মাসিক বসুমতী

৭ম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
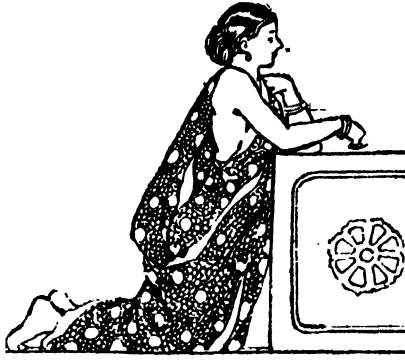
৭ম বর্ষ] ১৩৩৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ের নামানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্র-সূচী

৭ম বর্ষ]　　আষাঢ়, ১৩৩৫　　[৩য় সংখ্যা

৩

সমাজভেদ

আমরা যখন বিলাতে যাত্রা করি, তখন সেটা কেবল দেশ হইতে দেশান্তরে যাওয়া নয়, আমাদের পক্ষে সেটা একটা নূতন সংসারে প্রবেশ করা। জীবনযাত্রার বাহ্য প্রভেদগুলাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না। আমাদের সঙ্গে বসনে ভূষণে আহারে বিহারে বিদেশীর সাদৃশ্য থাকিবে না, সেটা ত ধরা কথা, সুতরাং সেখানে বিশেষ বাধে না। কিন্তু কেবল জীবনযাত্রায় নহে, জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে, সেইখানেই দিক্ নির্ণয় করা হঠাৎ আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম সেটা অনুভব করিতে সুরু করি। বুঝিতে পারি, এখন হইতে আমাদিগকে আর এক সংসারের নিয়মে চলিতে হইবে। হঠাৎ এতখানি পরিবর্ত্তন মানুষের পক্ষে অপ্রিয়—এই জন্যই আমরা সেটাকে মানিয়া চলি কিম্বা মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলি, ইহাদের চালচলনটা অত্যন্ত বেশী কৃত্রিম।

আসল কথা, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার যে প্রভেদ আছে, সেইটেই গুরুতর। পরিবার এবং পল্লী-মণ্ডলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলা বাঁধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের কি করিতে আছে এবং কি করিতে নাই, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কৃত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

কিন্তু যে সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে, সেই সমাজের পরিধি বড় নহে এবং সে সমাজ আত্মীয়সমাজ। সুতরাং আমাদের আদবকায়দাগুলি ঘোরো রকমের। বাবার সামনে তামাক খাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া

মামাশ্বশুরের নিকটসংস্রব বর্জ্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে, তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক।

বলিতে গেলে বর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের পল্লীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মত গাঁথিয়া তুলিয়াছে। আমরা একটা সমাপ্তিতে আসিয়াছি। ভারতবর্ষ তাহার সমাজ-সমস্যার একটা সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া বসিয়াছে এবং মনে করিয়াছে, এই ব্যবস্থাকে চিরকালের মত পাকা করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আর কোনো ভাবনা নাই। এই জন্য বর্ণাশ্রম-সূত্রের দ্বারা পরিবার সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল, ভারতবর্ষ তাহার একটা কোনো সমাধানে আসিয়া পৌছিতে পারিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র জাতির বিরোধকে সে একরকম করিয়া মিটাইয়াছে বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে এক-রকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে; বৃত্তিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বযুদ্ধকে নিরস্ত করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে সৃষ্টি করে, জাতিভেদের বেড়ার দ্বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। এক দিকে যদিও ভারতবর্ষ সমাজের নেতা ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য বর্ণের স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি সমস্ত সুখ-সুবিধা, শিক্ষা-দীক্ষাকে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ছোট-বড় প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এই জন্য ভারতবর্ষে ধনী যাহা ভোগ করে, নানা উপলক্ষ্যে সর্ব্বসাধারণে তাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় দিয়াও পরিতুষ্ট করিয়াই ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খ্যাতিলাভ করে। আমাদের দেশে ধনি-দরিদ্রের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই—এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

পাশ্চাত্য সমাজ পারিবারিক সমাজ নহে, তাহা জনসমাজ। তাহা আমাদের সমাজের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরি-মাণে সে নাই, যতটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিষ বোঝায়, তাহা য়ুরোপে বাঁধে

এই ছড়াইয়া-পড়া সমাজের স্বভাবই এই, এক দিকে তাহার বাঁধন যেমন আল্‌গা, আর এক দিকে তাহা তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। তাহা গদ্য-রচনার মত। পদ্য-ছন্দের মত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া চলে বলিয়া, তাহার বাঁধনটি সহজ; কিন্তু গদ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এই জন্যই এক দিকে সে স্বাধীন বটে, আর এক দিকে তাহার পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা চিন্তাবিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বারা বড় করিয়া বাঁধা।

ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেন না, সে আত্মীয়-সমাজে নাই। আত্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহ্য করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। রেলের লাইন যদি আমার একলার হয় অথবা আমার গুটিকয়েক ভাই-বন্ধুর অধিকারে থাকে, তাহা হইলে যেমন খুসি গাড়ি চালাইতে পারি এবং পরস্পরের গাড়িকে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে, যখন তখন দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি। কিন্তু সাধারণের রেলের রাস্তায় যেখানে বিস্তর গাড়ির আনাগোনা, সেখানে পাঁচ মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম হইলেই নানাদিকে গোল বাধিয়া যায় এবং তাহা সহ্য করা শক্ত হয়। আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশ-কালের বন্ধন নিতান্তই আল্‌গা;—আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ঐখানেই সব প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে বাহ্য ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত যাহা তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের যাহাতে সুবিধা, সেইটের অনুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখা-

ঢাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয়সমাজ নহে, সেখানে আত্মীয়সমাজের ঢিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভৎস হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।

য়ুরোপের এই ব্যাপক সমাজ এখনো কোনো সমাধানের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহা আচারে ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনো আপনাদিগকে কোনো একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া পরস্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। য়ুরোপ কেবলি পরীক্ষা, পরিবর্ত্তন এবং বিপ্লবের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের, ধর্ম্মসমাজের সঙ্গে কর্ম্মসমাজের, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, কারবারীদলের সঙ্গে মজুরদলের কেবলি দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের মত তাহার যাহা হইবার, তাহা হইয়া যায় নাই—এখনো তাহার আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গারের জন্য প্রস্তুত আছে।

কিন্তু আমরাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া সমাজব্যবস্থা চিরকালের মত পাকা করিয়া মৃতদেহের মত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? সময় উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছু দিনের মত খাড়া রাখিতে পারি, কিন্তু অবস্থাকে ত সেই সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরা মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন ঘোরো সমাজ লইয়া আর আমাদের চলিতেই পারে না। ইহারা কেবলমাত্র বাপ দাদা খুড়া নহে, ইহারা বাহিরের লোক, ইহারা দেশবিদেশের মানুষ,—ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে সতর্ক ও সচেষ্ট হইতেই হইবে—অন্যমনস্ক হইয়া ঢিলেঢালা হইয়া যদি চলিতে যাই, তবে এক দিন অচল হইয়া উঠিবেই।

আমরা সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়া উদ্ভিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষকেও অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই—এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনন্তকাল উচ্চারণ করিতেও চাই না। এক একটা বড় বড় বিপ্লবের পর সমাজের ক্লান্তি আসে, সেই সময়ে সে দ্বার বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া ঘুমের আয়োজন করে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়মের হুড়কায় সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে অনন্ত ঘুম বলিয়া গর্ব্ব করিলে সেটা হাস্যকর অথচ সকরুণ হইয়া উঠিবে। ঘুম ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ রাত্রি থাকে:—বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই, বড় বড় দোকান বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু সকালে যখন চারিদিকে হাঁকডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চুপচাপ পড়িয়া থাকিলেও আর কেহ যখন চুপ করিয়া নাই, তখন সনাতন দরজা আটেবাটে বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠকিতে হইবে।

রাত্রিকালের বিধান সাদাসিধা; তাহার আয়োজন স্বল্প; তাহার প্রয়োজন সামান্য। এই জন্য সমস্ত ব্যবস্থা বেশ সহজেই সম্পূর্ণ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া চোখ বোজা সম্ভব হয়; তখন যেখানে যেটি রাখি, সেখানে সেটি পড়িয়া থাকে, কারণ, নাড়া দিবার কেহ নাই। দিনের বেলাকার ব্যবস্থা তত সহজ নহে; এবং তাহা ভোরের বেলা একবারের মত সারিয়া ফেলিয়া তাহার পর সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে থাকা চলে না। ঘাড়ের উপর কাজ আসিয়া পড়ে, নূতন নূতন চেষ্টা করিতেই হয়, এবং বাহিরের জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রাকে বনাইতে না পারিলে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম্ম সমস্তেরই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত বাঁধা নিয়মের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিয়াছে। সেই অবস্থাটা গভীর আরামের বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে, তাহা নহে। আঘাত সব চেয়ে কঠিন বেদনাজনক—যখন তাহা ঘুমন্ত শরীরের উপর আসিয়া পড়ে। দিনের বেলা সেই আঘাতের সময়, এই জন্য দিনে জাগিয়া থাকাই সব চেয়ে আরামের।

ইচ্ছা করি আর না করি, সর্ব্বাঙ্গে আলস্য জড়াইয়া থাক্ আর না থাক্, আমাদের জাগিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হইতে ও বাহির হইতে আঘাত পাই-

সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে; একান্নবর্ত্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে: এবং সমাজে ব্রাহ্মণের পদ ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে, "ব্রাহ্মণসমাজ" প্রভৃতি সভা-সমিতির সাহায্যে ব্রাহ্মণ চীৎকার শব্দে আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার দুর্ব্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পল্লীসমাজের পঞ্চায়েৎ প্রথা গবর্মেণ্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না, দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারী অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটর গাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে; এবং বড় বড় কুল-শীল আপনার যথাসর্ব্বস্ব এবং কন্যাটিকে লইয়া বি, এ-পাশ-করা বরের পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই সমস্ত দুর্লক্ষণের জন্য কলিযুগকে, বিদেশী রাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রভু তাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন. আমাদের সনাতন শয়নাগার হইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জোর করিয়া চোক বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি সৃজন করিতে পারিব না। যে পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিয়া আনিতেই হইবে;—যদি আদর করিয়া তাহাকে না আনি, তবে সে আমাদের দ্বার ভাঙিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বার কি এখনি ভাঙে নাই?

অতএব আবার একবার আমাদিগকে নূতন করিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য ভাবিতে হইবে। য়ুরোপের নকল করিয়া সে কাজ চলিবে না; কিন্তু য়ুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুতঃ ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্যকে সত্যরূপে না জানিলে নিজেকে কখনই সত্যরূপে জানা যায় না।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম. সে কথাটা এই যে, আমাদের ঘোরো ঢিলাঢালা অভ্যাস লইয়া য়ুরোপীয় সমাজে আমাদের অত্যন্ত বাধে। কোনোমতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, সকলেই আমাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ আমার জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। আমরা আদর-আবদারের জীব, আত্মীয় সমাজের বাহিরে আমাদের বড় বিপত্তি। আমি এখানে আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমাদের ঘরের ছেলের পরের বাড়িতে প্রবেশের অভ্যাস নাই বলিয়াই আমাদের অধিকাংশ ছাত্র এখানে আসিয়া পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু এখানকার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এখানকার সমাজ বড় বলিয়াই এখানকার সমাজের দায় বেশি। সেই দায় স্বীকার করিলে তবে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের মিল হইতে পারে। সেই মিল না ঘটিলে এখানকার সব চেয়ে বড় শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। কারণ, এখানকার সব চেয়ে বড় সত্য এখানকার সমাজ। বস্তুত এখানকার সবচেয়ে বড় বীরত্ব বড় মহত্ত্ব এখানকার সমাজের ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে নহে। প্রশস্ত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসম্মান এখানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে; এইখানে ইহারা মানুষ হইতেছে এবং নানাপথে মানুষের কাজে আপনাকে দান করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে—বৃহৎসমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; এখানেও আসিয়া যদি তাহারা স্কুলের কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এখানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মনুষ্যত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিবেণী

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজকার্য্যের মধ্যে একটুখানি অবসর করিয়া রামপাল সন্ধ্যার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে, সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যারাণী সন্ধ্যা-পূর্ব্বের পশ্চিমাকাশের মতই সমুজ্জ্বল রক্ত-পট্টে তাহার সুকুমার তনুদেহ আবৃত করিয়া মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছিল। পরিশ্রমে তাহার ললাটের উপর নিটোল মুক্তাবলীর মতই ঘর্ম্মবিন্দুগুলি সঞ্চিত হইয়াছিল, চূর্ণালক-গুলি তাহাতে বিজড়িত হইয়া গিয়া আকাশের অর্দ্ধ-চন্দ্রের আশে-পাশে খণ্ড মেঘের মতই তাহা সুদৃশ্য দেখাইতেছিল। আনন্দোজ্জ্বল স্মিত মুখ স্বামীর দিকে ফিরাইয়া সে কহিল,—

"হাঁ, ডেকে পাঠিয়েছিলেমই ত, নৈলে যে আর দর্শনই পাইনে।"

রামপাল ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া কহিলেন,—"দর্শন দেবার অবসর কৈ, রাণি ? তবু ত সময় পেলেই ছুটে আসি। ঐ দেখ না, এক্ষণই আবার আমায় ফিরে যেতে হবে। প্রজা-পতি নন্দী বিশেষ কার্য্যের জন্য আমার প্রতীক্ষা করছেন।"

সন্ধ্যা তাহার আরব্ধ কার্য্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল, স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে পার্শ্বের মুক্তদ্বার গৃহের দিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল,—"আমার একটা নিবেদন আছে, আজই আমি তোমায় সেটা জানাতে চাই। একটুখানি ব'সে শুনে যেতে হবে, তা' তোমার যতই কায থাক।"

রামপাল স্ত্রীর মুখের দিকে প্রীত নেত্রে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"নিশ্চয়ই সেটা শুনে যেতে হবে বৈ কি! নন্দী-মহাশয়'না হয় একটুখানি অপেক্ষাই করবেন।"

"বসো" বলিয়া সন্ধ্যা স্বামীকে একখানা আসন জোগাইয়া দিল এবং তিনি আসন গ্রহণ করিলে নিজে তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিল। ইহা দেখিয়া রামপাল হাসিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তাহাকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, কি বলবে, বল্লে না ?"

"এই যে বলি—" এই বলিয়া নিজেকে একটুখানি প্রস্তুত করিয়া লইয়া সন্ধ্যা সহসা ঈষৎ মিনতির স্বরে কহিল,—"আজ বরেন্দ্রী অভিযানের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হওয়ায় দেব-ব্রাহ্মণের তুষ্টির জন্য অনেক কিছুই ত দান করলে, ভিখারীদেরও যথেষ্ট ভিক্ষা দিয়েছ, আমায়ও কিছু দাও—"

রামপাল হাসিয়া উঠিলেন,—হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভিক্ষা! ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চাও, সন্ধ্যা! কি আছে তার, কি দেবে সে তোমায় ? সবই ত তোমায় দিয়ে দিয়েছি, রাণি!"

সবই ত দিয়ে দিতে পার নি, যেটুকু দিতে বাকি আছে, আজ সেইটুকুই আমি ভিক্ষা চাইছি। দেবে না ?"

"সে কি সন্ধ্যা ? যা তোমায় আজও আমি দিতে পারি নি, আছে কি তেমন কিছু ? কৈ, মনে ত পড়ে না ?" রামপালের স্বরে ঈষৎ বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

"আছে বৈ কি, নৈলে কি আর চাইছি ? বল দেবে ?" সন্ধ্যা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"আগে বলতে হবে কি তোমায়—আজও আমার দিতে বাকি আছে ?"

"আত্মাভিমান!" এই বলিয়া সন্ধ্যা টিপিটিপি হাসিতে লাগিল।

"ওঃ"—বলিয়া রামপাল তাহার সেই হাস্যস্ফুরিত রক্তাধরে হাসিয়া চুম্বন করিলেন,—"সেটাও তোমার চাই ? ঐটুকু বাকি রাখো না, রাণি। সবই ত কেড়ে নিয়েছ।"

সন্ধ্যা প্রাণ-খোলা সুখের হাসি হাসিতে হাসিতে কহিল, "না, তা হবে না, ঐটেই আমার আজকের দিনে চাই। বল, আমি আজ যা ভিক্ষা চাইবো, তা' দেবে ?"

"যদি অসাধ্য না হয়, তা হ'লে তোমার প্রার্থনা যে অপূর্ণ থাকবে না, এ-ও কি আবার স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে, রাণি! তা' কি তুমি জানো না ?"

সন্ধ্যা এ কথার পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তাহার মনের মধ্যে যে কথাটা তাহার মনকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল, সেটা বলিতে সে মনে মনে একটুখানি ভয়ও পাইতেছিল। অথচ এখন আর পিছাইবারও উপায় নাই, এতখানি ভূমিকার পর আর তাহা না বলাও চলে না। রামপালের মনের মধ্যে যে সাগর এবং প্রজাপতি নন্দীর প্রতীক্ষিত মূর্ত্তিটাই আপাততঃ তাঁহার প্রিয়তমা সন্ধ্যাদেবীর অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বাহ্য লক্ষণে যতই ঢাকা থাকুক, তবু অনুভবে জানা যায়, বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে তিনি যে কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র যাইবেন, তাহাও সন্ধ্যা জানে। কাযেই কোনমতে চোখ-কান বুজিয়া তাহাকে কথাটা বলিয়া ফেলিতেই হইবে, আর বিলম্ব করা অবিধেয়!

স্বামীর বাহুমূলে মুখখানা লুকাইয়া সন্ধ্যা ধীরকণ্ঠে কহিল, "তুমি লক্ষ্মীশূরের মেয়ে মদনিকাকে বিয়ে করতে সম্মত হও।"

রামপাল বাস্তবিকই ততক্ষণে নন্দীর বিষয়েই উৎকণ্ঠানুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যা যে এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষই আছে, শুদ্ধ সে তাঁহাকে একটিবার কাছে পাওয়ার সুখের জন্যই ছল করিয়া ডাকাইয়া আনিয়াছে, ইহাও সস্নেহ কৌতুকে মনে করিয়া তাহার প্রতি সপ্রেম অনুকম্পায় তাঁহার অনুরক্ত চিত্ত গভীরতর অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কার্য্যহানির কোন ক্ষোভই তাঁহার কাছে যেন স্থান করিতে পারিতেছিল না। সহসা এই কথাটা যেন কোথা হইতে নিক্ষিপ্ত একটা তীক্ষ্ণ তীরের ফলকের মতই তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আসিয়া বিদ্ধ করিল। ইহা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ত্বরিতস্বরে কহিলেন, "কি বল্লে? কি করতে বল্লে আমায়, সন্ধ্যা?"

স্বামীর সচমক সাশ্চর্য্য প্রশ্নে সন্ধ্যা ঈষৎ প্রমাদ গণিয়াছিল। তাহার ভয় হইল, হয় ত এখনই তাহার তেজস্বী ও আত্মমর্য্যাদাশীল স্বামী তাহাকে তিরস্কার করিয়া চলিয়া যাইবেন, আবার কত দিনে দেখা হইবে, তাহারও ঠিক নাই। এমন করিয়া যদি আজ এই মনোমালিন্যের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছেদ ঘটে, যত দিন না আবার দেখা হইবে, সন্ধ্যার যে সে মৃত্যুতুল্য শাস্তি চলিবে। তাই সে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া গিয়া প্রথমটা কথা কহিতে পারে নাই। তাহার পর সহসা কিসের বলে যেন একটুখানি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়া সে তাহার লুকানো মুখখানা তুলিয়া অথচ স্বামীর দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিল,—"মন্দারের রাজকন্যা মদনদেবীকে বিয়ে করলে যখন আমাদের সব দিকে সুবিধা হচ্ছে, তখন তোমার এতই বা তাতে আপত্তি কেন?"

রামপাল স্থিরনেত্রে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, কহিলেন, "তোমার তা হ'লে তাতে আপত্তি নেই?"

তাঁহার কণ্ঠ বিশেষরূপ গম্ভীর। এই স্বরের জটিলতার মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক উদ্দেশ্যটাও বেশ বুঝিতে পারা গেল না। তথাপি সামান্য ক্ষণ নীরব থাকিবার পর সন্ধ্যাও যথাসাধ্য সহজভাবেই ইহার উত্তরে সংক্ষেপে কহিল,— "না—"বলিয়াই সে সযত্নে স্বামীর দৃষ্টি হইতে নিজের মুখখানাকে গোপন করিবার জন্য চেষ্টা করিল।

রামপাল অধিকতর গাম্ভীর্য্য-বিরসকণ্ঠে কহিলেন— "আমার 'পরে তোমার এই রকম ভালবাসাই বটে! না হ'লে আর অন্যের হাতে আমায় বিলিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ!" এই বলিয়াই তিনি অসন্তোষপূর্ণ দৃষ্টি সন্ধ্যার নত মুখে তীক্ষ্ণভাবে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত বুঝিয়া সন্ধ্যাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিল—"রাগ ক'রে চ'লে যেও না, শুনে যাও—"

সন্ধ্যার কণ্ঠে যে করুণ মিনতি ধ্বনিত হইল, তাহাতে রামপালকে গতিহীন করিয়া দিল, তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "কি শুনবো? তোমার পাগলামী? সে শুনবার অবসর আমার নেই।"

সন্ধ্যা কাছে সরিয়া আসিয়া স্বামীর হাত দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিল।

"পাগ্‌লামী কেন বলছো? আমি কি তোমার সময়ের দাম জানি না? আন্তরিকভাবেই এই অনুরোধ—এই ভিক্ষা আমি তোমায় জানাচ্ছি, তুমি মদনদেবীকে বিয়ে ক'রে মন্দারেশ্বরকে সহায় লাভ কর।" এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার কহিল, "বরেন্দ্রীর মঙ্গলের জন্যে এত অসাধ্যসাধন যখন করতে পারছো, আর এটা পারবে না?"

রামপাল সন্ধ্যার এই কথায় ও তাহার ধীর গম্ভীর শান্তভাবে যেন সহসা অতিমাত্র বিস্ময়ানুভব করিলেন। সন্ধ্যা যে এতখানি ভাবিতে, বুঝিতে আবার বুঝাইতেও শিখিয়াছে, তাহা যেন তাঁহার ধারণায় ছিল না। ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারার মতই

স্নিগ্ধোজ্জ্বল নেত্র দুইটি তাঁহার মুখের উপরে নির্নিমেষে স্থাপিতা হইল। স্বভাবসুন্দর মুখখানিতে কি অপূর্ব্ব প্রীতিপূর্ণ মাধুর্য্য! একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক রামপালদেব স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বরেন্দ্রীর মঙ্গলামঙ্গল আমারই চিন্তনীয়, তোমার স্বামীর শুভাশুভই তোমার প্রধান দ্রষ্টব্য, সন্ধ্যা। মিছামিছি এত সব ভেবে মাথা খারাপ করো না, বরেন্দ্রীর জন্য যা সঙ্গত উপায়, তা আমিই করবো।"

স্বামীর কথায় সন্ধ্যা ঈষৎ লজ্জা পাইলেও সে তাহা প্রকাশ করিল না, বরং ঈষৎ সাহসের সহিত কহিল—"রাজাধিরাজ! বরেন্দ্রীর মঙ্গলের উপরেই যে আমার স্বামীর মঙ্গল নির্ভর ক'রে রয়েছে। বরেন্দ্রী যে তোমার কত প্রিয়, তা কি সত্যিই আমি জানি না?"

রামপাল আবারও বিস্মিত হইলেন। সেই সন্ধ্যা! ভীরু নির্ব্বোধ অশ্রু-বিবশা! এ কি তাঁহার সেই সন্ধ্যা? হাতে করিয়া তাহার সতীতেজোদীপ্ত স্মিত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আবেগপূর্ণচিত্ত প্রেমিক হর্ষস্মিত মুখে কহিয়া উঠিলেন, "তা যদি জেনে থাক, সন্ধ্যা! তা হ'লে এটাও জেনো যে, তোমার স্বামী তার প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির উদ্ধারসাধন করতে তার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জেনো, তার জন্য সে তার আরও এক জন প্রিয়তম প্রাণতমকে উৎসর্গ করতে পারবে না। মন্দারেশ্বরের সহায়তালাভই যে বরেন্দ্রী উদ্ধারের একমাত্র উপায়, তাও ত নয়। আর তাও যদি হতো, তা হ'লেও সে পথ ছেড়ে আমায় পথান্তরের সন্ধানে যেতে হ'তো। সন্ধ্যা! এ জীবনে তুমি ভিন্ন আর কোন নারী আমার এ বুকে স্থান লাভ করতে পারে না, এ যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি জানেন বলেই এত বাধা-বিপত্তিবিপ্লবের মাঝখান দিয়েও আবার তিনি তোমায় আমার কাছে এনে দিয়েছেন। এ জীবনে তুমিই আমার একমাত্র প্রিয়তমা, আর কারু আমি হ'তে চাই নে। আর তুমিও আমায় অন্যের হাতে বিলিয়ে দিতে উদ্যোগী হ'ও না, রাণি! তোমার হয়েই থাকতে দিও। তাতেই আমি সুখী হব।"

এই বলিয়াই রামপাল কর্ত্তব্যবিমূঢ়া বাক্যহীনা সন্ধ্যাকে নিজের আবেগস্পন্দিত বুক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার আনত মুখে প্রগাঢ় চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, এবং পরক্ষণেই তাহাকে কথা কহিবার অবসরমাত্র না দিয়াই ত্রস্তপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

স্বামী দৃষ্টিপথের অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেলে, রুদ্ধকণ্ঠা সন্ধ্যারাণী আত্মগতই কহিল—"রাজাধিরাজ! ক্ষুদ্র সন্ধ্যাকে এত ভালবাস তুমি? সে যে তোমার কত অযোগ্যা, তা জেনেও কি এ ভালবাসার সমুদ্র তোমার এতটুকুও শুকাতে জানে না। কিন্তু সে-ও কি তোমার এত প্রেমের এতটুকু ক্ষুদ্র প্রতিদানও দিতে পারবে না? যে বরেন্দ্রী তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সেই বরেন্দ্রী লাভের সহায়তা যখন এ থেকে হ'তে পারে, তখন আমার জন্যে তুমি যে তা ত্যাগ করবে, সে ত আমার কিছুতেই সইবে না। তোমায় হারিয়ে যে আমি তোমার মূল্য বুঝেছি।"

নবম পরিচ্ছেদ

এ পর্য্যন্ত আর সে দিনের সেই প্রসঙ্গটাকে উত্থাপিত হইতে না দেখিয়া রামপাল তাঁহার পক্ষে সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গটাকে একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সন্ধ্যাও সে কথা ভুলিয়াছে। সন্ধ্যা কিন্তু সে কথা আদৌ ভুলিয়া যায় নাই, তবে ইদানীং স্বামীকে বিশেষরূপেই শ্রম-শ্রান্ত ও চিন্তান্বিত দেখিয়া এ কথার উল্লেখে সে আর ভরসা করে নাই। আজ রামপাল অনেক দিন পরে বিজয়ীর আনন্দ ও গৌরবপূর্ণ চিত্তে কতকটা সুস্থিরভাবে যখন তাহার মন্দিরে বিশ্রাম লইতে আসিলেন, তখন সে-ও অনেকখানি সুস্থ-মনে নিজের রুদ্ধ ইচ্ছাকে পুনর্স্থাপনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শয্যায় শায়িত স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিয়া পড়িয়া সন্ধ্যাও তাহার পদসেবায় মনোযোগী হইতেই রামপাল হাত বাড়াইয়া তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"পায়ে আমার কিছুই হয় নি, তুমি তার চেয়ে আমার কাছে এস।"

সন্ধ্যা তাহার কোমল ছোট্ট হাতখানি স্বামীর কঠিন চরণ-তলে স্থির রাখিয়া মিনতি করিয়া কহিল,—"নাই বা হ'ল, অমনিই কি দিতে নেই? দিই না একটু পা টিপে! লক্ষ্মীটি!"

রামপাল পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন,—"ও সব বদ অভ্যাসে কাম কি? যাকে রাতদিন হাতী চ'ড়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিক্‌বিদিকে দৌড়ে বেড়াতে হবে, তার কি অত সুখী হ'তে গেলে চলে রে? তুমি বরং আমার কাছে স'রে এস, কত দিন তোমায় দেখিনি, একটু দেখি।"

সন্ধ্যা অগত্যাই পা ছাড়িয়া দিয়া স্বামীর বুকের পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

"তুমি চিরদিনই আমায় যেন কচি খুকীটি মনে করবে, না? কিচ্ছু একটু করতে দেখলেই ব্যস্ত হও। কেন বল ত?"

হাসিয়া রামপাল কহিলেন,—"সন্ধ্যা বলতে আমার সেই নোলক-পরা ঝাপটা-কাটা ঘোমটাটানা খুকীটিকেই মনে পড়ে যে।"

সানন্দে—উল্লাসে ক্ষণকাল অসীম সুখে সন্ধ্যার চোখের পাতা দু'খানি যেন নিমীলিত হইয়া আসিল। গভীর একটা তৃপ্তিভরা শ্বাস গ্রহণ করিয়া সে ছোট্ট একটি বালিকার মতই সহকার তরুর বক্ষোবিলম্বিতা লতার মতই তাহার স্বামীর বিশাল বক্ষে লীন হইয়া রহিল। স্বামি-গৌরবে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন ভরা ভাদ্রের পূর্ণা নদীর মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিনও তাই কিছু বলা ঘটিল না।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রামপালপক্ষীয় বিজয়ী সেনা-সমাবেশিত জয়স্কন্ধাবার ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গ রামপালের হস্তগত হইয়া গেল, পরে নৌকা-মেলক দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া মহাপ্রতীহার শিবরাজ কৈবর্ত্ত-সেনার সহিত ভীষণ যুদ্ধে উত্তরবঙ্গের দ্বার পর্য্যন্ত পাল অধিকার পুনঃসংস্থাপন করিলেন। এ সংবাদে গঙ্গাতীরবর্ত্তী জয়স্কন্ধাবারে সে দিন উৎসবের আনন্দের সীমা রহিল না। মথন দেব, সুবর্ণদেব, প্রজাপতি নন্দী, বোধিদেব, দেবরক্ষিত, সায়ন, রুদ্রশেখর, কাহ্নুরদেব ও শিবরাজ সকলেই এইবার সম্মিলিত সামন্তচক্র-সম্বলিত সকল বল একত্র করিয়া বরেন্দ্রী আক্রমণে প্রস্তুত হইবার পরামর্শ দান করিলেন, মথনদেব সে দিনও একবার দুঃখের সহিত বলিলেন,—"এই সময়ে আমরা লক্ষ্মীশূরকে বন্ধুস্বরূপে পেতে পারলেই আমাদের আর কোনই ভাবনার বিষয় ছিল না। তা' যাই হোক, এতেও আমাদের আটক হবে না। কয়দলের পথেই আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে।"

সুবর্ণদেব জ্যেষ্ঠের এই মন্তব্যের ইঙ্গিত বুঝিয়াই যেন ইহার সমর্থন জন্যই বলিতে গেলেন—"কিন্তু এটা যখন রামপালের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, তখন—"

রামপাল মাতুলের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই সহাস্য মুখে অথচ স্নেহের স্বরে তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাঁর নিজের ছেলের বীরত্বের গাথা আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্রই গীত হচ্ছে, তিনি তাঁর ভাগিনেয়কে পৌরুষহীনতার আশ্রয় নেবার পরামর্শ নিশ্চয়ই দিচ্ছেন না! যা হোক, মাতুল! আমাদের এই অভিযানে কে কোন্ পদ গ্রহণ করবেন, এখন হ'তেই সেটা স্থির ক'রে ফেলা কর্ত্তব্য। বোধিদেব, প্রজাপতি নন্দী, শিবরাজ, সায়ন, কাহ্নুর এঁদের কার প্রতি কোন্ ভার দিতে চান? নৌ-কটক আমাদের যথেষ্ট প্রবল রয়েছে। বোধিদেব, শিবরাজ, ছোটমামা এঁরা বোধ হয় ঐদিকে থাকাই ভাল। কি বলেন, মাতুল?"

মথনদেব মনে মনে ঈষৎ দুঃখিত হইয়াও প্রকাশ্যে তাঁহার প্রিয় ভাগিনেয়ের অজ্ঞাতই রাখিয়া যথাকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এ বিবাহ হইলে রামপালের জনবল অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে পারিত ও তাঁহাকে আরও সহজেই বরেন্দ্র-বিজয়ী করিয়া দিত। কিন্তু তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা জানিতেও ত আর মথনদেবের বাকি নাই। কাযেই শেষ আশাটুকু একপ্রকার ত্যাগই করিলেন।

সন্ধ্যা সে দিন স্বামীর বিজয়-সংবর্দ্ধনা শেষ করিয়া এক নিশ্বাসে কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, "বল, যা বলবো, রাগ করবে না?"

রামপাল হাসিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন, "তোর উপর কবে রাগ করেছি রে?"

"ঈস! তা' বই কি! একটুখানি মনের মতন কথা না হ'লেই রেগে যেন যান না! আবার বলা হচ্ছে, কবে রাগ করেছি রে? ইঃ! ভারি শান্ত কি না!"

রামপাল তাহার কৃত্রিম অভিমানে ফুলানো ঠোঁটের উপর অঙ্গুলীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"তবে কিচ্ছু বলবি কেন? বলিস নি।"

সন্ধ্যা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আবদারের সুরে কহিল, "না, তা হবে না, রোজ রোজই তুমি আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেবে, সে আমি শুনবো না কিন্তু। আজ তোমায় আমার কথা শুনতেই হবে।"

রামপাল তাহার ভূমিকা দেখিয়াই বক্তব্যবিষয় বুঝিয়াছিলেন। সে দিনের সেই রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্বের পুনঃ পরিচয়ে মন তাঁহার খুব সন্তুষ্ট রহিল না, তথাপি মুখের উপর হাস্য-সরসতা রক্ষা করিয়াই মিষ্ট স্বরে কহিলেন—"তবে বল, শুনি।" বলিয়া তিনি স্থির হইয়া মনোযোগের অভিনয় করিলেন। এমন করিয়া শুনিতে গেলেই কি এখনো সব কথা

বলিতে পারা যায় ? সন্ধ্যার যেন মনের বল কমিয়া আসিতে লাগিল। তাহার বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল। এই হাসি-মুখে তাহাকে এখনই হয় ত ছায়াপাত করিতে হইবে ! এত প্রেমের এই প্রতিদান—এই কি তাহার কাছে ইঁহার পাওনা হইল ! অথচ কর্ত্তব্যও যে কঠোর ! তাঁহাদের পরম হিতৈষী মাতুল সে দিন বলিয়া দিয়াছেন, 'রামপালের এই মহৎ উপকারটুকু শুধু বৌমার উপরেই নির্ভর কচ্ছে। তিনি যেন মনে রাখেন, এর সঙ্গে পালসাম্রাজ্যের উত্থান-পতন জড়িত। সামান্যা স্ত্রীর মতন সপত্নী-ভীতির বশে যেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ না ক'রে ফেলেন !' দৃষ্টি নত ও অপরাধীর মতই সভয়-সন্দিগ্ধ স্বরে সন্ধ্যা কোনমতে বলিয়া ফেলিল, "তুমি মদন-দেবীকে বিয়ে কর—লক্ষ্মীটি ! তোমার পায়ে পড়ি।"

"তোকে ভূতে কিলোচ্ছে, না ?"

স্বামীর মুখে সরোষ তিরস্কারের পরিবর্ত্তে এই লঘু বিদ্রূপে ভীতা সন্ধ্যার একটুখানি ভরসা বাড়িয়া গেল। সে তখন ঈষৎ হাস্যের সহিত স্বামীর মুখের দিকে চকিত নেত্রপাত করিয়াই কোমলকণ্ঠে কহিল—"না, আমি সুখেই আছি। যে নামের আশ্রয় নিয়েছি, ভূতে নাগাল পেলে ত ! তুমি কি মনে কর, এতে আমি অসুখী হব ?"

রামপাল ব্যঙ্গ পরিহার করিয়া সহজস্বরে কহিলেন, "না, আমি অসুখী হব।"

ধীরকণ্ঠে সন্ধ্যা বলিল—"অসুখী হবে ! কিন্তু তুমি কি আজ ভুলে গেছ যে, পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্য—দেশের জন্য কত বড় বড় স্নেহ প্রেম ভালবাসাকে তুচ্ছ বস্তুর মতই অবলীলাক্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে কত বড় আত্মোৎসর্গ ক'রে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় !"

রামপাল চমকিয়া উঠিলেন, সচমক চকিত কটাক্ষে তাঁহার ক্ষুদ্র সন্ধ্যার ছোট্ট যুঁইফুলের মতই সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিলেন। সেই নম্র-কম্র শান্ত মধুর সরল মুখ, ঢল ঢল চোখ দুটি প্রেমে নির্ভরতায় তেমনই পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহার মধ্যে আর সেই ছল ছল ভীতিবিহ্বলতার যেন কোথাও স্থান নাই। সে যেন আজ আপনার পূর্ণতায় আপনিই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া অন্যকেও তাহারই অংশ বিলাইয়া দিতে উদ্যত। যে মলয় বহিলে ক্ষুদ্র লতিকা হেলিয়া পড়িত, আজ যেন সে কানন-ব্রততীরূপে অপরের ভারবহনে সমর্থা ! রামপাল সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার নতমুখে নিজের পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রাখিয়া পরে ঈষৎ সরিয়া আসিয়া তাহার নতমুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিলেন,—"পাগলের কথা এখনও মনে ক'রে রেখেছিস্ ? তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিল রে ! আর সেই অভিমানে নিজেকে আহুতি দিবি ?"

সন্ধ্যা ত্রস্তে মুখখানা সরাইয়া লইয়া, ঊর্দ্ধদিকে আহত মুখ তুলিয়া, বিস্ফারিতনেত্রে স্বামীর ঈষৎ সলজ্জ মুখের দিকে চাহিল, "না না, ও কথা তুমি বলো না ! বল, এ কথা তোমার মনের কথা নয় ? অভিমানে আপনাকে আহুতি দিচ্ছি ? ছি ছি, কি কথা বল্লে ! তোমার উপর অভিমান ? এই এত স্নেহ, এত আদর, এত ভালবাসা, এর বদলে প্রতিশোধ ! ছি ছি, না ; ও কথা বিশ্বাস করো না, মনে করো না গো। তোমার দুটি পায়ে পড়ছি।"

রামপাল ক্ষণকাল বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া নীরবে চাহিয়া রহিলেন। শরতের রাত্রি অত্যুজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়ী, অদূরে পরিপূর্ণা জাহ্নবীর গদগদ কলতান, তীর তরুদলে সুশোভিত। সুশ্যামল তীরভূমে রাজাধিরাজ রামপালদেবের বিজয়-স্কন্ধাবারের বিচিত্র পট্টাবাস সারি সারি শোভা পাইতেছে। গঙ্গার রজত-তরঙ্গের উপর নৌ-কটকের সারি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল রণতরী হইতে অসংখ্য আলোকমালা গঙ্গাবক্ষে সুবর্ণখচিত বস্ত্রোপরি হীরকহারের মতই জ্যোৎস্নাজালের মধ্যে ঝলমল করিতেছিল। পট্টাবাসের একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে জাহ্নবী-সলিল-সম্পৃক্ত শীতল নৈশ বায়ু রাজকীয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া গৃহবাসীর উষ্ণ শোণিতে ঈষৎ শীতলতা আনিয়া দিল।

আকস্মিক বিস্ময়াবেগ হইতে মুক্ত হইয়া উঠিয়া রামপাল ডাকিলেন—"সন্ধ্যা !"

"কি ?" বলিয়া সন্ধ্যা তাঁহার খুব কাছে ঘেঁসিয়া আসিল। উহাকে স্পর্শ করিয়া রামপালের সহসা বিষাদিত চিত্ত অনেকখানি সুস্থির হইলে তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"মদনদেবীকে বিয়ে না করেও যখন আমি বরেন্দ্রীর দ্বারে এসে পৌঁছতে পেরেছি, তখন অনর্থক এ বিয়েতে লাভটা কি, সন্ধ্যা ? তা হয় না।"

সন্ধ্যা স্বামীর দিকে না চাহিয়াই মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "তোমায় যে শুধু এরই জন্য আমি এত অনুরোধ করছিলেম, তাও নয়, এ ভিন্ন অন্য কারণও আছে।"

কৌতূহলহীন কণ্ঠে রামপাল প্রশ্ন করিলেন, "অন্য কারণ আছে ? সেটা কি ?"

সন্ধ্যা একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, "তোমায় এটা জানাবো না-ই মনে করেছিলেম, কিন্তু অগত্যাই জানাতে হ'লো, সে তোমায় ভালবাসে, তোমায় না পেলে সে জীবন বিসর্জ্জন করবে, তবু অন্যকে বিয়ে করবে না।"

"ক্ষেপেছ! কে বলেছে এমন কথা?"

"সে নিজেই বলেছে, আবার কে বলতে যাবে?"

"সে তোমায় নিজেই এই কথা বলেছে? খুব মেয়ে ত! যেমন তোমায় বোকা দেখেছে! তুমি অমনি এই সম্বাদে গ'লে গিয়ে তোমার স্বামীর ভাগ তাকে বেঁটে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ! কারণ, তোমার স্বামীতে তার লোভ পড়েছে, আশ্চর্য্য তুমি! বাঃ!"

সন্ধ্যার ক্ষণকাল কথা জোগাইল না, তাহার পর একটুখানি ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "তখন ত সে জানতো না যে, আমি তোমার কে, তাই না বলেছিল তার মনের কথা। জানলে কি আর বলতো?"

"তখনই বলেছিল না কি? নিশ্চয়ই সে জানতে পেরেছিল।"

সন্ধ্যা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"বাঃ! কেমন ক'রে জানবে? সে আমায় ভালবেসে তার মনের গোপন কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছিল। তখন ত তুমি নিরুদ্দিষ্ট পথের ভিখারী মাত্র, ঐশ্বর্য্যের লোভে, এমন কি, কখনও তোমায় পাবার আশামাত্র নিয়েও সে ত তোমায় ভালবাসেনি। শুধু তোমায়, তার হয় ত বা জন্মজন্মান্তরের সংস্কারবশেই ভালবেসেছিল। সে কি তখন জানতো, সেই দুর্ভাগ্য লোকটিই আবার মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হয়ে উঠবেন? এমন মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছো কেন?"

রামপাল কিছু বিস্মিত, কিছু সস্মিতমুখে সন্ধ্যার স্মিত-গম্ভীর মুখের দিকে সাশ্চর্য্যে চাহিলেন;—"এই যে তুমি মনের কথাও ধ'রে ফেলতে শিখেছ দেখছি! তা এত সব কখন শিখলি রাণি?"

"বাঃ! আমি কি এখনও তোমার সেই ছোট্ট সন্ধ্যাই আছি না কি? এখন যে আমি পালসাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী, না!" বলিয়াই সন্ধ্যা তাহার উচ্চ মর্য্যাদার অনুরূপ গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিতে গেল, কিন্তু ফলে তাহার বিপরীতই ঘটিয়া গেল। সহসা তাহার ভিতর হইতে কিসের একটা দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে তাহার পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট দুখানা বাতাসলাগা পদ্মপাপড়ির মত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার পদ্মপলাশ দুটি চক্ষু স্বচ্ছ শিশির তুল্য অশ্রুর আভাসে ছল-ছল করিতে লাগিল। পালসাম্রাজ্যের যিনি পট্টমহাদেবী ছিলেন, সন্ধ্যার সেই জীবন্ত জাগ্রত দেবী-প্রতিমাকে মনে পড়িয়া গিয়া তাহার সারা চিত্ত যেন গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আজ তাহার এই সুখের দিনে কোথায় তিনি? আর তাহার স্থানে বসিতে পাইয়াছে বলিয়াই সে কি না নির্লজ্জার মতই এই গর্ব্ব করিতেছে! এ কি অকৃতজ্ঞ সে!

রামপাল তাহার এই মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন নাই, তিনিও এই উত্তরে ঈষৎ বিমনা হইয়া পড়িয়া কিছু সত্যে কিছু রহস্যে মিশ্রিত করিয়া সব্যঙ্গে উত্তর করিলেন,—"অর্থাৎ কি না, ভবিষ্যৎ পট্টমহাদেবী!—বর্ত্তমানে পাল-সাম্রাজ্যই যখন অসম্পূর্ণ, তখন তার পট্টমহাদেবীটিই বা সম্পূর্ণরূপে তাঁর পদখানি অধিকার ক'রে বসলে চলবে কি ক'রে? এখনই অতটা ধূর্ত্ত হয়ো না, একটু একটু কম গম্ভীর হয়ো, আর কূটবুদ্ধির সবটাই শিখে ফেলো না! দোহাই পট্টমহাদেবি, নইলে আমার হাঁফ ধরবে। আমি আমার কঠোর পরিশ্রমের পর একটুখানি জুড়ুতে এসে আমার সেই ছোট্ট সন্ধ্যাটুকুকেই চাই যে!"—এই কথা বলিতে বলিতে দুই বাহু বিস্তৃত করিয়া রামপাল তাঁহার চির-প্রিয়তমাকে নিজের ব্যগ্র হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। প্রগাঢ় স্নেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া গভীর স্বরে কহিলেন—"একমাত্র তোমায় ভিন্ন অন্য কোন নারীকে কোন দিন আমি ভালবাসতে পারবো, এ কি তোমার মনে হয়? আমার কিন্তু তা হয় না সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা এইবার বড় বিপদেই পড়িল। বড় কঠিন সমস্যাই তাহার সম্মুখে। এবার সে কোন্ পথে যাইবে, বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল যেন কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া রহিল। তাহার পর বুদ্ধি করিয়া ঐ কথা বলিল,—"তুমি যে তাকে ভালবাসবে না, সে কথাও সে জানে, জেনেশুনেও তবু যখন তোমায় পেতে চায়, তখন তার এইটুকু ইচ্ছাপূরণে দোষ কি?"

রামপাল কহিলেন, "তোমার যুক্তিটি ভাল বটে! এ যেন বৈদ্যের দেওয়া একটুখানি কটু কষায় ঔষধ সেবন করামাত্র। ভাল, আমি যে তাঁকে ভালবাসবোই না, তাই বা তিনি জানলেন কি ক'রে? তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র প'ড়ে থাকবেন বোধ হচ্ছে!"

সন্ধ্যা রাগিয়া গিয়া স্বামীর বাহুমূলে একটা ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করিল, "যাও! কেবলই কথা কাটিয়ে দেবে। এমন মানুষকেও

মানুষে আবার পেতে চায়! ওগো! জ্যোতিষ পড়বার তার দরকারটা কি হ'ল? আমি তাদের বাড়ীতে যে তিন তিন বৎসর ধ'রে বাস করলাম, তা আমার কাছ থেকে আমার স্বামীর পরিচয় সে কি কিছুই জানতে পারে নি? আমি যে কে, সে কথা ত আমিও আগে কাকেও কিছু বলি নি। শুধু দুজনে সব কথাবার্ত্তা হতো। স্বামীর নাম নিতে নেই বলেই কাটিয়ে দিতুম। তার পর যে দিন জান্‌তে পারলে, সে দিন তার মনে যত আনন্দ, ততই বিষাদ উপস্থিত হলো। সে স্পষ্টই বল্লে যে, আজ থেকে তোমার স্বামীর প্রেমের আশা আমি ছেড়ে দিলাম। আমি বুঝেছি, তিনি একান্তই তোমাগত প্রাণ, অন্য নারী কখনও স্পর্শ করেন নি, হয় ত করবেনও না। শুধু আমার ক্ষমা কর বোন্! তাঁর চিন্তাটুকু হ'তে এ জন্মে বা জন্মান্তরে আমি আর নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারবো না। এই অধিকারটুকু আমায় নিজগুণে দান ক'রে যাও। বল দেখি, এ কি কম ভালবাসা? তাই ত বলছি, তার জীবনটা ব্যর্থ করো না, তাকে পায়ে স্থান দাও।"

রামপালের সস্মিত মুখ এইবার বস্তুতই একটু চিন্তাগম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি একটা মৃদু শ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিয়া দুঃখিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "যাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারবো না, তাকে কি পায়ে স্থান দেওয়া উচিত, সন্ধ্যা? নারীকে আমি সামান্য ক্রীড়নক ব'লে ত কখনও মনে করি নি। ভালবাসি না বাসি, তাকে নিয়ে যে দুদিন খেলা ক'রে নেবো, সে ত আমি পারবো না, রাণি! আমায় মাপ কর, তাঁকেও করতে ব'লো, আমার কাছে তোমরা তুচ্ছ নও—পূজ্য! পূজার বস্তু বিলাসের উপাদান হ'তে পারে না।"

সন্ধ্যা স্বামীর প্রশস্ত বক্ষের উপর হাত রাখিয়া তিরস্কার-পূর্ণ হাসি মুখে প্রতিবাদ করিতে গেল—"এত বড় চওড়া বুকখানা আর আমি এই ছোট্ট মানুষটি, এর সবটাতেই না কি আমি জুড়ে রয়েছি! এতটা যায়গার একটুখানি কোণেও না কি আবার কারুকে যে একটু যায়গা দিতে পারা যায় না? তুমি রাজাধিরাজই হও, আর মহা-রাজাধিরাজই হও, ভারি কৃপণ কিন্তু!"

রামপাল এবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া তাহার মুখের উপর হাত চাপা দিলেন, "তা—হোক হোক,—হই আমি কৃপণ! আজ তুমি এইখানেই সাঙ্গ কর, সন্ধ্যা! ও সব কথা বরেন্দ্রী-জয়ের পর তখন শোনা যাবে, যুদ্ধজয়ের অস্ত্রস্বরূপে আমি তোমার মদনদেবীকে ব্যবহার করতে পারবো না। তাতে আমার তার কাছে উপকার-মূল্যে বিক্রীত হ'তে হবে। এক ত শঙ্করীর বিয়েই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট হয়েছে। নিজেকেও আর এমন ক'রে বেচতে বলো না। এইটুকু মনুষ্যত্ব বাকি থাকতে দাও, রাণি! বরেন্দ্রীজয়ের পূর্ব্বে আর এ কথার উল্লেখ করো না।"

সন্ধ্যা স্বামীর মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া এইবার নীরব হইল এবং বরেন্দ্রীজয়ের পর তখন শোনা যাবে, এইটুকুতেই যথেষ্ট আশ্বস্ত হইয়া রহিল। অন্তরের সঙ্গেই সে মদনদেবীকে ভালবাসিয়াছিল ও তাহাকে সুখী করিয়া তাহার অশোধ্য ঋণজাল পরিশোধে আন্তরিকই সে ইচ্ছুক ছিল। তাই এত বড় মহান্ ত্যাগেও তাহার মনে বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ ছিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রীর সীমানার উপর সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর সন্নিবেশিত করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে ভীম প্রায় অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। রামপালপক্ষীয় অসংখ্য সেনা ও অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন সেনানায়করা অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর সেই অভেদ্য দুর্গপ্রাচীরও ভেদ করিল। পাল-আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য এই কয় বৎসর ধরিয়া রাজ্যসীমার স্থানে স্থানে বহুতর দুর্গ, প্রাচীর ও পরিখায় মহারাজাধিরাজ ভীম বরেন্দ্রীকে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা প্রাণপণেই করিয়াছে। বৃদ্ধ দিব্বোকের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চারি বৎসর ধরিয়া ভীম রামপালের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বরেন্দ্রীকে প্রস্তুত করিতেছিল। সুশিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ, ইহাতেই তাহার অধিকাংশ রাজকোষ ক্ষয় হইতেছিল, কিন্তু তাহার জন্য তাহার কোনই ক্ষতি ছিল না। রাজভোগ যাহাকে বলে, ভীম নিজের জন্য তাহার কিছুই গ্রহণ করিত না। দাস-দাসী তাহার নিজের সেবার জন্য বলিতে গেলে ছিলই না; মিতাহারী মিতাচারী সংসারবিরাগী ভাবে সে শুধু তাহার গুরু কর্ত্তব্যের ভারকে কর্ত্তব্যবোধেই পালন করিয়া চলিয়াছে। দরিদ্র সাধু সজ্জনরা এই রাজাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ইঁহারই বিজয় কামনা করিতেছিল। বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং অভিজাত সম্প্রদায় মনে মনে তখনও পুরাতন রাজবংশেরই অনুরাগী।

বরেন্দ্রীর দক্ষিণদ্বারে অবশেষে ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কয়েক দিনের মহাযুদ্ধের পর পাল-সৈন্যের করে

কৈবর্ত্ত-সৈন্যের পরাভব আরম্ভ হইল। কৌশাম্বী ও পদুবন্বা-রাজ এত দিন নিশ্চেষ্ট থাকার পর এবার পূর্ব্বতন রাজবংশের সাহায্যেই অগ্রসর হইলেন। রামপালের বল বর্দ্ধিত হইল।

দিব্য-দীঘির পূর্ব্বতটে শিবভবানীর যে মন্দির মহারাজা দিব্যোক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বদিন প্রত্যূষে উঠিয়া মহারাজা ভীম স্নানান্তে সেইখানে তাহার ইষ্টদেবতার যথাবিহিত পূজার্চ্চনা সমাধা করিয়া নির্জ্জন মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে লুণ্ঠিতশিরে মুক্তহৃদয়ে বলিল, "দেবাদিদেব! জানি না, এ যাত্রার কি পরিণাম; তোমার কাছে আর ফিরিয়ে আনবে কি না, সে তুমিই জানো। যদি আনতে চাও, আমারও আসতে আপত্তি নেই, আর যদি আমার রাজা রাজা খেলার এইখানেই শেষ হয়ে যাওয়া তোমার ইচ্ছা থাকে, তাই হবে, তাতেই বা ক্ষতি কিসের? শুধু এইটুকু জানিয়ে যাচ্ছি, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সতীকুলের রক্ষার ভার যে পুণ্যবতী সতীকুলরাণী আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমি তোমারই হাতে ফেরৎ দিয়ে গেলুম। আজ থেকে তাদের রক্ষাকর্ত্তা তুমিই রৈলে। দেখ, যেন আবার তাদের মধ্যে দুর্দ্দশার দিন এনে দিও না, তুমি ত জান প্রভু! আমার রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র শুধু এই ছিল, আমার রাজ্যে যেন সতীর অশ্রু পতিত না হয়। আমার যদি শেষ হয়ে যায়, তবু আমার এই কায়মন তপস্থার ফল যেন এ দেশ আর না হারায়।"

সুপ্রতীক নামধারী হস্তিপৃষ্ঠে ভীম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিল, তাহার স্থির প্রশান্ত মুখে যেন একটা অনৈসর্গিক দিব্য জ্যোতি দীপ্ত তেজে জ্বলিতেছিল, যুদ্ধ যেন তাহার মনের মধ্যে এতটুকুও ছায়াপাত করিতে পারে নাই, উদ্বেগ আশঙ্কা হিংস্রতা বিজীগিষা কিছুই যেন তাহার তপস্যা-সমাহিত চিত্ততলে স্থান করিতে পারে নাই। সে যেন তাহার কর্ত্তব্য-সমাধানেরই অঙ্গস্বরূপে যুদ্ধ করিতেছিল, রামপাল মথনদেবের প্রিয় হস্তী বিন্ধ্যমাণিক্যের পৃষ্ঠে ভীমের সম্মুখীন হইয়াই এই সত্যকে উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার গীতার সেই অমর উপদেশ মনে পড়িয়া গেল।

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।"

শস্ত্রপাণি রামপালের হস্তে কঠোর অস্ত্রমূল শিথিল হইয়া আসিল। তিনি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ বিহ্বলতায় তাঁহার আততায়ীর নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল না যে, তাঁহারা পরস্পরের বুকে তীক্ষ্ণ তীর বিঁধিতেই আজ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, বীর বীরের, রাজা রাজার সম্মুখে আসিয়াছেন, এখন যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য পরস্পর পরস্পরকে স্নেহে সাদরে গৌরবে অভ্যর্থিত করিয়া লওয়া।

পিছন হইতে রাজার শরীররক্ষী সেনাদলের অগ্রবর্ত্তী শিবরাজ রামপালের এই নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্যে ডাকিয়া বলিল,—"সাবধান রাজাধিরাজ!"

চকিত হইয়া রামপাল ভীমের উদ্যত অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।

যুদ্ধে ভীম বন্দী হইল। রাজ-আত্মীয় এবং মহাবলাধিকৃত বিত্তপালের হস্তে বন্দী রাজাকে সমর্পণ করিয়া রামপাল তাহাকে আদেশ দিলেন,—"আহত বীরের সেবার যেন ত্রুটি হয় না, মহাবলাধিকৃত! রাজবৈদ্যকে এই মুহূর্ত্তে সংবাদ পাঠাও এবং ইঁহাকে সসম্মানে উত্তম পটাবাসে স্থান দাও।"

মূর্চ্ছাহত ভীমকে লইয়া বিত্তপাল রাজাজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল। রামপালপক্ষীয় সৈন্যদল মহোৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, কৈবর্ত্তবাহিনী ভীম বন্দী হওয়ার সংবাদে একবারেই ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রামপাল বিজয় লাভ করিলেন।

ভীমের চিরসখা এবং ইদানীন্তন সেনাপতি হরি ছত্রভঙ্গ কৈবর্ত্তবাহিনীকে আবার যথাসম্ভব একত্র এবং পুনর্গঠিত করিয়া পুনশ্চ ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল। জীবন-মরণ পণে প্রায় সমুদয় কৈবর্ত্ত নাগরিক (শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত) এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল।

যুদ্ধে হরি রামপালের হস্তে হৃতসৈন্য এবং নিহত হইলে কৈবর্ত্ত-যুদ্ধের অবসান হইয়া গেল। শরণাগত শত্রুসৈন্যদের রামপাল অভয় প্রদানপূর্ব্বক নিজ সৈন্যমধ্যে গ্রহণ করিলেন।

রাজকবি রামপালের এই কীর্ত্তিগাথা শ্লোকচ্ছন্দে গ্রথিত করিয়া দিলেন, বন্দী যুবকরা এই শ্লোকে সুর সংযোজিত করিয়া গাহিতে লাগিল।—

"যুদ্ধসাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভীমরূপ রাবণ-রথ দ্বারা জনকভূ (জন্মভূমি বা বরেন্দ্রভূমি) উদ্ধারকারী মহারাজাধিরাজ রামপালদেব ত্রিজগতে দাশরথি রামের মতই বিস্তৃতযশা হইলেন।" [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

রামায়ণ (ঘ)

বিবাহকালে সীতার বয়স কত?

১। বনযাত্রাকালে অযোধ্যায় থাকিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর পরিচর্য্যা ও রাজা ভরতের আনুগত্য করিবার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে যখন নানা প্রকারে বুঝাইতেছিলেন, তখন সীতা কিছুতেই সে সব কথায় কর্ণপাত না করিয়া রামকে স্পষ্টতঃ কহিলেন,—"আমাকে তোমার কর্ত্তব্য উপদেশ করিতে হইবে না। আমার স্বামিসম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য আমি যথেষ্ট জানি। আমার মাতাপিতা আমাকে—তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কি ভাবে চলিতে হইবে, তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তোমায় আমাকে শিখাইতে হইবে না। (১)

২। রাম কিছুতেই যখন সীতাকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন না, তখন সীতা আরও জোরের সহিত কহিলেন, "পূর্ব্বে পিতৃগৃহে বাসকালে ব্রাহ্মণদিগের নিকট আমি শুনিয়াছি যে. আমার অদৃষ্টে বনবাস লেখা আছে। সেই সকল সাঙ্কেতিক বিদ্যাবিশারদের বাক্য শ্রবণ করা অবধি আমারও বনে বাস করিবার বাসনা বলবতী। বনবাসের কথায় আমার হৃদয় উৎসাহে ভরিয়া উঠে। (২)

উপরিলিখিত দুইটি স্থলের একটিতে দেখিতেছি, বিবাহের পূর্ব্বেই সীতাকে মাতাপিতা পত্নীর কর্ত্তব্য-বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং অপরটিতে—বিবাহের পূর্ব্বেই জ্যোতিষীদিগের নিকট হইতে সীতা শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার অদৃষ্টে "বনবাস" লেখা আছে। তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। তজ্জন্য সীতা মনকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের বাড়ীতে সীতা আর যান নাই, বা সীতার পালয়িত্রী মাতাও দশরথের বাড়ীতে আসেন নাই। সুতরাং প্রথমোক্ত স্থলে "পত্নীর কর্ত্তব্য" উপদেশ যে মাতাপিতা নিজ গৃহেই বিবাহের পূর্ব্বে সীতাকে দিয়াছিলেন.—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দ্বিতীয় স্থলেও—জ্যোতিষীদিগের বনবাস-বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণীও যে বিবাহের পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তাহা "পুরা পিতৃগৃহে"—উক্তিতেই সপ্রমাণ। এখন দেখা যাউক, ঐরূপ আর কি উক্তি রামায়ণে আছে।

৩। রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া বিশ্বামিত্র যখন জনকালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন দুই ভ্রাতার অনুপম রূপলাবণ্য ও যৌবনোল্লসিত সুঠাম শরীর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রাজর্ষি জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিবর! কে এই দুই কুমার, ইহাদের গজ এবং সিংহের ন্যায় গতি, দেবতার ন্যায় পরাক্রম, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় রূপ, এই নবীন যুবক দুইটি কার পুত্র?" (৩)

এই স্থলে দেখিতেছি—জনক রাম-লক্ষ্মণকে "সমুপস্থিত-যৌবন" বা নবীন যুবক বলিতেছেন। সুতরাং বিবাহের কালে ইঁহাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের বয়ঃক্রম এবং শারীরিক বলবত্তারও যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছি। জনকের এই উক্তি হরধনুর্ভঙ্গের পূর্ব্বে।

৪। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাবণানুচর মারীচ এবং সুবাহু নামক দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদ্বয়ের বিনাশের জন্য বিশ্বামিত্র যখন রামলক্ষ্মণকে লইবার উদ্দেশ্যে দশরথের নিকট আসিয়াছেন, তখন রাবণের নামের গন্ধেই ভয় পাইয়া বৃদ্ধ নৃপতি কহিতেছেন,—"আমার

---

(১) রামের প্রতি সীতা—
"অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্।
নাস্মি সংপ্রতিবক্তব্যা বর্ত্তিতব্যং যথা ময়া॥"
অযো, শ্লোক—১০, সর্গ ২৭।

(২) রামের প্রতি সীতা—
"অপাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্।
পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে॥
লাক্ষণেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে।
বনবাস-কৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল॥"
অযো ২৯ স, ৮।৯ শ্লোক।

(৩) "পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো নৃপঃ।
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।
গজ-সিংহ-গতৌ বীরৌ শার্দ্দূল-বৃষভোপমৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিত-যৌবনৌ।
————কস্য পুত্রৌ মহামুনে!"
১৭-১৯ শ্লোক—বাল, ৫০শ সর্গ।

কমললোচন রামের বয়ঃক্রম এই সবে পনর বৎসর। এ বয়সে রাক্ষসের সহিত এ কি করিয়া যুদ্ধ করিবে ? (১)

এ স্থলেও পাইতেছি, রামের এ সময়ে বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর। এই যাত্রাতেই ঘুরিতে ঘুরিতে, নানা যুদ্ধবিগ্রহের পর রামলক্ষ্মণ গিয়া জনকাশ্রমে উপনীত হন ও হরধনুর্ভঙ্গ পূর্ব্বক রাম জানকীর পাণি-পীড়ন করেন। এ সময়ে রামলক্ষ্মণ যৌবনে উপনীত হইয়াছেন।

৫। বিশ্বামিত্র গিয়া জনককে কহিলেন—"এই দুই রাজকুমার আপনার গৃহের সুবিখ্যাত ধনুর সন্দর্শন করিতে অভিলাষী।" উত্তরে, নানা কথার পর জনক উক্ত ধনুর প্রাপ্তি, সীতার উৎপত্তি, সীতার বিবাহে ধনুর্ভঙ্গ পণ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গ বলিতে বলিতে কহিলেন,—"ক্রমে আমার এই অযোনি-সম্ভবা কন্যা সীতা যখন 'বর্দ্ধমানা' প্রাপ্ত-যৌবনা হইলেন, তখন বহু রাজন্য ইঁহার পাণিগ্রহণের আশায় আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া গিয়াছেন। কেহই হরধনুঃ উত্তোলন করিতে পারেন নাই।" (২)

মূলে কথাটা আছে "বর্দ্ধমানা", ব্যাখ্যা-কর্ত্তারা কেহ "যৌবন-সম্পন্না," কেহ "প্রাপ্ত-যৌবনা" অর্থ করিয়াছেন। এ স্থলে দেখিতেছি, বিবাহের পূর্ব্বেই সীতার যৌবনোদ্গম হইয়াছে। অতএব "নবীন যুবক" রামের সহিত সীতার যখন পরিণয় হয়, তখন তিনিও "বর্দ্ধমানা" অর্থাৎ নবীনা যুবতী।

৬। রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের সহিত যথাক্রমে সীতা-উর্ম্মিলা মাণ্ডবী-শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন। রাজ-বাড়ীতে মহা ধূম। নানা প্রকার "স্ত্রী-আচার" মাঙ্গলিক ব্যাপার সম্পন্ন হইবার পর সীতা প্রভৃতি কয় ভগিনী নিজ নিজ পতির সহিত নির্জ্জনে সানন্দ-হৃদয়ে (কি বলিব ?)—আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। (৩)

মূলে কথাটা আছে, "রেমিরে" রমণ করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকর্ত্তা বলিয়াছেন,—"পতিগণের সহিত প্রমোদ সহকারে নির্জ্জনে রমণ করিতে লাগিলেন।" এ স্থলেও সীতা প্রভৃতির বয়ঃক্রমের একটা আন্দাজ পাইতেছি। তাঁহারা "নির্জ্জনে পতিগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে রমণ করিতে লাগিলেন"—ইহার অর্থ কি ? এ সময়ে রাজকুমারীদের বয়স কত ? রাম-লক্ষ্মণ যে "প্রাপ্তযৌবন", তাহা ত জনকই বলিয়া দিয়াছেন।

৭। বনবাসকালে অত্রি মুনির আশ্রমে অত্রি-পত্নী অনসূয়ার সহিত পাতিব্রত্য সম্বন্ধে কথোপকথন-সময়ে সীতা বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বে পাণি-প্রদানকালে আমার জননী অগ্নি-সমক্ষে আমাকে যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই আমি ভুলি নাই। সমস্ত আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। মা বলিয়াছিলেন,—"নারীজাতির পতি-সেবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর কিছুই নাই।" (৪)

পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য-বিষয়ে সীতার জননী সম্প্রদান-স্থলেই অগ্নি সাক্ষী করিয়া সীতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং তাদৃশ বিষয়ের উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতানুযায়ী বয়ঃক্রম যে সীতার তখন ছিল, ইহা অস্বীকার করা চলে না।

৮। কথাপ্রসঙ্গে ক্রমে সীতা অনসূয়াকে বলিলেন,—"আমার 'পতি-সংযোগ-সুলভ' বয়ঃক্রম দেখিয়া পিতা একান্ত চিন্তিত হইলেন। দরিদ্রের ধনহানিতে যেমন বিষাদ জন্মে, পিতার তেমনই হইল। (৫)

এ স্থলে একটি পদ দেখিতেছি—"পতি-সংযোগ-সুলভ।" কেহ কেহ ঐ পদের "বিবাহযোগ্য বয়স" ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ কবিতার পরবর্ত্তী আরও

(১) "ঊন-ষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীব-লোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥
বাল, ২০ স—২ শ্লোক।

(২) "ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্দ্ধমানাং মমাত্মজাম্।
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব !"
"তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্।"
"ন শেকুগ্র হণে তস্য ধনুষস্তোলনেহপি বা।"
"প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়ঃ————"
বাল, ৬০ সর্গ—১৫, ১৮, ১৯, ২০ শ্লোক।

(৩) "অভিগম্য ভিবাদ্যাংশ্চ সর্ব্বা রাজ-সুতাস্তদা।"
"রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ॥"
বাল, ৭৭ সর্গ—১৩, ১৪ শ্লোক।

(৪) "পাণিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা ত্বগ্নি-সন্নিধৌ।
অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম্॥
"পতিশুশ্রূষণান্ নার্য্যাস্তপো নান্যদ্ বিধীয়তে।"
অযো, ১১৮ সর্গ—৮,৯ শ্লোক।

(৫) "পতি-সংযোগ-সুলভং বয়োহবেক্ষ্য পিতা মম।
চিন্তামভ্যগমদ্দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ॥"
অযো, ১১৮ সর্গ—৩৪ শ্লোক।

কতকগুলি কবিতায় সীতার মুখ দিয়া কন্যাদায়-পীড়িত জনকের যে দুঃখের ও অপমানের বর্ণনা প্রকাশ পাইয়াছে,—তাহাতে মনে হয়, সীতা যেন কত বড় "অরক্ষণীয়াই" হইয়াছিলেন। (মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এ স্থলে "পতি-সংযোগ-সুলভ" পদের প্রকৃত অর্থ করিতে হইলে রামায়ণেরই আশ্রয় লইতে হইবে। "রহঃ রেমিরে"—তাঁহারা পতিগণের সহিত নির্জ্জনে রমণ করিতে লাগিলেন। বিবাহের অব্যবহিত পরের এই ব্যাপার। আর বিবাহের পূর্ব্বের অবস্থা—"পতি-সংযোগ-সুলভ বয়ঃক্রম" দেখিয়া পিতার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। সুতরাং এ স্থলের অর্থ আর তত দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয় না। "বর্দ্ধমানা" পত্নীর সহিত "প্রাপ্ত-যৌবন" পতি মিলিত হইলেন।

"প্রাপ্ত-যৌবন" রাম "বর্দ্ধমানা" সীতাকে যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর। কিন্তু সীতার বয়স কত ছিল? উপরি-ধৃত আটটি স্থলের সোজা—সরল অর্থ করিলে পাই, বিবাহকালে সীতা রাম হইতে দুই, এক বৎসরের ছোট হইতে পারেন। নতুবা রামায়ণে উল্লিখিত স্থলগুলির ব্যাখ্যা কঠিন হইয়া পড়ে।

এই ত গেল বিবাহ-সময়ে সীতার বয়সের কথা। কিন্তু এই রামায়ণেই অন্যত্র দেখিতেছি, সীতা নিজমুখে নিজের বয়সের অন্যরকম কথা কহিয়াছেন। তাহা দেখিলে,—বিবাহকালে তিনি যে একটি ছয় বৎসরের কচি খুকী ছিলেন,—ইহা স্বীকার করিতে হয়।

পরিব্রাজকরূপী রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিতে আসিয়াছে, তখন সংসার-বিরক্ত ব্রাহ্মণ অতিথি, কথা না কহিলে হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া বসিবেন, এই আশঙ্কায় সীতা আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন,—"মিথিলাপতি জনকের আমি দুহিতা, রামচন্দ্রের আমি পত্নী, নাম আমার সীতা। আমি দ্বাদশ বৎসরকাল ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গৃহে বাস করিয়া মানুষের ভোগ্য সমস্ত সুখই ভোগ করিয়াছি। আমার কোন বাসনা অপূর্ণ নাই।" "আমার মহা তেজঃসম্পন্ন ভর্ত্তা রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন পঁচিশ বৎসর, আর আমার আঠারো বৎসর।" (১)

দ্বাদশ বৎসরকাল সীতা পতিগৃহে বাস করার পর পতিগৃহ-বাসের ত্রয়োদশ বৎসরের প্রথমে রামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব হয় এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রস্থান করেন, এ কথাও সীতা বলিয়াছেন। (২)

তাহা হইলে বিবাহের পর বারো বছরকাল শ্বশুরবাড়ীতে সীতা ছিলেন এবং তের বছরে পা দিতেই রামের সহিত বনে গমন করেন, এ কথা এবং যখন বনে আসেন, তখন সীতার বয়ঃক্রম পূর্ণ আঠারো বৎসর, এ কথাও সীতার মুখে শুনিতে পাইতেছি। আঠারো বৎসর হইতে শ্বশুরবাড়ীতে থাকার বারো বৎসর বাদ দিলে পাই মাত্র ছয় বৎসর। তবে কি সীতার ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল? আর সম্প্রদানকালে জনক-জননী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমক্ষে দাঁড়াইয়া সেই ছয় বছরের মেয়েকে 'পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য' শিক্ষা দিয়াছিলেন? এবং সীতাও সেই উপদেশমালা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন? আবার এই ছয় বছরের কন্যাকেই কি "বর্দ্ধমানা" অর্থাৎ বয়স্থা দেখিয়া রাজর্ষি জনক তাঁহার বিবাহচিন্তায় চারিদিক অন্ধকার দেখিয়াছিলেন? এবং এই ছয় বছরের মেয়েকেই কি "পতি-সংযোগ-সুলভ" কাল আগত ভাবিয়া পিতা সীরধ্বজ মেয়ের পতিসংগ্রহের জন্য আকুল হইয়াছিলেন? আবার বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া এই সব মেয়েরাই কি স্ব স্ব পতির সহিত নির্জ্জনে "রেমিরে" আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছিল?—রমণ করিয়াছিল? এই সকলের সমাধান কি?

আবার আর একটা বিষম গোল উঠিতেছে। রাম ১৬ বৎসর বয়সে "প্রাপ্ত-যৌবন" অবস্থায় সীতাকে বিবাহ করেন। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যখন বনগমন করেন, তখন রামের বয়ঃক্রম যে পচিশ বৎসর ছিল, তাহাও রামায়ণে

---

(১) "ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈব অনুক্তো হি শপেত মাম্।
ইতি ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং তু সীতা বচনমব্রবীৎ॥
দুহিতা জনকস্যাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া॥
উষিত্বা দ্বাদশ-সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধিনী॥"
"মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥"
আরণ্য, ৪৭ সর্গ—২, ৩, ৪, ১০ শ্লোক।

(২) "তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ॥
"কৈকেয়ী নাম ভর্ত্তারং মমার্য্যা যাচতে বরম্।"
"মম প্রব্রাজনং ভর্ত্তুর্ভরতস্যাভিষেচনম্॥"
আরণ্য, ৪৭ সর্গ, ৫,৬,৭,১০ শ্লোক।

পাওয়া যায়। কোনও কোনও গ্রন্থে রাবণের নিকট সীতার "মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ" এই কবিতার রেখাঙ্কিত স্থলে "সপ্তবিংশকঃ"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। অযোধ্যাকাণ্ডের বিংশ সর্গের ৪৫ শ্লোকে দেখিতেছি, বনগমন-সময়ে কৌশল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে কহিতেছেন,—"রঘুনন্দন! তোমার দশম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া সপ্তদশ বৎসর কাটাইয়াছি।" সুতরাং রাম পূর্ণ সাতাইশ বৎসর বয়সেই বনে গিয়াছিলেন। (১)

এতক্ষণে কতকটা বুঝা গেল যে, বিবাহের সময়ে সীতার বয়ঃক্রম কত ছিল। উদ্ধৃত স্থলগুলি ছাড়া রামায়ণে আরও ছোটো-খাটো এমন অনেক কথা আছে, যদ্দ্বারা সীতা যে বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার পর—বিলক্ষণ বুদ্ধি-শুদ্ধি হওয়ার পর পরিণীতা হইয়াছিলেন, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইক্ষণে দেখিতে হইবে,—"বিবাহের পর বারো বছর পতিগৃহে ছিলাম, যখন বনে আসি, তখন আমার আঠারো বছর বয়স ছিল"—এই উক্তির সমাধান কি উপায়ে করা যায়। রাবণের নিকট সীতার এই উক্তি অনুসারে তাঁহার বিবাহকালে ছয় বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল, স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উদ্ধৃত অন্যান্য অংশগুলির কোনই সামঞ্জস্য থাকে না। এরূপ স্থলে পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন, রামায়ণের এই সকল পরস্পর-বিরোধী স্থলের কোন্‌টি গ্রাহ্য, আর কোন্‌টিই বা পরিহার্য্য। যদি কোনও মনস্বী এই সকল স্থলের কোনরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন, জানাইলে কৃতার্থ হইব। একটি পৃথক প্রবন্ধে রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। অবশ্য উদ্ধৃত বিরোধী স্থলগুলির এক কথায়—যা' হোক্ একটা সমাধান করা যায়। "অমুক অংশ প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া কায অনেকটা সোজা করা যায়। কিন্তু হঠাৎ অতটা বলিবার মত বুকের পাটা আমার নাই। আবার সন্দিগ্ধ স্থলের কোনরূপ "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা করিবার মত যোগ্যতায়ও এ দীন লেখক বঞ্চিত। কাব্য—কাব্য, তাহাকে দর্শনশাস্ত্রের পেষণে নীরস করিয়া কবির প্রতি অমর্য্যাদা করিতে সাহস সকলের হয় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

(১) "দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব!
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখ-পরিক্ষয়ম্॥

আমার স্বদেশ

স্বদেশ আমার—স্বপন আমার—পরশ যে তাঁর নিত্য পাই।
ধূলা যে তাঁর সোনার ধূলা—তুলনা এঁর নাই রে নাই॥
তাঁর কাননের কুসুম-সুবাস আমার প্রাণের মধুমাখা।
আনন্দে মোর ওই যে দোলে তাঁর-ই প্রজাপতির পাখা॥
আমার বুকের জীবনভরা বাতাসে তাঁর আকাশ ছাওয়া।
দৃষ্টি আমার আকাশ জুড়ে তারায় তারায় জাগায় চাওয়া॥
অশথ-বটের ছায়ায় ছায়ায় ছড়িয়ে মনের শীতল ছায়া।
কলস্বনা নদীর বুকে মোর গানের ই করুণ মায়া॥
জ্ঞানের জ্যোতি ওই জননীর শুভ্র কিরীট মুকুট-চূড়ে।
প্রেম-সুগভীর অশ্রু-জলে ওই যে পূজার কুম্ভ পূরে॥
বীর্য্য আমার সিংহরূপী হর্ষে মায়ের চরণ ধরে।
এই হৃদয়ের রক্ত-জবা আসন-তলে নিতুই ঝরে॥
মন্ত্র পূজার বাজ্‌ছে নিতি মর্ম্মবেদন নিবেদনে।
আকুল করা কাঁদনে মোর বর্ষে আশিস্ শুভক্ষণে॥
যা' কিছু মোর সব দিয়ে যে—এ দেশ আমার গড়া ভাই!
এ যে আমার সোনার স্বপন—তুলনা এঁর নাই রে নাই॥
গা' রে মানস-পাপিয়া মোর—পাগলকরা কণ্ঠে তোর!
এই সুরেরই আবেশমাঝে হোক্ এ জীবন-রাত্রি ভোর॥
রাত্রি শেষে আবার হেসে নতুন দিনের রোদ্ মেখে,
ফুট্‌তে যেন পারি মায়ের বুকের 'পরে মুখ রেখে!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি, এ)

শ্যামের বাঁশী

২

জড় ও চেতন এই দুই প্রকার বিভিন্ন স্বভাবের বস্তু-নিচয়ের ধর্ম্মবিনিময় দ্বারা একরূপতা-সম্পাদন শ্যামের বাঁশীর অসাধারণত্ব শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু শ্লোকে যেমন সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে অতুলনীয়। সংস্কৃত-সাহিত্য, যাহার নাম ইংরাজীতে ক্লাসিক কহে, তাহাতেও বঙ্গীয় গোস্বামিগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই ভাগবতের বংশী-ধ্বনির অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। শুধু তাহাই নহে, বরং বহু শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃত-কবি-সমাজে এই বংশীধ্বনির কোন বিশেষ চিহ্নও দেখা যায় না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিশ্ব-জনীন প্রেমের বন্যায় যখন নদীয়া ভাসিয়াছিল, সেই সময় হইতেই বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ অধ্যাত্মজীবনে এই বাঁশীর সুর নূতন করিয়া সাড়া দিয়াছিল, তাই আমরা বাঙ্গালার কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেনের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে দেখিতে পাই—

> "বিততিরপি গিরীণাং মুঞ্চতীবাশ্রুধারাম্
> ব্রজতি পুলকমুচ্চৈর্ব্বৃক্ষবীরুৎপ্রপঞ্চঃ।
> বিদধতি সরিতোঽপি স্রোতসস্তম্ভমেতা
> হরি হরি হরিবংশীনাদ এবোজ্জিহীতে॥"

(ঐ দেখ) গিরিশ্রেণী যেন প্রেমাবেগে দ্রুত হইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে, বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতা প্রভৃতিও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, স্রোতস্বিনীগণও অকস্মাৎ নিজ নিজ স্রোতকে স্তব্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, হরি হরি, এ নিশ্চয়ই শ্রীহরির বংশীধ্বনি আবির্ভূত হইতেছে!

এই বংশীধ্বনি যে ভাগ্যধরের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, তাহার প্রাণ কি ভাবে কিসের আশায় আকুল হইয়া উঠে?

কবি কর্ণপূর তাহাই একটি শ্লোকে কেমন স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, দেখুন—

> "শ্রুতিভিরপি বিমৃগ্যং ব্রহ্মসম্পত্তিভাজা-
> ম্‌পি পুরুরসনীয়ং মূর্ত্ত আনন্দসারঃ।
> যদহহ ভবিতাস্য শ্রীলশম্ভু স্বয়ম্ভূ-
> প্রভৃতিভিরভিবন্দ্যং পাদপদ্মং দৃশোর্নঃ॥"

(এ বাঁশীর সুর—যখন শুনিতে পাইয়াছি, তখন)—সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেই পাদপদ্ম এখনই আমার নয়নগোচর হইবে, সেই পদ-পঙ্কজ কেমন? সমগ্র উপনিষদ্ তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা জীবন্মুক্ত ভক্তগণের একমাত্র আস্বাদ্য, তাহা মূর্ত্তিমান্ আনন্দের সার, শ্রীশঙ্কর, চতুরানন প্রভৃতি দেবগণ তাহারই পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবে ইহারই প্রতিধ্বনি বর্ণে বর্ণে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

> "জাতস্তম্ভতয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে
> গ্রাবাণো দ্রবভাবসম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দ্দবম্।
> স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহুর্ম্মুহুরগা জাড্যাদগতিং জঙ্গমা
> বংশীং চুম্বতি হন্ত যামুনতটী-ক্রীড়াকুটুম্বে হরৌ॥"

যমুনাতটে ক্রীড়ানিরত শ্যামসুন্দরের মধুর অধরে মুরলী মিলিত হইয়াছে—তাই বৃন্দাবনে নদী-সমূহের তরল জলরাশি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা কঠিন হইয়া গিয়াছে! গিরি-গোবর্দ্ধনের শিলানিচয় গলিয়া যেন (নবনীতের ন্যায়) কোমল হইয়া উঠিতেছে! বৃক্ষ-সমূহ মুহুর্মুহুঃ এমন কাঁপিতেছে, মনে হয় যেন, তাহারা বুঝি চলিতেও আরম্ভ করিল! আর পশু, পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণি-গণ এমনই জড়ভাব অবলম্বন করিতেছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন, তাহারা চলিবার শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছে!

বৃন্দাবনে যমুনার শরচ্চন্দ্রিকা-সমুদ্ভাসিত বিমল সৈকতে জাতী-যূথিকা-মল্লিকার দিব্য সৌরভে বাসিত কুঞ্জমধ্যে নব-কিশোর রসিক-শেখর শ্যামসুন্দরের বিশ্ববিমোহন বংশী এই ভাবে সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু-নিচয়কে চিররূঢ় স্বভাব হইতে রূপান্তরিত করিয়া নিজের ভাবময় সাম্রাজ্যকে ক্রমে প্রসারিত করিতে লাগিল। সেই ভাব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা পৃথিবী ভাসাইয়া ক্রমে কেমন করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশবর্ত্তী লোকনিচয়কে প্লাবিত

করিয়াছিল, তাহার পরিচয় শ্রীরূপ গোস্বামীর—অমর ভাষাতে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই—

"রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তম্বুরুম্,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চপলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥"

এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে,—সেই বংশীধ্বনি ক্রমে ভূলোক ছাপাইয়া উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিল। দ্যুলোকের মেঘাবলীর গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, মেঘলোকের উপরে অমরাবতীতে মহেন্দ্রের সঙ্গীত-সভায় যখন তাহা পৌঁছিল, তখনই সুরগায়ক তুম্বুরুর চমৎকার লাগিল, বিস্ময়ের আতিশয্যে বীণার তারে আর তাহার অঙ্গুলিনিচয় খেলা করিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ জড়ীভূত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ দেবসভার সঙ্গীতোৎসব বন্ধ হইয়া গেল, সকল দেবতা—অপ্সরানিচয়, কিন্নরকুল নিস্তব্ধভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া সেই বাঁশীর স্বরসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিল। ক্রমে বংশীধ্বনি আরও উচ্চতর লোকে উঠিতে লাগিল। সত্যলোকের ধ্যাননিমগ্ন জীবন্মুক্ত সনক, সনাতন, সনন্দন প্রভৃতির নির্ব্বিকল্প নির্গুণ ব্রহ্মসমাধি ভাঙ্গিয়া গেল, সত্যলোকের অধিদেবতা চতুরানন ব্রহ্মার বিস্ময়-সাগর উথলিয়া উঠিল। কেবল যে সে বংশীধ্বনি উর্দ্ধেই উঠিতেছিল, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা অধোলোকসমূহে প্রসারিত হইতে লাগিল। পাতালে বলিরাজের প্রাণে বংশীধারীর সেই মধুর আনন্দ-সান্দ্র মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া সেই সুর আরও নীচে নামিতে লাগিল। ত্রিভুবন যাঁহার ফণামণ্ডলীর উপর অধিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বাধার অনন্তদেবেরও দেহ সেই সুরের উন্মাদনাময় আস্বাদনে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তলোককে আপূরিত করিয়া, সেই বংশীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পর্য্যাপ্ত অবকাশ না পাইয়া, বাড়িতে বাড়িতে প্রবল বেগে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-ভিত্তিতে এমন আঘাত করিতে আরম্ভ করিল যে, শেষে সে ভিত্তি চারিদিকেই ভাঙ্গিয়া পড়িল;—বংশীধ্বনি বিরজা পার হইয়া—ক্ষীরসমুদ্র পার হইয়া গোলোকের অভিমুখে অবিশ্রান্ত-বেগে ছুটিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই শ্যামের বাঁশীর বিশ্ববিমোহন স্বরলহরীর তত্ত্ব প্রিয় শিষ্য সনাতন গোস্বামীকে যেরূপে বুঝাইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বাঙ্গালার ভক্ত ভাবুক কবিকুলশিরোমণি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে কেমন মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখুন—

"সনাতন! কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপুর মধুর হইতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিগে বহে যার পূর॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পায়া পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিগে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষত যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোল হইতে কাড়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, সেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে॥
নীবি খসায় পতি আগে গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব প্রাণিগণে॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দে না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন্ বুলিতে বোলায় আন্,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥"
"এই বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।" ইত্যাদি।

বৈষ্ণব কবিগণের বর্ণিত এই বংশীধ্বনি হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইলে তাহা সকল সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিকূল ভাব ধারণ করে, পতিব্রতার ব্রত ভাঙ্গিয়া দেয়, পতির কোল হইতে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে টানিয়া আনে, সুতরাং এ হেন সমাজ-বিপ্লবকর বংশীধ্বনি সদাচারনিরত শিষ্ট সামাজিকগণের পবিত্র কর্ণবিবরে প্রবেশের যোগ্য নহে। ইহা পাশব কাম-প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত শিষ্ট-সমাজে সর্ব্বনাশকর বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা অশ্রাব্য ও সর্ব্বথা নিন্দনীয়; এই প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমালোচনা প্রাকৃত সংসারসর্ব্বস্ব ব্যক্তির পক্ষ হইতে হইবে, ইহা সম্ভাবনা করিয়া এই বংশীধ্বনির প্রথম দ্রষ্টা মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী'তে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে এই শ্যামের বাঁশীর সুর শুনিবার যোগ্যতা কোন মানবেরই হইতে পারে না। তাই সেই উত্তরের সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে,—

এই বংশীর আহ্বানে উন্মাদগ্রস্ত রোগীর ন্যায় লোক-লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজগোপীগণ যখন দৌড়িতে দৌড়িতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে শরচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা-ধবলিত যমুনার বিমল সৈকতে নিকুঞ্জরাজিবিরাজিত রাস-স্থলীতে শ্যামসুন্দরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন শ্যামসুন্দর হাসিতে হাসিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে অকম্পিত সুব্যক্ত স্বরে বলিলেন—

> "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
> ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥
> রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
> প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥
> মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
> বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥
> দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
> যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥
> তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
> ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥
> অথবা মদভিস্নেহাৎ ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
> ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
> তদ্‌বন্ধূনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপালনম্॥
> দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
> পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥
> অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
> জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥
> শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ ধ্যানান্ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
> ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥"

এই কয়টি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সৌভাগ্যবতী ব্রজবাসিনীগণ! পথে আসিবার সময়ে তোমাদের কোন ক্লেশ হয় নাই ত? বল, আমি তোমাদের কোন্ কার্য্য করিব। ব্রজের কুশল ত? অকস্মাৎ এমনভাবে ব্রজ ছাড়িয়া কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। এই ভয়ঙ্করী রাত্রি—এ সময় এই জনসঞ্চারশূন্য বনে বহু প্রকার হিংস্র প্রাণী বিচরণ করিয়া থাকে, তাই বলি, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, এই সময় এখানে তোমাদের ন্যায় কোমলাঙ্গী বনিতাগণের অবস্থিতি সমুচিত হইতে পারে না। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও ভর্ত্তা সকলেই ব্যাকুল হইয়া, তোমাদিগকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সাহসের কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের মনে ভীতির সঞ্চারণ করিও না। এখানে আসিয়া পড়িয়াছ, আসার ফলও যে কিছু না হইয়াছে, তাহা নহে; যমুনার স্নিগ্ধ সান্ধ্যসমীরসঞ্চারে কম্পিত তরুপল্লবনিচয়ে মনোহর পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রালোকে ধবলিত কুসুমিত সুন্দর কানন ত দেখা হইয়াছে, আর কেন এখানে থাকা? যাও পতিব্রতাগণ, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, পতিশুশ্রূষায় নিরত হও—গো-বৎসগণ সায়ংকালের গো-দোহন না হওয়াতে গোষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে, যাইয়া গো-দোহন কর। তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও, আর তোমাদের বালকগণকেও দুগ্ধ পান করাও, তাহারা ক্ষুধায় ক্রন্দন করিতেছে। আমি বুঝিতেছি, আমাকে তোমরা ভালবাসিয়াছ, সেই ভালবাসা তোমাদের অন্তঃকরণকে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। সেই জন্যই তোমরা এমন অসময়ে এমন করিয়া আমার নিকট আসিয়া পড়িয়াছ, ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ, প্রাণী মাত্রই আমাকে ভালবাসিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা

অকপটভাবে ভর্ত্তার সেবা করাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম। শুধু তাহাই নহে, ভর্ত্তার যাহারা আত্মীয়, তাহাদের কল্যাণসাধনও স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম এবং পুত্র-কন্যাগণের পালনও তাহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। যে সকল রমণী ইহলোকে পরলোকে শ্রেয়ঃ কামনা করিয়া থাকে, পতি যদি অসুন্দর হয় কিম্বা অসচ্চরিত্র কিম্বা দরিদ্র অথবা সে বৃদ্ধ, জড়, অভাগা কিম্বা রোগীও হয়, তবুও তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহাদের উচিত নহে; কেবল মহাপাতকগ্রস্ত পতি যদি প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, অন্যথা নহে। মনে রাখিও, স্ত্রীলোকের পক্ষে ভর্ত্তৃব্যতিক্রম অর্থাৎ উপপতির সেবা নরকপাতের কারণ, অকীর্ত্তিকর, ক্লেশজনক, ভয়-হেতু ও তুচ্ছ ফলপ্রদ; সকল মনুষ্যসমাজে এই ভর্ত্তৃব্যতিক্রম নিন্দিত হইয়া থাকে, সুতরাং কুলললনাগণের ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। আমাকে ভালবাসিতে চাহ, ভালবাস—তাহাতে কোন দোষ নাই, সেই ভালবাসাকে ঘনীভূত করিতে চাহ ত আমার কথা শ্রবণ কর, আমাকে গৃহে বসিয়া ধ্যান করিও, অবসরমত আমাকে দর্শন করিও, আর পার ত মুক্তকণ্ঠে আমার গুণলীলা কীর্ত্তন করিও, কিন্তু এমন করিয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আমার সহিত এমন সন্নিকর্ষ করিও না। তাই বলি, ব্রজসুন্দরীগণ, এখনও সময় আছে, শীঘ্র তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

অধর্ম্ম-বিপ্লব বিধ্বস্ত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল শুদ্ধ আদর্শ সংসারে স্থাপন করিবার জন্য যিনি যুগে যুগ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মমূর্ত্তি বাসুদেবের, সকল ধর্ম্মের সার প্রেমভক্তিরূপ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সংস্থাপনের শুভ মুহূর্ত্তে এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ যেমন সুন্দর ও সুসঙ্গত, তেমনই ইহা তাঁহার অন্তর্নিহিত অতি গম্ভীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে একান্ত অনুকূল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

প্রাণারাম দেবতার দেবতা প্রিয়তমের মুখে এই অসম্ভাবিত উক্তি শ্রবণ করিয়া,—মাধুর্য্য-ভক্তির আদর্শ ব্রজগোপীগণের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহারা শ্রীভগবানের এই কর্কশ হিত-বচনের কি প্রতিবচন দিয়াছিল, তাহা মধুররসের মাধুর্য্য-মণ্ডিত ভাগবতের মধুরতম কবিতাতেই ব্যক্ত হওয়া সম্ভব ও সুসঙ্গত; তাই ভাগবত বলিতেছে—

"ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসংকল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥"

শ্রীগোবিন্দের মুখে এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজ-গোপীগণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল; কারণ, তাহাদের চির-নিরূঢ় কৃষ্ণসেবার সংকল্প যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তাহারা অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল।

তখন তাহারা কি করিল?—

"কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমষিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্॥
প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামম্।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ॥"

অবসাদকর শোকের গুরু আশঙ্কায় তাহাদের বক্ষঃস্থল আলোড়িত করিয়া যে প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার তীক্ষ্ণ স্পর্শে তাহাদের সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় সুরুচির কোমল অধর ক্ষণকালের মধ্যে নীরস শুষ্ক হইয়া উঠিল। তাহাদের সমুন্নত বক্ষঃস্থলে লিপ্ত কুঙ্কুমাবলি অবিরলোদ্-গত নয়নকজ্জল-বিবর্ণীকৃত অশ্রুধারায় প্রক্ষালিত হইয়া গেল। গুরু দুঃখানুভূতির বিবশতায় তাহাদের মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন কথাই বাহির হইতে পারিল না।

যিনি আত্মা হইতেও প্রিয়তম, তিনিই এমন করিয়া ডাকিয়া আনিয়া এত রূঢ় কথা বলিতেছেন কেমন করিয়া? এই ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া শেষে তাহারা—যাহারা কৃষ্ণসেবার জন্য সকল কাম বিসর্জ্জন করিয়াছিল—তাহারা রোদনাশ্রুভারবিবশীকৃত লোচন-দ্বয় বসনাঞ্চলে যথাসম্ভব মুছিয়া ফেলিল, প্রেম-সংরম্ভের তীব্র আবেগে তাহাদের কণ্ঠ জড়ীকৃত হইতেছিল, অতর্কিত-ভাবে চরণনখের দ্বারা ভূমিতে কি লিখিতেছিল, তাহা তাহারা নিজেই বুঝিতেছিল না; তথাপি কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া তাহারা অতি সাবধানতার সহিত এই কয়টি প্রাণের কথা এই ভাবে প্রাণারাম শ্রীগোবিন্দকে জানাইয়াছিল—

"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।

ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥"

হে প্রভো! আপনি স্বতন্ত্র, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তাই বলিয়া এ সময়ে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আপনার এইরূপ কঠোর অভিভাষণ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; কেন পারে না, তাহা বলি, শুনুন—আমরা—আমার বলিবার যাহা কিছু এ সংসারে ছিল বা আছে, অথবা হইতে পারে, তাহা সকলই একেবারে অনন্তকালের জন্য উপেক্ষা করিয়া আপনার পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, তুমি কাহারও কাছে ধরা দিবার পাত্র নহ; কিন্তু আমরাও ছাড়িবার পাত্র নহি। কারণ, আমরা তোমার ভক্ত, আদিপুরুষ পরব্রহ্ম যেমন সংসারবিরত মোক্ষার্থী জ্ঞানী পুরুষদিগকে নিরাশ করেন না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে আত্মভাবে ভজনা করেন, তুমিও, প্রভো, তোমার একান্ত ভক্ত আমাদিগকে নিরাশ করিয়া ছাড়িও না, প্রত্যুত সেই আদিপুরুষের ন্যায় আমাদিগকে গ্রহণ কর।

আমরা সকলকে ছাড়িয়া কেন তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি, তাহাও শুন—

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং ননু বন্ধুরাত্মা॥"

তুমি সত্যই ধর্ম্মজ্ঞ বটে, কিন্তু মর্ম্মজ্ঞ নহ। তুমি ব্রজগোপীগণকে উপদেশ দিয়াছ যে, পতি, পুত্র, কন্যা ও সুহৃদ্‌গণের সেবাই নারীর স্বধর্ম্ম,—আমরা বলি শুন, এই ধর্ম্মোপদেশদাতা তোমাকেই যদি আমরা ভজনা করিতে পারি, তাহা হইলে কি আমাদের পতিসেবা, পুত্রসেবা, কন্যাসেবা ও সুহৃৎসেবা—একাধারে সুসম্পন্ন হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে, তাহার কারণ এই যে, তুমিই একমাত্র সকলের আত্মা—তুমিই একমাত্র সকলের বন্ধু; সুতরাং তুমিই সকলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, ইহাই যদি সকল শাস্ত্রের—সকল উপনিষদের সার রহস্য হয়, তবে তোমার সেবা করিলে আমাদের পতিসেবা হইবে না, পুত্র-কন্যা-সেবা হইবে না, সুহৃৎ-সেবা হইবে না, ইহা শাস্ত্ররহস্যজ্ঞ কোন্ ধর্ম্মবিৎ বলিতে সাহস করে—তাহা তুমি প্রভু, আমাদিগকে বুঝাইয়া দেও।

শ্যামের বাঁশীর ইহাই বিশেষত্ব যে, ইহার সুরের স্বর্গীয় ঝঙ্কারে কেবল বেহাগ, খাম্বাজ, ললিত, বিভাষ, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীই যে ফুটিয়া উঠে, তাহা নহে; কিন্তু ইহা কানের ভিতর দিয়া প্রাণের মরমে পশিয়া সিদ্ধ সাধকের জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত অন্তঃপ্রসুপ্ত ভাবরাজ্যকে চির-নূতন আনন্দময় আলোকের সাহায্যে নিত্য নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলে; তাই রাসলীলার শুভ আরম্ভক্ষণে গো-পালননিরত আজন্ম অশিক্ষিত গোপললনাগণের কর্ণে এই বাঁশীর স্বর প্রবেশ করিয়া বংশীধরের চরণপ্রান্তে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া যে আনন্দসান্দ্র চিন্ময় রসঘন বিগ্রহ দর্শন করাইয়াছিল, তাহাই উপনিষদের চরম প্রতিপাদ্য; তাহাই যোগিরাজবৃন্দের একমাত্র ধ্যেয়, তাহাই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা এবং ভক্তের ভগবান্।

এই বাঁশীর যে ভাববিবর্ত্ত মনের বৃন্দাবনে ফুটিয়া উঠে, তাহাই বুঝাইতে যাইয়া ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"ঐ যে শ্যামের বাঁশী বাজিছে বিপিনে।
বাঁশী, বনে বাজে কি মনে বাজে, তা ত বুঝি নে॥
বাজে বাঁশী, 'দে মা ননী'
শুনে নন্দরাণী—
'মাথায় বাধা দাও গো তুলে' নন্দরাজ শুনে।
রাখালবালক শুনে বাঁশী 'চল সখা বনে'।
আর—রাধানামে সাধা বাঁশী কিশোরীশ্রবণে॥

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

অমরনাথ

৪৭

বড় দিনের বন্ধে বেনসন সস্ত্রীক পশুপতিপুরে বেড়াইতে আসিলেন। অমর এক দিন তাঁহার বাংলোতে বসিয়া কহিলেন, "বেনসন, আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পার?"

বে। একেবারেই পারি না।

অ। আগে কথাটা কি, শোন।

বে। শোনবার দরকার নেই, আমি বুঝেছি।

অ। কি বুঝেছ বোকা?

বে। বুঝেছি, পণ্ডিত বিয়ে করতে দেশে যেতে চান।

অ। বিয়ের আমার ঢের দেরী।

বে। অস্বীকার করো না অমর—

মিরা। কা'কে বিয়ে করছ, অমর বাবু?

অ। (সহাস্যে) বেনসনকে জিজ্ঞেস করুন।

বে। আচ্ছা, আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেও।

অ। তোমাকে চব্বিশ মাস সময় দিলাম।

বে। অত সময় চাই নে—এ কি! আমার মাথা এমন করছে কেন?

বলিতে বলিতে বেনসন ঢলিয়া পড়িলেন—চেয়ারের উপর মাথা লুটাইয়া পড়িল। স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া স্বামীর পাশে ছুটিয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

বেনসন বুক দেখাইয়া দিলেন; মেম কোটের বোতাম খুলিয়া দিলেন, মিঃ বেনসনের বাসের জন্য যে বাংলো নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা একটু দূরে। অমর ইতস্ততঃ না করিয়া বেনসনকে কোলে উঠাইয়া লইলেন এবং স্বীয় শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া শয্যার উপর যত্ন-সহকারে শোয়াইয়া দিলেন। অমর জল আনিতে ছুটিলেন। ইত্যবসরে মেম দেখিলেন, স্বামীর অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি। তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অমর জল লইয়া আসিলে বেনসন অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আহা, কি সুন্দর! কি প্রেমময় চক্ষু! পারস্য দেশের গোলাবের ন্যায় বর্ণ! বাঙ্গালার আকাশের মেঘের ন্যায় চুল! সমুদ্রের ন্যায় নীল চক্ষু! পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা—"

এখন অমরের গৃহকোণে খাটের পায়ার দিকে একটি ছোট টেবলের উপর ফ্রেমে আঁটা মাঝারি রকমের ছবি একখানা দাঁড় করান ছিল। পাশে একখানি চেয়ার, ছবির পাশে টেবলের উপর রঙের বাক্স, তুলি, ব্রুস প্রভৃতি সরঞ্জাম। ছবিখানি জ্যোতির, অমর আঁকিতেছেন; এক বৎসর ধরিয়া আঁকিতেছেন, তবু শেষ করিতে পারেন নাই। তিনি আঁকিতে জানিতেন না, তীব্র বাসনা ও অধ্যবসায় অল্পকালমধ্যে তাঁহাকে আঁকিতে শিখাইয়াছিল। তিনি তাঁহার কল্পনা ও তুলি লইয়া তিন শত নির্জ্জন সন্ধ্যা মহানন্দে যাপন করিয়াছেন। চক্ষু দুইটি আঁকিতে কত দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র অবস্থায় তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কত পরিবর্ত্তনের পর চক্ষু দুইটি আঁকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সময় সময় তাঁহার মনে হয়, সে প্রেমময় গভীর ধ্যানরত চক্ষু আঁকিতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই—সে ভ্রূ, সে ললাট, সে নাসিকা, সে অধর তিনি আঁকিতে পারেন নাই—আঁকিতে কত সময় স্থির হইয়া বসিয়া নিমীলিত নয়নে জ্যোতিকে ধ্যান করিতে হইয়াছিল; ধ্যানপ্রভাবে তিনি জ্যোতির অশরীরিণী মূর্ত্তি মানসনয়নে নিয়ত দর্শন করিতেন। তাহার সেই মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া অমর ছবি আঁকিতেন।

ছবিখানি দিবসে বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিত, আজ কোন গতিকে আচ্ছাদন সরিয়া গিয়াছিল এবং ছবিখানি বেনসনের নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছিল। অমর বুঝিলেন, বেনসন ছলনা করিয়া তাঁহার শয্যাগৃহে আসিয়াছেন। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বেনসনকে এক চড় লাগাইলেন। বেনসন চড় খাইয়া একবারে ঘরের বাহির। বাহিরে গিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "চব্বিশ ঘণ্টা সময় চেয়েছিলাম, চব্বিশ মিনিটও লাগল না।"

অ। তুমি এত দুষ্ট, তা' জানতাম না—থামো, তোমাকে জব্দ করছি।

বে। আর যা হয় কর, মিরাকে নিও না।

এবার মেম চড় লাগাইলেন। বেনসন কহিল, "তোমরা দু'জনে মিলে মেরেও আমাকে তাড়াতে পারবে না—আমি এ দেশে কিছু দিন থাকব।"

অ। ছুটী আর ক'দিন ভাই—

বে। আমি ভাবছি, তিন মাসের ছুটী নেব—

অ। কেন?

বে। এ যায়গাটা বেশ; কেমন পাহাড়, নদী, জঙ্গল, বাতাস—শিকারও যথেষ্ট। আমাদের দেশে এমন সুন্দর স্থান নাই। আমি এখানে কিছু দিন থাকব।

অমর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেনসনের হাত দুইটি ধরিলেন এবং গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "বেনসন, তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি।"

বে। বুঝে থাক, বেশ করেছ, এখন হাত ছাড়।

অ। কেন তুমি আমার জন্তে এতটা ক্ষতি স্বীকার করবে ?

বে। তোমার জন্তে আমি কিছু করছি না।

অ। মিথ্যে বলো না—

বে। তোমার ভয়ে মিথ্যে বলা প্রায় ছেড়েছি। যাও অমর, বিয়ে ক'রে পৃথিবীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠকে ঘরে নিয়ে এস।

অ। তোমার মত বন্ধু পেয়ে আমি ধন্ত। দেশের জন্তে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে; এখন তোমার উপর কার্য্যভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্তমনে দেশে যেতে পারব।

বে। তুমি নিশ্চিন্তমনে যাও, অমর।

অ। মনে ক'রো না বেনসন, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি; সে সৌভাগ্য আমার কপালে নেই।

বে। সে কি অমর ?

অ। আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রো না, ভাই।

বেনসন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এমন সময় ব্রজবল্লভ দর্শন দিলেন; শিষ্টাচারাদির পর তিনি কহিলেন, "আমার কিছু দিনের ছুটী চাই, অমর বাবু, আগে হ'তে জানিয়ে রাখছি।"

অ। আমাকেও যে যেতে হচ্ছে—

ব্র। আপনি কবে যাবেন ?

অ। আজকাল; ফিরতে দু' তিন মাস বিলম্ব হবে।

ব্র। আমি চাই মাত্র পনর দিনের ছুটী—ছুটী আমাকে দিতেই হবে।

অ। কেন ?

ব্র। আমার বিয়ে হচ্ছে—

বে। তোমাদের ত আর পোষ মাসে বিয়ে হয় না, বাবু।

ব্র। না, হয় না। বিয়ে হবে মাঘ মাসে, আগে হ'তে আমি ব'লে রাখছি।

বে। তুমি বিলেত গিছলে না ?

ব্র। গিছলাম; আমার সার্টিফিকেট সেখানকার।

বে। তোমার বিয়ে কি হিন্দুমতে হবে, বাবু ?

ব্র। কেন হবে না ? বিলেত গেছি ব'লে ত আমি আর অহিন্দু নই; হিন্দু সমাজকে যদিও আমি শ্রদ্ধা করি না, তবু তার বাইরে যাই নি। হিন্দুর মেয়েকে হিন্দুমতে বিয়ে করব।

বে। মেয়ে বেশ শিক্ষিত ?

ব্র। শিক্ষিতা হওয়াই ত সম্ভব—তিনি এক জন হাকিমের মেয়ে; তাঁর ভাইও খুব সাহেব-ঘেঁসা।

অ। হাকিমের নাম শুনলে ভয় হয়; তিনি কোন্ দেশের হাকিম ?

ব্র। এখন আর তিনি হাকিম ন'ন—পেনসন নিয়েছেন। তাঁর নাম রায় বাহাদুর গণেশলাল—

অ। কোন্নগরে বাড়ী ?

ব্র। আপনি যে তাঁকে চেনেন দেখছি।

অ। বিয়ে পাকা হয়ে গেছে ?

ব্র। পাঁচ দিনের ভেতর সব ঠিক্ হ'ল।

অ। এত শীঘ্র কি ক'রে হ'ল ?

ব্র। টেলিগ্রাফে লেন-দেনের কথা স্থির হয়েছে; মেয়ের ফটো তাঁরা পাঠাবেন বলেছেন, আমি আজ আমার ফটো পাঠাচ্ছি।

অমর চিন্তামগ্ন হইলেন। একবার তাঁহার মুখ আনন্দে হাসিয়া উঠিল, পরক্ষণেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। বেনসন তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। অমর কহিলেন, "আপনি যান ব্রজ বাবু, বিয়ে ক'রে সুখী হন, স্ত্রীকে সুখী করুন।"

ব্র। শুনছি, মেয়েটি সুন্দরী, মোটা টাকাও যৌতুক পাচ্ছি।

অমর সে কথার আর উত্তর করিলেন না।

ব্রজ প্রস্থান করিলেন। তখন বেনসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু লুকিও না অমর, সত্য বল—তোমার ঘরে যে মেয়েটির ছবি দেখেছি, সেই মেয়েটির সঙ্গে কি ব্রজ বাবুর বিয়ে হচ্ছে ?"

অ। না; এ তার বোন্।

বে। তবে তোমাকে কাতর, বিষণ্ণ দেখছি কেন ?

অ। তবে শোন বেনসন, তোমাকে সব কথা বলি। যাকে ব্রজ বাবু বিয়ে করছেন, তার নাম রেবা, আর যার ছবি আমার ঘরে দেখেছ, তার নাম জ্যোতি। দু'জনেই আমাকে ভালবেসে স্বামিপদে বরণ করেছে। রেবা আমাকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করতে সম্মত নয়, চিরকাল অবিবাহিত থাকবে, এই রকমই সে সঙ্কল্প করেছিল। এখন হঠাৎ শুনছি, সে বিয়ে করতে উদ্যত। এর ভেতর রহস্য আছে।

বে। রহস্য যা আছে, তা' বুঝতেই পারছি। যখন সে দেখলে, তোমাকে কোন রকমে পাওয়া যাবে না, তখন সে আর তোমার আশায় ব'সে না থেকে—

অ। সে জাতের মেয়ে সে নয়—

বে। মেয়ে-মানুষ চেনা বড় কঠিন, অমর; আমি বুড়া হয়ে এলুম, তবু আজও তাদের চিন্‌তে পারলাম না। তা সে যাই হোক, তোমার দুঃখের কারণ কি ?

অ। আমার মনে হয়, রেবা শুনেছে, সে অবিবাহিত থাকতে আমি বিবাহ করব না। তাই আমাকে সুখী করতে সে আজ বিবাহে সম্মত।

বে। সে অবিবাহিত থাকতে তুমি বিয়ে করবে না কেন ?

অ। তার জীবন দুঃখময় ক'রে আমি নিজের সুখ অন্বেষণ করতে পারি নে।

মিরা। তোমার মনের ভাব বুঝেছি, অমর বাবু! এ ভাব পৃথিবীতে দুর্ল্লভ, স্বর্গেও দুর্ল্লভ—তোমার পক্ষেই এ ব্যবহার সম্ভব।

অ। ছি মিরা, আমি যে তোমার ভাই।

মিরা একটু লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর রহিলেন। বেনসন কহিলেন, "যে আত্মোৎসর্গ তোমাতে সম্ভব অমর, সে আত্মোৎসর্গ মানবদেহ নিয়ে অপর কেহ দেখাতে পারবে, তা আমার মনে হয় না।"

অ। তুমি হিন্দুদের চেন না, তাদের পুরাণ-ইতিহাসও পড় নি। বেনসন, তারা সব পারে। হিন্দুস্থান ত্যাগের ভূমি, ভোগের নয়। নূতন আদর্শ সামনে পেয়ে আমরা ভোগ শিখেছি, পুরাতন আদর্শ নষ্ট করেছি।

বে। তুমি যাই বল অমর—

পিয়ন আসিয়া চিঠি দিল। অমর কৃষ্ণের পত্রখানা চাহিয়া লইয়া পড়িলেন। তাহার এক স্থানে লেখা ছিল।—"যে রেবা

তোমাকে বই জানত না, সে রেবা এখন বিয়ে করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। চারিদিকে পাত্রের সন্ধান চলছে, শীঘ্র বিয়ে হবে, এরূপ সম্ভাবনা দাঁড়িয়েছে। তবে তুমি আর অবিবাহিত থাক কেন? আমি রেবাদের বাড়ী যাই না, তারাও আসে না; তাদের কোন কথায় থাকি না, তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কও রাখি না। তুমি মনে করো না, তোমার সম্বন্ধের কথা আমি তাদের কাছে বলেছি। শুনেছি, রেবা এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে; সুস্থ হয়ে বিবাহ-প্রস্তাবে সে আর আপত্তি করে নি। রেবার ফটো তুলতে আজ সকালে এখান হ'তে আর্টিষ্ট গিছল। তার মুখে শুনলাম, রেবার শ্রীসৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। চাও ত একখানা ফটো পাঠিয়ে দিতে পারি; দেখবে, কত গয়না ও হাসি নিয়ে রেবা ফটো উঠিয়েছে। আমার বিশ্বাস, রেবা এখন তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। স্ত্রীলোকের কাছে এর চেয়ে বেশী কি চাও?"

অমর চিন্তামগ্ন হইলেন। সহসা আর একখানি পত্রের শিরোনামা অমরের নয়ন আকর্ষণ করিল। অমর ঝটিতি খাম-খানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে দুইটি কথা মাত্র লেখা ছিল,—"ক্ষমা করবেন।" অমর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অন্যান্য পত্র টেবলের উপর উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। 'সাহেব-মেম' তাঁহাদের চিঠিপত্র পড়া সারিয়া খবরের কাগজ খুলিলেন। অমর কহিলেন, "বেনসন, তোমাদের কথাই ঠিক, রেবা আমাকে ভুলে গেছে; কিন্তু—"

বে। কিন্তু আবার কি?

অ। কিন্তু সময় সময় আমার মনে হয় যে, আমাকে ধ্যানে আকর্ষণ করছে। বিনা প্রেমে এরূপ আকর্ষণ অসম্ভব ব'লে জানতাম।

বে। ও সব বাজে কথা ছাড়, এখন যাও, বিয়ে ক'রে এস।

অ। তুমি এখানে থাকবে ত?

বে। কত বার সে কথা বলতে হবে?

অ। আমি বলছি, সেখানকার কায ছেড়ে এখানে ম্যানে-জার হয়ে থাকবার কথা।

বেনসন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। উত্তর না করিয়া অম-রের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। অমর মৃদু হাস্যসহকারে কহিলেন, "শুধু ম্যানেজার হয়ে নয় বেনসন্; পার্টনার হয়ে—"

বে। অন্য কেহ এ প্রস্তাব করলে আমি ভাবতাম, এটা রহস্য; কিন্তু তুমি যখন বলছ—

অ। তখন সেটা স্থির। এখন ইস্তফা-পত্র পাঠিয়ে দিয়ে তুমি স্থির হয়ে বসো।

বে। আমি ভেবে দেখি—

অ। ভাববার কিছু নেই, আমার প্রার্থনা, আমার আদেশ অবহেলা করবার তোমার সামর্থ্য নেই।

বে। কেন?

অ। তুমি যখন আমাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছ, তখন তোমার স্বাতন্ত্র্য নেই।

বে। আমার স্ত্রীটিও কি তোমার? সে যে ভাবে তোমার সম্বন্ধে কথা বলে, তা'তে মনে হয়, তা'কেও তোমার ক'রে নিয়েছ।

অ। আমার ক'রে নিয়েছি ত; মিরা আমার বোন্, মেয়ে, মা।

মিরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই পা অমরের দিকে অগ্রসর হই-লেন। অমরকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কথা ফুটিল না, চক্ষু সজল হইল, ওষ্ঠ কাঁপিল—ফিরিয়া গিয়া নিজের আসনে বসিয়া পড়িলেন।

অমর মুখ ফিরাইয়া লইয়া আকাশ পানে চাহিলেন। বেনসন্ কহিলেন, "অমর, তুমি যা' বলবে, তাই করব।"

অ। বুঝতেই পারছ বেনসন, আমি জ্যোতিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। ফিরতে দু' চার মাস হ'তে পারে। এমন কি, ফির-তেও না পারি, হাজারিবাগে একটা খনি কিনছি। ব্রজ বাবু বিয়ে ক'রে ফিরলেও তিনি বেশী দিন এখানে থাকবেন ব'লে মনে হয় না; থাকেন, তাও আমার ইচ্ছা নয়। এখন তোমার উপর সকল ভার।

একটু ভাবিয়া বেনসন কহিলেন, "অমর, তুমি আমাকে দিয়েছ অনেক; এত মিরা ছাড়া আমাকে কেহ দেয় নি। আর কেন বোঝা বাড়াও?"

"আমি তোমার কোন কথা শুনব না—যা' বলি, তাই কর।"

বেনসন উঠিয়া অমরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "তুমি বনের পশুকে বশ করলে, অমর!"

৪৮

রেবার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে মাঘ মাসের গোড়া-তেই। ফটকের দুই ধারে নহবতখানা উঠিয়াছে। মল্লারে রাগিণী ধরিয়া সানাই গ্রামবাসীদিগকে জানাইতেছে, আজ রেবার বিবাহ। কদলীবৃক্ষ মাথা নাড়িয়া অশুভকে দূরে থাকিতে কহিতেছে; অট্টালিকা দেবদারু-পত্রের বসন পরিয়া জগৎকে জানাইতেছে, আমার ভিতরে কি আছে, তোমাকে দেখিতে দিব না—বাহির দেখিয়া আমার প্রশংসা কর। স্তম্ভে স্তম্ভে বিলম্বিত ফুলমালা দর্শকদিগকে জানাইতেছে, আমি নানা বর্ণ—নানা রূপ ধারণ করত তোমাদের মন আকর্ষণ করিতে পারি বা না পারি, তোমাদের নয়ন মুগ্ধ করি। রক্তপতাকা উড়িয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতেছে—আজ আনন্দের দিন।

বরের জন্য নিকটে একখানি বাড়ী লওয়া হইয়াছিল। বর যথাকালে আসিয়া তাহা দখল করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপবাসে থাকিতে বলা হইয়াছিল; তিনি জানিতেন, হিন্দুদের এ সব কু-প্রথা; প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ না করিয়া তিনি কলিকাতায় গিয়া গোপনে চপ-কাটলেট খাইয়া আসিলেন এবং বিবাহ কালে মন্ত্রোচ্চারণের সময় পিঁয়াজ-রশুনের উদ্গার ছাড়িতে লাগি লেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, মন্ত্রগুলার কোন অর্থ নাই সুতরাং দুই চারিটা কথা অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিয়া বাকিগুল অং বং করিয়া সারিয়া লইলেন। রেবা কিন্তু উপবাসে থাকিয়া মন্ত্রগুলি যথাসাধ্য স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছিল।

বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেকে আসিয়াছিলেন। হিরণ, শোভা, রূপো, জ্যোতি তাঁহাদের জননীর সহিত আসিয়াছিলেন শোভা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু যাহার বিবাহে আসিয়াছিল

তাহার সহিত বাক্যালাপ করিল না। কারণটা কি, রেবা বুঝিল। বুঝিয়া বাসর-ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক নির্জ্জন কক্ষে শোভাকে টানিয়া আনিল এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছ না কেন, শোভাদি?"

শো। তোর বিয়েতে এইছি এই ঢের, তোর মত পাপিষ্ঠার সঙ্গে কথা আবার কব কি?

রে। আমি করেছি কি, শোভাদি?

শো। করিস নি কি? অমরের সঙ্গে ঢলাঢলির একশেষ ক'রে বিয়ে করলি কি না শেষকালে একটা খৃষ্টানকে। ছি ছি; তোর গলায় দড়ি।

রে। কোন্‌টা আমার অপরাধ, তাই খুলে বল, শোভাদি। খৃষ্টানকে কি বিয়ে করা, না আর কিছু?

শো। তুই অমরকে ভালবাসতিস কি না?

রে। তুমি ত তা' ভাল রকমই জান।

শো। এখন বুঝি তোর সে ভালবাসাটা আর এক জনকে দিতে চাস? দু' দিন বাদে আর এক জনের দোরে দাঁড়াবি, তার পরে ফিরি ক'রে বেড়াবি, কেমন?

রে। ভাল ত দু'জনকে বাসা যায় না, দিদি—

শো। তবে? তবে এ ভণ্ডামী কেন? এক জনকে শাঁস-জল খাইয়ে আর এক জনকে ছোবড়া দিতে এসেছ, বড় ভাল কাযই করেছ, না?

রে। কি করব দিদি? তাঁকে যখন পাওয়া গেল না, তখন কি করি বল? বিয়ে ত করতে হবে।

শো। এমন বিয়ের মুখে আগুন। হিঁদুর ঘরে জন্মালি কেন?

রে। আমি ত ইচ্ছে ক'রে জন্মাই নি, দিদি—

শো। জন্মিছিস যখন, তখন হিঁদুর আচার-বিচার নিয়ে থাক্; না পারিস, বেশ্যা হয়ে চ'লে যা'।

রে। শোভাদি!

শো। বেশী বলেছি?

রে। না, বেশী বল নি; আরও যদি কিছু বলতে চাও, তা হ'লে বল।

শো। এর চেয়ে আর বেশী কি বলব? যার বাড়া গাল স্ত্রীলোকের পক্ষে নেই, সেই গাল তোকে দিয়েছি। এতেও কি তোর পেট ভরে নি?

রে। না, ভরে নি—আরও বল।

শো। তুই যা' পাপ করেছিস, তার চেয়ে বড় পাপ হিঁদুর ঘরের মেয়ে করতে পারে না। তোকে আর কি বলব?

রে। আমার কি করা উচিত ছিল, দিদি?

শো। এই খৃষ্টানকে তোর আগে বলা উচিত ছিল যে, ছোবড়া ভিন্ন দেবার তোর আর কিছু নেই।

রে। তা হ'লে কেউ ত আমাকে বিয়ে করত না।

শো। না করত, আইবুড়ো থাক্‌তিস; তা'তে তোর যদি রুচি না হ'ত, তা হ'লে দড়ি—

রে। আত্মহত্যা যে মহাপাপ।

শো। যে পাপ করেছিস, সে পাপ যে আরও বড়।

রে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। আমি তা হ'লে মহাপাপ করেছি—আমি ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক—

শো। নিশ্চয়ই তুই বিশ্বাসঘাতক। শুদ্ধহৃদয় নিয়ে সরল বিশ্বাসীকে ছলনা ক'রে তুই যে মহাপাপ সঞ্চয় করলি, তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তুষানল।

রে। তা হ'লে প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমি জানতাম, নেই। ভেবেছিলাম, কোটি কোটি কল্প আমাকে নরক ভোগ করতে হবে—কৃমিকীটে আমাকে অহরহ দংশন করবে—

শো। দেখছি, তুই জ্ঞানপাপী, জেনে শুনে এ পাপ করেছিস।

রে। ঠিক বলেছ দিদি, আমি জ্ঞানপাপী—

শো। তোকে আমি বুঝতে পারলাম না।

রে। কিছু দিন অপেক্ষা কর, এর পরে এক দিন বুঝিয়ে বলব—আজ আর পারছি না—জ্বর এসেছে।

শো। জ্বর এসেছে! তাই বুঝি পাগলের মত বকছিস? গা দেখি। ও মা, তাই ত—গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

রে। আমি এইখানে শুয়ে পড়লুম, আমাকে আর উঠিও না।

শোভা ব্যস্ত হইয়া তাহার মাসীমাকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, রেবা কাঁপিতেছে। গণেশ বাবু আসিলেন, ডাক্তার আসিল—ব্যবস্থাদি হইল, কিন্তু বাসর হইল না—ফুলমালা উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল, দীপ নির্ব্বাপিত হইল, সুন্দরীর দল প্রসাধন বৃথা হইল ভাবিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণমধ্যে গৃহের আলো উচ্ছ্বাস আনন্দ নিবিয়া গেল।

পরদিবস কুশণ্ডিকা কোন রকমে সারা হইল। তৎপরদিবস ফুলশয্যা। সে দিন রেবা অপেক্ষাকৃত সুস্থ। যে গৃহে বরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই গৃহে ফুলশয্যার ব্যবস্থা করা হইল। পাকস্পর্শ প্রভৃতির ব্যয়ভার গণেশ বাবুকে লইতে হইল, কিন্তু আয়ের ভার লইলেন জামাই স্বয়ং। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্বর্ণ ও রজত উপহারে রেবাকে ভারাক্রান্ত করিলেন, কিন্তু ব্রজবল্লভ প্রসন্নচিত্তে সে ভার হইতে রেবাকে সত্বর মুক্তি দিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অনেকেই আহারাদি সমাপন করিয়া গৃহপ্রত্যাগত হইলেন; নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ উৎসব সমাপনার্থে অবস্থান করিলেন।

ফুলের গহনায়, ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া রেবা যখন গুরুজনদের চরণে প্রণাম করিল, তখন তাহার পাশে জ্যোতিকেও ম্লান দেখাইল। যৌবন কূলে কূলে পূর্ণ, পূর্ণ জোয়ারে দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আধার ক্ষীণ—দেহ রোগে শীর্ণ। গৌরবরণ, সিতবরণে পরিণত হইয়াছে; প্রেমময় চক্ষু সঙ্কুচিত, নাসিকা তীক্ষ্ণ, গণ্ড মাংসহীন, ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত। এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও রেবাকে আজ সর্ব্বশোভাময়ী রাজেন্দ্রাণী তুল্য দেখাইতেছিল।

কিন্তু তাহার মুখে আজ আর হাসি নাই। যে উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া রেবা দুই দিন পূর্ব্বে বধূবেশে সজ্জিত হইয়াছিল, সে উৎসাহ আজ আর নাই। সে দিন যোদ্ধৃবেশে জয়কামনায় উৎসাহভরে আসিয়াছিল, আজ যুদ্ধান্তে ক্লান্ত দেহ শ্রান্ত মন লইয়া পুষ্পময়ী রেবা ফুলশয্যায় পতিপার্শ্বে শুইতে চলিল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় রেবা ভাবে নাই, কত রক্তপাতে রণজয়ী হইতে হইবে; আজ যুদ্ধাবসানে রেবা দেখিল, তাহার সমস্ত রক্ত

বহিয়া গিয়াছে—সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে,—যজ্ঞভূমে বধার্থে আনীত পশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে রেবা যূপকাষ্ঠতুল্য শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

ব্রজবল্লভ তখনও ঘরে আসেন নাই। কক্ষ নবদম্পতির অপেক্ষায় সাজিয়া বসিয়া আছে। প্রাচীরে দীপ, আলেখ্য, দর্পণ, ফুলমালা; কোমল শয্যা পুষ্পাস্তীর্ণ; আধারে আধারে পুষ্প-গুচ্ছ। গৃহ সৌন্দর্য্যময়, গন্ধময়, আলোকোদ্ভাসিত। রেবা দেখিল, শয্যায় সর্প, গন্ধে হলাহল, আলোতে ভুজঙ্গের অগ্নিময় চক্ষু। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া রেবা শিহরিয়া উঠিল—পুষ্পময় শিরোভূষণ মাথা হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে ফেলিল, কণ্ঠ হইতে ফুলমালা খুলিয়া ফেলিল। পশুকে ধরিয়া যূপকাষ্ঠ-সমীপে আনয়ন করিলে সে যেমন সমূহবিপদ বুঝিয়া আত্মরক্ষার্থে শেষ চেষ্টা করে, রেবাও তেমনই ভীত শঙ্কিত হইয়া সে শয্যা, সে গন্ধ, সে আলোকধারা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় পলায়নতৎপরা হইল। কিন্তু পলাইতে পারিল না,—দ্বারদেশে তাহার স্বামী, তাহার প্রভু দণ্ডায়মান। রেবা শিহরিয়া পিছাইয়া আসিল।

ব্রজবল্লভ দ্বার বন্ধ করিয়া রেবার পানে চাহিলেন। দেখিলেন, রেবা অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাঁহার অর্থের লালসা মিটিয়াছে, এক্ষণে রূপের লালসা তাঁহার অন্তরমধ্যে জাগিয়া উঠিল। এ রূপ, এত রূপ স্বদেশ বা বিদেশে কোন রমণীর বদনে তিনি দেখেন নাই। তাঁহার উদ্দীপ্ত লালসা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, অসংযত বাসনা তাঁহাকে আত্মহারা করিল। তিনি কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "বিছানায় এস।"

রেবা একটু দূরে এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ভয়ে আশঙ্কায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইল; ভয়চকিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "না, না, তা' হবে না—"

ব্রজ। কি হবে না?

রেবা সহসা কোন উত্তর করিল না। ভাবিয়া দেখিল, এখন ভয়ে কাতর হইবার সময় নহে—পতনোন্মুখ খড়্গকে প্রতিহত করিতে হইবে। সাহসে বুক বাঁধিয়া রেবা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি বিছানায় শোন, আমি মেঝেতেই শোব।"

ব্র। তা' কি হয়—

রে। হ্যাঁ, তাই হবে।

ব্র। এ রকম কথা কখন ত শুনি নি।

রে। বিয়ে বোধ হয় পূর্ব্বে আর করেন নি।

ব্র। নিজে না করি, লোকের ত দেখেছি।

রে। হিঁদুর ঘরে বোধ হয় দেখেন নি। আপনি শুয়ে পড়ুন, রাত হয়েছে, আমি মেঝেতে একখানা লেপ নিয়ে শোব।

ব্র। ছি রেবা, কেন আমাকে দুঃখ দেও?

রেবা চমকিয়া উঠিল, কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। ব্রজ অগ্রসর হইলেন; কহিলেন, "রেবা, এস।"

"না, ক্ষমা করবেন।"

ব্রজ দুই পা অগ্রসর হইয়া রেবার হস্তধারণোদ্যত হইলেন। রেবা ত্রস্তপদে সরিয়া গিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "না, না, আপনি আমাকে ধরবেন না—না, না—"

ব্রজ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রেবার পানে চাহিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল দেখি?"

"বলবার কিছু নেই, আপনি দোর খুলে দিন, আমি চ'লে যাই।"

"তুমি আমার—"

"না, না—"

"আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দেব না।"

বলিয়া ব্রজ রেবার হাত ধরিলেন। রেবা হাত ছাড়াইয়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল; যে সাহসটুকু বুকে বাঁধিয়া এতক্ষণ সে যুঝিতেছিল, সে সাহস অন্তর্হিত হইল—হননোদ্যত খড়্গ পানে কৃপাপ্রার্থী নয়নে চাহিয়া রহিল। কৃপা নাই, কৃপা কাহাকে বলে খড়্গ জানে না, কৃপা করিতে সে জন্মায় নাই। খড়্গ বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক রেবাকে আলিঙ্গন করিল, রেবা তখন জ্ঞান হারাইয়া ছিন্ন-শির পশুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। ব্রজ এখন ভীত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন; পুর-মহিলারা আসিয়া রেবার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

৪৯

পরদিন প্রভাতে রেবা চক্ষু খুলিয়া দেখিল, জ্যোতি তাহার পাশে শুইয়া ঘুমাইতেছে। রেবা তাহাকে জাগাইল না—চুপ করিয়া শুইয়া তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিল। দেখিল, তাহা সুন্দর নির্ম্মল নিরঞ্জন। শান্তিস্নিগ্ধ, আনন্দোজ্জ্বল, নবযৌবনোদ্ভিন্ন কান্তি, প্রভাতারুণের ন্যায় রেবার নয়নে দৃষ্ট হইল। রেবা অতৃপ্তনয়নে তাহার রূপ দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, এ রূপ যেন জ্যোতির নহে, এ রূপ যেন সে ধার করিয়া আনিয়াছে, যাহার রূপের প্রতিবিম্ব পাইয়া অরুণ এত সুন্দর, না জানি সে কত সুন্দর!

জ্যোতির ঘুম ভাঙ্গিল; সে দেখিল, রেবা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; কহিল, "আমি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; এখন কেমন আছ, রেবাদি?"

রে। বেশ আছি, তুই শো।

জ্যো। না, আর শোব না, বেলা হয়েছে।

রে। সবে উষা দেখা দিয়েছেন, বেলা হয় নি।

জ্যোতি শুইল। রেবা তাহাকে টানিয়া নিজের লেপের ভিতর আনিল। কহিল, "তোর মুখখানা বড় সুন্দর জ্যোতি, ঠিক যেন উষা—"

জ্যো। তোমাকে রেবাদি, কাল দেখাচ্ছিল ঠিক যেন রতি-দেবী; তোমার নাম সার্থক হয়েছিল—

রে। আমি সন্ধ্যাতারা, আর তুই উষা। তোর জীবন-প্রভাত, আর আমার জীবন-সন্ধ্যা। তোর সম্মুখে নূতন আশা, নূতন জীবন; আর আমার সম্মুখে শুধু অন্ধকার—

জ্যো। তুমি অমন ক'রে বলো না রেবাদি, আমার বড় কষ্ট হয়।

রে। জ্যোতি, তুই সুখী হ'; আশীর্ব্বাদ করি, এই মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুই যেন তাঁর যোগ্য হ'তে পারিস।

জ্যো। মৃত্যুশয্যা! ছি রেবাদি, অমন কথা মুখে এনো না।

রে। সত্যি ভাই, এ আমার মৃত্যুশয্যা; এ দেহ আর রাখব না।

জ্যো। কেন, কেন?

রে। এ দেহের আর ত প্রয়োজন নেই।

জ্যো। তবে—তবে বিয়ে করলে কেন?

রে। তুমি এ কথা জিজ্ঞেস করো না, জ্যোতি।

জ্যো। আমি বুঝেছি, তুমি নিজেকে বলি দিয়েছ।

রে। না, না, ভুল বুঝো না, জ্যোতি—আমি জীবন সার্থক করেছি।

জ্যো। আমি ভুল বুঝি নি, ঠিকই বুঝেছি—

রে। আমার কত সুখ, কত আনন্দ—তা' তুই কি বুঝবি?

জ্যো। ত্যাগে আনন্দ, তা জানি, কিন্তু তুমি যা' করলে, তা' আমি পারতাম না, রেবাদি।

রে। ছি, ছি, আমি কিছুই করিনি; ও সব কথা আর তুলো না।

জ্যোতি সশ্রদ্ধ নয়নে রেবার পানে চাহিয়া রহিল। রেবা তখন কি ভাবিতেছিল—দূরে, শূন্যে তাহার দৃষ্টি। জ্যোতি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। যখন পালঙ্ক হইতে নামিতেছে, তখন রেবার ধ্যানভঙ্গ হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কবে ফিরবেন, জ্যোতি?"

জ্যো। দু'চার দিনের ভিতর আসবেন শুনছি, কৃষ্ণদার কায শেষ হ'লে দু'জনে একত্র চুণার হ'তে আসবেন।

রেবা। তিনি এলে একবার তাঁকে বলিস—না থাক্—

জ্যোতি। কি বলতে হবে, বল না—

রেবা। ভুলে গিছলাম, আমি এখন কে।

হিরণ ঝড়বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "জ্যোতি, তুই কি ব'লে এখনও উঠিস নি? বাড়ী যেতে হবে না? গাড়ী যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—"

রেবা। তোমরা আজই চ'লে যাচ্ছ, বড়দি? আমি বাঁচি কি মরি—

হির। ষাট ষাট, মরবে কেন? সুখে ঘর কর—

রেবা। সুখের আশা নিয়েই ত মানুষ কাযে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পোড়া যম যে প্রতিবাদী হয়ে সব নষ্ট করে। কেষ্টদাকে সব বলো।

হির। তুই 'যম' 'যম' করিস নে। বলিয়া তিনি জ্যোতি-সহ প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণপরে জননী ঔষধি লইয়া আসিলে, রেবা কহিল, "মা, তোমার সঙ্গে আর প্রতারণা করব না—আমাকে ওষধ আর দিও না।"

জননী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। রেবা কহিল, "ওষুধে আমার কিছু হবে না, এত দিন ত দেখলে।"

সর্ব্বা। কর্ত্তা তাই বলছিলেন, তোমাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যেতে। জামাই বললে, তার চাকরীর স্থান না কি খুব ভাল।

রেবা। ভাল হোক, আমি সেখানে যাব না।

সর্ব্বা। ও মা, সে কি! কাল তোকে জামাই নিয়ে যাবে ঠিক হয়েছে।

রেবা। আমি যাব না; তোমরা যদি জোর ক'রে পাঠাও, তা হ'লে আমি গলায় আঁচল বেঁধে মরব।

সর্ব্বাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ঔষধের শিশি ফেলিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কবির প্রতি

বল বল হে ভাবুক চির-উদাসীন!
কার ধ্যানে রহ তুমি মগ্ন নিশিদিন?
সুদূর বিমানচারী বিহগের প্রায়,
বল কোন্ কল্প-লোকে চিত্ত তব ধায়?
বল কবি কর তুমি কাহার সন্ধান,
কোন্ দরদীর তরে কাঁদে তব প্রাণ?

মায়ামুক্ত হে মায়াবি! কোন্ যাদু-বলে
রচিছ স্বপন-জাল অপূর্ব্ব কৌশলে?
বিচিত্র তুলিকা তব ওগো চিত্রকর!
আঁকিছে কত যে চিত্র সজীব সুন্দর।
নহ তুমি নহ কবি নর-জগতের—
মূর্ত্তিমান্ প্রতিকৃতি অমরলোকের।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস

———

মধ্য-এসিয়ায় হিন্দু সভ্যতা

(ইতিহাস-উদ্ধার)

মধ্য-এসিয়া আজ মুসলমান-প্রধান। তথাকার অধিবাসী তুর্কীভাষাভাষী—আচারে-ব্যবহারে পোষাকে-পরিচ্ছদে তাহারা তুর্কী। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভূখণ্ডই ছিল হিন্দু-প্রধান; তথাকার অধিবাসীরা ছিল আর্য্য-ভাষাভাষী; আচারে-ব্যবহারে পোষাকে-পরিচ্ছদে তাহারা আর্য্য হিন্দু ছিল। সহস্র বৎসরের উপর মধ্য-এসিয়া মুসলমান হইয়াছে,—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সহস্র বৎসর মধ্য-এসিয়া হিন্দু (বৌদ্ধ) ছিল, এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। তথায় হিন্দুসভ্যতার কোন নিদর্শন আপাত দৃষ্টিগোচর ছিল না বলিয়া,—কি হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই মধ্য-এসিয়ায় হিন্দুর বিজয়কাহিনীর ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। হিন্দুসভ্যতা যে ঐ সকল দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস জানিতাম চীনা পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকদের বিবরণী হইতে। এতদ্ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। হিন্দুকীর্ত্তি বা হিন্দু-সাহিত্যের কোনও নিদর্শন সাধারণে জানিত না। কেমন করিয়া আমরা আজ মধ্য-এসিয়ায় হিন্দুসভ্যতা-বিস্তারের ইতিহাস জানিলাম, তাহাই আমি এই প্রবন্ধে ভূমিকাস্বরূপ আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিব।

প্রায় আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে (১৮৯০, ৫ই নভেম্বর) কর্ণেল ওয়াটার হাউস্ নামক জনৈক য়ুরোপীয় মনীষী কতকগুলি মুদ্রা ও পুথি প্রদর্শন করেন। একখানি পুথি ছিল ভূর্জ্জপত্রে লেখা; পুথির সহিত মধ্য-এসিয়ার কাশগড়ের ইংরাজ রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী লেফটানেণ্ট বাওয়ার-এর একখানি পত্র ছিল। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "কুচার নামক এক সহরে বাসকালে একটি লোক আমার কাছে আসিয়া বলে যে, যদি আমি তাহার সহিত রাত্রিতে যাই, তবে সে মাটীর তলায় এক সহরে লইয়া যাইবে। যদি চীনারা জানিতে পারে যে, কোনও য়ুরোপীয়কে সুড়ঙ্গ-পথে কেহ লইয়া গিয়াছে, তবে অনর্থ করিবে। আমি রাজি হইলাম ও মাঝ-রাত্রে সেই পাতালপুরীর উদ্দেশে চলিলাম। সেই লোকটিই আমাকে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এক বাণ্ডিল পুথি আনিয়া দিল। লোকটি এই পুথিগুলি পুরাতন হর্ম্ম্যের পাদদেশ খনন করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, এই প্রাচীন কীর্ত্তি ও পুথি বৌদ্ধযুগের।"

এই পুথির পাঠোদ্ধার কেহই করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, এই পুথির দুইটি পৃষ্ঠা ছাপাইয়া সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। এই পুথির বর্ণনা ও পুথি আবিষ্কারের কথা শুভক্ষণে পণ্ডিতপ্রবর হের্ণলীর কর্ণগোচর হইল। ভারতবর্ষে আসিয়াই তিনি এই পুথির উদ্ধারসাধনে উদ্যোগী হইলেন এবং বহু চেষ্টায় ইহার পাঠোদ্ধার করিলেন। বাওয়ারের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য এই পুথির নামকরণ করা হইল, বাওয়ার' পুথি (হস্তলিখিত)। দুই বৎসরের গবেষণার ফলে হের্ণলী আবিষ্কার করিলেন যে, পুথিগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ; ইহার ভাষা সংস্কৃত, লিপি ভারতীয়। ইতঃপূর্ব্বে সংস্কৃতভাষায় এত প্রাচীন লিপি আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতের প্রাচীনতম পুথি হইতেছে নেপালের পুথি, একাদশ শতাব্দীর। তাহার পূর্ব্বের প্রাচীন পুথি ভারতে নাই। কারণ, এখানকার জলবায়ু, কীটপতঙ্গ সকলেই ইহার প্রতিকূল। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখিতে পারি যে, প্রাচীনতম সংস্কৃত পুথি জাপানে পাওয়া গিয়াছিল ৬০৯ খৃষ্টাব্দে। বাওয়ার পুথির তারিখ ৪র্থ শতাব্দী ত' বটেই; এমন কি, তাহার পূর্ব্বের হওয়াও বিচিত্র নহে। বাওয়ার পুথির বর্ণনা চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া গেল। সুধী-সমাজে এই ঘটনায় রীতিমত একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

মধ্য-এসিয়া সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুসন্ধিৎসা রুসিয়ার। তিব্বতী ভাষা ও ইতিহাস সম্বন্ধে রুসিয়ার উৎসাহ সমধিক। মোঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে তাহাদের সমকক্ষ পণ্ডিত কোনও জাতির মধ্যেই নাই। সুতরাং মধ্য-এসিয়ার এই নূতন আবিষ্কারের ফলে রুসিয়ার উৎসাহ বাড়িল। কাশগড়ের রুসীয় কন্সাল পেট্রোভস্কির চেষ্টায় বহু পুথি সংগৃহীত হইল। রিগণ (Esthonia) নগরীর অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ এ বিষয়ে রুসীয় পত্রিকাতে বিবরণী প্রকাশ করেন।

এ দিকে মধ্য-এসিয়ার নানা কেন্দ্রে য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ও পাদরীরা পুথিসংগ্রহে মনোযোগ দান করিলেন। লাদকের অন্তর্গত লিহ নগরীর মোরেভিয়ান্ (Moravia মধ্য-য়ুরোপের অন্তর্গত দেশ, অষ্ট্রীয়ার ভিতর) পাদরী বেবর কতকগুলি পুথি সংগ্রহ করিলেন। অপর দিকে কাশগড়ের বৃটিশ এজেণ্ট মি: মাকার্টনে কুচারের চীনা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে বহু পুথি সংগ্রহ করিলেন। এই পুথির মধ্যে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র, কাগজ—তিন শ্রেণীর লিখিবার উপাদান ছিল।

বেবর ও মাকার্টনে যে সব সংস্কৃত পুথি পাইয়াছিলেন, সেগুলির আদি সংগ্রহকর্ত্তা তদ্দেশীয় এক জন মুসলমান। পেট্রোভস্কি তাঁহার নিকট হইতে পুথি সংগ্রহ করেন। সুতরাং একই পুথির বিভিন্ন অংশ পৃথক্ পৃথক্ হস্তে গিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লাদকের কতকগুলি পুথি এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তগত হয়। এগুলি সংগ্রহকর্ত্তার নামানুসারে গড়ফ্রে পুথি নামে খ্যাত। মধ্য-এসিয়ার ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সংগৃহীত পুথিগুলি হের্ণলীর হস্তে অর্পিত হইল। তিনি ও তাঁহার বিদুষী স্ত্রী পুথির টুক্‌রা টুক্‌রা অংশগুলি একত্র করিয়া পাঠোদ্ধার করিতে লাগিলেন। এ দেশে হের্ণলী, জার্ম্মাণীতে ব্যুলর (Bulher), ও রুসিয়াতে সার্জ্জ ওল্ডেনবর্গ গভীরভাবে এই সকল পুথি লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারী মহানগরীতে নিখিল প্রাচ্য প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের একাদশ অধিবেশনে ফরাসী পণ্ডিত সেনার মধ্য-এসিয়ায় আবিষ্কৃত এক পুথির বর্ণনা করেন। পুথিখানি ধম্মপদের এক প্রাকৃত সংস্করণ। পুথিখানি খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। পুথিখানি সংগ্রহ করেন এক জন ফরাসী

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, নাম দেৎকুই-দঁ-রাঁস। এই বৈজ্ঞানিক বহুবার মধ্য-এসিয়ার মরু ভেদ করিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেন। ধম্মপদের খণ্ডিত অংশগুলি এই ভ্রমণকালেই দেৎ-রুই-এর হস্তগত হয়।

এই মধ্য-এসিয়ার জনহীন প্রান্তরে তিনি এক দিন দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদের হস্তে নিহত হন। তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য সেনার ধম্মপদের এই প্রাকৃত পুথির নাম রাখিলেন দেৎ-রুই-পুথি। সেই সময় রুশীয় পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ ঘোষণা করিলেন যে, তিনিও ধম্মপদের কয়েকটি অংশ পাইয়াছেন। সুতরাং পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, মধ্য-এসিয়ার পুথিগুলি কিরূপ ভাবে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পণ্ডিত সেনার প্রাকৃত ধম্মপদের খণ্ডিত অংশগুলি বহু টীকা-টিপ্পনীর সহিত ফরাসী দেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর মুখপত্রে (Journal Asiatique 1898 P 193-30) প্রকাশ করিলেন। য়ুরোপের পণ্ডিতগণ গবেষণার একটা নূতন ক্ষেত্র পাইলেন।

দশ বৎসর ধরিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের হস্তে প্রাচীন ভারতের হিন্দু সাহিত্যের বিস্তারের যে নিদর্শনসমূহ মধ্য-এসিয়া হইতে আসিতেছিল, তাহাতে লোকের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এইবার তাঁহারা রীতিমত গবেষণা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি পড়িল রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক সভার। ইতঃপূর্ব্বে দুই এক জন রুসীয় পরিব্রাজক তুরফান প্রভৃতি স্থানের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই যথার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইল। রুসিয়ার সরকারী ভৌগোলিক সভা রুবরবস্কি ও কজ্‌লভ্‌ নামে দুই জন পণ্ডিতকে এ বিষয়ে গবেষণার্থ নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের গবেষণার ফল জার্ম্মাণ ও ইংরাজী পত্রিকায় যথাসময়ে প্রকাশিত হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতবর ক্লেমেন্‌ৎজকে রুশীয় সরকার তুরফানের প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ক্লেমেন্‌ৎজের প্রবন্ধ জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইল। রুসিয়া হইতে পর বৎসর পুনরায় রাদ্‌লুফ ও সালেমান্ নামে দুই জন পণ্ডিতকে তুরফানে প্রেরণ করা হয়। রাদ্‌লুফ তুর্কী ভাষা সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছেন—তাহা আমরা 'তুর্কী ভাষায় হিন্দুসাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনার কালে দেখিব।

এ দিকে বৃটিশ সরকার নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভারতে তখন লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া আসিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন সম্বন্ধে —আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে যেরূপ মনোভাব থাকুক না কেন—একটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রাখা উচিত। সেটি হইতেছে, ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা। সুতরাং কার্জ্জন মধ্য-এসিয়ার মধ্যে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরণ করিবেন স্থির করিলেন। অপর দিকে মার্ক্‌ অরেল্‌ ষ্টাইন্ বৈজ্ঞানিক-জগতের আলোচনা পড়িয়া শুনিয়া মধ্য-এসিয়ার আবিষ্কার করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন। ভারত সরকার এই অভিযানের ব্যয় বাবদ ১১ হাজার টাকা দেন। ষ্টাইন্ কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন—তাঁহাকে ছুটী দেওয়া হইল; ভারতীয় জরিপ বিভাগও কয়েক জন বিশিষ্ট ভারতীয় কর্ম্মচারীকে এই অভিযানের সহিত দিলেন। ১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে ষ্টাইন্ মধ্য-এসিয়ার তারিম উপত্যকায় নানা তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার গবেষণার ফল আমরা পরে বর্ণনা করিব। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনী ও সাধারণ বৃত্তান্ত (Sand buried Ruins of Khotan মরুগর্ভে লুক্কায়িত খোটান সহরের ধ্বংসাবশেষ) নামক গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি ভ্রমণকালে যে সব পুথি, চিত্র ও বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে আরও কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিতে হয় এবং সে কার্য্য তিনি একাকীও করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই প্রত্নতত্ত্বপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থখানির নাম Ancient Khotan (প্রাচীন খোটান)। উহা দুই খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম খণ্ডে ইতিহাস ও বর্ণনা, দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্র। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ষ্টাইনের এই অভিযানের ঐতিহাসিক গবেষণার ফল আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করিব। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার হইতেছে, এক জালিয়াতের মিথ্যা ধরিয়া দেওয়া। ইস্‌লাম আকহুন নামে এক জালিয়াৎ কিছু কাল ধরিয়া "পুরানো পুথির" এক কারখানা তৈয়ারী করিয়া জ্ঞানগ্রস্ত পরিব্রাজকদের নিকট প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিক্রয় করিয়া পয়সা লুঠিতেছিল। সেই সব জাল পুথির উপর পণ্ডিতদের গবেষণাও হইয়া গিয়াছিল। ষ্টাইনের সন্দেহ হয় এবং তিনি সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার জালিয়াতী সুধীসমাজকে লিখিয়া জানাইলেন।

ষ্টাইনের গবেষণার ফল পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইলে জার্ম্মাণীতে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিল। তিব্বতী ভাষাবিদ্ বিখ্যাত পণ্ডিতদ্বয়—গ্রন্‌বেডেল (Grunwedel) ও হুথ (Huth) ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধ্য-এসিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। রুশীয় পণ্ডিত ক্লেমেন্‌ৎজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যেখানে খননকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই তুরফান ও তাহার নিকটস্থ বৌদ্ধ নগরীসমূহে গ্রন্‌বেডেল্‌ ও হুথ্‌ গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের গবেষণার ফল জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাণ্ড এক খণ্ডে ব্যাভেরিয়ার সরকারী বৈজ্ঞানিক পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। * এই গ্রন্থখানি হইতে মধ্য-এসিয়ায় হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত করিয়া আমি ভবিষ্যতে পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

প্রথম জার্ম্মাণ অভিযানের ফল খুবই আশাপ্রদ হইল। ইহার ফলে পণ্ডিতপ্রবর পিসেল (Pischel) প্রমুখ জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় মধ্য-এসিয়ায় গবেষণার জন্য একটি কমিটী গঠিত হয়। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট্‌ স্বয়ং এই তহবিলে ৩২ হাজার মার্ক ও তদীয় সরকার ১০ হাজার মার্ক দান করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহাপণ্ডিত অধ্যাপক (A Von Lecaq) ভন্ লিককের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযান যাত্রা করিল। তাঁহারা সাইবেরিয়ান রেলওয়ে দিয়া আসিয়া মধ্য-এসিয়ায় প্রবেশ করেন। লি-ককের গবেষণার ফল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুবৃহৎ চারি খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ পাণ্ডিত্য, জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক

* Berichte uber archalogische 'Arbeiten in Kikutschari und umgebung 1902-03.

অনুসন্ধিৎসার চরম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই দুইটি অভিযানের ফলে আজ সংস্কৃত ভাষায় বহু সহস্র পুথি ও মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন ভাষায়—যথা, খোটানী, তুখারী, তুর্কী, সুগাদ বা শূলিক ভাষার অসংখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ বার্লিনের গ্রন্থাগারে আসিয়াছে। এই সব গ্রন্থের বর্ণনা যথাস্থানে আমরা দিতে চেষ্টা করিব। হিন্দু-সভ্যতা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বলিব।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ তৃতীয় অভিযান মধ্য-এসিয়ায় আসিল গ্রনবেডেলের নেতৃত্বে। লি-কক তখন কাশগড়ে—কঠিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেছেন। লি-কক ও গ্রন্‌বেডেল কুচান, কারাসহর হইয়া রুসিয়ার মধ্য দিয়া দেশে ফিরিবেন মনস্থ করিলেন; কিন্তু তখন রুসিয়ায় বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। লি-কক কারাকুরুম পার হইয়া, ভারতবর্ষ হইয়া জার্ম্মাণী ফিরিয়া গেলেন। গ্রন্‌বেডেল্ আরও কিছু কাল কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলেন।

ইতিমধ্যে সার অরেল ষ্টাইন্ তাঁহার দ্বিতীয় অভিযানের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এবার তিনি এসিয়ার আরও অন্তঃস্থলে ও চীনের অজ্ঞাত পশ্চিম প্রদেশে যাইবেন স্থির করিলেন। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আড়াই বৎসর ধরিয়া মরুভূমি ও মরু-উদ্যানের মধ্যে ষ্টাইন্ ও তাঁহার দল প্রায় দশ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বহুস্থানে খনন-কার্য্যও চলিয়াছিল। সার অরেলের নিজের ভাষায় (অনুবাদ) বলিতেছি, "১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাকলামাকান মরুভূমিতে খোটান ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম যে, এই ভূখণ্ড এককালে কত বড় ঐতিহাসিক দেশ ছিল,—যেখানে হিন্দু, চীন ও গ্রীক্ সভ্যতার সঙ্গমে নূতন সভ্যতা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে যে সকল সামগ্রী আশ্চর্য্যভাবে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। দ্বিতীয় অভিযানে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান হইতে সোজা হাজার মাইল পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলাম। এই পথ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে চীনকে মধ্য-এসিয়া ও পশ্চিম-এসিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই স্থানে প্রাচীন ইতিহাস, শিল্প ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় যে সব নিদর্শন পাইয়াছি, তাহা এত কাল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কেবলমাত্র চীন ঐতিহাসিকদের 'ইতিহাস'ই ইহার একমাত্র উপাদান ছিল।"

ষ্টাইনের দ্বিতীয় অভিযান প্রত্যেক পদক্ষেপে নবনব সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইতে লাগিল। নিয়া নদীর তীরে তিনি বহু সহস্র কাষ্ঠফলক আবিষ্কার করেন। সেগুলি প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তৃতভাবে বলিব। হিন্দু-গ্রীক্ সভ্যতার বহু নিদর্শন মধ্য-এসিয়ায় আবিষ্কৃত হওয়ায় গবেষণার নূতন দিক্ খুলিয়া দিল। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার—(বোধ হয়, লেয়ার্ডের নিনেভার লাইব্রেরী আবিষ্কারের পর এত বড় আবিষ্কার আর হয় নাই) হইতেছে তুন্-হুয়াঙের গুহা (Tun Huang caves.) চীনের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীন চীন-প্রাচীরের নিকট এক পর্ব্বতের গাত্রে কোন যুগে, সাধনার জন্ত, বহুশত গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ দানবীরগণের পুণ্যচেষ্টার নিদর্শন এই গুহাগুলি। গুহাগুলিতে বুদ্ধমূর্ত্তি সুসজ্জিত; প্রাচীরগাত্রে চিত্র; বহু বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিও আছে। একটি গুহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ব্যতীত মধ্য-এসিয়ার সকল প্রাচীন ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ, মণিধর্ম্মের গ্রন্থ, সেখানে নয় শত বৎসর আবদ্ধ ছিল। বোধ হয়, দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কোনও বুদ্ধিমান্ লোক এই গুহাটিকে বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ষ্টাইনের আগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক তাও-ধর্ম্মী চীনা পুরোহিত ইহার সন্ধান পান। তাঁহারই সাহায্যে ষ্টাইন্ এই গুহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তুন-হুয়াঙের গুহায় কি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলেও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। ষ্টাইন্ এই গুহা হইতে যে সব পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ২৪ বাক্স বোঝাই; যে সব ছবি, কাপড়চোপড়, নিশান প্রভৃতি সংগ্রহ করেন, তাহা ৫ বাক্স বোঝাই। এই সমস্ত মহামূল্যবান্ পুথি ও ঐশ্বর্য্য লণ্ডনে বিখ্যাত বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হইতেছে। ষ্টাইন তাঁহার ১৯০৬—৮ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় ভ্রমণকাহিনী (Ruins of Desert Cathay) ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় ইহাতে কিছুই নাই। এই ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা (Ser India) নামক এক বিপুল গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ভ্রমণের তের বৎসর পরে। গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খণ্ড। তিন খণ্ড লিখিতাংশ,—এক খণ্ড মানচিত্র, এক খণ্ড তুন-হুয়ঙের ছবি। গ্রন্থখানি লিখিতে ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, দিনেমার, বেল্জিয়ান্ পণ্ডিতগণ সমভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। যে সব পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার তালিকা কিছু কিছু Ser Indiaতে আছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কার্য্য হইতে এখনও বহু বর্ষ লাগিবে। সংস্কৃত, খোটানী বা শকভাষা, তুখারী, শূলিকভাষা (Sogdian) তুর্কীভাষার নানা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোনও কোনও পুথি দ্বিভাষায় লিখিত—যেমন শূলিক-সংস্কৃত, তুখারী-সংস্কৃত, শক-সংস্কৃত, তুর্কী-সংস্কৃত। সেই সব গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও মর্ম্ম বুঝিতে দুই তিন জন পণ্ডিতকে একত্র কায করিতে হইয়াছে।

ষ্টাইন্ যখন মধ্য-এসিয়ায়—তখন ফরাসী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরফ হইতে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ পেলিও (Pelliot) তথায় উপস্থিত হন। পেলিও বহু ভাষাবিদ্ ও যথার্থ পণ্ডিত। চীন ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। পেলিও-মিশন মধ্য-এসিয়ায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন; তন্মধ্যে বৎসরাধিক কাল পেলিও তুন-হুয়াঙের নিকটে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তুন-হুয়াঙের গুহা হইতে পেলিও যে সব সামগ্রী সংগ্রহ করেন—তাহার মূল্য ষ্টাইনের সংগৃহীত সামগ্রী হইতে কিছু ন্যূন নহে। পেলিও ষ্টাইনের স্তায় কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তিনি স্বয়ং পণ্ডিত; বহু চীনা-তুর্কী-গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি তুন-হুয়াঙের গুহায় ছবিগুলির ফটো গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে প্রকাণ্ড একখানি চিত্রগ্রন্থ ৬ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ষ্টাইন্‌ও অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নাম "Ten thousand Buddhas" পেলিওএর গ্রন্থের নাম দিয়া Grottos da Tun-Houang. পেলিও এই ছয় খণ্ডের ভূমিকা

খনও প্রকাশ করেন নাই। তবে তুন-হুয়াং সম্বন্ধে যাহা কিছু ঐতিহাসিক ও আর্টিষ্টিক গবেষণা হইয়াছে, তাহা পেলিওএর।

তুন-হুয়াং চীনরাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। তথাকার প্রথম গুহাগুলি নির্ম্মিত হয় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম শতাব্দীতে চীনে প্রচারিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ-সাহিত্যের প্রচার যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ শিল্পের প্রথম আবির্ভাব হয় ৫ম শতাব্দীতে ওয়াই রাজত্বের সময়। বাই রাজবংশ চীনা নহে; ইঁহারা তাতার-বংশোদ্ভব। উত্তর-চীন জয় করিয়া রাজা হইলেও চীনা সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহারা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারা পরম নিষ্ঠার সহিত এই ধর্ম্মের সেবা করিতে লাগিলেন। চীনে তাঁহাদের যুগের শিল্প যেমন ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া ফুটিয়াছিল, এমন পরে কোনও যুগে হয় নাই। ওই wei রাজবংশীয়রা চীনের বহু স্থানে পর্ব্বতের মধ্যে গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তুন হুয়াংএর কতকগুলি গুহা তাহাদের কীর্ত্তি। অন্যান্য স্থানের মূর্ত্তি, প্রাচীর-চিত্র জলবায়ুর শৈত্যের জন্য নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তুনহুয়াং মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান। তথাকার শুষ্ক জলবায়ু চীনের রাজনৈতিক কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থান প্রভৃতি কারণের জন্য গুহার ভিতরকার চিত্র ও মূর্ত্তি বিশেষ কিছুই নষ্ট হয় নাই; সেই জন্য ৪র্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ তুন্-হুয়াংএও প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু তুন্-হুয়াংএর সমস্ত চিত্রমূর্ত্তি রাজবংশের সমসাময়িক নহে; যুগে যুগে নির্ম্মিত হইয়াছে, ঠিক যেমন আমাদের অজন্তা বহু শতাব্দীর সাধনায় গঠিত। চীনের বিখ্যাত রাজবংশ তাঙদের (Tang) সময়ে ৭ম হইতে ১০ম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহু গুহা নির্ম্মিত হয়। এক স্থানে শিল্পোন্নতির এমন সুন্দর ইতিহাস অন্যত্র খুব কম পাওয়া যায়। চীনা শিল্প ৫ম হইতে ১০ম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আমরা এই গুহাগুলিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারি। পেলিওর মতে তুন্-হুয়াংএর প্রাচীনতম মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ভারতের গান্ধার শিল্পের প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়; অর্থাৎ যে গ্রীকপ্রভাব গান্ধারকে এক সময়ে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই প্রভাব দেখা যায়। গ্রীক্ প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে চীনারা মধ্য-এসিয়ার গ্রীকদের নিকট হইতে পায় নাই। তাহারা পাইয়াছিল ভারতের নিকট হইতে। পর-যুগে চীনে যখন স্থলপথ ও জলপথে যাতায়াত সুগম হইল, তখন হইতে চীনের শিল্পের মধ্যে ইহার গুপ্তপ্রভাব দেখা যায়। মধ্য-এসিয়ায় গান্ধারের গ্রীক্ গুপ্তপ্রভাব যে কি পরিমাণে হইয়াছিল, তাহারও নিদর্শন আমরা লিপিতে শিল্পে পাই। তাঙ-যুগে ও পরযুগে বহু শত চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষ হইতে পুথি, মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রভাব চীন-শিল্পের উপর সামান্য হয় নাই।

চীন ও মধ্য-এসিয়ার মধ্যে যে প্রাকৃতিক বাধা ছিল, তাহা খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেই লোপ পায়,—তদবধি চীন ও মধ্য-এসিয়ার মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ হয়। আমরা সাহিত্য আলোচনাকালে দেখিব যে, মধ্য-এসিয়া হইতে কত পণ্ডিত গিয়া চীনে কায করিতেছেন; মধ্য-এসিয়ার মঠের পুস্তকাগার হইতে কত সংস্কৃত গ্রন্থ চীনে নীত হইতেছে। আবার ইহাও দেখিব, চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য-এসিয়ার কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচারিত হইতেছে।

মধ্য-এসিয়া আজ ভারত হইতে যে পরিমাণ বিচ্ছিন্ন, ভারতের গৌরবের যুগে সেরূপ ছিল না। আজ ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, সর্ব্ববিষয়ে ভারত মধ্য-এসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন। সেই গৌরবের ইতিহাস বর্ণনা করাই এই রচনার উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে দেখাইব, কেমন করিয়া কোন কোন্ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য কারণে ভারত তাহার প্রাচীন গৌরব হইতে চ্যুত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

বাদল-বেদন

বর্ষারাণীর বাদল বীণায়
লক্ষ ধারার তারে,
আজকে করুণ শোকের গীতি
ঝরছে অঝোর ধারে।

ঐ রাগিণীর ব্যথার সুরে
সারাটা মোর হৃদয় জুড়ে
কি যে গভীর বিষাদ ঘনায়
কিছুই বুঝি না রে,
বাদল বীণায় রোদন বাজে
ধারার তারে তারে।

মেঘের গুরু আর্ত্তনাদে
পুত্রহারা ওই কে কাঁদে
তড়িতের তার বুকের জ্বালা
জ্বলছে বারে বারে,
বাদল বীণায় কাঁদন ঝরে
ধারার তারে তারে।

মেঘলা দিনের মলিন রবি
বালবিধবার মুখের ছবি
প্রাণের পটে দিচ্ছে এ কে
সজল অন্ধকারে,
বাদল বীণা করছে হা হা
বেদন ঝঙ্কারে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

মেঘমুক্তি

মনীষার কথা

৩
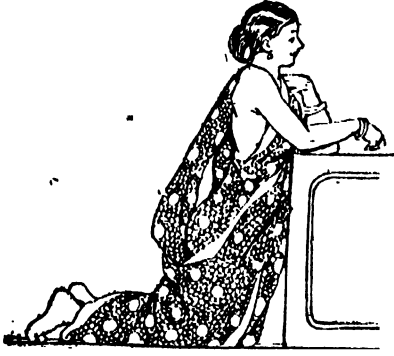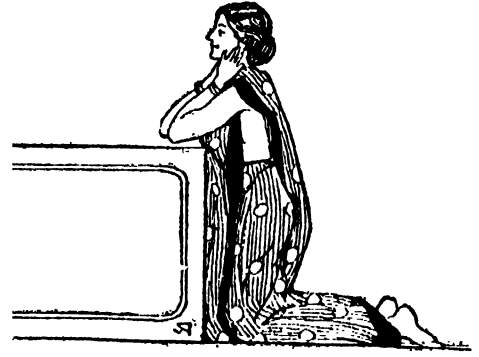
উষাও বোধ হয় কথাটা ভাবিতেছিল। বাড়ী ফিরিয়া সে বলিল—"আশ্রমটি দেখে আমার ত বেশ ভাল লাগলো—দিদি! কোনও হৈ হৈ নেই—আড়ম্বর নেই—শুধু একটিমাত্র লোকের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে নিঃশব্দে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে! এখন একটু ভাল ব্যবস্থা ও আয়ের একটা পথ করতে পারলেই এই ছোট জিনিষটিই কালে একটা বিরাট স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াতে পারে।"

বলিলাম, "গলদ ত সেইখানেই। শুনলি ত আশ্রয়-প্রার্থিনী কটি মেয়ের চিঠির উত্তরে উপস্থিত ওঁদের অক্ষমতা জানাবার কথা লেখাই স্থির হয়ে গেল। এই ছোট জিনিষ-টুকুর খরচটাও ওঁরা এখন চালাতে পারছেন না।"

উষা একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয়—আশ্রম-পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু গোল আছে; না হ'লে ওঁরা ওখানকার কাযের যে হিসাব দিলেন, সে হিসাবমত জিনিষ তৈরী হ'লে বাজার দর মত যা আয় হয়—তাতে ওঁদের কোন অভাব না থাকবারই কথা। এ ছাড়া জামা কাপড় সেলাই করেও স্বতন্ত্র একটা আয় করেন—শোনা গেল। তাই ভাবছিলুম——"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে থামিল। আমি একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "কি ভাবছিলি—বল্ না?"

সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ভাবছিলুম—তুমি যদি বল—তা হ'লে আমি শিবু কাকার সঙ্গে এখানে থেকে আশ্রমটার ভার হাতে নিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখি—কিছু করতে পারি যদি। আমার ত মনে হয়—তৈরী জিনিষ—বেশী কিছু করতে হবে না। একটু চেষ্টা করলেই দাঁড়িয়ে যাবে। কি করবই বা কলকাতায় ফিরে?"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। নিজের সম্বন্ধে যে চিরদিন সহিষ্ণু ও নির্ব্বাক্—আজ তাহার অন্তরের এই সামান্য প্রকাশে আমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল।

আমায় নীরব দেখিয়া উষা বলিল, "সত্যি ভাই, মেয়েদের কি দুঃখ! কি অসহায় অবস্থা! আশ্রমের মেয়েগুলিকে দেখলে ত? যারা বিধবা—তাদের ত পথে দাঁড়ান ছাড়া উপায়ই নেই—কিন্তু কটি সধবা মেয়েরও সেই একই অবস্থা! কারও স্বামী উন্মাদ কেউ বা পতিপরিত্যক্তা, কারুর স্বামী অক্ষম, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে অপারগ। যে সব মেয়ে আশ্রমে আসতে চায়—তাদের চিঠিপত্রেও এই রকম অবস্থার কথা! তাই ভাবি—দেশজোড়া এই দুঃখ ও অবিচারের প্রতীকারকল্পে একটা জন্ম কাটিয়ে দেওয়া কত সহজ!"

বলিলাম, "বেশ ত! দিন কতক এ'দের কার্য্যপ্রণালী দেখবার ও বোঝবার জন্য দু'জনেই ওখানে যাওয়া যাক্—তার পর দেখা যাবে কি করতে পারা যায়।"

দুই চারি দিনেই বোঝা গেল—আশ্রম-পরিচালনা সম্বন্ধে চারিদিকেই দারুণ বিশৃঙ্খলা। আশ্রমকর্ত্রীর কর্ম্মশক্তি অসাধারণ—পরিশ্রম করেন যথেষ্ট, পরের দুঃখ বুঝিবার—ও সে দুঃখমোচনের চেষ্টায় ত্যাগস্বীকার করিবার মত তাঁহার হৃদয় মহৎ ও উদার; কিন্তু এরূপ একটা প্রতিষ্ঠান চালনা করিবার মত শক্তি ও জ্ঞানের একান্ত অভাব। সেই জন্য স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রেরণায় যেটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে, অপটু হস্তের চালনার দোষে ক্রমিক উন্নতি ত সুদূরপরাহত, প্রারব্ধ কর্ম্মটুকুর ভিতরও নানা গলদ জমিয়া গিয়াছে।

আশ্রমের মেয়েগুলি প্রায় সকলেই অল্পবয়স্কা তরুণী, বিধবার সংখ্যা বেশী হইলেও সধবা মেয়েও কম নহে। তাই মনে হইত, যাহাদের জীবনে কোন ভোগসুখ বা আশার

পরিতৃপ্তি হইল না, সেই সব দুঃখী—আজন্ম বঞ্চিতাদের কেবল দুই মুষ্টি অন্ন দিলে বা পড়াপাখীর মত দুইটা স্তোত্র পাঠ করিতে শিখাইলে সত্যই কি তাহাদের ভাল করিতে পারা যায়? ত্যাগ, সংযম, নিষ্ঠা এ সব অন্তরের বস্তু, অন্তর হইতে প্রেরণা না আসিলে শুধু বাহিরের চাপে কি এই সমস্ত উজ্জ্বলতম বৃত্তির বিকাশ সম্ভব? কতকটা ভোগের পর ত্যাগ হয় ত সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের সাংসারিক সকল সুখের উপাদান অন্তরের আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল, জীবনে যাহা কখনও করায়ত্ত হইল না, যম-নিয়মের মাত্রা স্থির করিয়া দিলেই কি তাহাদের চিত্ত একবারে নিবৃত্তি-মূলক হইয়া যাইতে পারে?

উনি আর আমি কয়েক দিন হইতে আশ্রমে কয়েকটি নিয়ম প্রবর্ত্তনের কথা ভাবিতেছিলাম। একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকলের পক্ষে খাটান যায় না, মানুষের হৃদয় সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে পূর্ণ, আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ভরা এক বিচিত্র সৃষ্টি! প্রত্যেকের রুচি, প্রবৃত্তি, স্বভাব বিভিন্নমুখী—প্রত্যেকের ব্যবস্থা তাহার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির অনুকূল হইলে তবেই সে নিয়ম কল্যাণকর হইতে পারে। যাহারা সংযত ও পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহে, তাহাদের সম্বন্ধে কোন বক্তব্য নাই; কিন্তু যাহাদের সে পথ নহে—যাহাদের জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব, তাহারা আশ্রমে শিক্ষালাভের পর যদি ইচ্ছা করে, তবে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা কি অসম্ভব? তাহার পর শিক্ষার কথা—আমার মনে হয়, আশ্রমের শিক্ষা শুধু তাঁত-চরকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকাই ভাল। যে মেয়েদের পক্ষে সম্ভব, তাহাদের জন্য স্কুলের বন্দোবস্ত রাখিয়া রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। মেয়েদের অর্থকরী বিদ্যার সহিত যদি কতক পরিমাণে শিক্ষা দিয়া তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা নিজের জীবনের পথ নিজেই স্থির করিয়া লইতে পারিবে, তাহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা অন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না।

আমরা দুই জনে এইরূপ অনেক কথাই ভাবিতেছিলাম; শেষে কার্য্যক্ষেত্রে যে তাহার কতটা সম্ভব হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া গেল। আশ্রম-পরিচালিকা সমিতির একটি মহিলার সঙ্গে এক দিন এ বিষয়ে কথা হইয়াছিল—তাহাতে বুঝিলাম যে, উপস্থিত নিয়ম বজায় রাখিয়া যদি আর্থিক উন্নতি করিতে পারা যায়, তবেই ইহাদের সহিত কাম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব—অবশ্য সে দিকেও যে বিশেষ সুবিধা হইবে—তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ, ইঁহারা সহসা কোন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন এবং কোন বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেও একান্ত অনভ্যস্ত।

মহিলাটির মুখে শুনিলাম, এখানে এইরূপ নারী-প্রতিষ্ঠান আরও কয়েকটি আছে। তাহাদের অবস্থাও বিশেষ উন্নত নহে। কোনও রকমে গতানুগতিক ভাবে চলিতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া আমাদের উৎসাহ কতকটা দমিয়া গেল। কিন্তু আমি ভাবি, যদি এরূপ না-ও হইত, যদি আমাদের ইচ্ছা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী আশ্রমটির দিন দিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইত, তাহা হইলেও কি আমি আমার সমগ্র শক্তি—সমস্ত চিন্তা এই কাযের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে পারিতাম? তাই যদি হয়, কেন তবে মনের ভিতর হইতে কাযের জন্য বল পাই না? আশ্রমের কথা ভাবিতে গিয়া মন যেন কোন সুদূরে একখানি গৃহের সন্ধানে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়; পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অকারণে চোখে অশ্রু ভরিয়া আসে! অন্তরের এ দীনতা আমার আর কি কোন দিনই ঘুচিবে না?

আজ কত দিন হইয়া গেল, তাঁহার কোন খবর পাই নাই। আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি দিই, তাই তাঁহারও পত্র দিন দিনই ছোট হইয়া আসিতেছে। শুধু আমার শারীরিক কুশল ও সেই সঙ্গে নিতান্ত অবান্তর দুই চারিটা সামান্য কথা। নিজের খবর কিছুই কোন দিন লেখেন না, কেনই বা লিখিবেন? আমিও ত অভিমানের বশে কখনও তাঁহার কথা কিছু জানিতে চাহি নাই। অভিমান কি শুধু আমারই? আমার ব্যবহারে তাঁহারও ত মনে আঘাত লাগিতে পারে?

প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় জানালার ধারে দাঁড়াইয়া এই কথাটাই একমনে সে দিন ভাবিতেছিলাম, তবে কি আমারই সব দোষ? আমিই কি না বুঝিয়া নিজের বুদ্ধির দোষে নিজে এত কষ্ট পাইলাম, তাঁহাকেও অযথা কষ্ট দিলাম? এখন দূরে বসিয়া কেবল মনে পড়ে, তাঁহার ছোট বড় সকল কথা—সকল ব্যবহার! অনেক ভাবিয়া অনেক বিশ্লেষণ করিয়াও তাঁহার ব্যবহারের কোথাও যে ত্রুটী হইয়াছে, তাহা ত মনে পড়ে না। বরং মনে হয়, আমার অসুস্থতার জন্য তাঁহার সে কি ব্যাকুলতা—কি অধীর আগ্রহ! কত দিন কত স্নেহে কত আদরে আমার অসুখের কারণ জানিতে চাহিয়াছেন এবং আমি তাহার

প্রতিদানে দিয়াছি শুধু নীরব বিরাগ ও অবহেলা এবং এ সব সত্ত্বেও শেষ দিনে যখন কেবল আমাকে সুস্থ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবার আশায় পশ্চিমে বেড়াইতে আসিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞায় তাঁহাকে প্রত্যাখান করিয়া একাই চলিয়া আসিয়াছি! রাগ ও অভিমানের বশে তখন এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, শুধু নিজের দিক্ ছাড়া অন্য কোন দিক্ চোখে পড়ে নাই। এখন কয়েক দিন হইতে কেবলই মনে হইতেছে, তিনি যাহাই করুন, আমার নিজের ব্যবহারটাও বিশেষ শোভন হয় নাই। বিদ্বেষ ও অভিমান কি মানুষকে এমনই নির্ম্মম ও কাণ্ডজ্ঞানহীন করিয়া তুলে ?

আজ সকাল হইতেই ঘন বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণ অবিরাম ধারায় ঝরিতেছে। যেন কাহার ব্যথিত হৃদয়ের অশ্রু-রাশির মত! এই ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধ আলোয় আজিকার দিনটির রূপ কি শান্ত—কি করুণ! আজ আমার অন্তরও এই বিষণ্ণতার ছায়াপাতে আচ্ছন্ন—ম্রিয়মাণ! এ ব্যর্থ জীবনের ভার যেন দুর্ব্বহ—অর্থহীন অশ্রুনদীর কূলে বসিয়া বেদনা-ব্যাকুল চিত্তে দিন গণিতে গণিতেই কি এবারকার জীবনের পরিসমাপ্তি ? কবে ? কত দিনে ?

"বহুজী!"

ফিরিয়া দেখি, হাস্যপ্রফুল্ল মুখে বৈজু দাঁড়াইয়া! তাহার হাতে কাঁচা শালপাতায় কয়েকটি বৃষ্টিকণাসিক্ত অম্লান জুঁই ফুল।

ফুলশুদ্ধ হাতখানি আমার দিকে বাড়াইয়া বৈজু হাসি-মুখে বলিল, "বহুজী! আপনি ফুল ভাল বাসেন তাই আপনার জন্য ফুল তুলে নিয়ে এসেছি। দেখুন কেমন টাটকা ফুল!"

আমি তাহার হাত হইতে ফুলগুলি লইয়া বলিলাম, "বাঃ! ভারি সুন্দর ফুল ত! কিন্তু তুমি এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাগানের ফুল তুলতে গিয়েছিলে কেন ? বৃষ্টি ধরলে গেলেই ত হ'ত ?"

সে উপেক্ষা ভরে বলিল, "ও ত টিপটিপে বৃষ্টি! ওতে ভিজলে কিছু হয় না। আপনি জানেন না বুঝি ? আজ যে নাগ-পঞ্চমী! 'নাগ 'দেওতার' পূজা হবে কি না ? আমি সকাল থেকে সেই সব যোগাড় করছি। দুপুর বেলা আবার এক জায়গায় যেতে হবে। ওঃ! আজ কত যে কায!"

নাগ-পঞ্চমীর ব্যাপারটা আমার বিশেষ জানা ছিল না। বলিলাম, "তাই না কি ? তা হ'লে তুমি ত খুব ব্যস্ত আছ দেখ্‌ছি! নাগ-পঞ্চমীতে কি কি করতে হবে তোমায় ?"

বৈজু আমার এ অজ্ঞতায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল, বলিল, "আপনি কিছুই জানেন না ? এখন সকালে ত 'নাগ দেওতার' পূজা হবে। তার পর দুপুর বেলা 'সঙ্কট-মোচনে' বড় ভারি মেলা—সে কিসের মেলা জানেন ? কাজরী গানের! অনেক সব গানের দল সেখানে আসবে—কাজরী গান হবে! তার পর শুনিয়া বিচার ক'রে যে দল ভাল গান করবে, তাদের সব বক্‌সিস দেওয়া হবে। সে সব অনেক কাণ্ড! বাপজীর সঙ্গে আমি সেই মেলা দেখতে যাব!"

বৈজুর খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেশ ত বৈজু! তুমি মেলা দেখে ফিরে এস, তার পর তোমার কাছে আমি সেই সব গল্প শুনবো। কেমন ?"

"সে আমি ঠিক আসবো। এখন চটপট কাযগুলো সেরে নিই!" বলিতে বলিতে বৈজু তিন লাফে বারান্দা পার হইয়া ছুটিয়া পলাইল।

তাহার স্নেহের উপহার সেই ফুলগুলি টেবলের উপর সাজাইয়া রাখিলাম। সে নিজেও এই ফুলগুলির মতই সুন্দর ও মনোরম!

কয়েক দিন ধরিয়া শরীর যেন অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন বোধ হইতেছে। জানালার ধারে ইজি-চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া চুপচাপ পড়িয়া রহিলাম। বাহিরে অবিরাম বৃষ্টির শব্দ টিপিটিপি-টুপটাপ। বাড়ীর পাশে কোথায় হয় ত কোন উৎসব আগতপ্রায়। পাড়ার মেয়েরা ঢোলক বাজাইয়া গান ধরিয়াছে, প্রায় সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত ধরিয়া সমানে এক ঘেয়ে সুরে গান। এই গান না কি অদূরবর্ত্তী উৎসবের সূচনা। এ দেশের অধিবাসীদের জীবনে সর্ব্ব ঋতুতে সর্ব্বকালে সাংসারিক সকল উৎসবে গান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আজ উষা একাই আশ্রমে গিয়াছে। আমি কয়েক সপ্তাহ প্রত্যেক অধিবেশনেই গিয়াছিলাম। তবে আশানুরূপ বিশেষ কিছু করিবার না থাকায় এ দিকে কয় দিন আর যাই নাই। তা ছাড়া এখন বুঝিতেছি, অন্তরের মধ্যে প্রবল কর্ম্মশক্তি জাগ্রত না থাকিলে প্রকৃত কর্ম্মী হওয়া যায় না। যে কোন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলে কায হয় ত

গোঁজামিলের ভিতর দিয়া কতকটা হইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু নিজের মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা ও উৎসাহ না থাকিলে সে কর্ম্মে সুসঙ্গতি ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় না, আর মনও শান্তি পায় না। কর্ম্মের মূলে চাই একাগ্র সাধনা ও প্রাণশক্তি। আশ্রমকর্ত্রী তাঁহার সমস্ত সময়—সমগ্র শক্তি এই কাযের মধ্যে নিয়োগ করিয়াছেন ; তাঁহার জীবন স্বচ্ছল—মুক্ত—উদ্বেগবিহীন—আর আমি ?

আহারাদির পর বৈজু খুব সাজ-পোষাক করিয়া উপস্থিত। তাহার ধুতি মালকোঁচা দিয়া পরা—গায়ে রঙ্গীন চাপকান, মাথায় পিতার অনুকরণে প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে এক গাছা ছোট লাঠি !

দারোয়ান ও তাহার কয়েকটি বন্ধু লাঠি ও পাগড়ীতে সজ্জিত হইয়া নীচে দাঁড়াইয়াছিল।

বৈজুর বীরবেশ দেখিয়া আমি বলিলাম, "তোমার সাজ ত খুব সুন্দর হয়েছে, বৈজু ! তোমায় খুব ভাল দেখাচ্ছে ! কিন্তু তোমরা সকলে মেলা দেখতে এত লাঠি-শোঁটা নিয়ে চলেছ কেন ?"

বৈজু মুখখানি যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া বিজ্ঞভাবে বলিল, "পথে বেরোবার সময় শুধু হাতে যাওয়া ঠিক নয়, একটা 'হাতিয়ার' থাকা ভাল। আর সেখানে মারামারি হতেও পারে, তাই——"

বলিলাম, "সেখানে গান হবে বল্লে না ? তার মধ্যে আবার মারামারি কিসের ?"

বৈজু হাসিয়া বলিল, "বাঃ ! যে সব দল হেরে যাবে, তারা মারামারি কর্ব্বে না ? হেরে গেলে ত সকলেরই রাগ হয়। এক এক বার খুব দাঙ্গা হয় শুনেছি। এবার যদি সে রকম কিছু হয়, আমিও তা হ'লে লাঠিটা ঘুরিয়ে বেশ দু চার ঘা বসিয়ে দেব !" বলিয়া বৈজু যেন মারামারির সম্ভাবনায় খুব বীরদর্পে লাঠিখানা বাগাইয়া ধরিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মেলাটা বেশ জমবে তা হ'লে !"

চম্পা একটা 'গুড়িয়া' পুতুল বুকে করিয়া দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আমায় একদৃষ্টে দেখিতেছিল। তাহাকে বলিলাম, "তুমি মেলা দেখতে যাবে না চম্পা ?"

সে বেচারা কি বলিবে, স্থির করিতে না পারিয়া বিব্রত-ভাবে তাহার পুতুলটি নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। বৈজু মুরুব্বীর মত হাসিয়া বলিল, "ও বড় ছেলেমানুষ কি না ; আপনার সঙ্গে কথা বলতে ওর ভয় করে। মেলাতে চম্পা যেতে চায় না। জোরে বাজনা বাজলেই ও ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলে। না রে চম্পা ?"

চম্পা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া কথাটা অনুমোদন করিল।

আমি বৈজুর হাতে কিছু পয়সা দিয়া বলিলাম, "মেলায় তুমি খাবার কিনে খেও। আর চম্পার জন্য কিছু খেলনা ও খাবার এনো।"

বৈজু মহা খুসি ! "জরুর ! বহুজী ? জরুর ! চম্পার জন্যে আমি রেউড়ী আর পানের দোনা নিয়ে আসবো !" বলিয়া বৈজু চম্পাকে ফেলিয়াই ছুটিয়া চলিল।

সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর বৈকালের দিকে বৃষ্টি থামিয়া গেল। ঘরের মধ্যে আর থাকা যায় না, প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে ! উঠিয়া ছাদে গেলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা—মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আজ একটিও তারা ফুটে নাই। রাজবাড়ীর গেটের উপর আলো জ্বলিতেছে। চারিদিকের নিবিড় আঁধারের মধ্যে ঐ আলোটি মনে হয় যেন দীপ্ত তারার মত ! নহবৎখানায় সানাইএ সবে সুর ধরিয়াছে।

আজ কয়েক দিন হইতে মোক্তার সাহেবের অসুখ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ! তাঁহাদের সেই নিস্তব্ধ গৃহ অনেক লোকের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় সর্ব্বক্ষণ বিস্তর লোকের যাতায়াত ও কথাবার্ত্তার শব্দ এবং নানারূপ গোলমাল শুনা যাইত।

গয়লানী বুড়ী একদিন বলিল, মোক্তার সাহেবের অসুখ বাড়ায় তাঁহার দেশ হইতে অনেক আত্মীয়-স্বজন আসিয়াছেন। আজ তাঁহার উইল হইয়া গেল।

আমি মাঝে মাঝে ছাদে আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীর দিক্‌টায় দাঁড়াইতাম। বাড়ীতে তাঁহারা দুই জন ও একটি আত্মীয় যুবক ছাড়া পূর্ব্বে আর কেহ ছিল না। ছেলেটি অধিকাংশ সময় বাহিরের কাযেই ব্যস্ত।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী নিঃশব্দে যন্ত্রের মত সংসারে ছোট বড় সকল কায—রোগীর সেবা অক্লান্ত পরিশ্রমে করিয়া যাইতেন। এ দেশের প্রথা অনুযায়ী তাঁহার মুখ সর্ব্বক্ষণ অবগুণ্ঠনে আবৃত, আমি কোন দিন তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতাম না। শুধু দেখিতাম, তাঁহার বিশ্রামহীন—আলস্যহীন অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি—অসাধারণ ধৈর্য্য !

আর আশ্চর্য্য মানুষ এই মোক্তার সাহেব! এত বড় দুঃসহ রোগযাতনায় কোন দিন তাঁহাকে অধৈর্য্য হইতে দেখি নাই। মৃত্যু অবধারিত জানিয়া সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা—সমস্তই নিজে সম্পাদন করিলেন। এ দিকে কয় দিন হইতে তাঁহার বিশ্বাসমত শাস্ত্রসঙ্গতভাবে প্রায়শ্চিত্ত—দীনদরিদ্রকে দান ধ্যান তুলাদান অর্থাৎ নিজ দেহের পরিমাণ মত শস্য ও মুদ্রা বিতরণ—এই সব অনুষ্ঠান চলিতেছিল। এ সব যথাকর্ত্তব্য শেষ হইলে তিনি সর্ব্ববিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া ভাগবতশ্রবণে আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রত্যহ বৈকাল হইতে, রাত্রি পর্য্যন্ত এক জন পণ্ডিত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিত। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইত পুরাণোক্ত রাজা পরীক্ষিতের কাহিনী। স্বধর্ম্মে কত বড় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিলে মানুষ এমন ধীর ও স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে পারে!

আজ তাঁহাদের গৃহ নীরব—স্তব্ধ, ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। চিকের ভিতর হইতে রোগীর ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। খাটের উপর তিনি তেমনই স্তব্ধ ভাবে শয়ান—বধূ তেমনই নিঃশব্দে কখনও রান্নাঘরে কখনও স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় ব্যস্ত—উজ্জ্বল আলোর রেখা মোক্তার সাহেবের মুখের উপর পড়িয়াছে, সে মুখ পাণ্ডুর—রক্তহীন—দৃষ্টি গভীর—সুদূর প্রসারিত।

এই মর্ম্মান্তিক শোচনীয় দৃশ্য দেখিলেই আমার মন যেন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বিষাদের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়! সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ ছোট সংসারটি; স্বামি-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহে ভালবাসায় একান্ত নির্ভরশীল; আজ অকালে মৃত্যু হানা দিয়া এই গৃহের সকল সুখ ও মাধুর্য্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে; আর কোন দিন এ নিরানন্দ গৃহ আশার আলোকে—আনন্দে—উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে না; এখন কেবল চারিদিকে অন্ধকার—আশাহীনের বিপুল গাঢ় অন্ধকার! নিষ্ঠুর নিয়তি! নিষ্ঠুর তাহার বিধান!

ঊষার মনটাও আজ বিশেষ ভাল ছিল না। সেই মহিলাটি সত্যই বলিয়াছিলেন, আশ্রমে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সকলেই নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইহাদের ব্যবস্থা করেন; কিন্তু আশ্রমবাসিনীদের প্রয়োজন কি—তাহাদের মঙ্গল কিসে—সে দিক্ হইতে কেহই বিচার করেন না। বিশ্বাস ও সংস্কারে আবদ্ধ মন লইয়া কত দূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া যান—প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পান না।

ঊষা এই সব কথার পর শেষে বলিল, "যেখানে সত্য সত্যই একটা বড় কায করবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সেখানে গোঁজামিল দিয়ে যা তা গোছ একটা কিছু নিয়ে থাকার মধ্যে কোন তৃপ্তি নেই। কিছু অর্থবল ও একাগ্র চেষ্টা—এই দুটি জিনিষ হ'লে এ সব কায গ'ড়ে তুলতে কতক্ষণ? তাই ত আমার খালি নরেশ-দাকেই মনে পড়ে। এমন সব কাযের মধ্যে যদি তিনি থাকতেন!"

কথাটা আমিও কত দিন ভাবিয়াছি। তবু হাসিয়া বলিলাম, "তোর কাছে তিনি একবারে সর্ব্বদিকেই অদ্বিতীয়—না?"

ঊষাও হাসিল—বলিল, "অদ্বিতীয় না হ'তে পারেন, তবে তাঁর মত আর এক জনও ত চোখে এ পর্য্যন্ত পড়লো না?"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ঊষার এই কথাটি যেন এক অশ্রুত-পূর্ব্ব রাগিণীর মত আমার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বাজিতে লাগিল; তিনি মহৎ! তিনি নিষ্কলঙ্ক! অন্যায়ের লেশমাত্র কোন দিন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। ব্যতিক্রম যাহা হইবার—সে তাঁহার দিকে কিছু হয় নাই, হইয়াছিল আমারই মনে। এখন মনে মনে যতই এ সব বিষয় ভাবি, তত কেবল মনে হয়, তাঁহার সম্বন্ধে এমন হীন সংশয় আমার মনে জাগিল কিরূপে? অমিয়া চিরদিন উজ্জ্বল নদী-তরঙ্গের মত চঞ্চল আনন্দময়! তাহার ব্যবহারে সমাজের বাঁধাধরা নিয়মের কোথায় কি ব্যতিক্রম ঘটিবে—কোথায় কি জঞ্জাল বাধিয়া উঠিবে, সে কোন দিনই এ সব ভাবিতে পারে না, তাহার মত আনন্দ-প্রতিমাকে কে না ভালবাসে? তিনিও তাহাকে এই জন্যই এত স্নেহ করিতেন—কোন দিন এ স্নেহাধিক্য তিনি গোপন করেন নাই, বরং কথা প্রসঙ্গে নিজেই কত বার সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন—অথচ আমি!

* * * * *

যাহাদের সহিত তাঁহার সামান্য মাত্র পরিচয়—তাহারাও কোন দিন তাঁহার সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা মনে আনিতে পারে না—আর আমি তাঁহাকে এত ভাল জানিয়া—তাঁহার মনের সমস্ত পরিচয় পাইয়াও অনায়াসে এমন একটা অদ্ভুত ও অন্যায় সন্দেহ পোষণ করিতেছি! এ কি লজ্জা!

আজ এত দিন পরে তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে আসিয়া নিজেই বুঝিতেছি, আমার সবই অলীক কল্পনা মাত্র; রঙ্গীন চশমা পরিলে যেমন সবই রঙ্গীন দেখায়, আমার সংশয়-জর্জ্জরিত চিত্তে তেমনই তাঁহার সমস্ত ব্যবহারই এত দিন অন্যায় ও কপটতায় পূর্ণ বলিয়া মনে হইত! এখন আমার মনের সে গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে, আজ সংশয়মুক্ত শান্ত চিত্তে জাগিয়া উঠিতেছে—তাঁহার প্রতিদিনের ছোট বড় কত কথা, অত্যন্ত সহজ ও অত্যন্ত তুচ্ছ কত কাহিনী; মনে পড়িতেছে, সেই পূর্ণিমার রাত্রিতে ষ্টীমারে যাত্রা—গঙ্গাবক্ষ সে দিন জ্যোৎস্নার প্লাবনে কূলে কূলে ভরা—অজিত বাবু আর উমা রেলিংএর ধারে। অমিয়া নিজের মনে উৎফুল্ল চিত্তে গান গাহিয়া ফিরিতেছিল। তিনি বলিলেন, "আজ আমরা দু'জনে ওদের দলে ভিড় করবো না—আমাদের আজ একান্তে ব'সে দু'জনে গল্প করবার দিন! এই সব গোলমালের মধ্যে আমরা দু'জনে যেন পরস্পরের কাছ থেকে অনেকটা দূরে পড়ে গেছি—না মনীষা?"

সে দিন ভাবিয়াছিলাম, এ শুধু তাঁহার আমায় ভুলাইবার জন্যই রচা কথা! অমিয়া আসার পর হইতে আমাদের দুই জনের যে নিভৃত সঙ্গসুখ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার অভাব ও অতৃপ্তি আমায় সর্ব্বক্ষণ পীড়া দিত, তাঁহার মনে সে আভাস আজকাল আর তেমন করিয়া জাগে না। আজ বুঝিতেছি—সে আমারই রচিত সন্দেহ; আমাদের মধ্যে নিবিড় সান্নিধ্যের অনবসর তিনিও আমারই মত অনুভব করিতেন—তাই সে দিনের সেই সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন—যথার্থ মনের দিক্ হইতেই। তাহার মধ্যে কপটতা ছিল না।

আর এক দিন—সন্ধ্যার পর ঘরে বসিয়া সকলেই কথাবার্ত্তা ও নানা আলোচনায় ব্যস্ত! তাহার মাঝে মাঝে অমিয়ার উচ্ছ্বসিত অনর্গল গল্প ও গানে সভা জমিয়া উঠিয়াছে! আমার এ সব কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে সকলের অলক্ষ্যে উঠিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলাম—ঘরে আলো ছিল না—জানালার বাহিরেও অস্পষ্ট তারার আলো! আমি স্তব্ধনেত্রে সেই ম্লান আলোর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিলাম—নিজের এই অদ্ভুত বিপর্য্যস্ত জীবনের কথা! আর একটা অনির্দ্দেশ্য বিপুল বেদনায় ও নিস্তব্ধ রোদনে আমার বিবশ চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সহসা অন্ধকারের মধ্যে যেন কাহার পায়ের শব্দ! শুনিলাম, "মনীষা! অন্ধকারে একলা শুয়ে কেন? কিছু কি অসুখ বোধ হচ্ছে?"

পরক্ষণেই আমার কপালের উপর তাঁহার হাতের স্পর্শ অনুভব করিলাম। স্নেহের সামান্য পরিচয়ে দারুণ অভিমানে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া চোখে জল আসিতেছিল। প্রথমটা কিছু বলিতে পারিলাম না। তাহার পর কতকটা সংযত হইয়া বলিলাম, "অসুখ কিছু নয়—মাথাটা ধরেছে—তাই—তুমি উঠে এলে কেন? ওরা সব বসে আছে—"

তিনি বিছানায় বসিয়া বলিলেন, "ওরা গল্প করছে—করুক্। আমি তোমার কাছে একটু বসি! তুমি না থাকলে ওখানে আমার ভাল লাগে না।"

তাঁহার স্বরে বা ভাবে কপটতার লেশমাত্র ছিল না। পূর্ব্বের মতই অকৃত্রিম সস্নেহ আচরণ! তিনি আমার মাথায় ও কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। এখন তাই ভাবি—তাঁহার সমস্ত ব্যবহারের মধ্যেই একটা প্রাণহীন কৃত্রিমতা আমি তখন কোথা হইতে আবিষ্কার করিয়াছিলাম? আজ মনে হয়—তিনি চিরদিনই পবিত্র ও নির্ম্মল—আমি আমার মনের বিকারবশে একটা নিতান্ত তুচ্ছ সামান্য বিষয় লইয়া এই অভাবনীয় কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু আমার এতকালের শিক্ষা ও সুরুচিসঙ্গত ভব্যতার আবরণের মধ্য হইতে এই যে লজ্জাকর কুৎসিত রূপ ফুটিয়া উঠিল—ইহার পর আর কোন দিন তাঁহার পাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব কেমন করিয়া?

সে দিন সন্ধ্যাটা কাটিল—এইরূপ স্বপ্নাচ্ছন্ন চিন্তাজালের মধ্যে! সাংসারিক কায-কর্ম্ম—খাওয়া-দাওয়া—প্রতিদিনের নিয়মমত—একই ভাবে চলিতেছিল—আমার মন এ সবের সীমা ছাড়াইয়া বহুদিন পূর্ব্বের স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল——যে সব দিন জীবনে আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না—যে সব দিন অন্তরে কেবল স্বপ্নের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়া চিরবিদায় লইয়া অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে! সেই সব দিনের চিন্তার মধ্যে মন আশ্রয় খুঁজিতেছিল। বর্ত্তমান যে হারাইয়া ফেলে—বাস্তব জীবনে যাহার কোন অবলম্বনই আর অবশিষ্ট থাকে না, চিন্তার রাজ্য ছাড়া তাহার আর আশ্রয় কোথায়?

রাত্রি প্রায় এগারোটা। সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিলাম। দূরে একটা একতলা চালায় আলো

জ্বলিতেছে। জনকতক লোক সেখানে বসিয়া রামায়ণ পাঠ শুনিতেছে; চারি দিক নিস্তব্ধ!

কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে তিনি হয় ত এখন লাইব্রেরী-ঘরে। গদাধর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে দরজার বাহিরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়—তিনি পড়ায় তন্ময়! আগে কত দিন আমি আলো নিবাইয়া—বই কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়াছি! এখন আর কে তেমন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিনিদ্রনয়নে সজাগ থাকিবে? হয় ত কত দিন রাত্রিতে খাওয়াই হয় না—কে জানে?

তিনি কি আমার উপর রাগ করিয়াছেন? এই যে সুগভীর নীরবতা—এই যে নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব—রাগ ও অভিমানের প্রকাশ ভিন্ন ইহার আর কোন অর্থ আছে? এই নিঃশব্দ রজনীর ধ্যানমগ্ন স্তব্ধতার মাঝে মনে পড়ে তাঁহার সেই মৌন-গম্ভীর স্তব্ধ রূপ! সে মুখে প্রেমের—করুণার কোন চিহ্ন নাই! সে মুখে শুধু ক্ষমাহীন সুকঠিন ঔদাসীন্য ও গভীর বিরাগের ছায়া! এক দিন আমি নিজের দর্পে তাঁহাকে অবহেলা করিয়া তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম—আজ ভাবি—এ যদি সত্য হয়—তবে আমি আর বাঁচিব কিরূপে?

রাত্রিতে মোটে ঘুম আসে না—এলোমেলো কত যে চিন্তা—সবই বিশৃঙ্খল—অর্থহীন! তবু এমনই গভীর নিশীথে—এমনই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মাঝে ঐ অগণ্য গ্রহতারকামণ্ডিত উদার উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এমনই অসংলগ্ন নিরর্থক চিন্তার মধ্যে নিদ্রাহীন রজনী কাটাইয়া দিতে আমার ভাল লাগে। দিনের চাঞ্চল্য—দিনের অবিরাম কর্ম্মপ্রবাহ আমার এই চিন্তার স্বপ্নজাল মাঝে মাঝে ছিন্ন করে—আমার এই অবসাদগ্রস্ত নিশ্চেষ্ট ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে যেন কর্ম্মচঞ্চল গতিশীল দিনের আলোর যোগ নাই, রাত্রির নিস্তব্ধ অনন্ত প্রসারিত আকাশের সঙ্গেই তার নিগূঢ় পরিচয়! মাঝে মাঝে গভীর ক্লান্তিতে চোখের পাতা মুদিয়া আসে—ক্ষণেকের জন্য সব কথা ভুলিয়া যাই, কি যে ভাবি—কেনই যে ভাবি—কিছুই মনে থাকে না। তাহার পরই চমকিয়া জাগিয়া উঠি—আবার সব মনে পড়ে—আবার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া সেই নিষ্ফল বেদনা ও মৌন রোদন বাজিতে থাকে!

সমস্ত রাত্রি সে-দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। শরীর অত্যন্ত অবসন্ন ও ক্লান্ত—ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকটা সুস্থ মনে হইল—প্রচুর মুক্ত বাতাস পাইবার জন্য ছাদে উঠিলাম। দুই এক পা অগ্রসর হইতেই দেখি—ছাদের উপর সদ্যস্নাতা সিক্তবসনা মোক্তার-পত্নী দাঁড়াইয়া! আজ তাঁহার মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না—সে মুখ অত্যন্ত সুন্দর। প্রভাত-রবির কোমল কিরণ-রেখা তাঁহার সুগৌর মুখে ও সিক্ত কেশজালের উপর চিক্ চিক্ করিতেছিল—তাঁহার চোখ দুইটি মুদ্রিত—পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া যুক্তকরে তিনি প্রাণের কোন্ একাগ্র কামনা দেবতার চরণে নিবেদন করিতেছিলেন।

চারিদিকের ছাদে সে সময় কোন লোক ছিল না। সকাল বেলায় যে যাহার কাযে ব্যস্ত—সেই জনহীন ছাদের উপর মূর্ত্তিমতী বেদনার ন্যায় এই স্তব্ধ ধ্যানরত রূপ! মনটা যেন এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া বাস্তব জগতের সংস্পর্শে ফিরিয়া আসিল। সে যুগের সাবিত্রী যমের নিকট হইতে সাধনা-বলে মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন—এ-কালের সাবিত্রীর এ প্রাণান্ত সাধনা কি শুধু কালের ধর্ম্মেই নিষ্ফল হইয়া যাইবে? এই একাগ্র উপাসনার সম্মুখে দাঁড়াইতে কুণ্ঠা বোধ হইল। সসম্ভ্রমে নামিয়া আসিলাম।

ঊষা আমার জাগরণক্লান্ত শুষ্ক মুখ দেখিয়া বলিল, "আজ তোমায় বড় খারাপ দেখাচ্ছে। তুমি ঘরেই থাক—আমি সকালের কাযগুলো সেরে এখানেই আসছি।"

আজ আর প্রতিবাদ করিবার শক্তি বা ইচ্ছা—কিছুই ছিল না—সুতরাং বৃথা কথা কাটাকাটিতে মন না দিয়া সমস্ত দিন ঘরেই পড়িয়া রহিলাম। শিবুকাকা সে-দিন অকস্মাৎ আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—এবং বারবার কলিকাতায় অবিলম্বে টেলিগ্রাম করা উচিত—এইরূপ প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।

আমাদের প্রতিবেশীর গৃহের পক্ষকালব্যাপী মঙ্গলাচরণের বোধ হয় অবসান হইয়াছিল। বৈকালে মহা সমারোহে—'বরাত' বাহির হইবার বিরাট আয়োজন। অসংখ্য 'ফুলওয়ারি' আলো বাদ্যভাণ্ড—সুসজ্জিত 'তাঞ্জাম' এবং লোকজন—কিছুরই অভাব ছিল না—কিন্তু বরকে দেখিয়া আমরা ত অবাক্! বর সেই আমার প্রতিদিনের পরিচিত—ছাদের পায়রাগুলির বন্ধু—মাধব—ওরফে মাধোলাল! বেচারা

চীরখণ্ড মাত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া পায়রা লইয়া খেলা ত—তখন তাহার মধ্যে একটা সহজ ও অকুণ্ঠ স্বাচ্ছন্দ্য —এখন বরের রাজবেশে সুসজ্জিত হইয়া সে যেন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট! ক্ষণে ক্ষণে বলয়মণ্ডিত কৃশ হস্তে সে তাহার মাথার ঢলঢলে আলগা টোপর যথাস্থানে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মুখের ভাব—বড় বিব্রত ও করুণ!

শরীরটা যথার্থই যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দুই দিন আর উঠিতে পারি নাই—অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছাগ্রস্তের মত পড়িয়া থাকিতাম। এত দিন শিবুকাকা বা ঊষা কাহাকেও আমার অসুখের কোন কথা বলি নাই—এখন আর গোপন রাখিবার কোন উপায় রহিল না।

ঊষা এ দুই দিনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল—আজ সে বলিল—"এখানে এসে তোমার শরীর তো কিছুই সারলো না—আমি নরেশ-দাকে সব কথা লিখে দিই, তিনি এসে যা হয় ব্যবস্থা করুন।"

আমি উষার কথার উত্তরে কিছু বলিলাম না। কিন্তু যদি সত্যই আমার জন্য তাঁহার কোন চিন্তা বা আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে এত দিনের মধ্যে একবারও কি সংবাদ লইতে পারিতেন না? অসুস্থ দেহ লইয়াই ত সেখান হইতে আসিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া আমি না হয় আসিবার সময় সঙ্গে আসিতেই বারণ করিয়াছিলাম; কোনও দিনই যে আমার কাছে আসা চলিবে না, এমন ত বলি নাই? আমাকে দেখিবার—আমার খোঁজ লইবার ইচ্ছা যদি তাঁহার থাকিত, তবে এই দুই মাসের ভিতর কি একবারও আসিতে পারিতেন না? যদি তাঁহার নিজের কোন আগ্রহ না থাকে, আমার সংবাদ রাখা তিনি যদি নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, তবে বৃথা তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া লাভ কি?

আমি জানি, অন্যায় যাহা করিবার, সে আমিই করিয়াছি; না, না, অন্যায় নয়,—ভুল! আমি বুঝিতে ভুল করিয়াছিলাম! কিন্তু সে ভুল কি এতই দোষের? মানুষের জীবনে ভুল-ভ্রান্তি কে কবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? যদি আমার ভুলই হইয়া থাকে, তবে কেন তিনি আমায় বুঝাইয়া দিলেন না? তিনি ত জানেন, আমি অনন্যচিন্তা অনন্যহৃদয় হইয়া তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। তিনি ত জানিতেন, তাঁহার প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা, তাঁহাকে হারাইবার ব্যাকুল আশঙ্কাই আমাকে এমন অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সবই বুঝিতেন—সবই জানিতেন, তবে আমায় কেন আমার ভুল বুঝাইয়া দিলেন না? কেন রাগ করিয়া আরও দূরে সরিয়া গেলেন? এই যে দুই মাস বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, ইহার মধ্যে এক মুহূর্ত্তও ত তাঁহার চিন্তা অন্তর হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিলাম না! কতবার কত দিকে মন ফিরাইয়া এ সব ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, সব চেষ্টাই বৃথা ও নিরর্থক হইয়া গিয়াছে! অথচ তিনি ত বেশ নিশ্চিন্ত; তাঁহার মনে আমার জন্য কোন চিন্তা—কোন উদ্বেগ নাই! আমায় দূরে পরিহার করিয়া তিনি বেশ শান্তিসুখেই রহিয়াছেন! আমার অন্তরের গভীর ভালবাসার কথা তিনি ভাবিলেন না, আমার সামান্য দোষ-ত্রুটিই তাঁহার কাছে বড় হইয়া রহিল।

তাই মনে হয়, বৃথা আর তাঁহাকে ডাকাডাকি করিয়া সোরগোল করা কেন? শরীর যেরূপ ক্লান্ত ও অবসন্ন, মনে হয়, আর যেন এ জীবনের ভার অধিক দিন বহন করিতে হইবে না; এবার শীঘ্রই মুক্তি! আমার চারিদিকে নিরন্তর যে অবিরাম জীবন-স্রোত চলিতেছে, তাহার একটা অস্পষ্ট কলরব এখন আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন অর্দ্ধচেতনার মধ্যে ভাসিয়া আসে। ক্রমশঃ এই অনুভূতি আরও ক্ষীণ—ক্ষীণতর হইয়া আসিবে—এই দিনের আলো, রাতের তারা, পাখীর কলরব, পাতার মর্ম্মর-ধ্বনি সমস্তই! প্রিয়জনের উদ্বেগকাতর মুখ ক্রমশঃ চোখের উপর অস্পষ্ট নিষ্প্রভ মনে হইবে, তাহার পর এক দিন সবই শেষ! আমার সমস্ত দোষ—আমার সব অন্যায়-ত্রুটি সবই লইয়া আমি নিঃশব্দে এ সংসার হইতে অপসৃত হইয়া যাইব—তাঁহাকে বিন্দুমাত্র উত্যক্ত না করিয়া; তাঁহার শান্তিসুখ পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়াই! সেই ভাল! সেই ভাল! সেই ভাল!

আজ পাড়ায় উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বালক মাধোলাল তাহার কিশোরী পত্নীকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; বধূর শুভ আগমনের মঙ্গল-উৎসবে আজ পাড়া মুখর! আত্মীয়স্বজন ও নিমন্ত্রিত লোকদের কলরব, কর্ম্মবাড়ীর অশ্রান্ত কোলাহল, ছেলে-মেয়েদের চীৎকার—সমস্ত মিশিয়া একটা তুমুল সোরগোলের শব্দ আমার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। মাঝে মাঝে বাজীর উৎকট শব্দ ও বারুদের ধোঁয়া এবং মেয়েদের উচ্চ গানের সুর এই সম্মিলিত আনন্দ-কলরবের মধ্যেও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

সানাইয়ে আজ মিলনের মধুর রাগিণী বাজিতেছিল। আশ্চর্য্য এই সুরের খেলা! মনে হয়, যেন দিকে দিকে

আনন্দ-উৎসব! জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র যেন এই উৎসবের সুর বাজিতেছে! সংসারে আজ কোথাও দুঃখ, কষ্ট, অভাব নাই? কিন্তু সত্যই এ আনন্দের সুর সর্ব্বত্র বাজে না কেন? জগতে এমন বৈষম্যের সৃষ্টি কে করিল? পার্শ্বের ঐ দ্বিতল গৃহে আজিকার সমস্ত আনন্দ ব্যর্থ—প্রতিহত! চতুর্দ্দিকের এই কলরোল—এই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে মোক্তার-দম্পতি প্রতিদিনের মতই স্তব্ধ নির্ব্বাক! অনন্ত কালসাগরের কূলে অজ্ঞাত পথের যাত্রী! এক দিন এমনই আনন্দ-প্রবাহের মধ্যে দেবতা সাক্ষী করিয়া বৈদিক মন্ত্রে এই দুইটি জীবনের মিলন-বন্ধন হইয়াছিল, তাহার পর হইতে এত দিন ঐ সন্তানহীনা বন্ধ্যা নারীর অন্তরের সমস্ত অমৃত যাহাকে সেবায়, প্রেমে, মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিয়া রাখিত, আজ তাহার সেই অবলম্বন ভাঙ্গিয়া যায়! আজ তাহাদের সকল আশা—সকল আনন্দের অবসান! এই আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যাকুল আশঙ্কায় তাহারা স্তব্ধ! মুহূর্ত্তের জন্য কাছছাড়া হইতে তাহাদের ভয়! কথা বলিলে এই নিবিড় সান্নিধ্যের গভীরতা নষ্ট হইয়া যাইবে—তাই তাহারা সর্ব্বক্ষণ নীরব! শুধু শঙ্কা-কম্পিত মৌনহৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু অনুভবেই আকুল!

খোলা জানালা হইতে মুক্ত আকাশের খানিকটা দেখা যাইতেছে। এক একটা বাজি শূন্যপথে বহুদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া বিচিত্র বর্ণের আগুনের ফুল কাটিতে কাটিতে নিবিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মানুষের জীবনটাও যেন ঐ বাজিগুলার মতই উজ্জ্বল সুন্দর—ক্ষণস্থায়ী! দুই দিনের জন্য কতই না আড়ম্বর—কত সুখ—কত হাসি! তাহার পর এক দিন অকস্মাৎ—সব শেষ!

আজ যেন শরীরের মধ্যে একটা অননুভূত ভাব বোধ করিতেছি। কেমন যেন একটা করুণ মোহে আমার চেতনা আবিষ্ট হইয়া আসিতেছে। এই যে গভীর ক্লান্তি—এই যে গভীর আচ্ছন্নতা—এই কি মৃত্যু?

যদি তাই হয়, আজ আমার মনে আর কোন গ্লানি—কোন অভিযোগ নাই! আমার সমস্ত অন্তর আজ এক অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে! আমি এত দিন যে সুগভীর যাতনা ভোগ করিয়াছি, আজ সে সবের পরমা শান্তি! আমার যত কিছু অন্যায়—যত কিছু গ্লানি, সমস্তই মুছিয়া যাক্, শুধু আমার অন্তরের একনিষ্ঠ পবিত্র ভালবাসা অম্লান বহ্নিশিখার মত দীপ্ত হইয়া উঠুক! আমি যদি কোন দিন কাহাকেও কোন দুঃখ দিয়া থাকি, তাহার স্মৃতি—আমি যদি কোন দিন মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া থাকি, তাহারও স্মৃতি আমার অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে—এবারকার সমস্ত সুখ-দুঃখ-বাসনার শেষ!

মিলনের বাঁশী—উৎসবের কলরোল ক্রমেই যেন দূরে মিলাইয়া আসিতেছে! সমস্ত শরীর কেমন যেন ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে। উষা কাহার সহিত কথা বলিতেছিল, তাহাকে একবার ডাকিতে চেষ্টা করিলাম, কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। ধীরে ধীরে গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

ব্যথা

সব শোক-ব্যথা-দুঃখে তোমারি যে অনুভব
করি এ অন্তরে মোর করুণার এ বৈভব।

তোমার পরশ পাই এ হৃদয়ে মনে প্রাণে—
বিফলতা যবে শেষ মৃত্যু-দূতে ডেকে আনে।
সংসারমরুতে যদি পথ না হারাত, প্রভু,
লভিত কি নর-নারী এ অমৃতধারা কভু?

প্রেমসিন্ধু হে দয়াল! তবু নাহি চিনে নর,
যতক্ষণ দুঃখ নাহি বসে তার বক্ষ'পর!
তুমি আছ' ক্ষয়ে ক্ষোভে দুর্দ্দশা ও হতাশায়—
পরিণামে তব নাম দেয় শেষ-সান্ত্বনায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র (এম্ এ, বি এল, বি, সি, এস)।

সাহিত্যে স্বৈরাচার

কিছু লিখিলেই যে তাহা সাহিত্য হইবে এবং তাহা ছাপাইলেই যে স্থায়ী হইবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত বাতুলতা। কেন না, তাহা হইলে যে কোনও ব্যবসাদারের সচিত্র ক্যাটালগগুলি অতি মূল্যবান্ সাহিত্য বলিয়া এত দিন নিশ্চয়ই পরিগণিত হইত। কিন্তু উক্ত ব্যবসায়িগণ যখন এগুলিকে সেরূপ কিছু বলিয়া চালাইতে চাহে না, তখন আমাদেরও তাহাদের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এখন অ-সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া যদি কেহ প্রচার করে, তাহা হইলে কি অমনই আমরা তাহাকে নির্ব্বিচারে সাহিত্য বলিয়া মানিয়া লইব? ট্যাংরা-মাছকে ভেটকী-মাছ বলিয়া মৎস্যবিক্রেতার চালাইবার চেষ্টা কিছু বিচিত্র নহে, কিন্তু সেটা কেনা না কেনা ক্রেতার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে।

বর্ত্তমানকালে বাঙ্গলা-সাহিত্যের হাটে এমনই অনেক ভেজাল ও মেকি আসিয়া জুটিয়াছে। গুটিকয়েক অপরিণত-বয়স্ক যুবক তাহাদের খুসীমত, জ্ঞানমত ও অভিজ্ঞতামত অশ্লীল ও কদর্য্য গল্প এবং কবিতা লিখিয়া, নিজেরাই মাসিক-পত্র বাহির করিয়া তাহাতে ছাপাইতেছে। কিন্তু কবে হইতে ইহারা এরূপ কার্য্য করিতেছে, এত দিন সে খবরটা সাধারণ সাহিত্য-রসিকদিগের মধ্যে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল। সাহিত্যিকরাই যখন এই সব রচনার বিষয়ে এমন অজ্ঞ ছিলেন, তখন দেশের অন্য লোকের কথা ত বলাই বাহুল্য।

ভদ্রজনসমাজে এ সব লেখার প্রচার দূরে থাকুক, তাঁহারা এ যুগে এ জাতীয় লেখার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও যখন অবগত ছিলেন না, বঙ্গ-সাহিত্যের নাট্যশালায় তখন অকস্মাৎ আর এক দল লেখকের আবির্ভাব হইল, যাঁহারা পুলিসের বোমা-আবিষ্কারের মত, এই অশ্লীল সাহিত্যের জন্ম ও তাহার নিজ নিজ পিতৃ-মাতৃ-ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হওয়ার খবর আবিষ্কার করিয়া—খুব জোর-গলায় ভদ্রলোকদিগকে এই বিপদাশঙ্কার বার্ত্তা জানাইয়া দিয়া সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে "চোর, চোর" রব শুনিয়া পথিক যেমন চোরকে খুঁজিতে সুরু করে, কৌতূহলীর দলও তেমনই চোরকে খুঁজিতে লাগিলেন। সকলে মিলিয়া খুঁজিয়া অন্ধকার গলিতে লুক্কায়িত তস্কর মহাশয়কে অবশেষে লোকলোচনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

এই সব অশ্লীল লেখাও এমনই করিয়া ভদ্রসমাজের গোচরে আসিল। অশ্লীল রচনার আবিষ্কারকগণ আশঙ্কা করিলেন যে, ঈদৃশ রচনাবলী জনসাধারণের সুনীতির পরিপন্থী এবং ইহা দ্বারা দেশের নরনারীগণের নীতি ও রুচি কলুষিত হইল বলিয়া।

আমাদের দেশের লোকেরা যে পুস্তক পড়িয়াই খারাপ হয়, এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। পুস্তকে লিখিত হাজার হাজার নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াও লোক চিরকাল খারাপ হইয়া আসিতেছে—ইহা আমরা বহু দেখিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি। আর খারাপ হইতে হইলে যে বিশেষ কোনও সাহিত্য বা অ-সাহিত্য পাঠ করিতে হয়—এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া লোক যখন সাধু হয় না, তখন অশ্লীল রচনা পড়িয়াই বা তাহারা খারাপ হইতে যাইবে কেন? আসল কথা, লোকের খারাপ হওয়া না-হাওয়া কোনও রচনা-পাঠের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে সেই ব্যক্তিবিশেষের নিজ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও অবস্থার উপর।

এই জন্যই আমার মনে হয় যে, সাহিত্যে যে এই কারণে একটা প্রবল চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা নিতান্তই অকারণ শুধু নহে, ইহাকে স্বীকার করিয়া এতটা প্রাধান্য দেওয়াটাই অন্যায় ও অশোভন হইয়াছে।

এখন, এই যে কয় জন যুবকের লেখা—যাহার বিরুদ্ধে এই দুরন্ত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, সেগুলি যে আসলে সাহিত্যই নয়। যাহা সাহিত্য নয়, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করাটাই নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য বলিতে বুঝি, যাহা একটা জাতির মর্ম্মবাণী হইতে সমুদ্ভূত ও তাহার প্রাণ-রসে পরিপুষ্ট হইয়া, সেই জাতির রস-ঘন সত্যমূর্ত্তিটিকে জগৎসমক্ষে ধরিয়া দেয়। সাহিত্য কাহারও ফটোগ্রাফ নয়, চিত্র; ইতিহাস নহে, সঙ্গীত; ডাইরি বা জমা-খরচের খাতা নহে—একটু হাসি, একটু আলাপ, একটু মধু। এই জন্য সাহিত্য কোনও একটা বিশেষ কালের নয়—সে নিত্য, চিরন্তন, শাশ্বত; কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষেরও নয়—সে সার্ব্বজনীন; কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়েরও নহে,—সে সব বিষয়ের মধ্য দিয়া গিয়া বিষয়াতীত, এই জন্য সর্ব্বব্যাপী

এবং বিরাট। সাহিত্যে কল্পনার মিথ্যা আছে, কিন্তু সে মিথ্যারও পরপারে, অদ্বৈত সত্য; সাহিত্যে অলকার ঐশ্বর্য্য ও শ্মশানের চিতা-ভস্ম মিশিয়া, সে হইয়াছে মৃত্যুঞ্জয়ী শিব। শিবের ললাট-বহ্নির তেজে মদনও ভস্ম হইয়া যায়। এই সাহিত্য। ইহাকে পাইতে হয় সাধনার ভিতর দিয়া ও তপস্যার মধ্য দিয়া—যেমন দাক্ষায়ণী সতী শিবকে পাইয়াছিলেন অপর্ণা তপশ্চারণা করিয়া।

তাহা হইলেই এখন দেখা যাউক, এই যুবকগণ-লিখিত রচনাবলীতে সত্য, সুন্দর ও শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না। অবশ্য, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভবপর নহে; দিতে হইলে এই সমস্ত রচনা অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া যুক্তি-তর্ক দিয়া প্রমাণ করিতে হয়। কিন্তু সে সময় নাই এবং সে ক্ষেত্রও ইহা নহে। সুতরাং সেরূপ কিছু না করিয়া কেবলমাত্র ইহাদের রচনার বিষয়বস্তু-ধারা এবং বর্ণনা-ভঙ্গী ও ব্যঞ্জনা দেখিয়া যেটুকু বুঝা যায়, তাহারই আলোচনা আমি করিব।

এই আধুনিক রচনাকারীরা যেন কয়েকটি বিশেষ সমস্যা ও বস্তুর পক্ষ গ্রহণ করিতেই কলম ধরিয়াছেন, ঠিক সাহিত্য-রচনার সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হন নাই। দারিদ্র্য-সমস্যা এবং দৈহিক ক্ষুধা ও তাহার পরিতৃপ্তিই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন। আর ইহার পশ্চাতে, নূতন-কিছু করার একটা প্রচণ্ড অহঙ্কার তাহার জয়ঢাক বাজাইতেছে। এই জাতীয় সব লেখাই যেন তারস্বরে একবাক্যে বলিতেছে—আমরা জগতের উপেক্ষিত-দিগকে, নিন্দিতদিগকে ও তুচ্ছতমগণকে জাতে তুলিতেছি, তোমরা আমাদের দুঃসাহস দেখ, শক্তি দেখ। যে কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এ কার্য্য কেহই এত দিন করেন নাই, আর ইহাই আমাদের আনীত সাহিত্যে নবযুগ।

অথচ ইঁহারা গোড়াতেই একটা মস্ত গলদ করিয়া বসিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন অথবা জানেন না যে, সমস্যা-মূলক রচনাবলী অতি উচ্চাঙ্গের হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, কিন্তু সেগুলি যে ঠিক সেই কারণেই সাহিত্য-পদবাচ্য হইবে—তাহার মোটেই কোনও কারণ নাই, যেহেতু, উদ্দেশ্য-মূলক রচনামাত্রই, কিছু সাহিত্যপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাহা সাহিত্য, তাহা সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বকালের।

মানবজাতির চিরন্তন সমস্যা-ভিত্তির উপরে যে সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত, যে সমস্যার কোনও দিন সমাধান হয় নাই বা হইবেও না, যাহা কোনও ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়—তাহাই প্রকৃত সাহিত্য। দারিদ্র্য-সমস্যা লইয়া সত্যকারের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নহে; ও-বিষয়ে গবেষণা করিলে, হয় ত দারিদ্র্য-নিবারিণী এবং দেশহিতকর কোনও উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারে—যাহা অধ্যয়ন করিলে দেশের ধন-বৃদ্ধি ত হইবেই; উপরন্তু ভারতবর্ষ যে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে—এরূপ সম্ভাবনাও না কি হৃদয়ে জাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈদৃশ জ্ঞান-গর্ভ পুস্তককেও রসিকগণ সাহিত্যের পংক্তি হইতে বহু দূরে রাখিবেনই, কখনই তাহাকে সাহিত্যের সমান আসন নিশ্চয়ই দিবেন না।

কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ; অন্ন অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অন্ন মধু কখনও হইবে না। মধুর স্থানে অন্ন কেহই গ্রহণ করিবে না। নবীন লেখকগণ তাঁহাদের উল্লিখিত রচনাগুলি যতই সাহিত্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করুন না কেন, রসিক-ভবীগণ নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা প্রতারিত হইবেন না। বিবাহ-সভায় বিনা মূল্যে বিতরিত প্রীতি-উপহারের পদ্যকে একটি উৎকৃষ্ট বিবাহ-সমস্যা-মূলক কবিতা বলিয়া চালানও তাহা হইলে ইঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য নহে।

তার পর দেখিতে পাই, ইঁহাদের রচনায় দৈহিক ক্ষুধা-লালসাকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এ প্রচেষ্টাও নূতন নহে।

রস-শাস্ত্রে আদিরস যেমন আছে, শৃঙ্গাররসও ঠিক তেমনি বিদ্যমান, কিন্তু অশ্লীলরস বলিয়া জগতের সাহিত্যে যে কিছু আছে, এত দিন তাহা শুনা যায় নাই। সংস্কৃত, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে শৃঙ্গাররস একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকবি কালিদাস, মোঁপাসা, জোলা, সেকস্পীয়ার, বাইরণ প্রভৃতি প্রতিভাধরদিগের শৃঙ্গার-রসাত্মক বহু রচনা আজ পর্য্যন্ত বিশ্বের নর-নারীকে অনির্ব্বচনীয় রস পরিবেষণ করিয়া আসিতেছে এবং করিবেও। অনশ্লীল শৃঙ্গার-রস রস-রচনার চূড়ান্ত নিদর্শন। উভয়ের মধ্যেই মাদকতা থাকা সত্ত্বেও মধু ও মহুয়ার রস যেমন এক পদার্থ নহে, তেমনি শৃঙ্গাররসাত্মক ও অশ্লীল রচনাও এক বস্তু নহে।

বঙ্গসাহিত্যেও শৃঙ্গাররসের দৃষ্টান্তের অভাব নাই; ভারতচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেরই কাব্যে শৃঙ্গার-রসাত্মক রচনা আছে, যেগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য স্থায়ী সম্পদ; কিন্তু তাহা যে অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট, এ কথা বোধ হয়, কোন সাহিত্যরসবিদ্‌ই বলিবেন না; গোঁড়া নীতিবাদীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তেঁতুল দেখিলে দাঁত টকিয়া যায়, এমন লোকও আছে, আবার এমনও আছে—অম্লরসই যাহাদের অত্যন্ত মুখরোচক। রস উপভোগ করা-না-করা নিজ নিজ শিক্ষা, সংস্কার ও রুচিসাপেক্ষ; কিন্তু এ কথা রসেরই, নীরসের নহে।

শৃঙ্গাররস রচনা করিতে গিয়া যেখানে রস না হইয়া রসের গাদ তৈরি হইয়া পড়ে, সেখানে অবশ্য আর যাহারই উপভোগ্য বস্তু থাকুক্, রসিকের কিছু থাকে না—ইহা খাঁটি কথা। রসের ভিয়ান করিতে যে বসিবে, তাহার সর্ব্বাগ্রে রসের মাপ ও ভাগটা জানা বিশেষ প্রয়োজন। ভাল রাঁধুনী যে, সে ভাল ভাল রাঁধুনীর সাহচর্য্যে ও শিক্ষায় তবে ভাল রাঁধুনী-পদবীতে উঠে। নিপুণ রাঁধুনী জানে যে, লবণই সব ব্যঞ্জনের প্রাণ; কিন্তু ব্যঞ্জনকে অধিকতর সুস্বাদু ও মুখ-রোচক করিবার নিমিত্ত মাপাতিরিক্ত লবণ দিলে সেটা যে কিরূপ সুখাদ্য হয়, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। রস-রচনাও ঠিক তদ্রূপ। এই যে আধুনিক রচনাগুলি এমন ঝঙ্কারজনক, বীভৎস এবং অশ্লীল হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত রচয়িতাদের রসজ্ঞানের একান্ত অভাব।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ আছে; যেমন এই নব্য যুবকদিগের নূতন-কিছু-করার উদ্ধত অহঙ্কৃত দাবী। যে পাশ্চাত্য মহাসাহিত্য হইতে এই অতি-আধুনিক রচনার প্রেরণা এবং যাহাদের ব্যর্থ অনুকরণে এই সব রাবিশের সৃষ্টি, তাহাতে কিন্তু আমরা অন্যরূপ দেখি। পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনায় বীভৎসতার নগ্নমূর্ত্তি আমরা দেখি সত্য, কিন্তু তাহা ঘৃণার চক্ষুতে এবং ঘৃণা করিতে; তাহাতে পাঠকের চক্ষু ফোটে, পাঠক সচেতন হয়। কিন্তু এ সব লেখা পড়িলেই মনে হয় যে, অশ্লীলতাটাকে এবং মানব-অন্তরের সুপ্ত পশুটাকে জাগাইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার একটা দুর্জ্জয় [illegible], অসম্ভব অভিমান এবং একটা ইতর আনন্দই যেন ইহাদিগকে সবলে পরিচালিত করিতেছে। অশ্লীলতা ও রিরংসাকে প্রচার করিবার জন্যই যেন উক্ত সব রচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

রচনাকে সত্য, সার্থক ও রূপময় করিতে হইলে যে রসায়নের প্রয়োজন, তাহাকেই প্রাধান্য দেওয়া রচনার উদ্দেশ্য কখনও হইতে পারে না। তাহা করিতে গেলে রচনা আর রচনা থাকে না, সেটা হইয়া দাঁড়ায় সেই রসায়নের বিজ্ঞাপন ও বাহন মাত্র। একখানি চিত্রে লাল-রঙের প্রয়োজন আছে বলিয়া, যদি কেহ তাহাতে যথেচ্ছ-ভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত লাল রং খানিকটা ঢালিয়া দেয়, তাহা হইলে সেখানা আর যাহাই হউক্, চিত্র কিন্তু হইল না। রচনা রসের বাহন, কিন্তু রস যদি রচনার বাহন হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে হয় ত নূতন একটা কিছু হইতে পারে, কিন্তু হয় না কেবল রস বা রচনা।

আদিম দৈহিক ক্ষুধা ও লালসা, জৈবধর্ম্মে আহার ও নিদ্রার মতই মানুষের সহজাত স্বভাব, এই জন্য অপরি-বর্জ্জনীয়। অন্যান্য জীবের ন্যায় স্ত্রীলোকের দেহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও কামনা পুরুষমানুষের অত্যাজ্য স্বভাব। কিন্তু মানুষ সমাজ সংস্কার ও বৃত্তি দ্বারা এমন কতকগুলি বিধি-নিষেধ এবং আইন-কানুন তৈরি করিয়া লইয়াছে, যেগুলি এত দিন পরে জগতের সকল সভ্যসমাজেই সাদরে গৃহীত হইয়াছে। অবাধ স্ত্রীপুরুষমিলনের দিনও ছিল, কিন্তু সেটি মানুষ বুদ্ধি ও বৃত্তির ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়াছে, করে নাই কেবল কোনও কোনও অসভ্য বন্য-জাতি এবং পশুরা। ক্রমশঃ মানুষের সূক্ষ্ম রস-জ্ঞান ও শ্লীলতা-বোধের উন্মেষের সহিত শৃঙ্গার-সম্বন্ধীয় যত কিছু ব্যাপার, এমন কি, নাম-সংজ্ঞাগুলি পর্য্যন্ত মানুষ গোপন করিতে শিখিল।

এ নিয়ম বর্ত্তমান যুগে দারিদ্র্য-সমস্যা যখন অত্যন্ত প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে, তখনই সৃষ্ট হয় নাই—যদিও উক্ত সমস্যার সহিত অশ্লীলতা রচনার কোনও সম্বন্ধই আমরা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। অশ্লীলতা-বর্জ্জন-বিধি প্রথম যখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন তার বেতার রয়তার দূরে থাকুক, এমন কোনও খবরের কাগজ কি মাসিকপত্রও এক-খানা ছিল না, যাহা দ্বারা এক দেশের খবর অন্য দেশে নীত হইত—আর সব লোক তাই পড়িয়া শিখিত। দেখা যাইতেছে, পৃথিবী খণ্ড-খণ্ডাকারে যখন স্ব স্ব প্রধান ও

স্বাধীন ছিল, কেহই কাহারও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না, তখনই তাহারা এই দেহ-লালসা এবং রিরংসার উত্তেজক কাহিনী বা ব্যাপার, তাবৎ লোক-চক্ষুর আড়ালে রাখার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তাটা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল। আর সেই অজ্ঞাত অতীত কাল হইতেই সর্ব্বদেশের সুধী-সমাজ এই তৃতীয় জৈব-ক্ষুধাকে সংহত ও সংযত করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছেন।

অতি আধুনিক লেখার মধ্যে এই সব যুবকেরা খুব জোরের সহিত দেখাইতে চাহেন যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টির একেবারেই উপযোগী নহে; তাহার কারণ, ইহাতে অবাধ মিলন, প্রকাশ্যমিলন, নিষিদ্ধমিলন প্রভৃতি মনুষ্যত্বের পরিপোষক বিধি নাই! এই জন্য, ইঁহারা গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে তাঁহাদের অভীপ্সিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দৈহিক-লালসা ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়াই যেন সমাজ ত সংস্কৃত হইবেই, অধিকন্তু তদ্দ্বারা দারিদ্র্য-সমস্যা, শ্রমিক-গণ্ডগোল, বেকার-বিপত্তি সমস্তই একবারে দূর হইয়া যাইবে, জগতে স্বর্গরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে!

কিন্তু সত্য সত্যই এমন এক দিন ছিল। তখনও মানুষ ছিল—আর, সে মানুষেরা এই সব মানুষদেরই পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহারাই কিছুদিন পরে; বর্ত্তমান বিধিনিষেধগুলির খস্‌ড়া তৈরি করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন বুদ্ধির উৎকর্ষে, জ্ঞানের বৃদ্ধিতে এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আদিম প্রথানুসরণ পশুর কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষের নহে। যুগে যুগে এই বোধটাই স্পষ্ট ও দৃঢ় হইতে হইতে আসিয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে, তাই আজ পর্য্যন্ত সে আদিম প্রথা আর চলিল না।

এই তৃতীয় ক্ষুধার শত তাড়না সত্বেও মানুষ আজ পর্য্যন্ত অবনত মস্তকে বিধি-নিষেধগুলিকেও মানিয়া আসিতেছে। তার পর, জানি না, কবে কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে শৃঙ্গারের দেহ নিংড়াইয়া তাহার রসটুকু মাত্র লইয়া আনন্দের এক অপূর্ব্ব প্রস্রবণ সৃষ্ট হইল। ইহারও পরে, আরও মার্জ্জিতরূপেও অভিনব ভাবে চিত্তের হ্লাদিনী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা দিল। অন্তরের সহস্রদল অরবিন্দ ফুটিয়া উঠিল। মানুষ শৃঙ্গারের কণ্টকিত শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া শালীনতার শুভ্র কৈলাস-শিখরে আরোহণ করিয়া লাভ করিল—আদিরস। এই দিনেই মানুষের তপস্যা সমাপ্ত হইল; মানুষ মানুষ হইল। আর পশু—সে পশুই রহিয়া গেল।

আজ তাই বারম্বার মনে হইতেছে, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি কি চরমোন্নতির শেষ সীমান্তে পৌছিয়াছে? তাহাই যদি না হইবে, তবে মানুষ মানুষের কোঠা হইতে আবার পশুত্বের দিকে ঝুঁকিতে এত ব্যস্ত কেন? মানুষ পশুত্বকে বর্জ্জন করিতে এবং পশুভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে, আদিম তৃতীয় ক্ষুধাকে শিল্পকলা, সাহিত্য ও শালীনতা হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে এত দিন ধরিয়া অক্লান্তভাবে প্রয়াস পাইতেছে, কারণ, আরও উন্নতিকামী বিবর্ত্তন-শীল মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কাজেই যাহা তাহার উচ্চবৃত্তির বিরোধী, তাহাই তাহার পরিত্যাজ্য। এ কারণ শ্লীলতার পরিপন্থী নীরস অশ্লীলতা তাহার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অশ্লীল রচনা যতই নীরস হউক না কেন, তাহা পাঠকের মনে ক্ষণিকের জন্য একটা উত্তেজনা আনে সত্য, কিন্তু তাহা প্রসন্ন আনন্দ নহে। এই উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যকেই এই অশ্লীল লেখকগণ আনন্দ ভাবেন। তাঁহারা জানেন না যে, রস ছাড়া আনন্দের অন্য জন্মস্থান নাই। আর রস দশ বিশটা নাই, মাত্র নয়টাই এবং তাহার কোনওটির মধ্যেই অশ্লীলতার স্থান নাই।

রসের রং মাখাইয়া কোনও রচনা চালাইতে গেলে তাহা সাহিত্য কখনও হয় না, সং হয়; সং-এর জন্য কৌতূহলও লোকের অল্প নয়। তাহার প্রমাণ, চৈত্র-সংক্রান্তির সংয়ে ভিড় দেখিলেই বুঝা যায়। অশ্লীল রচনা সাহিত্যের রূপ নয়, বিদ্রূপ।

ঢাক-ঢোল পিটাইয়া যাহাকে আত্ম-পরিচয় দিতে হয়, তাহার পরিচয়ে বিশেষ একটা গোল থাকে। চিত্র আঁকিয়া যদি বুঝাইয়া দিতে হয় যে, সে কিসের চিত্র, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ছবিখানি প্রদত্ত পরিচয়োক্ত বস্তু ছাড়া বহু জিনিসকেই বুঝাইতে পারে, তাই ঐ ভূমিকার প্রয়োজন। আর ঠিক এই কারণেই বোধ হয় ইঁহারা ইঁহাদের রচিত অশ্লীল রচনাগুলিকে সাহিত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে এত লালায়িত।

যে প্রকৃত রস-স্রষ্টা, সে উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া শুধু অকারণেই

আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া কেবলি সৃষ্টি করিয়া যান। এই সৃষ্টি করাতেই তাহার সুখ। শিল্পীর মন বেগবতী নদীর ঢেউ, দক্ষিণের হাওয়া, ফুলের গন্ধ। শিল্পীর প্রাণ বেণুবনের বাঁশী, বাদকের ফুঁয়ে-বাজা বাঁশীর সুর নহে; সে উদার আকাশে চাঁদের আলো, গৃহ-কোণের ক্ষুদ্র দীপশিখা নহে; সে অন্তহীন উদধির বিচিত্র উর্ম্মি-লীলা, ক্ষুদ্র জলাশয়ের ক্ষীণ হিল্লোল নহে।

এই নব্য যুবকসম্প্রদায়ের আর একটি দোষ, তাঁহাদের পঙ্গু লিখনভঙ্গী, অপটু-প্রকাশ-কলা এবং অর্থহীন গ্রাম্য শব্দের বহুল প্রয়োগ। ইঁহাদের লিখন-ভঙ্গী (ইংরাজীতে যাহাকে style বলে) ঠিক বাঙ্গালা ভাষার লিখন-ভঙ্গী নহে। একটা নূতন ভঙ্গী প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে ফাঁকি দিয়া অমরত্ব লাভ করা যায় সত্য—কিন্তু সেটি ভাষার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে হইবে ত? বক্তব্যের অনেকটা প্রকাশ পায় লিখন-ভঙ্গীর দ্বারা, আর সেই ভঙ্গীই সুষ্ঠু, যাহা দ্বারা ভাষার নিজস্ব রূপ ব্যাহত না হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয় এবং যাহা দ্বারা লেখকের বক্তব্যটির প্রকাশ সরস হয়।

অবশ্য এখানে বলিতে হইবে যে, বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গী ইতিপূর্ব্বে আর কয়েক জন সাহিত্যিকও চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও কেহ কেহ করিতেছেন; কিন্তু সে style এ পর্য্যন্ত কেহই গ্রহণ করে নাই; তাহার কারণ, তাহাতে কৃত্রিমতাই সব এবং সহজ ও স্বচ্ছন্দতার একান্ত অভাব। নৃত্যের লীলায়িত গতি, ছন্দ ও ভঙ্গী খুবই মনোহর সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ভঙ্গীতে চলা নিশ্চয়ই সুসাধ্য নহে। তাই সে ভঙ্গী ভাষাতেও চলিল না।

এ যুবকগণ নিজেদের অদ্ভুত মনোভাবের পরিচয় দিবার জন্যই বোধ হয় এই অচল ভঙ্গীটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অচল বস্তু ও রসাবতারণার মতই এই বিশেষ ভঙ্গীটিতে হয় ত সুবিধাই বোধ করেন। ভূমিকম্পে একটা অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইলে তাহার দরজা-জানালা কড়ি-বরগা প্রভৃতি যেমন চতুর্দ্দিকে বেমানান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, ইঁহাদের এই অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গীতেও তেমনি কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণগুলি রচনার চারি পাশে অকারণ অর্থহীন ভাবে ছড়ান থাকে। ক্রিয়ার রূপ সবই প্রায় বর্ত্তমানের Present tense. লেখার বিষয়ও বর্ত্তমান কালোপযোগী শুধু মুটে মজুর গণিকা এবং তৃতীয় ক্ষুধার প্রচণ্ড পীড়া। আর এই সব মুটে মজুর শ্রমিক ও বারাঙ্গনাদিগকে উপলক্ষ করিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার বিশদ ও বিলম্বিত ভাবে যে সব রিরংসার উদ্দ্যোতক কাহিনী লিখিত হয়, তাহাই না কি বর্ত্তমান যুগের দারিদ্র্য-সমস্যা!

আর এক দোষ, স্থানে অস্থানে অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য। অকারণ ইঁহারা এমন সব অভিধান-বহির্ভূত অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করেন, যাহার অর্থ এক লেখক ব্যতীত কাহারও বোধগম্য হইবার কোনও উপায় নাই।

এইখানে একটি জটিল সমস্যা আছে, যাহার মীমাংসা বোধ হয় এখনও সাধ্যাতীত নহে। এ সমস্যা—সাহিত্যে চল্‌তি কথার প্রচলন লইয়া।

কিছু দিন হইতেই এই চল্‌তি কথা নূতন করিয়া সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। বহু প্রাচীন কালেও এরূপ কথ্য-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল, যেমন আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক লঘু রচনায় এবং প্রহসনে; কিন্তু গম্ভীর সৎসাহিত্য রচনায় কেহই এ ভাষা ব্যবহার করেন নাই।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এ ব্যাপারের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এখন এই ভাষা ছাড়া লিখেন না। কিন্তু ইহা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষাটিকে যে অযথা বিকৃত করা হইতেছে, সেটার সম্বন্ধে তো কেহই কিছু বলেন নাই?

আমার আপত্তি এই যে, চল্‌তি ভাষার প্রচলনে কথ্য—উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দের ধাতুগত বানান বদ্‌লাইয়া নূতন বানান্ দিয়া, তাহাদের আসল রূপের আমূলপরিবর্ত্তন-সাধন করিতে হয়। যেমন কেহ লেখেন 'নতুন', কেহ লেখেন 'নোতুন্' অথচ আদি শব্দ 'নূতন' হইতে ইহাদের কত প্রভেদ! এমনি করিয়া চল্‌তি ভাষার লেখকগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যেক শব্দের যদি নূতন নূতন বানান্ লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়?

ক্রিয়াপদেও তাই। এক 'করিলাম' লিখিতে নিজ নিজ কথিত ভাষায়, কর্‌লাম, কল্লাম, কর্‌লুম, কর্‌লেম, কল্লেম, কর্‌নু, কন্নু প্রভৃতি কত রূপই না হইতেছে! ইত্যাকারে সুপ্রতিষ্ঠিত একটা ভাষার যদি ক্রমশঃ বিকৃতিই ঘটিতে থাকে এবং শব্দগুলি নিজ নিজ ধাতু ও গোত্র হইতে সম্পূর্ণ প[illegible] পড়ে, তাহা হইলে সেটি কি ভাষার পক্ষে বিশে[illegible] হইবে?

উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা পৃথিবীর অন্য কোন্ ভাষায় আছে জানি না, তবে ইংরাজীতে যে নাই, তাহা দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডে শুনিয়াছি, প্রদেশে প্রদেশে শব্দের উচ্চারণ বিভিন্ন, কিন্তু সাহিত্য পদগুলির বানান্ একই; সেটা বহুকাল হইতে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংস্কৃত ও সুবিধিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহার গায়ে কেহই কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুখে যে শব্দের যেমনি উচ্চারণই করুক্ না কেন, সাহিত্যে তাহাকে স্থান দিতে কেহই অমন ব্যগ্র নয় বলিয়া, তাহাদের পরস্পরের শব্দের উচ্চারণগত বহুবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, সাহিত্যের ভাষা বুঝিতে তাহাদের কোনও কষ্টই হয় না: কারণ, ইংরাজীতে সাহিত্যের ভাষা এক, অভিধান এক এবং ব্যাকরণও এক। যিনি যে প্রদেশেরই হউন না কেন, যেমনই তিনি উচ্চারণ করুন, লিখিবার সময় তাঁহাদিগকে আদর্শানুযায়ী সাধুভাষা লিখিতেই হইবে। Cat উচ্চারণ করিয়া Kat কোনও ইংরাজই লিখিবে না, Psalmএর স্থানে Sam ও কেহ লেখেন নাই। Quay ও Key উচ্চারণ দুইয়েরই এক, কিন্তু সেজন্য ইহাদের উচ্চারণ বা বানান বদলাইবার জন্য কেহই বিশেষ চিন্তিত বলিয়াও ত বোধ হয় না।

তবেই, লিখিত ও কথিত শব্দের উচ্চারণগত বৈষম্য চিরদিন আছে, চিরদিনই থাকিবে—সব দেশে সব ভাষাতেই যেমন আছে। লিখিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা—তাহা আদর্শ ভাষা, যাহা সর্ব্বকালে সব মানুষে বুঝিবে। তাহাকে উচ্চারণগত করিতে গেলে, তাহাকে যে কেবল এই যুগেই আদর্শচ্যুত করা হইবে, শুধু তাহাই নহে, অন্য যুগে যদি অন্যভাবে তখনকার লোক তাহার উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার এক নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে এবং যুগে যুগে ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তনে ভাষা ত ভাসিয়া যাইবেই, তাহার সঙ্গে যাইবে পূর্ব্বতন যত সাহিত্যও। ভাষার পরিবর্ত্তনে এই ক্ষতিই সব চেয়ে বড় এবং অনিবার্য্য।

কাজেই, চল্‌তি ভাষার সাহিত্যে প্রচলনই আমার মতে অযৌক্তিক। ইহাতে আরও বিপদ আছে। যদি কথ্য-ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে কলিকাতার ভাষাই শুধু লওয়া হইবে কেন? কলিকাতার ভাষার এমন কি সার্ব্বজনীনতা ও অধিকার আছে, তাহা একেবারেই আমার বুদ্ধির অগম্য। কথ্য ভাষাই যদি লইতে হয়, তবে বাঙ্গালার প্রত্যেক স্থানের ভাষাই লইতে হইবে; ঢাকা, ময়মনসিং ও চট্টগ্রাম কি রাঢ়ের ভাষাই বা বাদ যাইবে কেন?

চল্‌তি ভাষার লেখকগণ বলেন, চল্‌তি ভাষার নাকি নিজস্ব একটা জোর আছে, ইহা দ্বারা ভাষার শক্তি ও বেগ বাড়ে। হয় ত কোন কোনও স্থলে ইহা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু অনেক স্থলে যে চলতি ভাষা বিশেষ দুর্ব্বল-ও, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোনও গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় বা গভীর চিন্তাশীল বিষয়ে চল্‌তি ভাষা মোটেই উপযোগী নহে। এ ভাষা এক চলে, কেবল লঘু বিষয়ে অথবা হাস্যরসের রচনায়।

ভাষায় জোর কি সাধু ভাষার রচনা দ্বারা দেওয়া যায় না? আমি তাহা বিশ্বাস করি না, বরং দিতে না-পারাটা লেখকের অক্ষমতাই মনে করি। জোর বাড়ানই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দী, উর্দ্দু বা ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিলে, চল্‌তি কথা অপেক্ষাও জোর হয়। তবে কি তাহাই করিতে হইবে?

চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতিগণ আরও বলেন যে, এতদ্দ্বারা ভাষার শব্দ-সম্পদও নাকি বাড়িতেছে। অকারণ কতকগুলি ফার্শী আর্‌বী প্রভৃতি শব্দ ভাষায় ঠাসিয়া দিলেই যে ভাষার সম্পদ বাড়ে, আমার সে ধারণাও নাই। অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, খুব কতকগুলি খাইলেই গায়ে জোর হয়, তা' সে খাদ্য হজম হউক্ আর না হউক্; ফলে, তাঁহারা অচিরেই উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এও যেন ঠিক সেই প্রকার খাওয়ান। এক গাছের ফল ছিঁড়িয়া আনিয়া অন্য একটা গাছে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিলেই কি তাহা শেষোক্ত গাছের রস আহরণ করে? তাহা করে না। এ সব বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষাও তেমনি বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে কখনই খাপ খাইবে না। অথচ সংস্কৃতের অফুরন্ত শব্দকোষে এত বেশী নিজস্ব শব্দ আছে এবং অগণিত ধাতু হইতে সহজে এত বেশী শব্দ-সৃষ্টি করা যাইতে পারে যে, তত শব্দ সাধারণ সাহিত্যিকের লেখক-জীবনে হয় ত ব্যবহার করার সুযোগই ঘটিবে না। কিন্তু ইঁহারা ততটা ক্লেশ-স্বীকার করিতে যে প্রস্তুত নহেন, তাহা বুঝাই যাইতেছে, এই জন্য অন্যের দ্বারে ভিক্ষালব্ধ আয়েই নিজের দৈন্য পূর্ণ করিতে এতটা ব্যস্ত।

এইখানে ইঁহাদের একটি অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। চল্‌তি কথার প্রচলনে বহু বৈদেশিক শব্দ—যেমন ফার্শী আর্‌বী, এমন কি, ইংরাজী শব্দ পর্য্যন্ত লইতে ইঁহারা কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু ভাষাকে "সংস্কৃত-ঘেঁষা" করিতে নিতান্ত নারাজ। বাঙ্গলা-রচনায় খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের অভাবে সংস্কৃত হইতে শব্দ লইতে যে কি ক্ষতি, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম, যদিও সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গলারই গর্ভ-ধারিণী। এ জ্ঞাতি-বিদ্বেষের কারণটা কি, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

অবশ্য, যে সমস্ত বৈদেশিক শব্দ ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছে এবং বহুদিন বাঙ্গলা-ভাষার আশ্রয়ে বাস করিয়া বাঙ্গলাই হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করিতে চাহি না। তাহাদের শুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। তাহারা থাকিবেই। বহু সভ্যতার বন্যা এ দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহাদের পলিমাটী যাহা পড়িয়াছে, তাহা ধুইয়া ফেলিবার উপায় নাই। মুসলমান সভ্যতার চিহ্ন আছে আর্‌বী, ফার্শী ও উর্দ্দূ কথায়; পর্ত্তুগীজ সভ্যতার নিদর্শন—চাবি, আল্‌মারি, গির্জ্জা, পাদ্রী প্রভৃতি; তার পর ইংরাজী সভ্যতার দান, সে বহু। এগুলি এতই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন ইহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দেওয়া মানে নিজেরই অঙ্গচ্ছেদ করা। কিন্তু, এই সব আসিয়াছে বলিয়া অকারণ আরও বহু শব্দ যে আমদানী করিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে, স্থানে অস্থানে ও অকারণে 'ফুল' অর্থে 'গুল্', 'রক্ত' অর্থে 'খুন', 'উদ্যান' অর্থে 'বাগিচা' 'জল' অর্থে 'পানি' অবাধে ব্যবহৃত হইতেছে; ইহারাও যখন বৈদেশিক শব্দ, তখন যদি কেহ ইংরাজী শব্দের প্রচুর ব্যবহারে বাঙ্গলা রচনা করেন, তাহা হইলে তাহাতে দোষ কি ? এই বিংশ শতাব্দীতে আর্‌বী ফার্‌শী অপেক্ষা ইংরাজীই বেশী লোকে বুঝে; দুই চারিটি ইংরাজীভাষা ব্যবহার না করে, দেশে এমন লোক বিরল। স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও চারিটি শব্দের বাক্য বলিতে তিনটি ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করে। আমরা এখন ইংরাজী সাহিত্য পড়ি, ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া লিখি, দুরূহ দুর্ব্বোধ্য ভাব প্রকাশকালে ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরাজী শব্দটি বসাইয়া তবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিই। ইংরাজীতে বক্তৃতা দিই, মীটিং করি, ক্লাব করি, পাসে স্টেজ রাখি, লেক্‌চার শুনি, এগ্‌জামিন্ দিই, এমন কি, পিতা, মাতা, স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ইংরাজীতে পত্র লিখি।

উচ্চশিক্ষিত বলি তাঁহাদিগকেই—যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাইয়াছেন; যদিও তাঁহাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় একখানি চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে পারেন না। বহু বাঙ্গালীর দোকানের খাতাপত্র পর্য্যন্ত ইংরাজীতে লেখা হয়; বৈষয়িক কাজকর্ম্মের অধিকাংশই ইংরাজীতে সারি, বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরাজীতে দ্রুত লেখা যায়, এবং তাহাতে সময়ের বহু সংক্ষেপ হয়। এত সব মহাপ্রয়োজনীয় কাজ ইংরাজীতে চলিতে পারে, আর ইংরাজী শব্দের দ্বারা বাঙ্গলা রচনা চলিবে না ?

চল্‌তি কথার প্রচলনে আরও একটা মুস্কিল আছে। কথ্য শব্দের মত শব্দপ্রয়োগ করিতে গেলে এবং বাঙ্গলা ভাষার প্রাকৃত কি সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিতে গেলে, বাঙ্গলা ভাষার নূতন করিয়া বর্ণমালা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং প্রচলিত শব্দগুলির উচ্চারণ মতই বানানেরও সংস্কার প্রয়োজন।

বর্ণমালায় বহু অপ্রয়োজনীয় বর্ণ আছে, যেমন "ণ" ও "ন"; দুইটা "ব"; "জ" ও "য"; তিনটা "শ" "ষ" "স"; "ব"—ফলা "য"—ফলা ও একই বর্ণের দ্বিত্বরূপে বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চারণে বিশেষ কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না, যেমন ক, ক্য ও ক্ক;—তিনটির আবশ্যক হয় না, যেটা হয় একটা থাকিলেই চলিবে; " ি " ও " ী " " ু " ও " ূ " —কারের উচ্চারণেও কোনই প্রভেদ নাই; দুইটা "ঋ", দুইটা "৯" প্রভৃতিরও বাঙ্গলায় নিশ্চয়ই কোনও দরকার নাই। আর বানানের তো ধরাবাঁধা কোন নিয়মই থাকিবে না; কারণ, নিজ নিজ উচ্চারণ-অনুযায়ী, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই লিখিবে। পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার এই হইবে যে, বাঙ্গলা ভাষা বানান ভুলের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। বাঙ্গলায় বানান ভুল কিছুতেই কেহ করিতে পারিবে না।

আজ এই অতি-আধুনিক যুবকগণের রচনানীতির বহু লোক নিন্দা করিতেছে; কিন্তু এ বিষয়ে ইহাদের পূর্ব্ব-সূরিগণ কি বিশেষরূপে দায়ী নহেন ?

পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, নব্য যুবকগণের এই যে সুন্ নীরস অশ্লীল রচনা, যাহা নিতান্তই উপেক্ষার জিনিষ লইয়া এতটা মাতামাতি করিয়াই আর এক্

সাহিত্যের সেবার চেয়ে বেশী ক্ষতি করিয়াছেন। এই অশ্লীল আবর্জ্জনাগুলিকে অকারণ ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া এমন যে অযথা ছড়ানো হইয়াছে, তাহার জন্য এই শেষোক্ত লেখকগণই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সমালোচনার নামে ইঁহারা উপেক্ষণীয় এই আবর্জ্জনাগুলির বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা প্যারডি এবং তাহাদের অশ্লীল অপাঠ্য অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিয়মিতরূপে মাসের পর মাস বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দিতেছেন। এই সব লেখা বা এই নগণ্য লেখকদের আরও নগণ্য মাসিকপত্রগুলি চিরদিনই লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া যাইত, যদি স্বয়ং-নিযুক্ত নির্ব্বোধ সাহিত্য-কোতোয়ালগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিতেন। ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনা ও রাবিশ তখনই রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে, যখন কোনও ষণ্ড বপ্রক্রীড়াচ্ছলে তাহার গায়ে শৃঙ্গ-ঘর্ষণ করে।

সাহিত্য-সমালোচনার নামে ইঁহারা যেরূপ অভদ্র ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কেবলমাত্র গালি-গালাজ দিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করাই ইঁহাদের প্রথম, প্রবল ও একমাত্র উদ্দেশ্য—সাহিত্য-সমালোচনা একটা অজুহত মাত্র।

তথাকথিত সমালোচনা যাহা বাহির হয়, তাহাতে বিদ্বিষ্ট কোনও এক জন লেখকের কোনও একটি লেখাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া লেখকের ব্যক্তিগত, তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণের—এমন কি, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের পর্য্যন্ত পরিবাদ পরিকীর্ত্তিত হয়। আর এ সব রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত অতি-আধুনিকগণের ভাষা হইতে বড় বেশী ভদ্রও নয়।

আর এই সব অনর্থক বাগ্-বিতণ্ডার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাহাকে ইঁহারা নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকেই প্রকারান্তরে বাঙ্গলার রাজপথে জয়যাত্রা করাইয়া তবে ছাড়িলেন। আমার মতে এই নব্য অশ্লীল রচনার এত বহুল প্রচারের জন্য শেষোক্ত এই ড্রেন-ইনেস্পেক্টারগণই মুখ্যত দায়ী।*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

* শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ অধিবেশনে পঠিত।

বিরহে

নূতন করিয়া আর চাহি না তোমারে
কভু যে আছিলে মোর হৃদয়-ভবনে
সেই স্মৃতি থাক্ শুধু স্মৃতির মাঝারে,
অশ্রু দেছ ? থাক্ তাহা এ দুটি নয়নে।

আমি যে তোমারে কভু বাসিয়াছি ভালো
গোপন কথার মত থাক্ সে আমার
নীরবে বহিব তারে,—সেই মোর আলো
বিস্মৃতির অন্ধকারে,—চির-আপনার।

এ প্রাণ দিয়েছে তোমা যত ভালবাসা,
এ বাহু বেঁধেছে যত প্রণয়ের ডোর,
ফিরায়ে না লব কিছু, নাহি কোন আশা,
বিরহের মাঝে রব তোমাতে বিভোর।
ভালবেসে দূরে রেখে, হে প্রিয়া আমার
দিয়েছ জানিতে তুমি কত আপনার।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

বন্ধুর সঙ্গে হাসি-মস্করা গল্প হচ্ছিলো।

ঘন ঘুরঘুটি অন্ধকারে করালা বিদ্যুজ্জ্বালা যেমন চম্‌কে ওঠে, তেম্‌নি হঠাৎ তার মনের উপর দিয়ে একটা কথা চম্‌কে গেলো; সে চম্‌কে উঠ্‌লো, মুখ চূর্ণ হয়ে গেলো, চোখ বিস্ফারিত হলো, নিশ্বাস একটু ঘন হয়ে পড়তে লাগ্‌লো। তার মুখের অর্দ্ধোচ্চারিত কথা মুখেই থেকে গেলো, তার উতলা ব্যাকুল মুখ দেখে তার বন্ধু প্রফুল্ল উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—নীরেন, তোমার কি হলো?

"নাঃ, কিছু নয়......"

নীরেন্দ্র কথাটা উদাসীন অগ্রাহ্যের ভাবে বল্‌লে যদিও, কিন্তু তার মুখের প্রত্যেক রেখায় রেখায় দুশ্চিন্তার আত্ম-কাহিনী লেখা হয়ে গিয়েছিলো। তার দুশ্চিন্তা কি যেমন-তেমন? সেই মুহূর্ত্তে তার এই অতি ভয়ঙ্কর কথা সুস্পষ্ট হয়ে মনে পড়েছে যে, সে বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে চার ভাঁজ ক'রে টেবিলের উপর ফেলে রেখে এসেছে। তার পাশে তার বাল্যপ্রণয়িনী নলিনীর নাম-ঠিকানা লেখা খামখানা আছে, কিন্তু সে চিঠিখানা খামে ভ'রে বন্ধ ক'রে রেখে আসে নি। এই বিষম ভুলের কথা তার মনের মধ্যে বিদ্যুজ্জ্বালার মতন চম্‌কে চম্‌কে উঠছিলো।

সে তো চিঠি লিখে খামে পুরে বন্ধ ক'রে বেড়াতে যাবার সময় নিজে ডাকে ফেল্‌তে নিয়ে আস্‌বে সঙ্কল্প ক'রেই চিঠি লিখতে বসেছিলো; তবে আবার এমন সর্ব্বনেশে ভুল ক'রে বস্‌লো কেমন ক'রে? হঠাৎ প্রফুল্লর ডাক শুনে সে তাড়াতাড়ি টেবিল ছেড়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে; প্রফুল্লর সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে চিঠির কথা সে সাফ ভুলেই গিয়েছিলো। কিন্তু তার এই সর্ব্বনেশে অন্যমনস্কতার জন্য তার নিজেকে আগাপাশতলা চাবকাতে ইচ্ছা কর্‌ছিলো।

এমন ভয়ানক ভুলটা তার হ'লো কেমন ক'রে? হয় তো খামের উপর ঠিকানা লিখে কালী শুকোবার অপেক্ষা করছিলো; কালী শুকোলে চিঠি খামে ভ'রে খামের মুখ এঁটে নিয়ে আস্‌তো; কিন্তু কালী শুকোবার আগেই প্রফুল্ল ডাক দিলে, আর সে-ও অন্যমনস্ক হয়ে চ'লে এলো। কালী তো কখন্ শুকিয়ে গেছে, এখন তার মুখও যে শুকিয়ে কালীমাড়া হয়ে উঠলো!

এই সন্ধ্যাবেলা তো তার স্ত্রী তার ঘরে ঝাড়-পোঁছ কর্‌তে আস্‌বে......টেবিলের উপরকার এলোমেলো কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখবে......ঠিকানা-লেখা খাম-খানা তার চোখে পড়বে... আর পরক্ষণেই সে দেখতে পাবে, খামের পাশে ভাঁজ করা চিঠি......সে তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে দেখবে, ঐ চিঠি ঐ খামের জন্য উদ্দিষ্ট কি না, সে চিঠি উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে চিঠির এমন একটা দু'টো কথা প'ড়ে ফেল্‌বে, যাতে তার আগ্রহ উদ্রিক্ত হবে, আর তার পর অল্পে অল্পে একটু একটু ক'রে সব চিঠিটাই সে প'ড়ে ফেল্‌বে।.........নীরেন্দ্রের মানসদৃষ্টির সাম্‌নে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।

প্রফুল্ল নীরেন্দ্রের মুখ দেখে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার হলো কি? তোমার মুখ অমন শুকিয়ে কালো হয়ে উঠলো কেন?

—নাঃ......কিছু না......আমাকে এখনই একবার বাড়ী যেতে হচ্ছে...............কিছু মনে কোরো না ভাই.........

নীরেন্দ্র ক্ষিপ্তের মতন বাড়ীমুখো ছুটলো......সে এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে নিলে যে সে শীঘ্র পৌঁছাতে পারে, সে কথা তার মনেই পড়লো না......সে একবার ক'রে খানিকটা পথ ছুটে যায়, আর হাঁপিয়ে গিয়ে খানিক হন্‌হনিয়ে চ'লে, আবার একটু দম এলেই ছুট দেয়। একখানা খালি গাড়ী তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো......গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'গাড়ী চাই বাবু?'......তবু তার হুঁস হলো না......আর তখন সে হাঁপাচ্ছিলো ব'লে কোনো কথাও বল্‌তে পার্‌লে না।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে উৎসুক দৃষ্টি প্রেরণ ক'রে নীরেন্দ্র দেখ্‌লে, তার ঘরে আলো জ্বল্‌ছে না। নীরেন্দ্রের একটা আশ্বাসের নিশ্বাস পড়লো, বুক থেকে ভয়ের চাপ

অনেকখানি নেমে গেলো—যাক, তা হ'লে এখনো প্রচণ্ডা পত্নী তার ঘরে পদার্পণ করেন নি······তিনি হয় তো ঝিয়ের ঘর ঝাঁট দেওয়া পছন্দ হয় নি ব'লে তার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে ঝাড়া ঘর আবার ঝাড়ছেন, নয় তো চাকরের মাজা বাসন মনঃপূত হয় নি ব'লে সেগুলোকে সানে আছড়াচ্ছেন আর মাজছেন, আর নয় তো তাঁর নিজের মাসতুত বোন্ করুণাকে তারই সম্বন্ধে কুৎসিত কথা ব'লে খোঁটা দিয়ে চোখের জলে নাকের জলে লাঞ্ছনা কর্‌ছেন।······

এই কথা মনে হ'তেই নীরেন্দ্রের মুখ আবার শুকিয়ে গেলো······করুণা বিধবা নিরাশ্রয়া, তাই সে তাদেরই আশ্রিতা। করুণা বড় কোমল প্রকৃতির, সেবাপরায়ণা; সে মিষ্ট স্বরে নম্রভাবে কথা কয়, আশ্রয়দাতা ও ভগিনীপতি ব'লে নীরেন্দ্রের সেবা-যত্ন কর্‌তে চায়; এই অপরাধে সে দিদির কাছে কুৎসিত অপবাদে লাঞ্ছিত হয়——ভগিনীপতির ওপর অত দরদ কেন লো? ··ভগিনীপতির সঙ্গে আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কথা কওয়া হয়······আমি কি নিজের সর্ব্বনাশের জন্যে দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষ্‌ছি না কি? ·····এমন ভর্ৎসনা কত দিন নীরেন্দ্র স্বকর্ণে শুনেছে! কুৎসিত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা কর্‌লে সকলেরই অপমান ও লজ্জার কথা ব'লে সে শুনেও শোনে নি, এমনই ভাবে সব সহ্য করেছে। এই সন্দিগ্ধমনা স্ত্রীর হাতে যদি ঐ চিঠি প'ড়ে থাকে, তা হ'লে তার কি আর রক্ষা আছে? চিরজীবনের সুখ-শান্তিকে আজ থেকে চিরবিদায় দিতে হবে।

নীরেন্দ্র রুদ্ধশ্বাসে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এসেই প্রথমে নিজের ঘরে গেলো, আর ইলেকট্রিক-লাইটের সুইচ টিপে আলো জেলে দিলে।······তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেলো, পা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো······টেবিলের উপর চিঠি নেই!······নীরেন্দ্র টেবিলের উপরকার সব কাগজপত্র নেড়ে উল্টে পাল্টে সরিয়ে দেখ্‌লে, কোথাও সেই চিঠি নেই!······ ভুলে কি নিজের পকেটেই রেখেছে?······তিনটে পকেটই হাঁট্‌কে দেখ্‌লে, কোথাও সেই চিঠি নেই······দেরাজের টানা টেনে টেনে দেখ্‌লে······নাঃ! ·····উড়ে যায় নি তো? ······টেবিল চেয়ার খাট বাক্‌স আলমারি দেরাজের তলা আশপাশ দেখ্‌লে····· নাঃ!······বারান্দায় আলো জ্বাল্‌লে ······বাগানে নেমে দেখ্‌লে······কোথাও সেই সর্ব্বনেশে চিঠি নেই·····

নীরেন্দ্র ঘরে ফিরে এলো······ঘর্ম্মাক্ত কপাল হাতের তেলো দিয়ে জোরে মুছে ফেলে একবার চোখের উপর দিয়েও হাতটা বুলিয়ে দিলে······ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি উবুড় ক'রে দেখ্‌লে, তাতেও সেই চিঠি নেই।

গেলো কোথায়?··· ··আর কোথায়! যেখানে যাবার সেইখানেই গেছে!······নীরেন্দ্রের কপাল পিলপিল ক'রে ঘামতে লাগলো। সে অবশ শরীর এলিয়ে চেয়ারে ব'সে পড়লো।

"বাবুর ঘরে দালানে কে আবার আলো জ্বাল্‌লে?"······ বল্‌তে বল্‌তে ঝি এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ালো এবং নীরেন্দ্রকে দেখেই সঙ্কুচিত হয়ে আপন মনে 'বাবু এসেছে!' ব'লেই চ'লে যাচ্ছিলো······

নীরেন্দ্র ডাক্‌লে——ঝি, শোনো······

ঝি ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

নীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এখানে আমার একখানা চিঠি ছিলো······কি হলো?

—আমি তো জানি না বাবু, আমি তো এ ঘরে আসি নি······

—সন্ধ্যাবেলা এ ঘর ঝাঁট দিয়েছে কে?

—মা নিজে।

সর্ব্বনাশ! তবেই হয়েছে! নীরেন্দ্র একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তিনি কি কর্‌ছেন?

আমি দেখিনি······

নীরেন্দ্র চিন্তান্বিত উদাস ভাবে বল্‌লে—আচ্ছা······

ঝি চ'লে গেলো।

নীরেন্দ্র অভিভূতের মত নিশ্চল হয়ে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—এইবার প্রচণ্ডার শুভাগমন হবে আর তর্জ্জন-গর্জ্জন অশ্রুবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগ্যের ও পিতার জামাতা-নির্ব্বাচনের নিন্দা আরম্ভ হবে······

দশ মিনিট কেটে গেলো······প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় দশ মিনিট দশ ঘণ্টার চেয়েও দীর্ঘ আর ভারী বোধ হ'তে লাগলো। তার ঘরে আলো দেখে এবং ঝিয়ের মুখে তার আগমনবার্ত্তা পেয়ে এতক্ষণে তো সেই ভ্রূকুটিকুটিলা বিদ্যুজ্জ্বালাকরালা পত্নীর শুভাগমন হওয়া উচিত ছিলো! কারণ থেকে কার্য্য হ'তে কখনো তো এতো বিলম্ব হয় না—নীরেন্দ্রের ভাগ্যে বিভাবনা অলঙ্কারের ঝঙ্কার যদিও খুব বেশী জোটে!

পনেরো মিনিট হয়ে গেলো! আশ্চর্য্য! বাড়ী এখনও নিঃশব্দ!

নীরেন্দ্রের কেমন অসহ্য অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো ......যা হবার তা হ'য়ে চুকেবুকে গেলে সে নিস্তার পায়, এ রকম সম্ভাবনার প্রতীক্ষা যে সুদুঃসহ!......বজ্রপতনে কা শঙ্কা?—বজ্রধ্বানেব ভয়ঙ্করম্!—বজ্রাঘাত হ'লে তো সব লেঠা চুকেই গেলো, বজ্র পড়্‌বে-পড়্‌বে এই আশঙ্কাই তো ভয়ঙ্কর!

নীরেন্দ্র আর ভবিতব্যের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌তে পার্‌লে না; সে অবশ্যম্ভাবীকে স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে নিতে প্রস্তুত হলো......সে উঠে পড়লো......বাড়ীর ভিতর চল্‌লো......

বাড়ীর ভিতর যেতেই তার সঙ্গে দেখা হ'লো করুণার। করুণা নীরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়েই সন্ত্রস্ত কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হয়েছে জামাই বাবু?......আপনার কি সেই বুকের কলিক্ ব্যথাটা ধরেছে?......

বিপদে সমবেদনার এই আভাস পেয়ে নীরেন্দ্রের চোখে জল এলো; সে বল্‌লে—না। তোমার দিদি কোথায়?

—তিনি চৌধুরী-বাড়ী বেড়াতে গেছেন।

'ও!'—ব'লে নীরেন্দ্র ফিরে নিজের ঘরে এলো এবং আবার শিথিল শরীরটাকে চেয়ারের কোলে বসিয়ে দিলে। নীরেন্দ্র প্রত্যাশা করেছিলো, সে করুণার কাছে অন্ততঃ শুনবে, তার দিদি বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌ছেন। কিন্তু তাও নয়? চৌধুরী-বাড়ী বেড়াতে গেছে! তবে চিঠিখানা গেলো কোথায়?

করুণা এসে কোমল স্বরে ডাক্‌লে—জামাই বাবু, সেই মমতা-ভরা ডাক নীরেন্দ্রের মর্ম্ম স্পর্শ কর্‌লে; সে উত্তর দিলে—কি করুণা? তোমার দিদি এসেছেন?

—না।......

—তবে?......

—আপনার নিশ্চয় অসুখ করেছে,......দিদিকে ডেকে আন্‌বো?......

নীরেন্দ্রের জীবনব্যাপী রুদ্ধ অস্বস্তি এক-এক সময় অকস্মাৎ ক্রোধে জ্ব'লে ওঠে; সে বিরক্ত-কর্কশ স্বরে বল্‌লে —না না, আমার কিছু হয় নি......তুমি কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না?......বলতে লজ্জা করে, তবু বল্‌ছি—তুমি সন্ধ্যাবেলা একলা এখানে এসেছো কোন্ সাহসে? এক্ষণই চ'লে যাও......

এ যে কি গভীর বেদনার ভর্ৎসনা এবং কাকে, তা করুণা বুঝ্‌তে পার্‌লে; তার কোমল অন্তর সমবেদনায় ভ'রে উঠ্‌লো। তবু সে আর কিছু না ব'লে ম্লানমুখে ফিরে চল্‌লো।

নীরেন্দ্র করুণাকে ডাক্‌লে—করুণা......

'আসি' ব'লে করুণা ফিরে দাঁড়ালো।

—টেবিলের উপর একখানা চিঠি ছিলো......আমি লিখে ফেলে গিয়েছিলাম......দেখেছো?

করুণা বুঝতে পারলে, জামাই বাবুর অসুখটা কোথায়, এবং এর ব্যথা কলিক-ব্যথার চেয়েও তাঁর বুকে কত বেশী বাজে। সে বল্‌লে—না, আমি তো এ ঘরে আসি নি...... দিদি একবার এসেছিলো......

—আচ্ছা ......

করুণা চ'লে গেলো। সে তো জানে, তার জামাই বাবু বাড়ীতে না থাক্‌লে দিদি তাঁর দেরাজ আল্‌মারী হাটকায়, কাগজপত্র খুলে খুলে পড়ে। এ চিঠি যে কোথায় গেছে, তা সে বুঝ্‌তে পার্‌লে আর জামাই বাবুর আশঙ্কার কারণ ও পরিমাণ অনুমান কর্‌তেও তার বিলম্ব হ'লো না।

নীরেন্দ্র টেবিলের উপর কনুই রেখে দুই হাতে মাথা ধ'রে সেই হতভাগা চিঠির কথাই ভাবতে লাগলো স্ত্রীকে সেই চিঠির কথা জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌বার তার দরকার হবে না; তিন পাড়া বেড়িয়ে ফিরে এলেই তার মাথায় ঝড় ঝাপ্টা ভেঙে পড়বে। রোজ সে ক্লাব থেকে রাত্রি নটার সময় বাড়ী ফেরে; তার আগে আজও ফিরবে না মনে ক'রে তার স্ত্রী পাড়া বেড়াতে গেছে......হয় তো সেই চিঠিখানা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে প্রতিবাসিনীদের কাছে স্বামীর কুকীর্ত্তি ঘোষণা কর্‌ছে! নীরেন্দ্র সেই চিঠিতে লেখা কথাগুলি মনের সাম্‌নে সাজিয়ে ধ'রে মানসদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো......সব কথা সুস্পষ্ট তার মনে পড়ছে—বড় দুঃখ-বেদনায় কাতর অন্তরের অভিব্যক্তি সেই চিঠি!

এই চিঠির ব্যাপারটাই যেন নিয়তির নির্ম্মম খেলা। নীরেন্দ্র কিশোর বয়সে একটি মেয়েকে উন্মুখ যৌবনের প্রাণ-ভরা দুরন্ত আবেগে ভালো বেসেছিলো—তার নাম নলিনী। তার পর নলিনীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে যখন

সে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, সে কত কালের কথা। এখন নীরেন্দ্র এম-এ পাস ক'রে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উপাধ্যায়। এই দশ বারো বৎসরের মধ্যে সে নলিনীকে একটু দেখতে পাবার জন্যে কত ব্যর্থ-চেষ্টাই করেছে। নলিনীর পিতা তখন কল্‌কাতায় থাকেন; নীরেন্দ্রও ম্যাট্রিক পাস ক'রে কল্‌কাতায় আই-এ পড়তে গেলো; নলিনীর পিতা পদস্থ লোক, তাঁর ঠিকানা খুঁজে বাহির করতে নীরেন্দ্রের বেশী কষ্ট হলো না; কিন্তু তাঁর বাড়ীটা একটা কাণা বন্ধ-গলির মধ্যে; তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে যে হেঁটে যাওয়া-আসা ক'রে কোনো দিন হঠাৎ নলিনীর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনাটার আরাধনা করবে, সে সুযোগও সে পেলে না। নলিনীর পিতা নীরেন্দ্রের পিতৃবন্ধু, সে কালেভদ্রে তাঁদের বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেও পারতো, কিন্তু সে যে নলিনীকে আকুল আগ্রহে ভালোবাসে, এই সংবাদ নলিনীর পিতামাতার অগোচর ছিলো না, এবং সেই লজ্জাতেই নীরেন্দ্রের তাঁদের বাড়ীতে যাওয়ার পথে বিষম বাধা হয়েছিলো। তার পর নীরেন্দ্র খবর পেলে, নলিনীর বিয়ে হয়ে গেছে; নীরেন্দ্র খোঁজ ক'রে ক'রে তার স্বামীর বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করলে—তার স্বামী থাকে বালিগঞ্জে। সেই দুর্গম সুদূর অঞ্চলে কত দিন কত বিভিন্ন সময়ে গিয়ে নলিনীর বাড়ীর সামনে দিয়ে দুবার ক'রে যাতায়াত করেছে, কিন্তু কোনো দিনই নলিনীর অস্তিত্বের একটু আভাস পর্য্যন্ত পায় নি। নলিনীর কোনো স্মৃতিচিহ্ন তার কাছে ছিলো না। অন্তরের বিচ্ছেদ-বেদনা ছাড়া; সে নলিনীর একটা ছবি, একটু হাতের লেখা পাবার জন্য কত ইচ্ছা করেছে, লজ্জায় ভয়ে সঙ্কোচে কত ক্ষীণ আর ব্যর্থ-চেষ্টাই করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। ক্রমে নলিনী বহু সন্তানের জননী হয়েছে; নীরেন্দ্রও এম-এ পাস ক'রে প্রমদাকে বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছে। বিয়ের পরই যখন প্রমদার সন্দিগ্ধ স্বভাব ও উগ্র কটু মেজাজের পরিচয় পেয়ে নীরেন্দ্র প্রমাদ গুণলে, তখন আর একবার নলিনীর অভাব নীরেন্দ্রের মনকে পীড়া দিলে। যখনই সে স্ত্রীর কর্কশ, প্রীতিশূন্য ও অপ্রীতিকর আচরণে ব্যথিত হয়, তখনই একবার তার মনে পড়ে নলিনীকে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ভাবে—হায়! নলিনীকে যদি আমি পেতাম, তা হ'লে আমার জীবনটা অন্য রকম হ'তে পারতো। সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরে নীরেন্দ্র আজই একখানা চিঠি পেলে —অপরিচিত হাতের লেখা, ছাপ দেওয়া বাঁকিপুর ডাকঘরের। বাঁকিপুর থেকে কে তাকে চিঠি লিখলে! কৌতূহলী হয়ে নীরেন্দ্র খাম খুলে দেখলে, ছোট্ট একটু চিরকুট কাগজে অল্প কয়েক ছত্র লেখা, সম্বোধনের পাঠ শুধু নীরু-দা, আর চিঠির তলায় স্বাক্ষর 'তোমার পূর্ব্বপরিচিত নলিনী।' নলিনী? পূর্ব্বপরিচিত নলিনী? তার সহপাঠী নলিনীকান্ত সেন? সে বাঁকিপুরে থাকে না? বাঁকিপুর গেছে? সে তো কখনো তাকে নীরু-দা ব'লে সম্বোধন করতো না? বহু কাল পরে পত্র লিখছে ব'লেই কি সে নূতন সম্বোধন করেছে? এই রকম ভাবতে ভাবতে নীরেন্দ্র সেই রহস্যময় পত্র পড়তে লাগলো—

নীরু-দা,

তুমি এখন বিদ্বান্ বড় লোক হইয়াছ। বগুড়ার কথা কিছু মনে পড়ে কি? আমি কিন্তু ভুলি নাই। প্রায়ই তোমার কথা ভাবি। তোমার পত্র পেলে সুখী হবো।

তোমার পূর্ব্বপরিচিত নলিনী।

বগুড়ার কথা? বগুড়া থেকে নীরেন্দ্র ম্যাট্রিক পাস ক'রে কল্‌কাতায় যায়; তার পর তো আর বগুড়ায় যায় নি। বগুড়ায় নলিনী?……নলিনী! সেই জীবন আঁধার ক'রে হারিয়ে-ফেলা নলিনী? যার হাতের লেখা একটু ছেঁড়া কাগজের জন্যে সে লালায়িত হয়ে বেড়িয়েছে, সেই নলিনী তাকে নিজে চিঠি দিয়েছে? এই সম্ভাবনাটা তার মন থেকে এত সুদূরপরাহত ও আশাতীত ছিলো যে, সেই কথাটা সে শীঘ্র মনেই আনতে পারে নি এবং অবশেষে সেই সম্ভাব্যতা মনে উদ্ভাসিত হবা-মাত্রই তার মন যেমন উল্লসিত হলো, তেমনই সন্দেহাকুলও হলো—এমন সৌভাগ্যও কি সম্ভব? সে পরম আগ্রহভরে বার বার ক'রে সেই ক্ষুদ্র লিপিখানি পড়তে লাগলো, ক্রমে ক্রমে তার প্রত্যয় নিশ্চয়ে পরিণত হ'লো যে, সেই পত্র তার বাল্যপ্রণয়িনী নলিনীরই। তখন তার মনে হ'লো রবীন্দ্রনাথের পলাতকা বইয়ের মধ্যেকার 'ছিন্নপত্র' কবিতাটির কথা—

"মনুরে কি গেছ এখন ভুলে?
মনু? আমার মনোরমা? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই?
অমনি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভ'রে
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিলো মোরে!

* * * * *

সেই মনু আজ এতো কালের অজ্ঞাতবাস টুটে'
কোন্ কথাটি পাঠালো তার পত্রপুটে ?
কোন্ বেদনা দিলো তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি ? ক্ষতি সে কি ? সে কি অত্যাচার ?
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়-ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে ?"

নীরেন্দ্র মনে করলে, এই হয় তো তার জীবনের প্রথম ও শেষ সুযোগ—এই চিঠির উত্তর হয় তো নলিনীর হাতে পৌঁছাবে, না পৌঁছাতেও পারে··· তার স্বামীর হাতে পড়লে সে হয় তো না পেতেও পারে, এর পরে হয় তো সে চিঠি লিখতে নিষেধ করতে পারে ; অতএব এই স্বয়ং আগত সুযোগে তার হারাণো নলিনীকে তার সন্তপ্ত জীবনের সকল সংবাদ দিয়ে রাখতে নীরেন্দ্রের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হলো। সে ব'সে ব'সে দীর্ঘ বারো বৎসরের সঞ্চিত দুঃখের ইতিহাস লিখেছিলো বাইশ পৃষ্ঠার চিঠি। সেই চিঠির মধ্যে অতীতে হারিয়ে-যাওয়া কিশোর-জীবনের প্রণয় ও আনন্দের কথা প্রাণের দরদ দিয়ে লেখা ছিলো, গত-জীবনের সঙ্গে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনায় গত-জীবনের প্রতি একটি বেদনাময় মমতা প্রকাশ পেয়েছিলো ; কত সুপ্ত স্মৃতি, কত ভাবাবেগ, অতীত মিলন-দিনের কত খুটিনাটি তুচ্ছ কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রণয়-মাধুর্য্যের পরিচয় সেই চিঠিখানির বুক জুড়ে ছিলো। সেই দিন নীরেন্দ্র প্রমদার কর্কশ অভদ্র আচরণে ব্যথিত হয়েছিলো, আর সেই দিনই নলিনীর চিঠি পেয়ে অন্তরের সমস্ত সন্তাপ সে দীর্ঘ অভিযোগে ও অনুতাপে ঢেলে দিয়ে-ছিলো সেই চিঠির পাতায়। সেই অনুতাপ ও অভিযোগ অদৃষ্টের অবিচারে ঘ্যান ঘ্যান করা নয়—নিজের দুরদৃষ্টকে ব্যঙ্গ ক'রে ব্যথিত রঙ্গরস দিয়েই সেই চিঠিখানি সে লিখে-ছিলো ; তার প্রথম প্রণয়ের বিচ্ছেদে আঘাতের বেদনা আর তার বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়ের অভাবে হতাশা এবং স্ত্রীর স্বরূপ বর্ণনার স্পষ্ট নিখুঁত ছবি সেই পত্রের পাতায় পাতায় ছড়ানো ছিলো। সেই চিঠির শেষ কথাগুলি এখনও তার স্পষ্ট মনে পড়ছে—"সত্যি নলিন, আমি তোমাকে হারিয়ে আমার সুখ-শান্তিও হারিয়েছি। হয় তো অপর কোনো রমণী আমার স্ত্রী হ'লে তোমার অভাব এত তীব্র হয়ে রজনী-দিন আমার মনে বিরাজ করতো না ; কিন্তু যাঁকে পেয়েছি, তাঁর সঙ্গে আমার প্রকৃতির একটুও মিল নেই—গরমিলটাই আমার জীবন। কিন্তু যে দুঃখ অসহ্য অথচ প্রতীকারের অতীত, তা যে সহাও যায় না, বহাও যায় না। রমণীর কণ্ঠস্বরে যে এত বিষ ও দুঃখ দেবার শক্তি আছে, আগে তো আমি জানতাম না— এ রমণী রমণীয় মোটেই না। তাঁকে মধুসংক্রান্তির ব্রত করতে বলি ; কিন্তু আমি বলি ব'লেই তিনি সে কথা গ্রাহ্য করেন না। যার বিদ্যা নেই, ক্ষমা নেই, সহ্য নেই, বিশ্বাস নেই, মমতা নেই, সেই আমার সহধর্ম্মিণী ! তোমায় হারিয়ে নলিন, আমি এমনই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছি।"

এই চিঠি পড়েছে প্রমদার হাতে ! প্রমাদ আর কাকে বলে ? প্রমদা ভালো লেখাপড়া জানে ; নীরেন্দ্রের হাতের স্পষ্ট লেখা চিঠি পড়বার মত ক্ষমতা তার আছে। বুদ্ধিও তার কম নেই। সুতরাং তার ফল যা হবে, তা ভাবতেও নীরেন্দ্রের গা শিউরে ও মন কেঁপে উঠলো, প্রমদা তো স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, তার স্বামী তাকে ভালো তো বাসেই না, পছন্দও করে না : সে তাকে বিয়ে ক'রে সুখী হয় নি। কিন্তু সেই ওকে বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছে না কি ? এত দিন প্রমদা যা সন্দেহ ক'রে আসতো, তা তো আজ হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে গেলো, নীরেন্দ্র অপর মেয়েকে ভালোবাসে, তাকে চিঠি-পত্র লেখে······দেখা-সাক্ষাৎও কি আর হয় না ?

এই সব সিদ্ধান্তের পর প্রমদা যে কাণ্ডটা করবে, তা মনে কল্পনা করতেও নীরেন্দ্রের ভয় হচ্ছে······চেঁচিয়ে হাট বাধাবে, পাড়াময় স্বামীর গুণ ঘোষণা ক'রে অপমানে তা'র মাথা হেঁট ক'রে দেবে। পাড়ার মেয়েরা আসবে সান্ত্বনা দিতে, আর মুখ টিপে টিপে সবাই হাসাহাসি করবে। প্রমদা বাপের বাড়ী যাবার নোটিশ দেবেন, অথচ যাবেন না··· ···গেলে তো নীরেন্দ্র দু'দিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, কিন্তু তাব দারোগা-পত্নী তাকে ছেড়ে গেলে তাকে নজরবন্দী পাহারায় রাখবে কে ?

কিন্তু নীরেন্দ্র কিছুই তো বাড়িয়ে লেখে নি, একটুও অত্যুক্তি তো করে নি ; সত্যই তো সে সুখী নয়, সে প্রমদাকে ভালোবাসে না, তাকে তার ভালোও লাগে না। কিন্তু এ হলো সেই জাতীয় সত্য, যা অপ্রকাশ্য, চিরজীবন অন্তরের অন্তরালে গোপন রাখার যোগ্য, গদ্যময় বাস্তব জীবনের দিন-গত পাপক্ষয় করবার যে-সব প্রথা মেনে চলতে হয়, তার একান্ত বিরুদ্ধ। নলিনী তো নীরেন্দ্রের জীবনের কেবল-মাত্র কল্পনা-স্বপ্ন আর মুগ্ধ-হৃদয়ের কাব্য ; তাকে গদ্যময়ী

গৃহিণীরূপে পেলে তার সঙ্গেও ঝগড়া হ'তো, মান অভিমানে উভয়েরই বাক্‌রোধ হ'তো। নীরেন্দ্র তার জীবনের বিফলতার ও নৈরাশ্যের কথা নলিনীকে লিখেছিলো। কিন্তু নলিনী ছাড়া আর কেউ তার দুর্ভাগ্যের জন্য নালিশ শোনে, এ নীরেন্দ্রের অভিপ্রেত তো ছিলোই না, বরং তার সম্ভাবনায় তার লজ্জা পাবারই আশঙ্কা ছিলো। তবু দৈবদুর্ব্বিপাকে যা সে চায়নি, তাই হ'য়ে গেলো। নলিনীর চিঠির জবাব ফেরত ডাকেই যাবে না; আবার লিখে পাঠাতে দেরী হবে; আর তত বিলম্বে কি সে চিঠি তার হাতে পৌছাবে? হয় তো দু-চার দিনের জন্য তার স্বামী অন্যত্র গেছে, এই সুযোগে সে চিঠি লিখেছে স্বামী ফির্‌বার আগেই নীরেন্দ্রের জবাব পাবে আশা ক'রে; বিলম্বে জবাব দিলে তাকে হয় তো বিপদেই ফেলা হবে। আর তা ছাড়াও নলিনীর চিঠি পাওয়ার আনন্দের প্ররোচনায় যে-রকম রস দিয়ে এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিলো, এই বিরস ব্যাপারের পর পুনর্লিখিত চিঠিতে কি আর রস জম্‌বে? ক্ষ্যাপা যে পরশ-পাথর সারা জীবন খুঁজে মরেছে, সেই পরশ-পাথর খুইয়ে জীবনের দুর্ল্লভ স্বকৃত আগত সুযোগ সে এ জন্মের মতই হারালো।

নীরেন্দ্র চেয়ারের পিঠের উপর মাথা হেলিয়ে ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে ভাবছিলো। হঠাৎ সে চম্‌কে উঠলো ······প্রমদা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করছে—তুমি কখন্ এসেছো?······

অবাক্ কাণ্ড! নীরেন্দ্র নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না; প্রমদার কণ্ঠস্বর কোমল ঝাঁঝশূন্য ব'লে যে মনে হ'লো, তা কি তার শ্রবণের ভ্রান্তি?

প্রমদা বল্‌তে লাগলো—আজ এত শীঘ্র ফিরলে? তাস-খেলার লোক জোটেনি বুঝি?······

নীরেন্দ্র ভাবলে, এ কি বিদ্রূপ? সে যে চিঠির খোঁজেই শীঘ্র ফিরে এসেছে, এই জেনেই এই প্রশ্ন তাকে মিথ্যা বলিয়ে মজা দেখবার জন্যে? কিন্তু প্রমদার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের কাকু ধ্বনিত হ'লো ব'লে তো বোধ হ'লো না!

প্রমদা বল্‌তেই লাগলো—করুণা বেশ মেয়ে তো!······

নীরেন্দ্রের বুক কেঁপে উঠলো—এ আবার কি অপ্রত্যাশিত নূতন বিপত্তি! করুণা বেচারীকে এর মধ্যে জড়িয়ে আবার কি অনর্থ উপস্থাপিত করা হবে না জানি।

প্রমদা বল্‌লে—করুণাকে ব'লে গেলাম যে, আমি একটু চৌধুরী-বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, তোর জামাই বাবু বাড়ীতে ফিরলেই আমাকে ডেকে পাঠাস······

নীরেন্দ্র ভাবলে, সে বাড়ীতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে তাকে ভৎর্সনা আরম্ভ করা যায়, তার জন্যই করুণার প্রতি ঐ আদেশ ছিলো; কিন্তু করুণা ব্যাপার বুঝেই করুণা-পরবশ হয়ে তার দিদিকে আর খবর দিতে পারে নি—কসাই-য়ের হাতে বলির পশুকে সঁপে দিতে করুণার মন সরে নি।

প্রমদা তার উক্তি শেষ করলে—চিংড়ি-মাছের কাট্‌লেট-গুলো গ'ড়ে ঠিক ক'রে রেখে যাচ্ছি, তোর জামাই বাবু এলেই গরম গরম ভেজে খেতে দেবো।······তা মেয়ের হুঁশই নেই যে আমায় একটু খবর পাঠিয়ে দেবে।······তুমি একটু বোসো লক্ষ্মীটি, আমি এক্ষণই ভেজে তোমাকে খেতে দিচ্ছি······

প্রমদা চ'লে গেলো। নীরেন্দ্র অবাক্ স্তম্ভিত! গরম গরম বকুনি খাবে ব'লে সে প্রতীক্ষা করছিলো, তার বদলে গরম গরম বেগুনিও নয়, একেবারে গরম গরম চিংড়িমাছের কাট্‌লেট খাবার নিমন্ত্রণ! এটা কি ফাঁসীর খাওয়া খাওয়ানো? বলির ছাগলকে বেলপাতা খেতে দেওয়া? ঝড়ের আগে প্রকৃতির থম্‌থমে অবস্থা? স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ? কপালে একটু অভিনব ধরণের লাঞ্ছনা-ভোগ আছে!

নীরেন্দ্র দুর্ভাবনায় তলিয়ে গেছে। কতক্ষণ সে উন্মনস্ক হয়ে ছিলো, তার ইয়ত্তা নেই। ঝি এসে ডাকলে—বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে!

নীরেন্দ্র ভারী-মন নিয়ে মন্থর-গমনে খেতে গিয়ে দেখলে, খাবারের সাম্‌নে প্রমদা পাখা হাতে ব'সে আছে। এও অভাবনীয় অপূর্ব্ব অঘটন ঘটনা! নীরেন্দ্রের খাবার সময় প্রত্যহ দু' বেলা প্রমদার অনুপস্থিত থাকাই নিয়ম—সকালে ঠিক সেই সময়টিতে হয় কোনো ঘর ঝাঁট দেওয়া বা স্নান করতে যাওয়া এবং রাত্রিতেও কোন ঘর ঝাঁট দেওয়া বা কোন বিছানা কর্‌তে যাওয়া প্রমদার পক্ষে অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ এ কি আশ্চর্য্যজনক অনিয়ম! আজ নীরেন্দ্র ও প্রমদা উভয়েরই একটা ভালোমন্দ কিছু না হয়ে যায় না।

নীরেন্দ্র মাথা নীচু ক'রে খেতে লাগলো; স্ত্রীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি মিলিত হবার ভয়ে সে চোখ তুল্‌তে পার্‌ছিলো না।

কিন্তু নীরেন্দ্রের গলা দিয়ে খাবার নামে না। প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে হচ্ছে, এইবার ঝগড়ার ঝড় ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়বে। প্রমদার একটু নড়া-চড়ায় সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে -- এই, এইবার। মাথার উপর ড্যামোক্লিসের তরোয়াল ঝুলিয়ে ভোজ খেতে বসা তার মোটেই রুচিকর মনে হচ্ছিলো না। অথচ না খেয়েও তো উঠতে পারে না— বিশেষতঃ প্রমদার নিজের হাতে ভাজা চিংড়িমাছের গরম কাট্‌লেট! নীরেন্দ্র একখানা কাট্‌লেট হাতে তুলে কামড়াতে যাচ্ছে, এমন সময় প্রমদা কথা ব'লে উঠলো—আর পত্নীর কণ্ঠধ্বনি কানে যাবা-মাত্রই নীরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর এমন কেঁপে উঠলো যে, তার মুখের গ্রাস কাট্‌লেট ঠক ক'রে থালার উপর প'ড়ে গেলো, তার মনে হ'লো— এইবার আরম্ভ হ'লো! কিন্তু পরক্ষণেই স্ত্রীর কথার দিকে মন দিয়েই সে শুন্‌লে, প্রমদা বল্‌ছে— করুণা, ঠাকুরকে বল্, তোর জামাই বাবুর দুধটা গরম ক'রে দিয়ে যাবে!

এখানেও গরমের ব্যবস্থা, কিন্তু গরম গরম ঝাল ঝাল কথা শোন্‌বার যে আশঙ্কায় নীরেন্দ্র কম্পিতকলেবর হয়েছিলো, তা নয় শুনে সে আশ্বস্তও হলো হতাশও হলো। তার ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হচ্ছিলো-- যা হোক একটা ভালো-মন্দ কিছু হয়ে চুকে বুকে গেলে সে বাঁচে। তার এই অনিশ্চিত বিপৎপাতের প্রতীক্ষায় ক্ষণে ক্ষণে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা অসহ্য বোধ হচ্ছিলো।

প্রমদা নীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমাকে ভারী কেমন কেমন দেখাচ্ছে, কিছু অসুখ-বিসুখ করছে না কি?

পত্নীর প্রশ্নে নীরেন্দ্র আরো বিব্রত হয়ে উঠলো, তার মনে হ'লো, তার স্ত্রী মনে মনে হাস্‌ছে-- নিষ্ঠুর লোক কোনো পরাভূত জীবকে যন্ত্রণা দিয়ে যেমন মজা দেখে, এ-ও বোধ হয় তার মানসিক অস্বস্তিতে তেমনি আনন্দ অনুভব করছে। তথাপি নীরেন্দ্র বেশ ধীর শান্ত আত্মস্থভাবে বল্‌লে—"হ্যাঁ, শরীরটা তেমন জুৎসই মনে হচ্ছে না।" কিন্তু পরক্ষণেই নীরেন্দ্রের মনে হ'লো, প্রমদার মনের মধ্য থেকে অনুচ্চারিত বিদ্রূপ সে শুন্‌তে পেলে—শরীর? না মনটা?······নীরেন্দ্রের কানে রক্তের ঝিঁ ঝিঁ বাজতে লাগলো।

নীরেন্দ্র কোনোমতে আহার সমাপ্ত ক'রে উঠে পড়লো।

সে আঁচিয়ে এসে ব'সে ভাবছে, এইবার বোধ হয় পত্নীর শুভাগমন ও প্রিয়সম্ভাষণ হবে। কিন্তু সে শুন্‌লে, প্রমদা বল্‌ছে—করুণা, তোর জামাই বাবুকে পান দিয়ে আয়, আমি খেতে বসি······

তা হ'লে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সমগ্র রজনীব্যাপী স্বামি-সম্ভাষণের সময় চল্‌বে! এত আত্মসংযম ও অপেক্ষা করার ক্ষমতা প্রমদা পেলে কোথায়? পেটে খাবার পড়লে রাগ যে চাপা প'ড়ে যাবে? ভর্ৎসনার আয়োজনে এত কালক্ষয় কি কারণে, কিসের অপেক্ষায় এই নিবৃত্তি?

নীরেন্দ্র দুশ্চিন্তায় অভিভূত হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে আরম্ভ কর্‌লে। অনেকক্ষণ পরে সে শুন্‌তে পেলে, প্রমদার খাওয়া আঁচানো পান-খাওয়া শেষ হলো। এইবার! নীরেন্দ্র গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত ধূর্জ্জটির মতন শক্ত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো। নীরেন্দ্র শুন্‌তে পেলে, প্রমদা করুণাকে বল্‌ছে—তোর খাওয়া হ'লে তোর জামাই বাবুর জন্যে একটু দই পেতে দিস। আমি তা হ'লে শুতে যাই?···

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে ভয়ঙ্করী ভীমা!······ প্রতীক্ষায় নীরেন্দ্রের বুক ধকধক করতে লাগলো।

প্রমদা শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রেই নীরেন্দ্রকে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্‌লে তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছো? শরীরটা ভালো নেই, শুয়ে পড়ো।

নীরেন্দ্রের মনে হ'লো, পীড়িত পশুকে বলি দিতে নেই ব'লেই বোধ হয় প্রমদা দয়া ক'রে আঘাতটা আজকের রাতের মত মুলতবি রাখছে। এ দয়া নীরেন্দ্রের অসহ্য বোধ হলো, তাই সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—নাঃ, আমি বেশ আছি, গরম গরম কাট্‌লেট খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।······ তার পর সে মনে মনে বল্‌লে—এইবার তোমার ঝাড়ন-মন্ত্র আরম্ভ হোক।

প্রমদা নীরেন্দ্রকে হতাশ ক'রে বল্‌লে—তা হোক, আজ তোমাকে রাত জেগে লেখাপড়া করতে দিচ্ছি না; শুয়ে পড়ো, আমি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।

নীরেন্দ্র অবাক্ হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলে—তার পানপারা গৌরবর্ণ মুখে অথবা বাদামের মতন চোখ দুটিতে বিদ্রূপের অথবা ক্রূরতার হাসি লুকানো আছে কি না দেখ্‌বে ব'লে। সে মুখে তো ক্রোধ বা বিদ্রূপের চিহ্ন নেই! স্ত্রীর মুখের উপর এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি রেখে ফিরিয়ে নিতেই নীরেন্দ্রের দৃষ্টি পড়্‌লো তার সম্মুখের দেয়ালে আয়নার উপর—ঐ পাঁশের মত ফ্যাকাসে সন্দেহাকুল শঙ্কিত মুখচ্ছবি

কি তার? সে আশ্চর্য্য হয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়ার প্রতি তাকিয়ে রইলো।·····তবে কি সেই চিঠিখানা বাতাসে উড়ে গেছে? সে কি সে-খানা কোথাও রেখে মনে করতে পারছে না?······কি দুর্ভোগ আর যন্ত্রণা! তার মগজের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা দাপাদাপি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। অনিশ্চয়তার সন্দেহে ও সংশয়ে নীরেন্দ্র অভিভূত হয়ে নড়তেও পারছিলো না, আবার সঙের মতন দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছিলো না। সে এই হাস্যকর দুরবস্থা থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে মনে বল সঞ্চয় ক'রে স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আমার টেবিলের উপর একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলাম, পাচ্ছি না। তুমি দেখেছো?

প্রমদা স্বচ্ছন্দে সহজভাবে নীরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলে, আমি ঠাকুরকে দিয়ে ডাক-বাক্সে ফেলিয়ে দিয়েছি।

ও!·····ব'লেই নীরেন্দ্র হিষ্টিরিয়ার রোগীর মতন হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তার মন খুশী হয়ে উঠলো যে, সে স্তম্ভিত আগ্নেয়গিরির রুদ্ধমুখ খুলে দিয়েছে, এইবার অনলোদ্গার আরম্ভ হবে।······একটি মুহূর্ত্ত তার কাছে অনন্ত কালের মত অফুরন্ত বোধ হলো, তার শিরা উপশিরা ঝনঝন করতে লাগলো, তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আর কপালের দু' পাশের রগে রক্তের হাতুড়ি পেটা চলতে লাগলো; তার মনে হ'লো, প্রকাণ্ড একটা দৈত্য যেন তাকে তুলে নিয়ে অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বরের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে—কখন্ ছেড়ে দেয়,'তার ঠিক নেই।

সেই একটি দুঃসহ মুহূর্ত্তের অন্তে প্রমদার সহজ স্বর সে শুনতে পেলে—তুমি শোও, আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দি।

নীরেন্দ্র উত্তেজনার অন্তে অবসাদ-অবশ হয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু তার মনের বিশ্রাম হলো না। সে থেকে থেকে চোখ খুলে খুলে দেখে, তার স্ত্রী কোমল লঘুভাবে তার সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করছে, তার দীর্ঘপক্ষ্মচ্ছায়াচ্ছন্ন চোখে একটুও উগ্রতা নেই। নীরেন্দ্রের মনে হ'তে লাগলো, আজ যেন এই তাদের ফুলশয্যার রাতে শুভদৃষ্টি হচ্ছে। তার মনে পড়লো—

"রমণীর মন,
সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন!"

তার এই স্ত্রীরূপিণী রমণীর অন্তরে গোপন ফল্গুধারায় কোন্ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে? সে কি ঐ চিঠিখানা পড়েছে? যে লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি ক'রে সব চিঠি পড়ে, করুণা তার কাছে এলে যে ব্যক্তি আড়ি পেতে বেড়ায়, সে ব্যক্তি যে এক জন স্ত্রীলোককে লেখা অত বড় সুদীর্ঘ পত্র হাতে পেয়ে না প'ড়েই ডাকে দিয়েছে, এ কি বিশ্বাস করা যায়? চিঠিটা ডাকেই দিয়েছে, না আবার আগুনেই দিয়েছে, তা কে বলবে? সেই চিঠি যদি প'ড়ে থাকে, তবে ক্রোধ প্রকাশ পেলো না কেন? এ কি উপেক্ষা—স্বামীর নিন্দা-প্রশংসায় তার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই? কিংবা সে তার স্বামী-সম্বন্ধে এমনই উদাসিনী হয়েছে যে, স্বামী যা খুশী ও যাকে খুশী চিঠি লিখুক, তাতে তার কিছু আসে যায় না?···হয় তো ঐ চিঠি প'ড়ে তার চৈতন্য হয়েছে, স্বামীকে হারাবার ভয়ে সে ও-সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করতে চায় না? কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি, তা কি চিরকাল অজানাই থেকে যাবে? কোনও দিন কি সত্য আবিষ্কার সে করতে পারবে?·····আজীবন তারা একত্র থাকবে, কিন্তু এই রহস্যটি কি ঐ প্রহেলিকা-রমণীর অন্তরে চির-অবরুদ্ধ হয়ে থেকে যাবে? স্বামীর সুখ-শান্তি নষ্ট হবার আশঙ্কায় যে স্ত্রীর এত সহন-ক্ষমতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও বিবেচনা, অবশেষে প্রৌঢ় বয়সে কি সেই স্ত্রীর প্রেমে পড়বে না কি?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিশরের মুসলিম নারীজাগরণ

মিশর আর একটি মুসলমান রাজ্য। বহু যুগ পূর্ব্বে মিশরের সভ্যতা জগতে সুবিদিত ছিল। গ্রীক ও ফিনিসীয় সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেই প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার অনেক নিদর্শন এখন তুতান খামেনের কবর খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে। সেই সভ্যতার সহিত বর্ত্তমান মিশরের সভ্যতার কোনও সম্বন্ধ নাই। মিশরের সেই অতীত গৌরবের দিন অস্তমিত হইবার পর অতি ঘোর অন্ধকার যুগ আসিয়াছিল। তাহার পর তুর্ক জাতি কর্ত্তৃক মিশর বিজিত হইবার পরে মিশরে নূতন জাতি ও নূতন সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। এই মিশরীয় মুসলমান সভ্যতার সম্পর্কে এই প্রবন্ধ রচিত।

তুর্কীর ন্যায় মিশরের মুসলমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল হারেম ও বোরখায়। এখনও সেই প্রভাব মিশর অতিক্রম করিতে পারে নাই! তবে মিশরেও তুর্কীর মত নারী-জাগরণ পরিলক্ষিত হইয়াছে। আরবী পাশার সময় হইতেই মিশরে বোরখা ও অবরোধের বিরুদ্ধে নারীর মুক্তির আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই প্রথম আন্দোলনের প্রাণ জামাল-উদ্-দীন ও মনগুর ফাহমী। তাঁহারাই প্রথমে মিশরের নারীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনসম্পর্কে নানা সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মিশরের বিদুষী কবি আবির্ভূত হয়েন, তাঁহার নাম আয়েসা উল তাইমুর। তাঁহার রচনার প্রভাবে মিশরে নারীর আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত হয়। উহার দুই বৎসর পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কাসিম বে আমিন "মিশরীয় নারীর মুক্তি" নামে গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে মিশরে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। প্রাচীনপন্থী দল তাঁহার অভিমতের ঘোর বিপক্ষতাচরণ করেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমাজে তাঁহার গ্রন্থের সমাদর হইয়াছিল, মিশরীয় নরনারী তাঁহার গ্রন্থে এক নূতন ভাবের আস্বাদন পাইয়াছিল। পরে যখন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "The new woman" বা "নূতন নারী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন মিশরে সত্য সত্যই একটা নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। তিনি ঐ গ্রন্থ মিশরের শ্রেষ্ঠ নেতা সৈয়দ জগলুল পাশাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জগলুল নারীর মুক্তির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন; এ বিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাঁহার পরম সহায় ছিলেন।

মিশরের নারীর মুক্তির আন্দোলনে মালাকা নাসিফের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিশরের ব্যবস্থাপক সভায় মসজেদসমূহে নারীর অবাধ প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে দাবী করিয়া এক পাণ্ডুলিপি পেশ করেন এবং উহা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত করেন।

কথিত আছে, হজরৎ মহম্মদের জীবিতকালে পুরুষের সঙ্গে নারীরও মসজেদে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। আলির সময় পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালিত হইত। কিন্তু আলির সময়ে নারীকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। নারীদের জন্য মসজেদে স্বতন্ত্র বসিবার স্থান নির্ম্মিত হইবার ব্যবস্থা হইল, উহা পুরুষের বসিবার স্থানের পশ্চাতে অবস্থিত হইবে এবং উভয় আসনের মধ্যে পর্দ্দা থাকিবে,—এইরূপ নিয়ম বাহাল হইল। মালাকা নাসিফ দাবী করিলেন যে, যখন হজরৎ মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং যখন তাঁহার সময়ে নারীর মসজেদে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল, তখন তাঁহার সময়ের নিয়ম পালিত হইবে না কেন? মহম্মদই মুসলমান আইনকানুনের শাস্ত্রপুরাণের উৎস, সুতরাং তাঁহার অনুমোদিত আইন লঙ্ঘন করিয়া নারীর জন্য এরূপ বন্ধনের ব্যবস্থা চলিবে কেন?

কৃষক-কন্যা

মালাকা নাসিফ আরও কয়টি দাবী করেন, যথা,—

(১) পুরুষ ও নারী, উভয়ের সম্পর্কে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা-বিধান করা,

(২) নারী চিকিৎসক তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা বিধান করা,

(৩) দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা,

(৪) নারী বাহিরে ভ্রমণ করিতে গেলে পথে তাঁহাকে বিরক্ত বা অপমান না করে, তাহা দেখিবার জন্য উপযুক্ত পুলিস-প্রহরী নিয়োগ করা,

(৫) গৃহস্থালীর কার্য্য এবং পেশার কার্য্য নারীদিগকে শিখাইবার ব্যবস্থা করা,

(৮) পুরুষের বহুবিবাহ এবং তালাকের আইন-কানুনের সংস্কারসাধন করা।

বলা বাহুল্য, সময়ের গুণে ঐ সকল দাবী ব্যবস্থাপক সভায় স্বীকৃত হয় নাই। তথাপি এ বিষয়ে মালাকা নাসিফের এই প্রথম উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু মালাকা নাসিফ ভগ্নমনোরথ হন নাই, তিনি এ বিষয়ে মরণান্তকাল পর্য্যন্ত লেখনী চালনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আজ ৮ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বদেশে কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া গিয়াছেন। 'লেডি ক্রোমার' ঔষধালয় সমূহ এবং তাহাদের পরবর্ত্তী 'আইন-আল-হায়াত' ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। অবশ্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের নারী

অশ্বপৃষ্ঠে মিশরী নারী

ডাক্তার ও নার্স'রা য়ুরোপীয় ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণার্থ মিশরীয় নারীদিগকে সময়ে সময়ে হারেমের অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু ও মুক্ত আলোক উপভোগে উৎফুল্ল করিত। তাঁহাদের সাহচর্য্যে অনেক সময় মিশরীয় নারীদিগের মনের সঙ্কীর্ণতার ও অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হইত।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লেডি বিং কায়রো সহরে নারীদিগের জন্য এক আন্তর্জাতিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ক্লাবে শিক্ষিতা মিশরীয় নারীরা যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে নানা জাতীয় নারীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও সামাজিক মিলামিশা সম্ভবপর হইয়াছিল। ঠিক ঐ বৎসরে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত নারীর উদ্যোগে একটি নারী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম,—"মিশরীয় নারীদিগের সামাজিক ও মানসিক উন্নতিবিধায়িনী সমিতি।" বলা বাহুল্য, মিশরীয় নারী হারেম ও বোরখার প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে এমন সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইতেন না, দেশের কর্তৃপক্ষ ও পুরুষগণও ইহাতে বাধা প্রদান করিতেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, তখন মিশরে নারী-জাগরণ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর মিশরে এমন এক আন্দোলন উপস্থিত হইল, যাহার সংস্রবে আসিয়া নারীজাগরণ-আন্দোলন সহস্রগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সে আন্দোলন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন। সে আন্দোলনের কর্ণধার স্বয়ং সর্ব্বজনপ্রিয় জননায়ক

ফলওয়ালী

জগলুল,—আর তাঁহার অধীনে মিশরের তাবৎ নরনারী মুক্তিমদিরার উন্মাদনা ও উত্তেজনায় সকল বাধাবন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণবিচূর্ণ করিতে দণ্ডায়মান—সে আন্দোলনে নরনারীর প্রভেদ অন্তর্হিত -জাতির সে আন্দোলন অনির্ব্বচনীয়, অননুভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব। সে আন্দোলনে ফেল্লাহিন, বেদুইন, আরবী কপ্ট,—এক হইয়া গিয়াছে। আন্দোলন-চক্র ঘোর রোলে কুলালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে,—তাহার সংস্রবে যে আসিতেছে, সেই আকৃষ্ট হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। জগলুল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রবর্ত্তন করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে সরকারী রাজপুরুষ কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, শান্তিরক্ষক চাপরাশ ফেলিয়া দিল, স্কুল-কালেজের ছাত্র বাহির হইয়া আসিল, আইনজীবী আদালত ত্যাগ করিল,—সে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় কাণ্ড! মিশরের নারীও সেই কুলালচক্রের ঘূর্ণনের প্রভাব হইতে মুক্ত

হইতে পারিলেন না। বালিকা শিক্ষার্থিনীরা স্কুল ছাড়িয়া পথে আসিয়া বিরাট শোভাযাত্রায় যোগদান করিল ও নারীরা হারেম ও বোরখা ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে আপনাদের শোভাযাত্রা বাহির করিলেন; বিদুষী নারীরা প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগিলেন,—"আমরা যদি তোমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া থাকি, তোমরা যদি আমাদের এই মাতৃজাতির স্তন্যপানে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া থাক, তবে আজ তাহার পরিচয় দাও—মানুষের মত এই মুক্তির সংগ্রামে বুক ফুলাইয়া দণ্ডায়মান হও। যে কাপুরুষ কুলাঙ্গার এই সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইবে, সে কুলটার সন্তান, আমাদের সন্তান নহে!" বহু লেখিকা সংবাদপত্রের স্তম্ভে পুরুষকে উত্তেজিত করিয়া অনলবর্ষী প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন। এইপ্রকারে নারীরা জাতির এই মুক্তি-সংগ্রামে পুরুষের যথার্থ সহধর্ম্মিণীরূপে পুরুষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। মিশরের মুক্তির ইতিহাসে নারী-জাগরণের সে কি এক স্মরণীয় দিন।

মিশরী সুন্দরী; অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত, শুধু নয়নযুগল অনাবৃত

ইহার অব্যবহিত পরে মিশরে লাবিবা আমেদের নেতৃত্বাধীনে প্রথম নারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। প্রথমে উহার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। ঐ সময়ে আরও কয়েকটি নারী-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইল। নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র সাময়িক পত্র-সমূহও প্রকাশিত হইতে লাগিল। মিশরীয় নারীরা এই সময়ে ঐ সকল পত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে "লা য়ুনিয়ন ফেমিনিন ইজিপ্সিয়েন" অথবা মিশরীয় নারীগণের সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হইল। দ্বাদশটি নারী উহার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইলেন, ঐ দ্বাদশ জনের মধ্যে একটি মহিলা খৃষ্টান। শ্রীমতী হুদা সারাবাই উহার নেত্রী-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি তৎপূর্ব্বেই মিশরীয় নারীর মুক্তিসমরে নারীগণের নেতৃত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সার্কেশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা; বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং শিক্ষিতা, বিদুষী ও আধুনিক যুগের অনুযায়ী সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনে অভিজ্ঞা ছিলেন।

ঐ বৎসরে রোম সহরে নারীর নির্ব্বাচনাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী আন্তর্জ্জাতিক নারী-সম্মিলনের এক কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। হুদা সারাবাই, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং নবাবিয়া মুসা নাম্নী মিশরীয় মহিলা মিশর হইতে ঐ কংগ্রেসে নারী প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইলেন। নবাবিয়া মুসা মিশরীয় শিক্ষাসচিবের অধীনে প্রথম নারী স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার হইয়াছিলেন। ঐ কংগ্রেসে মিশরীয় নারীগণের পক্ষ হইতে নয়টি প্রস্তাব পেশ হইয়াছিল, যথা,—

(১) দেশের আইন-কানুন ও আচারব্যবহারানুযায়ী নৈতিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পুরুষের সহিত তাহার সমান অধিকার সাব্যস্ত করিতে হইবে।

(২) উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়-সমূহে নারী শিক্ষার্থিনীদিগকে অবাধ প্রবেশাধিকার দিবার এবং পুরুষ শিক্ষার্থীদিগের সহিত তাহাদের সমান অধিকারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

(৩) যাহাতে বিবাহার্থী নরনারী বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বে পরস্পর পরিচিত হইতে পারে, সেই ভাবে প্রচলিত আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার ব্যবস্থা হইবে।

(৪) কোরাণের প্রকৃত অনুজ্ঞা যাহাতে পালিত হয়, সেই ভাবে বিবাহের আইনের সংস্কারসাধন করিতে হইবে এবং তদ্দারা অহেতুকী বহু বিবাহের অবিচার হইতে নারীকে

রক্ষা করিতে হইবে ; পরন্তু রীতিমত কারণ না থাকিলে কোনও পক্ষ বিবাহ-সম্বন্ধ অস্বীকার বা বিচ্ছেদ করিতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) নারীর বিবাহে সম্মতিদানের বয়স ১৬ বৎসরে উন্নীত করিতে হইবে।

(৬) সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য—বিশেষতঃ শিশু-মঙ্গলের জন্য রীতিমত প্রচার-কার্য্য চালাইতে হইবে।

(৭) সতীত্বের মহিমা প্রচার ও সতীকে উৎসাহিত করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পাপ ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।

(৮) সর্ব্ববিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। এমন কতকগুলি আচার-ব্যবহার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, অথচ হদিশে তাহাদের সম্বন্ধে উক্তি আছে। সেগুলির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'জারের' উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূত ও দৈত্যদানাগ্রস্ত লোকের 'ভূত-ছাড়ান'কে জার বলে।

(৯) নারী-সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বুঝাইবার জন্য সংবাদ-পত্রের মারফতে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

পাঠক এই কয়টি প্রস্তাব হইতেই বুঝিবেন, মিশরের অনেক নারী কি পরিমাণে অবরোধ ও বোরখার প্রভাব অতিক্রম করিতেছেন, পরন্তু জাতির উন্নতি-বিরোধী কুসংস্কারসমূহের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। ইহা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কথা; তাহার পর আরও ৪।৫ বৎসর অতীত হইয়াছে।

মিশরীয় নারী প্রতিনিধিরা রোমের নারী-কংগ্রেস হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সমিতির কমিটীর মারফতে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী যাহিয়া পাশার নিকট এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করিলেন এবং জানাইলেন যে, মিশরীয় নারীরা তাঁহার গভর্ণমেণ্টের নিকট এই সকল সংস্কার প্রার্থনা করে। ৫ মাসের মধ্যে মিশরীয় পার্লামেণ্ট আইন বিধিবদ্ধ করিলেন যে, ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে মিশরীয় নারী বিবাহিত হইতে পারিবে না, পরন্তু ঐ বৎসরের নূতন আইনের একটি সর্ত্ত হইল যে, মিশরীয় বালক-বালিকাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধীন হইতে হইবে।

মিশরীয় নারী-সমিতি অতঃপর নানা দিকে সংস্কারসাধনোদ্দেশে বিরাট আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটি কার্য্যতালিকা প্রস্তুত হইল। প্রথম দুই দফায় তাঁহারা মিশরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিলেন। সামাজিক সংস্কারের দিক হইতে তাঁহারা দাবী করিলেন,—[১] শিক্ষা সম্বন্ধে আরও অধিক সুযোগ দান, [২] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপামর সাধারণের জন্য ধর্ম্ম ও নীতিগত শিক্ষাদান, [৩] দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উৎসাহদান, [৪] মাদকদ্রব্য সেবনে বাধা প্রদান, [৫] বেশ্যাবৃত্তি দমন, [৬] দেশের সর্ব্বত্র হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা, [৭] বৃদ্ধ, অক্ষম, দরিদ্র, অন্ধ, আতুর ও গৃহ-হীন আশ্রয়হীনগণের জন্য সুব্যবস্থাবিধান এবং [৮] কারাগারের কঠোর আইন সমূহের ও ব্যবহারের সংস্কারসাধন। নারীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ দাবীর কথা পূর্ব্বোল্লিখিত ৯টি প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার উপর বিশেষ কয়টি দাবী এইরূপ, [১] শিক্ষা-সম্পর্কে নরনারীর সম্পূর্ণ সমতা রক্ষা, [২] বালিকা

কপ্টসুন্দরী,—বিবাহের পরিচ্ছদে

শিক্ষার্থিনীদিগের জন্য নারী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা, (৩) পুরুষের সহিত নারীর সমান নির্ব্বাচনাধিকার, যদি তাহা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে পুরুষের রচা আইন নারী মানিবে না, এইরূপ অনুযোগও ছিল, (৪) পুরুষের বহু বিবাহ নিবারণ এবং তালাক দিবার বিধিনিষেধের কড়াকড়ির ব্যবস্থা।

মিশরী মাতা ও তাহার পুত্র

নারী-জাগরণ ও নারী-আন্দোলনের ফলে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি বড় বড় সহরে অবগুণ্ঠন বহুল পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অবরোধের কড়াকড়িও অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন মুসলমান নারীরা স্বামী ও পুত্রের সহিত রাজপথে প্রকাশ্যে বাহির হইয়া থাকেন। শত শত নারী আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতেছেন। শত শত বালিকা 'গারল গাইড' হইতেছে, নার্স হইতেছে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মিশরে প্রথম বালিকাদিগের জন্য শিক্ষালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন মিশরে পুরাদস্তুর বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন মিশরের প্রধান কেন্দ্রসমূহে বালিকাগণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কায়রোর সানিয়া ট্রেনিং কলেজে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও উচ্চ শিক্ষালয়ের শিক্ষকদিগের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

মিশরী বালিকা

ঘাটের পথে

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কায়রো সহরে আধুনিক কালোপযোগী একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষের স্থায় নারীরও প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। সারোয়াৎ পাশা যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি প্রকাশ্যে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মিশরীয় বালিকারা পুরুষ শিক্ষার্থীর সহিত একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য করে, ইহা দেখিতে পাইলে তাঁহার জীবনের এক উচ্চ আশা পূর্ণ হয়। সময়ে তাহা যে সম্ভব হইবে, এ কথা সারোয়াৎ পাশা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার আশা সফল হইয়াছে। বর্ত্তমানে মিশরীয় সরকারই উদ্যোগী হইয়া কয়েকটি নারীকে য়ুরোপে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। সানিয়া কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্তা কয়েকটি নারী ইংলণ্ডে আর্টস ও মেডিসিনে গ্রাজুয়েট হইবার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেছেন। মিশরীয় সরকার কতকগুলি নারীকে শারীরিক ব্যায়াম, শরীরবিজ্ঞান, গৃহস্থালী, অন্ধকে শিক্ষাদানপ্রণালী এবং আইন শিক্ষা করিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারাই পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রভৃতিতে শিক্ষাদান করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য। এখনও মিশরীয় নারীদের মধ্যে শতকরা ১'৫ জন শিক্ষিতা। সুতরাং দেশের নারীর অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে হইলে কত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কায়রোর সরবৎবিক্রেতার নিকট সুন্দরী গৃহিণী স্বয়ং সরবৎ কিনিতেছেন

যাহা হউক, যত অল্প পরিমাণেই হউক, মিশরে নারীজাগরণ বাস্তবে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সংস্পর্শ ও সংক্রমণের প্রভাব বড় ভয়ানক, সে প্রভাব অতি অল্প লোকই এড়াইতে পারে। যখন মুসলিম সভ্যতার অন্ধকার যুগে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশে বদ্ধমূল ছিল, যখন মুসলিম জগতে কোরাণের অনুজ্ঞা ও হদিশের আদেশের অপব্যাখ্যা দ্বারা নারীর অবস্থা হীন করা হইয়াছিল, তখন মুসলমান দেশসমূহও অতি হীনাবস্থায় ছিল। বর্ত্তমানে আবার মুসলিম সুখসূর্য্য উদিত হইতেছে। যে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে মুসলিম জগৎ প্রাচীনকালে উদ্ভাসিত ছিল, আজ আবার নবীন তুর্ক রাজ্যের অভ্যুদয়ে তাহা ফিরিয়া আসিতেছে, অস্তমিত গৌরবসূর্য্য আবার উদয়াচলে আরূঢ় হইয়াছে। সেই আলোকে অন্যান্য মুসলিম রাজ্যও আলোকিত, উদ্ভাসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে,—নবীন বিজয়ী তুর্কীর সংসর্গে—তাহার নারী-জাগরণ আন্দোলনের সংক্রমণে মিশর ও অন্যান্য মুসলিম রাজ্য প্রভাবান্বিত হইতেছে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তুর্কী ও মিশর ব্যতীত অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের নারীজাগরণের পরিচয় প্রদান করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

জাতিভ্রষ্টা ?

১

"গিজ্ ধা ঘিনি—গিজ্ ধা ঘিনি—তেরে কেটে তাক্—তেরে কেটে তাক্—তা ধিন্ না—তা ধিন্ না—ধিন্।"

কমলপুরে ছোট বাবুর বৈঠকখানা-ঘরের সামনে বারোয়ারী-তলায় যাত্রার আসর হইতে যাত্রার বাজনা বাজিয়া উঠিল।

গ্রামের যিনি বাবু অর্থাৎ জমীদার, তিনি বিদেশী: ভিন্ন জেলায় তাঁহার বাস। বহুদিন হইতেই তিনি গ্রামখানির ইজারা-পত্তনী বিলি করিয়া, নিশ্চিন্তমনে তাঁহার দুইটি চক্ষুর মধ্যে পৌনে দুইটি এই গ্রাম হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেই সময় গ্রামের কৈবর্ত্ত-নন্দন সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত জেলা আদালতে উকীলের মুহুরীগিরি করিতে করিতে হঠাৎ কি করিয়া কোন্ ফাঁকে যে নিজ গ্রামের পত্তনী লইয়া ফেলিয়াছিল, গ্রামের লোক তখন তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কেবল আশ্চর্য্যই হইয়াছিল। লোকটা যে পরিমাণ ছিল চাপা, সেই পরিমাণ ছিল আড়ম্বরহীন এবং হিসাবী। বুড়া কখনও জমীদারী চালে চলে নাই। পত্তনী লইয়া যে কয় বৎসর বাঁচিয়া ছিল, হস্তবুদের কাগজ দেখিয়া গ্রামের খাজনাটি নীরবে ও নির্ব্বিবাদে ষোল আনা আদায় করিত ও সদরের খাজনা মিটাইয়া যাহা কিছু উদ্‌বৃত্ত করিতে পারিত, তাহা লোহার সিন্দুকে পূরিয়া, হরিনামের মালা জপিতে জপিতে সিন্দুকের জমা টাকার সংখ্যাটাও একবার করিয়া গণিয়া রাখিত।

কিন্তু তাহার আমলের সে হাওয়া এখন আর নাই। এখন ছোট বাবুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। পর পর পিতা এবং বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে ছোট ভাই হৃষীকেশ মণ্ডলই এখন কর্ত্তা গ্রামের বাবু। দশ চক্ষু দিয়া ছোট বাবু গ্রামের উপর নজর রাখিয়া গ্রাম শাসন করে এবং আড়ম্বরে ও দপদপায়, পসারে ও প্রতাপে স্বয়ং জমীদারকে পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

"গিজ্ ধা ঘিনি—গিজ্ ধা ঘিনি—তেরে কেটে তাক্—তেরে কেটে তাক্—তা ধিন্ না—তা ধিন্ না—ধিন্।"

বারোয়ারীর আসরে যাত্রা সুরু হইয়া গেল।

ছোট বাবু অনুচরবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া, বৈঠকখানা-ঘরের বারান্দার উপর আরাম-কেদারায় বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিল আর মধ্যে মধ্যে উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে স্বর্ণবর্ণ পানীয় গেলাসে ঢালিয়া চুমুক দিয়া আসিতেছিল। কিছু কিছু প্রসাদলাভে অনুচরবৃন্দও বঞ্চিত হইতেছিল না।

রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিল,—"ভট্‌চায, চাঁদা সব আদায় হ'ল ত? দেখো বাবা, গাঁট থেকে কিছু না যেন গচ্চা দিতে হয়।"

ভট্‌চায কহিল, "বারোয়ারী ক'রে গাঁট্ থেকে গচ্চা দিতে হবে, তেমনধারা কাযই ভট্‌চায করে না।—তবে, আপনার নিবারণ বাগ্দীকে আর পাল্লুম না।—ব্যাটার কাছে আর কিছুতেই আদায় হ'ল না।"

ছোট বাবু লক্ষ্মণের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে, সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? আদায় হ'ল না কেন?"

"সে বলে—'খেতেই পাচ্ছি না, দু'টাকা চাঁদা দেবো কোত্থেকে?'—বলে 'চাঁদাও দিতে পারবো না—যাত্রাও শুনবো না'।"

ছোট বাবু গর্জ্জাইয়া উঠিয়া কহিল,—"আলবৎ চাঁদা দেবে—আলবৎ যাত্রা শুনবে!—এই—গিরে,—মুটো!—দু'জনে গিয়ে নিবে বাগ্দীকে ধ'রে নিয়ে আয় এক্ষুনি আমার কাছে।"

শ্রীরামচন্দ্র যখন প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাস

দিবার ব্যবস্থা করিয়া, লক্ষ্মণকে আদেশ-উপদেশাদি প্রদান করিতেছিল, আর লক্ষ্মণ মাথা হেঁট করিয়া এই একান্ত অপ্রিয় ও হৃদয়বিদারক কার্য্য কি করিয়া সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া চম্‌কাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় নিবারণ বাগ্‌দীকে লইয়া গিরিধারী ও লুটবিহারী—ছোট বাবুর সম্মুখে হাজির করিল।

ছোট বাবু তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ রে নিবে, বারোয়ারীর চাঁদা না কি দিস নি?"

নিবারণ কহিল,—"খেতেই দু'টি পাচ্ছি নি ছোট বাবু, তা চাঁদা দি কোত্থেকে বল? ঘরে একটি মুঠো ধান পর্য্যন্ত ছিল না। কাহন দু'য়েক খড় ছিল পুঁজি, তাই ব্যাপারীর হাতে তুলে দিয়ে, খোরাকীর ধান কিনে তবে কোন রকমে দিন চলছে। এখন ঘরই বা ছাই কি দিয়ে, আর গরু দুটোকেই বা খাওয়াই কি? কি বলবো ছো—"

ছোট বাবু রুখিয়া উঠিয়া বলিল,—"আমি তোর সংসারের হিসেব শোনবার জন্যে ডাকি নি। চাঁদা দিবি কি না বল্।"

"কোত্থেকে দেবো ছোট বাবু? তুমি রাজা,—মিথ্যে বলবো না তোমার কাছে। একরত্তি দুধের ছেলে,—তা তাকে একবেলা ভাত আর এক বেলা নুণ-ফ্যান খাইয়ে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখছি। তা' তাই ত ভট্‌চার্য্যি মশাই, শিবু ঠাকুর, ওনাদের হাতে ধ'রে বললুম যে, চাঁদা এবার আর দিতে পারলুম না। আজ তিন দিন জ্বরে প'ড়ে, তবু পয়সার জন্যে ডাক্তারের কাছে যেতে পাচ্ছি না ছোট বাবু, বেশী কি আর বলবো—"

ছোট বাবু সিংহের মত লাফাইয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল,— "হারামজাদা, ষ্টুপিড্, শুওর! আবার মহাভারত আওড়াতে সুরু করলি? আমি ও সব নেই মাংতা হায়। চাঁদা দিবি কি না, আমি শুধু তাই জানতে চাই।"

কাপড়ের খুঁটে বাঁধা একটি সিকি বাহির করিয়া নিবারণ ছোট বাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল,—"ওষুধ আনব ব'লে রেখেছিলুম, এই নিয়ে দয়া কর ছোট বাবু। ওষুধ না হয় আর খাব না।"

চোখ হইতে আগুন বাহির করিয়া ছোট বাবু কহিল,— "চার আনা?—অর্থাৎ ভিক্ষে?"

হাত দু'টি বুকের কাছে জোড় করিয়া নিবারণ কহিল,— "আর পারব না ছোট বাবু। দোহাই ধর্ম্ম,—মাপ কর এবার।"

"পারব না ছোট বাবু?—আচ্ছা, কেমন না পারিস, আমি দেখে নিচ্ছি" বলিয়া জুতা দিয়া সিকিটিকে দূর করিয়া নীচে পথের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কহিল,—"কে ওখানে? চাটুয্যে?—শোন। কাল সকালেই গিয়ে আর মনিরদ্দীকে সঙ্গে নিয়ে হারামজাদার গরু জোড়া খুলে নিয়ে আসবে। বারোয়ারীর চাঁদা কেমন না আদায় হয় দেখি।" তাহার পর হাতের সরু বেতগাছটা দিয়া নিবারণের গায়ে সপাং সপাং করিয়া দুই ঘা মারিয়া কহিল,—"নিকালো আভি হারামজাদ্!"

ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে নিবারণের চেতনা কিছুক্ষণের জন্য যেন লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে পথে নামিয়া তাহার তিন দিনকার অসুস্থ ও উপবাসী দেহটাকে কোন রকমে আপন গৃহ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া দিল।

নিবারণের স্ত্রী থাকমণি জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, ছোট বাবু তলব করেছিল কেন?"

নিবারণ চোখ বুজিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল, কথার জবাব করিল না।

থাকমণি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"অমন ক'রে এসে শুয়ে পড়লে কেন? কি হয়েছে গা? ছোট বাবু ডেকেছিল কেন?"

নিবারণ দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কটু কণ্ঠে জবাব দিল,— "ডেকেছিল, বাটি-ভরা ক্ষীর খাওয়াবে ব'লে! 'ছোট বাবু ডেকেছিল কেন?'—কেন ডেকেছিল, জানিস্ না?"

"ও মা, রকম দেখ! আমি কি ক'রে জানবো, কেন ডেকেছিল! ও মা, এ কি! আমায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠা কেন গো?"

চীৎকার করিয়া নিবারণ কহিল,—"বারোয়ারীর টাকা না দিলে কাল সকালে গরু খুলে নে যাবে, তার খবর রাখিস্? দে কাঁথাখানা দে—আবার জাড় ক'রে জ্বর এলো দেখছি!— না,—শুলেও ত হবে না। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দে, আমি আসছি। শুয়ে থাকলে চলবে না।" বলিয়া নিবারণ দেয়ালের কোণ হইতে বাঁশের লাঠী গাছটি হাতে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে গোয়ালের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

২

পরদিন প্রভাতে মনিরদ্দী পাইক আসিয়া ছোট বাবুকে জানাইল যে, নিবারণ বাগ্‌দীর গোয়াল শূন্য—গরু নাই এবং

নিবারণ নিজে জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। তার পর বলিল,—"মাগীটার কি তেজ গো ছোট বাবু! বলে,—কোম্পানীর রাজিত্বি—এত অত্যাচার সইবে না। ছোট বাবুকে বলিস যে, দেশে রাজা আছে,—তার বিচার আছে।"

প্রকৃতপক্ষে, থাকমণি এ সকল কিছুই মনিরদ্দীকে বলে নাই; অনেক দিন হইতেই ইহাদের উপর এই মনিরদ্দীর বিশেষ একটু রাগ আছে। রাগটা নিবারণের উপর ততটা নহে; রাগ থাকর উপরেই। এই থাকর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত দিন সে চোখ ঠিকরাইয়া ফেলিয়াছে, ইঙ্গিতে ইসারা করিয়াছে, কিন্তু কোন সুবিধাই করিতে পারে নাই। থাক কোন দিন ফিরিয়াও তাহার দিকে চাহে নাই,—বরং এ সকল সে ঘৃণার সহিতই বরাবর অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে। শেষে, নদীর পথে সে দিন স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে আসিতে আসিতে থাক তাহাকে শুনাইয়া বলিয়াছে,—"অমন করবি যদি, ত আঁশ-বঁটী দিয়ে তোর ছাগল-দাড়ী পেঁচিয়ে কাটবো, —নচ্ছার কোথাকার! ঘরে সোমত্ত বেটী রয়েছে, তার দিকে চেয়ে ইসারা ইঙ্গিত কত্তে পারিস্ না?"

ছোট বাবু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"দেশে রাজা আছে,—তার বিচার আছে!—আচ্ছা, রাজাও দেখাচ্ছি—তার বিচারও দেখাচ্ছি।"

"মাগীর কি মুখ গো ছোট বাবু! নষ্ট-দুষ্ট, কি না, তাই ঐ অত তেজ!"

গড়গড়ার নলটি মুখ হইতে খুলিয়া লইয়া ছোট বাবু কহিল, "গরু জোড়া তা' হলে ব্যাটা রাতারাতিই সরিয়েছে। তা গরু যখন পেলি না, তখন তাকেই কেন ধ'রে নিয়ে এলি না?"

"বৌটাকেই ধ'রে আনবো, ছোট বাবু?"

"বৌটাকে? কুচ্ পরোয়া নেই,—তাকেই ধ'রে নিয়ে আয়। তার রাজার বিচার তাকে দেখিয়ে দেওয়াচ্ছি।"

মনিরদ্দী লাফাইয়া উঠিল।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিল,—"নিবের বৌটা ঘোম্‌টা টেনে থাকে, দেখতে শুনতে মনে হয়, মন্দ নয়। বয়স কত হবে রে?"

"বয়স, ছোট বাবু, পঁচিশের উরুদ্ধে হবে না। কিন্তু বৌটার আঁট-সাট গড়ন যে রকম, তাতে—"

খানিক কি ভাবিয়া, ছোট বাবু বলিল,—"আচ্ছা, থাক্ এখন, আমি দেখছি।"

ইহারই দিন পাঁচ ছয় পরে এক দিন গ্রামে পুলিসের আবির্ভাব হইল। ইনস্‌পেক্টার ছোট বাবুর বৈঠকখানা-ঘরে এক ঘর লোকের মধ্যে বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে কার ওপর আপনার সন্দেহ হয়, মিষ্টার মণ্ডল?"

ছোট বাবু কহিল,—"সন্দেহ—ধরতে গেলে ঠিক কার ওপরেই বা করবো? সে দিন হার গলায় দিয়ে অনেকেরই কোলে কোলে ছিল কি না।"

ইনস্‌পেক্টার কহিল,—"তবু, সে সময় কে কে খোকাকে আপনার নিয়েছিল?"

ছোট বাবু দুই এক জন বাড়ীর চাকরের নাম করিল। ইনস্‌পেক্টার তাহাদের কাহারও কাহারও ঘর একটু আধটু খানা-তল্লাস করিয়া ছোট বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ ছাড়া, খোকা আর কারও কোলে গিয়েছিল সে সময়?"

ছোট বাবু কহিল,—"খানিকক্ষণের জন্যে যেন একবার নিবারণ বাগ্‌দীও কোলে ক'রে আসরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।"

তখন ইনস্‌পেক্টার সদলবলে নিবারণের ভগ্ন-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিবারণের তখন জ্বর আসিয়াছিল। দাওয়ায় একখানি খেজুরের চ্যাটাইয়ের উপর শুইয়া পড়িয়া, আপাদমস্তক কাঁথা মুড়ি দিয়া সে তখন হুঁ-হুঁ করিয়া কাঁপিতেছে। শিয়রের গোড়ায় একটা পাথরের বাটীতে বোধ হয়, এক রত্তি সাগু পড়িয়া ছিল, একটা বিড়াল তাহাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছিল। গোয়ালের ও-পাশে আমতলার ছায়ায় বসিয়া থাক ছেলেকে গুগ্‌লির ঝোল দিয়া পান্তাভাত মাখিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতেছিল।

এমন সময় সহসা উঠানের উপর পুলিসের লোকজন দেখিয়া, সেই ভাত-মাখা হাতেই ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া, থাক খিড়কীর দিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

তখনই খানা-তল্লাস সুরু হইল এবং মিনিট পনের পরে গোয়ালের তুষের জালার ভিতর হইতে ছোট বাবুর খোকার গলার সোনার হার বাহির হইয়া পড়িল,—লকেটে ছোট বাবুর নামের আদ্যক্ষর লেখা। সাক্ষী-সাবুদের অভাব ছিল না। সুতরাং সেইখানে বসিয়া পাঁচ জনের সামনে রিপোর্ট লিখিয়া, ইনস্‌পেক্টার তখনই মাল ও চোরকে দুই জন চৌকীদারের হাওলা করিয়া থানায় পাঠাইয়া দিল।

যথাদিনে রাজার আদালতের বিচার শেষ হইয়া, নিবারণের ছয় মাস কারাবাসের হুকুম হইল।

মনিরদ্দী আদালতে সাক্ষ্য দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পাড়ায় বলিল,—"অকুতো সাহস বলি বাবা! ছোট বাবুর জিনিষ চুরি! কিন্তু—এটাও ঠিক যে, শুধু নিবের একার মৎলবেই এটা হয় নি, মাগীটারও এতে যোগ ছিল নিশ্চয়। অত বড় পাজি মেয়েমানুষ—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩

এক দিন নদীর পথের যে স্থানটাতে দাঁড়াইয়া থাক মনিরদ্দীকে বলিয়াছিল—"আঁশবটা দিয়ে তোর ছাগল-দাড়ী পেঁচিয়ে কাটবো", ঠিক সেই যায়গাটাতে মনিরদ্দী আজ আবার আসিয়া ঝোপের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল। থাক নদীর ঘাটে স্নান করিয়া সেইখান দিয়া আসিতেই সে কাছে আসিয়া বলিল,—"আবার আজ ছোট বাবু পাঠিয়ে দিলে, তুই কি বলিস্ বল্। ভাল ক'রে ভেবে ছাখ। রাজি হ'লে ভাগ্যিটা তোর ফিরে যাবে, জেনে রাখ্।"

নদীর এই পথটাতে বড় কেহ একটা যাতায়াত করিত না। ইতস্ততঃ চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া থাক বলিল,—"তোরও মুখে আগুন—তোর ছোট বাবুরও মুখে আগুন!"

"এই শেষ কিন্তু; আর তোকে সাধা-সাধি করা হবে না, তা বলছি,—ভাল ক'রে বুঝে ছাখ্।"

"তোর মুখে নুড়ো জেলে দি।"

"এই কথা তা হ'লে ছোট বাবুকে বলি গিয়ে? কি দুর্দ্দশা তোর হবে তা হ'লে, বুঝে দেখেছিস্ ত একবার?"

"দেখেছি। দুর্দ্দশা ভগবান্ না করলে, মানুষের সাধ্যি কি যে করে! বরাতে যদি আরও দুর্দ্দশা থাকে ত সে হবে।"

"কিন্তু রাজি যদি হতিস্ ত ভাল হ'ত। পয়লা নম্বরেই তা হ'লে এক ছড়া সোনার—"

"তোর 'এক ছড়া'র মুখে আগুন—আর তোর মুখেও আগুন, মুখপোড়া কোথাকার! ফের যদি আমার কাছে আস্‌বি ত ঝেঁটিয়ে মুখ ভাঙ্গবো।" বলিয়া থাক প্রাণপণ শক্তিতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর তিন চারি দিন কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। আকাশের গায় কোথাও এক রত্তি জ্যোৎস্নার আভাস পর্য্যন্ত নাই। চারিদিকে বিকট অন্ধকার ঘুট্-ঘুট্ করিতেছে। সন্ধ্যার সময়েই ছেলেকে দু'টি খাওয়াইয়া দিয়া, থাক তাহাকে লইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল।

শুইয়া শুইয়া ছেলের মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে থাক কত কথাই ভাবিতেছিল,—'এত দিনে তবে একটা মাস কাট্‌ল; কত দিনেই যে পাঁচটা মাস আর কাটবে? বাছাকে আমার কি করেই যে আমি একলা বাঁচিয়ে রাখবো? জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে কাঁপতে কাঁপতে সে——। একবার ভাল ক'রে তার পানে চেয়ে দেখবারও অবকাশ দিলে না, হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল!—হে হরি, হে ঠাকুর! যদি যথার্থ্যি এক বাপের মেয়ে হই আমি, আর যদি যথার্থ্যি আমি সতীলক্ষ্মী হই ত এর ফল তুমি দিও,—আমার মত দিগ্‌ঘি শ্বাস, চোখের জল যেন তা'দের বৌয়েদেরও পড়ে!'

"মা!"

"কেন যাদু?"

"তুমি ঘুমোও নি?"

"না ধন,—রাত হয়েছে, তুমি ঘুমোও, বাবা!"

পাঁচ বছরের ছেলে—সে জানিত না যে, তাহার মায়ের চোখ হইতে ঘুম আজ এক মাস হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

"মা!"

"বাবা!"

"কুটুমবাড়ী থেকে কবে আস্‌বে বাবা?"

"এই—আসবে এক দিন যাদু।"

"কা'দের কুটুমবাড়ী মা?"

"আমাদেরই বাবা। এখনও ঘুমুচ্ছ না কেন ধন? ঘুমোও।"

খানিক পরেই ছেলে ঘুমাইয়া পড়িল। থাক তাহার বুকে হাত রাখিয়া শুইয়া রহিল। ঘুম আর তাহার আসিল না। রাত গভীর হইয়া আসিলে, এক সময় তাহার একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, কিন্তু তখনই খিড়কীর দিকে কিসের একটা শব্দে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, সে কান খাড়া করিয়া রহিল। খানিকক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর, ঘরের খিল ঠিক দেওয়া আছে কি না দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঘরের মধ্যে কিসের একটা আলো আসিয়া পড়িল, আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখিল, ঘরের একটা কানাচ্ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

চীৎকার করিয়া তখন ছেলেকে বুকে করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। আগুন তখন মটকায় গিয়া লাগিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক কোলাহল করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বিষম একটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করিয়া ফেলিল এবং কলসী, কানেস্তারা, হাঁড়ি, বালতি, যে যাহা পাইল, তাহাই লইয়া জলের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা, নিবারণের ঘরের আগুন নিভাইবার জন্য নহে, আশ-পাশের ঘরগুলিকে বাঁচাইবার জন্য।

লোকজনের ভিড় হইতে একটু দূরে আসিয়া, পথের ওপাশে একটা আতা-গাছের নীচে দাঁড়াইয়া, থাক কাঠ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ দেখিতেছিল। শুধুই স্তম্ভিতের মত চাহিয়া রহিয়াছিল,—কিছু ভাবিবার তাহার আর শক্তি ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাতে সর্ব্বাঙ্গ তাহার ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল, পা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া, সেইখানে আতা-গাছের তলায় বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই পিছন হইতে কাহারা নিঃশব্দে আসিয়া তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া, সেই অন্ধকারের ভিতর তাহাকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

৪

"তা' হলে খাবি নি ত ?"

ফুলপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে পীরপুকুর নামে ছোট্ট একটি মুসলমানের গ্রাম। এই পীরপুকুরের একটি ক্ষুদ্র বাটীর ভিতরকার একখানি ঘরের দাওয়া হইতে জানালায় মুখ বাড়াইয়া মনিরদ্দী কহিল,—"তা' হ'লে খাবি নি ত ? ক'দিন না খেয়ে শুকিয়ে থাকবি ? আমার কথা শোন্—খা। ছেলেটাকেই বা না খাইয়ে কত দিন রাখবি ?"

গত কল্য রাত্রিশেষ হইতে থাককে এইখানে আনিয়া চাবি বন্ধ করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। ইহা মনিরদ্দীর বিধবা ভগিনীর বাটী।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় আর একবার মনিরদ্দী জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল,—"আবার বলছি—এখনও খা। ও জাত্‌টাত্ এখন রেখে দে। ভাল চাস্ ত মায়ে-পোয়ে খেতে বোস্। আমার পাতে ওবেলাকার একরাশ ভাত-তরকারী রয়েছে,—বল, খাবি ? দেবে এনে ?—কথা নাই কেন মুখে ? বোবা হয়ে গেলি নাকি ? তোর অত চোটপাট্ এখন গেল কোথায় ? কথা কইবি ত ক—নইলে তালা খুলে মুখে থুথু দেবো।"

ঘরের ভিতর হইতে থাক কহিল,—"আমি ত বলেছি, খাব না, আমার ক্ষিদে নেই।"

"ক্ষিদে নেই ? সারাদিনই ক্ষিদে নেই ?—আচ্ছা, কখন্ ক্ষিদে হয় দেখবো" বলিয়া মনিরদ্দী একবার বাটীর বাহির হইয়া গেল।

মনিরদ্দী চলিয়া গেলে, তাহার ভগিনী নছিবন্ জানালার ধারে আসিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া ডাকিল,—"দিদি—ও দিদি!"

"কেন গা ?"

"এই মুড়ি-বাতাসা ক'টি ঘরে ছ্যালো দিদি, এই ক'টি ছেলেকে তোর খেতে দে,—এতে কোন দোষ হবে না। খাওয়া দিদি,—আহা, কচি ছাওয়াল, সারাদিনটা অম্‌নি অম্‌নি রইল!"

পরদিন বেলা যখন তৃতীয় প্রহর, তখন ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায় থাক নির্জীবের মত ঘরের এক ধারে পড়িয়া ছিল; কিন্তু ছেলে তাহার দুই দিনের অনাহার সহ্য করিতে পারিল না, ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিল। আগের দিন সেই দুটি মুড়ি-বাতাসা ছাড়া আর সে কিছুই খাইতে পায় নাই। একরত্তি ছেলে, আর তার কতই সয় ? আর সে থাকিতে পারিল না,—বার বার নেতাইয়া নেতাইয়া পড়িতে লাগিল।

তখন থাক উঠিয়া, জানালার ধারে আসিয়া ডাকিল,—"ওগো, একবার এসো।"

মনিরদ্দী উঠানে বসিয়া, তাহার চারি বৎসরবয়স্ক ভাগিনেয়টির জন্য ছোট্ট একগাছি কঞ্চির ছিপ কাটিয়া দিতেছিল। থাকর ডাকে কঞ্চিগাছটি হাতে করিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"কি ? খাবি দু'টি ?—ভাত দিয়ে যেতে বল্‌বো ?" বলিয়া ঘরের তালা খুলিয়া, নছিবন্‌কে ভাত আনিতে বলিয়া কহিল,—"ওবেলাকার অনেক ভাত-তরকারী পাতের সব রয়েছে,—পেট ভ'রে মায়ে পোয়ে খা।"

নছিবন একখানি মাটীর বড় সান্‌কীতে ঝোল-মাখা ভাত-তরকারী রাখিয়া গেল। মনিরদ্দী বলিল,—"খা, পেট ভ'রে দু'টি খা দেখি।"

"আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না,—খোকাকে খাওয়াব।"

"এখনও তোর ক্ষিদে নেই ? ও কথা আমি আর শুন্‌বো না। তোকে খেতেই হবে। খাবি কি না বল্।"

"আমার ক্ষিদে নেই।"

সপাং করিয়া হাতের কঞ্চিগাছটা দিয়া সজোরে মনিরদ্দী থাকর ছেলের পিঠে মারিল। "বাবা গো" বলিয়া সে সেইখানে শুইয়া পড়িল। মনিরদ্দী বলিল, "এখনও বলছি খা, নইলে তোরই সামনে তোর ছেলেকে আজ শেষ করব। খা বলছি—হারামজাদী নইলে ফের মারব" বলিয়া পুনরায় কঞ্চিগাছটা তুলিতেই থাক তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"ওগো, তুমি আমার ধম্ম-বাপ। রক্ষে কর মেরো না গো, মেরো না আর মেরো না ম'রে যাবে। ওগো, তোমার ৫টি পায়ে পড়ি আর বাছাকে আমার মেরো না।"

"ভাত খাবি কি না বল্?"

তেমনই পায়ের উপর লুটাইতে লুটাইতে থাক কহিল,—"খাবো—ওগো, খাবো ঠিকই খাবো—এই খাচ্ছি" বলিয়া থাক ছেলেকে খাওয়াইল এবং নিজেও খাইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মনিরদ্দীর আহার হইলে, সেই সান্‌কীতেই থাক ও তাহার ছেলের ভাত দেওয়া হইল। তাহাদের খাওয়া হইয়া গেলে, দরজায় তালা লাগাইয়া, মনিরদ্দী দাওয়াতে মাদুর পাতিল এবং সমস্ত বেলাটা ধরিয়া ঘুমাইয়া, সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই আজ সে নিজেই ভাত-তরকারী বাড়িয়া আনিয়া নিজেও খাইল এবং থাককেও খাওয়াইল!

সে দিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া একটা ভয়ানক রকম দুর্য্যোগের সূচনা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে কিছু পরেই ভীষণ ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষল-ধারায় বৃষ্টি নামিল। বহুদিনকার বৃষ্টিশূন্য আকাশের সঞ্চিত যত জল সব বুঝি দেবতা আজ এক দিনেই নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে বসিলেন। যেমন জল, তেমনই ঝড় আর তেমনই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার। থাক, ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে চাপিয়া চ্যাটাইয়ের উপর শুইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া ছিল। আজ বহিঃপ্রকৃতির এই ভীষণ দুর্য্যোগের সঙ্গে তাহার অন্তরের দুর্য্যোগ বুঝি বা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল।

বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল।

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া নছিবন্ ডাকিল,—"দিদি, ঘুমোলে না কি ?"

"না দিদি!"

"কি দুর্য্যোগ ভাই! ছেলেটা এই এতক্ষণে তবে ঘুমুলো। একলাটি ব'সে ছ্যালাম্, ভাবলুম—দিদি কি কচ্ছে দেখে আসি।"

"একলা কেন ? —তোমার ভাই ?"

"ভাই ত নেই। সে ত সাঁজ হবার আগেই ফুলপুর গেছে। আজ ছোট বাবু আসবে কি না,—তাই তেনাকে আনতে গেছে।—দিদি!—দিদি!—ও দিদি! ঘুমিয়ে পড়লে না কি ?—রাতও হয়েছে—ঘুমোও তবে।" বলিয়া নছিবন্ নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

রাত বোধ হয় প্রহরেক হইবে। ঝড়-বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছিল। দাওয়ার উপর আবার কাহার পায়ের শব্দ শুনা গেল। অতি সন্তর্পণে কে আসিয়া থাকর ঘরের তালা খুলিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল, তাহার পর অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া থাকর গায়ে হাত দিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল,—"দিদি দিদি,—শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর।—শীগ্‌গীর পালা—দিদি, শীগ্‌গীর পালা।"

"কে ?—তুমি ? কি—"

"আর কথা কোস্ নি দিদি। ছেলেকে নিয়ে শীগ্‌গীর পালিয়ে যা—সামনের মাঠ ধ'রে বরাবর গিয়ে বাঁধে উঠবি; তার পর সোজা উত্তরে চ'লে যাবি—খবরদার, দক্ষিণে গিয়ে প'ড়স নি যেন। য্যাদ্দিন কোন ফাঁক পাইনি দিদি, কিছু ক'রে উঠতে পারি নি। আজ এখন দেখি, চাবিটা ভুলে তাকের ওপর ফেলে গেছে। আমিও যে ছেলের মা রে দিদি। যা, আর দেরী করিস নি। এই টাকা দু'টো আঁচলের খুটে বেঁধে রাখ।"

থাক উঠিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হবে বোন্?"

"আমার জন্যে তোর ভাবতে হবে না। আমার খোদা আছে" বলিয়া নছিবন্ থাককে সম্মুখের মাঠের পথ দেখাইয়া দিয়া সদর-দুয়ারে খিল লাগাইয়া দিল।

৫

সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই জেলার বিস্তীর্ণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে পথের উপর একে একে কতকগুলি লোক

পতিদেবতা

মাতাল পতির জুতোর ঘায়ে রগ দে রুধির বয় ;
জয় জয় জয় সতী নারীর পতিদেবতার জয় ।

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আসিয়া জমা হইল। ইহাদের কাহারও আত্মীয়, কাহারও বন্ধু, কাহারও বা প্রতিবাসী আজ খালাস পাইয়া জেল হইতে বাহির হইবে।

আজ নিবারণেরও খালাসের দিন। অপরাপর কয়েদীর সঙ্গে সে-ও ফটকের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রেলিঙের ফাঁক দিয়া বাহিরে পথের উপর দেখিল যে, প্রায় সকল কয়েদীকেই কেহ না কেহ লইতে আসিয়াছে, শুধু তাহাকে লইতে কেহই আসে নাই। সেইখানে, সেই লোহার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া নিবারণ চকিতে একবার তাহার মনটিকে ফুলপুরের একখানি গৃহ, একটি প্রাঙ্গণ, একটি আমতলা ঘুরাইয়া আনিল। ছয় মাস! ছয় মাসে আর কত বড়ই হইয়াছে? যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে। থাকি একলা তাকে নিয়ে কি করেই যে দিন কাটাচ্ছে! কেমন যে আছে তারা, আছেই কি না, তারই বা ঠিক কি?

ঢং ঢং করিয়া জেলখানার ঘড়ীতে ৭টা বাজিল। কারাধ্যক্ষ কয়েদীদের নাম পড়িয়া এক এক জন করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

নিবারণ ফটকের বাহির হইয়া পথের উপর আসিয়া ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইল। তাহার পর সম্মুখস্থ ময়দানের দিকে অগ্রসর হইয়া একটি বটগাছের তলায় আসিয়া বসিয়া পড়িতেই পিছন হইতে কে আসিয়া ঢিপ্ করিয়া তাহার পায়ের তলায় গড় করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—ঐ দোকানে চাকরী করছি। এই নাও—এই ছেলে নাও। ছেলে দেবার জন্যেই শুধু য্যাদ্দিন প্রাণটাকে ধ'রে রেখেছি।"

"থাকি!—কি ক'রে এখানে এলি? তোরা আছিস্ তা হ'লে?" বলিয়া ছেলের মাথায় পিঠে শীর্ণ শুষ্ক হাতখানি বুলাইয়া নিবারণ একবার তাহাকে পাঁজরার হাড়গুলার মধ্যে চাপিয়া ধরিল। চক্ষুর কোণে দুই ফোঁটা জল বোধ হয় জমিয়া আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুছিয়া কহিল,—"কেমন আছিস্ তোরা বল্ দেখি?"

"খুব ভাল আছি,—খুব ভাল! এমন ভাল বুঝি দেবতা কারুকেই রাখেন না গো! তা'—চল, ওঠ এখন—ঐ দোকানের বাসায় চল। একটু সুস্থ হয়ে নাও আগে—তার পর সবই শুনবে এখন।"

*   *   *   *   *   *

দোকানের ভিতরদিকে একখানি ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বসিয়া থাক নিবারণের কাছে একটি একটি করিয়া এই ছয় মাসের কাহিনী শেষ করিল,—"ধর্ম্মটাকে রাখতে পেরেছি, কিন্তু জাতটাকে আর রাখতে পারলুম না। তোমার পতীক্ষেয় এই দোকানের এঁটোকাটা মেজে ধান সেদ্ধো ক'রে পাঁচ মাস প'ড়ে রইছি। বাঁচতে আর আমার এক তিল ইচ্ছে নেই,—বেঁচেও আর থাকবো না। শুধু ছেলেকে তোমার হাতে হাতে দিয়ে যাব ব'লে, আর—" খানিক থামিয়া ভরা-গলায় থাকিয়া থাকিয়া কহিল,—"আর অনেক দিনের দেখার সাধ,—একটিবার শেষ দেখা দেখে যাব ব'লে"—মুখের কথা আর শেষ করিতে পারিল না। হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া চোখের জলে মুখ-বুক ভাসাইতে লাগিল।

নিবারণ তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—"তোর ধর্ম্মও যায়নি, জাতও যায়-নি। তোর যদি জাত গিয়ে থাকে, তা হ'লে কারুরই জাত নেই। যাক্;—অনেক দিন তোর হাতের রান্না খাইনি রে, সকাল সকাল আগে দু'টি ভাত চাপিয়ে দে দেখি।"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে থাক কহিল,—"কি বলছো গো? আমার হাতের রান্না খাবে তুমি? এর পরেও আমায় আবার তুমি নেবে?'

নিবারণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া থাকর হাত ধরিয়া টান দিয়া কহিল,—"তুই বড় বাজে কথা বকিস্, থাকি। উঠে দু'টি রান্না চাপিয়ে দিবি কি না বল্?—আবার হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলি?—আরে নে—ওঠ! সকাল্ সকাল দু'টি খেয়ে দেয়ে নিয়ে, বেরিয়ে পড়ি চ! যেতেও ত হবে—অনেক দুর!" বলিয়া নিবারণ জোর করিয়া থাকর হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিল।

তেমনই ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে থাক জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাবে?"

নিবারণ কহিল,—"তাও ত জানি না। তবে ফুলপুরে আর নয়। যেখানে ছোট বাবু নেই, এমন যায়গাও ত অনেক আছে।"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

কাশীর ইতিহাস

৫

রাজতরঙ্গিণীর প্রদত্ত সময় হইতে জানা যায় যে, বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি প্রতাপাদিত্য ১৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাহার ২ শত ৮৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৫ খৃষ্টাব্দে 'মাতৃগুপ্ত' কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত ব্রাহ্মণ ও কবি ছিলেন, তিনি শকজাতির (১) উচ্ছেদকর্ত্তা শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্য নামক উজ্জয়িনী-রাজের সভায় কিছু দিন ছিলেন। উজ্জয়িনী-রাজ শ্রীহর্ষ ভারতের সম্রাট ছিলেন, তিনি মাতৃগুপ্তের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তৎকালে কাশ্মীরের রিক্তসিংহাসনে তাঁহাকে রাজা করিয়াছিলেন এবং ইহার ৪ বৎসর পরে শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যের দেহান্তর হয়। রাজতরঙ্গিণীকারের মতসিদ্ধ এই বিক্রমাদিত্যই নানা কিম্বদন্তীর নায়ক শকারি। তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ৫১ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহাকে সম্বতের প্রবর্ত্তয়িতা ধরিলে ১ শত ৮৬ বৎসর তাঁহার জীবনকাল কল্পনা করিতে হয়। আমার মনে হয়, কহ্লনের কথিত বিক্রমাদিত্যই সম্বতের প্রবর্ত্তয়িতা এবং শকারি ছিলেন, তবে তাঁহার প্রদত্ত সময়ের সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

মাতৃগুপ্ত ৪ বৎসরমাত্র রাজত্ব করিলে পর ১২৯ খৃষ্টাব্দে প্রবর সেন নামক প্রকৃত কাশ্মীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুদ্ধার্থ কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে মাতৃগুপ্ত বিনাযুদ্ধে রাজ্যত্যাগ করিয়া কাশীতে আগমন করেন ও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ১০ বৎসরকাল কাশীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু প্রবর সেনও অত্যুদারপ্রকৃতি মাতৃগুপ্তের জীবনকাল পর্য্যন্ত তৎপরিত্যক্ত রাজ্যের রাজস্ব গ্রহণ না করিয়া কাশীতে মাতৃগুপ্তের নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং ভিক্ষাভোজী মাতৃগুপ্ত ও ভিক্ষার্থীদিগকে ঐ অর্থ বিতরণ করিয়া দিতেন, ১৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। (২)

যে সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, ঠিক তাহার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনী রাজ্যের উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল; ২য় চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে শ্রীহর্ষও বিক্রমাদিত্য উপাধিভূষিত ছিলেন এবং তিনি শকারিও ছিলেন। এই সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত রাজতরঙ্গিণীর ৩য়োচ্ছ্বাসে বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিণী প্রায় ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে কহ্লন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইয়াছে।

৩১৯ খৃষ্টাব্দে ১ম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন ও তদবধি গৌপ্তাব্দ গণনা আরব্ধ হয়। ইহার পর সমুদ্রগুপ্ত ভারতবিজয়ী সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিজিত রাজন্যগণের নামমধ্যে অবমুক্তরাজ নামে এক জন রাজার উল্লেখ দেখা যায়। ইনিই সম্ভবতঃ অবিমুক্ত-(কাশী) রাজ হইবেন। অবিমুক্ত কাশীর অপর নাম। ভারত-বিজেতা সমুদ্রগুপ্তের অধীনে যে কাশী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, উত্তরাপথের পূর্ব্বদিক্‌পালকে জয় না করিয়া তিনি সম্পূর্ণ উত্তরাপথ জয়ে সমর্থ হয়েন নাই।

এলাহাবাদের সমুদ্রগুপ্তের লিপি হইতে জানা যায়, সকল আরণ্য রাজ্য, আর্য্যাবর্ত্ত রাজা, শাহিরাজ্য ও সিংহলরাজ্য, শক মুরুণ্ডরাজ্যের রাজগণ ও সকল দ্বীপবাসিগণ সমুদ্রগুপ্তের নিকট আত্মনিবেদন ও কন্যাদান করিয়া গরুড়-চিহ্নাঙ্কিত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের শাসন প্রার্থনা করিত। (১) অশ্বমেধযজ্ঞকর্ত্তা প্রবলপ্রতাপ সমুদ্রগুপ্তের দত্তা দেবী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট্ হয়েন, ৮২ গৌপ্তাব্দে বা ৪০১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে উদয়গিরিগুহা খনিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে একটি চন্দ্রনামক রাজপ্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুধ্বজ আছে, উহাতে কোন সময় নির্দ্দেশ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ

---

(১) শকান্ বিনাশ্য যেনাদৌ কার্য্যভারো লঘূকৃতঃ।—রাজতরঙ্গিণী ৩য়োচ্ছ্বাস।

(২) অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ।
সর্ব্বং সন্ন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্যতিঃ॥
রাজা প্রবরসেনোঽপি কাশ্মীরোৎপত্তিমঞ্জসা।
নিখিলাং মাতৃগুপ্তায় প্রাহিণোদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥
মঠাধ্বতিতাং লক্ষ্মীং ভিক্ষাভুক্ প্রতিপাদয়ন্।
সর্ব্বার্থিভ্যঃ কৃতী বর্ষান্ দশ প্রাণানধারয়ৎ।
রাজতরঙ্গিণী, ৩য়োচ্ছ্বাসঃ।

(১) রুদ্রদেব-মতিল-নাগদত্ত-চন্দ্রবর্ম্ম-গণপতি-নাগ-নাগসেনাচ্যুত--নন্দি -বলবর্ম্মাদ্যনেকার্য্যাবর্ত্তরাজ --প্রসভোদ্ধরণোদ্বৃত্তপ্রভাবমহতঃ পরিচারকীকৃত-সর্ব্বাটবিকরাজ্যস্য———দেবপুত্র-শাহিশাহানুশাহিশক-মুরুণ্ডৈঃ সৈংহলকাদ্রিশ্চ সর্ব্বদ্বীপবাসিভিরাত্মনিবেদনকন্যোপায়নদানগরুত্মদঙ্কস্ববিষয়ভুক্তি-শাসনযাচনাদ্যুপায়সেবাকৃতবাহুবীর্য্যপ্রসরধরণিবন্ধস্য—
শ্রীগুপ্তপ্রপৌত্রস্য
ঘটোৎকচগুপ্তপৌত্রস্য
চন্দ্রগুপ্তপুত্রস্য
সমুদ্রগুপ্তস্য—।

গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের এই ধ্বজ বলিয়া মনে করেন। ঐ ধ্বজে একটি শ্লোক আছে। "যাহার খড়্গ প্রতাপ বক্ষে লেপন করিয়া বঙ্গদেশে সংগ্রামকারী শত্রুগণ সহ মিলিত হইয়া বাহুতে কীর্ত্তি লিখিয়াছে, এবং যিনি সিন্ধুর সপ্তমুখ উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীক-(বক্ষ) গণকে জয় করিয়াছেন এবং অদ্যাপি যাঁহার বীর্য্যবায়ু দ্বারা দক্ষিণ-সমুদ্র অধিবাসিত (সুগন্ধযুক্ত), সেই চন্দ্ররাজ নিজ বাহুবলে পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করিয়া এবং চন্দ্রের ন্যায় মুখশ্রী ধারণ করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ভাবপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে ভগবান্ বিষ্ণুর উন্নত ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন। (১)

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রাধীশ্বর পরস্ত্রীকামুক শকনরপতিকে তাঁহারই রাজধানীতে স্ত্রীবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া হত্যা করিয়াছিলেন। (২)

২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুদ্রার দ্বিতীয় দিকে পরমভাগবত মহারাজাধিরাজশ্রীচন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যঃ এইরূপ লেখা আছে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদে লিচ্ছবিবংশের জামাতা ১ম চন্দ্রগুপ্ত একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার পিতার নাম ঘটোৎকচ গুপ্ত—তাঁহার নামাঙ্কিত একটি স্বর্ণমুদ্রা সেণ্ট-পিটার্স বার্গে বা পেট্রোগ্রাডের চিত্রশালায় আছে। চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত এক জাতীয় স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার এক দিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজদম্পতির নাম অপর দিকে 'লিচ্ছবয়ঃ' লিখিত আছে।

৪১২-৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইলে ১ম কুমারগুপ্ত মগধের রাজা হইয়াছিলেন। ইনিও সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন; বামন ভট্টের কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে প্রথম কুমারগুপ্তের উল্লেখ আছে। মহারাজাধিরাজ ১ম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষাংশে পুষ্যমিত্রীয় ও হূণগণ তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত বহু কষ্টে ইহাদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হইলে সম্রাট্ তাম্রমিশ্রিত স্বর্ণমুদ্রা ও তাম্রের উপরে রৌপ্যের ক্ষীণাবরণযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১ম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্ত রাজা হয়েন। হূণগণ তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেও উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হয় নাই, তাহারা পঞ্চনদে নূতন রাজ্য স্থাপন করে। হূণরাজ তোরমাণ বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিমিত্ত পঞ্চনদ প্রদেশে ১টি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্জাবের লবণ-পর্ব্বতের শিলালিপি ও মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় ঈরাণ নামক স্থানের একটি বরাহ-মূর্ত্তির বক্ষঃস্থলের লিপি দ্বারা জানা যায় যে, তোরমাণের রাজ্যাঙ্ক ৪৮৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী।

৪৬৫ খৃষ্টাব্দেও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের শাসনকর্ত্তা শর্ব্বনাগের অনুমত্যনুসারে দেববিষ্ণু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপুরনগরে সূর্য্যদেবের মন্দিরে নিত্য প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়াছিলেন। ইহার পরে পুনরায় হূণগণ বার বার গুপ্তরাজ্য আক্রমণ করে। দেশের জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিবার পর স্কন্দগুপ্ত হূণযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল। ১ম কুমারগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র পুরগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের পর রাজা হইলেও তাঁহার রাজত্ব মগধ ও বঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার পর নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য বারাণসীতে রাজধানী করিয়া প্রবলপ্রতাপে সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং মালবীয় যশোধর্ম্মদেবের সাহায্যে হূণপতি মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করেন। বালাদিত্যের যত্নে হিন্দুতীর্থের পুনরুদ্ধারসাধন ও ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বালাদিত্যের পুত্র প্রকটাদিত্য ২য় কুমারগুপ্ত কাশীর সিংহাসনে কিছুকাল রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধতীর্থ সারনাথেও হিন্দুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিষয় সারনাথে আবিষ্কৃত প্রকটাদিত্যের শিলালিপি হইতে জানা যায়। উহাতে আছে, তিনি মরন্বিষ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভগ্ন অস্পষ্ট শিলালিপির যতটুকু আছে তাহা এই—

১। দে···বো···। কাশীতি—
বিখ্যাতং পুরং কা (?) মে! ভূষিতম্
২।···পু (পুরন্দর ইবে)···—···পতত্যহো (!)
৩। ত (জ) থ ত (?) ব···শাস্ত্রবিদো···তটানাম্। করি···
৪। বান্-মধ্য-স-ংশ মানীতঃ। তদ্বংশ সম্ভবো স্তো বালাদিত্যো নৃপঃ প্রিয়া। তদ্গোত্রলব্ধজন্মা বালাদিত্যো···পতিঃ। তস্য ধবলেতি জায়া পতিব্রতা রোহিণীব চন্দ্রস্য,·গৌরীব শূলপাণেঃ লক্ষ্মীরিব বাসুদেবস্য।]
৫। প্রতাপগুপ্তামিত্রবধূ সিন্ধু-শো··· তিবিনয়া···
স্বয়ভূতং ভক্তিধর্ম্মৈকশক্তিসততপ্রথিতঃ···
৬। সুতবৎসল···সুতঃ···শৌর্য্যঃ···বিনয়সম্পন্নঃ শ্রীমান্ প্রকটাদিত্যো···
৭। দ্বিজবরনিকরাশ্রয়ঃ···প্রবৃদ্ধগুণঃ কল্পদ্রুম ইব নিতরাং নিষ্কম্পঃ প্রকটমূলোপি।
৮। দ্বিজগণসেব্যঃ সততং বিদ্বৎসমূদয়বিহিতরুচিঃ···নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়শত্রুঃ।
৯। পুত্রঃ কার্ত্তিকেয় ইব। যস্য···ব নির্গত···লুব্ধ হৃষ্ট ভ্রমদ্ভ্রমর
১০। ত দিনং পৃথুপুষ্করিণ্যঃ। যে (!) ন রিপুসুন্দরীণাং স্খলিনানি কৃতানি···

(১) যস্যোদ্বর্ত্তয়তা প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষাহববর্ত্তিনোঽভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লীকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণঃ॥
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরং চৈকাধিপত্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং বক্ত্র শ্রিয়ং বিভ্রতা।
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ॥
(২) অরিপুরে চ পরকলত্রকামুকং কামিনীবেশগুপ্তশ্চন্দ্রগুপ্তঃ শকনরপতিমশাতয়ৎ।—হর্ষচরিতম্ ৬ষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ।

১১। ন শ! ন! দ্বিজগুরু।…কারিত মেতন্ম ভবনম্মুরদ্বিষো র…

১২-১৬। যুতায়ামিক…প্রকট…বহুমতো ধর্ম্মযশোরাশি…যঃ খণ্ডা স্ফুটিতসংস্কার…পৃ…তংস…প্রশস্তিঃ রামচন্দ্রপুত্রেণ দেবকেন।

গুপ্তরাজগণের অধিকারকালে উত্তরাপথে শিল্পোন্নতি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪।৫।৬ শতাব্দীর যে সকল নিদর্শন উত্তরাপথে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই এই উন্নতির কথা সহজেই অনুভব করা যায়। গুপ্তাধিকারকালের বহু মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত ও ধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি স্তম্ভক্ষোদিত চিত্র কাশী মথুরা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

১ম কুমারগুপ্তের বংশ লুপ্ত, হীনবল বা স্থানান্তরিত হইলে ২য় চন্দ্রগুপ্তের ২য় পুত্র গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের বংশধর ৩য় কুমারগুপ্ত মগধের রাজা হয়েন। ইনি ঈশান বর্ম্মা নামক জনৈক নরপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পরাভূত ঈশান বর্ম্মা মৌখরিবংশীয় হইবেন।

৩য় কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদরগুপ্ত হূণবিজয়ী যুক্তপ্রদেশের মৌখরিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মৌখরিগণ বিশেষ সম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা অর্চ্চিত হওয়ায় বাণভট্টের যাজ্ঞিক পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। (১) বাণভট্ট গুপ্তরাজগণের কথাও কাদম্বরীর প্রথমে উল্লেখ করিয়া নিজ বংশমহিমা প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। (২)

দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত ও কন্যা মহাসেনগুপ্তা। সম্ভবতঃ হর্ষচরিতে এই মহাসেনগুপ্তকেই কাশীরাজ বলা হইয়াছে। কাশীমাহাত্ম্য নামক একখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত ষড়্বিংশাধ্যায়াত্মক পুস্তকেও মহাসেনগুপ্তের কথা আছে। এই কাশীমাহাত্ম্য পুস্তকের বহুলভাগ ত্রিস্থলী সেতু নামক (৩) গ্রন্থে নির্ণয়সিন্ধুকারের পিতামহ নারায়ণ ভট্ট উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। কাশীমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে আছে যে, চন্দ্রবংশীয় মহাসেন নামে কাশীর রাজা দুশ্চরিত্র, পাপী ও পরদাররত ছিলেন এবং চাটুকার ও চোরগণের প্রিয় ছিলেন। তিনি অক্ষৌহিণীপতি হইলেও প্রতিষ্ঠানপতি চণ্ডসুমেধা নামক রাজার নিকট পরাজিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন, দ্বিতীয় বারেও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত তীর্থদর্শনচ্ছলে দ্বারকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে প্রয়াগরাজ সুমেধা কাশীরাজ মহাসেনপুত্রকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

বৃহৎসংহিতার ৭৮ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পাঠে জানা যায়, রাজপত্নী (সুপ্রভা) রাজার প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং বিষদিগ্ধ নূপুরের দ্বারা কাশীরাজকে বিনাশ করিয়াছিলেন। (১)

হর্ষচরিতে আছে, কাশীরাজ-মহাসেন-পত্নী সুপ্রভাদেবী নিজ পুত্রের রাজ্যের জন্য মদ্যপানে হৃষ্ট কাশীরাজ মহাসেনকে মধুরকলিপ্ত লাজ দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। (২) এই সকল গ্রন্থ পাঠে মনে হয়, কাশীরাজ মহাসেন অত্যন্ত ব্যভিচারী ছিলেন—যাহার জন্য তাঁহার পত্নী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। পরে পলায়িত রাজা ফিরিয়া আসিলে পুত্রের রাজ্য যায় দেখিয়া রাজমহিষী স্বামিহত্যারূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। মহাসেনগুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থাণ্বীশ্বররাজ আদিত্যবর্ম্মার বিবাহ হয়। আদিত্যবর্ম্মা শ্রীহর্ষের পিতামহ, সুতরাং খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি ও মহাসেনগুপ্ত রাজা ছিলেন। মহাসেনগুপ্তার গর্ভে প্রভাকরবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই প্রথমে স্থাণ্বীশ্বররাজবংশে সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। মহাসেনগুপ্ত কামরূপরাজ সুস্থিত বর্ম্মাকে লৌহিত্যতীরে পরাজিত করিয়াছিলেন। (৩)

দামোদরগুপ্তের কন্যা মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থাণ্বীশ্বররাজ আদিত্যবর্ম্মার বিবাহ হয়। তৎপুত্র প্রভাকরবর্দ্ধন ৫৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের দুই পুত্র—রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন। রাজ্যশ্রী নাম্নী ১টি কন্যাও হয়, ঐ কন্যার মৌখরিবংশীয় গ্রহবর্ম্মার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে গ্রহবর্ম্মা যুদ্ধে নিহত হইলে দেবগুপ্ত রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। (৪)

ইতঃপূর্ব্বে প্রভাকরবর্দ্ধন মালব জয় করিয়া মালবরাজকুমারদ্বয়, কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্তকে থানেশ্বরে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের সঙ্গী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মালব জয় করিলেও অধিকার করেন নাই। প্রভাকরবর্দ্ধন সূর্য্যোপাসক ছিলেন; তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'পরমসৌর' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে—প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর দক্ষিণে দেবগুপ্ত ও পূর্ব্বদিকে শশাঙ্ক প্রাচীন

---

(১) স শেখরৈর্মৌখরিভিঃ কৃতার্চ্চনম্।

(২) অনেকগুপ্তার্চ্চিতপাদপল্লবম্। (কাদম্বরী)

(৩) নির্ণয়সিন্ধু ১৫৫৬ সংবতে বা ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থকারের পিতামহ নারায়ণভট্ট তৎকালে কাশীর এক জন প্রধান মীমাংসক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গয়া, কাশী ও প্রয়াগ এই তিন স্থানের কর্ত্তব্যকার্য্যাবলম্বনে এই অত্যুপাদেয় পুস্তক রচনা করেন। ইহা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১) "বিষপ্রদিগ্ধেন নূপুরেণ দেবী বিরক্তা কিল কাশিরাজম্"—মনুটীকায়াং কুল্লুকভট্টধৃতং বচনম্ ইতি হর্ষচরিতটীকা—বৃহৎসংহিতা ৭৮ অধ্যায় ১ শ্লোক।

(২) মধুমোদিতং মধুরকসংলিপ্তৈঃ লাজৈঃ সুপ্রভা পুত্ররাজ্যার্থং মহাসেনং কাশীরাজং জঘান।—হর্ষচরিত ৬ উচ্ছ্বাস।

(৩) ফ্লিটের ইন্‌স্ক্রপ্সন।

(৪) স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত কিছু দিন মালব শাসন করেন। বুধগুপ্তের সময় ৪৮৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ হওয়া সম্ভব। ভানুগুপ্ত ৫১০—১১ পর্য্যন্ত মালবশাসক ছিলেন। ইহারা মগধের গুপ্তবংশীয় বলিয়াই মনে হয় এবং এই বংশীয় দেবগুপ্তই গ্রহবর্ম্মার নিহন্তা।

গুপ্তবংশের গৌরব উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই শশাঙ্ক সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদি দ্বারা জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর ও স্থাণ্বীশ্বররাজের সহিত তাঁহার বিবাদ ছিল। এই শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত বহু সুবর্ণ-মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানিতে ৩০০ গৌপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন।

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন কি না, ইহা লইয়া বহু মতবাদ চলিতেছে। শশাঙ্কই যে নরেন্দ্রগুপ্ত, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাইলেও আমরা যে সকল প্রমাণাভাস পাইয়াছি, তাহা নিম্নে ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে। সম্ভবতঃ ইনি মহাসেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ইঁহার মাতা সুপ্রভা ইঁহারই রাজ্যের জন্য স্বামিহত্যারূপ পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ মাধবগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের তুল্যবয়স্ক ছিলেন।

মহাসেনগুপ্তের ভগিনী হর্ষের পিতামহী, মহাসেনগুপ্ত কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মার সমসাময়িক ব্যক্তি। সুস্থিতবর্ম্মার কনিষ্ঠ পুত্র ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের সমসাময়িক ব্যক্তি।

হর্ষচরিতের পুস্তকবিশেষে ও উহার টীকায় শশাঙ্কের নাম নরেন্দ্রগুপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং কতকগুলি শশাঙ্কের মুদ্রায় 'নরেন্দ্র বিনত' এইরূপ লেখা আছে।

গুপ্তবংশের রাজগণমধ্যে ২য় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য', ১ম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য,' স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, পুরগুপ্ত 'প্রকাশাদিত্য'—নরসিংহগুপ্ত 'বালাদিত্য', ৩য় চন্দ্রগুপ্ত 'দ্বাদশাদিত্য', ২য় কুমারগুপ্ত 'প্রকটাদিত্য' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন; এবং কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মা 'মৃগাঙ্ক' উপাধিবিশিষ্ট ছিলেন। সেইরূপ মহাসেনগুপ্তের পুত্র নরেন্দ্রগুপ্তও শশাঙ্ক উপাধিভূষিত ছিলেন। পরিশেষে বিক্রমাদিত্য উপাধির ন্যায় শশাঙ্ক উপাধিতেই তিনি পরিচিত হয়েন, অনেকেই নাম জানিত না বা ভুলিয়া গিয়াছিল। এখনও দেশীয় রাজন্যবৃন্দের নাম অনেকেই জানে না, কেবল অমুক স্থানের রাজা ইত্যাদি শব্দে তাঁহাদিগকে অভিহিত করে। পুরাকালেও কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রস্তাবনায় 'ইয়ং হি বিক্রমাদিত্য-পরিষৎ' এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, রাজার নাম বলেন নাই। গুরুজন মান্যব্যক্তির নাম বলা তখনকার রীতিবিরুদ্ধও ছিল। বিশেষতঃ রাজসমক্ষে অভিনীয়মান নাটকের ভূমিকায় রাজার নামোচ্চারণ করিতে কুশী-লবগণ কুণ্ঠিত হইত বলিয়াও নাম বলা হয় নাই।

"বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীং নরেন্দ্রগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি" এই শ্লোকার্দ্ধ কিরূপ ভাবে অবগত হইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে স্মারকলিপিমধ্যে অন্বেষণ করিয়া তাহা পাই নাই।

এই শ্লোকার্দ্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নরেন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে পৃথিবী আনন্দপূর্ণ ছিল। বিকশিত কুসুমরাজিরূপ বিম্পষ্ট হাস্যমুখী পৃথিবীকে যখন নরেন্দ্রগুপ্ত শাসন করিতেন, ইহা উহার অক্ষরার্থ।

শশাঙ্ক দেবগুপ্তের আহ্বানে তৎসাহায্যার্থ মালবগমন করেন, কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাজ্যবর্দ্ধন কর্ত্তৃক দেবগুপ্ত পরাজিত হয়েন। শশাঙ্ক তথায় পৌঁছিয়া পিতৃস্বস্রেয়পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে সম্ভবতঃ নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং রাজ্যবর্দ্ধন কোনরূপ সত্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করেন। (১)

হর্ষচরিতে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর সংবাদবাহক হর্ষবর্দ্ধনের নিকট রাজহত্যাকারীর নাম গ্রহণ করিলে পাপ হইবে বলিয়া যে পরিচয় দান করিয়াছে, তাহা দ্বারাও শশাঙ্ক নাম বুঝিতে পারা যায়। সংবাদবাহক রাজ্যবর্দ্ধনকে সূর্য্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজ্যবর্দ্ধনরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলেও অন্ধকার-নাশের জন্য গ্রহগণ বনবিহারী এক হরিণাধিপ-লাঞ্ছন চন্দ্রমা কখনও বিধাতৃ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন না। (২)

ইহার পরেই সেনাপতির উক্তিতে দেখা যায় যে, হর্ষবর্দ্ধনকে সূর্য্য বলিয়া পলায়িত শশাঙ্কের রাজলক্ষ্মী ক্ষণস্থায়িনী, এই কথা চন্দ্রের জ্যোৎস্না সূর্য্যপ্রভাপেক্ষায় ক্ষণস্থায়িনী এই শ্লেষভঙ্গীতে বলা হইয়াছে, সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসেই ইহা বুঝিতে পারেন। (৩)

হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম' 'সর্প' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। শশাঙ্ক নিজের পিতৃস্বসার পৌত্রকে নিমন্ত্রণ করিলে সেই ভ্রাতৃপুত্রের নিঃশঙ্ক ও নিরস্ত্র হইয়া তাঁহার নিকটে যাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু সেই বিশ্বস্ত ভ্রাতৃপুত্রকে হত্যা করা নিতান্তই গর্হিত এবং সর্পস্বভাবের পরিচায়ক। পূর্ব্বোক্ত শ্লেষে আদিত্যবর্ম্মার বংশধরগণকে সূর্য্য বলাও স্বাভাবিক এবং কলঙ্কিত কার্য্য করায় ও নামসাদৃশ্য বুঝাইতে (নগেন্দ্রগুপ্তকে) শশাঙ্ককে হরিণলাঞ্ছন বলাও অত্যন্ত লেখ-কৌশলের পরিচায়ক।

হর্ষবর্দ্ধন যে সময়ে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে অভিযান করেন, তখন তাঁহার নামের মুদ্রা প্রথমাঙ্কিত হইয়া সরস্বতী-তীরস্থিত স্কন্ধাবারে আনীত হয়, ঐ মুদ্রা স্বর্ণনির্ম্মিত এবং বৃষ-চিহ্নিত ছিল। (৪)

হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে তাঁহাকে পরমমহেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মুদ্রায় বৃষ অঙ্কিত থাকায় তিনি শৈব ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধ ছিলেন, হর্ষও বৌদ্ধগণকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহন্তার শাসন জন্য দিগ্বিজয়ে নির্গত হইলে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। হর্ষ বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিতা ভগিনী 'রাজ্যশ্রী'কে উদ্ধার

---

(১) রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ
কৃত্বা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ।
উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ।
ইফিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা।

(২) নত্বাশু অস্তমুপগতবত্যপি ত্রিভুবনচূড়ামণৌ সবিতরি বেধসা আদিষ্টঃ সৎপথশত্রোঃ অন্ধকারস্য নিগ্রহার্থায় গ্রহবণ্ড-বিহারৈক হরিণাধিপঃ শশী। হর্ষচরিত ৬ষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ।

(৩) কাতরস্য তু শশিন ইব হরিণদ্বিতীয়স্য পাণ্ডুরপৃষ্ঠস্য কুতো স্থিরাত্রমপি নিশ্চলা লক্ষ্মীঃ। হর্ষচরিত ৬ষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ।

(৪) তত্রস্থস্তে চ বৃষাঙ্কাম্ অভিনবঘটিতাং হাটকময়ীং মুদ্রাং উপনিন্থে জগ্রাহ চ তাং রাজা।—হর্ষচরিত।

করেন ও পরে ভাস্করবর্ম্মার সাহায্যে শশাঙ্কের রাজধানী 'কর্ণ-সুবর্ণ' ধ্বংস করেন।

শ্রীহর্ষের নামে কয়েকখানি সংস্কৃত নাটক রচিত আছে। তন্মধ্যে নাগানন্দ ও রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় একই শ্লোক দ্বারা কবির নাম কথিত হইয়াছে, যথা—"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী।" এই অংশ দ্বারা শ্রীহর্ষ নাটকের প্রণেতা বলা হইয়াছে, পরন্তু এই হর্ষ কে? বিক্রমাদিত্য হর্ষ অথবা স্থাণ্বীশ্বররাজ হর্ষ, কিম্বা কাশ্মীররাজ হর্ষ? রাজতরঙ্গিণীকার কাশ্মীররাজ হর্ষকে কবি বলিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার কবি বলেন নাই, উজ্জয়িনীরাজকেও কবিপোষক বলিয়াছেন, কবি বলেন নাই। হর্ষচরিতেও হর্ষবর্দ্ধনকে নাটককার বলা হয় নাই, পরন্তু ইঁহারা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। অধিকাংশ লোকের মত, হর্ষবর্দ্ধনই নাটকপ্রণেতা ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি। শুনা যায় যে, শ্রীহর্ষবর্দ্ধন নাগানন্দ নাটকের জীমূতবাহনের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষ শীলাদিত্য নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি দাতা, উদার ও পরম মাহেশ্বর হইলেও সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষশূন্য ছিলেন; বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দুগণকে নির্ব্বিশেষভাবে দেখিতেন। শ্রীহর্ষের তাম্রশাসনে দেখা যায়, ইঁহার পিতা আদিত্যোপাসক ও ভ্রাতা বৌদ্ধ ও নিজে মাহেশ্বর ছিলেন, কয়েক বৎসরান্তে যখন ইনি সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণকে আহ্বান করিয়া একটি মহামেলার প্রবর্ত্তন করিতেন, সেই সময়ে তিনি কখন সূর্য্য, কখন শিব, কখন বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিতেন, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ব্যাখ্যানাদি শুনিতেন ও তত্তদ্ধর্ম্মপোষণার্থ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। শ্রীহর্ষবর্দ্ধন ৬৪৬—৪৭ খৃষ্টাব্দে অমাত্য অর্জ্জুন বা অর্জ্জুনাশ্ব-হস্তে নিহত হয়েন। বাণভট্টপ্রণীত হর্ষচরিত অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে হর্ষ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি, হর্ষের রাজ্যপ্রাপ্তি ও ভ্রাতৃহন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ও ভগিনীকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাহায্যে উদ্ধার ও তৎপ্রতি অনুরক্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত কোন রাজ্যবিজয়াদিরও উল্লেখ নাই।

স্থাণ্বীশ্বর রাজগণের রাজধানীর নাম বর্দ্ধমান কোটী, কৌরবদিগের রাজধানী হস্তিনাকেও বর্দ্ধমানপুর বলা হইত। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১২৬ অধ্যায়ে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যখন কুন্তী পুত্রগণসহ শতশৃঙ্গ পর্ব্বত হইতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই কালকার বর্ণনামধ্যে আছে—

"সেই কুন্তী অদীর্ঘকালে কুরুজাঙ্গল প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'বর্দ্ধমানপুর' দ্বার প্রাপ্ত হইলেন।" বর্দ্ধমান শব্দের অর্থ বৃদ্ধিশীল ও দেশভেদের নাম। স্থাণ্বীশ্বর রাজবংশের নামাবলী—

শ্রীহর্ষের জীবন ও রাজ্যকালমধ্যে ব্রাহ্মণদ্বেষী চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং বা ই এন্ চোয়াং ভারতে বৌদ্ধ কীর্ত্তি ও তীর্থ দর্শনার্থ আগমন করেন। তিনি ভারতে আসিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বারাণসীর বিবরণে জানা যায় যে, তৎকালে কাশীরাজ্য ৪ হাজার লি অর্থাৎ ৩ শত ৩৩ ক্রোশ এবং কাশীর রাজধানী বারাণসী নগরী ১৮।১৯ লি অর্থাৎ দেড়ক্রোশ দৈর্ঘ্যে ও ৫।৬ লি অর্থাৎ অর্দ্ধক্রোশ বিস্তারে ছিল। বর্ত্তমান সময়েও আদিকেশব হইতে অসি পর্য্যন্ত ৩ মাইল এবং অধিকাংশ স্থলে বিস্তারেও ১ মাইলের বেশী হইবে না।

বারাণসী বহুজনাকীর্ণ নগরী;—তোরণসমূহও তীক্ষ্নদংষ্ট্রাগ্র লৌহকবাটযুক্ত। এখানকার অধিবাসিগণ মহাধনবান্ ও প্রাসাদমালা মহার্ঘ-রত্ন-শোভিত। প্রজাসাধারণ নম্রপ্রকৃতি, অতি উদার ও শাস্ত্রানুরাগী। তাহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মে অবিশ্বাসী অর্থাৎ দেবপূজক; দুই এক জনমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত। এ সময়ে কাশীপ্রদেশে সহস্রাধিক দেবমন্দির ও ২০টি মাত্র সঙ্ঘারাম বা বিহার আছে। কিন্তু বারাণসীতে একটিও সঙ্ঘারাম বা বিহার নাই।

হিন্দুর এই পরম মোক্ষধামে গগনস্পর্শী পাষাণময় উচ্চচূড়াশোভিত, উপবন ও তড়াগবেষ্টিত ২০টি দেবমন্দিরের অপূর্ব্ব ভাস্কর শিল্প, কারুকার্য্যমণ্ডিত মণ্ডপ ও নাটমন্দির দেখিয়া চীন পরিব্রাজকও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে ১ শত ফুট উচ্চ তাম্রময় মহেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই দেবাদিদেবমূর্ত্তি কি মহান্, কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, ঠিক যেন জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। এরূপ তাম্রমূর্ত্তির নিদর্শন যবদ্বীপে ব্রহ্মবনম্ নামক স্থানে ৫ম শতাব্দীতে গঠিত হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তিতে ছিল, সেই মূর্ত্তিও স্থানান্তরিত হইয়াছে। তখনও উলঙ্গ পরমহংস ভস্মমণ্ডিত পাশুপত প্রভৃতি সন্ন্যাসিসংপ্রদায় দ্বারা কাশীধাম ব্যাপ্ত ছিল এবং অত্রত্য জনসাধারণ মাহেশ্বর নামে অভিহিত হইত। চীন পরিব্রাজক বরণানদীর উত্তরপূর্ব্বে প্রায় ১ ক্রোশপথ আসিয়া মৃগদাবের সঙ্ঘারামে পৌঁছিয়াছিলেন। সেই স্থানে তৎকালে ১৫ শত বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন। এই সঙ্ঘারাম ৮ মহালে বিভক্ত ও চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। চারিদিকে প্রায় শতাধিক গবাক্ষে স্বর্ণময় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও বিহারের মধ্যস্থানে তাম্রময় বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন। বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোকের ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ শতাধিক ফুট উচ্চ আছে। ইহার সম্মুখে ৭০ ফুট উচ্চ একটি পদ্মরাগের মত উজ্জ্বল স্তম্ভ, যেখানে স্বয়ং শাক্যসিংহ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, ইত্যাদি বহু কথা সারনাথ সম্বন্ধে লেখা আছে। এখন সারনাথের কীর্ত্তি বিধ্বস্তপ্রায় হইলেও ইংরাজরাজের চেষ্টায় পুনরায় বহুবিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীন পর্য্যটকের সময় হইতে সারনাথের অধঃপতন ঘটিয়াছিল! পরিশেষে পালরাজগণের চেষ্টায় পূর্ব্বকীর্ত্তি কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইলেও অশিক্ষিত মুসলমান নরপতিগণের সময়ে নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছে। এমন কি, বৌদ্ধপ্রভাবের শেষ চিহ্নটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। একটি সঙ্ঘারাম নাই—আছে কেবল বিরাটকলেবর বিলুপ্ত অশোক-স্তূপ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গুপ্তসম্রাট্গণের উৎসাহে কাশীধাম শত

শত সৌধমালায় ও দেবমূর্ত্তিতে সুশোভিত হইয়াছিল এবং চীন পর্য্যটকের ভারতাগমনের প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে কাশীর রাজা ছিলেন বালাদিত্য; ইনিই মালবরাজের সাহায্যে হূণরাজ তোরমাণ ও মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পর ...পুত্র প্রকটাদিত্য কাশীর রাজা হইয়াছিলেন ও ৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে পুনরায় কাশী গুপ্ত সম্রাটের অধীন হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর ১ম পাদে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মদেবের অধীন হয়। যশোবর্ম্মদেব মালব, মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি স্থান জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সভার অন্যতম কবি বাক্‌পতিরাজকৃত 'গউংবহো' নামক প্রাকৃত কাব্যে ঐ দিগ্বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধে পরাজিত মগধনাথের নাম ঐ কাব্যে না থাকিলেও গৌড়ের রাজমালায় ঐ রাজার নাম দিয়াছেন ২য় জীবিতগুপ্ত, ইনি নেপালরাজ শিবদেবপুত্র জয়দেবের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। ২য় জীবিতগুপ্তের পিতামহভগিনীর সহিত মৌখরি-বংশীয় ভোগবর্ম্মার বিবাহ হয়; ভোগবর্ম্মার কন্যার সহিত নেপালরাজ শিবদেবের বিবাহ হয়, শিবদেবের পুত্র জয়দেব কামরূপরাজ হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। তবেই ২য় জীবিতগুপ্তের পিতামহভগিনীর দৌহিত্র জয়দেব তাহার সমসাময়িক ব্যক্তি, এই জয়দেব নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরণে এই পরিচয় উৎকীর্ণ করাইয়াছেন; উহা ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ।

যশোবর্ম্মদেব ৭৩১ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে এক জন দূত চীন-সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, ইহা চীনদেশীয় ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ফরাসী পণ্ডিত শাবন ও লেভির মতে ঐ দূত ৭৩৪-৭৪৭ মধ্যে প্রেরিত হইয়াছিল।

যশোবর্ম্মদেব কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় কর্ত্তৃক পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়া মগধদেশে যশোবর্ম্মপুর নামক একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। পালবংশীয় সম্রাট্ দেবপালের ক্ষোদিত লিপিতে যশোবর্ম্মপুরের উল্লেখ আছে। ইহার পর কাশ্মীরাধিপতির সন্তোষার্থে গৌড়রাজ যশোবর্ম্মদেব কতকগুলি হস্তী প্রেরণ করেন। তাহার পর কাশ্মীররাজের আহ্বানে যশোবর্ম্মদেব কাশ্মীরে গমন করিলে পরিহাসপুরের (বর্ত্তমান পরসপোর উত্তর) নামক নগরে পরিহাসকেশব নামক দেবতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া ললিতাদিত্য প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি তাহার অতিথির অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু রাজা ললিতাদিত্য ত্রিগ্রামী নামক স্থানে অতিথিকে হত্যা করিয়া স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। গৌড় ও কাশীপতির ভৃত্যগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য সারদা দেবীর যাত্রাচ্ছলে পরিহাসকেশবের মন্দির অবরোধ করে ও ভ্রমক্রমে রামস্বামীর মূর্ত্তি ধ্বংস করে, কাশ্মীররাজ তখন কাশ্মীরে ছিলেন না। ইতোমধ্যে রাজধানী শ্রীনগর হইতে সৈন্যগণ আসিয়া গৌড়গণকে আক্রমণ করিলে তাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সংগ্রামে নিহত হয়। কহ্লনের সময়েও (দ্বাদশ শতাব্দীতে) রামস্বামীর মন্দির শূন্য ছিল। ললিতাদিত্য ৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৪৯ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজা ছিলেন। ইনি ...ীয় বীর ছিলেন। ইহার সমগ্র জীবনের মধ্যে গৌড়রাজকে হত্যা করাই প্রধান কলঙ্ক। কাশ্মীররাজ হিমালয়ে আর্য্যানক-... অসময়ে অতিরিক্ত বরফপাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মতবিশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি যশোবর্ম্মদেবের অন্যতম সভা-কবি ছিলেন। যশোবর্ম্মা বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার সময়ে তাঁহারই প্রযত্নে কাশী কনোজরাজ্যের অধীন হয়। তিনি কনোজে ও কাশীতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা দ্বারা লুপ্তপ্রায় বৈদিক ধর্ম্মের উদ্ধারসাধন ও কাশীতে সমধিক বেদচর্চ্চার উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার পরে তৎপুত্র চক্রায়ুধ ও পৌত্র ইন্দ্রায়ুধ রাজা ছিলেন।

৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে উত্তরাপথে কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতী-হারবংশ, গৌড়ের পালবংশ এবং মান্যখেতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারই রাজ্য দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই।

দেবহূতির পুত্র অবন্তীরাজ বৎস পিতার মৃত্যুর পর ভিল্লমাল রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া পূর্ব্বে গৌড়, পশ্চিমে সিন্ধু, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। বৎসরাজ ৭০৫ শকে জীবিত ছিলেন, ইহা জৈন হরিবংশপাঠে জানা যায়। ৭০৫ শকে বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে (যশোবর্ম্মদেবের পৌত্র) ইন্দ্রায়ুধ উত্তরদিক্, কৃষ্ণপুত্র বল্লভরাজ দক্ষিণদিক্, অবন্তীরাজ বৎস পূর্ব্বদিক্, এবং জয়যুক্তবরাহ পশ্চিমদিক্ পালন করিতে-ছিলেন। (১)

উত্তরাপথেশ্বর শ্রীহর্ষ বিজয়ী কর্ণাট-সৈন্যগণগ্রহ দন্তিদুর্গ জয় করেন। তৎপৌত্র ধ্রুবধারাবর্ষ ৭৭৫-৭৯৫ খৃঃ অব্দে রাষ্ট্রকূট সিংহাসন দখল করেন,—কিন্তু উত্তরাপথে অধিক দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই।

এই সকল রাজগণমধ্যে যে কে কখন্ কাশী জয় করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। এই সকল রাজারই অল্পবিস্তর কীর্ত্তি কাশীতে ছিল, বৎসরাজ-বংশধর ভোজ-দেব ও তাঁহার বংশধর পাল উপাধিধারী রাজগণ বারাণসী ও শ্রাবস্তীর (২) মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বারাণসীতে বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভোজদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহেন্দ্রপাল বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রপালের সময়ে পূর্ব্ব-দিকে তীরভুক্তি ও মগধ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ৯৫৫ বিক্র-মাব্দে ৮৯৮ খৃঃ অব্দে মহেন্দ্রপালদেব একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন।

যোধপুররাজ্যান্তর্গত দৌলতপুরায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনপাঠে জানা যায় যে, ৮৪৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ১ম ভোজদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

---

(১) শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্। পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাদিরাজেঽপরাং মৌর্য্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি॥

(২) শ্রাবস্তী—অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত সাহেত বা মাহেত নামে বর্ত্তমানে পরিচিত।

১ম বিগ্রহপাল যে সময়ে গৌড়, মগধ ও বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন, ঠিক সেই সময়ে গুর্জ্জরগণ ১ম ভোজদেবের নেতৃত্বে উত্তরাপথ বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ভোজদেব মিহির, আদি-বরাহ, প্রভাস প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভোজদেব ৫০ বর্ষের অধিক কাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ৮৪৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই কান্যকুব্জ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, ৯৩২ বিক্রমাব্দে ৮৭৫ খৃঃ অব্দে ভোজদেব কর্তৃক নিযুক্ত গোপাদ্রির (গোয়ালিয়রের) শাসনকর্ত্তা একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রের পৌত্র ধ্রুব রাজদেব (দ্বিতীয় ধ্রুব) ৭৮৯ শকে ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মিহির বা ভোজদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১ম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল ভোজদেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মগধ ও তীরভুক্তির অধিকাংশ ভোজদেবকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নারায়ণপাল ভোজদেবের অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী রাজ্যের শেষার্দ্ধে তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। গুর্জ্জররাজ ১ম ভোজদেব বারাণসী অধিকার করিয়া পরে মগধ আক্রমণ করেন, সাগরতালের আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ভোজদেব তাঁহার প্রধান শত্রু বঙ্গদিগকে কোপ-বহ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (১) ভোজরাজ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। তিনি এক জন বীর পণ্ডিত সহৃদয় গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন, তাঁহার সময় সম্বন্ধে বহু মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ভোজদেবের সময় ৯৩২—৯৮৩ শক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ ১০৩৮ বিক্রমাব্দ বা ৯৪৩ শকাব্দে ভোজের দানপত্রের কথা বলিয়াছেন। বামনাচার্য্য ৯১৮-৯৭৩ শক ১০৩৬ শকাব্দ (২) ভোজদেবের বৃদ্ধাবস্থায় তিনি সিদ্ধান্তশিরোমণিকার ভাস্করাচার্য্যকে বিদ্যাপতি উপাধি দান করেন। মৈথিল ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যও ভোজরাজের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ৯০৬ শকে লক্ষণাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। (৩)

ভোজদেবের সম্বন্ধে উল্লিখিত সময়প্রভেদ অনেক, ভোজের পৌত্র ২য় ভোজদেবও ১ম ভোজদেবের ন্যায় গুণভূষিত ছিলেন, এই কথা বলা হয়। ভোজদেবকৃত যোগদর্শনের, ব্যাকরণের ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের অত্যুপাদেয় গ্রন্থসকল আছে।

কলচুরিবংশীয় ১ম শঙ্করগণের পুত্র ১ম গুণাম্ভোধিদেব ভোজদেবের সহিত মিলিত হইয়া অথবা সামন্তরূপে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। গুণাম্ভোধিদেবের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ সোঢ়দেব ১১৩৪ বিক্রমাব্দে (১০৭৭ খৃঃ অব্দে) সরযূপারের অধিপতি ছিলেন।

মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় ভোজদেব কান্যকুব্জের রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই রাজ্যলাভ নির্ব্বিবাদে ঘটে নাই, কারণ, চেদিবংশীয় ১ম কোকল্লদেব তাঁহাকে সাহায্য করিয়া পিতৃসিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। চেদিবংশীয় রাজগণের শিলালিপিতে জানা যায় যে, ১ম কোকল্লদেব পৃথিবীতে দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন—১ম কীর্ত্তিস্তম্ভ উত্তরদিকে ভোজদেব, দ্বিতীয় দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় কৃষ্ণ বা অকাল-বর্ষ। (১) কোকল্লদেবের পরবর্ত্তী বীর সম্রাট কর্ণদেবের বারাণসীতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোকল্লদেব ভোজ বল্লভরাজ চিত্রকূটভূপাল শ্রীহর্ষ, এবং শঙ্করগণকে অভয়দান করিয়াছিলেন। (২) ভোজশব্দে দ্বিতীয় ভোজ, বল্লভরাজপদে দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং চিত্রকূটরাজ বলিতে চন্দেল্লবংশীয় রাজা শ্রীহর্ষ বুঝিতে হইবে। হর্ষ ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ যাঁহার সমসাময়িক, তিনি কখনও ১ম ভোজদেবের সমসাময়িক হইতে পারেন না।

দ্বিতীয় ভোজদেব অত্যল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালদেব সিংহাসন লাভ করেন। এই সময়েই গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরব্ধ হয়। তাঁহার অভিষেকের অল্পকাল পরেই দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৌত্র ইন্দ্র উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া গুর্জ্জর-রাজধানী কান্যকুব্জ ধ্বংস করেন। (৩)

তৃতীয় ইন্দ্রের নরসিংহ নামক জনৈক সামন্ত যমুনা পার হইয়া পলায়নপর মহীপালের অনুসরণ করিতে করিতে সাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে তদীয় অশ্বকে স্নান করাইয়াছিলেন। (৪)

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।

---

(১) ধারাবর্ষসমুন্নতিং গুরুতরামালোক্য লক্ষ্যা যুতো,
ধামব্যাপ্তদিগন্তরোঽপি মিহিরঃ সদ্বংশ্যবাহান্বিতঃ।
যাতঃ সোঽপি সমং পরাভবতমোব্যাপ্তাননঃ কিং পুন-
র্যেঽতীবামলতেজসা বিরহিতা হীনাশ্চ দীনা ভুবি।
যস্য বৈরিবৃহদ্বঙ্গান্ দহতঃ কোপ-বহ্নিনা।
প্রতাপাদর্ণসাং রাশীন্ পাতুর্বৈতৃষমাবভৌ॥

(২) রসগুণ-পূর্ণ-মহীসম-শকনৃপ-সময়েঽভবন্মমোৎপত্তিঃ,
রসগুণ-বর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ।

(৩) তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্॥

(১) জিত্বা কৃৎস্নাং যেন পৃথ্বীং সমগ্রাং
কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বন্দ্বমারোপ্যতেস্ম।
কৌম্ভোদ্ভব্যাং দিশ্যসৌ কৃষ্ণরাজঃ
কৌবের্য্যাঞ্চ শ্রীনিধির্ভোজদেবঃ।

(২) ভোজে বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকূট-ভূপালে।
শঙ্করগণে চ রাজনি যস্যাসীদভয়দঃ পাণিঃ॥

(৩) যস্মাত্তদ্বিপদণ্ডঘাতবিষমং কালপ্রিয়প্রাঙ্গণং
তীর্ণা যত্তুরগৈরগাধ-যমুনা-সিন্ধুপ্রতিস্পর্দ্ধিনী।
যেনেদং হি মহোদয়ারিনগরং নির্ম্মূলমুন্মূলিতং
নাম্নাঽদ্যাপি জনৈঃ কুশস্থলমিতি খ্যাতিং পরাং নীয়তে।
কম্রায় আবিষ্কৃত ৪র্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন।

(৪) কনোজ ভাষায় পম্পরাজ-চরিত কর্ণাট শব্দানুশাসন।

মহাজন-বাণী

(মহাকবি ভবভূতির নীতি-বাক্য ও সদুক্তি)

দেশে নীতিশিক্ষার বড়ই অভাব। অথচ এই শিক্ষার উপযোগিতা সর্ব্বপ্রধান। পুঁথিগতবিদ্যা যত হউক বা না হউক, ব্যক্তিমাত্রেরই নৈতিক শিক্ষা আগে চাই। পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মূল ভিত্তিই ছিল নৈতিক শিক্ষা। বিজ্ঞ ও প্রবীণগণের মুখে প্রায়ই বহুমূল্য নীতি-বাক্য শুনা যাইত। চাণক্য-শ্লোক,—হিতোপদেশের শ্লোক—এবং পুরাণাদির হিত ও মনোহারী শ্লোকসমূহ পণ্ডিত ও সামাজিক প্রাজ্ঞগণের মুখে-মুখেই থাকিত। সমাজে নীতিশিক্ষা এই ভাবেই প্রচারিত হইত। নিরক্ষর ব্যক্তি পর্যান্ত এইরূপে প্রচারিত নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া—চরিত্রগঠনের সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত হইত। ধনী,—নির্ধন, ভদ্র,—ইতর—সকলেরই ব্যবহারগত শিষ্টতা ও মাধুর্য্য এবং অকৃত্রিমতা ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে তৃপ্তি দান করিত।

এই নীতিশিক্ষার অভাবের দিনে—নীতিবাক্য-সঙ্কলনই আমার ব্রত। এই সকল বাক্য সমাজের কাণের নিকট ধ্বনিত করিয়া যদি এক জনেরও মানসিক উন্নতি এবং আন্তরিক শিষ্টতা-সাধন করিতে পারি,—তবেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

এই সকল মহামূল্য সদুক্তিসংগ্রহের অপর উদ্দেশ্য এই যে, এইগুলি শিক্ষা করিয়া সভায়, সমাজে বা মজলিসে যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারিলে বাক্যের প্রাবীণ্য ও প্রামাণিকতাই প্রকাশ পায়। "সদসি বাক্‌পটুতা" এই ভাবেই গড়িয়া উঠে।

সামাজিকগণের উচিত, তাঁহারা এই সকল মহাজন-বাক্য কণ্ঠস্থ করেন এবং ছাত্র, পুত্র ও প্রতিবেশী বালক-বালিকাগণকে শিক্ষা দেন। মহাত্মা ৺ভূদেব বাবু এইভাবেই তাঁহার বাটীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতেন।

অদ্য মহাকবি শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির অমূল্য কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সুধীসমাজের সম্মুখে ধরিব।

১। সাধু-সঙ্গ।

সজ্জনগণের সহিত সমাগম পুণ্য দ্বারাই সম্ভব হয়। মহাকবির কথা এই—

"সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।"

সজ্জনের সহিত সঙ্গলাভ অতি দুর্ল্লভ—বহু পুণ্যফলেই ঘটিয়া থাকে। ভবভূতির সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্রও কহিয়াছেন—

"স্মরণং শ্রবণং বাপি দর্শনং বা মহাত্মনাম্।
সেয়ং কুশলবল্লীনাং মহতী ফলসন্ততিঃ॥" অবদানকল্পলতা

এই হেতু সাধু-সঙ্গের জন্য প্রত্যেকের সতত চেষ্টিত হওয়া উচিত। (উত্তরচরিত, ২য় অঙ্ক ১ম শ্লোক)

২। সাধুব্যক্তির প্রকৃতি।

এই প্রসঙ্গেই সজ্জনগণের চরিত্র কিরূপ অকৃত্রিম—শিষ্টতামণ্ডিত, —পরহিতৈষাপ্রবণ—এবং বিনয়-মধুর বাক্য দ্বারা মধুময়, তাহা মহাকবি কহিতেছেন—

"প্রিয়প্রায়া বৃত্তির্বিনয়মধুরো বাচি নিয়মঃ
প্রকৃত্যা কল্যাণী মতিরনবগীতঃ পরিচয়ঃ।
পুরো বা পশ্চাদ্বা তদিদমপর্য্যাসিতরসং
রহস্যং সাধুনামনুপধিবিশুদ্ধং বিজয়তে॥"

(২য় অঙ্ক ২য় শ্লোক)

সাধুগণের ব্যবহার সকলেরই প্রীতিকর,—লোকের অনিষ্ট বা অপ্রীতিকর কার্য্য তাঁহারা কখনই করেন না। তাঁহাদের কথা কহিবার রীতি বিনয়-মধুর ও সুমিষ্ট। সতত লোকের হিতকামনাই তাঁহাদের স্বভাব,—লোকের যাহাতে কল্যাণ হয়,—কিসে ভাল হয়—এই শুভাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহাদের অনুরাগ বরাবরই একরূপ অচল অটল ভাবে থাকে। সাধুগণের এই নিষ্কৃত্রিম অনাবিল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট আদৃত হইয়া থাকে।

এই আদর্শে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চরিত্র শিষ্টতামণ্ডিত,—কপটতাশূন্য,—পরহিতাকাঙ্ক্ষী ও বিনয়-মধুর সম্ভাষণ দ্বারা মধুময় করিয়া তুলিবে।

৩। অহমিকাপূর্ণ গর্ব্বোক্তি বর্জ্জনীয়।

সাধুগণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন বিনয়, তেমনই অসাধু দাম্ভিকগণের চরিত্রে উহার বিপরীত ভাবই পরিদৃষ্ট হয়—

অহমিকাপূর্ণ গর্ব্বোক্তিকে মহাকবি—"রাক্ষসী বাক্" কহিয়াছেন। যথা— (৫ম অঙ্ক ৩য় শ্লোক)

"ঋষয়ো রাক্ষসীমাহুর্বাচমুন্মত্তদৃপ্তয়োঃ।
সা যোনিঃ সর্ব্ববৈরাণাং সা হি লোকস্য নির্ঋতিঃ॥"

উন্মত্তের প্রলাপ ও অহঙ্কারপূর্ণ দাম্ভিকের গর্ব্বোক্তিকে মনীষী ঋষিগণ "রাক্ষসী বাক্" কহিয়াছেন।—এইরূপ বাক্য যত কিছু শত্রুতার কারণ। দাম্ভিকের বাক্যে সকলেই ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই 'নির্ঋতি' বা অলক্ষ্মীর আকর।

এই হেতু কাহারও পক্ষে বাক্য দ্বারা দম্ভ বা গর্ব্ব প্রকাশ করা উচিত নহে।

৪। প্রিয় ও সত্যবাক্যের প্রশংসা।

"কামান্ দুগ্ধে বিপ্রকর্ষত্যলক্ষ্মীং
কীর্ত্তিং সূতে দুষ্কৃতং যা হিনস্তি।
তাং চাপ্যেতাং মাতরং মঙ্গলানাং
ধেনুং ধীরাঃ সূনৃতাং বাচমাহুঃ॥

(৫অঙ্ক ১৩ শ্লোক)

"সূনৃত" বা প্রিয়-সত্য বাক্য দ্বারা লোক বশীভূত হয়,—তাহার ফলে ঐরূপ বাক্য-প্রয়োগকারীর সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়, —যশ ও সুখ্যাতি হয়। এইরূপ বাক্যকে মনীষিগণ নিখিল মঙ্গলের আস্পদরূপে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ বাক্য—পূর্ব্বোক্ত রাক্ষসীবাক্যের বিপরীত। এই জন্য ইহার ফলও কল্যাণকর।

৫। আদর্শ অকৃত্রিম প্রেম।

সজ্জনের সহিত অকৃত্রিম প্রেম অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার প্রতি সীতার অনাবিল প্রেম-বর্ণন প্রসঙ্গে—এই বিমল প্রেমের কথা কহিতেছেন।—যে প্রণয় সকল অবস্থাতেই—সুখে দুঃখে,—বিপদে সম্পদে—একইরূপ থাকে,—কোন অবস্থাতেই বিগড়াইয়া যায় না,—পাণ থেকে চূণ খসিলেই যে প্রেম টুটিয়া যায় না,—যে প্রণয় হেতু হৃদয়ের পূর্ণ নির্ভরতা বা বিশ্বাস জন্মায় —এইরূপ প্রেমই আকাঙ্ক্ষার জিনিষ। নতুবা আজ প্রেমের তুফান উঠিয়াছে,—কাল ভাটা পড়িয়া গেল,—আজ খুব দহরম

মহরম—কাল মুখ-দেখাদেখি বন্ধ—এমন ক্ষণভঙ্গুর প্রেম না হইলেও চলে। এ বিষয়ে মহাকবির বাক্য শুনুন।—

(১ম অঙ্ক ৩৯ শ্লো)

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্-
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥"

জীবনে প্রকৃত সজ্জনের সহিত অকৃত্রিম অনাবিল প্রেম—সকলের ভাগ্যে সহজে ঘটে না,—যে প্রেম সুখ ও দুঃখে এক-রূপ—এবং সকল অবস্থাতেই অটুট,—যে প্রেমের উপর হৃদয়ের পূর্ণ নির্ভরতা বা বিশ্বাস উৎপন্ন হয়,—যে প্রেমের মধুরতা বার্দ্ধক্যেও অপসৃত হয় না,—বরং যতই দিন যায়, ততই সঙ্কোচ বা বাধ-বাধ ভাব গিয়া—প্রগাঢ় স্নেহে পরিণত হয়,—"দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু" হইয়া দাঁড়ায়—এই খাঁটি প্রেম অতি দুর্ল্লভ পদার্থ।

মহাকবিবর্ণিত এই প্রেমের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া যাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা চাই।—তাহার প্রতি নিষ্কৃত্রিম অনাবিল স্থায়ী প্রেম পোষণ করিতে হইবে। ক্ষণভঙ্গুর কপট প্রেমের কোনই মূল্য নাই।

৬। প্রথম দর্শনে যে প্রণয়োৎপত্তি—ইহাই স্বাভাবিক প্রেম।

(৫ম অঙ্ক সুমন্ত্রবাক্য ১৭ শ্লোক)

"ভূয়সা জীবধর্ম্ম এষ যদ্ রসময়ী কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রীতিঃ। যত্র লৌকিকানামুপচারস্তারামৈত্রকং চক্ষুরাগ ইতি। তমনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি।"

"অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া।
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তর্ম্মর্মাণি সীব্যতি॥"

জীবগণের মধ্যে ইহা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির—অপর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দেখিবামাত্রই অনুরাগ উৎপন্ন হয়—ইহাকেই লৌকিক ভাষায় বলা হয়—'তারামৈত্রক' বা 'চক্ষুরাগ' (Love at first sight)—অর্থাৎ দর্শনমাত্রেই পরস্পরের প্রীতির সঞ্চার। ইহাকেই স্বাভাবিক বা নিষ্কারণ প্রেম বলা হয়; এই প্রেম কোন স্বার্থকারণ-জনিত নহে। এই নিষ্কারণ প্রেমের প্রতীকার নাই,—যেহেতু, ইহা স্নেহময় তন্তুরূপে উভয়ের হৃদয় গাঁথিয়া থাকে।

৭। অপত্য-স্নেহ

সন্তান যে পিতা-মাতার কত স্নেহের পাত্র,—তাহা ভাবের কবি ভবভূতি অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—এমন অন্য কোনও কবি পারিয়াছেন কি না জানি না।

"প্রসবঃ খলু প্রকর্ষপর্য্যন্তঃ স্নেহস্য—পরমং চৈতদন্যোন্যসংশ্লেষণং পিত্রোঃ—

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি বধ্যতে॥"

(উঃ চরিত ৩ অঙ্ক ১৭ শ্লোঃ)

'প্রসব' বা সন্তানই হইল স্নেহের পরাকাষ্ঠা। উহা পিতা ও মাতা উভয়ের হৃদয়ের বন্ধনস্বরূপ। সন্তান—পতি পত্নী উভয়েরই স্নেহের সাধারণ আশ্রয় বা আধারস্বরূপ অর্থাৎ পিতার স্নেহ সন্তানে যেমন আসিয়া পড়ে—মাতার স্নেহও ঐরূপ উহাতে আশ্রয় করে। উভয়ের স্নেহ মিলিত হইবার একমাত্র পাত্র হইল পুত্র বা কন্যা। এই হেতুই সন্তান পিতামাতার হৃদয়-যুগলের যেন 'আনন্দগ্রন্থি' অর্থাৎ আনন্দময় বন্ধন (a Joyous link that knits the parent's hearts)

৮। তেজস্বীর তেজঃপ্রকাশ।

এক জন তোমার উপর তেজ ফলাইল—আর তুমি নীরবে তাহা সহিয়া আসিলে—ইহা কাপুরুষতামাত্র। মহাত্মা খ্রিশ্ট যে দক্ষিণ গণ্ডে করাঘাত পাইয়া বাম গণ্ড পাতিয়া দিতে বলিয়াছেন,—অথবা গান্ধি-জী যে শত্রুকৃত শত অত্যাচারেও অহিংস-নীতি অনুবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—আধ্যাত্মিক আদর্শে তাহা উত্তম। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে এইরূপ নিরীহতায় মন্দ বৈ ভাল হয় না। প্রকৃত তেজীয়ান্ কখনই অপরের তেজ সহ্য করিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব বাল্মীকির আশ্রমসন্নিকটে পৌঁছিলে—অশ্বরক্ষকগণের গর্ব্বদীপ্ত বাক্যে কুশ ও লব উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন।—তাঁহাদের এই তেজস্বিতায় প্রীত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদের প্রশংসাচ্ছলে কহিতেছেন— (৬ অঙ্ক ১৪ শ্লোক)

"ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে
স তস্য স্বো ভাবঃ প্রকৃতিনিয়তত্বাদকৃতকঃ।
ময়ূখৈরশ্রান্তং তপতি যদি দেবো দিনকরঃ
কিমাগ্নেয়ো গ্রাবা নিকৃত ইব তেজাংসি বমতি॥"

তেজস্বী ব্যক্তি অপরের তেজঃপ্রকাশ সহ্য করিতে পারে না। ইহাই তাহার স্বভাব—এবং স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ইহা অকৃত্রিম। দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্য যদি তাঁহার কিরণমালা দ্বারা অজস্র তাপ প্রদান করিতে থাকেন, তাহা হইলে সূর্য্যকান্তমণি সেই তেজ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন নিজ হইতে তেজ উদ্গিরণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে আমাদিগকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। কাহারও তেজ—তিনি যত বড়ই হউন—মাথা পাতিয়া সহ্য করা হইবে না। কেহ তেজঃ প্রকাশ করিলে সুদে আসলে তাহার প্রতিশোধ দিয়া তাহাকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা ভীরু ফেরুপাল নহি। ইংরাজীতে একটি কথা আছে "Even a worm turns when it is trodden."—এইরূপ ব্যবহার করিতে শিখিলেই ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে, তবেই জাতি সবল প্রতিপন্ন হইবে—অপর জাতি ভয় ও শ্রদ্ধা করিবে। নতুবা ভীরু ও কাপুরুষের দল বলিয়া—নিত্য নূতন দলনের আয়োজন হইতে থাকিবে।

৮। অসাধারণ ব্যক্তিগণের চরিত্র

বজ্র অপেক্ষা কঠোর,—আবার কুসুম অপেক্ষা কোমল। সংসারে অবস্থাবিশেষে—কোমল হৃদয়ে দয়া ও ক্ষমা করিতে হয়, আবার কঠোরতার সহিত দণ্ডেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। এক-বারে ক্ষমাশীল নির্জ্জীব মাটীর মানুষ হইলে চলে না,—আবার নিরন্তর কঠোর হইয়া থাকিলেও চলে না। তাই মহাকবি, শ্রীরামচন্দ্রের এক দিকে সীতানির্ব্বাসনবিষয়ে কঠোরতা এবং অপর দিকে অশ্বমেধযজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীরূপে হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতির ব্যবস্থায় কোমলতা—এই উভয় ভাবের সংমিশ্রণ বর্ণনপ্রসঙ্গে কহিতেছেন—(২ অং ৭ শ্লোঃ)

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

'লোকোত্তর' বা আদর্শ মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে—একাধারে কোমল ও কঠোর ভাব পরিদৃষ্ট হয়। অপরাধীকে এক দিকে বজ্র-হস্তে শাসন করিতে হইবে, অপর দিকে শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার জন্য কুসুম-পেলব হৃদয় পাতিয়া দিতে হইবে। এই 'কড়ি-কোমল' ভাবের সমাবেশেই—মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে। জগজ্জননী ভগবতী শ্রীশ্রীদুর্গার স্তবেও দেবগণ গাহিয়াছেন—

"—চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি।"

(চণ্ডী ৪ অধ্যায়।)

"হে দেবি! এক দিকে শরণাগত ভক্তের জন্য তোমার চিত্তে কৃপা, অপর দিকে পাপী দৈত্যগণের দলনে তোমার নিষ্ঠুরতা—ত্রিভুবনে এই কোমল ও কঠোরতার মিশ্রণ কেবল তোমাতে দৃষ্ট হয়।" আমাদের দেবদেবীগণের এক হস্তে বরাভীতি এবং অপর হস্তে নিশিত প্রহরণ, ইহার মূলেও ঐ কোমল-কঠোর ভাবের সমাবেশ।

২। গুণই পূজার পাত্র

গুণের আদর করা—ভারতবর্ষের নিজস্ব। গুণী ব্যক্তি যে বর্ণেরই হউন,—স্ত্রী বা পুরুষ হউন—বয়োজ্যেষ্ঠ বা বালক হউন—তাঁহার পূজা ভারতের হিন্দুমাত্রেই করিয়া থাকেন। শিশু ধ্রুব তাঁহার একনিষ্ঠ তপস্যা ও সিদ্ধির জন্য ভারতের আবালবৃদ্ধের নিকট পূজ্য। ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহার ব্রহ্মচর্য,—সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য ব্রাহ্মণগণেরও পূজ্য। ব্রাহ্মণগণের পক্ষেও ভীষ্মতর্পণের ব্যবস্থা আছে; ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা ত অবতার—সকলেরই পূজ্য। ধর্ম্মব্যাধ ব্যাধজাতীয় হইলেও ব্রাহ্মণের পূজ্য বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে। সীতা, সাবিত্রী—স্ত্রীজাতি হইলেও সর্ব্বসাধারণের পূজ্যা। অরুন্ধতী—সীতার গুণ আলোচনা করিয়া প্রশংসাচ্ছলে কহিতেছেন—

"শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাম্
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"

সীতা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং স্ত্রীজাতি হইলেও—সারা জগতের বন্দনীয়া—যেহেতু, গুণই পূজার পাত্র,—ব্যক্তিগত বয়স বা স্ত্রীপুরুষ এইরূপ লিঙ্গভেদে কিছুই আসিয়া যায় না। গুণী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া তাহার গুণেরই পূজা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় আদর্শ।

এখন আমরা অনেকটা এই আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছি। এখন কোন ব্যক্তির গুণের প্রশংসা কেহ করিলে—ঐ লোকটির ঘাঁটঘাঁটিতে লাগিয়া যাই, অর্থাৎ উহার নানা দোষ উদ্ঘাটন করিতে থাকি। ইহা ঠিক নহে—লোকটা যাহাই হউক—সে দিকে না তাকানই ভাল—তাহার যতটা গুণ আছে—তাহার জন্য তাহাকে সম্মান করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ (এম, এ)।

স্মৃতি-নিবন্ধকার মনীষিত্রয়ের পরিচয়

দেশের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ অল্পবিস্তর জানিয়া আসিতেছেন যে, জাতির কল্যাণ ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মই মানবজীবনের মর্ম্মস্থান। যখনই দেশে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের একমাত্র নিদান ধর্ম্মরূপনদীর স্রোতঃ ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন তাহার রক্ষাকল্পে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। কারণ, ধর্ম্মস্রোতঃ অব্যাহতগতিতে সংসারে প্রবাহিত না হইলে সমাজের শান্তি ও মৈত্রী-বন্ধন শিথিল হয়, তাহাতে ক্রমে লোক ধ্বংসপথের পথিক হইয়া থাকে। সৃষ্টির লোপ ঘটে। ভগবান্ যেমন যুগাবতারে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে পূর্ণভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনই ভক্ত কর্ম্মী ও বৈদিকধর্ম্মের উপদেষ্টা ও লোকোত্তর বীর প্রভৃতিতে অংশরূপে আসিয়া ধর্ম্মের শৃঙ্খলা রাখিয়া থাকেন।

এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় স্মৃতিনিবন্ধকর্ত্তা মহাত্মারাও কর্ম্মমার্গের সাধনপ্রণালী দেখাইয়া বিধিনিষেধের ভিতর দিয়া ত্যাগেরই মূলমন্ত্র পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিভূতিমৎ সত্ত্ব বুঝিয়া ভগবানেরই অংশভূত বলা যায়।

সেই অবতারভূত আপ্তজনের বিষয় আলোচনা করাও শান্তিপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম ও শান্তির বিশ্রামগৃহ, সুতরাং তাঁহাদের বিষয় কিছু বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

ব্যাস, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকার ঋষদের শ্রীমুখনিঃসৃত আজ্ঞাবাক্যই সনাতনবর্ণাশ্রমীর আচারানুষ্ঠানের উপযোগী। কিন্তু তাহাতে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের কাল দেশ অধিকারী অনুসারে যাঁহারা মীমাংসাসরণি দ্বারা সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিবন্ধকার বলে। দিন দিন জীবের বুদ্ধি, বিচারশক্তি, জ্ঞান ও আয়ুষ্কালের হ্রাস ঘটিতেছে, যদি ঐ সকল নিবন্ধকার অবতীর্ণ না হইতেন, তবে শ্রদ্ধাবান্ লোকরাও নিজ নিজ বুদ্ধির অনুসারে আর্ষবাক্যের অসঙ্গত অর্থ করিতেন, ইহাতে বিরুদ্ধবাক্যের বিবৃত সমাধান করা হইত, ইহাতে লোক ধর্ম্মানুষ্ঠানে পণ্ডশ্রম হইতেন।

(১) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালার যিনি আপ্তজনের ন্যায় শ্রদ্ধেয়বাক্ হইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, সেই স্বনামধন্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মীমাংসা দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে, তাঁহার বাক্যে ঋষিজনের অভিপ্রায় সরলভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। তাই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ সেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থকে প্রমাদহীন বুঝিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া তদনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

তিনি চতুর্ব্বর্ণের অনুষ্ঠেয় প্রতিপাল্য আচার ও ধর্ম্মের বিষয়ে কোন কথাই বলিতে ত্রুটী করেন নাই, তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধ মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি ২৮ খানি গ্রন্থে পরিণমিত বলিয়া আটাশ তত্ত্ব স্মৃতি বলিয়াও প্রচারিত আছে।

তিনি এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে মীমাংসা-সরণির অনুসরণে পরস্পর-বিরোধী ঋষিবাক্যের সমাধান ও পূর্ব্বাচার্য্যদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন ও যুক্তিতর্ক ও প্রমাণের অবতারণা দ্বারা যেরূপ ধর্ম্মাচার ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে এই বিদ্বদ্বরেণ্যের সর্ব্বশাস্ত্রবেদিতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি সকল মূল গ্রন্থ দেখিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিবন্ধগ্রন্থ ও

সকল শাস্ত্রেই যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থই পরিচয় দিতেছে।

বর্ত্তমানে লোক অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল প্রতিলিপি করিতে থাকিলেও তাঁহার সমগ্র গ্রন্থ ৫।৭ বর্ষে লিখা সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়নকালে যে সব মূল সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, এখন বৈদিকাচারীদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সেই সকল মূল পুস্তকের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার পক্ষে ২টি প্রধান কারণ বুঝা যায়, প্রথম দেশের লোক নিবন্ধকারের পুস্তক পাইয়া মূল পুস্তকের রক্ষাকল্পে যত্নের শৈথিল্য করিতে লাগিল; দ্বিতীয়—মধ্যে মধ্যে ভিন্নধর্ম্মীর নিষ্করুণ কটাক্ষের কবলে পড়িয়া অমূল্য পুস্তকরাশি চিরদিনের মত সংসার হইতে বিলোপ পাইল। ইহার পরও আর একটি কারণ, দেশের বৃত্তিসঙ্কট ও বৃত্তিসঙ্কট ঘটায় পুস্তকের লিখন-পঠন সম্প্রদায়ও নষ্ট হইয়া গেল।

বর্ত্তমানে আমাদের মাননীয় রাজার প্রজানির্বিশেষে অপক্ষপাত দৃষ্টির কৃপায় অবশিষ্ট কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থমধ্যে আত্মপরিচয় যাহা দিয়াছেন,তাহাতে জানা যায় যে,তিনি রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটীয় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এবং হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র (এই হরিহর ভট্টাচার্য্য পারস্করগৃহ্যের ভাষ্যকার) এবং নবদ্বীপে বসিয়াই রঘুনন্দন গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্বের মধ্যে দুইটি কালপরিচায়ক শ্লোক পাওয়া যায়।

একটি সংক্রান্তি আনয়নক্ষেত্রে বলা আছে—

"বিষুবং মীনকল্পাব্দে স্বেকাক্ষীন্দ্রশকাব্দকে।"

ইহাতে পাওয়া যায় যে, তিনি ১৪২১ শকে অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃঃ অব্দের লোক, আর দ্বিতীয়টি অয়নপরিচয়ক্ষেত্রে—

"নবাষ্টশক্র-হীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতাঃ।"

ইহাতে ১৪৮৯ শক অর্থাৎ ১৫৬৭ খৃঃ অব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে এই বিবেচনাই সঙ্গত যে, তিনি ১৪২১ শক হইতে ১৪৮৯ শক পর্য্যন্ত ৬৭ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং পুস্তকরচনার শেষসময় ১৪৮৯ শক ধরা যায়। এ বিষয়ে রঘুনন্দন চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়া যে প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিতেছে, তাহারও পোষক হইতেছে; কারণ, কিঞ্চিদধিক চারি শত বৎসর হইল চৈতন্যদেবের লীলা-বিচরণের সময়।

বিশেষতঃ ঐ সময় বঙ্গের সনাতনধর্ম্মীদের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন ঘটিয়াছিল, বিধর্ম্মীর প্রবল প্রভাবে লোকসকল আচার-ভ্রষ্ট ও ধর্ম্মে আস্থাহীন হয়। তখন ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া বৈদিকাচার বিপর্য্যস্ত করিতেছিল।

তাই এক দিকে ভগবৎপ্রেমে জীবকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাব, অপর দিকে সনাতন সদাচার রক্ষাকল্পে মহাত্মা রঘুনন্দন প্রভৃতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা রঘুনন্দন ভটাচার্য্যের কাছে বাঙ্গালার চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ কত যে ঋণী, তাহা সামান্য কথায় কৃতজ্ঞতা দেখাইলে পরিশোধ হয় না। রঘুনন্দনের ধর্ম্মমত বলিলে আর কোন তর্কই উঠে না। এক কথা বলিলে ইহাই বলা যায় যে, রঘুনন্দন আমাদের ধর্ম্ম ও আচারের শিক্ষাগুরু।

উঁহার বিষয়ে আর একটি গল্প চলিয়া আসিতেছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নিজের সঙ্কলিত গ্রন্থের অন্যতর ভাগবিশেষ সংস্কারতত্ত্বের অনুসরণে পুত্রকে উপনীত করিয়া তৎকালীন নবদ্বীপভূষণ এবং বর্ত্তমানাকারের ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক গুরুস্থানীয় রঘুনাথ শিরোমণির কাছে প্রণাম করাইতে লইয়া যান, কিন্তু শিরোমণি মহাশয় ঐ প্রণামকারী উপনীত বালককে প্রতিপ্রণাম করিলেন না। রঘুনন্দন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শিরোমণি মহাশয় উত্তর দিলেন, যদি তোমার মতই ঠিক হয়, তবে আমাদের উপনয়ন-সংস্কার অসিদ্ধ; সুতরাং আমরা অব্রাহ্মণ হইয়া তোমার ব্রাহ্মণপুত্রকে কিরূপে প্রতিপ্রণাম করিব? আর যদি আমরাই যথার্থ বেদসিদ্ধ বিধানে উপনীত হইয়া থাকি, তবে ব্রাহ্মণ হইয়া কেমনে তোমার এই অব্রাহ্মণ পুত্রকে প্রতিপ্রণাম করিব?

এই প্রকার শিরোমণির কথার পর হইতেই লোক রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্বে আস্থাহীন হইল। তাই স্মার্ত্তের সংস্কারতত্ত্বমতে দেশে আর বড় সংস্কার হয় না। রঘুনাথ শিরোমণির সময় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর, ইহা সিদ্ধান্তিত আছে। সুতরাং রঘুনন্দন তাঁহারই সময়ের।

এই মহাপুরুষের কথা কীর্ত্তনেও পুণ্যসঞ্চয় হয়।

(২) গোবিন্দানন্দ

আর এক জন বাঙ্গালী স্মৃতিসংগ্রহকার গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য রঘুনন্দনের কিঞ্চিদধিক সময়ের অর্থাৎ ঐ পঞ্চদশ গত খৃষ্টাব্দের তিনি অমূল্য রত্নভূত হইয়াও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বাঙ্গালায় সম্যক্ প্রতিষ্ঠা পান নাই। ইঁহার গ্রন্থে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ইনি রঘুনন্দনের ৪০ বর্ষ পূর্ব্বেকার সংগ্রহকার। রঘুনন্দন নিজগ্রন্থে ইঁহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দানন্দ নিজের পিতার পরিচয় দিয়াছেন—

"বিশ্বাঙ্গ-শ্রুতি-সম্মিতে কলিযুগস্যাব্দে প্রসিদ্ধান্বয়ো
ভট্টঃ খ্যাতগুণোত্তরো গণপতির্জ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ।
লক্ষ্মীনন্দি-পুরন্দরাগ্রজ-পদদ্বন্দ্বারবিন্দার্পিত-
স্বান্তঃ সন্ততমিন্দিরাপরিগতো জ্যোতির্ম্মতীমাতনোৎ॥"

অর্থাৎ ৪৬১৩ কল্যব্দে খ্যাতনামা গুণশালী জ্যোতির্বিদ্বরেণ্য গণপতিভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের পদারবিন্দ ধ্যান করিতে থাকিয়া এই জ্যোতিষ্মতী টীকা করিয়াছেন।

সুতরাং এখন হইতে ৪৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লেখা হয়, ইহা গণপতি ভট্টের প্রাচীন বয়সের, সন্দেহ নাই; কারণ, পুত্র গোবিন্দানন্দের গ্রন্থরচনাও প্রায় ঐ সময় ঘটিয়াছিল।

গোবিন্দানন্দ উপরি-উক্ত শ্লোকে পিতৃপরিচয় দিয়া পরেই লিখিতেছেন—

"তত্তনুজন্মা বিদুষামনুরাগে মধুলিকাভিরাসিক্তঃ।"

অর্থাৎ সেই গণপতিভট্টের পুত্র আমি পণ্ডিতবর্গের আগ্রহাতিশয়রূপ মধুতে পরিষিক্ত হইয়া এই গ্রন্থ করিতেছি।

পণ্ডিত গোবিন্দানন্দ তৎকালে নবাগত কান্যকুব্জীয় গৌতমগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরদের নিকট বিশেষ পৃষ্ঠপোষণ না পাওয়ায় নিজগ্রন্থের প্রতিপত্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাহাতে সমাজে অপক্ষপাতে গৃহীত না হইলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অপরিস্ফুট হন নাই, তাঁহার

গ্রন্থ পণ্ডিতরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন রঘুনন্দন প্রভৃতি সংগ্রহকাররা তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে উঠাইয়া লইয়াছেন। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ অল্পবিস্তর ন্যূনাধিক সময়ের হইলেও রঘুনন্দনের কর্ম্মস্থান নবদ্বীপ ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র। আর গোবিন্দানন্দের কর্ম্মস্থান বাঁকুড়া জেলার সামান্য ক্ষুদ্রপল্লী। সুতরাং তাহাতে যে গ্রন্থ-প্রসারের অসুবিধা হইবে, তাহা বলাই বেশীর ভাগ। আজিও গোবিন্দানন্দের বংশধররা তাঁহা হইতে দশপুরুষ রামসত্য বেদান্ততীর্থ প্রভৃতিরা গড়বেতার নিকট খুনবেড়িয়াতে আছেন। গোবিন্দানন্দ শেষজীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার তপঃশক্তির পরিচয়ক্ষেত্রে একটি প্রবাদ আজিও চলিয়া আসিতেছে। তিনি সন্ন্যাসী অবস্থায় নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এক সময় বারাসতের নিকট বামুনমুড়া গ্রামে উপস্থিত হন। ঐ সময় একটি গৃহস্থের শিশুপুত্রের আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী শেষ কার্য্যের জন্য স্বজনরা ব্যস্ত আছেন। এ দিকে তথাকার একটা বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসী গোবিন্দানন্দ বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তখন বালকের স্বজনরা দারুণ শোকার্ত্ত হইয়া সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাতরতা জানাইলে তিনি কৃপাপরবশ হইয়াই শিশুকে প্রাণদান করেন।

তাঁহার বিষ্ণুভক্তি অলৌকিকী। প্রতি গ্রন্থের আদিতে, শেষে ও মধ্যে মধ্যে যে বিস্তর প্রণাম-শ্লোক সকল দেখা যায়, তাহা পাঠ করিলে চিত্ত দ্রবীভূত হয়। ধন্য মহাপুরুষ, একাধারে সর্ব্বশাস্ত্রবেদিতা ও ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ এরূপ সাধক বঙ্গের বিশৃঙ্খলতার সময়ে আসিয়াছিলেন, তাই সনাতনধর্ম্মের মূলভিত্তি অস্খলিতই আছে। ইঁহার স্মৃতি-সংগ্রহ গ্রন্থ ছাড়া জ্যোতিষের জাতকার্ণব ও প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকা প্রচলিত আছে।

রঘুনন্দনের সঙ্গে—গোবিন্দানন্দের স্থানে স্থানে মতভেদ দেখা যাইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না; কারণ, তিনি কোন কথাই বিদ্যাভিমানে বলেন নাই—যেমন ভীষ্মতর্পণে গোবিন্দানন্দ শূদ্রাধিকার দেন নাই এবং দশহরাস্নান গঙ্গা ভিন্ন সকল স্থানেই বলেন।

গোবিন্দানন্দের স্মৃতিসংগ্রহ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। যথা—বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, দানক্রিয়াকৌমুদী, শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, শুদ্ধিকৌমুদী ও ক্রিয়াকৌমুদী। ইহার মধ্যে প্রথম চারি খণ্ড বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সভার ব্যয়ে "বিব্লিয়োথিকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। "ক্রিয়াকৌমুদী" খণ্ডখানির মাত্র একখানি অসম্পূর্ণ পুথি থাকায়, প্রকাশিত হয় নাই।

(৩) মৈথিল সংগ্রহকার চণ্ডেশ্বর ঠকুর

ইঁহার গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত পরিচয়ে জানা যায় যে, ইঁহার পিতা বীরেশ্বর ঠকুর ও পিতামহ দেবাদিত্য ঠকুর উভয়ে ক্রমিক মিথিলেশ্বর কর্ণাট ক্ষত্রিয়বংশীয় মহারাজ স্বাধীন হিন্দুনৃপতি হরিসিংহদেবের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। পরে চণ্ডেশ্বর সেই পিতৃপিতামহ-ক্রমাগত ঐ পদ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করিয়াছিলেন। সান্ধি-বিগ্রহিক পদ বলিতে ইহা বুঝা যায় যে, একাধারে সেনাপতি, মন্ত্রী ও সভা-পণ্ডিতের পদ। চণ্ডেশ্বর যুদ্ধবিদ্যায়ও সুনিপুণ ছিলেন। বেণ্ডলের নেপালের ইতিহাসে জানা যায়, যখন গিয়াসুদ্দীন তোগলকের নিকট পরাজিত হইয়া হরিসিংহদেব নেপাল অভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন চণ্ডেশ্বর ঠকুরের সৈন্যাপত্যে হরিসিংহ দেব নেপালরাজকে পরাজিত করিয়া নেপাল ভাটগাঁও নামক স্থানে রাজ্যস্থাপন করিয়া নিজের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন করিয়াছিলেন। ঐ সময় চণ্ডেশ্বর বহু গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন এবং অভিরামপুরে বিশাল সরোবর খনন করাইয়া বহুজীবের জীবনরক্ষক হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার সে কীর্ত্তি দেদীপ্যমান আছে। তিনি নেপালে বাগ্মতী নদীতীরে যে তুলাপুরুষ মহাদান করিয়াছিলেন, তাহার পরিচায়ক শ্লোক তাঁহারই বিবাদরত্নাকর গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাতে তাঁহার সময় পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই—

"রসগুণভুজচন্দ্রৈঃ সম্মিতে শাকবর্ষে
সহসি ধবলপক্ষে বাগ্মতী-সিন্ধুতীরে।
অদিততুলিতমুচ্চৈরাত্মনা স্বর্ণরাশিং
নিধিরখিলগুণানামুত্তরঃ সোমনাথঃ॥"

(বিবাদরত্নাকর)

ইহাতে প্রমাণ হয়, ১২৩৬ শকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করেন।

সুতরাং ইনি লক্ষ্মণসেনের সভাপতি হলায়ুধাচার্য্যের পরবর্ত্তী ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সার্দ্ধ দ্বিশতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইঁহার সংগ্রহ গ্রন্থ রত্নাকর নামে খ্যাত, ৭ ভাগে বিভক্ত ;—কৃত্যরত্নাকর, দানরত্নাকর, বিবাদরত্নাকর, পূজারত্নাকর, শুদ্ধিরত্নাকর, ব্যবহাররত্নাকর ও রাজনীতিরত্নাকর।

ইঁহার গ্রন্থ যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সরল ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে। ইনি কৃত্যরত্নাকরের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"যস্মিন্ন কিঞ্চিদপি শংসতি কামধেনুর্নৈবেষ্টমল্পমপি কল্পতরুর্ন দত্তে।
ধত্তে ন গন্ধমপি কঞ্চন পারিজাতস্তৎ সর্ব্বমেব বিবিনক্তি নয়প্রবীণঃ॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্বাচার্য্যগণের স্মৃতিসংগ্রহ কামধেনু,কল্পতরু ও পারিজাত প্রামাণিক শাস্ত্রেও যাহার উল্লেখ নাই বা সামান্য আছে, আমি তাহা বিশদরূপে মীমাংসার সহিত উল্লেখ করিয়া যাইলাম।" ভাষাকবি সাধকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ইঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র। নেপালে তিনিই প্রথম সর্ব্বসময়ে পশুপতিনাথকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিয়াছেন। তদবধি শিবরাত্রিদিনে মাত্র সকলের স্পর্শ করিয়া পূজার অধিকার অব্যাহত আছে। তিনি যে সব সংহিতার প্রমাণ উঠাইয়া গিয়াছেন, সে সব মূল পুস্তক আর মিলে না। দুই একখানি বিশেষ খণ্ডিত অবস্থায় বেনারস কলেজে পাইয়াছি আর শুনিয়াছি, ঐ অসম্পূর্ণভাবে দুই একখানি ইণ্ডিয়া আফিসেও সংগৃহীত হইয়া আছে। এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যেও যাদবরাজ মহাদেবের মন্ত্রী হেমাদ্রি চতুর্বর্গচিন্তামণি নামে বিশাল স্মৃতিসংগ্রহ প্রণয়ন করেন; কারণ, ঐ সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা হইতেছিল, তাই নিবন্ধকারদিগের অভ্যুদয়। প্রাচীন ও নব্য ভারতের যত সংগ্রহকার আছেন, ইনি সকলের অপেক্ষা অনেক নূতন বিষয়ের বিশালভাবে প্রমাণ-প্রয়োগপরিপাটী দেখাইয়া নিজের শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

ইঁহার বিবাদরত্নাকর বিব্লোথিকায় অনেক পূর্ব্বে (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা সংস্কৃত পরীক্ষায় "প্রাচীন স্মৃতির" উপাধিতে পাঠ্যরূপেও নির্দ্দিষ্ট আছে। আর বর্ত্তমানে আমার সম্পাদকতায় কৃত্যরত্নাকর ও গৃহস্থরত্নাকর এসিয়াটিক সোসাইটীর বিব্লোথিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

আমাদিগের গৃহস্থালীতে স্ত্রীজনদের নিকট প্রতিপদবিন্যাসে যে সকল বিধি-নিষেধ মেয়েলী আচার বলিয়া শুনিয়া ও মানিয়া চলা যায়, তাহার মূলে যে ঋষিদেরই ঐরূপ আজ্ঞা আছে, তাহা চণ্ডেশ্বরের পুস্তক হইতে বেশ বুঝা যায়; সুতরাং আমাদিগের সকল হিন্দুয়ানীর মূল আছে, কপোলকল্পিত ব্যর্থ বাক্য নহে।

বাচ্যাবাচ্য ও আপদ্বৃত্তি প্রসঙ্গের এবং বরপরীক্ষা অধিবেদনের কথার কি সারবত্তা! তাঁহার গ্রন্থ পড়িলে আনন্দ অনুভব হয়। এক আধারে এত বড় বিজ্ঞানরাশির গ্রন্থকর্ত্তা অদ্বিতীয় বীর ও মন্ত্রণাকুশল ব্যক্তি আর মিলে না। ইঁহাদের চরিত্রালোচনাতেও আত্মোন্নতি হয়, তাই তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (মহামহোপাধ্যায়)।

শৈশব-স্মৃতি

সে যে কত কালের কথা, সে কথা না বলাই ভাল, তবু সে দিনের যে ছবি অবিনশ্বর বর্ণে আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে আছে, সে আর মুছবার নয়। আকাশ, বাতাস, সেই তরুলতা, ফুল-ফল, কোরক আর কিশলয়, সেই পাখী, সেই চপল পাখা প্রজাপতির সারি, আর সেই মধু-লোলুপ ভ্রমরের উতলা যাওয়া আসা, কিছুই ভুলে যাই নি, আর কখনই ভুলে যাব না। এরা সকলে মিলেই শৈশবে শিশুকে গ'ড়ে তোলে, বালককে কিশোর ও তরুণকে প্রবীণে পরিণত করে, আর জীবনের বালুঘড়ি হ'তে উষর বালুকা ঝ'রে প'ড়ে যখন ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসে, তখনও শৈশবস্মৃতি আনন্দের উজ্জ্বল রঙে সমান রঙীন হয়ে থাকে। এই বিদ্যালয়ের দৃষ্টিপথের অন্তর্ভুত ও অগভীর পুষ্করিণীর অপর পারে আমরা বহুকাল বাস করেছিলাম। আর এমন একটি দিনও যায় নি, যে দিন আমরা চঞ্চল পতঙ্গের মতই আশে-পাশে ঘুরে না বেড়িয়েছি। পথ কোথায় শেষ হ'ল, ভাঙা বেড়ার ফাঁকে অনধিকার-প্রবেশের অবসর কতখানি, এই ছিল অনির্দ্দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ক্রমে সে পথের প্রত্যেকখানি পাথর, প্রতিটি গর্ত্ত, প্রতি গাছ, প্রতি আনমিত লতিকা, প্রতি কোণ, প্রত্যেক তৃণাস্তৃত আসন, এমনই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল যে, আজ পর্য্যন্ত তারা আমার মানস নয়নে প্রত্যক্ষ হয়ে আছে—এই দর্শনই জীবনের চিরানন্দ। মেঘ, রৌদ্র, ঋতুপর্য্যায়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের শোভাযাত্রার সহযোগে প্রকৃতি যে অপরিমিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেছিলেন, তাহারই সাহায্যে আমার শিক্ষার সূচনা হয়। জীবন-প্রভাতের এই দীক্ষা আমার মনে এমনই মোহিনী শক্তি বিস্তার করেছিল যে, খোলা আকাশ-বাতাসের প্রভাব এখনও আমাকে নগরের ধূম ও ধূলি হ'তে বনভূমির শ্যামল পথে ও পল্লী আবাসের শান্তির আশ্রয়ে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসে। আমি যখন বলি, অরণ্য আশ্রয়ে ও পল্লীপথে আমি অনেক শিক্ষালাভ করেছি—সে কথা আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। তবে সে শিক্ষা আজও সম্পূর্ণ হয়নি—এখনও শিক্ষার অনেক নূতন উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। কত কি প'ড়ে থাকবে, যা কখনও শেখা হবে না, কিন্তু মনের চিরন্তন এই অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসায় আমাদের চিন্তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে না, আমাদের সম্মুখের যাত্রার অন্তরায় হবে না, যদি আমরা মনে রাখি যে, এই সুন্দর বিশ্বজগতে প্রতি অণু, পরমাণু, জড়, উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, জীব-জন্তু সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে, আর সেইটি সুসম্পন্ন করবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি। মানুষই কেবল প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিপন্ন হয়, আর সকলেই বিধাতৃ-বিহিত পথে চলে, অটল অধ্যবসায়ের সঙ্গে আজীবন কর্ত্তব্য পালন করে। এক অপূর্ব্ব সাধনার পথ তাদের কাছ হ'তে আমরা লাভ করি,যার বীজমন্ত্র হচ্ছে—'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' যে দেশের যা তাকে স্থানান্তরিত করার পাতক প্রকৃতি কখনই সহ্য করেন না, তা সে উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণী যাই হোক না কেন। তিনি আমাদের এই অভ্রান্তবাণী শুনিয়েছেন যে, স্বাধীনতা ভিন্ন কোন জীবনই উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে না—পরবশ্যতায় কিছুই বিকাশলাভ করে না। তৃণ, লতা, তরু, গুল্ম, ওষধি, কীট, পতঙ্গ, পশু, নর, নারী—যদি মুক্ত আলোক, আকাশ ও বাতাসের প্রশ্রয় না পায়, তবে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে তারা নিতান্তই নিষ্ফল হয়।

দেবনাথ বাবুর অধীনে আমার শিক্ষার সূচনা হয় নি। তিনি আমার মাষ্টার মহাশয় ছিলেন না, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম ছিলেন তাঁর ছাত্র, তবু আমাদের সে দিনে সব মাষ্টার মহাশয়ই আমাদের গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা সে তিনি ভ্রাতার গুরু কিম্বা অপরের গুরুই হ'ন না কেন। সেই হিসাবে দেবনাথ বাবু আমারও গুরু ছিলেন। যদিও প্রথম প্রথম ইংরাজী ভাষায় ঈষৎ কাঁচা ছিল, তবে আর আর বিষয়ে, মাতৃভাষায় শিক্ষা করার গুণে সে একেবারে পাকা হয়ে গিয়েছিল। সেকালে এই মাষ্টার মহাশয়দের ও আমাদের যে শুধু শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ ছিল, তা নয়, শিষ্যরা তাঁদের পুত্রস্থানীয় ছিল। আর সে সম্বন্ধ যে কত মধুর, আজ আমার তরুণ বন্ধুগণ সে কথা অনুমান করতে না পারলেও যখন তাঁহাদের সন্তানাদি হবে, তখন আমারই মত সে সম্পর্কের আনন্দ ও মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবেন। পিতা না হ'লে পিতৃস্নেহ যে কি সামগ্রী, তা কখনও বোধগম্য হয় না। উপরন্তু শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ বিদ্যালয়ের প্রাচীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত না—পরিবারের মধ্যেও প্রসার লাভ করত। সেকালে প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য পরিবারস্থ সকলেরই মনে শ্রদ্ধার আসন পাতা থাকত। তার পর আমরা কলেজে প্রবেশ করলাম। সে দিনের সে নিরুপম আনন্দ আর কোথায়ও পাই নাই। কত দেশ-দেশান্তরে গিয়েছি, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণনগর কলেজ ও তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মত অমন সুন্দর আর কিছুই কোথায়ও দেখিনি, অমন ক'রে কোন স্থানই আমাদের নয়ন-মন হরণ করতে পারেনি। নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুপ্রশস্ত শস্যশ্যামল প্রান্তর, কখনও গাঢ় হরিৎ, কখনও বা আপক্ক ধান্যমঞ্জরীর হিল্লোলে

হিরন্ময়। বর্ষার প্রাচুর্য্যে নদীটি যখন কাণায় কাণায় ভ'রে উঠত, তখন আমাদের আর কষ্ট ক'রে তাকে অভিবাদন করতে যেতে হ'ত না। সেই সুজলা তরঙ্গবহুলা দেবীই অগ্রসর হয়ে এসে আমাদের স্বাগত জানাতেন। সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনে সুদূর নবদ্বীপের ছায়াছবি, নদীবক্ষে স্রোতের প্রতিকূলে কষ্টবাহিত নৌকাশ্রেণীর ব্যাহত গমন, স্রোতের অনুগামী তরণীমালার সাবলীল স্বচ্ছন্দগতি, সব চেয়ে অধিক মনে পড়ে, আর মনকে মুগ্ধ করত মেড়ুয়াবাদীদের নোড়ার গঠনের কীলকাকীর্ণ প্রকাণ্ড কিস্তী, মালের বহর, তাদের শিল ও নোড়া, কিন্তু যখন তারা নানা রঙের পাল তুলে দিয়ে বিপুলবপু এক একটা গরুড়ের মত একেবারে উড়ে চলত, আমরা বিস্ময়ে নিমেষহত হয়ে রইতাম। ব্যাপারটা হয় ত বা আপনাদের কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন, আমরা যে অসংখ্য বিদ্যার বহর বয়ে নিয়ে চলি, সে ঐ মেড়ুয়াবাদীর কিস্তীর মতই পাথর আর নুড়ি, যাতে আমাদের দন্তস্ফুট করার সাধ্য নাই,—নয় ত চলি চিনির বলদের মত, যে ভার আমাদের স্কন্ধে ভর করে, এ জীবনে তার মাধুর্য্য আস্বাদনের সাধ্য কখনই হয় না। কলেজের মাঠের সেই প্রকাণ্ড মেহগনী গাছটার (সে গাছ এখনও আছে কি না কে জানে) উপর দিয়ে ঢিল ছুড়ে পার করা আর সেই মাঠ একদৌড়ে এক নিশ্বাসে প্রদক্ষিণ ক'রে আসা, আমাদের কাছে পুঁথির পাঠ মুখস্থ করার চেয়ে অধিকতর গৌরবজনক ছিল। সে মাঠের প্রতি গাছের সঙ্গে আমাদের প্রণয়-সম্বন্ধ ছিল। যখন দেখতাম, যে সকল প্রকাণ্ড মহীরুহ কালের শাসন উপেক্ষা ক'রে যুগ যুগ ধ'রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে উন্নত মস্তক সগৌরবে আকাশে তুলে ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল—নিষ্ঠুর মানবের আদেশে ও কুঠারাঘাতে তারাই ভূলুণ্ঠিত হয়ে ধরাশয্যা গ্রহণ করছে, তখন আমাদের মন বেদনায় ভ'রে উঠত। প্রকৃতির সঙ্গে খেলা চলে না, বিবেকরহিত নিষ্ঠুরতাবশতঃ আমরা যখনই অরণ্য ভূমিসাৎ করি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, যথেচ্ছা হত্যা করি, তখনই তার শাস্তি আমাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করতে হয়। সে দণ্ড আজ নয়, কাল, এক দিন না এক দিন অপ্রতিহত গতিতে নেমে আসবেই, তখন আমাদের মাথা পাতবার ঠাঁইটুকুও থাকবে না। প্রকৃতির আইনের পুঁথিতে প্রথম অপরাধের জন্য স্বল্প শাস্তির বিধান কোথায়ও স্থান পায় নি। পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রতার প্রবল বন্যায় বর্ত্তমানে ধরিত্রীর যে দুরবস্থা হয়েছে, আধুনিক সভ্যতার যে বিকারগ্রস্ত উত্তেজনায় প্রত্যেক মানবই মুগ্ধ, তার অবশ্যম্ভাবী অভিসম্পাত সুদূর নয়—আমাদের প্রাচ্যদেশবাসীদেরও সম্মুখ ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করবার অবসর নাই। তাঁরাও এই দুরন্ত স্রোতে ভেসে চলেছেন, কে জানে কোথায় তার পরিসমাপ্তি, কোন্ প্রবল ধ্বংসের কবলে তার সমাধি হবে। পূর্ব্ব-ঋষিগণ যে সরল জীবনযাত্রার আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন, তার অবশেষ আর কিছুই নাই। জীবধাত্রী ধরিত্রীকে তাঁরা মাতার সম্মান দান করেছিলেন—আমাদের দৈনিক জীবনের স্বল্প প্রয়োজনের জন্য তাঁরই সম্মুখে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে হোতো—তাঁরই পরিচর্য্যায় দিনাতিপাত ক'রে, গৃহস্থাশ্রমের শেষে বানপ্রস্থ আশ্রয়ে প্রকৃতির প্রীতির সহিত সর্ব্বপ্রকারে যোগযুক্ত হয়ে অন্তিম-দিনের পরম শান্তি অর্জ্জন করা—এই ছিল তাঁদের অনুশাসন। কর্ম্মশেষে বিশ্রাম, দীপালোকের মত দীর্ঘরজনী সমুজ্জ্বল থেকে প্রভাতে নীরব সম্পূর্ণ বিরতি। আমি হয় ত এমন রাজ্যের প্রবেশ-পথে আপনাদের নিয়ে এসেছি, যেখান হ'তে আপনাদের মন এখন সুদূরে প'ড়ে আছে, তবুও এই পথেই আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে, সেই সাগর-সীমান্তেই আমাদের জীবন-তরী যাত্রা করবে—সে তটভূমি এখনও আমাদের চোখে অস্পষ্ট হ'লেও, সেই গন্তব্য স্থান, আমাদের জীবন-যৌবনের লক্ষ্য, সে কথা ভুললে চলবে না।

যদি বা 'বিস্মরণ' হই, তাই সর্ব্বপ্রথমেই সেই সকল শিক্ষক ও গুরুজনদিগের অভিবাদন জানাচ্ছি, যাঁরা এই নদীয়ার সহস্র সহস্র ছাত্রের সঙ্গে আমাদের মন-গঠনের সাহায্য করেছিলেন। যদি কোনও আনন্দলোক থাকে, যেখানে মহৎ ও হৃদয়বান্ ব্যক্তি মৃত্যুর পর যাত্রা করেন, তবে নিঃসংশয়ে বলতে পারি, সেই পরম লোকে তাঁরা সচ্চিদানন্দ পুরুষের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে বসতি করছেন। এমন দিন যায় না, যে দিন ঈশ্বরস্মরণকালে আমি গিরীশ পণ্ডিত মহাশয়ের নাম মনে না করি; কেন না, তাঁরই দৃষ্টান্তের বলে আমার জীবনের যা' কিছু অর্জ্জন ব'লে মনে করি—সমস্তই সম্ভব হয়েছে।

দৌড়ে সকলকে হারান, ঘোড়ার পিঠে অবিচ্ছেদ্যভাবে সোয়ার হওয়া, অভ্রান্ত-লক্ষ্য হয়ে তীর-চালনা করা, নিশ্চিন্ত আঘাত করার শক্তি বহন ক'রে চালানো, অথচ কেবল লেখনীর নিপুণ চালনায় আমি যে সুন্দর অক্ষর সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারি না, সে কথা তিনি বিশ্বাস করেন নি। সেই ছেলেবেলায় এক দিন যখন অযত্নে কাকের ছা বগের মত কুশ্রী অসমান লেখা তাঁর সম্মুখে ধ'রে দি, তিনি আমায় কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"না, না, ও সব আমি বিশ্বাস করি না, সুন্দর ক'রে তোমায় লিখতেই হবে।" সেই যে সমবয়সী সহপাঠীদের সম্মুখে অক্ষমতা নয়, অমনোযোগিতার জন্য শাস্তির অপমান, যত অল্প সময়েরই জন্যই হোক না কেন, তার ফল হয়েছে সুদূর-প্রসারী। শাস্তির সময়টুকু আমার কাছে কিছুতেই ক্ষণিক ব'লে বোধ হয় নি। পরদিন আমার শ্লেট তিনি সব শেষে দেখবার জন্য রাখলেন। আমি কোন দিন কোন শ্বাপদরাজ, শার্দ্দূল কিম্বা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে আজ পর্য্যন্ত ভীত হইনি। কিন্তু সে দিনকার কথা কখনও ভুলবো না, আমার ছোট্ট শরীরটির মধ্যে ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটি বার বার দুর দুর ক'রে কাঁপছিল, ওষ্ঠাগত প্রাণে আমি তাঁর মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলাম। কিন্তু কি আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার সমস্ত দেহ-মন প্লাবিত হ'ল, যখন পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন,—"আমি ত তখনই বলেছিলাম—তুমি যে ভাল লিখ্‌তে পার না, এ আমি বিশ্বাস করিনে, আজ তোমার লেখা, ক্লাশের সকলের লেখার মধ্যে সব চেয়ে ভাল। তোমাকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি।" আমি যতদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম ও আর যত দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, এই ঘটনার বারংবার উল্লেখ করতেন।

আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে মার্জ্জনা করবেন জানি, যদি আমি বলি, সংসারক্ষেত্রে বৈষয়িক হিসাবে, আমার ভাগ্যে বিশেষ কোনও পদোন্নতি না হয়েও থাকে, তবু সেই পূজনীয় শিক্ষকের আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে আমার জীবনে কোনও আত্মিক

স্থান লাভ করে নি। সুস্থ সবল শরীর, সুনিয়মিত অভ্যাস, নির্ম্মল মানসিক বৃত্তি, ভব্য আচার-ব্যবহার, চিরদিনই আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার সহায়তা করেছে। সেই পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয় ও আমাদের সকল শিক্ষকের উদ্দেশে আমরা যেন সর্ব্বদাই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন কর্ত্তে পারি, কেন না; লোকান্তর-বাসী হ'লেও তাঁদের সান্নিধ্য আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি, তাঁদের স্মৃতি মৃত্যুহীন।

পুরাতন পরিচিত অনেক প্রিয়জনের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হ'তে আজ আমি বঞ্চিত। তবে সেই সকল বংশাবলিতে তরুণ পত্র ও নব-প্রসূনের উদ্ভব হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। বর্ষশেষে পাণ্ডু-জীর্ণ পত্রের মত আমরাই আজ অবশিষ্ট। কিন্তু প্রকৃতি আমার কানে কানে বলছেন, এ জগতে কিছুই মরে না। আসন্ন শীতে পীত পত্রের ছায়ায় অভিনব কোরকের সুকুমার সৌন্দর্য্য যেমন অমরতার পরিচায়ক, তেমনই মানুষের মনোরাজ্যেও চির-তারুণ্যের উৎস অনন্তকাল উৎসারিত। হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, যদি আমার মনে সেই উৎস শুষ্ক হয়ে যেত, তবে আমি আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারতাম না।

প্রথমেই আমি বলেছি, পরাধীনতায় কিছু উন্নতিলাভ করে না। যেটুকু আমরা করি বা করতে পারি, এমন কি, আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরাও যা করেন বা করতে সমর্থ হ'ন, সে-ও এই স্বাধীনতার বা এই স্বাবলম্বনের সাহায্যে। যে কেহ এই পরবশ্যতার শৃঙ্খলমুক্ত, তাঁরই মনে প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়, ভ্রাতার বন্ধন উন্মোচন, তাঁরই কার্য্যের প্রথম উদ্যম ভ্রাতার মুক্তির প্রচেষ্টা।

বসুন্ধরা জরাতুরা,
স্বর্গ আজ পরিশ্রান্ত শুনি মানবের
শূন্যবাণী ; ন্যায় আর প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মের।

এ পৃথিবীতে ন্যায়ের আদর্শ শক্তিমানের অভিরুচি, সম কক্ষের মধ্যে সমধর্ম্মী, দুর্ব্বলের দুরদৃষ্টে তার স্বরূপ বিভিন্ন—প্রবলের যথেচ্ছাচার, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় দুর্ব্বলকে বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হয়।

সামর্থ্যই যৌবনের সম্পদ্। আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সেই তরুণদলের অভিযান সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, যারা বৃথা কাজে সময় ও শক্তির অপচয় না ক'রে জীবনের লক্ষ্যের অভিমুখে স্বায়ত্তের তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হবেন। *

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী [ব্যারিষ্টার]।

* কৃষ্ণনগর দেবনাথ স্কুলের অভিভাষণ।

বর্ষাবতরণ

নেমেছে বাদল আদ্র আদল কার্ম্মুক টঙ্কারি,
বাজে অর্ব্বুদ অম্বুদদলে মর্দ্দল ঝঙ্কারি!
ইন্দ্র-ধনুতে বলাকার দল
গুণ আরোপিয়া চলে চঞ্চল
পথিক-চিত্ত বিদ্ধ করিতে উদ্যোগ নিশি দিন—
তিতি[illegible]রত এ রণ-সজ্জা বারণ বিরতি হীন॥

বিদ্যোহী শত এসেছে ছুটিয়া তৃষিত চাতকদল—
ধরার নিন্দা রটায়ে ফিরিছে লভি নব-ঘন-জল;
জলদৌঘের বিপুল শিবির
পড়িয়াছে আজ ঘিরি গিরি-শির,
ধরণীর প্রাণ-স্পন্দন ঘন শ্বসিছে চপলা-দোলে—
ভ্রূকুটি-শাসন জাগে অনুখন আঁধার কানন-কোলে।

দিছে যৌতুক বন বনশ্রী, সর্জ্জনীপের গন্ধ,
উশীরস্তম্ব ককুভদ্রুম কন্দলীদল কন্দ;
নবীন কেশর কেতকী-পরাগ
মালতী বকুল সৌরভ-ভাগ,
নব-যৌবন বিলোল তড়াগ,—বিজয়ী রাজার ভেট,
খর্জ্জুর তালী অঞ্জনবীথি জল-ঝর-ঝর হেঁট।

বন্ধুর শিলা-শুষ্ক সরণে তিতায়ে বক্রগতি
নাগিনীর মত উদ্ধত জল চলেছে ফুঁসিয়া অতি;
পন্নগ-ফণা-ত্রস্ত-ফেনিল
ধূসর মলিন বহিছে সলিল—
পথে দর্দ্দুর ভয়-জর্জ্জর ফণিনী ভাবিয়া ডরে,
অহি ভাবি শিখী রূপ-বিস্তর পাখা বিস্তার করে।

লভি কম তনু অতনু ফিরিছে বাদলোৎসবে আজি—
কে কোথা একেলা আছ নরনারী, এস অভিসারে সাজি,
সম্বরি বপু নীল-অম্বরে
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ-প্রভা আলো ধরে,
তৃণাঙ্কুরের বৈদূর্য্যেতে চরণ ফেলিয়া ধীরে—
লাক্ষার লালচিহ্ন রচিছে ইন্দ্র-গোপেরা ঘিরে!

আশ্রোণি-দোলা কাজল চিকুর সংহত ফুল-মালে
এসো প্রিয়তমা আজি এ আঁধারে বাদর নিশীথকালে!
ঝর-ঝর জলে চরণ-শব্দ
হরি লবে, ধরা এমন স্তব্ধ;
একখানি মেঘ-উত্তরী আজি গাঁঠছড়া বন্ধনে
বাঁধিবে দু'জনে—এমন সজল নিবিড় আঁধার ক্ষণে।

কোথা আজি বধূ, কোথা প্রাণ-বধু, কেন আজি একা-একা,
আলোকে যাহারে না লখে, তাহারে আঁধারে যাবে যে দেখা!
উঠে বরষার বন্দনা-গান
সার্থক তার রণ-অভিযান,
বন্দী আজিকে নিখিল ভুবন, সঙ্গীরে লও সাথে—
হেন দুর্য্যোগে বাঁচাও, বন্ধু, বরষার শরঘাতে॥

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
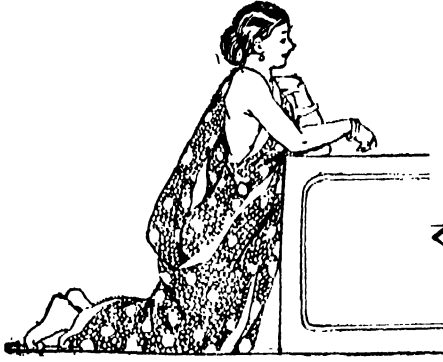
কারাগারের পথে

১

"অপরাধ অনেকেই করে।"

"কিন্তু মাত্রা ত আছে ?"

বন্ধু বলিল, "তোমার অপরাধের নূতনত্ব যে, তুমি কাহারও সহানুভূতি পাচ্ছ না।"

আবেশময় চোখদুটি বন্ধুর দিকে ফিরাইয়া অপরাধী ধীরে ধীরে চোখদুটি নামাইয়া লইল। চোখের ভাষা যেন বলিল, "তুমিও না ?"

"না, আমিও তোমায় সহানুভূতি দেখাতে পাচ্ছি না।" তার পর একটু জোর দিয়া বলিল, "না—হ'তেই পারে না... এ সহানুভূতি নয়, পাপকে পোষণ করা।"

অপরাধীর আড়ষ্ট জিহ্বা যেন কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। পাপকে পোষণ করা ? সত্য কি ? বুকে হাত দিয়া কেহ বলিতে পারে, সে জীবনে পাপ করে নাই ? অপরাধীর ক্ষোদাই-করা মূর্ত্তি হইতে জ্বলন্ত চোখদুটি এবার আগুন ছড়াইতেছিল। বন্ধু একটু ভয় পাইয়া বলিল, "ঠিক পাপ না হ'লেও সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য তোমায় একটুও দরদ দেখানো উচিত নয়।"

এবার অপরাধীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, "ওগো বন্ধু—তোমার দরদখানি কে-ই বা চেয়েছে ? আমি কারুর দরদ চাই না।"

সাহস করিয়া বন্ধু বলিল—"তবে একটা কথা যাবার বেলায় বলছি—জীবনের পথে যে ভুল ক'রে আজ তুমি এই শাস্তি পাচ্ছ, তোমার দৃষ্টান্তে অন্য অনেকে শিক্ষা পেয়ে যাবে।"

মৃদু হাসিয়া অপরাধী বলিল, "তা হ'লে আমি নিজেকে উৎসর্গ ক'রে সমাজ-শিক্ষা দিচ্ছি! কি বল বন্ধু ? নয় কি ?"

ইস্! লোকটার মনোবৃত্তির অস্বাভাবিক পরিস্ফুরণ! কালিমালিপ্ত বক্ষ সমাজের মুখের উপর স্ফীত করিয়া অপরাধের গর্ব্ব করে ? বন্ধু একবার থমকিয়া গেল। অপরাধীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি জাহান্নামে যাও।"

"তা ত যেতেই বসেছি। এ জন্য আর দুঃখ কি ?" তাহার পর ধীরে ধীরে সংযতস্বরে বলিল, "যীশু ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিল, নয় কি ? আর সক্রেটিস্ ?"

লোকটার স্পর্দ্ধা কি! যীশুর সহিত নিজকে তুলনা করিতেছে ? অপরাধের শাস্তি ভোগ করিয়া লোক-শিক্ষা দিতেছে! বন্ধু সভয়ে বলিল, "তোমার ছায়া মাড়ানও ভয়ঙ্কর—"

তাহার পর হন্ হন্ করিয়া এক দিকে চলিয়া গেল।

অপরাধী এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমন ক্ষোদাই-করা মূর্ত্তিখানা হাসির তরঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছিল।

বন্ধু দূর হইতে একবার ফিরিয়া দেখিল। আবার দ্রুত নয়ন ফিরাইয়া চলিয়া গেল। তাহার চোখে কে যেন আগুন ছড়াইয়া দিয়াছে।

২

মেঘ-মলিন আকাশ, আবছায়া ঘেরা পৃথিবী।

অপরাধীর স্ত্রী ও কন্যা এত বড় বাড়ীটায় পাদচারণ করিয়া বেড়াইতেছিল। উভয়ের মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না। আসন্ন বিপদে উভয়ে নীরবে বুঝিতেছিল। অনেক চিন্তা, অনেক সন্দেহ, অনেক আশঙ্কা এক একবার তাহাদের বুকখানা দমাইয়া দিতেছিল, আবার আশার আলোকে তাহা ফুলিয়া উঠিতেছিল—আশা ও নিরাশায় তখন তীব্র সংগ্রাম চলিতেছিল।

দূরে পদশব্দ শুনা যায়, আর উৎকণ্ঠায় হৃৎপিণ্ডটা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। ঐ পদশব্দ কি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে! পদশব্দ বিলীন হয়, হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ

সাময়িক বিরাম পায়, তাহাও কত আরামের! কন্যা মাতার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, মাতা কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ে উভয়ের স্পর্শালিঙ্গনে পরস্পরের ব্যথার স্পন্দন অনুভব করিল।" যেন দুই খণ্ড মেঘ জড়াজড়ি করিয়া আপনাদিগকে দেখিতেছে, কিন্তু গর্জ্জনও করিল না, বর্ষণও করিল না।

কন্যা শেষে উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল—"আজই ত রায় বেরোবার দিন।"

উদ্বেগ বক্ষের স্পন্দন সংযত করিয়া মাতা বলিল, "তাই ত ভাবছি!"

"মা, তাই যদি হয়?" কন্যা এবার কাঁদিয়া উঠিল।

"চুপ্‌, চুপ্‌! ঝি-চাকর এখনও এ বিষয়ে কিছু জানে না, অমঙ্গলকে আগে ডাকিস্ কেন?"

"তা হ'লে আমাদের কি হবে? আমরা যে কারুর কাছে মুখ দেখাতেই পারবো না, "হা ভগবান্!"

কন্যা আবার চুপ করিয়া মায়ের বুকে মুখ রাখিল।

ধীরপদে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া অপরাধী উপরে উঠিয়া আসিল, তাহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। কন্যা ও মাতা দাঁড়াইয়া রহিল—কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। সম্মুখীন আশা ও নিরাশায় বুকের আক্ষেপ এবার জোরতরঙ্গে উঠিতেছিল নামিতেছিল।

অপরাধীর মুখে মৃদু মৃদু হাসি, কিন্তু চোখদুটি অস্বাভাবিক ভয়াবহ।

"তুমি বুঝি আশা করেছিলে, সমাজ আমায় অত সহজেই রেহাই দেবে?"

স্ত্রীর কণ্ঠ হইতে একটি ক্ষীণ চীৎকার ছুটিয়া বাহির হইল।

"দু এক মাসের শাস্তি নয়, দু পাঁচ বছর! বিচারক ত আর অন্যায় করতে পারেন না?"

কন্যা ও মাতা শিহরিয়া উঠিল। এ যে অমানুষিক! এত বড় শাস্তি যে ধারণার বাহিরে!

"তোমরা ভাবছ, এত বড় শাস্তি হ'ল কেন? আমি দেশের সঞ্চিত ধন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক নষ্ট ক'রে দিয়েছি। দেশ ত এখানে আমায় ক্ষমা করবে না—করতে পারেও না।"

"কিন্তু অন্তর্য্যামী ত জানেন, তুমি নিরপরাধ।"

"বিবেক! ও অনেক সময়ে ফাঁকি দেয়।"

বেয়ারা আসিয়া বলিল, "সোফার জিজ্ঞাসা কচ্ছে, মোটর ঠিক রাখবে কি? আপনি কখন্ বেড়াতে বেরুবেন?"

অপরাধী কিছু বলিল না—নিজের ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। স্ত্রী একবার স্বামীর দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "যাও, আমরা শীগ্‌গীরই যাচ্ছি।"

বেহারা চলিয়া গেল।

স্ত্রী বলিল, "এখনও ঝি-চাকররা কিছু জানে না। তারা যে কিছু জানবে, তা আমি সহ্য করতে পারবো না।"

মৃদু হাসিয়া অপরাধী বলিল, "আর কয়েক ঘণ্টা পরে যে দুনিয়া শুদ্ধ লোক জান্‌বে।"

বেহারা আবার আসিয়া বলিল, "সরকার মশাই জিজ্ঞাসা কল্লেন, দিদিমণির জন্মদিনে কাল কত লোক এখানে খাবেন?"

একটু রাগত হইয়া স্ত্রী বলিল, "একটু পরে বলছি, তুমি এখন যাও।" বেহারা চলিয়া গেল।

"তা হ'লে তুমি কি বল্‌তে চাও, তোমার বিবেকেও তুমি নির্দ্দোষ নও?"

"যদি তাই বলি?"

স্ত্রী এবার পিছাইয়া গেল, তাহার মুখখানা তখন একবারে রক্তশূন্য! সত্যই স্বামী তবে অপরাধী! এত দিন সে যে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল—চারিদিকে পাহাড়ের মত অপরাধের প্রমাণ থাকা সত্বেও স্বামী তাহার নির্দ্দোষ! এই একমাত্র সান্ত্বনা! স্ত্রীর মাথা এবার ঘুরিতেছিল।

"সত্যই তুমি অপরাধী, আর এত দিন আমায় ভুলিয়ে ছিলে?"

"যদি তোমার কাছে মিছাই ব'লে থাকি!"

"আমার সঙ্গেও প্রতারণা? তুমি কি?"

অপরাধী কিন্তু তখনও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

স্ত্রী এবার জোরের সহিতই বলিয়া উঠিল, "তুমি অদ্ভুত প্রতারক! তুমি দেশের কাছে, সবার কাছে, এমন কি, স্ত্রীর কাছে পর্য্যন্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছ—তুমি কি?"

স্ত্রী চলিয়া গেল।

• ৩ •

অপরাধী ও কন্যা সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া ছিল। দুই জনেই নির্ব্বাক্। পিতা অতি স্নেহে কন্যার মুখের দিকে তাকাইতেছিল, মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, তাহার ঐ পাষাণের

মত কঠিন বুকখানা বুঝি বা স্নেহের আতিশয্যে সহসা গলিয়া যায়।

কন্যাও পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল অন্য কথা, পিতার অপরাধের কথা।

"আচ্ছা বাবা, তুমি ও কাযটা করেছিলে কেন?"

"অপরাধের কথা বলছ! তা যদি করেই থাকি, এর ভেতর নতুনত্ব কি আছে?"

"তুমি তা হ'লে তোমার অপরাধের সমর্থন করতে চাও?"

"সমর্থনীয় কিছু না থাকলে কেহ অপরাধ করতে পারে না। অন্য লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কিন্তু অপরাধ করার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এমন একটা সমর্থনীয় ভাব অপরাধীর হৃদয়ে জোর ক'রে চেপে ধরে, যাতে অপরাধকে সে অপরাধ ব'লে গণ্য করতে পারে না।"

"কন্যা পিতার মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "তুমি নিজেকে প্রতারণা কচ্ছ, নিজের দুর্ব্বলতাকে জোর ক'রে ঢেকে দিচ্ছ।"

"হ'তে পারে কিন্তু এও মানুষের একটা স্বভাব।"

"তোমার কিন্তু সাহস দেখেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়।"

"নূতনত্ব কিছুই নাই। স্পেন দেশটা করায়ত্ত ক'রে নেপোলিয়াঁও নিজেকে সমর্থন করেছে—আর তাও খুব জোরের সহিত।"

"তুমি নিজেকে নেপোলিয়াঁর সাথে তুলনা করতে চাও?"

"এমন দোষই বা কি হয়েছে? আমিও ত মানুষ। আর তুমি যদি তাকে বড় বলতে চাও, তবে বড় ও ছোটর সাথে তুলনায় ত আরও পরিস্ফুট হয়। কিন্তু কথা তা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে সমর্থনের ভাব নিয়ে।"

"বাবা, তুমি অমন কথা বোলো না। আমার যেটুকু সহানুভূতি তোমার উপর হচ্ছিল, তাও যেতে বসেছে। তোমার অপরাধের জন্য যে দুঃখ হয়েছে, তা ছাপিয়ে গিয়ে তোমার এই ভুল ধারণা আমায় আরও কষ্ট দিচ্ছে।"

অপরাধী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। চোখ দুটি তখন তাহার জ্রর নীচে কুঞ্চিত।

"দেখছি, তুমি মানুষকেই ভালবাসতে ভুলে গেছ—তাই দেশ, সমাজ তোমার কাছে অর্থহীন—অনায়াসে তাদের অনিষ্ট কচ্ছ!"

অপরাধী তখনও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

কন্যা এবার অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি অমন ক'রে হেসো না, আমার ঐ হাসিতে বড় ভয় করে। ও হাসিতে দেখছি যেন পরম নাস্তিকের হাসি—যেন সে ভগবান ও মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কচ্ছে।"

"না মা, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি হাসি—আমার কাযের সমর্থন একা আমিই জানি, এই ভেবে। মনের ভিতর ত আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না? তিনি জজই হোন্ কি উকীলই হোন্, তুমিই হও কি তোমার মা'ই হোন্, এর ভিতরও নূতনত্ব, কেমন? নয় কি?"

"আশ্চর্য্য! তোমার সঙ্গে কথা বলাও পাপ, হয় ত নাস্তিক হয়ে যাবো!"

এবার চোখদুটি স্তিমিত করিয়া অপরাধী আপনমনে বলিয়া উঠিল, "বটে!" তাহার পর কিছু না বলিয়া আরাম-চেয়ারে শরীরটা এলাইয়া দিয়া আপন মনে একবার হাসিয়া উঠিল। পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া নিঃশব্দে তাহা ধরাইয়া কুণ্ডলীকৃত ধূমের চক্রাকার গতি দেখিতে লাগিল।

কন্যা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু পিতা নির্ব্বাক্। অবশেষে অতি ক্ষুব্ধভাবে কন্যা চলিয়া গেল, মনে মনে বলিল, "বাবাকে সহানুভূতি দেখানও চলে না।"

৪

রাত তখন বোধ হয় অনেক হইয়াছে, অপরাধী আরাম-চেয়ারে তন্দ্রায় একটু একটু ঢুলিতেছিল। পাশের ঘরে স্ত্রী ও কন্যা মনের দুঃখে সুপ্তিমগ্ন। তাহারা অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া ভাবিতেছিল, কি করিয়া প্রতিবেশীকে মুখ দেখাইবে—তাহাদের জীবন যে একবারে মাটী হইয়া গিয়াছে।

অপরাধী কিন্তু সে সময়ে ভাবিতেছিল অন্যরূপ। চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাও চক্রাকারে ঘুরিতেছিল। মুখে চোখেও হাসি মৃদু মৃদু খেলিতেছিল। তার পর সে কখন্ তন্দ্রায় ডুবিয়া গিয়াছে—জানে না।

হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, কেহ সন্তর্পণে ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়াছে। অতি অস্ফুটশব্দ, কিন্তু তন্দ্রা তাহার ছুটিয়া গিয়াছে, সে শুনিতে পাইল, অতি আস্তে আস্তে কেহ ড্রইং-রুমে চলাফেরা করিতেছে।

অপরাধী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সন্তর্পণে ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল। অন্ধকার গৃহ। উঁচু একটা জানালা দিয়া

আলোর একটুমাত্র আভাস নিবিড় আঁধারকে একটুমাত্র তরল করিয়া দিয়াছিল। তাহাতেই যেন মনে হইল, কেহ ড্রয়ার খুলিয়া নিঃশব্দে জিনিষপত্র বাহির করিতেছে। অপরাধী মনে করিল, ঘরে চোর ঢুকিয়াছে।

চোর নিবিষ্টমনে একটার পর একটা ড্রয়ার খুলিতেছিল, আর জিনিষপত্র বাছিতেছিল, কতক বা একটা থলিতে রাখিতেছিল, কতক বা ফেলিয়া দিতেছিল। অপরাধী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা অনুভব করিতেছিল।

সহসা বিজলী-বাতি জ্বলিয়া উঠিল, অতর্কিতে এক ঝলক আলো আসিয়া চোরকে জানাইয়া দিল, ঘরে সে একা নহে।

"তোমার কাযে বাধা দিয়েছি বন্ধু?"

চোর প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছিল—তাহার পর স্বাভাবিক সতর্কতা বশতঃ পলায়নের চেষ্টা দেখিল, কিন্তু দরজার সম্মুখে লোক দেখিয়া সে চেষ্টাও নিষ্ফল ভাবিল—ভয়ে তখন তাহার মুখখানা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

"মনে কিছু কোরো না বন্ধু—তোমার কোন ভয় নাই।"

অপরাধীর মুখে আবার সেই মৃদু মৃদু হাসি।

চোর শিহরিয়া উঠিল। ঐ হাসি ভয়ঙ্কর না সুন্দর?

শেষে আড়ষ্টভাবে বলিল,—"তু-তুমি কে?"

"ভয় নেই, আমিও একই পথের পথিক—আমরা বন্ধু।"

চোর যেন কূল পাইল। ভাবিল, এ হয় ত দোসরা কোন চোর। তখন অনুচ্চস্বরে জোর দিয়া বলিল, "আলো নিভিয়ে দাও—কেউ দেখবে।"

"নিভানোর দরকার নাই—এই দরজা দিলাম—বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না।"

চোর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচা গেল—যে ভয় পেয়েছি! আমি ভাবলাম বা এখানকারই কেউ—আচ্ছা, তোমাকে ত ভদ্দরলোক ব'লে বোধ হচ্ছে—"

"অনেক ভদ্দরলোকই এ কায করে—ভদ্দর বেশটা অনেক কাযকেই আড়াল দেয়।"

"বাঃ, তোমার ত খাসা মাথা! আমি কিন্তু এ কথাটা এক দিনও ভেবে দেখি নি।"

"আমি অনেক ভেবেছি কি না—তাই।"

"আর বেশী সময় নষ্ট করলে চলবে না। এস, তাড়াতাড়ি কাযটা সেরে নেই।"

চোর আবার ড্রয়ার খুলিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিল।

"আচ্ছা, তুমি কদ্দিন এ ব্যবসা ধরেছ?"

অনুসন্ধান করিতে করিতে চোর বলিল, "সে অনেক দিন—বাপ মারা গেলে আর করি কি? মা-বোন্‌কে ত আর অনাহারে রাখতে পারি না—হাত সাফাইর জোরে পেটটা চলছে। তোমার কদ্দিন?"

"আমারও বন্ধু অনেক দিন স্ত্রী, কন্যা, প্রতিবেশী আছে ত! তাদের ত কিছু দেওয়া চাই!"

"তোমারও তা হ'লে আমারই দশা!"

"একই রকম—মাত্রার কিছু তফাৎ হ'তে পারে।"

"আজকের রাতটা নেহাৎ মন্দ হবে না। তোমায়ও ভাগ দেবো। দশ আনা ছয় আনা। তোমার ত আর কিছু করতে হচ্ছে না।"

"ষোল আনা তুমিই নাও বন্ধু, আমি আজ অনেক পেয়েছি।"

চোর একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "তা যদি না নিতে চাও ত আর কি করবো?"

"আজকাল তোমার অবস্থা কিরূপ?"

"তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে এক রকম বাগিয়েছি।"

"তবে এ কাযটা আজও কচ্ছ কেন?"

"কি বলব ভাই, ও একরকম অভ্যাস হয়ে গেছে—আর সময় কাটান ত চাই! অবস্থা হ'লে কি হয়? গাঁয়ের আর পাঁচ জন ত আমার সঙ্গে মিশবে না,—বলে বেটা চোর। চোর নয় কে?"

"মনে হচ্ছে, তুমি সহানুভূতি পাচ্ছ না।"

"ওরা যখন দিচ্ছে না, আমি কেন চাইতে যাবো?"

"তুমি বলছ, সমাজ তাদের গুমর নিয়ে থাক্, তুমি তোমাকে নিয়ে থাকবে, কেমন, সত্যি বলছি কি না?"

"ঠিক বলেছ—তোমার সঙ্গে ত আমার বেশ মিলছে।"

"আমরা একই পথের পথিক কি না! এই জন্যই ত সমাজের উপর আমাদের এত আক্রোশ!"

"আর বলবার সময় নেই, কায হয়ে গেল, এখন চলো।"

চোর তাহার থলিটা কাঁধে করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। অপরাধীর মুখে মৃদু মৃদু হাসি, বলিল, "মনে থাকে যেন বন্ধু!"

"তা আর বলতে! আচ্ছা, তোমায় একবার ভাল ক'রে দেখে নিচ্ছি, যেন ভুলে না যাই।"

ঠিক এই সময়ে বাহির হইতে কে আসিয়া দরজা ঠেলিল, চোর সন্ত্রস্তভাবে পলায়নের চেষ্টা দেখিল। দরজা ততক্ষণে উন্মুক্ত হইল—দরজার সম্মুখে অপরাধীর স্ত্রী। চোর দেখিয়া স্ত্রী এবার চীৎকার করার উপক্রম করিল—বাধা দিয়া অপরাধী বলিল, "ভয় নাই—এ আমার বন্ধু।"

চোর অর্থহীন দৃষ্টি শুধু অপরাধীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল।

স্ত্রী কিন্তু স্বামীর মুখে সেই সুস্পষ্ট মৃদু মৃদু হাসি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

"যাও বন্ধু, কেউ তোমায় রুখবে না।"

হতবুদ্ধি চোর অভ্যাসমত চলিয়া গেল।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ও লোকটা কে?"

"ও একটা লোক।"

"ওকে পুলিশে দিলে না কেন?"

"ও যে আমার বন্ধু।"

"তুমি এতদূর অধঃপাতে গিয়েছ! চোর বদমাস আজ তোমার বন্ধু!"

"এতদিন ভদ্দর লোক বন্ধু ছিল, আজ না হয় চোর বদমাসই বন্ধু হ'ল—মাঝে মাঝে মুখ বদলান চাই ত।"

স্ত্রী নির্ব্বাক্—শুধু স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল।

"কেন? এর মাঝে কি নূতনত্ব আছে?"

"আশ্চর্য্য! এ সব কথা বল্‌তে তুমি একটুও কুণ্ঠিত হচ্ছ না? সমাজ ও শিক্ষা কি একেবারে ভুলে গেছ?"

অপরাধী সহসা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "সমাজ ও শিক্ষা আমি এত বেশী আলোচনা করেছি যে, এ কথা বলতে আমি মুক্তকণ্ঠ।"

"তোমার মনোবৃত্তি এত নীচ—এত অধঃপতিত—শুনতে পর্য্যন্ত আমার ঘৃণা হয়।"

আবার সংযত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া অপরাধী বলিল, "শুনতে ত আমি বলছি না!"

স্ত্রী আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৫

আত্মসমর্পণের পর প্রহরী-বেষ্টিত অপরাধী কারাগারের পথে চলিতেছিল—চারিদিককার দর্শক মনের সুখে তাহাকে ধিক্কার দিতেছিল অনেকেই তাহার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। বন্ধু বলিল, "কারাগারের শিক্ষার পর আশা করি সমাজকে ভালবাসতে শিখবে।"

"তুমি ভুল বুঝেছ বন্ধু।"

"তোমার মনোবৃত্তির এখনও কি পরিবর্ত্তন হয় নি?"

"মনোবৃত্তির এমন কি অস্বাভাবিকতা দেখলে যে, পরিবর্ত্তন হবে?"

"নাঃ, সমাজকে—মানুষকে তুমি ভালবাসতে শিখলে না।"

অপরাধী ধীরে ধীরে বলিল—"সমাজকে—মানুষকে আমি খুব ভালবাসি—" তার পর জোরের সহিত বলিল, "দেখ না, আমি নিজেকে উৎসর্গ কচ্ছি।"

তার পর চলিতে লাগিল।

বন্ধু জনতাকে বুঝাইতে লাগিল—লোকটা এত বড় ভণ্ড যে, দুনিয়ায় ওর জুড়ি নাই। অপরাধ করিয়াও তাহাকে সমর্থন করে—ওর জেল হওয়াই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

* * * *

ক্ষিপ্ত জনতার তীব্র তিরস্কার কন্যার কানে পশিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে জাগিল তাহার ঐ হতভাগ্য পিতা দুনিয়ার একটা লোকেরও সহানুভূতি পায় নাই। মানুষের নিয়ম কর্ত্তব্য জ্ঞান শুধু ন্যায়েরই নিশান উড়াইয়াছে। মানুষ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ, মানবতার স্নিগ্ধধারা ফল্গুর মত বালুকাচ্ছন্ন—বিদ্যুতের লীলায়িত ভঙ্গিমা বজ্রের গর্জ্জনে অন্তর্লীন। কন্যা এবার কাঁদিয়া উঠিল—আত্মজা সে, তবু পিতার জন্য একটু সহানুভূতি দেখায় নাই, ন্যায়ের গর্ব্বে সে আত্মহারা হইয়াছিল। এবার সে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল, যদি দীর্ঘ নিশ্বাসের একটি তরঙ্গও কারাগারের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া পিতার বুকে আনন্দ শিহরণ জাগাইয়া তুলে।

* * * *

প্রহরী-বেষ্টিত অপরাধী চলিতেছিল। লোক-জন সব পিছাইয়া পড়িয়াছে। সহসা তাহাকে দেখিয়া পথচারী এক জন থমকিয়া দাঁড়াইল—অতি তীক্ষ্ণভাবে অপরাধীকে দেখিতে লাগিল। অপরাধী তাহাকে চিনিয়া বলিল,—

"কি বল বন্ধু, ভাল আছ!"

"এ কি? এ দশা কেন?"

"ধরা পড়েছি বন্ধু, তাই সমাজ আমায় চায় না।"

"কিন্তু তুমি ত সমাজকে ভালবাস।"

"ভালবাসি ব'লেই ত যাচ্ছি।"

"স্ত্রী-পুত্র প্রতিবেশী কাউকে ত দেখছি না—তারা আসে নি?"

"তারা হয় ত কোন কাগে আটকে আছে।"

"ও কি বন্ধু! তুমি ত মিছা কথা বল না—এখন ভাঁড়াচ্ছ কেন? বুঝেছি, তোমার এ অবস্থা দেখে সবাই তোমার উপর বিরূপ হয়েছে, নয় কি?"

"হ'তে পারে।"

"তা হ'লেও বন্ধু যাবার বেলা আমি ব'লে দিচ্ছি—আমি চোর বটে—কিন্তু আমারও একটা অন্তরাত্মা আছে—আমি সেই অন্তরাত্মার দোহাই দিয়ে ব'লে দিচ্ছি—দুনিয়ার আর সবাই তোমার উপর বিরূপ হোক, আমার কিন্তু দীর্ঘশ্বাস তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে। মনে রেখো বন্ধু, দুনিয়ায় অন্তত এক জন তোমার বন্ধু আছে।"

"আমায় সহানুভূতি দেখানর মত আমি এমন কিছু ত করি নি।"

"তার কারণ কি জানো?"

"কি?"

"কারণ, আর একটা লোকও তোমার মত সহানুভূতি দেখায় নি, সবাই অপরাধের বিচার করেছে, অপরাধীর বিচার করে নি—আর—"

"আর কি?"

"তুমিই যে বলেছিলে, তুমি আর আমি একই পথের পথিক, আমরা বন্ধু।"

এবার অপরাধীর মুখের সেই মৃদু মৃদু হাসি পূর্ণানন্দের প্রফুল্ল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত।

পূর্ব্বরাগ

(বৈষ্ণব কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণে)

সখি লো—আর কেমনে প্রাণের তৃষা
জানাই বলো তোমার কাছে?
তৃষিত—নয়ন-চকোর অমৃত-চোর
তোমার খোঁজে-খোঁজেই আছে।
প্রিয়া গো—তোমার হারিদ গা'র বরণে,
ছুপিয়ে—বসন ধরি মোর পরণে,
হেরিতে—শ্লথ-বেশে আঙন-কোণে
ব'সে রই—উঁচুশাখায় কদমগাছে।

বাঁশরী—বাজাই আমি গাইতে রাধানামের গীতি
বাঁশরী—দূতীর মুখে প্রাণের কথা পাঠাই নিতি,
জানালায়—দেখ্‌তে তোমার চাঁদবদনী,
নূপুরে—শুন্‌তে মধুর শিঞ্জধ্বনি,
দুপুরে—নানা ছলায় সারাক্ষণই
ঘুরিয়া—বেড়াই তোমার ঘর-কানাচে।

ব্যাপারী—সাজি আমি তোমার লাগি দইএর হাটে,
খেয়ারী—মাঝি সাজি কালিন্দীর ঐ খেয়ার ঘাটে।
যে ঘাটে—স্নান ক'রে যাও সেই ঘাটেতেই
নাহিয়া—পরশ তোমার গায় মেখে নেই,
গা মুছি—কাপড় কাচি, তোমার ঢঙেই
চিকুরে—ঝুঁটি বাঁধি তোমার ধাঁচে।

ছলনায়—তোমার ছায়ায় ছায়া মিলাই আস্‌তে যেতে,
চলিতে—গা ঘেঁষে যাই তোমার গায়ের গন্ধ পেতে।
ঘাট হ'তে—ভিজে পায়ের চিহ্ন আঁকি,
ফির, সে—পঙ্ক তুলে অঙ্গে মাখি,
সে-রূপে—জুড়ায় আমার তপ্ত আঁখি
চলি যে—একটু দূরে পাছে পাছে।

আঘণে—দক্ষিণে রই তোমার নিশাস বাতাস লোভে,
ফাগুনে—উত্তরে রই তোমার পরশ সুবাস লোভে,
এমনি—কতরূপেই তোমার লাগি,
পিয়াসা—পরকাশি তোমায় মাগি,
তুমি না—বুঝিলে সই, অনুরাগী
গোকুলে—কেমন ক'রে হায় গো বাঁচে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

চীনের কৃষি-জীবন

দীর্ঘকাল ধরিয়া য়ুরোপে "পীতাতঙ্ক" চলিয়া আসিতেছে। চল্লিশ কোটি নরনারী-অধ্যুষিত চীনদেশ মহানিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া যে দিন আপনার প্রাপ্য-গণ্ডা বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিবে, সে দিন য়ুরোপের পক্ষে বড় শুভদিন নহে, ইহা বহু পূর্ব্ব হইতেই বহু য়ুরোপীয় রাজনীতিক আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিলেন। চীন এখন সত্যই জাগিয়াছে, আত্ম-বিস্মৃত মহাজাতি এখন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সাধনায় সিদ্ধির সমীপবর্ত্তী

নিষিদ্ধ নগরীর সন্নিহিত স্থানে কুমুদের চাষ

হইয়াছে। সুতরাং চীনদিগের সম্বন্ধে সকল কার্য্য জানিবার আগ্রহ মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক।

চীনদেশ স্মরণাতীত যুগ হইতে কৃষি-প্রধান। যখন সমগ্র চীনদেশ খণ্ড খণ্ডভাবে বিভক্ত ছিল—এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, ভিন্ন প্রদেশের নায়ককে পরাজিত করিয়া—এক খণ্ড অস্থির জন্য সারমেয় দল যেরূপ মারামারি, কাড়াকাড়ি করিতে থাকে,—সেইরূপ ভাবে কলহ করিত, তখন চীনদেশে কৃষির বিশেষ বিস্তার ছিল। অথচ চীনারা তখন ভূমির গুণাগুণ, উৎপন্ন শস্যের পার্থক্য এবং আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে জানিত না। বর্ত্তমানেও চীনারা এ বিষয়ে এখনও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করে নাই। টলেমীর বর্ণনানুসারে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কৃষিসম্বন্ধে চীনারা যে অবস্থায় ছিল, এখনও ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে। অথচ এত প্রচুর শস্য-সম্পদ পৃথিবীর অন্যত্র সুদুর্লভ।

য়ুরোপের অধিবাসীরা যখন অসভ্য—বর্ব্বর মাত্র—দেশবাসী যখন পশুচর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া যাযাবর-জীবন যাপন করিত, সেই সময়ে চীনের কৃষিজাত পণ্যই সর্ব্বস্ব ছিল। বাস্তবিক, সমগ্র দেশবাসীর যাবতীয় অভাব মৃত্তিকা-জাত শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিবার মত দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

এডাম্ ওয়ারউইক নামক জনৈক ঐতিহাসিক চীনদেশের কৃষি-পণ্যের সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, নোয়ার সময় হইতে চীনদেশে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আর এই কৃষিজাত পণ্যেই চীনের ন্যায় বিরাট দেশের অসংখ্য

নরনারী জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় যাবতীয় অভাব সেই স্মরণাতীত যুগ হইতে সমানভাবে মিটাইয়া আসিতেছে।

মধ্য-চীনে কবে চীনারা বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক সঠিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, পীত নদের তীরবর্ত্তী উত্তর-চীনের বিরাট মালভূমিতে চীনারা এত কাল পূর্ব্ব হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে যে, তাহাদিগকে উহার আদিম অধিবাসী অনায়াসে বলা যাইতে পারে। "কৃষ্ণকেশ জাতি" লৌহ অথবা ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহারসম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবার বহু পূর্ব্বেই তাহার প্রতিনিধিগণ বসন্তকালে শস্য-রোপণকালে সেন্ নুংএর পূজা করিতেন। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে সাম্রাজ্যিকতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে। দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ এখন আর এই পূজাবিধি পালন করেন না। তবে কৃষককুল এখনও সেন্ নুংএর উপাসনা করিয়া থাকে।

চীনদেশে ভূসম্পত্তি বিভাগ ব্যাপারেও এই প্রাগৈতিহাসিক চীনসম্রাটের প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগে এক এক স্থানে চীনারা বসবাস করিতে আরম্ভ করায় তাহারা এক একটি পরিবার বা দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন পরিবারের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ

চাষীর গৃহ

অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন প্রত্নতাত্ত্বিকের বর্ণিত মানবজাতি কৃষিকার্য্যের জন্য দারুময় দ্রব্যাদির ব্যবহার উদ্ভাবিত করিয়াছিল, সেই যুগে চীন জাতি বর্ত্তমান ছিল।

চীনারা বলে যে, তাহারা সম্রাট সেন্ নুংএর রাজত্বকালে লাঙ্গল দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিত। এই চীনসম্রাট খৃষ্টজন্মের ২ হাজার ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই পুরাণোক্ত সম্রাট এখনও কৃষাণের অবশ্যপূজ্য এবং কৃষির দেবতা বলিয়া সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও পিকিংস্থিত চীনসম্রাট এবং থাকিতেন, তাঁহার উপরই কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইত। ক্রমে ক্রমে এক একটা পরিবার বা দলের কর্ত্তা সেই স্থানের মালিক ও শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিতেন।

নূতন স্থানে বসবাস আরম্ভ করিবার পর পীত নদে একটা ভীষণ বন্যা ঘটে। এই জলপ্লাবনকে 'চীনের মহাশোক' নামে লোক বর্ণনা করিয়া থাকে। এই সুপ্রসিদ্ধ বন্যার ফলে, বন্যা-প্লাবিত স্থানের অধিবাসীরা সে স্থান ত্যাগ করিয়া পাহাড়-পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সময় যে মহাত্মা দেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম

যুগযুগান্তর ধরিয়া চীনারা গান করিয়া আসিতেছে। সেই মহাপুরুষের নাম উ।

বন্যাপ্লাবিত স্থানকে মনুষ্য-বসবাসযোগ্য ও ভূসম্পত্তির পুনর্বিভাগ করিবার জন্য মহাত্মা উ কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 'উর দান' শীর্ষক একটি সুপ্রাচীন দলিলে তাহার উল্লেখ আছে।

তার পর ঐতিহাসিক যুগে আমরা চিন্-সি-হংটির সংস্কার-প্রণালী ও চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণের ব্যাপার অবগত হই। খৃষ্টজন্মের ২ শত ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই চিন্-সি-হংটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। তাঁহারই চেষ্টায় এক একটা সম্প্রদায়ের নেতার ভূস্বামিত্ব অবলুপ্ত হইয়া যায় এবং সেই স্থানে ব্যক্তির অংশে জমী বিলি করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

সেই সময় হইতেই চীনদেশে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন প্রথাও কোনও কোনও স্থানে অস্থায়িভাবে মাঝে মাঝে পুনরায় দেখা দিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি উহার স্মৃতিচিহ্ন এখনও আবিষ্কার করা যায়।

এখনও ব্যক্তি অপেক্ষা পরিবারের প্রভাব চীনদেশে সম্পূর্ণ বিদ্যমান—প্রাচীন যুগে পরিবারের কর্ত্তা যেমন সর্ব্বময় ছিল, এখনও তাহাই আছে। কোনও জমী হস্তান্তরিত করিতে হইলে সেই পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং অন্যান্য সকলের পরামর্শ ব্যতীত তাহা হইবার উপায় নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পার্ব্বত্য জিলা সমূহে গোচারণ মাঠ অনেকগুলি গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি। ইহাতে প্রাচীন যুগের সভ্যতার ধারা প্রমাণিত হয়।

চীনের পল্লীগ্রামে জনসংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট। এমন স্থান আছে, যেখানে প্রতি বর্গমাইলে ৩ হাজার ৮ শত মানুষ, ৩ শত ৮৯ গর্দ্দভ এবং ৩ শত ৮৯ শূকর দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে কর্ষণের অযোগ্য বহু পার্ব্বত্য প্রদেশও অকর্ষিত অবস্থায় আছে।

চীনা কৃষক জমীতে লাঙ্গল দিতেছে

চীনারা স্বল্প ভূমির উপস্বত্বে দিন যাপন করিতে পারে। তাহার কারণ, দেশের আবহাওয়া উত্তম, জমীর উর্ব্বরাশক্তি পর্য্যাপ্ত এবং চাষপ্রণালী কার্য্যকরী। তাহা ছাড়া চীনারা অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং জমীর কর অতি সামান্য।

চীনের মনস্বী ও বিজ্ঞ সম্রাট ক্যাং-সি তাঁহার অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী রাজত্ব উপলক্ষে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষে তিনি

প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে গোচারণ ভূমি

চীনা চাষার ধান্য রোপণ

ঘোষণা করেন যে, সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে পরিমাণে কর্ষিত ভূমি বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং জমীর খাজনার হার লোকসংখ্যার অনুপাতে ধার্য্য হইবে। ইহার পর আর কখনও জমীর কর বৃদ্ধি পাইবে না। তাঁহার সেই ঘোষণার পর সত্যই এ পর্য্যন্ত চীনের ভূমি-শুল্ক অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আছে।

ছোট বালক শিশু ভগিনীকে দুগ্ধপান করাইতেছে

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র চীন-দেশের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ২ কোটি ৯০ লক্ষ টেল বা ২ কোটি ২০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টেল ভূমি-শুল্ক হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই হ্রাসের কারণ, পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের নানাবিধ দৈবদুর্ব্বিপাক।

চীনদেশে এমন কোন জমী নাই, যেখানে চীনা কৃষক চাষ আবাদ করে না। যেখানে শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, দলে দলে চীনারা সেই স্থানে শস্য ও শাক-সব্জী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেই। এক ইঞ্চ পরিমিত ভূমি তাহারা অকর্ষিত অবস্থায় কখনই ফেলিয়া রাখিবে না।

প্রস্তরাকীর্ণ—পার্ব্বত্য প্রদেশে ক্রমে ক্রমে মাটী ফেলিয়া চীনারা চাষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ইতস্ততঃ করে না। বহু বৎসরের বিপুল চেষ্টায় এরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। চীনারা পরিশ্রম করিতে আদৌ কুণ্ঠিত নহে। নদীর মধ্যে কাঠের ভেলা বাঁধিয়া তাহার উপর মাটী ফেলিয়া ধান্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। নদীর মধ্যে সেই ভেলা নোঙ্গর করিয়া রাখা হয়। সমুদ্র-সৈকতে শস্যক্ষেত্রের অন্ত

চীনা বালক-বালিকা ফড়িঙ্গ ধরিতেছে

ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা

চীনা কৃষক কুমড়া লইয়া বাজারে চলিয়াছে

কাষ্ঠসেতুর উপর অশ্ববাহিত পাল্কীযোগে চীন পরিব্রাজক
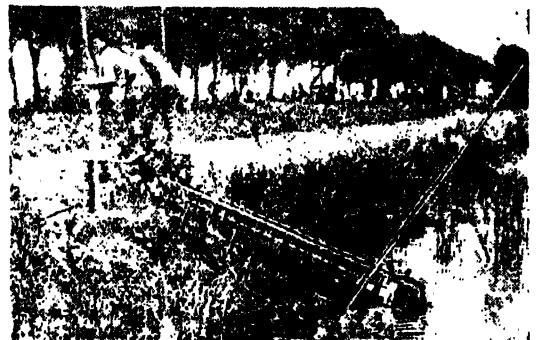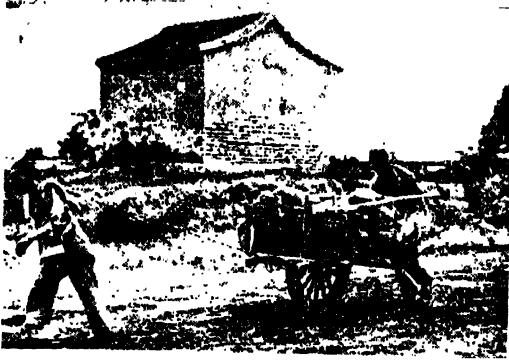
নাই। বাস্তবিক, এরূপ পরিশ্রমী চাষী পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ।

যে কোনও চীনা কৃষিক্ষেত্র এবং গোলাবাড়ী মানুষের হস্তপদজাত শ্রমের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতির সংস্রব আদৌ নাই। একটা পরিবারের সমবেত চেষ্টাতেই এরূপ গোলাবাড়ী সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের আচার, রীতি-নীতি, দীর্ঘকালের আবেষ্টন, আবহমান কালের আচরিত অনুষ্ঠানের সংস্কার এবং অর্থ-নৈতিক অবস্থা চীনা কৃষকের মনে এমন দৃঢ়রূপে অঙ্কিত যে, সে কোনক্রমেই মূলধন বিনিয়োগে বৃহৎভাবে কৃষি-ব্যবসায়কে পরিচালিত করিবে না।
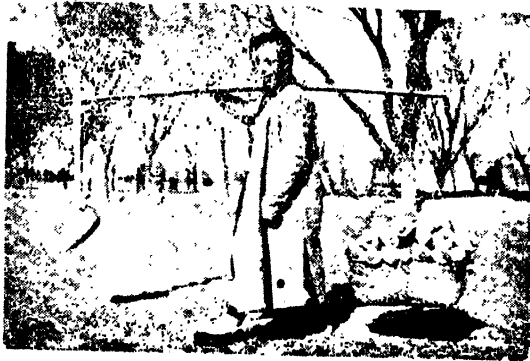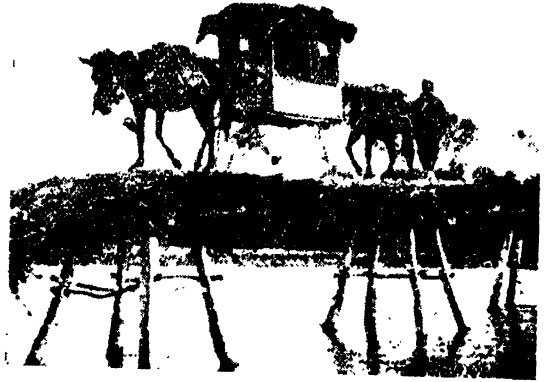
তরকারীসহ চানা কৃষক

বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া একই উপায়ে চীনারা চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে। জমীর বিশিষ্ট গুণ এবং বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কৃষি-পদ্ধতির প্রভাবেই চীনা কৃষক ক্ষেত্র হইতে পর্য্যাপ্ত শস্য সংগ্রহ করিয়া থাকে।

অধ্যাপক এফ, এইচ, কিং চীনের কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণাকালে এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমরা ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করিবার জন্য কত-প্রকার সার দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছি। প্রতি বৎসরেই নূতন ভাবে সার দিয়া পর্য্যাপ্ত শস্যসংগ্রহের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চীনারা কি করিয়া জমীর উর্ব্বরা-শক্তিকে অব্যাহত অবস্থায় রাখিয়াছে। তাহারা আমাদের

চীনা কৃষক গুড় জাল দিয়া চিনি প্রস্তুত করিতেছে

ভুট্টাক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ
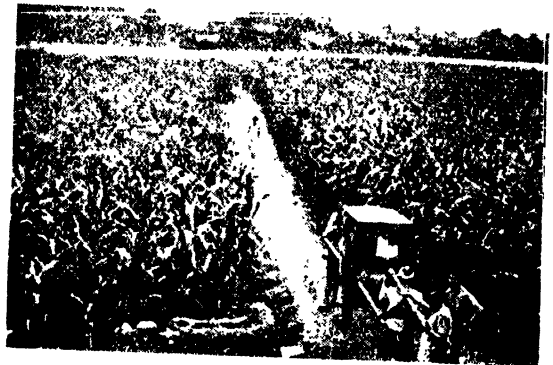
মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন প্রকার সার ব্যবহার করে না, অথচ তাহাদের জমীর উর্ব্বরা-শক্তি যেন সমান ভাবেই বিদ্যমান। সমগ্র সভ্য-দেশ চীনের এই চাষক্রিয়া ব্যাপারে সত্যই বিস্ময়-বিমুগ্ধ।”

সম্ভবতঃ চীনারা স্বাভাবিক উপায়ে জমীর উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে বলিয়া জগতে এ বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। চীনা চাষা ‘নাইট্রেট’ বা ‘ফস্‌ফেট্’ জমীতে প্রয়োগ করিতে পারে না—সামর্থ্যের অভাববশতঃও বটে এবং উহা বহুমূল্য এবং সহজপ্রাপ্য নহে বলিয়াও বটে। মনুষ্যদেহের এবং পশুদেহনির্গত মলের সারই সে

চীনা পরিবার চাউল ধুইতেছে

কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জমীকে অনুর্ব্বর হইবার অবকাশ দেয় না।

কৃষি সম্বন্ধে হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, সাংহাই নগরের নর্দ্দামা প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ আবর্জ্জনা কোন চীনা কনট্রাক্টারকে ৩১ হাজার স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছিল। এই আবর্জ্জনা সার-স্বরূপ পল্লীর কৃষকগণের নিকট প্রেরিত হয়। মফঃস্বলে সার বিক্রয় করিবার জন্য, নৌবহর বাৎসরিক ভাড়ায় খালের মধ্য দিয়া গতায়াত করিয়া থাকে।

মার্কিণ বিশেষজ্ঞগণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মনুষ্যদেহনির্গত

পাহাড়ের উপর ধানের চাষ

প্রভূত মলরাশি কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হইয়া ভূগর্ভস্থ নলপথে সমুদ্রগর্ভে চলিয়া যায়। চীনারা কিন্তু এই মলরাশি কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া প্রভূত শস্য-সম্পদ লাভ করিয়া থাকে।

চীনা দস্যুর শাস্তি—প্রকাশ্য স্থানে মুণ্ড ঝুলিতেছে

প্রত্যেক চীনা চাষীর গোলা-বাড়ীতে নানাবিধ আধারে এই বিচিত্র সার সঞ্চিত থাকে। যথা সময়ে জলের সহিত মিশাইয়া চীনা চাষী তাহা ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রতি গৃহে, যাহা আবর্জ্জনা বলিয়া পরিকল্পিত, ছাই ভস্ম প্রভৃতিও ছোট ছোট বালকরা সারের জন্য সংগ্রহ করে। কোনও জিনিষই চীনারা ফেলিয়া দেয় না।

যেখানে খাল আছে, তাহার কর্দ্দম শস্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সর্ব্বত্র এই সার সুপ্রাপ্য নহে।
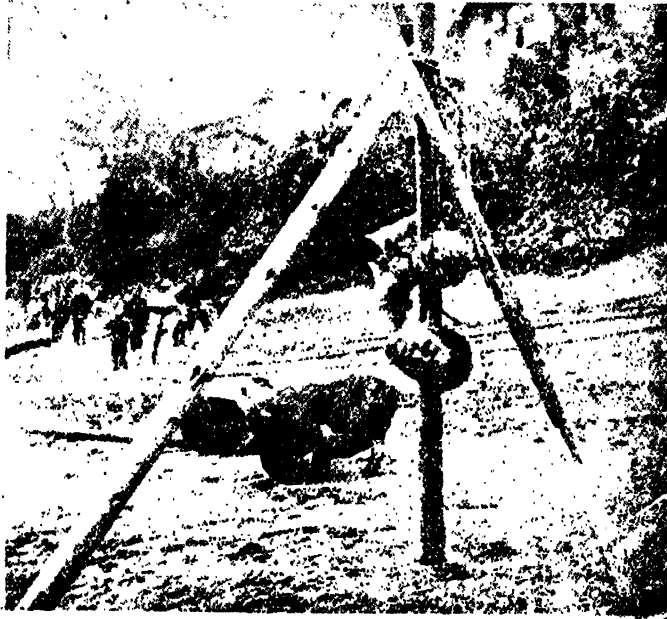
চীনের চাষ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; ধান্য ও অন্যান্য শস্য। চীনদেশের সর্ব্বত্র আবহাওয়া এক-প্রকার নহে, সুতরাং জমীও সর্ব্বত্র একই প্রকার উর্ব্বরা নহে—স্থানহিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু চাষপ্রক্রিয়া সর্ব্বত্র একই প্রকারের। অতি প্রাচীনকাল হইতে যে প্রণালীতে চাষ আবাদ হইয়া আসিয়াছে—সর্ব্বত্র সেই ব্যবস্থা
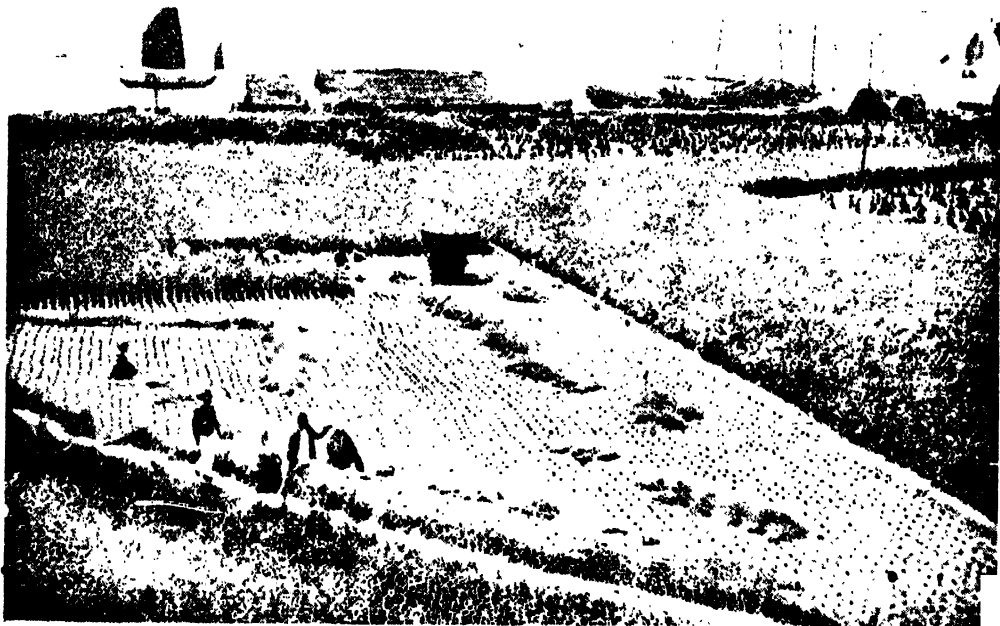
চীনা চাষীর ধান কাটা

অনুসারেই চাষীরা শস্য রোপণ ও বপন করিয়া থাকে। লাঙ্গল প্রভৃতি চাষের উপযোগী যন্ত্র যেমন লঘুভার, তেমনই বিকল হইলে সহজে কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া চলে। চাষীরা নিজ হস্তেই লাঙ্গল মেরামত্ করিতে পারে।

চীনা-লাঙ্গল লঘুভার; কিন্তু ভূমিকর্ষণের বিশেষ উপযোগী। সমগ্র কর্ষিত জমী মনুষ্যহস্তে প্রস্তুত হয়, ধান রোপণ বপন এবং শস্য কর্ত্তন—সকল ব্যাপারেই চীনারা হস্তের সাহায্য গ্রহণ করে, অন্য কোনও যন্ত্রের শরণাপন্ন হয় না। ঊষার উদয় হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া পর্য্যন্ত চীনা চাষী সপরিবারে গৃহপালিত পশুসহ চাষের কার্য্যে রত ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, চীনারা কিরূপ স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী ও অদ্ভুতকর্ম্মা।

পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি—বালক-বালিকা হইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ অকারণ বসিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করে না। পুরুষরা ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপন করে—নারীরা ক্ষেত্র হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলে। যাহারা অসমর্থ, তাহারা ক্ষেত্রমধ্যস্থ অস্থায়ী কুটীরে প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। পক্ব শস্যাদি কেহ চুরী করিতে আসিলে তাহারা ডাকহাঁক করিয়া চৌর্য্য-কার্য্যে বাধা জন্মায়।

ধনী কৃষকের গৃহ

থাকে—ক্ষেত্র ছাড়িয়া কোথাও যায় না। অনেক সময় মধ্যাহ্নের আহার্য্য মৃত্তিকানির্ম্মিত অস্থায়ী উনানে পাক করিয়া আহার করিয়া থাকে।

কোনও কৃষক কদাচিৎ তাহার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া মজুরের দ্বারা কৃষিকার্য্য করায়। শুধু মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে যে সকল ব্যক্তির কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা অধিক, তথায় স্যাণ্টং প্রদেশের অনেক শ্রমজীবী আসিয়া শস্যকর্ত্তনকালে সাহায্য করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে কোনও চীনা-পরিবার স্ব স্ব ক্ষেত্রের শস্য রোপণ হইতে শস্য কর্ত্তন বা বহমের কার্য্য আপনারাই করিয়া থাকে—বাহিরের কোনও সাহায্য গ্রহণ করে না।

দক্ষিণ চীন অর্থাৎ ধান্য-প্রধান অঞ্চলে চীনা চাষীর বিপুল শ্রমসহিষ্ণুতা মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করিবে। এতদঞ্চলের আবহাওয়ার গুণে বৎসরে অনেকগুলি ফসল একই ক্ষেত্র হইতে লাভ করা যায়।

চাউল চীনাদের প্রধান খাদ্য নহে বটে; কিন্তু উহারা অন্নের ভক্ত। উচ্চ নীচ—সকল স্তরের চীনাই অন্ন ভোজন করিতে ভালবাসে। কিন্তু সমগ্র চীনদেশের কর্ষিত ক্ষেত্রের আট ভাগের একভাগ মাত্র স্থানে ধান্য উৎপাদিত হয়।

প্রত্যেক ধান্যক্ষেত্র এক ফুট উচ্চ স্বতন্ত্র 'আইলের' দ্বারা বেষ্টিত—ভারতবর্ষের ধান্যক্ষেত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

কোন কোন ক্ষেত্র একটা ছোট ঘরের মত স্বল্প পরিসর। ক্ষেত্রের পার্শ্বে—চাষী একটি স্থানে ধানের চারাগাছ রোপণ করিয়া রাখে। সেই স্থান হইতে চারাগুলি তুলিয়া চাষী ক্ষেত্রমধ্যে ধান্যগাছ বপন করে। অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্রটি শ্যাম আস্তরণে নয়ন-বিমোহন শোভা ধারণ করিয়া থাকে।

চীনা চাষীরা বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। নানা উপায়ে তাহারা ক্ষেত্রের মধ্যে জল ভরিয়া দেয়। সুতরাং বৃষ্টি না হইলেও চাষের কোন ক্ষতি হয় না। ধানের চারা যখন ১২ ইঞ্চ দীর্ঘ হয়, সেই সময় চীনারা উহা ক্ষেত্রমধ্যে আরম্ভ করিলে পক্ষিকুলকে তাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ঘটে।

উত্তর চীনে বৃষ্টিপাত বহুলাংশে কম হইয়া থাকে। এ জন্য সে অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এতদঞ্চলের কৃষিগণ সর্ব্বক্ষণই জলের সন্ধানে থাকে এবং এক বিন্দু জলও নষ্ট হইতে দেয় না। জনার-জাতীয় এক প্রকার শস্য এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোধুমের ন্যায় এই ভুট্টা প্রধান খাদ্য-শস্য।

চীনের জনার অনেক প্রকারের। তন্মধ্যে 'সোরঘাম বা কেওলিয়াং' জাতীয় জনারই উৎকৃষ্ট। এই শস্য মাঞ্চুরিয়া

পেঁয়াজ-রসুনসহ চীনা কৃষক

বপন করিতে থাকে। এই কার্য্যটিতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। চারাগুলি মুঠা করিয়া ধরিয়া চীনারা প্রথমতঃ ধীরে ধীরে উপাড়িয়া লয়। তাহার পর উহার গোড়ায় যে কর্দ্দম লাগিয়া থাকে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া চাষীরা বপন করিতে থাকে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের বপনপ্রণালীর সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই বলিতে হইবে।

বপনকার্য্য শেষ হইয়া গেলে আর বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। শুধু আগাছাগুলিকে সরাইয়া দেওয়া এবং আইল ভাঙ্গিল কি না, এই দুইটি ব্যাপার পরিদর্শনই চাষীদিগের তখনকার কর্ত্তব্য। শস্য পরিপক হইতে হইতে তৃতীয় শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম নীত হয়। এই শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ২৫ মণ শস্য পাওয়া যায়। এই খাদ্যশস্যের এমন গুণ যে, এক জন শ্রমজীবীর এই শস্যের প্রায় দুই সের হইলেই এক দিন দুই বেলা উদরপূর্ত্তি হইবে এবং এক জন সাধারণ মানুষের তাহার অর্দ্ধেক শস্যেই দিন চলিয়া যাইবে।

কিন্তু এই শস্য মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবেরও ভক্ষ্য। অশ্ব, অশ্বতর, গরু, মেষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি যাবতীয় গৃহপালিত জীব এই শস্যেই জীবনধারণ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহা হইতে ভিনিগার এবং আসব প্রস্তুত হইয়া

থাকে। মোঙ্গল-বংশের রাজত্বকালে জনৈক পানাসক্ত ব্যক্তি এই শস্য হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়াছিল। তদবধি পল্লী অঞ্চলে এই মদ্যের প্রসার। তবে দিন দিন, চীনারা সুরা-পানের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া লইতেছে।

এই জনার জাতীয় বৃক্ষ অনেক কার্য্যে লাগে। শস্যকাটা হইয়া গেলে, উহার পত্র দ্বারা মাদুর, চ্যাটাই প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ডাঁটাগুলি—ঘরের বেড়া, প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। গাছগুলি ১২ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এ জন্য অন্য শস্যকে বায়ুর প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার বেড়া দিলে সে আশঙ্কা আর থাকে না।

তবে এই গাছের একটা দোষ আছে। যখন জনার-জাতীয় গাছগুলি বড় হইয়া উঠে, তখন ইহার ঘনপাতাচ্ছন্ন ছায়ায় অশ্বারোহী দস্যুগণ অনায়াসে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যখন কেওলিয়াং শস্য পরিপক হইতে থাকে, চীনারা সেই ঋতুটিকে তখন "দস্যুঋতু" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

উত্তর চীনে নানাবিধ কলাই, মটর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মটরই প্রধান। মাঞ্চুরিয়া-জাত মটর-তৈল আমেরিকা যুক্তরাজ্যে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ম্যানিলা হইতে ১৬শ শতাব্দীতে আলু চীনদেশে নীত হয়; কিন্তু মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর পশ্চিম চীন ব্যতীত অন্যত্র শাদা আলু তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। রাঙ্গা আলু চীনাদিগের অত্যন্ত প্রিয়। ইহার চাষ সে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি জাতীয় তরকারী চীনের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ফুটি, তরমুজের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। অনেকের গৃহের চালে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

শূকরের বাজার

চা চীনদেশের শ্রেষ্ঠ চাষ। কবে চা প্রথম চীনদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্ততঃ খৃষ্টজন্মের ২ হাজার ৭ শত বৎসর পূর্ব্বেও চা চীনদেশে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় চা এখন চীনের চা-র বিশেষ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তথাপি চীনদেশের উৎপন্ন চা পৃথিবীর অনেক স্থানেই বিক্রীত হইয়া থাকে।

চীনদেশের রেশম আর একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়। এই রেশম পৃথিবীব্যাপী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতি বৎসর বহু কোটি মুদ্রা মূল্যের রেশম চীনদেশ হইতে নিউইয়র্কে প্রেরিত হইয়া থাকে। রেশম উৎপাদনের জন্য বহু ক্ষেত্রে তুঁতের চাষ হইয়া থাকে।

ইহার পরই কার্পাসের চাষ। চীনদেশের অনেক স্থলেই তুলা উৎপাদনের জন্য কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। খাদ্যশস্যের পরই ইহা চীনাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর পক্ষে তুলা অপরিহার্য্য। তুলা হইতেই শীতকালের ব্যবহারের উপযোগী যাবতীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চীনদেশে কর্ষণকার্য্য এক ইঞ্চ পরিমিত ভূমিও চীনারা বিনা চাষে ফেলিয়া রাখে না সত্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধির জন্য ইহারা সানন্দচিত্তে বহু জমী ফেলিয়া রাখে। পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি চীনাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অত্যন্ত অধিক।

কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বহুদিন পূর্ব্বেই এইরূপ সেচের খাল খনিত হইয়াছিল। হুনাংচা এবং সাংহাইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রতি মাইলে তিনটি করিয়া সেচের খাল বিদ্যমান। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল খাল খনিত হইয়াছিল এবং ৪ হাজার বৎসর ধরিয়া চীনা কৃষকরা তাহাদের শস্যক্ষেত্রে এই খাল হইতে জল সেচন করিয়া আসিতেছে। দারুনির্ম্মিত জলসেচন-যন্ত্রের সহিত একটা মহিষকে বাঁধিয়া দিয়া তাহার দ্বারা জল তুলিয়া ক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রতি দশ-ঘণ্টা পরিশ্রমের পর একটা মহিষকে বিশ্রাম দিয়া দ্বিতীয় মহিষ অথবা তাহার শাবকের দ্বারা উক্ত কার্য্য চলিতে থাকে।

কশাইখানার অভিমুখে

বহুদিনের ব্যবহারে পাহাড় পর্ব্বতের বৃক্ষগুল্ম হ্রাস হইয়া যাওয়ায় চীনদেশে জ্বালানি কাষ্ঠের সমস্যা অত্যন্ত জটিল। মন্দির ও সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বৃক্ষ দুর্ল্ভ। চিহিলি ও স্যাণ্টং প্রদেশের অধিবাসীরা শস্যোৎপাদনের পর শুষ্ক তৃণের অব্যবহৃত অংশ ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে "মাসিক বসুমতীতে" এ বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ক্যাণ্টনের বিস্তৃত 'ব'দ্বীপ এবং ইয়াংসি উপত্যকা-ভূমির সর্ব্বত্র সেচের খালের অতি চমৎকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। একটা চীনা-শিশু একটা মহিষকে অনায়াসে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মহিষ এমনই পোষ মানিয়া থাকে যে, শিশুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে তাহার বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। যে চাষীর অনেকগুলি মহিষ থাকে, সে ব্যক্তি চীনদেশে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত।

স্যাণ্টং ও হোনান অঞ্চলের চাষীরা সাধারণতঃ গৃহে কতিপয় গরু প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু গৃহপালিত পশুর সংখ্যা চীনদেশে এরূপ দুষ্প্রাপ্য যে, কেহই সাধারণতঃ মাংস ভোজন করিতে পায় না। বৎসরে মাত্র একবার—

ধান্য মলাই

নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে একটি মাত্র কৃষ্ণ শূকর মারিয়া ভোজের আয়োজন করা হইয়া থাকে।

কাহারও কাহারও গৃহে ছাগল বা ভেড়া অল্প সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্ম বা লোমের জন্য তাহারা প্রতিপালিত হয়। ছোট ছোট গৃহপালিত জীব গৃহস্থদের শয়নগৃহের একপার্শ্বে আশ্রয় পাইয়া থাকে। কাঠের বেঞ্চ বা টেবল ছাড়া ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের বাহুল্য কোনও চাষীর গৃহে নাই। কাহারও কক্ষতল কার্পেটমণ্ডিত নহে। সুতরাং মোরগ, মুরগী, ছাগল, ভেড়া ঘরের মধ্যে অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়ায়—কোন কিছু নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

প্রতীচ্য দেশের তুলনায় চীনা কৃষকের আবাসগৃহ নানাবিধ অস্বাচ্ছন্দ্যের আগার। সাধারণতঃ প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে তিনটি কক্ষ, একটি রন্ধনাগার এবং এক টুক্রা প্রাঙ্গণ।

চীনারা জীবনযাত্রার যাবতীয় ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য হইতে বর্জ্জিত। মিতাচার তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিস্ফুট। একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিয়া চীনারা গর্ব্ব করিয়া থাকে। বাস্তবিক, পৃথিবীর কুত্রাপি এরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই। পৃথিবীর বক্ষে আলোকের প্রথম কিরণ প্রদীপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের জীবন-সংগ্রাম আরব্ধ হয় এবং যতক্ষণ আলোকদীপ্তি অন্তর্হিত না হয়, ততক্ষণ ইহারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে থাকে। এত গুরু পরিশ্রমেও চীনা চাষীর মুখে প্রসন্নতার হাস্য চির সমুজ্জ্বল—সন্তোষের তৃপ্তি তাহার আননকে উদ্ভাসিত রাখে। তাহার কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতাও যেমন অপরিসীম, তাহার নীতিজ্ঞানও তেমনই প্রবল।

চীনা নরনারী গোধূম পিষিতেছে

শূকর বাঁকে ঝুলাইয়া কৃষক বাজারে চলিয়াছে

কৃষকবধূ শিশু-সন্তানের দলের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকে। কোনও সন্তানের বয়স দুই তিন বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত মাতা তাহাকে লালন-পালন করে, কিন্তু কখনও সে জন্য অধীরতা বা অসন্তোষ প্রকাশ করে না। চীনা চাষীর পুত্র-কন্যাগণ সর্ব্বক্ষণ পিতার পার্শ্বে থাকিয়া পরিশ্রম করিয়া থাকে।

চীনা কৃষক মোটর গাড়ী চড়ে না, টেলিফোঁ ব্যবহার করে না। এক চাষীর গৃহ, অপরের গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী

নহে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাহারা কাছাকাছি বাস করিবার শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। দস্যু-তস্করের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অধিক বলিয়া বহু প্রাচীন যুগ হইতেই পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে বাস করিয়া থাকে।

চীনারা স্বভাবতঃই অত্যন্ত সামাজিক ব্যক্তি। যে ব্যক্তি গ্রামবাসীর সহিত মিলিতে মিশিতে চাহে না—সামাজিক ব্যবহার করিতে চাহে না, তাহাকে সকলেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। চীনাদের সামাজিক জীবন অতি পবিত্র এবং তাহারা মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভালবাসে।

চীনাদের আহার্য্য অতি সামান্য; বাসস্থান অপ্রশংসনীয় হইলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের জীবন তাহারা যাপন করিয়া থাকে। এক জন অপরের অপেক্ষা হীন, ইহা তাহাদের জ্ঞানের অগোচর। তাহারা জানে, দেশের মেরুদণ্ড তাহারাই। এ জন্য কোন প্রকার আত্মত্যাগে তাহারা পশ্চাৎপদ নহে—তাই তাহারা সর্ব্বক্ষণ পরিশ্রম করিয়াই সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। ভূমিকে তাহারা মাতৃজ্ঞানে পরিচর্য্যা করে, ভালবাসে। ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে এই জাতির প্রতি সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

তাল-বেতাল

শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য-প্রসঙ্গ

প্রেমিক-চাষী

নিউইয়র্কের হার্লেম পুলিস-আদালতে সংপ্রতি একটা মজার মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। আসামী একটি কৃষক যুবক। সারাদিন মাঠে চাস-আবাদ করিয়া অপরাহ্নে সে বাড়ী ফিরিল। সে অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিল, সহরের 'মিউজিক হলে' নানা রকম রং-তামাসা হয়, মজার মজার গান শুনিতে পাওয়া যায়; সামান্য কিছু খরচ করিলে কয়েক ঘণ্টা বেশ আমোদে কাটে। সে দিন যুবকের হাতেও কিছু পয়সা ছিল। সে স্থির করিল, সেই দিন সন্ধ্যার পর একটা 'মিউজিক হলে' গিয়া কয়েক ঘণ্টা স্ফূর্ত্তি করিয়া আসিবে।

এই সঙ্কল্পানুসারে সে সাজপোসাক করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং একখানি টিকিট কিনিয়া গান শুনিবার জন্য মিউজিক হলে প্রবেশ করিল। সে জীবনে সর্ব্বপ্রথম মিউজিক হলে গিয়াছে! প্রাণ ভরিয়া গান শুনিবে ও গায়িকাদিগকে চোখ ভরিয়া দেখিবে। চক্ষু-কর্ণ সফল করিবে, এই উদ্দেশ্যে বেশী পয়সা দিয়া সে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াছিল, এবং সম্মুখের বেঞ্চিতে স্থান সংগ্রহ করিয়াছিল।

দুই তিনজন গায়িকার গান শেষ হইলে একটি তরুণী গায়িকা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। তাহার যেমন রূপ, তেমনই পোষাকের ঘটা! সে দর্শকগণের মুখের দিকে অপাঙ্গ ভঙ্গিতে চাহিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল, "এসো যাদু আমার বুকে, চুমো খাও আমার মুখে"—চাষী যুবক দেখিল, গায়িকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া তাহাকে ইসারা করিয়া পুনঃপুনঃ গাহিতেছে—'এসো যাদু আমার বুকে'—ইত্যাদি। গান শুনিয়া যুবকের বুকের রক্ত তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি পরী? স্বর্গ হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া গানের সুরে তাহাকে আহ্বান করিতেছে? চাষী আর তাহার আসনে স্থির থাকিতে পারিল না; সে অর্চেষ্ট্রা বাহিয়া উঠিয়া 'ফুটলাইট' পার হইল, এবং তরুণী গায়িকার সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া গভীর তৃপ্তিভরে তাহার মুখে চুম্বন করিল!

তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া দর্শকগণ সক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল; কেহ বলিল, 'মারো।' কেহ বলিল, 'পাগলটাকে পুলিসে দাও।' চাষীর কায দেখিয়া অনেক মহিলার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। উঃ, কি ভীষণ বেয়াদপি! গায়িকার কণ্ঠরোধ হইল, সে চাষীর আলিঙ্গন-পাশ হইতে সবলে মুক্তিলাভ করিয়া ক্রোধে ঘৃণায় কাঁপিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সেই চাষী-প্রেমিক অবিলম্বে পুলিসের হস্তে সমর্পিত হইল।

পরদিন হার্লেম পুলিস-আদালতে অভিযুক্ত প্রেমিক-চাষীর অপরাধের বিচার হইল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—'শান্তিভঙ্গ এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে (An explosion of emotion) নারীর লজ্জাশীলতায় আঘাত।'

আসামী আত্মসমর্থনের জন্য বলিল, "আমি নিরপরাধ। ঐ গায়িকা আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে সে আমাকে অরসিক মনে করিবে ভাবিয়াই ঐ কার্য্য করিয়াছিলাম। ঐ রকম সুন্দরী যুবতীর অনুরোধ কি করিয়া অগ্রাহ্য করি, হুজুর!"

আসামীর কথা শুনিয়া হুজুর তাঁহার এজলাসেই সেই যুবতীকে সেই গানটি ঠিক সেই ভাবে গাহিতে আদেশ করিলেন। এজলাস কিছুকালের জন্য রঙ্গালয়ে পরিণত হইল; যুবতী গায়িকা নাচিয়া নাচিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া সেই গান গাহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গান শুনিয়া রায় দিলেন—ফরিয়াদীর গান এরূপ মোহ-উৎপাদক নহে যে, তাহা শুনিয়া আসামী ঐ অশিষ্ট ব্যবহারে প্রণোদিত হইতে পারে। উহার তিন ডলার (সাড়ে সাত টাকা) জরিমানা।

আসামী লম্বা সেলাম দিয়া বলিল, "ধন্যবাদ, হুজুর! আমি যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহার দাম তিন ডলারের চেয়ে অনেক বেশী। আর একবার সেই আনন্দ লাভের জন্য আর তিন ডলার জরিমানা দিতে রাজী আছি।"

এজলাসে হাসির রোল উঠিল।

লোমহর্ষণ সুদ

আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশের একটি নগরের নাম সান-জোস্। এই নগরের জেম্‌স্ জোন্‌স নামক একটি ভদ্রসন্তান তাহার বন্ধু জর্জ মিল্‌সের নিকট দুইশত পঁচিশ ডলার (প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড) ধার লইয়াছিল। সে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

অনেকেরই অভ্যাস—টাকা ধার লইয়া সে কথা ভুলিয়া যায়। এ বিষয়ে জেম্‌সের স্মরণশক্তিও প্রখর ছিল না; সে সেই ঋণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার বন্ধু কি সে কথা ভুলিতে পারে? বিশেষতঃ আমেরিকার আইনে বোধ হয় 'তামাদি' বলিয়া কোন কথা নাই; সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে জর্জ তাহার বন্ধুকে সুদে-আসলে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বলিল।

জেম্‌স্ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাই ত, সামান্য টাকা; একদম্ ও কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ভাই! তা টাকাগুলা আমি দিতে রাজী আছি, কিন্তু তুমি বন্ধু মানুষ, সুদটা রেহাই দাও।"

জর্জ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা কি করিয়া হইবে? তুমি আমার বন্ধু, কিন্তু আমার টাকার সঙ্গে ত তোমার বন্ধুত্ব নাই। সুদ ছাড়িতে পারিব না।"

জেম্‌স্ বলিল, "তবে মাসিক শতকরা দশ ডলার হিসাবে যে সুদ হয়—তাহা লইয়া আমাকে অব্যাহতি দাও; হিসাব করিলে সুদে আসলে অনেক টাকা হইবে।"

বন্ধু জর্জ তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া জেম্‌সের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিল। কারণ প্রকাশ নাই, নিম্ন আদালতে ও আপীল আদালতে জর্জ মামলায় হারিল; দুই আদালতে হারিয়া তাহার জিদ বাড়িয়া গেল। অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের

বিচারে সে জয়লাভ করিল। সুপ্রীম কোর্টের দুই জন হিসাব-নবীশ সুদ কষিতে আরম্ভ করিল। দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তাহারা সুদের পরিমাণ স্থির করিল—দুই শত পঁচিশ পাউণ্ডের সুদ—ছিয়াত্তর লক্ষ কোটি পাউণ্ড!—এই ঋণ পরিশোধ করিতে জেম্‌সকে কত লক্ষবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে, সুপ্রীম কোর্টের হিসাবনবীশেরা তাহা গণনা করিতে পারিয়াছে কি না সংবাদ পাই নাই। কিন্তু এই সংবাদটি মার্কিণের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন আড্ডার আমদানী নহে। মার্কিণের সকলই অদ্ভুত!

—*—

সম্পাদকের লাঞ্ছনা

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সংবাদপত্র-সম্পাদকের মাথার উপর ডেমক্রিসের তরবারি ঝুলিতে দেখা যায়। স্পষ্টবাদী নির্ভীক সম্পাদকগণ প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজার বা রাজপারিষদবর্গের খেয়ালের কঠোর সমালোচনা করেন, ইহা তাঁহাদের অসহ্য। রাজা বা তাঁহার আমলাতন্ত্র কর্ম্মচারীরা প্রজার স্বার্থ পদদলিত করিলে, বে-আইনী আইনের বলে প্রজাসাধারণকে উৎপীড়িত করিলে, যে সকল সম্পাদক সরকারের কার্য্যের সমর্থন করিয়া বলেন, 'তা বটে, তা বটে, বেশ!'—তাঁহারা রাজদ্বারে সম্মান লাভ করেন; কিন্তু যাঁহারা বিদ্রূপ-কশাঘাতে তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত করেন, তাঁহাদেরই বিপদ্‌। সকল দেশের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সম্পাদকগণকে অল্পাধিক পরিমাণে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হইতে হয়; এমন কি, স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র য়ুরোপেও ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না।

য়ুরোপের হঙ্গেরী রাজ্যে একখানি সংবাদপত্র আছে, তাহার নাম 'নেপ্‌সজাভা,; (Neps Zava) হঙ্গেরিয়ান্ গবর্মেণ্ট এই সংবাদপত্রখানির প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন। হঙ্গেরীয় আইনে গবর্মেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা নিষিদ্ধ, এই জন্ম সে দেশের প্রায় কোন সংবাদপত্রে গবর্মেণ্টের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয় না; কিন্তু 'নেপ্‌সজাভা' গবর্মেণ্টের কুকার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করে।

এই অপরাধে বর্ত্তমান বর্ষে এক মাসের মধ্যে 'নেপ্‌সজাভা'র সম্পাদক, লেখক ও পরিচালকবর্গের বিরুদ্ধে ১ শত ৭০ দফা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর আর এক সপ্তাহে আরও ১ শত ২৬ দফা অভিযোগ উপস্থিত! অর্থাৎ পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদিগকে ২ শত ৯৬ দফা অপরাধে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, কোন ফেরিওয়ালা এই সংবাদপত্র রাজপথে বিক্রয় করিতে পারিবে না, এবং ইহার গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদেরও সতর্ক হইতে বলা হইয়াছে। সুতরাং 'নেপ্‌সজাভা'র পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে—এরূপ অনুমান অসঙ্গতও নহে।

যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাভিনয় সাঙ্গ হইয়াছে। সম্পাদক প্রভৃতির প্রতি যে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সেই সকল দণ্ডের পরিমাণ একত্র করিলে এক শত তিন বৎসর হয়; এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের অর্থদণ্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার পাউণ্ড। উপসংহারে 'একটি অপরাধে প্রধান সম্পাদকের আরও দুই বৎসরের কারাদণ্ড ও ত্রিশ পাউণ্ড অর্থদণ্ড হইয়াছে। ইহা 'বোঝার উপর শাকের আঁটি।'

এই সকল মামলার বিচারের পর 'নেপ্‌সজাভা' প্রকাশিত হইতেছে কি না, আমরা জানিতে পারি নাই।

—*—

ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী

ভূমিকম্পের প্রকৃত কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই, এবং বৈজ্ঞানিকরা ইহার যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহার কোন্‌টি সত্য, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। এখন পৃথিবীর কোন অংশে ভূমিকম্প হইলে কলের সাহায্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূর হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভবিষ্যতে কখন্ ভূমিকম্প হইবে, তাহা কোন দৈবজ্ঞ বলিতে পারেন না।

নিউইয়র্কের ডাক্তার মিণ্টন এ নোবল্‌স প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ—তিনি ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

ডাক্তার নোবল্‌স ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ নিউইয়র্কের 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, সেই বৎসর ৪ঠা মার্চ্চ হইতে ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে যে ভূমিকম্প হইবে, তাহার ফলে য়ুরোপের কোন অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। ইটালী দেশেই প্রথম কম্পন-বেগ অনুভূত হইবে। ডাক্তারের এই ভবিষ্যদ্বাণী সে সময় অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; কিন্তু চারি দিন পরে অর্থাৎ ৫ই মার্চ্চ ইটালী দেশের প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়স্ হইতে দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে দুইবার ভূমিকম্পের বেগ অনুভূত হইয়াছিল। গত বৎসর বৃটিশ দ্বীপের নানা স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছিল; এবং সংপ্রতি জুগো শ্লোভিয়ার ভূমিকম্পে সারাজেভো প্রভৃতি কয়েকটি নগরের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, জনক্ষয়ও যথেষ্ট হইয়াছে। ফ্রান্সের পাশ্চাত্য প্রদেশে ভূমিকম্প হওয়ায় পাহাড় ধ্বসিয়া তাহার সন্নিহিত অনেকগুলি গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে;—ডাক্তার নোবল্‌সের ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এই সকল ভূমিকম্পের কথা জানিতে পারা গিয়াছিল; সকলগুলিই মিলিয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ সতর্ক হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই; দেশব্যাপী ভূমিকম্পে সতর্কতা নিষ্ফল।

—*—

স্বপ্ন কি অমূলক

স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, কখন কখন তাহা সত্যে পরিণত হয়; সংপ্রতি লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত দুর্ঘটনাটির কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের পার্লি (Purley) নামক স্থানে দুই জন লোক কিছু কিছু টাকা মূলধন দিয়া 'ওয়েলকম্ ষ্টড ফার্ম্ম' নামক একটি কারবার আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এই দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে; তাহাদের মৃত্যু অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার।—কারবারিদ্বয়ের এক জনের নাম ছিল ডায়ার। সে কারবার করিতে করিতে প্রতারণার সাহায্যে তাহার বখরাদারের বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করে। তাহার বখরাদার তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম

পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ডায়ার প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে গোপনে হত্যা করে, তাহার পর ফেরার!—পুলিসের গোয়েন্দারা স্কারবরো হোটেলে তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করে। তাহার সঙ্গে একটি পিস্তল ছিল, সে ধরা পড়িবার ভয়ে সেই পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করিল। সে মনে করিয়াছিল—তাহার বখরাদারের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, বিচারে তাহার ফাঁসী হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পুলিস তাহাকে নরহন্তা বলিয়া সন্দেহ করে নাই, প্রতারণার অভিযোগেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

ডায়ারের বখরাদারের পিতা স্থানান্তরে থাকিত, সে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া তাহার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হইল। পুত্রের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিয়া সে নানা স্থানে পুত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অবশেষে সে এক দিন স্বপ্ন দেখিল—তাহার পুত্রের মৃতদেহ ওয়েলকমষ্টড ফার্ম্মের অভ্যন্তরস্থিত কূপে পড়িয়া আছে। সে পুলিসের কাছে এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলে পুলিস তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহার আগ্রহাতিশয্যে সেই কূপে নামিয়া দেখিল—সত্যই কূপে একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে!—তাহা সেই বৃদ্ধের পুত্রের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত হইল। পুলিস ক্রমাগত ছয় মাস তদন্তের পর প্রমাণ পাইল, ডায়ারই তাহার বখরাদারকে কারখানার মধ্যে গোপনে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

—*—

দস্যুদমন মোটরকার

য়ুরোপ ও আমেরিকার দস্যুরা আমাদের দেশের দস্যুদলের ন্যায় শান্তশিষ্ট নহে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখিলে তাহারা সহজে আত্মসমর্পণ করে না। তাহাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে দুই এক জন পুলিসকে বা ডিটেক্‌টিভকে তাহাদের পিস্তলের গুলীতে পঞ্চত্ব লাভ করিতে হয়; কারণ, আত্মরক্ষার জন্য ইহারা সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকে। পুলিস আহত বা নিহত না হইয়া যাহাতে দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরের পুলিস অনেক দিনের চেষ্টায় এক প্রকার মোটরকার প্রস্তুত করাইয়াছেন, এখানে তাহারই প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। পুলিস এই কারে চাপিয়া পলায়নপর তিন জন সশস্ত্র দস্যুর অনুসরণ করিতেছিল; দস্যুরা পলায়নে অসমর্থ হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা এই চিত্রেই সুপরিস্ফুট। বিলাতের নূতন নূতন মাল আমাদের দেশে আমদানী হইতেছে,
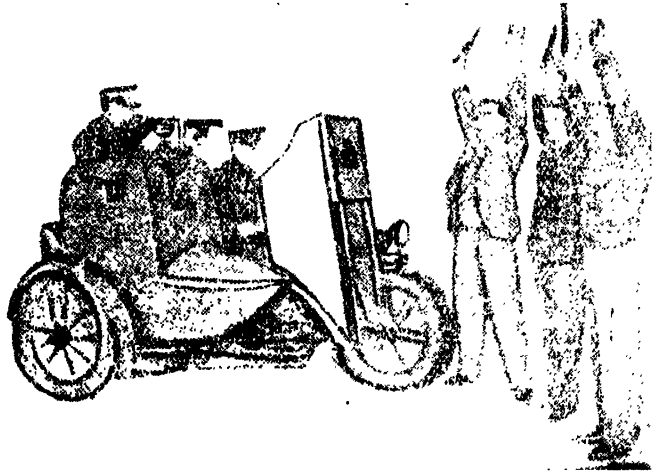
দস্যুদমন মোটরকার

ঐ রকম সাহেব ডাকাতের দল যখন এ দেশে আমদানী হইবে, তখন আমাদের দেশের ডিটেক্‌টিভদের প্রাণরক্ষার জন্য ঐ প্রকার দস্যুদমন মোটরকারেরও প্রয়োজন হইতে পারে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গৃহ-কেতকী

কি বাদ সাধিলি দেয়া,
গৃহকণ্টক-কাননে গুমরি' আমি যে হ'লাম কেয়া।
অকালে গগনে বাদল লাগালি, হ'লি শাশুড়ীর বাড়া,
হিয়ায় পশিয়া নয়নে ঢালিলি অঝোরে বেদনাধারা।
কি ছলে বেরুই পিছল কূপথে নিচোল ভিজায়ে জলে,
ননদী অভাগী সাথে সাথে রয় আজি যে নানান ছলে,
ব'লে—"ঘাটে আজ জলে ভিজে ভিজে
যাবি লো কিসের তরে?
কূয়ার জলেই গা ধুস,—খাবার ঢের জল আছে ঘরে।"
আমি অভাগিনী রাধা,
সে ত মানিবে না বর্ষা-বাদল, মানিবে না কোন বাধা।
ভিজিছে সে হায় ঘাট-পথে ঠায় আশা-পথ চেয়ে চেয়ে।
অবিরল ধারা ঝরিছে তাহার কপোল কপাল বেয়ে।
সঙ্কেত ক'রে মিছে ভোগাইনু, অনুতাপে তনু জ্বলে,
আঁখিজলে নিজে ভিজি,—তবু ঘরে,—
সে যে ভেজে শাখিতলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সমাজ-সংস্কার

বর্তমান সময়ে সমাজ-সংস্কারকল্পে বহু লোকের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সকল জিনিষের যেমন মধ্যে মধ্যে সংস্কারের প্রয়োজন হয়, তেমনই সামাজিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানগুলিরও মধ্যে মধ্যে সংস্কারসাধন করা আবশ্যক। কাল-সহকারে মনুষ্যকৃত প্রায় সকল ব্যাপারই জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠে। কালের প্রভাবেই এইরূপ ঘটে। কারণ, পরিবর্ত্তনসাধনই কালের ধর্ম্ম। কাল কোন বস্তুই ঠিক একরূপ রাখিতে দেয় না, সে উহার উপচয় বা অপচয় ঘটায়। অদ্য যে সদ্যোজাত শিশু, কল্য সে চপল চঞ্চল বালক, পরশ্ব সে জ্ঞানপিপাসু কিশোর, পরে সে কর্ম্মঠ যুবক, ক্রমে সে গম্ভীর প্রৌঢ়, শেষে সে স্থবির বৃদ্ধ হইবেই হইবে। জীব-জগতে যেমন এইরূপ ঘটিতেছে, জড়জগতেও তেমনই ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। আজ আমি বাতাস বা বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া যে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলাম, কালসহকারে তাহা জীর্ণ এবং মনুষ্য-বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। কিছুতেই তাহা রক্ষা করা যাইবে না। তবে যদি উহার জীর্ণত্বের লক্ষণ প্রথম প্রকাশিত দেখিলেই বিশেষ নিপুণতার সহিত উহার সংস্কারসাধন করা যায়, তাহা হইলে ঐ সৌধ বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে। সেই জন্য সংস্কারের প্রয়োজন। মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কতকটা জীবধর্ম্মী, কতকটা জড়ধর্ম্মী। সেই জন্য উহার সংস্কার সাধন আবশ্যক। বিশেষ বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং দূরদৃষ্টির সহিত সংস্কার-সাধন না করিলে তাহাতে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য সংস্কার-সাধন অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। সংস্কারের দোষে অনেক সময় অনেক গৃহ অকালে নষ্ট হইয়া যায়। চিকিৎসার ত্রুটিতে ও দোষে অনেক লোক অকালে পঞ্চত্ব পায়।

এখন জিজ্ঞাস্য, সংস্কার কাহাকে বলে? সংস্কার এবং সংহার এক নহে। সংস্কার শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে করা। অর্থাৎ গৃহে, অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে কালসহকারে যে সকল ত্রুটি বা দোষ ঘটিয়াছে, তাহার সম্যক্‌ভাবে শোধন করা। কোন স্থানে একটি জীর্ণ দেবালয় আছে। আমি যদি সেই জীর্ণ দেবালয়টি উচ্ছিন্ন করিয়া তাহার স্থানে একটি নাট্যশালা নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে আমার সেই দেবালয়টির সংস্কার-সাধন করা হইবে না। উহাকে সংহার করা হইবে। কারণ, দেবমন্দিরের যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য নাচঘরে বা রঙ্গগৃহের দ্বারা সাধিত হইবে না। সমাজে নাট্য-শালার প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু দেবালয়ের যে প্রয়োজন, নাট্যশালার সে প্রয়োজন নহে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যে উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান রচিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যদি অন্য উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উহার আমূল পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে উহার সংস্কার-সাধন করা হয় না; উহার সংহার-সাধনই করা হইয়া থাকে। এমন কি, যে দেবালয়টি ছিল, উহার আকার যথাযথভাবে অক্ষুন্ন রাখিয়া আমি যদি উহা হইতে দেব-বিগ্রহটি সরাইয়া ফেলি এবং ঐ গৃহটিকে নর্ত্তকীর লাস্যদর্শন স্থানে পরিণত করি, তাহা হইলেও আমি ঐ দেবালয়টির সংস্কার না করিয়া সংহার করিলাম বুঝিতে হইবে। আসল কথা, উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়া প্রতিষ্ঠানাদির ত্রুটি-সংশোধনের নামই সংস্কার-সাধন।

সুতরাং সমাজ-সংস্কারসাধন করিতে হইলে আমাদের সমাজ-বিন্যাসের উদ্দেশ্য, প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং কি ভাবে তাহার পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হইলে তাহার সহিত অনুস্যূত অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি হইবে না, বা আঘাত লাগিবে না, মুখ্যতঃ সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। অধিকন্তু সেই প্রতিষ্ঠান আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত কিরূপ ভাবে গ্রথিত, তাহারও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এই শেষোক্ত বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, এইখানে যদি গোল ঘটে, অর্থাৎ আমাদের নব-রচিত প্রতিষ্ঠান বা নবীভূত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত সমঞ্জসীভূত না হয়, তাহা হইলে অচিরেই উহা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে এবং সমাজে একটা ঘোর বিপ্লব ঘটাইবে। কণারকের সূর্য্য-মন্দির যতই দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হইয়া থাকুক না কেন, উহা বালুকাবিস্তারে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই এত শীঘ্র ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। দৃঢ় বনিয়াদের উপর কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান রচনা না করিলে তাহার পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হয়, ইহার ভগ্নাংশগুলি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সমাজ-সংস্কার কার্য্যটি নিতান্ত সহজ নহে। উহা অত্যন্ত কঠিন।

সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে 'সমাজ' কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। কারণ, শব্দের প্রকৃত অর্থ পরি-স্ফুটভাবে না বুঝিলে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করাই সম্ভব হয় না। আমরা অনেক সময় শব্দার্থ না বুঝিয়া একটা গোলযোগ করিয়া বসি। সমাজ শব্দটি সংস্কৃত। অন্যান্য সংস্কৃত শব্দের ন্যায় এই শব্দেরও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না বুঝিলে ইহার লক্ষ্যার্থ বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। সম উপসর্গের সহিত অজ ধাতুর উত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া সমাজ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সম অর্থে তুল্যভাবে, অজ অর্থে গমন করা। সুতরাং সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, যাহারা একই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদেরই নিবিড় সঙ্ঘাতকে সমাজ বলে। একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদিগের ধাতু, প্রকৃতি, রীতিনীতি, শিক্ষা, সংস্কার, আচার-ব্যবহার সমস্তই একরূপ এবং জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শও একরূপ হইয়া থাকে। আমরা আজকাল শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িয়া ইংরাজী Societyকেই সমাজ বলি। ঐটিই আমাদের বিষম ভুল। সোসাইটী শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ সঙ্ঘ। ল্যাটিন Socius অর্থে সঙ্গী বা সহচর। ঐ শব্দই ইংরাজী সোসাইটী শব্দের জনক। একই স্বার্থে, উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে চালিত নানা সমাজ হইতে সম্মিলিত লোকদিগের সংহতিকে সোসাইটী বা সঙ্ঘ বলে। বরং ইংরাজী People এবং Nation শব্দ সংস্কৃত 'সমাজ' শব্দের অনেকটা সন্নিহিত। তবে ঐ দুইটি ইংরাজী শব্দ রাজনীতিক

সাহিত্যেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'আর আমাদের সমাজ শব্দটি ধর্ম্মমূলক সাহিত্যেই অধিক দেখা যায়। কাযেই লক্ষণায় এবং ব্যঞ্জনায় এই দুইটি ইংরাজী শব্দের সহিত আমাদের দেশীয় সমাজ ও শব্দের কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে।

'People শব্দের অর্থ এইরূপ,—যাহারা বংশপরম্পরাক্রমে একই সভ্যতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত, মনের একই প্রকার গতি এবং প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত, একই ভাষা একই আচার অনুষ্ঠান দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ, সেই মানবমণ্ডলীর মধ্যে যে একতাবুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে এবং অন্য সমাজস্থ মানবমণ্ডলী হইতে পার্থক্যসাধন করে, সেইরূপ একতাবুদ্ধির দ্বারা সংহত মানবমণ্ডলীকে people বলা হয়। উহারা সকলে যে একই বৃত্তি দ্বারা জীবন-যাপন করিবে অথবা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী হইবে, এমন কোন কথা নাই। * প্রকৃতপক্ষে সমাজের মূল বনিয়াদ হইতেছে সভ্যতা এবং কৌলিক শক্তি। সভ্যতাই সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে এক উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে চালিত করিয়া তাহাদিগকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া থাকে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকের পরস্পরের মধ্যে এই নিবিড় সম্মিলন এবং বহির্ভূত জনমণ্ডলী হইতে এই পার্থক্য সভ্যতার বিকাশধারা হইতে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা ঐ সভ্যতারই প্রভাবজনিত। একই সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া, একই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, একই প্রকার প্রকৃতি ধরিয়া যাহারা সমতালাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া এক একটি সমাজ হইয়া থাকে, দৈহিক বৈশিষ্ট্যে, ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে সমাজস্থ সকলে যেন একটা দৈহিক বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং উহাকে একটা শরীরী বস্তু বলা হইয়া থাকে।

রাজনীতিক দিক দিয়া ইংরাজী nation শব্দ অনেকটা সংস্কৃত সমাজ শব্দের অনুরূপ। বিভিন্ন অঙ্গের পরস্পর গাঢ় সংযোগফলে যেমন একটা দেহ গঠিত হয়, সেইরূপ একই ভাবের বহু লোকের নিবিড় সংযোগে এক একটা nation বা জাতি গঠিত হয়; কিন্তু সোসাইটী বা সঙ্ঘ তাহা নহে। উহা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু ব্যষ্টির একটা সমষ্টি মাত্র। জীবদেহে যেমন মস্তক ও অন্যান্য অবয়ব দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ, নেশন বা জাতি রাষ্ট্রমধ্যে সেইরূপ দৃঢ়ভাবে দেহ-ধর্ম্মী বস্তুর ন্যায় দৃঢ় সম্বদ্ধ। সঙ্ঘ ঐ প্রকার এক দেহে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ লোকের সমষ্টি নহে। † তবে এই ইংরাজী সোসাইটী শব্দের বিশেষণ Social শব্দটি অনেক সময় ব্যাপকভাবে সামাজিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—social organism.

আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় সমাজ বলিলে আবার নানারূপ অর্থ বুঝায়। অসাবধানতার সহিত শব্দপ্রয়োগের ইহাই ফল। যাহা হউক, সমাজ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একই সভ্যতার প্রভাবে উদ্ভূত, একই প্রকার মনোবৃত্তিতে চালিত, একই প্রভাবে প্রভাবিত, এবং জীবনযাত্রার পথে একই লক্ষ্যে প্রধাবিত একীভূত মানবসমূহকে সমাজ বলে। এই অর্থেই আমি এই প্রবন্ধে সমাজ শব্দ ব্যবহার করিলাম।

এখন জিজ্ঞাস্য, সভ্যতা কাহাকে বলে এবং সভ্যতার লক্ষণই বা কি? যাহার প্রভাবে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই সভ্যতা; তাহার স্বরূপ কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝা কর্ত্তব্য। সভ্যতাই যখন সমাজের বনিয়াদ, সভ্যতার প্রভাবে যখন সামাজিক মানুষ বন্যভাব পরিহার করিয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়, তখন সভ্যতার স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। এ কথা সত্যই যে, সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। মানসিক ও ব্যবহারিক উন্নতিই সভ্যতার ফল। সভ্যতার প্রভাবেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয় এবং মানব-সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও উন্নত শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানুষের যত কিছু সদ্‌গুণ এবং যত কিছু মানসিক উৎকর্ষ, তাহা সমস্তই সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া গজাইয়া উঠে। ফরাসী পণ্ডিত গীজোর (Guizot) মতে উন্নতি ও বিকাশসাধনই সভ্যতার লক্ষণ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহা বুঝা কতকটা সহজ হইয়া উঠে। কারণ, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সভ্যতার ফল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সাধনা-সাপেক্ষ। কৃষির দ্বারা যেরূপ শস্যের ও ফলের উৎকর্ষসাধন করা যায়, সভ্যতার দ্বারা সেইরূপ সমাজের উন্নতিসাধন করা হইয়া থাকে। উভয় কার্য্যই সাধনাসাপেক্ষ। সুতরাং সাধনাই সভ্যতার প্রাণশক্তি। সাধনার পদ্ধতি অনুসারেই সভ্যতা আকার প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সভ্যতা বলিতে মানুষের উৎকর্ষসাধনের সাধনার ধারা বুঝিতে হইবে। এই সাধনার সংস্কৃত শব্দ তপঃ বা তপস্যা; এই পৃথিবীতে বহুদেশে বহু সময়ে বহু মানবসমাজে বহু প্রকার সভ্যতা আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছে। সকল সভ্যতা একই প্রকারের হয় নাই। সকল সভ্যতা বা সাধনার ধারা একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই। উহার ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন ধারা ধরিয়া বিভিন্ন সমাজের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছে। য়ুরোপ-খণ্ডে গ্রীক ও রোমক সভ্যতা যেরূপ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া যেরূপ খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল, ভারতীয় সভ্যতা সেরূপ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সেরূপ খাতে প্রবাহিত হয় নাই। সাধনামাত্রেরই একটা আদর্শ বা লক্ষ্য থাকে। সাধক-মাত্রেই কর্ম্ম দ্বারা সেই আদর্শের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন সভ্যতার আদর্শ বিভিন্ন বলিয়া ইহা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। সেই জন্য আমরা হেলেনিক

---

* It is the union of the masses of men of different occupations and social Strata in a hereditary Society of common spirit, feeling and race, bound together, especially by language and customs, in a common civilization which gives the sense of unity and distinction from all foreigners quite apart from the bond of the State. Vide Bluntschitis Theory of the State Eng. Trans. page 90.

† The Nation is necessarily a connected whole, while society is a casual association of a number of individuals. The Nation as embodied in the State is an Organism with head and members; Society is an unorganised mass of individuals. The Nation has a legal personality. Society has no collective personality, but only consists of a mass of private persons, etc. —Ibid page 109.

সভ্যতা, ল্যাটিন সভ্যতা, সেমেটিক সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন সভ্যতার নাম দেখিতে পাই। প্রত্যেক সভ্যতাই আপন আপন আদর্শ অনুযায়ী আপন আপন সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। সুতরাং এক সমাজের আচার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান অন্য সমাজে বিনা বিচারে গ্রহণ করা সমীচীন নহে। উহা করিলে বিপ্লব ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান সময়ে সেই জন্য আমাদের দেশে একটা বিষম সমাজ-বিপ্লব ঘটিতে বসিয়াছে। বিধাতার বিধানে য়ুরোপীয় সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই দুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। এই প্রবন্ধে উভয় সভ্যতার পার্থক্য বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিবার স্থানাভাব। তবে মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে, উভয় সভ্যতার লক্ষ্যই "আনন্দলাভ।" য়ুরোপীয় সভ্যতাও আনন্দ চাহে, ভারতীয় সভ্যতাও আনন্দ চাহে। এই হিসাবে উভয় সভ্যতার লক্ষ্য এক; এ বিষয়ে কোন সভ্যতার সহিত কোন সভ্যতার ভেদ নাই। কারণ, আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা মনুষ্যপ্রকৃতির সহিত অনুস্যূত। মানুষের ধর্ম্ম ও মানুষের আদর্শ কখনই মানুষের প্রকৃতি ছাড়িয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সেই আনন্দের স্বরূপ লইয়াই যত গোল। য়ুরোপীয়রা ভোগেই আনন্দের সন্ধান করে,—ভারতবাসীরা ত্যাগেই আনন্দ পাইতে চাহে। অথচ য়ুরোপীয় সভ্যতায় ত্যাগের বা ভারতীয় সভ্যতায় ভোগের স্থান নাই—এ কথা আমি বলিতেছি না। উহা বলিলে বিষম ভুল করা হইবে। তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা ত্যাগ চাহে—ভোগের জন্য; ভারতীয় সভ্যতা ভোগ চাহে—ত্যাগের জন্য। য়ুরোপীয় সভ্যতা ইহকালসর্ব্বস্ব, ভারতীয় সভ্যতা পারলৌকিক আনন্দমূলক। য়ুরোপীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত মানবমণ্ডলী জীবনের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে—আত্মপ্রসাদলাভের জন্য, খ্যাতির জন্য, মানসিক বিলাস-সম্ভোগের জন্য। শ্মশানের বা সমাধির পর পর্য্যন্ত তাহাদের দৃষ্টি প্রসৃত নহে; আত্মপ্রসাদ ও যশঃই তাহাদের কাম্য। হিন্দু ভোগ করে ত্যাগের জন্য, হিন্দু ভোগের আনন্দ ভগবানে অর্পণ করিতে চাহে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ,—আত্মতৃপ্তির জন্য, আত্মস্পর্দ্ধার জন্য, আত্মগৌরবের জন্য ভোগ চাহে; ভারতীয় সভ্যতায় প্রভাবিত ব্যক্তি সমস্ত ভোগ্যবস্তু দেবতাকে অর্পণ করিয়া স্বয়ং দেবপ্রসাদ পাইতে চাহে। "যৎ করোমি যদশ্নামি তদস্তু তব পূজনম্" ইহা হিন্দুর কথা। সুতরাং উভয় সভ্যতায় ও উভয় শ্রেণীভুক্ত মানবমণ্ডলীর আনন্দের স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক শ্রেণীর আনন্দ ঐহিক সুখসম্ভোগে, আর এক শ্রেণীর আনন্দ আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে। য়ুরোপীয় সভ্যতা দেশমাতৃকাসেবায় নিরত, ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে অবহিত। সুতরাং উভয় সভ্যতার আদর্শ বিভিন্ন, লক্ষ্যও বিভিন্ন; এমন কি, এই উভয় সভ্যতা অনেক সময় পরস্পর বিপরীতমুখী।

প্রত্যেক সভ্যতা আপনার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে, যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে,—তাহা যে পরস্পর বিসদৃশ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সেই জন্য অনেক স্থলে একের সহিত অন্যের সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে। এমন কি, একই সমাজের ও একই সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় আচার অনুষ্ঠানের পরস্পর সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। সভ্যতা একটি স্থির পদার্থ নহে। উহা অচল ও অটল হইয়া থাকে না। সমাজের মানসশক্তির বিকাশের সহিত উহার বিকাশলাভ হইয়া থাকে। এমন কি, উহা ধর্ম্মের মূর্ত্তি এবং সভ্যতা-বিকাশের সহিত ও সমাজের জনসাধারণের বুদ্ধির অগ্রগতির সহিত বিকাশলাভ ও ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সামাজিকগণের মানসিক অবস্থা যেরূপ, বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ, তাহার ধর্ম্মসম্বন্ধে ধারণা, আচার-অনুষ্ঠানের আকার তাহারই অনুসারী হইবে। আমাদের এই হিন্দু সমাজের আচার-অনুষ্ঠান যে সব সময়ে ঠিক একরূপই ছিল, তাহা নহে; কাল-সহকারে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই জন্য এক-যুগের ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠান অন্য যুগে অবলম্বনীয় নহে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। সেই জন্য একই সমাজের অতীত কালের আচার-অনুষ্ঠান বিনা প্রয়োজনে জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে; ভিন্ন প্রদেশের আচার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান চালাইবার চেষ্টা করা কখনই সঙ্গত নহে। সেই জন্য হিন্দু অধিকারীর বিচার করিয়া থাকে। সেই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকারিভেদে ব্যবহারও ভেদ করা হইয়া থাকে। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্ম-ব্যবস্থা অবস্থা-নিরপেক্ষ ও নির্ব্যূঢ় নহে। সেই জন্য বিখ্যাত য়ুরোপীয় মনস্বী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন যে,—

The belief in a community of nature between himself and the object of his worship, has always been to man a satisfactory one, and he has always accepted with reluctance those successively less concrete conceptions which have been forced upon him.

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—"সকল সমাজস্থ লোকের উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে সম্বন্ধসম্পর্কিত ধারণা সেই সমাজের প্রত্যেক লোকের পক্ষেই সন্তোষজনক হইয়া থাকে, তাহাদিগকে সূক্ষ্মতর মত জোর করিয়া দিতে গেলেই তাহারা উহা অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে।" সেই জন্য হিন্দুরা সমাজের সকল স্তরের লোকের জন্য একই প্রকারের উপাসনার ব্যবস্থা করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে "নুড়ি কাষ্ঠ নুড়ি শিলা" হইতে অধিকারিভেদে নিত্য শুদ্ধ নিষ্কল ব্রহ্মের উপাসনা পর্য্যন্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। য়ুরোপীয়রা হিন্দুর এই অধিকারতত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াই হিন্দু ধর্ম্মকে নানা ধর্ম্মের সমবায় মনে করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যাহা খাটে, সামাজিক আচার ও প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। কোনমতেই তাহার ব্যতিক্রম হয় না। সেই জন্য আগষ্ট কমটে (অগষ্ট কোমৎ) বলিয়াছেন যে, যে সমাজে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সেই সমাজের উপযোগী। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও সেই কথা বলিয়াছেন। আমি

পাদ-টীকায় তাঁহাদের উভয়ের মতই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * আসল কথা, সমাজের অধিকাংশ লোক যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন, হঠকারিতার এবং দাম্ভিকতার সহিত তাহা উন্মূলন করিবার চেষ্টা করা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। উহার কোন না কোন সার্থকতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, মানবসমাজ অথবা আমাদের এই হিন্দু সমাজ কি চিরকালই গতিশূন্য, বিকাশবর্জ্জিত এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অচলায়তনরূপে বিরাজ করিবে? উহার কি কোন পরিবর্ত্তন হইবে না? বলা বাহুল্য, আমি সে কথা একবারেই বলিতেছি না। সজীব বস্তু যেমন পরিবর্ত্তনশীল, সজীব সমাজও সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। উহার পরিবর্ত্তন-সাধনই কালের ধর্ম্ম। মানুষের মানসিক শক্তির ও বিচারবুদ্ধির পরিবর্ত্তনের সহিত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবর্ত্তনের সহিত সে পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে। আজ যাহা কুসংস্কার বলিয়া গৃহীত, কাল হয় ত তাহা সুসংস্কার মনে হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ধারণাকে বিষয়নিরপেক্ষ সত্য মনে করিয়া সমাজের উপর তাহা জোর করিয়া চালাইবার প্রয়াস পাইতে গেলে বিষম ভুল করা হইবে। শিশু ভ্রমণ করিতে করিতে পদস্খলিত হইয়া যখন ভূতলে পড়িয়া যায়, তখন সে উঠিয়া জীবভ্রমে ভূমিকেই ক্রোধে পদাঘাত করে। ইহা তাহার ভ্রম। কিন্তু তাহার যেরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা, তাহাতে তাহার পক্ষে সেই ভ্রম স্বাভাবিক, তখন তাহার সেই ভ্রম ঘুচাইবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু ক্রমে যখন তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি ও বুদ্ধি বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, তখন আর সে তাহা করে না; তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়। কিন্তু সে আবার অন্য ভ্রমে পতিত হয়। এইরূপ ভ্রমের ভিতর দিয়াই সে উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। বিষয়নিরপেক্ষ সত্য বা অভ্রান্ত সত্য প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। মানুষের জ্ঞানের বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা একটা উপমা দ্বারা স্থূলভাবে বুঝা যাইতে পারে। যেমন, যখন কোন লোক ঘনকৃষ্ণতিমিরস্তব্ধ নিশীথে আলোক (লণ্ঠন) হস্তে চলিতে থাকে, তখন সে সমস্ত পথ দেখিতে পায় না, পথ সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে তাহার সম্মুখস্থ কতক দূর পথমাত্র দেখিতে পায়; যতটুকু তাহার লণ্ঠনের আলোকে আলোকিত হয়, রাস্তার ততটুকু সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান জন্মে; দূরস্থ পথসম্বন্ধে তাহার জ্ঞান থাকে না; এইরূপে সে যতই অগ্রসর হইবে, ততই রাস্তা সম্বন্ধে তাহার অধিক জ্ঞান জন্মিবে। সে যদি রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার রাস্তা সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিতে পারে। তাহার হস্তস্থিত আলোক যদি প্রখর এবং দৃষ্টিশক্তি যদি তীক্ষ্ণ হয়, তবেই তাহার সেই রাস্তা সম্বন্ধেই পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। আর যদি আলোক নিষ্প্রভ ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে পথে তাহার রজ্জুকে সর্প-ভ্রম এবং সর্পকে রজ্জুভ্রম হইবেই হইবে। পথ সম্বন্ধে তাহার অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিবে না। প্রকৃত সত্য তাহার মানস-মুকুরে প্রতিভাত হইবে না। য়ুরোপীয় সমাজও এখন উন্নতির দিকে বিজ্ঞানের আলোকহস্তে তাহার সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার হস্তস্থিত আলোক উজ্জ্বল, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু সে পথ কিরূপ, উহা সর্পবহুল ও তাহাতে সর্পতে রজ্জুভ্রম হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে কি না, তাহার সম্পূর্ণ পরীক্ষা এখনও হয় নাই। তাহাকেও অনেক সিদ্ধান্ত প্রথমে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ এবং পরে ভ্রান্ত বলিয়া পরিহার করিতে হইয়াছে। বিজ্ঞানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সুতরাং আমরা কোন একটা আধুনিক সিদ্ধান্তকে যতই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি না কেন, উহা যে অবস্থা-নিরপেক্ষ সত্য এবং সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বসমাজে এবং সর্ব্ব অবস্থায় অবিচারিত-ভাবে প্রযোজ্য, ইহা মনে করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। সকল সমাজে, সকল দেশে, সকল যুগে মানুষ আপেক্ষিক সত্যকে অবস্থা-নিরপেক্ষ সত্য মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া বিবেচিত অনেক সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরেও যে তাহা করিবে না, তাহা বলা যায় না। সেই জন্য উন্নতিশীল য়ুরোপের কোন সামাজিক অনুষ্ঠানকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমাদের সমাজে গ্রহণ না করিলে, হয় ত সময়বিশেষে আমাদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপীয়রা যে পথ ধরিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ভারতবাসীরা সে পথ ধরে নাই। য়ুরোপীয় সমাজ বিজ্ঞানের আলোক ধরিয়া জড়বাদের পথে অগ্রসর হইতেছেন, ভারতবাসীরা ধর্ম্মের আলোক ধরিয়া আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম য়ুরোপে

---

* Adhering to our relative, in opposition to the absolute, view, we must conclude the social state regarded as a whole, to have been as perfect, in each period, as the co-existing condition of humanity and of its environment would allow. Without this view, history would be incomprehensible. Vide Compte's Positive Philosophy, translated by Miss Marteneau Vol. II. P. 89.

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন :—

The presumption that any current opinion is not wholly false, gains in strength according to the number of its adherents. Admitting, as we must that life is impossible unless through a certain agreement between internal conviction and external circumstances; admitting therefore that the probabilities are always in favour of the truth, or at last the partial truth, of a conviction we must admit that the convictions entertained by many minds in common are the most likely to have some foundation.—Herbert Spencer's First Principles. P. 4.

ইংরাজী-শিক্ষিতগণ ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না, সেই জন্য আমি এই দুই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আধ্যাত্মিকতার আবহাওয়া সৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে খৃষ্টান ধর্ম্ম সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। আজকাল য়ুরোপীয়দিগের চিন্তা হইতে ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইয়াছে, ইহা য়ুরোপের এক জন বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজকের কথা। তবে য়ুরোপ এখন উন্নতিশীল—ভারত এখন অবনতির দিকে অগ্রসর। কারণ, ভারতবাসীর হস্তে যে ধর্ম্মের আলোক ছিল, পাশ্চাত্য জড়বাদের ঝটিকায় তাহা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে। ভারতবাসী নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে এবং অবনতির দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কতকগুলি স্বদেশহিতৈষীর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিজ্ঞানের আলোক আনয়ন করিয়া ভারতবাসীকে জড়বাদের পথে প্রধাবিত করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে। ইহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভ্রান্ত। ভারতীয় শিক্ষা ইহারা কিছুমাত্র লাভ করেন নাই; কাযেই ইঁহারা জড়বাদের আপাতরমণীয় মূর্ত্তিতে মুগ্ধ। জড়বাদের দোষ ইঁহাদের নেত্রে পতিত হইতেছে না। জড়বাদের প্রভাবে য়ুরোপীয়দিগের জীবনে যে অশান্তির করাল ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহা ইঁহাদের মুগ্ধ নেত্রে প্রতিভাত হইতেছে না। য়ুরোপের গার্হস্থ্য শান্তি বিনষ্টপ্রায়, সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত। য়ুরোপীয় সভ্যতা যেন ছিন্নমস্তার ন্যায় আপনার মস্তক কাটিয়া আপনার রুধির আপনিই পান করিতে উদ্যত হইয়াছে, অবিশ্বাস এবং এক জনের বা এক পক্ষের ক্ষতি করিয়া অন্য পক্ষের স্বার্থরক্ষার প্রয়াস তাহাদের জীবনের প্রধান ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকগণ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। তাঁহারা ভ্রান্ত বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মনে করিতেছেন যে, য়ুরোপীয় অশান্তি পরিহার করিয়া তাঁহারা য়ুরোপীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আনয়ন করিতে পারিবেন। ইহা তাঁহাদের বিষম ভুল।

বিবাহই মানবসমাজবন্ধনের আদি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া সকল মানবসমাজই বিকাশলাভ করিয়াছে। জড়বাদী য়ুরোপ এখন বিবাহব্যাপারকে কেবল ভোগের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মান্য করিতেছেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম উহাকে কতকটা ধর্ম্মমূলক করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল,—কিন্তু উহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। যতদিন য়ুরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কতকটা প্রভাব ছিল, তত দিনই উহা তথায় ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু জড়বাদের ভিত্তিতে এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ভাব স্থায়ী হইল না। জড়বিজ্ঞানই য়ুরোপীয়দিগের জীবনের এখন নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, আমাদের এই আধ্যাত্মিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে য়ুরোপীয় জড়বাদমূলক আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলে তাহার ফল ভাল হইবে কি না? অবশ্য সমাজ-সংস্কারকগণ ফল ভাল হইবে বলিয়াই মনে করেন। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে সাড়ে পনর আনা লোকই শিক্ষা-বিভ্রাটে পড়িয়া জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কখনও আধ্যাত্মিক ভাবের চর্চ্চা বা অনুশীলন করেন নাই,—তাঁহারা তাহার মর্ম্মও বুঝেন না। জনমতকে অনুকূল করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক স্বাধীনভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করাইয়া লইবার তাঁহাদের সামর্থ্য এবং সাহস নাই। কাযেই তাঁহারা আইন করিয়া, অর্থাৎ রাজশক্তির সহায়তায় বলপূর্ব্বক তাঁহাদের ভ্রান্ত বুদ্ধি অনুসারে সমাজ-সংস্কার করিতে চাহেন। সার হরি সিং গৌর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আইনের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন দেশেই ব্যাপকভাবে সমাজ-সংস্কার বা সামাজিক কুরীতি দূর করা সম্ভব হয় নাই। এ কথা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাঙ্গালায় বহুবিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল; কিন্তু বিনা আইনে সেই প্রথাও প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। শিশুবিবাহ প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সুতরাং এ দেশে লোকমত পরিবর্ত্তিত করিয়া যে সমাজ-সংস্কার করা যায় না, এ ধারণা একবারেই ভুল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সার হরি সিং গৌর প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকদের হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতির সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতার উপর কোন শ্রদ্ধাবুদ্ধি নাই। সার হরি সিং স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মত্যাগী খৃষ্টান, সুতরাং তিনি হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুর ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর কিরূপ শ্রদ্ধাবান্, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাঁহারা তাঁহার সহায়ক ও সহকর্ম্মী, তাঁহারা য়ুরোপীয় ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে এই সকল সমাজ-সংস্কারকের মত হিন্দু-সমাজ মানিতে চাহে না,—মানা উচিতও নহে। কতকগুলি চপলমতি বালক ও ধর্ম্মশিক্ষাহীন যুবক কেবল ইঁহাদের আপাত-মনোহর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাদের পক্ষই সমর্থন করিতেছেন। হিন্দুভাবে প্রভাবিত কয় জন ব্যক্তি বিবাহবিষয়ক এই সকল ব্যবস্থাসংস্কারের সমর্থন করিতেছেন? আমরা সেই জন্য হিন্দু সমাজকে এই বিষয়ে সাবধান হইতে অনুরোধ করি।

য়ুরোপে রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মে যখন পোপের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন ঐ ধর্ম্মের সংস্কারসাধনে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের হঠকারিতার প্রভাবে ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে ইনকুইজিসনের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। লোকমতের বিরুদ্ধে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভীষণ হইয়া থাকে। ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। জার্ম্মাণীর ও ফ্রান্সের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, লোকমতের প্রতিকূলে সামাজিক ও রাজনীতিক সংস্কারসাধন করিতে যাওয়ায় সংস্কারকগণ দেশের প্রভূত অনিষ্টই করিয়া বসিয়াছিলেন। উপধর্ম্মের লোপ করিতে যাইয়া উহা অধিকতর বদ্ধমূল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মার্কিণ রাজ্যে অতি সহজেই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দেখাদেখি ফ্রান্সের অধিবাসীরা আপনাদের দেশে ঐরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহার ফলে তখন ফ্রান্সে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভুবনে বিদিত। উহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে নেপোলিয়ানের স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেনে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে যাইলে তথায় কিরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহাও ইতিহাসজ্ঞগণ অবগত আছেন।

যদি সমাজের হিতসাধনকল্পে সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সমাজ-সংস্কারে এত বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যাঁহারা সমাজসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, বিদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমাজ-সংস্কারের ফল কিরূপ বিষময় হইবে, তাহা সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজের স্বাভাবিক বিকাশধারা ধরিয়া যে অবস্থাটি পরে আসিবে, যে সকল আচার এবং প্রতিষ্ঠান পরে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা যদি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা যদি জোর করিয়া পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল ভাল না হইয়া মন্দই হইয়া থাকে। সকল দেশের ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। *

অধিকন্তু সমাজসংস্কারকদিগের ভ্রান্তির ফলে অনেক সময়ে সমাজের ঘোর অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের কুব্যবস্থার ফলে তাঁহারা যে দোষ পরিহার করিবার প্রয়াস পায়েন, সেই দোষই বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। য়ুরোপে এক সময়ে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের জন্য মঠ (monastry) প্রবর্ত্তিত ছিল। নারীদিগের জন্য সন্ন্যাসিনীর আশ্রম ছিল। যাঁহারা স্বভাবতঃই বিষয়বিরক্ত, তাঁহারা ঐ আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। যত দিন এই ব্যবস্থা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইত, তত দিন উহাতে বিশেষ দোষ ঘটে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উহাতে অসংযত লোক প্রবেশ করায় মঠগুলিতে ব্যভিচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। সেই জন্য তথাকার সমাজ-সংস্কারক ঐ সকল মঠ উঠাইয়া দেন। য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বে যে সকল নারীর বিবাহ না হইত, তাঁহারা সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে প্রবেশলাভ করিয়া সংযম অভ্যাস করিতেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতির দোষে সন্ন্যাসধর্ম্মে অনধিকার হেতু পদস্খলিত হইতেন। ফলে ঐ পাপ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মঠগুলিতে অতি প্রবল হইয়া উঠে। সেই জন্য সমাজ-সংস্কারকগণ ঐ মঠের ব্যবস্থা উঠাইয়া দেন। তাঁহারা উহার সংস্কারসাধনের জন্য চেষ্টা করেন নাই। কোন্ কোন্ অনাচারের ফলে মঠগুলিতে ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সন্ধান লয়েন নাই। ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত লোক পার্থিব সুবিধা ভোগের জন্য মঠগুলিতে প্রবেশ করাতে উহার অবনতি ঘটে, সংযম নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মঠগুলি তুলিয়া দেওয়ায় উহার ফল আরও মন্দ হইয়াছে। যে ব্যভিচারের জন্য তাঁহারা মঠগুলিকে উঠাইয়া দিয়াছেন, সমাজের সর্ব্বস্তরে সেই ব্যভিচারই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। য়ুরোপে প্রজননসঙ্কোচ-ব্যবস্থা সুপ্রচলিত থাকিলেও যে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মার্কিণের বিচারপতি বেন লিণ্ডসে তাঁহার Revolt of Modern Youth, এবং Companionate Marriage নামক দুইখানি গ্রন্থে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। "দি নেশন এণ্ড এথেনিয়াম"পত্রে মিষ্টার রে ষ্ট্রাচিও স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃটিশ দ্বীপেও ব্যভিচার ইদানীং অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তথায় বিচারপতি বেন লিণ্ডসের স্থায় এক জন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেখান যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, যাঁহারা সমাজের ইষ্টসাধনে ঐকান্তিক প্রবল ইচ্ছার বশে সমাজে একটা উৎকট সংস্কার করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহারা মনের আবেগে অনেক সময় যে ভুল করিয়া বসেন, তাহার ফলে সমাজের হিত না হইয়া দারুণ অনিষ্টই হইয়া থাকে।

যখন একই ভাবের সমাজে অসময়ে দোষের সংস্কারসাধন করিতে গেলে, অথবা দোষের প্রকৃত প্রতীকারের উপায় অবলম্বন না করিতে পারিলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়, তখন ভিন্নভাবে গঠিত, আধ্যাত্মিকভাবে পরিচালিত সমাজে জড়বাদ-প্রধান সমাজের ব্যবস্থা যথাযথভাবে আমদানী করিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে ঐরূপ সমাজের সংস্কার-সাধন করিতে গেলেই সেই কার্য্য সমাজের পক্ষে ঘোর অমঙ্গল-জনক হইবে। এই সকল কথা আমি বারান্তরে বলিব।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

* জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স সম্বন্ধে বাকল বলিয়াছেন :—

"Thus for instance in France and Germany, it is the friends of freedom who have strengthened tyranny, it is the enemies of superstition made superstion more permanent."

Channing বলিয়াছেন : France failed through the want of that moral preparation for liberty without which the blessing cannot be secured. She was not ripe for the good she sought.—Essay on Napolean.

প্রতীক্ষা

আসা-পথ চেয়ে আশা যায় যে গো, বেলা হয় অবসান,
পথ চেয়ে চেয়ে নয়ন অন্ধ—অবশ হইল প্রাণ।
প্রভাতের মালা মলিন হইল, নীল শাড়ী গুরুভার,
শিথিল সজ্জা, দারুণ লজ্জা, মিছে হ'ল অভিসার!
দীর্ঘ দিবস বিগত ব্যর্থ রক্ত তপন ডোবে,
নয়নের নীর নীরবে বহিছে, হৃদয় ডুবিছে ক্ষোভে,
হায় রে পান্থ, কোন্ পথে তুমি, কোথা পাব সন্ধান,
আসা-পথ চেয়ে, আশা যায় যে গো, বেলা হয় অবসান!

দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস,
(কত) যুগ-যুগান্ত অতীত-অঙ্কে নিল অন্তিম শ্বাস।
কত বসন্ত হইল অন্ত, আসা-পথ চেয়ে শুধু,
যায় যৌবন, যায় যে জীবন, আশ না মিটিল বঁধু।
এস অন্তর-রাজ্যের রাজা—এস হে অন্তরতম,
লও এসে বঁধু সারাজীবনের পূজা উপহার মম।
হে প্রিয় আমার, কবে আর হায়, পাব তব সন্ধান,
আসা-পথ চেয়ে, আশা যায় যে গো, বেলা হয় অবসান!

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা।

সোনার পাহাড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নূতন আবিষ্কার

মৃত ব্যক্তির ভেলাখানি আমাদের নৌকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে আমার আপত্তি ছিল। ইহার প্রধান কারণ, ভেলার আরোহীর মৃতদেহটি খৃষ্টানের মৃতদেহের ন্যায় সমাহিত করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এক জন খৃষ্টানের মৃতদেহ,— তাহা যতই বিকৃত, গলিত, দুর্গন্ধযুক্ত হউক, সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাঙ্গর-কুম্ভীরের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিবে, এ কথা চিন্তা করিয়া আমি মর্মাহত হইলাম। ভেলাখানি সঙ্গে লইয়া নৌকা চালাইবার জন্য আমার অনুচরদিগকে আদেশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাত্রি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, আকাশে একটিও তারকা দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু সমুদ্র-জল ফস্ফরাসের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আলোক এরূপ মৃদু ও প্রেত-দেহের আলোকের ন্যায় রহস্য-সঙ্কুল যে, তাহা দেখিয়া মন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইল। আমরা জানিতাম, হাঙ্গরগুলা দ্রুতবেগে সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদের পাখনা জলের উপর মুহুর্মুহুঃ ভাসাইয়া তুলিলে সমুদ্রে ঐরূপ আলোকস্ফুরণ লক্ষিত হয়। সেই সকল ভীষণাকার ক্ষুধার্ত্ত জলজন্তুর তীক্ষ্ণ দন্ত হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় একখানি তক্তামাত্র। সেই তক্তা কোন কারণে বিদীর্ণ হইলে হাঙ্গরগুলা আমাদিগকে ছিঁড়িয়া খাইবে, কাহারও প্রাণরক্ষা হইবে না, এই আশঙ্কায় আমাদের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

আমাদের অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। আমরা তখন কোন্ দিকে যাইতেছিলাম, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না; কারণ, আমাদের সঙ্গে না ছিল কম্পাস, না ছিল আকাশে নক্ষত্র-বিকাশ। স্থলভাগও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। আকাশ যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে দৃষ্টিহীন নেত্রে স্তব্ধ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ছিল; আকাশের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, শীঘ্রই ঝড় উঠিবে। আমি আমার সঙ্গীদিগকে জোরে দাঁড় টানিতে বলিলাম। আমি হাল ধরিয়াছিলাম, নৌকার মাথা ঘুরিয়া না যায়, সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল। দাঁড়ের ঝুপ ঝুপ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না, চতুর্দিক এতই নিস্তব্ধ! সহসা আকাশ ও সমুদ্র উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল, সেই আলোকের ঝলকে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, মুহূর্ত্ত পরে সুগভীর বজ্রনাদে আমাদের কর্ণ বধির হইল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জলের ফোঁটাগুলি যেন এক একটা টেনিসের বল! গ্রীষ্ম-মণ্ডলের ঝড়-বৃষ্টিসম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, ইকুয়েডর উপকূলে হঠাৎ যেরূপ প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত ভীষণ ঝটিকার আবর্ত্তের ও সেই সঙ্গে বিপুল জলোচ্ছ্বাসে প্রলয়ের সূচনা লক্ষিত হয়, পৃথিবীর অন্য কোন অংশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ অতঃপর এরূপ ভীষণ বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, দাঁড়িরা দাঁড় ছাড়িয়া নৌকার আচ্ছাদনের নীচে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, সেই সঙ্কটকালে আমিও হাল ছাড়িয়া দিলে নৌকাখানি ডুবিয়া যাইত। এই সময় মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুদ্বিকাশ হওয়ায় আমাদিগকে আর অন্ধকারের অসুবিধা সহ্য করিতে হইল না। একবার বিদ্যুতের নীলাভ আলোকে আকাশমণ্ডল

ঝকমক্ করিয়া উঠিল, পর-মুহূর্ত্তেই সৌদামিনীর রক্ত-লোহিত সহস্র জিহ্বা সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাহার পর সহস্র কামান-গর্জ্জনের ন্যায় সুগভীর মেঘ-গর্জ্জন! সেই সঙ্গে শ্রবণপটহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পশ্চিমদিক হইতে প্রচণ্ড ঝটিকার ভৈরব হুঙ্কার উত্থিত হইবার পরমুহূর্ত্তে পূর্ব্বদিক হইতে সেইরূপ গভীর হুঙ্কার উঠিয়া দিগ্‌-দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গগনে, পবনে, সমুদ্রে ও মেঘে সে কি ভীষণ সংগ্রাম! স্থূল বৃষ্টিধারা সমুদ্রে বর্ষিত হইয়া তুষার-প্লাবনের শুভ্রতায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিল, এবং মনে হইল, সহস্র সর্প সমতালে গর্জ্জন করিতেছে। আমাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও প্রকৃতির সেই প্রলয়ঙ্কর বিরাট সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইলাম।

দুই ঘণ্টার পর ঝড়-বৃষ্টির বিরাম হইল। কিন্তু বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘের কোলে বিদ্যুৎপ্রভা তখনও মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। বহু দূর হইতে এক একবার মেঘ-গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম; তাহার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল, তারকারাজি আকাশে হাসিতে লাগিল। তখন আমাদের মনে সাহসসঞ্চার হইল; আমরা একটা বালতীতে কিছু বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম। কঠোর পরিশ্রমে আমরা ক্ষুধিত হইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী না থাকলেও মৃত ব্যক্তির বাক্সে যে শুষ্ক মাংস ছিল, তাহারই কিয়দংশ আহার করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিলাম। তাহার পর, পুনর্ব্বার নৌ-চালন আরম্ভ করিলাম, কারণ, সেই বিপৎসঙ্কুল সমুদ্রে ক্ষুদ্র নৌকায় আর এক রাত্রিও বাস করা আমরা সঙ্গত মনে করিলাম না। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু এই ভাবেই চলিল; ক্রমশঃ উষালোকে সমুদ্র লোহিতাভ হইল, তাহার পর পূর্ব্ব-গগন নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া তরুণ অরুণ আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল। গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রগর্ভ হইতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য কিরূপ মনোমুগ্ধকর, তাহা না দেখিলে ধারণা করা অসাধ্য; ভাষায় তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে ভাষার দৈন্য বুঝিতে পারা যায়। তাহা দেখিয়া মুখে কথা বাহির হয় না, আনন্দে আপ্লুত হইয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত হৃদয়ে নির্নিমেষনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। যিনি এই মহান্ দৃশ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত হয়। মনে হয়, ইহা সত্য নহে, স্বপ্নরাজ্যের দৃশ্য কল্পনালোক হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে।

প্রভাতের আলোকে আমরা সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অপরিস্ফুট তীর-রেখা দেখিতে পাইলাম। সুনীল সমুদ্রপ্রান্তে প্রকৃতির শ্যামল শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল; শ্রেণীবদ্ধ তাল-তরুগুলির সমুন্নত শির যেন সৌর-করোজ্জ্বল আকাশ চুম্বন করিতেছিল। অনুমান হইল, আমরা কোন দ্বীপের অদূরে উপস্থিত হইয়াছি। আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মহা উৎসাহে নৌকা চালাইয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমার ধারণা হইল, আমরা গুয়াকুইল উপসাগরের মোহানাস্থিত পুনা দ্বীপই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, সেই তালীবন তুষার-মুকুটিত গগনস্পর্শী পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত; সেই পর্ব্বতের তুষার-কিরীটে প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নানা বর্ণের হীরকের উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল। আমি পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, এই পর্ব্বতের নাম 'চম্‌বোরাজো'; কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা এই পর্ব্বতকে 'চিম্‌পুরাজা' নামে অভিহিত করে। 'চিম্‌পুরাজা' শব্দের অর্থ 'তুষার-শৈল।' (হিমপুরী কি?) উহার উচ্চতা বাইশ হাজার ফুট।

আমি চিরদিনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে আমার সম্মুখবর্ত্তী সেই দ্বীপের অপূর্ব্ব দৃশ্য-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। উত্তর হইতে দক্ষিণে যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হইতে পারে, সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক দৃশ্য সমান মনোহর। আমি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া ছিলাম। সেই সময় আমার ছুতার বন্ধু আমার স্কন্ধ স্পর্শ করায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে বলিল, "ফেলজি, তুমি অবাক্ হইয়া দেখিতেছ কি? আমরা কি ঐ দ্বীপে যাইবার চেষ্টা করিব না? ওখানে গিয়া কিছু খাবার জিনিষ সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহার পর কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া আমরা সোনার রাজ্য আবিষ্কার করিতে যাইব। বিশেষতঃ ওখানে না যাইলে এই পচা মড়া মাটীতে পুতিবার ত কোন ব্যবস্থা হইবে না।"

বন্ধুর প্রস্তাবটি অসঙ্গত মনে হইল না। আমি পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, গুয়াকুইল উপসাগরের মোহানাস্থিত পুনা দ্বীপ

সম্পূর্ণ নির্জ্জন, সেখানে মনুষ্যের বসতি নাই। আমাদের সেই অবস্থায় কোন নির্জ্জন দ্বীপে পদার্পণ করিতে আপত্তি ছিল না, কারণ, সেখানে কোন শত্রু কর্ত্তৃক আমাদের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না। মানুষ অপেক্ষা মানুষের ভীষণতর শত্রু কেহই নাই, ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আমি ইকুয়েডরের ভ্রমণবৃত্তান্তে পাঠ করিয়াছিলাম—সেখানে যে সকল অসভ্য জাতি বাস করে বা দলবদ্ধ হইয়া দেশের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের প্রকৃতি অতি ভীষণ; তাহাদের কবলে পড়িলে ধন-প্রাণ রক্ষা করা কঠিন। এই জন্য আমরা বলবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম; বিশেষতঃ, স্থলপথে আমাদের গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিব, তাহাও স্থির করিতে হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমার সঙ্গীদিগকে সেই দ্বীপে নৌকা ভিড়াইবার আদেশ করিলাম; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কি আছে, তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম? আমরা দ্বীপে উঠিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, পুনা-দ্বীপের তটভূমি এরূপ দুরারোহ ও পর্ব্বতাকীর্ণ যে, তীরে অবতরণ করা অসম্ভব হইল। অগত্যা সেই দ্বীপের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া অবতরণের উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতে লাগিলাম। কয়েক ঘণ্টার পর আমরা একটি সঙ্কীর্ণ খাঁড়ি দেখিতে পাইলাম; সেই খাঁড়িতে প্রবেশ করিয়া বালুকাপূর্ণ সমতল তটভূমি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল; মনে হইল, প্রকৃতি দেবী সেখানে একখানি সোনার চাদর ফেলিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, সেই সৈকত-তট স্বর্ণাভ বালুকারাশি দ্বারা সমাচ্ছাদিত। আমরা হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সোৎসাহে সেই স্থানে নৌকা ভিড়াইতে উদ্যত হইয়াছি, সেই সময় জিম স্মিথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "দেখ, দেখ, এক-নৌকা 'নিগার' ঐ দিকে বাইতেছে!"

জিম স্মিথের কথা সত্য। দেখিলাম, বাঁ-দিকে অনেক দূরে একখানি ডিঙ্গায় বসিয়া কতকগুলি দেশীয় লোক আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছি বুঝিতে পারিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি দাঁড় টানিয়া একটা বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাবে দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হইল না; কিন্তু বো-সোয়েন নিক্সন অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "লক্ষণ বড় ভাল নয়, ফেলজি! এই কালো সয়তানগুলা আমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে পারে, আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে।"

আমার ছুতোর বন্ধু অবজ্ঞাভরে বলিল, "উহাদের ভয়ে ত কাঁপিয়া মরিলাম, আমরা বার-দুই বন্দুকের আওয়াজ করিলে ঐ রকম দুই চারি শো 'নিগার' এ অঞ্চল হইতে পলাইবার পথ পাইবে না।"

বার্ণি ফাগান সদম্ভে বলিল, "উহাদের তাড়াইতে বন্দুকের আওয়াজ করিতে হইবে? তোমার ত ভারি সাহস! আমি যদি একগাছা কাঁটাওয়ালা বেত পাই, তাহা হইলে সেই বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে সব বেটা কালো সয়তানকে তাড়া করিয়া দেশছাড়া করিতে পারি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আশা করি, সে সুযোগ তুমি পাইবে; কিন্তু বেতের ব্যবহারে উহারা বোধ হয় তোমার অপেক্ষা বেশী ওস্তাদ। আপাততঃ তীরে নামিবার ব্যবস্থা কর।"

অল্প চেষ্টাতেই নৌকার মাথা তটের বালুকারাশির উপর আসিয়া পড়িল। নিক্সন তটে লাফাইয়া পড়িয়া নৌকার মাথা টানিয়া ধরিলে আমরা সকলেই নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলাম। তাহার পর নৌকাখানা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিলাম। কিন্তু ভেলাখানি সেই ভাবে ডাঙ্গায় টানিয়া আনিতে পারিলাম না; সেখানি টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারা যায়, এরূপ কোন স্থান পাওয়া যায় কি না, দেখিবার জন্য সেই খাঁড়ির ধারে ধারে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গজ অতিক্রম করিলাম; সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কোন কোন ব্যক্তির কার্য্যের নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। কুড়ুল দিয়া গাছ কাটিলে কাঠের যে সকল 'কুচুলি' বাহির হয়, সেইরূপ কুচুলি বেলাভূমির চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন খণ্ড খণ্ড দড়ি, কাঠের পিপার চাক্তি এবং নারিকেলের ছোবড়ার দড়ির মত একজাতীয় সুদৃঢ় লতা এক স্থানে স্তূপীকৃত ছিল। আমার স্মরণ হইল, মৃত ব্যক্তির ভেলাখানি সেই জাতীয় লতার সাহায্যে বাঁধা হইয়াছিল; তক্তাগুলি লতা দিয়া বাঁধিয়া ভেলার কোন কোন অংশে রজ্জু ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া আমার অনুমান হইল, ভেলার আরোহী এই স্থানেই ভেলা প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিল। আমার এই অনুমান অসঙ্গত নহে; কারণ, ভেলাখানি সর্ব্বপ্রথম যেখানে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এই দ্বীপ হইতেই তাহা

সেখানে ভাসিয়া যাওয়া সম্ভবপর মনে হইল। তাহা যে এই দ্বীপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম।

আমি আমার অনুচরগণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া এই সংবাদ তাহাদের গোচর করিলাম, তাহার পর সকলে পরামর্শ করিয়া নৌকাখানি পুনর্ব্বার জলে ভাসাইলাম এবং তাহার সঙ্গে ভেলা বাঁধিয়া ভেলা ও নৌকা সেই স্থানে লইয়া চলিলাম। সেই খাঁড়ির ভিতর বায়ুর বেগ বা সমুদ্রতরঙ্গের উদ্দাম নৃত্য না থাকায় আমাদিগকে কোন অসুবিধা সহ্য করিতে হইল না।

অতঃপর আমরা দ্বীপের ভিতর অগ্রসর হইলাম। ভেলাখানি যে সেই দ্বীপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাইলাম। সৈকতরাশি অতিক্রম করিয়া কিছু দূরে নলখাগড়ার জঙ্গল দেখিতে পাইলাম; তাহার ভিতর প্রবেশের একটি সুঁড়ি পথ ছিল। এ জন্য সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিতে আমাদের কষ্ট বা অসুবিধা হইল না। জঙ্গল পার হইয়া আমরা একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে উপস্থিত হইলাম: সেখানে দুইটি তালগাছের ছায়ায় একখানি কুটীর ছিল। আমি সেই কুটীরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলাম; প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না: কারণ, কুটীরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অগত্যা কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কুটীরের চারিকোণে চারিখানি তক্তা কাঠের খুঁটির উপর প্রসারিত ছিল। অল্প দিন পূর্ব্বে সেই কুটীরে যে একাধিক লোক বাস করিয়াছিল, কুটীরের অবস্থা দেখিয়া তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। আমি সেই কুটীরের বাহিরে প্রায় কুড়ি গজ দূরে গিয়া দেখিলাম, অনেকখানি স্থান পরিষ্কার, সেখানে এক একটি মাটীর স্তূপ, প্রত্যেক স্তূপের উপর কাঠের এক একটি নব-নির্ম্মিত ক্রশ্ সংস্থাপিত। সেই ক্রশ্গুলির চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড সজ্জিত, দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সেই স্থানটি সমাধিক্ষেত্র। অল্প দিন পূর্ব্বে সেখানে কয়েক জন লোক সমাহিত হইয়াছিল। সমাধিগুলি পুরাতন হইলে সেখানে ঘাস জন্মিত। এই দ্বীপের মৃত্তিকা এরূপ সরস ও উর্ব্বর যে, তৃণাদি উন্মূলিত হইলেও অতি অল্পদিনেই তাহা প্রচুরপরিমাণে উদ্গত হইয়া থাকে।

সেই সমাধিক্ষেত্র হইতে আমি কুটীরে প্রত্যাগমন করিলাম। সেই কুটীর পরীক্ষা করিয়া, সেখানে কাহারা বাস করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। আমার বিশ্বাস হইল, কোন জাহাজ সমুদ্রে জলমগ্ন হওয়ায় কয়েক জন নাবিক কোন উপায়ে সেই দ্বীপে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং উক্ত কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কুটীরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার কাঠের প্রাচীরে একটি জানালা ছিল; আমি সেই জানালাটি খুলিয়া দিলে কুটীরের ভিতর আলোক প্রবেশ করিল। কুটীরের এক প্রান্তে টীনের কয়েকটি পেয়ালা ও তিনখানি ডিস্ দেখিতে পাইলাম: সেগুলি বহুদিনের ব্যবহারে বিবর্ণ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ধূমপানের একটি ভাঙ্গা পাইপও দেখিলাম; সুতরাং সেখানে কোন কোন নাবিক বাস করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। আমার ছুতোর বন্ধু এবং দুই এক জন অনুচর ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

স্যাণ্ডি বলিল, "ঐ ভেলাখানি এখানেই নির্ম্মিত হইয়াছিল; আমার এ কথা মিথ্যা হইলে আমি স্কচম্যান নহি।"

আমি বলিলাম, "তুমি কিরূপে জানিলে যে, উহা এখানেই নির্ম্মিত হইয়াছিল?"

স্যাণ্ডি বলিল, "যে সকল চারা গাছের গুঁড়ি দিয়া ভেলাখানি নির্ম্মিত, সেই সকল গাছের ছোট ছোট চেলাকাঠ চারিদিকে পড়িয়া আছে। গাছগুলি কাটিবার সময় ঐ সকল কুচুলি বাহির হইয়াছিল। এগুলি অন্য কাঠের কুচুলি নহে, তাহা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। আমি কাঠ চিনিব না, তবে কি তোমরা চিনিবে? বিশেষতঃ যে লতা দিয়া ভেলার কাঠগুলি বাঁধা হইয়াছিল, সেই লতাও ত এখানে রাশীকৃতভাবে পড়িয়া আছে।"

আমি কোন কথা না বলিয়া সেই কুটীরে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু এক টুকরা কাগজেরও সন্ধান মিলিল না: তখন আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম, "আমাদের আবিষ্কৃত ভেলা ও তাহার আরোহীদের সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারিলাম না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।"

বো-সোয়েন বলিল, "এই কুটীরে কোন কাগজপত্র নাই বটে, কিন্তু ভেলার আরোহীর পকেট হাতড়াইলে তাহার পরিচয়সূচক কাগজপত্র পাওয়া যাইতেও পারে।"

আমি বলিলাম, "তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ; মৃত ব্যক্তির

পকেট হাতড়াইলে কাগজপত্র পাওয়া যাইতে পারে—ও কথা পূর্ব্বে আমার মনে হয় নাই। যাহা হউক, ভেলা হইতে মৃতদেহটি আগে তুলিয়া আনি, তাহার পর তাহার পকেটে কি আছে না আছে, দেখা যাইবে।"

জিম স্মিথ্ জলের কিনারায় পাহাড়ের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; সে কিছু দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "জলের ধারে এই পাহাড়ের আড়ালে একখানি ডোঙ্গা ভাসিতেছে!"

আমরা দ্রুতবেগে জিমের কাছে গিয়া দেখিলাম—একখানি ডোঙ্গা জলের ধারে বাঁধা আছে। যে সকল নাবিক এই দ্বীপে আসিয়া উক্ত কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল—তাহারাই এই ডোঙ্গার সাহায্যে দ্বীপসন্নিহিত দেশ হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল—এইরূপই আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম। আমরা ডোঙ্গাখানি উল্টাইয়া ফেলিতেই তাহার নীচে ডোঙ্গার পালখানি গুটান অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। সেই পালখানি ইংলণ্ডের কোন তাঁতশালায় নির্ম্মিত এবং কোন জাহাজের পাল হইতে তাহা কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম, "ভালই হইল, এই পাল দিয়া আমরা মৃতদেহটি আবৃত করিয়া তাহা সমাহিত করিব।"

আমরা ডোঙ্গা হইতে সেই পালখানি ভেলার উপর লইয়া চলিলাম। তাহা ভেলার উপর প্রসারিত করিয়া মৃতদেহটি তাহার উপর স্থাপিত করিলাম, তাহার পর কাটামুণ্ডটি মৃতদেহের পাশে রাখিয়া, সেই পালের চারিমুড়া ধরিয়া তাহা তীরে আনিলাম। কাযটি বড়ই অপ্রীতিকর হইল। প্রখর রৌদ্রে সেই পচা মৃতদেহ গলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দুর্গন্ধে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। অতি কষ্টে বমনের বেগ সংবরণ করিলাম।

এইবার মৃত ব্যক্তির পকেট অনুসন্ধানের পালা!—কিন্তু আমার অনুচরবর্গের কেহই সেই গলিত মৃতদেহ স্পর্শ করিতে সম্মত হইল না। অগত্যা আমি এক হাতে নাক চাপিয়া ধরিয়া মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পকেট হাতড়াইতে লাগিলাম। সুখের বিষয়, আমার পরিশ্রম বিফল হইল না। তাহার একটি পকেটে একখানি বহুদিনের ব্যবহৃত জীর্ণ নোট-বহি পাইলাম; তাহার পাতাগুলি হস্তাক্ষরে পূর্ণ। একটি পকেটে তামাক রাখিবার একটি কৌটা ছিল, কৌটাটি পিত্তলনির্ম্মিত; কিন্তু তামাকের পরিবর্ত্তে তাহা খণ্ড খণ্ড বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিপূর্ণ। আর একটি পকেটে একখানি বড় ছুরী ছিল। এই জিনিষগুলি ভিন্ন আর কিছুই পাইলাম না।

আমি বলিলাম, "এই নোট-বহিতে ভেলার আরোহী সম্বন্ধে সকল কথাই বোধ হয় লেখা আছে; পরে ইহা পড়িয়া দেখিব, আগে এই মৃতদেহ ও কাটা মুণ্ডটি মাটী চাপা দেওয়া যাউক, নতুবা দুর্গন্ধে এখানে তিষ্ঠিতে পারিব না।"

নিকসন বলিল, "কাযটা যত সহজ ভাবিতেছ, তত সহজ নয়। মাটী না খুঁড়িলে ত গোর দিতে পারিব না, কিন্তু মাটী কি দাঁত দিয়া খুঁড়িব? অস্ত্র কোথায়?"

আমি বলিলাম, "কিছু দূরে কয়েকটি নূতন গোর দেখিয়া আসিয়াছি। মাটী খুঁড়িয়া সেখানে মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছিল, সুতরাং মনে হইতেছে খুঁজিয়া দেখিলে মাটী খুঁড়িবার কোন অস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে। আগে কুটীরের ভিতর খুঁজিয়া দেখা যাউক।"

কুটীরে কাঠের খোঁটার উপর যে সকল তক্তা প্রসারিত ছিল, তাহাদেরই একখানির নীচে কাঠের একটি বাক্স পাইলাম। পূর্ব্বে তাহা দেখিতে পাই নাই। সেই বাক্স খুলিতেই তাহার ভিতর ছুতারের ব্যবহারোপযোগী কয়েক প্রকার অস্ত্র, কয়েকখানি কোদালী, তিন চারিখানি কুড়ুল, একখানি গাইস, একখানি দা, একটি হাতুড়ি, একখানি সাবল এবং কয়েকটি গুণছুচ দেখিতে পাইলাম। সেগুলি পাইয়া আমাদের যেরূপ আনন্দ হইল, এক বাক্স সোনা পাইলেও তত আনন্দ হইত না।

যাহা হউক, কোদালীর সাহায্যে দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ছয় ফুট দীর্ঘ এবং সাড়ে চারি ফুট গভীর একটি গহ্বর খনন করিলাম। তাহার পর ডোঙ্গার পালের চারি মুড়া মুড়িয়া সিলাই করিলাম। মৃতদেহ ও কাটা মুণ্ডটি একত্রই রহিল। আমি আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম, "মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় পাদ্রী কি বলিয়া উপাসনা করে, তাহা তোমাদের কেহ জান কি?"—কিন্তু তাহারা সকলেই মাথা নাড়িল। আমিও তাহা জানিতাম না! আমি বলিলাম, "এই বেচারাকে সমাহিত করিব,—কিন্তু উহার আত্মার কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইবে না; ইহা ত সঙ্গত নহে।" সৌভাগ্যক্রমে উপাসনার কয়েকটা মন্ত্র আমার জানা ছিল; আমরা সকলে জানু নত করিয়া বসিয়া সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম। সেই সময় অশ্রুভারে আমার চক্ষু ঝাপ্সা হইয়াছিল,

এ কথা স্বীকার করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। উপাসনা শেষ হইলে আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া সেই 'বাণ্ডিলটা' ধীরে ধীরে সমাধিগহ্বরে নামাইয়া দিলাম। তাহার পর মাটী ফেলিয়া গহ্বরটি পূর্ণ করিলাম। পাছে কোন বন্যজন্তু সমাধি খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করে, এই আশঙ্কায় আমরা কতকগুলি বড় বড় পাথর আনিয়া সেই সমাধির উপর স্থাপিত করিলাম। যে তামাকের কৌটা সোনায় পূর্ণ ছিল, তাহা আমি নিজের কাছে রাখিলাম; আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম,—"সময়ান্তরে সেই সোনার ঢেলাগুলি আমরা সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইব।"

অতঃপর আমরা বাস্নগুলি ভেলা হইতে তুলিয়া আনিয়া কুটীরে রাখিলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল, কিছু কাল পূর্ব্বে যে দেশীয় লোকগুলিকে নৌকায় খাড়ি পার হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তত থাকা প্রয়োজন। এই জন্য আমরা বন্দুকগুলি পরিষ্কৃত করিতে লাগিলাম। আমরা তিন জনে তিনটি বন্দুক লইলাম; অবশিষ্ট দুই জনকে দুইখানি স্প্যানিস ছোরা দিলাম। আমার আশা হইল, সেই সকল অস্ত্রের সাহায্যে শত্রুদলকে বিতাড়িত করিতে পারিব। আমরা পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, অতঃপর শুষ্ক মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া সেই কুটীরে শয়ন করিলাম। কুটীরে চারি জনের মাত্র শয়নের স্থান ছিল; চারিটি শয্যায় আমার চারি জন অনুচরকে শয়ন করাইয়া আমি মাটীতে শয়ন করিলাম, আমার জ্যাকেটটি জড়াইয়া মাথায় দিয়া বালিসের অভাব পূর্ণ করিলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম।

সপ্ত পরিচ্ছেদ

শত্রুকবলে

কয়েক ঘণ্টা পরে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ, বুঝিলাম, দিবা অবসানপ্রায়। আমার সঙ্গীরা তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তাহাদিগকে জাগাইতে ইচ্ছা হইল না। আমিও বোধ হয়, আরও কিছু কাল ঘুমাইতাম; কিন্তু একটা পিপীলিকা বা মাকড়সা আমার স্কন্ধে দংশন করায় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম; সন্দেহ হইল, সাপে কামড়াইল না কি?—কিন্তু খানিক তামাক-পাতা চিবাইয়া সেখানে টিপিয়া দিতেই জ্বালা-নিবৃত্তি হইল; আমি আর কোন কষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। বিচ্ছুতে বা সাপে কামড়াইলে আমি এত সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতাম না।

সন্ধ্যাসমাগমের আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া আমি কতকগুলি শুষ্ক পত্র ও বৃক্ষের শুষ্ক শাখা সংগ্রহ করিয়া সেই কুটীরের সম্মুখে সেইগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিলাম। তাহার পর সেই দ্বীপটির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিলাম; দ্বীপটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার মধ্যস্থলটি এরূপ নিবিড় অরণ্যে আবৃত যে, সেই অরণ্য ভেদ করিয়া কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলাম না, তখন আমাকে অন্য দিক্ দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইল। কুটীরে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই চতুর্দ্দিক্ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আমার চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ জোনাকী পোকা উড়িতে লাগিল; মনে হইল, প্রকৃতি দেবীর কাল পোসাকে লক্ষ লক্ষ হীরা-মাণিক ঝল্‌মল্ করিতেছিল! কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিতপ্রায়; আমি কয়েকখানি শুষ্ক কাঠ টানিয়া আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম; তাহার পর কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার অনুচররা তখনও পর্য্যন্ত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। দীর্ঘকাল দাঁড় টানিয়া তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, এ জন্য তাহাদিগকে তখন পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম না। আমি ভেলার মৃত আরোহীর পকেটবহিখানি বাহির করিয়া অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসিয়া পড়িলাম এবং সেই আলোকে তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম। ভেলার আরোহী যে দিন তাহার আত্মকাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই দিনের মাস ও তারিখ সে লিখিয়া রাখিয়াছিল; তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, যে দিন আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে তাহার মৃতদেহ সহ ভেলাখানি ভাসিতে দেখিয়াছিলাম, তাহার ঠিক একপক্ষ পূর্ব্বে সে এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই পকেট-বহিতে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি পাঠ করিলাম,—

"আমার সঙ্গীরা সকলেই পীড়িত। সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; যাহারা জীবিত আছে, তাহাদেরও জীবনের আশা নাই, সকলেই মরিবে। আমারও শরীর অসুস্থ; সম্ভবতঃ আমারও প্রাণ-রক্ষা হইবে না; এই জন্য ভবিষ্যতে আমার এই পকেট-বহি ও ভেলার দ্রব্যসামগ্রীগুলি যাহার হস্তগত হইবে—ঈশ্বরের দিব্য দিয়া

তাহাকে অনুরোধ করিতেছি—সে আমার এই ভেলায় যে সোনা পাইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ এবং এই নোট-বহির শেষাংশে যে গালা-মোহর করা পত্রখানি পাইবে, তাহা স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর ৪৮ নং—ষ্ট্রীট নিবাসিনী মেরী এলেন ক্রিম্যান্টন্ নাম্নী মহিলার হস্তে অর্পণ করিবে; অবশিষ্ট স্বর্ণ সে স্বয়ং গ্রহণ করিবে। আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে, যদি সে খৃষ্টান হয়—তাহা হইলে আমি অভিসম্পাত করিতেছি, নর্দ্দমায় পড়িয়া ক্ষ্যাপা কুকুর যেরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাকেও যেন সেইরূপ দুর্গতি সহ্য করিয়া মরিতে হয়, এবং মৃত্যুর পর যেন তাহার আত্মা পরমেশ্বরের করুণায় বঞ্চিত হয়।"

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমি সেই পকেট-বহির শেষ পৃষ্ঠা খুলিয়া সেখানে গালা-মোহর করা একখানি লেফাপা দেখিতে পাইলাম। আমি সেই লেফাপাখানি পরীক্ষা করিয়া মনে মনে বলিলাম, "যদি আমি শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকি এবং সুযোগ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ভেলার আরোহীর এই অন্তিম অনুরোধ পালন করিব। যদি আমি স্বেচ্ছায় এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে আমারও অন্তিম কামনা যেন অপূর্ণ থাকে।"

ভেলার আরোহী তাহার সংগৃহীত স্বর্ণের ও তাহার লিখিত উক্ত পত্রখানির ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের পরিচয় সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"আমার নাম পিটার ডন্‌কুম্। আমার বয়স এখন পয়তাল্লিশ বৎসর। আমি ব্রিষ্টল নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ব্রিষ্টলের কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা আমাকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল—আমি ইঞ্জিনিয়ার হই। কিন্তু আমি বাল্যকাল হইতে সমুদ্রভ্রমণের পক্ষপাতী ছিলাম। জাহাজে চাপিয়া দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইব, জগতের নানা দৃশ্য-বৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ হইব, বিদেশে বিপন্ন হইলে বুদ্ধিকৌশলে তাহা হইতে উদ্ধারলাভ করিব এবং নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব, এই আশায় আমি ও আমার ভাই এক দিন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া কোন জাহাজে চাকরী লইলাম। কিন্তু আমার ভাই দুই তিন বৎসর নাবিকের কায করিয়া নাবিকবৃত্তিতে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল। সেই সময় আমার পিতার মৃত্যু হওয়ায় আমরা দুই ভাই তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলাম। আমার অংশ আমার ভাইকে প্রদান করিলে সে ভাল্‌পারেসো নগরে গমন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল; আমি আরও কয়েক বৎসর এ দেশ ও দেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে এক ওলন্দাজ-জাহাজে চাকরী লইলাম। পাঁচ বৎসর চাকরীর পর কোন দুর্ঘটনায় আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম; অগত্যা আমাকে সেই চাকরী ত্যাগ করিতে হইল। আমি অসুস্থদেহে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো নগরে আমার ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেখানে কিছু দিন তাহার বৈষয়িক কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি ছিল না। সেই সময় কুমারী মেরী এলেন ক্রিম্যান্টনের সহিত আমার পরিচয় হয়; তাহার ন্যায় রূপবতী ও গুণবতী মহিলা আমি জীবনে দেখি নাই। আমাদের বন্ধুত্ব কিছু দিনের মধ্যেই প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম; কিন্তু আমাকে দরিদ্র ভবঘুরে মনে করিয়া এলেনের পিতামাতা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমি আমার প্রণয়িনীকে লাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেরূপে পারি ধনবান্ হইব। স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিলে আমার প্রণয়িনীকে লাভ করা সহজ হইবে বুঝিয়া আমি দিবারাত্রি কেবল স্বর্ণেরই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখিয়া আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এ জন্য কি উপায়ে কোথায় প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ভাল্‌পারেসো নগরে এক জন পর্য্যটকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, সে আমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিল, সে ভ্রমণোপলক্ষে ইকুয়েডর রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দেশে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছিল। তাহার কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহার প্রমাণস্বরূপ সে তাহার সংগৃহীত কয়েক দলা স্বর্ণও আমাকে দেখাইয়াছিল। আমি পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছিলাম—তাহা বিশুদ্ধ স্বর্ণ। সে যখন আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছিল, তখন আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই, উপকথা বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু মিস্ ক্রিম্যান্টনের পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার ইচ্ছা হইল, সেই পর্য্যটকের কথা সত্য কি না, স্বয়ং

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যেরূপে পারি ইকুয়েডর রাজ্যে উপস্থিত হইব। আমি কোন কোন পুস্তকেও পাঠ করিয়াছিলাম, ইকুয়েডর রাজ্য অফুরন্ত স্বর্ণের ভাণ্ডার, ইকুয়েডরে অসংখ্য সোনার খনি বর্ত্তমান; সেই সকল খনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা কঠিন নহে, কিন্তু সেই দুর্গম প্রদেশে গমন করাই কঠিন; একে ত পথের অভাব, তাহার উপর স্থানীয় লোকরা কোন বিদেশীকে স্বর্ণ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে দেখিলে তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তাহাদের বাধা অতিক্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

"এই সকল বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আমি নিরুৎসাহ হইলাম না; কিন্তু সেই দেশে যাত্রা করিবার কোন সুযোগ পাইলাম না। কিছু দিন পরে শুনিতে পাইলাম, একখানি জাহাজ কালাও বন্দরে যাইবে। আমি সেই জাহাজের সাধারণ নাবিকের পদ গ্রহণ করিয়া কালাও বন্দরে উপস্থিত হইলাম এবং গোপনে জাহাজ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রোপকূল দিয়া পদব্রজে উত্তরদিকে চলিলাম। সেই পথে আমাকে প্রাণ হাতে করিয়া অগ্রসর হইতে হইল; কয়েক বার আমার জীবন এরূপ বিপন্ন হইল যে, আমাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া ইকুয়েডরের সানরোজা নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে এক জন স্প্যানিস ভদ্র লোকের সহিত আমার পরিচয় হইল। আমি কি উদ্দেশ্যে সেই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি সেই অঞ্চলের পথ-ঘাট চিনিতেন, এ জন্য আমি তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আমরা উভয়ে ইকুয়েডরের অরণ্যপ্রদেশে প্রবেশ করিলাম। সেই দুর্গম প্রদেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে কয়েক মাস আমাদের কষ্টের সীমা রহিল না। অবশেষে আমরা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই স্থানের মৃত্তিকা স্বর্ণমিশ্রিত, যেন মাটীর উপরেই প্রচুর স্বর্ণ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! মাটীর ভারের স্তরে অপর্য্যাপ্ত সোনা দেখিয়া আমার সহযাত্রী স্প্যানিয়ার্ডের মাথা ঘুরিয়া গেল; তিনি ক্ষিপ্তবৎ হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন এবং পাহাড়ের উপর আরও অধিক সোনা আছে বুঝিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। কিছু দূর উঠিয়া তাঁহার পদস্খলন হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ একটি গিরিগুহায় নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

"আমি সেখানে একাকী বড়ই বিপদে পড়িলাম। একাকী কোন্ দিকে যাইব, কি করিব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা সানরোজাতে প্রত্যাগমন করিলাম। সেই সময় পেরুর দক্ষিণ উপকূলস্থিত লো নামক বন্দরে একখানি জাহাজ যাইতেছিল, আমি সেই জাহাজের আরোহী হইয়া লো বন্দরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমাকে কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে আর একখান জাহাজ পাইলাম; সেই জাহাজে চিলির কোপিয়াপো বন্দরে আসিলাম। এই বন্দরে একখানি বৃটিশ জাহাজের সন্ধান পাইলাম; সেই জাহাজের কয়েক জন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হওয়ায় চাকরী খালি ছিল; আমি চাকরীর প্রার্থী হওয়ায় সহজেই একটি চাকরী পাইলাম। চাকরী লইয়া সেই জাহাজে আমি লিভারপুলে যাত্রা করিলাম; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে কালিফর্ণিয়াগামী একখানি জাহাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল; আমি সেই জাহাজে চাপিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

"আমি আমার ভ্রাতাকে বলিলাম—ইকুয়েডরে প্রচুর স্বর্ণ দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে গমন করিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে অল্পদিনেই আমরা ধনবান্ হইব, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারিব। আমি তাহাকে আমার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম; কিন্তু আমার ভাই তখন রীতিমত সংসারী, সে বিবাহ করিয়াছিল এবং তাহার চারিটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু সে সময় তাহার একটি সন্তানও জীবিত ছিল না। সে বলিল, বহু দূরবর্ত্তী বিদেশের দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই, তাহার পুত্র-কন্যাগণ যেখানে সমাহিত হইয়াছে—সেই স্থানে অন্তিম শয্যা প্রসারিত করাই তাহার প্রার্থনীয়। সে আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইলেও আমি হতাশ হইলাম না, তাহার মত-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাকে বলিলাম, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাহার ঋণভার দুর্ব্বহ হইয়াছে, সেই ঋণ পরিশোধ করা তাহার অসাধ্য, তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে; এ অবস্থায় যদি সে কিছু দিন আমার সঙ্গে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে

তাহার সকল অভাব দূর হইবে। সে ধনবান্ হইতে পারিবে। অবশেষে সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল বটে,কিন্তু সে বলিল, যদি আরও ছয় জন লোক আমার সঙ্গে গমন করে—তাহা হইলেই সে যাইবে।—আমি আরও কয়েক জন সঙ্গী জুটাইবার চেষ্টা করিলাম। রাশি রাশি স্বর্ণ লাভের আশায় আরও ছয় জন লোক আমাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল। আমার ভাই তাহার কারবার বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিল; অন্য কয়েক জন লোকও যত টাকা পারিল লইয়া আসিল। সেই টাকায় আমরা স্বর্ণ উত্তোলনের উপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয় করিলাম, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীও সংগ্রহ করা হইল; তাহার পর একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া আমরা ইকুয়েডর রাজ্যের উত্তর-স্থিত কলম্বিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কলম্বিয়ায় উপস্থিত হইয়া আমরা জাহাজ পরিত্যাগ করিলাম। সেখান হইতে পদ-ব্রজে জনহীন দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। পথের কষ্টে আমা-দের এক জন সঙ্গী প্রাণত্যাগ করিল; কিন্তু দীর্ঘপথ অতি-ক্রম করিয়া অবশেষে আমরা সোনার রাজ্যে উপস্থিত হইলাম।

"কিন্তু সেই দুর্গম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আমরা পদে পদে বিপন্ন হইতে লাগিলাম, আমাদের দুঃখ ও দুর্গতির সীমা রহিল না। আমাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করা কঠিন হইল; খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে কোন কোন দিন আমাদিগকে অনাহারেই কাটাইতে হইল। ইহার উপর স্থানীয় অসভ্য অধিবাসীদের আক্রমণে আমরা বিব্রত হইলাম; আমাদিগকে প্রায় প্রত্যহই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, সুতরাং যুদ্ধে কোন দিন আমরা পরাজিত হই নাই, কিন্তু শত্রুপক্ষের আক্রমণে আমরা মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, এক বৎসর যাবৎ পরিশ্রম করিয়া আমরা কয়েক সের স্বর্ণ সংগ্রহ করিলাম। সে দেশে সোনা এতই অপর্য্যাপ্ত যে, আমরা নানা ভাবে বিপন্ন না হইলে সেই পাঁচ সাত সের সোনা এক সপ্তাহেই সংগ্রহ করিতে পারি-তাম। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা সকলেই জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। আমা-দের দলের কেহ কেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; এই জন্য আমরা জাহাজের আশায় সমুদ্রোপকূলে যাত্রা করিলাম। আমাদের লটবহর ও সংগৃহীত স্বর্ণরাশি বহনের জন্য অনেক চেষ্টায় কয়েকটি অশ্বতর সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে যাইবার সময় আমরা এরূপ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলাম যে, আমরা কোন দিন সমুদ্রতটে উপস্থিত হইতে পারিব,—সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। এই সময় পথিমধ্যে আমাদের আর এক জন সঙ্গীর মৃত্যু হইল, আমরা তাহার মৃতদেহ কোটোপাক্সি নামক আগ্নেয়গিরির নিভৃত পাদদেশে ভস্মরাশির মধ্যে সমাহিত করিলাম। সেই দুর্দ্দিনের কথা চিরজীবন আমার স্মরণ থাকিবে।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে স্থানীয় গবর্মেণ্টের এক দল প্রহরী আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। আমাদের অপরাধ কি, তাহা তাহারা বলিল না,—তাহা জানিবার জন্য আমাদেরও আগ্রহ ছিল না; কিন্তু বিনা চেষ্টায় তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে আমাদের আপত্তি ছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই যুদ্ধে আমাদের এক জন সঙ্গী বন্দুকের গুলীতে নিহত হইল, সুতরাং আমাদের দলে পাঁচ জনের অধিক লোক রহিল না। দীর্ঘ-কাল যুদ্ধের পর আমরা জয়লাভ করিলাম এবং শত্রুপক্ষ বলসঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই অবসন্ন দেহে পলায়ন করিয়া অতি কষ্টে গুয়াকুইলে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে সেই অঞ্চলের যে মানচিত্র ছিল, তাহাতে গুয়াকুইল উপ-সাগরের মোহানায় পুনা নামক একটি দ্বীপ দেখিয়া আমরা সেই দ্বীপেই আশ্রয় গ্রহণের সঙ্কল্প করিলাম। আমরা দুই-খানি ডোঙ্গা ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে গভীর রাত্রিতে সেই দ্বীপে যাত্রা করিলাম। সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া কোন নিভৃত স্থানে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিলাম; আমাদের সঙ্গে এক জন ছুতোর মিস্ত্রী ছিল, পূর্ব্বে সে জাহা-জের চাকরী করিত; তাহার সঙ্গে গাছ কাটিবার, তক্তা প্রস্তুত করিবার ও গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী অস্ত্রাদি থাকায় কুটীর-নির্ম্মাণ আমাদের অসাধ্য হয় নাই। আমরা যে ডোঙ্গার সাহায্যে এই দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম,—তাহা লইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রা করা বিপজ্জনক বুঝিয়া আমরা একখানি সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু নানা কারণে তাহা অসাধ্য হইল। সুতরাং আমরা একখানি ভেলা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলাম; স্থির হইল, তাহাতে দাঁড় ও পাইল উভয়ই থাকিবে। সেই ভেলায় আরোহণ করিয়া আমরা জাহাজের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব। কিন্তু ভেলার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার

পূর্ব্বে ভীষণ জ্বররোগে আমার তিন জন সঙ্গীর মৃত্যু হইল। আমি ও আমার ভাই এই দুই জন মাত্র জীবিত রহিলাম; কিন্তু আমার ভাইও তখন জীবন্মৃত। সেই সাংঘাতিক জ্বরের কবল হইতে তাহার নিষ্কৃতি-লাভের সম্ভাবনা না থাকায় এবং শীঘ্রই তাহারও মৃত্যু হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে আমাকে অনুরোধ করিল—যদি আমি তাহার মৃতদেহ সঙ্গে লইয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার মাথাটাও লইয়া গিয়া স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো নগরে তাহার সন্তানগণের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করি। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিলাম, আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিব। শীঘ্র তাহার মৃত্যু হইবে, ইহা আমি তখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু বিধাতা আমাদের প্রতি বিমুখ, তাহারও মৃত্যু হইল! তখন আমাকে আমার অঙ্গীকার পালন করিতে হইল, আমি তাহার মাথা কাটিয়া লইয়া দেশী মদে কিছু কাল ডুবাইয়া রাখিলাম, তাহার পর তাহা তুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলাম। ভেলা-নির্ম্মাণকার্য্য তখন পর্য্যন্ত অসমাপ্ত ছিল, আমি একাকী সেই নির্জ্জন দ্বীপে আমার ভাইবন্ধুগণের সমাধিক্ষেত্রের অদূরে বসিয়া বহু পরিশ্রমে ভেলাখানি জলে ভাসাইবার উপযোগী করিলাম। যে দিন তাহা জলে ভাসাইলাম—সেই দিন হইতে আমিও অসুস্থ হইলাম; কিন্তু জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমার ভেলা গভীর রাত্রিতে সেই দ্বীপপ্রান্তবাহিনী খাঁড়ি হইতে প্রবল স্রোতে মুক্ত সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল; তাহা কোন্ অকূলে ভাসিয়া যাইতেছে, সে দিকে আমার লক্ষ্য রহিল না; লক্ষ্য করিয়াই বা কি লাভ? আমার সঙ্গীরা সকলেই একে একে অকালে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আমি একাকী অসুস্থদেহে অকূল প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমান; প্রচণ্ড ঝটিকার এক ফুৎকারে হয় ত সমুদ্রগর্ভে তলাইয়া যাইব, হয় ত এই কালব্যাধির আক্রমণেই এই ভেলার উপর মরিয়া পড়িয়া থাকিব; কিন্তু যদি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন জাহাজ আমার এই ভেলা দেখিতে পায় এবং জাহাজে তুলিয়া লইয়া কোন সুসভ্য দেশে নামাইয়া দেয়—এই আশায় অকূলে ভাসিলাম। যিনি এই বিশ্বমণ্ডলের অধীশ্বর, তিনি এই অকিঞ্চনের আকিঞ্চন পূর্ণ করিবেন কি না, তিনিই জানেন।"

সেই ভেলার হতভাগ্য আরোহী পিটার ডন্‌কুমের আত্মকাহিনী এই স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছিল; স্থান-কাল, নিজের অবস্থার কথা বিস্মৃত হইয়া ইহা পাঠ করিতেছিলাম। কেন বলিতে পারি না, ইহা পাঠ করিতে করিতে কঠোর-হৃদয় নাবিক আমি, আমার উভয় চক্ষু অশ্রুভারে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছিল, কি এক অব্যক্ত বেদনায় বুকের ভিতর টন্‌টন্ করিতেছিল। আমি পকেটবহিখানি বন্ধ করিলাম; ইহার পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ স্বর্ণপূর্ণ সিন্দুকের ভিতর ছিল, এবং তাহা পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, পিটার স্বর্ণভূমি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ও তাহার সঙ্গিগণকে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, অবশেষে যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় তাহাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া এই বিপজ্জনক অভিযানে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হইল না। সত্য কথা বলিতে কি, যদি সেই সময় সেই নির্জ্জন দ্বীপ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ-যাত্রা করিবার কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তেই সেই স্থান ত্যাগ করিতাম। আমি মনে মনে বলিলাম, "পিটার ডন্‌কুম ও তাহার সঙ্গীরা যদি এত আয়োজন করিয়া আসিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা জাহাজের কয়েকজন পলাতক নাবিক কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?"

কিন্তু আমার এই নিরাশা ও নিরুদ্যমভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। এক ঘণ্টা পরেই এ সকল কথা বিস্মৃত হইলাম এবং পূর্ণ উদ্যমে তৎকালোচিত ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমি স্থির করিলাম, দুইটি কায করিতে হইবে; প্রথম এই নোটবহিতে পিটার ডন্‌কুমের যে আত্মকাহিনী পাঠ করিলাম, তাহা আমার সঙ্গীদের নিকট প্রকাশ করা হইবে না। কারণ, এ সকল কথা তাহাদিগকে জানাইয়া কোন লাভ নাই, হয় ত তাহারা আমার অপেক্ষা অধিকতর নিরুৎসাহ ও ব্যাকুল হইবে। আমি অল্পসময়েই মনস্থির করিতে পারিলাম বটে, কিন্তু তাহারা পারিবে কি? হয় ত ভয়ঙ্কর গোলমাল আরম্ভ করিবে। দ্বিতীয় কায, কাল প্রত্যূষে সোনার সিন্দুকটা মাটীর ভিতর পুতিয়া ফেলিতে হইবে। কখন্ কোন্ দিক হইতে শত্রুদল আসিয়া তাহা অধিকার করিবে, কে বলিতে পারে?—আমি কিছু কাল অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসিয়া পাইপ টানিলাম, তাহার পর খাঁড়ির জলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম;—নবোদিত চন্দ্রের

শুভ্র কিরণস্পর্শে জলরাশি গলিত রজতধারাবৎ প্রতীয়মান হইল। অতঃপর আমি কুটীরে প্রবেশ করিলাম এবং একটা কাঠের কুঁদা আমার জ্যাকেট দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, তাহা বালিসে পরিণত করিয়া, সেই বালিস মাথায় দিয়া মেঝের উপর শয়ন করিলাম। আমাদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু নাবিকের দল চিরদিনই এইরূপ কোমল উপধান ব্যবহারে অভ্যস্ত, সুতরাং আমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না। আমার সঙ্গীরা তখনও সেইভাবে ঘুমাইতেছিল; সেই রাত্রিতে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তাহার সম্ভাবনা দেখিলাম না।

আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, বলিতে পারিব না, কিন্তু চট্‌ করিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বোধ হয়, কুটীরমধ্যে কি একটা কোলাহল শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয়নের পূর্ব্বে আমি কুটীরের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিলাম; এ জন্য চন্দ্রালোক কুটীরে প্রবেশ করিতেছিল। সেই আলোকে কুটীরমধ্যে কয়েক জন লোককে দণ্ডায়মান দেখিলাম। আমার সঙ্গীরাই জাগিয়া উঠিয়াছে মনে করিয়া বলিলাম, "ভাই, সকলের ঘুম ভাঙ্গিল কি?"

আমার মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে কয়েকটা বিকটাকার জোয়ান শক্ত দড়ি দিয়া আমার হাত-পা এ ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল যে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব কি, আমার নড়িবারও শক্তি রহিল না। আমার সঙ্গীদের নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা সকলেই আমার মত বাঁধা পড়িল। কেহ একখানি হাতও তুলিতে পারিল না।

আমরা যে স্থানীয় অসভ্য জাতির হস্তে বন্দী হইয়াছি—ইহাও বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা আমার অধিক ক্ষোভ হইল, শয়নের পূর্ব্বে সোনার সিন্দুকটা মাটীর ভিতর পুঁতিয়া না রাখায়। আমরা এই দ্বীপে উঠিবার সময় যে দেশীয় লোকগুলাকে নৌকা লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, আমাদের আততায়ীরা যে সেই দলের লোক, এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। আমরা যখন তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, সেই সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, উহারা সুযোগ পাইলেই আমাদিগকে বিপন্ন করিবে। ইহা জানিয়াও আমরা সতর্ক হই নাই, এ জন্য আমাদের আক্ষেপের সীমা রহিল না। যদি আমাদের এক জনও বন্দুক লইয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম; বিবেচনার ত্রুটিতে সশস্ত্র অবস্থাতেই আমাদিগকে বাঁধা পড়িতে হইল। জানি না, এ বিপদের শেষ কোথায়?

সেই অসভ্য দলের প্রধান ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিল। লোকটা পাচ হাত লম্বা জোয়ান। জ্যোৎস্নালোকে তাহার ভীষণ মুখকান্তি দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, সে সেই দেশের সঙ্কর বর্ণের লোক, তাহার চক্ষু দুইটি জলন্ত অঙ্গারের মত জলিতেছিল। তাহার হাতে প্রায় আড়াই হাত লম্বা তীক্ষ্ণধার তরবারি, আমার অনুমান হইল, তাহার এক আঘাতে প্রকাণ্ডকায় ষাঁড়ের গর্দ্দানও দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে আমাকে যে কথা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, যদি আমরা তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করি কিম্বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, তাহা হইলে সেই তরবারির এক এক আঘাতেই আমাদের মুণ্ডচ্ছেদন করিবে। কাযটা যে তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, ইহা বুঝাইবার জন্য সে তাহার তরবারি আমার স্কন্ধে স্পর্শ করিয়া হাত নামাইল।

আমি তাহাকে কোন কথা না বলিয়া আমার সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "ভাই সকল, আমরা বুদ্ধির দোষে শত্রু-দলের ফাঁদে পড়িয়াছি, কিন্তু এখন আক্ষেপ নিষ্ফল। এই দস্যুগুলা অসভ্য হইলেও অকারণে আমাদিগকে হত্যা করিবে, ইহা বিশ্বাস হয় না। আমাদিগকে ইহারা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এখন আমরা নিরুপায়, সুতরাং ইহাদের আদেশ পালন করাই কর্ত্তব্য; ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, যাহা হয় হইবে।"

বার্ণি সক্রোধে বলিল, "দুত্তোর ভাগ্য! কি বলিব, ঘুমের ঘোরে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি, যদি হাত দুখানা খোলা পাইতাম, আর এতক্ষণে তলোয়ার হাতের কাছে থাকিত, তাহা হইলে এই কালো 'হিদেনগুলোকে' পাগলা ষাঁড়ের লড়াই দেখাইয়া দিতাম। সব বেটাকে কচু-কাটা করিতাম।"

কিন্তু আমাদের কাহারও হাত নাড়িবার উপায় ছিল না। আমাদের আততায়ীরা আমাদিগকে একসঙ্গে শৃঙ্খলিত করিয়া কুটীরের বাহিরে লইয়া গেল। তাহার পর আমাদের সোনার সিন্দুক, খাবারের বাক্স, অস্ত্রশস্ত্রগুলি সমুদ্র-তটে বহিয়া লইয়া চলিল। কিছু কাল পরে পূর্ব্বাকাশ লোহিতাভ হইলে আমরা সেই উষালোকে সমুদ্র-তটে নীত হইলাম। দলপতি তীক্ষ্ণ তরবারি আস্ফালন করিয়া আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইল, তাহার সহচররা আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বঙ্গদেশের ভক্ষ্য মৎস্য

সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বর্ষার সময় নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড উত্তাপে অবসন্ন প্রকৃতি বর্ষা-সমাগমে আবার জাগিয়া উঠে। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, স্থলচর, জলচর ও উভচর সকল প্রকার জীবই স্ফূর্ত্তি অনুভব করে এবং বংশবিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়। মৎস্যকুলও এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। বঙ্গদেশের অধিকাংশ মৎস্যের পোণা বর্ষাকালেই হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে মৎস্য-প্রজনন, পালন ও সংস্থানের (Conservation) ব্যবস্থা খুবই কম; অথচ মাছ ধরার যন্ত্রপাতি এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, চুণো-পুঁটি ও অতিশয় ক্ষুদ্র পোণা কিছুই বাদ যায় না। পুরাতন নদী, খাল, বিল এবং অন্যান্য জলাশয়ের সংস্কার না হওয়ায় জলাভাব যেমন বাড়িয়াছে, অপরিণত-মৎস্য-ধ্বংসের প্রবৃত্তিও তেমনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে বঙ্গদেশে উত্তরোত্তর মৎস্যের অভাব যে গুরু হইয়া উঠিবে, তাহা আদৌ বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। জাপানের ন্যায় বঙ্গদেশেও মৎস্য পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে অন্যতম; তাহার অভাব হইলে বাঙ্গালীর শরীর যে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং সহজে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। সুতরাং এই বিষয়ের গুরুত্ব যাহাতে দেশের লোক সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। ইতঃপূর্ব্বে মাসিক বসুমতীতে (ভাদ্র—১৩১১ ও জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪) এ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গালায় যে সকল মৎস্য সাধারণতঃ পালিত ও ধৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

মৎস্যের সদ্ব্যবহার

বঙ্গদেশ নদীমাতৃক ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বলিয়া এতদ্দেশে মৎস্যজাতির সংখ্যা খুবই অধিক। মৎস্যের প্রাচুর্য্যের জন্য এক সময় বঙ্গদেশ মৎস্যদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। অবশ্য খাদ্য হিসাবেই মৎস্যের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু মৎস্য হইতে অন্যান্য অনেক জিনিষও পাওয়া যায়। এইরূপ মৎস্যজাত পদার্থ-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান:—

(১) মৎস্য-শিরীষ; (Isinglass) রাসায়নিক সংগঠনের হিসাবে প্রকৃত শিরীষ ও জিলাটিনের সহিত ইহার পার্থক্য নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মৎস্যের পোঁটা এই কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভারতের মৎস্য-শিরীষ অন্যূন চৌদ্দ জাতীয় মৎস্য হইতে সংগৃহীত হয়; তন্মধ্যে দাঁতনে, খাগের ও সমগণের অন্য ৫টি মাছ, শিলন্দ ও শিল্লি বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মৎস্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য-শিরীষ উৎপাদনের উপাদান। বলা বাহুল্য যে, এই শিল্প এতদ্দেশে এখনও নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে।

(২) সার।—ইক্ষু, কাফি ও নানাবিধ ফল চাষের পক্ষে মৎস্যসার বিশেষ উপকারী। দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রতটস্থ স্থানসমূহে মৎস্যসারের প্রচলন কম নহে। মালাবারে মৎস্য-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় উৎকৃষ্ট সার উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। যাহারা শুঁটকিমাছ প্রস্তুত করে, তাহাদিগের সার প্রস্তুতের যথেষ্ট সুযোগ আছে, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই নিরক্ষর লোক এবং তাহারা উত্তম সার প্রস্তুত করিতে পারে না, অথবা করে না।

(৩) মৎস্য-তৈল।—অন্যান্য মৎস্য-বহুল দেশে মৎস্য-তৈলের কায খুবই লাভজনক এবং বহু লোক তৈলপ্রস্তুতে নিযুক্ত থাকে। বাঙ্গালায় সুন্দরবন অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে মৎস্য-তৈল প্রস্তুত হয় এবং যাহা হয়, তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট শ্রেণীর। আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে হাঙ্গর-যকৃৎ হইতে তৈল
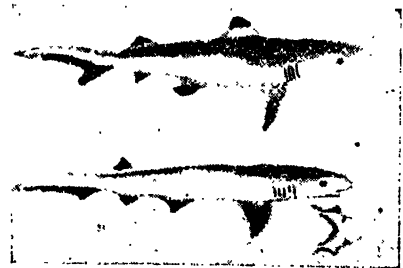
গঙ্গায় দুই জাতীয় হাঙ্গর

নিষ্কাশনের কথা বলিয়াছি। উহা পূর্ব্বে কডলিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইতে পারে, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের এ সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ নাই। তিত্‌পুঁটি, তিন জাতীয় ইলিশ, শিলন্দ প্রভৃতি হইতে ভক্ষ্য তৈল পাওয়া যায়। কেরোসিনের বহু বিস্তৃত প্রচার সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত নানা স্থানে মৎস্য-তৈল জ্বালান হইয়া থাকে। সাবান

লবণাক্ত জলের মৎস্য

মিঠা জলের মৎস্য

প্রস্তুতে ও শিল্পেও মৎস্য ও অন্যান্য তৈলের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অনেক জাতীয় মাছ পরিণত বয়সে যেমন নিরামিষাহারী, অল্পবয়সে তেমনই আমিষাহারের প্রত্যাশী। ম্যালেরিয়া-দমনের উপায়-সমূহের মধ্যে কতিপয় জাতীয় মাছের পোণা যথেষ্ট পরিমাণে জলাশয়ে ছাড়িয়া দেওয়া একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহারা মশক-কীড়া সমূহকে খাইয়া ফেলে; মশকবংশ আর বৃদ্ধি পাওয়ার অবসর পায় না। বঙ্গদেশীয় কতিপয় জাতীয় মৎস্যের এই গুণ আছে। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এই শ্রেণীর মৎস্যের এক চালান রাওলপিণ্ডি সহরে পাঠান হইয়াছে। সেখানে এখনও পরীক্ষা চলিতেছে।

ঝিল, দীঘি ইত্যাদি বৃহৎ জলাশয়ের মৎস্য

বঙ্গদেশে যে সমস্ত মাছ সাধারণতঃ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জলাশয়ের মাছ। রুই, কাতলা, মিরগেল, কালবোস্, বাটা ও ভাঙ্গন-বাটা সকলেরই সুপরিচিত। ক্ষুদ্র জলাশয়ে এই সমুদয় মাছ থাকিলেও ইহাদের পালনের পক্ষে বৃহৎ জলাশয়ই প্রশস্ত। ইহাদের প্রজননের জন্য বর্ষাকালে নদী হইতে ডিম্ব সংগৃহীত হইয়া থাকে। আগে ধারণা ছিল যে, দীঘি, ঝিল প্রভৃতিতে ইহারা প্রসব

রুই মাছ

করে না। অধুনা জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন স্থানের অতি বৃহৎ জলাশয়ে এবং পুরুলিয়া ও রাঁচি অঞ্চলের বাঁধ নামক জল-সংরক্ষণের বড় বড় 'খাদে' ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। রোহিত-জাতীয় মৎস্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। ফলুই ও চিতল এক শ্রেণীর মাছ ও স্বাদু-জলবাসী ফলুই কর্দ্দমে থাকিতেই ভালবাসে, কিন্তু ইহা হিংস্র নহে। পক্ষান্তরে, চিতল আকারেও যেমন বৃহৎ হয়, ইহার স্বভাবও তেমনই হিংস্র। ফলুই ও চিতল

ফলুই মাছ

আফ্রিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে উহারা বঙ্গদেশ হইতে আফ্রিকায় গমন করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বৃহৎ জলাশয়ের আর একটি বড় মাছ আমলেট্, বড় পুষ্করিণী ব্যতীত নদী ও সমুদ্রেও ইহা পাওয়া যায়। আড় ও টেঙ্গরা মাছ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। টেঙ্গরা ও আড় মাছ প্রায়ই গর্ত্তের মধ্যে বাস

আমলেট মাছ

টেঙ্গরা মাছ

করে। টেঙ্গরার ৫টি জাতি সচরাচর বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুই একটি জাতি স্বাদু জলে বাস করে; অন্যগুলি নদী অথবা লবণাক্ত জলের মাছ। বৃহৎ জলাশয়ে অবশ্য ক্ষুদ্র মৎস্য থাকে। তন্মধ্যে পুঁটি, চাঁদা ও মৌরলাই প্রধান।

শেষোক্ত মৎস্যের ঝোল অনেকেই সুপথ্য বলিয়া মনে করেন।

খানা, ডোবা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয়ের মাছ

খানা, ডোবা, নালা প্রভৃতি জলাশয়ের মাছ যে বড় বড় পুষ্করিণীতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। তবে সাধারণতঃ উক্ত শ্রেণীর মাছ ক্ষুদ্র জলাশয় হইতেই ধৃত হয় এবং যদি পালন
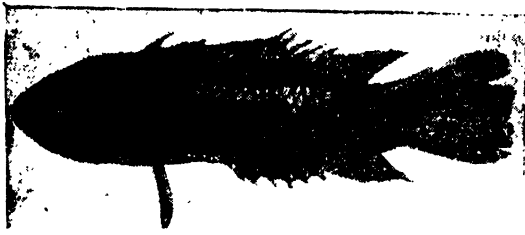
কই মাছ

করিতে হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে ক্ষুদ্র জলাশয়ে পালন করাই ভাল; তাহাতে ধরিবার কষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর মাছের মধ্যে কই ও মাগুর উৎকৃষ্ট মাছ। এই মাছগুলিও আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। যে সমুদয় বিশেষ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইহারা স্বল্পজলে অথবা জল বিহনে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বিবৃত করা হইয়াছে।

শিঙ্গি মাছের চাহিদাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শোল, শাল, ল্যাটা, চেং একবর্গীয় মাছ। ভদ্র ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইহাদের ব্যবহার অধিক না হইলেও অন্যান্য লোকের ইহারা সাধারণ খাদ্য। কুঁচে, গড়ুই ও দুই জাতীয় পাঁকাল সম্বন্ধেও উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। গুলে মাছ কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয় এবং অনেকের ধারণা যে, ইহা পুষ্টিকর। কিন্তু মফঃস্বলে অনেক স্থানে ইহা কেহ খায় না।

নদীর মাছ

পূর্ব্বোক্ত অনেক মাছই নদীতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ স্থলে নদীর মাছের মধ্যে কেবল সেইরূপ মৎস্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—যেগুলি নদী ব্যতীত বৃহৎ জলাশয়ে প্রায়ই পাওয়া যায় না। ইলিশ ও জাটক্যা নদীতেই ধরা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইলিশ সমুদ্রবাসী; কেবল ডিম
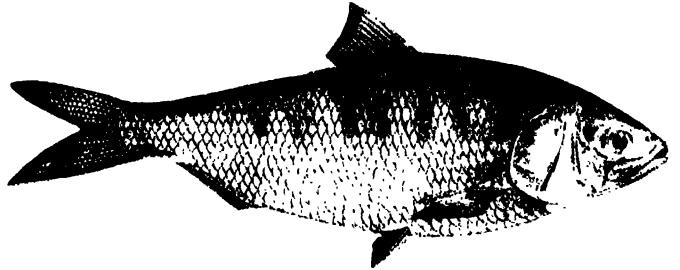
ইলিশ মাছ
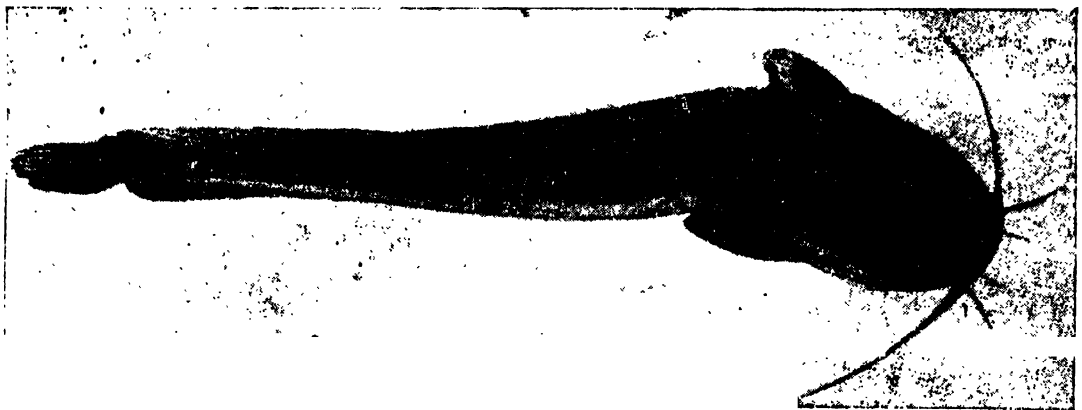
মাগুর মাছ

হ্যাদস ও খল্‌সে কইর সমবর্গীয় মাছ। বাজারে ইহাদের কাট্‌তিও সামান্য নহে। কিন্তু ডোবা প্রভৃতির মাছের মধ্যে

পাড়িবার সময় নদীতে উঠিয়া আসে। পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত জাটক্যা মাছ পূর্ব্বে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত

জাটকা মাছ

১০।১৫ সের হইয়া থাকে। খরসুলা ও কালকন্দা পার্‌সের ন্যায় নদীর মোহানার মাছ। মোতিয়া মৎস্য ইলিশজাতীয়; বঙ্গের নানাস্থানে, বিশেষতঃ সুন্দরবনে ইহা ধৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে তপসী মাছের কথা বলিতে পারা যায়। ইহা বৎসরে দুইবার সমুদ্র হইতে নদীতে আসে ও সেই সময় ধৃত হয়।
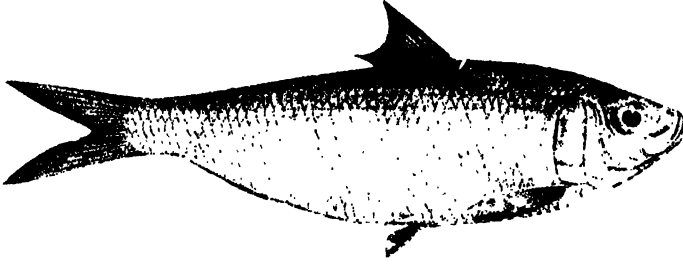
হইত। এখন কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইহা ইলিশেরই শিশু। চাপিলা ইলিশ-জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য; ইহা স্বাদু জলেই থাকে। আড় ও টেঙ্গরা-বর্গীয় মাছের বাঙ্গালায় প্রাধান্যও খুবই অধিক। নদীসমূহে এ বর্গের কতিপয় মৎস্য সচরাচর দৃষ্ট হয়; যথা—গাগর, পাবদা, কুরকুরিয়া, বাচা, পাঙ্গাস, রিঠা, শিলন্দ, বোয়াল ও শিশোর মাছের বিচিত্র চেহারার বিষয় পূর্ব্ব-প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সমস্ত নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়, তাহাতে গাগোর মাছ পাওয়া যায়; ইহার আরও ৫টি আত্মীয় নদীর মোহানাতে বাস করে; শুঁটকি মাছ প্রস্তুতের জন্য ইহাদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যে স্থলে পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেরূপ স্থল কুরকুরিয়া মাছের আবাসস্থান। বাচা ও শিলন্দ খুব বড় মাছ এবং এগুলিকেও শুঁটকি করা হইয়া থাকে। পাঙ্গাস, রিঠা ও বোয়াল কদর্য্য দ্রব্য আহার করে বলিয়া অনেকের ইহাদের উপর অভক্তি আছে; কিন্তু কলিকাতার বাজারে সবই কাটিয়া যায়। রোহিত-বর্গীয় মাছের মধ্যে করচি, দাঁড়িকা, খড়িকা ও ডানকুনি মাছ নদীতে পাওয়া যায় এবং ওজন প্রায়
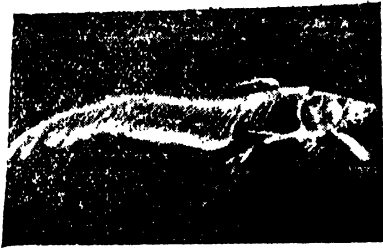
মোতিয়া মাছ

বোয়াল মাছ

নদী-মোহানা ও ঈষৎ লবণাক্ত জলের মাছ

অনেক মাছ সাধারণতঃ নদী ও সাগর-সঙ্গমের নিকটেই থাকে। ঈষৎ লবণাক্ত (Brackish) জলযুক্ত বৃহৎ জলাশয়েও এই সকল মাছ দৃষ্ট হয়। বাখরগঞ্জ ও খুলনা, ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় এই শ্রেণীর কতিপয় মাছ পাওয়া যায়; দৃষ্টান্তস্বরূপ ভেট্‌কির উল্লেখ করিতে পারা যায়। মূলতঃ সমুদ্রবাসী হইলেও ইহা ক্রমশঃ সমুদ্রতটসন্নিকটস্থ জলাশয়েও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সুবর্ণ-খড়িকা মাছ

নার ইলিশ, ফেঁসা ও তেল-চাপড়ি ইলিশবর্গীয় মাছ; সুবর্ণখড়িকাও তাহাই। এ সমস্তই সুস্বাদু মাছ। ভাঙ্গন ও পারসে নিকট-আত্মীয়। দাঁতনে ও ভোলা বড় মাছ, কিন্তু তেমন সুপরিচিত নহে। শুঁটকি করিবার জন্য রূপাপাতা মাছ যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গার মোহানায় ধরা হয়। বওয়া প্রসিদ্ধ বিলাতী মৎস্য Troutএর সমতুল্য। বাইন মাছ মুসলমানদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত। পিপলে শোল প্রায় বঙ্গদেশেই আবদ্ধ। ইহার পাখনায় ময়ূরপঙ্খী রং, দেখিতে চমৎকার।

বেলে মাছের আবাসও ঈষৎ লবণাক্ত জলে। বাঘ-আড় সমুদ্রসঙ্গমের ও সমুদ্রের একটি ভীষণাকার মাছ। হলদে জমীর উপর অনুপ্রস্থ কাল ডোরা এবং সুপুষ্ট গোঁফ থাকায় ইহা ব্যাঘ্র সদৃশ বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহা খুব বড় মাছ এবং শুঁটকি মাছের মধ্যে অন্যতম।

সমুদ্র উপকূলের মাছ

কতকগুলি মাছ সমুদ্রোপকূলে কিম্বা সমুদ্রজলের সহিত সংযুক্ত জলাশয়ে বাস করে। সুন্দরবনে এরূপ মৎস্য বিরল নহে। যাঁহারা বালেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ অনেক মৎস্যের সহিত পরিচিত আছেন। এই প্রকার মাছের মধ্যে কানগুর্ত্তা, সবা, বাড়ং ও কূড়া-ফেঁসা অন্যতম। নীল, লোহিত, সবুজ ও কালর সমাবেশে কানগুর্ত্তার
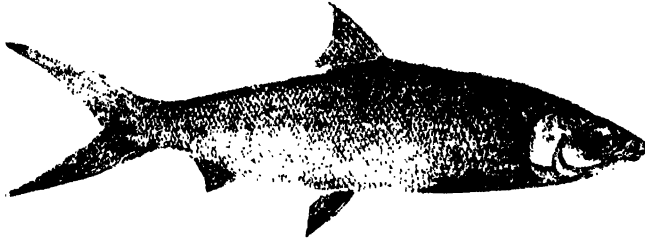
সবা মাছ

বিচিত্র অবয়ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত-উপকূল হইতে মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমুদ্র ইহাদিগের বাসস্থান। সবা প্রসিদ্ধ salmon মাছের ন্যায় সুমিষ্ট। চিল্কা হ্রদে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ইলিশ অপেক্ষা অনেক বড়—প্রায় ৩ ফুট দীর্ঘ। মহীশূরাধিপতি হায়দর আলি এই মাছের
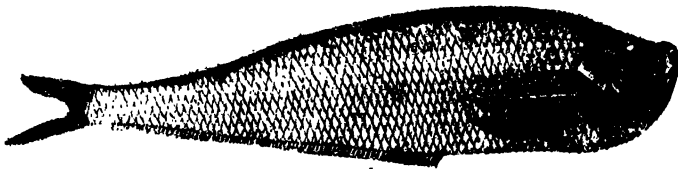
কুড়াফেঁসা

স্বাদে মুগ্ধ হইয়া এক সময়ে শ্রীরঙ্গপত্তনের বৃহৎ জলাশয় সমূহে ইহার চাষ করাইয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত সবা মৎস্যের বংশধরগণকে উক্ত স্থলে দেখা যায়। বাড়ং বিলাতী Herring সদৃশ মাছ; তজ্জন্য ইহাকে ভারতীয় হেরিং বলে; শুঁটকি মাছের জন্য ইহা খুব ব্যবহৃত হয়। কুড়াফেঁসা উপকূল ব্যতীত সুন্দরবন এবং পূর্ব্ববঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ভেটকি ও সন ভেটকি উভয়ই সামুদ্রিক মৎস্য। শীতকালে উপকূলের নিকট আসিলে ধৃত হইয়া থাকে। পায়রাচাঁদাগণের দুই এক জাতীয় মাছ ঈষৎ লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হইলেও এই গণের সমস্ত বড় বড় জাতি সমুদ্রবাসী ও Pomfret নামে পরিচিত। খাদ্য-মৎস্য হিসাবে ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। শিল্পি মৎস্য তপসী মাছের আত্মীয়, ইহা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য-শিরীষ প্রস্তুত হয়। বঙ্গোপসাগরে মৎস্য বিভাগের জাহাজ Golden Crown দ্বারা বারো বৎসর পূর্ব্বে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহাতে আরও নানাপ্রকার মাছ ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার কোন ব্যবস্থা এতদ্দেশে নাই এবং শীঘ্র হওয়াও সম্ভবপর নহে। উপকূলের ২।১ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত মৎস্য আইসে, তাহাই ধৃত হয় মাত্র।

বঙ্গদেশে মৎস্যাভাব

বঙ্গদেশের মৎস্য-ব্যবসায় প্রধানতঃ ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়ের মাছ লইয়া চলে। কলিকাতার বাজারে বহু দূরদেশ হইতে মৎস্য আনা হয় বলিয়া ততটা অভাব বোধ হয় না। বৎসরে কিছু কম সাড়ে চারি লক্ষ মণ মাছ কলিকাতায় আমদানী হইলেও কলিকাতাবাসিগণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সকলে বৎসরের সকল সময় সুখাদ্য মাছ ক্রয় করিতে পারে না। এক বর্ষাকাল ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে মৎস্যের অভাব আরও অধিক। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মাছ সহরেই চলিয়া আসে। কলিকাতা হইতে মাছ লইয়া গিয়া অন্য ক্ষুদ্র সহরে সরবরাহ করা হয়। নৈহাটীর মৎস্য-ব্যবসায় তাহার দৃষ্টান্তস্থল। খাল, বিল, নদী, বৃহৎ জলাশয়াদি মজিয়া গিয়া স্বাভাবিক উপায়ে মৎস্য-বংশবৃদ্ধির পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন অবস্থাপন্ন গ্রামবাসিগণেরও মৎস্য-প্রজননের চেষ্টা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। অথচ ২।৪টি ক্ষুদ্র জলাশয় লইয়া মৎস্য-চাষ করিলে যথেষ্ট লাভ করা যায়। ফলতঃ যে সমস্ত কারণে বঙ্গদেশে চাষের জমী কমিয়া যাইতেছে, সেই সমুদয় কারণেই মৎস্যাভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

রোমান্সের দাম

(গল্প)
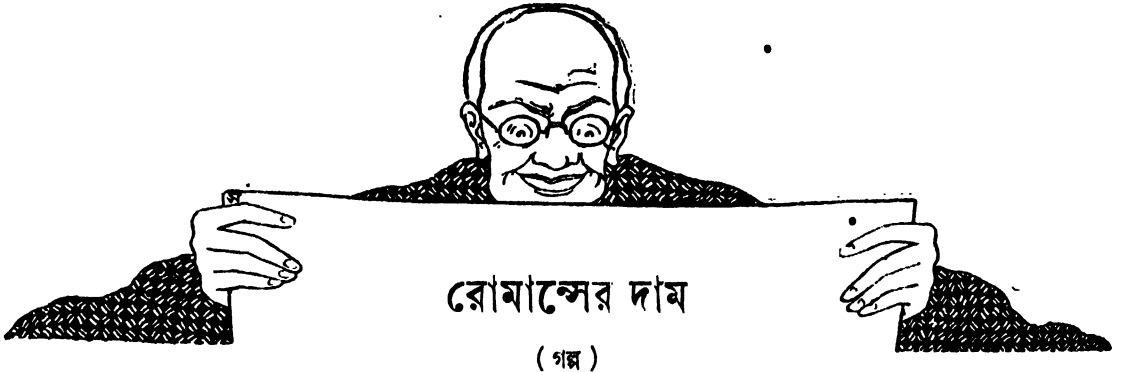
প্রথম পরিচ্ছেদ

রোগের বিষ

পাঁচ সাত দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া সারিয়া উঠিলে বিশ্বনাথকে ডাক্তার বাবু বলিলেন,—এক হপ্তা অন্ততঃ এখন দস্তরমত বিশ্রাম চাই। কোনো কাজ-কর্ম্ম করা হবে না……হার্টটা এখনও একটু দুর্ব্বল আছে, এ বয়সে শরীরকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া চাই। তা তো আপনার নেই…… কেবলি……

বিশ্বনাথের বয়স চল্লিশের কোটা পার হইয়া সবে এই একচল্লিশে পা দিয়াছে। বড়বাজারে তার লোহার মস্ত কারবার; শালকিয়াতে ফাউণ্ড্রী আছে। লোহা-লকড়ে চড়িয়া মা-লক্ষ্মী তার ঘরে আসিয়া নিজের আসনখানিতে বেশ কায়েমিভাবে বসিয়া দুই হাতে স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে বিশ্বনাথের গৃহিণী শ্রীমতী কুঞ্জকামিনী আসিয়া বলিল,—শুনলে তো ডাক্তারের কথা! তোমায় এখন কিছু দিন বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে দিচ্ছি নে ·····তাতে তোমার কারবার থাক আর যাক!

হাসিয়া বিশ্বনাথ কহিল—ছি ছি সাধ্বী সতী, কারবারকে ঠেশ দিয়ে কোনো কথা কয়ো না, ওই টুকুর দৌলতেই যা কিছু ···না যদি কোথাও বেরুই তো সময় কাটে কি নিয়ে?

কুঞ্জকামিনীর প্রাণের কোণে ছোট একটা নিশ্বাস জমিয়া উঠিল; প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়িল! এই স্বামীরই তখন কি মনোযোগ! নিশ্বাস চাপিয়া সে কহিল, তা বটে! ·· তা, লেখাপড়া করো না ··এক কালে তো সে সখও ছিল। কারবার করতে প্রথম যখন ঢোকো, তখন তো ফিরে এসে এই লেখাপড়ারই চর্চ্চা হতো।

বিশ্বনাথ কহিল—তাই হোক্। খানকতক বইই দিয়ো··· পড়া যাবে।

আহারাদির পর বিশ্বনাথ খাটে শুইয়া বাংলা বই পড়িতেছিল, পাশে একরাশ মাসিকপত্র। হালের যত বই ছাপিয়া বাহির হয়, তার সব কখানাই এ গৃহে দিব্য প্রবেশ-অধিকার পায়। খাটের নীচে মেজেয় মাদুরে বসিয়া কুঞ্জকামিনী একখানা কার্পেটের আসন বুনিতেছিল।

বইখানা খানিক পড়িয়া বিশ্বনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিল, তার পর আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বইখানা রাখিয়া মাসিকের গোছা ধরিয়া টানিল, টানিয়া পাঁচ-সাতখানার পাতা উল্টাইয়া বইগুলা ছুড়িয়া দ্বারপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। কুঞ্জকামিনী চমকিয়া কার্পেট রাখিয়া স্বামীর পানে চাহিল, পরে উঠিয়া তার পাশে আসিয়া কহিল—হলো কি? বইগুলো ছুড়ে ফেল্লে যে?

বিশ্বনাথ কহিল—কি যে সব লেখে! যেটা খুলি, ঐ এক কথা······

সকৌতূহলে কুঞ্জকামিনী প্রশ্ন করিল,—কি কথা?

বিশ্বনাথ কহিল—রোমান্স! পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই রোমান্সের ছড়াছড়ি! রোমান্স এমন সস্তা হয়ে উঠেছে, তা জানতুম না।

কুঞ্জকামিনী কথাটা না বুঝিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

বিশ্বনাথ হাতের কাছ হইতে আর একটা মাসিকপত্র টানিয়া তার একখানা পাতা উল্টাইল; পরে পাতাটায় মিনিট খানেক চোখ বুলাইয়া কহিল—এই ছাখো—এতেও ঐ কথা······

কথাটা বলিয়া বিশ্বনাথ কাগজখানা কুঞ্জকামিনীর সামনে আগাইয়া দিল। কুঞ্জকামিনী পড়িল,—একটি গল্প; গল্পের নাম, নয়ন-কটাক্ষ। গল্পের লেখা এরূপ—

কুঞ্জকামিনী পড়িতে লাগিল,—

ঝাড়া এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পিচ-ঢালা পথ চকচক্ করছে, যেন এক প্রকাণ্ড কালো তিমির তেলা পিঠের মতো! মাঝে মাঝে দু'একখানা ট্যাক্সি ছুটে চলেছে যেন রেড-ইণ্ডিয়ানের তীর তিমির গা বিঁধতে এসে পিছলে গড়িয়ে স'রে যাচ্ছে। আমি বেকার,—দুপুরবেলাটা চাকরির উমেদারিতে ঘুরে ঘুরে হায়রাণ, ভাবছি, এখন কি করি! মনের অবস্থা ঠিক যেন ধুনি জ্বালা শিকার-প্রত্যাশী ছাইমাখা নাগার মতো!…

হঠাৎ ছড়ছড়্ শব্দে একখানা থার্ডক্লাস গাড়ী আসছে, দেখলুম। গাড়ীখানা দেখবামাত্র আমার বুক ছাঁৎ ক'রে উঠলো—নদীতে ঢিল ফেললে যেমন ছলাৎ ক'রে জল ছিটিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি! মনে হলো, যেন ঐ গাড়ীটা আমায় এ অকূলে কূলের সন্ধান ব'লে দেবে!…হলোও তাই!

গাড়ীটা আমার সামনে আসতে তার চাকাখানা ভেঙ্গে পড়লো—গরিবের টলটলে দেহখানার মতোই গাড়ীটা নড়বড় করছিলো।…সঙ্গে সঙ্গে 'মা গো' ব'লে একটা আর্ত্ত রব ফুকরে উঠলো।

চোখ মেলে দেখি,—দুখানি হাত। তাজের শ্বেতপাথরে তৈরী দুখানি সরু থামের মতো। হাতে দুগাছি ক'রে সোনার চুড়ি… যেন সাদা মেঘে বিজলীর রেখা! এগিয়ে গেলুম্—তরুণী মূর্চ্ছিতা। তাকে বুকে তুলে পথে দাঁড়ালুম। পাশে একটা বাড়ীর রোয়াক—সেই রোয়াকের উপর মূর্চ্ছিতা তরুণীকে শোয়াবামাত্র সে চোখ মেলে চাইলে, বললে—আর কত দূর?

আমি বললুম—কোথায় যাবে তুমি?

তরুণী মুচকে হেসে বললে—যাওয়ার শেষ হয়ে গেছে… দরদী তরুণ সঙ্গীর সন্ধানে বেরিয়েছিলুম—এমন বাদলায় ঘরে মন বসলো না, আর…একটা থার্ড ক্লাশ গাড়ীকে সম্বল করেই নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিচ্ছিলুম—

আমি তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলুম—মনে হলো, আমি বেকার নই…কেরাণীগিরির উমেদার নই…আমি…আমি যেন—মন ব'লে উঠলো—এই তো কামনার ধন! এর চেয়ে বড় কামনার বস্তু জগতে আর কি আছে রে বোকচন্দর…!

বিশ্বনাথ বইখানা টানিয়া লইয়া বিরক্তিভরা স্বরে কহিল—কি এ পাগলামি বলো তো!—এই রকম লিখচে… আর কাগজে ছাপচেও!

কুঞ্জকামিনী কহিল—কেন?……কি হয়েছে?

বিশ্বনাথ কহিল—কেন, কি হয়েছে, বলচো!… প্রথমেই স্থাখো, ঐ পথের উপমা……তিমির কালো তেলা পিঠের মত……তিমিমাছ নিত্য যেন দেখচেন, তাই তার উপমা চালিয়েছেন!……পর পর অমনি উপমার কেয়ারী বুনে গেছে, মানে হয় না! তার পর কল্পনা……ঐ বয়সের বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে থার্ডক্লাশ গাড়ীতে চেপে মনের মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছে……আর ঐ সাদা মেঘে বিজলীরেখা! এ জিনিষ চোখে দেখার সৌভাগ্য এই একচল্লিশ বছরেও হয় নি কখনো!

কুঞ্জকামিনী কহিল—গল্প গল্প, তার মধ্যে বুঝি আবার সত্যি কিছু থাকে!

বিশ্বনাথ কহিল—আর কিছু না থাক, তা ব'লে এমনি গাঁজার ধোঁয়া থাকবে!—বিশ্রী ব্যাপার……আর এই সব পয়সা দিয়ে কিনচো তোমরা?

কুঞ্জকামিনী কহিল—জোড়া পোষ্টকার্ডে কি কাকুতিই যে জানায়……কেনবার জন্যে কি মাথা কুটে মরে,—আহা, বেচারারা…কাজেই……

বিশ্বনাথ কহিল—না… …এতে হতভাগা বেকুবদের বড্ড প্রশ্রয় দেওয়া হয়……যতগুলো বই খুললুম, ঐ এক কথা!……দেশের মেয়েদের হলো কি এ?…মান-ইজ্জৎ বিসর্জ্জন দিয়ে এমনি ছুটোছুটি ক'রে সব কি বলে!……এ সব লেখা পড়ো না……

কুঞ্জকামিনী কহিল—সময় কাটানো চাই তো! তবে এ সব লেখার একটা গুণ আছে এই—দু ছত্তর পড়তে না পড়তে এমন ঘুম আসে যে, ও তিমিমাছ, থার্ডক্লাশ গাড়ী, ও-সব মনের কোণেও থিতুতে পায় না।

বিশ্বনাথ কহিল—নাঃ! অনবরত এই সব পড়তে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে…এই স্থাখো তো একটা নভেল! নভেলের নাম—মনের ঘুণ। এমন নামও কখনো শুনিনি! গল্প লিখচে,—এক বাড়ীর বৌ জানলার ধারে দাঁড়ায়, আর পাশের বাড়ীর এক ছোকরার সঙ্গে চোখে-চোখে দেখা হয়। এক দিন বৌ ছোকরাকে চিঠি লিখলে—আমায় নাও…… ছোকরা অমনি এক সন্ধ্যাবেলায় একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির।……এ কি সব…মেয়েদের এমন অপমান ক'রে এই সব অকালকুষ্মাণ্ডর দল বই লিখবে আর মেয়েরাই পয়সা দিয়ে নিজেদের এই অপমানের কাহিনী কিনবে……এর জন্যে রীতিমত শাসনের দরকার হয়েছে যে!

কুঞ্জকামিনী হাসিয়া কহিল—কে বা ঐ নিয়ে মাথা ঘামায়! লেখে ছাই-পাঁশ… সময় কাটাবার জন্যে পড়ি… পড়বার সময় আমরাই কি হাসি না এ উদ্ভুট্টে পাগলামি দেখে!

বিশ্বনাথ কহিল—না, শুধু হাসি কি! এ সব বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এ বই প'ড়ে সময় কাটানোর চেয়ে ধুলোয়

পড়ে গড়াগড়ি খাওয়া ভালো—মদ খেয়ে মাতলামি করা'র চের ইজ্জতের !

কুঞ্জকামিনী কহিল—বেশ তো বাবু……ও বই তোমায় পড়তে হবে না।

বিশ্বনাথ কহিল—তার চেয়ে সেই নার্শারির ক্যাটালগটা এনে দাও…… বাঁধা কপির চাষের বৃত্তান্ত প'ড়ে আমি সময় কাটাই……জ্বরের পর অরুচির মুখে ও-জিনিষ রুচবেও ভালো !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষের ক্রিয়া

বাতাসের মুখে বট-অশথের ছোট বীজ কখন্ আসিয়া তিন-চারতলা বাড়ীর দেওয়ালের ফাটে গাড়িয়া বসে, তার পর ছোট চারা মাথা ঠেলিয়া ওঠে…কেমন করিয়া কি যে ঘটিয়া যায়, এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য !

বিশ্বনাথ এ কালের লেখায় বিরক্ত হইয়া মাসিকপত্রের গোছা ফেলিয়া দিলেও সে লেখার কালির পোঁছ তার মনের কোণে লাগিয়া রহিল। কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে সেই সব কালির পোঁছ কখনো হরফের মালা গাঁথিয়া, কখনো বা সেই সব মাসিক-গল্পের বিচিত্র নরনারীর রূপ ধরিয়া তার চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, বিশ্বনাথও তাদের দেখিয়া এক একবার ভাবে, এই কঠিন বাস্তবের ফাঁকে একটু নয় উহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিলাম ! হানি কি ! কাগজ ঠেলিয়া সেই সব নর-নারী যেন তাকে ডাকিয়া বলে, বয়সগুলা ময়লা লোহা ঘাঁটিয়াই খোয়াইয়া বসিলে, বাপু! পয়সাই নয় করিয়াছ, সে পয়সায় দুনিয়ার কত মণি-মুক্তাই যে হাতে পাইতে !

ফলে দাঁড়াইল, বিশ্বনাথ ছুটীর দিনে ঐ সব মাসিকপত্র খুলিয়া সে-গুলার পাতায় মনোযোগ অর্পণ করিয়া সময় কাটায়। কুঞ্জকামিনী আসিয়া হাসিয়া বলে—ও কি গো, হলো কি ? ঐ সব ছাই-পাঁশ নিয়ে প'ড়ে আছো যে !

বিশ্বনাথ হাসিয়া জবাব দেয়,—হ্যাঁ, দেখচি, কি সব লিখচে।

কুঞ্জকামিনী বলে—তা বাবু, সময় কেটে যায় এক রকম ক'রে—নয় কি ?

বিশ্বনাথ কহিল—প'ড়ে এক একবার ভাবি, এ একঘেয়ে জীবনটা কেমন ক'রে এমন হেসে-খেলে কাটিয়ে এলুম! আমাদের বুকে কি দীর্ঘনিশ্বাসের একটু ছিটেও কখনো ভগবান পুরে দেন নি ? চাঁদনী রাতের বিহ্বলতা—এ জিনিষটা কি ছাই চোখেও কখনো দেখলুম না, প্রাণেও কোনো দিন বুঝলুম না !

কুঞ্জকামিনী হাসিয়া কহিল—তামাসা রাখো…এ বয়সে আর তা বোঝবার চেষ্টা করো না—লোকে হাসবে।

বিশ্বনাথ কহিল,—আহা, তা নয় গো, শোন, আমার তো এই বয়স হয়েছে। এ বয়সে অনেক দেশ ঘুরেছি—বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে নির্জ্জন পথেও অনেক চলেছি, কিন্তু কখনো কোনো তরুণী বিপদে প'ড়ে আমার মুখের পানে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে না, একটু আশ্রয়ের ভিখারী হয়ে…আর এই ছাখো, এ বইখানাতে এই মাত্র পড়ছিলুম, এক নায়ক এগজামিনে ফেল ক'রে বাড়ীতে তাড়া খেয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পথে এক মোটরের ধাক্কা খেয়ে হাসপাতালে গেল, হাসপাতালে মিষ্টার রায়ের তরুণী কন্যা পরাগিণীর প্রেমের স্পর্শে দিব্যি ভোল ফিরিয়ে ফেললে ! মোটরে লোক চাপা পড়ছে নিত্য, কিন্তু এই পরাগিণীর দর্শন বাস্তব জীবনে কেউ পেয়েছে ব'লে শুনলুম না। ধাক্কা দিয়ে ফৌজদারী আদালতে আসামী হয়ে ড্রাইভাররা মোটা জরিমানা দিচ্ছে, নয় তো জেলে যাচ্ছে—এর চেয়ে বড় বেশী যাকে ভুগতে হচ্ছে, তাকে ড্যামেজ দিতে হচ্ছে ! আইন-আদালতের কথা এই সব সব্যসাচী লেখকের দল কি ক'রে ভুলে যায় কুঞ্জ, তাই ভাবছিলুম…অথচ আইন-আদালতটা ভারী জীবন্ত, ভারী প্রত্যক্ষ সত্য।

কুঞ্জকামিনী হাসিয়া কহিল,—তোমার দেখচি ছোঁয়াচ লেগেছে গো ! অত কথা কে-ই বা ভাবে, বলো ! এক দল লোক যা খুশী লিখে যায়, আর এক দল গো-গ্রাসে তাই পড়ে…দু'দলেরই সময় কেটে যাচ্ছে এক রকমে…

বিশ্বনাথ কহিল,—এক একবার আমার কি মনে হয়, জানো…?

কুঞ্জকামিনী কহিল—কি ?

বিশ্বনাথ কহিল—এক দিন এই সব গল্পের নায়কদের মত 'নিশীথের নিবিড় অন্ধকারে' এই সহরের পথে পথে উদাসীনের মত ঘুরবো…ঘুরে দেখবো, যথার্থই এই সহরের কোথাও কোনো রোমান্সের উপাদান ও-সময়ে মেলে কি না।

কুঞ্জকামিনী কহিল—দোহাই তোমার—এ বয়সে আর ও চেষ্টায় ঘুরো না…সর্দ্দি হবে, নয় তো পায়ের ব্যথায় এক মাস

শয্যাগত থাকতে হবে।···তা ছাড়া দেখচো তো, ও-সব গল্পের নায়কদের বয়স বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে, আর প্রায় সবগুলিই বেকার—বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না এমন অবস্থা···আমরা তো জানি, বেকার পয়সা-রোজগারেরই চেষ্টা করবে! ভগবান যদি কাকেও পয়সা থেকে বঞ্চিত রাখেন, তা হ'লে তার উচিত, সে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করা! তা না,এই সব বেয়াড়া সখ!

বিশ্বনাথ কহিল—আহা, এইখানেই তো মজা আরো বেশী! এই তো সব হাঘরে নায়ক···অথচ রাজকন্যা, সদাগর-কন্যারা তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে এদেরই জন্য আকুল হয়ে পথে ছুটে আসে! সুপাত্রের এমন অভাব ঘটে কখনো কোনো দেশে? এ কথাও এই সব লেখকদের মাথায় আসে না?

কুঞ্জকামিনী কহিল—তোমার সঙ্গে আর বকৃতে পারি না বাবু, ও-গুলো রেখে একটু ঘুমোও দিকিনি! তবু একটু জিরেন পাবে।

কিন্তু জিরেন পাইবার উপায় ছিল না। এই সব লেখার আবহাওয়া ভূতের মত বিশ্বনাথের ঘাড়ে চাপিয়াছিল। এগুলো পড়িয়া প্রথম বয়সের হারানো কত কি মনের আশে-পাশে তারার মত ঝিকৃমিক করিয়া যে ফুটিয়া উঠিতেছিল! আলো-ছায়ার কত যে লুকোচুরি! আবার বয়সের মেঘ পরক্ষণেই সেগুলাকে ঢাকিয়া দিতেছিল! চল্লিশ বৎসর বয়সটার দুর্ব্বলতা এইখানে······

একবার যদি তার খেয়াল হয়, বিশ-ত্রিশের কোঠা পার হইয়া গিয়াছে, সামনে পঞ্চাশ তার জীর্ণ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া······অমনি চঞ্চলতায় মন সারা হইয়া ওঠে! তাড়াতাড়ি ঐ বিশ-ত্রিশের গণ্ডীর দিকে হুঁসিয়ার দৃষ্টিতে তার সন্ধান চলিতে থাকে, কি ও-ধারে ফেলিয়া আসিলাম. কোন্ হারানো স্মৃতি, কি সুর, কিসের গন্ধ······কি স্পর্শ·· ও-ধারে আজ ও কিসের উৎসব চলিয়াছে······হাসির বিদ্যুৎ আর অশ্রুর বাষ্পে কি মায়ালোকের ঐ অস্পষ্ট আভাষ জাগে! ভালো করিয়া সেগুলা দেখিয়াও আসিলাম না!—এমনি অস্থিরতার মুহূর্ত্ত বিরাম থাকে না!

বিশ্বনাথের মনে হইতেছিল,—দুনিয়াটা সত্যই শুধু লোহার থামের উপরই খাড়া নাই · লোহার থামগুলার অন্তরালে বাগিচা আছে, সবুজ পাতার মাঝে মাঝে ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে, ফুলের পাপড়ির ধারে ধারে অলি-ভ্রমর গুঞ্জন-রব তুলিয়া ঘোরে,গাছের ডালে বসিয়া পাখী নানা সুরে গান ধরে, বাগানের ধার দিয়া স্বচ্ছ নদীটিও লঘু গতিতে মৃদু তান তুলিয়া বহিয়া চলে··· ··এ-গুলার কি কোনো অর্থ নাই,—না, এরা মানুষের মনের কোনো অভাব পূরণ করে না? তবে······

সে হায়, এ-গুলার পানে না চাহিয়া শুধু এই লোহার থাম-গুলার পানেই নজর রাখিয়া এতখানি পথ চলিয়া আসিয়াছে! আজ সে চলা-পথে ফিরিবারও উপায় নাই! পথের আশে-পাশে ঐ যে পাখীর গান, জলের তান, হাসির উচ্ছ্বাস, অশ্রুর আভাষ—এ-গুলার একটু পরশও সে লইতে পারে নাই! রুটিনে বাঁধা নেহাৎ একঘেয়ে জীবনটাকেই সে বহিয়া আসিয়াছে······শিব যেমন কোন্ অতীত যুগে সতীর প্রাণ-হীন শবদেহটাকে স্কন্ধে বহিয়া পাগলের মত পথ চলিয়া-ছিলেন—এ'ও ঠিক তেমনি! রূপ রস গন্ধ স্পর্শ······যা লইয়া এত লেখালেখি চলিয়াছে, তার কোনো পরিচয়ই কোনো-দিন লইল না সে······এমন হতভাগ্য!

এমনি একটা চিন্তা বার বার তার মনে বিঁধিয়া তাকে কাতর পীড়িত করিয়া তুলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তরুণী নায়িকা

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। খিদিরপুরের ওদিকে নিমন্ত্রণ সারিয়া গৃহে ফিরিবার পথে বিশ্বনাথ গাড়ী হইতে মাঠের এক-ধারে নামিয়া পড়িল। চাঁদের আলোয় চারিধার ঝল মল করি-তেছে। ময়দানে লোক-চলাচল নাই। পথে গাড়ী রাখিয়া বিশ্বনাথ ময়দানের মধ্যে বহুদূর হাঁটিয়া আসিয়া একটা বেঞ্চে বসিল।

খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তার মনে জাগিল—এই তো জ্যোৎস্না-রাত্রি, নির্জ্জন নিরালা মাঠ, সে-ও একা বসিয়া···গল্পের মত আবহাওয়া চারিধারে বেশ জমিয়া উঠি-য়াছে! কিন্তু কৈ সে ত্রস্তচরণা নায়িকা···ঐ সব বইগুলার পাতায় পাতায় যার পায়ের ধ্বনি স্বপ্নসুন্দরীর নূপুর-ধ্বনির মত রণিয়া রণিয়া বাজিয়া মনকে মাতাল মশগুল করিয়া তোলে!

চিন্তার প্রাখর্য্যের অন্তরালে কৌতুকময়ী তন্দ্রার অদৃশ্য অলক্ষ্য গতি চিরপ্রসিদ্ধ। বিশ্বনাথের চিন্তার পিছনে তন্দ্রা আসিয়া তার চোখ চাপিয়া ধরিল·· বড় মধুর আবেশ! সারা-দিনের পরিশ্রম, তার পর নিমন্ত্রণ-বাড়ীর গুরুভোজনের পর তন্দ্রার এ স্পর্শের আবেশ সীমাহীন···বিশ্বনাথ তন্দ্রার স্পর্শে চেতনা হারাইল।

প্রতীক্ষায়

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী ।

সহসা একেবারে পাশে স্খলিত কুণ্ঠিত স্বর—মশাই···

'মশাই' তখন তন্দ্রার স্পর্শে কোন্ স্বপ্নলোকের পথে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে! তার পর প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কাণের পাশে আবার সেই স্বর—মশায় শুনচেন···?

ধড়-মড়িয়া জাগিয়া বিশ্বনাথ দেখে, সামনে দাঁড়াইয়া এক নারী···সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত···শুধু মুখখানির উপর কোনো আবরণ নাই! ঘুম-চোখে বিশ্বনাথ দেখিল, মুখখানি চমৎকার··মনে হইল, সেই গল্পটার মধ্য হইতে এই নারী আসিয়া শেষে এই ময়দানে দেখা দিল!···চল্লিশ বৎসর বয়সের আবরণে চাপা-পড়া বিশ বৎসরের মন মাথা তুলিয়া আত্মগতভাবে বলিয়া উঠিল—এত দিন পরে মনে পড়লো, পাষাণী!

কিন্তু পাষাণী কথা কহিল। নারী বলিল, বিপদে পড়েছি। বড্ড ভয় করছে···

রগড়াইয়া দুই চোখ মুছিয়া তন্দ্রার ঘোর ছাড়াইয়া বিশ্বনাথ চাহিয়া চমকিয়া উঠিল, না, এ তো স্বপ্ন নয়···এ যে সত্যই নারী···শরীরিণী মূর্ত্তি···এবং···এ যে তরুণীও!···ভয় হইল। চিরদিনের সংস্কারবশতঃ সে চারিধারে চাহিল, কোনো পুলিশপাহারাওয়ালা সঙ্গে নাই তো?···না···।

নারী কহিল—আমায় রক্ষা করুন···

এ যে সব মিলিয়া যাইতেছে। বাঃ! নির্জ্জন রাত্রি···আকাশে চাঁদ···একা সে···সামনে তরুণী···এবং সে রক্ষা করিতে বলে! চকিতের জন্ত বিশ্বনাথের সংশয় জাগিল। সে বিশ্বনাথই তো? সেই ছেঁড়া মাসিকপত্রে ছাপা গল্পের বেকার নায়ক মন্মথনাথ নয়···? তন্দ্রার পূর্ব্বক্ষণে বিশ্বনাথ মুখে পাণ চিবাইতেছিল—এই যে, সে পাণ এখনো মুখে আছে···তবে?

নারী কহিল—শুনতে পাচ্ছেন না, মশাই?

—এঁ্যা···বলিয়া বিশ্বনাথ তার পানে চাহিল।

নারী কহিল—আমি বিপদে পড়েছি।

বিপদ! বিশ্বনাথ চারিধারে চাহিল।—কি বিপদ? গোরায় তাড়া করে নাই তো?···জ্যোৎস্নার ফুটন্ত আলোর ধারায় চারিধারে যত দূর নজর চলে, বিশ্বনাথ চাহিয়া দেখে, ময়দানের কোথাও গোরার কোনো চিহ্নমাত্র নাই···তবে, ঐ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটা···ও-দুর্গও নিদ্রার নিবিড়তায় আচ্ছন্ন!···

দেখিয়া বিশ্বনাথের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। বিশ্বনাথ কহিল—কি বিপদ?

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে নারী কহিল—আমার স্বামী মাতাল, খিদিরপুরে থাকে—রোজ মারে, আজ মেরে তাড়িয়ে দেছে···আমি বাপের বাড়ী যাচ্ছিলুম···কিন্তু ভয় করছে···

বিশ্বনাথ তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিল—নারী তরুণী বটেই···মুখশ্রীটুকু মন্দ নয়। চোখের দৃষ্টিতে কাতরতা—অমনি কাতরতার পরিচয় সে সম্প্রতি গল্পগুলার মধ্যেও পাইয়াছে প্রচুর!

বিশ্বনাথ তরুণীর মুখের পানে চাহিয়াছিল—তরুণী তার পানে চাহিয়া···দু'জনে চোখোচোখি হইল!···তরুণীর চোখে অমনি একটা কটাক্ষ খেলিয়া গেল। যেন বিদ্যুতের একটি ঝিলিক! অপ্রতিভভাবে বিশ্বনাথ চোখ নামাইল।

বিশ্বনাথ কহিল—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?

নারী কহিল,—জানবাজারে।···তার পর মুখ নামাইয়া ধীরস্বরে কহিল,—আমায় আপনি বল্‌বেন না, এ-দাসীর নাম মালতী।

দাসী! বিশ্বনাথের বুকটা দুলিয়া উঠিল—মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ কহিল—বেশ, চলো,···আমার গাড়ী আছে···

মালতী একেবারে কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গিয়া বিশ্বনাথের দুই পায়ে হাত রাখিয়া কহিল—আমায় কিনে রাখলেন আপনি ···যদি কখনো সুদিন পাই···

বিশ্বনাথের ভারী লজ্জা হইল! মালতীকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি সে বলিল—থাক্, থাক্,—তুমি এসো মালতী···

মালতীকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথ পথে আসিল। কোচম্যান-সহিস কি ভাবিবে? বাবু ময়দান হইতে সহসা এ কি রত্ন কুড়াইয়া আনিলেন!···যদি ভাবে, আগে হইতেই যড় ছিল, তাই বাবু এত রাত্রে ময়দানে নামিয়াছিলেন?···বিশ্বনাথ মালতীর পানে চাহিল—মালতীর মুখের আবরণ তখন আরো মুক্ত হইয়াছে···মুখের উপর গাছের ফাঁক দিয়া ঝরা জ্যোৎস্নার একটি রেখা···অপরূপ! বিশ্বনাথ ভাবিল, কিছু ভাবে যদি তো ভাবুক—তা বলিয়া এক বিপন্না তরুণীকে সে রক্ষা করিবে না—বিশেষ তরুণী যখন এমন অসহায়!

বিশ্বনাথ কহিল—জানবাজারের কোথায় যেতে হবে?

মালতী কহিল—হগ্ সাহেবের বাজারের পুবদিকে গলি—গলির নাম ইহু মিস্ত্রীর লেন।

বিশ্বনাথ কহিল—গাড়ীতে ওঠো···

মালতী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; বিশ্বনাথ পরে উঠিল, উঠিয়া সহিসকে কহিল,—জানবাজার চলো—

বাতি জ্বালা হইল এবং গাড়ী চলিল।

গাড়ী চলিলে বিশ্বনাথ কহিল—তোমার মা-বাপকে কি বলবে···?

মালতী কহিল—তারা আমার স্বামীর কীর্ত্তির কথা জানে···বেশী কিছু বলতে হবে না। পথের বাতির আলো চলন্ত গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া মালতীকে ছুঁইয়া গেল। মালতীর চোখে তেমনি বিদ্যুৎ! বিশ্বনাথের মনে হইল, এ সে কোন্ মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিল! বুকের মধ্যে সদ্য-পড়া গল্প-উপন্যাসের বড় বড় কথাগুলা এমন ভিড় করিয়া কলরব তুলিয়া দিল যে, তার মধ্য হইতে বাছিয়া কোন্ কথাটা যে প্রয়োগ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিল। মালতীও চুপ—বিশ্বনাথ ভাবিল, মালতী কি ভাবিতেছে? বিশ্বনাথের কথাই?···মালতী যে বলিল—সে কেনা হইয়া রহিল—যদি সুদিন পায়···

কিসের সুদিন? যদি পায় তো কি—কি—কি···?

হঠাৎ মালতী বলিল—এই যে, ডানদিকে···ডানদিকে···

বিশ্বনাথ কহিল—ডাহিনা যাও।

একটা ট্যাক্সি হুশ করিয়া ডানদিকের গলির মধ্যে ঢুকিয়া গেল। মালতী দেখিল। তার সারা শরীর বহিয়া একটা পুলকের ঢেউ ছুটিল। বিশ্বনাথ সেটুকু লক্ষ্য করিল না।

সে কহিল—ব্যাটা এমন ক'রে ট্যাক্সি চালায়··· এখনি ধাক্কা দিয়েছিল আর কি!

বিশ্বনাথের গাড়ী ডানদিকের গলির মধ্যে ঢুকিল। খানিকটা যাইতেই মালতী কহিল—এবার থামাতে বলুন।

বিশ্বনাথ আদেশ দিল। গাড়ী থামিল। মালতী নামিল, বিশ্বনাথকে কহিল—তা হলে আসি! কিন্তু আপনি নামবেন না একবার? মার সঙ্গে···স্বরে কি মিনতি! বিশ্বনাথ মুগ্ধ হইল।

বিশ্বনাথও তাই ভাবিতেছিল, ইহারই মধ্যে বিদায়! একবার বাড়ীটা দেখিয়া আসিবে না? সত্যই তো মালতীর মা-বাপ ···একটা আত্মীয়তা··· এই কৃতজ্ঞতার আবেগের এমন অবসর···

বিশ্বনাথ কহিল—চলো, তোমায় পথে ছেড়ে দিয়েও যেতে পারি না তো—

একটা শাণ-বাঁধানো সরু গলি। মালতী সেই গলিতে ঢুকিল, ঢুকিয়া দ্রুত চলিল; বিশ্বনাথ তার পিছনে। দু'তিনটা মোড় বাঁকিয়া একটা ভাঙ্গা একতলা বাড়ী। মালতী গিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে লোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল—এক প্রৌঢ়া নারী। সে কহিল—কে! মালতী! তুই এত রাত্তিরে?

মালতী কহিল—আমায় তাড়িয়ে দেছে···এঁকে ধরে এলুম—ভাগ্যে এঁকে পেয়েছিলুম···

প্রৌঢ়া কহিল—এসো বাবা···একটু বসবে এসো।

বিশ্বনাথ একটু বিস্মিত হইল—এত বড় বিপদে দুটা কথায় সব বৃত্তান্ত সাফ হইয়া গেল! আশ্চর্য্য কি—মালতীই তো বলিয়াছিল—তার মা-বাপ স্বামীর কীর্ত্তির কথা জানে! এমন ধারা প্রায়ই তার ঘটে!

বিশ্বনাথও বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। দূরে কোন্ বাড়ীর ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রোজা-সংবাদ

ঘরের মধ্যে তক্তাপোষে বিশ্বনাথ বসিয়া···মেঝেয় বসিয়া মালতী। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, মালতীর মা গিয়াছে পাণ সাজিয়া আনিতে। বুড়ী পাণ না খাওয়াইয়া এত বড় উপকারীকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

বিশ্বনাথ ডাকিল—মালতী···

মালতী কহিল—আজ্ঞে··

বিশ্বনাথ কহিল—তুমি যদি বলো, তা হলে তোমার স্বামীকে আমি শায়েস্তা করে দিতে পারি।

মালতী কহিল—থাক্···আমি আর সেখানে যাবো না।

বিশ্বনাথের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে কহিল—সে কি হয়? হিঁদুর মেয়ে···স্বামী ছাড়া গতি নেই যে। তা ছাড়া তোমার এই বয়স···

আবেগের ভরে আরো কথা গলার কাছে ঠেলিয়া আসিয়াছিল, বিশেষ করিয়া, মালতীর ঐ রূপ! কিন্তু মালতী বাধা দিল। মালতী একেবারে বিশ্বনাথের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কহিল,—না, না,···তার চেয়ে এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরবো···তাতেও আরাম।

বিশ্বনাথ আবেশে চক্ষু মুদিল—পায়ের উপর মালতীর মুখখানি···তা ছাড়া মালতী কি এ-সব কথা যে কয়···

সহসা মুগ্ধ মুদিত দুই চোখ খুলিয়া গেল. ঝড়ের মত

এক প্রবল গর্জ্জনের রোলে! চোখ খুলিয়া বিশ্বনাথ চাহিয়া দেখে, সামনেই গুণ্ডার মত একটা লোক—হাতে তার মোটা লাঠি। লোকটা সগর্জ্জনে কহিল—বটে! এই জন্যে ছুটে আসা!······খাসা বাবু পেয়েছো! এঁ্যা! আজ এই এক লাঠির ঘায়ে দু'জনেরই মাথা ফাটাবো।

রোমান্স, তরুণী চকিতে কোথায় সব সরিয়া গেল! মালতী এ হুঙ্কারে সভয়ে সরিয়া ছিটকাইয়া পড়িল। লোকটা আগাইয়া আসিয়া কহিল—তুই কে রে ছুঁচো? পাঞ্জাবী-জামা গায়ে নবাবী দেখাতে এসেছিস! আমার ইস্তিরি···তার সঙ্গে তোর এত কিসের ভাব? পায়ে মাথা রেখে একেবারে বিভোর!······

বিশ্বনাথ তার আকৃতি আর ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল! বাপ রে, যেন শয়তানের মূর্ত্তি! কিন্তু ইহার মধ্যেই এ খিদিরপুর হইতে আসিয়া এখানে উদয় হইল! আশ্চর্য্য! তবে কি সেই ট্যাক্সিটা? এইখানেই ট্যাক্সিটা আসিতে-ছিল বটে!······তবু সে ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

লোকটা অতি বর্ব্বর। কোনো কথা কাণে তুলিতে চায় না! সে কহিল—যদি পুলিশ এনে ধরিয়ে দি?

সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে বেইজ্জতীর যে আর সীমা থাকিবে না। কে তখন বিশ্বাস করিবে যে, কৃপাপরবশ হইয়া এক বিপন্ন নারীকে সে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল মাত্র! খবরের কাগজে এই ব্যাপার কি কুৎসিত বীভৎস আকার ধরিয়া যে লোকের চোখের সামনে উদয় হইবে!·····

বিশ্বনাথ কাঁদিয়া লোকটার পায়ে পড়িল, কহিল,—দোহাই বাবা, কোনো অসদভিপ্রায়ে আসিনি··তুমি মালতীকেই জিজ্ঞাসা করো

লোকটা হাসিয়া কহিল—মালতী তো তোমার দিকে হবেই যাদু! বলে, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল!

বিশ্বনাথ কহিল—না, না—তা নয়···তুমি যা বলছো······

লোকটা মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইল, তার পর কহিল—এক কাজ করলে মানে-মানে ছেড়ে দেবো।

বিশ্বনাথ কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল—কি কাজ, বলো?

লোকটা কহিল—দেড় হাজার টাকা যদি এখন দিতে পারো।

হতাশভাবে বিশ্বনাথ কহিল—কিন্তু অত টাকা তো আমার কাছে নেই।

লোকটা কহিল—তা হলে পুলিশের হাতে যাও।

বিশ্বনাথ কহিল—না বাবা, দোহাই তোমার······

লোকটা অটল। তার মুখে এক কথা—দেড় হাজার টাকা দিতে পারো তো খালাশ দিই!

বিশ্বনাথ কহিল—কিন্তু অত টাকা চেক ভাঙ্গানো না হলে দেবার তো শক্তি নেই!

সে কহিল—বেশ, তবে চেক দাও দেড় হাজার টাকার।

বিশ্বনাথ কহিল—চেক-বই তো কাছে নেই। আমার সঙ্গে চলো।

লোকটা হাসিয়া কহিল—হঁ্যা, কি কথাটাই বললেন! আমি সঙ্গে যাই, তার পর ফাঁকি দাও······ফাঁকি কি—আমায় উল্টে পুলিশের হাতে দেবে তখন।

বিশ্বনাথ কহিল—তা হলে উপায়? বিশ্বনাথের চোখের সামনে অকূল সমুদ্র ফুঁশিয়া উঠিল।

লোকটা কহিল—চেক-বই আনাও। গাড়ী তো আছে। চিঠি লিখে দাও। আমার লোক ঐ গাড়ীতে গিয়ে চেক-বই আনবে!—এই অবধি বলিয়া লোকটা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তবে চিঠি যা লিখবে, তা আমার কথামত।

দু'হাজার কি! বিশ হাজার যদি এ চাহিয়া বসে, তাহা হইলে মুক্তির জন্য তা'ও বুঝি বিশ্বনাথ দিতে রাজী হয়! মানে-মানে বিদায় লইতে পারিলে তার যেন পুনর্জ্জন্ম হয়! বিশ্বনাথ কহিল,—বেশ—কি লিখবো, বলো।

লোকটা ডাকিল—মালতী······

মালতী আসিয়া দাঁড়াইল। তার মুখে-চোখে ভয়ের বা কাতরতার চিহ্নমাত্র নাই! বিশ্বনাথ তাহা লক্ষ্য করিল। অথচ একটু আগেই······আশ্চর্য্য! ইহারি কথায়······সেও তবে ছল! ব্যাধের ফাঁদ!

লোকটা কহিল—কাগজ আর কালি-কলম নিয়ে আয় শীগ্‌গির······আজকের শিকার বহুৎ আচ্ছা হ্যায়!

মালতী তখনি কাগজ, কালি, কলম লইয়া আসিল। লোকটা কহিল—নাও, লেখো······চেক-বই পাঠাতে···কি কাজ করা হয়?

বিশ্বনাথ কহিল,—কারবার আছে।

লোকটা কহিল,—বটে, বটে, বেশ! তা হলে এই কথা লেখো—একটা জরুরি কন্‌ট্রাক্ট করার জন্য এখনি চেক-বই দরকার, না হলে সে কন্‌ট্রাক্ট হাত ফস্কে যাবে।······

তার পর আরো লেখো যে, কাজটা চুকিয়ে কাল বেলা একটা নাগাদ বাড়ী ফিরবো—ভাবনার কারণ নেই।

বিশ্বনাথ অবাক হইয়া লোকটার পানে চাহিল।

লোকটা কহিল—চেক সই করে আজ বাড়ী যাও, তার পর কাল ব্যাঙ্কে টাকা দিতে বারণ করে লিখে পাঠাও—ব্যাস······আমি ফাঁকিতে পড়ি—তা হবে না। আজ চেক দেবে, নিজের নামে Bearer-চেক—কাল সে চেক আমি ভাঙ্গিয়ে আনি, তার পর তুমি ছাড়া পাবে······টাকা যদি ঠিকঠাক পাই, তা হলেই খালাশ···না হলে থানা-পুলিশ তো আর কাল পালাচ্ছে না··· ··

কত বড় শয়তান! ওঃ, কি ফন্দীবাজ! বিশ্বনাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু উপায় যখন নাই······

কাজেই লোকটার কথা-মত কাজ করিতে হইল।······ নিজের নামে দেড় হাজার Bearer-চেক লিখিয়া পিছনে endorse অবধি করিয়া দিতে হইল।

লোকটা চেক লইয়া হাসিয়া কহিল—এখন ঘুমোও নিশ্চিন্তি হয়ে ······বলো তো, মালতী এসে নয় মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিক্······এঁ্যা······হাঃ হাঃ হাঃ!

লোকটা অট্টহাস্য করিল। সে হাসি বাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর!

বিশ্বনাথ কহিল—না থাক্, মাথায় যথেষ্ট হাত বুলিয়েছ··· আর মালতীকে পাঠিয়ে কাজ নেই!

লোকটা কহিল—তোমার গাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দিছি······ ভাবনা নেই, কাল ট্যাক্সি ডেকে দেবো···আর একটা কথা···

বিশ্বনাথ তার পানে চাহিল। সে কহিল—একটু ছোট চিঠি চাই······এই বলে যে,—মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক রইলো না···

বিশ্বনাথের গা ছমছম করিয়া উঠিল। এ শয়তানের আরো কি ফন্দী আছে! সে কাতরভাবে লোকটার পানে চাহিল।

লোকটা কহিল—মানে এর পর বেরিয়ে গিয়ে যদি পুলিশে খবর দাও যে, দেড় হাজার টাকা চাপ দিয়ে আদায় করেছি······অবশ্য তাতে কিছুই এসে যাবে না! তবু······

বিশ্বনাথ কহিল—তেমন লোক আমি নই যে, এখান থেকে একবার বেরুতে পেলে আবার এ-ধারে পা দেবো!

লোকটা কহিল—ভালো, ভালো। তা হলে ঘুমোও··· কাল সকালে চা খাবে, আর দুটি ভাত আর মাছের ঝোল··· গরীবের খুদ কুঁড়ো······তা মালতী রাঁধে ভালো। ·····

বিশ্বনাথ কোনো কথা কহিল না। তার মনের মধ্যে যা হইতেছিল, তা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে যে, টুঁ শব্দটিও করা যায় না!

* * * * *

বাড়ী ফিরিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া বিশ্বনাথ দেখে, আড়াইটা বাজে।

কুঞ্জকামিনী আসিয়া কহিল—হাঁ গা, কি এমন কাজ যে, রাত্রে বাড়ী ফিরতে পারলে না! ভাবনায় মরি সারারাত।

বিশ্বনাথ কাতর চোখে কুঞ্জকামিনীর পানে চাহিল,—অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় কুঞ্জকামিনীর চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে!

উচ্ছ্বসিত আবেগে এই বয়সেই বিশ্বনাথ কুঞ্জকামিনীকে বুকের কাছে টানিয়া তার বুকে মাথা রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইল।

কুঞ্জ কহিল—কি গা······অমন করছো কেন?

বিশ্বনাথ কহিল—মস্ত বড় কন্ট্রাক্ট, কুঞ্জ······সে কথা পরে বলবো। আগে এক কাজ করো দিকিনি, ঐ যে ছাই-পাঁশ গল্প আর উপন্যাস জড়ো করেছো ঘরে, সেগুলো এখুনি এনে নিজে তাতে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরাও—ধরাও আগুন···

কুঞ্জ কহিল—কি পাগলের মত বকছো!

বিশ্বনাথ কহিল—পাগল নই, কুঞ্জ······এই দ্যাখো······ বলিয়া বিশ্বনাথ চেক-বইখানি খুলিয়া দেড় হাজার টাকার চেকের Counterfoilটা দেখাইয়া কহিল—কি কন্ট্রাক্ট, দেখবে? কিসের জন্যে রাত্রে বাড়ী ফিরতে পারিনি······

কুঞ্জ দেখিল, Counterfoilএ বড় বড় বাংলা হরফে লেখা আছে—রোমান্সের দাম।

সে স্বামীর পানে চাহিল।

বিশ্বনাথ কহিল—বিষ ধরেছিল, রোজার লাঠিতে নেমে গেছে ··এখন এই অবধি—তার পর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সব কথা তোমায় বলবো—সব কথা—একটুও গোপন না রেখে···

কুঞ্জ অবাক হইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল, তার পর তাড়াতাড়ি ডাকিল—ওরে ভিকনা, বাবুর তেলের বাটী এই ঘরে দিয়ে যা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অভিনব চুরুটিকা-আধার

সন্তরণকারীদিগের সুবিধার জন্ত তাহাদের কোমরবন্ধে চুরুটিকার আধার এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যে, তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া আধারস্থ চুরুটিকা প্রভৃতির কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সন্তরণকারীদিগের মধ্যে যাহাদের ধূম-তৃষ্ণা প্রবল,

জলনিবারক চুরুটিকার আধার

তাহারা মধ্যে মধ্যে আধার হইতে চুরুটিকা ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া মন ও শরীরকে তাজা করিয়া লয়। এই আধারের নির্ম্মাণ-কৌশল এমনই বিচিত্র যে, সন্তরণকালে জল প্রবেশ করিয়া আধারস্থিত কোন জিনিবই নষ্ট করিতে পারে না। আধারটি সহজেই উন্মুক্ত করা যায়।

সিংহের চিকিৎসা

সিংহ হিংস্র জন্তু। মানুষ তাহাকে পোষ মানাইয়া নানারূপে কার্য্যে ব্যবহার করে। পীড়িত হইয়া পড়িলে ইহাদের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিতেছে, হিংস্র পশুরও চিকিৎসা তাহার দ্বারা হইবে না কেন? অধুনা পীড়িত সিংহকে আহার্য্যপ্রদান-কালে তন্মধ্যে রোগপ্রতিষেধক ঔষধের বটিকা রাখিয়া শুশ্রূষাকারী পুরুষ অথবা নারী উহা তাহাকে খাইতে দেয়। পীড়িত

পীড়িত সিংহ-শাবককে ঔষধ সেবন করান হইতেছে

সিংহ কোনরূপ আপত্তি করে না। পীড়ার সময় হিংস্র পশুও শুশ্রূষার মর্য্যাদা বুঝে।

মোটরবাহিত শিশুর গাড়ী

ইংলণ্ডে মোটর-চালিত একপ্রকার গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার গতিবেগ ঘণ্টায় দেড় মাইল মাত্র। এই গাড়ীতে শিশুকে
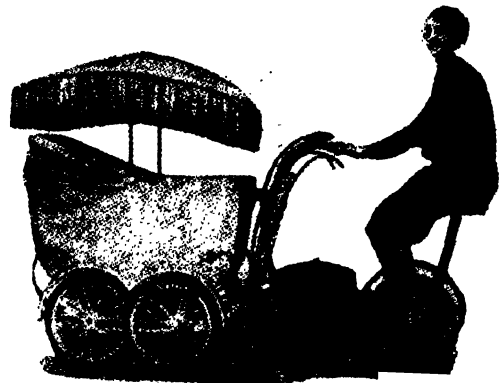
মোটর-চালিত শিশুর গাড়ী

বসাইয়া বা শায়িত করিয়া হাওয়া খাওয়ান হয়। যে পরিচারিকা সঙ্গে থাকে, তাহাকে হাঁটিতে হয় না। তাহার জন্য স্বতন্ত্র বসিবার আসন আছে। দুইটি শিশু এইরূপ গাড়ীতে অনায়াসে বসিতে পারে।

ব্যাঘ্রমুখ মোটরগাড়ী

বার্লিন নগরে একখানি মোটরগাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখভাগ ব্যাঘ্রের মুখবিশিষ্ট। ভারতবর্ষের অরণ্যে শিকার-

ব্যাঘ্রমুখ মোটরগাড়ী
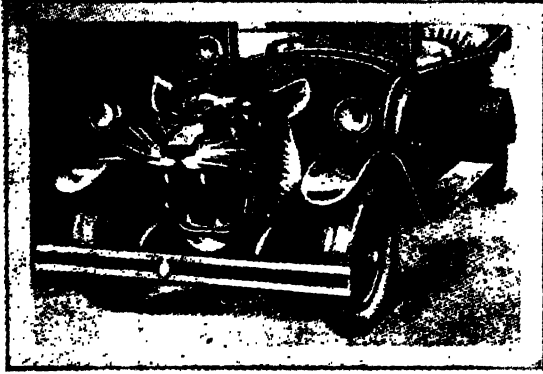
ব্যপদেশে এই মোটরখানি ব্যবহৃত হইবার কথা। ব্যাঘ্রের চক্ষু-যুগল হইতে সবুজ আলো নির্গত হয়; দন্তগুলি ইস্পাত-নির্ম্মিত। অরণ্যের মধ্যে এই মোটরবাহিত গাড়ী ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযুক্ত।

যুদ্ধব্যাপারে দ্বিচক্রযান

মার্কিণ সেনাদলে দ্বিচক্রযানের কোন স্থান নাই। কিন্তু বর্ত্তমান রুস সেনাদলে দ্বিচক্রযানের বিশেষ ব্যবহার হইতেছে।

বিষাক্ত বাষ্পযুদ্ধে দ্বিচক্রযানারোহী সেনাদল

বিপক্ষদল বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিলে কিরূপে তাহার প্রতি-বিধান করিতে পারা যায়, তাহা পরীক্ষার্থ রুসীয় বাহিনীর মধ্যে এক দল সেনা বিষাক্ত বাষ্পপ্রতিরোধকারী মুখোসে মুখ ঢাকিয়া দ্বিচক্রযানে চড়িয়া শিক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি রুসিয়ার সামরিক প্রদর্শনীক্ষেত্রে এই দ্বিচক্রযানবাহিনী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। রুসিয়াতে বর্ত্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রে রাসায়নিক ব্যাপারের সংস্রব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও শিক্ষা হইতেছে।

বাগানে জলসেচনের বিচিত্র যন্ত্র

বাগানে 'হোস্ পাইপ' বা নলের সাহায্যে যেখানে ইচ্ছা জল-সেচন করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি বাজারে একপ্রকার

জল-সেচনের নূতন যন্ত্র

'হোলডার' বা ধারক যন্ত্র বাহির হইয়াছে। উক্ত নলে তাহা কৌশলে সন্নিবিষ্ট হইলে যে কোনও দিকে জলধারা অনায়াসে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, অথচ নলের মুখের কাছে আসিলে বস্ত্র আর্দ্র হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি কোনও স্থানে বহুক্ষণ ধরিয়া জলধারা নিক্ষেপের প্রয়োজন ঘটে, তাহা হইলে ধারকযন্ত্রটি সেইখানে রাখিলেই দৃঢ়ভাবে নলটিকে সমান অবস্থায় ধারণ করিয়া রাখিবে।

বিমানপথে বিজ্ঞাপন-প্রচার যন্ত্র

রাত্রিকালে বিমানপথে চিত্রের দ্বারা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য একপ্রকার নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা একসঙ্গে

ছয়খানি বিজ্ঞাপনচিত্র আকাশপটে প্রতিবিম্বিত হয়। ৫ শত গজ দূরে ১ শত ৭০ গজ বিস্তৃত প্রত্যেক ছবি ৪৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তাহার পর বর্ত্তুলাকার বিজ্ঞাপনের আধারটি
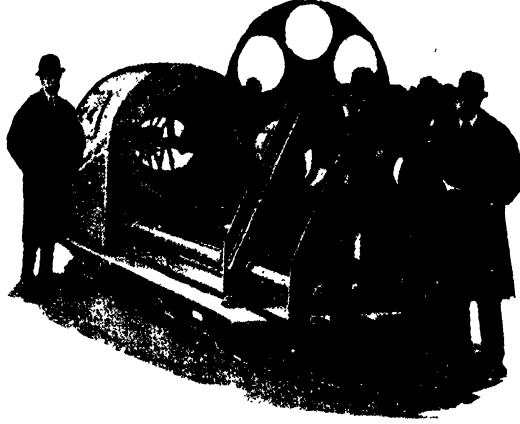
বিমানপথে বিজ্ঞাপনের চিত্র

আপনা হইতে সরিয়া যায় এবং পুনরায় অন্য চিত্র বিমান-পথে ভাসিয়া উঠে। যতক্ষণ যন্ত্রটি চলিতে থাকে, এইভাবে এক চিত্রের পর অপর চিত্র আকাশপটে দেখা যায়।

মোটর-গাড়ী সাহায্যে অষ্ট্রীচ পাখী ধরা

আরব দেশের কোনও মরুভূমির মধ্যে এক দল শিকারী ৩টি অষ্ট্রীচ পাখী জীয়ন্ত গ্রেপ্তার করিয়াছে। মরুভূমির মধ্যে পাখীরা বিচরণ করিতেছিল। মোটরবিহারী শিকারীরা উহা-দিগকে তাড়া করে। চারিদিকে গুলী করিয়া মারে। প্রথমতঃ পাখীগুলি দ্রুতধাবনে মোটরকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন শিকারীদিগের এক জন মোটর হইতে হাত বাড়াইয়া পাখীটার গলা ধৃত করে। ইহার সঙ্গীটিও অনুরূপ ভাবে ধরা পড়িয়াছিল। সারা মরুভূমির মধ্যে দৌড়াইয়া পাখী দুইটি এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর আত্মরক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করিতে পারে নাই।
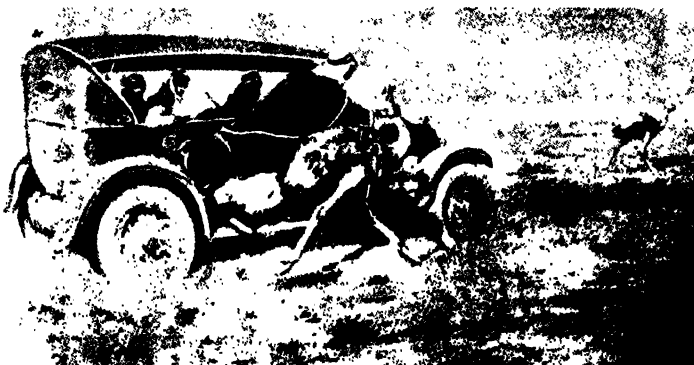
মোটর-গাড়ীর সাহায্যে অষ্ট্রীচ পাখী শিকার

মোটর-বাহিত তুষারভেদী লাঙ্গল

পঞ্চাশ অশ্বের গতিবেগযুক্ত দুইটি মোটরবাহিত তুষারভেদকারী লাঙ্গল সুইজারলাণ্ডের পার্ব্বত্যপথ পরিষ্কারের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। একটা এঞ্জিনের দ্বারা পথ চলার কার্য্য হয়, অপরটির দ্বারা

মোটরবাহিত তুষারভেদকারী লাঙ্গল

তুষাররাশি পথের উভয় পার্শ্বে সরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। বিগত শীতকালে এইরূপ একখানি লাঙ্গলের সাহায্যে ৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ ফুট গভীর তুষারাচ্ছন্ন ৯ মাইল পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল।

বিচিত্র ঘটিকাযন্ত্র

নানাবিধ জন্তুর আকার-বিশিষ্ট ঘটিকাযন্ত্র অধুনা প্রতীচ্যদেশের বাজারে

বিচিত্র ঘটিকাযন্ত্র

দেখা দিয়াছে। এখানে একটি পেচকের আকারবিশিষ্ট ঘটিকাযন্ত্রের চিত্র-প্রদত্ত হইল। দুইটি অক্ষি-গোলকের তারকার দ্বারা ঘণ্টা ও মিনিট নির্ণীত হয়। তারকাযুগল আবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা দুইটি নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা ও মিনিট বিজ্ঞাপিত করে। অবশ্য অক্ষিগোলকের চতুষ্পার্শ্বে ঘণ্টা ও মিনিট অঙ্কিত থাকে। অক্ষিতারকার বিভিন্ন অবস্থায় এমন চিত্র ফুটিয়া উঠে যে, দর্শক তাহাতে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করেন।

কুকুরের চশমা

পোষা কুকুরের যদি দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিকে প্রবল করিবার জন্য একপ্রকার

কুকুরের চশমা

চশমা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই চশমা কুকুরের নাসিকার উপর এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট করা যায় যে, কুকুর উহা ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে সহজ অবস্থার ন্যায় মনিবের সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে। চশমা-ধারণের ফলে তাহাকে দেখিতে সুন্দর মনে হয়।

হরিণশৃঙ্গ-নির্ম্মিত আসন

নদীয়া কৃষ্ণনগরের কারুশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় হরিণের শৃঙ্গ লইয়া একটি সুদৃশ্য আসন রচনা করিয়াছেন। এই আসন যেমনই বিচিত্র, তেমনই সুদর্শন। শিল্পী বহু পরিশ্রম সহকারে আসনে শিল্প-সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর কারুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এইরূপ নানা বিচিত্র ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য নির্ম্মিত হইলে ব্যবসায়ের পথ আরও

হরিণশৃঙ্গ-নির্ম্মিত আসন

প্রশস্ত হইবে এবং সে অঞ্চলের অনেকেই বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান করিতে পারিবেন।

৺কেদার-বদরী

জয় কেদারনাথ-স্বামীকি জয়

জয় বদরীবিশাল-লালকি জয়

১। অথ বস্তুনির্দ্দেশঃ

নমক্রিয়ায়—জয়শব্দ উদীরণে আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে বস্তুনির্দ্দেশ করি।

'শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্।' কন্থার কথা জানি না, কন্থার খবর রাখি না, কেন-না, কন্থা-কৌপীনধারী বৈষ্ণব-বাবাজী কখনও নহি, আর এখন কন্থাশায়ী শিশুও নহি। 'শনৈঃ কন্থা'—কাঁথা-সেলাইয়ের এই 'মাটো' চা'ল, অফুরন্ত ধৈর্য্য, প্রযত্ন ও অধ্যবসায়ের রহস্য বঙ্গ-সীমন্তিনী-গণই জানেন। (বোধ হয়, 'Penelope's web' এই নিতান্ত শাদামাটা গার্হস্থ্য-ব্যাপারের গ্রীক্-পুরাণোক্ত জম্‌কালো সংস্করণ)। তাঁহাদিগের অবসর-বিনোদন—পুরাতন জীর্ণ ছিন্ন কাপড়ে তীক্ষ্ণ সূচি বিঁধিয়া নানান্-বর্ণী সুতার সাহায্যে বিচিত্র ফুল-লতা-পাতা কাটা; আর আমাদের অবসর-বিনোদন—পুরাতন বা নূতন, আস্ত বা ছেঁড়া, দু-পিঠ শাদা বা এক পিঠ লেখা (যখন যেমন যোটে) কাগজে তীক্ষ্ণ বা ভোঁতা লেখনী চালাইয়া ঘনকৃষ্ণ বা ফিকে মসীর সাহায্যে বিচিত্র অক্ষর-সন্নিবেশে ভাবের ও ভাষার ফুল ফুটান (কথাটা একটু কবিত্বময় ও অনেকখানি অহমিকাপূর্ণ হইয়া গেল)। বিলাতী কবি বলিয়াছেন—'Man for the sword and for the needle she'; ইংরেজ বীরের জাতি, সুতরাং তাঁহাদিগের বেলায় এ কথা খাটে; কিন্তু আমরা কলমপেশা বাঙ্গালী জাতি, Knights of the sword নহি, Knights of the pen; অসিজীবী নহি, মসীজীবী; অতএব আমাদের বেলায় পাঠান্তর 'Man for the pen and for the needle she'; যাক্, কন্থা চাপা দিয়া 'পন্থাঃ' ও 'পর্ব্বতলঙ্ঘনম্'এর কথাই বলি। 'শনৈঃ পন্থাঃ' ও 'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্' ঠিক এক লম্ফে সমুদ্র-লঙ্ঘনের মত ত্রেতাযুগের মহাবীরের কাহিনী নহে, ৺কেদার-বদরীর সঙ্কীর্ণ গিরিপথে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চরণ—কলির দুর্ব্বল মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। সেই কথাই আজ বলিতে বসিয়াছি।

২। অথ সঙ্কল্পঃ

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এই পাপমনে ৺কেদার-বদরীনারায়ণ-দর্শনের বাসনার উদয় হয়।* কি সূত্রে এই সদিচ্ছা মনের ভিতরে দানা বাঁধে, সে গুহ্যতত্ত্ব অবগত নহি। * আমার সুপ্তচৈতন্যে সহপাঠী পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু ও সাহিত্যসাধনার সহযোগী নবলব্ধ বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই বন্ধুযুগলের নামমাহাত্ম্যের কোনও রূপ ক্রিয়ার ফলে মানসক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়াছিল কি না, বৈজ্ঞানিক Freudই সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন। সম্ভবতঃ উপর্য্যুপরি শোকতাপ পাইয়া মনে ক্রমশই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঝোঁক প্রবল হইয়াছিল, religious complex মনের মধ্যে জট পাকাইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে গত বর্ষে গ্রীষ্মাবকাশে, তথা পূজাবকাশে, কাশী, গয়া, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, তথা প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, 'পুষ্কর তুষ্কর' প্রভৃতি তীর্থপরিক্রমা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। (যদিও ইহার কোনও কোনও তীর্থদর্শন-সৌভাগ্য পূর্ব্বেও হইয়াছিল)। যাহা হউক, রেলওয়ের কল্যাণে এই সব তীর্থ সুগম। কিন্তু 'কঠিন কেদার' ও তত্তুল্য দুর্গম বদরিকাশ্রমে যাত্রার কথা কিছু দিন পূর্ব্বে আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অথচ কোথা হইতে কি হইল, কিছুই জানি না। 'যৎকৃপা পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্', ইহা তাঁহারই এক নবলীলা বৈ আর কি বলিব? গৃহিণীর অজ্ঞাতসারে, এক প্রকার নিজেরও মনের অগোচরে, সেভিংস্-ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে আরম্ভ করিলাম, দীর্ঘ এক বৎসরে হাজারখানেক টাকা জমাইতে সমর্থ হইলাম। তাহার পর গত বর্ষে গ্রীষ্মাবকাশে যখন একটি কৃতী ভাগিনেয়কে সহায় করিয়া সস্ত্রীক হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলার ওপারে পর্য্যন্ত অভিযান করিলাম, তখন কি জানি কেমন করিয়া আমাদের উভয়ের মুখ দিয়াই একসঙ্গে বাহির হইয়া

* পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রোগমুক্তির চেষ্টায় পাটনায় গিয়া Behar School of Engineering এর অন্যতম শিক্ষক, ছাত্রজীবনের পরিচিত শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাসের মুখে তাঁহার কেদার-বদরীদর্শনের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। এত দিন পরে সেই পুরাতন প্রসঙ্গের স্মৃতি উজ্জীবিত হইয়া মনের উপর প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

পড়িল, "এ বৎসর (পত্নীর) শরীরে কুলাইবে না বলিয়া হইল না, আগামী বর্ষে উভয়ে ৺কেদারবদরী যাত্রা করিব।" * (ভাগিনেয়টি এ শুভসঙ্কল্পে আমাদের সহায় হইবেন, সে ভরসাও দিলেন)। কে যে আমাদের মুখ দিয়া এই বাক্য উচ্চারণ করিল, তাহা জানি না, বুঝি না। 'কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন?' 'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।' 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।' এমন কি, এই যে রোগভোগ, শোকতাপ, এ সব 'দাগা' দিয়া তিনিই আমাদিগের 'খাদ' পোড়াইয়া 'খাঁটি' করিয়া লইতেছেন।

"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে কেবল তব দয়া বুঝেছি মা দুঃখহরা॥
সন্তানমঙ্গল-তরে, জননী তাড়না করে,
তাই ভাবি মা বহি শিরে, দুঃখের পসরা॥"

গত বর্ষের শুভসঙ্কল্প বর্ত্তমান বর্ষে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নূতন পঞ্জিকা বাহির হইলে 'অকাল' বলিয়া কোনও কোনও আত্মীয় এ বৎসর ক্ষান্ত থাকিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমরা নদীয়া জিলার লোক, 'ন্যায়ের ফাঁকি' আমাদের মজ্জাগত। সুতরাং এই বলিয়া আপত্তি খণ্ডন করিলাম যে, 'সঙ্কল্প যখন গত বর্ষে লছমনঝোলা পার হইয়া ৺কেদার-বদরীর পথে দাঁড়াইয়া করিয়াছি, তখন কাল শুদ্ধ ছিল ; অতএব বর্ত্তমান বর্ষে সেই সঙ্কল্পসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কালাশুদ্ধির দোষ স্পর্শ করে না—এ যেন মিহির ও খনার মাহেন্দ্রলগ্নে পা বাড়াইয়া রাখা।' আর এক কথা। 'অকালে' বিবাহাদি সংস্কার নিষিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু দেবদর্শনে আবার কালাকাল কি? যাঁহার স্মরণে-মননে দেহ ও আত্মার শুদ্ধি হয়, তাঁহাকে দর্শন করিলে কি 'অকাল' থাকিতে পারে? তাঁহার দর্শন-মাত্রেই ত সুদিনের উদয়, সুকালের উদ্ভব ; যে দিন তাঁহার দর্শন না পাই, 'তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে।" (শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক দেবীর অকালবোধন ও স্মর্ত্তব্য)।

৩। অথ লোকসংগ্রহঃ

প্রথম অবস্থায় মনের নিভৃত কোণে এই সঙ্কল্প থাকিলেও ক্রমে ইহা সাত কাণে প্রবেশ করিল, তাহার ফলে 'ভাবগ্রাহী' দৈনিক 'বসুমতী'-সম্পাদক মহাশয় গত পূজাবকাশের প্রাক্-কালে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ কথাটা দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিয়া পরোক্ষে আমার পরমোপকারসাধন করিয়াছিলেন। 'পরোপকারায় সতাং জীবিতম্।' কেন-না, দশের কাছে অপ্রস্তুত হইবার ভয়ে এই কঠোর সঙ্কল্প আর কোনও প্রকারে শিথিল করিতে পারিলাম না। জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব (শত্রুমিত্র) পাড়াপড়্শী সকলেই কথাটা জানিলেন। অনেকে উৎসাহ ত দিলেনই, পরন্তু সঙ্গী হইবেন বলিয়া আশ্বাসও দিলেন। আমাদের সমাজে নারীজাতিই অধিক ধর্ম্মপ্রাণ, সুতরাং কয়েক জন কুটুম্বিনীও গৃহিণীর দোসর হইতে আগুয়ান হইলেন। The plot thickens—ব্যাপার ক্রমেই ঘনীভূত হইল। বুঝিলাম, এ ভাবে কথাটা নদী-তরঙ্গে তৈলবিন্দুর ন্যায় ছড়াইয়া পড়িলে শ্রাদ্ধ যে কতদূর গড়াইবে, তাহার ঠিক নাই। হয় ত একটা বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া গৌরীশঙ্কর-অভিযান (Everest Expedition) প্রভৃতি অভিযানের নায়কদিগের যশঃ ম্লান করিয়া দিব! কিন্তু সুখের বিষয়, বাঙ্গালী-চরিত্রের একটা বিশেষ সদ্‌গুণ আছে। স্বদেশ ও স্বজাতিভক্ত কবি সে কথাটা স্পষ্টবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন, 'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়' ইত্যাদি, আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। কে আবার স্বজাতিদ্রোহী বলিয়া ধিক্কার দিবেন—এই স্বরাজের স্বপ্নের দিনে (দিবাস্বপ্ন)। বলা বাহুল্য, পূজাবকাশের পূর্ব্বে যদিও বহু লোকের নিকট (assurance) প্রতিশ্রুতি পাইলাম যে, এই অক্ষমকে 'সেধে' হইয়া (স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি) তাঁহাদিগকে দুর্গম তীর্থে লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহারা একে একে নিরস্ত হইলেন। * ২।১ জনকে অবাঞ্ছনীয়

---

* এখান হইতে ফিরিয়া লক্ষ্ণৌএ এক আত্মীয়ের বাটীতে কয়েক দিন ছিলাম। সেই সময়ে একটি দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা তাঁহার একটি জ্ঞাতি-সঙ্গে কেদার-বদরীদর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌএ উক্ত আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে যেন আমাদের ভবিষ্যতে সঙ্কল্প-সিদ্ধির পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলাম। অন্ততঃ মনে এইরূপ সাহস পাইয়াছিলাম।

* কাশীবাসী সুচিকিৎসক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, একবার মুসৌরীতে তিনি কয়েক জন উৎসাহী যুবকের নিকট assurance পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ৺কেদার-বদরী-যাত্রায় ডাক্তার বাবুর সঙ্গী হইবেন। কয়েক মাস পরে তিনি যখন তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিলেন, তাঁহারা যাইবেন কি না, তাহা বুঝিয়া তিনি ছুটীর দরখাস্ত করিবেন, তখন কেহ কেহ সাড়াই দিলেন না, আর কেহ কেহ ভদ্রতা করিয়া খোলসা জবাব দিলেন যে, যাইতে পারিবেন না!

(undesirable)-বোধে আমার পক্ষ হইতেই নিরস্ত করিতে হইয়াছিল। এক জন কেবল শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিলেন, তাঁহার কথা যথাস্থানে বলিব।

আমাদের বয়সে লোক গৃহকোণ ছাড়িয়া কোথাও বাহির হইতে চাহে না, এমন কি, মাটী আঁকড়াইয়া থাকে, জননী ধরিত্রী হইতেও নড়িতে চাহে না। আমার কিন্তু বাল্যকাল হইতে বহু গ্রাম-নগর ঘুরিয়া কেমন একটা 'ভবঘুরে' স্বভাব হইয়া গিয়াছে (অথবা রোগশোকের তাড়নায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে), কর্ম্মজীবনে একটু হাঁফ ফেলিবার সময় পাইলেই (অর্থাৎ ছুটী হইলেই) চুপ করিয়া আরামে শুইয়া থাকিতে এক মিনিটও ইচ্ছা করে না। কেবল মনে হয়, এদেশ ওদেশ (গৃহিণীর ভাষায় 'অলিঙ্গি-কলিঙ্গি') ঘুরিয়া বেড়াই। গৃহিণীরও আজকাল এই স্বভাব হইয়াছে। তবে এখন বয়সের দরুণ এইটুকু জড়তা আসিয়াছে যে, কোনও উদ্যমশীল লোক না চালাইয়া লইলে অচল হইয়া পড়ি; পথের নানা ঝঞ্ঝাট পোহাইবার শক্তি নাই। সুতরাং গত গ্রীষ্মাবকাশে একটি ভাগিনেয় ও পূজাবকাশে আর একটি ভাগিনেয়ের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পুত্রটি আইনের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া কোনও বারই সঙ্গে যাইতে পারেন নাই।

এ যাত্রায় ভাগিনেয়দ্বয় * ত তীর্থ-পথের সহায়ক হইতে প্রস্তুত রহিলেন। পুত্রটিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের সঙ্গ লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। দেবদর্শনে পুণ্যলাভ-স্পৃহা যতটা না হউক (এ বয়সে ধর্ম্মপিপাসা প্রবল হইবার কথা নহে), মাতাপিতার সেবা করিয়া, মাতাপিতার আকাঙ্ক্ষা-পরিপূরণে সহায়তা করিয়া পুণ্যলাভস্পৃহায় বটে। তাহার উপর নূতন দেশ ও প্রকৃতিবৈচিত্র্য-দর্শনে আনন্দলাভের আশায়ও বটে। সুধীসূক্ত আছে—"প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা, দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনম্। তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি।" পুত্রটি প্রথমবয়সে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন, সরল পথে এম্ এ ও আইনের পেঁচোয়া পথে (!) শেষ বি এল্ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, এইবার ধনার্জ্জনের পালা। (উকীল হইলেই স্যর রাসবিহারী ঘোষ হইবেন, ইহাতে কোন্ পিতা বা পুত্র সন্দেহ করেন ?) ওকালতীর লাইসেন্সের দরখাস্ত করিয়াছেন; এই সন্ধিক্ষণে ফাঁকতালে একটু পুণ্য অর্জ্জন করিয়া লইবার চেষ্টা মন্দ কি ? তৃতীয় বয়সের পূর্ব্ব হইতেই কিঞ্চিৎ মূলধন হইয়া থাকে। অর্থনীতির ন্যায় ধর্ম্মনীতিতেও এই (principle) নিয়ম চলিলে লাভ বৈ লোকসান নাই। ওকালতী ব্যবসায়ে মূলধনের প্রয়োজন কে অস্বীকার করিবে ? অবশ্য এ ক্ষেত্রে মূলধনটা আধি-ভৌতিক নহে, আধ্যাত্মিক; ব্যবসায়টা যে প্রকৃতির, তাহাতে আধ্যাত্মিক মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে বৈ কি! পুত্রের এই সাধু সঙ্কল্পে কি পর্য্যন্ত আনন্দ পাইলাম, তাহা আর লেখনীমুখে কি প্রকাশ করিব ? পঞ্চপুত্রের শেষাবশিষ্ট এক পুত্রের উপযুক্ত কাযই তো এই। থাক্, সে বেদনা ও সান্ত্বনার ক্লেশকর প্রসঙ্গ। ইহাতে অনেকখানি দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল, বুকে বল হইল, প্রাণে আশার সঞ্চার হইল যে, দুর্গম তীর্থে যথাসম্ভব কষ্টের লাঘব হইবে। ইহাও ভাবিলাম যে, এই তীর্থযাত্রা যদি মহাযাত্রায় পরিণত হয় (পঞ্চপাণ্ডব এই পথেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, এ কথাটাও চকিতের মত মনে হইল), তবে শেষে মুখাগ্নি করিবার, তথা ব্রহ্মকপালীতে পিণ্ডদানের অধিকারী বংশ-প্রদীপ পুত্র সঙ্গেই থাকিল, সুতরাং পুণ্যভূমিতে মরণ-সৌভাগ্যের মধ্যে কোনও ত্রুটি (flaw) থাকিবে না, এই শোকতাপদগ্ধ ভগ্নহৃদয়ের ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে ? যাক্, শুভসঙ্কল্পের প্রসঙ্গে এ সব 'অলক্ষুণে' কথা বলিয়া আর রসভঙ্গ করিব না।

৪। অথ তথ্যসংগ্রহ

তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প স্থির রহিল। এক্ষণে এই দুর্গম তীর্থ-সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে মন দিলাম। গল্প শুনিয়াছি, এক জন ইংরেজ, এক জন ফরাসী ও এক জন জার্ম্মান্ তাঁহাদিগের ক্লাবে বসিয়া 'উট' কি প্রকার জীব, এই বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে পরস্পরকে কথা দিলেন যে, ঠিক এক বৎসর পরে তাঁহারা ক্লাবে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরের সিদ্ধান্ত জানাইবেন। যথাসময়ে মিলিত হইয়া ইংরেজ বলিলেন, তিনি ক্লাব হইতে বাহির হইয়াই সাহারা মরুভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তথায় সশরীরে উষ্ট্রারোহণে ধন্য হইয়া ফিরিয়াছেন;

* ঘটনাচক্রে পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া এক জন শেষে সঙ্গী হইতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি যেমন দুঃখিত, আমরাও তেমনই দুঃখিত। তাঁহার পরিচয়—শ্রীমান্ কুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা সায়েন্স কলেজে পদার্থবিদ্যার প্রোফেসার্। অপরের পরিচয়—শ্রীমান্ আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর কলেজে রসায়নশাস্ত্রের প্রোফেসার্।

অতএব উক্ত 'কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ' জীব-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান একেবারে প্রত্যক্ষ। ফরাসী বলিলেন, উট-সম্বন্ধে যত কিছু পুস্তক আছে, তিনি এই এক বৎসরে তৎসমুদয় পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত। শেষে জার্ম্মান্ বলিলেন, তিনি দূরদেশেও যান নাই, পুস্তক-অধ্যয়নেও সময় ব্যয় করেন নাই, ধ্যানযোগে ঐ জীবের আকৃতি-প্রকৃতি-সম্বন্ধে অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়াছেন (evolved out of his inner consciousness)! শুনিয়াছি, বাঙ্গালা-সাহিত্যের কোন কোন ধুরন্ধর কাশ্মীর না যাইয়া উল্লিখিত জার্ম্মান্ প্রণালীতে কাশ্মীরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ধ্যানধারণার দেশের লোক হইয়াও আমার ঐ প্রণালী অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি নাই। আমি ইংরেজের রাজ্যে বাস করি, ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আবাল্য নাড়াচাড়া করিতেছি, সুতরাং ইংরেজের প্রণালীর প্রতিই আমার পক্ষপাত স্বাভাবিক; আমার কাছে, চার্ব্বাকের ন্যায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। তথাপি ফরাসী প্রণালীটাও আমি একেবারে ছাড়িতে প্রস্তুত নহি, কেন-না, ফরাসী 'সভ্যজাতি-মধ্যে সভ্যতার খনি।' আচ্ছা, ফরাসী প্রণালীতে 'কাঠামো'টা গড়িয়া একমেটে করিয়া লইয়া ইংরেজী প্রণালীতে দোমেটে করা, ও পরে জার্ম্মান্ প্রণালীতে রংফলান ও ডাকের সাজ পরান—এইভাবে সব দিক্ রক্ষা করা যায় না কি? ফল কথা, অজ্ঞাত প্রদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বগামীদিগের লিখিত বিবরণগুলি পাঠ করিয়া লওয়াই প্রকৃষ্ট প্রণালী। আমার অবলম্বিত ব্যবসায়ে যখন পাঁচখানা বই পড়িয়া পড়ান, পাঁচফুলের সাজি সাজান, অভ্যস্তবিদ্যা, তখন এ পথ যে আমি পছন্দ করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রথমেই এই পথের 'পায়োনিয়ার্' (অগ্রদূত)—উদ্যম-উৎসাহের কথা ধরিলে 'ইংলিশ্‌ম্যান্'ও বলা যায়—প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'হিমালয়' আবার বহু বৎসর পরে নূতন করিয়া পাঠ করিলাম। ভাষার ইন্দ্রজালে মোহিত হইলাম, জীবন্ত (graphic) বর্ণনা-পাঠে আত্মহারা হইলাম, উৎসাহে প্রাণ মাতিয়া উঠিল, রণডঙ্কার বাদ্যে সৈনিকের ন্যায় যাত্রা করিতে যেন আর বিলম্ব সহে না। তাহার পর পড়িলাম (হাওড়ানিবাসী) শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাসের 'কেদার-বদরীর পথে।' নূতন লেখকের এই নবপ্রকাশিত পুস্তকখানি ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের উচ্ছ্বাসে (veteran) ঝুনো লেখক জলধর বাবুর সুপরিচিত পুস্তকের পার্শ্বে স্থান পাইবার অযোগ্য নহে (a good second to it)। তাহার পরে পড়িলাম, দ্বিতীয়খানির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বদরিকা-শ্রম-পরিভ্রমণ।' ইহা হইতেও বিস্তর আনন্দ ও উৎসাহ পাইলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ 'বদরী-নারায়ণের পথ' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, এখানি গাইড-বুক্ বা পথিপ্রদর্শিকা-হিসাবে বেশ কাযে লাগে। এই চারিখানি পুস্তক ছাড়া, মাসিক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি বিবরণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। যথা, 'উদ্বোধনে' [১৩২০] প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দাস-লিখিত, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে [১৩২৭-২৮] প্রকাশিত জনৈক বঙ্গমহিলা-লিখিত, ও 'ভারতবর্ষে' [আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ১৩৩২, এবং আষাঢ় ১৩৩৩] প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত। পরিশেষে 'finishing touch'-স্বরূপ ভগিনী নিবেদিতার ইংরেজীতে রচিত 'A Pilgrim's Diary'—নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাঁহার ভক্তি-ভাবে বিগলিতচিত্ত হইলাম। এই সকল পুস্তক—প্রবন্ধ হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া একখানি ছোট পকেট্-বহিতে টুকিয়া রাখিলাম—হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসার পুস্তকের মত সেখানি সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে, যথাস্থানে প্রয়োজন-মত খুলিয়া দেখিব। পুস্তক-প্রবন্ধাদি নিজে পড়িয়াও ক্ষান্ত হইলাম না, পুত্র ও ভাগিনেয়কেও পড়িতে দিলাম, তাঁহারাও বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন, পথের একটা নক্সা (chart) পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিলেন।

পুস্তক-প্রবন্ধ-পাঠেও পরিতৃপ্তি হইল না। কৌতূহল 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। কলেজে সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী কর হাওড়ায় থাকেন; তাঁহারই সৌজন্যে বীরেশ বাবুর বইখানি পড়িতে পাইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় বীরেশ বাবুর সহিত আলাপ করিয়া মৌখিক আরও তথ্যসংগ্রহে যত্নবান্ হইলাম। বীরেশ বাবু এমন সজ্জন যে, আমাকে তাঁহার দ্বারস্থ হইবার অবকাশ না দিয়া তিনি নিজেই আমার গৃহে সশরীরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উপাদেয় পুস্তক এক খণ্ড উপহারও দিলেন।

ইহাকেই বলে, 'দূরের গঙ্গা কাছে আসা।' তাঁহার সহিত পরিচয়ে আপ্যায়িত হইলাম, মুখে মুখে অনেক তথ্য জানিয়া লইলাম। কলেজের এক জন সহকর্ম্মীর পত্নী ও কন্যা উক্ত তীর্থ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতেও অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিলাম। তথ্যসংগ্রহের ইহাই শেষ সুযোগ নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী গত বর্ষে কেদার-বদরী দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারই লিখিত (সম্প্রতি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ক্রমশঃ প্রকাশমান) একটি রচনায় ইহার আভাস পাইয়া পত্রযোগে * তাঁহারও নিকট হইতে কিছু তথ্য আদায় করিলাম এবং পুত্র ও ভাগিনেয়কেও পত্রগুলি দেখাইলাম। ফলতঃ বহু তথ্য উদরস্থ করিয়া আমাদের তিন জনের দশা টেনিসন্-বর্ণিত অশ্বত্রয়ীর মতই হইল !—

"Till like three horses that have
broken fence,
And glutted all night long breast-
deep in corn,
We issued gorged with knowledge."

[ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* গত বর্ষে ৺পূজার ছুটীতে ৺কাশীধামে তথা অসিধামে শ্রদ্ধেয়া লেখিকার সহিত আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছে, সে জন্য কল্যাণীয় শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ ধন্যবাদার্হ।

তখন ও এখন

তখন খেঁদির কথা কে শুনিত,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি' ফিরিত যবে,
যখন বলিত, "কানু দা' তোমায়
বেড়াল আঁকিয়া দিতেই হ'বে।"
তখন তাহার ঝুঁটি-বাঁধা চুলে
সজোরে মারিয়া একটি টান,
অতি অবহেলে দূরে দিয়ে ঠেলে
আপনার মনে গেয়েছি গান ;
"হেঁই কানু-দাদা, একবার ঐ ঘড়িটা
দাও না আমার কাণে !"
দিয়াছি তাড়ায়ে রোষ-কষায়িত
দৃষ্টি হানিয়া তাহার পানে।
কোলে উঠিবার তরে যবে দুই বাহু
পসারিয়া এসেছে ধেয়ে,
আমি বলিয়াছি, সরে' যা', সরে' যা'
গায়ে-পায়ে ধুলো নোংরা মেয়ে !

* * * *

এখন হায় রে ! খেঁদি আর সেই খেঁদি নয়,
"মিস্ রমলা রায় !"
জরীর জুতায়, পরীর পোষাকে,
ব্রুহাম হাঁকায়ে কলেজে যায় !
সে যদি এখন একবার বলে—
বেড়াল ত ছার, আঁকিতে পারি
এত জানোয়ার, চিড়িয়াখানার মালিকো
জানে না ঠিকানা তা'রি !
এখন হায় গো যদি সে চায় গো
ঘড়ি ছড়ি, আর যা কিছু আছে,
বাক্স-পেঁটরা উজাড় করিয়া সবি
ধরি' দিব পায়ের কাছে !
ঠোঁটটি নাড়িয়া ইঙ্গিতে যদি
একটিও গান শুনিব বলে,
তবে ত এখনি বেহাগ, সাহানা,
তটিনীর মত ছুটিয়া চলে !
গায়ে-পায়ে ধূলা, সে ত ভাল কথা,
আজ যদি যায় ড্রেণেতে পড়ি'—
মেথুয়ার পাঁক-ময়লা-মাখানো দেহটি
দু'হাতে তুলি গো ধরি' !
খেঁদি, সে যখন খেঁদি ছিল,
তা'রে কেন যে যতন করিনি হায় !
আজ যে ভুলেও চাহে না এ-ধারে
গরবিণী "মিস্ রমলা রায় !"

শ্রীরাধেন্দু দত্ত।

নারীর কৃতিত্ব

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ কর্ণেল লিণ্ডবার্গ মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে একাকী তাঁহার 'স্পিরিট অফ সেণ্টলুই' নামক বিমানপোতে ৩৬ ঘণ্টায় নিউইয়র্কের নিকটস্থ উডোকলের আড্ডা হইতে যাত্রা করিয়া প্যারিসের নিকটস্থ চারবুর্গ আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগরের আকাশপথে ঝড়-বৃষ্টি-কুহেলিকা জয় করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আজ তাঁহার নাম জগতের সর্ব্বত্র লোকমুখে বিঘোষিত। আর তাঁহারই দেশের মহিলা বিমানবিদ্‌ কুমারী এমিলিয়া ইয়ারহার্ট তাঁহার "ফ্রেণ্ডসিপ" নামক বিমানপোতে মার্কিণ দেশের নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ওয়েলস দেশের বেরিপোর্ট ও ল্যানলি নামক স্থানের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন। নারীর মধ্যে তিনিই প্রথম বিমানপোতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইলেন।

শ্রমিক দলপতির দুই রূপ

বিলাতের হাইড পার্ক নামক সাধারণ প্রমোদোদ্যানে সম্প্রতি সার লিও চিওজা মানি ও কুমারী সাভিজের আচরণ সম্পর্কে যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার তুলনা আমাদের দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের নর্দ্দামার জমাদার মিস্‌ মেয়ো এত চেষ্টা করিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া রচিয়াও এমন ধরণের 'সভ্য' আচরণের দৃষ্টান্ত এ দেশ হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। এই ব্যাপার লইয়া লণ্ডনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পুলিস একটু হৈ-চৈ করিয়াছিল, আদালতেও ব্যাপার গড়াইয়াছিল। এ সব ব্যাপার যতই চাপা থাকে, ততই মঙ্গল। ইহার কদর্য্যতাজনক দুর্গন্ধ সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া কেবল পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এ জন্য আমরা ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিতে পারিব না বা সার লিও বা কুমারী সাভিজের দোষগুণের সমালোচনা করিব না। আমরা কেবল এই সম্পর্কে বিলাতের পুলিস ও জনমতের মধ্যে সম্পর্কটা একটু ফুটাইয়া তুলিব। সার লিও ও কুমারী সাভিজের আচরণের বিপক্ষে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ যে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে ভূতপূর্ব্ব শ্রমিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী বর্ত্তমান শ্রমিক দলপতি মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড "গ্লাসগো ফরওয়ার্ড" পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমাদের দেশে কি পুলিস-রাজ আরম্ভ হইল? পুলিস ও ফৌজদারী কর্ত্তৃপক্ষ কি মনে ভাবিয়াছেন যে, তাঁহারাই দেশের কর্ত্তা (Jacks in office) তাঁহারা কি দেশের প্রত্যেক লোককেই ভাবী অপরাধী potential criminal বলিয়া মনে করেন? তাঁহাদের পেশার ছুতায় তাঁহারা যে ভাবে কার্য্য করেন, তাহাতে ত ইহাই মনে হয়। তাঁহারা আমাদের প্রতি এমন ভাবে ব্যবহার করেন, যেন আমরা তাঁহাদের খেলার পুতুল—তাঁহাদের ইচ্ছাই যেন আমাদের চলাফিরা করিবার নির্দ্দেশদণ্ড! পুলিস ও ফৌজদারী কর্ত্তৃপক্ষের এই ধারণা চিরতরে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে সোজা কথায় বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে যে, বৃটিশ নাগরিক যে সে লোক নহে, সে স্বাধীন জাতির দশ জনের এক জন—সেই স্বাধীনতার অধিকার সে ভোগ করিবেই। সে পুলিস-রাজের অধীন নহে।"

অতি চমৎকার কথা। কিন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যখন প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিয়া ভারতে পুলিস-রাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—বে-আইনী বিধিবজ্র প্রয়োগ করিয়া শত শত নির্দ্দোষ লোককে বিনা বিচারে কেবল পুলিসের সন্দেহে নির্ব্বাসন ও আটক করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এই যুক্তি কোথায় ছিল? যখন মুসলমানপাড়া বোমার মামলায় অথবা মেদিনীপুরের বোমার মামলায়, কিম্বা সিন্ধুবালাদ্বয়ের মামলায় বা নারায়ণগড় ট্রেণধ্বংসের মামলায় পুলিসের কীর্ত্তিতে ভারতের জলস্থল ছাইয়া গিয়াছিল, তখন তাঁহার বা তাঁহার দেশের ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ইংরাজের এ যুক্তি কোথায় ছিল? এ দেশের পুলিস যে ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য হইতে সামান্য গৃহস্থকে বোমাওয়ালা বিপ্লববাদী মনে করে—বড়লাটের বন্ধু কালা আদমীকেও ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে—এবং সেই ব্যবহারের দ্বারা পদে পদে তাঁহাদিগকে অপদস্থ—অপমানিত করিয়া তাঁহাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলে,—তাহার বিরুদ্ধে ত মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের মুখে একটি কথাও শুনা যায় না। তবে ইহা সম্ভব যে, তাঁহার দুই রূপ। তিনি কভু শ্যামরূপে বাঁশী বাজাইয়া গোপাঙ্গনার মনোহরণ করেন, আবার কভু শ্যামারূপে অট্ট অট্ট হাসিয়া পেটের প্লীহা চমকিত করেন। ভারত বিলাত নহে, অতএব তাঁহারই বা দুই দেশের বেলা দুই রূপ হইবে না কেন?

মিস্‌ মেয়োর মিথ্যাকথা

ভারতের নর্দ্দমা-ঘাঁটা মিস্‌ মেয়োর গুণাগুণ ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বিলাতের পার্লামেণ্টের এক ছোটখাটো কমিটীর সমক্ষে মিস্‌ মেয়োকে ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। মিস্‌ মেয়ো এখন বিলাতে। তিনি না কি দয়া করিয়া আবার একবার ভারতে শুভ পদার্পণ করিবার সাধু সঙ্কল্প আঁটিয়া মার্কিণ মুল্লুক হইতে বিলাতে আসিয়াছেন। বোধ হয়, সেখান হইতে কোমরে জোর লইয়া এ দেশে আসিবেন। যাহা

হউক, বক্তৃতাকালে তাঁহার এক মস্ত বুজরুকি ধরা পড়ে। তিনি বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের প্রত্যেক হাঁসপাতাল ইংরাজ ও মার্কিণের পয়সায় পরিচালিত হয়। শ্রীযুক্ত শাকলাৎ-ওয়ালা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তিনি বোম্বাই, কলিকাতা ও অন্যান্য সহরের হাঁস-পাতাল সমূহের এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করিয়া দেখান যে, সমস্ত হাঁসপাতালই ভারতীয়ের অর্থে পুষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে। সভায় হুলস্থুল পড়িয়া যায়। মিস্ মেয়ো হতভম্ব হইয়া নির্ব্বাক্ অবস্থায় অবস্থান করেন। পার্লামেণ্টের সদস্যরা মিস্ মেয়োর মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অনৃতবাদিতা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে থাকেন যে, এইরূপ ভাসা ভাসা ধারণা লইয়া তিনি কিরূপে ভারতের সম্বন্ধে মন্তব্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই নর্দ্দামা-ঘাঁটা নারীর বিদ্যা বিলাতে জাহির হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতেছি, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু শীঘ্রই মার্কিণ দেশে যাত্রা করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় কোকিলকণ্ঠী বাগ্মী যখন মার্কিণে গিয়া ভারতের পারিজাতকাননের সৌরভ বিলাইয়া আসিবেন, তখন এই নর্দ্দামা-ঘাঁটা রমণীর নর্দ্দামার গন্ধ ডুবিয়া যাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—

লাঙ্কাশায়ারের দুর্দ্দশা

এক দিন ভারতের তন্তুবায়কুলের ধ্বংসসাধনের ফলে লাঙ্কাশায়ার বিজয়গর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছিল। আজ তাহার কি দশা? যে ভারতের সর্ব্বনাশে তাহার পৌষ মাস হইয়াছিল, আজ সেই ভারতই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে।

মহাত্মা গন্ধীর স্বদেশী ও খদ্দর প্রচারের ফল এখন প্রত্যক্ষভাবে লাঙ্কাশায়ারের উপরে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ সঙ্গে ভারতের কলজাত বস্ত্রও লাঙ্কাশায়ারের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লাঙ্কাশায়ারের দুর্দ্দশার কারণ নির্ণয়ের জন্য তৎকালীন শ্রমিক সরকার এক বস্ত্রশিল্প কমিটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সার আর্থার বালফুর ঐ কমিটীর সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতের স্থানীয় বস্ত্রশিল্পের প্রচারের ফলে লাঙ্কাশায়ারের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পে লাঙ্কাশায়ার এখনও বাঁচিয়া আছে, এ বিষয়ে সে প্রাচ্যের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন কি, প্রাচ্যের শিল্পকে অতিক্রমও করিতে পারে। কিন্তু স্থূল বস্ত্রশিল্পে প্রাচ্যদেশ লাঙ্কাশায়ারকে পরাস্ত করিয়াছে, কোন কালে যে লাঙ্কাশায়ার আর পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। ইহাই কমিটীর সুচিন্তিত অভিমত। তাই কমিটী বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালের উপযোগী উপায় অবলম্বন না করিলে লাঙ্কাশায়ারের উত্থানের আর আশা নাই। লাঙ্কাশায়ারের সুবিধা ও সুযোগ যথেষ্ট—তাহার পক্ষে স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট আছেন। এখন লাঙ্কাশায়ার যদি প্রাচ্যের উপায়গুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে, তবে আবার স্থূল বস্ত্রশিল্পের হারের পাশা উল্টাইয়া দিতে পারে। কমিটীর ইহাই উপদেশ।

স্বদেশী বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ইঙ্গিত অবশ্যই বুঝিতেছেন। স্থূল বস্ত্রশিল্পের প্রসারে আমাদের এই বাঙ্গালার খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিশ্রম ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নানা সরকারী ও বে-সরকারী বাধা ও অসুবিধার মধ্য দিয়াও দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে যে ভাবে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা অবশ্য কাহারও অবিদিত নাই। এখন তাঁহাদের এই স্থূল বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা করিবার নিমিত্ত লাঙ্কাশায়ারে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। তাঁহারা এ কথাটি স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের গুপ্ত নীতি যেন প্রাণপণে গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন। এ দেশে ও বিদেশে তাঁহাদের শত্রুর অভাব নাই। বিশেষতঃ ঘরের শত্রু বিভীষণকে ভয় অধিক।

—

আবার রণসজ্জা

জগতে সকল যুদ্ধের অবসান করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবতারণা করা হইয়াছিল, যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ হইতে এইরূপ কথা শুনা গিয়াছিল। এখন যে ভাবে রাসিয়াকে কোণ-ঠেসা করা হইতেছে এবং সে সম্বন্ধে মার্কিণ পত্রসমূহে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে ত মনে হয় না যে, জগৎ হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে। ইংরাজ ও মার্কিণে মনকষাকষি হইয়া যে ভাবে নৌবলহ্রাস বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল, পরন্তু জেনিভার শান্তি-সভায়-যুদ্ধ-সংঘটন-সম্ভাবনা-হ্রাস বৈঠক যে ভাবে প্রহসনে পরিণত হইল, তাহাতেও মনে হয় না যে, জগৎ হইতে যুদ্ধ-সম্ভাবনা কখনও অন্তর্হিত হইবে।

রাসিয়ান সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বৃটিশ পক্ষ হইতে যে একটা চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে, তাহার পরিচয় ইংরাজী পত্রে বার্লিনস্থ সংবাদদাতাসমূহের সংবাদেই প্রকাশ পায়। সকলেই জানেন, লর্ড বার্কেণহেড মাঝে বার্লিনে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত জার্ম্মাণ বৈদেশিক সচিব হার ষ্ট্রেসম্যানের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।—সংবাদদাতারা বলেন, বার্কেণহেড প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—

[১] জার্ম্মাণীকে অবিলম্বে রাসিয়ার সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

[২] জার্ম্মাণী সোভিয়েট সরকারকে আর ধার দিতে পারিবে না।

[৩] জার্ম্মাণী হইতে সমস্ত রাসিয়ান কর্ম্মচারীকে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

[৪] বৃটিশ ও জার্ম্মাণ প্রতিনিধিদিগের মধ্যে কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য পরামর্শ করিতে হইবে।

[৫] জার্ম্মাণ কম্যুনিষ্টদিগের বিপক্ষে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের রুদ্রনীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

যদি ষ্ট্রেসম্যান এই সকল সর্ত্তে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে রাসিয়ার বিরুদ্ধে ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণের এক মিতালী হইয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে এক বাধা উপস্থিত হইল। ষ্ট্রেসম্যান বলিলেন, "যদি আমাদিগকে এই সকল সর্ত্তে সম্মত হইতে হয়, তাহা হইলে পরিণামে রাসিয়ার বিপক্ষে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। যুদ্ধ করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজ কথা নহে। অতএব এই সকল সর্ত্তে সম্মত হইতে হইলে আমাদিগেরও এই সুবিধাগুলি করিয়া দিতে হইবে,—

(১) যুদ্ধে যে সকল জার্ম্মাণ উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার সকলগুলি অথবা নিতান্ত অপারগ পক্ষে কতকগুলি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(২) আবার জার্ম্মাণ বাহিনী গঠন করিতে দিতে হইবে।

ষ্ট্রেসম্যান যখন এই বোমা ফেলিলেন, তখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ড আঁতকাইয়া উঠিলেন। বিজিত হীনবল জার্ম্মাণীর মুখে এ কি কথা! ইংলণ্ড জার্ম্মাণ উপনিবেশ ফিরাইয়া দিতে পারেন না—যাহা একবার বিক্রমপুরে গিয়াছে. তাহা আর উদ্ধার করিয়া দেওয়া যায় না। ফরাসী ঘরের দুয়ারে আবার জার্ম্মাণ বাহিনী খাড়া করিতে দিতে পারেন না। কাযেই বন্দোবস্ত ভাঙ্গিয়া গেল।

—

দয়ার বন্যা

বিলাতের নরনারীর প্রাণ মাঝে মাঝে ভারতের জন্য কাঁদিয়া উঠে। কখনও মূক জনসাধারণের জন্য, কখনও আসামের চা-বাগিচার 'কুলী'দের জন্য, কখনও বা কলের মজুরদের জন্য, আবার কখনও বা ভারতীয় অভাগিনী নারীদের জন্য। সম্প্রতি বিলাতের এক ন্যাশানাল য়ুনিয়ন সেখানকার সঙ্ঘবদ্ধ শ্বেতাঙ্গী নারীদের তরফ হইতে এক 'স্মারকলিপি' (Memorandum) লিখিয়া দেশের লোককে জানাইয়াছেন যে, সাইমন কমিশন আর যাহাই সংস্কারের ব্যবস্থা করুক, ভারতের অভাগিনী নারীদের সম্বন্ধে একটা সংস্কারের ব্যবস্থা না করিলে তাঁহারা আর প্রাণে বাঁচিবেন না! ভারতের নারীদের কিসে মঙ্গল হয়, তাহাই অষ্টপ্রহর তাঁহাদের চিন্তা। সাইমন কমিশনের সংস্কারের ফলে দেশের শাসন-নীতির পরিবর্ত্তন হইলে তাহার প্রভাব নারীর উপর অমঙ্গলকর হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহেন না, এটুকু দয়া তাঁহাদের আছে; অথবা বলিতেও চাহেন না যে, আর এক ঝলক স্বায়ত্তশাসন বাঁটিয়া দিলেই নারীদের অবস্থার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। হয় ত ইহার বিপরীতও হইতে পারে,—এমন ধারণাও তাঁহাদের আছে। তবে তাঁহারা এইটুকু বলিতে চাহেন যে, সাইমন কমিশন কেবল রাজনীতির দিকটা দেখিতে গিয়া যেন এই সমাজ-নীতির দিকটাও অবহেলা না করেন। তাঁহাদের ত জানাই আছে, ভারতীয় নারীদের দুর্ভাগ্যের কথা,—অজ্ঞতা. বাল্যবিবাহ, অতিরিক্ত শিশুমৃত্যু, অতিরিক্ত মাতৃমৃত্যু, পর্দ্দা ও অবরোধ, মন্দস্থানে বাস, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভারতের নারীর ভাগ্যের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সকল দৃষ্টান্তই যে মিথ্যা, এমন কথা আমরা কখনও বলি না। ভারতের নারীর অবস্থার উন্নতি অনেক রকমে অনেক দিক হইতে এখনও করার প্রয়োজন আছে, এ কথাও স্বীকার করি। সে জন্য যে এ দেশে চেষ্টা হইতেছে না, তাহা কিন্তু বলিতে পারি না। এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নারীরাও স্বয়ং এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। যদি সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এই অশ্রুতপূর্ব্ব শ্বেতাঙ্গী নারীসঙ্ঘ ভারতীয় নারীর অবস্থার উন্নতিসাধন বিষয়ে চেষ্টিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সুখেরই কথা। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাই হইয়া থাকেন, তবে ঢেঁকিশাল দিয়া কটকে যাওয়া কেন, সরাসরি নিজেরা অর্থে-সামর্থ্যে সেই উন্নতিবিধানে চেষ্টিতা না হইয়া সাইমন কমিশনের লেজ ধরিয়া বৈতরিণী পার হইতেছেন কেন? সাইমন কমিশন সামাজিক কমিশন নহে—সে উদ্দেশ্যে উহাকে উহার সৃষ্টিকর্ত্তারা গঠন করেন নাই, তাঁহারা বসাইয়াছেন রাজনীতিক উদ্দেশ্য-সাধনার্থ। তবে অনর্থক ধান ভানিতে শিবের গীত আনিয়া আসল জিনিষকে নকল দিয়া বাধা দিবার চেষ্টার উদ্দেশ্য কি? ইহার মধ্যে মিস্ মেয়োর নর্দ্দামা ঘাঁটার কেরামতি নাই ত?

আর একটা কথা, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইতে এই শ্বেতাঙ্গী নারীসঙ্ঘের ভারতের নারীর জন্য থাকিয়া থাকিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে কেন? তাঁহাদের দেশের নারী-সমাজ কি একবারে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়াছে? সে দেশে কি নারীর সামাজিক উন্নতিসাধনের কোনও প্রয়োজন নাই? সার লিও চিওজা মনি ও কুমারী সাভিজের সম্পর্কে হাইড পার্কের যে সকল গুপ্ত ঘটনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কি তাঁহাদের সমাজের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা? সে দিন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন,—"গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে হাইড পার্কে অশ্লীলতা আচরণের জন্য ৩ শত ২৫টি নরনারী ধৃত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ২ শত ৫৮ জনের দণ্ড হইয়াছে; পরন্তু আরও ৩৭ জনের বিপক্ষে অপরাধ সপ্রমাণিত হইলেও তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। মোট ৩ শত ২৫ জনের মধ্যে ২ শত ৯৫ জনের অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ২ শত ৬৯ জন ব্যভিচারের অপরাধে ধৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২ শত ৪২ জন দণ্ডিত হইয়াছে। এই কার্য্যে সাহায্য ও উত্তেজনা করার অপরাধে ৩৬ জন ধৃত এবং দণ্ডিত হইয়াছিল। অসৎ কার্য্যের উদ্দেশ্যে উপরোধ ও উত্যক্ত করা অপরাধে ২ জন ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিল। অশ্লীলভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উলঙ্গ করিয়া রাখা অপরাধে ১ জন ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিল। এক জন বলাৎকারের অভিযোগে ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু দণ্ডিত হয় নাই। নারীর উপর অশ্লীল আক্রমণের অপরাধে ২ জন ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু দণ্ডিত হয় নাই। ইহা ছাড়া অপমানজনক লজ্জাশীলতা হানি করার জন্যও অনেকে ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিল।"

হাইড পার্ক লণ্ডনে একটি বটে, কিন্তু এই ভাবের পার্ক যে আর নাই, তাহা নহে। সে সব পার্কের খবর প্রকাশ পায় নাই। ইহা ছাড়া হোটেল, রেস্তোরাঁ, স্বাস্থ্যনিবাস, সমুদ্র-বিহারের বন্দর প্রভৃতি নানা স্থানের নানা খবরও ইংরাজী দৈনিকপত্রের ফাইল ঘাঁটিলে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বোর্ণমাউথ নামক সমুদ্র-স্বাস্থ্য-বিহারের স্থানে কিছু দিন পূর্ব্বে একটি যুবতীকে কি ভাবে হত্যা করিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাও আদালতে বিচারকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বদেশের এমন পাপানুষ্ঠানের প্রতীকারকল্পে এই নারীসঙ্ঘ কি চেষ্টা করিতেছেন? তাঁহাদের প্রতিবেশী ফরাসী জাতির প্যারিস সহরে সাধারণ প্রমোদোদ্যানে নরনারীর প্রকাশ্য চুম্বন ও অশ্লীল রসালাপ নিষিদ্ধ করিবার জন্য পুলিস কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা অবশ্যই জানেন।

আর তাঁহাদের দেশে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটাটা কিরূপ বাড়িয়াছে,

তাহারও খবর অবশ্য তাঁহারা রাখেন। এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তর পরিচয় পূর্ব্বে বহুবার দিয়াছি। পাছে এই সকল 'দম্পতি-কলহের' মামলার কুরুচিজনক বিবরণ সাধারণে প্রকাশ পায় এবং উহার ফলে সমাজে পাপস্রোতের বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় বর্ত্তমানে আইন করিয়া এই সকল মামলার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করার বিপক্ষে আইনের কড়াকড়ি করা হইতেছে কি না? তাঁহাদের দেশের War Babies, war marriages ও Barnardo's Homeএর কথাও অবশ্য তাঁহারা শুনিয়াছেন! আর তাঁহাদের দেশে ও মার্কিণ মুল্লুকে তরুণ-তরুণীর মধ্যে বিবাহবন্ধনের পরিবর্ত্তে 'ইচ্ছা-মিলনের' কিরূপ দ্রুত প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাও নিশ্চয়ই তাঁহাদের অবিদিত নাই। ঘরের এ দিকটা আগে সামলাইয়া তাঁহাদের পরের জন্য প্রাণ কাঁদান কর্ত্তব্য নহে কি?

—

অবাধ যৌন-মিলন

অধুনা কোন কোন দেশে সভ্যতার দোহাই দিয়া বিবাহকে কু-সংস্কারের মধ্যে পরিগণিত করা একটা সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে রোগটা যেন বিশেষভাবে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহটা মানুষের গড়া বিধি—সুতরাং মানুষ সুবিধা ও অসুবিধামত উহা ভাঙ্গিতে গড়িতে পারে—উহার বন্ধনের মধ্যে থাকিতে বাধ্য নহে, ইহাই এই শ্রেণীর ভাবুক ও চিন্তাশীলার ধারণা। ইঁহারা এই জন্য নিয়ম-মত বিবাহটা উঠাইয়া দিয়া অবাধ যৌন-মিলন প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যত দিন মিলনের ইচ্ছা প্রবল থাকিবে, তত দিন যৌন-মিলন সম্ভবপর হইবে, অন্যথা নর-নারী স্বেচ্ছামত আপোষে সেই মিলন ভঙ্গ করিয়া দিবে।

ইহা যে সমাজের শৃঙ্খলা-ভঙ্গের মূল, পরন্তু পাপ ও অনাচারের প্রশ্রয়দাতা, এখন ঐ সকল দেশের কোন কোন চিন্তাশীল মনীষী বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়া আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া সমাজকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। মিঃ বেন লিণ্ডসে মার্কিণ দেশের কলোরেডো বিভাগের ডেন্‌ভার সহরের অন্যতম বিচার-পতি। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর এবং পারিবারিক সম্বন্ধ সম্পর্কিত মামলার সুবিচার করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি।

সম্প্রতি বিচারপতি লিণ্ডসে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, একখানির নাম "যৌবনের (অর্থাৎ যুবক-যুবতীর) বিদ্রোহ", অপরখানির নাম "কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ বা সাহচর বিবাহ।" ঐ গ্রন্থদ্বয়ে তিনি স্বদেশের নর-নারীর যৌনসম্মিলনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই সভ্যতাভিমানী দেশ উৎসন্নের পথে যাইতে অধিক দিন বিলম্ব করিবে না। লেখক বলেন,—"মার্কিণদেশে বর্ত্তমানে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের অবাধ যৌনমিলন চলিতেছে। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধ হইতে ঐ দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌন-নীতি সম্বন্ধে মনোভাব দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন তাহার ফলে তাহারা আর নরনারীর অবাধ যৌনমিলনকে দোষাবহ বা নিন্দার বিষয় বলিয়া মনে করে না। যে সকল বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করা অশোভন এবং শালীনতা ও শ্লীলতার হানিকর বলিয়া পূর্ব্বে মনে করা হইত, এখন তরুণসঙ্ঘ সেই সকল বিষয়ে প্রকাশ্যে অবাধে আলোচনা করিয়া থাকে—তাহার জন্য বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। এ বিষয়ে যুবতীরাই অধিক অগ্রণী। সাহচর বিবাহ বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে,—ইহার অর্থ পুরুষ ও নারী 'বন্ধুর' অবাধ যৌনমিলন, ইহাতে চিরাচরিত বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজন হয় না। তরুণরা বলিয়া থাকে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কাহারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, ব্যক্তিগত ইচ্ছামত পুরুষ ও নারী অবাধ যৌনমিলন করিবে, ইহাতে সমাজ কোন বন্ধন বা বাধা-বিঘ্ন দিতে পারিবে না।"

বিচারপতি লিণ্ডসে এই অত্যদ্ভুত সংবাদ দিবার পর আরও বলিয়াছেন যে, "বর্ত্তমানে তরুণ সম্প্রদায় প্রজনন সঙ্কোচ করিয়া থাকে। এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি উহাদের মধ্যে গর্ভসঞ্চারও হয়, ভ্রূণহত্যাও হয়, ইহাও সত্য। ভ্রূণহত্যা সকল দেশেই অল্প-বিস্তর সংঘটিত হয় সত্য, কিন্তু তথাপি মার্কিণ দেশে ইহার অত্যন্ত আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়! ইহার ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, শরীর নানা রোগের বাসস্থান হইতেছে। সমাজে এই সকল দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্র ও ছাত্রীদিগের মধ্যে অন্যূনপক্ষে হিসাব করিলেও শতকরা ৪৫ জন অবাধ যৌন-মিলন অপরাধে অপরাধী।"

কি ভীষণ অবস্থা! আর ইহারই আমদানী করিবার জন্য আমাদের দেশের এক দল লোক এই আদর্শের অনুকরণে গল্প উপন্যাস রচনা করিতেছে! বিড়ম্বনা আর কি! বিলাতের "নেশান এণ্ড এথিনিয়াম" পত্রেও কোন বিশিষ্ট লেখক বলিয়াছেন যে,—"আমাদের দেশেও বিচারপতি লিণ্ডসের ন্যায় লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।" অর্থাৎ সে দেশেও তরুণ-তরুণীর যথেচ্ছা-চারে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন!—লেখক মিঃ রে, ষ্ট্যাচি প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়া-ছেন, "আমরা উটপক্ষীর মত সাইমুম্ ঝড়ের পূর্ব্বাহ্নে চক্ষু মুদিয়া আছি, ঝড় উঠিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে 'ভদ্র' মহিলাদের উৎপাতে বেশ্যাবৃত্তি-সমস্যার পরিবর্ত্তন হইতেছে।" ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। প্রার্থনা, এই 'সভ্যতার' হস্ত হইতে যেন আমাদের দেশ অব্যাহতি লাভ করে!

—

সাম্রাজ্যবাদীর হুম্‌কী

সকলেই জানেন, বিলাতের বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেনের হুমকীতে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা ও তাঁহার মন্ত্রিসভা কিরূপ নরম হইয়াছিলেন। হইবারই কথা, কেন না, সেই হুমকীর পশ্চাতে বৃটিশ শক্তির বন্দুক-বেয়নেট উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, মাল্টা হইতে রণপোতবহর মিশরযাত্রার্থ আদিষ্ট হইয়াছিল। বৃটেনের হুকুম পালন করাইবার নিমিত্ত তথায় উপযুক্ত লোক হাজির ছিলেন,—তাঁহার নাম লর্ড লয়েড। এই লয়েডই (তখন সার জর্জ্জ লয়েড) এক দিন ভারতের বোম্বাই প্রদেশের লাট ছিলেন। কাযেই তিনি যে জবরদস্তির উপাসক হইবেন, তাঁহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ভারতের

সিভিলিয়ান মনে করেন, প্রাচ্যে জোর-জবরদস্তি ব্যবহার না করিলে আপোষে কথা হয় না, প্রাচ্যের লোক বন্দুক-বেয়নেটই বুঝে ভাল। এই ধারণাবশে ডায়ার ওডয়ার পঞ্জাবে বৃটিশ শক্তির কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়াছিল। মিশরীয় পার্লামেণ্টে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হইতেছিল, ঐগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে মিশরীয়রা কতকগুলি অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু লর্ড লয়েড তাহাতে অনুমতি দিবেন কেন? তিনি দ্বিতীয় মাসোলিনির ন্যায় মিশরকে বজ্রমুষ্টি দেখাইলেন—চেম্বারলেনের মারফতে চরমপত্র (ultimatum) দিলেন,—অবিলম্বে ঐ পাণ্ডুলিপিগুলি যদি প্রত্যাহার না কর, তাহা হইলে মিশরে বৃটিশ রণপোত প্রেরিত হইবে। প্রাচ্যের লোককে এই ভাবে ভয় দেখাইয়া অন্যায় সর্ত্তে বাধ্য করিবার নীতিতে লেবার দলও সায় দিলেন—ইংলণ্ডের অধঃপতনের ইহাও চড়ান্ত নিদর্শন। সুয়েজ খালের পাশে ও পূর্ব্বদিকে সকল বৃটিশ রাজনীতিক দলই "এক নৌকায় পাড়ি দিয়া থাকেন", ইহা সকলেই জানেন। কাযেই নাহাস পাশা আর কি করিবেন?

যে মুহূর্ত্তে নাহাস পাশা নরম হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই বিলাতের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্র দম্ভভরে বলিলেন,—"গ্রেটবৃটেনের কড়া কথায় নাহাস পাশা ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যে চেতনা লাভ করিয়া তদ্দণ্ডেই ঘোষণা করিয়াছেন,—মিশরীয় পারলামেণ্টে আর ঐ পাণ্ডুলিপিগুলি পেশ হইবে না,—ইহা অতি সংকর্ম্মই হইয়াছে। মিশরের এই আচরণে অন্যান্য প্রাচ্যজাতিরও শিক্ষা হইবে সন্দেহ নাই। গ্রেটবৃটেনের সহিত সন্ধির সর্ত্ত অমান্য করিতে অতঃপর আর তাহারা সাহসী হইবে না।"

কেমন সুন্দর মন্তব্য! দস্যু সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেছে,—"খবরদার, সর্ত্ত ভঙ্গ করিও না,—চেঁচাইয়া লোক জড় করিও না; পুলিস ও লোকজন ডাকিবার সর্ত্ত ত তোমার সহিত হয় নাই।" বন্দুক-বেয়নেটের জোরে দুর্ব্বল মিশরকে যে সর্ত্তে পূর্ব্বে সহি করান হইয়াছে, আজ মিশরকে 'স্বাধীনতা' দিবার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মিশর যদি সেই সকল সর্ত্তের রদবদল করিতে চাহে, তবেই সে সর্ত্ত-ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হয়? চমৎকার ন্যায়বিচার বটে!

মিশরকে উদ্দেশ করিয়া এই যে প্রাচ্যজাতিদিগকে হুমকী দেখান হইয়াছে, তাহারও ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঠক জানেন, পারস্যের শাহ রেজা খাঁ ইংরাজের কথামত রাজ্যে উড়োকলের আড্ডার স্থান দিতে বা রাজ্যের উপর দিয়া উড়োকল উড়াইতে অনুমতি প্রদান করেন নাই; পরন্তু জার্ম্মাণীকে ও অন্যান্য বৈদেশিক জাতিকে পারস্যে রেল নির্ম্মাণে ও তৈল উত্তোলনে সুবিধা করিয়া দিলেও বৃটেনকে কোনও সুবিধা করিয়া দিতে চাহেন নাই। তদুপরি বাহরিণ দ্বীপ সম্পর্কে বৃটেনের সহিত পারস্যের রেজা খাঁর মনোমালিন্যও ঘটিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নাহাস পাশার নরম হইবার পরই পারস্যের শাহ রেজা খাঁও সঙ্গে সঙ্গে নরম হইয়াছেন! জার্ম্মাণীর "ডিউসে এলিমেন্ জেটাং" নামক পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন যে, "কয়েক মাস ধরিয়া রেজা খাঁ ইংরাজের কোন প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু নাহাস পাশার নরম হইবার পরেই শাহ রেজা খাঁর বৈদেশিক সচিব বৃটেনের সন্ধির কয়েকটি সর্ত্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে পারস্যের উপর দিয়া বৃটিশ উড়োকলের যাতায়াতে সম্মতির কথা আছে। এতদর্থে পারস্য সরকার তাঁহাদের রাজ্যের স্থানে স্থানে উড়োকলের আড্ডা নির্ম্মাণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বৃটিশ ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েস কর্ত্তৃপক্ষ ইণ্ডো-ইংলিশ বিমানপথের সমস্ত বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। ফলে মিশরের সুয়েজ খালের মত এই বিমানপথ পারস্যের 'ভারত-পথ'রূপে ব্যবহৃত হইবে। অর্থাৎ উহার সম্পর্কে পারস্যের উপর বৃটেনের প্রভাব কাঁকড়ার দাঁড়ার মত বিস্তৃত হইবে—একবার চাপিয়া বসিলে আর ছাড়িয়া দিবে না। কাষ্টমস্ সম্পর্কে পারস্যকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। ইংরাজ ব্যবসায়বাণিজ্যে এ যাবৎ নিজের ক্ষতি করিয়া কোনও জাতিকে সুবিধা করিয়া দেয় নাই, এখনও দিবে না, ইহা নিশ্চয়। ক্যাপিচুলেশান রদ করিবারও একটা সর্ত্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহারও আটঘাট যে ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পারস্যের কোন লাভ নাই। ইংরাজের দূতের আদালত উঠিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বৃটিশ প্রজাকে পারসিক আইনের আমলে আনিতে হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আনিতে হইবে এবং তাহার দণ্ড জরিমানা ব্যতীত কিছু হইতে পারিবে না। প্রত্যেক বৃটিশ অপরাধীকে জামীন দিতে হইবে এবং তাহাকে ধৃত করিবার কথা বৃটিশ দূতকে তৎক্ষণাৎ জানাইতে হইবে।

তবেই বুঝুন, বৃটিশ-নীতি পারস্য সম্পর্কে কি ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে।

কাইজার ও মাসোলিনি

জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম হলাণ্ডের ডুর্ণসহরে নির্ব্বাসিত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, এ কথা সকলেই জানেন। তিনি মাঝে মাঝে সংবাদসংগ্রাহকদিগের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি এই ভাবে গণতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, কাইজারের এই অভিমতের সহিত ইটালীর ডিকটেটর বা নিয়ামক মাসোলিনির মতের কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে।

কাইজার বলেন,"পার্লামেণ্টের মারফতে দেশ শাসন করা এখন সর্ব্বত্রই নিন্দনীয় হইতেছে। পার্লামেণ্ট প্রথা আর উৎকোচাদিগ্রহণ একই কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজা এক জন মানুষ মাত্র আর কিছু নহেন। কিন্তু একাকী এক মানুষ বলিয়া তাঁহার বিবেক আছে। কিন্তু গণের (জনমণ্ডলীর) কোনও বিবেক নাই। রাজার রাজত্বে এক জন কর্ত্তা; কিন্তু পার্লামেণ্ট প্রথার সাধারণতন্ত্রে শত কর্ত্তা। সেখানে কর্ত্তৃত্বের এত ভাগাভাগি যে, শেষে দায়িত্ব কাহারও থাকে না। এই হেতু গণতন্ত্র শাসনের ক্রমশঃ অধপতন হইতেছে। অন্যে পরে কা কথা, মার্কিণের মত শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রশাসিত দেশেও সকল দিকেই ডিক্‌টেটর বা নিয়ামকের সৃষ্টি হইতেছে, যেমন চলচ্চিত্রের ডিক্‌টেটর, পোষাক-পরিচ্ছদের ডিক্‌টেটর, মার্কিণের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল মার্কিণ সাহিত্যের ডিক্‌টেটর। গণতন্ত্র-শাসিত দেশে যথার্থ স্বাধীনতার

অস্তিত্ব নাই; সেখানে সকল চিন্তা ইতরতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জনগণ ভাবের দ্বারা—জিদের দ্বারা—হঠাৎ একটা খেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু রাজা বংশগত শাসনের ক্ষমতা ধারণ করেন বলিয়া জনগণকে শিক্ষিত, সংযত ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন করিতে পারেন। ডিক্‌টেটর 'এক পুরুষে' বলিয়া তাহারও সে ক্ষমতা নাই। রাজাই যথার্থ গণতন্ত্র শাসন চালাইতে পারেন।"

কাইজারের কথা শুনিয়া প্রাচীন ভারতের মন্ত্রি-পরিষদ-পরিবৃত ব্রাহ্মণ-শাসিত গণমুখ্যগণসেবিত হিন্দু রাজার কথা মনে পড়ে। তখনই যথার্থ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। এখন সে রাজাও নাই, সে গণতন্ত্রও নাই।

মাসোলিনি বলেন,—"বর্ত্তমান কালে পার্লামেন্টের দ্বারা শাসন সম্ভবপর নহে। পার্লামেন্ট গভর্ণমেন্ট ও জনগণের মধ্যে সংস্পর্শ ঘটাইতে সমর্থ নহে। তবে পার্লামেন্টকে গভর্ণমেন্টের সাহায্যকারী বলা যাইতে পারে বটে। জনমণ্ডলী স্বয়ং একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় গঠন করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগকে না চালাইলে চলিতে পারে না। গণতন্ত্র মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধ—জগতে গণতন্ত্র তিষ্ঠিতে পারে না, গণতন্ত্র জগতে নাইও। যেখানে এক শত লোক সমবেত হয়, সেখানে হয় এক জন, না হয় দুই তিন জন তাহাদিগকে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়।"

কাইজার ও মাসোলিনির বজ্রমুষ্টি যে একই, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই প্রকৃতির শাসক নিজে যাহা ভাল বলিয়া বুঝে, তাহার প্রতিবাদ হাজার যুক্তিতর্কপূর্ণ হইলেও সহ্য করিতে পারে না।

আফগানরাজের প্রত্যাগমন

আফগানিস্থানের নরপতি আমীর আমানুল্লা খাঁ ও তাঁহার মহিষী সৌরিয়া রাসিয়া, তুরস্ক ও পারস্য হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের আদর-অভ্যর্থনা হইয়াছিল। সেই অভ্যর্থনায় সমরসজ্জার ঘটা বা পানভোজন-সাজসজ্জার আড়ম্বর না থাকুক, আন্তরিকতা যে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাসিয়ার মস্কো সোভিয়েটের কর্ত্তা কালিনিন আফগান বাদশাহকে অভ্যর্থনাকালে উভয় স্বাধীন রাজ্যের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমাদের উভয় রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য শত্রু যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা শত্রুর সেই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি। এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই শান্তির সময়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমাদের উভয় রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্বের সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের নিরপেক্ষতা ও আক্রমণরোধমূলক সন্ধি হয়। বর্ত্তমানে আমাদের উভয়ের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে সন্ধির কথা চলিতেছে, ইহা শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হইয়া যাইবে।"

তুর্কীদেশে মুস্তাফা কামাল পাশার সহিত আফগান আমীরের সন্ধি হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। পারস্য ও মিশরের সহিত আফগান-নরপতির বন্ধুত্ব-সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, এরূপও প্রতীচ্যের সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে এসিয়ার রাজ্যসমূহের মধ্যে একটা আত্মরক্ষার অনুকূল আপোষ-বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম ফল,—শীঘ্রই তুর্কীদেশ হইতে আফগানিস্থানে একটি মিলিটারী মিশন আসিতেছে। আফগান সৈন্যগণকে আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত এই মিশন আমন্ত্রিত হইয়াছে। জেনারেল কাজিম পাশা মিশনের কর্ত্তা হইয়া আসিতেছেন। তিনি আফগানবাহিনীর চিফ-অফ জেনারল ষ্টাফের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, পরন্তু আমীর আমানুল্লার সামরিক পরামর্শদাতা হইবেন। চারি জন তুর্কী কর্ণেল আফগান সমরসচিবের অধীনস্থ বিভাগসমূহের তত্ত্বাবধান করিবেন।

গত ২৫শে জুন আফগান-রাজা ও রাজমহিষী স্বরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। পারস্যে পদার্পণ করিয়াই রাণী সৌরিয়া পুনরায় বোরখা ও অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গে আর য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ নাই। দেশের জনগণের মতানুযায়ী চলিয়া তিনি প্রজাবাৎসল্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। হিরাটে রাজা ও রাণীর বিপুল অভ্যর্থনা হইয়াছিল। হিরাট হইতে কান্দাহারে তাঁহারা বিমানপোতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১লা জুলাই তাঁহাদের কাবুল পৌঁছিবার কথা।

তাঁহাদের স্বদেশপ্রত্যাগমন সম্পর্কে বিলাতের পত্রসমূহে আবার এক জনরব রটিয়াছিল। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, রাসিয়া যাত্রার পূর্ব্বে ঐ সকল পত্রে রটিয়াছিল যে, আফগানিস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় আফগান-রাজ-দম্পতির আর রাসিয়ায় যাওয়া হইল না, তাঁহারা জার্ম্মাণী হইয়াই স্বদেশযাত্রা করিবেন। এবারও রটিয়াছিল যে, পারস্যে অবস্থানকালে স্বরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল শুনিয়া রাজা আমানুল্লা তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিতেছেন। য়ুরোপের কোন কোন পত্র ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ এজেণ্টরা আফগানস্থানের মোল্লাদিগকে রাজা আমানুল্লার বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্য গোপনে প্রচারকার্য্য চালাইতেছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে, রাণী সৌরিয়া কাফেরদিগকে মুখ দেখাইয়াছেন, বিদেশী বিধর্ম্মীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহারা আরও রটাইয়াছিল যে, রাজা আমানুল্লা দেশে ফিরিয়া সমস্ত মসজেদের সম্পত্তি (ওয়াকফ ইত্যাদি) সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া জাতির সম্পত্তিরূপে পরিণত করিবেন, পরন্তু স্কুল-কালেজসমূহে মুসলিম ধর্ম্মশিক্ষা আর দেওয়া হইবে না, কেবল ঐহিক শিক্ষাই দেওয়া হইবে।

কেন এমন প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছিল, তাহার কারণ দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, তুর্কী ও আফগানিস্থানের মধ্যে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ সম্পর্কে বন্ধুত্ব-সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে এবং রাসিয়া, আফগানিস্থান, তুর্কী ও পারস্যের মধ্যে একটা সদ্ভাব-দ্যোতক আপোষ বন্দোবস্ত হইতেছে বলিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ভীত হইয়াছেন। বিশেষতঃ বিলাতের রাজপুরুষগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও আফগান-নরপতিকে কোন সন্ধি স্বাক্ষর করাইতে পারেন নাই। এই সকল কারণে আফগানিস্থান এক্ষণে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজনীতিকগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছেন। তাই তাঁহার বিপক্ষে এইরূপ প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছিল।

এই জনরব সত্য কি না, জানিবার উপায় নাই। সত্য হউক বা না হউক, আফগান আমীর যে নিরাপদে স্বরাজ্যে

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার পূর্ণোৎসাহে রাজ্যশাসন করিতেছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত।

—

তুর্কীর নূতন সংস্কার

মুস্তাফা কামাল পাশার গভর্ণমেণ্ট তুর্কীভাষার জন্য রোমান অক্ষর প্রচলন করিবার, পরন্তু ফরাসী ও হুঙ্গেরিয়ান প্রথার উচ্চারণ দোরস্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বস্! এইবার সব শেষ। মুসলিম ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থানচ্যুত হইয়াছে, বোরখা ও অবগুণ্ঠন, ফেজ ও চাপকান আচকান,—সবই পরিত্যক্ত হইয়াছে, মোল্লা মৌলভীদের প্রভাব নষ্ট হইয়াছে, সকল ধর্ম্মকে তুল্য আসন প্রদান করা হইয়াছে। শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। রাজ্যশাসনের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এত দিন তুর্কী-ভাষা আরবী হরপে লিখিত হইয়া আসিতেছিল। মুসলিম ধর্ম্ম আরবের ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মের প্রভাব তুর্কীর ভাষার উপরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। কামাল পাশার গভর্ণমেণ্ট সেই প্রভাবও নষ্ট করিয়া দিলেন। তবে আর তুর্কীতে মুসলিম প্রভাব রহিল কি?

—

স্বাধীন চীন

এত দিন পরে অবনত, পতিত, পরপদানত মহাচীনের স্বাধীনতা-সূর্য্য অবসাদের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া প্রাচীর গগনে সমুদিত হইয়াছে। চীনের মুক্তি-সমরের প্রধান পুরোহিত ডাক্তার সান-ইয়াট-সেনের নিজ হাতে গড়া দক্ষিণী কুওমিণ্টাং বা ন্যাশানালিষ্ট দল উত্তরের দস্যু-সর্দ্দারগণকে রণে পরাভূত করিয়া রাজধানী পিকিং ও টিণ্টাসন নগর অধিকার করিয়াছে এবং মহাচীনের সর্ব্বত্র চীনের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। ইহা কেবল চীনের পক্ষে নহে, সমগ্র প্রাচ্যের পক্ষে মহা শুভদিন। যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতীচ্য এত দিন কেবল 'গানবোট' নীতি অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল এবং অশ্বেত জাতিমাত্রকেই নিকৃষ্ট মনে করিয়া কুকুর-বিড়ালের মত ব্যবহার করিতেছিল, সেই প্রতীচ্যের মুখ আশু বিপদের ও প্রতিপত্তি-প্রভুত্বহানির আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্থান,—এইবার চীন; এসিয়া আবার তাহার নষ্টগৌরব উদ্ধার করিতেছে। ইহা নিশ্চিতই ভারতের পক্ষেও শুভদিন।

পিকিনের দস্যুসর্দ্দার চাংসোলিন নিহত কি জীবিত, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই, তবে ইহা স্থির যে, তিনি যুথভ্রষ্ট সহচর-অনুচর-পরিত্যক্ত হইয়া উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেনে পলায়ন করিয়াছেন। তিনি যে শক্তিশালী সঙ্ঘ-গঠনক্ষম সমরকুশলী পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে তাঁহাকে য়ুয়ান-সি-কাইএর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তিনি যাহাই হউন, তিনি যে চীনের মুক্তিকামনার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমাবধি যদি তিনি স্বয়ং প্রভুত্বকামী স্বার্থান্বেষী দস্যুসর্দ্দার হইয়া না দাঁড়াইয়া সান ইয়াটসানের কুওমিণ্টাং দলের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা হইলে চীনের মুক্তি আরও সহজসাধ্য ও অল্পসময়সাধ্য হইতে পারিত। যাহা হউক, তিনি জীবিতই থাকুন বা নিহতই হউন (মুকডেনে তিনি আততায়ীর বোমায় আহত হইয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, ইহাই জনরব), তিনি যে আর দুষ্ট গ্রহরূপে চীনের ভাগ্যাকাশে উদিত হইবেন, এমন আশঙ্কা আর নাই। কুওমিণ্টাং দল এখন চীনের অন্যান্য সকল দলকে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিয়া উত্তর-চীনেও সুশাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন মাঞ্চুরিয়া তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। অগ্রে উত্তর ও দক্ষিণ-চীন সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহারা পরে মাঞ্চুরিয়ার বিষয়ে মনোযোগী হইবেন, এইরূপই সম্ভাবনা। মাঞ্চুরিয়া হইতে আক্রমণের ভয়ও তাঁহাদের নাই, তাঁহারা সে বিষয়ে যথেষ্ট শক্তি ধারণ করেন।

যে চিয়াং কাইসেককে এক দিন দেশদ্রোহী বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তিনিই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চীনের মুক্তিসাধন করিলেন। আমরা বহুপূর্ব্বে চিয়াং কাইসেকের জীবন-কথা ও দেশের জন্য সর্ব্বস্বদানের কথা বসুমতীর পাঠককে জানাইয়াছিলাম। তিনি ডাক্তার সান ইয়াটসেনের মন্ত্রশিষ্য—চীনে সামরিক কালেজ-প্রতিষ্ঠার মূল। দক্ষিণ-চীনের জয়যাত্রায় তিনিই প্রথমে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া হ্যাঙ্কো, সাংহাই ও নানকিং অধিকার করেন। সেই সময়ে রাসিয়ান বোরোডিন ও চীন বৈদেশিক দূত ইউজিন চেনের সহিত সাংহাই ও নানকিনে কম্যুনিষ্টদিগের অত্যাচার সম্পর্কে তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল; তিনি পদত্যাগ করিয়া চীনের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহারই নীতি পরে অধিকাংশ ন্যাশানালিষ্টের মনঃপূত হয় এবং ন্যাশানালিষ্টরা বোরোডিন ও চেনকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকেই পুনরায় সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইউজিন চেন, মোঙ্গোলিয়ার খৃষ্টান সেনাপতি ফেং উসিয়াংকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছিলেন; কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতাচ্যুত হইলে পর ফেং উসিয়াং, চাং কাইসেকের সহিত যোগদান করেন। এই দুই জন সেনাপতি অতঃপর দুই দিক হইতে উত্তর চীন আক্রমণ করেন এবং পরিণামে টিণ্টসিন, সিনানফু ও পিকিং অধিকার করেন।

মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও ফেং উসিয়াং যে স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতাপ্রয়াসী দস্যুসর্দ্দার নহেন, যথার্থ দেশহিতকামী, তাহা তাঁহাদের পিকিং-জয়ের পর বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন বলিয়া সান-সি, সাণ্টাং ও চিহিলি প্রদেশের সামরিক নেতারা একরূপ বিনা যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইতে দিয়াছিলেন এবং পরে নিজেরাও চ্যাংসোলিনের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। চিয়াং ও ফেং পিকিং অধিকারের পর সানসির শাসককে পিকিংএর শান্তিশৃঙ্খলাবিধানের ভার অর্পণ করিয়া সসৈন্যে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন, এমন কি, চিয়াং কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সেনাপতিত্ব হইতে এবং রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এমনই নিঃস্বার্থভাবে এক দিন রোমান সেনাপতি সিনসিনেটাস রণজয়ের পর কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া পুনরায় আপনার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ

করিয়াছিলেন! চিয়াং কত মহৎ, তাহা ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। ফেংও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, শাসনের ভার যোগ্য পাত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং রঙ্গস্থল হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চীনের মুক্তির ইতিহাসে তাঁহাদের নাম নিশ্চিতই চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

জাতীয় দল পিকিং হইতে নানকিংএ রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পিকিংএর যিনি বৈদেশিক সচিব ছিলেন, তাঁহাকেই তাঁহারা ঐ পদে বহাল রাখিয়াছেন। কেবল উহাই নহে, উত্তর-চীনের পক্ষ হইতে যাঁহারা বিদেশে দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ন্যাশানালিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকেও স্বপদে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। ইহা কত বড় উদারতা ও দেশহিতৈষণার পরিচয় প্রদান করে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন।

অন্য দিকে তাঁহারা শাসনের সুব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা বিদেশীয় শক্তিগণকে জানাইয়াছেন যে, চীনের দুর্ব্বল অবস্থায় বন্দুকের মুখে চীনকে যে সকল সন্ধি-সর্ত্তে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা নাকচ করিয়া দিতেছেন এবং শক্তিপুঞ্জকে চীনের সম্মানজনক স্বাধীনতা-সূচক সমান অধিকারজ্ঞাপক নূতন সন্ধি করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এ যাবৎ শক্তিপুঞ্জের তরফ হইতে ইহার কোনও প্রতিবাদ শুনা যায় নাই। ইহার এক প্রবল কারণ আছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ চীনের বন্ধু,তাঁহারা চীনকে শক্তিশালী দেখিতে কামনা করেন। কেবল মুখে নহে, কাযে! যে সময়ে চিয়াং কাইসেক সাংহাই ও নানকিং অবরোধ ও অধিকার করেন, সেই সময়ে বৃটেন, জাপান ও মার্কিণ বিদেশীদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল;—এই অভিযোগে তাঁহারা চীনের নিকট কৈফিয়ৎ ও ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছিলেন। চিয়াং অপরাধীদের দণ্ডবিধান করেন এবং চীনের প্রতি বিদেশীয়গণের অত্যাচারের সম্পর্কে পাল্টা অনুযোগ করেন। মার্কিণ তাঁহার যুক্তির সারবত্তার প্রমাণ পাইয়া চীনে অতঃপর 'গানবোট' নীতি অনুসরণ করিতে ক্ষান্ত হন। ঐ সময়ে অন্যান্য দুই এক বৈদেশিক শক্তির চীনপ্রবাসী প্রজারা মার্কিণকে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কুলিজ কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি শক্তিরাও চীনের সহিত বন্ধুত্বসম্বন্ধ ভঙ্গ করেন নাই। এবারও মার্কিণ চীনের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া অন্যান্য পররাজ্য-লোলুপ শক্তি মনে ইচ্ছা থাকিলেও 'গানবোট' নীতি অর্থাৎ বলপ্রদর্শন নীতি অনুসরণ করিতে সাহসী হন নাই।

ন্যাশানালিষ্টরা কাষ্টম শুল্ক বৃদ্ধি করিবার এবং নিজহস্তে উহার কর্তৃত্ব রাখিবারও প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চীনের সমস্ত কাষ্টম শুল্ক নিয়ন্ত্রণ ও আদায়ের ভার বিদেশীদের হস্তে ন্যস্ত আছে। চীন বার বার কাষ্টম শুল্ক বৃদ্ধি করিবার কথা জানাইয়াও কোনও ফল প্রাপ্ত হন নাই। বিদেশীয়রা নিজেদের ব্যবসায়ীর সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত চীনের কাষ্টম শুল্ক কখনও বৃদ্ধি করিতে দেয় নাই। ভারতেও কাষ্টম শুল্কের হার শতকরা ১৫ টাকা। অন্য সমস্ত স্বাধীন দেশে ইহার অপেক্ষা শুল্কের হার অনেক অধিক। চীন কর্তৃপক্ষ শুল্কের হার মাত্র শতকরা ১২½ টাকা করিবার জন্য বহুবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদেশিকরা সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন চীনের ন্যাশানালিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাষ্টম শুল্ক আদায়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহার ন্যায়সঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে বৈদেশিক ব্যবসায়ীর গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি?

ন্যাশানালিষ্টদের আর এক প্রস্তাব এই যে, তাঁহারা—তাঁহাদের নিজের মনের মত করিয়া চীনকে ঢালিয়া সাজিবেন। অর্থাৎ এত দিন বৈদেশিক শক্তিরা নিজের ইচ্ছামত চীনকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, চীন এখন নিজে নিজের গঠনের ভার গ্রহণ করিয়া সেই পূর্ব্বের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন-সংশোধন করিবেন। যাহাতে চীন জাপানের মত শক্তিশালী হয়, প্রথম ও প্রধান শক্তিগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়, কথায় কথায় যাহাতে চীনকে কোন বিদেশী চোখ রাঙ্গাইতে না পারে, যাহাতে চীন নিজের দেশে নিজে প্রভু ও কর্ত্তা হয়, যাহাতে বিদেশে সে মান্য ও গণ্য হয়,—তাহারই জন্য চীন এখন হইতে বদ্ধপরিকর হইবে।

আশা হয়, মার্কিণযুক্তরাজ্য পূর্ব্বের ন্যায় এ সময়েও চীনের বন্ধুরূপে কার্য্য করিবেন। তিনি চীনের সহায় থাকিলে জগতের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী লোভী শক্তির মুখ বন্ধ হইবে। আর ভগবদিচ্ছায় প্রাচ্যে জাপানের মত আর একটি শক্তি স্বাধীন ও শক্তিশালী হইলে জগতে প্রাচ্য জাতির অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ ক্রমশঃ হ্রাস হইবে।

অপরাধী

তোমার নিকটে অপরাধী আমি
কত শত অপরাধে—
সে সব স্মরিয়া আমার এ হিয়া
দিবস-রজনী কাঁদে।
সহিয়াছ তুমি অপরাধ যত,
সহনশীলা এ ধরণীর মত,
সবই আজ মনে উঠে অবিরত,
কহিতে কণ্ঠ বাধে॥

তোমার পানে ত দেখিনি চাহিয়া
মজি নিজ সুখ-আশে;—
আজি তা স্মরণে মোর আঁখি-কোণে
জল ঝরে হা-হুতাশে।
আজি প্রিয়ে তব নিকটে যাব না
অপরাধ যত কর মার্জ্জনা,
অনুতাপে হৃদি মাগে কৃপা-কণা—
ভিখারীর মত সাধে॥

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত।

যুবক-জীবন

—২
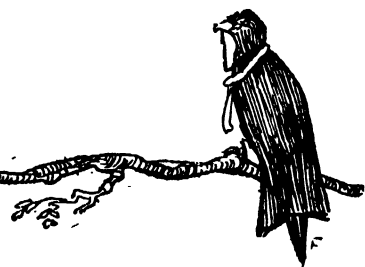
কলেজ খোলবার পর শ্যামাপদ কৃষ্ণনগরে চ'লে গেছে, বিভা শাশুড়ীর কাছে-ই আছে। গ্রামের সকলে-ই বৌকে সুন্দরী বলে; মাঝে মাঝে বৌএর হাতের সখের রান্না খেয়ে বাড়ীর লোকে খুশী; পাড়ার দু'চার জন মেয়ে এই নূতন বৌএর কাছে সেলাইয়ের কাজ শিখতে আসতে আরম্ভ করেছে। শাশুড়ীরও দৃষ্টিটুকু মধুর, শুধু তাই নয়, বৌএর হাতের লেখা কবিতা গল্প-টল্প পাঁচ জনকে ডেকে পড়ান, তাতে গ্রামের এম ভি স্কুলের মাষ্টার-পণ্ডিতের কাছে পর্য্যন্ত শ্যামাপদর বৌএর সুখ্যাতি পৌঁছেছে। কিন্তু জননীর সঙ্গ ও শিক্ষার প্রভাব উপর বিভার মনে পিসীমার আচার-ব্যাভারে যে ছাপটুকু পড়েছিল, তা একেবারে মুছে যায় নি। আর যায় নি পিসে-সাহেবের কাব্য-সাধনাকার্য্যে উত্তরসাধিকা হয়ে বাঙ্গালার নবীন উপন্যাসরাশি পাঠে তার কিশোর প্রাণে প্রস্ফুটিত পেরিনিয়াল হাইব্রীড গোলাপের নৈশ নিশ্বাসের নেশা। প্রেম—তৃপ্তির জীবনীশক্তিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তার ইষ্টে নিবেদিত ভালবাসার প্রসাদ অঞ্জলি অঞ্জলি ভ'রে সংসারের অঙ্গনে হরির লুট দিতে বলত; আর ঔপন্যাসিক প্রণয় কল্পনার আশ্রয়ে বিভার শিয়রে ব'সে "ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসীর" গান গাইত; কাজকর্ম্মে অঙ্গচালনা যেন তার কাছে একটি লীলারঙ্গ। শক্তিমতী লেখনি! তোমার দীপ্তিতে তমসা বিদূরিত হয়, আবার তোমার জ্বলনের ফল গৃহদাহ!

কিন্তু স্বচ্ছল সংসারে বধূর প্রকৃতি-আশ্রিত এই দৌর্ব্বল্য-টুকু নব-যৌবনসমাগমের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য বলে-ই সকলের মনে হ'ত।

এই সুখের সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে সব একেবারে উল্টে-পাল্টে গেল। টেলিগ্রাম এল, উমাপদ বাবু সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত; শ্যামাপদ কৃষ্ণনগর থেকে ছুটে এসে মাকে সঙ্গে ক'রে বাগেরহাটে চ'লে গেল। মাতা-পুত্রে যে দিন সেখানে পৌঁছুল, সে দিন ধ'রে আট দিন উমাপদ বাবু টাইফয়েড জ্বরে ভুগছিলেন; দিন দশ এগার পরে যে দিন বাড়ী ফিরে এলো, সে দিন মায়ের সীঁথেয় সিঁদূর নাই, পরনে থান, ছেলের গলায় কাছা।

উমাপদ বাবু বাইশ বৎসর বয়সে প্লিডারশিপ পরীক্ষায় পাশ হয়ে খুলনা জেলার বাগেরহাট সাবডিভিসনে ওকালতী করতে আরম্ভ করেন; প্রথম বছর চার পাঁচ ঝটাপটি করবার পর ক্রমে প্র্যাক্‌টিশ জ'মে আসতে থাকে; শেষে সম্মানে ও উপার্জ্জনে একটিমাত্র প্রবীণ মোক্তারের স্থান তাঁর উপরে ছিল। মহকুমা আদালতে অগ্রবর্ত্তী আইন-ব্যবসায়ীদিগের আয় জেলা কোর্টের প্লিডারদের তুলনায় অনেক কম। উমাপদ বাবুর খরচ ছিল অনেক। তিন জায়গায় তিনটি মেসের সরবরাহকারী তিনি মাত্র একা। পল্লীগ্রামে এখনও পরিবার মানে স্ত্রী, পোষ্য অর্থে কেবল পুত্র-কন্যাই নয়; সুতরাং গ্রামস্থ বাস্তুটিতে অনেকগুলি বিধবা, সধবা, অপোগণ্ড ও নাচার আত্মীয়ের অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য প্রভৃতির দায় তিনি আপনার কাঁধেই নিয়েছিলেন। শ্যামাপদ'র কলেজে ও হোষ্টেলের খরচা তাঁকে কৃষ্ণনগরে পাঠাতে হ'ত। বাগেরহাটের বাসাতেও নিজের রাঁধুনী, চাকর, মুহুরী, তিন চারিটি স্কুলের ছাত্র শয়ন-ভোজনের নিত্যসঙ্গী ছিল, এর উপর মাঝে মাঝে উপরীর আমদানী হ'ত। আবার বাড়ীখানি তৈয়ারী করবার সময় এবং একটি পিতৃহীনা ভাইঝির বিবাহ দিতে কিছু দেনা হয়ে পড়ে। বংশবৃদ্ধি কার্য্যে ঋণ "রাবণ" অপেক্ষাও শক্তিমান্। কোনও মাসে দিতে পারেন নি, কোনও মাসে দিতে পেরেছেন—এই রকম ক'রে সুদ যে কত জ'মে গেছে, এর হিসাব উমাপদ বাবু মনে-মনে-ও কখন করেন নি। বাইরের চটক বজায় রাখাটা সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাবুগিরির সখ নয়; এমন কতকগুলি জীবিকা অর্জ্জনের বৃত্তি আছে, যা অবলম্বন করলে, চাল-চলন বাবদ একটা ইন্‌কাম ট্যাক্স দিতে হয়। বালুচরে আমার ধান ছাঁটাইয়ের কল আছে, যেমন ক'রে হ'ক শালিয়ানা সাত আট হাজার টাকা ঘরে আসে,

আমি খালি পায়ে গামছা কাঁধে সারা মুর্শিদাবাদ সহরটা ঘুরে এলেও আমার ব্যবসায়ের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, বরং সাবধানী ব'লে অনেক ছোটখাট কারবারী লোক তাদের উদ্বৃত্ত টাকা বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে জমা রেখে যায়; কিন্তু পালুই পাড়ার নীলমণি ডাক্তারকেও কোট-প্যান্টালুন জুতো পরতে আর একটা টাটু ঘোড়া রাখতে হয়। কলকাতায় অনেক নতুন ডাক্তারের লাষ্ট চান্স বাড়ী বাঁধা দিয়ে মোটর কেনা, নিজের শিষ্যদের সব চেয়ে বেশী রিফাইন ক'রে নিতে চায়, আইন: তিন চার কোট ফরাসী পালিস না লাগালে তাঁদের শাইন্ করবার অন্য উপায় নাই। এর উপর মফঃস্বলের উকীল-মোক্তার একেবারে চামার না হ'লে শুধু নিজের পেটের মত চালটি বার ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না, বিশেষ যেখানে স্কুল-কলেজ আছে। বংশমর্য্যাদা-মাৎসর্য্য-ও যে একটু লাহিড়ী মহাশয়ের মনের মধ্যে ছিল, তাতে কোন-ও ভদ্রলোক-ই আশ্চর্য্য হবেন না।

শ্রাদ্ধের পর দেনার বিল, ফর্দ্দ, তাগাদা, খত দলিলাদির মর্ম্ম গ্রহণ করতে বাড়ীর লোক যখন সমর্থ হ'ল, তখন বুঝতে পারলে যে, একটিমাত্র শালের খুঁটির চাড়ার উপর এই এত বড় সংসারের আটচালাখানা এত দিন খাড়া ছিল, সেই চাড়া-ও নড়েছে—সংসার-ও পড়েছে একেবারে মাটীতে মাথা গুঁজে।

যখন এক দিকে লাহিড়ী-পরিবার অর্থাৎ শ্যামাপদর মা, এক আপনার খুড়ী আর পিসী দুপুরের রৌদ্রেও ভাবনার দৃষ্টি যত দূর পর্য্যন্ত যায়, তত দূরে ঘোর অন্ধকার দেখছে; তখন অন্য দিকে এঁদের আত্মীয়-কুটুম্ব পরিচিত প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষের মাথায় এত দিন যে প্রখর বিষয়-বুদ্ধি লুকান ছিল, তা উমাপদর বুদ্ধিহীনতা ও স্বার্থপরতার সমালোচনার আকারে হঠাৎ সাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। আন্দ'-জ্যেঠা বল্লেন, "বুঝে না চলতে পারলে-ই শেষটা এই রকম দাঁড়ায়, এ ত আর নতুন কথা নয়; আয় বুঝে ব্যয়—বুঝেছ হে, আয় বুঝে ব্যয়।" আন্দ'-জ্যেঠার আয় ব'লে কোন-ও ল্যাঠাই নেই; সকালে হাত-মুখ ধুয়ে বার হন, একটা না একটা সম্পর্ক অনেকের সঙ্গে-ই পাতান আছে, তার ওপর আন্দ' ঠাকুরের হাত দেখে ফলাফল ব'লে দেবার উপর গ্রামের কমল মুদীর একান্ত বিশ্বাস, সুতরাং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে যখন বাড়ী ফেরেন, গামছাখানি বেশ ভর্ত্তি আর অন্ততঃ গোটা ছয় পয়সা নগদ-ও ট্যাঁকে থাকত; আয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি প্রত্যহ ছ' পয়সার বেশী আফিং-ও খান না। উৎসব বক্সির বিধবা গ্রামের বেমলমাসী বল্লেন, "আমাদের সেই মিনুষে-ও অমনি উড়ন-চণ্ডে ছিল, নইলে দু'হাতে চাল-ডাল বিলিয়ে আজ আমায় দুটি অন্নের জন্য পাঁচ দোরে হাত পাততে হয়! তা ওই উমো লাহিড়ী—ঐ মাসে যা তিনটি ক'রে টাকা ফেলে দিত, এর উপর এই আট বছরের ভেতর মাসী ব'লে আট গণ্ডা পয়সা-ও কেউ হাত তুলে দেয় নি।" পুরুষের মধ্যে 'আন্দ'-জ্যেঠা' ও মেয়েদের মধ্যে 'বেমলমাসী', আরও অনেকগুলি ঐ রকম ছিল। কারুর কোন-ই দায়িত্ব নেই, নিজের লাভালাভটুকু নিজের মনের মত খতিয়ে নিয়ে তাঁরা প্রত্যেক বিষয়ের-ই সমালোচনা ক'রে থাকেন। আপনারা যাঁরা ভুক্তভোগী, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁদের পয়সা রোজগার করতে হয় ও সময়ে সময়ে দায়ে প'ড়ে দেনা করতে বাধ্য হন, সহানুভূতি তাঁদেরই মুখ থেকে মৃত উমাপদ বাবুর ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের জন্য 'আহা আহা' শব্দটা বার করিয়েছিল।

অনেক খরচায় প্রস্তুত পল্লীগ্রামের কোটা-ভিটে, বসবাসের সুখ অত্যন্ত অধিক; কিন্তু বিক্রী করতে গেলে খদ্দের জোটে না, ভাড়া-ই বা সেখানে কে নিতে যাবে? চাকর-জন ছাড়িয়ে দিতে মাস তিন চারের মধ্যেই বাড়ী শ্রীহীন ও জঙ্গলে পূর্ণ হ'তে লাগল। গুড় ফুরিয়েছে দেখে আশ্রিত-আশ্রিতা নতুন কলসীর অন্বেষণে লাহিড়ী-পরিবারকে আপাততঃ পূর্ব্বজন্মের ঋণ হ'তে মুক্তি দিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে চ'লে গেলেন। বিধবা ঝা-টি ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে মুখপানে চায় দেখে শ্যামাপদর মা তার হাত ধ'রে বললেন, তুমি আর কোথা যাবে বোন্, আমাদেরও যে দশা, তোমারও সেই দশা। বিভাকে আপাততঃ দিন কতকের জন্য তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এ 'দিন কতকের' শেষ যে কত দিনে হবে, তা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে এক একখানি গয়না বাঁধা দিতে দিতে-ও বিভার শাশুড়ী তখন বুঝতে পারেন নি। বৎসরেকমাত্র পরিণীতা প্রিয়তমাকে নিভৃতে নিরানন্দে বিদায় দেবার সময় শ্যামাপদ সেই নবীন নয়ন দুটির প্রথম জলধারা যে আদরের উপায়ে মুছিয়ে দিয়েছিল, বাঙ্গালীর লোকাচারে তা মুদ্রিত করবার প্রথা থাকলে-ও সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ নিষেধ।

পিতামহের আমলের বৃদ্ধ পরিচারক দীনুর সঙ্গে

কৃষ্ণনগরে গিয়ে বিভাকে রেলে তুলে দিয়ে শ্যামাপদ বাড়ী ফিরে মা'র কাছে ব'সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "মা, এখন আমি কি করব ?"

মা। তোমার পড়ার কি হবে ?

শ্যা। সে মোহ কেটে গেছে মা ; বিপদে প'ড়ে আমার এই উপকারটুকু হয়েছে। ডিগ্রী পাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই বুঝেছি ; কলেজে নাম কাটিয়ে এসেছি।

মা। আহা !

শ্যা। ঢের 'আহা' মা, আমাদের আশ্রয় করবার জন্যে হা হা ক'রে বেড়াচ্ছে, কলেজ ছাড়ার জন্য আহাটা না হয় বাদ-ই দিলে।

মা। তা হ'লে কি চাকরীর চেষ্টা করবে ?

শ্যা। তা ছাড়া ত আর উপায় নেই। কিন্তু কলেজ ত আমায় চাকরী করতে শেখায় নি মা। অনেক বড় বড় বচন মুখস্থ বল্‌তেও পারি, কাগজে লিখতেও পারি, কিন্তু তার জোরে ত চাকরী মেলে না ; আফিসের সাহেব ত আমার $H_2 + \circ = H_2\circ$ কি Heat Light বুঝবে না।

মা। সে কি ?

শ্যা। অন্যায় করেছি মা, তোমাকে ওগুলো বলা ভাল হয় নি। আসল কথা, আমি যে ভাবের লেখাপড়া যতটুকু শিখেছি, তাতে চাকরীর বাজারে আমার দু' একখানা চিঠি-পত্র লেখা ছাড়া আর কোন-ও কাজ-কর্ম্ম করবার যোগ্যতা নেই। কল এসে হাতের লেখারও মান গেছে। আমার ঠাকুরদাদা শুনেছি, এক জন নামজাদা কেরাণী ছিলেন। হাতের লেখার গুণে তাঁকে লোক ডেকে চাকরী দিত ; তা সে সব এখন গল্পে দাঁড়িয়েছে।

মা। তোমার যেমন কথা ! এই ত শুনতে পাচ্ছি, বিজয়ের খুব বড় চাকরী হয়েছে।

শ্যা। সে যে এম, এস, সি পাশ করেছে মা, তার উপর বিজয় দাদার মাথা বড় জবর। উনি যদি এ দেশে না জন্মে বিলেতে কি জার্ম্মাণীতে জন্মাতেন, তা হ'লে একটা মস্ত লোক হতেন।

মা। একটা চিঠি লিখে দেখ না তাকে ; তোকে-ও যদি তার আফিসে একটা কিছুতে বসিয়ে দিতে পারে।

শ্যামাপদ কোন-ও উত্তর করলে না। নীরবে ব'সে রইল। মা মনে মনে করলেন, তাঁর ছেলে কিছুতেই বিজয়ের চাইতে কম নয়। তাই অভিমানে তার আশ্রয় প্রার্থনা করতে চায় না। প্রকাশ্যে বললেন, "এতে আর লজ্জা কি, সময় কারু-র-ই চিরদিন সমান যায় না ; বিজয় মানুষ মন্দ নয়, তার অহঙ্কার-ফঙ্কার নেই।"

শ্যা। বিজয় দাদার অহঙ্কার ! তুমি জান না মা, বিজয় দাদা আমাদের ছাত্র-সমাজের অলঙ্কার। আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছেন, তাতে ত আমি তাঁকে দেবতা মনে করি। কিন্তু মা, আমি গলগ্রহ কারুর হ'তে চাইনে। যেটুকু শিখেছি, সে বিদ্যে নিয়ে টাটানগরের ভাল চাকরী চলে না। তার ওপর বাড়ীতে তোমার ও বাবার আদর আর হোষ্টেলের ফাষ্ট ক্লাশ বোর্ডার, এ পলকা শরীরে আগুনের হলকার সামনে দাঁড়ান কি সহ্য হবে ?

মা। তবে ?

শ্যা। একটা আশা মাঝে মাঝে মনে মনে হচ্ছে বটে ; রেশিটেশন ক'রে কতকগুলো মেডেল পেয়েছি, আর ঐ জন্যে সে সময় কলকেতার কতকগুলো ভাল ভাল লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়ে গ্যাছে ; এ সময় তাঁদের কাছে গিয়ে ধরলে যদি কিছু হয়।

মা। তবে কি কলকেতাতেই যেতে চাও ?

শ্যা। তুমি যদি মা, অনুমতি দাও।

মা। কাজেই।

১৩

সপ্তাহে সপ্তাহে সভা, মাসে মাসে 'সোস্যাল', পার্ব্বণে পার্ব্বণে নাট্যাভিনয়োৎসবাদির পর আপাততঃ কৃষ্ণনগর একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। এ বিশ্রামে কিন্তু সৌরভ-ও নাই, রঙ-ও নাই ; বিজয় জামসেদপুর চ'লে যাওয়ার পর যুবক-সমাজে একটু অবসাদ এসেছে। ব্রজমোহনের উদ্যমের এঞ্জিন-ও বছর তিনেক ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের বেগে চ'লে 'রায় সাহেব'-ষ্টেশনে পৌঁছবার পর একবার থামা খেয়েছে ; নূতন জল নেবে কি এঞ্জিনখানাই একেবারে বদলাবে, সেটা এখন-ও ঠিক হয় নি।

জলযোগাদিযুক্ত প্রমোদ-মিলনে সকলে উপস্থিত থাকলে-ও উপাধিলাভের পর থেকে ব্রজমোহনসম্বন্ধে সমাজে একটু দলাদলির ভাব দেখা দিয়েছে। যাদের রক্ষা করবার উপযুক্ত জমী-জমা, বিষয়-আশয়, ধন-সম্পত্তি জ'মে গেছে বা বৃদ্ধিতে

পুষ্ট হয়ে উঠছে, তাঁরা হয়েছেন রক্ষণশীল; ইংরাজ-রাজের একটু এদিক-ওদিক হ'লে কোম্পানীর কাগজের দর নেমে যাবে, সেয়ারের বাজার take care of itself, Bank এর গায়ে Rupt শব্দ সংযোজিত হওয়া একান্ত সম্ভব; সুতরাং তাঁরা সাহেবের যজ্ঞভাগ আগে রেখে দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধনে ব্রতী হ'তে রাজি। যাঁরা পঞ্চাশোর্দ্ধে হাতের পাঁচ রেখে ঘরে ব'সে দরোয়ানী ও বাজার-সরকারী কচ্ছেন বা যাঁদের চাকরীর মেয়াদ আধা-আধি পার হয়েছে, তাঁদের বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরা এ-বেলা ও-বেলা সাহেবদের আশীর্ব্বাদ না ক'রে জল-টুকু পর্য্যন্ত মুখে দেন না, কর্ত্তার পরমায়ুবৃদ্ধির ও ইংরাজ-রাজের অমরত্বলাভ তাঁরা নিয়ত প্রার্থনা করেন ওই পেনসন-টুকু বজায় রাখবার জন্য। আহা! ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর অবিরাম 'পেন' চালাবার পর তবে এই মাসহারা-যোগান 'সন্‌টি' জন্মগ্রহণ করেছে, মা ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদে যত দিন বাঁচে; হা ভগবান্, কর্ত্তাকে যদি হনুমান্ কর্ত্তে! ভগবান্ হনুমান্ করেন নি বটে, কিন্তু গিন্নী-ঠাকরুণ কর্ত্তাকে বানর বানিয়ে রেখেছেন, কাজেই কর্ত্তাজাতি রক্ষণশীল। এঁরা ব্রজ-মোহনের দিকে; এঁরা তাঁকে বলেন, কালেক্টার সাহেবের হাত দিয়ে চট ক'রে আর-ও গোটা দু'তিন ভাল কাযের জন্য খরচ করুন; জানুয়ারীতে না হ'ক, জুনে যে তোমার গুণ রায় বাহাদুররূপে গেজেটে প্রকাশ হবে, তার আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু যাঁরা ফরিদপুর থেকে কুষ্ঠে, কুষ্ঠে থেকে চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা থেকে রাণাঘাট ঘুরে এসে বছর তিনেকেও কৃষ্ণ-নগরের বারে অদৃষ্টকে ফেরাতে পারেন নি, তাঁরা দেশের জন্য উপদেশ, উত্তেজনা, আদেশ, এমন কি, বড় বৌএর কাছে মর্টগেজ দেওয়া প্রাণটি পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। আর ছাত্রদল,—বিজয়-যাত্রাই ত তাদের বয়সের উৎসব! চাল-ডাল, কাপড়-চোপড়, টেক্স-খাজনার খবর দে জাগিয়ে কে যাবে তাদের এই হোরির স্বপ্ন ভাঙ্গতে! চা, চিঁড়েভাজা, ব্যাড-মিণ্টনের নেটিং, রিহার্সালের খরচ, ষ্টেজের পোষাক কিছুতেই ব্রজমোহনের প্রয়াস আর যুবকদের পূর্ণ প্রীতি আকর্ষণ করতে পারলে না।

সন্ধ্যার পর শূন্যপ্রায় বৈঠকখানায় ব'সে ব'সে অনেক চিন্তার পর ব্রজমোহন স্থির করলেন যে, এ বাজারে রায় বাহাদুর না হয়ে দেশ-বাহাদুর হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

এক দিন সকালে ব্রজমোহন জজ সাহেবের বাংলায় গেল সেলাম দিতে। মাছের কচুরী খাইয়ে যে জজ সাহেবকে জানকীনাথ হাত করেছিলেন, কিছু দিন হ'ল, একটা বড় ছুটী নিয়ে তিনি বিলাত গিয়েছেন; তাঁর যায়গায় কৃষ্ণনগরে এখন সেলবোরণ সাহেব কায করছেন। সেলবোরণ সাহেবের মনে মনে ভয়ানক একটা আভিজাত্যের গৌরব আছে; কোন আর্‌ল-পরিবারের সঙ্গে এঁদের না কি একটা অতি দূর-সম্পর্ক আছে, সে পরিবারমধ্যে কারও মৃত্যু হ'লে সেল-বোরণরা এখনও কোটের আস্তেনে কাল ক্রেপ জড়ান; কৌলীন্যের এই অভিমানে ইনি যে-সে সিভিলিয়নের সঙ্গে মেশামিশি করেন না। তাঁকে জুডিশিয়াল বিভাগে সরিয়ে দেওয়ায় তাঁর মনের ভিতর বড় একটা ব্যথা জমে আছে। বেঞ্চে ব'সে ফাঁসীর হুকুম পর্য্যন্ত দিতে পারেন বটে, কিন্তু সরাসরি ক্ষমতা কিছুই নাই। দেবতাদের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা, জেলা-জজের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ, বড় জোর উলুর চালে আগুন লাগাতে পারেন, পাটের গুদামের সদ্গতির ভার বেলাররা ইদানীং নিজের হাতেই নিয়েছে, তার জন্যে আর ব্রহ্মার কৃপার অপেক্ষা করেন নি; কিন্তু কালেক্টর সাহেব একেবারে সাক্ষাৎ ত্রিপুরারি; তা'র ওপর—ম্যাজিষ্ট্রেট নামে যমের কাযের ভারটাও ex-officio-ভাবে নির্ব্বাহ করবার অধিকার পাওয়ায় তাঁর ক্ষমতা বিধি-বাধার মধ্যে আবদ্ধ নয়। যেমন ইন্দ্রের হাতে কুলিশ—তেমন-ই নরেন্দ্রের হাতে পুলিস। এ দেশের লোক নির্গুণ নরেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখে ডাকের টিকি-টের ছাপে, আর সগুণ নরেন্দ্রকে দেখে ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রেষ্টিজে। পুলিস—ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে তাঁর মাথায় ছাতা ধরে, জমীদার-দের দাতা করে, নেতাদের গোঁতা মারে, আইনের নিরুক্ত সূত্র প্রয়োজনমত সরবরাহ করে, সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম কর-বার সময় দিশী লোকের চোখে যে কাকুতি চাউনি দেখা যায়, জজ সাহেবকে সেলাম করবার সময় তা মালুম দেয় না—বড় জোর একটু সম্মান। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম অ্যাওরুজ। সেলবোরণ-শোণিত যার দেহ-যন্ত্রকে শক্তিমান্ ক'রে রেখেছে, তার সমক্ষে হ্যারি, টমি, অ্যাওরুজ গোছ লোক একটা জেলার সর্ব্বে-সর্ব্বা, এটা জজ সাহেবের একেবারে বর-দাস্তের বার। অ্যাওরুজ ঘরে ঢুকলেই সেলবোরণ ক্লাব ছেড়ে চ'লে যান। বিচারসম্বন্ধীয় কাযে যেখানে যতটুকু পারেন, অ্যাওরুজের বিপরীত দিকে চলেন। জজ সাহেবের

কাছে দরখাস্ত কল্লেই ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা দণ্ডিত জেল-আসামী জামীনে খালাস পায়। অ্যাণ্ডরুজের গা' দিয়ে ট্যালোর গন্ধ পাওয়া যায়, এ কথা-ও মাঝে মাঝে সেলবোরণ রঙ্গমঞ্চের স্বগতের সুরে উচ্চারণ করেন।

তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে একখানি সিঙ্গাপুরী চেয়ার দেখিয়ে দিলে ব্রজমোহন ইতস্ততের সম্ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাতে উপবিষ্ট হবার পর:—

জজ—Well Babu! How goes the world?

ব্রজ—By your order Sir, quite well.

জজ—আপনি বাংলা বলিলেন করুন। কথোপকথন অভ্যাস ব্যতীত আমি বেঙ্গলি ভুলিব।

ব্রজ—আপনি যেমন বাংলা বলেন, অমন অনেক কলেজের ছেলেরা পারে না; দশটা বাংলার ভিতর ছ'টা ইংরাজী মিশিয়ে ফেলে। আশ্চর্য্য কিছুই নয়—আপনি হ'লেন বনেদি ঘরের লোক।

জজ বনেদ? বনেদ কাহাকে বলে? Broad cloth বানাট?

ব্রজ—নো সার! বনেদ ইজ Foundation; ancient aristocracy.

জজ—Yes yes! Aristocracy; উহার বাঙ্গালী কি?

ব্রজ—Aristocracyর Sir বাংলা নেই। অনিষ্টকরোসি ব'লে একটা সংস্কৃত কথা আছে, কোন কোন জায়গায় Aristocracyর বদলে খাটে বটে, তবে সব জায়গায় নয়। Now Sir একটা পরামর্শ—I mean orderএর জন্য আপনার নিকট এসেছি।

জজ—Well?

ব্রজ—এই যে হুজুর আমাকে রায় সাহেব টাইটেল্ দেওয়া হয়েছে, এর কোনো মূল্য আছে?

জজ- কি মূল্য আপনি দিল, কি মূল্য এণ্ডরুজ লইল, অপর ব্যক্তি কেমন করিয়া পারিবে জান্তে হ'তে?

ব্রজ—হুজুর, ঐ টিউব-ওয়েল্‌টাতে তো হাজার ছয়েকের ওপর লেগেছে; এর আগে—

জজ—নল-কূপ স্থাপন করিয়া কি মঙ্গল হইল? নদী প্রবাহিত করিলে পান হইত, স্নান হইত, কৃষি হইত। নদী নোবল্, ওয়েল্ কমন্। টোমার ডেশ পাইত কত উপকার—খনন করিলে ঐ নদী।

ব্রজ—আপনি হুজুর, আমাদের দেশকে ভালোবাসেন।

জজ—কারণ, তিনি পুরাতন।

ব্রজ—আমায় হুজুর অনেকে বল্‌ছে—টাইটেল্-ফাইটেলের দিকে না ঝুঁকে দেশের কাজে লাগ্‌তে।

জজ—Ah! তারা চাহিতেছে আপ্‌নাকে কংগ্রেস হইতে। কংগ্রেস কিছু করিল না—কিছু করিল না; কেবল ক্রিশ্‌মাস্ ডিনার ভোজন করিল এবং বিলাত গমন করিল। কত বৎসর চীৎকার করিল, কলেক্টার হস্ত হইতে পোলিস্ উৎপাটন করিতে পারিল না।

ব্রজ—আপনি যদি আমায় স্বদেশী-কাযে যেতে দিতে হুকুম দেন, তবে আমি সব কায ছেড়ে যা'তে বিচার ও শাসন-বিভাগ আলাদা হয়—

জজ—বিচার, বিচার,—বিচার করিবে বিচারপতি; কলেক্টার করিবে রেভিনিউ আদায়, কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে তাহার অধিকার থাকিবে না।

ব্রজ—তা তো বটে-ই হুজুর। জজ থেকে জজমেণ্ট কথাই হয়েছে, ম্যাজিষ্ট্রেট-মেণ্ট ব'লে তো আর কোনো শব্দ নেই। তা হ'লে কি আপনি অনুমতি—

জজ—অল্ রাইট, গুড্ মর্‌নিঙ্।

"গুড্ মর্‌নিঙ অ্যাণ্ড থ্যাঙ্ক ইওর অনার স্যার্" ব'লে ব্রজমোহন বিদায় হ'লো। বাড়ীর ভেতর থেকে কাপড়টি মাত্র ছেড়ে বাইরে আসতেই তিন জন চাপরাসী একটু হেসে বাবুজীকে সেলাম কল্লে। সেই সেলাম—সেই হাসির সঙ্গে কি মুরুব্বিয়ানা—কি অনুকম্পার ভাব যে মেশানো আছে, তা যে সব নবীন ডেপুটী মুন্সেফ্ উকীল প্রভৃতি সাহেবদের কাছে এতালা দিতে চান—তাঁরাই বোঝেন। এই চাপরাসীরা ঐ বাবুদের সম্বোধন ক'রে যতগুলি "হুজুর" শব্দ প্রয়োগ করেন, তা'র প্রত্যেকটির বাঙলা মানে হ'চ্চে—"বুঝেচো বাবাজী," "কি জানো ছোক্‌রা" "সাহেবের রাজি-গররাজির মালিক আমরাই"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসাদ বল্লে—"দিনু মিঞা আসতি পার্‌লা না, হাজরীর বকৎ হয়েছে, তারির তদ্‌বিরি থাকৃতি হইছে; হুজুরকে ছেলাম পেটিয়েচে আর কই দিছে যে কাছারি বাংলা লিয়ে মোরা ল'টি পেরাণী আপনকার তাঁবেদারীতে মোতায়েন আছি। তা' হুজুর সমঝদার মানুষ, বেশী এতলা তো আর কত্তি হবো না।"

দক্ষিণান্ত না ক'ল্লে "মুলাকাতী পূজা" সিদ্ধ হয় না, ব্রজমোহনের তা' বিশেষ জানা ছিল, সুতরাং নগদ পাঁচটি টাকা দিয়ে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হ'লেন। আসাদ বল্লে—"সে রোজ লিরোদ বাবু আস্‌ছিল, তানার তো জমীদারী আছে, লেকেন বস্‌ল্যান্ ঐ ব্যাঞ্চে, আর আপনারে জজ্ সাহেব আজ কুর্শী খাছেন; পাঁচ মিনিটের যাস্তি হাজির থাকৃতি সরকারী উকীল ঐ যোগেশ চৌধুরীরে বি সাহেব দিয়ে থাহেন না। আর আপনকারে আজ কমব্যাস বিশ মিনিট টেইম দিছেন, মুই ঘরী খ্যাক্‌ছি।" ব্রজমোহন আপ্যায়িত হলেন, চপরাসীরা বিদায় নিলে।

কলকাতা থেকে ব্রজমোহনের জন্য খদ্দরের পোষাকী আটপৌরে সব স্যুট তৈরী হয়ে পৌছল—মায় নেকটাই হ্যাট ব্যাগগুলি পর্য্যন্ত খদ্দরের। ব্যবহারিক কাপড়-চোপড়গুলি ব্রজমোহন দিশী বিলাতী অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন: কিন্তু ব্রজমোহন-মোহিনী শ্রীমতী স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি মামুলি ইঙ্গিত ক'রে বল্লেন, "সব জায়গাতেই তো আর ঐ খেরোর কাপড়-চোপড় প'রে যেতে হবে না, স্বদেশী সভায় না হয় ঐগুলো প'রে গেলে, বিয়ের-টিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার জন্যে এগুলো থাক।"

কংগ্রেসে ঢুকলেন ব্রজমোহন একেবারে সিজার সেজে*:—আগমন, চক্ষুদান, আরতি। *গোড়া থেকেই দেখা যাচ্ছে, কম্‌প্লিমেন্টারী কার্ডের খাতিরে ব্রজমোহনের বিশ্বাস নাই; পপুলারীটি থিয়েটারে প্রবেশের জন্য টিকিট কেনা আবশ্যক, এ কথাটি তিনি ভাল ক'রেই বোঝেন: সুতরাং তিনি একখানি ড্রেস সার্কেল কিনে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন। রায় বাহাদুরী সৎকার্য্যে—অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা পড়ত,—তার জায়গায় দেশের হিতের জন্য পাঁচ হাজার কিছুই নয়। কৃষ্ণনগর বারের যে হোপলেস ব্রাদারটি—ব্রজমোহনকে আলোয় আনতে বেশী চেষ্টা করেছিলেন, তিনি-ও ওই সঙ্গে সদৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য ইংরাজ আদালতের ওকালতী ছেড়ে দিলেন; পল্লীসংস্কার কার্য্যের জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরাজের রেলে চড়লেন, রাহা খরচ বাদে—'গৌরীসেন তবিল' থেকে—মাসিক পঁচাত্তর-ট্যাঁক-টাকা। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

কাবুলীওয়ালা

স্ত্রীশিক্ষা

এ দেশে নারীজাগরণের নানা দিক হইতে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে নানা স্থানে নারীমঙ্গল সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে এই সকল সমিতি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পরন্তু কলিকাতায় সম্প্রতি একটি নারী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

সভাসমিতির যতই প্রতিষ্ঠা হউক, প্রথমেই প্রয়োজন স্ত্রীশিক্ষার। যে দেশের নারীর শিক্ষার দৌড় কথামালা কি বোধোদয় পর্য্যন্ত, সে দেশে প্রথমেই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কাহার দোষে কি জন্য এত দিন নারী শিক্ষাক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন, সে তর্কের স্থান ইহা নহে, এখন দেখিতে হইবে, কিসে নারীকেও প্রাচীন ঋষিদের উপদেশানুযায়ী "পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ" করিতে পারা যায়।

প্রথমেই বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক। এই বাঙ্গালার—বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীর নারীশিক্ষামন্দির সমূহের সংখ্যা ও অবস্থার তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয় সমূহই সমধিক উন্নত, মুসলমান ও মাড়োয়ারী বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের অবস্থা মন্দ নহে, কেবল হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। ইহার কারণ কি?

কারণ আর কিছুই নহে, যে কারণে বাঙ্গালা বাঙ্গালীর মাতৃভূমি হইয়াও আজ বাঙ্গালায় বিহারী, উড়িয়া, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভিন্-দেশীয়ের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য অধিক, সেই হেতুই বাঙ্গালী হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতি না হইয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর বালিকাবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য সকল জাতিরই জন্য যেমন বিশিষ্ট ব্যবস্থা আছে, তেমনই স্কুল সম্পর্কেও সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা আছে, নাই কেবল বাঙ্গালী হিন্দুর। বাঙ্গালী হিন্দুর যেন মা-বাপ নাই!

খৃষ্টানদের কথাই নাই, কেন না, রাজা খৃষ্টান। সুদূর পল্লীর নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা নারীদিগকে খৃষ্টান মিশনারীরা খৃষ্টান করিতেছেন, আর তাহাদিগকে কলিকাতায় আনিয়া ট্রেনিং স্কুলে ২।১ বৎসর রাখিয়া সার্টিফিকেট দিয়া শিক্ষয়িত্রী তৈয়ার করিতেছেন এবং উহাদের হস্তে দেশের বালিকার শিক্ষার ভার দেওয়া হইতেছে। অথচ ইহাদের বিদ্যার দৌড় বোধোদয় ও ফার্ষ্ট বুক পর্য্যন্ত, কিছু যোগ-বিয়োগ, কিছু ড্রয়িং, কিছু সেলাই ও বুনন, আর কিছু ভূগোল। বস্! এই বিদ্যা লইয়া ইহারা বাঙ্গালার বালিকার শিক্ষার ভার পাইতেছে। অথচ শিক্ষিত উচ্চ ঘরের বাঙ্গালী হিন্দুর দরিদ্র অসহায় অনাথ বিধবা ও কুমারীদিগকে সামান্য চেষ্টায় উত্তম শিক্ষয়িত্রী করা যায়—তাহা করা হইতেছে না। শিক্ষয়িত্রী নাই, শিক্ষার ভার গ্রহণ করে কে? বিশেষতঃ আমাদের দেশের ভাবধারার সহিত যে শিক্ষার কোনও সংস্রব নাই, সেই শিক্ষায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া বাঙ্গালীর মেয়ে গড়িয়া আমাদের লাভ কি? ইহাতে বাঙ্গালীর ছেলে যেমন ধর্ম্মশিক্ষা না পাইয়া কিম্ভুতকিমাকার হইতেছে, আমাদের গৃহলক্ষ্মী জননী-ভগিনীরা যদি সেই ভাবের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন, তাহা হইলে আমাদের নারীদের শিক্ষা না পাওয়াই ভাল। উহাতে কেবল ঘরে অশান্তি ডাকিয়া আনা হয়।

তাহার পর শিক্ষামন্দির পরিপোষণের ব্যবস্থাও চমৎকার। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, মুসলমান, মাড়োয়ারী,—প্রায় সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট সাহায্য (Grant) আদায় করিয়া লইতেছে এবং নিজ নিজ শিক্ষা-মন্দিরের ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া লইতেছে। কেবল বাঙ্গালী হিন্দুর মা-বাপ নাই—তাহাদের জন্য কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত (Grant) নাই, তাহারা কাদায় পড়িয়া শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইতেছে! মহাকালী পাঠশালা প্রভৃতি হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়গুলির অবস্থা দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। অথচ মজা এই, যে সমস্ত খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের নামে স্বতন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করা হয়, সে সমস্ত বিদ্যালয়ে খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম ছাত্রী কয়টি? প্রায়ই ত সব হিন্দু ছাত্রী। কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা কিরূপ হয়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পল্লীগ্রামের হাড়ী-বাগদীর নারীকে ধরিয়া আনিয়া 'ট্রেনিং স্কুলের পাশ' সার্টিফিকেট দিয়া হিন্দু ছাত্রীর শিক্ষয়িত্রী করিয়া দেওয়া হয়, অথবা ব্রাহ্মভাবাপন্না শিক্ষয়িত্রীর উপর শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত হয়। এই সমস্ত বিজাতীয় বিধর্ম্মী অল্পশিক্ষিত শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষার ফল আধুনিক হিন্দু গৃহস্থকে ভোগ করিতে হইতেছে, এমনই বিড়ম্বনা! অথচ এ দিকে হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি পড়ে না কেন, ভাবিয়া বিস্ময়ে, ক্ষোভে, লজ্জায় অভিভূত হইতে হয়। যাঁহারা ছুঁৎমার্গের ঘোঁট পাকাইবার সময় হিন্দুকুল-চূড়ামণির পদবী গ্রহণ করিতে লম্ফ প্রদান করিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের এ দিকে মন নাই। তাঁহাদের ঘরের মা-লক্ষ্মীরা সুশিক্ষিতা সুগৃহিণী হন, ইহা কি তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে?

রেলের কথা

ভারতে রেলের গাড়ী তৈয়ার করায় সকল ভারত সরকারেরই নিজস্ব। সরকার স্বয়ং ভারতে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টি-সাধন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য সরকার জনসাধারণের বহু অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন।

হঠাৎ ভারত সরকার এই শিল্পের পুষ্টি ও পরিণতিসাধনে বিরত হইয়াছেন। সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারের এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। যদি সরকার এই ব্যবসায়টি গড়িয়া পিটিয়া 'মানুষ' করিয়া না-ই তুলিবেন, তবে ইহার সৃষ্টি করিলেন কেন? এ জন্য জনসাধারণের প্রদত্ত 'কষ্টের অর্থ' জলের মত ব্যয়ই বা করিলেন কেন? সার রাজেন্দ্র এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

কেন? সার রাজেন্দ্রের মত ব্যবসায়ে দক্ষ চিন্তাশীল লোক এই সমস্যার উত্তর খুঁজিয়া পান না কি? যখন ভারত সরকার এ দেশে রেলগাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করেন, তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা যদি তিনি তুলনা করিয়া দেখেন, তবেই এ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। তখন জার্ম্মাণদের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টলমল করিতেছে। তখন যেমন করিয়া হউক, যে দিক দিয়া হউক আর যাহার নিকটেই হউক,—বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সাহায্য চাই-ই। তাই সেই সময়ে এই হীন পদানত অবজ্ঞাত ভারতের নিকট হইতেও সাধিয়া তোষামোদ করিয়া লোক ও অর্থ ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। তখন ভারতকে বিশ্বাস করিয়া ভারত হইতে বৃটিশ সৈন্য (মাত্র ১৫ হাজার বাদে) অপসারণ করিয়া লওয়াও সম্ভবপর হইয়াছিল!

তখন ভারত সরকারের বিস্তর মালগাড়ীর প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তখন বিলাত হইতে গাড়ী আমদানী করিবার উপায় নাই—তখন বিলাতের আবালবৃদ্ধবনিতা রণসাজে সজ্জিত, যুদ্ধোপকরণ যোগাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত। কাযেই ভারত সরকার তখন ভারতেই মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য জলের মত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। পাঁচ জনের দ্বারস্থ হইয়া, পাঁচ জনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষ জার্ম্মাণযুদ্ধ জয় করিয়াছেন। এখন আবার বিলাতের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে, বৃটিশ জাতি আবার শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এখন আবার বৃটিশ কারখানার কারিগরদিগের কায চাই। এখন সেখানে মালের অর্ডার দেওয়া চাই। কাযেই এখানে আর মালগাড়ী তৈয়ার করিবার প্রয়োজন নাই।

সার রাজেন্দ্র কি বিলাতের বেকার-সমস্যার কথা এত অল্পদিনেই ভুলিয়া গিয়াছেন? জার্ম্মাণ-যুদ্ধাবসানে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন প্রায় ১০ হাজার বেকার হাইড পার্ক হইতে শোভাযাত্রা করিয়া পার্লামেণ্টের সম্মুখে ও রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে বেড়াইয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষুধার্ত্ত প্রজা যেমন 'রুটী চাই' বলিয়া বুরবোঁ রাজা ষোড়শ লুইএর রাজ-শকটের পার্শ্বে চীৎকার করিয়াছিল, ইংলণ্ডেও প্রায় বেকারদের মধ্যে তদ্রূপ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহার প্রভাব ভারত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রাজস্বসচিব সার ম্যালকম হেইলি ব্যবস্থা পরিষদে প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, বিলাতে বেকার-সমস্যা এত প্রবল হইয়াছে যে, তিনি ভারতের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় দেখিয়াও বিলাতী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক বসাইতে পারিতেছেন না। তাহা ছাড়া বিলাতের বেকার সমস্যার চাপে ভারত সরকার ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে ভারতের রেল ঢালিয়া সাজিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া বিলাত হইতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ টাকার অধিকাংশই বিলাতে বেকারের কার্য্যদানে ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বৃটিশ ব্যবসাদাররা ও কারখানাওয়ালারা সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা ঐ সমস্ত টাকাটাই বিলাতে ব্যয় করিবার নিমিত্ত বায়না লইয়াছিলেন।

বিলাতের চাপেই যে ভারত সরকারকে বিলাতের কারখানাওয়ালাদিগকে ভারতের প্রয়োজনাতিরিক্ত মালের অর্ডার দিতে হয়, তাহা বিলাতের অর্ডারের বহর দেখিয়া জানা যায়। যত মালগাড়ীর প্রয়োজন, তাহার অনেক অধিক অর্ডার বিলাতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার পক্ষে সার চার্লস ইনেস স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, তখন ৫ হাজার মালগাড়ী মিছামিছি বসিয়া ছিল; অর্থাৎ এত গাড়ীর অর্ডার ও যোগান দেওয়া হইয়াছিল যে, ঐ ৫ হাজার গাড়ীর কোন প্রয়োজন ছিল না! এই যে গৌরী সেনের টাকা আময়দা খরচ করা হইয়াছিল, তাহার জন্য দায়ী কি কেহ হইয়াছিল? জলাভাবে বা অন্নাভাবে, ঔষধ-পথ্যাভাবে, শিক্ষার অভাবে প্রজার যতই অসুবিধা হউক, গৌরী সেনের অর্থব্যয়ের কখনও কোন অভাব বা অসুবিধা হয় না, ইহা ত নিত্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইহাতেও কি সার রাজেন্দ্র বুঝেন না, কেন ভারতীয় মালগাড়ী-নির্ম্মাণ ব্যবসায় সরকারের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় না?—কেন সার রাজেন্দ্রের কোম্পানী সরকারের নিকট মালগাড়ী নির্ম্মাণের অর্ডার প্রাপ্ত হয় না?

—

ক্রীড়াকৌতুকেও জাতিবিদ্বেষ

মাসিক বসুমতীর পাঠক জানেন, 'ভারতীয়' হকি খেলোয়াড় দল এবার ওলিম্পিয়ার প্রতিযোগিতায় য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দল সমূহকে পরাজিত করিয়া প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দলের সকল খেলোয়াড়ই খাঁটি ভারতীয় নহেন, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ (জগতের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড) ভারতীয় বটে। আরও কয় জন খেলোয়াড় ভারতীয় হইলেও অবশিষ্ট প্রবাসী ইংরাজ ও য়ুরেশীয়। দলের কাপ্তেন প্রবাসী ইংরাজ। সকলেই বলিতেছে, 'ভারতীয় দল' বিজয় লাভ করিয়াছে। ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তাই তিনি জার্ম্মাণীর কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন,—"আমি শুনিতেছি, এখানকার লোক ভাবিয়াছে যে, আমাদের দল ভারতীয় নেটিব লইয়াই গঠিত। অবশ্য আমাদের দলের অনেকে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ কখনও ভারতের বাহিরে পদার্পণ করেন নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন—যেমন ধ্যানচাঁদ, ফিরোজচাঁদ, কার সিং ও ইউসুফ —খাঁটি ভারতীয়। অবশিষ্ট আমাদের কয় জনের মধ্যে একবারে খাঁটি ইংরাজ-রক্ত প্রবাহিত।" আমরা শুনিয়াছি, ইংরাজ খেলায় জাতিবৈষম্য আনয়ন করেন না। কিন্তু সে বোধ হয়, সুয়েজখালের ওপারে। এপারে এই কলিকাতায়ও আমরা দেখিয়াছি,

খেলাতেও পুরা দস্তর জাতিবৈষম্য অবলম্বিত হয়। ভারতীয়রা নিজের দেশেও খেলাধূলায় নিকৃষ্ট পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং 'ভারতীয়' হকি খেলোয়াড় দলের ইংরাজ কাপ্তেনই বা সেই নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন কেন? যেখানে এমন বিদ্বেষ, এমন ঘৃণা, সেখানে ভারতীয়রা স্বতন্ত্র হইয়া খেলিলে পারেন ত!

গোয়েন্দা-লীলা

সকল দেশের লোকই গোয়েন্দাকে ঘৃণা করে, বিশেষতঃ যে সকল গোয়েন্দা পুলিসের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মিথ্যা রটাইয়া নির্দ্দোষ লোককে রাজনীতিক অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধরাইয়া দেয়, তাহাদের মত হীন, নীচ ও জঘন্য লোক ভূভারতের সকল নিরপেক্ষ ভদ্র ব্যক্তিরই ঘৃণার পাত্র। কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্র সরকারের নিকটে এই জীবটি বড় প্রিয় বলিয়া মনে হয়; না হইলে এই সরকারের বিলাতের ছোট কর্ত্তা আরল উইণ্টার্টন এই জীবকে "পরম উপকারী নাগরিক" বলিয়া সার্টিফিকেট দিবেন কেন? এই জীব পুলিসকে অতি প্রয়োজনীয় গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, এই হিসাবে আরল উইণ্টার্টন ইহাকে উপকারী নাগরিক আখ্যা দিয়াছেন।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এই শ্রেণীর লোক কি ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে, তাহার খবর আরল উইণ্টার্টন রাখেন কি?

কে, সি, ব্যানার্জ্জী এই শ্রেণীর একটি জীব। সম্প্রতি এই ব্যক্তি পঞ্জাবে গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে সরকারের মুখ রক্ষা করা ভার হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে ইহার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে জানা যায়,—এই ব্যানার্জ্জী পিস্তল সমেত লাহোর ষ্টেশনে ধরা পড়ে। বিচারে তাহার ৫ বৎসর সশ্রম জেল হয়। কিন্তু মজা এই, হঠাৎ এই ৫ বৎসরের গুরু কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী মুক্তিলাভ করে। লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্র প্রথমে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। উহাতে প্রকাশ পায় যে, ব্যানার্জ্জী পুলিসের বেতনভুক্ গোয়েন্দা, সে পুলিসের নিকটে পিস্তল পায় এবং ঐ পিস্তলের সাহায্যে নির্দ্দোষ অসতর্ক যুবকগণকে বিপজ্জালে জড়িত করিবার চেষ্টা করে। সে যাহাদিগকে জালে জড়াইয়াছিল, তাহাদের সহিত ধৃত হইয়া দণ্ডিত হয়। এই লোকটা যে পুলিসের গোয়েন্দা, তাহা বিচারককে জানান হয় নাই, তাই তিনি আইন অনুসারে উহাকেও দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

তখন ব্যানার্জ্জী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, পুলিসকে ভয় দেখাইল, যদি তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিবে! পরে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে কি ভাবে গোয়েন্দাগিরি করিত, তাহা সে নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার বিবরণ এইরূপ:—

"আমি যুক্তপ্রদেশে গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের বেতনভুক্ গোয়েন্দা। আমি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই কায করিতেছি। আমি গত আগষ্ট মাসে মিরাটের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টমাসকে, গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা প্রভুদয়ালকে এবং হেড কনেষ্টবল শ্রীশচন্দ্র সিংহকে জানাই যে, মৈনপুরীর মিঃ এন—নামক বিপ্লববাদীর ২টা পিস্তল আছে, অথচ উহার লাইসেন নাই। উপরওয়ালা মিঃ টমাস ও গোয়েন্দা পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব আই,এন,ব্যানার্জ্জীর উপদেশ অনুসারে আমি মিঃ এন—এর সহিত মিশিতে আরম্ভ করি এবং তাহার নিকট হইতে ভিতরের কথা জানিবার চেষ্টা করি; পরন্তু তাহার নিকট হইতে সেই দুইটা পিস্তল আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিই। মিঃ এন—এর কাকোরি ষড়যন্ত্রের সহিত সংস্রব ছিল; আমি ভাণ করিলাম, যেন আমি তাহাদের দলে ভর্ত্তি হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।"

অতঃপর ব্যানার্জ্জীর বিচার ও কারাদণ্ড হয়। তাহার পর ব্যানার্জ্জী বলিয়াছে:—

"গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমায় বলেন যে, 'তুমি আপাততঃ ১ মাসের জন্য জেলে থাক। উহাতে জনসাধারণকে ও বিপ্লববাদীদিগকে দেখান হইবে যে, তুমি যথার্থই বিপ্লববাদী; গোয়েন্দা নহ। যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে যে কায আমরা আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মধ্যপথে নষ্ট হইয়া যাইবে।' আমার বর্ত্তমান অবস্থা এমন হইল যে, আমি হাইকোর্টে সকল কথাই খুলিয়া বলিতে বাধ্য হইলাম। আমি সরকারের কাযে সরকারের পিস্তল লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম। অথচ ইহার জন্য আমায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল!... সরকারী রাজনীতিক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব লালা চুণিলাল আমায় আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, এক মাস আমি জেলে থাকিব. সেই এক মাস আমার খুব যত্ন করা হইবে। অথচ আজও পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার কথা রাখেন নাই।"

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। আরল উইণ্টার্টন ও লর্ড আরউইন কি মনে করেন, এই জাতীয় পুলিস ও গোয়েন্দার উপর নির্ভর না করিলে বৃটিশ ভারতের ভিত্তি শিথিলমূল হইবে? এই পুলিসই যাঁহাদের হস্ত ও চক্ষু, তাঁহারাই বিনা বিচারে নির্দ্দোষ লোককে ইচ্ছামত আটক করিয়া রাখেন!

ভারতের দারিদ্র্য

মিঃ পার্শেল পার্লামেণ্টের সদস্য। তিনি মিঃ হলস্‌ওয়ার্থ নামক বন্ধুর সহিত ভারতে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এ দেশের শ্রমিকের অবস্থা দেখিতে আসাই তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য। তিনি বিলাতে গিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দুইটা দিক আছে। এক দিকে তিনি আসামের চা-বাগিচার কুলীর দুর্দ্দশার কথা জাহির করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়াছেন এবং ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা বলিয়া আমলাতন্ত্র সরকারকে বিষম বিপদে ফেলিয়াছেন, আবার অন্য দিকে বিলাতের পণ্যপ্রসারের অনুকূলেও কথা কহিয়াছেন। আসামের চা-বাগিচার কুলীর দুরবস্থার কথায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিয়াছে, "না, না,—ঐ অবস্থা দেশীয় চা-বাগানে দেখা যায় বটে, বিলাতী লোকের চা-বাগিচার সুন্দর বন্দোবস্ত, মহাত্মা গন্ধী সেই বন্দোবস্তের সুখ্যাতি করিয়াছেন।" অথচ মজা এই,

মহাত্মা গন্ধী বলেন, "আমি এমন সুখ্যাতি কখনও করিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না।" ঠিক এই ভাবেই ভারতের নদ্দামা-ঘাঁটা মিস মেয়ো গন্ধীর দোহাই পাড়িয়াছিল ও অনৃত-বাদিনী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল! ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে মিঃ পার্শেল বলিয়াছিলেন,—"উঃ, সে কি সর্ব্বনেশে অবস্থা! ২৫ কোটিরও অধিক লোক সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্ত থাকে, তাহারা পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য যথেষ্ট ভাতও খাইতে পায় না।" এ কথার জবাব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া খুঁজিয়া পায় নাই, তাই ধান ভানিতে শিবের গীত আনিয়া মুরুব্বীর চালে বলিয়াছে,—"বস্তুতঃ ভারতের সমস্যা রাজনৈতিক নহে, অর্থনৈতিক।" কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা হস্তগত না হইলেও ভারতীয়রা কিরূপে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবে, সে কথা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া বলিয়া দেয় নাই। সিন্দুকের চাবিকাঠি হাতে রাখিয়া অপরকে খরচ করিতে বলাও যাহা, আর আমলাতন্ত্র সরকারের হাতে রাজস্বের সমস্ত কর্তৃত্ব রাখিয়া ভারতবাসীকে ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা-সমাধান করিতে বলাও তাহা!

এ দিকে মিঃ পার্শেল আবার এ কথাও বলিয়াছেন যে, "যদি ভারতবাসীরা যথার্থই একমনে একধ্যানে কাপড়ের কল ও অন্যান্য সরঞ্জামী কল তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কেবল যে বৃটেনের শ্রমিক সম্প্রদায়কে ইহার বেগ সহ্য করিতে হইবে, তাহা নহে, য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়কেও তাহা হইলে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। বৃটেনের এক জন শ্রমিকের সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অল্প বেতন, ভারতের ৬ জন ৮ জন শ্রমিকের তাহাই অধিক বেতন। এই অবস্থায় অর্থাৎ মজুরী যখন এত সস্তা, তখন ভারত শিল্প-বাণিজ্যে নিজের কল-কব্জা নির্ম্মাণ করিয়া প্রসারবৃদ্ধি করিতে থাকিলে আমরা কোথায় দাঁড়াইব? আমরা কি চুপ করিয়া বসিয়া ভারতের এই জাগরণ দেখিব?"

ভারতের ভীষণ দারিদ্র্যে মিঃ পার্শেল ব্যথিত বলিয়া মনে হয়, অথচ ভারত শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা নষ্টগৌরব উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেই লগুড়ের ব্যবস্থা! এ কেমন যুক্তি? এ যুক্তির মর্ম্ম বুঝা ভার।

——

বর্দ্দোলি সত্যাগ্রহ

বর্দ্দোলি সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তালুকের প্রজাবর্গ ও সরকারের যে আপোষের চেষ্টা হইতেছিল, বুঝি তাহা নিষ্ফল হইল। পাঠান অত্যাচার, তালাতি ও পটেলদের পদত্যাগ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদত্যাগ, ব্যবস্থাপরিষদের প্রেসিডেণ্টের সমুচিত প্রতিবাদ, প্রজাগণের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, সমগ্র ভারতের তারস্বরে চীৎকার,—কিছুতেই বোম্বাই লাটের সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না। তাঁহার উপরওয়ালা বিলাতের আরল উইণ্টার্টন যেমন 'স্থানীয় কর্ত্তার' (Man on the spot) উপর সকল ভার ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত, তিনিও তেমনই বর্দ্দোলির জাপ্তি ও মামলাতদার নামধেয় সরকারী ক্ষুদে হুজুরদের উপর এই ব্যাপারের নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন! সার লেসলি উইলসন তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার দোহাই দিতেছেন, বলিতেছেন, ব্যবস্থাপক সভা সরকারের কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহাও এক সুখের, খবর সন্দেহ নাই। সার লেসলি কবে হইতে কাউন্সিলের এমন ভক্ত হইয়া পড়িলেন? আশা করি, তাঁহার এই কাউন্সিল-ভক্তি যে বর্দ্দোলির বিপদের নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মত উবিয়া না যায়। কিন্তু বেশী দিনের কথা নহে, মাত্র ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কাউন্সিল যখন ভোটের জোরে খাজনার হার হ্রাস বা বৃদ্ধির আইন গঠনের পূর্ব্বে একটি কমিটী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সেই কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, পরন্তু কাউন্সিল পুনরায় ভোটের জোরে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সকাউন্সিল গভর্ণর কমিটীর রিপোর্টের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করুন অথবা যত দিন সেই কার্য্য করা না হয়, তত দিন যেন সরকারী কর্ম্মচারীরা নূতন খাজনাবৃদ্ধির হারে খাজনা আদায় স্থগিত রাখেন,—তখন ত সার লেসলির এই কাউন্সিল-ভক্তি উথলিয়া উঠে নাই! বরং কাউন্সিলের এই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের দুইটি মন্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া সার লেসলি বর্দ্দোলি ও অন্যান্য তালুকের বর্দ্ধিত হারের খাজনা আদায় করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। এ কথা কি ভারতবাসী ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছে? তবে এই কাউন্সিলের দোহাই দেওয়া কেন? তাঁহারই এই স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মুন্সী সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, এ কথাও কি সার লেসলি বিস্মৃত হইয়াছেন? এই সদস্য পদত্যাগপত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—"সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি আমার আদৌ সহানুভূতি নাই। তথাপি সরকারের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দর্শনে আমি পদত্যাগ করিতেছি।" এই ধনুর্ভঙ্গ-পণ বোম্বাই গভর্ণর কিছুতেই ছাড়িতেছেন না, পাছে সরকারের 'প্রেষ্টিজ' নষ্ট হয়!

গভর্ণর জিদ ধরিয়াছেন;—(১) পুরাতন বাকীখাজনা সরকারে জমা দিতে হইবে, (২) নূতন বৃদ্ধির টাকাটা কোনও ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে, (৩) সরকার এক বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন, তিনি বর্দ্দোলির ব্যাপারের নূতন করিয়া তদন্ত করিবেন, এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিবেন, তাহা উভয় পক্ষকে মানিতে হইবে। গভর্ণর কেবল এই সর্ত্তে আপোষ করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার আপোষ বন্দোবস্তের আদৌ ইচ্ছা নাই। কেন না, এই সকল সর্ত্ত কোন প্রজাই মানিয়া লইতে পারে না। যাহার জন্য তাহারা নানা ত্যাগ স্বীকার করিয়া সত্যাগ্রহ করিতেছে, দারুণ দুঃখ-বিপদ বরণ করিয়া লইতেছে, সেই মূলনীতি পরিহার করিয়া তাহারা ত আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে পারে না। সার লেসলি এখনও ভাবিয়া দেখিলে পারেন, কোন্ পক্ষের জিদের জন্য বর্দ্দোলিতে অসন্তোষ ও অশান্তি চিরস্থায়ী হইবার উপক্রম করিতেছে।

——

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালা সরকার যাহাই বলুন, বাঙ্গালার স্থানে স্থানে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, আমরা তাহা বলিতে ক্ষান্ত হইব না। সরকারের কর্ম্মচারীরা কি ভাবে 'দুর্ভিক্ষ' কথাটা ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই।

বাঁকুড়া, বীরভূম, খুলনা, বালুরঘাট (দিনাজপুর),—এই ৪টি অঞ্চলেই লোকের দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত। তাহার পর মেদিনীপুরে কংসাবতী নদী (কাঁসাই) ভাসিয়া গিয়াছে বলিয়া তথাকার অধিবাসীর যে নানা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাঁকুড়ায় সোনামুখী কেন্দ্রে ৭ শত তন্তুবায়-পরিবার উপবাস করিতেছে বলিয়া খবর আসিয়াছে।

এ সকল স্থানের দুঃস্থ জনগণকে সাহায্য দান করিতে বাঙ্গালার লোকের ঔদাসীন্য নাই, অনেক স্থলেই দেশকর্ম্মীরা উপস্থিত হইয়া লোকের দুঃখ-বিপদ মোচন করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু বিপদের ও অভাবের অনুপাতে ঠিকমত সাহায্য যে হইতেছে না, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেশবাসীকে এ জন্য অবিলম্বে অবহিত হইতে হইবে।

সরকারও যে একবারে নিশ্চেষ্ট আছেন, তাহা বলিতেছি না; তবে তাঁহাদের হস্তে যখন সরকারী ভাণ্ডারের চাবিকাঠি ন্যস্ত, তখন তাঁহাদের পক্ষ হইতে সমধিক চেষ্টার আশা করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু একটা বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে; সরকার কিছুতেই বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। শুনা যায়, যতক্ষণ লোক গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া না খাইবে, ততক্ষণ তাঁহারা না কি দুর্ভিক্ষ কথাটি মানিয়া লইবেন না, এইরূপ সরকারী কেতা! কোন সরকারী কর্ম্মচারী একবার বলিয়াছিলেন;—"সরকার দাতব্য প্রতিষ্ঠান নহে।" আর এক কর্ম্মচারীর মুখে শুনা গিয়াছিল, "নদীতে মাছ, গাছে ফল আছে। লোকের অভাব কোথায়?" অথচ এই সরকারের সাগর-পারের উপরওয়ালারা সেই দেশের বেকারের অন্ন-সংস্থানের উদ্দেশ্যে ভারতের জন্য মাল যোগাইবার কারখানায় কাযের উপযোগী মালের অর্ডার দিতে কার্পণ্য করেন না!

অন্নকষ্ট খুলনা-বাঁকুড়ায় কম না হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা বালুরঘাটের অবস্থা শোচনীয়। এই স্থানে লোক অনাহারে মরিয়াছে, এবং বাধ্য হইয়া পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়াছে, এমন কথা প্রমাণ-প্রয়োগসহ প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও বহু দুঃস্থ পরিবার উপবাসকষ্ট সহ্য করিতেছে, দেশকর্ম্মীরা প্রত্যক্ষদর্শিরূপে এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। সে সকল বিবরণ হৃদয়বিদারক। উপবাস-কষ্টে অস্থির হইয়া শত শত লোক এতদঞ্চলের নানা দিকে খাদ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কর্ম্মীরা তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, বলিয়া খবর পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাহাদের মুখে চোখে যেরূপ নৈরাশ্যের ও 'মরিয়া' হইবার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এখানে শান্তিভঙ্গ হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। তাহারা আহার্য্য পাইতেছে না, ঋণ পাইতেছে না, চাষবাসেরও চেষ্টা করিতেছে না; কেবল যেন হতাশ হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। বার বার কর্ত্তৃপক্ষের দরবারে আবেদন-নিবেদন করিয়াও আশানুরূপ ফল হইতেছে না। সরকারের পুলিস দুর্ভিক্ষের কথা বলিলে ক্রুদ্ধ হয়; স্থানীয় শাসক দুর্ভিক্ষের কথা মানিতেই চাহেন না।

অবস্থা এইরূপ দেখিয়া কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটীর সদস্য উকীল শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বিশ্বাস প্রায় ৭ শত অনুচর সঙ্গে বালুরঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় উপস্থিত হন। যতক্ষণ না সরকারিভাবে বালুরঘাটে দুর্ভিক্ষ বিঘোষিত না হয়, ততক্ষণ তিনি ও তাঁহার ৪ শত ১৫ জন অনুচর তথায় প্রায়োবেশন করেন। ঝড়বৃষ্টি, রৌদ্র, গ্রীষ্ম কিছু না মানিয়া তাঁহারা সেই স্থানে পড়িয়া থাকেন এবং মাত্র পানীয় জল ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন নাই। জগতের ইতিহাসে এই বালুরঘাট সত্যাগ্রহ অনুপম, ইহার তুলনা নাই। পরার্থে এরূপ আত্মদান এই স্বার্থসর্ব্বস্ব যুগে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনিল বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, বালুরঘাটে অনাহারে লোক মরিতেছে এবং সেই মৃত্যু উপবাসে হয় নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামদাস মুচির স্বীকারোক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যক্তি স্থানীয় চৌকীদার। সে তাহার স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছে যে, ঝলবাহার গ্রামের ফুলু নস্য অনাহারে মারা গিয়াছে। ফুলুর বিধবা পত্নী জাবেদা বেওয়া অনিল বাবুর নিকটে বলিয়াছিল যে, সে তাহার স্বামীর অনাহারের কথা পঞ্চাইতের কাছে (যাহারা সরকারী সাহায্য বণ্টন করে) বলিয়া সাহায্য চাহিতে গিয়াছিল। তাহারা ভিক্ষা দেয় নাই। অপরের নিকটেও সে সাহায্য পায় নাই। তাহার স্বামী 'ভাত' 'ভাত' করিয়া মরিয়াছে। চৌকীদার রামদাস বলে, সে তাহার 'জন্ম-মৃত্যু' বহিতে 'অনাহারে মৃত্যু' লিখিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল; কিন্তু উহাতে থানাওয়ালারা তাহাকে গালাগালি করে, মারিতে উঠে। সে তাহার স্বীকারোক্তিতে আরও বলিয়াছে যে, ১০ নং বিটের দফাদার পূবা চৌকীদারের জন্মমৃত্যু বহিতে একটা অনাহারের মৃত্যুর কথা লিখা হইলে, জমাদার বাবু বলিয়াছিলেন, 'বেটা, এ সব লিখিলে মার খাইবি। চিরকাল যেমন জ্বর-ব্যায়রামে মৃত্যু লিখিস, তেমনই লিখিবি।' তখন বিট সরকার উহা কাটিয়া 'জ্বরে মৃত্যু' লিখিয়াছিল। আমিও তাই দেখাদেখি বাধ্য হইয়া ফুলু নস্যের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে লিখিয়াছি। মালিকরা যাহা চায়, সেই হুকুমে আমাদের কায করিতে হয়।"

এই স্বীকারোক্তি বহু গ্রামবাসী এবং ফুলুর স্ত্রীর সাক্ষাতেই করা হইয়াছিল। সুতরাং বুঝিয়া দেখুন, কি ভাবে অনাহারে মৃত্যুর কথা চাপিয়া রাখা হইতেছে।

যাহা হউক, অনিল বাবুর আত্মত্যাগে কায হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা আপোষে কায করিতে সম্মত হওয়ায় বহু দেশবাসীর অনুরোধে তাঁহারা অনশনব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন। দিনাজপুরের সদর রাজকর্ম্মচারী অন্নকষ্ট দূর করিতে অবহিত হইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। সে বিষয়ে চেষ্টাচরিত্রও হইতেছে।

কিন্তু অনিল বাবুর কথায় প্রকাশ, সরকারী সাহায্য-দানের আশ্বাস এখনও সন্তোষপ্রদ হয় নাই। দিনাজপুরের সিনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজবন্ধু ভৌমিক বলিয়াছেন যে, সরকার ৫০ হাজার টাকা দান করিবেন। অনিল বাবু ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় বলেন, ৫০ হাজার টাকা দূরে থাকুক, ১ লক্ষেও কিছু হইবে না। এখন যদি বালুরঘাটে ১৫ হইতে ২০ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করা হয়, তবেই প্রজা বাঁচিবে; নতুবা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু তুল্য সরকারী সাহায্যে বিশেষ কোন উপকার হইবার আশা নাই।

এ বিষয়ে দেশবাসীরও অবিলম্বে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমাদের মুসলমান দেশবাসীর এ বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। এতদঞ্চলের অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, মুসলমান পক্ষ হইতে সাহায্যের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য বলিলেই হয়। এ কথা স্থানীয় সভায় কোনও বিশিষ্ট মুসলমান বক্তাই বলিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ-প্লাবনের সময়েও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। সেখানেও অধিকাংশ বিপন্নই ছিল মুসলমান, অথচ সাহায্য দান করিয়াছিল সমধিক হিন্দু। দেশমাতৃকার সেবায় মুসলমানের এরূপ ঔদাসীন্য প্রশংসার কথা নহে।

—

সাইমন কমিশন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক কমিটীকে, সাইমন কমিশনের সহিত সমান অধিকার দিতে হইবে, পঞ্জাবের এক শ্রেণীর রাজনীতিক এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ঐরূপ করিলে শাসন-সংস্কার-অনুরাগী ভারতীয়রা পূর্ণান্তঃকরণে কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। সাইমন কমিশন উহার উত্তরে সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতীয়ের কথাই শুনা হইল, তাঁহারা যে গোপনে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা আর করিবেন না, ভারতীয় কমিটীর সমক্ষেই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। এতদ্দারা ভারতীয় কমিটীকে সাইমন কমিশনের সহিত সমান অধিকার দেওয়া হইল, কেন না, তাঁহারাও কমিশনের মত সাক্ষ্য গ্রহণ ও অভিমত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

সার জন সাইমনের এই কথায় সার মহম্মদ সফির দল আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নৃত্য করিবার কি আছে, বুঝা যায় না। প্রথমতঃ গোপনে সাক্ষ্য লওয়ার কথা তুলাই সার জনের মত আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে ঘোর অন্যায় ও বে-আইনী হইয়াছিল। ভারতীয়কে কমিশন হইতে বাদ দিবার সময়ে বলা হইয়াছিল যে, যে হেতু সাইমন কমিশন রাজাদেশে সংস্কার আইনের কার্য্যপদ্ধতির ভালমন্দ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে যাইতেছে এবং ভারতবাসীরা আরও সংস্কার পাইবার যোগ্য কি না বিচার করিতে যাইতেছে, সেই হেতু কমিশনে ভারতবাসীর স্থান হইতে পারে না, কারণ, যাহার বিচার হইবে, সে বিচারকের আসনে বসিতে পারিবে না। ইহাই ত গোড়ায় গলদ। বহু মাস পরে সার জন এইটুকু যে বুঝিতে পারিলেন, ইহাই কি আশ্চর্য্য নহে? আবার যে সকল সাক্ষী 'গোপনে' সাক্ষ্য দিবে, ভারতীয় কমিটী তাঁহাদের সাক্ষ্য শুনিতে পাইবেন না, বা তাহাদিগকে জেরা করিতে পারিবেন না, এমন ব্যবস্থাও হইয়াছিল। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যাহারা সংস্কার-আইনের বিপক্ষে ক্ষতিকর সাক্ষ্য দিবে, এইরূপ সম্ভব, তাহাদিগের সাক্ষ্যই গোপনে গ্রহণ করা হইবে। তাহারা সাক্ষ্য দিবে যে, ভারত এখনও সংস্কার-আইনের যোগ্য হয় নাই এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে আর অধিক স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহাদিগকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক কমিটী কোনও জেরা করিতে পারিবে না, কেন তাহারা এমন কথা বলিতে চাহে, তাহার কৈফিয়ৎ লইবে না। এ ব্যবস্থা কেমন চমৎকার!

এখনই ত দেখা যাইতেছে যে, ভারত সরকার সম্প্রতি সংস্কার আইনের সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার সমূহের মতামত সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বুঝা যায়, প্রাদেশিক সরকার সমূহের (বিশেষতঃ বাঙ্গালাসরকার) অভিমত এই যে, সংস্কার আইন সুফল প্রদান করিতেছে না, সুতরাং আর অধিক সংস্কার প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই ভাবের অভিমত যে সিবিলিয়ান ও শ্বেতাঙ্গ প্রবাসীমাত্রেই পোষণ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমতী বেশাণ্ট ও মিঃ এণ্ড্রুজকে ছাড়িয়া দিলে ভারতে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী য়ুরোপীয় নাই বলিলেই চলে। সে ক্ষেত্রে এই সকল শ্বেতাঙ্গকে ভারতীয় কমিটীর দ্বারা জেরা করিতে দেওয়া কি কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত নহে?

সুতরাং 'গোপন' সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া সাইমন কমিশন বিশেষ কোনও উপকার করেন নাই। তাঁহারা যখন দেখিলেন, রাজভক্ত পঞ্জাবের সফির দলও বিগড়াইয়া যায়, তখন বোধ হয়, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এইটুকু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে কি আমাদের ভারতীয় কমিটীর, সাইমন কমিটীর সহিত সমতা রক্ষা করা হইয়াছে? সাইমন কমিশন রাজাদেশে বসিয়াছে, রাজাদেশে অধিকার লাভ করিয়াছে। সুতরাং রাজাদেশ ভিন্ন অপর কাহারও ভারতীয় কমিটীকে সেই অধিকার দিবার ক্ষমতা নাই ও সাইমন কমিশন নিজে ত সে অধিকার দান করিতে পারেনই না।

সাইমন কমিশন যে রাজভক্ত 'সফির' দলেরও মনস্তুষ্টিসাধন করিতে পারে নাই, তাহা লাহোরের ভাঙ্গা মুসলিম লীগ দলের সম্পাদক সার মহম্মদ ইকবলের পদত্যাগেও জানা যায়। তিনি তাঁহার পদত্যাগপত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "লাহোর মুসলিম লীগ সাইমন কমিশনকে যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে এমন সব প্রস্তাব আছে, যাহার সহিত পঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতিমত মতভেদ আছে। পঞ্জাবে মুসলমান সমাজ পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করেন। এই সামান্য দাবীটাও সার মহম্মদ সফির ধাতুসহ হয় নাই, তিনি সার ম্যালকম হেইলির নির্দ্দিষ্ট স্বায়ত্তশাসনের উপরে অন্য কিছু ধারণা করিতে পারেন নাই।"

ইহা হইতেই বুঝা যায়, সাইমন কমিশন কিরূপে 'সকল বাধা' অতিক্রম করিয়াছে!

—

নারীশিক্ষা-সম্মেলন

গত ২০শে জুন তারিখে ত্রিহুত বিভাগের নারীশিক্ষা-সম্মেলনের, প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় এই বিভাগের প্রায় ৬ শত মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী পি, কে, সেন সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবী অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্তা শিক্ষিতা মহিলা সভায় কার্য্যে যোগদান করিয়া নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আপন আপন মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

বিহারের মত স্ত্রীশিক্ষায় পশ্চাৎপদ প্রদেশে এরূপ সম্মেলন বস্তুতঃই আশাপ্রদ। যেখানে নিম্নশ্রেণীর পুরুষকে তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না, প্রশ্ন করিলে এখনও বলে, "হাঁ, সাদি ত হুয়াই হ্যায়, জরু থোড়া থোড়া চলতে হ্যায়!" সেই বিহার প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হওয়া কতদূর বাঞ্ছনীয়, তাহা এক মুখে বলা যায় না।

সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে শিক্ষাপ্রচার অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারের প্রতি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী বাল্য-বিবাহ, পর্দ্দা, বহুবিবাহ প্রভৃতি মন্দ আচার সমূহ তুলিয়া দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহার পর যাহাতে আমাদের বালিকারা পরে উপযুক্ত গৃহিণী ও মাতা হইতে পারে, তাহার অনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।"

সভানেত্রী মহোদয়ার সাধু উদ্দেশ্যে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু পথিনির্ণয়ে তিনি দূরদর্শিতা বা গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মন সন্দেহমুক্ত হয় না। আগে গাড়ী, তাহার পর ঘোড়া, না আগে ঘোড়া, তাহার পর গাড়ী,—বর্ত্তমানে ইহাই অতীব গুরু সমস্যা। আমাদের দেশের নারীরা যেরূপ অতি অল্পসংখ্যায় শিক্ষিতা, সেই হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে সমাজসংস্কার করিতে গেলে, তাহাতে শুভফল লাভ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অল্পসংখ্যক উচ্চ স্তরের শিক্ষিতা মহিলা যে সংস্কার প্রার্থনা করেন, জনসাধারণ অশিক্ষিত থাকিলে সেই সংস্কারের বিরোধী ভাব প্রকাশ করিবেই। প্রতীচ্যের নারী আমাদের দেশের নারী অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সংখ্যায় শিক্ষিতা, অথচ সেই প্রতীচ্যের শিরোমণি ইংলণ্ডেও বাল্যবিবাহ এখনও পূরা মাত্রায় প্রচলিত। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত কথা নহে, মিঃ আর্ম্ট রবার্টসন নামক ইংরাজ লেখক 'ডেলী মেল' পত্রে এই কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইংলণ্ডে বালিকার বিবাহ হয় না বলিয়া একটা কথা আছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বলা যায়, এ কথা ভ্রমাত্মক। ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী (Tropical) দেশে বালিকা দ্বাদশ বৎসরে দেহের যে পরিণতি ও পুষ্টি লাভ করে, আমাদের এই ইংলণ্ডে বালিকা ১৬।১৭ বৎসরে সেই পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করে। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ ১৮।১৯ বৎসরে বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে। সেই হিসাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বালিকার বিবাহ অসঙ্গত নহে। ১৮।১৯ বৎসরের ইংরাজ-বালিকার বুদ্ধিবৃত্তি ১৩।১৪ বৎসরের প্রাচ্য বালিকার অপেক্ষা অধিক পরিপক্ক হয় না, অথচ ঐ বয়সেই তাহাদিগকে চির-জীবনের সঙ্গী বাছিয়া লইতে হয়। আশ্চর্য্য এই যে, জীবনের এত বড় একটা সমস্যার সমাধান করিবার যোগ্যতা যাহার হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, সেই বালিকাকে সামান্য সাংসারিক ব্যাপারে কোন পরামর্শ দিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় না!

"গত ১ শত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে বিবাহের বয়স কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু নারীর জাগরণ ঐ ১ শত বৎসরে যে পরিমাণে হইয়াছে, সেই পরিমাণে এই বৃদ্ধি নগণ্য। ১৮ বৎসরে বালিকার বিবাহ ইংলণ্ডে এখনও যথেষ্ট দেখা যায়, আর সেই বিবাহে বর পছন্দ করিয়া বালিকা যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।"

সুতরাং যে ইংলণ্ডে নারীজাগরণ নিতান্ত অল্পদিনের নহে, সেখানেও বালিকা-বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে। সুতরাং সেখানেও শিক্ষাপ্রচারের এখনও বিশেষ আবশ্যক। মাত্র ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের নারীর ১৬ বৎসরে বিবাহ হইত (যাহা আমাদের দেশের ১২ বৎসরের সমান), তখন নারীশিক্ষার বিস্তার হয় নাই। তাহার পর ক্রমে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বয়সও বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যায়, এই সমস্ত সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে শিক্ষার বিস্তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

আমাদের দেশেও ক্রমে নারী-শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আপনিই বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। এখন বাঙ্গালী উচ্চশ্রেণীর ঘরে ১৬।১৭ বৎসরে বালিকার বিবাহ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; ১৪।১৫ বৎসরে ত সর্ব্বসাধারণেই হইতেছে। কিন্তু 'থোড়া থোড়া চলতে হ্যায়' বিবাহ বন্ধ করিতে হইলে নারীর মধ্যে প্রথমেই শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। তাহার ভার গ্রহণ করিবেন কে? 'বোধোদয়' ও 'ধারাপাত' অথবা 'মথিলিখিত সুসমাচার' পড়া খৃষ্টান মিশনারী স্কুলের সার্টিফিকেটওয়ালা দেশীয় খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর হস্তেই কি চিরদিন সেই ভার ন্যস্ত থাকিবে? আমাদের শিক্ষিতা মহিলারা এ বিষয়ে কি বলেন?

কলিকাতায় ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট ও পুলিসের ব্যবহার

কলিকাতায় অল্পসময়ের ব্যবধানে পর পর দুইবার ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট হইয়া গেল। ধাঙ্গড় বা ঝাড়ুদারদের অভাব-অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত কি না এবং করপোরেশান কর্ত্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে সুবিচার করিয়াছেন কি না;—তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, তবে এই সম্পর্কে একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। যে জন্যই বিবাদ হউক, করপোরেশান কর্ত্তৃপক্ষ করদাতৃবর্গকে কয় দিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করাইলেন, তাহার জন্য দায়ী কে? সে জন্য কি তাঁহারা করদাতৃগণের ট্যাক্স এক পয়সা কম লইবেন?

তাঁহাদের আদায়ে বা এসেস্‌মেণ্ট নির্দ্ধারণ ও বৃদ্ধিতে পাণ হইতে চূণ খসিবার যো নাই ; কিন্তু এক দিন কল খারাপ হইয়া রাস্তায় জল পড়িলে বা রাস্তায় এক ঘণ্টার জন্য এক ফেরা চূণ ফেলিলে অমনই ৩০ জন কর্ম্মচারীরা দৌড়াইয়া আসে দণ্ড আদায় করিবার জন্য !

আর একটা কথা এই সম্পর্কে বলিবার আছে। ঝাড়ুদার ধাঙ্গড়দের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার প্রভাবতী দাশগুপ্তা নাম্নী সম্ভ্রান্তা শিক্ষিতা মহিলা তাহার প্রেসিডেণ্ট। মেথরদের দাঙ্গা উপলক্ষে তিনি ও তাঁহার সহকারী ধর্ম্মঘট-বিরোধী ধাঙ্গড়দের মারপিট করিয়াছেন, এই অভিযোগে পুলিসের হস্তে গ্রেফতার হইয়াছিলেন। এখন প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই সম্ভ্রান্তা শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাকে সমস্ত রাত্রি থানার হাজতে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাঁহার সহকারীকে চোর-ছেঁচড়ের মত কোমরে দড়ী ও হাতে কড়া লাগাইয়া ছুটাছুটি করা হইয়াছিল, ব্যারিষ্টার ইন্দুভূষণ সেনের মত পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জামীন হইতে চাহিলেও জামীন দেওয়া হয় নাই, পরন্তু শ্রীমতী প্রভাবতীকে সমস্ত দিন অনাহারে রাখা হইয়াছিল।

অভিযোগ যে গুরু, তাহাতে সন্দেহ নাই। করপোরেশানের স্বরাজী পক্ষের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে, করপোরেশানের কোয়ালিশন দলের কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে পুলিস কমিশনার সার চার্লস টেগার্ট এই 'অপ্রত্যাশিত অভূতপূর্ব্ব' গ্রেফতার করিয়াছেন। আমরা কোনও পক্ষভুক্ত নহি। এ জন্ত নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, যদি ধাঙ্গড়দের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মঘটী ধাঙ্গড়রা ধর্ম্মঘট-বিরোধী ধাঙ্গড়দিগকে মারিয়া থাকে, তাহা হইলে করপোরেশান কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসের সাহায্য চাহিতে পারেন। ততোধিক যদি তাঁহারা কিছু করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অপরাধ নাই। যাহারা তাঁহাদের কায অচল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগের বিপক্ষে তাঁহারা পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না কেন ? দস্যু, চোর বা দাঙ্গাকারী গুণ্ডা-বদমায়েসের অত্যাচার নিবারণের জন্ত পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, এমন স্বরাজী বা 'অরাজী' অসহযোগী ত এ যাবৎ দেখি নাই। দেশে বাস করিতে হইলেই নানা কারণে দেশের শান্তিরক্ষকদিগের সাহায্য ও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবেই। সুতরাং পুলিস যদি তাঁহাদের আহ্বানে দাঙ্গাকারী সন্দেহে কাহাকেও গ্রেফতার করে, তবে তাঁহারা সে জন্ত দায়ী নহেন। আর পুলিস যদি ধৃত আসামীকে জামীনে খালাস না দেয় বা আটক রাখিয়া খাইতে না দেয়, কিম্বা কোমরে দড়ী বাঁধে বা হাতে হাতকড়া দেয়,—তাহা হইলেও তাঁহাদের অপরাধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ, তাঁহারা দাঙ্গাকারীদিগকে গ্রেফতার করিবার জন্ত পুলিসকে আহ্বান করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা পুলিসকে আসামীদের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে পরামর্শ বা হুকুম দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি ?

গোল উঠিয়াছে আসামী নারী বলিয়া। এ দেশে নারীকে গ্রেফতার করা যে সহজ কথা নহে, তাহা সিন্ধুবালাদের মামলায় সপ্রমাণ হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন নারী শিক্ষিতা ও উচ্চপদস্থ হন, তখন গোল আরও অধিক। বাসন্তী দেবী যখন ধৃত হইয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালায় কি ভীষণ আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল ? করপোরেশান কর্ত্তৃপক্ষ যদি হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। জানি, বলা হইবে, নারী যখন পুরুষের সমান অধিকারপ্রার্থিনীরূপে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ধর্ম্মঘটীর প্রেসিডেণ্ট-রূপে অবতীর্ণা,—তখন তাঁহাকে পুরুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর দায়িত্বের অংশও বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে। বিলাতের সফ্রেজিষ্ট আন্দোলনে মিসেস ও মিস প্যানকহার্ষ্ট অগ্রণী হইয়া পুলিসের হস্তে বহুবার নিগৃহীত হইয়াছেন, লাঞ্ছনা ও জেল ভোগ করিয়াছেন,—তবে ইংলণ্ডের পুরুষ নারীকে ভোটাধিকার দিয়াছেন। পুরুষের মত এই কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে কি তাঁহাদের আন্দোলন সফল হইত ? আর লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও তাঁহারা একটি দিনও অভিযোগ করেন নাই যে, তাঁহাদের প্রতি অন্যায় বা অত্যাচার করা হইতেছে। এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি এ দেশে ও অন্ত দেশে অনেক প্রভেদ। আমরা আমাদের নারীদিগকে যে দৃষ্টিতে দেখি, অন্য দেশে তাহা দেখে না। আমরা মাতৃজাতির প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান দেখিলে ক্ষিপ্ত হইয়া যাই। কাপুরুষতার জন্ত মাতৃজাতির অসম্মান সহ্য করিয়া যাওয়া স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু প্রত্যেক ভারতীয়ই মনে জানে যে, মাতৃজাতির অপমানের তুল্য জগতে অন্ত অপমান কিছু নাই।

শ্রীমতী প্রভাবতী দাশ গুপ্তা

এই হিসাবে পুলিস প্রভুর এই অপরাধের ক্ষমা নাই। এ বিষয়ে যাহাতে তাঁহার এই কার্য্য গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহার জন্ত আমাদের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। পরন্তু যদি আমাদের করপোরেশান কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়া শুনিয়া প্রভাবতী দেবীর বিপক্ষে পুলিস লাগাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই কলঙ্কের কৈফিয়ৎ কি ?

——

সঙ্গীতজ্ঞের সাংবাৎসরিক উৎসব

বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরসজ্ঞ বেণীমাধব ঘোষ মহাশয়ের সাংবাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রসিদ্ধ গীতবাদ্যাচার্য্যগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে সঙ্গীত, বক্তৃতা আদি হইয়াছিল। যাহাতে বাঙ্গালার এক জন প্রসিদ্ধ গায়কের স্মৃতি-সম্মান রক্ষিত হয়, তাহার জন্য অনেকে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বেণীমাধব ঘোষ

অল্পবয়সে পঠদ্দশাকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বেণীমাধব ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পিতা পরলোকগত রামতারণ ঘোষ মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সংসার-প্রতিপালনের ভারগ্রহণ করিয়া তিনি অল্পবয়সেই চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জন্য অবসরকালে বিদ্যা বা সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে বিরত হন নাই। সঙ্গীতে তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বিশেষ অনুরাগ ছিল। নানা দুঃখ-বিপদের মধ্যে পড়িয়াও তিনি সঙ্গীত-বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যে সেই বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বেণীমাধব বাবু ১২৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৩১৬ সালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস

গত ৩রা আষাঢ় রবিবার পুরীধামের সন্নিহিত তাঁহার সাক্ষি-গোপালের 'সত্যবাদী' আশ্রমে উড়িষ্যার সর্ব্বজনপ্রিয় জননায়ক পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত মার্চ্চ মাসে তিনি 'জনসেবক' সমিতির বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার উদ্দেশে লাহোরে যাত্রা করিয়াছিলেন; তিনি সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হন। ঐ রোগ ক্রমে টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক বিকারে পরিণত হয়; উহা হইতে নিরাময় হইয়া তিনি কলিকাতার উড়িয়া শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশে কলিকাতায় যাত্রা করেন। তখনও তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই; কিন্তু জনসেবা যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি কি অসুস্থ-শরীরেও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? কলিকাতা হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। উহাই তাঁহার অকালে লোকান্তরের কারণ হইয়াছে।

তিনি বহুদিন যাবৎ জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্লাবন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র উড়িয়ার মর্ম্মব্যথা তিনি যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং সে জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এমন আর কয় জন করিয়াছেন? মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত 'সমাজ' পত্র ও তাহার ছাপাখানা 'জনসেবক সমিতিকে' দান করিয়াছিলেন। সত্যবাদী বিদ্যামন্দির জনসেবক সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে, তিনি এইরূপ ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু ন্যূনাধিক ৫০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ধর্ম্মকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন।

বরিশালের সত্যাগ্রহ

বরিশালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শুভ যবনিকাপাত হইল, ইহাতে বাঙ্গালীমাত্রেই পরম আনন্দলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। বরিশালের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান অধিবাসীদিগের শীর্ষস্থানীয়রা আপোষে স্থির করিয়াছেন যে, সকলে সকল সময়ে ধর্ম্মস্থানের সম্মুখে গীতবাদ্যাদি করিয়া শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন, তবে ম্যাজিষ্ট্রেটের আইন অনুসারে শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা আছে, তাহা সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে। সত্যাগ্রহের নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনের ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগেই যে এই 'অসম্ভব' সম্ভব হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও স্থির হইয়াছে যে, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিবেন।

শুভ-বিবাহ

"ভারতবর্ষের" শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সরোজকুমারের সহিত "বসুমতীর" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দীপ্তি দেবীর শুভ-পরিণয়ক্রিয়া আষাঢ়ের ৩০শে তারিখে সুসম্পন্ন হইল। নবদম্পতির জীবনপথে দেবতার শুভাশীর্ব্বাদধারা বর্ষিত হউক। সুগন্ধি পুষ্পসম্ভারে, হাস্য ও গানের ঝঙ্কারে তাহাদের মিলন-রজনী পবিত্র ও সার্থক হউক।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

বসুমতী প্রেস] ডাক-বাঙ্গালা [শিল্পাচার্য্য—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই ।
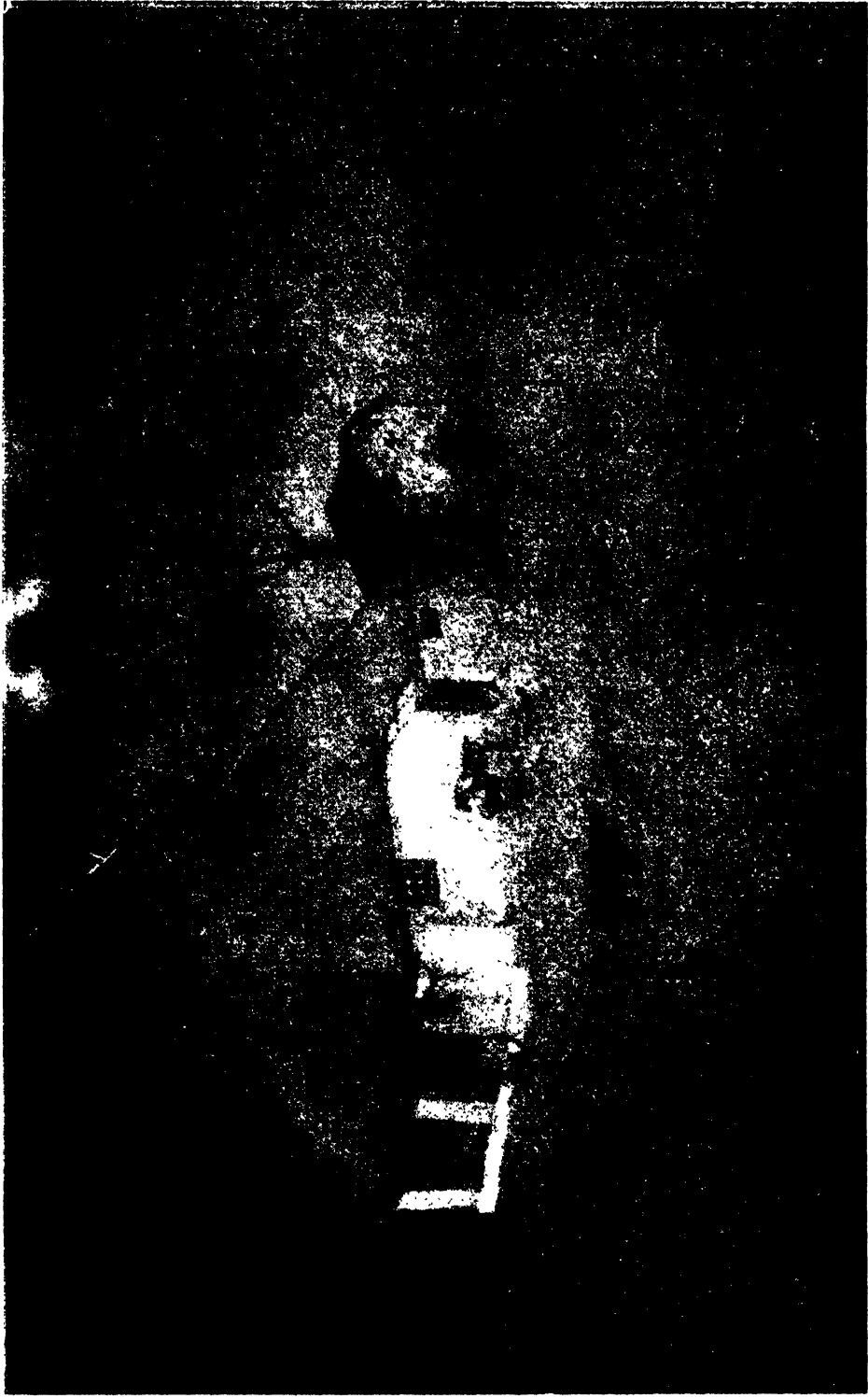
৭ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৫ [৪র্থ সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

বোম্বাই সহর

বোম্বাই সহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য কাল বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল, বোম্বাই সহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলিকাতার যেন কোনও চেহারা নাই, সে যেন যেমন তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরী হইয়াছে।

আসল কথা, সমুদ্র বোম্বাই সহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তাগলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই সহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্ত্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। সহরের এই একটি জানালা ছিল—যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোষাক পরাইয়াছে এবং তাহার কোমর-বন্ধ এমনি কষিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্ত্তি ধরিয়াছে; গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর কোনও বড় কাজ ছিল, তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তুলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল!

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয়, কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের

কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই সহরের ধারে সমুদ্রের মূর্ত্তিটি অক্লান্ত;—যেমন এক দিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে, তেমনি আর এক দিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করিতেছে—ঘোরতর কর্ম্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভাল লাগিল—যখন দেখিলাম, শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্ণের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার সহরে এক ইডেন গার্ডেন আছে—কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আহ্বান নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান, সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু সমুদ্র ত কাহারো তৈরি নহে, ইহাকে ত বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এই জন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই সহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও ত সেই অসঙ্কোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সব চেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায়, তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জ্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি, তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এই জন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্ণে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মত ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে; কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ? বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে, সেখানে কি সরল আনন্দে এক দিনও আমাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইবে না?

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি, কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নহে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা-পরা মারাঠি মেয়েরাও বসিয়া আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারিদিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড় একটা সঙ্কোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্ব্বদা সসঙ্কোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে ষ্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডনপার্ক ও গোলদীঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কি লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা!

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে, তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায়, তাহা নহে, বস্তুতঃ তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি, তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজ-কর্ম্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে, আমার ত তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে পাড়ে, মেয়েদের সাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই, তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে, কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের ত কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে

সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না—পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য। এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে, তবে কত বড় একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর একটা জিনিষ বোম্বাই সহরে অত্যন্ত বড় করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশীলোকের ধনশালিতা। কত পার্সি, মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড় বড় বাড়ীর গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারীতে, এই জন্য তাহা বড় ম্লান। জমিদারীর সম্পদ্ বদ্ধ জলের মত—তাহা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না, তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এই-জন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চয় আছে, তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারী, পার্সি, গুজরাটি, পাঞ্জাবীদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মত—তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিষটাকে আমাদের দেশ সচেতন ভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এই জন্য আমা-দের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্ত্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শৈব

খোঁড়ার পা কি খালেই পড়ে এ কি দারুণ দৈব,
আমার ঘরে অতিথ হলো হঠাৎ কে এক শৈব।
আস্ত পাগল, পাগলা ভোলার চেলার মত মূর্ত্তি,
মুখে তাহার ভস্মমাখা বুকে অপার স্ফূর্ত্তি।

প্রদক্ষিণ সে করলে ভারত কথাটা ঠিক সত্য,
কত দেশের কইছে কথা কত নূতন তথ্য।
কল্‌কাতাতে দাঙ্গাদিনে আঘাত পেয়ে মস্ত,
এসেছে প্রায় হারিয়ে আধেক চরণ এবং হস্ত।

শিবের লাগি যুঝল যে দিন সে-ও ত বীরদর্পে,
রইল অটল, বিমুখ হলো যখন অপর সর্ব্বে।
ঢুকতে কেহই পারলে নাক মন্দিরে তার জন্য,
শৈব ছিল সে দিন হলো বীর বলিয়া গণ্য।

বিধর্ম্মীদের ভীষণ লাঠী রুখলে অবিশ্রান্ত
শক্ত এমন শাক্ত যে সে অন্যে কি তা জান্‌তো।
ভাঙলো কারো পাঁজরা ও শির নড়লো কারো অস্থি
একাই সে যে করলে কাবু একটা গোটা বস্তি।

ভাঙড়ের সে ভক্ত বটেই চায় না গোটা থাকতে,
আপনি হ'ল ভগ্ন তাহার শিবকে গোটা রাখ্‌তে।

* * * * *

সন্ধ্যাবেলায় পড়ছে খোকা ইতিহাসের অংশ,
করলে মামুদ কেমন ক'রে সোমনাথেরে ধ্বংস।

ভাবছি আমি সন্ন্যাসী তার কলকে গাঁজার টান্‌ছে,
দেখছি সে যে ছেলের মত ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে।
কোন্ সে যুগের কুঠারাঘাত কোথায় এসে লাগলো,
কোন্ অতীতের বিষের বীজ আজ কোন্ মাটীতে জাগলো।

কোন্ সুদূরের হাহাকার আজ উঠছে তাহার বক্ষে;
কোন্ সাগরের লবণ-বারি ঝরছে তাহার চক্ষে।
সত্য এরাই যুগের যুগের আপনহারা ভক্ত,
ভাণ্ডায় রাঙ্গা এরাই রাখে দিয়ে বুকের রক্ত।

এরাই নিতি মুখর করে অতীত এবং মূককে,
জীবকে এরাই শিব গ'ড়ে দেয় গৌরব দেয় দুখকে।
এদের ডাকেই দেবতা আসেন জড় সে লভে সংজ্ঞা,
এদের চোখের জোয়ার জলেই আকুল করে গঙ্গা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
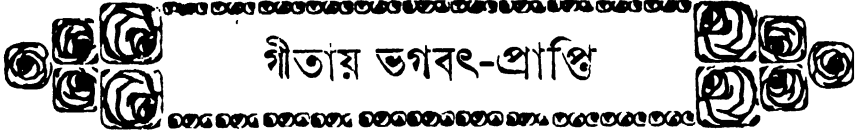
গীতায় ভগবৎ-প্রাপ্তি

ভগবান্‌কে পাইতে হইবে, মানব-জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভগবানের সন্ধান করিতেছে।—ভগবান্ কি, কেমন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে পাইলে কি হয়, এ সব কথা অতি অল্প লোকই উপলব্ধি করে, তথাপি তাহাদের অন্তরের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা তাহাদিগকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইতেছে। যে যে পথেই চলুক না কেন, সকলেই সেই এক ভগবানের দিকেই চলিয়াছে,—"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" জগতে মাঝে মাঝে এমন যুগ আসে, যখন মানুষ ভগবান্‌কে অস্বীকার করে, দেহ, প্রাণ, মনের প্রকৃত ভোগকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলিয়া মনে করে, জীবনের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনে ভগবদুপাসনার, ধর্ম্ম-কর্ম্মের কোন প্রয়োজনই উপলব্ধি করে না; নিজেদের বুদ্ধির জোরে, বাহুর বলেই নিজেদের উন্নতি করিতে চাহে, সমাজের উন্নতি করিতে চাহে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশে আমরা তাহাই দেখিতে পাইতেছি। আমাদের দেশেও কেহ কেহ পাশ্চাত্যের অনুকরণে ধর্ম্মকে, ভগবান্‌কে জীবন হইতে বাদ দিতে চাহিতেছেন, কারণ, তাঁহাদের মতে ধর্ম্মই দেশের, জাতির, সমাজের যত অকল্যাণের মূল! মহামায়ার মায়ায় মানুষ মাঝে মাঝে এমনই অন্ধ হইয়া পড়ে যে, যাহাতে নিজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, তাহাকেই আপদ-বালাই বলিয়া মনে করে। কিন্তু এরূপ ভাব স্থায়ী হইতে পারে না, সত্যকে এই ভাবে চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না। যাহারা মনে করে, ধর্ম্মকে উঠাইয়া দিবে, ভগবান্‌কে বাদ দিবে, তাহারা অতি বড় মূর্খ ও অজ্ঞান। ভগবান্ আছেন, ইহা অপেক্ষা বড় সত্য জগতে আর কিছুই নাই। এই সত্যকে অবহেলা করিয়া, জীবন হইতে, সমাজ হইতে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, ভগবদুপাসনাকে তাচ্ছীল্য করিয়া মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধন কিছুতেই হইতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশের মনীষীরাও ক্রমে ইহা উপলব্ধি করিতেছেন, সর্ব্বত্রই আবার ধর্ম্মের দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষণ দেখা যাইতেছে; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মকে বিদায় দিবার নিমিত্ত আমাদের দেশহিতৈষীরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সকল ভ্রান্ত লোকের চেষ্টায় ধর্ম্মের কোন ক্ষতিই হইবে না, বরং তাহা আরও উজ্জ্বল, আরও ভাস্বর হইয়া উঠিবে।

মানবজাতির মধ্যে এই যে চিরন্তন প্রেরণা, ভগবান্‌কে লাভ করিবার বাসনা, ইহার অর্থ কি? কেন মানুষ ভগবান্‌কে চাহে? ভগবান্‌কে পাইলে কি হয়? সাধারণে ইহার কিছুই বুঝে না, তাহাদের প্রাণে একটা প্রেরণা আছে, অন্ধভাবে তাহার দ্বারাই চালিত হয়। যখন কেহ আসিয়া বলে, ভগবান্‌কে আমি জানিয়াছি, তোমরা এই সব আচরণ কর, এই ভাবে উপাসনা কর, তাহা হইলেই তোমাদের পারলৌকিক কল্যাণ হইবে, তখন তাহার কথায় যাহাদের বিশ্বাস হয়, তাহারা তাহাকে অনুসরণ করে। এই ভাবে জগতে বহু ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সকল ধর্ম্মই বলে, আমরাই ঠিক পথটি ধরিয়াছি, আমাদের পথে চলিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে, অন্য পথে গেলে সর্ব্বনাশ, অনন্ত নরক ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দু ইহা বলে না, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। হিন্দু বলে, যে যে ভাবে উপাসনা কর, যে নামেই ভগবান্‌কে ডাক, যে মূর্ত্তিরই পূজা কর, যদি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ঠিক থাকে, আন্তরিকতা ঠিক থাকে, তাহা হইলে উহা হইতেই আপন আপন যোগ্যতা অনুযায়ী ফল সকলে লাভ করিবে, এক ভগবান্‌ই সকলের সেই ফলের বিধান করিয়া দিবেন।

> "স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
> লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥"
>
> গীতা ৭।২২

পূজা, অর্চ্চনা, উপাসনা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা—এই সব যদি ঠিকভাবে করা যায়, তাহা হইলে মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হয়, মানুষের চিত্ত-মন ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়। কিন্তু কেবল এই সকলের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। গীতা বলিয়াছেন, বেদত্রয়-বিহিত যজ্ঞাদির দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যাহারা স্বর্গে গমন করে, তাহারাও ভগবান্‌কে পায় না; তাহাদের পুণ্যের ফল যত দিন থাকে, তত দিন স্বর্গভোগ করিয়া আবার তাহাদিগকে মর্ত্ত্যলোকেই ফিরিয়া আসিতে হয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ ভগবান্‌কে পাওয়া; এই মর্ত্ত্যের

জীবনে, এই মানবদেহেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইবে। যত দিন এই পরমকল্যাণ সে লাভ করিতে না পারিতেছে, তত দিন মানুষকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং এই ভাবে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কেবল সদাচারের দ্বারা, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা, যাগ-যজ্ঞ-তপস্যার দ্বারাই এই পরমা গতি লাভ করা যায় না। এ সকলের খুব উচ্চ ফল আছে। তাহা উচ্চতম কল্যাণ নহে এবং তাহা স্থায়ীও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কেহ যদি পরিশ্রমের দ্বারা ধন অর্জ্জন করে, তবে সে কিছু দিন সেই ধন ভোগ করিতে পারে বটে, কিন্তু ভোগের দ্বারা সে ধন ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, তখন আবার তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে পাইয়াছে, সে সবই পাইয়াছে, সে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে, অনন্তকাল ভোগ করিলেও আর তাহার ক্ষয় নাই, তাহাকে আর পুনঃপুনঃ কষ্ট করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে হয় না, সে চির-মুক্ত, চির-পবিত্র, চির-আনন্দময়।

অতএব যাহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান্, তাহারা তুচ্ছ দ্রব্যলাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া, একবারে ভগবান্‌কেই লাভ করিতে চাহে। যাহাদের বুদ্ধি অল্প, "অল্পমেধসাম্", তাহারাই তুচ্ছ-ভোগের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া হয়রাণ হয়। কিন্তু ভগবান্ কি? তাঁহাকে কেমন করিয়া লাভ করা যায়? ভারতের ঋষিগণ সাধনার বলে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া এ সম্বন্ধে যে সত্যজ্ঞান পাইয়াছিলেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গ্রন্থসমূহে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। কেবল বেদাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়াই উহা সনাতন সত্য নহে, যে কেহ সাধনার দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবে, সেই ব্যক্তিই নিজ হৃদয়ে ঐ সত্যের দর্শন পাইবে, এই জন্যই উহা সনাতন সত্য। ভগবান্ সকলের হৃদয়েই রহিয়াছেন, সমস্ত জ্ঞান তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায়, বেদাদি-শাস্ত্র কেবল সেই সনাতন সত্যের বাঙ্ময় রূপ, শব্দব্রহ্ম।

> "—সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
> মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্—"

সকল জ্ঞানের, সকল বেদের মূল ভগবান্ যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাঁহার বাণী কেমন করিয়া শ্রবণ করা যায়, কি উপায়ে 'জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা' ভিতর হইতেই উজ্জ্বল জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া সব অন্ধকার, সকল অজ্ঞান দূর হয়, গীতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে সেই তত্ত্ব, সেই সাধনারই বর্ণনা আছে। এ সব সত্য প্রত্যক্ষ, এই সত্যের অনুসরণে পরম আনন্দ, এই সত্যের অনুসরণ করাই সকলের কর্ত্তব্য। "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।" সেই সত্য কি?

এক ভগবান্‌ই সত্য, এ সংসারে যাহা কিছু আছে, সবই ভগবান্, "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্।" ভগবান্ নিজের প্রকৃতিকে, চৈতন্যশক্তিকে ধরিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই প্রকৃতি অংশরূপে প্রত্যেক জীবে বিদ্যমান। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ভগবৎসত্তা রহিয়াছে—গুপ্তভাবে, বীজভাবে রহিয়াছে। সেই সত্তাকে প্রকট করিতে হইবে, প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাই বিশ্বলীলা, জীবলীলা। ভগবানের প্রকৃতিই এই লীলা প্রকট করিতেছেন, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্বয়ং ভগবান্ এই লীলাকে পরিচালিত করিতেছেন (ময়াধ্যক্ষেণ), এই লীলার আনন্দ গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাবে প্রত্যেক জীবের মধ্যে তাঁহার ভাগবত সত্তা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সকল সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীব ক্রমশঃ ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

তাহা হইলে ভগবান্‌কে লাভ করার অর্থ কি? সর্ব্বভূতের হৃদয়েই ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, ভগবানের মধ্যেই সকলে বাস করিতেছে, ভগবান্‌কে ছাড়া এ সংসারে কোন কিছু মুহূর্ত্তের জন্যও থাকিতে পারে না, "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব,"—অতএব ভগবান্‌কে আবার নূতন করিয়া কি ভাবে পাইতে হইবে? প্রত্যেক জীবই ত ভগবানের অংশ, আত্মায় সকলেই ভগবানের সহিত এক, আত্মা এক ভিন্ন আর দুই নাই, তাহা হইলে ভগবান্‌কে পাইতে হইলে আবার কোথায় যাইতে হইবে? মূলতঃ সকলেই ত ভগবান্, "তত্ত্বমসি।"

ইহার উত্তর এই যে, আত্মায় সকলে ভগবানের সহিত এক বটে, কিন্তু প্রকৃতিতে বিভিন্ন। প্রত্যেক জীবে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, তাহা ভাগবত প্রকৃতির অংশ হইলেও বিকৃত, অবিকশিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাই সেখানে চলিতেছে ইচ্ছা-দ্বেষের খেলা, জন্ম-মৃত্যু, দ্বন্দ্ব-মোহ, সুখ-দুঃখের খেলা—এক কথায়, অজ্ঞানের খেলা, অবিদ্যার খেলা বা

মায়ার খেলা। সাধারণ মানুষের জীবন ইহাই, গীতাতে ইহাকেই ত্রিগুণের খেলা বলা হইয়াছে এবং অর্জ্জুনকে এই নীচের খেলা ছাড়িয়া উপরে উঠিতে বলা হইয়াছে, "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ভগবান্ সকলের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু এই অবিদ্যা মায়ার খেলার জন্য সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, চিনিতে পারে না, "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" এই মায়ার আবরণ দূর করিয়া ফেলিতে হইবে, আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে বাসুদেব বিরাজ করিতেছেন, সাম্‌নাসাম্‌নি তাঁহাকে দেখিতে হইবে, চিনিতে হইবে। আমাদের হৃদয়-রথের এই চির-সারথি সম্মুখে প্রকট হইয়া গুরুরূপে, সখারূপে, সুহৃৎরূপে আমাদিগকে পরিচালিত করিবেন, জ্ঞান দিবেন, শক্তি দিবেন, প্রেম দিবেন—ইহাই পরমা গতি, ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি।

ভগবান্ আমাদের অতি নিকটে থাকিয়াও অতি দূর হইয়া রহিয়াছেন, কেবল এই মায়ার জন্য। এই মায়ার আবরণ ভেদ করা অতিশয় কঠিন, 'দুরত্যয়া।' সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণকে অতিক্রম করিতে না পারিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। যাহাদের মধ্যে তমঃ খুব প্রবল, যাহাদের মধ্যে অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞান অতি গভীর, তাহাদের নিকট হইতে ভগবান্ বহু দূরে, দিব্যজ্যোতিঃ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে তাহারা জীবন যাপন করে। রজোগুণের দ্বারা তামসিকতা নষ্ট হয়, কাম-ক্রোধের দ্বারা চালিত হইয়া মানুষের জড়তা, আলস্য, অপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়, মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা আলস্য, অনুদ্যম, অজ্ঞান ও ভয়ের বশে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, নিজেদের উন্নতির জন্য, ভোগের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য এতটুকু চেষ্টা করিবার যাহাদের প্রবৃত্তি নাই, কোনরূপ কষ্ট সহ্য করিবার, সংগ্রাম করিবার, বিপদ মাথায় করিবার যাহাদের সাহস নাই, গতানুগতিক-ভাবে বাঁধা পথে চলিয়া কোনরূপে যাহারা জীবনটিকে কাটাইয়া দিতে চাহে, সংসারের মধ্যে তাহারা অধমের অধম। ভোগৈশ্বর্য্যের জন্য অবিশ্রান্ত যাহারা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, "যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে নূতন করিয়া গড়িতে" চাহিতেছে,—

গিয়া সিন্ধু-নীরে ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে
গিরি উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে—

স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারা আরও উপরের স্তরের, রাজসিক স্তরের মানব। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশে এই শ্রেণীর মানুষই অধিক এবং আমাদের দেশে এখনও অধিকাংশ লোক হীন তামসিকতার স্তরেই পড়িয়া রহিয়াছে। তামসিকতার বশে জীবন-যুদ্ধে বিমুখ হইয়া যাহারা মনে করে যে, তাহারা বড়ই অহিংস, ধার্ম্মিক, আধ্যাত্মিক, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কুরুক্ষেত্রের মহাসন্ধিক্ষণে ক্ষত্রিয়বীর অর্জ্জু-নের মধ্যে সহসা এইরূপ তামসিকতার লক্ষণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া উঠিয়াছিলেন, "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ।"

কিন্তু দিব্য জীবন লাভ করিতে হইলে, ভগবান্‌কে পাইতে হইলে তামসিকতাকে যেমন ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, রাজসিকতাকেও তেমনই অতিক্রম করিতে হইবে। তামসিকতার লক্ষণ অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি; রাজসিকতার লক্ষণ কাম, আসক্তি, বাসনা। এই কামই যত অনিষ্টের মূল। মানুষ সংসারে যত অন্যায়াচরণ করে, পাপ করে, তাহার মূলে আছে বাসনা, কামনা,—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ।" আবার যাহারা পাপাচরণ করে, তাহারা ভগ-বান্‌কে পায় না,—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

এই জন্য গীতাতে সর্ব্বপ্রথমেই বলা হইয়াছে, কামকেই পরম শত্রু বলিয়া জানিবে, "হে মহাবাহো, কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে সংহার কর।"

সত্ত্বগুণের দ্বারা এই মহাশত্রু কামকে দমন করিতে হইবে। যাহারা কাম-ক্রোধের বশেই চালিত হয়, মায়া তাহাদের জ্ঞানকে হরণ করিয়া লয়, তাহারা আসুরভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, ভগবান্‌কে লাভ করা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। কিন্তু যাহারা বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা শুভাশুভ, পাপ-পুণ্য নির্ণয় করে, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে কাম-ক্রোধকে সংযত করে, বাসনার বশে কর্ম্ম না করিয়া কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়াই কর্ম্ম করে, তাহারাই সাত্ত্বিক, "সুকৃতিনঃ"; তাহাদের হৃদয়মন ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়।—এইরূপ সুকৃতিশালী লোকই ভগবান্‌কে ভজনা করে।

"সুকৃতিনো জনা মাং ভজন্তে।"

কিন্তু শুধু সুকৃতির দ্বারা, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। সত্ত্বের আবরণও আবরণ, যদিও তাহা খুব সূক্ষ্ম আবরণ। অর্জ্জুনের মধ্যে সত্ত্বের খুবই বিকাশ ছিল, তিনি বুদ্ধিমান্, সংযমী, চরিত্রবান্, স্বধর্ম্মপরায়ণ, আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই, বিষম সন্ধিক্ষণে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সত্ত্বরাজসিক ক্ষত্রিয়বীর হইয়াও সহসা ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব শুধু সাত্ত্বিকতাতেই মুক্তি নাই, সত্ত্বেরও উপরে উঠিতে হইবে, মায়ার আবরণ সম্পূর্ণভাবে ভেদ করিতে হইবে, হৃদিস্থিত ভগবানের সাক্ষাৎসংস্পর্শে আমাদের ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য পরা প্রকৃতির স্বরূপ লাভ করিতে হইবে, তখন নীচের প্রকৃতির তমঃ হইবে দিব্য শান্তি, রজঃ হইবে দিব্য তপঃশক্তি, সত্ত্ব হইবে দিব্য আনন্দ, দিব্য জ্যোতিঃ—ইহাই দিব্য জীবন, ইহাই ভগবৎ-প্রাপ্তি।—তখন আর আমাদের পতনের আশঙ্কা থাকিবে না, তখন মানসিক যুক্তিতর্ক করিয়া আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে না, দিব্যজ্ঞানের সূর্য্য হৃদয়মাঝে উদিত হইয়া আমাদের সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিবে। তখন সংসারের কোন গুরু দুঃখই আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অচল, অক্ষর, নিত্য, সনাতন আত্মার অটুট শান্তিতে আমাদের দেহ, প্রাণ, মন পূর্ণ থাকিবে। তখন কষ্ট করিয়া, চেষ্টা করিয়া, লাভালাভ পাপপুণ্যের বিচার করিয়া আমাদিগকে কোন কার্য্য করিতে হইবে না। ভগবানেরই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছা আমাদের প্রকৃতিকে, স্বভাবকে শুদ্ধ যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া জগতে ভগবদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভগবদিচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা মিলিত হইবে। তখন ক্ষণিক দ্বন্দ্ব-পূর্ণ—মলিনতাপূর্ণ সুখের জন্য আমাদিগকে তুচ্ছ ভোগের পশ্চাতে ছুটিতে হইবে না। ভগবানের বিশ্বলীলার যে আনন্দ, আমাদের শুদ্ধ, বুদ্ধ, শান্ত, শক্তিমান আধারে সেই দিব্য আনন্দ উপর হইতেই নামিয়া আসিবে। তখন আমরা হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে পাইব, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক ঘটনায় সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে ভগবান্‌কে দেখিব—"একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।" গীতার মতে ইহাই ভগবৎ-প্রাপ্তি।

কিন্তু যতক্ষণ আমরা ত্রিগুণের উপরে উঠিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ এইরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। তাহার উপায় ভগবান্ নিজমুখে বলিয়া দিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

ইহাই গীতাশিক্ষার সার কথা। ত্রিগুণময়ী অবিদ্যামায়ার আবরণ ভেদ করিতে হইবে এবং ইহার একমাত্র উপায় ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া।—কিন্তু শুধু মুখে "আমি তোমার শরণাগত," "ত্বাম্ প্রপন্নম্," বলিলে চলিবে না।

ভূমি, ধান্য, ধন, কামিনী কাঞ্চন,
যশঃ মান প্রাণ সদা চাহে মন
আমি হেলায় বলি হরি, "তুমি হে আমারই"—
লোকে যাতে আমায় সাধু কয়!

তাহা হইলে চলিবে না, দেহ, প্রাণ, মন, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ইচ্ছা ও কর্ম্ম ভগবন্মুখী করিতে হইবে।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

ইহা সহজ ব্যাপার নহে।—আমাদের মন-প্রাণ, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা বাহিরের দিকে ছুটিতেছে, বুদ্ধিবিবেকও টানিয়া লইয়া নিজেদেরই তুচ্ছ ভোগক্রীড়ায় আসক্ত করিয়া দিতেছে। ভগবান্ কে, কোথায় আছেন, জানি না, তাঁহাকে পাইলে কি হইবে, বুঝি না, কিন্তু বাহ্যজগতে, চক্ষুর সম্মুখে ভোগের, সুখের, তৃপ্তির অসংখ্য বস্তু রহিয়াছে—এই সব ছাড়িয়া ভগবানের দিকে, আত্মার দিকে মন দেওয়া কি সহজ? তাই,

ডাকতে হয় তোমায় ডাকি,
কিন্তু, বিষয় নিয়েই থাকি,
ফাঁকি দিয়ে কি তোমায় পাওয়া যায়!

না; ফাঁকি দিয়া, মুখে কয়েকবার "হরি" "হরি" বলিয়া, সকাল-সন্ধ্যা নিয়মমত গায়ত্রী জপ করিয়া আর দুই চারিটা দান-ধ্যান সদাচার করিয়াই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যে আর সব কিছু ছাড়িতে না পারে, সে ভগবান্‌কে পায় না। কিন্তু যে ভগবান্‌কে পায়, তাহার আর পাইতে কিছুই বাকী থাকে না, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাহার সর্ব্বার্থ সাধিত হয়, ভগবান্ স্বয়ং তাহার যোগক্ষেম বহন করেন।

ভগবান্‌কে পাইতে হইলে সব ছাড়িতে হইবে,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"—কিন্তু এই গুহ্যতম কথা গীতা প্রথমেই বলেন নাই, সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন। কারণ, কর্ম্মের দ্বারা যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অন্তর আলোকিত হয় নাই, এইরূপ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। তাই গীতা ভগবান্-লাভের সহজ সাধনা দেখাইয়াছেন। মানুষ স্বভাবতঃ কর্ম্ম চাহে, জ্ঞান চাহে, প্রেম চাহে। গীতা বলিয়াছেন, কর্ম্ম-পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম কর; কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে, ভগবানের দাস হিসাবে, যন্ত্র হিসাবে, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম কর। জ্ঞানের চেষ্টা করিয়া ভগবান্‌কে সমগ্রভাবে জান; তুমি কে, ভগবান্ কি, জগৎ কি, ভগবানের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি, জগৎলীলার নিগূঢ় রহস্য কি,—তাহা অবগত হও। ভগবান্ তোমার হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতের মধ্যেও রহিয়াছেন, অতএব সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেম কর, সর্ব্বভূতের হিতসাধন কর। এই ভাবে ক্রমশঃ চিত্ত, মন ও প্রাণকে সর্ব্বতোভাবে ভগবন্মুখী কর,—তাহা হইলেই ভগবান্‌কে পাইবে—

> "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি তে সত্যং প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"
>
> গীতা ১৮অ, ৬৫।

ইহাই গীতোক্ত সাধনা, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়। গীতায় অর্জ্জুনকে এই পথই প্রদর্শন করা হইয়াছে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, অর্জ্জুন কর্ম্মবীর, অতএব কর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু এই কর্ম্মযোগই গীতার চরম কথা নহে, ভক্তি বা আত্মসমর্পণই চরম কথা। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়,—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। আবার যে ব্যক্তি পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিয়াছে, ভগবান্‌কে যে ঠিক ভাবে জানিয়াছে, তাহার ভক্তি আপনা হইতেই আইসে,—"স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।" সার কথা, এই ভক্তি। ভগবান্‌কে যে একান্তভাবে ভজনা করিতে পারিবে, সে কর্ম্মীই হউক আর অকর্ম্মীই হউক, জ্ঞানীই হউক আর অজ্ঞানীই হউক, সেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবে। ভগবান্ আমাদের হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন, মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া অনন্যচিত্তে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিতে পারিবে, সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বদা এই মায়ার আবরণকে দূর করিতে চাহিবে, ভগবচ্ছক্তি উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সেই আবরণ ভেদ করিয়া দিবেন, তাহার অবিদ্যামায়াই বিদ্যামায়ায় পরিণত হইবে। ভগবান্ শ্রীমুখে অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন—"তুমি সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব, তোমার কোন ভাবনা নাই, "অহং ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি।" আমরা অবিশ্বাসী, আমরা ক্ষুদ্রমতি, সংসারে পদে পদে ব্যর্থ হইয়া, পদে পদে দাগা পাইয়া আমাদের মন সংশয়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাই ভগবানের এই মহান্ প্রতিজ্ঞাবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি না। "অনিত্যম্ অসুখম্", এই সংসারের অজ্ঞান খেলায় পড়িয়া থাকিয়া অশেষ দুঃখ, শোক, লাঞ্ছনা ভোগ করি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সকলকেই যে কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে হইবে, গীতায় এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। বরং কর্ম্মত্যাগের দ্বারাও ভগবানকে লাভ করা যায়, এ কথা গীতা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। যাহার স্বভাব যেরূপ, প্রকৃতি যেরূপ, সেইভাবে সাধনা করাই তাহার উপযোগী, স্বধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ না ধরিয়া কেবল ভক্তি বা আত্মসমর্পণের দ্বারা সাধনা করিয়াছিলেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলিতেন, "জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।" কলির জীবের মুক্তির জন্য তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত যজন-যাজন প্রভৃতি বর্ণধর্ম্মের পালন করিয়া ভগবানের উপাসনা করেন নাই, বেদ-বেদান্তাদি জ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া ভগবানের সন্ধান করেন নাই, তিনি একান্তভাবে আত্মসমর্পণের সাধনা করিয়াছিলেন। সাধকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে নিজে বলিয়াছেন—"আমি মা'র কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে ক'রে মা'র পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায়

শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

যাহারা কোনরূপ ফলের কামনা করিয়া ভগবানের উপাসনা করে, তাহাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে, বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ং তাহাদের সেই ফল প্রদান করেন। কিন্তু যাহারা আর কিছুই চাহে না, শুধু ভগবান্‌কেই চাহে—তাহাদের ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি। যাহাদের মনে ভগবান্ ছাড়া আর কিছু স্থান পায় না, সকল সময়েই যাহারা হৃদিস্থিত ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য, পাইবার জন্য কামনা করিতেছে, ভগবান্ নিজে আসিয়া তাহাদের নিকট ধরা দেন। তাহাদের নিকট তিনি অতি সুলভ—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

গীতা বলিয়াছেন, যাহারা পুণ্যবান্, সদ্বংশজাত, সদাচার-পরায়ণ কেবল তাহারাই যে ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে, তাহা নহে—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

যদি কোন অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমার দিকে ফিরিয়া সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া একমাত্র আমাকেই ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। কারণ, তাহার বুদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধ্যবসায় উত্তম। সে ব্যক্তি অতি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং অনন্ত শক্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমার যে ভক্ত, তাহার বিনাশ নাই। হে পার্থ, নীচকুলজাত ব্যক্তি, স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্র—ইহারাও যদি আমার শরণাগত হয়, তাহা হইলে পরমগতি লাভ করে।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ও শৌর্য্য ও লোকহিতকর কর্ম্ম,—এ সকলের মূল্য আছে, কারণ, এই সমস্ত থাকিলে মানুষের পক্ষে ভাবগত জীবনের আদর্শ অনুসরণ করা এবং পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু এ সব কিছু না থাকিলেও অন্তরের মধ্যে ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া যদি কেহ ভগবান্‌কে একান্তভাবে কামনা করিতে পারে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভগবান্‌কেই ভালবাসিতে পারে, ভক্তি করিতে পারে, "আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমাকে চাই", এই ভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে উপরের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে, "আমার মায়ার আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন হউক, আমি অন্তরের মধ্যে ভগবানের দর্শন ও স্পর্শ পাই", সর্ব্বদা এই প্রবল আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে পারে, স্বয়ং ভগবান্ তাহার অজ্ঞান দূর করিয়া দেন, তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তাহাকে নিজের অঙ্কে স্থান দেন, "ময্যেব নিবসিষ্যসি।" ভগবানের নিকট সকলেই সমান, তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পাপি-পুণ্যবান্, উচ্চ-নীচ, জ্ঞানি-অজ্ঞান কোন ভেদ নাই। তিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না, কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই, যে তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতে পারিবে, সে তাঁহাকে তেমনিই নিজের হৃদয়ের মধ্যে পাইবে।

—"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

সমাজ স্ত্রীলোককে যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর বিধি-নিষেধের যে অসংখ্য বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকের আত্মা বিকশিত হইতে পায় না, তাহার মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। বৈশ্য দিবারাত্রি ধনচিন্তা করিয়া এবং ধনোৎপাদনেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়া সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া পড়ে, তাহার দৃষ্টি উপরের দিকে যাইতে পায় না। চিরকাল পরের দাসত্ব করিয়া এবং সমাজের নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া শূদ্রের মন ক্ষুদ্র হইয়া যায়, উচ্চ-জীবনলাভের কোন আশা তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে যাহারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, সমাজের সকল শিক্ষাদীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদা হীন সংসর্গে কুৎসিত পরিবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া তাহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে। এই সব ব্যক্তির পক্ষে ভগবান্ লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি যদি

তাহারা ভগবানের দিকে মন ফিরাইয়া ভগবানের ভজনা করিতে পারে, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাদের মুক্তির পথ সুগম হয়। যে যত হীন, যত ক্ষুদ্র, যত পাপী ও অশুচি হউক না কেন, ভগবানের মন্দিরের দ্বার কাহারও নিকটে রুদ্ধ নাই। ভক্তিভাবে যে ভগবান্‌কে ডাকিবে, সেই তাঁহাকে লাভ করিবে। ভগবান্‌কে যে যেমন ভালবাসিবে, ভগবান্ ঠিক তেমনই তাহাকে ভালবাসিবেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিবার যে সঙ্কল্প ও ইচ্ছা, তাহার বলে আত্মার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, ভগবানের শক্তি পূর্ণভাবে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয় এবং সেই শক্তি তাহার দেহ, প্রাণ, মনের সমস্ত দোষ, গ্লানি, অপূর্ণতা দূর করিয়া দেয়, তাহার প্রকৃতিকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে দিব্য জীবন প্রদান করে। শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত এই ভাগবতশক্তিকে নিজের মধ্যে আহ্বান করিতে হইবে এবং ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাহার পর যাহা করিবার, ভগবান্ নিজেই করিয়া দিবেন। ভগবান্ ও মানুষের মধ্যে যে মায়ার আবরণ রহিয়াছে, আত্মসমর্পণের শক্তিতে সেই আবরণ দূর হইয়া যায়, সকল বাধা, সকল ভ্রান্তি বিনষ্ট হয়। যাহারা নিজেদের মানবীয় শক্তির বলে জ্ঞানের দ্বারা বা পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা বা কঠোর তপস্যার দ্বারা দিব্য জীবন লাভ করিতে চাহে, তাহাদিগকে প্রতি পদে সংশয়ের সহিত অতি কষ্টেই অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু আমরা যখন নিজের অহংকে এবং অহংএর সমস্ত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট উৎসর্গ করি, নিজেদের সমস্ত ভার ভগবানে অর্পণ করি, নিজের জন্য কিছু রাখি না, কিছু চাহি না, কিছু ভাবি না, তখন ভগবান্ নিজে আমাদের নিকটে আসেন এবং আমাদের ভার গ্রহণ করেন। অজ্ঞানকে তিনি দিব্যজ্ঞানের আলোক আনিয়া দেন, দুর্ব্বলকে তিনি ভাগবত ইচ্ছাশক্তির দিব্য বলে বলীয়ান্ করেন, পাপীকে দিব্য প্রকৃতির চির-পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করেন, দুঃখী তাপীকে অধ্যাত্মজীবনের অনন্ত আনন্দ প্রদান করেন,—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

তাহাদের দুর্ব্বলতা বা মানবীয় শক্তির অপূর্ণতাতে কিছুই আসিয়া যায় না, ভগবান্‌ই তাহাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া দেন। অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমার যে ভক্ত, তাহার কদাপি বিনাশ নাই।"

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

শ্রীঅনিলবরণ রায়, এম-এ।

চাঁদের আলো

চাঁদের আলো, চাঁদের আলো,
কিসের জ্যোতি তুই রে,—
চাঁদের আলো,—চাঁদের আলো,
আলোর মোতি যূই রে।
জমাট হয়ে স্বাতীর বিন্দু
তুষার-খণ্ড বাতির—ইন্দু,
বুঝি বা সেই তুষার-গলা
স্রোতস্বতী তুই রে!

তুই কি আলো, অপরূপের
রূপের পাথার-নাওয়া
অ-লোক মরাল?—শীকর ঝরে
লেগে পাখার হাওয়া?

একটা স্বপ্ন শুভ্র যেন
ছড়ায় চূর্ণ অভ্র হেন,
শিবের অঙ্গ-বিভূতি-ভা
দিকের বিথার-ছাওয়া!

চাঁদের আলো, চাঁদের আলো,
সুদূর আলো তুই রে,
মোমের আলোর মতন মৃদু,—
মধুর আলো তুই রে!
স্বর্গ-পাবারতরা উড়ে
বাজায় পাখার দাদ্‌রা—ঘুরে'
কোন্ উর্ব্বশীর কপোল-বিম্ব
মেদুর আলো তুই রে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

করতোয়া ও গঙ্গাদেবীর সম্মিলন স্থানে অপুনর্ভবা মহাতীর্থে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ রামপালদেবের প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজধানী রামাবতী নগরীতে রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া মহাসমারোহেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নিদারুণ দুঃখময় অতীত স্মৃতিতে ভরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রামপালের পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। শ্রীহেতুর অধিপতি চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর নবরাজধানীর স্থান নির্ণয় করিয়া দিলে অত্যল্পকালের মধ্যেই নূতন রাজধানীর নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। এই নব নগরীতে জগদ্দল মহাবিহার এবং অসংখ্য পরিমাণে দেবদেবীর মন্দির সুশোভিত হইল। নগরীর মধ্যভাগে বুদ্ধ, তারাদেবী এবং অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি নৃপতির স্বধর্ম্ম-প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ স্থান পাইল। তাঁহার পরধর্ম্ম-দ্বেষহীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যক্ত রহিল,—হারীতি মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির মতই শিব, ভবানী, চতুর্ভুজা সারদা, লক্ষ্মীনারায়ণ, মহিষমর্দ্দিনী, অষ্টাদশভুজা প্রভৃতির অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরে। সমস্ত মন্দিরই স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-সম্ভূত, সযত্ন-গঠিত। মন্দির শীর্ষে দারুময় দেবদেবী ও অতিমানবীয় নানারূপ আশ্চর্য্যদর্শন মূর্ত্তি, দ্বারে ধাতুময় লতাপত্রের শিল্প-চাতুর্য্য। মন্দির-সোপানের উভয় পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত অতি সুন্দর গঠনের হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও প্রহরী মানবের অনুকৃতি। নগরীর মধ্যস্থলে রামপালদীঘি নামক দীর্ঘিকা, তাহার চারিপার্শ্ব পর্ব্বতের মতই উচ্চ, সেই সমুচ্চ পাহাড়গুলি নানারূপ বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে এই নূতন রাজধানীতে শতসংখ্যক বিদ্যাগার সংস্থাপিত হইয়া গেল। দেশ-বিদেশের পণ্য-সম্ভারে ইহার আপণগুলি অল্পদিনেই ভরিয়া উঠিল। বাণিজ্য-তরী এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণ আবার রাজ-সহায়তা-লাভে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সুদূর সমুদ্রপথে যাত্রা আরম্ভ করিল। হিন্দুবৌদ্ধনির্ব্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কেহ বিদ্যা, কেহ অর্থ, কেহ পদ-লাভাশায় দলে দলে রামাবতীতে বাস আরম্ভ করিল। ফলে অল্পদিনেই রামাবতী ধনে-জনে ও বিদ্যার গৌরবে জগতের শীর্ষস্থানীয়দেরই মধ্যে একতম হইয়া উঠিল।

রাজান্তঃপুরে পট্টমহাদেবী সন্ধ্যা তাহার সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য ও গৌরবানন্দের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও অসম্বরণীয় অশ্রুবিন্দু পুনঃপুনঃই নিজের পট্টাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিতেছিল। হায়, আজ কোথায় সেই মাতৃরূপিণী স্নেহপ্রতিমা!—যিনি নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের অসহনীয় বিপৎ-কঠোর দিবসেও এই ভবিষ্য শুভ দিনের একান্ত লোভনীয় প্রলোভন দেখাইয়া তাহার দুঃখাভিহত জীবনকে ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই ত সবই হইল, কিন্তু শুধু আজ যদি তিনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার বড় আদরের সন্ধ্যার এ সুখটুকু চোখে দেখিতেন!

মহাসমারোহে শ্রীরামাবতী নগর-সমাবেশিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরমকুশলী, পরমভট্টারক শ্রীরামপালদেবের সাম্রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে নানা-দিগ্‌দেশ হইতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পাল-সাম্রাজ্যের হিতকারী বন্ধু, আত্মীয় এবং অধীনস্থগণ সকলেই নব-রাজধানীতে সমাগত হইয়া বিরাট্ আনন্দোৎসবে যোগদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুকগণ অপর্য্যাপ্ত ভোজনে ও প্রচুরতর অর্থ বস্ত্র-মিষ্টান্নাদিতে পরম পরিতুষ্টি লাভ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া জয়ধ্বনি করিল।

এই আনন্দ-সমারোহের ঠিক পরের দিনই এক বিশেষ অপ্রিয়তর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল; তাহা কৈবর্ত্তরাজ ভীমের বিচার।

এত দিন আহত ভীমের আঘাত-ক্ষত সকল আরোগ্য না হওয়ায় তাহার বিচারকার্য্য স্থগিত ছিল।

সে দিন রাজসভায় তিলধারণেরও স্থান ছিল না। মহামাত্য বোধিদেব হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন সাম্রাজ্যের সমস্ত নবনিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী, মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক প্রজাপতি নন্দী, মহাপ্রতীহার শিবরাজ, মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব, মহাবলাধিকৃত বিত্তপাল, মহাসামন্ত, মহাসেনাপতি সায়ন, বৈদ্যচূড়ামণি ভদ্রেশ্বর, মহাক্ষপটলিক, মহাকুমার অমাত্যবর্গ, রাজস্থানীয়োপাধিক, দৌঃসাধসন্ধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, দাণ্ডিক, দণ্ডোপাসিক, শৌল্কিক, ক্ষেত্রপ প্রান্তপাল, কোট্টপাল, তদাযুক্তক, হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবল-ব্যাপৃতক, দ্রুতপ্রেষণিক, গমাগমিক, তারিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদমর্য্যাদার অনুরূপ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপালের মিত্ররাজ ও মাতুল-জামাতা পীঠিপতি দেবরক্ষিত, দেবগ্রামের বিক্রমকেশরী, কুজবটীর সুরপাল, তৈলকম্পপতি রুদ্রশেখর, উচ্ছালপতি ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয় প্রতাপসিংহ, কয়ঙ্গলের রাজা নরসিংহার্জ্জুন এবং নিদ্রাবলের বিজয়, কৌশাম্বীর দোরপবৰ্দ্ধন প্রভৃতি অভিষেকোৎসবে সমাগত রাজা ও রাজন্যবর্গ এই বিচার-সভায় সমুপস্থিত ছিলেন। বর্ম্মণরাজ শ্যামলবর্ম্মাও এ সভায় সমুপস্থিত ছিলেন।

ক্লেশবিশীর্ণ অথচ বৈরাগ্য-প্রশান্ত বীরমূর্ত্তি বিদ্রোহিবীর আসিয়া যখন বন্দীর স্থান অধিকার করিল, সহস্র দর্শকের সহস্র বিভিন্ন চিত্তভাব একমুখী হইয়া ঐ তপস্বিজনোচিত শান্তমূর্ত্তি বীরের প্রতি স্থির হইয়া গেল। অধিকাংশের মনেই তাহাদের এই অশেষ যুদ্ধক্লেশদাতা বিদ্রোহীর প্রতি একটা সহানুভূতিপূর্ণ করুণার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। অনেকেই রাজার কর্ণ বাঁচাইয়া উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিল, কাহারও চক্ষু সলিলার্দ্র হইয়া আসিতেও কোনরূপ বাধা মানিল না।

বিচার আরম্ভ হইল। বিচারক মহারাজাধিরাজ স্বয়ং।

রামপাল যন্ত্রস্বরের মতই স্থির ও গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার প্রতি রাজদ্রোহ এবং রাজহত্যার অপরাধ আরোপিত, এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে ?"

ভীম তাহার সম্মুখস্থ সিংহাসনাসীন—যে স্বর্ণসিংহাসনের অম্লান গজমুক্তাবলিযুক্ত স্বর্ণচ্ছত্রতলে কিছুদিনমাত্র পূর্ব্বেই সে নিজেই এইভাবে উপবিষ্ট হইয়া অন্যের বিচার করিত, সেই তাহার সুপরিচিত এবং উপভুক্ত রাজাসনে উপবিষ্ট নূতন রাজার প্রতি কৌতূহলপূর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে বারেকমাত্র চাহিয়া দেখিল, তাহার পর যথাপূর্ব্ব নতনেত্র হইয়া ভয়, উদ্বেগ, অহঙ্কার এবং নৈরাশ্যের ছায়ামাত্রপরিশূন্য সংযমপ্রশান্তমুখে রাজার আরোপিত ভীষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদমাত্র না করিয়াই ধীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিল, "না।"

"তোমার স্বপক্ষসমর্থন জন্য অপর কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে তুমি সমর্থ। অবসর যদি নিতে চাও, আমরা তা-ও তোমায় প্রদান করতে অনিচ্ছুক নই।"

অতি ক্ষীণ মৃদুহাস্য ভীমের দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে অৰ্দ্ধনিমেষ কালের জন্যই যেন অস্পষ্ট দামিনীলেখার মতই উচ্চকিত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বের মত সংকল্প স্থির প্রশান্ত কণ্ঠেই সে উত্তর করিল, "কোন প্রয়োজন নেই।"

"তোমার প্রতি আরোপিত অপরাধ তুমি সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছো ?"

এক মুহূর্ত্তের জন্য ভীমের মাংসপেশী-দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের মতই রোষদীপ্তিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার প্রসুপ্ত জ্বলন্ত কোপবহ্নি উচ্চশিখায় যেমন করিয়া এক দিন প্রবল-পরাক্রান্ত পালসাম্রাজ্যকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তেমনই করিয়াই জ্বলিয়া উঠিতে চাহিল। "অপরাধ!" মহীপালদেবকে হত্যা তাহার পক্ষে অপরাধ! মহীপালদেবের অধিকৃত রাজ্য কাড়িয়া লইয়া ভোগ করা তাহার পক্ষে রাজদ্রোহ! সবেগে মুখ খুলিয়াই তীব্রকঠোরতার সহিত কোন কথা কহিতে গিয়াই কিন্তু সহসা সে মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিল। কথনোদ্যত কথা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার পর মাত্র এক মুহূর্ত্তকালের চেষ্টায় সেই প্রচণ্ড বেগবান্ আগ্নেয়গিরিবৎ সহসা প্রজ্বলিত চিত্তকে প্রাণপণে সংযত করিয়া ফেলিয়া যথাপূর্ব্ব স্থিরকণ্ঠে সে পুনশ্চ উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

বিচারক প্রথমে মহামাত্য, পরে সভাসীন সকল ব্যক্তির এবং তাহার পর বন্দীর প্রতি চাহিয়া সেইরূপ গাম্ভীর্য্যময় কণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণদণ্ড !"

ভীমের ওষ্ঠপ্রান্ত এবার সুস্পষ্ট আনন্দের স্মিতহাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঘোর অন্ধকারময় কারাকক্ষের অনাবৃত মৃত্তিকায় অপরিচ্ছন্ন অরাজোচিত শয্যার উপর কর-চরণে শৃঙ্খলিত রাজাধিরাজ

ভীম নিদ্রাহীন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছিল। এই নিদ্রাহীনতা তাহার আজিকার নয়. তাহার জীবনের সেই করাল-কালরাত্রির পর আজ সুদীর্ঘতর চারিটি বৎসর ব্যাপিয়াই তাহার চোখের ঘুম তাহাকে উজ্জ্বলার মতই জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দিনের প্রাণান্তকর কঠোর পরিশ্রমের পর সে কি কঠিন শাস্তি! আর তাহার সঙ্গে যদি প্রতি দণ্ড, প্রতি পল, প্রত্যেক বিপলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে,—অতীতের অফুরন্ত যন্ত্রণাময় তীব্র স্মৃতি! যদি জ্বলন্ত হইয়া জাগিয়া উঠে, অনির্ব্বাণ স্মৃতির দহনজ্বালা! আর অরুন্তুদ হইয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরে অসহ্য অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক-দংশন। ক্ষণে ক্ষণে অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার সারা চিত্ত তাহাকে এই কথা বলিয়া ধিক্কার দিয়া আসিয়াছে যে, কোন্ প্রমাণে তুই তাকে অবিশ্বাসিনী ব'লে—বিশ্বাসঘাতিনী ব'লে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলি? একটা দিন আগেও যদি তুই তা'কে আনতে যেতিস, সে ত মরতো না! এই অবিধেয় অপরিবর্ত্তনীয় অনুতাপের কশা-লাঞ্ছিত হইতে হইতে সে যেন ভিতরে ভিতরে একেবারে জর্জ্জরিত—জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। লোক বলে, কালে শোকের হ্রাস হয়, কিন্তু ভীমের এ শোক যেন নিত্য নূতন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল। বিশেষতঃ তাহার অভিষেকের দিন সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে নাই। কোনমতে বাহ্যস্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন সে করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভিতরে আসিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্বর্ণপর্য্যঙ্ক ছাড়িয়া কঠিন মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতে হইতে সে আর্ত্তকণ্ঠে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল,—

"উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! কোথা তুমি আজ? ভিখারী ভীম আজ বরেন্দ্রীর অধিপতি, আজ কোথা রইলে তার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী! তোমা বিনা এ পৃথিবী, এ রাজসম্মান, এই স্বর্ণচ্ছত্র-সিংহাসন, এ সবই যে আমার অর্থহীন, সমস্ত পৃথিবীই যে আমার শূন্যময়!"

আজ কিন্তু এই ভীষণতর কারাকক্ষে অস্ত্রক্ষতময় শরীরে আসন্ন মৃত্যুদণ্ডকে মাথায় লইয়া এত দিনের সেই অসহনীয় অসম্বরণীয় মনের জ্বালা তাহার বহুলাংশে প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল, প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সে শুধু তাহার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠতাতের চরণোদ্দেশে প্রণত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "যে ব্রত গ্রহণ করিয়েছিলে, জ্যেঠামশাই! আমার যথাসাধ্য তা পালন ক'রতে চেষ্টাও আমি করেছি। রাজ্যভোগে আমার স্পৃহা ছিল না ব'লে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করেছি, মনে হয় না। কিন্তু তাও বলি, আমার এ পরাজয়ে আমি খুবই দুঃখিত হই নি। রামপাল পাল-সিংহাসনের অনুপযুক্ত নয়, তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সে গ্রহণ করেছে, সে ভালই হয়েছে। এখন আমায় আশীর্ব্বাদ করো, জীবনে যে শান্তি পাই নি, মরণ যেন আমায় সেইটুকু শুধু দিতে পারে।"

তাহার পর ক্ষণকাল ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে মনে মনে কাহাকে যেন স্মরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার ক্লেশ-শুষ্ক অধরপ্রান্ত একটি ফোঁটা পরম সুখের মন্দহাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে যেন চিরপরিতৃপ্তির একটি সানন্দশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিকটে উপবিষ্ট কাহার উদ্দেশে কহিয়া উঠিল, "আর কি? এইবার তোমায় পেলেম ত? এই রাতটুকু শুধু অপেক্ষা ক'রে থাক, সে-ও আর বেশীক্ষণ দেরি নেই। তার পর আর আমাদের সহস্র মহীপাল এলেও ছাড়াছাড়ি করাতে পারবে না। উজ্জ্বলা!..."

সন্তর্পণে কে যেন কারাকক্ষের অর্গল মুক্ত করিয়া অত্যন্ত সাবধানে ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে সাবধানন্যস্ত পদধ্বনি শ্রুত হইল, মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল না। ভীম প্রথমটা জানিতে পারিয়াও কথা কহিল না। তাহার মনে হইল, হয় ত ভোর হইয়াছে, প্রহরী তাহাকে বধ্যভূমে লইবার জন্যই আসিয়া থাকিবে। তাহার পর সহসা সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহার অত্যন্ত নিকটে কোন অপরিচিত কণ্ঠের সম্বোধনে তাহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে শুনিল, "ভীম, তুমি কোথায়?"

সবিস্ময়ে ভীম শব্দানুসরণে ফিরিয়া বলিল, "কে আমায় ডাকে?"

আগন্তুক কহিলেন, "কৈ তোমার হাত?"

ভীমের হস্তে লৌহ-শৃঙ্খল ঝনঝনা শব্দে বাজিয়া উঠিল। "আস্তে" বলিয়া প্রশ্নকারী শব্দলক্ষ্যে হাত বাড়াইয়া যন্ত্র-সাহায্যে তাহার হাতের বাঁধন এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া দিলেন। তেমনই মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "চ'লে এস।"

ভীম অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিল, অনিচ্ছার সহিত সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব? বধ্যভূমে? কিন্তু তার জন্যে এত সাবধানতা কেন?"

শৃঙ্খলমুক্তকারী পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না, মুক্তি নিতে, বিলম্ব অবিধেয়।"

ভীম তথাপি উঠিল না, কহিল, "মুক্তি ত আমার কাম্য নয়? আমি যাব না।"

আগন্তুক ঈষৎ হাসিলেন, "কি তোমার কাম্য? বরেন্দ্রীর সিংহাসন?"

ভীম উত্তর করিল, "তাও না—"

আগন্তুক সেইরূপ মৃদু হাসিলেন, "তবে?"

ভীম কহিল, "মৃত্যু!"

এবার আর সেই স্নিগ্ধমধুর হাসিটুকু শুনা গেল না। গম্ভীর প্রশান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, "সে ত আমাদের পাওনা আছেই ভাই। এ জীবন ত মৃত্যুরই রূপান্তর! তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তাকে অন্বেষণ করবার কোনই প্রয়োজন ত নেই, সে নিজেই আমাদের দরকার হ'লে খুঁজে নেবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে চ'লে এস দেখি। বিলম্বে প্রহরীরা এসে পড়তে পারে।"

নিরতিশয় বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া ভীম এবার নীরবেই তাহার আদেশকারীর অনুজ্ঞা মন্ত্রমুগ্ধের মতই প্রতিপালন করিল। আজ্ঞাকারীর কণ্ঠের মৃদুতা তাঁহার আদেশ দিবার শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে নাই।

দুই জনে নীরবে ও সাবধানে চলিয়া কারাকক্ষ এবং কারাগৃহের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বহু পথ অতিক্রম করিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ উভয়ে নগরীর বহির্ভাগে করতোয়ার তটভূমে আসিয়া দাঁড়াইবার পর সহসা ভীমের পথিপ্রদর্শক তাঁহার মুখের উপর হইতে বস্ত্রাচ্ছাদনী খুলিয়া ফেলিয়া ভীমের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

অতি বিস্ময়ে ভীমের মুখ দিয়া বহির্গত হইল—"মহাকুমার মহারাজাধিরাজ রামপালদেব!"

রামপাল শুধু স্বীকৃতির ভাবে মাথা নত করিলেন।

সাশ্চর্য্যস্বরে প্রায় বিহ্বল ভীম পুনশ্চ উচ্চারণ করিল, "তুমিই আমায় মুক্তি দিলে? নিজের মুখে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর! তুমি?"

রামপাল নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "আশ্চর্য্য কি, ভীম? যে রাজা ভীমকে দণ্ড দিয়েছিল, সে রাজা রামপাল—সে ত তোমায় মুক্তি দিচ্ছে না। মানুষ রামপাল—যে তোমার মনুষ্যত্বের পূজা করে, এ মুক্তি তোমায় সেই দিচ্ছে।"

ভীমের বক্ষ মথিত করিয়া তাহার নেত্র অশ্রু-স্পন্দিত হইয়া আসিল। পাছে তাহার সেই দুর্ব্বলতাটুকু ধরা পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে সে কথা কহিল না। তখন রামপাল পুনশ্চ কহিলেন, "আমি বিদ্রোহীর শাস্তিবিধান করেছি, কিন্তু যে রাজা অত অল্পদিনে এমন প্রজারঞ্জক হ'তে পেরেছিল, তার অমূল্য জীবন নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই। আমি নিজে হয় ত তোমার মত প্রজাপালক হ'তে পেরে উঠবো না। তাই বলি, আমাদের এখন দুটি উপায় আছে, হয় আমার সঙ্গে একত্র ব'সে তুমি আমি দুজনে মিলেই বরেন্দ্রী-মগধশাসন, কামরূপ কলিঙ্গ জয় করি এস, আর না হয়, প্রজাদেরই তাদের ভবিষ্যরাজনির্ব্বাচনের অধিকারটা দান করা যাক। তারা যদি তোমায় চায়, আমি আনন্দের সহিত তোমায় সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে যাব, আর তারা যদি আমায় চায়, তোমার স্থান তুমি ছেড়ে দেবে। এ কি মন্দ?"

এবার ভীম কথা কহিল, রামপালের সম্মুখে সহসা নতজানু হইয়া সে কৃতজ্ঞতা-গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল, "আমিই প্রজাদের পক্ষ থেকে তাদের রাজ-নির্ব্বাচন কায়মনোবাক্যে ক'রে দিলুম। তুমিই বরেন্দ্রীর উপযুক্ত রাজাধিরাজ!"

রামপাল দুই হাতে তুলিয়া তাঁহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরম মিত্রের মতই নিজ বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন, "তবে আমার সঙ্গী হবে এস।"

ভীম আত্মস্থৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিল, সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "না, আমার জন্য দণ্ড পরিবর্ত্তন করবার দরকার নেই। দেওয়া জিনিষ ফেরত নেওয়া রাজাধিরাজের যোগ্য হবে না।"

সহাস্যে রামপাল কহিলেন, "কে রাজাধিরাজ? রাজাধিরাজ আমি হ'লে তুমি আমায় 'তুমি' না ব'লে 'আপনি' বলতে! শোন ভীম! মৃত্যুদণ্ড তোমায় যে দিয়েছিল, তার তাই করাই তখন কর্ত্তব্য ছিল, তাই সে করেছিল। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য, তোমায় মুক্তি দেওয়া। এ যদি তুমি না নাও, অগত্যাই আমায় রাজ্য ছেড়ে এবার চির-নির্ব্বাসনে ফিরে যেতে বাধ্য হ'তেই হবে। অতীতে যা' ঘ'টে গেছে, তার উপর আবার তোমার রক্তে অনুরঞ্জিত হয়ে এ সিংহাসনে বসলে সে আমার সহ্য হবে না।"

ভীম মুগ্ধ হইল। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ গৌরবের সুখে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বিস্ময়াপ্লুতস্বরে কহিয়া উঠিল, "তোমার মত শত্রু লোকের শ্লাঘনীয়! কিন্তু রাজাধিরাজ! জীবনের অপেক্ষা মৃত্যুই এখন আমার প্রার্থিত! শ্রীরামচন্দ্রের মৈত্রীর চেয়ে তাঁর শত্রুতাই রাবণের পক্ষে ইষ্টজনক

হয়েছিল, আমার পক্ষেও তাই। আমারও জীবন বড় ভারাক্রান্ত! একে আর বৃথা বহনের দুঃখ আপনি অনর্থক কেন দিতে চাইছেন?"

রামপাল ক্ষণকাল নীরবে উর্দ্ধে চাহিলেন। আকাশের শত শত গ্রহনক্ষত্র যেন অপরিসীম কৌতুহলে পৃথিবীর এই দুই বীরপুরুষকে সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, যাহারা আজিকার এই মুহূর্ত্তের কতটুকুই বা পূর্ব্বে দুই জন অপ্রতিহত ভীষণ আততায়ী মাত্র ছিল, আর এক্ষণে দুই জনেই দুজনকার বীরত্ব ও মহত্ত্বমুগ্ধ, দুই জন অকৃত্রিম স্নেহপাশে নিবদ্ধ প্রিয়সখা। সে দিক হইতে নেত্র ফিরাইয়া রামপাল অদূরস্থ করতোয়ার বক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন, চন্দ্রহীনা যামিনীর ক্ষীণতর নক্ষত্রালোকে অর্দ্ধোদ্ভাসিত সেই নদীবক্ষে মৃদুমন্দ বীচি-বিক্ষেপের অর্দ্ধস্ফুট কলতানে কাহাদের কথা না জানি সে তাহার বক্ষোধৃত তারকার প্রতিচ্ছায়াগুলিকে শুনাইতেছিল, সে-ও কি এই ইহাদেরও কাহিনী?—যাহাদের মধ্যে নিদারুণ জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা ব্যতীত আর অপর কিছুই এ পৃথিবীর সাধারণ লোক আশা করিতে পারে না!

রামপাল সেখান হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভীমের মুখের পানে চাহিলেন। গভীর অন্যমনস্কতায় ভীম তাঁহার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল না, সে গাঢ় চিন্তাসমুদ্রে যেন নিমজ্জিত হইয়া একই ভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রামপাল তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন, ধীর-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তুমি আমায় অযাচিতভাবে বারেবারেই রাজাধিরাজ ব'লে সম্বোধন করেছ। আমায় যখন রাজা ব'লে স্বীকার করে নিয়েছ ভীম! তখন রাজার আদেশ তুমি পালন করতেও বাধ্য। আমি আদেশ করছি, তোমায় বাঁচতে হবে। জীবন খেলার বস্তু নয়, বহু যুগের তপস্যালব্ধ ফল, তাকে ইচ্ছাসাধে বিসর্জ্জন দেবার অধিকার তোমার আমার নেই। বেঁচে থেকে আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপে, আমার পাশে ব'সে এই সিংহাসনের এবং এর গুরু দায়িত্বের অর্দ্ধাংশ—"

আর্ত্তস্বরে ভীম বাধা দিল—"ক্ষমা কর রামপাল! না না, রাজাধিরাজ! আমায় ক্ষমা করুন। অতদূর নিষ্ঠুর হবেন না, মরণের চেয়ে এ শাস্তি আমার বেশী হবে!"

রামপাল তাহার হাত ধরিলেন, "জানি ভীম! তবু এ শাস্তি তোমায় নিতে হবে। তুমিও ত আমায় কম কষ্ট দাও নি, অনেক ভুগিয়েছ, এ তারই প্রায়শ্চিত্ত।"

ভীম ব্যাকুল উর্দ্ধনেত্রে যেন কাহার সহায়তার বৃথা আশাতেই একবার প্রত্যাশাপন্নভাবে চির-রহস্যময়, চির-অপরিবর্ত্তিত, অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল। কৈ? কে কোথায়? অন্ধকার রন্ধ্রবিহীন কারাকক্ষে তাহার মনঃকল্পিত চিদাকাশে যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকে আসন্ন মিলনের আনন্দে উদ্ভাসিত স্মিত-প্রফুল্লমুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে তাহার দীর্ঘ বিরহজ্বালাদগ্ধ অন্তরে সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ লাভ করিয়াছিল, কৈ, কোথায় সেই দিব্যরূপিণী, এই কঠিন সমস্যার মাঝখানে তাহাকে অসহায় করিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল? উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! তবে কি তাহার এই দুঃসহ দীর্ঘ বিরহব্রতের উদ্‌যাপনকাল এখনও সমুপস্থিত হয় নাই? আরও সহিতে হইবে? আরও দুঃখ না কি আছে?

প্রকাশ্যে রামপালের আগ্রহোত্তেজিত মুখের দিকে শান্তনেত্রে চাহিয়া ভীম পূর্ণ সংযমের সহিত স্থির এবং ধীরকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "তবে তাই হোক রাজাধিরাজ! তোমার স্নেহের দণ্ডই আমি মাথায় ক'রে তুলে নিলেম। কিন্তু যেখানে এক দিনের জন্যও আমি রাজা ছিলাম, সেখানে রাজ্যচ্যুত হয়ে আপনার দাক্ষিণ্যের দান নিয়ে আর আমি বাস করতে পারি নে। আমায় যদি মুক্তি দিয়ে থাকেন, তবে একেবারেই মুক্তি দিন, এই মুহূর্ত্তে এ রাজ্য ছেড়ে জন্মের মতই আমি চ'লে যাচ্ছি। এই সর্ত্ত ভিন্ন এ মুক্তি আমি নিতে পারবো না।"

ঈষৎ দুঃখিত অথচ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া সাগ্রহে রামপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কোথায় যাবে তুমি, আমায় ব'লে যাও, অর্থ এবং লোকবল যত তোমার প্রয়োজন, এই মুহূর্ত্তেই আমি—"

হাসিয়া ভীম তাঁহাকে বাধা দিল, "শুধু এই দেহ এবং একমাত্র পরিধেয়, এর বেশি এ জগতে ভীমের আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। যদি যেতে হয়, এই নিয়েই যাব!"

"কিন্তু বল, তবে কোথা যাবে? এমন নিঃসম্বলে—"

"কি সম্বল নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলুম, যাবার সময়ই কিবা সঙ্গে নিতে পারা যাবে? কোথায় যাব? কি জানি, কোথায়? হয় ত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব, হয় ত হিমালয়ের গিরিগুহায় তপস্যা করবো, আর না হয় ত—কি জানি, কি হয়ে ওঠে!—"

"ভীম!"

"দুঃখ করো না, রামপাল! তুমিও ত এক দিন এমনই নিঃসহায় অবস্থায় এ রাজ্য হ'তে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়েছিলে, তা'তে কতটুকুই বা ক্ষতি হয়েছে? আমার অবশ্য স্বতন্ত্র কথা! আমার জন্য দুঃখ পাবার কারু কিছু নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমার রাজ্য অতীতের রামরাজ্য হোক!"

রামপাল বিদায় লইয়া ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরিয়া গেলে, বহুক্ষণ ভীম নীরবে তাঁহার গতিপথে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক মুখ ফিরাইল।

ত্রিযামার শেষ যামে শিশুচন্দ্র ততক্ষণে ধীরে ধীরে করতোয়ার পরপারের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন। সুষুপ্ত চরাচর গভীর শান্তিমগ্ন। মৃদু জ্যোৎস্নাচ্ছায়ায় করতোয়ার শান্ত বক্ষ অর্দ্ধালোকিত হওয়ায় এক্ষণে তাহার পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। শুভ্র আস্তরণবিস্তৃত একখানি কোমল সুপ্তিশয্যার মতই তাহাকে পরম লোভনীয় বোধ হইতেছিল, উহার তীরভূমে মৃদু মৃদু লহরীলীলাভঙ্গের অস্পষ্ট কলতান এবং তীরতরুশিরে ঝিঁঝিঁ দলের অতি মৃদু সঙ্গীতময় স্বর একত্র মিশ্রিত হইয়া যেন ঘুম-পাড়ানিয়া গানের মতই শুনাইতেছিল। শয্যাগৃহের প্রহরীদের মতই অসংখ্য তারকা দীপহস্তে অক্লান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভীম ধীরে ধীরে অনতি-উচ্চ তটভূমে অবতরণ পূর্ব্বক নদীর বেলাভূমে আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নাগরিকগণ নিদ্রাভঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে প্রতি মুহূর্ত্তে যে সংবাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিল, বেলা অনেকখানি বাড়িয়া গেলেও তাহাদের সেই প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষিত বিশেষ সংবাদ রাজপথে কোন ঘোষকের দ্বারা প্রচারিত হইতে শুনিতে পাওয়া গেল না। যাহারা কৈবর্ত্তরাজের আত্মীয়বন্ধু, অথবা মনে মনে উঁহাদের পক্ষপাতী, তাহারা শিব-স্মরণে মনে মনে প্রার্থনা করিল, 'তাই হোক্, কোন দৈবিক ঘটনায়ও যদি মহারাজাধিরাজ ভীম রক্ষা পেয়ে গিয়ে থাকেন।' যাহারা সর্ব্বদাই নূতনের পক্ষপাতী, অথবা স্বভাবতঃই নির্ম্মমপ্রকৃতি, তাহারা মনে মনে একটুখানি আশাহত হইল। তবু ত একটা নূতন কিছু হইত!

অবশেষে সঠিক সংবাদ জানা গেল।

সকালবেলায় রাজসভার অধিবেশন হইয়াছে। রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে মহামাত্য বোধিদেবের সম্মানাসন; যে আসনকে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপিতামহগণ সমলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, গর্গ, সোমেশ্বর, গুরব মিশ্র, কেদার মিশ্র প্রভৃতির সেই লোকপূজ্য বিচারাসনে পালসাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক ও উপদেষ্টা-বেশে তাঁহাদেরই যোগ্য বংশধর বোধিদেবকে দেখিয়া গুণগ্রাহী জন পরম পরিতুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। রাজসিংহাসনের বামে রাজ-মাতুল এবং বরেন্দ্রী-বিজয়ের সর্ব্বপ্রধান সহায় অঙ্গাধিপ মথনদেব, সুবর্ণদেব এবং মহাপ্রতীহার শিবরাজ, মহাসন্ধিবিগ্রাহিক প্রজাপতি নন্দী, মহাসেনানায়ক সায়ন, মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব এবং পীঠিপতি দেবরক্ষিত প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দ যথাযোগ্য আসনে শোভা পাইতেছিলেন। সকলেই দারুণ দুঃসংবাদে আশঙ্কা-মলিন এবং ভগ্নচিত্ত। মথনদেবের মুখ আভ্যন্তরিক কোপের তীব্রতাপে আরক্তাভ। সভায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধননিবাসী গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠাপন্ন সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পরাজিত কৈবর্ত্তপতির রহস্যময় পলায়নের বার্ত্তা সকলকেই প্রায় বিস্ময়-স্তম্ভিত করিয়াছিল। এ সংবাদে পাল-সম্রাটের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ চিন্তিত ও পুনশ্চ যুদ্ধারম্ভের ভয়ে কিছু শঙ্কিতও হইয়াছিলেন, তবে যাহারা মনে মনে এখনও কৈবর্ত্তরাজের হিতকামী, তাহাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে রাজ-আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উৎকণ্ঠা-চাঞ্চল্যে মথনদেব ঈষৎ অধীর হইয়া মহামাত্যকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "রাজাধিরাজের আজ এত দেরী হবার কারণ কি?"

স্বল্প পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে ফিরিয়া অধৈর্য্যের সহিত কহিলেন, "তুমি একবার সংবাদ লও দেখি, শিবরাজ! কোন অসুখ হলো না ত?"

তাহার পর ভীতত্রস্ত অর্দ্ধমৃতবৎ অবসন্ন কারাধ্যক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার কম্পিত বক্ষকে অধিকতর কম্পিত করিয়া তীব্র-কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি নিশ্চিত ক'রে বল্‌তে পার যে, বন্দি-গৃহের কুঞ্জিকা দুটি ভিন্ন তিনটি থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়? আর তার একটি রাজাধিরাজের আজ্ঞাতে তুমি স্বহস্তে তাঁর নিজের হস্তে প্রদান করেছিলে,

আর অপরটি সমস্তক্ষণ তোমার কোমরের ঘুনসিতে বাঁধা ছিল এবং এখনও আছে ?"

ভয়ার্ত্ত কারাধ্যক্ষের আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। স্খলিত জড়িত কণ্ঠে সে কোনমতে উচ্চারণ করিল, "দেব! এর চেয়ে আর বেশী কিছু আমার বল্‌বার নেই! এই তালিকাটি এ দেশের প্রস্তুত নয়, গান্ধার দেশ হ'তে বিশেষ কৌশলে প্রস্তুত করিয়ে আনানো হয়েছিল। বিশেষ অপরাধীর জন্যই এর ব্যবহার হয়ে থাকে, এবারও তাই হয়েছিল। নিশ্চয়ই এ ভৌতিক ব্যাপার! মানুষের সাধ্যে কৈবর্ত্তপতিকে মুক্তি দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।"

মথনদেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "শিশুর মত প্রলাপ দিয়ে এত বড় গুরু অপরাধ কারু কোন দিন ঢাকা পড়েনি কারাধ্যক্ষ! সাবধান!"

তাহার পর ঈষন্মাত্রায় আত্মসংবরণ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ সহজ-ভাবাবলম্বনে সচেষ্ট হইয়া পুনশ্চ ঐ হতভাগ্যকেই প্রশ্ন করিলেন, "রাজাধিরাজকে কখন্ তুমি কুঞ্চিকা প্রদান করেছিলে? সেখানে তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল?"

কারাধ্যক্ষ উত্তর করিল, "কেহ না, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ স্বয়ং আমার গৃহে এসে আমায় নিজেই বল্‌লেন, 'কৈবর্ত্তপতির বন্দি-গৃহের কুঞ্চিকা কোথায় আছে?' আমি রক্ষণস্থল দেখালে, তিনি বল্‌লেন, 'দুটোই তোমার হাতে থাকা সঙ্গত হবে না, একটা আমার কাছে দাও দেখি।' তার পর আরও বল্‌লেন, 'দেখ, সাবধানে রক্ষা করো, কোনমতে যেন হস্তচ্যুত হয় না।' আমিও আমার যথাসাধ্য—"

"বিশ্বাসঘাতক! সেই জন্যই অত যত্ন ক'রে তোমার রাজার আদেশ তুমি পালন করেছ? জীবন্ত শূলে চড়ালে তবেই তোমার উপযুক্ত দণ্ড হয়! রাজদণ্ডের অধীনকে মুক্তি দিলে সে-ও রাজদ্রোহী হয়, এ কথা তুমি জানতে না পাপিষ্ঠ?"

দ্বারের প্রহরিবৃন্দ নতজানু হইয়া কাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল. প্রবর্দ্ধমান জনতা শশব্যস্তে ও সসঙ্কোচে ত্বরিতে কাহার গতিপথ মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

মহারাজাধিরাজ রামপালদেব সভা-প্রবেশ করিলেন।

ত্রস্ত বিস্ময়ে সকল চক্ষুই একসঙ্গে বিস্ফারিত হইয়া রাজবেশপরিশূন্য তুচ্ছতম নাগরিকের বেশধারী রাজার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাজমাতুল মথনদেবের রোষ-কষায়িত জলন্ত নেত্রও ইহার অনতিক্রম্য প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিলেন, "এ কি! এ কি রামপাল! পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ রামপালদেব কি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছেন?"

ত্বরিতগতিতে সুবৃহৎ সভামণ্ডপ অতিক্রম পূর্ব্বক সিংহাসনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে শান্তস্বরে রামপালদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, "আত্মবিস্মৃত হইনি, মাতুল! আত্ম-নিবেদন করতে এসেছি।"

রাজসিংহাসনের সম্মুখীন হইতেই মহামাত্য তাঁহার নিয়মানুসারে বিস্ময়াশ্চর্য্য-পরিশূন্য সহজ কণ্ঠেই রাজাকে সস্মিতমুখে আদেশ করিলেন, "বসুন, মহারাজাধিরাজ!"

রাজাধিরাজ তাঁহার মহামাত্যের আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু তাহা সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক নয়, সাম্রাজ্যের সেই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকারের পদপ্রান্তে তিনি নতজানু হইলেন।

"এ কি, রাজাধিরাজ!"

রামপাল যুক্তকরে একবার মহামাত্যের প্রসন্ন স্মিতোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর বিস্ময়াশ্চর্য্যে বিহ্বলপ্রায় জনতাপূর্ণ রাজসভার সকলকার দিকেই তাঁহার স্থিরদৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক ধীর-গম্ভীর প্রশান্ত স্বরে উত্তর করিলেন, "আমি আজ আর আপনাদের রাজাধিরাজ নই, এক জন রাজদ্রোহী, তাই তার উপযুক্ত দণ্ড নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। কি আমায় আপনারা দণ্ড দিতে চান, দিন, আমি নিতে প্রস্তুত আছি।"

বোধিদেবের স্মিতমুখ আভ্যন্তরিক আনন্দের আভায় হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মথনদেবের বিস্ময় সীমাতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহাকে অধীরতর করিয়া তুলিল, তিনি বিরক্তির শেষ সীমায় পৌছিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন—"বাতুল হয়েছ রামপাল! তুমি রাজদ্রোহী!"

রামপাল মাতুলের উত্তাপতপ্ত অঙ্গারখণ্ডের মতই আরক্ত মুখের দিকে নিজের অনুত্তেজিত প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিলেন, কহিলেন,—"মামা! আপনিই ত এই কতক্ষণমাত্র পূর্ব্বে বলছিলেন,—'রাজদণ্ডাধীন অপরাধীকে মুক্তি দিলে মুক্তিদাতা রাজদ্রোহী গণ্য হয়, তার দণ্ড শূলদণ্ড।' তাই যদি হয়, তবে কারাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে সে দণ্ড আমারই প্রাপ্য। আমিই কৈবর্ত্তরাজকে মুক্তি দিয়েছি।"

আকস্মিক বজ্রপাতেও হয় ত সমস্ত সভা এতই স্তম্ভিত হইত না! কতক্ষণে বাক্যকথনশক্তি ফিরিয়া পাইয়া মথনদেব ও সুবর্ণদেব একসঙ্গে উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন, "ভীমকে তুমি মুক্তি দিয়েছ? তোমার মুখে আজ এ কি অসম্ভব কাহিনী শুনলেম!"

মহামাত্য বোধিদেবের পদতলে নতজানু রাজাধিরাজ নতশিরে থাকিয়াই অধিকতর ধীর স্বরে কহিলেন, "আমি তাকে শুধু মুক্তি নয়, অর্দ্ধরাজ্য, এমন কি, যদি প্রজারা আমার পরিবর্ত্তে তাকে রাজা চায়, তা হ'লে তাদের সুখের জন্য সমস্ত রাজ্যই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, সে নিলে না। বীর সে, ভিখারী নয়! আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, আমার পিতৃরাজ্য আমি উদ্ধার করেছি, এখন আমার পিতৃপ্রজাবর্গ যাকে তাদের মনোভিলাষ, অনায়াসেই তাদের রাজা নির্ব্বাচন ক'রে নিয়ে সিংহাসনে বসাক্, আমার তা'তে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। মহতের—বীরের—ত্যাগীর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়ে রাজ্য করার গৌরবের চেয়ে, শূলদণ্ডেই হোক অথবা নির্ব্বাসনেই হোক, যা আমায় আপনারা বিচার ক'রে দান করবেন, যতই তা' অগৌরবের বস্তু হোক, আমি আদর ক'রে নেবো।"

এক মুহূর্ত্তকাল সমস্ত সভা স্তব্ধ হইয়া রহিল, এক মুহূর্ত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি জিহ্বা উচ্চারণেচ্ছুক হইয়াও ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ বাক্যোচ্চারণের জন্য প্রত্যেকের ব্যগ্র চিত্তই উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ইত্যবসরে সকলে দেখিল, মগধ-বরেন্দ্রীর মহামাত্য সাম্রাজ্যের প্রধানতম বিচারপতি বোধিদেব তাঁহার মহামন্ত্রীর আসন ত্যাগ করিয়া অপরাধীর পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন, হস্তে তাঁহার এতক্ষণ রাজসিংহাসনের উপর রক্ষিত পালসাম্রাজ্যেশ্বরের উজ্জ্বল মণিময় রত্নময় রাজমুকুট। গৌরবদীপ্তমুখে তিনি রাজদ্রোহী রাজার অবনত শির মহারাজাধিরাজগণের চিরগৌরবান্বিত শিরোভূষণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া দিতে দিতে সহাস্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"রাজদ্রোহী, বরেন্দ্র-প্রজার সম্মতি বুঝে এই দণ্ড তোমার জন্য বিধান করলেম্, দণ্ড গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া মুকুট পরাইয়া তাহার পর স্বর্ণময় রাজদণ্ড রাজার অঞ্জলিবদ্ধ করের মধ্যস্থানে অর্পণ করিলেন।

তখন সেই মহাজনতাপূর্ণ বিরাট সভার জনমণ্ডলী সমবেত শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে গভীর আনন্দভরে প্রাণখোলা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—

"ধন্য! ধন্য! মহারাজাধিরাজ রামপালদেব!"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সমাপ্ত

অন্তঃপুর

অন্তঃপুরের সিংহাসনে রাজরাণী যে আপন গুণে,
বল্‌লে তাকে খাঁচার পাখী, সে উপহাস কেই বা শুনে!
প্রাচীর-ঘেরা দেউল মাঝে
যার চরণের নূপুর বাজে
মন্ত্রণা যা'র সকল কাজে ধন্য নিয়ে দর্পী নর,
বন্দিনী কে বল্‌বে তাকে পুরুষ যাহার "আজ্ঞাধর!"

ঘোম্‌টা যে ঐ কমল-মুখে,
তাতেই সে রয় সোহাগ-সুখে,
রূপ-সুধা হায় সুলভ হ'লে মর্য্যাদা তা'র থাকাই দায়,
রূপ থাকিলেও রূপহীনা সে লাজের মাথা যে জন খায়!

কে বলে ঐ অন্তঃপুরে,
কাঁদে নারী ব্যথার সুরে—
কে দিতে চায় ভেঙ্গে চুরে তাহার সুখের স্বর্গ,
রক্ষা কর ভাঙ্গন-প্রিয় ওগো সুহৃদ্‌বর্গ!

স্ত্রী ও মাতা, ভগ্নী, কন্যা,
শ্রীসম্পদে সেথায় বন্যা,
তা'দের লক্ষ্মী সরস্বতী দেছে তা'দের বিজয়-হার,
আমারি ও অন্তঃপুরে শিক্ষা পরের চাইনে আর!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

শশাঙ্ক-পরিচয়

কোনও বড় কবি সাহিত্যিক বা প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জীবনকথা আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে হয়, জাতীয় জীবনে তাঁহার বিশেষ দান কি ? তিনি তাঁহার সাহিত্যিক বা অনুরূপ প্রতিভা দ্বারা দেশকে কিছু দিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না বা তাঁহার জীবনে সেই যুগের কোনও বড় সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে কি না ? যদি হইয়া থাকে, তবে তাহার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব কত দূর, এই প্রসারের পরিমাপ লইয়া বড় ও ছোট প্রতিভার পরিমাপ হয়। যাঁহার ভাব-জীবন নিতান্তই প্রভাবহীন ও সঙ্কীর্ণ এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ, তাঁহার জীবন সাধারণভাবে আলোচ্য নহে।

কবি শশাঙ্কমোহনকেও বুঝিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে, তাঁহার ভাব-জীবনের প্রভাব প্রসার কত দূর ছিল। তিনি তাঁহার সাহিত্য-সমাপত্তির দ্বারা আমাদের বৃহত্তর জীবনের কোনও প্রশ্নের সমাধান করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না। আমাদের জাতির সম্মুখে এমন কোনও আদর্শ ধরিতে পারিয়াছেন কি না, যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের জীবনপ্রবাহ নবতর শক্তিসমাযুক্ত হয়। যদি পারিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠতার দাবী, নতুবা তাঁহার জীবন-কাহিনীতে ব্যক্তি-বিশেষের হয় ত সহানুভূতি থাকিতে পারে, জাতির কাছে তাঁহার মৃত্যু অন্য পাঁচ জনের মৃত্যুর মতই সাধারণ ঘটনা।

কবি শশাঙ্কমোহন

শশাঙ্কমোহনকে সাহিত্যে আমরা ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই ;—কবিরূপে, সাহিত্য-সমালোচকরূপে ও দার্শনিকরূপে। তাঁহার শৈল-সঙ্গীত, সিন্ধু-সঙ্গীত, বিমানিকা খণ্ডকবিতা, স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের মিলনগাথা কাব্য-সাবিত্রী ও বিশ্বামিত্র নাট্যকাব্য, তাঁহার সমালোচনা-গ্রন্থ দুইখানি "মধুসূদন" ও "বঙ্গবাণী", "বাণী-মন্দির", সাহিত্যদর্শন ; এ ছাড়া আরও অনেক অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে, তাহা আমাদের অধুকার আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু এ সমস্তের ভিতর দিয়াই তাঁহাকে একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে আমরা দেখিতে পাই, সেটি হইতেছে তাঁহার কবিরূপ। শশাঙ্কমোহন এক জন প্রকৃত কবি ছিলেন, ভাবপ্রধান কবি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে, Mystic। তাঁহার জাতীয় জীবনে যদি কিছু দান থাকে, তাহা এই কবিভাবের ভিতর দিয়া। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি একটি খুব বড় আদর্শকে পাইয়াছিলেন, যাহাকে এই জাতীয় আদর্শের মহত্তম আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং যাহার ভিতর দেশ-বিদেশের সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতর আদর্শের সমন্বয় আছে। এই আদর্শকেই তিনি জাতির জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার যদি জাতিকে কোনও দান থাকে, ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহার ভিতর দিয়াই তাঁহার ছোট বড়র বিচার হইবে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে, তাহার পূর্ব্বে শশাঙ্কমোহনকে আমরা একবার কবিতার বাহিরের দিক অর্থাৎ শিল্পের দিক (ভাব ভাষা উভয়তঃ) দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শশাঙ্কমোহনের কবিতার ক্ষেত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ডতর বহিঃপ্রকাশগুলিতে তত বেশী ছিল না, যত ছিল তাহাদের চরম লক্ষ্যে। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার সারা জীবনে আমাদের ক্ষুদ্র জাগতিক জীবনের ক্ষুদ্রতর সুখ-দুঃখের কথা লইয়া কখনও কোনও কবিতা লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ, বরং প্রকাশের রীতিতে অনেক ক্ষেত্রে তিনি এই সমস্ত ক্ষুদ্র খণ্ডকে ডিঙ্গাইয়াই চলিতেন। ক্ষুদ্র ছিল তাঁহার কাছে বৃহৎকে বুঝিবার উপলক্ষ মাত্র এবং বাস্তবের অপেক্ষা কল্পনার দামই ছিল অনেক বেশী। এই হিসাবে তাঁহার সাহিত্যের প্রবৃত্তিকে বরং বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রবৃত্তির বিরোধীই বলা চলে। আর্টে ছিলেন তিনি বিশুদ্ধ Indian Artist, তাঁহার ভাষা ছিল ভাব প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র এবং উক্ত কার্য্য সম্পাদনে তাহার ইঙ্গিতের বেশী সার্থকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না—

"অসীমের দেশ হ'তে আজি অভ্যাগত
জ্যোতির ইঙ্গিত নবদুয়ারে আমার
আহ্বান করিতে তারে হয়েছি বিব্রত
নাহি জানি সে দেশের ভাষা ব্যবহার।"

"সঙ্কেত ইঙ্গিত আজ হৃদয়ের পটীয়সী ভাষা" ইত্যাদি এবং এই ভাব প্রকাশে তিনি যদৃচ্ছা শব্দ, ইংরাজী শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, স্বরচিত শব্দ, গ্রাম্য শব্দ, ইংরাজী রীতি, সংস্কৃত রীতি যখন যাহা খুসী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ভাষা প্রকাশের মুখে সর্ব্বদাই নিজের একটি পথ করিয়া চলিত এবং তাহা হয় ত বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচলিত ভাষা-রীতির কোনও কোনও দিকে বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। সেই জন্য তাঁহার সাহিত্যে—

"কে ওই ? এ ব্রজভূমে কে বসিয়া বালা
আকাশের পানে চেয়ে অশ্রু দরদর
কেন গো উহার তরে পরাণ এমন করে
সে যেন আমারি লাগি কাঁদিয়া কাতর !"

ইত্যাদি ভাষা ও ছন্দের অনবদ্য সুন্দর শ্লোকের সহিত—

"চিরকাল বিশ্বে উহা বাতুলের নাড়ী
'ধরিয়া বসাই' শুধু রহস্য যাহার
আঁধারের পুরী হ'তে
উলি অনুভূতি পথে
বিশ্ব জুড়ি শিশু এক করিছে বিহার।"

ইত্যাদি কবিতার অংশসমূহ একসঙ্গে মিশামিশি করিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। 'বাতুলের নাড়ী', 'ধরিয়া বসাই',

'উক্তি' ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শশাঙ্কমোহন যে বর্ত্তমান রুচিরও কত বড় ছন্দ ও ভাষাশিল্পী ছিলেন, তাহার পরিচয়ও তাঁহার "স্বর্গে মর্ত্ত্যে" ও "সাবিত্রী"র সর্ব্বত্র ছড়ান আছে, আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

কিন্তু ভাব ও রস এবং তাহাদের স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষমতার তাঁহার রচনাতে যাহা পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একবারে অপূর্ব্ব। অবশ্য গীতি-কবিতা-রীতির খণ্ড মূর্চ্ছনা এবং কাব্যরীতির গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা বড় ভাবকে অখণ্ড উল্লাসে নানা বিচিত্র প্রকাশের ভিতর দিয়া জাগাইয়া রাখা, এ দুয়ের কোন্‌টা অধিকতর শক্তিশালী, আমরা এখানে তাহার বিচার করিব না, কিন্তু ভাবের অপূর্ব্বতা, প্রকাশের আনন্দ, সমস্তটা জড়াইয়া একটা সুমহৎ ব্যঞ্জনা, রসের সলিল ও অবাধ চেতনা, ইহা তাঁহার সাহিত্যে যেমনটি দেখিয়াছি, এমনটি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। একবারে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় ভাণ্ডটিকে যেন ভরাইয়া উপচাইয়া দেয়, আমাদের এই জীবন যে এত স্বর্গ-ঘেঁসা এবং ইহার অর্থ যে এত মহৎ, তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। শশাঙ্কমোহন উপনিষদিয়া কবি ছিলেন। উপনিষদের রসে তাঁহার চিত্ত একবারে ভরপূর ছিল। তাঁহার ভাবনায় আর্য্য ভারতের যে একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেমন উজ্জ্বল, তেমনই মধুর, তিনি তাহার চিত্র দেখাইতে দেখাইতে পাঠককে একবারে যে ভারতবর্ষে আনিয়া হাজির করেন, তাহার তপোবন হোমগন্ধী, ঋষিগণ জ্যোতিরন্তরিত সূর্য সম, রাজপুত্র ক্ষত্রিয়াদর্শে জাগ্রত সিংহবীর্য্য, অতিমানব-রাজকন্যা মহিমান্বিতা নারীশ্রেষ্ঠা, রাজশ্রী-রাজ-গৌরব-বিদ্যা-বিনয়-স্বাধীনতা-মণ্ডিতা, অনুপমা ঋষিশিষ্যা। পরন্তু শশাঙ্কমোহন, তাঁহার সমস্ত রচনা বাদ দিলেও, এই এক সাবিত্রীতে যে শক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহার মহনীয়তা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কি অপূর্ব্ব কবিত্ব, কি আশ্চর্য্য নাট্যকলা, কি নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ, মনুষ্যত্বের কি মহিমাময় আদর্শ—সমস্ত কিছু জড়াইয়া সমগ্র বইখানিকে যেন বঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছে—বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের কোনও কিছুতে ইহার তুলনা মিলে না। ইহার সদৃশ খুঁজিতে গেলে, হয় ত কালিদাসাদি প্রাচীন সংস্কৃত মহাজন বা গ্যেটেশিলারাদি জার্ম্মান মহাজনগণের কাছে যাইতে হয়। প্রাচীন আদর্শের সহিত বর্ত্তমান আদর্শের, পাশ্চাত্য রীতির সহিত প্রাচ্যরীতির, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সহিত মানুষের জীবন-কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে এই একখানি গ্রন্থই শশাঙ্কমোহনের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। আমরা এই অতুল কাব্য-সৃষ্টির দুই এক স্থান বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের জন্য না তুলিয়া দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সুধীগণ দেখিবেন,—শশাঙ্কমোহন অন্য দিকে কত বড় ভাষাশিল্পী ছিলেন।

(ক)

ঋষি উদ্দালক আসিয়া সাবিত্রীকে সত্যবানের আসন্ন মৃত্যু-কালের কথা অবগত করাইতেছেন।

উদ্দালক। মনস্বিনি,
আসিয়াছি আজি এক সমাচার দিতে।
সাবিত্রী। কেন প্রভু, কি সে বার্ত্তা?
উদ্দালক। সুব্রত চলিয়া যাবে পঠদ্দশা-শেষে
গৃহাশ্রমে—সন্নিকট তাহার সময়।......
বলেছিনু তোমা—
আসন্ন-মরণ সত্যবান্—শুন তাহা
সনিশ্চয়ে—শাস্ত্র যদি সত্য হয় বুঝে থাকি আমি
সেই দিন সুনিশ্চিত মরণ তাহার।
সাবিত্রী। হায় প্রভু, কি শুনালে! দেবতা তোমরা
বুঝ না কি মানবের—রমণীর দুঃখ?
বুঝ না কি, এই ক্ষুদ্র বুকের ভিতর
শ্বেতরক্ত পক্ষপুটে দুর্নিবার পাখী
করিতেছে ছট্‌ফট্! কি আবেগ-ভরে,
আমরা আপন-জনে বেঁধে রাখি প্রাণে!
কি বেদনা; হারাই যখন! ওহে দেব,
দেখিয়াছ বরষায় আকাশের বুক
চিরিয়া ছুটিতে সৌদামিনী! দেখিয়াছ
গুমরি গুমরি কিসে ছুটে হাহারব
নভস্তলে? সেইরূপ নারীর হৃদয়
স্বামীর বিচ্ছেদে ফাটে—ফাটে সে এমন
মর্ম্মের শোণিত রাঙা বুঝি দেখা যায়।
কেন শুনাইলে দেব, কেন জানাইলে
অক্ষমা নারীরে, যাহা অলঙ্ঘ্য অচল
বিধির বিধান।.... ..
উদ্দালক। শুন বৎসে!
আসি নাই অকারণে শোনাতে তোমারে—
সে বিধি অলঙ্ঘ্য নহে।
সাবিত্রী। (সাবেগে) নহে প্রভু!
কহ মোরে ফিরাইতে পারিয়াছে কেহ
মরণেরে? কখনো যে শুনি নাই তাহা!
উদ্দালক। পারে নাই!—চাহে নাই কেহ।
পারিলেও অকথিত ইতিহাস তার।
তাই ব'লে—কে বলিবে—পারিবে না কেহ?
পারে নাই? চাহে নাই, শুভে—এ সংসারে
এতখানি আত্মত্যাগ কে করিতে পারে
আপনার প্রাণ দিয়ে কে বাঁচাবে পরে?
এত শক্তি—এত সিদ্ধি কার সাধনায়?......
সাবিত্রী। (সাগ্রহে) আমি, আমি প্রভু।
বিশ্বাস হয় না দেব! করহ বিশ্বাস
কিসে তোমা প্রকাশি হৃদয়! এ শরীর
খণ্ড খণ্ড করি, যদি দিনে—পর দিনে
দিতে হয় বর্ষ ধ'র তাও দিতে পারি
তাঁহার মঙ্গল অর্থে। পারিব কি প্রভু
বাঁচাইতে? জীয়াইতে পারিব কি তাঁরে
আমার জীবন দিয়ে? এ কি সত্য কথা?
কহ ধ্রুব বাণী দেব। (ভূনত-জানু)......

উদ্দালক। সুলক্ষণে,
অসীম শক্তির কেন্দ্র মানব-হৃদয়—
মানবের আত্মা তাহা মহাত্মারি ছায়া।
[প্রস্থান।

সাবিত্রী। কি শুনিনু। সত্য সে কি? প্রভো গুরুদেব
নারীর অসাধ্য নহে! দিলে না বুঝিতে?
চকিত রেখার মত অন্তর্হিত হ'লে!
এ কি লীলা! কে বুঝাবে বাব কার কাছে!
নাহি জানি কি হবে করিতে। কি সাধনে
হীনা নারী হবে সতী শক্তিস্বরূপিণী!
[প্রস্থান।

(খ)

সত্যবানের মৃত্যুকাল সন্নিকট—তপোবনে আধিদৈবিক উপদ্রব দেখা দিয়াছে—আশ্রমারণ্যে কুলপতি বনস্পতির সন্নিকটে পুষ্পমাল্য ও অর্ঘ্য-হস্তে ঋষিবালকেরা প্রার্থনা করিতেছে।

চিন্ময়। কে তুমি এ বন-ভূমে দিকে দিগন্তরে
সৃজিয়াছ মহোন্নত তরুর সমাজ!
তোমার সন্ততি সব কাতারে কাতারে
শিরে শির জড়াইয়া চেয়ে আছে সবে
তোমার মহান্ উচ্চ উত্তোলিত শির
নভোদেশে—কি ভাবিছে কি বুঝিছে তারা!
কে তুমি অনাদিশেষ দিতেছ পহরা!
বুঝিছ কি জগতের গতি ও নিয়তি
শুন তুমি আমাদের স্তুতি।

সুতপাঃ। কে তুমি এ বনরাজ্যে মহান্ সম্রাট,
একেশ্বর! শির তব বিলীন গগনে
পদ তব ধরণীর অন্তস্তম তলে;
দৃষ্টি তব বিহরিছে দিগন্তসীমায়;
নিত্য উঠে সূর্য্য-সোম, নিত্য নেমে যায়
অন্ধকারে; দিবা-রাত্রি সদা অবিশ্রাম
সুন্দরী কামিনী সম সেবেন তোমারে!
উর্দ্ধকরে, যোড়-করে করি গো প্রণতি
শুন তুমি আমাদের স্তুতি!

প্রিয়ঙ্কর। কে তুমি, কিরূপে ডাকি কিছুই না জানি!
অর্থ সমাযুক্ত কর আমার এ বাণী!
জানি তুমি, যাহা দেখি তাই নহ কভু;
জানি তুমি এ ভুবনে অসীমের ছবি;
ক্ষুদ্র গোষ্পদের জলে আকাশ যেমন—
প্রতিবিম্ব প্রকাশিত পুরোভাগে তুমি!
সমুদ্রে বড়বারূপে, নভে সূর্য্যরূপে
আকাশে বিদ্যুৎরূপে তোমারি আভাস;
বড় ঋতু দশদিক তোমারি শয়ন।
ভূত বস্তু হ'তে রস করি আকর্ষণ
নিত্য নব পরিচ্ছদ করহ বয়ন
ধরণীর; গতিশীল বারিবিন্দুচয়ে
অন্তরীক্ষে বিরচিয়া স্বর্গের তোরণ
প্রাণেরে ইঙ্গিত করি হও ভাসমান!
ব্যোমে উড্ডয়নশীল উর্ম্মির সমূহে
ঢালহ প্রবাহরূপে ধরণী উপর!
বিপুল পুলক-প্লবে ব্যাপহ ধরণী!
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগ অজ সর্ব্বাশ্রয় তুমি!
মোদের ইন্দ্রিয়-পথে এ বিশ্ব-জগৎ
কায়াহীন ছায়াসম করেছে প্রকাশ!
কে তুমি অনাদিশেষ ভাবব্যক্তি শুধু!
কে তুমি স্বরের তলে নীরবতা শুধু!
কে তুমি স্রোতের তলে নদী চিরন্তন!
কে তুমি গতির তলে অস্তি সচেতন!
ওত-প্রোত বিরাজিত সদা সর্ব্বঘটে!
শ্যেন পক্ষী-নীড়ে যথা, তোমার নিকটে
দীপ্তিমতী এ প্রার্থনা করুক গমন।

সত্যবান্। সাধু, সাধু!

প্রিয়ঙ্কর। আমরা আলোকশূন্য রজনীর শেষে
করি তোমা আবাহন; ভীত ভীত মোরা
এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য কক্ষচ্যুত হয়ে
কভু যেন নাহি পড়ে পৃথিবী-উপর!
সোম ঋক্ষ মেঘগণ আকাশ হইতে
আগুন বর্ষে না যেন আমাদের শিরে!
গগন কটাহ-স্রুত নিত্য স্রোতঃশীল
অন্ধকার, ধরাবক্ষে জমে নাহি যায়!
আমাদের আশ্রমের তরুগুলি যেন
দাঁড়ায় না দৈত্যসম মারাত্মক ক্রোধে!
সর্ব্বংসহা জগদ্ধাত্রী নাহি যায় স'রে
পদতলে; অনিন্দিত-অকুটিল পথে
নিয়ে যাও আমাদেরে।

সাবিত্রী। ঋজুপ্রিয় বালক ইহারা
অকুটিল পথসেবী সূর্য্যরশ্মিসম
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝে।

* * * * * *

প্রিয়ঙ্কর। প্রাতঃস্নান-পূতদেহ আসিয়াছি মোরা
এসেছি হৃদয়ে করি পবিত্র নির্ম্মল!
ভগ পূষা মিত্র দক্ষ সোমার্ক অরুণ
অদিতি অর্য্যমা ইন্দ্র বিশ্বায়ু: বরুণ
উষা সন্ধ্যা হুতবহ দিবস যামিনী
সরস্বতী নিখিলের সৌভাগ্যশালিনী
আমাদের এই স্তুতি করুণ গ্রহণ!
স্তোতা হৃদয়ের সহ সবার উদ্দেশে
প্রচারিছে মাননীয় স্তুতি।

পার্ব্বতী। সাঙ্গ পূর্ণ তোমাদের পূজা
বাঞ্ছিত-জননী হোক্!

প্রিয়ঙ্কর। (উচ্চকণ্ঠে) দেবীবাক্যে সাঙ্গ হ'ল পূজা।

সকলে। বায়ুগণ মধু করুন বর্ষণ!
নদীগণ মধু করুন ক্ষরণ!

সকলের পালয়িতা বিপুল আকাশ
পূর্ণ মধুচক্রসম হউন প্রকাশ !
আমাদের রাত্রি উষা শ্যামলা এ ধরা
চন্দ্রসূর্য্য নিরাবিল হোক মধুভরা !

অধ্যয়নকালশেষে তপোবন হইতে গৃহাশ্রমে যাইবার কালে সত্যবান্-সখা সুব্রত শিক্ষাব্রত-ধারিণী তরুণী তাপসী পার্ব্বতী ও অপর সকলের নিকট বিদায় লইতেছেন। পাঠকগণ ইহার সহিত জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ অবস্থায় দেবযানীর নিকটে কচের বিদায় গ্রহণের চিত্রটি মিলাইয়া পড়িলে ইহার রস আরও পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

(পরিক্রমণ-নিরত সুব্রত ও সশিষ্যা পার্ব্বতীর প্রবেশ)

সুব্রত। চলিলাম, দেবি !

পার্ব্বতী। স্বস্তি, সুমঙ্গল !
কত জন আসে যায় তপোবন হ'তে
শুধু তাহাদের স্মৃতি, তাহাদের প্রীতি,
ক্ষণতরে ছায়া ফেলে মোদের হৃদয়ে
দুঃখশীল মোরা। কিন্তু তুমি সুব্রাহ্মণ,
আপন চরিত্র-গুণে করিয়াছ জয়
হৃদয় মোদের ; আজি যেতেছ চলিয়া,
প্রাণের ফলকে রাখি রেখা চিরন্তন—
উদার চরিত্র-স্মৃতি। যত দিন বাঁচি
রহিবে স্মরণে। পারি যদি, মরণের পারে
নিয়ে যাব, সখা তব এ পবিত্র স্মৃতি।

সুব্রত। দেবি, দাও পদধূলি।

পার্ব্বতী। পদধূলি ! ছি ছি !
তুমি সখা, তুমি বন্ধু, সমকক্ষ মম,
আমি তোমা দেব পদধূলি ! ক্ষম মোরে।
লহ এই অক্ষমালা, দীনা তাপসীর
উপহার। ভারাক্রান্ত আজি এ হৃদয়।
তাপসীর স্নেহ গিয়ে, সংসারের পথ
কল্যাণ কুসুমাকীর্ণ করুক তোমার।

সুব্রত। (মস্তকে ধারণ)

কালিন্দী। না দেব, আমার মন কেমন করচে ! তুমি যেও না !
(সত্যবান্‌কে আলিঙ্গন)

সুব্রত। স্বর্গপ্লাবী সুধাধারা তুই ধরাপরে
কালিন্দী রে ! স্নেহময়ী ভগিনী আমার !

পার্ব্বতী। সিদ্ধকাম তুমি সখা, আজি ধন্য তুমি—
আজীবন আত্মনিষ্ঠ পশিছ সংসারে।
তুমি আর সত্যবান্, তোমরা দুজনে
যে খেলা খেলিলে হেথা—দুইটি হৃদয়
কোমল কঠোর আহা কিবা সখ্য-বিধি !
গৌতম-আশ্রম তাহা গৌরবের ভরে
রাখিবে স্মরণ সদা। নিয়েছ বিদায়
সখা হ'তে ?

সুব্রত। লইয়াছি দেবি !
সে মুহূর্ত্ত, সে বিদায় বর্ণনীয় নহে।

প্রিয়ঙ্কর। (নিকটস্থ হইয়া) একান্ত চলিলে দেব ?

সুব্রত। চলিলাম ; কিন্তু তব কাছে
প্রাণের একাংশ ভ্রাতঃ, রেখে যাই মম।

প্রিয়ঙ্কর। রেখে যাও ; কিছু আর দিয়ে যাও মোরে,
যাহাতে পাইব তোমা জীবনের মাঝে—
তুমিই আদর্শ মম।

সুব্রত। (চিন্তিত) কি দিব তোমায় !

প্রিয়ঙ্কর। যে কিছু—তোমার যাহে অভিরুচি হয় ;
তৃণগাছি—তাও মম মহাদর পাবে।

সুব্রত। তবে লহ এই—
"কেন" উপনিষদের ভাষ্য—সুমহান্
ভাবের ধারণা তরে নিষ্ফল প্রয়াস
অক্ষমের। অধ্যয়ন অবসরে বসি
করেছিল অভিলাষ নভঃ উড্ডয়নে
পক্ষহীন পক্ষী কোনও ; প্রতিচ্ছত্রে তার
নিরর্গল হইয়াছে অক্ষম পিপাসা।
নিবেশে পড়িও ভ্রাতঃ ; পড়ো যতবার
নাহি পাও মর্ম্মগত প্রাণের পরশ,
বহুমুখী বেদনা তাহার। পাবে হেথা
প্রশান্ত প্রতিভা বিভা প্রাচীন ঋষির
গুহায় সুগুপ্ত যাহা। কি কায ইহারে
বহিয়া চলেছি যথা। অধ্যয়ন করি
দিও যদি নিজ সম পাও কোন জনে
অন্যথা পাবকদেবে করিও অর্পণ।

প্রিয়ঙ্কর। ধন্য আমি দেব !
নাহি জানি, কোথা রাখি অভিজ্ঞান তব,
হৃদয়ে কি শিরোপরে।

সুব্রত। (সকলের প্রতি) তবে যাই !

সকলে। স্বস্তি !

[অন্য সকলের প্রস্থান।

সুব্রত। (পরিক্রমণ ও পশ্চাৎ ফিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাসে)
অয়ি পুণ্য বনভূমি, তমালমালিনী
অরণ্যানী, মৌনময়ী, গম্ভীরভাবিনী
হৃদয়ের প্রিয়সখি, আজ বুঝিতেছি
কত ভালবাসিতাম তোমা ! আজি কোথা
পড়িয়াছে টান ! আজি ছেড়ে যাই সব—
প্রিয়তম সখা, গুরু, আত্মবন্ধুজন
আশৈশব পরিচিত—নিরশ্রু নয়নে
কঠোর করিয়া বুকে ; তুমি কোথা ছিলে
এ সবার মাঝখানে, সবারে ব্যাপিয়া
মর্ম্মমাঝে আপনার প্রভুত্ব বিস্তারি !
সবারে ছাড়িয়া যাই, তোমা নাহি পারি !
এমনি কি কত শিষ্য, আমার মতন
অনিয়ত কাল হ'তে আসিতে যাইতে
তোমারে দেয়নি ধরা ! পশ্চাৎ করিতে
বিষম লাগেনি মনে। বুঝে নাই প্রাণ

প্রতিপদে মর্ম্মবন্ধ যাইতেছে ছিঁড়ি—
মা !

(পতিত হইয়া ভূতলে হৃদয় স্থাপন ও সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান)

এইরূপ উদাহরণ অজস্র—পাতায় পাতায়—উদ্ধার করিতে গেলে সমস্ত বইখানিই উদ্ধার করিতে হয়। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, শুধু বঙ্গসাহিত্যেই নহে, বিশ্বের বাণী-কুঞ্জে শশাঙ্কমোহনের স্থান কোথায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অসামান্য নাটকখানির নাম বাঙ্গালী পাঠক সমাজের শতকরা নিরানব্বই জনই জানেন না এবং নাট্য সাহিত্য-দীন "বাসরে বিদ্রোহ"—"প্রেমের ছুরি"—প্লাবিত বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে ইহার কখনও অভিনয়ও হয় না। অবশ্য এই নাটকখানির কাব্যরূপের জন্য তিনি পৌরাণিক কাহিনী ও হয় ত কোনও কোনও পূর্ব্ব-সূরীর কাছে কিছু ঋণী, কিন্তু তাঁহার এই ঋণ "Prometheus unbound"এর জন্য শেলির গ্রীক পুরাণের কাছে, শকুন্তলার জন্য কালিদাসের মহাভারতের কাছে, বা সেক্সপীয়রের কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের কাছে যতটুকু ঋণ, তাহা অপেক্ষা বেশী নহে।

এই গেল শিল্পী শশাঙ্কমোহনের কথা। কিন্তু এ পরিচয় তাঁহার গৌণ—তাঁহার প্রকৃত পরিচয় যাহা—তাহা দ্রষ্টা দার্শনিক আদর্শবাদী হিসাবে—ভাবের এত অসামান্য মহোদারতা, আদর্শের এত বড় গৌরব বঙ্গসাহিত্য কেন, অন্য কোনও সাহিত্যেও দেখা যায় কি না, জানি না। শশাঙ্কমোহন একবারে ভাবের যেখানে শেষ, সেইখানে তাঁহার বীণার সুর বাঁধিয়াছিলেন—তাঁহার সেই উপজীব্যের শিল্পমূর্ত্তি ছিল বাণী—একবারে ব্রাহ্মী বাণী—আমাদের দৈনন্দিন ভাব-বাণিজ্যের বাহন ভাষা নহে—এই আদিম বাণী যাহা অখণ্ড অদ্বয় নির্ব্বিশেষের প্রথম বিশেষণ এবং যাহা আমাদিগের ভারতীয় ঋষিগণের চিত্তে আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে ধরা পড়িয়া এক দিন আরণ্যকের সহস্র উল্লসিত গাথায় ফাটিয়া পড়িয়াছিল, তাহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া শশাঙ্কমোহন তাঁহার আগাগোড়া রচনাবলীর জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন—তাঁহার এই বাণী-পন্থা সম্বন্ধে তিনি নিজেই এক যায়গায় পরিচয় দিয়াছেন—

"তোমার অনন্তমুখী আদিরস-খেলা
ভুবন কবিতা-ছন্দে করি অবহেলা
বাহিরের ধ্বনিরঙ্গ বিলাসে বিহ্বল
শবদের অন্ধ বনে ঘুরেছি কেবল।
সকল শব্দের অর্থ পরমার্থ ভূমি
সে অন্ধ ঘূর্ণীর মাঝে তুমি—ছিলে তুমি
অতর্কিত অযাচিত! লভিনু তোমায়
ছন্দেরি অন্দরপুরে অন্তর-গুহায়
সর্ব্বার্থসিদ্ধির মহামহিমা সৌরভে
দিলে ভরি শূন্যোদর ভূমার গৌরবে
সেই তুমি উপস্থিত আজি সর্ব্বমতে
সকল ছন্দেরে নিতে একচ্ছন্দ পথে!
বিশ্বের সকল ছন্দে সাগর সঙ্গীত
নিখিল শবদ অর্থে এক অর্থরীত
গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ সঙ্গীত আকারে
পশিছে প্রণবচ্ছন্দে একের পাথারে।"

শশাঙ্কমোহনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার এই একচ্ছন্দা, "বিশ্বের সকল ছন্দসাগরসঙ্গীত"রূপ বাণীর প্রকৃতিটিকে সর্ব্বপ্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। ইহার উপরই তাঁহার সমস্ত সাহিত্যসিদ্ধি, ইহাই তাঁহার সমস্ত কাব্যের মূল-প্রকৃতি এবং তাঁহার সমস্ত দার্শনিকতার অন্তর্লীন তথ্য। আমরা এই বাণীকে প্রকট মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই তাঁহার "স্বপ্নপুরী" নামে ক্ষুদ্র নাট্য-কাব্যে। সেখানে ইহা আদিসৃষ্টির মহাবাণী,—অব্যক্তের প্রথম ব্যক্তরূপ এবং এই ধ্বংস-সৃষ্টিশীল জীবন-মরণ-বিচিত্র বিশ্ব-সংসারের প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এই জ্ঞান ইচ্ছা প্রেমরূপা ত্রিস্রোতগা সৃষ্টিধারা বা সৃষ্টির expression তাহা হইতেই প্রসূত হইয়া আবার তাহাতে আসিয়া প্রলীন হইয়াছে—এবং ইহার প্রত্যেক অংশ তাহারই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রকৃতিতে আনন্দে অনুবিদ্ধ—ব্যবহারতঃ খণ্ডভাবে সমগ্রতঃ অখণ্ডভাবে—যখন এই খণ্ড অনুভূতিগুলি সৃষ্টির গুণধর্ম্মে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া ক্রমে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যখন মহা-বিশ্বের সেই অনাদি রাগিণী আমাদের কানে আর বাজে না এবং এই স্বপ্নপুরী অত্যন্ত সত্য বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ যখন আমাদের অনাদি জীবনের অনন্ত শাশ্বত বাণী একেবারে আবৃত হইয়া যায় এবং সংসারে বাণী-বিভ্রাট ঘটে, তখনই সেই অনন্ত শক্তিময়ী আদিরূপা সনাতনী ভৈরবী মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিয়া যত কিছু ক্ষুদ্রতার খণ্ডতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার আপনার বিরাট স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংসারে ইহার নামই মহাবিপ্লব, মহাসংগ্রাম বা মহা অন্য কিছু এবং ভক্তের কাছে ইহাই মহা-মিলন। জগতের যত কিছু ঘাত-প্রতিঘাত, মিলন-বিরহ, সৃষ্টি-মৃত্যু, তাহাদের সকলের ভিতর দিয়াই এই এক বিরাট বিশ্বরূপা বাণী তরঙ্গোপহত বীচিচঞ্চল মহাসমুদ্রের মত বিরাজিত আছেন। এক দিকে যেমন ইহা সৃষ্টিরূপা, অনন্ত সনাতন পুরুষ হইতে উত্থিতা এবং তাহারই বক্ষে শায়িতা মূল প্রকৃতি; অন্য দিকে ইহাই আবার অনাদি মিলন-মহিমার নিত্যকাল মন্দ্রিত বেদরূপ সঙ্গীত, ইহারই উদাত্ত ভৈরব হুঙ্কার জগতের মননশীল করিয়া যখন যেমন আপনাদের হৃদয়-সংবেদনের ভিতর দিয়া ধরিতে পারিয়াছেন, তখনই তেমনই কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ইনিয়াড, প্যারাডাইস্ লষ্ট, ডিভাইনা কমেডিয়া, ম্যাক্‌বেথ, হ্যাম্‌লেট, ফষ্ট, মেঘনাদবধ কাব্য—সমস্তই এই মহাবাণীকে খণ্ডভাবে হৃদয়ের কোটায় ধরিবার ইতিহাস। শুধু কাব্য কেন, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব সকলই এই ত্রিগুণাত্মিকা বাণীর সাময়িক অভিব্যক্তি এবং স্বরূপ ধরিয়া বিচার করিলে তাহাদের ভিতরও ঐ তিনটি গুণই আছে। শশাঙ্কমোহনের এই বাণীর সম্বন্ধে পণ্ডিতবর ডাক্তার বি, এন, বড়ুয়া যাহা বলেন, তাহা এই—

"Each period of India's history, nay the history of the whole humanity, is in our poet's vision, but a particular mode of expression of Vani....the evolutionary process of nature and of humanity has

a reality meaning and value only in so far as it goes to build the sanctuary for Vani. The oceans, the mountains, the skies and the luminaries have all expressions of rythmic movement of joyousness. These are all inarticulate and therefore imperfect. The whole of culture which is man's heritage is barren and lifeless if it is not turned to the progressive spirit."

এই বাণী পন্থা, এই বাণী আদর্শ শশাঙ্কমোহন তাঁহার সমস্ত কাব্য নাটক দর্শন খণ্ডকবিতায় অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার এই সমস্ত কাব্য-প্রচেষ্টার যদি কিছু মানে থাকে, তাহা অসীমকে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরিবার চেষ্টা তাঁহার এই বাণী প্রকৃতির ভিতর দিয়া। তাঁহার অমর কাব্য "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে" গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই অন্বেষণ, এই "ধরিয়া বসাইবা"র প্রয়াস দ্বারাই প্রণোদিত, "বাণী মন্দির" এই বাণীরই মন্দির। অবশ্য উপজীব্যভেদে ইহার মূর্ত্তিভেদ হইয়াছে। সাবিত্রীতে ইহার মূর্ত্তি প্রেম (co-hesion), সেখানে কবি অনন্ত জীবনচ্ছন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন শুষ্ক বৈরাগ্যের মত আত্মঘাতকে অনন্ত মিলন রাগিণীর অখণ্ড সুর মহাপ্রেম দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়াছেন—সেখানে তাঁহার বাণীমন্ত্র "অপ্রেম বন্ধনমুক্তি বিশ্বময় প্রেম।" "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে" ইহার মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য—সৌন্দর্য্যের স্বপ্নে জাগ্রত একটি মানবচিত্ত। প্রকৃতি ও মানব সৃষ্টির এই দুই মহনীয় বিকাশের ভিতর দিয়া প্রেমের প্রেরণারূপ বাণীর সুরের দ্বারা উপেক্ষিত "সকল রূপের রূপ সে প্রিয় সুন্দর"কে অন্বেষণ করিতেছে, সেখানে অনুভূতিতে ঘনীভূত হইয়াই বুঝি তাঁহার সৌন্দর্য্য-ব্যাকুলতার উদ্দিষ্ট দেবতাই মানবের মূর্ত্তিতে আসিয়া ধরা দিয়াছেন—

> "অর্দ্ধদেব অর্দ্ধনর হিমাগিরি হেন
> শির বিষ্ণু-পদে যার পদ অবনীতে
> পদে তার ক্ষতচিহ্ন লাগিয়াছে যেন
> বিদ্রোহী এ সংসারের কণ্টকিত পথে।"

কিন্তু মানুষ সকল সময়ে সেই মহান্ প্রেম ও সৌন্দর্য্য সঙ্গীতের অখণ্ডরূপ দেখিতে পায় না, নানা দিকে তাহার তাল কাটিয়া যায়, তাই এই বিরাট বিশ্বরূপের সম্মুখে ব্যাহতচিত্ত ও সংশয়ী মানবাত্মার সেই চিরন্তন প্রশ্ন—

> "এ বিরোধ এ জিঘাংসা অশান্তি সমর
> নহে কি গো হে দেবতা নৈবেদ্য তোমার।"

এবং এখানে তাঁহার বাণীর চূড়ান্ত প্রকাশ—"জীবনের অন্য নাম যাহি অন্বেষণ।" এইরূপে এই তাঁহার এক বাণী আদর্শ তাঁহার সকল লেখার মধ্যে অনুস্যূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে।

এখন বিশুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির দিক বাদ দিয়া জীবনের দিক্ দিয়া দেখিলেও এই সর্ব্বজাতীয় ভাবের সমন্বয়কারী ভাবগত রস অনুপ্রবিষ্ট মহান্ আদর্শের ফল কিরূপ দূরপ্রসারী, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। তাঁহার এই আদর্শের ভিতর ভারতীয় ভাবধারার সমস্ত সার সত্যটুকু লুকান আছে। এক দিকে ইহা যেমন ব্রহ্মপন্থী, তেমনই অন্য দিকে ইহাতে আমাদের জাগতিক ক্ষুদ্রতম আশা-আকাঙ্ক্ষাটুকুরও অস্বীকৃতি নাই। যে যে ভাবে করুক না কেন এবং যাহাই করুক না কেন, সমস্তটাই অন্বেষণ—এ যে পাপতাপ-দিগ্ধ হতাশা-ব্যাকুল মানবজীবনে মস্ত বড় আশার বাণী! শশাঙ্কমোহনের এই বিরাট ব্রহ্মবাণী আদর্শের বৈশিষ্ট্য জগৎকে বাদ দিয়া নহে, জগৎকে লইয়া, জগতের ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া নহে, পরন্তু সবগুলিকে জোড়া দিয়া এক অখণ্ড দেহের অংশ করিয়া দেখাইয়া এবং সর্ব্বশেষে সকলকে এক মহান্ সচ্চিদানন্দ আদর্শে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়া; যেখানে নিখিল পোষক—কেহ কাহারও বাধক নহে, সকলে উপপ্লুত হইয়া চলে, কেহ কাহারও গায়ে লাগে না। অবশ্য শশাঙ্কমোহনের এ বিশিষ্টাদ্বৈত আদর্শ ভারতবর্ষেরই, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব যে, এ যুগে তিনি এই মহা সমন্বয়সাধিনী ভাবপ্রতিমা ভারত ধর্ম্মের এই সনাতনী মূর্ত্তিটিকে ঘন অন্ধকারে হাতড়ানোর ভিতরে ধ্যানযোগে ও রসের ভিতর দিয়া জীবন্তভাবে আপনার প্রাণের মধ্যে পাইয়াছিলেন এবং তাহাকে কাব্য-নাটক ইত্যাদির ভিতর দিয়া পরিবেষকরূপে আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। অবশ্য এই ঋষির ভারতে নূতন আর কোন্ ভাব আছে—শশাঙ্কমোহনের শ্রেষ্ঠতার দাবী ভাবের নূতন সৃষ্টিতে নহে, তাহা সর্ব্বভাবের মহা সমন্বয়ে, যাহাতে প্রতীচী ও প্রাচীর সব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কালের ডাক

> হে তরুণ—হে নির্ভীক—হে দুঃখসাধক!
> আগে চল; ফিরে আর চেয়ো নাক মিছে।
> তুচ্ছ শোক-দুঃখ—যত ভোগের লালসা,—
> ক্ষণিকের মোহ টানে জীবনের পিছে॥
>
> যুগে যুগে জাতিগত সঞ্চিত সে পাপ,
> ক্রূর সর্প সম রোষে দংশে নিশিদিন।
> অজ্ঞানতা অন্ধকার হীনতার গ্লানি—
> ঢাকিয়াছে আলোরন্ধ্র করি দৃষ্টিহীন॥
>
> প্রেম ত্যাগ উদারতা নিঃশঙ্ক জীবন
> মুক্তির আনন্দ-স্বাদ ভুলে গেছে হায়!
> স্বার্থ শুধু লেলিহান রসনা বিস্তারি
> লেহন করিছে ক্লেদ সবলের পায়॥
>
> রক্তি-পরিমলে-মাখা ক্লান্ত-ক্লিন্ন ফুলে
> অনঙ্গেরে পূজিবার এই কি সময়?
> এসো নারী—এসো নর—নব-সৃষ্টি দূত,—
> কর আজি সর্ব্বদুঃখ-লাঞ্ছনারে জয়!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায়চৌধুরী

অমরনাথ

৮০

চন্দননগরে কৃষ্ণনাথের বাড়ীতে মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী তাঁহার বন্ধুকে লইয়া প্রভাতের গাড়ীতে দেশে ফিরিয়াছেন। এত বড় ব্যাপারে একটা ছাগও নিহত হইল না, পুকুরে জালও পড়িল না। গৃহবাসীদের আনন্দোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কোন অসাধারণত্ব দেখা গেল না।

নরু, লতা না কি তিন চারি মাসের মধ্যে খানিকটা বড় হইয়া পড়িয়াছে, অমরনাথ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। নরু, লতা ছুটিয়া গিয়া বৃহদায়তন দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, তাহাদের কোন্ অঙ্গটা বাড়িয়াছে। বুঝিতে অসমর্থ হইলেও তাহারা প্রধান আদালতের রায় মানিয়া লইল এবং আব্দার ধরিল, তাহারা এবার কলিকাতায় পড়িতে যাইবে। কলিকাতায় পড়িতে যাইবার মত বড় হইয়াছে কি না, সে বিষয় উত্তরপাড়ায় কমিটীতে মীমাংসিত হইবে, এইরূপ অবধারিত হইল। লতা, নরু তাহাদের পক্ষসমর্থনার্থে অনেক অকাট্য যুক্তি দাখিল করিল; এমন কি, কহিল, খুকু বড় হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং কলিকাতার প্রান্তে কাশীপুরে অবস্থান করত পাঠাভ্যাস করিতেছে। অমরনাথ এ সংবাদ অবগত থাকিলেও তাহাদের আনন্দবর্দ্ধনার্থে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

বাড়ীর ভিতর গিয়া অমর দেখিলেন, হিরণ হাসির 'ফাগু' মুখময় মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অমর প্রণাম করিলে হিরণও আনতি দিল। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউদি, এত হাসি কোথায় পেলে?"

হি। পেয়েছি তোমার কাছে; তুমি আমাকে হাসতে শিখিয়েছ।

অ। আমি ত দেশে এলাম বহুকাল পরে—

হি। মনে নেই, তুমি এক দিন মীরপুরে আমাকে বলেছিলে, মনে সন্তোষ রাখতে পারলে ভগবান্ তার প্রতি প্রসন্ন হন?

অ। এই কথা?

হি। এই কথা নয়—অনেক কথা। আমি এখন কত আনন্দে আছি, তা তোমাকে কি বোঝাব? রোগ, বিপদ্ মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আমার দুঃখ-কষ্ট নেই—তাঁর উপর সকল ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। নরুর টাইফয়েড হ'ল, আমি একটু কাতর বা চিন্তিত হইনি; তাঁর দ্বারে এক দিনের জন্যেও মাথা কুটি নি, ছেলের রোগমুক্তি কামনা ক'রে এক দিনের জন্যেও প্রার্থনা করিনি। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক ব'লে আনন্দভরে আমার কর্ত্তব্য ক'রে বেড়িয়েছি।

অ। বেশ ক'রেছ বউদি; কিন্তু তোমার এ আনন্দ এত দিন কোথায় ছিল?

হি। আমাতেই ছিল। উৎস-মুখ আবর্জ্জনায় বন্ধ ছিল; লতা সে জঞ্জাল সরিয়ে দিলে, আর তুমি সে উৎস-মূলে অফুরন্ত জল ঢেলে উৎসকে চিরপ্রবাহী ক'রে রেখেছ।

অমর মৌনী রহিলেন। অতঃপর হিরণ রেবার বিয়ের কথা তুলিল। হিরণ কহিল, "ফুলশয্যার রাত্রিতে রেবাকে ফুলের গয়না প'রে কি সুন্দর দেখিয়েছিল, তা' তোমাকে কি বলব ঠাকুর-পো! বিয়ের দিনেই বা কি আনন্দ তার! কিন্তু বাসর হ'ল না, জ্বর এসে গেল। পোড়া ম্যালেরিয়া তার দেহটাকে চিবিয়ে খাচ্ছে।"

অ। তুমি লিখেছিলে বটে, মীরপুর হ'তে সে ম্যালেরিয়া এনেছে। আজও তা' সারল না?

হি। এইবার সারবে ব'লে মনে হয়; জামাই না কি তাকে তাঁর চাকরীর যায়গায় নিয়ে যাবেন।

রেবা যে এক দিন পশুপতিপুরে যাবে, অমর তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া তিনি রেনসনকে বলিয়াছিলেন, ব্রজবল্লভকে সরাইতে হইবে। রেবা তাঁহার প্রতিবেশী হইয়া থাকিলে মন স্থির রাখিতে পারিবে না বলিয়া অমরের বিশ্বাস। তাই তাহাকে দূরে রাখা অভিপ্রায়। ব্রজ পশুপতিপুর ত্যাগ না করিলে তিনি তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন।

অপরাহ্নে কৃষ্ণ ও অমর গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসিলেন। সুন্দর, প্রশস্ত পথ। এক দিকে গঙ্গা, অন্য দিকে সুরম্য সৌধমালা। একখানি বেঞ্চের উপর দুই জনে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। কত নৌকা যাইতেছে, কত মানুষ পারাপার হইতেছে, কত তরঙ্গ উঠিতেছে নামিতেছে। দুই জনে কত গল্প করিলেন। গল্পের শেষ নাই, কিন্তু সময়ের শেষ আছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন উভয়ে স্থির করিয়া উঠিলেন যে, পরদিন প্রভাতে তাঁহারা উত্তরপাড়ায় যাইবেন। পূর্ব্বাহ্নে হরনাথ বাবুকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে 'তার' করিতে তাঁহারা ডাক-ঘরের দিকে চলিলেন। 'তার' করা হইলে তাঁহারা গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। তখন সন্ধ্যা ৬টা হইলেও অন্ধকারে পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। যে পথ বহিয়া

তাঁহারা গৃহে ফিরিতেছিলেন, সে পথ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। সহসা তাঁহারা শুনিলেন, বামাকণ্ঠে কে কহিতেছে, "আপনারা আসুন না।"

অমর বন্ধুসহ দাঁড়াইলেন। কণ্ঠ তাঁহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। পথে অন্য কেহ নাই। রমণী একখানি পর্ণ-কুটীরদ্বারে অন্ধকারমধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। অমরও অন্ধকারে; রমণী তাঁহাদিগকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সাহস পাইল; পুনরায় ডাকিল, "আসুন।"

কৃষ্ণ বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ্যা। তিনি অমরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন; যাইতে যাইতে কহিলেন, "এ মাগী বেশ্যা; তুমি কি ব'লে ওর আহ্বানে দাঁড়ালে?"

অ। ও বেশ্যা নয় কৃষ্ণ, ও লাবণ্য।

কৃ। বিপিনের বোন্ লাবণ্য?

অ। হ্যাঁ। আমি ওর কণ্ঠস্বরে ওকে চিনেছি।

কৃ। এত দ্রুত নেমেছে?

অ। দেখ্‌ছি ত তাই। নিশ্চয় ও খুব কষ্টে পড়েছে—কৃষ্ণ, তোমাকে ওর কাছে গিয়ে সন্ধান নিতে হবে।

কৃ। আমি বেশ্যাবাড়ী যাব? তুমি কি বল?

অ। কেন, যেতে দোষ কি? উদ্দেশ্য নিয়ে ত বিচার।

কৃ। আমি ওদের ঘৃণা করি।

অ। ছি ছি, ঘৃণা কাউকে করো না; ওরা অনাথা, অজ্ঞান,—কৃপার পাত্র।

কৃ। তোমার দয়া যদি এত উথলে উঠে থাকে, তবে তুমি কেন যাও না?

অ। আমাকে ও চেনে, হয় ত লজ্জায় কোন কথা বলবে না—আচ্ছা, চল।

কৃ। গিয়ে কি হবে বল দেখি?

অ। ওকে এ নরক হ'তে উদ্ধার ক'রে বিপিনের কাছে পাঠাব।

কৃ। বিপিন নেবে?

অ। না নেয়, অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।

দুই জনে ফিরিলেন। লাবণ্য দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইল। ভাবিল, আজ রাত্রি তাহারে উপবাসে কাটিবে না।, কয় দিন ভাল রকম আহার জুটে নাই, আজ জুটিবে আশা করিল। অমরনাথ অগ্রসর হইলে লাবণ্য বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত ডাকিল, "ভিতরে আসুন।"

উভয়ে ভিতরে গেলেন; লাবণ্য পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। কুটীর ক্ষুদ্র ও সামান্য। কয়েক জনমাত্র মধ্যবয়সী বারবনিতা কুটীরে বাস করে। তাহারা ভাড়াটিয়া মাত্র। যিনি গৃহস্বামিনী, তিনি প্রায় আধকাঠা জমী লইয়া রোয়াকে উপবিষ্ট ছিলেন। পাশে একটা ডিবা জ্বলিতেছিল। কয়েক জন প্রৌঢ়া রমণী নিকটে বসিয়া কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া ধোঁয়া লইতেছিল এবং আজকালকার লোকেদের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। প্রত্যেক বক্তী প্রতিপন্ন করিতেছিল, সে কত বড় বুদ্ধিমতী ও ধার্ম্মিকা। স্বামিনী তাঁহার ক্রোড়ে শায়িতা মার্জ্জারীর অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ দ্বারা নিরতি জানাইতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া লাবণ্য তাহার ঘরের দিকে যাইতেছে, তা'র পিছনে দুইটি বাবু। মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে নগি?" নগি ওরফে নগেনবালা ওরফে লাবণ্যবালা উত্তর করিল, "দুটি বাবু।"

"বাবু ত অনেকেই; এক জনকে টাকা নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।"

কৃষ্ণনাথ মুখের ভূরিভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অনিচ্ছার সহিত স্বামিনীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু শাস্ত্রের বিধানানুসারে শত হস্ত দূরে থাকা ক্ষুদ্র অঙ্গনে সম্ভবপর নয় দেখিয়া কৃষ্ণ শত অঙ্গুলি দূরে রহিলেন। বর্ষীয়সী কঠোর কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া কহিলেন, "টাকা আগে দিয়ে নগির ঘরে যেও বাপু! এর পরে যে বলবে, কুচ্ছিৎ—"

কৃষ্ণ দুই টাকা ঝনাৎ করিয়া রোয়াকের উপর ফেলিয়া দিলেন। দুইটা টাকা পাইবে, বৃদ্ধা এতটা আশা করে নাই। একটা পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত; দুইটা দেখিয়া অস্বাভাবিক তৎপরতার সহিত কুড়াইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল এবং প্রশান্তকণ্ঠে কহিল, "যাও বাবু, যাও, ঐ যে ঘর—তুমি ভদ্রলোক—যাবে বই কি—ভদ্রলোক দেখলেই চেনা যায়—"

কৃষ্ণ দ্রুতপদে উঠান পার হইয়া লাবণ্যর ঘরে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, অমর মেঝের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর লাবণ্য অনতিদূরে করতলে মুখ ঢাকিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অমর কহিতেছিলেন, "আর দেরী করো না লাবণ্য, চল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।"

লাবণ্য। আমি যাব না, আপনি চ'লে যান, আপনাকে আমি ডাকি নি।

অমর। তুমি ডেকেছ, তা নইলে ভগবান্ আমাকে এমনই সময়ে এ পথে পাঠাবেন কেন? তুমি কষ্টে প'ড়ে তাঁকে ডেকেছ, তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি যে কারুর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করেন না।

লাবণ্য। আমার কোন কষ্ট নেই, আমি বেশ আছি।

অমর। তোমার অনেক কষ্ট। তুমি খেতে পাও না, তুমি পর্‌তে কাপড় পাও না, শুতে বিছানা পাও না। এই দারুণ শীতে তোমার গায়ে কাপড় নেই, বিছানায় লেপ নেই—

লাবণ্য। না থাকে, আপনার কি? আপনি যান—

অমর। এই জীবন, এই পেশা তুমি যদি স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়ে থাক, তা হ'লে আমি চ'লে যাচ্ছি।

বলিয়া অমর প্রস্থানোদ্যত হইলেন। লাবণ্য তখন কহিল, "না, দাঁড়ান, একটা কথা শুনে যান—"

অমর দাঁড়াইলেন। লাবণ্য কহিল, "আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমি স্বেচ্ছায় এ পেশা নিই নি, পেটের জ্বালায় আমাকে নিতে হয়েছে। হাঁসপাতাল হ'তে বিদায় নিয়ে যখন আমি পথে দাঁড়ালাম, তখন এক পয়সাও আমার সম্বল ছিল না। তাই—তাই—সে সব নোংরা কথা আপনার মত লোকের কাছে বলতে পারব না।"

অমর। বলবার দরকার নেই; কিন্তু তুমি অন্য পেশা ত নিতে পারতে। এর চেয়ে পথে পথে ভিক্ষা—

লাবণ্য। ভিক্ষা করতে কখন পারিনি, বোধ হয়, এখন পারি। ভগবান্ একে একে সব কেড়ে নিয়ে আমার দর্প চূর্ণ

করেছেন—এখন বোধ হয়, আমি এক মুষ্টি অন্নের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।

অমর। তবে চল লাবণ্য, আমার সঙ্গে, ভিক্ষা তোমাকে করতে হবে না—তোমার এই ভাইটি বেঁচে থাকতে তোমাকে কোন কষ্ট আর পেতে হবে না।

লাবণ্য হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল। মুখ হইতে হাত উঠাইল না, সম্মুখও ফিরিল না।

কৃষ্ণ কহিলেন, "আবার বসলে যে,—চল—না, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।"

লাবণ্য সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিল, "আপনারা কি সত্যি আমাকে এ নরক হ'তে উদ্ধার করতে এসেছেন?"

অমর। বলেছি ত, তোমার কণ্ঠস্বরে তোমাকে চিনে আমরা এসেছি।

লাবণ্য। আমাকে কোথা নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছেন?

অমর। বিপিনের কাছে পাঠিয়ে দেব।

লাবণ্য। না, না, সেখানে আমি যাব না—দাদাকে, বৌদিদিকে এ মুখ আর দেখাতে পারব না।

অমর। অন্তর যদি চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে পেরে থাক, তবে আর লজ্জা কি?

লাবণ্য। না, আমি যাব না—আপনি যান।

অমর। তোমাকে না নিয়ে যাব না লাবণ্য, তুমি যে আমার বোন্।

লাবণ্য। আমি—আমি এখন আপনার বোন্ হবার স্পর্দ্ধা রাখি না, আপনার দাসীর দাসী হবারও যোগ্যতা এখন আমার নেই।

অমর। বোন্ চিরদিনই বোন্। আমরা পাপ করলে তিনি ত আমাদের ঘৃণা করেন না, ত্যাগ করেন না, আমরা যে চিরদিনই তাঁর সন্তান।

লাবণ্য। আমার মত পাপ যে কেউ করে না।

বলিতে বলিতে তাহার চোখের জল উথলিয়া উঠিল। চোখের জল লাবণ্য লুকাইতে গেল, পারিল না; ধ্বনি চাপিতে গেল, পারিল না। অমর তখন হেঁট হইয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "তোমার পাপ ত আর নেই দিদি, চোখের জলে যে সব ধুয়ে গেছে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে লাবণ্য কহিল, "ধোয় নি, ধুয়ে গেলে আমার এ যন্ত্রণা থাকত না। আপনি এসে আমাকে আদর ক'রে আমার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিলেন।"

অমর। আরও বাড়তে দেও; যন্ত্রণা যত তীব্র হবে, তত শীঘ্র শান্তি পাবে।

লাবণ্য। আমার যা হয় হবে; আপনি এ নরকে আর থাকবেন না—যান।

অমর। তোমাকে নিয়ে যাব ব'লে যে এসেছি, দিদি।

লাবণ্য। বলেছি ত, আমি দাদাকে আর মুখ দেখাতে পারব না। তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে কত ভাল মনে করতেন, আর আমি এমনি ক'রে তাঁর মুখে চুণ-কালি দিয়ে এসেছি।

অমর। তবে তুমি আমার বাড়ীতে চল; লোকে বোন্‌কে যেমন আদর-যত্নে রাখে, আমি তেমনই তোমাকে আদরে সেখানে রাখব।

লাবণ্য আবার কাঁদিল—খুব কাঁদিল। বেগ একটু কমিলে কহিল, "জানেন না, কাকে আপনি এত আদর করছেন। আমি সে লাবণ্য আর নই, আমি এখন পিশাচী—সকলের ঘৃণার পাত্রী। আমার মুখ দেখে শিউরে উঠবেন না—ভয়ে চেঁচাবেন না। এই দেখুন আমি কে—" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখ ফিরিয়া মুখ হইতে হাত নামাইল। অমর ও কৃষ্ণ স্তম্ভিত হইলেন। কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি! মুখের দক্ষিণদিক পুড়িয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে যেন কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে; গণ্ডের স্থানে স্থানে মাংস নাই; দক্ষিণচক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বামদিক যদি এই ভাবে ভ্রষ্টসৌন্দর্য্য হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এত বীভৎসদর্শন হইত না। কৃষ্ণনাথ সে মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; অমরনাথের হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল; লাবণ্য এক চক্ষু অমরের বদনের উপর রাখিয়া কহিল, "এই দেখুন, পিশাচীকে দেখুন—পাপের জীবন্ত মূর্ত্তি, শ্মশানের অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, পথভ্রষ্টা ব্যভিচারিণীর পরিণাম দেখুন। এখনও কি একে আপনার ভগিনী ব'লে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন?"

অমর। আমি ভগ্নী ব'লে তখন ভুল করেছিলাম। তুমি ভগ্নী নও, তুমি আমার মা।

লাবণ্য স্তম্ভিত হইল; বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে অমরের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর—তাহার পর অমরের চরণের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল; অশ্রুতে পদযুগল ধৌত করিল; উচ্ছ্বাসে মুহুর্মুহুঃ কাঁপিতে লাগিল।

* * * *

ক্ষণপরে তিন জনে গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে একখানা গাড়ী লইয়া গৃহে ফিরিলেন। অমরের নিকট লাবণ্য সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া হিরণ কহিল, "ঠাকুরপো, তুমি যা কর, সবই ঠিক; কিন্তু ওকে এখানে আনা কি ঠিক হয়েছে?"

অ। ঠিক মনে না কর, লাবণ্যকে উত্তরপাড়ায় রেখে আসছি।

হি। বাবাও ওকে স্থান দেবেন না।

অ। নিশ্চয় দেবেন। তিনি জ্ঞানী—মন দেখে বিচার করবেন।

হি। আর আমি অজ্ঞানী, দেহ দেখে বিচার করছি, না?

অ। ঠিক বলেছ বউদি; যারা অজ্ঞানী, তারা বোঝে না, পাপ কোন্ স্থানটা স্পর্শ করে। ঋষিরা মন নিয়ে বিচার করেছেন। পরশুরামের জননী রেণুকা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকে ভার্য্যাসহ জলবিহার করতে দেখে কামাতুর হয়েছিলেন। স্বামী জমদগ্নি ধ্যানপ্রভাবে তা জানতে পেরে তাঁর শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেন এ কঠোর ব্যবস্থা করেছিলেন? রেণুকার দেহ ত কলুষিত হয় নি, তবে এ ব্যবস্থা কেন? আবার মৎস্যগন্ধা সত্যবতী কৌমারে পরাশর কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হয়েও কিরূপে শান্তনুরাজের অঙ্কলক্ষ্মী হলেন? তাঁরা মন নিয়ে বিচার করতেন, দেহের কালিমাপানে চেয়ে দেখতেন না। যে মুহূর্ত্তে তোমার পাপে রতি হ'ল, সেই মুহূর্ত্তে তুমি পাপ করলে—ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত করবার অপেক্ষা থাকে না।

হি। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও কার্য্য দুই ত'বর্ত্তমান।

অ। না, বর্ত্তমান নয়। ঘটনাচক্রে প'ড়ে লাবণ্য আজ জঘন্ত বৃত্তি অবলম্বন করেছে। এক জনকে লাবণ্য অন্তরের সঙ্গে ভালবাসত, সে বিয়ের লোভ দেখালে, সরল বিশ্বাসী লাবণ্য তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে। এই চরিত্রহীন ব্যক্তি লাবণ্যকে মদ ধরালে; তার পর বিজয়া-দশমীর দিন যখন সে নেশাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তখন অপর এক দুর্ব্বৃত্ত তাহার অচৈতন্ত দেহ নিয়ে পলায়ন করলে। দুই ব্যক্তি লাবণ্যর দেহ কলুষিত করলে—এক জন ছলনায়, অপরে কৌশলে। লাবণ্য দোষী কি না, ভগবান্ জানেন। তার পরে বিকৃত দেহ নিয়ে লাবণ্য যখন হাঁসপাতাল হ'তে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াল, তখন সে সম্বলহীন, আশ্রয়শূন্য। কেহ তখন তাহাকে হাত ধ'রে তুলে আনে নি; যে তাকে তুলে এনে মুখে দুটো ভাত দিলে, সেই তাকে এ পথে আনলে। নিঃসহায় নিরবলম্বন—করে কি? তুমি ঘরে ব'সে নাক সিঁটকুতে পার, কিন্তু তার তখনকার অবস্থাটা বিচার ক'রে দেখ দেখি। যে সর্প, যে ব্যাঘ্র লাবণ্যর এই সর্ব্বনাশ করলে, তারা সমাজের মাথায় ব'সে পূজা লুঠে বেড়াচ্ছে; আর এই অনাথা অজ্ঞানী তার অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্ত মানুষের দ্বার হ'তে ঘৃণাভরে বিতাড়িত হচ্ছে। যদি ঘৃণা করতে হয়, তবে তাকেই কর—যে চিত্ত মন নিয়ত পাপচিন্তায় কলুষিত করছে, পরের হিংসা করছে, সর্ব্বনাশ করছে—

হি। তা হ'লে তোমার বিচারে লাবণ্য নিষ্পাপ?

অ। বিচার করবার তোমার আমার অধিকার কি? তুমি শুধু দুঃখী কাঙ্গালের সেবা ক'রে যাও—তাদের জননী হও।

লা। তোমার উপদেশ, তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম ঠাকুর-পো। তোমার জ্ঞানবুদ্ধি আমার জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী।

কৃষ্ণনাথ আসিয়া কহিলেন, "তা যদি তুমি সত্যই মনে করতে, তা হ'লে অমরের সঙ্গে তর্ক করতে না। অমর যা করে, তাই সুন্দর, আমি কখন তার কার্য্যের প্রতিবাদ করি না।"

অমর। এখন লাবণ্যকে স্নান করাও, খাওয়াও।

৫১

উত্তরপাড়ায় পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন প্রভাতে হরনাথ পার্ব্বতী-দেবীকে কহিলেন, "আজ এত আনন্দ তোমার কিসের?"

পা। আজ আনন্দময় আমার ঘরে আসছেন।

হ। তাই এত আনন্দ? কেন, সে দিন ত আনন্দ করনি, যে দিন সে উপযাচক হয়ে তোমার গৃহে আতিথ্য চেয়েছিল?

পা। সে দিনের কথা আর বলো না।

হ। মুখে না বললেও, অন্তরে যে সব জাগছে, পার্ব্বতি!

পা। আমার অন্তরে আর জাগছে না, বুঝি অনুতাপে সে স্মৃতি ধুয়ে গেছে।

হ। তবে তুমি সুখী; আমি যে তা ভুলতে পারছি না, পার্ব্বতি!

পা। তবে তুমি তার সঙ্গ করলে কি? আমার অন্তরের সব আবর্জ্জনা ধুয়ে দিয়ে সে যে আমাকে নতুন মানুষ করেছে।

হ। তা' দেখছি, তুমি আর সে পার্ব্বতী নও। এখন আমি জপ করতে বসলে, তুমি ঘরে কাউকে আসতে দেও না; সব কায ফেলে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে যাও—

পা। সত্যই আমি আর সে পার্ব্বতী নই—এখন আমি অমরের মা। সে যে দিন মীরপুরে আমাকে মা ব'লে ডাকলে, সেই দিন হ'তে আমি অহরহ চেষ্টা করছি, কি করলে আমি অমরের মা হ'তে পারব! কোন কথা বলবার আগে, কোন কায করবার আগে ভেবে দেখি, অমর সে কথাটা বা কাযটা পছন্দ করবে কি না।

হ। একেই বলে সৎসঙ্গ। তুলসীদাস বলেছেন—

> এক ঘড়ি আধি ঘড়ি আধি মে আধ
> তুলসী সঙ্গৎ সাস্তকি হরে কোটি অপরাধ।

এই সাত্ত্বিক সঙ্গ অনেক রকমে হয়; শাস্ত্রকথা বল, বা মহৎ চরিত্রের আলোচনা কর, এতেও সৎসঙ্গের ফললাভ হয়। আমরা সৌভাগ্যবলে মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করেছি—

শোভা অকস্মাৎ আসিয়া কহিল, "আচ্ছা বাবা, তুমি অমরকে মহৎ মহৎ কর কেন?"

হর। যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী, সেই মা, মহৎ; আবার যে চিত্তজয়ী, সে মহৎ হ'তেও মহৎ। দিগ্বিজয়ী বীররা পৃথিবী জয় করেছেন, কিন্তু চিত্ত জয় করতে পারেন নি। দেবরাজ ইন্দ্রও তাই; তিনি অসুরজয়ী, কিন্তু চিত্তজয়ী নন। যে চিত্ত-জয়ী, সে ঋষি; যে সত্যাশ্রয়ী, সে মহাপুরুষ।

শোভা। সকল সময় সত্যি বলা যায় না বাপু!

হর। কেন বলা যায় না? এই ত অমর বলে।

শোভা। ভারি ত বলেন! ঝড়েতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সত্যি ত বলতে পারেন নি।

হর। মিথ্যাও ত বলেন নি; এ স্থলে সত্য গোপন করায় অধর্ম্ম নেই। এমন কি, তিনি যদি মিথ্যাও বলতেন, তা হ'লেও বোধ হয়, কোন অপরাধ হ'ত না। তুমি ঋষিপুত্র সত্যবাচের উপাখ্যান পড়েছ?

শোভা। মানুষের এ রকম বিদ্‌কুটে নামই কখন শুনি-নি।

হর। অমর সত্যবাচের উপাখ্যান প'ড়ে থাকবেন; ঋষি-পুত্র এই প্রকার অবস্থায় যেরূপ জবাব দিয়েছিলেন, অমরও ঠিক সেইরূপ উত্তর করেছিলেন। তিনি সত্য গোপন ক'রে এক জনের উপকার করেছেন, কাহারও অনিষ্ট করেন নি। যদি গোপন না করতেন, তা হ'লে বেনসনের অনিষ্ট হ'ত, অথচ কাহারও উপকার হ'ত না।

পার্ব্ব। তুমি এ সব মামলা-মকর্দ্দমার কথা জানলে কি ক'রে?

হর। কৃষ্ণের নিকট শুনেছি; অমর ত তার নিজের কথা আমাকে কিছু বলে না।

এমনি সময় জ্যোতির্ম্ময়ী চঞ্চল চরণে আসিয়া শোভার পাশে দাঁড়াইল। তাহার মুখময় আনন্দ। হরনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর এসেছে, মা?"

"হুঁ।"

পার্ব্বতীকে হরনাথ কহিলেন, "তুমি যাও—আগে তাকে

যাওয়াও গে। দুই বৎসর পরে বিতাড়িত অতিথি ফিরে এসেছে।"

কথা শেষ হইবার আগে গৃহিণী দ্বিতলে উপনীত হইলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে হরনাথ কি ভাবিয়া দ্বারসান্নিধ্য হইতে ফিরিয়া গিয়া চৌকীর উপর বসিলেন এবং জ্যোতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এবার যে মা, অমর তোমাকে নিতে এসেছে।"

জ্যোতির মুখ উজ্জ্বল; সে নীরব রহিল। কিন্তু শোভা নীরব থাকিবার মেয়ে নয়—সে কহিল, "তুমি কেমন ক'রে তা জানলে, বাবা?"

হর। জানলাম কেমন ক'রে, তা ত তোমাকে বোঝাতে পারব না মা; আমার মন ব'লে দিচ্ছে, অমর এবার মন্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়, তোকে চিনে জেনে জিজ্ঞেস করছি, তুই কি তার যোগ্য হ'তে পারবি?

জ্যো। আমি ত আর মিথ্যে বলি না, বাবা।

হর। অমর যে শুধু সত্যধর্ম্মে বড়, তা ত নয়—বড় সে চিত্তজয়ে, সেবাব্রতে। অমর পরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। তুমি মা পরকে নিজের চেয়েও ভালবাসতে পারবে?

জ্যো। কেন পারব না বাবা? আমি ত তোমারই মেয়ে।

হর। আমি নিজেই যে তা পারি না মা। পরকে আত্মবৎ মনে করা ভারি কঠিন। আমি একবার হাজার টাকার তোড়া ডান হাতে নিয়ে বাম হাতকে অনায়াসে তা দিলাম, কোনও উদ্বেগ হ'ল না, কিন্তু সেই তোড়া নিয়ে রাস্তার এক জন পথিককে দিতে কিছুতেই আমার মন সরল না। বাম হাতকে আপনার জেনে তোড়াটাকে দিতে পারলাম, কিন্তু পথিককে পারলাম না। আমাতে ত্যাগ কোথায় মা? কিন্তু অমর টাকার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান্ নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে পরের জীবনকে বড় মনে করে; অনায়াসে সেই অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। এ আত্মোৎসর্গ মানুষে পারে, কিন্তু দেবতায় পারে না। দেবতা স্বকার্য্যসাধনের জন্যে মানুষের দ্বারে তার জীবন, তার অস্থি ভিক্ষা করলে; মানুষ অনায়াসে তা দিলে, আর দেবতা অসঙ্কোচে তা' নিয়ে শত্রু মারতে, রাজ্যোদ্ধার করতে অস্ত্র নির্ম্মাণ করলে। দেবতা ভোগ জানে, ত্যাগ জানে না। এই রেবা—

শো। আমিও রেবার কথা ভাবছিলাম, বাবা। তার মত ত্যাগ অমর বাবুও দেখাতে পারেন নি। রেবা অনন্ত নরক স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিলে অমরের সুখের জন্যে।

হর। সেই রকম কথা আমিও তোমার গর্ভধারিণীর মুখে শুনছিলাম। কিন্তু তিনিও সব কথা বলতে পারলেন না।

শো। আমি কিছু জানতাম না, কাল আমি জ্যোতির মুখে সব শুনেছি; ছি ছি, আমি আবার তাকে কুলটা ব'লে গাল দিয়েছিলাম।

হর। কু—ল—টা!

শো। হ্যাঁ বাবা। তাকে আমি বলেছিলাম, অমরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রে কেমন ক'রে সে স্বেচ্ছায় অপর এক জনকে বিয়ে করলে? দ্বিচারিণীর প্রায়শ্চিত্ত কি, তা-ও তাকে বলেছিলাম। তখন ত জানতাম না, অমরের সুখশান্তির জন্যে সে নিজেকে বলি দিচ্ছে।

হর। এ ত্যাগের পুরস্কার নরক নয়, অক্ষয় স্বর্গ। থাক্ এখন এ সব কথা। তোমাদের ব'লে রাখি, এ সব কথা যেন অমরের কানে না যায়; তা হ'লে তার মনে বড় আঘাত লাগবে। এই যে অমর এসেছ, এস বাবা; এস কৃষ্ণ, এস— তোমরা জলটল খেয়েছ?

অমর ও কৃষ্ণ প্রণাম করিয়া ভূতলে একখানা গালিচার উপর বসিলেন। অমর উত্তর করিলেন, "মা কি না খাইয়ে ছাড়েন। কত আদর—"

শোভা ও জ্যোতি উভয়কে প্রণাম করিল। শোভা প্রণামান্তে অমরকে কহিল, "এই আমার শেষ প্রণাম।"

ইঙ্গিতটুকু বুঝিলেও কৃষ্ণনাথ মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "অমরকে বুঝি তোমার পছন্দ হ'ল না?"

শো। (মৃদুস্বরে) দেখুন কেষ্টদা, আমাকে ঘাঁটাবেন না।

কৃষ্ণ। এমন কায আমি কিছুতেই করব না, তা হ'লে যে আমারই গায়ে ছিটকে লাগবে।

হরনাথ কহিলেন,—"তুমি অনেক দিন পরে এলে, এখন কিছু দিন থাকবে ত, অমর?

অ। ফিরে যাবার বিশেষ তাড়া নেই, বেনসনের উপর সকল ভার দিয়ে এসেছি।

হর। বেশ বন্ধুটি তোমার জুটেছে। যে ব্যক্তি তাঁর উপর নির্ভর করে, ভগবান্ ঠিক সময়ে ঠিক মানুষ বা জিনিষ জুটিয়ে দেন। তার কোন অভাব রাখেন না। তা' তোমার এখন কি রকম লাভ হচ্ছে?

অম। এ বছর বিশ পঁচিশ হাজার টাকার বেশী হবে ব'লে মনে হয় না। বেনসন বলছে, দু' তিন বছরের ভেতর লাভ দু' তিন লাখ টাকায় দাঁড়াবে।

হর। শুনে বড় আনন্দ হ'ল। তুমি এবার নিশ্চিন্ত হ'লে। যার অন্নচিন্তা আছে, তার ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হয় না।

অম। আমি মনে করছি, এবার নরুকে নিয়ে যাব। আমার কাছে পড়বে, কাযও শিখবে।

হর। ওর বাপ মা থাকতে পারবে?

অম। কিছু দিন আমার কাছে থাক; এখানে লেখাপড়া হচ্ছে না। তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে। কৃষ্ণ বলছিল, লতা নরুর মধ্যে প্রণয় গাঢ় হয়ে আসছে; তাদের পৃথক্ করা দরকার। কৃষ্ণই নরুকে আমার সঙ্গে পাঠাতে চায়।

হর। তোমরা যা' ভাল বোঝ, তাই কর। এখন ও সব কথা থাক বাবা—অনেক দিন তোমার কীর্ত্তন শুনি নি—

কৃষ্ণ কহিলেন, "অমরের মনটা আজ বড়ই চঞ্চল—"

হর। কেন, কেন?

কৃষ্ণ। সে আপনার কাছে কি চায়, কিন্তু লজ্জায় আশঙ্কায় চাইতে পারছে না।

হর। তাকে চাইতে হবে না—আমি বুঝেছি। আশঙ্কা কি বাবা? তোমারই জন্যে যে মরী; তার কত সৌভাগ্য! মরি, মা, এ দিকে এস—লজ্জা কি মা—স্বামী যে অতি পবিত্র।

জ্যোতির হাত দুইখানি লইয়া হরনাথ অমরের হাতের

মধ্যে দিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "এই নাও বাবা, আমার মাকে—মূর্ত্তিমতী প্রেমকে তোমার হাতে দিলাম। তোমার যোগ্য হবে কি না, জানি না, কিন্তু এর বেশী তোমাকে দেবার আমার ত কিছু নেই, বাবা। আর মণি, তুমি জানবে মা, অমর তোমার প্রভু, তোমার সখা, তোমার সন্তান। সে তোমার বংশীধারী কৃষ্ণ, তোমার হৃদয়নাথ, তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা। আশীর্ব্বাদ করি, উভয়ে একপ্রাণ, একাত্মা হও—তোমাদের অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ হোক।"

তাঁহার কথা আর শুনা গেল না—চারিদিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

৫২

ফাল্গুনের শেষে জ্যোতি এক দিন কোন্নগরে রেবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা। ঘরের বাহিরে আলো, ভিতরে অন্ধকার। আলো জ্বালিবার সময় হয় নাই বলিয়া ঘরে কেহ আলো দেয় নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী অস্পষ্টালোকে বিদ্যুৎগঠিত প্রতিমাবৎ রেবার নয়নে প্রতিভাত হইল; তাহাকে দেখিয়া রেবা চমকিয়া উঠিল; চিনিতে পারিল না। কহিল, "কে তুমি? স্বর্গের দেবী? না, দেবী ত এত সুন্দর হয় না। অনেক প্রতিমা দেখেছি, তা হ'লে কে তুমি? আমাকে নিতে এসেছ? ফিরে যাও, আমার যাবার এখনও সময় হয় নি, অমর—আমার হৃদয়নাথ আগে দেশান্তরে চ'লে যাক্, তার পর—"

"আমাকে চিন্‌তে পারছ না রেবা-দি? আমি যে জ্যোতি।"

"ওঃ, তুই এসেছিস। তুই এত সুন্দর হয়েছিস? তা' হবি না কেন? তুই যে রূপের সাগরে আশ্রয় পেয়েছিস। আয় ভাই, বোস।"

রেবার শীর্ণ দেহ, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু, মাংসহীন গণ্ড দেখিতে দেখিতে জ্যোতি কাঁদিয়া উঠিল। রেবা কহিল, "কেঁদো না বোন্, আমি বড় আনন্দে আছি। দেহ দেখে—আমার খোলসটা দেখে আমার অন্তরের বিচার করো না।"

জ্যোতি চোখের জল মুছিয়া রেবার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রেবা কহিল, "এবার অনেক দিন পরে এলি জ্যোতি—"

জ্যো। কি করব, আসতে পারি নি—

রেবা। আমি সব খবর পাই। তুমি বিয়ের পর চন্দননগরে গিছলে, সেখান হ'তে আজ ক' দিন হ'ল ওতরপাড়ায় ফিরেছ, শীগ্‌গির আবার পশুপতিপুরে যাবে—

জ্যো। হ্যাঁ; বোশেখের প্রথমেই যাব।

রেবা। যাও, সুখে থাক; যে সুখশান্তি সংসারে কেহ কখন লাভ করে নি, সেই সুখশান্তি তুমি পাও। আমার কথা কখনও তোমরা তুলো না, আমার স্মৃতি কখন যেন তোমাদের পীড়ন করে না।

জ্যো। তোমার কথা যে আমরা কখন ভুলতে পারব না। তিনি যে সে দিনও তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

রেবা। আমার কথা! এই হতভাগিনীর কথা তাঁর মুখে! বল, তিনি কি বলছিলেন?

জ্যো। বলছিলেন তোমার রোগের কথা—

রেবা। ছি ছি, এই সব তুচ্ছ কথা তাঁর মুখে—

জ্যো। বলছিলেন তোমার মনের কথা—

রেবা। আমার মন? আমার মনে ত দু' কথা নেই, মাত্র একটি কথা, একটি চিন্তা আছে—সব মিশে একটিতে দাঁড়িয়েছে।

জ্যো। বড়দি যখন বললেন, তুমি বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছ, তখন তিনি ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আর আমাকে ও কথা ব'লে বুঝিও না বউদি, সে আমাকে নিয়ত ধ্যানে আকর্ষণ ক'রে তার সমস্ত অন্তর আমাকে খুলে দেখাচ্ছে।'

রেবা। সর্ব্বনাশ! তবে ত তাঁকে আমি সুখী করতে পারলাম না, আমার কথা ভেবে যে তিনি কাতর হয়ে পড়বেন। জ্যোতি, একটু জল—

জ্যোতি জল খাওয়াইয়া শায়িতা রেবার পাশে বসিল। ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে চিন্তা করিল। জ্যোতি রেবার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে সযত্নে উঠাইয়া লইয়া কহিল, "আমি এই দেড় মাস কত বার ভেবেছি রেবা-দি—"

রেবা। কি ভেবেছিস?

জ্যো। যদি তোমার বিয়ের আগে তোমার মনের পরিচয় পেতাম, তা হ'লে—তা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঘটাতাম।

রেবা। পাগল আর কি! তোমরা দু'জনে মাথা কুটলেও তাঁকে আমি বিয়ে করতুম না। তিনি ভালবাসেন তোমাকে, আমি কেন আমার সুখের আশায় তাঁকে পীড়ন করতে বিয়ে করব? ছি ছি, কিছুতেই আমি তা করতুম না। যে দিন মীরপুরে জানলুম, তিনি তোকে ভালবাসেন, সেই দিন হ'তে নিয়ত ভগবানের চরণে মাথা কুটেছি—তোদের মিলন প্রার্থনা ক'রে। জ্যোতি, আর একটু জল—

জ্যোতি জল দিয়া কহিল, "তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে রেবা-দি!"

রেবা। কিন্তু অন্তর শীতল। সেখানে কেবল আনন্দের ধারা। আমি হৃদয়ের ভিতর প্রেমময়ের মূর্ত্তি গ'ড়ে তাঁর পূজা করি, তাঁর গায়ে গলায় মালা পরাই, চরণে মাথা দিই। আমি দিবানিশি তাঁকে নিয়ে থাকি, তাঁর সঙ্গে খেলা করি, তাঁকে আদর করি। তোমরা যখন আমাকে জাগাও, তখন আমি রোগের যন্ত্রণা অনুভব করি। কেহ আমার কাছে আসে বা থাকে, তা' আমি পছন্দ করি না। মা এলে তাঁকে উঠিয়ে দি। একটু জল—

জল খাইয়া রেবা কহিল, "আমি বেশ আছি জ্যোতি, আমার জন্যে একটুও দুঃখু করিস নে। আমি অনেক আশা নিয়ে এ দেহ ত্যাগ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি—তোরই গর্ভে আবার আসছি—বেশী দেরী হবে না, এক বছরের মধ্যেই আসছি। কিন্তু তোরা এ দেশে থাকতে আমি যে মরতে পারছি না; পাছে আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগে।"

জ্যোতির গণ্ড বহিয়া জল গড়াইল। কাঁদিতে কাঁদিতে রেবার চরণের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, "আমাকে

আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আমি যেন তোমার মত তাঁকে ভাল বাসতে পারি।"

রেবা। পারবে কি ক'রে বোন্? তুমি যে ভোগ চাও। স্পৃহা, কামনা যত দিন থাকবে, তত দিন ভালবেসে সুখ পাবে না। জ্ঞান জন্মালে বুঝতে পারবে, কামনাবর্জ্জিত ভালবাসায় কত সুখ, কত তৃপ্তি। তুমি মীরপুরে আমাকে কি বলেছিলে, মনে আছে?

জ্যো। কি বলেছিলাম দিদি?

রেবা। তুমি ফটো দিয়ে আমাকে বলেছিলে, ছায়া নিয়ে তুষ্ট থাকতে। বেশ, আমি তাই নিয়েই তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু সময়ে সে ছায়া ত আর ছায়া রইলো না—কান্তি দীপ্তি পেয়ে সূর্য্য-পত্নী ছায়ার ন্যায় ভূতময় দেহ ধারণ করলে। এখন সে পাঞ্চভৌতিক কায়াও আর নেই—ধ্বংস হয়েছে; তার স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে এক উজ্জ্বল অশরীরী মহামহিম মূর্ত্তি। তার তুলনায় তোমার ছায়া ও কায়া অতি তুচ্ছ। আমি এই অপার্থিব মূর্ত্তির ধ্যানে দিবারাত্রি মগ্ন থাকি—ঘুমিয়ে পড়লে মনে হয়, সময়টা যেন বৃথা গেল। আমি যে আনন্দ নিয়ে আমার মানস-প্রতিমার সঙ্গে বিহার করি, সে আনন্দের এক কণাও তুমি—ভোগপরায়ণ তুমি পাও নি। তুমি পেয়েছ অনিত্য, আমি পেয়েছি নিত্য। তুমি পেয়েছ সসীম নশ্বর রূপধেয় রূপ, আর আমি পেয়েছি অসীম অধ্বংসী অরূপজ রূপ। আমি বড় আনন্দে আছি, জ্যোতি, আমার জন্যে কোন দুঃখ করো না। এখন তুমি যাও—ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অমরকে—আমার অমরকে—হ্যাঁ, সে আমার, তোমার নয়—বোলো, আমি তাকে নিয়ে বড় সুখে আছি।

রেবা চক্ষু মুদ্রিত করিল। জ্যোতি ভক্তিভরে রেবার রেণ-ধূলি মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিল।

৫৩

তার পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে।

পশুপতি বাবু এক্ষণে বৎসরের অধিকাংশ সময় কাশীপুরে অতিবাহিত করেন। তথায় গঙ্গার ধারে একখানি বাগানবাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। কাশীপুর কলিকাতার উপকণ্ঠে। সুকুকে কলিকাতায় একা ছাড়িয়া দিতে তাঁহার ভরসা হয় না; কাষেই নিজেকেও সপরিবারে তথায় থাকিতে হইয়াছে। পূজার সময় বা গ্রীষ্মাবকাশের সময় কালেজ বন্ধ হইলে তিনি নিশ্চিন্তমনে সুকুকে লইয়া মীরপুরে যান।

লতাও কলিকাতায় থাকিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়ে। সে বোর্ডিংয়ে থাকে, কাশীপুরে থাকে না। তাহাকে নিজের কাছে রাখিবার পশুপতির ইচ্ছা থাকিলেও হরনাথ তাহাকে তথায় রাখিতে দেন নাই। বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলে সে কখন চন্দননগরে, কখন উত্তরপাড়ায়, কখন বা কাশীপুরে আসে। সকলের উপর হিরণের দাবীটাই বেশী। নরু কাছে নাই, লতার জন্যে তাহার মন সতত উৎকণ্ঠিত। লতা প্রতি শনিবারে আসিত; আসিয়া তার বউদিদির কাছে বসিয়া ছয় দিনের গল্প এক রাত্রিতে করিত। হিরণ সকল কায ফেলিয়া বিনিদ্রনয়নে তাহার গল্প শুনিত। আর এক জনও অনিমেষনয়নে লতার মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহার গল্প শুনিত। সে লতার নূতন দিদি—লাবণ্য। হিরণ ও কৃষ্ণ তাহাকে নূতন দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

লাবণ্য আর সে লাবণ্য নাই। অকালে বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহার চাঞ্চল্য, উচ্ছ্বাস, আবেগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সে এখন ধীর স্থির শান্ত; কিন্তু গম্ভীর বা ম্রিয়মাণা নয়—সদা হাস্যমুখী। এ হাসি শান্তির। হৃদয়ে শান্তি না থাকিলে এ হাসি আসিতে পারে না। সে বাল্যে শুনিয়াছিল, রামনামে না কি পাপ যায়, ভূত পালায়। উইঢিবি ব'লে না কি এক মুনি ছিল, তা'র সব পাপ না কি রামনামে ক্ষয় হয়েছিল। লাবণ্য নাম জপিতে লাগিল, কিন্তু মন বসিল না। পাপের স্মৃতি আসিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল; পবিত্র হিন্দু-সংসারে থাকিয়া আদর ও সম্মান লাভ করিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিল। অবশেষে লজ্জায়, ধিক্কারে, নৈরাশ্যে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া আত্মনাশ করিবার অভি-প্রায় করিল। অমর তাহা বুঝিয়া বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে তাহাকে এক দিন কহিয়াছিলেন, "তুমি অপবিত্র নও, তোমার দেহ অপবিত্র। যখন তোমার অনুতাপ জন্মিয়াছে, তখন তুমি পবিত্র হইয়াছ; তবে দেহটাকে পবিত্র করা দরকার—তুমি প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গাস্নান করবে, আর তুলসীপাতা খাবে।"

লাবণ্য তাই করিতে লাগিল,—ঝড়-বৃষ্টি, শীত কিছুই মানিত না—প্রত্যহ সূর্য্য অভ্যুদয়ে স্নান করিত। পাড়ার তুলসীগাছে পাতা আর রহিল না—লাবণ্য নিঃশেষ করিল। এই ব্রত আরম্ভের কয়েক দিনের মধ্যে তাহার জপে প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিল। নিদ্রা কমাইল, আহার কমাইল—দিবা-রজনীর অধিকাংশ সময় রাম-নাম জপে অতিবাহিত করিতে লাগিল। হিরণ ও লতার পাদোদক পান করিত, তাহাদের কোন আপত্তি শুনিত না। ক্রমে তাহার মুখে এক লাবণ্য, এক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল—শ্মশানের অঙ্গার জ্বলিয়া উঠিল।

সেই আলো অমর দেখিতে পাইলেন, পূর্ণ তিন বৎসর পরে যখন তিনি চন্দননগরে ফিরিলেন, লাবণ্য দূরে দাঁড়াইয়া অমরকে দেখিল—বিগ্রহপানে লোক যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধাবনত নয়নে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে লাবণ্য অমরের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া অমরকে প্রণাম করিল। অমরের চরণস্পর্শ করিতে সাহস করিল না। অমর তাহা বুঝিয়া একটু সরিয়া আসিয়া লাবণ্যর মাথায় হাত দিলেন; স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "আর সঙ্কোচ কেন, দিদি?" লাবণ্য কোন উত্তর করিল না; কিন্তু তাহার চক্ষু সজল হইল, ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। অতঃপর সরিয়া আসিয়া অমরের চরণের উপর মাথা রাখিল, রুক্ষ চুলের বোঝা পায়ের উপর ফেলিয়া জুতার ধুলা ঝাড়িয়া লইল; তাহার পর ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

জ্যোতি আসিয়াছে, নরু আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে আর একটি নূতন জীব আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কৃষ্ণনাথ গৃহে নাই। তিনি লতাকে আনিতে কলিকাতায় গিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ জানিতেন না, অমর আসিবেন। তিনি কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া চুপি চুপি আসিয়াছেন। পর-দিবস দোল-পূর্ণিমা, বিদ্যালয় বন্ধ; তাই কৃষ্ণনাথ লতাকে

আনিতে কলিকাতায় গিয়াছেন, কিন্তু আনিতে পারিলেন না, পশুপতি তাহাকে কাশীপুরে লইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, তথায় চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে। নরু ছুটিয়া আসিয়া বাপের পা দুটা জড়াইয়া ধরিল; প্রস্ফুটিত পদ্ম তুল্য জ্যোতির্ম্ময়ী গোলাপমুকুল তুল্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কৃষ্ণনাথের চরণে প্রণত হইল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদের প্রতি বড় বেশী মন দিতে পারিলেন না; যে তাঁহার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়, তাহার পানে বিবশ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। অমর হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যে ভেবড়ে গেলে।"

কৃ। বহুকাল পরে এ রকমটা হ'ল; আচ্ছা, শোধ নেব।

অ। তোমার এই রকম মুখখানা দেখবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে আগে কোন চিঠি দিই নি।

কৃ। আজও তোমার লোভ। রিপুজয় করলে কি?

অ। কিছুই করতে পারি নি ভাই; যখনি ভাবি, এ রিপুটা জয় করেছি, তখনই সেটা প্রবল হয়ে উঠে।

কৃ। ও সব কথা থাক্; এখন ওতরপাড়ায় যাচ্ছ কবে?

অ। কাল সকালে; সেখান হ'তে অপরাহ্নে সদলে কাশীপুরে।

খোকা কাঁদিয়া উঠিল; হিরণ তাহাকে কোলে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল, জ্যোতিও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। শিশুকে দুধ খাওয়াইতে গিয়া হিরণ সহসা চমকিয়া উঠিল। জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, চমকালে কেন?"

হি। এক জনকে মনে প'ড়ে গেল, তাই।

জ্যো। ঠিক বলেছ দিদি; রেবাদির মত মুখের ভাব অনেকটা আসে। তাঁর দাড়ির নীচে যেমন দুইটা তিল পাশাপাশি ছিল, খোকার দাড়ির নীচেও তেমনই দু'টা তিল।

হি। তার ডান কানে যেমন দাগ ছিল, এর ডান কানেও তেমনই দাগ।

জ্যো। তিন বছর আগে তিনি বলেছিলেন, আমার কাছে তিনি আসছেন; এসেছেনও তাই—

হি। খোকার নাম কি হয়েছে?

জ্যোতি। রৈবত, রৈবতকুমার।

হি। নামটা ভাল হয় নি।

জ্যো। বললেন—রৈবত, মহাদেবের নাম।

হি। কোন্‌টি তাঁর নাম নয়?—ছত্রিশ অক্ষরই যে তিনি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রাবণে

আয় আয় আয় মেঘ জগৎ ভরি
ধরণীর আলোছায়া মলিন করি—
আজি এ শ্রাবণ দিনে বেদনা-বিধুর দীনে
নিউক তোমারে চিনে, আদরে বরি;
বদ্ধ-দ্বার জালায়ন, পথ-ঘাট নিরজন,
কি গভীর আয়োজন নিখিল'পরি—
আয় আয় আয় মেঘ আঁধার করি।

রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি নূপুর-গীতি
বাজুক বনে ও মনে আমার নিতি;
লুপ্ত হোক রবি সোম—হোক্ এক মহী ব্যোম,
শিহরি উঠুক রোম-কদমবীথি,
কামনা চাঁপার মত তীব্র গন্ধ মদোদ্ধত
ফুটাইয়া দাও শত, আজি অতিথি—
ব্যথা মোর বেলা-বনে লুটাক্ তিতি।

এস গো পরাণ-প্রিয়া মেঘ-বাহনে—
এমন বাদল দিনে মম আঙনে;
এ রুদ্ধ দুয়ার ঠেলি, দিনরাতি কর কেলি
আমি আছি আঁখি মেলি তব কারণে;
তোমার তনুর বাস ভরা আজি এ আকাশ,
বাতাসে মদির শ্বাস লাগে আননে—
সজল-কাজল আঁখি, জাগে কাননে।

বৃথা ভূষা আভরণ, অভিসারিকা,
ত্যজ লাজ আবরণ, হে রূপ-শিখা;
করি মহা মহী-গেহ দিক্-বাসে ঢাকি দেহ,
গলিত সজল স্নেহ, এস ব্যাপিকা—
বিরহ-যক্ষের দ্বারে বিশ্বরূপে একেবারে
এস ওগো দোলাবারে প্রেম-মালিকা,
অখিল-হৃদয়-তাপ-অপসারিকা।

হে বরষা-প্রিয়া মোর, অভিমানিনি,
তোমার মনের কথা আগে জানি নি!
তাই কি এ দিকৃচয় ঝলকে চমকময়
—কালো আঁখি-কালিন্দ'র ফণি-দামিনী;
কর ঘাত অনিবার সুখের কি বেদনার
আজি মোর বুঝা ভার, ওগো ভামিনি,
অনিদান কেন মান হেন, কামিনি?

দিগ্বিদিকে স্রস্ত কেশ এলায়ে পড়ে'—
মালতী-মালাটি ছিঁড়ে পড়িছে ঝরে';
কর্ণ হ'তে কর্ণিকার ঝুমকা-শিরীষ-ভার—
ইন্দীবর মেখলার ধরণী'পরে—
'কেতকী বিনোদ-বেণী, ছিন্ন শিখিপুচ্ছশ্রেণী
কোন্ রাগে বিরাগিণী এমন করে'?
গরজে গভীর ব্যথা গলার স্বরে!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্যামের বাঁশী

ব্রজগোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানসিক বৃত্তি রাসারম্ভের পূর্ব্বে বাঁশীর স্বর শুনিয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে রাসলীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তাই রাসলীলারম্ভের পূর্ব্বে রাসস্থলীতে সমবেত ব্রজগোপীগণের মুখেই ভগবান্ বেদব্যাস ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঁশীর রবে উন্মনা হইয়া, পতি, পুত্র, স্বজন, গৃহ ও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রাসস্থলীতে সমবেত হইয়াছিল, কুলটা-জনোচিত পাশব বৃত্তির চরিতার্থতাসাধন তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকে দেখাইয়াছি। তাহাদিগের আর একটি উক্তিও এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

"কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—

হে অরবিন্দনয়ন, যাহারা কুশল অর্থাৎ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের পরিজ্ঞাতা, তাহারা তোমাকেই ভালবাসিয়া থাকে। কেন ভালবাসে, তাহার কারণ, তুমিই সকলের আত্মা। শাস্ত্রেই বলিয়াছে, আমরা প্রজা অর্থাৎ সন্ততি প্রভৃতি লইয়া কি সুখ পাইব? পুত্র বল, পতি বল, ধন বল, স্বজন বল, এ সংসারে প্রাকৃত লোকসমূহ যাহাকে সুখের হেতু বলিয়া জানে, তাহারা কেহই সুখ দিতে পারে না; প্রত্যুত তাহারা সকলেই মানসিক পীড়া বা অবিশ্রান্ত উদ্বেগতারই কারণ হইয়া থাকে। যাহারা আত্মাকে বুঝে না, আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি দেহাত্মাভিমানের আবরণ বশতঃ যাহাদের হয় নাই, তাহাদেরই নিকট পতি, পুত্র, ভার্য্যা, ধন, জন, ঐশ্বর্য্য ও পারলৌকিক সমৃদ্ধি সুখের হেতু বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল পতি, সুত প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগের কি লাভ হইবে? আমরা তোমাকে অর্থাৎ আমাদের সকলের আত্মাকে যখন তোমারই কৃপায় পাইয়াছি—হে পরমেশ্বর, তুমি প্রসন্ন হও। অনাদিকাল হইতে তোমাকে পাইবার জন্য, পাইয়া সেবা করিবার জন্য আমরা যে বড় আশা মনে মনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সে আশা ছিন্ন করিও না, ইহাই তোমার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা।

এই যে গোপীগণের মনোবৃত্তি, ইহাকে কি বলা যাইতে পারে? ইহা অদ্বৈতবাদীর সম্মত ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, সেই বিজ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার এ সংসারে কোন বিষয়েই আশা বা আকাঙ্ক্ষা সম্ভবপর নহে। তাহার নিকটে এ সংসারে সকল বস্তু মায়িক ব'লয়া প্রতীত হয়। সুখের অনুভূতির জন্য সে লালায়িত হয় না। দুঃখের প্রতিও তাহার কোনরূপ বিদ্বেষও থাকে না। কারণ, তাহার চক্ষুতে প্রপঞ্চের সুখ ও দুঃখ একজাতীয় বস্তু, অর্থাৎ তাহারা দুইই কল্পিত, কেহই সত্য নহে। আমরা কিন্তু উক্ত শ্লোকে দেখিতে পাইতেছি যে, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মভাবেও দেখিতেছে অথচ সেই সঙ্গে প্রার্থনাও করিতেছে যে, তোমার সেবার জন্য আমাদিগের চিরসঞ্চিত আশাকে ছিন্ন করিও না, তুমি প্রসন্ন হও, আমাদিগকে তোমার সেবা ক'রবার অবসর দাও—শক্তি দাও। তোমার সেবা হইতে আমরা যেন আর কখনও বঞ্চিত না হই। এরূপ প্রার্থনা যে করে, সে কখনই অদ্বৈত-জ্ঞানসম্পন্ন নহে। সেব্যসেবকভাব তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অথচ সে বলিতেছে, তোমাকে আত্মা বলিয়াই বুঝিয়াছি। আত্মাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকেও চাহি না। এ বড় বিষম সমস্যা। শ্রুতি বলিতেছে—"যস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ"—যাহার নিকট সবই আত্মা বলিয়া প্রতীত হয় অর্থাৎ আত্ম-ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুরই পৃথক্ সত্তা আছে, এই জ্ঞান যাহার লুপ্ত হইয়াছে, সে কোন্ প্রমাণের সাহায্যে কোন্ বস্তুর বিজ্ঞাতা হইবে? কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে কাহাকে দেখিবে? এই দার্শনিকগণেরও চিত্তভ্রান্তিকর বিষম সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই শ্যামের বাঁশী রাসলীলার আরম্ভক্ষণে বাজিয়া উঠিয়াছিল। এই বাঁশীর স্বরলহরীতে ভক্তহৃদয়ে যে ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হয়, তাহারই পরিচয় দিতে যাইয়া কোন্ ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

"অদ্বৈতবোধাব্ধিতলে নিমগ্নাঃ
প্রশান্ততাপা নিভৃতা নিরীহাঃ।
বয়ং যদীয়কলবেণুনাদে—
দাসীকৃতা গোপসুতং নুমস্তম্ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দীর্ঘকাল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রভাবে আমরা অদ্বৈতজ্ঞানরূপ নিরবধি সমুদ্রের তলভাগে তলাইয়া গিয়াছিলাম। ভেদবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন সকল প্রকার পাপ-তাপ আমাদিগের শান্ত হইয়া গিয়াছিল। আত্মস্বরূপ আনন্দের উদয়ে আমাদিগের সকল চেষ্টাই নিবৃত্ত হইয়াছিল। এই আনন্দময় অবস্থাকে পাইয়া আমরা পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ যাহার কলবেণুনাদ—আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে সেবার জন্য সমুদ্যত দাসীরূপে পরিণত করিয়াছে, সেই গোপতনয় শ্রীকৃষ্ণকে আমরা স্তুতি করিতেছি।

যোগ, ধ্যান, ধারণা ও তপস্যা প্রভৃতির প্রভাবে যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত অশুদ্ধিমলকে পরিহার করিয়া স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় সর্ব্বাত্মভূত অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কেবল তাহাদিগেরই হৃদয়ে এইরূপ ভাবান্তর উৎপাদন করিতেই যে বাঁশী সমর্থ, তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছে—

"ধন্যাস্ত মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ-বেণুরণিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং নয়নোপহারৈঃ ॥"

গোপবালকোচিত-বিচিত্রবেশধারী সেই নন্দনন্দনকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার কলবেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ পতির সহিত মিলিত হরিণীগণ ধন্য। যেহেতু, তাহারা বিস্ফারিত বিস্ময়স্তিমিত সমুজ্জ্বল নয়নের দ্বারা তৎকালে তাঁহার উপযুক্ত পূজা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ভাগবত আরও বলিতেছে—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্ ॥"

হে ভুবনসুন্দর! তোমার বেণু হইতে নির্গত অব্যক্ত মধুর প্রাণস্পর্শী গীত যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, এমন কোন্ মানবী আছে যে, সে সম্মোহিত হইয়া আর্য্যগণসেবিত ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তাহার উপর আবার এই যে তোমার রূপ, যাহার এক অংশের দ্বারা সকল সৌন্দর্য্য, সকল মাধুর্য্য পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই এই রূপও যে নারীর নয়নপথের পথিক হয়, সেও সম্মোহিত হইয়া কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। না করিবারই ত কথা, সে ত মানবী, তাহারও ত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি আছে। ঐ দেখ, তোমার আশে-পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে ব্রজের গোসমূহ, বৃন্দাবনের বৃক্ষনিচয়, আকাশের পক্ষিসমূহ ও অরণ্যের মৃগকুল এই রূপ দেখিয়া ঐ বাঁশীর সেই কলকাকলীময় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত শরীরে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরের এই মধুর বংশীনিনাদে ব্রহ্মজ্ঞানীর শুষ্ক অদ্বৈতজ্ঞানকে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় যেমন ভাসাইয়া দেয়, তেমনই আজন্ম অশিক্ষিত, কায়মনোবাক্যে গৃহকর্ম্মনিরত ব্রজের কুলললনাগণের অহংভাবাবিষ্ট সরল অন্তঃকরণে সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দরসঘন পরমাত্মার অখণ্ডস্বরূপ সমুদ্ভাসিত করে। বনের মৃগ, গাছের পাখী, ব্রজের গাভীকে চিরাভ্যস্ত কর্ম্মসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া আনন্দঘন সৌন্দর্য্যময় রসরূপ ব্রহ্মের আস্বাদন করাইয়া নিস্তব্ধ, রোমাঞ্চিত ও আনন্দবিহ্বল করিয়া তুলে। এ বাঁশীর স্বরে বাতাসের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, নদীর স্রোত প্রতিকূলবাহী হয়, বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রত্যেক অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, ইহাই উল্লিখিত শ্লোক কয়টির দ্বারা সুব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রাসলীলারম্ভের পূর্ব্বে শ্যামের বাঁশীর এই অপূর্ব্ব রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতরচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মানবাত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি কেবল বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেরই উপর নির্ভর করে না। মানবের আকৃতি, মানবের প্রকৃতি, মানবের দেহ, মানবের বাহ্য আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়ের রীতি-নীতি, গঠনপ্রণালী ও কার্য্যসমূহের গূঢ় রহস্যের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, এ সংসারে মানবের সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নহে। সে উদ্দেশ্য কি? দার্শনিক ভারত অনাদিকাল হইতে বলিয়া আসিতেছে যে, মানবজীবনের চরম বা পরম উদ্দেশ্য হইল মুক্তি বা নির্ব্বাণ। এ মুক্তি বা নির্ব্বাণ যদি কখনও মানবের ঘটে, তখন তাহার আপনার বলিবার কিছুই

থাকে না। যাহার জন্য সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে এ পর্য্যন্ত সে অবিশ্রান্তভাবে কায করিয়া আসিতেছে, সেই তাহার আত্মার বা জীবস্বরূপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এই নির্ব্বাণে ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের জন্য সে মুক্তি-পথের পথিক হয়, তাহার সেই প্রিয় আত্মাই পুনরাবৃত্তি-রহিতভাবে যে সচ্চিদানন্দব্রহ্মে মিশিয়া যায়, তৎকালে সে আনন্দের অনুভূতি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই মুক্তি যদি মানবসৃষ্টির চরম লক্ষ্য হয়, তবে তাহার এই যে মানবদেহ, যাহার প্রতি অঙ্গের সমাবেশবৈচিত্র্যে সেবার অপূর্ব্ব উপযোগিতা বিস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে মানবদেহ নির্ম্মাণের জন্য বিধাতৃপুরুষের অসাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এ মুক্তি ত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার ছিল, তবে আবার সেই মুক্তি পাইবার জন্য এ সেবায় সামগ্রীসম্ভারে সুরচিত মনুষ্যদেহ নির্ম্মাণের জন্য জগৎকর্ত্তার এত প্রয়াস কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর অদ্বৈতজ্ঞানের আচার্য্যগণের নিকট হইতে শুনিবার জন্য মানবসমাজ চিরদিন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে সদুত্তর এখনও তাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া তাহার ঔৎসুক্যময় অন্তরাবরণকে শান্ত করিতে পারে নাই।

মানবজীবনের লক্ষ্যনির্ণয় বিষয়ের—এই অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত আকুলতা, উৎকণ্ঠা ও সংশয়কে দূর করিয়া মানবপ্রকৃতির অনুগত মানবের একান্ত ঈপ্সিত, মানবাত্মার চিরাভীপ্সিত উদ্দেশ্যের আনন্দময় মূর্ত্তি হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতকার মহর্ষি বেদব্যাস রাসলীলা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ রাসলীলার উদ্দেশ্য মুক্তি নহে, কিন্তু মুক্তের পক্ষেও স্পৃহণীয়। মানবাত্মার পরিপূর্ণতাবিধায়ক প্রীতিময় সেবাধর্ম্ম। এ সেবা কাহার? যাহার অপেক্ষা সুন্দর এ সংসারে নাই, যাহা অপেক্ষা মধুর মানবের কল্পনার অতীত, সৌন্দর্য্যের, লাবণ্যের, মাধুর্য্যের, পবিত্রতার ও অখণ্ডিত মহিমার যাহা একমাত্র আধার, যাহার সত্তায় প্রপঞ্চের সকল বস্তু সত্তাযুক্ত হইয়া থাকে, যাহার অস্তিত্বের উপর চেতন অচেতন সকল বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে, যাহার প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, যাহার অনুভূতির উপর সকল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অনুভূতি নির্ভর করিয়া থাকে, সেই রসোজ্জ্বল-বিগ্রহ রসিক-শেখর প্রতি জীবের আত্মভূত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাই হইল মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। এই সেবায় অগ্রে আনন্দ, মধ্যে আনন্দ, পশ্চাতেও আনন্দ। এই সেবা আনন্দের কারণ নহে, কিন্তু ইহাই সাক্ষাৎ রসঘন অনাবিল আদ্যন্তরহিত পূর্ণানন্দ। এই সেবানন্দের অধিকারী হইতে হইলে মানবকে সৌন্দর্য্যানুভূতির যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। দেহাত্মভাবের পরিচ্ছিন্নতায় আবদ্ধ মানবে এই অনাবিল ঈশসৌন্দর্য্যের অনুভব করিবার শক্তি থাকে না। এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মানবের যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব হয় সাংসারিক জীবই থাকে, না হয় সে সংসারের জ্বালা-তাপ হইতে এড়াই-বার জন্য মুক্তিপথের পথিক হইতে চাহে, কিন্তু সে ভক্ত বা ভগবৎ-সেবক হইতে পারে না। এই সর্ব্বানর্থকর দেহাত্ম-ভাবকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে পরমাত্মসৌন্দর্য্যের অনুভবের একমাত্র কারণ সাধন-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জ্ঞান-গর্ব্বিত শুষ্ক চিত্তে সাধন-ভক্তির প্রবেশসম্ভাবনা নাই। এই সকল সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে এবং বুঝিয়া সেবাধর্ম্মের অধিকারী হইতে হইলে শ্যামের বাঁশীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। ভক্তি-সিদ্ধান্তের এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝাইবার জন্যই রাস-লীলায় অপূর্ব্ব শ্যামের এই বংশীধ্বনি হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

অশ্রু

হৃদয়ের নিকুঞ্জ-কাননে সুকোমল সুন্দর সুঠাম,
প্রস্ফুটিত নিরমল একটি কুসুম—প্রেম তার নাম!
দীর্ঘশ্বাস বহে সে যে বসন্তের মলয়-পবন,
অশ্রু-ঝরে মধু তার অমৃতের তরল প্লাবন!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

সুন্দরবনে শিকার

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে শিকার করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে, ইহা একরূপ শুভচিহ্ন বলিতে হইবে; কারণ, বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্য বাঙ্গালী জাতির ভিতর হইতে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। কোন স্থানে শিকার সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে, প্রায়ই শুনা যাইত যে, অমুক স্থানে অমুক ইংরাজ এত বড় শিকার করিয়াছে, বাঙ্গালীর ভিতর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, তাহা বড় একটা শুনা যায় না। বাঙ্গালীর মধ্যে ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদা বাবু প্রমুখ যে কয়েক জন উচ্চদরের শিকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহাদের মৃত্যুর পর শিকারীর সংখ্যা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য তাঁহাদের সমসাময়িক কুমুদ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েক জন এখনও এ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া তাঁহাদের স্থান পূরণ করিতেছেন। কিন্তু অধুনা আমাদের মনোভাব যেন কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির ভিতর শিকার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন যুগে আমাদের হিন্দুদের ভিতর নৃপতিগণ শিকারপ্রিয় ছিলেন। এমন কি, ত্রেতাযুগে ঈশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্দ্র শিকার করিয়াছেন। তিনি সীতার মনোরঞ্জনার্থ ধনুর্ব্বাণ লইয়া শিকার করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিকার করিয়াছেন। মহাভারত হইতে জানিতে পারা যায়, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই মৃগয়া করিতেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে, যখন তাঁহারা বনে অবস্থান করিতেন, তখন প্রত্যহ পশুশিকারের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এমন কি, তাঁহাদের শিকারকার্য্যের জন্য অরণ্য পশুশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মহাভারতে আছে, "একদা রজনীযোগে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নিদ্রাবসানের পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিলেন যে, কতকগুলি মৃগ কম্পিত-কলেবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? মৃগেরা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তে কহিতে লাগিল, হে মহারাজ, আমরা মৃগ, এই দ্বৈতবন আমাদের আবাসস্থান, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপরাক্রান্ত আপনার ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মৃগগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন; অতএব আপনি স্থানান্তরে গিয়া বাস করুন।"

বনপর্ব্বে অন্য এক স্থানে আছে, "পাণ্ডবগণ অরণ্যে নানাবিধ আরণ্যক মৃগমাংসে অন্নার্থী ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সময়াতিপাত করিতেন।"

অন্যত্র দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বলিতেছেন, "যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব আমাকে এ স্থানে রাখিয়া মৃগয়ায় গিয়াছেন।"

বনপর্ব্বের আর এক স্থানে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বলিতেছেন, "এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর, আমি তোমার প্রাতরাশ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চ শত মৃগ প্রদান করিতেছি, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমাকে এণ, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, রুরু, শাবর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি নানাবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।"

অন্য স্থানে আছে, "এ দিকে পাণ্ডবরা শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়া বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাণ-সংহার করত পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন।"

ইহা ছাড়া মহাভারতের বহু স্থানে শিকারের উল্লেখ আছে। জগতের অন্যান্য পুরাতন লোকরা শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং সকলেই বনে যাইয়া মৃগয়া করিয়াছেন। শিকারকার্য্য যদি দোষের হইত, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজে উহা এত আদর পাইত না এবং হিন্দুর মধ্যে তাহাদের আদর্শপুরুষ রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুরাজন্যগণ সেই সকল কার্য্য করিতেন না।

পূর্ব্বে মানবরা কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনার্থ শিকার করিতেন। যাহা হউক, এই শিকারে যে কেবল নিজের আনন্দ হয়, তাহা নহে, ইহা দ্বারা সমগ্র মনুষ্যজাতির উপকার সাধিত হয়। কারণ, মনুষ্য জাতি শিকারফলে হিংস্র বন্যপশুদের হস্ত হইতে নিরাপদে বাস করিতে সমর্থ হয়। নচেৎ তাহারা মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত, তাহাদের হস্ত হইতে মনুষ্যজাতির রক্ষার একমাত্র উপায় শিকার। তাহার পর শিকারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মাংসাহার; কারণ, মনুষ্য মাংসাশী, আমিষভক্ষণ তাহার শরীররক্ষার উপযোগী। মানুষ মাংসভক্ষণ করিতে ভালবাসে, অবশ্য কেহ কেহ নিরামিষাশী আছেন বলিয়া যে মানুষ মাংসাশী নহে, এ কথা বলা যায় না। মহাভারতেই উল্লেখ আছে, পূর্ব্বতন লোক সকল প্রায় সকলেই মাংস ভক্ষণ করিতেন এবং এজন্য তাঁহারা শিকার দ্বারা মাংস সংগ্রহ করিতেন। জগতে মাংসভক্ষণের জন্য গৃহপালিত যত প্রকার প্রাণী আছে, তাহা দ্বারা মনুষ্যসমাজের যাবতীয় ব্যক্তির আহার্য্য মাংসের অভাব দূরীভূত হয় না। তাহার জন্য গৃহপালিত পশু ছাড়াও বন্য পশুর মাংসের আবশ্যক হয়।

এই বন্য পশুর মাংস সংগ্রহ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে শিকার। এই বন্যপশুরা মনুষ্যের জীবনধারণোপযোগী কৃষিজাত ফসলের অনেক সময় অনিষ্ট করে। সেই সময় যদি উহাদিগকে শিকারের দ্বারা হত্যা না করা হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমলব্ধ কৃষিজাত শস্য নষ্ট হইয়া যায়, ফলে মানবের পক্ষে জীবনধারণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। সেই জন্যও শিকার আবশ্যক। রামায়ণে উল্লেখ আছে, এইরূপ অনাবৃষ্টির সময় বন্যপশু হইতে মনুষ্যের পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্য বন্যপশুভ্রমে মনুষ্য হত্যা করিয়া মহারাজ দশরথ শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই সকল কারণ হইতেই স্পষ্টই দেখা যায়, শিকারের দ্বারা মনুষ্যসমাজের উপকার ছাড়া অপকার নাই, ইহাতে যে সব শিকারী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পশুপূর্ণ জঙ্গলের মধ্যে গমন করিয়া বন্য পশু শিকার করেন, তাঁহারা যে মনুষ্যসমাজের কত উপকার করেন, তাহা লিখিয়া কিংবা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহারা যদি সেরূপ কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, হিংস্র বন্য পশুর অত্যাচারে পৃথিবী মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইত। পৃথিবীতে মানুষ হিংস্র পশুর জন্য নির্ভয়ে চলা ফেরা করিতে কোনক্রমে সমর্থ হইত না কিংবা তাহাদের জীবনধারণোপযোগী শস্য উৎপাদন করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিত না অথবা

শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় গৃহাদিনির্ম্মাণ করিবার জন্য জঙ্গলের ভিতর হইতে কাষ্ঠাদিসংগ্রহ করাও দুর্ঘট হইত। এই সকল কারণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শিকারকার্য্যের দ্বারা মনুষ্যসমাজের বহু উপকার সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই কার্য্যে জগতের উপকার হয় বলিয়াই আদিমকাল হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মানব-হিতৈষী বীরপুরুষগণ শিকারকার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। এই মহোপকারী শিকারকার্য্য কখনও নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

তবে দেখা যায়, এই শিকারকার্য্য কখনও দুর্ব্বল কিম্বা ভীরুদিগের দ্বারা সাধিত হয় না। ইহা কেবল বলবান্ এবং সাহসী লোকের কার্য্য।

আমরা বাঙ্গালী আজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। তাই আজ আমরা বীরত্বের কার্য্যগুলিকে প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছি এবং করিতে বসিয়াছি। তাই এই হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল বঙ্গদেশে বসিয়া আমরা বিদেশীর শিকার-কার্য্যের গল্প বলিতে কিম্বা শ্রবণ করিতে গর্ব্ব অনুভব করি। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় বর্ত্তমানকালে শুভলক্ষণ দেখা দিয়াছে। এখন আমাদের ভিতর অনেকের শিকার-লালসা পুনরায় জাগরিত হইতেছে; তাই যাঁহারা শিকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই শিক্ষাসাপেক্ষ শিকারকাহিনী লিখিতে অগ্রসর হইলাম।

যাঁহারা এই অশেষ কল্যাণকর বীরত্বপ্রকাশক শিকারকার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন সেই কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ভালরূপে শিকারের প্রণালী শিক্ষা করেন। তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা ভালরূপ শিকারকার্য্য সম্পন্ন হইবে। সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, খুব ভাল ভাল মূল্যবান্ বন্দুক খরিদ করিলেই উচ্চদরের শিকারী হওয়া যায় না। হাতের লক্ষ্য স্থির হইলে কিংবা ক্ষিপ্রহস্ত হইলে যে ভাল শিকারী হওয়া যায়, তাহাও নহে। এই সমস্ত গুণের সহিত শিকারীকে শিকার করিবার কৌশল সকল বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হইবে; নচেৎ ভাল শিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারা যাইবে না। অশিক্ষিত শিকারীর দ্বারা শিকারকার্য্যও ভালরূপে সুসম্পন্ন হইবে না। কারণ, শিকারকার্য্য প্রায়ই কৌশলের উপর নির্ভর করে।

শিকারকার্য্য সর্ব্বদা নির্জ্জন গভীর জঙ্গলের মধ্যেই করিতে হয়, সুতরাং শিকার করিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রথমে কোন্ জঙ্গলে কিরূপে প্রবেশ করিতে হয়, কি ভাবে জঙ্গলের মধ্যে চলিতে হয়, কি প্রকারে জন্তুদিগের অন্বেষণ করিতে হয় ও তাহাদের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে হয় কিংবা কোন্ জানোয়ারের দেখা পাইলে কিরূপে তাহাকে আঘাত করিতে হইবে, কিংবা কোন আহত পশুকে দূরতর কিংবা দুর্গম স্থান হইতে আনয়ন করিতে হইলে, অথবা জঙ্গলের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িলে তাহার নিকট হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয় শিকারীর বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। এই সকল বিষয় শিকারীর শিকারের উপর নির্ভর করে। ভাল শিকারী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই কৌশলগুলি আয়ত্ত করা আবশ্যক। তাহার উপর শিকারীর শিক্ষা করা আবশ্যক, কোন্ জানোয়ারকে কিরূপ ভাবে হত্যা করা যায় এবং কোন্ জানোয়ারকে কি উপায়ে দূর হইতে নিকটে আনয়ন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক জীবের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ, দেখা যায়, জঙ্গলের মধ্যে প্রত্যেক বিভিন্ন জাতীয় জানোয়ারের প্রকৃতি, গতি, অবস্থানস্থান, চলিবার স্থান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সেই সমস্ত বিষয় শিকারীর পক্ষে বিশেষভাবে অবগত থাকা আবশ্যক। তাহার পর শিকারীর জানা উচিত, কোন্ জানোয়ারের শরীরের কোন্ স্থান সহজে ভেদ করা যায় কিংবা কোন্ জানোয়ারের শরীরের কোন্ স্থান লক্ষ্য করিতে পারিলে তাহাকে অল্প আয়াসে আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করা যাইবে।
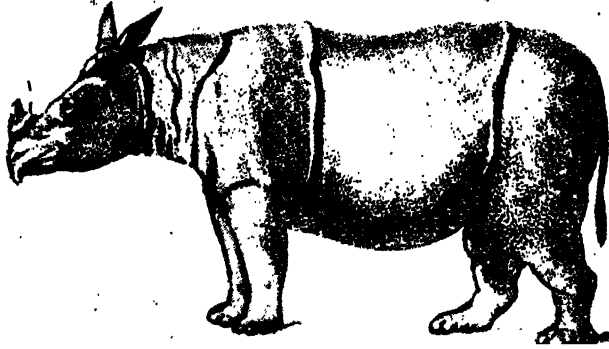
সুন্দরবনের অধুনা-লুপ্ত গণ্ডার

ইহা ছাড়া কোন্ জানোয়ার কোন্ সময় কোথায় অবস্থান করে, তাহাদের আহার্য্য দ্রব্য কি, এবং তাহারা কখন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিতে কোন্ স্থানে আগমন করে, তাহা জানা চাই; এ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে শিকারে সুবিধা হয় না। অনেক সময়ে জানোয়ারের চলিবার পথ জানা থাকিলে সহজে শিকার করিতে পারা যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, হয় ত একটা গাদা জালের কাঁটা ভরা বন্দুকের আওয়াজে এক আঘাতে একটি ব্যাঘ্র নিহত হইল, কিন্তু অপর একটা ভাল বন্দুকের ভাল গুলী দ্বারা একটি হরিণকে শিকার করা যায় না, সেই হরিণ হয় ত গুলী দ্বারা সামান্য আহত হইয়া পলায়ন করিল। ইহার কারণ, অনেক সময় শিকারীর অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এরূপ অবস্থা-যে কখনও কখনও কোন ভাল শিকারীর হস্তে হয় না,

তাহা নহে। তবে সেরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে, বিশেষ কিছু অসুবিধার দরুণ এরূপ ঘটিয়াছে। অধিকন্তু যে জঙ্গলে শিকারী শিকার করিতে যাইবে, পূর্ব্ব হইতে সেই জঙ্গলের অবস্থা সম্বন্ধে শিকারীর বিশেষ পরিচয় থাকা আবশ্যক। নচেৎ শিকারকার্য্যে সুবিধা হইবে না; কারণ, এই ভারতবর্ষের যে যে স্থানে অরণ্য আছে, তাহাদের ভিতরের অবস্থা বিভিন্ন, যেমন আসাম প্রদেশের জঙ্গল একপ্রকার, সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল অন্যপ্রকার এবং সুন্দরবনের জঙ্গল অন্যবিধ; ইহাদের একের অবস্থা সমস্ত বিষয়ে অন্যের সহিত পৃথক্। ইহার মধ্যে কোন জঙ্গলে একরূপ বৃক্ষ আছে; কোন জঙ্গলে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকারের বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অরণ্যের প্রকৃতিভেদে জানোয়ারগণেরও গতিবিধি বিভিন্ন। এই সকল কারণে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাযুক্ত জঙ্গলে শিকারপ্রণালীও বিভিন্নপ্রকারের। আসামের জঙ্গল অত্যন্ত ঘাসবহুল, তথায় হস্তী না হইলে শিকারের সুবিধা হয় না। কিন্তু সুন্দরবনের জঙ্গল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা নদীবহুল স্থানে অবস্থিত; এখানে নৌকা না হইলে শিকারকার্য্য হইবে না। সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে হাতী কিংবা নৌকার সুবিধা হয় না, এখানে পায়ে হাঁটিয়া শিকার করিতে হয়। এইরূপ জঙ্গলের অবস্থা প্রথম হইতে শিকারীকে জানিতে হইবে।

তাহার পর শিকারীর জানা আবশ্যক, কোন্ জঙ্গলে কোন্ প্রকার বৃক্ষ আছে এবং সেই জঙ্গলের কোন্ পশু কোন্ পাতা খাইতে ভালবাসে ও কোন্ বৃক্ষের তলায় কোন্ পশু অবস্থান করে। কারণ, তাহা হইলে সেই বৃক্ষের তলদেশ অনুসন্ধান করিলে সেইরূপ পশুকে শিকারের জন্য পাওয়া সম্ভবপর। তাহা ছাড়া শিকারীর জানা আবশ্যক যে, বৎসরের কোন্ সময় কোন্ বৃক্ষের ফল হয় এবং সেই ফল পশুখাদ্য কি না, কিম্বা কচি পাতা ও ফল কোন্ সময় হয় এবং পশুরা তাহা খায় কি না। এই ফল, ফুল কিংবা পাতা কোন্ কোন্ জানোয়ারের খাদ্য, তাহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক।

কোথায় সেই জঙ্গলে জীব-জানোয়ারগণের পানীয় জল আছে এবং কোন্ সময় তাহারা সেই জল পান করিতে আইসে, তাহা জানা না থাকিলে শিকারের পক্ষে সুবিধা হয় না। কারণ, অত বড় বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে কখন্ কোন্ স্থানে যে বন্য পশুর দল অবস্থান করিবে, তাহার স্থিরতা নাই এবং তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। এই জন্য সহজে বন্যপশুসকলকে শিকারের জন্য পাইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত অবস্থার বিষয় ভালরূপে জানা উচিত। ইহাই শিকারের কৌশল এবং এই সকল কৌশল জানা থাকিলে অনেক সময় কোন পশুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শিকার করিতে অসমর্থ হইলেও তাহাকে নানারূপে প্রলুব্ধ করিয়া নিকটে আনয়ন করিয়া শিকার করিতে পারা যায়। তাই বলিতেছি যে, কেবলমাত্র ভাল বন্দুক থাকিলে কিম্বা স্থিরলক্ষ্য হইলেই যে ভাল শিকারী বলিয়া গণ্য হওয়া যায়, তাহা নহে। শিকারীর এতগুলি বিষয় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন ধনী ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া হস্তী প্রভৃতি লইয়া কিংবা সুন্দরবনের ভিতর হইলে বড় বড় নৌকা প্রভৃতি লইয়া বহু লোকজন সমেত জঙ্গলের মধ্যে শিকার করিতে আগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা হয় ত ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। আবার সেই সময় সেই স্থানের একটি সামান্য লোক হয় ত একটি একনলা গাদা বন্দুক লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিল। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সেই সামান্য লোকটিই জঙ্গলের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত আছে এবং সেই জঙ্গলস্থিত জানোয়ারগণের গতিবিধি সম্বন্ধে তাহার সম্যক্ জ্ঞান আছে। সেই কারণে সেই লোক জঙ্গলে প্রবেশমাত্র শিকারে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং পূর্ব্বোক্ত লোক সে সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া শিকারে অকৃতকার্য্য হইল। এ জন্য অগ্রে শিকারীর শিকার-কৌশল আয়ত্ত করা আবশ্যক। ইহার পর শিকারীর সাহস থাকা অত্যাবশ্যক। জগতে সাহসী এবং কষ্ট-সহিষ্ণু না হইলে কখনও ভাল শিকারী হইতে পারা যায় না। ভীরুপ্রকৃতি এবং বিলাসপ্রিয় লোকের পক্ষে শিকার করিতে গমন করা বাতুলতা মাত্র। অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে শিকারে যত উৎকৃষ্ট বন্দুক প্রভৃতি হইবে, ততই ভাল, সে সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, পূর্ব্বে যে সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা বলিয়াছি, সেইগুলি শিকারীর জানিতে হইবে। তাহার উপর শিকারী যে জঙ্গলে শিকার করিতে যাইবে, সেই জঙ্গলের মোটামুটি অবস্থানের একটা ধারণা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ অনেক সময় জঙ্গলের মধ্যে পথিভ্রান্ত হইলে তাহাকে নানাপ্রকার বিপদে পতিত হইতে হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জঙ্গলস্থ বৃক্ষগণের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং সেই বৃক্ষসকলের মধ্যে কোন বৃক্ষে কাঁটা আছে, কোন্ বৃক্ষে নাই, তাহাও জানিয়া লইতে হইবে। জঙ্গলের কিরূপ স্থানে কোন্ বৃক্ষ জন্মায়, ভূমি উচ্চ কিংবা নীচু ও সমান, তাহাও জানিয়া লইতে হইবে। পশু-খাদ্য বৃক্ষের কিংবা তৃণের সন্ধান পাইলে আর একটি বিষয় জানিতে হইবে যে, কোন্ সময় এই জঙ্গলস্থ পশুসকল আহারের জন্য বহির্গত হয়। তাহা হইলে শিকারের সুবিধা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পশুসকলের গমনাগমনের পথ জানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং ভিন্ন ভিন্ন পশুর পদচিহ্ন চিনিয়া রাখা আবশ্যক। পদচিহ্ন দ্বারা পশুর অবস্থানস্থান বুঝিতে পারা যায়। আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিকারীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহা ঋতুর ও আব-হাওয়ার অবস্থা। কোন্ ঋতুতে কোন্ রকম ফল পাওয়া যায়, তাহা জানা অত্যাবশ্যক। তাহার পর এক শ্রেণীর জানোয়ার কোনও স্থানে অবস্থান করিলে কোন্ কোন্ জানোয়ার তাহার নিকট অবস্থান করে অথবা কোন্ কোন্ জানোয়ার অবস্থান করিলে কোন্ কোন্ জানোয়ার তথায় থাকে না, সে সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যেমন সুন্দরবন জঙ্গলের মধ্যে যে স্থলে বানরের দল অবস্থান করিবে, নিশ্চয় সেই স্থানে হরিণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কারণ, বানররা বৃক্ষে বসিয়া বৃক্ষের উপরিস্থিত কচি কচি পাতা ফেলিয়া দেয়, হরিণসকল তাহা ভক্ষণ করে। সেই কারণ বানরের অবস্থানস্থানের নিকটে নিশ্চয় হরিণ দৃষ্ট হইবে। আবার জঙ্গলের যে স্থলে বন্য দুর্ম্মর [illegible] থাকিবে, সেই স্থানে হরিণ

শিকার করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে ; কারণ, সেখানে প্রায় হরিণ দৃষ্ট হয় না। এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ হইয়া তৎপরে জঙ্গলে শিকার করিতে গমন করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এই-গুলি গেল শিকারীর অরণ্যসম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয়, এক্ষণে শিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আলোচ্য প্রবন্ধে কেবলমাত্র সুন্দরবনের শিকার সম্বন্ধে বর্ণনা থাকিবে। কলিকাতার নিকটেই সুন্দরবন জঙ্গলের অবস্থানস্থান। এক সময় এই কলিকাতাই সুন্দরবনের পার্শ্ববর্ত্তী অংশ ছিল। কলিকাতার অনেক জমীদারের জমীদারী এখন সুন্দরবনের মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহারাও অনেক সময় জমীদারী পরিদর্শন করিতে আসিয়া জঙ্গলে শিকার করেন। ইহা কলিকাতার সন্নিহিত বলিয়া কলিকাতারও অনেক লোক সুন্দরবনে শিকার করিতে গমন করেন। ইহা ছাড়া দূরস্থিত শিকারিবর্গের অনেকে সুন্দরবনে শিকার করিতে আসেন। এই সকল শিকারীর সুবিধার জন্য আমরা কেবলমাত্র সুন্দরবনের শিকার-প্রণালী আলোচনা করিব। সুন্দরবনে শিকার করিবার পূর্ব্বে জানিতে হইবে, শিকারের জন্য কোন্ কোন্ জানোয়ার এই জঙ্গলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে সুন্দরবন জঙ্গলে কেবলমাত্র ব্যাঘ্র, হরিণ এবং বন্য বরাহ ছাড়া আর কোনও প্রকার শিকারের উপযোগী জন্তু নাই। পূর্ব্বে বন্য মহিষ এবং গণ্ডার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা এক্ষণে একবারে পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; বন্য মহিষ কদাচিৎ দুই একটি দৃষ্ট হয় ; কিন্তু গণ্ডার একবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

৪০ বৎসর পূর্ব্বেও জঙ্গলের মধ্যে গণ্ডার দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার আর কোনরূপ চিহ্ন নাই। তবে শিকারের জন্য সুন্দরবনের মধ্যে বন্য শূকর বড় কেহ শিকার করে না। কারণ, উহার মাংস হিন্দু-মুসলমান কেহই আহার করে না, এবং উহার চামড়া পাওয়া যায় না। সেই কারণে উহার দিকে কাহারও লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হয় না। লোক সুন্দরবনের মধ্যে কেবলমাত্র হরিণ এবং ব্যাঘ্র শিকার করিতেই গমন করে। কারণ, মৃগমাংস উৎকৃষ্ট এবং ইহার চর্ম্মও মূল্যবান্। ব্যাঘ্র শিকার করিলে গভর্ণমেণ্ট হইতে ২০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহার চর্ম্মও মূল্যবান্। শিকারীর পক্ষেও ব্যাঘ্র-শিকার একটি গৌরবের বিষয়, সেই কারণে লোক ব্যাঘ্র শিকার করিতে অগ্রসর হয়। ইহা ছাড়া সুন্দরবন প্রদেশের নদী সকল অত্যন্ত কুম্ভীরপূর্ণ, অনেকে কুম্ভীর শিকারও করেন। সাধারণতঃ লোক সুন্দরবন জঙ্গলে আসিয়া হরিণ শিকার করেন এবং এই হরিণ শিকার করিবার জন্যই লোক জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেই কারণে প্রথমে হরিণ শিকার সম্বন্ধে বর্ণনা প্রয়োজন। তৎপরে অন্যান্য জানোয়ার শিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র।

সৌন্দর্য্য-সাধনে

সৌন্দর্য্য-সাধনে যদি যায় এ জীবন,
যাক্ তবে যাক্ ;—
শুধু থাক্
মর্ম্ম-মাঝে সুন্দরের অনন্ত ব্যঞ্জনা !
যত কিছু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা
পদতলে লুটাক ধূলায়—
গণি না তাহায় !
সৌন্দর্য্যের বেদীতলে ডালি দিলে প্রাণ
সে সাধন হয় সত্য প্রকৃত মহান্ !
বুঝি মমতাজ
বুঝেছিল এই সত্য, মনে ভাবি আজ !

প্রেম সুন্দরের পায়ে তাই সে এমন
উৎসর্গ করিয়া তার আপন জীবন
রচি' গেল বিরাট সে মর্ম্মর-স্বপন
নিরুপম সৌন্দর্য্যের দূত—
অপূর্ব্ব অদ্ভুত !
কোনখানে নাহি তার ভোগের কামনা
আছে শুধু একান্ত সাধনা।

মহা ব্যোমে সোম শশী গ্রহ তারাদল
সুবিমল-কিরণ উজল,—
অন্তহীন নীলিমায় জলদের মেলা,
বিজলীর খেলা,
সপ্তবর্ণ বিচিত্রিত ইন্দ্রধনু ছায়,
মেঘাবিল ক্ষীণ জ্যোছনায়
হেনাকুঞ্জে উৎসব-সভায়,—
বরষার গিরি-দরীতলে
ভঙ্গ স্বপ্ন নির্ঝরের অফুট কল্লোলে,—
হাসিভরা বসন্তের মাধবীর বনে,
শিশুদের মৃদুহাস্যে চপল নর্ত্তনে,
লাজরক্ত যৌবনের রক্তিম কপোলে
অনাবিল যে সৌন্দর্য্য সতত উছলে
কাম গন্ধহীন,—
আমি উদাসীন
চাহি তার একান্ত সাধনা।

আমি চাই সাধনান্তে চ'লে যেতে হায়
মমতাজ প্রায় !
ধরিবে আনন্দ-মূর্ত্তি সে সাধন সুর
শত সাজাহান বুকে অপূর্ব্ব মধুর।
প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরি তার
তুলিবে কালিন্দী কত কল্লোল-ঝঙ্কার !

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল, বি-এ।

গাঁজাখোর

১

সে যখন তিন বৎসরের শিশু, তখন তাহার মা-বাপ মারা যায়। জমী-জমা কিছু ছিল—তাই এক দূর-সম্পর্কের মামা দুই বেলা দুই মুঠা ভাত দিত। ঘরের গরু-বাছুরগুলির হেফাজৎ হইতে আঁস্তাকুড় পর্য্যন্ত সাফ করাইয়া লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়াইত যে, সে ছিল বলিয়াই না কি ছেলেটা আজ মানুষের মত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ না হইয়া সে একটা জন্তুতে পরিণত হইয়াছিল। কণ্ঠস্বর একটু মিঠা ছিল বলিয়া গান-বাজনাটা সে একটু শিখিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গদোষে সে মদ-গাঁজায় এমন পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার আর জোড়া ছিল না। স্কুলে সে সেকেণ্ড ক্লাস অবধি উঠিয়াছিল, কিন্তু মদ খাওয়ার জন্ত এক দিন হেড মাষ্টারের বাঁশের কঞ্চির আস্বাদ পাইয়া সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়া এখন বেশ নির্ঝঞ্চাটে বেড়াইতে পায়। মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে।

নদীর ধারে একটা বটগাছের কোটরে তাহার গাঁজার সরঞ্জাম থাকিত। সকালবেলা মাথাটাকে একটু সাফ করিয়া লইবার জন্ত অগ্নিশীর্ষ গাঁজার কলিকাটিতে সে বেশ এক টান দিয়াছে, এমন সময় সঙ্গী গোবরা আসিয়া জানাইল যে, তাহার মামা তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; গোবিন্দপুর হইতে লোক আসিয়াছে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্ত। প্রথমটা ত সে বিশ্বাসই করিল না যে, তাহার মত হতভাগাকে কেহ মেয়ে দিতে পারে—তাহার পর যখন বুঝিল যে, কথাটা সত্য, তখন তাহার তরুণ প্রাণ আনন্দে লাফাইয়া উঠিল—বিয়ে হবে—কি মজা!

বাড়ীতে আসিয়া বার দুই তিন সাবান ঘষিয়া শরীরটাকে বেশ ধোপদস্ত করিয়া একটা পাঞ্জাবী চড়াইয়া সে যখন বাহির হইল, তখন বাস্তবিক তাহাকে দেখিয়া মনে হইল—বিংশ শতাব্দীর কার্ত্তিকটি!

পাকাদেখা হইয়া গেল; কিছু জমী-জমা আছে বলিয়া মেয়ের বাপ বিশেষ আপত্তি করিল না। মেয়েটি ত মোটা ভাত-কাপড় পাইবে! আজিকার দিনে উহাই যে যথেষ্ট। ইহার অপেক্ষা ভাল পাত্র যোগাড় করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। দুই তিন বৎসর ধরিয়া ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া তাঁহার আর্থিক অবস্থাটা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আদরের ছোট মেয়েটিকে এই মূর্খের হাতেই দেওয়া ছাড়া অন্ত উপায় নাই। জামাই যে মদ-গাঁজায় কি রকম ওস্তাদ, সেটা অবশ্য তিনি তখন জানিতে পারেন নাই। পরে এক জন দুষ্ট লোক সেই কথাটা তাঁহাকে জানাইয়া দেয়; কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। মেয়ের বাপ তাঁহার সালঙ্কারা কন্যা ঐ হতভাগার হাতেই অর্পণ করিলেন।

২

বাসরঘরে নেশাখোরের বিচিত্র রসিকতায় মেয়ের দল ভয়ানক বিরক্ত হইল। তবু তাহারা কোন রকমে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—তাহার বউ পছন্দ হইয়াছে কি না? বধূকে সে এখনও ভাল করিয়া দেখে নাই শুনিয়া এক জন বধূর অবগুণ্ঠন তুলিয়া তাহাকে দেখাইল। মজা করিবার জন্ত কেহ বলিল, বর বধূকে একটু আদর করুক। অমনই বর একঘর স্ত্রীলোকের সম্মুখে নূতন বধূকে আদর দেখাইতে উদ্যত হইল। বধূর অন্যান্য ভগিনী বেশ ভাল ঘরে ও বরেই পড়িয়াছিল। তাহার ভাগ্যে এই গণ্ডমূর্খ স্বামী! সুতরাং কিশোরীর প্রাণ প্রফুল্ল ছিল না। তাহার পর সে পরম্পরায় শুনিয়াছিল, স্বামীটি আবার নেশাখোর! আহত হৃদয়কে কতকটা সংযত করিয়া সে বিবাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলি নিঃশব্দে করিয়া যাইতে-ছিল; কিন্তু একবাড়ী লোকের সম্মুখে বরের এই নির্লজ্জতা তাহার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। গর্জ্জন করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "গাঁজাখোর কোথাকার!" চিরদিনই লোকের নিকট হইতে গালাগালি সে সহজেই হজম করিয়া আসিতেছিল, কেহ তাহাকে গাঁজাখোর বলিলে সে মোটেই চটিত না, বরং হাসিত আর বলিত যে, নেশা করা বড়লোকের কায। যাহারা নিন্দা করে, তাহারা ছোটলোক। কিন্তু আজ এই কিশোরী বধূ—যাহাকে সে জীবনের সাথী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে এমন বজ্রশক্তি ছিল যে, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল! সে আর কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহিল না, একবারে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

ফুল-শয্যার রাত্রিতে অসুখ করিয়াছে বলিয়া বিছানার এক পাশে সে এমন নিস্পন্দভাবে শুইয়া রহিল যে, বুঝাই গেল না, সে জাগ্রত কি নিদ্রিত। তাহার এই নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া বধূ বুঝিল যে, স্বামী তাহার উপর কি রকম দুর্জ্জয় অভিমান করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে তাহার পা ধরিয়া মাপ চাহে; কিন্তু লজ্জায় সে কিছুতেই তাহা করিতে পারিল না। নীরব অভিমানে তাহাদের পুষ্প-বাসরের রজনী প্রভাত হইল।

সকালে উঠিয়াই বর তাহার কাপড় কয়খানি বাক্সে তুলিয়া সোজা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ীতে উঠিল ;—একবারে বাঙ্গালা-দেশ ছাড়িয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত। সেখানে এক পণ্ডিতের কাছে সে সংস্কৃত আর ইংরাজী পড়িবার সুবিধা করিয়া লইল। তাহাকে দেখিয়া তখন কেহ বুঝিতে পারিত না যে, সে নেশাখোর ছিল। অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলিয়া তাহার পাঠ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এখন সে কিছু কিছু কাব্য-চর্চ্চাও করে। সে বলে, গাঁজার নেশার অপেক্ষা না কি কাব্যের নেশা জমে ভাল।

৩

পাঁচ বৎসর পরের কথা। তের বৎসরের কিশোরী এখন আঠার বৎসরের যুবতী। তাহার ভরা যৌবন নিঃসঙ্গভাবেই একটা উদাস আকুলতার মধ্য দিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। গাঁজাখোর হউক আর যা-ই হউক, নারী যে স্বামী ছাড়া থাকিতে পারে না, ইহা সে এখন বেশ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। তাহার অন্যান্য ভগিনীরা বেশ সুখেই ঘরসংসার করিতেছে—আর সেই শুধু অনাথার মত একধারে পড়িয়া আছে। সকলেই যেন একটু করুণার দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহে—সহানুভূতির প্রকাশেই যেন সকলে তাহার সব অভাব ঘুচাইয়া দিবে, কিন্তু তরুণীর এ সব মোটেই ভাল লাগে না। তাই সে এখন প্রায় সকল সময়েই ঘরের কোণে বসিয়া বই পড়ে—কাহারও সহিত মিশে না। আজও সে একখানা বই কোলে লইয়া নিবিষ্ট মনে পড়িতেছিল। বইখানা প্রতিষ্ঠাবান্ কবি মুকুল বাবুর রচিত। প্রিয়-বিরহের মর্ম্মন্তুদ বেদনা-ঝঙ্কৃত এই বইখানি তাহার বড়ই ভাল লাগে। কে এই অপরিচিত কবি? তাহার প্রাণের সকল ব্যথার কথাই যেন এই কবির অতুলনীয় লেখনীসম্পাতে শরীরিণী হইয়া উঠিয়াছে! তিনি যেন কত যুগ-যুগান্তরের পরিচিত বন্ধুর মতই তাহার বুকের হাহাকারকে তাহার চোখের সম্মুখে ছবির মত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মুকুল বাবু কে, তাহা সে জানে না, তাঁহাকে দেখে নাই, তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি তাহার চিরপরিচিত বন্ধু—অন্তরের আপন-জন।

তাহার নয়নবিগলিত অশ্রুধারা কাব্যখানিকে অভিষিক্ত করিল। যে নিষ্ঠুর তাহার নবীন প্রেমের মুকুলকে এমনভাবে পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে বলিবার মত কিছুই তাহার নাই—যেন তাহার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তই সে আজ করিতেছে। আজ যদি সে একবার ফিরিয়া আসে! কিন্তু—

বৌদিদি সহসা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা ভণিতার পর তাহাকে বলিলেন যে, তাহার নেশাখোর স্বামী কাল বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে ; আজ এখানে সে আসিবে ; সুতরাং তাহাকে এখন সাজগোজ করিবার জন্ত উঠিতে হইবে। রৌদ্রদীপ্ত দিগন্তপ্রসারিত মরুভূমির মধ্যে এ কি স্নিগ্ধ শীতলতা! তরুণীর হৃদয়ে এ কি বিচিত্র আলোড়ন! ইহা কি আনন্দরসপূর্ণ জাহ্নবীধারার তরঙ্গোচ্ছ্বাস?

৪

সন্ধ্যার সময় দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির পর সে যখন শ্বশুর-বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন সেখানে একটা আনন্দের কলরোল উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। কিন্তু তাহার অমার্জ্জিত রসিকতার সকলেই বুঝিল যে, সে তেমনই অভদ্রই আছে। আবার যখন এক শ্যালিকা তাহার পকেট হইতে একটা গাঁজার কলিকা বাহির করিল, তখন তাহারা সবাই হতাশ হইয়া পড়িল। এত দিন কোথায় ছিল, কি করিত, এ সম্বন্ধে শত শত প্রশ্ন করিয়াও কেহ তাহার কাছে কোন কথা জানিতে পারিল না। কথাপ্রসঙ্গে এক জন বলিল, মুকুল বাবুর চিত্রের সহিত তাহার না কি অসাধারণ সাদৃশ্য আছে। সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "মুকুল বাবু আবার কে?" সর্ব্বজনপরিচিত সুকবি মুকুল বাবুর নাম পর্য্যন্ত যে জানে না—এমন একটা হস্তিমূর্খ কি না তাহাদের আদরের ভগিনীর স্বামী! হা ভগবান্! শ্যালিকাবৃন্দ তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। বড়বৌদি বলিলেন যে, তাহার স্ত্রীকেই যেন সে জিজ্ঞাসা করে, মুকুল বাবুটি কে। সে দিন-রাত তাহার বই পড়ে—কবিতাগুলি পড়িয়া পড়িয়া তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

অন্তরের আনন্দধারা মুখে চোখে বাহির হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল যে, তাহার স্ত্রী যখন মুকুল বাবুকে এতটা ভালবাসে, তখন তাহার মত নেশাখোরকে সে কেমন করিয়া স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে! তাহার কথার কেহ-ই আর জবাব দিতে পারিল না।

রাত্রিতে যখন একরাশি ফুলের মত তরুণী পত্নী স্বামীর পদমূলে লুটাইয়া পড়িল, সে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো, নেশাখোরকে ভালবাসতে পারবে ত?"

পত্নী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় মাপ কর।"

"রাজি আছি—কিন্তু তুমি পারবে ত আমায় ভালবাসতে?"

"স্বামীকে কে না ভালবাসতে পারে?"

"কিন্তু তুমি না কি কোন্ এক মুকুল বাবুকে খুবই ভালবাস, শুনলাম?"

তরুণী বজ্রাহত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে সে জানাইল যে, সে মুকুল বাবুকে ভালবাসে না, তবে তাঁহার অসামান্ত কবিত্ব-প্রতিভাকে একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করে মাত্র। ইহাতে যদি তাহার স্বামী ক্ষুণ্ণ হন, তবে সে আর তাঁহার লেখা পড়িবে না। আজ সে এই গাঁজাখোরকেই তাহার তরুণ প্রাণের সমস্ত প্রেম-অর্ঘ্য দিতে চাহে। স্বামী ছাড়া আজ আর তাহার কেহ নাই—কিছু নাই।

ঝর্-ঝর্ করিয়া তরুণীর নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে তখন পত্নীর শিশিরধৌত শতদলের মত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহাতে প্রথম প্রেমের রেখা মুদ্রিত করিয়া বলিল যে, মুকুল বাবুকে শুধু শ্রদ্ধা করিলেই ত চলিবে না—একটু ভালবাসিতেও হইবে। তাহার কারণ আর কিছু নহে—যে মুকুলের গন্ধে তাহার তরুণ প্রাণটি আজ ভরপূর হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি আর কেহই নহে—তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া—তাহারই নেশাখোর স্বামী। তরুণী স্বামীর বক্ষোদেশে আপনাকে বিসর্জ্জন দিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।
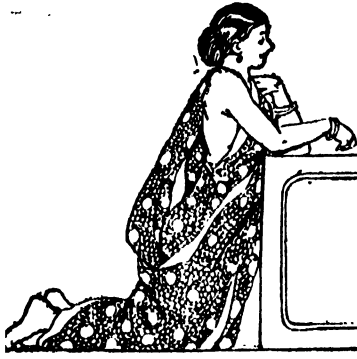
মেঘমুক্তি

অজিতের কথা

১

নরেশ বাবুর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। মন তখন অত্যন্ত চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত; কোন বিষয় চিন্তা করিবার মত অবস্থা ছিল না; সুতরাং কোথায় যাইব, কি করিব, কিছু না ভাবিয়া চলিতেছিলাম লক্ষ্যশূন্যভাবেই! রাজপথের অগণ্য জনপ্রবাহ, ট্রাম মোটর মোটরবাস ইত্যাদির অবিরাম গতি, পথচারী পথিকদের হাস্যকলরব—সবই যেন তখন আমার অর্থশূন্য নিরর্থক মনে হইল। সুখ, আশা, আনন্দ সবই ত শেষ হইয়া গিয়াছে! তবে আর কেন মিথ্যা এ হাসি-খেলা?

পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। মহানগরীর চলমান জীবন-স্রোত মন্দীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। বহুক্ষণের পরিশ্রমে ক্লান্তদেহে অবসন্নচিত্তে আমি তখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সে দিন আকাশে চাঁদ ছিল না—কৃষ্ণপক্ষের তারায় ভরা সুপ্তিময়ী রজনী। সেই ছায়াময় ম্লান আলোয় ছাদের উপর আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক এতক্ষণে কথঞ্চিৎ শীতল হইয়া আসিতেছিল; ধীরে ধীরে অন্তরমধ্যে দুই মাস পূর্ব্বের প্রথম দর্শনের চিত্র ফুটিয়া উঠিল! ফাল্গুনের সেই মধুর সন্ধ্যা, সেই বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বল জনাকীর্ণ সুপ্রশস্ত কক্ষ আর সেই সুসজ্জিত আলোকমালায় উদ্ভাসিত ষ্টেজের উপর উষার অনবদ্য সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় রূপ! আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। বহুদিন পূর্ব্বের শ্রুত সেই গভীর মধুর সুর কানে বাজিতে লাগিল—

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।'

সে দিনও আমি এই ছাদের উপর এমনই স্তব্ধ হইয়া আমার জীবনে প্রথম দৃষ্ট সেই নারীরূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলাম। সে যেন আমার চিরপরিচিত এই জগতের সঙ্গে নূতন পরিচয়; অন্তরে সে দিন অপূর্ব্ব আনন্দ ও পুলকের প্লাবন! তাহার পর? আশার অতীত যাহা—তাহাও সম্ভব হইল, ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম, বাস্তবের মধ্যে আমার প্রতিদিনের সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে—আমার অত্যন্ত সন্নিকটে! কিন্তু সহসা আজ এ কি? আমার এত দিনের মায়াময় কল্পনা—এত দিনের রচিত সুখের স্বপ্ন, নিমেষের মধ্যে আজ সবই শেষ! আমার স্বচ্ছন্দ সুনির্দ্দিষ্ট জীবনের গতি মুহূর্ত্তে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, আজ আর কোন দিকে কিছু অবলম্বন খুঁজিয়া পাইলাম না; অন্তর বাহির জুড়িয়া কেবল এক গভীর নিরাশা ও বিষাদের সুর কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

আমার পূর্ব্বজীবনের কথা মনে পড়িল। দুই তিন মাস পূর্ব্বের সেই নিরুদ্বেগ মুক্ত অনাড়ম্বর জীবন! প্রাত্যহিক নিয়মমত রোগী দেখা, ঔষধপত্রের ব্যবস্থা এবং তাহারই নিভৃত অবসরে একাগ্রচিত্তে আমার নিজস্ব বিষয়ের জ্ঞানের সাধনা! জগতের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না, সুখ বা দুঃখ দিবার জন্য দ্বিতীয় কোন লোকের অস্তিত্ব ছিল না এবং সে জন্য কোন অভাববোধ বা অতৃপ্তিও ছিল না। সে দিন একমাত্র লক্ষ্য ছিল, চিকিৎসাশাস্ত্রে সাধ্যমত জ্ঞানসঞ্চয়, আর কামনা ছিল, এত দিনের অনাবিষ্কৃত রোগতত্ত্বসমূহ ও তাহার প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া জনসাধারণের সেবা। সে দিন আমার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জগৎটুকুর ভিতর স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করিয়াও আমার শান্তি—আমার সুখও অব্যাহত ছিল; আবার কি যাওয়া যায় না? সেই নিশ্চিন্ত স্বাধীন জীবন—সেই সাধনায় নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়া যায় না?

আমি সমস্ত চিন্তা হইতে মন ফিরাইয়া ইহারই ভিতর পথ পাইবার চেষ্টা করিলাম; ভাবিলাম, বহুজনের হিতের—বহুজনের সুখের জন্য আত্মত্যাগের কথা, চিরবরেণ্য ত্যাগী কর্ম্মবীরগণের মহৎ চরিতকথা, লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে উচ্চাঙ্গের জ্ঞানসাধনার কথা! কিন্তু আজ আর এই সব উন্নত আদর্শের মধ্যে কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার আহত ব্যথিত হৃদয় কেবল অসহ্য বেদনায় গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। নাই—নাই! এ সব শুষ্ক জ্ঞানের চর্চ্চায় কোন তৃপ্তি নাই! সে ভিন্ন সব শূন্য, জগৎ অন্ধকার—সংসার নিষ্ফল!

প্রভাতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রামলাল স্তম্ভিত হইয়া গেল। "বাবুর কি কিছু অসুখ করেছে?" তাহার এই সশঙ্ক প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "কাল অতিরিক্ত গরমের জন্য শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছিল, এখন ভালই আছি।"

সে বলিল, "তবে আপনি যান, স্নান ক'রে আসুন। আমি ততক্ষণ আপনার খাবার ঠিক ক'রে রাখি। রাত থেকে ত খাওয়া হয় নি?"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্নানের ঘরে গেলাম। সত্যই সে সময় ক্লান্তি ও অবসাদে শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

বাহিরে বসিবার ঘরে রামলাল সব গুছাইয়া রাখিয়াছিল;—সরবতের গ্লাস, খাবার, সমস্তই। আমি গেলে সে ফ্যানের সুইচ টিপিয়া দিয়া, আমাকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিয়া নিজের কাযে চলিয়া গেল।

আমি টেবলের ধারে গিয়া বসিলাম। আবার সেই দুর্ব্বহ চিন্তা! এখন আবার নূতন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যবস্থা স্থির করিয়া লইতে হইবে। আমি চলিতে না চাহিলেও সংসার ত চলিবেই। সে কাহারও জন্য তিলার্দ্ধ বসিয়া থাকিবে না! কিন্তু জীবনের পথে চলিবার যে নির্দ্দিষ্ট ধারা ছিন্নভিন্ন হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, এখন আবার কোন্ দিক হইতে কোন্ পথে আরম্ভ করা যায়? কলিকাতায় থাকা, আর আমার নিজের কায পূর্ব্বের নিয়মে করিয়া যাওয়া, এ চিন্তাও যেন তখন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল।

সহসা সশব্দে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং সুধীর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, "ডাক্তার! ডাক্তার! আছ ত? যাক্! বাঁচা গেল!"

তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ত অবাক্! বলিলাম, "ব্যাপার কি? এত ব্যস্ত কেন? বোস!"

সুধীর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হুঁ! বসা! আমার বলে মরবারও অবসর নেই! দুটো কথা বলবার আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব'লে যাই!"

হঠাৎ টেবলের উপরে সরবতের গ্লাসটার উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে তখনই আগাইয়া আসিয়া সেটি তুলিয়া লইল; বলিল, "কপাল একেই বলে, বাবা! আমরা কোথায় এই বোশেখ মাসের দুর্জ্জয় গরমে মাঠে ময়দানে ঝল্‌সে পুড়ে মরছি, অর্দ্ধেক দিন ভাতে ভাতও জোটে না, মুড়ি চিবিয়ে দিন কাটাই, আর তুমি দিব্বি সাজসজ্জা ক'রে ফ্যানের নীচে ব'সে তোফা বরফ-সরবৎ খাচ্ছ, আর—" কথাটা শেষ না করিয়াই সে হাঁক দিল—"রামচন্দ্র! ওহে রামলাল!"

বলিলাম, "আবার সে বেচারাকে তলব কেন?"

সে বলিল, "রামচন্দ্র নিশ্চয়ই গণনাবিদ্যা শেখেন নি! সুতরাং টেবলের উপরের ব্যবস্থাটা আমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে নেই, এটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে! আমার—হাজার হোক্ একটা চক্ষুলজ্জা আছে ত?"

রামলালকে আর এক প্রস্থ সরবত ও খাবারের ফরমাস দিয়া সুধীর ঝুপ করিয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িল। সরবতের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়া বলিল, "উঃ, তেষ্টা যা পেয়েছিল—একবারে মারাত্মক! ক্ষিধেও মন্দ পায় নি দেখছি! অথচ দেখ, এতক্ষণ এ কথা আমার মনেও ছিল না—একবারে যাকে বলে তন্ময় অবস্থা।"

আমি কিছু না বলিয়া একটু হাসিলাম। সুধীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "হাস্‌ছো কি? মহাপুরুষ হবার যা যা লক্ষণ, ক্রমশঃ সেগুলো একে একে আমার ভিতরে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সে কথা থাক্। তোমায় উপস্থিত একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলুম। তোমার মতলবটা কি বল দেখি? কিছু কাযকর্ম্ম করবার ইচ্ছা আছে? না চিরটাকাল ঐ সব পুঁথিপত্র নিয়েই কাটাবে? কি স্থির করেছ?"

বলিলাম, "বিশেষ কিছুই স্থির করি নি। কারণ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কাল সম্বন্ধেই কোন আগ্রহ নেই। তবে তোমার হঠাৎ সকালবেলা উঠেই এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে উঠলো কেন?"

সুধীর বলিল, "সেই কথা বলতেই ত এই সাতসকালে এসে হাজির হয়েছি, * * * জিলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, জান ত?"

বলিলাম, "কাগজে দেখেছি।"

সে সরবতটি নিঃশেষ করিয়া গ্লাসটা টেবলের উপর রাখিল; বলিল, "ব্যাপারটা প্রথম যেমন হয়ে থাকে, তেমনই হয়েছিল, অর্থাৎ সকলেই তোমার মত কাগজে দেখেই ক্ষান্ত ছিলেন। ক্রমে বাড়াবাড়ি হয়ে উঠলো, তখনও এখান থেকে কিছু কিছু সাহায্য ক'রেই চলছিল; কিন্তু সে রকম ক'রে আর বেশী দিন চল্‌লো না। অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে ওঠায় এখন অনেক সম্প্রদায় সেখানে সেবাকেন্দ্র খুলে গ্রামবাসীদের সাহায্য করছেন। আমার ত বাড়ীই ওদিকে; আমিও আমাদের একটা দল নিয়ে সেখানে কায কর্‌ছিলুম। মাস-খানেক থেকে যথাসাধ্য চেষ্টায় ব্যাপারটা সন্তোষজনক ক'রে তোলবার আশাই করা যাচ্ছিল; কিন্তু লোকগুলোর কেমন যে ঝোঁক—তারা মরবেই! এত দিন না খেয়ে মরছিল, সেটা যদি বা কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা ক'রে আনা গেল ত এখন রোগে মরতে সুরু করেছে। এর উপায় ত আমরা করতে পারি নি। তাই তোমার কাছে এসেছি।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। আজ সকাল হইতে এই রকম একটা কিছুর আকাঙ্ক্ষায় আমার সারা মন-প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতায় থাকা, গতানুগতিকভাবে জীবনযাত্রা, আবার তাঁহাদের সহিত দেখাশুনা ও বাধ্য হইয়া সেখানে যাতায়াত! এ সম্ভাবনার চিন্তামাত্রেই যেন প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। সুধীরের কথা শুনিয়া মনে হইল—এই ত আমার মুক্তির পথ!

সুধীর বলিতে লাগিল, "আমার হাতে যে গ্রাম কখানার ভার আছে উপস্থিত সেইগুলোতেই ব্যারাম দেখা দিয়েছে সহর সেখান থেকে অনেক দূর। আর তা না হলেই বা কি লাভ হতো? এ ত একবার এসে দেখে গেলে কায চলবে না? ডাক্তারকে সেখানে থাকতে হবে। অন্ততঃ কিছু দিন ত নিশ্চয়ই। তুমি দিনকতক হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করতে না?"

আমি বলিলাম, "এখনও করি। কবে যেতে হবে?"

সুধীর সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিল—"কবে যেতে হবে? তুমি যেতে রাজী আছ তা হ'লে?"

বলিলাম, "এতে রাজী না হবার কি আছে? তুমি ত জানই, বাধ্য হয়ে এখানে থাকতে হবে, এমন কোন গুরু কাযের ভার আমার হাতে নেই।"

সুধীর একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তা সত্যি। তবে তুমি যে বলবামাত্রই যেতে সম্মত হবে, তা আমি ভাবি নি ভাই! তা বৃথা বিলম্বে ফল কি? আমি ত আজ দুপুরের গাড়ীতেই যাচ্ছি, তুমি যদি প্রস্তুত থাক, তা হ'লে তোমায় তুলে নিয়ে যেতে পারি।"

তাহাই হইল। বিশেষ কার্য্যে কলিকাতার বাহিরে যাইতেছি, রামলালকে এইটুকুমাত্র বলিয়া সেই দিনই আমি সুধীরের সহিত কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

* * * * *

সুধীর আমাকে লইয়া গেল তাহার নিজের বাড়ীতে। তাহার পরিবারবর্গ কলিকাতায় থাকায় সে বাড়ীতেই সহচর কর্ম্মীদের লইয়া সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছিল। তাহার গ্রামপ্রান্তে ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। অপ্রশস্ত মাটীর রাস্তা; দুই পাশে ঝোপঝাড় বাগান; আলো-অন্ধকারের অস্পষ্ট ছায়ায় সেই পথ বাহিয়া তাহার বাড়ীতে উঠা গেল। বাড়ীর বাহিরে একটি প্রকাণ্ড আটচালা; ভিতরে বসিয়া একটি যুবক একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল।

সুধীর বাহির হইতেই একটা বিরাট হাঁক দিল, "দেবা! ওরে দেবা! কৈ, এরা সব গেল কোথায়?"

পাঠরত যুবকটি উঠিয়া আসিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ওরা বিকেলে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি!"

সুধীর বলিল, "এখনও ফেরে নি? যাক্, ডাক্তারকে ধ'রে এনেছি, দেখছিস্ ত? একবারে সাজসরঞ্জাম শুদ্ধ। এখন এই ওষুধের বাক্স আর বইটইগুলো একটা ভাল যায়-গায় রাখতে হবে। ধর ত এগুলো!"

দেবেন্দ্র আমার হাত হইতে বইগুলি লইয়া বলিল, "আসুন—ঘরের ভিতর উঠে বসবেন চলুন।"

তিন জনে আটচালার ভিতর প্রবেশ করিলাম। সুধীর বলিল, "উপস্থিত এই আটচালাখানাতেই আমাদের অবস্থিতি। একে সেবাকেন্দ্র বা আশ্রম অথবা যে কোন গৌরবজনক আখ্যা দিতে পার। আর দেবা এই আশ্রমের গিন্নী। আমরা জনদশেক ওরই তত্ত্বাবধানে আছি। আমরা শুধু বাইরের

কায ক'রে ঘুরি, আশ্রমের আয়-ব্যয়, ভাঁড়ার, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, সব ভারই ওর। দেবা! ডাক্তারকে তোর হাতেই সমর্পণ করলুম। ও বেচারা আমাদের মত ডানপিটে নয়—ওকে একটু দেখিস। যেন ওর কোন কষ্ট না হয়।"

দেবেন্দ্র কিছু না বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া শুধু হাসিল। আমিও তাহার মুরুব্বীয়ানা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

সুধীর আমাদের হাসিতে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিল, "দেবা! একটু চা'য়ের যোগাড় কর্‌তে পারিস? আমি ততক্ষণ আমার বসবার ঘরখানা ডাক্তারের জন্য গুছিয়ে ফেলি।"

আমি বলিলাম, "তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত কর্‌বার দরকার নেই। এইখানে তোমাদের সঙ্গে আমি বেশ থাকতে পার্‌বো।"

সুধীর বলিল, "না, না, এ ঘরে থাকা তোমার পোষাবে না! যে রত্ন কটি আছেন, রাত্রে একত্র হলেই এমন হল্লা লাগাবেন যে, তুমি একবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তোমার আবার যে রকম নিরালায় থাকা অভ্যাস! বিশেষ তোমার এই সব বই-টই আর ওষুধের বাক্স—এ সব একটু ভাল যায়গায় রাখা দরকার। তুমি বোস, আমি এখনই আসছি।"

সুধীর উঠিয়া গেল। দেবেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছিল। তখন আমি একা সেই অপরিচিত স্থানে বসিয়া নিজের চিন্তায় মগ্ন হইলাম।

বাহিরে তখন ঘোর অন্ধকার। আটচালার বাহিরে প্রশস্ত আঙ্গিনায় একটা কিসের গাছ প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা মেলিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল! চারিদিক্ গভীর নিস্তব্ধ, যেন জনমানবের সম্বন্ধবিবর্জ্জিত, কেবল সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে উৎকট ঝিল্লীরব অবিরাম অশ্রান্ত সুরে বাজিতেছিল। কলিকাতা হইতে কয়েক ঘণ্টার মাত্র অন্তরে কত প্রভেদ! কোথায় সেই জনকোলাহল-মুখরিত আলোকোজ্জল মহানগরীর কর্ম্মচঞ্চল জীবন-প্রবাহ, আর কোথায় এই নীরব স্তব্ধ অন্ধকারের ছায়াচ্ছন্ন সুপ্ত পল্লী! কা'ল সন্ধ্যা হইতে আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার নিজের জীবনেও এ কি আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!

কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্র এক পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত! বলিল, "আপনি মুখ-হাত ধুয়ে একটু চা খান।"

আমি বলিলাম, "আর আপনারা?"

সে বলিল, "আমি ত চা খাই না—আর সুধীরকে ও-ঘরে দিয়ে এসেছি।"

বলিলাম, "সুধীরের কথা শুনে আপনি যেন আমার জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করবেন না। সকলের জন্য যা হয়, আমারও তাইতে বেশ চ'লে যাবে।"

দেবেন্দ্র একটু হাসিল; বলিল, "তাই হবে। এ সময়ে এখানে বিশেষ কোন ব্যবস্থা করবার উপায়ও নেই। আর আপনারই কি স্থির হয়ে ব'সে স্নান আহার করবার সময় হয়ে উঠবে? ঘরে ঘরেই রোগের আক্রমণ প্রবল হয়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রামখানির মধ্যেই ত চার পাঁচ জনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি।"

আমি বলিলাম, "এ দিকে এ রকম অন্নকষ্ট কত দিন ধ'রে চলছে?" দেবেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিল, "তা প্রায় মাস দুই হবে। গত বৎসর এ দেশে ভাল বৃষ্টি হয় নি ব'লে ফসল তেমন হয় নি। তার পর এবারও সেই অবস্থা, যারা দিন-মজুরী ক'রে খায়, যাদের সঞ্চিত কিছু থাকে না, দুর্ভিক্ষ হ'লে তাদেরই প্রথম অন্নকষ্ট হয়, তার পর যত দিন যায়, যার যেটুকু সঞ্চিত থাকে, ফুরিয়ে এলে অবস্থাটা সর্ব্বব্যাপী হয়ে পড়ে।"

দেবেন্দ্রের কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। এইরূপে অর্দ্ধাহারে অনাহারে জীবনীশক্তির ক্ষয় এবং ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া তাহার শেষ ফল রোগ ও অনিবার্য্য মৃত্যু।

দেবেন্দ্র আরও অনেক কথা বলিল। তাহার কথা হইতে বুঝিলাম, তাহাদের হাতে যে গ্রাম কয়খানার ভার আছে, তাহাতে প্রায় সব ঘরই নিরন্ন। অন্যান্য সেবাকেন্দ্র হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যায়, সেও প্রায় এইরূপ। দুই বেলা আহারের সংস্থান আছে, এরূপ পরিবার অত্যন্ত কম। এ অবস্থা যদি আবার আরও কিছু দিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাদেরও এমনই দুরবস্থা অনিবার্য্য!

সুধীর এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল। তাহার সহকর্ম্মীরাও কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল, পার্শ্বের দুইখানি গ্রামের অবস্থা রোগের প্রকোপে অত্যন্ত শোচনীয়।

পরের দিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর বাহিরে আসিতেই এক ভীষণ দৃশ্য দেখিলাম! দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদের চিত্র

এ পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম— এখন প্রত্যক্ষ করিতেই সমস্ত শরীর যেন আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। সেই আটচালার সাম্‌নে প্রকাণ্ড আঙ্গিনায় সারি সারি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সাহায্য পাইবার আশায় বসিয়া ছিল। কঙ্কালসার শীর্ণ-বিশীর্ণ দেহ; চক্ষু জ্যোতিহীন, কোটরগত; শরীরে যেন জীবনের কোন চিহ্নমাত্র নাই। অনশনে অর্দ্ধাশনে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও চাঞ্চল্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

সুধীর আমায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "দেখছো কি অবাক্ হয়ে? মাসখানেকের চেষ্টায় এখন তবু ত এদের কতকটা মানুষের মত চেহারা হয়েছে। যখন প্রথম এসেছিলুম—তখন যদি গ্রামের অবস্থা একবার দেখতে! কত লোক ম'রে গেল—কত লোক অনাহারে দুর্ব্বলতায় অকর্ম্মণ্য অক্ষম হয়ে গেল—কত লোক পরিবারবর্গকে বাঁচাবার কোন উপায় না পেয়ে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল—সে কি ভয়ানক অবস্থা!"

নিবারণ ও হারণ আঙ্গিনায় প্রত্যেককে আহার্য্য বিতরণ করিতেছিল। আর কয়েকটি যুবক বড় বড় ধামায় পাত্রে পাত্রে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া সেইগুলি বহন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওরা এ সব জিনিষ-পত্র নিয়ে কোথায় গেল?"

সুধীর সেই দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ঐগুলোই ত আমাদের প্রধান কায। যারা এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, যারা এত দূর হেঁটে যাতায়াত করতে অপারগ, তাদের আহার্য্য ঘরে পৌঁছে দিতে হয়। তা ছাড়া অত্যন্ত ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মধ্যেও কয়েক ঘরে বিশেষ অভাব ঘটেছে। এঁদের অবস্থাই সব চেয়ে শোচনীয়। তাঁরা ত এ ভাবে সাহায্য নিতে অভ্যস্ত নন। অনেক বাড়ীতে পুরুষ পর্য্যন্ত নেই। মেয়েরা উপবাসী থাকলেও লজ্জায় সে কথা প্রকাশ করতে পারেন না। যে যে স্থানের খবর আমরা পেয়েছি, সেই সব ঘরে দৈনিক প্রয়োজনমত চাল, ডাল ইত্যাদি প্রতিদিন রেখে আসি। ওরা এই সব কাযের যোগান দিতে গেল। এ সমস্ত কায মিটতে বেলা ১টা বেজে যাবে।"

আমি বলিলাম, "তোমরা কাযের বেশ ব্যবস্থা করেছো। উপস্থিত তোমাদের এই রকম চেষ্টার ফলে এতগুলি লোকের জীবনরক্ষা হ'ল; কিন্তু এর পর এদের কি উপায় হবে? শুধু এক এক মুঠো খেতে দিয়েও এদের বাঁচান যাবে না। এরা ত একেবারে নিঃসম্বল নিরুপায়।"

সুধীর বলিল, "সে চেষ্টাও যথাসাধ্য করা যাচ্ছে। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও লেখালেখির ফলে গবর্ণমেণ্ট থেকে কিছু কৃষি-ঋণ পাবার আশা পাওয়া গেছে। আষাঢ় মাসে যদি এবার জলটা ভালরকম নামে—তা হলেই অনেক পরিমাণে ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে। যা হোক, তত দিন লোকগুলো যাতে সবল ও কার্য্যক্ষম হয়ে ওঠে, উপস্থিত সেইটাই প্রাণপণে চেষ্টা করা যাক্! তুমি কখন্ বেরোচ্ছ? রোগীগুলোকে একবার দেখে আসা যাক! কাল থেকে বেচারাদের খবর নিতে পারি নি।"

আমি বলিলাম, "চল না এখনই। আমি ত সর্ব্বসময়ই প্রস্তুত।"

একটি ছোট বাক্সে একখানি বই ও কয়েকটি ঔষধ গুছাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথ প্রায় জনশূন্য, বৈশাখের খরতাপে যেন চারিদিক্ ঝলসাইয়া যাইতেছে। পথের দুই ধারে বাগান, মাঝে মাঝে আধ-ভাঙ্গা পাকা বাড়ী, কোথাও বা জলশূন্য পুষ্করিণী।

ক্রমশঃ সুধীরদের পাড়া ছাড়াইয়া গ্রামের অন্য প্রান্তে আসিলাম। এ অঞ্চলে প্রায় প্রতি গৃহে এক জন দুই জন করিয়া অসুস্থ। রোগ প্রায়ই উদরাময় ও আমাশয়। পেটের যাতনায় অনেকেই আর্ত্তনাদ করিতেছে। অনেকের আবার সেটুকু শক্তিও নাই, নির্জ্জীব, অবসন্ন, যেন প্রাণহীন কঙ্কাল-মাত্র! কয়েকটি গৃহে রোগীদিগকে দেখিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতেই যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া অল্পসময়ের মধ্যে স্নান আহার সারিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম।

এইরূপে সেখানকার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম দিন কতক ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ হইত না। রোগের প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ক্ষিপ্রগতিতে রোগ ছড়াইয়া পড়িল। যাহাদের অবস্থা পূর্ব্ব হইতে অনাহারে ও রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে মন্দ হইয়া আসিয়াছিল, বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারা গেল না। ফলে আমার কাযের প্রথম দিকে চারিদিকেই মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। রোগের

প্রারম্ভেই যাহাদের ঔষধ-পথ্য নিয়মমত দিতে পারা গেল, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা আশাপ্রদ মনে হইল। অনেকের ঘরে রোগীকে দেখিবার বা পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিবারও লোকাভাব। সে সব স্থানে আশ্রমের ছেলেরাই পালা করিয়া সেবা করিত। কাযের মাত্রা এক এক সময় এত বাড়িত যে, বাড়ীতে সকলের সঙ্গে অনেকের দেখা পর্য্যন্ত হইত না। রাত্রিতে একত্র হইলে প্রত্যেকেই দিনের কাযের হিসাব-নিকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিত। ফলে কথার অপেক্ষা গোলমালের মাত্রাই বেশী, সকলের অপেক্ষা অধিক চেঁচাইত সুধীর! এবং সে-ই অপর সকলকে ধমক দিয়া থামাইয়া বলিত, "চুপ! চুপ! তোরা এত চেঁচাস্ কেন? ডাক্তার ঘুমোচ্ছে!"

এই বিপুল কর্ম্মস্রোতের মধ্যে আমি আমার সমস্ত শিক্ষা ও শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার নিজের বিষয়ে কোন কথা কখনও আমার মনে উদয় হইত না, এবং সে অবসরও থাকিত না। প্রতিদিন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আমি রোগী দেখিয়া বেড়াইতাম, গ্রামের যে চিত্র আমার সমক্ষে পড়িত, তাহা যেমন ভীষণ, তেমনই ভয়াবহ! মাঠের পর মাঠ, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র—ধূসর, শুষ্ক, ধূ ধূ করিতেছে। চাষী আর চাষ করে না, রাখাল আর গো-চারণ করে না; হাটবাজার নিস্পন্দ, জন-মানবহীন গৃহস্থের গৃহে গৃহেও সেই দশা, সকলের ঘরেই চারিদিকে ভীষণ দারিদ্র্যের করাল দংশন। অনেকের ঘরের চাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ঘরেরও ভগ্নদশা। সন্ধ্যার প্রদীপ আর গৃহস্থের ঘরে জ্বলে না, সযত্ন-রোপিত তুলসী-মঞ্চ শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অনেকেই মৃত, যাহারা আছে, তাহারাও যেন কেমন আশাহীন, নিরানন্দ, উদাস! মনে হয় যেন, চারিদিক হইতে জীবনের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! নিরন্তর এই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া আমার মনও বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বক্ষণ চোখের উপর যেন এই সব কঙ্কালসার দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর প্রতিমূর্ত্তি ভাসিয়া বেড়াইত, রাত্রিতে স্বপ্নের মধ্যেও বাজিত—বুভুক্ষু নিপীড়িত অসংখ্য মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন!

এখানে এই বিপদের দিনে আমি আমার আবাল্য বন্ধু সুধীরকে যেন নূতন করিয়া জানিতেছিলাম। সে চিরদিনই অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল-স্বভাব, তাহার মধ্যে যে এমন অপূর্ব্ব কর্ম্মপটুতা, অক্লান্ত শ্রমশক্তি ও গভীর ধৈর্য্য থাকিতে পারে, আমি কখনও তাহা ভাবি নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আমায় মুগ্ধ করিত তাহার পরদুঃখকাতর মহৎ হৃদয়! দুঃস্থ গ্রামবাসীদিগের প্রতি তাহার অপার করুণা ও মমতা! তাহার মনের শক্তিও ছিল তেমনই। সর্ব্বদাই সে সমান প্রফুল্ল, অত্যন্ত শোক, দুঃখ, দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়াও সে সহজে বিচলিত হইত না।

তাহাদের ক্ষুদ্র দলটিতে সে-ই ছিল দলপতি। তাহার সহকর্ম্মীরা সকলে সুধীরের আদর্শেই গঠিত এবং অনুগত ভক্তের মত সর্ব্বদা সুধীরের সমস্ত ব্যবস্থা মানিয়া চলিত।

কেবল দেবেন্দ্র ইহাদের সকলের মধ্যে একবারে স্বতন্ত্র-প্রকৃতি। সে কথা কহিত কম এবং কায করিত অত্যন্ত অধিক। আশ্রমে আমাদের প্রত্যেকের জন্য এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, সেইমত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে কোন দিন তাহার ত্রুটি হইত না। প্রতিদিন অতিশয় পরিশ্রমের পর ক্লান্তদেহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতাম, দেবেন্দ্র আমাদের জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রস্তুত। সে কোন দিন নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিত না, কিন্তু তবু সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে যেন এই আশ্রমটির প্রাণস্বরূপ। বাড়ীর সমস্ত কাযের ভার থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাহিরের কাযেও সাহায্য করিত যথেষ্ট, কিন্তু তাহার সেই শান্ত মধুর প্রকৃতির মধ্যে কেমন যে একটি সুদূর নির্লিপ্তভাব ছিল যে, তাহার সহিত অন্য সকলের মত অবাধে মিশিতে পারা যাইত না। সে যেন নিজের মধ্যে নিজেই সমাহিত। আমার মনে হইত, যেন তাহার সমস্ত কায-কর্ম্ম হাসি-কথার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বিষাদের ছায়া!

সে দিন সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া আমি আমার ঘরে বসিয়া ছিলাম। সুধীর ও তাহার সঙ্গীরা কেহ তখনও ফিরে নাই। পল্লীগ্রামের সন্ধ্যা। বেলাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক নিস্তব্ধ। দেবেন্দ্র তাহার সকল কর্ম্মের অবসরে আলো জ্বালিয়া তাহার অভ্যস্ত পাঠে মগ্ন! মাঝে মাঝে তাহার গভীর ভাবপূর্ণ কণ্ঠস্বর আমার কানে আসিতেছিল—

"ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা! ওরে মন,
নত কর শির! দিবা হ'ল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী! তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা, এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা।"

শুনিতে শুনিতে বহুদিন পরে মন যেন কেমন স্থির আত্মস্থ

হইয়া আসিতেছিল, এত দিনের সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তা, সমস্ত চাঞ্চল্য দূর হইয়া ক্রমশঃ একটি গভীর প্রশান্তিতে চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল—

"ওই শুন বাজে—
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি।"

আমি আকাশের দিকে চাহিলাম। অন্ধকারের স্তব্ধ ছায়া ধীরে ধীরে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অরণ্যে, প্রান্তরে, গৃহস্থের কুটীরে সর্ব্বত্র সেই ছায়ার আবরণ। জীবনে এই সন্ধ্যা কতবার আসিয়াছে গিয়াছে, কিন্তু আজিকার মত কোন দিন এমন নিবিড়ভাবে তাহাকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করি নাই। আজ মনে হইল, এ যেন একটি ম্লান গভীর বিষাদময় রূপ! যেন জীবনের সকল কর্ম্মের অবসানে—

চিন্তাসূত্রে বাধা পড়িল। "ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!"

পরক্ষণেই নিবারণ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘরে আসিয়া বলিল, "আপনি একবার উঠে আসুন! বড় বিপদ্!"

কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাহার ব্যাকুল মূর্ত্তি ও ব্যগ্রতা দেখিয়া তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলাম; বলিলাম, "কি হয়েছে? কোথায় যেতে হবে?"

সে বলিল, "এই কাছেই। ন-পাড়ায়। একটি ভদ্র-মহিলার অবস্থা বড়ই মন্দ। সুধীর আমায় এখনই আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিলে।"

দুই জনে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে যাইতে যাইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁর অসুখটা কি? কত দিনই বা হয়েছিল?"

নিবারণ বলিল, "সে সব আমরা কিছুই জানি না, সার! সময়ে কোনও খবরই পাই নি। এঁরা ত সহজে সাহায্য গ্রহণ করতে চান না? বোধ হয়, বেশ কিছু দিন কষ্ট গেছে। বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই। একটি ছোট ছেলে আর মা। তা ছেলেটিও মারা গেছে।"

ছেলেটি মারা গিয়াছে! মাতাও মৃত্যুশয্যায়!

নিবারণ বলিতে লাগিল, "সম্প্রতি আমরা জানতে পেরে দৈনিক চাল-ডাল বাড়ীর ভিতরে রোয়াকে রেখে যেতুম। কাল যে চাল রেখে এসেছি, আজ নিয়মিত যোগান দিতে গিয়ে দেখি, সেগুলি প'ড়ে আছে। কিছু বুঝলুম না, তখন অনেক কায হাতে ছিল—আজকের চালগুলিও রেখে চ'লে এলুম। বিকেলে সুধীর আর আমি সমস্ত কায সেরে এই পথ দিয়ে ফিরে আসবার সময় ভাবলুম, একবার খবরটা নেওয়া ভাল। ঘরের ভিতর উঠে দেখি, সেই মহিলাটি একা ঘরে অচৈতন্য। মুমূর্ষু অবস্থা। সেই দেখে আপনার কাছে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি!"

গিয়া দেখি, সত্যই তাই। ঘরের ভিতর একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপরে—আসন্নমৃত্যু রোগী! মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে।

সুধীর মাথার নিকট বসিয়া তাঁহার শুষ্ক অধরে জল দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া সে উঠিয়া বলিল, "দেখ একবার শেষ চেষ্টা ক'রে। যদি কিছু করতে পার।"

কিন্তু আমায় কিছুই-ই করিতে হইল না। কাছে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র সেই অচৈতন্য নারীদেহ একবার থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াই পর-মুহূর্ত্তে নিশ্চল স্থির হইয়া গেল। বুঝিলাম, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তিন জনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঘরের চারিদিকে ভীষণ দারিদ্র্যের নিদারুণ চিহ্ন। একটা থালা, বাটি বা একখানা কাপড়ের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব ছিল না। যত দিন সাধ্য শেষ সম্বলটুকুরও বিনিময়ে হয় ত শিশুটির প্রাণরক্ষা করিয়া নিজে অনশনে অর্দ্ধাশনে কত দীর্ঘদিন কাটাইয়াছেন! নহিলে কি এমন অবস্থা সম্ভব হয়?

আমি একবার মৃতার মুখের দিকে চাহিলাম। হয় ত খুব বেশী বয়স হয় নাই, হয় ত এক সময়ে রূপও ছিল, আজ কিন্তু এ অস্থিসার শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা জানিবার কোন উপায় নাই। চির-সহিষ্ণুতা—চিরশান্তির আধার বাঙ্গালার নারী! সংসারের শত অভাব-অভিযোগ—শত দুঃখ-কষ্টের ভার নীরবে বহন করিয়া জীবন কাটিয়াছে! আজ এ ঘোর দুর্দ্দিনেও লজ্জা-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার শেষ নিশ্বাস নীরবে অনন্ত প্রবাহে মিলাইয়া গেল!

কিছুক্ষণের পর সেখানকার গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুধীর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বলিল "থাক্, ভালই হ'ল! দুঃসহ পুত্রশোক, দারুণ অভাব, ভিক্ষান্নের জ্বালা—এবারকার মত সবই শেষ! নিবে, তুই যা। এরা সব ফিরেছে কি না—একবার দেখ। এ দিককার যোগাড়-যন্ত্রও ত করতে হবে।"

নিবারণ চলিয়া গেল। আমরা দুই জনে মৃতার উদ্দেশ্যে গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত অশ্রুবিন্দু নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বাহিরে তখন গাঢ় অন্ধকার। সেই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে চারিদিকের বড় বড় গাছগুলি মাথা তুলিয়া যেন শোকাতুরের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একটা কি পাখী মাঝে মাঝে ডানা ঝট্‌পট্‌ করিতে করিতে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ করিতেছিল ;—সে যেন কাহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও বিলাপের মত। দূর হইতে বাতাসে মধ্যে মধ্যে নারীকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন সমস্ত প্রকৃতি একটা অব্যক্ত শোকের ভারে থম্‌থম্‌।

সুধীর এতক্ষণ সেই ক্রন্দন শুনিতেছিল। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এই আর এক যন্ত্রণা দেখছো? ওর জ্বালায় আমার আর ও-দিকের পথে যাবার উপায় নেই।"

বুঝিলাম, কোন শোকাতুরার আর্ত্তনাদ! বিশদ বিবরণ আর শুনিবার ইচ্ছা ছিল না, তবু জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কে? কি হয়েছে?"

সুধীর বলিল, "ও নিধের স্ত্রী। সেই যে কলেরা কেস্‌—মনে আছে? প্রথম দিনই তোমায় যাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম? তোমার চিকিৎসায় এত দিনে একটু সামলেছে। ওর তিনটি ছেলেমেয়ে, নিজে, তা ছাড়া নিজের এক বিধবা বোন্‌—জন-মজুরের ঘরে খাবার লোক এতগুলি! সংসারে যা কিছু ছিল, বেচে কিনে খেয়ে যখন আর কোন উপায় রইলো না. চার পাঁচ দিন শাক সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ খেয়ে খেয়ে একটা ছোট ছেলে আমাশয়ে ম'রে গেল—নিধে তখন নিরুপায় দেখে এক দিন গলায় দড়ি দিলে!"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কি মর্ম্মান্তিক কাহিনী!

সুধীর বলিল, "এই একটা শুনে অবাক্‌ হয়ে গেলে? গোড়ার দিকে ঘরে ঘরেই ত এমন কাণ্ড হয়ে গেছে! তা ছাড়া নিধে জান্‌ত, এই রকম ক'রে একে একে সব কটাই যাবে—সে তাই আগে থাক্‌তে স'রে গেল। তখন কলকাতা থেকে সাহায্যের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়ে ওঠেনি, কাযেই বাঁচবার যে কোন উপায় হ'তে পারে, নিধে তা ভাবতে পারে নি। ওর স্ত্রীও তখন মরতে বসেছিল, তখন আর নিধের কথা ভাববার সময় ছিল না। এখন কোন রকমে প্রাণধারণের উপায় হয়েছে, রোগ থেকে উঠে একটু বলও পেয়েছে—এখন দিনরাত মর্‌ছে কেঁদে কেঁদে। আমায় দেখলেই বলে, 'দাদাবাবু! সেই ত তোমরা এলে, গাঁ শুদ্ধ সবাইকে বাঁচালে—তবে দুদিন আগে এলে না কেন? তা হ'লে ত মিন্‌ষে এমন ক'রে মরত না?' কি যে ওকে বোঝাব!"

এইরূপে চতুর্দ্দিকের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও রোগ, শোক, মৃত্যুর সঙ্গে অনবরত অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের পর প্রায় দুই মাস পরে ক্রমশঃ গ্রামগুলির অবস্থা আশাপ্রদ হইয়া আসিল। আষাঢ়ের ঘনঘটা তখন দিকে দিকে জমিয়া উঠিতেছে।

সুধীর বলিল, "এই বর্ষার মুখটা কোন রকমে কাটিয়ে তুল্‌তে পারলেই কতকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারা যায়।" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "ডাক্তার, তোমার ত কায প্রায় শেষ হয়ে এল, আর হপ্তা দুই গেলেই বোধ হয় তোমার হাতের সব কটা রুগীই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তার পরই—বাস্‌! তোমার ছুটী! অবশ্য আবার নূতন কিছু উপসর্গ যদি না হয়।"

কথাটায় মনে বিশেষ আনন্দবোধ হইল না। বহুদিন পরে আবার নূতন করিয়া নিজের কথা মনে হইল। এখানে এই গ্রাম ও গ্রামান্তরের নরনারীর প্রতিদিনের মর্ম্মান্তিক দুঃখ-শোক ও অভাবের তীব্রতার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের বিষয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের সকলের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া আমার যথাসাধ্য শক্তি ও চেষ্টা দুঃস্থ জনগণের সেবায় নিয়োগ করিয়া দিন কাটিতেছিল, নিজের বিষয় কোন দিন মনেও পড়িত না। বিশেষ তখনও এখানে আরও কতকগুলি কায ছিল। কাযেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কোন আগ্রহ অনুভব করিলাম না।

সুধীর আমায় নীরব দেখিয়া বলিল, "কি হে, কি ভাবছ এত? নতুন কিছুর সম্ভাবনায় মন দ'মে গেল না কি?"

আমি তখন একটু হাসিয়া বলিলাম, "ভাবছি, যাবার ত আমার বিশেষ কোন তাড়া নেই, আরও কিছু দিন পরে গেলেও চলবে। নতুন বর্ষার মুখে এরা সব কেমন থাকে—সেটা দেখে যাওয়া উচিত। কিন্তু তোমরা এত চেষ্টা ক'রে যাদের বাঁচালে, তাদের অনেকেরই ঘর-দুয়ারের দুর্দ্দশা দেখছো ত? বর্ষা নামবার দেরি নেই, এদের ঘর ভাল ক'রে ছাইয়ে না দিলে এত দিনের পরিশ্রম সবই মিথ্যে হবে। এই দুর্ব্বল শরীরে ভিজতে আরম্ভ করলেই জ্বরের আক্রমণ থেকে ওদের আর বাঁচান যাবে না।"

সুধীর বলিল, "আমিও ঐ কথাটা ভাবছি, কিন্তু থোক টাকা কিছু না হ'লে ত এ কাযে হাত দেওয়া যায় না। তুই এক দিনের ভিতর কলকাতায় গিয়ে আবার কিছু টাকার যোগাড় ক'রে আনতে হবে।"

আমি বলিলাম, "বেশ, যাবার সময় আমার কাছ থেকে * * * * ব্যাঙ্কের উপর একখানা চেক নিয়ে যেও। টাকাটা বৃথাই প'ড়ে আছে—এ সময় তোমাদের কাযে লেগে যাক্।"

কথাটা শুনিয়া প্রথমটা সকলেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সুধীর সহসা অতিশয় উৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাবাস্! ডাক্তার! সাবাস্! 'থ্রী চীয়ারস্'—মর ছাই! পোড়া অভ্যাসগুলো আর কিছুতে যেতে চায় না,—'বন্দে মাতরম্'! যা হোক্! ডাক্তারটা মানুষ হয়ে গেল!" বলিয়া টেবলের অভাবে দেবেন্দ্রের পিঠ বিষম জোরে চাপড়াইয়া দিল!

সকলে তাহার কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়াই আকুল।

দেবেন্দ্র বেচারা পিঠে হাত বুলাইতেছিল, সুধীর তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল, "এই! তুই কি চিরটা কালই মুখ গোমড়া ক'রে থাকবি? এমন একটা সু-খবর শুনলি, মুখে একটু হাসি আসে না?"

"হাসি ত আসছেই! তবে তোমার টাকা পাবার সু-খবরে নয়, ডাক্তার বাবু এখন আরও কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন ব'লে।"—বলিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসির সহিত দেবেন্দ্র আমার মুখের দিকে চাহিল।

সুধীর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহাস্ফূর্ত্তির সহিত বলিতে লাগিল, "দেখলে বাবা! একেই বলে, সৎসঙ্গে কাশীবাস! সাধ ক'রে কি আর ওকে আমাদের দলে টেনে আনলুম? না, কল্‌কাতা সহরে ডাক্তারের অভাব ছিল? স্রেফ ওরই মঙ্গলের জন্য! দেখলুম, লোকটা একেবারে বয়ে যাচ্ছে! এখন ফলটা দেখ।"

আমরা যেমন আশা করিয়াছিলাম, সেইমত আমাদের গ্রাম কয়খানায় রোগসংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং সেই অনুপাতে আমার হাতের কাযও শেষ হইয়া আসিল। তবে সে সময় পার্শ্ববর্ত্তী সেবাকেন্দ্রে রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেখানে সেবাকার্য্যের লোকাভাব হওয়ায় আমরা অবসরমত সে কেন্দ্রে সাহায্য করিতে যাইতাম।

দেবেন্দ্র আমাদের আশ্রম হইতে এক দণ্ড সরিলেই সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা গোলমাল ও বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত, সেই জন্য তাহার অন্যত্র কোথাও যাওয়া সম্ভব হইত না। আমাদের গ্রামের কাযও অনেক লঘু হইয়া আসিয়াছিল, সেই জন্য ছেলেদের এখানে রাখিয়া বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন হইলে অধিকাংশ স্থলে যাইতাম আমি এবং সুধীর।

সে দিন পার্শ্বস্থিত সেবাকেন্দ্র হইতে আমাদের উভয়ের ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, ছেলেরা সকলে যে যাহার কার্য্য সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জনকতক আটচালার বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছিল, আর কয়েক জন ঘরের ভিতর তাস-খেলায় ব্যস্ত, দেবেন্দ্র ইহার মধ্যে কোন দলেই উপস্থিত ছিল না।

তাহাকে আলোর নিকট বই লইয়া বসিতে দেখিয়া আমি সুধীরকে বলিলাম, "তোমার এই বন্ধুটি যেন আর সকলের চেয়ে কেমন একটু স্বতন্ত্র ধরণের। ওর সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি নির্লিপ্তভাব আছে যে, মনে হয়, সহজে যেন ওকে নিতান্ত কাছে ছোঁওয়া যায় না।"

সুধীর বলিল, "দেবার কথা বলছো ত? ও ঐ রকমই! ও বেচারার জীবনটাই একটা ট্র্যাজিডি!"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। বলিলাম, "সে কি?"

সুধীর বলিতে লাগিল, "সংসারকে ও সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, কিন্তু ওর ভাগ্যে সে সুখ নেই। যাকেই ভালবেসে ও ঘরে আনে, ওর সংস্পর্শে এলেই সে আর বাঁচে না। দুদিনেই মারা যায়!"

আমি অদূরে পাঠরত স্তব্ধ মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিলাম। একটা করুণ বেদনায় আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল।

সুধীর বলিতেছিল, "প্রথমবার এই রকম হবার পরই ও সংসার থেকে অনেকটা তফাৎ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওর আত্মীয়-স্বজনরা সেটা সহ্য করতে পারলেন না, অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রে আবার বিবাহ দিলেন। সেবারও তাই। এখন ও নিশ্চিত বুঝেছে, সংসারী হ'তে যাওয়া ওর বিড়ম্বনামাত্র। যে সেবাপরায়ণতা, যে ভালবাসার প্রবৃত্তি নিয়ে ও এসেছিল, ওর নিজের সংসারে তা সার্থক হ'তে পেল না। তাই এখন

পাঁচ জনের সুখ-দুঃখের ভিতরেই ও নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছে।”

আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। সুধীরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, “ভাল হ’ল কি মন্দ হ’ল, কে বলতে পারে? তবে ও নিজে এখন এই সব কায ও অসবরমত নিজের পড়াশুনো নিয়ে এ জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।”

আমরা দুই জনে আমার ঘরের কাছে আসিলাম। সুধীর বলিল, “যাক্ গে ও সব কথা; মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায়। তুমি যাও, কাপড় ছেড়ে এসো, আমি ততক্ষণ একটু ওদের কাছে গিয়ে বসি।”

সে চলিয়া গেল। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেখান হইতে দেবেন্দ্রের কণ্ঠ শুনা যাইতেছিল। সে তখন অনুচ্চস্বরে নিজের মনে কবিতা পাঠ করিতেছিল:—

“ওগো—তুমি অমনি সন্ধ্যার মত হও!
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।”

তাহার পাঠের মধুর স্বর—তাহার আবৃত্তির মনোহর ভঙ্গী—শুনিতে শুনিতে আমার মন যেন এক অজ্ঞাত সুর ও মোহের আবেশে ভরিয়া উঠিল। সে যেন আমার বহুদিনের বিস্মৃত—বহুদিনের হারানো একটি পুলকময় স্মৃতির আভাসে পূর্ণ! আমি আবিষ্টচিত্তে তাহার পাঠ শুনিতে লাগিলাম—

“অমনি সুন্দর শান্ত অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী
ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন-তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।”

সেই গভীর সুর ও ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে তন্ময় হইয়া অন্তর হইতে বর্ত্তমানের সমস্ত চিত্র কখন্ যে মুছিয়া গিয়াছে, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই। কল্পনায় তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল—এমনই আর একটি সুমধুর সন্ধ্যা—কাব্যে সঙ্গীতে মুখরিত একটি আলোকোজ্জল সুসজ্জিত গৃহ! নরেশ বাবুর বিদগ্ধজনোচিত রসালাপ—মনীষার সস্নেহ স্নিগ্ধ হাসি—আর উঁহার সেই ধীর অচপল অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী! আর অমিয়া? সেই চটুলা চঞ্চলা চির-আনন্দের নির্ঝরিণী! আমার কল্পলোকে আমাদের ক্ষুদ্র সভাটির চিত্র অপরূপ রূপ ও ভাবসৌন্দর্য্যে ফুটিয়া রহিল—দূর-দূরান্তর হইতে যেন অমিয়ার কণ্ঠের অপূর্ব্ব সুরলহরী ভাসিয়া আসিল—

“যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন—
আছি কি না আছি
যদি যাই চ’লে—তবু মনে রেখো!”

* * * * *

আরও কিছু দিনের মধ্যে আমাদের সমস্ত কায শেষ হইয়া গেল। গ্রামগুলির তখন অনেকাংশে অবস্থা উন্নত—স্থানে স্থানে আবার চাষ-আবাদের কায আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সুধীরের একান্ত চেষ্টা ও ব্যবস্থার ফলে গ্রামবাসীদের গৃহগুলি সুসংস্কৃত—তাহারা প্রত্যেকেই সবল ও সুস্থ—জন-মজুর কৃষি-জীবী যে যাহার কাযে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বের সেই জনহীন নীরব পল্লীপথগুলি আবার বালক-বালিকাদের হাসি-খেলায়, পল্লীরমণীগণের অবিরাম যাতায়াতে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকেই একটা শান্তি ও সন্তোষের ভাব।

সুধীরদের কলিকাতায় ফিরিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। কিন্তু আমার আর কোনও কায ছিল না; সুতরাং বিদায়ের পালা। তবে আমার সহকর্ম্মী বন্ধুরা আমায় কিছুতেই ছাড়িতে চাহিত না। তাহারা এবার কলিকাতায় গিয়া তাহাদের ক্লাবে যে আমায় নিশ্চয় যাইতেই হইবে, এ বিষয়ে বার বার প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছিল। তবুও আজ-কাল করিয়া কেবলই যাইবার দিন পিছাইয়া দিত। সকলের অপেক্ষা আমায় বেশী ভালবাসিত—দেবেন্দ্র। এত দিন এখানে একত্র থাকার ফলে যেন সকলের সহিত একটা মনের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সব নিরক্ষর নিরীহ পল্লীবাসীর প্রাণঢালা ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা, বন্ধুদের অনাবিল স্নেহ ও প্রীতি, এ সঙ্গসুখ ছাড়িয়া যাইতে আমারও যেন মন সরিত না। অথচ আমার মনে আর তিলমাত্রও শান্তি বা সুখ ছিল না। দিনের পর দিন কাযের মাত্রা কমিয়া যতই বিশ্রামের অবসর হইতে লাগিল, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ততই সেই এত দিনের সুপ্ত দুর্ব্বহ চিন্তা ধীরে ধীরে স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বর্ষণঘন সন্ধ্যায় একা বসিলেই মনে পড়িত—তিন মাস পূর্ব্বে কলিকাতার সেই অপূর্ব্ব সুখস্মৃতি!

আজকার এই বাদল রাতে নরেশ বাবুর ঘরখানিতে হয় ত আগের মতই ক্ষুদ্র সভা জমিয়াছে, হয় ত আকাশের ধারাপাতের সঙ্গে সুর মিলাইয়া অমিয়ার কলকণ্ঠে অবিশ্রাম বর্ষার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে! নরেশ বাবু তেমনই বাঙ্ময়, মনীষা তেমনই হাস্যময়ী! আর উষা? অমনই সেই প্রশান্ত অনুপম মুখচ্ছবি আমার মানসদর্পণে ফুটিয়া উঠিত! কি এক দুর্নিবার আবেগে প্রাণ যেন তখন আকুল ও চঞ্চল হইয়া আর কোন বাধা মানিতে চাহিত না। মনে হইত, সংসার ও সমাজের এই মিথ্যা বাধা-বন্ধন অতিক্রম করিয়া আমার সেই বাঞ্ছিত সঙ্গের মধ্যে ছুটিয়া যাই! সেখানে সবই সেই পূর্ব্বের মত রহিয়াছে, শুধু আমিই সেই সুখস্বর্গচ্যুত হইয়া অশান্ত-চিত্তে দেশে বিদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছি।

কখনও মনে হইত, ক্ষণিকের এই অতিথিকে কি আজও তাহাদের মনে আছে? দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে যেমন তাহাদের অভাবের দুঃসহ বেদনা আমায় নীরবে দগ্ধ করিতেছে, আমার অভাবও কি তেমনই কখনও তাহাদের কাহারও মনে জাগে? শান্ত মধুর সন্ধ্যায় উচ্ছ্বসিত হাস্যোল্লাসের মধ্যে আমার কথা মনে পড়িয়া কি কখনও কাহারও নয়ন দুটি অশ্রুভারে অবনত হইয়া আসে? অথবা দুই দিনের পরিচয় দুই দিনের অদর্শনেই শেষ হইয়া গিয়াছে?

কিন্তু এ সম্ভাবনার কথা আমার মনে স্থান পাইত না। আমার মনে হইত, বিদায়দিনের সন্ধ্যা! আমার সে দিনের ক্লিষ্ট ক্লান্ত রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়নে সে কি উদ্বেগ ও আকুলতার ছায়া! সে কি কখনও ভুল হইতে পারে? তাঁহার অন্তরের যে অনুচ্চারিত সত্য আমি আমার অন্তর দিয়া বুঝিয়াছি, সে মিথ্যা হইবার নহে! সেই দৃষ্টি, সেই স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর—আমার হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার জ্বালার উপর যেন অমৃতের স্পর্শ বুলাইয়া দিত। সে মুখ মনে করিয়া আমি বন্ধুদের উচ্ছ্বসিত হাস্য-কলরবের মধ্যে সহসা স্তব্ধ নীরব হইয়া যাইতাম। মনে হইত, সন্ধ্যার তারাটি যেন উষার শান্ত গভীর দৃষ্টির মত অনিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে!

কিন্তু শুধু এইটুকুমাত্র সান্ত্বনা—এইটুকু স্মৃতি, ইহাই কি আমার চির-জীবনের সম্বল? এইটুকু আশ্রয় করিয়াই কি সারা জীবন এমনই বিপুল ব্যর্থতার মধ্যে কাটাইতে হইবে? এ চিন্তায় আমার অন্তর যেন সময় সময় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বাহিরে যখন শ্রাবণের ধারা অবিরাম ঝম্ ঝম্ রবে বাজিত এবং দেবেন্দ্র তাহার সুরে সুর মিলাইয়া হৃদয়ের আবেগে একমনে কাব্য পাঠ করিত, তখন আমার অন্তর যেন আর বাধা মানিতে চাহিত না, সমস্ত প্রাণ-মন যাহার জন্য অনুক্ষণ অধীর আগ্রহে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট হইতে চিরদিন এমনই দূরে থাকিয়াই কি সারা জীবন কাটাইতে হইবে?

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

পতিতার মেয়ে

ও যে—
পঙ্ক-অঙ্কে ফুটেছে কমল
পাষাণ-বক্ষে নির্ঝর-জল
খনির আঁধারে মণির কণিকা
করিতেছে ঝল্মল্!

ও যেন পুষ্প শুষ্ক তরুর
শ্বাপদারণ্যে বিহগের সুর
ডোবার মাঝারে কুমুদের রূপ
উজ্জ্বল নির্ম্মল!

মৃগশিশু ও যে কসা'য়ের ঘরে
শ্যামল শষ্প শ্মশানের পরে
অনল-কুণ্ডে উড়ে পড়া যেন
কচি কিসলয়দল!

ও যে গো অর্ঘ্য দেবতা-পূজার
ভাগাড়ে ফেলেছে কোন্ দুরাচার
সুধার বিন্দু গরলের কূপে
প'ড়ে হ'ল নিষ্ফল!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শিবতত্ত্ব ও শিবলিঙ্গপূজা

লিখিতে বসিয়াছি বটে, কিন্তু ভয় হইতেছে। একে ত ভাষাভাণ্ডারের বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ নাই, তাহার উপর এরূপ গভীর প্রবন্ধের তত্ত্বালোচনার অনুকূলে যেরূপ শাস্ত্রানুসন্ধান আবশ্যক, তাহারও সম্যক্ সম্ভাব ঘটাইবার সুযোগ পাই নাই। তাই মনে হয়, মহাভারতের ঋষির এই বাক্য আমাতে প্রয়োগ হইবে কি না,—"বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি" অর্থাৎ অল্পজ্ঞের কাছে "এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে" এই বুঝিয়া শাস্ত্র ভয় পান। আমার মনে হইতেছে, ঐ বাক্য আমাতে প্রয়োগ হইবে না। কারণ, আমি শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতেছি না। যে কিছু আপ্তবাক্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাকে নিজের সুবিধামতে গড়িয়াও তুলি নাই। প্রত্যুত, আর্যজ্ঞানসরণির অনুসরণ করিয়াই বিষয়টির গঠন করিয়াছি। সেই জন্য আমার সাহস ও ধারণা এই যে, আমি প্রজ্ঞাচক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্ পাঠকজনের কাছে অবজ্ঞাত হইব না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যদি বিষয়াসক্ত, বিক্ষিপ্তচিত্ত কোনও এক ব্যক্তির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া পারলৌকিক পথিপ্রদর্শনব্যাপারে খদ্যোতের সাদৃশ্য ধারণ করে, তাহা হইলে আমি শ্রমের সাফল্য জ্ঞান করিব ও কৃতার্থ হইব।

শিবের পরিচয়

"শিব" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "অশুভনাশকারী মঙ্গলবিধাতা।" ইহা প্রথমেই ভগবান্ মহাদেবকে বুঝায়। ইনি যে জীবের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করেন ও আমাদের নিত্য উপাস্য দেবতা, ইহা আমরা সার্ব্বভৌম সনাতনধর্ম্মের ভিত্তি অপৌরুষেয় বেদ হইতে বুঝিতে পারিতেছি। কারণ, ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ৯২ সূক্তের নবম ঋকে প্রথমে "শিব" নাম দেখিতে পাই। "যেভিঃ শিবঃ স্ববা এবয়া বভির্দিবঃ নিষক্তিস্বযশনিকাসতিঃ।"

অর্থাৎ সেই রুদ্ররূপী শিব ঐ সমুদয় মরুদ্গণকে সহায় করিয়া আকাশ হইতে জলসেচন করত মঙ্গলকর হউন ও নিজযশে ভূষিত থাকুন। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে "রুদ্র" বলিয়া তাঁহার উল্লেখ আছে। এই "রুদ্র" ভগবান্ শিব ভিন্ন অন্য দেবতা নহেন। কারণ, ঋগ্বেদে অন্যত্র (৬।১৬।৩৯) পাইতেছি—

য উগ্র ইব শর্য্যহা তিগ্মশৃঙ্গনবংসগঃ।
অগ্নিপুরোরুরোজিথ।

আচার্য্য উক্ত মন্ত্রের ভাষ্য করিলেন,—

"রুদ্রো য এষ অগ্নিরিতি শ্রুতিঃ রুদ্রকৃতমপি
ত্রিপুরদহনং অগ্নিকৃতমেব ইত্যগ্নিঃ স্তূয়তে।"

সুতরাং এখানে আমাদের উপাস্য দেবতা শিব বেদে কোথায়ও অগ্নি নামে ও প্রায় অধিকাংশ স্থলে রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। সে বিষয়ে তর্ক আসিতে পারে না। যেহেতু, জগতের সংহারকর্ম্মে ব্যাপৃত যে ভীষণ মূর্ত্তি, তাহাই রুদ্রমূর্ত্তি। আর শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অগ্নি অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম।

শুক্লযজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী সংহিতায় ৩য় অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রটিতেও আমরা শিবের পরিচয় পাইতেছি;—

"শিবো নামাসি নমস্তে মা মা হিংসীঃ।"

অর্থাৎ আপনি শিবনামে অভিহিত। আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আমাদিগকে যাতনা হইতে মুক্ত করিবেন।

যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রীয় স্তবে, মহাদেবের পুরাণপ্রসিদ্ধ "ভব" "শর্ব্ব" "পশুপতি" প্রভৃতি নামেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "প্রাচ্যাদিদেশভেদেন শর্ব্বাদিনামভেদেঽপি দেবতা এক এব।" অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রভৃতি দেশভেদে শর্ব্ব প্রভৃতি নামভেদ হইলেও দেবতা একই। বিশেষতঃ অগ্নি নামে উল্লেখের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎকে শিবের শক্তি বলা হইয়াছে. "যা তে বিদ্যুৎ অবসৃষ্টা দিবস্পরি" (ঋগ্বেদ ৭।৪৬।৩) অর্থাৎ অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ) এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে ভগবান্ শিব ত্রিপুরদাহন ও মদনভস্ম প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার "অগ্নি"নাম অসঙ্গত নহে।

শিব যে রোগনাশকার্য্যে আদিবৈদ্য, তাহাও ঋগ্বেদে (২।৩৩।৪) পাইতেছি—

"ভেষজেভি ভিষক্ত ত্বাং ভিষজা শৃণোমি।" অর্থাৎ আপনি চিকিৎসকমধ্যে প্রধান বৈদ্য, আপনাকে বৈদ্যরূপেই আশ্রয় করিতেছি। যজুর্ব্বেদেও (৩য় অধ্যায় ৫৯) পাওয়া যায়, "ভেষজমসি ভেষজম্।" এই সকল বুঝিয়া, আজও লোক অসাধ্যরোগমুক্তিকামনায় শিবস্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আসন্নমৃত্যুর জীবনরক্ষাকল্পে (শিবের শুক্রোপাসিত মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র সহকারে) মৃত্যুঞ্জয়শিবের পূজা ও বংশরক্ষাকল্পে সাধারণ শিবপূজা করা হইয়া থাকে। ইহাতে শিবের জগদীশ্বরত্ব

প্রতিপন্ন হইতেছে। শিব যে "আশুতোষ," সে বিষয়ের বহু উদাহরণ পুরাণে আছে। মহাভারতে (সৌপ্তিক পর্ব্বে) অশ্বত্থামার সামান্য ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হইয়া, শিবের বরদান তাঁহার আশুতোষত্বের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। অনন্তকাল ধরিয়া শিবপুরাণোক্ত ধ্যানে (ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশম্ ইত্যাদি) আমাদের দেশে শিবের পূজা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ মন্ত্রের মূলে সনাতন বেদ আছেন। পুরাণকার ঋষি ঐ ধ্যানোক্ত বিবরণের মূল সূত্র বেদে পাইয়া মাত্র বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। শিবের "পিনাকপাণি" ও "কৃত্তিবাসাঃ" নামদ্বয় যজুর্ব্বেদের ৩য় অধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক মন্ত্রে নিহিত, তিনি পিনাকনামক ধনুর্ধারী ও চর্ম্মাম্বর-পরিধায়ী। ত্র্যম্বকমন্ত্রে (ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি) শিবের ত্রিনয়নের পরিচয় রহিয়াছে। সায়ন ও মহীধর "অম্বক" পদের "নয়ন" অর্থ করিয়াছেন। উপনিষদে শিবের একটি বিশেষণ "বিশ্বতোমুখঃ।" পুরাণকারেরা উহা হইতেই তাঁহার পাঁচটি মুখের কল্পনা করিয়াছেন। আমরা ধ্যানের সময় তাঁহাকে পঞ্চমুখ ধারণা করিয়া থাকি।

সুতরাং শিবের অবয়বসংস্থান ও নামনির্দ্দেশ আমরা বৈদিক যুগ হইতে পাইয়া আসিতেছি। ভগবান্ স্বীয় শরীরের ঐরূপ আশ্চর্য্য সংস্থান ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ স্বয়ংই দেখাইয়াছিলেন। নচেৎ, তাঁহার সগুণভাব কল্পনায় আনাইবার ক্ষমতা জীবের নাই। কারণ, শাস্ত্রে আছে যে, যে অব্যক্তরূপের ধারণার দ্বারা জীবের ভববন্ধনমোচন হয়, সেই অব্যক্তরূপচিন্তা স্থূলরূপ-চিন্তা না করিলে সম্ভবপর নহে।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে শিবের অষ্টোত্তরসহস্র নাম ও রামায়ণের বালকাণ্ডে কতিপয় নাম পাইয়া থাকি। কল্প, মন্বু, যুগ, যুগান্তর ধরিয়া ভগবান্ শিব যে সব লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় ঐ সকল নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তানুকম্পায় শিবের মূর্ত্তি ধরিয়া দর্শনদানের প্রচুর নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায়। অনুশাসনপর্ব্বে (১৪। ১৩৭) একটি শ্লোক আছে—

"হৃদিস্থঃ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ।
ভক্তানামনুকম্পার্থং দর্শনঞ্চ যথাশ্রুতম্।"

অর্থাৎ বিশ্বরূপ মহাদেব জীবের হৃদয়ে আছেন। তিনি ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে দর্শন দেন।

তবে ইনি বিষ্ণুর ন্যায় যোনিজ হইয়া আসেন না বলিয়া "অজ" ও "অনাদি" আখ্যা পাইয়াছেন। তাই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে "বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা" বলিয়াছেন অর্থাৎ ইনি ত্রিনয়ন ও ইঁহার জন্ম লক্ষিত হয় না।

ভারতের সনাতনধর্ম্মের উদ্দেশ্য ত্যাগ। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমা", অর্থাৎ একমাত্র ত্যাগেই মুক্তি। কৈবল্য উপনিষদে আছে, "জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে", অর্থাৎ শিবকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। মুক্তির ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। শিব শ্মশানবাসী ও কৃত্তিবাসাঃ হইয়া জীবের সম্মুখে সেই ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন।

কালিকাপুরাণের শিববাক্যও উক্ত মতের পোষক—

"কস্ত্বং কোঽহঞ্চ কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ।
অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি যথাক্রমে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ হইয়াছি। সকলকে একমাত্র পরমব্রহ্ম আমারই অংশত্রয় জানিবে।

দৈত্যরা অভীষ্টকামনায় শিবের তপস্যা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনের পাশুপতাস্ত্রলাভ শিবের প্রসাদেরই ফল।

তন্ত্রশাস্ত্রে শিবের অনেক মূর্ত্তির পরিচয় ও তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ নামে পৃথক্ পৃথক্ পূজাপরিপাটী আছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞধ্বংসের পর সতীদেহ লইয়া শিবের তাণ্ডব-নৃত্যের বিবরণ-পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তন্ত্রশাস্ত্র শিববাক্য। তদনুসারে শিবের উপাসনা করিলে শিবে বিশ্বাস ঘনীভূত হয় ও প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

শিবলিঙ্গের পরিচয়

আমরা শাস্ত্রোক্ত শিবমূর্ত্তির ধ্যান করিলেও ধ্যানসম্মত বিগ্রহ গড়ি না, লিঙ্গের উপরই পূজা করি। অনন্তকাল ধরিয়া ভারতময় লিঙ্গমূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, বৈদিক যুগের পর হইতেই লিঙ্গাধারে পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, বেদে লিঙ্গমূর্ত্তিতে শিবোপাসনার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। সেই জন্য পুরাণের যুগ হইতে লিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে ধ্যান-সম্মত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দাক্ষিণাত্যে রাজমাহেন্দ্রীর কোনও কোনও পল্লীতে অধুনা দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে অন্নপূর্ণাপূজায় ধ্যানোক্ত শিবমূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে।

পুরাণ-উপনিষদের মতে লিঙ্গ ও যোনি (রূপান্তরে পুরুষ ও প্রকৃতি) জগতের আদিকারণ ও জীবের উৎপত্তির কারণ। সুতরাং ভারতবাসী আর্য্যগণ কারণেরই উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। আবার লিঙ্গশব্দে আকাশ ও যোনি শব্দে পৃথিবী— এই আর্ষব্যাখ্যানুসারে ঐ দুইটি সকল দেবতার আশ্রয়। সুতরাং লিঙ্গপূজায় জগতের কারণভূত দেবতারই পূজা করা হয়।

নারদপঞ্চরাত্রে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা আছে, তাহার সারাংশ এই যে,—দেবতারা দক্ষের কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ দেন। হরপার্ব্বতীর সঙ্গমের পর ভূপতিত সেই তেজ অসংখ্য পীঠসংলগ্ন লিঙ্গের আকারে আবির্ভূত হন। তদবধি মর্ত্ত্যধামে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আবার পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৭৮ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তির বিষয় যাহা লেখা আছে, তাহার সারমর্ম্ম এই :—

পুরাকালে জগতের মূলতত্ত্ব লইয়া ঋষিগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ ঐ সন্দেহ দূর করিবার জন্য কৈলাসে মহাদেবের নিকট গমন করেন। কিন্তু তখন শিব পার্ব্বতীর সহিত কামব্যাপারে আসক্ত থাকায় দ্বাররক্ষক নন্দী তাঁহাদিগকে ভগবানের নিকট যাইতে নিষেধ করেন। অনেক দিন ধরিয়া দ্বারসন্নিধানে থাকিয়া তাঁহারা ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং তন্মধ্যে ভৃগুমুনি ক্রোধে শিবকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন,

"আজ হইতে তোমার লিঙ্গাকার হইবে। উহা দেবীর যোনি-পীঠে আসক্ত থাকিবে।" ভগবান্ শিব উত্তর দেন, "ব্রহ্মবাক্য সত্য হইবে বটে; কিন্তু জীবসাধারণ ঐ লিঙ্গেরই পূজা করিবে। লিঙ্গপূজায় আমার ফললাভ ঘটিবে।"

আবার লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তির কথা উপর্য্যুক্ত বৃত্তান্ত হইতে বিভিন্ন। তথায়, বিবদমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিরোধ ও অহঙ্কার দূর করিবার জন্য ভগবান্ শিব অনাদি অনন্ত লিঙ্গ আকারে আবির্ভূত হন। মূল বচনটি এই :—

"প্রলয়ার্ণবমধ্যে তু রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।
এতস্মিন্নন্তরে লিঙ্গমভবচ্চাবয়োঃ পুরঃ॥" (১।১৮।৩৩)

এই যে পুরাণভেদে লিঙ্গোৎপত্তির বিবরণের ভিন্নতা, ইহা কল্পভেদে সমাধান করাই সঙ্গত।

লিঙ্গপুরাণের শেষে বলা আছে যে, "অথাতো দেবমীশানং লিঙ্গে সম্পূজয়েচ্ছিবম্।" উপর্য্যুক্ত ভৃগুশাপের পর হইতে লিঙ্গে শিবপূজা হইতে লাগিল। এ বিষয়ে স্কন্দপুরাণের শিববাক্য এই :—

"ন তুষ্যাম্যর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং পুষ্পধূপনিবেদনৈঃ।
লিঙ্গেঽর্চ্চিতে যথাত্যর্থং পরং তুষ্যামি পার্ব্বতি॥"

অর্থাৎ, হে পার্ব্বতি! লিঙ্গে পূজিত হইলে যেরূপ সন্তোষলাভ করি, পুষ্পধূপাদি দ্বারা মূর্ত্তিতে পূজিত হইলেও তাদৃশ সন্তোষলাভ করি না।

শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজাও গঠিত লিঙ্গের উপর হওয়াই শাস্ত্রীয় বিধি। এই অষ্টমূর্ত্তি বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত আর কিছু নহে। কারণ, অষ্টমূর্ত্তিবর্ণিত ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ও যজমান এই আটটি বস্তুতেই জগতের পূর্ণতা সাধিত হয়। তাই পূর্ণ বিরাট ব্রহ্মস্বরূপ শিবের এই আটটি মূর্ত্তিতে আটটি নামে অর্চ্চনা হইলেই উপাসনার পূর্ত্তি হইল। কত বৎসর ধরিয়া যে ভারতবর্ষে লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা চলিতেছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তবে মহাভারতে উল্লিখিত দুই একটি জ্যোতির্লিঙ্গের কথায় বুঝা যায় যে, মহাভারতের যুগে উহা কিঞ্চিৎ আরব্ধ হইয়াছিল।

মহাভারতপ্রসিদ্ধা কুন্তীদেবী বাণলিঙ্গের পূজা করিতেন বলিয়া শুনা যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের পঞ্চাশত্তমবর্ষে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম জুবিলী প্রদর্শনী হইয়াছিল। উহাতে পৃথিবীর বহুতর আশ্চর্য্য দ্রব্যের সমাবেশ করা হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছি, তথায় কোন এক রাজার ঘর হইতে একটি অপূর্ব্ব সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় বাণলিঙ্গ আনীত হইয়াছিল। সেই লিঙ্গের তলদেশে লেখা ছিল, "কুন্তীর নিত্যপূজিত লিঙ্গ।"

সুতরাং মহাভারতের সময়ে যে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু "সেতুবন্ধের লিঙ্গ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত" এই প্রবাদ সত্য না হইবার কারণ নাই, সুতরাং আরও পূর্ব্বে যে এই পূজার প্রচার ছিল, এ কথা অবাধে বলা যায়। ভারতবর্ষে দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছেন। পুরাণ হইতে তাহার নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় :—

১। সৌরাষ্ট্রে (বর্ত্তমান সুরাটে) সোমনাথ
২। কাশীতে বিশ্বনাথ
৩। শ্রীপর্ব্বতে মল্লিকার্জ্জুন
৪। উজ্জয়িনীতে মহাকাল
৫। কাবেরীনর্ম্মদাসঙ্গমে ওঁকারনাথ
৬। প্রজ্বলিকাতে বৈদ্যনাথ
৭। দারুকবনে নাগেশ্বর
৮। সহ্যপর্ব্বতে কেদারনাথ
৯। ইলাপুরে ঘৃষ্ণীশ্বর
১০। সেতুবন্ধে রামেশ্বর
১১। রাক্ষসরাজ্যে ভীমনাথ
১২। গৌতমীতটে ত্র্যম্বকনাথ

চীনদেশে ও রোমে শিবপূজার প্রসার ছিল। তাহার চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পর্য্যালোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতের প্রবাসী হিন্দুরা যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ঐ সকল লিঙ্গস্থাপনা করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজা জলৌকা কাশ্মীরে অনেকগুলি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই লিঙ্গগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের মতে লিঙ্গপূজার প্রসার বহুপূর্ব্ব হইতে হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানতীর্থ মক্কাতে প্রতিষ্ঠিত মক্কেশ্বরদেবের সময়-নির্ণয় অদ্যাপি হয় নাই।

লিঙ্গমূর্ত্তির উপাদান

লিঙ্গ নিম্নলিখিত দ্রব্য হইতে নির্ম্মিত হইতে পারে :—

মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময়, তাম্র, কাংস্য, কাষ্ঠ ও স্ফটিক। নর্ম্মদা পর্ব্বত হইতে নার্ম্মদলিঙ্গও হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পার্থিবলিঙ্গই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা। কারণ, নন্দিপুরাণে আছে যে—

"আয়ুষ্মান্ বলবান্ শ্রীমান্ পুত্রবান্ ধনবান্ সুখী।
বরমিষ্টং লভেল্লিঙ্গং পার্থিবং যঃ সমর্চ্চয়েৎ॥"

অর্থাৎ যদি তুমি দীর্ঘায়ুঃ, বলিষ্ঠ, পুত্রবান্, ধনবান্ ও সুখী হইতে চাও, তবে পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা কর। সকল অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে।

কল্পিত লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণে হইলে পূজা-যোগ্য নহে। অর্থাৎ অশীতিরতিপরিমাণ তত্তৎদ্রব্যঘটিত হওয়া চাই। ইহা ভিন্ন বাণাসুরের পূজিত লিঙ্গকে বাণলিঙ্গ বলে। তাহাও পূজার যোগ্য। তাহাতে আবাহন-বিসর্জ্জন নাই, কিন্তু পৃথক্ ধ্যান আছে। দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্য-পুরাণের প্রমাণ মতে পার্থিব-লিঙ্গের পূজা-পারপাটী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্বে বিবৃত করিয়াছেন।

শিবচতুর্দ্দশীতে সর্ব্ববর্ণ স্ত্রীপুরুষ অবিচারে ভারতবর্ষে শিবরাত্রিব্রত চালয়া আসিতেছে। উহাতে ভক্তের মনে যে ভাব উদিত হয়, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

সগুণ ব্রহ্মের এরূপ বিশ্বজনীন উপাসনা আর কোন মূর্ত্তিতেই দেখা যায় না। শিবপূজা তাহাদের আদর্শ।

শাক্ত-বৈষ্ণবাদিভেদে অনেক সাধনাধারা প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এই শিবপূজা সকল সম্প্রদায়ের কাছেই আদর পাইয়াছে। কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিবার মূলভিত্তি শিবপূজা। তাই অনুরূপ স্বামিলাভের আশায় বালিকার শিবপূজা। শিব উপাস্য বলিয়া, দ্বিজাতি উপনীত হইয়া ও শূদ্র জ্ঞান পাইয়া শিবপূজা করিয়া থাকেন। মুমূর্ষুর জীবনের আশায় আত্মীয়স্বজন মৃত্যুঞ্জয়শিব ও অপুত্রক ব্যক্তি বংশরক্ষার জন্য বীরেশ্বর শিবপূজা করিয়া থাকেন। পুরাণকার বলিয়াছেন—

"অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
মহেশার্চ্চনপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।"

অর্থাৎ শত রাজসূয়যজ্ঞ ও সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ একত্র করিলেও তাহাদের ফল শিবপূজাফলের ষোড়শাংশের যোগ্যও নহে।

সারদাতিলকতন্ত্রে শিবের ঈশান, বামদেব প্রভৃতি নানা মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভগীরথ শিবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার জটা হইতে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিষ পান করিয়া শিবই জগৎরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠদেশ বিষসংসর্গে নীলাভ হওয়ায় তদবধি তিনি "নীলকণ্ঠ" নামে খ্যাত হইয়াছেন। শিব জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাই ঋষি বলিয়াছেন:—

"জ্ঞানন্তু শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ।"

ইহারই সমর্থনকল্পে সূতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"দর্শয়িত্বা তথাভীষ্টং পূর্ব্বং দেবো মহেশ্বরঃ।
পশ্চাৎ পাকানুগুণ্যেন দদাতি জ্ঞানমুত্তমম্।"

অর্থাৎ ভক্তাধীন ভগবান্ শিব প্রথমে ভক্তের অভীষ্ট প্রদান করিয়া পরম জ্ঞান (মুক্তি) দেন।

তাহাই বিভূতিমৎসত্ত্ব মনীষিতম গঙ্গেশোপাধ্যায় দুই হাজার বৎসর আগে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র কুসুমাঞ্জলিতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"কারং কারমলৌকিকাদ্ভুতময়ং মায়াবশাৎ সংহরন্
হারং হারমপীন্দ্রজালমিব যঃ কুর্ব্বন্ জগৎ ক্রীড়তি।
তং দেবং নিরবগ্রহস্ফুরদভিধ্যানানুভাবং ভবং
বিশ্বাসৈকভুবং শিবং প্রতি নমন্ ভূয়াসমন্তেঽপি।"

অর্থাৎ যিনি অলৌকিক বিস্ময়নীয় জগৎপ্রপঞ্চ বারম্বার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন ও ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়াবশে বারম্বারই সংহার করিয়া ফেলিতেছেন, সেই অব্যাহত ধ্যানগম্য দেদীপ্যমান ও বিশ্বাসের একমাত্র স্থান ভগবান্ শিবকে যেন অন্তিমসময়েও নমস্কার করিয়া যাইতে পারি। শিব যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তাহাই ভক্তের বিশ্বাস, ধন্য মহাত্মারা—যাঁহারা শিবকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভক্তের বাক্য মহিম্নস্তবেও দেখা যায়।

অর্থাৎ "নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"—হে ভগবন্ শিব! জলের একমাত্র গন্তব্য স্থান সাগরের মত আপনিই একমাত্র জীবের আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার।

তাই সাধকও বলিয়াছেন:—

'অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়োঃ।'

হে দেব! তোমার মহিমা বাক্য-মনের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। উহা অবাঙ্মনসগোচর।

ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন:—

"যং বৈ বেদো বেদ নো নৈব বিষ্ণু-
র্নো বা বেধা নো মনো নৈব বাণী।
তং দেবেশং মাদৃশঃ কোঽল্পমেধা
যাথাত্ম্যেন বেত্ত্যহং বিশ্বনাথম্।"

অর্থাৎ যাঁহাকে বেদ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মন কেহই সম্যক্ জানিতে পারে না, মাদৃশ ক্ষুদ্রমতি জীব সেই দেবদেব বিশ্বনাথ শিবকে সম্যক্‌রূপে কেমনে জানিতে পারিব?

আপ্তকল্প মহাকবি কালিদাস তাই বলিয়াছেন—

"বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু নঃ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলেন, যিনি স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপিয়া আছেন, যাঁহাতেই ঈশ্বর এই সার্থক বর্ণপঠিত শব্দটি রহিয়াছে এবং মুমুক্ষুরা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া অন্তরে যাঁহাকে অন্বেষণ করেন, সেই ভক্তিবশ্য ভগবান্ শিব আমাদের মঙ্গলবিধান করুন।

হে পরমেশ্বর! পঞ্জর বদ্ধ থাকায় আমার সর্ব্বদাই অনুশোচনা আসিতেছে। তাই চরম প্রার্থনা, যেন আপনাতে আমার প্রেম সুদৃঢ় থাকে।

শিবপূজার প্রত্যক্ষ ফলের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত অনন্তকাল হইতে জগতে রহিয়াছে। আমার পিতামহ স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্নের শিবপূজা নাস্তিকের নয়নেও জল আনিয়া দিত। তাহার ফলে তাঁহার জীবদ্দশায় তদীয় পরিজনবর্গ, শিষ্য-স্বজনাদি কাহারই কোন বিশেষ দুঃখ ঘটে নাই।

তাই উপসংহারে ভক্তের বাণী পুনরুচ্চারণ করি:—

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেবস্তাদৃশায় নমো নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায়

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (মহামহোপাধ্যায়)।

চতুঃসূত্রী

সভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রকে চতুঃসূত্রী বলে।

যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিত, প্রলয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম।

উপনিষৎ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না, অর্থাৎ উপনিষদই ব্রহ্মের একমাত্র প্রতিপাদক। ব্রহ্ম-উপদেশই উপনিষদের আদি, অন্ত, মধ্য।

সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষ অপেক্ষা অন্য পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, কারণ, উহা অবিনশ্বর।

যে সে ব্রহ্মবিচার করিবে, ইহা ঠিক নহে। যাঁহার অন্তঃ-করণ নিতান্ত নির্ম্মল, তিনিই ব্রহ্মবিচার করিবেন।

চতুঃসূত্রীর ইহাই মর্ম্মার্থ।

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ১।

জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩।

তত্তু সমন্বয়াৎ। ৪।

এই চারিটি সূত্র।

১

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ১।

'অথ' শব্দের অর্থ অনন্তর। অনন্তর অর্থাৎ অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করিবে।

(১) বিবেক (২) বৈরাগ্য (৩) শমদম (৪) মুমুক্ষুত্ব, এই চারিটি যার আছে, সেই অধিকারী।

এইরূপ অধিকারী হইবার পর ব্রহ্ম বিচার করিবে।

যে অধিকারী নহে, তাহার বিচার করিয়া কোন ফল হইবে না।

'অতঃ' হেত্বর্থ কর্ম্মের ফল স্বর্গ। স্বর্গ নশ্বর। জ্ঞানের ফল মোক্ষ। মোক্ষ অবিনাশী। সেই হেতু ব্রহ্মবিচার করিবে।

'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। 'ব্রহ্ম' 'বৃহৎ' 'নিরতিশয়'। সেই ব্রহ্মকে (ব্রহ্মণঃ কর্ম্মে ষষ্ঠী) জানিতে ইচ্ছা করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম বিচার করিবে।

২

সেই ব্রহ্ম কিরূপ?

জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২।

'জন্মাদি' জন্ম স্থিতি ভঙ্গ "অস্য" জগতের। জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—'যতঃ' যাঁহা হইতে হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম।

৩

ব্রহ্মের প্রমাণ কি?

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩।

এক শাস্ত্র উপনিষৎই ব্রহ্মের 'যোনি' প্রমাণ। ব্রহ্মের অন্য পমাণ নাই।

৪

জৈমিনি বলেন, বেদে কেবল কর্ম্ম উপদেশ। কর্ম্ম ছাড়া ার যাহা উপদেশ, তাহা অনর্থক। সূত্রকার ভগবান্ ব্যাস ার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তত্তু সমন্বয়াৎ। ৪।

'তু' জৈমিনির সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। কারণ—'তৎ' ব্রহ্ম ন্বয়াৎ' সমন্বয় হেতু সর্ব্ব উপনিষদের তাৎপর্য্য বা পর্য্যবসান।

সমন্বয়।

উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও পত্তি এই ছয়টিকে সমন্বয় বলে।

এই ছয়টি লিঙ্গ দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। এই কয়টি লিঙ্গ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই উপনিষদের তাৎপর্য্য।

(১) উপক্রম—উপসংহার। প্রকরণের আদিতে এবং অন্তে যে বস্তুর নির্দ্দেশ করা হয়, সেইটি প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে, পিতা ভৃগু-পুত্র শ্বেত-কেতুকে প্রকরণের আদিতে 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ ত্রিবিধ ভেদশূন্য এবং প্রকরণের অন্তে 'এতৎ আত্মন্ ইদম্ সর্ব্বম্' সমস্ত আত্মময় বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

(২) অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করার নাম অভ্যাস। যে বস্তু পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই বস্তু প্রকরণের প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। উক্ত প্রপাঠকে নয়বার 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম শ্বেতকেতুকে বুঝান হই-য়াছে। ইহা দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

(৩) অপূর্ব্বতা। প্রতিপাদ্য বস্তু যদি অন্য প্রমাণের বিষয় না হয়, তাহা হইলেই সেই বস্তুর অপূর্ব্বতা সিদ্ধ হয় এবং সেই প্রমাণের তাহা প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

"তং তু ঔপনিষদং পৃচ্ছামি।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম মাত্র উপনিষদ্‌বেদ্য বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। অসংসারী আত্মার জ্ঞান ছাড়া অন্য যাহা কিছুর জ্ঞান সংস্কাররূপে জানা যায়। যেরূপ জাতমাত্রের স্তন্যপানাদির জ্ঞান সংস্কারবশে জাত হয়। সেইরূপ কর্ম্মের জ্ঞানও সংস্কারবশে জাত হয়। কিন্তু পরমাত্মজ্ঞান উপনিষৎ ও গুরু ছাড়া হয় না।

(৪) ফল। প্রকরণের অনুশীলনের ফল দ্বারা প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। মুক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল বলা হইয়াছে। 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসার অতিক্রম করেন। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম ভবতি' যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান। ইহা দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

(৫) অর্থবাদ। অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাবাক্য। যে বস্তুর প্রশংসা করা হয়, সেই বস্তুই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই উক্ত প্রপাঠকে প্রশংসা করা হইয়াছে। যথা—'যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্।' যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়। যাহা মত হইলে অমত বিষয় মত হয়, যাহা বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়। এই প্রশংসাবাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তাৎপর্য্য।

(৬) উপপত্তি। প্রতিপাদনের যোগ্য যুক্তিকে উপপত্তি বলে। যুক্তির সহায়ে প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। যথা—'একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং মৃত্তিকা এব সত্যম্।' একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ জানা যায়। ঘট শরাব মৃত্তিকামাত্র। বিকার কেবল বাক্য দ্বারা আরব্ধ হয়; উহা নামমাত্র। ঘট-শরাব বস্তুগত কোন পদার্থান্তর নহে, উহা মিথ্যা, মৃত্তিকাই

সত্য। এই যুক্তি দ্বারা বৈকারিক নিরাকৃত হইয়া ব্রহ্মের পারমার্থিকতা বুঝান হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, অদ্বিতীয় বস্তুই প্রতিপাদ্য।

উপরি-উক্ত কয়টি লিঙ্গ দ্বারা বুঝা যায়, শ্রুতিতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অদ্বৈত ব্রহ্মই বেদান্তের তাৎপর্য্য। অদ্বৈত মতই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন। অর্দ্ধশ্লোকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কোটি গ্রন্থের সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—

'ব্রহ্ম সত্যম্, জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্'
ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম।

শ্রীবিহারীলাল সরকার (বি, এল, সবজজ)।

কবি ওমর খৈয়াম

ওমর-খৈয়ামের জীবন-অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি আপন জীবদ্দশায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিলেও স্বদেশে কবিরূপে সম্মানিত ছিলেন না। পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি-বিবরণী-লেখক মহম্মদ আওফি তাঁহার "লুবাব-উল-আলবাব" গ্রন্থে ওমরের নামোল্লেখ করেন নাই। মহম্মদ আমহল্লা মুস্তওফি তাঁহার "তারিখ-ই-গুজিদাতে" ওমরের কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। দৌলত শাহ তাঁহার "তজকিরাতু-শোয়ারা" গ্রন্থে অপর কবির তুলনা প্রসঙ্গে ওমরের কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। ওমর সম্বন্ধে কোন বিবরণ এই গ্রন্থমধ্যে স্থান পায় নাই। লুতফ আলি বেগ তাঁহার "আতশকদা" গ্রন্থে কতকগুলি চতুষ্পদী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, ওমর সুবিখ্যাত হকিম (দার্শনিক) হইলেও কতকগুলি সুন্দর আরবী ও ফার্সী রুবাই রচনা করিয়া গিয়াছেন। ওমরের প্রিয় শিষ্য নিজামী অরুসী সমরকন্দী তাঁহার "চহার মকালা" গ্রন্থের প্রথম মকালা (প্রস্তাব) কবি-প্রসঙ্গে ওমরের নাম উল্লেখ করেন নাই। কেবলমাত্র ইমাম উদ্দিন খাতিব তাঁহার "করিদাত-ওল-আস্র" গ্রন্থে ওমরের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ওমর খৈয়ামকে খোরাসানের কবি-তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। সৈয়দ আলী বিন মহম্মদ অল-হুসেনী তাঁহার "বাজমারাই" নামক কবি-বিবরণীতে লিখিয়াছেন, ওমর খৈয়াম কতকগুলি অতি সুন্দর চতুষ্পদী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি নিজে শক্তি পরীক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য কাব্য-অনুশীলন করিতেন।

আমাদের মনে হয়, জ্ঞানচর্চ্চার অবসরে রচিত স্বল্পসংখ্যক চতুষ্পদী ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা স্বদেশে কবিযশ লাভ করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ইরাণে স্বল্পসংখ্যক কবিতা-রচয়িতারা কবি-তালিকাভুক্ত হইতেন না। ইরাণের অধিকাংশ কবিই এত অধিকসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার। তাঁহারা অধিকসংখ্যক শ্লোক-রচয়িতাকে কবির সম্মান দান করিতেন। এই কারণ ইরাণে পঞ্চাশ হাজারের অধিকসংখ্যক শ্লোক-রচয়িতা ফারদৌসী মহাকবিরূপে সম্মানিত। ইহা ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজ-অনুগ্রহে প্রতিপালিত রাজভক্তিকারক কবিগণ জনসাধারণের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইতেন; তাঁহাদিগের কবিত্ব কিম্বা রাজসম্মান জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা বলা কঠিন হইলেও আমরা উদাহরণস্বরূপ পারস্যের দ্বিতীয় কবি পয়গম্বর আন্ওয়রি যিনি প্রথম জীবনে বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাঁহার কবিরূপে অবতীর্ণ হইবার কথা উল্লেখ করিতে পারি।

ইরাণে রাজকবি—সুলতানের স্তুতিকারক অধিকতর সম্মানিত হইতেন। ওমর খৈয়াম রাজকবি ছিলেন না। তিনি রাজজ্যোতিষী (মুনাজ্জেম-ই-শাহী) ছিলেন। কবি হিসাবে সম্মান লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না। তাহার পর দেখা যায় যে, ইরাণের বিদ্বান্‌মাত্রেই কবিতা-রচনার প্রয়াস পাইতেন—কবিপ্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক। উদাহরণস্বরূপ ওমর-গুরু আবু নিসার নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ওমরের মত আবু নিসার কবিপ্রতিভাও পারস্যের জনসাধারণের চিত্তজয় করিতে পারে নাই—তাঁহার স্বল্প রচনাই ইহার জন্য একমাত্র দায়ী। বেকনের কবিতা সম্বন্ধে প্যালগ্রেভ বলিয়াছিলেন,—"A fine example of a peculiar class of poetry that written by thoughtful men who practices this art but little." আমাদের মনে হয়, ওমরের স্বদেশবাসিগণ ওমরের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে উপরি-উদ্ধৃত মত পোষণ করিতেন বলিয়া ওমরের কবিপ্রতিভা তাঁহাদিগের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

সে যাহাই হউক, স্বদেশে কবিরূপে সম্মানিত না হইলেও একমাত্র কবিপ্রতিভার জন্যই তাঁহার জগৎজোড়া খ্যাতি। একমাত্র কবিত্বশক্তিই প্রায় সহস্র বৎসরের কালতরঙ্গ ভেদ করিয়া কবি ওমরের স্মৃতি বিশ্বমানবচিত্তে অক্ষয়, অমর ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আজ আমরা এই প্রবন্ধে কবি ওমর সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ওমরকে অনেকে রোমীয় কবি দার্শনিক লুক্রেসিয়াসের সহিত এমনভাবে তুলনা করিয়াছেন যে, এতদুভয়ের মতামত ও ধ্যান-ধারণার অভিন্নতা একই প্রকারের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে যথার্থ কোনই মিল নাই। প্রথমে আমরা সেই কথারই আলোচনা করিব।

ওমর খৈয়াম ও লুক্রেসিয়াস্

ওমর খৈয়াম যে সব জিনিষ অতি সহজ ভাবেই স্বীকৃতবিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, লুক্রেসিয়াস তাঁহার মহাকাব্যে তাহার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের প্রথমতঃ দ্বিতীয় ভাগে তিনি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জগতের আদিম সৃষ্টির অথবা পরবর্ত্তী পরিচালনার মূলে কোনও প্রকৃত নায়ক ছিল না। অপর পক্ষে, ওমর খৈয়াম কখনও এ বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই যে, তিনি ভগবানের সৃষ্ট এবং তাঁহারই হস্তের ক্রীড়াপুত্তলী। লুক্রেসিয়াস আণবিক তথ্যের ধারাগুলিকে অন্তঃপ্রকৃতির ব্যাখ্যাকার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, দেহের বিনাশে আত্মাও বিনষ্ট হয়,—অপর পক্ষে অমরতার জন্য ওমরের ব্যাকুলতা এবং উহা প্রমাণ করিতে না পারার জন্য

মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ, এমন একটি মানসিক অবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, যাহা নাস্তিকতা হইতে অনেক বিভিন্ন প্রকৃতির। লুক্রেসিয়াস বলিয়াছেন যে, জগৎ নিজেও যেমন দেবী নহে, তেমনই আবার দৈবশক্তি-চালিতও নহে। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসেরই শত্রুতাচরণে লুক্রেসিয়াস এখানে কৃতসঙ্কল্প। ওমর খৈয়াম কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই জগতের অতি স্বাভাবিক পরিচালনায় দৃঢ়-বিশ্বাসী এবং একবারও এমন কোন প্রকার সংশয় প্রকাশ করেন নাই যে, মানুষের কোন নিয়ামক বা স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকিতেও পারে। এক কথায়, লুক্রেসিয়াস ধর্ম্মের এই দুইটি ভিত্তিভূমিকেই অস্বীকার করেন যে, জগতের এক জন নিয়ন্তা বিদ্যমান আছেন এবং আত্মার ভবিষ্য-জীবন আছে। অপর পক্ষে ওমর খৈয়াম এই যুগল ভিত্তির প্রথমটিকে সর্ব্বান্তঃকরণেই গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধেও একটি ক্ষীণ আশা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান উপভোগের প্রবণতায় উভয়েই মিত্রভাবাপন্ন বটে, তবে প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা নহে। লুক্রেসিয়াস দাবী করেন যে, তিনি সাধনার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। ওমরের আত্মশ্লাঘা এত দূর পৌঁছায় নাই। অনেকগুলি দিক্ আছে—যেখানে এতদুভয়ের মিল খুব ঘনিষ্ঠ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জীবনের মূল-কারণ, প্রকৃতির গতিপথ এবং মানবের সহিত ইহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে উভয়েই সমান উৎসুক; উভয়েরই দার্শনিকতায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের লড়াই সুস্পষ্ট; উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাপারগুলি অধ্যয়নে নিয়োজিত-চিত্ত এবং উভয়েই চিন্তাশীল জীবন বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু গুরু বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা ও বিশ্বাসের বিরোধগুলির তুলনায় এ সকল মিল বুঝি বা উল্লেখযোগ্যই নহে। কারণ, ওমর আর যাহাই হউন না কেন, নাস্তিক ছিলেন না। তিনি সত্যের এক জন সন্ধানী মাত্র; কিন্তু যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন বিশ্বাসকেই বুকে লইয়া। উহা সহজাত বিশ্বাস। তিনি ইহার মূল্য প্রমাণ করিতে না পারিলেও ঐ বিশ্বাস অল্প দৃঢ় নহে। এ বিশ্বাস এই যে, "ভগবান্ আছেন।" তাঁহার সমস্ত জীবনে এই বিশ্বাসটির মূল শিথিল হয় নাই। সময়ে সময়ে ভাবনার কূল-কিনারা না পাওয়ায় তিনি বলিয়াছেন বটে,—

"দেবতা আর মানুষ নিয়ে কাষ কি মাথা ঘুলিয়ে ফেলায়,
আস্‌ছে কালের দুর্ভাবনা ভাসিয়ে দে সব হাওয়ার ভেলায়;
ঘুরুক এবার অঙ্গুলি তার এলোকেশের নিবিড় বনে,
কাঁকালে যার সুরার কলস, সুধার পরশ অধর-বেলায়।"

তথাপি সুরা বা সাকী কখনও তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই,—ভগবান্‌ই তাঁহার দৃষ্টিতে অনাদি-অনন্ত ...কায় বাধা ঘটে নাই,—অথবা মানুষও আপন অস্তিত্বের ...া ভগবৎ-নির্ভরতা পরিহার করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে ...রের আগাগোড়াকার কথা—

"যাচ্ছে লিখে সচল কলম, পড়ছে ঝ'রে আখর-মালা;
বৃথাই যে তোর ধার্ম্মিকতা, জ্ঞান-গরবের মশাল জ্বালা;
পিছন হটে ঐ লেখনী কাটবে না আর একটি কথাও—
মুছতে আরে পারবে না তোর সাগর-প্রমাণ অশ্রু-ঢালা।"

বর্ত্তমান সর্ব্বস্বতার দার্শনিক যুক্তি

অদৃষ্টের উপর হস্তক্ষেপ করিবার উপায় অভাবে অসহিষ্ণু হইয়া ওমর মধ্যে মধ্যে যেন ও সকল চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেই চাহিয়াছেন। এমনই একটা লঘু মুহূর্ত্তে ওমর লিখিয়াছেন,—

"বায়েক যদি লভ সুরার পাত্র-অধর-পরশ-প্রীতি—
সকল 'নেতি'ই মহোল্লাসে উঠবে ব'লে—'ইতি' 'ইতি'!
তবেই দেখ যাবৎ-জীবন, ভবিষ্যতের 'নেতিই' আছে,
মধ্যে 'ইতি'র আস্বাদনে মূল্য-কমার নাইকো ভীতি।"

পরিহাস-গর্ভ হইলেও এই যুক্তিটির মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। "আমি যখন কিছুই না" তিনি বলেন—"তখন স্ফূর্ত্তি না করিব কেন? আমি কিছুই ছিলাম না—ভবিষ্যতেও কিছু থাকিব না, অতএব 'অতীতের আমি' বা 'ভবিষ্যতের আমি' হইতে 'বর্ত্তমানের আমি' মন্দ কিসে?" ভবিষ্যৎ তাঁহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে অন্ধকারে বিলীন থাকায়, বর্ত্তমানই তাহার তুলনায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ও দৌর্ব্বল্যের প্রতি ব্যঙ্গ ছাড়া ইহার মধ্যে আরও অনেক ইঙ্গিত আছে। ইস্‌লাম-একেশ্বরবাদ ও ধরা-বাঁধা কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সুফী মতবাদ অন্যতর প্রতিক্রিয়া হওয়ায়—বিশেষতঃ মহম্মদ-কর্ষিত ভূমিতে প্রাচীন বৈদান্তিক চিন্তার বা ব্রাহ্মণ্য 'ভূমা'-বাদেরই কলমের চারারূপে গজাইয়া উঠায়—দৃশ্যমান জগতের অলীকতা-বিষয়ক ধারণাটিকেও সুফী-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। "মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা"ই সুফী মতবাদের মধ্যে এই জগৎকে অনাত্মার উপর আত্মার প্রতিবিম্বরূপে দাঁড় করাইয়াছিল। ভগবান্‌ই সত্য, কিন্তু জগৎ অলীক—এই ছিল তখনকার বক্তব্য। 'ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু'র তাৎপর্য্য অপেক্ষা 'জগতের মায়াময়ত্ব'ই যেন শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে অধিকতর লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ওমর যদি নিজেকে বর্ত্তমানে 'কিছুই না' বলিয়া থাকেন, তবে সে উক্তি এক শ্রেণীর প্রচারক যাহা বলিতেন, তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র। এ মতে অতীতের বা জন্মের পূর্ব্বে তিনি (ভগবান্ না হওয়ায়?) কিছুই ছিলেন না—ভবিষ্যতে বা মৃত্যুর পরে কিছুই থাকিবেন না, আর জগতের অলীকতা-সম্বন্ধে উক্ত ভাবুকদিগের ধারণা যদি সত্য হয়, তবে জগতেরই অংশীভূত হওয়ায় বর্ত্তমানেও কিছুই নহেন। তিনি নিজেই যখন অলীক, তখন কাহারও আপত্তির কারণ না ঘটাইয়াই একটু আমোদ-প্রমোদের অলীকত্বও উৎপাদন করিতে পারেন। আপন অস্তিত্বের মত তাঁহার পানোৎসবের অস্তিত্বও অলীক; অতএব তিরস্কারেরও অযোগ্য।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে হয় পরিহাস, আর না হয় যুক্তি ও বিদ্রোহের তারে পর্য্যায়ক্রমে আঘাত করিয়া আসিতেই দেখিতেছি। এইবার এমন একটি বিভিন্ন পর্দ্দার পরিচয় লাভ করিব, যেখানে আশা ও সংশয় পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্য প্রবলবিক্রমে যুধ্যমান।

আত্মার অমরতা ও ওমর খৈয়াম

"অতল অপার গোলক মালার কক্ষ-ভ্রমণ-চক্রগুলির মাঝে,
চরমতম পানের লাগি' সবার তরেই পাত্র সে এক আছে;
আসবে যখন তোমার পালা, ফেলো না কো কলুষে-কাটা শ্বাস,
অসঙ্কোচে পান করো তায় সর্ব্বাবসান অনেক দূরে রাজে।

* * * *

"বঙ্গুবরে তুই হোস রে যদি ধূলোর পোষাক ছেড়ে ধূলোর' পর,
নীলাম্বরের মাঝখানেতে দাঁড়াবি এক আত্মা দিগম্বর,—
বসবি বিভুর সিংহাসনে! লজ্জা তবু হয় না কি রে তোর
হেথায় এসে ব'সে থাকায়, উচ্চে ধরে তুচ্ছ মেটে-ঘর?"

* * * *

"অন্য কিছু নয়কো খায়াম, তাঁবুই বটে শরীরখানা তোর,
নৈশ-বিরাম লভেন হেথা, বাদশাহ এক—চলার নেশায় ভোর;
শয্যা যখন ছাড়েন তিনি, মৃত্যু-নকীব ভাঙতে আসে তাঁবু—
নতুন ক'রে খাটায় আবার, বিরাম-সময় আসলে ফিরে ওঁর।"

এই কবিতাত্রয়ে ওমর এমন এক আলোকে দেখা দিয়াছেন, যাহা অন্য কোথাও লক্ষিত হয় নাই। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভগবদ্‌বিশ্বাসীর যে দুইটি প্রধান আশ্রয়, তন্মধ্যে প্রথমটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ওমরকে দৃঢ়ভাবেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এখানে স্পষ্টতঃই দেখিতেছি যে, বিশ্বাসের দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আত্মার অবিনশ্বরতায় তিনি আস্থাবান্।

ভাব-তন্ময়তার অনুরাগী না থাকিলেও, ঐ পদ্ধতিটি যে ওমরের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে ছাড়ে নাই, তাহার প্রমাণ—মধ্যে মধ্যে তিনি মানবধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা ও মানুষের ব্যক্তি-বিশেষত্বের প্রতি সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সে প্রবণতা সবলে পরিহার করিয়া ব্যক্তিবিশেষত্ব-স্বীকারের আবশ্যকতাই যেন তিনি উপলব্ধি করিতেছেন। আপন চেতনার ভিতর হইতেই যেন তিনি এই মহা সিদ্ধান্তটি মানিয়া লইয়াছেন—"আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।" সমস্ত পারিপার্শ্বিক মত ও বিশ্বাসের প্রভাব অতিক্রম করিয়া তিনি নিজেকে এখানে এক চিরন্তন ও আত্ম-সচেতন কর্ত্তারূপে জানিয়াছেন। জানিয়াছেন যে, এই আত্মাই—এই জীবে জীবে বিশেষ আত্মাই একীকরণ-মন্ত্রের মূল সূত্র এবং ইহারই অস্তিত্বের সহিত অবিনশ্বরতার রহস্য বিজড়িত।

অখণ্ডতার মধ্যে খণ্ড আত্মার নিমজ্জন-সম্ভাবনা ওমর বহু স্থলেই বিনা আপত্তিতে মানিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখানে সর্ব্বব্যাপী অখণ্ডতা হইতে তাঁহার আত্মা যেন পৃথক্—যেন বাদশাহের মতই কিছু দিনের জন্য ছোট ঘরে বাস করিলেও কোনও বৃহত্তর পরিণতির অভিমুখেই ধাবমান। সে পরিণতি যেমনই হউক, উহা যে একটা ভাবী জীবনেরই নির্দ্দেশক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেহ এখানে ব্যক্তি নহে,—মানুষটাকে (ওমরের ভাষায় তাঁবুকে) মৃত্যু আসিয়া উৎপাটন করিবে; কিন্তু তাহার ভিতরের বাদশাহ মৃত্যুর অধীন নহে—উহাই আত্মা।...এগুলি বিভিন্ন সময়ের রচনাই হউক বা কোনও বিশেষ মুহূর্ত্তেই বিরচিত হউক, প্রাচ্য বিশ্বাসের উচ্চতম স্তরকেই স্পর্শ করিয়াছে।

মৃত্যুর চরম-পানপাত্র আমাদিগকে, অসঙ্কোচে, দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—কেন? কারণ, উহাই 'সর্ব্বাবসান' নহে—উচ্চতর ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছে। দেহবন্ধন পরিহার করিয়া তাহা লাভ করা আবশ্যক। কিন্তু বস্তু ও আত্মার পৃথকরণ কি সম্ভব? সম্ভব নহে শুধু—ইহাই অপরিহার্য্য; দেহ (তাঁবু) মৃত্যুর অধীন, কিন্তু আত্মা (বাদশাহ) চির-গতিশীল।

কিন্তু ওমরের চতুষ্পদীতে ভাব-সামঞ্জস্য খুঁজিবার চেষ্টা করা বৃথা। রঙ্গরসিকতা তাঁহাকে ছাড়িয়া অধিকক্ষণ অনুপস্থিত থাকিতে পারে না—যেহেতু, গড়িয়া তুলা অপেক্ষা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী। তবে এটি খুবই সম্ভব যে, দার্শনিকতার ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলি অনেক স্থলেই রঙ্গদর্শনের জন্যই—অন্তরতম বিশ্বাসের অভিব্যক্তি নহে। এমন কি, দৃশ্যতঃ তাঁহার কাব্যের আকার ঐহিক-ভোগসুখপ্রধান মনে হইলেও উহা কবির অন্তরের প্রতিচ্ছবি কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়।

ভাব-মত্ততা ও সুরা-প্রমত্ততার ভেদাভেদ

"আছে কি নেই বিচার করা দার্শনিকের জ্ঞান-নিকষে,
সারাজীবন ভাসিয়ে দেওয়া বীজগণিতের সূত্রবশে,
ঢের হয়েছে এই জীবনে; পাইনি তবু এমন কিছু
মেলে না যা সব-ভোলানো, মন-মজানো দ্রাক্ষারসে।"

মূল কবিতাটিতে ওমর বলিয়াছেন যে, আত্মা ও অনাত্মার রহস্য তিনি উহাদের ব্যবহারিক ও যৌগিক উভয় অর্থেই পরখ করিয়াছেন; কিন্তু উহাদের উদ্দিষ্ট তন্ময়তার মধ্যে এমন কোনও উচ্চভাবের সন্ধান পান নাই, যাহা না কি সুরার ভাণ্ডারে নাই। ভাবের নেশাকে এইরূপে মদের নেশার তুল্যমূল্য করার উদ্দেশ্য একশ্রেণীর ভণ্ড-তপস্বীর প্রতিই কটাক্ষপাত করা। ওমর বলিতে চাহেন যে, ইহাদের লক্ষ্য মদ্যপের লক্ষ্য হইতে উন্নততর নহে, তবে ভাবের মাতাল ও মদের মাতাল বিভিন্ন পথে অচেতন অবস্থায় উপনীত হয়, এই যা প্রভেদ।

যে শান্তি কখনও আসে না, তাহার জন্য চির-অশান্ত আত্মার চরম আবেদন নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদীতে প্রকাশ পাইয়াছে :—

"মুক্ত কর আমায় প্রভু, 'বেশী' 'কমের' ধন্দ কর দূর;
ডুবাও আমায় তোমার মাঝে, তুমি-আমির দ্বন্দ্ব কর দূর;
বুদ্ধি আমায় ঘুরিয়ে মারে মন্দ-ভালর গোলক-ধাঁধায়—
সব চেতনা হরণ করি' সদসতের সন্দ কর দূর।"

ওমরের প্রকৃতি

এই সত্যান্বেষী সেই প্রকৃতির লোক—যিনি জীবনের সকল পথই পরখ করিয়া দেখিয়াছেন—জগতের উদ্বেগ ও উল্লাস, আশা ও নৈরাশ্যের সকল মর্ম্মই চরম করিয়া জানিয়াছেন—এবং জানিয়াও অবসাদ ও নৈরাশ্য-জনিত তিক্ততার সহিত এ সকলকে বিদ্রূপেরই সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। নিজের সমস্ত পাণ্ডিত্য, সমস্ত উত্তম নিয়োগ করিয়াও তিনি যাহা পাইলেন না, তাহা নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরই মত সহজভাবে পাইয়াছে বলিয়া যাহারা মর্য্যাদার দাবী করে, তাহাদিগকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করিতে কখনও তিনি

প্রাপ্তি অনুভব করেন নাই। তাহাদিগের ধারণা ও বিশ্বাস স্বভাবতঃই ন্যায় বা যুক্তির সর্ব্বপ্রকার সম্পর্করহিত, সুতরাং ওমরের নিকট সম্পূর্ণ মূল্যহীন। আপন বীজগণিতের ভূমিকায় স্পষ্টাক্ষরেই এই ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"আধুনিক কালে যাঁহারা পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মিথ্যাকে সত্যের ছদ্মবেশে সাজান এবং শিক্ষার অহঙ্কার ও অভিনয়ের গণ্ডী ছাড়িয়া কখনও এক-পা'ও অগ্রসর হন না, যৎসামান্য বিদ্যার পুঁজিকে নীচ স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত লাভালাভের জঘন্য ক্রীতদাস করিয়া তুলাই তাঁহাদের অভ্যাস। যদি এমন একটা লোক তাঁহাদের চোখে পড়ে, যে মুখোস পরিবার বা প্রতারণা চালাইবার চেষ্টাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়াই চলিতে চাহে, তবে তাহার উপর এই সমস্ত পণ্ডিতের ঘৃণার আর অন্ত থাকে না; এবং শরাঘাত-ক্ষত বক্ষে বহন করাই দাঁড়ায় সে বেচারীর ভাগ্যলিপি।"

আত্ম-সান্ত্বনা

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে ওমর নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছেন—

"জীবন তোমার মন্দ ব'লে কেন খায়াম দুঃখে মর?
অনুতাপে ফল কি শুনি? বরং কসে স্ফূর্ত্তি কর।
পাপী যে নয় বিভুর দয়ায় নেইকো তাহার কোনোই দাবী,
করুণা তো পাপীর তরেই, এই আশাতে জীবন ধর।"

এ আত্ম-প্রবোধ যেমন করুণ—তেমনই সুন্দর।

জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্বন্ধে ওমরের মতলব

জ্ঞানের বিষয়ে ওমরের শেষ কথা সংশয়বাদীরই কথা। তাঁহার মতে অজ্ঞেয়বাদ, অনিশ্চয়তা এবং চির সংশয়ই সকল প্রকার যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও মানব-জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হইয়া থাকিবে:—

"দেখছো খাসা জগৎ, তবু কিছুই-না-ও দেখছো যা'-সব;
বলছো যা' তা' অসার সবই, কিছুই নহে শুনছো যা'-সব;
বিশাল ধরার চতুঃসীমায় যা'-কিছু পাও, স্বপ্ন শুধু—
ফক্কিকারী,—রত্ন ভেবে যত্নে বুকে লুকাও যা'-সব।"

মানুষের বোধি ও বুদ্ধি যে সমস্ত ভাব ও যুক্তির জাল বুনিয়া চলে, আসলে তাহা অসার বাগ্‌বিন্যাস ছাড়া অন্য কিছুই নহে। সত্যের আবরণ উহা কোনওকালেই উন্মোচন করিতে পারিবে না। যত কিছু প্রচলিত বিশ্বাস, যাবতীয় প্রথা-পদ্ধতি, প্রত্যেকটি দ্বিধাশূন্য চিত্তে বর্জ্জন করা আবশ্যক—

"কেউ বা 'প্রথায়' সত্য খোঁজে, কেউ বা 'আচার-ব্যবহারে'
'জ্ঞান মুনির মত' ঘেঁটে কেউ, ভাবে যাচাই কর্ব্বে তারে;
ঘোমটা-খানির আড়াল থেকে এদের ডেকে বলছে বাণী—
'পথের আভাস নেই যে মূঢ়, এই দু'পথের কোনো ধারে'।"

* * * * *

"মন্দিরে বা মঠের মাঝে, মসজিদে বা শিক্ষাশালায়,
স্বর্গ-লোভ আর নরক-ভীতি, বক্ষে জাগে পালায় পালায়;
প্রাণের আলোয় ঝিঁঝির ঝিঁঝি উঠ্‌লে জলে জ্ঞানের মূলে,
অসার ও-সব গল্পকথা হৃদয় থেকে ছুটে পালায়।"

সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে যাহা সুনিশ্চিত, তাহা এই যে, ধর্ম্মমতমাত্রই অসত্য। ইহা সত্য নহে, বা সত্য হইতেও পারে না যে, মানুষ কোনও এক দ্যুলোক-বাসী খেয়ালী জগদীশ্বরের লীলা-উপভোগের জন্য গোড়া হইতেই বিভিন্ন ললাটলিপি লইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু কি জন্য আমাদের জীবনধারণ, কি জন্য আমরা সচেতন এবং কি জন্যই বা মনে করি, যে জড় ও শক্তির সমবায়ে একটি স্বপ্নময় অস্তিত্বের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য ফুটিয়া যাহা অনুভব করিতেছি, তাহার কারণ বুঝিতেও সমর্থ—এ সমস্যার নিরাকরণ সম্বন্ধে কবি কোনও সম্ভাব্য সমাধানের ইঙ্গিত করেন নাই। স্বর্গ নরক সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

"জল ঢেলে দে নরক-শিখায়, আগুন জ্বালা স্বর্গ জুড়ে!
সত্য যা' তা' এইটকু যে জীবনখানা চল্‌ছে উড়ে;
সত্য শুধু এইটকু, আর বাদবাকী সব নিছক মিছে
বারেক ফুটে মরে যে ফুল চিরকালের চিতায় পুড়ে।"

ভয় দেখাইয়া বা লুব্ধ করিয়া যে সকল জ্ঞানী ধর্ম্মাচরণের প্রবৃত্তি জাগাইয়াছেন, ওমরের দৃষ্টিতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের দৈন্য তিরস্কারযোগ্য। ওমর ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভূত পরিমাণেই প্রভাবান্বিত হওয়ায়, ভয় বা লোভকে কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের সহকারী শক্তি-হিসাবে সহ্য করা দূরে থাকুক, অবজ্ঞা করিতেই বাধ্য। জ্ঞানী কখনও স্বর্গ-কামনা করেন না, বা নরকের ভয়ও রাখেন না। শুধু ভারতীয় কেন, অন্যত্রও এ সত্য সমান গ্রাহ্য। জেরেমী টেলার কর্ত্তৃক বিবৃত এক আখ্যায়িকা হইতে এ বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্মরণযোগ্য:—

"সেণ্ট আইভো কোনও উপলক্ষে সেণ্ট লুইসের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া পথের মাঝখানে দেখিলেন যে, একটি বিষণ্ণ-গম্ভীর প্রৌঢ়া রমণী এক হাতে জলপাত্র ও অপর হস্তে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া চলিয়াছে। স্বাভাবিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আইভো তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; উত্তরে রমণী বলিল,—'আমার উদ্দেশ্য এই মশাল দিয়া স্বর্গকে দগ্ধ করা এবং এই জলের নিষেকে নরকের আগুন নিভাইয়া দেওয়া; এরূপ না করিলে মানুষ ভয় বা আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রীতির জন্যই তাঁহাকে নিষ্কামভাবে চাহিবে না'।"

"ব'লে গেছেন যে-সব-কথা দূর অতীতের তত্ত্ব-জ্ঞানী,
আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভক্তগণের আপ্ত-বাণী,
গল্প সবই—ঘুমের ফাঁকে সঙ্গী জনে গুছিয়ে-বলা,—
শেষকালেতে পড়ছে ঢুলে ঘুমটুকুকেই চরম মানি।"

মৃত্যুর রহস্য—মহা মহা মনীষী ও সাধুগণের যুগযুগান্তরের চেষ্টার বিরুদ্ধেও রহস্যই থাকিয়া গিয়াছে। দার্শনিক সমাধানই বল, আর ঋষিদের আপ্তবাক্যই বল, সমস্তই সমান মূল্যহীন এবং নিতান্তই রূপকথা। জগতের অন্ধকার-রাজির ভিতর হইতে কোনও নিরাপদ ও নিশ্চিত পথ বাহির করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া সকলেই নিজের নিজের গল্প গাঁথিয়া গিয়াছেন

এবং নিজেরাও ঐ মৃত্যুর অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সমাধান যে সত্য, এইটুকু বলিবার জন্য—মহা মহা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও—ফিরিয়া আশাটুকু পর্য্যন্ত সকলেরই সাধ্যাতীত।

ওমরের দুঃখবাদ

সংশয়বাদ ও জাতীয় চরিত্রের উৎসমুখ হইতে একটি বিষণ্ণ সুর সমুত্থিত হইয়া ওমরের সমস্ত রঙ্গ-রসিকতার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এইটি তাঁহার রুবাইয়াতের কেন্দ্রীয় সুর। কড়ি ও কোমল উভয় পর্দ্দাতেই এই দুঃখবাদ বাজিয়া উঠিয়াছে। বিপুল বিশাল ও বুদ্ধির অনধিগম্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে নিঃসঙ্গ মানবের অপরিসীম নিরাশার এক দিকে যেমন এই দুঃখবাদ অভিব্যক্ত—অপর দিকে আবার জীবনের শোক-তাপ-মৃত্যুর ভিতর দিয়াও উহা উচ্ছ্বসিত। একমাত্র সংশয়কে সঙ্গিরূপে লইয়া বিশ্বাসহীন মানবের জীবনধারণ যে কি হতাশাময়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদীটিতে স্পষ্টীভূত :—

"গির্জ্জা-ঘরের বৈরী আমি, মসজিদে মোর প্রবেশ মানা,
কোন্ মাটীতে জীবন-স্বামী গড়লে এমন বরাতখানা ?
গেরুয়া-বেছুট্ সন্ন্যাসী বা কুশ্রী বারনারীর মতন,
ভবিষ্যে মোর নেইকো আশা, বর্ত্তমানেও দুঃখ নানা।"

এই জাতীয় আর একটি রুবাই সফোক্লিসেরই বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়—

"যা' কিছু পাই আমরা সবাই দুঃখ-তাপের এই আগারে,
যখন সেটি শোকের দাহন, কিম্বা গাহন আঁখির ধারে,—
তখন শুধু তারাই সুখী, আস্‌তে যাদের হয় না হেথা ;
কিম্বা, যারা এসে আবার, সকাল সকাল সর্‌তে পারে।"

ওমরের প্রমোদ-প্রিয়তা

কিন্তু মানুষ সব সময়েই সন্তাপ ও বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। জীবন অন্ততঃ বিবিধ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর প্রমোদের উপকরণ সরবরাহ করিতে উদার-হস্ত। অতএব সুযোগ ঘটিলে তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং উহাদিগকে ব্যবহারে লাগাইয়া জীবনধারণ ব্যাপারটিকে যথাসম্ভব লঘু করিয়া তুলা অসম্ভব নহে। সুতরাং দুঃখবাদ "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" লোকায়তিক মতবাদে পরিণত হইয়া গেল এবং নৃত্য-গীতের মধ্যে তত্ত্ব-চিন্তার অবসাদ নিমজ্জিত করার আবশ্যকতাও দেখা দিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিচতুষ্টয় লক্ষ্য করিলে উক্ত বিবর্ত্তন স্পষ্ট হইবে :—

"মরুদেশের বাত্যা বা ঐ স্রোতস্বিনীর স্রোতের মত
এই জীবনের গোণা-দিবস ফুরিয়ে আসে অবিরত ;
আমল তবু দিইনে আমি মনের কোণে দুটো দিনে,—
যে দিনখানা আস্‌ছে এবং হয়ে গেছে যে দিন গত।

সংশয়রাজির ভিতর হইতেও কবি বলেন যে, আমাদের অনুভব করিবার যে শক্তি আছে, এইটুকুই আমাদের নিকট একমাত্র নিশ্চিত বস্তু। মানুষ মিথ্যা হইতে মিথ্যান্তরে যাত্রা করে, এ কথা যদি সত্য হয় হউক, কিন্তু শরীর সুস্থ ও মনের স্বাস্থ্য থাকিলে বেড়ার কোলের বুনো ফুলও তাহার চোখে সুন্দর হইয়া উঠে। একখানি সুন্দর মুখ, ওষ্ঠপ্রান্তের একটু টোল একটু প্রীতি-মধুর হাসি, মানবজীবনের বিবিধ ত্রুটির সহস্রগুণ ক্ষতিপূরণ। হয় ত বা অনুরাগও সর্ব্বশেষে, মনের ভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই দাঁড়াইবে না—তথাপি ইহাই আপাততঃ উত্তম ও সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং ইহা টেঁকসইও বটে। কাযেই—

"প্রাণ মন ঢালি, ভালবাসি খালি, গোলাপী-গণ্ড-দুটি ;
সুরার সঙ্গ সোহাগ হইতে হাতেরে দিইনে ছুটী ;
প্রতিটি অংশে করেছি নিয়োগ তার করণীয় কাযে,
প্রতি-অংশটি এক সমগ্রে যাবৎ না উঠে ফুটি।

আরিষ্টটল্ ও প্লেটোর দার্শনিক আত্মার বাণী উঠিয়াছে। 'প্রেম'সম্বন্ধে কবি অন্যত্র অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

"প্রেমের প্রতিমা কহিল একদা ভক্তেরে তার ডাকি'—
কেন আজ তুই আমার পূজারী, জানিস্, ভক্ত, তা কি ?
তোর নয়নের বাতায়ন-পথে যে-প্রাণ রয়েছে চাহি'
রঞ্জিত মোরে করিয়া গেছে সে নিজেরি আলোকে আঁকি।'

নির্ভীকতা ও নৈতিকতা

জীবনের পথে ওমর খৈয়াম বেপরোয়া পথিক, মৃত্যু ও নির্ব্বাণের প্রতি নির্ভীক তর্জ্জনীহেলন করিয়া জীবনের দান গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন; ওষ্ঠের প্রান্তে হাসিটুকু শেষ পর্য্যন্ত সজাগ। হৃদয়ের উদারতা, স্পষ্টবাদিতা এবং নিঃসঙ্কোচভঙ্গী তাঁহার রুবাই মাত্রকেই যেন বিশেষ একটি মর্য্যাদা দান করিয়াছে। জীবনযুদ্ধে ভগ্নোদ্যম সঙ্গীদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য সময়োপযোগী আশ্বাসবাণী তাঁহার রসনায় নিত্য জাগ্রত :—

"সকাল বেলায় শপথ করি—'রাত কাটাবো অনুতাপে,
পানশালাতে আর যাব না, থাক্‌বো না আর কোনোই পাপে।'
কিন্তু এ যে বসন্তকাল; কেমন ক'রে শপথ রাখি!
কেমন ক'রে কাঁদতে বসি, গোলাপ যখন হাস্তে কাঁপে!"

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহবাণী নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ওমরের উক্তি :—

"শক্তি যদি থাক্‌তো আমার খোদায় সুমন্ত্রণা দিতে,
আদেশ দিতাম, আকাশ এবং ভুবনখানা ঝেঁটিয়ে নিতে ;
গড়িয়ে নিতাম এমন জগত, থাকতো যেথায় সম্ভাবনা
পূর্ণ হওয়ার সব বাসনাই উপ্ত যা' এই মানব-চিতে।"

এক দিকে যেমন নির্ভীক পথিক, অপর দিকে মর্য্যাদা-বুদ্ধিতেও তিনি জগতের অপরাপর স্বাধীন চিন্তাশীলগণের সমকক্ষ। উন্নত মস্তকে যদি মানবসমাজে বিচরণ করিতে চাও, তবে ওমরের পরামর্শ :—

"দুঃখ কারেও দিও নাকো এই কথাটি রেখো স্মরণ
জেলো নাকো রোষের আগুন কর্‌তে কারো শান্তিহরণ ;
অন্যেরে না পীড়ন ক'রে পীড়ন ক'রো আপনাকেই
সাধ যদি রে চিরদিনের আনন্দেরেই কর্‌তে বরণ।

বরং ভাল প্রফুল্লতায় মাতিয়ে তোলা একটি প্রাণী,
নয়কো তবু রোপণ করা মরুর বুকে নগর আনি ;
হাজার হাজার বন্দীকে মুক্ত ক'রে দেওয়ার চেয়ে
একটি স্বাধীন প্রাণে বরং পরাও প্রেমের বাঁধনখানি।"

নৈতিক আদর্শেও মনীষী ওমর দরিদ্র ছিলেন না, তিনি না কি সকল দার্শনিকতার চুম্বকটুকুকে এই বলিয়াই মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন,—

"খাবার মত খানিক রুটী, মাথা গোঁজার একটু কুঁড়ে,
আছে যাহার, আনন্দ তার নৃত্য করুক হৃদয় জুড়ে।
চায় না যে জন দাস্য কারো, নয়কো নিজে কাহারো দাস,
তাহার সমান ভাগ্যখানি, কে পাবি বল্ জগত ঘুরে।"

শেষ-কথা

যে সকল চতুষ্পদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে আজ আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহা বহুশতাব্দী পূর্ব্বের বটে, তথাপি ইহার আধুনিকত্ব আজ পর্য্যন্ত অপরিম্লান। দেশদেশান্তরের শিক্ষিত সমাজে যে সকল সমস্যা চিরন্তন, মানব-প্রকৃতির ভিত্তিমূলে যে সকল বৃত্তি চিরনবীন, ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সে সকল চিন্তা মৃত্যুঞ্জয়ী, ওমরের রুবাইগুলি ইঙ্গিত ও সঙ্কেতের ভিতর তাহা ধরিয়া রাখিয়াছে। ওমর তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া মানব-সমাজের একটি বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন এই হিসাবে যে, ফার্দৌসী-প্রমুখ কবি-কুলের কাব্য সে যুগে যে প্রভুত্বের লোভ ও লড়াইয়ের প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ওমরের দার্শনিকতা-গর্ভ চতুষ্পদীগুলি তাহার গতিরোধ করে ও লোকের মনের ঝোঁক অন্য দিকেই ফিরাইয়া দেয়। অনেকের বিশ্বাস যে, ভারত-সম্রাট আকবরের ধর্ম্মমতের ঔদার্য্য বহুল পরিমাণে ওমরের রুবাইগুলির নিকট ঋণী। এটি অবশ্যই অনুমান-কথা, যেহেতু, ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে "আইন-ই-আকবরির" পাঠকমাত্রেই জানেন যে, ওমরের রুবাইগুলি আকবরের এত প্রিয় ছিল যে, তিনি হাফিজের একটি করিয়া কবিতা পাঠের পর ওমরের একটি করিয়া রুবাই পড়িবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন; কেন না, তাঁহার মতে, প্রথমের মাদকতা-পানের পর দ্বিতীয়ের অনুপান, রসের সঙ্গতি-রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

বঙ্গ-সাহিত্যে নবীনচন্দ্র

স্বদেশকবি নবীনচন্দ্র আধুনিক সাহিত্য-যুগের প্রথমার্দ্ধের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি এবং প্রকৃত জাতীয় কবি। আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের দেবতাদর্শ প্রভৃতির সঙ্কীর্ণতা এবং একদেশ[illegible]কে সকল দিক দিয়া পরিহার করিয়া অভিনব মানবীয় আদর্শ লাভ করিয়াছে। এই মানবীয় আদর্শই উনবিংশ শতাব্দীতে প[illegible] সাহিত্যের স্বরূপ, যেই লক্ষণে আক্রান্ত হইয়া প্রাচীন সা[illegible] মানুষের অন্তরাত্মাকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, সেই লক্ষণের আভিজাত্য ও কৌলীন্যকে সর্ব্বপ্রথমে দীনবন্ধু এবং বিশেষভাবে মধুসূদনই স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন প্রতিভা এবং প্রবৃত্তিকে মানবের রহস্যময় অন্তরের সন্ধানে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। অভিনিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ, মানুষের সত্য সৌন্দর্য্যময় বাস্তবজীবনের ইতিহাস প্রদান, অন্তরময় জাতীয়তার ভাবসৃষ্টি এবং অন্তরের ভাব-প্রকাশের ঋজুতা বা সহজ পদ্ধতি। প্রাচীন সাহিত্য-লক্ষণের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও কবিকঙ্কণ অনেক দিক দিয়া এই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণত্রয়কে অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তির অমর স্মারক 'চণ্ডী' রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্যও প্রেমের বৈচিত্র্য এবং প্রকৃষ্ট ভাবের পরিচয় দিতে গিয়া আধুনিক সাহিত্যের অনেক লক্ষণে গৌরবময় হইয়া এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যরসদানে বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। প্রাচীন সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের সন্ধিস্থলে কবি দীনবন্ধু তাঁহার নবীন প্রতিভার আলোকপাত করিলেন। তাঁহার ভিতরেও যে প্রাচীনতার আভাস একবারে দুষ্প্রাপ্য, তাহা নহে। তবে আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণও তাঁহার কাব্যে সুস্পষ্ট। মধুসূদন আধুনিক সাহিত্যের জন্মগুরু, আবার তিনি আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণের স্রষ্টা ও আদি-পুরোহিত হইলেও তিনি এবং হেমচন্দ্র উভয়েই ভারতীয় আদর্শের সহিত বিদেশীয় সাহিত্য প্রভৃতির আদর্শের যথাযোগ্য সংমিশ্রণ করিয়া বাঙ্গালীকে অপূর্ব্ব সাহিত্যরসের সন্ধান দিয়াছেন। বাঙ্গালীর চিরন্তন ধর্ম্মপ্রাণতা এবং হৃদয়ের সরল 'জংলা সুর' বিজাতীয় ভাবের মিশ্রণ হেতু মধু-হেমের অর্গ্যানে বা ভেরীতে সাধারণ বাঙ্গালী শুনিতে পায় নাই। কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালার ধর্ম্ম এবং সমাজ এতই বিক্ষিপ্ত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাঙ্গালীকে নিজস্ব জাতীয়তা শিক্ষা দিবার জন্য এক জন হাসি-কান্নামিশ্রিত স্বভাবকবির প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সঙ্কটকালে বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের নবীনচন্দ্র তাঁহার কল্যাণময় বাণী প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইলেন, নবীনচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হইল। তাঁহার জাতীয়তা খাঁটি স্বদেশী, উহা বিদেশের আমদানী বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আসরে মধু, বঙ্কিম, হেম ও নবীন প্রায় এক সময়েই দুর্দ্দমনীয় প্রতিভার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। কাব্যক্ষেত্রে অভিনব পথিপ্রদর্শক মধুসূদনের প্রতিভা এবং দান অপ্রতিদ্বন্দী হইলেও এবং তিনি কোন কোন দিক্ দিয়া দেশীয় আদর্শের অনুসারক হইয়াও তিনি জাতীয়তার ও খাঁটি স্বাদেশিকতার চিত্র আঁকিয়া দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি কাব্যরসের জন্যই 'মধুচক্রের' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দেশের কল্যাণের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন কমই। জাতীয়তা এবং দেশানুরাগ হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইলেও তাহা যেন 'ক্লাসিক কালোয়াত' এবং তাহা নিখুঁত দেশীয় আদর্শও নহে, মানুষের সহজ প্রাণ তাহাকে সহজে গ্রহণ করিতে পারে নাই। মধু এবং হেম যে শক্তি, উচ্ছ্বাস এবং কল্পনার অলৌকিকতা

লইয়া বাঙ্গালার প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের সর্ব্ববিধ সাধারণ্যে লোকায়ত হইতে পারে নাই ; কারণ, উহা বিদেশীয় প্রভাব ও উচ্চ আভিজাত্যের দরুণ ভারতের মর্ম্মস্থান চিনিয়া লইতে পারে নাই।

কাব্যক্ষেত্রে ইঁহাদের পরস্তুরেই নবীনচন্দ্রের প্রতিভার উদ্দাম লীলা। তিনি মধু-হেমের সহযোগী হইয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। মধু-হেম স্বীয় আদর্শের পোষকতার জন্ত যে অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানবের সত্য-সুন্দর আদর্শে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি তাহা সর্ব্বতোভাবে শুধু লোকশিক্ষাদানের জন্ত পরিহার করিলেন। নবীনচন্দ্রের প্রতিভার বিশেষত্ব তাঁহার জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণে এবং বলা বাহুল্য, এই জাতীয়তার আদর্শ বিশেষভাবে মানবধর্ম্মের মধ্যেই পর্য্যবসিত। মানবধর্ম্মের বিকাশ না ঘটিলে জাতি ও দেশের অন্তরকে উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতা হয় না। জগতের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে মানব-ধর্ম্মের উদ্দীপনা এবং বিকাশই লক্ষিত হইতেছে, দেশ-ধর্ম্ম এবং দেশ-প্রীতির চিত্র আঁকিতে গিয়া বিদেশীয় আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন নাই।

অনেকে নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া Byronএর সহিত তাঁহার উপমা দিয়া থাকেন। তাঁহার প্রথম বয়সের কাব্যের আবেগময় উচ্ছ্বাস, অবারিত স্বাধীনতা ও প্রতিভার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি হিসাবে নবীনচন্দ্রকে কতকাংশে বায়রণের সহধর্ম্মী বলা যাইতে পারে ; কিন্তু পরিণত বয়সে অর্থাৎ ধর্ম্মভাবমুখীন কাব্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনি বায়রণীয় দোষ বা গুণ পরিহার করিয়া প্রতিভাকে স্থির ও সংযত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র অধ্যয়নশীল পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি বায়রণের দুইটি-মাত্র কাব্য পড়িয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই দুইটি কাব্যই যে নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তাহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নহে। পাশ্চাত্য সাহিত্য ত দূরের কথা, তিনি আমাদের স্বদেশজ সংস্কৃত সাহিত্যেরও ধৈর্য্যশীল অধ্যেতা ছিলেন না। "রঙ্গমতী"র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্যের ভিতর অসম্বৃত প্রতিভার প্রদীপ্ত উচ্ছ্বাস এবং একটা ধ্বংসশীল জ্বালাময়ী উদ্দীপনা বায়রণীয় প্রতিভাকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ঐ জাতীয় দোষগুণ হইতে নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার বায়রণ বলা হয়। বস্তুতঃ নবীনচন্দ্রের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের পরিমাণ নির্ভয়ে নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁহার প্রথম জীবনের বায়রণীয় ধর্ম্ম হয় ত ঘটনাক্রমে ঘটিয়াছে, তিনি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বায়রণের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা অনুমান করিবার কোন কারণ বোধ করি নাই।

কাব্যের মধ্যে নিখুঁত দেশানুরাগের চিত্রাঙ্কনই নবীনচন্দ্রের প্রতিভার একটি বিশেষত্ব। আবার দেশপ্রীতির যে অটল প্রতিষ্ঠা, তাহা নিছক কল্পনা এবং কবিত্বের উপর ভিত্তি লাভ করিতে পারে না। প্রবল ধর্ম্মাস্থতার উপরে যে প্রীতির বা অনুরাগের প্রতিষ্ঠা, তাহাই অমর এবং সর্ব্বদিক্ দিয়া কর্ম্মক্ষম। তাই সেই ধর্ম্মসাধনা আর্য্যজাতির চিত্তকে আবহমান কাল নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। সেই ধর্ম্ম-সাধনার দিকে অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন ভারত এবং সনাতন আর্য্য বা হিন্দু-ধর্ম্মের আদর্শের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উহার পুনরভ্যুত্থানের চিন্তায় নবীনচন্দ্র বিভোর হইয়াছিলেন এবং দেশকে ধর্ম্মের দিক দিয়া জাগ্রত করিবার জন্তই তিনি অতিমানব বা অতিকল্পিত ঘটনাকে অনেক স্থলে পরিহার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও "বঙ্গদর্শনে" শেষ বয়সের কথা-সাহিত্যে এবং ধর্ম্মতত্ত্বে ভাগবত-ধর্ম্ম ও ভক্তি-আদর্শের চিত্র আঁকিয়া সাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন অন্ধগুহা হইতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উঁহাকে উজ্জ্বলতর করিয়া মানুষের সুপ্ত ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু-আদর্শের অভ্যুত্থান বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সমধর্ম্মী। তাঁহারা প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক ভিত্তির উপরেই হিন্দু দেবতা, মহাত্মাদিগের জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র পরিশেষে 'এক ধর্ম্ম এক জাতি' গঠনের প্রয়াসী হইয়াই অলৌকিক ঘটনাকে পরিহার করিয়া ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং দেবতা-কাহিনী ত্যাগ করিয়া বিচিত্র কল্পনা ও ভাবের সমাবেশে 'অমিতাভে' 'খৃষ্টে', এমন কি, ভাগবতের ব্যাখ্যায় পর্য্যন্ত তিনি মানবত্বের ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবাত্মার মধ্যে যে দেবত্ব, তাহাই স্বাভাবিকভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের গুরু হইয়া দাঁড়ায়। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, নবীনচন্দ্র খৃষ্টের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেও তিনি খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিপক্ষে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের কবি।

প্রকৃত কবি-প্রতিভা জাগ্রত হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরক্ত হয়, আত্মবোধের মধ্য দিয়া সাহিত্যবীরের দেশানুরাগ জন্মে, জাগ্রত দেশের প্রীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতির প্রতি সহৃদয় সহানুভূতি অথবা নিপীড়িত ও অধঃপতিত জাতির জন্ত বেদনা সাহিত্যিককে দেশের চিত্রাঙ্কনে প্রবুদ্ধ করে, আপনার প্রতি যাহা প্রীতি, তাহাই ভাবের ঔদার্য্যে সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া দেশানুরাগে পরিণত হয়। আমরা দেখি, বঙ্কিমের নবজাগ্রত প্রতিভাও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই "মৃণালিনীর" মধ্য দিয়া দেশানুরাগের প্রস্ফুট চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কবি হেমচন্দ্রও কবি-প্রতিভায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রথমেই "চিন্তা-তরঙ্গিণীর" মধ্যে দেশের ও সমাজের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া নিষ্ফল রোদন করিয়াছিলেন এবং বীরবাহুর কল্পিত-দেশরক্ষা চিত্র আঁকিয়া খেদ মিটাইয়াছিলেন। দেশভক্ত কবি নবীনচন্দ্রও কবি-প্রতিভার এই স্বভাব-রীতি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। তাঁহার দেশানুরাগে যথেষ্ট বিশিষ্টতা এবং মৌলিকতা আছে। শুধু প্রতিভার জাগরণের প্রথম অবস্থাতে নহে, তাঁহার জীবনের সর্ব্বত্রই তিনি স্বদেশকে এবং স্বসমাজকে উন্নত করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই বাঙ্গালী কবির জাতীয় প্রতিভা এবং জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য। অকৃত্রিম দেশভক্তি এবং 'এক ধর্ম্ম এক জাতি' প্রতিষ্ঠার জ্বালাময়ী বাসনায় উদ্দীপ্ত নবীন-প্রতিভা কল্পনারাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াও সাধারণ-অভিকাঙ্ক্ষিত অলৌকিকতা ও উদ্ভট অতি কল্পনালীলাকে যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রাচীন কাহিনীর বাস্তবতাক্ষেত্রকে নিতান্ত অভিনবত্বে সিক্ত করিয়া স্বদেশী বীর্য্য শাস্ত মত্তাকে তিনি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ইতিহাসের

বাস্তব ঘটনাকে টানিয়া আনিয়া জনসাধারণের স্বাভাবিক দেশানুরাগকে উদ্দীপিত করিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক ঘটনার উপস্থাপন যেন অনেকটা কাল্পনিক ও ভাবপ্রবণ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তাঁহার প্রতিভার প্রথম দান "পলাশীর যুদ্ধের" মধ্যেই তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং অধঃপতিতের জন্য তীব্র বেদনা বিশেষভাবে প্রকটিত। নবাব সিরাজের জীবন নাট্যের যবনিকা-পতন অথবা চতুর বীর ক্লাইভের বীরপণা নবীনচন্দ্রের উন্নত প্রতিভাকে আকৃষ্ট করে নাই, পরন্তু বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা ও মানসিক হীনতা দর্শনে এবং দুর্লভ রত্ন হারাইবার দরুণ কবির অন্তর্দাহ বা ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বাষ্পোচ্ছ্বাসই এই কাব্যের মর্ম্মকথা। এই কাব্যে মোহনলালের ভিতর আমরা কবির আত্মার পরিচয় পাইতেছি। বাঙ্গালার শেষ দিনে মোহনলালের যে অন্তর্ভেদী ক্রন্দন, নিষ্ফল উত্তেজনা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী, তাহা যেন কবির অন্তরের কথা বলিয়াই মনে হয়। কবির অন্তরের ক্রন্দন মোহনলালের বাণীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কবির অপরিণত বয়সের এই দেশপ্রেমোচ্ছ্বাস অনেক কবির কল্পনারও অতীত।

দেশানুরাগের আদর্শের কথা বাদ দিলে কাব্যহিসাবেও এখন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় "পলাশীর যুদ্ধের" আবির্ভাব হয় নাই। কল্পনার সংযত লীলায়, ছন্দের মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও সংযমে, ভাষার লীলাচাঞ্চল্যে ও গতির দ্রুততায়, বাঙ্গালীর মর্ম্মকথার প্রকাশে, সর্ব্বোপরি কবির স্বাধীনতায় ও সরলতায় বাঙ্গালার হৃদয় এতই আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, "পলাশীর যুদ্ধের" অনেক পদবিশেষ বাঙ্গালীর নিত্য-ব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইখানে তিনি যে পরিপূর্ণ কাব্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সংরক্ষণ তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে আর ঘটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাব্যের ও আর্টের দিক্ দিয়া যে সংযমের বশে তিনি "পলাশীর যুদ্ধের" সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় ও অনতিক্রম্য।

নবীনচন্দ্রের জাতীয় প্রতিভার ও দেশপ্রীতির দ্বিতীয় চিত্র "রঙ্গমতী।" জন্মভূমির প্রতি তাঁহার তীব্র আকর্ষণ এই কাব্যের ঘটনাক্ষেত্রকে চট্টগ্রামে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি আমরণ তাঁহার "সরিৎমালিনী শৈলকিরীটিনী চট্টলাকে" প্রাণপণে ভালবাসিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্টতায় তিনি শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন, "রঙ্গমতীর" দেশভক্ত এবং দেশদৈন্যে জর্জ্জরিতপ্রাণ 'নায়ক' স্বয়ং নবীনচন্দ্রই। তিনি জন্মভূমির সত্যময় সৌন্দর্য্যে বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া স্বাধীনভাবে কল্পিত স্বাধীনতা-প্রয়াসের সঙ্গীত করিয়াছেন এবং দেশমাতার চরণতলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। তাঁহার এই কল্যাণ-কামনা শুধু স্বাধীনতায় উচ্চকিত নহে, কল্পনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেশের অধ্যাত্মভাবকে জাগাইয়া তুলিয়া একটা বিরাট জাতি গড়িবার অভিলাষকে তিনি "রঙ্গমতীতেও" প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের স্বদেশী ভাবপ্রবণতাকে তিনি উদার ও বিচিত্র কল্পনা-জল্পনার অবাধ গতিতে প্রকাশ করিয়াছেন, বাহিরের কোন বাধা-বিঘ্নকে লক্ষ্য করেন নাই। এই কাব্যে নায়ক দেশের অযোগ্যতা ও সঙ্কীর্ণতায় হতাশ্বাস হইয়া "চিন্তা-তরঙ্গিণীর" নায়কের মত অকারণ আত্মবিসর্জ্জন দিয়া দুশ্চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহে নাই, বরং সাফল্য-লাভের প্রবল চেষ্টার্জ্জনই নবীনচন্দ্রের জাতীয় প্রতিভার একটি বিশেষত্ব। তিনি ধ্বংসশীল নহেন বরং সর্ব্বদিক্ দিয়া গঠনপ্রয়াসী; "রঙ্গমতীতে" কবির দেশের প্রতি তীব্র দৃষ্টি এবং নীরব ক্রন্দনের ভাবটাই যেন শেষ দিকে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কাব্যে কবি বিশেষ আত্মহৃদয় দান করিতে পারিয়াছেন। হৃদয়ের এই অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস কাব্যশাস্ত্রের বিধান এবং ছন্দের বন্ধনকে অনেক স্থলে লঙ্ঘন করিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। নবীনচন্দ্রের আত্মপ্রকৃতিও ইহাই; তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা ও উদ্দীপনা এত অধিক ছিল যে, তিনি কাব্যকলার প্রতি সতর্ক এবং সংযত দৃষ্টি স্থাপন করিতে পারেন নাই; অধিকন্তু অমিত্রাক্ষরের মধ্যে আসিলে নবীনচন্দ্র একবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিয়ম-বন্ধন ভাঙ্গিয়া চলিতেন।

কিন্তু দেশের অবনতির ও অক্ষমতার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন এবং শুধু কল্পনার সাহায্যে একজাতি গঠনের প্রয়াস মানুষের পতিত ও দুর্ব্বল আত্মাকে প্রথমে এবং সহজে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না, অধিকন্তু ঐ ভাবধারা কর্ম্মক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না, ইহা পরিণতবয়স্ক কবির দেশভক্তির শেষ পরিণতিও হইতে পারে না। দেশের অন্তরে ভগবানের অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিয়া, ভগবদ্ভক্তির আনন্দময় স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেশকে নীতির দিক্ দিয়া উন্নীত ও ধর্ম্মপ্রাণ করিবার যে আকুল প্রয়াস, তাহাই কবির স্বদেশধর্ম্ম। মানুষের অন্তর্জ্জীবনের সুনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাচীন-ধর্ম্মের বিধানকে ও মানবধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে নূতন এবং যুগোচিত ভাবে প্রবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীকে প্রকৃত মানবধর্ম্ম শিক্ষাদানের কল্পনাই নবীনচন্দ্রের পরিণত প্রতিভাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। স্বদেশের ও স্বজাতির 'এক ধর্ম্মের ও এক জাতির' চিত্র কল্পনার চোখের উপর রাখিয়াই তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শকে গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির ও কর্ম্মশক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই অভাবনীয় চিন্তার অপূর্ব্ব ফল 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস'। তাঁহার এই কাব্যত্রয় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আদর্শ এবং ঘটনা টানিয়া আনিলেও উহারা আধুনিক রুচি, প্রয়োজন এবং ভাবের দ্বারা এমনই সুসমঞ্জস ও সুমার্জ্জিত হইয়াছে যে, সাধারণে চিরদিন উহারা অভিনব সৃষ্টি আদর্শরূপে সমাদৃত হইবে। এই আধুনিক ছাঁচের গড়া কর্ম্মগীতি আধুনিক জনহৃদয়কে ছন্দবীণার মধুর নিক্কণে অবাধে জয় করিতে পারিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃত কবিমাত্রেই বৈষ্ণবভাবের ভাবুক। সহজ সরল ও করুণ হৃদয়ের আকুল প্রেম বৈষ্ণব ভাবের প্রাণ। তাহাই যে কবি-হৃদয়ের স্বভাবতঃ অপরিহার্য্য অঙ্গ ও ঐশ্বর্য্য, তাহা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। নবীনচন্দ্রও কাব্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মতঃ বৈষ্ণবরীতির অনুসারক। তিনি 'সোহহং'এর শিষ্য হইয়াও 'রাগানুরাগের' প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই এবং কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ দ্বৈতভাবের উপাসক হইয়াছেন। বৈষ্ণব-প্রেমকেই ভগবদ্ভক্তির আদর্শ করিয়া তিনি দেশভক্তির পন্থা নিষ্কণ্টক করিবার জন্য অন্ধগুহা হইতে প্রেমময় ও কর্ম্মময় শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধার করত কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন। কবির

পক্ষে এই বৈষ্ণবের রাজাকে হৃদয়রাজ করা কিছুতেই অসঙ্গত নহে।

কবি নবীনের মধ্যে বীরধর্ম্ম প্রবল ছিল এবং সেই জন্য বীরত্বের প্রেমময় কর্ম্মাবতার শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যলীলাই তাঁহার কাব্যত্রয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও ভক্তিবুদ্ধিকে সুস্থির করিবার অভিলাষে, অধিকন্তু দেশের মহাবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া দেশপ্রাণতায় উদ্‌বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কবি প্রাচীন কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণবাণীকে আধুনিকতার মোহন তুলিতে মোহময় ও উপযোগী করিয়া কাব্যত্রয়ে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের কৃষ্ণ এবং 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের' কৃষ্ণের মধ্যে যুগ-হিসাবে অনেক বিভিন্নতার সৃষ্টি করা হইয়াছে। কল্পনাপ্রবণ নবীনচন্দ্র অনেক স্থলে কল্পনার জোরেই শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিজের ভাবে আঁকিয়াছেন। তিনি ভক্তির যে আদর্শ ও পন্থার চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভগবদ্‌-গীতা হইতে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া চৈতন্যযুগের আকুল উন্মাদনাময় প্রেমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রেম-ভক্তি-উচ্ছ্বাসের মূলকেন্দ্র বৃন্দাবনের সপ্তর্ষি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল এবং তাহাতে যে চৈতন্যপ্রেমের কাহিনী ভক্তি-অশ্রুতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার আভাসই নবীনচন্দ্রের ভক্তিতত্ত্বে ও প্রেমতত্ত্বে দেখিতে পাই। এই ভক্তিতত্ত্বমূলক কাব্যত্রয় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, সমগ্র বঙ্গ ব্যাপিয়া চৈতন্যজীবনের অসাধারণ প্রচার এবং দেশময় ভক্তি-কীর্ত্তনের সুফল। বলা বাহুল্য, ইহাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে বিদেশী চরিত্রের ছায়া অপ্রত্যক্ষভাবে পড়িলেও তাহা হিন্দুর ধর্ম্মকথায় আত্মস্থ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের কোন কোন অংশের সহিত বিদেশী কবিগণের চিত্রের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইলেও উহা যে একান্তই বিদেশী ছায়ার অন্তর্গত, তাহা স্বীকার করা, বোধ হয়, সঙ্গত হইবে না; অধিকন্তু ভারতীয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের মধ্যে বিদেশীয় চিত্রের কথা কবির বা পাঠকের স্মরণ হওয়াও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

"রৈবতকের" শ্রীকৃষ্ণ যেন তথাকথিত বালচাপল্য ও কৌতুকপ্রিয়তা অনেক স্থলে পরিহার করিয়া অনেকটা স্থির, সংযত ও ঐশ্বরিক মহিমায় গরিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন এবং এই স্থিরতাই যেন যৌবনে "কুরুক্ষেত্রে" নিজকে কর্ম্মময় করিয়া দেশকে কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছেন। এইখানে 'রৈবতক' হইতে 'কুরুক্ষেত্রে' প্রয়াণের যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি-সূত্র, তাহা অতুলনীয়। তাহার পর কর্ম্মলীলার অবসানে "প্রভাসের কল্পনা," এখানে মাধুর্য্যময় প্রেম, বৈষ্ণবের মাধুর্য্যরস। চৈতন্যলীলার যাহা মূলমন্ত্র, তাহারই চিত্র "প্রভাসের" উৎসবে, এমন কি, "মহাপ্রস্থানে" পর্য্যন্ত। 'শৈল-সুভদ্রার' ত কথাই নাই; 'কারুর' শক্রতাচরণের মধ্যেও অবসানের ক্রোড়ে সেই মাধুর্য্যরসময় চৈতন্য-জীবনের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে। "প্রভাস" সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য-জীবন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমময় পরাকাষ্ঠা।

আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, নবীনচন্দ্রের কোন কাব্য আত্মসম্পর্কশূন্য নহে। তিনি শুধু নিজের ভাবকে পরের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া, তাহাদিগকে তাঁহার সহিত হাসাইয়া কাঁদাইয়া নিরস্ত নহেন, বরং প্রায় প্রতি কাব্যের ভিতর তাঁহার আত্মজীবনের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক রাখিয়াছেন; অথবা আত্মীয়-স্বজনের একটি নামের হইলেও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার হৃদয়ের অকৃত্রিম সরলতা এবং কাব্যকে আপন জীবন হইতে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার অভিলাষ।

উক্ত কাব্যত্রয়ে কবির ভক্তি-আদর্শ ও কর্ম্ম-আদর্শের অবসান নহে; বুদ্ধ, চৈতন্য এবং খৃষ্টকে অবতারশ্রেণী হইতে মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে আনিয়া তিনি তাঁহাদের পূজা করিয়াছেন। মানুষের মধ্যে যে দেবতা, সে-ই পূজ্য, দেবতার মধ্যে দেবত্ব ত স্বাভাবিক এবং ঐ দেবত্ব মানুষকে বিস্ময়ের সহিত পুলকিত করিয়া সহজে কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে না; মানুষের মহত্ত্ব দেখিয়া তাহাকে মানুষের আসন হইতে তুলিয়া লইয়া যদি দেবতার শ্রেণীতে বসান হয়, তবে মানবত্বেরই অবমাননা করা হয়। মানুষের মধ্য হইতে দেবতা বাছিয়া লইয়া মানুষ হিসাবেই তিনি দেশের কাছে আদর্শ খাড়া করিয়াছেন। ইহা শুধু মহতের পূজা নহে, দেশকে আদর্শপথে চালিত করিবার প্রয়াস হেতু দেশানুরাগও বটে। তিনি প্রকৃত হিন্দু হইলেও এইখানে কোন ধর্ম্মদ্বেষ নাই এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন ধর্ম্মের আলোচনাও করেন নাই, তিনি মানুষের মনুষ্যত্বকে পূজা করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যচিত্রে জ্ঞানের প্রাধান্য যতই থাকুক না কেন, বীরের ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্মকেই তিনি দৃঢ়তার সহিত অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। "কুরুক্ষেত্রে" কর্ম্ম-অবতারণার কথা বাদ দিলেও নবীনচন্দ্রের "গীতা"ও কর্ম্মের প্রেরণায় উদ্দীপিত। 'গীতার' মধ্যে তাঁহার কর্ম্মগীতি হৃদয়কে যত আকৃষ্ট করে, জ্ঞানের গবেষণা তত প্রবলভাবে চিত্তে আন্দোলন জাগাইয়া তুলে না। নবীনচন্দ্রের 'গীতার' ইহাই বিশেষত্ব এবং যুগ হিসাবে এই আদর্শ সম্পূর্ণ সমীচীনও বটে। ইহাও দেশানুরাগের অন্যতম প্রকৃতি। সেই জন্যই বলিয়াছি, ধর্ম্মপ্রেরণার ভিতর দিয়া দেশপ্রাণতাকে জাগাইবার প্রচেষ্টাই নবীন-প্রতিভার বিশেষত্ব।

"অবকাশ-রঞ্জিনীর" মধ্যে কবি-কল্পনার বিচিত্রতা, অনুভবের গাঢ়তা ও চিন্তাধারার বিভিন্ন গতি আছে এবং তাহার প্রকাশও জ্বালাময়ী হৃদয়-বাণীতে। তিনি পরিবারতন্ত্রীয় প্রেম, স্বদেশবাসী মহতের চিরযাত্রার জন্য ক্রন্দন এবং হৃদয়ের নানা অভিরুচি-প্রকাশের মধ্যে কবির করুণ, প্রেমিক ও আত্মবিস্মৃত হৃদয়ের সর্ব্বত্র পরিচয় দিয়াছেন। অধিকন্তু ভাবধারার এই বিচিত্রতার মধ্যে তিনি স্বদেশ এবং স্বজাতিকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার দেশানুরাগ বিবিধ উচ্ছ্বাসের মধ্যেও জাগ্রত, তিনি এখানে কিন্তু বিদেশী প্রভাবকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্র "পলাশীর যুদ্ধ" হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রভাস" পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই স্বীয় মুক্ত ও উদ্দীপ্ত হৃদয়ের বাণীকে স্বাধীনভাবে ঢালিয়া দিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কল্পনার এই মুক্ততাতে কাব্য-কলার হিসাবে উহাদের সর্ব্বথা সুসঙ্গতি না ঘটিলেও হয় ত 'একধর্ম্ম একজাতি' গঠনে এই স্বাধীনতার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই 'জাতি' এবং 'ধর্ম্মই' তাঁহার কবিধর্ম্ম বা মানবধর্ম্ম। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তিনি তথাকথিত

Art for art's sake এবং ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতার বিরুদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র দেশীয় উপাদানকে গ্রহণ করিয়া নিজের ক্ষিপ্রতা, প্রকাশুতা ও নির্ভয়তার সাহায্যে সহজ ও সরল চিত্র আঁকিয়া যাইতেন, কবির সহিত হাসিবার বা কাঁদিবার জন্য পাঠককে তিলমাত্রও বেগ পাইতে হয় না।

"ভানুমতীর" মধ্যে কবি-চিত্ত বিশেষভাবে স্থির এবং সংযত। ইহা কথা-সাহিত্য নহে। একটি সাধারণ অথচ মনোমদ ঘটনা অবলম্বন করিয়া নবীনচন্দ্র 'ভানুমতীর' মধ্যে প্রাচীন যুগের, তথা আধুনিক যুগের ধর্ম্ম, ভক্তি, সমাজের রীতি-নীতির আদর্শ এবং দেশের নানাবিধ দুরূহ সমস্যার নানা তথ্যপূর্ণ গবেষণার দ্বারা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সফলও হইয়াছেন; কবির দেশের ও সমাজের জন্য যে চিন্তা, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই "ভানুমতীর" মধ্যেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট, তিনি এইখানেও মানব-ধর্ম্মের প্রচারক।

মানুষের জীবনের দুইটা দিক্ আছে, বহির্জ্জীবন ও অন্তর্জ্জীবন। বাহিরের জীবন কতকগুলি স্থূল ঘটনার দ্বারা পরিপুষ্ট, কিন্তু অন্তরের জীবন বাহিরের চোখ দিয়া দেখিবার জিনিষ নহে, তাই মানুষের অন্তর্জ্জীবন সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়া যায়; কিন্তু কবির অন্তর্জ্জীবন তাঁহার কাব্যের ভাবধারার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। বাহিরের অবান্তর ঘটনাকে বাদ দিয়া নবীনচন্দ্রের "আমার জীবনেও" তাঁহার অন্তরের স্বাধীনতা, তথা কল্পনা বা কাব্যকলার স্বাধীনতা ধরা দিয়াছে। যেই স্বাধীনতা ও দুর্দ্দমনীয়তা তাঁহার বাস্তব জীবনে দেখিতে পাই, তাহাই তাঁহার কল্পনাক্ষেত্রে এবং রচনাক্ষেত্রেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে অপূর্ব্ব গৌরবে। তাঁহার "আমার জীবন" হইতে আমরা তাঁহার অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনের এই সামঞ্জস্যটুকু দেখিতে পাই। আবার প্রত্যক্ষে হউক কিম্বা পরোক্ষে হউক, মানুষের বহির্জ্জীবনের ঘটনাপুঞ্জ তাহার অন্তরের ভাবের সহিত সাদৃশ্য লাভ করে। কবির জীবনের ঘটনার ধর্ম্ম কবির অজ্ঞাতেই কাব্যের মধ্যেই প্রকৃতি প্রকাশ করে। তাঁহার বাল্য-জীবনের চাপল্য ও দুর্দ্দমনীয়তা হইতেই তাঁহার কাব্যের ঋজুতা ও সরলতা প্রাণ লাভ করিয়াছে। তাঁহার "আমার জীবনকে" বিশ্লেষিত করিলে তাঁহার কাব্যের ধর্ম্ম ধরা পড়িবার আশা করা যায়।

ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং ধর্ম্মপ্রাণ নবীনচন্দ্র আমরণ ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রচারকরূপে হিন্দুর শেষ অবতারত্রয়কে ভক্তি-অশ্রুতে সিক্ত করিয়া গভীর হৃদয়ের অঞ্জলি দান করিয়া আসিয়াছেন। পরিণত প্রতিভার প্রারম্ভেই ভক্ত-কবি নবীনচন্দ্র 'রৈবতককুরুক্ষেত্র-প্রভাসে' কৃষ্ণলীলার গান করিয়া দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। আবার "প্রভাসের" এই কৃষ্ণরূপের চিন্তা হইতেই বিচিত্র অনুকূল ঘটনার প্রভাবে চৈতন্যের প্রতি তাঁহার ভক্ত-হৃদয়ের অনুরাগ জন্মে এবং পরিশেষে সেই অনুরাগ "অমিয় নিমাই চরিত্রের" দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া নবীনচন্দ্রের "অমিতাভের" সৃষ্টি করে। আমাদের গভীর পরিতাপ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়, চৈতন্য-পূজার পরিসমাপ্তি না হইতেই নবীনচন্দ্র চৈতন্যলোকে চলিয়া গেলেন। বিদেশীয় ধর্ম্মগুরু খৃষ্টকেও মানবজাতির মধ্যে এক জন মহাপুরুষ ভাবিয়া তিনি ভক্তি-বিগলিত চিত্তে অর্ঘ্য দান করিয়াছেন, বুদ্ধের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির দৃষ্টান্ত অমৃতময় "অমিতাভ" কাব্য, দেশের ভক্তিবুদ্ধি ও কর্ম্মবুদ্ধিকে জাগাইবার ইহাও একটি পন্থা।

নবীনচন্দ্র সেন

একটি কথা আছে, কবির কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি জীবনে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য নহে। তিনি "পলাশীর যুদ্ধ" হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শেষ কাব্য "অমিতাভের" স্থলবিশেষে পর্য্যন্ত যে প্রকৃত কবিত্ব, কল্পনা ও মাধুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কাব্যক্ষেত্রে প্রতি সাহিত্য-রসিকের চিরদিন বিস্ময়স্থল হইয়া রহিবে। স্বভাবশিশু দেশভক্ত নবীনচন্দ্রের উপর বাগ্দেবীর এই অযাচিত করুণা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে এবং আমরা তাঁহার অমরতা স্মরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (এম্, এ)।

মুক্তার মালা

সন্ধ্যার আসন্ন নিস্তব্ধতায় চিতোরগড়ের পর্ব্বত দূর হইতে চিত্রের ন্যায় দেখাইতেছিল। সূর্য্যাস্তের সোনালী আভা স্বপ্নের হাসির মত মিলাইতে মিলাইতেও রহিয়া গিয়াছে। ঠিক এমনই সময়ে পাহাড়ের বিভিন্ন দিকের দুই পথ বাহিয়া দুইটি অশ্বারোহী প্রবলবেগে নামিয়া আসিতেছিল। দুই জনের হস্তেই ধনু, পৃষ্ঠে তূণ। পথ দুইটি বিভিন্ন দিক্‌ হইতে আসিয়া যেখানে মিশিয়াছে, সে স্থানটি কিছু সঙ্কীর্ণ এবং দুরারোহ। এক জন অশ্বারোহী আগে যাইবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, "হরিণ আমার—"

অপরটি উপেক্ষাভরে উত্তর করিল, 'কে বল্‌ছে যে আপনার নয় ?'

'আমারই তীর আগে লেগেছে—'

অপর জন তেমনই তাচ্ছীল্যের সঙ্গে উত্তর করিল, 'আমার তীর লাগে নি ?'

'না, কখনও না।'

'কি আশ্চর্য্য, আমি ত সেই কথাই বল্‌ছি।'

প্রথম বক্তা একটু অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বলিল, 'বল্‌ছ বৈ কি ? আগে গিয়ে শিকারটি দখল কর্‌বার যোগাড় ত বিলক্ষণ আছে, দেখ্‌ছি।'

'কিসে বুঝলেন আপনি ?'

'তা নয় ত কি ? পথের মাঝখানে এগিয়ে যাবার চেষ্টা, এ কি রকম ব্যবহার ? আমার পথ ছাড়ুন।'

'যদি না ছাড়ি ?'

'তা হ'লে আমায় জোর ক'রে পথ ক'রে নিতে হবে।'

বলিয়া সে অশ্ব আগে চালাইবার চেষ্টা করিল। অপর অশ্বারোহী তাহা লক্ষ্য করিয়া ঘোড়ার মুখ বাঁকাইয়া একবারে পথ রোধ করিয়া দিল। তখন প্রথম ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া বলিল, 'চিতোরের এ সৌজন্য অনেক দিন মনে থাক্‌বে।'

'ওঃ, আপনি কি চিতোরের অতিথি—গুরুদাসপুর গড়ের রাজকুমার ?'

'থাক্‌, সে পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। আপনি যখন পথ ছাড়লেন না, তখন এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি—কিছু মনে কর্‌বেন না।'

এই বলিয়া রাজকুমার অশ্বকে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু অপর অশ্বারোহী তাহার বল্গা ধরিয়া ফেলিল; সপ্রতিভভাবে বলিল, 'যাবেন না।'

'কেন ?'

'চিতোরের জঙ্গলে শুধু হরিণ থাকে না, বাঘও আছে।'

'ওঃ,—আমার জন্যে আপনার এই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক আশঙ্কার জন্য ধন্যবাদ ! পথ ছাড়ুন—'

'আপনি এখন যাবেন না। এখনই চাঁদ উঠবে, আপনি তখন গিয়ে স্বচ্ছন্দে আপনার হরিণ আনতে পারবেন।'

রাজকুমার একটু ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, 'আচ্ছা, আমার জন্যে আপনার কেন যে এমন অসঙ্গত মাথা-ব্যথা, সেটুকু দয়া ক'রে ব'লে দেবেন কি ?'

অপর অশ্বারোহীর দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সে কিছু না বলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল এবং তীরের পর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার অশ্বকে এড়াইয়া রাজকুমার বেগে ধাবিত হইলেন এবং অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন, কিন্তু সহসা বন হইতে যে শব্দ উঠিল, তাহাতে অশ্ব এবং অশ্বারোহী যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রাজকুমার তূণ হইতে তীর লইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া যেমন ছুড়িতে যাইবেন, অমনই পশ্চাদ্দিক হইতে চীৎকার উঠিল, 'ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন। শিকার আমার।' বলিতে বলিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নক্ষত্রবেগে অগ্রসর হইল। তখনও তাহার ধনুক হইতে বাণ-বৃষ্টি হইতেছিল। রাজকুমারও ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই কর্ষিত জ্যা হইতে তীর বিমুক্ত হইল না।

যখন অশ্বদ্বয় বিশ্রাম করিতে পাইল, তখন অনেক পথ

অতিক্রান্ত হইয়াছে। জঙ্গলের পার্শ্বে একটি ঝরণার ধারে আসিয়া ব্যাঘ্র শেষ গণ্ডূষ জল পান করিয়া ঢলিয়া পড়িল।

অশ্বারোহিদ্বয় অবতরণ করিয়া সন্তর্পণে উপলরাশি পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। উভয়েরই হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। চাঁদের কিরণে ঝরণার শতধারা উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে করিতে বহিতেছিল। উভয়েই নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, বাঘ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার শরীরে তখনও কতকগুলি তীর বিদ্ধ হইয়া ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সজোরে সেগুলি উৎপাটিত করিয়া তূণে রক্ষা করিল। বলিল, 'এ তীরগুলি আমার!'

রাজকুমার হাস্য করিয়া বলিলেন, 'কে অস্বীকার করছে?'

'হরিণ আপনার হ'তে পারে, বাঘ আমার।'

'হ'তে পারে' মানে?'

'আমি ত আপনাকে তীর ছুড়তে দেখি নি। আপনারই সম্ভব। কারণ, আমি হরিণ লক্ষ্য করি নি।'

'তবে? আপনি কি বাঘ আগে থেকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন না কি?'

'না, আমি অনুমান করেছিলাম। হরিণটা অস্বাভাবিক রকম তাড়াতাড়িতে যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল, তখনই আমার সন্দেহ হ'ল—তার পরে বন নড়্‌তে দেখে বুঝ্‌তে পারলাম—'

'সে কথা আমায় তখনই ত বল্‌লে হ'ত—'

'শুধু সন্দেহ বৈ ত নয়—'

রাজকুমার ভাবিতে লাগিলেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, এই অসাধারণ ধনুঃশিক্ষা, এমন অফুরন্ত সহানুভূতি এই কিশোর রাজপুত-বালকে থাকিতে পারে! তাঁহারও বয়স বেশী নহে, কেবল কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু ইহার তরুণ কমনীয়তায় সময়ে সময়ে ইহাকে বালক বলিয়াই ভ্রম হয়।

উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং একখানি একটু বড় প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া তাহার উপরে উভয়ে [illegible]ভাবে বসিয়া পড়িলেন। চাঁদ উঠিয়াছে, ঝরণার [illegible]গান মৃদু সঙ্গীতের মত ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। [illegible]র শীকরকণা সন্ধ্যার বাতাসে মিশিয়া কোমল হস্তে পথিক [illegible]র ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না। রাজপুত্-বালক অনিমিখে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে সুন্দর মুখে চাঁদের কিরণ পড়িয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজপুত্রই বটে! রূপকথায় এমনই রাজপুত্রের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। রাজবারার মধ্যে, এমন কি, সারা ভারতবর্ষে এমন সুন্দর রাজপুত্র আছে, তাহা যেন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! যুবক স্বপ্নাবিষ্টের মত দেখিতে দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, অপরে কি মনে করিতেছে।

রাজপুত্র মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে মনে যে গৌরব ছিল, তাহা আজ এমন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়, এমন চন্দ্রালোকে এক অপরিচিত দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিতের নিকটে এমন ভাবে সার্থক হইয়া উঠিবে, ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'যুবক, কি দেখ্‌ছ?'

যুবক অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর করিল 'আপনার রূপের কথা আগেই গল্প শুনেছিলাম, আজ তাই দেখ্‌লাম।'

'কি দেখ্‌লে? সব গাল-গল্প শুনেছিলে, তাই মনে হচ্ছে, না?'

'না, যা গল্পে শুনেছিলাম; তার চেয়েও আপনি সুন্দর।'

'তুমি কে যুবক, তা আমি জানি নে। তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, তোমার মত চেহারাও আমাদের দেশে যে কোনও স্থানে দেখেছি, তা ত স্মরণ হয় না—'

এই কথা বলিয়াই রাজকুমার কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। কারণ, দুই জন যুবকের মধ্যে চেহারা লইয়া এত আলোচনা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল। অপর যুবক যেন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, 'ইস্, ভারি ত আমার চেহারা।'

'ধন্য, তোমার অস্ত্র-শিক্ষা।'

'কি-ই বা জানি?'

'বিনয়ের প্রয়োজন নেই। আজ তোমার জন্যে আমার প্রাণরক্ষা হ'ল। হঠাৎ বাঘের মুখে গিয়ে পড়লে কি হ'ত, কিছুই ত বলা যায় না।'

এবার জ্যোৎস্নার মধ্যেও দেখা গেল, যুবকের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ পরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইল।

রাজকুমার ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার দুইটি হস্ত সাগ্রহে

আপনার দুই হস্তে গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, 'যদি কিছু মনে না কর, ভাই, তবে আমি তোমায় সামান্য কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।'

যুবক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াই বলিল, 'কি পুরস্কার দিবেন শুনি? পুরস্কার আমরা নিই না। আপনার মিষ্ট কথাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

যুবকের গলা যেন কাঁপিয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় কোমল বলিয়া বোধ হইল। কি আশ্চর্য্য প্রতিকূল সমাবেশ? এমন দৃঢ়তাপূর্ণ বাহুযুগল, অথচ এত কমনীয়, শান্ত কণ্ঠ এই বালকের!

রাজকুমার বলিলেন, 'না, আমি তুচ্ছ পুরস্কার দিয়ে তোমার শিষ্টতা ও মধুর ব্যবহারের ঋণ শোধ করতে চাইছি না। চিরজীবন আজকার গোধূলি আমার নিকট স্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু আমার কোনও একটি চিহ্ন তুমি রাখবে না, ভাই? হয় ত সেটি দেখলেও তোমার এক দিন মনে পড়বে যে, তুমি গুরুদাসপুর গড়ের রাজকুমারের জীবন রক্ষা করেছিলে।'

যুবক ভাবিতেছিল। রাজকুমার ধীরে ধীরে তাঁহার শিরস্ত্রাণ হইতে বহুমূল্য মুক্তার মালা খুলিয়া লইয়া যুবকের পাগড়ীতে পরাইয়া দিলেন। মালা-ছড়াটি দীর্ঘ হইলেও পাগড়ীটি একটু বেশী বড় ছিল, এমন কি, যুবকের কচি মুখখানি পাগড়ীতে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজকুমার সেই পাগড়ীতে মুক্তার মালা জড়াইয়া দিতে পাগড়ী খসিয়া পড়িল এবং তাহার মধ্য হইতে অযত্ন-সম্বদ্ধ বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত হইল; অলকরাজি মুক্তি পাইয়া কপালে দুলিতে লাগিল। ইহার মস্তকে সুদীর্ঘ বেণী, কর্ণে হীরক-কুণ্ডল, ললাটে অলকশ্রেণী, এ কেমন যুবক! রাজকুমার সংশয়ে, দ্বিধায়, কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মুক্তার মালা তাঁহার হস্তেই রহিল। যুবকের মুখে পুনঃপুনঃ রক্তের গোলাপী ঢেউ বহিয়া কর্ণমূল হইতে গ্রীবাপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজকুমার একটু সপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'আপনি কে?'

'পরিচয় না জান্‌লে কি প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেওয়া যাবে না?'

'না, তা কেন? তবে আমি—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

'না-ই বা পার্‌লেন! পুরস্কার দিতে বাধা কি?'

'মুক্তোর মালা গলায় পরিয়ে দিতে পারি কি?'

'সে আপনার ইচ্ছা।'

রাজকুমারের সর্ব্ব-অঙ্গে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল। আজ চাঁদের কিরণে যেন মদিরা ঢালিয়া দিয়াছে। নির্ঝরের ঝর্-ঝর্ শব্দ বাতাসকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে।

রাজকুমার আবেগে জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'ইচ্ছা! ইচ্ছা আমার? তোমার অনুগ্রহ—'

'কিন্তু মুক্তোর মালা গলায় পরিয়ে দেবার দায়িত্ব যে অনেক—'

'তুমি কে, সুন্দরি?'

'আপনি অনুমান করুন।'

'চিতোর রাজনন্দিনী-বসুমালতী—'

'ইচ্ছা হয়, আপনার মুক্তোর মালাছড়াটি আর কোনও ভাগ্যবতীর জন্যে তুলে রাখতে পারেন।'

"আপনি, আপনি রাজকুমারী বসুমালতী, মহারাণা ধন্ত-সিংহের একমাত্র কন্যা, রাজপুত-রমণীকুলের গৌরব—আপনার নাম রাজবারায় এমন কেউ নেই, যে না জানে। আপনার রূপ, আপনার দয়া-দাক্ষিণ্য, আপনার অনুপম শৌর্য্য আজ যা প্রত্যক্ষে দেখলাম, আপনার ন্যায় রমণীরত্ন লাভ ক'রে বসুমতী ধন্য।"

'বলুন, বলুন, আপনার যা কিছু বলবার আছে, ব'লে ফেলুন। আপনি দেখছি চারণদের ব্যবসা মাটী করতে বসেছেন।'

'আপনি জানেন কি, কেন আমি চিতোরগড়ে এসেছি?'

'আপনার পিতা রায়রাণা চন্দ্রাবৎ এসেছেন ব'লে বোধ হয়।'

'না, কখনও নয়। তিনি চিতোরের অতিথিরূপে আস্‌তে পারেন, কিন্তু আমি এসেছি—'

'দেশভ্রমণে।'

'ভারতবর্ষে আর কি দেশ নেই?'

'আমাদের কাছে চিতোরই ভারতবর্ষ।'

'আমার কাছেও তাই। চিতোরই ভারতবর্ষের সার! আর চিতোরের মধ্যে রাজনন্দিনী বসুমালতীই সার।'

'আপনি কি যে বলেন, তার ঠিক নেই।'

'সত্যই আমি চিতোররাজদুহিতাকে দেখব ব'লে এত দূর এসেছি।'

'তাই না কি? এখনই ত আর এক জনের গলায় মালা দিয়ে ফেলেছিলেন।'

'তাতে আমার লজ্জিত হবার কিছু নেই। কারণ, এখানে এসে বসুমালতীর সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে তাঁর কণ্ঠে মালা দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারি নি।'

'এখন যে বড় পারলেন?'

'আপনার দয়া!'

'দেখুন, রাজকুমার! আমি চিতোরের মেয়ে, চিতোরের হাওয়ার মতই স্বাধীন। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় এই পাহাড়ে ঘেরা অরণ্যবিলসিত ঝরণার ধারে আমাকে যুবক ভ্রমে আপনি যে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, এর জন্যে কখনও যদি আপনার মনে অবসাদ বা অনুতাপ আসে—'

'অবসাদ? অনুতাপ? এ সব আপনি কি বলছেন? আমার এ অভাবনীয় সৌভাগ্যের জন্য ভগবান্ একলিঙ্গকে প্রণাম করি।'—বলিয়া রাজকুমার মালাছড়া বসুমালতীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

রাজকুমারীও ভক্তিভরে ভগবানের উদ্দেশে কর দুইটি যুক্ত করিয়া মস্তকে ধরিলেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম্ এ)।

শঙ্কর-বিজয়

সর্ব্বশাস্ত্র করি অধ্যয়ন,
শঙ্কাহীন শঙ্করের মন;
অহঙ্কার অনুক্ষণ কণ্ঠে তাঁর তুলিছে ঝঙ্কার!
বেদান্তের ধ্বান্তরাশি নাশি',
বিশ্বলোক আলোকে উদ্ভাসি'—
গর্ব্বরূপী দুর্ব্বলতা কণ্ঠরোধ করিছে শঙ্কার!
ক্ষণজন্মা বিশ্বমাঝে আমি জ্যোতির্ব্বিদ,
গণনা খণ্ডিবে হেন হেন কে আছে পণ্ডিত?

আগন্তুক কহে এক জুড়ি' দুই কর,
"হে অভ্রান্ত আচার্য্য শঙ্কর!
কর্ম্ম-অন্তরালে মোর লুক্কায়িত রহিয়াছে কিবা,
স্থূল যবনিকা উত্তোলিয়া,
ভাগ্য মোর দেখাও খুলিয়া।"
বেদান্তের ভাষ্যকার কহে হাসি,—"স্পষ্ট যেন দিবা—
দেখি তব মৃত্যু শীঘ্র হবে বজ্রাঘাতে,
ত্রিলোকে নাহিক শক্তি তাহারে খণ্ডাতে।"

জলাঞ্জলি দিয়া সব সুখে,
হতভাগ্য ফিরে ম্লানমুখে,
পথিপার্শ্বে যোগী এক বসি' আছে ধূর্জ্জটির প্রায়,
ইঙ্গিতে তাহারে আহ্বানিয়া,
বিষাদের কারণ জানিয়া,
কহে,—"মিথ্যা এ গণনা! ত্যজ দূরে বৃথা আশঙ্কায়।
"মিথ্যা হ'লে শিষ্য হ'ব" উঠিল গর্জ্জন,
"শঙ্কর সকল বিদ্যা দিবে বিসর্জ্জন।"

নির্দ্দিষ্ট দিবস অতঃপর—
হইলে উদয় যোগিবর,
"জীবন্মৃতে" যোগবলে অনন্তর সমাধিস্থ করি'
ভূগর্ভের অতি তলদেশে,
প্রোথিত করিয়া রাখে হেসে,
গণিত সময়ে ঠিক সে স্থানের মৃত্তিকা উপরি—
কি আশ্চর্য্য! ভীষণ অশনি এল নামি,
চেতনা বিহীনে কিন্তু ক্রিয়া গেল থামি'।

প্রোথিতে করিয়া উত্তোলন,
যোগী তাহে প্রাণ সঞ্চালন—
করে দেখি, বাক্যহীন শঙ্করের সবিস্ময় মন;
পতন হইল অহঙ্কার!
শঙ্কর রাখিতে অঙ্গীকার,
গঙ্গোদকে গ্রন্থরাজি বিসর্জ্জিয়া করিল গ্রহণ
নবদীক্ষা; বিশ্বনাথ ধন্য করে প্রাণ!
পূর্ণ শিক্ষা দিলা চূর্ণি শত অভিমান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

কাঁঠাল

কতিপয় প্রসিদ্ধ আমের ন্যায় কয়েক জাতীয় কাঁঠালও অনেক দেরীতে অর্থাৎ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাকিয়া থাকে। বঙ্গদেশের আয়কর বৃক্ষাবলীর মধ্যে কাঁঠাল নিতান্ত নিম্নস্থান অধিকার করে না। পশ্চিম-ভারতের বালুকাময় উষ্ণ অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অন্য সর্ব্বত্রই কাঁঠালগাছ দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের পাদদেশে ৪ হাজার ফুট উচ্চ পর্য্যন্তও কাঁঠাল-তরু জন্মে। কিন্তু ইহার বিস্তৃতি এত অধিক হইলেও ইহার প্রকৃত জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য জঙ্গল। পশ্চিম উপকূলের ঘন শ্যামল নিবিড় অরণ্যের অপূর্ব্ব শোভা কাঁঠাল-গাছই অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। ইহার মালয়ালী নাম যক (Tsjak); তাহা হইতে পর্ত্তুগীজরা প্রথম নামকরণ করেন Jack এবং ইংরাজীতেও তদবধি কাঁঠাল Jack fruit নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য যে, দাক্ষিণাত্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত ভারতের অন্যত্র কাঁঠালগাছ রোপিত অথবা রোপিত গাছ হইতে উদ্ভূত। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা থাকিলে এই প্রকার বৃক্ষের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না এবং সেই জন্যই উত্তর-ভারতে বহু পূর্ব্বে কাঁঠাল অপরিচিত ছিল। ইহার সংস্কৃত নাম 'পনস' অপেক্ষাকৃত আধুনিক; বাঙ্গালা নাম 'কণ্টকফল' (অপভ্রংশ কাঁঠাল) আরও পরবর্ত্তী কালের। পুরাতন ভারতের যব, বলীদ্বীপ প্রভৃতির সহিত যথেষ্ট বাণিজ্য থাকায় কাঁঠালগাছ মালয়দ্বীপ-পুঞ্জ দিয়া দক্ষিণ-চীন পর্য্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমে পঞ্চনদের পশ্চিম সীমায় উষর অঞ্চল এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা ইহাকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ব্রেজিল, মরিচদ্বীপ, সিসিলিস্ প্রভৃতি দেশে কাঁঠালতরু ভারত হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতেছে। বস্তুতঃ অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর এক স্থানের গাছ যে কত দেশে ব্যাপ্ত হইতে পারে, কাঁঠালগাছ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চাষের পরিসর ও ব্যবহার

কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম Artocarpus Integrifolia L; কাঁঠালের সমগুণভুক্ত গাছের সংখ্যা ৪০এর কম হইবে না। তন্মধ্যে কেবলমাত্র দুই চারিটি সাধারণের নিকট পরিচিত, যথা,—চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাপলাস বৃক্ষ, উদ্যান-পালিত রুটিতরু (Bread fruit tree) এবং বাঙ্গালার সর্ব্বত্র দৃষ্ট জ্যাফল্ গাছ। কাঁঠালের কোন আত্মীয়ই ইহার সমকক্ষ নহে; কারণ, কোনটিতেই বহুবিধ গুণের সমাবেশ নাই। বঙ্গদেশে কাঁঠালের যথেষ্ট আদর আছে। হুগলী, বহরমপুর, নদীয়া প্রভৃতি জিলায় সুবৃহৎ কাঁঠালসমূহ তাহার পরিচায়ক। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাটীতেও দুই একটি কাঁঠালগাছ আছে। অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট ছায়াতরু; ইহার প্রাস্থিকভাবে প্রসারিত দীর্ঘ শাখাসমূহ ও ঘন-সন্নিবিষ্ট, স্থূল, মসৃণ, উজ্জ্বল-শ্যাম পত্ররাজি শীতল ছায়া প্রদানে মনুষ্য ও পশ্বাদিকে প্রফুল্ল করে। সকল পুরাতন রাস্তার পার্শ্বে কাঁঠালগাছ সেই জন্য অবিরল নহে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট কাঁঠালবৃক্ষ রোপিত। তদ্দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, অন্য সর্ব্বত্রই মানুষ নিজ হস্তেই কাঁঠালগাছ রোপণ করিয়াছে। যেমন আমের আঁটি নানারূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বয়ং উপ্ত (Self sown) হইয়া থাকে, কাঁঠালও তদ্রূপ। বস্তুতঃ রাস্তার ধারে, গ্রামাকুঞ্জে অথবা ক্ষেত্রপার্শ্বে যে সকল কাঁঠালগাছ দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই স্বয়ং উপ্ত। পশ্বাদির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যখন তাহারা বড় হইয়া ফল প্রসব করে, তখনই কেবল মানুষে তাহাদের যত্ন লয়। স্থান উত্তম হইলে কাঁঠালগাছ ৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়; সাধারণ উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। পুরাতন

কাঁঠালগাছ
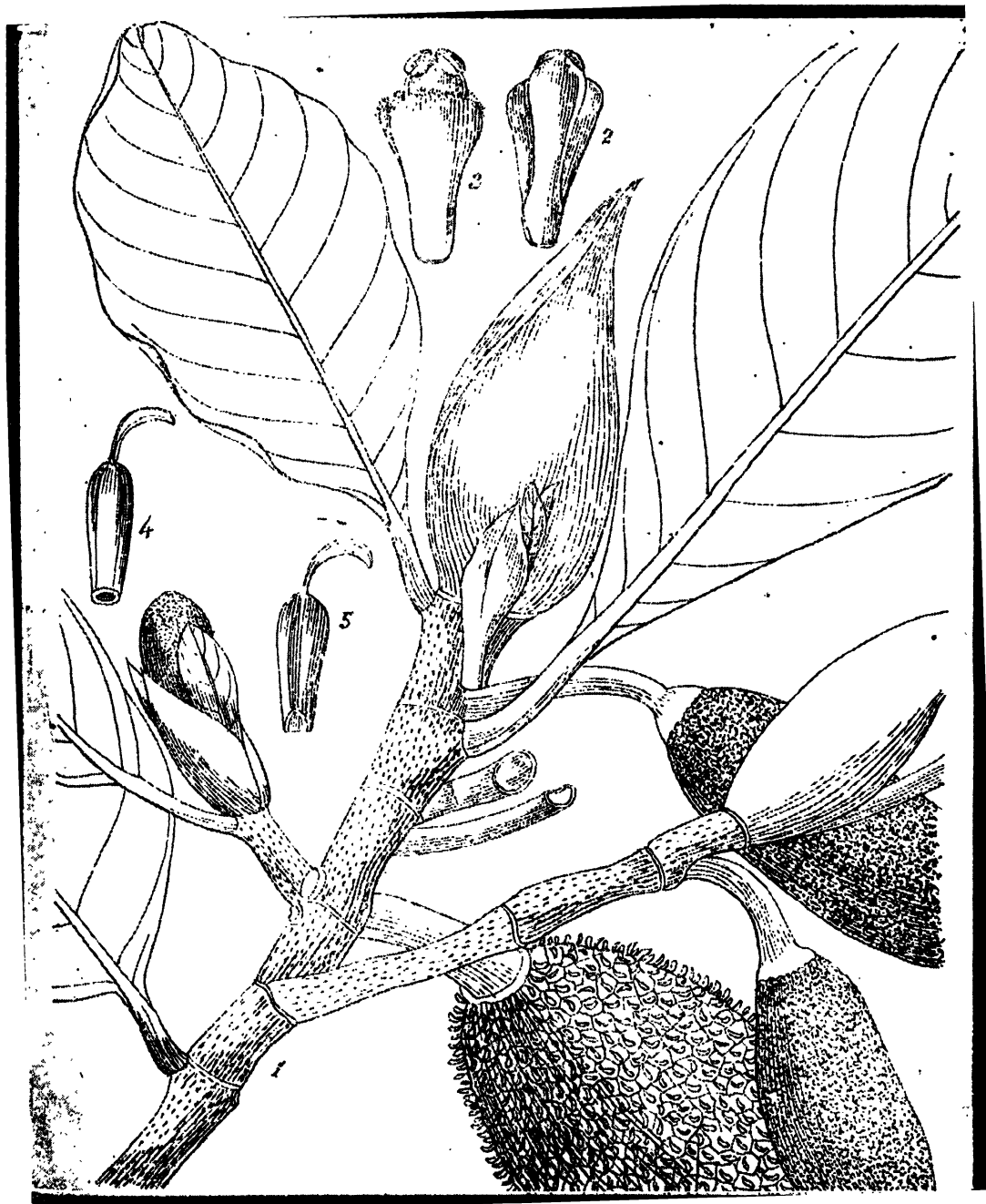
গাছ হইতে তক্তা করিবার জন্য ১২ হইতে ১৫ ফুট লম্বা গুঁড়ি সচরাচর পাওয়া যায়। পাকা তক্তার বর্ণ ঈষৎ ধূসরাভ পীত; সুবিখ্যাত মেহগ্নি কাঠের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। নানা প্রকার আসবাব ও গৃহসজ্জা প্রস্তুতে কাঁঠালকাঠের খুব চাহিদা আছে; ইহাতে উচ্চশ্রেণীর পালিস করা চলে এবং দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। যে সমুদয় ভারতীয় কাষ্ঠের ভারতের বাহিরে কাটতি আছে, তন্মধ্যে কাঁঠাল একটি; তবে ইহার বিদেশে চালান অপেক্ষাকৃত কম। কাঁঠাল-কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড অথবা করাতগুঁড়া সিদ্ধ করিয়া মনোরম পীতবর্ণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা পাগড়ী, সাড়ী, ওড়না প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইত; এখন সেরূপ ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি ব্রহ্মদেশে কাঁঠাল-বর্ণ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের গাত্রবাসাদি রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কাঁঠালগাছের সকল কোমলাংশই বিক্ষত হইলে দুগ্ধবৎ এক প্রকার গাঢ় নির্য্যাস নির্গত হয়। এই নির্য্যাস অর্থাৎ আঠা রবর উৎপাদনের মূল উপাদান কাউচুক্—(Cauotchouc) জাতীয়। ফুটন্ত জল দ্বারা ধৌত করিলে ইহা রবরেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় কাঁঠালের আঠা আঠাকাঠি প্রস্তুতের জন্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সামান্য উত্তপ্ত করিয়া লইলে উক্ত আঠা ভগ্ন চীনামাটী অথবা পাথরের দ্রব্যাদি যোড় লাগাইবার জন্য উত্তম সিমেণ্টরূপে ব্যবহার করা চলে। কাঁঠালের পাতা উত্তম পশু-খাদ্য। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যাঁহারা ছাগল ও মেষ পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যথেষ্ট মূল্য দিয়া কাঁঠালপাতা ক্রয় করেন। ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পক্ব কাঁঠাল শরীরের স্থূলতা বৃদ্ধি করে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কাঁঠালের ছোবড়া ও ভূতি দুগ্ধবতী গাভীসমূহকে খাইতে দেওয়া হয়।

বৃক্ষের প্রকৃতি

কাঁঠালের পুষ্পগুচ্ছ গুঁড়ি অথবা মোটা ডাল হইতে নির্গত হয়; পুং ও স্ত্রী-পুষ্প স্বতন্ত্র থাকে। শীতকালেই গাছ ফুল প্রসব করিয়া থাকে এবং ফল পাকিতে ৪।৫ মাস সময় লাগে। ভূগর্ভ-নিহিত কাঁঠাল সম্বন্ধে পাড়াগাঁয়ে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই অলীক। অবশ্য এরূপ কখনও কখনও ঘটিয়া থাকে যে, আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কাণ্ডের কিয়দংশ মাটীতে শুইয়া যায় ও ক্রমশঃ মৃত্তিকা-প্রোথিত হয়; সেরূপ ভূগর্ভ শাখাকাণ্ড মৃত্তিকার উপরিভাগস্থ কাণ্ডের ন্যায় সমভাবে ফল প্রসবক্ষম। কাঁঠালগাছের বিশেষত্ব এই যে, ইহার মূল ও কাণ্ডের সন্ধিদেশ পর্য্যন্ত ফুল-ফল প্রসব করিতে পারে। মৃত্তিকার নিম্নে এইরূপে যে কাঁঠাল হয়, তাহা সুপক্ব না হওয়া ও তাহার চতুর্দ্দিকে মাটী না ফাটিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ধরা পড়ে না। তখন উক্তরূপ কাঁঠাল কৌতূহলের দ্রব্য হইয়া পড়ে এবং উহা অবলম্বন করিয়াই নানারূপ অদ্ভুত কাহিনী রচিত হয়। অনেক পশু-পক্ষীই কাঁঠাল খাইতে ভালবাসে, কিন্তু শৃগালই ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং প্রধানতঃ উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কাঁঠালগাছের গুঁড়ির চতুর্দ্দিকে কাঁটার বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। পক্ব কাঁঠালের গন্ধে সর্পকেও সময় সময় আকৃষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এক একটি কাঁঠালগাছে অনেক ফল ফলিয়া থাকে। কাঁঠাল কিন্তু জমীর উর্ব্বরাশক্তি বহুল পরিমাণে ক্ষয় করে। একবার প্রচুর ফসল হইলে ২।৩ বৎসর আর প্রচুর ফসল হয় না। সাধারণতঃ কাঁঠালগাছে সার জল কিছুই দেওয়া হয় না; কিন্তু বারিসেচন ও সার-প্রয়োগ দ্বারা অনুপযুক্ত স্থানেও যথেষ্ট ফল ফলিয়া থাকে। বর্ষার শেষে মৎস্য-সার এবং পুষ্পোদ্গমের সময় জলসেচন দ্বারা অনেক স্থলে ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছোট এচোঁড় অনেক সময় ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তরলসার-মিশ্রিত জলসেচন তাহা প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। কাণ্ড হইতে ৩।৪ হাত তফাতে ইহা প্রয়োগ করা উচিত।

মনুষ্য-খাদ্য

সমগ্র উদ্ভিদ্-রাজ্যের মধ্যে কাঁঠালের ন্যায় গুরু ওজনের ফলপ্রসূ গাছ কমই দেখা যায়। সংখ্যায় অনেক গাছ অধিক ফল প্রসব করিতে পারে বটে, কিন্তু ফলের ওজন হিসাব করিলে খুব কম ফলগাছই কাঁঠালের সমকক্ষ হইতে পারে। প্রায় ১ মণ ওজনের কাঁঠাল প্রত্যেক বৎসরে দুই চারিটি দেখা যায়, সে কথা স্বতন্ত্র। একটি প্রাপ্তবয়স্ক কাঁঠাল-গাছে ৫ মণের কম ফল হয় না। সচরাচর ফলের ওজন ৬ হইতে ১৫ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কাঁঠালকে সাধারণতঃ একটি ফল বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা

একটি ফল নহে—একটি সাধারণ দণ্ডের উপর বিন্যস্ত ও একটি সাধারণ ত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত ফলসমষ্টি। প্রত্যেকটি কোয়া এক একটি স্বতন্ত্র ফল। এইরূপ ফলসমূহের উদ্ভিদ-তত্ত্বে নামকরণ হইয়াছে—সমষ্টিফল (Aggregate fruits)।

কাঁঠালের তরুণ ফল এঁচোড় নামে পরিচিত। এ চোড়ের নানাবিধ মুখরোচক তরকারী পশ্চিমবঙ্গেই অধিক প্রচলিত। বিশেষভাবে প্রস্তুত করিলে এঁচোড়ের ডালনা অনেকটা মাংসের ন্যায় হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহার নাম গাছপাঁঠা হইয়াছে। কিন্তু এঁচোড়ের আদর সর্ব্বত্র নাই। বঙ্গের ভিতরে ও বাহিরে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে এঁচোড় খাইতে লোক ভয় পায়। তাহারা মনে করে যে, সুপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত কাঁঠাল খাওয়া আদৌ উচিত নহে।

কাঁঠালের গন্ধ কোন কোন লোকের পক্ষে অপ্রিয়; অতি পক্ক কাঁঠালের গন্ধ যে বিরক্তিজনক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্বেতাঙ্গগণ সেই জন্য কাঁঠালের উপর বীতশ্রদ্ধ; কিন্তু যাঁহারা গন্ধটা একবার সহ্য করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের কাঁঠালের উপর বিশেষ অনুরাগ। সময় সময় অনুরাগের মাত্রা বিচারের সীমা অতিক্রম করে, তখন তাহার অনিবার্য্য ফল ভোগ করিতে হয়। 'খাজা' ও 'নেয়ো' হিসাবে কাঁঠালের দুই শ্রেণী আছে—তাহা সকলেই জানেন। নেয়ো কাঁঠালের রস সহযোগে এক প্রকার উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু রুটী প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা তৈয়ারী করিবার কৌশল বর্ত্তমান যুগের মহিলারা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন।

কাঁঠালের ন্যায় কাঁঠাল-বীজের গন্ধ অথবা স্বাদ নাই বটে, কিন্তু ইহা কোয়া অপেক্ষা অনেক বেশী পুষ্টিকর। সেই হিসাবে বীজকে কাঁঠালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ বলিতে পারা যায়। ইহাতে অন্যূন শতকরা ১৩ অংশ খাদ্য-সার (Proteids) এবং ৩১ অংশ শ্বেতসার জাতীয় (Carbohydrates) বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উপরের পর্দ্দা উঠাইয়া ফেলিয়া আবার তপ্ত বালুকার উপর খুব শুষ্ক করিয়া পরিষ্কৃত বালির মধ্যে রাখিয়া দিলে কাঁঠাল বীজ বহু দিবস অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এই উদ্দেশ্যে যে বালিতে বীজ শুষ্ক করা হয়, সেই বালিই সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা ভাল; কারণ, তাহাতে আদৌ আর্দ্রতা থাকে না। সিংহলে কাঁঠালগাছ খুব বড় হইয়া থাকে এবং ফলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয়। সেই জন্য উক্ত দেশে কাঁঠালবীজ একটি সাধারণ খাদ্য। ভাজা অথবা পোড়া কাঁঠালবীজের স্বাদ বিলাতী চেষ্ট্নাট্ (chestnut) ফলের সমতুল্য বলিয়া অনেক শ্বেতাঙ্গ স্বীকার করেন। কাঁঠাল-বীজ চূর্ণ করিয়া এক প্রকার আটা প্রস্তুত হয়। দাক্ষিণাত্যে আরণ্যজাতিসমূহের মধ্যে কাঁঠালবীজের আটার যথেষ্ট প্রচলন আছে। সুপ্রসিদ্ধ রুটী ফলের (bread fruit) আটা অপেক্ষা ইহা অধিক নিকৃষ্ট নহে।

আয়কর বৃক্ষ

একবার উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে কাঁঠালগাছ সহজে মরে না। জলাভাব সহ্য করিবার ক্ষমতা ইহার অনেক পরিমাণে আছে। কিন্তু গোড়ায় জল বসিলে কাঁঠালগাছ অনেক সময় মরিয়া যায়। আয়কর বৃক্ষ হিসাবে ইহার আরও অধিক পরিমাণে চাষ হওয়া উচিত। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের সান্নিধ্যে কোন গৃহস্থের ১০।১২টি কাঁঠালগাছ থাকিলে সেগুলি হইতে যে আয় হইতে পারে, তাহা সামান্য নহে। প্রতি গাছের এঁচোড় ও পক্ক কাঁঠাল বিক্রয়ে অন্ততঃ ১০ টাকা এবং পত্র বিক্রয়ে ২ টাকা, মোট ১২ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা সর্ব্বনিম্ন (minimum) হিসাব। এক একটি কাঁঠাল-গাছ হইতে ৩০ টাকা লাভ হইবার বিষয়ও আমরা অবগত আছি। কলিকাতার বাজারে রেল, জলপথ ও সাধারণ রাস্তা দিয়া বহু পরিমাণ কাঁঠাল আমদানী হয়। স্থানীয় লোক চেষ্টা করিলে সেই ব্যবসায়ের অনেকটা হস্তগত করিতে পারেন।

আমাদের দেশে আধুনিক উপায়ে ফলসংরক্ষণের চেষ্টা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট খাজা কাঁঠালের কোয়া এবং নেয়ো কাঁঠালের রস উভয়ই সংরক্ষণ করা অসম্ভব নহে। প্রথমোক্তের জন্য শুষ্ক ও আর্দ্র সংরক্ষণপ্রণালী প্রয়োগ করা চলে; কিন্তু কাঁঠালের রসের জন্য কেবলমাত্র আর্দ্র প্রণালীই উপযুক্ত। কাঁঠাল যেরূপ সাধারণের প্রিয় ফল, তাহাতে টিনে অথবা বোতলে সংরক্ষিত কাঁঠাল-কোয়া অথবা রসের কাটতি অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য মূল্য যথাসম্ভব সুলভ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

ফতুয়া

সরঞ্জাম—যাহার গায়ের ফতুয়া, তাহার গায়ের নিম্ন-লিখিত স্থানের মাপ আবশ্যক।

ঝুল—

সেস্ত—ঠিক গলা ও কাঁধের সংযোগস্থল হইতে নাভিস্থল পর্য্যন্ত (কোটের সেস্ত আরও উপরে লইতে হয়)।

ছাতি—

কোমর—ঠিক নাভির ৷৷০ ইঞ্চি উপরে কোমরের চারি পার্শ্বের মাপ।

গলা—

পুট—

পুটহাতা—

মুহুরী—ঠিক কনুইয়ের গাঁটের উপরকার চারি পার্শ্বের মাপ। কারণ, ঐ স্থানই সাধারণতঃ বেশী মোটা, হাতাকে ঐ স্থান অতিক্রম করাইতে হইবে।

ফতুয়া কাটিতে অন্য কোন স্থানের মাপের আবশ্যক নাই। এখন মনে করুন, একটি ফতুয়া কাটিতে হইবে, তাহার মাপ ;—

ঝুল—২৬ ইঞ্চি, ছাতি ৩৪ ইঞ্চি, সেস্ত—১৮ ইঞ্চি, কোমর—৩০ ইঞ্চি, গলা—১৫ ইঞ্চি, পুট—৮৷৷০ ইঞ্চি, হাতা—২০ ইঞ্চি, মুহুরী—৯৷৷০ ইঞ্চি।

কতখানি কাপড় লাগিবে—৩৩ হইতে ৪৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত যে কাপড়ের বহর, তাহার দুই লম্বা ও এক হাতা লাগিবে।

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে—২৬+১৷৷০ ইঞ্চি (১৷৷০ ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য)=২৭৷৷০, ২৭৷৷০×২=৫৫ ইঞ্চি+১১৷৷০ +২৷৷০=৬৯ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ গজ ৩৩ ইঞ্চি। (একটু ঘুরাইয়া কাটিতে পারিলে কমে হয়, কিন্তু সেটা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে)।

ফতুয়া কাটিবার নিয়ম—থান হইতে দু লম্বা কাপড় (৫৫ ইঞ্চি) কাটিয়া লউন, তাহার পর তাহার এড়ো দিকে ছাতি+৪ ইঞ্চির অর্দ্ধেক কাপড়কে আধা-আধি ভাঁজ করুন, অর্থাৎ এক পাশ ছাতি+৪ ইঞ্চির $\frac{1}{4}$ হইবে। যখন সম্পূর্ণ লম্বাটা ঐ মাপে ভাঁজ হইয়া যাইবে, তখন পাঞ্জাবীর মত লম্বাটা আধা-আধি না করিয়া খড়ি দিয়া উহারই উপর এক লম্বা (২৭৷৷০ ইঞ্চি) দাগ দিন। নীচের আর এক লম্বা এখন থাক। তাহার পর উপরের লম্বাটাকে নিম্নের চিত্রের ন্যায় কথিতমত সমস্ত স্থানে মাপ ধরিয়া অঙ্কিত করিয়া কাটুন, ইহা পশ্চাৎ পাত অর্থাৎ ইহাই পিঠের দিকে থাকে। [১, ৯, ১০, ৫ হইতেছে পশ্চাৎ পাত]।

চিত্র নং—১

১ হইতে ৯=ঝুল+১৷৷০ ইঞ্চি =২৭৷৷০ ইঞ্চি
১ " ৭= সেস্ত =১৮ "
১ " ৬= ছাতির $\frac{1}{4}$ = ৮৷৷০ "

১ হইতে ৫ = পুট + ।০ ইঞ্চি = ৮৸০ "

৫ " ৩ = ২ "

৫ " ৪ = ১ হইতে ৬ = ৮॥০ "

১ " ২ = ছাতির $\frac{1}{2}$ = ২৸০ "

৬ " ৪ = ছাতি + ৪ ইঞ্চির $\frac{1}{4}$ = ৯॥০ "

৭ " ৮ = কোমর + ২ ইঞ্চির $\frac{1}{4}$ = ৮ "

১০ " ১১ = = ৪ কিম্বা ৫ "

৯ " ১০ = ৬ হইতে ৪ (অথবা ১" বেশী)

এখন ছবির মাপের মত কাটিয়া যাউন, কেবল ১১ অঙ্কিত স্থানে নাচি করিবেন।

ইহাতে পশ্চাৎ পাত কাটা হইল।

এখন সম্মুখ পাত--পশ্চাতের পাত, কথিত মাপমত ভাঁজ করিয়া কাটার পরও অনেকটা কাপড় বেশী থাকে। যেমন মনে করুন, কাপড়ের বহর ৩৬ ইঞ্চি, ছাতির মাপ ৩৪ ইঞ্চি। তাহা হইলে ঘের কাটা হইবে (৯ হইতে ১০) এর ডবল = ১৯ ইঞ্চি ধরুন, মোট ২০ ইঞ্চি লাগিবে। আর বাকি আভাঁজ রহিল ১৬ ইঞ্চি। এখন এই ১৬ ইঞ্চি দিয়া সম্মুখের এক পাত হইবে, আর এক পাত অবশিষ্ট ২৭॥০ ইঞ্চি লম্বা যে কাপড়টা আছে, উহা হইতে লইতে হইবে। তাহা হইলে এখন এই ২৭॥০ ইঞ্চি লম্বা ১৬ ইঞ্চি চওড়া কাপড়টা আভাঁজ করা ২৭॥০ ইঞ্চি লম্বা ৩৬ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের এক পাশে পাড়ে পাড় মিলাইয়া ফেলুন। তাহা হইলে এই পাশ হইতেই দুই পাত 'সামনা' হইবে। (ক, গ, ঘ, চ) হইতেছে 'সামনা' পাত। ফতুয়ার সামনা পাত কাটিতে মোটেই হাঙ্গামা নাই। কেবলমাত্র পশ্চাতের পাতটা সামনা পাতের কিনারা হইতে ১॥০ ইঞ্চি (ক হইতে ৯ কিম্বা খ হইতে ৯) দূরে বসাইয়া পশ্চাতের পাতের সঙ্গে কাটিয়া যান। তাহার পর 'সামনার' দুই পাতেরই বুকের কাছের কিনারাটা ॥০ কিম্বা ৸০ ইঞ্চি চিত্রের ন্যায় (গ, ন, ম) দিয়া না দিলে গলার কাছে কাপড় ফুলিয়া থাকিতে পারে।

ফতুয়ার 'সামনা' ও 'পিছন' পাঞ্জাবীর মত একই রকম হয় না। 'পিছন' একটু কম ও 'সামান্য' বেশী হয়--

পিছনের পাতে ছাতির মাপ —৯॥০ করিয়া ১৯ ইঞ্চি

" " কোমরের " —৮ " —১৬ "

সামনের পাতে ছাতির মাপ —৯॥০ + ১॥০ —২১॥ "

" " কোমরের " —৮ + ১॥০ —১৯ "

তাহা হইলে মোট ছাতি হইল ১৯ + ২১॥০ = ৪০॥০ ইঞ্চি

" " কোমর " —১৬ + ১৯ = ৩৫ "

অর্থাৎ ছাতি ৬॥০ এবং কোমর ৫ ইঞ্চি ঢিলা (ল্যাপেট) সামনার পাতে গলা ও মহড়া একটু বেশী করিয়া খেরে দিতে হয়।

হাতা কাটিবার প্রণালী--কাপড় লম্বা লইয়া এড়ো দিকে ৩৪" লইয়া তাহাকে ৪ ভাঁজ করুন। তাহা হইলে একত্র দুই হাতা হইবে। তাহার পর মাপমত কাটুন :—
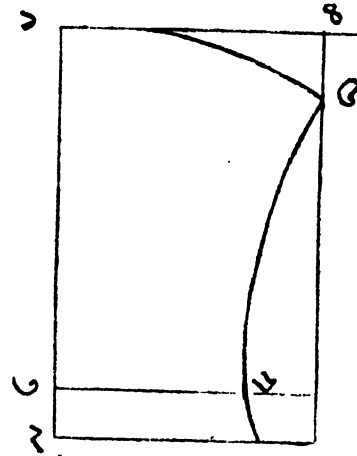
চিত্র নং—২

১ হইতে ৩ = হাত মাপ = ১১॥০ ইঞ্চি

৩ " ২ = মুহুরী মোড়াইয়ের জন্য- ২॥০ ইঞ্চি

১ " ৪ = ছাতির $\frac{1}{4}$ = ৮॥০ ইঞ্চি

৪ " ৫ = ৩ ইঞ্চি

৩ " ৬ = মুহুরী + ২ ইঞ্চির $\frac{1}{2}$ = ৫৸ ইঞ্চি

সেলাই প্রণালী প্রথমেই 'সামনা' পাত লইয়া আরম্ভ করুন। সামনা পাত দুইটি লইয়া আগে 'বুকিয়ে' বিছাইয়া অর্থাৎ ঠিক করিয়া লক্ষ্য করিয়া লউন যে, কোন দুই পাশ 'সিধে' হইবে। এরূপ না বিছাইয়া নেপেল লাগাইলে দুই পাতই হয় ত 'ডান সামনা' অথবা 'বাঁ সামনা' হইয়া যাইতে পারে। এখন নেপেল লাগান। প্রথমে যে দিকটা সোজা, সেই দিকের কিনারায় (খ, ন, গ, স) নেপেল বসাইয়া লম্বা সেলাই করুন। তাহার পর এটা উল্টাইয়া ধার মুড়িয়া সেলাই করুন। (সামনে একটা ফতুয়া ধরিয়া কাযকর্ম্মে সেলাইয়ের বড়ই সুবিধা হইবে)। নেপেল লাগাইবার পর (১১—১০) এইটুকু ৪ পাতই হেমিন করুন। তাহার পর সামনা দুই পাত মাটিতে বিছাইয়া ফেলুন, যাহাতে সিধা দিক উপরে থাকে।

এখন ইহার উপরে পিঠটা ফেলুন—যাহাতে পিঠের উল্টো পাত উপরে থাকে। তাহার পর (১১,৮,৪) টুকু ডবল সেলাই করিলেই জামা এক রকম খাড়া হইবে। তাহার পর (৯—১০) নীচুটুকু ১ ইঞ্চি চওড়া করিয়া হেমিন করুন।

তৎপরে পকেট।

কাগজে কলমে ফতুয়ার পকেট বুঝান সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই কার্য্যকালে সামনে ফতুয়া রাখিয়া অথবা কাহারও সামান্য একটু উপদেশ লইয়া পকেট তৈয়ারী করা সহজ হইবে। তবুও যতটা সম্ভব বুঝাইতেছি।

পকেট তৈয়ারী—যখন পুট বাদে Bodyটা ডবল সেলাই হইয়া যাইবে, তখন দুই পাত সামনাকে একত্র বিছাইয়া ফেলুন। তাহার পর কোমরের দাগের উপর (৭, ৮) কিনারা হইতে (৭, ক) ২ ইঞ্চি দূর হইতে (ক—খ) ৬ ইঞ্চি দূরে একটা দাগ দিন। এখন এই ৬ ইঞ্চি (ক—খ) দুই পাতই চিরিয়া ফেলুন। কাপড়টা চিরিতে দুই পাত করিয়া ৪ পাত হইল। এখন প্রথমে এক সামনা অর্থাৎ দুই পাত লইয়া কায করুন। ক, খ—এবং ন, ণ এই হইল দুই পাত।
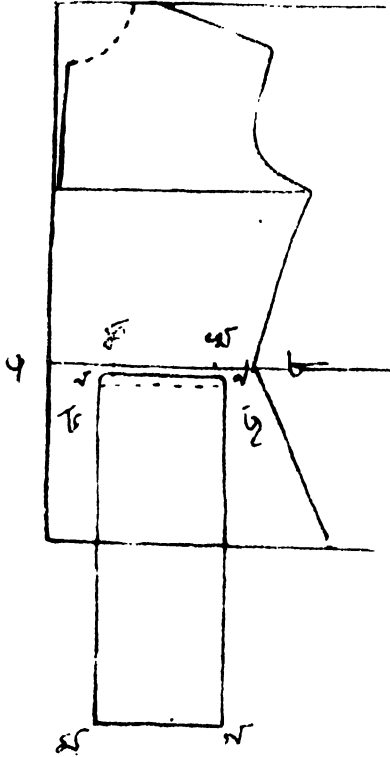
চিত্র নং—৩

একখানা ৭ ইঞ্চি চওড়া ও ১৮ ইঞ্চি লম্বা কাপড়ের এক কিনারা ণ, ন ও (নীচু পাত) সঙ্গে ফেলিয়া (সোজা দিকেই) ধার দিয়া একটা লম্বা টানা সেলাই করিয়া সেই সেলাইয়ের মুখ হইতে ২ ইঞ্চি নীচে পকেটের কাপড়ের দুই পাশেই ॥০ ইঞ্চি করিয়া নাচি কাটুন (চ, ছ)। তাহার পর কেবলমাত্র (ণ, চয়ের অর্দ্ধেক) ১ ইঞ্চি পাড়ের জন্য উঁচু রাখিয়া—পকেটের কাপড়ের আর সবটাই পকেটের চেরার মধ্য দিয়া ভিতরে দিন। চ, ছ নাচি কাটা ছিল বলিয়া ১ ইঞ্চি বেশী কাপড়টা (ণ, ন হইতে চ, ছ ১ ইঞ্চি বেশী) ভাল ভাবে পড়িল। সেই জন্যই এইখানটা নাচি কাটা। তাহার পর এই এক ইঞ্চি উঁচু পাড়ের দুই ধারই সেলাই করিয়া ঐ ম,গ (যাহা ভিতরে দেওয়া হইয়াছে) ক, খর (উপরের পাত) সঙ্গে কাঁচা সেলাই এমন ভাবে করুন, যাহাতে কাঁচা মুখ ভিতরে থাকে। ঠিক এই রকমেই অপর সামনা পাতটাও করিতে হইবে। পরে একটা ১ ইঞ্চি চওড়া কাপড় কোমরের চারি পার্শ্বেই লাগাইতে হইবে। তাহা হইলেই পকেটের কাঁচা মুখগুলি চাপ পড়িয়া যাইবে। ইহার পর পকেটের মুখ ৪টা সেলাই করিয়া দিলেই পকেট বসান হইয়া গেল। শেষে পুটের দিকটা সেলাই করিলেই জামা তৈয়ারী করা হইয়া গেল।

হাতা মুহুরীর কাছটা ২ ইঞ্চি চওড়া করিয়া সেলাই করুন। তাহা হইলে হাতা লম্বা ১ হইতে ৩+॥০ ইঞ্চি থাকিবে। ॥০ ইঞ্চি Bodyর সঙ্গে জুড়িবার সময় লাগিবে। তাহার পর ৬ হইতে ৫ ডবল সেলাই করিলেই হাতা তৈয়ারী করা হইল।

এখন হাতার ডাণ্ডি Bodyর ডাণ্ডির সহিত মিলাইয়া সমস্ত ঘেরটা দেখিবেন। যদি বগল ছোট হয়, তাহা হইলে কাটিয়া হাতার মহড়ার মাপমত কমাইয়া তৎপরে ডবল সেলাই করিলেই হাতা লাগান হইল।

গলা—সামনের পাত একটু নামাইয়া ও পশ্চাতের পাত একটু কমাইয়া কাটিতে হয়। মোট কথা, যাহাতে গলা মাপ অপেক্ষা ১ ইঞ্চি বড় হয়। তাহার পর একটি 'ওরেফ' পটী করিয়া পাঞ্জাবীর মত কাটিয়া সেলাই করিতে হইবে।

তৎপরে 'বাঁ সামনায়' ৫টি বোতামের ঘর ও 'ডান সামনায়' বোতাম বসাইলেই ফতুয়া তৈয়ারী হইয়া গেল। নীচের বোতামের ঘর ঠিক কোমর পাটীর সিধে হইতে হইবে। ফতুয়া কাটিতে ও সেলাই করিতে হইলে, প্রথম শিক্ষা করিবার কালে একটি তৈয়ারী ফতুয়া সম্মুখে রাখিয়া এই প্রণালীতে করিলেই ভাল হয়। *

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

* হেমিন, ডবল সেলাই ইত্যাদির বিষয় জানিতে হইলে গত ভাদ্র মাসের "মাসিক বসুমতী" দ্রষ্টব্য।

প্রাচ্যে নারী-জাগরণ

উত্তর-আফ্রিকা

মিশর ব্যতীত আফ্রিকার আরও কয়টি মুসলমান রাজ্য আছে, তন্মধ্যে আরব-মুরদিগের রাজ্যই প্রধান। ট্রিপলি, ফেজ, টিউনিস, আলজিয়ার্স ও মরক্কো,—এই কয়টিই মুসলমান-প্রধান দেশ। তবে এ সকল দেশে ইটালী, ফ্রান্স ও স্পেন দেশের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি স্বীকৃত। আলজিয়ার্স খাঁটি ফরাসী উপনিবেশ, মরক্কো অর্দ্ধেক ফরাসী; অর্দ্ধেক স্পেনীয়, টিউনিস ও ফেজ অর্দ্ধেক ফরাসী এবং ট্রিপলি ইটালিয়ান। য়ুরোপীয় শক্তিরা এই কয়টি রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও এই উত্তর-আফ্রিকার লোকসংখ্যার মধ্যে য়ুরোপীয়, ইহুদী, গ্রীক ইত্যাদি নানা জাতীয় লোক থাকিলেও মূলতঃ দেশ মুসলমান এবং মুসলমান আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মই এই দেশে প্রচলিত। মুষ্টিমেয় বিদেশীর রাজনীতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকিলেও সামাজিক ও শিক্ষাদীক্ষাদি ব্যাপারে মুসলমান প্রভাব সমধিক বিদ্যমান।

উচ্চবংশীয়া কাবিল-মহিলা

কিন্তু তথাপি এই উত্তর-আফ্রিকার 'কাবিল নারীদের মধ্যে যে মুক্তির আন্দোলন হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্ময় অনুভব করিতে হয়। এই কঠিন মরুভূর কঠিন আরব-মুরদের মধ্য হইতে কাবিল নারীরা কেমন করিয়া পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাউক।

স্বীকার করিতে হইবে যে, ফরাসী সরকারের কার্য্যের পরোক্ষ প্রভাব ইহাদের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া এই নারীমুক্তির আন্দোলন সম্ভবপর হইয়াছিল। কাবিলরা যোদ্ধজাতি, উহাদের মধ্যে অনেকে ফরাসীর ঔপনিবেশিক সেনাদলে নাম লিখাইয়াছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ঐ সকল সেনা ফ্রান্স ও বেলজিয়াম প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিহত অথবা আহত ও বিকলাঙ্গ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, ফরাসী সরকার তাহাদের জননী, পত্নী ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই নারীরা হাতে হাতে বৃত্তি পাইত। ইহা হইতেই তাহাদের মনে ধীরে ধীরে একটা আত্ম-সম্মান-জ্ঞান এবং আত্মাধিকার-জ্ঞান জাগিয়া উঠে। কাবিল নারীরা তখন হইতে মনে করিতে থাকে যে, কাহারও অধীন বা গলগ্রহ না হইয়া তাহারাও ত নিজের ভরণপোষণ সম্পাদন করিতে পারে। এত দিন সংসারে তাহাদিগকে ক্রীতদাসীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতে হইত, দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন জঠরানলনিবৃত্তির জন্য প্রাপ্ত হওয়া কেবল তাহাদের দাসীবৃত্তির উপরেই নির্ভর করিত। তাহারা অন্তরে এই দাসীবৃত্তির উপর বিরক্ত ছিল এবং উহা যে তাহাদের সময়ে সময়ে অসহ্য বলিয়া বোধ হইত, তাহার প্রমাণ মাঝে মাঝে প্রকাশ্য আদালতের মামলাতেও পাওয়া যাইত।

এ দিকে কাবিল পুরুষদেরও মধ্যে একটি ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধের জন্য নানা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছিল, জগতের নানাজাতির নানাধর্ম্মীর আচার-ব্যবহারের সহিত পরিচিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের

কূপমণ্ডূকত্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটা দৃষ্টির ও ভাবের উদারতা আসিয়া অন্তরে স্থান করিয়া লইয়াছিল। যাহারা ফ্রান্সে গিয়াছিল, তাহারা তথায় গৃহস্থগৃহে নারীর স্থান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা যখন দেখিল, ফরাসী গৃহস্থের পত্নী তাহার স্বামীর অধীন ক্রীতদাসী নহে, বরং তাহার সঙ্গিনী—সমান অধিকারে অধিকারিণী ; যখন তাহারা দেখিল, পথে, ঘাটে, রেলে, মোটরে নারীকে পুরুষ সর্ব্বত্র সম্মান ও শ্রদ্ধা করে,—তখন তাহাদেরও সংসারে নারীর সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহারাও ক্রমে বুঝিতে লাগিল যে, নারী ক্রীতদাসী বা খেলিবার পুত্তলিকা নহে, তাহারও একটা সত্তা আছে, সংসারে তাহারও একটা বিশেষ স্থান ও অধিকার আছে, পরন্তু তাহার প্রতি তাহার স্বামীরও একটা গুরু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে। এই সকল সৈনিক পুরুষ ও সেনানীর মধ্যে যাহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারাও নারীর মুক্তির আন্দোলনে সানন্দে ও সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কাগজে-কলমে কাবিল নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় এ বিষয়ে তাহারা সুবিচার প্রাপ্ত হইত না, এ বিষয়ে নারীর অপেক্ষা পুরুষের স্বার্থই সমধিক রক্ষা করা হইত। নারী প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছেদের দাবী করিতে পারিত না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কোন এক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় আপীল আদালত নারীর এই দাবী সমর্থন করেন। এই রায় কাবিল নারীর অধিকার সাব্যস্ত করিয়া দিবার পক্ষে এক প্রধান নজীর বলিয়া ধরা হয়। ইহার পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কাবিল-নারীদিগের দুরবস্থার প্রতীকারকল্পে ফরাসী সরকার প্রজার অনুরোধে একটি কমিশন বসান। কমিশন বসান অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, যুদ্ধের জন্য বিস্তর কাবিল-পুরুষকে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিতে হইয়াছিল (সৈন্যশ্রেণীতে নাম লিখাইবার জন্য) ; এই হেতু গ্রামে বহু নারীকে অভিভাবকহীন অবস্থায় সংসার চালাইতে হইয়াছিল ; অথচ এরূপভাবে স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া সংসার চালাইবার অধিকার তাহারা এ যাবৎ কখনও উপভোগ করে নাই, সে অভিজ্ঞতাও তাহাদের ছিল না ; কাবিল-পুরুষরাও সেই জন্য বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের প্রচলিত আচার-ব্যবহারের কিছু কিছু সংশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। কি ভাবে ঐ পরিবর্ত্তন করা উচিত, তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কমিশন বসান হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্য কাবিলদিগের সামাজিক কত যে ওলট-পালট হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পুরুষদের অনুপস্থিতি হেতু কাবিল-নারীদিগকেই সংসার চালাইতে হইত এবং নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে হইত। এ জন্য তাহাদিগকে প্রায়শঃ সরাসরি ফরাসী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত কথা কহিতে এবং কায করিতে হইত। বিশেষতঃ বিবাহাদি কার্য্যের এবং পেন্সন লইবার জন্য তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অতি অবশ্য যাইতে হইত, না হইলে সহজে কার্য্যোদ্ধার হইত না। এই জন্য তাহারা ক্রমশঃ পর্দ্দা ও বোরখার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

লিবীয় মরুবাসিনী সুন্দরী

যাহা হউক, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কমিশন বসিল। প্রথম অধিবেশনে কমিশন স্থির করিলেন যে, কাবিল-নারীদিগের সামাজিক অবস্থার উন্নতির উদ্দেশে কেন্দ্রে কেন্দ্রে বালিকাবিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যদি তাহা অচিরাৎ সম্ভবপর না হয়; তাহা হইলে

যত দিন বালিকাবিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত দিন বালকদিগের বিদ্যালয়েই বালিকারা শিক্ষালাভ করিবে। আপাততঃ কাবিল বালিকাদিগকে লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষাদান করা বিশেষ প্রয়োজনীয়; পরন্তু ঐ সঙ্গে শিশুপালন, মাতৃমঙ্গল এবং গৃহস্থালী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাদান করাও কর্ত্তব্য।

কমিশন আরও সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করিবার উদ্দেশে কাবিল নরনারীর মধ্যে অবিশ্রান্ত প্রচারকার্য্য চালাইয়া তাহাদিগকে সেই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। বহু সাক্ষ্য গ্রহণের পর, বহু তর্কবিতর্কের পর কমিশন পরামর্শ দিলেন;—

(১) রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে বিবাহের বাগ্‌দান সম্বন্ধে ঘোষণা করিতে হইবে; না করিলে আইনানুসারে অপরাধীকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

(২) নারীর বিবাহের বয়স ১৫ বৎসরের ন্যূন হইতে পারিবে না।

(৩) কয়েকটি বিশেষ কারণে নারীর বিবাহবিচ্ছেদ দাবী করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) যে স্বামী পত্নীকে তালাক দিবে, তাহার পত্নীর "ছাড়ের টাকায়" (Ransom money) কোনও দাবী থাকিবে না। কাবিল আইন অনুসারে তালাকের পর পত্নী যদি পুনরায় নূতন পতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বামীর হস্তে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দণ্ড দিতে হয়; উহাকে 'ছাড়ের টাকা' বলে।

(৫) মৃত পতির সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার স্বীকৃত হইবে। পিতা ও মাতার সম্পত্তিতে কন্যা ও দৌহিত্রীদের অধিকার স্বীকৃত হইবে। মুসলমান আইন অনুসারে নারী সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে। কিন্তু ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কাবিলদের এক কানুন গঠিত হয়; ঐ কানুন অনুসারে কাবিল-নারীরা সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। এই অন্যায় দূর করিবার উদ্দেশে এই সর্ত্তটি গঠন করা হইল।

কমিশন এই যে পরামর্শ দিলেন, ইহা কেবল পরামর্শরূপে গৃহীত হয় নাই, ইহা গভর্ণমেণ্টের 'ডিক্রী' বা অনুজ্ঞা বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল। ইহা নিশ্চিত যে, যখন এই ব্যবস্থার পশ্চাতে সরকারের অনুজ্ঞা আছে, তখন উহা আশু ফলপ্রদ হইবে, এবং তাহার ফলে উত্তর-আফ্রিকার ফরাসী রাজ্যে মুসলমান নারীর সামাজিক অবস্থা দিন দিন উন্নত হইবে।

তুয়ারেগ খৃষ্টান তরুণী

কাবিলদিগের প্রতিবেশীদিগের নাম 'তুয়ারেগ।' উহাদের নারীর অবস্থা অনুন্নত নহে। ইহার এক বিশেষ কারণ আছে। এই জাতির নারীরা চিরদিনই আপনাদের অধিকার ও বিশেষ স্বার্থ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। এমন কি, যেখানে তাঁহাদের অধিকার ও স্বার্থের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মের (মুসলিম) সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেখানে তাঁহারা ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন প্রদান করেন। তুয়ারেগ নারীরা চিরদিন তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অবাধে পুরুষের সহিত মিলামিশা করেন। পুরুষ ও নারীর মিশ্র সভা-সমিতিতে তাঁহারা সভানেত্রীর আসন অধিকার করিয়াছেন, সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র রক্ষা করিয়াছেন, কাউন্সিল কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছেন, আপনাদের সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যে তাঁহাদের জন্য আরও অধিকার ও বিশেষ স্বার্থ আদায় করিতে ক্ষান্ত হইবেন না, ইহা নিশ্চিত।

উত্তর-আফ্রিকায় অন্যান্য অংশেও নারীর অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য অল্পবিস্তর চেষ্টা চলিতেছে। এ বিষয়ে সে সকল দেশের নারীদের তুয়ারেগদের মত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, সে চেষ্টা সরকারের পক্ষ হইতেই হইয়া থাকে। ইহারও মূলে গত জার্ম্মাণ যুদ্ধ নিহিত আছে, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কারণ, যুদ্ধের পূর্ব্বে এ বিষয়ে সরকারের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় নাই।

আলজিরিয়া, টিউনিস ও মরকো দেশে নারীর (সামাজিক) অবস্থা সন্তোষজনক নহে। তবে অধুনা বহু সুনিয়ন্ত্রিত বালিকা-বিদ্যালয় ঐ সকল দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ, আলজিরিয়ার মাত্র শতকরা ২টি নারী শিক্ষাপ্রাপ্তা, টিউনিসে ইহারও কম এবং মরক্কোয় শিক্ষাপ্রাপ্তা নারী নাই বলিলেও হয়।

সিরিয়া

সিরিয়া দেশে তিন সম্প্রদায়ের নারী দেখা যায়;—(১) মুসলমান, (২) দ্রুজ, (৩) খৃষ্টান। এই তিন শ্রেণীর নারীর মধ্যেই অধুনা একটা জাগরণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই নারীদের মধ্যে একটা নারী-আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে বেরুট বন্দরে একটি নারীসমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উহার সদস্যসংখ্যা সমধিক। সমিতির সভায় নারীর স্বার্থ সম্পর্কে প্রায়শঃ আলোচনা ও বিচার-বিতর্ক হইয়া থাকে। তবে এখনও সিরিয়া হইতে পর্দ্দা বা অবগুণ্ঠন বিতাড়িত হয় নাই। সে দেশে পুরুষের বহু বিবাহ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা অত্যন্ত অধিক। ইহাতে অনুমান হয় যে, তথায় দাম্পত্য-জীবন সুখকর নহে।

সিরীয় সুন্দরী

সিরিয়ার 'প্রতিবেশী' রাজ্যসমূহে এ যাবৎ শিক্ষার যেরূপ প্রচার হইয়াছে, সিরিয়ায় তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তথায় অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, পরন্তু বেরুট সহরে নারী শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি ট্রেণিং কলেজ আছে। আজ দুই পুরুষ যাবৎ বেরুট, দামাস্কাস ও অন্যান্য বড় বড় সহরে বালিকা-বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তথায় বহু নারী শিক্ষালাভ করিয়া উন্নতিমার্গে পদার্পণ করিয়াছেন।

যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই বেরুটে একটি নারীসমিতির অস্তিত্ব ছিল। ঐ সমিতির সভার অধিবেশনে আত্ম-নির্ভরশীলা (অর্থাৎ যাঁহারা নিজেই নিজের জীবিকা অর্জ্জন করেন, এমন নারী) নারীরা যোগদান করিয়া থাকেন। বেরুট ও দামাস্কাসের বহুসংখ্যক হাঁসপাতালে সিরীয় নারী নার্স-রূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এখনও হইতেছেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধাবসানের পর হইতে বহু সিরীয় নারী সরকারী ও অন্যান্য দপ্তরে চাকুরী করিতেছেন।

এ দিকে সিরিয়ায় অনেকগুলি য়ুরোপীয় ও আমেরিকান খৃষ্টান মিশনের সম্পর্কে আসিয়া তত্রত্য নারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় এবং স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অন্ততঃ সহরের অধিবাসিনী সিরীয় নারীদিগের সম্বন্ধে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ বিষয়ে সিরিয়ার নারীরা পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের নারীদিগের অপেক্ষা সমধিক উন্নত।

প্যালেষ্টাইন

প্যালেষ্টাইনের নারীরাও সিরিয়ার নারীদের মত সরকারী ও অন্যান্য দপ্তরে চাকুরী করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শেষোক্ত নারীদের মত সংস্কারকামিনী নহেন। রাজনীতিতে তাঁহাদের বিশেষ আস্থা নাই। শিক্ষাসম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। প্যালেষ্টাইনের ইহুদী নারীদের আন্দোলনের পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যায়। ইহুদী নারীদিগের মধ্যে পর্দ্দা বা বোরখার প্রথা নাই।

ইরাক বা মেসোপটেমিয়া

ইরাক মুসলমানপ্রধান দেশ। এখানেও নারীদিগের মধ্যে জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়। কিছু দিন হইতে এখানে নারী-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে রাজধানী বোগ্দাদে একটি নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, উহার বহুসংখ্যক সদস্যই মুসলমানমহিলা। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে এই নারীসমিতির নিয়মকানুন যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন উহা লইয়া বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, কতকটা সোরগোলও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু এখন সে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ নিবৃত্তি পাইয়াছে, ইরাকের নারী-আন্দোলন এখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

বৎসর তিন চার পূর্ব্বে ইরাকের সরকারী বালিকাবিদ্যালয়-সমূহ হইতে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় যে, 'বয়-স্কাউট' প্রতিষ্ঠানের মত 'গার্ল গাইড' প্রতিষ্ঠানেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু যখন সত্য সত্য বোগদাদের রাজপথে 'গার্ল গাইড'রা বাহু দোলাইয়া নিশান উড়াইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইল, তখন প্রাচীনপন্থীরা সেই 'ভীষণ' দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিলেন। বোগদাদের আরবী দৈনিক সংবাদপত্র 'মুফতিদ্' যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"সে দিনের প্রতীচীর সভ্যতা আমাদের বালিকাবিদ্যালয়সমূহের মারফতে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের জাতীয় সনাতন ভাবধারার সহিত এবং আমাদের নারীর শ্রীলতা, শালীনতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত এই নবীন সভ্যতা আদৌ খাপ খাইতেছে না। 'গার্ল গাইড' আন্দোলন আমাদের জাতীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে দেশ ৫ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া অজ্ঞানতার অন্ধতামসে পড়িয়া আছে, তাহার ভিতরে এই ভাবের পরিবর্ত্তন আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য শিক্ষা সম্বন্ধে আরব জাতির সনাতন ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থাদি করা আমাদের শিক্ষাসচিবের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

'মুফতিদ্' যাহাই বলুন, ইরাকেও কিন্তু ধীরে ধীরে আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতার আদর্শে নানা পরিবর্ত্তনের স্রোত সঞ্চারিত হইতেছে। ইহা কালের ধর্ম্ম। কালের স্রোত রুদ্ধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সকল দেশেই নূতনত্বের বিরোধী দল থাকিবেই, প্রাচীনপন্থী সংস্কারবিরোধী লোক নাই, এমন দেশ পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং ইরাকেও যে 'মুফতিদে'র মত সংস্কারবিরোধী প্রাচীন-পন্থী থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

তাই দেখা যাইতেছে, ইরাকবাসী তরুণ আরবদিগের প্রবল ইচ্ছার স্রোতে প্রাচীনপন্থীদিগের বাধার মত্তমাতঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। ইরাকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে বালিকা-বিদ্যা-লয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতেও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই; ইরাকবাসী আরবরা আরও বালিকা-বিদ্যালয় চাহি-তেছে। বর্ত্তমানে ইরাকে ৪ সহস্রাধিক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বোগদাদ, মসুল, বসোরা ও আমারায় উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়সমূহ (Secondary Girl's Schools) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, আরব বালিকাদিগকে ব্যায়াম ও খোলা মাঠে খেলায় অভ্যস্ত করা হইতেছে। এখন বালিকা খেলো-য়াড় দলসমূহের মধ্যে খেলার প্রতিযোগিতাও চলিতেছে। পারিতোষিকাদি দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে। যাহাকে ইংরাজীতে বলে Camraderie অথবা ফরাসীতে বলে Espirit de Corps অর্থাৎ দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সখ্য, আরব বালিকাদের মধ্যে তাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারা দেশের সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদিতে ব্যুৎপন্ন হইতেছে, কেহ কেহ উহাতে পারদর্শিতাও লাভ করিতেছে। কি ভাবে বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হইবে, তাহাও আরব শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিখাইবার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোগদাদে সন্তান-জননীদিগকে শিশুপালন, মাতৃমঙ্গল ও গৃহস্থালীর বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

ইরাকের নূতন গভর্ণমেণ্ট দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। এখন ইরাকে লোক নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে পারে, যত্রতত্র যাতায়াত করিতে পারে, এখন তথায় লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ, ব্যবসায়-বাণিজ্যও কতক পরি-মাণে নিরাপদ। যে জাতি শান্তিতে বসবাস করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহারা অন্যদিকে যতই ক্ষতিগ্রস্ত হউক, (অর্থাৎ

সমরপ্রিয়তা ও শৌর্য্য যতই নষ্ট করুক) তাহাদের শিক্ষা ও মানসিক উন্নতিসাধন করা বিশেষ সম্ভবপর হয়। ইরাকেও তাহাই হইতেছে। মরুভূমির আরবরা পার্ব্বত্য আফগানদের মতই দুর্দ্ধর্ষ সমরপ্রিয় জাতি ছিল। কিন্তু ইংরাজ-শাসনের সম্পর্কে আসিয়া ক্রমে তাহারা আমাদেরই মত শান্তিপ্রিয় 'নিরীহ' জাতিতে পরিণত হইতেছে। লোকের কায না থাকিলে খুড়ার গঙ্গাযাত্রা করাইয়া থাকে, ইহা বাঙ্গালাদেশের প্রবাদ। যখন আরবরা লুঠপাট করিত, বংশানুক্রমে রক্ত-দর্শন করিত, তখন তাহাদের অনেক কায ছিল। এখন ইরাকের 'শান্তিরক্ষকরা' সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাযেই ইরাকের পুরুষরাও বোধ হয় 'কাযের অভাবে' এখন 'শিক্ষা স্বাস্থ্য' আদি ছোট-খাটো কাযেই আত্ম-নিয়োগ করিতেছে। তাহারা যদি এ দিকে উদ্যোগী না হইত, তাহা হইলে কেবল গভর্ণমেণ্টের ডিক্রীতে অথবা নারী-আন্দোলনের ফলে স্ত্রী-শিক্ষা তাহাদের দেশে বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিত না।

তবেই বুঝা যাইতেছে, ইরাকের আরবদের মধ্যে নারীর শিক্ষা ও অধিকার লইয়া একটা ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আরব পুরুষরা শান্ত ও 'সভ্য' হইয়া আপনাদের নারী-দিগকে মানসিক উন্নতির পথে যাইতে দিতেছে। পুরুষ ও নারীর যোগাযোগে ইরাকে নারীর উন্নতি সাধিত হইতেছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

শ্রাবণ উতরোল

শ্রাবণ উতরোল
গোপনে দিল দোল্
সজল বরিষার
নয়ন ঢুলে তার
পরাণে শিহরণ
বাজিছে অনুখন
কদম শিহরায়—
বুকেতে কি ঘনায়
যাতনা সুনিবিড়
কত না রজনীর
মালতী-বধূ আজ
বিফল হ'ল সাজ
বিরহ নিদারুণ
বঁধু যে অকরুণ
নিবিড় বরিষার
জাগিল অভিসার'
যামিনী আঁধিয়ার
কামিনী নায়িকার
ফুটিল সন্ধ্যায়
শ্রাবণ প্রাতে হায়
যামিনী হ'ল শেষ
মানিনী পর বেশ
বেলা সে অবেলায়
বাদল 'ঝুম্-ঝাম্
পাগল নিবারণ
কেবলি অকারণ

কেতকী-বনে;—
কত কি মনে!
পাগল চুমে,—
নিবিড় ঘুমে।
বুকে কি তৃষা
পায় কি দিশা!
পুলক লাগে;
কামনা-রাগে।
কাতর প্রাণে
বিফল গানে।
সজল আঁখি;—
সকল ফাঁকি।
ঘুচিল না যে;
বাদল-সাঁঝে।
সজল গীতে
কামনা চিতে।
লুপ্ত দিশি;—
বিফল নিশি।
যে ফুলগুলি
পরশে ধূলি।
বঁধু না এল;—
নয়ন মেল।
ফুটিয়া সাঁঝে
মরিল লাজে।
শোনে না কানে;
ঘোম্‌টা টানে।

বালিকা বেলি তাই
বোঝে না কেন ছাই
টগর পথ চায়
ডাগর চোখ হায়!
শ্রাবণ উতরোল
বুকেতে কলরোল
বাদল-ধারে জল
টগর-বধূ বল্
করবী পরি সাজ
গরবী হ'ল আজ
কেয়ার চোখ চায়
দেয়া যে গরজায়
বকুল জাগি' রাত
প্রভাতে হ'ল কাত
চাঁপা সে টুক্‌টুক্
সোহাগে ভরা বুক
চাঁপা লো খোঁপা আজ
শ্রাবণ-ধারা মাঝ
যুঁই লো তুই কোন্
ঝরিলি বল্ বোন্
বাসর জাগি' কার
প্রভাতে মুখ-ভার
অশ্রু ঝরে তোর
ঝরালি আঁখি-লোর

কাঁপিয়া মরে;
নয়ন ঝরে।
নাগর লাগি';—
ব্যথানুরাগী।
নিবিড় ব্যথা;
গোপন কথা।
নিবিড় হেন;
উদাসী কেন?
কত না ছলে
সোহাগে গ'লে।
কাহার দিশা;—
বুকে কি তৃষা।
বিলাস-সুখে
ধরণী-বুকে।
লাজুকে বধূ,
ঠোঁটেতে মধু।
ফেল্ না খুলি'—
আপনা ভুলি'।
নিঠুর ঘায়ে
মাটীর পায়ে?
সকল রাতি
মলিন-ভাতি।
নয়ন-পাতে;
কি বেদনাতে!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

ঘাটের পথে

বসুমতী প্রেস]

শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা।

গাড়ীর আড়ি

সে অনেক দিনের কথা। আমি ট্রেণে চ'ড়ে কর্ম্মস্থান কল্‌কাতা থেকে বাড়ী যাচ্ছিলাম। গাড়ীর কামরা লোকে ভর্ত্তি। পূজার প্রাক্কাল। গাড়ী শ্রীরামপুর ষ্টেসন ছেড়ে ছুটে চল্‌লো কতো মাঠ-ঘাট পেরিয়ে, কতো ষ্টেসন ডিঙিয়ে। গাড়ী শেওড়াফুলি ষ্টেসনে না থেমেই ছুটে চল্‌লো। গাড়ীতে এক জন যাত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে মুখ শুকিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ স্বরে বল্‌লে—গাড়ী শেওড়াফুলিতে ধর্‌লো না? আমি তো বরাবর এই গাড়ীতে আসি, শেওড়াফুলিতে নামি; আজ ধর্‌লো না কেন?

আমি বল্‌লাম—কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেন নি, আজ থেকে গাড়ীর টাইমিং আর ষ্টপেজ্ বদ্‌লে গেছে?…… হাবড়া থেকে শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর ছেড়ে একবারে ব্যাণ্ডেল, আর ব্যাণ্ডেল ছেড়ে বর্দ্ধমানে গিয়ে থাম্‌বে। এ গাড়ীটা প্যাসেঞ্জার হ'লেও এক্সপ্রেসের মতন হয়েছে……

সে ভদ্রলোক নাম্‌বে ব'লে উঠে দরজার কাছে গিয়েছিলো; আমার কথা শুনে হতাশ হয়ে ব'সে পড়লো আর কাতর স্বরে বল্‌লে—আমাকে ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত উজিয়ে যেতে হবে, আবার ফিরে ভাটিয়ে আস্‌তে হবে! ব্যাণ্ডেলে থাম্‌বে তো, না একেবারে বর্দ্ধমান না আসানসোল গিয়ে দম নেবে?

আমি তাকে আশ্বাস দেবার জন্য হেসে বল্‌লাম—না, ভয় নেই আপনার, ব্যাণ্ডেলে থাম্‌বে।

গাড়ীর এক কোণে এক জন অতিবৃদ্ধ শীর্ণকায় বিদেশী মুসলমান ব'সে ছিলো; সে ক্ষীণ ম্লান হাসি হেসে ভাঙা ভাঙা বাঙ্‌লায় বল্‌লে—গাড়ী থাম্‌তেও পারে, না থাম্‌তেও পারে। আপনি বল্‌ছেন ব্যাণ্ডেলে থাম্‌বে, ভয় নেই। কিন্তু ভরসাই বা কি? একবার তো একখানা গাড়ী আড়াই শো মাইলের মধ্যে একবারও থামে নি।

সকল যাত্রীর নজর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে ধাবিত হলো। আমি দেখ্‌লাম, তার চুল দাড়ি সব সাদা, বকের পালকের মতন ধবধবে আর ফুরফুরে; তার দেহ দুর্ব্বল, মনে হলো, তার অঙ্গ যেনো পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। তার বয়স ষাটও হ'তে পারে আর আশী নব্বইও হ'তে পারে।

এক জন যাত্রী তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সে গাড়ী বুঝি স্পেশ্যাল ছিলো?

বৃদ্ধ কম্পিত ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে—না, যাত্রীগাড়ীই ছিলো। সেই গাড়ীর সেকেণ্ড এঞ্জিন-ড্রাইভার ছিলাম আমি। আমার উপরওয়ালা হেড ড্রাইভার ছিলো টার্ণার সাহেব। আমরা এক শো মাইলের মধ্যে গাড়ী থামাতে পারি নি,…… গাড়ী আপনি যদি না থাম্‌তো, তা হ'লে হয় তো গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুবে যেতো কিংবা কোনো কিছুতে ধাক্কা লেগে উল্টে পড়্‌তো, আর শত শত লোক মারা পড়্‌তো……

সকল যাত্রী কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ঘুরে বস্‌লো আর উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সে কি ব্যাপার হয়েছিলো মিঞা সাহেব? আপনি মেহেরবাণী ক'রে বলুন, আমরা শুনি……গাড়ী তো এখন শীগ্‌গির থাম্‌ছে না।

বৃদ্ধ তার শীর্ণ মুখে আবার ক্ষীণ হাসি হেসে বল্‌লে—কখনো থাম্‌বে কি না, তাই বা কে বল্‌তে পারে?……সে অনেক কাল আগের কথা। পঞ্চাশ বছর হবে। তখন এতো সব নতুন নতুন রেল-লাইন হয় নি; তখন ছিলো লুপ লাইন আর কর্ড লাইন। আমি ছিলাম লুপ লাইনের ট্রেণের সেকেণ্ড ড্রাইভার। ট্রেণ সাহেবগঞ্জ থেকে ছেড়েছে; গার্ড আর ড্রাইভার বদল হয়েছে; এবার ট্রেণের চার্জে আছি টার্ণার সাহেব আর আমি। সেও এমনি সময়ে হবে……বর্ষার শেষ-দিকটায়। গাড়ী একে লুপ লাইনের, তায়

মিক্সড্ প্যাসেঞ্জার, ঢিমা তালে ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলেছে, ছুটে চল্‌বার তার জো নেই, পদে পদে তাকে থাম্‌তে হবে। সমস্ত দিনটা গুমোট গরম হয়েছিলো ; তার উপর এঞ্জিনের গরমে আমাদের দম যেনো আটকে যাচ্ছিলো। বিকাল বেলাটায় সমস্ত আস্‌মানটা যেনো থম্‌থম্ করতে লাগলো, মনে হ'লো ঝড় উঠ্‌বে। সন্ধ্যা হলো ; রাত্রি হ'তে চল্‌লো।

ইলেক্‌ট্রিক লাইটের সুইচ তুলে দিলেই যেমন নিমেষ-মধ্যে সমস্ত অন্ধকারে ঢেকে যায়, তেমনি হঠাৎ আকাশটা ঘোলাটে অন্ধকার হয়ে উঠ্‌লো. আকাশে একটা তারাও রইলো না, চাঁদের চিহ্নও থাক্‌লো না। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চম্‌কে আকাশখানার এপার থেকে ওপার ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগলো, আর তার পরেই কালীগোলা অন্ধকার ঘন হয়ে চারিদিক ঘিরে ফেল্‌ছিলো।

আমি সাহেবকে বল্‌লাম— খুব পানি বর্ষাবে।

সাহেব বল্‌লে—ঢের আগেই পানি বর্ষানো উচিত ছিলো, যে গরম! কিন্তু একে অন্ধকার, তার উপর বৃষ্টি হ'লে চোখে আর কিছু শুঝ্‌বে না······তোমাকে চোখের পাতা চেড়ে সিগ্‌ন্যালের সন্ধান করতে হবে।

আমি বল্‌লাম—কুছ পরোয়া নেই, আমার চোখের জলুষ বিল্লির মতন চোখা আছে, আঁধারেও সিগ্‌ন্যাল মালুম হবে।

কথা বল্‌তে বল্‌তে বৃষ্টি এলো···মুষল-ধারে, মনে হ'লো যেনো এক আকাশ জল হঠাৎ আকাশ উল্টে চ'ল্‌কে পড়্‌ছে! সঙ্গে সঙ্গে সে কি বিষম মেঘের ডাক!

ট্রেণ ছুটে চলেছে···ঝড়ের দিকে···বৃষ্টির ব্যূহের মধ্যে··· ঝড়-বৃষ্টিকে ধর্‌বার জন্যই যেনো ট্রেণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে! চারিদিকে কালীগোলা ঘন অন্ধকার ; কালীর সমুদ্রের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি প্রবল বেগে ঘূর্ণীপাক খেয়ে মাতামাতি করছে ; আর তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে পাগল বেগে প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতন সেই ট্রেণখানা! আমাদের মনটা ভয়-ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো, গাটা ছম্‌ছম্ কর্‌তে লাগ্‌লো!

বজ্রাঘাতের শব্দে ডুবে গেলো ট্রেণ ছোটার উৎকট শব্দ, এঞ্জিনের নিশ্বাস ছাড়ার ফোঁসফোঁসানি!

এঞ্জিনের বয়লারের নীচের ফার্‌নেসের দরজা খুলে দিলাম, যদি গন্‌গনে আগুনের আলোয় জমাট অন্ধকার একটুখানি পাত্‌লা হয়। দেখ্‌লাম যে, এঞ্জিনের চোঙ্ দিয়ে হুড়হুড় ক'রে জল গড়িয়ে এসে আগুন নিবিয়ে দেবার জোগাড় করেছে। নতুন কয়লা কোদালে ক'রে ক'রে আগুনের উপর চাপিয়ে দিলাম। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে চোঙের মুখে ছুট্‌লো ; বৃষ্টির জলস্রোত চায় চোঙের মধ্যে ঢুকতে আর ধোঁয়া চায় চোঙ ছেড়ে বেরুতে ; জলে ধোঁয়ায় ঠেলাঠেলি লেগে গেলো ; কালো ধোঁয়ায় মেঘ্‌লা রাতের অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠ্‌লো।

অন্ধ উন্মত্ত অজগরের মতন ট্রেণ ছুটে চলেছে।

আমাদের অস্তিত্বটাই অনুভব কর্‌বার জন্য আমি এঞ্জিনের বাঁশী বাজাবার চেন ধ'রে টান মার্‌লাম। এঞ্জিনের বাঁশী তীক্ষ্ণ চীৎকারে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে যেনো চার-পাঁচটা বজ্রাঘাতের শব্দ হলো এঞ্জিনের ডাইনে বাঁয়ে! রেল-লাইনের ধারেই একটা শাল-গাছের মাথায় বাজ পড়েছে···গাছটা আকাশ-জোড়া অন্ধকারকে দাঁত ভেঙিয়ে দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো! একটা বাজ তীরের মুখের রূপার ফলার মতন ছুটে এসে ট্রেণের পাশে মাটিতে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে মাটিতে গেঁথে গেলো।

আমিও চোখ বুজে মুখ থুব্‌ড়ে এঞ্জিনের অল্পপরিসর মেঝের উপর প'ড়ে গেলাম।

কতোক্ষণ অম্‌নি তাল পাকিয়ে অসাড় নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে ছিলাম, জানি না। আর একটা বজ্রনাদে আমার চেতনা ফিরে এলো! বিদ্যুতের আলোতে দেখ্‌লাম, আমি মাথা কাত ক'রে এঞ্জিনের মেঝেতে প'ড়ে আছি।

উঠ্‌তে ইচ্ছা করলাম। শরীরে চেষ্টা নেই। একটা বিরাট হাতুড়ির ঘায়ে যেনো আমার শিরদাঁড়াটা থেঁৎলে গেছে, অঙ্গসঞ্চালনের শক্তি নেই, ঘাড় তোল্‌বার ক্ষমতা নেই, হাড়গুলো যেনো গুঁড়িয়ে গেছে। অথচ কোনো অঙ্গে একটুও বেদনা-বোধ নেই!

ডাকতে চাইলাম টার্ণার সাহেবকে। মুখ থেকে কথা ফুট্‌লো না। সমস্ত শরীরটা আমার গায়ের জামার মতনই অচেতন, অথচ আমার চেতনা আছে! আমার অঙ্গ আমার বশ নয়, অথচ মনে ইচ্ছা আছে! এ যে কি ভয়ানক অবস্থা, তা ব'লে বোঝানো শক্ত!

কেবল চোখ দুটো ছিলো খোলা। অন্ধকার আর অন্ধকার ; আর অন্ধকার চিরে চিরে বিদ্যুতের মাতামাতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন ক্লান্ত হয়ে উঠছিলো ; চাইলাম চোখ

বুজুতে। চোখের পাতা কে যেনো টেনে জ্বর সঙ্গে এঁটে গেঁথে দিয়েছে। চোখের উপর দিয়ে কালীর আর জ্বালার স্রোত কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ব'য়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

এঞ্জিনের উপর নেতিয়ে প'ড়ে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শুধু অনুভব করছি অনিবার অবারণ চলা! এঞ্জিন পুরা দমে ছুটে চলেছে। অসংখ্য তীরের ফলার মতন বৃষ্টির ধারা এসে আমার মুখের উপর পটপট ক'রে বিঁধছে।

চোখ খোলাই আছে; চোখের সাম্‌নে টার্ণার সাহেব নেই। চোখ ফিরিয়ে যে দেখবো আশে-পাশে কোথায় কি অবস্থায় টার্ণার সাহেব আছে, তারও জো নেই, ডেকে যে সাড়া নেবো, তারও উপায় নেই।

মনের সমস্ত ইচ্ছা চোখের তারায় প্রয়োগ ক'রে চোখের তারা ঘুরিয়ে দেখলাম, এঞ্জিনের মধ্যে টার্ণার সাহেব নেই! ভয়ে আমার অবশ শরীর যেনো জল হয়ে গ'লে গেলো······শুধু আমার চেতনা আছে, অথচ আমার শরীর নেই, আমি যেনো আমার অশরীরী প্রেতমূর্ত্তি, আমি আমার ভূত! নিজেকেই নিজের ভয় করতে লাগলো!

একটা ষ্টেসন পার হয়ে ট্রেণ আবার অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো; ষ্টেসনের আলো ক্ষণিকের জন্য আমার চোখের উপর প'ড়ে পিছনে চ'লে গেলো। আমি যেনো সৃষ্টির আদিম যুগের প্রাণ-পদার্থ, গতিরথে চ'ড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, তারা থেকে তারায় ছুটে চ'লেছি অন্ধকার অসীম আকাশের পথ বেয়ে! কতো লক্ষ যোজন দূর থেকে শুরু হয়েছে এই যাত্রা, কতো কোটি মাইল দূরে গিয়ে এর গতি স্থগিত হবে, তা কে জানে! আমি যেনো উল্কা, আমি যেনো ধূমকেতু, অসীমের শেষ কিনারায় ছুটে চলেছি!

বিদ্যুৎস্ফুরণ কম হয়ে এসেছে······বজ্রাঘাতে সব বিদ্যুৎ ফুরিয়ে গেছে, অথবা ট্রেণটাই বজ্র-বিদ্যুতের রাজ্য ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে চলেছে। চোখের সাম্‌নে শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার! সমস্ত অন্ধকারটা যেনো উদ্দাম দুর্দ্দম বেগে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা ষ্টেসন, আলোক-বিন্দুর মতন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতন অন্ধকারের মাঝখানে চকিতে ফুটে উঠেই তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে······অন্ধকার ঘনতর হয়ে উঠছে!

ধীরে ধীরে চেতনার মধ্যে সংজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। টার্ণার সাহেব এঞ্জিনে নেই······বজ্রাহত হয়ে সে এঞ্জিন থেকে প'ড়ে গেছে······বেঁচে আছে কি নেই, কে জানে!······আমাকেও বজ্রাঘাতে পেড়ে ফেলেছে······প্রাণ যায় নি······কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক আর শোচনীয় অবস্থায় আমি প'ড়ে আছি······পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে।······ এই এঞ্জিনের পিছনে সারি সারি শিকলের গাঁঠছড়া-বাঁধা গাড়ীতে শত শত যাত্রী নিশ্চিন্ত হয়ে হয় তো ঘুমিয়ে রয়েছে, তারা স্বপ্নেও জানে না যে, তারা নিশ্চিত মৃত্যু আর বিনাশের মুখের মধ্যে ছুটে চলেছে! এতোগুলি প্রাণী নির্ভর ক'রে আছে দুটি মাত্র মানুষের উপর; তারা তাদের দুস্তর পথ উত্তীর্ণ ক'রে গন্তব্য স্থানে নিরাপদে পৌঁছে দেবে! কিন্তু তাদের এক জন যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে, তার ঠিকানাই জানা নেই; আর এক জন অক্ষম পঙ্গু হয়ে তাদেরই সঙ্গে বিনাশের অপেক্ষা করছে। এঞ্জিনের উননে সদ্য সাত কোদাল কয়লা দিয়েছি; তার আগুন যতোক্ষণ জ্বল্‌বে, ততোক্ষণ জল টগবগিয়ে ফুটবে, ভাপ উঠবে, আর গাড়ীও বেগে ছুটে চল্‌বে। সেই গতিবেগ সংযত বা দমন কর্‌বার কেউ নেই। গাড়ী চল্‌তে চল্‌তে যখন আগুন নিববে, জল জুড়োবে, তখনই গাড়ী আপনি থাম্‌বে। কিন্তু সেই থামার আগে কতো ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে যাবে; কত জায়গায় বাঁক ঘুরবে, পুল পার হবে; বাঁকের মুখে আর পুলের উপর এই বেগে গেলে বিনাশ অনিবার্য্য! এই বিপুল বেগে পুল পেরোতে গেলে পুল ভেঙ্গে গাড়ী জলে ঝাঁপ দেবে, বাঁক ঘুর্‌তে গেলে ছিটকে উল্টে প'ড়ে চুরমার হয়ে যাবে! কতো ষ্টেসনে থাম্‌বার কথা, অথচ থাম্‌বে না; বোকা লোকেরা বাড়ী ছেড়ে গাড়ী চ'লে যায় দেখে চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে নাম্‌বে আর অপঘাতে মারা যাবে, অথবা আমার মতন পঙ্গু হয়ে থাক্‌বে!

আমার দেহ যে পরিমাণে পঙ্গু বোধ কর্‌ছিলাম, সেই পরিমাণে আমার মনের বোধশক্তি চাঙ্গা হয়ে উঠলো! আমি যদি লেখাপড়া জান্‌তাম, তা হ'লেও তখনকার মনের ভাব আমি কথায় প্রকাশ কর্‌তে পারতাম না। আমি তো মূর্খ মানুষ, আপনাদের আমি কেমন ক'রে বোঝাব বাবু সে কি দারুণ অস্বস্তি আর যন্ত্রণার অবস্থা!

অন্ধকারে লোহার রেল-লাইন চক্‌চক কর্‌ছে······কালো অন্ধকারের নীচে একজোড়া রূপালি লাইন টানা! সেই জোড়া লাইন আমার দৃষ্টির তলা দিয়ে ক্রমাগত ছিট্‌কে ছিট্‌কে ছুটে পিছিয়ে চ'লেছে! অভ্যাসের বশে যে গতিবেগ

এর আগে অনুভব কর্‌তাম না, আজ সেই গতিবেগ সমস্ত মন ও চেতনা দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম……দেহ থাক্‌লে দেহ দিয়েও অনুভব ক'রতাম হয় তো! গাড়ী পাগল বেগে ছুটে চ'লেছে……লোহার শরীর ঝড়ের মতন! গতি-বেগে লোহায়-কাঠে ঠোকাঠুকির ঝঞ্জনা বাজছে প্রলয় কালের সর্ব্বনাশের বাজনার মতন! যেনো গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় ঠোকাঠুকি লাগিয়ে জিব্রাইল ধ্বংসের তাল বাজাচ্ছে!

একটা ছোটো ষ্টেসনের কোল দিয়ে গাড়ী ছিটকে বেরিয়ে গেলো যেনো বন্দুকের গুলি, যেনো সয়তানের হাতের আসমান ধনুকের লোহার তীর! সেই ক্ষণিকের মধ্যেই দেখতে পেলাম ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বহু লোক জড়ো হয়েছে, কেউ লাল আলো দোলাচ্ছে, কেউ লাল নিশান নাড়ছে, কেউ দু হাত উৎক্ষেপ বিক্ষেপ ক'রে গাড়ীকে থামাতে সঙ্কেত করছে, আর সবাই মিলে চেঁচাচ্ছে……কি বল্‌ছে কানে পৌছাবার আগেই গাড়ী ষ্টেসন ছেড়ে ছিটকে চ'লে চল্‌লো!

গাড়ী এক লাইন থেকে অপর লাইনে চালান হলো; গাড়ী একটু টল্‌লো, কতকগুলো ঘটাং ঘটাং শব্দ হলো, তার পরে আবার ছুট! চোখের সাম্‌নে দূরের সরু রেল-লাইন ক্রমশঃ স'রে স'রে কাছে এসে চওড়া আর দুফাঁক হয়ে এঞ্জিনের দু পাশ দিয়ে পিছনে চ'লে যাচ্ছে; রেল-লাইনের পাশের শাদা পাথরের খোয়াগুলো জলের স্রোতের মতন পিছনে ছুটে চলেছে!

আবার ষ্টেসন। দূরের ডিস্‌ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের গায়ে পাঁচ-সাতটা লণ্ঠনে লাল আলো জ্বেলে বিপদ ঘোষণা করছে; রেল-লাইনের ধারে ধারে দু পাশে লোক খাড়া থেকে লণ্ঠন আর নিশান নাড়ছে, উচ্চস্বরে চেঁচাচ্ছে! বধির লোহার এঞ্জিন নিয়তির মতন গাড়ীগুলোকে টেনে নিয়ে সব অগ্রাহ্য ক'রে ছুটে চল্‌লো। গাড়ীর জঠরে শত শত যাত্রীর যে কি দারুণ অবস্থা হয়েছে, তা মনে করতেও আমার কান্না পাচ্ছিলো।

ভাগলপুর ষ্টেসন। ষ্টেসন পিছনে ফেলে গাড়ী ভাগলো। ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালের কাছ থেকে রেল-লাইনের দু' পাশে সার দিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে ট্রেণ থামাতে সঙ্কেত করছিলো। কিন্তু গাড়ীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কে থামাবে এই পাগল গাড়ীকে! চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত বেদম হয়ে যখন আপনি থাম্‌বে, তখনই থাম্‌বে, নইলে একে থামায় এমন সাধ্য কারও নেই!

ষ্টেসনের পর ষ্টেসন ছিটকে পিছিয়ে পড়তে লাগলো। যে ষ্টেসনে যে সময় গিয়ে থাম্‌বার কথা, তার অনেক আগেই ট্রেণ সেই ষ্টেসন পেরিয়ে চল্‌লো।

সাম্‌নে জামালপুরের পাহাড়ের সুড়ঙ্গ……টনেল! সব পথই তো আমার চেনা। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ ভেদ ক'রে এক ফালি চাঁদের আধখানা বেরিয়েছে; ফিকে আলোয় গাঢ় অন্ধকার অল্প একটু ভিজে উঠেছে!

গাড়ী লোহার ঝড়ের মতন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়লো!……ক্ষণকাল পরেই আবার মুক্ত আকাশের তলে বেরিয়ে এলো। গাড়ীর গতি হ্রাস হয় না, থাম্‌বার তো নামও নেই!

এইবার গাড়ী লুপ-লাইনের সব চেয়ে বাঁকা মোচড়টার কাছে এগিয়ে চলেছে! যে বেগে গাড়ী ছুটে চলেছে, এই বেগে সেই বাঁক ফির্‌তে গিয়েই গাড়ী এবার নির্ঘাত উল্টে পড়বে আর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে চুরমার হয়ে যাবে!……

গাড়ী বাঁকের মাথায় গিয়ে কাত হলো……এই ছিটকে পাটিয়ে পড়ে আর কি!……চাকার চাপে আর গতির ঘর্ষণে রেল-লাইন আর্ত্তনাদ কর্‌তে লাগলো!……কিন্তু সমস্ত গাড়ী একবার টাল খেয়ে সাম্‌লে নিলে……বাঁক পার হয়ে গাড়ী সোজা রেলে গিয়ে উঠেছে! এ কেবল আল্লার মেহেরবাণী!

এই বাঁকটাকেই আমার সব চেয়ে ভয় ছিলো। আমি একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কিন্তু এই স্বস্তি আমার বেশীক্ষণ রইলো না। আমার মনে হলো, গাড়ী যেনো সোজা পথে না গিয়ে মুঙ্গেরের পথে ছুটে চলেছে। সর্ব্বনাশ! ট্রেণ সোজা পথে যদি চল্‌তো, তা হ'লে প্রত্যেক ষ্টেসনের পয়েন্টস্‌-ম্যান্‌ গাড়ীখানাকে এমন লাইনে চালান ক'রে ক'রে দিতে পার্‌তো যে লাইন অনেক অনেক দূরে চ'লে গেছে, আর তা হ'লে এঞ্জিনের আগুন নিবে গাড়ী কোথাও না কোথাও আপনি থেমে যাবার সম্ভাবনা থাক্‌তো। কিন্তু গাড়ী যদি মুঙ্গেরে যায় আর সেখানে গিয়ে বা তার আগে না থামে, তা হ'লে তো সমস্ত গাড়ী গিয়ে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেবে! কষ্টহারিণী-ঘাটে সকলকার কষ্ট হরণ কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌বে! গাড়ী যদি মেন লাইন দিয়েই চল্‌তো, তা হ'লেও মোকামা ঘাটে

গিয়ে গঙ্গালাভ হ'তো; কিন্তু তার সম্ভাবনা ছিলো সুদূরে, তার আগেই গাড়ী হয় তো স্থগিত হ'তে পার্‌তো। কিন্তু এ যে নিশ্চিত ধ্বংস মাথায় ক'রে অন্ধ আবেগে পাগলের মতন আত্মহত্যা করতে ছুটেছে, সঙ্গে সঙ্গে নর-নারী-শিশু পশুহত্যাও যে কতো হবে, তার লেখাজোখা থাক্‌বে না!

আমি যে তখন কেনো পাগল হয়ে যাই নি, এখন কেবল তাই ভাবি। সাম্‌নে সুনিশ্চিত বিনাশ, আমি একটু উঠে এঞ্জিন চালাবার লেভার-হাতলটা টেনে দিলেই ট্রেণ থেমে যায়, অথচ সে শক্তি আমার নেই, আর এক গাড়ী বোঝাই লোক নিয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল ছুটে চলেছে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে!

আমি নিজেকে ডেকে বল্‌লাম—ওরে সলিম্-উল্লা, তোর জন্যে যে এতোগুলো প্রাণী মর্‌তে চলেছে! এই ধ্বংস তুই রোধ কর্‌তে পারিস যদি একটু উঁচু হয়ে দু ফুট তফাতের ঐ হাতলটা ধ'রে তার পর ম'রে গিয়েও ঝুলে পড়্‌তে পার্‌তিস, তা হ'লে তোর মরা দেহের ভারেই যে গাড়ী থেমে যেতে পার্‌তো, তোকে আর কোনো চেষ্টাই করতে হ'তো না। কিন্তু তোর কি এইটুকু নড়্‌বার শক্তিও নেই? যদি না নড়্‌তে পারিস ওরে হতভাগা, তবে তুই এইখানে প'ড়ে প'ড়ে দেখ্‌বি, তোর চোখের সাম্‌নে গঙ্গার জল দেশের কতো পরিবারের চোখের জলের নদী হয়ে তোকে সুদ্ধ সমস্ত গাড়ী গ্রাস কর্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গঙ্গার জলধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তোর চোখের উপর নাচ্‌বে, তার পরেই ব্যস সব খতম্!······মরণের চেয়েও এ যে ভয়ানক······যাতে মৃত্যু সেই জিনিসটা মেরে ফেল্‌তে এগিয়ে আস্‌ছে, চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারই গ্রাসে লাফিয়ে গিয়ে পড়া, পালিয়ে বাঁচ্‌বার চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত কর্‌বার শক্তি নেই!

আমি চোখ বুজতে চেষ্টা করলাম। চোখের পাতা অনড়। যা দেখতে চাই না, চোখ মেলে তারই দিকে প'ড়ে থাক্‌তে হ'লো! প্রাণপণ ইচ্ছায় চীৎকার করতে চাইলাম—'রক্ষা করো, রক্ষা করো, গাড়ী থামাও!' কণ্ঠে স্বর নেই, জিব নড়ে না। আর চেঁচাতে পার্‌লেই বা কে শুনতো? শুন্‌তে পেলেই বা কে কেমন ক'রে গাড়ী থামাতো? যিনি শুন্‌তে পেতেন আর গাড়ী থামাতে পার্‌তেন, সেই খোদা-তা'লা তো আমার মনের কথাও জান্‌তে পার্‌ছিলেন, কিন্তু তাঁর মর্জ্জি যে ছিলো অন্য রকম!

আমার সর্ব্বাঙ্গ তো ম'রে গেছে, যদি মাথার মগজটাও ম'রে যেতো, তা হ'লে এতো সব ভাবনার বালাই থাক্‌তো না। মগজ আছে বেঁচে, আর তার সঙ্গে ভয়ানক জীবন্ত হয়ে আছে এক জোড়া চোখ! চোখের যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে·····অন্ধকারেও সব দেখতে পাচ্ছে। জীবন্ত হয়ে আছে দুটো কান, ট্রেণের গর্জ্জন আর ঝঞ্ঝনার ভিতর দিয়েও শুন্‌তে পাচ্ছে গঙ্গার জলস্রোতের কলধ্বনি। আর জীবন্ত হয়ে আছে অসহায় অথচ উন্মত্ত ইচ্ছা, যা ক্রমাগত আমাকে হুকুম কর্‌ছে, যেমন ক'রে হুকুম করে যুদ্ধে পরাজিত ছত্রভঙ্গ সেনাকে তার সেনাপতি আবার ব্যূহবদ্ধ হয়ে লড়াই ক'রে মর্‌বার জন্যে!

গঙ্গা!······হিন্দুরা যাকে বলে পতিতপাবনী!·····পাঁচ শো গজ দূরে······তিন শো গজ······এক শো গজ ······এইবার ব্যস্······খতম!

গাড়ী জলের তলেও কি চলেছে? কিন্তু গতি মন্দ, চাকার শব্দ থেমে এসেছে, জলের মধ্যে তো আর লোহার রেল নেই যে ঘষাঘষি ঠোকাঠুকিতে শব্দ হবে?

গাড়ী যেনো থাম্‌লো! অমনি অন্ধকার রাত্রি-ঢাকা আকাশ অনেক লোকের কলরবে ভ'রে উঠলো। এ কি মরণোন্মুখ যাত্রীদের আর্ত্তনাদ?

আমি আর কিছু বুঝতে পার্‌ছিলাম না, আমার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিলো······কেবল খোলা চোখের ঠিক উপরে দেখতে পাচ্ছিলাম মেঘমুক্ত একটা তারা মিটমিট কর্‌ছে, মূর্চ্ছাহত আকাশের স্থগিতপ্রায় হৃৎপিণ্ডের মতন! দেখে আমার ভারি হাসি এলো······

যখন জ্ঞান হলো, তখন আমি হাঁসপাতালে। শুন্‌লাম, গাড়ী মুঙ্গেরের গঙ্গায় ডুবে যায় নি, মুঙ্গেরের পথে যায়ই নি······মেন লাইন দিয়েই চল্‌তে চল্‌তে কিউল ষ্টেশনের পরে মাঠের মাঝখানে আপনি থেমে গিয়েছিলো·····যাকে গঙ্গা ব'লে ভ্রম ক'রে ভয়ে ভাবনায় আমি মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলাম, সেটা রেল-লাইনের ধারে জমা বৃষ্টির জল।······দু' চার জন লোক যারা চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমেছিলো, তারা ছাড়া আর কেউ জখম হয় নি······সকল যাত্রীকে রেল-কোম্পানী বিনা

ভাড়াতে আবার তাদের নিজের নিজের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিলো……

সলিম্ উল্লা এই পর্য্যন্ত ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থাম্‌লো।

এক জন যাত্রী জিজ্ঞাসা করলে—যাত্রীরা গাড়ীর ডেঞ্জার-সিগ্‌ন্যালের চেন ধ'রে টান মারলেই তো গাড়ী আপনি থেমে যেতো? অতো লোকের মধ্যে এ বুদ্ধিটা এক জনের ঘটেও জোগালো না?

সলিম্-উল্লা বল্‌লে—তখন এ-সব চেন-টেন ভ্যাকুয়াম-ব্রেক্ এ দেশে হয় নি।

আর এক জন যাত্রী বল্‌লে—কোনো লোক তো গাড়ীর পা-দান ব'য়ে ব'য়ে এঞ্জিনে এসে দেখতে পার্‌তো ব্যাপার কি?

সলিম্-উল্লা ঈষৎ হেসে বল্‌লে—কিন্তু কেউ তো আসে নি।

যে লোকটির শেওড়াফুলি ষ্টেশনে নাম্‌বার কথা ছিলো, কিন্তু নামা হয় নি, সে বল্‌লে—আগাগোড়া গাঁজা।

আমি লোকটিকে বল্‌লাম—ব্যাণ্ডেলও যে ছেড়ে দিলে মশায়, আপনি নাম্‌লেন না?

সেই লোকটি বিরক্ত হয়ে বল্‌লে—গাঁজার নেশায় নাম্‌বার কথা স্রেফ ভুলেই গিয়েছিলুম। এর পরে গাড়ী কোথায় থাম্‌বে?

সলিম্-উল্লা হেসে বল্‌লে বর্দ্ধমানে! অথবা যেখানে এঞ্জিনের নিজের মর্জি হবে!

গাড়ীর সকল প্যাসেঞ্জারের মনের মধ্যে ছাঁৎ ক'রে উঠলো। এই অলক্ষুণে লোকটা বলে কি?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ করণ

গত ১লা শ্রাবণ মেদিনীপুরের বিখ্যাত সাহিত্য-সেবী পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচার পত্রিকার ও প্রতিভা-সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় ৪১ বৎসর ৮ মাস বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন! হিজলীর মসনদ্-ই-আলা, 'খেজুরী-বন্দর', An Ethnology of the Cultivating Pods 'সমাজরেণু', 'ভূদুন্দুভি', 'বঙ্গলক্ষ্মী ব্রত-কথা' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার গভীর গবেষণা ও কবিত্বের পরিচয় দিতেছে। তাঁহার হিজলীর মসনদ্-ই-আলা বঙ্গের অতীত ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

মহেন্দ্রনাথ করণ

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'ক্ষেমানন্দ লাইব্রেরী', অজানাবাড়ী স্কুল, ও হিজলী সাহিত্য-সমাজ তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির নিদর্শন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালাভাষার এক জন একনিষ্ঠ সেবকের তিরোভাব ঘটিল। সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীভগবান্ তাঁহার বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্র-কন্যাদিগের হৃদয়ে এই দুর্ব্বিষহ বেদনা সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের নিবেদন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

কৎস্থ

জাপানীদিগের গুপ্ত বিদ্যা

স্মরণাতীত কাল হইতে জাপানীদের মধ্যে "কৎস্থ" নামক এক প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতদেহে জীবনসঞ্চারণ করার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই বিদ্যা বহুদিন গুপ্তভাবে শুধু জাপানীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু জাপানী জাতি অন্যান্য জাতির সংস্রবে আসিবার সময় এবং অবস্থায় বাধ্য হইয়াই হউক অথবা ইচ্ছা বশতঃই হউক, ইহা প্রকাশ করিয়াছে।

জাপানীদের জীজিউৎস্থ বিদ্যা যেমন সকলের নিকট আদরণীয়, কৎস্থও তদপেক্ষা আদরণীয় ও শিক্ষণীয় এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়। জীজিউৎস্থ বিদ্যা শিক্ষা করিলে অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিও অনেক সময় আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। কৎস্থ বিদ্যা শিক্ষা করিলে অনেক সময় মৃতপ্রায় ব্যক্তিতে জীবনী শক্তি প্রদান করিয়া উহার জীবন রক্ষা করা যায়।

জাপানীরা বেশ কুস্তিপ্রিয়। বোধ হয়, কুস্তি করার সময় অথবা জীজিউৎস্থ খেলিবার সময় ইহাদের মধ্যে অনেকে আহত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিত; তাহার পর দৈবচক্রে অথবা পর্য্যবেক্ষণক্রিয়া দ্বারা এই কৎস্থ বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। কারণ, জাপানীরাও ইহার উৎপত্তির সময় ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য যে সম্যক্‌রূপে অবগত, এমত নহে।

বাস্তবিকপক্ষে মৃতদেহে জীবন দান করার ক্ষমতা ভগবান্ ভিন্ন অথবা ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান কোন পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও যে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব প্রকৃত মৃত্যু কোন্ অবস্থাকে বলা যায়, তাহা প্রথমতঃ দেখা উচিত। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াজনিত শব্দ শুনিতে না পাইলে, চোখের উপর অঙ্গুলি প্রদান করিলে যদি কোন প্রত্যাবর্ত্তন-ক্রিয়া লক্ষিত না হয়, তথাপি উক্ত অবস্থাকে প্রকৃত মৃত্যু বলা যায় না। কারণ, এই অবস্থাতেও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চলা সম্ভব হইতে পারে। সর্পদংশনে রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও অনেক সময় এই প্রকার চলিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে বন্ধ হইয়া গেলেও তাহাকে মৃত্যু বলা যায় না। কারণ, কোন কঠিন অস্ত্রোপচার করার সময় যদি অবসাদ বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে বক্ষ ও উদরমধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা (Diaphragm) ভেদ করিয়া অনতিবিলম্বে হৃৎপিণ্ডে হস্ত মর্দ্দন (Massage) করিলে রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। অতএব দেখা যায় যে, দেহে পচন-ক্রিয়া আরম্ভ না হইলে অন্য কোন অবস্থাকেই প্রকৃত মৃত্যু বলা যায় না। ডাক্তারী শাস্ত্রমতেও ইহাই মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। যে সব লোক বৈদ্যুতিক স্রোতের দ্বারা অথবা বজ্রাঘাত দ্বারা আহত হয়, তাহাদেরও অনেক সময় প্রকৃত মৃত্যু হয় না; মৃগী রোগে অথবা অন্য কোন প্রকারে হঠাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যাহারা মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও উহাকে প্রকৃত মৃত্যু বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। কারণ, এই কৎস্থ দ্বারা জাপানে বহু লোক আশু মৃত বলিয়া পরিগণিত হইয়াও জীবনলাভে সমর্থ হইয়াছে।

আমি ইতঃপূর্ব্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর কলিকাতা হইতে জাপানগামী জাহাজে কয়েক বৎসরের জন্য ডাক্তার ছিলাম। উক্ত সময়ের মধ্যে একবার জাপানে কোবি বন্দরে একটি জাপানী কুলী কাষ করিবার সময় জাহাজের ডেকের উপর হইতে খোলের মধ্যে পড়িয়া গিয়া একবারে মৃতবৎ হইয়া পড়ে। আমি উহাকে দেখিয়া মৃত বলিয়াই মনে করিলাম। কারণ, উহার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ ছিল, এবং নাড়ী হাতের কব্জীপ্রদেশে অথবা বাহু-প্রদেশে অনুভব করিতে পারি নাই। কুলীদের মধ্যে এক জন কৎস্থ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল, সে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই উহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিল। আমি মনে করিলাম, "বোধ হয়, আমার দেখিতে ভুল হইয়াছে; হয় ত কুলীটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, পুনর্ব্বার জ্ঞান লাভ করেছে।" ইহা আমি মনে করিয়া আমার ডাক্তারী বিদ্যার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ লজ্জিত হইলেও উপস্থিত অন্যান্য কুলীর মুখে কোন প্রকার বিস্ময়সূচক উপহাসের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। জাপানস্থ আমার ভারতীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে একটি পার্শী বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে উক্ত বিষয়টি বলিলে তিনি আমাকে এই কৎস্থ বিদ্যার কথা সবিশেষ বলিয়াছিলেন এবং একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকার মধ্যে এই কৎস্থ বিদ্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমি উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং অন্যান্য জাপানী বন্ধুদের নিকট এই বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা দ্বারা দেশের লোক উপকৃত হইবে, আশা করিয়া নিম্নে উক্ত বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম। এই বিষয় আলোচনা করিতে হইলে ডাক্তারী বিদ্যা সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করা দরকার।

সচরাচর দেখা যায়, কোন লোক হঠাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলে, উহাকে তিন চারি বার একটু এদিক ওদিক নাড়া দিয়া বুকে-পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেই প্রকৃতিস্থ হয়। ইহাকে ডাক্তারী মতে মস্তিষ্কের সাময়িক অব্যবস্থিত অবস্থা (slight concussion of the brain) বলা যায়। মস্তিস্কের প্রধান ভাগ সেরিব্রামের (cerebrum) অভ্যন্তরস্থ সঞ্চালক কেন্দ্রে আঘাত বশতঃ সাময়িক অবসাদ আসিলেই এই প্রকার অবস্থা হয়। এই আঘাতের গুরুত্ব অনুসারে অজ্ঞানতা ও অন্যান্য লক্ষণগুলির তারতম্য হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যে কোন উপায়ে উক্ত কেন্দ্রে কোন প্রকার উত্তেজনা পাঠাইতে পারিলেই রোগীকে প্রকৃতিস্থ করার আশা করা যায়। হিষ্টীরিয়া রোগে অজ্ঞান অবস্থায় কোন কোমল পদার্থ দ্বারা কর্ণমধ্যে সুড়সুড়ি দিলে, অথবা কোন উত্তেজক পদার্থ নাকে আঘ্রাণ করাইলে অনেক সময় রোগীর জ্ঞান হয়। কারণ, কর্ণে শব্দবাহক স্নায়ু (auditory nerve) ও নাসিকাতে গন্ধবাহক স্নায়ু (olfactory nerve) ইহাদের সকলেরই স্ব স্ব উৎপত্তিকেন্দ্রস্থল সেরিব্রামে (cerebrum)। আমাদের অক্ষি-কোটরের ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ চক্ষুর ও ভ্রূর নিম্নভাগে যে অস্থ্যাধার আছে, তাহার মধ্যে নাসিকার উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় ½ ইঞ্চি দূরে উভয় দিকে উক্ত অস্থ্যাধারের মধ্যে দুইটি ছোট খাদ আছে, উহার মধ্য দিয়া

সুপ্রাঅর্বিটাল (supraorbital) নামক দুইটি স্নায়ু-শাখা উভয় চক্ষুর দৃষ্টিসঞ্চালক স্নায়ু (optic nerve) হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছে। কোন সময় উক্ত দুইটি খাদে উভয় অঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক সজোরে উর্দ্ধদিকে চাপিয়া আনিলেও চেতনার সঞ্চার হয়। অর্থাৎ শরীরমধ্যস্থ যে সব স্থানে জ্ঞানসঞ্চালক স্নায়ুগুলি (sensory nerve) সহজপ্রাপ্য, সেই স্থানই উহা দ্বারা সুপ্ত মস্তিষ্কে—কোন প্রকার উত্তেজনা প্রেরণ করিতে পারিলেই রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হয়। রোগীর অবস্থাবিশেষে এই উত্তেজনা প্রেরণের মাত্রা পর্য্যাপ্ত না হইলে রোগীর চেতনা হয় না।

এই কৎসুবিদ্যা আলোচনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুরে আমার জন্মভূমি সাজাপুর গ্রামে আমাদের প্রতিবেশীর একটি নয় দশ বৎসরের মেয়েকে সর্প দংশন করে। মেয়েটি রাত্রিতেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে; সকালবেলা তাহার মুমূর্ষু অবস্থা লক্ষিত হয়। আমাদের গ্রামেই একটি ভদ্রলোক সর্পাঘাতের চিকিৎসা জানিতেন; তিনি মন্ত্র পড়িয়া নানা প্রকার প্রক্রিয়া করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন তিনি একখানা নূতন গামছার এক ধারে কয়েকটি গাঁট দিয়া মন্ত্র পড়িয়া উহা দ্বারা উহার মস্তিষ্কের উপরিভাগে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কতক সময় করার পর মেয়েটির ক্রমশঃ একটু একটু জ্ঞানসঞ্চার হইতে লাগিল। দেখিয়া মনে হইল, সে যেন অত্যন্ত গভীর ঘুমে অচেতন ছিল, উহার তন্দ্রাভাব যেন কাটিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ মেয়েটি সুস্থ হয়। ইহা হইতে আমার মনে হয় যে, মন্ত্র তন্ত্র ত মনের ঐকান্তিকতা আনয়নের জন্য কোন দেবতার আরাধনা হইতে পারে; কিন্তু তৎসঙ্গে যে মস্তিষ্কে একটি বৃহৎ রকমের উত্তেজনা প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সাপে কাটা রোগী ভিন্ন অন্য কোন অবস্থার অজ্ঞান রোগীতে এই প্রকার উত্তেজনা প্রেরণের চেষ্টা করা উচিত নহে। কারণ, অনেক সময় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রক্তস্রাব হইয়াও অজ্ঞানতা আনয়ন করে। উত্তেজনা প্রেরণের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্য কর্ণকুহরে, নাসিকাভ্যন্তরে অথবা ভ্রূনিম্নস্থ উক্ত খাদে বেশী জোর প্রকাশ করা উচিত নহে, কারণ, উহাতে কর্ণপটহ ছিন্ন হইতে পারে, নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে এবং ভ্রূর উক্ত স্নায়ুও আহত হইয়া চক্ষুর সঞ্চালনক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দৃষ্টির বাধা জন্মাইতে পারে। কৎসু উপায় দ্বারা মৃতপ্রায় রোগীতে জীবনসঞ্চারণের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও প্রকৃষ্ট উপায়।

রোগীকে বসাইয়া তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়াইয়া ডান অথবা বাম হাঁটু রোগীর পৃষ্ঠদেশের সপ্তম কশেরুকার (7th Vertebra) উপর স্থাপন করিবে; পরে দুই হস্ত রোগীর বক্ষঃস্থলে এমনভাবে স্থাপন করিবে, যেন বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় রোগীর কণ্ঠপ্রদেশের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়ের মিলনস্থলে মিলিত হয়। তৎপরে উভয় হস্ত দ্বারা রোগীর বক্ষঃস্থল জোরে চাপিয়া ধরিয়া একবার নিম্নে ও একবার উর্দ্ধে এবং একটু পশ্চাদ্‌ভাগে চাপ দিতে হইবে, এবং ঠিক সেই সময়ে হাঁটু দ্বারা উক্ত সপ্তম কশেরুকার উপর পুনঃ পুনঃ সজোরে আঘাত করিতে থাকিবে। এই প্রকার প্রতি মিনিটে ষোল হইতে বিশবার করিবে। ইহাতে মস্তিষ্কে স্থিত, হৃৎপিণ্ডের ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়াসঞ্চালক কেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ আনয়ন করিবে।

ঘাড় বক্র করিলে ঘাড়ের নিম্নভাগে যে উচ্চস্থান দেখা যায়, উহার পর হইতে মেরুদণ্ডের নিম্নদিকে উচ্চস্থানগুলি গণিয়া আসিলে সপ্তম স্থানেই সপ্তম কশেরুকা মিলিবে। কশেরুকা মেরুদণ্ডের একটি অংশবিশেষ; ঘাড়ের পৃষ্ঠদেশের ও কটিদেশের সমস্ত কশেরুকা মিলিত হইয়াই মেরুদণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া বৃহৎ ছিদ্র আছে, তদ্দ্বারা Spinal chord অর্থাৎ মেরুদণ্ডমধ্যস্থ কোমল পদার্থ মস্তিষ্কের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রক্রিয়া করিলে মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা কেন হয়, ইহা জানা থাকিলে প্রক্রিয়া করিবার আশা ও উৎসাহবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক মনে করিয়া আমি উহার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

হস্ত হইতে কোন সময় ঘড়ী পড়িয়া গেলে উহার কোণ বাঁকা, হেয়ার স্প্রিং, মেইন স্প্রিং অথবা অন্য কোন অংশের অনিষ্ট না হইলেও অনেক সময় ঘড়ীটি বন্ধ হইয়া যায় এবং একটু নাড়া দিলেই পুনঃ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেই অবস্থা হইতে পারে। ডাক্তারী মতে ইহাকে Shock অর্থাৎ অবসাদ-সূচক স্নায়বীয় আঘাত বলে। অনেক সময় এই Shock বশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। শরীরস্থ কোন স্থান হইতে অথবা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যদি একটা ভয়ানক উত্তেজনা মস্তিষ্কে নীত হয়, তবে স্নায়বীয় বিধানে একটি সর্ব্বসাধারণ অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই অবসাদ বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া সবই বন্ধ হইয়া যায়। অনেক ঘড়ীতে পুরা দম দিলে বন্ধ হইয়া যায়, ইহাও সেই প্রকারের অবস্থাবিশেষ। এই সময় যদি মস্তিষ্কে (Cerebrum) কোন প্রকার উত্তেজনা প্রেরণ করিতে পারা যায়, তবেই মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন-সঞ্চার হয়।

আমাদের মেরুদণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় একটু বক্র, সপ্তম কশেরুকার স্থানটি এই বক্রতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, উক্ত স্থানে চাপ দিয়া উহাকে সোজা করিতে গেলেই Spinal chord-এতে অর্থাৎ মেরুদণ্ডমধ্যস্থ কোমল পদার্থে চাপ পড়ে এবং সেই সময় বক্ষঃস্থিত হস্ত দ্বারা বক্ষপশ্চাতে চাপ থাকিলে উক্ত চাপের মাত্রা আরও বৃদ্ধি হয় এবং একটি বৃহৎ উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়।

মস্তিষ্ক হইতে দ্বাদশ যুগ্ম স্নায়ু বহির্গত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী, যকৃৎ, অন্যান্য যন্ত্র ও কতক মাংস-পেশীতে সঞ্চালিত হইয়াছে,তন্মধ্যে দশম স্নায়ু (Pneumogastric nerve) হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রে সঞ্চালিত হইয়াছে। হাত দিয়া যখন বক্ষঃস্থলে চাপ দেওয়া হয়, তখন উক্ত স্নায়ুকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়। উহাতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আনয়ন করে এবং সেই সঙ্গে বক্ষ ও উদরমধ্যবর্ত্তী পর্দ্দাকে (diaphragm) সঙ্কোচ ও প্রসারণের চেষ্টা করা হয়। উহাই শ্বাসপ্রশ্বাস আনয়ন করে।

আঘাতপ্রাপ্তি বশতঃ যে সব রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়া মৃতবৎ অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের জন্যই এই উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। ব্যাধিবশতঃ যান্ত্রিক বিকারে মৃত্যু হইলে অথবা আভ্যন্তরীণ কোন যন্ত্র গুরুতররূপে আহত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে যদি মৃত্যু হয়, তবে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। জলে ডুবা, সাপে কাটা, বাজপড়া, মৃগী প্রভৃতি আকস্মিক রকমের মৃত্যুতে এই প্রক্রিয়া দ্বারা বাঁচাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। জলে ডুবা রোগীকে উবুড় করিয়া শোয়াইয়া দুই হাত পেটের তলায় দিয়া অঙ্গুলীতে আবদ্ধ করিয়া উহাকে উত্তোলন করিবে এবং আস্তে আস্তে একটু ঝাঁকি দিতে হইবে, মাথার দিকটা পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে একটু নিম্নে রাখিতে হইবে। ইহাতে পেট হইতে সব জল বাহির হইয়া যাইবে। তাহার পর পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়ম অনুসারে উহাকে বসাইয়া উক্ত প্রক্রিয়া করিতে থাকিবে। অনেক সময় ক্রমাগত উক্ত প্রক্রিয়া এক ঘণ্টা করার পর রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে, এরূপ ঘটনাও শুনা গিয়াছে। সপ্তম কশেরুকার স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখার জন্য খড়ি অথবা ধূলা দ্বারা দাগ দিয়া লওয়া ভাল। কারণ, আঘাতগুলি স্থানান্তরে পড়িলে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

সাপে কাটা রোগীর শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া যদি অপেক্ষাকৃত উত্তাপে লবণজল ভরিয়া উক্ত প্রক্রিয়া করা যায়, তবে বোধ হয়, অনেক স্থলে সুফল লাভ করা যায়।

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বর্ষারাণী

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া দিগন্তের অন্তরাল হ'তে
ঝিল্লীরব-মুখরিত ফুল্লফুল-উল্লসিত পথে
ওগো বর্ষারাণী—
বর্ষপরে এলে ফিরে
মেঘময় তাজ শিরে,
নবীন মালতীমাল্য আলোল কুন্তলে লয়ে টানি।

নিঃস্বনিয়া মুহুর্মুহু গুরু গুরু দামামা-আরাব
নকীব চলেছে আগে বিঘোষিয়া তব আবির্ভাব
দুর্জ্জয় প্রভাব।

পল্লবের রাজচ্ছত্র প্রসারিত তব শির'পর
দোলে শ্যাম অঙ্গে তার কণ্টকিত কদম্ব-ঝালর
সুবর্ণ-শোভায়।
সবুজ কিংখাবে নব
ঢাকা পাদপীঠ তব,
পুষ্প-অর্ঘ্য-থালি লয়ে বসুন্ধরা চরণে লোটায়।

গন্ধবারিসিক্ত পাখা গাত্রে তব দোলায় পবন,
ঐক্যতানে দর্দ্দুরেরা স্তুতিগানে মাতায় গগন
আনন্দে মগন।

যুদ্ধসাজে আজি তুমি দিগ্বিজয়ে হয়েছ বাহির
অজস্র বরুণ-বাণ-জর্জ্জরিত অঙ্গে অরাতির
করিছ বর্ষণ।
বিদ্যুন্ময় তব অসি
প্রকৃতির বক্ষে পশি
শত লক্ষ খণ্ডে তারে চিরি চিরি করিছে ধর্ষণ।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তব বহি শিরে পরাভব-গ্লানি
লজ্জায় মার্ত্তণ্ড নিল আরক্তিম ক্ষুণ্ণ মুখখানি
অন্তরালে টানি।

দুরন্ত নিদাঘরাজে রণে জিনি দিলে নির্ব্বাসন,
কেড়ে নিলে বাহুবলে বিজিতের রাজ-আভরণ
দণ্ড সিংহাসন।
রুদ্রবহ্নি-শিখাদলে
নির্ব্বাপিয়া স্নিগ্ধ জলে
শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্য ধরণীতে করিলে স্থাপন।

দিকে দিকে বাজে তব অভিষেক শঙ্খ সুমঙ্গল
ভরি ওঠে ফুলে ফলে শস্যে জলে ধরার অঞ্চল
শ্যামল চঞ্চল।

তব বীর-সজ্জাতলে মাতৃ-বক্ষ রহে সঙ্গোপনে,
ধরার সন্তান লাগি দুগ্ধধারা নিত্য তব স্তনে
উঠে উচ্ছ্বসিয়া।
তোমার অজস্র দানে
উচ্ছল স্নেহের বাণে
ভরি যায় কূলে কূলে ধরিত্রীর পুলকিত হিয়া।

তোমার অঞ্চলতলে বয়ে যায় অমৃতের ধারা—
হিল্লোলিয়া ওঠে সৃষ্টি মর্ম্মে মর্ম্মে জাগে নব সাড়া
বাধা-বন্ধ-হারা।

তুমি স্নেহ-সুকোমলা তুমিই কঠোর বজ্রপাণি
ঋতুকুলরাণী তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী—
তুমি একাধারে।
তব স্নেহে স্থিতি-সৃষ্টি
রোষে তব মৃত্যু-বৃষ্টি,
বীর্য্যে স্নেহে পাল তুমি রাজ্য তব দণ্ডে পুরস্কারে।

যেই মন্ত্রে জগন্নাথ চালান এ বিশ্ব-রথখানি
তোমারো অন্তরে নিত্য ছন্দে সুরে জাগে সেই বাণী
ওগো বর্ষারাণী!

শ্রীসত্যজীবন বসু।

হিন্দু সমাজ-সমস্যা

১

গত বৈশাখে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছি, তাহার আলোচনা যেরূপ বিস্তৃতভাবে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি বিশেষভাবে উৎসাহ পাইয়াছি। আমাদের সমাজে এই অভিভাষণে একটা নূতন ভাবের যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহার পরিণাম যে আমাদের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের সমাজ এক্ষণে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের যে ঐকান্তিক আবশ্যকতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রাচীনপন্থিগণের কেহ কেহ আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতুষ্ট নহেন। তাঁহারা এই সমাজকে টানিয়া পিছনের দিকে ঠেলিয়া বর্ণাশ্রমের অতীত আদর্শের উপর এই যুগে আবার সংস্থাপিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ দিকে নব্যপন্থিগণও প্রাচীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বর্ণাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর নহে, কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও তাহা দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দু জাতির যাহা প্রকৃত কল্যাণ, তাহা সাধিত হইতে পারিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাসম্পন্ন হইয়া, বর্ণাশ্রমের সংস্কার ও পরিবর্ত্তন দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে করিবার জন্য ক্রমশঃই দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন। হিন্দু সমাজের এই প্রকার মতদ্বৈধ ও তন্মূলক কলহ ও বিদ্বেষ প্রভৃতি এমন ভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া সমাজের অভ্যুদয়কামী—সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। ক্রমশঃই চারিদিকে অশান্তির অনলই জ্বলিয়া উঠিতেছে। ধীরভাবে অপক্ষপাতহৃদয়ে সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার শক্তি সমাজের ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে গালি দিতেছেন। অপর পক্ষ প্রতিবাদিগণের সঙ্কীর্ণতার প্রতি উপহাস করিয়া নিজের মত দল বাঁধিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাই হইল বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। এ অবস্থায় প্রকৃতভাবে স্বজাতির ও স্বদেশের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, ইহাই ময়মনসিংহের অভিভাষণে আমি স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি। নব্য ভাবে শিক্ষিত স্বজাতিহিতৈষী মহানুভবগণ আমার অভিভাষণের এই মুখ্য তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, বহু সংবাদপত্রে যে ভাবে আমার মত সমর্থন ও অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি আশান্বিত হইয়াছি, এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অপর দিকে প্রাচীনপন্থীদিগের কতিপয় মহানুভব পণ্ডিত আমার অভিভাষণ পাঠ করিয়া বা লোকমুখে শুনিয়া আমার প্রতি নিতান্ত বিরূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। আমার অভিভাষণের ফলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া সভা-সমিতি করিয়া আমার অদূরদর্শিতা ও শাস্ত্রানভিজ্ঞতা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের কোন কোন নেতৃপ্রধান মহোদয়ের এই প্রকার সদয় ব্যবহারেও আমি যথার্থই আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই বিশ্বতোমুখ সামাজিক অবসাদের দিনে এরূপ উৎসাহবর্দ্ধক আনন্দ অযাচিতভাবে পূর্ণমাত্রায় তাঁহারা এই অকিঞ্চনকে দিতেছেন এবং সেই সঙ্গে আমার এই বার্দ্ধক্যের একঘেয়ে জীবনে নূতন আশা ও কার্য্যকরী শক্তির সঞ্চার করিয়া, আমাকে আমার প্রিয়তম সমাজের সেবার উপযোগী করিয়া তুলিতেছেন, এই জন্য আমি তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার অভিভাষণে যে কয়টি প্রস্তাব আমি করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে শুদ্ধি ও বিধবাবিবাহ এই দুইটি বিষয়েই সনাতনীদিগের নায়কস্বরূপ কতিপয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশেষ আপত্তি করিতেছেন। তাঁহাদিগের মতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে শুদ্ধি দ্বারা সনাতন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে দিলে সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইবে, এইরূপে বিধর্ম্মিগণের হিন্দুসমাজে প্রবেশ হিন্দুশাস্ত্রবিহিত নহে। আমি কিন্তু বলিয়াছি, শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুসমাজের উচ্ছেদ হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত এইরূপ শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুসমাজের পরিপুষ্টি হইবে, এবং তাহা দ্বারা হিন্দুমাত্রেরই ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে। হিন্দুশাস্ত্র-সমূহ এই প্রকার শুদ্ধির বিরোধী নহে, প্রত্যুত এই প্রকার শুদ্ধির বিধান হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে প্রচুরভাবেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসও এই শুদ্ধি যে অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুসমাজে হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই বিষয়ে আমি যে সকল প্রমাণ আমার অভিভাষণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদিগের প্রামাণ্য কেহই এ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সেই সকল প্রমাণ-বচনের সরল সহজ বুদ্ধিগম্য ও পূর্ব্বাপর অবিরুদ্ধ তাৎপর্য্য আমি যাহা দেখাইয়াছি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অথবা বুঝিয়াও সংস্কারের বশে যুক্ত্যাভাস ও প্রমাণাভাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের জিদ বজায় রাখিবার জন্য আমার উপর রাশি রাশি অপবাদ-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিয়াছেন মাত্র। এই প্রকার রীতি অবলম্বন করিয়া, যাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিসাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে দ্বেষ ও কলহের সৃষ্টি করিয়া উন্নতির অন্তরায়ই হইবে, প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে কখনই পারিবে না, এই কথা এক্ষণে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই বেশ বুঝিয়াছেন। সুতরাং আমার বিরুদ্ধবাদিগণের বৃথা আস্ফালনে ও 'ধর্ম্ম গেল' 'দেশ গেল' 'সমাজ গেল' এই প্রকার চিরাভ্যস্ত দিগন্তভেদী চীৎকারে, সমাজহিতৈষী স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে সমুদ্যত উপচীয়মান শিক্ষিত সমাজের কোন প্রকার ভীতি বা তন্মূলক পশ্চাৎপদতার যে অণুমাত্রও সম্ভাবনা নাই, তাহা এখনও যদি প্রতিবাদপরায়ণ পণ্ডিত মহাশয়গণ না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনন্যোপায়।

আমি শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতা পরিহার সম্বন্ধে কোন নূতন পথ অবলম্বন করি নাই। কলিযুগপাবনাবতার দীনতারণ পতিতপাবন করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে পথ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর গৌরবস্তম্ভ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীনিবাস, শ্রীনরহরি, শ্রীনরোত্তম প্রভৃতি অসংখ্য পাপী, তাপী, পতিত ও উপেক্ষিত মানবসমূহের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ আত্যন্তিক হিতের সাধন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন, আমি সেই পথেরই নির্দ্দেশ আমার অভিভাষণে করিয়াছি। আমি অভিভাষণে বলিয়াছি এবং এখনও নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি যে, বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক যদি পতিত, অন্ত্যজ প্রভৃতি যথার্থ ভাগবত ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা অস্পৃশ্য থাকে না, তাহারা দানের পাত্র হয়, তাহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে কাহারও পাতিত্য হয় না। জাতি, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও ধনমদে মত্ত হইয়া হরিবিমুখ লোক বঞ্চনার্থ ধর্ম্মধ্বজী ব্রাহ্মণগণ হইতেও তাহারা পবিত্রতম স্পৃশ্য ও নমস্য হইয়া থাকে, ইহাই হইল সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের পরম ও চরম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে স্বয়ং আচরণ করিয়া অপরকে শিখাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা কবিকল্পনা নহে, ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত জাজ্বল্যমান ও অখণ্ডনীয় সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত, অনুমোদিত ও প্রচারিত এই অখণ্ডনীয় সার সত্য সিদ্ধান্ত তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বা মস্তিষ্কবিকারপ্রসূত নহে, তাহাই হিন্দুর প্রাণের ধর্ম্ম, তাহাই ঋষিগণের অনন্যসাধারণ সাধনার অমৃতময় পরিণতি, তাহাই সনাতন ধর্ম্মের অবিচাল্য মহাভিত্তি। হিন্দুর পুরাণ, হিন্দুর স্মৃতি, হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর ঐতিহ্য, হিন্দুর অনাদিকাল-প্রবৃত্ত আচার ও ব্যবহার এই সার সত্য সিদ্ধান্তের ঘোষণা চিরদিনই করিয়া আসিতেছে, এবং যত দিন এ জগতে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন অপ্রতিহতভাবে এই ঘোষণাই করিবে।

কলিযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছে—

"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন চ ভূরিমানঃ।"—৭।৯।১০

ব্রাহ্মণ শম, দম, তমঃ প্রভৃতি দ্বাদশগুণসম্পন্ন হইয়াও যদি শ্রীভগবান্ নারায়ণের পদারবিন্দে ভক্তিসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি বিবেচনা করি; যদি ঐ চণ্ডাল শ্রীভগবানের সেবার জন্য প্রাণ, মন, কর্ম্ম ও অর্থ অকপটভাবে সমর্পণ করে, তাহা হইলে এইরূপ ভগবদ্ভক্ত নীচজাতিও সকল কুলকেই পবিত্র করিয়া থাকে। বিরাট অভিমান যাহার আছে, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও সে যখন স্বয়ংই অপবিত্র, তখন তাহার দ্বারা কোন কুল পবিত্র হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভাগবতসন্দর্ভ' বা 'ষট্সন্দর্ভগ্রন্থে' নিম্নলিখিত গরুড়পুরাণের বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ! স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।"

এই অষ্টবিধ ভক্তি যে ম্লেচ্ছ ব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানী এবং সেই প্রকৃত পণ্ডিত, সে দানের যোগ্যপাত্র, তাহা হইতে প্রতিগ্রহও বিধেয়।

শ্রীজীব গোস্বামীর 'ষট্সন্দর্ভে' এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আর একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"

যেমন রসশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কাংস্য স্বর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধি দ্বারা সকল মনুষ্যই দ্বিজত্বলাভ করিয়া থাকে। এই শ্লোকে 'দ্বিজত্ব' এই শব্দটির অর্থ বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব, এইরূপ তাৎপর্য্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বসম্মত প্রমাণগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসের টীকাগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ-বচন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিস্তারভয়ে ঐ সকল বচন আমি মৎকৃত অভিভাষণে উদ্ধৃত করি নাই, আবশ্যক বোধ হইলে তাহা উপযুক্ত ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

এই সকল শিষ্ট-সম্মত শাস্ত্রীয় বচনই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পতিতোদ্ধাররূপ মহাযজ্ঞের প্রমাণ, নিজে আচরণ করিয়া তিনি এই সকল বচনের প্রামাণ্য লোকমধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভক্তকুলের আদর্শভূত যবন হরিদাসের মৃতদেহ স্বয়ং বহন করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক সমাধি প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেই মৃতদেহের পাদোদক নিজের পার্ষদ ব্রাহ্মণকুলগৌরব স্বীয় ভক্তবৃন্দকেও পান করাইয়াছিলেন। বঙ্গীয় বারেন্দ্রশ্রেণী-ব্রাহ্মণকুলাগ্রগণ্য প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য নিজের পিতৃশ্রাদ্ধের সময় উপযুক্ত অন্য ব্রাহ্মণ না পাইয়া এই যবন হরিদাসকেই বরণ ও আমন্ত্রণাদি করিয়া শ্রাদ্ধীয় পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন, ইহা কবিকল্পনাও নহে—আরোপনাও নহে, ইহা ঐতিহাসিক জাজ্বল্যমান সত্য। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণগ্রন্থসমূহে এই সকল কথা স্পষ্টভাবে লিখিত রহিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় এইরূপ শুদ্ধিকার্য্যের দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুজাতির ধর্ম্ম উচ্ছেদ পায় নাই—প্রত্যুত পরমোৎকর্ষই লাভ করিয়াছিল। আজ দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য, সংগঠনের জন্য, জন্মসিদ্ধ অধিকারানুসারে স্বরাজলাভের জন্য, যদি বাঙ্গালী নীচ অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত তথাকথিত হীনজাতির শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ভাগবতী দীক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক তাহাদের সমুন্নতিবিধান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের সনাতন ধর্ম্মের কোন ক্ষতিই হইবে না, প্রত্যুত বাঙ্গালীর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পরমোৎকর্ষই সাধিত হইবে।

আমার অভিভাষণে আমি স্পষ্টভাবে ইহাই বলিয়াছি যে,

দেশ, কাল ও পাত্রভেদে হিন্দু-সমাজে আচারের পরিবর্ত্তন হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের সম্মত, মহর্ষি পরাশর তাঁহার ধর্ম্মসংহিতায় এইরূপ পরিবর্ত্তনের ঐকান্তিক আবশ্যকতা স্বয়ংই প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরাশর-ধর্ম্মসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কলিযুগে যথাবিধি বেদাধ্যয়ন হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেদার্থজ্ঞান হইতেছে না; অর্থজ্ঞান না হওয়ায় বেদার্থ-যাগহোমাদিধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে না, ব্রহ্মচর্য্য লুপ্ত হওয়ায় যথাবিধি গার্হস্থ্যের অনুষ্ঠান বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর নহে; যুগপ্রভাবে মানব-সমাজে সত্যের প্রচার ক্রমশঃই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতেছে; কাম ও ক্রোধের অধীন হইয়া মানব নিঃসঙ্কোচে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, রাগ-দ্বেষ-বিরহিত সত্যানিরত শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের যথাবিধি ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল কারণে যথাসম্ভব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, যুগপ্রভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন আচার-রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। এই পরিবর্ত্তন শাস্ত্রানুমোদিত, এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে ধর্ম্মের আত্যন্তিক বিনাশ হইবার আশঙ্কা অমূলক। মাধবাচার্য্যের এই প্রকার উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি আমার অভিভাষণে বর্ত্তমান যুগের অনুকূলভাবে আমাদের আচার-রীতি-নীতির অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সাধারণ সমক্ষে নিবেদন করিয়াছি। যথাসম্ভব প্রাচীন শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া যুগপ্রভাবে আবির্ভূত, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক একবাক্যে অনুমোদিত অবর্জ্জনীয় আচারগুলিকে সনাতনধর্ম্মের চিরন্তন প্রথানুসারে বিরাট বর্দ্ধনশীল ভবিষ্যৎ হিন্দুসমাজের অনুকূল করিয়া লইয়া সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু-সম্প্রদায়কে এক মহান্ উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিবার জন্য হিন্দু-সমাজের নেতৃবর্গকে আমার কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছি। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সহিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিরোধ নাই—হইতেও পারে না। আমার এই মত অসত্য বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিরাট হিন্দুসমাজ তাহা নির্ণয় করুন। রাগদ্বেষরহিত সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র ও লোকব্যবহারে নিষ্ণাত ধীর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া আমি যে শাস্ত্রপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে কি না, তাহা স্থির করুন, ইহাই হইল আমার স্বজাতিহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট বিনীত আবেদন।

আমার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা নিজ কল্পনাবলে শুদ্ধির দ্বারা হিন্দু-সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছেন, আর 'ধর্ম্ম গেল' 'বর্ণ গেল' 'আশ্রম গেল' 'সদাচার বিলুপ্ত হইল' বলিয়া প্রবল চীৎকারে বাঙ্গালার আকাশ-পবন মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি আমার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা ব্যথিত হইয়াছেন, ইহা আমি জানি; কিন্তু ঐ সকল কথা বলা ছাড়া এখন গত্যন্তর নাই বলিয়াই আমি সেই সকল অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ জনসাধারণের সমক্ষে বাধ্য হইয়া করিয়াছি। আমি চাহি, অনাদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ যেমন হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের দ্বারা স্বজাতির অশেষ প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধান করিয়া আসিতেছেন, এখনও তিনি সেইরূপই করুন, কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য করিবার শক্তি এক্ষণে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহার দোষে আজ ভারতের ব্রাহ্মণ্যশক্তি এমন শোচনীয়ভাবে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে? ইহার সত্য উত্তর বর্ত্তমান কালে জাতিমাত্রাভিমানী ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত কটু হইবে, তাহা আমি যেমন বুঝি, তাহা আমার প্রতিবাদী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আমা অপেক্ষা অধিক বুঝেন, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কিন্তু অপ্রতিবিধেয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে বলিতেই হইতেছে যে, আমরা নিজেরই দোষে এই অমরদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্যশক্তি হারাইতে বসিয়াছি। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? তাহার নির্ণয়ার্থ প্রবৃত্ত ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারতে কি বলিয়াছেন, তাহা শুনুন—

"শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

মহা-শান্তি—মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায়।

বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ শৌচ ও সদাচারে যিনি সম্যগ্রূপে অবস্থিত, যিনি যজ্ঞশিষ্টভুক্, যাঁহার সেবা ও অকপট ভক্তিতে গুরুজন প্রসন্ন থাকেন, নিত্যব্রতপরায়ণতা যাঁহার স্বভাব, আর যিনি কায়মনোবাক্যে সত্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য, দান, অহিংসা, অনৃশংসতা, লজ্জা, সর্ব্বভূতে দয়া এবং তপস্যা যাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

এই সকল ব্রাহ্মণোচিত গুণ যাহার নাই, সে আমি ব্রাহ্মণের পুত্র, সুতরাং ব্রাহ্মণ এবং যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ, সেই হেতু আমাদের শীর্ষস্থানে বসিবার ও সমাজ পরিচালনা করিবার অধিকার আমারই আছে, এই বলিয়া উচ্চ চীৎকারে গগন ফাটাইয়া নেতৃত্বের দাবী করিবে, দলাদলির সৃষ্টি করিয়া সমাজের মধ্যে ঘোর অশান্তির অনল জ্বালাইবে, পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের দোহাই দিয়া আপনার অজ্ঞতা, দাম্ভিকতা ও হিংসকতাকে ধর্ম্মরক্ষকতার আবরণে কৌশলের সহিত আবৃত করিয়া—নিজ জীবিকার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিবে, সে দিন এ দেশে আর নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দু সমাজ মস্তকহীন কবন্ধের দশা প্রাপ্ত হয়, ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাবে আজ হিন্দু সমাজ যে কবন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাও জাজ্বল্যমান ধ্রুব সত্য। যথার্থ ব্রাহ্মণ যদি এক জনও থাকিত, তাহা হইলে তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দু সমাজ তাহার চরণে মাথা নত করিয়া আপনার অভ্যুদয়ের পথে অপ্রতিহতবেগে অগ্রসর হইতে পারিত, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, করিতে পারেও না। সত্য কথা বলিতে যাহাদের সাহস নাই—ঘরে যাহা করি, বাহিরে তাহারই নিন্দা করিতে যাহাদের রসনা সঙ্কোচবোধ করে না, সভা-সমিতিতে, সংবাদপত্রে, মুদ্রিত পুস্তকে—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বেদের অধ্যয়ন যথাবিধি সমাপ্ত না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করে, সে অতি শীঘ্রই সবংশে শূদ্রত্বলাভ করে।

এই মনুবচনের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন করিবার জন্য তাহারা যদি যথাবিধি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন না করে, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ যে অতি নিকটবর্ত্তী, ইহা এখন বাঙ্গালার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন। সুতরাং ঐ প্রকৃতির লোক যতই দল বাঁধিবার চেষ্টা করুন না কেন, তাহাতে বাঙ্গালার নবজাগ্রত অভ্যুদয়োন্মুখ বিরাট হিন্দু সমাজের কোন ক্ষতিরই সম্ভাবনা নাই। নিজের বিবেক, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এবং স্বজাতি ও দেশমাতৃকার অকপট সেবার জন্য অকৈতব সমুৎসাহ মিলিত হইয়া বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়ের অনুকূল গন্তব্যপথের নির্দ্দেশ অতি শীঘ্রই করিয়া দিবে, ইহাই হইল শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। ইহারই অভিব্যক্তি আমার ময়মনসিংহের অভিভাষণে অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। আগামী বারে তাহাই ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

এ যুগের 'ঘর-কন্না'

শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহায়া বধূ

ক

চার কুড়ি বৎসরের মাতা বিদ্যমান থাকায় মাতৃবাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া চরণ নন্দী তৃতীয় পক্ষ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রভাতে সানাই যখন তাহার সুকরুণ সুরে গ্রামটি প্লাবিত করিয়া ফেলিল, তখন অনেকেরই বুকের ভিতর "ছাঁৎ" করিয়া উঠিল। অনেকেই ভাবিল—বিবাহের আনন্দ-লহরীর ভিতর সানাইয়ের করুণ ক্রন্দন যেন মানায় না। হয় ত এই গ্রামে এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিবাহ-ই এইরূপ চিন্তা-স্রোতের প্রধান কারণ, নতুবা সানাই ত প্রায় প্রতি বিবাহে, চিরকাল ধরিয়া এই ভাবেই কাঁদিয়া আসিতেছে, কৈ, কাহারও ত তাহা কখনও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না।

তা' যে প্রকারেরই হউক, বিবাহ ত বটে! গ্রামের মেয়ে-মহল বিয়ে-বাড়ীতে বধূ দেখিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বউ দেখিয়া সকলেই হতবুদ্ধি না হইলেও অবাক্ যে হইয়াছিল, সে কথা শপথ করিয়া বলা যাইতে পারে। নববধূ মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া অতিরিক্ত বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহ-পরিষ্কারে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শাশুড়ী অন্যগৃহ হইতে ডাকিয়া কহিলেন,—"কি কোচ্ছো বউমা, ও-সব রেখে, ও দিকে একবার যাও ত মা, সবাই তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন।"

নব-বধূ তাড়াতাড়ি কয়েকখানি আসন লইয়া আসিয়া যখন দেখিল, দর্শকবৃন্দা নিতান্ত অল্প নহেন, তখন সেগুলি রাখিয়া তাড়াতাড়ি দুইখানি 'মাদুর' আনিয়া বারান্দায় পাতিয়া দিয়া বলিল,—"বসুন।"

এক জন বলিলেন,—"যাই হোক, বউ কিন্তু দেখ্‌তে বেশ! দাদার আমাদের স্ত্রী ভাগ্য ভাল।"

বধূ ইহার উত্তর দিল,—"আয়নায় রূপ দেখে অনেক দিন নিজেই আমি 'মূচ্ছো' যাব যাব হয়েছি।"

প্রশংসাকারিণী ভাবিলেন,—এ আবার কি!

একটু অপ্রস্তুত হইয়া, চুপি চুপি তাহার এক সঙ্গিনীকে বলিলেন,—"বাবা! কি ধিঙ্গি মেয়ে গো, যেন সাতকেলে বুড়ী।"

সঙ্গিনী একটু ঝঙ্কারের স্বরে উত্তর দিলেন,—"বুড়ী না ত কি ছুঁড়ী? এত বড় মেয়ে যে এত দিন আইবুড়ো ছিলেন, এই আশ্চয্যি!"

নব-বধূ পারুলবালা ওরফে পরী কহিল,—"সত্যি বলছি ভাই, আমি বুড়ী মোটেই নই। এই ত্যাখ, আমার একটা দাঁতও পড়ে নি, কি একগাছি চুলও পাকে নি। বিশ্বেস না হয়, এই ত্যাখ না।" বলিয়াই মাথায় যে একটু ঈষৎ অবগুণ্ঠন ছিল, তাহাও মুক্ত করিয়া দিয়া বলিতে লাগিল,—"আর যদি এক আধগাছি পাকেই ভাই, তাতেই বা এমন কি বয়ে গেল! তোমাদের দাদার যে আধগাছিও আর কাঁচা নেই—একেবারে বরফ-ঢালা হিমালয় ঠাকুর! নিজেদের দিকটা একবারও দেখ্‌তে চাও না, তোমরা কি এম্‌নি একচোখো?"

ইহার পর আর কথা চলে না। সম্পূর্ণ অবাক্ হইবার যাহা কিছু বাকী ছিল, এবারে আর তাহার কোনই অবশিষ্ট রহিল না। দুই চারি জন যাঁহারা বৃদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা বধূর শাশুড়ীর নিকট বিদায় লইতে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। তখন বধূ তাড়াতাড়ি একথালা পাণ ও দোক্তার কৌটাটা আনিয়া অবশিষ্ট আগন্তুকদিগের সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"ভাগ্যি আমি দোক্তাটুকু সঙ্গে ক'রে এনেছিলুম বোন্, তাই না আজ তোমাদের একটুখানি আপ্যায়িত করতে পেলুম। এ বাড়ীতে কি কেউ পাণ খেতে জানে?"

এক জন রসিকা উত্তর দিল,—"জান্‌বে লো এবার থেকে আবার জান্‌বে। তবে ভাই, হামানদিস্তেয় পাণ ছেঁচে দিতে হবে তোমায়, তা আগেই ব'লে রাখা ভাল।"

বধূ বলিল,—"সে তখন দেখা যাবে, সে জন্যে ভেবে ভেবে যেন কঠিন একটা মাথার 'ব্যায়রাম' ক'রে বসো না। এখন 'নিশ্চিন্দি' হয়ে পাণ-দোক্তা গিলে একটু 'রক্তমুখ' কর, আমি বুড়ীর মাথায় একটু তেল-জল দিয়ে এসে মিষ্টিমুখ করাব'খন। বুড়ীর আবার কাল সারারাত্তির একটুও ঘুম হয়নি কি না।"

রক্তমুখী রহস্যটা সকলেরই যেন কেমন একটু তিক্তই বোধ হইতেছিল, তথাপি সেই রহস্যপ্রিয়া ললনাটি আরও একটু রহস্য করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না, কহিলেন—"কি ক'রে জান্‌লে বউ? তুমি কি কাল রাত্তিরে শাশুড়ীর ঘরে ছিলে,—দাদার ঘরে ছিলে না?"

বধূ কহিল,—"ছিলুম না ত কি তোমরা এসেছিলে? তবু ত আমার স্বোয়ামীর মা-জননী, তাঁর খবরটাও কি আমার রাখ্‌তে নেই?" বলিয়াই সে দ্রুতপদে শাশুড়ীর নিকটে আসিয়া, তাঁহার কোন 'আপত্তিই' গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার মাথায় তেল ঠাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এ দিকে তাহাকে লইয়া যে কি মন্তব্য চলিতে লাগিল, তাহা শুনিবার জন্য তাহার কোন কৌতূহলই দেখা গেল না। তখন সকলেই সহানুভূতির পরিবর্ত্তে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা লইয়াই গৃহে ফিরিল, "ছিঃ! ছিঃ! কি বেহায়া বউ গা!"

পাড়ায় পাড়ায় বধূর বেহায়াপনার দুন্দুভি-নিনাদ শুনিয়া বাড়ীর বুড়ী গতি ঝির যখন নিতান্তই আর সহ্য হইল না, তখন সে আসিয়া কহিল,—"ছিঃ! বউ, অমন কি করতে আছে? পাড়ায় যে সকলে 'যাচ্ছেতাই' কচ্ছে।"

বধূ হাসিয়া উত্তর দিল,—"বেশ ত, আমার বিয়ের এ বাড়ি কি তোর পছন্দ হচ্ছে না? ওঃ, তবে আমাকে বুঝি তোর হিংসে হচ্ছে।"

গতি ঝির আর কোন গতি-ই রহিল না। সে তখন নিরুপায়।

খ

চরণ নন্দী গ্রামের ভিতর ঠিক বর্দ্ধিষ্ণু বলা যায় কি না, জানি না, তবে যে তাঁহার দু'পয়সার সংস্থান ছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ-ই নাই। কিন্তু এই সংস্থান ভোগ যে করিবে কে, সেটা একটা দারুণ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপর্য্যুপরি দুইটি বধূ পার করিলেও পুন্নাম নরক হইতে ভবিষ্যতে পার করিবার জন্য যখন কেহই দুইটি কোমল বাহু বাড়াইয়া বর্ত্তমানে নিতান্তই হাজির হইল না, তখন অগত্যা তিনি ভাবিলেন—বার বার, তিনবার, এইবার একবার শেষ চেষ্টাটা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তাঁহার মাতার আর সে বিষয়ে কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। চরণ মাতার এই অসম্ভব ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন ও মাতার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেই পারের কড়ি সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সকলকে বলিলেন—"কি করি, মাতাঠাকুরাণীর নিতান্ত জিদ্।"

বঙ্গদেশে কন্যার আবাদ বোধ করি সর্ব্বদেশ অপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে। খোঁজ করিলে মরণের পর 'বৃষকাঠের' সহিত বিবাহ দিবারও বোধ হয় কন্যার অভাব হয় না। তা চরণ নন্দীর আর এমন বিশেষ কি বয়স হইয়াছে। মাত্র তিন কুড়ি তিন বৎসর বই ত নহে—এ আর বেশী কি? নন্দী মহাশয়ের বিবাহের পাত্রী মিলিল। তবে কন্যার একটু বয়স বেশী, এক কুড়ি না হইলেও যে 'অষ্টাদশ বৎসরের একগাছি মালা'—তাহা নিশ্চয়। শত্রুদের কথা ধরিতে নাই, তাহারা একটু বাড়াইয়াই বলে—এক কুড়ি তিন বৎসর। কন্যার সংসারে মাত্র এক কুল বর্ত্তমান ছিল,—সেটা মাতুল-কুল। আর তাহার কেহই ছিল না। তাই মাতুল মহাশয় কয়েক শত রজত-চক্রের বিনিময়ে আপন ভাগিনেয়ীকে শ্বশুরকুলে উৎসর্গ করিয়া আর একটা কুল 'বজায়' রাখিলেন—এটা একটা মস্ত বড় মহানুভবতাই বলিতে হইবে। সংসারের লোক হইয়া ইহার অধিক আর কি করিতে পারে? সে যাহা হউক, সেই কন্যা পারুল-বালা বা সংক্ষেপে পরী। এ হেন পরীর স্বামী তিন কুড়ি তিন বৎসরের চরণ নন্দী তাহার এই তৃতীয় পক্ষ লইয়া একটু অধিক মাত্রায়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

অন্নাভাবে যখন শরীর শীর্ণ, বর্ণ মলিন ও চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া আসে, তখন এই দীনতাগুলিকে ঢাকা দিবার জন্য নানা রকমের পোষাক-পরিচ্ছদের নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু এই শত শত সজ্জার মূল্যও কোন রকমে হয় ত জোগাড় হয়, তথাপি শীর্ণ শরীর পূর্ণ করিবার যে সমস্যা অর্থাৎ কি না অন্ন-সমস্যা, তাহার আর কোনই নিরাকরণ হয় না। চরণ নন্দীরও তাহাই হইল। যদিও অন্নাভাবে তাঁহার পূর্ব্বকথিত কোন প্রকার দুর্দ্দশা না হউক, কিন্তু সময় চরণের উপর তাহার ডিক্রীজারী করিতে বিশেষ কার্পণ্য ত করে নাই। তাই চরণ তাঁহার এই ক্ষতিটাকে নকল দিয়া পূরণ করিবার জন্য যত প্রকার চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহার সর্ব্ববিষয়ে, একটু বেশী রকমই সজাগ হইয়া উঠিলেও সময়ের অত্যাচারের হস্ত হইতে কিসে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে, সে সমস্যার কোনই সমাধান করিতে পারিলেন না। তিনি শারীরিক দীনতাগুলি যতই ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলেন, তাহা ঢাকা না পড়িয়া ততই আরও উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। এ দিকে তাঁহার কয়েকগাছি "গ্যাল্‌ভানাইজড" চুলের উপর নানা রকমের 'হেয়ার ডাইয়ে'র মুখোস যতই আঁটিতে লাগিলেন, পরীবালা ততই মাখিবার "হেজ্‌লিন স্নো"গুলি মুখে না মাখিয়া চুলে লেপিতে আরম্ভ করিল। চরণ যে দিন কলিকাতা হইতে দাঁত বাঁধাইয়া বাড়ী ফিরিলেন, পরী সে দিন শাশুড়ী বুড়ীর ভাঙ্গা চশমাখানি নাকের ডগায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল। স্বামী ব্যথিত হইয়া নিকটে আসিলে পরীবালা আয়না-চিরুণী লইয়া স্বামীর কেশপ্রসাধনে মনোযোগ দিল।

চরণ কহিলেন,—"পারুলবালা, তুমি আমাকে কোন দিনই কি একটু ভাল চোখে দেখ্‌বে না?"

পরী উত্তর দিল,—"ভাল চোখে দেখবো বলেই ত চোখে চশমা এঁটে এসেছি—দেখছো না?"

চরণ বাবু ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"না হয় আমার বয়স একটু বেশীই হয়েছে, তবুও ত আমি তোমার স্বামী।"

পরীবালা কহিল,—"আমি কি বল্‌ছি মশাই আপনি আমার বোনাই? আর আমি ত এখন কচি খুকীটি নই যে, চশমা চোখে দিলেই গোল্লায় যাব। পাড়ার সকলে ত আমাকে বুড়ী-ই ব'লে গিয়েছে।"

তিন কুড়ি তিন বৎসর বয়সেও মানুষের সখ একবারে মরে না। নির্ব্বাপিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অগ্নি যেরূপ আরও বিশেষভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ মানুষের সখও বোধ হয়, বয়স অধিক হইলেই একটু বেশীই হইয়া থাকে। চরণ বাবু বলিলেন,—"যাও, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।"

পারুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া নন্দী মহাশয়ের মুখ চাপিয়া ধরিল: "ছিঃ ছিঃ, ও কথা বল্‌তে নেই, তা হ'লে আমার যে অনন্ত নরক। আমি মশাইয়ের তৃতীয় পক্ষ হ'লেও মশাই ত আমার এক পক্ষ-ই।"

চরণ কহিলেন,—"তবে তুমি আমাকে দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও কেন?"

"কবে আবার পালালুম? আমি কি চোর যে, পালিয়ে বেড়াব?"

"চোরই ত! আমার মন-প্রাণ কি চুরি কর নি?" বলিয়া আপন রসিকতায় আপনিই মোহিত হইয়া নন্দী মহাশয় 'হোঃ হোঃ' করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

পরী কহিল—"ভারি আশ্চয্যি ত! মন-প্রাণ এত দিনও টিঁকে ছিল! আগের দু'পক্ষ ত বেজায় রকমের সাধু ছিল দেখতে পাচ্ছি।"

চরণ ব্যথিত হইলেন। বেদনায় মুখখানি ম্লান করিয়া, খানিকটা নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,—"মানুষের হাত, পা, কান, চোখ কি একাধিক থাকে না? মানুষ কি প্রত্যেকটা-কেই সমান ভালবাসে না?"

পরী কহিল,—"তা বটে, তোমার চোখ ত দু'টি নয়—তিনটি। তুমি যে শিব ঠাকুর!"

"ওঃ! তুমি আমাকে বুড়ো বল্‌ছো ত?"

"কিসে?"

চরণ কহিলেন,—"কিসে নয়?

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।'

এই ত? আমি লেখা-পড়াও কিছু শিখিনি মনে কর?"

পরী উত্তর দিল,—"আমিও আর বুঝি কিছুই জানিনে? তবে শুনবে?—

'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে,
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়?'

এই আমার মত বিধু কি আর ধূলায় গড়াগড়ি গেলে শোভা পায়? তাই না স্থাণুর ললাটে স্থান পেয়ে ত্রিনেত্র পূর্ণ করেছি।"—বলিয়াই পারুলবালা হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

চরণ বাবু আরও ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"না হয় আমি শিবের মতই বুড়ো! তথাপি স্বামী ত! স্বামী ব'লেও ত একটু ভালবাসতে হয়।"

পারুল বলিল,—"তা কি আর বাসি না, মশাই?"

উত্তর হইল,—"ছাই বাস, দিনরাত্তির ত মায়ের সেবাই চল্‌ছে! আমার কথা ত একটুও ভাবতে দেখি না।"

স্বামীর কথায় পরীকে যেন ভূতে পাইল। সে বেদম হাসিতে লাগিল, প্রায় দম বন্ধ হইবার উপক্রম আর কি। হাসির বেগ একটু থামিলে সে কহিল, "আঃ, যেতে দাও, ও বুড়ী বা আর কত দিনই টিকবে! বুড়ী 'অক্কা' পেলে, ঐ শ্রীচরণ পূজিবার তরে পারুল রহিবে চিরকাল। যাই, বুড়ীর চশমা নিয়ে এসেছি, দিতে যাই, আবার শেষে চোখে না দেখতে পেয়ে কি কোথাও প'ড়ে মরবে।"

"কি বিপদ্! একটু পরে দিলেই চলবে, দাঁড়াও না।"

"না না, বুড়ী কি শেষে অপঘাতে মরবে?"

"হুঁ! মরার 'বান্দাই' বটে! অত শীগ্‌গির মরছেন না। সে ভয় তোমার নেই।"

পরী সে কথা কানে না তুলিয়া, দ্রুতবেগে শাশুড়ীর নিকট চলিয়া গেল।

তিন কুড়ি তিন বৎসরের চরণ বাবুও ভাবিলেন,—হায়! বিবাহিত জীবনে মাতাই হইতেছে মানবের পরম ও চরম শত্রু।

৩

ইতঃপূর্ব্বে বৈকালে একটুখানি বৃষ্টি হইয়া ধরণীকে তৃপ্ত না করিয়া তাহার তৃষ্ণা অনেকখানি বৃদ্ধিই করিয়াছে। গ্রীষ্মটা যেন এতক্ষণ গুমোট বাঁধিয়াছিল, এখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

গিন্নী বুড়ী এতক্ষণ ঘরের কোণে বসিয়া মালা জপ করিতে-ছিলেন, এখন বৃষ্টিটা থামিয়া যাওয়ায় দুই হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার করিয়া মালার থলিটা ভিতের গায়ে একটা কাঁটার সহিত ঝুলাইয়া রাখিয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন। পরী এতক্ষণ শাশুড়ীর গৃহমার্জ্জনায় ব্যস্ত ছিল, শাশুড়ীকে এখন দাওয়ায় বসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার নিকট একখানি মাদুর বিছাইয়া দিয়া পুনরায় শাশুড়ীর শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্ম গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া একখানি পাখা হস্তে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, গৃহিণী মাদুরের উপর শুইয়া আছেন। তখন সে একটি বালিস আনিয়া শাশুড়ীর মস্তক-নিম্নে গুঁজিয়া দিয়া নিকটে বসিয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতে লাগিল।

শাশুড়ী কহিলেন, "থাক্ মা, থাক্। যাও, এখন চুলটুল বাঁধ গে।"

বধূ কহিল,—"চুল না বাঁধলে কি তোমার পছন্দ হয় না, মা? আমি কি এতই কুৎসিত?"

"দেখ্‌ছো মেয়ের কথা! তুই যদি কুৎসিত মা, জানি না, সুন্দরী তবে কে। বুড়ো হয়েছি মা, এখনও চোখের মাথা একেবারে খাই নি। চুল যদি না বাঁধবি ত না-ই বাঁধলি, তাই ব'লে তোকে আর অত দিন-রাত্তির আমার সেবা করতে হবে না। আর এখনও যদি চুলটুল না বাঁধবি মা, তবে আর কবে বাঁধবি? 'সাজগোজ' করবার এই ত বয়েস মা?"

বধূ উত্তর করিল,—"আর তোমার-ই বুঝি এখন সংসারের বাঁদীপণা করবার সময় মা? এখনও যদি সেবা না নেবে, তবে আর কবে নেবে মা? আর কেউ হ'লে যে এত দিনে 'বাহা-ত্তুরে' ধরতো! তুমি যাই মেয়ে, তাই না এই বয়সেও এত ঝক্কি সহ্য কর।"

"আমি আর কি করি মা, আমার কি এখন আর কোন সামর্থ্য আছে?"

"না, নেই আবার! তোমার এখনও এই পাকা পাঁজরার একখানা ভাঙ্গা হাড়ের যা যোগ্যতা রয়েছে, তা এই বাড়ীশুদ্ধ ক'জনারই বা আছে?"

বুড়ীর চক্ষু ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। এই পোড়ারমুখী মেয়ে, এত কাল পরে সে যখন মরণের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন কেনই বা আসিয়া তাহাকে এমন করিয়া জ্বালাইতে লাগিল!

পারুল কহিল,—"ছিঃ মা, তুমি কাঁদছো?"

শাশুড়ী কহিলেন,—"এর আগে ত এমন ক'রে কথা আমায় কেউ বলে নি, মা!"

বধূ কহিল,—"তাদের যে তুমি শাশুড়ী ছিলে মা, আর আমার যে তুমি খালি মা। মায়ের আদর যে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। আমার এ উপবাসী প্রাণ যে অনেক দিন এমন ক'রে মায়ের আদর পায় নি, মা!"

"না মা, তুই-ই আমার মা! সেই কত কালের আগেকার হারানো মা, আবার বুঝি ফিরে এলি।"

বধূ হাসিয়া কহিল,—"মনে থাকে যেন, আমি তোমার মা, তুমি আমার মেয়ে, এখন থেকে আমি যা বোলবো, মাথা হেঁট ক'রে কিন্তু শুনতে হবে। আর কোন ওজর আপত্তি কিন্তু শুনবো না।"

শাশুড়ী বধূর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বধূ প্রণাম করিল।

শাশুড়ী কহিলেন,—"আমার এই পাগ্‌লী মাকে যে জগতে কেউ কখন বুঝতে পারবে না, তা ত আমি ভালই জানি। মামার বাড়ী কি করেই যে এত দিন কাটিয়েছিস্ মা, জানি না। কৈ, তারা ত আর কোন খবরও নিলে না।"

পারুল বলিল,—"সেথায় দিন ত কাটাতে পারি নি মা, তাই ত আমার মায়ের কাছে পালিয়ে এলুম।"

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীর বক্ষে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। শাশুড়ী কহিলেন,—"এখন যাও মা, ঘরে যাও, ছেলে আবার রাগ করতে পারে; আমিও উঠি, ঠাকুর কি করছে, একটু খোঁজ নিয়ে আসি।"

বধূ কহিল,—"না, মা, তুমি বোসো। ছেলেকে দেখে তোমারই বা এত ভয় কি মা? তুমি মা, না ছেলে?"

শুনিয়া শাশুড়ী একটুখানি হাসিলেন মাত্র, কিছুই আর বলিলেন না। এই ছেলেটি এক দিন এতটুকুই ছিল। কত কষ্টে, কত যত্নে যে তাহাকে মানুষ করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা সে এই হতভাগী মা-ই জানেন। কিন্তু সেই ছেলে আজ মায়ের প্রতি যে আচরণ করিতেছে, তাহা মা হইয়া আর কেমন করিয়া উচ্চারণ করা যায়। তাই নীরবেই রহিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে এই ষাট বছরের 'বুড়ো খোকা' বধূর প্রসঙ্গ লইয়া মাতার সহিত যে কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে এই আশ্চর্য্য বধূটিও অতিমাত্রায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে পারুল আরও শাশুড়ীর "ন্যাওটো" হইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ীর হৃদয়ের এই গভীর ক্ষতের সেই ত প্রধান কারণ, সুতরাং সেই-ই ইহার নিরাকরণ করিবে। চরণ কিন্তু ইহাতে দিন দিন আরও অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ এই পরিবারের মধ্যে একটা অশান্তির ঝড় বাড়িয়াই চলিল।

ছয়

মানুষের দিন পড়িয়া থাকে না, একরকমে কাটিয়াই যায়। নন্দী-পরিবারেরও দিন চলিতেছিল। মেঘে মেঘে বেলাটা অনেকই হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ণ চারি বৎসর কাটিয়াছে। সংসারে অনেক পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে বৃদ্ধার একটি পৌত্র হইয়াছে। চরণের স্বর্গে যাইবার সিঁড়ি তৈয়ারী হইল; পারে যাইবার কড়ি সংগ্রহ হইল। এখন এই কড়ি চোরে না লইয়া যায়—ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে হয়। এত হইয়াছে, কিন্তু পারিবারিক অশান্তির কিছুমাত্র হ্রাস ত হয়ই নাই; বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া সকলে বলিল,—"এ বউ যে এবার নন্দী মহাশয়কে পার করিবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ-ই নাই।"

খোকা এখন তাহার ঠাকুরমার নয়নের মণি। খোকাকে না লইলে এক দণ্ড এখন আর তাঁহার চলে না। আহ্নিকের মন্ত্র ভুল হইয়া গিয়াছে, হরিনাম মাথায় উঠিয়াছে। ঠাকুরমা যতই তাহার দাদুভাইকে অঞ্চলে বাঁধিলেন, পরীও ততই শাশুড়ীকে বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। বধূর সহিত চরণের এখন দেখা-সাক্ষাৎ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। শাশুড়ী, বধূ ও এই নবাগত দেবতাটিকে ঘিরিয়া যে মধুচক্র প্রতিদিন গড়িয়া উঠিতেছিল, চরণ যেন তাহাতে হুল ফুটাইবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ইহাতে মাতার প্রতি নন্দী মহাশয় যতই কেন কঠিন হউন না, পত্নীকে তিনি বিশেষভাবে ভয় করিয়াই চলিতেন এবং রাগের জ্বালাটা অকারণে মাতার উপর বর্ষিত হইতেই পরী "হাঁ হাঁ" করিয়া ছুটিয়া আসিত। নন্দী মহাশয় ল্যাজ গুটাইয়া পলাইতে পথ পাইতেন না। এমনই ভাবেই এত দিন চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক জন যদি সদা-সর্ব্বদা অপরকে নির্য্যাতন করিবার কেবলই সুযোগ খুঁজিতে থাকে, তবে অন্যে হাজার সতর্ক থাকিলেও তাহাকে সর্ব্বদা অপমানের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।

এক দিন এমনই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া গেল যে, কি পারুল, কি তাহার শাশুড়ী কাহারই লজ্জায় মুখ রাখিবার আর এতটুকুও যায়গা পর্য্যন্ত রহিল না।

সে দিন পরীর সামান্য একটু 'ইনফ্লুয়েঞ্জার' মত জ্বর হইয়াছিল। পরী শাশুড়ীর শয্যায় শুইয়া শাশুড়ীর কোলে তাহার দাদুভাইয়ের দুগ্ধপান দেখিতেছিল। বুড়ী তাঁহার দাদুকে দুধ খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, শিশুর পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়া বধূকে কহিলেন,—"যাও মা, শোও গে যাও।"

বধূ কহিল,—"তুমি একটু চুপ ক'রে শোও মা, পায়ে তেল দিয়ে দি।"

"তোমার আর জ্বর-গায়ে পায়ে তেল দিয়ে দিতে হবে না মা, এখন তুমি ওঠো।"

কিন্তু বধূ তাহার নৈমিত্তিক কার্য্য না করিয়া কিছুতেই উঠিবে না। শাশুড়ীও কিছুতেই পায়ে তেল দিতে দিবেন না।

"পায়ে তেল না দিয়ে আমি কিছুতেই উঠবো না।"—বলিয়া শাশুড়ীর পিঠ ঘেঁসিয়া, তাঁহাকে জড়াইয়া পরী শুইয়া পড়িল। শাশুড়ী আর কিছু না বলিয়া পাশ ফিরিয়া বধূকে বুকের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,—"জ্বরটা ত দেখ্‌ছি, ভালই ক'রে বোসেছ বাছা!" এমন সময় নন্দী মহাশয় অকস্মাৎ ধূমকেতুর ন্যায় অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মাতাকে ভ্যাঙচাইয়া উঠিলেন,—"এখন আবার 'ন্যাকামো' হচ্ছে—'জ্বরটা ত দেখ্‌ছি ভালই ক'রে বোসেছ বাছা!' বুড়ী একে একে দুটিকে খেয়েছেন, এখন এটাকে পেটে না পূরলে আর দুর্ভিক্ষ ঘুচবে না বোধ হয়। ছেলেটাকে ত সারাদিন জোঁকের মত আঁকড়ে ব'সে রয়েছেন! ঐ রাক্ষুসীর নিশ্বাসে যে ওটা এত দিনও টিঁকে আছে, এই-ই আশ্চয্যি।"

মাতা বলিলেন,—"অত চোখ রাঙ্গাস কেন, বাপু? কে তোর বউকে আমার কাছে আসতে বলে? সে না এলেই ত

পারে। তুই আটকে রাখতে পারিস্ নি? আমি কি পায়ে ধ'রে ডেকে আনি?"

"না, আনো না। দু'জনে শাশুড়ী বউ ত নয়, যেন দুই সখী। রাতদিন দু'জনে কেবল হিঃ হিঃ-ই করছেন! লজ্জাও করে না!"

সত্য বটে, তাঁহার লজ্জা নাই, নহিলে এত দিন বাঁচিয়া থাকাটাই যে তাঁহার পক্ষে একটা লজ্জার কথা! যমের মত লজ্জাও যে তাঁহাকে আজ ত্যাগ করিয়াছে। তবুও এই নির্লজ্জা মাতা মুখ বুজিয়াই এত দিন পুত্রের অত্যাচার নীরবে সহিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ এই ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তিটিরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে নামিয়া আসিয়া তিনি কহিলেন,—"ত্যাখ, মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্।" বধূও তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন নন্দী মহাশয় ক্রোধে জানোয়ারের মতই গর্জ্জিয়া উঠিলেন.—"বটে! এত বড় স্পর্দ্ধা, যার খাও, তাকেই চোখ রাঙ্গাও! বেরোও আমার বাড়ী থেকে, নিকাল যাও।"

অকস্মাৎ সম্মুখে বজ্রপতন হইলে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হইয়া যায়, শাশুড়ী ও বধূ উভয়েই সেইরূপ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নন্দী মহাশয় তখন ঘুমন্ত পুত্রকে টানিয়া কোলে করিয়া স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিলেন—"এস।"

পুত্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পারুল গর্জ্জিয়া উঠিল—"যাব না, যাও।"

"বটে! তবে তোমারও আর এ বাড়ীতে ঠাঁই নাই জেনো। তুমিও এই সঙ্গে দূর হও। দেখি, তোমার কোন্ বাবা তোমাকে এখানে ঠাঁই দেয়।" এই বলিয়া নন্দী পুত্রকে লইয়া বিদ্যুদ্‌বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শাশুড়ী ও বধূ উভয়েই নির্ব্বাক্, লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া গৃহের দুই কোণে দুই জন বসিয়া রহিল। পরস্পর কেহই আর কোন সান্ত্বনা-বাক্যও খুঁজিয়া পাইল না।

৬

সেই পুরাতন কথা! 'দিন পড়িয়া থাকে না।' সেই লজ্জাকর রজনীরও অবসান হইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে, শাশুড়ী ও বধূর নিদ্রাকর্ষণ হইলে উভয়েই শূন্য মেঝের উপরই সুষুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইল। মানব-হৃদয়ের গভীর ক্ষত যখন অতিরিক্ত রক্ত উদ্গিরণ করিতে থাকে, তখন এই শান্তিময় নিদ্রাই সেই রক্তবমন বন্ধ করিয়া থাকে। তখন প্রকৃতির এই শান্ত মেয়েটিই বেদনায় শুশ্রূষা করিতে তাহার কোমল বাহুলতা বাড়াইয়া না আসিলে, শক্তিহীন, নিরুপায়, স্বভাবদুর্ব্বল মানবের ত আর কোন উপায়ই রাহত না।

শাশুড়ীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বালারুণের স্বর্ণচ্ছটায় পৃথিবী উদ্ভাসিত হইয়াছে। বিহঙ্গমের মুখর কাকলীতে সর্ব্বত্র একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জগৎ পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। তাহার ত কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই! কেবল সেই ভগ্নহৃদয়া, ভগ্ন-শরীরা, বৃদ্ধা নারীরই যেন সব ওলোট-পালোট হইয়া গিয়াছে। তিনি ত এই জীবনে কত পরিবর্ত্তনই না দেখিয়া আসিলেন, তথাপি এই পরিবর্ত্তনটা যেন বিশেষ করিয়া তাঁহার জীর্ণ পঞ্জরে নাড়া দিয়া গিয়াছে। জগতে কৈ আর কাহারও ত কিছুই হয় নাই! তবে ত তাঁহার জন্য আর এ সংসার নহে। তাঁহার ত এখন যাওয়াই উচিত, অনেক পূর্ব্বেই ত তাঁহার এখান হইতে বিদায় লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে এ কি কচ্ছপের পরমায়ু প্রদান করিয়াছেন। এখনও ত তাঁহার ডাক আসিল না। তবে আর তিনি কি করিবেন? গৃহিণী বাহিরে আসিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। আসিবার সময় একবার ফিরিয়া দেখিলেন, গৃহকোণে জড়পিণ্ডের ন্যায় বধূ পড়িয়া আছে। 'আহা! এই এক বিধাতা-বর্জ্জিত হতভাগী!' একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে ডাকেন, কিন্তু পারিলেন না। আস্তে আস্তে গৃহের বাহিরে আসিয়া, একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, গৃহ-দেবতা 'রাধারমণের' গৃহ মার্জ্জনা করিবার মনস্থ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

মাতার প্রতি অকারণ ক্রোধ বশতঃ গত রজনীতে কুৎসিত কাণ্ডটির অনুষ্ঠান করিয়া মনে মনে চরণ নন্দী যে অনেকখানি অনুতপ্ত না হইয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু অনুশোচনা অপেক্ষা পারুলের প্রতি ভীতির সঞ্চারই হইয়াছিল তাঁহার অত্যধিক; তাই দূর হইতে যখন তিনি মাতাকে "রাধারমণের" গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তখন ধীরে ধীরে মাতার গৃহে পারুলের দেখা পাইবেন ভাবিয়া প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, অচৈতন্য অবস্থায় পারুল মেঝের উপর কুণ্ডলীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। চরণ বাবুর বুকের ভিতর আঁতকাইয়া উঠিল, জ্বর কি তবে বেশী হইয়াছে? কিংবা উহা ক্রোধের বিকাশমাত্র! তখন তিনি গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন,—গাত্র পুড়িয়া যাইতেছে। চরণ তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পারুল কেবলমাত্র তাহার জবাকুসুমের মত রক্তবর্ণ চক্ষু একবার মুক্ত করিয়াই পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। চরণ কি করিবেন, বুঝিতে না পারিয়া মাতাকে ডাকাইলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না। চরণ বাবু তখন গতি ঝিকে ডাকিয়া পত্নীর অত্যন্ত জ্বরের কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে তক্তপোষের উপর শয়ন করাইতে উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাড়ী ছুটিলেন।

কিন্তু বধূ কিছুতেই নড়িবে না। সে 'মাটী' কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। গতি ঝি নিরুপায় হইয়া গৃহিণীকে যাইয়া সবিশেষ বলিল। গৃহিণী আসিয়া বধূকে বিছানায় যাইতে অনুরোধ করিলে পারুল কহিল,—"না, মা, যার বাড়ীতে যায়গা নেই, তার বিছানা নিয়ে কি হবে মা?" গৃহিণী তথাপি ছাড়িলেন না। নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

বধূ কহিল,—"মা, তুমি একটু মাথায় হাত দাও, আমি ত আর কথা কইতে পাচ্ছি নি, মা।"

শাশুড়ী বধূর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"ওঠ মা, ডাক্তার আস্‌ছেন। আহা! আমি কি জানি, বাছার আমার এত অসুখ হয়েছে। ওঠ্ মা, ওঠ্!"

বধূ তথাপি নড়িল না।

শাশুড়ী কহিল,—"তুইও কি আমায় দিবারাত্তির দগ্ধাবি বউ! ওঠ্ মা, ওঠ্।"

বধূ তখন আর কোন আপত্তি না করিয়া বলিল,—"যাচ্ছি

মা, আমাকে ধ'রে তোল। আমার যে দম্ বন্ধ হয়ে এল মা!" তখন গৃহিণী ও গতি ঝি কোন প্রকারে বধূকে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সাথে নিউমোনিয়া; দুই পার্শ্বই আক্রমণ করেছে। একটু কঠিনই হয়েছে। অতিরিক্ত শুশ্রূষার প্রয়োজন; খুব ফোমেণ্টেশান্ দিতে থাকুন। বুকে পিঠে তুলার গদি 'ফ্লানেল' দিয়ে বেঁধে দিবেন।" পরে মালিস ও ঔষধের 'প্রেস্কৃপসন' লিখিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

ঔষধ আসিলে বধূ কহিল,—"না, মা, আর ত কিছু খাব না, তুমি আর অনুরোধ কোরো না। বাঁচতে আমি চাই নি, মা!"

কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, অবশেষে তাহাকে ঔষধও খাইতে হইল, ফোমেণ্টেশানও লইতে হইল। তাহাতে পীড়ার কোনই উপশম হইল না। অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। রোগিণী দ্বিপ্রহরে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া নন্দী মহাশয় এতটুকু হইয়া গেলেন। খবর পাইয়া পাড়ার দুই চারি জন আসিয়াও যথেষ্ট শুশ্রূষা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পীড়া এতটুকুও আরাম করিতে সমর্থ হইলেন না।

বধূ প্রলাপের ঘোরে বকিতে লাগিল,—"এবার আমি যাই মা, সেথায় গিয়ে তোর জন্যে ব'সে থাকবো। তুই শীগ্‌গির ক'রে আসিস যেন।" কখনও বা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এত আলো! এত ফুল! কি সুন্দর! ঐ দেখ, আমার মা দাঁড়িয়ে! যাই মা, যাই দাঁড়া, এ মা ছেড়ে দিলেই চলে যাব।"

পাড়ার যাহারা আসিয়াছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ আড়ালে বলিতে লাগিলেন,—"ঢং দেখ না!"

শাশুড়ী কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার অন্ধচক্ষুকে একবারে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। সহস্র ক্রন্দনেও আর কিছু হইল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরে বধূ একবারে স্তব্ধ হইল। রজনীর সেই ঘোর অন্ধকারে বধূর প্রাণ-পাখীটি কোথায় উড়িয়া গেল।

কোথায় গেলে বেহায়া বধূ—এই ঘোর অন্ধকারে? একটু ভয়ও কি করিল না! যাক্! গেল! যেথায় গেল, হয় ত বা সে দেশে রোগ, শোক, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া কিছুই নাই। সেখানে হয় ত দূর করিয়া দিবার স্পর্দ্ধাও কেহ রাখে না। এক মুষ্টি দগ্ধ তণ্ডুলের মূল্যও হয় ত সেখানে এত অধিক না-ও হইতে পারে! মিটিয়া গেল!—সব শেষ হইল! অদৃষ্টের কি নিদারুণ গুপ্ত অট্টহাস! যে যাইবে, সে থাকিয়া গেল, আর যে থাকিবে—সে চলিয়া গেল! বৃদ্ধা কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইল।

তাহার পর নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া যখন "হরিবোল ধ্বনি" উত্থিত হইল, তখন অনেকেই শেষ রজনীর সুখনিদ্রার ক্রোড়ে সুখস্বপ্নে মগ্ন। প্রভাতে যখন সংবাদটা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন সকলেই একবাক্যে কহিল,—"আহা! সতী লক্ষ্মী বউ গো, সতী লক্ষ্মী বউ! স্বামীর কোলে পুত্র দিয়ে, একমাথা সিঁদুর প'রে বৈকুণ্ঠে গেল।"

বেহায়া বধূ কিন্তু এত বড় প্রশংসাটা একবার শুনিতেও আসিল না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

বর্ষার ব্যথা

শ্রাবণের ঘন কৃষ্ণ মেঘ ফেলিয়াছে ব্যাপ্ত করি
মধ্যাহ্ন-আকাশ,
উতলা বাতাস ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধচিত্তে হাহা করি
ফেলিতেছে শ্বাস।

দূর বনান্তরে অবিশ্রান্ত ডাকিছে সুতীব্র স্বরে
ডাহুকী সঘনে,
ধরিয়াছে কি অপূর্ব্ব শোভা গন্ধে পুষ্পে থরে থরে
কেতকীর বনে।

আছে চাহি ধ্যাননিমগন, উৎফুল্ল বিটপিরাজি
এ ভরা বর্ষায়,
বিরহীর শূন্য হিয়াখানি কাঁদিয়া উঠিছে আজি
ঘোর নিরাশায়।

হেন দিনে নির্ব্বাসিত যক্ষ আপন প্রিয়ারে স্মরি
বলেছিল কত,
প্রাণহীন অতনু মেঘেরে ব্যাকুল আহ্বান করি
উন্মাদের মত।

আজি মূক-প্রকৃতির মুখে ফুটিয়াছে ম্লান ছবি
কি তীব্র বিরহ!
জাগাইয়া তুলিতেছে শুধু পাণ্ডুর নিষ্প্রভ রবি—
ব্যথা অহরহ।

বিশ্বব্যাপী জাগিয়াছে যেন মহা বিরহের গান
সকরুণ সুরে,
প্রাণ-ভরা ব্যাকুল আহ্বানে কে যেন তুলিছে তান
দূরে—বহু দূরে।

সেই মহা সঙ্গীতের ঘাত লাগিয়াছে মোর প্রাণে
তীব্র বেদনায়,
কোন্ এক বিরাট পুরুষ টানিয়া অদৃশ্য টানে
বলিছেন "আয়।"

প্রকৃতির স্তব্ধতার মত, ব্যাকুলতা বারে বারে
জাগিতেছে মনে,
গোপনে কাঁদিছে মম প্রাণ ব্যথী শুধু মিলিবারে
বাঞ্ছিতের সনে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে।

পলিনেসিয়া

যাঁহারা ভূগোল পড়িয়াছেন, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জের নাম তাঁহারা অবগত আছেন। এই দ্বীপপুঞ্জকে পলিনেসিয়া বলে, পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ য়ুরোপীয় নাবিকগণের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শত শত বৎসর ধরিয়া, বহু কষ্ট ও দুঃখভোগ করিয়া, নাবিকগণ প্রশান্ত মহাসাগরের অনন্ত জল-বিস্তারের মধ্যে এই সকল দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া নানা তথ্য সুসভ্য জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে অসমসাহসিক নাবিক-গণ মধ্যে মধ্যে পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে জলযাত্রা করিয়া আসিতেছেন।

জেম্‌স্ কুক্, বোয়েঁ-ভিলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাবিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে জলযাত্রা-ব্যপদেশে যে সকল দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার মনোজ্ঞ কাহিনী সে যুগের প্রত্যেক সভ্যদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিই আগ্রহভরে পাঠ করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের আবিষ্কারকাহিনী কৌতূহলী পাঠকের চিত্ত বিমোহিত করিয়া থাকে।

কুকের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে ইংলণ্ডের কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায় 'সোসাইটী' দ্বীপপুঞ্জে প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন। উইলিয়ম্ ইলিস্ তাঁহার রচিত "পলিনেসীয় গবেষণা" শীর্ষক গ্রন্থে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে হার্ম্যান্ মেলভিলীর "টাইপী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নরখাদক দ্বীপ-বাসীদিগের বিবরণ বর্ণিত ছিল। পাঠক সমাজ সাগ্রহে এই রোমাঞ্চকর বিবরণ পাঠ করিত।

রাপা রমণী 'টারো' মূল উৎপাটন করিতেছে

বর্ত্তমান যুগে পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ বলিতে সোসাইটী, টুয়ামোটু, মার্কোয়েসাস্, অষ্ট্রাল্, সামোয়া, এলিস, ফিনিক্স্, ইউনিয়ন্, ম্যান্‌হিকি এবং টুঙ্গা প্রভৃতিই বুঝায়। উক্ত দ্বীপগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও বহু দ্বীপ আছে, তাহাদের সংখ্যা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নির্ণীত হয় নাই। নিউজিলাণ্ড ও হাওয়াই বর্ত্তমান যুগে পলিনেসীয় দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত নহে। কারণ, নিউজিল্যাণ্ড অষ্ট্রেলেসীয় ভূভাগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং হাওয়াই বিষুবরেখার উত্তর-ভাগে অবস্থিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হাওয়াই ও নিউজি-ল্যাণ্ডকে বাদ দিয়া অন্যান্য প্রধান দ্বীপের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বর্ণিত হইল।

আবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জের ভূভাগের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজার বর্গ-মাইল। তন্মধ্যে সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জের পরিমাণ ৬ শত ৩৭ বর্গ-মাইল, মার্কোয়েসাসের পরিমাণ ৪ শত ৯০, টুয়ামোটু এবং অন্যান্য ৮০টি দ্বীপের মোট পরিমাণ ৩ শত ৬৪ বর্গ-মাইল।

সোসাইটী, মার্কোয়েসাস্, টুয়ামোটু এবং অষ্ট্রান্ দ্বীপপুঞ্জ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ফরাসীর অধিকারে রহিয়াছে। অন্যান্য বহু দ্বীপ ইংরাজের অথবা নিউজিল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত।

সামোয়া দ্বীপের উপর মার্কিণ যুক্তরাজ্যের একাধিপত্য, ইহা ছাড়া কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপের সহিতও মার্কিণের সংস্রব আছে। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন শক্তির নেতৃত্ব কোন্ কোন্ দ্বীপে রহিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট নহে—সমস্যা একটু জটিল হইয়াই আছে।

বোঝা পৃষ্ঠে রাপা নারী

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যেরূপ মধ্যে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া থাকে, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশস্থিত দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম ভাগেও সেই প্রকার অগ্ন্যুৎপাত এখনও বিদ্যমান। কোনও কোনও দ্বীপের সন্নিহিত জলভাগের তলদেশ—যথায় পূর্ব্ব-যুগের আবিষ্কারকগণ অর্ণবযান নোঙ্গর করিয়াছিলেন—অধুনা আরও গভীর হইয়াছে, অথবা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই উহা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন।

টারো কন্দ পেষণে নিরতা রাপা নারী

পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থানে আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। তবে যে দ্বীপগুলি বিষুবরেখার সন্নিহিত, তথায় ঝটিকার প্রভাব বেশী দেখা যায়। এই সকল স্থানে বারিপাতও প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। মার্কোয়েসাস্ দ্বীপমালার মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ, তথায় অরণ্যানীর সংখ্যা অধিক। এই দ্বীপপুঞ্জ যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রচুর ছিল। কিন্তু শ্বেত জাতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলে এমন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে যে, তাহার ফলে বর্ত্তমান কালে দুই সহস্রের অধিক অধিবাসী মার্কোয়েসাসে নাই।

নারিকেল এবং 'ব্রেডফ্রুট' কুঞ্জের তলদেশে দেশীয় ব্যক্তিগণের কুটীর বিনির্ম্মিত। মার্কোয়েসাসে একটা প্রথা ছিল যে, কোন শিশু জন্মগ্রহণ করিলেই একটি "ব্রেডফ্রুট" বৃক্ষ রোপিত হইত। এই রুটীতরু ভবিষ্যতে নবজাত শিশুর ভরণ-পোষণ

রাপার কফিক্ষেত্রে নারীরা কায করিতেছে

দ্বীপপুঞ্জে ইদানীং যে সকল ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্রমে ক্রমে আবিষ্কারকগণের দ্বারাই তদ্দেশে নীত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বহু আবিষ্কারক এই সকল দ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। দ্বীপবাসীরা সযত্নে ফলের উদ্যান রচনা করিয়া প্রচুর ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। নারিকেল, কলা, জাম প্রভৃতি ফল অধিকাংশ দ্বীপেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্ব-সীমাস্থিত দ্বীপমালায় ইন্দুর (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) ব্যতীত অন্য কোন জীব সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু পূর্ব্বে তাহাও ছিল না। প্রাচীন যুগে মানবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কোনও উপায়ে এখানে আসিয়াছিল। অনেক দ্বীপে বাদুড় পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

সরীসৃপের প্রাদুর্ভাবও এই সকল দ্বীপে নাই বলিলেই হয়। সামুদ্রিক সর্প ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সর্প সামোয়া হইতে গ্যালাপ্যাগোজ দ্বীপ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। ফিজি এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জে না আসা পর্য্যন্ত ভেকের দেখা মিলিবে না।

করিবে মনে করিয়াই দ্বীপবাসিগণ বৃক্ষ রোপণ করিত। অধুনা দ্বীপবাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় এই তরুর চাষও কমিয়া গিয়াছে। ব্রেডফ্রুট তরুর ফলে বীজ হয় না। সুতরাং যত্ন করিয়া এই বৃক্ষের চাষ আবাদ না করিলে এই বৃক্ষ আরণ্য বৃক্ষগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। কাযেই ব্রেডফ্রুট বৃক্ষের সংখ্যা বর্ত্তমান যুগে মার্কোয়েসাসে ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কদলী এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা দ্বীপপুঞ্জবাসীদিগের অন্যতম প্রধান খাদ্য।

পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জে বিষাক্ত বৃক্ষলতার প্রাচুর্য্য নাই। অধিকাংশ দ্বীপই অত্যন্ত উর্ব্বর। অনেক বৃক্ষ ও লতা বিদেশ হইতে আনীত হওয়ার ফলে এখন নানা স্থানে দুর্ভেদ্য অরণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দেশীয় বৃক্ষলতার অরণ্য কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক পলিনেসীয় নারী মাছ ধরিতেছে

অষ্ট্রাল দ্বীপবাসীরা সমুদ্রযাত্রার বেশে

বহুবিধ পক্ষী এই সকল দ্বীপের ভূষণ। ভিন্ন দেশাগত পক্ষী এবং স্থানীয় নানা জাতীয় সুদৃশ্য পক্ষী দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

কীট-পতঙ্গাদি দ্বীপপুঞ্জে কিছু কিছু আছে। মার্কোয়েসাস্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহারা না কি অত্যন্ত দংশন করিয়া থাকে। মশক না কি পূর্ব্বে এই সকল দ্বীপে দেখিতে পাওয়া যাইত না। শ্বেত জাতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মশককুল বহু দ্বীপে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অধিবাসীরা অভিযোগ করিয়া থাকে।

সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ মুগরিয়ার মশকের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। মেল ভিলি 'ওমু' নামক গ্রন্থে উহার বিবরণ দিয়াছেন। গল্পটি এইরূপ—

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও জাহাজের অধ্যক্ষ সন্নিহিত এক উপসাগরে জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তত্রত্য দ্বীপের অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহার গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি দেশীয় সর্দ্দারদিগের নিকট তাঁহার অভিযোগ বিজ্ঞাপিত করেন। অভিযোগের প্রতীকার না হওয়ায়, জাহাজের অধ্যক্ষ মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিশোধ দিবার স্পৃহা তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। একদা রাত্রিকালে তিনি একটা দুর্গন্ধ সলিলপূর্ণ পিপা তীর-ভূমে নিক্ষিপ্ত করেন। সেই স্থান অত্যন্ত আর্দ্র ছিল। উক্ত দুর্গন্ধ জল হইতেই মশকের উৎপত্তি হয়।"

বৃদ্ধা মার্কোয়েসান্

প্রাচীন যুগের পলিনেসীয় নাবিকগণ পোতযোগে ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে নানাবিধ গৃহপালিত জীব সংগ্রহ করিয়া দ্বীপে লইয়া যাইত বলিয়া কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করেন। এই সকল গৃহপালিত জীবের মধ্যে কুক্কুট, কুকুর এবং শূকরের সংখ্যাই অধিক। ঐতিহাসিক যুগে এই সকল জীব যেরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছে, তদ্দ্বারা প্রাচীন যুগের এই সকল জীব কোন্ শ্রেণীর ছিল,

তাহা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

প্রাচীন কালে যে সকল য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী এই সকল দ্বীপে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহাদের অশ্ব ও ছাগ দর্শনে দ্বীপবাসিগণ তাহাদিগকে প্রথমতঃ রাক্ষস বলিয়া মনে করিয়াছিল। ভ্রমণকারীরা অনেক অশ্ব ও ছাগ সেই সকল দ্বীপে ত্যাগ করিয়া যান। দ্বীপবাসীরা বহু কষ্টে তাহাদিগের নামকরণ করিয়াছিল।

সোসাইটী দ্বীপের যুবক—স্কন্ধে সুপক্ক কদলী

দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যাহাদিগকে যথার্থ পলিনেসীয় বলিয়া অভিহিত করা যায়, তাহাদের আদিম অধিবাসীরা দীর্ঘাকার ও প্রিয়দর্শন ছিল। তাহাদিগকে মিশ্র বা সঙ্কর জাতি বলা গেলেও অষ্ট্রেলেসীয় আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় তাহারা গভীর কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত-কেশবিশিষ্ট নহে। অষ্ট্রেলেসীয় আদিম অধিবাসী ও পলিনেসীয় আদিম অধিবাসী—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

পলিনেসিয়া সম্বন্ধে যে সাহিত্য বা ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বীপবাসীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইতে পারেন নাই। মোটের উপর এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পলিনেসিয়ানরা সমুদ্রবক্ষস্থিত দ্বীপপুঞ্জে বিদ্যমান ছিল।

ডাক্তার হাণ্ডি সংপ্রতি নানা গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, মার্কোয়েসাস্ দ্বীপে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মনুষ্যবসবাস ছিল।

পলিনেসিয়ার অধিবাসীরা কোন্ জাতীয় লোক, এ বিষয় লইয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে গবেষণা চলিতেছে। নানা পণ্ডিত এ বিষয়ে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার লুই সলিভান্ পলিনেসীয়গণের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন,—

"নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, উহারা

টারো ক্ষেত্র অভিমুখে রাপা তরুণীদল

মোঙ্গল জাতীয় লোক, আবার অপর পক্ষ তাহাদিগকে ককেশীয় বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আবার আর এক দল আছেন, তাঁহারা উহাদিগকে একটি বিশিষ্ট জাতির লোক বলিয়া মনে করেন। এই সকল অনুমান হইতে মনে করা যায় যে, পলিনেসীয়গণ নানা বর্ণের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে।

"পলিনেসীয়দিগের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও, সাধারণতঃ তাহারা দীর্ঘাকার এবং সুগঠিত-দেহ। তাহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, নাসিকা উচ্চ এবং খর্ব্ব, মস্তকের কৃষ্ণ কেশরাজি সোজা অথবা ঈষৎ তরঙ্গায়িত। তাহাদের দেহের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ। বর্ত্তমান যুগে দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এই জাতীয় মানব অবশ্য দেখা যায় না। এরূপ প্রমাণও আছে যে, অতীত যুগে এইরূপ আকৃতির লোক অধিকসংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যাইত না।"

টুয়ামোটু দ্বীপের বৃদ্ধ

ডাক্তার সলিভানের মতে, প্রশান্তসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগের সহিত মার্কিণগণের সৌসাদৃশ্য সম্বন্ধে যে মতবাদ আছে, তাহা ততটা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতসমূহের আলোচনায় এইটুকু বুঝা যায় যে, কি আকৃতিগত, কি প্রকৃতিগত সকল বিষয়েই পলিনেসীয়গণের সহিত য়ুরোপীয় মানবগণের বিচিত্র সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সৌসাদৃশ্য এবং দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এতদুভয়ের প্রভাবে শ্বেত জাতির প্রতি পলিনেসীয়গণের তীব্র আনুরক্তি বস্তুতই বিস্ময়াবহ। গত দুই শতাব্দী ধরিয়া শ্বেতজাতি এই সকল দ্বীপে আগমন করিয়া তাহাদের সহিত বসবাসও করিয়াছে, এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য।

পলিনেসীয় নারীদিগের আকর্ষণী শক্তি আছে, এ কথাও য়ুরোপীয় এবং মার্কিণ নাবিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ মাসের পর মাস জলযাত্রা করিয়া

বালক-বাহিত টায়ো বোঝাই ডিঙ্গি

অষ্ট্রাল দ্বীপপুঞ্জের কিশোর ধীবর

টুরিয়া দ্বীপে নারিকেল-শস্ত শুকাইবার ব্যবস্থা

সঞ্চিত নারিকেল

রাপা দ্বীপের শিক্ষিত সম্প্রদায় মার্কিণদিগকে ভোজ দিতেছে

নাবিকগণ যখন আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলীয় বন্দর হইতে ক্লান্ত মনে পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জে জাহাজ নোঙ্গর করিত, তখন তাহাদের কাছে দ্বীপবাসিনী নারীদিগকে অতুলনীয়া রূপসী মনে করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান থাকিত।

দ্বীপবাসিনীরা সাধারণতঃ উদার ও স্বাধীন-প্রকৃতিবিশিষ্টা। তাহাদের সুগঠিত দেহ এবং মধুর ব্যবহার নাবিকদিগকে মুগ্ধ করিত। সুতরাং নাবিকগণ যে তাহাদিগের গুণবর্ণনে মুক্তকণ্ঠ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই।

দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র নারীগণের মধ্যে যৌননীতি সম্বন্ধে মতের সমতাও ছিল না। কুক্ এবং অন্যান্য প্রাচীন যুগের নাবিক যে সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে, কোন কোন দ্বীপের নারীরা স্বাধীনা এবং যথেচ্ছাচারপরায়ণা ছিল; আবার অন্য দ্বীপের নারীরা ঠিক সেই অনুপাতেই সতীত্বের অনুরাগিণীও ছিল। ধর্ম্ম বলিয়া তাহারা সতীত্ব সম্বন্ধে কঠোর নীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিত।

মার্কোয়েসাস্ দ্বীপের সপুত্র গৃহস্থ

টাহিটি, বিশেষতঃ মার্কোয়েসাস্ দ্বীপপুঞ্জের নারীগণের সৌন্দর্য্যখ্যাতি এবং তাহাদিগের স্খলিত নীতির কথা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কুইরোস্ হইতে আরম্ভ করিয়া কুক, মার্চ্চাদ, ক্রুশেনষ্টারন্, পোর্টার এবং পরবর্ত্তী যুগের বহু পরিব্রাজক, এমন কি, ধর্ম্মপ্রচারকগণও অত্যন্ত ঘৃণার সহিত উল্লিখিত দ্বীপবাসীদিগের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রবার্ট কুস্ম্যান্ মরফে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বযুগের লেখকগণ দ্বীপবাসীদিগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। য়ুরোপীয় সামাজিক নীতির কোন্ কোন্ ধারার সহিত পলিনেসীয়দিগের নীতিধর্ম্মের পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে কাহারও কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান ছিল না।

রিমিটারা দ্বীপের প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাচীর

তিনি মৎস্যশিকার-ব্যপদেশে যে নাবিকগণ মার্কোয়েসাস্ দ্বীপে শুধু ব্যভিচার করিবার জন্য গমন করিয়াছিল,

টাকায়োয়ার নর্ত্তকী

এখনও যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা বলেন যে, দেশীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব-যুগের লেখকগণ যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য নহে।

মার্কোয়েসাস্‌দিগের নীতিজ্ঞান দোষ-যুক্ত নহে। উহা অনুশীলন করিয়া কালে তাহারা চমৎকার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। উহাদিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা শুধু যৌনসম্মিলন নহে। তাহার উদ্দেশ্য পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা।

শ্বেতজাতিরা যখন দ্বীপে আগমন করিল, তখন হইতেই তাহাদের ধ্বংসের সূত্রপাত হইল। তাহাদের সংসর্গে পড়িয়া দ্বীপবাসীরা পূর্ব্বাভ্যস্ত জীবন-যাত্রার পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টায় ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ডাক্তার হ্যাণ্ডির রচিত মার্কোয়েসাস্ জাতির পরিচয়জ্ঞাপক গ্রন্থ পড়িলেই এই সকল বিষয় বিশদরূপে অবগত হওয়া যায়।

ডাক্তার হ্যাণ্ডি মার্কোয়েসাস্‌দিগের সত্যবাদিতা, গণতন্ত্র-প্রিয়তা বর্ণনায় পঞ্চমুখ। ইহারা অত্যন্ত উদার, বন্ধুবৎসল এবং কৃতজ্ঞহৃদয়। ব্যক্তিত্বের প্রতি ইহাদের অসাধারণ

তাহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তত্রত্য নারীদিগের সম্বন্ধে ভীষণ নিন্দা প্রচার করিয়াছিল। যাহারা ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, শয়তানের লীলাখেলা পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘটিয়া থাকে।

ক্রুশেনষ্টারন্ উক্ত প্রসঙ্গের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন যে, মার্কোয়েসাস্ দ্বীপের যুবতীরা ব্যভিচার করে, তাহার প্রধান কারণ, নারীর স্বামী, পিতা প্রভৃতি আত্মীয় পুরুষগণ শ্বেতকায় জাতির নিকট হইতে লৌহ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের লোভে ঘরের নারীদিগকে শ্বেতজাতির কুৎসিত বাসনা পরিপূর্ণ করিবার জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। ষ্টিভেনসন্ বলিয়াছেন, দ্বীপ-বাসীদিগের অধঃপতনের জন্যই এই সকল কুকার্য্য ঘটিয়া থাকে।

আধুনিক যুগের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের সহিত একমত নহেন। মার্কোয়েসাস্ দ্বীপের অধিবাসীরা ক্রমেই লোপ পাইতেছে—

পলিনেসীয় কুটীর

অনুরাগ—প্রত্যেক মানুষই স্বাধীনভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করিতে পারে, তাহাতে কাহারও বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, এই তথাকথিত অসভ্য দ্বীপবাসীরা ইহা উত্তমরূপে অবগত আছে। ইহাদের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, অনুভূতিও তেমনই প্রচণ্ড।

প্রশান্তসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের এইরূপ অধিবাসীরা শ্বেতজাতির জাহাজ দ্বীপের বন্দরে নোঙ্গর করিবার পর হইতেই ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। ষ্টিভেন্‌সন্ লিখিয়া গিয়াছেন, "হাপ্পার অধিবাসীদিগের সংখ্যা ৪ শত ছিল। বসন্ত রোগের প্রকোপে তাহার এক-চতুর্থাংশ অধুনা বিদ্যমান। ৬ মাস পরে এক জন নারীর মধ্যে ক্ষয়রোগের বীজ প্রকাশ পাইল। উপত্যকাভূমিতে যেন ব্যাধি প্রদীপ্ত হুতাশনের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এক বৎসর পরে সমগ্র দ্বীপের যাবতীয় অধিবাসী মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিল—মাত্র এক জন নারী কোনওরূপে উদ্ধার পাইয়া সে দ্বীপ ত্যাগ করিয়াছে—জনবর্জ্জিত দ্বীপ এখন শুধু অরণ্যে পরিপূর্ণ।"

পলিনেসীয় দেবমূর্ত্তি

জনপরিপূর্ণ মার্কোয়েসাস্ দ্বীপে অধুনা মাত্র ১ হাজার ৮ শত জন লোক বাস করিতেছে। তন্মধ্যে শ্বেতজাতি এবং মিশ্র চীনারাও আছে।

আবিষ্কারের পর হইতেই পলিনেসীয়গণ নানাবিধ অকল্যাণের দ্বারা পীড়িত হইতেছে।

পলিনেসিয়ার অবস্থা দেখিয়া মার্কিণগণ তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিতেছেন। কি উপায়ে দ্বীপবাসীদিগকে সুস্থ সবল রাখা যায়, তাহার ব্যবস্থারও চেষ্টা করিতেছেন।

টয়ামোট দ্বীপের জনৈক বৃদ্ধ অধিবাসী

টৌরাটা দ্বীপের মার্কোয়েসাস্ বালিকা

অষ্ট্রাল অথবা তুবুয়াই দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে রাপা দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্কুভার উহা আবিষ্কার করেন। উহার পর ৩৫ বৎসর ধরিয়া বহির্জগতের সহিত রাপার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বীপের অধিবাসীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। টাহিটি দ্বীপে যে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহারাই উদ্যোগ করিয়া রাপাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাদান করেন।

পরবর্ত্তী যুগে তিমি মৎস্য শিকারব্যপদেশে যে সকল অর্ণবযান সমুদ্রে গতায়াত করিত, তাহারা রাপার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ, রাপাবাসীরা অতুলনীয় নাবিক বলিয়া তাহারা জানিতে পারিয়াছিল। অধুনা বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার রাপাদ্বীপে জাহাজ গমন করিয়া থাকে।

আপাটাকি দ্বীপের বালক নারিকেল ছাড়াইতেছে

রাপাদ্বীপের বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত হাল ও দাঁড় টানিতে পারে। ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যেও ১০।১২ বৎসবেব বালকগণ নির্ভয়ে ডোঙ্গা বা ডিঙ্গি বাহিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া যায়। সমুদ্রের সহিত রাপাবাসীর শৈশব হইতে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সকল সময়েই বালক-বালিকারা জলে মাতামাতি করিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অথবা ডোঙ্গা লইয়া সমুদ্রে পাড়ি জমাইতেছে। বালিকারা এ বিষয়ে বালকদের সহিত প্রতিযোগিতাও করিয়া থাকে।

পলিনেসীয় রাজমজুর

সামোয়া দ্বীপের মাছধরা ডিঙ্গি

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

কেদার-বদরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫। অথ উদ্‌যোগপর্ব্ব—দ্রব্যসংগ্রহঃ

লোকপ্রিয় লেখক Jerome. K. Jerome তাঁহার 'Three Men in a Boat'-নামক সুখপাঠ্য পুস্তকে এক পক্ষ কালের জন্য ইংলণ্ডের এক বন্দর হইতে আর এক বন্দর পর্য্যন্ত নৌকাবিহারের জন্য তিন বন্ধুর প্রয়োজনীয় জিনিশের ফর্দ্দের একটা খসড়া দাখিল করিয়াছেন এবং জিনিশের বহর নৌকার বহরকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বেশ একটু কৌতুক করিয়াছেন। তাঁহার পাত্র মোটে তিন জন, আমরা পাত্রপাত্রীতে পাঁচ জন; তাঁহাদের মিয়াদ ১৪।১৫ দিন, আমাদের মিয়াদ এক মাস দেড় মাস, দুই মাসও হইয়া যাইতে পারে; দূরত্বেও আমাদের পথ অনেক অধিক, দুর্গমত্বের ত কথাই নাই; সুতরাং আমাদের ফর্দ্দ উহার চতুর্গুণ হইলেও দোষের হয় না। যাহা হউক, সুরসিক বিলাতী লেখকের উদ্দেশ্য একটু মজা করা, সঙ্গে সঙ্গে একটু বিদ্রূপের আমেজও আছে, আবার এই নৌকাযাত্রা-প্রসঙ্গে তিনি হাসিতে হাসিতে নাগরিক বৃত্তিতে জীবনযাত্রাসম্বন্ধে বেশ একটু সৎশিক্ষাও মধুরভাবে দিয়াছেন। * আর আমার উদ্দেশ্য প্রকৃত তথ্যপ্রচার করা; পরিহাস নহে, ('পরমার্থ,'তা' কথাটা যে অর্থেই লউন)। গৌরীশঙ্কর-অভিযান (Everest Expedition) বা মেরুপ্রদেশ-অভিযানের (Polar Expedition) প্রয়োজনীয় জিনিশের ফর্দ্দের সহিত বরং আমার ফর্দ্দের তুলনা হইতে পারে। ওরূপ ফর্দ্দ কোনও পুস্তক-প্রবন্ধে দেখি নাই, সুতরাং তুলনা করিতে পারিলাম না, এ ক্ষেত্রে কাযে লাগাইতেও পারিলাম না। পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কাহারও জানা থাকে, তাহা হইলে একবার মিলাইয়া দেখিবেন, আমার ফর্দ্দে কোথায় কি ত্রুটি আছে। তবে একটু আধটু ত্রুটিতেই বা দোষ কি? আমরা বাঙ্গালী, মধ্যবিত্ত, তাহাতে আবার তীর্থযাত্রী; আমাদের কৃত্রিম অভাব (artificial need) অল্প, অভাবজ্ঞানও তেমন সজাগ নহে, পয়সাও রাজার জাতির তুলনায় অনেক কম।

যাক্, এত বাজে কথা না বলিয়া কাযের কথা বলি, অর্থাৎ শ্রেণী-বিভাগ করিয়া জিনিশের ফর্দ্দ দাখিল করি। সাধারণ পাঠকের একটু বিরক্তিকর লাগিবে, তবে মাঝে মাঝে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না (অবশ্য লেখকের 'খরচায়') তাহাতে অনেকটা হালকা হইয়া যাইবে। তীর্থযাত্রীর কাযে লাগিবে বলিয়া ফর্দ্দের কিছুই ছাড়িলাম না। রসলোলুপ পাঠকবর্গ এই নীরস অংশটা বাদ দিয়া পড়িবেন। 'তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।'

(১) পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্য

৺কেদারনাথের পূজার জন্য সোণার বিল্বপত্র (একটি কচি বিল্বপত্রের অনুকরণে আড়াই আনা পরিমাণ সোণায় প্রস্তুত), সোণার শ্রীফল (প্রতিবেশিনীর ব্রতে প্রাপ্ত, ইহা ভাঙ্গিয়া শিশুপৌত্রের লম্বা চুলে পরার জন্য 'চুড়টা' না গড়াইয়া দেবপূজার জন্য সঞ্চিত ছিল) ও রূপার ত্রিশূল (ভরি খানেক রূপায় প্রস্তুত)। সত্যকার বিল্বপত্র কলিকাতা হইতে বোঝা না বাড়াইয়া কাশী হইতে সংগ্রহ করিবার মানস ছিল; কিন্তু যথাকালে ভুলিয়াছিলাম। জনৈক পূর্ব্বগামী বলিয়াছিলেন, পথে অগস্ত্যমুনি-নামক স্থানে শেষ পাওয়া যায়,

* এই মধুর উপদেশবাণীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। মিষ্টদ্রব্য একা একা উপভোগ করিয়া সুখ হয় না, পাঁচ জনকে বিলাইতে ইচ্ছা করে।

"How they pile the poor little craft mast-high with fine clothes and big houses; with useless servants, and a host of swell friends that do not care two-pence for them . . ., expensive entertainments that nobody enjoys, ... with empty show. . . .

"It is lumber, man—all lumber! Throw it over-board. It makes the boat so heavy to pull, you nearly faint at the oars. It makes it so cumbersome and dangerous to manage, you never know a moment's freedom from anxiety and care . . . . Throw the lumber over, man! Let your boat of life be light, packed with only what you need—a homely home and simple pleasures, one or two friends, worth the name, someone to love and someone to love you, ... enough to eat and enough to wear. . . .

"You will find the boat easier to pull then, and it will not be so liable to upset . . . you will have time to think as well as to work . . . . Time to drink in life's sunshine—time to listen to the Aeolian music that the wind of God draws from the human heart-strings around us—time to—."—Chapter. III.

সেখানেও লইতে ভুলিয়াছিলাম। যাহা হউক, গুপ্তকাশীতে ও ৺কেদারধামে তাজা বিল্বপত্র মিলিয়াছিল। অতএব পরবর্ত্তিগণের ঘর হইতে শুকাইয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

৺বদরীনারায়ণের পূজার জন্য সোণার তুলসীপত্র (৵০ পরিমাণ সোণায় প্রস্তুত), রূপার নারিকেল (ব্রতে প্রাপ্ত, দেবকার্য্যে লাগান গেল), সত্যকার তুলসীপত্র সচন্দন—হরিদ্বারে সংগৃহীত (৺বদরিকায় শুক্‌না গুঁড়া গুঁড়া পাওয়া যায়)।

উভয় দেবতার জন্য এক একখানি ক্ষুদ্রকায়া গীতা—দেবনাগর অক্ষরে ছাপা, হিন্দী টীকা, মূল্য ৵০ বা ৴০ মাত্র। কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে পাওয়া যায়; অত দুর যাইতে সময় না পাওয়াতে ৺কাশী ও হরিদ্বারে খরিদ করিয়াছিলাম। উভয়ত্রই যথেষ্ট মিলে, বিশেষতঃ হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে বৈকালে যে বাজার বসে, সেই বাজারে।

পূজার জন্য নববস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাই নাই। যথাস্থানে গিয়া কপর্দ্দীর কৌপীনের জন্য এক টুকরা মলমল এবং ৺বদরীনারায়ণের জন্য একটি সুন্দর চটকদার জামা কিনিয়া ভেট দিয়াছিলাম। অন্য যে সব তীর্থে নববস্ত্র লাগিয়াছে, সেখানেও বাজারে কিনিতে পাওয়া গিয়াছে—অবশ্য চড়াদরে। তথাপি কলিকাতা হইতে কিনিয়া লইয়া যাওয়া সুবিধা নহে, বোঝা বাড়ে, কুলীভাড়া বেশী পড়ে।

উপবীত কয়েকটি—পূজা, ভোজ্য-উৎসর্গ (নানাতীর্থে) ও ব্রহ্মকপালীতে শ্রাদ্ধের জন্য। (গৌরী, শাকম্ভরী, লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার জন্য) সিন্দুর ১ থান ও আলতা কয়েক পাতা। উভয় দেবতার জন্য মেওয়া ফল—খেজুর, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস ইত্যাদি। এখান হইতে না লইলেও চলিত। পরে দেখা গেল, তীর্থস্থানে ও পথেও বড় বড় চটীতে পাওয়া যায়, অবশ্য মূল্য বেশী। তবে সের পিছু ১৷০ মুটেভাড়া দেওয়ার অপেক্ষা সেখানে চড়াদরে অল্প-স্বল্প কেনাই ভাল। মিছরি ও নারিকেলও (শুক্‌না শাঁসটুকু—'গোলা' নামে অভিহিত) সেখানে পাওয়া যায়, মূল্য চারি আনা। দেবপূজায় লাগে।

গুপ্তকাশীতে গুপ্তদানের জন্য (নারিকেলের ভিতর) সোনার ও রূপার কুচি (গৃহিণীর ভাঙ্গাচুরা গহনার ঝাঁপী হইতে সংগৃহীত)। পরে শুনিলাম, ৺বদরীধামেও তপ্তকুণ্ডে ঐরূপ গুপ্তদান করিতে হয়। পূর্ব্বগামীদিগের পুস্তকে উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরাও 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই বাক্যস্মরণে তপ্তকুণ্ডে গুপ্তদান করি নাই। পুণ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়াছে।

গঙ্গাজল দেবপ্রয়াগে লইতে হয়, কেন না, তাহার পর আর গঙ্গার দর্শন পাওয়া যায় না, এক জন পূর্ব্বগামী বলিয়া দিয়াছিলেন। এ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা ঘটে নাই। পরে জানিলাম, ৺কেদারের পূজা মন্দাকিনীর জলে ও ৺বদরীনারায়ণের পূজা অলকনন্দার জলেই বিধেয়। উভয় জলই গঙ্গাজলের ন্যায় পরম পবিত্র। কোশা-কুশী, টাট, তাম্রকুণ্ড লওয়া হয় নাই, সর্ব্বত্রই জলে জলে সন্ধ্যাহ্নিক সমাধা করা হইয়াছে। অথবা ঘটীগঙ্গা—এই ঘটী সর্ব্বঘটে বিদ্যমান অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ হইয়াছিল। (পিত্তলের ঘটী ধুইলে মাজিলেই শুদ্ধ)।

(২) ঔষধপথ্য

তৈজসপত্র ও খাদ্যদ্রব্য না লইলেও চলে, মোটামুটি সবই পথে চটীতে পাওয়া যায়; কিন্তু বিদেশে বিঘোরে ঔষধ-পথ্য লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বোঝা বাড়িবে বলিয়া অবহেলা করা উচিত নহে। রোগের, তথা আকস্মিক দুর্ঘটনার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে, অথচ কেবল কয়েক জায়গায় (যথা শ্রীনগর, গৌরীকুণ্ড ইত্যাদি) হাঁসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সর্ব্বত্র নাই। সাধারণ পথ্য (মিছরি ছাড়া) চটীতে মিলে না, এমন কি, গত বারে দেখিয়াছিলাম, হরিদ্বারে পর্য্যন্ত বার্লির নাম কোন দোকানদার শুনে নাই।

আমরা এ জন্য বার্লি ছোট ১ কৌটা লইয়া গিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয়, প্রয়োজনের সময়ে পাইলাম না। যখন ৺কেদারধামের ২।৩ দিনের পথ বাকী, তখন বোঝাওয়ালাদের বোঝা কমাইবার জন্য (এই পথটা বড় খারাপ) অধিকাংশ মাল নারায়ণ-চটীতে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, বার্লির কৌটাও সেই সঙ্গে ছিল; এ কয় দিনে যে প্রয়োজন হইবে, অনুমান করা যায় নাই। অথচ ঠিক তাহার পরেই আমার পেটের দোষ জন্মিল। ফলে বার্লির অভাবে তিন দিন খাড়া উপবাস দিতে হইল—শুধু মিছরি ও জল খাইয়া। ভাগ্যে মিছরি পকেটেই থাকিত, কেন না, ৺কাশীর ডাক্তার বাবুর উপদেশ ছিল, সহজ শরীরেও তৃষ্ণা পাইলে শুধু জল না খাইয়া এক টুকরা মিছরি মুখে ফেলিয়া জল খাইতে; নতুবা আমাশয় হইবার সম্ভাবনা।

Horlick's malted milk লওয়াও উচিত, যদিও আমরা লই নাই ও লইতে উপদিষ্ট হই নাই। কোনও কোনও স্থানে দুধ মিলে না, অন্যত্র মহিষের দুধই বেশীর ভাগ মিলে, গো-দুগ্ধ কম। মহিষের দুগ্ধ গুরুপাক—বিশেষতঃ রোগীর পক্ষে সুপথ্য নহে। (চা-খোর সঙ্গে থাকিলে ত বিলাতী দুগ্ধ সম্বল থাকা খুবই উচিত।)

Boric powder, Boric cotton, Tincture Iodine, Little's Oriental Balm বা Zambuk, পুরাতন ধোপদস্ত কাপড়। বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে পড়িয়া গিয়া নুণছাল উঠিয়া যাওয়া, পা মচকান, চোট লাগা, মাথা ফাটা প্রভৃতির সম্ভাবনা অল্প নহে। (First Aid জানা থাকিলে ভাল হয়।) সেকতাপের জন্য ফ্ল্যানেল্ ১ টুকরা। ব্র্যাণ্ডিও ২।৪ আউন্স লওয়া ভাল—অবশ্য 'ঔষধার্থম্।' Eucalyptus Oil সর্দ্দির জন্য; Ammoniated Quinine সর্দ্দি-জ্বরের জন্য। ইসুপগুল, মিছরি, নালিতা, পুরাতন তেঁতুল, বীটলবণ, ভাস্করলবণ বা সুলেমানি সল্ট্, মথুরার হজমী বড়ী, যোয়ানের আরক ইত্যাদি—আমাশয়, রক্ত-আমাশয়, পেটের অসুখ প্রভৃতি নিবারণের ও উপশমের জন্য। এ সব রোগ পথে একপ্রকার অনিবার্য্য—কতকটা অনিয়মে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে, কতকটা অনভ্যস্ত খাদ্যের জন্য, কতকটা পাহাড়ের জল-হাওয়ার জন্য। এগুলি খুব কাযে লাগিয়াছিল, তবে তাহাতেও পূর্ব্বাহ্নে রোগনিবারণ হয় নাই। গোলাপনির্য্যাস (পাহাড়ে রৌদ্র বা ঠাণ্ডা লাগিয়া চোখের অসুখ হইবার আশঙ্কা আছে)।

৺কাশীর ডাক্তার বাবু (Cathartic pills) জোলাপের বড়ী লইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা (অন্ততঃ বিদেশে) 'মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ' নীতির পক্ষপাতী। তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া Chlorodyne ও Spirit Camphor লই নাই, ভাল করি নাই। তিনি "সাবধানের মা'র নাই" বলিয়া আর একবার বসন্তের টীকা লইতে বলিয়াছিলেন, সে কথাও অবশ্য শুনি নাই। (ডাক্তারদিগের এ সব বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি আছে।) কেহ কেহ ঝরণার জল না ফুটাইয়া খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এত বহ্বাড়ম্বর দুর্গমপথে করা সহজ নহে। একটি বিলাতী বয়েদ্ মনে পড়ে,—'To give impossible prescriptions is a foible of Doctors.'

ইহা ছাড়া ভাগিনেয় বাবাজী তাঁহার জ্যেঠা মহাশয়ের ভৈষজ্যালয় হইতে এক প্রকার মলম ও কয়েক প্রকার 'চূরণ' (চূর্ণ) লইয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি খুব কাযে লাগিয়াছিল ও প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ হইয়াছিল। শুধু নিজেদের রোগ-আরামের জন্য নহে, কাণ্ডীওয়ালা, ডাণ্ডীওয়ালা, চটীওয়ালা, পথচলতি লোক সকলেরই জন্য এ-গুলির খয়রাত হইয়াছিল। এ বিষয়ে চাহিদা এত বেশী যে, আমাদের মত অব্যবসায়ী-দিগকে কখনও কখনও গোঁজামিলও দিতে হইয়াছিল। যথা—এক জন ডাণ্ডীওয়ালা বেহারার প্রস্রাবে জ্বালা ও রক্তনির্গম হইয়াছিল, তাহার আগ্রহাতিশয্যে একটা ঠাণ্ডাই ঔষধ এই রোগে চালাইতে হইল (একেবারে অন্ধকারে ঢিল মারা)। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতেই তাহার উপকার ও উপশম হইল। Faith-cure বলিব কি? (বড় বড় স্থানে হাঁসপাতাল ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে, কিন্তু তাহারা যাইতে চাহে না, বলে, রোগবৃদ্ধি হইবে, রোগ না সারা পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিবে। জানি না, সবটাই কুসংস্কার কি না।)

(৩) তৈজস-পত্র

চটীতে দোকানদারের কাছে 'বর্ত্তন' (রান্নার হাঁড়ী প্রভৃতি) পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হাঁড়ী-কড়ার তলার কালী তোলার বালাই এ অঞ্চলে বাসন-মাজার প্রথায় চলিত নাই বলিয়া গৃহিণীরা ওরূপ পাত্রে রাঁধিতে নারাজ, সেই জন্য বাসনের বোঝা বহিতে হয়। যাহা হউক, হালকা হইবে বলিয়া এলুমিনিয়মের বাসন এক প্রস্থ—হাঁড়ী, থালা, ডিস্, ঘটী, গেলাস, বাটি, মায় বালতী ও টিফিন্-ক্যারিয়ার্ লওয়া গিয়াছিল, তদুপরি পিতলের সরা বা তই এবং কাঁসার থালা ২।১ খানাও ছিল। (কলাগাছ প্রায় প্রত্যেক চটীতেই আছে। কিন্তু কলাপাতা-বিক্রয়ের প্রথা নাই। গাছ হইতে না বলিয়া কাটিয়া লইতে সাহসও হয় নাই, প্রবৃত্তিও হয় নাই।) সাঁড়াশী, হাতা, খুন্তী, বেলুন (চাকীর কায থালা উল্টাইয়াই হইত, বেলুনের কাযও গেলাসে চলে, তবে একটু কষ্ট হয়), ছোট বঁটী (মুড়িয়া রাখা যায়)। বাল্তী না লইলেও চলে, দোকানদারের কাছে বালতী বা ঘড়া ('গাগরা') পাওয়া যায়। ষ্টোভ, একটা লইলে ভাল হয়, (সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে স্পিরিটও), কেন না, চটীতে উনানগুলা নিতান্ত আখোদ্দা, তাহাতে রুটী-পুরী বানান চলে, কিন্তু ভাত-তরকারী রাঁধা শক্ত।

এই ত গেল রান্নার তন্ত্র। তাহার পর অন্যান্য দরকারের জন্য ছুরী, কাঁচি, নরুণ (নাপিত সমস্ত পথে কেবল দুই জায়গায় পাইয়াছিলাম), কানখুসকী, পেরেক, আলপিন, সেফ্‌টী-পিন্‌, কর্ক-স্ক্রু, স্ক্রু-ড্রাইভার্‌, দড়ী (কলসী নহে), ছুঁচ-সুতা *, ছেলেদের কামাইবার সরঞ্জাম, আয়না, চিরুণী (বুরুশ, এসেন্স, পাউডার্‌ নহে), টুথ্‌পেষ্ট, টুথ্‌ব্রাশ, নিজের দাঁতের মাজন, † জিবছোলা, সাবান তিন প্রকার (গায়ে মাখার, সান্‌লাইট্‌ ও বাঘমারি), দিয়াশলাই ১ প্যাকেট্‌, বাতী ঐ, হারিকেন্‌ লণ্ঠন দুইটা (কেরসিন অগ্নিমূল্য—স্থানে স্থানে এক লণ্ঠন তৈলে সাত আনা !) বাড়ন, যত কিছু সবই লওয়া গিয়াছিল, অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হয় নাই। বারণগাছটি কিন্তু কলিকাতা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়া ধর্ম্মশালায় হারাইয়া গেল। একরকম শাপে বর—কেন না, ইহা অযাত্রা।

বাণীসেবার প্রয়োজনে না হইলেও হিসাবপত্র রাখার ও চিঠিপত্র লেখার জন্য খাতা, কাগজ, পেন্‌সিল্‌, শিশিতে চারি পাশে তুলা দিয়া টিফিন্‌-ক্যারিয়ারের একটি বাটিতে বিশেষ তোয়াজ করিয়া রক্ষিত কালী। শেষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া শুকাইয়াও ছিল। খাম, টিকিট, পোষ্টকার্ডও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। পথে বড় বড় জায়গায় ডাকঘরেও পাওয়া যায়।

(৪) খাদ্যদ্রব্য

পুরাতন সিদ্ধ চাউল সের-খানেক 'ঘর বলিয়া' রাখা হইয়াছিল—পেটের অসুখ হইলে লঘুপথ্যের জন্য। (২।১ দিন খরচও হইয়াছিল।) ঘরে ভাজা মুগের ডাল ছিল, লইলেই ভাল হইত, কেন না, পথে ধোয়া মুগ (অর্থাৎ খোসা-ফেলা) শ্রীনগর, গুপ্তকাশী, পিপ্পলকোঠী এইরূপ ২।৩ স্থানে ভিন্ন পাওয়া যায় না। অন্য সর্ব্বত্র খোসাশুদ্ধ ডাল—একেবারে অখাদ্য। অরহর ও মসুর ডাল মন্দ নহে। দুই ঘরে (সঙ্গে এক জন পরিচিতা বিধবা ছিলেন) গুঁড়া মশলা বিস্কুটের কৌটায় তথা হাতখরচের জন্য একটি লম্বা ঝুলিতে যে পরিমাণ লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে একটা বড় ভোজের রান্না হয়। অথচ সের পিছু ।১০ মুটেভাড়া দিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এইখানটায় একটু হিসাবে ভুল হইয়াছিল। সাধারণ মশলা, বিশেষতঃ লঙ্কা ('মর্চ্চা') সকল চটীতেই পাওয়া যায়, লবণও পাওয়া যায় ; আর একখানি শিল গয়াসুরের মত দেহবিস্তার করিয়া বা অহল্যাপাষাণীর মত অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে, যে যত ইচ্ছা মশলা বা লবণ গুঁড়াইয়া লও, বা আলু্‌পিঁয়াজ (!) ছেঁচিয়া লও। (আলু ছেঁচিয়া সিদ্ধ করিলেই এ দেশে সুবিধা। পিঁয়াজের খুব চল।) সাতজন্মে ধোয়া হয় না।

সরিষার তৈল সেরখানেক (ওদেশের অখাদ্য), নারিকেল-তৈল আধ সের (ওদেশে অপ্রাপ্য ও অশ্রুত), ভাতে খাওয়ার ঘী আধ সের লওয়া হইয়াছিল—শিশিতে ও টীনের পাত্রে।

ইহা ছাড়া অরুচি-নিবারণকল্পে (একঘেয়ে আলু-কুমড়ায় অরুচি জন্মে) ও মুখবদলানর জন্য বড়ী (ছোট ও বড়), পাঁপর (কোনও দিনই কিন্তু ভাজার সুযোগ হয় নাই), সুজী অল্পস্বল্প (কোনও দিনই কিন্তু হালুয়া প্রস্তুত করার অবসর পাওয়া যায় নাই), উচ্ছে শুকান (কাযে লাগিয়াছিল), কপি শুকান (পুঁটলীবন্দীই থাকিয়া গিয়াছিল, কারণ, ২।৩ জায়গার টাটকা বাঁধাকপি মিলিয়াছিল), তেঁতুল (পুরাতন ও নূতন), আমচুর, কুলশুক্‌না—সবই সংগ্রহ ছিল। আমসত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তেঁতুল-গোলায় উপকার হইয়াছিল, 'তিন্তিড়ী-সহযোগেন অন্নং চলতি পঙ্কবৎ।' অম্বল রান্নাও মাঝে মাঝে হইত। ২।৩ দিন কাঁচা আম কিনিতে পাওয়া গিয়াছিল, উত্তম মুখরোচক 'ফটিক-ঝোল' হইয়াছিল। আচার, কাসুন্দী, লেবুর জারক লওয়া হয় নাই—অযাত্রা বলিয়া। পথে ২।৪ জায়গায় আচার-চাটনী মিলিয়াছিল—বিশেষতঃ পুরীতয়কারীর সঙ্গে। গোঁড়ালেবুর মত এক রকম লেবুও ২।৩ জায়গায় পাইয়াছিলাম।

নিজের ও বিধবাটির মুখশুদ্ধির জন্য হরীতকী খণ্ড খণ্ড করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অপর সকলের জন্য পাণের মশলা ছিল। গৃহিণীর জন্য পাণ ১ কিস্তি ৺কাশীতে ও ১ কিস্তি হরিদ্বারে কেনা হইয়াছিল। পূর্ব্বগামীরা বলিয়া দিয়াছিলেন,

* নিজেদের জন্যও বটে ও পাহাড়ীরা চাহে বলিয়াও লইতে হয়। পাহাড়ী মেয়েদের জন্য টিক্‌লিও লইতে হয়। আমরা তাহাও ভুলি নাই। তবে একবার দিতে আরম্ভ করিলে রীতিমত ভিড় জমিয়া যায়, তাল সামলান কঠিন হইয়া পড়ে, সব পুঁজি এক স্থানেই ফুরাইয়া যায়। দশ জনকে দিয়া বাকী লোকদিগকে না দিলে আবার বলে 'অধর্ম্ম হইল !' বড় সহজ পাত্র নহে।

† ছেলেদের সরঞ্জাম গলা হইতে ঝুলান ব্যাগে ও নিজের সরঞ্জাম পকেটে থাকিত। জিবছোলাটি মাঝপথে পকেট্‌ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। কোথাও কিনিতে পাই নাই, এমন কি, কেহ জিনিশটার নাম বা ব্যবহার পর্য্যন্ত জানে না। শ্রীনগরের কাছে আশশেওড়া গাছ পাইয়াছিলাম, তাহাতে ২।৪ দিন চলিয়াছিল।

পথে কোথাও মিলে না। কিন্তু তাঁহার ভাগ্য ভাল, শ্রীনগর, চামোলি, পিপ্পলকুঠী ও ৺বদরীধামে পাওয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পাণের বাটা (উহাই বাঙ্গালী গৃহলক্ষ্মীর 'খুঁচি') কখনও খালি থাকে নাই। দোক্তা, আফিঙ, চা,—তিন শত্রুই সঙ্গে ছিল। (এ পক্ষ যদিও ও রসে বঞ্চিত।) বিড়ি-বার্ডসাইএর কেহ ধার ধারি না, তবে পথে অনেক পাহাড়ী ও সাধু (?) চাহিয়াছিল। অধিকাংশ চটীতেই পাওয়া যায়। মাথা ও আমাথা তামাকও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। (এ অঞ্চলে তামাকের চাষ আছে।) তবে অবশ্য গয়ার ও বিষ্ণুপুরের আশা করা যায় না। তাহার মর্য্যাদাই বা এ পাহাড়ের দেশে কে বুঝে? ৺কেদারধামের ৪ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী রামবাড়া চটীতে এবং তাহারও পরে এক স্থানে তৈয়ারী চা বিনা-মূল্যে বিতরিত হয়—শীতনিবারণের অমোঘ উপায়। এই চা-সত্র জলসত্র অপেক্ষাও যাত্রীদিগের উপকারে আসে। অনেকের পক্ষে মধি-লিখিত সুসমাচার অপেক্ষাও আনন্দদায়ক!

বেশ বুঝিতেছি, সাধারণ পাঠক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থযাত্রীর কাযে আসিবে বলিয়াই এত খুটিনাটি লিখিয়া কাগজ ভরাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে কি সুবিধা অসুবিধা হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ করিতেছি।

(৫) শয্যা, পরিধেয় ও শীতাতপ-নিবারণের দ্রব্য

সাধারণ ধুতী চাদর জামার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। পথে ধোপার মুখ দেখিবার যো নাই, (এক প্রকার ভাল), সুতরাং ৪।৫ সুট কাপড় প্রভৃতি লইতে হয়, না হয় গেরুয়া রং করিয়া লইতে হয়, নতুবা দীর্ঘকাল ব্যবহারে 'চিরকুট কালো' হইবে। যদিও তীর্থযাত্রী বিবাহের বর বা বরযাত্রী নহে, তথাপি ইহা স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। পথে মধ্যে মধ্যে সাবান করিয়া লইলে চলে, কিন্তু তাহার সময় পাওয়া কঠিন। রং করার দোষ এই যে, সেগুলি পরে ব্যবহারে আসে না; আর রং করিলে ময়লা চোখে পড়ে না, এই পর্য্যন্ত, কেবল পরের চোখে ধুলা দেওয়া বা নিজের মনকে 'চোখ ঠারা'। (কেহ কেহ গৃহী হইয়া ব্রহ্মবস্ত্র—গেরুয়া—পরিতে চাহেন 'না, তাঁহারা গিরিমাটীর বদলে এলামাটী দিয়া ছোপাইতে পারেন—'ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।') পূর্ব্বোক্ত কারণে আমরা শাদা কাপড়ই লইয়াছিলাম। সঙ্গের বিধবাটি গেরুয়া পরিয়াছিলেন, রাস্তায় খাতিরও পাইয়াছিলেন অসাধারণ—গৈরিকধারিণী মাতাজী-বুদ্ধিতে অনেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিল, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিল, কেহ কেহ পুণ্যলাভের আশায় অল্পক্ষণ তাঁহার ডাণ্ডী-বহনও করিয়াছিল। (শেষোক্ত সৌভাগ্য এ অধমেরও একবার হইয়াছিল—জানি না কোন্ পুণ্যফলে।)

কম্বল প্রত্যেকের শয়নের একখানি ও গায়ে দেওয়ার একখানি (রাগ্ হইলে ভাল হয়)। তোষক প্রভৃতি বিলাসিতা তীর্থপথে না করাই ভাল (বোঝা বাড়ে)। ৺কেদার-বদরীর প্রচণ্ড শীতের জন্য আরও কম্বল লওয়ার প্রয়োজন বটে, কিন্তু পূর্ব্বগামীদিগের মারফত জানা ছিল, কলিকাতা বা ৺কাশী বা হরিদ্বার হইতে লইয়া না গিয়া শ্রীনগর, গুপ্ত-কাশী প্রভৃতি স্থানে কিনিয়া লওয়া যায়। অবশ্য দাম একটু বেশী পড়ে। কিন্তু বোঝাওয়ালাদিগকে সের-করা ১।• ভাড়া দেওয়া অপেক্ষা ইহা বোধ হয় সস্তা পড়ে। পথে বোঝার গোঁজা দিলে উহারা টের পায় না। (মাল ওজন হৃষীকেশ ছাড়াইয়া টোল্ আফিসে হয়)। ইহাও জানা ছিল, ৺কেদারধামের কাছে রামবাড়া-চটীতে ও ৺বদরীধামের কাছে হনুমান্-চটীতে কম্বল ভাড়া পাওয়া যায়, ফিরিবার সময় ফেরত দিতে হয়। ঠিকানায় পৌছিলে পাণ্ডারাও লেপ, কম্বল ও কাঠের আগুন যোগাইয়া যজমানের অতিথিসৎকার করেন। (আমরাও এ যত্নখাতির পাইয়াছিলাম।)

বালিশ প্রত্যেকের একটি মাঝারী বা ছোট—শয়নেও প্রয়োজন, ডাণ্ডীতেও প্রয়োজন। নিজের একটি পাশ-বালিশও লইয়াছিলাম, নতুবা ঘুম হয় না, এইরূপ বদ-অভ্যাস। কার্য্যকালে বোঝা খুলিয়া বাহির করার সুবিধা হয় নাই, নিদ্রার কোন ব্যাঘাতও হয় নাই! "শরীরের নাম মহাশয়। যা সহাবে তাই সয়॥" ছেলেরা বর্ষাতি মাথায় দিয়াই রাত কাটাইত, বিকালে বৃষ্টি হইলে উহা স্বকার্য্যেও লাগিত। 'A double debt to pay'।

বিছানার চাদর সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা পোঁটলা বাঁধিতেই লাগিত, এবং এত ময়লা হইয়াছিল যে, লোকালয়ে ফিরিলে ধোপা হারি মানিয়াছিল। ডাণ্ডীতে (বোঝা লওয়ার ঝুড়ীতে) লাগিয়া ছিঁড়িয়াও গিয়াছিল।

বর্ষাতি, রেন্-কোট্ বা ওয়াটার্-প্রুফ্ প্রত্যেকের এক

একটি লওয়া হইয়াছিল। বৈকালে প্রায়ই বৃষ্টি হয় জানা ছিল। ৪।৫ দিন ভুগিয়াও ছিলাম। বোঝাওয়ালাদিগের বোঝা ঢাকা দিবার ৩।৪ খানি রবারক্লথ, বা অয়েলক্লথও লওয়া হইয়াছিল, নতুবা মালপত্র ভিজিয়া যাইবে। অয়েলক্লথ, ২।১ খানি ঘরে ছিল, ২।১ খানি কেনাও হইয়াছিল। বর্ষাতি যোগাড় হইয়াছিল। এ দুইটি জিনিশ চাই-ই। ইহা ছাড়া ডাণ্ডী-আরোহী ও আরোহিণীদের জন্য তিনটি ছাতা ছিল—পাহাড়ে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাইবার জন্য। (ছেলেদের এক জনের হ্যাট্ ও অপর জনের পাগড়ী ছিল।) ছাতা তিনটির একটি ট্রেণেই বিছানার সঙ্গে বাঁধার দরুণ কিঞ্চিৎ জখম হইয়াছিল, তবে উহাতেই বেশ কায চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত ঐটিই টিকিয়াছিল এবং 'সবে ধন নীলমণি' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ২য়টি দমকা বাতাসে ও গাছের ডালে বাধিয়া ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়াছিল, ৩য়টি শেষের দিনের পূর্ব্বদিন অসাবধানে তাহার উপর চাপিয়া বসায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইতি ছত্রভঙ্গপর্ব্বাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

কলিকাতা হইতে একখানি পুরাতন হাত-পাখা (তালবৃন্ত) লওয়া হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল, ৺কাশীর সুন্দর পাখাও একখানি লইব, শেষটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হরিদ্বার হইতে চাটাইএর মত বোনা পাখা একখানি দুই আনা মূল্যে খরিদ করা হইয়াছিল। ফিরিবার পথে এখানি শ্রীনগরে এক জন উপকারককে 'দাতব্য' করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার খানিই ভাঙ্গা অবস্থায়ও বরাবর কাযে লাগাইতে হইয়াছিল। ইহা ত দ্বিপ্রহরে শ্রমাপনোদনের জন্য ব্যবহৃত হইতই (পাহাড়ের দেশে রৌদ্র প্রখর, সুতরাং পাথরের ঘরে গরমও খুব), তাহা ছাড়া কাঠের উনান ধরাইতে ও মাছি তাড়াইতেও প্রয়োজন হইত। মাছি হৃষীকেশ হইতেই আরম্ভ, কেবল খুব ঠাণ্ডা জায়গায় নাই। পক্ষান্তরে, মশা কোথাও পাই নাই। সুতরাং মশারি না লইয়া ঠকি নাই। ভারও কমিয়াছিল।

মালপত্রের জন্য ক্যাম্বিসের দুইটি লম্বা ব্যাগ, (Kit-bag) লওয়া হইয়াছিল, কেন না, বোঝাওয়ালাদের ঝোড়ায় টীনের পেঁটরা লওয়ার সুবিধাও হয় না। ভাঙ্গিয়া তোবড়াইয়া যাইবারও আশঙ্কা আছে। ইহাতে ওজনও বাড়ে।

এ সব ছাড়া আর একটি ভ্রমণের সহচর লইতে হইয়াছিল —প্রত্যেকের এক একগাছি লাঠি—নীচে লোহার ফলা লাগান (hill-stick, বিলাতের alpen-stock)—হরিদ্বারে কিনিতে পাওয়া যায়। মূল্য আট আনা। পাহাড়ের রাস্তায়, বিশেষতঃ বরফের উপর দিয়া চলিতে সুবিধা হয়। নতুবা পা পিছলাইবার সম্ভাবনা। (ডাণ্ডীতে গেলেও দুর্গম স্থানে নামিয়া হাঁটিতে হয়।)

পোষাক-পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে পৃথগ্‌ভাবে কিছু বলিবার প্রয়োজন। তীর্থযাত্রার প্রথম অংশের (Stage) শেষে ৺কেদারধামে অসহনীয় শীত, দ্বিতীয় অংশের শেষে ৺বদরীধামেও প্রায় উহারই সমান-সমান। পূর্ব্বগামীদিগের পুস্তক-প্রবন্ধে এই তথ্যটি জানাতে 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্করে'র জন্য বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিলাম, প্রয়োজনও যে ছিল, তাহা 'পিছে' বেশ 'মালুম' হইয়াছিল। 'লোকশিক্ষা'র জন্য নরলোকে প্রচার করিতেছি। 'আপনি আচরি প্রভু অপরে শিখান।'

(৴০) দেহচর্ম্মের অব্যবহিত উপরেই (next the skin) পিঠবস্ত্র-স্বরূপ একটি টুইলের ফতুয়া, গেঞ্জি অপেক্ষা আরামের। (২।১ মাস পূর্ব্বে প্রস্তুত হইলেও সারাপথ—মাঝে মাঝে সাবানে কাচিয়া—খুব ধথল সহিয়া জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, ফিরিয়া গিয়া আর ব্যবহার চলিবে না।) (৵০) যুদ্ধের সময় সস্তায় ক্রীত (Ammunition Boardএর) ও কলিকাতায় যে কয় দিন বিষম (?) শীত পড়ে, সেই কয় দিন ব্যবহৃত উলেন্ সোয়েটার্। (৶০) ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত (২।৪ স্থানে রিফু করা) ওয়ার্-ফ্ল্যানেলের শার্ট্। (।০) ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত ও এত দিন ধরিয়া পুরাতন পোষাকের পিঁজরাপোল পেঁটরায় রক্ষিত, নাতি-নাতিনী হইলে তাহাদের জামা করার জন্য সযত্নে সঞ্চিত, (বাসনওয়ালীরা লইতে চাহে না) সার্জ্জের প্যাণ্টুলন্ চাপকান এক্ষণে কাযে লাগিল। ভাগ্যে টেনিসনের কবিতায় পড়িয়াছিলাম, "Keep a thing, its use will come." আমাদেরও কথায় বলে—'যা'কে রাখ, সেই রাখে।' (।৴০) ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত গরম কাপড়ের খুব লম্বা কোট্ (তেমন কাপড় আজকাল আর বাজারে মিলে না)—ইহার 'দার্জ্জিলিঙ্-হিমালেয়ান্ কোট্' নামকরণ করিয়াছিলাম। কলিকাতায় বিষম (?) শীত পড়িলে ২।৫ দিনের জন্য শ্রীঅঙ্গে চড়িত। (সব বৎসর প্রয়োজন হইত না।) পেঁটরায় ধরিত না, বাহিরে

বাহিরেই থাকিত।* (।৶০) উলেন্ ড্রয়ার্—এই অভিযানের জন্য ক্রীত। (।৵০) পুরু মলিদার কম্ফর্টার্—পূর্ব্ববৎসরে খরিদ। (॥০) তাহাতেও মাথা গরম থাকিবে না বলিয়া দেড় বৎসরবয়স্ক পৌত্রের উলের টুপী—মাথায় ঠিক লাগিল (fit করিল), সুতরাং এ পক্ষের যে second childhood (২য় দফা বাল্যকাল) হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিল। (৷৷৵০) কম্বলের তৈয়ারি দস্তানা—এই অভিযানের জন্য অনেক দোকান ঘুরিয়া সংগৃহীত। (শীতে হাত আড়ষ্ট হইবার ভয়ে ইহা যথাস্থানে পরিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার দাপটে আবার হাত আড়ষ্ট হইয়াছিল)। (॥৶০) গরম মোজা—নূতন। (॥৵০) Keds জুতা (রবারের সোল্ দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা)।—(Heel-less) গোড়ালি-বিহীন জুতায় অনভ্যস্ত বলিয়া ২।৩ মাস পূর্ব্বে কিনিয়া তালিম করা হইতেছিল। অনেকের ধারণা, দড়ীর জুতা এই পথে ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু তাহা বৃথা, ২।৪ দিনেই ছিঁড়িয়া অকেযো হইয়া যায়। নূতন অবস্থায়ও এত কমপোক্ত যে, পথে কাঁটা থাকিলে তাহাও আটকায় না, পায়ে ফুটিয়া যায়। ভাগিনেয়টি এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। ভাগ্যে একযোড়া Keds'ও তাঁহার মজুত ছিল। (উভয় প্রকারের জুতাই কলিকাতায় না লইলেও ৺কাশীতে, হরিদ্বারে এবং পথে বড় বড় জায়গায় —যথা দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, গুপ্তকাশী—এমন কি, কোনও কোনও চটীতেও—যথা চন্দ্রাবরীচটী পিপ্পলকুঠী—পাওয়া যায়, অবশ্য একটু বেশী দামে। পাহাড়ে পথের ধারেও এক জনকে বিক্রয়ের জন্য লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।) (৸০) এততেও বাঙ্গালীর শীতনিবারণ হয় না বলিয়া একখানি 'গ্যাদরা' মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত জড়ান ও (৸৶০) একখানি কম্বলে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত। ক্যামেরা সঙ্গে লওয়ার কথা ছিল, যোগাড় হইয়া উঠে নাই। থাকিলে, চেহারাটা কিরূপ খুলিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া সহৃদয় পাঠকবর্গকে চমকিত করিতে পারিতাম। স্থূল কথা, চারুপাঠের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত সিন্ধুঘোটকের ছবি যাঁহাদিগের বাল্যে পরিচিত, তাঁহারা কতকটা অনুধাবন করিতে পারিবেন। যাহা হউক, এই সব পোষাক-পরিচ্ছদে প্রপুরিত ও প্রপীড়িত হওয়াতে ডাণ্ডীর ভার প্রায় অর্দ্ধ মণ বাড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বাহকদিগের আপত্তি হয় নাই। আলাদা জিনিশ এক ছটাক লইতেই যত আপত্তি।

গৃহিণী তাঁহার জন্য উলেন্ ড্রয়ার্ পয়সা খরচ করিয়া কিনিতে নারাজ হইয়াছিলেন। তাহার অনুকল্পে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে সমুদ্রস্নানের জন্য প্রস্তুত লংক্লথের ড্রয়ারটি (ভুক্তভোগিনীগণ জানেন, সেখানে ইহা অপরিহার্য্য) লইতে রাজী হইয়াছিলেন। শাদা লংক্লথের শেমিজ, তদুপরি ওয়ার্ ফ্ল্যানেলের শেমিজ, তদুপরি দার্জ্জিলিংএর শীতের উপযোগী ক্যাশ্মীয়ারের জ্যাকেট। আর্য্যনারী হইলেও মোজাজুতা পরিতে হইয়াছিল। মাথায় নাতীর দ্বিতীয় প্রস্থ উলের টুপী ; (গলাবন্ধ ও দস্তানায় রাজী হইলেন না)। শীতবস্ত্র ও কম্বল কবরী হইতে বিনামার প্রান্ত পর্য্যন্ত বিলম্বিত।

ছেলেদের খাকী বা খদ্দরের হাফ্প্যাণ্টের নীচে underwear, পদব্রজে পার্ব্বত্য পথে চলার পক্ষে এই কাটা-ছাটা পোষাকই সুবিধা, underwearএর উপর মদীয় যৌবন-কালের উলেন্ ড্রয়ার্ (এত দিন ধরিয়া সযত্নে সঞ্চিত—'well-saved' !) গরম সোয়েটার্, গরম কোট্, খাকী বা খদ্দরের শার্ট্, মাথায় হ্যাট্ বা পাগড়ী. পায়ে গরম মোজা ও keds ত ছিলই, তাহার উপর পট্টি জড়ান। (তাঁহাদিগকে যে সারা পথ হাঁটিতে হইবে—স্থানে স্থানে বরফের উপরেও।) তাঁহারাও কম্বল ছাড়েন নাই ; উক্তঞ্চ উদ্ভটপুরাণে 'কম্বল-বন্তং ন বাধতে শীতম্।"

শীত বস্ত্রের, তথা অন্যান্য হরেক রকম জিনিশের লম্বা ফিরিস্তি দেখিয়া পাঠকবর্গ বোধ হয় স্তম্ভিত হইবেন, অনেকে বোধ হয়, মনে মনে বা উচ্চ কণ্ঠে হাসিবেন, এবং লেখক যে বহুকেলে শিক্ষক, সুতরাং নিতান্ত নির্ব্বোধ, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন। পূর্ব্বগামীদিগের এবং বহু পরামর্শদাতার মতানুবর্ত্তন করিতে গিয়াই কিন্তু আমার এই দশা হইয়াছিল। (Aesop's Fables বা কথামালায় 'বৃদ্ধ, তাঁহার পুত্র ও তাঁহাদিগের গর্দ্দভ' গল্পটি স্মর্ত্তব্য)। তথাপি সকলের সকল কথা রাখিতে পারি নাই ! কার্য্যকালে অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় এত জিনিশ মজুত থাকা-সত্ত্বেও ভোগে লাগে নাই। সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, যথা—একটু বার্লির জলের অভাবে দারুণ পেটের অসুখে শুষ্ক কণ্ঠে মিছরি চিবাইয়া বা

---

* এবার দেবদর্শনের ফলে মন উদার হওয়াতেই হউক অথবা গীতোক্ত 'বাসাংসি জীর্ণানি'-স্মরণেই হউক, বহুকেলে কোট্টি মায়া কাটাইয়া ৺বদরীধামের পাণ্ডার গোমস্তাকে দান করিয়া ফেলিয়াছি। খুব সুকৌশলে এটির হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি। 'কমলি' এত দিনে ছাড়িয়াছে।

চুষিয়া মরিয়াছি (যদিও ওরূপ উপবাসে উপকারই হইয়াছিল)। যাহা হউক, এই বিরাট্ বোঝার জন্য যথেষ্ট শাস্তি ও শিক্ষাও পাইয়াছি। রেল্‌পথে চার চার খান ইণ্টার্ ক্লাসের টিকিটের জোরে (দুই মণ ফ্রী) মাশুল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি বটে, কিন্তু বোঝাওয়ালাদের বোঝা ওজনে যখন চড়িল ও মণকরা ৫০ টাকা হিসাবে শতাধিক টাকা আক্কেলসেলামী লাগিল, তখন বেয়াকুবিটা ভাল করিয়াই বুঝিলাম, তবু ত রান্নার হাঁড়ী, বেড়ী, তৈল, লবণ, মশলা হইতে গায়ের কম্বল, বর্ষাতি ও হাতের ছাতা-লাঠি পর্য্যন্ত ডাণ্ডীওয়ালাদিগের প্রবল আপত্তিসত্ত্বেও ডাণ্ডীতে চড়াইয়াছিলাম। (নতুবা বোঝাওয়ালাদিগের ভরসায় থাকিলে রন্ধন-ভোজনে অসঙ্গত বিলম্ব ঘটে। তাহারা অনেক আগে রওনা হইয়া অনেক পরে পৌঁছিত)। নিজে ঠকিয়াছি, ঠেকিয়া শিখিয়াছি, পরবর্ত্তী তীর্থযাত্রিগণ যাহাতে না ঠকেন, দেখিয়া শেখেন (ইংরেজী প্রবচন আছে, 'By others' faults wise men correct their own,' জ্ঞানী লোকেরা পরের ভ্রান্তি দেখিয়া নিজেদের ভ্রান্তি সংশোধন করেন),সেই উদ্দেশ্যে নিজেদের চড়া দরে কেনা অভিজ্ঞতা (dear-bought experience) হইতে তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দিতেছি—তাঁহাদিগেরই উপকারের জন্য, তাঁহারা যেন 'ভূতে পশুস্তি' বলিয়া এ অধমকে টিটকারী দিবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক জিনিশ পথেই পাওয়া যায়, অনেক জিনিশ না লইলেও বেশ চলিয়া যায় (যথা পাশ-বালিশ)। এ সব বিষয়ে প্রয়োজনের পরিমাণ কমান আর্থিক হিসাবেও সুবিধাজনক, পারমার্থিক হিসাবেও মঙ্গলদায়ক। তীর্থে বাহির হইলে কৃচ্ছ্র-সাধনই (যতটা সহে) শ্রেয়স্কর। ধুতি ও শাদা জামা, সাধারণ একখানা গায়ের কাপড়, না হয় তাহার উপর একখানা কম্বল সম্বল করিয়া, লোটা হাতে, ছাতা ঘাড়ে, ছোট বা মাঝারী একটি পোঁটলা ঘাড়ে, পিঠে বা মাথায় করিয়া, অনেক স্থলে খালি পায়ে শত শত নরনারী চলিয়াছে, তাহারা একটুও কাতর নহে; আর পিঁয়াজের সাত পুরু খোলার মত জামা-যোড়া জড়াইয়াও আমাদের 'হি হি ক'রে কাঁপে গাত্র'—

শীতেনাহং কুঁকুড়ি-সুকুড়ি সর্ব্বগাত্রেষু কম্পঃ—

যেন শেকস্‌পীয়ারের নাটকে পাগল-সাজা এড্‌গারের কাতরানি "Poor Tom's a-cold', অথবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় শাপগ্রস্ত Harry Gill—

> "Poor Harry Gill is very cold.
> Abed or up, by night or day,
> His teeth, they chatter, chatter still.
> Of waistcoats Harry has no lack,
> Good duffle grey, and flannel fine;
> He has a blanket on his back,
> And coats enough to smother nine."

তাহারাও মানুষ, আমরাও মানুষ; সাধে কি পাঁচু দা বলিতেন, আমরা 'কাপুড়ে বাবু' বনিয়া গিয়াছি। বাস্তবিক, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আর সে মোটা চা'ল নাই, আমরা বড় আয়েসী হইয়া উঠিয়াছি। অন্য প্রদেশের যাত্রীদিগকে দেখিলে এ কথাটা বেশ সমজাইতে পারি। অবশ্য ধনীর কথা স্বতন্ত্র। দেখিলাম, এক জন বোম্বাইওয়ালা, বহু ডাণ্ডী কাণ্ডী সঙ্গে লইয়াছেন, চাকর-বাকর অসুস্থ হইয়া পড়ার আশঙ্কায় খালি ঝাম্পান ২।১ খানিও লইয়াছেন, একটা সুট্‌কেস্—লেবেল্ লাগান সারি সারি তর-বেতর ঔষধের শিশিতেই ভর্ত্তি। কিন্তু তিনি হয় ত লক্ষপতি; আর আমরা—এক দিন চাকরী না থাকিলেই চক্ষুঃ চড়কগাছ, বাড়ী ভাড়া বাকী পড়াতে গাছতলায় বা রাস্তায় বসিতে হয়, শ্মশান-কৃত্যের জন্য অনাথ-ভাণ্ডারের দ্বারস্থ হইতে হয়, ইত্যাদি।

যাক, লোকসংগ্রহ, তথ্যসংগ্রহ, দ্রব্যসংগ্রহ—তিনই হইল, একেবারে "ত্র্যহস্পর্শ।" অতএব যাত্রা নাস্তি। সুতরাং এখনকার মত এখানেই বিশ্রাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোনার পাহাড়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুইটোর কারাগারে

যে কয়েক জন অসভ্যদেশীয় লোক আমাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া চলিল, তাহারা সংখ্যায় অধিক ছিল না; যদি আমরা ঘুমাইয়া না পড়িতাম ও সেই অবস্থায় শৃঙ্খলিত না হইতাম, তাহা হইলে আমরা পাঁচ জনেই তাহাদের সকলকে গুলী করিয়া মারিতে পারিতাম; কেহই পলায়নের সুযোগ পাইত না। বুদ্ধির দোষে আমাদিগকে এই ভাবে বিপন্ন হইতে হইল, এ কথা চিন্তা করিয়া ক্ষোভ ও মনস্তাপের সীমা রহিল না। বিশেষতঃ, সোনার বাক্সটি হারাইয়া আমরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। আমার অসতর্কতাই সকল অনর্থের মূল, ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কিছুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করিলে এরূপ সঙ্কটের সম্ভাবনামাত্র থাকিত না। জাহাজের উপর যেরূপ প্রহরী নিয়োগের ব্যবস্থা থাকে, এখানেও যদি সেই ব্যবস্থানুযায়ী কায করিতাম, তাহা হইলে এই 'দো-আঁসলা' অসভ্যগুলার ভাগ্যফল অন্য প্রকার হইত। আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই, সুতরাং আক্ষেপ নিষ্ফল বুঝিয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে নিম্নস্বরে বলিলাম, "ভাই সকল, আমরা বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি; কিন্তু এখন বলপ্রকাশের চেষ্টা নিষ্ফল।"

তাহারা আমার কথা বুঝিল বটে, কিন্তু তাহারা সকলেই অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল; আমি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়া, যাহারা আমাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়াছিল, তাহাদের দলপতিকে বলিলাম, "তোমরা আমাদিগকে এ ভাবে বাঁধিলে কেন? আমাদের এখন কোথায় লইয়া যাইবে, আমাদের লইয়া করিবেই বা কি?"

সে গজদন্তের মত সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া, মুখের বিকট ভঙ্গী করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "তোমরা চোর, তোমরা খুনী আসামী; আমরা অনেক দিন হইতে তোমাদের সন্ধান করিতেছিলাম, এত দিন পরে ধরিয়াছি। তোমাদিগকে এখন কুইটো লইয়া যাইব, সেখানে ফাঁসী দিয়া তোমাদিগকে হত্যা করা হইবে।"

আমরা তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারি নাই মনে করিয়া সে রজ্জুর এক প্রান্ত নিজের গলায় জড়াইল, তাহা আকর্ষণ করিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিল এবং আধ হাত জিহ্বা বাহির করিয়া, আমাদের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিল।

তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বার্ণি সভয়ে বলিল, "সদাপ্রভু আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা চোর, আমরা খুনী আসামী? যদি তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে পার, তাহা হইলে আমাদিগকে যেখানে যে ভাবে ইচ্ছা ফাঁসে লটকাইতে পার, তাহাতে আপত্তি করিব না।"

আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়া আমার ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল; কিন্তু এ কথাও আমার মনে হইল যে, এ রাজ্যে যদি বিন্দুমাত্র সুবিচার থাকে, তাহা হইলে আমাদের মুক্তিলাভ করা কঠিন হইবে না, কারণ, আমাদের অপরাধের কোন প্রমাণ ছিল না।

আমার ছুতোর বন্ধু বলিল, "ঐ দো-জেতে ভূতটা ও কথা বলিল কেন, বুঝিতে পারিয়াছ? যে সকল লোক সোনার

পাহাড় হইতে সোনা সংগ্রহ করিয়া এ দেশে আসিয়াছিল, উহারা আমাদিগকে সেই সকল লোক বলিয়া ভুল করিয়াছে।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি অন্ধকারের মধ্যে যেন আলো দেখিতে পাইলাম। তাহার এই অনুমান সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইল। তাহারা আমাদিগকে ভ্রমক্রমেই গ্রেপ্তার করিয়াছিল; সুতরাং কুইটোর বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া আমরা ইহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিতে পারিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, এ আশা অসঙ্গত মনে হইল না। আমি জানিতাম, কুইটো ইকুয়েডর সাধারণ তন্ত্রের প্রধান নগর। এই ইকুয়েডর রাজ্য দক্ষিণ-আমেরিকার স্বাধীন রাজ্যগুলির অন্যতম। আমি নাবিকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহার উপকূল-সন্নিহিত সমুদ্রে তিন চারি বার আসিয়াছিলাম, এবং এই দেশের যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সিম্বোরাজো ও অন্যান্য পর্ব্বতশ্রেণীর পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি কোটোপাক্সির বিস্ময়াবহ বিবরণ পাঠে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম; আকাশে মেঘ না থাকিলে সমুদ্রবক্ষে জাহাজে বসিয়া এক শত মাইল দূর হইতেও সেই সকল পর্ব্বতের গগনস্পর্শী শৃঙ্গগুলি দৃষ্টিগোচর হইত। কত দিন আমি জাহাজ হইতে সেই সকল তুঙ্গ শৃঙ্গ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছি। আমি জানিতাম, এই দেশের অধিকাংশ স্থান অনাবিষ্কৃত ছিল। ভিন্ন দেশের লোকরা এই দেশকে রহস্য-পূর্ণ অজ্ঞাতরাজ্য বলিয়া মনে করিত এবং ইহার দুর্গম প্রদেশে স্বর্ণ ও হীরক-রত্নের যে সকল খনি সংগুপ্ত আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য আমার কৌতূহল ও আগ্রহ অসংবরণীয় হইয়া উঠিত। কুইটো নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাড়ে নয় হাজার ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত; তাহা পিচিঞ্চা নামক আগ্নেয়গিরির সানুদেশে সংস্থাপিত বলিয়া পিচিঞ্চা-সমুৎসারিত ভস্মরাশিতে ও গলিত ধাতুপ্রবাহে এই নগর বহুবার আচ্ছাদিত হইয়াছিল, এবং অসংখ্য নগরবাসীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, এ সংবাদও আমার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আমাকে যে কোন দিন বন্দিভাবে এই নগরে উপস্থিত হইয়া দস্যু ও নরহন্তার ন্যায় বিচারাধীন হইতে হইবে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুতরাং আমি যখন আমার অনুচরবর্গের সহিত শৃঙ্খলিত হইয়া কুইটো নগরে যাত্রা করিলাম, তখন আমার হৃদয় আশায় ও নিরাশায় আন্দোলিত হইতেছিল; কিন্তু নিরাশায় মুহ্যমান হইবার কোন কারণ ছিল বলিয়াও মনে হইল না। আমার অদ্ভুত ভাগ্য নানা ঘটনাবৈচিত্র্য অতিক্রম করিয়া আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছিল, অকালে আমার ইহ-জীবনের অবসানই যে তাহার পরিণাম, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, আমরা সেই দ্বীপের প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া তিনখানি ডোঙ্গা দেখিতে পাইলাম; সেই সকল ডোঙ্গায় কয়েকটি দেশীয় লোক এক একখানি তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ ছোরা লইয়া বসিয়া ছিল। যে ডোঙ্গাখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার, আমাদের পাঁচ জনকেই সেই ডোঙ্গায় তুলিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ডোঙ্গার পাল তুলিয়া সর্ব্বাগ্রে যাত্রা করা হইল; অন্য দুইখানি ডোঙ্গা আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই উপসাগরের মোহানায় গোয়াকুইল নগর অবস্থিত; আমরা সেই নগর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। প্রভাতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া আমরা সন্ধ্যার পর গোয়াকুইল নগরে উপস্থিত হইলাম। ডোঙ্গা হইতে নামিয়া আমরা স্থানীয় কারাগারে নীত হইলাম। কারাগারটি নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, ইষ্টকনির্ম্মিত অনুচ্চ গৃহ। সেখানে তখন যে পাঁচ ছয় জন প্রহরী ছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইল, ছেলেদের খেলনার বাক্সে যে সকল টীনের সিপাই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ইহারা তুলনার অযোগ্য নহে। যাহা হউক, আমাদিগকে সেই কারাগারে লইয়া গিয়া যে কক্ষে আবদ্ধ করা হইল, তাহা কুকুরের বাসগৃহ অপেক্ষাও অপকৃষ্ট; সেই সঙ্কীর্ণ অনুচ্চ কারাকক্ষে বায়ুপ্রবেশের কোন উপায় ছিল না। যেন আমরা একটি বাক্সের ভিতর স্থাপিত হইলাম। সেই কক্ষের মেঝের মাটীর উপর ইটের গাঁথ্নী না থাকায় মাটী দিয়া জল উঠিতেছিল, এবং দেওয়ালগুলিও অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে। যে শৃঙ্খল দ্বারা আমাদের সকলকে একসঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, প্রহরীরা সেই শৃঙ্খল অপসারিত করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরাইয়া দিল, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এক একটি শৃঙ্খলের উভয় প্রান্ত হাতকড়ি ও বেড়ির সঙ্গে আঁটিয়া দিল। এ জন্য আমাদের হাত-পা নাড়িতে অত্যন্ত কষ্ট হইল, দুই চারি পা হাঁটিয়া যাওয়া ত দূরের কথা! আমাদের আততায়ীরা বোধ হয় আমাদের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এবং

বুঝিতে পারিয়াছিল, কোন উপায়ে একবার আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের দলের এক জনকেও জীবিত রাখিব না ; এই জন্য তাহারা আমাদের প্রতি ভীষণপ্রকৃতি বন্য জন্তুর মত ব্যবহার করিতেছিল।

যাহা হউক, আমাদিগকে সেই কারাকক্ষে এই ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহারা আমাদের জন্য যৎসামান্য কদর্য্য খাদ্য-দ্রব্য ও খানিক ঘোলা পানীয় জল রাখিয়া গেল। অবশেষে শয়নের জন্য আমাদের ভাগ্যে এক একখানি ছেঁড়া মাদুরও মিলিল! আমরা ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম বলিয়াই সেই অখাদ্য খাদ্য ও অপেয় জল অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিলাম। আহারান্তে মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিবামাত্র আমরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এই স্থানে আমাদিগকে চারি দিন থাকিতে হইল। এই চারি দিন আমাদের কোন কায ছিল না। দিবসের অধিকাংশ সময় আমরা গল্প করিতাম, কখন কখন একটু বেড়াইয়া আসিতাম ; কিন্তু আমরা সেই কারাগারের ক্ষুদ্র আঙ্গিনার বাহিরে যাইতে পাইতাম না। সেই সময় চারি পাঁচ জন প্রহরী গাদা বন্দুক ঘাড়ে লইয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত। সেই একই ভাবে বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি অতিবাহিত করিতে আমাদের কি কষ্ট হইত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য ; ইহার উপর আমাদের ভাগ্যে কি আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমরা ক্ষিপ্তবৎ হইলাম। আমরা কাহারও নিকট কোন কথা জানিতে পারিতাম না। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া মাথা নাড়িত, তাহার পর আমাদের মুখের উপর এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়িয়া মজা দেখিত! এই স্থানের সকল লোক দিবারাত্রি বিড়ি টানিত; এক মিনিটের জন্যও কাহাকেও বিড়ি ত্যাগ করিতে দেখি নাই, এই জন্য আমার ধারণা হইয়াছিল, রাত্রিকালে নিদ্রাঘোরেও তাহারা বিড়ি টানে! স্থানীয় সাধারণ লোকগুলি যে বিড়ি ব্যবহার করিত, তাহা এক জাতীয় বৃক্ষপত্র দ্বারা নির্ম্মিত। গাছের পাতাগুলি সুকৌশলে জড়াইয়া বিড়ি প্রস্তুত করিত। সেই বিড়িতে তাহারা যে তামাক ব্যবহার করিত, তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট, জঘন্য তামাক ; অগ্নিসংযোগে সেই সকল বিড়ি হইতে যে দুর্গন্ধ নির্গত হইত, তাহা আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে বমনোদ্রেক হইত। গোময়ে অগ্নি সংযোগ করিলে যেরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়, এই সকল বিড়ির গন্ধও প্রায় সেই প্রকার! কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব রুচির পক্ষপাতী ; আমরা যাহা রুচিকর মনে করি, তাহা তাহারা ব্যবহারের অযোগ্য মনে করে। আমাদের কাছে কিছু উৎকৃষ্ট তামাক ছিল, দুই তিন জন প্রহরীকে তাহা পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সেই তামাকে দুই এক টান দিয়া 'নি বোনো' 'নি বোনো' শব্দে চীৎকার করিয়া বমনের অভিনয় করিল!

পঞ্চম দিন প্রভাতে আমাদের যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহারা আমাদের সকলকে একসঙ্গে শৃঙ্খলিত করিয়া কারাকক্ষের বাহিরে লইয়া গেল। আমরা পথে আসিলে আমাদিগকে দেখিবার জন্য অসংখ্য নরনারীর সমাগম হইল। দেখিলাম, স্ত্রী, পুরুষ, এমন কি, বালক-বালিকাগণেরও মুখে বিড়ি। দুর্গন্ধময় তাম্রকূট-ধূমে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

নরনারীর দল চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাদের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল দেখিয়া বার্ণি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "এই বর্ব্বরগুলা কি আমাদিগকে বুনো জানোয়ার মনে করিয়াছে? উহারা দেখিতেছে কি?"

যাহা হউক, আমরা নগরের পথ দিয়া অসংখ্য নরনারীপরিবেষ্টিত হইয়া নদীতীরে নীত হইলাম। পরে শুনিয়াছিলাম, এই নদীর নাম গুয়াযাস্। নদীতীরে একখানি অদ্ভুত আকারের নৌকা ছিল; আমরা সকলে সেই নৌকায় আরোহণ করিলে কয়েক জন সেই দেশীয় মাঝি দাঁড় টানিতে লাগিল। তাহারা দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে দাঁড় টানিয়া পরদিন প্রভাতে এক স্থানে নৌকা বাঁধিল। এই স্থানটির নাম বোডেগাস। আমরা নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিলে আমাদের বন্ধনশৃঙ্খল অপসারিত হইল। আমরা প্রত্যেকে এক একটি অশ্বতরের উপর আরোহণ করিলাম। আমাদের প্রহরীরাও অনুরূপ ভাবে অগ্রগামী হইল। প্রথমে আমরা কিছু দূর পর্য্যন্ত উত্তরে চলিলাম, তাহার পর আমাদিগকে পূর্ব্বদিকে ফিরিতে হইল। চিমবোরাজো নামক সুবিশাল পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অবশেষে পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম ; পথটি বেশ প্রশস্ত ও সুগম। পার্ব্বত্য প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। পথের কষ্ট ভুলিলাম। আমরা ক্রমশঃ এত দূর ঊর্দ্ধে উঠিলাম যে, সেই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ।

তরুলতাবর্জ্জিত ধূসর সমতল ক্ষেত্রে সেই রাত্রির জন্য আমাদের তাম্বু পড়িল। প্রহরীরা চারিদিক্ খুঁজিয়া কতকগুলি শুষ্ক গুল্ম সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহাতে অগ্নিসংযোগ করায় প্রচুর ধূম উঠিতে লাগিল। কিন্তু উত্তাপের অভাব হইল না। পর্ব্বতের এই অত্যুচ্চ অংশে রাত্রিকালে শীতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল। আমরা বিষুবরেখার সন্নিকটে থাকিলেও এখানে কি প্রবল শীত! আমাদের দেহে গ্রীষ্মমণ্ডলের ব্যবহারোপযোগী পাতলা পরিচ্ছদ থাকায় শীতে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। প্রহরীর নিকট জানিতে পারিলাম, এই স্থানটির নাম—"আরেনাল গ্রাণ্ডি।"

'আরেনাল গ্রাণ্ডি'র অর্থ বৃহৎ গিরিসঙ্কট। স্পেনবাসীরা এই দেশ জয় করিয়া এই পথটি প্রস্তুত করিয়াছিল। গুয়াকুইল হইতে কুইটো গমনের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ।

পরদিন প্রভাতে পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিয়া আমরা নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। বহু দূরে সমতল ক্ষেত্রে কুইটো নগর অবস্থিত। কিন্তু সেই নগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে আরও এক দিন পথে পথে কাটাইতে হইল। তৃতীয় দিন আমরা কুইটো নগরে উপস্থিত হইবামাত্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম। এই কারাগার গুয়াকুইলের কারাগার অপেক্ষা বৃহত্তর এবং সেরূপ জঘন্য নহে। আমরা কারাগারে প্রবেশ করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলাম। কারণ, আমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের কি অভিযোগ, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু আমার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। এখানে আসিবার পর আমাদের শৃঙ্খল অপসারিত হইল; আমরা কতকটা স্বাধীনতা লাভ করিলাম বটে, কিন্তু প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। আট সপ্তাহ আমাদিগকে কুইটোর কারাগারে বাস করিতে হইল। এ সময়ে আমাদের প্রতি কেহই অসদ্ব্যবহার করে নাই। এক জন স্প্যানিয়ার্ড এই কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল; তাহার বয়স তখন উনিশ বৎসর। তাহার নাম নাসিস্কা। নাসিস্কার মত সুন্দরী তরুণী আমি জীবনে দেখি নাই। তাহার সদয় ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইলাম। সে প্রায় প্রত্যহ আমাদিগকে দেখিতে আসিত। বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় সে অনর্গল কথা কহিতে পারিত এবং আমাদের সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিত। সে আমাদের আত্মকাহিনী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং আমাদের ইকুয়েডরে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিত। প্রথমে দুই এক দিন আমরা তাহার নিকট সত্য-কথা গোপন করিয়াছিলাম; কিন্তু অবশেষে মনে হইল, তাহাকে সত্যকথা বলিলে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। আমাদের সকল কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, সেই দেশে একটা জনশ্রুতি আছে যে, ইকুয়েডরের কোন দুরারোহ ও দুর্গম পার্ব্বত্য উপত্যকা বিশুদ্ধ স্বর্ণের স্তূপে পরিপূর্ণ। বহু সাহসী ব্যক্তি স্বর্ণের সন্ধানে সেই প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পথের কষ্টে ও দুর্দ্দান্ত বন্য জাতির আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; যে অল্পসংখ্যক লোক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, তাহারা পথের কষ্টে রুগ্ন, জীর্ণ ও কঙ্কালসার হইয়াছিল, এবং অল্প-দিন পরে তাহাদেরও মৃত্যু হইয়াছিল। পথে তাহাদিগকে যে ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার ভয়াবহ বিবরণ শুনিয়া আতঙ্কে সকলেরই লোমহর্ষণ হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, এক দল ইংরাজ বহু কষ্ট-ভোগের পর সেই দুর্গম সোনার উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়াছিল। এ কথা প্রথমে কেহ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু অবশেষে জানিতে পারা গিয়াছে, সেই সকল ইংরাজ সোনার পাহাড় হইতে সমুদ্রতটে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিল এবং সেই অঞ্চলের অনেক লোক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা গুয়াকুইলে উপস্থিত হইয়া দেশীয় মাঝিদের কয়েকখানি ডিঙ্গা চুরী করিয়াছিল, এবং সেই সকল ডিঙ্গার সাহায্যে গুয়াকুইল উপসাগরে যাত্রা করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যদল তাহাদের সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা পথের কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, অথবা জাহাজে চাপিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই সংবাদ অবিশ্বাস করিয়া দেশের চারিদিকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদেরই এক দল আমাদিগকে নৌকা ও ভেলা লইয়া দ্বীপের নিকট আসিতে দেখিয়াছিল। তাহারা প্রথমে আমাদিগকে পূর্ব্বদৃষ্ট ইংরাজদল বলিয়াই ভুল করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের ভেলায় একটি মৃতদেহ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল—আমরা সেই

দলের লোক নহি, সম্ভবতঃ কোন জাহাজ হইতে সেখানে নূতন আসিয়াছি ; কিন্তু আমরা সেই পলাতকগণকে চিনি—ইহাই তাহাদের ধারণা হইয়াছিল। আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইবে, কর্তৃপক্ষ এত দিনেও তাহা স্থির করিতে না পারায় আমাদিগকে বিচারালয়ে প্রেরণ করেন নাই।

কি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে কুইটো নগরে ধরিয়া আনা হইয়াছে—নাসিস্‌কার কথা শুনিয়া তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। বিদেশীরা এ দেশে আসিয়া কোন কারণে গভর্ণমেণ্টের বিরক্তিভাজন হইলে তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না ; এ অবস্থায় আমাদের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কঠোর ব্যবহারে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

কিছু দিনের মধ্যেই সুন্দরী নাসিস্‌কা বার্ণি ফাগানের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিল ; এবং তাহাদের অনুরাগ প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল। বার্ণির ন্যায় রূপবান্ যুবক আমাদের দলে আর এক জনও ছিল না। তাহার বয়স অল্প, সুগঠিত সুদৃঢ় দেহ যেন স্বাস্থ্যের সজীব মূর্ত্তি ; তাহার ন্যায় মিষ্টভাষী রসিক যুবক নারীর মনোরঞ্জন করিবে—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমরা বিদেশী, অসহায় ও বিপন্ন, কারাগারে বন্দিভাবে কালযাপন করিতেছি, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ; বিচারে হয় ত আমাদের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ হইবে ; কিন্তু নাসিস্‌কা এ সকল কথা চিন্তা না করিয়াই বার্ণিকে ভালবাসিল। সে সংসারজ্ঞানহীনা সরলা যুবতী এবং প্রেম-অন্ধ। তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া আমি ক্ষুণ্ণ হইলাম ; কিন্তু তাহাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল।

অবশেষে এক দিন প্রভাতে শুনিতে পাইলাম, পরদিন আমাদিগকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, সেখানে আমাদের অপরাধের বিচার হইবে। এত দিন পরে আমাদের ভাগ্যফল জানিতে পারিব বুঝিয়া আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম ; কিন্তু বিচারে যদি আমাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের আদেশ হয়, যদি আমাদিগকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়, তাহা হইলে নসিস্‌কাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় বার্ণি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই কারাগারে বাস করিতে পাইলেই বোধ হয় ত সে সুখী হইত। তাহার তখন অন্য কোন কামনা ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচার

পরদিন প্রভাতে এক দল প্রহরিপরিবেষ্টিত হইয়া আমরা কুইটোর বিচারালয়ে নীত হইলাম। বিচারালয়টি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ, নগরের বাহিরে সংস্থাপিত, এবং তাল ও খর্জ্জুর-জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। অনেকগুলি জমকালো চেহারার লোক অদ্ভুত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বিচারালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; তাহাদের প্রত্যেকের কোমরবন্ধে তরবারি, এবং মুখে বিড়ি। এক মুহূর্ত্ত তাহাদের ধূমপানের বিরাম ছিল না। বিচারালয়ের সকল লোক কৌতূহলভরে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন আমরা নূতন এক জাতীয় বানর!

মামলা আরম্ভ হইলে আমাদিগকে এজলাসে গিয়া কাষ্ঠ-দণ্ড-পরিবেষ্টিত আসামীর কাঠরায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইল। এজলাসটি কাষ্ঠনির্ম্মিত উচ্চ মঞ্চের উপর সংস্থাপিত এবং তাহা লোহিত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রধান বিচারপতি প্রকাণ্ড জোয়ান, তাঁহার প্রকৃতি গম্ভীর এবং দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। তাঁহার দুই পাশে আরও চারি পাঁচ জন বিচারক উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর আমাদের অপরাধের বিচার আরম্ভ হইল। কিন্তু বিচারপতি কি ভাবে বিচার শেষ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাদের কেহই ইংরাজী জানিতেন না ; আমাদিগকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না, অথচ বিচার চলিতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপার আগাগোড়া প্রহসন বলিয়াই আমার ধারণা হইল। টিফিনের সময় আমাদিগকে এজলাসের বাহিরে লইয়া গিয়া কিছু খাইতে দেওয়া হইল। তাহার পর পুনর্ব্বার আমরা আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে আমরা পুনর্ব্বার কারাগারে নীত হইলাম। বিচারক আমাদের অপরাধের কি প্রমাণ পাইলেন, এবং বিচারের কি ফল হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না।

ইহার পর দুই দিন আমরা কারাগারেই আবদ্ধ রহিলাম। আমাদের মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। এক জন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, বিচার শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট রায় প্রকাশ করেন নাই। তৃতীয় দিন

মধ্যাহ্নকালে এক দল প্রহরী আমাদিগকে প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের কামরায় লইয়া চলিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া সুন্দরী নাসিস্‌কাকে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আসামী বার্ণির প্রণয়িনী কি উদ্দেশ্যে হাকিমের বাসায় আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে অনুমান করিলাম, সে তাহার প্রণয়ীর অনুকূলে ওকালতী করিতে আসিয়াছে; কিন্তু তাহার কাতর মুখচ্ছবি দেখিয়া আমাদের মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। অবশেষে জানিতে পারিলাম, সে ভাল ইংরাজী জানে বলিয়া দোভাষীর কায করিবার জন্য তাহাকে সেখানে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সাহায্যে আমাদিগকে জানাইবেন—কোন্ অপরাধে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কি ভাবে বিচার শেষ করা হইয়াছে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট কি রায় দিয়াছেন। সুদীর্ঘ গোঁফবিশিষ্ট ভীষণাকৃতি একটি যুবক একটা প্রকাণ্ড নথি খুলিয়া দশ পনের মিনিট কাল উচ্চৈঃস্বরে কি পাঠ করিল। বুঝিলাম, সেই যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটের পেশকার এবং যাহা পাঠ করিল, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়। আমরা তাহার একটি কথাও বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু সুন্দরী নাসিস্‌কা ইংরাজী ভাষায় আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিল। এখানে সেই সুদীর্ঘ রায়ের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের সহিষ্ণুতায় আঘাত করিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু সেই রায়ের মর্ম্ম জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেট যে রায় লিখিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, তদ্দেশীয় গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন বিদেশী সেই দেশে উপস্থিত হইয়া কোন মূল্যবান্ ধাতু সংগ্রহ করিলে, সে আইন অনুসারে দণ্ডার্হ। পিটার ডন্‌কুম ও তাহার সহচররা সেই দেশে উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রচলিত আইন অমান্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহারা গভর্ণমেণ্টের প্রহরিগণের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া পলায়নে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা আর এক দল বিদেশী, পথিমধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সংগৃহীত স্বর্ণের লোভে তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলাম। আমরা যে নরহত্যা করিয়াছিলাম, ইহার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ ছিল না বটে, কিন্তু ডন্‌কুম ও তাহার দলের লোক যে স্বর্ণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই স্বর্ণ আমাদের নিকট একটি বাক্সের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। ডন্‌কুম ও তাহার সহচরগণকে হত্যা না করিলে সেই সুবর্ণরাশি আমাদের হস্তগত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং আমরা চুরী ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী।

বিচারকালে আমাদের বিরুদ্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদের জবানবন্দী হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে, পুনা দ্বীপের একটি বিজন অরণ্যে একখানি কুটীরে আমাদিগকে বাস করিতে দেখা গিয়াছিল; সেই কুটীরখানি সেখানে গোপনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কুটীরে একটি বাক্সের ভিতর অপহৃত স্বর্ণরাশি পাওয়া গিয়াছে; এতদ্ভিন্ন আমাদের নিকট বন্দুক, ছোরা, গোলাগুলী প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, আইন অনুসারে ঐ সকল সামগ্রী যুদ্ধোপকরণ বলিয়া গণ্য এবং সুযোগ পাইলে আমরা প্রহরিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতাম, এ বিষয়ে বিচারক নিঃসন্দেহ।

সুন্দরী নাসিস্‌কা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে বিচারকের বিচার-কৌশলের পরিচয় পাইয়া আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমরা ডন্‌কুমকে সদলে হত্যা করিয়া তাহাদের সোনা চুরী করিয়া আনিয়াছি, ইহা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমানমাত্র; এই অনুমানে নির্ভর করিয়া তিনি আমাদের অপরাধী স্থির করিলেন। তবে আমাদের মত বিদেশীর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাদের দেশে প্রবেশ করা অবৈধ হইয়াছিল—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সেই রায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মারাত্মক অংশ এই যে, সেই দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আমাদের অপরাধের বিচার নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই ন্যায়ানুমোদিত বিচারের প্রতিকূলে কিছুই আমাদের বলিবার থাকিতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যে দণ্ডের বিধান করিয়াছেন, ইকুয়েডর সাধারণতন্ত্রের সভাপতি মহাশয় সেই দণ্ডাদেশের অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব আদেশ হইল যে, আমাদের প্রত্যেককে দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং এই দশ বৎসর আমাদিগকে আজগুয়েসের অভ্রের খনিতে কুলীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

আজগুয়েস্ কোথায়, তাহা তখন আমরা জানিতাম না; পরে জানিতে পারি, ইহা কুইটো হইতে বহু দূরে ইকুয়েডর রাজ্যের অতি দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত। নিহিলিষ্টরা

রাজদ্রোহের অপরাধে সাইবেরিয়ার দূরতম প্রদেশে নির্ব্বাসিত হইত; আমাদের দণ্ড সেই দণ্ডের তুলনায় লঘুতর নহে। আজগুয়েস্ বহুকাল হইতে অভ্রের খনির জন্য বিখ্যাত। বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই সকল খনিতে অভ্র উত্তোলিত হইতেছে। দীর্ঘকাল অভ্রের খনিতে কায করিলে নানা প্রকার সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইতে হয় এবং অল্পদিন পরেই শ্রমজীবীরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; এ জন্য কোন শ্রমজীবী স্বেচ্ছায় সেখানে কায করিতে যায় না। ইকুয়েডরের গভর্ণমেণ্ট অগত্যা কয়েদীদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করে। এই দণ্ডের কথা শুনিয়া আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। আমাদের সকল আশা বিলুপ্ত হইল। আমরা জীবনে কোন দিন অভ্রের খনি দেখি নাই, কিন্তু অভ্রখনির বাষ্প কিরূপ বিষাক্ত এবং অভ্রখনিতে যাহারা কায করে, তাহারা দুই এক বৎসরের মধ্যে কিরূপ দুশ্চিকিৎস্য ও যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। এই সকল খনিতে নির্ব্বাসন-দণ্ড, প্রাণদণ্ডের আদেশেরই নামান্তর। আমরা স্বর্ণের লোভে মুগ্ধ হইয়া, জাহাজ ত্যাগ করিয়া আসিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম; ভ্রমক্রমে মরীচিকা অনুসরণ করিয়া অবশেষে আমাদিগকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইল! ক্ষোভে, দুঃখে, উদ্বেগে ও আতঙ্কে আমরা জীবন্মৃত হইলাম।

কিন্তু বিনা প্রতিবাদে এই ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করা সঙ্গত মনে হইল না। জানিতাম, প্রতিবাদ করিয়া ফল হইবে না, তথাপি আমি আমাদের দলের দলপতিস্বরূপ এই আদেশের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলাম, যে অপরাধে আমাদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; অবিচারে আমাদের প্রতি অতি ভীষণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এ বিচার বিচারই নহে, ইহা যথেচ্ছাচারের নামান্তর। বিচারের অভিনয়ে আমাদিগকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল, এ সংবাদ বৃটিশ জাতির অগোচর থাকিবে না। তাঁহারা আমাদের উদ্ধারের জন্য নৌ-সেনানী পূর্ণ রণ-তরীর বহর পাঠাইয়া এই ক্ষুদ্ররাজ্য ও ইহার গভর্ণমেণ্টকে সমুদ্রগর্ভে ডুবাইয়া দিবেন। তাঁহাকেও আর অধিক দিন হাকিমী ফলাইতে হইবে না।

আমি জানিতাম, আমার এই কথাগুলি উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র, কিন্তু তখন আমাদের যে অবস্থা, সেই অবস্থায় আমাদের মুখ হইতে এইরূপ কথা বাহির হওয়াই স্বাভাবিক।

যাহা হউক, আমার কথা শুনিয়া প্রধান বিচারক অবজ্ঞা-ভরে একটু হাসিলেন এবং মুখ হইতে এ-ভাবে এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িলেন—যেন আমার কথাগুলি সেই ধোঁয়ার মতই হাল্কা ও অসার। সেই সময় মুক্তিলাভের কোন উপায় আছে কি না দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। আমার সঙ্গীরাও বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমার কাছে সরিয়া আসিল; প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় তাহাদের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ হইল। আমাদের সকলেরই উভয় হস্ত শৃঙ্খলিত ছিল, এবং দশ বারো জন সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত ছিলাম। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ কিরীচ; তাহা তাহারা এ ভাবে উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিল যে, আমরা আত্মরক্ষার জন্য সামান্য চেষ্টা করিলেই সেই অস্ত্রের আঘাতে আমাদের মস্তক দেহচ্যুত হইত। সুতরাং বিচারপতির আদেশ নতশিরে গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর ছিল না। প্রহরীরা আমাদের সকলকে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বিচারকের বাসগৃহ হইতে কারাগারে লইয়া চলিল; সেই সময় সহসা নাসিস্কার সহিত আমার দৃষ্টিবিনিময় হইল। দেখিলাম, গভীর দুঃখে তাহার প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুন্দর মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার চক্ষু দুটি জলে ভাসিতেছে। আসন্ন বিরহাশঙ্কায় তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছিল।

আমরা কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িলাম। আশার ক্ষীণ শিখাটুকু নির্ব্বাপিত হওয়ায় আমাদের হৃদয় গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। আমার মনে হইল, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে মগ্নপ্রায় জাহাজে বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হইলে আমাদের মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইত, তখনকার অবস্থা তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র আশাপ্রদ ছিল না। আমাদের কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। আমাদের হতাশ নেত্রের সম্মুখে কারাকক্ষের দ্বার ঝন্-ঝন্ শব্দে রুদ্ধ হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সমাজ-সংস্কার

২

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে আমি গতবারে স্থূলভাবে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে, দেশের লোকের ধাতু, প্রকৃতি ও মানসিক ভাব অনুসারে তাহাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশলাভ করিয়া থাকে। দেশের জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রভাব এবং দেশবাসীর কৌলিক প্রভাব তাহাদের বৈশিষ্ট্য-বিকাশের ধারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। আমাদের দেশের প্রাচীন মনস্বিগণ কৌলিক প্রভাবকে (Hereditary force) অত্যন্ত বলবান্ মনে করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, কৌলিক প্রভাব বা কৌলিক শক্তি অনুশীলনের অভাবে সুপ্ত (Latent) হইলেও সহজে লুপ্ত হয় না। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়রা এই তথ্য মানিতেন না, জানিতেনও না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মানীর জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে কৌলিক শক্তির সহিত প্রথম পরিচিত হন। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অতি সামান্য। ইহার পরে সার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন, অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্সন, অধ্যাপক ওয়েল্ডন প্রভৃতি অনুসন্ধানের বর্ত্তিকা লইয়া এই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি তথ্য এই যে, মানুষ পুরুষ-পুরুষানুক্রমে যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা করিয়া থাকে, তাহার ফল সম্ভূক্ষণ-প্রবণতা (Potentialities) তাহার সন্তানেও বহু পুরুষ ধরিয়া প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে। মানুষ তাহার পিতৃপুরুষদিগের সাধনালব্ধ যে শক্তি জন্মকালে লাভ না করে, এক পুরুষ বা দুই পুরুষব্যাপী শিক্ষা বা সাধনার দ্বারা সেই শক্তি সম্যক্‌ভাবে কিছুতে লাভ করিতে পারে না। অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্সন এই তথ্য প্রথমে আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি মনুষ্য, পশু এবং উদ্ভিদ-জগতে কৌলিক শক্তির প্রভাব পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ সকল জীবের দৈহিক গঠন ও বল প্রভৃতি বীজ-শক্তির দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। শেষে মানবজাতির মানসিক শক্তি বিষয়ে তিনি সেই পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। মানবজাতির তেজস্বিতা, প্রফুল্লতা, ন্যায়নিষ্ঠা, মেজাজ, কার্য্যদক্ষতা, হস্তলিপি প্রভৃতি চারিত্রিক ব্যাপারে কৌলিক শক্তির প্রভাব কিরূপ, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। এ সম্বন্ধে অতি সাবধানে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানুষের কতকগুলি গুণ কৌলিক ধারা ধরিয়া সংক্রমিত এবং সাধনার দ্বারা বিকাশিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের রিপোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল এবং সরকারী বিদ্যালয়ের ১০ বৎসরবয়স্ক ছাত্রদিগের ভাবগতি দর্শনে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের চরিত্রবল, মানসিক শক্তি, প্রতিভা, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি গুণ কৌলিক ধারা ধরিয়াই বিকাশ লাভ করে অর্থাৎ মানুষের প্রায় সমস্ত সদ্‌গুণই বীজাকারে বংশধারা ধরিয়া সংক্রমিত এবং অনুশীলনের বারিধারা পাইলেই তাহা ফলপুষ্প-শোভিত মহাবৃক্ষে পরিণত হয়।* যেখানে যাহার বীজ নাই, সেখানে যেমন কেবল বারিবর্ষণ এবং জলসেচনের দ্বারা সেই বৃক্ষ উৎপাদন করা সম্ভবে না, সেইরূপ যে বংশে কোন বিশেষ গুণের বীজশক্তি নাই, সেই বংশে কেবলমাত্র অনুশীলন দ্বারা সেই গুণের আবির্ভাব করা সম্ভবে না। সেই চেষ্টা অনেক সময় পণ্ডশ্রমেই পরিণত হইয়া থাকে। ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। ইহা প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। য়ুরোপীয়গণ অতি অল্পদিনই সেই নিয়মের সন্ধান পাইয়াছেন। এ বিষয় লইয়া তাঁহাদের দেশে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। য়ুরোপীয়দিগের সুপ্রজনন বিদ্যা (Eugenics) এই সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশের আর্য্য ঋষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে এই প্রাকৃতিক নিয়মের রহস্য জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা সমস্ত সমাজকে অধিকারভেদে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যে, সমাজস্থ সকলেই যেন পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সদাচার পালন করেন। কারণ, এক পুরুষের সাধনার ফল কখনই সন্তানে সংক্রমিত হয় না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া শত শত পুরুষানুক্রমে যে সাধনা করা যায়, সে সাধনার ফল বীজশক্তিতে এরূপ প্রবল হইয়া থাকে যে, সেই বংশের সন্তানসন্ততি সহজেই তাহার অধিকারী হইতে পারে। আর্য্য ঋষিগণ এই কৌলিক শক্তির বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখন তত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারণ, পাশ্চাত্য সমাজে এই কৌলিক শক্তিবাদ (Law of heredity)

---

* এ সম্বন্ধে সকল কথা এখানে বলা অসম্ভব এবং কতকটা অপ্রাসঙ্গিক। সেই জন্য বর্ত্তমান যুগে এই সম্বন্ধে মনীষিগণের সিদ্ধান্ত কি, তাহার সংক্ষিপ্ত সার বিলাতের কিংস্ কলেজের ফেলো মিষ্টার এল ডনকাষ্টার যাহা প্রদান করিয়াছেন, ইংরাজী ভাষাবিৎ পাঠকগণের জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

The conclusion is therefore reached that not only bodily characters, but also those of the mind are essentially determined by the hereditary endowment received from the parents. This result is of great importance practically; it shows how little room is left in the development of the individual for the effects of environment even on the intellect or mind, in the broadest sense of the word; no doubt the direction which intellectual development takes is to a considerable extent determined by circumstances, but the kind of mind is irrevocably decided before the child is born. Still less is there room for the inheritance of the mental acquirements made by the individual during his life, and hence the hopes held out of improving the race by education and by special care of the dull or feeble-minded are illusory, except in so far as they improve the tradition.—Heredity P. 49-50.

এবং সুপ্রজনন বিদ্যা (Eugenics) নবাবিষ্কৃত। তবে তথায় ইহা এখন দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে। ঋষিরা এই নিয়ম সত্য জানিয়াই ইহার উপর সমাজের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে এই মূল কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে। উহা না জানিয়া যাঁহারা সমাজ-সংস্কার করিতে যাইবেন, তাঁহাদের কার্য্যফলে সমাজ সংস্কৃত না হইয়া সংস্রুতই হইবে।

এ স্থলে য়ুরোপীয় সমাজের মূলভিত্তির সহিত আমাদের সমাজের মূলভিত্তির কি পার্থক্য আছে, তাহাও বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুরুষানুক্রমিক সাধনাই প্রত্যেক সভ্যতার বনিয়াদ। য়ুরোপীয় সভ্যতাও য়ুরোপবাসী জনগণের যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনার ফল। তবে য়ুরোপীয়রা শিক্ষার প্রভাবকে বরাবরই প্রবলতর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বরাবরই মনে করিয়া আসিতেছেন যে, শিক্ষার দ্বারা সকল মানুষেই সকল সদ্‌গুণের বিকাশসাধন সম্ভবে। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের মন প্রথমে অঙ্কনমাত্র-বর্জ্জিত প্রস্তর-ফলকের ন্যায় থাকে। মানুষ তাহার উপর যাহা লিখিতে চাহে, অর্থাৎ সুপরিচালিত শিক্ষার দ্বারা তাহাতে যে গুণ বিকশিত করিবার ইচ্ছা করে, সেই গুণই তাহাতে বিকশিত করিতে পারে। সেই জন্য য়ুরোপ স্বভাবতঃই সাম্যবাদী। তাহার কারণ, য়ুরোপীয়রা মনে করেন যে, সাধু ও অসাধু লোকের মধ্যে মূলে কোন পার্থক্য নাই, শিক্ষার দোষে বা গুণে সমাজে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মে। যে ব্যক্তি অসাধু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে যদি প্রথম হইতেই সুশিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে সে-ও এক জন সর্ব্বজন-সম্মানিত সাধু হইত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস তাহা নহে। ইঁহারা শিক্ষার গুণ অস্বীকার করেন না, কিন্তু শিক্ষার দ্বারাই মানুষের মজ্জাগত দোষকে বিলুপ্ত করা যায়, তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কৌলিক শক্তির প্রভাব অতিশয় প্রবল। * সেই জন্য তাঁহারা বৈষম্য-বাদী। হিন্দুরা লৌকিক হিসাবে সকলকে সমান মনে করেন না। য়ুরোপীয়দিগের সহিত ভারতীয়দিগের আদর্শগত এই পার্থক্য সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

হিন্দুর সামাজিক বিন্যাস এই কৌলিক শক্তির বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা জানিতেন যে, মানুষ যদি পুরুষ-পুরুষানুক্রমে একই ভাবে কর্ম্ম করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সন্তানেও সেই বর্দ্ধজ ফল অর্শে। সেই জন্য তাঁহারা প্রত্যেক স্তরের লোককে তাঁহাদের সময়োপযোগী কতকগুলি নিয়মে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সেই নিয়মগুলি সদাচার বলিয়া পরিজ্ঞাত। এই আচারকেই তাঁহারা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর কথা এই—

"আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্! কুলস্য চ।
আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ।"—ভবিষ্যোত্তরে।

হে রাজন্! আচার ধর্ম্মের মূল এবং বংশগত মর্য্যাদারও মূল। যে ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট, সে কখনই কুলীন এবং ধার্ম্মিক হইতেই পারে না। অন্যত্র কথিত হইয়াছে,—

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা, যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ।"

যদি কোন আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করে, তাহা হইলেও সে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার আধ্যাত্মিক শক্তিও লাভ হয় না, ধার্ম্মিকতাও জন্মে না। পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্‌গমের পর যেমন সে তাহার বাসা পরিত্যাগ করিয়া যায়, বেদাদি শাস্ত্রও মৃত্যুকালে তাহাকে সেইরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার বিশদার্থ এই যে, আচারই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি সঙ্কুক্ষিত করে। যদি মানুষের সেই আধ্যাত্মিক শক্তি সঙ্কুক্ষিত ও মনের ধর্ম্মভাব বৰ্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ পড়ায় কোন সুফলই লাভ হইতে পারে না; উহা নিষ্ফল হইয়া যায়। কারণ, আচারই সাধনা। সাধনাই সিদ্ধিলাভের উপায়। আগমশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

"ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে।"

যখন দেখা যাইতেছে যে, সদাচার ব্যতিরেকে কাহার কোনও ধর্ম্মকার্য্যই সিদ্ধ হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, সকল হিতকর কার্য্যে সদাচারের অপেক্ষা আছে।

হিন্দুশাস্ত্রে সদাচারের এরূপ প্রাধান্য কেন দেওয়া হইয়াছে, তাহার আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। উহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে। তবে স্থূলতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সদাচার দ্বারা মনের তামস ভাব কাটিয়া যায়, সাত্ত্বিক বুদ্ধির উদয় হয়, সেই জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য জন্মে। একবার গোবরডাঙ্গা গ্রামে এক জন সন্ন্যাসী গিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে এক জন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার নিকট তথাকার কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য আপনাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা সদাচার পালন করুন। ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা করিতে থাকুন। তবেই আপনারা ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অগ্রে ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষ হউক, তবে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি জন্মিবে। তাঁহার কথা যে সত্য, তাহা প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

আজকাল যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার-সাধনে অধিক ঐকান্তিকতা প্রকটিত করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দুর দৃষ্টিতে আচারভ্রষ্ট, সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে একান্ত অসমর্থ। এই জন্য আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারের ফল ভাল হইতেছে না—অনেকে শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়িতে বসিতেছেন। সেই জন্য সমাজে নানা কুসংস্কার

* য়ুরোপীয়রা এখন ক্রমশঃ এ কথা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিষ্টার এল ডনকাষ্টার বলিয়াছেন,—

Of course education is a necessary condition for the full development of the mental power, but at present we have no evidence that it can add potentialities not present at birth.

আসিয়া আশ্রয় করিলেও সমাজ সংস্কৃত হইতেছে না—লোক সেই সমাজ-সংস্কার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতেছে না। যাঁহাদের আচরণে হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস সূচিত হইয়া থাকে, তাঁহারা যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তনসাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে লোক তাহা শুনিতে চাহিবে না। ডাক্তার গৌর স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী, তিনি হিন্দুর দৃষ্টিতে বিধর্ম্মী। তিনি যদি হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলে লোক তাহা শুনিবে কেন? হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার সনন্দ তিনি কোথায় পাইলেন? এ সম্বন্ধে সেণ্ট পল যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সকলের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।*

এক্ষণে বক্তব্য এই, হিন্দুজাতি কতকগুলি সদাচার অবলম্বন করিয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ধাতু-প্রকৃতি এক প্রকার গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সদাচার পরিহার পূর্ব্বক সেই ধাতু-প্রকৃতির বিলোপসাধন করিতে যাইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। হিন্দুর সদাচার আধ্যাত্মিকতার উন্মেষকল্পে পরিকল্পিত। যাঁহারা সেই সদাচারগুলির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনন্যসাধারণ ছিলেন, হিন্দুমাত্রেরই মনে এই ধারণা বলবতী। কার্য্যক্ষেত্রেও এই ধারণা যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু যত ত্যাগ স্বীকার করে, আর কোন বিষয়ের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করে না। কুবেরের ঐশ্বর্য্য পরিহার পূর্ব্বক দণ্ডকমণ্ডলুমাত্রসম্বল সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এমন লোক এখনও এই হিন্দু সমাজে বিরল নহে। আজকাল হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সদাচারের বিকৃতি ঘটাতে এবং ধার্ম্মিকতার পরিবর্ত্তে দেশাত্মবোধের উন্মেষ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে সমাজের যে ঘোর অনিষ্ট সংঘটিত হইতে বসিয়াছে, তাহা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। অনেক যৌথ কারবারের ম্যানেজার বা পরিচালকদিগের অনবধানতায়, কার্য্যশৈথিল্যে ও অন্যবিধ নৈতিক দৌর্ব্বল্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। কিন্তু এই বঙ্গদেশে ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বেও লোক চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া ঋণদান করিয়াছে, তাহাতেও লোকের অর্থনাশ হয় নাই। আসল কথা, ধার্ম্মিকতার বেদিকার উপর যদি দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, তাহা হইলে এ দেশে দেশাত্মবোধ স্থায়ী হইবে না, হইতে পারে না। কারণ, ধার্ম্মিকতাই হিন্দু জাতির কৌলিক ও মজ্জাগত অবদান। সদাচারের বিকৃতিফলে এবং কুশিক্ষার ও কুসিদ্ধান্তের প্রভাবে তাহা মলিন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই হিন্দু সমাজের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে।

আজকাল দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুর বিবাহবিধির সংস্কারে বা সংহারকল্পে আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ বিশেষভাবে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা যে ভাবে এই চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দুত্বের এবং হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন না। পাশ্চাত্যভাবে পূর্ণমাত্রায় বিভোর হইয়া তাঁহারা এই কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কাযেই বর্ণাশ্রমী বা সনাতনী সমাজ এই ব্যবস্থায় ঘোর প্রতিবাদী হইয়া উঠিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারকরা এই কয়টি সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন।

(১) বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন।
(২) বাল্য-বিবাহের উচ্ছেদসাধন।
(৩) বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।
(৪) অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন।
এবং (৫) রেজিষ্টারী করিয়া বিবাহ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি বিধবা-বিবাহের বিষয় আলোচনা করিব না। পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় হইতে নানা দিক দিয়া ইহার আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আইনও হইয়াছে। দুই একটি বিধবা-বিবাহও হইতেছে,—কিন্তু তাহা হইলেও ইহা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প বলিয়াই মনে হয়।

আজকাল বাল্য-বিবাহের উচ্ছেদপূর্ব্বক যৌবন-বিবাহের প্রবর্ত্তনকল্পে এক দল সমাজ-সংস্কারক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা এই চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যে হিন্দু বিবাহের তাৎপর্য্য সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাহা আমাদের মনে হয় না। তাঁহারা অনেকটা য়ুরোপীয় আদর্শেই এ দেশে বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন বলিয়াই বোধ হয়। ইঁহারা বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ এই কয়েকটি আপত্তিই উপস্থিত করিয়া থাকেন :—

(১) বাল্যকালে বিবাহিত জনক-জননীর গর্ভজাত সন্তান দুর্ব্বল, অল্পায়ু এবং রুগ্ন হইয়া থাকে।

(২) বাল্যকালে বিবাহিতা বালিকার উপর অনেক সময় যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়ন করা হইয়া থাকে।

(৩) বাল্যবিবাহ দারিদ্র্য-বর্দ্ধক।

আমরা একে একে এই তিনটি অভিযোগের বিষয় আলোচনা করিব। প্রথম কথা এই যে, কতকগুলি লোকের ধারণা যে, জনক-জননীর দেহের যত দিন পূর্ণতা সংঘটিত না হয়, তত দিন তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান সবল হইতে পারে না। এই মত যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন নরনারীরই ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। কারণ, তৎপূর্ব্বে মানবদেহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সমাজসংস্কারকরা কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা করিতে সাহসী নহেন। তাঁহারা ষোড়শী বা অষ্টাদশী বিবাহেরই পক্ষপাতী। ইহাতে তাঁহাদের মূলনীতির সহিত অবলম্বিত কার্য্যপদ্ধতির অসামঞ্জস্যই সূচিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে (১) আপত্তিটি নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসঙ্গে সমভাবে পুষ্টি লাভ করে না। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আগষ্ট উইজম্যান বিশেষ গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে. দেহের অন্যান্য যন্ত্রের পূর্ণতাপ্রাপ্তির বহু পূর্ব্বে প্রজনন-সম্পর্কিত যন্ত্রগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার এলবার্ট উইলসন এক জন বিশিষ্ট সামাজিক লেখক। তিনি লিখিয়াছেন যে,—

"Age seems of less importance as regards the maternal unit, but it is quite other wise on the paternal side, where vigour and activity are essentials".

* 1 Corinthians 19-22.

অর্থাৎ জনকের বয়সের পরিপক্কতার যত প্রয়োজন, জননীর বয়সের পরিপক্কতার তত প্রয়োজন নহে। পিতা সতেজ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইলে সন্তানও সতেজ ও কর্ম্মিষ্ঠ হয়। এখানে বয়সের পরিপক্কতা অর্থে জীবকোষের (Cell) পরিপক্কতার বয়স। সাধারণতঃ ১৬ বৎসর বয়সেই এদেশীয় জননেন্দ্রিয়ের জীবকোষ পরিপক্কতা লাভ করে।

তথ্যের দিক দিয়া বিচার করিলেও ১ম আপত্তি ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হইয়া থাকে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানীরা ১১ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিত। ইহারাও রুসিয়ার অতি বলবান্ কশাক সৈন্যদিগকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিল। এখন জাপানে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে জাপানীরা যে অধিক বলবান হইতেছে, তাহা নহে; বরং তাহাদের বিবাহ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

রুসিয়ার কৃষীবলের এবং টার্কোম্যানদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহই প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তাহারা ত অন্য কোন জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। কৃষিজীবী সম্প্রদায়-মাত্রই পত্নীদিগকে তাহাদিগের কার্য্যের সহায়করূপে পাইবার জন্য অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া থাকে। এখনও রুসিয়ার পল্লীগ্রামের কৃষকরা সময় সময় ১২।১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করে। শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার সন্দর্ভে লাটুর্ণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, রুসিয়ার কৃষকগণ তাহাদের বহু পুত্র-কন্যাকে ৮।৯ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু রুসিয়ার কৃষক ত দুর্ব্বল নহে, বরং বিলক্ষণ সবল ও সাহসী। তাহাদের দাম্পত্য জীবন যে সুখময়, তাহা জন পোলেন প্রভৃতি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডাররা এবং আইরিশরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সাধারণ ইংরাজ অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। চীনা ও আফগানদিগের মধ্যেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। সে জন্য উহাদিগকে দুর্ব্বল বলা যায় না।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে বহু বলবান্ এবং দীর্ঘজীবী লোক দেখা যাইত। প্রতি গ্রামেই ১০।১৫ জন বিশেষ বলবান্ লোক লক্ষিত হইত। ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবে ও দারিদ্র্যবৃদ্ধির ফলে ঐরূপ লোক বিরল হইয়া পড়িয়াছে। অম্বু গুহ, শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ, মহারাজা সূর্য্যকান্ত, রাজা জগৎ-কিশোর, গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন, ভীম ভবানী নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন না। ইঁহারা সকলেই বাল্যে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের সন্তান। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে এক এক জন মুটে ৩ মণ বোঝা মস্তকে লইয়া অনায়াসে চলিয়া যাইত, ইহা আমরা বাল্যকালে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা দেখিয়াছি যে, বড় বড় যজ্ঞে ও ভোজে গ্রামের ভদ্রমহিলারা অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া সাত আট শত লোককে পঞ্চাশ বাট ব্যঞ্জন সহ অন্নাদি পরিবেষণ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে ভোজন করাইয়াছেন। প্রায় ৩৫ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে নদীয়া জিলায় একবার বড় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই বৎসর উক্ত জিলায় বিশ্বগ্রামে পূজা উপলক্ষে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা স্বহস্তে সকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে ২৫ মণের অধিক চাউলের অন্ন পাক করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি জলস্পর্শও করেন নাই। এই অধম লেখক তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার কার্য্যের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছিল। যেখানে ২৫ মণ চাউল সিদ্ধ হয়, সেখানে দাইল, তরকারী, মাছ কত আবশ্যক, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন। এই সমস্তই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ মহিলারা আসিয়াই রন্ধন করিয়াছিলেন। তখন পাচক ব্রাহ্মণদিগের হস্তে লোক অন্ন খাইত না। যাঁহারা এইরূপ অন্ন পাক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের পিতাই গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বহু সন্তানপ্রসবিনী ছিলেন। সুতরাং বাল্যে বিবাহিতা নারীরা যে দুর্ব্বল হয়, সে ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত।

বাল্যবিবাহের ফলে এ দেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অধিক, এ উক্তি নিতান্তই মূর্খতা-বিজৃম্ভিত। বিহার অঞ্চলেই বাল্যবিবাহ অত্যন্ত অধিক। বিহারের মধ্যে দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তথায় শিশু-মৃত্যুর হার অত্যন্ত অল্প। ভাগলপুর জিলাতেও বাল্যবিবাহ প্রবল, কিন্তু শিশু-মড়ক সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পক্ষান্তরে, বীরভূম জিলায় বাল্যবিবাহ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইলেও তথায় শিশু-মৃত্যুর হার দ্বারভাঙ্গা ও ভাগলপুর জিলার শিশুমৃত্যুর হারের প্রায় দ্বিগুণ। পুরী জিলায় শৈশব-বিবাহ নিতান্ত বিরল, বাল্য-বিবাহও অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু তথায় শিশুমৃত্যুর হার দ্বারভাঙ্গার ও ভাগলপুরের দ্বিগুণ। ব্রহ্মদেশে বাল্যবিবাহ একবারেই নাই, অথচ ব্রহ্মদেশে শিশুমড়কের হার দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর, মানভূম প্রভৃতি বাল্যবিবাহপ্লাবিত অঞ্চলের শিশু-মড়কের হারের প্রায় দ্বিগুণ। এরূপ অবস্থায় শিশুমড়ক বৃদ্ধির দোষ বাল্যবিবাহের স্কন্ধে আরোপণ করা কিরূপে যাইতে পারে, তাহা বুঝা একবারেই অসম্ভব। বাল্যবিবাহের সমর্থক দল যদি তথ্য লইয়া বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে অনায়াসেই উপনীত হইতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল সভায় যাইয়া ইংরাজী কেতায় চেয়ার-বেঞ্চ ছুড়িলে ও গুণ্ডামী করিলে বিশেষ কোন ফলোদয় হইবে না।

২য় আপত্তি একবারেই মিথ্যা নহে। বর-বধূর বয়সের পার্থক্য অধিক হইলেই কখন কখন ঐরূপ অত্যাচার ঘটে। ধর্ম্মশিক্ষার এবং সংযমের অভাবই ইহার কারণ। কন্যা রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে স্বামি-স্ত্রীতে একত্র নির্জ্জনে অবস্থান বন্ধ করিয়া দেওয়াই ইহার প্রতীকারের প্রকৃত উপায়। সেই ব্যবস্থাই পূর্ব্বে ছিল। আইন করিয়া বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ইহার উপায় নহে।

৩য় আপত্তি কতকটা ন্যায়সঙ্গত। যাহারা চাকুরীজীবী, তাহাদের পক্ষে অনেক সময় অল্পবয়সে সন্তানলাভ বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশে অধিকাংশ লোকের পক্ষে বাল্যে বিবাহ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র অনেক সময়ই কৃষকদিগের কার্য্যের সহায় হইয়া থাকে। যদি অল্পবয়সে সন্তানলাভ হয়, তাহা হইলে প্রৌঢ় বয়সে সেই সন্তান দ্বারা অনেক উপকারপ্রাপ্তির আশা করা যায়। তবে যে সকল ভারতবাসী বিলাতী আদর্শের অনুযায়িনী বিলাসিনী বিবাহ

করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহ করিবার উপযুক্ত সময় পাওয়াই অসম্ভব। কারণ, দেশ দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে,—এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীর পক্ষে বিলাস করাই বিড়ম্বনার কারণ। সে দোষ বাল্য-বিবাহের নহে, সে দোষ বিলাসিতার। যাহা হউক, যাহাদের আয়ে কুলাইবে, তাহারা অবস্থা বুঝিয়া বাল্য-বিবাহ করিবে, আইনের দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু বাল্য-বিবাহের কতকগুলি বিশেষ গুণও আছে। উহা দাম্পত্য-প্রণয়কে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া থাকে। আয়ার্লণ্ডে, রুসিয়ায়, বুলগেরিয়ায় বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়া তথায় দাম্পত্য-প্রণয়ের দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক। মার্কিণে, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণীর কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌবন-বিবাহ ও যৌবনান্ত-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া তথায় বিবাহ-বিচ্ছেদের ধূম পড়িয়া গিয়াছে, ব্যভিচারে দেশ প্লাবিত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজ-সংস্কারকরা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, মার্কিণে দাম্পত্য-জীবন অচল হইয়া উঠিতেছে বলিয়া তথায় বাল্য-বিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব হইতেছে।

ভারতে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়াই এ দেশে দাম্পত্য-প্রণয়ের দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক। এই দেশেই স্ত্রী-পুরুষের আধ্যাত্মিক সংযোগ বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই দেশের নারীরা স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সহমরণ প্রথার অপব্যবহার হইত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা ইচ্ছা করিয়াই সহমৃতা হইতেন। নড়াইলের রাজপরিবারের ইতিহাসে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং আসিয়া রাণীকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিলেও রাণী কিছুতেই তাহা শুনেন নাই। পরন্তু তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে স্বয়ং তাঁহার তর্জ্জনীটি দগ্ধ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর চিতানলে দগ্ধ হইতে কাতর নহেন। সার ফ্রেডরিক হ্যালিডে যখন হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন হুগলী জেলাতে তাঁহার সম্মুখে গঙ্গাতীরে এক সতী স্বামীর চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সার ফ্রেডরিক এবং অন্য দুই জন য়ুরোপীয় তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেই পতিব্রতা সতীকে ঐ কার্য্য করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। Bengal under the Lieutenant Governors নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সার ফ্রেডরিক হ্যালিডের ভাষায় ঐ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া নারীটি যে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আচরণ এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়েন, তাহা বেশ বুঝা যায়। আজ শতবর্ষ হইল সতীদাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু স্বামিশোকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। এখনও স্বামিবিয়োগ বিধুরা হিন্দু-মহিলারা নিতান্ত অধীরা হইয়া আত্মনাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু স্বামিশোকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা কয়েকটি দেখিয়াছি। ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত খাঁটুরা গ্রামে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তাহা হইতে উঠেন নাই বলিলেও চলে। তাঁহার স্বামী যে সচ্চরিত্রতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে বিশেষ সতর্কতার সহিত সকলে রক্ষা করিলেও তিনি কোন গতিকে স্বামীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহার তিন দিন কি চার দিন পরে শান্তিতে দেহত্যাগ করেন। আমি আর একটি ঘটনা জানি, যে ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অনাহারে তিন চারি দিন পড়িয়া থাকেন, তাহার পর 'বুক গেল বুক গেল' বলিয়া দেহত্যাগ করেন। চিকিৎসকরা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা দাম্পত্য-প্রণয়ের দৃঢ়তারই প্রমাণ দিতেছে। বাল্য-বিবাহে এবং বিবাহে ধর্ম্মবুদ্ধিই এই দাম্পত্য-প্রণয়ের দৃঢ়তার কারণ। সমাজ-সংস্কারকদিগের তাহা বুঝিবার মত মনোবৃত্ত নাই।

আমাদের দেশের লোক পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ধর্ম্মবুদ্ধির অনুশীলন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহাদের সকলেরই ভিতরে ধর্ম্মভাব অল্পবিস্তর প্রবল আছে। শিক্ষার এবং অনুশীলনের অভাবে তাহা অনেকের প্রকৃতিতে সুপ্ত এবং নিস্তেজ হইয়া থাকিলেও উহা একবারে লুপ্ত হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের দেশের লোকের মনে যে সকল সংস্কার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কখনই স্থায়ী ও কল্যাণজনক হয় না। যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলেই বিবাহে ধর্ম্মবুদ্ধির বিলোপ হইবে,—পবিত্র বিবাহ-সংস্কার বিধিবোধিত বেশ্যাবৃত্তি বলিয়া মনে হইবে। য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে। যখন প্রাচীন রোমকদিগের আইন অনুসারে বিলাতে ১২ বৎসরের বালিকার এবং ১৪ বৎসরের বালকের বিবাহ বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত, তখন তথায় বিবাহ বিচ্ছেদের এত ধূম পড়ে নাই। জারজাশ্রম (Foundling house) প্রতিষ্ঠারও কোন প্রয়োজন উপলব্ধ হইত না। এখন তথায় ব্যভিচার কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা বিলাতের, মার্কিণের এবং কানাডার সামাজিক পত্রগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। আমাদের দেশের কতকগুলি সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি যেরূপ মলিন হইয়াছে, তাহাতে যৌবন-বিবাহ ও যৌবনান্ত-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজে ব্যভিচার অতি প্রবল আকার ধারণ করিবে।

আমাদের বিশ্বাস, সমাজ-সংস্কারকরা বাল্য-বিবাহের দোষগুলি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত বাল্য বিবাহে যে কোন দোষ নাই, তাহা আমরা বলি না। শাস্ত্রে কুত্রাপি ৮ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেক স্থলে লোক ১ বৎসর ২ বৎসর বয়স্কা কন্যারও বিবাহ দিয়া থাকেন। এইরূপ বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া আমার ধারণা। হিমাদ্রি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবক্তৃগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—

"কুমারীং শিক্ষয়েৎ বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি।
ততো বরায় বিদুষে দেয়া কন্যা মনীষিভিঃ।
এষঃ সনাতনঃ পন্থা ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা কন্যামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্।"

ইহার অর্থ এই যে, "অবিবাহিতা কন্যাকে সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান এবং ধর্ম্ম ও নীতিবিদ্যায় পারদর্শিনী করিবে। কারণ, এই প্রকার বিদুষী কন্যা পিতৃকুলের এবং শ্বশুরকুলের কল্যাণদায়িনী হইয়া থাকে। তাহার পর অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যা যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষিতা হইবে, তখন তাহাকে বিদ্বান্ বরের হস্তে প্রদান করিবে, ঋষিরা ইহাই সনাতন পন্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে কন্যা পতির মর্য্যাদা জানে না, পতিসেবা বুঝে না, ধর্ম্মের অনুশাসন অবগত নহে, পিতা কখনই সেই কন্যাকে বিবাহ দিবেন না।

সুতরাং নিতান্ত অল্পবয়সের শিশুকে বিবাহ দেওয়া কোনমতেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। পূর্ব্বে যত দিন বিবাহিতা কন্যা প্রাপ্তযৌবনা এবং তাহার গর্ভাধানসংস্কার না হইত, তত দিন তাহাকে স্বামীর সহিত একত্র অবস্থান করিতে দেওয়া হইত না। এখন লোকের শিক্ষার দোষে ও ধর্ম্মবুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হওয়াতে সে ব্যবস্থা অনেক স্থানে আর প্রতিপালিত হইতেছে না। সুতরাং এখন বিবাহের বয়স বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালায় কন্যার বিবাহের বয়স বৃদ্ধিই পাইতেছে। উচ্চবর্ণের মধ্যে ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অতি অল্প কন্যারই বিবাহ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আইন দ্বারা বিবাহের বয়সবৃদ্ধির কোনমতেই সমর্থন করিতে পারি না। আইন দ্বারা সমাজ-সংস্কার কোন দেশেই ফলোপধায়ী হয় নাই। পরন্তু উহাতে অপকার অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে দেশে বিদেশী শাসন প্রবর্ত্তিত, শাসকজাতির ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণা শাসিত প্রজাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সে দেশে আইন দ্বারা সমাজ-সংস্কারসাধন অত্যন্ত গর্হিত। সামাজিক ব্যাপারে বৈদেশিক পুলিস-শাসনের প্রবর্ত্তন অতীব অসঙ্গত প্রস্তাব। ইংরাজরাজ এ দেশের ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই সর্ত্তে এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। আজ সমগ্র হিন্দু সমাজের সেই ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য অহিন্দু বা অহিন্দু-ভাবাপন্ন সমাজ-সংস্কারকদিগের এত চেষ্টা কেন? বিদেশীর হস্তে আপনাদের দেশবাসীর স্বাধীনতা বিকাইয়া দিবার জন্য এইরূপ চেষ্টা যাহারা করে, তাহাদের মনোবৃত্তি কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর যাহাদের আস্থা বা মর্য্যাদাবুদ্ধি নাই, তাহাদের হস্তে আইন পরিচালনার এবং বিচারের ভার দিলে উহার যে কিরূপ অপব্যবহার হইয়া থাকে, অনেক ধর্ম্মমূলক মামলার বিচারে তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে আমি আর কোন দৃষ্টান্ত দিলাম না। সম্প্রতি বিহারে এইরূপ একটি মামলা হইয়া গিয়াছে। মামলাটি আপীল হইবে মনে করিয়া আমরা আর উহার উল্লেখ করিলাম না।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ইংরাজরাজ আইনের দ্বারা সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে পুত্রবিসর্জ্জন, চড়কে বাণফোঁড়া প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং ইংরাজ যখন হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাতে আপত্তি কি? এ যুক্তি নিতান্তই অসার। প্রথমতঃ ইংরাজ সরকার যদি অন্যায়রূপে হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যে অন্যায়রূপে হিন্দুর ধর্ম্মব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার জন্মিয়াছে, এ কথা কখনই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল আইনে বিশেষ দোষ হয় নাই। সতীদাহে কোন কোন স্থলে কোন কোন নারীর আন্তরিক অনিচ্ছায়ও পতির চিতায় দগ্ধ করা হইত। সুতরাং উহা বন্ধ করাতে সাক্ষাৎ স্ত্রীহত্যার পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী বিধবা হইলে শাস্ত্রে তাহার পক্ষে দুইটি পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, একটি সহমরণে গমন, আর একটি আমরণ ব্রহ্মচর্য্যপালন। একটা পথ রুদ্ধ হইলেও অন্য পথ উন্মুক্ত আছে। গঙ্গাসাগরে পুত্রবিসর্জ্জন কোন স্মৃতিসম্মত ব্যবস্থা নহে। উহা ধর্ম্মকার্য্য নহে। চড়কের বাণফোঁড়াও তদ্রূপ। উহা না করিলে কেহ প্রত্যবায়ভাগী হয় না। কিন্তু বিবাহ হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। উহার উপর আইন প্রয়োগ অত্যন্ত গর্হিত। বিশেষতঃ বহু শাস্ত্রকারই কন্যাকে রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। না দিলে পিতাকে এবং অভিভাবকদিগকে পাতকগ্রস্ত হইতে হইবে, ইহাই কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান। যাঁহারা সেই বিধান মানিয়া চলিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

সমাজ-সংস্কারকগণ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিতে চাহেন, ইহাতে তাঁহাদের অসাধুতাই সূচিত হইয়া থাকে। মিষ্টার হরবিলাস সর্দ্দা বাল্যবিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার সময় বলিয়াছেন, মনু রজস্বলা হইবার তিন বৎসর পরে কন্যাকে বিবাহ দিবার বিধান দিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। মনু বলিয়াছেন :—

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্।
অদীয়মানভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।"

মনু, ৯।৯০-৯১।

ইহার অর্থ, "ঋতুমতী হইয়াও কুমারী তিন বৎসরকাল অপেক্ষা করিয়া তাহার পর আপনার উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। পিতা প্রভৃতি যদি কন্যাকে যথাকালে বিবাহ না দেন, তাহা হইলে কন্যা স্বয়ং কোন পাত্রকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিবে, তাহাতে তাহার পাপ হইবে না।" ইহাতে কন্যা রজস্বলা হইবার তিন বৎসর পরে তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। শাস্ত্রবাক্যের বিকৃতিসাধন পূর্ব্বক যাঁহারা সমাজ-সংস্কার করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনই হিন্দুজাতির হিতকর ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমি পরে বলিব।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য প্রসঙ্গ

চতুর তস্কর

ফরাসী রাজধানী প্যারী হইতে একটি অদ্ভুত চুরীর সংবাদ পাওয়া গেল; চোরের নির্লজ্জ দুঃসাহসে না কি ফরাসী-ছাঁচ ঢালা!

চোর হাত খেলাইবার পূর্ব্বে যোগাড়যন্ত্রে কোন খুঁত রাখে নাই। এক দিন সে প্যারীর এক জন প্রধান জহরত-বিক্রেতার দোকানে গিয়া কতকগুলি হীরকালঙ্কার পরীক্ষা করিল; অবশেষে সে মহামূল্য নেক্লেসগুলি হইতে বাছিয়া বাছিয়া আট হাজার পাউণ্ড (লক্ষাধিক টাকা) মূল্যের একছড়া নেক্লেস ক্রয় করিল। জহুরী জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যাস্ মেমো (নগদ বিক্রয়ের রসিদ) দিব কি?"—ক্রেতা (তখন তাহাকে চোর বলা অনুচিত) তৎক্ষণাৎ তাহাকে আট হাজার পাউণ্ডের নোট গণিয়া দিয়া প্যারীর কোন সৌখীন হোটেলে নেক্লেস পাঠাইতে আদেশ করিল।

উক্ত ক্রেতা দুই সপ্তাহ পরে পুনর্ব্বার জহুরীর দোকানে আসিতেই দোকানী মহাসমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। ক্রেতা বলিল, "আর একছড়া আরও বেশী দরের নেক্লেস চাই, আর্জেণ্টাইন সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের পত্নীর ফরমাস।"—জহুরী তৎক্ষণাৎ তাহার ভাণ্ডারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেক্লেসগুলি বাহির করিয়া দেখাইল। ক্রেতা যে নেক্লেসছড়া পছন্দ করিল, তাহার মূল্য চব্বিশ হাজার পাউণ্ড (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকারও অধিক)। মূল্য দেওয়ার সময় ক্রেতা বলিল, "অত টাকা ত সঙ্গে নাই; তা এক কায কর বাপু! তোমার কোন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া উহা আমার হোটেলে পাঠাও; সে সেখানে আমাকে নেক্লেস দিয়া মূল্য লইয়া আসিবে।"

ক্রেতা হোটেলে প্রস্থান করিল। জহুরী নেক্লেসসহ নেক্লেসের বাক্সটি একটি বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া হোটেলে পাঠাইল। সে হোটেলে আসিয়া শুনিল—ক্রেতা গোসলখানায় কামাইতে বসিয়াছেন, হোটেলের ভৃত্য ক্ষৌরকর্ম্মনিরত ক্রেতাকে সংবাদ দিল, জহুরীর দোকান হইতে এক জন কর্ম্মচারী আসিয়াছে, হুজুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী। হুজুরের আদেশে জহুরীর কর্ম্মচারী গোসলখানায় প্রেরিত হইল।

ক্রেতা কর্ম্মচারীকে বলিল, "দেখি হে, নেক্লেস-ছড়াটা আর একবার; আমার সেই নেকলেসই ত দিয়াছ?"—সে ক্ষুর রাখিয়া হাত বাড়াইল।

জহুরীর কর্ম্মচারী বাক্স খুলিয়া নেক্লেস বাহির করিয়া ক্রেতার হাতে দিল। ক্রেতা তাহা হাতে লইয়া অলঙ্কারের প্রশংসা করিতে করিতে ওয়াসষ্ট্যাণ্ডের উপর যে খোলা বাক্সটি ছিল, তাহার ভিতর রাখিয়া দিল। জহুরীর কর্ম্মচারীকে বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, কামাইয়া লই, তাহার পর তোমার টাকা দিতেছি।"

কর্ম্মচারী গোসলখানার দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ হইলেই সে টাকা পাইবে; কিন্তু ভদ্রলোকের কামানো আর শেষ হয় না, চাঁচের উপর চাঁচ চলিতে লাগিল। কর্ম্মচারী ভাবিল, "বড় লোক কি না; এই রকমই উঁহাদের কামাইবার ঘটা!"

ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ হইলে ক্রেতা ক্ষুর, সাবান প্রভৃতি রাখিয়া কর্ম্মচারীকে বলিল, "এখানেই দাঁড়াইয়া থাক, আমি পাশের ঘরে পোষাক পরিয়া তোমায় টাকা আনিয়া দিতেছি।"

এই সঙ্গত প্রস্তাবে কর্ম্মচারীর আপত্তি হইল না; ক্রেতা যে বাক্সটিতে নেক্লেস ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সেই বাক্সটি তখনও সেই কক্ষে ছিল, এবং ক্রেতা পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় নেক্লেসও লইয়া যায় নাই, তাহার সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। সে সেই বাক্সটির উপর নজর রাখিয়া গোসলখানার দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

পনের মিনিট চলিয়া গেল, ক্রেতার দর্শন নাই! জহুরীর কর্ম্মচারী উৎকণ্ঠিত হইল। সে গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া ওয়াসষ্ট্যাণ্ডের বাক্সটির ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাহা দেখিতে পাইল—তাহা নেক্লেস নহে, সর্ষপ-পুষ্প!

সেই বাক্সের ভিতরে একটি কৌশলপূর্ণ ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রটি সেই কক্ষের প্রাচীরের ভিতর দিয়া নামিয়া গিয়াছিল; প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের নেকলেস নিঃশব্দে সেই ছিদ্র-পথে অদৃশ্য হইয়াছিল। পাশের কক্ষ হইতে তাহা সেই ছিদ্র হইতে বাহির করিয়া লইয়া চতুর চোর কখন্ কোন্ পথে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা ফরাসী গোয়েন্দারা এ পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই।

শুল্ক-সমস্যা

শুল্কের আয় সকল গভর্ণমেণ্টেরই প্রকাণ্ড আয়। এরূপ দ্রব্য অল্পই আছে, যাহা বিনা শুল্কে এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রেরিত হইতে পারে। শুল্ক ত দূরের কথা, 'বিনা পাস-পোর্টে' এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমনও নিষিদ্ধ। অল্পদিন পূর্ব্বে এক জন লোক বাজি রাখিয়া ইংলিস্ চ্যানাল পার হইতেছিল। ক্যালে হইতে

সাঁতার দিয়া সে ডোভারের সীমায় পদার্পণ করিবামাত্র শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাহাকে পুনর্ব্বার জলে নামাইয়া দিতে উদ্যত হইল, কারণ, তাহার সঙ্গে পাস্‌পোর্ট ছিল না। সে বহু-কষ্টে তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

সংপ্রতি মার্শেলিস্ বন্দরে ওরাং আউটাং জাতীয় চারিটি বানর পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় জাহাজ হইতে নামিলে মার্শেলিসের শুল্ক-কর্ম্মচারীরা বানরগুলির মালিকের নিকট মাশুলের দাবী করিল। মালিক বলিল—এই বানরগুলি প্যারিসের পশুশালার জন্য ক্রীত হইয়াছে, সেগুলি সে প্যারিসে লইয়া যাইবে।

শুল্ক-কর্ম্মচারী বলিল,—ফ্রান্সে যে সকল মনুষ্যভোজ্য পশু দেশান্তর হইতে আমদানী হইয়া থাকে, তাহাদের মূল্যের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হারে আমদানী-শুল্ক ধার্য্য আছে। ওরাং আউটাংএর মাংস ভোজনে কোন বাধা নাই, সুতরাং তাহা পশুশালায় রাখিবার জন্য আনীত হইলেও তাহা ভোজ্য পশু, এই যুক্তিতে তাহাদের আমদানী মাশুল দিতে হইবে।

বানরগুলার মালিক বলিল,—ফরাসী দেশের কোন লোক কোন দিন ওরাং আউটাংএর মাংস ভোজন করে নাই এবং বানর-মাংস ভোজনের জন্য কাহারও আগ্রহ নাই। যে পশু ভোজনের জন্য আনীত হয় নাই, তাহার শুল্ক প্রদান করিতে সে আইন অনুসারে বাধ্য নহে। কিন্তু শুল্ক-কর্ম্মচারীরা তাহার যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া তাহার নিকট হইতে সেই বানর চারিটির মাশুল আদায় করিয়া লইল। বানরগুলির মূল্য কত এবং শতকরা কুড়ি টাকা হারে কত টাকা মাশুল আদায় করা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ফরাসী দেশে বানরও মনুষ্যের খাদ্যতালিকাভুক্ত, এ সংবাদ আমাদের জানা ছিল না। খাদ্যহিসাবে রাবণ রাজার গভর্ণমেণ্টের সহিত সুসভ্য ফরাসী গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে।

——

ম্যাজিষ্ট্রেটের চক্ষুদান

ইংলণ্ডের নটিংহাম জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সার আলফ্রেড হল এক দিন সাদা দস্তানা হাতে দিয়া বিচারালয় ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন; সে দিন তাঁহার হাতে কোন ফৌজদারী মামলা ছিল না। সাদা দস্তানা পরিধান করিবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, কোন আসামীর অপরাধের বিবরণ লিখিয়া সে দিন তাঁহার হস্ত কলুষিত করিতে হয় নাই। শুভ্রতা শুচিতার নিদর্শন।

এজলাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি নটিংহাম পুলিসের যোগ্যতার প্রশংসা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর তিনি এজলাস পরিত্যাগ করিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে সাইকেলে তিনি বাড়ী হইতে বিচারালয়ে আসিয়াছিলেন, বারান্দা হইতে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও তাহা পাওয়া গেল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে সময় তিনি পুলিসের কার্য্যদক্ষতার প্রশংসাসূচক বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন তস্কর তাহা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে উত্তর-লণ্ডনের ফৌজদারী আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট চারিখানি সাইকেল চুরীর মামলার বিচার করিতেছিলেন। এক দিনে চারিখানি সাইকেল চুরী! ম্যাজিষ্ট্রেট সাইকেল-চোরদের প্রতি অপেক্ষাকৃত কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, ভবিষ্যতে আর কেহ সাইকেল চুরী না করে, এই উদ্দেশ্যেই আসামীদের প্রতি গুরুদণ্ডের বিধান করা হইল। আদালতের কায শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাস ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য তাঁহার সাইকেলে উঠিতে গিয়া তাহা দেখিতে পাইলেন না। চোর তাঁহার সাইকেলখানি চুরী করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল—দণ্ডের কঠোরতায় চোরের চুরী করিবার প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয় না এবং চুরী করিবার সুযোগও সে ত্যাগ করে না।

——

বিচার-বিভ্রাট

পৃথিবীর সকল দেশেই বিচার-বিভ্রাটে কত নিরপরাধকে কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহার সংখ্যা নাই। আসামী বিদেশী হইলে এবং বিচারক তাহার ভাষা বুঝিতে না পারিলে অনেক সময় সুবিচারের আশা ত্যাগ করিতে হয়। সংপ্রতি নিউ-ইয়র্কের কোন সংবাদপত্রে এইরূপ একটি বিচার-বিভ্রাটের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন যুরোপীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ের ঘটনা। নিউইয়র্ক-প্রবাসী এক জন ইটালিয়ানকে আমেরিকান ফৌজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আহ্বান করা হইলে তাহার স্ত্রী বাঁকিয়া বসিল, বলিল—সে সৈন্যদলে নাম লিখাইতে পারিবে না, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার যাওয়া হইবে না।

ইটালিয়ান যুবক বলিল, সে কাপুরুষ নহে, সৈন্যদলে সে নাম লিখাইবে। অতঃপর স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ডবেগে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বামী বলিল, পত্নীকে অরক্ষিত অবস্থায় একাকিনী রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করা সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, পরদিন সে যাইবেই। অভিমানিনী পত্নী স্বামীকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে না পারায় স্বামীর পিস্তলটি আনিয়া নিজের মাথায় গুলী মারিয়া আত্মহত্যা করিল।

ইটালিয়ান যুবক স্ত্রীকে সত্যই ভালবাসিত, স্ত্রী তাহার সমক্ষে আত্মহত্যা করায় শোকে দুঃখে সে ক্ষিপ্তবৎ হইল এবং সেই পিস্তলটি তুলিয়া লইয়া নিজের দেহে গুলী করিল। কিন্তু সেই গুলীতে সে মরিল না, আহত হইল মাত্র। কিছু দিন ভুগিয়া সে আরোগ্যলাভ করিল।

কিছু দিন পরে যুবকের শ্বশুর-শাশুড়ী জামাতার বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ করিল, সে তাহাদের কন্যাকে হত্যা করিয়াছে। পুলিস যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ করিল। পত্নীহত্যার অভিযোগে নিউইয়র্কের বিচারালয়ে তাহার বিচার আরম্ভ হইল। আসামীর পরিজনবর্গ অল্পদিন পূর্ব্বে সুদূর ইটালী দেশের কোন পল্লী হইতে নিউইয়র্কে আসিয়াছিল, তাহারা ইংরাজী বা ফরাসী ভাষা জানিত না। সুতরাং তাহা-দের জবানবন্দী গ্রহণের জন্য বিচারক এক জন দোভাষীর সহায়তা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দোভাষী সাক্ষীদের কথা বুঝিতে পারিল না, বিচারককেও তাহাদের কথার মর্ম্ম বুঝাইতে পারিল

না। অগত্যা বিচারক আসামীর স্বদেশীয় কোন প্রতিবেশীকে আহ্বান করিয়া সাক্ষীদের কথা দোভাষীকে বুঝাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

দোভাষী সেই ব্যক্তির সাহায্যে সাক্ষীদের জবানবন্দী ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় জজ ও জুরীদের বুঝাইয়া দিল। কিন্তু তাহার অনুবাদ এরূপ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল যে, জজ ও জুরীরা বুঝিলেন, আসামী সত্যই অপরাধী। আসামী স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইলেন। আসামীর উক্তি ভাষান্তরিত করায় তদ্দারাও প্রতিপন্ন হইল, সে পত্নীহন্তা।

কিন্তু জজ ও জুরীরা ইটালীয় যুবকের প্রাণদণ্ডের আদেশের পরিবর্ত্তে তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তাহাকে ট্রেন্টনের কারাগারে প্রেরণ করা হইল। সেই কারাগারে সে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে ইংরাজী ভাষা শিখিতে লাগিল। ইংরাজী ভাষা শিখিয়া যখন তাহার সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিবার অভ্যাস হইল, তখন সে কারাধ্যক্ষের নিকট তাহার স্ত্রীর মৃত্যুসংক্রান্ত সকল কথা এরূপ পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিল যে, কারাধ্যক্ষের ধারণা হইল, কয়েদী সত্যই নিরপরাধ; অবিচারে তাহার প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান হইয়াছে। অতঃপর অনুসন্ধানে কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন, বিচার-বিভ্রাটেই তাহাকে অকারণ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে। কয়েদী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে মুক্তিলাভ করিল। সে যে অপরাধ করে নাই, তাহার সেই অপরাধ ক্ষমা করা হইল।

বোমার পরিবর্ত্তে তিরযুৎ

সেকালে নিহিলিষ্ট, এনার্কিষ্ট প্রভৃতি বিপ্লববাদীরা প্রচলিত রাজবিধানের ধ্বংসসাধনের চেষ্টা করিত; রাজা রাণী প্রভৃতিকে বোমা মারিয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিত। সে জন্য তাহাদিগকে সুযোগের প্রতীক্ষায় অনেক অস্থানে লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে হইত এবং তাহাদের জীবন পদে পদে বিপন্ন হইত। বিপ্লববাদের সন্দেহে ধৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দুর্গম সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইতে হইত; অন্যভাবে নিগ্রহের ত কথাই নাই।

কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে বিপ্লববাদীদের সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায়েরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর বোমা, ডিনামাইট, গন্‌কটনের যুগ নাই; এই মোটর, এরোপ্লেন, সব্‌মেরিনের যুগে একটি তিরযুৎ সংগ্রহ করিতে পারিলেই বিপ্লব-বাদীদের সঙ্কল্পসিদ্ধি হইতে পারে। প্রমাণ?

হঙ্গেরীর বুদাপেষ্ট নগর বিপ্লববাদীদের একটা বড় আড্ডা; 'অন্তরীণে' আটক রাখিয়া তাহাদিগকে কাবু করিবে, 'সে সব দৈত্য নহে তেমন।'—সংপ্রতি বুদাপেষ্ট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মাসখানেক পূর্ব্বে আর্কডিউক আল্‌ব্রেচ তাঁহার কয়েকটি খেতাবধারী বয়স্যসহ মোটর-দৌড়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েকখানি প্রবলশক্তিসম্পন্ন 'কার' পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল; কথা ছিল—ইঙ্গিতমাত্রেই তাহারা একসঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিবে। আরোহী-সহ তাহারা দৌড়াইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আর্কডিউক বিপ্লববাদীদের দলের কোন বিভীষণের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, প্রত্যেক কারের কলকব্জাগুলি পরীক্ষা না করিয়া গাড়ী ছাড়িলে তাহাদের মৃত্যু অপরিহার্য্য। তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা আরম্ভ হইল; দেখা গেল, কোন কারের প্রধান প্রধান স্ক্রু অপসারিত হইয়াছে, কোন কারের ধুরার প্যাঁচ আল্‌গা, কোন কারের এঞ্জিনের শ্রেষ্ঠ অংশ জখম করিয়া রাখা হইয়াছে; সকল কারের অবস্থা এরূপ সাংঘাতিক যে, গাড়ীগুলি সবেগে চলিতে আরম্ভ করিলে কিছু দূর চলিয়া চূর্ণ হইত, এবং আরোহীরা একযোগে মহাসমারোহে পরলোকযাত্রা করিতেন। কিন্তু বিভীষণের অনুগ্রহে তাঁহারা এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। দুই একটি তিরযুতের ব্যবহারেই বিপ্লববাদীদের দুরভিসন্ধি প্রায় সফল হইয়াছিল!

ডার্ব্বি-'রেশ'

ডার্ব্বির ঘোড়দৌড়ের ন্যায় উত্তেজনাপূর্ণ বহুজনসমাদৃত খেলা সমগ্র য়ুরোপে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত দেড় শত বৎসর হইতে এই খেলা ইংলণ্ডে মহাসমারোহে চলিয়া আসিতেছে। ১৭৮০ অব্দে আর্ল অফ ডার্ব্বি কর্ত্তৃক এই খেলার প্রথম সূচনা; তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম 'ডার্ব্বি রেশ।' লণ্ডনের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পাশ্চমস্থিত সার জেলার এপসম নামক পল্লী ডার্ব্বি খেলিবার স্থান। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বৎসর এই খেলা বন্ধ রাখা হয় নাই; এমন কি, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড যখন লণ্ডভণ্ড, এবং ইংরাজ-জাতির রোদন করিবারও অবসর ছিল না, সেই দারুণ দুর্দ্দিনেও ডার্ব্বি খেলা বন্ধ ছিল না, তবে যুদ্ধের চারি বৎসর ক্যাম্বিজের নিউমার্কেট স্থানে এই খেলা চলিয়াছিল। সভাজগতে যাঁহাদের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আছে, এই খেলায় জয়লাভ তাঁহারা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা বলিয়া মনে করেন। এই খেলায় উপর্য্যুপরি দুইবার জয়লাভ করা কোন অশ্বস্বামীর পক্ষে একান্ত দুরূহ হইলেও সার জে হাউলি এবং ডিউক অফ ওয়েষ্টমিনিষ্টার এই উভয়ের অশ্ব চারিবার করিয়া ডার্ব্বির বাজি মারিয়াছিল। ডার্ব্বির ঘোড়দৌড়ের জন্য খেলা আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই ঘোড়ার নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু কোন বৎসর খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঘোড়ার মালিকের মৃত্যু হইলে সেই ঘোড়া খেলিবার অধিকারে বঞ্চিত হয়। মালিকের মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়া যদি তাহার ঘোড়া প্রতিযোগিতায় প্রেরিত হয় এবং সেই ঘোড়া ঘোড়দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে তাহার 'জিৎ' নামঞ্জুর করা হয়, এবং সে পুরস্কারে বঞ্চিত হয়। একবার এরূপ একটা কাণ্ড লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, এবং আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। সে এক ডিটেক্টিভ উপন্যাসের ব্যাপার!

পরিচারিকার হীরক গ্রাস

কথিত আছে, ভুবনবিখ্যাত ক্লিওপেট্রা মুক্তাচূর্ণ করিয়া তাহার সরবৎ পান করিতেন। আমাদের দেশের নবাব-বাদশাহরা

তাম্বুলের সহিত মুক্তাভস্ম ব্যবহার করিতেন। এ সকল সে-কালের কাহিনী। এ-কালে জার্ম্মাণীর বার্লিন সহরে কোন ভদ্র-পরিবারের পরিচারিকা এক খণ্ড হীরক গ্রাস করিয়া প্রাচীন যুগের ক্লিওপেট্রার যশোভাতি ম্লান করিয়াছে। বিবরণটি বিলক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক।

বার্লিনের সংবাদপত্র পাঠে আমরা এই পরিচারিকার নাম জানিতে পারি নাই। সে এক দিন কোন সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া জানিতে পারিল, বার্লিনের কোন হীরক-ব্যবসায়ী কিস্তীবন্দী করিয়া টাকা লইবার সর্ত্তে হীরক বিক্রয় করিতেছে। কিছু টাকা দিলেই হীরা পাওয়া যাইবে, তাহার পর প্রতি মাসে কিস্তী অনুসারে টাকা দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু কিস্তীখেলাপ করিলে হীরা ফেরত দিতে হইবে, টাকা ফেরত পাইবে না। আজকাল আমাদের দেশেও অনেকে এই ভাবে ধারে হাতী কিনিতেছেন। গ্রামোফোন বাইসেকল হইতে মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত!

যাহা হউক, পরিচারিকা এক দিন সাজপোষাক করিয়া জহুরীর দোকানে উপস্থিত হইল, এবং দুই হাজার পাউণ্ড মূল্যের (আজকাল প্রায় আটাশ হাজার টাকা!) একখানি সুদৃশ্য হীরক ক্রয় করিল। সে দাস্যবৃত্তি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চিত করিয়াছিল, প্রথম কিস্তীর টাকা দিতেই তাহা নিঃশেষিত হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল, কিছু টাকা জমাইতে পারিলে উক্ত হীরক দ্বারা একখানি 'ব্রূচ' প্রস্তুত করাইবে। এই উদ্দেশ্যে সে হীরাখানি চীনামাটীর একটি পাত্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিল।

এক মাস পরে দ্বিতীয় কিস্তীর টাকা দেওয়ার সময় আসিল, কিন্তু টাকার অভাবে তাহাকে কিস্তী খেলাপ করিতে হইল। তখন জহুরীর দোকানের গোমস্তা হীরা ফেরত লইতে আসিল। দাসী বলিল, "সে হীরা কি আর আমার কাছে আছে? ঘরে থাকে, খুঁজিয়া লইয়া যাও।"—গোমস্তা তাহার বাক্স-বিছানা হাতড়াইয়া হীরার সন্ধান পাইল না, অবশেষে সেই চীনামাটীর পাত্রটি পরীক্ষার জন্য হাত বাড়াইল। দাসী দেখিল সর্ব্বনাশ, এক রাশি টাকা গিয়াছে—হীরাখানাও যায়! সে তাড়াতাড়ি সেই পাত্র হইতে হীরাখানি তুলিয়া লইয়া মুখে পূরিল এবং তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলিল।

মাগীর কাণ্ড দেখিয়া গোমস্তার চক্ষুস্থির! কিন্তু সে দাসীটাকে ছাড়িল না, তাহাকে ধরিয়া তাহার মনিবের দোকানে লইয়া চলিল। জহুরী পুলিসের সহায়তা প্রার্থনা করিলে পুলিস দাসীকে লইয়া এক জন ডাক্তারের দোকানে উপস্থিত হইল। ডাক্তার সকল কথা শুনিয়া দাসীকে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইল। বমন করিতে করিতে উদরস্থ হীরা বাহির হইয়া পড়িল। জহুরী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। দাসীর 'আমও গেল ছালাও গেল!' অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতাতেও এইরূপ একটি কাণ্ড ঘটিয়াছিল। চোর একটি হীরকাঙ্গুরী চুরী করিলে তাহাকে জোলাপ দেওয়া হইয়াছিল।

সজীব আলোকস্তম্ভ

বড় বড় সহরের বিভিন্ন পথের সংযোগস্থানে (যেমন কলিকাতার বৌবাজার, হ্যারিসন রোড বা ধর্ম্মতলার মোড়ে) মোটরকার, ট্যাক্সি, বস্, ট্রামগাড়ী প্রভৃতির গতি সংযত করিবার জন্য কোন এক জন পাহারাওয়ালাকে দিবারাত্রি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহারা শকটের গতি-নির্দ্দেশ না করিলে

সজীব আলোকস্তম্ভ

অনেক সময় দুর্ঘটনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই সকল পাহারাওয়ালা তেমাথা বা চৌমাথা পথের সংযোগস্থানে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া দিবাভাগে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে; রাত্রিকালে তাহারা রঙ্গীন আলো ব্যবহার করে। ফরাসী দেশে এখন বিজলী-বাতি ব্যবহারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু সংপ্রতি ইংলণ্ডের বাথ নগরের পুলিস যানবাহনের গতি সংযত করিবার জন্য টুপীর উপর বৈদ্যুতিক বাতি বসাইয়া লইয়াছে; বৈদ্যুতিক দীপের 'ব্যাটারী' তাহার কোমরবন্ধে আবদ্ধ থাকে। এই সজীব আলোকস্তম্ভের একখানি প্রতিকৃতি এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মধ্য-এসিয়ায় হিন্দু-সভ্যতা

২

গত মাসের প্রবন্ধে আমরা মধ্য-এসিয়ার হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে কিরূপভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই কাহিনী বিবৃত করিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমরা মধ্য-এসিয়ায় হিন্দু-সভ্যতা কখন্ ও কিরূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাই ব্যক্ত করিব। কিন্তু হিন্দু-সভ্যতার বীজ যে ক্ষেত্রে উপ্ত হইল, সেই ক্ষেত্রের পরিচয় কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া দরকার; কারণ, বীজ ও ক্ষেত্রের সংযোগেই সৃষ্টি। সুতরাং মধ্য-এসিয়ায় সহস্রবৎসরাধিককাল সে হিন্দুসভ্যতা প্রাণবান্ ছিল, তাহার ইতিবৃত্ত বলিতে গেলে তথাকার অধিবাসীদের কথাই পূর্ব্বে বলা উচিত।

মধ্য-এসিয়া বলিতে আমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ বা বিশেষ কোনও জাতির বাসস্থান বলিয়া বুঝি না। ইতিহাসে আমরা পড়িয়াছি, মধ্য-এসিয়া আর্য্যদের আদিম বাসস্থান। সেই মতবাদ আজ পণ্ডিতমণ্ডলীতে চলুক আর না-ই চলুক, মধ্য-এসিয়া এককালে যে আর্য্যদের একটা বড় রকম কেন্দ্র ছিল, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। তবে আর্য্য বলিতে একটা অখণ্ড জাতি বুঝায় না। শ্লাভ, টিউটন, কেল্ট, হেলেনিক ইরাণী, হিন্দু সকলেই আর্য্য; অথচ ভাষায়, ভাবে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের আস্‌মান-জমীন্ তফাৎ। মধ্য-এসিয়ায় যে সকল আর্য্য-উপনিবেশ হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই ইরাণীদের কুটুম্ব; ইরাণীরা ও হিন্দুরা খুব নিকট-কুটুম্ব। কিন্তু মধ্য-এসিয়ার পূর্ব্বদিকে কুচি (বোধ হয় আমাদের কুশদ্বীপ) প্রভৃতি দেশে যে সব আর্য্য বাস করিত, তাহারা খুব একটা প্রাচীন স্তরের। পণ্ডিতরা বলেন যে, কুশবাসীরা Italo-Geltic জাতির কুটুম্ব, সুতরাং খুবই প্রাচীন শাখা। ইহারা বাস করিত একেবারে চীনের কাছে। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পরে বলিব। খোটানের লোকরাও ছিল আর্য্য ইরাণীদের কুটুম্ব। মধ্য-এসিয়ায় আজ তুর্কীরা প্রবল। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, তখন তুর্কীরা মধ্য-এসিয়ায় তেমন-ভাবে প্রবেশ করে নাই। অলতাই পর্ব্বতের উত্তরে তাহারা বাস করিত। আমরা দেখিব যে, তুর্কীরাও এককালে হিন্দু সভ্যতার আলোক পাইয়াছিল।

মোট কথা, মধ্য-এসিয়ায় আসলে ছিল আর্য্য-ইরাণী-সভ্যতা। সগ্‌ডিয়ান (শূলিক), তুখার ও শক জাতি—সকলেই ইরাণী জাতির নিকট-কুটুম্ব। কুশবাসীরা প্রাচীন একটা স্তরের আর্য্য। তুর্কীজাতির অন্তর্গত উইগুর শাখা আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া তিব্বতীয়, চীনা জাতি ত মধ্য-এসিয়ার বড় জাতি। এই বিচিত্র ভাষাভাষী জাতিসমূহের ইতিহাসের সহিত মধ্য-এসিয়ার হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস জড়িত।

মধ্য-এসিয়া মরুদেশ। মরুর মাঝে মাঝে মরূদ্যান। সেই মরূদ্যানগুলি এক একটি জাতির আড্ডা। তাকলামাকান মরুভূমির মধ্যে তারিম উপত্যকা; সেই উপত্যকার মরূদ্যানে ছোট বড় অনেকগুলি নগর। এই মরূদ্যানের নগরগুলি ছিল পূর্ব্ব-এসিয়ার সহিত পশ্চিম-এসিয়ার সেতুস্বরূপ। চীন পূর্ব্ব-এসিয়ায় প্রবল হইয়া উঠিতেছিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে। চীনা-রেশমের বাজার পশ্চিমে পাইবার জন্য চীনের চেষ্টা চলিতেছিল। মধ্য-এসিয়ার পশ্চিমস্থিত কাশগড় প্রভৃতি নগর ছিল বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র। গ্রীক্ রোমের বণিকরা এইখানে জড় হইত। চীনের চেষ্টা চলিতেছিল, পশ্চিমে আসিবার। আবার খোটান প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্ররা (city-state) চেষ্টা করিতেছিল, চীনের এই পণ্যদ্রব্য হাতাইয়া পশ্চিমে চালান করার। Bactriaর বাণিজ্যকেন্দ্রে পণ্যভার উপস্থিত করিবার জন্য তারিম-উপত্যকার নগর-রাষ্ট্রসমূহের চেষ্টা চলিতেছিল; চীনারা বেগতিক দেখিয়া সে পথ ত্যাগ করিয়া উত্তরের পথ দিয়া চলিল, তাহাদের উদ্দেশ্য বাকৃট্রিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্রে সামগ্রী আনা। এই বাণিজ্যের বাজার লইয়া হুড়াহুড়ির সময়ে তৃতীয় জাতি মধ্য এসিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত হইল; তাহারা উত্তর-ভারতের হিন্দু।

মধ্য-এসিয়ায় হিন্দুদের যে ধ্বংসচিহ্ন পাই, তাহা অবশ্য ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থের, শিল্পের ও স্থাপত্যের। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রাচীনতম হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ছিল বণিক্। এখনও মধ্য-এসিয়ার সহিত উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ, কাশ্মীর ও আফগানিস্থান (যাহার প্রাচীন নাম ছিল উদ্যান ও যাহা এক-কালে বৌদ্ধধর্ম্মের বড় একটি কেন্দ্র ছিল)এর বাণিজ্যের যোগ যথেষ্ট আছে। সেইরূপ যোগ উত্তর-ভারতের সহিত মধ্য-এসিয়ার বহুকালের। হিন্দুরা মধ্য-এসিয়ায় গিয়া যেখানে সব আগে উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেটি হইতেছে তারিম-উপত্যকার খোটান ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত মরূদ্যানগুলি। পূর্ব্ববর্ণিত খননকার্য্যকালে নিয়া নদীর ধারে ও অন্যান্য স্থানে যে সব লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। এ সম্বন্ধে পরে আমরা ভাল করিয়াই বলিব।

ভারতের সহিত বহির্ভারতের যথার্থ যোগস্থাপনের চেষ্টা হয় অশোকের দ্বারা। এ কথা সকলেই জানেন, প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক যবন রাজাদের (অর্থাৎ গ্রীক্) দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠাইয়াছিলেন। মধ্য-এসিয়ায় বাকৃট্রিয়া, পশ্চিম-এসিয়ার সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় শ্রমণগণ গিয়াছিলেন। তবে এই সব শ্রমণের কার্য্য কতদূর স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। পশ্চিম-এসিয়া ও মধ্য-এসিয়ায় বৌদ্ধ শ্রমণ পাঠাইবার সুস্পষ্ট ইতিহাস যেমন রহিয়াছে, তেমনই চীনে অশোক কর্ত্তৃক বৌদ্ধ শ্রমণ পাঠাইবার কিম্বদন্তী বিদ্যমান আছে। অশোকের সমসাময়িক সম্রাট্ বিখ্যাত শিহ্-হুয়াং-তি; তিনি 'চীনের প্রাচীর' নির্ম্মাণ করেন। কিম্বদন্তী যে, শিহ্-হুয়াং-তির সময়ে চীনে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ গিয়াছিল; সেগুলি সম্রাটের আদেশে পুড়াইয়া ফেলা হয়। এ ঘটনাটি অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য নহে। মোট কথা, সম্রাট্ অশোকের সহিত ভারতের বাহিরে হিন্দু সাহিত্য ও সভ্যতা প্রচারের ইতিহাস জড়িত। মধ্য-এসিয়ায় প্রাচীনতম হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসও মহারাজ অশোকের সহিত যুক্ত দেখা যায়। কথিত আছে, কুণাল নামে অশোকের এক

প্রিয় পুত্র ছিল; রাজকুমারের বিমাতা সম্রাটের প্রিয় মহিষী তক্ষশিলা মহানগরীর অধিবাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজের পুত্র কুণালকে অন্ধ করিয়া দেন। এই কুণালের অন্ধতা সম্বন্ধে বৌদ্ধ-সাহিত্যে অনেক উপাখ্যান (অবদান) রচিত হইয়াছে। মহারাজ অশোক এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া তক্ষশিলার বহু অধিবাসীকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই নির্ব্বাসিত লোকেরা গিয়া খোটানে বাস করেন। হিন্দু উপনিবেশের ইহাই প্রাচীনতম ইতিহাস। খোটানের সহিত হিন্দু ভারতের যোগ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহা পরে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধ্য-এসিয়া মরুদেশ; সুতরাং তিব্বত বা চীনের ন্যায় কোনও অখণ্ড রাজ্য সেখানে গড়িয়া উঠে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরসমূহ স্বাধীনভাবে জাগিয়াছিল; সেই সব নগরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পশ্চিমাংশে কাশগড়, উত্তর-পশ্চিমে কুণ্ডা, কারাশহর ও তুরফান; দক্ষিণে ইয়ারকন্দ, খোটান ও মিরান। খৃষ্টীয় অব্দারম্ভের পূর্ব্ব হইতে ইয়ারকন্দ বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইয়ারকন্দের অনুকূল ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য চীনা ও খোটানীরা উভয়েই ইহাকে গ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে থিউ-চিরা এখানে প্রবল হইয়া উঠে ও তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে এক জনকে রাজা করিয়া দেয়। খুব সম্ভব, খৃষ্টীয় ১২০ অব্দে ইয়ারকন্দে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দু সাহিত্য প্রবেশ করে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, বাক্ট্রিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে এখানে আসে ও সংস্কৃত আলোচনার বেশ বড় রকম একটি কেন্দ্র হইয়া উঠে। ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতে আসিবার সময়ে এই নগর হইয়া যান। সেই সময়ে ইয়ারকন্দে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি তিনি লক্ষ্য করেন। ফা-হিয়ান যখন এই নগরে বাস করিতেছিলেন, তখন তথাকার বৌদ্ধরাজা পঞ্চপরিষদ উৎসব যাপন করিতেছিলেন। ফা-হিয়ান এই পরিষদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমরা দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়ায় হিন্দু প্রভাবের একখানি নিখুঁত ছবি পাই। তিনি লিখিয়াছেন, "যখন এই উৎসব সম্পাদিত হয়, তখন রাজা তাঁহার রাজ্যের সকল স্থান হইতে শ্রমণগণকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। (বৃষ্টির পূর্ব্বে) যেরূপ মেঘের সমাবেশ হয়, তদ্রূপ শ্রমণগণ রাজধানীতে উপস্থিত হন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, সভাস্থল বিশেষরূপ সজ্জিত হয়। রেশমের পতাকা ও চন্দ্রাতপে সেই স্থানের শোভাবৃদ্ধি করা হয় এবং সুবর্ণ ও রৌপ্যের পদ্ম প্রস্তুত করিয়া সভাপতির আসনের পশ্চাদ্দিকে স্থাপন করা হয়। সকলে পরিষ্কার শয্যার উপর উপবিষ্ট হইলে রাজা ও মন্ত্রিগণ ধর্ম্ম ও বিনয়ানুযায়ী উপহারসমূহ প্রদান করেন। সাধারণতঃ বসন্ত ঋতুর প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে এই পরিষদের অধিবেশনব্যাপার সংঘটিত হয়।"

ভারতীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের আদর্শানুযায়ী রাজা বিপুল ঐশ্বর্য্য ভিক্ষুগণকে দান করিতেন ও পুনরায় অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া লইতেন। বৌদ্ধ নরপতি অশোকের আদর্শে ভারতের বাহিরস্থিত এই সব বৌদ্ধ নৃপতি অনুপ্রেরিত হইতেন। চীনেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। ফা-হিয়ান ইয়ারকন্দের যে রাজার দানসাগরের কথা বলিয়াছেন—তাঁহার আড়াই শত বৎসর পরে ভারতের হর্ষবর্দ্ধনের দানসাগরের কথা হুয়েন-সাঙ বর্ণনা করিয়াছেন। ফা-হিয়ান আরও লক্ষ্য করেন যে, লোক বুদ্ধদেবের একটি পিকদানী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল ও তাঁহার একটি দন্ত পাইয়া তাহার উপরে প্রকাণ্ড এক স্তূপ নির্ম্মাণ করে। তথাকার বৌদ্ধেরা ছিল হীনযানের সর্ব্বাস্তিবাদী, মঠসমূহে সহস্রাধিক ভিক্ষু বাস করিত।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হুয়েন-সাঙ যখন ইয়ারকন্দ হইয়া যান, তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় প্রবল। লোকদের বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর গভীর শ্রদ্ধার কথা হুয়েন-সাঙ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নগরীতে বহুশত সঙ্ঘারাম ও বহু-সহস্র সদ্ধর্ম্মবিশ্বাসী দেখেন। অধিবাসীরা সর্ব্বাস্তিবাদী মতাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে এমন সব শ্রমণ ছিলেন, যাঁহারা সমগ্র সংস্কৃত ত্রিপিটক বিভাষা সমেত আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ শ্রমণই ইহার অর্থ ভাল করিয়া জানিতেন না। হুয়েন-সাঙ আরও বলিয়াছেন যে, ইয়ারকন্দের অধিবাসীরা ভারতীয় বিধি ব্যবহার করিত। ভারতের গুপ্তলিপি মধ্য-এসিয়ার বহু স্থানেই প্রচলিত ছিল। আজ যেমন মধ্য-এসিয়ায় তুর্কী ভাষা ও পারস্যলিপির প্রচলন, তেমনই তখন ছিল ভারতীয় লিপির প্রচলন ও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সহিত বহির্ভারতের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার মধ্যে প্রথম কয়েক শতাব্দী মধ্য-এসিয়ার সহিত প্রত্যক্ষভাবে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। চীনে হাজার বৎসরের মধ্যে খুব কম করিয়া পাঁচ হাজার গ্রন্থ ভারতীয় ভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে অবশ্য অধিকাংশই সংস্কৃত। চীনা ভাষায় হিন্দু সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, প্রথম তিন শত বৎসর চীনারা মধ্য-এসিয়ার নানা কেন্দ্র হইতে সংস্কৃত পুথি ও অনুবাদক সংগ্রহ করিয়াছিল। প্রথম দিক্‌কার অধিকাংশ অনুবাদকই পার্থিয়াবাসী বা যুউ চি অর্থাৎ খোটানের লোক। খোটান হইতে সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের দৃষ্টান্ত একাধিক বার আমরা পাইয়া থাকি। সুতরাং মধ্য-এসিয়ায় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ও ভারতীয় বিদ্যার চর্চ্চা বিশেষভাবে দেখিতে পাই। ফা-হিয়ান চীনের সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়া যে দেশে আসিলেন (৩৯৯ খৃষ্টাব্দ), সে দেশ হইতে কুচা, তুরফান প্রভৃতি রাষ্ট্র-নগরের দেশ। ফা-হিয়ান বলিতেছেন, "এই রাজ্যের এবং এই ভূভাগস্থ রাজ্যসমূহের সাধারণ অধিবাসিবর্গ ও শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত ভারতীয় নিয়ম পালন করে।" তিনি তথাকার লোকদের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ লোক দেশীয় ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু যে সকল জাতি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কৃত পুস্তক ও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। এই কুচা ও তাঁহার নিকটস্থ রাষ্ট্র-নগরসমূহে এককালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কিরূপ সমাদর ছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

মধ্য-এসিয়াকে হিন্দুরাই সুসভ্য করে। ভারতের লিপি এককালে মধ্য-এসিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইত।

সে সব দেশে বর্ত্তমানে পার্শী লিপির চলন। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগের মধ্য এসিয়ায় তখনও ভারতীয় লিপি প্রচলিত। প্রসঙ্গক্রমে বলি—তিব্বতের লিপি ভারতীয়; উত্তর-ভারত হইতে সে লিপি গিয়াছিল; নাগরীর সহিত তাহার যথেষ্ট মিল আছে; গুপ্তলিপি হইতে ত' তাহা গৃহীত। মধ্য-এসিয়ায় 'খরোষ্ঠী' ও 'ব্রাহ্মী' এই দুই প্রকার লিপিই চলিত ছিল। খরোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-যুগের লিপি এবং অল্প পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খোটানের নিকটবর্ত্তী নিয়া নামক নদীর তীরে খননকার্য্যকালে বহু শত কাষ্ঠলিপি পাওয়া গিয়াছিল। লিপিগুলির অক্ষর খরোষ্ঠী, ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষা বলিলে আমরা যেন প্রাকৃত গ্রন্থের ভাষা না বুঝি। এ ভাষা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে সাধারণ লোকের ভাষা। চিঠিপত্র, প্রতিবেদন (Report), স্থানিক কর্ম্মচারীর উপর হুকুম, অভিযোগ, আবেদন, ছাড়পত্র (Passport) প্রভৃতি 'লিপিবিস্তরেণ' অল্পদিনের অর্থাৎ লিপি-বিস্তরেণ অজ্ঞপ্তিলেখা। চিঠিপত্রের মধ্যে আমরাও যেমন সংস্কৃত ভাষায় অনেক নমস্কার, সম্মান প্রভৃতি দেখাইয়া নিজ ভাষায় আসল কথাটা লিখি,—এই সব প্রাকৃত চিঠিপত্রেও সেই সংস্কৃতবহুল আদবকায়দার ছড়াছড়ি। রাজাদের উপাধিগুলি সংস্কৃত অনুযায়ী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত—যেমন মহারাজ, দেবপুত্র, মহভুব মহরথ ইত্যাদি। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি; এই সব লম্বা লম্বা উপাধিগুলি কুশন রাজাদের। রাজা উপাধি ব্যতীত রাজকর্ম্মচারীদের উপাধি পাই,—যেমন 'দিবির' (Clerk) চর, চরক, বয়দ্বরপুরস্থিত (অর্থাৎ রাজদ্বার-পুরস্থিত,) লেখহারক, দুতিয় (দূত) ইত্যাদি। লেখমালায় হিন্দুনাম প্রচুর—যেমন ভীম, বসুসেন, নন্দসেন, সমসেন, শীতক, উপজীব ইত্যাদি। হিন্দু নামের মত অথচ পুরা হিন্দু নহে, এমন নামও এই সব খরোষ্ঠী লিপিতে পাওয়া যায়;—এ ছাড়া পুরা ইরাণী ভাষায় নাম ত' আছেই। এই সব লেখে কতকগুলি রাজার নাম পাওয়া যায়; আমরা এইখানে কয়েকটি লিপি বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া দিলাম; তৎপরে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সম্বৎশরে ৪৩ মহনুব মহরয় জিতুঘ বযমন দেবপুত্রস মাসে ৪২ দিবসে ১০ ৪ তম্ কালম্মি···।

আর একটি—

সম্বৎশরে ৪৩ ভটরগস মহনুব মহরয় চিতুঘি মহিরিয় দেব পুত্রস মাসে ৩ তিবসে ৪ ১ ইশ চুম্ নম্মি···।

এই দুই ও অন্যান্য লিপিতে আমরা তিন জন মহারাজার নাম পাই। যথা, বযমন, অংকুব (অংগুবক অংগোক) ও মহিরিয় (মৈরিয়, মৈম্বিরি)। এই বহু শত খরোষ্ঠী লিপিতে আমরা যে তিন জন রাজার নাম পাই, তাঁহারা মহনুব মহরয় ভট্টরগ (ভট্টারক) বা মহরয়তিরয় (মহারাজাধিরাজ) মহনুব মহরয় বা মহরয় রজতিরজ প্রভৃতি উপাধিভূষিত।

চীনা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খোটানে ১৭৫ খৃঃঅব্দে অন-কুও নামে এক রাজা ছিলেন; অন-কুওর পিতামহ ফাং-ৎ সিআন্ (Fang t sian) ১২৯ হইতে ১৩২ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করেন। পণ্ডিতপ্রবর ষ্টেন্ কোনো বলেন যে, খরোষ্ঠী লিপির বযমন ও অংকুব Fa-t sian ও Au-kuo হইতে অভিন্ন। মহিরিয় তাঁহার প্রমাণ অনুসারে ১৮৮ খৃঃ অব্দের পর রাজত্ব করেন। এই মহিরিয় ব্যতীত অপর কেহই মহারাজ রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বযমন খুব সম্ভব কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন এবং ঐ প্রবল সম্রাটের জীবিতকালে তেমন করিয়া মাথা খাড়া করিয়া তুলিতে পারেন নাই। অংকুব প্রথমে নিজ নগরীর গৌরব দাবী করেন ও মহিরিয় রাজাধিরাজ উপাধি লইয়া সেই দাবী পূর্ণমাত্রায় ঘোষণা করেন। মহারাজ মহিরিয়ের রাজত্বকালে খোটান ও তন্নিকটবর্ত্তী নগরীসমূহে মহাযান মত প্রচারিত হয়। 'মহাযান সংপ্রস্থিত চোঝবো ধর্ম্মসেন' নামে এক জন ভারতীয় ভিক্ষু মহিরিয়ের রাজত্বকালে বাস করিতেছিলেন। এই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ার তীরস্থ সেই অধুনা লুপ্ত প্রাচীন নগরীকে নূতন প্রাণ দান করিয়াছিল।

খরোষ্ঠী লিপি ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত যে সব লেখা আমরা পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা বহু শত। সেগুলি কি ধরণের, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এ ছাড়া প্রাকৃত ভাষায় ও খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'ধম্মপদের' একটি সংস্করণের ছিন্ন পুথির খণ্ডিতাংশ মধ্য-এসিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক পর্য্যটক দেত-রুই দর্ঁাস্ সেখানি পাইয়াছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত সেনা (Senart) তাহা ১৮৯৮ অব্দে সম্পাদন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রাকৃত ধম্মপদ, সুপরিচিত পালি ধম্মপদ; তিব্বতী উদানবর্গ-ধর্ম্মপদ (যাহার ইংরাজী অনুবাদ Rockhill প্রকাশ করিয়াছেন) ও চারিখানি চীনা তর্জ্জমার (যাহার তুলনামূলক Study বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক করিয়াছেন) সহিত মিলে না। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করিব। বর্ত্তমানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, প্রাকৃত ভাষায় এ পর্য্যন্ত আর কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। নিয়া-নদীতীরের এই নগরীতে আমরা প্রাকৃত ভাষামূলক যে সভ্যতার চিহ্ন পাইলাম, তাহা কেমন করিয়া কবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

প্রাকৃত যুগের যবনিকার পর পটপরিবর্ত্তন হইলে আমরা খোটান বা তন্নিকটবর্ত্তী নগরীতে প্রাকৃত ভাষা ও খরোষ্ঠী লিপির পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মী লিপি ও খোটানী ভাষা বা শক ভাষা পাই। বেশ একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। খোটানে যে রাজবংশ দেখি, তাহার নাম 'বিজয়'—সম্পূর্ণ হিন্দু নাম। চীনা রাজ-ইতিহাসে Wei-chih রূপে লিখিত। এই নূতন রাজবংশের প্রথম রাজার নাম বিজয়সম্ভব। বিজয়সম্ভবের পিতার ye-u-la নাম তিব্বতী ইতিহাস অনুযায়ী। ye-u-la এই নাম হিন্দু নাম নহে। বিজয়সম্ভবের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতা খোটানে প্রবেশ করে। এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, হিন্দু সভ্যতার প্রভাবেই এই শক রাজারা হিন্দু নাম গ্রহণ করেন। হিন্দু নাম গ্রহণ করার প্রথা এককালে মধ্য-এসিয়া, চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষ ভাবেই ছিল। বিজয়-সম্ভবের সময় খোটানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে। আর্য্য বৈরোচন

নামে এক জন হিন্দু ভিক্ষু রাজার ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় খোটানের সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ হয়; লিপি আবিষ্কৃত হয়। এই লিপি অবশ্য ব্রাহ্মী লিপি। খরোষ্ঠী লিপি খোটানে প্রচলিত ছিল না,—খোটানের পূর্ব্বস্থিত আর একটি নগর রাষ্ট্রে। খোটানের ইতিহাস সুরু বিজয়সম্ভবের সময় হইতে। সম্ভব নামটি হম্ ফো নামে খোটানী শব্দের সংস্কৃত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়। চীনা ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৫৮-৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খোটানী সেনাপতি Hiu-mo-pa খোটানের রাজা হন। পণ্ডিতবর ষ্টেন্-কোনো অনুমান করেন যে, Hiu-mo-pa ও সম্ভব অভিন্ন। সুতরাং এ কথা আমরা প্রায় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খোটান হিন্দুসভ্যতা পাইয়াছিল। বিজয়-সম্ভব নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন ও ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ গন্ধকূট পর্ব্বতে বৃহৎ এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বিজয়সম্ভবের পর দশ জন রাজা খোটানের সিংহাসনে বসেন; ইতিহাসে দুই জনের মাত্র নাম পাওয়া যায়। এই বংশের একাদশ রাজা বিজয়জয় চীনের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। চীনারাজকন্যা তাঁহার নবগৃহের ও দেশের উন্নতির জন্য চীন হইতে খোটানে রেশমের শিল্প প্রবর্ত্তন করিলেন। ঘটনাটি আপাত-সামান্য। কিন্তু মধ্য-এসিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ, রেশমের শিল্পে চীনের একচেটিয়া বাণিজ্য দূর হইল; খোটান তাহার বড় রকমের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হইল।

চীনের সহিত খোটানের যোগ যেমন নানাভাবে জড়িত হইতে থাকিল, ভারতের সহিত খোটানের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও তেমনই অক্ষুণ্ণভাবে চলিতে লাগিল। রাজা বিজয়জয় সঙ্ঘঘোষ নামে এক জন হিন্দু ভিক্ষুকে তাঁহার কল্যাণ-মিত্র পদে বরণ করিলেন। বিজয়জয়ের এক পুত্র ধর্ম্মানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হইয়া ভারতে চলিয়া আসিলেন। খোটান, চীন ভারতের সহিত পারম্পারিক সম্বন্ধ এককালে কি নিবিড় ছিল, তাহা এই সামান্য ঘটনা দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

রাজকুমার ধর্ম্মানন্দ ভারতবর্ষে অধ্যয়ন করিয়া যখন খোটানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি মহাসঙ্ঘিক মত আনেন। এই সময়ে সর্ব্বাস্তিবাদ মতও খোটানে প্রচারিত হয়। এই মত আনিয়াছিলেন হিন্দু ভিক্ষু সমন্তসিদ্ধি। রাজভ্রাতা ইঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে সর্ব্বাস্তিবাদ মত তেমন সমাদৃত হয় নাই, মহাযানই প্রবল হইয়া উঠে। খোটানী ভাষায় সর্ব্বাস্তিবাদী গ্রন্থ বিশেষ পাওয়া যায় নাই।

ভারতের সহিত খোটানের এই সম্বন্ধ যে সর্ব্বদাই নিছক আধ্যাত্মিক ছিল, তাহা নহে; কোন কোন সময়ে তাহা রাজনৈতিক আকারও ধারণ করিত। বিজয়কীর্ত্তি নামে এক রাজা উত্তরভারত আক্রমণ করেন এবং অযোধ্যা প্রদেশস্থ সাকেত জয় করেন ও কনিক রাজাকে পরাভূত করেন; কনিক বোধ হয় কোন কুশলবংশীয় রাজা। বিজয়কীর্ত্তি বুদ্ধদেবের শরীরচিহ্ন সংগ্রহ করিয়া খোটানে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এক বিহারে স্থাপন করেন।

ইহার পর দশ এগার জন রাজা খোটানের সিংহাসনে বসেন। আমরা কেবল জানিতে পারি যে, খোটান মাঝে মাঝে শত্রুদের হাতে অপদস্থ হইতেছে। তুর্কী, জুয়ান-জুয়ান প্রভৃতি নানা বর্ব্বর জাতি এই উর্ব্বর ও ধনসম্পন্ন মরুস্থানটি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাজা বিজয়সংগ্রাম ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নষ্ট-গৌরব কিয়ৎপরিমাণে উদ্ধার করেন। ইহার পর বিজয় রাজাদের পরাক্রম ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে ও অবশেষে তিব্বত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়া খোটান গ্রাস করেন। কিন্তু তিব্বত অধিককাল তাহাকে বশে রাখিতে পারে নাই। সে একবার উঠিয়াছিল—তাহা ক্ষণকালের জন্য। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে ইসলামধর্ম্ম আসিয়া খোটানকে গ্রাস করে। মধ্য-এসিয়ার শকগণ সহস্র বৎসর হিন্দুসভ্যতার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল; এক্ষণে আরবী তুর্কী সভ্যতা আসিয়া সংস্কৃত হিন্দুসভ্যতাকে লুপ্ত করিয়া দিল।

খোটানের উত্তরে মরুভূমির পারে আর এক সারি মরুস্থান ছিল। সেই মরুস্থানের মধ্যে কুচা নগরী বিশেষ খ্যাত। এখানকার অধিবাসীদিগকে অনেক সময়ে তুখার (বা চীনা-তু-হো-লো) বলা হয়। গ্রীক লেখকগণ তুখার জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন তাহারা পামীরের নিকট বাস করিত। পরে আরও পূর্ব্বদিকে বাস করে। কুচা, তুরফান প্রভৃতি নগরী পৃথক্ রাজার অধীন ছিল; এমন কি, তাহাদের তুখারী ভাষাও দুই স্থানে দুই রকম ছিল। উভয় উপভাষায় লিখিত বহুশত বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; সে কথা আমরা পরে বলিব। তুখারগণ আর্য্যজাতীয়; তবে তাহারা আর্য্যজাতির খুব একটি প্রাচীন শাখা—তাহাদের ভাষার মিল দেখা যায় ইতালী কেল্‌টিক ভাষার সহিত।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুচা মধ্য-এসিয়ার বৃহৎ নগর রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইতে দেখা যায়। কুচার অবস্থিতি ভৌগোলিক দিক্ হইতে বাণিজ্যের বিশেষ অনুকূল। সেই জন্যই বোধ হয়, চীন সম্রাট্ ফু-কিয়েন (৩৮৩ খৃ: অ:) এই নগরী অধিকার করেন। এই সময়ে কুমারজীব নামে কুচার বিখ্যাত হিন্দু ভিক্ষুকে চীনারা বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। কুমারজীবের জীবনী বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত। চীনা-সাহিত্যে কুমারজীবের নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তিন শত বৎসর পরে কুচানগরী চীনাদের একটা বড় রকম সৈন্যনিবাস হইয়া দাঁড়ায়। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এই নগরী দিয়া Wu-Kung নামে পরিব্রাজক যান। Wu-Kung ভারতবর্ষ হইতে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। কুচার এক পণ্ডিত গ্রন্থখানি চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়া দেন। সুতরাং তখনও সংস্কৃত আলোচনা সে দেশে চলিতেছিল। ইহার পর প্রায় তিন শত বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা কুচায় জীবিত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃই তাহা গলিত হইয়া পড়িতেছিল; অবশেষে যখন ইসলাম আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল, তখন তুখারদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে কুচা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ ইসলামের অধীন হয়। হিন্দুর পরাভব হইল। তুখারগণ হিন্দু ঋষির পূজা ত্যাগ করিল, সংস্কৃতভাষা ভুলিল, ভারতীয় আচার রীতি-নীতি ছাড়িল; তাহার বদলে আরবের ধর্ম্মগুরু, তুর্কীর ভাষা, আরবের কায়দা তাহারা গ্রহণ করিল।

শক (খোটানী) ও তুখার (কুচাবাসী) ছাড়া মধ্য-এসিয়ায় আর এক দল আর্য্য বাস করিত—সগ্‌ডিয়ান্‌। ইহারা প্রাচীন পারসিক ভাষায় সুঘুদ (Sughuda) নামে পরিচিত। পারসিক্ সম্রাট্ দারয়ুসের বেহিস্থানের শৈল-লিপিতে এই প্রদেশটি অষ্টাদশম ক্ষত্রপী বলিয়া অভিহিত। গ্রীকদের সময়ে উহা Bactriaর সহিত যুক্ত ছিল। এই Sughuda শব্দ পেলহবী ভাষায় Surak; তিব্বতী ভাষায় তাহাই Sulik হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনাভাষায় Suli নামে Sogdiana পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাই হইতেছে শূলিক। শূলিক শব্দ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও মৎস্যপুরাণে আছে। শেষোক্ত পুরাণে স্পষ্টই আছে যে, ঐ দেশ বক্ষু-নদীর তীরে অবস্থিত। আল্-বিরুনী বলেন যে, বায়ুপুরাণের ভূগোল অনুযায়ী শূলিকদেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় শৌলিক শব্দ আছে। চরকসংহিতা বোধ হয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ। তাহাতে আছে,—

"বাহ্লিকা পহ্লবাশ্চীনাঃ শূলিকা যবনাঃ শকাঃ।"

সবগুলি জাতি মধ্য-এসিয়ার। এই শূলিক জাতির মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারিত হইয়াছিল। তাহাদের বৌদ্ধ সাহিত্যের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

হিন্দুসভ্যতার ব্যাপ্তি মধ্য-এসিয়ার আর্য্য ইরাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। চীন, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া প্রভৃতি অ-আর্য্য দেশে হিন্দুসভ্যতা বিস্তারের কথা আমরা পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছি। মধ্য-এসিয়ার অন্তর্গত অ-আর্য্য জাতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তুর্ক-উইগুর উপজাতি। এই উইগুর জাতি অলতাই পর্ব্বতের উত্তরে বৈকালহ্রদ ও এনিসি-অর্খন নদীর তীরে বাস করিত। এই দেশেও বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। তুখানের লোকরাই প্রধানতঃ এই প্রচারকার্য্য করে; তবে বহু হিন্দু ভিক্ষুর নামও আমরা পাই। এ সম্বন্ধে পরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

এই উইগুর জাতি ছাড়া চীনের উত্তর-পশ্চিমস্থিত তাঙ্গুত্ (চীনা—সি-হিয়া) জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়: তাহাদের বিপুল সাহিত্য ছিল। কাশ্মীরের উত্তরে দার্দিস্থানে Bruza নামে এক ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল; তিব্বতী কাঞ্জুরে ঐ ভাষা হইতে অনূদিত খানকয়েক গ্রন্থ আছে। ইহা ছাড়া Haza নামে একটি ভাষাতেও না কি বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধে আমরা মধ্য-এসিয়ার যে সব জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। আগামীবারে আমরা ঐ সব দেশের সাহিত্যের ইতিহাস দিব। পাঠকগণ বুঝিবেন যে, হিন্দু সভ্যতা এককালে এসিয়াকে কেমনভাবে অধিকার করিয়াছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী)।

বাদল রাতে

দ্বারের পাশে ব'সে আছি একা,
আকাশ-কোণে সন্ধ্যাতারা
আজকে সে আর যাচ্ছে নাকো দেখা।
মেঘ জমেছে নীল গগনের গায়ে,
কেয়াফুলের গন্ধটুকু
আস্‌ছে ভেসে বাদল সাঁঝের বায়ে।
বুঝতে পারি না যে—
পুরানো কোন্ স্মৃতিখানি
উঠছে জেগে আমার বুকের মাঝে।

মনে পড়ে একটি হাসি-মুখ,
বর্ষা রাতে জাগিয়ে দিল
পরাণে আজ কত কালের দুখ।
সে দিন ছিল এম্‌নি বাদল রাতি,
বাসর-ঘরে ছিলাম জেগে
সারানিশি জ্বেলে রঙিন বাতি।
আজো পড়ে মনে—
বিভোর হয়ে ছিলাম সে দিন
প্রিয়ার বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনে।

প্রিয়ার সাথে সেই যে পরিচয়,
একটি রাতের আলাপ—তাতেই
হয়েছিল প্রাণের বিনিময়।
মিটিয়েছিল আমার প্রাণের আশা,
বিলিয়ে দিয়েছিল সে যে
আকুল প্রাণের গভীর ভালোবাসা।
তারই স্মৃতি হায়—
নূতন ক'রে পড়ছে মনে
এই বাদলের ঘন বরষায়।

আজকে সে যে আমার পাশে নাই,
হৃদয়খানি সেই বেদনায়
আকুল হয়ে কাঁদ্‌ছে যে গো তাই।
ব'সে আছি একা বাদল রাতে,
সারানিশি আজকে যে মোর
নিদ্ নাহি এ পোড়া আঁখির পাতে।
বাদল-ধারার মত
আমার নয়ন-আকাশ হ'তে
অশ্রুধারা ঝর্‌ছে অবিরত।

ডাঃ এ, মালেক (এল্, এম, এফ)।

স্বাধীন চীন

এত দিনে মহাচীন পরের প্রভুত্বের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইল, উত্তর ও দক্ষিণ-চীন একতাসূত্রে আবদ্ধ হইল, কেবল সর্ব্বোত্তরের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটি চীনের পূর্ণ জয়-যাত্রার পথে একটিমাত্র কণ্টকরূপে অবশিষ্ট রহিল। তাহা হউক, কিন্তু যখন অসম্ভবও সম্ভব হইল, এত শীঘ্র দক্ষিণ-চীনের জাতীয় জাগরণের ও মুক্তিমন্ত্রের গুরু ডাক্তার সান ইয়াট-সেনের মন্ত্র-চালিত কুওমিণ্টাং বা জাতীয় দল যখন জয়ের পর জয়ের মাল্য ও শ্রকচন্দনাঙ্কিত হইয়া একরূপ বিনা বাধায় পিকিং ও টিন্‌ট-সিন অধিকার করিতে সমর্থ হইল, তখন মাঞ্চুরিয়া-জয় তাহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত হইবে না। সমগ্র এসিয়াবাসীর হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মঙ্গলেচ্ছার কি একটা জাগ্রত জীবন্ত মন্ত্রশক্তি নাই? আজ প্রাচী সাদরে সানন্দে মহাচীনের এই সুপ্ত-সূর্য্যোদয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। অতীতের অন্ধকার গহ্বরে চীনের সঙ্গত ভারতের সুখসৌহার্দ্দের কাহিনী নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, আজ আবার এই নবারুণোদয়ে সেই অন্ধকার বিদূরিত হইয়া সত্যালোক প্রকাশিত হউক, আবার ভারত প্রাচীন সংযত সভ্য বন্ধু চীনের সহিত প্রীতি-শ্রদ্ধার শুভালিঙ্গনে আবদ্ধ হউক, ইহা প্রত্যেক মুক্তিকামী ভারতবাসীর আন্তরিক প্রার্থনা!

পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে, নানকিংএর কর্ত্তৃপক্ষ (এখন ঐ সহরেই জাতীয় দলের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) প্রত্যেক বৈদেশিক শক্তিকে পুরাতন সন্ধি নাকচ করিয়া নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিয়াছেন; পরন্তু কাষ্টম শুল্ক নির্দ্ধারণ সম্পর্কে এবং কাষ্টম বিভাগের কর্তৃত্ব চীন গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতেও আহ্বান করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের রাজনীতিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-সম্পর্কিত কর্ত্তৃত্ব হস্তগত না হয়, ততক্ষণ কোন গভর্ণমেণ্টকেই স্বাধীন বলা যায় না। চীনের জাতীয় দল যে বিস্ময়কর ত্যাগ ও দুঃখ-বিপদ স্বীকার করিয়া বিচ্ছিন্ন চীনকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী স্বাধীন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাইতে হইলে তাঁহাদের দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে তাঁহাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিচয় সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিতে হয়। নতুবা কেবল দেশে অরাজকতার অবসান করিয়া শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিলেই সে বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অবসান হয় না। বাহিরের লোক আসিয়া তাঁহাদের ঘরের ব্যাপারে প্রভুত্ব করিলে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের অস্তিত্ব কোথায় রহিল? বিদেশীরা গায়ের জোরে অন্যায় করিয়া যদি এত দিন তাঁহাদের বাণিজ্য-শুল্কের পরিমাণ নিতান্ত কমাইয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া থাকেন, অথবা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চীনের দুর্ব্বল অবস্থায় যদি ইচ্ছামত সন্ধিতে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া থাকেন, স্বাধীন চীন এখন তাহা মানিবেন কেন?

মহাচীনে যে কয়টি বিদেশী শক্তির স্বার্থ সমধিকভাবে নিহিত, তাঁহাদের মধ্যে জাপান, বৃটেন ও মার্কিণই প্রধান; রাসিয়ার স্বার্থও মহাচীনে অল্প ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট রাসিয়া স্বেচ্ছায় সেই স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া চীনকে সমান ও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জগতের মুক্তির ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক, বৃটেন, জাপান ও মার্কিণ কি ভাবে চীনের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্য তিন শক্তির মধ্যে বৃটেনের মনোভাব চীনের জাতীয় দলের সম্পর্কে কিরূপ, এইবার তাহার আলোচনা করা যাউক। সে দিন পার্লামেণ্টে বিলাতের বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বার্লেন চীনের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—"চীন গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আমাদিগকে এক পত্র দিয়াছেন। ঐ পত্রে তাঁহারা আমাদিগকে পুরাতন সন্ধি বাতিল করিয়া নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা চীনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী দেখিলে আনন্দিত হইব। কিন্তু এখনও চীনের এমন অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে পুরাতন সন্ধি রদবদল করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। চীন কাষ্টম শুল্কের উপর কর্ত্তৃত্বও প্রার্থনা করিয়াছেন। উহাও এখন বিবেচনা করিবার সময় আসে নাই। নানকিংএ চীনের জাতীয় দল প্রবাসী বৃটিশের উপর যে অনাচার আচরণ করিয়াছিল, আমরা তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। অদ্যাপি চীন তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেন নাই, আমাদের ক্ষতিপূরণ করিয়াও দেন নাই। যত দিন চীন এ বিষয়ে অবহিত না হইবেন, তত দিন আমরা চীনের সহিত নূতন কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিব না।"

এই রাজনীতিক হেঁয়ালী বুঝা দায়। চীনকে সার অষ্টেন শক্তিশালী ও স্বাধীন দেখিলে সন্তুষ্ট হন, অথচ চীন যে পথে স্বাধীন ও শক্তিশালী হইতে পারে, সে পথ তিনি বন্ধ করিয়া রাখিতেছেন। ইহা কিরূপ যুক্তি? পূর্ব্বে যখন উত্তর ও দক্ষিণ-চীনে সংঘর্ষ হইতেছিল এবং দক্ষিণের জাতীয় দল হ্যাঙ্কো ও নানকিং দখল করিয়া লইয়াছিল, তখন বৃটেন বলিয়াছিলেন,

আগে দক্ষিণের গভর্ণমেণ্ট সমগ্র চীনদেশ এক শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া অরাজকতার পরিবর্ত্তে শাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করুক, তবে তাহার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহা যাইবে। যখন দক্ষিণ ও উত্তর-চীন এক হইল, অরাজকতা দূর হইল, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন সার অষ্টেন বলিলেন, আগে নানকিংএর কাণ্ডের দরুণ দক্ষিণ-চীন ক্ষমাপ্রার্থনা করুক ও ক্ষতিপূরণ করিয়া দিউক, তাহার পর তাহার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিব। এই ভাবে কি চীনকে 'স্বাধীন ও শক্তিশালী' করা হইবে ?

তাহার পর জাপান। জাপরা বর্ত্তমানে 'প্রাচ্যের ইংরাজ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজের মতই তাহারা নৌশক্তির বিষয়ে সমরকুশলী। আবার ইংরাজের মতই তাহারা সাম্রাজ্য-বাদীই হইয়া উঠিয়াছে। হাঙ্কো ও নানকিংএর ব্যাপারে তাহারা মুক্তিকামী চীনকে যেরূপ চোখ রাঙ্গাইয়াছিল, সাণ্টাংএর যুদ্ধেও সেইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী টানাকা চীনের গভর্ণমেণ্টের পত্রের উত্তরে বলিয়াছেন, যতক্ষণ চীন সাণ্টাংএর যুদ্ধে জাপ প্রজার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করেন এবং তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া না দেন, ততক্ষণ জাপ গভর্ণমেণ্ট সাণ্টাং হইতে সৈন্য অপসারণ করিবেন না, পরন্তু সিনান রেল-লাইনের দখলও ছাড়িয়া দিবেন না। তাহার পর মন্ত্রী টানাকা বলেন,—"চীন গভর্ণ-মেণ্ট ওয়াসিংটন সন্ধির সর্ত্ত না মানিয়া লবণ ও ডাক বিভাগের শুল্ক সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন; চীনকে এই সর্ত্তও মানিতে হইবে। আর চীন যে বৈদেশিক শক্তিগণকে পূর্ব্বের সন্ধি নাকচ করিতে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আবেদনপত্র প্রত্যাহার না করিলে জাপান সন্ধির রদবদল করিতে সম্মত হইবেন না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শক্তিগণের সহিত চীনের যে সন্ধি হইয়াছে, চীন তাহা মানিতে বাধ্য। শক্তিগণ যদি স্বেচ্ছায় সেই সন্ধির রদবদল করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।"

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! মাত্র সে দিন জাপান প্রতীচ্যের শক্তিদের খাতায় নাম উঠাইয়াছে, কিন্তু তাহাতেই দর্প কত! সাম্রাজ্যবাদের এমনই মোহ বটে—ধরাকে সরা জ্ঞান হয়। নানকিং ও সাণ্টাংএর ব্যাপারে কে দোষী, তাহার তদন্তের জন্য চীন সমস্ত শক্তিকেই একটা নিরপেক্ষ কমিটী বসাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সাণ্টাং উপদ্বীপে যে রেল-লাইন আছে, উহার সিনান জংশন হইতে দক্ষিণে নানকিং ও উত্তরে পিকিং যাওয়া যায়। জাপান ঐ জংশন ও তৎসংলগ্ন রেল দখল করিয়াছিলেন। উদ্ভট সিনান জংশনে চীনা জাতীয় দলের সৈন্য জাপ-প্রবাসীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। ন্যাশনালিষ্ট চীন গভর্ণ-মেণ্টের বৈদেশিক সচিব জাপানের প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক সচিব ব্যারণ টানাকাকে ইহার প্রতিবাদ করিয়া পত্র দিয়া-ছিলেন। ঐ পত্রে তিনি জাপানের অনাচারের কথা উল্লেখ করিয়া সিনানের কাণ্ডের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত করাইতে বলিয়া-ছিলেন। জাপান সেই আহ্বান গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বিবদমান পক্ষদ্বয়ের অন্যতম, অথচ নিজেই ঘটনার বিচার করিয়া মামলা ডিক্রী-ডিসমিস করিতে চাহেন! ইহাই বোধ হয় নূতন সাম্রাজ্যবাদীর ন্যায়বিচারের নমুনা। এ দিকে পাছে অন্যান্য শক্তি তাঁহার কার্য্যে সন্দিহান হয়, এই আশঙ্কায় মুখে এক পা নড়িব না বলিলেও জাপান সাণ্টাং হইতে সৈন্যাপসারণ করিয়া লইতেছেন এবং বরাবর বলিতেছেন, "অবস্থা যত ভাল হইবে, ততই আমরা বাকী সৈন্য অপসারণ করিব।" প্রতীচ্যের রাজনীতিক ধড়িবাজীতে কে কম, কে বেশী, তাহা বলাই ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বৃটেন ও জাপান এইরূপ ব্যবহার করিলেন বটে, মার্কিণ কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারই করিয়াছেন। নানকিংএ মার্কিণ প্রবাসীরও ক্ষতি হইয়াছিল। সে সময়ে মার্কিণ বৃটেনের সহিত একযোগে চীনের নিকট কড়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু চীন যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, এক হাতে তালি বাজে নাই, পরন্তু চীনের সেনাপতি জেনারল চিয়াংকাইসেক যখন যথার্থই নিজের দলের লোকের অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতে লাগিলেন, তখন মার্কিণ চীনের সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় চীনের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিলেন এবং চীন যাহাতে নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তাহার সর্ব্ববিধ সুযোগ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন।

ইহার অপেক্ষাও গুরু সমস্যার কথা উঠিয়াছে। সকলেই জানেন যে, চাংসোলিনের পুত্র ও সহচর অনুচররা এখন মাঞ্চুরিয়ায় গিয়া আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই স্থানে জাপানের পক্ষপুটের আশ্রয়ে নিরাপদ রহিয়াছেন। জাপান চীন গভর্ণ-মেণ্টকে চরমপত্র দিয়া জানাইয়াছেন যে,—পিকিং পর্য্যন্ত যাহা হইবার হইয়া গেল, কিন্তু তাহার উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার দিকে চীন অগ্রসর হইলে গোলযোগ বাধিবে। মাঞ্চুরিয়ায় যদি ন্যাশানালিষ্ট চীন চাংসোলিনের দলের বিপক্ষে যুদ্ধ চালাইতে আসেন, তাহা হইলে জাপান সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিবেন।

কত বড় স্পর্দ্ধার কথা দেখুন। মাঞ্চুরিয়া জাপানের সম্পত্তি নহে, চীনের। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটনে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে সমস্ত শক্তি মাঞ্চুরিয়া প্রদেশকে চীন-সাম্রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এখন যদি জাপান গায়ের জোরে চীন-গভর্ণমেণ্টকে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিতে না দেন, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে মাঞ্চুরিয়াটিকে কি জাপান নিজের রক্ষিত রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন না? সে ক্ষেত্রে ওয়াসিংটনের সন্ধির কি মর্য্যাদা থাকে? এক আধটি নয়, ৮টি শক্তি ঐ সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। জাপান তন্মধ্যে অন্যতম। তবে জাপান এখন কি বলিয়া নিজের স্বাক্ষরিত সন্ধির মর্য্যাদা ভঙ্গ করিতে চাহেন?

মার্কিণের বোষ্টন সহরের "ক্রিশ্চান সায়েন্স মনিটর" পত্র এ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—"মার্কিণ যুক্তরাজ্য এ যাবৎ চীনের শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ওয়াসিংটন সন্ধি তাঁহারই চেষ্টায় স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। যাহাতে বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপান চীন-সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লইতে না পারে, মার্কিণ এ যাবৎ তাহারই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। এখন চীন-সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ (মাঞ্চুরিয়া) এক শক্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈদেশিক শক্তিরা চীনদেশে যে সব 'কনশেসান' বা বিশেষ অধিকারলব্ধ স্থান সন্ধি দ্বারা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থান

ব্যতীত চীনের অন্য সকল স্থানেই চীন গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতার বলে যদি চীন গভর্ণমেণ্ট চীনের মহা প্রাচীর (Great wall) পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করেন, তবেই ত জাপানের সহিত গোলযোগ বাধিবে। সেক্রেটারী কেলগকে তখন ত বিষম সমস্যায় পড়িতে হইবে।"

প্রাচ্যে তাহা হইলে যে খুবই সঙ্গীন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফিলাডেলফিয়ার 'ইনকোয়ারার' পত্র বলিতেছেন,—"আমাদের অনুক্ষণ চিন্তা ও ভয়,—কখন্ জাপান মাঞ্চুরিয়াকে নিজের আশ্রিত রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করে। একবার আশ্রিতরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলে উহা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে জাপানের কতক্ষণ লাগিবে ?"

বোষ্টনের "গ্লোব"পত্র বলিয়াছেন,—"মাঞ্চুরিয়া লইয়া শেষে কি জাপানে ও চীনে সংঘর্ষ বাধিবে ? আজ ৩ মাস হইতে উভয়ের মধ্যে এই মাঞ্চুরিয়ার সম্পর্কে অত্যন্ত মনকসাকসি চলিতেছে। মাঞ্চুরিয়া ঐতিহাসিক হিসাবে চীনের সাম্রাজ্যভুক্ত সন্দেহ নাই। উহার লোকসংখ্যার অধিকাংশই চীনা। মোট দেড় কোটি লোকের মধ্যে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ চীনা। মাঞ্চুরিয়ায় জাপের সংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ৭৫ হাজারের অধিক নহে। কিন্তু জাপানে আর জাপানের লোক ধরে না, তাই মাঞ্চুরিয়ার মত একটা সমৃদ্ধ উপনিবেশ হইলে মন্দ কি ? জাপানের ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও তাহা হইলে অনেক সুবিধা হয়। এই সকল কারণে জাপানও সহজে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িবে না।"

তবেই ত গোল ! মার্কিণ সহজে জাপানকে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিতে দিবেন না। জাপান প্রশান্তমহাসাগরে আর অধিক সমৃদ্ধ বা শক্তিশালী হয়, ইহা মার্কিণের অভিপ্রেত হইতে পারে না। বিশেষতঃ মার্কিণ চীনদেশের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে-আছেন। এ অবস্থায় যদি জাপানে চীনে মাঞ্চুরিয়া লইয়া বিবাদ বাধে, তাহা হইলে মার্কিণ নীরব থাকিবেন বলিয়া মনে হয় না। আর যদিই মার্কিণ সময় অনুকূল নহে মনে করিয়া নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলেও চীন বলশেভিক রাসিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। ইহা আমাদের কথা নহে, কোন মার্কিণ সংবাদপত্রই এইরূপ অনুমান করিতেছেন। "ব্রুকলিন ঈগল" পত্র বলিতেছেন, "চীন আর এখন আটাশে ছেলে নহে, তাহাকে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইলে বা পাঁয়তাড়া দিলে সে ভুলিবে না। জাপান যেন এ কথাটা স্মরণ রাখে।"

তবেই বুঝা যাইতেছে, প্রশান্ত-তটে হয় ত অচিরে আবার বিশ্বযুদ্ধের রণভেরী বাজিয়া উঠিবে ! সেই মহাহবে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিবে, তাহা ভাবিলেও শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে !

মিশরের স্বাধীনতা

মিশরের পার্লামেণ্ট বিদেশীদের সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন আইনের (Public Assemblies Bill) খসড়া আইনে পরিণত করিবার সঙ্কল্প ও উদ্যোগ করিলে মিশরের রাজার উপরেও রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা বৃটিশ হাই কমিশনার লর্ড লয়েড কি ভীষণ ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিয়াছিলেন এবং বৃটেনের বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বার্লেনের মারফতে মিশরকে কি প্রকৃতির চরমপত্র দিয়া, অধিকন্তু মাণ্টা হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় বৃটিশ রণতরী প্রেরণের বিভীষিকা প্রদর্শন করাইয়া কিরূপ অপদস্থ, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, তাহা এখন ইতিহাস-প্রথিত হইয়া গিয়াছে। মিশর গভর্ণমেণ্টকে, সিনেটে সেই আইনের সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মুলতুবি রাখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মিশরের স্বাধীনতা ফলে-ফুলে লতায়-পাতায় বসন্তের মাধবীর মত মুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে !

বোধোদয়ে সকলেই পাঠ করিয়াছেন, পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না, মুখ আছে, কথা কহে না, হাত আছে, নাড়িতে পারে না ; পা আছে হাঁটিতে পারে না। মিশরের রাজা ফাউদও পুত্তলিকাবিশেষ। তিনি স্বয়ং হাত-পা নাড়িতে পারেন না, কথা কহিতে পারেন না। কিন্তু যখন পুত্তলের কল টিপিয়া দেওয়া হয়, অথবা ছায়াবাজীর পুত্তল যখন মাথা ও বগলের অথবা কোমরের দড়ীর জোরে নড়িতে থাকে,—তখন পুত্তলিকা কত রকম অঙ্গভঙ্গি করে, কত খেলা খেলে, কত নাচে কোঁদে, কত ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে। রাজা ফাউদও এখন তেমনই করিতেছেন।

প্রথমেই ২০শে জুলাই তারিখে রয়টার সারা জগতে তারের সংবাদ প্রকাশ করিলেন যে, এক রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ৩ বৎসরের জন্য মিশরের সিনেট ও চেম্বার অর্থাৎ পার্লামেণ্ট মুলতুবি রাখা হইল, ঐ ৩ বৎসর রাজা মন্ত্রিসভার সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। ৩ বৎসর পরে পার্লামেণ্ট ও সিনেটের পুনর্নির্ব্বাচনের কথা বিবেচনা করা যাইবে। কেবল ইহাই নহে, ঐ ঘোষণার সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের কথাও প্রচারিত হইল। অর্থাৎ মিশর পার্লামেণ্ট যে আইন দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা মুলতুবী রাখা হইল। ইহার পরই সাধারণ সভাসমিতির অধিবেশনও নিষিদ্ধ হয়। সর্ব্বশেষে শিক্ষাসচিব মধুরেণ সমাপয়েৎ করিয়া দিলেন। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীকে এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা যেন এক ঘোষণা প্রচার করেন যে, যে কোনও শিক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রসমিতিসমূহে যোগদান করিয়া রাজনীতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবে অথবা ধর্ম্মঘট, শোভাযাত্রা ইত্যাদি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিবে, তাহাকে এক বৎসরকালের জন্য স্কুল-কালেজে পড়াশুনা করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, অধিকন্তু তাহাকে পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে। যদি কোন ছাত্র অন্য ছাত্রগণকে ধর্ম্মঘট করিতে অথবা শোভাযাত্রাদি করিতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে, তাহা হইলে তাহাকে স্কুল বা কালেজ হইতে একবারে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। যদি কোন স্কুলের বহুসংখ্যক ছাত্র এই ভাবে বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে সেই স্কুলটিকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে, অর্থাৎ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এ দিকে নাহাস পাশার (ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর) উপর রাজকীয় হুকুমনামা জারী হইল যে, তিনি কিছু করুন বা না করুন, কোনও সভাসমিতি বা শোভাযাত্রায় কোনরূপ গোলযোগ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলেই তাঁহাকে দায়ী করা হইবে।

বলা বাহুল্য, রাজা ফাউদ ও তাঁহার গভর্ণমেণ্টের এই স্বেচ্ছাচারমূলক আদেশ প্রচারিত হইবার পর মিশরীয় প্রজা

সন্তুষ্টচিত্তে উহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে নাই। রাজার ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর উকীল সম্প্রদায় ৩ দিনের জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া আদালতে অনুপস্থিত হইলেন। সরকারও অবশ্য ইহার বিপক্ষে চাল চালিতে ছাড়িলেন না। এ দিকে জনসাধারণ সরকারী ঘোষণার প্রতিবাদস্বরূপ শোভাযাত্রা করিতে ক্ষান্ত হইল না। তদুপলক্ষে রাজধানী কাইরো সহরেই ৫০ জন লোক গ্রেফতার হইল। নাহাস পাশাকে বিরাট অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাণ্ডা রেল-ষ্টেশনে এই হেতু কড়া সৈনিক প্রহরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থার ফলে কোন শোভাযাত্রা হয় নাই, জনসাধারণ নাহাস পাশাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত কোন সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। এজন্য মনে হয়, স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের আপাততঃ জয় হইয়াছে। প্রজারা চণ্ডনীতির ফলে ভীত হইয়া রাজনীতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু মিশরের প্রজা সেই ধাতুতে যে গঠিত নহে, তাহারা যে জগলুলের স্বাধীনতা-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, তাহা অচিরে প্রমাণিত হইয়াছে। মিশরের জাতীয় দলের মুখপত্র 'আল বালাগ' অবিলম্বে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত করিলেন। ঐ ঘোষণাপত্র মহামতি জগলুলের বিধবা পত্নীর দ্বারা লিখিত। উহাতে তিনি মিশরীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে আমার মিশরীয় পুত্রগণ! তোমরা এই অনাচারের বিপক্ষে কঠোর যুদ্ধঘোষণা করিয়া পরিচয় দাও যে, আমার স্বামীর আত্মা এখনও জীবিত রহিয়াছে। আজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের স্বাধীনতার উপর—আমাদের নিয়মানুগ শাসনতন্ত্রের উপর তাঁহাদের বজ্রহস্ত নিপাতিত করিয়াছেন। তোমরাও দেখাও যে, তোমরাও ভীরু কাপুরুষ নহ! দুর্ব্বল ক্ষীণ নহ! সৈয়দ জগলুলের মৃত্যুর সহিত তাঁহার আত্মারও মৃত্যু হয় নাই। সৈয়দ জগলুলের সারা জীবনের কর্ম্মফল এবং তোমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সৈয়দের জীবনান্তের সহিত কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই—সেই কর্ম্মফল ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাঁহার আত্মার মত সজীব ও সজাগ রহিয়াছে, উহার পরিচয় দাও।"

দেশের মুক্তি-যুদ্ধে মিশরীয়রা সবাই এক, তাহাদের মধ্যে মুসলমান, কপ্ট, ইহুদী, ফেলাহিন নাই। জগলুলের নেতৃত্বে বহুবার তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মিলনার কমিশন বর্জ্জনকালে মিশরের বোরখা ও পর্দ্দার অন্তরাল ঘুচাইয়া মুসলমান-মহিলা প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইয়া মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন,—"হে মিশরবাসী! তোমরা পরিচয় দাও যে, তোমরা আমাদের সন্তান! জন্মভূমির মুক্তির কল্যাণে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরিচয় দাও যে, আমরা জারজ সন্তান গর্ভে ধারণ করি নাই!" আজ জগলুলের বর্ষীয়সী বিধবা পত্নীও জলন্ত স্বরে মিশরীয়গণকে জন্মভূমির কর্ম্মে আত্মত্যাগে আহ্বান করিয়াছেন, মিশরীয়গণও তাহাতে সাড়া দিয়াছে।

সরকারের কড়া আদেশের বিরুদ্ধেও 'আল বালাগ' শ্রীমতী জগলুলের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, গভর্ণমেণ্ট যে সিনেট ও চেম্বার ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সেনেটার ও ডেপুটীগণের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদপত্রও প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। দেশময় একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

এ দিকে গভর্ণমেণ্টও 'আল বালাগ'কে সাবধান করিয়া দিলেন। পরন্তু ঘোষণা করিলেন যে, সরকারের আদেশ যদি পুনরায় উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে অতি কঠোর ব্যবস্থা করা হইবে। গত ২৫শে জুলাই তারিখে সিনেট ও চেম্বারের জাতীয় দলের সদস্যদিগের সভায় সমবেত হইবার কথা ধার্য্য হইয়াছিল। অবশ্য সরকারের আদেশে ঐ দুই প্রতিষ্ঠানই ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের জাতীয় দলের সদস্যরা এমন ভাব দেখাইলেন, যেন ঐ দুই প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ পার্লামেণ্ট) ভঙ্গ হয় নাই, যেন সরকারের উহা ভঙ্গ করিবার কোনও অধিকার নাই। তাই তাঁহারা দেখাইলেন যে, যেন সরকারের আদেশের কোনও মূল্য নাই, তাঁহারা যেমন পার্লামেণ্টের সভায় অধিবেশন করিয়া আসিতেছেন, তেমনই করিয়া যাইবেন। এই হেতু ২৮শে জুলাই তাঁহাদের পার্লামেণ্টের সভার অধিবেশনের কথা ছিল। এ দিকে চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট ও সিনেটের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, গভর্ণমেণ্টের নিকট পার্লামেণ্ট গৃহের চাবী চাহিয়া পাঠাইলেন। গভর্ণমেণ্টও এমনই ভাব দেখাইলেন যে, সেই চাবী চাহিবার অধিকার তাঁহাদের আদেশে 'ভঙ্গ পার্লামেণ্টের' নাই। পরন্তু তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ২৮শে তারিখে পার্লামেণ্টের সভা যেন কোথাও না বসে!

কিন্তু সিনেট ও চেম্বারের সদস্যরা সরকারের সেই আদেশে কর্ণপাত করিলেন না; পার্লামেণ্ট-গৃহের দ্বার বন্ধ বলিয়া তাঁহারা কায়রোর অন্যত্র সভার অধিবেশন করিলেন এবং সভায় সমবেত হইয়া মন্তব্য গ্রহণ করিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট বে-আইনী ব্যবস্থা করিয়া আইনানুগ পার্লামেণ্ট বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই কার্য্য মিশরের আইনের পূর্ণ বিরোধী। যে সরকার মিশরবাসীর নিয়মানুগ আইন এই ভাবে ভঙ্গ করিতে সাহসী হন, সেই সরকার এক দণ্ডও স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী অবিলম্বে পদত্যাগ করিয়া পার্লামেণ্টকে পুনরায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে দিন।

এইরূপে মিশরে স্বাধীনতার স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘোষণা অনুসারে মিশর যতটুকু 'স্বাধীনতা' উপভোগ করিয়া আসিতেছিল এবং যে ঘোষণা অনুসারে মিশরকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইংরাজ এ যাবৎ বড়াই করিয়া আসিতেছেন, ইংরাজেরই হাতে গড়া রাজা ফাউদ ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী কলমের এক আঁচড়ে সেই 'স্বাধীনতার' তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! মিশরে পুনরায় পূর্ণ স্বেচ্ছাচার শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর মেঘের অন্তরালে মেঘনাদের মত গুপ্ত থাকিয়া মিশরের মাসোলিনী লর্ড লয়েড মনের সাধ মিটাইয়া হাসিতেছেন! মরিস্ জর্জ্জ লয়েড যখন সার জর্জ্জ লয়েডরূপে বোম্বাইয়ের মসনদে বসিয়াছিলেন, তখন হইতে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, আজ মিশরে তাহা পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের হাওয়া যে শাসকের অঙ্গে একবার স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার স্বেচ্ছাচারের স্পর্দ্ধা যে গগনস্পর্শিনী হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

—

মেঘের ফাঁকে

১

"তবে যা ভাল বোঝ কর, বাবু! আমি আর কিছুতে নেই। এমন ভাল পাত্র পছন্দ হ'ল না!"

মামাবাবুর মুখে অসন্তোষের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

মা নত দৃষ্টিতে বলিলেন, "দাদা, তুমি রাগ করো না; বুঝে দেখ, প্রাণ ধ'রে মেয়েটাকে কি ক'রে দেই?"

মামাবাবু গড়গড়ার নলটা এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দোজবর ত শুধু নামে; কি এমন বয়স হ'য়েছে,—চল্লিশের বেশী ত নয়? শুধু একটি দশ বছরের ছেলে; কিন্তু কত বড় জমীদার, মস্ত বংশ— সেগুলো একবার ভেবে দেখ্‌লে না? মেয়ে যে পরম সুখে থাক্‌বে— গা-ভরা হীরা-মুক্তার গয়না, মোটর গাড়ী! কি বল নরেশ, তোমার মতটা কি?"

দাদা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। তিনি আজ সকালে কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আম ছাড়াইয়া দিতেছিলাম। তিনি গম্ভীর মুখে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন।

দাদা কি উত্তর দিবেন, তাহা আমি জানিতাম। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিচয় বাড়ীর সকলেরই জানা ছিল। জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কখনও দাদার মুখে এতটুকু স্নেহের সম্বোধন পাইয়াছি কি? সামান্য কথাতেই তিনি মুখ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত করিতেন। সামান্য ত্রুটি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। শুধু আমি নহি, আমার দিদির সম্বন্ধেও দাদার ব্যবহার অনুরূপই ছিল। মা'র প্রতিও দাদার ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচয় কি প্রসংশনীয়? দাদার অন্তরে আমাদের জন্য এক বিন্দু স্নেহ সঞ্চিত আছে, এ পরিচয় কখনও আমরা পাই নাই। দিদির বিবাহ বাবাই দিয়া গিয়াছিলেন। আজ তিনি ইহজগতে নাই। আমি এখন দাদার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছি।

দাদা আমাকে পোড়ারমুখী, বাঁদরী প্রভৃতি শ্রুতিমধুর সম্বোধনে অভিহিত করিতেন। আমাদের বিষয়ে মিষ্ট কথা তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই। দিদি শ্বশুরবাড়ী হইতে কদাচিৎ এখানে আসিত। ইদানীং দাদা তাহাকে কিছু বলিতেন না। আমার উপর দিয়াই কাল-বৈশাখীর ঝড় বহিয়া যাইত। কিন্তু একটা সত্য কথা বলিব, দাদার এ তিরস্কার বা অপ্রিয় বচনে আমার দুঃখ হইলেও রাগ হইত না। কেন না, অনেক সময় আমার মনে হইত, দাদার অপ্রিয় সম্বোধন এবং কর্কশ কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্যের অভাব সত্ত্বেও তিক্ততা যেন ন'ই—হুল তাহাতে যেন ছিল না। শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই এমন হইত কি?

আমারই প্রসঙ্গে আলোচনা—লজ্জা, কুণ্ঠা এবং হয় ত আরও কিছুর গুরুভারে আমার মাথা নত হইয়া পড়িতেছিল। পার্শ্বের খোলা জানালা দিয়া অপরাহ্নের রৌদ্র দাদার রেকাবীর উপর পড়িয়া যেন চোখে জ্বালা ধরাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার কপাট বন্ধ করিতে গেলাম।

দাদা বোধ হয় আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, তাঁহার মুখে সেই চির-পরিচিত বিদ্রূপের বক্র হাসি!

"বা রে, বাঁদরী! মুখখানায় যেন অমাবস্যার অন্ধকার ঢেলে রেখেছিস্!"

বয়স হইয়াছিল। অষ্টাদশবর্ষের শীত, গ্রীষ্ম, বুঝি বসন্তও বা দেহের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিদুষী বলিয়া জননীর একটা খ্যাতি ছিল। যত্ন করিয়া তিনি নিজে আমায় লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। প্রবেশিকার সোপানপথে দাদা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় লইলেও পড়াশুনার দিকে তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল। বহু বাঙ্গালা সাময়িক পত্র এবং নব প্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থসংগ্রহ বিষয়ে দাদার প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। মধুর, সস্নেহ ব্যবহার না পাইলেও এ বিষয়ে দাদার কৃপণতা আমাদের সম্বন্ধে ছিল না; বরং অতিরিক্ত উৎসাহই প্রকাশ করিতেন। ইংরাজী গ্রন্থ সম্বন্ধেও দাদার পক্ষপাতিতা যথেষ্ট ছিল। সুতরাং লেখাপড়ার চর্চ্চাটা ভালই ছিল। দাদার কথার অর্থ বুঝিয়া অকস্মাৎ আমার অন্তরে একটা

প্রচণ্ড আলোড়নের যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিব না।

মা একবার আমার দিকে চাহিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহাও আমার দৃষ্টি এবং শ্রুতি এড়াইল না।

গম্ভীরভাবে দাদা মামাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "তা তোমার এত আপত্তি কেন, মা? সুষির বিয়েতে টাকা খরচ করা যখন সম্ভব হবে না, তখন মামাবাবুর পাত্রটি মন্দ কি? চল্লিশ বছর বয়স এমন বেশী কি? সুষিও ত আর কচি খুকী নয়। দোজবর? তাতে দোষ কি?"

মামাবাবু উৎসাহভরে বলিলেন, "পাত্রের চেহারাও খুব সুন্দর—যেমন রূপ, তেম্‌নি স্বাস্থ্য। 'কন্যা বরয়তে রূপম্‌।' এ ক্ষেত্রে সবই পাওয়া যাবে—অর্থ, বংশমর্য্যাদা, প্রতিপত্তি এবং রূপ-গুণ। তা ছাড়া তোমাদের খরচপত্রও করতে হবে না। আমি কি সব ভাল না বুঝে প্রস্তাব করছি?"

"দাদা! আর আম দেব?"

চির-পরিচিত মাধুর্য্যলেশহীন কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, "তোকে হাজারবার বারণ ক'রে দিয়েছি, আমরা যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করব, খবরদার, তার মাঝখানে কথা বল্‌বি না। কিন্তু পোড়ারমুখীর বদ-স্বভাব কিছুতেই যাবে না!"

অপরাধ যে কোথায়, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না; কখনও পারি নাই। কিন্তু তিরস্কারলাভ সে জন্য বন্ধ থাকিবে কেন? ইহা ত আমার নিয়তি; কিন্তু তথাপি আজ চোখে জল নামিয়া আসিতেছে কেন?

কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলাম। না, দুর্ব্বলতা যখন জীবনে কখনও প্রকাশ করি নাই, আজ কেন সকলের সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করিব? আবার হয় ত দাদা এই বিষয় লইয়াই বিদ্রূপের উৎসমুখ খুলিয়া দিবেন। সে বড় লজ্জা, বড় অপমান!

কর্ণমূল উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতেছি, নয়নেও কি উত্তাপ নাই? বাষ্পবিন্দু কি উত্তাপের প্রভাবে শুকাইয়া যাইবে না?

ধীরে ধীরে উঠিয়া আমি কক্ষান্তরে চলিলাম।

শুনিলাম, দাদা বলিতেছেন, "মিছে ভেবে কোন লাভ নেই, মা। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হিসাবে মামাবাবুর প্রস্তাবই ভাল। টাকাকড়ির অবস্থা সবই জান। দোজবর হলেও সুষমা ওখানে সুখে থাক্‌বে ব'লে মনে হয় না কি?"

শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "আমার আবার মত? মেয়ে-মানুষের আবার বুদ্ধি কি?"

আমি আর দাঁড়াইলাম না। দাদার উচ্চহাস্য তখনও শুনা যাইতেছিল।

২

শুনিয়াছিলাম, বাবার জীবনবীমা ছিল। তাহাতে দাদা বিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। দেশে যে ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতে আমাদের মত সংসারের অন্নবস্ত্রের অভাব পর্য্যাপ্ত-রূপেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাহার বেশী, অর্থাৎ বিলাসিতা বা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন সম্পত্তির উদ্বৃত্ত আয়ে চলিতে পারিত না।

দাদা এখনও অবিবাহিত। অবস্থার উন্নতি না হইলে তিনি বিবাহ করিবেন না বলিয়া ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর ঘরের মেয়েকে ত চির-কুমারী রাখা চলে না। আমার বিবাহের বয়স না কি অনেক দিন আগেই চলিয়া গিয়াছে, গ্রাম্য মজলিসে এই রায় কায়েম-মোকাম হইয়া গেলেও দাদা কাহারও মতামত, আলোচনা কানে তুলেন নাই। সুপাত্র না হইলে বয়স যতই হউক না কেন, কখনই তিনি বিবাহ দিবেন না বলিয়া পণ করিয়া বসিয়াছিলেন। গ্রামের মহিলা-বৈঠকের তীব্র সমালোচনা তাঁহার ধৈর্য্যকে টলাইতে পারে নাই। এই পাত্র-সমস্যার যুগে গ্রামের অনেকের গৃহেই ইদানীং অনূঢ়া তরুণী কন্যা বিদ্যমান ছিল বলিয়া সমালোচনাটা দণ্ডে পর্য্যবসিত হইবার অবকাশ পায় নাই। তবে মা দাদাকে বিবাহের কথা লইয়া কিছু দিন হইতে বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

দাদা গ্রামে বড় একটা থাকিতেন না। কলিকাতা বা অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া আমরা জানিতাম। কি একটা ব্যবসা করিতে গিয়া দাদা না কি বিশ হাজার টাকাই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, এমন কথা গ্রামেই রটিয়া গিয়াছিল। মা'র সঙ্গে এ বিষয়ে দাদার কি আলোচনা হইয়াছিল, তাহা জানি না, তবে মা তাঁহাকে কয়েকবার তিরস্কার করিয়া-ছিলেন, শুনিয়াছিলাম। দাদা কিন্তু নীরবেই সে তিরস্কার পরিপাক করিয়াছিলেন। দাদার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে বিশেষ অপরাধী না হইলে তিনি এমনভাবে তিরস্কৃত হইয়া নীরবে থাকিবার পাত্র ছিলেন না।

দাদা অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং অসামাজিক বলিয়া গ্রামের কাহারও প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বন্ধু বা সহচর সকলেরই থাকে, দাদার কিন্তু কিছুই ছিল না। প্রতি মাসে তিনি দুই তিন দিনের জন্য গ্রামে আসিতেন। কখনও কখনও দুই মাস পরে হয় ত তিন চারি দিনের জন্য গ্রামে বাস করিয়া যাইতেন। তখন নানাবিধ গ্রন্থই তাঁহার নিঃসঙ্গ দিবা ও রজনীর সহচরের কার্য্য করিত। আর সেই কয় দিন বাড়ীর সকলেই তটস্থ হইয়া থাকিত। সামান্য ত্রুটি হইলে তাঁহার বক্র মুখভঙ্গিমা ও রসলেশহীন ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার ঝড় বহিয়া যাইত।

আমরা ভয়ে কখনও কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম না। মা যদি বলিতেন, সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া বিদেশে পড়িয়া থাকিবার কি প্রয়োজন, তাহা হইলে দাদা প্রায়ই সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেন না। তবে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "একটা ত মানুষ আমি। ঘুরে বেড়িয়ে প্রাণে শান্তি পাই, তাই যাই। যা বিষয়সম্পত্তি আছে, তাতে তোমাদের ত কোন কষ্ট হবে না। আমার জন্য কোন চিন্তা নেই।"

সত্যকথা বলিতে কি, দাদা দেশের বিষয়সম্পত্তির একটি পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। গ্রামের লোক বলিত, ছেলেটা ক্রমেই অধঃপাতে যাইতেছে। বিশ হাজার টাকা বদখেয়ালেই গিয়াছে। মন্দ সংসর্গে না মিশিলে এমন উদাসীন প্রকৃতি হইবে কেন?

জনরব শতজিহ্ব হইয়া দাদার নামে কত কাহিনীই প্রচার করিত! শুনিয়া আমাদের মন ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিত; কিন্তু দাদা যে অসৎসংসর্গে পড়িয়া উৎসন্নের পথে চলিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইত না। তাঁহার অন্তরে আমাদের জন্য বিন্দুমাত্র স্নেহ না থাকিতে পারে, মাতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব সুস্পষ্ট; কিন্তু তিনি চরিত্রহীন, ইহা কল্পনা করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠিত। আদর্শ-চরিত্র পিতা তাঁহাকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দাদার অদৃষ্টে ঘটে নাই; কিন্তু জীবনে তাঁহাকে মিথ্যা-কথা বলিতে শুনি নাই। ধূমপান ত দূরের কথা, পাণ পর্য্যন্ত কদাচিৎ খাইতেন। নারী সম্বন্ধে দাদার অসাধারণ উদাসীনতা দেখিতাম। কিন্তু তবুও নিন্দকের রসনার বিরাম ছিল না।

দাদার কানেও গ্রাম্য সমালোচনা প্রবেশ করিয়াছিল। মা দুই একবার সে প্রসঙ্গের আভাস দিয়াছিলেন। উত্তরে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে শুধু বক্র হাসির বিকাশই দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কোনও প্রকারে প্রতিবাদের ক্ষীণ চেষ্টাও তিনি কখনও করেন নাই। এ জন্য সময় সময় সত্যই আমার হৃদয়ে একটি তীব্র বেদনার শেলাঘাত অনুভব করিতাম। মাও যেন হাঁপাইয়া উঠিতেন।

তবুও গড্ডলিকাপ্রবাহে আমাদের দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় মামাবাবুর বিবাহ-প্রস্তাব জননীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

মামাবাবু জিলা কোর্টের উকীল। দাদার সঙ্গে বোধ হয় কথা পাকাপাকি করিয়া লইয়াছিলেন। রাত্রিতেই তিনি নৌকাযোগে সহরে চলিয়া যাইবেন। আশেপাশে ঘুরিবার অবকাশে শুনিলাম, মা বিষয় বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দোজবর পাত্র তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। মামাবাবু সে প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, "তুমি কি শেষে নরেশকে পথে বসিয়ে যেতে চাও? বুদ্ধির দোষে সে নগদ টাকা খুইয়েছে ব'লে সম্পত্তিটাও তুমি নষ্ট কর্'তে চাও? সে হবে না। এই পাত্রে মেয়ে দাও. মেয়েও সুখী হবে, ছেলেও বাঁচবে।"

মা'র প্রকৃতি চিরদিনই কোমল—ভীরুস্বভাব। মামাবাবুকে তিনি ভক্তি করিতেন, ভালবাসিতেন. আবার ভয়ও করিতেন।

অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, মা অতি সঙ্গোপনে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

সত্যই তখন ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, মা, তুমি কাঁদিও না। মেয়ের জন্য কেন তুমি আমার পিতৃকুলের শেষ বংশধরকে পথের ফকির করিয়া যাইবে? বাঙ্গালার মেয়ে হাসি মুখে সকল প্রকার লাঞ্ছনা চিরদিনই বরণ করিয়া আসিতেছে, আমি পারিব না? নারীজীবনে কত দুঃখই আছে—দোজবরের দুঃখ কি তাহার তুলনায় অসহনীয়?

কিন্তু কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সমস্ত শরীর যেন অসহনীয় বেদনায় শিহরিয়া উঠিল। কম্পিত হস্ত হইতে মামাবাবুর জন্য আনীত পাণের ডিবাটা সশব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দাদা বলিয়া উঠিলেন, "অত বড় মেয়ে, তোর হ'ল কি? মা মনে করেন, মেয়ে

আমার সুন্দরী, ওর ভাল পাত্র হবে। যে গুণের মেয়ে, দোজবর পাত্র জুট্‌লেই এখন ভাগ্য ব'লে মনে হবে!"

এই দাদাই সুপাত্র না হইলে বিবাহ দিবেন না, পণ করিয়াছিলেন!

সম্পত্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কা মানুষকে—সহোদরকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে? আজ বাবা বাঁচিয়া থাকিলে—না, না, এ আমি কি ভাবিতেছি? আমার দাদা, আমার মা'র পেটের ভাই, তাঁহার সম্বন্ধে স্বার্থান্ধ হইয়া আমি অবিচার করিতেছি! সম্পত্তি বন্ধক দিলে, তাহা কি আর উদ্ধার করা সম্ভব হইবে? সর্ব্বরিক্ত দাদা তখন পথের ভিখারীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর আমি তাহার বিনিময়ে সুখী হইব? ছিঃ! ছিঃ!

৩

জননীর সদাপ্রসন্ন মুখে চিরন্তন মধুর হাসির উৎসটি শুকাইয়া গিয়াছে, ইহা আমার কাছে তিনি লুকাইতে পারিতেছিলেন না। আমাকে দেখিলেই তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া প্রসন্নতার দীপ্তি নয়নে, আননে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এইটুকু বুঝিবার ক্ষমতা আমার ছিল। স্নেহ, প্রেম, ভক্তির কাছে লুকাচুরী চলে কি?—অভিনয় সেখানে ব্যর্থ হয় না কি?

প্রচণ্ড নেশায় আমি যেন মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কারণে, অকারণে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িবার মোহ যেন আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। নৃত্যচপল চরণে আমি সারা বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার অন্তরে যদি ব্যথা বাজিয়া থাকে, সে বেদনার যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া কেন আমার স্নেহময়ী জননীর দুঃখকে উদগ্র করিয়া তুলিব? জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই; সুখ-দুঃখের আবর্ত্তে কোটি কোটি নর-নারী প্রতিদিন পড়িতেছে, উঠিতেছে —কেহ বা তলাইয়া যাইতেছে। ভীত হইলে চলিবে না। দুঃখ আসিতেছে, আসুক। বীরের মত হাসিমুখে, অচঞ্চল, অকম্পিত হৃদয়ে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, এই সত্যবাণীই ত শাশ্বত ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। বাবার কাছে, মা'র কাছে এই ভাবে কত উপদেশ পাইয়াছি। রামায়ণ-মহাভারতে ইহার কত অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত পড়িয়াছি।

বুঝিলাম, মা আমার এই বিচিত্র ভাবপরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। সমবয়স্কা গ্রাম্য নারীরা, আমার সখীস্থানীয়ারা কত প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। এত দিনে বিবাহের ফুল ফুটিবার সম্ভাবনায় আনন্দে না কি আমি মাতিয়া উঠিয়াছি! হইবেও বা!

দাদা আজ চারি দিন কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। মামাবাবুর প্রস্তাবিত পাত্রকেই তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবেন। পাত্রপক্ষ না কি আমার ফটো মামাবাবুর নিকট হইতে পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। আমাদের পরিচয়ও তাঁহাদের অগোচর নাই। মেয়ে দেখিবার প্রয়োজন হইবে না। বিবাহের দিন সকালে আসিয়া প্রথামত আশীর্ব্বাদ-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেই চলিবে!

মুকুলিত আশা, বাসনাপূর্ণ আমার এই তরুণ জীবনে যাহার প্রথম উদয় সমগ্র বিশ্বকে আমার কাছে সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিবে বলিয়া কল্পনার অবকাশে এত দিন সে বিষয়ে কত বিচিত্র স্বপ্নই না দেখিয়াছিলাম! স্বপ্নবিলাসী মন! এই-বার চমৎকার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হও! নারী-জীবনের দেবতা আসিতেছেন, পূজার অর্ঘ্যভার সাজাইয়া রাখিবে না?

সন্ধ্যার অন্ধকারে খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সারা দিনের নিরুদ্ধ অশ্রুকে আর বাধা দিয়া রাখিতে পারিলাম না। সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে জীবনের যে অবস্থাকে অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া এত দিন মনে করিয়া আসিয়াছি, তাহার আসন্ন সম্ভাবনার দুশ্চিন্তাকে রোধ করিবার সামর্থ্য সত্যই নাই। মিথ্যা এই অভিনয়! মিথ্যা মনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চেষ্টা!

অকস্মাৎ পৃষ্ঠদেশে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম। চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিলাম। অন্ধকারেও জননীর নিস্তব্ধ মুখশ্রী দেখিতে পাইলাম। সে চিত্র আমাকে গভীরভাবে আহত করিল। প্রচণ্ড চেষ্টায় মনের দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

"অভাগী মেয়ে, মা হয়ে তোকে কেমন ক'রে বিসর্জ্জন দেব! না—নরেশ ফিরে আসুক। এ সম্বন্ধ আমি ভেঙ্গে দেব!"

মৃদু কণ্ঠে বলিলাম, "না, মা, দাদা আমার ভালর জন্যে যা করছেন, তাতে বাধা দিও না। আমার মনে কোন কষ্ট নেই, মা।"

"পাগ্‌লী মেয়ে, আমার কাছে লুকুবি? আমি না তোর মা?"

হায়! জননি! তোমরা আছ, তাই পৃথিবী এখনও স্বর্গ, তাই সংসারের অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও সন্তান মায়ের বক্ষে সান্ত্বনার প্রলেপের সন্ধান পায়। যে দিন মাতৃত্বের অভাব হইবে, বিশ্বের দরবারে পৃথিবী সে দিন দেউলিয়া হইয়া যাইবে ---সম্ভবতঃ তাহার অস্তিত্বও থাকিবে না।

বাহুবেষ্টনে মা'র কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া যথাসাধ্য স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, "তুমি আমার জন্য কিছু ভেব না, মা। আমাদের অবস্থা ত দেখছ, সর্ব্বস্ব বেচেও তোমার মনের মত পাত্র পাবে না। কত লোকই ত এসেছিল---সবাই যেন অর্দ্ধেক রাজত্ব চায়। না মা, আমার জন্য দাদাকে পথে বসাতে পারবে না। আমার পিতৃকুলের শেষ বংশধর শেষে পথে পথে ভিখিরীর মত ঘুরে বেড়াবে, সে আমার সহ্য হবে না। তার আগে—"

লজ্জার মাথা খাইয়া এত দিনের রুদ্ধ মনের ভাব বলিয়া ফেলিলাম। রাত্রির অন্ধকারে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু শেষের কথাগুলি বলিবার পূর্ব্বেই মা আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

হায়! জননীর স্নেহ!

সহসা বাহিরে আলোকরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম;

"মা!"

এ যে দাদার কণ্ঠস্বর! তিনি কি ইহারই মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন?

বক্ষঃস্থল দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল কেন?

মা'র কানে কানে বলিলাম, "তুমি যদি আমাকে একটুও ভালবাস, দাদাকে কোন কথা বল্‌তে পাবে না।"

আলো লইয়া রামার মা অগ্রে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে দাদা।

"এই যে তোমরা এখানে!—ঘরে আলো নেই; অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন, মা?"

দাদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অবশেষে আমার মুখের উপর স্থির হইল। সেই চিরপরিচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপভরা বক্র হাসি ওষ্ঠাধরে নৃত্য করিয়া উঠিল।

"বাঃ! বাঁদরীর মুখে ক'দিনেই যে শ্রী ফুটে উঠেছে, তাতে দোজবর পাত্রও যে ফিরে চাইবে না!"

আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। মা বলিলেন, "কি যে বলিস্ তুই! ভাল ত কোন দিনই বাসিস্ নি; কিন্তু মিষ্টি কথারও দুর্ভিক্ষ হয়েছে না কি? আজ উনি বেঁচে থাক্‌লে—"

"মা!"

জননী আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

লণ্ঠন ভূমিতলে রাখিয়া রামার মা বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল।

দাদা জামা, জুতা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "না, বল্‌বে না! পোড়ারমুখী সব সময়েই কালপেঁচার মত মুখ অন্ধকার ক'রে থাকে কেন? যাক্, আসল কথা শোন। বিয়ের দিন স্থির ক'রে এলাম। আজ মঙ্গলবার, আগামী সোমবারে বিয়ে।"

দাদা যেন মুখস্থ করা পাঠ বলিয়া গেলেন। তাঁহার নয়নযুগলে যে আলোকদীপ্তি দেখিতেছি, তাহা কি মুক্তির আনন্দজ্ঞাপক? একরূপ বিনা ব্যয়ে ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাইতেছে, ইহা কি অল্প সৌভাগ্যের কথা?

অস্ফুট স্বরে মা বলিলেন, "একবারে ঠিক ক'রে এলি, নরেশ!"

"নিশ্চয়। শুভ কাযে বিলম্ব করতে আছে? শাস্ত্র নিষেধ করেছেন যে, মা। মণিকে তার ক'রে দিয়েছি, সে সুরমাকে নিয়ে আসবে।"

মা সেইখানে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন।

৪

রোশনচৌকী নাই—গ্রামের ঢোল, কাঁসি বা বাঁশীর স্বরও ছিল না।

মণিবাবু দিদিকে লইয়া আসিয়াছেন। উৎসবের কোনও কলরব আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল না। শুধু প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র ধারাস্নাত বৃক্ষশীর্ষ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। আষাঢ়ের আকাশ আজ মেঘমুক্ত।

আজ সোমবার—পূজার বলি সন্ধ্যায় দেবতার চরণে উৎসৃষ্ট হইবে।

মা ও দিদি নীরবে প্রয়োজনীয় কাযগুলির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পাড়ার কয়েক জন আত্মীয় মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন।

দাদা বহির্ব্বাটী হইতে ভিতরে আসিয়া ডাকিলেন, "মা, এ দিকে শোন।"

আমি পার্শ্বের কক্ষেই একা বসিয়া ছিলাম।

মা'র সঙ্গে দিদিও তথায় আসিল। দাদা বলিলেন, "তোমাদের আগে বল্‌তে পারিনি; আমার অপরাধ নিও না। মামাবাবু যে দোজবর পাত্রের কথা বলেছিলেন, তারা কিছু না নিলেও প্রায় শ-ভুই বর-যাত্রী সঙ্গে আসবে বলেছিল, তা এত লোকের খাওয়ার যোগাড় করা ত সহজ নয়; তা ছাড়া বড়লোক হলেও যাতায়াতের খরচ তারা চেয়েছিল। তাই সে পাত্রের আশা ছেড়ে দিতে হয়েছে।"

মা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তবে উপায়? এখন কি হবে?"

দাদা বলিলেন, "বিয়ে আজই হবে। আমি আর একটি পাত্র ঠিক ক'রে ফেলেছি। তারা ভোরেই এসে পৌঁছেছে। নৌকাতেই এখনও রয়েছে! ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল; কিন্তু বড় গরীব। সংসারে আপনার বলবারও কেউ নেই, আর দোজবরও নয়। তারা একটু পরেই মেয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে আসবে।"

দিদির কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু সে কণ্ঠে শুধু একটিমাত্র শব্দ উচ্চারিত হইল—"দাদা!"

হৃদয়ের মহাসমুদ্রে আলোড়ন, আন্দোলন সবই ত থামিয়া গিয়াছিল! আবার এ কি বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস! নীল সাগরে কি পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় দেখিয়া হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল?

দাদা বলিলেন, "এ বিয়েতে খরচের দায় থেকেও বেঁচে গেলাম। মাত্র ৪।৫ জন লোক সঙ্গে এসেছেন—মায় পুরোহিত। দিতে থুতেও কিছু হবে না। ছেলেটিকে আমি জানি, অনেক দিন থেকেই চিনি। তাই সহজে রাজি করান গিয়েছে।"

দেবতা! এত দিন তোমার মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া সচন্দন বিল্বদলে একাগ্রমনে অর্চ্চনা করিয়াছি, হে শঙ্কর! তাই কি শেষ মুহূর্ত্তে তোমার আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়া সেবিকাকে চরিতার্থ করিতেছ?

দাদার অবিচলিত কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি আমার চিন্তা-সূত্রকে ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি বলিতেছিলেন, "সুরমা, সুষমাকে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দে। কাপড়-চোপড় পরাতে যেন ঘণ্টা দুয়েক দেরী ক'রে ফেলিস্‌নে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা আশীর্ব্বাদ কর্‌তে আসবে।"

পরমুহূর্ত্তে মা ও দিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মাতার কোমল বাহুবেষ্টনে কয়েক মুহূর্ত্ত আমি যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম।

দিদির মুখ আনন্দের জ্যোৎস্নাধারায় যেন স্নাত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "গরীব হোক্ গে মা, ছেলেটি ভাল, আর দোজবর নয়। মনের সুখ ত হবে।"

মা'র চোখ দুইটি যেন হাসিতেছিল। তিনি সস্নেহে আমার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "সুর, ওকে তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়ে দে। আমি মঙ্গলচণ্ডীর ঝাঁপিতে একটা টাকা তুলে রেখে আসি।"

কিন্তু সত্য বলিতে কি, তখনও আমার অদৃষ্টকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। প্রসাধনশেষে যথাসময়ে দাদার সঙ্গে বাহিরের ঘরে কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝখানে আসিয়া বসিলাম। লজ্জানত দৃষ্টি তুলিয়া কোনও দিকে চাহিবার মত শক্তি তখন ছিল না। সুতরাং ভাবী জীবনের যিনি ভাগ্যবিধাতা হইতে চলিয়াছেন, তাঁহাকে দেখি নাই বলিলে মিথ্যা বলার পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে না।

কিন্তু পরে দিদি আমাকে কানে কানে বলিয়াছিল, "দাদার পছন্দ আছে রে, সুষি! তোর ভাগ্য ভাল।"

শুভদৃষ্টির সময়ও ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। কিন্তু তার পর দেখিয়াছি—দেখিয়া মনে মনে দাদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছি, তুমি আমাকে পোড়ারমুখী, বাঁদরী যাহা ইচ্ছা বলিয়া সহস্রবার গাল দিও, দাদা। তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

কিন্তু পাড়ার লোক কানাকানি করিতে লাগিল, নরেশ পিতৃহীনা ভগিনীকে জলে ভাসাইয়া দিল। তিন কুলে যাহার কেহ নাই, মাথা গুঁজিবার স্থান পর্য্যন্ত যাহার নাই, এমন এক জন হতভাগার হাতে ভগিনীকে সম্প্রদান করিয়া নরেশ অন্যায় কার্য্য করিয়াছে।

মামাবাবু বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুখে কিছু বলেন নাই বটে; কিন্তু তিনি যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল। তবে এ বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কা হইতে যে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে, ইহার উল্লেখ করিয়া তিনি দাদার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যাক্, দাদা আত্মরক্ষার জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক,

দোজবর পাত্রের কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এ জন্য কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য।

৫

দাদার সংসারের অন্নগ্রহণ—পিতৃগৃহে বাস কিন্তু আমার ঘুচিল না। তিন বৎসর হইতে চলিল, স্বামিগৃহে যাইবার সৌভাগ্য আমার হইল না। তিনি বি, এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কয় বৎসর ধরিয়া কয়লার খনির কায শিখিয়াছিলেন। এখন সাঁওতাল পরগণার কোন কয়লার খনিতে কি একটা কায করিতেছেন। সেইখানেই বারো মাস থাকিতে হয়। শুধু বৎসরে একবার বা দুইবার করিয়া কয়েক দিনের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। দাদার ন্যায় তিনিও অত্যন্ত স্বল্পভাষী। আমাকে কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবার সুবিধা তাঁহার এখনও হয় নাই।

মাঝে মাঝে পত্র তিনি লিখিতেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কথা ও শারীরিক কুশলপ্রশ্ন ব্যতীত উদ্বেল যৌবনের অপ্রয়োজনীয় উচ্ছ্বাসভঙ্গী তাঁহার সংক্ষিপ্ত পত্রে কখনও থাকিত না। যাহা থাকিত, তাহাতে তরুণ মনের ক্ষুধা না মিটিলেও তৃপ্তির অভাব হইত না।

দাদার লক্ষ্যহীন, উদাসীন জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি পূর্ব্ববৎ মাসে একবার কয়েক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। পূর্ব্ব-অভ্যাসমত বক্র মুখভঙ্গী এখনও ছিল।

প্রায় দেড় বৎসর হইল, দিদি তাহার শিশুপুত্র লইয়া আমার সঙ্গিনী হইয়াছে। পিতা-মাতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মণিবাবু দিদিকে এইখানে রাখিয়া গিয়াছেন। উপর-ওয়ালার সহিত কলহের ফলে মণিবাবু না কি কায ছাড়িয়া দিয়াছেন। নূতন কার্য্যের চেষ্টায় তিনি ধানবাদে গিয়াছেন। এত দিন সেইখানেই আছেন। তিনিও এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখিয়া এত দিন ঝরিয়ার কোন কয়লার খনিতে না কি কায করিয়াছিলেন।

স্বামিগৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে থাকিবার পর পিতৃগৃহে বাস করার জন্য দিদি কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; কিন্তু অন্য উপায় ত কিছু ছিল না।

মাঘের প্রথমে সহসা এক দিন দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার প্রায় দুই মাস তিনি বাড়ীতে আসেন নাই। চা-পানের পর আমাদিগকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"মা, তোমরা প্রস্তুত হও। কাল তোমাদের সকলকে কলকাতায় নিয়ে যাব।"

মা সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি রে? কলকাতায় কেন?"

"লেক্ রোডে একটা নূতন বাড়ী নিয়েছি। তুমি ও সুমি কখন কলকাতা ত দেখ নি, এবার বেড়িয়ে আসবে চল।"

দাদার আবার এ কি খেয়াল? কোন দিনই তিনি আমাদের কোন প্রকার সুখদুঃখের সন্ধান লইতেন না। নিজের লেখাপড়া এবং ভবঘুরে জীবন লইয়াই এত কাল কাটাইয়া দিয়াছেন। কাহার কি অভাব, কাহার কি দুঃখ, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আজ সহসা আমাদের জন্য তাঁহার মন এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল কেন?

দাদার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ আছে ত?

মুখভঙ্গী করিয়া দাদা বলিলেন, "তুই অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস্ কেন? আমি পাগল না জানোয়ার? পোড়ার-মুখীকে গালাগালি দিলেও আবার অভিমান করা হয়!"

মা বলিলেন, "কলকাতার বাড়ী-ভাড়ার টাকা কোথায় পাব? আর সেখানকার যে খরচ! না বাপু, ও সব আমাদের মত গরীবের পোষাবে না।"

কিন্তু আমি জানিতাম, মা কালী ও গঙ্গাদর্শনের জন্য মা'র মনে চিরদিন একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছে।

দাদা বলিয়া উঠিলেন, "সে সব ভাবনা তোমায় কিছুই করতে হবে না, মা। তোমার বিষয়ের টাকা খরচ না হইলেই ত হ'ল?"

"তবে কি দেনা ক'রে শেষে তুই মুস্কিল বাধাবি, নরু?"

"তোমাকে যখন বলছি, ও সব কিছু ভাবনা নেই, তখন কেন মিছে কথা বাড়াচ্ছ?"

"হাঁ, তোর ত বুদ্ধি! বিশ হাজার টাকাই জলে ফেলে দিলি। না বাপু, কায নেই।"

দাদা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে যা-ই বল না কেন, কাল যেতেই হবে। আমি কোন কথা শুনবো না। ওরে সুরমা, সুষমা, আজকের ভেতর সব গোছগাছ ক'রে রাখিস্।"

দাদার খেয়াল! আমাদের সাধ্য নাই প্রতিবাদ করি। সকলকে যাইতেই হইবে।

মাছধরা

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬

শিয়ালদহষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই তাড়াতাড়ি মাথার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে হইল। দিদিরও আমারই মত অবস্থা। তাঁহার পার্শ্বেই মণিবাবু সহাস্যমুখে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এ কি অভাবনীয় সংযোগ। তাঁহারা জননীর চরণ বন্দনা করিলেন।

মণিবাবুদের সঙ্গে এক জন চাকর ছিল। দাদার আদেশে সে একখানা গাড়ীতে আমাদের জিনিষপত্র তুলিতে লাগিল।

তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ দেখিয়া মন যে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিব না।

আমরা ট্যাক্সি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, মা বলিলেন যে, তিনি গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন না করিয়া বাসায় যাইবেন না।

দাদা বলিলেন, "মণি ও সুরেশ তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে যাক্। ভজুয়া জিনিষপত্র নিয়ে বাসায় গেলেই চল্‌বে।"

মা বলিলেন, "তুই আমাদের সঙ্গে যাবিনে?"

"না, ততক্ষণ একটা জরুরী কায সেরে নেওয়া যাক্।"

দাদা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। মণি বাবু বলিয়া উঠিলেন, "একটু সকাল সকাল ফিরে এস, দাদা।"

দাদা আমাদিগের গাড়ী চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন, দেখিলাম।

আজব সহর কলিকাতা! ইহার কত প্রকার বর্ণনা কত গ্রন্থেই না পড়িয়াছি। মা ও আমি বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে সৌধমালা, রাজপথ, ট্রাম, বাস প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। আমাদের গাড়ীতে উনি ট্যাক্সি-চালকের পার্শ্বে বসিয়া মাকে উদ্দেশ করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির পরিচয় দিতে-ছিলেন। নক্ষত্রবেগে গাড়ী ময়দানের পার্শ্বস্থ রাজপথ দিয়া ছুটিয়া চলিল।

গঙ্গার ঘাটে স্নান সারিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ ও দেবতা দর্শন করিতে বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। পল্লীর নিভৃত অঙ্গনে যাহারা আবাল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, সহরের বিলাস, ঐশ্বর্য্য ও কোলাহলে তাহাদের চিত্তবিভ্রম হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। যেন স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি।

পূজা ও অর্চ্চনার পবিত্র প্রভাবে শরীর ও মন যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মা'র মুখ প্রসন্নতার হাস্য-রেখায় সমুজ্জ্বল; দিদিরও তাহাই।

ট্যাক্সি চড়িয়া আমরা যেন এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। কৃত্রিম হ্রদের অনতিদূরে রাজপথের উত্তর ধারে কয়খানি নবনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকা। তাহারই একটির ফটকের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ী অগ্রসর হইল।

গাড়ী-বারান্দার নীচে ট্যাক্সি থামিলে আমরা নামিয়া পড়িলাম। ভজুয়া ও এক জন পরিচারিকা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল।

না, দাদার সখ আছে স্বীকার করিতেই হইবে। বাড়ী-খানি চমৎকার। প্রত্যেক ঘর নানাবিধ প্রয়োজনীয় আস-বাবে সুসজ্জিত। কলিকাতার বাড়ীওয়ালারা কি এমনই ভাবে গৃহস্থালীর উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভারে বাড়ী সাজাইয়া ভাড়া দিয়া থাকে?

মা ও দিদি আমারই মত বিস্মিত হইয়াছিলেন। না জানি, এমন বাড়ীর ভাড়াই বা কত?

মণি বাবু ও উনি হাসিতেছেন কি? আমার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই দেখিলাম, উনি মুখ ফিরাইয়া জানালার দিকে চাহিলেন। মণি বাবুও যেন কেমন ভাবে উঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

পল্লীগ্রামের মেয়ে আমরা, সে কথা ত মিথ্যা নহে। কলিকাতা সহরের আদবকায়দা, ভোগ-বিলাস, ঐশ্বর্য্যের কোন পরিচয়ই আমরা পূর্ব্বে পাই নাই—প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের কিছু নাই। আমাদের অজ্ঞতা দেখিয়া কি উঁহাদের বিদ্রূপ করা উচিত? কৌতূহল ত আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। মনে মনে যে একটু অভিমান হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

দিদি সহসা বলিয়া উঠিল, "দেখ সুষি, পর পর দু'খানা বাড়ী ঠিক এই রকমের দেখতে। কি সুন্দর ভাই!"

উনি একটু সরিয়া আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাড়ী দু'টো দেখতে চান, দিদি? চাবী আমাদের কাছেই আছে। চলুন না দেখিয়ে আনি। রান্নার এখনও একটু দেরী আছে। নরেশ দা ততক্ষণে ঘুরে আসুক।"

উপরে উঠিবার সময় দেখিয়াছিলাম, ঠাকুর রান্নাঘরে রাঁধিতেছে। মা'র আজ একাদশী। সুতরাং দক্ষিণ হস্তের

ব্যাপারের জন্য এ বেলা আমাদের বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হইবে না। ট্রেণে সারারাত্রি পর্য্যটনেও শরীরে কিন্তু কোন প্রকার অবসাদ বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কৌতূহলই তখন প্রবল।

মণিবাবু ও উনি আমাদিগকে লইয়া চলিলেন। পাশাপাশি অপর দুইটি অট্টালিকাই প্রথমটির অনুরূপ। কোনও বিষয়েই পার্থক্য নাই। একইভাবে সুসজ্জিত। শুধু বাড়ী দুইটিতে কোনও অধিবাসী নাই।

মা বলিলেন, "তিনটি বাড়ীর মালিক বোধ হয় এক জনই।"

উনি চুপ করিয়া রহিলেন। মণিবাবু বলিলেন, "তাই হবে।"

আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ফটকের গায় একখানা কালো পাথরের উপর সোনার অক্ষরে কি যেন লেখা রহিয়াছে, এতক্ষণ তাহা দেখিতে পাই নাই। নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই লেখাটা পড়িতে পারিলাম—"সুষমা-নিকেতন।"

আমি মণিবাবুর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীটা তোমার কি না, তাই ঐ নাম।"

মৃদুকণ্ঠে ভৎর্সনার সুরে বলিয়া উঠিলাম, "যান, আপনি বড় দুষ্টু!"

"আচ্ছা, বিশ্বাস না হয়, সুরেশভায়াকে জিজ্ঞাসা করতে পার।"

উনি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। দিদির দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাদাকে ত কেউ চিন্‌তে পারেন নি। সবাই তাঁকে চিরদিন হৃদয়হীন বলেই মনে ক'রে এসেছেন। কিন্তু তা নয়। নিজের যথাসর্ব্বস্ব তিনি সমান তিন ভাগ করেছেন। এই তিনটা বাড়ী তার ছোট্ট নিদর্শন।"

মা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা কি বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না, বাবা!"

মণিবাবু বলিলেন, "মা, আর যে দু'টি বাড়ী দেখে এলেন, তার একটি আপনার, আর অপরটি আপনার বড় মেয়ের। এ সবই নরেশদার কীর্ত্তি। বাড়ী দু'টির ফটকে আপনাদের নামও লেখা আছে— অতটা আপনারা তাড়াতাড়িতে লক্ষ্য করেন নি।"

সত্যই আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের স্পর্শে কলিকাতার রাজধানীর কৃত্রিম হ্রদের পার্শ্বে রাতারাতি এমন সুদৃশ্য, সুসজ্জিত অট্টালিকা গজাইয়া উঠিল না কি? অন্ততঃ লক্ষ টাকার কমে এমন তিনখানি বাসভবন কখনই নির্ম্মিত হইতে পারে না।

বিস্ময়চালিত হইয়া আমরা উপরে উঠিয়া আসিলাম। মা ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবা।"

মণিবাবু বলিলেন, "নরেশদার বিশহাজার টাকা মাঠে মারা যায় নি, মা! উনি হাজারিবাগ জেলায় একটা কয়লার খনিতে ১৫ হাজার টাকা খরচ ক'রে ফেলেছিলেন। প্রথম প্রথম খালি লোকসান গিয়েছিল। কাউকে নরেশদা সে কথা জান্‌তে দেন নি—আমিও বছর দুই আগে কিছুই জানতাম না। তবে সুরেশভায়া সব জানতেন। নরেশদাই ওঁকে মাইনিং এঞ্জিনিয়ারীং শিখিয়ে নিয়েছিলেন। দু'জনের বন্ধুত্ব অনেক দিনের। ভায়া এঞ্জিনিয়ার হয়ে কয়লার খাদে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে থাকেন। মা-লক্ষ্মী যখন মুখ তুলে চান, তখন চারিদিকেই সোনা ফল্‌তে থাকে। কিন্তু নরেশদা এমন চাপা লোক, আর তাঁর সহকারীটিও তেম্‌নি। আত্মীয়-স্বজন কেউ কিছু জান্‌তে পারে নি। তার পর দাদা আমাকে চাকরী ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। কোডারমায় একটা অভ্রের খনি কেনা হ'ল। ও কাযটা আমারও কিছু জানা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কয়লার খনি ইজারা নেওয়া হ'ল। গেল দু'বছরে প্রায় লাখদেড়েক টাকা পাওয়া গেছে।"

উনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "নরেশদার সঙ্গে আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। তাঁর মনের কোন কথা আমার অজানা নেই। মণিদাকে নরেশদা অভ্রের খনির মালিক ক'রে দিয়েছেন। আর তাঁর এই ছোট ভাইটিকে একটা কয়লার খনি দিয়েছেন। সুধু মুখে নয়, রেজেষ্ট্রী দলিলের দ্বারা।"

জননীর দুই নয়ন বাহিয়া দর্ দর্ ধারে যেন জাহ্নবীর পবিত্র স্রোতোধারা বহিতেছিল। আমাদেরও নয়ন শুষ্ক ছিল না। এই স্বভাব-গম্ভীর, শুষ্ক, কঠোর অপ্রিয়ভাষী মনুষ্যটির হৃদয়ের অন্তরালে স্নেহ, প্রীতি, মমতা ও কর্ত্তব্যবোধের যে ফল্গু-প্রবাহ অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আমরা ত দূরের কথা, যিনি গর্ভধারিণী জননী, তিনিও কোন দিন অনুমান করিতে পারেন

নাই! এমন দাদার সহোদরা হওয়া বহু তপস্যা ও ভাগ্যের কথা।

আমরা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাদার এই বিচিত্র ব্যবহারসম্বন্ধে ধ্যান করিতে লাগিলাম। আমার মন দাদার চরণের দিকে ধাবিত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

সহসা দাদা যেন ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভজুয়া এক ঝোড়া ফল লইয়া আসিল।

"ওরে, মা'র আজ—একাদশী, আগে ছাই মনেও ছিল না।—এ কি? তোমরা সব এমন ক'রে ব'সে কেন? কি হয়েছে, মণি বাবু?"

"মাপ করো, নরেশদা! মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাষেই সব বল্‌তে হয়েছে।"

"আঃ! তোমরা বড় পাগল। আগে খাওয়া-দাওয়া করবে, না, যত বাজে কথা? কি রে, তুই যে কেঁদেই ভাসিয়ে দিলি, পোড়ারমুখী? আজ যে তোর বাড়ীতে আমরা অতিথি। আমাদের খেতে দে।"

বল, শতবার তোমার মুখে ঐ সম্ভাষণ শুনিতে চাই। উহা'ত গালাগালি নহে, উহা যে জ্যেষ্ঠের স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। মেঘের ফাঁক দিয়া পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণরাশি ধরিত্রীবক্ষে ঝরিয়া পড়িতেছে! আমরা পবিত্র ও ধন্য।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

স্মৃতির তর্পণ

সচেতন সত্যই কি রহিয়াছি আমি?
সত্য তবে দেখে লোকে জাগ্রতে স্বপন?
স্বপন স্বপনমাত্র—বিকৃত মনের
ক্রূর প্রতিচ্ছবি কিংবা সুচঞ্চল
ভ্রান্ত মরীচিকা—কহে লোকে জানি।
তাই কি রে ধরি আসে সত্যের স্বরূপ
আমার এ নিদারুণ স্বপন-বারতা—
দিয়ে যায় অন্তরের প্রতি অন্তপরে
বিষম বিপ্লবময়ী বিষাদ-বেদনা?
তাই কি বহিয়া আনে শুভ্র সুমধুর
শৈশবের স্মৃতিপূত বহু বরষের—
ইতিগাথা চিত্রের আকারে?
তাই হ'ক্
হ'ক মিথ্যা স্বপন-কাহিনী—যাক্ যাক্
লুপ্ত হয়ে স্বপনের স্মৃতি!

সরল গাম্ভীর্য্য-ভরা সহাস আনন,
সুমধুর স্নেহদীপ্তি মৃদু আঁখি-পাতে,
কুন্দ-শুভ্র সুমার্জ্জিত চারু দন্তপাতি
তা ব'লে কি লুপ্ত হয়ে যাবে স্বপ্ন-সাথে?
পারে কি ভুলিয়ে দিতে ভ্রান্ত মরীচিকা
ললিত মধুর কণ্ঠে সেই অধ্যাপন?
যাব কি ভুলিয়ে সেই আগ্রহ আকুল
স্নেহের শাসন? কভু সম্ভবে কি ইহা?
ভুলিতে নারিব তায় হ'ক সত্য কিবা
হ'ক মিথ্যা স্বপনের কথা, ক্ষতি
কিবা? সদা সেই চিত্র রবে আঁখি'পর—
ভক্তিপ্রেমপূত অশ্রুধারা-বরষণে
নিয়ত হইবে তাঁর স্মৃতির তর্পণ!

শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক

বর্দ্দোলি

বর্দ্দোলি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শুভ যবনিকাপাত হইল। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সুরাট হইতে নির্ব্বাচিত কয়েক জন সদস্যের মধ্যস্থতায় বোম্বাইএর গভর্ণর ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেল আপোষে বর্দ্দোলির সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়াছেন। বর্দ্দোলির প্রজার পক্ষ হইতে কোনও ভূম্যধিকারী গভর্ণরের প্রস্তাবিত কর-বৃদ্ধির টাকা আমানত দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, গভর্ণরও করবৃদ্ধি ন্যায়সঙ্গত কি না, বিচারের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন। গভর্ণর সত্যাগ্রহের বন্দীদিগকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তলাতি ও পেটেলদিগকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন, "গভর্ণর পূর্ব্বে সুরাটে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রভেদ অনেক। এখন সরকার যে সকল কথা বলিতেছেন, পূর্ব্বে তাহা বলিলে আন্দোলনের মীমাংসা পূর্ব্বেই হইয়া যাইত। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেল যে প্রস্তাব করিয়াছেন, মীমাংসা তাহাকে ভিত্তি করিয়াই হইল, গভর্ণরের সর্ত্তে নহে।"

কিন্তু বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া গভর্ণর সার লেসলি উইলসনের দূরদর্শিতাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি যে ইজ্জৎরক্ষার জন্য শেষ পর্য্যন্ত এ ধনুর্ভঙ্গ পণ ধরিয়া রাখেন নাই, ইহাই তাঁহার পক্ষে প্রশংসার কথা। প্রবলপ্রতাপ সরকার এক দিকে, অপর দিকে বর্দ্দোলির দরিদ্র কৃষক প্রজা। সে ক্ষেত্রে সরকার ধনুর্ভঙ্গ পণ ধরিলে ব্যাপারের সহজে নিষ্পত্তি হইত না, প্রজাকে দারুণ কষ্ট ও বিপদ উপভোগ করিতে হইত। অবশ্য তাহারা ত্যাগে ও ধৈর্য্যে অবিচলিত থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিত, তাহার পরিচয় আমরা এ যাবৎ পাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে যাইতে হইল না, ব্যাপার যে চরমে উপস্থিত হইল না, এ জন্য গভর্ণরের বিচক্ষণতার কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উভয় পক্ষই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপোষ বন্দোবস্তে সম্মত হইয়াছেন, ইহাতে উভয়েরই মহত্ত্ব অনুসূচিত হইতেছে। গভর্ণর করবৃদ্ধির বিষয়ে ন্যায়বিচার করিবার জন্য তদন্তের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার রাজনীতিকোচিত বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে। বর্দ্দোলির দরিদ্র কৃষক প্রজা যে অপরের দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা তাল ঠুকিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হয় নাই, বরং নিজেদের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অন্যায় ব্যবস্থার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, গভর্ণর ইহা পরিণামে বুঝিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব। এই মূল্যবৃদ্ধির দিনে তাহাদের জমীজমা বজায় রাখিয়া অতিরিক্ত খাজনা দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর কি না, সেই বিষয়ে প্রজারা তদন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল মাত্র। তাহাদের এই প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। লোকের বাৎসরিক ২ হাজার টাকা আয় হইলে তাহার উপরে আয়কর বসিয়া থাকে। তাহার কম যাহাদের আয়, তাহাদের উপর সরকার আয়কর ধার্য্য করেন না। কেন করেন না? কারণ, তাঁহারা বুঝেন, এই দারুণ মূল্যবৃদ্ধির দিনে ইহার অল্প আয়ের লোকের আয়কর দিবার সামর্থ্য নাই। তেমনই দরিদ্র কৃষকের জমীর আয় যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কায়ক্লেশে তাহাদের সপরিবারে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর অতিরিক্ত কর চাপাইলে তাহা দিতে তাহাদের সামর্থ্যে কুলায় কি না, তাহা দেখাও ত সরকারের উচিত। প্রজারা সেই তদন্তই প্রার্থনা করিয়াছিল। সম্ভবতঃ বোম্বাইএর গভর্ণর প্রজার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আত্মত্যাগে তাহা বুঝিয়াছেন, তাই আপোষে সম্মত হইয়াছেন।

বর্দ্দোলির দরিদ্র প্রজা একটা মূলনীতির মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যাহা করিল, তাহা ভারতের মুক্তির ইতিহাসে বিরল। তাহারা যাহা অন্যায় মনে করিয়াছিল, তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দুঃখ-বিপদের চরমসীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। বর্দ্দোলি বোম্বাই বিভাগের সুরাট জিলার একটা ক্ষুদ্র তালুক, কিন্তু আজ ইহার নাম জগতের ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বর্দ্দোলি-নেতা শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেলকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন,—"আজ বর্দ্দোলির অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষক আমাদের দেশের শিক্ষাভিমানী সম্পন্ন রাজনীতিক আন্দোলন-কারীর শিক্ষাগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনে আন্তরিকতার অভাব আছে। আমরা বিদ্যার জোরে গভীর গবেষণা করি, রাজনীতিক চালবাজীতে কূটবুদ্ধির পরিচয় দিই। কিন্তু তাহাতে আন্তরিকতা নাই বলিয়াই আমাদের আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয় না। বর্দ্দোলির দরিদ্র অশিক্ষিত কৃষক অন্তরে বাহিরে অন্যায়ের তীব্র দাহন অনুভব করিয়াছিল, তাই তাহাদের আন্দোলনে কৃত্রিমতা ছিল না, আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাই তাহাদের আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।"

কথাটা ঠিক। আত্মিক বল আন্তরিকতা হইতেই উৎপন্ন হয়, দৈহিক বল উহার নিকট অতি তুচ্ছ। আত্মিক বল যে দৈহিক বল অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ—বিরাট দৈহিক বলের অনাচার ও অন্যায়ের বিপক্ষতাচরণে সেই আত্মিক বল যে পরিণামে জয়লাভ করে, বর্দ্দোলির সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে সহায়-সম্পত্তিহীন দরিদ্র প্রজা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই ভারতে যিনি ত্যাগমন্ত্রের গুরু, যিনি ত্যাগের পবিত্র

তোমানলে পাপ আত্মাভিমান ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থচিন্তা ভস্মীভূত করিয়া দেশবাসীকে ন্যায় ও সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আজ সেই মহাত্মা গন্ধীর মহান্ আনন্দের দিন। আজ তাঁহারই প্রদর্শিত পথের পথিক বর্দোলির প্রজা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সত্যের জন্য সংগ্রাম করিয়া জয়ের সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে, অধিকন্তু দেশবাসীকে জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। আর তাঁহারই যোগ্য অনুচর শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেলেরও আজ আনন্দের দিন, জয়ের দিন! আজ দেশবাসী তাঁহাকেও সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দিত করিতেছে!

সাইমন কমিটী

পাঞ্জাবের ও বোম্বাইএর মত বাঙ্গালাদেশের ব্যবস্থাপক সভা হইতে সাইমন কমিশনের সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত এক কমিটী গঠিত হইল! সাইমন কমিশনের সমর্থন এ যাবৎ ভারতের এক পাঞ্জাবের সার মহম্মদ সফির মুষ্টিমেয় দল ব্যতীত আর কোথাও হিন্দু মুসলমান করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। যদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বার্থান্বেষী অনুন্নত দলের জন কয়েক লোক ব্যতীত অন্য কেহ নহে। সেই সাইমন কমিশনকে আর যে কোনও প্রদেশের কাউন্সিল সমর্থন করুক বা না করুক, বাঙ্গালার কাউন্সিল যে করিবে না, এ বিষয়ে অনেকে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে, বাঙ্গালার মুখে চূণ-কালী পড়িয়াছে। কমিটীতে ৪ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দু এবং ১ জন খৃষ্টান য়ুরোপীয় সদস্য নিযুক্ত হইলেন, ইঁহারা সাইমন কমিশনের তাঁবেদারী করিবেন, অর্থাৎ তাঁহাদের সাক্ষ্য ইত্যাদির রসদ যোগান দিবেন। যখন সাইমন কমিশন বিলাতে রাজার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন এবং এখানকার কমিটী এখানকার কাউন্সিল হইতে নিযুক্ত হইতেছেন, তখন যে কমিশন উপরওয়ালা ও কমিটী তাঁবেদার বা তল্পীবাহক হইবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সার সাইমন যতই বলুন, কমিটীও তাঁহাদের কমিশনের সমকক্ষ হইবেন, তাঁহার ত সেই সমকক্ষতা দিবার ক্ষমতা নাই। ইহা দ্বারা ভারতবাসীর মাথা হেঁট করা হইল, ভারতবাসীকে নিকৃষ্ট আসন দেওয়া হইল। সাগরপারের প্রভুরা হাতে মাথা কাটুন, তাহাতে আমাদের কথা কহিবার উপায় নাই, কিন্তু আমরা নিজে মাথা পাতিয়া তাহা আজ মানিয়া লইয়া তল্পীদারী করিতে ছুটিলাম; হায় বঙ্গভঙ্গের বাঙ্গালা!—হায় স্বদেশী যুগের বাঙ্গালা!—হায় অসহযোগের যুগের বাঙ্গালা!

মান্দ্রাজের "হিন্দু"পত্র দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব হইয়া বলিয়াছেন,—"আর যে যাহাই করুক, বাঙ্গালার কাছে আমরা আঘাতের আশা করি নাই।" হায় হিন্দু! এ ত আর সে বাঙ্গালা নাই, এ যে বাঙ্গালার কায়া নহে, ছায়া,—বাঙ্গালার কঙ্কাল! বাঙ্গালা মরিয়াছে, বাঙ্গালার রাজনীতিক শ্মশানে আজ প্রেতের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। স্বার্থ-সর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণচেতা লোক এখন ন্যাসানালিষ্টের মুখোস পরিয়া নেতার আসন দখল করিয়াছে, সংবাদপত্রের পবিত্র আসন কলঙ্কিত করিতেছে, সোনার বাঙ্গালার সমাধি হইয়াছে। দুঃখ এই, এ দৃশ্য দেখিতে প্রকৃত দেশমুক্তিকামীকে এখনও বাঁচিয়া থাকিতে হইল!

সাইমন কমিশনের প্রতি দেশের জনসাধারণের মনোভাব কি, আজ তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। সার চুণিলাল মেহতা বোম্বাইএ সাইমন কমিশনের তাঁবেদারী করিবার জন্য এক কমিটী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বোম্বাইএর ব্যবস্থাপক সভায় সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে অন্যান্য কয়েক জন সদস্যের সহিত ডাক্তার আম্বেদকর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক। গত ৭ই আগষ্ট তারিখে যখন তিনি কলেজে পড়াইতে যান, তখন আইন ক্লাসের ছাত্রগণ একযোগে কলেজগৃহ ত্যাগ করিয়া যায়। যাইবার পূর্ব্বে তাহারা এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিল,—

"আপনি কোথায় আমাদের এই তরুণসজ্ঞের নেতা ও পথি-প্রদর্শকরূপে আমাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইবেন ও সত্য ও ন্যায়ের দিকে আমাদের মনে অনুপ্রেরণা প্রদান করিবেন, না, তৎপরিবর্ত্তে দেশের ঘোর সঙ্কটকালে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। যে সাইমন কমিশনকে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশের পক্ষে অপমানকর বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে, সামান্য স্বার্থের খাতিরে আপনি তাহাকে সমর্থন করিয়াছেন, তাহার অধীনে কমিটীতে কার্য্য করা দেশের লোকের পক্ষে লজ্জাকর ও অপমানজনক নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; পরন্তু নিজেও ঐ কমিটীতে সদস্যের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাই আমরা আজ আপনার প্রতি এই অপ্রীতিকর অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছি। এখনও সময় আছে, এখনও কর্ত্তব্যের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করুন।"

ইহার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন হইবে না। যে কাউন্সিল দেশের প্রতি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, তাহার মূল্য কি আছে? মহাত্মা গন্ধী কি এই জন্যই কাউন্সিল বর্জ্জন করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই? যেখানে পদে পদে লোভ ও স্বার্থের টোপ ছড়ান আছে, সেখানে গিয়া স্বরাজসাধনা হইবে, এই আশা করা বাতুলতা নহে কি?

প্রাথমিক শিক্ষা

বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী নবাব মোসারফ হোসেন বাঙ্গালার পল্লী-মফঃস্বলে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে রচিত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে ভাবে পথ-কর (Road-Cess) আদায় করা হয়, সেই ভাবে টাকায় ৫ পয়সা হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদে প্রজার নিকট কর আদায় করা হইবে, এই ৫ পয়সার মধ্যে জমীদার টাকায় ১ পয়সা এবং রাইয়ত টাকায় ৪ পয়সা আদায় দিবে। নবাব সাহেব যুক্তি দিয়াছেন, জমীদাররা সন্তানদিগের শিক্ষার সুবিধা করিতে পারেন, রাইয়তরা পারে না। সুতরাং জমীদারদিগের গায়ে ত এই টাকায় ১ পয়সা কর লাগিবেই না,

আর যাহাদিগের সুবিধার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে অথচ যাহাদের নিজে সে ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য নাই, সেই রাইয়তদিগকে টাকায় ৪ পয়সা মাত্র শিক্ষা-কর দিতে হইবে। বস্তুতঃ রাইয়তদিগের সন্তানরাই প্রস্তাবিত আইনে শিক্ষালাভের সুবিধা পাইবে। সুতরাং জমীদার ও প্রজা পথ-করের মত শিক্ষা-কর দিলে দেশেরই মঙ্গল হইবে।

যুক্তি অতি চমৎকার। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এ দেশে যে অতীব প্রয়োজনীয়, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। যাহা বহু দিন পূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল, তাহা আজ হইতেছে, ইহা কি সরকারের পক্ষে বড়ই গৌরবের কথা? যাহা হউক, এত দিন পরেও যে আসন টলিয়াছে, ইহাও মন্দের ভাল। কিন্তু সে আসন কি কেবল প্রজার বুকে চাপিয়া বসিবার জন্যই টলিল? পুলিসের বাবদে অযথা ব্যয় কমাইয়া অথবা সরকারের সবজান্তা বা বাবুয়ানী ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কিংবা অন্ততঃ বাঙ্গালার নিজস্ব পাট-কর (পাটের রপ্তানী শুল্ক) হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া কি বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা সম্ভব হয় না? দুর্ব্বহ করভারপীড়িত, এক বেলা পেটের অন্ন যোগাইতেও অসমর্থ, বুভুক্ষু, অন্ন-কষ্টপীড়িত, জীবনীশক্তিরহিত দরিদ্র প্রজার উপর আরও করভার চাপাইয়া কি সেই শিক্ষাবিস্তার না করিলেই নহে? এমন শিক্ষাবিস্তার না-ই বা হইল? দেশের শতকরা ১০ জন মাত্র সামান্য লেখাপড়া (প্রাথমিক) জানে বলিয়া শুনা যায়। না হয় ঐ ১০ জনও মূর্খ রহিল, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু যে ভারবাহী জীব আর ভার সহিতে অক্ষম, তাহার পৃষ্ঠে আরও ভার চাপাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় লাভ কি?

আর একটা কথা, আয়করের মত শিক্ষাকর আদায়ের ত প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু আয়কর ও পথকরের পথও যে শিক্ষাকর প্রাপ্ত হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? আয়কর ও পথকর কি উদ্দেশ্যে আদায় করিবার কথা হইয়াছিল? আর আজ সেই সব কর কি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতেছে? শিক্ষাকর প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের নামে এখন প্রজার বুকে জাঁকিয়া বসাইবার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু পরে কি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে, তাহার প্রতিশ্রুতি দিবার কাহারও ক্ষমতা আছে কি?

ফল কথা, দরিদ্র প্রজার উপরে আরও গুরু করভার চাপাইয়া দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন নাই, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। পাটের রপ্তানী শুল্ক হইতে এই ব্যয়টা করিলে ত সকল দিকে শোভন হয়। দরিদ্র কৃষকরাই পাট উৎপাদন করিয়া থাকে—তাহাদের শ্রমলব্ধ বাঙ্গালার খাস সম্পত্তির আয় হইতে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা কি সঙ্গত নহে?

——

মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে!

মাঝে মাঝে আমাদের এই ভারতের মূক জনসাধারণের জন্য কর্ত্তাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—সহানুভূতির প্রেমাশ্রু নয়নপ্রান্তে উথলিয়া উঠে। সম্প্রতি পার্লামেণ্টে ভারতের কথা উঠিয়াছিল—অবশ্য বিলাতের শ্রমিক ও বেকার সমস্যার সম্পর্কে। যাহাই হউক, বেচারী আরল উইণ্টার্টন ভারতের ব্যথায় যত ব্যথী হউন বা না হউন, প্রশ্নবর্ষণের চাপে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িয়া যে প্রাণের কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, "প্রশ্ন ত করো তোমরা সবাই; কিন্তু তোমাদের কয় জন ভারতের বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে সভায় থাক? এক দিন বাদানুবাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাও রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা। এই অল্পসময়ের মধ্যে তোমাদের বহু দিনের গড়া হাজার হাজার প্রশ্নের জবাব আমি দিই কিরূপে? গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষ পক্ষের উচিত, এ বিষয়ে একটা পূরা দিন নির্দ্দিষ্ট করা; কিন্তু তাঁহারা তাহার জন্য কখনও জিদ করেন না। লিবারলরা ত উপস্থিতই থাকেন না। আজ ত মাত্র এক জন লিবারল সভায় উপস্থিত।" বিপক্ষপক্ষের (লেবার পার্টির) মিঃ জনষ্টনও বলেন, "মরশুমের শেষে মাত্র ২।৩ ঘণ্টায় ৩১ কোটি ভারতবাসীর সুখ-দুঃখের কথা আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া তোমাদের বলডুইন সরকারও ভারতের সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা দেখাইয়াছে বটে!"

আমাদের ভাগ্যবিধাতাদের আমাদের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কিরূপ গভীর আস্থা, তাহা ইহা হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং ইহাদের মুখে ভারতের 'মূক জনসাধারণের' প্রতি ভালবাসার কথা শুনিলে সত্যই যদি বাঙ্গালায় প্রচলিত 'মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে' কথাটা মনে পড়ে, তাহা হইলে ভারতবাসীকে দোষ দেওয়া যায় না। কেন যায় না, তাহা বলিতেছি।

লেবার পার্টির মিঃ জনষ্টন ভারতের সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ককালে বলেন,—কৃষি কমিশনের সমক্ষে যে সকল সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের সমস্যা রাজনীতিক নহে, 'পেট'-নীতিক, অর্থাৎ অপ্রচুর আহারই হইতেছে ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে সকলের অপেক্ষা কঠিন সমস্যা। তাই তিনি বলেন যে, রাইয়তের ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিবার জন্য খাজনা কমাইয়া তাহাদের শস্য উৎপন্ন করিবার সমধিক সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত এবং এ জন্য আধুনিক কালোপযোগী ভূমিকর্ষণাদির যন্ত্র তাহাদিগকে সরবরাহ করা উচিত। আর এক সদস্য বলেন, যে সাম্রাজ্যিক সরকারী ঋণ গ্রহণ করিবার আয়োজন হইতেছে, তাহা হইতে ভারতের কৃষিব্যবসায়ীর সেচের টাকা সরবরাহ করা এবং যৌথ সমিতি সমূহ সমধিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কয়েক জন সদস্য ভারতের কৃষক ও শ্রমিকের ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করিবার পর শ্রীযুক্ত শাকলাতওয়ালা সভার মধ্যে এক 'বোমা' 'ফেলিয়া দেন, অর্থাৎ এমন এক কথা বলেন, যাহাতে সকলের প্লীহা চমকিত হইয়া যায়। তিনি বলেন, "ভারত হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা।" অর্থাৎ তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, ভারতে যত দিন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত দিন এই ভাবের জোড়াতাড়া দেওয়া কাযে কোন ফল হইবে না। কথাটা বোধ হয়, শ্রোতৃবর্গের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছিল। তাই মিঃ পার্সেল তীব্র কণ্ঠে বলিলেন,—

"দেখুন, সাম্রাজ্যিকতার জন্য ভারত কষ্টভোগ করিতেছে না, কষ্টভোগ করিতেছে পেটের যন্ত্রণার জন্য। ভারত পেটের অন্ন চাহে, কিন্তু ধলার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড কালার হস্তে প্রদান

করিলে সেই পেটের অন্ন জুটিবে না। 'নেটিভ' গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই অবস্থার উন্নতি হইবে না। তাহা হইতে বৃটিশ ও ভারত গভর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের শ্রমিকগণকে শ্রমিক সমিতি সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই তাহারা প্রভুদিগের যথেচ্ছাচারিতার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে।"

শাকলাতওয়ালা ভারতের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইয়া যতই অপরাধ করিয়া থাকুন, তিনি কিন্তু স্বয়ং ভারতবাসী এবং ভারতবাসীর সুখদুঃখের কথা সম্যক্ অবগত আছেন। তিনি শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন কামনা করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। ভারতবাসীরা এই শাসনপদ্ধতির কামনাতেই স্বরাজ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। মিঃ জনষ্টোন ও পার্সেল প্রমুখ শ্রমিক সদস্যরা ভারতবাসীর সুখদুঃখের কথা কি জানেন? ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকের ব্যথায় ব্যথা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা 'ভারতবন্ধু' আখ্যা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশের মূলে কি গূঢ় কারণ নিহিত আছে? মিঃ জনষ্টোন স্পষ্টই বলিয়াছেন, মূক জনসাধারণের ক্রয়ের ক্ষমতাবৃদ্ধি করিলে তাহাদের অন্নকষ্ট দূর হইবে। এই 'ক্রয়ের ক্ষমতার' অন্তরালে কি গূঢ় ইঙ্গিত নিহিত আছে? বিলাতের পণ্য ভারতের বাজারে অধিক বিক্রীত হইতেছে না। এ জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারের অনেক তাঁতী বেকার বসিয়া আছে। অন্যান্য বিলাতী পণ্য সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। তবেই ত বুঝা যায়, ভারতীয় জনসাধারণের ক্রয়ের ক্ষমতাবৃদ্ধির অন্য নাম কি বিলাতের বেকারসমস্যা সমাধান নহে? তবেই কি পার্লামেণ্টের সদস্যদের এই ভারতীয় প্রীতির মূল কি বুঝা যায় না?

তাহার পর কৃষকদের কৃষির যন্ত্রাদি সরবরাহের দ্বারা অবস্থার উন্নতিসাধনের সম্পর্কে আরল উইণ্টার্টন যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অতি চমৎকার! তিনি বলেন, "কৃষি বিভাগে ভারত-সচিবের হস্তক্ষেপ করা নিয়মানুগ পথের অনুযায়ী কার্য্য হইবে না। কারণ, ঐ বিভাগটি মণ্টেগু সংস্কারের দ্বারা হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। এ সকল ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সমূহের এবং মন্ত্রীদিগেরই সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে!"

বাটীর কর্ত্তা সিন্দুকের চাবিকাঠি হাতে রাখিয়া কর্ম্মচারীকে বলিলেন, 'যাও, জনমজুরদের মাসিক বেতন দিয়া দাও, পুকুর কাটাইবার যন্ত্র কিনিতে দাও।' ইহাও যেমন চমৎকার, আরল উইণ্টার্টনের উক্তিও কি তেমনই চমৎকার নহে? ভারতে ব্যবস্থাপক সভা ও মন্ত্রিমণ্ডলী আছে, এ কথা সত্য। ভারতের শাসনব্যাপারে হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত বিভাগ আছে, এ কথাও সত্য। কিন্তু সভা ও মন্ত্রী ও তথা হস্তান্তরিত বিভাগের ক্ষমতা কতটুকু? সংরক্ষিত বিভাগের রাজস্ব-সচিব সিন্দুকের চাবিকাঠি স্বহস্তে রাখিয়া থাকেন। কৃষির জন্য যন্ত্রাদি কিনিতে সেই চাবি কি তিনি হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে ছাড়িয়া দেন? যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিদ্বয় যখন পদ ত্যাগ করেন, তখনই তাঁহারা ত পদত্যাগপত্রে অবস্থাটা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আরল উইণ্টার্টন যদি উটপাখীর মত সাইমুমের ভয়ে বালুকারাশির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ভাবেন, ঝড় উঠে নাই, তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে ঝড় উঠে নাই? তিনি শাক দিয়া মাছ ঢাকিলেই মাছ ঢাকা পড়িবে না। সূর্য্যালোক কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না!

কথা হইতেছে, কেবল ভারতের 'মূক জনসাধারণের' ব্যথায় বুক চাপড়াচাপড়ি করিলে কষ্টের আন্তরিকতা প্রদর্শিত হইবে না, কার্য্যে উহার পরিচয় দিতে হইবে। যদি যথার্থই ভারতের রাজনীতিকরাই 'মূক জনসাধারণের' স্বার্থের হন্তারক হয়, তবে তাহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া সত্য সত্য 'মূক জনসাধারণের' জঠরানল নিবারণে আন্তরিকতা দেখাইলেই ত হয়। আপাততঃ বালুর ঘাট, বাঁকুড়া, খুলনা, বর্দ্ধমান, বীরভূমে তাহার পরিচয় দিবার ত প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

মিঃ আর্কার্ট শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের স্থানে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক যদুনাথ বিদ্বান্ ও পণ্ডিত লোক, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে কেবল পাণ্ডিত্য থাকিলে নেতৃত্ব করা যায় না। যে প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্বরূপ তরুণসঙ্ঘের চরিত্র গঠিত হয়, তাহাকে দেশের ভাবধারার অনুযায়ী করিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা যাঁহাতে সম্যক্ পরিস্ফুট, যিনি কেবল প্রতিভাবলে নহে, নিজের ব্যক্তিত্ব দ্বারাও সেই প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই ইহার নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া দেশবাসীর নিকট পরিগণিত হইতে পারেন। পরলোকগত সার আশুতোষে এই গুণ সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার জাতীয় বিদ্যামন্দিরে—দ্বিতীয় নালন্দায় পরিণত করিবার অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এ জন্য তিনি বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে এই মন্দিরে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক যদুনাথ প্রতিভাবান্ প্রত্নতাত্ত্বিক, গভীর গবেষণায় পারদর্শী পণ্ডিত হইলেও তাঁহাতে আশুতোষের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যে নির্ভীকতার, তেজস্বিতার ও জাতিত্বগর্ব্বের স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন হইয়া সার আশুতোষ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহার অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল, তাঁহার স্বহস্তে গঠিত বাগদেবীর স্বরাজ-সৌধের উন্নত শীর্ষ অনবত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার বড় সাধের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ বিরোধ-স্বার্থসংঘর্ষের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। পরন্তু বাঙ্গালীর বাগদেবীর স্বরাজমন্দিরে আবার সরকারের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব হস্তান্তরিত হওয়ায় ব্যক্তিগত হিসাবে অধ্যাপক যদুনাথের জন্য দুঃখ হইলেও জনসাধারণের মঙ্গলের হিসাবে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। তবে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, চ্যান্সেলার মিঃ আর্কার্টের নিয়োগে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে

পারেন নাই। অধ্যাপক আর্কার্ট আজ প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ এ দেশের শিক্ষার্থী তরুণগণকে শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারও পাণ্ডিত্যের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালার এই জাতীয় জাগরণের দিনে বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার ভার এক জন বিদেশীয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া চ্যান্সেলার এক ভ্রম হইতে অন্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিদেশী পণ্ডিতের পদতলে বসিয়া এ দেশের নবীন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহাদের শিক্ষার গতিপ্রকৃতি, তাহাদের জাতীয় ভাবধারার অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে বিদেশীয়ের নেতৃত্ব কতটুকু ফলদায়ক হইবে, তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা কি সরকারের কর্ত্তব্য ছিল না? দেশীয় প্রতিভাবান্ পণ্ডিতগণের মধ্যে এক জনও কি সেই পদের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইলেন না? স্বায়ত্ত-শাসনের বিস্তারের উদ্দেশ্যে যখন সাইমন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া দুন্দুভিনাদে বিঘোষিত হইতেছে, তখন বাঙ্গালার তরুণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশীয়ের হস্তে নেতৃত্ব অর্পণ করা কি সঙ্গত হইয়াছে?

সাইমন কমিশন

বাঙ্গালা কাউন্সিলে মুসলমান সদস্যদিগের ভোটাধিকার ফলে সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য কাউন্সিল হইতে কমিটী গঠিত হইল, এই কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ সেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না বিলাতে থাকিয়া সকল শ্রেণীর ইংরাজের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সাইমন কমিশন সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমি লণ্ডনে বাস করিবার কালে ভারতবর্ষের প্রতি ইংরাজ জাতির মনোভাব কি, অবগত হইবার জন্য স্বভাবতঃ উৎসুক হইয়াছিলাম। এ জন্য আমি যাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছি। ফলে জানিয়াছি যে, ইংরাজকে যুক্তিতর্কের দ্বারা ভারতের দাবী বুঝানর কোন আশা নাই। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত—ভাল হউক বা মন্দ হউক—ভারতের উপর চাপাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর। যে কয় জন মুষ্টিমেয় ভারত-হিতৈষী ইংরাজ আছেন, ইংরাজের রাজনৈতিক জগতে তাঁহাদের কোন প্রতিপত্তি নাই। আমি বুঝিয়াছি যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্কন্ধে সাইমন কমিশনটি (বর্ত্তমানে যে অবস্থায় গঠিত, সেই অবস্থাতেই) চাপাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। লেবার পার্টিও এমনভাবে কাষ করিয়া বসিয়া আছেন (কমিশনে নিজের দলের লোককে সদস্য হইতে দেওয়া ইত্যাদি), যাহাতে তাঁহারা কমিশনকে সমর্থন না করিয়া পারেন না। ভারতবাসীর পক্ষে ইহার একমাত্র উত্তর আছে। তাহারাও এই কমিশন বর্জ্জন করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে যেন বিচ্যুত না হয়। যাহারা মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া আছে যে, ভারতবাসীর বর্জ্জনের সঙ্কল্প শিথিলমূল হইয়া যাইবে বা একবারেই ভঙ্গ হইবে, ভারতবাসী নিজের কার্য্য দ্বারা তাহাদের সেই মোহ দূর করিয়া দিউক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাহারা ভারতবাসীকে তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে কৃতসঙ্কল্প অথবা যাহারা স্বকৃত ভ্রমপ্রমাদ স্বীকার করিয়াও তাহা সংশোধন করিতে সম্মত নহে, তাহাদিগকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে যাওয়া কেবল অনর্থক সময়ের অপব্যয় করা মাত্র।"

যাঁহারা বিলাতে থাকিয়া আমাদের 'ভাগ্যবিধাতাদের' সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতের জন্মগত অধিকারের দাবীর বিষয়ে বিচার আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের দেশের কাউন্সিলাররা হঠাৎ বেশী বুঝিয়া ফেলিয়াছেন যে, সাইমন কমিশনই আমাদিগকে আকাশের চাঁদ হাতে ধরিয়া দিবে। হাঁ, এ কথা সত্য যে, এঁটো-কাঁটা হাড়ের টুকরা পরিবেষণের সময়ে হয় ত আমাদের কাহারও পাতে দুই চারিখানা বেশী পড়িতে পারে, আবার কাহারও বা পাতে দুই চারিখানা কম পড়িতে পারে। কিন্তু মূলে যে আমরা আসলের কিছুই কমিশনের মারফতে পাইতে পারি না—কাহারও মারফতে পাইতে পারি না, তাহা এখনও বহুসংখ্যক দেশবাসী বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহাই দুঃখ। লোকমান্য তিলকের বজ্রবাণী—"স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার"—এখনও দেশের দিকে দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যাহা আমাদের জন্মগত অধিকার, তাহা আমাদের সহজাত, তাহার ভোগ করা বা না করা আমাদের ইচ্ছা, উদ্যম ও আগ্রহের উপর নির্ভর করে,—জগতের লাট-বেলাট বা সম্রাট্-বাদশাহ তাহা আমাদিগকে দিতে পারেন না।

সতী

বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুনারী স্বামীর চিতাশয্যায় স্বেচ্ছায় অথবা পারিপার্শ্বিক কারণে দেহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। যুগধর্ম্মের প্রভাবে ও পরিবর্ত্তনে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ আইনের দ্বারা সে প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। আত্মহত্যা মহাপাপ, সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, আমরা আত্মহত্যারই বিরোধী। সতী-দাহ প্রথার তিরোধান সে হিসাবে অবশ্যই মঙ্গলজনক বলিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে heridity বলে, সেই বংশধারা বা কৌলিক গুণ বা দোষ জাতির অস্থিমজ্জা ও রক্তে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাহা কোনও কালে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি বা জাতির মধ্য হইতে অন্তর্হিত হয় না। ইহা পূর্ব্বকালের ঋষিরা ত স্বীকার করিতেনই, বর্ত্তমান যুগের প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবহমানকাল হইতে যে আবেষ্টন, ঐতিহ্য ও ভাবধারার প্রভাবে মনোবৃত্তির বিকাশ হইয়া আসিয়াছে, তাহা আইনের দ্বারা শৃঙ্খলিত হইলেও লুপ্ত করা অসম্ভব। স্বামী সম্বন্ধে হিন্দুস্ত্রীর যে পরম্পরাগত মনোবৃত্তি, তাহা প্রতীচ্য প্রভাব ও শিক্ষার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে কোন কোন স্তরের কোন কোন নারীর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সাধারণভাবে কৌলিকগুণ লুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সতীদাহ প্রথা দেশের মধ্য হইতে দীর্ঘকাল অন্তর্হিত হইয়াছে,

সত্য, কিন্তু এখনও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, চিতাশয্যায় না হউক, স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কায়, নারী সুস্থ দেহেও অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—তা হৃদ্‌রোগ, অপস্মার বা মস্তিষ্ক-বিকার প্রভৃতি যে কোনও নামে তাহাকে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়-কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বিদুষী পত্নী নলিনী রায়ের আত্ম-হত্যার ঘটনা ঠিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিজয় বাবু পুনা-স্থিত আবহ বিভাগের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার সুশীলা পত্নী নলিনী রায় যেমন বিদুষী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। দাম্পত্যজীবনে তাঁহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই ছিল না। এক দিন তিনি ভোরবেলা একটা দুঃস্বপ্ন দেখেন—যেন স্বয়ং শীতলা দেবী তাঁহার অলঙ্কার বল-পূর্ব্বক খুলিয়া লইতেছেন। আপত্তি করায় তিনি শুনিলেন, দেবী যেন বলিতেছেন যে, তিনি বিধবা হইয়াছেন, সুতরাং অলঙ্কার ধারণের অধিকার তাঁহার নাই। নলিনী দেবী এই বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নের কথা তাঁহার স্বামী অথবা শ্বশ্রূমাতাকে জানিতে দেন নাই; অথচ স্বপ্নের বিভী-ষিকা অনুক্ষণ তাঁহাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিতে থাকে। বিজয় বাবু পত্নীর স্বাস্থ্যহানি দেখিয়া তত্রত্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। ঔষধাদি সেবনে বাহ্য উপকার কিছু হইল; কিন্তু বিভীষিকা অচল অটলই রহিল। চিকিৎসকও বহু চেষ্টা করিয়াও স্বপ্নের কথা জানিতে পারেন নাই। বিগত ৩০শে জুন রাত্রি-কালে স্বামী ও সন্তানদিগকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া তিনি কোলের শিশুকে লইয়া ভিন্ন শয্যায় শয়ন করেন। বিজয় বাবু মধ্যরাত্রিতে গৃহপ্রাঙ্গণে একটা আর্ত্ত চীৎকার ও বহু মনুষ্যের পদশব্দে জাগ্রত হন। পত্নীকে শয্যায় শয়ান না দেখিয়া শঙ্কিতভাবে বাহিরে গিয়া দেখেন, বহির্ব্বাটীর স্নানাগারে আগুন জ্বলিতেছে এবং পাড়ার বহু লোক তথায় উপস্থিত। পাছে অন্তঃপুরের স্নানাগারে আত্মহত্যার ব্যাঘাত ঘটে, এ জন্য বহির্ব্বাটীর স্নানাগারে নলিনী দেবী আত্মহত্যা করেন। পার্শ্বের বাটীর লোকজন আগুন জ্বলিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসে। কিন্তু স্পিরিটসিক্ত বস্ত্র এমনভাবে ধরিয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকে রক্ষা করা যায় নাই। অগ্নিদাহের অসহ্য যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, শুধু প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে একবার চীৎকার করিয়া-ছিলেন। আত্মহত্যার পূর্ব্বে তিনি স্বামী ও সহোদরাকে দুই দুইখানি পত্র লিখিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন। পত্রে লেখা ছিল, স্বপ্নের বিভীষিকা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে স্বামীর মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু দয়িতবিহনে জীবনধারণ বিড়ম্বনা—তাই স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য মহাপাপ জানিয়াও তিনি আত্মহত্যা করিলেন! কোন অবস্থাতেই আত্মহত্যার আমরা পক্ষপাতী নহি; কিন্তু এই মনোবৃত্তি—স্বামীর জন্য স্ত্রীর আত্মত্যাগ—ইহাকে সমালোচনা করিতেও লেখনী স্তম্ভিত হইয়া যায়। মনে হয়, হিন্দু নারীর অস্থি-মজ্জায়, শোণিতধারায় সতীধর্ম্মের যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাকে ধ্বংস করা মনুষ্যশক্তির অতীত। আমরা বিজয় বাবুর এই মর্ম্মান্তিক শোকে সান্ত্বনার ভাষা ব্যবহার করিতে অসমর্থ।

নলিনী দেবী

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়

আয়ুর্ব্বেদসম্মত রোগ-চিকিৎসা এ দেশের লোকের ধাতুসহ, এ কথা ক্রমেই দেশবাসী বুঝিতেছেন। পূর্ব্বে দেশের আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়

ব্যবসায়ী চিকিৎসকের যে সম্মান এবং যে প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছে, এখন তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা প্রচারকল্পে এখন যত চেষ্টা হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

আমরা এই জন্ম যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্যশালার প্রতিষ্ঠা, পুষ্টি ও উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে কবিরাজ যামিনীভূষণের অক্লান্ত পরিশ্রম, অশেষ ত্যাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা বাস্তবিকই বিস্ময়কর এবং অনুকরণযোগ্য। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন অকালে ইহলোক ত্যাগ না করিলে এই প্রতিষ্ঠান যে সাফল্যের সমধিক উচ্চশিখরে আরোহণ করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যামিনীভূষণ ১৩৩২ সালে ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটে মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ায় এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে তথায় স্থান সঙ্কুলান না হইলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৮।১৯ শ্যামবাজার ব্রীজ রোডে মাসিক ২ শত ২৫৲ টাকা ভাড়ায় বিদ্যামন্দির উঠাইয়া লইয়া যান।

ঔষধ বিভাগ

বর্ত্তমানে যে জমীর উপর এই বিদ্যালয় ও দাতব্য আরোগ্যশালার বিরাট হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা কলিকাতা করপোরেশনের দান; উহার পরিমাণ প্রায় এক বিঘা ১৪ কাঠা। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গন্ধী এই বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। করপোরেশন হইতে এ বিষয়ে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে।
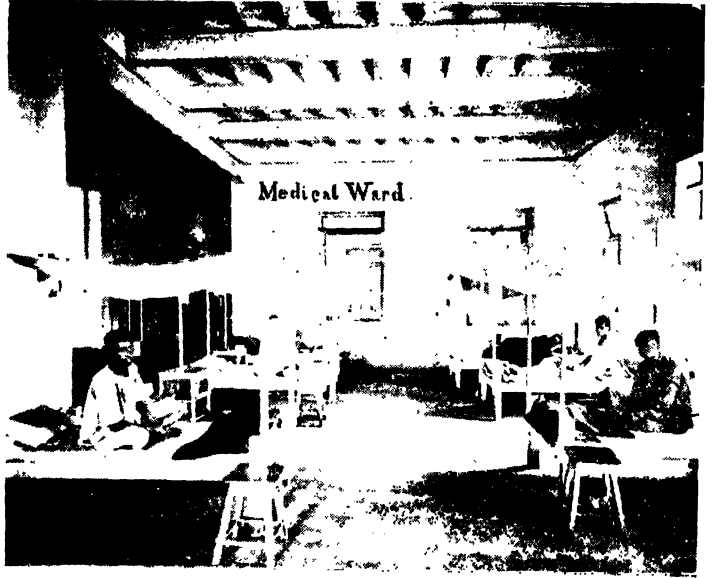
কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৩৩৩ সালে মাত্র দুই দিনের অসুস্থতায় কবিরাজ যামিনীভূষণ অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহারই প্রাণপাত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের যন্ত্রশালাগার, ভৈষজ্য পরিচয়াগার, বিকৃত শারীর দ্রব্যসম্ভার ও শরীর পরিচয়াগার প্রভৃতি গঠিত ও পু[illegible] হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন গৃহনির্ম্মাণকল্পে যামিনীভূষণ ৭০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে এই বিদ্যালয়ের হাঁসপাতালের উন্নতিকল্পে বালীগঞ্জে ১[illegible] কাঠা জমী, গ্রে ষ্ট্রীটে ৬ কাঠা জমী, পাতিপুকুরে অট্টালিকাসম্বলিত ১২ বিঘা বাগানবাটী, রাঁচী ও কারসিয়াংয়ের স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতি বহু সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

অস্ত্রচিকিৎসা বিভাগ

তাঁহার অভাবে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ভগ্নোৎসাহ হন নাই, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই বিদ্যামন্দির ও হাঁসপাতালাদির নির্ম্মাণকল্পে অর্থসাহায্য করিতে কার্পণ্য করেন নাই। পাঁড়ে মহাশয় কেবল আট সহস্র টাকা
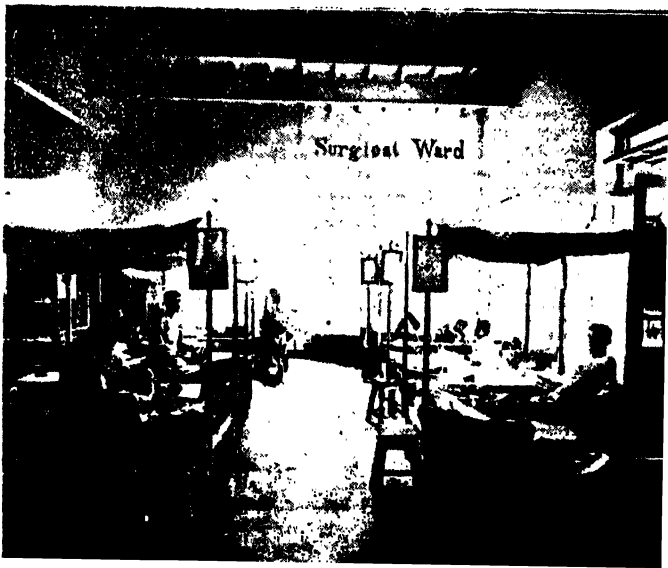
দান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি এই আরোগ্যশালার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার কলিকাতায় সম্পত্তির আয় হইতে বার্ষিক ৪ হাজার টাকা দানের জন্য ট্রাষ্ট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠান যাহাতে স্থায়ী ও ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া দেশবাসীর অশেষ কল্যাণসাধনের উপযুক্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে। কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া আরোগ্যশালা পরিদর্শনে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়াছেন।

কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান প্রথম দৃষ্টিতে যত বড়ই মনে হউক না কেন, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিসাধনের হিসাবে ইহা সমুদ্রে শিশির-বিন্দুতুল্য। প্রয়োজন অতি বৃহৎ, অথচ আয়োজন আশানুরূপ নহে, এ অবস্থায় যাহা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই হইতেছে। এই দেশীয় বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের সম্যক্ উন্নতিসাধন করিতে হইলে আরও অধিক চেষ্টার প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে, তাহার উপর স্ত্রীরোগ বিভাগ, যক্ষ্মা বিভাগ, উন্মাদরোগ বিভাগ, শিশুচিকিৎসা বিভাগ প্রভৃতির উদ্বোধন করা বিশেষ আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন শুশ্রূষাকারিণীদিগের এবং চিকিৎসকগণের জন্য স্বতন্ত্র বাসভবন নির্ম্মাণ করা, আরোগ্যশালাকে বর্দ্ধিতায়তন করা—এমন অনেক কায অবশিষ্ট রহিয়াছে।

দেশের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারে দেশবাসী যত্নবান্ হইলে এই কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। দেশে সুবাতাস বহিতেছে, এ সময়ে দেশের লোক এই প্রতিষ্ঠানটি সজীব করিয়া তুলিতে বিমুখ হইবেন না, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি। দশে মিলিয়া কায করিলে একের দ্বারা যাহা করা অসম্ভব, তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

১নং—ভাস্কর-মূর্ত্তি

বাঙ্গালী ভাস্কর

অধুনা বাঙ্গালীর প্রতিভা নানা দিকে নানাভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। সুবিধা ও সুযোগ পাইলে বাঙ্গালী অনধ্যুষিত পথে অগ্রসর হইয়া সাফল্যের গৌরবমুকুট শিরে ধারণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে বিরল নহে। ভাস্কর্য্য বিদ্যায় বাঙ্গালী বিদেশে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, এমন একটি দৃষ্টান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ রায় ৪৫ বৎসর বয়সে প্রতীচ্যের ভাস্করসমাজে সমাদরলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই ভাস্কর্য্যবিদ্যায় তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। আন্তরিক আগ্রহ ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। অশ্বিনীকুমারে তাহার অভাব ছিল না। তিনি ব্র্যাডফোর্ড নগরে এক পল্লীতে বসবাস করিয়া একাগ্রচিত্তে ভাস্কর্য্যশিল্পের সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। এখন বিলাতেই তাঁহার দেশবিশ্রুত নাম, বহু বিশিষ্ট সংবাদপত্রে তাঁহার ভাস্কর্য্য-বিদ্যাজ্ঞানের অশেষ খ্যাতি প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার 'বেদব্যাস', 'বেকার' ও 'ক্যালভারির যন্ত্রণা' প্রভৃতি স্বহস্তগঠিত মূর্ত্তিসমূহের নাম আজ সর্ব্বজনবিদিত।

২নং—ভাস্কর-মূর্ত্তি

১৪
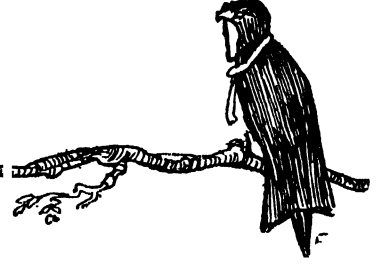
আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দ্বাদশ বর্ষ ধ'রে কৃষ্ণনগর মিউনিসি-প্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান যে ভদ্রলোকটি নির্ব্বাচিত হয়ে আসছিলেন এবং গত ইষ্টারের ছুটীতে-ও স্থানীয় করদাতৃ সভা যাঁকে একখানি অভিনন্দন দান করেছিলেন, এখন সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, তিনি এক জন ঘোর স্বার্থপর, 'আপকাওয়াস্তে'। মিউনিসিপ্যাল মেথরাণী বিনা বেতনে তাঁর অন্দর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করে, মিউনিসিপ্যাল আফিস থেকে তিনি বাড়ীর জন্য ফিনাইল আনান, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের টিউব ওয়েলের জল দু'কলসী ক'রে রোজ তাঁর বাড়ীতে এক জন চাপরাসী কাঁধে ক'রে পৌছে দেয়, গয়লানী টাকার তাগাদা করলেই ভাইস-ভার্য্যা ভয় দেখান, বাবুকে ব'লে দিয়ে দুধে জল দেওয়ার অপরাধে তাকে 'বেঞ্চে'র সামনে দাঁড় করাবেন, আর তাঁর ছেলে গেল বার আই-এ, পাশ করার পর যে প্রীতি-ভোজন হয়, তার জন্য ক্ষোয়ারাম কনট্রাক্টর ৫টা খাসী দিয়েছিল।

আসছে ইলেক্‌সনের আর মাস কয়েক বাকী আছে, চেয়ারস্থ ভাইস-ম্যান শঙ্কিত হলেন; অনেক ইংরাজী বাঙ্গালা কাগজে প্রেরিত পত্র ও সম্পাদকীয় ছত্রচ্ছলে ভাইসের ভাইস-রাশির কথা আর বাসি হয়ে পড়তে পেলে না।

একটু আগে বলা গেছে যে, কৃষ্ণনগর অবসাদের চাদর মুড়ী দিয়ে অসাড় হয়ে পড়েছিল; পাপপ্রাণ দেশদ্রোহী ভাইসের প্রসাদে সরভাজার রাজ্য আবার তাজা হয়ে খাড়া হ'ল। সপ্তাহান্ত ফাঁক যায় না, প্রতি শনি-রবি বারেই সভা, মুখ্য উদ্দেশ্য মিউনিসিপ্যাল সংস্কার, প্রধান বক্তা বা সভাপতি 'জেলা-জলোজ্জ্বল' শ্রীযুত ব্রজমোহন। দেশ ব্রজমোহন ব্যাঙ্গাচির 'বাবু' লেজটি খসিয়ে তাঁকে 'জেলা-জলোজ্জ্বল' উপাধিটি দিয়েছে।

ভাইস-চেয়ারম্যানের দোষে মিউনিসিপ্যালিটীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে দেশহিতৈষী নাগরিকরা সভাদি সহজ চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌জেক্‌সনের-ও ব্যবস্থা করলেন। এক শুভপ্রাতে সহর শিহরে উঠল শুনে যে, মেথর, ঝাড়ুদার, ময়লা-ফেলা গাড়ীর গাড়োয়ান ইত্যাদি কর্ম্মিগণ সব ষ্ট্রাইক করেছে। রাস্তায় রাস্তায় স্তূপে স্তূপে আবর্জ্জনা, গলিজের গন্ধে গলির ভিতর বাস বা প্রবেশ দুঃসাধ্য; পাঁচ দিনের দিন কলেরা দেখা দিলে। ইটের চোটে ভাইস-চেয়ারম্যানের গাড়ীর দরজা দুটি চৌচির, তিনি ভাড়াটে গাড়ী আনিয়ে নতুন নতুন রাস্তা দিয়ে তবে কাছারী যান।

এমন সময় এক দিন রাস্তায় ঢোল বেরুল···টাউনহলের মাঠে আগামী শনিবার অপরাহ্ণে বিরাট সভা। খোলা জমীর উপর সতরঞ্চ পাতা, সেখানে মেথরাদি মহাশয়কে অভ্যর্থনা ক'রে বসাবার জন্য আট দশ জন যুবক, কেউ বা হাত জোড় ক'রে, কেউ বা ফুলের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; পথি-পার্শ্বস্থ ছাদের উপর থেকে একসঙ্গে শত শঙ্খধ্বনি হচ্ছে; এমন সময় সভাপতি ব্রজমোহন সভাস্থলে উপনীত হলেন। আজ তাঁর পরিধানে খুব মোটা ন' হাতি কুমিল্লার খদ্দর, বুকে পিঠে ঐ মার্কা ফতুয়া, গাত্রে তদ্বৎ চাদর আর একেবারে নগ্ন পদ। "জেলা-জলোজ্জ্বল কি জয়" "জেলা-জলোজ্জ্বল কি জয়" রবের ঘন ঘন আঘাতে বায়ুমণ্ডল ব্যথিত হয়ে উঠলো। ব্রজমোহন প্রথমে-ই দুই হাত বাড়িয়ে সর্দ্দার মেথরকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন, সে সময়ে সভাস্থ বৃদ্ধরা-ও আনন্দাশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। ভাবে বিভোরা সর্দ্দারণী-ও এগিয়ে আসছিল; কিন্তু ব্রজমোহনের জানা ছিল যে, রাস্তার ওপারের বাড়ীর খড়খড়ির ফাঁকের ভিতর আছে ব্রজমোহন-মোহিনীর দু'টি নীলোৎপল লোচন, তাই দূর হ'তে "মাতৃজাতির সেবা-ধর্ম্ম প্রতিমা, তোমায় আমি নমস্কার করি" ব'লে আসনে গিয়ে উপবিষ্ট হলেন।

সর্টহ্যাণ্ড পাশ করা ছোকরা রিপোর্টাররা বাঙ্গালা বক্তৃতার পুরোপুরি নোটিশ লওয়াটা একটু হীনতা মনে করেন, তাই

ব্রজমোহনের সে দিনকার সেই লেকচার অমরত্বের খাতায় স্থান পেলে না।

তিনি কত কি-ই যে বলেছিলেন, আর তার মধ্যে বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপ্যালিটী, কোপেন্-হেগেন্ টাউন কাউন্সিল, জাঞ্জিবার বেরিয়াল কমিটী, রাইও-ডি-জেনেরো সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতির তুলনায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী যে কত অজ্ঞান-অন্ধকারিত, স্বার্থমানসিত, অপারগ হস্তে বিধ্বস্ত. তা দেখিয়ে অতি ত্বরায় মেথর মহাশয়দিগের মাসিক অনোরেরিয়াম বা মর্য্যাদা যাহা দেওয়া হয়, তাহা বৃদ্ধিকরণ, ধাঙ্গড়কুমারদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা এবং কেশ-কুসুমদাম-দোদুল্যা বাল্‌তিবাহিনী মহিলাকুলের বিচরণ জন্য পদাপার্ক ও মুখামৃত সঞ্জীবনী জর্দ্দার ব্যবস্থা ত্বরায় করা কর্ত্তব্য। "এখনি বা কখন না! এখনি বা কখন না, এখনি বা কখন না।" নাউ অর নেভার!

আবেগের দোক্তার উগ্রতা যখন বক্তার রসনাকে উত্তপ্ত ক'রে শব্দ-সাইক্লোনের সৃষ্টি করে, ভাষা যেন তখন নেশার ঝোঁকে অলঙ্কারের ঝঙ্কারে নৈষধকে-ও হর্ষহীন ক'রে তোলে। অর্থ? কে কবে কোথায় অলঙ্কারের খাতিরে অর্থের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেছে? নেকলেসের জন্য আরজী পেশ হ'লে কোন্ সুশীল সুবোধ স্বামী অর্থনাশের শঙ্কায় ইতস্ততঃ করতে প্রস্তুত?

ব্রজমোহনের বক্তৃতার ফলে কৃষ্ণনগরবাসী মহোদয়-মহোদয়াগণ জানতে পার্‌লেন যে, আমেরিকার রাস্তায় যে আজ ঝাড়ু দেয়, কাল সে অনায়াসে হেল্‌থ অফিসার হয়ে যেতে পারে; সেখানকার জুতাসেলাইওয়ালারা অবসরের অভাবে ভোট আদায় কর্‌তে বেরুতে পারে না, তাই প্রেসিডেণ্ট হয় না। আর সভ্যতা-সুমেরুর সুবর্ণশিখরে শুভ্র চরণ স্থাপিত ক'রে রুসিয়াসুন্দরী আজ জগৎকে দেখাচ্ছেন যে, তাঁর সেদিনকার হীরকহার-গরবিণী কাউণ্টেস আজ প্যারিস হোটেলের দাসী, তাঁর কৃপাভাগিনী রজকিনী সোভিয়েটের সদর-মেট।

১৫

সাদা কথায় সেকালে যেটাকে 'দল পাকান' বোলতো, ইদানীং তার নাম হয়েছে 'অর্গানিজেশন'। অর্গানিজেশন করতে হ'লে শক্তির আবশ্যক; এ শক্তি নিহিত বাহুতে নয়, বিদ্যায় নয়, অভিজ্ঞতায় নয়, কার্য্যতৎপরতায় নয়, সততায়-সম্পদে-ও নয়। যেমন যে লোক চারের ব্যবহারে অভিজ্ঞ, সেই ইচ্ছায় এক-ই পুষ্করিণী হ'তে মাগুর মৃগেল চিংড়ী রুই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মৎস্য বঁড়শীতে গাঁথতে পারে, তেমন-ই যে যোগাড়-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন, সেই অর্গানিজেশন বা দল পাকাতে জানে। ছিপের অনুরূপ এ দলপতিদের-ও অমনি একটি যন্ত্র আছে—তার নাম 'হুইপ'।

কলিকালে যোগাড়ের কাছে যোগ্যতা পরাজিত। এক চাষীর ক্ষেতে বিস্তর শসা ফলেছে, কিন্তু তা'র শসা রোজই চুরি যায়, অথচ সে ধর্‌তে পারে না। এক দিন দুপুরবেলা সে হঠাৎ ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে দেখে যে, এক জন কালো বামুন শসা ছিঁড়ছে আর গামছায় বাঁধছে, চাষী ত একবারে হুমকে গিয়ে তার হাতখানা ধ'রে বল্লে, "ও বামুন, তুমিই এমনি ক'রে আমার সর্ব্বনাশ কর? চল, আজ তোমায় ফাঁড়িতে দিয়ে তবে ছাড়বো।"

বামুন ঠাকুর ত রেগে অগ্নিশর্ম্মা, বল্লেন, "তবে রে পাষণ্ড, চোতের রোদ্দুরে ব্রাহ্মণ তেতে-পুড়ে তেষ্টায় একটা ডিমের শসা গালে দিয়েছে, তা তুই তাকে থানায় দিবি! তোর জেতের ভাগ্যি—ক্ষেতের ভাগ্যি যে, দেবতা তোর শস্যি পেসাদি ক'রে দিয়েছে।"

চাষী। একটা আধটা ছিঁড়ে খেলে কোন্ সুমুন্ধি মুয়ে রা কাড়তো; তুমি যে পুঁটুলী বেঁধে নে পালাচ্ছেলে।

বামুন। লেব না! ঘরে ছেলেমেয়েগুলো রয়েছে, তাদের দুটো দেব না? বাগ্দী বৌ অরুচিতে ওক্ তুলে তুলে খুন হচ্ছে, কচি কচি দেখে তার জন্যে-ও পাঁচ সাতটা নিচি, তা হয়েছে কি?

চাষী। হচ্ছে চুরি, আহেদ জমাদারের সামনে হাজির হলেই বোঝবা কি হইছে।

বামুন। বামুনকে চোর কোস্, তোর এত বড় আস্পদ্দা, এই পইতে ছুয়ে শাপ দিচ্ছি, তেরাত্তিরের মধ্যে তো'র ঘরে আগুন লাগবে।

চাষী। বরাতে থাকে লাগবে, তোমার কথায় লাগবা না।

পাড়াগাঁয়ের চাষী, তার সত্য সত্যই ইচ্ছা ছিল না যে, গ্রামস্থ লোক—বিশেষ ব্রাহ্মণ, তাকে থানায় দেয়। 'দেখো ঠাকুর, এমন কায আর কোরো না' বোলে লোকটাকে ছেড়ে দিলে, যে কটা শসা নিয়েছিল, তা-ও আর ফেরত

চাইলে না। দু'দিন পরে, ভারি রাতে চাষী ঘরে শুয়ে, এমন সময় চাষীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, চালের উপর একটা খসখসানি শব্দ শুনে, চোর মনে ক'রে আস্তে আস্তে বাইরে এসে দেখে, মটকায় একটা মানুষ; "কে রে" ব'লে হাঁক দিতে, ওপর থেকে উত্তর এল. "আমি সেই বামুন।"

চাষী। বামুন! কোথাকার বামুন---এত রেতে আমার চালার ওপর কি কচ্ছো?

বামুন। মনে নেই নচ্ছার, সে দিন শাপ দিয়েছিলেম. "তেরাত্তিরের ভেতর" তোমার ঘরে আগুন লাগবে?

চাষী। ও ঠাকুর, তুমি সেই শসা-চোর? তা শাপ দেছ দেছ, যা হবার হবে, তুমি ওখানে কি কচ্ছ?

বামুন। উজ্জুগ ক'রে দিচ্ছি রে ব্যাটা উজ্জুগ ক'রে দিচ্ছি; মুখ্যু চাষা, এ আর বুঝিস নি, কলিকালে কেবল মুখের শাপ ফলে না, জোগাড় চাই। ঘর থেকে একখানা টিকে ধরিয়ে এনে তোর চালে গুঁজে দিয়ে বেহ্মশাপ ফলাচ্ছি।"

* * * *

জোগাড়ের জোরে স্বরাজ, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী দখল ক'রে বসেছে।

ব্রজমোহন এখন কৃষ্ণনগরে 'একম্', কিন্তু আমরা বরাবর দেখে আসছি, তার মাথা খুব ঠাণ্ডা, লিবার বেশ সতেজ। সম্মানের মদিরা, সোহাগের স্যাম্পেন, প্রভুত্বের ব্র্যাণ্ডি, ক্ষমতার হুইস্কি, তোষামোদের পাঞ্চ কিছুতেই তার পা টলে না। সেই আ-মুদী জমীদার পর্য্যন্ত সকলের সম্মুখে যোড়হস্ত, সেই দীনতার মৃদু হাস্য, সেই বিনয়ের অভিনয়। ইলেক্‌সনের পর অনেকগুলি কমিশনার যখন তা'কেই ভাইস-চেয়ারম্যানের পদে মনোনীত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তখন ব্রজমোহন যে জিবকাটার মুখে ছবি দেখিয়েছিল, তাতে নবদ্বীপের "পোড়া মাও" শিউরে উঠেছিলেন। "আমি—আমি আপনাদের চরণের দাস; আপনারা হুকুম করবেন, আমি সাধ্যমত আপনাদের সেবা করতে চেষ্টা করব। এই জন্যই আমি কমিশনার হ'তে রাজি হয়েছিলুম। আমার কোন শক্তি নাই, কোন গুণ নাই, কোন বিদ্যা নাই, কৃষ্ণনগরের রাস্তা ঝাঁট দিতে পেলে আমি আপনাকে ধন্য মনে করি। যদি পুরাতন চাকর ব'লে অনুমতি করেন ত আমি প্রস্তাব করি যে, আপনারা গাঙ্গুলী মশাই-কেই চেয়ারম্যান-পদের জন্য নির্ব্বাচিত করুন।"

স্বার্থত্যাগের এই সুবর্ণ দৃষ্টান্তে ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, তিন ভাষায় ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল। এই কথা যখন প্রকাশ হ'ল, তখন বৃদ্ধ গাঙ্গুলীর সেকেলে চোখ দু'টি জলে ভ'রে উঠল।

গোকুল গাঙ্গুলী মহাশয় সেকেলে উকীলদের মধ্যে শেষ এক্‌জিবিট্। সকলে-ই পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে শ্মশানগত হয়েছেন, ইনি ৩৫ বৎসরের ওপর টেবলের কোণের সর্ব্বাঙ্গে পতর-পেরেকমারা চেয়ারখানি ক্ষয় করে-ও একটি ছোটখাট পুঁটলি পর্য্যন্ত বাঁধতে পারেন নি, তাই বোধ হয়, গিন্নী রাগ করবে, ছেলেরা চোটে যাবে, এই ভয়ে প্রস্থান করতে ইতস্ততঃ করছেন। ইনি অতি ভালমানুষ; এত ভাল-মানুষ যে, লোকের কাছে 'বোকা' উপাধি লাভ করেছেন। আজ বিশ বছর ধ'রে ছেলে ক'টি সকালে ছিপে হুইল বাঁধতে বাঁধতে বৈকালে চুলে বুরুষ দিতে দিতে, এমন কি, মধ্য-রাত্রে বাড়ী ফিরে-ও বাপকে টাকা জমিয়ে না রাখার জন্যে ঘুম ভাঙ্গিয়ে কত ভৎর্সনা ক'রে আসছে, এখন-ও সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ব'সে পাড়ার দু'চারটে ছেলের পড়া ব'লে দিলে-ও মাসে যা হোক কিছু আসে, এই রকম কত কি উপদেশ দেয়, কিন্তু কিছুতেই গাঙ্গুলী মশায়ের ভাল-মানুষীও গেল না—উপার্জ্জন-প্রবৃত্তি-ও সাড়া দিলে না।

ফৌজদারী আদালতে এঁর প্র্যাক্‌টিশ; প্রবেশ করেছিলেন প্রতিজ্ঞা ক'রে যে, প্রসিকিউশন কেস কখন নেবেন না; চোর-ছেঁচড়ের বন্ধন-মোচনে-ই এঁর আনন্দ। কারুর অয়ে হস্তক্ষেপ করেন না ব'লে আদালতে এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, সকল উকীলই এঁকে দয়ার চোখে দেখেন। দেশী বিলিতী ফৌজদারী হাকিমদের চড়া-পড়া মনে-ও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে করুণার জোয়ার-জল টেনে তুলতে পারেন ব'লে তাঁরাও এঁকে ভালবাসেন, সময়ে সময়ে অন্যায় আবদারও সহ্য করেন। এমন ঘটনা কতবার ঘটেছে যে, হাকিম সাজার রায় লিখতে যাচ্ছেন, বুড়ো গাঙ্গুলী ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলে সাহেবের হাত চেপে ধরেছেন, আর বলেছেন, "আমি জানি হুজুর, এ যত দোষ-ই করুক, বাড়ীতে ওর আর রোজগেরে কেউ নেই—খেতে অনেকগুলি; সব উপোস্ ক'রে মরবে।" বুড়োর চোখের খাঁটি জল পেনাল-কোডের পাতা ধুয়ে দিয়েছে। খালাস হয়ে যাবার সময় আসামী মক্কেল গাড়ীভাড়া ব'লে চারগণ্ডা পয়সা গাঙ্গুলী মহাশয়ের হাতে দিতে গেছে, না নিলে সে বেচারা মনঃক্ষুণ্ণ হবে ভেবে গাঙ্গুলী সেই পয়সাকটি-ও নিয়েছেন।

এমন 'নিরাপদ' 'নিঃস্ব' ভদ্রলোককে কারবারের মঙ্গল-চিহ্নস্বরূপ দোকান-ঘরের দেয়ালে ব্রাকেটের ওপর গণেশভাবে বসিয়ে রাখা বিষয়ী জনের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও শুষ্ক ভক্তির বিশেষ পরিচায়ক।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে নির্ব্বাচিত যাজকগণ তাঁদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণটি সবার চেয়ে অপণ্ডিত ও অকর্ম্মণ্য, তাঁকেই ব্রহ্মরূপে বরণ করান; একটি পরিধানের জোড়, যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাদি পেয়ে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে রকে ব'সে চক্ষু মুদে গুড়ুক টানেন, আর বেদীতে আসন গেড়ে ব'সে আগুনে ঘি ঢালা থেকে তৈজস বস্ত্র ভোজ্য পেয় 'কাঞ্চনমূল্য' এমন কি, চরু রাধার স্থালীটি দর্ব্বিখানি পর্য্যন্ত আচার্য্য হোতা প্রভৃতি সদস্য মহাশয়রা স্ব স্ব অংশ ব'লে গ্রহণ করেন।

গোকুল গাঙ্গুলী মহাশয় সত্যি-ই নিরীহ লোক। এ নিরীহ শব্দের অর্থ, তিনি স্বল্পে সন্তুষ্ট ও দুষ্টের সঙ্গে-ও শিষ্ট ব্যবহার করেন। ভীরুতার অপবাদ অগ্রাহ্য করে-ও অন্যায্য উপার্জ্জনকে-ও নোঙরা কায মনে করেন। কিন্তু হ'লে হবে কি, কলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে নিদেন চিমনীর ভূষোও এসে গায়ে পড়বে। যেমন কুশ না দিলে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হয় না, তেমনই ঘুষ না দিলে রাজপুরুষরা-ও সন্তুষ্ট হন না, এ ধারণাটা এত দিন থেকে লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে এসেছে যে, যদি কোন পুলিসের দারোগা ঘুষ না নেয়, তবে অনেকে তাকে খারাপ-লোক বলে। ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল্যটা সংসারী লোকের চোখে এত ছোট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অধিকসংখ্যক নর-নারীর বিশ্বাস, মাত্র দু'টি পয়সা ডাবে ও একটি পয়সা চিনিতে খরচ করলে জগজ্জননী সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়ে তাঁর কৃপায় একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে ওলা-উঠোর কবলে পাঠিয়ে সমস্ত সম্পত্তিটা একায়ত্ত ক'রে নেওয়া যায়। উৎ-কোচের পুণ্যপতাকা উড়িয়ে কত সোনার বিল্বপত্র, কত রজত-ছত্র, কত মোহরের মালা, বিবিধ দেবমন্দির উজ্জ্বল ক'রে রয়েছে। টিকিট-কালেক্টারকে ঘুষ দিয়ে রেলে বেশী মাল নিয়ে যাবার ন্যায় কত পাকা ব্যবসায়ী স্বর্গের দ্বাররক্ষককে গোশালা, ধর্ম্মশালা, কলেজ, হাঁসপাতাল প্রভৃতি ঘুষ দিয়েছেন।

গাঙ্গুলী মশাই ভাইস্-চেয়ারম্যান হয়ে-ও যে অনেষ্ট পুয়োরম্যান, সেই পুয়োরম্যান থাকতে-ই রাজী; কিন্তু ঘোষ-বউয়ের নাম বিরাজী-ই নয় যে, সে বেরাহ্মণকে বঞ্চিত ক'রে পাওনা টাকা ফেলে রেখে ঐ বাঁশকায়েতের বাড়ী দুধ যোগাতে যাবে। ঝকঝকে পেতলের কেঁড়ে কাঁকালে দুলিয়ে, সোনার নাকছাবি শুদ্ধ নাক ফুলিয়ে, বিরাজ মশলা দেওয়া তেলের সৌরভে বাতাস ভরপূর ক'রে গাঙ্গুলী মশায়ের অন্দরের উঠানে এক দিন এসে দাঁড়াল। সে নাবে না, খাবে না, গিন্নীর পায়ের কাছে প'ড়ে হত্যে হবে, যদি মা তার কাছ থেকে দুধ না নেন; ছ'সেরের দরে দেবে - একেবারে খাঁটী; তার স্বপ্ন হয়েছে, বাবাকে দুধ খাওয়াইনি ব'লে মুঙ্গলীর একটা বাঁট কাণা হয়ে গেছে। বলেছি, গাঙ্গুলী মশাই সওর পার, একেবারে নিরাপদ, সুতরাং তাঁকে বাবা ব'লে সম্বোধন করতে বিরাজাদির কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যেখানে কর্ত্তা অত ভালমানুষ, সেখানে গিন্নীরা প্রায়ই একটু বেশী সজাগ থাকেন; কাযে-ই ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীদের পাতে একটু আধটু দুধ পড়তে লাগল। হুণ্ডিরাম মাড়োয়ারী এক দিন দোকানের সামনে বড় বাবুকে পাকড়া ক'রে ভাল ঘিয়ের একটা পাঁচ-সেরা টিন গছিয়ে দিলে: পুরানা আমলে 'চার-মন' বাবু বেচারাকে খামকা তগলিব দেছেন; সে বড় বাবুকে খাইয়ে দেখাতে চায়, তার ঘি বাজারের সেরা আসল খুর-জাকা চিজ, গো-মাতাকে পাঁচ পোয়া গুড় না খেলায়ে হুণ্ডী-রাম মুমে জল বি দে না; তার মোটারের চাকায় পর্য্যন্ত সে ঘি ঢালে, আর সে খাবার-ঘিয়ে চর্ব্বি মেশাবে! যেমন 'চার-মন' তেমন ডাগদার; অবিনাশ বাবু মুর্দ্দা ফাড়্‌তে জানে, ঘিউর কি বুঝবে! এমনি ক'রে স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদি মারফত ভক্তদত্ত বিবিধ পূজোপকরণ নিত্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছুতে লাগল। আলাদা হুকুম নেই, অথচ এ বেলা ওবেলা দু'বার ক'রে ওভারশিয়ার বাবু নিজে দাঁড়িয়ে রাস্তা পরিষ্কার করান—সেখানে জল ঢালেন। বহু দিন থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস করলে-ও পূজার সময় বরাবর-ই তিনি সমস্ত পরিবার নিয়ে ক'দিনের জন্য একবার দেশে যান, সেখানে 'সাজার' বাড়ীতে তাঁদের পাঁচ ছ'পুরুষ ধ'রে দুর্গোৎসব হয়ে আসছে, সুতরাং উপস্থিত হবার এ নিয়মটি কখন-ই তিনি ভঙ্গ করেন নি। এবার-ও সেইরূপ দেশে গিয়েছিলেন, বুড়ো মুহুরীটি বাড়ী দেখত; ছুটীর পর ফিরে এসে দেখেন, বাড়ী আর সে বাড়ী নেই; কোথায় সেই নোণা-ধরা ইটের ভিতর থেকে আড়াইগজী অশথ গাছের বহর, কোথায় সেই ঝুল-ঝোলা মাকড়সার জাল; আর কোথাই বা সেই উইএ খাওয়া

বরগার পাশে পাশে চেরা বাঁশের ঠেকো। একেবারে চূণকামে সব ধবধব করছে; আলকাতরার উপর গ্রীণ ধরে না, তাই জানলা কপাট কড়ি—সব লাল রঙে টকটকে। "কে এ করলে?" মুহুরী উত্তর করলে, সে কিছুই জানে না, তবে বাবু যখন এখন মিউনিসিপ্যাল সরকারের ছোটসাহেব, সে ভেবেছিল, সরকারী লোকজন এসেই এ সব মেরামত ক'রে দিয়ে গেল; বিশেষ সে দেখত যে, ঠিকেদার নসীরুদ্দীন এসে সব তদারক ক'রে যায়। নসীরুদ্দীনকে তলব হ'লে সে এসে সেলাম ক'রে বললে, 'বাবাজান, আমরা হলুম আপনার ছাবাল, ছানাটা-পোণাটা কোন্ দিন কোথায় কি করলে, তা নিয়ে আপনকার মাথা ঘামাবার কি জরুরা?"

গাঙ্গুলী মশাই যেন আরও মুসড়ে গিয়ে বললেন, "বাবা, এ যে বিস্তর টাকার কায, আমার এখন সময় তেমন নয়—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নসীর জবাব করলে, "নেহাত নেক্ আদমী পেয়ে সবাই আপনাকে ঠকিয়ে খায়; কে বলেছে আপনাকে বিস্তর টাকা খরচ এই চূণটুকু লাগাতে? এই লিন্, বিল আমার সাথেই আছে; রেশবৎ নসীর কখনও কাকে-ও দেয়-ও না—লেয়-ও না; সাইত্রিশ ট্যাকা ন আনা ৭ পাই খরচা পড়েছে। এর আর কাটবান না কোটবান না; যা দস্তুর আছে, মাসে চার টাকা ক'রে কিস্তি দিবেন।"

গাঙ্গুলী বুড়ো বাঁচল, নসীর যখন বিল করেছে, তখন যমের কাছে ভাউচার দেখালেই খালাস। গাঙ্গুলী মশাই আর এক দিকে নিশ্চিন্ত যে, ব্রজমোহন তাঁর হয়ে খাটুনীর ভার অনেকটা নিজের কাঁধে নিয়ে গেছে, এমন কি, সই-সাবুদ বা অন্য কোন কাযের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে হাজির হবার দায় থেকে পর্য্যন্ত গাঙ্গুলী মশাইকে সে রেহাই দিতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বাঙ্গালায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা

[সমালোচনা]

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে কয় জন দেশকর্ম্মী মুক্তিপথের যাত্রিরূপে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এ যুগের তরুণসঙ্ঘের নিকট তাঁহার নাম হয় ত অপরিচিত হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালায় এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা এই নামের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। অন্ততঃ হেমচন্দ্র কানুনগো নামের কথা তাঁহাদের না জানা থাকিলেও যে, হেমচন্দ্র 'দাসের' কথা তাঁহারা জানেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিণাম বাঙ্গালায় বিপ্লববাদের আবির্ভাব। বাঙ্গালার কতক লোক লর্ড মরলের Settled factএ আশাহত হইয়া নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে অন্তর্দাহ সহ্য করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক জন্মভূমির এই অপমান নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য করেন নাই। তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ ও ভাব-প্রবণ। তাঁহারা প্রতীচ্যের এনার্কিষ্টদিগের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং উহা দ্বারা সরকারের অটল সঙ্কল্প টলাইতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনুধাবন করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস বাঙ্গালার সেই বিপ্লববাদীদিগের মধ্যে অন্যতমরূপে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আলিপুরের ষড়যন্ত্র মামলায় প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তিনি প্যারিস হইতে বোমা প্রস্তুত করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আসিয়া এ দেশে প্রথম বোমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মাণিকতলার বোমার কারখানায় তাঁহারই চেষ্টায় বোমা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমাবধি বাঙ্গালার বিপ্লববাদীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ভারতে বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদকামনায় কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত এই গ্রন্থে যে বাঙ্গালার বিপ্লব-চেষ্টার ও তথা হিংসার পথে বাঙ্গালীর প্রথম মুক্তিসংগ্রামের সত্য তথ্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৩২৯ সালের আশ্বিন হইতে ১৩৩৪ সালের মাঘমাস পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতীর' কোন কোন সংখ্যায় 'বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী' শীর্ষক যে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহাই সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া "বাঙ্গালায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা" নামকরণ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। এইখানি তাহার প্রথম সংস্করণ, ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে কমলা বুক ডিপোয় প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় চলিত ভাষায় লিখিত। ভাষার মনোহারিত্বে, ভাবের আতিশয্যে এবং ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশে

গ্রন্থখানি উপাদেয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রথম মুক্তির আন্দোলন কিরূপে কোন্ পথ দিয়া কিসের সন্ধানে কাহাদের আত্মদানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিতে স্বতঃই বাঙ্গালীর মনে পাঠের স্পৃহা ও আগ্রহ বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটনা জানিবার জন্য মনের আকুলতা কূলপ্লাবী হইয়া উঠে। পরন্তু গ্রন্থকারের সহজ সরল দ্বেষলেশহীন অথচ কঠোর ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা তাঁহার লিপিকুশলতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের মুক্তিকামী বাঙ্গালী যে ইহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের একটা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস অবগত হইতে পারিবেন ও তথা বিপ্লববাদের ব্যর্থতার ক্রমবিকাশের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দেশের মুক্তির পথ বিভিন্ন আকারের। কেহ বা নিয়মানুগ পথে আবেদন-নিবেদনের অর্ঘ্য সাজাইয়া শাসকজাতির মনস্তুষ্টি-সাধন করিয়া অগ্রসর হইতে চাহেন; কেহ বা বিপ্লবের পথে বোমা-রিভলভারের সাহায্যে শাসকজাতিকে ভীত-ত্রস্ত করিয়া দেশের দাবী মান্য করাইতে চাহেন; আবার অপরে শাসকের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া স্বয়ং কষ্ট ও বিপদ বরণ করিয়া লইয়া শাসকের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া তাঁহাদিগকে আপোষে বাধ্য করিতে চাহেন। যাঁহারা দ্বিতীয়োক্ত পথের পথিক নহেন, তাঁহারা বিপ্লববাদের পথকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং বিপ্লববাদী হইয়া যখন বিপ্লবের পথে দেশের মুক্তিসাধনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই পথের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহাও গ্রন্থকার নিজের রচনার মধ্য দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের নিবেদনের মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন, "জন কয়েক বিশিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীকে উপলক্ষমাত্র ধ'রে নিয়ে জাতীয় চরিত্রের যে সকল দোষ থাকতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি কখনও সম্ভব হ'তে পারে না, সেই সকল দোষেরই সমালোচনা করেছি।"

বস্তুতঃ আমাদের বাঙ্গালী জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের এমন কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, যাহার উপস্থিতি জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। সমাজের সেই সকল ত্রুটি সর্ব্বপ্রথমে পরিহার করিতে হইবে, তবে বাঙ্গালী মুক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে। তাই গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"তাঁদের (বিশিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীদের) যে সকল ত্রুটির উল্লেখ করেছি, তা যে পারিপার্শ্বিক ঘটনা-চক্রের প্রভাবেই করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন এবং সে জন্য যে আমাদের সমাজই দায়ী, সেই কথাটাই পরিষ্কার ক'রে বলতে চেয়েছি। সেই সমাজের ভাব, ভাবনা, চিন্তাধারা আদির আমূল পরিবর্ত্তন না হ'লে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত।" এই সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তরুণ দেশকর্ম্মীরা অন্ধ স্তাবকের মত নেতা ও উপ-নেতাদের পূজা করিয়া আদর্শকে অবহেলা করিয়াছিলেন। ইহাতে গ্রন্থকারের ভাষায় "এই ভক্তির দেশে পূজ্য ব্যক্তিদের দোষ সমাজের অহিতকর জেনেও ঢেকে চেপে রাখা, সে দোষ অস্বীকার করা অথবা তা লীলা ব'লে সমর্থন করা প্রচলিত প্রথা বা রীতির" পূজা করা হয় সত্য, কিন্তু "এতে দেশের কল্যাণ অস্বীকার ক'রে ব্যক্তিবিশেষকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।" সুতরাং এ সকল ত্রুটি থাকিতে আন্দোলন যে বিফল হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু ছিল না।

বিপ্লব-প্রচেষ্টার আরও একটা বিষম ত্রুটি ছিল:—"এই বিপ্লব অনুষ্ঠানের একটা ক্ষুদ্র অংশ বা দিক আছে যা বাংলার মত দেশের পক্ষে একটু গৌরবজনক। ঐটুকুমাত্র অতিরঞ্জিত-ভাবে দেখেই সমস্ত ব্যাপারটার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে ভেবে বাঙ্গালী আমরা বেশ গৌরব অনুভব করেছি। আর একটা সস্তা অসঙ্গত আশায় বুক বেঁধে নিশ্চিন্ত আছি যে, দেশ উদ্ধারের আর দেরী নেই; বাংলা নিশ্চিত অথচ দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে; পেছন ফিরে আর দেখবার আবশ্যক নেই অথবা নতুন ক'রে কিছু ভাববার বা করবার দরকারও নেই।"

এইখানেই বিপ্লববাদ-চেষ্টার অসাফল্যের বীজ নিহিত। তবে কি মুক্তির আশা নাই? নিশ্চয়ই আছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"সর্ব্ববিষয়ে ক্রমোন্নতি ব্যতীত স্বরাজ অসম্ভব।" পূর্ব্বে ঘর না বাঁধিয়া বর্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যেমন সম্ভব, জাতিকে সর্ব্ববিষয়ে স্বরাজের জন্য প্রস্তুত না করিয়া বিপ্লব দ্বারা মুক্তি-লাভের চেষ্টাও তেমনই সম্ভব। মুক্তির আন্দোলনে এই হেতু মহাত্মা গন্ধী সর্ব্বাগ্রে দেশ ও জাতিকে গড়িয়া তুলিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও কতকটা সেইরূপ। অর্থাৎ দেশকে ত্যাগের পথে—মুক্তির পথে পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্ববিষয়ে প্রস্তুত না করিয়া স্বরাজসাধনা করিতে গেলে মুক্তির প্রচেষ্টা কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে বাষ্পস্নান

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য প্রতীচ্য দেশের নারীরা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বাষ্পস্নান সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের প্রকৃষ্ট উপায়।
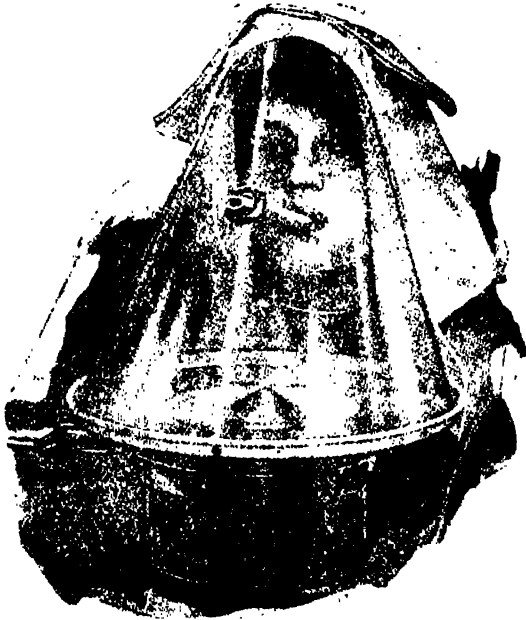
বাষ্পস্নান

এই উপায়ে গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত কোমল মসৃণ থাকে। রোমকূপে যে ময়লা অদৃশ্যভাবে থাকে, তাহাও এই বাষ্পস্নানে দূরীভূত হইয়া সৌন্দর্য্যদীপ্তি বর্দ্ধিত হয়। বাষ্পের তাপকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থাও আছে। বাষ্পস্নানের সময় নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ উপভোগের বন্দোবস্ত থাকায় স্নানের সময় কষ্টভোগ করিতে হয় না। নলপথে নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ প্রবেশ করিয়া থাকে।

——

হস্তীর চিকিৎসা

ভিয়েনানগরে পশুক্লেশনিবারণী সভা পশুদিগের চিকিৎসাসম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করিয়াছেন। হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার জন্তুও তাঁহাদের চিকিৎসাধীন থাকিতে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ করে না। এই সঙ্গে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাতে হস্তীর ঠাণ্ডা লাগিয়া
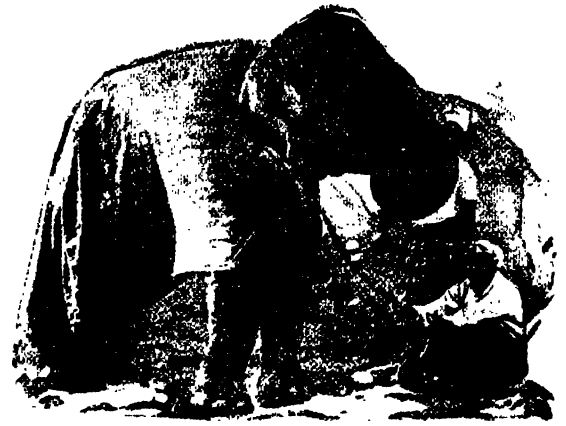
পীড়িত হস্তী

পীড়া হইয়াছিল। শুশ্রূষাকারীরা তাহাকে ঔষধ দিতেছে—উহার শরীর শীতবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত।

——

অভিনব টুপী

মার্কিণ নারীদিগের ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি এক প্রকার টুপী বাজারে বাহির হইয়াছে। এই টুপীর সম্মুখের অংশ এমনভাবে নির্ম্মিত যে, টুপীধারিণী উহা পরিয়া গ্রীষ্মের রৌদ্রে পথে বাহির হইলে নয়নে রৌদ্রের উত্তাপ লাগে না। এই টুপী অত্যন্ত লঘুভার এবং উহার চারিপার্শ্বে যে বন্ধনী আছে, তাহা এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, যে কোনও নারী ইচ্ছা করিলে মস্তকে ধারণ করিতে পারেন।

অভিনব টুপী

এঞ্জিনীয়ারের কেরামতি

কালিফের স্তান্ পেড্রো অঞ্চলের পথগুলিকে সমতল করিবার জন্য যেখানে পাহাড় বা উচ্চভূমি ছিল, সমস্তই সরাইয়া ফেলা
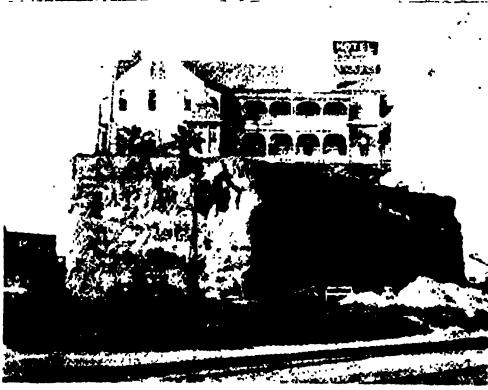
এঞ্জিনীয়ারের কেরামতি

হইতেছে। এই সঙ্গে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে,কি পরিমাণ মৃত্তিকা অপসৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভূমির উপর একটি হোটেল ছিল, তাহা অপসৃত হওয়ায় হোটেলটিকে এখন যেন একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

বিচিত্র অবরোহিণী

ইংলণ্ডে সংপ্রতি অত্যুচ্চ অট্টালিকা অথবা কারখানা-সমূহে এক প্রকার আরোহণী বা অবরোহণী ব্যবহৃত হইতেছে। এই অবরোহণী এমন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে যে, আগুন লাগিলে অট্টালিকা হইতে তাড়াতাড়ি অবরোহণকালে উহা কিছুমাত্র আন্দোলিত হয় না, সুতরাং অট্টালিকামধ্যস্থ অধিবাসীরা সত্বর ও সহজে অগ্নিময় অট্টালিকা বা কারখানা হইতে পলায়ন করিতে পারে।

বিচিত্র অবরোহণী

অপূর্ব্ব টুথ্‌ব্রস্

বাজারে এক প্রকার টুথ্‌ব্রস্ বাহির হইয়াছে, উহার দ্বারা দন্তধাবনের বিশেষ সুবিধা। ইহা এমনভাবে নির্ম্মিত যে, সোজা

নূতন টুথ্‌ব্রস্

অথবা 'এড়ো'ভাবে উহাকে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। শুধু তাহাই নহে, যে কোনও দিকে উহাকে সহজে ঘুরান-ফিরান সম্ভবপর। ইহা দ্বারা দন্তের ভিতর ও বাহির সকল দিকের ময়লা পরিষ্কার করা চলিবে।

পেঁপের অভ্যন্তরে পেঁপে

চন্দননগরের স্বদেশপ্রাণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় আমাদের একটি অদ্ভুত জোড়া পেঁপের ফটো পাঠাইয়াছেন।

পেঁপের অভ্যন্তরে পেঁপে

একটি পেঁপে কাটিয়া তাহার ভিতর আর একটি পেঁপে বাহির হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক জগতের নিত্য নূতন উদ্ভাবনের মত লীলাবৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিদেবীও সময় সময় অদ্ভুত খেয়াল প্রদর্শন করেন। এই জোড়া পেঁপে প্রকৃতিদেবীর একটি অদ্ভুত খেয়াল।

সতীর পতি

(উপন্যাস)

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চিঠির প্রতীক্ষায়

কলিকাতা মেল হীরালালকে লইয়া দার্জ্জিলিং ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল।

রেবতী বলিল, "ঠাকুরপো, এখন তুমি স্যানিটেরিয়মেই যাবে ত?"

"চল, আগে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না না,—আবার অত দূর কষ্ট করতে যাবে কেন? আমি একলাই বেশ যেতে পারব।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, না, আমার কিছু কষ্ট হবে না। হীরুদা আমায় রেখে গেল খবরদারী করতে, আমি তোমায় একলা ছেড়ে দিতে পারি? পথে যদি কেউ তোমায় লুটে নিয়ে যায়, তার জন্যে দায়ী হবে কে, বৌদি?" বলিয়া বিপিন বাবু হাসিলেন।

রেবতী তখন ভাবাবিষ্ট, এ পরিহাস তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শই করিল না। সে বিপিন বাবুর মুখের পানে ছল-ছল নেত্রে চাহিয়া বলিল, "আমায় এখন একটু একলা থাকতে দাও, ঠাকুরপো!—না হয় আমায় একখানা রিক্শা ক'রে দাও।"

রেবতীর মুখভাব ও কণ্ঠস্বর যেন বিপিন বাবুর পৃষ্ঠে চাবুক মারিল। তিনি বুঝিলেন, পরিহাসটুকু অসময়োচিত হইয়াছে। বলিলেন, "ওঃ, আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাব না, বৌদি। আমি অতটা বুঝতে পারি নি, আমায় মাফ কর। চল, একটা রিক্শায় তোমায় তুলে দিই।"

এ সময় উভয়ে তাহারা প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরেই খানকয়েক রিক্শা দাঁড়াইয়া ছিল। বিপিন বাবু একটার ভাড়া স্থির করিয়া রেবতীকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া রিক্শাওয়ালাকে বলিলেন, "যাও, মেম সাহেবকো কোঠী পৌঁছায় দো। হুঁসিয়ারিসে লে যানা।"

রেবতী বলিল, "ও-বেলা আসছ ত ঠাকুরপো, চা-য়ের সময়?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আসব?"—তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু অভিমানের রেশ যেন ধরা পড়িয়া যায়।

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ ঠাকুরপো, এস, নইলে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে কে?"

"আসবো বৌদি, সাড়ে চারটের সময়।" বলিয়া বিপিন বাবু রেবতীকে নমস্কার করিলেন। ঘণ্টাধ্বনি সহ রিক্শা ছুটিয়া চলিল।

ঠিক সাড়ে চারিটার সময় বিপিন বাবু রেবতীর আবাসে গিয়া পৌঁছিলেন। কাঞ্চি ভৃত্য যথানিয়মে দ্বারদেশে বসিয়া ছিল, বিপিন বাবুকে ড্রয়িং-রুমে বসাইয়া সে উপরে "মেম সাহেব"কে সংবাদ দিতে গেল।

বিপিন বাবু দশ মিনিট কাল অপেক্ষা করিবার পর রেবতী নামিয়া আসিল। বলিল, "তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, ঠাকুরপো, একবারে বেড়াতে বেরুবার পোষাক পরেই নেমে এলাম।"

"ভালই করেছ বৌদি।"—বিপিন বাবু লক্ষ্য করিলেন, রেবতীর চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে। এ কি দিবানিদ্রার জন্য? না, রেবতী কাঁদিয়াছে? বোধ হয়, শেষের অনুমানটাই ঠিক, কারণ, গলার স্বরও তাহার ভারি ভারি।

বিপিন বাবু আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "হীরুদা বোধ হয় এতক্ষণ কার্সিয়ং ছাড়িয়ে গেল।"

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী পৌঁছবেন কখন্?"

"কাল সন্ধ্যে নাগাদ।"

সৌদামিনী ঝি চা আনিল। চা-পান ব্যাপারটা প্রায় নীরবেই চলিতে লাগিল। গুমট অসহ্য হইলে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদি, তুমি এত কি ভাবছ বল দেখি?"

রেবতী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কৈ, ভাবলাম আবার কখন্ ?"

"এমন নীরব যে !"

"তুমিই বা কোন্ সরব !"

"ও রকম মন খারাপ ক'রে থেক না বৌদি—একে তোমার দেহ ভাল নয়,—হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করতে পারে।"

"কর্‌লেই বা। তুমি রয়েছ, তার জন্যে ভাবনা কি ? একটা পরীক্ষাও হয়ে যাবে।"

"কিসের পরীক্ষা ?"

"দাদার উপর তোমার যে রকম টান, বৌদির উপরও সে রকম কি না।"

"না, দোহাই তোমার, সে পরীক্ষায় পাশ করতে আমি চাইনে ! চাটুকু শেষ ক'রে নাও; চল এখন বেড়াতে বেরোন যাক্।" বলিয়া বিপিন বাবু নিজ পেয়ালার চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া মুখে দিলেন।

দুই জনে তখন বাহির হইয়া বটানিকেল গার্ডনের দিকে নামিতে লাগিলেন। বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া রেবতী বলিল, "ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বসা যাক্ এখানে।"

একটা খালি বেঞ্চি পাইয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন। বিপিন বাবু বলিলেন, "বৌদি, তুমি থিয়েটরে ঢুকেছ কত দিন ?"

থিয়েটরের প্রসঙ্গে রেবতীর মুখ খুলিয়া গেল। কোন্ কোন্ থিয়েটরে রেবতী ছিল, কোন্ কোন্ নাটকে কোন্ কোন্ চরিত্রে অভিনয় করিয়াছে, বিপিন বাবুর প্রশ্নে সমস্তই সে বলিতে আরম্ভ করিল। দুই জনের গল্প এতক্ষণে বেশ জমিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

উভয়ে তখন উঠিয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া রেবতী বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি কেন এইখানেই খেয়ে যাও না।"

বিপিন বাবু রেবতীর দিকে আড়চোখে চাহিয়া, চটুল হাসি হাসিয়া, কোমল স্বরে বলিলেন, "খেয়ে যাব ? তা পারি, যদি ভোজন-দক্ষিণা পাই।"

রেবতীর মুখে রোষ ও ঘৃণার চিহ্ন দেখা দিল—তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইহা, পথের অল্পালোক সত্ত্বেও বিপিন বাবুর দৃষ্টি এড়াইল না—কারণ, এ প্রস্তাবে রেবতীর মুখভাব কিরূপ হয়, তাহাই তিনি দেখিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। রেবতী নিজ কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য সংযমিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত বামুন নও, কায়েথ,—তবে এত দক্ষিণার লোভ কেন ? কি দক্ষিণা চাও তুমি, শুনি ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এই, দুটো গান-টান শুন্‌বো আর কি ! তার বেশী আর কিছু দাবী করবো না, বউদি !"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

রেবতী মনে মনে বলিল, "আমায় পরীক্ষা করা হচ্ছে বুঝি ?" প্রকাশ্যে বলিল, "গান শুনতে তুমি ভালবাস ?"

"ভালবাসি।"

"আচ্ছা, সে জন্যে আটকাবে না।"

এই সময় উভয়ে রেবতীর গৃহদ্বারে পৌছিল। রেবতী বলিল, "তুমি হাত-মুখ ধোবে ত, ঠাকুরপো ? নীচে একটা গোসলখানা আছে। এই কাঞ্চি, সাহেবকো গোসলখানা দেখলাও।"—বলিয়া রেবতী উপরে চলিয়া গেল।

রেবতী নামিয়া আসিলে, কয়েকটা গান হইবার পর, আহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারান্তে ঘণ্টাখানেক বিপিন বাবু রহিলেন। রেবতী হীরালালের সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিল—বিশেষ করিয়া সুরবালা ও তাহার খুকীর কথা। সুরবালা সম্বন্ধে বিপিন বাবু তাঁহার স্ত্রীর নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন—এই ব্যাপারের প্রথম সংবাদ পাইয়া সুরবালা কিরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল,—তাহার পর স্বামীকে গৃহে ফিরাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা,—সমস্তই বিপিন বাবু বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রেবতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া রেবতী নিজ চেয়ারের উপরে এলাইয়া পড়িল। বিপিন বাবু ইহা দেখিয়া বলিলেন, "বৌদি, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আমি এখন উঠি, তুমি শোও গে যাও।"

রেবতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কাল আবার আসছ ত ঠাকুরপো ?"

"হ্যাঁ, আস্‌ব বৈ কি। আজ যেমন সময় এসেছিলাম ; কিন্তু বেড়িয়ে ফিরে, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে চ'লে যাব,—কেমন ?"

রেবতী বলিল, "অর্থাৎ রাত্রে এখানে খাবে না, এই কথা বলছ ত ?"

"হ্যাঁ। দেখ, হীরুদা এখানে নেই, তুমি একলা রয়েছ ; তুমি ছেলেমানুষ, আমিও নিতান্ত বুড়ো হই নি। এ অবস্থায়"—বলিয়া বিপিন বাবু দুষ্টামির হাসি হাসিলেন।

রেবতী বলিল, "কেন, পাছে তুমি আমার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে যাও ? এই ভয় ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, সেটা ত সুখের কথাই, ভয়ের বিষয় আর কি ?—মুর্গীটা যেমন হিন্দুসমাজে চল্ হয়ে উঠেছে, বউদি-ঠাকুরপোর প্রেমটাও, সমাজে না হোক, বাঙ্গালা সাহিত্যে আর দোষের ব'লে গণ্য হচ্ছে না, তা ত দেখছ ?"—বলিয়া বিপিন বাবু কয়েকখানি আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের নাম করিয়া বলিলেন, "পড়েছ ত ?"

রেবতী বলিল, "হাঁ, পড়েছি বৈ কি !—সেটাকে তুমি যদি ভীতিজনক মনে না কর, তবে আর ভয় কিসের ? তোমাতে আমাতে বেশী মেশামিশির কথা জানতে পেরে তোমার হীরুদা পাছে রাগ করে ?"

"সেইটেই হীরুদার পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি ?"

"হাঁ, তা বটে। কালকের কথা সে তখন কাল হবে। তুমি বিকেলবেলা এস ত।"

বিপিন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শয়নকক্ষে গিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর আলো নিবাইয়া শয়ন করিয়া রেবতী অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না। আজ হীরু বাড়ী পৌছিয়াছে। রাত্রি এখন দশটা—সুরবালার সহিত এতক্ষণ সে নিভৃতে একত্র হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার, তাহাদের কথাবার্ত্তা রেবতী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। তাহার হৃদয় অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। এ অনুশোচনা আজ প্রথম তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। দার্জ্জিলিঙে আসা অবধিই হীরালালের সহিত সম্পর্কটা তাহার মনে আত্মগ্লানির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আজ বিপিন বাবুর মুখে সুরবালার অনেক কথা শুনিয়া রেবতীর মনটা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

বিপিন বাবু প্রত্যহই আসেন ; চা পান করিয়া রেবতীকে বেড়াইতে লইয়া যান—বেড়াইয়া ফিরিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া, নিজ বাসায় যান। রাত্রিতে একত্র আহার বন্ধ।

রেবতী দিনের মধ্যে শতবার মনে মনে হিসাব করিতেছে—হীরালাল এখান হইতে গিয়াছে সোমবারে। মঙ্গলবারে সন্ধ্যা নাগাদ তাহার বাড়ী পৌছিবার কথা। বুধবারে সে পত্র লিখিবে বলিয়া গিয়াছে, শুক্রবারে সেই পত্র রেবতীর পাইবার কথা।

শুক্রবার বেলা দুইটা হইতে রেবতী অধীর আগ্রহে ডাকপিয়নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক-পিয়ন আসিল, কিন্তু হীরালালের পত্র আসিল না। তাহার দ্বারবান্ মহাবীর সিং কাহাকে দিয়া বাঙ্গালায় এক পোষ্ট কার্ড লেখাইয়াছে ; বাড়ী-ঘর জিনিষপত্র সমস্ত ঠিক হওয়ার সংবাদ দিয়াছে, মা-জীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে ; সর্ব্বশেষে লিখিয়াছে, গত কল্য এক জন পার্সি সাহেব সাক্ষাৎ জন্য আসিয়াছিলেন, তিনি দার্জ্জিলিঙের ঠিকানা লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার না কি বিশেষ কি প্রয়োজন আছে।

এই পার্সি সাহেবটি কে, এবং রেবতীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনই বা কি, রেবতী ইহা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। এ বিষয় লইয়া সে অধিক মাথাও ঘামাইল না। হীরালালের চিঠি যে আসে নাই, এই নৈরাশ্যের দুঃখেই তাহার বুকখানি ভরিয়া রহিল।

কেন চিঠি আসিল না ? সেখানে পৌছিয়া হীরালাল কি তবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে ? না, সুরবালাকে লইয়া সে এতই বিব্রত যে, দুই চারি কথায় পৌছান সংবাদটাও লিখিবার অবসর করিতে পারে নাই ?—প্রথমটা না হইয়া থাকিলেই ভাল। সে ভাল থাকুক,—দ্বিতীয় কারণটাই যেন ঘটিয়া থাকে। রেবতী মনে মনে এই প্রার্থনা করিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিপিন বাবু যথাসময়ে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রেবতী বলিল, "তোমার হীরুদার চিঠি ত কৈ আজ এল না ঠাকুরপো ? তোমার কাছে এসেছে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, আমার কাছে ত আসেনি। কাল হয় ত আসতে পারে।"

"দেখা যাক্"—বলিয়া রেবতী চায়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহে

হীরালালের গোযান যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সদর দরজা খোলাই ছিল—সুটকেস্ হস্তে হীরালাল উঠানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, কে এক ব্যক্তি একটা লণ্ঠন ও লাঠি হাতে লইয়া তাহাদের বড় ঘরের বারান্দা হইতে নামিতেছে। উঠান ও বারান্দা অন্ধকার,—হীরালাল লণ্ঠনটাই দেখিল, মানুষটা কে, তাহা বুঝিতে

পারিল না। ক্ষণকাল পরেই তাহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইল। হীরালাল দেখিল, ইনি গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার বিধুভূষণ কুশারি। হীরালালকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হীরেনাল এসেছ ? খুব সময়ে এসে পড়েছ, বাবা! যাও, তোমার মাকে দেখ গে!"

হীরালাল শঙ্কিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন ডাক্তারবাবু, মা'র কি হয়েছে ?"

"আজ ৮ দিন তাঁর জর। একজরী অবস্থায় রয়েছেন।"

"অবস্থা কি রকম ?"

"বড় ভাল নয়। তবে আজ রাতে কোনও ভয় নেই বোধ হয়। যে ওষুধ দিয়েছি, সেই ওষুধই এখন চলবে।"

বলিয়া ডাক্তার বাবু লণ্ঠন হাতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

হীরালাল তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিয়া, সুটকেসটা সেখানে ফেলিয়া, জুতা ছাড়িয়া, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ওডিকলোনের গন্ধ পাইল।

ঘরের এক কোণে তেলের প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। তক্তপোষের উপর তাহার জননী শায়িতা, তাঁহার কপালে জলপটি, মেঝ খুড়ীমা মাথায় পাথার বাতাস করিতেছেন। রোগিণী জ্বরঘোরে অচেতন। সুরবালা ঘোম্‌টায় মুখ আবৃত করিয়া পদতলে বসিয়া শ্বাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতেছে। উঠানে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে ঘোম্‌টা দিয়াছিল।

মেঝ কাকীমা হীরালালকে দেখিয়া বলিলেন, "হীরু, এলি বাবা ? খুব সময়ে এসে পড়েছিস্!"

হীরালাল মাতার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিল, যেন আগুন। তার পর প্রথমে জননীর, পরে মেঝ খুড়ীমা'র পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আজ ৮ দিনই কি বেহুঁস রয়েছেন ?"

মেঝ খুড়ীমা উত্তর করিলেন, "না, তা কেন ? জ্বরটা যখন বেড়ে উঠে, তখনই বেঁহুস হয়ে পড়েন, অন্য সময় বেশ জ্ঞান থাকে, কথাবার্ত্তা ক'ন। বিকেল পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কয়েছেন। তার পর থেকেই জ্বরটা বাড়তে আরম্ভ করে। তোমার দেহ ত বেশ ভাল আছে, বাবা ?"

"হ্যাঁ, আমি ভালই আছি।"

"তুমি ত এখন দার্জ্জিলিঙ থেকেই আসছ ? সারাদিন খাওয়া হয়নি বোধ হয় ? যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। বৌমা, যাও ত, হাত-পা ধোবার জল গামছা দিয়ে, রান্নাঘরের শিকেয় বাতাসা আছে, তাই ভিজিয়ে এক গেলাস সরবৎ ক'রে দাও, আর তোমার ছোট খুড়ীমাকে বল, ভাত চড়িয়ে দিতে।"

সুরবালা শ্বাশুড়ীর পদসেবা ছাড়িয়া, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। হীরালাল তখনই তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া, মা'র পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিন বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, হয়েছিল।"

"তিনিও এসেছেন তোমার সঙ্গে ?"

"না, তিনি এখন দার্জ্জিলিঙেই রইলেন।"

"তোমার সে চাকরী কি আর নেই ?"

"হ্যাঁ, আছে বৈ কি। তিন মাসের ছুটীতে রয়েছি।—মা কি খাচ্ছেন ?"

"ডাক্তার বাবু ত জল-সাবুরই ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু দিদি জল-সাবু খেতে চান না; গঙ্গাজল মিশিয়ে একটু একটু দুধই দেওয়া হচ্ছে। যখনই জ্ঞান হচ্ছে, খালি তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন।"

হীরালাল একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

এই সময় হীরালালের কন্যাকে কোলে করিয়া ছোট খুড়ীমা প্রবেশ করিলেন। হীরালাল নামিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া, কন্যাকে কোলে লইয়া তাহাকে চুমা খাইল। খুকী যেন নিতান্ত বিস্ময়েই বলিয়া উঠিল—"বাবা!"

ছোট খুড়ীমা বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি! বাবা এসেছেন, আর কোনও ভয় নেই। হীরু, যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে যাও, সরবৎটুকু খেয়ে এস।—আয় খুকী, আয়।"—বলিয়া তিনি খুকীকে লইলেন।

হীরালাল বাহির হইয়া দেখিল, সেই ঘরেই বারান্দার প্রান্তে গাড়ু, গামছা ইত্যাদি সজ্জিত আছে,—অদূরে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছে। হাত-পা ধুইতে ধুইতে হীরালালের মনে হইল, ছোট খুড়ীমা যে রান্নাঘরে বউকে মোতায়েন করিয়া নিজে চলিয়া আসিয়াছেন এবং রান্নাঘরে গিয়া সরবৎ পান করিয়া আসিতে হুকুম করিয়াছেন, ইহা দুই জনকে নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দিবার কৌশলমাত্র। কিন্তু এখন সুরবালার সম্মুখীন হওয়া, তোপের মুখে দাঁড়ানর চেয়েও তার পক্ষে সমধিক ভীতিজনক—অথচ পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। তাই হীরালাল হাত-মুখ ধুইয়া, সরবতের

প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, সেই গাড়ুর অবশিষ্ট জলটুকুই অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর হাত-মুখ গামছায় মুছিয়া, ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। ছোট খুড়ীমা বলিলেন, "সরবৎটুকু খেয়ে এলে না বাবা ?"

হীরালাল বলিল, "খাব এখন ছোট খুড়ীমা, তাড়াতাড়ি কি ? এখন আমার তৃষ্ণা পায় নি।"

এই বিতৃষ্ণার কারণ বুঝিতে ছোট খুড়ীমার বিলম্ব হইল না। "দেখি, বউমা রান্নাবান্নার কতদূর কি করলেন।"—বলিয়া খুকীকে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

হীরালাল আবার জননীর পদপ্রান্তে বসিল।

পাঁচ মিনিট পরে ছোট খুড়ীমা ছোট একটি রেকাবীতে দুইটি সন্দেশ এবং সরবতের গ্লাসটি আনিয়া হীরালালের কাছে ধরিলেন। হীরালাল উহা গ্রহণ করিল।

সরবৎ পান করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া সে আবার জননীর পার্শ্বে বসিল। মেঝ-বউ তখন ছোট বউকে নিজ-স্থলাভিষিক্ত করিয়া রান্নাঘর পরিদর্শনে গমন করিলেন।

রাত্রি একটা। গৃহিণীর জ্বরোত্তাপ একটু একটু করিয়া কমিতেছে। মাথার জলপটি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হীরালাল আহারান্তে সেই কক্ষেরই এক পার্শ্বে একখানা মাদুরের উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুরবালা তাহার খুকীকে লইয়া অন্য ঘরে শুইয়াছিল, মেঝবউ তাহার নিকটে ছিলেন। ছোট বউ এ ঘরে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন। আর খানিক পরে, মেঝবউ আসিয়া ছোট বউকে ঘুমাইতে পাঠাইবেন। এইরূপ পালা করিয়া রোগিণীর শুশ্রূষা চলিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহিণী সচেতন হইলেন। তাহা দেখিয়াই ছোট বউ বলিলেন, "ও দিদি, তোমার হীরু এসেছে যে!"

গৃহিণী পাশ ফিরিয়া বলিলেন, "অ্যা ? কি ? আমার হীরু এসেছে ? কৈ সে ?"

"ঐ যে, দেখ, শুয়ে ঘুমুচ্চে।"

গৃহিণী মাথাটি তুলিয়া নিদ্রিত পুত্রের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয় মা রাধারাণী!" প্রায় এক মিনিট নীরব থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন. "কখন্ এল ?"

"সন্ধ্যের একটু পরেই।"

"ভাল আছে ? খাওয়া-দাওয়া করেছে ?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে। খেয়েছে। রাত ১২টা পর্য্যন্ত বোসে তোমার পায়ে হাত বুলুচ্ছিল। ডেকে দেবো ?"

"না না, ঘুমুচ্চে ঘুমুক, আহা, বাছা ক্লান্ত হয়ে এসেছে; এখন ডেক না।"

ঘুম ভাঙ্গিলে, এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দেওয়া ডাক্তার বাবুর উপদেশ ছিল। ছোট বউ বলিলেন, "এইবার তোমায় ওষুধ দিই, দিদি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না না, আর ওষুধ কেন ? হীরু বাড়ী এসেছে, এখন ওকে রেখে, ওর হাতের দেওয়া গঙ্গাজল মুখে দিয়ে আমি যাতে যেতে পারি, এখন সেই ব্যবস্থাই কর তোমরা। ওষুধ আমি আর খাব না।"—বলিতে বলিতে গৃহিণীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

ছোট বউ বলিলেন, "ছেলের হাতের গঙ্গাজল খেয়ে যেতে পারা—সে ত অবিশ্যি ভাগ্যেরই কথা দিদি। কিন্তু এখন কেন ? এখনও একটি নাতির মুখ তুমি দেখনি। নাতি হোক, তাকে মানুষ কর, তার পর তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো, আমরা বারণ করবো না। ওষুধ দিই, খাও।"

গৃহিণীর নিষেধ সত্ত্বেও ছোট বউ পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহাকে ঔষধ পান করাইয়া দিলেন। তার পর বলিলেন, "ওঠাই ছেলেকে।"—বলিয়া হীরালালের শয্যার নিকটে গিয়া তাহার গা ঠেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "হীরু, বাবা, ওঠো ওঠো—দিদি জেগেছেন—তোমায় ডাকছেন।"

হীরালাল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "অ্যাঃ! মা জেগেছেন!"—বলিয়া জননীর কাছে আসিয়া, তাঁহার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ মা ? জ্বর ত অনেকটা কমেছে দেখ্ছি। এখন আর কিছু কষ্ট আছে কি ?"

গৃহিণী পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া, সেই অঙ্গুলিপুটে চুমা খাইয়া বলিলেন, "না বাবা, আর কোনও কষ্ট নেই আমার। তুমি বাড়ী এসেছ, আমার হারাধন ফিরে পেয়েছি, আর কি আমার কোনও কষ্ট থাকে ?"

হীরালালের চক্ষু দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বালকের মত জননীর বক্ষে মুখ লুকাইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

তুমি কোন্ কাননের ফুল,

তুমি কোন্ গগনের তারা।

বসুমতী প্রেস। [শিল্পী—ঠাকুর সিং।

৭ম বর্ষ]　　কার্ত্তিক, ১৩৩৫　　[১ম সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

৬

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি

সকল সময়েই মানুষ যে নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিবার সুযোগ পায়, তাহা নহে,—সেই জন্য পৃথিবীতে কর্ম্মরথের চাকা এমন কঠোর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলে। যে মানুষের মুদির দোকান খোলা উচিত ছিল, সে ইস্কুলমাষ্টারি করে, পুলিসের দারোগা হওয়ার জন্য যে লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তাকে পাদ্রির কাজ চালাইতে হয়। অন্য ব্যবসায়ে এইরূপ উল্‌টাপাল্‌টাতে খুব বেশী ক্ষতি করে না; কিন্তু ধর্ম্মব্যবসায়ে ইহাতে বড়ই অঘটন ঘটাইয়া থাকে। কারণ, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে মানুষ যথাসম্ভব সত্য হইতে না পারিলে তাহাতে কেবল যে ব্যর্থতা আনে, তাহা নহে, তাহাতে অমঙ্গলের সৃষ্টি করে।

খৃষ্টানধর্ম্মের আদর্শের সঙ্গে এ দেশের মানবপ্রকৃতির এক জায়গায় খুব একটা অসামঞ্জস্য আছে। খৃষ্টান শাস্ত্রোপদিষ্ট একান্ত নম্রতা ও দাক্ষিণ্য এ দেশের স্বভাবসঙ্গত নহে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে জয়ী করিবার উত্তেজনা ইহাদের রক্তে প্রাচীনকাল হইতে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য সৈন্যদলে যাহাদের ভর্ত্তি হওয়া উচিত ছিল, তাহারা যখন পাদ্রির কাজে নিযুক্ত হয়, তখন ধর্ম্মের রং শুভ্রতা ত্যাগ করিয়া লাল টক্‌টকে হইয়া উঠে। সেই জন্য য়ুরোপে আমরা সকল সময়ে পাদ্রিদিগকে শান্তির পক্ষে সার্ব্বজাতিক ন্যায়পরতার পক্ষে দেখিতে পাই না। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ইহারা বিশেষভাবে ঈশ্বরকে নিজেদের দলপতি করিয়া দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরোপাসনাকে রক্তপাতের ভূমিকারূপে ব্যবহার করে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, ইহারা যাহাদিগকে হীদেন বলে, তাহাদের প্রতি সত্যবিচার করিতে ইহারা অক্ষম। যেন তাহারা খৃষ্টানের ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনো দেবতার সৃষ্টি, সুতরাং তাহাদিগকে নিন্দিত করিতে পারিলে যেন নিজের

ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, এই রকমের একটা ভাব তাহাদের মনে আছে। এই বিরুদ্ধতা, এই উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা পাদ্রি অন্য ধর্ম্মের লোককে সর্ব্বদা পীড়া দিয়াছে। তাহারা অস্ত্রধারী সৈন্যদলের মত অন্যকে আঘাত করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে।

তাই ভারতবর্ষে পাদ্রিদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাহা এই বিরুদ্ধতার ধারণা। তাহারা যে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত পৃথক্, এইটেই আমরা অনুভব করিয়াছি। তাহারা আমাদিগকে খৃষ্টান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে; কিন্তু এক করিবে না। এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতিকে মিলাইবার ভার ইহাদেরই লওয়া উচিত ছিল, যাহাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া সুবিচার করিতে পারে—সেই সেতু বাঁধিয়া দেওয়া ত ইহাদেরই কাজ। কিন্তু তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। খৃষ্টান পাদ্রিরা অখৃষ্টান জাতির ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার-ব্যবহারকে যতদূর সম্ভব কালিমালিপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে চিত্রিত করিয়াছে; এমন কোনও জাতি নাই, যাহার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো যায় না। অথচ ইহাই নিশ্চিত সত্য যে, সকল জাতিকেই তাহার শ্রেষ্ঠতার দ্বারা বিচার করিলেই তাহাকে সত্যরূপে জানা যায়। হৃদয়ে প্রেমের অভাব এবং আত্মগরিমাই এই বিচারের বাধা। যাঁহারা ভগবানের প্রেমে জীবনকে উৎসর্গ করেন, তাঁহারা এই বাধাকে অতিক্রম করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু অন্য জাতিকে হীন করিয়া দেখাইয়া পাদ্রিরা খৃষ্টান অখৃষ্টানের মধ্যে যত বড় প্রবল ভেদ ঘটাইয়াছে, এমন বোধ হয় আর কেহই করে নাই। অন্যকে দেখিবার বেলায় তাহারা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের সাম্প্রদায়িক কালো চস্‌মা পরিয়াছে। বিজেতা ও বিজিতজাতির মাঝখানে একটা প্রচণ্ড অভিমান স্বভাবতই আছে, তাহা শক্তির অভিমান—সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মানুষোচিত মিলনের সেই একটা মস্ত অন্তরায়; পাদ্রিরা সেই অভিমানকে ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির দিক হইতেও বড় করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই খৃষ্টানধর্ম্মও নানা প্রকারে আমাদের মিলনের একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছে—তাহা আমাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এমন সাধারণভাবে কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। এখানে আসিয়া একজন খৃষ্টান পাদ্রির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে, যিনি পাদ্রির চেয়ে খৃষ্টান বেশি—ধর্ম্ম যাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্ত্তি ধরিয়া উগ্ররূপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত সুসম্মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না যে, ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্য দলের। ইহাই অত্যন্ত অনুভব করি, ইনি মানুষ—ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন—তাহা খৃষ্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ঈর্ষা করেন না। আরো আশ্চর্য্যের বিষয়, ইঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে। সেখানে খৃষ্টানের পক্ষে যথার্থ খৃষ্টান হইবার মস্ত একটা বাধা আছে—কারণ, সেখানে তিনি রাজা। সেখানে রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতির সপত্নী। অনেক সময়ে তিনিই সুওরাণী। এইজন্যে ভারতবর্ষের পাদ্রি ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে সমবেদনার যোগ রাখিতে পারেন না। একটা মস্ত জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত আছে এবং এক জায়গায় তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শির নত করিতে পারেন না। তিনি নম্রতা দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সেটা স্বর্গরাজ্যের নীতি। ইঁহারা মর্ত্ত্যরাজ্যের অধীশ্বর।

আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, ইনি রেভারেণ্ড এণ্ড্রুস্। ভারতবর্ষের লোকের কাছে ইঁহার পরিচয় আছে। তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে, তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খৃষ্টানধর্ম্ম যেখানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে যে কি মাধুর্য্য এবং উদারতা, তাহা ইঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।

ইনিই একদিন আমাকে বলিলেন, "দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে এখানকার গৃহস্থবাড়ি তোমাকে দেখিয়া যাইতে হইবে। সহরে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে—পল্লীগ্রামে না গেলে তাহার ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।" ইঁহার এক জন বন্ধু ষ্টাফোর্ড-শিয়রে এক পল্লীতে পাদ্রির কাজ করিয়া থাকেন; তাঁহার বাড়িতে এণ্ড্রুস সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আগষ্ট মাস এদেশে গ্রীষ্মঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য।

সে সময়ে সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খাইয়া আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অবারিত ভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গ পাই, সেখানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচুররূপে আমাদের পক্ষে সুলভ যে, তাহার সঙ্গে যোগ-সাধনের জন্য বিশেষভাবে আমাদিগকে কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু এখানে প্রকৃতিকে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জন্য লোকের মনের ঔৎসুক্য কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে, সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া যায়—বড় ছুটি পাইলেই সহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির ট্রেণগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ, বসিবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই সহরের উড়ুক্ষু মানুষের ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম!

গম্যস্থানের ষ্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা তাঁহার খোলা-গাড়িটি লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে যখন চড়িলাম, তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি ম্লানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদূর যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া যখন পৌছিলাম, গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুন-জ্বালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাদ্রি-নিবাস নহে। ইহা নূতন তৈরি। গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বৃদ্ধ তরুশ্রেণী বহুদিনের ধারাবাহিক মানবজীবনের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পল্লবপুঞ্জের অস্ফুট ভাষায় মর্ম্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নূতন, বোধ হয় ইঁহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘন সবুজ তৃণ-ক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া কাঙাল চক্ষুর কাছে অজস্র সৌন্দর্য্যের অবারিত অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছে। গ্রীষ্মঋতুতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য্য, এমন ত আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ যে কি ঘন ও তাহা কি নিবিড় সবুজ, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন, লাইব্রেরী সুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযত্নের চিহ্ন নাই। এখানকার ভদ্রগৃহস্থ ঘরে এই জিনিষটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইঁহাদের ব্যবহারের, আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্য জিনিষটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে। নিজের চারিদিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা, তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই জাগ্রত আত্মাদরের ভাবটি ছোট-বড় সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মনুষ্যগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘরবাড়িকে যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে, সমাজকে, দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জ্জন করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদের প্রয়াস অহরহ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। ত্রুটি জিনিষটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই মাপ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্বামী উট্রম্ সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এখানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্ত্তা পরিয়া বেড়ায়, এখানকার দেবতাও সেই রকম অত্যন্ত গম্ভীর ভদ্রবেশে আচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু এই ঘন গাম্ভীর্য্যের ছায়াতলেও এখানকার পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়িল না। গুল্মশ্রেণীর বেড়ার দ্বারা বিভক্ত ঢেউখেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্যামলিমা দুই চক্ষুতে স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে, কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও নাই; আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন সুরের গায়ে সুর মীড়ের টানে ঢলিয়া পড়ে, এখানকার মাটির উচ্ছ্বাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে;—ধরিত্রীর সুর-বাহারে যেন কোন্ দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গৎ বাজাইতেছেন। আমাদের দেশের যে সকল প্রদেশ পার্ব্বত্য, সেখানকার যেমন একটা উদ্ধত মহিমা আছে, এখানে তাহা দেখা যায় না; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, বন্য-প্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ—শরীরটি নধর চিক্কণ, নন্দীর তর্জ্জনী-সঙ্কেত মানিয়া তাহার পায়ের কাছে শিং নামাইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রভুর তপোবিঘ্নের ভয়ে হাম্বাধ্বনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উট্রম্ সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই—স্থানীয় চাষী গৃহস্থদিগকে নিজেদের ভিটার চারিদিকে

খানিকটা করিয়া বাগান করিতে উৎসাহ দিবার জন্য ইঁহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্ষ অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে। উট্রম্ সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজের কুটীরের চারিদিকে বহুযত্নে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারীর বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর একটি সুফল এই যে, এই উৎসাহে মদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেষ্টায় নিজের অন্তরকেও ক্রমশঃ সৌন্দর্য্যের সুরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্রম্ সাহেবের হিতানুষ্ঠানের সম্বন্ধ আরো নানাদিক হইতে দেখিয়াছি। এই প্রকার মঙ্গলব্রতে নিয়ত উৎসর্গ করা জীবন যে কি সুন্দর, তাহা ইঁহাকে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি। ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইঁহার জীবন পরিপক্ক মধুর ফলের মত নম্র হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইঁহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে; ইঁহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর, তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।

এই যে এক একটি করিয়া পাদ্রি কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্র হইয়া বসিয়া আছেন, ইঁহার সার্থকতা এবার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই সর্ব্বদেশব্যাপী বৃহৎবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা নিতান্ত গণ্ডগ্রামগুলির মধ্যে একটা উন্নতির প্রয়াস জাগ্রত হইয়া আছে। এইরূপে ধর্ম্ম এদেশে শুভকর্ম্ম আকারে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ ব্যবস্থার সূত্রে এদেশের সমস্ত লোকালয় মালার মত গাঁথা হইয়াছে। আমাদের মত যাহারা এই প্রকার সার্ব্বজনীন ব্যবস্থার অভাবে পীড়িত হইতেছে, তাহারাই জানে, ইহা কত বড় একটি কল্যাণ।

মানুষ এমন কোন নিখুঁৎ ব্যবস্থা চিরকালের মত পাকা করিয়া গড়িয়া রাখিতে পারে না—যাহার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি কোনো অনর্থ কোনোকালে প্রবেশ করিবার পথ না পায়। এদেশের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মতন্ত্রের সঙ্গে এখনকার উন্নতিশীল কালের কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে, এ কথা সকলেই জানে। আমি এখানকার অনেক ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। যে সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব, তাহাকে অন্ধভাবে স্বীকার করিবার পাপে তাঁহারা লিপ্ত হইতে চান না। এইরূপে দেশপ্রচলিত ধর্ম্মমত নানাস্থানে জীর্ণ হইয়া পড়াতে ধর্ম্মের আশ্রয়কে তাঁহারা সর্ব্বাংশেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ সময়েই নানা কপটাচার বৃদ্ধ ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরো রোগাতুর করিয়া তোলে। আজকালকার দিনে নিঃসন্দেহেই চার্চ্চের মধ্যে এমন অনেক পাদ্রি আসন গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন না, তাহা প্রচার করেন এবং যাহা প্রচার করেন, তাহাকে কায়ক্লেশে বিশ্বাস করিবার জন্য নিজেকে ভোলাইবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই মিথ্যা যে সমাজকে নানাপ্রকারে আঘাত করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদিনই গোঁড়ামি ধর্ম্মের সিংহদ্বারকে এমন সঙ্কীর্ণ করিয়া ধরে, যাহাতে করিয়া ক্ষুদ্রতাই প্রবেশ করিবার পথ পায়, মহত্ত্ব বাহিরে পড়িয়া থাকে। এইরূপে য়ুরোপে যাঁহারা জ্ঞানে প্রাণে হৃদয়ে মহৎ, তাঁহারা অনেকেই য়ুরোপের ধর্ম্মতন্ত্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এ অবস্থা কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না।

কিন্তু য়ুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম্ম—গতির বেগে সে আপনার বাধাকে কেবলি আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে। খৃষ্টান ধর্ম্মমত যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া এই স্রোতের বেগকে বাধা দিতেছে, সেই পরিমাণে ধাক্কা খাইয়া তাহাকে প্রশস্ত হইতে হইবে। এই প্রক্রিয়া প্রত্যহই চলিতেছে; অবশেষে এখনকার মনীষীরা যাহাকে খৃষ্টান ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাহা নিজের স্থূল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। তাহা ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খৃষ্টান পুরাণবর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যস্থবাদীও নহে। য়ুরোপের ধর্ম্মপ্রকৃতির মধ্যে খুব একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চিত, য়ুরোপ কখনই আপনার সনাতন ধর্ম্মমতকে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেয়ে নীচে ঝুলিয়া পড়িতে দিয়া নিজেকে এত বড় একটা বোঝায় চিরকাল ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিবে না।

যাহাই হোক, পাদ্রিরা এই যে ধর্ম্মমতের জাল দিয়া সমস্ত

দেশকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের সত্যকে কিছু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর ইহাতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ সুরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তাহা স্বভাবতই আপন কর্ত্তব্যের দায়িত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের আদর্শ যতই উচ্চ হইবে, ততই তাহা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে—যখনই সমাজের কোনও বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্বকে বংশগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখনই আদর্শকে যতদূর সম্ভব খর্ব্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এই নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ মিথ্যার বোঝা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণকে সমাজ ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে, সে ব্রাহ্মণ চরিত্রে ও ব্যবহারে ভক্তিভাজন হইবার জন্য নিজেকে বাধ্য মনে করে না, সে কেবলমাত্র পৈতার লাগামের দ্বারা সমাজকে চালনা করিয়া তাহাকে নানাদিকে কিরূপ হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহা অভ্যাসের অন্ধতাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না। এখানে প্রত্যেক পাদ্রিই যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু ইহারা বংশগত পাদ্রি নহে, সমাজের কাছে ইহাদের জবাবদিহি আছে;—নিজের চরিত্রকে আচরণকে ইহারা কলুষিত করিতে পারে না—সুতরাং, আর কিছু না হউক, সেই নির্ম্মল চরিত্রের, সেই ধর্ম্মনৈতিক সাধনার আদর্শটিকে যথাসাধ্য দেশের কাছে ইহারা ধরিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রে যাহাই বলুক, ব্যবহারতঃ অধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করাইতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা-সঙ্কোচ নাই। ইহাতে ধর্ম্মের সঙ্গে পুণ্যের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না,—ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বকে আমরা প্রত্যহ অপমানিত করিতেছি। এখানে অধার্ম্মিক পাদ্রিকে সমাজ কখনই ক্ষমা করিবে না; সে পাদ্রি হয় ত ভক্তিমান না হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে চরিত্রবান্ হইতেই হইবে,—এই উপায়েই সমাজ নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসন্দেহই তাহার পুরস্কার লাভ করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, এখানকার পাদ্রির দল সমস্ত দেশের জন্য একটা ধর্ম্মনৈতিক মোটাভাত মোটাকাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু সেইটুকুতেই ত সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নহে। সমস্ত দেশের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যে বড় বড় ধর্ম্মসমস্যা উপস্থিত হয়, খৃষ্টের বাণীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া পাদ্রিরা ত তাহার মীমাংসা করেন না। দেশের চিত্তের মধ্যে খৃষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার যে ভার তাঁহারা লইয়াছেন, এইখানে পদে পদে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। যখন বোয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সমস্ত দেশের পাদ্রিরা তাহার কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন? এই যে পারস্যকে দুই টুকরা করিয়া কুটিয়া ফেলিবার জন্য য়ুরোপের দুই মোটা গৃহিণী বঁটি পাতিয়া বসিয়াছেন, পাদ্রিরা চুপ করিয়া আছেন কেন? ভারতবর্ষে কুলি-সংগ্রহ ব্যাপারে, কুলি খাটাইবার ব্যবস্থায় সেখানকার শাসন-তন্ত্রে, সেখানে দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে এমন কি কোনো অবিচার ঘটে না, যাহাতে খৃষ্টের নাম লইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া দুর্ব্বল অপমানিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন? তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কি আমরা দেখিয়াছি? ইংরেজিতে "পয়সার বেলায় পাকা, টাকার বেলায় বোকা" বলিয়া একটা চলতি কথা আছে। বড় বড় খৃষ্টানদেশের ধর্ম্মনৈতিক আচরণে আমরা তাহার পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছি; তাঁহারা ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শকে আঁট করিয়া রাখিতে চান, অথচ সমস্ত জাতি ব্যূহবদ্ধ হইয়া এমন সকল প্রকাণ্ড পাপাচরণে নির্লজ্জভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যাহাতে সুদূরব্যাপী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখ-দুর্গতির সৃষ্টি করিতেছে। এমন দুর্দ্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজাতির এই সার্ব্বজনীন সয়তানীর বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়িতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পাদ্রি কয়জন? এমন কি, গণনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্মে আস্থাবান্ নহেন। অথচ চার্চ্চের চির-প্রথাসম্মত কোনো বাহ্য পূজাবিধিতে সামান্য একটু নড়চড় ঘটাইলে সমস্ত পাদ্রিসমাজে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই জন্যই কি যিশু তাঁহার রক্ত দিয়াছিলেন? জগতের সম্মুখে ইহা কোন্ সুসমাচার প্রচার করিতেছে? খৃষ্টানদেশের পাদ্রির দল স্বজাতির ধর্ম্ম-তহবিলের সিকি-পয়সা আধ-পয়সা আগলাইয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু বড় বড় কোম্পানির কাগজ ফুঁকিয়া দিবার বেলায় তাঁহাদের হুঁস নাই। তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাকে কড়ির মূল্যে সমান করেন ও মোহরের মূল্যে অপমানিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রতিদিন

দেখিতেছি। পাদ্রিদের মধ্যে এমন মহাশয় আছেন, যাঁহারা অকৃত্রিম বিশ্ববন্ধু, কিন্তু সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য। কিন্তু দলের দিকে তাকাইলে এই কথা মনে আসে যে, ধর্ম্মকে দলের হাতে সমর্পণ করিলে তাহাকে খানিকটা পরিমাণে দলিত করা হয়। ইহাতেও এক প্রকারের জাত তৈরি করা হয়—তাহা বংশগত জাতের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভাল হইলেও তাহাতে জাতের বিষ খানিকটা থাকিয়া যায় ও তাহা জমিয়া উঠিতে থাকে। ধর্ম্ম মানুষকে মুক্তি দেয়, এই জন্য ধর্ম্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাখা চাই; কিন্তু ধর্ম্ম যেখানে দলের বেড়ায় আটকা পড়ে, সেখানেই ক্রমশঃ তাহার ছোট দিক্‌টাই বড় দিকের চেয়ে বড় হইয়া উঠে, বাহিরের জিনিষ অন্তরের জিনিষকে আচ্ছন্ন করে ও যাহা সাময়িক, তাহা নিত্যকে পীড়া দিতে থাকে। এই জন্যই সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাদ্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না;—তাঁহাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নাই, যাহার সম্মুখে এই সকল বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্ব্বসমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গরীবের বৌ

১

সে ত নহে কোন ধনিজন-বধূ
বিলাসের ফুলদানী,
বসনে ভূষণে নাহি দেয় সে যে
ঝলসি দৃষ্টিখানি!
নহে সুকোমল দেহখানি তার
শুধু শুয়ে বসে খেয়ে,
পাউডারে রং-এ নাহি প্রসাধন
নিত্য সাবানে নেয়ে।
গরীবের বৌ নাহি বাবুয়ানা
তবুও সে সুন্দরী,
রূপের মাধুরী উথলিয়ে পড়ে
সকল দেহটি ভরি।
খাটুনীতে তার গঠিত শরীর
পল্‌কা-ঠুন্‌কো নহে,
অৰ্দ্ধ-অশন কভু অনশন
মুখ বুজে তাই সহে।
নিয়মিত তেল বিহনে তাহার
রুক্ষ-রুক্ষ কেশ,
ছেঁড়া তালি দেওয়া সাড়ীখানি পরে
নাহিক বাহার-লেশ।
সারা দেহে তার ওঠেনি কখন
সোনা-রূপা এক রতি,
দু'গাছি শাঁখায় সিঁদুর রেখায়
সে যেন গো ভগবতী!
মোটা খায় পরে কুঁড়ে ঘরে থাকে
দিন কাটে দুখে-সুখে,
সারাদিন খাটে আপনার মনে
কথাটি নাহিক মুখে।
দিবসের শেষে যায় সে যখন
প্রেমময় স্বামি-পাশে,
স্বর্গ হইতে শান্তি তাহার
হৃদয়ে নামিয়া আসে।

২

লেপা-পোঁছা তার ঘরখানি যেন
লক্ষ্মীর মন্দির,
একগাছি তৃণ নাহিক কোথায়
উঠান কানাচটির।
ক্ষারে কাচা তার কাপড়-বিছানা
সদা ধপ্‌ধপ্ করে,
ঝক্ ঝক্ করে বাসন-কোসন
মাজে সে আপন করে।
ঝাড়া বাছা তার চাল-ডাল ক'টি
গোছান যত্ন ক'রে,
হাঁড়ি-ডালা-কুলো আছে একধারে
থাকে থাকে থরে থরে।
বাড়ীটি দেখিলে জুড়ায় নয়ন
তৃপ্তিতে বুক ভরে,
দেখিনি এমন শুচিতার শ্রী
অনেক ধনীর ঘরে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সোনার পাহাড়

একাদশ পরিচ্ছেদ

নাশোটোয়ারো

যখন আমরা অগণ্য গিরি, নদী, অরণ্য, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আমাদের সকল আশা, আনন্দ ও সুখশান্তির সমাধিক্ষেত্র পারদ-খনির অভিমুখে ধাবিত হইলাম, তখন হইতেই আমরা পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম; কিন্তু সেই দুর্গম পথে কোনও দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই। পলায়নের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, সঙ্গিগণের সহিত তাহার আলোচনা করিলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ, প্রহরীরা তাহা শুনিলেও বুঝিতে পারিত না; তথাপি নীরব থাকাই সঙ্গত মনে হইল। আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, পলায়ন ভিন্ন দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের আশা নাই; কঠোর পরিশ্রমে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া, দুশ্চিকিৎস্য রোগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই যাহাদের একমাত্র পরিণাম, তাহারা সেই কঠোর ভাগ্যলিপি ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে দিবারাত্রি পলায়নের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সচেষ্ট থাকিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ দুর্গম পথে আমরা পলায়নের কোন সুযোগ পাইলাম না; অবশেষে আমাদের গন্তব্য স্থল আজোগুয়েসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই স্থান হইতে পলায়নের কোন উপায় নাই! প্রহরীরা অত্যন্ত সতর্ক, তাহার উপর তাহারা আমাদিগকে এরূপ কড়া পাহারায় রাখিয়াছিল যে, প্রথম কয়েক দিন এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িলাম।

এই ভাবে এক সপ্তাহ অতীত হইলে আমার পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। কারণ, সেই কয়েক দিনেই বুঝিতে পারিলাম, আমাদের প্রহরীরা (তাহাদিগকে সৈনিক বলুন বা কারারক্ষক বলুন) সরকারের এক দল অকর্ম্মণ্য, কর্ত্তব্যজ্ঞানরহিত কিঙ্কর। সেই স্থান হইতে পলায়ন করা আমাদের সাধ্যাতীত; ইহা বুঝিতে পারায় কয়েক দিন পরে তাহারা তাস খেলিয়া, ধূমপান করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল; তাহাদের নিদ্রার পরিমাণও বাড়িয়া গেল!--কোন য়ুরোপীয় কারাগারে এরূপ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে যে সকল সৈনিকের উপর নির্ব্বাসিত কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ-ভার অর্পিত ছিল, তাহারা অত্যন্ত নোংরা, অলস, নিদ্রালু, আরামপ্রিয় জীব। ইহা কেবল তাহাদের নহে, দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ দেশের অধিবাসিবর্গের চরিত্রগত বিশেষত্ব; স্থানীয় জল-হাওয়াই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ধারণা হইল, যদি আমরা পাঁচ জন য়ুরোপীয় কয়েদী কোন উপায়ে এক একটি বন্দুক ও উপযুক্ত পরিমাণ টোটা সংগ্রহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই শান্ত্রিদলকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতাম। আমরা পাঁচজনেই দীর্ঘকায় বলবান পুরুষ এবং অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। দীর্ঘকাল নাবিকের কার্যে নিযুক্ত থাকায় আমরা কষ্টসহ ও পরিশ্রমী হইয়াছিলাম, এবং বিপদ আপদে পড়িলে ভয় পাইতাম না। আমাদের দেহে বৃটিশ-শোণিত প্রবাহিত, এ জন্য আমাদের এটুকু বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকে নূন্যকল্পে কুড়ি জন ইকুয়েডরীয় সৈন্যের সমকক্ষ। কিন্তু আমাদের এই আত্মাভিমান যতই তৃপ্তিকর হউক, আমরা নিরস্ত্র বন্দী বলিয়া, আমাদের ধারণা যে সত্য, ইহা প্রতিপন্ন করিবার উপায় ছিল না; এবং শৌর্য্য-বীর্য্যের অধিকারী হইয়াও আমরা শিশুর ন্যায় অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক শত নিরস্ত্র সাহসী

বীরপুরুষও সম্মুখ-যুদ্ধে পাঁচ জন সশস্ত্র কাপুরুষের সমকক্ষ নহে।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও কয়েক দিন পরে আমাদের হতাশ হৃদয়ে ধীরে ধীরে নূতন আশার সঞ্চার হইল। আমার মনে হইল, যদি সুন্দরী নসিস্‌কা তাহার অঙ্গীকার পালন করে, এবং কোন দিন আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা তাহার সহায়তা লাভ করিতে পারিব। সে রমণী হইলেও বুদ্ধিমতী ও চতুরা, এবং বার্ণিকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল; পৃথিবীতে এরূপ নারী কে আছে যে, তাহার প্রণয়ীর হিতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় কুণ্ঠিত হইবে? কিন্তু সে কি সত্যই আমাদের নিকট আসিতে পারিবে? এ বিষয়ে আমার সন্দেহ না থাকিলেও বার্ণি নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। তাহার ধারণা হইল—নসিস্‌কা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে পারিবে না; পথের কষ্টেই হয় ত তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া বার্ণি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাহার সাহস, উৎসাহ, ধৈর্য্য সকলই বিলুপ্ত হইল। সে দিনের মধ্যে পাঁচবার আক্ষেপ করিয়া আমাকে বলিত, আর তাহার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই, মৃত্যু হইলেই সে শান্তিলাভ করিতে পারে। নসিস্‌কার প্রেমে সে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, বিরহযন্ত্রণা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অবস্থা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

আমরা আজোগুয়েসের কারাগারে উপস্থিত হইবার পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট ভাবেই কাটাইলাম। কারাগারের কর্ম্মচারী ও রক্ষিগণের ভাব-ভঙ্গি এবং ব্যবহার লক্ষ্য করিতেই এই তিনটি সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কারা-বিধান অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক বলিয়াই আমার ধারণা হইল। দেখিলাম, আমাদিগকে কারা-প্রাঙ্গণের বাহিরে যাইতে দিতেই তাহাদের যত আপত্তি; কারাবরোধে আমরা যাহা খুসী করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদিগের নিকট ঘোষণা করা হইয়াছিল—যদি আমরা কোন দিন কারাপ্রাঙ্গণ হইতে পলায়নের চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। যদি কারারক্ষীরা বা স্থানীয় সৈনিক পুরুষরা কোন পলাতক কয়েদীকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে না পারে, তাহা হইলে স্থানীয় আইন অনুসারে প্রত্যেক গ্রামবাসী সেই পলাতক কয়েদীকে দেখিবা মাত্র গুলী করিয়া হত্যা করিতে বাধ্য। কোন গ্রামবাসী করুণাবশে বা অন্য কোন কারণে কোন পলাতক কয়েদীকে আশ্রয় দান করিলে বা কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিলে, যদি সে ধরা পড়ে, তাহা হইলে কয়েদীর সঙ্গে তাহার আশ্রয়দাতাকেও গুলী করিয়া তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়, পলাতক কয়েদীর আশ্রয়দাতা আদালতে আত্মসমর্থনের সুযোগ লাভ করিতে পারে না। এই সকল কারণে কারাপ্রাঙ্গণ হইতে কোন কৌশলে পলায়ন করিতে পারিলেও কোন কয়েদী দীর্ঘকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। কয়েদীরাও জানে, পলায়ন করিলেও নিস্তার নাই, সুতরাং তাহারা সুযোগ পাইলেও পলায়নের চেষ্টা করে না।

কিন্তু এই সকল বিষয় অবগত হইয়াও আমরা পলায়নের চেষ্টায় বিরত হইলাম না। আমরা বুঝিয়াছিলাম, দীর্ঘকাল পারদ-খনিতে কুলিগিরি করিলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য; পলায়নের চেষ্টা করিলেও মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল, কিন্তু যদি কোন উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব। ইহাও মন্দের ভাল। কারাগারের অধ্যক্ষের, এমন কি, কারাবাসীদেরও ধারণা ছিল, প্রাণভয়ে কোন কয়েদী কোন দিন পলায়নের চেষ্টা করিবে না। কারণ, সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা সে জানে।

একটি সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নির্ম্মিত চৌকা অট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে কয়েদীরা বাস করিত। সেই প্রাঙ্গণে কয়েদীদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। বাহির হইতে সেই প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য একধারে একটি খিলানের তলা দিয়া দ্বার ছিল; সেই খিলানের উপর খোলা বারান্দাবিশিষ্ট 'গ্যালারী।' এই গ্যালারীতে বার জন সশস্ত্র প্রহরী দিবা-রাত্রি পাহারায় থাকিত। খিলানের নীচে কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ দ্বার; কয়েক জন কারারক্ষী এই দ্বার রক্ষা করিত। কারাকক্ষগুলির পশ্চাতে প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাচীর; এই প্রাচীরের মাথায় কয়েক ফুট ব্যবধানে এক একটি বারান্দার মত স্থান। প্রত্যেক বারান্দায় এক এক-জন সশস্ত্র প্রহরী থাকিত। সুতরাং কারাগারটি কিরূপ সুরক্ষিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন কয়েদী যথা-সাধ্য চেষ্টাতেও প্রহরীদের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিতে পারিত না।

এরূপ দুর্গম স্থানে নির্ম্মিত কারাগার এরূপ সুদৃঢ় করিবার কারণ কি, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পরে ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই কারাগারের কয়েদিগণকে বিভিন্ন স্থানে বিভক্ত করা হইত।

কয়েদীরা যে পারদ-খনিতে কুলিগিরি করিবার জন্য প্রেরিত হইত, সেই খনি কারাগারের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। কয়েদীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত রাখিয়া এক এক জনকে দুই মাসের জন্য খনিতে কায করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেই দল দুই মাস কুলিগিরি করিয়া এরূপ পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইত যে, তাহাদিগকে দুই সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইত। তাহারা বিশ্রাম উপভোগ করিতে আজোগুয়েসের কারাগারে প্রত্যাগমন করিত, এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে আর এক দল সেই কারাগার হইতে খনিতে প্রেরিত হইত। পূর্ব্বে এরূপ নিয়ম ছিল না; কিন্তু কয়েদীরা খনিতে অনির্দ্দিষ্ট কাল কঠোর পরিশ্রম করায় কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছিল, অকালমৃত্যুর হার ক্রমে এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, কুলীর অভাবে খনির কায অচল হইবার উপক্রম হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে কয়েদীদের দুই মাস শ্রমের পর দুই সপ্তাহ কাল বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় মৃত্যুর হার না কি অনেক কম হইয়াছিল। বস্তুতঃ, পারার খনির বাষ্প এরূপ বিষাক্ত যে, একাদিক্রমে দুই মাসের অধিক কাল সেই খনিতে কায করিতে হইলে সকল কয়েদীকেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন্মৃত হইতে হইত। সেই সকল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইতে তাহাদের পরিত্রাণলাভের আশা থাকিত না। দুই মাসের পরিশ্রমের পর পরিশ্রান্ত কয়েদীরা কারাগারে প্রত্যাগমন করিয়াও যদি কারাকক্ষে রুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইত, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে কারাপ্রাঙ্গণের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে দেওয়া হইত। সেখানে তাহারা তখন স্বাধীন। এইরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিতেও পারে—এই আশঙ্কায় কারাগার সুদৃঢ় করিয়া তাহা সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই কারাগারে এক মাস বাস করিবার পর এক দিন প্রভাতে আমরা সংবাদ পাইলাম, আমাদিগকে পারদের খনিতে অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে। এই সংবাদে আমাদের মন আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইল। স্থানটি কিরূপ ভীষণ এবং পরিশ্রম কিরূপ কঠোর, এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইল। আমরা চল্লিশ জন কয়েদী এক শত সশস্ত্র সৈনিকের 'হেফাজতে' যাত্রা আরম্ভ করিলাম। এই সকল খনি কয়েকটি পাহাড়ের অধিত্যকায় অবস্থিত; তাহার চতুর্দ্দিকে অরণ্য ও দুর্গম গিরি-কান্তার। কয়েদীরা খনিতে কায করিবার পর খনির বাহিরে আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের কুটীরে রাত্রিবাস করিত। এই সকল কুটীর বিক্ষিপ্ত—একটির সহিত অন্যটির সংস্রব নাই। এই সকল খনিতে একই সময়ে দুই শত কয়েদী কায করিত, এবং চারি শত সৈনিক ও প্রহরী বন্দুক ঘাড়ে লইয়া তাহাদের পাহারায় থাকিত।

আমরা কয়েক দিন এই সকল খনিতে কায করিয়া পরিশ্রমের কঠোরতা ও ভীষণতা উপলব্ধি করিলাম। সবল ও সুস্থ দেহে কঠোর শ্রম দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু পারদ-খনিতে পরিশ্রম করিলে অল্প সময়েই শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িত, এবং বিষাক্ত বাষ্পের প্রভাবে দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণের কিছু বিলম্ব থাকিলেও মন এরূপ অবসন্ন ও বিষাদাচ্ছন্ন হইত যে, তাহার ফলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইত। উন্মত্ততাই এই পরিশ্রমের শোচনীয় পরিণাম।

আমরা পাঁচ জনেই এক খনিতে কায করিবার ভার পাইয়াছিলাম,এ জন্য আমাদের যুক্তি-পরামর্শ করিবার সুযোগের অভাব হয় নাই। আমরা স্থির করিলাম, যেরূপে হউক পলায়ন করিতে হইবে, সে চেষ্টায় যদি প্রাণ যায় তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু আজীবন দাসত্ব করা বা 'ক্ষেপিয়া মরা' অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আমরা কয়েক দিন পরিশ্রম করিয়া তাহা এত দূর অসহ্য মনে করিলাম যে, অবিলম্বেই পলায়ন করা কর্ত্তব্য মনে হইল; কিন্তু আমাদের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বার্ণি অত্যন্ত কাতর হইল, এবং ব্যাকুলভাবে বলিল, "ভাই সকল, তোমরা এত ব্যস্ত হইও না; আমার প্রিয়তমা অঙ্গীকার করিয়াছিল, সে এক মাসের মধ্যেই কুইটো হইতে এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবে। সে নিশ্চয়ই আসিবে, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না; বরং আমার আশঙ্কা হয়, সে হয় ত পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়া প্রাণ হারাইবে, এখানে আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারিবে না। অন্য ভাবেও সে বাধা পাইতে পারে; কিন্তু আরও কিছু দিন তাহার প্রতীক্ষা কর, তাহার পর যাহা ভাল মনে হয় করিও। সে আসিয়া যদি আমাদিগকে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, ভাবিয়াছ কি?"

তাহার প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া আমরা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলাম। আমি নসিস্কার অঙ্গীকার

নির্ভরযোগ্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার অন্যান্য সঙ্গীরা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর সে আসিয়াছে! যদি সে পথে বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় পাকে ডুবিয়া মরিয়াছে, না হয় তাহাকে বাঘে খাইয়াছে।"—আমার ধারণা হইল, তাহাদের এই অনুমান মিথ্যা, বার্ণির প্রতি তাহার প্রণয়ের গভীরতায় বিশ্বাস থাকিলে তাহারা অসঙ্কোচে এরূপ দৈববাণী করিত না।

আরও কিছু দিন অতীত হইল, অবশেষে আমাদের কুইটো ত্যাগের ঠিক দুই মাস পরে নসিস্‌কা আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আমরা কিরূপ আনন্দিত হইলাম, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। কারাগারে অবস্থিতি কালে বাহিরের কোন লোক কোন কয়েদীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে কারাধ্যক্ষ বা প্রহরীরা তাহাতে বাধা দিত না; কিন্তু যে সকল কয়েদী পারদের খনিতে কায করিতে আসিত, তাহাদের সহিত স্বেচ্ছায় কেহ দেখা করিতে পারিত না, সে-জন্য কুইটোর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাহাকে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত; কিন্তু নসিস্‌কা কুইটোর কারাগারের অধ্যক্ষের কন্যা; কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঐরূপ অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই।

নসিস্‌কা আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল, বার্ণির সহিত তাহার মিলনের দৃশ্য এরূপ হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে, আমি তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমি কঠোরহৃদয় নাবিক; স্নেহ, প্রেম, করুণা প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তির সহিত আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ বিরহে উৎকণ্ঠিতা নসিস্‌কা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, অবসন্ন দেহে বার্ণিকে যখন দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন আমার কঠিন প্রাণও বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং আমার দুই চোখের জল টস্‌-টস্‌ করিয়া গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নসিস্‌কা বিহ্বল স্বরে বার্ণিকে বলিল, "ওগো আমার চোখের মণি, ওগো আমার বুকের কলিজা, তোমাকে হারাইয়া যে কষ্ট পাইয়াছি, একশ বার মরিতেও আমার তত কষ্ট হইত না!"

হায় অভাগিনী!—তাহার দুঃখে আমার হৃদয় বিগলিত হইল; কারণ, তাহার প্রেমাস্পদের সহিত তাহার এই মিলনের স্থায়িত্বের আশা ছিল না। যদি সে বার্ণিকে বিবাহ করে, তাহা হইলে চিরজীবনের জন্য তাহাকে দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইবে। প্রেমের অন্ধ দেবতাটির কাণ্ডজ্ঞান নাই! নতুবা সুন্দরী নসিস্‌কা নির্ব্বাসিত বন্দীকে হৃদয় সমর্পণ করিবে কেন?"

নসিস্‌কা অল্পকাল সেখানে থাকিবার আদেশ পাইয়াছিল, এই জন্য তাহাকে সেই গিরি-উপত্যকা ত্যাগ করিয়া আজোগুয়েসে প্রস্থান করিতে হইল। কিন্তু নসিস্‌কা অঙ্গীকার পালন করায় বার্ণি প্রফুল্ল হইল; তাহার আনন্দ ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। সে হাসিয়া বলিল, "নসিস্‌কা সত্যই আমাকে ভালবাসে; তাহাকে লাভ করিবার জন্য আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি। দেখ ভাই সকল, নসিস্‌কার সাহায্যেই আমরা এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব, সে আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। আমার এ কথা মিথ্যা হইলে, আমার নাম বার্ণি কেগান নহে।"

তাহার উৎসাহ দেখিয়া আমরাও উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম; আমাদের হতাশহৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু নসিস্‌কা কি ভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিবে, এবং তাহার সহায়তায় কিরূপে আমরা মুক্তিলাভ করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সেই খনিতে দুই মাস অতিবাহিত হইলে আমরা অবকাশ লাভ করিলাম। কিরূপ কষ্টে ও পরিশ্রমে এই দুই মাস কাটিল, তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। দুই মাসের কঠোর শ্রমে আমরা কৃশ ও দুর্ব্বল হইলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিন আমরা প্রহরীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আজো-গুয়েসের কারাগারে যাত্রা করিলাম। যে কয়েদীদল আমাদের পরিবর্ত্তে পারার খনিতে কায করিতে আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা পরিশ্রম করিতে যাইতেছে, আমরা বিশ্রাম করিতে চলিয়াছি। তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল, আমাদের সৌভাগ্যে তাহাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছে। সংসারের নিয়মই এইরূপ! খোঁড়াও অন্ধের হিংসা করে, কারণ, অন্ধের মত সে চলিতে পারে না।

যে দিন আমরা কারাগারে প্রত্যাগমন করিলাম, তাহার পর-দিন নসিস্‌কা আমাদের সহিত দেখা করিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারাবরোধের অন্তরালে আমাদের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল, অর্থাৎ আমরা যখন ইচ্ছা কারাকক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রশস্ত আঙ্গিনায় বেড়াইতে পারিতাম। কয়েদীরা সেখানে বসিয়া বাহিরের লোকের সহিত গল্প করিতে পারিত, ধূমপানেও আপত্তি হইত না, কোন কয়েদী নিদ্রিত হইলেও কেহ তাহার নিদ্রার

ব্যাঘাত করিত না। তবে তাহারা প্রহরিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত যে কোন ব্যক্তি বিনা-এত্তেলায় কারাগারে প্রবেশ করিয়া কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিত। নগরের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ তদ্দেশবাসী 'ইণ্ডিয়ান,' তাহাদের অধিকাংশই শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের লোক। কিন্তু সেই নগরে য়ুরোপীয় বণিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না, তবে তাহাদের অনেকেই সঙ্কর-বর্ণ; জার্ম্মাণ, ইহুদী এবং স্পানিয়ার্ড বণিকও কয়েক জন সেখানে বাস করিত। এতদ্ভিন্ন আমাদের স্বদেশবাসী এক জন ভদ্রলোকও বহুদিন হইতে সেখানে বাস করিতে ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম রিচার্ড জো-ওয়েল। কিন্তু তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর দক্ষিণ-আমেরিকায় প্রবাস-জীবন যাপন করায় এবং স্বদেশের সংস্রব ত্যাগ করায় মাতৃভাষা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। শেষ দশ বৎসর তিনি আজোগুয়েস নগরে বাস করিতেছিলেন; এখানে তিনি যাশোটোয়ারো নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, সেখানে কিছু কিছু 'যার্ব্বামতে' (দক্ষিণ আমেরিকার চা) উৎপন্ন হইত। তিনি তাঁহার ক্ষেত্রোৎপন্ন চা বিক্রয় করিতেন, তদ্ভিন্ন কিছু কিছু পারদও য়ুরোপে রপ্তানী করিতেন। শিকারে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিয়াত্তর বৎসর হইলেও তিনি যুবকের ন্যায় সুস্থ ও সবল ছিলেন। তাঁহার দেহ সরল ও উন্নত ছিল, বার্দ্ধক্যভারে তাহা বক্র হয় নাই এবং এই বয়সেও তিনি শ্রমসাধ্য কর্ম্মে রত থাকিতেন। আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী, এই সংবাদ পাইয়া এক দিন তিনি কারাগারে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, এবং আমাদের দুঃখ-কষ্টে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, নসিস্‌কা তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্রী। যাশোটোয়ারো বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে কুইটো যাইতেন, এবং নসিস্‌কার পিতার সহিত কারবার করিতেন। এ জন্য অনেক দিন হইতেই নসিস্‌কার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

কারাগারে যাশোটোয়ারোর সহিত আমাদের পরিচয় হইলে আমি তাঁহাকে আমাদের সকল কথাই বলিলাম, তবে ডন্‌কুমের যে সকল কাগজপত্র আমার কাছে ছিল, তাহা তাঁহাকে দেখাইলাম না। সেই কাগজগুলি আমি একখানি রুমালে বাঁধিয়া কোমরে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। এ জন্য এত দিন কেহই সে-গুলির সন্ধান জানিতে পারে নাই। যাশোটোয়ারো আমাদের বিশ্বাসের পাত্র হইলেও কারাগারের ভিতর সেই সকল কাগজপত্র বাহির করা আমি সঙ্গত মনে করিলাম না। ডন্‌কুম্ তাহার নোট-বহিতে স্বর্ণভূমির যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম না। তাঁহাকে এইমাত্র বলিলাম, ডন্‌কুম্ ও তাহার সহচররা স্বর্ণভূমি আবিষ্কার করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ; কারণ, তাহার ভেলায় যে বাক্সটি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে প্রচুর স্বর্ণ সঞ্চিত ছিল। সেই সকল স্বর্ণ স্বর্ণভূমি হইতে সংগৃহীত, ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আমার সকল কথা শুনিয়া যাশোটোয়ারো গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমার কথা অবিশ্বাস করেন নাই, এবং আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী বলিয়া আমাদের পক্ষপাতীও হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট অবিচারে আমাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহার লজ্জাজনক,—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ডনকুম্ ও তাহার সহচরবর্গ কর্তৃক স্বর্ণ-সংগ্রহের প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "এ দেশের আদিম অধিবাসিবর্গের মধ্যে দীর্ঘ-কাল হইতে এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বাঞ্চলে ওরিয়েণ্টে এবং নাপো নদীর সন্নিকটস্থ কোন গিরি-উপত্যকা রাশি রাশি স্বর্ণে পরিপূর্ণ। আমি স্বয়ং পূর্ব্বাঞ্চলে অধিক দূর যাইতে পারি নাই, সুতরাং সেই অঞ্চল সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তবে আমার যখন শিকারের বাতিক ছিল, সেই সময় শিকার উপলক্ষে আমি দক্ষিণে পেরু সীমান্তে এবং উত্তরে নিউ গ্রাণাডার সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম।"

তিনি পুনর্ব্বার চিন্তামগ্ন হইলেন, এবং কয়েক মিনিট পরে মাথা তুলিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমার ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এই প্রাচীন বয়সেও যৌবনের উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও আমার দেহে বলেরও অভাব হয় নাই, এবং শিকারিসুলভ সুতীব্র ঘ্রাণ-শক্তিতেও বঞ্চিত হই নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি হঠাৎ নীরব হইলেন, এবং দুই-এক মিনিট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাথা

নাড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি নির্ব্বোধের মত এ সকল কি বলিতেছি ?—তোমরা কয়েদী, ইকুয়েডর রাজ্যের আইন অনুসারে তোমাদের অপরাধের শাস্তি হইয়াছে। আমি এখন এই রাজ্যের প্রজা, তোমাদিগকে সাহায্য করা দূরের কথা, তোমাদের প্রতি সহানুভূতিপ্রদর্শনও আমার অকর্ত্তব্য। আমি তোমাদিগকে আর একটি কথাও বলিব না।"

আমাকে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ কারাপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলেন, এবং মুহূর্ত্ত পরেই অদৃশ্য হইলেন। তখন আমার মনে হইল—লোকটা পাগল না কি ? সন্দেহ হইল, বৃদ্ধের মাথার একটু গোল আছে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"আগুন! আগুন!"

যাশোটোয়ারোর সহিত যে দিন কারাপ্রাঙ্গণে বসিয়া আমাদের ঐ সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল, তাহার পরদিন নসিস্কা কিছু ফল-মূল লইয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সে-গুলি সে আমাদিগকে উপহার দিয়া, বার্ণির হাত ধরিয়া সেই আঙ্গিনার একপ্রান্তে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। সেখানে কয়েক মিনিট তাহাদের প্রেমালাপ চলিল। আমি দূরে থাকায় তাহাদের কথা শুনিতে পাইলাম না; তাহা শুনিবার জন্যও আমার আগ্রহ ছিল না।

তাহাদের কথা শেষ হইলে উভয়ে আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিল। আমি নসিস্কাকে বলিলাম, "শোন নসিস্কা, ঐ যে বুড়োটা কাল আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল—কি যেন তাহার নাম,—হাঁ, মনে হইয়াছে—যাশোটোয়ারো, ঐ বিদ্‌কুটে নাম কি মনে রাখা যায়? তা বুড়োর নাম যাহাই হউক, তাহার মাথার একটু গোল আছে; কি বল তুমি?"

আমার কথা শুনিয়া নসিস্কার হাসিমাখা চক্ষু দুটি দারুণ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল, তাহার পর সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "চুপ করুন; পাগলের মতন কি বলিতেছেন ? এই ইকুয়েডর রাজ্যে উহার মত চতুর লোক আর এক জনও আছে কি না জানি না। এ দেশে আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে উনিই সেই লোক। আপনারা উঁহার বন্ধুত্বলাভে উপকৃত হইবেন, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উনি আমাকে আপনাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা দু'জনে একটা কিছু জোগাড়-যন্ত্র করিব স্থির হইয়াছে। এককালে তিনি সুদক্ষ শিকারী ছিলেন। এ দেশের ইণ্ডিয়ানরা উঁহাকে যেমন বিশ্বাস করে, সেই রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। তাহারাই উঁহার নাম দিয়াছে যাশোটোয়ারো। তাহারা উঁহার আদেশে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। বিশেষতঃ উনি—"

সেই সময় এক জন অপরিচিত নগরবাসী আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাহাকে দেখিয়া নসিস্কা হঠাৎ নীরব হইল, এবং আমাকেও নির্ব্বাক থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। কিন্তু সে কথা শেষ না করিলেও যতটুকু বলিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিলাম, ইণ্ডিয়ানরা যখন তাঁহার আদেশে পরিচালিত হয়, তখন তিনি তাহাদের সাহায্যে এরূপ কোনও পন্থা অবলম্বন করিবেন, যাহার ফলে সেই কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আমাদের স্বাধীনতালাভ অসম্ভব হইবে না।

কিন্তু নাসিস্কা সে-দিন আমাদের নিকট আর কোন কথা প্রকাশ করিল না। রাত্রিকালে বার্ণি শয্যায় শয়ন করিয়া আমার কাণে কাণে বলিল, "আমার প্রিয়তমার সাহায্যেই আমরা উদ্ধারলাভ করিব, বন্ধু!"

বার্ণির কথা শুনিয়া আনন্দে উৎসাহে আমার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, আমি চাপা গলায় বলিলাম, "আমরা উদ্ধারলাভ করিব ?—কাহার সাহায্যে বলিলে ?"

বার্ণি বলিল, "আমার প্রিয়তমা কে জান না!—নসিস্কা। ন্যাকামী করিতেছ কেন ?"

আমি বলিলাম, "ন্যাকামী নয়, তোমার কথা বুঝিতে পারি নাই, ভাই! নসিস্কা বালিকা মাত্র, তাহার সহায়-সম্বল নাই, তাহার সাহায্যে আমরা মুক্তিলাভ করিব, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি ? সে কি করিবে ?"

বার্ণি বলিল, "এই নরক হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে।"

আমি বলিলাম, "সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছ, কিন্তু কি উপায়ে ?"—উত্তেজনা বশতঃ কথাটা একটু জোরে বলিয়া ফেলিলাম।

বার্ণি সভয়ে বলিল, "আস্তে, সতর্কভাবে কথা বল। আমি তাহার মনের কথা জানিতে পারি নাই, তবে তাহার কথার ভাবে বুঝিয়াছি, সে যাশোটোয়ারোর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাদের উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করিয়াছে।"

বার্ণির কথা শুনিয়া যাশোটোয়ারো সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল। যাহাকে পাগল মনে করিয়াছিলাম—তিনি সত্যই বীরপুরুষ, এবং আমাদের হিতৈষী বন্ধু; তিনি আমাদের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন!—একটু আশ্বস্ত হইলাম, এবং নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যাশোটোয়ারো পরদিন পুনর্ব্বার আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, কিন্তু সে দিন আমাদের বিপদের প্রসঙ্গে কোন কথা না বলিয়া নিজের পুরাতন কাহিনীর আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল, লোকটির জীবন রহস্যবৈচিত্র্যে পূর্ণ। বস্তুতঃ, তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি, ইহা তাঁহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম। লোকটি পাচ হাত লম্বা জোয়ান, ষাঁড়ের গর্দ্দানের মত সুদৃঢ় স্থূল গর্দ্দানের উপর প্রকাণ্ড মাথা! পোড়া তামার মত মুখের বর্ণ; কিন্তু মুখের প্রত্যেক শিরার ভাঁজে ভাঁজে চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। বৃদ্ধের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি কি তীক্ষ্ণ, যেন এক জোড়া আগুনের ভাঁটা! সুদীর্ঘ ভ্রূযুগলে তাহা প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভ্রূ-জোড়াটি তুষার-শুভ্র, এক-গাছি কেশও কাল ছিল না। তাঁহার মস্তকের শুভ্র কেশরাশি দীর্ঘ, তাহা তাঁহার ঘাড়ের উপর লতাইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাঁহার চেহারা খুব মাতব্বর দেখাইতেছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর সতেজ, পরিস্ফুট, সুমিষ্ট, এবং আন্তরিকতাপূর্ণ; প্রকৃতি গম্ভীর, প্রগল্‌ভতা-বর্জ্জিত।

তিনি উঠিবার পূর্ব্বে আমার কাছে সরিয়া আসিয়া কাগজের একটি ছোট বাণ্ডিল আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। তাহার পর নিম্নস্বরে তাড়াতাড়ি বলিলেন, “জীবনের প্রতি মমতা থাকিলে সতর্ক থাকিবে, কাগজখানি লুকাইয়া রাখিবে, সুযোগ পাইলে গোপনে ইহা পাঠ করিবে, তাহার পর পুড়াইয়া ফেলিবে; ইহার এক টুক্‌রাও কেহ দেখিতে না পায়।”

এই সকল কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। কাগজের বাণ্ডিলটি আমি তৎক্ষণাৎ আমার আস্তিনের ভিতর লুকাইয়া রাখিলাম। উৎসাহে ও উত্তেজনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ বায়ু-তাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

আমরা কারাগারে কতকটা স্বাধীনতা ভোগ করিলেও কারা-রক্ষীরা আমাদের চোখে চোখে রাখিত; এ জন্য বৃদ্ধপ্রদত্ত কাগজ সে দিন পাঠ করিবার সুযোগ পাইলাম না। রাত্রিকালে কারাকক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, এ জন্য রাত্রিতেও তাহা পাঠ করা হইল না। পরদিন প্রত্যুষে ঊষালোকে কারাকক্ষ আলোকিত হইলে আমি চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কয়েদীরা তখনও সকলেই নিদ্রামগ্ন। কোন কারারক্ষীরও সাড়াশব্দ পাইলাম না। আমরা একদল কয়েদী সেই কক্ষে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শায়িত ছিলাম; আমার ঠিক মাথার উপর সেই কক্ষের গবাক্ষ; সেই গবাক্ষ-পথেই ঊষালোক কারাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছিল। আমার পাশে আর কোন কয়েদীর শয্যা না থাকায় আমি সেই পাশের দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইলাম; তাহার পর আস্তিনের ভিতর হইতে কাগজের বাণ্ডিলটি বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিলাম। সেই সময় এক জন শাস্ত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। কিন্তু আমি দেওয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া কাগজখানি এ ভাবে ধরিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম যে, শাস্ত্রীটা তাহা দেখিতে পাইল না; আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইতেছি,—ইহাই তাহার ধারণা হইল। কাগজখানি গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা হইয়াছিল; হস্তাক্ষর ক্ষুদ্র এবং এরূপ অপরিচ্ছন্ন যে, সকল কথা পাঠ করিতে কষ্ট হইল; দুই চারিটা শব্দ বুঝিতে পারিলাম না। বর্ণাশুদ্ধিরও অভাব ছিল না। কিন্তু কাগজখানি পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

“আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ বয়সে আমার আর অর্থ-লালসা নাই, তথাপি তোমাদের সহিত যোগদান করিয়া সেই স্বর্ণভূমি আবিষ্কার করিবার জন্য তোমাদের সঙ্গে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। তোমার নিকট যে গল্প শুনিয়াছি,—তাহা আমার কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছে; আমি নিশ্চেষ্টভাবে ঘরে বসিয়া থাকিবার বাসনা ত্যাগ করিয়াছি। উৎসাহ-হীন, বৈচিত্র্যহীন, নিরুদ্যম জীবন বহন করা আর বাঁচিয়া থাকা—একই কথা। আমি এ ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষপাতী নহি! চির-জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি সত্য, কিন্তু জীবন-সন্ধ্যায় অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিয়া আরাম উপভোগ করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, তোমরা আমার স্বদেশবাসী; তোমরা যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, তাহা নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু সে জন্য যে শাস্তি পাইয়াছ, অপরাধের তুলনায় তাহা অত্যন্ত গুরু; সুতরাং অবিচারে তোমরা দণ্ড ভোগ করিতেছ,—ইহা আমি স্বীকার করিতে

বাধ্য। এ অবস্থায় তোমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে আমি সুখী হইব; কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ জন্য তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। বিনা রক্তপাতে তোমাদের মুক্তিলাভের আশা নাই। স্থানীয় অধিবাসী 'ইণ্ডিয়ানরা' আমার অনুগত, তাহারা নতশিরে আমার আদেশ পালন করিবে, আমার আদেশে তাহারা জীবন-বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নহে। যদিও তাহাদিগকে বিপন্ন করিতে আমার আগ্রহ নাই; কিন্তু জল অপেক্ষা রক্ত ঘন। আমি আমার বিপন্ন স্বদেশীয় বন্ধুগণের উদ্ধারকামনায় তাহাদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিব। হাঁ, তোমাদের মুক্তিদানের জন্য তাহারা বিদ্রোহী হইবে। স্বজাতি-প্রেমের অনুরোধে আমার এই দুর্ব্বলতা, আমার এই অপরাধ পরমেশ্বর মার্জ্জনা করুন। যেখানেই যখন কোন ইংরাজ বিপন্ন বা উৎপীড়িত হইয়াছে, সেই স্থানেই তাহার স্বদেশবাসী স্বার্থ ভুলিয়া, নিজের সুখ-সম্পদ তুচ্ছ করিয়া —তাহার বিপদ্ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছে, তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছে; ইহা ইংরাজের চরিত্রগত বিশেষত্ব। আমি জীবনের অধিকাংশ কাল পৃথিবীর অন্য প্রান্তের এই সুদূর প্রবাসে যাপন করিয়াছি। বহুকাল হইতে মাতৃ-ভূমির সহিত আমার সংস্রব নাই; কিন্তু ইংরাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব কি ত্যাগ করিতে পারি? ইহা আমার সহজাত সংস্কার। আমি তোমাদের কারাগার আক্রমণের ব্যবস্থা করিব; যদি আমার ষড়যন্ত্র সফল হয়,—তাহা হইলে তোমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরভাবে অপেক্ষা কর। তোমরা নসিস্কার উপদেশে পরিচালিত হইবে। তোমার কথায় বা কার্য্যে কাহারও মনে যেন সন্দেহের উদ্রেক না হয়; কারণ, যদি কর্ত্তৃপক্ষ কোন উপায়ে এই ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা বুঝিতে পারে—তাহা হইলে তোমাদের সকলকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তোমাদের জীবনের আশা বিলুপ্ত হইবে।"

পত্রখানি এইখানেই শেষ হইয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া আমার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। আমাদের মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল; কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কাপুরুষ কে আছে যে, স্বাধীনতালাভের জন্য জীবন বিপন্ন করিতে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইবে?—কিছুকাল পরে আমরা সকলেই শয্যাত্যাগ করিলাম। প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে আমি সেই পত্রখানা জ্বালাইয়া তদ্দ্বারা 'পাইপ' ধরাইলাম। পত্রের মর্ম্ম ভুলিয়া যাইব—সে জন্য আশঙ্কা ছিল না। যাহা পাঠ করিলাম—তাহা কি ভুলিতে পারি?—বিশেষতঃ আমার স্মরণ-শক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, আমি যে কোন পুস্তকের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া, প্রয়োজন হইলে তাহা কয়েক দিন পরেও আবৃত্তি করিতে পারিতাম।

কয়েক ঘণ্টা পরেই আমার সঙ্গীদিগকে যাশোটোয়ারোর পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাইলাম। তাহারা আমার সঙ্কল্পের সমর্থন করিল, সকলেই বলিল—স্বাধীনতালাভের জন্য তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে। সেই যুদ্ধে যদি প্রাণ যায়—তাহাও তাহারা বাঞ্ছনীয় মনে করিল।

কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমরা এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিলাম না। অবশেষে এক দিন নসিস্কা বার্ণির নিকট গোপনে প্রকাশ করিল—সেই কারাগারের কতকগুলি 'ইণ্ডিয়ান' প্রহরী যাশোটোয়ারোর অর্থে বশীভূত হইয়া তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইয়াছে। এই সকল ইণ্ডিয়ানকে গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা ক্রীতদাসের ন্যায় অবজ্ঞা করিত; সুতরাং তাহাদিগকে হস্তগত করা যাশোটোয়ারোর পক্ষে কঠিন হয় নাই। সেই সকল প্রহরী গোপনে কতকগুলি স্বজাতীয় নগরবাসীকে দলভুক্ত করিয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইল। ষড়যন্ত্রের সকল আয়োজন শেষ হইলে বিদ্রোহিগণকে জ্ঞাপন করা হইল—নির্দ্দিষ্ট দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কারাগারের সেই সকল রক্ষী 'আগুন, আগুন' বলিয়া চীৎকার করিবে। তাহাদের চীৎকারে কারাগারে বিভীষিকার সঞ্চার হইবে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবে, কোথায় আগুন লাগিয়াছে জানিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিবে;—সেই সুযোগে কারারক্ষীরা কারাগারের দ্বার ভিতর হইতে খুলিয়া দিবে। তাহার পূর্ব্বেই এক একখানি তরবারি আমাদের হস্তে প্রদত্ত হইবে; সেই অস্ত্রের সাহায্যে আমরা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভের জন্য কারাগার ত্যাগ করিব। কারাগারের দেউড়ীর বাহিরে যাশোটোয়ারো আমাদের প্রতীক্ষা করিবেন; যদি আমরা সৈনিকগণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাঁহার দলের সহিত যোগদান করিতে পারি—তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশ করিবেন। যাশোটোয়ারো আমাদের পথিপ্রদর্শক হইলে দুর্গম অরণ্যে আমাদের পথ হারাইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

নসিস্কা বার্ণির নিকট এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিলে বার্ণি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিল,—"কিন্তু তোমার কি হইবে—

তাহা ত বলিলে না, নসিস্‌কা! যাশোটোয়ারোর সাহায্যে আমরা না হয় পলায়ন করিলাম, স্বাধীনতা লাভ করিলাম। কিন্তু তুমি তখন কোথায় থাকিবে? যদি তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে না পারি —তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই। আমরা চিরজীবন নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিব, পারার খনিতে কুলীগিরি করিয়াই জীবন শেষ করিব।"

নসিস্‌কা বার্ণিকে গাঢ় স্বরে বলিল, "তোমার আশঙ্কার কি কোন কারণ আছে, প্রিয়তম! আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতে পারি? আমি রমনী,—বিপদের সময় তোমাদের অনুসরণ করিতে পারিব না—এইরূপ অনুমান করিয়া ভয় পাইয়াছ?—কিন্তু আমি তোমাদেরই মত বন্দুক ধরিতে জানি, যে কোন যোদ্ধার মত তরবারি ব্যবহার করিতে পারি। কারাগারের বাহিরে যে দল তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবে —আমিও যে সেই দলের এক জন। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকিব।"

নসিস্‌কার কথা শুনিয়া আমরা সকলে সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জানিতাম সে প্রেমিকা; কিন্তু সে বীর নারী, আমাদের সাহায্যের জন্য সে বীরপুরুষের ন্যায় বন্দুক ও তরবারি ব্যবহার করিতে পারিবে, শত্রুর আক্রমণে সে বিচলিত হইবে না, অকম্পিত হস্তে তাহাদের বক্ষে গুলীবর্ষণ করিতে পারিবে—ইহা পূর্ব্বে কোন দিন কল্পনা করিতে পারি নাই। তাহার কথা শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণ দিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করিব। তাহাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিবে—এরূপ কাপুরুষ আমাদের দলে এক জনও ছিল না।

আরও দুই দিন অতীত হইল; মুক্তিলাভের আশায় এই দুই দিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় কাটিল। এক একটি দিন এক এক বৎসরের মত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল—আমরা যে নিশ্চিত কৃতকার্য্য হইব—এ কথা কে বলিতে পারে?—আমাদের চেষ্টা বিফল হইবারও যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। যদি আমরা কৃতকার্য্য হইতে না পারি—তাহা হইলে সৈনিকগণের অব্যর্থ গুলীতে আমাদের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে, অথবা অধিকতর যন্ত্রণা দিয়া আমাদিগকে নিহত করা হইবে। আমরা কাহারও কাহারও নিকট শুনিয়াছিলাম—যে সকল কয়েদী পূর্ব্বে এই কারাগার হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই; তাহারা ধরা পড়ায়, সৈনিকের গুলীতে নিহত হইয়াছিল; কেহ কেহ পারদ-খনিতে প্রেরিত হইয়াছিল। অন্যান্য কয়েদীরা দুই মাস পরিশ্রমের পর দুই সপ্তাহ বিশ্রামের অনুমতি পাইত; কিন্তু তাহারা সেই অনুগ্রহে বঞ্চিত হওয়ায় দুশ্চিকিৎস্য ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া অতি অল্প দিনেই ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছিল। সুতরাং মুক্তিলাভের চেষ্টা বিফল হইলে কিরূপ বিপন্ন হইব—ইহা চিন্তা করিয়া আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইল। আমাদের মন আশা ও নিরাশার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু নসিস্‌কা আমাদের হতাশভাব লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার আশা, আনন্দ ও উৎসাহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। সে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল—আমাদের চেষ্টা কোন কারণেই বিফল হইবে না; আমরা সকলেই পলায়নে সমর্থ হইব।

নসিস্‌কা বার্ণিকে বলিল, "শোন প্রিয়তম, তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি সকলই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমি এ জীবনে কুইটোতে ফিরিয়া যাইব না। বনবিহঙ্গের ন্যায় আমি স্বাধীনভাবে অরণ্যে-কান্তারে বিচরণ করিব, বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া আরণ্য প্রকৃতির মনোহর শোভা উপভোগ করিব—ইহাই আমার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কামনা কোন দিন আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, এই দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকালে আমি যে বিশালকায় নদীর তীরে ভ্রমণ করিতাম—সেই নদীর ও তাহার অরণ্যময় তীরভূমির অপরূপ শোভা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেরূপ বৃহৎ নদী পৃথিবীতে আর একটিও আছে কি না জানি না। শুনিয়াছি, নাপো বা আমেজন সহস্র সহস্র ক্রোশ দীর্ঘ। আমি আমার সেই সুখময়—শোভাময় জন্মস্থানে, আমার বাল্যের আনন্দময় ক্রীড়াকুঞ্জে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়াছি। যদি সেখানে তোমাকে পাই, তাহা হইলে সেই অরণ্যে স্বর্গসুখ উপভোগ করিব।"

বার্ণি সরল যুবক, তাহার মনে কপটতার লেশমাত্র ছিল না, এবং সে কোন কথা গোপন করিতে জানিত না। সে নাবিক হইলেও তাহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। নসিস্‌কার ঐ সকল কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বার্ণি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ অবস্থায় আমি কি করিব?—আমি

কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। একদিকে নারীর প্রেম, অন্যদিকে—"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অন্যদিকে পাহাড়-ভরা হেম!—একদিকে কামিনী, অন্যদিকে কাঞ্চন; কোন্ দিক্ সাম্লাইবে—স্থির করা কঠিন বটে! তবে নারী-প্রেমের মর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়। যদি তুমি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার—তাহা হইলে জীবন বিপন্ন করিয়াও তোমার প্রণয়িনীর মান ও প্রাণ রক্ষা করিবে, এবং কাঞ্চন-সংগ্রহের আশা ত্যাগ করিয়া উহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে; উহাকে সঙ্গে লইয়া উহার বাল্যের সুখ-স্মৃতিপূর্ণ লীলা-ক্ষেত্রে যাত্রা করিবে।"

আমার কথা শুনিয়া বার্ণি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "তোমার এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, ভাই! যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি—তাহা হইলে তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া নসিস্কাকে লইয়া কোথায় যাইব? না, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না; নসিস্কাকে ত্যাগ করাও আমার অসাধ্য। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ কহিয়া বলিতেছি—যত দিন বাঁচিব, নসিস্কাকে ত্যাগ করিব না। স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে যে গ্রামে বা নগরে উপস্থিত হইব—সেই স্থানের পাদরীকে বলিব—'নসিস্কার সঙ্গে আমার বিবাহ দাও'।—তাহাকে বিবাহ করিয়া আমরা সকলে একত্র সেই স্বর্ণভূমি আবিষ্কার করিতে যাইব।"

বার্ণির আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। আমি জানিতাম, বার্ণি নসিস্কাকে কখন ত্যাগ করিবে না। পৃথিবীর সকল দেশেই এরূপ যুবক অনেক আছে, যাহারা সুন্দরী যুবতী-দের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে, তাহার পর যখন রূপের নেশা কাটিয়া যায়, প্রেম পুরাতন হয়—তখন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তাহাদের নারী-জীবন ব্যর্থ হয়। বার্ণি সেরূপ ইতর বিশ্বাসঘাতক নহে। নসিস্কাকে রক্ষা করিবার জন্য বার্ণি জীবন-বিসর্জ্জনেও কাতর হইবে না।

আমরা দুই সপ্তাহ মাত্র বিশ্রামের অবকাশ পাইয়াছিলাম, সেই দুই সপ্তাহ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আর দুই এক দিন পরেই আমাদিগকে খনিতে যাত্রা করিতে হইবে বুঝিয়া স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টায় অবিলম্বে যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইলাম; অথচ আমরা কোন রকম উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিব—তাহার উপায় ছিল না। কারণ, আমরা পরমুখাপেক্ষী নিরস্ত্র বন্দিমাত্র। আমরা ব্যাকুলহৃদয়ে নসিস্কা ও ষাশোটোয়ারোর যোগাড়-যন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। তাহাদের সাহসে ও আন্তরিকতায় আমাদের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু বিদ্রোহীরা জয়লাভে সমর্থ হইবে কি না বুঝিতে পারিলাম না। তবে এ কথা সত্য যে, আমরা যাশোটোয়ারো অপেক্ষা যোগ্যতর নেতার সহায়তা লাভ করিতে পারিতাম না।

অবশেষে ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার সময় পর্য্যন্ত স্থির হইল। নসিস্কা আমাদিগকে বলিয়া গেল—সেই দিন রাত্রি বারটার সময় কারাগারে আগুন লাগিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। কারাগারে যাশোটোয়ারোর দলের লোক সুযোগের প্রতীক্ষা করিবে; কারাগারে আগুন লাগিয়াছে শুনিয়া তাহারা কয়েদীদের মনে আতঙ্ক-সঞ্চার করিয়া তাড়াতাড়ি কারাগারের দেউড়ী খুলিয়া দিবে। যাশোটোয়ারো ও তাহার দলের লোক কারাপ্রাচীরের বাহিরে লুকাইয়া থাকিবে; দেউড়ী উন্মুক্ত হইবামাত্র যাশোটোয়ারো সদলে কারাগারের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবেন। আমরাও দ্রুতবেগে দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইব। যাশোটোয়ারোর অনুচররা কারাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই আমাদিগকে কিরীচ বা তরবারি দিয়া সাহায্য করিবে; আমরা সেই সকল অস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করিব এবং সম্মুখের বাধা অপসারিত করিয়া কারাপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিব।

আমরা অধীর আগ্রহে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে কয়েদিগণকে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে হইত। রাত্রি নয়টার সময় কোন কয়েদী কারা-প্রকোষ্ঠের বাহিরে রহিল না। কার্য্যারম্ভের এখনও তিন ঘণ্টা বিলম্ব! আমরা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলাম—প্রকৃতিদেবী সেই রাত্রিতে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই দিন দিবাভাগে রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য হইয়াছিল; কারা-প্রাঙ্গণের বায়ু এরূপ উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, সেই স্থানটি যেন রুটিওয়ালার উনানের অভ্যন্তর ভাগ! সেই উত্তাপে কয়েদীরা জড়ভাবাপন্ন ও অবসন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা-লাভের প্রত্যাশায় দৈহিক অবসাদ ও জড়তা ত্যাগ করিলাম। আমাদের চেষ্টা সফল হইবে কি না জানিতাম না; কিন্তু আমাদের হৃদয় তখন আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ।

সূর্য্যাস্তের পর আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, সমগ্র আকাশ সীসার পাত দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে!

কিন্তু অল্পকাল পরে উর্দ্ধাকাশের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ মেঘের স্তর দৃষ্টিগোচর হইল। সায়াহ্নে গগনমণ্ডলে লোহিত মেঘের ঘটা কোন উপপ্লবের সূচনা কি না, তাহা আমরা না জানিলেও কয়েদীরা বলিল—"ইহা ভীষণ ঝটিকারম্ভের পূর্ব্বলক্ষণ!" ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল—কিন্তু উত্তাপের হ্রাস হইল না; শুনিলাম—ইহাও আসন্ন ঝটিকার একটি লক্ষণ। গরমে কয়েদীরা কারাকক্ষে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ঘরের ভিতর শয়ন করা অসাধ্য হইল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ হইল, কয়েদীরা বারান্দায় শয়ন করিতে পারে। কারাকক্ষের বাহিরে আঙ্গিনার দিকে দীর্ঘ বারান্দা ছিল। সকল কয়েদী মাদুর বগলে করিয়া সেই বারান্দায় শয়ন করিতে আসিল। আমরাও বারান্দায় আসিয়া স্পন্দিত-বক্ষে ও রুদ্ধ-নিশ্বাসে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে রাত্রি সাড়ে এগারটার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের নীলাভ জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র শিখা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া চক্ষু ধাঁধিয়া দিল; মুহূর্ত্ত পরে যুগপৎ শত কামান গর্জ্জনের ন্যায় সুগম্ভীর শ্রবণ-বিদারক বজ্রনির্ঘোষ! মেঘগর্জ্জনে সমগ্র অট্টালিকা সবেগে কাঁপিয়া উঠিল। মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইলে সমগ্র প্রকৃতি নিস্তব্ধ, তাহা অস্বাভাবিক গম্ভীরভাব ধারণ করিল। ইকুয়েডর রাজ্যে আসন্ন ঝটিকার ইহাও একটি বিশেষত্ব। কয়েক মিনিট পরে সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে অতি ভীষণ বৃষ্টি; টেনিসের বলের মত এক একটি বৃষ্টির ফোঁটা। বৃষ্টির সেরূপ শব্দ পূর্ব্বে কোথাও আমাদের শ্রবণগোচর হয় নাই। বৃষ্টি আরম্ভ হইবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পুনর্ব্বার মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিকাশে সমস্ত আকাশ আলোকিত হইতে লাগিল। ঘন ঘন মেঘগর্জ্জনে ও প্রচণ্ডবেগে বারি-বর্ষণে নৈশপ্রকৃতি প্রলয়ের আভাস জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

রাত্রি গভীর হওয়ায় অনেক কয়েদী নিদ্রামগ্ন হইয়াছিল; এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে তাহারা সকলেই জাগিয়া সভয়ে উঠিয়া বসিল। আমরাও এই সুযোগে একত্র উঠিয়া দাঁড়াইলাম; সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিবামাত্র আমরা বারান্দা হইতে নামিয়া দেউড়ীর দিকে ধাবিত হইব—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সময় যেন আর কাটে না! অবশেষে আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া আমি আমার সঙ্গীদের বলিলাম,—"ভাই সকল, সতর্ক থাক, স্মরণ রাখিও—সম্মুখে স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!"

সঙ্গীরা একবাক্যে বলিল, "হাঁ, স্বাধীনতা, অথবা মৃত্যু!"

আরও কয়েক মিনিট পরে সেই ভীষণ ঝটিকা ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সোঁ সোঁ ঝম্‌ঝম্ শব্দের ভিতর কারাগারের ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বারটা বাজিল। পেটা ঘড়ির সেই শব্দ আমরা সকলেই শুনিতে পাইলাম। মুহূর্ত্ত পরে কেহ সেই ঝটিকার ও বৃষ্টির শব্দ ডুবাইয়া, ভীতিবিহ্বল স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"আগুন! আগুন!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আঁধার রাতের ঝিল্লী

সে চলেছে—কে জানে কে!
নীল নিচোলে গা ঢেকে,
ঝমর্-ঝমর্ ঝুমুর বাজে
চল্‌তে তারি পা থেকে!

সে মেতেছে—দুষ্টু মেয়ে
কাজ্‌লা-কালো কালিন্দী,
জল্‌তরঙ্গ বাজিয়ে, নিশীথ-
নিদের নিতল আলিঙ্গি'!

সে বেজেছে—এক অভিনয়-
আরম্ভেরি ঐক্যতান,
কালো যবনিকার পিছে
নাট্যশালার মুখর প্রাণ!

সে গাহিছে—আম্রবনের
অন্তরালের 'কুউ-কুহু',
অবিশ্রান্ত সুর-কাঁপনে
কাঁপ্‌ছে কি মুহুর্মুহু!

আঁচল-চাপা মুখের হাসি,
বুক-ঢাকা বীণ্ কার কাঁদে,—
আঁধার রাতের ঝিল্লী যে আজ
আমার বুকে তার বাঁধে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিশ্বপ্রেম

বঙ্গ-জননীর—শ্যামল-কোমল-স্নিগ্ধ অঙ্কে ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে অপূর্ব্ব প্রেমময় লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

সে অপূর্ব্ব প্রেমময় লীলা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক কবি গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজের অমর-কাব্য 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' যেমন ফুটিয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই প্রেমলীলাবর্ণনের ভূমিকায় কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

> "এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আইলা।
> পূর্ব্ব-প্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িলা॥"

চরিতামৃতকার বলিতেছেন যে,—শ্রীগৌরাঙ্গদেব মহাপ্রভু কলিহত, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবনিবহকে প্রেম-বন্যায় ভাসাইয়া চরিতার্থ করিবার জন্য, নিজের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিজে ভক্তভাব পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; প্রভু নিত্যানন্দ ভক্তস্বরূপে দেখা দিয়াছিলেন। আর প্রভু আচার্য্য গোস্বামী অদ্বৈতাচার্য্য ভক্ত অবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তগণ আরাধক ভক্তরূপে সেই প্রেম-লীলায় যোগদান করিয়াছিলেন, আর গদাধর, স্বরূপ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মহাপ্রভুর শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই পাঁচ প্রকারই হইল পঞ্চতত্ত্ব। ভগবদ্‌ভক্তি, যাহার নামান্তর বিশ্বজনীন প্রেম, তাহার আস্বাদন নিজে করিয়া বিশ্বমানবকে করাইবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং ভক্তরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই হইল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত।

জ্ঞানে মানবের শান্তি হইতে পারে না, প্রেমেই মানবাত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিপ্রধান আর্ষ-গ্রন্থে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

> "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!—
> ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
> তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে—
> নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

জ্ঞান ব্যতিরেকে মানব সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হাত হইতে ঐকান্তিক ভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না, ইহাই হইল উপনিষদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বুঝাইবার জন্য ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক ঋষি ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন রচনা করিবার পর, নিজে এই সিদ্ধান্তেই পরিতৃপ্তি লাভ না করিতে পারিয়া মহর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে ভক্তিবাদী হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে ভক্তিরস-প্রধান শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। এ কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথমেই মহর্ষি বেদব্যাস নিজেই বলিয়াছেন। সেই ভাগবতের মধ্য হইতে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—হে প্রভো! মানবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি; অর্থাৎ বিশ্বাত্মা যে তুমি, তোমাকে ভালবাসা। এই প্রেমলক্ষণ ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, ইহার অনুশীলন না করিয়া কেবল শুষ্ক নিরাকার, নির্ব্বিকার অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানকে চরম পুরুষার্থলাভের উপায় বুঝিয়া, যাঁহারা সেই বোধ লাভ করিবার জন্য ধ্যান-ধারণা-সমাধি প্রভৃতি অশেষ ক্লেশকর সাধননিচয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এইরূপ সাধনের সমাশ্রয় পরিণামে ক্লেশেরই হেতু হইয়া থাকে; তাহার দ্বারা তাঁহারা অভীপ্সিত পরমনির্বৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন না। যেমন ধানের মধ্যবর্ত্তী তণ্ডুলকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ যদি তুষসমূহেরই অবঘাত করে, তাহার পক্ষে যেমন সেই তুষাবঘাত কোনও ফলপ্রদ হয় না, কিন্তু পরিণামে ক্লেশের জনক হইয়া থাকে, ভক্তিকে ছাড়িয়া জ্ঞানের আশ্রয় করিলেও তাহা সেইরূপ পরিণামে নিষ্ফল ও ক্লেশকর হইয়া থাকে, ইহাই হইল উদ্ধৃত শ্লোকটির তাৎপর্য্যার্থ। ভাগবত-শাস্ত্রেরও ইহাই হইল সার সিদ্ধান্ত; এই সিদ্ধান্ত যুগযুগান্তর হইতে মহর্ষিগণের সমাধিসিদ্ধ ভাষায় প্রতিবোধিত হইলেও ভক্তি যে আনন্দস্বরূপ, তাহার উদয় হইলে এ সংসারে মানবের আর অন্য কিছুই স্পৃহনীয় থাকে না, তাহা মানব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না; তাহার কারণ, ভক্তির মহিমা আদর্শ ভক্ত ব্যতিরেকে অপর কেহ বুঝাইতে পারে না।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবান্ এ ভারতে বহুবার অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ঐশীশক্তির প্রভাবে অধর্ম্মের নিরাকরণ করিয়াছিলেন, বারবার ধর্ম্মের সংস্থাপন

করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তির প্রকৃত মহিমা নিজে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন নাই বলিয়া, পরোক্ষভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমভক্তির বন্যায় জগৎ ভাসাইতে পারেন নাই, তাই এবার শ্রীভগবান্ আমাদিগের পুণ্য-জন্মভূমি বঙ্গদেশে নিজের সকল ঐশ্বর্য্যের বোঝা দূরে নামাইয়া রাখিয়া,—দীনভাবে অশ্রুসিক্তনয়নে ভক্তির প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ অসংখ্য ভক্তকে আস্বাদন করাইয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্য হয় না; যেখানে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ আছে, সেখানে ভক্তি ফুটে না। তপস্যা, যোগ, জ্ঞান, মানুষকে ঈশ্বরের সম্মুখীন করে বটে, কিন্তু ঐ মাধুর্য্যহীন ঐশ্বর্য্যের অনুভূতিতে হৃদয় গলে না, হৃদয় না গলিলে ভক্তি দেখা দেয় না। তাই ভাগবত বলিতেছেন—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতান্ ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাং তনু বাঙ্মনোভিঃ
তৈঃ প্রায়শোঽজিত? জিতোঽসি ননু ত্রিলোক্যাম্॥"

"পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য জ্ঞানলাভের প্রয়াসকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া, যাহারা নত হইয়াছে এবং নত হইয়া সকল অভিমান দূরে বিসর্জ্জন দিয়া, হে ভগবন্! তোমার সেই কথাকেই নিজের জীবন করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, যে কথায় জীবন্মুক্ত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মভাবাপন্ন মৌনী সাধুগণও মুখরিত হইয়া উঠেন, শুনিতে শুনিতে তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন, সেই কথাকেই যাঁহারা সংসারের সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বুঝেন ও তাহারই আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সাধনার জন্য তীর্থ-পর্য্যটনের আবশ্যকতা থাকে না; নিজ-গৃহেই হউক বা তোমার ভাবে বিভোর তোমার প্রেমে উন্মত্ত সাধুগণের সন্নিধানেই হউক, যে কোন স্থানে থাকিয়াই যে কোন অবস্থার মধ্যেই পতিত হইয়া, যাহারা তোমারই বার্ত্তাকে নিজের জীবিকা বা প্রাণধারণের প্রধান উপায় বলিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে, হে অজিত! ত্রিভুবনে তোমাকে কেহ জয় করিতে না পারিলেও অর্থাৎ তুমি কাহারও বশীভূত না হইলেও তাহারাই তোমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।" এই শ্লোকে ভগবানকে 'অজিত' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, 'অজিত' শব্দের অর্থ কি, যাহাকে কেহই জয় করিতে পারে না—তাহাই ত অজিত, সুখই হইল এ সংসারে অজিত। সকল জীবই সুখকে জয় করিয়া বশীভূত করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই সে সুখকে জয় করিতে সমর্থ হয় না; সুখের আশায়, সুখের বাসনায়, সুখের প্রলোভনে মানব অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করে, সুখকে বশীভূত করিবার জন্য কত অসাধ্য-সাধনও করে, সুখ কিন্তু কাহারও কখনও বশীভূত হয় না।

উপনিষদে বলে, ভগবান্ বা ব্রহ্ম সেই আনন্দ বা সুখ ছাড়া আর কিছুই নহেন। ভগবানের এ মুখের বাণী; শ্রুতি তাই বলিতেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি, আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"

"আনন্দ হইতেই সকল জীব আবির্ভূত হইয়া থাকে, আবির্ভূত হইয়া সকল জীব আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে, আবার মরণের পর সকলেই সেই আনন্দেই মিশিয়া যায়, সেই আনন্দই হইল ব্রহ্ম। ইহাই হইল উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। যে আনন্দ হইতে জীব উৎপন্ন হয়, যে আনন্দের প্রভাবে জীব জীবিত থাকে, মরণেও জীব যে আনন্দে মিশিয়া যায়, সে আনন্দ যেহেতু সকলের কারণ, সকলের আদি ও অন্তে বিরাজমান এবং যেহেতুক তাহা নিত্যসিদ্ধ স্বতন্ত্র, সুতরাং তাহা যে কাহারও বশীভূত নহে, হইতেও পারে না, ইহা কে অস্বীকার করিবে?"

অথচ সেই আনন্দকে পাইবার জন্য, পাইয়া চিরদিনের তরে নিজের অধীন করিবার জন্য সৃষ্টির প্রথম হইতে মানুষ কতই না চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মানবের বিজ্ঞান, মানবের দর্শন, মানবের সভ্যতা, মানবের জ্যোতিষ, মানবের বার্ত্তাশাস্ত্র, মানবের বাণিজ্য, এক কথায় বলিতে গেলে মানবের যাহা কিছু সাধনসম্পদ্, সে সকলেরই উদ্দেশ্য এই আনন্দকে, এই স্বতঃ স্বয়ংপ্রকাশ অজিত আনন্দকে বশীভূত করিয়া উপভোগ করিবার জন্য।

ব্যাপার মন্দ নহে। বশীভূত না হওয়াই যাহার স্বভাব, তাহাকেই বশীভূত করিবার জন্য সকল মানবই ব্যাকুল হইয়া আজীবন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ আনন্দ-'অজিত' কাহারও বশীভূত হইতেছে না।

এই আনন্দকে বশীভূত করিতে পারে যে সাধন, তাহাই মানবের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে

অধিকারভেদের তারতম্য ঘুচাইয়া দিয়া আচণ্ডালে বিলাইবার জন্য, ভগবান্ ভক্তভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—ইহাই হইল শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য ও অনুপম রহস্য। ভাগবতে ইহার সূচনা করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব ইহাকে মানবের করায়ত্ত করিয়া দিবার জন্য প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া ব্রহ্মার দুর্লভ এই প্রেম স্বয়ং সপরিকর পার্ষদগণের সহিত আস্বাদন করিয়া, জগতের আপামর সকল জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি অপূর্ব্ব প্রবল প্রেম-বন্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় দিতে যাইয়া অপার্থিব প্রেমের অসাধারণ কবি কি বলিতেছেন, তাহা শুনুন—

"পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাঢ়ে অণুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিঞা পিঞা হয় উনমত্ত।
নাচে গায় হাসে কান্দে যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥"
(চৈতন্য-চরিতামৃত—আদিকাণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)

কবি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—এই পঞ্চতত্ত্ব পৃথিবীতে আসিয়া নিত্যসিদ্ধ প্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। প্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা কি, তাহা আগে বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালে রাজার বহুমূল্য রত্নপূর্ণ ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাতে শিকল দিয়া 'কুলুপ' দেওয়া হইত, সেই 'কুলুপে'র উপর চাবির মুখে গালা গালাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হইত, তাহার উপর নরপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা দ্বারা ছাপিয়া 'শীলমোহর' করিয়া অঙ্কিত হইত; এই রাজার শীলমোহরাঙ্কিত কুলুপ রাজার আদেশে মুদ্রাবিরহিত করিয়া খুলিতে পারিলে তবেই সেই রত্ন-ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করা যাইত। এই মুদ্রা ভঙ্গ না করিতে পারিলে রত্ন-ভাণ্ডারে প্রবেশ করা সম্ভবপর হইত না।

প্রেম-ভাণ্ডারের দ্বারেও জগতের মানব-সৃষ্টির প্রথম অবস্থা হইতে এইরূপ মুদ্রা নিবেশিত হইয়া আছে। প্রেম-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার দ্বার হইল আমাদিগের অন্তঃকরণ। সেই অন্তঃকরণের মুদ্রা হইল অভিমান, এই অভিমানস্বরূপ মুদ্রার দ্বারা জীবের অন্তঃকরণের দ্বার যে পর্য্যন্ত রুদ্ধ থাকে, সে পর্য্যন্ত সেই অন্তঃকরণের নিভৃততম প্রদেশে অবস্থিত নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহার্হ-রত্নের দর্শন বা আস্বাদন কোন জীবের ভাগ্যেই ঘটে না। তাই ভগবদ্‌ভক্তগণের মধ্যে বরণীয় কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর হস্তিনাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বারকা-প্রস্থানে উদ্যত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো!
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্॥
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

"আমি প্রার্থনা করিতেছি—হে জগদ্‌গুরো! আমাদিগের সর্ব্বদাই বিপদ লাগিয়া থাকুক; কারণ, বিপদ আসিলেই তোমার দর্শন হইয়া থাকে। সে দর্শন কেমন, তাহা যাহার ভাগ্যে ঘটে, তাহার আর সংসারের কোন দুঃখই ভোগ করিতে হয় না। সাংসারিক জীব জাতি, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও শ্রী-মদে মত্ত হইয়া সর্ব্বানর্থকর অভিমানের অন্ধতম কূপে নিপতিত হইয়া আত্মহারা হয় বলিয়াই সকল বিপদ নিবারণের একমাত্র ঔষধ তোমার নাম পর্য্যন্ত লইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, তুমি কাহার? যাহার কিছু নাই, যে বুঝিয়াছে—এ সংসারে তুমি ছাড়া তাহার আর কেহই নাই, সেই তোমার নাম লইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলে, তোমাকে—সচ্চিদানন্দ ঘনরস বিগ্রহ যে তুমি, সেই তোমাকে—দেখিতে পায়, অন্যথা তোমার দর্শন কিছুতেই সম্ভবপর নহে।"

কুন্তীদেবীর এই প্রার্থনায় ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, জাতি, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও শ্রীমদের দ্বারা উপচীয়মান যে দেহাত্মাভিমান, তাহাই হইল মানব-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রেম-ভাণ্ডারের সুদৃঢ় মুদ্রা। শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় জগৎ বহাইবার পূর্ব্বে এই চতুর্ব্বিধ মদজনিত দুরন্ত আত্মাভিমানের দুর্ভেদ্য মুদ্রাকে উদ্‌ঘাটিত বা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পার্ষদগণের অপূর্ব্ব চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিশ্বপ্লাবিনী প্রেম-বন্যার প্রবাহে সেই সকল মহাপুরুষের জাতি, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যের স্বভাবসিদ্ধ অভিমান, মূলের সহিত অনন্তকালের জন্য উৎপ্লাবিত হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল, তাই শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন, অখণ্ডপ্রতাপ-গৌড়েশ্বরের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিত্বপদের দুরন্ত ঐশ্বর্য্যাভিমানকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া কৌপীনমাত্রসম্বল হইয়া, সেই প্রেম-বন্যায় ভাসিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্ম আশ্রয়

করিয়াছিলেন, তাই শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী বার্ষিক দ্বাদশলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আয়সম্পন্ন জমীদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও উদ্দামতারুণ্যের প্রলোভনময় জীবন ও সম্পদ্ ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া গভীর নিশীথে পিতৃগৃহ হইতে পলায়নপূর্ব্বক অনাহারে দৌড়িতে দৌড়িতে নীলাচলে দীনের বেশে কাঙ্গালের ন্যায় তাঁহারই পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাই নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ্যের কৌলীন্যের অভিমান দূরে বিসর্জ্জন দিয়া নাম বিলাইবার সময় আচণ্ডালে কোল দিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ মহাপুরুষগণের নিরভিমান ব্যবহার দেখিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীচৈতন্যাবতারের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে ঐশ্বর্য্যাদি মদবিজৃম্ভিত আত্মাভিমানরূপ প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রার উদ্‌ঘাটন।

এইরূপে প্রেমভাণ্ডারের মহামুদ্রার উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহারা সকলেই সর্ব্বাগ্রে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর কৃপায় প্রেমরূপ অমৃতের আস্বাদন করিয়াছিলেন। উহা আস্বাদন করিয়া তাঁহারা মাতিয়া গিয়াছিলেন, ব্যবহার জগতের চিরাভ্যস্তরীতির শৃঙ্খলাময় বন্ধন তাঁহাদিগের চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, প্রতিক্ষণ নূতন প্রেমের নব নব আস্বাদনে বিভোর হইয়া জগৎকে সেই প্রেমের আস্বাদনে চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা কি করিয়াছিলেন?

"লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে।"

এই ত হইল প্রেমের অসাধারণ স্বভাব। এ প্রেমরস যে আস্বাদন করে, তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, উত্তরোত্তর প্রতিক্ষণে আনন্দময় পিপাসাই বাড়িতে থাকে। তাহার পর সেই প্রেম-রস আস্বাদয়িতাকে প্লাবিত করিয়া তাহার প্রেমময়, করুণাময় ব্যবহারাবলীরূপ 'খাত'কে আশ্রয় করিয়া তাহারই সাহায্যে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সম্মুখে আশে পাশে যাহাকেই পায়, তাহাকেই ভাসাইয়া ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে বন্যার আকারকে প্রাপ্ত হয়, তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"উছলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বালক-যুবাবৃদ্ধ সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজনাশ।
তাহা দেখি পঞ্চ জনের অধিক উল্লাস॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭ম পরিঃ)

প্রেমিক কবি প্রেমের ভাষায় প্রেম-বন্যায় অবগাহনের ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'বীজনাশ'। এ বীজনাশ শব্দের অর্থটি কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে, মানব-হৃদয়ের জন্ম-জন্মান্তর হইতে সঞ্চিত পাপপ্রবণতা বা অভিমানজনিত সংস্কাররাশিকেই 'বীজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অভিমানজনিত সংস্কারই মানবের সকল প্রকার দুঃখের মূল, ও সকল প্রকার পাপের একমাত্র নিদান, সুতরাং দিগন্তপ্লাবিনী প্রেমবন্যায় অবগাহনের মুখ্য ফল হইতেছে, জীবের সকল প্রকার দুঃখ ও তাহার কারণ স্বরূপ বীজরূপে অবস্থিত পাপনিবহের বিনাশ। এই বীজনাশ তপস্যার প্রভাবে হয় না, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে হয় না। কিন্তু ভক্ত প্রপঞ্চিত প্রেমবন্যায় না ডুবিলে ইহার নাশ হইবার অন্য কোনই উপায় নাই।

প্রেমিক কবি কবিরাজ গোস্বামীর রসময়ী কবিতাতে ইহা এক ভাবে ফুটিয়াছে। আবার দার্শনিক কবি বেদব্যাসের গম্ভীর ভাবসমন্বিত দার্শনিক ভাষায় তাহাই অন্যরূপে ফুটিয়া বিশ্বপ্রেমিক ভক্তের জীবনের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া ভগবান্ বেদব্যাস ভক্তের মুখ দিয়া ইহাই প্রকারান্তরে ফুটাইয়াছেন—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎপরাং
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিললোকভাজাং—
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকটে আমি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য-যুক্ত ব্রহ্ম ইন্দ্র বরুণাদি পদপ্রাপ্তির প্রার্থনা করি না। আমি মুক্তিও চাহি না, আমি চাহি, আমি যেন জগতের সকল জীবের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের যত প্রকার আপত্তি আছে, তাহা সকলই গ্রহণ করি, আর তাহারা যেন ঐ সকল আপত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"ভারতভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করে করি পর উপকার॥"
(চৈঃ চঃ ৯ম পরিঃ)

শ্রীমদ্‌ভাগবতও তাই বলিতেছেন—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈ র্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।"

এ ভারতে মনুষ্যজন্মের ইহাই সফলতা যে, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সকল প্রাণীরই শ্রেয়োবিধান করা।

বিষ্ণুপুরাণও তাই বলিতেছেন—

"প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥"

কি ইহকালের, কি পরকালের, যাহা সকল প্রাণীর উপকারের হেতু, মতিমান ব্যক্তি মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা তাহারই ভজনা করিবে।

এই সকল আর্ষ বচনের দ্বারা সকল প্রাণীর শাশ্বত মঙ্গলের অসাধারণ হেতু যে প্রেমধর্ম্ম, সেই প্রেমধর্ম্মের নিজে আস্বাদন করিয়া সংসারের সকল মানবকে আস্বাদন করাইবার জন্য বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর প্রেমময় বঙ্গভূমির শাশ্বত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীচৈতন্যদেব এই বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রেমের বন্যা বহাইয়া ছিলেন, সেই বন্যাতে প্লাবিত উর্ব্বর বঙ্গভূমিতে ভক্তসঙ্ঘরূপ প্রেম-ফলের কল্পতরুকে বড়ই যত্ন ও আগ্রহের সহিত রোপণ করিয়াছিলেন। সেই প্রেমকল্পতরু হইতে যে প্রেম-ফল পাকিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি আচণ্ডাল, আযবন, আপতিত সকল মানুষকে জাতি-বর্ণ-অধিকার নির্ব্বিশেষে বিলাইয়া ছিলেন। তাহারই পরিচয় দিতে যাইয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"মূলস্কন্ধে শাখাতে আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেম-ফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী, নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে আছে যত ধন রত্ন মণি!
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্রে কুড়াঞা খায় মালাকার হাসে॥"

(চৈ, চঃ আদি ৯ম পরিঃ)

আত্মকলহে, স্বজাতিদ্রোহে, বিজাতীয়গণের প্রতি বিদ্বেষে সেই প্রেমের ঠাকুরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রেমবন্যার উদ্ভব-স্থান এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে আজ যে বিরোধের অনল জ্বলিয়াছে, সে অনলের লেলিহান বিষ-জ্বালাময় প্রদাহে আজ আমরা মরণের দ্বারে আসিয়া শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছি, আর মধ্যে মধ্যে 'স্বরাজের' সুখময় কল্পনার মোহময় ছবি আঁকিয়া পাগলের ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহা বকিতেছি। ভারতের স্বরাজের মূল ভিত্তি হইল যে প্রেম,—সর্ব্বজীবে দয়া, সর্ব্বত্র সমভাব, সকলকে আপনার করিবার জন্য আত্মাভিমানের বিসর্জ্জন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। এ দুর্দ্দিনে প্রেমের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ও অহমিকা যে জাতীয় উন্নতির পথের প্রধান অন্তরায়, ইহা ভাবিবার সামর্থ্যকেও হারাইতে বসিয়াছি। হিন্দুর স্বরাজ প্রেমের স্বরাজ, এ স্বরাজের মূলভিত্তি হইল প্রেম, তাহা একবারে বিস্মৃত হইয়াছি। এ আত্মহারা, মোহগ্রস্ত বাঙ্গালীকে প্রতীচ্য সভ্যতার মদিরাবেশ ঘুচাইয়া কে আবার সেই প্রেমের পথে ফিরাইবে? যে ফিরাইবে, তাহাকে পাইবার জন্য, তাহাকে আবার ভারতে পাঠাইবার জন্য বাঙ্গালার প্রেম-বন্যার আদি উদ্‌ভাবয়িতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের করুণার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী আজ চাহিয়া রহিয়াছে, আর চাহিয়া চাহিয়া কৃপার ভিখারী হইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই মধুর মহাবাক্যকেই সর্ব্বদা মনে করিতেছে—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ—
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে—
জীবেত যো মুক্তিপদে সদায়ভাক্॥"

স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগে চঞ্চল না হইয়া কেবল হে প্রাণময়! প্রাণের ঠাকুর! তোমারই করুণাপ্রকাশের শুভ মুহূর্ত্তের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া যে হৃদয়, বাক্য, ও শরীরের দ্বারা সর্ব্বথা সর্ব্বদা নত হইয়া এ সংসারে জীবনধারণ করিয়া থাকিতে পারে, সে-ই মুক্তিপদে অর্থাৎ তোমাতেই ভালবাসারূপ প্রেম-ভক্তি-লাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

কবি আনন্দচন্দ্র শিরোমণির পাঁচালী

আমরা 'মাসিক-বসুমতীর'—১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উপরি-উল্লিখিত কবির পাঁচালীর বিশদ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছি এবং উহাতে দেখাইয়াছি যে, ঐ পাঁচালীখানি কিরূপ রসভাবে সমৃদ্ধ এবং উহা কিরূপ খাঁটী বাঙ্গালার নিদর্শন। এক্ষণে আসলের আস্বাদন করাইবার জন্য সহৃদয় সুধীবৃন্দের নিকট মূল পাঁচালীখানি উপস্থাপিত করিতেছি। এই পাঁচালীখানির প্রণেতা কবি আনন্দচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইনি ভট্টপল্লীর পণ্ডিত-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, বাগ্মিতা ও তেজস্বিতা দেশময় প্রসিদ্ধ ছিল। বিমল কৌমুদীর মত তাঁহার সুযশ দেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। তাই তাঁহার সম্বন্ধে "আনন্দচন্দ্রশ্চন্দ্রোঽসৌ"—বলিয়া প্রবাদের মত একটি শ্লোক গ্রামের পণ্ডিত-সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। ইনি ১৮৮৪ অব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। সুতরাং গোটা উনবিংশ শতাব্দী—ইঁহার জীবৎকাল ধরা যাইতে পারে। বঙ্গভাষার ওলট-পালট এই সময়ের মধ্যে যথেষ্টই হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ামে সিবিলিয়ানগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থ মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত শিশু বাঙ্গালা গদ্যের হামাগুড়ি অবস্থা যেমন দেখা গিয়াছে, তেমনই কিছু পরে বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্করের সংস্কৃতবহুল ভাষা আবির্ভূত হইয়াছে; আবার শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতকান্ত ভাষাও বিকশিত হইয়াছে। গদ্য সাহিত্যের যখন এইরূপ বিপ্লবকর বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া উহাকে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতেছিল, তখন বঙ্গ সাহিত্যের একটি জিনিষে খাঁটি ভাব বরাবর একই ভাবে রহিয়াছিল। ইহা হইল পাঁচালী সাহিত্য। আমরা কবি আনন্দচন্দ্রের পাঁচালী সমালোচনায় এইটি অতি বিশদ করিয়া দেখাইয়াছি। কবি আনন্দচন্দ্র,—তারাশঙ্কর ও বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক—এবং নিজে সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত হইলেও তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ খাঁটি বাঙ্গালায় রচিত। ইহাতে সংস্কৃতের 'ভাঁজ' পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে—বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ লেখকগণ কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমবিকাশের (Gradual development) নিয়ম অনুসারে ক্রমশঃ সংস্কৃত-ভাবের পরিবর্জ্জন দ্বারা (Elimination of Sanskrit elements) খাঁটি বাঙ্গালায় পরিণত হইতেছে, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, খাঁটি বাঙ্গালা বহু প্রাচীন-কাল হইতেই প্রচলিত ছিল—পাঁচালী সাহিত্যে উহা কায়েমী ভাবে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। আজ কবি আনন্দচন্দ্রের পাঁচালী হইতে ইহা আপনারা বেশ উপলব্ধি করিবেন। আবার পাঁচালী সাহিত্য চলতি ভাষায় লিখিত হওয়ায় ইহা হইতে তখনকার চলতি বাঙ্গালারও পরিচয় পাইবেন।

কবির বংশগত পরিচয় আর কি? ভট্টপল্লীর বাশিষ্ঠ বংশ ধারাবাহিকভাবে পাণ্ডিত্য-গৌরবে প্রসিদ্ধ। ইঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইঁহার পুত্র ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় বঙ্গদেশের অন্যতম প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। তাঁহার অনেক মৌলিক স্মার্ত্ত মত বঙ্গদেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইঁহার পৌত্র—ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়। আর এই অধম সমালোচক তাঁহারই অযোগ্য প্রপৌত্র।

গীত ১

ঐ দাঁড়ায়ে কালিন্দী-কূলে শ্রীনাথ আমার।
রূপে চিনেছি—ভব-জলধির উনি কর্ণধার॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা শ্রীপদে পেয়েছি দেখা
শ্রীবৎসলাঞ্ছন নৈলে অঙ্গে শোভে কার॥
ভৃগুচরণ-সরোজ-চিহ্ন অঙ্গে নাহি আর
কেবল ভঙ্গী ভিন্ন ভূষণ অন্য
কিন্তু সেই আকার॥
তাজে কৌস্তভ-ভূষণ বনফুলের আভরণ
গোপীর প্রেমে ব্রজধামে যেরূপ ব্যাভার
আবার রাখাল সনে গোচারণে বিপিন-বিহার
বেদে না পায় সীমে (যার) ও মহিমে—
অনন্ত অপার।
পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার জীব-জন্তু সবাকার
করিতে পরম উপকার
কৃষ্ণরূপে অবতার , গুণবন্ধু গুণাধার
ধরেন মনোরঞ্জন আকার;
যদি দৃষ্টিপথে এলেন ব্রহ্ম যোগী ত্যজিলেন যোগধর্ম্ম
রাজকর্ম্ম ত্যজিলেন যম।
ধর্ম্মিষ্ঠ হইল তুষ্ট দীনহীনের গেল কষ্ট
নষ্ট হ'ল নাস্তিকের ভ্রম॥
তখন সাধু সব করিয়ে যুক্তি সার করিলেন কৃষ্ণভক্তি
মুক্তি তাদের দাসীর সমান।
শুধু তো এ যুক্তি নয় ভক্তিভাবে মুক্তি হয়
কত ভাবে কত জন নির্ব্বাণ॥
দেখ, জরাসিন্ধু আদি জন বৈরিভাবে দিয়ে মন
স্নেহভাবে নন্দ, নন্দরাণী—
বৃন্দাবনে যত রাখাল সুহৃদ্‌ভাবে ভেবে গোপাল
পরকালে পেলে চক্রপাণি।
দেখ, আর এমন কত ভাবে কত জন মাধবে ভেবে
ম'রে—ভবে নাহি এল আর।
গোপিকা ভেবে অন্তরে কামভাবে শ্রীনাথেরে
ব্রহ্মপদ পেলেন পরাৎপর॥
যাঁরা বলেন—না ঘুচিল কামভাব, তাঁরে পাওয়া অসম্ভব
প্রেমতত্ত্বে স্বত্ব তাদের নাই।
একি শুনি চমৎকার কামভাব ভাবের সার
বৃন্দাবনে সার করিলেন কানাই।
দেখ জগৎজনার মাঝে বৃষভানু রাজকন্যে
কৃষ্ণ জন্যে মগ্না বিরহেতে।

ভেবে ভেবে হয়ে সারা দুনয়নে জলধারা
প্রেমভাবে মজিয়ে শ্যামেতে।
হায়! এ কি সামান্য লজ্জা যে রাই ধরিল বিরহ-সজ্জা
ব'সে আছেন শ্রীমতী সুন্দরী।
ঘটকালি তখন দূতীর কাছে জানায় ললিতে সুন্দরী।

গীত ২

বাহার—তিওট

বুঝি রাই মরে এবার রাধা ভার
যে আকার সখি, তার।
আমি অনুমান করি বিরহ-বিকার।
কি ব্যথা আছে অন্তরে দিবানিশি আঁখি ঝরে
জিজ্ঞাসিলে বল্‌তে নারে
তবে কি হবে সজনি উপায় ইহার।
দেখ (আ)সিয়ে একবার কি হইল রাধিকার
এ কথা অন্যে আর (ওগো) জানাতে বিষম সরম আমার।
এ যে বিচ্ছেদ লক্ষণ তুমি বলিছ রাধার,
এ যে বড় অসম্ভব প্রেমভাব তার,
প্যারীর শরীর-নগর ধৈর্য্য-গড়ে বেড়া,
প্রবোধ-কোটাল তাহে তিলে নাহি ছাড়া,
পাত্র-মিত্র—কুলশীল, মন্ত্রী-বিবেচনা,
দিবানিশি কামজ্বরেতে দিতেছে যন্ত্রণা,
প্রেমে নিয়োগ সে ত কামজ্বরের উদ্যোগ,
কামের পক্ষে বিপক্ষ এমন ছিল না চারি যুগ,
প্যারীর গুরু ভয় সে ত কামেরই গুরু ভয়
কেমনে অনঙ্গ বল সে অঙ্গে মিশায়,
সরম-সাঁজোয়া গায় কিরীট-কুলধর্ম্ম,
সুচরিত্র-অস্ত্রে রাধা কাটিছে কুকর্ম্ম।
ত্যজে মনোরথ রথ করিয়ে সুমতি
মানস-তুরঙ্গ যাতে নিবিত্তি সারথি।
হেন রথে আরোহণ করিলেন শ্রীমতী,
সুখ্যাতি পদাতি সঙ্গে ফেরে নানা জাতি।

মদনের প্রভাব বর্ণন

ঘটকালী।—

যুদ্ধ সুশিক্ষিত জিত সকল সমরে
অমুচিত চিত সে ত সকলের করে।
মৃত্যুঞ্জয় জয় যখন করেছে মদন,
সে জনারে জয় করে কে আছে এমন।
কি ক্ষণেতে পঞ্চশর ধরে পঞ্চ-শর,
চরাচর করে রাজ্য অলি রাজ্যকর।
স্মরের স্মরণে মনে সবে করে ডর,
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর কিন্নর কি নর।
দেখ, সমাধি ঘুচায়ে শিব মত্ত কামানলে,
নারীর পায়ে ধ'রে হরি ভাসেন নয়নজলে।
দৈববিধি বিধানকর্ত্তা বিধাতা এমন,
কামকূপেতে লুপ্ত হ'য়ে * * * গমন।
গুরুর রমণী হরণ করিয়ে শশাঙ্ক,
অদ্যাপি ঘুচাতে নারে সে পাপ-কলঙ্ক।
অহল্যার উপপতি সুরপতি হ'ল,
* * * * * * *
রামের রমণী হরণ করিয়ে রাবণ,
সবংশেতে ধ্বংস হ'ল কামেরই কারণ।
যে কারণে হ'ল রাজা পাণ্ডুর মরণ,
বিশেষ জানিবে ভাই পুরাণ-শ্রবণ।
কীচক কি চুক্‌লো বাবা ভীমকে ভেবে নারী,
বলি হারি যাই সে ত মদন-চাতুরী।
সাবাস মদন পরাশরের নেম ভঙ্গ,
সাবাস মদনে মত্ত হইল ঋষ্যশৃঙ্গ।
সাবাস মদনে নইলে কি ভগীরথের জন্ম।
তা এমন যে মদন, যারে সবে করে ভয়,
সে কি আজ নারীর কাছে হবে পরাজয়!

গীত ৩

ঘটকালী গান

তাই শ্রীমতীর আতঙ্ক শ্রীহীন শ্রীঅঙ্গ,
পরাজয় করেছে তায় অনঙ্গ,
অঙ্গে হেনেছে তাই শরের স্বরূপ শ্যামাঙ্গ।
কুষ্ণের যশ ল'য়ে ধনু নিরমিয়ে
কৃষ্ণ-গুণ গুণ তাহে বাঁধিয়ে
করে রাই-বধের কারণ মদন এই রঙ্গ। (৩)

কথা। • ।—

* যদি কারুর চরণেতে কুশাঙ্কুর ফোটে।
তার জ্বালায় শূর বীর অস্থির হয়ে ছোটে।
শ্রীমতী অবলা জাতি জানে না দুখের লেশ।
তার প্রাণে ফুটে রইলো বাঁকা হৃষীকেশ।
কি হবে ত্রিভঙ্গ রাধার অন্তরেতে র'লো।
বাহিরে কিসে হেসে রাধা কথা কবে বল।
প্রাণ হ'তে কিরূপে সে রূপ বাহির করা যায়।
কেমনে বাঁচাব রাধায় বল সই উপায়।

ঘটকালী।—

যার প্রেমেতে নারদ মত্ত শম্ভু শ্মশানবাসী।
পেট থেকে পড়ে অমনি শুকদেব সন্ন্যাসী।

---

(৩) অনুরূপ উক্তি নৈষধ-চরিতে দেখুন—
অথ নগস্ত গুণং গুণমাত্মভূঃ
সুরভি তস্ত যশঃ কুসুমং ধনুঃ।
শ্রুতিপথোপগতং সুমনস্তয়া
তমিষুমাশু বিধায় জিগায় তাম্।
নৈষধ ৪ সর্গ ১ শ্লোক, শুকশিখা কণ্টকাগ্র, কুশাঙ্কুর।
* নিবিশতে যদি শূকশিখা পদে
সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাম্।
মৃদুতনোর্বিতনোতু কথন্ন তাম্
অবনিভৃত্ত নিবিশ্য হৃদি স্থিতঃ। নৈষধ ৪ সর্গ ১১ শ্লোক।

বলি দিল সর্ব্বস্ব হ'য়ে তার প্রেমে ভোর।
প্রহ্লাদের প্রমাদ কতই দুঃখের নাইক ওর ॥
তবু তারে ভুলতে নারে সে যে এম্‌নি কুহক জানে।
ছেলেবেলা ছেড়ে খেলা ধ্রুব গেল বনে ॥
যার প্রেমে অস্থির ধীর বীর হনুমান।
দাস্যকর্ম্মে কাল কাটাল ত্যজে অভিমান ॥
আরো এমন কত ভাবে কত জন ছাড়িয়ে স্বজন।
নাগর নাগরী ছেড়ে সার করেছে বন ॥
সেই কালাচাঁদের প্রেমফাঁদে পড়েছেন রাধিকে।
আজন্ম সে মর্ম্মে থাকবে ভোলা ভার তাকে ॥

(ললিতে লো)

তবে তুমি বল্‌ছ আমায় বুঝাতে রাধায়।
চল্লেম্ আমি—কিন্তু রাই ভুল্‌বে না কথায় ॥
চলে তখন বৃন্দা দূতী সুধামুখীর কাছে।
স্রোতে খঞ্জন গঞ্জন আঁখির অঞ্জন ভেসেছে।
সুধাংশুবদনী ধনীর বদন মলিন।
অনুভাবে ভাবে রাই হয়েছে পরাধীন ॥

ত্রিপদী

ঘটকালী।

ও রাই পরকে দিলি আপন মন, না জেনে পরের মন
এমন রীৎ অনুচিত রাই।
আগে কর পর্ বশ পরে প্রকাশিবে রস
পরে নহিলে ঘটিবে বালাই ॥
পরের চঞ্চল ভাব আগে কর অনুভব
পরে ভাব প্রকাশিবে তায়।
সে যদি রজনী-দিবে তোমারে অন্তরে ভাবে
তবে ভাব জানাতে কি ভয় ॥
(এখন) সতত উৎসুকে থাক মনের কথা মনে রাখ
শেখ ধনি ! পীরিতির রীত্।
করেছ মলিন মুখ ব্যক্ত হবে মনোদুখ
হেন চুক তোমার অনুচিত্ ॥
(আর) যারে সদা প্রাণ চায় তারে ত জানান নয়
জানাইলে একে হয় আর।
শুন শুন রাজকুমারি নয়নে চাতুরী করি
আগে কর মন চুরি তার ॥
নইলে তার অঙ্গ মন তোমার যে এত যতন
অরণ্যে রোদন হবে শুধু।
পুরুষের নানা মতি জেনেও কি ভোল শ্রীমতি
আগে ভাগে তারে বল বঁধু ?

তখন দূতীর বাণী শুনি ধনীর অধিক রোদন।
সান্ত্বনা করিতে হ'ল বিরহবর্দ্ধন ॥
কোথায় প্রবোধে শীতল হবে যাবে সকল জ্বালা।
জ্বালা ত গেল না,—দ্বিগুণ জ্বলে রাজবালা ॥
এরূপ দেখিয়ে পুনঃ জিজ্ঞাসিছে দূতী।
কি জন্যে এ জ্বালা ?—ভেঙে বল গো শ্রীমতি ॥

তখন শ্রীমতী বৃন্দার নিকট কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন।

গীত নং ৪

সিন্ধু—মধ্যমান

যদি বিরলে একবার নাথের নাগাল পাই।
তবে যে প্রাণে কি আছে তাঁহারে জানাই ॥
প্রাণে যে জ্বালা সই, কে বুঝে কারে কই ?
অন্যে কি নিভাতে পারে—সেই নাথ বই।
বারেক সে মুখ হেরে সকলই জুড়াই ॥ ৪ ॥

কথা।

অনঙ্গের আগুন অঙ্গে যে হয়েছে প্রবল।
নাথের প্রেমসিন্ধু বিনে কে করিবে শীতল ?
এ দারুণ আগুন অঙ্গ জলে না জুড়ায়,
প্রেমসিন্ধু-জলে যেতে বল সই উপায়।

ঘটকালী, বৃন্দার উক্তি :—

এমন মন্ত্রণা তোমায় কে দিয়েছে, সে যে অবুঝেরে বুঝা-য়েছে। এমন কর্ম্ম কে করেছে,—সে যে জন্মের মতন মজিয়েছে —রাই তোরে জন্মের মত মজিয়েছে।

আমরা শুনেছি সেই প্রেমসিন্ধু, নাহি তার কূল।
অকূলে ভাসিবে রাধে হইবে আকুল ॥
গুরুজনার গঞ্জনা তায় তরঙ্গ তুফান।
আতঙ্কে কাঁপিছে অঙ্গ হারাবি পরাণ ॥
(আবার) অতল পরশ তায় পরের মন রাখা।
সেখানে সাঁতার ভার, ভার বেঁচে থাকা ॥
প্রেমসিন্ধু-জলে অঙ্গ না হবে শীতল।
বিরহ-বাড়বা তাহে প্রবল অনল ॥
সুধার সমান বটে আঁখির মিলন।
কিন্তু কলঙ্ক-বিষেতে বেড়া না হবে গ্রহণ ॥

ঘটকালী।

তাই বলি রাই,—প্রেম-জলে যেও না, অমন কর্ম্ম ক'রো না। প্রেম-জলের বিবরণ, কল্লে ত শ্রবণ,—তাই করি গো বারণ, সেথা ক'রো না গমন,—গেলে রবে না পরাণ ॥

তখন বৃন্দার প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।—

বৃন্দে ! তুমি কি সই সুবোধ হয়ে হ'লে আজ অবোধ।
আমার কি সে বোধ আছে, তাই দিতেছ প্রবোধ ॥
(আর) আমার কুলশীলে কি সই ! তোমার যতন বেশী।
সাধে কি প্রমাদ—সাধ করি লো রূপসি ॥
(দূতি !) আগে আমিও এমনি ভাবতেম যখন মন ছিল বশ।
এখন আপনিই আপনার নই, কিসে রয় বল সুযশ ॥
পরে এমন বল্‌তে পারে, না জেনে পরের প্রাণ।
পরের পিপাসা পরের না হয় অনুমান ॥
আমার যন্ত্রণা অন্তরে তোরে জানাব কেমনে।
অঙ্গ জ্ব'লে যায় হায় সে অঙ্গ বিহনে ॥
আমার ইচ্ছা করে পাখী হ'য়ে আকাশে উড়ে যাই।
শ্যামরায় কোথায় হায় কিরূপেতে পাই'॥
ইচ্ছা করে সাগর-পারে করি সই গমন।
ইচ্ছা করে সাগর ছেঁচে তুলি সে রতন ॥

ইচ্ছা করে এ সংসারে দিয়ে সই আগুন।
অরণ্যে নির্জ্জনে গিয়ে ভাবি তার গুণ ॥
ইচ্ছা করে কাজল ক'রে কালায় চোখে রাখি।
ইচ্ছা করে কুঙ্কুমে তায় মিশাইয়া মাখি।
ইচ্ছা করে হারে তারে গাঁথিয়া সজনি।
হৃদয়-মাঝারে রাখি দিবস-রজনী ॥
ইচ্ছা করে বুক বিদরি বাহির ক'রে প্রাণ।
প্রাণের স্থানে রেখে তারে ত্যজি আপন প্রাণ।
আমার ইচ্ছা করে জলধরে ধরি গে সজনি।
প্রেম-জলেতে শীতল করি জ্বলন্ত পরাণী।
ইচ্ছা করে শ্যামশরীরে মিশাইয়া যাই।
তবে ত বিচ্ছেদ-খেদ সকলই জুড়াই।

ঘটকালী। বৃন্দা :—

(বলি) তুই করবি কি রাই কুলবতী করেছে বিধাতা।
অন্তরে মিলাতে হবে অন্তরের ব্যথা ॥
কুলবতী জনার এমন ইচ্ছে কিছু নয়।
ইচ্ছে তুচ্ছ কর নইলে ঘটিবে প্রলয়।
কুলবতীর প্রেমে ইচ্ছা যেমন দারিদ্রের ইচ্ছা ধনে।
বামনের চাঁদ ধরা ইচ্ছা—পঙ্গুর ইচ্ছা গুণে ॥
কুজোর ইচ্ছা চিত হয়ে শোয়—খোঁড়ার ইচ্ছা ছোটে।
বোবার ইচ্ছা কথা কয় সতত মুখ ফুটে।
কালার ইচ্ছা শোনে,—তেমনি কাণার ইচ্ছা চায়।
ইচ্ছা ক'রে হবে কি রাই বিধি বাদী তায়।
মূর্খের ইচ্ছা মান বাড়াতে দুঃখীর ইচ্ছা সুখ।
চোর করে ধর্ম্ম ইচ্ছা সে কেবল তার চুক ॥
বয়স গেলে বয়স ইচ্ছা সে কেবলই ভ্রম।
প্রাণ লয়ে প্রাণ কখন ফিরে দিয়েছে যম।
তেমনি প্রেম ক'রে লুকাতে ইচ্ছা সে কেমন তা জান।
জ্বলন্ত অনল যেমন বসনে লুকান ॥
দাঁড়ের পাখী ইচ্ছা করে উড়ে যায় কানন।
সে যেমন বুঝে না—পরে নিগড়-বন্ধন ॥
তেমতি শ্রীমতি! তোমার কুলরূপ কুলুপ।
বিধাতা দিয়েছে, কিসে ভেটিবে সে রূপ ॥

শ্রীমতীর উক্তি :—বৃন্দে, তুমি যা বল্‌ছ, তা সকলই সত্য বটে, কিন্তু আমি যে সে রূপ কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি নে। তাই শ্রবণ কর।

গীত ৫ নং

অড়ানা-বাহার—খেমটা

হায়! কেমনে পাসরি হরি করি কি উপায়।
করেছে কি গুণ—
যদি থাকি আঁখি মুদে—অন্তরে উদয় হয়।
জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, নয়নে, শ্রবণে, বচনে কি মনে
বিরাজিত শ্যামরায়।
পড়েছি এ কি দায়—
আমার যে মন, সে ত নহেক মোর বশীভূত
সদা তারি অনুগত ভালবেসে তায়। ৫।

কথা। তখন দেখে দূতী শ্যামের প্রতি রাধার যে বাসনা।
অন্তরে ব্যাকুল—বল্ কখন রবে না।
বংশীধারী বিনে প্যারীর রবে না জীবন।
অনুচিত রাইকে এখন করা নিবারণ।
এখন যাতে প্রাণ রয় বলিতে উচিত তাই।
রাধারে সান্ত্বনা ক'রে শ্যামের কাছে যাই ॥

ঘটকালী বৃন্দার উক্তি।—

("ও রাই")—"বুঝিতে অন্তর তোর বিনোদিনী রাই।
বারণ করেছি কত—ভজিতে কানাই।
(কিন্তু রাই মনের সহিত তোকে বারণ করি নাই)
মনের সহিত পিরীত আমি ভালবাসি ধনি।
পিরীত আমার গলার হার মস্তকের মণি ॥

ঘটকালী। শ্রীমতীর উক্তি।—

"তুমি অতি রসবতী রসিকের ধন।
দিবানিশি রসে থাক ভুলিয়ে ভুবন ॥
রসিকের শিরোমণি—শিরোমণি তুমি।
জেনে শুনে প্রেম-বিপদে স্মরণ নিলেম আমি।
প্রেমসিন্ধু-তরণীর হও তুমি ত কাণ্ডারী।
প্রেম-ধনে বিধি তোমায় করেছে ভাণ্ডারী ॥
প্রেমের মূলাধার তুমি প্রেমের কল্পতরু।
প্রেম-মন্ত্র কানে দিয়ে তুমি হও প্রেমের গুরু।
প্রেমের সৃষ্টি স্থিতি লয়—তোমার কটাক্ষেতে হয়।
তুষ্টিতে প্রেমের পুষ্টি—রুষ্টিতে প্রলয় ॥
প্রেম-পথের সাথী তুমি, প্রেম-পথের সেথো।
তোমার আশ্বাস পেলে ভক্ত জুটে কত ॥
তখন এরূপ মিনতি স্তুতি করিলে শ্রীমতী।
কুটিলতা ছেড়ে দূতী সরল হ'লেন অতি ॥

ঘটকালী বৃন্দার উক্তি।—

শ্রীমতি! যা অনুমতি করিবে আপনি।
প্রাণপণেতে একমনেতে করিব এখনি ॥

শ্রীমতীর উক্তি।—

মন-হীন জনের সই যেরূপ যন্ত্রণা।
সহে না সহে না কিসে মরি তা বল না ॥

তখন শ্রীমতীকে বৃন্দা কিরূপ প্রকারে প্রবোধ দিতেছে, শ্রবণ কর।

গীত ৬ নং

বাহার—তিওট

কেন—মনের খেদে কিশোরি মরবে—
এখনি মন-চোর ধরিয়ে দিব তোর
বাঁধিবি তোর গুণে, পালাতে নারবে।
নাথের মন-পাখী, তুমি ব্যাধ সখি
রাধারূপ ফাঁদে (বেঁধে ও রূপফাঁদে) আসিয়ে পড়বে,
তখনি তার মন হরণ করবে। ৬।

[ক্রমশঃ।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ (এম, এ) সঙ্কলিত।
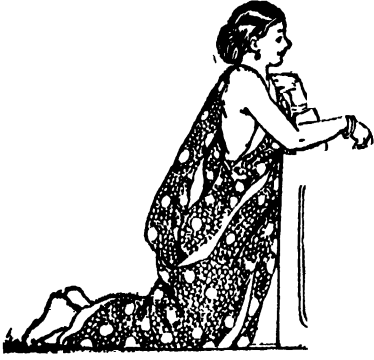
টুনটুনী

(মাতৃনীড়ে)

২

অপ্রয়োজনীয় অত্যাজ্য

অই ভাবের আধার হোয়ে একটি কোরে লোক প্রত্যেক সংসারে থাকে, যার নাম কর্ত্তা। এঁর হাতে একটু সামান্য মাত্র কার্য্যের ভার থাকে, সেটি গৃহ-সেনা নিবাসের রসদ সংগ্রহ কোরে এনে পৌঁছে দেওয়া, প্রতিদানে বেতনস্বরূপ পেয়ে থাকেন ভোজন, আচ্ছাদন ও গৃহিণীর প্রিয় সম্বোধন। বকুল-বাগান রোডের বাটীতে গিরিধারীলাল বাবু সংসারকার্য্যে একেবারে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জীব অথচ অত্যাজ্য; কেন না, রসদ-বিভাগের গোমস্তাকে বরখাস্ত করা চলে না; সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে এখানে অতি অল্প গোটাকতক কথা বল্লে-ই চলবে। এঁর বাল্যকালে পিতার অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে-ই গড়িয়ে যাচ্ছিল; খাওয়া-পরার চেয়েও বাপের বেশী ভাবনা দাঁড়িয়েছিল, কি কোরে ছেলেটিকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ কর্বেন। দুনিয়ার রসদদারের নজর সব দিকে, তিনি গিরিধারীর চরিত্র, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের দিকে একটু বেশী নজর রাখলেন। মাইনার পাস কোরে সে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হোলো ফ্রী পড়বার ও মাসে ৪ টাকা জলপানি পাবার অধিকার নিয়ে। তার পর এণ্ট্রান্স থেকে আরম্ভ কোরে বি-এ ডিগ্রী পাওয়া পর্য্যন্ত বরাবর সে প্রথম শ্রেণীর স্কলারসিপের টাকা পেয়ে এসেছে; এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ পারিতোষিকের নিদর্শন-স্বরূপ প্রবোধ-পদক, ও ফলপ্রদ নগদ মুদ্রা ও পাঠ্য পুস্তক হস্তগত কোরে পিতার প্রাণে পরিতোষ দিতে সমর্থ হয়ে এসেছে। হায় বৃদ্ধ, ছেলের এম-এ পাস ও অর্থোপার্জ্জন দেখতে পেলে না! এক প্রকার ভাল-ই হয়েছে, হয় ত উপ-কর্ত্তা হোয়ে দরোয়ানী ও বাজার-সরকারী কর্ত্তে হোত।

বসুমতীর পিতা মাত্র ছেলে ভাল এবং মাথা গোঁজবার একখানা বাড়ী আছে, এই দেখে গিরিধারীকে কন্যাদান করেন। জামাতা শ্বশুরের দূরদর্শিতার যে সম্মান রক্ষা কো র-ছেন, তা এখন সকলে-ই দেখতে পাচ্ছে। কর্ত্তা যে একটা অপ্রয়োজনীয় অত্যাজ্য পদার্থ, এটা একবারে মিথ্যা সংস্কার নয়। গৃহিণীরূপ পাওয়ার-হাউস থেকে শক্তির প্রেরণা না এলে কর্ত্তার ক্রিয়াফল একবারে অচল থেকে যায়। প্রফে-সরী কাজটা গিরিধারীর ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেটের জোরে ও সার আশুতোষ ভাইস-চ্যান্সেলারের গুণগ্রাহিতা এবং আশ্রিত-বাৎসল্যের ফলে লাভ হয় বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যের আয়ে বর্ত্তমান বাজারে বাহ্য-শোভাসম্পন্ন সমাজগ্রাহ্য সম্ভ্রান্ত স্বচ্ছলতার জীবন-যাপন কখন-ই সম্ভবপর হোত না। স্ত্রী দেখেন, স্বামী সন্ধ্যার পর কতকগুলো খাতা নিয়ে কেবল কি টোকেন। এক দিন জিজ্ঞেস করলেন, "অত মনোযোগ দিয়ে ঐগুলো কি লিখে লিখে চোখ নষ্ট করো?" স্বামী বল্লেন, হ্যাঁ, চোখটা—তা চোখটা —চোখটা বটে—তবে কি জান, আমি ছেলেবেলা থেকে আঁক-টাকে বড় ভালবাসি; এই ভালবাসা জন্মো দেবার গুরু ছিলেন আমাদের মাইনার স্কুলের বিশ্বনাথ পণ্ডিত মহাশয়; তিনি এমন সব আঁক আমাদের দিতেন, আর সে-সব কোষে ফেল-বার যা যা সহজ উপায় শিখিয়েছিলেন, তাতে মনে হোতো না যে, আমরা কোনো একটা শক্ত জিনিষ আয়ত্ত কর্ব্বার জন্যে বুকের রক্ত শুকিয়ে ফেলছি; আঁক কোষে শ্লেট ফেল্লুম, মনে হোলো যেন একটা খেলায় বাজী জিতে মাত কল্লুম। এখন বড় বড় অঙ্ক যাতে ছাত্ররা ঐ রকম আমোদের সঙ্গে আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে, সেই চেষ্টায় ভেবে ভেবে নিজে কোষে তার প্রণালীগুলো এ-সব খাতায় লিখে নি, তার পর ছাত্রদের সব বুঝিয়ে দেই। তবে এর জন্যে স্কুলে শেখবার এল্‌জাবরা, জিওমেট্রীগুলো ঐ রকম আমাকে সহজ কোরে এখনও বুঝিয়ে

দিতে হয়; অনেকেরই দেখতে পাই গোড়ার শিক্ষা এক-জামিন পাস করা গোঁজামিলের সাহায্যে।"

অশিক্ষিতপটুত্বপ্রভাবে নারী স্বভাবতঃ প্রয়োগবিদ্যা-নিপুণা, তার উপর বসুমতী ভাল কোরে বাঙ্গালাটা পড়েছেন; তিনি স্বামীকে বল্লেন, "তা হোলে তোমার উচিত নয় কি যে, এই খাতার বিদ্যে কেবল তোমার ছাত্র ক'টিকে না দিয়ে দেশের সব ছেলেদের সুপ্রাপ্য কোরে দেওয়া?" গিরিধারী মাথা তুলিয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বসু। বুঝতে পারছ না; আমি বলছি, ঐ লেখাগুলো বই কোরে ছাপিয়ে ফেলো।

গিরি। ছাপানো—হাঁ, তা মন্দ নয়, তবে খরচ—খরচ—তা—

বসু। তোমার ত নাম আছে শুনতে পাই; তা হ'লে এ সব বই কি স্কুল-কলেজে চলবে না?

গিরি। তা একটু জোগাড় কল্লে, আমার শক্ত বেশী নেই—

বসু। দাও, হপ্তা-খানেকের ভেতর সব ঠিকঠাক কোরে একখানা আগে ছাপাতে দাও। প্রথমখানার খরচের ভার আমার, আর না হয় তোমার অনুরোধে লাভের ভারটা-ও কষ্ট কোরে মাথা পেতে নেবো।

লক্ষ্মীর পরামর্শে, লক্ষ্মীর টাকায়, লক্ষ্মীর পূজায় এইরূপে গিরিধারীলালের সংসারে লক্ষ্মীশ্রী প্রথম উজ্জ্বল হোয়ে ফুটে উঠলো।

টুনী জন্মাবার পর সেই বছর-ই তিনি বি-এর পরীক্ষক নিযুক্ত হন; কন্যার পয়ে এই নূতন উপার্জ্জন মনে কোরে প্রায় তিন শ' টাকা ব্যয়ে টুনটুনীর জন্য তার অন্নপ্রাশনের সময় তিন চারখানা গহনা প্রস্তুত কোরে বাকি চারশত টাকার কিছু উপর লীলাবতী নাম দিয়ে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দেন; সেই অবধি গত ১৩ বৎসর প্রতি পরীক্ষাকার্য্য শেষ হবার পর সাত শত টাকা কোরে কন্যার নামে এ পর্য্যন্ত জমা দিয়ে আসছেন। পিতা-মাতার নিশীথ-নিভৃত পরামর্শের মধ্যে ইদানীং কন্যার বিবাহের কথা একটা আবশ্যক বিষয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। আর দু'টি স্ত্রী-পুরুষ আপনা-আপনির মধ্যে এখন টুনটুনীর জন্য একটি ভাল বরের দৈহিক, মানসিক ও বৈষয়িক সরঞ্জাম কি রকম হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আলোচনা করেন; মাতা-পিতার পর মামাবাবু ও বাহন ভিন্ন টুনটুনীর উপর এত বুকের টান আর কার?

নবীন অতিথি

অধ্যাপক-জীবনের স্মৃতির মধ্যে কুলপতি মুখোপাধ্যায় বোলে ছাত্রটির নাম গিরিধারীলাল বাবুর মনে অন্যান্য কথা অপেক্ষা একটু বেশী উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত ছিল। এ লেখা শুকিয়ে ম্লান হোতে দেয়নি এই ছাত্রটির পূর্ব্বাধ্যাপকের সহিত সতত সাক্ষাৎ রাখায়। শৈশবে পিতা ও কৈশোরে মাতৃহীন হওয়ায় কুলপতি তার ভবানীপুরবাসিনী বিধবা মাতামহীর কাছে থেকেই লেখাপড়া করে। কুলপতি এখন সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ, শিষ্ট, অধ্যবসায়শীল, প্রফুল্লপ্রাণ নবীন যুবক। দুই বৎসরের কিছু উপর কলিকাতা পুলিস কোর্টে সে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ কোরেছে এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, এরির মধ্যে সে যে-টুকু নাম কর্ত্তে পেরেছে এবং যা উপার্জ্জন কচ্ছে, তা'তে আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ দূরলক্ষ্য নয় বোলে মনে হয়। আর-ও একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, সে অর্থোপার্জ্জনক্ষেত্রে প্রবেশ কোরে-ই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেয়নি এবং ওকালতী কর্ত্তে-কর্ত্তে-ই সংস্কৃতে এম-এ ডিগ্রী নিয়েছে, এবং কোনো একটি ইংরাজী কলেজে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য সংস্কৃত অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় ওকালতীর আয়ের সঙ্গে মাসে শতাবধি টাকা যোগ কর্ত্তে সমর্থ হয়। মাতৃকুল হোতে উত্তরাধিকারিসূত্রে সে লাভ কোরেছে মাতামহীদত্ত দুইখানি ভবানীপুরের বাটী এবং মাতামহদত্ত পুস্তক-রচনার প্রবৃত্তি। স্কুল থেকে বেরোবার পূর্ব্বে-ই সে এক্‌সসাইজের খাতায় লুকিয়ে ছোট ছোট গল্প লেখা অভ্যাস করে এবং কলেজ-জীবনের দ্বিতীয় বর্ষ হোতেই তার রচিত ছোট গল্পগুলি মাসিকপত্রে প্রকাশের যোগ্য হয়ে দাঁড়ায়; কুলপতি-প্রকাশিত দু'খানি গল্প-সংগ্রহ পুস্তক ইতিমধ্যেই কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ সাগ্রহে গৃহীত হ'য়ে থাকে।

অঙ্ক-পঙ্কজের মধুসংগ্রহ গিরিধারী বাবুর জীবনের আনন্দ-ব্রত হোলেও ললিত সাহিত্যকে তিনি অনাদরের চোখে দেখেন না। কুলপতির গল্পগুলি প'ড়ে তিনি খুব আমোদ পান এবং "বেশ লিখছ হে" বোলে ছাত্রের কানে আনন্দ প্রদান করেন; এমন কি, অন্দরের পবিত্র মন্দিরমধ্যেও তিনি কুলপতির বইগুলি বিনা আপত্তিতে পাঠিয়ে দেন।

সম্প্রতি মাসকতক গিরিধারী বাবুর বাটীতে কুলপতির আসা-যাওয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী ঘন ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষকের দর্শন ও তাঁর সদালাপ শ্রবণের আকর্ষণকে তীব্রতর কোরে তুলেছে আর এক মিষ্ট আকর্ষণ, মামাবাবুর সাদর আহ্বান। কথায় কথায় মামাবাবু একদিন জানতে পারেন যে, কুলপতি একটু-আধটু দাবা-বোড়ে খেলতে জানে; আর যায় কোথা! মামাবাবু তার হাত দুখানি স্নেহের ব্যগ্রতার বেগে ধোরে বোল্লেন, "ভাই, যে দিন যখন সময় পাবে, দু'এক বাজি বুড়োর সঙ্গে খেলে যেয়ো, তোমার কাছে যে দিন আমি বার দু'তিন মাত হই, সে দিন শরীরটা এমনি জুড়িয়ে যায় যে, এক কাতেই রাত পোহায়।" এমন সুলভে মানব-মনে আনন্দ দেবার প্রলোভন, কুলপতি পরিত্যাগ করতে পারলে না। এই নিঃস্বার্থ পুণ্যপ্রয়াসের ব্রত-ফল সে হাতে হাতে পেলে, তার কল্পনা-কাননে রোপণ করবার উপযোগী ভাল ভাল ফুলের দেশী বীজ মামাবাবুর নিকট হোতে সংগ্রহ কোরে। মামাবাবুর স্নেহ-মায়া আশা-উদ্যম তৃপ্তি প্রভৃতি বৃত্তিগঠিত সমস্ত মনটির আশ্রয়স্থান ছিল তাঁর হাতের অঙ্গুলীগুলি। ব্যবসায় কার্য্যে অঙ্গুলীক'টির সাহায্যে ক্রেতার হাতে পণ্য তুলে দিয়ে-ই তাঁর সুখ; গোলাপের পাতাগুলির ধুলো ধুয়ে দিয়ে-ই, পাখী ক'টির পরে হাত বুলিয়ে তাদের ঠোঁটে কমলা লেবুর কোয়া আমের ফালি ধ'রে দিয়ে, টুনটুনীকে কোলে কোরে তার চুলগুলি ফুলিয়ে দিয়ে রথ, দোল, চড়ক প্রভৃতি পার্ব্বণের দিন আদরের জোরে মঙ্গলার হাতে চারটি কোরে পয়সা গুঁজে দিয়ে আর সতরঞ্চের বল চেলে তিনি জীবনের সমস্ত সুখটুকু তিন আঙ্গুলে ধ'রে মনের ভিতর পাঠিয়ে দিতেন। কুলপতিকে পেয়ে তিনি যে কেবল খেলার সখই মিটুতেন, তা নয়। তিনি এতাবৎকাল কত রকম ব্যবসার কল্পনা মনে মনে কোরেছেন, কত কারবার হাতে কোরে চালিয়েছেন এবং সেই সব সদ্যঃফলপ্রদ বাণিজ্যে কেন যে লোকসান হোল, তা আজো পর্য্যন্ত বুঝতে পারেন নি, তার গল্প অই খেলার সাথীর কাছে-ই প্রাণের সরল ভাবনায় বোলতেন এবং নিজের গল্পের আনন্দে বুঝতে পার্ত্তেন না যে, তাঁর কথার ভিতর থেকে কুলপতি ললিত-সাহিত্যের কত আমোদপ্রদ উপাদান সংগ্রহ কোরে নিচ্ছে।

একদিন অপরাহ্নে কুলপতি এসে চাকরদের কাছে শুনলে যে, মামাবাবু বংশীকে সঙ্গে কোরে দু'টো ঘড়ায় রাংঝাল দিয়ে আনবার জন্যে দোকানে গিয়েছেন; বাড়ী ফিরে না গিয়ে সে গিরিধারী বাবুর পড়বার ঘরে গেল; বাবু তখন-ও জল খেয়ে বাইরে আসেন নি; সে একলা বোসে কি করে, দেখলে, এক কোণে হোয়াটনটের উপর একখানা এলবাম রয়েছে। সেইখানা পেড়ে নিয়ে অন্যমনে ছবি দেখতে আরম্ভ কর্লে। প্রথমেই গিরিধারী বাবুর মায়ের ছবি; তার পর বাবুর নিজের সাদা কাপড়ে একখানা। এম, এ গাউন-ক্যাপে একখানা, প্রোফেসারী বেশে একখানা; তাঁর স্ত্রীর একখানা সালঙ্কারা সজ্জিত ছবি। একখানা আহ্নিককার্য্যে উপবিষ্ট, একখানি পুত্রক্রোড়ে; সেনেট হলের সামনেকার ছবি একখানা, কলেজ ইউনিয়নের চিত্রপুঞ্জ একখানা; আর দু'একখানা এই রকম ছবি দেখবার পর আর একখানি চিত্র যখন তার নয়ন-মনকে একটু বেশী আকৃষ্ট করেছে, তখন গিরিধারী বাবু কক্ষে প্রবেশ কোরে-ই জিজ্ঞাসা কর্লেন, "এই যে কুলপতি এসেছ; কি কচ্ছ, একা বোসে বোসে, ফটো দেখছ?"

কুল। আজ্ঞে, আলবামখানা বাইরে-ই ছিল, তাই মনে করলুম—

গিরি। ওর আবার মনে করা কি, অনায়াসে দেখতে পার; বিশেষ তুমি হচ্ছ একরকম ঘরের ছেলে। বাড়ীর ভেতরে-ও চোখে না দেখুন, তোমাকে বেশ চেনেন।

কুল। আজ্ঞে, মা'র ছবি আপনি আর একবার দেখিয়েছিলেন, তাই এতে দেখে-ই চিনতে পেরেছি।

গিরি। এখন কি দেখছিলে?

কুল। একটি ফিরিঙ্গী মেয়ের যেন ছবি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঠিক যেন বাঙ্গালীর মুখ; আমি সাহেবী কলেজে পড়াই। কিন্তু এমন হুবহু বাঙ্গালীর মতন মিষ্টি মুখ, কোমল চাউনী আমি তাদের ভেতর দেখিনি; মেয়ে ছাত্রী-ও কলেজে আছে।

গিরিধারী বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; কুলপতি যেন একটু অপ্রতিভ হইল।

গিরি। পোষাকটা ফিরিঙ্গিয়ানা বটে, ও আমার মেয়ে টুনুর ফটো; তেরো বছর বয়সে যখন প্রথম লরেটোতে ভর্ত্তি হয়, সেই সময়কার তোলা; প্রথম প্রথম মাস কতক কে জানে কি মনে কোরে আমি ইংরাজী পোষাক পোরে-ই স্কুলে পাঠাতুম।

কুলপতি সসম্ভ্রমে এলবামখানি বন্ধ কোরে যথাস্থানে রেখে দিলে। গিরিধারী বাবুর মুখ থেকে "টুনটুনী" কথাটা বা'র হবার পরে-ই কুলপতির চোখে প্রশ্নচিহ্ন দেখে একটু হেসে বল্লেন, "ওর নাম রেখেছিলুম লীলাবতী, কিন্তু কেমন কোরে টুনটুনী হোল, তোমার খেলার বন্ধু মামাবাবুর মুখে শুনো; ও ছবিতে

যা দেখলে, তা আর নেই, এখন যেন চেহারা একেবারে-ই বদলে গেছে। দেখাচ্ছি দাঁড়াও," বোলে গিরিধারীবাবু আর একখানা আলবাম বা'র কোরে একটা পাতা খুলে কুলপতির হাতে দিলেন। মিনিট দেড়েক নিবিষ্ট মনে দেখা হয়েছে, এমন সময় গিরিধারী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখছো? পনেরো বৎসর পূর্ণ হোতে এখন-ও মাস-দুই আছে, দেখায় যেন সতেরো বছরের মেয়ে, খুব সুস্থ। বাপ-মা'র চোখ বড় পক্ষপাতী; তোমার কি বোধ হয়, এ মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে বেশী কষ্ট পেতে হবে?"

কুল। কষ্ট—পাত্র পাবেন কোথায়, তাই আমি ভাবছি।

গিরি। সন্তানের প্রশংসা মা-বাপের মনে বড়-ই মিষ্ট লাগে, বিশেষ তোমার মুখে আরও বেশী মিষ্টি লাগছে; তুমি তোমাকে আমায় সন্তানের মতন ভালবাসতে শিখিয়েছ।

কুলপতি মাথাটি নত করিয়া রহিল। এমন সময়ে নীচে হোতে মামার গলার সাড়া পাওয়ায় গিরিধারী বাবু দু'এক কথার পর কুলপতিকে বোল্লেন, "তুমি আস যাও, কিন্তু তোমার মুখে একদিন-ও কিছু দিতে পারিনি; আসছে শনিবার আমার সঙ্গে বোসে সন্ধ্যার পর কিছু খেয়ে যাবে? দু'টি কি তিনটি বন্ধুকে বোলব, বেশী নয়।"

মামা বাবুর হাত ছাড়িয়ে পালাবার যো কি? অনিচ্ছা সত্ত্বে-ও তাঁর মুখ থেকে গিরিধারী বাবুর কন্যা সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য কুলপতি ছকের সামনে গিয়ে বসলো।

মামা বাবু এখন আর দু'খানা পাথর পার হোলে-ই সত্তরের মাইল-ষ্টোনে গিয়ে পৌছবেন। আর মঙ্গলা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে পেছন ফিরে দেখে, চল্লিশ আর সামনে চেয়ে দেখে পঞ্চাশ, সে ঠিক মাঝখানে; সুতরাং মঙ্গলা এখন আর লজ্জার ধার ধারে না। সবার সামনে-ই মামাবাবুকে লক্ষ্য কোরে বলে, "হাঁ, উনি তো আমার স্বোয়ামী-ই বটে। আর জন্মে বিয়ে হয়েছিল, তোমরা জান না।" আজ-কাল সে কাষ-কর্ম্ম সেরে মামাবাবুর ঘরে এসে মেঝেয় বোসে প্রায়ই তাঁর মুখে রামায়ণ-মহাভারত পড়া শোনে। সে জানতো যে, কুলপতি বাবু বেশীক্ষণ থাকবেন না, তাই ঘর থেকে স'রে গেল না, অপেক্ষায় বোসে রইল; খেলাটা চুকে গেলে-ই সে গল্প শোনার সঙ্গে একটু পুণ্যি কোরে নেবে।

আজ মামাবাবু উপরি-উপরি দু'দু' বাজি জিতেছেন। কুলপতি আগে থেকে-ই মাত হ'য়ে খেলতে বোসেছিলো।

টুনটুনী নামের রহস্য, টুনটুনী পাখীর মতন-ই বালা-বিহঙ্গিনীর অই সবুজ পাতার ঝোপের মাঝে ফুড়ুক ফুড়ুক কোরে ওড়া; বড় জোর উড়ে পাঁচীলটুকুর উপর বসা; তার 'বাহনকে' ভালবাসা, কেমন ছেলেবেলায় সে বাহনের জন্য আর একটি পেয়ারা না দিলে নিজের পেয়ারাটি ফিরিয়ে দিতো; মামাবাবুর মুখে শুনে সংস্কৃত স্তোত্র পর্য্যন্ত কেমন সে শীঘ্র মুখস্থ কর্ত্তো; একটা ছানা ম'রে গেলে মেনীটা যখন কেঁদে-কেঁদে বেড়াতো, তখন টুনটুনীর চোখ দিয়ে কেমন টপ্ টপ্ কোরে জল পড়তো; একটু অনাদরে তার কত অভিমান হোতো, এই সব কথা জিজ্ঞাসা না করতে-ই মামাবাবুতে বাহনে মিলে কুলপতিকে শুনিয়ে দিলে। বাহন আরো বল্লে, আমার টুনটুনী এখনো তেমনিটি-ই আছে। এই তো 'দিদিমণিদের' স্কুলে পড়ে-ই কত মেয়ে যেন ধিঙ্গী হয়ে উঠে; মেমেদের মেয়েরা যেখানে পড়ে, আমার টুনু সেখানে তো ক'বছর ধোরে লেখাপড়া শিখেছে, এখন-ও সেই আগেকার মত 'বাহন' বোলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, ইচ্ছে করে একবার কোলে তুলে নিই, তা হেসে পালিয়ে যায়। তা বিয়ের পরদিন আমি কোলে কোরে পাল্কীতে তুলে দেব-ই দেবো, বরের সামনে তো আর দৌড়ে পালাতে পারবে না।

মামা। জামাতা তো আজ পর্য্যন্ত দেখি, মেয়ের বিয়ের কথা মুখে-ও আনেন না। কত ভাল ভাল বামুনের ছেলে তো ওঁর হাত দিয়ে পাশ হয়ে যায়, উরির মধ্যে একটি বেছে নিলে পারেন।

মঙ্গলা। আপনার খেলুনী বাবুটি-ও তো বাবার পোড়ো? হাঁ বাবু, তোমার বিয়ে হয়েছে কোথায়?

কুলপতি ঈষৎ হাস্য করিল মাত্র।

মঙ্গলা। ও মা! আজও আইবুড়ো! তোমার মা বৌ আনেন না কেন ঘরে?

মামা। ঐখানটাতেই আমাদের কুলপতির একটু কষ্ট; ছেলেবেলা-ই মা-বাপ চ'লে গেছে; শুনেছি, বে' দেবো-দেবো কত্তে-কত্তে-ই দিদিমাটি-ও চক্ষু বুজেছেন। দাঁড়িয়ে বে' দেবার লোকের অভাব, কেমন হে?

কুল। একটু রোজগার-টোজগার করি, তাড়াতাড়ি কেন?

মামা। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মাসে হাজার টাকার উপর রোজগার হোক। বছর দুয়ের মধ্যে-ই যখন কালেজে

আদালতে মিলিয়ে শুন্‌ছি টাকা শ' তিনেক অক্লেশে আনছো, তার ওপর এই ভবানীপুরে দু'খান বাড়ী; পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য তোমার যথেষ্ট আছে। তবে তোমার মতন রূপবান্ লেখাপড়ায় অদ্বিতীয় ছেলের যুগ্যি ক'নে একটু ভাল কোরে খুঁজে পেতে নিতে হবে। বাহন, তুমি একটু চেষ্টা-বেষ্টা কর না, শিবী ঘটকীর সঙ্গে তো তোমার বেশ জানাশোনা আছে।

মঙ্গলা। যখন আপনার বোলতে তেমন কেউ নেই, তখন বাবা কেন উদ্যুগ কোরে দাঁড়িয়ে এনার বিয়েটা দিয়ে দিন না; মাকে দিয়ে বলাবো।

কুল। না না, আমার বিয়ের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। তবে দাদামশায়ের সঙ্গে তোমার যেমন বিয়ে হয়েছে, ওরকম হয় তো আমি রাজী।

মঙ্গলা। (ঈষৎ হাসিয়া) যখন জানলেম, দাদামশাই সব মূলধন খুইয়ে ঘরে বোসে বোসে ঘোড়া হাতী চালছেন, রাজা মন্ত্রী মারতে বোসেছেন, তখন আমি ওঁর গলায় মালা দিলেম। আপনার মতন বাবুর এখন এমন একটি বৌ চাই, যার পয়ে মূলধন ধরে আসবে। বলে শোন নি, স্ত্রীভাগ্যে ধন।

কুল। যদি কখনো আমার বিয়ে হয়, তবে টাকা নিয়ে বে' আমি কোর্ব্বো না; সব সইতে পারি, স্ত্রীর খোঁটা সইতে পার্ব্বো না।

মঙ্গলা। অই—অই জন্যেই মা বলেন, বড় মানুষের ঘরে কুটুম্বিতে তিনি কখনো কর্ব্বেন না। ট্যাকা—ট্যাকা—ট্যাকা, সহরে বড় নোকেদের মুখে যেন আর কথা নেই। তোমাদের বেরাহ্মণদের গাঁই-গোত্তর-ফোত্তর আমি নাপ্‌তের মেয়ে কিছুই জানিনে, কিন্তু মনে এয়েছে, বোলে ফেলি; হ্যাঁ দাদামশাই, আমার টুনুর বর হোলে দু'টিকে বেশ মানায় না?

কুলপতি জুতা পরিল, মামাকে নমস্কার করিল, "বাহন, তবে আজ আসি" বলিয়া প্রস্থান করিল।

টুনটুনী, কুলপতি, বিবাহ—এই তিনটি বাক্যকে প্রত্যক্ষ রাখিয়া বিরাটপর্ব্ব পাঠারম্ভের পূর্ব্বে সে দিন মন্ত্রবন্ধনে অনাবদ্ধ, স্পর্শের স্পন্দনে অসিদ্ধ এই দম্পতির মধ্যে যে কতকটা মনের কথার বিনিময় হয়েছিলো, তা সম্ভব।

পিঞ্জরের আবাহন

ষোল বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ কোরে আট বৎসর ধ'রে কুলপতি কল্পনায় অনেক কিশোরীর ছবি এঁকেছে; কি রকম ছাঁচের মুখের সঙ্গে কি রকম কোরে চুল সাজালে খাপ খায়, মনে মনে তা ঠিক কোরে নিয়েছে; আবার মুখের সঙ্গে মানিয়ে ভ্রমরকৃষ্ণ, সুনীল, বিলোল, উদাস, মর্ম্মভেদী, প্রশ্নপূর্ণ, সলজ্জ প্রভৃতি রকম রকম কবিকুলপ্রিয় চক্ষু বসিয়ে দেছে; কারুর কপালে আধো-চাঁদ, কারো চূর্ণকুন্তল, কারো কুটিল ভ্রূকুটী ফুটিয়েছে; এইরূপে কপোলে গোলাপ, চিকুরে আদর, অধরে চুম্বন, গ্রীবায় হেলন, বুকের আগল খুলে দু'টো ভালবাসা-ভরা উত্তপ্ত উদ্দাম, চলন-ভঙ্গীলীলার লাবণ্যের দোদুলদুল, আরো কত ভাব ভাষা অলঙ্কারে তার কল্পনার ছবিগুলি জনমনোরম কোরে সুষুপ্তির জন্য সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন রচনা কোরেছে। কিন্তু যা বল্লেম, যা কিছু এঁকেছে, যা কিছু গড়েছে, সব-ই জনমনোরম কোরে; নিজের মনের অব্যর্থ আকাঙ্ক্ষাকে মুখর কর্ত্তে সমর্থ হয়নি তার অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে কোনখানি। পিগ্‌ম্যালিয়নের মত সে আজো পাতর কেটে এমন একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করতে পারে নি, যার পানে চাবামাত্র সে পায়ে লুটিয়ে পোড়ে প্রাণের সদ্য সাজানো অনুদ্দিষ্ট নৈবেদ্যখানি ঢেলে দিতে পারে; আজ গিরিধারী বাবুর এলবামে যে ছবিখানি দেখে এসেছে, তার প্রতিরূপ অক্ষরের অলঙ্কারে অঙ্কিত করা যায় না, ভাষার সুষমায় সাজানো যায় না। কালিদাস থেকে আজ পর্য্যন্ত সকল কবি-ই রমণী-রূপের বর্ণনায় কাব্য-রাজ্য উজ্জ্বল কোরে গিয়েছেন, কিন্তু উর্ব্বশীর জন্য পুরূরবাই বা পাগল কেন, আর দুষ্মন্তকে অশান্ত কোর্ত্তে শকুন্তলার সৌন্দর্য্য প্রয়োজনীয় কেন, এর মীমাংসা কে কোর্ত্তে পারে? মুখখানা হাঁ কোরে তুলে বিদ্যাদিগ্‌গজ আশমানীর মুখনিঃসৃত দেড় ছটাক অমৃত পান কোরেছিল, কিন্তু অন্যমনস্কে আয়েষাকে ছুঁয়ে ফেল্লে হয় ত সে স্নান কর্ত্তে যেতো। আমার চোখ রূপ চেনে, সৌন্দর্য্য অনুভব কর্ব্বার শক্তি আমার মনে আছে, কিন্তু আমার মনের নেগেটিভ কোন্ পজেটিভের স্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে, তা অন্তর আলোকিত হবার পাঁচ সেকেণ্ড পূর্ব্বে-ও টের পাইনে। গিরিধারী বাবুর আলবামে স্কার্ট-পরিহিতা ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার প্রতিকৃতি দেখবামাত্রেই তার বুকের ভিতরের রক্তটা ঝাঁৎ কোরে যেন একটা গোলা বেঁধে উঠেছিলো; পরে যখন দ্বিতীয় ছবিখানি দেখলে, তখন-ই তার ভিতরকার আলো উছলে উঠলো। কাব্য-সুন্দরীর আকর্ষণশক্তির দু'একটা উদাহরণ পড়া গিয়াছে; বাস্তব জীবনেও দেখা ভোগা দুই-ই গিয়েছে যে, আমি একজনের মনের শব্দটুকু শোনবার জন্য সমস্ত প্রাণটা

কাণের ভিতর পৌঁছে দিয়ে রেখেছি, আর বন্ধু বোলছেন, তুমি তার অই চেহারায় কি দেখে পাগল হয়েছ, তা ত আমি বুঝতে পারিনে; আবার বন্ধু তার অভীপ্টার জানলার আলোটির পানে রাস্তায় হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে থাকেন, তখন আমি মনে করি, অমন স্ত্রী আমার হোলে বিবাগী হতেম। প্রত্যেক আত্মার-ই একটা জোড়া আছে; যতক্ষণ না এই জোড়ার মিল হয়, ততক্ষণ কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়কে-ই জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ কোরে যাতায়াত কোর্ত্তে বাধ্য হোতে হয়; অনেক সময়-ই মনে হয় যে, এইবার বুঝি ঠিক মিল হোয়েছে, কিন্তু দিন কতক বাদে-ই দেখা যায়, জোড় কলম বাঁধল না, দুটো-ই শুকিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যা থেকে পরবর্ত্তী শনিবার পর্য্যন্ত কুলপতি টুনুর ছবিখানি বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখে একটা সুখের অস্বস্তি ভোগ কোরে নিলে। শনিবারে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন, গিরিধারী বাবুর ভগিনীপতি ভাগলপুরের মুন্সেফ রমেশ ঘোষাল, পাড়ার ডাক্তার নীরোদ বাঁড়ুয্যে, আর শিরীষ বোলে একটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের ছাত্র; তিন জনে-ই অতি ঘনিষ্ঠ, সেই জন্য আহারে বসবার পূর্ব্বে আলাপের বৈঠকটুকু বোসেছিল অন্দরের মধ্যে-ই। টুনটুনীর ছবি আঁকার স্কেচ বই, লেখার খাতা, হাতের সেলাই অন্য সবার সঙ্গে কুলপতি-ও দেখলে; পিসে মশাইয়ের কথায় টুনুকে সেতার-ও বাজাতে হোল, দুখানা গান-ও গাইতে হোল; কুলপতি মনে মনে ভাবতে লাগল, উপন্যাস লিখেছি না ছাই লিখেছি, আমি-তো-আমি—কোনো কবিগুরুর কল্পনা-ই বোধ হয় কৈশোর-সৌন্দর্য্যের এ আদর্শের কাছে এগুতে পারে না।

আর টুনটুনীর আজ এ কি হোলো? সে সরলা, আনন্দময়ী, নম্রনয়না বরাবর-ই বটে; রমেশবাবু যখন তার সেতারের সুখ্যাত কোরেছেন, তখন সে যা ফিক কোরে হেসেছে, তার সঙ্গে একটু লজ্জা মাখানো ছিলো, তার হাতের আঁকা ভিখারিণীর ছবি দেখে পোষ্টগ্রাজুয়েটটি যখন "চমৎকার চমৎকার" বোলেছে, তখন সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট কোরেছিল, কিন্তু কুলপতির মুখের পানে চাইতে তার কেমন বাধ-বাধ ঠেকছিল; এ নূতন লজ্জা তার নয়নে আজ কোথা থেকে এলো? পুরুষের কণ্ঠস্বরে যে একটা আহ্বান থাকে, কুলপতির কথা কাণে যাবার পূর্ব্বে তা তো কখনো টুনুর মনে হয় নি! বসুমতী ছিলেন খড়খড়ির অন্তরালে; স্ত্রীলোকের চোখ, স্ত্রীলোকের কাণ—বিশেষ সে স্ত্রীলোকটি প্রসূতি প্রতিপালিনী জননী, সুতরাং দুহিতার হাবভাবের আভাসে তার মনের ভাষা অপরের অবোধ্য হোলে-ও মা'র প্রাণে শিশুবোধের ন্যায় সহজ হোয়ে গেল।

*　　*　　*

লক্ষ্য কথা না হোলে বিবাহ হয় না, এ প্রবাদ-বাক্য ফলিয়ে তোলবার শক্তি বা ধৈর্য্য আমার নাই; 'বসুমতীর' মুদ্রাযন্ত্রাগার একটা বিরাট ব্যাপার হোলে-ও আমার জন্য সেখানে তিন চার লক্ষ অক্ষরের সংকুলান হবে কি না, সে বিষয়ে-ও সন্দেহ; সুতরাং গিরিধারী বাবু স্নেহের যুক্তিতে, আদরের আশ্বাসে, বিশ্বাসে সান্ত্বনায় কুলপতির বিস্ময়, বিনয়, লজ্জা, ভয় সব অপসারিত কোরে কেমন কোরে তার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, "আমি আশৈশব পিতৃহীন, আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, সন্তানকে যা আজ্ঞা কোরবেন, তাই হবে," এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আর করলেম না।

ইদানীং বাঙ্গালী ভদ্রঘরে বিবাহে বরাভরণের ব্যয়বহনে অনেক কন্যাকর্ত্তার দেনার দায়ে কারাবরণের ব্যবস্থা হয় বটে, কিন্তু সে দানের অর্থের শ্রাদ্ধ এবং কোথাও কোথাও বিবাদের বাদ্য-ও বাজে। একটু আগের সেকালে কন্যাদান খুব অল্প বয়সে-ই হোত বটে, এত অল্প বয়স যে, বর বধূ উভয়ের-ই প্রাণ কামগন্ধহীন কৌমার-পরিমলে পরিপূর্ণ, কিন্তু সে বিবাহ সম্প্রদান মাত্র, ইংরাজীতে যাহাকে betrothal বলে। কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তার বরের সহিত দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়া তবে তাকে শ্বশুরবাড়ী "ঘর" করতে পাঠানো হ'ত। এই সময় কন্যার সঙ্গে একটা সওগাত যেতো, যার নাম ছিল, ঘর-বসতের তত্ত্ব। এক দম্পতিকে সংসার পেতে ঘর কত্তে হোলে যে যে বস্তু নিত্য প্রয়োজন, খুঁটিনাটি মিলিয়ে মেয়ের মা সেগুলি সব তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। সিন্দুক পেঁটরা, বাক্স আল্না, দেরাজ বিছানা, বালিস, লেপ মশারি, রকম-রকম কাপড়, ঘড়া, ঘটী, থালা, রেকাব, বাটি, ডাবর, পানের বাটা, ডিবে, গাড়ু, পিলসুজ, কড়া, বেড়ি, হাতা, খুন্তী, শিল, নোড়া, যাঁতা, পিঁড়ি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তৈজস; তার পর বঁটী, কাটারি, কুরুণী, ধামা, চাঙ্গারি, ধুচুনি, কুলো, মিষ্টান্ন প্রস্তুতের রকম-রকম ছাঁচ, বড়ি, আমসত্ত্ব; রাঁধবার, পাণ সাজবার, হলুদ থেকে ছোট এলাচ, কর্পূর পর্য্যন্ত যত রকম মশলা; এই সব সংসারের সুসারের দ্রব্য যে যার অবস্থা বুঝে দিতেন; কোথাও কোথাও

মশলাদি এত পরিমাণে এসেছে যে, বেশ একটা মাঝারি পরিবারের সমস্ত বৎসরের খরচ কুলিয়ে-ও বাড়তি থাকতে দেখা গেছে।

কুলপতির বাড়ী আছে, ঘর আছে, আয় উপার্জ্জন সবই আছে, নাই কেবল লক্ষ্মীরূপিণী নারীপ্রতিষ্ঠিত সংসার। বসুমতী দেবী বিবাহের পনেরো দিন পূর্ব্ব হোতে-ই মামাবাবু ও মঙ্গলাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে ভাবী জামায়ের ঘর সাজাতে আরম্ভ কোরে দিলেন। তাঁর ফর্দ্দমাফিক এখনকার প্রয়োজনীয় ও পছন্দসই গৃহ-সজ্জায় ব্যবহার্য্য সামগ্রী গিরিধারী বাবু আনিয়ে দেন, আর মধ্যাহ্ন হোতে অপরাহ্ণ শেষ পর্য্যন্ত বসুমতী সেগুলি সাজান। দম্পতি নিজ বাড়ীটাকে একটা খাবার শোবার আড্ডা বোলেই মনে কোরতো, শুভ কার্য্যের তিন দিন আগে সে আপনার রান্নার ভাঁড়ার খাওয়া শোওয়া বসবার ঘরগুলি দেখে বুঝতে পাল্লে, গৃহশ্রী কাকে বলে।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির পর বোলতে গেলে গিরিধারী বাবুর বাড়ীতে তাঁর এই প্রথম ক্রিয়া।

কন্যাদায় নয়—দান, সেই জন্য শুভ-রাত্রে কর্ম্ম-বাড়ীতে আনন্দের তুফান ছুটছিলো। বর-ক'নের বুকের ভিতর সবুজ পাতায় সাজানো যে উৎসবের মজলিস বোসেছিল, মর-নয়নে তা আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু বাইরের মজলিস দেখেছি। সেখানে কলিকাতা, কালীঘাট, ভবানীপুরবাসী গণ্য-মান্য বিস্তর লোক। মাষ্টার প্রোফেসর ছাত্রের সংখ্যাই বেশী; কবিতার কাগজ যে কত রকম বিলানো হয়েছে, তার আর সংখ্যা নাই। হেমবাবুর সময় থেকে উকীল-কুলায় হোতে অনেক কোকিলের কুহর শোনা যায়; সুতরাং বরের সহকর্ম্মীদের মধ্য থেকে পদ্যের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হোয়ে অন্ধকার সভা আনন্দিত কোরে দিয়েছে। মামাবাবুর বড় ইচ্ছে ছিল যে, চাকরদের মতন তিনি-ও একখানা রংকরা কাপড় পরেন, কিন্তু আনন্দের এই নিশানটি ওড়াতে পাননি মঙ্গলার মুখে "অই ব্যবসাটাই বাকী আছে" এই ভৎর্সনা শুনে। মঙ্গলা কিন্তু নিজে রং-করা কাপড় পরেছে, সোনার তাগা জোড়াটি আর তসরখানি তুলে রেখেছে, পোরে মেয়ের সঙ্গে যাবে বোলে।

এখন-ও চকের ছাতে লোক-জন খাচ্ছে, এই পংক্তি হোলে-ই ছুটী; এখন-ও মাঝে-মাঝে বাসরের হাসির সঙ্গে-সঙ্গে শাঁখের আওয়াজ অন্দর থেকে শোনা যাচ্ছে; ফটকের উপরে বাঁধা রাঙা কাপড়-মোড়া নহবৎখানায় শানাইয়ে বেহাগের আলাপ সুরু হোলো। বাঙ্গালীর বিবাহে পাঁচজনের নেবার ঘটা, দেবার ঘটা, খাবার ঘটা, আলাপের ঘটা।

বর-বধূর প্রথম আলাপের ঘটা আরম্ভ হবে ফুলশয্যার মধু-যামিনীতে।

* * *

প্রোফেসর গিরিধারীলাল! আজ কোথায় গেল তোমার গম্ভীর্য্য! স্পষ্ট কোরে বল না "এদ্দিন আমার ছিল, আজ তোমায় দিলুম"; কেঁদ না—বল "যত্নে রেখো"। বসুমতী বসুমতী! বাসা খালি—অই টুনটুনী উড়ে গেল।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

শারদ প্রভাতে

নক্ষত্র-চন্দ্রক-চিহ্ন-বিমুক্ত আকাশ,
মুদিতার মাধুরীতে মন্দার মোদিত,
ছায়াগূঢ় গ্রামচ্ছবি দিগন্তে চিত্রিত
প্রান্তর তরুণ হাস্যে সুন্দর মহান,—
ক্ষেতে ক্ষেতে চম্পকের বর্ণ সমারোহ,
কাঁপিছে খর্জ্জুর-বন প্রভাত-পবনে,
ধূলিচ্ছবি ছাতারের অনল নয়নে
স্ফুরিছে উৎসাহ-দীপ্তি আনন্দের মোহ।

আচ্ছন্ন শেফালি মঞ্জু মুকুতা মুকুলে,
পুকুরে পল্বলে ঝিলে কুমুদ উৎসব,—
শ্যামশোভা পুষ্পরিক্ত নিস্তব্ধ বকুলে
মিশিছে ঝিল্লীর সুরে দোয়েলের রব।
সারিকার গর্ব্ব-হাস্য শুনা যায় দূরে—
প্রতি কলোচ্ছ্বাসে যেন স্বরমদ স্ফুরে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

ব্যবহারিক কীট-পতঙ্গ

কীট-পতঙ্গকে আমরা অনিষ্টের হেতু বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি। বস্তুতঃ লক্ষ লক্ষ টাকার আরণ্য ও ক্ষেত্রজ ফসল প্রতিবৎসর ইহাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হয়; বহুসংখ্যক গৃহ-পালিত পশু-পক্ষী এবং মানব কীট অথবা কীট-বাহিত ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তথাপিও ইহা স্থির যে, পুরাকালে কীট-পতঙ্গের নিকট মনুষ্য অল্পবিস্তর পরিমাণে উপকার পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। বহু দেশে বহুবিধ উদ্দেশ্যে নানা জাতীয় কীটের ব্যবহার আছে; তন্মধ্যে যেগুলি মনুষ্য সমাজের অধিকতর উপকারে আইসে, সেইরূপ কয়েকটি কীট-পতঙ্গের এ স্থলে উল্লেখ করা হইল।

আহার্য্যরূপে কীট-পতঙ্গ

কথাটা শুনিয়া অনেকেই ঘৃণা বোধ করিবেন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি আদিম কাল হইতে কীট-পতঙ্গ মনুষ্যের ভক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বাইবেলের একাধিক স্থানে কীটজাত খাদ্যের উল্লেখ আছে। মুষা বলিতেছেন যে, ইহুদিগণ চারিপ্রকার কীট খাইতে অভ্যস্ত। প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচারক জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট্ (John the Baptist) মধু ও পঙ্গপাল আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত আফ্রিকা ও আরব দেশের অনেক জাতির মধ্যে পঙ্গপাল প্রিয়খাদ্য। তাঁহারা নিয়মিত ভাবে পঙ্গপাল ঝাঁক ধরে; ভাজিয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা আবার ভবিষ্যতের জন্য শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দেয়। ভারতেও কতিপয় বন্যজাতি এবং কোন কোন স্থানে নিম্ন শ্রেণীয় মুসলমানগণের মধ্যে খাদ্যার্থ পঙ্গপাল ধরার প্রথা রহিয়াছে। উত্তমরূপে শুষ্ককৃত ও টিনে আবদ্ধ পঙ্গপালের বিদেশে কাট্‌তি আছে, উহা পক্ষি-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

পঙ্গপালের কথা-প্রসঙ্গে বলিতে পারা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায় অন্য কোন দেশেই ইহার এমন সদ্ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। তথায় জোহানেস্‌বর্গ সহরে পঙ্গপাল-জাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য একটি বৃহৎ কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ প্রথায় পঙ্গপাল ও ফড়িং শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া কয়েক প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও সর্ব্বশেষে সার প্রস্তুত হয়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পশুপক্ষিখাদ্য এবং মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী পঙ্গপাল আটার বিস্কুট অন্যতম। উক্ত সমস্ত দ্রব্যেরই কাট্‌তি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পঙ্গপাল মানুষের যে কিরূপ প্রবল শত্রু, তাহা ইহা বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, লোহিত সাগরের উপর দিয়া একটি ঝাঁক কিছু দিবস পূর্ব্বে উড়িয়া যায়। উহা ২০০০ বর্গমাইল আকাশপথ অধিকার করিয়াছিল বলিয়া অনেকে বলেন। ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না; কারণ, সাইপ্রাস দ্বীপে উক্ত ঝাঁকের ডিম্বই ধ্বংস করা হয় প্রায় ১৩ শত টণ।

প্রাচীন গ্রীকগণও পঙ্গপালের ভক্ত ছিলেন; কিন্তু রোমানরা কঠিনপক্ষ পতঙ্গের কীড়া খাইতে অধিক ভাল বাসিতেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী কীটতত্ত্ববিৎ ফেবার (Fabre) স্বয়ং উক্তরূপ কীড়া ভক্ষণ করিয়া উহা উপাদেয় খাদ্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো দেশে প্রজাপতি ও জলজকীট আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উই পোকা যৌন-সম্মিলনের প্রাক্কালে যখন সহস্র সহস্র সংখ্যায় উড়িতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পক্ষবিচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, তখন তাহারা শুধু যে নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর খাদ্য যোগায় তাহা নহে, কোল, মাহের প্রভৃতি জাতিগণও উক্ত প্রকার কীট খাইতে কোন দ্বিধা বোধ করে না। সিংহলেও কোন কোন জাতি উইপোকা খাইতে ভালবাসে।

যখন বিবেচনা করা যায় যে, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, শামুক, গুগ্‌লী প্রভৃতি কীটপতঙ্গের দূর-সম্পর্কীয় না হইলেও এখনও পর্য্যন্ত উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, তখন কীটপতঙ্গের উপর সভ্য মানবের আহার্য্যরূপে ঘৃণা শুধু অভ্যস্ত আচার-সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়।

শীতের প্রারম্ভে যে এক প্রকার কৃষ্ণ বিন্দুযুক্ত সবুজবর্ণ

পোকা সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় দৃষ্ট হয় ও উজ্জল আলোকের নিকট প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া থাকে, সেগুলি মনুষ্যখাদ্য না হইলেও ক্ষুদ্র জাতীয় পিঞ্জরা-বদ্ধ পাখীর উৎকৃষ্ট খাদ্য। এই কীটের সাধারণ নাম 'দেওয়ালীপোকা'। ইহাকেও শুকাইয়া টিনে পূরিয়া বিক্রয় করা চলে।

কীটজাত অন্যান্য আহার্য্যের উপর সভ্য সমাজ যতই বীত-স্পৃহ হউক না কেন, মধু সম্বন্ধে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। সকল দেশেই খাদ্যরূপে মধুর যথেষ্ট আদর আছে এবং জগতের অধিকাংশ স্থলেই অল্পবিস্তর মধু উৎপাদিত হয়। পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতীতে' ভারতীয় মধুর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; এ স্থলে আর অধিক বলা অনাবশ্যক।

রঞ্জক পদার্থ

যে সমস্ত কীটপতঙ্গ হইতে বহু পুরাকালে রং নিষ্কাশিত হইত, তন্মধ্যে লাক্ষাকাট অন্যতম। অথর্ব্ববেদে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে লিখিত প্রতীচ্য গ্রন্থাদিতে লাক্ষা যে ভারত হইতে লোহিত সাগরের উপকূলে আডলি বন্দরে চালান যাইত, তাহার উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ লাক্ষা বহু শতাব্দী ধরিয়া শুদ্ধ রঞ্জক পদার্থরূপে ব্যবহৃত হইত; ইহার রজনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এক সময়ে লাক্ষা রং ভারতের প্রচুর আয়ের দ্রব্য ছিল এবং লাক্ষা-বর্ণ-রঞ্জিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কারুকার্য্য বহু-মূল্যে নানা দূরদেশে বিক্রয় হইত। রাসায়নিক প্রথায় প্রস্তুত কৃত্রিম রং সমূহের প্রচলনে অনেক প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ রঞ্জক পদার্থের সহিত লাক্ষা রংও অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবলমাত্র সুদূর গ্রামাঞ্চলে আলতা এবং স্থানে স্থানে রঞ্জিত কারুকার্য্যে ইহার চিহ্ন রহিয়াছে। লাক্ষা ভারতের নিজস্ব এবং একচেটিয়া দ্রব্য; সামান্য পরিমাণে শ্যাম-রাজ্য কোচিন চিনে পাওয়া গেলেও কার্য্যতঃ—ভারতই জগতের মধ্যে লাক্ষা উৎপাদনের এক মাত্র কেন্দ্র। লাক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃমিদানা (cochineal) লাক্ষার সমগণভুক্ত কীট। ইহার আদিম বাসস্থান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা; এখন কিন্তু
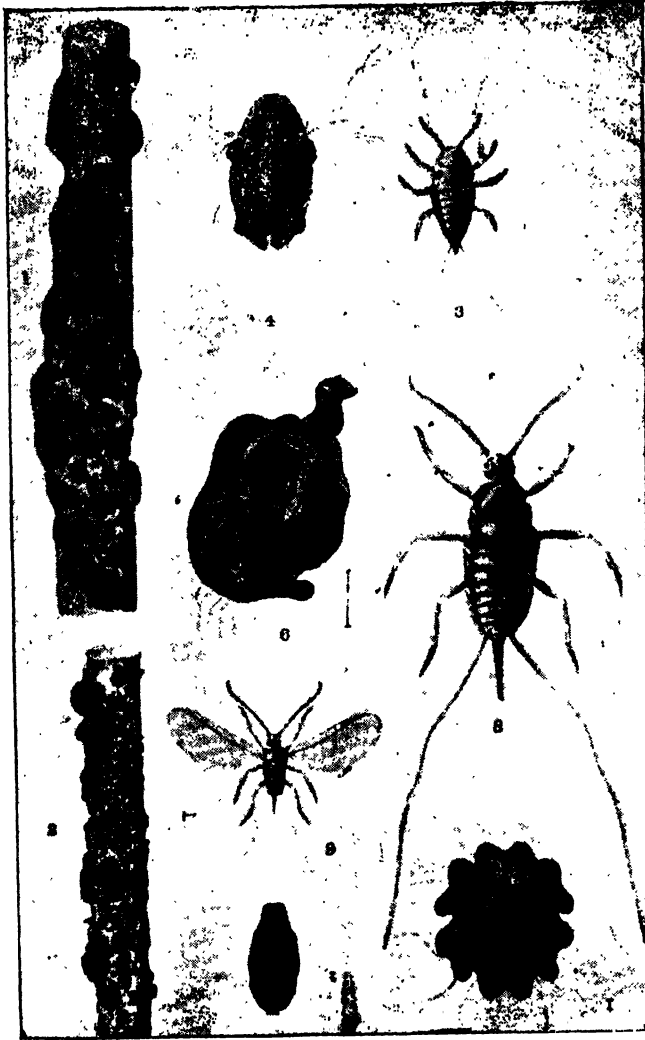
(১) বীজযুক্ত শাখা; (২) রোগদুষ্ট বীজযুক্ত শাখা (৩) নবীন লাক্ষা-কীট; (৪) প্রবীণ স্ত্রী-কীট; (৫ স্ত্রী-কোষ হইতে কীড়া বাহির হইতেছে; ৬) অপক্ষ পুং-কীট; (৭ সপক্ষ পুংকীট.

ইহা স্পেন, যবদ্বীপ, ভারত প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনবাসিগণ মেক্সিকো দেশে ক্রমিদানা আবিস্কার করেন এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন নিজ দেশজাত ও তাহার আমেরিকার সাম্রাজ্যোৎপন্ন ক্রমিদানা একচেটিয়া
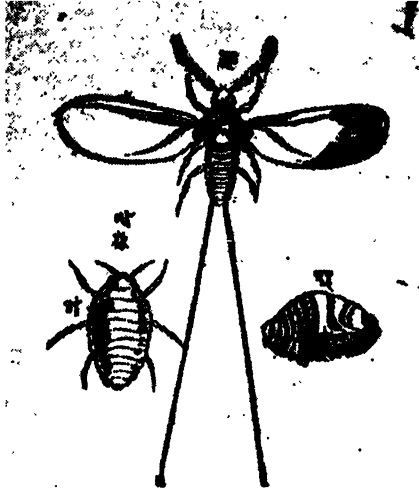
লাক্ষা কীট

করিয়া প্রভূত লাভ করে। ভারতে এই কীট অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবর্ত্তিত হয়। মাদ্রাজ ও বাঙ্গালায় এই কীট পালনের বিবরণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজ-পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে কলিকাতার নিকটস্থ রিষড়ায় ১ শত ৫০ বিঘা জমীতে ক্রমিদানা চাষের একটি বাগিচা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয়। কৃত্রিম রং যদিও ক্রমিদানার যথেষ্ট অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তবুও ইহা এখনও কতিপয় শিল্পে ও ঔবধরঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে প্রাপ্ত ঘোর এবং উজ্জ্বল রক্তবর্ণের নাম কার্মাইন (carmine); ভারতে প্রতি বৎসর ২ হইতে ৬ লক্ষ টাকার কার্মাইন আমদানী হয়। নানা জাতীয় ফণি-মনসার গাছে ক্রমিদানা-কীট পালন করা হইয়া থাকে। অন্য ফসলের আনুষঙ্গিক রূপে ক্রমিদানার চাষ করিয়া এখনও লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার চাষ উঠিয়া গিয়াছে।

শিল্পের উপাদান

কীটজাত পদার্থাদি কয়েক প্রকার শিল্পের উপাদান। তন্মধ্যে মোম অন্যতম। নানাবিধ কার্য্যে মোমের ব্যবহার আছে। চর্ম্মপাদুকা, কয়েক শ্রেণীর রঞ্জিত বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ও পিত্তলের দ্রব্যাদির ছাঁচ গড়ন এবং বাতি প্রস্তুতে অল্পবিস্তর পরিমাণে মোম আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে ধনশালী ব্যক্তিগণের গৃহ ও দেবমন্দিরাদি আলোকিত করিবার জন্য আবশ্যকীয় বাতি প্রস্তুতের উপাদানরূপে যথেষ্ট মোম প্রয়োজন হইত। এখন খনিজ মোম ও মিশ্র (composition) বাতির অনুগ্রহে বিশুদ্ধ মোমবাতি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

এক জাতীয় লাল অথবা তেঁতুলে বর্ণের পিপীলিকাকে গাছে বাসা করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহারা এক স্থানে বহু সংখ্যায় থাকে এবং ইহাদের দংশনে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়। পিপীলিকার শরীরস্থ ফরমিক্ এসিড্ (formic acid) ইহার কারণ। আমেরিকায় পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর পিপীলিকা হইতে ব্যবসায়িক হিসাবে ফরমিক্ এসিড্ প্রস্তুতে লাভ হইতে পারে।

আমাদের দেশে আগে 'টিপে'র প্রচলন ছিল এবং এখনও গ্রামাঞ্চলে একবারে উঠিয়া যায় নাই। যে উজ্জ্বল, ঘন-নীল কঠিন-পক্ষ কীট হইতে টিপ্ প্রস্তুত হয়, তাহার সাধারণ নাম 'সোনা পোকা'। আসাম, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জঙ্গল সমূহে এই শ্রেণীর পোকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সমগণীয় আর এক জাতীয় পোকার কঠিন পক্ষ কাটিয়া ছাঁটিয়া হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজে প্রস্তুত কয়েক প্রকার পোষাকের শোভা সম্পাদনার্থ ব্যবহৃত হয় এবং হস্ত-ব্যজনী, সিন্দূর কৌটা প্রভৃতি অলঙ্কৃত করিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরিধেয়

কীট-জগত হইতে মানবের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও মূল্যবান পরিধেয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রেশম, তসর, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। কৃত্রিম দ্রব্য এ ক্ষেত্রেও স্বভাবজ দ্রব্যের যথেষ্ট প্রতিযোগিতা করিতেছে, তথাপি উচ্চ শ্রেণীর স্বাভাবিক রেশম বস্ত্রের ইহা এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য যে, সকল প্রকার রেশম কীটেরই আদিপুরুষ বন্য ছিল। কালক্রমে মানুষ পালন ও প্রজনন করিয়া নানা উপজাতির সৃষ্টি করিয়াছে। তুঁত রেশমের পক্ষে এই মন্তব্য বিশেষরূপে প্রযোজ্য। বন্য গুটি হইতেও কিন্তু এখনও কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুত হয়। 'বসুমতী' ১৩৩৩ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত তসর শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ রেশম বস্ত্রের প্রতি
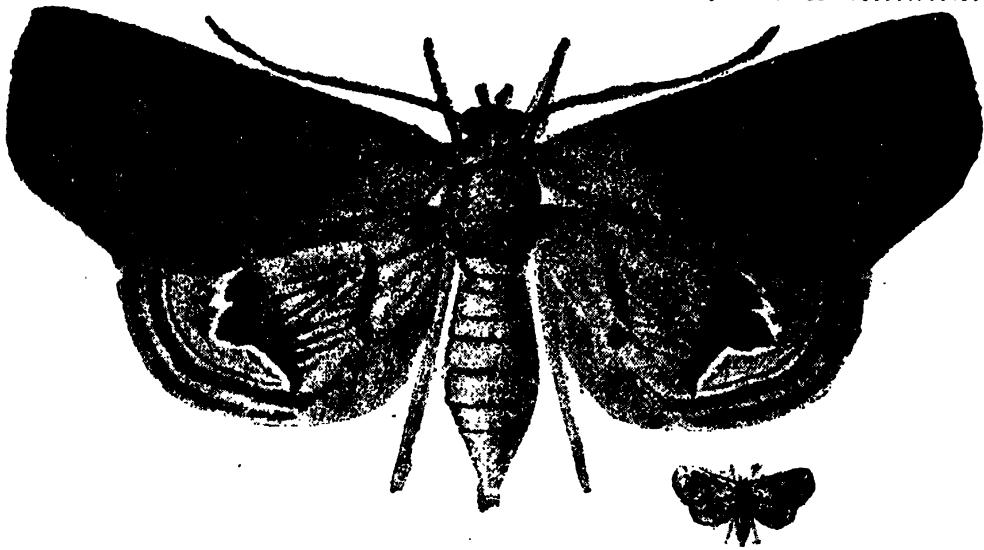
তসর কীট

বৎসর কাটতি হয়,তাহা হিসাব করিলে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, কত কোটি মণ রেশম গুটি মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে। রেশম কীটের ন্যায় মাকড়সাও এক প্রকার সূত্র প্রসব করে; কিন্তু উহা বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী নহে। এক জাতীয় মার্কিণী মাকড়সার জাল এত ঘনভাবে বোনা যে, উহা ক্ষত-স্থানে বাঁধিয়া দিলে রক্তরোধকরূপে কার্য্য করে।

ঔষধে ব্যবহার

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে কত প্রকার কীট-পতঙ্গ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে গেলেও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। তদ্রূপ কীট-পতঙ্গাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতিপয় শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ বর্ত্তমান সময়েও ঔষধ প্রস্তুতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ
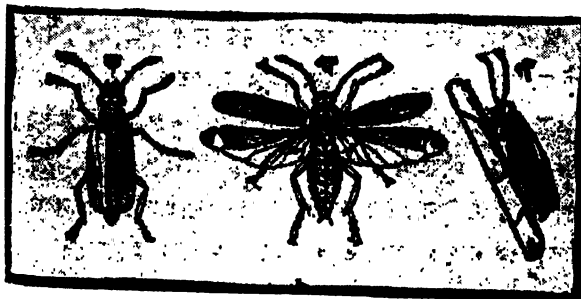
তেলিনী পোকা

ক্যাম্থারাইডিসের (Cantharides) নাম করিতে পারা যায়। ইহা এক প্রকার নীলাভ-কৃষ্ণ। কঠিন পক্ষবিশিষ্ট পতঙ্গ। ইহা প্রধানতঃ স্পেন দেশ হইতেই আমদানী হয়; কিন্তু রুসিয়া ও চীনেও ইহা একটি স্বভাবজ ঔষধ দ্রব্য। ভারতেও এই শ্রেণীর পতঙ্গ আছে—উহাদের সাধারণ নাম 'তেলিনী পোকা'। আসামে খাসিয়া পর্ব্বতাঞ্চলে বিলাতী ক্যাম্থারাইডিস্ মক্ষিকা পাওয়া যায়। কিন্তু নিকট গণীয় মাইলাব্রিস্ (Mylabris) মক্ষিকারই এতদ্দেশে প্রাধান্য অধিক। তেলিনী পোকা গায়ে বসিলে ফোস্কা হইয়া যায়। তাহার কারণ, উহাদের দেহস্থিত ক্যাম্থারাইডিন (Cantharidin) উগ্রবীর্য্য। ভারতীয় তেলিনী পোকায় অন্য দেশের সম শ্রেণীর পোকা অপেক্ষা ক্যাম্থারাইডিনের মাত্রা অধিক। বর্ষাকালে ভুট্টা অথবা অন্যান্য শস্য-ক্ষেত্রে এই সমস্ত কীট ধৃত ও শুষ্কীকৃত হইয়া বাজারে আইসে। বিদেশে ভারতীয় তেলিনী পোকার প্রচার এখনও সম্যকরূপে হয় নাই।

আর্শুলা গৃহের একটি উপদ্রব। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ডিপ্‌থিরিয়া ও অন্য ২।১টি রোগ প্রসারের সহিত আর্শুলার সম্পর্ক সামান্য নহে। তবুও ইহার উপকারিতা আছে। হোমিও-প্যাথি চিকিৎসায় হাঁপানির প্রধান ঔষধ আর্শুলা (Blatta orientalis); হাঁপানি রোগীর দম আটকাইয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিক ঔষধেও আর্শুলাচূর্ণ ৪ হইতে ৮ গ্রেণ মাত্রায়

ঘর্ম্মকারকরূপে ব্যবহৃত হইবার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ভিন্ন আর্শুলার অন্যান্য গুণ আছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন। তাঁহাদের মতে সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী। চীন দেশে আর্শুলা প্রিয়খাদ্য ও প্রসিদ্ধ ঔষধ। চীনবাসিগণের মতে পুনর্যৌবন লাভ করিতে হইলে এবং দেহের যৌবন-সুলভ কান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রত্যহ কিছু কিছু আর্শুলা খাওয়া দরকার। মোঙ্গোলীয়রা আর্শুলার সাহায্যেই নাকি বার্দ্ধক্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে।

আমরা এতক্ষণ প্রধানতঃ পতঙ্গের কথাই বলিয়াছি। এক্ষণে একটি প্রকৃত কীটের উল্লেখ করা যাইতেছে। উহা জলৌকা অথবা জোঁক। রক্ত-মোক্ষণের জন্য জোঁকের ব্যবহার বহু পরিমাণে কমিয়া গেলেও একবারে উঠিয়া যায় নাই। জোঁক কেঁচোর নিকট-আত্মীয়; জোঁকের অনেকগুলি জাতি আছে এবং অর্দ্ধ ইঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহারা আড়াই ফুট পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। খুব বড় অথবা হাতি জোঁক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না; মধ্যমাকারের ৩—৫ ইঞ্চ লম্বা জোঁকের ২।৩টি জাতি মাত্র এই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যখন জোঁকের অধিক ব্যবহার ছিল, তখন এক শ্রেণীর লোক নদী, বিল, জলা প্রভৃতি হইতে জোঁক ধরিয়া ডাক্তারখানায় বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিত।

কীট-পতঙ্গবর্গের ন্যায় এমন জাতি ও বর্ণ-বহুল প্রাণী জগতে আর নাই। আকার, অবয়ব, বর্ণ, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে কীট-পতঙ্গের মধ্যে যেমন অসীম মাত্রায় প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাদের উপকারিতার ক্ষেত্রও তেমনই বিস্তৃত। ফসলের যেমন শত্রু-কীট আছে, তেমনই মিত্র-কীটও আছে। যতই নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়া ব্যবহারিক কীট-তত্ত্বের কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ততই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় কীট-পতঙ্গ মনুষ্যের কার্য্যে আসিতেছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

জার্ম্মাণ খেলনা

পৃথিবীতে যত বড় বড় ব্যবসায় আছে, তাহার মধ্যে খেলনার ব্যবসায় ও বাণিজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হউক, অন্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই। খেলনার ব্যবসায়ে কখনও খরিদ্দারের অভাব হয় না। খেলনার খরিদ্দার প্রধানতঃ ছেলে-মেয়েরা। তাহাদের আবদার এড়াইবার যো নাই। বরং খাদ্য ও পানীয় ব্যতীত ছেলে-মেয়েদের দিন চলিতে পারে; কিন্তু খেলনা না হইলে তাহাদের এক দণ্ড চলে না। আবার ছেলে-মেয়েরা এমন খামখেয়ালী যে, তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে পিতা-মাতাকে সময়ে সময়ে মহা বিব্রত হইতে হয়। যখন যে বস্তু তাহাদের মনে ধরে, তখন তাহা না পাইলে আর রক্ষা নাই—যেমন করিয়াই হউক, তাহা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া চাই। কখনও কখনও অতি তুচ্ছ জিনিষ পাইলেই শিশু-চিত্ত আহ্লাদে আট-খানা হয়। আবার কখনও কখনও তাহারা এমন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুর জন্য আবদার ধরে, যাহা সংগ্রহ করা হয় ত পিতা-মাতার সাধ্যাতীত। পক্ষান্তরে, বিপদের উপর বিপদ এই যে, কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে দরিদ্র পিতা হয় ত ছেলের আবদার মিটাইবার জন্য একটা দামী খেলনা সংগ্রহ করিয়া দিলেন; কিন্তু ছেলে কতক্ষণ যে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কিছুক্ষণ মহানন্দে খেলা করিবার পর ছেলের সখ মিটিয়া গেল। তখন সে হয় ত সেই দামী খেলনা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া নূতন একটা খেলনার জন্য আবদার আরম্ভ করিল। তখন হয় ত পিতাকে বাধ্য হইয়া পুত্রের শাসন আরম্ভ করিতে হইল—তাহাকে প্রহারে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইল। বস্তুতঃ, ছেলেদের ন্যায় অব্যবস্থিত-চিত্তকে প্রসন্ন করা অতি দুরূহ কার্য্য।

ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়নক যাঁহারা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের ঘটে অনেক বুদ্ধি-বিবেচনা থাকা আবশ্যক। শিশুর সাইকলজি বা মনস্তত্ত্বে তাঁহাদের বিলক্ষণ অধিকার না থাকিলে শিশু-চিত্ত-রঞ্জন ক্রীড়নক তাঁহারা প্রস্তুত করিতে পারেন না। ছেলেদের চিত্ত অধিকার উপযোগী খেলনা নির্ম্মাণ-কার্য্যে সেই জন্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত থাকিতে হয়। তাঁহারা শিশুদের মতি-গতির অব্যবস্থিততা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সেই জন্য তাঁহারা শিশুর চিত্তাকর্ষক খেলনা প্রস্তুত করিতে পারেন।

এখন, শিশু কিসে সহজেই মুগ্ধ হয়? প্রথমতঃ, বর্ণের উজ্জ্বলতা শিশুচিত্ত সহজেই অধিকার করিতে পারে। সেই জন্য এক শ্রেণীর খেলনায় কৌশলে উজ্জ্বল বর্ণ-বিন্যাস করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, জীবজন্তু শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। জীবিত, নিরীহ জীবজন্তু পাইলে শিশু যতটা আনন্দ লাভ করে, এমন আর কিছুতেই নহে। জীবিত জীবজন্তুর অভাবে জীবজন্তুর মূর্ত্তি খেলনারূপে সংগ্রহ করিয়া দিলেও শিশুকে অনেকটা সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়। একটু বয়স্ক শিশুদের জন্য ক্রীড়নকের

মধ্যে কল-কৌশলের বিন্যাস করা চলে। চতুর্থতঃ গৃহসজ্জা, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র খেলনা পাইলেও শিশুরা প্রসন্ন হইতে পারে। সকল শিশুর চিত্ত-বৃত্তি যে সমান হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। তবে, এইরূপ নানা শ্রেণীর ক্রীড়নককে বিভিন্ন মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট শিশুর মনোরঞ্জন করা অসম্ভব নহে।

এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা ক্রীড়নক নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা অনায়াসে সকল শ্রেণীর শিশু-চিত্ত জয় করিতে পারেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্বদেশজাত ক্রীড়নকের ব্যবসায় প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে বলিলেই হয়। এ দেশের ক্রীড়নক-নির্ম্মাণকারীরা শিশুর চিত্তবৃত্তি অধ্যয়নে মনোযোগ দেন না। সেই প্রাচীনকালে, মান্ধাতার আমল হইতে যে সকল ক্রীড়নক আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হইতেছে না। কালের প্রভাব শিশুদের উপরও অল্প কার্য্য করে না। বিংশ শতাব্দীর নূতন আলোক আমাদের এই পরাধীন দেশের শিশুদের উপরও যে প্রভাব বিস্তার করে নাই, এমন কথা বলা যায় না। সেই জন্য, শত কিম্বা দ্বিশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শে নির্ম্মিত যে সকল খেলনা তৎকালীন শিশুদের মন হরণ করিতে পারিত, এখন আর তাহাদের সে ক্ষমতা নাই। নব যুগে, নূতন আলোকে, নবীন আদর্শের ক্রীড়নক এ দেশে প্রস্তুত না হওয়ায় বিদেশী ক্রীড়নককে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। এ দিকে কেহ লক্ষ্য করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহা বড় দুঃখের বিষয়। ছেলেদের খেলনা কিনিতে গেলেই, জাপানের সস্তা, চটকদার, ভঙ্গপ্রবণ খেলনা, কিম্বা জার্ম্মাণী ও আমেরিকার বহুমূল্য খেলনা ভিন্ন দেশী খেলনা বড় একটা পাওয়া যায় না। বিদেশী জিনিষ বয়কট করিবার প্রতিজ্ঞা করিলে, অন্য সকল বিষয়ে হয়ত আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি; নিজেরা সংযত থাকিয়া বিদেশী জিনিষের ব্যবহার পরিহার করিতে পারি; কিন্তু খেলনার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা নিশ্চয়ই কঠিন হইবে। শিশু রাজনীতি বুঝিবে না, বয়কটের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, সে অর্থনীতিশাস্ত্রেও পণ্ডিত নহে। খেলনা তাহার চাই-ই চাই; তা' সে দেশীই হউক আর বিদেশীই হউক। দেশী খেলনা যখন ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, তখন বিদেশী খেলনা কিনিয়া দিয়াই শিশুদের প্রসন্ন করিতে হইবে। নচেৎ, গৃহস্থের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

জার্ম্মাণীর ধাতু-নির্ম্মিত খেলনা

যে সমস্ত বিদেশী খেলনা অধুনা আমাদের দেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে জার্ম্মাণ খেলনাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। খেলনা নির্ম্মাণ জার্ম্মাণীর একটি বহু কালের পুরাতন শিল্প। বহু কালের অভিজ্ঞতায় জার্ম্মাণী এখন খেলনা নির্ম্মাণে অসাধারণ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার ফলে জার্ম্মাণী নিত্য নূতন নূতন ক্রীড়নক আবিষ্কার করিয়া সকল দেশের শিশুদের মুগ্ধ করিতে পারিতেছে। জার্ম্মাণী হইতে যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার শতকরা ১·৩ অংশ কেবল শিশুদের ক্রীড়নক। সুতরাং তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। এই জার্ম্মাণ খেলনা শিল্পটি বহু শতাব্দীর পুরাতন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ খেলনা শিল্পের বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহারও বহু কাল পূর্ব্ব হইতে জার্ম্মাণীর নুরেমবার্গ নগরে প্রচুর পরিমাণে ক্রীড়নক নির্ম্মিত হইত, এরূপ মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না। তবে, তখন অবশ্য খেলনা শিল্প একটা স্বতন্ত্র, স্বপ্রধান শিল্প বলিয়া গণ্য হইত না। নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল শিল্পের কারখানায় পরিত্যক্ত বস্তু সমূহ হইতে অতিরিক্ত
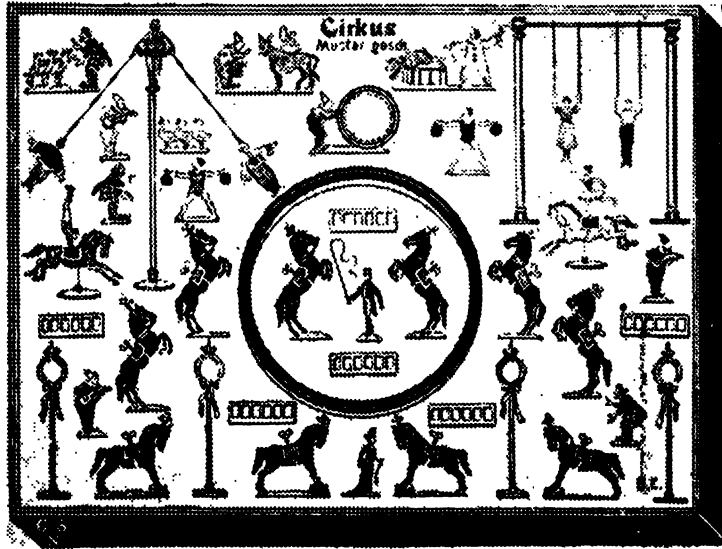
হিসাবে খেলনা প্রস্তুত হইত, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার ক্রম-পরিণতির ফলে নুরেমবার্গের খেলনা শিল্প স্বতন্ত্র ও বিশ্ববিশ্রুত হইয়া ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জার্ম্মাণীর অপর কয়েকটি নগরও অধুনা ক্রীড়নক নির্ম্মাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, জার্ম্মাণীতে অধুনা ৫৫ হাজার লোক খেলনা শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। জার্ম্মাণীর কোথাও কোথাও এখনও ব্লক প্রভৃতি, কিম্বা বন্দুক, পিস্তল, সেলায়ের কল, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, পুতুল ও পুতুলের সাজ-পোষাক, কাপড়ের জীবজন্তু, কাঠের খেলনা তৈয়ার হইয়া থাকে। কোন নগরে কলকব্জা-ওয়ালা খেলনা, যথা, কলের গাড়ী, ষ্টিমার, মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতির কারখানা স্থাপিত। কোথাও বা কেবল সেলুলয়েডের নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত হয়। এইরূপে এক এক প্রকার খেলনার জন্য এক একটি কেন্দ্র খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর ছিন্ন-বস্ত্রখণ্ড-নির্ম্মিত খেলনা

কিছু কিছু খেলনা হাতে প্রস্তুত হইলেও, অন্য প্রায় সর্ব্বত্রই অপরাপর শিল্পের ন্যায় খেলনাও বড় বড় কারখানায় কলকব্জার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল সুবৃহৎ কারখানা কোন স্থানবিশেষে আবদ্ধ নহে, সমগ্র জার্ম্মাণীতে বিস্তৃত। তবে এক এক শ্রেণীর খেলনা প্রায় একটা স্থানে বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়। যেমন কোথাও কেবল বড় বড় ডল পুতুল প্রস্তুত হয়। কোথাও জীবজন্তু, গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদি। কোথাও বা ছেলেদের খেলনা ঘড়ি, বাঁশী, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কোন স্থানে এঞ্জিনীয়ারীং খেলনা, খেলা-ঘরের বাড়ী ঘর তৈয়ারী করিবার মালমসলা—যথা কাঠের

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণী হইতে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ডবল হন্দর ওজনের এবং ১১ কোটি ৪০ লক্ষ রিকৃসমার্ক মূল্যের খেলনা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর খেলনা পৃথিবীর সকল দেশেই রপ্তানী হয়। এ বিষয়ে জার্ম্মাণী অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপানের খেলনা রপ্তানীর পরিমাণ ২ কোটি মার্ক। ফ্রান্স ১ কোটি ৭ লক্ষ মার্ক, যুক্তরাষ্ট্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ মার্ক এবং ইংলণ্ড ১ কোটি ২০ লক্ষ মার্ক মূল্যের খেলনা বিদেশে রপ্তানী করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী আরও অনেক বেশী টাকা মূল্যের খেলনা রপ্তানী করিত। যুদ্ধের পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতে নানারূপ পরিবর্ত্তন হওয়া

পূর্ব্বাপেক্ষা খেলনা রপ্তানীর পরিমাণ এখন কিছু কম হইতেছে। যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী হইতে সকল প্রকার পণ্যের রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে খেলনা রপ্তানীও বন্ধ হইয়াছিল। সেই সুযোগে সকল দেশেই খেলনা শিল্প কিছু কিছু প্রসার লাভ করিয়াছিল। জার্ম্মাণী এখনও তাহার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। তদ্ব্যতীত প্রায় সকল দেশেই খেলনার উপর কিছু কিছু চুঙ্গী মাশুল বসিয়াছে, এই কয়েকটি কারণে জার্ম্মাণ খেলনার রপ্তানী এখনও পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে না। জার্ম্মাণ শিল্পীরা বলেন, জার্ম্মাণ খেলনার খরিদদারের জার্ম্মাণ খেলনায় উপর চুঙ্গী মাশুল বসাইয়া উহাদের বিক্রয় কমাইয়া নিজেদেরই ক্ষতি করিতেছেন—স্বদেশের শিশুদিগকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিতেছেন। এ কথা কতকটা যথার্থ। কারণ, জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক খেলনাগুলি শিশুদের পক্ষে অনেকটা শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক বটে। এই বাণিজ্য-শিল্পের যুগে এ দেশে খেলনাশিল্পের উন্নতি বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

হেমেন্দ্রকুমার

ভাগলপুরের পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হেমেন্দ্রকুমার বসু গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি জেলা ২৪ পরগণার দণ্ডীরহাটের বিখ্যাত বসু-বংশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত বিনোদবিহারী বসু বশিরহাটের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী ডাকবিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন এবং অল্পদিনেই তথায় উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য তিনি বিহার প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। সার ভূপেন্দ্রনাথের ভ্রাতা ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্রের এক কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে কর্ম্মস্থানে প্রথমে সামান্য জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া জননী, পত্নী ও আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতা বিদ্যমান, তন্মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ মেডিক্যাল কালেজের শেষ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মৃত্যুকালে তিনি তিনটি অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের কথা, তাঁহার শ্বশুর তাঁহার মৃত্যুকালে পোষ্টাল বিভাগের সরকারী কার্য্যে বিলাতে ছিলেন, তাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎও হয় নাই। তাঁহার শোকাতুরা জননী ও পত্নীকে এই দারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না।

হেমেন্দ্রকুমার বসু

৺বৈদ্যনাথ-কাহিনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বীরভূমের কালেক্টার মিষ্টার এ, হেসেলরিজ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত প্রাচীন পত্রে মন্দির সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংক্ষেপে উল্লিখিত পত্রের মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। হেসেলরিজএর রিপোর্টে প্রকাশ যে, ৺বৈদ্যনাথ দেবের মন্দির রঘুনাথ গোঁসাই কর্ত্তৃক ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে হিন্দুস্থানের প্রায় প্রতি স্থান হইতে যাত্রিসমাগম হয় এবং শিব-চতুর্দ্দশী পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষভাবে বুন্দেল-খণ্ড হইতে বহু যাত্রী আসে; অন্যান্য সময়ে মন্দির-দ্বার রাত্রিকালে অবরুদ্ধ থাকে; কিন্তু এই মেলার সময় উহা দিবা-রাত্রি উন্মুক্ত থাকে, এবং মন্দিরে যাবতীয় মূল্যবান্ সামগ্রী যাত্রিগণ কর্ত্তৃক অর্পিত হয়। মন্দিরের প্রাচীরমধ্যে গোঁসাইগণ-নির্ম্মিত সপ্তদশটি মন্দির আছে। যথা;—১। বৈদ্যনাথ অথবা শিব, ২। সন্ধ্যা দেবী, ৩। পার্ব্বতী এবং গৌরী, ৪। নীলকণ্ঠ, ৫। লছমী-নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, ৬। অন্নপূর্ণা দেবী, ৭। কালী, ৮। শ্যাম কার্ত্তিক, সিদ্ধেশ্বর ৯। গণেশ, ১০। বিমলা, ১১। বীর অনন্ত, ১২। কুবের, ১৩। সূর্য্য, ১৪। বগলাদেবী, ১৫। রাম-লছমণ, ১৬। গঙ্গা, ১৭। কানাই।

উক্ত সপ্তদশটি মন্দির ব্যতীত প্রাচীর-বহির্দ্দেশে তিনটি মন্দির অবস্থিত আছে; ১। বৃদীয়নন্ত (?) ২। মূলকিশোর ৩। বিষ্ণুপাদ।

শিবগঙ্গার সন্নিকট শিব-মন্দির দুইটি ১১৬০ সালে শিবাজী সিং কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। দেওঘরের গোঁসাইগণ যাত্রিগণের নিকট হইতে দেবতার ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে কেহই উক্ত সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন না। গোঁসাইরূপে মনোনীত হইবার পর তাঁহাকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরমধ্যে বসবাস করিতে হয় এবং মন্দিরের কার্য্যে সর্ব্বথা আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে হয়। এক জন গোঁসাইর মৃত্যু হইলে পণ্ডিতগণ স্বীয় মণ্ডলী হইতে দুই ব্যক্তিকে উক্ত শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত করিয়া দুইটি বিভিন্ন তালপত্রে তাঁহাদের নাম লিখেন এবং ৺জিউ-ঠাকুরের মস্তকে উক্ত তালপত্র দুইটি অর্পণ করিয়া তাঁহারা মন্দির-বাহিরে চলিয়া আসেন। অতঃপর কোন শিশুকে ৺ঠাকুরের মস্তক হইতে একটি তাল-পত্র আনয়নের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়। এই প্রণালীতে যাঁহার নামাঙ্কিত তাল-পত্র শিশু-হস্তে আনীত হয়, তিনিই ৺জিউ-ঠাকুরের বিশেষরূপে অনুমোদিত বলিয়া গোঁসাইরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দেওঘর মন্দিরে গোঁসাইর কার্য্য করিয়াছেন :—

রঘুনাথ—(যিনি ৺বৈদ্যনাথ-মন্দির-নির্ম্মাতা)।
বামদেব—
মনোহর—(ইঁহার সহিত রঘুনাথের বংশ লুপ্ত হয়)।
চাঁদ—(বর্ত্তমান গোঁসাইদের পূর্ব্বপুরুষ)।
প্রয়াগ—
রতন পাল—(চাঁদের পুত্র)।
সদানন্দ—
ক্ষেমকরণ—
জয়নারায়ণ—(রতন পালের পুত্র)।
যদুনন্দন—
টীকারাম—
দেবকীনন্দন—(যদুনন্দনের পুত্র)।
রামদত্ত—(বর্ত্তমান গোঁসাই)।

জমীদারগণের উপর যখনই জেলার বন্দোবস্তের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা মন্দিরের প্রাপ্য হইতে শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বোর্ডের অনুমোদনের সপক্ষে হেসেলরিজ তৎকালীন গোঁসাই মহাশয়ের সহিত চুক্তি করেন যে, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, জহরৎ, স্বর্ণ ও অন্যান্য বিশেষ মূল্যবান্ পদার্থ সরকারের অংশ এবং গো, ষণ্ড, মহিষ, ছাগ ইত্যাদি মন্দিরের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের ব্যয়-ভার সঙ্কুলান হইয়া অর্থ, বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী যাহা উদ্বৃত্ত রহিবে, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ সরকারের প্রাপ্য ও অবশিষ্টাংশ গোঁসাইগণের প্রাপ্য। শিবচতুর্দ্দশী পর্ব্বের সময় ব্যতীত মন্দিরের আয় সাধারণতঃ এত নগণ্য যে, মাসে ২০।২৫ টাকার অধিক হয় না। কিন্তু পর্ব্বের সময় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। কেন না, যাত্রীর সংখ্যা ও তাহাদের 'মানসিকে'র উপর উহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মেলার সময়ে প্রতারণারও অবতারণা হইয়া থাকে। হেসেলরিজ বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে, জমীদারগণ গোঁসাইগণের নিকট প্রাপ্য অংশের দাবী করিলেই তাঁহারা (গোঁসাইগণ) তিন চারি ক্রোশ দূরে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করেন, যাহাতে যাত্রিগণ মন্দিরে আসিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে উক্ত ব্রাহ্মণগণের হস্তে মূল্যবান্ সামগ্রীসমূহ অর্পণ করে। হেসেলরিজ ইহাও নিবেদন করিয়াছেন যে, বোর্ডের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও ইহা একবারে দমন করা অসম্ভব। তিনি একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ এত ধূম-পরিপূর্ণ থাকে ও সর্ব্বক্ষণ এত বারিবর্ষণ হইতে থাকে যে, সেই সময়ে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং উক্ত সুযোগে ধৃত হইবার বিশেষ কোন আশঙ্কা না থাকায় ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে মূল্যবান্ সামগ্রী সমূহ সংগ্রহ করে। হেসেলরিজএর রিপোর্টে মন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া রঘুনাথের নামোল্লেখ আছে। তাঁহার পূর্ব্বের সর্দ্দার পাণ্ডাগণের নামের কোন উল্লেখ নাই; এই বিষয়ে দেওঘরের জনৈক বাঙ্গালী পাণ্ডা ৺কৃপারাম্ চক্রবর্ত্তীর এজাহারে কতকগুলি মূল্যবান্ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, "পুরী" নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ৺শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথজীউ ঠাকুরের অভিলাষ অনুযায়ী "ওঝা" নিযুক্ত হইতেন। মন্দিরের যখন কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না, সেই সময়ে মুকুন্দ ওঝা

প্রথম ওঝা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর চিকু ওঝা এবং তাঁহার পর সুন্দর ওঝা-পদ লাভ করেন। এই সময়ে ওঝা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে হাকিমের কোন সংস্পর্শ ছিল না। সুন্দর ওঝার মৃত্যুর পর রঘুনাথ ওঝা হন এবং তিনিই এই শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ওঝাগণ মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কুলীন, কেহ বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। পঁচিশ বা ত্রিশ বর্ষবয়স্ক কোন ব্রাহ্মণই ওঝা হইতে পারিতেন না। সাধারণতঃ যিনি ওঝা নিযুক্ত হইতেন, তাঁহার বয়স চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশের ন্যূন নহে এবং তাঁহার চারি বা পাঁচটি সন্তান থাকিত। ওঝা হইলেই তাঁহারা গৃহ ও স্বজনসংস্পর্শ ত্যাগ করিতেন। কদাচ

লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির--স্থাপয়িতা ৺বামদেব ওঝা

তণ্ডুল আহার করিতেন না। শুদ্ধমাত্র দধি, দুগ্ধ এবং ফল-মূলে জীবনধারণ করিতেন। মুকুন্দ, চিকু ও সুন্দর ওঝা—ইঁহারা ব্রহ্মচারী ছিলেন। ইঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, কেহই অবগত নহেন। রঘুনাথ ও তাঁহার আত্মীয় বামদেব স্বয়ং ওঝা হন। মুণ্ডিতমস্তক হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ-ধারণের প্রথা রঘুনাথের সময় হইতে প্রচলিত। বামদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয় মনোহর ওঝা পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার পরবর্ত্তী চাঁদ ওঝার সহিত মনোহরের কোন সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল না। চাঁদ ওঝার জীবিতাবস্থায় প্রয়াগ ওঝা বস্ত্রাদি ধৌত করিবার নিমিত্ত কোন রজকের নিকট প্রেরণ করিলে সে কহিয়াছিল যে, সে চাঁদ ওঝার রজকের কার্য্য করিয়া আসিতেছে, সুতরাং সে প্রয়াগের কার্য্য করিবে না। চাঁদ ওঝার মৃত্যুর পর এই রজকের উপহাসবাণীর কথা প্রয়াগ বিস্মৃত হন নাই। তিনি গিধৌড়-রাজকে ৭ শত টাকা নজর প্রদান করিয়া ওঝা হন এবং "টীকা" গ্রহণ করেন। তাঁহারই সময় হইতে সর্ব্ব-প্রথম টীকার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রয়াগ, চাঁদের স্বগোত্র হইলেও অনাত্মীয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে চাঁদের পুত্র রতনপাল ৭ শত টাকা সেলামী দিয়া ও হাকিমের নিকট হইতে টীকা গ্রহণ করিয়া ওঝা হন। রতনপালের পর অপর একটি ব্রাহ্মণবংশ হইতে ঘনশ্যাম হাকিমের নিকট হইতে টীকা গ্রহণ করিয়া ওঝা-পদ লাভ করেন। ঘনশ্যাম আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পুত্র সদানন্দ পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী হাকিম কর্ত্তৃক ওঝা নির্ব্বাচিত হন। সদানন্দের মৃত্যুর পর অপর একটি ব্রাহ্মণ-

সাবিত্রী-(সন্ধ্যা) মন্দির—স্থাপয়িতা ৺ক্ষেমকরণ ওঝা

বংশ হইতে ক্ষেমকরণ ওঝা নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী ওঝাগণের নাম যথাক্রমে জয়নারায়ণ, যদুনন্দন, টীকারাম। টীকারাম বিভিন্ন বংশীয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দেবকীনন্দন ওঝা হন। যখন দেবকীনন্দনের মৃত্যু হয়, মিষ্টার হাজিসন বীরভূমের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। ওঝা-পদের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রার্থি-গণের কলহ উপস্থিত হয় এবং নাগ সরকার মিষ্টার হাজিসনের তরফ স্যাজেওয়াল (রিসিভার) নিযুক্ত হইয়া দেওঘর আসেন। নাগ সরকার, রোহিণীর জমীদার ও রাজা রূপদেওর তরফ ফৌজদার দেবনাথ তেওয়ারী দেবকীনন্দনের মৃত্যুর তিন দিন পরে নারায়ণ দত্তকে ওঝা নিযুক্ত করেন এবং রূপদেও টীকা প্রদান করেন। রামদত্ত মিষ্টার হাজিসনের নিকট বিচারে জয়লাভ করেন ও ওঝার পরওয়ানা প্রাপ্ত হন। মিষ্টার হাজি-সন বীরভূম পরিত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে মিষ্টার সামার

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। নারায়ণদত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট আবেদন করিয়া ওঝার পরওয়ানা প্রাপ্ত হন ও রামদত্তকে পদচ্যুত করেন। নারায়ণদত্ত তৎপর প্রায় দুই বৎসর কাল ওঝার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামদত্ত বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা হোসিয়ার জঙ্গএর নিকট আর্জ্জি দাখিল করেন এবং তাঁহার বিচারে নারায়ণদত্ত পদচ্যুত হন। রামদত্ত স্বীয় পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু নারায়ণের প্ররোচনায় জমীদারগণ ছয় মাস কাল রামদত্তকে বন্দী করিয়া রাখেন এবং সেই অবকাশে নারায়ণ ওঝাগিরী দখল করেন। বীরভূমে মিষ্টার টেলার শাসনকর্ত্তারূপে পুনরাগমন করিলে নারায়ণের সৌভাগ্য অচিরে অস্তমিত হয় এবং তাঁহার সুবিচারে পুনরায় হৃত পদ প্রাপ্ত হইয়া রামদত্ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিনা ঝঞ্ঝাটে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

পার্ব্বতী-মন্দির—স্থাপয়িতা—রত্নপাণি ওঝা

রামদত্তের সময় হইতে প্রচলিত রীতি ও আইন অনুযায়ী একমাত্র তাঁহারই বংশধরগণ মন্দিরের সর্দ্দার পাণ্ডা হইবার প্রধান অধিকারী। বর্ত্তমান "এণ্ডাওমেণ্টের" সর্ত্ত অনুযায়ী রামদত্তই প্রথম সর্দ্দার পাণ্ডা। রামদত্ত সর্ব্বপ্রথমে সম্রাট শাহ আলম বাদশাহাজীর তরফ বাঙ্গালা মুলুকের দেওয়ান ও রাজমন্ত্রী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি জি, ভানসিটার্ট মহোদয়ের নিকট যে ওঝাগিরীর পরওয়ানা প্রাপ্ত হন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রামদত্ত ওঝা চাকলে বীরভূম অন্তর্গত দেওঘরের পাণ্ডা তাহাকে এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে :—

নারায়ণদত্ত নামক জনৈক ব্যক্তি, যে পূর্ব্বে উক্ত দেওঘরে দরওয়ানের কার্য্য করিত, তাহার পিতা দেবকীনন্দন ওঝার মৃত্যুর পরে ভোলানাথ সিকদারের চক্রান্তে বরুণ দেবীকণ্ঠ মৌজা ও ছয়শত মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া "ওঝার" পদ লাভ করিয়াছে। তদন্তে ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উক্ত নারায়ণদত্তের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর মাত্র এবং তাহার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ওঝা হইবার কোন অধিকার নাই। এই হেতু পূর্ব্বে রামদত্তের পিতা ও পিতামহের বয়ঃক্রম ন্যূন হওয়ায় অপর ব্যক্তিগণকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। তাহাদের ওঝা হইবার উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইলে তাহাদিগকে (রামদত্তের পিতা ও পিতামহকে) পুনরায় ওঝা-পদে নিযুক্ত করা হয়। তদন্তে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, ওঝা-গিরীতে বংশপরম্পরা অনুসারে তাহার পিতা ও পিতামহকে ওঝা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বের সনদগুলিতে ইহাও লিখিত আছে—"মৌরস বদন ওঝাগিরী"। সুতরাং বর্দ্ধমান জেলা-সভার বিচার ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওঝাগিরী পদ রামদত্তকে অর্পণ ও উক্ত পদে তাহাকে অভিষিক্ত করা হইল। প্রাচীন ও প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ যথাযথ সম্পাদন করিতে তাহাকে রীতি অনুযায়ী সরকারের অধিকার মোতাবিক বহুমূল্যবান্ সামগ্রী যথা জহরৎ, হস্তী, উষ্ট্র, স্বর্ণনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং পূজারীর প্রাপ্য পুরাতন প্রথানুযায়ী স্বল্প মূল্যের সামগ্রী অর্থাৎ রৌপ্যনির্ম্মিত ও অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যাদি সে স্বয়ং গ্রহণ করিবে। এই বিষয় জরুরী গণ্য করিবে। তারিখ, ১৭ই জমাদিল আওয়াল, ১৬ বর্ষ, ইংরাজী ২৭ জুলাই, ১৭৭৪ সাল।

(পৃষ্ঠে)

হুজুর সেরিস্তায় নকল প্রাপ্তির তারিখ ১৯ জমাদিল আওয়াল ১৬ জলুব বর্ষ, ১১৮১ বাঙ্গালা সাল। অনুবাদ প্রাপ্তির তারিখ ২৭ জুলাই, ১৭৭৪, ১৪ই শাওন, ১১৮১। পঠিত

(সহি) অস্পষ্ট।

বীরভূম রাজ-সরকার তৎকালীন মন্দিরের মালিক ছিলেন এবং মন্দিরের সেবা, পূজা ও ব্যয়ভার বহনান্তে

উদ্বৃত্তের দশ আনা অংশ রাজ-সরকারে দাখিল হইত ও ছয় আনা ওঝার প্রাপ্তি ছিল। কিন্তু মন্দির সম্বন্ধে সমুহ বন্দোবস্তের ভার প্রধান পুরোহিতের উপর ন্যস্ত ছিল।* "স্বীয় শাসনের প্রারম্ভে বৃটিশ সরকার মন্দিরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করা স্থির করিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ইরাজী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সরকারের ব্যয়ে এক দল পুরোহিত, অর্থসংগ্রহকারী ও পাহারাওয়ালা নিযুক্ত হইল। অচিরেই রাজস্বের হ্রাস হইতে লাগিল। তাহার কারণ, প্রধান পুরোহিত মন্দিরের পথগুলি অনুচরবর্গে পরিপূর্ণ রাখিতেন। উহাদের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া যাত্রিগণ মন্দিরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে অর্পণ করিবার দ্রব্যাদি তাহাদিগকে দান করিত। ইহার ফলে ইং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ৫০ হাজার যাত্রিসমাগম হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৪ হাজার ৮৪ টাকা আমদানী হইয়াছিল। পরবৎসর বীরভূমের কালেক্টার মিঃ কীটিং ১ শত ২০ জন সশস্ত্র পুলিস ও ১৫ জন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আমদানী সংরক্ষণের নিমিত্ত

* ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার হইতে, পৃষ্ঠা ২৬২

নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে সেই বৎসর ৮ হাজার ৪ শত ৬৩ টাকা প্রাপ্তি হইয়াছিল। ইংরাজী ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত আমদানী পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত তিনি স্বয়ং দেওঘরে আসেন। তৎকালীন যাত্রিগণের অসুবিধার কাহিনী তাঁহার রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে।

"কোন যাত্রীর ও ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না, বসবাসের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া বাড়ী বা কোন প্রকার যান-বাহন বোধ হয়, পাঁচটির অধিক পরিবারের ছিল না। দুর্য্যোগ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত বংশদণ্ডের উপর একখানি কম্বলের চন্দ্রাতপই একমাত্র অবলম্বন ছিল, এমন পরিবারের সংখ্যা এক শতেরও অধিক হইবে না। অবশিষ্ট যাত্রিগণ—সময়ানুযায়ী ন্যূন সংখ্যায় পনের হইতে পঁচিশ হাজার পর্য্যন্ত—সর্ব্বপ্রকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সন্নিকটস্থ বৃক্ষাদির নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিত। ঐ সকল নরনারীর চাল-চলনে অভাবের ছাপ এতই পরিস্ফুট ছিল যে, তাহাদের ভক্তি সহকারে অর্পিত অর্ঘ্যাদিতে মন্দিরের কোন লভ্য হইতে পারে, ইহা ধারণাও হয় না। প্রকৃতপক্ষে যাহারা নিজেরাই দরিদ্র, তাহাদের নিকট প্রাপ্তির আশাও যৎসামান্য।"

অতঃপর বৃটিশ সরকার হিন্দু-ধর্ম্ম-মন্দিরের ভার কতকগুলি সর্ত্তে প্রধান পুরোহিতের হস্তে প্রত্যর্পণ করা স্থির করেন। এই সম্বন্ধে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে তৎকালীন স-পারিষদ বড়লাটের ইং১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখের লিখিত একখানি পত্রের অবিকল বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

উইলিয়াম কুপার স্কোয়ার

সভাপতি ও রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মহাশয়ের প্রতি।

মহাশয়গণ!

আমরা আপনাদের লিখিত ৬ই তারিখের দুইখানা পত্র ও তৎসহ প্রেরিত কাগজপত্রাদি প্রাপ্ত হইলাম।

২। বীরভূমের কালেক্টারের প্রদত্ত উল্লিখিত কারণগুলির নিমিত্ত আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, দেওঘরে যাত্রিগণের "চড়াওয়ের" (ঠাকুরকে চড়ান অর্থাৎ অর্পিত অর্ঘ্যাদি) উপরে সরকার যে অংশ গ্রহণ করিতেন, তাহা ত্যাগ করা বিধেয় এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত জমীদারকে ৪ হাজার ৯ শত টাকা রাজস্ব হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরের "চড়াওয়ের" সমুদয় অর্ঘ্যাদি গোঁসাইগণ নিম্নলিখিত সর্ত্তে সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবেন। ওঝাগণ মন্দির সমূহ সর্ব্বদা সংস্কার করিবেন, বৃত্তিভোগীদের নিয়মিত বৃত্তি দিবেন, যাহার যাহা অধিকার, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্যে যাহা পূর্ব্ব হইতে ব্যয় হইতেছে, উক্ত ব্যয়ভার নিয়মিত বহন করিবেন এবং ফাল্গুন মাসের প্রধান মেলা উপলক্ষে শান্তিরক্ষা ও জুলুম নিবারণের নিমিত্ত আবশ্যক হইলে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যয়াদি বহন করিতে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন। আপনি কালেক্টার সাহেবকে আদেশ দিবেন, তিনি যেন গোঁসাইগণকে অবগত করান যে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যাত্রিগণ যাহা অর্পণ করিবে, তদতিরিক্ত গ্রহণ করিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে যাত্রিগণের উপর কোন প্রকার জুলুম হইলে তাঁহারা পদচ্যুত হইবেন। আমরা আপনাকে আরও আদেশ দিতেছি যে, প্রতি বৎসর প্রধান মেলার সময় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত কালেক্টার যেন এই সম্বন্ধে ইস্তাহার জারী করেন।

* * * * *

ফোর্ট উইলিয়াম
১৫ই জুলাই, ১৭৯১
সাল।

আমরা ইত্যাদি।—
(সহি) চার্লস ষ্টুয়ার্ট
(সহি) পিটার স্পিক
(সহি) উইলিয়াম কুপার

ইং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই সরকার হইতে ৺রামদত্ত ওঝা গোঁসাই পারস্য মোহরযুক্ত নিম্নলিখিত পরওয়ানা প্রাপ্ত হন।

৺বৈদ্যনাথ জীউ ঠাকুরের চরণ উপাসনা অনুরক্ত রামদত্ত ওঝা গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি।

"১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ফান্‌স স্বয়ং দেওঘরে গমন করিয়া মঠগুলির সেবা, পূজা ইত্যাদি পুরাতন পদ্ধতি ও ব্যবহার অনুযায়ী সম্পন্ন হইতে দেখিয়া তথাকার প্রকৃত ঘটনা সমূহ জ্ঞাত হইয়াছেন। ওঝা, গোঁসাই ও অন্যান্য ব্যক্তি সম্বন্ধে এবং মন্দির সমূহ ও তৎসংস্পর্শীয় বিষয়গুলিতে স্বীয় পরিদর্শন অনুযায়ী বিবেচনাপূর্ণ মন্তব্য তিনি সদরে নিবেদন করিয়াছেন। তৎপরে এ বিষয়ে সপারিষদ বড়লাট বিবেচনা করিয়া মিষ্টার ফান্সের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ কার্য্যাদির ভার ওঝা গোঁসাইর হস্তে ন্যস্ত হইবে ও দেওঘরের চড়াও ইত্যাদির উপর কোন সরকারী কর্ম্মচারী বা তৎপক্ষে মিষ্টার ফান্স, জমীদার বা জমীদারের লোক সমূহ, ঘাটওয়াল এবং অন্যান্য কাহারও কোন প্রকার অধিকার থাকিবে না এবং তদনুযায়ী জমীদারগণ চড়াও হইতে যে অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদের সদর মালগুজারি হইতে সেই পরিমাণ জমা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সরকার সেই (জমীদারের প্রাপ্য) অংশ স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে প্রত্যর্পণ করিতেছেন। যে যে সর্ত্তে সরকারের হুকুম প্রতিপালিত হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"ওঝা গোঁসাই সমস্ত মন্দির সংস্কার ও নির্ম্মাণ করিবেন এবং যে সকল মন্দির অর্দ্ধ-নির্ম্মিত বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, সেই সকল মন্দির-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিবেন। পুরাকাল হইতে যেরূপ পদ্ধতি ও ব্যবহার প্রচলিত আছে, তদনুযায়ী প্রতিদিন সেবা ও পূজা নির্ব্বাহ করিবেন। প্রচলিত রীতি ও পুরাতন ব্যবহার অনুযায়ী পুরাতন মুসাহারাদারগণ (বৃত্তিধারী), রোজিনাদার (দৈনিক বৃত্তিধারী), মাহিয়ানা হারে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ এবং যে সব ব্যক্তি দাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে ও ঘড়িওয়ালাদের ইত্যাদি প্রাপ্য সমূহ নিয়মিত দিবেন ও মন্দির-সম্পর্কীয় যেরূপ কার্য্যাবলী নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুযায়ী সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। পূর্ব্বপদ্ধতি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন পাওনাদারগণকে তাহাদের রোজিনা, কমিশান এবং মেখলা (সন্ধ্যারতির পর ৺জীউ ঠাকুরের আচ্ছাদনের নিমিত্ত পরিচ্ছদবিশেষ) পতাকা, ধ্বজা ও ঐরূপ দ্রব্যাদির উপর যে বৃত্তি নির্দ্ধারিত

আছে, তাহাও পাওনাদারগণকে দিবেন। ইহা ব্যতীত বড় মেলার সময়ে তিনি প্রয়োজন অনুসারে ছড়িদার, পাইক, চৌকীদার ইত্যাদি নিযুক্ত করিবেন এবং যাহাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যাত্রিগণ খুন বা মারাত্মকরূপে আহত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যাহাতে কাহারও দ্রব্যাদি অপহৃত বা লুঠ না হইয়া যায়, সে বিষয়েও সতর্ক নজর রাখিবেন। যাহাতে যাত্রিগণ নির্ভাবনায় তাহাদের পূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারে, ইহাও তিনি দেখিবেন। গোস্বামী অথবা তাঁহার লোক অথবা মন্দির-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কোন কারণেও যাত্রীর নিকট হইতে একটি তাম্রমুদ্রাও জুলুম করিয়া লইতে পারিবেন না। স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যাত্রিগণ যাহা চড়াওস্বরূপে অর্পণ ক'রবে, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র প্রাপ্য। কৌন্সিলের সদস্যগণের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় এবং ধর্ম্ম-দানাদি সংরক্ষণ ও এই কার্য্যগুলি শাস্ত্রানুযায়ী সম্পন্ন হইবার মানসে উহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী ওঝা গোস্বামী তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। নির্ধন, অবস্থাহীন, পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, রোগী, দুর্ব্বল, সহায়হীন ব্যক্তিগণের যাহাতে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যদি ইহা প্রমাণ হয় যে, ওঝা গোস্বামী এই সব নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তের কোনও একটির ব্যতিক্রম করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি সরকারের নিকট শাস্তির যোগ্য হইবেন। সুতরাং আপনাকে আপনার তরফে এক জন মোক্তার নিযুক্ত করিবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে। আপনি রামনারায়ণ সেন, অন্যান্য ব্যক্তি ও সদর আমলাদের সমক্ষে মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া এবং উক্ত মোক্তার-নামায় সম্ভ্রান্ত সাক্ষিগণের সহি লইয়া হুজুরে প্রেরণ করিবেন। সদরের কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশানুযায়ী এই সব লিখিত হইল। মোক্তারনামা ও অঙ্গীকারপত্র দাখিল হইলে পর সাজাওয়াল রামনারায়ণ সেনকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইবে। ইহা অতি জরুরী গণ্য করিবেন। তারিখ ২৭শে জুলাই, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই শ্রাবণ ১১৯৪।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী (বি-এ)।

দূরের স্বপন

নদী ওই আঁকা বাঁকা,
স্বপনের মায়া মাখা,
কোথায় চলেছে ধেয়ে
কে বা জানে বল্?

কত দূরে অন্তরে,
কত গ্রাম প্রান্তরে,
পুলকে গাহিয়া গেছে
গান কল কল্?

ঢল ঢল ওই জল্,
ওই সুরে অবিকল্,
অমনি গাহিয়া কি গো
আমারি সে গাঁয়ে,

দূরে সেই বহু দূরে,
গিয়াছে কি ঘুরে ঘুরে,
স্রোতের নূপুরখানি
বাজাইয়া পায়ে?

হয় ত বা আজ সেথা,
গ্রামের সে বুড়ো 'নেতা',
কূলে বসি ভাবে গত
জীবনের খেলা।

পাশে তরু-ছায়া তলে,
কৌতুক কোলাহলে,
মিলিয়াছে শৈশব—
সে মধুর মেলা

তীরে তীরে ধানক্ষেতে,
রাখালেরা যেতে যেতে,
উতলা হাওয়ার তালে
বাঁশরী বাজায়।

আমারি কুটীর পাশে,
হয় ত সে বন হাসে,
অন্তিম রবি-রূপ
মাখি শ্যাম গায়॥

সন্ধ্যার আগে প্রিয়া,
ছোট বাঁকা পথ দিয়া,
ঘোমটায় ঢাকি মুখ,
কলসিটি কাঁখে,—

হয় ত চলেছে ধীরে,
সুশীতল শ্যাম নীরে,
ভরিতে কোলের কুম্ভ
সেই নদী বাঁকে!

জল্ ভরা আঁখি নত,
সেও কি আমারি মত,
তটিনীর কাণে কাণে
মোরি কথা কহে?

তাই কি রে চঞ্চল,
ওই কাল স্রোত জল্,
তরল ব্যথার লিপি
বুকে নিয়ে বহে?

বিধাতা বেঁধেছে মোরে,
কঠিন করম-ডোরে,
দূরে তাই আছি প'ড়ে,
এ বিদেশ ভূমে।

তবু সেই মাঠ বাট,
সেই গ্রাম গৃহ-পাট,
হাসিমাখা প্রিয়া-মুখ
মন মোর চুমে॥

শ্রান্তির ঘুম-ঘোর,
ঘনায় নয়নে মোর,
আধ জাগরণে ভাবি—
এই বুঝি শেষ!

যদি তাই সম্ভবে,
মরি যেন শুনে তবে,
—নের শ্রবণে তারি
সঙ্গীত-রেশ॥

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

তস্কর-গোয়েন্দা
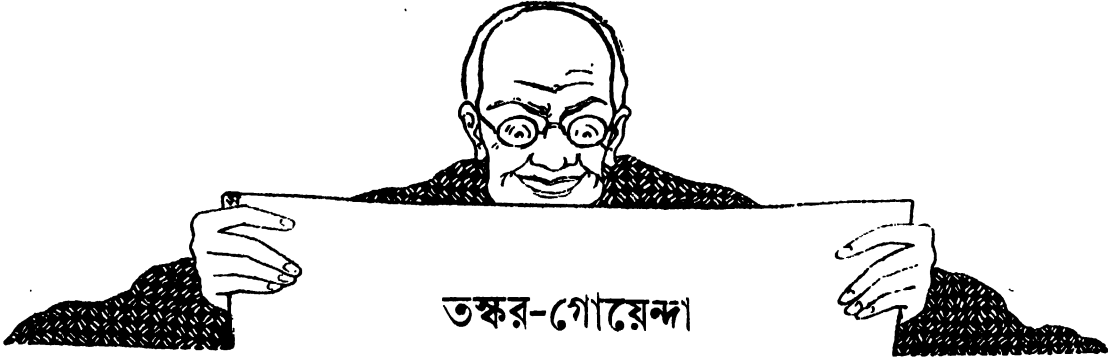
(চার্ল‍্স্ প্রাইসের জীবন-কথা)

পৃথিবীর কোনও দেশে দুঃসাহসী চতুর তস্করের অভাব নাই এবং সকল সভ্য দেশেই কার্য্যদক্ষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বহুদর্শী গোয়েন্দা বর্ত্তমান। কিন্তু তস্কর এক মূর্ত্তিতে চুরি-ডাকাতী করিতেছে, অন্য মূর্ত্তিতে গোয়েন্দাগিরি করিতেছে; স্বয়ং চুরি করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। গোয়েন্দার কাহিনীতে আমরা দস্যু-তস্করের অনুষ্ঠিত অনেক অদ্ভুত চুরি-ডাকাতী, বাটপাড়ীর কাহিনী পাঠ করি; তাহার কিয়দংশ সত্য এবং অধিকাংশ কাল্পনিক উপকথা। কিন্তু আজ যাহার জীবন-কথার আলোচনা করিতেছি, সে কাল্পনিক ব্যক্তি নহে। নিম্নলিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য। চার্ল‍্স্ প্রাইসের জীবন-কথা পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ কাল্পনিক গল্পপাঠ-জনিত আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ লাভ করিবেন; এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কল্পনা সত্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। "Truth is stranger than fiction"—এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।

লণ্ডনের মন্‌মাউথ ষ্ট্রীটে মিঃ প্রাইস্ নামক এক জন ধনাঢ্য দোকানদার বাস করিতেন। তাঁহার একখানি বৃহৎ মনোহারী দ্রব্যের দোকান ছিল। কলিকাতার হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌লা কোম্পানী প্রভৃতির দোকান যে শ্রেণীর—মিঃ প্রাইসের দোকানখানিও সেই শ্রেণীর দোকান ছিল, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ জিনিষই তাঁহার দোকানে বিক্রয় হইত। চার্ল‍্স্ প্রাইস্ তাহারই সন্তান। চার্ল‍্স্ ব্যতীত তাঁহার আরও একটি সন্তান ছিল; কিন্তু চার্ল‍্সের ন্যায় সে খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই।

বাল্যকাল হইতেই চার্ল‍্সের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহার পিতা তাহার সুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চার্ল‍্স্ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে—এই আশায় তাহার পিতা প্রচুর বেতন দিয়া তাহার জন্য এক জন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; চার্ল‍্স্ তাঁহার নিকট ফরাসী, জর্ম্মাণ ও ইটালীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল।

চার্ল‍্সের বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়-স্বরূপ তাহার জীবন-চরিত-লেখক তাহার বাল্যজীবনের একটি গল্প লিখিয়াছিলেন।—বাল্যকাল হইতেই চার্ল‍্স্ "পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞান করিত। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে বাপের দোকানেই তাহার হাতে-খড়ি হইয়াছিল।

বলিয়াছি—তাহার পিতার মনোহারী দ্রব্যের দোকান ছিল। চার্ল‍্স্ এক দিন সুযোগ বুঝিয়া সেই দোকান হইতে এক গুলি সোনালী ফিতা অপহরণ করিয়াছিল। সে সেই ফিতা এক জন ইহুদীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। পিতা এই চুরির কথা জানিতে পারিয়া চার্ল‍্স্‌কে কোন কথা বলিলেন না, চার্ল‍্সের দাদাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়া চাবকাইয়া দিলেন। চাবুক খাইয়া সেই নিরপরাধ বালক বলিল—"আমার দোষ কি? আমাকে মারেন কেন?"—বাবা বলিলেন, "তুই ত চোর, আমার দোকানের গোমস্তারা দেখিয়াছে, তুই ফিতা চুরি করিয়াছিস।"—সে এই অপরাধ অস্বীকার করিল। সে সত্য কথা বলিয়াছে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না; কারণ, চার্ল‍্স তাহার দাদার পোষাকটি পরিধান করিয়া তাহারই ছদ্মবেশে এই কর্ম্ম করিয়াছিল।—তাহার বয়স তখন নিতান্ত অল্প।

চার্ল‍্স্ প্রাইসের বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সে নানা প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। পিতার দোকান ভিন্ন অন্য কয়েকটি দোকানেও সে কিছুদিন ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছিল; তাহার পর সে আমষ্টারডাম নগরের এক জন বিখ্যাত রত্ন-বণিকের দোকানে চাকরী লইয়া হল্যাণ্ড যাত্রা করে। সে সেই রত্ন-বণিকের সংগৃহীত মহামূল্য হীরা-জহরতগুলি সান পালিশ দিয়া পরিষ্কৃত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

রত্ন-বণিক্ "ডাইনীর হাতে ছেলে" সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সে বেচারা তখনও চার্লসের গুণের পরিচয় পায় নাই।

চার্লস্ সুপুরুষ ছিল, তাহার উপর রমণী-সমাজকে সে সহজেই মুগ্ধ করিতে পারিত। তাহার কথায় ও ব্যবহারে, বিশেষতঃ তাহার রূপে, রত্ন-বণিকের তরুণী কন্যা অল্পদিনেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। চার্লস্ রূপসী শ্রেষ্ঠিকন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিল—লণ্ডন হইতে সে বিবাহের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া আনিবে, কিন্তু সে জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই। পরিচ্ছদের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাহার প্রণয়িনী পিতার ধনভাণ্ডার হইতে কয়েকখানি মহামূল্য হীরক সংগ্রহ করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিল। হীরাগুলির মূল্য কয়েক সহস্র পাউণ্ড। চার্লস্ তাহা হস্তগত করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিল, আর সে আমষ্টার্ডামে ফিরিল না। তাহার প্রণয়িনী গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতক প্রণয়ী তাহাকে নিরাশ করিল।

চার্লস্ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বরের হাম্পসায়ারস্থ বিয়ারের ভাটিখানার ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইল। কিন্তু কয়েক মাস পরে সে তহবিলের টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া লণ্ডনে পলায়ন করিল এবং সেখানে ঘটকালীর একটি আফিস (Matrimonial Egency) খুলিয়া বসিল! এই ব্যবসায়ে সে প্রায় এক বৎসর লিপ্ত ছিল এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল।

ঘটকালীর ব্যবসায়ে সে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিল!

চার্লস্ ধনবান, রূপবান ও বিদ্বান যুবক বর সংগ্রহ করিয়া দিবে,—এই অঙ্গীকারে চল্লিশটি ধনাঢ্য বিধবাকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় প্রেমপত্র লিখিতে লাগিল; উৎসাহের সঙ্গেই শুভ-বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। কিন্তু কেবল পত্রে প্রাণ শীতল হয় না, বরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া চাই ত! চার্লস্ একাই বর সাজিল এবং বিভিন্ন নামে নূতন নূতন ছদ্মবেশে সেই সকল বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল; কেহই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল না। চার্লস্ও সুযোগ বুঝিয়া তাহার প্রণয়িনীগণের অর্থ শোষণ করিতে লাগিল। অবশেষে যখন বহু অর্থ তাহার হস্তগত হইল,—তখন সে ঘটকের দোকান বন্ধ করিয়া ও প্রজাপতির পাখা খসাইয়া লণ্ডনের অন্য অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিল! বহু অর্থে ও পরিণয়ের আশায় বঞ্চিত হইয়া বিধবার দল হা-হুতাশ কবিতে লাগিল। অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইল।

যে চল্লিশটি বিধবাকে বিভিন্ন ছদ্মবেশে ভুলাইতে পারে,—তাহার ছদ্মবেশ ধারণের শক্তি কিরূপ অসাধারণ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সে দুইটি, কখন কখন তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করিল। এক ছদ্মবেশে সে মিঃ প্রাইস, অন্য ছদ্মবেশে মিঃ প্যাচ্। প্রাইসের ছদ্মবেশে সে সুপুরুষ, সুবেশধারী ডিটেক্‌টিভ; প্যাচের ছদ্মবেশে সে কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী, ভীষণ-দর্শন, কদাকার দস্যু; তাহার এক দিকের ভ্রূর উপর একটা কাল দাগ! ডিটেক্‌টিভের ছদ্মবেশে সে অনেকের জন্য গোয়েন্দাগিরি করিত। অর্থোপার্জ্জনের বিস্তর ফন্দী তাহার জানা ছিল।

চার্লস্ এক দিন অপরাহ্ণে বণ্ডষ্ট্রীটের এক ডাক্তারের ঔষধালয়ে উপস্থিত হইল; তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সে দিন সে বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। সে ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারী হইতে একখানি সাবান ও কিছু গাছ-গাছড়া ক্রয় করিল। তাহার পর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারের সহিত গল্প করিতে করিতে তাহাকে জানাইল,—বহুদিন হইতে সে বাতরোগে কষ্ট পাইতেছে; বৃষ্টির দিন তাহার বাতের বেদনা অসহ্য হইয়া উঠে;—ইত্যাদি।

গল্প শেষ হইলে সে ডিস্‌পেনসারী পরিত্যাগ করিল। পরদিন ঠিক সেই সময় চার্লস্ স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে ডিস্‌পেনসারীতে আসিয়া কম্পাউণ্ডারের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিল,—কম্পাউণ্ডার তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তখন তাহার মাথায় একটি নূতন খেয়ালের আবির্ভাব হইল।

দুই দিন পরে সে পুনর্ব্বার বৃদ্ধের ছদ্মবেশে সেই ডাক্তারখানায় গিয়া কম্পাউণ্ডারকে বলিল, "বাতে বোধ হয় শীঘ্রই আমাকে পঙ্গু করিবে; আমি ত কিছুমাত্র উপশম বুঝিতেছি না; বিশেষতঃ বাদলার দিন আমার রোগ আরও বাড়িয়া উঠে; এ রোগ হইতে আমার নিষ্কৃতি নাই।"

কম্পাউণ্ডার সহানুভূতিভরে মাথা নাড়িয়া তাহার চোখ-মুখ পরীক্ষা করিল, সে সভয়ে দেখিল, বৃদ্ধের মুখ গিনির মত হলদে!

কম্পাউণ্ডার বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, আপনার ভয়ঙ্কর 'কামল' (Jaundice) হইয়াছে মহাশয়! আপনার অসুখ যে খুব বেশী!"

চার্লস্‌ বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে বলিল, "কামল?—এ যে বড়ই কঠিন ব্যাধি!—আমি বিড়ালের মত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। সংসারে এই বুড়ার আত্মীয়-স্বজন আর কেহই নাই, আমি একা। তবে একা আসিয়াছি,—একা যাইব, সে জন্য আক্ষেপ করিতেছি না; এই রোগে শীঘ্রই অক্কা লাভ করিব—সে জন্যও দুঃখ নাই। দুঃখ এই যে,—আমার অনেক টাকা সঞ্চিত আছে, সে টাকাগুলি কাহাকে দিয়া যাইব, স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার মৃত্যুর পর টাকাগুলি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে, এই চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। সরকার এতগুলি টাকা ফাঁকি দিয়া লইবে?—কি আপশোষ!"—সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সিন্ধুঘোটকের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিল; কম্পাউণ্ডার তাহাকে বৃদ্ধের রোগের কথা বলিল। ডাক্তার তাহাকে এক শিশি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিল। বৃদ্ধ ঔষধ লইয়া বাতের রোগীর মত কষ্টে পা বাড়াইয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিল এবং দ্বারপ্রান্তস্থিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সে অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছে শুনিয়া ডাক্তার বিস্তর মিষ্ট কথায় তাহার মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে বিদায় দান করিলেন। ডাক্তার মনে মনে বলিলেন, বুড়ার বিস্তর টাকা; সংসারে উহার কেহই নাই, টাকাগুলি কাহাকে দিয়া যাইবে,—স্থির করিতে পারিতেছে না!—বুড়াকে হাতে রাখা চাই।

চার্লস্‌ বাড়ী আসিয়া ঔষধের শিশিটা নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর গরম জল দিয়া মুখের হলুদে রং ধুইয়া ফেলিল। সে ছদ্মবেশ পরিবর্ত্তন করিল। বৃদ্ধের খোলস ত্যাগ করিয়া, স্বাভাবিক বেশ ধারণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "বোকা ডাক্তারটাকে বঁড়শীতে গাঁথিয়াছি, আর সে পলাইতে পারিবে না। এখন কয়েক দিন ওদিকে যাইতেছি না।"

চার্লস্‌ বৃদ্ধ রোগীর ছদ্মবেশে ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ উইল্‌মট নামে আত্মপরিচয় দিয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে সে মিঃ উইল্‌মটের ছদ্মবেশেই পুনর্ব্বার ডাক্তারের ঔষধালয়ে উপস্থিত হইল; কিন্তু সে দিন সে মুখে হলুদে রংএর পোঁচড়া দিল না; ডাক্তারকে বলিল, "কি চমৎকার ঔষধই দিয়াছিলেন ডাক্তার। আমার 'কামল' ত পনের আনা রকম সারিয়া গিয়াছে।"

'মিঃ উইলমট' ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া উচ্ছ্বাসভরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল এবং তিনি ভবিষ্যতে লণ্ডনের চিকিৎসক-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, এইরূপ দৈববাণী করিয়া পকেট হইতে টাকার থলি বাহির করিল।

ডাক্তার বৃদ্ধের সদাশয়তায় মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ বলিল, "আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আপনার জন কেহই নাই। আপনি আমার উপকার করিয়াছেন, আপনার সুচিকিৎসায় সুস্থ হইয়াছি। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার এই যৎসামান্য নিদর্শন আপনি গ্রহণ করুন, ডাক্তার!"

বৃদ্ধ থলি হইতে দশ পাউণ্ডের এক খানি নোট বাহির করিয়া কম্পিত হস্তে ডাক্তারের হাতে গুঁজিয়া দিল। ডাক্তার বৃদ্ধের সদাশয়তার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি বৃদ্ধকে এক শিশি ঔষধ দিয়াছিলেন-মাত্র; নিয়ম বাঁধিয়া তাহার চিকিৎসা করেন নাই। সেই এক শিশি ঔষধ খাইয়াই কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ তাঁহাকে দশ পাউণ্ড উপহার দিলেন!—ডাক্তার গলিয়া জল হইলেন।

'মিঃ উইল্‌মট' ডাক্তারের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিল; কিন্তু সে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তারকে বলিল, "ডাক্তার, বুড়া হইয়া গিয়াছি কি না, সকল বিষয়েই ভুল হইতেছে! আমার কাছে যাহা ছিল, আপনাকে দিয়াছি দেখিলেন ত! আমার কাছে খুচরা টাকা, 'রেজকি' একটিও নাই। আপনি নোটখানি ভাঙ্গাইয়া যদি আমাকে গুটি পাঁচেক সিলিং দিতে পারিতেন, তাহা হইলে পথখরচের অভাবে বিব্রত হইতাম না।"

ডাক্তারের নিকট খুচরা টাকা না থাকায় তিনি বৃদ্ধকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিয়া অদূরবর্ত্তী কোন দোকানে নোটখানি ভাঙ্গাইতে চলিলেন। কিন্তু তিনি নোট ভাঙ্গাইয়া ডিস্‌পেনসারীতে ফিরিয়া আসিয়া মিঃ উইলমটকে দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধ পথখরচের টাকা না লইয়াই প্রস্থান করিয়াছিল।

পরদিন বৃদ্ধ ডাক্তারের ঔষধালয়ে আসিয়া তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিল এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া নানা কথার আলোচনার পর ডাক্তারকে দশ পাউণ্ডের পাঁচখানি নোট দিয়া বলিল, "এই নোট কয়খানি ভাঙ্গাইয়া আমাকে টাকা দিবেন ডাক্তার! বুড়ো মানুষ, বেতো রোগী, নোট ভাঙ্গাইবার জন্য কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইব ?"

ডাক্তারের তহবিলে সে দিন টাকা ছিল। তিনি নোট পাঁচখানি রাখিয়া বৃদ্ধকে পঞ্চাশ পাউণ্ড প্রদান করিলেন। সে গিনিগুলি লইয়া "বুড়ো মানুষ, বড়ই উপকার করিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, দিন দিন আপনার উন্নতি হউক!" এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল।

ডাক্তার নোটগুলি ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া সংবাদ পাইলেন, পাঁচখানি নোটই জাল নোট! বুড়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া পঞ্চাশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছে। ডাক্তার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন!

জালিয়াতিতেও চার্লসের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই সকল নোট সে স্বয়ং জাল করিয়াছিল। তাহার অনেক গুণ, তাহার উপর তাহার সাহসও অসীম। সে জাল নোট দিয়া ডাক্তারের পঞ্চাশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াই ডাক্তারের সংস্রব ত্যাগ করিল—কেহ এরূপ মনে করিবেন না। ঠিক এক সপ্তাহ পরে সে তাহার স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে উপস্থিত হইল এবং 'ডিটেক্‌টিভ' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গোয়েন্দাগিরির গল্প বলিতে আরম্ভ করিল।

ডাক্তার তাহার পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধের জালিয়াতির ও প্রতারণার সংবাদ জানাইলেন এবং জালিয়াৎ বৃদ্ধকে ধরিবার জন্য তাহাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে অনুরোধ করিলেন।

চার্লস্ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, উহাই ত আমার পেশা; আমি সেই বুড়া জালিয়াৎকে ধরিয়া পুলিসে দিব। আপনি আমার উপর অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। বুড়া পাকা জালিয়াৎ, নোটগুলি এ ভাবে জাল করিয়াছে যে, তাহা আসল কি নকল —বুঝিবার উপায় নাই! আপাততঃ আমার এক শিশি এসেন্সের প্রয়োজন। পাঁচ পাউণ্ডের এই নোটখানি লইয়া তাহার দাম কাটিয়া লউন, বাকি টাকা আনিয়া দিন।"

চার্লস্ পাঁচ পাউণ্ডের একখানি জাল নোট বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে দিল এবং এক শিশি এসেন্স ও বাকি টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

এক জন নিরীহ চিকিৎসককে এইভাবে প্রতারিত করা তেমন কঠিন কায না হইতেও পারে, কিন্তু চার্লস্ প্রাইস সুচতুর ও বহুদর্শী বণিকগণকেও কি ভাবে প্রতারিত করিত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইউয়ার্ট নামক এক জন ডচ্ বণিক সেই সময় লণ্ডনে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষে আমষ্টার্ডাম নগরের কোনও ডচ্ বণিকের সহিত তাহার সংস্রব ছিল। চার্লস্ প্রাইস আমষ্টার্ডাম নগরে অনেক দিন বাস করিয়াছিল; সেই সময় সে অনেক ডচ্ বণিকের ব্যবসায়-সংক্রান্ত গুপ্ত সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল। সে জানিত, ক্রামার নামক এক জন ডচ্ মিঃ ইউয়ার্টের হল্যাণ্ডের কার্য্যালয়ের এজেণ্ট। চার্লস্ ক্রামারের হস্তাক্ষর জাল করিবার জন্য কোন উপায়ে তাহার স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্র সংগ্রহ করিল; এবং সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে ক্রামারের হস্তাক্ষর জাল করিয়া একখানি পত্র লিখিল—পত্রখানি যেন ক্রামার মিঃ ইউয়ার্টকেই লিখিয়াছিল।

চার্লস্ প্রাইস্ সেই পত্র লইয়া ছদ্মবেশে মিঃ ইউয়ার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং পত্রখানি তাহাকে দিয়া বলিল— সে ক্রামারের বন্ধু, ক্রামার পত্রখানি তাহারই মারফত পাঠাইয়াছে।

ইউয়ার্ট ছদ্মবেশী চার্লসের কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, অপরিচিত আগন্তুকের কথা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মিঃ ইউয়ার্ট অত্যন্ত চতুর লোক, কেহই তাহাকে ঠকাইতে পারিত না। ইউয়ার্ট তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া চার্লস্ তাহাকে বলিল, "দেখুন মিঃ ইউয়ার্ট, আমার নিজের এবং মান্‌হির ক্রামারের স্বার্থ ও সুনাম রক্ষার জন্যই আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি। আপনাদের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড ধড়িবাজ বদমায়েস্ আমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে তাহার নাম ট্রেভার্স। আপনি মান্‌হির ক্রামারের স্বহস্ত-লিখিত এই পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা হইলেই ট্রেভার্সের শয়তানীর পরিচয় পাইবেন। তাহার মত নরপিশাচ আপনাদের মাথায় হাত বুলাইয়া বিস্তর টাকা হস্তগত করিবে, আপনি তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না, ইহা কি সঙ্গত?"—ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার চোখ-মুখ লাল হইল।

মিঃ ইউয়ার্ট জাল চিঠিখানি নিঃশব্দে পাঠ করিল। হস্তাক্ষর

দেখিয়া, তাহা যে ক্রামারের স্বহস্তলিখিত পত্র নহে, এ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইল না। মানুষ জাল ও লেখা জাল করিবার শক্তি চার্লসের অসাধারণ ; এ বিষয়ে সে সময় ইংলণ্ডে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না।

সেই জাল পত্রের মর্ম্ম এই যে, ট্রেভার্স নামক একটা প্রতারক কৌশলক্রমে ক্রামারের এক হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছে ; এই টাকার সমস্তই বা কিয়দংশ তাহার নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য মিঃ প্রাইসের উপর ভার দেওয়া হইল। মিঃ ইউয়ার্ট যেন এই কার্য্যে মিঃ প্রাইস্‌কে যথা-শক্তি সাহায্য করেন। তাঁহার সাহায্য পাইলে টাকাগুলি ট্রেভার্সের নিকট হইতে আদায় করা মিঃ প্রাইসের অসাধ্য হইবে না।

মিঃ ইউয়ার্ট কয়েক মিনিট চিন্তার পর ছদ্মবেশী প্রাইসকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। তাহার বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছে বুঝিয়া প্রাইস্ মিঃ ইউয়ার্টকে চুপে চুপে বলিল, "দেখুন, মিঃ ইউয়ার্ট, গোয়েন্দাগিরিই আমার পেশা, তবে আমি পুলিসের বেতনভোগী গোয়েন্দা নহি ; কিন্তু প্রয়োজন হইলে পুলিস আমাকে সাহায্য করিয়া থাকে, আমিও নানা-ভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করি। আমার অনুরোধে বো-ষ্ট্রীটের পুলিস এই শয়তান ট্রেভার্সের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে ; সে পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করিতে পারিবে না! আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলে কেবল যে মান্‌হির ক্রামারের ক্ষতিপূরণ হইবে, এরূপ নহে, আপনি ন্যায়ের সমর্থন করিবেন, আমারও সুনাম বৃদ্ধি হইবে।"

প্রাইসের প্রস্তাব শুনিয়া ইউয়ার্টের মনে আনন্দ হইল এবং পুলিসকে সাহায্য করিতে তাহার আগ্রহও হইল। কোন ডিটেক্‌টিভ লণ্ডনের কোন ভদ্রলোকের সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে সাহায্য করা গৌরবের বিষয় মনে করেন, ইহা প্রাইসের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং মিঃ ইউয়ার্ট তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবে, ইহা সে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মিঃ ইউয়ার্টের সম্মতি লাভ করিয়া সে তাঁহাকে উৎসাহভরে বলিল, "আগামী কল্য ট্রেভার্স বাজারে বাহির হইবে, এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। বিশেষতঃ ডচ্ পল্লীতে সে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার পোষাক দেখিলেই তাহাকে চিনিতে পারিবেন ; অঙ্গে লাল রঙ্গের কোট, মাথায় পরচুলা, পায়ে বগলস্‌ওয়ালা জুতা, তাহার চক্ষু দুটি মিট্‌মিটে, গলার আওয়াজ মিহি।—কোন কৌশলে তাহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া গল্প আরম্ভ করিবেন এবং ক্রমে আমষ্টার্ডামের কথা পাড়িবেন। তাহার পর তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইবেন—তাহার উপর কোন কোন কাযের ভার দেওয়ার জন্য আপনার আগ্রহ আছে। অবশেষে আপনার বাড়ীতে আসিয়া 'ডিনারে' যোগ-দানের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিবেন।

"সে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিবে ; আপনার বাড়ীতে আসিলে তাহাকে কাযের কথা বলিবেন, ক্রামারের এই পত্র-খানিও তাহাকে দেখাইবেন এবং অসঙ্কোচে বলিবেন—ক্রামা-রের যে টাকাগুলি সে প্রতারণা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা অবিলম্বে আপনাকে প্রত্যর্পণ না করিলে আপনি তাহার প্রবঞ্চনার কথা অন্যান্য বণিকের নিকট প্রকাশ করিবেন।

"লোকটা টাকার মানুষ, বিশেষতঃ তাহার পকেটে সর্ব্ব-দাই বিস্তর টাকার নোট থাকে। আপনার কথা শুনিয়া সে ভয় পাইবে ; ক্রামারের যে টাকা সে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা সমস্তই আপনি আদায় করিতে পারিবেন, সমুদয় টাকা না হউক, অধিকাংশই যে আদায় হইবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ইউয়ার্ট কূটবুদ্ধি ও সুচতুর বণিক ; চার্লস্ প্রাইসের উপদেশ পালন করিলে তাহার স্বার্থ-হানির আশঙ্কা নাই, ইহা সে বুঝিতে পারিল। প্রাইসের কোন কথা অসঙ্গত মনে হইল না। প্রাইস্ বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ, সে বিশ্বাসের পাত্র, তাহার উপদেশে চলিয়া যদি ক্রামারের টাকাগুলি আদায় হয়, তাহা হইলে ঐভাবে তাহা আদায় করাই সে সঙ্গত মনে করিল।

মিঃ ইউয়ার্ট পরদিন ডচ্‌দিগের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ট্রেভার্সকে দেখিতে পাইল। ডিটেকটিভ প্রাইস তাহার পরিচ্ছদ ও চেহারার বিশেষত্ব পূর্ব্বেই ইউয়ার্টকে জানাইয়া রাখিয়াছিল ; সুতরাং ট্রেভার্সকে দেখিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না। মিঃ ইউয়ার্ট কোন ছলে তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। আগন্তুক ইউয়ার্টের নিকট পরিচয় গোপন করিল না, সরলভাবে স্বীকার করিল, তাহার নাম ট্রেভার্স।

প্রাইস্‌ই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ট্রেভার্সের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু

কূটবুদ্ধি, চতুর ও সতর্ক বণিক ইউয়ার্ট তাহা বুঝিতে পারিল না। প্রাইসের ছদ্মবেশ এরূপ নিখুঁত হইয়াছিল যে, সে গোয়েন্দার ছদ্মবেশে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য ইউয়ার্টের মনে স্থান পাইল না। এমন কি, কণ্ঠস্বরেও সাদৃশ্য ছিল না! ইউয়ার্ট ট্রেভার্সের সহিত দীর্ঘকাল আলাপ করিয়া অবশেষে তাহাকে তাহার বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিল। 'ট্রেভার্স' অসঙ্কোচে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

ইউয়ার্ট বেশ ঘটা করিয়া ডিনারের আয়োজন করিয়াছিল। ছদ্মবেশী প্রাইস্ পরিতোষ সহকারে আহার করিল। আহারের সময় নানাপ্রকার গল্প চলিল, ইউয়ার্ট তাহার প্রত্যেক উপদেশ যথাযথভাবে পালন করিতেছে দেখিয়া প্রাইস অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল, তাহার মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল।

আহার শেষ হইলে মিঃ ইউয়ার্ট হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া ট্রেভার্সের প্রতারণার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল এবং প্রাইসের নিকট ক্রামারের যে জাল পত্র পাইয়াছিল, তাহা খুলিয়া ট্রেভার্সের সম্মুখে ধরিল।

সেই পত্র পাঠ করিয়া 'মিঃ ট্রেভার্সের' মুখ চূণ হইল, তাহার কম্পিত হস্ত হইতে চুরুটটা খসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ইউয়ার্ট বুঝিতে পারিল, ট্রেভার্স তাহার অপকর্ম্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে। চার্লস্ প্রাইসের অভিনয় এরূপ নিখুঁত হইল যে, কোন প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনয়-কৌশলে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না।

'মিঃ ট্রেভার্স' প্রতারণার সাহায্যে মিঃ ক্রামারের নিকট হইতে এক সহস্র পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছে, ইহা সে মিঃ ইউয়ার্টের নিকট তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাতরভাবে বলিল, "মহাশয়, আপনি যদি আমার এই প্রতারণার কথা বণিকসমাজের গোচর করেন, তাহা হইলে আমি লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না; আমার সর্ব্বনাশ হইবে। যদি আমার কাছে আমার নিজস্ব হাজার পাউণ্ড থাকিত, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তে তাহা আপনার কাছে ফেরত দিতাম; কিন্তু আমার নিজের অতগুলি টাকা নাই। আপনি, যদি আমার এই প্রতারণার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পাঁচশত পাউণ্ড দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, এ কথা ভবিষ্যতে কোন দিন আপনার মুখ হইতে বাহির হইবে না।"

মিঃ ইউয়ার্ট অনুতপ্ত ট্রেভার্সের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, প্রতিজ্ঞা করিল, ট্রেভার্সের প্রতারণার কথা কোন কারণে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ট্রেভার্স প্রশান্ত চিত্তে বলিল, "আপনার প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, কিন্তু ঐ পত্রখানি আপনার কাছে থাকিতে আমার মন স্থির হইবে না। উহা যে অন্য কাহারও কাছে পড়িবে না, ইহার নিশ্চয়তা কি? দেখুন মিঃ ইউয়ার্ট, আমার এক জন বন্ধুর গচ্ছিত পাঁচশত পাউণ্ডও আমার সঙ্গে আছে। আপনি ঐ পত্রখানি আমাকে দিবেন এবং আমার প্রতারণার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, এই সর্ত্তে আপনাকে পাঁচ শত পাউণ্ড দিতেছি, কিন্তু আমার কাছে হাজার পাউণ্ডের এক কেতা নোট আছে, তাহা হইতে আপনি পাঁচশত পাউণ্ড লইয়া অবশিষ্ট পাঁচশত পাউণ্ড আমাকে ফেরত দিবেন কি? উহা আমার কোন বন্ধুর টাকা; ঐ টাকা আজই তাঁহাকে দিতে হইবে।"

ইউয়ার্ট 'ট্রেভার্সে'র প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ দেখিল না। প্রাইস্ তাহাকে বলিয়াছিল, হাজার পাউণ্ড আদায় না হইলেও যত টাকা আদায় হয়, তাহাই লইতে হইবে। এত সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে, ইহা ইউয়ার্ট আশা করিতে পারে নাই। সে বলিল, "হাজার পাউণ্ডের নোট লইয়া পাঁচশত পাউণ্ড ফেরত দিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমার ঘরে ত পাঁচশত পাউণ্ড নাই। আমি পাঁচশত পাউণ্ডের একখানি চেক দিতেছি, আমার ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া লইও।"

ইউয়ার্ট ট্রেভার্সের নিকট হইতে হাজার পাউণ্ডের নোট লইয়া তাহাকে জাল চিঠিখানি ও পাঁচশত পাউণ্ডের একখানি চেক প্রদান করিল। ট্রেভার্স তাহা পকেটে ফেলিয়া ইউয়ার্টের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, এবং দুই ঘণ্টা পরে নূতন ছদ্মবেশে ব্যাঙ্কে গিয়া চেকখানি ভাঙ্গাইয়া লইল।

পরদিন প্রভাতে ইউয়ার্ট ট্রেভার্স-প্রদত্ত হাজার পাউণ্ডের নোট ব্যাঙ্কে জমা করিতে পাঠাইলে, ঘণ্টা খানেক পরে তাহা ফেরত আসিল; কারণ, নোটখানি জাল! ইউয়ার্ট তাহা জাল বলিয়া বুঝিতে না পারিলেও ব্যাঙ্কে জাল ধরা পড়িয়াছিল।

ইউয়ার্ট ক্রোধে শোকে অধীর হইয়া তাহার ব্যাঙ্কার

"হার্লি, বর্সাল এণ্ড কোং"র ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইল, এবং ট্রেভার্স কে যে চেক দিয়াছিল, তাহার টাকা বন্ধ রাখিতে আদেশ করিল। কিন্তু "চৌরে গতে সতি কিমু সাবধানম্?" 'ট্রেভার্স' পূর্ব্বদিনই, চেক্ পাইবার অব্যবহিত পরেই, তাহা ভাঙ্গাইয়া পাঁচশত পাউণ্ড লইয়া গিয়াছিল! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলিল, "কাল ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদধারিণী একটি বৃদ্ধা ঐ চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা লইয়া গিয়াছে!"—উহাও চার্লস প্রাইসের আর একটি ছদ্মবেশ!

চার্লস্ প্রাইস এই ভাবে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। কত নূতন নূতন কৌশলে সে বুদ্ধিমান্ ও সতর্ক বণিক্‌গণকে নিত্য প্রতারিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইল। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না, তাহাদের চক্ষুর উপর সে অসঙ্কোচে প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিত, নোট জাল করিয়াও ধরা পড়িত না! কিন্তু তাহার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছিল; তাহার এক জন বন্ধুই তাহাকে পুলিসে ধরাইয়া দিল। নোট জালের অভিযোগে সে অভিযুক্ত হইল। সে ধরা পড়িবার পূর্ব্বে নোট জাল করিবার যন্ত্রাদি গোপন করিতে না পারায় তাহার বাড়ী খানা-তল্লাসীর সময় সেগুলি পুলিসের হস্তগত হইল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরে সে জাল নোট ভাঙ্গাইয়া যে বিপুল অর্থ হস্তগত করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ লক্ষাধিক পাউণ্ড, অর্থাৎ সেই সময়ের হিসাবে পনের লক্ষ টাকারও অধিক!

বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে বধ্যমঞ্চে উঠিতে হয় নাই, টটুহীল ফীল্ডসের কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল; সেই কারাগারেই সে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

চার্লস প্রাইস্ কিরূপ নির্লজ্জ ও নীচাশয় ছিল, তাহার একটি উদাহরণ তাহার আখ্যায়িকা-লেখক মিঃ গাইন ইর্ভাসের লেখনী-মুখে পরিব্যক্ত হইয়াছে। চার্লস প্রাইস্ প্রতারণার সাহায্যে এক জন প্রসিদ্ধ বণিকের পাঁচ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছিল। আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে সে সেই বণিক্‌কে একখানি পত্র লিখিয়াছিল; সেই পত্রে সে লিখিয়াছিল, "আপনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; আপনার পাঁচ হাজার পাউণ্ড ঠকাইয়া লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি হয় নাই। আপনি বহু অর্থ অনায়াসে জলে ফেলিতে পারেন, এই জন্য আমি এই অন্তিমকালে আমার স্ত্রী ও আমার আটটি পুত্র-কন্যার প্রতিপালন-ভার আপনার হস্তেই অর্পণ করিলাম। এই ভার-বহনে আপনি কষ্ট অনুভব করিবেন না।"

অসৎ উপায়ে যে লক্ষাধিক পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানও রাখিয়া যাইতে পারিল না!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ধ্যান

প্রতি প্রভাতের আলোকের সাথে
অনুরাগ প্রেম লয়ে
তোমার অরূপ মাধুরীর ধ্যানে
ডুবে যাই স্থির হয়ে!

তুমি সীমাহীন বিশাল সাগর,
আমি যেন ঢেউ তাহারি ভিতর—
তোমারি মাঝারে যুগ যুগান্তর
মহাবেগে যাই বয়ে।

সুনীল অসীম উদার আকাশে
পরমাণু-কণা বায়ুবেগে ভাসে
কত কাল হতে বেড়াই উল্লাসে
তোমা মাঝে স্থান পেয়ে।

কোথা ছাড়াছাড়ি তোমাতে আমাতে—
আছি দোঁহে বাঁধা কত কাল হ'তে;
তোমারি রাগিণী আমার বীণাতে
ফেলেছে নিখিল ছেয়ে!

তুমি যেন স্রোতে চপলা তটিনী,
নাহি কোন কূল শুধু কলধ্বনি—
তারি মাঝে যেন আমার তরণী
চলেছি সুখেতে বেয়ে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুর সমর-বিদ্যা

নিরপেক্ষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে, পুরাকালে হিন্দুগণ সর্ব্ববিষয়েই সমুন্নত ছিলেন। যত প্রকার জ্ঞান মানবের আয়ত্ত হওয়া সম্ভব, হিন্দুগণ তৎসমুদয়ের শীর্ষস্থানে পৌছেন। পরে, তাঁহাদের অর্জ্জিত, অনুশীলিত সেই জ্ঞান-রাশির কিয়দংশমাত্র ভগ্নাংশের আকারে শিষ্য প্রশিষ্য-পরম্পরা-ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, এই লাঞ্ছিত,উপেক্ষিত হিন্দুজাতিই এক দিন জগতের জ্ঞানগুরু ছিলেন এবং এখনও অনেক নিরপেক্ষ শ্বেতাঙ্গ সেই সরল সত্যটুকু তাঁহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে লজ্জাবোধ করেন না। এই প্রবন্ধেই আমরা তাহার প্রমাণ সন্নিবেশিত করিব।

অধুনা, পৃথিবীতে যত প্রকার বিদ্যার আলোচনা অনুষ্ঠিত হইতেছে, সমর-বিদ্যা তন্মধ্যে অন্যতম। বিজিত জাতি বলিয়া হিন্দুগণ কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই বিদ্যার অনুশীলনে হৃত-অধিকার হইলেও, বস্তুতঃ তাঁহারাই এই বিদ্যার জনক। সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা ও শিব সমরবিদ্যার উপদেশ দেন। সে অনেক দিনের কথা। তাঁহাদের উপদেশাবলী কালক্রমে বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইলে, জগতের কল্যাণকামী ঋষিগণ ক্ষত্রিয়সন্তানকে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ করিবার মানসে ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ সমর-বিদ্যার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বহু ঋষিই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশই এখন লুপ্তপ্রায়। কেবল শুক্রনীতি-কামন্দকনীতি-বর্ণিত ধনুর্ব্বেদ, অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, লঘুবীরচিন্তামণি, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, যুদ্ধজয়ার্ণব, যুক্তিকল্পতরু, নীতিময়ুখ প্রভৃতি গ্রন্থে ধনুর্ব্বেদের কথা জানিতে পারা যায়। মধুসূদন সরস্বতী "প্রস্থানভেদ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যজুর্ব্বেদস্তোপবেদো ধনুর্ব্বেদঃ" অর্থাৎ ধনুর্ব্বেদ যজুর্ব্বেদেরই উপবেদ। যজুর্ব্বেদসংশ্লিষ্ট যে ধনুর্ব্বেদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রণীত। বৈশম্পায়ন বলেন, যত প্রকার অস্ত্র শস্ত্র এ জগতে আবিষ্কৃত বা উদ্‌ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অসিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অসির পর, বেণরাজার পুত্র পৃথুর সময়ে ধনু এবং পরে অন্যান্য অস্ত্রাদি উদ্‌ভাবিত হয়।

পাশ্চাত্যরা এখন যে কামান, বন্দুক, বিস্ফোরক দ্রব্য, গ্যাস, বিষ, তৈলাদি দাহ্য পদার্থ, যুদ্ধের সময় ব্যবহার করিতেছেন, সে সমুদয়ের একটিও অভিনব উদ্ভাবন নহে। হিন্দুগণের মধ্যে পুরাকালে উহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বন্দুক-কামানকে হিন্দুগণ আগ্নেয় অস্ত্র বলিতেন। মহাভারতের বহুস্থানে এই আগ্নেয় অস্ত্রের উল্লেখ আছে (কর্ণপর্ব্ব ৮৯—১৭।১৮ ; দ্রোণপর্ব্ব ৩১—৫৪ ॥ ১৬—৪৮ ; বনপর্ব্ব ২৪৪—৭ ; বিরাটপর্ব্ব ৫৮—৫২ ; উদ্যোগপর্ব্ব ১৮২—১২, দ্রষ্টব্য)। রামায়ণেও আগ্নেয় অস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রকে যে "শিখর" অস্ত্র শিক্ষা দেন, "কাবি" ও "মার্সমানএর" মতে উহা আগ্নেয়-অস্ত্র (Hindu Superiority, Page 303 দ্রষ্টব্য)। পরশুরাম সগর রাজাকে যে অস্ত্র শিক্ষা দেন, তাহাও আগ্নেয়াস্ত্র (বায়ু পুরাণ ৮৮—১৩৪ দ্রষ্টব্য)।

হিন্দুদিগের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বন্দুক ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ১।৫।৬।৭ ঋকের সায়নাচার্য্যের টীকায় বন্দুকের প্রসঙ্গ দেখা যায়। বৈশম্পায়নের নীতি-প্রকাশিকায় "নলিকা" অস্ত্রের কথা আছে। প্রাচীন যুগে বন্দুককে "নলিকা" অস্ত্র বলিত। কুরুক্ষেত্ররণে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল (উদ্যোগপর্ব্ব ১৭১—৩৮ ; ভীষ্মপর্ব্ব ৯৫—৩১ ॥ ১০৬—১৩ ; দ্রোণপর্ব্ব ১৮৬—৪৪ ; কর্ণপর্ব্ব ৪৯—৩৪ । ৮৯—২৪ ; সৌপ্তিকপর্ব্ব ১০—১৫ ; স্ত্রীপর্ব্ব ১৯—৬ ॥ ২৩—১৮ ।) দ্রোণাচার্য্য তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে যে "ব্রহ্মশির" অস্ত্র শিক্ষা দেন, তাহা বন্দুক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ব্রহ্মশিরের উল্লেখ মহাভারতের অনেক স্থলেই আছে (আদিপর্ব্ব ১৩৩—১৮।১৯ ২০ ॥ ১৩৯—১০।১১ ; সৌপ্তিক পর্ব্ব ১৩—১৯।২২ ॥ ১৫—১৬ ॥ ১৪—৭।১০) মহাভারতে "অয়ঃকণপ" নামক যে অস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাও বন্দুক-বিশেষ (আদিপর্ব্ব ২২৭—২৫ দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য অপার্ট বলেন—"বেদে বন্দুকের উল্লেখ আছে।"

হিন্দুরা কামানের ব্যবহারও জানিতেন। তাঁহারা কামানকে "শতঘ্নী" "সহস্রঘ্নী" নামে অভিহিত করিতেন। শতঘ্নী নাম রামায়ণে দৃষ্ট হয় (লঙ্কাকাণ্ড ৩—১৩ দ্রষ্টব্য)। শতঘ্নীই যে কামান, তাহা এখনকার ইংরাজরাও স্বীকার করেন (Hindu Superiority, Page 305 দ্রষ্টব্য)। মহাভারতে সহস্রঘ্নী নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে (দ্রোণপর্ব্ব ১৯৮—১৯ ॥ ১৭৭—৩৬,৩৭,৪৬)। ইহাকে "মহাঅস্ত্র"ও বলা হইত। মৎস্যপুরাণেও কামানের উল্লেখ আছে। সহস্রঘ্নী যে কামান, হলহেড তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন (Hindu Superiority, Page 306 দ্রষ্টব্য)। রামায়ণের সময়ে শত শত কামানের ব্যবহার ছিল। রাক্ষসরা লঙ্কার দুর্গদ্বারে শত শত কামান সজ্জিত রাখিত। (আদিকাণ্ড ৫—১১ ; লঙ্কাকাণ্ড ৩—১৩ দ্রষ্টব্য)। মহাভারতীয় যুগেও পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী শতঘ্নী ও লৌহময় মহাচক্র দ্বারা

শোভিত করিয়াছিলেন। দ্বারকায়ও বিস্তর শতঘ্নী ছিল বলিয়া জানা যায়। সেখানকার নগর-দ্বারেও শতঘ্নী থাকিত (আদিপর্ব্ব ২০৭—৩৫; বনপর্ব্ব ১৫—৭; শান্তিপর্ব্ব ৬৯—৪৫) কুরুক্ষেত্রের রণে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন (উদ্যোগপর্ব্ব ১৯৫—১৪ ॥ ৪৮—৭৯; ভীষ্মপর্ব্ব ৯৬—৫৮ ॥ ১১৯—২; দ্রোণপর্ব্ব ১০০—২৯ ॥ ১৩৬ ২০ ॥ ১৫৪—১৪১ ॥ ১৭৩—৪০; কর্ণপর্ব্ব ১১—৮ ॥ ২৭—৩০ ॥ ৫৮—১৫ দ্রষ্টব্য)। তখন কামানের আর একটি নাম ছিল—তুলাগুড় অস্ত্র। এ নামও মহাভারতে দেখা যায় (বনপর্ব্ব ৪২—৫)। নাগ-অস্ত্র নামেও কামান অভিহিত হইত (বনপর্ব্ব ৪২—৬ দ্রষ্টব্য)।

কুরুক্ষেত্র-রণে বিস্ফোরক যন্ত্রও ব্যবহৃত হয়। অর্জ্জুন ইহা ব্যবহার করেন (দ্রোণপর্ব্ব ১৪—৫।৬ দ্রষ্টব্য)। নারায়ণ-অস্ত্র নামে অশ্বত্থামাও ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন (দ্রোণপর্ব্ব ১৯৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

হিন্দুগণ যে কামান, বন্দুক ও বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক লেখক থেমিস্‌টিয়াস্ বলিয়াছেন,"ব্রাহ্মণরা বজ্র ও বিদ্যুৎ দ্বারা দূর হইতে যুদ্ধ করে।" আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষে আমার সৈন্যের উপর বহু প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বর্ষিত হইয়াছিল।" এতদ্ভিন্ন ফিলোস্‌ট্রেটাস্, হলহেড, ইলিয়ট্, ম্যাডাম ব্লাভাস্কী প্রভৃতি আরও অনেকে ঐ মত সমর্থন করিয়াছেন। ভারতে বারুদের নাম "অগ্নিচূর্ণ" ও "আগ্নেয় ঔষধ"। প্রিন্সেফ বলেন—ভারতেই বারুদ প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। হলহেড বলেন, বারুদ অতি প্রাচীন কালেও ভারত ও চীনে ব্যবহৃত হইত। (Hindu Superiority, Page 305 দ্রষ্টব্য)।

জার্ম্মাণ যুদ্ধে যে গ্যাস ব্যবহৃত হয়, তাহাও ভারতে অবিদিত নহে। মহাভারতে যে বায়ব্য-অস্ত্রের কথা আছে, তাহা গ্যাসেরই নামান্তরমাত্র (বিরাটপর্ব্ব ৫৮ ৫২; উদ্যোগপর্ব্ব ১৮২ ১১; ভীষ্মপর্ব্ব ১০২ ২০ দ্রষ্টব্য)। বিরাট-ভবনে অর্জ্জুন যে সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীষ্ম-দ্রোণকে অচেতন করিয়া ফেলেন, তাহা গ্যাস প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে (বিরাটপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়ে এই সম্মোহন বাণের প্রসঙ্গ আছে।)। হিন্দুগণ যুদ্ধে মদ্য ও বিষ ব্যবহার করিতেন। মহাভারতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—"বিষ ও অগ্নি দ্বারা শত্রুর রাজ্য নিপীড়িত করিবে।" (শান্তিপর্ব্ব ৬৯-২২ দ্রষ্টব্য)। দাহ্য পদার্থের ব্যবহারের বিষয় মহাভারতের অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয় (সভাপর্ব্ব ৫-১২২; বনপর্ব্ব ১৫-৬; উদ্যোগপর্ব্ব ১৫৪—৫।৭।৯ দ্রষ্টব্য)। রামায়ণেও দাহ্য পদার্থ ব্যবহারের প্রসঙ্গ আছে (লঙ্কাকাণ্ড ৩—১১ দ্রষ্টব্য); মনুসংহিতা গ্রন্থেও উহার উল্লেখ আছে (৭—১৯৫ ১৯৬ দ্রষ্টব্য)

যদি জার্ম্মাণ যুদ্ধে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহৃত না হইত, তবে এখনকার যুগে হয় ত অনেকেই উহাকে কবির অসার কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের রথ দগ্ধ করিয়া দেন। ইহাই অগ্নি-ব্যবহারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ (আদিপর্ব্ব ১৭০—৩০।৩১)। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের পর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ কৌরবগণের শিবিরে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদের রথ কৌরবরা দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (শল্যপর্ব্ব ৬২ অধ্যায়) ইহাতেও অগ্নি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। তেসিয়স্, ইলিয়স্ ও ফিলস্‌ট্রেটাস্ বলিয়াছেন—হিন্দুরা একরূপ তৈল যুদ্ধকালে ব্যবহার করিতেন, যাহা প্রজ্বলিত হইলে সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিত, আর সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করা যাইত না (Hindu Superiority, Page 307)।

উপরি-উক্ত প্রমাণে এবং য়ুরোপীয়গণের মন্তব্যে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ভারতের হিন্দুগণ অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে চিরাভ্যস্ত ছিলেন। ইংরাজ-রাজ যদি এই বীর জাতিকে রণশিক্ষায় শিক্ষিত করেন, তবে জগতের লোক আবার ইহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে।

হ্যামিল্টন, বোল্টন, প্রভৃতি বহু গণ্য-মান্য শ্বেতাঙ্গ এই বীর জাতির বীরত্বগাথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আধুনিক কালের শ্বেতাঙ্গ সমাজ—যদি ভারতীয় হিন্দুকে সৈনিক বিভাগের অনুপযোগী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন বা সৈনিক বিভাগ হইতে হিন্দুকে দূরবর্ত্তী রাখিবার অভিপ্রায়ে কূট তর্কজাল বিস্তারের প্রয়াস পান, তবে তাঁহাদের তাদৃশ আচরণকে শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া বুঝিয়া লইলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। তদ্দ্বারা তাঁহারা স্বজাতীয় মনীষীদিগেরই মন্তব্য-মাহাত্ম্য ও ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকেন মাত্র। আধুনিক শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিরুদ্ধ মন্তব্যে হিন্দু-প্রকৃতির বীরত্ব-ভাণ্ডারের একটি কড়া-ক্রান্তিরও অপচয় হইবে না। আমি যদি তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলি—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আদৌ নাই, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা; তবে তাহাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কি কিছু অপচয় ঘটে? কখনই না। যেমন শক্তি, তেমনই থাকে। তদ্রূপ, সহস্র কণ্ঠ হইতেও যদি চীৎকার উঠে যে, হিন্দু জাতি সমরবিদ্যার অনুপযোগী, তবে সে চীৎকারও অরণ্যে রোদন। ইতিহাসের সাক্ষ্য কে মুছিয়া ফেলিবে? ইতিহাস অশনি-নির্ঘোষে পাল রাজাদের মন্ত্রী ভট্ট গুরবের কথা, জাতবর্ম্মার কথা, একাদশ শতাব্দীর রাজা রামনারায়ণের কথা, দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গেশ্বর বিজয়ের কথা, চতুর্দ্দশ শতকের শিখিবাহন সান্যাল ও জনার্দ্দন সান্যালের কথা, রাজা গণেশ ও সহদেবের কথা, ষোড়শ শতকের মুকুন্দরাম ভাদুড়ীর কথা, সঞ্জয় রায়ের কথা, প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর কথা, খিজিরপুরের কালিদাস রায়ের কথা, সুন্দরবনের বীরকেশরী মুকুন্দ রামের কথা, সপ্তদশ শতাব্দীর শত্রুজিতের কথা, প্রচণ্ড ভাদুড়ীর কথা, উদয়নারায়ণ মজুমদারের বীরগাথা, অষ্টাদশ শতকের সীতারাম রায়ের লোমহর্ষণ বীরত্বকাহিনী, কীর্ত্তিচাঁদ ও রামনারায়ণের সেনাপতিত্বের অশ্রুতপূর্ব্ব রণপাণ্ডিত্য, মাণিকচাঁদ, মোহনলাল ও মীরমদনের রোমাঞ্চকর বীরত্বকাহিনী, নসীপুর রাজবংশের বীরপুঙ্গব বজ্রদাসের অপূর্ব্ব বীরত্ব আখ্যান, উনবিংশ শতকের কালীচরণ ঘোষের বীরবিক্রমে সেনাপতিত্ব গ্রহণের আশ্চর্য্য আখ্যান এবং সুদূর ব্রেজিল রাজ্যে ভারতীয় হিন্দু কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের অনন্যসাধারণ সমর-নৈপুণ্যের চিরকৌতূহলোদ্দীপক বীরত্বকাহিনী বজ্র-নিনাদে ঘোষণা করিতেছে। এ সত্যের কি কেহ কখনও অপলাপ করিতে পারে?

ভারতীয় হিন্দু বীরত্বের অফুরন্ত নির্ঝর। শ্যামাকান্ত এবং যতীন্দ্রনাথ গুহ ওরফে গোবর বিখ্যাত মল্লবীর। প্রতীচ্য কোন মল্লই দৈহিক বলে ইঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

প্রতীচ্য জাতিসমূহ যুদ্ধ-বিগ্রহে যে প্রণালীতে সেনা-সমাবেশ করেন, ভারতীয় হিন্দুদিগকে সুযোগ-সুবিধা দিলে তাঁহারা অতি অল্পদিনেই যে তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। মাণিকচাঁদ, মীরমদন, কালীচরণ ঘোষ, মোহনলাল প্রভৃতি হিন্দুগণ আধুনিক যুগের মুসলমানের ও শ্বেতাঙ্গের সেনা-সমাবেশের প্রণালী অতি উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। নচেৎ তাঁহারা পলাশী প্রভৃতি স্থানের দারুণ সংগ্রামে তিষ্ঠিতে বা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন না।

রণক্ষেত্রে কিরূপ ভাবে সেনা-সমাবেশ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে হয়, ভারতীয় হিন্দুগণ তাহা অতি উত্তমরূপেই জানিতেন। হিন্দু জাতির অক্ষয় ইতিহাস মহাভারতে এবং অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার পুরাণাদি গ্রন্থে সেনা-সমাবেশের প্রণালী অবগত হওয়া যায়। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, অভিমন্যুকে নিহত করিবার জন্য সেনাপতি দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন; জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বীয় সেনাগণকে শকটব্যূহে সজ্জিত করেন। এইরূপ আরও অনেক ব্যূহ অর্থাৎ সেনা সমাবেশ প্রণালীর উল্লেখ মহাভারতে আছে। মনুসংহিতায় এইরূপ কথা আছে—

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াৎ তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্।

(মনু ৭।১৮৭-৮ দ্রষ্টব্য)

রাজা যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন চারিদিক্ হইতে যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি "দণ্ডব্যূহ" রচনা করিয়া গমন করিবেন। পশ্চাদ্দিকে যদি ভয়ের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে "শকটব্যূহ"; উভয় পার্শ্বদেশ হইতে ভয় থাকিলে "বরাহব্যূহ", বা "মকরব্যূহ"; অগ্রে বা পশ্চাতে ভয়ের কারণ থাকিলে "গরুড়ব্যূহ"; সম্মুখে ভয় থাকিলে "সূচীব্যূহ" রচনা করিবেন। নিজে "পদ্মব্যূহে"র মধ্যে থাকিবেন। মনুসংহিতায় আমরা দণ্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচী, গরুড়, পদ্ম, বজ্র— এই কয় প্রকার ব্যূহের উল্লেখ দেখিতে পাই। কামন্দকীয় নীতি বলেন—ধন্ম, সূচী, দণ্ড, শকট ও মকরধ্বজ এই কয়টি মহাব্যূহ। বীরবর অর্জ্জুন দ্রোণের এই "শকট" নামক মহাব্যূহ ভেদ করিয়া জয়দ্রথকে হত্যা করেন। "নীতিময়ূখ" গ্রন্থে মকর, শ্যেন, সূচী, শকট, বজ্র, সর্ব্বতোভদ্র এই কয় প্রকার ব্যূহের উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণ গরুড়, মকর, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, 'মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী এই ব্যূহগুলিকেই প্রধান বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যূহরচনা সম্বন্ধে "নীতিসারগ্রন্থ" এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপুরুষাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং কোষশ্চ স্বামী ফল্গু চ যদ্বলম্।
পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়ো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়োর্নাগা নাগানাঞ্চাটবী বলম্।

ব্যূহের সম্মুখে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি শূরগণ-পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন; কেন না, তাঁহাকে রক্ষা করিয়া অন্যান্য সেনানীগণের যুদ্ধ করা বিধেয়। যে কোন ব্যূহই রচিত হউক না কেন, তাহার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোক, কোষ, ধনাগার, রাজা, ফল্গু-শৈল্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য এবং তাহার রক্ষকগণ অবস্থান করিবেন। ব্যূহের দুই পার্শ্বে অশ্বারোহী, অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী এবং রথারোহীর পার্শ্বে পদাতি সৈন্য সাজাইতে হইবে।

ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন, দিল্লীর ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সমরক্ষেত্রে ধনাগার এবং বেগমগণকে লইয়া যাইতেন। আপাত-দৃষ্টিতে ইহা নির্ব্বোধের কার্য্য বলিয়া মনে হইলেও, হিন্দুশাস্ত্রে যে এবম্বিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উপরি-উদ্ধৃত বচন হইতেই অবগত হওয়া যায়। হিন্দু বীরগণ বরাবরই পাঠান ও মোগলদিগের মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ব্যূহ-বিদ্যাবিশারদ হিন্দু সেনাপতিই মোগলের পক্ষে এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিতেন, যাহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করায় ঔরঙ্গজেব যুদ্ধকালেও বেগমগণের মর্য্যাদা ও ধন-রত্ন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। অন্ততঃ এরূপ অনুমান করিলেও অন্যায় হয় না; কেন না, জগতের যাবতীয় জ্ঞানই হিন্দু জাতির অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বিতরিত হইয়াছে। সেনা সমাবেশ ব্যাপার হিন্দু জাতির গ্রন্থে যেমন সম্যগ্‌ভাবে, বিশদরূপে আলোচিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য কোন জাতির গ্রন্থে তেমনটি হইয়াছে কি না সন্দেহ। যদিই বা হইয়া থাকে, তাহা যে হিন্দুদিগের কথারই প্রতিবিম্ব, তাহা নিরপেক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিককে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

—

শ্রীমদ্ভাগবতের আর্যত্ব ও মহাপুরাণত্বের কিঞ্চিদাভাস ও সূতের পরিচয়

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ব্যাখ্যানের আদর্শ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীপ্রসূত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত অন্যতম সংহিতা। ভাগবতের আর্যত্ব সম্পাদন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। বৈদিকমার্গানুসারীদের, বিশেষতঃ প্রেমিক বৈষ্ণবদিগের ভক্তিপথের কামধেনু বলিয়া যে গ্রন্থকে বর্ণাশ্রমীরা বিগ্রহের ন্যায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন, ধার্ম্মিক ভক্তজনরা যে ভাগবতের পাঠ ও কথা দিয়া জীবন চরিতার্থ করিতেছেন, যাহার পঠন-পাঠনা সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে, যাহার টীকাটিপ্পনী সহস্রাধিক বৎসরের রহিয়াছে এবং যাহার দর্শনশাস্ত্রের মত ভাষ্য হইয়া আছে, যাহার (জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ) ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটি

ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে স্থান পাইয়া বেদান্তদর্শনের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই পার্থিব জগতের অমর অনুপম রত্নভূত ভাগবত যদি আর্ষ না হইবে, তবে আর আর্ষ কে?

কেহ কেহ এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া ভাগবতকে বোপদেবের রচিত কাব্যমাত্র বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের এই প্রকার ধারণার মূলে দুইটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। একটি দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ভট্টের ভাগবত শব্দের ব্যুৎপত্তিতে (ভগবত্যা ইদং) এই তদ্ধিতার্থ রূপ অসার ইঙ্গিত। তাহাতে নীলকণ্ঠ ভট্ট দেবীভাগবতকেই ব্যাসরচিত ভাগবতপদ-বাচ্য মহাপুরাণ বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় কারণ, দ্বাদশ শত শকাব্দে দাক্ষিণাত্যে দেবগিরিরাজ মহাদেবের হিমাদ্রি নামে মন্ত্রীও পণ্ডিত ছিলেন, যিনি চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামে বিশাল স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া বর্ণাশ্রমীদের প্রভূত উপকারসাধন করত অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সভাপণ্ডিত বোপদেব মিশ্র—যিনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ নানাশাস্ত্র দর্শনের ফলভূত প্রচুর গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া জগতে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈদ্যকশাস্ত্রের গ্রন্থও সুধিসমাজে গণনীয়। সেই বিজ্ঞানরাশি বোপদেব উপজীব্য মন্ত্রিবর হিমাদ্রির অভিপ্রায়মতে ভাগবতের সারাংশ ১৭৬ শ্লোকে সঙ্কলন করত যে হরিলীলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই নাম বোপদেবী ভাগবত। অজ্ঞজনরা এই বোপদেবী ভাগবতী না দেখিয়া কেবল কথামাত্র শুনিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবী ভাগবত বলিয়া অপসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে অনার্ষ বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

হরি-লীলা বা বোপদেবী ভাগবতের পরিচয় এক জন তত্ত্ববিদ্ স্বপণ্ডিতের অনুসন্ধানফলের সাহায্যে জানিয়াছি যে, বোপদেব লিখিতেছেন—

"হিমাদ্রেঃ সচিবস্যার্থে সূচনা ক্রিয়তেঽধুনা।
স্কন্ধাধ্যায়কথানাঞ্চ যৎ প্রমাণং সমাসতঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহিমাদ্রিতুষ্টয়ে॥"

এবং উহা ১৭৬টি শ্লোকে যে নিবদ্ধ, তাহারও প্রমাণ—

"হিমাদ্রেঃ সচিবস্যার্থে সূচনা ক্রিয়তেঽধুনা।
কৃৎস্নস্যাস্য চ গ্রন্থস্য শতং মুনিরসোত্তমম্॥"

বোপদেবের উপজীব্য চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিকার হিমাদ্রি স্বীয় দানখণ্ড গ্রন্থে পুরাণদান প্রস্তাবে মৎস্যপুরাণের এই বচন উঠাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত দানের ফলের কথা বলিয়াছেন।

মৎস্যপুরাণে বলা আছে—

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ধর্ম্মকথা বলা হইয়াছে এবং যাহাতে বৃত্রাসুরের বধপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, সেই আঠারো হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। সুতরাং বোপদেবের উপজীব্য হিমাদ্রি পণ্ডিতও এই শ্রীমদ্ভাগবতকে আর্ষ জানিয়াই তাহার লক্ষণ উঠাইয়াছেন ও নিজের স্মৃতিনিবন্ধে এই ভাগবতকে বহুস্থানে প্রমাণ পরিচয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনরাও ভাগবতের টীকাসম্পাদন ক্ষেত্রে বলিয়াছেন—'শ্রীমদ্ভাগবতং নামাপ্যপি নাশঙ্কনীয়ং' অর্থাৎ ভাগবত অপর কিছু নহে, এ আশঙ্কা করিও না।

বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য যিনি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নানা প্রমাণে সিদ্ধান্তিত আছেন, তিনি স্বরচিত বেদান্ত-ভাষ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উঠাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী বলিয়াই এই সগুণ ব্রহ্মের লীলাত্মক ভাগবতের প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, আমি তাহা জানি না। তবে রামানুজাচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বকালীন, তিনি স্বরচিত শতদূষণী গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উঠাইয়া ভাগবতকে আর্ষ ও প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

এই ভাগবতের কত কাল হইতে যে কত টীকা-টীপ্পনী হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ রামানুজাচার্য্য গীতা-ভাষ্যের অনুক্রমণিকায় ভাগবতোক্ত লীলার পরিচয় দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য মহাশয়ও স্বরচিত গোবিন্দাষ্টকে মৃদ্ভক্ষণলীলার যে কথা-সূত্র ধরিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই।

আমি বাঙ্গালা ১৩০৪ সালে মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে নেপাল কাটমুণ্ডু সহরে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। ঐ সময় ভাতগাঁও ভেস্মলিয়াতে এক পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে একখানি গাছের ছালে হাতের লেখা এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ দেখিতে পাই। তাহার শেষের শ্লোকে জানিতে পারি যে, ঐ পুস্তকখানি ১৫৮ নেপাল সংবতে লেখা। সুতরাং ঐ পুস্তক আজি হইতে ৮৮৮ বর্ষ পূর্ব্বের লিখিত। ইহাতেও ঐ লেখা বোপদেব পণ্ডিতের জন্মাইবার বহু পূর্ব্বে ঘটিতেছে, সেই শ্লোক—

শ্রীজয়প্রাণমল্লঃ তস্য সুতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুসিংহো বিরাজতে।
তস্যার্থমলিখৎ পুণ্যং শ্রীকৃষ্ণচরিতং শুভম্।
হরিবর্ম্মপ্রবীণোঽসৌ দৈবজ্ঞকুলচন্দ্রমাঃ।
বসুবাণাজমানাব্দে যাতে মাঘেঽর্জ্জুনোত্তরে।
সপ্তম্যামসিতেঽর্কেঽহ্নি লিপিঃ পূর্ণং তদাঽগমৎ।

ইতিব্যাসোক্ত-ভাগবতং সম্পূর্ণম্।

কথা কয়টিতেই ব্যাকরণ ভুল কিছু থাকিলেও এখানকার অব্দ শব্দে নেপাল সম্বৎই লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ, নেপালে বসিয়া লেখাতে নেপাল সম্বতের পরিচয় থাকিবে, আর অন্য ধরিলে আরও পূর্ব্বের হইয়া পড়ে, তাহাতে তো ভালই হয়।

বিশেষতঃ যে জয়প্রাণমল্লদেবের পুত্র বিষ্ণুসিংহের জন্য দৈবজ্ঞ হরিবর্ম্মা লিখিতেছেন, ঐ জয়প্রাণ মল্ল নেপাল সম্বতের প্রথম শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করিতেন, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদরা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে নেপাল সম্বৎ ১০৪৫ বৎসর চলিতেছে। তাহার ১৫৮ সম্বতে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় নয়শ বৎসরের সময় ঐ পুথিখানি লেখা হইয়াছে। সুতরাং কোথায় রহিলেন বোপদেব গোঁসাই?

আর দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ বলিলে মহাপুরাণের চতুর্লক্ষাত্মক শ্লোকসমষ্টির ব্যাঘাত তো হয়। বিশেষতঃ দেবী-ভাগবতের দশলক্ষণলক্ষিত মহাপুরাণত্বের সঙ্ঘটন হয় না। কারণ, মহাপুরাণের লক্ষণ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বলা আছে—

"সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥"

অর্থাৎ আদিসৃষ্টি, প্রজাপতিগণকৃত সৃষ্টি, জীবিকা-নিরূপণ, অবতারকৃত সৃষ্টিরক্ষা, মন্বন্তর বর্ণনা, তত্তদ্বংশীয় প্রধান পুরুষাদির চরিত্রব্যাখ্যান, প্রলয়বার্ত্তা, সৃষ্টিরক্ষার উপায় ও জীবের মুক্তির কথা এই দশটি বিষয় যাহাতে থাকিবে, তাহা-কেই মহপুরাণ বলে। পাঁচটিমাত্র থাকিলে উপপুরাণ হয়। এ বিষয়ে মৎস্যপুরাণে ও মনুর বাক্য ও শব্দ-কল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণীয় ১৩২ অধ্যায়ের বাক্যের সঙ্গে প্রায়ই সামঞ্জস্য আছে; তবে ঐ দুই পুরাণের বাক্যে একাদশ সংখ্যা পাওয়া যাইবে ও বিশেষ বিবৃতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ এক একটির অধিক বলা অসঙ্গত হয় না।

অর্থাৎ যেমন সাধারণতঃ দশ সংখ্যার মধ্যবর্ত্তী দেবতা কীর্ত্তনের ভিতর বিষ্ণুকীর্ত্তন পড়িলেও বিষ্ণুকীর্ত্তন পৃথক্ নির্দ্দেশ মহাপুরাণ-লক্ষণের পরিচায়ক মাত্র, লক্ষণের ঘটক নহে। সুতরাং এই শ্রীমদ্ভাগবতই মহাপুরাণ লক্ষণাক্রান্ত দেবীভাগবত নহে। এই পঞ্চ লক্ষ শ্লোকাত্মক পঞ্চম বেদের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে হইলে দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা চাই এবং গোবিন্দের প্রতি প্রীতি রাখিতে পারিলেই ভাগবতের মর্ম্মবিদ্ হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত শব্দব্রহ্ম বেদেরই স্বরূপ, তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধবাদী হইয়া যতই লোক তাঁহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে, ততই তাঁহার উৎকর্ষ বাড়িয়া উঠিবে, যেমন লোক অগ্নিকে যতই অধো-দিকে প্রসারিত করুক না কেন, তাহার শিখা কখনই অধো-গামিনী হয় না। এ কথা প্রাচীন কবি বলিয়াছেন,—

অধঃ কৃতস্যাপি তনূনপাতো নাধঃ শিখা যাতি কদাচদেব।

এক সময় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রবাজপেয়ীর সভাতে এই ভাগবতের আর্ষত্ব লইয়া বিচার হয়। তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের নিরাসকল্পে আর্ষত্বসমাধানের অনুকূলে যে বিচারফল লিখিত হয়, তাহা দুর্জ্জনমুখচপেটিকা প্রভৃতি নামে অভিহিত দুই-খানি পুস্তক হইয়া আছে। তাহারও সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত আর্ষত্বের অনুকূলেই আছে। পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আংশিক ভাব এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতেই বৃত্রাসুরবধ ও গায়ত্রী অধিকারে ধর্ম্ম বিস্তর বলা আছে। অপর কোন পুরাণেই নাই। সুতরাং আপ্তজনরা ইহা দেখিয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ ও ব্যাসরচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে জানিতে হইবে, বেদব্যাস এই ভাগবত কখন্ প্রণয়ন করিয়াছেন? সে বিষয়ে এই ভাগবতে ও পদ্মপুরাণে স্পষ্টই বলা আছে যে,—

"দশ সপ্ত পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
নাপ্তবান্ মনসা তোষং ভারতেনাপি ভামিনি॥
চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্॥"

অর্থাৎ ব্যাস মহাশয় ১৭খানি মহাপুরাণের মূল সংহিতা প্রণয়নের পর মহাভারত প্রস্তুত করেন ও সর্ব্বশেষে এই ভাগ-বতী সংহিতা রচনা করিয়াছেন।

দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও উহার আভাস পাইবে।

"বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতং তথা।
কৃত্বা সম্মোহসম্মোহোঽভবদ্ব্যাসো মনস্যপি।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং কৃতবান্ মুনিঃ॥"

অর্থাৎ বেদশাখা-সমুদয়, পুরাণ সকল, বেদান্ত দর্শন ও শ্রীমন্মহাভারত ক্রমিক প্রস্তুত করিয়াও বেদব্যাসের অন্তরের ভাব-শুদ্ধি না হওয়াতে তিনি এই ভাগবত রচনা করিয়া মনের শান্তি পাইয়াছিলেন।

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলনে জীবের ঐহিক কল্যাণ-লাভ ঘটে। এরূপ ভাষার সৌন্দর্য্য কোথায়ও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; এরূপ বিষ্ণুপ্রেমের প্রস্রবণ আর কিছুতেই নাই। আমি বৃদ্ধপরম্পরাগত প্রবাদ শুনিয়াছি, যাঁহারা ভাগবতী হইতেন, তাঁহাদের সম্মুখে যদি কেহ কখন কোথায়ও ভাগবত গ্রন্থ পড়িত, তখন তাঁহাদের নয়ন-যুগল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত। অন্তিমসময়ে রাজা পরীক্ষিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ ভাগবতের কথাই লোক শুনিয়া আসিতেছে; সেই ভাগবতকে প্রণাম করি।

রোমহর্ষণ সূতের পরিচয়

(ভাগবত প্রবন্ধেরই অন্তর্গত)

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, পুরাণবক্তা সূত শূদ্রজাতীয়। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। কারণ, বরাহপুরাণে পুরাণপাঠ সূতজাতির স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ আছে এবং বিষ্ণুপুরাণে বেণ রাজার হস্ত-মন্থনে পৃথুরাজার উৎপত্তি হইলে ঋষিগণ পৃথুকে স্তব করিবার নিমিত্ত সূতকে আদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং কুশীলবাদির ন্যায় রোমহর্ষণ সূতকে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সূত জাতির হাতেই পুরাণবক্তা হইয়া আসিতেছে। বেদব্যাস প্রথমেই রোমহর্ষণ সূতকে পুরাণ-বক্তা করিয়াছিলেন। ঐ সূতের পুত্র রোমহর্ষণি উগ্রশ্রবাও পৈতৃক অধিকার পাইয়া পুরাণবক্তা ছিলেন। সুতরাং সঙ্করোৎপন্ন শূদ্রজাতীয় সূতরাই পুরাণবক্তা।

ইহা অতি অপসিদ্ধান্ত। কারণ, শাস্ত্রে দুই প্রকার সূতের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মনু যাহাকে অন্ত্যাবসায়ি-দের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে হইল "ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।" অর্থাৎ ক্ষাত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে যাহার জন্ম, সেই প্রতিলোমবিবাহে সঙ্করোৎপন্ন সূত শূদ্রজাতীয়। তাহাদের বেদাধিকার নাই; তাহারা পুরাণবক্তা নহে।

আর এক প্রকার সূতের পরিচয় ভাগবতেই পাওয়া যায়। পৃথুর যজ্ঞে ঐন্দ্র চরুর উপরিভাগে বার্হস্পত্য চরু মিশ্রণ হওয়াতে অর্থাৎ ক্ষাত্রিয় চরুতে ব্রহ্মচরু মিশিয়া যে অযোনিসম্ভব সূতের উদ্ভব হয়, সেই উৎপন্ন ব্যক্তিকে মাতৃ সমান জাতিত্ব পাইল বলিয়া ক্ষত্রিয় জাতীয় সূত বলা হয়। এই সূত

বেদাধিকারসম্পন্ন ক্ষত্রিয়বর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছিল ও থাকে। বিরাট পর্ব্বের কীচক প্রভৃতিরা এই সূত জাতি ; ইহাদের বংশ-সম্ভবা সুদেষ্ণাকে রাজা বিরাট মহিষী করিয়াছিলেন। ইহার পরিচয় প্রথম বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়—

"সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে সূতোঽভূৎ চরুমিশ্রণাৎ॥"

অর্থাৎ সেই মহাযজ্ঞে সৌত্য কর্ম্মার্হ দিবসে চরুমিশ্রণে সূত জন্মিয়াছিলেন।

অগ্নিপুরাণও বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণঃ পৌষ্করে যজ্ঞে সূত্যা হবিষি সম্ভৃতে।
পৃষদাজ্যাৎ সমুৎপন্নঃ সূতঃ পৌরাণিকঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মার পৌষ্কর যজ্ঞে সূত্যা হবিতে পৃষদাজ্যমিশ্রণে যে সূত উঠিয়াছিলেন, তিনিই আদি পৌরাণিক সূত।

সুতরাং আমাদের বক্তা রোমহর্ষণও সেই দ্বিজাতি সূত। নচেৎ ব্রহ্মণ্যদেবাবতার মহাত্মা বাদরায়ণি জৈমিনি শাংশপায়ন প্রভৃতি বেদজ্ঞ ঋষি শিষ্য থাকিতে রোমহর্ষণকে কেন পুরাণসংহিতা দিবেন ? বিশেষতঃ ঐ রোমহর্ষণের ব্রহ্মজ্ঞতা ও গুরু-প্রিয়তা ও ব্যক্তিগত বাগ্মিতাও ছিল, তাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অতি প্রিয় গুণবান্ শিষ্য হইয়াছিলেন।

প্রিয় শিষ্য বা পুত্রকে রহস্য সার বস্তু দিবার প্রমাণ পরাশর-সংহিতার ভাষ্যে আচার্য্য মাধব ছান্দোগ্য উপনিষদের মধুবিদ্যায় দেখাইয়াছেন,—

"ইদং বাব জ্যেষ্ঠপুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণায্যায় বান্তেবাসিনে নান্যস্মৈ কস্মৈচন।"

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্র বা প্রিয় শিষ্যকে রহস্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবে, আর কাহাকে দিবে না। এই জন্য ঋষসমাজকে উপেক্ষা করিয়াও রোমহর্ষণকে নিজ রহস্য বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সূতের রোমহর্ষণ নামের যৌগিকার্থও বরাহ-পুরাণে বলা আছে—

"দ্রষ্টুং তান্ স মহাবুদ্ধিঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ।
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যৎ সুভাষিতৈঃ॥
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোকেঽস্মিন্ লোমহর্ষণঃ॥"

অর্থাৎ সেই পুরুষপ্রধান পুরাণবিদ্ সূত ঋষি-সমাজকে দেখিতে আসিয়া মধুরালাপে শ্রোতৃবর্গের রোমরাজি উৎফুল্ল করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য তিনি লোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ভগবান্ বলরাম ঠাকুর ঐ সূতকে ঋষিসমাজে উচ্চাসনে বসিয়া পুরাণ বলিতে দেখিয়া বিরক্ত হন এবং তাঁহার আগমনে অভ্যর্থনার নিমিত্ত পুরাণবক্তা সূত অভ্যুত্থান করেন নাই। ইহাতে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লাঙ্গল দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি দ্বিজাতি সূত এবং বেদজ্ঞ গুরুপ্রিয়, ব্যক্তিত্ববিচারে ঋষিদের অপেক্ষা অধিক সম্মানেরই পাত্র ; ইহাকে বধ করিয়া আমার মহাপাতক হইয়াছে ; তখন তিনি ঘোর অনুতপ্ত হইলেন ; এবং প্রথমে ঋষিদের অভিপ্রায় লইয়া নিজেও পরীক্ষা করিয়া তাহারই পুত্র প্রিয়শিষ্য রোমহর্ষণি উগ্রশ্রবাকে সেই পুরাণবক্তার আসনে বসাইয়া দিলেন এবং স্বকৃত ব্রহ্মহত্যাপাপের ক্ষালনমানসে সাগরসঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতী নদীতে প্রতিকূল স্রোতে বর্ষব্যাপী গমনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্পাপ হইলেন। এই বিবরণটি মহাভারতের বন-পর্ব্বের তীর্থযাত্রাধ্যায়ে এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত আছে।

এখানে মার্কণ্ডেয়পুরাণের মূল প্রমাণটি উঠাইলাম—

"ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো হলী সূতং মহাবলম্।
নিজঘান বিবৃত্তাক্ষঃ ক্ষোভিতাশেষদানবঃ॥
*　　*　　*　　*　　*
অবধূতং তথাত্মানং মন্যমানো হলায়ুধঃ।
চিন্তয়ামাস সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্॥
*　　*　　*　　*
আত্মানঞ্চাবগচ্ছামি ব্রহ্মঘ্নমিব কুৎসিতম্।
তৎক্ষয়ার্থং চরিষ্যামি ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্।
অথ চেয়ং সমারব্ধা তীর্থযাত্রা ময়াধুনা।
এতামেব প্রযাস্যামি প্রতিলোমাং সরস্বতীম্॥"

ইহার ভাবার্থ অগ্রেই দিয়াছি।

প্রাচীন ভারতে বর্ত্তমানের মত অকোবিদ হইয়া কোবিদবাদ কীর্ত্তন করিবার সাহস লোকের ছিল না। সাধারণেও সে সাহসের অনুসরণ করিতে দিত না। যথার্থ পাত্র বলিয়া সূতের সেই কার্য্য শোভা পাইয়াছিল। হইতে পারে, কোন এক সময়ে শূদ্রজাতি সূত পৌরাণিক দুই চারিটি ইতিহাস লইয়া রাজসভায় পুরাণকথা কীর্ত্তন করিয়া লোককে মোহিত করিত বলিয়া তাহাদের বৃত্তি হইয়াছিল। যেমন বর্ত্তমানেও দাঁড়া রামায়ণ, মনসার পালা, চণ্ডীর গান প্রভৃতি বিষয় লইয়া অনেক সঙ্করোৎপন্ন জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে কি বলিতে হইবে যে, রামায়ণ-মহাভারত অন্ত্যাবসায়ী সূতজাতির হাতে ছিল ? সুতরাং রোমহর্ষণ সূত অন্ত্যাবসায়ী নহেন, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (মহামহোপাধ্যায়)।

রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মোপাসনা

রাজা রামমোহন, গোস্বামীর সহিত বিচারে বলিয়াছেন—

"তবে তান্ত্রিক দীক্ষা—যাহা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এ দেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ওই উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয় ; অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।

যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-রহিত ব্যক্তিদের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনা দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

"কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে সহস্র

সহস্র লোক কি এ দেশে কি পশ্চিমাদি দেশে নিষ্কল নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপসনা করেন, তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্য দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের তারতম্য হয়; অতএব আমরা সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেতে অধম যত্তপিও হই, তাহাতে এ ধর্ম্মের অগৌরব নাই এবং অন্ত উত্তম জ্ঞানীদেরও কি তাহাতে কি হানি হইতে পারে, সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে, রামপ্রসাদ অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গোঁসাই এবং কবিতাকার আপন আপন সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এমৎ নিশ্চিৎ হয় না যে অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই, বরঞ্চ ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অনেক ব্যক্তি অনুষ্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপাসনা করিতেছেন, তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান্যতা বিজ্ঞ লোকের নিকট হয় এমৎ নহে।"

ব্রহ্মোপসনায় "প্রথমে সাকার ব্রহ্মের ভজন আবশ্যক কি না," রাজা রামমোহন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"উত্তর। ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে লেখা গিয়াছে যে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইলে কর্ম্ম ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন থাকে, যদি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ও উপাসনার দ্বারা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয়, তবে সাকার উপাসনার কদাপি প্রয়োজন নাই। যে হেতু যথার্থ বস্তুতে ব্যক্তির অভিনিবেশ হইলে কল্পনাতে বিশ্বাস কোন মতে থাকে না। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যধৃত বচন—

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ন্তদর্থমনুকম্পয়া॥

আশ্রমী তিন প্রকার হয়েন,—উত্তম, মধ্যম, অধম; অতএব তাহাতে মধ্যম ও অধমের নিমিত্ত এই উপাসনা বেদে কৃপা করিয়া কহিয়াছেন।

অসমর্থো মনো ধাতুং নিত্যে নির্বিষয়ে বিভৌ।
শব্দৈঃ প্রতীকৈর্বাচোভিরুপাসীত যথাক্রমম্॥

নিত্য উপাধিশূন্য সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরেতে মনকে স্থাপন করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয়, সে শব্দের দ্বারা কিম্বা অবয়বের কল্পনা দ্বারা অথবা প্রতিমার দ্বারা যথাক্রমে উপাসনা করিবেক।"

রাজার লেখায় প্রমাণিত হইতেছে যে,—তিনি অধিকারী বিবেচনায় সাকার উপাসনা ও প্রতিমা পূজার আবশ্যক বিবেচনা করিতেন।

অসমর্থ ব্যক্তিদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া,—শব্দ-অবয়ব কল্পনা এবং প্রতিমা দ্বারা উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম ও উপাসনার দ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, চিত্তশুদ্ধি না থাকাতে যাহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় নাই, তাহাদের সাকার উপাসনার আবশ্যক। ইহা ছাড়া রাজা বলিতেছেন যে, সাকার উপাসনারও প্রকারভেদ আছে। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকরা উৎকৃষ্ট সাকার উপাসক।

রাজা রামমোহন তাঁহার "প্রার্থনা পত্রে" যাহা "সবিনয় প্রার্থনা" করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধ ভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন, তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশু-খ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন, ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয়। এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য—উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।"

এই জন্ম রাজা রামমোহনের Unitarian খ্রীষ্টানদের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল এবং তিনি নিজেও ঐ সম্প্রদায়ের লোক, এইরূপ পরিচয় দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ইংলণ্ডে Unitarian Association এর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"I am much indebted to Dr. Kirkland and to Dr. Bowring for the honour they have conferred on me by calling me their fellow-labourer, and to you for admitting me to this Society as a brother, and one of your fellow-labourers. I am not sensible that I have done anything to deserve being called a promoter of this cause; but with respect to your faith, I may observe, that I too believe in the one God, and that I believe in almost the doctrines that you do; but I do this for my own salvation and for my own peace." রাজা আরও বলিতেছেন—

"I laboured under many disadvantages. In the first instance, the Hindoos and the Brahmins, to whom I am related, are all hostile to the cause and even many Christians there are more hostile to our common cause than the Hindoos and the Brahmins. I have honour for the appellation of Christian, but they always tried to throw difficulties and obstacles in the way of the principles of Unitarian Christianity."

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার রচিত "প্রার্থনাপত্রের" সবিনয় প্রার্থনায় আরও জানাইয়াছেন—

"আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যিশু-খ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার "প্রতিমূর্ত্তিকে" মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বর ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর। কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও বিরোধী ভাব কর্ত্তব্য নহে,—বরং আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শন "তাঁহাদের সহিত যেরূপ অবিরোধিভাব রাখি," সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতি কর্ত্তব্য।

"আর যে সকল ইউরোপীয় যিশু-খ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের স্বরূপ জানিয়া তাঁহার নানাপ্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের

প্রতি দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না, বরঞ্চ আমাদের মধ্যে—যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু এই দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে। যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন, তখনও তাঁহাদিগে৷ "দ্বেষভাব না করিয়া" বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিৎ হয়। যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে, ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অল্প কোন ক্রটী আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।—"

এইখানে আমরা দেখিতে পাই, রাজা সমুদায় মনুষ্য জাতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক দল যাঁহারা "পরমেশ্বরকে এক জানেন" এবং "মনের শুদ্ধ ভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন।" এই শ্রেণীর লোকরা "দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন।" অন্যদল যাঁহারা কোন অবতারকল্প মহাপুরুষকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করেন;—"তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শন এবং অপর দল যাঁহারা অবতার পুরুষদিগকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহার নানাপ্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করেন।" এই তিন শ্রেণীকে তিনি প্রথমে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং কেহ কাহাকেও দ্বেষ করিবে না, এই প্রেমবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন।—এই উদারতার জন্য তিনি তাঁহার গৃহ-দেবতাদের বিসর্জ্জন দেন নাই,—তাঁহাদের পূজার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহে শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়াই বিবাহ দিয়াছিলেন, মরণের দিন পর্য্যন্ত উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে রাম নাম উচ্চারণ শুনিয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল এবং মৃত্যুকালে যখন তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ রামরতন ব্রাহ্মণোচিত ভগবন্নাম আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিতে কেহ নাই।—মিস্ কার্পেণ্টার "Last day of Rammohan Roy" গ্রন্থে মিসেস এষ্টলিনের ডায়েরী হইতে নিম্ন লিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন—

Mr. Estlin describes as follows the departure the Hindu servants:—

"October 29th, 1833—Mr. Hare having fixed the next day for the departure of the late Rajah's Hindu attendants from Stapleton Grave, requested that they might be permitted to take leave of the ladies, and to express their grateful thanks. Accordingly they entered the drawing-room, bowing very low several times returning their thanks for the many favours they had received. Miss Kiddel then said, "Ram Ratan, you have, I understand, visited Mr. D. at his request." "Yes, I have." "Well Mr. D. declares that you told him that when the Raja was dying he prayed to 364 gods!" Ram Ratan exclaimed, "It is a great lie." "What then did you say?" said Miss Kiddell. The Hindoo lifted his eyes and hands to heaven, and pointing in a most energetic manner upward exclaimed. The Raja prayed to Him—to that God who is here—who is there—who is all over—everywhere to that God—the one God!

পাচক রামরতন মুখোপাধ্যায় কি রকম ইংরাজীতে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় মিসেস কিডেলির কিরূপ জ্ঞান ছিল, আমরা জানি না। তবে রাজা রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি হিন্দু দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এরূপ একটা জনরব রটিয়াছিল—ঐ ইংরাজী ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যেই ইহার প্রচার হইয়াছিল।

রাজা রামমোহনের ন্যায় জ্ঞানী এবং উদারভাবাপন্ন ব্যক্তি হিন্দু দেব-দেবীর নাম কিম্বা যীশু-খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করিলেই যে জাহান্নমে গেলেন, এ রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের নাই। রাজা হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না,—তিনিও হিন্দু দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। যাক,—এক্ষণে তিনি ব্রহ্মোপাসনা কি ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার রচনাবলী হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রাজা "অনুষ্ঠান" নামক যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মোপসনার ব্যাখ্যা ও তাঁহার উপাসনার পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। আমরা এইখানে তাহা তুলিয়া দিয়া রাজার ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

১ম শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন?

১ম আচার্য্যের উত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়। কিন্তু পরব্রহ্মের বিষয় জ্ঞানের আবৃত্তকে উপাসনা কহি।

রাজা এখানে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহিতেছেন। এখন এই ভাবের সহিত অদ্বৈতবাদীর কোনও প্রভেদ নাই।

"২ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়?

২ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে যত্ন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ যে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন, যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে. বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না; অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদি অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা, তাঁহার চিন্তন করিবেন এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ওষধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরের অধীনে হয়,

এই প্রকার অর্থ-প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন; অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরম ব্রহ্ম তাহার উপাসনায় সমর্থ হন।"

এইখানে রাজা রামমোহন অন্য কোন নূতন উপাসনা-পদ্ধতির কথা বলিতেছেন না। তিনি প্রচলিত মার্গে প্রচলিত প্রথায় ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে বলিতেছেন। এই জন্য সাকারবাদী যে শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, রাজা সে শব্দের অবলম্বন দ্বারা পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে বলিতেছেন। তাই তিনি বলিতেছেন, "পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদি অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাহাই চিন্তন করিবেন"—এইরূপ উপদেশ দিতেছেন। তিনি যে ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তন্ত্রোক্ত স্তব আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সেই ব্রহ্ম স্তব—

"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" আবৃত্তি করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে বলিয়া দিয়াছিলেন, "ইহা তান্ত্রিক অধিকারে" এবং স্তবের নীচে লিখিলেন, ইহা গোপ্য নহে। তাই মুদ্রিত হইল।

রাজা অধিকারবাদ বিশেষভাবে মানিতেন। তিনি লিখিতেছেন।

১১ প্র। এ উপাসনাতে দেশ দিক কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না?

১১ উঃ। উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমন বিশেষ নিয়ম নাই। অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিব।

১২ প্র। এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে?

১২ উঃ। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাহার যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি, তাহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিরোচন অশুদ্ধস্বভাব প্রযুক্ত উপদেশের ফল প্রাপ্ত হইলেন না।—ছান্দোগ্য।

রাজার এই ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতির সহিত বর্ত্তমান ব্রহ্মোপাসনার বিশেষ কোন যোগ নাই। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদিকে প্রামাণ্য বলিয়া মানেন না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত যে শ্লোক আজকাল আবৃত্তি করা হয়, তাহা খণ্ডিত ও সংস্কৃত করিয়া অর্থাৎ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছে। রাজা নিজেকে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মরা অদ্বৈতবাদী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না। সামাজিক হিসাবে রাজা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে Baptist Missionary Societyর Periodical Accountsএ আছে—"Europeans breakfast at his house at a separate table in the English fashion." "He has not renounced his cast." তখন পাদরীরাও বলিতেন, "One of the Society, though he professes to have renounced idolatory, yet keeps in his house a number of gods, as well as two large pagodas."

পাছে জনরব রটে, তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন এই ভয়ে তিনি ইংরাজী খানা খাইতেন না বা ইংরাজের সহিত এক টেবলে খাইতেন না,—যদিও ইংরাজদের খানা খাইবার সময়ে তিনিও টেবলে বসিয়া গল্প করিতেন। পাদরীরা রামমোহন সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

Miss Carpenter লিখিয়াছেন

"It was known, however, that he adhered to all Brahminical customs, which, in his opinion did not savour of idolatory; this was not from any value which he attached to them; so much as to avoid all unnecessary cause of offence to his countrymen which might lessen with them the influence of his writings. Two Brahmin servants continually attended on him and after his death they found upon him the thread indicating his caste."

এই বিষয়ে মিস্ কার্পেণ্টার যে রামমোহনের দৌর্ব্বল্য দেখাইয়াছেন,—তাহা তাঁহার স্বীয় কল্পনাপ্রসূত—একবারে ভিত্তিহীন। যিনি নির্ভীক চিত্তে সমস্ত অত্যাচার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া সতীদাহ প্রথার রহিত করিয়াছিলেন; যিনি কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কারে কোটি কোটি লোকের বিপক্ষে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, তিনি দেশবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য জাতি ও জাতীয় প্রথা মানিয়া চলিবেন,—ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত সংস্কার। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতেন। তিনি নিজেই এই সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তাঁহার "প্রার্থনা পত্রের—"

"১০ম প্রশ্ন। এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য।

১০ম উত্তর। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়। অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামত আহার-ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়। আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়ত বিরুদ্ধ হয়; শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া আপন আপন ইচ্ছামত আহার ও ব্যবহার করে, তবে লোকনির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়; কেন না, খাদ্যাখাদ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকট নাই। কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দ্দোষ হইবার প্রতিকারণ হয়; ইচ্ছা সর্ব্বজনের একপ্রকার নহে, সুতরাং পরস্পরবিরোধী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ

শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থচর্চ্চা না করিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু আহার কোনপ্রকারের হউক অর্দ্ধ প্রহরে সেই বস্তুরূপে পরিণামকে পায় যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিয়া থাকেন এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে আহারের স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে,—অতএব উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতা চেষ্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।"

রামমোহন স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। এক দিকে তিনি শাস্ত্রানুযায়ী সমাজে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে উপদেশ দিতেছেন, আবার তেমনই সাধন করিয়া বলিতেছেন, আহারের উত্তমতা ও অধমতা লইয়া ব্যস্ত থাকিও না! আহারের যে পরিণাম, তাহা তো জান, সুতরাং উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবে। এই আদর্শেই রামমোহনের আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন হইত। রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনা সমাজ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা বা বিদ্রোহীর ধ্বংস-বিষাণ নহে। হিন্দুর জাতীয় সম্পদ শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বনে তাহার গঠন হইয়াছে। তাহার মন্ত্র প্রণব ব্যাহৃতি শ্রুতিবাক্য যাহা আচার্য্যপরম্পরা যুগে যুগে ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি কোনও ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমতের বিদ্বেষী ছিলেন না এবং বলিতেন, সাকার উপাসনা অধিকারিভেদে বিভিন্ন ভাবে হইয়া থাকে। সাকার উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নহে,—প্রতিবন্ধক নহে; বরং চিত্তশুদ্ধির জন্য সাকার উপাসনা আবশ্যক, ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধি না হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইলে পরব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী হয় না; সাকার ও প্রতিমাপূজকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্ট দুই শ্রেণীর বিভাগ করিয়াছেন। অপকৃষ্ট মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

রামমোহন ছিলেন নির্গুণ ব্রহ্মবাদী, জ্ঞানী ও শান্ত সাধক। ভক্তি বা রসপ্রধান ধর্ম্মের আস্বাদ তিনি করেন নাই; তাই তত্ত্বালোচনায় ব্রহ্মোপাসনা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে। রামমোহনের ব্রহ্মসভা সংস্কার সভা ছিল না, তাহা ব্রহ্মালোচনা সভা। জাফর-খাঁ যে ভাবে উন্মত্ত হইয়া গাহিয়াছেন,"যো-কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়"—রামমোহন সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদের ভজনা করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

মিথিলার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ

পুণ্যভূমি মিথিলা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও শিক্ষায় বৈদিক সময় হইতে অলঙ্কৃতা। বাঙ্গালাদেশও জ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে বিখ্যাত। বাঙ্গালার সহিত যে মিথিলার একযোগ হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালা ও মিথিলা উভয় স্থানই গৌরবান্বিত হয়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার সহিত মিথিলার বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সেন-বংশীয় রাজগণের নবদ্বীপে রাজধানী ছিল। রাজা বিজয় সেন মগধের পালবংশীয় রাজাদিগের হস্ত হইতে মিথিলা জয় করিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। তঁ াহার পুত্র বল্লালসেন তাঁহাদের অধিকারভুক্ত গৌড়রাজ্যকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেন, যথাঃ—

১। বারেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গ।
২। রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গ।
৩। বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ।
৪। বাগড়ি যাহাকে এখন প্রেসিডেন্সী ডিভিজন বলা হয়।
৫। মিথিলা।

খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সেন-রাজগণ মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ মিথিলাতে প্রচলিত হয় এবং এখনও তাহা তথায় প্রচলিত আছে। এই লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন বখ্‌তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ আক্রমণ করেন ও লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়া সুবর্ণগ্রামে আশ্রয় লন, সেই সময় হইতে মিথিলাও সেন-রাজগণের হস্তচ্যুত হয়।

সেন-বংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গ এবং মিথিলা উভয় স্থানই বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। লক্ষ্মণসেনের বঙ্গের রাজ-সভায় গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেব এক জন সভাপণ্ডিত ছিলেন। সেই সময়ে গোবর্দ্ধনাচার্য্য, মিথিলার এক বিখ্যাত কবি বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার লিখিত আর্য্যাসপ্তশতীতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

জয়দেবও তাঁহার গীতগোবিন্দে এ বিষয় লিখিয়াছেন।—
একটি তাম্রফলকে পাওয়া গিয়াছে—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ।"

বাঙ্গালাদেশ এবং মিথিলা এক রাজার অধীনে থাকায়, মিথিলার লোক বাঙ্গালায় যাওয়া এবং বাঙ্গালার লোক মিথিলায় আসা যথেষ্ট সম্ভবপর ছিল। সুতরাং মিথিলার ভাব বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার ভাব মিথিলায় আদান-প্রদান হইত।

আবার যখন মুসলমানগণ পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চল জয় করিয়া বাঙ্গালা ও মগধে রাজত্ব বিস্তার করিতে লাগিল, তখন মিথিলা সেই আক্রমণের বহির্ভূত থাকায় সেখানে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে পণ্ডিত ও সদ্‌ব্রাহ্মণ সমাবেশে মিথিলা তাহার পূর্ব্বের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তখনও বাঙ্গালার পণ্ডিতগণের মিথিলায় যাওয়া আসা চলিতে লাগিল।

মিথিলা দেশ এক দিকে যেমন জনক রাজাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনার জন্য বিখ্যাত, তেমনই আবার ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বর্ত্তমান কমতৌল ষ্টেশনের নিকট গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শন প্রবর্ত্তিত করেন। ন্যায়দর্শন প্রকৃত তর্কশাস্ত্র। উহাতে তর্ক অর্থাৎ বিচারপ্রণালী বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

মিথিলা যেমন ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত, বাঙ্গালার নবদ্বীপও সেইরূপ সরস্বতীর গৌড়পীঠ-স্বরূপ ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য জগদ্বিখ্যাত। বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ মিথিলায় আসিতেন; আবার কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি নানা

দিকের নানা স্থানের পাঠার্থিগণ নবদ্বীপে আসিয়া বাঙ্গালী গুরুর নিকট পাঠ স্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন।

মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ঃ—ইনি এক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের প্রণেতা। মিথিলাবাসিগণের মতে ইনি মৈথিলী এবং বঙ্গবাসীর মতে ইনি বাঙ্গালী। বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। গঙ্গেশের আবির্ভাব ঐ সময় হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ১১০৮ খৃষ্টাব্দে। বাঙ্গালার পণ্ডিতের মিথিলায় আসিয়া বাস করা তখনকার পক্ষে কিছু অসম্ভব ছিল না।

গঙ্গেশের জীবন-চরিত সম্বন্ধে বিশ্বকোষে আছে,—"বঙ্গদেশে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে গঙ্গেশের জন্ম হয়। মাতা-পিতা গঙ্গেশকে লেখাপড়ায় অমনোযোগী দেখিয়া মাতুলের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কারণ, মাতুল এক জন উত্তম পণ্ডিত, আশা—যদি তাঁহার যত্নে গঙ্গেশের লেখাপড়া হয়। কিন্তু মাতুলের বহু চেষ্টাতেও গঙ্গেশের কিছুই হইল না, ক্রমে গঙ্গেশ অশাসিত বালকের ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে গঙ্গেশ এক যোগীর দর্শন পাইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যান। গৃহের সকলে মনে করিলেন, গঙ্গেশ মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যোগীর কৃপায় গঙ্গেশের সমুদায় উত্তম বিদ্যাই অর্জ্জিত হইল। বহুদিন পরে গঙ্গেশ মাতুলালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। মাতুল তখন তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্য হইলেন এবং তাঁহাকে "চূড়ামণি" উপাধি দিলেন। এই গঙ্গেশ উপাধ্যায় ন্যায়শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যে মিথিলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বর্ত্তমান রোবড়ার নিকট কারিয়ান গ্রামে তাঁহার ভিটা এখনও আছে, সেখানকার মৃত্তিকা লোকে সম্মান সহকারে ভক্ষণ করিয়া থাকে।"

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী কালে মিথিলায় পক্ষধর মিশ্র এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালাদেশ হইতে মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ আসিতেন।

নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মিথিলায় আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি পক্ষধর মিশ্রের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বাসুদেব নিজ পুস্তকাদি লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন দেখিয়া মৈথিলিগণ পুস্তক লইয়া যাইতে বাধা দেন। অগত্যা বাসুদেব সমস্ত শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন ও সেখানে একটি ন্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

নবদ্বীপের বিদ্যালয়ে রঘুনাথ তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। রঘুনাথকে তিনি সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। কিন্তু রঘুনাথের অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া এবং নিজ কণ্ঠস্থ শাস্ত্রের বিস্মৃতির আশঙ্কা করিয়া বাসুদেব রঘুনাথকে নিজগুরু পক্ষধরের নিকট পাঠসমাপ্তির জন্য মিথিলায় পাঠাইলেন।

এই বাসুদেবের টোলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কিন্তু বাসুদেব যখন শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া মহাপ্রভুর মহত্ত্ব দেখিলেন, তখন তিনি চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

রঘুনাথ আর দুই জন সহাধ্যায়ী সঙ্গে লইয়া মিথিলায় গমন করিলেন। সেখানে পক্ষধরের টোলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্তরক্রমে নির্ম্মিত এক উচ্চ আসনে পক্ষধর বসিয়া আছেন এবং তাঁহার নিম্নের এক স্তরে শিষ্যগণ পারদর্শিতা অনুসারে উপবিষ্ট। রঘুনাথ পক্ষধরকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বনিম্ন স্তরে উপবেশন করিলেন। তৎপরে এক এক স্তরের শিষ্যগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া পক্ষধরের নিকটস্থ স্তরে স্থান লাভ করিলেন। রঘুনাথ ৩ বৎসরকাল মিথিলায় অবস্থান করিয়া সকল ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। পাঠ শেষ হইলে রঘুনাথ নিজ পুস্তকাদি লইয়া স্বগৃহে যাইবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় পক্ষধর বলিলেন, "বৎস! পুস্তক লইয়া যাওয়া মিথিলায় নিয়মবিরুদ্ধ, সুতরাং পুস্তক লইও না।" রঘুনাথ নিরুপায় হইয়া শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আরও কিছু দিন মিথিলায় অবস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে রাজার আদেশে রঘুনাথ পুস্তকাদি বঙ্গদেশে লইয়া যাইতে সমর্থ হন।

রঘুনাথ নবদ্বীপে গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিলেন। তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপৃত হইয়া গেল। ভারতের নানাস্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আসিতে লাগিলেন। মিথিলার খ্যাতি ক্রমে অপসারিত হইল। পরে মিথিলা হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে গিয়া অধ্যয়ন সমাপন করিতেন। নবদ্বীপের টোল ভারতবর্ষে অজেয় বলিয়া পরিগণিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গলিপি এখনও মিথিলাতে প্রচলিত। এই বঙ্গলিপি মিথিলা হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়, অথবা বাঙ্গালা হইতে মিথিলায় আনীত হয়, এই বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে বঙ্গলিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষর।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষর ১ সহস্র বৎসরেরও বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। বঙ্গলিপির কথা বহুপূর্ব্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর গ্রন্থেও বঙ্গলিপির কথা লেখা আছে। ইহা খৃষ্ট জন্মিবার ৩ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। বাঙ্গালা অক্ষর দেবনাগরী অক্ষর অপেক্ষাও প্রাচীন। ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রথম লিপি ব্রাহ্মী লিপি ছিল। তৎপরে অশোকলিপি হইতে গুপ্তলিপির উৎপত্তি—যাহা গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের সময়ে প্রচলিত ছিল। গুপ্তলিপি হইতে "শ্রীহর্ষ"লিপির উৎপত্তি। "শ্রীহর্ষ"-লিপি হইতে দেবনাগরী লিপি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গলিপির প্রথম উল্লেখ ২ হাজার ২ শত বৎসর পূর্ব্বের ললিতবিস্তর পুস্তকে রহিয়াছে। "গুপ্তলিপি" হইতে দেবনাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হইলে তাহা অনেক পরবর্ত্তী। কারণ, গুপ্তবংশীয় রাজগণ অনেক পরবর্ত্তী শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুশুনিয়া পাহাড়ে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ১ হাজার ৫ শত বৎসর পূর্ব্বের ক্ষোদিত। তাহার অক্ষর বাঙ্গালা অক্ষরের অনেকটা অনুরূপ। ৯ শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা একখানি কাশীখণ্ড পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার লেখা বাঙ্গালা অক্ষরের অনুরূপ। নেপাল হইতে সংগৃহীত ৭ শত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গাক্ষরে লিখিত কতকগুলি বৌদ্ধপুস্তক এখনও কেম্বিজ নগরে রক্ষিত। ইহা

পর হইতে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাও ৬ শত বৎসরের কথা। সেন রাজাদিগের রাজত্বসময় হইতেই মিথিলায় বঙ্গলিপির প্রচার হওয়া সম্ভবপর।

মৈথিলী অক্ষর ও ভাষা

মৈথিলী অক্ষর ও বাঙ্গালা অক্ষরে পার্থক্য অতি অল্প। ই ঈ ঋ ঠ র শ এবং হ ব্যতীত আর সকল অক্ষর বাঙ্গালা ও মৈথিলী সম্পূর্ণ এক প্রকার। বিদ্যাপতি ঠাকুরের লেখা ৬ শত বৎসরের পূর্ব্বের। তাহাও এই অক্ষরে লেখা। সুতরাং মিথিলায় ৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা প্রমাণ হইতেছে। এখনও ত্রিহুতা ভাষা ঐ প্রকার অক্ষরে লিখিত হয়। ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বের দলিল-দস্তাবেজ মধুবাণী অঞ্চলে পাওয়া যায়—যাহা বঙ্গাক্ষরে লেখা। সেন রাজাদিগের অবনতির পর মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবগণের অধীনেও মিথিলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্বের পরও ইংরাজরাজের আমলে বাঙ্গালা ও মিথিলা এক শাসনাধীন ছিল। এই সকল কারণে বাঙ্গালার ও মিথিলার এক যোগ চলিয়া আসিতেছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাঙ্গালার কবি এবং বাঙ্গালায় সম্মানিত; আবার বাঙ্গালার জয়দেব মিথিলায় সম্মানিত। উত্তরপূর্ব্ব-মিথিলার ঘরবাড়ী দেখিলে এখনও বাঙ্গালার ঘরবাড়ীর ন্যায়ই মনে হয়। বাঙ্গালার লোক যেমন লৌকিক বিচার ও পরিচ্ছন্নতা-প্রিয়, মিথিলার ব্রাহ্মণগণও সেইরূপ বিচারবান্ ও পবিত্রভাবে থাকেন।

বিদ্যাপতি :—বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বিদ্যাপতি এই মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিথিলার বিখ্যাত ঠাকুর-বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় ৫ শত বৎসর হইল, তিনি আবির্ভূত হইয়া রসভাবযুক্ত ও ভাবতরঙ্গপূর্ণ ছন্দে বঙ্গভাষার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহারই অনুসরণ করিয়া প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ পদাবলী দ্বারা বঙ্গবাসীর ধর্ম্মভাব পোষণ করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালার কবি চণ্ডিদাসের সমসাময়িক। বিদ্যাপতির আবির্ভাব রাজা শিবসিংহের সময়ে হইয়াছিল। রাজা শিবসিংহ তাঁহার কবিত্বশক্তির পুরস্কার-স্বরূপ ১৪০০ খৃঃঅব্দে "বিসপী" গ্রাম তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে পণ্ডিত গ্রীয়ারসন্ লিখিয়াছেন :—"His chief glory consists in his matchless sonnets in the Maithili dialect dealing allegorically with the relations of the soul to God under the form of love which Radha bore Krishna."

পণ্ডিত নিউম্যান বলিয়াছেন :—"If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman; yes, however manly thou may be among men."

বিদ্যাপতির বংশধরগণ এখন সেই বিসপীতে না থাকায় উক্ত গ্রাম ক্রমে বিক্রীত হইয়া অবশেষে মজঃফরপুরের বসু-বংশের অধিকারে আসিয়াছে। মৈথিল কবির পদাবলী যেমন বাঙ্গালীর সম্পত্তি, সেইরূপ তাঁহার বিষয়সম্পত্তিও আজ বাঙ্গালীর সম্পত্তি হইয়াছে।

বিদ্যাপতি এবং শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য্য সমসাময়িক ছিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে জানা যায়, তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার গান করিবার শক্তি ও রাগ রাগিণীজ্ঞান উৎকৃষ্ট ছিল।

বিদ্যাপতির ধর্ম্মভাব অতি উচ্চ ও উদার। তিনি যেমন এক দিকে বৈষ্ণবভাবাত্মক পদাবলী লিখিয়াছেন, অপর দিকে আবার দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছেন। বিসপী গ্রামে তিনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের উচ্চ সীমায় আরোহণ করায় তিনি শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ভাব সমানভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব-চূড়ামণি হওয়ায় অদ্বৈত প্রভুর সহিত বিদ্যাপতির মিলন বিদ্যাপতির বৈষ্ণবভাবের পরিপুষ্টি হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিদ্যাপতি একটি কবিতাতে ব্রহ্মের অনাদি ও অনন্ত ভাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন :——

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আদি-অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারণ ভার তোহার।

বিদ্যাপতির ভাগবত প্রেমের দৃষ্টান্ত :—ভগবানকে বলিতেছেন, সকলই তুমি, জীবনের সার তুমি।——

হাতক দরপণ মাথাক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।
পাখীক পাখ মীনক পাণি।
জীবক জীবন হম তুহু জানি।
* * * * *
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনমু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল।
* * * * *

বিদ্যাপতির পর মুসলমান রাজত্বসময়ে বাঙ্গালার সাহিত্য বা ভাষা-সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোনপ্রকার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। ইংরাজ-রাজত্বসময়ে আবার মিথিলার সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে থাকে।

১৭৯৩ খৃঃঅব্দে (১৩৪ বৎসর অতীত হইল) কলেক্টরের রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, আথর, কাঁচি, পুপরী, দাউদপুর, মতিপুর প্রভৃতি নীলকুঠী ত্রিহুতে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল কুঠীর শ্বেতাঙ্গরা যখন প্রথম আসিয়াছিলেন, অনেকেই এক একটি করিয়া বাঙ্গালী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তখনকার সকল কুঠীতেই এক জন করিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আসিতেন এবং শ্বেতাঙ্গদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস সেই সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হইত। ত্রিহুতময় নীলকুঠীর প্রভুত্ব হওয়ায় বাঙ্গালীদেরও সম্মান সেই সঙ্গে যথেষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে আথর, কাঁচি ও পুপরী কুঠীগুলি বাঙ্গালীর সম্পত্তি হইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গার রাজ-সম্পর্কেও বাঙ্গালীর সম্মান যথেষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ১৮৯৮ পর্য্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় একটি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিতগণ আসিলে রাজসভায় শাস্ত্রবিচার হইত এবং বাঙ্গালার পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট বিদায় দিয়া তিনি সম্মানিত করিতেন।

মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের সহকারী (অ্যাসিষ্টাণ্ট) ম্যানেজার চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এক গভীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বেদান্তসার, আত্মতত্ত্বদর্শন, পরলোকতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মিথিলায় বর্ত্তমানকালে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি বঙ্গদেশে অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত (বি এল)

সাহিত্যে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক সময় আমরা গৌরব অনুভব করি। নিজের দেশ উন্নত—স্বীয় মাতৃভাষা নানাবিধ ভাবরত্নের খনি, এই কথা মনে হইলে কাহার না আনন্দ হয়—আত্মপ্রসাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া না উঠে? কিন্তু গর্ব্বে স্ফীত হইবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের গর্ব্ব সমুচিত কি না। বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ চলিতেছে। বস্তুতন্ত্রহীন ভাবুকতায় বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য কণ্টকিত। য়ুরোপীয় সাহিত্যের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা আনিয়া আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসরে লইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়া য়ুরোপীয় মতবাদসমূহ আমদানী করিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। এই জন্য শুধু লেখকগণ দায়ী, তাহা বলা যায় না, পাঠকগণও দায়ী। আবশ্যক অনুসারে বস্তু সরবরাহ করা হয়। বাণিজ্যের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও এই চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম বর্ত্তমান। সাহিত্য যদি জাতির মনোভাব প্রকাশের দ্বার হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, আমাদের জাতীয় মনোভাব তরল হইয়াছে, ইহা কোন বৃহৎ, উচ্চ বা গভীর ভাব ধারণে অসমর্থ। বাঙ্গালী পাঠকের মতি ও রুচি উচ্চাঙ্গের ভাবগ্রহণে অপটু। চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতার পূর্ণ বিকাশে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য শক্তিহীন দুর্ব্বল। বাঙ্গালী লেখনী ধারণ করিলে হয় কবি, না হয় কথাসাহিত্যিক হইয়া বসেন। বাঙ্গালী পাঠক মাসিকের সূচীপত্রে চুট্‌কী কবিতা বা গল্পের সংখ্যাপ্রাবল্য দেখিলে পাঠ করিবার জন্য পাতা উল্‌টাইয়া দেখেন।

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য কত বলহীন ও দরিদ্র, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য বা বিজ্ঞানের পুস্তক যে কোন ভাষারই হউক্ না কেন, ইংরাজ তাহা নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিতে বিলম্ব করেন না। এক ইংরাজী ভাষা জানিলে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি পাঠ করিতে পারা যায়। গ্রীসের হোমর, প্লেটো, আরিস্ততল, সফোক্লীস্, ইউরিপীডিস্, হেরোডোটস্, থ্যুকিডিডিস্, জিনোফন; রোমের দান্তে, ভার্জ্জিল; জার্ম্মেনির গেটে, কাণ্ট, মিলার, হেগেল; ফ্রান্সের হিউগো, রুসো, ভল্‌টেয়র; স্পেনের কলভিয়ন, লোপ্ ডি ভেগা; ভারতের কালিদাস, বাল্মীকি, বড়্দর্শন, বৌদ্ধশাস্ত্র; পারস্যের হাফেজ, সাদি, ওমর; আরবের কোরাণ ইত্যাদি যে কোন দেশের যে কোন উচ্চাঙ্গের কবি, দার্শনিক—লেখকের গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় বহু উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বহুবার ভাষান্তরিত হইয়াছে। চাহিদা না থাকিলে এতগুলি শক্তিধর পুরুষ এই সমস্ত বিদেশী ভাষার পুস্তক মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করিয়া শক্তির অপব্যবহার করিতেন না।

অনুবাদের অভাবে বঙ্গসাহিত্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরূপে বিশ্বে নিজ স্থান দখল করিতে পারিতেছে না। অনুবাদ সাহিত্যের দুর্ব্বলতা ও দৈন্য দূর করিয়া তাহার শালীনতা, সামর্থ্য ও সবলতা সম্পাদন করে। মুসলমান অধিকারের প্রারম্ভে বঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুবাদ প্রবলবেগে আরম্ভ হয়। তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্য-জননী তাঁহার হেমমুকুটে দুইটি শ্রেষ্ঠ মণি লাভ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শুধু সংস্কৃতের অনুবাদ করিলে আংশিক ফল পাওয়া যাইবে। বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগকে বিশ্বের মহামানবের সভায় স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য বিশ্বসাহিত্যের মহাভাণ্ডার হইতে বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া বঙ্গভাষা-জননীর অঙ্গরাগ বর্দ্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা বাঙ্গালা উন্নত সাহিত্যের উচ্চাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না।

সাহিত্য-জগতে প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা অধিক নহে। তিন হাজার বৎসর অতিবাহিত হইতে বসিয়াছে—কিন্তু ইলিয়ডের মত আর একখানা মহাকাব্য আমাদের হস্তগত হইল না; শকুন্তলা, ফাউষ্ট, হ্যামলেটের মত একখানা পুস্তক আমাদের নয়নগোচর হইল না। মহাকালের বক্ষে কি নিধি সঞ্চিত আছে, তাহা ভবিতব্যই জানেন। হোমর, কালিদাস, শেকস্‌পীয়র, গেটে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য-শিল্পী জন্মাইতে পারে সাহিত্য—সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অন্তর্নিহিত ভাবতত্ত্ব ভবিষ্যতে কোন অজ্ঞাত মনীষী দ্বারা বিশ্লেষিত হইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় শকুন্তলা, ফাউষ্ট, হ্যামলেট রচিত হইবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই জন্য অধুনা পরিজ্ঞাত শ্রেষ্ঠতম শিল্পসাধনার পরিমূর্ত্ত ফলের অনুবাদ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অন্য সাহিত্যের

ভাবধারা মাতৃভাষায় যথাযথ বিবৃত বা চিত্রিত করিতে না পারিলে, সাহিত্যজগতের উপার্জ্জিত সম্পত্তি আয়ত্ত করিতে না পারিলে বঙ্গভাষার সম্যক উন্নতি সাধিত হইবে না।

বাঙ্গালায় ধর্ম্ম, দর্শন বা সমাজ সম্বন্ধে কোন মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা এখনও পর্য্যন্ত দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে সংস্কৃত-সাহিত্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই, বোধ হয়, পাইবারও আশা কম। ইহার আর এক কারণ, বাঙ্গালা গদ্য এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। বাঙ্গালা গদ্য ফরাসী বা ইংরাজী গদ্যের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। গদ্যসাহিত্যের সমুচ্চ পরিণতি সংঘটিত না হইলে বস্তুবুদ্ধিসম্বলিত বৈজ্ঞানিক রচনার উদ্ভব সম্ভবপর নহে। আমরা আলস্যপুষ্ট কমনীয় দেহকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ভাবাবেগ-প্রসূত উল্লম্ফন—উদ্দাম নৃত্যকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া ধরিয়া লই, তরল ভাবুকতাকে উচ্চ সাহিত্য বলিয়া গলাধঃকরণ করি। জাতীয় জীবনের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। বাহুল্য বা বাড়াবাড়ি ত্যাগ করিয়া জীবনের বহুমুখীন ভাবসমূহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারিলে বাস্তবজগতে কোন জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। জাতি হিসাবে যাহা সত্য, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাই।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রসারে আমাদের একটা নিশ্চেষ্টতা বিদ্যমান। মাইকেল, হেমচন্দ্র অনুবাদের যে পন্থা দেখাইয়াছেন, তাহা অন্য কোন শক্তিশালী বাঙ্গালী লেখক কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় নাই। যিনি স্বয়ং কবি, তিনিই কবির ভাষা ও ভাব সম্যক্ বুঝিতে সমর্থ হন এবং ইচ্ছা করিলে তাহা স্বীয় ভাষায় যথাযথ-ভাবে রূপান্তরিত করিতে পারেন। আমরা দুই ছত্র লিখিতে পারিলেই মৌলিকতা দেখাইতে ছুটিয়া যাই, চুটকী কবিতা, ছোট গল্প বা উপন্যাস লিখিয়া আত্মীয়-বন্ধুগণকে চমৎকৃত করিয়া দিতে চাই। যাঁহারা ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মাণ বা অন্য কোন বিদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা যদি তত্তৎ ভাষায় শ্রেষ্ঠ কাব্য বা পঠনীয় গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষার শক্তি-বৃদ্ধি হইবে, নূতন ভাবের উৎস খুলিয়া যাইবে। যাঁহারা বলেন যে, এইরূপ গ্রন্থ বাজারে কাটতি হইবে না, তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সত্যেন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের নীতি-কবিতায় তীর্থ-সলিল ও তীর্থরেণু বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার হতাদর করেন নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবাদর্শের আদান-প্রদানে এক নূতন যুগের অবতারণা হইবে, বঙ্গের সারস্বত বীণায় নূতন সুর বাজিয়া উঠিবে, ভাবদৈন্য ঘুচিয়া যাইবে, ভাষায় শব্দশক্তি, বস্তুজ্ঞান ও শক্তিচর্য্যা বৃদ্ধি পাইবে। য়ুরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সমধিক অনুবাদ বঙ্গভাষায় সুফল প্রসব করিবে। হিব্রুসাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাইবেল য়ুরোপের বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইবার পর দান্তে, সেক্সপীয়র, হিউগো, গেটে প্রভৃতি মহামনীষায় সম্ভব হইয়াছিল। গ্রীক্ ও লাতিন সাহিত্যের আলোচনা ও অনুবাদে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তবে অনুবাদমাত্রই মনোজ্ঞ হয় না। অনুবাদক স্বয়ং কবি বা প্রতিভাশালী লেখক হইলে তাঁহার অনুবাদ হৃদয়গ্রাহী হয়।

অনেকে বলেন, ইংরাজী ভাষা জানিলেই বিশ্বসাহিত্যের মধু আস্বাদন করিতে পারা যায়। কিন্তু ইংরাজীতে সামান্য জ্ঞান হইলে কাণ্ট, গেটে, হিউগো প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লেখকগণের গ্রন্থ বুঝিবার সামর্থ্য হয় না। ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না হইলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মাইবে না। এই জন্য যাঁহারা সাহিত্যের রসগ্রহণে সমর্থ, তাঁহারা যদি মৌলিকতা প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিয়া বন্ধ বা ভাগবত অনুবাদে লেখনী চালনা করেন, তাহা হইলে ইংরাজী অনভিজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার উপকার সাধিত হয়।

পুট্, হ্যামসেন, রমা রঁলা, ইব্সেন, মেটারলিঙ্ক্, চিকোভ, ডাষ্টাভিস্কি, বার্ণাড্স, ওয়েলস্ প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পঠিত হইলে আমাদের ভাবদৈন্য ঘুচিয়া যাইবে, বিশ্বসাহিত্যের সকল ধারার সহিত সুপরিচিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে মহৎ ভাবশিখার স্পর্শে বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক তরলতা ঘনীভূত হইয়া অমৃত উৎপাদন করিবে ও সাহিত্যিক উচ্চ আদর্শের রূপ ফুটিয়া উঠিবে। ইহা যে শুধু পল্লবগ্রাহী ভ্রমরের ক্ষণিকের ক্ষুধা মিটাইবে, তাহা নহে, ইহা শুষ্ক মেরুদণ্ডহীন জাতির অন্তরে প্রকৃত সাহিত্য-রস সেচন করিয়া মন্দারমালার সুরভিতে ভারতবাসীর অন্তর আমোদিত করিয়া তুলিবে।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম-এ।

বাঙ্গালীর পঞ্জিকা

বঙ্গদেশে প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহের গণনা ভ্রমসঙ্কুল, ঐ গণনার সহিত আকাশের, পরিদৃশ্যমান সূর্য্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণের অবস্থান দৃশ্যত মেলে না, এ কথা ইদানীং প্রায় সকলেই জানেন। আর যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী জ্যোতিকতত্ত্ববিদ্, তাঁহারা বাঙ্গালীর পঞ্জিকার পঞ্চাঙ্গের প্রধান অঙ্গদ্বয় তিথি ও নক্ষত্র এবং পঞ্চাঙ্গান্তর্গত ঔদয়িক গ্রহস্ফুট যাহা প্রতিদিনের তারিখের পার্শ্বে মুদ্রিত থাকে, তাহা নিয়ত পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐ তিথি ও নক্ষত্র এবং গ্রহস্ফুট ভ্রমসঙ্কুল। কোন কোন পঞ্জিকাকার এ কথা স্পষ্টবাক্যে স্বীকারও করেন, অথচ বাঙ্গালীর পঞ্জিকার সংস্কার হয় না, ইহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহের প্রণয়ন-ভার কতকগুলি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের হস্তে ন্যস্ত আছে, জনসাধারণ সংস্কার-প্রয়াসী হইলেও তাঁহারা সংস্কারের পক্ষপাতী নহেন। হয় ত তাঁহাদের ধারণা যে, তাঁহারা সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রানুসারে অর্থাৎ সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তরহস্য, দিনচন্দ্রিকা প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের পদ্ধতিক্রমে গণনা করিয়া থাকেন, এবং অঙ্ক শাস্ত্রানুবর্ত্তী গণনাতেও যখন কোন ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হয় না, তখন তাঁহাদের গণিত পঞ্জিকা ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ হইবে কেন? লোকেই বা সে আপত্তি উত্থাপন করে কেন? আমরা হিন্দু, যদি আমাদের শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে সেই শাস্ত্রানুসারে গণিত পঞ্জিকাও মানিতে হইবে। রক্ষণশীল ব্যক্তিগণও

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত এবম্বিধ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রচলিত পঞ্জিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই জন্যই আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী পঞ্জিকা-সংস্কারের পক্ষপাতী নহেন। পঞ্জিকার প্রদর্শিত তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহস্ফুটের সহিত গগনচারী গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান মিলুক বা না মিলুক, তাহাতে তাঁহাদের কিছুই যায় আসে না; শাস্ত্রানুসারে গণিত পঞ্জিকাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, গ্রহ-গতি চিরদিন সমান থাকে না, সুতরাং জ্যোতিষের গণনা সংস্কারসাপেক্ষ। এক বৎসর গগনের যে পথে সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ গমন করে, পরবর্ত্তী বৎসরে তাহাদের রথের চাকা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চাকার ঠিক দাগে দাগে যায় না, প্রতি-বৎসরেই ঈষৎ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই ব্যতিক্রমের ফলে দুই চারি বৎসরে বিশেষ কিছুই যায় আসে না; কিন্তু বহু বর্ষসঞ্জাত ব্যতিক্রমের ফলে গগনচারী সূর্য্য-চন্দ্রের অবস্থানের সহিত পঞ্জিকার গণনা মেলে না। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের প্রথিতযশা অধ্যাপক জ্যোতিস্তত্ত্ববিদ্ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঞ্জিকা-সংস্কার ও বঙ্গে জ্যোতিষ-মান মন্দির স্থাপনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

বহু দিন পূর্ব্বে একখানি ছিন্ন পঞ্জিকার ভূমিকায় দেখিয়াছিলাম যে, "গ্রহ দুই প্রকার;—দৃশ্য ও অদৃশ্য। গগনে যে গ্রহগণকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, তাহারা দৃশ্য গ্রহ, আর পঞ্জিকায় যে গ্রহগণের স্ফুট বা অবস্থান দেওয়া থাকে তাহারা অদৃশ্য গ্রহ। সুতরাং পঞ্জিকার গ্রহগণের সহিত গগনচারী গ্রহগণের কোন সম্বন্ধ নাই।" এবম্বিধ প্রলাপোক্তি তমসাচ্ছন্ন যুগে হয় ত শোভা পাইত! পঞ্জিকাখানি ছিন্ন এবং মাত্র ভূমিকার কয়েকটি পাতা আমি দেখিয়াছিলাম, সুতরাং ঐ পঞ্জিকার পরিচালকগণকে জানিতে পারি নাই। জ্যোতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থের নাম-পরিচায়ক প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেখিতে পাই যে, "বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্। সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।" ইহা কি লোক ভুলাইবার জন্য কথার কথা মাত্র? সাক্ষ্য দিতে হইলে, গগনচারী পরিদৃশ্যমান চন্দ্র-সূর্য্যকেই সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাঁহাদের সাক্ষ্যই একমাত্র প্রামাণ্য। পঞ্জিকার গণিত অদৃশ্য অর্থাৎ অপরিচিত চন্দ্র সূর্য্যের সাক্ষ্য কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে? আর এক শ্রেণীর পঞ্জিকাকার বলেন যে, পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই গ্রহণীয়। সন ১৩১৮ সালের পি, এম, বাকচীর পঞ্জিকার ভূমিকায় শারদীয়া মহাপূজায় মহামায়ার সন্ধিপূজার সময়নির্দ্দেশে তাঁহাদের গণনার অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন যে, "এ বৎসরেও সন্ধিপূজার যে সময় নিরূপিত হইল, তাহাতে গণনার কিছুমাত্র ভ্রম নাই। আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র বিশুদ্ধ সময় নির্দ্ধারিত হইল। দৃগ্‌গণিতৈক্যবাদী পাশ্চাত্য মতাবলম্বী শাস্ত্রবিরুদ্ধবাদী কতিপয় নব্যজনের যতই কেন আপত্তি উত্থাপিত হউক না, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সেই সকল আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া নির্ব্বিবাদে, নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের পঞ্জিকা-লিখিত সময়ে মহামায়ার সন্ধিপূজা সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে ধর্ম্মের হানি বা কিছুমাত্র প্রত্যবায় ঘটিবে না। তথা চ—যেনৈব পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন দুষ্যতি।" কিন্তু এত উপদেশ সত্ত্বেও সে বৎসর বঙ্গদেশের বহু স্থানে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে সন্ধিপূজা হয় নাই। তাঁহাদের ঐ অমূল্য উপদেশ পঞ্জিকা-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃকই গ্রহণীয় হইয়া থাকে ও হইবে। যাঁহারা পঞ্জিকা-তত্ত্ব অবগত আছেন ও হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই এবম্বিধ উপদেশে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না।

ভূগোল চিত্র, হিন্দু পপুলার য়্যাষ্ট্রনমি, তারা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা তারাদর্শক স্বর্গীয় কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাঁহার তারা গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "রাশি-বিদ্যা ও নক্ষত্র-বিদ্যা ঋষিগণের গৌরবের ধন ছিল, তমসাবৃত ভারতে সেই সব শাস্ত্রের গ্রন্থ মাত্রই বিলুপ্ত হইয়াছে। তারা-হারা হইয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা গ্রহগণের বর্ত্তমান গতি ও স্থিতি নিরূপণ বিষয়ে অপটু হইয়াছেন। প্রাচীন বচনোক্ত গ্রহগতির ও গ্রহস্থিতির বীজ (পার্থক্য) সংশোধন করিবার উপায় রহিত হইয়াছে। অগত্যা পঞ্জিকাকারগণ প্রাচীন বচনসাহায্যে যাহা গণনা হইতে পারে, তাহাই গণনা করিতেছেন। রচনা সময়ে প্রাচীন বচন অব্যর্থ ছিল বটে। কিন্তু গ্রহগতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। যুগযুগান্ত পরে এক বচন খাটিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ গণেশাচার্য্য বলিয়াছেন—ব্রহ্মসিদ্ধান্তে, বৃহস্পতিসিদ্ধান্তে, বশিষ্ঠসিদ্ধান্তে এবং কশ্যপসিদ্ধান্তে গ্রহগণের স্থিতি যথার্থতঃ নিরূপিত ছিল। কিন্তু কালবশে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কলির প্রারম্ভে পরাশরসিদ্ধান্ত (শঃ পূঃ ১৪৬৯) সত্য ফলপ্রদ ছিল। তৎপরে গ্রহগতির ব্যতিক্রম দৃষ্টে আর্য্যভট্ট (শঃ ৩৯৮) বীজ সংশোধনের পদ্ধতি স্থির করিয়া দেন। পুনরায় ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে দুর্গাসিংহ, মিহির (শঃ ৪২৬) প্রভৃতি বীজ সংশোধন করেন। তৎপরে জিষ্ণুপুত্র ব্রহ্মগুপ্ত (শঃ ৫২০) বীজ সংশোধন করেন। কেশবাচার্য্য (শঃ ১৩১৮) গ্রহগণের স্থিতি নিরূপণ করেন। ৬৫ বৎসর অন্তে তৎপুত্র গণেশ বীজ সংশোধন করিলেন। তদবধি বীজ-সংশোধন সমাপ্ত হইল। এখন পঞ্জিকাভেদে আজ এ বাড়ী কাল ও বাড়ী দেবার্চ্চনা ও একাদশী পালন হইতেছে। প্রাচীন বচনের শাসনে পূর্ণ অম্বুবাচীদিন অবহেলা করিয়া অদিনে অম্বুবাচী পালিত হইতেছে। মহাবিষুব সংক্রান্তিদিন ও জলবিষুবসংক্রান্তিদিন পালনের ত কথাই নাই। গ্রহণাদির লগ্নের বিশেষ তারতম্য ঘটিয়াছে।। কবিকল্পনা অসীম উন্নত উপমাক্ষেত্রে বিচরণে বিরত হইয়াছে। যে ধ্রুবতারা দর্শনে ঋষিগণ প্রতি সন্ধ্যায় দেহ পবিত্র করিতেন, সেই ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত এখন হিন্দু জাতির অপরিচিত হইয়াছে। সমাবর্ত্তনে ও বিবাহ-সংস্কারে—ভবদেব ভট্ট-ধৃত গোভিলবচনোক্ত—ধ্রুব ও অরুন্ধতী দর্শন রহিত করিতে হইয়াছে। অগস্ত্য অর্ঘদান পুরাবৃত্তের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তামসী নিশায় দিগ্বিদিক্-নির্ণয় ও রাত্রি-লগ্ন নিরূপণ করিবার ক্ষমতা ভারতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কৃষ্ণা রজনীতে বিলে পড়িলে বঙ্গনাবিক নৌ-নিগড়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেখিয়া শুনিয়া সুদূরদর্শী পুরাণকার

সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিলেন। কালের বিচিত্র গতি! পাশ্চাত্য শিক্ষাগুণে সুশিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় রীতি-নীতির সংস্করণের কল্পনা করিতেছেন। এমন কি, পারাবারে তরী ভাসাইবার কথাও উঠিতেছে। 'তারা' প্রচারের সময় আগতপ্রায় বোধ হইতেছে।"

সন ১৩১২ সালে 'তারা' প্রকাশিত হয়, তখনও তারা দর্শনে লোকের চিত্ত বেশী আকৃষ্ট হয় নাই; তজ্জন্য 'তারা'র প্রচার আশানুরূপ হয় নাই, তথাপি তারা দর্শক কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরু পরিশ্রম সহকারে জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোচনা করিয়া বীজ-সংস্কারের যে ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার মূল্য নিতান্ত কম নহে। পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৪ শত ৭ বৎসর পূর্ব্বে যে বীজ-সংশোধন হইয়াছিল, তদনুসারেই বর্ত্তমান কালের পঞ্জিকাকারগণ গণনা করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের গণনা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রানুমোদিত এবং গণিতশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুযায়ী, তথাপি উপযুক্ত বীজ সংশোধনের অভাবে এই সুদীর্ঘ কালে গ্রহস্ফুটে যে ৫৭ দিনের এবং তিথি ও নক্ষত্রের স্থিতি মানে ৫।৭ ঘণ্টার তফাৎ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

সন ১৩১৩ সালের বঙ্গবাসী পঞ্জিকার ভূমিকায় লিখিত আছে যে, "এবারে যেমন উদ্বেগ বহন করিতে হইয়াছে, পঞ্জিকার ব্যবস্থাদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি এমন আর কখনও হয় নাই।" উদ্বেগের কারণ কি, তাহা বলিতেছি; গত বর্ষের (১৩২২ সালের) দেবী-বোধন ও দেবী-বিসর্জ্জন ব্যবস্থার মীমাংসার জন্য কলিকাতায় 'বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভা'গৃহে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে সমবেত পঞ্জিকা-গণকগণের বাদানুবাদে বুঝিলাম,—কলিকাতার গণিত পঞ্জিকা সমূহের তিথ্যাদিমান কলিকাতা অঞ্চলের নহে,—উজ্জয়িনী হইতে ২ শত যোজন পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত কুমিল্লা অঞ্চলের। সুতরাং প্রচলিত পঞ্জিকা দেখিয়া কলিকাতা অঞ্চলের লোক ক্রিয়া-কলাপ করিলে অনেক স্থলেই তাহা পণ্ড হয়। আরও শুনিলাম যে, প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে যে গ্রহণ গণনা হয়, তাহা ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকার নকল—আমাদের গণনায় তাহা মিলে না। আরও শুনিলাম যে, এই মিল করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্যোতির্বিগণ যে যত্ন করিয়াছেন, বহুকাল সে যত্ন নাই। সেই কারণে নিয়ত গতিশীল গ্রহগণের অন্তর হয়,—তাহাতেই এই অমিল, অতএব এখন পুনর্ব্বার যত্ন করা উচিত। যন্ত্রে দেখিয়া যাহাতে তাহার সহিত মিল হয়, এইরূপে সংস্কার করা কর্ত্তব্য। রাঘবানন্দ প্রভৃতিও এই মিল করিবার জন্য বীজ-সংস্কার দিয়াছেন। এখন রাঘবানন্দ প্রভৃতির মতেই গণনা হয়,—বীজ-সংস্কারও আছে। কিন্তু মিলে না, সুতরাং পুনর্ব্বার সংস্কার প্রয়োজন। যন্ত্র দর্শনের সহিত যে গণনার মিল, তাহা 'দৃগ্‌গণিতৈক্য সংস্কার দ্বারা দৃগ্‌গণিতৈক্য' সাধন কর্ত্তব্য। ইহাই অনেকের মত। কেহ কেহ বলেন, 'দৃগ্‌গণিতৈক্য' আমাদের শাস্ত্রীয় মতে কখনও হইত না। কাছাকাছি হইত, তবে এখন তাহাও হয় না, তাহাতেও ভুল আছে। সেই ভুল সংশোধনের জন্য সংস্কার প্রয়োজন। যাহা হউক, প্রচলিত পঞ্জিকা যে অভ্রান্ত নহে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, অতএব সংস্কারের জন্য হিন্দুমাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ-সভা সে বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন; কিন্তু সে সংস্কার হইতে অন্ততঃ এক বৎসর লাগিবে।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ভূমিকা হইতে জানিতে পারি যে, "ইহার পর কয়েক বৎসর উল্লেখোপযোগী কোন কার্য্যই ব্রাহ্মণ-সভা করিলেন না। অবশেষে মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ মহাশয়ের উদ্যোগে মাননীয় মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, এস, আই, মহাশয়ের বিপুল অর্থ-সাহায্যে হাইকোর্টের মাননীয় জজ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে বঙ্গের সর্ব্ব বিভাগ হইতে আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা হইল। সভায় নিরূপিত হইল যে, পঞ্জিকা-সংস্কারার্থ উপযুক্ত সারণী প্রস্তুত হইবে এবং উপনীত ব্যক্তিগণের নির্ব্বাচনে সারণী সংগঠকগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইল। তদবধি এ পর্য্যন্ত বিষয়টি আর অগ্রসর হয় নাই।" কেন হয় নাই, তাহা জনসাধারণ জানিতে পারে নাই। বীজ-সংশোধন পদ্ধতির উপযুক্ত গ্রন্থাবলীর বিলোপ-সাধন অথবা অপ্রাচুর্য্যই কি ইহার কারণ? কে জানে? কিন্তু বঙ্গবাসী পঞ্জিকার পরিচালকবর্গ প্রচলিত পঞ্জিকা অভ্রান্ত নহে, জানিয়াও বার বৎসরেরও অধিককাল সেই ভ্রান্ত মতের সমর্থন করিয়া তাঁহাদের পঞ্জিকা প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হয় নাই এবং হিন্দু জনসাধারণকে দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে ভ্রান্ত মতে পরিচালিত করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন না?

বেলুড় মঠস্থ শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামীর বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমেত শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত সন ১৩১৬ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামীজী লিখিয়াছেন:—

"** হিন্দু জ্যোতিষের মূলতত্ত্বগুলিও পূর্ব্বে যথাসাধ্য মধ্যে মধ্যে শোধিত হইত। এখন তাহা আর করা হয় না। এগুলি যাহাতে পুনরায় পাশ্চাত্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে শোধিত হয়, তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তজ্জন্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ইংরাজী বেধালয় নির্ম্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।* * সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনা-প্রণালী পাশ্চাত্যগণনার সহিত মিল খাইবে না, তবে ইংরাজী বেধালয় হইতে দর্শনাদির দ্বারা সূর্য্যসিদ্ধান্তের বীজগুলি শোধিত হইতে পারে।" স্বামীজীর কৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রচার কিরূপ হইয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার উক্তি এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেও ফলপ্রসূ হয় নাই।

পূর্ব্বে বাজারে প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহের মধ্যে গণনায় পরস্পর মিল ছিল না। ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকখানি পঞ্জিকা যথা দে ব্রাদার্সের হিন্দুপ্রেস পঞ্জিকা, এন, এল, শীলের ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত কালাচাঁদের ফুল পঞ্জিকা ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মিলাইয়া দেখিলেই এ কথার সত্যাসত্য জানিতে পারা যায়। তখন পি, এম, বাক্‌চীর ও বঙ্গবাসী পঞ্জিকার জন্ম হয় নাই; পরে একখানি ক্ষুদ্র পঞ্জিকা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত, তাহাই পরবর্ত্তী কালে বঙ্গবাসী পঞ্জিকার আকার গ্রহণ করে। বর্ত্তমানকালে নানা কারণে কয়েকখানি পঞ্জিকার মধ্যে বেশ একটু মিল

দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের পরিচালকবর্গ যেন একটা যুক্তি করিয়াই গণনার কতকটা ঐক্য-সাধন করিয়াছেন, নতুবা ব্যবসায় চালান দায়! কেন না, ২।৩ খানি পঞ্জিকা যদি এক প্রকার হয়, তাহা হইলে সে গণনা ভ্রান্তিপূর্ণ হইলেও লোকের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে না। বরং তাহাদের সহিত অমিল অথচ নির্ভুল পঞ্জিকার প্রতিই লোকের সন্দেহ হয়। ইহাদের কেহ কেহ লোক ঠকাইবার আর এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পঞ্জিকায় ধূমকেতুর আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়া থাকেন, কোন ধূমকেতু চাক্ষুষ বা দূরবীক্ষণ যোগে দৃষ্টিগোচর হইলেই তাঁহারা তাঁহাদের পঞ্জিকায় গণনার বিশুদ্ধির কথা ভেরীনিনাদে ঘোষণা করিয়া হিন্দু-জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। যে হেতু প্রতি বৎসরই দুই চারিটি পরিচিত বা অপরিচিত, চাক্ষুষ বা দূরবীক্ষণিক ধূমকেতু আমাদের আকাশে আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহাদের বিবরণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বাহির হইয়া থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, হিন্দু-জ্যোতিষের কোন্ গ্রন্থের কোন্ স্থানে ধূমকেতুর কক্ষাসাধন ও তাহার স্পষ্ট আনয়নের গণনা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে? ঐ সকল পঞ্জিকার পরিচালকবর্গ এ কথার উত্তর দিবেন কি? আমরা জানি, ধূমকেতুর কক্ষাসাধন ও তাহার স্পষ্ট আনয়ন করিতে হইলে একমাত্র পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কেহ কেহ পঞ্জিকায় ভূমিকম্পের কথাও সন্নিবিষ্ট করিতে লজ্জা বোধ করেন না। হায় বাঙ্গালীর পঞ্জিকা!

গ্রহগতির বীজ পরিশোধিত বিশুদ্ধ সারণীর অভাবে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার পরিচালকবর্গ, পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকা হইতে দৃক্‌সিদ্ধ গ্রহস্ফুট গ্রহণ করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি সিদ্ধান্তশাস্ত্রানুমোদিত প্রথায়—যে প্রথায় বাঙ্গালার সমস্ত পঞ্জিকা গণিত হইয়া থাকে—গণনা করিয়া থাকেন। তথাপি বহু রুচিবাগীশ 'পাশ্চাত্য-সংশ্রয়-কলুষিত' বলিয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ব্যবহারে বিরত আছেন। তাঁহারা অসত্যপ্রচার ব্রতে ব্রতী সাধারণ পঞ্জিকা ব্যবহার করিয়া ধর্ম্ম ও পৈত্র্য কার্য্য লোপ-জনিত পাতক সঞ্চয় করিবেন, তথাপি সত্য-ফলপ্রদ পরিদৃশ্যমান চন্দ্র সূর্য্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন না। সন ১৩০১ ও ১৩০২ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার দীর্ঘ ভূমিকায় নাবিক পঞ্জিকা হইতে গ্রহস্ফুট গ্রহণ করিয়া পঞ্জিকা গণনা করার বিরুদ্ধে ও বাঙ্গালার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ এখানে তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল না, সুধী ও কৌতূহলী পাঠকবৃন্দ উক্ত পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সে আজ ৩৩।৩৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণই দেশের সর্ব্ববিভাগে, সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ইংরাজী শিক্ষিত দার্শনিক ও জ্যোতিবিদ্গণ, এমন কি, ইংরাজী শিক্ষিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিজ নিজ বিভাগের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মধ্যযুগের অশিক্ষিত পটু, রক্ষণশীল, সংস্কার-জ্ঞান-পরিবর্জ্জনকারী জগতের সহিত সম্বন্ধ-পরিশূন্য প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিগণের আলস্য-বিজড়িত ঔদাসীন্যের ফলেই ভারতের অবনতির সূচনা হইয়াছিল। তাঁহাদেরই কৃত কর্ম্মের ফলে হিন্দু জ্যোতিষের গণনা দৃক্‌সিদ্ধ করিবার বেধালয়—ভারতের মানমন্দিরগুলি পরিত্যক্ত হওয়ায়, আর্য্যঋষিগণের গৌরবের ধন রাশি-বিদ্যা ও নক্ষত্র-বিদ্যা দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ-প্রভাতে যখন উষার কনককিরণ দিকে দিকে প্রসারিত হইয়া সর্ব্ব-বিভাগের সংস্কারের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতেছে, তখন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের গৌরবের ধন জ্যোতিষশাস্ত্রের, তথা হিন্দুর নিত্য ব্যবহার্য্য দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যের একমাত্র সহায় পঞ্জিকার সংস্কার কেন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না? আমাদের বুধমণ্ডলীর মনোযোগ কি এ দিকে আকৃষ্ট হইবে না?

আমরা এই স্থানে কয়েকটি অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সন ১৩৩৪ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার গ্রহস্ফুটে দেখা যায় যে, ১৯শে কার্ত্তিক ৫ই নভেম্বর রবি ৬।১৮।২৬।২১ বুধ ৬।১৯।২১।৪৮ অর্থাৎ বুধ সূর্য্য হইতে ০।০।৫৫।২১ পূর্ব্বদিকে। ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নভেম্বর রবি ৬।১৯।২৬।৪৮ বুধ ৬।১৮।৩২।৫৭ অর্থাৎ বুধ সূর্য্য হইতে ০।০।৫৩।৫১ পশ্চিম দিকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৯শে কার্ত্তিক সূর্য্যোদয়ের পর হইতে ২০শে কার্ত্তিক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে কোনও সময়ে বুধ সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বুধ ঐ সময়ে বক্রগতি ক্রমে পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে গমন করিতেছিল। ঐ প্রকার গমনকালে যদি সম্ভব হইত, তবে ঐ দিন বুধকে সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগে দেখিতে পাওয়া যাইত। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় দেখা যায় যে, ২৪শে কার্ত্তিক ১০ই নভেম্বর রবি স্ফুট ৬।২৩।৫২।৩৯ বুধ স্ফুট ৬।২৪।০৩।৫৮ অর্থাৎ বুধ সূর্য্য হইতে ০।০।১১।১৯ পূর্ব্বদিকে। ২৫শে কার্ত্তিক ১১ই নভেম্বর রবি স্ফুট ৬।২৪।৫২।৫৮ বুধ স্ফুট ৬।২৩।৪।৩১ অর্থাৎ বুধ সূর্য্য হইতে ০।১।৪৮।০৭ পশ্চিমে। অতএব ২৪শে কার্ত্তিক সূর্য্যোদয়ের পরে বুধ সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে আসিয়াছে। যদি সম্ভব হয়, তবে ঐ সময়ে বুধকে সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগে দেখিতে পাইবার কথা। যশোহর হইতে আমরা এবং হুগলী ঘুটিয়া-বাজার হইতে দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাতা ধর ব্রাদার্সের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা অবসর-প্রাপ্ত সবজজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ধর এম-এ বি-এল মহাশয় দূরবীক্ষণ যোগে বুধকে ঐ দিন সূর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়া গমন করিতে দেখিয়াছিলাম। প্রাতে ঘ° ৮।৫৮।১ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকৃতি বুধ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সূর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়া গমন করিয়া অপরাহ্ণ ঘ° ২।২০।৫৮ সময়ে সূর্য্যমণ্ডল হইতে অপসৃত হইয়াছিল। এখানে রবি ও বুধের প্রকৃত স্ফুটে প্রচলিত পঞ্জিকার স্ফুটের সহিত পাঁচ দিনের তফাৎ।

সন ১৩৩৫ সালের বঙ্গবাসী পঞ্জিকার গ্রহস্ফুটে দেখা যায় যে, ২৬শে আষাঢ় মঙ্গল ০।১৪।১৪।২ বৃহস্পতি ০।১৪।৩৯।১৫ অর্থাৎ মঙ্গল বৃহস্পতি হইতে ০।০।২৫।১৩ পশ্চিমে এবং ২৭ আষাঢ় মঙ্গল ০।১৪।৫৫।২৯ ও বৃহস্পতি ০।১৪।৪৮।২২ অর্থাৎ মঙ্গল বৃহস্পতিকে অতিক্রম করিয়া ০।০।৭।৭ পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছেন। আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় দেখা যায় যে, ২০শে আষাঢ়

মঙ্গল ০।১২।৪২।২৩ ও বৃহস্পতি ০।১২।৪৪।৫৪ অর্থাৎ মঙ্গল বৃহস্পতি হইতে ০।০।২।৩১ পশ্চিমে এবং ২১শে আষাঢ় মং ০।১৩।২৪।৫৭ ও বৃহস্পতি ০।১২।৫৪।১৭ অর্থাৎ মঙ্গল বৃহস্পতিকে অতিক্রম করিয়া ০।০।৩০।৪০ পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। এখানে মঙ্গল ও বৃহস্পতির প্রকৃত স্ফুটের সহিত প্রচলিত পঞ্জিকায় প্রদর্শিত স্ফুটে ছয় দিনের তফাৎ। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের যুতি বা একই বিষুবাংশে অবস্থান একটি প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। ২০শে ও ২১শে আষাঢ় শেষ রাত্রিতে আমরা অনেকেই উহা দেখিয়াছিলাম। ২৬শে ও ২৭শে আষাঢ় মঙ্গল বৃহস্পতি হইতে বহুদূরে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিল। বৃষরাশিস্থ অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ "হলদ্দীবরণ" নামক তারাটি রোহিণী নক্ষত্রের যোগতারা। ঐ তারাটি চন্দ্রের গমনপথের প্রায় উপরে অবস্থিত, এবং সময়ে সময়ে চন্দ্র কর্ত্তৃক ঐ তারাটি আবরিত হইয়া থাকে, চন্দ্রের সহিত রোহিণীর সম্বন্ধসূচক বহু আখ্যায়িকা বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। সুতরাং ঐ তারাটি বাঙ্গালার বহু নর-নারীর নিকট সুপরিচিত, আমরা চন্দ্রকর্ত্তৃক ঐ তারাটি আবৃত হওয়া—ইহা একটি চাক্ষুষ পরিদৃশ্যমান ঘটনা, ইহা দেখিতে দূরবীক্ষণের আবশ্যক হয় না—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রচলিত পঞ্জিকায় প্রদত্ত চন্দ্রের স্ফুট ভ্রমসঙ্কুল। যদি প্রচলিত পঞ্জিকায় প্রদত্ত সূর্য্যের ও চন্দ্রের স্ফুট ঠিক না হয়, তাহা হইলে সূর্য্য ও চন্দ্রের স্ফুটের অন্তর—তিথি—এবং চন্দ্র গ্রহ বা নক্ষত্র যাহা প্রচলিত পঞ্জিকায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহার স্থিতিমান কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র (এম-বি, এ, এ)।

কি দিব ?

চয়ন করিয়া আনিব কি প্রভু,
হেম-চম্পক-দলে ?
উজারিয়া সাজি ঢালিব কি আজি
রাতুল চরণতলে ?

আহরণ করি' আনিব কি প্রভু
বিকচ কমল-মধু ?
কি নামে ডাকিব, কি দিয়ে পূজিব,
ব'লে দাও তুমি শুধু।

ইন্দ্রধনুর বরণ মধুর
হবে কি তোমার প্রিয় ?
তোমার ভুবনে, আমার ভবনে,
যা আছে সকলি নিও।

সৌর-কিরণে জল-দল-লীলা,
আনিব কি শোভা তা'র ?
ধরণী-ধূলিতে লুটে কি পড়িব
নামাতে হৃদয়-ভার ?

তটিনীর সাথে ছুটে কি চলিব
অকূল জোয়ার টানে ?
বাজাব কি বীণা বরষা-নিশায়
মেঘ-মল্লার তানে ?

কুসুম-ভূষণ মধু উপবন
তুমি কি গো ভালবাস ?
বিরহ-শয়নে রজনী জাগিলে,
তুমি কি নিকটে আস ?

চাঁদের জোছনা, মলয়-পরশ,
আনিব কি চুরি করি' ?

নিতি-নিরমল রঞ্জ-বধূ-প্রেম
ল'ব কি মরম ভরি' ?

গোধূলির রাগ, ধ'রে কি রাখিব
উষার রঙিন হাসি ?
সুনীল-গগনে তারকার মালা
তুমি কি লইবে আসি ?

দীন-হীন-জনে দয়া কি করিব,
মুছাব নয়ন-বারি ?
শিশুর সোহাগে জননীর চুমা,
তোমারে কি দিব ডারি ?

কাঁখে হেম-ঝারি যাইব কি আমি
আনিতে যমুনা-জল ?
দোল-রজনীতে আবিরে রাঙিব
প্রেমাবেশে ঢল ঢল ?

ভুবন-ভুলান বন্দনা-গান
গাহিব কি ছায়ানটে ?
নব-জলধর শ্যামসুন্দর
আঁকিব হৃদয়-পটে ?

পূজারিণী হয়ে ধূপ-চন্দনে
পূজিব আসনে বসি'
অথবা ধেয়ান মিলনানন্দে
হেরিব বদন-শশী ?

অনলে অনিলে পূজিব কি তোমা'
অথবা ধরণীতলে ?
মুকুতা-মালায় চরণ সাজাব
অথবা নয়ন-জলে ?

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

বিষব্যাপ্তির অভিনব উদ্ভাবন

শত্রুদিগের মধ্যে অতি সহজে বিষাক্ত গ্যাস পরিচালিত করিবার মানসে ফরাসীরা অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে।

বিষাক্ত গ্যাসবাহী মোটর সাইকেল

এমন একরূপ মোটর সাইকেল নির্ম্মিত হইয়াছে—যাহার পার্শ্ব দেশে বিষাক্ত গ্যাসের একটা প্রকাণ্ড আধার সংন্যস্ত আছে। সংপ্রতি ইহার কার্য্যকারিতার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

গুপ্ত বিছানা

শয্যাবাহী মোটর

অধুনা মোটর গাড়ীর মধ্যে মটরকার সঙ্গে বিছানা লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রয়োজনকালে পাতিয়া লওয়া চলে। পর্য্যটক ও ডাক্তারগণের পক্ষে এরূপ শয্যাবাহী মোটর খুবই প্রয়োজনীয়।

বস্ত্রনির্ম্মিত জলাধার

পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণের বস্ত্রাবাসে এমন একরূপ জলাধার ব্যবহৃত হয়, যাহার মধ্যে অনেকগুলি লোক একই সময়ে সাঁতার
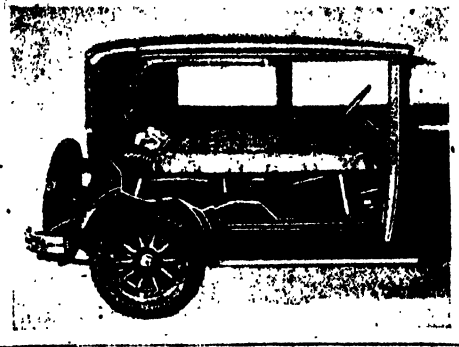
স্নানের কৃত্রিম জলাধার

কাটিয়া স্নান করিতে পারে। এই জলাধারটি কেম্বিশ বস্ত্রে নির্ম্মিত, খুব হালকা, অতি সহজেই উহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া চলে এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই উহাকে যে কোন স্থানে পাতা যায়।

"ফোন"—তরু

লণ্ডনে এক দল টেলিফোন-চালক টেলিফোন যন্ত্রের "তার-তন্তু"গুলিকে একটি অভিনব প্রণালীতে এমনই ভাবে একত্র

"ফোণ"—তরু

বিন্যস্ত করিয়াছে যে, ঐ গুচ্ছাকার যন্ত্রটিকে দেখিলে উহাকে একটি তরু বলিয়া বোধ হয়। এই ফোন-তরুতে সর্ব্বশুদ্ধ দুই হাজার জোড়া তার বিন্যস্ত আছে।

তিন চাকার মোটর গাড়ী

জর্ম্মাণীর বার্লিন সহরে একরকম তিন চাকার মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহাতে চালককে লইয়া পাঁচ জন অনায়াসে
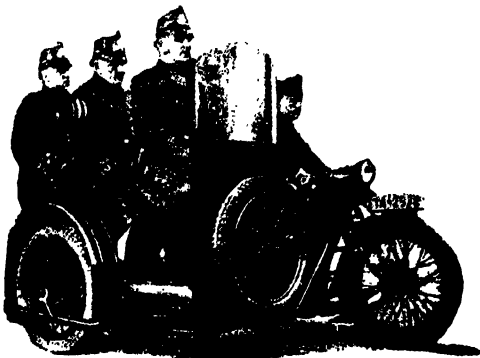
তিন চাকার মোটর

বসিতে পারে। পুলিস বিভাগেই ইহার ব্যবহার চলিতেছে। ইহা দ্রুতগামী, সহজে বহনীয় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী।

বিচিত্র নৌকা

এমন একরূপ নৌকা উদ্ভাবিত হইয়াছে—যাহাকে ভাঁজ করিয়া একটি ক্ষুদ্র গাঁঠরিতে পরিণত করা চলে। আবার দুই মিনিটের মধ্যেই ইহাকে বিস্তৃত করিয়া একখানি নৌকায় পরিণত
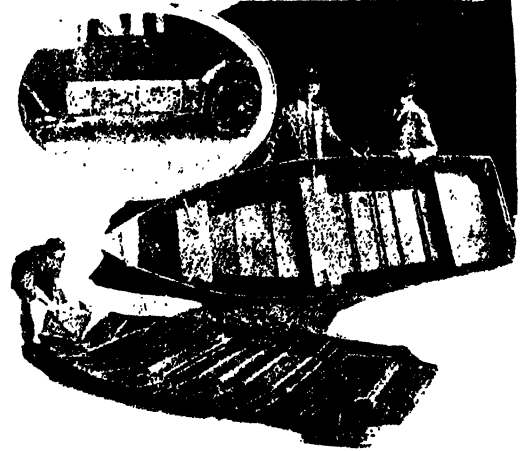
ভাঁজ করা নৌকা

করা যায়। মেহগনি কাঠের টুক্‌রা ও জলনিবারক বস্ত্রে ইহা নির্ম্মিত। ইহার ওজন ৫০ সেরেরও কম। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন ফুট। ইহাকে ব্যবহার করিতে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বহির্দ্দেশ হইতে মোটর সংযোগ করিয়াও ইহাকে পরিচালিত করা যায়।

এক হস্তে বন্দুক পরিচালন

বন্দুক হস্তে টম্‌সন

দ্রুত বন্দুক ছুড়িবার নৈপুণ্যের জন্য টি, টমসন বৃটিশ সমর আফিস হইতে ১৫ হাজার শিলিং পুরস্কার পাইয়াছেন। এই বন্দুক দেখিতে রিভল্‌ভারের মত এবং পর পর দুইবার আওয়াজ হয়।

অশ্রু-গ্যাস

নিউ ইয়র্ক সহরের পুলিস এখন এমন একরকম গ্যাস ব্যবহার করিতেছে—যাহার সাহায্যে অপরাধীরা অনায়াসেই ধৃত হই-

পুলিসের হাতে গ্যাসপূর্ণ দণ্ড

তেছে। পুলিসের হাতে সাধারণ আকারের লাঠির মধ্যে অতি কৌশলে ঐ গ্যাস পুরিয়া রাখা হয়। অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া আবশ্যকমত উহাকে নিঃসৃত করা চলে। উহাতে অপরাধীর নয়নে জলোদ্গম হয়। এই জন্য ইহাকে "অশ্রু-গ্যাস" বলে।

কুকুরের শিক্ষালয়

কুকুর দ্বারা পুলিসের কার্য্যে সহায়তা লইবার নিমিত্ত কুকুরকে

কুকুর শিক্ষাগারে নীত হইতেছে

শিক্ষিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে. এই অভিপ্রায়ে কুকুর-শিক্ষার নিমিত্ত একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা কুকুরের প্রকৃতি এবং অপরাধীদিগের কার্য্যকৌশল অবগত আছেন, এমন সকল ওস্তাদ ধরণের ব্যক্তিই ঐ শিক্ষালয়ে শিক্ষাদানের ভার লইয়াছেন। শিক্ষাপ্রদানকালে কুকুর কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, এই জন্য এক জন শিক্ষক মোটা জামা পরিধান করিয়াছেন।

সুবিরাট অর্ণব-যান

জার্ম্মাণীর বার্লিন সহরে "রোমার" নামক একখানি সুবিরাট অর্ণব-যান নির্ম্মিত হইয়াছে। কারখানা হইতে চাকার উপর গড়াইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার একটা চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল।
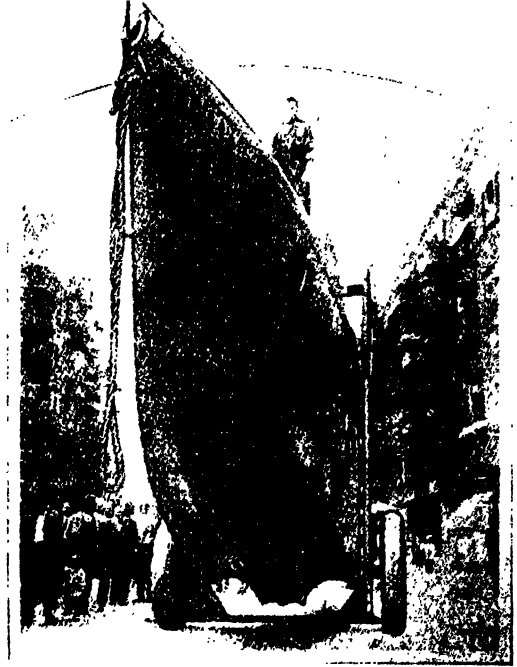
প্রকাণ্ড জাহাজ

এই যানে তিনটি মোটর সংযুক্ত। এই কল তিনটির সমবেত শক্তি ৭ হাজার ২ শত অশ্ব-শক্তির সমান। এই যানের পার্শ্বস্থ কক্ষে দুই হাজার গ্যালনেরও অধিক "গ্যাস" সংরক্ষিত হইতে পারে। ইহা কোন একটি কেন্দ্র হইতে আড়াই হাজার মাইলের ব্যাসার্দ্ধ পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ।

পরিধেয় আলোক

একরূপ তাড়িত-আলোক উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহা শিল্পিগণ মস্তক-বেষ্টনীর সঙ্গে পরিধান করিয়া থাকে। একটা স্বতশ্চল তাড়িত-যন্ত্রের সহিত ঐ আলোক সংযুক্ত। উহার জন্য স্বতন্ত্র

ভাবে কোনরূপ ব্যয় বহন করিতে হয় না। আলোকযুক্ত বেষ্টনী মাথায় পরিধান করিলে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই; পরিধানেও উহা বেশ সুখকর। শিল্পিগণ কোন শিল্পকার্য্যে

আলোর সাহায্যে চাকার বেড় বদলানো হইতেছে

ব্রতী হইলে দ্রব্যাদির উপর শিল্পীর মাথা হইতে সুন্দর আলোক আসিয়া পড়ে, অথচ আলোক ধরিয়া রাখিবার জন্য শিল্পীকে তাহার হাত জোড়া রাখিতে হয় না। ইহাতে তাহার কায-কর্ম্ম করিবারও খুব সুবিধা হয়। শিল্পী ইচ্ছা করিলে যত্র-তত্র আলোক নিপাতিত করিতে পারে।

একাধারে টেব্‌ল্ ও ডেস্ক্

ছেলেদের জন্য এমন ডেস্ক উদ্ভাবিত হইয়াছে—যাহাকে যুগপৎ টেবল ও ডেস্করূপে ব্যবহার করা চলে। উহার সহিত ছবি

বহুরূপী ডেস্ক

আঁকিবার 'বোর্ড', 'ছবির আদর্শ' এবং অন্যান্য দ্রব্যও সন্নিবেশিত আছে। সেগুলি ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করা চলে। ইচ্ছামত উহাকে উঁচু-নীচু করিয়া পাতা যায়। উহার এক দিকে এক-খানি প্লেট আছে; তাহাতে ছবি আঁকিবার রং প্রভৃতি রাখা বা নক্সা আঁকা চলে। তখন ডেস্ক অংশটি সরাইয়া উহাকে টেবল্‌রূপে ব্যবহার করা যায়। নক্সাগুলি গুটান আকারে উহার সহিত সংযুক্ত আছে; ইচ্ছামাত্রই উহাকে অতি সত্বর পরিবর্ত্তিত করা যায়।

—

পুলিসের শিরস্ত্রাণে আলোক

ইংলণ্ডের পথে যে সকল পুলিস যানাদির নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাদিগকে একপ্রকার নূতন আলোক দেওয়া হইয়াছে। উহা কতকটা খনিতে ব্যবহৃত আলোকের মত। রাত্রিতে বা

আলোকযুক্ত শিরস্ত্রাণধারী পুলিস

কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে পথিকগণকে পরিচালিত করিবার পক্ষে এই আলোক অতীব প্রয়োজনীয়। পুলিসের কোমরে যে তাড়িত-যন্ত্র থাকে, তাহা হইতে তাড়িতস্রোতে ঐ আলোক প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। শিরস্ত্রাণ হইতে ঐ আলোকধারা নির্গত হয়।

অভিনব চলৎযান

চলৎযানে শিশুকে বসাইয়া লইবার এমন ব্যবস্থা ইদানীং হইয়াছে যে, তাহার মাকে আর সে জন্য বিব্রত হইতে হইবে না। শিশুর বসিবার স্থানটি যান-চালকের একবারেই পার্শ্বে।

তাহাতে সে বেশ ঠিকভাবে বসিতে পারে ; ইহা ছাড়া, তাহার কোমর ও বুকে "বন্ধনীর দ্বারা" আট্‌কানো হয়। ছোট ছোট

নিরাপদে শিশু বসিয়া আছে

ছেলেদের লইয়া বেড়াইবার পক্ষে এইরূপ যানগুলি বড়ই প্রয়োজনীয়।

পুলিসের পাদক্ষেপ-পরীক্ষা

নির্দ্দোষ পাদক্ষেপ সকলের পক্ষেই, বিশেষতঃ পুলিসের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ; কেন না, পুলিসকে সরকারী কাযের সময়

যন্ত্রে পুলিসের পরীক্ষা

অধিকাংশ সময় পায়ের উপরেই থাকিতে হয়। সংপ্রতি পদ-বিজ্ঞানে বিশারদ এক ব্যক্তি বিশেষ ধরণের "ট্রেড মিল" যন্ত্রে পুলিসকে পরীক্ষা করিবার পাদ-চারণায় অনেক ক্রটি বাহির করিয়াছেন। ট্রেড-মিল যন্ত্র পায়ে মাড়াইয়া চালিত করিতে হয়।

উড্ডীয়মান দোল্‌না

ছেলেদের স্ফূর্ত্তির জন্য এরোপ্লেনের মত উড্ডীয়মান দোল্‌না উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই দোল্‌নার চারি মোড়ে শিকল সংযুক্ত, এই কারণে ইহা হইতে ছেলেদের গড়াইয়া পড়িবার ভয় নাই। ইহাতে তিনটি ছোট ছোট ছেলে একই সময়ে চড়িতে পারে।

নূতন দোল্‌না

দোল্‌নাটি দেখিতে ঠিক একটি উড়ো-জাহাজের মত। ইহার ঠিক সম্মুখভাগে একটি চালন-চক্র আছে। উহার সাহায্যে উহা আপনা আপনি দুলিতে থাকে। চালনচক্রের ডানাগুলি কাঠের। দেহটা ৪ ফুট লম্বা ; চালকের সম্মুখে ও পশ্চাতে এক জন করিয়া বসিতে পারে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই যন্ত্রটিকে খাটানো যায় এবং বাহিরে লইয়া যাইবারও অসুবিধা নাই।

সন্তরণে "রবার"-নল

বায়ুপূর্ণ এমন সকল রবার-নল আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা দেহে জড়াইয়া সাঁতার দিলে, যে সাঁতার দেয়, তাহার কোন অসু-

রবার-নলে সজ্জিত সন্তরণকারিণী
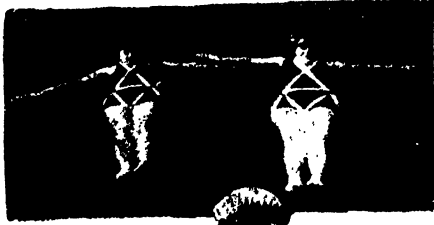
বিধাই ঘটে না। যাহারা প্রথমে সাঁতার দিতে শিখিতেছে, এই নল তাহাদের খুবই সাহায্য করিতে পারে। ইহা অতি শীঘ্রই পরিধান করা এবং খুলিয়া ফেলা যায়।

কাঠের ঘোড়ায় সাগর পার

এমন জল-যান উদ্ভাবিত হইয়াছে—যাহার উপর দুইটি কাঠের ঘোড়া নির্ম্মিত আছে। দুইখানি তক্তার উপর দুইটি অশ্ব।

ঘোড়ার নৌকা

প্রত্যেক অশ্বের উপর দুইটিরও অধিক লোক বসিতে পারে। কোন এক জন আরোহী তার কেন্দ্র ঠিক রাখিয়া দুইটি ঘোড়ার পিঠে দুই পা রাখিয়াও চলিতে পারেন। রোমকরা সত্যকার দুইটি অশ্বের উপর দুই পা রাখিয়া চলিতেন। এইখানে মোটর সংযোজিত আছে এবং ইহা তরঙ্গের উপর দিয়া অতি দ্রুত যাইতে পারে।

অগ্নি-নির্ব্বাপকের রবারের পোষাক

সমুদ্র-কূলে জেটীর নিকটে যাহারা অগ্নি-নির্ব্বাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের জন্য একপ্রকার রবারের পোষাক উদ্ভাবিত

রবার-পোষাকধারী ব্যক্তি

হইয়াছে। এই পোষাক পরিলে দেহ শুষ্ক অথচ ঠাণ্ডা থাকে। সমুদ্রে পড়িয়া গেলেও এই পোষাকধারী ব্যক্তি ডুবিয়া মরে না। সংপ্রতি ইহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।
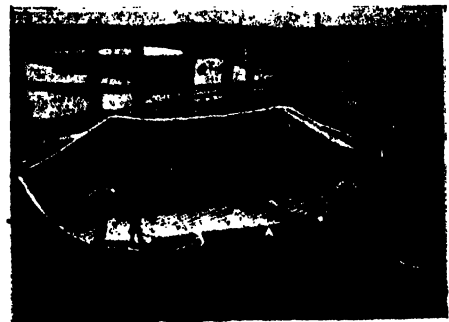
বায়ুপূর্ণ নৌকা

বায়ুপূর্ণ নৌকা

সংপ্রতি জার্ম্মাণীতে একরূপ নৌকা উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহা

বায়ুপূর্ণ হইলে নৌকার আকার ধারণ করে এবং তখন উহাতে চড়িয়া জলবিহার করা চলে। বায়ু নিষ্কাশিত হইলে, উহা এত ছোট হইয়া যায় যে, তখন উহাকে বোচ্‌কায় লইয়া যাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত উহার উপরে এমন একটা জলনিবারক আবরণ আছে, যাহার সাহায্যে আরোহী রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

আনারসী জলাধার

হনোলুলু নামক স্থানের ক্যানিং প্ল্যাণ্টে জল-প্রোক্ষণের নিমিত্ত একরূপ অদ্ভুত জলাধার ব্যবহৃত হইতেছে। ক্ষেত্রজাত

আনারস-ট্যাঙ্ক

ফসলের প্রচার-কল্পে কোম্পানী জলাধারটিকে একটা আনারসের আকারে গঠিত করিয়াছেন। এই জলাধারে লক্ষ গ্যালন জল ধরে; ইহা উচ্চে ৬৪ ফুট; ইহার লৌহনির্ম্মিত চূড়াটি ১ শত ৩৫ ফুট দীর্ঘ। এই কারণে সহরের প্রায় যে কোন স্থান হইতেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ওজন ১ হাজার ৫ শত মণেরও অধিক।

ফোনের মধ্যে ফটোর কল

টেলিফোনের মধ্যে ফটো

প্রতীচ্য দেশীয় এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি এমন একরূপ টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, উহার সাহায্যে গতিশীল ব্যক্তিবর্গের ফটো তোলা যাইবে, অথচ যাহার বা যাহাদের ফটো লওয়া হইবে, সে বা তাহারা তাহা জানিতে পারিবে না। পরীক্ষার জন্য ৮৫ ফুট দূর হইতে ফটো তোলা হইয়াছে। সমুদ্রতীরে যে সকল দস্যু-তস্কর উপদ্রব করে, ইহার সাহায্যে তাহারা ধৃত হইবে।

সনেট-সুন্দরী

থমকি দাঁড়ালে কেন সনেট-সুন্দরী
অর্দ্ধ-বিকশিত অয়ি চতুর্দ্দশী বালা?
অকস্মাৎ কাছে এসে নূপুর গুঞ্জরি'
দাঁড়াইলে নতমুখে হাতে পুষ্পমালা!
এ কি তব মুখখানি সুন্দর কোমল
আঙ্গুরের মত আহা মধুর! মধুর!
এ কি তব চোখ দুটি রসে ঢল ঢল্
পুষ্পিত কোমল তনু গন্ধ ভরপুর!

চরণে সঙ্কোচ তব অধরেতে হাসি
ললাটে উজ্জ্বল আভা সলজ্জ সুন্দর।
তোমারে হেরিয়া মোর জীবনের বাঁশী
বিচিত্র সঙ্গীতরূপে কাঁপে থর থর।
ফিরিও না হে কিশোরী, আমি দিব মালা
প্রথম প্রণয়মুগ্ধ চতুর্দ্দশী বালা!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

নবদুর্গা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল

বাসায় গিয়া পাক-শাকের ব্যবস্থা করিতে, আহারাদি শেষ করিতে, বেলা ২টা বাজিয়া গেল। আহারান্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিলেন।

স্বামীর সহিত মোহান্ত মহারাজের সদয় ব্যবহারে ভগবতী দেবীও অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারও মনে আশা জন্মিয়াছিল, যদি মোহান্তকে ধরা যায়, তবে বোধ হয়, তিনি অনায়াসেই নবদুর্গার জন্য একটি সুপাত্র স্থির করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার জমীদারীতে গ্রামে গ্রামে কত ব্রাহ্মণ-প্রজা রহিয়াছে, কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই কত ব্রাহ্মণ-সন্তান আছে, গাঁই-গোত্রে মিলিয়া যায়, এমন কাহাকেও যদি তিনি ইঙ্গিত করেন, তবে বোধ হয়, সে এখনই নবদুর্গাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়। অতি রূপবতী কন্যা দুর্ভাগা হইয়া থাকে, ইহা যদি সত্যও হয়, তবে মোহান্ত মহারাজের আশীর্ব্বাদে এবং বাবা কেদারেশ্বরের কৃপায় সে অমঙ্গল কাটিয়া যাইতেও পারে।

নবদুর্গা পিতার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার আহার সমাপ্ত করিয়াছিল, সে পিতার পদসেবা করিতে লাগিল, ভগবতী দেবী স্বামীর পাতে প্রসাদ পাইয়া ঘরের এক পার্শ্বে মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

বেলা তখন ৫টা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া মুখে হাতে জল দিয়া বাহিরের বারান্দায় বসিয়া তামাক সাজিতেছিলেন। ভগবতী দেবী কন্যাসহ তখনও নিদ্রিতা। সারি সারি দুই ধারে যাত্রি-বাড়ী—মধ্যে পথ। তামাক সাজিতে সাজিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, ভদ্রবেশধারী এক ব্যক্তি ধীর-মন্থর-পদে এই দিকেই আসিতেছেন।

নিকটে আসিয়া সেই লোকটি দাঁড়াইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পানে চাহিয়া বলিল, "এই যে, আপনি এইখানে বাসা করেছেন বুঝি?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে চিন্‌তে পারছিনে যে!"

লোকটি বলিল, "আমিই কি আপনাকে চিন্‌তাম ঠাকুর? আজই আশ্রমে আপনাকে প্রথম দেখ্‌লাম। আপনি ও-বেলা সুফল নিতে গিয়েছিলেন ত? মহারাজ আপনার সঙ্গে ব'সে কথাবার্ত্তা কইছিলেন, সেই সময় আপনাকে সেখানে দেখেছিলাম। আমি রাজবাড়ীর এক জন কর্ম্মচারী কি না!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ওঃ—বেশ বেশ। মশায়ের নাম?"

"আমার নাম শ্রীমাণিকলাল দাস ঘোষ। কায়স্থ আমরা।"

"নিবাস?"

"উপস্থিত এই গ্রামেই। আমরা তিন পুরুষ ধ'রে রাজ-বাড়ীর অন্নে প্রতিপালিত। আমার পিতামহের নিবাস ছিল ২৪ পরগণার খলসেপুর গ্রামে। তিনিই তীর্থ করতে এসে তখনকার মোহান্ত মহারাজের সুনজরে প'ড়ে যান। ঠাকুর্দ্দাকে মহারাজ চাকরী দিয়ে, জমী-জিরাৎ দিয়ে এই গ্রামে বাস করিয়েছিলেন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বেশ বেশ। তামাক প্রস্তুত—আসুন না, একটান খেয়ে যান!"—তাঁহার আসল উদ্দেশ্য আতিথেয়তা বা সৌজন্য প্রকাশ নহে—কন্যার বিবাহের একটা কিনারা করিয়া দিবার জন্য মোহান্তকে যদি ধরা যায়, তবে সুফলের আশা কতদূর, তাহাই অবগত হওয়া।

মাণিকলাল এই আমন্ত্রণ অবহেলা করিল না, বারান্দায় উঠিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পার্শ্বে বসিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কায়েথের হুঁকো আর এখানে কোথায় পাব? একখানা কলাপাতা এনে দিই'।"—বলিয়া তিনি ভিতরে গিয়া

ও-বেলা বাজার হইতে আনীত কলাপাতা হইতে খানিকটা কাটিয়া আনিয়া মাণিকলালের হাতে দিলেন। তার পর নিজে কিঞ্চিৎকাল ধূমপান করিয়া "খান" বলিয়া কলিকাটি মাণিকের হাতে দিলেন।

মোহান্ত সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। মাণিক বলিল, "ভট্টচায মশায়, আমাদের মহারাজ যে আপনাকে কি চোখে দেখেছেন, তা বলতে পারিনে। ও-বেলা আপনি চ'লে এলে বলতে লাগলেন, 'ওহে, লোকটি অতি সজ্জন, যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই বিনয়ী। আহা, বেচারী বড় গরীব, মেয়েটির বিয়ে দিতে পারছেন না, কন্যাদায়ে ব্রাহ্মণ বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন—ওঁর অবস্থা শুনে ভারি দুঃখ হ'ল।"

এ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বিব্রত ব'লে বিব্রত মশাই! মেয়ের বিয়ের ভাবনায় মুখে অন্ন-জল রোচে না, রাতে ঘুম হয় না; কি মনের কষ্টে যে আছি, তা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন।"

মাণিক বলিল, "মহারাজ বল্লেন, ওঁর কি উপায় একটা করি, ভেবে-চিন্তে দেখবার জন্যেই কাল ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবার অছিলায় ওঁকে আটকে রেখেছি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "উনি মনে করলে এক দণ্ডেই আমায় কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। তা করবেন কি দয়া ক'রে? যদি করেন ত গরীব ব্রাহ্মণের বড়ই উপকার করা হয়।"

মাণিক কলিকাটি কলাপাতার নল হইতে খুলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে দিয়া আপন মনে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য তাহার এই মুখভাব লক্ষ্য করিয়া ঔৎসুক্যপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসছ যে, ভায়া?"

মাণিক বলিল, "উপায় একটা তিনি স্থির করেছেন। তাই বলতেই ত আমার আসা। শুধু কন্যাদায় থেকে উদ্ধার নয়, আপনার দারিদ্র্য-মোচনেরও একটা উপায় তিনি স্থির করেছেন।"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুকখানা দশ হাত হইল। মনে মনে বলিলেন, "জয় বাবা সত্যনারায়ণ! সকলই তোমার দয়া।"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "কি রকম? কি রকম? পাত্র একটি স্থির করেছেন কি? কি রকম পাত্র, তুমি তাকে দেখেছ কি, মাণিক ভায়া? বংশটি ভাল ত?"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "সব কথাই শুনবেন, অত উতলা হচ্ছেন কেন, ঠাকুর? এ বেলা, ঘুম থেকে উঠে মোহান্ত মহারাজ আমায় ডেকে পাঠালেন; যদিও চাকর-মনিব সম্বন্ধ, তবুও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ব্যাভার করেন। আমি তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, মহারাজ বিছানার উপর উঠে ব'সে আছেন। একখানা চেয়ার টেনে বিছানার কাছে আমায় বস্‌তে বল্লেন। তার পর আপনার মেয়ের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে গোপনে অনেক পরামর্শ করলেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরামর্শে কি স্থির হ'ল?"

মাণিক বলিল, "আঃ, এ বারান্দায় রোদ্দুর এসে পড়লো যে! এক কায করবেন? চলুন না দু'জনে একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্! বেড়াতে বেড়াতে সব কথাই আপনাকে বলবো এখন।"

ভট্টাচার্য্য অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, তাই চলুন তবে। চাদরখানা ছড়িটে নিয়ে আসি।"

বারান্দা হইতে উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণী কখন্ গাত্রোত্থান করিয়াছেন, দ্বারের পার্শ্বেই বসিয়া আছেন—সম্ভবতঃ ইঁহাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত শুনিয়াছেন। স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "বেরুচ্ছ?—ফিরতে যেন দেরী কোর না।"

"না, একটু ঘুরে ফিরে শীগ্‌গিরই ফিরে আসবো।"—বলিয়া তিনি দড়ির আলনা হইতে নিজ উত্তরীয় এবং ঘরের কোণ হইতে বাঁশের ছড়িটি লইয়া বাহিরে গেলেন।

যাত্রি-বাড়ীগুলি পার হইয়া, বাজারের ভিতর দিয়া ক্রমে তাঁহারা মন্দিরের নিকট পৌঁছিলেন। মন্দিরের নিকটেই কেদারগঙ্গা নামক দীর্ঘিকা—উহার তীরে তীরে দুই জনে অগ্রসর হইয়া, ক্রমে নির্জ্জন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দীঘির অপর প্রান্তে আম্রকানন—ক্রমে উভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজের কি পরামর্শ হ'ল, সেটা এইবার বল; এ স্থান ত বেশ নির্জ্জন।"

মাণিক বলিল, "মহারাজ বল্লেন, লোকটি বড় গরীব, ওঁকে কিছু জমীজিরাৎ দিয়ে, এই গ্রামে বসবাস করালে হয় না? আমি বল্লাম, এ ত ভাল প্রস্তাব! ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠার তুল্য পুণ্য কি আর আছে? তিনি বল্লেন, শ'খানেক বিঘে লাখরাজ জমী দিলে, বোধ হয় ওঁর আর কোনও কষ্ট থাকে না। কি বল, অ্যাঁ? আমি বল্লাম, তার কমে কি আর হয়? তিনি বল্লেন, হ্যাঁ, কেদার

"* * * সে চুম্বন, সে প্রেম-সঙ্গম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝঙ্কারসম, সে ত মোর নহে।"—রবীন্দ্রনাথ

বসুমতী প্রেস।

গঙ্গার উত্তর ধারে যে জমীগুলো আমার খাসে আছে—একশো বিঘের উপরই হবে বোধ হয়,—সেই জমীগুলো আমার আর খাসে রাখবার ইচ্ছে নেই—ঐগুলো রীতিমত দানপত্র লিখে, রেজিষ্টারি ক'রে ওঁকে দিলে হয়। আর, বৃত্তিও একটা নির্দ্ধারিত ক'রে দেওয়াও ত আবশ্যক? আমি বল্লাম, তা না হ'লে আর কি ক'রে চলবে? তিনি বল্লেন, কত? মাসে গোটা পঁচিশ,—না ত্রিশ? আমি বল্লাম, গোটা পঞ্চাশ হলেই ভাল হয়। দেখ্‌ছেন ত, মানুষের খরচ দিন দিন কত বেড়ে যাচ্ছে! তিনি বল্লেন, হাঁ, তা বটে, তুমি যথার্থই বলেছ মাণিক। আচ্ছা, পঞ্চাশই ধরা গেল।—তা, তিনি নিজের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে, এখানে এসে বাস করতে সম্মত হবেন কি? সেইটে একবার তুমি গিয়ে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে জেনে এস।—তা ভটচায মশায়, আপনার এ বিষয়ে মত কি বলুন দেখি? দেশে আপনার যা আছে, সে সব বেচে কিনে, এখানে এসে বসবাস করাই ভাল নয় কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "মহারাজ যা প্রস্তাব করেছেন, সে ত খুব ভালই। তা বেশ, এ বিষয়ে আমি গিয়ে আজ রাত্রে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে পরামর্শ করি—তিনি কি বলেন দেখি। সে ত হ'ল, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে মহারাজ কি বল্লেন? কোনও পাত্র-টাত্র—"

মাণিক বলিল, "বল্লেন, কন্যাদায়ে ব্রাহ্মণ বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, তারও একটা ব্যবস্থা আমাকেই ত করতে হবে! দেখি ভেবে চিন্তে, সে বিষয়ে কি করা যায়। বল্লেন, মেয়েটির ঠিকুজী কুষ্ঠী যদি থাকে, তবে সেগুলো একবার দেখা দরকার। মহারাজ খুব ভাল জ্যোতিষ জানেন কি না! সামুদ্রিকও তাঁর বেশ ভাল রকম জানা আছে। বল্লেন, ভট্‌চায্যি মশায় তাঁর মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে একবার যদি এখানে আসেন ত ভাল হয়। হাত, পা, চুল, নাক, মুখ, চোখ—এ সবগুলোর লক্ষণ-টক্ষণ মিলিয়ে দেখা দরকার। সেই সব লক্ষণ মিলিয়ে তবে পাত্র স্থির করতে হবে কি না! তবে ত মেয়ে সৌভাগ্যবতী হবে!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা, মেয়েকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব এখন। কাল ত নেমন্তন্নই করেছেন।"

"কখন্ যাবেন? দুপুরবেলা?"

"হ্যাঁ—না হয় একটু সকাল সকালই যাব।"

মাণিক নিজ চিবুক দুই অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া, ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সে সময় ত সুবিধে হবে না! তখন মহারাজের সময় কোথা?"

"তবে, কোন্ সময় নিয়ে গেলে সুবিধে হয়, বল?"

"সকালে উঠে স্নান-আহ্নিক করতেই ত ৯টা বাজে। তার পর গদিতে আসেন, যাত্রীদের সুফল দিতে হয়—সে কায শেষ হলে, জমীদারী সেরেস্তার কাযকর্ম্ম দেখা, চিঠিপত্র লেখা—এই সব করতে করতেই ত বেলা দুপুর বেজে যায়। তার পর আহার ক'রে একটু বিশ্রাম। বিকেলবেলাটাও জমীদারী কাযকর্ম্ম দেখা, পরদিন বাবা কেদারেশ্বরের পুজো, ভোগ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা—সন্ধ্যে হয়ে আসে। তার পর মুখ-হাত ধুতে, সন্ধ্যাহ্নিক সারতে রাত ৮টা বাজে। সেই সময় থেকে তাঁর অবসর।"

"তা হ'লে, আপনি কি বলেন, রাত ৮টার সময় যাব?"

মাণিক বলিল, "হ্যাঁ, সেই হলেই ভাল হয়। আপনাকে এখানে এনে বাস করানো সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাও হয় ত মহারাজ সেই সময় আপনার সঙ্গে কইতে পারেন। আমিই বরং আপনার বাসায় এসে, সঙ্গে ক'রে আপনাকে নিয়ে যাব, কি বলেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে সূর্য্যাস্তসময় উপস্থিত হইল। সূর্য্যদেব যেন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া, উচ্চশীর্ষ মোহান্ত-প্রাসাদের উপর দৃষ্টি হানিতে হানিতে, মাঠের পারে পশ্চিম সীমান্তে অস্তগমন করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাসায় ফিরিয়া ব্রাহ্মণীকে সকল কথাই সংক্ষেপে বলিলেন। শুনিয়া ভগবতী দেবী বলিলেন, "তা বেশ, রাত ৮টার সময় মেয়েকে নিয়ে যেও। বলি হাঁ গা, আমি বাসায় একলাটি থাকবো? আমিও কেন যাই না তোমাদের সঙ্গে?"

"বেশ ত, তাই চল—তাতে আর বাধা কি?"

হাত-পা ধুইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন। তাহা শেষ হইলে, ভগবতী দেবী কিঞ্চিৎ ফলমূল ও মিষ্টান্নে তাঁহাকে জলযোগ করাইলেন। গৃহিণী বলিলেন, "রান্না-বাড়ার যোগাড় এখন আর করবো না, ওখান থেকে ফিরে এসেই করা যাবে, কি বল?"

তাহাই স্থির হইল। গৃহিণী এক ছিলিম তামাক সাজিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া সেখানে বসিলেন এবং মাঝে

মাঝে উৎসুক নয়নে, মাণিক ঘোষের আগমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাপসাশ্রমে

যথাসময়ে মাণিক ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সকলকে মোহান্ত-ভবনে লইয়া গিয়া, ত্রিতলের একটি কক্ষে প্রবেশ করাইল।

কক্ষখানি সুন্দরভাবে সজ্জিত। একধারে মাঝখানে ধবধবে ফরাস বিছানা পাতা। তাহার উপর ছোট বড় অনেকগুলি তাকিয়া। একটা স্থানে রেশমী গালিচা পাতা আবরণহীন মকমলের তাকিয়া—এইখানেই মোহান্ত মহারাজ অবস্থান করেন। তিনি এখনও আসেন নাই। মাণিক ঘোষ সেই গালিচার নিকট ফরাসের উপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বসাইল। ভগবতী দেবী কন্যাসহ ফরাসের নিম্নে, মার্ব্বেল-মণ্ডিত মেঝের উপর স্বামীর পশ্চাতে উপবেশন করিলেন।

মাতা কন্যা কখনও কোনও ধনশালী ব্যক্তির গৃহাদি দেখে নাই—উভয়ে বিস্মিত নেত্রে কক্ষস্থিত মহার্ঘ সাজ-সরঞ্জামগুলি দেখিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মাণিকের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ হে, মহারাজ কৈ?"

"বোধ হয়, এখনও তাঁর আহ্নিক শেষ হয় নি। দেখি।" —বলিয়া মাণিক বাহির হইয়া গেল।

ভগবতী দেবী চুপে চুপে স্বামীকে বলিলেন, "হাঁ গা—মোহান্ত সন্ন্যাসী মানুষ, তাঁর এত ধূমধাম, এত নবাবী কেন?"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া, চুপে চুপে উত্তর করিলেন, "তিনি কি যে সে সন্ন্যাসী? মস্ত জমীদার—বিষয় কত! একটা রাজা বল্লেই হয়।"

ভগবতী দেবী আর কিছু বলিলেন না।

প্রায় দশ মিনিট পরে মাণিক ঘোষ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পূজো আহ্নিক শেষ হয়েছে। কিঞ্চিৎ জলযোগ করছেন—আপনারা এসেছেন, সে খবর আমি তাঁকে দিয়েছি—তিনি এলেন ব'লে।"—বলিয়া, সে ফরাসের উপর বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন ভৃত্য এক হস্তে বৃহৎ একটি রূপার ফর্সি এবং অপর হস্তে ধূমায়মান কাশীর সুচিত্রিত কলিকা লইয়া প্রবেশ করিল। মহারাজের আসনের অনতিদূরে, খালি মেঝের উপর উহা স্থাপন করিয়া, বাহির-বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এক মিনিট পরেই বাহিরে খড়মের খট্‌খট্ আওয়াজ উঠিল। শাদা রেশমের আলখাল্লা পরিয়া, মোহান্ত মহারাজ প্রবেশ করিলেন। মাণিক ঘোষ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল—তাহার দেখাদেখি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও দাঁড়াইয়া উঠিলেন—তাঁহার স্ত্রী-কন্যাও দাঁড়াইলেন।

খড়ম পরিত্যাগ করিয়া, মোহান্ত ফরাসে উঠিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "এই যে ভট্‌চায মহাশয় এসেছেন। নবদুর্গাও এসেছে দেখ্‌ছি। উনি নবদুর্গার মা বুঝি? বেশ বেশ। বসুন বসুন।"

মোহান্ত স্বস্থানে উপবেশন করিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ভৃত্য আসিয়া ফর্সির নলটি তাঁহার হাতে দিল। মোহান্ত তাহাতে কয়েক টান দিয়া, ভট্টাচার্য্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "মেয়ের ঠিকুজী-কুষ্ঠী এনেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ—কুষ্ঠী ত তৈরি করানো হয়নি,—ঠিকুজী ছিল, সেইটে এনেছি।"—বলিয়া একখানি ছিন্নপ্রায় কাগজ মোহান্তের হস্তে দিলেন।

মোহান্ত চোখে সোণার চশমা লাগাইয়া, ঠিকুজীখানি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল। ভট্টাচার্য্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "জন্মসময়ে গ্রহ-নক্ষত্রগণের যেরূপ যোগাযোগ দেখ্‌ছি,—তাতে ত আপনার মেয়ের রাজরাণী হবার কথা, ভট্‌চায মশায়!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে কেন হবে না, মহারাজ?"

মোহান্ত বলিলেন, "হবে—হবে—আপনার মেয়ের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। ও রাজরাণীই হবে। ওর হাতটা একবার দেখি তা হ'লে। ওগো নবদুর্গা, তুমি উঠে এসে এইখানে আমার কাছে বস ত!"

নবদুর্গা এই প্রস্তাবে ভীত হইয়া, কাতরভাবে একবার মাতার দিকে, একবার পিতার দিকে চাহিতে লাগিল। পিতা বলিলেন, "এস মা এস, ভয় কি?" মাতা তাহার গায়ে হাত দিয়া উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। নবদুর্গা শঙ্কিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতা তাহার হাতটি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মোহান্ত-নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিলেন।

মোহান্ত নবদুর্গার কম্পিত দক্ষিণ হস্তখানি নিজ হস্তে

ধারণ করিলেন। সেখানি, আলোকের নিকট ধারণ করিয়া, রেখাগুলি নিরীক্ষণ করিবার ভাণ করিতে লাগিলেন। পরে, নিজ উভয় হস্ত প্রয়োগ করিলেন;—হাতখানি মণিবন্ধ অবধি নানাভাবে স্পর্শ করিয়া, তাহার অঙ্গুলিগুলির ফাঁকে নিজ অঙ্গুলি দিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, টিপিয়া, টানিয়া, "পরীক্ষা" করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে বালিকার যদি কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত যে, ইহা লালসার স্পর্শ,—করকোষ্ঠী পরীক্ষার নহে।

তার পর মোহান্ত নবদুর্গার বাম হস্তখানি চাহিলেন। সেখানিও ঐরূপভাবে, অনেকক্ষণ ধরিয়া "পরীক্ষা" করিলেন। তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইল, চক্ষুযুগলে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরমধ্যে কি হইতেছে, তাহা অন্তর্য্যামীই জানিলেন; নবদুর্গার পিতা-মাতা নিবিষ্ট নয়নে মোহান্তের মুখ পানে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহারা এ ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না।

প্রায় দশ মিনিট কাল হস্ত পরীক্ষা করিবার পর, মোহান্ত নিরস্ত হইলেন। ইঙ্গিতে নবদুর্গাকে উঠিতে বলিয়া, বামাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নিজ ললাটের উভয় পার্শ্ব ধারণ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নত নেত্রে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে একটু শঙ্কারই উদয় হইল, ঠাকুর বোধ হয় তবে নবদুর্গার কোনও অমঙ্গলেরই আভাস পাইয়াছেন। তিনি বিহ্বল ভাবে মোহান্তের পানে চাহিয়া রহিলেন, কোন প্রশ্ন করিতে সাহস পাইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে মোহান্ত মুখ উত্তোলন করিলেন। মৌন ভঙ্গ করিয়া ডাকিলেন—"মাণিক!"

মাণিক ঘোষ বাহির-বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, "আজ্ঞে" বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

মোহান্ত বলিলেন, "ভট্চায মশায়ের জলযোগের ব্যবস্থা কর।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না না, ও সব আবার কেন?"

মোহান্ত বলিলেন, "তা কি হয়? সামান্য কিছু—যা পারেন, আহার ক'রে যান। আপনার পাতে আপনার স্ত্রী-কন্যাও প্রসাদ পাবেন এখন। মাণিক, এঁদের জন্যে একটি নির্জ্জন ঘরে ঠাঁই করাও—দোতালার উত্তর দিকের খালি ঘরের ভিতরে বা বারান্দায়, সেই দিকটায় কেউ যায় না।" ভট্টাচার্য্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণঠাকুররা খাবার দিয়ে বেরিয়ে যাবে এখন, আপনি নিজের ঘরে ব'সে যেমন আহারাদি করেন, সেই ভাবেই নিশ্চিন্তমনে আহার করবেন। মাণিক, সেই রকম বন্দোবস্ত কর হে!"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া মাণিক ঘোষ প্রস্থান করিতেছিল। মোহান্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মাণিক, সব প্রস্তুত হ'লে এঁদের এসে তুমি ডেকে নিয়ে যেও। তার পর ভট্চায মশায়কে খেতে বসিয়ে দিয়ে, তুমি একবার আমার কাছে এস।"—বলিয়া তিনি ফরাস হইতে নামিয়া খড়ম পায়ে দিয়া, খট খট করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। মাণিক ঘোষও অদৃশ্য হইল।

কক্ষটি নির্জ্জন হইবামাত্র ভগবতী দেবী অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া স্বামীকে বলিলেন, "হ্যাঁ গা, হাত দেখে ঠাকুর ত কিছুই বল্লেন না—ভাল, কি মন্দ, কোন কথাই ত বল্লেন না!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "পরে বলবেন বোধ হয়।"

"কেন গা? কোনও ভয়ের কারণ—"

ভট্টাচার্য্য স্ত্রীর পানে চাহিয়া চোখ টিপিয়া এ প্রসঙ্গ আপাততঃ বন্ধ রাখিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার মনের ভাব এই—অমঙ্গলজনক আশঙ্কার কথা মেয়ের সাক্ষাতে উল্লেখ না করাই ভাল।

পনেরো মিনিট পরে মাণিক ঘোষ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ভট্চায মশায়, গা তুলুন। মা ঠাকরুণ, আপনিও মেয়েকে নিয়ে ওঁর পিছু পিছু আসুন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিলেন। মাণিক ঘোষ অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। দ্বিতলে অবতরণ করিয়া, নানা কক্ষ ও বারান্দা অতিক্রম করিয়া, একটি কক্ষমধ্যে ইঁহাদিগকে লইয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, কক্ষখানির মধ্যস্থলে সুবৃহৎ পুরু গালিচা আসন পাতা, তাহার সম্মুখে, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত জয়পুরী থালিতে, এক রাশি ফুলা ফুলা শাদা ধবধবে লুচি, ছোট বড় অনেকগুলি রূপার বাটিতে নানাবিধ ব্যঞ্জন, মোহনভোগ ও পায়সান্ন, রেকাবীতে রেকাবীতে নানাবিধ মিষ্টান্ন। রূপার গ্লাসে জল, তাহার উপর কর্পূরের গুঁড়া ভাসিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরে আরও একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে, অপেক্ষাকৃত ছোট থালায় ও তাহার আশে পাশে ঐ সকল উপকরণই সজ্জিত। মাণিক ঘোষ ভিতরে প্রবেশ করিল না, বলিল, "ভট্চায মহাশয়, ঐ বারান্দায় বালতিতে জল, ঘটি, গামছা সব আছে। হাত-মুখ

ধুয়ে আহারে বসুন। খুকীমা, তুমিও খেয়ে নাও তোমার বাবার সঙ্গে। ঐ কোণে ঝুড়িতে লুচি, সন্দেশ, বোগনোয় ক্ষীর, পায়স সবই আছে, যা লাগে, তোমার মাকে বোলো, উনি দেবেন। তোমরা স্বচ্ছন্দে ব'সে খাও দাও—সবাইকের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আবার আমি আসবো এখন। তার আগে আর কেউ আসবে না এখানে। দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে বসুন ভট্চায মশায়।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আচ্ছা, তা বসছি। ওহে দেখ মাণিক ভায়া, মহারাজ আমার মেয়ের হাত ত অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলেন, কিন্তু কৈ, কিছুই ত বল্লেন না।"

মাণিক ঘোষ বলিল, "না, এখন কি বল্‌বেন? অর্দ্ধেক রাত্রি হ'লে উনি যোগে বসবেন। কররেখা-টেখা সবই দেখে রেখেছেন,—ওঁর ইষ্টদেব যোগের অবস্থায় ওঁকে সব ব'লে দেবেন।"

এ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দেহ শিহরিয়া উঠিল। বলিলেন "বটে—ঠাকুর তা হ'লে এক জন সিদ্ধপুরুষ!"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "তার কি আর সন্দেহ আছে? এখন আপনার অদৃষ্ট। যান যান, ব'সে পড়ুন, লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"—বলিয়া প্রস্থান করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরে চটিজুতা জোড়াটি ত্যাগ করিয়া, ভিতরে গিয়া কবাট ভেজাইয়া দিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শিশির-কণার প্রতি

ওরে ওরে শিশিরের কণা!
ধরণীর ধূলি-ধূসরিত শত মলিনতা আবরিত
শত শ্যাম শষ্প শিরে গলিত বেদনা!
নিশীথিনী সারারাত জাগি, বিদায়ের চুমাটিরে মাগি
ঢেলে দিয়ে গেল চুপে নয়নের নীর।
ঝরা তা'র বিন্দু বিন্দু হয়ে সারা বিশ্বে গেল বুঝি র'য়ে;
শত জ্বালা তৃষাতুর হৃদি বনানীর
এঁকে নিল মোহের আবেশে, কাজলকালিমা আঁকা বেশে,
চাঁদিমার সে পাণ্ডুর মোহন মূরতি।
নিস্তব্ধতা, দেখি' লগ্ন শেষে ভানুমুখ পূর্ব্বদ্বারদেশে
মুখর সঙ্গীতে তার করিল আরতি।
রবি-রশ্মি পরশ মাখিয়া ফোটে জবা রক্তিম আঁখিয়া
চমকিত হ'ল দেখি' রক্তবিন্দু বুকে।
কে কেঁদেছে বুক চিরি' চিরি' কর হানি দ্বারে দ্বারে ফিরি'
না পেয়ে বধুর সাড়া অবনত মুখে?
কিম্বা বুঝি রক্তিমা ঝলকে নববধূ মুকুতা নোলকে
বিগত রাত্রির শত চুম্বনের রাগে;
সেই রাগ চুপে চুরি ক'রে মাখালে কে পলাশ অধরে
ধরণীর মুঞ্জরিত শত ফুলরাগে।
গুলিয়া রে হলুদে ও তেলে কালিকা ফুলে কে দিলে ঢেলে?
ধরণীর গায়ে হলুদ আসে অধিবাস
আনন্দাশ্রু পাতায় পাতায় ফুটে উঠে লুলিত লতায়,
পদ্মপাতে প্রেমলিপি নিয়ে গেল হাঁস।
রবি-তাপে তাপিত বালুর তৃষা গেল তৃষিত তালুর
তোরই স্নেহস্পর্শ লভি', শিশিরের কণা!
মরু-হৃদে মরু-দ্বীপ হইল রচনা।

শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত (বি, এস্-সি, এম-বি)।

সৃষ্টিতত্ত্বে মানবকে যে আখ্যাই প্রদান করুক না, আমরা 'মানব' বলিতে তাহার রক্তমাংসের দেহটাকে ধারণায় আনিব না, আনিব—তাহার অমর, অজর, অজেয় আত্মাকে। আজ আমরা যে অবস্থায় নামিয়া আসিয়াছি, সে অবস্থায় আর মানুষের জড়দেহকে লইয়া কারবার করিলে চলবে না, উহার মুখ চাহিয়া থাকিলে হইবে না। আমাদের আজ প্রয়োজন—রথের রথীকে। আত্মার উৎকর্ষসাধন হইলে দেহেরও শক্তি আপনিই বাড়িয়া উঠে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আমাদের দেশে আত্মাই নাই, কাযেই আসল দেহও দুর্লভ! যেন এ এক বায়ুর দেশ—কথা কহিবার ভাষা নাই, কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই; কুচি-কুচি করিয়া কাটিলেও এক ফোঁটা রক্ত পড়িবে না! যাহা নাই, তাহাই নির্ম্মাণ করিতে হইবে, অর্থাৎ—মানুষ!

মানুষ

মানুষের জাতি-নির্দ্দেশ হইয়াছিল কর্ম্মের অনুপাতে। তদ্রূপ কর্ম্মেরও জাতি-নির্দ্দেশ করিতে হইবে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির অনুপাতে। এই কাযটাই আজিকার দিনে বেশী কায। মানব-সমাজকে এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখিলে চলিবে না—সাজাইতে হইবে।

ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার 'চন্দ্রানন' দেখিয়া জনক-জননী কামনা করেন—'সন্তান দীর্ঘজীবী হোক্, আর একটা—বিদ্বান্ হোক্, পাশ করুক্, 'রাজা হোক্!'—ব্যস্—এইটুকু মাত্র! তার পর পাঁচ বছরেরটি হইলেই সমারোহে হাতে-খড়ি হয়, পাঠশালে যায়। তার পর—স্কুলে যায়, কলেজে পড়ে,—বড় জোর বি-এ, এম্-এ পাশ করে। তার পর সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী কেহ ডাক্তার, কেহ এঞ্জিনীয়ার, কেহ উকীল-ব্যারিষ্টার, কেহ বা অপরের 'চাকর' হয়। অর্থাৎ সারাজীবনের সার্থকতা কেন্দ্রীভূত হয় নিজেরই গ্রাসাচ্ছাদনে, কাহারও কম, কাহারও বেশী—কাহারও আবার কিছুই না! তার পর হাতে-পায়ে ঠেলিয়া জীবনের বাকি কয়টা দিন কাবার করিতে পারিলেই তাহাদের নরজীবনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তার আদি-অন্ত থাকে না! এই শিক্ষা, জীবনযাত্রার ঈদৃশ ধারা-প্রবাহ এমনতরই বহিয়া আসিতেছে।

এক জন যে পুস্তক পড়িয়াছে, যে পাশ করিয়াছে, অপরকেও ঠিক সেই পুস্তক ও সেই পাশ করিতে হইবে। আমি যে ওজনে যে প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়াছি, তোমাকেও ঠিক সেই প্রণালীতে শিক্ষা পাইতে হইবে—ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই! শিক্ষায় বৈচিত্র্য নাই, বৈশিষ্ট্য নাই, কাযেই কর্ম্মের ধারাও তদ্রূপ! বাঁধা-বন্দোবস্ত! এই বন্দোবস্তেরই অনুপাতে আমাদের জীবনের মূল্য নিরূপিত হয়। গভর্ণমেণ্ট তাহার নিয়ন্তা। আমরাও অবনত-শিরে তাহাই তুলিয়া লইয়াছি, কোন দিন খুঁৎ ধরি নাই, কোন দিন কৈফিয়ৎ কাটি নাই—নিজেরাও সংস্কার করিতে কদাপি কোমর বাঁধি নাই। আমার ছেলের অঙ্কে মাথা থাকুক আর না থাকুক—তাহাকে 'প্রব্লেম' কষিতে হইবেই, কেন না, প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত বাধ্যতামূলক। না পারে—সে আমার ত্যাজ্যপুত্র। ইহাই ত আমাদের বাঁধা বুলি। কিন্তু ভাবিয়াও দেখি না—ও তবে কি পারে, কিসে ওর মাথা আছে? এই সমস্যাটাই আমাদের আজিকার আলোচ্য।

আদর্শ

নৈপুণ্যের অবতারণা করিতে গেলে সম্মুখে এক আদর্শ খাড়া করিয়া রাখিলে কাযটা অত্যধিক সহজ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব শিক্ষার সংস্কারে যদি আমরা কোন উৎকৃষ্ট আদর্শ পাই, তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? যে দেশ বর্ত্তমানে মহিমায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে পৃথিবীর সর্ব্ববাদিসম্মত শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে, তাহারই আদর্শ গ্রহণ করা যাউক। সে দেশ—আমেরিকা! কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন—

"হোথা আমেরিকা নব-অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে
ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়!"

কোথা হইতে উদ্ভূত এই শক্তি? মানবের ভিতর দিয়া! এ কথা যদি কেহ অস্বীকার না করেন, তবে ঐ অসাধারণ মানব-জাতির প্রেরণা আমাদের নিমন্ত্রণ করিতে দোষ কি? বিদেশীর আর কিছু গ্রহণ করি আর না করি, শিক্ষা ও সভ্যতা যদি উৎকৃষ্ট হয়, তাহা গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে।

আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয়োজন—মানুষ গড়নে। তাহারা পৃথিবীর একঘেয়ে গতানুগতিক ধারা আঁকড়িয়া ধরিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। সন্তানের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণে রাখা হয়—কিরূপ তাহার মুখের ভাববিকাশ, কিরূপ তাহার হাত-পা নাড়া, এমন কি, দিন-রাতে কয়বার সে হাসে-কাঁদে,—এবংবিধ প্রণালীতে শিশুর স্বভাব ও প্রকৃতি পরীক্ষা করা হয়। তার পর হয়—ডাক্তারী ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। ডাক্তারী পরীক্ষায় স্থির করা হয়—তাহার স্বাস্থ্যের দৌড়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মীমাংসিত হয়, তাহার মেধা কোন্‌-মুখী—জগতের কোন্‌ কল্যাণে সে গাণ্ডীব ধরিবে? শিল্পে, সাহিত্যে, না বিজ্ঞানে? এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিয়ম ও প্রথা বহুবিধ। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ছেলেদের মস্তকের গঠন পরীক্ষা। কিরূপ গঠনের কি মস্তক হইলে কি জ্ঞানের ভাণ্ডার সেই মস্তকের মস্তিষ্কে রহিতে পারে, তাহা আমেরিকান্‌ বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ নির্ভুল আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই তথ্যে প্রণোদিত হইয়াই ছেলেদের সেই প্রকারের শিক্ষার প্রশংসাপত্র দেওয়া হইয়া থাকে। সেইভাবে, সেই নির্দ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট তন্ত্রেই ছেলেদের "হাতে-খড়ি" হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা ও কর্ম্মজীবনের চরমপ্রান্তে উপনীত হইতে হয় এবং ফলে যে কি দাঁড়ায়, সে প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস দিতেছে।

এইরূপে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী যদি আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া আমেরিকার ছাঁচে ঢালা হয়, তবেই আশা—আবার আমরা মানুষ হইয়া উঠিব।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—আমরা পরাধীন জাতি, সরকার আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার ছক কাটিয়া দিয়াছেন, উহা ব্যর্থ করিয়া নূতন-কিছুর প্রবর্ত্তন করা কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্তু, ভাবিতে হইবে—শিক্ষা আমাদের, সরকারের নহে। এইটুকু দাবী করিবার সৎসাহস যদি আমাদের না থাকে, তবে সরকারী শিক্ষায় দীক্ষিত হইবার আগ্রহ আমাদের কোন্‌ লজ্জায় আসে? যদি বিপ্লবের আয়োজন করিতে হয়, এই দিকে কর—ইহাতে অধর্ম্ম নাই। ইহা ইংরাজ-লেখকেরই কথা—"When a Government is destructive of the natural rights of a man, it is man's duty to destroy it!" তবে রক্তারক্তির বাণী ইহা নহে—"All forms of Violence is contrary to the spirit of God's law."

প্রণালী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছেলের স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝিয়া কোন্‌ বিষয়ে সে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে, তাহাই নির্দ্ধারিত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ দেখা যায়, ছয় বৎসরে পা দিতে-না-দিতেই, ছেলেদের স্বভাব ও প্রকৃতিতে উত্তর-সাধক 'মানুষের' সাড়া পড়ে, অর্থাৎ তাহাদের মনের প্রতি রন্ধ্রে অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বৃত্তির স্ফুরণ হয়। ঠিক সেই সময় হইতে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণে রাখা আবশ্যক; পরীক্ষার প্রয়োজন—প্রকৃতি ও স্বভাবে কোন্‌ বৃত্তিটা তাহাদের প্রবল, কোন্‌ দিকে তাহাদের ঝোঁক বেশী। ইহা বুঝিয়া, তাহাদের শিক্ষার গতিও সেই দিকেই নিয়োজিত করা একান্ত বিধেয়। এই পরীক্ষাকে বলা যাইতে পারে—প্রাথমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যে লক্ষণ পাওয়া যাইবে, তদনুযায়ী একটিমাত্র বিশিষ্ট "লাইন" ছেলেদের ধরাইতে হইবে, যে দিকে তাহাদের প্রকৃতি-গত, সংস্কারগত, স্বভাবগত আস্থা, আগ্রহ ও লক্ষ্য আছে। কিন্তু, মনে রাখা উচিত, এই প্রাথমিক পরীক্ষায়, ছেলেদের মূলধনের কিছু সংস্থান করিয়া দিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। একমাত্র প্রয়োজন—ছেলেদের পরীক্ষা (test) দেখিতে হইবে, ছেলেরা স্বেচ্ছায় কোন্‌ বিষয়টার উপর ঝোঁক দেয়—সাহিত্যে, শিল্পে, না এমন কিছুতে যাহার ধর্ম্ম বিজ্ঞানের অন্তর্গত। অতএব, এতদুপযোগী বিষয় (Subject) ও অনুশীলনের সংস্থান করিতে হইবে ঐ প্রাথমিক পরীক্ষায়। ইহাতে ছেলেরা পরীক্ষাই দিতে থাকিবে, পড়িয়া তাহাদের শিখিবার প্রয়োজন নাই কিছু।

শিখিবার বিষয় স্থূলতঃ তিনটি—বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য। ছেলেদেরও এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে—(১) বৈজ্ঞানিক ছাত্র, (২) শিল্পী ছাত্র, (৩) সাহিত্যিক ছাত্র। ইহারাই উত্তরকালে দাঁড়াইবে—(১) বিজ্ঞান-মানুষ, (২) শিল্প-মানুষ, (৩) সাহিত্য-মানুষ।

বৈজ্ঞানিক ছাত্র

দেশের বিশাল শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে—বিজ্ঞানের উপর। য়ুরোপ-আমেরিকায় বিজ্ঞান-চর্চ্চার আয়োজন আছে, ঘটা আছে—প্রত্যেক নর-নারীর এ দিকে লক্ষ্য আছে। বিজ্ঞানই যে দেশের রাজ-লক্ষ্মী, এ কথা সম্রাট হইতে ক্ষুদ্র প্রজা পর্য্যন্ত জানে। কিন্তু আমাদের দেশে কি দেখি?—

কলেজে ছেলে-ভুলানো দুই একখানা বিজ্ঞানের কেতাব পড়ানো হয়, এই মাত্র! ব্যস্—আমরাও "বৈজ্ঞানিক" হইয়া যাই, গর্ব্বে আমাদের মাটীতে পা পড়ে না! কিন্তু, মর্থ আমরা—এটা বুঝি না যে, 'রাজ্যের রাজ-লক্ষ্মী' অত ছোট সাধনার বস্তু নহে! এই রাজ-লক্ষ্মী আছেন সাগর-পারে—যাঁর দিব্যাঙ্গের আভাই সামান্য একটুক্ আমাদের দেশে পড়ে! অতএব আমাদের প্রয়োজন – সমরায়োজন, যে অভিযানে আমাদেরও দাবী থাকে—বিজ্ঞানে পুরাপূরি অধিকার আমাদেরও আছে, 'রাজ-লক্ষ্মী' তোমাদের একার নয়!

চাই তপস্যা! এই তপস্যায় দীক্ষিত করিতে হইবে, ভারতের "প্রথম স্বপ্ন"—শিশুকে! ছয় হইতে আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের প্রতিভার ধারাবাহিক স্ফুরণ ও বিকাশ হয়। অতএব, এই সময়ে যদি কোনও বিশিষ্ট শিক্ষা-বিষয়ে 'প্রতিভাকে' একমুখী করা যায়, তাহা হইলে উত্তরকালে চর্চ্চা ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিভা যে জাতির মূলধন হইয়া দাঁড়াইবে না, এ সন্দেহ যুক্তি-তর্কে আসে না। পরন্তু, উক্ত প্রতিভাকে যদি প্রারম্ভেই শতমুখী করা হয়, তাহা হইলে, উহার কোনও খণ্ডই যে বিশ্বের এই লোমহর্ষণ প্রতিযোগিতার আসরে কোন কালেই স্থান পাইবে না, ইহা মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারা যায়। অতএব এই "শিশু" মিলাইতে হইবে প্রাথমিক পরীক্ষা হইতে, যাহার অবতারণা পূর্ব্বেই করিয়াছি। কিন্তু, একটা ছোট ছেলের কি প্রতিভা এমন পরিস্ফুট হইতে পারে, যাহা হইতে তাহাকে বিজ্ঞান-কর্ম্মীর পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়? —ইহা নির্ব্বাচন করা একটু শক্ত। এ ভার পরীক্ষকের উপরই দেওয়া ভাল—তাঁহারাই ছেলেদের স্বাভাবিক লক্ষণ দেখিয়া বাছ-বিচার করিবেন। অবশ্য, প্রবন্ধের সৌষ্ঠবের জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে :—

পূর্ব্বাহ্ণেই কথিত হইয়াছে, প্রত্যেক বিদ্যার্থী শিশুকে পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে রাখিতে হইবে। সেই অবস্থায় দেখিতে হইবে, তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন্ দিকে। যদি দেখা যায়, ছেলেটি আঁকের রেখাপাত করিতে, বা আঁক কষিতেই পছন্দ করে, নামতা পড়ায় আমোদ পায়, দপ্তর-ভরা অতগুলি বহির ভিতর 'ধারাপাত-শুভঙ্করী'খানার উপরই তাহার যত্ন অধিক, তবে হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হইবে। সে দাঁড়াইল—'বৈজ্ঞানিক ছাত্র'। এরূপ নির্ব্বাচনে বড় একটা ঠকিতে হইবে না।

বিজ্ঞান হইল স্থূল ও মূল বিষয়। ইহার অন্তর্গত রহিবে—ডাক্তারী, জ্যোতিষশাস্ত্র, বাণিজ্য ইত্যাদি। বিজ্ঞানের কর্তৃত্বে যে সমস্ত পরিপুষ্ট হইবে, সেই মূল ও আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যায় ও শ্রেণীতে রুচি ও আস্থা অনুযায়ী ছেলেদের সাজাইতে হইবে।

শিল্পী-ছাত্র

কবি বলিয়াছেন—

"এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে
　　তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ,
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে
　　তার উপর তোমার নামটি লিখেছ!"

বাস্তবিক শিল্প ঈশ্বরের পেশা—এ কাযে হাত দেওয়া ঋষির কায। বিজ্ঞান—আত্মা, শিল্প—দেহ। আত্মার কোনও প্রয়োজনই রহিত না, যদি দেহ না থাকিত! একের অবর্ত্তমানে অপরের কোনও সার্থকতাই থাকে না। অতএব, শিল্পের আদর, শিল্পের প্রয়োজন বিজ্ঞানের অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। বর্ত্তমান কালে আমাদের শিক্ষায় শিল্পের মোটেই স্থান নাই, যেন—ভারতবাসীর ইহা জানিবার, বুঝিবার, শিক্ষার বস্তু নহে! আমরাও তাহাই বুঝিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছি। কৈফিয়ৎ উঠিবে—কেন, সরকার ত আর্ট স্কুল করিয়া দিয়াছেন! আমার জবাব এই—"তোমার যেমনই আশীর্ব্বাদ, আমারও তেমনই দণ্ডবৎ!"

আমাদের স্মরণ করিতে হইবে, ভারতের নাম যে এখনও বিশ্বের বুক হইতে মুছিয়া যায় নাই, তাহা সেই এক দিনের শাসনে—যখন ভারত ছিল, শিল্পে বিশ্বের আচার্য্য। তাহারই সন্তান আমরা—আমাদের জন্মগত অধিকার আছে, আবার শিল্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার!

এক্ষণে দেখা যাউক, শিল্পের ভার কাহার হাতে দেওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক ছাত্র বাছিয়া যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহাদেরই ভিতর শিল্পী ছাত্র বাছিতে হইবে। প্রণালী একইরূপ। একটি দৃষ্টান্ত :—

দেখা গেল, একটি ছেলের হস্তাক্ষর চমৎকার, জামা-কাপড় পরিয়া ফিটফাট হইয়া থাকিতে সে ভালবাসে, সে কাদার পুতুল গড়িতে পাইলে খাবার ঠেলিয়া রাখে, সব জিনিষেই তার পর্য্যবেক্ষণের শক্তিটা তীক্ষ্ণ—অমনই তাহাকে পৃথক্ করিয়া রাখ।

শিল্পও স্থূল ও মূল বিষয়। ইহার শাখা ছড়াইবে—কৃষিবিদ্যা।

সাহিত্যিক ছাত্র

এ একটি রহস্যময় বিষয়। ইহার কোন ব্যাখ্যা নাই। মোটামুটি এই অদ্ভুত জিনিষটি—বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়কেই জ্ঞান ও শক্তির পরিবেষণ করে, চাণক্য পণ্ডিতের ন্যায় রাজা ও রাজত্বই রচনা করে। ইতিহাস সাক্ষী—গোড়ায় সাহিত্য ব্যতীত কোন দিন কোনও জাতই উঠে নাই। অতএব জাতির উঠা-নামা নির্ভর করে সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতির উপর।

সাহিত্য-ছাত্র বাছাবাছির বালাই নাই। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী ছাত্র বাছিয়া যাহারা অবশিষ্ট রহিবে, তাহারাই—'সাহিত্যিক ছাত্র'। কথাটার যেন এ অর্থ না করা হয় যে, বাছগোছের পর আবর্জ্জনাগুলাই (rubbish) সাহিত্যে চালাইবার প্রয়াস পাইতেছি। মানুষের প্রতিভা প্রায় সকলেরই সমান, ক্বচিৎ কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। কেবল প্রতিভার অপপ্রয়োগ হয় বলিয়াই আমাদের ধাঁধাঁ লাগে। নতুবা ভগবান্ 'একচোখো' নহেন—সবাইকে একই উপাদান দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, শিল্পী যে চিত্রই আঁকুক না, চাতুর্য্য কিছু সে হাতে রাখে না! আজ হয় ত একটা লোককে দেখিতেছি, সে নিতান্তই গাধা—প্রতিভা তাহার কোনও দিকেই খুলিবার নহে, তখন বুঝিতে হইবে, অপপ্রয়োগ তাহার শিক্ষায় না হউক, তাহার পিতা, পিতামহ অথবা ঊর্দ্ধতন আরও কোন্ পূর্ব্ব-পুরুষের শিক্ষায় হইয়া গিয়াছে, তাহারই ধারা 'কুৎসিত ব্যাধির' বিষের ন্যায় তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া নামিয়াছে!

সাহিত্যও এক স্থূল ও মূল বিষয়। শাখা—দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, আইন। এক্ষণে শিক্ষায় মানুষ এইভাবে সাজানো গেল।

প্রাথমিক পরীক্ষা
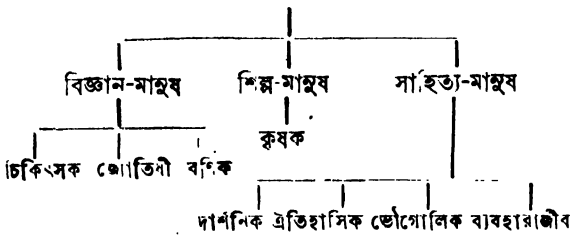
প্রাথমিক পরীক্ষার কাল

বলা হইয়াছে,—শিক্ষা-তন্ত্রে ছেলেদের দীক্ষিত করিবার পরই তাহাদের প্রাথমিক পরীক্ষা করিতে হইবে। তার পর তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্তরে সাজাইতে হইবে—জন্মগত ও প্রকৃতিগত প্রতিভা অনুযায়ী। এক্ষণে কথাটা হইতেছে, এই প্রাথমিক পরীক্ষার কাল ছেলেদের কত বয়স পর্য্যন্ত? বলিয়াছি, মানুষের প্রতিভার স্ফুরণ ও প্রসার হয় যথাক্রমে ছয় হইতে আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। অত্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ সুরু করিতে হইবে ছয় হইতে, এবং (আমার মতে) পরীক্ষা শেষ করা যাইতে পারে আটের ভিতর। আট বৎসর হইতেই অনায়াসে ছেলেদের নির্দ্দিষ্ট বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শিক্ষালয়

বলা বাহুল্য, এই তন্ত্রের শিক্ষালয়ও গঠনীয়। অর্থাৎ আট বৎসর বয়স হইতেই—বৈজ্ঞানিক ও তদন্তর্গত ছাত্র, বিজ্ঞান ও তদন্তর্গত শিক্ষালয়ে চলিয়া গেল; (২) শিল্পী ও তদন্তর্গত ছাত্র শিল্প ও তদন্তর্গত শিক্ষালয়ে চলিয়া গেল; (৩) সাহিত্যিক ও ছাত্র, সাহিত্য ও তৎসংক্রান্ত শিক্ষায় চলিয়া গেল।

ছাত্র-নির্ব্বাচন যদি সব ক্ষেত্রে ঠিক আট বৎসর বয়সে সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে উহা এক আধ বৎসর পরে করিলেও ক্ষতি নাই।

আসল কথা

এইবার আমাদের প্রবন্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা যাউক। বলিয়া রাখি, আমি শিক্ষাবিদ্‌ও নহি, শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞও নহি। আমি আনাড়ী। কয়লাব্যবসায়ী আমি—কয়লার সম্বন্ধেই দুই একটা কথা বলিতে পারি এবং বলাও সাজে, মানায়। তবে, মানব-সমাজের সদস্য হিসাবে, কোনও বিষয়ের কল্যাণার্থে সকলেরই যেমন যে কোন কথা বলিবার বা আলোচনা করিবার অধিকার আছে, বোধ করি, তেমনই আমারও আছে। সেই সাহসেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিচার আলোচনা করেন, ইহাই কামনা।

এক কথায় আমি ইহাই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর কাঠগড়ায় যেন আমরা আর আসামী না হই! পরমায়ু হিসাবে মানুষের প্রতিভা—পরমায়ু যেরূপ অল্প, মানব-প্রতিভাও সেই পরিমাণে কম সময়ের জন্য স্থায়ী। অতএব, যে সময়ে প্রতিভা ও ধারণাশক্তির জোয়ার আসে, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, অপটু

শিক্ষায় কালক্ষেপ করিয়া যেন আমরা আত্মহত্যা না করি। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—'ইউনিভারসিটি বিলের' সংস্কার। এ বিষয়ে 'কৌন্সিল' ও 'এসেম্বির' শিক্ষা-মন্ত্রী ও সদস্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বলা হইয়াছে, শিখিব আমরা—শিক্ষা আমাদের। আমাদের দাবী-অধিকার আমাদেরই হাতে। প্রয়োজন কেবল—সমবেত ও যুক্ত আবেদন বা দাবীর। ইহার শক্তি কোনও দিনই পণ্ড হয় নাই, আজও হইবে না! এক্ষণে প্রয়োজন—আমাদের সুমতি!

আলোকে

আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই! মানুষ 'মানুষ' হইতে শিখিলে, তাহার আবার দৈন্য কোথায়? কিন্তু, এই 'মানুষ' হইবার গোড়ায় আসল—সত্যকার—কার্য্যকরী শিক্ষা চাই। কণ্ঠের সহিত যন্ত্রের সুর ও 'পরদা' না বাঁধিলে, সঙ্গীত জমে না—ইহা প্রমাণিত। তেমনই মানুষের ধাতুর সহিত শিক্ষার সুর ও 'পরদা' না মিলিলে—তাহার জীবন-সঙ্গীত জমিবে কেন? কিন্তু, আসর বসানো চাই সকালে-সকালে—বেলা পড়িলে, আয়োজনের কতটুকুই বা সার্থকতা? অতএব, সাধারণ শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন নাই, প্রাগুক্ত বিশেষ শিক্ষার আয়োজন মানুষের কাঁচা দেহ ও প্রতিভা হইতেই সুরু করা হউক। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে আমি বলিতে পারি—আমরাও মহামানবের রাষ্ট্রীয় আসন একদিন পাইবই পাইব। এতদিন ত সাধারণ শিক্ষাকে সময় দেওয়া হইল,—কোন্ দিকে আমরা অগ্রণী হইয়াছি? এক আধ জনের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু, কথাটা হইতেছে—জাতীয় উন্নতির! দল বাঁধিয়া সব দিকে সকলের মাথা তোলা চাই—বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে। তার পর, দল বাঁধিয়া বলিব—আমরাও 'মানুষ'! এক ইংরাজ-পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—"With the arms of the Punjabees, with the hearts of the Maharattas, and with the heads of the Bengalees, I can conquer the whole world!" শুধু স্বরাজ-স্বরাজ বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না! ক্ষেত্র তৈয়ারী হউক, 'মানুষ' হইতে শিখি—তার পর স্বরাজ আপনিই আসিবে, জয়শ্রী স্বেচ্ছায় ধরা দিবে—চাহিতে হইবে না!

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিন্না লতা

১

রজনীতে ঘোর বহিল ঝটিকা
কাঁপায়ে কানন বন;
পড়িল তাহাতে ভীষণ পাদপ
শাখা নিয়ে অগণন।
লতিকা কোমলা ছিল সেইখানে
জড়ায়ে তরুর অঙ্গ;
তারি' সাথে প্রাণ দিল বলিদান
ছাড়ে নি তাহার সঙ্গ।
ছিঁড়ে গেছে তার তনুখানি হায়,
যুঝিতে ঝড়ের সনে;
কচি দুটি হাত আছে তরুগায়
বাঁচাতে পরাণ-ধনে।
কেঁদেছিল কত রজনীতে বধূ
বঁধুর জীবন তরে;
প্রাতে তাই দেখি জলভরা আঁখি;—
ব্যথিতা রয়েছে প'ড়ে।

২

লোকে পথে হায়, চেয়ে চেয়ে যায়,
মুখেতে বলিল কত,—
"বহু পুরাতন ছিল তরু, আহা,
ঝড়েতে হইল হত।"
কেহ বলে, "আহা, গরু যেত বাঁধা,
রাখালের ছিল গেহ।"
তরু তরে খেদ সকলে করিল,
লতারে দেখে না কেহ।
তখনো প্রিয়ের গলাটি ধরিয়া
ঝুলিছে লতিকা ছিন্না;
কত টানাটানি সকলে করিল,
তবুও হ'ল না ভিন্না।
এত স্বার্থত্যাগ, হেন ভালবাসা—
সুনিবিড় প্রেম যার,
না জানি বিধাতা কোন্ সতীলোকে
রচেছে আসন তার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

বেদান্ত-দর্শন ও গীতা

উপক্রমণিকা।

বর্ত্তমান যুগে অনেক প্রাচীন ধর্ম্মই বিজ্ঞানের (Science) অনুসন্ধিৎসার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মের অন্তর্গত আচার-অনুষ্ঠান সমস্ত তর্ক-যুক্তির দ্বারা মিথ্যা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং মানব-সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ তত্ত্ব সকলের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ হওয়ায়, ধর্ম্মকেই লোক উড়াইয়া দিতে চাহিতেছে। কিন্তু এইরূপ অনুসন্ধিৎসা ও সমালোচনার ফলে হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্ষতিই হইতে পারে না। কারণ, এই ধর্ম্মের ভিত্তি অতি সুদৃঢ়; আপাত-দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম্মের যে অংশকে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলেই তাহারও সার্থকতা ও উপযোগিতা বুঝিতে পারা যায়; এই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম সহস্র সহস্র বৎসর কত গুরু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজও সঞ্জীবিত রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সকল সন্দেহ ও সংশয়কে জয় করিয়া মানবসমাজ—মানব-জাতিকে প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে।

হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্গত নানা শাখা ও সম্প্রদায় আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে তিনটি অঙ্গ। প্রথম, বাহ্য, আচার ও অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ বহির্মুখী, এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ তাহারা অন্তর্মুখী হইয়া অধ্যাত্ম-জীবনের যোগ্যতা লাভ করে। এই সকল আচার-অনুষ্ঠান অনেক সময় অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু শুধু মন বুদ্ধি যুক্তি তর্ক লইয়াই মনুষ্যত্ব নহে। মানুষের আছে দেহ, প্রাণ, হৃদয়—এই সকলেরও উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ ইহাদিগকেই দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং মানব-জীবন বিকাশের এই প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের নানা আচার-অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ধর্ম্মের আছে, দার্শনিক ভিত্তি। ঈশ্বর কি, জীব কি, জগৎ কি, ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ কি, জীবের শ্রেষ্ঠ গতি কি, মানব-জীবনের পূর্ণতম সিদ্ধি কি, এই সব সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত যুক্তির উপর হিন্দুস্থানের সকল ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞান, যুক্তি ও গবেষণার ফলে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিতেছে, হিন্দুর দর্শনের সহিত তাহাদের বিরোধ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ Evolution বা ক্রম-বিকাশবাদের কথা বলা যাইতে পারে। জড় প্রকৃতি হইতেই কেমন করিয়া ক্রমশঃ প্রাণি-জগতের আবির্ভাব হইয়াছে, প্রাণি-জগৎ হইতে কেমন করিয়া মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, এই সকল সম্বন্ধে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের মূলে আঘাত পড়িয়াছে। কিন্তু যে ক্রম-বিকাশবাদ বর্ত্তমান বিজ্ঞান অতি অস্পষ্টভাবে ধরিবার ও বুঝিবার প্রয়াস করিতেছে, উপনিষদের ঋষিগণ বহু পূর্ব্বেই তাহার সুস্পষ্ট সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক পূর্ণাবয়ব ধর্ম্মের এক নিগূঢ় অংশ আছে,—অধ্যাত্ম বা যোগসাধনা—আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা, দার্শনিক চিন্তা-বিচারের দ্বারা যাহাদের দেহ-প্রাণ মনের যথেষ্ট পুষ্টি হইয়াছে, অধ্যাত্মজীবন লাভের যোগ্যতা যাহারা লাভ করিয়াছে, তাহাদের জন্যই এই নিগূঢ় সাধনা। এই সাধনার দ্বারা তাহাদের চেতনার রূপান্তর সাধিত হয়। পাশ্চাত্যদর্শনের ন্যায় হিন্দু দর্শন কেবল বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই জীব, জগৎ, ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করে নাই। যাহাতে মানব এই সকল তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অন্তরের সাধনার দ্বারা নিজের প্রকৃতির রূপান্তরসাধন করিতে পারে, মুক্তি বা দিব্য অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে পারে, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক ধর্ম্মেই সে সম্বন্ধে নিগূঢ় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক অংশের অবলম্বন হইতেছে উপনিষদ্ বা বেদান্ত। বস্তুতঃ বেদই হিন্দুধর্ম্মের মূল; অপূর্ব্ব সাধনার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া বৈদিক ঋষিগণ যে সকল সত্য দর্শন করিয়াছিলেন এবং বেদের মন্ত্রে প্রতীক তন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, উপনিষদে তাহাদেরই সার সংগ্রহ ও সমন্বয় করা হইয়াছে এবং ইহাই বেদের শেষাংশ বা বেদান্ত। কিন্তু উপনিষদে অধ্যাত্ম সত্যসমূহের যে বর্ণনা আছে, তাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা নির্দ্ধারিত বা নিরূপিত হয় নাই, উপনিষদ্ দর্শনশাস্ত্র নহে। উপরের প্রেরণায় অন্তরের মধ্যে সত্যের যে প্রকাশ হইয়াছে, উপনিষদে প্রত্যক্ষ দর্শনের ভাষাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। নানা ঋষি নানা ভাবে আপন আপন উপলব্ধির বর্ণনা করিয়াছেন, প্রয়োজনমত উপমা ও রূপকের সাহায্য অন্তরের সত্যকে বাহ্য রূপ দিয়াছেন, শ্রোতা বা পাঠকগণ যেন সেই সকলের সহিত নিজেদের অনুভূতি, উপলব্ধি মিলাইয়া দেখেন, সেই সকল হইতে সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া নিজেরাই সাধনা করেন। দর্শনশাস্ত্রে যেমন মানসিক যুক্তি-তর্কের দ্বারা সাজাইয়া গুছাইয়া সত্যের নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়, উপনিষদে সে চেষ্টা করা হয় নাই। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম-জগতের সত্যকে এই ভাবে বুদ্ধিগোচর করা সম্ভব নহে। কারণ, মন-বুদ্ধির দোষ একদেশদর্শিতা, বুদ্ধি কোন সত্যকে পূর্ণভাবে দেখিতে পারে না। এই জন্যই একই উপনিষদের সত্যসমূহকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্র বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। তথাপি এরূপ চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়, যাহাদের আধ্যাত্মসাধনা বা অন্তর্দৃষ্টি নাই, তাহাদিগকে প্রথমে বুদ্ধি-বিচারের দ্বারাই যথাসম্ভব সত্যের ধারণা করিতে হয় এবং সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়, ইহাই দার্শনিক বিচার, দর্শন-শাস্ত্রের সার্থকতা।

উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া ভারতে যে ষড়দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে বেদান্তদর্শন। বেদান্ত বা উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া মহামুনি বাদরায়ণ ব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে জীব, জগৎ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে যুক্তিযুক্ত দার্শনিক বর্ণনা দিয়াছেন, তাহারই নাম বেদান্তদর্শন। শুধু

বেদান্ত বলিতে সাধারণতঃ উপনিষদ্‌কে বুঝায়, আর বেদান্তদর্শন বলিতে বাদরায়ণ-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রকেই বুঝায়। গীতা ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের জন্ম নির্দ্দেশ করিয়াছে—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩। ৪ ॥

এই শ্লোকের প্রথম পাদে বেদ ও উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ, অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-তর্কের সাহায্যে জগৎতত্ত্ব যেখানে আলোচিত হইয়াছে; ইহাই দর্শনের সংজ্ঞা, অতএব ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তদর্শন।*

গীতার উল্লিখিত শ্লোক হইতেই বুঝা যায় যে, দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে তৎকালে ব্রহ্মসূত্র প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত। আজও শুধু ভারতে নয়, জগতের সকল স্থানেই বেদান্তদর্শন অতিশয় মান্য। জার্ম্মাণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক সোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন, "জীবনে বেদান্ত হইতেই শান্তি পাইয়াছি, মরণেও বেদান্ত আমাকে শান্তি দিবে।" কিন্তু মহামুনি বাদরায়ণ এই ব্রহ্মসূত্রে কোন্ অর্থ লক্ষ্য করিয়াছেন, কোন্ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, অথবা কোন্ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া এই ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা লইয়া আজ বিষম মতভেদ উপস্থিত। বেদান্তদর্শনে কিঞ্চিদধিক ৫ শত সূত্র আছে। গ্রন্থকার বহু বিচারের সার সংক্ষেপ করিয়া এক একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। এই সকল সূত্র এতই সংক্ষিপ্ত ও এতই অর্থবহুল যে, ইহাদের অর্থনির্ণয় ভাষ্য-টীকাদি ব্যতীত সহজে করিতে পারা যায় না। সূত্র রচনার উদ্দেশ্য বহু বিষয় সহজে স্মৃতিপটে জাগরূক রাখা। এই সকল সূত্রকে অবলম্বন করিয়া আচার্য্যগণ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিবেন, গুরুপরম্পরায় শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে, ইহাই সূত্র-রচনার সার্থকতা। কিন্তু কালক্রমে একই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নানা ব্যাখ্যা, নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মতভেদ এত অধিক যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা আর এত দিন পরে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথচ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এই বেদান্তদর্শন আমাদের ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই দর্শনের প্রাচীন অর্থ সম্যক্‌ভাবে জানিতে না পারিলেও, ইহার মূল লক্ষ্যটি—ইহার উপদেশের সার তত্ত্বটি যাহাতে আমরা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারি, সে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ প্রণালীতে তাহা সম্ভব ?

আচার্য্য শঙ্কর অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া ব্রহ্মসূত্রের যে বিস্তৃত প্রাঞ্জল ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, আমরা যদি নির্ব্বিবাদে তাহাই গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর কোন হাঙ্গামাই ছিল না। এক কালে ভারতে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব খুবই বেশী ছিল, শঙ্করের মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভারতের ইতিহাসের গতিই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ হইতে বৈদিক ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া শঙ্করাচার্য্যই ভারতে আবার নূতন করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই জন্যই হিন্দুর মনে শঙ্করের স্থান আজও এত উচ্চে। আজও বেদান্তদর্শন বলিতে অনেকেই শঙ্করের মতই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্কর বৌদ্ধ মতকে খণ্ডন করিলেও, নিজে সম্পূর্ণভাবে উহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তিনি ব্রহ্ম ও মায়া সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধমতের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।* কেহ কেহ এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাকেই ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া সমগ্র ভাবে গ্রহণ করা চলে না। ব্রহ্মসূত্রের আজকাল যে সব ভাষ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শঙ্করের ভাষ্যই প্রাচীনতম। কিন্তু শঙ্করের ভাষ্যেই দেখা যায় যে, শঙ্কর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের নানা মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শঙ্করের পরেও রামানুজ, শ্রীকণ্ঠ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বিজ্ঞানভিক্ষু, শ্রীকর, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি আচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই শঙ্করের ব্যাখ্যার মূলতঃ প্রভেদ রহিয়াছে। অতএব, ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক ভাষ্যকেই নির্ব্বিবাদে বেদান্তদর্শনের প্রকৃত বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। নিজ মতানুযায়ী বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়া শঙ্কর যে কর্ম্মত্যাগ, সংস্কারত্যাগ, সন্ন্যাসের আদর্শ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগের মানুষকে সে আদর্শ আর তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না, বেদে জীবনের সহিত আধ্যাত্মিকতার যোগের সহিত ভোগের যে সমন্বয় হইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তার গতি, সাধনার গতি আবার সেই দিকে যাইতেছে, সেই জন্য শঙ্করের ভাষ্যকেই চরম বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ বাহির করিবার জন্য আজকাল নূতন ভাবে চেষ্টা হইতেছে।

---

* ব্রহ্মসূত্রে "ঔডুলোমি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়" প্রভৃতি মুনিঋষির নাম যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহারাও অনুরূপ বেদান্তদর্শনের রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

* "পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ভাবের দ্বারা সাংখ্যের জ্ঞানপ্রণালীর প্রভাব নিশ্চয়ই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সাংখ্যের ন্যায়ই অনীশ্বরবাদী ও বহুবাদী বৌদ্ধমত বিশ্ব-শক্তির কার্য্যাবলীর অনিত্যতার উপর ঝোঁক দিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধমতে এই বিশ্বশক্তিকে প্রকৃতি না বলিয়া "কর্ম্ম" বলা হইয়াছে, কারণ, বৌদ্ধেরা বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ স্বীকার করে না; তাহাদের মতে বুদ্ধি যখন বিশ্বক্রিয়ার এই অনিত্যতা বুঝিতে পারে, তখনই মুক্তি হয়। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, তখন আর সেই পুরাতন সাংখ্যমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হইয়া শঙ্কর কর্ত্তৃক প্রচারিত বেদান্তমতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। শঙ্কর বৌদ্ধদের অনিত্যতার স্থানে তদনুরূপই বৈদান্তিক মায়াবাদ প্রচার করিলেন এবং বৌদ্ধদের অসৎ অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বাণ, শূন্যের স্থানে তদনুরূপই অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয়, অরূপ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

আমাদের পণ্ডিতরা কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে, নানা ভাষ্য ও টীকার মত তুলনায় সমালোচনা করিয়া, ব্রহ্মসূত্রের উল্লিখিত উপনিষদ্বাক্যসমূহের অর্থ উদ্ধার করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্রের রচনাপদ্ধতি আলোচনা করিয়া, শ্রুতিসঙ্গতি, শাস্ত্রসঙ্গতি, অধিকরণসঙ্গতি, পাদসঙ্গতি প্রভৃতির সূক্ষ্ম বিচার করিয়া, সূত্রের রচনাপ্রণালীঘটিত প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া এবং এইরূপ আরও নানা উপায়ে গবেষণা করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের মূল অর্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। * এইরূপ বিচার ও আলোচনার দ্বারা মানসিক তর্কশক্তি, বিচারশক্তির অনুশীলন হইতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তি পুষ্ট হইতে পারে, গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই ভাবে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ বাহির করা কত দূর সম্ভব হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। ব্রহ্মসূত্র রচনার যুগ হইতে আমরা এতদূরে সরিয়া আসিয়াছি; তখনকার ভাব, চিন্তা, ভাষা, রচনাপদ্ধতি আমাদের সহিত এত বিভিন্ন যে, আমরা এই ভাবে যত চেষ্টাই করি না কেন, বেদান্তদর্শনের রচয়িতার অভিপ্রেত অর্থ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা আর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।" বর্ত্তমান কালে বেদান্তদর্শনের যে দশখান ভাষ্য এবং তাহাদের টীকা এবং তদুপরি টীকাদি পাওয়া যায়, তাহাতে সূত্রার্থ অধিকরণার্থ, সূত্রপাঠ, অধিকরণবিভাগ এবং সূত্র ও অধিকরণের বিষয়বাক্যাদি লইয়া এত মতভেদ হইয়াছে এবং সেইমত মতভেদের অনুকূলে ও প্রতিকূলে এতই সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্রের অর্থ উদ্ধার করিতে তর্কবিচারকেই যথেষ্ট বলা যাইতে পারে না।

যাহাই হউক, দার্শনিক চিন্তার বিকাশের দিক দিয়া আমরা এরূপ চেষ্টার বিরোধী নহি। কিন্তু, ব্রহ্মসূত্র রচনার যাহা মূল লক্ষ্য, উপনিষদের অধ্যাত্ম সত্যসমূহের অনুসরণ করিয়া আমাদের জীবনকে অধ্যাত্ম[illegible] গড়িয়া তোলা, তাহা বুঝিবার জন্য এত তর্ক বিচারের কোন প্রয়োজন নাই এবং কেবল তর্কবিচারের দ্বারা তাহা ঠিক ভাবে বুঝাও যায় না। ব্রহ্মসূত্র রচনার পশ্চাতে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকটা সেরূপ উপলব্ধি বা দৃষ্টি না থাকিবে, তাহাদের পক্ষে শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের অর্থোদ্ধার করা আদৌ সম্ভব নহে। এ বিষয়ে গীতাই আমাদের আদর্শ। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব জানা আবশ্যক হইতে পারে, ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে সেরূপ তত্ত্ব যাহা পাওয়া যায়, গীতা সে সকলের সারোদ্ধার করিয়া নিজের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। গীতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ, গীতা সূত্রাকারে অতি সংক্ষিপ্তভাবে রচিত না হওয়ায়, তাহার অর্থ বুঝা তত কঠিন নহে; অতএব বর্ত্তমানে গীতাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকার সকলেই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া গীতা নিজেই বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ; বৌদ্ধযুগের অবসানের পর যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়, তখন উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই তিনটিই বেদান্ত সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, এই তিনটি সেই জন্য প্রস্থানত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর ভারতে যত বৈদিকসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে সকলেই নিজ নিজ মতের প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় গীতাকেও অবলম্বন করিয়াছেন গীতার উপরেও ভাষ্য ও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু গীতার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা তাঁহাদের মূল লক্ষ্য ছিল না, আপন আপন সাম্প্রদায়িক মতের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য; এই জন্য তাঁহারা নিজেদের সুবিধামত অনেক স্থলে টানিয়া বুনিয়া গীতার শিক্ষাকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ, গীতা কোন সাম্প্রদায়িক মতের পক্ষে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য রচিত হয় নাই। গীতায় আছে—বেদ উপনিষদের সমগ্র শিক্ষার সারোদ্ধার এবং সকল মতের উদার সমন্বয়। যাঁহারা গীতা হইতে কোন সম্প্রদায়বিশেষের বা মতবিশেষের সমর্থন করিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে গীতার অর্থ সঙ্কুচিত ও বিকৃত করিতেই হইবে। অতএব, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সরল অন্তর্দৃষ্টি সহায়েই গীতার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা যায়। যাহাই হউক, বর্ত্তমানে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা গীতার অর্থ বুঝা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ এবং গীতাকেই এখন হিন্দুধর্ম্মের, বৈদিকধর্ম্মের ও বেদান্তশিক্ষার প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই তিনটি বৈদিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ী। উপনিষদে যাহা নানা ছন্দে, নানা ঋষির দ্বারা নানা ভাবে গীত হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা সেই সমুদয়ের সার সংগ্রহ করিয়া সূত্রাকারে সাজাইয়া দিয়াছেন। বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ, সূত্রসমূহের উদ্দেশ্য বেদান্তবাক্যরূপ কুসুমরাশিকে একটি মালার আকারে গ্রথিত করা। কিন্তু দেখা যায় যে, উপনিষদ বা বেদান্তবাক্যকে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মসূত্র যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের যে সারসংগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রাধান্য থাকিলেও, উপনিষদের সকল তথ্যই ঠিকভাবে, পূর্ণভাবে ব্রহ্মসূত্রে গৃহীত হয় নাই। উপনিষদ হইতেই উদ্ভূত বেদান্তদর্শন, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন প্রভৃতির মধ্যে যে বিরোধ, গীতা তাহার সমন্বয় করিয়াছে এবং ইহার জন্য গীতা সকল দর্শনের মূল উপনিষদ্ সমূহকেই অবলম্বন করিয়াছে। অতএব, ব্রহ্মসূত্র যেমন উপনিষদের শিক্ষার সারসংগ্রহ, গীতাও সেইরূপ সারসংগ্রহ, কিন্তু গীতার সমন্বয় আরও উদার ও ব্যাপক। গীতা ব্রহ্মসূত্রের বৈদান্তিক শিক্ষাকেই কাঠামোস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে সাংখ্য ও যোগদর্শনের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। ব্রহ্মসূত্রে কেবল বেদান্ত বা উপনিষদেরই সারসংগ্রহ করা হইয়াছে। উপনিষদ্গুলি জ্ঞানপ্রধান, সাধারণতঃ নিবৃত্তিমূলক; বেদের উত্তর অর্থাৎ শেষভাগে

---

* শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত "বেদান্তদর্শনের কোন্ ব্যাখ্যা সঙ্গত?" নামক সুলিখিত প্রবন্ধে এইরূপ প্রস্তাবই করিয়াছেন।

কাণ্ডের সমন্বয় করিয়াছে। অতএব সকল দিক দিয়া দেখিলে বর্ত্তমানে আমরা গীতাকেই বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ্, দর্শনের সমগ্র আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

গীতা শিক্ষার আলোকে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের মূল সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ বুঝা যায়, এইবার আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

ব্রহ্ম

মহামুনি বাদরায়ণ-রচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র হইতেছে,—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

যাহা চরম সত্য, Ultimate Reality, উপনিষদে তাহাকে ব্রহ্ম নাম দেওয়া হইয়াছে, বেদান্তদর্শনে সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাই ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র বা ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মই পরম বস্তু, ইহার উপরে আর কিছুই নাই। বেদান্ত বলিয়াছে, সেই পরম সত্য বস্তু এক বই আর দুই নহে, একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা সকল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের অন্তর্গত। উপনিষদে ব্রহ্মকে কোথাও ঈশ্বর বলা হইয়াছে, কোথাও পুরুষ বলা হইয়াছে, কোথাও দেব বলা হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তদর্শন ব্রহ্ম বলিতে এ সকল শব্দ ব্যবহার করে নাই। সাংখ্য পুরুষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, যোগ ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, বেদান্তদর্শন সাংখ্য ও যোগের মত খণ্ডন করিয়া যেমন নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেইরূপ পুরুষ ও ঈশ্বর শব্দকেও ব্রহ্ম-বাচক শব্দরূপে গ্রহণ করে নাই। বস্তুতঃ ন্যায়সঙ্গত ব্রহ্মবাদে পুরুষ, ঈশ্বর ও দেবের স্থান ব্রহ্মের নীচেই হয়, আচার্য্য শঙ্কর তাহাই দেখাইয়াছেন। কিন্তু গীতা পুনরায় উপনিষদের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মকেই পুরুষ ও ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে ; গীতার মতে এই তিনটি শব্দই সমানার্থবাচক এবং ইহা শুধু নাম লইয়াই গোলমাল নহে, নামের সহিত তত্ত্বেরও নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে।

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে সেই ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

জন্মাদ্যস্য যতঃ

ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি।

সাংখ্য বলিয়াছে, ব্রহ্ম বা পুরুষ অকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয় ; প্রকৃতিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। সাংখ্যের এই মত নিরসন করিয়া বেদান্ত বলিতেছে,—ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি। ইহাতে এক দিকে যেমন সাংখ্যের মত নিরসন করা হইয়াছে, অন্য দিকে ব্রহ্মেরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদে নানা স্থানে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্গুণ, তাহাকে কোনরূপ লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, কেবল "নেতি," "নেতি," দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝান যায়, ব্রহ্ম "ইহা নহে," "ইহা নহে"। তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তাঁহার শব্দ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই, ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই। অন্যত্র বলা হইয়াছে, তিনি বাক্যের, মনের, ইন্দ্রিয়ের অতীত। কিন্তু, যখন বলা হইল, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, তখন ত "নেতি," "নেতি" হইল না। তিনি ত মনের অগোচর রহিলেন না, বুদ্ধির দ্বারা ত তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা গেল ! তাহা হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম এক নহে, দুই। এক ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ, আর এক ব্রহ্ম নির্দ্দেশ্য, সগুণ এবং এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি।—কিন্তু, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক ছাড়া আর দুই নাই।—তাহা হইলে একই ব্রহ্মের দুই অবস্থা, দুই ভাব, aspects—একটি নির্গুণ, একটি সগুণ।—কিন্তু একই বস্তুতে এরূপ বিরোধী ভাব কেমন করিয়া সম্ভব হয় ? ব্রহ্মসূত্রকার ইহার সহজ উত্তর দিয়াছেন,—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ

যুক্তি-তর্কের দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝা যায় না, শ্রুতি অর্থাৎ বেদোক্ত উপনিষদই ব্রহ্মবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে সগুণও বলিয়াছে, আবার নির্গুণও বলিয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের কোন স্থান নাই।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু শুধু এইরূপ উত্তরেই সন্তুষ্ট হন নাই। শ্রুতিকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা ঠিক। কিন্তু শ্রুতি ত যুক্তি-তর্কও নিষেধ করে নাই, শ্রুতিতেই আছে—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ"—বৃঃ, উঃ ২।৪।৫

এ স্থলে এই মননটি অনুমানাত্মক বিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব অনুমান, বেদান্তসিদ্ধান্তের অবিরোধী হইলে বেদান্ত-বাক্যার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার জন্যই আবশ্যক হয়। এইরূপে মানসিক যুক্তিতর্কের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর যুক্তির দ্বারাই উল্লিখিত বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। শঙ্করের যুক্তির সারমর্ম্ম এই,—

ব্রহ্ম একই সঙ্গে নির্গুণ ও সগুণ হইতে পারে না, অথচ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথাও নির্গুণ বলা হইয়াছে, কোথাও সগুণ বলা হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মের যে সগুণ ভাব, এটা মিথ্যা, মায়া, অবিদ্যা। বাস্তবিক ব্রহ্মে কোন গুণ, কোন লক্ষণ, কোন বিশেষ নাই, কেবল মনবুদ্ধির অজ্ঞান বা অবিদ্যার বশেই এইরূপ মনে হয়। ব্রহ্মের সগুণভাব, ঈশ্বরভাব, জগৎস্রষ্টা ভাব সত্য নহে এবং সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন এই জগৎও সত্য নহে, এ সবই মায়া, অবিদ্যা, যেন নিদ্রিতের স্বপ্ন দেখা।

তাহা হইলে সূত্রকার প্রথমেই ব্রহ্মের যে বর্ণনা করিয়াছেন, ভাষ্যকার শঙ্কর সেইটিকেই অবিদ্যা, বাণ মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনবুদ্ধির অজ্ঞানের বশেই ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের কোথাও অবিদ্যা বা মায়ার এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই অবিদ্যা বা মায়া সম্বন্ধে ধারণা

আচার্য্য শঙ্করেরই আবিষ্কৃত, * সূত্রকারের মনে ইহা স্থান পায় নাই।

কিন্তু, তাহা হইলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সমন্বয় কেমন করিয়া হয়? সূত্রকার এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল শ্রুতির প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ২।১।৩৭
সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ২।১।৩০
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ২।১।২৮

ব্রহ্মে সর্ব্বগুণই আছে, আবার ব্রহ্ম নির্গুণও বটেন, একই ব্রহ্মের মধ্যে বিরোধী ধর্ম্ম আছে, ইহা আমরা চিন্তার দ্বারা ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই যে ইহা অসম্ভব্য তাহা নহে, ব্রহ্মে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগ আছে এবং শ্রুতিই এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ।

এ বিষয়ে গীতা যে সমাধান করিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। ব্রহ্মসূত্রের ন্যায়ই গীতা শ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছে যে, একই ব্রহ্মের মধ্যে নানা বিরোধী ধর্ম্মের সমাবেশ হইয়াছে, ব্রহ্ম সগুণও বটেন, আবার নির্গুণও বটেন।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।
গীতা ১৩। ১২-১৪।

গীতার সকল দার্শনিক তত্ত্ব মূলতঃ শ্রুতি হইতেই গৃহীত। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শ্রুতিকে ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে অনুমান যুক্তি তর্কের ব্যবহার করিতে হয়। শ্রুতির মর্ম্ম ঠিক ভাবে বুঝা যায় যে, অতিশয় কঠিন, গীতা তাহা স্বীকার করে নাই। নানা লোক নানা ভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করে, তাহাতে লোকের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না, গীতা ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু, তাই বলিয়া গীতা শঙ্করের ন্যায় তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে মানসিক অনুমান যুক্তির উপর নির্ভর করিতে বলে নাই। সমাধির দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিলে, ভিতর হইতে যে জ্ঞানের দীপ জ্বলিয়া উঠে, জ্ঞানদীপের ভাস্বতা, গীতার মতে তাহাই সত্যাসত্যের চরম প্রমাণ।—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি। ২। ৫৩।

গীতার মতে বেদের স্থান খুবই উচ্চ। গীতা বলিয়াছে, স্বয়ং ভগবান্‌ই বেদবিৎ বেদান্তকৃৎ, কিন্তু ভগবান্ বেদেরও উপরে; কারণ, তাঁহা হইতেই সকল বেদের উৎপত্তি। অতএব, যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া অন্তর্যামী ভগবানের সহিত যুক্ত হইবে, সে বেদকেও অতিক্রম করিতে পারিবে, শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে। গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্—

বেদও বলিয়াছেন, হৃদয় হইতেই মন্ত্রের উৎপত্তি, সদনাৎ ঋতস্য গুহায়াম্। হৃদয়ের গুহ্যস্থান হইতে বেদের মন্ত্রের উৎপত্তি, এই জন্যই বেদ প্রামাণ্য। কিন্তু সত্য, অনন্ত বেদের মন্ত্রের মধ্যেই যে তাহা পূর্ণভাবে নিঃশেষে কথিত হইয়াছে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। অতএব অন্তরের সত্য অনুভূতি উপলব্ধির ভিতর দিয়াই আমাদিগকে বেদের জ্ঞানকেও পরিস্ফুট ও পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

যোগলব্ধ অন্তর্দৃষ্টির সহায়েই গীতা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সমন্বয় করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের প্রকৃত সত্তার অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে বেদান্তমতানুযায়ী প্রথমে আমাদিগকে "নেতি", "নেতি", "ইহা নহে", "ইহা নহে" করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। আমি এই দেহ নই, এই প্রাণ নই, এই মন নই—যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, সংসারে আমার ভিতরে ও বাহিরে যে পরিবর্ত্তনের খেলা চলিতেছে, আমি বস্তুতঃ এই সকলের উপরে অচল, অক্ষর, শান্ত, নিত্য, সনাতন, এক, সর্ব্বব্যাপী আত্মা, এই ভাবেই আমরা আমাদের মধ্যে নামরূপের অতীত সত্তার বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি পাই। এই উপলব্ধিই অধ্যাত্মজীবনলাভের অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রথম সোপান। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে নির্গুণ, নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর সত্তা রহিয়াছে, তাহাতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রকৃতির খেলা বন্ধ হয় না। * আমাদের ভিতরে ও বাহিরে দেহ, প্রাণ, মনের খেলা, জীবনের খেলা অবাধেই চলিতে থাকে, কেবল আমাদের আত্মা নিজের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করিয়া সাক্ষিস্বরূপ, উদাসীনবৎ, সেই খেলাকে দেখিতে থাকে, তাহার সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলে না। এই ভাবে দেখিলেই জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। যতক্ষণ আমরা আমাদের দেহ, প্রাণ, মনকেই আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া মনে করি, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ "অহং"কে, কাঁচা "আমি"কেই আমাদের সব বলিয়া মনে করি, ততক্ষণ এই জগৎলীলা, জীবনলীলা দ্বন্দ্ব-মোহের খেলা, সুখ-দুঃখের খেলা বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, গীতার মতে ইহাই অজ্ঞান, মায়া। কিন্তু যখন আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মায় পাকা "আমি"তে প্রতিষ্ঠিত হই, দেখি যে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বব্যাপী যে এক অক্ষর, অচল, নামরূপের

* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৌদ্ধগণের "অনিত্যতা" হইতেই শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণকে অনুসরণ করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, জগৎ মায়াত্মক। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে কোথাও জগৎকে মায়া বা মিথ্যা বলা হয় নাই।

* শঙ্কর মতানুযায়ী জগতের খেলা যদি মিথ্যা মায়া মাত্র হইত, তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই সেই মায়া দূর হইত, জগৎ লোপ পাইত, শরীর, প্রাণ, মন সব লোপ পাইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও দেহ থাকে, জীবন থাকে—সেই অবস্থাকে ব্রহ্মসূত্রে "জীবন্মুক্ত" বলা হইয়াছে।

অতীত নৈর্ব্যক্তিক আত্মা রহিয়াছে, আমিই তাই, "তত্ত্বমসি," "সোঽহং", তখন সমস্ত দ্বন্দ্ব মোহ দূর হইয়া যায়, সর্ব্বত্র ঐক্য, শান্তি ও আনন্দের লীলা আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, প্রকৃতি তখন নিজের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করে। ক্রমে আমরা উপলব্ধি করি যে, এই প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতি সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মারই শক্তি, আত্মা শুধু উপদ্রষ্টা নহে, আত্মাই ঈশ্বর, প্রকৃতি নিজের প্রভুর আনন্দের জন্য প্রভুরই ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে এই বিশ্বলীলার বিকাশ করিতেছে। সেই প্রভুই অচল অক্ষর আত্মারূপে এই লীলাকে দর্শন করিতে-ছেন, অনুমতি দিতেছেন, ধরিয়া রাখিয়াছেন, আবার তিনিই ক্ষররূপে এই প্রকৃতির লীলাকে সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে পরি-চালিত করিতেছেন—উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

ইহাই গীতার সমন্বয়। ব্রহ্ম নির্গুণও বটেন, সগুণও বটেন, অক্ষরও বটেন, ক্ষরও বটেন, ক্ষররূপে, সনাতন ভাবে নিজের শক্তিকে ধরিয়া তিনি বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন, বিশ্বলীলা করিতে-ছেন, জন্মাদ্যস্য যতঃ, আবার অক্ষররূপে, নির্গুণভাবে প্রকৃতির লীলা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া সেই লীলাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, দর্শন করিতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, কিন্তু সে লীলার মধ্যে মগ্ন হন নাই, তিনি সকল নামরূপের অতীত, নির্গুণ, নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষররূপে তিনি জীব ও জগতের মধ্যে আবির্ভূত, অক্ষররূপে সকল নামরূপের অতীত থাকিয়া জীব ও জগতের এক অচল শান্ত প্রতিষ্ঠারূপে বিরাজ করিতেছেন, আবার তিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত, জগতের অতীত, বিশ্বাতীত (transcendent), অচিন্ত্য অনির্দ্দেশ্য। তিনি ক্ষরেরও অতীত, অক্ষরেরও অতীত, তাই তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। এই পুরুষোত্তমই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।

অতএব সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মের সমন্বয় করিতে সূত্রকার বাদরায়ণ শ্রুতিকেই প্রমাণস্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন, শঙ্কর অবিদ্যা বা মায়াবাদের কল্পনা করিয়াছেন, আর গীতা দিব্য দৃষ্টিতে শ্রুতি-বাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সগুণ ও নির্গুণ এই দুইটিই পরব্রহ্মের দুইটা দিক, দুইটা অবস্থা, একই সঙ্গে তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম এই দুইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি বিশ্বানুগত বটেন, আবার বিশ্বা-তীতও বটেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅনিলবরণ রায় (এম্ এ)।

রাধিকার জ্বালা

বহি'—এত জ্বালা, লাঞ্ছনা, সকালে সাঁঝে,
সহি'—এত ব্যথা রাধা বল কেমনে বাঁচে ?
'ওহি'—বাঁশীটি সাধা, শুধু—বলিছে,—"রাধা,"
মরে লাজে সে আধা, কেহ শোনে বা পাছে।

দেখি—দেরি সে উতলা বাঁকা বাঁকিছে পুনঃ,
সখি—আয়ান রাগিয়া খুন হাঁকিছে শুন ;
পড়ি—জটিল জালে, ও যে—নাচিছে তালে,
ওই—কোটালী কুটিলা ফের টানিছে গুণ।

ফিরে—নিধু-বনে নিদ্‌হীন জাগিয়া বাঁকা,
ধীরে—রজনী বাড়িছে, বন—আঁধারে মাখা ;
পরি'—নীলাম্বরী, হরি—হৃদয়ে স্মরি'
ছাড়ি'—ভূষণ রাধিকা চলে আঁধারে ঢাকা।

ওই—আকাশে উঠিল মেঘ, চিকুর হানে !
এই—বিকাশে ধরাতে ধারা ঝাঁঝর গানে ;
বুঝি—বজর পড়ে ! যুঝি' সজোর ঝড়ে,
খুঁজি—ফেরে পথ, শুধু বিঁধে বারির বাণে।

নীচে—কণ্টক বিঁধে পদে ; ঝরিছে বারি,
নাচে—বিরাট পাদপ ভীম সঘনে সারি ;
বাঁশী—আবার বাজে ! আসি—রাধার বাজে।
পশি'—বড় নিদারুণ হয়ে হৃদয়ে তাঁরি।

তা'র—দু'পায়ে ঝরিছে লহু, তবু সে চলে,
যা'র—উপায় নাহিক তারে কি হবে বলে ?
বহি—কত না জ্বালা, যবে—মিলিল কালা,
'সেহি'—ছল ভরা মানে রাধা আবার জ্বলে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় [এম, এ]।

দরদিয়া

পাহাড়তলীর পাশ দিয়া যে শুভ্র কঙ্কররচিত পথখানি বিসর্পিত, তাহারই পার্শ্বে ঠিক পথের মোড়ে আমাদের বাংলো। স্বামী অসুস্থ, তিন মাসের ছুটী লইয়া আমরা উভয়ে এই নির্জ্জন নিভৃত স্থানে বাসা বাঁধিয়াছি। জনকোলাহল হইতে দূরে পশ্চিমের এই ছোট সহরটির নিভৃত প্রান্তে, ভৃত্য সুখন, উৎকলদেশীয় পাচক, এক ঝি আর গৃহরক্ষক রামরূপ চৌবে সঙ্গে আসিয়াছে। কলিকাতায় দশ জনের ভিড়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী ঘর-ভরা লোকের মাঝে নিতান্ত আপনার ভাবে স্বামীর সেবা ঘটিয়া উঠিত না। প্রিয়কে যখনই একান্তভাবে আপনার করিয়া লইব ভাবিয়াছি, তখনই দশ জনের কটূ কটাক্ষ, বিদ্রূপ এমন শাসনের ইঙ্গিত জানাইয়াছে যে, উন্মুখ বাসনার সমস্ত প্রবৃত্তিটাকে তখনই প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া চোখের জল ফেলিতে হইয়াছে। রুগ্ন, দুর্ব্বল স্বামীকে যতটা আঘাত দিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে রোগও ততটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শেষে এক দিন সমস্ত মাথায় তুলিয়া স্বামীর পায়ে কাঁদিয়া জানাইলাম, 'ওগো! এখানে থাক্‌লে যে তোমায় আমি কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না। এদের দুর্নিবার স্নেহের রূপ ধ'রে যে নির্ম্মমতা অহরহ তোমায় এমন ক'রে রোগের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তা হ'তে তুমি কি ক'রে রেহাই পাবে? আমি কি বুঝি না, তুমি কি চাও?—দুটি পায়ে পড়ি তোমার, এখান হ'তে বাইরে কোথাও চল, তুমি যা চাও, তাই দিয়ে আমি তোমার বুক ভরিয়ে রাখব। বল, আমার কথা রাখবে? আমি যে আমার বুভুক্ষু হৃদয়ের প্রাণপণ ভালবাসা, সেবা-যত্নে তোমায় ঢেকে রাখতে চাই। তুমিও কি এটুকু বুঝবে না?—এমনই ক'রে তিলে তিলে আমায় অকালে ভাসিয়ে দেবে?'

রুগ্ন স্বামী নীরবে মৃদু হাসিয়া আমায় বুকে তুলিয়া লইলেন, গালের উপর দুইটি আঙ্গুলের টোকা মারিয়া বলিলেন, "আমিও ক'দিন থেকে তাই ভাবছি, নীলা, বাড়ীর জন্যেও লিখে দিয়েছি। বোধ হয়, তিন চার দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে পারবো, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। যা বল্লে, ভাল ক'রে তুলতে পারবে ত?"

"নিশ্চয়ই, দেখো!—" আনন্দে নয়নপথে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"ও কি?—ছিঃ, তুমি বড় ছেলেমানুষ!"—তাড়াতাড়ি সাড়ীর আঁচলে মুখ-চোখ পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ গা! কে কে সঙ্গে যাবেন?"

"কেউ না, কেবল তুমি আর আমি দুজন। সকলকেই যদি সঙ্গে নিলাম, তবে ত সেই কলকাতায়ই হ'ল, তোমায় আর কোথায় কাছে পেলাম? ভয় নেই, মা আর বাবার অনুমতি পেয়েছি।"

সে দিন আনন্দের আতিশয্যে, স্বামীর কাছে নিতান্ত নীরব মৃদুভাষিণী আমার মুখ দিয়াও যে কত কথা বাহির হইয়া পড়িল, তাহা মনে করিয়া শেষে লজ্জাই পাইলাম। স্বামী কেবল সস্মিত মুখে সব শুনিতে লাগিলেন। সেই প্রবাসে সুদূর নিভৃতে উভয়ে কেমন বাসা বাঁধিব, আপন হাতে সংসার গুছাইয়া তুলিব, স্বামীকে আমার আকুল যত্ন ও সেবায় কেমন করিয়া আরোগ্যের পথে লইয়া আসিব ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম যায়গা সেটা?" স্বামী বলিলেন, "পাহাড়ে স্থান, বড় সুন্দর!—" সে স্থান কত আনন্দময় ও সুখের হইবে! কল্পনার রঙ্গীন নেশায় বিভোর হইয়া, কখন্ যে তাঁহার বুকের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম, সে খেয়াল ছিল না।

প্রায় দুই মাস হইল আমরা এখানে আসিয়াছি। সৌধ-কিরীটী, জনবহুল সহরের নির্ম্মম কঠোর আলিঙ্গন, সে যেন মানুষের প্রাণকে কেবল শাসনের চাপে পিষ্ট করিতে চাহে। নব বিকাশের ধারাকে একটা জড়ত্বের কঠিন আবরণে ঢাকিয়া রাখাই বুঝি তাহার উদ্দেশ্য। নারী তাহার দামী ভারি গহনা পরিয়া সুখ পায়, অহঙ্কার করে; কিন্তু স্বস্তি পায়—যখন ঘরে ফিরিয়া সেগুলিকে সে অঙ্গচ্যুত করে। তখনই সে খতাইয়া দেখে যে, তাহার প্রকৃতিদত্ত তনুখানির উপর যত্ন করিয়া

কতকগুলি কৃত্রিমতার আবরণ চাপাইয়া সত্যই তাহার উৎকর্ষের সে সহায়তা করিয়াছে, না তাহাকে প্রপীড়িতই করিয়া তুলিয়াছে? সহরের ইট-কাঠ, গাড়ী-ঘোড়া, মাথা ঠোকা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রকৃতির এই অবাধ অচঞ্চল উন্মুক্ত স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া দুই বেলা তাহাই খতাইয়া দেখিতেছিলাম।

সুদূর প্রবাসের এই মায়াময় পাহাড়ে-পুরীর স্নিগ্ধ নির্জ্জনতার নিভৃত সেবায় স্বামী দ্রুত আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, কেবল একটু বুকের দোষ আছে মাত্র। শরীরের দুর্ব্বলতার সঙ্গে আপনিই তাহা অন্তর্হিত হইবে। অনেক দিন পরে মুক্তির হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নীলা, এখানে এসে আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছে জান?"

"কি!"—

"আমার লক্ষ্মীটিকে চিন্‌তে পেরেছি। কলকাতায় থাক্‌লে কখনও তাকে আমি এত একান্ত নিবিড়ভাবে বুঝবার সুযোগ পেতাম না—এত সুন্দর, এত মিষ্টি সে!"—

'তবে তার বকশিস্'—বলিয়া হাত পাতিতেই স্বামী আমাকে টানিয়া লইয়া দুই গালে উপর্য্যুপরি কয়েকটা পুরস্কার-চিহ্ন আঁকিয়া দিলেন। অপ্রতিভ হইয়া আমি নিজেকে কোন রকমে ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম, "যাও! চারদিকে চাকর-বাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে—দেখে ফেল্‌ত যদি?"

স্বামী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

আমাদের নিত্যকার কাযের মধ্যে ছিল, রোজ দুই বেলা বেড়ান। স্বামীর দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। তাঁহাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য, শিরীষ-গাছের ছায়া-ঘেরা বারান্দায় দুইখানা চেয়ার পাতিয়া আমি বই পড়িতাম, স্বামী শুনিতেন। কখনও উভয়ে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতাম—দূরের তরঙ্গায়িত পাহাড়গুলির দিকে। ঘুঘুর ডাক, দূর শালনিকুঞ্জের অন্তরাল হইতে সাঁওতাল বেণুর টানা সুর কাণে প্রবেশ করিত। স্বামী বলিতেন, "কি মিষ্টি, কি সুন্দর,—সমস্তই যেন উদাস ক'রে দেয়।"

সে দিন সকালেও প্রতিদিনের মত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। আঁকাবাঁকা পথের দুই পাশে সরল শালের শ্রেণী, বন ঝোপ। জানি না, কোন্ দূরগ্রামে এই জনহীন পথ গিয়া মিশিয়াছে। স্বামী আর আমি পাশাপাশি, একটু পশ্চাতে সুখন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতের আলো, সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ-ঝাড়, শাল-নিকুঞ্জের শ্যাম-স্নিগ্ধতাটুকু বেশ লাগিতেছিল। সেই সঙ্গে খুব কাছেই কোন এক রাখাল-বালকের বেণুগান নিতান্ত পরিচিত বোধ হইতেছিল। যে দিন হইতে আমরা এখানে বাসা বাঁধিয়াছি, সে দিন হইতে দুই বেলা ঐ সুর কাণে বাজিয়া আসিতেছে।

বেশী দূর আসি নাই; পাতার ফাঁকে তখনও আমাদের বাংলোটি দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, পথের পাশে এক সাঁওতাল-তরুণী বেশ সস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। বোধ হয়, এই শাড়ী-সেমিজ-শোভিত বঙ্গনারীটি কোন অভিনব জিনিষের পর্য্যায়ে পড়িতে পারে—হয় ত সে তাহাই ভাবিতেছিল। তাহার নিটোল দেহ যৌবনের লাবণ্য-সম্ভারে ভরপুর। ভারি বুনট জোলাই কাপড়টি তাহার কালো কটিখানিকে বেষ্টন করিয়া যৌবন-তরঙ্গায়িত পুষ্ট বুকের উপর দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহার ঘনশ্যাম গাত্রবর্ণ কি স্নিগ্ধ! গোলগাল হাত দুইটিকে ঘিরিয়া কয়েকটি ভারি চাঁদির তাগা, বাকিটুকু উল্কি আঁকা; নগ্নকণ্ঠে হাঁসুলি, পায়ে থাপে থাপে বসা ভারি চাঁদির 'গোড়ি'। তাহার কালো চুলের প্রকাণ্ড খোঁপায় নানাবর্ণের পুষ্পসম্ভার, দুই কাণে দুইটি রক্ত টগর। তাহার বাম কক্ষে একটি ছোট্ট ঝাঁপি, শালপাতার দোনায় সাজানো কয়েক রকমের বুনো ফল। বোধ হয়, হাটে বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। স্বামী বলিলেন, 'এগুলি পিয়ার আর বুনো জাম।' ভারি ইচ্ছা হইল, তাহার সঙ্গে কথা বলি। স্বামী বলিলেন, 'বেশ ত, কিছু ফল নাও না; ওর-ও বিক্রী হবে—তোমারও কথা বলা হবে।' আমি একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সেগুলিকে সে বেচিবে কি না? প্রথমটা কোন উত্তরই পাইলাম না; কেবল তেমনই সস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ডাকিল, "চন্দু,—এ চন্দু, ইধারকে আয় না রে!"

"কেনে গে?"

"আয় না তু!"

বলিতে বলিতে রাস্তার ধারের বনের অন্তরাল হইতে আর এক তরুণ সাঁওতাল যুবক আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার দুই হাতে দোনায় করা কালজাম, বগলে তৈলচর্চ্চিত পাকা বেণুটি। নিটোল গোল মুখখানিকে ঘিরিয়া কালো থোকা থোকা কোঁকড়ান চুলের রাশি ঘাড়ে কাঁধে লুটাইয়া পড়িয়া দোল খাইতেছে; তাহার কাণের

পাশ দিয়া জড়ানো শাল-ফুলের সরু মালাটি, এক পাশে সাধের চিরুণীটি যত্নে গোঁজা। আমাদের পানে তাকাইয়া তাহারা নিজেদের মধ্যেই কি হাসাহাসি করিয়া লইল। শেষে মেয়েটি চন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "জরু বটে, না রে?" বুঝিলাম, আমি আমার পাশের লোকটার স্ত্রী কি না, সেইটাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিতেছে। স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝলে ত?" আমার মনের ভিতরেও যে একটু সরমের ললিত ছাপ না পড়িল, তাহা নহে। শেষে স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে! এগুলি বেচবি?"

চন্দু দোনাগুলি ঝাঁপির ভিতর সাজাইতে সাজাইতে বলিল, "তু লিবি?—সব?"

"হুঁ, কত?"

বড় বড় দুই চক্ষু তুলিয়া খুব গম্ভীরভাবে চন্দু বলিল, 'চার পিইসা'—সঙ্গে সঙ্গে হাতের চারটা আঙ্গুল তুলিয়া দেখাইল। স্বামীও ঠিক তেমনই গম্ভীরভাবে হাতের দুইটা আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, 'দু পিইসা!'

'দুৎ, বাবুটা লিবেক নাই, ঢং করছে রে, চন্—হুঁ!" বলিয়া চন্দুর সঙ্গিনী স্বামীর প্রতি একবার কোপকটাক্ষ হানিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। স্বামী হাসিয়া ফেলিলেন, পকেট হইতে একটা আধুলি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "সুখন এগুলি বাংলোয় দিয়ে আসুক, আমরা ততক্ষণ একটু এগোই।" চন্দুর সঙ্গিনী আধুলিটা তুলিয়া লইল, পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। শেষে চন্দু বলিল, "এ বাবু, পিইসা নেই, তুই লিয়ে যা।"

'আচ্ছা, তু ওটা লে,—বকশিস্'—তার পর সুখনকে ফলগুলি বাংলোয় পৌঁছিয়া দিতে বলিয়া উভয়ে অগ্রসর হইলাম। চন্দুকে তাহার সঙ্গিনী বলিতেছিল, "না, বাবুটা ভাল বটে।"

সুখনের এটা কিন্তু বিশেষ মনঃপূত হয় নাই। তাহার ইচ্ছা, পয়সা না থাকে, বাংলোয় গিয়া দিবে, আধুলি কিছুতেই দিবে না। কিছু দূর গিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, সে তাহাদের সঙ্গে রীতিমত বচসা সুরু করিয়া দিয়াছে। স্বামীর এই দানশীলতা তাহার কাছে বোকামিরই নামান্তর ছাড়া অন্য কিছু নহে। কিন্তু এই জংলিরা যে তাহার প্রভুকে দুই পয়সার জিনিষ দিয়া আটগণ্ডা পয়সা আদায় করিয়া লইবে, প্রভুভক্ত সুখন বোধ হয় উহা বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। এ ছাড়া তাহার দৃষ্টিটাও আমার কাছে কেমন কুৎসিত বোধ হইল। সে আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, সেই সাঁওতাল তরুণীর অর্দ্ধ অনাবৃত সৌন্দর্য্যপুষ্ট কমনীয় তনুখানির দিকে লুব্ধ লোলুপভাবে কেবলই ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছিল। স্বামীর নজরে পড়ে নাই বটে, কিন্তু মেয়েমানুষের চোখ—এড়ান বড় কঠিন।

একটি ছোট ঝর্ণাধারা কতকগুলি নুড়ি-পাথরের বুকের উপর দিয়া ঝির্ ঝির্ বহিয়া যাইতেছে। দুই পাশে তেমনই ঝোপ-ঝাড় বনের খেলা, ক্ষুদ্র একটি পাথরের সেতুর উপর দিয়া পথটি ঘুরিয়া গিয়াছে। স্বামী রুমাল বাহির করিয়া সাঁকোর ধারের খানিকটা পাথর ঝাড়িয়া বলিলেন, 'এস, একটু বসা যাক্।' তার পর পথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'না—সুখনটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, মাগীটাকে নিয়ে আবার টানাটানি সুরু করেছে।' চাহিয়া দেখিলাম, দূরে সুখন সাঁওতাল মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাংলোর দিকে চলিয়াছে। তাহার কক্ষে ফলের ঝাঁপিটি, পশ্চাতে চন্দু। স্বামীকে বলিলাম, "ওগো, সুখনকে একবার ধম্‌কে দাও না, কেন ওদের খাম্‌কা জ্বালাতন কচ্ছে!"

"আমার কি আর অত গলার জোর আছে যে, চেঁচালে শুনতে পাবে?—মরুক্ গে, বোঝাপড়া করুক ওরা, তুমি একটু বস, হাঁপিয়ে পড়েছ যে দেখছি।"

বসিলাম। কতক্ষণ পরে, হঠাৎ বাংলোর দিক হইতে একটা চেঁচামেচি, তর্জ্জন-গর্জ্জন কাণে আসিতেই স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'না, বেটারা তাড়িখোরের জাত, কোথায়ও কি একটু স্বস্তি দেবে না? সুখন বেটাকে আজ ঘাড় ধ'রে না তাড়ালে চল্‌ছে না, খাম্‌কা ওদের নিয়ে হৈ-চৈ লাগিয়েছে। চল—না গেলে ত আর নিবৃত্তি নেই।'

বাংলোর কাছে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। কোন রকমে মুখ দিয়া বাহির হইল, 'ওগো, এ কি হ'ল?'—সিঁড়ির উপর চিৎ হইয়া সুখন গোঁ গোঁ করিতেছিল, মাথায় রক্তের ফিনকি, সমস্ত সিঁড়িটা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ঝি চাকর সকলে মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া চেঁচামেচি করিতেছিল। পাশেই রামরূপ আর উড়িয়া পাচক মিলিয়া চন্দুর দুইটি হাতকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়াছে। তাহার কালো কুচ্‌কুচে লম্বা বাঁশীটি সম্মুখে ধূলিলুণ্ঠিত—টাট্‌কা রগরগে রক্তমাখা। তাহার সমস্ত মুখখানা বার বার ফুলিয়া ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। এক একবার দাঁত কিড়মিড় করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, আর চৌবে তাহাকে আরও

ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিতেছে। এক পাশে নিতান্ত ভীত জড়সড়ভাবে সেই সাঁওতাল মেয়েটি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দৃষ্টিতে আকুল উদ্বেগের ছায়া। এক নিমিষেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া স্বামী, উড়িয়া ঠাকুরকে তখনই থানায় পাঠাইলেন। তার পর সকলে মিলিয়া সুখনের রক্তবন্ধের চেষ্টা করিতে লাগিল। ডাক্তার আসিলেন, রক্ত অনেক কষ্টে থামিল বটে, কিন্তু সুখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার বলিলেন, "আঘাতটা ঠিক তালুর ওপর, বড় সাংঘাতিক রকম লেগেছে—হাঁসপাতালে পাঠানই ভাল।" স্বামীও তাহাই উপযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু সেখানে তাহার বেশীক্ষণ বিশ্রামের অবসর হইল না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুখনের ইহজীবনের অবসান হইয়া গেল।

দারোগা আসিলেন, স্বামীর ও ডাক্তারের এজাহার লিখিয়া লইয়া কয়েকজনকে সাক্ষী মানিয়া আসামীকে চালান দিলেন। লাল-পাগড়ী দুই জন কনেষ্টবল চন্দুর দুই হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিয়া লইয়া চলিল। চন্দু একবার শুধু মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ডর করিস নাই রে নীমু, আমি এই এখনকে আস্‌ছি—বড়কুকে বলিস্ নাই।" পিছন হইতে এক লাল-পাগড়ী গলা ধাক্কা দিয়া বলিল, 'হঁ—বে, অথ্‌খনকে আস্‌ছি—চল্!—'

নীমু এতক্ষণ কোন শব্দ করে নাই, কেবল নিতান্ত অসহায় বিষণ্নমুখে চন্দুর পাশে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিতেছিল। কিন্তু চন্দুকে টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া সে আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া পথ আগুলিয়া ধরিল। পুলিস তাহাকে সরাইয়া দিতে গেল, নীমু জোর করিয়া চন্দুর কোমর আঁকড়াইয়া ধরিল, কিন্তু দুই জন সবল পুরুষের শক্তির কাছে অসহায়া দুর্ব্বলা নারীর শক্তি কতটুকু? তাহাকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া পুলিস আসামী লইয়া চলিয়া গেল। নীমু হাহাকারে চারিদিক আকুল করিয়া আমাদের বাংলোর রকে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। ভয় পাইয়া আমি বলিলাম, "ওগো, দেখ না গো!"

"না, ও-রকম খুনেদের প্রশ্রয় দিতে নাই" বলিয়া স্বামী গম্ভীর হইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। নীমু আমার পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল, চন্দুর দোষ শুধু তাহাকে কুৎসিত অপমান করিতে দেখিয়া রাগের ভরে সুখনের মাথায় আঘাত করে—এমন ভীষণ পরিণাম হইবে, তাহা সে ভাবে নাই। আমারও তাহাই মনে হইল, নহিলে নিরীহ শান্ত পাহাড়ী ইহারা, মানুষ খুন করা ইহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সঙ্গিনী নারীর নির্য্যাতনই চন্দুর তরুণ দেহের রক্তকে এমন উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিশ্চয়ই তাই। ঝিকে ডাকিলাম, সে-ও বলিল, ঐ সাঁওতালনীটাকে সুখন এমনভাবে টানাটানি করিতেছিল যে, তাহার কুৎসিত আচরণ চন্দু সহিতে পারে নাই! কোন পুরুষমানুষই পারে না। ভিতরে আসিয়া স্বামীকে সে কথা জানাইলাম, কিন্তু তিনি সে কথায় কাণ দিলেন না, বাহিরে আসিয়া নির্ম্মমভাবে নীমুকে বাংলোর বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আমার চোখ দুইটাও কেন জানি না অকারণ অশ্রুতে হঠাৎ ছল-ছল করিয়া উঠিল। নারীর মমত্ব, আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে, আমি আমার এই রুগ্ন স্বামীকে আরোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য এই নিভৃত পুরীতে ঘর বাঁধিয়াছি, তাহারই দ্বারে আজ তাহারই মত এক অসহায়া নারীর কাতর করুণ আবেদন এমনই ভাবে উপেক্ষিত হইল! হউক সে জংলী—নারীর মমত্ব, প্রেম চিরকাল সকল দেশে কি তেমনই গভীর, তেমনই নিবিড় নহে?

*　*　*　*

সে দিন বৈকালবেলা আদালত হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া একটা ইজিচেয়ারের উপর স্বামী বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আজ রায় বেরিয়ে গেল।"

"কি হ'ল?"

"যা ছিল কপালে, ফাঁসী—"

চমকিয়া উঠিলাম, "ফাঁসী! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, তাহার নিরীহ শান্ত সঙ্গিনী নীমুর কথা। যৌবনের এই প্রথম চলার পথে, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা লইয়া উভয়ে পাহাড়ের কোলে ঘনবনচ্ছায়ে ছোট পল্লীর ক্রোড়ে নিতান্ত সহজ সরল ভাবে তাহাদের ঘর বাঁধিয়াছিল। দুই দিন আগে তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, কত বড় একটা নির্ম্মম অন্তরায় তাহাদের এই নিবিড় মিলনের মাঝে একটা প্রকাণ্ড, আজীবন বিরহের রেখা টানিয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভ্রমেও কখন তাহারা ভাবে নাই, তাহাদের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষার কল্পনা এক গভীর অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে এমনই আকস্মিকভাবে মিলাইয়া যাইবে! একটা তীব্র বেদনা আমার সমগ্র অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

'কে এর জন্য দায়ী ?' নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

'উঃ!' বলিয়া স্বামী একটা পরিশ্রান্ত দীর্ঘনিশ্বাস টানিতেই চমকিয়া দেখিলাম, স্বামী তাঁহার মাথাটি চেয়ারের উপর এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া আছেন। তাঁহার আননে একটা যন্ত্রণার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ও কি, অমন কচ্ছ কেন তুমি ?"

"বুকটা কেমন কচ্ছে, নীলা। তোমার কথা না শুনে এ কদিন হাঁটাহাঁটি ক'রে বড় অন্যায় করেছি, এখানটায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে ?"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। "কেন তুমি আমার কথা শুন্‌লে না ? এখানে যদি তোমার অসুখ বাড়ে, তবে একলা মেয়েমানুষ আমি, তোমায় নিয়ে কি করবো ?"

স্বামী বোধ হয় আমাকে একটু ভুলাইবার জন্যই জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন। "ও কিছুই নয় নীলা, দুর্ব্বল কি না, তাই একটু হাঁপিয়ে পড়েছি। এক কাপ চা কর দেখি, সব সেরে যাবে।" তাড়াতাড়ি এক কাপ চা করিয়া ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলাম।

ডাক্তার আসিলেন। নানা রকমে পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিয়া গেলেন, 'হার্ট খুবই দুর্ব্বল, এতটা পরিশ্রম তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। অতি সাবধানে রাখিতে হইবে।'

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে অনেকটা সংবরণ করিয়া রামরূপকে দিয়া শাশুড়ীকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলাম। সারারাত্রি স্বামীর পার্শ্ব ত্যাগ করিলাম না। প্রথম রাত্রিটা তিনি ভালই রহিলেন, কিন্তু ভোরের দিকে এমন প্রবল জ্বর দেখা দিল যে, বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। উদ্বেগে আশঙ্কায় আমার বুকের সমস্ত রক্ত শুকাইয়া গেল। আর বুঝি ধরিয়া রাখিতে পারি না। "ভগবান্! এত নিষ্ঠুর হইবে তুমি ?"

শ্বশুর-শাশুড়ী আসিলেন। সঙ্গে লোকজন আসিল। সেবা চলিতে লাগিল। জ্বর কমিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তেমনই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এত বড় শাস্তি আমায় দিও না ঠাকুর! এ আঘাত আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না। কিন্তু, সেই নিদারুণ মুহূর্ত্তে,—স্বামীর সেই শেষ বিদায়ের ক্ষণেও আমার সমস্ত আকুল ক্রন্দনকে ছাপাইয়া কাণের কাছে কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, সেই সাঁওতাল মেয়ে নীমুর কাতর ক্রন্দনধ্বনি—প্রিয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় কি করুণ আর্ত্তধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে না নির্গত হইয়াছিল!

উঃ! আজ যেন বিদ্রূপের রূপ ধরিয়া সেই স্মৃতি কেবলই আমায় তীব্র কশাঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল।—'ভগবান্, এই কি তার শাস্তি ?'—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, 'তারা কি আমায় ক্ষমা করবে না, ঠাকুর!—তুমি ত জান অন্তর্যামি, তার বেদনায় কত বড় আঘাত আমার মর্ম্মের মাঝে সে দিন দিয়েছিল—উপায়হীনা নারী আমি,—কতটা নাড়া দিয়েছিল সে আমার অন্তরের নারীত্বের আসনটাকে, সবই ত জান তুমি!—তবে ?—স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও দয়াল!—'

অভাগী আমি! মানবের শত কাতর ক্রন্দন, আকুল হাহাকার মৃত্যুর আসন কবে টলাইয়াছে ?—জীবনের সমস্ত ইহকাল ভাসাইয়া দিয়া প্রিয় আমার সেই দিনই শেষ বিদায় লইলেন। শাশুড়ী হাহাকার করিয়া উঠিলেন। আমি যখন আপনাকে সচেতন অবস্থায় ফিরিয়া পাইলাম, তখন আমার নূতন বেশ—শুভ্র, রিক্তাভরণা। শাশুড়ী বলিলেন, 'বৌমা, একটু স্থির হও, দুদিন ত চ'লে গেল, আর এখানে থেকে কি হবে ?—চিরকাল ত কাঁদবার জন্য আছেই, আজই আমরা এখান হ'তে বেরিয়ে পড়ি।'

বৈকালে জিনিষপত্র বোঝাই হইয়া গাড়ী ষ্টেশনে চলিয়া গেল। বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত, শাশুড়ী ডাক দিলেন। একবার শেষবারের জন্য স্বামীর ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িলাম। সেই ঘরে স্বামী আমার শেষ শয্যা লইয়াছিলেন।—নারীর সে যে পূজামন্দির, পুণ্যতীর্থ।—শাশুড়ী তাড়া দিলেন, অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিলাম।

গাড়ীতে উঠিতে গিয়া আমার উদ্যত পা সেইখানেই থামিয়া গেল। এক ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া সেই নীমু, আমারই মত আভরণহীনা,—ছোট্ট একটি ঝাঁপিতে সযত্নে সাজান তেমনই কতগুলি—পিয়ার আর জাম!—নীরবে সে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, এক এক বার তাহার মোটা শাড়ীর আঁচলে সে চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিল। ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে তাহার সমস্ত মুখখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমার দিকে চাহিতেই তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। তেমনই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তু যাচ্চিস্, মাইজি! এগুলি লিয়ে এসেছি—তু কি লিবি নাই ?"

আমি আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলাম না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। কত বড় শত্রুতা ভুলিয়া তাহার নিজের মহা দুর্দ্দিনেও আজ ঐ সাঁওতাল মেয়েটি আমার এই প্রচণ্ড বেদনায় তাহার প্রাণের সহানুভূতি জানাইতে আসিয়াছে! কত বড় দরদী সে, যাহার বুকের ভিতরে, এই অজানিতা অপরিচিতার অসীম বেদনাই আগে তাহার নিজের সমস্ত দুঃখ-বিষাদকে ছাপাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! সর্ব্বস্ব হারাইবার কি বেদনা,সেই যে আজ যথার্থ বুঝিয়াছে, তাই ত— সে আজ তাহার সমব্যথিতার দ্বারে ছুটিয়া আসিয়াছে! ধীরে আঁচল পাতিয়া তাহার সযত্নের দানগুলি বুকে তুলিয়া লইলাম,—এ যে কত বড় ক্ষমার দান!

গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। যত দূর দৃষ্টি চলে, নীনু তাহার অশ্রুধারা চোখে লইয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। ক্রমে ঝাপসা—দূর হইতে দূরে সে চলিয়া গেল। গাড়ীর জানালায় মাথা রাখিয়া আমি,—অত-বড় শোকের মাঝেও বুকের ভিতর তখন একটা স্নিগ্ধ তৃপ্তির রেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—সে আমায় ক্ষমা করিয়াছে, আজ সেইই আমার বুকের যথার্থ দরদিয়া—মরমের মরমিয়া, ঠাকুর!

শ্রীঅরুণ ঘোষ।

সুবিচার

(গাথা)

গৌড়ের দরবারে
নিবিড় কালো জমাট মেঘের ভারে
থমথমে ঘোর বজ্র-গর্ভ আকাশখানির মত
নিরুদ্ধ-শ্বাস পাত্র মিত্র সভাবৃন্দ যত,
শুনতেছিল দরিদ্র এক নারীর করুণ অশ্রু-সজল কথা,
ভাষায় ভাবে ভঙ্গিমাতে যার চল্‌কে যেন পড়তেছিল ব্যথা।
কইল নাগরিকা,
রাজার কুমার কেমন করে' তায়
দেখে একা পাতার কুঁড়েয় দীন দরিদ্র দুর্ব্বল নিরুপায়,
করল হরণ তাহার পরম নিধি
সব নারীকেই বিধি
করেছেন যা দান
রাজেন্দ্রাণী হ'তে ক্ষুদ্র কুটীরবাসী—তাহারো সমান।

নত নয়ন আরো নত করে'
রইল খাড়া ধর্ষিতা সে কম্পমতী, ডরে!
স্তব্ধ সভাতল—
নিশীথ কালে যেমন নীরব বিপুল মরুস্থল।
আমি জানি, এ নয় সতী কভু;
এ অভিযোগ মিথ্যা, সত্য নয়!
এ কুরূপায় কুমার হবেন আসক্ত যে, করবে কে প্রত্যয়?
যাচ্ছে বোঝা বেশ
দারিদ্র্যের ক্লেশ
করতে লাঘব বের করেছে ফন্দি অভিনব—
আজ্ঞা দিউন্, দুষ্টে এমন দূর ক'রে দি' রাজ্য হ'তে তব।

টপটপিয়ে পড়তেছিল তপ্ত আঁখিজল
ভিজিয়ে নারীর ছিন্ন শাড়ী ব্যথায় দোদুল দীর্ণ উরস্থল।
রামপাল দেব রাজা
ভাবতেছিলেন সিংহাসনে ব'সে, কারে দিবেন সাজা;
অপরাধী কে—
কুমার, কিম্বা এই দুখিনী নারী, বাদী যে।

মন্ত্রী কহেন ধীরে—
"কিছু অর্থ ভিক্ষা দিউন্, যাক্ এ ঘরে ফিরে।
পাল-বংশের কুলপ্রদীপ তরুণ যুবা কুমার—"
শেষ হলো না কথা। খুলে পিছন দুয়ার
বেগে সভায় ঢুকলেন এসে অশ্রুমুখী রাণী—
সভয়ে সব সভাসদ্‌গণ, আসন ছেড়ে দাঁড়াল, জোড়-পাণি।
রাণী কিছু বল্‌বার আগেই আজ্ঞা দিলেন রাজা
"—এ রাজ্যে যে নারীর মান না রাখে, মৃত্যু তাহার সাজা!"

তড়িৎ-পৃষ্টের মত
আঁৎকে উঠল সভাসদগণ যত।
কহেন রাণী—"প্রভু, কর' অবধান,
লও আগে সন্ধান—"
বল্‌লেন রাজা হাসি—
"এখনো কি কেউ আছে অবিশ্বাসী?
এক বর্ণও মিথ্যা ইহার নয়।
সব শুনেছি, অনেক ভেবে করেছি প্রত্যয়।
মরণেও সেই গ্লানির মরণ নেই, হেন কলঙ্কময়—
কোনো নারীই কোন লোভে, মিথ্যা নাহি কয়।
আজ্ঞা আমার তাই—
নারীর এমন সর্ব্বনাশ যে করে, মৃত্যুই শাস্তি তার—উপায় নাই।"
গর্জ্জিলা পাট-রাণী—
"এ অবিচার, আমি এ না মানি।"
নম্র ধীর বাণী
কহেন রাজা—"শোনো রাজেন্দ্রাণি,
এই সুবিচার, আমি নিরুপায়—
ঘরে চল', রাজসভাতে শোক শোভা না পায়।"
যেতে যেতেও বলে' গেলেন রাজা—
"অত্যাচারীর শূলই আসল সাজা।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আঙ্কেরের বিলুপ্ত সভ্যতা

ফরাসী ইন্দোচীনের গভীর অরণ্যমধ্যে আঙ্কর অবস্থিত। কত কাল পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয়। তবে ইদানীং এই স্থান অরণ্যবেষ্টিত হইলেও এককালে এখানে সুবিশাল নগর, সুরম্য মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। নগরনির্ম্মাণপদ্ধতি, পরিখা প্রভৃতি দেখিলে দর্শকের মনে হইবে, এক দিন এখানে শক্তি ও বিদ্যার প্রচুর চর্চ্চা হইত। প্রভূত বাহুবলকে উপেক্ষা করিবার বিপুল আয়োজন এখানে ছিল।

কিন্তু যে শিক্ষার আদর্শ 'আঙ্কর'এ গঠিত হইয়াছিল, যে লোকসমাজ এখানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এক দিন সহসা নীরবে তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তার পর শত শত বৎসর ধরিয়া বংশ ও অশ্বত্থবৃক্ষের অরণ্য এই নগরকে লোকলোচন হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সুসভ্য জগৎ তাহার স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। যেখানে একদা ৩ কোটি লোকের বাস ছিল, তাহার সকল ইতিহাস, সকল স্মৃতি জগৎ ভুলিয়া গিয়াছে।

কাম্বোডীয় প্রেক্ষাগৃহের দৃশ্য

দুই পুরুষ পূর্ব্বে জনৈক ফরাসী জীবতত্ত্ববিদ এই ভীষণ অরণ্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া জীবজন্তুর প্রকৃতি অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করেন। তিনি তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের আজ্ঞানুবর্ত্তী দৈত্যের কৃত কর্ম্মের ন্যায় অকস্মাৎ তাঁহার নয়নসমক্ষে একটা আশ্চর্য্য নগরী—মন্দির, পরিখা, প্রাসাদ-সমন্বিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। কিন্তু সেই জনহীন, শব্দহীন অরণ্যমধ্যে একটি পাঁচতল পিরামিডের মত অট্টালিকা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, সেই সোপানবহুল মন্দির অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময়—এমন বিচিত্র কারুশিল্প, এমন ভাস্কর্য্য মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

উহার চারি পার্শ্বে পরিখাবেষ্টিত প্রাচীর। কারুকার্য্যখচিত একটি তোরণ-পথে মন্দিরের সোপানশ্রেণীর সন্নিহিত হওয়া যায়। নানাবিধ আরণ্য লতা, গুল্ম ও বৃক্ষ মন্দিরের চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মন্দির অটুট অবস্থায় গর্ব্বোন্নত শিরে দণ্ডায়মান।

দেউলের ইতস্ততঃ তখনও বহু দিন নির্ব্বাপিত যজ্ঞাগ্নির ভস্মরাশি পতিত রহিয়াছে। পরিব্রাজক উহা দর্শন করিয়া এমনই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইতেছিল, বুঝি যাজ্ঞিকগণ এখনই ফিরিয়া আসিবেন, হয় ত তাঁহাদের পদশব্দে জনহীন মন্দিরের প্রচণ্ড নীরবতা আবার এখনই ভঙ্গ হইবে। বাস্তবিক, এমন একটা সভ্যতা যে জাতির মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই সভ্যতা ও সেই দেশের জনমণ্ডলী

অকস্মাৎ কোনও প্রকার সংবাদ, প্রতিবেশীকে পর্য্যন্ত না দিয়াই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল ?

শূন্য দেবালয়ে, গৃহে কোনও মনুষ্যের কঙ্কাল পর্য্যন্ত নাই। শুধু প্রাচীর-বেষ্টিত নগর—ধ্বংসস্তূপে মানবের স্মৃতি জাগ্রত।

জীবতত্ত্ববিদ্‌ মাউহো যখন অভিভূতভাবে এই দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ৬০ বৎসর পরে আঙ্ককরের ভাস্কর্য্য-প্রতিভা পণ্ডিতগণের দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়াছে। এখন সেই জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর শত শত দর্শনার্থী এখানে সমবেত হইয়া নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া প্রসঙ্গে উপকথার কাহিনীকেও ম্লান করিয়া দেন।

টোন্‌লে স্যাপ বা সুবৃহৎ হ্রদের তীরে যে সকল অপূর্ব্ব-দর্শন দেউলাদি কোনও এক প্রাচীন যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও তাহা দেখিয়া দর্শকের দল জীবতত্ত্ববিদ্‌ মাউহোর ন্যায়ই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। এই বিস্ময়কর সভ্যতার নিদর্শন যে জাতি রাখিয়া গিয়াছে, তাহার আকস্মিক তিরোধান সম্বন্ধে সভ্য জগৎ এখনও তেমনই অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। মানুষ শুধু তাহার সম্বন্ধে নানা উপকথার রচনা করিয়াই আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

প্রাচীন রাজধানীর ছাদের দেওয়ালে হস্তিপৃষ্ঠে শিকার-চিত্র

কিন্তু সে জাতির কীর্ত্তি-স্তম্ভগুলি জাজ্বল্যমান, দৃষ্টি বন্ধ করিয়া রাখিলেই তাহাদের বিশাল অরণ্যানী ভেদ করিয়া মানুষ লুপ্তরত্নের উদ্ধার করিতেছে। ভগ্নস্তূপের উপর বিবৃতিলিপিসমূহ দর্শকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে, শিলালেখসমূহের অনুবাদ বিগত মহিমার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আঙ্ককরের ইতিহাস সম্পূর্ণ রহস্যজালে আবৃত।

অবশ্য সভ্য জগৎ এই অদৃশ্য নগরী সম্বন্ধে এখন কিছু কিছু অবগত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সে কতটুকু? অগ্রে যেখানে দুর্ভেদ্য বাঁশঝাড়ের অস্তিত্ব ছিল, এখন তাহা পরিষ্কৃত হইয়া তথায় মোটর-যান পরিচালনের সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, অরণ্য সুপরিষ্কৃত হইয়া ধান্যক্ষেত্রসমূহ শস্যভারে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। দর্শক-দলকে এখন বিন্দুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিয়া এখানে আসিতে হয় না। আঙ্ককরের প্রাকারপার্শ্বে সুদৃশ্য বাঙ্গলোসমূহ দর্শকগণের অবস্থিতির

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। আঙ্ককর থম্‌ প্রাচীর-বেষ্টিত নগরী। উহার অভ্যন্তরে এক দিন নিশ্চয়ই অসংখ্য নাগরিকের বাসভবন ছিল। আমেরিকার জনৈক প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ রবার্ট কে সি আঙ্ককর পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছেন, এই নগরীর অভ্যন্তরে স্মরণাতীত যুগে নাগরিকের যে সংখ্যা ছিল, সম্ভবতঃ তত লোক আগষ্টসের সময় রোম নগরে অথবা হানিবলের সময় কার্থেজেও ছিল না। আর আঙ্ককর ভাট (প্রসিদ্ধ মন্দিরকে অধুনা এই নামে অভিহিত করা হইতেছে) এমন অপূর্ব্ব-দর্শন, ইহার ভাস্কর্য্য এমনই বিচিত্র যে, বাবেলের দুর্গ-নির্ম্মাণ হইতে এ যাবৎ পর্য্যন্ত এমন অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

আঙ্ককর থম্‌ (নগরের নাম ইহাই রাখা হইয়াছে) এত

দীর্ঘ যে, মেকং নদের শাখানদীসমূহের সমীপবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগের অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, অন্ততঃ তিন কোটি লোক এই মন্দির-নির্ম্মাতৃজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যে জাতি এখানে এক কালে বাস করিয়াছিল, তাহারা যে উচ্চস্তরের সভ্য এবং নেবুকাডনেজারের রাজত্বকালে ব্যাবিলনবাসীর অপেক্ষাও প্রচুর সম্পৎশালী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজেতৃরূপে সেই জাতি যে এই দেশে বসবাস করিয়াছিল, তাহাও অনেকের ধারণা। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ শুধু এইটুকু অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে, কোন কারণ বশতঃ সমগ্র অধিবাসী এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল এবং কখনও ফিরিয়া আসে নাই। তার পর সম্ভবতঃ ৫ শতাব্দী ধরিয়া এই স্থানে অরণ্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইখানেই রহস্যের আরম্ভ এবং শেষ।

ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীর-চিত্র

যে জাতি আঙ্গকর থম্‌এ তাহার অতুলনীয় সভ্যতা সহ প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার বিচিত্র শিক্ষার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এ যাবৎ বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। এই স্থানের অধিবাসীদিগকে ক্ষেমার বলিয়া অভিহিত করা হইত। হয় ইহারা হিন্দুজাতির বংশধর অথবা হিন্দু শিক্ষকের শিক্ষাধীন হইয়া আত্মোন্নতি করিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ শুধু এই তথ্যটুকুই আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জাতির পরিণাম কি হইয়াছিল, কেহই তাহা জানে না এবং তাহা রহস্যান্ধকারে বিলুপ্ত।

২৩৮ খৃষ্টাব্দের চীন দেশের কোন বিবরণে ইন্দো-চীনে হিন্দুপ্রভাবপুষ্ট একটা রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্য হিন্দুর কি না, তাহা বুঝিতে পারা না গেলেও, হিন্দুর প্রভাবে যে এই রাজ্য পরিচালিত হইত, তাহার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ পাইয়াছেন যে, ক্ষেমার জাতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও তাহাদের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, পার্শ্ববর্ত্তী জাতিদিগের উপর ইহাদের সভ্যতা বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

যে সভ্যতা ও শিক্ষার পরিচয় ভাট আঙ্গকর মন্দিরে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সভ্যতা এমন নিঃশব্দে কি করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসমূহের অগোচরে বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহাই পরম বিস্ময়ের বিষয়। যাহারা ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহারা কি এ সভ্যতার কোন সংবাদই রাখিত না? ব্যাপার দেখিয়া তাহাই ত অনুমিত হইতেছে।
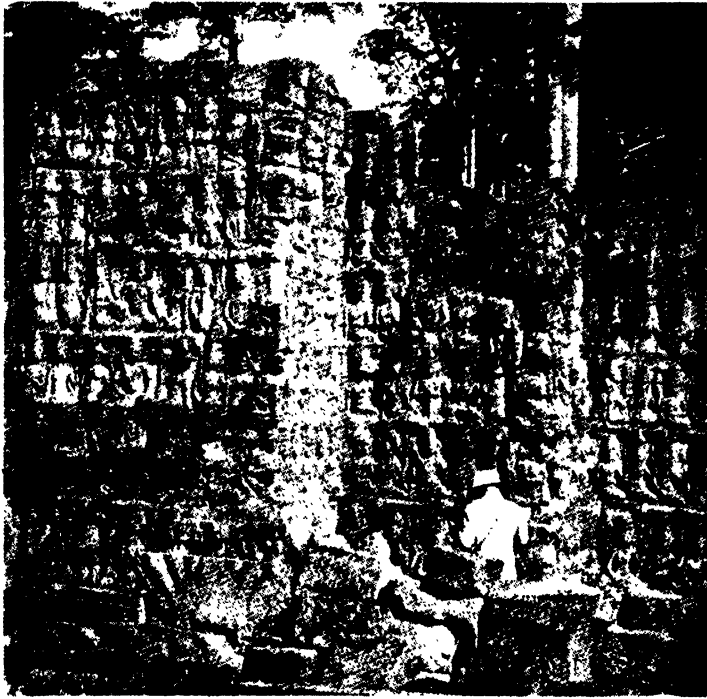
দুই পুরুষ পূর্ব্বে আঙ্গকরের কথা বর্ত্তমান জগতের শ্রুতিপথেও প্রবেশ করে নাই। ইন্দোচীনে তখন গহন অরণ্য বিরাজিত ছিল। ফরাসীরা তখন তটভূমিতেই শুধু বিক্রেয় পণ্যসহ উপস্থিত হইত মাত্র। মেকং নদপথে বেশী দূর পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত না।

কাম্বোডিয়া রাজ্যের রাজধানী পৌপেঁ তখন একটি গণ্ডগ্রামমাত্র। পর্ণকুটীরই তখন রাজধানীর শোভাবর্দ্ধন করিত। সে সময় তথায় যিনি রাজত্ব করিতেন, তিনি অত্যাচারী স্বৈর

শাসক ছিলেন, নাগরিকরা যে তখন সুসভ্য ছিল, তাহা য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন না।

ফরাসী জাতির প্রচেষ্টার ফলে তখন আনামের দক্ষিণাংশে স্যেগং নগর ধনৈশ্বর্য্যে খ্যাতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহার উত্তরাংশে নিবিড় অরণ্যের বৃক্ষপত্রের অন্তরালে কোন্ প্রাচ্য সম্পদ অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার কল্পনাও কেহ তখন করে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায় টোন্‌লে সাপের (হ্রদের) তীরবর্ত্তী বৃক্ষারণ্যের মধ্যে যে বিচিত্র গগনভেদী চূড়াসমন্বিত, অট্টালিকাপূর্ণ নগর সমূহের কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, জগৎ তাহা শুনিয়াছিল বটে; কিন্তু তার পর আর সে কথা মনে করিয়া রাখে নাই। এই বিশ্বের যেখানে অনাবিষ্কৃত দেশ থাকে, তাহার সম্বন্ধে লোক এমন নগরের কথা উল্লেখ করিয়াই থাকে,তাই জগতের বিজ্ঞ লোক ঐরূপ ব্যাপারকে কল্পনার খেলা বলিয়াই মনে করিয়া থাকে,—বিশ্বাস করিতে চাহে না।

কাম্বোডীয় বালিকা

এ কথা সত্য যে, চিও-টা-কোয়াং নামক জনৈক চীনা-পরিব্রাজক তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়াছেন যে, মেকং উপত্যকাভূমিতে কোনও রাজ্যে তিনি রাজদূত হিসাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ তাঁহার উক্তির এইটুকু সত্য বলিয়া মানিয়া লন যে, হয় ত উক্ত পরিব্রাজক কোনও রাজ্যে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার বিবরণে সেই রাজ্যের বর্ণনায় তিনি যে বিচিত্র দৃশ্যাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এমনই অসম্ভব যে, পর্য্যটকের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে,—লোকটা মিথ্যাবাদী!

কাম্বোডিয়াবাসীদিগকে যদি উল্লিখিত প্রাসাদ-মন্দির প্রভৃতি-সমন্বিত বিচিত্র রাজধানীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত চীনা পরিব্রাজক যে প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদী, তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কাম্বোডিয়ার রাজধানী পোঁপেঁ—কুটীরসমাচ্ছন্ন নগরী য়ুরোপের অনেকেই দেখিয়াছে, উহার সভ্যতারও পরিমাপ অনায়াসসাধ্য। অরণ্যের ধারে জগতে এমন সহস্র সহস্র নগর পৃথিবীতে আছে। সুতরাং ও সকল কথা শুধু কল্পনামাত্র।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞমণ্ডলীর মনোভাব যখন এই প্রকার, সেই সময় এম্ মাউবো নদীপথে টোন্‌লে-সাপ্ হ্রদতীরে পৌছিলেন—তখন তিনি এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সংবাদ পাইয়া এই লুপ্ত বা গুপ্ত নগরীর রহস্য উদঘাটনে নিযুক্ত হইলেন। ব্যাঘ্র, হস্তী শত শত বৎসর ধরিয়া নির্ব্বিবাদে এই নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে বসবাস করিতেছিল। তাহারা সহসা দেখিল, কি উৎপাত! গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত, চশমাধারী ভদ্রলোকগণ নির্ভয়ে অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—ইঁহাদের মনে জীবনের জন্য শঙ্কা নাই, উদ্বেগ নাই, সুখ-সুবিধার জ্ঞানও নাই! ক্ষুব্ধচিত্তে ব্যাঘ্র-হস্তিকুল আঙ্কর অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেল। তখন পণ্ডিতের দল ক্রমে ক্রমে ক্ষেমার জাতির ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই প্রদেশ সে সময় শ্যাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে উহা ফরাসীদিগের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু বিজ্ঞান

তখন মানুষের শাসন-নীতি মানিয়া চলিতে চাহিল না। আঙ্গকরভাট মন্দিরের ঝোপ-জঙ্গল সুপরিষ্কৃত হইয়া গেল। প্রাচীর ও স্তম্ভে যে সকল শিলালেখ ছিল, তাহার প্রত্যেকটি সংস্কৃত অক্ষরে উৎকীর্ণ! প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উহাদের অনুবাদ করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া পণ্ডিতগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রকৃতই অতি উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিজীবী জনসম্প্রদায় এই উপত্যকাভূমিতে এক অতি অপূর্ব্ব সভ্যতা সংস্থাপিত করিয়াছিল ; কিন্তু সে সভ্যতা—সে জাতি অত্যন্ত

এখন মোটর-গাড়ীর কৃপায় মেকং হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই দূরবর্ত্তী স্থানে পৌছান যায়। অরণ্যের পরিবর্ত্তে পথের দুই ধারে শুধু ধান্য-ক্ষেত্র—অরণ্য এখন দিকচক্রবালে যেন পলায়ন করিয়াছে! আজ যাঁহারা আঙ্গকর পরিদর্শনে যাইতে উৎসুক, তাঁহাদের নেত্রপথে শত শত মাইলের মধ্যেও কদাচিৎ বৃক্ষকুঞ্জ পতিত হইবে; কিন্তু সে দিনও এই পথে ব্যাঘ্র ও হস্তী নিঃশঙ্কচিত্তে এই সকল স্থানে বিচরণ করিত। তাহারাই তখন ক্ষেমারের পরিত্যক্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল।

আঙ্গকর—কাম্বোডীয় নর্ত্তকীরা নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে

আকস্মিক ভাবে, অন্যের অগোচরে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

আঙ্গকরএ যাইবার পথে অনেক বড় নদী পড়ে, নৌকা-যোগে পার হইতে হয়। অধুনা তথায় সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। মেকং নদ পার হইয়া গেলে মনে হয়, যেন একটা নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিকে বিবিধ পুষ্পশোভিত আরণ্য বৃক্ষলতার কুঞ্জ—নানাবিধ পক্ষীর কূজনে আনন্দ-মুখরিত। পূর্ব্বে নৌকাযোগে আঙ্গকরএ পৌছিতে পাঁচ দিন লাগিত। সে যুগে যাঁহারা উক্ত স্থান দেখিতে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনায় শুধু পথের কষ্ট ও দুর্গম অরণ্যের বিবরণই দেখিতে পাওয়া যায়।

পোঁপেঁ—যথায় সপ্তফণ গোক্ষুর সর্প, সেতু, স্তূপ এবং স্বর্ণশীর্ষ গম্বুজগুলির রক্ষক ছিল, এখন আঙ্গকরের শিক্ষা ও সভ্যতার ন্যাসরক্ষক।

নগর অতি বিস্তৃত, ইহার রাজপথগুলি বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্ন, তুষারধবল অট্টালিকাগুলি সূর্য্যালোকে ঝকঝক করিতে থাকে। রমণীয় উদ্যানের সম্মুখে রাজপ্রাসাদ! বাজারের দোকানগুলি সুবিন্যস্ত। কিন্তু যে সকল পর্য্যটক চীন-সীমান্ত হইতে নদীতীর-পথে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া এখানে পদার্পণ করেন, তাঁহাদের কাছে এই সকল দৃশ্য যেন একটা জাতির মনোবৃত্তির চিত্র।

ফরাসী জাতির প্রভাবের প্রচুর দৃষ্টান্ত পোঁপেঁতে পাওয়া

যায়। এই স্থানের যাদুঘরে আঙ্করের অনেক দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। মসিয়ে জর্জ্জ গ্রস্লিয়ার আঙ্করের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া এই যাদুঘরের পরিচালক। ক্ষেমার জাতির প্রাচীন স্থপতিশিল্প, ললিতকলা প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কাম্বোডীয় নৃত্যকলার সাহায্যে ক্ষেমার জাতির নাটক নহে, কাব্যরচনা-কৌশলকে অনেকটা বজায় রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কাম্বোডীয়দিগের জন্য শত শত দোকান-ঘর নগরমধ্যে কাম্বোডীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। জাতীয় বেশভূষায় সজ্জিত

এই স্থানে শত শত বৌদ্ধ পুরোহিতের বাস। দলে দলে তাহারা নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করে। রাজপথে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাদের পীতবাস বাতাসে উড়িতে থাকে। কি ভাবে রাজধানীতে কাম্বোডিয়ার ছায়াপাত হয়, রাত্রিকালে বাঁশীর ধ্বনি, ঢক্কার নিনাদ এবং বিচিত্র স্বরলহরীর সমবায়ে মনে হয়, যেন অতীত যুগের ক্ষেমার জাতি ইন্দ্রজালপ্রভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে—অদৃশ্য নর্ত্তকীদের চরণাঘাতে যেন তাহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

পোঁপেঁ হইতে যাত্রা করিলে উষার আলোকে প্রথমেই
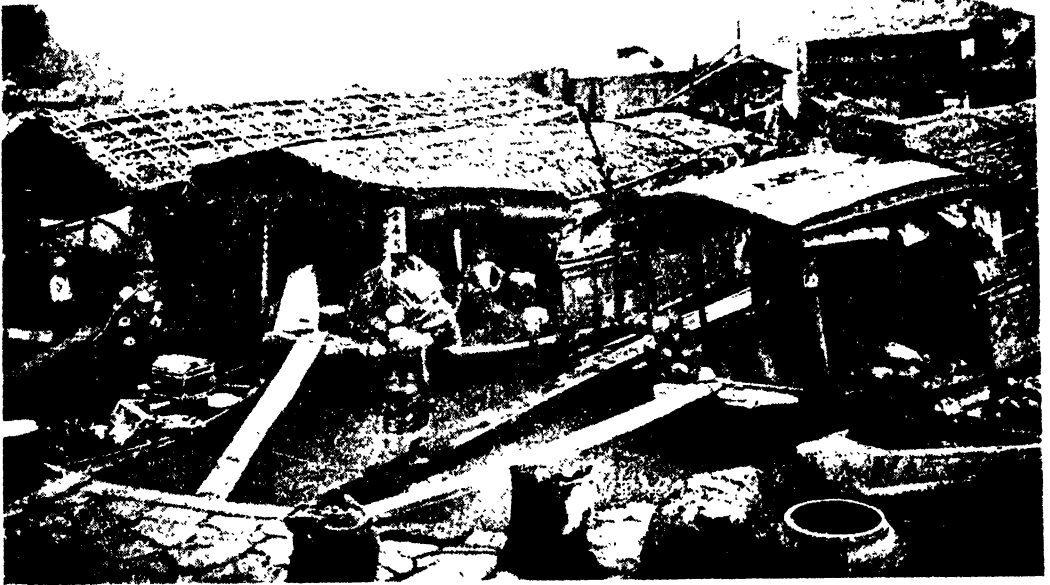
পোঁপেঁ—সাম্পান জীবন

হইয়া তাহারা দোকানে চলা-ফেরা করে। অন্যান্য মানুষ অনুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সারাদিন দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার অজুহতে যাতায়াত করিতে থাকে। রাজপথের দুই ধারে নানাবিধ দেশীয় খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ দোকান-ঘর বিদ্যমান। তথায় অধমাঙ্গ আবৃত করিয়া দোকানী হয় কদলী দগ্ধ করিতেছে, অথবা হাঁড়ি হইতে সিদ্ধান্ন বাহির করিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জলের ধারে নারীরা ঘুরিয়া বেড়ায়—তাহাদের দন্তপংক্তি তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত এবং মস্তকের কেশরাজি পুরুষের ন্যায়। শুধু তাহাদের লীলায়িত গতিভঙ্গীর দ্বারাই পুরুষের সহিত তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের পরিচ্ছদও পুরুষের ন্যায়—মুখাকৃতি পুরুষের ন্যায় দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

দর্শকের নেত্রপথে উর্ব্বরা ধান্যক্ষেত্র পতিত হইবে। এমন উর্ব্বরা ভূমি পৃথিবীর অন্যত্র আছে কি না, তাহা অভিজ্ঞ দর্শকের মনেও প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিবে। দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া দর্শকের মনে অকস্মাৎ প্রাচীন যুগের লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতির কথাই যেন জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান যুগের কাম্বোডীয়গণ যেমন শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, এক সময়ে এখানে তাহারাও এমনই ভাবে বেড়াইত; একই প্রণালীতে তাহারা সেচের খাল খনন করিত, একই ভাবে ধান্য রোপণ ও বপন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। সেই একই প্রকার প্রাচীন যুগের লাঙ্গলের সাহায্যে ভূমি কর্ষিত হইত,—তাহাদের অঙ্গে এমনই ভাবের বস্ত্র শোভা পাইত।

আঙ্কর ধ্বংসস্তূপের দুইটি অংশ—আঙ্কর ভাট বা মন্দির এবং আঙ্কর থম্ বা নগর, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কেহ কেহ অনুমান করেন, সংস্কৃত নগর শব্দের অপভ্রংশ হইতে আঙ্কর শব্দের উৎপত্তি। স্থানীয় ভাষায় থমের অর্থ—প্রধান। ভাট শব্দের অর্থ—মন্দির—প্রধানতঃ বৌদ্ধ মন্দির।

আঙ্কর ভাট ক্ষেমার জাতির বিচিত্র কলাবিদ্যার শেষ, অপূর্ব্ব, অতুলনীয় নিদর্শন। প্রথমতঃ হিন্দু দেবতা বিষ্ণু ও শিবের উদ্দেশ্যে এই মন্দির পরিকল্পিত হইলেও পরে উহা বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। হিন্দু স্থপতি-শিল্পের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াও ক্রমে এই মন্দিরের কারুকার্য্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

পোঁপেঁর বিখ্যাত সপ্তফণ নাগরক্ষিত প্যাগোডা

সমগ্র মন্দিরের পরিধি প্রায় ¾ বর্গ-মাইল। উহার চারি পার্শ্বে পরিখা এবং উচ্চ প্রাচীর। মন্দিরটির উচ্চতা অনুমান করিয়া বলা কঠিন। এক একটি চূড়া অরণ্যের দীর্ঘতম তালগাছ অপেক্ষাও উচ্চ। কিন্তু ইহার গঠন-প্রণালীতে চূড়াগুলিকে আরও উচ্চ বলিয়া অনুমিত হইবে। সমগ্র মন্দিরটি মিশরের পিরামিড অপেক্ষা দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে, ইহার কারুকার্য্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাজমহলের সৌন্দর্য্যকেও পরাভূত করে। কিন্তু এই অপরূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই
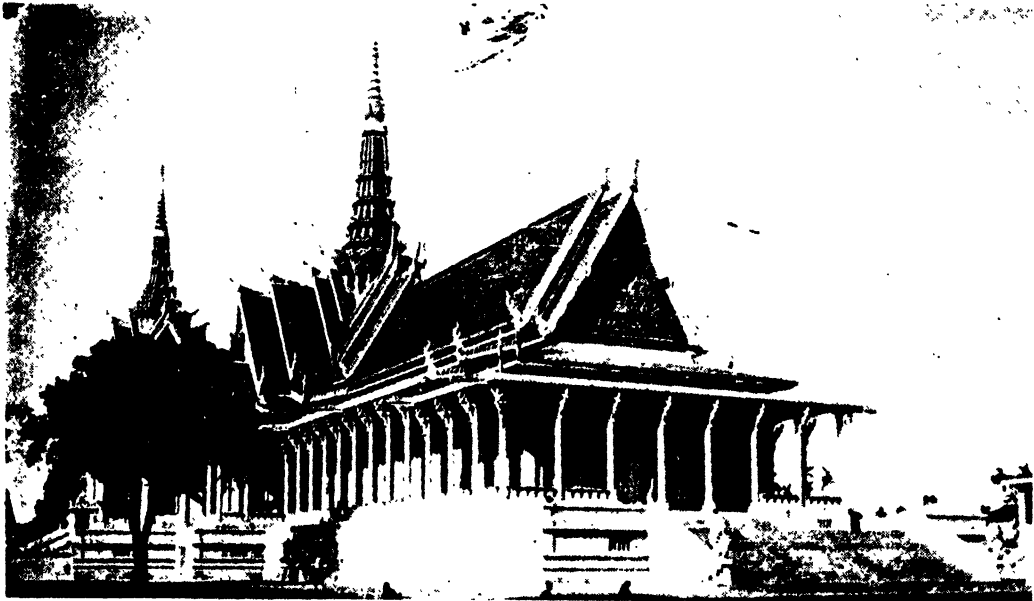
পোঁপেঁর আধুনিক রাজ-সভা।

দর্শকদল এখানে আসিতেছে না। এই সৌন্দর্য্যস্রষ্টা যাহারা, তাহাদের ইতিহাস এখনও পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত—এই জন্যই দলে দলে লোক এখানে আগমন করিয়া থাকে।

মন্দিরের উত্তরভাগে মাইলের দুই-তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করিলে আঙ্কর থম নগরের প্রাচীর-পার্শ্বে উপনীত হওয়া যায়। এইখানে সপ্তফণ নাগ—ক্ষেমার জাতির কথা ও কাহিনীর উল্লিখিত দেবতা প্রস্তর নির্ম্মিত দানব-মূর্ত্তির হস্তের উপর স্থাপিত। প্রাচীন নগরের প্রবেশ-পথে একটি উচ্চচূড় দুর্গ। ইহার দ্বারপথে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। দুর্গের প্রত্যেক ভাগে ধ্বংস-শক্তি রুদ্র বা শিবের মুখমণ্ডল ক্ষোদিত, যেন তিনি জগতের দিকে ভ্রূভঙ্গিভীষণ কটাক্ষ করিতেছেন।

কাম্বোডীয় নর্ত্তকী

শিলালেখ হইতে দেখা যায় যে, রাজা বাকোবর্ম্মন্ ৮৮৯ হইতে ৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্ষেমার জাতির শাসক ছিলেন। তিনিই উক্ত নগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি আঙ্কর থম্ প্রাসাদের ছাদের উপর রাজসভা স্থাপন করেন। প্রাচীন যুগে এরূপ বৃহৎ নগর অতি অল্পই দেখা যাইত। নগরের এক দিকের প্রাচীর প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ। প্রাচীরের অধিকাংশই এখনও অটুট অবস্থায় রহিয়াছে। একটা প্রাচীরের ধারে বেয়ন নামক একটি মন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরটি আঙ্করভাট মন্দিরের ন্যায় বৃহৎ। ধ্বংসের দেবতা রুদ্র বা শিব এই নগরের দেবতা। 'বেয়ন' মন্দিরের পঞ্চাশটি গম্বুজের প্রত্যেকটিতে চতুর্ম্মুখ শিব বিরাজিত।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখে হস্তীর শোভাযাত্রা

ইন্দোচীনের মুচী

আঙ্করর সভ্যতার তিরোধান সম্বন্ধে তিন প্রকার অনুমান আছে। প্রথম অনুমান এই-রূপ :—ক্ষেমার জাতি থাইস্ জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই থাইস্ জাতির মধ্যে শ্যামবাসীরা একটা প্রধান অংশ। ক্ষেমার জাতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নগর হইতে বিতাড়িত হয়। কিন্তু ইহাতে একটা প্রশ্ন উঠে, যুদ্ধে ক্ষেমারগণ বিতাড়িত যদি হইয়া থাকে, তবে তাহারা কি কারণে নগরে ফিরিয়া আসিতে পারিল না? অথবা বিজেতা জাতি এসিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নগর জয় করিয়া কেন তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করে নাই?

দ্বিতীয় অনুমান বলে যে, মহামারীর প্রকোপে ৩ কোটি

ক্ষেমার জাতির কার্য্যের পরিচয় লাভ করিতে প্রত্যেকের মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হয়, এই জাতি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—তাহাদের পরিণামই বা কি হইয়াছে? বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দেবদেবীর অন্তর্দ্ধানের পরিচয় সে পায় সত্য, ক্ষেমার জাতির শিক্ষা ও সভ্যতা না হউক, তাহার চিন্তার পরিচয় এখনও কাম্বোডিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সত্য। সে ইহাও সত্য মনে করিতে পারে যে, ইদানীং পোঁপে নগরে যে সকল অধিবাসী আছে, তাহারা আঙ্কর-নির্ম্মাতৃগণের শারী-রিক বংশধর; কিন্তু তাহাতে ত রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে, সমস্যার সমাধান হয় না।

কাম্বোডীয় তরুণীর সঙ্গীত-চর্চ্চা

ক্ষেমার নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নহে। কারণ, এত লোক মরিয়া গেল, অথচ তাহাদের ধ্বংসাবশেষ কিছুই নাই। এমন কি, তাহাদের রণ-সজ্জার কোন নিদর্শন পর্য্যন্ত নগরের কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

কাহারও কাহারও নিকট এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে কিন্তু এই বিয়োগান্ত ব্যাপারের সমর্থক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নৃপতিদিগের কল্যাণকর কার্য্যকলাপের বিবরণ এই

ধনী কাম্বোডিয়াবাসী শবের শোভাযাত্রা

তৃতীয় অনুমান বা সিদ্ধান্ত হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, এই নগরের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ক্রীতদাস ছিল। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া নগরের উচ্চসম্প্রদায়কে হত্যা করিয়া ফেলে। শিক্ষকদিগের তিরোধানে বাকী অংশ কালক্রমে অসভ্যতার চরম স্তরে নীত হয়। এম্ গ্রস্‌লিয়ার এই মতের সমর্থক।

সকল শিলালেখ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার পর সব অন্ধকার, আর কোনও বিষয়ের উল্লেখ নাই। ক্ষেমার জাতির ইতিহাস ঐ সময় হইতে অন্ধকারের অতল সমাধি লাভ করিয়াছে,—আছে শুধু প্রকাণ্ড হলঘর, উন্নতচূড় গম্বুজ আর সেই চরম প্রশ্ন—ইহারা গেল কোথায়?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

চিরন্তন

কতরূপে, কত ভাবে আভাষে ইঙ্গিতে
তুমি যে রয়েছ নাথ চাহ বুঝাইতে—
কিন্তু মোরা হেন পাপী, এ হেন দুর্ব্বল,
এমনই অজ্ঞান অন্ধ, এমনই চঞ্চল,
এমনই তরল-মতি, কাণ্ডাকাণ্ডহীন,
এমনই বিবেক-মূঢ় হেন অর্ব্বাচীন

এ মাংস-পিণ্ডের হায় এ জড় দেহের
বাসনা-বিলাসে মগ্ন হয়ে সন্দেহের
গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে মরি রাত্রি-দিন।
তুমি যে মঙ্গলময়, তুমি সত্য শিব
প্রতিপদে সাক্ষ্য তার পাইয়াও হায়
ভগবান্ নাই বলি কথায় কথায়

এ হেন পাপের পঙ্কে হই নিমজ্জিত—
যা হ'তে উদ্ধার লাভ কল্পনা অতীত!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (বি, এ)।

জুজুর ভয়

১
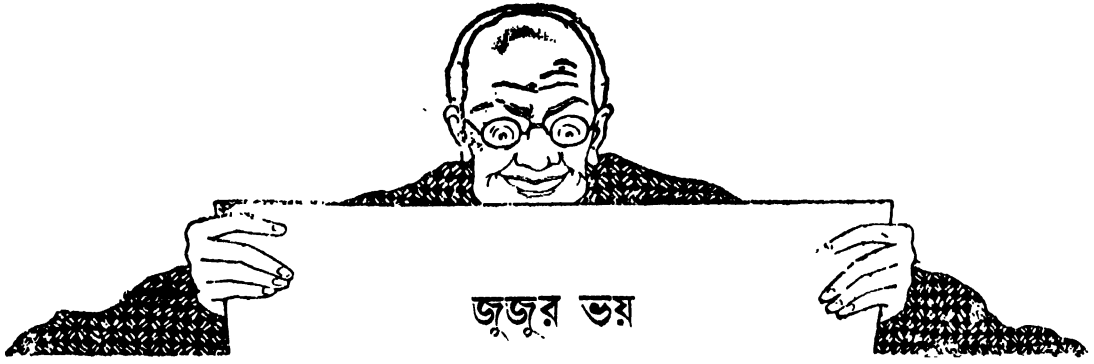
সে দিন আমার মণিদাদার শালা পরিতোষের বৌ-ভাত। মণি-দা' আমার মাসতুতো ভাই। নিমন্ত্রণ সারিয়া আমি সকাল সকাল বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, সহসা পরিতোষ কোথা হইতে আসিয়া খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, "আরে, যাও কোথা? কায আছে। মেয়েদের খাওয়াবে কে?"

আমি অনেক ওজর-আপত্তি করিলাম। পরিতোষ ছাড়িল না, টানিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। সেখানে আমি বৌ'দিদির হুকুমনামা অমান্য করিতে পারিলাম না। সীতা-দেবীর জন্য দেবর লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর নিদ্রা জয় করিয়াছিলেন। আমি বৌ'দি'র জন্য একটি রাত্রি ঘুমের মায়া কাটাইতে পারিব না? আমাকে পরিবেষণ করিতে হইল। আমার সঙ্গী হইল, "কেষ্ট।"

সাদা, কাল, ধোঁয়াটে রঙ্গের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের অর্দ্ধনগ্ন সৌন্দর্য্য আকাশের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক তাহার নীচে—ছাদের উপর নানারঙ্গের শাড়ীর অবগুণ্ঠনের ফাঁকে অনেকগুলি অনাবৃত মুখের অনাবিল জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আকাশে একটি চাঁদ। নীচে প্রতিবিম্ব অনেক-গুলি। কিন্তু সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কে বলিবে—কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি নকল! প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা পংক্তি দিয়া—ব্যূহরচনা করিয়া বসিয়া গিয়াছে।

মেয়েদের এই মজলিস্‌গুলায় সঙ্গিহীন পুরুষকে "দেবতার" সিংহাসন হইতে উপদেবতার আসনে নামিয়া আসিতে হয়, তাহা জানিতাম। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথিই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আজ এই প্রমীলার সৈন্যমধ্যে বিপক্ষ দলের আমি একা। আমার সঙ্গী দ্বাদশবর্ষীয় বালক, "কেষ্ট"! বড় ভয় হইল। ভয়াতুরা জননী দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর গায়ে হাত রাখিয়া সাহসে বুক বাঁধে। আমি হৃদয়ে বলের সঞ্চয় করিয়া ডাকিলাম, "কেষ্ট!" কেষ্ট বলিল, "আজ্ঞে!" তবে আর ভয় কি? পদাতিক একা, কিন্তু সেনাপতির অনুগামী।

কাযে লাগিয়া গেলাম। নব-বধূদের লইয়া বড় মুস্কিলে পড়িলাম। কেহ এমনই একটু ছোট ঘাড় নাড়িল, বুঝিতে পারিলাম না; "হাঁ" কি "না"। কেহ অস্ফুটস্বরে কি বলিল, শ্রুতি-সুখ হইল না। কেহ পাতার উপর হইতে হাতখানি ঈষৎ উঁচু করিয়া ধরিল,—"হাঁ।" কেহ পাতার উপর হাত-খানি চাপিয়া ধরিল.—"না।" বাহিরের এই সকল অস্পষ্ট সঙ্কেত বুঝিয়া তাহাদের মনের তৃপ্তি-সাধন করিতে হয়।

ঠিক আমার ডান পাশে একটু দূরে একটি বধূ কলাবউএর মত একগলা ঘোমটা দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। আমি বলিলাম, "আপনাকে—," বধূ কোন সঙ্কেত করিল না। পিছন হইতে আমার বউদিদির সম্পর্কে দিদি-মা বলিলেন, "তুমি কেমন মিন্‌ষে হে! বউ-মানুষ কি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না কি?" চারিদিকে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম। নিরুপায় হইয়া ডাকিলাম, "কেষ্ট!" ঘোমটা খসিয়া পড়িল। আমার বউ-দি—আমার মণিদা'র বউ হাসিয়া বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! চিন্‌তে পার্‌লে না?" আর একবার চাপা ও স্পষ্ট হাসির শব্দে ছাদ ভরিয়া উঠিল। আমি ফিরিয়া আসিতেছিলাম। বৌ-দিদি ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! আমার বোন্‌টি কি বানে ভেসে এসেছে না কি?"

সত্য, আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। বৌ-দিদির ঠিক পাশে কিঞ্চিদূর্দ্ধ ত্রয়োদশবর্ষীয়া একটি কিশোরী বসিয়াছিল। বৌ-দিদির সহাস্য পরিহাসে সে একটিবার নিমিষের তরে চোখ তুলিয়াছিল; কিন্তু অপর দুইটি পলক-হীন চক্ষুর কঠিন দৃষ্টিতে আহত হইয়া চক্ষু নত করিল। কেন জানি না, ঠিক কি না, তাহাও জানি না, আমি বোধ হয় ক্ষণিকের তরে সেই

সঙ্কুচিতা কিশোরীর পানে চাহিয়াছিলাম। সেই রাত্রির প্রমীলা আসরের "সভাপতি"—আমার বউ-দিদির সম্পর্কে দিদিমা ডাকিলেন, "ওহে পুরুষ-সিংহ! এ দিকে ফের! ওখানে কি পায়ে শিকড় গজাল না কি?" আবার একটা হাসির তুফান ছুটিল।

আমার সমস্ত কাযের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া গেল। আমি ছক্কার পাত্রে চাটনী আনিয়া ঢালিলাম। যে চাহিল, তাহাকে দিলাম না। যে চাহিল না, তাহাকে দিলাম।

"সভাপতি"র পঙ্‌ক্তির ভার কেষ্টর হাতে সঁপিয়া দিয়া আমি ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু বেচারা কেষ্ট কিছুতেই আমল পাইতেছিল না। হঠাৎ "সভাপতি"র আহ্বান আসিল, "ওহে, গয়লাদা! এ পথ কি ভুলে গেলে না কি?" আমি তখন দই দিতেছিলাম। এক হাঁড়ি দই আনিয়া বউ-দিদির সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বৌদিদি বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! এ দিকে কি গা ছমছম্ করে না কি?—ভয় না লজ্জা?" লজ্জা! তা হইতে পারে। কিন্তু চতুর্বিংশবর্ষীয় যুবক সে কথা 'অবলার' সম্মুখে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে পারে না। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "কেন, জুজুর ভয় না কি?"

"জুজুর ভয়!"—হিঃ-হিঃ-হিঃ! সে হাসির হ্রাস নাই, অন্ত নাই। অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, লজ্জায় কিশোরীর মাথা ঝুঁকিয়া মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতেছে। সে কি সুন্দর! বোধ হয়, এমনই একটা ভাব অবলম্বন করিয়া কবিগুরু বাল্মীকি সীতার পাতালপ্রবেশের চিত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া বৌদিদি বলিলেন, "ও ঠাকুরপো! তুমি আমাদের জুজুকে ভয় কর না কি? সত্যি, বল না ঠাকুরপো?"

জুজু কি এই কিশোরীর নাম? আমার মাথা হইতে পা অবধি বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! হাত হইতে দইএর হাঁড়িটা ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। আমি ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নামিয়া সেই রাত্রিতেই হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

২

আমি তখন মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মেডিকেল কলেজ হইতে মাসীমার বাড়ী পাঁচ মিনিটের পথ। কলেজ হইতে প্রায়ই মাসীমার বাড়ী যাইতাম, বৌদিদির কাছে রূপকথা শুনিতাম। যে দিন ভাল বলিতাম, সে দিন জল-যোগের মাত্রা বাড়িয়া যাইত। কিন্তু পরিতোষের বিবাহের পর হইতে প্রায় এক মাস আমি আর বৌদিদির বাড়ী যাই নাই। এক দিন বৌদিদির একখানা চিঠি পাইয়া আমি কলেজের ফেরৎ বউদিদির ওখানে গেলাম।

আমাকে দেখিয়া বৌদিদি বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! এখনও ভয় গেল না? জুজু ত আর এখানে নেই!"

আমি একটু লজ্জিত হইলাম। বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! একটা কথা বলব?" আমি বলিলাম, "বলুন!"

বৌদিদি আমার মুখের দিকে চাহিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! তুমি জুজুকে বিয়ে কর্‌বে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তার পর?"

বৌদিদি বলিলেন, "সত্যি ঠাকুরপো, বিয়ে হ'লে তোমরা দুজনেই খুব সুখী হবে। মেয়েদের মনের কথাটা তোমাদের চেয়ে আমরা অনেক বেশী বুঝি। জুজু তোমাকে সত্যি সত্যিই পছন্দ করে। সে দিন ত দেখেছ। জুজুকে কি দেখতে নিন্দের, বল না? একটু আধটু লেখাপড়াও জানে। গান-বাজনা জানে না। কিন্তু গলাটা ভারী মিষ্টি। তুমি ইচ্ছা করলে, পরে শিখিয়ে নিতে পারবে। তোমরা আজ-কাল যেমনটি খোঁজ, ঠিক তেমনটিই না-ও হ'তে পারে। কিন্তু সংসারের খুটিনাটি কাযকর্ম্ম এমনই গুছিয়ে কর্‌তে পারে! কি করবে ঠাকুরপো? তুমি যেমন পেটুক বৃকোদর, তেমনই অনেক রকম খাবার তৈরী করতে পারে। কি বল, ঠাকুরপো?"

এই আমার নায়িকার গুণ-পরিচয়! রসায়ন শাস্ত্রে আমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সোনার পদক উপহার দিয়াছেন। তখনও প্রতি বৎসর আমি কলেজ হইতে বৃত্তি পাইতেছিলাম। বিবাহ কি ছেলেখেলা! আমার এত বড় গৌরবময় জীবনের সাথী হবে জুজু! না, তা' হইতে পারে না। আমার মন যত দূর দৌড়িতে পারে, তত দূর ব্যাপিয়া আমার চোখের সামনে কল্পনার তেপান্তরের মাঠ পড়িয়াছিল। সেখানে আশার হিল্লোলে দোল খাইয়া বাসনার তৃণ-শষ্প আকাশের বুকে নাচিতেছিল। আর ঠিক তাহার মাঝখানে অরূপ-সুন্দরী তাহার সঙ্গীত-ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। সে রূপসীর কায়া ছিল না,—শুধু একটা নিছক কল্পনা। তিল তিল করিয়া রূপ-সঞ্চয় করিয়া, বিধাতা

তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেশী ও বিদেশী নায়িকার গুণগাথা একটু একটু কুড়াইয়া আমি আমার জীবনের সাথীকে গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। সে আসনে জুজুর এতটুকুও স্থান ছিল না। কি অহঙ্কার!

বৌদিদি বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! কি বল?"

আমি মনের কথা লুকাইয়া শুধু বলিলাম, "না বৌদি,' পাশ না ক'রে আমি বিয়ে করতে পারব না।"

"তবে তাদের তাই লিখে দি?"

"হাঁ।"

আমি ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম। খানিকটা আসিয়া মনে হইল, ফিরিয়া যাই; গিয়া বৌদিদিকে বলি, "হাঁ।" মনের একটা দিক বলিল, "ছি!" আর একটা দিক বলিল, "ফিরিয়া যাও। শুধু কল্পনার খাতিরে—জীবনটা নষ্ট করিও না।" কি করি! ফিরিয়া যাইব? "না।"—"হাঁ।" না, এ চিত্তের দুর্ব্বলতা।

আমি একটা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। এক জন ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আমি একটু লজ্জিত হইয়া পকেটে হাত দিলাম, কি যেন ভুলিয়া আসিয়াছি। সত্যকে উপেক্ষা করিয়া প্রতারণা শিখিলাম!

৩

সেই দিন হইতে জুজুর কথা কেবলই আমার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অহঙ্কার তেমনই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই বৎসর পরে শেষ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিলাম। শরীরটা যে দিন দিন শুকাইয়া আসিতেছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বের মত আর তেমন করিয়া চোখ তুলিয়া মায়ের সঙ্গে কথা বলিতে পারিতাম না। মা ডাকিলে, বইএর পাতার মধ্যে মনকে অনাবশ্যক নিবিষ্ট করিয়া রাখিতাম। কিন্তু মায়ের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারিলাম না। শিশুকালে অসুখে কাঁদিলে, তিনি কপালে একটা আঙ্গুল ছোঁয়াইয়া বলিয়া দিতেন, "সর্দ্দিতে সতুর টাকরা জ্বালা করছে," তাঁর কাছে চাতুরী চলে না। এক দিন মা বলিলেন, "সতু, প'ড়ে প'ড়ে তোর শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। তুই বরং কিছু দিন কোথাও হাওয়া বদলে আয়।"

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। প্রায় এক মাস কাল পশ্চিমের অনেক যায়গায় ঘুরিলাম। কিন্তু কোথাও শান্তি পাইলাম না। গাড়ীতে, পথে অনেক অনূঢ়া কিশোরী দেখিলাম। কিন্তু কেহই জুজুকে আমার মনের আসন হইতে টলাইতে পারিল না।

আমার এক পিসীমা পাঞ্জাবে থাকিতেন। হঠাৎ তাঁহার কথা মনে হওয়ায় আমি পাঞ্জাবে গেলাম। পিসীমা এক দিন একটি মেয়েকে সাজাইয়া আনিয়া বলিলেন, "সতু! এমন সোনার-চাঁদ মেয়ে তোরা ছবিতেও দেখেছিস্? একে যদি তোর মা ঘরের লক্ষ্মী করতে পারে, তবে তোর মায়ের কপাল-জোর বলতে হবে! কি বল্?"

মেয়েটি সুন্দরী বটে! বাঙ্গালীর ঘরে এমন নিখুঁত সৌন্দর্য্য আর কখনও চোখে পড়ে নাই। কিন্তু নিমিষের তরে জুজুকে দেখিয়া আমার নয়নে যে ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল, সে ছাপের সহিত মেয়েটিকে তুলনা করিয়া আমার মন বলিল, "না!" পাঞ্জাব আমার ভাল লাগিল না।

আমি বাড়ী ফিরিতেছিলাম। মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ীতে ছোট একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে আমি একাকী বসিয়াছিলাম। একাকী—মনটা জুজুর কথা লইয়া ভাবিতে বসিয়া গেল। মনের একটা দিক্ জুজুর অংশ অভিনয় করিল, আর একটা দিক্ আমার হইয়া সাড়া দিতে লাগিল।

"এত দিনে জুজুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নয়?"

"হাঁ!"—"না-না-না!"

"যদি না হয়! আমি ফিরিয়া গেলে, যদি বলে, 'ওগো! আমি সূর্য্যমুখীর মত তোমার আশা-পথ চাহিয়া আছি!'—তাহা হইলে?"

"তাহা হইতে পারে না। সে কবির কল্পনা। এখানে কল্পনার স্থান এটুকুও নাই।"

"তবে?"

"জুজুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"আচ্ছা, আমার কথা কি তাহার একটুও মনে হয় না?"

"ছিঃ! জুজু এখন পর-স্ত্রী!"

"পর-স্ত্রী!" ভাবের ঝোঁকে আমি স্পষ্ট চীৎকার করিয়া বলিলাম, "পর-স্ত্রী।" কথাটা আমার কাণে আসিয়া বাজিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। গাড়ী কখন্ ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, জানিতাম না। আমি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম—জুজু! ঠিক আমার সম্মুখে বসিয়া জুজু ও তাহার পার্শ্বে সাহেবের পোষাকে এক জন বাঙ্গালী-যুবক, সম্ভবতঃ জুজুর নব-পরিণীত স্বামী।

তাহারা উভয়ে চুপি চুপি কথা বলিতে বলিতে হাসিতেছিল। আমি হঠাৎ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। মনে হইল, তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। কিন্তু তাহা নহে। সত্য সত্যই জুজু ও তাহার স্বামী। জুজু আমাকে চিনিল না। সে যে আমাকে চেনে, এমন চিহ্ন তাহার মুখভঙ্গীতে দেখিতে পাইলাম না। কি প্রতারণা এই নারীর! বৌদিদি বলিয়াছিলেন,"ঠাকুরপো, জুজু তোমাকে সত্যিই ভালবাসে।" ভালবাসে! কথাটা মনে মনে আলোচনা করিয়া বিতৃষ্ণায় আমার কণ্ঠ ভরিয়া উঠিল। হিংসা তাহার লক্ লক্ জিহ্বা বাহির করিয়া এক জন নিরীহ ভদ্রলোকের শোণিত পান করিতে লাগিল। আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। গাড়ী তেমনই ছুটিতেছিল। তাহারা তেমনই গল্প করিতে লাগিল। আমার "বার্থ"এর "কুশন"টার এক দিক্ উঁচু করিয়া দিয়া, মাথা রাখিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম।

পরের একটা ষ্টেশনে, ভদ্রলোক ও তাহার স্ত্রী—জুজু ও তাহার স্বামী নামিয়া গেল। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তাহারা অন্য একটা কামরায় গিয়া উঠিল।

কাযটা আমার ভাল হয় নাই। জুজু হয় ত আমাকে চিনিতে পারে নাই। পারিবে কেন? তৃপ্তির মাধুরীতে জুজুর মন হয় ত কাণায় কাণায় পূর্ণ। সেখানে আমার স্মৃতির স্থান ছিল না। কিন্তু, পরস্ত্রীকে এমনই করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করা আমার ভাল হয় নাই। ভদ্রলোক উদার, স্ত্রীর হাত ধরিয়া পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আজ যদি অন্য কেহ হইত?—ছি! ছি! ছি!

বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মা মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সতু! তোর মুখ যে একেবারে কালী হয়ে গেছে রে!"

ইহার কি উত্তর দিব? মা বুঝিলেন, পরীক্ষার ফলের জন্য আমার বড় ভাবনা হইয়াছে!

গুর্ব্বিণীর ক্ষীণ, পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চাহিলে তাঁহার পরম আত্মীয়েরও চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। পুত্রকে লেখাপড়া করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিলে, বাঙ্গালা দেশে এমন জননী কে আছেন, যাঁহার হৃদয় আনন্দে ফুলিয়া উঠে না?

৪

বন যখন পোড়ে, সবাই দেখিতে পায়। মন পোড়ে, কিন্তু কেহ দেখিতে পায় না। আমার মনের কুঞ্জে আগুন জ্বলিতেছিল। আমি সে জ্বালা লইয়া উপরের একটা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। হঠাৎ সেই ঘরের ভিতর বৌদিদি আসিয়া ডাকিলেন, "ঠাকুরপো!" আমি চমকিয়া উঠিলাম। অভ্যাসমত উঠিয়া আসিয়া বউদিদিকে প্রণাম করিলাম। বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো!" আমি বউদিদির মুখের দিকে চাহিলাম। সেখানেও একটা উৎকণ্ঠার সাড়া পাইলাম।

আমি বলিলাম, "বউদি', আপনি একলা এসেছেন?"

"না, তোমার দাদাও এসেছেন। তোমার দাদা এসেছেন কালীঘাটে। আমি এসেছি তোমার কাছে।"

"আমার কাছে! কেন?"

বউদিদি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! তোমার মনে আছে, সে রাত্রিতে তোমার হাত থেকে দইএর হাঁড়িটা প'ড়ে গিয়েছিল। আমরা কেউ দেখিনি, দই ছিটকে জুজুর চোখে প'ড়ে যায়। তার পর জুজুর চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে উঠল। যখন তোমাকে জুজুর বিয়ের কথা বলছিলাম, তখন তার চোখের অসুখ। আমরা মনে করেছিলাম, সেরে যাবে। চোখের ফুলো ক'মে গেল, লাল কেটে গেল। কিন্তু চোখে কেমন ঝাপসা-ঝাপসা দেখতে লাগল। এখন আর রাত্রিতে মোটেই দেখতে পায় না। চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু হ'ল না। জুজুর এক যায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। পাকা দেখা পর্য্যন্ত হয়ে গেল। কিন্তু তারা কেমন ক'রে জানতে পেরে হঠাৎ এক দিন রাত্রিতে জুজুকে দেখতে এল। কোন গতিকে ত জুজুকে তাদের সামনে এনে বসিয়ে দেওয়া গেল। তারা জুজুকে একখানা বই পড়তে দিলে। জুজু ত পড়তে পারলে না। তা পারবে কেন? আমার মেসোমশাইকে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে তারা উঠে গেল। তাদের এক জন আত্মীয়কে বিশেষ পীড়াপীড়ি করায়, স্বীকার করলেন যে, তাঁরা একখানা চিঠি পেয়েছিলেন; কিন্তু নাম প্রকাশ করলেন না; বললেন, শপথ দেওয়া আছে। আমার মেসোমশায়ের এক জন জ্যেঠামশাই আছেন। আমাদের সন্দেহ হয়, তাঁরই এ কায। জান ত জ্ঞাতি-শত্রু কেমন! তার পর হ'তে যেখান থেকেই সম্বন্ধ আসে, ভেঙ্গে যায়।"

আমি বিস্ময়ে বউদিদির মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "জুজুর বিয়ে হয় নি?"

"না।"

"মিথ্যা কথা! এই সে দিন আমি নিজে জুজুকে তার স্বামীর সঙ্গে মোগলসরাই ষ্টেশনে দেখেছি।"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "তবে তুমি তার বড় বোন্ বিজুকে দেখেছ। বিজুর স্বামী মন্মথ ঐখানকার কি একটা যায়গার 'এঞ্জিনীয়ার'। বিজুতে জুজুতে সবে দেড় বছরের ছোট-বড়। ওদের দুজনকে দেখতে ঠিক এক, তবে জুজুর চোখ দুটো আরও একটু টানা।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "আর একটু কাণা!" প্রকাশ্যে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৌদিদি বলিতে লাগিলেন, "আমার মেসোমশাই ত ভেবে ভেবে পাগলের মত হয়ে গেছেন। মাসীমার আর সে চেহারা নেই। লজ্জায় ঘৃণায় তাঁরা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারেন না।"

তার পর হঠাৎ আমার হাত দুইটা ধরিয়া বউদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো"—তাঁহার গলার স্বর আর্দ্র, চক্ষু অশ্রুসিক্ত।—"ঠাকুরপো! তোমার বড় ভাজের একটা কথা রাখ, ভাই। আমার মাথা খাবে, 'না' বোলো না। জুজুকে নিয়ে তোমাকে ঘর করতে হবে না। তুমি শুধু তার আইবুড় নামটা ঘুচিয়ে দাও। আমরা মনে করব, তার ফুলগাছের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তার পর ঠাকুরপো, আমি শপথ ক'রে বলছি, আমি নিজে দেখে তোমার আর একটা বিয়ে দেব।" বউদিদি আমার দাড়ীতে হাত দিয়া বলিলেন, "বড় ভাজের এই কথাটা রাখবে না, ভাই?"

জুজুকে কাণা করিবার জন্য দায়ী কে? আমি! বউদিদির এ মিথ্যা অভিযোগ। তাহা হউক, অহঙ্কারের শাস্তি হওয়া উচিত। এত দুঃখেও আমার হাসি আসিতেছিল। মনের যে সিংহাসনে এক দিন আদর্শ রূপসী বসিয়াছিল, আজ তাহারই পাদপীঠে বসিয়া, অন্ধতরুণী জুজু আমার জীবনযাত্রার সঙ্গিনী হইবে! বাঃ, চমৎকার! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও যাহাকে না পাইয়া আমার হৃদয় মরুভূমির মত তৃষিত জিহ্বা মেলিয়া আর্ত্তশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহারই একটা অঙ্গ নাই বলিয়া আজ আর তাহাকে পাইবার জন্য কোনও আবেগের প্রেরণা অনুভব করিতেছি না! আমাদের ভালবাসা কি শুধু চোখের নেশা? সংকল্প স্থির করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, "তাই হবে, বৌদি'!"

বউদিদি আমার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "আমি মাসীমাকে যে ক'রে হ'ক রাজী করাব। খালি জুজুর ঐ কথাটা ভাঙ্গা হবে না। শত্রুরা কিন্তু চিঠি লিখতে কসুর করবে না। তুমি একটু সাবধানে থেকো, ঠাকুরপো! চিঠিখানা যেন মাসীমার হাতে গিয়ে না পড়ে।"

৫

জুজু রাতকাণা। তবুও আমাদের শুভদৃষ্টি হইল! ঠিক তেমনই ভাবে মৃদু হাসিয়া, জুজু চোখ তুলিয়া চাহিল। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল। কি প্রতারণা!

বাসর জমিল না। জমিবে কেন? সে রাত্রিতে যে নাটকের অভিনয় হইল, তাহার নায়ক পদ্ম-লোচন ও নায়িকা ছদ্ম-লোচনা; তাহা সকলেই জানিত।

আমি খাটের উপরে বসিয়া ছিলাম। বৌদিদি জুজুর হাত ধরিয়া আনিলেন, বলিলেন, "ঠাকুরপো! তুমি আমাদের মুখ রক্ষে করেছ। আর একটা কথা রাখ, ভাই! শুধু আজকের রাতটুকুর মত জুজুর সঙ্গে দু'টো কথা বলো। জুজুর চোখ দুটো গেছে, কিন্তু ওর প্রাণটা এখনও তাজা। আজকের রাতটাই বুঝি ওর জীবনের শেষ স্মৃতি! জুজু আমাদের বড় অভিমানী, বড় লাজুক! তার পর সব দায় আমি মাথা পেতে নেবো।"

অশ্রুবন্যায় বউদির বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। আমার হৃদয়ে এ কি অনুভূতি? আঁচলে চোখের জল মুছিয়া বউদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো! দোরটা দাও, ভাই।"

দরজা বন্ধ করিয়া আমি কপাটের খিলটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। আর্দ্র মনটা আমার সম্মুখের সুদূরব্যাপী ভবিষ্যৎটা জরিপ করিয়া দেখিতেছিল। জুজু ধীরে ধীরে সহজভাবে উঠিয়া আসিয়া, গলায় আঁচল দিয়া আমায় প্রণাম করিল। আমি একটু বিস্মিত হইয়া বাহু ধরিয়া জুজুকে উঠাইয়া দিলাম। জুজু আমার চোখের উপর একবার চোখ রাখিয়া, হঠাৎ চোখের কোণে একটা আঙ্গুল দিয়া বলিল, "তুমি কাঁদছ কেন?"

জুজুর হাতের যে যায়গাটায় হাঙ্গর-মুখো বালাটা হাঁ করিয়া—যেন সাশ্চর্য্যে আপনার পাকা রংয়ের সহিত জুজুর কাঁচা হলুদ-বর্ণের তুলনা করিতেছিল, আমি সেইখানটা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম, "জুজু! তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

"হাঁ!"

আমি জুজুকে উন্মত্ত আবেগে বাহুপাশে বদ্ধ করিলাম। কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলাম, "জুজু!"

"কি!"

"তুমি না কি রাতকাণা!"

"হাঁ।"

"তবে?"

"সে ত তোমার অভিসম্পাতে। তোমারই চরণ স্পর্শ ক'রে মুক্তি পেয়েছি।"

আমি বিস্ময়ে জুজুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া জুজু বলিতে লাগিল, "তুমি মহাভারত পড়েছ? অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে পেয়ে গান্ধারী নিজে অন্ধ হয়েছিলেন। আমি তোমাকে পাবার জন্য শুধু অন্ধ সেজেছিলাম।"

অপূর্ব্ব অনুভূতিতে আমার মাথা নত হইয়া আসিল। প্রীতিতে আমার মন যেন জুজুর পায়ের উপর লুটাইতে চাহিল।

শান্ত-স্বরে জুজু বলিল, "ভাগ্যি, তোমার হাত থেকে দইএর হাঁড়িটা প'ড়ে গিয়ে দু'এক ফোঁটা দই আমার চোখে ঠিক্‌রে লেগেছিল! আমার চোখ দুটো লাল হয়ে বেদনায় ফুলে উঠল! তার পর দিদি চিঠি লিখলেন, তুমি পাশ না ক'রে বিয়ে করবে না। আরও দু'বছর!—তুমি কি নিষ্ঠুর! কিন্তু যে চোখ দুটো দিয়ে তোমাকে একবার দেখেছি, সেই দুটো দিয়ে আবার কেমন ক'রে আর এক জনকে দেখব, বল না?"

আমি বলিলাম, "জুজু! তবে চিঠি লিখে শত্রুতা করত কে?"

"বুঝতে পারছ না?"

"তুমি?"

মৃদু হাসিয়া জুজু বলিল, "সবাই চিঠি পেয়েছিল, কিন্তু তুমি ও চিঠি পাও নি।"

অধীর আগ্রহে জুজুকে শয্যার উপর বসাইয়া আমি বলিলাম, "দাঁড়াও, আমি বৌদি'কে ছুটে গিয়ে ব'লে আসি।"

জুজু আমার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া বলিল, "ছি! লজ্জা করে না?"

লজ্জা!—হইবেও বা! আমি পুরুষ, নারীর সান্ত হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসার কথা ধারণা করিব কিরূপে?

আমি বলিলাম, "জুজু! যখন তুমি জানতে পেরেছিলে, আমি তোমায় বিয়ে করব না, তখন তোমার মনে কি হ'ল?"

জুজু আমার কাণের ভিতর সুধা ঢালিয়া দিল। সে এত কোমল সুর, যেন বাতাসের ভর সহে না; এত ধীর—এত মৃদু, যেন নব-বধূর সরম-জড়িত চরণ-বিক্ষেপ! আমি বিহ্বল হইয়া শুনিলাম,

"যদি মরমে লুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণ-ভরা আশা দিলে গো?"

আমার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল। আমি বলিলাম, "জুজু! যদি কাণা মেয়ে বিয়ে না করতাম?" জুজু ঠিক তেমনি ভাবে বলিল,

"এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো?"

*　　*　　*　　*

জুজুকে লইয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম। গুরুজনের উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদে আমার মাথা নত হইয়া আসিল। বউদিদির সজল দৃষ্টিপাতে আমার মন আত্মগ্লানিতে ছি ছি করিতেছিল। পরে সকলেই বিশ্বাস করিল, জুজু আমারই সুনিপুণ চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইয়াছে। কিন্তু সঞ্জীবনী সুধা দিয়া কে কাহার জীবন বাঁচাইল, সে কথা আমি আজও প্রকাশ করিতে পারি নাই।

শ্রীবলরাম পাত্র।
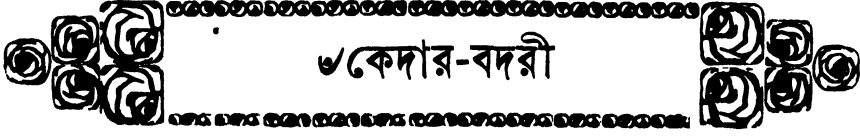
৺কেদার-বদরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭। অথ যানবাহনতত্ত্বম্

কাণ্ডীডাণ্ডীর কথা হরিদ্বারের প্রসঙ্গে (ভাদ্র ৮০১ পৃঃ) মোটা-মুটি বলিয়াছি, এবারে বিশেষ করিয়া বলিব।

এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথে চলিবার চতুর্ব্বিধ যান আছে; কাণ্ডী, ঝাম্পান, ডাণ্ডী ও ঘোড়া। অবশ্য পায়ে হাঁটার তুল্য সুবিধা আর কিছুতেই নাই, সম্পূর্ণ স্ববশ; দুইখানি কম্বল ও একটা ওয়াটার্-প্রুফ্ ও সামান্য ২।৪টি জিনিশ (কাপড়-জামা, লোটা-ছাতা ইত্যাদি) বহিতে পারিলে ত লেঠাই নাই; বহিতে কষ্ট হইলে এক জন কাণ্ডীওয়ালা ভাড়া করা যায়, তাহা হইলে তদনুযায়ী একটু বেশী জিনিশ-পত্র লওয়া চলে; ৪।৫ জন দল বাঁধিয়া পথ চলিলে এক জন কুলীকে সকলের জিনিশ দেওয়া চলে, সব শুদ্ধ এক মণের বেশী না হইলেই হইল; দলে অবশ্য সুপরিচিত লোক থাকা বাঞ্ছনীয়। (ইহাতে অন্য সুবিধাও আছে, অসুস্থ হইয়া পড়িলে সঙ্গীরা দেখাশুনা করিতে পারেন।) কাণ্ডীওয়ালা জল আনা, বাসন মাজার কাযও করে, তবে ব্রাহ্মণ হইলে দ্বিতীয় কাযটি করিবে না, বরং রান্নার কায তাহা দ্বারা করান যায়; অবশ্য এ সকলের জন্য স্বতন্ত্র 'ইনাম' দিতে হয়; (কাণ্ডীডাণ্ডী-ঝাম্পানের বাহকগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয় বা 'ঠাকুর'; কেবল শ্রীনগর হইতে ফিরিবার সময়, জল-আচরণীয় নহে, এরূপ বাহক পাইয়াছিলাম, তাহাদের অবশ্য বাসন মাজিতে, এমন কি, উচ্ছিষ্ট খাইতেও আপত্তি নাই।) কাণ্ডীওয়ালা পথ চিনাইয়াও লইয়া যায়, যদিও এ পথে কোনও গাইডের প্রয়োজন নাই, কারণ, সর্ব্বদাই যাত্রী চলিতেছে, আর সাধারণতঃ পথও এক বই দুই নাই। পথে বিস্তর লোককে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছি—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি; অন্ধ-খঞ্জও তাহাদিগের মধ্যে আছে।

যাহা হউক, অনেকে দীর্ঘ পথ চলিতে অশক্ত, বিশেষতঃ চড়াই ভাঙ্গিতে; সহরবাসীরা জন্মাবধি ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম গাড়ী, মোটর গাড়ী প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হওয়াতে একবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছেন; বরং পল্লীগ্রামের লোক পায়ে হাঁটিতে অভ্যস্ত। রেলওয়ের কল্যাণে এখন পল্লীগ্রামেও হাঁটার পাট উঠিয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, সারাপথ হাঁটিয়া যাইতে হইলে রোজ ২০ মাইল হাঁটিলে চলিবে না, প্রভাতে ৭।৮ মাইল, বৈকালে ৩।৪ মাইল, অথবা তাহাও না পারিলে শুধু প্রভাতে ৫।৬ মাইল করিয়া যাইতে পারেন; লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে না হয় কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে।

'চরণ-মাঝী'র নীচেই সুবিধার বাহন—ঘোড়া। হাঁটার কষ্ট বাঁচে, অথচ মানুষের চেয়ে দ্রুত যায়। সঙ্গে সহিস থাকে, ঘোড়ার ও তাহার নিজের খোরাকী সে চালায়, ঘোড়ার হেফাজত করে, গাইডের কাযও করে, দুর্গম স্থানে লাগাম ধরিয়া সতর্কভাবে লইয়া যায়। ঘোড়ার কথা শুনিয়া অনেকে হয় ত একবারে মূর্চ্ছা যাইবেন, কেন না, ঘোড়ায় চড়া সাহস, তথা শিক্ষা-সাপেক্ষ; (পল্লীগ্রামের লোকের বাল্যকাল হইতে 'পুকুরে' ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস আছে।) কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাহস, শিক্ষা, অভ্যাস কিছুরই প্রয়োজন নাই, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার জন্য যে ভাবে অশ্বারোহণ-পটুত্ব শিক্ষা করিতে হয়, ইহা তাহার দিক্ দিয়াও যায় না। 'দুর্গা' বলিয়া চড়িয়া বসিলেই হইল; ঘোড়াগুলি বেশী উচ্চ নহে, খুব ঠাণ্ডা, ধীরে চলে (এ সব পথে ঘোড়দৌড় সম্ভবও নহে); তাহার উপর সহিস সর্ব্বদাই হুঁসিয়ার থাকে, রেকাবে পা দিয়া ঘোড়ার উপর উঠিতে জানিলেই হইল। স্থূলকায় বা অথর্ব্ব হইলে এটুকুও অসম্ভব, তাহা মানি। আমার ত মনে হয়, ইহা বেশ আরামের—অবশ্য পরখ না করিয়াই কথাটা জোর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম। পাঠকবর্গ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পথে অনেক স্থানে দেখিয়াছি, মারাঠী, গুজরাটী, ভাটিয়া ও হিন্দুস্থানী নারী 'ধায় (?) অশ্বপৃষ্ঠে অসঙ্কোচচিতে'; কেবল বাঙ্গালী নারী অশ্বপৃষ্ঠে দেখি নাই। (বাঙ্গালী পুরুষও দেখি নাই।) পথে যাইতে যাইতে ভাড়ার জন্য অনেক ঘোড়া দেখিয়াছি, পুত্র ও ভাগিনেয় ঘোড়া ভাড়া করিবেন কি না জিজ্ঞাসিতও হইয়াছেন। ভাড়ার হার শুনিয়াছি, ডাণ্ডী ও ঝাম্পানের মত। মাল-পত্র লওয়ার জন্যও ঘোড়া পাওয়া যায়, তাহার ভাড়া বোধ হয় কম। আমরা ফিরিবার সময় শ্রীনগর হইতে মাল বহার জন্য ঘোড়া ভাড়া করিয়াছিলাম।

সর্ব্বনিকৃষ্ট যান—কাণ্ডী অর্থাৎ ঝোড়া; পুরু কাপড়-চোপড় পাতিয়া তাহার উপর খাড়া বসিয়া যাইতে হয়,

রৌদ্র-বৃষ্টিতে ছাতা ধরা যায়, দৃশ্য-উপভোগের ব্যাঘাত হয় না, চাই কি, ঘাড় গুঁজিয়া দিব্য নিদ্রাও দেওয়া যায়, তবে অধিকক্ষণ একভাবে খাড়া বসিয়া থাকিতে প্রাণান্ত হয়। সস্তা বটে, ভাড়া মালের মতই, ৫০৲।৬০৲ টাকা; স্থূলকায় লোক হইলে লয় না। বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকাকে এই যানে বাহিত হইতে দেখিয়াছি; আশ্চর্য্যের বিষয়, একটিও বাঙ্গালী পুরুষ বা নারী দেখি নাই। (অন্য লেখকদিগের পুস্তক-প্রবন্ধে কিন্তু বাঙ্গালী পুরুষ ও নারীর এই যান-আরোহণের উল্লেখ দেখিয়াছি।)

কাণ্ডী অপেক্ষা ঝাম্‌পানে একটু সুবিধা আছে। ইহা কাঠ ও দড়ীর তৈয়ারী, কতকটা খাটুলি ও কতকটা ডুলির মত, মধ্যভাগে বসিবার স্থান; ইহাতেও খাড়া বসিয়া যাইতে হয়, ছাতা ধরা যায়। কাণ্ডীর মত হাঁফাইয়া উঠিতে হয় না, কিন্তু খাড়া বসিয়া থাকিতে ঘাড় ধরিয়া যায়, পিঠ-কোমর টাটাইয়া উঠে। ইহার ভাড়াও ডাণ্ডীর মত, ৪ জন বাহকে বহে, বাহকদিগের কাছেই ঝাম্‌পান থাকে; পথে ঝাম্‌পান-সমেত অনেক বাহক দেখিয়াছি; যখন ডাণ্ডী হইতে নামিয়া পদব্রজে গিয়াছি, তখন ঝাম্‌পান ভাড়া করিব কি না জিজ্ঞাসিত হইয়াছি। অধিক স্থূলকায় হইলে, বোধ হয়, ইহাতেও বাহকগণ লইতে চাহে না,—ভারের জন্যও বটে, দড়ী ছেঁড়ার আশঙ্কায়ও বটে!

এই উভয় যান অপেক্ষা ডাণ্ডী আরামের (ইহার বর্ণনা ভাদ্র-সংখ্যায় ৮০১ পৃষ্ঠায় দিয়াছি)—কারণ, ইহাতে হেলান দেওয়ার সুবিধা আছে। যাঁহারা পদব্রজে যান অথবা কাণ্ডী বা ঝাম্‌পানে আরোহণ করেন, তাঁহারা খুব সম্ভবতঃ এই জন্য ডাণ্ডী-আরোহীদিগকে হিংসা করেন; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে হিংসার কারণ অল্পই আছে। এ সেই মামুলি কথা—'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।' হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া যাওয়া যায়, আরামে দৃশ্য-উপভোগের সুবিধাও আছে, ঘেরাটোপ থাকার দরুণ সম্মুখে রৌদ্র বা সম্মুখে ছাট না হইলে ছাতা খোলার প্রয়োজন হয় না—বস্‌, এই পর্য্যন্ত। আর কোনও সুখ নাই। ইহাতেও অধিকক্ষণ থাকিলে কোমর চড়চড় করে, বসিবার আসনের উপর কম্বল পাতিলেও অধিকক্ষণ থাকিলে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে, অধিক দিন এরূপ বসিলে অর্শোরোগের উৎপত্তি হয় বলিয়াও আশঙ্কা হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যানটি নৌকার মত, আরোহী বসেন হাঁলের জায়গায়; কিন্তু হইলে কি হয়? মাঝীর মত চালনার কর্ত্তৃত্ব তাঁহার নাই; একটু পাশ ফিরিলে, ঘাড় ফিরাইলে, সামনে ঝুঁকিয়া দ্রষ্টব্য কিছু দেখিতে চেষ্টা করিলে অমনই বাহকরা হাঁ হাঁ করিয়া উঠে, যাহাতে যানের ভারকেন্দ্র (balance) ঠিক থাকে, সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেয়, ডাহিনে কি বামে জোর দিতে হইবে, তাহা (জাহাজের কাপ্তেন বা যুদ্ধের সেনাপতির মত) নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, কেন না, এই যানে সমস্ত ঝোঁকটা পিছনে দিতে হয়, সম্মুখে বা পাশে ঝোঁক দিলেই বাহকদিগের কষ্ট, অসুবিধা, এমন কি, আরোহীর যান-ভঙ্গ বা যানভ্রংশ হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে। অধিক কি বলিব, ঘেরাটোপ তোলা বা ছাতা খোলায়ও সময়ে সময়ে তাহাদিগের আপত্তি, ঘোরা-বাঁকা পথে পিছনের বেহারাদের নজর চলার ব্যাঘাত হয়। ফল কথা, জেলের কয়েদীর মতই আরোহীর স্বাধীনতা পদে পদে ব্যাহত। আড় হইয়া শুইয়া নিদ্রার চেষ্টা করিলে (শেষ রাতে যাত্রা করিয়া ভোরের হাওয়ায় একটু নিদ্রাকর্ষণ হইত) তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, কেন না, ঐভাবে শুইলে ভারকেন্দ্র ঠিক থাকে না। ভুক্তভোগী ভিন্ন এ সব অসুবিধা ও কষ্টের কথা কেহ বুঝে না। 'The wearer best knows where the shoe pinches'; অতএব ডাণ্ডী-আরোহী (enviable) হিংসার পাত্র নহেন, বরং (pitiable) দয়ার পাত্র। যখন দুর্ব্বলতা-বশতঃ একবারে চলিতে অশক্ত হইয়াছিলাম, তখন সারাপথ ডাণ্ডীতে বসিয়া থাকিতে যে কি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল—তাহা বুঝান শক্ত।

ডাণ্ডী-আরোহণের আর এক বিপদ্ আছে। চারি জন বাহকের এক জন যদি হোঁচট খায় বা কোনও রকমে তাহার পা হড়্‌কাইয়া যায়, তাহা হইলে যান স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়;—ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে, আরোহীর ছিটকাইয়া পড়ার আশঙ্কাও আছে। এরূপ ঘটনা কয়েকবার হইয়াছিল, তবে বাহকরা সামলাইয়া লইয়াছিল বলিয়া আরোহীর আঘাত লাগে নাই। এই জন্য যেখানে পথ অত্যন্ত খারাপ, সেখানে তাহারা ডাণ্ডী হইতে না নামাইলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (তাহাদিগের সাহায্যে) হাঁটিয়া গিয়াছি, পরের দোষে পৈতৃক প্রাণটা খোয়াইবার ভয়ে!

কোথায় যেন রবিবাবুর লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম, প্রকৃতির সুষমাময় পথে তিনি পাল্কী চড়িয়া যাইতেন আর

কাগজ-পেনসিল্ লইয়া কবিতা লিখিতেন। আমরা অবশ্য কবি নহি, কিন্তু এই প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধ পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমাদের গদ্যময় হৃদয়েও অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবের উদয় হইত (তাহাতে আমাদের কৃতিত্ব নাই, স্থান-মাহাত্ম্যই তাহার কারণ), কিন্তু সেগুলি তখনই তখনই লিখিয়া ফেলিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইত। চলন্ত অবস্থায় পেন্সিল্ নড়িয়া যাইত, লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট হইত। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি সদ্যঃ সদ্যঃ মনে যে ছাপ মুদ্রিত করিত, তাহার বর্ণনা তখনই তখনই লিপিবদ্ধ করিলে সুপাঠ্য হইত মনে হয়, কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। যখন ডাণ্ডীওয়ালারা দম লইত, অথবা যখন চটীতে পৌঁছান যাইত, তখন 'ডায়েরী' লিপিতে বসিতাম—তাহাও ধীরে সুস্থে, বিশ্রামান্তে। তখন সে সমস্ত সুন্দর ভাব অধিকাংশই উপিয়া যাইত। পাঠকবর্গকে সেই সকল সুন্দর ভাবের অবতারণায় প্রীত করিতে পারিলাম না, সে জন্য মনে বড় দুঃখ রহিয়া গেল।

নরস্কন্ধবাহিত হইয়া তীর্থগমন পুণ্যলাভের পরিপন্থী, এই সংস্কার অনেকের আছে। কথাটা অসমীচীন নহে। তবে এ সম্বন্ধে একটা ভাবিবার কথা আছে। এই শ্রেণীর দরিদ্র লোকের ইহাই একমাত্র উপজীবিকা, ইহার অভাবে তাহাদিগের সাংসারিক অনটন ঘুচে না। সুতরাং কথাটা এই ভাবেই বুঝিতে হইবে যে, আমরা তাহাদের দারিদ্র্যভঞ্জনের অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ দিয়া পরোপকার করি, তাহাতে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তাহারাও শুধু স্বার্থ-চিন্তায়, অর্থ-লোভে এই হীনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, আমাদের পুণ্যার্জ্জনের সহায়তা করে; এ যেন মৈত্রীর সম্পর্ক—'রামসুগ্রীবয়োরিব', আর না হয় 'অন্ধখঞ্জন্যায়'ই বলুন। দুর্গম পথে ভারবহনে অবশ্য তাহাদের খুবই কষ্ট হয়, এক একবার তাহারা কষ্টের তাড়নায় বলিত, "শেঠজী, * এ জান-বাহির করা পয়সা"; কিন্তু ইহা ভিন্ন বেচারাদের উপায় নাই।

দুর্গম পথে ইহাদের চলাফেরা খুব হুঁসিয়ারির কায; সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া লোকজন বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে, অমনি তাহারা সতর্ক করিতেছে 'বাচ্ছো,—এক বগল্—ভিতর', অর্থাৎ একধারে পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াও। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, বাহকরা কি মূর্খ! নিজেরা পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া যাওয়াই ত নিরাপদ, ওধারে যাইতে 'খদে' পড়ে ত পথচল্‌তি লোকই পড়ুক না,—'যা শত্রু পরে পরে।' কিন্তু ক্রমে বুঝিলাম, পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া গেলে ইহাদিগের ডাণ্ডী লইয়া ঘোরাফেরার অসুবিধা, চাই কি পাহাড়ের গায়ে ডাণ্ডীর ধাক্কা লাগিতে পারে, আরোহীর চোট্ লাগিতে পারে। ফলতঃ ইহাদিগের দক্ষতা পাকা মাঝীকেও লজ্জা দেয়; দু'ধার হইতেই ডাণ্ডী, কাণ্ডী, ঝাম্পান যাতায়াত করিতেছে, এরূপ স্থান দিয়াও ইহারা নিরাপদে লইয়া যায়। ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, অশ্বতর, এমন কি, গরুর বা মহিষের পাল বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে, সে অবস্থায়ও ইহারা এমন সুকৌশলে সতর্কভাবে গিরিসঙ্কট পার হয় যে, তাহা দেখিয়া তাহাদিগের হুঁসিয়ারির ও ঠাণ্ডা মাথার তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। আরোহীর প্রতি তাহাদিগের দরদ যথেষ্ট।

১৮। অথ কাণ্ডীওয়ালা-ডাণ্ডীওয়ালাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি।

ইহাদিগের কথা যখন উঠিল, তখন ইহাদিগের আকৃতি-প্রকৃতি, রীতি-নীতির কথাও বলি। ইহাদিগের বর্ণ ও মুখের গঠন দেখিয়া আর্য্যজাতীয় বলিয়া বেশ বোধ হয়; অনার্য্য বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ব-প্রকরণে বলিয়াছি, ইহারা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ('ঠাকুর'); কচিৎ অনাচরণীয় জাতির লোক দেখা যায়। শীতের দেশ বলিয়া গরম জামা প্রভৃতির নিতান্ত প্রয়োজন, অথচ দারিদ্র্যবশতঃ কিনিবার ক্ষমতা নাই; ফলে, পরণে নেংটি বা খাটো ধুতী, কচিৎ হাফ্-প্যাণ্ট (এক জন বাচ্ছা কাণ্ডীওয়ালার দেখিয়াছি); গায়ে সাত-সেলাই জামা, চট বা কম্বল-ছেঁড়া প্রভৃতি জড়ান। (৺ত্রিযুগী নারায়ণ, ৺কেদারনাথ, ৺বদরীনারায়ণ প্রভৃতির পাণ্ডা, পুরোহিত, পূজারী প্রভৃতি প্রায় সকলেই প্যাণ্ট-কোট-টুপীধারী; পট্টবস্ত্র-পরিহিত নহে)। ছাত্রজীবনে 'হর্ষচরিতে' 'চীরচীরিকয়া রচিতমুণ্ডমালকম্'—রাজবাড়ীর সংবাদ-বাহক কুরঙ্গকের এই বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া পাগড়ী বাঁধা (যথা ছেঁড়া চুলের খোঁপা—নারীপক্ষে); ইহাদের সকল বস্ত্রই 'চীরচীরিকয়া' রচিত; তবে টুপী সকলেরই মাথায় আছে। ইহারা এই গোল টুপীতে চানাভাজা বা

* ধনী না হইলে ডাণ্ডী ভাড়া করিতে পারে না। এই বিবেচনায় ডাণ্ডী-আরোহী, বাঙ্গালীই হউন আর হিন্দুস্থানীই হউন, 'শেঠজী' খেতাব লাভ করেন।

পার্ব্বত্য দৃশ্য

পার্ব্বত্য নদী

ঝরণায় স্নান

ঝুলান সেতু

'মাসিক বসুমতী'র অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে এই আলোকচিত্র চারিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য উভয়কেই ধন্যবাদজ্ঞাপন করিতেছি।

পুরী-মিঠাই প্রভৃতি রাখিয়া সানন্দে ভোজন করে, এমন কি, এই পাত্রে করিয়া ঝরণা বা নদী হইতে পানীয় জল পর্য্যন্ত আনে; অর্থাৎ ইহা টুপী-কে-টুপী, আবার থালা, ঘটি, ডিস্-গেলাসেরও কায করে।

আহার—ভাত ও রুটী দুই প্রকারই অভ্যস্ত। বিড়ি-বার্ড সাই বেশ চলে, তবে শ্রমাপনোদনের জন্য দম লইবার সময় উহাতে শাণায় না—তামাক সাজিয়া খায়। দিয়াশলাই-এর কাঠী (ইংরেজী নামটি আত্মসাৎ করিয়াছে—'ম্যাচিস্') আরোহীকেই যোগাইতে হয়। আরোহীর বিড়ি-বার্ড সাই অভ্যাস থাকিলে, তাহাও চাহে। ফলে ইহাদের চাওয়ার অন্ত নাই। দুটি মেওয়া, কিস্মিস্ ইত্যাদি, এমন কি, মিছরিটুকু পর্য্যন্ত ইহাদিগের সম্মুখে খাইবার যো নাই, অমনি চাহিয়া বসিবে। কেবল হরীতকী ও দাঁতের মাজন চাহিতে দেখি নাই! ঔষধের জন্য ত ইহাদিগের বিশেষ আগ্রহ। ছুঁচ-সূতার জন্য এ দেশের সকলেই লালায়িত! সুতরাং ইহারাও বাদ যায় না। ইহা ছাড়া, দীর্ঘ পথের শেষে পুরাতন বস্ত্র, জামা, জুতা পর্য্যন্ত দক্ষিণা-স্বরূপ প্রার্থনা করে। এক জন সৌখীনগোছের ডাণ্ডীওয়ালা এলুমিনিয়মের (jug) 'জাগ'টাই চাহিয়া বসিল, কেন না, ঐ অঞ্চলে উহা মিলে না। আমাদের সঙ্গে বরাবর আসিলে ডাণ্ডী কয়খানিও লইবার জন্য 'দরবার' করিয়া রাখিয়াছিল। এই 'হ্যাংলা' স্বভাব অবশ্য ইহাদিগের দারিদ্র্যবশতঃ।

ইহারা চোর নহে, এটা অবশ্য মহৎ গুণ; কিন্তু ইহা কতটা তাহাদিগের সাধুতা-প্রণোদিত, এবং কতটা পুলিসের ভয়ে—তাহা বলা শক্ত। শুনিয়াছি, এ দেশে পুলিসের শাসন খুব কড়া। অবশ্য গেজেটিয়ারে লেখে যে, ইহারা মোটেই criminal tribe নহে। তথাপি ইহা বলিব যে, লোকগুলা সাঁওতালদিগের মত সরল, সাধু ও সত্যবাদী নহে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলা, পাক দিয়া দর চড়ান, ইত্যাদি ব্যবসাদারী বুদ্ধি, বহনকার্য্য করিতে করিতে ইহাদিগের বিলক্ষণ হইয়াছে। অনেক সময়ে একটু কড়া না হইলে ইহাদিগের কাছে ঠকিতে হয়। তবে মোটের উপর ইহাদিগের ব্যবহার মন্দ নহে। * পূর্ব্ব-প্রকরণে বলিয়াছি যে, আরোহীর বিপদ্ বা ক্ষতি ('তগ্লিব') না হয়, সে বিষয়ে ইহারা খুব হুঁসিয়ার। এ কথাও বলিয়াছি, যেখানে দুর্গম পথে হাঁটিতে হয়, সেখানে ইহারা হাত ধরিয়া লইয়া যায়। ইহারা (obliging) খুব অনুগতও বটে, পথে দম লইবার সময় ঝরণা বা নদী হইতে জল আনিয়া দেওয়া প্রভৃতি ফাই-ফরমায়েশ প্রসন্নমুখে খাটে। কাণ্ডীওয়ালারা ডাণ্ডীওয়ালাদিগের অপেক্ষাও বিশ্বাসী। হয় ত সারাদিন তাহাদিগের সহিত দেখা হইল না। কিন্তু জিনিশ-পত্র এক তিলও এদিক্ ওদিক্ হয় না—মায় ভাঙ্গা পাখাখানা পর্য্যন্ত হারায় না।

দ্বিতীয় দিন—২২এ বৈশাখ, ৫ই মে, শনিবার

ভোর ৫টায় গরুড়চটী হইতে রওনা, বেলা ১০টায় বড়-বিজনী চটী (১০ মাইল), মধ্যাহ্নযাপন।

বৈকালে পৌনে ৪টায় রওনা, সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় বন্দরভেল চটী (৬ মাইল), রাত্রিযাপন।

৺কাশীর ডাক্তার বাবুর উপদেশ ছিল, ভোরে যাত্রার পূর্ব্বে সংক্ষেপে আহ্নিক ও জপ সারিয়া একটু মিছরি বা বাতাসা বা ইসুপগুল-মিছরি ভিজান খাইয়া (শেষোক্তটি পেটের অসুখ, আমাশয় প্রভৃতি যাহাতে না হয়, সেই জন্য) রওনা হইতে। কিন্তু এ দিন উৎসাহের আতিশয্যে সে সব হইয়া উঠে নাই; শেষ রাতে উদ্যোগ করিয়া বোঝাওয়ালাদিগকে রওনা করিয়া দিয়া এবং কোথায় দুপুরে আড্ডা লইব বলিয়া দিয়া ভোর ৫টায় নিজেরা রওনা হইলাম—পদব্রজে। খানিক পথ গিয়া একটি ঝরণার ধারে (চটীতে ছাড়া পথেও এরূপ ঝরণা অনেক স্থানে আছে) শৌচক্রিয়ার জন্য গতিরোধ করিতে হইল; জামা-কাপড় গৃহিণীর জিম্মায় রাখিয়া গামছা পরিয়া (অর্থাৎ আচার পূরামাত্রায় বজায় রাখিয়া) শৌচক্রিয়া সমাধা করিলাম। (ক্রমে এতটা আচার-রক্ষা ঘটে নাই শেষে উদরভঙ্গের আমলে ত অনাচারের চরম—একবারে বেসামাল অবস্থা হইয়াছিল।) ঝরণার আশে-পাশে নোংরার চূড়ান্ত, যাত্রীরা ঘটী-গাড়ু না লইয়া ঝরণার জলও নোংরা করিতেছে দেখিয়া বড় অশ্রদ্ধা হইল। পুত্রকে দিয়া নীচে হইতে গঙ্গাজল আনাইয়া দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, তথা জপাদি সারিয়া পকেটস্থ মিছরি দিয়া জলযোগ

* এক এক সময়ে অবাধ্যতা দেখাইত, যদিও কড়া বুলিতে সায়েস্তা হইত, কখনও কখনও দু'টা মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইত। এক এক দিন একটু বেশী পথ চলিতে হইত (আমাদের প্রোগ্রাম্ ঠিক রাখার জন্য); এবং কাণ্ডীওয়ালাদের পৌঁছিতে বিলম্বের জন্য রন্ধনের বাসন প্রভৃতি ডাণ্ডীতে লইতে হইত। এই দুইটি ব্যাপারে তাহারা প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া উঠিত।

করিলাম। পুত্রের আসিতে বিলম্ব হওয়াতে উভয়ে একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম, পরে বুঝিয়াছিলাম, গঙ্গাগর্ভ উপর হইতে যতটা নিকট মনে হয়, আসলে ততটা নহে, পথটিও (উঠিবার সময়) বেশ সুগম নহে।

এখন রৌদ্র উঠাতে কষ্ট এড়াইবার জন্য উভয়ে ডাণ্ডী আরোহণ করিলাম ; কিন্তু অধিকক্ষণ এ আরাম সহিল না। (হিজলী, হিউলী, হিউল, নানা পুস্তকে নানা নাম দেখিলাম, পদ্মনাথ বাবু ইহাকে হিরণ্যগঙ্গাও বলিয়াছেন) নদী পার হইবার জন্য নামিতে হইল ; জল এক হাঁটু, কিন্তু অনেকটা পথ, আর জলতলস্থ উপলখণ্ডগুলি পিছল, সন্তর্পণে হাত ধরিয়া এক জন ডাণ্ডীওয়ালা পার করাইল, কিন্তু গৃহিণীকে হালকা ওজন বলিয়া ডাণ্ডীতে বসাইয়াই পার করিল ; সঙ্গের বিধবাটি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া বলিয়া এ খাতিরটুকু পান নাই। ডাণ্ডীওয়ালারা সারা পথই উভয়ের মধ্যে এই (invidious distinction) অন্যায় প্রভেদ বজায় রাখিয়াছিল। আবার পুত্রটিকেও এক জন ডাণ্ডীওয়ালা কাঁধে করিয়া পার করিয়াছিল ; অথচ ভাগিনেয়টিকে জুতা-মোজা খুলিয়া হাঁটিয়া পার হইতে হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও একযাত্রায় পৃথক্ ফল হইয়াছিল।

এই পথে এক জন এদেশীয় সৈনিকের সহিত দেখা ও ছেলেদের কিঞ্চিৎ আলাপ হইয়াছিল। ২৪।২৫ বৎসরের যুবা, অল্প-স্বল্প ইংরাজী জানে, দেরা-ইস্মাইল-খাঁতে ছিল, ২॥০ বৎসর পরে ছুটী লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে, ঘরে বৃদ্ধা মাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্ত্রী ও শিশুকন্যা আছে, নদীপারে বাড়ী। যুবককে দেখিয়া 'Soldier's Dream' কবিতাটি মনে পড়িল, তবে এই সৌভাগ্যবান্ যুবকের বেলায় নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন নহে, জাগ্রদবস্থায় মধুর আশা।

And sunshine arose on the way
To the home of my fathers, that welcomed me back.

* * * *

My little ones kissed me a thousand times o'er,
And my wife sobb'd aloud in her fullness of heart.
Stay—stay with us!—rest—thou art weary and worn'.

গরুড়চটী হইতে দুই মাইল পরে ফুলবাড়ী চটী, এখানে সুপ্রশস্ত গঙ্গা চটীর নীচেই তরঙ্গায়িতা ; ফুলবাড়ী ছাড়াইয়াই কিন্তু গঙ্গা কিছুক্ষণের জন্য অদর্শন হইলেন। দুই মাইল দূরে গুলারচটীর পর লোহার ঝুলান পুলে (Suspension Bridge —এই প্রথম এ শ্রেণীর পুল দেখা, বাকী পথে আরও অনেকগুলি আছে) পূর্ব্বোক্ত হিউল নদী পার হইলাম, এখানে ইহা প্রশস্ত। তিন মাইল পরে মোহন চটীতে ডাণ্ডীওয়ালারা দম লইল, ছেলেরা এখানে দন্তধাবনান্তে চিনি কিনিয়া গতরাত্রির প্রস্তুত লুচি দিয়া জলযোগ সারিয়া লইল। আবার দুই মাইল পরে ছোট-বিজনীতেও বেহারারা দম লইল, সুতরাং আমাদেরও বিশ্রাম। ইহার পর একটি চড়াই—প্রথম নমুনা। ডাণ্ডীতে থাকায় ইহার মাহাত্ম্য ততটা হৃদয়ঙ্গম হইল না। এইরূপ এক মাইল গিয়া বেলা ১০টায় বড় বিজনী চটীতে পৌছিয়া উঠন্ত রৌদ্রের তেজ হইতে অব্যাহতি পাইলাম। চটীতে সুস্নিগ্ধ বটচ্ছায়া ও ঝরণা হইতে জলের পাইপ্ বসান, তবে জল তেমন সুস্বাদু নহে। একটি দোতলা 'মাটকোটা'য় আশ্রয় লইলাম। ডাল-ভাত আলুভাতে আলুভাজা আলুর ডালনা প্রস্তুত হইলে স্নানান্তে আহার করা গেল, একঘেয়ে আলুর জন্য গুড়-তেঁতুল-গোলা দ্বারা মুখের রুচি করিতে হইল। বোঝাওয়ালারাও বিলম্বে আসিয়া যুটিয়াছিল।

বিশ্রামান্তে পড়ন্ত রৌদ্রে পৌনে ৪টায় সদলবলে রওনা হওয়া গেল। এইবার বিজনী চড়াই—ডাকসাইটে ; ডাণ্ডী হইতেই দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল ; ইহার পরে আরও ভীষণ চড়াই আছে (যথা গুপ্তকাশীর ঠিক আগে)। কিন্তু এই প্রথম বিষম চড়াই বলিয়া বিলক্ষণ ভীতিসঞ্চার করিল। 'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।' তিন মাইল পরে কুণ্ডাচটী, এখানকার দোকান-ঘরগুলি রাস্তার অনেক নীচে। কুণ্ডা চটীর ঠাণ্ডা জল খাইয়া, চড়াই-দর্শনে শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইলাম। এই চটীর কিছু পূর্ব্ব হইতেই গরুড়-ভগবানের কৃপায় উতরাই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। কুণ্ডা চটীর ঠাণ্ডা জল অনুপ্রাসের * প্রভাবে হইতে পারে, কিন্তু ইহার আধিভৌতিক কারণ, কালীকম্বলীওয়ালীর প্রসাদ। রাস্তায় স্থানে স্থানে ('পিঁয়াও' অর্থাৎ) জলসত্রের ব্যবস্থা তাঁহারই দয়াগুণে ; ঠাণ্ডা জলের জালা মাটীতে পোঁতা, শুধু মুখটা জাগিয়া আছে ; পথচল্‌তি লোকদিগকে জল-বিতরণ চলিতেছে। এই জলদানই ত প্রকৃত পুণ্যকর্ম্ম, এই নরসেবাই ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

* অনুপ্রাস মহিমা এ পথে বহু প্রকারে দেদীপ্যমান। কেদারবদরী যুগল-নামে দর-দর ধারে, বদরীবিশালা ও কঠিন কেদারে আড়ম্বরে, পাণ্ডা ডাণ্ডী কাণ্ডীর ডিমি ডিমিধ্বনিতে (মেথরের নাম 'ভাঙ্গি'না হইয়া 'ভাণ্ডী' হইলে আরও মজিত), ঝাম্পানে অনুনাসিকের ঝিরাবৃত্তিতে, কেদারকঙ্কণে পর্যন্ত এই অলঙ্কারের ঝঙ্কার শ্রুত হয়।

কুণ্ডা চটীর পর খুব উতরাই পথ অনেক দূর পর্য্যন্ত। উতরাই দেখিয়া গড় গড় করিয়া উতরাইব, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উৎসাহে নামিয়া পড়িলাম, তখন রৌদ্রও পড়িয়াছে; কিন্তু অল্পক্ষণ দ্রুত অবতরণ করিয়া বুঝিলাম, ব্যাপারটা যেরূপ সহজ মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে। খাড়া চড়াই উঠিতে বুকে জোর লাগে, উতরাই নামিতে পায়ের (brake ব্রেক্ কষিতে কষ্ট হয়, (আয়েস নহে) আয়াস বোধ হয়, পরিণামে হাঁটুতে ব্যথা ধরে। কৃশকায়া গৃহিণী কিন্তু এই অবতরণে খুব আরাম ও আনন্দ পাইয়াছিলেন, আদৌ কষ্টবোধ করেন নাই। এই নিম্নভূমিতে পথের দুই ধারে আম, জাম, লিচু প্রভৃতির চারা সযত্নে রোপিত ও জলসেচনে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিলাম—অবশ্য সরকারী পূর্ত্তবিভাগের বন্দোবস্তে। ১০।১২ বৎসরে গাছগুলি বড় হইলে পার্ব্বত্য তরুলতাকীর্ণ পথে বৈচিত্র্য ঘটিবে। তিন মাইল চলিয়া (শেষটা ডাণ্ডীর শরণ লইতে হইয়াছিল) বন্দরভেল বা বান্দর চটীতে পৌঁছিলাম। কাছাকাছি পথটা ভাল বাঁধান নহে, বড় বড় এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়া চলিতে ডাণ্ডাওয়ালাদিগকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইল, তাহার ধাক্কা ডাণ্ডীতে বসিয়াও কতক কতক পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় (পৌনে সাতটায়) এই কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

কুণ্ডা চটীর আগেই গঙ্গার পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল, বন্দরভেল চটী গঙ্গার উপরেই, এখানে গঙ্গা সুপ্রশস্ত, গঙ্গার চরে দোকানের সারি। এখানে একতলা ঘরই যুটিল; (যতদূর মনে পড়ে, দোতলা এ চটীতে নাই।) তিন জনে সন্ধ্যার অন্ধকারে বড় বড় অসমান পাথরের উপর দিয়া গিয়া গঙ্গাতীরে পরম শান্তিতে সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিলাম। তীরে কিন্তু অপকর্ম্মের দুর্গন্ধ অতি কদর্য্য। মহাত্মা গান্ধী যে ('defiling the Ganges',—"Young India" June 7, 1928.) এই কদর্য্য কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিলাম। হিন্দুজাতি ধর্ম্মের—আচারের ভড়ং করিলেও কতটা ধর্ম্মহীন কদাচারী হইয়াছে, ইহা দেখিলেই সম্‌জান যায়। পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতেন, আমরা সেখানে অশুচিতা ও কদর্য্যতা আনিয়া ফেলিয়াছি।

এ পথের যা' নিয়ম—'বেদের টোল,' পুঁটুলী খোলা ও বাধা, লবণ মশলা আদি বাহির করা, দোকানে ঘী আটা আলু কিনিয়া 'পুরী'-তরকারী বানান যথারীতি হইল; ঘীএর দর এখানে চড়া, ৩৲ টাকা সের। (কুণ্ডা চটীতে দুধ সস্তা দেখিলাম, ৵০ সের)। আহারান্তে শয়ন করা গেল, নিদ্রা আসিতে কিন্তু বিলম্ব হইল; কারণ, দোকানের এক অংশে খানিকক্ষণ এক জন গায়কের কণ্ঠ-সঙ্গীত চলিল। আর স্থানটি তিন দিকে পাহাড়বেষ্টিত বলিয়া বড় গুমট; নোট্‌গুলি বুক-পকেটে থাকাতে সূতী কোটটি খুলিয়া রাখিতে সাহস হইল না, কিন্তু তাহাতে অস্বস্তি হইতে লাগিল। তাহার উপর, অর্দ্ধরাতে একটা কিসের (সম্ভবতঃ বিছা বা বিচ্ছু নহে, * কাঠপিঁপড়ের) কামড়ে জ্বালা আরম্ভ হইল (পরদিন সারাদিন জ্বলুনি দপদপানি ছিল)। শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর লছমণ-ঝোলায় বিচ্ছুর কামড়ে যে যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া কতকটা ধৈর্য্য ধরিলাম; তাঁহার মত গুরু-বল নাই যে, সাধুর কৃপায় জ্বালা উপশম হইবে।

অদ্য লছমণঝোলা হইতে ১৬ মাইল (হরিদ্বার হইতে ৩৪ মাইল) পথ আসা গেল। এক দিনের পক্ষে মন্দ কি? মনে রাখিতে হইবে, আমরা তিন জন কতক ডাণ্ডীতে কতক পদব্রজে গেলেও ছেলেরা উভয়ে এই ষোল মাইল পথ সমানে হাঁটিয়াছিল। হরিদ্বার হইতে মাইল গণনা আরম্ভ, বরাবর পার্ব্বত্য পথে পাহাড়ের গায়ে বা পিল্‌পে গাঁথিয়া মাইলের অঙ্ক ত উৎকীর্ণ আছেই, ফর্লং এর অঙ্ক পর্য্যন্ত আছে।

পাহাড় দু'ধারে, এক ধারের পাহাড়ের গায়ে পূর্ত্তবিভাগের প্রস্তুত পথ, অধিকাংশ স্থলেই নীচে গভীর খদ্, (স্থানে স্থানে যাত্রীদিগের পতনাশঙ্কায় সেই পার্শ্বে আলিসা গাঁথা), নদীও পাশে পাশে প্রায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত। কোথাও অনেকখানি সমান জমী রাস্তার এক বা দুই ধারে, সেখানে রাস্তাও চওড়া। পাহাড় কোথাও তরুলতা-সমাচ্ছন্ন সুন্দর মনোহর; কোথাও উলঙ্গ উদ্দাম দৈত্যের মত বিকট ও ভীতিপ্রদ, পথিকের মাথার উপর ঝুঁকিয়া আছে, মনে হয়, এখনই মাথায় পড়িল; কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চ্যাঙ্গড় বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া আছে, যেন প্রবল ভূকম্পনে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে অথবা দেব-দৈত্যের যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল; কোথাও বহুদূর পর্য্যন্ত চীনদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীরের মত অভ্রভেদী খাড়া, কোথাও সুঠাম

* সাপ, বিছা, বিচ্ছু, পথে কোথাও পাই নাই। যে পথের ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে গরুড়-নারায়ণের বিগ্রহ স্থাপিত, যাত্রীরা অহরহ গরুড় নাম উচ্চারণ করিতেছে, সে পথে ইহারা আসিবেই বা কোন্ সাহসে?

প্রকৃতি-হস্ত-গঠিত ৺জগন্নাথের মন্দিরের মত উচ্চচূড়। (বাস্তবিকই ত স্বয়ং জগন্নাথের জন্য বিশ্বকর্ম্মার কারু-কৌশল, দর্শনে ভাবুক-হৃদয়ে বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক করে।) ফলতঃ গিরিরাজের ভীম ও কান্তরূপে মুগ্ধ হইতে হয়, পথের কষ্ট ভুলিয়া যাইতে হয়। পুণ্যস্পৃহার আধ্যাত্মিক ভাব ছাড়িয়া দিলেও সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য-উপভোগে নয়ন-মন চরিতার্থ হয়। কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া শুধু পার্ব্বত্য 'চীর' (pine ?) গাছ কেন, নেড়া সেজ, খেজুর-গাছ, আম-জাম লেবু-গাছ, কলাগাছ, বাসক কুর্চ্চি প্রভৃতি ফুলগাছ, এমন কি, বন্য-গোলাপ চামেলি পর্য্যন্ত পর্ব্বত-গাত্রে জন্মিয়াছে। এক এক স্থানে বনফুলের সুবাসে মন মাতাইয়া দেয়। ইহাকেই বাইবেলের ভাষায় বলা যায়,—'Out of the strong came forth sweetness.'

সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বলিলাম। যাত্রার প্রথম অবস্থায় নূতন অপরিচিতের সহিত সংস্পর্শে অভিভূত ও দুর্লভ দেব-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠায় উত্তেজিত অস্থিরচিত্ত ছিলাম। ফিরিবার সময় পথ পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া আর সেরূপ অভিভূত হই নাই এবং দেবদর্শনে কৃতার্থম্মন্য হইয়া সুস্থিরচিত্ত আত্মস্থ হইয়াছিলাম, সুতরাং সবিশেষভাবে নিরীক্ষণ ও সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছিলাম। অতএব ভবিষ্যতে যখন রুদ্রপ্রয়াগ হইতে এই পুরাতন পথে ফিরিব, তখনকার বিবরণ পাঠকবর্গ যেন পাঠ করেন, পুনরাবৃত্তি মনে করিয়া যেন ছাড়িয়া না দেন। ভাগ্যে পুরাতন পথে ফিরিয়াছিলাম, (এ পথে সাধারণতঃ যাত্রীরা ফেরে না), তাই তখন ভাল করিয়া এ সব দৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। তবে যাইবার সময় সজাগভাবে সমস্ত লক্ষ্য না করিলেও সেই সব পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্য যে অলক্ষ্যে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুইজার্ল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে একখানি (রেলওয়ে কোম্পানীর) পুস্তিকায় যে কথাটি পড়িয়াছি, সে কথাটি খুব ঠিক।

"At the time the demands on strength and nerve may be too absorbing to permit the conscious appreciation of the mountain beauty, but unconsciously they are all being stored up in that treasure-house of memory which is the chiefest reward of the mountaineer."

তৃতীয় দিন—২৩এ বৈশাখ, ৬ই মে, রবিবার

ভোরে বন্দরভেল হইতে রওনা, বেলা ১০টায় কাণ্ডীচটী (১০ মাইল), মধ্যাহ্নযাপন।
বৈকাল ৪টায় রওনা, সন্ধ্যা ৬টায় ব্যাস-চটী (৪ মাইল) রাত্রিযাপন।

শেষ রাতে উঠিয়া ৺কেদারনাথের পাণ্ডার ভ্রাতা গুপ্তকাশীতে ও পরে ৺কেদারধামে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিবার জন্য অগ্রগামী হইলেন। এ দুই দিন সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। রাতে মিছরি ও ইসপগুল ভিজান ছিল, ভোরে জপাদি সারিয়া তাহাই এক এক চুমুক খাইয়া রওনা হওয়া গেল। গঙ্গাগর্ভ যদিও ত্যাগ করিলাম, তথাপি দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, গঙ্গা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন—মায়ের এমনই দয়া! এবার অনেকখানি পথই চড়াই, সাড়ে ৩ মাইল পরে মহাদেব-চটী; এখানে একটি টিলার উপর মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির, উপরে উঠিয়া দেবদর্শন ও সামান্য 'ভেট চড়ান' গেল। মন্দিরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, রেল-লাইনের গুম্‌টির মত। ৺কাশীর ক্ষুদ্রতম মন্দির, ৺কাশীর কেন, আমাদের পল্লীগ্রামের শিবমন্দিরও ইহা অপেক্ষা অনেক বড়। পরে দেখিয়াছি, ৺কেদারনাথের ও ৺বদরীনারায়ণের মন্দির ইহার তুলনায় বৃহৎ হইলেও ৺কাশী-গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র। যাহা হউক, এই দরিদ্র দেশে ক্ষুদ্র মন্দির-নির্ম্মাণও ভক্ত সাধকের হৃদয়ের ঐকান্তিকতার পরিচয়।

এখানে ডাণ্ডীওয়ালাদিগের দম লওয়া হইলে এবং ছেলেদের ও আমার পেড়া কিনিয়া জলযোগ হইলে আবার যাত্রা করা গেল। (পেড়াগুলি টাটকা বটে, তবে মিষ্টতা কিছু বেশী, এ দেশের রুচিমত প্রস্তুত, চিনি যদিও সস্তা নহে।) পূর্ব্বে কতকটা পথ পদব্রজে আসিয়াছিলাম; এবার ডাণ্ডীর আশ্রয় লইলাম। এক মাইল পরে রামপট্টি চটি, নূতন স্থাপিত। আরও ২॥০ মাইল পরে শ্যামল বা সন্তালু চটী; সেখানেও বেহারারা দম লইল। চড়াইপথে নিজেদের কষ্টলাঘবের জন্য তাহারা মধ্যে মধ্যে বিধবাটিকে নামাইয়া হাঁটাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, তাঁহাকেও

কৃপাপরবশ বা কোপপরবশ হইয়া তাহাদিগের কথা রাখিতে হইয়াছিল।

পথে স্থানে স্থানে ৺গরুড়নারায়ণের ছোট ছোট মন্দির (কুলুঙ্গী বলিলেই ঠিক হয়), পূজারী যাত্রী দেখিলেই ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিল এবং সামান্য কিছু (পাই আধলা) ভেট চড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল ও অনুরোধ রক্ষিত হইলে 'অভিলাষ পূর্ণ হউক, সফল হউক', ইত্যাকার আশীর্ব্বাদ-বৃষ্টি করিল। বলা বাহুল্য, এ সব মূর্ত্তি-স্থাপন পয়সা রোজগারের ফিকির, ধর্ম্মের নামে ব্যবসা চালান। এক স্থানে আমাদিগকে বিগ্রহের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়াই পূজারী বালক ছুটিয়া আসিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিয়া গেল; একটু বিলম্ব হইলেই শীকার ফস্‌কাইত! আর একটি রোজগারের ফিকিরও এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। চটীর, বিশেষতঃ তীর্থস্থানের (যথা গুপ্তকাশী, উখীমঠ ইত্যাদি) কাছাকাছি আসিলেই ডুগ্‌ডুগী বাজাইয়া (অথবা বিনা-যন্ত্রে) তীর্থযাত্রা-বিষয়ে ছড়া-গান গাহিয়া পূর্ণবয়স্ক লোক বা বালক-বালিকা কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করে ও 'দেবদর্শনের বাসনা পূর্ণ হউক' বলিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। গানগুলি মিঠে (২।১টি টুকিয়া লই নাই বলিয়া আক্ষেপ হয়), কিন্তু এই ব্যবসাদারী দেখিয়া 'চিত্তির' এমন চটিয়া যাইত যে, আনন্দের পরিবর্ত্তে বিরক্তিরই সঞ্চার হইত। বিপরীত দিক্ হইতে আগত যাত্রীর সহিত দেখা হইলেই 'বদরীবিশাললালকী জয়' 'কেদারনাথ-স্বামীজিকী জয়' শব্দে উল্লাস প্রকাশ পাইত; ডাণ্ডীওয়ালারাও চটী হইতে যাত্রা করার সময় ঐ জয়-শব্দ উচ্চারণ করিত; এ কথাও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি। ফলতঃ সারাপথই ভক্তি-ভাবভাবিত হওয়ার শুভ-সুযোগ ঘটিত। তথাপি পথের কষ্ট অনুভব করিলে সেটা নিতান্তই আমাদের ভক্তিভাবের অল্পতা সূচিত করে।

আরও তিন মাইল গিয়া (কোথাও চড়াই, কোথাও উতরাই) কাণ্ডী চটীতে বেলা ১০ টায় পৌছান গেল। এখানেও দোতলা 'মাঠকোটায়' আশ্রয় লইলাম। এখানেও একটি টিলার উপরে ক্ষুদ্র মন্দির আছে—সাক্ষিগোপালের। হাসপাতাল ও ধর্ম্মশালাও আছে। এখানে জলের খুব সুখ, ২।৩টি বড় বড় ঝরণা, অবিরত বেগে জল পড়িতেছে; এখানকার স্নানের সুখের কথাই গতবারে বলিয়াছি (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৯ পৃঃ;) এবং এইখানেই কম সওদা করার জন্য দোকানদারের সঙ্গে বচসা হয় (ঐ, ৯৬০ পৃঃ;) পরে আবার লোকটি একটু জুয়াচুরির চেষ্টাও করে, উহার কাছে দুধ না থাকার দরুণ অন্য দোকানদারের কাছ হইতে দুধ লওয়া হয়, এবং পরে তাহাকে দাম চুকাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু এ ব্যক্তিও সেই দুধের দাম জিনিশের হিসাবে ধরিতেছিল; ইহা লইয়া বেশ একটা খণ্ড-যুদ্ধ—অবশ্য বাক্যবাণই এ যুদ্ধের অস্ত্র—লাগিয়া গেল; ব্যাস-ঘাট হইতে পুলিস আনিয়া তাহাকে হায়রানী করিব, এই ভয়-প্রদর্শনেও তাহাকে কাবু করা গেল না; সুখের বিষয়, যুদ্ধের ঝনঝনা-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া অপর দোকানদার অকুস্থলে আসিয়া পড়িল, ব্যাপার শুনিয়া সে আমাদের পক্ষাবলম্বন করিল, সুতরাং ঘরশত্রুর বিপাকে পড়িয়া বেচারাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল।

এই চটীতে পরিচিত মুখ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম; বিদেশে দুর্গম পথে ইহা সত্য সত্যই আনন্দের বস্তু। ভাগলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ (আমার এক বৎসর পূর্ব্বে পাশ, বয়সে ৪।৫ বৎসরের বড়)—প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ভাগলপুর কলেজে কায করিতাম, তখনকার আলাপ। নিবাস গুপ্তিপাড়া। দুইটি যুবক সঙ্গী লইয়া পদব্রজে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; রোজ ধীরে-সুস্থে ৭।৮ মাইল হাঁটেন। হাঁটার পক্ষে ইহাই ঠিক ব্যবস্থা (by easy stages)। পরবর্ত্তী চটীতে আবার দেখা হইয়াছিল। তাহার পর দেবপ্রয়াগে। পরে পিছাইয়া পড়েন, ৺কেদার-দর্শনে কৃতার্থ হইয়া যখন ফিরি, তখন আবার দেখা—তিনি ৺কেদার-দর্শনে যাইতেছেন। (তীর্থভ্রমণে এক মাস ও লক্ষ্ণৌএ আত্মীয়গৃহে এক পক্ষকাল কাটাইয়া ৺কাশীধামে আসিয়া শুনিলাম—উভয়ের পরিচিত একটি ভদ্রলোকের মুখে—যে তিনি সুস্থদেহে ফিরিয়া ভাগলপুর পৌছিয়াছেন।)

যথানিয়মে বৈকালে ৪টায় রওনা হওয়া গেল; ৪ মাইল পরে ব্যাসঘাট তীর্থ ও ব্যাসচটী। এখানে অনেকটা সমতল স্থান। কিন্তু পথে বরাবর চড়াই উতরাই আছে ও তীর্থে রাত্রিবাস বিধেয় বলিয়া এবার ৪ মাইল আসিয়াই আড্ডা লওয়া স্থির হইল। ৬টায়—বেশ বেলা থাকিতেই পৌছান গেল। (এ দেশে সন্ধ্যা বোধ হয় ৭।৷০ টায় হয়, তখনও পর্য্যন্ত ঝিকিমিকি আলো থাকে।) একটি লোহার ঝুলান সেতু পার হইলে সঙ্গম—গঙ্গা ও ব্যাসগঙ্গা বা নয়ার নদীর; (এলাহাবাদ) প্রয়াগের পরে এই প্রথম সঙ্গম, সঙ্গমটি সুস্পষ্ট, কিন্তু ইহার তেমন নামডাক নাই, বোধ হয়, ৯।১০ মাইল পরেই দেবপ্রয়াগে প্রসিদ্ধ (গঙ্গা ও

অলকনন্দার) সঙ্গমস্থান থাকার দরুণ এরূপ ঘটিয়াছে—'মহা-দীপসমীপে নাল্লাঃ স্ফুরন্তি' ইতি ন্যায়াৎ। এখানেও ভাল দোতলা ঘর পাওয়া গেল, পার্শ্বেই ব্যাসদেবের ক্ষুদ্র মন্দির (কাণ্ডী চটীর সাক্ষিগোপালের ও মহাদেব-চটীর মহাদেবের সজাতীয়); পশ্চাতে একটু দূরে—কিন্তু বেশী নীচে নহে—গঙ্গা; গঙ্গাতীরে বসিয়া তিন জনে সন্ধ্যাহ্নিক করা গেল; কিন্তু এখানেও বন্দরভেলের মত অপকর্ম্মের দুর্গন্ধ ও সাবধানে শুচিতা বাঁচাইয়া গঙ্গাতীরে যাতায়াত করিতে হয়। ব্যাসদেবের মন্দিরে আরতি দেখিয়া দূরে ব্যাসেশ্বর শিব-মন্দির ও ব্যাসদেবের পাঁচ-পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে যাওয়া গেল—'সেথো' ৺বদরীনাথের পাণ্ডার গোমস্তা; গঙ্গার ধারে ধারে খানিক দূর গিয়া বিস্তর পাথরের বড় বড় নুড়ির উপর দিয়া কষ্টে চলিয়া ঝরণা পার হইয়া উচ্চ পাড়ে উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে মোটেই 'খরচা' পোষাইল না; স্থানটি নির্জ্জন বটে, কিন্তু রমণীয় নহে, তেমন ভক্তির সঞ্চারও হয় না। শুনিয়াছিলাম, ব্যাসঘাট-তীর্থ ব্যাসদেবের সিদ্ধিক্ষেত্র; চোখে দেখিলাম, গঙ্গার ধারে জংলী সিদ্ধির ক্ষেত। কলির পূর্ণ প্রকোপ!

এখানেও যথারীতি পুরী-তরকারী বানান হইল; দোকানের গরম গরম মুখপ্রিয় জেলাপী—ইদমধিকম্; এ জিনিশটা এত-দঞ্চলে উতরায় ভাল; পরে অন্যত্রও (দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, গুপ্তকাশী, চামৌলি ইত্যাদি) পরখ করিয়াছি। এখানে ডাকঘর, পুলিস ষ্টেশন ও স্কুল আছে। (ইহা ছাড়া এখানে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়।) লক্ষ্ণৌএর আত্মীয়টিকে দুই দিন ধরিয়া একখানি চিঠি লিখিতেছিলাম, এইখানে ডাকে ছাড়িয়া দিলাম। রাত্রে আহারান্তে শয়ন করা গেল। গত রাত্রের ন্যায় এ রাত্রেও সঙ্গীতালাপ শুনা গেল—যন্ত্রসঙ্গত-সমেত। যাহা হউক, শীঘ্রই থামিয়া গেল, সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

চতুর্থ দিন—২৪এ বৈশাখ, ৭ই মে, সোমবার

রাত্রি ৪টায় রওনা, প্রাতঃ ৮॥০টায় দেবপ্রয়াগ
(৯ মাইল) —মধ্যাহ্ন, তথা রাত্রিযাপন।

পরদিন একটু সকাল সকাল পৌঁছিয়া দেবপ্রয়াগে তীর্থকৃত্য সারিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে রাত্রি থাকিতেই রওনা হইয়া পড়া গেল; তাড়াতাড়ির ফলে গৃহিণীর এণ্ডির চাদরখানি ভুলক্রমে ফেলিয়া যাওয়া হইল; পরে যখন ধরা পড়িল, তখন এক জন ফিরিয়া গিয়া তল্লাস করার প্রবৃত্তি হইল না, এই ক্ষতিতে এমন মুসড়াইয়া পড়া গেল; সেবে কলিকাতা ছাড়িবার সময় ইহার মূল্য ১২৲ টাকা শোধ করিয়াছিলাম। বাকী দীর্ঘ পথে আমার সামান্য দুই পয়সা মূল্যের একটি জিব-ছোলা ছাড়া আর কোনও দ্রব্য লোকসান হয় নাই। অনেক দিন পরে ফিরিবার সময় অবশ্য দোকানদারের কাছে খোঁজ লওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে পাইয়াছে স্বীকার করিল না। হয় সেই আত্মসাৎ করিয়াছে, না হয় পরদিন যে যাত্রীরা আসিয়াছিল, তাহাদেরই লভ্য হইয়াছে।

ব্যাসচটী ছাড়াইয়া রামঘাটে দেবমন্দির পথে পড়ে, যাত্রীর সাড়া পাইয়া পূজারী সেই শেষ রাতেও ঘণ্টা বাজাইয়া আমাদিগকে দেবদর্শন করিবার জন্য ডাকিল; কিন্তু তখন আর বিলম্ব করিতে ইচ্ছা হইল না। এখানে গঙ্গা অনেক নীচে। আবার নীচে দিয়া টেলিগ্রাফের তার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিতেছে। পথ কোথাও চড়াই, কোথাও উতরাই; কতক হাঁটিয়া, কতক ডাণ্ডীতে গেলাম। পথে মানভূমের একটি ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত দেখা হইল, মাতা-পিতা বর্ত্তমান, হাঁটিয়া তীর্থ করিতে বাহির হইয়াছে, কাপড়-জামা ও অর্থ-সম্বল সামান্য, প্রথম দিন নাকি ২৮ মাইল হাঁটিয়াছে; দেবপ্রয়াগে আবার দেখা হইয়াছিল; শেষ পর্য্যন্ত অতটা গতিবেগ ছিল না, ক্রমে পিছাইয়া পড়িয়াছিল। তিন মাইল পরে ছালোরী চটী, তাহার পর আবার ২ মাইল পরে উমরাসু চটী, আরও দুই মাইল পরে সোর চটী; সোর চটীতে আমবাগান দেখিলাম, নীচে স্থানে স্থানে কলাবাগান দেখিলাম। আর দুই মাইল পরে দেবপ্রয়াগ; মাইল খানেক থাকিতে পাণ্ডার উৎপাত, 'বাড়ী কোন্ জিলা, পাণ্ডা কে' ইত্যাদি প্রশ্নবৃষ্টি; ডাণ্ডীতে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহিলাম; 'বোবার শত্রু নাই' এই প্রবাদবাক্য পুরীতে অসত্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল, এখানে কিন্তু ইহা ফলিল। পরে বুঝিয়াছিলাম, অনেক যাত্রী এই তীর্থপথে ডাণ্ডীতে বসিয়া জপ করিতে করিতে যায়, পাণ্ডার দল আমাকেও সেই শ্রেণীর মনে করিয়াছিল। ক্রমে গঙ্গাতীরে আসিলাম; ওপারে ইংরেজের অধিকৃত 'বা' সহর; লোহার ঝুলান সেতু দিয়া গঙ্গা পার হইয়া আমরা উক্ত স্থানে গেলাম, পুত্র ও ভাগিনেয় অনেক পূর্ব্বে পৌঁছিয়া পাণ্ডা দ্বারা একটি তেতলা বাড়ীতে বাসা ঠিক করাইয়া রাখিয়াছিলেন; বাড়ীটি অন্য এক জন পাণ্ডার, ভাড়া লাগে নাই। দোতলায় পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস; সম্মুখের

রাস্তা হইতে দোতলাকে একতলা ভ্রম হয়, কিন্তু নীচে আরও একতলা আছে, নদীর দিক্ হইতে দেখা যায়। বাড়ীখানি ভাল; অলকনন্দার উপরেই, যদিও নদী অনেক নীচে। পাশেই অলকনন্দার পুল (সেটিও লোহার ঝুলান সেতু)।

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া শৌচক্রিয়ার জন্য ব্যস্ত হইলাম। পথে বরাবর দেখিয়া আসিতেছিলাম, হয় গঙ্গার ধারে, না হয় পাহাড়ের গায়ে এই কার্য্যের জন্য যাইতে হয়, ইহাকে 'জঙ্গল যাওয়া' বলে; 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' এই শাস্ত্রীয় বচনের সম্মান-রক্ষার্থ আমাদিগকেও গতানুগতিক হইতে হইয়াছিল। এখানে পাশেই পায়খানা আছে শুনিয়া বড় আরাম পাইলাম; কিন্তু তথায় গিয়া দেখিলাম, নরককুণ্ড, সম্মুখের জমী, পায়খানার দুয়ার, বসিবার স্থান সমস্ত নোংরা; অনেক কষ্টে অতি সাবধানে কয়েকটির মধ্যে একটিতে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতির প্রবল অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল; গা ঘিন্ ঘিন্ করিতে লাগিল এবং তীর্থপথের অভ্যস্ত মনের পবিত্রতা একেবারে লোপ পাইল।

হরিদ্বার-হৃষীকেশ ছাড়াইয়া এই প্রথম বড় তীর্থ এবঞ্চ উত্তরাখণ্ডের পঞ্চপ্রয়াগের ইহাই প্রথম ও প্রধান 'প্রয়াগ'। (পঞ্চপ্রয়াগ যথা—দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ)। এইখানে ৺বদরীনারায়ণের পাণ্ডাদের স্থায়ী বাস। তীর্থকৃত্য-সাধনার্থ সকলে পাণ্ডা ও তাহার গোমস্তার সহিত অলকনন্দার পুল পার হইয়া দেবপ্রয়াগে গেলাম। তথায় বাজারে ভোজ্য-শ্রাদ্ধাদির জন্য থালা, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য কিনিয়া সঙ্গম-তীর্থে পৌছিলাম, অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া খুব নীচে সঙ্গমস্থলে যাইতে হয়। সঙ্গম দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলাম, কি উত্তাল তরঙ্গমালা! গঙ্গার জল ধবলবর্ণ, অলকনন্দার জল নীলবর্ণ—এ আবার সেই কালিদাস-বর্ণিত গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমেরই পুনরাবৃত্তি (রঘুবংশ, ত্রয়োদশ সর্গ)। প্রথম কার্য্য, মস্তক-মুণ্ডন, ৺পূজার ছুটীতে (এলাহাবাদে) প্রয়াগে হইয়াছিল, আবার এখানে হইল—অবশ্য ৬ মাসের ব্যবধানে; সঙ্গের বিধবাটির এই যাত্রাতেই প্রয়াগে মুড়ান মাথা আবার মুড়ান হইল; গৃহিণী (সধবা বলিয়া) এক বিঘৎ পরিমাণ চুল ছাঁটিয়াই নিস্তার পাইলেন, সে জন্যও নাপিতকে দুই আনা পারিশ্রমিক দিতে হইল; আমাদিগের মুণ্ডনও ঐ হারেই হইল, তীর্থরাজ প্রয়াগে এত সহজে ছাড়ে নাই। এখানে মস্তক মুণ্ডন করিলে আর কোথাও করিতে হয় না; অবশ্য মহাগুরুনিপাতে অশৌচান্তে করিবার নিষেধ নাই। মুণ্ডনান্তে গাঁটছড়া বাঁধিয়া সঙ্গমস্নান—স্রোত প্রবল হইলেও লোহার শিকলি ধরিয়া সুন্দররূপে স্নান করা গেল, মাছের কামড় ২।১টা যদিও সহ্য করিতে হইল; জল খুব ঠাণ্ডা। সায়াহ্নে বন্দরচটী ও ব্যাসচটী পৌছানতে গঙ্গাস্নান হয় নাই, সে আক্ষেপ মিটিল। তখন জানিতাম না যে, তীর্থপথে আমার এই শেষ অবগাহনস্নান। তাহার পর শ্রাদ্ধ ও ভোজ্য-উৎসর্গ—অন্য পুরোহিতে করাইল, এক এক আধুলি দক্ষিণা লাগিল। স্নানঘাটের উপরেই পাহাড়ে অনেকগুলি গুহা আছে, তথায় শুষ্ক বস্ত্রাদি রাখা চলে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেলে পাণ্ডার সঙ্গে দেবদর্শনে যাওয়া গেল। অত্যন্ত খাড়া এবং বিস্তর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ও অন্যান্য দেবতার মন্দিরে যাইতে হইল—রাস্তার চড়াইও ইহার কাছে হারি মানে, রামানুচরগণই কেবল এখানে অবলীলাক্রমে উঠিতে পারে; বিধবাটিকে পাণ্ডার গোমস্তা রীতিমত হাত ধরিয়া তুলিতে লাগিল, তথাপি তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন। গৃহিণী সঙ্কল্পস্নানান্তেই পাকক্রিয়ার জন্য বাসায় ফিরিয়াছিলেন, বলিয়া গেলেন, শ্রাদ্ধ ও ভোজ্যদান আমি করিলেই তাঁহার করা হইল। মন্দিরে মন্দিরে 'ভেট চড়াও, ভোগ লাগাও' ইত্যাদি চীৎকার, মায় মন্দিরসংলগ্ন পাঠশালায় 'চাঁদা দাও'; যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া গেল। ভিখারীর ও ব্রাহ্মণের উৎপাত ঘাটে ও মন্দিরে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। একটি অন্ধ ভিখারীকে সঙ্গের বিধবাটির কথামত স্নানের বস্ত্রখানি দান করিলাম (এখানে তীর্থরাজ প্রয়াগের মত নাপিতে কাপড় দাবী করে না), বস্ত্রখানি ছিন্ন, তাহাও বলিয়া দিলাম, কিন্তু তাহাতে সে আপত্তি করিল না। দৈবগত্যা সেই ভিখারীই ঘণ্টাখানেক পরে বাসায় ভিক্ষার্থ আসিলে ঘাটে তাহাকে পুরাতন বস্ত্র দিয়াছি বলিলে সে জবাব দিল, 'ভারী ত একখানা ছেঁড়া কাপড়!' এবং কাপড়খানি ফেরত দিতেও চাহিল!!

দেব-দর্শনান্তে ফিরিতে বেশ বেলা হইল; তীর্থকৃত্যের অনুরোধে নগ্নপদে গিয়াছিলাম, এক্ষণে উত্তপ্ত পাথরে পা দিতে পা পুড়িয়া যাইতে লাগিল; স্নানে যে তৃপ্তি ও শান্তি পাইয়াছিলাম, সেটুকু একদম নষ্ট হইয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া ঘাম মরিলে দোকানের সদ্যঃপ্রস্তুত গরম গরম জেলাপী জলযোগ হইল, পরে অন্নাহার। মধ্যাহ্নভোজনের পর শৌচে যাওয়ার একটা বদ অভ্যাস আছে, নরক ঘাঁটিয়া দুপুরে রৌদ্রে বহু নিম্নে অলকনন্দায় অর্দ্ধ-স্নান করিয়া তবে শুদ্ধ হইলাম।

বিশ্রামান্তে আত্মীয়গণকে কয়েকখানি চিঠি লিখিয়া নীচের তলায় ডাকে ফেলিলাম।

বৈকালে (পাণ্ডা বা তস্য গোমস্তার সঙ্গ না লইয়াই) সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম —সহর ও সঙ্গম-দর্শনের অভিপ্রায়ে। দুই মিনিটে 'বা' সহরের কয়েকখানি দোকান, * ধর্ম্মশালা, যাত্রীর ভিড় (অনেকগুলি বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিলাম) দেখা শেষ করিয়া দেবপ্রয়াগও ঐ ভাবে দেখিয়া সঙ্গমঘাটে সন্ধ্যাহ্নিক সমাধা করিয়া প্রাণ ভরিয়া সঙ্গমে তরঙ্গলীলা দেখিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণবালকগণ তীরশায়ী বড় বড় পাথরের চ্যাঙ্গড়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরণচিহ্ন, শঙ্করাচার্য্যের কমণ্ডলু রাখার চিহ্ন প্রভৃতি দেখাইয়া 'ভেট চড়াইতে' বলিল ও ভিক্ষাও চাহিল ; দুই বেলাই ভিখারীর সমান উৎপাত। যাহা হউক, আমরা একমনে একধ্যানে উত্তাল তরঙ্গের ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিলাম। একটি তাজ্জব ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম—কাঠের তক্তা অলকনন্দার তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইরা দ্রুতবেগে গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে। শুনিলাম, পাহাড়ে শাল-সেগুনের গাছ কাটিয়া তক্তা করিয়া এই ভাবে চালান দেওয়া হয়, ভাসিতে ভাসিতে হৃষীকেশে পৌঁছিলে সংগ্রহ করিবার বন্দোবস্ত আছে—এক পয়সাও নৌকা-ভাড়া লাগে না—চোরেও লয় না।

বাসায় ফিরিলে সন্ধ্যার পর বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল ; এ পথে এই প্রথম বৃষ্টি পাইলাম, ভাগ্যে আজ পথ চলা ছিল না, সুতরাং কোনও ক্ষতি হইল না। পথে এই প্রথম বড় তীর্থস্থান বলিয়া এখানে রাত্রিবাস স্থির করা গিয়াছিল, যেহেতু, তীর্থে ত্রিরাত্র, অন্ততঃ পক্ষে এক রাত্রি বাস করার নিয়ম। তবে এটা 'ভাবের ঘরে চুরি' হইল, কেন না, স্থানটি ত দেবপ্রয়াগ নহে, পরপারস্থিত 'বা' সহর—অর্থাৎ ৺কাশী নহে, ব্যাসকাশী!

পাণ্ডা-ঠাকুর সন্ধ্যার পর আসিয়া খাতায় আমাদের নাম-ধাম, বংশ-পরিচয় লিখিয়া লইলেন এবং পুরুষানুক্রমে তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে তীর্থগুরু করিব, এই একরারনামা খাতায় লেখাইয়া লইলেন। তাঁহাকে দোকানে ক্রীত ভোজ্যাদির মূল্য হিসাব করিয়া দেওয়া গেল ; এবং প্রণামী হিসাবে (নিজের ও সঙ্গের বিধবাটির পক্ষ হইতে) একুনে দশ টাকা দিলাম। তাহাতে তিনি বেশ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, তবে ৺বদরিকাধামে তাঁহাকে একটি 'মোকাম' বানাইয়া দিতে হইবে, এ কথা গাহিয়া রাখিলেন ; ইহা পাণ্ডাদিগের বাঁধা বুলি ; যখন তদুত্তরে বলিলাম, 'নিজেরই মোকাম নাই, ভাড়ার বাড়ীতে থাকি', তখন আশীর্ব্বাদ করিলেন, নিজস্ব ভদ্রাসন বাড়ী হইবে। ভবিষ্যতে দেখা যাইবে, 'অমোঘা ব্রাহ্মণাশিষঃ' ফলে কি না। প্রবীণ পাণ্ডাজী (কলিকাতায়, তথা হরিদ্বারে যে পাণ্ডা সঙ্গ লইয়াছিল, ইনি তাহার পিতা) আলাপ-আপ্যায়িতে অতি সজ্জন বলিয়া মনে হইল ; পরদিন প্রাতে সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দুর প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিলেন এবং ৺বদরিকাধামে আবার সাক্ষাৎকারের আশা দিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট একটি সুন্দর শ্লোক শিখিলাম—"নমস্কারপ্রিয়ঃ সূর্য্যো জলধারাপ্রিয়ঃ শিবঃ। অলঙ্কারপ্রিয়ো বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণো ভোজনপ্রিয়ঃ॥"

এখানে দোকানে গরম গরম 'পুরী'-তরকারী বানাইতেছে দেখিয়া পুত্র ও ভাগিনেয় স্ত্রীলোকদিগের রাত্রির পরিশ্রম বাঁচাইলেন ; আমি অতটা সাহস না করিয়া পেড়া দিয়া রাত্রির আহার সারিলাম। বরাবর যদি এই সাবধানতা অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে অচিরে পেটের অসুখটা হইত না। রাত্রিভোজনান্তে ঘরে গুমট বোধ হওয়াতে বারান্দায় শয়ন করা গেল, নিদ্রাভঙ্গ হইলেই অলকনন্দার গদ্গদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল—বড় মধুর, বড় শান্তিপ্রদ—(এই কুলু কুলু রব ৺রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত সারাপথই শুনিব) ; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে চন্দ্রালোকে বীচিমালার শোভাদর্শনে বঞ্চিত হইলাম। পর্ব্বতগাত্রে স্তরে স্তরে সাজান কাঠের বাড়ীগুলির আলোকশ্রেণী নক্ষত্রের মত ঝকমক করিতেছিল, সেই শোভা দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। কাঠের বাড়ীগুলিও সুন্দর, তবে দার্জ্জিলিং-সিমলার মত অমন পরিপাটী সুন্দর নহে।

দেবপ্রয়াগ একটা 'জংশান' জায়গা ; কেন না, এখান হইতে যেমন ৺কেদারবদরী যাইতে হয়, তেমনই গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীও যাইতে হয়। (দড়ীর পুলে গঙ্গা পার হইয়া অপর পার দিয়া বরাবর রাস্তা)। * উক্ত তীর্থদ্বয়ের অনেক পাণ্ডা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা ওদিকে যাইব কি না। [ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* দুই পারের বাজারেই যাত্রীদের ব্যবহার্য্য জুতা, ছাতা, কম্বল, অয়েল্-ক্লথ, লণ্ঠন প্রভৃতি পাওয়া যায়। ডাণ্ডী-ঝাম্পানও মিলে।

* পুত্র ও ভাগিনেয় সখ করিয়া দড়ীর পুল পার হইয়াছিলেন, এক এক পয়সা মাশুল লাগিয়াছিল।

খাট্টা ও খোট্টা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুরন্ত মেয়ে

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। নৈহাটী ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে ক'জন যাত্রী ট্রেণ হইতে নামিল। টিকিট-কালেক্টরকে টিকিট দিয়া বাহির হইয়া এক জন তরুণ-বয়স্ক যাত্রী কহিল,—পার্ব্বতী হালদার মশায়ের বাড়ীটা কোন্ দিকে?

এক জন যাত্রী কহিলেন,—কাঁঠালপাড়ায়। আমার সঙ্গে আসুন, আমার বাড়ী ঐ দিকেই।

কাঁঠালপাড়া শুনিয়া তরুণের মনটা একবার দুলিয়া উঠিল। বাঙ্গালার ষ্ট্রাটফোর্ড-অন্-অ্যাভন্ এই কাঁঠালপাড়া! তরুণ যুবা যাত্রীটির সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যাত্রীটি কহিলেন,—আমাদের জ্ঞাতি হন্। আঃ, কি কারবারই ফেঁদেছিলেন—সর্ব্বস্ব গেল! তা, আপনি তাঁর কাছে?—

তরুণ কহিল,—আমার বাবার সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছেলেবেলা থেকে। আমরা থাকি পাটনায়। আমি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছি।

যাত্রীটি কহিলেন,—পাটনা! সেখানকার উকীল সুধানাথ বাবুকে—

তরুণ কহিল,—আমি তাঁর বড় ছেলে শচীনাথ। আমার বাবাকে আপনি জানেন?

যাত্রীটি কহিলেন,—জানি বৈ কি! সুধানাথ বাবুও আমাকে বিলক্ষণ চেনেন। কতবার এখানে এসেছেন। পার্ব্বতী বাবু আমার কাকা হন—জ্ঞাতি-সম্পর্কে—আলাদা থাকলেও আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমার নাম লালবেহারী।

মাথার উপর দীপ্ত সূর্য্য—পথে ধূলাও তেমনি! বড় বড় গাছের ছায়ায় পথ চলিতে তেমন কষ্ট হইল না। খানিক আসিয়া জীর্ণ একটা বাড়ী দেখাইয়া লালবেহারী কহিল,—এই বাড়ী। তা হ'লে আসি। যদি থাকেন, তা হ'লে সন্ধ্যাবেলা দেখাও হবে'খন। বলিয়া লালবেহারী বিদায় লইল।

শচীনাথ গিয়া জীর্ণ গৃহের দ্বারে কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে কে বলিল—কে?

শচীনাথ কহিল,—দরজাটা খুলে দাও······

বাড়ীর পাশে খানিকটা পড়ো জমি, সেখানে রীতিমত জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দুটো পল্লীগাভী তৃণ ভোজন করিতেছে; জামগাছের তলায় দড়ি-বাঁধা একটা ছাগল শুইয়া আছে।

এক বৃদ্ধ বাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিলে শচীনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল; কহিল,—পার্ব্বতী বাবু বাড়ী আছেন?

বৃদ্ধ কহিল,—না, তিনি হুগলি গেছেন।

শচীনাথ প্রমাদ গণিল; কহিল,—কখন্ ফিরবেন?

বৃদ্ধ কহিল,—মা-ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করি। বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

শচীনাথ দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিল। ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে দু'টা পায়রা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বুঝি, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের প্রখর তেজ হইতে একটু রক্ষা পাইবার আশায়! বৃদ্ধ তখনই ফিরিয়া আসিল; আসিয়া কহিল,—সন্ধ্যার পরে। তা আপনি কোথা থেকে আসছেন?

অদূরে জানালার অন্তরালে একটা শাড়ীর পাড় দেখা গেল। দেখিয়া শচীনাথ কি ভাবিল; পরে কহিল,—আপাততঃ কলকাতা থেকে আসছি—কিন্তু তা বললে তো বুঝতে পারবেন না—বলো গে, আমি পাটনা থেকে আসছি। কলকাতায় আমার মামার বাড়ী—সেখানে এসেই উঠেছি। এখন সেখান থেকে—

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া

রোয়াকে দাঁড়াইলেন; কহিলেন,—পাটনা থেকে আসছো বাবা? তুমি কি হাবুল?

শচীনাথ রোয়াকে উঠিল, এবং মহিলার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

তার মাথায় করস্পর্শ করিয়া মহিলা কহিলেন,—উনি বলছিলেন, তোমার বাবা পাটনা থেকে লিখেছেন, তুমি এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করবে। তা, কবে এলে?…সেই ছেলেবেলায় দেখেছি এতটুকুন্‌টি!

শচীনাথ কহিল,—পাটনা থেকে এসেছি সোমবার। ছোট মামার শরীর খারাপ ছিল ব'লে ক'দিন আসতে পারি নি। বাবা তাড়া দিয়েছেন। আজই তাঁর চিঠি পেয়েছি। তাই আর দেরী না ক'রে আজই চ'লে এলুম।

মহিলা কহিলেন,—এসো বাবা, ঘরের মধ্যে এসো।

শচীনাথকে সঙ্গে করিয়া মহিলা দোতলায় শয়ন-কক্ষে আসিলেন। সে-ঘরে বুকে ভর দিয়া মাদুরে শুইয়া এক ত্রয়োদশী বালিকা একখানা সচিত্র মাসিক-পত্র পড়িতেছিল। মহিলা কহিলেন,—ওঠ্ দিকিনি খেঁদি তোর শচীদা এসেছে, ওঁর কাছে শুনছিলি না?

মেয়ে খেঁদি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। মা কহিলেন,—নমস্কার কর্।

খেঁদি শচীনাথের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল, প্রণামান্তে বইখানা হাতে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন,—বসো বাবা। উনি একটা কি কাযের সন্ধানে হুগলি গেছেন, সন্ধ্যা-নাগাদ ফিরবেন।

শচীনাথ বিছানার উপর বসিল; বসিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিল। দেওয়ালে বহুবাজার আর্ট ষ্টুডিওর ক'খানা ছবি ঝুলিতেছে—ফ্রেমের সোনালি কাজ চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে—কতকালের ছবি, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য! ঘরের আসবাব দামী, তবে বহুকালের পুরানো। কাঠের ইস্ত্রি-পালিশ কবে মুছিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের পেণ্টিং ওঠা, চুণ-বালি খসা, যেন এক সৌখীন ব্যক্তি বহুকাল রোগে ভুগিয়া, কঙ্কাল-সার ম্লান মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে!

শচীনাথ সংক্ষেপে কহিল—ব্যবসায় সব গেছে?

আলমারিতে পিঠ ঠাসিয়া গৃহিণী মেঝেয় বসিলেন, কহিলেন,—সর্ব্বস্ব। এইটুকুন্ আছে। আমার শ্বশুর এ ভিটে দেবোত্তর ক'রে গেছলেন, তাই এখানে আশ্রয় মিলেছে। দেনার দায়ে ইনসলভেণ্টো নিইয়ে ছেড়েছে।

শচীনাথ কহিল,—অথচ ওঁর কারবার কি রকম চলছিল! বেনারসী কাপড়ের পত্তন করেছিলেন না?

মহিলা কহিলেন,—করেছিলেন তো। তা, যত চেনাশোনা লোককে ধারে কাপড় বেচলেন—কেউ একটি পয়সা উপুড় হাত করলে না। তার পর কলে আগুন লাগলো—আর এক বোম্বাইওলা পিছনে লেগে যত পাওনাদারকে ওস্কাতে সুরু করলে।—গৃহিণী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

শচীনাথ কহিল,—আমার সাধ, কাপড়ের ব্যবসা করা। বাবা তাই বললেন, তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করো গে; তিনি যদি মত করেন আর তাঁকে যদি সঙ্গে নিতে পারো, তা হ'লেই আমি পয়সা দেবো।

গৃহিণী বুঝিলেন, এ প্রস্তাবের মধ্যে বন্ধুর জন্য বন্ধুর কতখানি মমতা, কত দরদ, কি সহানুভূতি! হাতে পয়সা তুলিয়া দিলে স্বামী তাহা লইবেন না। স্বামীর তেজ কতখানি, তাহা তাঁর অজানা নহে। যত বড় আপন-জন হউক্, যত দরদী বন্ধুই হউক্—পয়সার সাহায্য কাহারো কাছ হইতে নহে, নিজের হাত-পা থাকিতে—খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য থাকিতে! তিনি কহিলেন,—বেশ তো, বাবা! উনি আসুন, কথাবার্ত্তা কও, তুমি ছেলে—আমি নয় পেটেই ধরি নি—তা, একটু কিছু খাও বাবা!

শচীনাথ কহিল,—না কাকিমা, খেতে পারবো না।

গৃহিণী কহিলেন,—কিছু না হয় তো ডাবের জল? ডাব পাড়ানো আছে। না, তোমরা একালের ছেলে, চা চাই? সে ব্যবস্থাও যে গরীব কাকীর নেই, তা ভেবো না। কথাটা বলিয়া তিনি হাসিলেন।

শচীনাথ কহিল,—একটু চা-ই নয় দেবেন, আমি একটু ঘুরে আসি। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমবাবুর বাড়ী। তীর্থস্থান! এলুম যখন, সে তীর্থ একবার চোখে দেখে আসি।

গৃহিণী সখেদে কহিলেন,—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আমরা তো দেখেছি, রথে কি ঘটা হতো! নতুন বৌ-মানুষ, তখন সবে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছি! কতই বয়স? দশ-এগারো বছর। তা, কি রকম মেলা বসতো—কি জাঁক-জমক! এখন এমনি প'ড়ে আছে! দিল্লী, আগ্রা দেখেছো তো? ঠিক তেমনি দশা!

শচীনাথ কহিল,—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবো'খন। কিন্তু বেশী কিছু খাওয়ার আয়োজন করবেন না, কাকিমা! শুধু এক পেয়ালা চা—ব্যস্।

হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

শচীনাথ চলিয়া গেল। গৃহিণী ডাকিলেন,—খেঁদি!

কোন উত্তর নাই। আবার তিনি ডাকিলেন,—শুন্‌তে পাচ্ছিস?

তবু কোনো জবাব নাই—যেন কে কাহাকে ডাকিতেছে!

গৃহিণী উঠিলেন, উঠিয়া মেয়ের কাছে গেলেন। মেয়ে তখন মাসিকপত্রের মধ্যে এমন তন্ময় যে, সাম্‌নে বাজ পড়িলেও বুঝি তা খেয়ালে আসিবে না!

মা কহিলেন,—সকলি অনাছিষ্টি! নবেল, নবেল, নবেল! চব্বিশঘণ্টা নবেল পড়া! সংসারের কুটোটা নাড়বি নে? এখন কি পোষায়! যখন অবস্থা ভালো ছিল, তখন সব সাজতো! এখন ও নবাবী সাজে না।

মেয়ের তবু ভ্রূক্ষেপ নাই! হাসি-মুখে বইয়ের পাতা উল্টাইল—গল্পের নায়িকা তখন নায়ককে লইয়া ভারী এক মজা বাধাইয়া দিয়াছে! মা উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন,—খেঁদি!

এ আহ্বান খেঁদির কাণে গেল। খেঁদি ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল,—কি?

মা কহিলেন,—কথা শোনো! যেন মারতে উঠলেন! শোন্, বই রাখ্, রেখে ষ্টোভটা জ্বাল্, জ্বেলে কেটলিতে দু কাপ জল দে। তোর হাবুদা এসেছে—চা খাবে। আমার সেই বাতের ব্যথা চাগিয়েছে, অমাবস্যার কোটাল পড়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো—তুই চা তৈরী করবি।

খেঁদি সঝঙ্কারে কহিল,—আমি পারবো না।—মেয়ের কথা শুনিয়া মা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাঠে-কাঠে

শচীনাথ এক ঘণ্টা পরেই ফিরিল, ফিরিয়া অসঙ্কোচে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। কক্ষান্তরে মা ও মেয়েতে তখন তর্ক চলিয়াছে। মা বলিলেন,—অত বড় ধাড়ী মেয়ে, কায করতে বললে যেন মারতে আসে! রকম ভাখো না—

মেয়ে সগর্জ্জনে কহিল—কি করতে হবে?

মা কহিলেন—ময়দাটা শুধু মেখে দিবি—আমি লুচি বেলে নেবো—

মেয়ে কহিল—আমি পারবো না। কখনো মেখেছি যে বল্‌ছো?

মা কহিলেন—কখনো মাখোনি ব'লে আজো মাখবে না? কখনো এমন দশা তো ছিল না—থাকলে বলতুম না!

মেয়ে কহিল—গোবরাকে ডাকো না!

মা কহিলেন—গোবরা তো মাইনের চাকর নয় মা—তবু রেয়ৎ—মান্যি করে; তার উপর যা করে, ঢের! খড় কাটছে, গরুর জাব দিচ্ছে, বাজার ক'রে আনছে, ওর মেয়ে এসে বাসন মেজে দিয়ে যাচ্ছে—ওর উপর তো ফরমাশ চলে না মা! শেষের দিকটায় মা'র কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল।

মেয়ে কোনো জবাব দিল না। কথাগুলা শুনিয়া শচীনাথ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় দুম্‌দুম্ শব্দে মেয়ে খেঁদি আসিয়া সাম্‌নে হাজির! তার হাতে একটা বাঁধানো বই। শচীনাথ ভাবিল, সে মাসিক-পত্র পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, এ আবার এক নূতন পর্ব্ব। তার ইচ্ছা হইল, বইখানা টানিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করে, আর তীব্র রোষে বলে, মা'র মুখে চোপা করো—এই তোমার বিদ্যা! এই বিদ্যা লইয়া নভেল পড়ো! কিন্তু প্রথম দিন—একেবারে অপরিচিত। তবু রাগে তার গা গশ্‌গশ্ করিয়া উঠিল! খেঁদি তার সামনে দিয়া একতলায় নামিয়া গেল, শচীনাথ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পর সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল,—সামনে লুচির সরঞ্জাম—কাকিমা বঁটিতে আলু কুটিতেছেন, একটা ষ্টোভ জ্বলিতেছে—ষ্টোভের উপর কড়ায় তরকারী রান্না হইতেছে। শচীনাথ কহিল—এ সব কি করছেন্ কাকিমা? বললুম তো—

বাধা দিয়া কাকিমা কহিলেন—বেলা প'ড়ে গেছে বাবা, জলটল খাবার সময়

শচীনাথ কহিল—কিন্তু আমি জলখাবার খাই না, কাকিমা—কলকাতায় এসে এমন হয়েছে যে, ক্ষিদেই হয় না। ভাত যা খাই, তা শুধু নিয়ম-রক্ষার জন্য!

কাকিমা কহিলেন,—খুব ঘুরে বেড়াচ্ছ বুঝি?

শচীনাথ কহিল—না। সেখানে তো ছোটমামার অসুখ হয়েছিল, বাড়ীতে চুপটি ক'রে ব'সে থাকতুম। তা এখন সেরেছে, কাল পথ্য করেছে। চা হলো?

কাকিমা কহিলেন,—এই যে বাবা, এখনি ক'রে দিচ্ছি। তুমি ছিলে না কি না,—

শচীনাথ কহিল,—আপনি উঠুন। কেটলি কোথায়? আমি ক'রে নিচ্ছি।

কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—পাগল ছেলের কথা শোনো।

শচীনাথ কহিল—না কাকিমা, আমি সব পারি। আমাদের যে প্রায় চড়িভাতি হয় সেখানে। তা আমি রান্নার ভার নি—মাংস যা রাঁধি কাকিমা, একেবারে ফাষ্ট ক্লাশ! আর আলুর দম, ছোলার ডাল, চাটনি এ সবও রাঁধতে জানি।

কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, এক দিন খাইয়ো তখন রেঁধে।

হাসিয়া শচীনাথ কহিল—বেশ, খাওয়াবো!

কাকিমা উঠিয়া গেলেন, শচীনাথ বিছানার উপর বসিল। ভাবিল, কাকিমা নিশ্চয়ই মেয়ের সন্ধানে গিয়াছেন—বুঝাইয়া-সুঝাইয়া যদি আনিতে পারেন!

খেঁদি আসিল না, কাকিমা একা ফিরিলেন; তাঁর মুখের ভাব প্রসন্ন নহে! শচীনাথ মর্ম্ম বুঝিল। সে কহিল—তরকারী নামিয়ে দি—হয়ে গেছে। বলিয়া সে কাকিমার কথার প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া কড়ার দুই আংটার মধ্যে খন্তি লাগাইয়া তাহার সাহায্যে কড়া নামাইল। কাকিমা কহিলেন—পাগল ছেলে কি করে, ছাখো—

পাগল ছেলে কি করিবে, তাহাও দেখাইয়া দিল। ঘরের কোণে জল-ভরা কেটলি ছিল। সেটা লইয়া ষ্টোভে চাপাইয়া দিয়া সে কহিল—দুধ? এই যে। আচ্ছা, লুচি খেতে হবে? দেখুন কাকিমা, আমি করতে পারি কিনা। বলিয়া সে ময়দা ঢালিয়া তাহাতে ঘী দিল; তার পর ধীয়ে ময়দাটা নাড়িয়া মিশাইয়া জল ঢালিল; ঢালিয়া ময়দা মাখিতে লাগিল।

কাকিমা অবাক্! তিনি বলিলেন,—তোমার চায়ের জল হয়েছে, বাবা!

—ইস্, তাই তো! বলিয়া শচীনাথ কেটলি নামাইল ও তাহাতে চা ফেলিয়া কেটলিটা চাপা দিল। কাকিমা ততক্ষণে ময়দায় হাত দিয়াছেন। শচীনাথ কহিল—আচ্ছা কাকিমা, আপনি বেথে দিন, তার পর আমি লুচি বেলবো, আর আপনি ভাজবেন।

কাকিমা কহিলেন—বেশ বাবা, তাই হবে।

কাকিমার মন বলিতেছিল, এই নির্জ্জন অন্ধকার গৃহে এত দিন ধরিয়া যে দুঃখ-হাহাকারের বেদনা জমাট বাঁধিয়াছিল, আজ এ ছেলেটি কোথা হইতে কি শুভ্র হাসির হাওয়া সেখানে বহিয়া আনিল—এ হাসির হাওয়ায় বেদনার সে গুমটভাব নিমেষে যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! এবং বহুদিন পরে তাঁর প্রাণ যেন আলো পাইয়া জুড়াইয়া বাঁচিয়াছে! মনে আবার অন্ধকার আসিয়া উদয় হইল—ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা—এ দশায় পড়িয়া আজও অমন তেজে মট্মট্ করে কি বলিয়া? ওরে, ভগবান যে ধূলার মধ্যে গুঁজিয়া ধরিয়াছেন—এখনো তেজ! এর পরে কি যে হইবে—তা ভাবিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া আছেন!

আহারাদি সারিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আশ্বিনের বেলা—ছোট হইয়া আসিয়াছে। শচীনাথ কহিল,—আজ আসি, কাকিমা। কাকাবাবুকে বলবেন, কাল আবার আস্‌বো। আজ দিদিমাকে ব'লে আসিনি কি না—তাই—

যে হাসি, যে খোলা মন, যে উদার হৃদয়ের পরিচয় কাকিমা এইমাত্র পাইয়াছেন, দুর্দ্দিনের কত বেদনা যে তাহাতে ভুলিয়া থাকা যায়! তাহা ভাবিয়া কাকিমা কহিলেন—দু'দিন কাকিমার কাছে এসে থাকতে পারো না, বাবা? বলতে ভয় হয়—যে কষ্টে আছি···

শচীনাথ কহিল—আবার ঐ কথা! মা আর কাকী কি ভিন্ন! স্নেহের কাছে পয়সার কি দাম, বলুন তো কাকিমা?

কাকিমা কহিলেন—তা তো ঠিক কথা, বাবা! তবু—

শচীনাথ কহিল—আবার তবু কি! বেশ, কাল আমি আসবো। সকালেই আসবো, আর এসে দু'বেলা এখানে খাবো। আমার নেমন্তন্ন রইলো কাল—

কাকিমা কহিলেন—এ যে আমার পরম সৌভাগ্য, বাবা!

শচীনাথ কাকিমাকে প্রণাম করিল, তার পর একটু কৌতুকের অভিপ্রায়ে কহিল—কৈ, খেঁদি কোথায়?

কাকিমা ডাকিলেন,—খেঁদি!

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খেঁদি যেন এ-মুল্লুকেই নাই! কাকিমা লজ্জায় অপ্রতিভভাবে কহিলেন—বুঝি ঐ উমাদের বাড়ী গেছে।

শচীনাথ কহিল—না, ওধারকার ঘরে কাকে যেন ঢুকতে দেখলুম একটু আগে—বলিয়া শচীনাথ সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরে ঢুকিয়া শচীনাথ কহিল—এই যে খেঁদি, তুমি এবারে এম-এ এক্‌জামিন দেবে বুঝি, বই নিয়ে ভারী মত্ত, দেখছি।

খেঁদি মুখ তুলিয়া চাহিল—শচীনাথের চোখে বিদ্রূপের রেখা ছুরির ফলার মত ঝিক্‌ঝিক্‌ করিয়া উঠিল! খেঁদি বক্রদৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। শচীনাথ কহিল—আজ তা হ'লে চললুম, শ্রীমতী বিদ্যাবতী দেবী মশায়। ভালো ক'রে পড়া-শোনা করো—কাল এসে এক্‌জামিন করবো, বিদ্যা কেমন হলো।

খেঁদি অবাক্! গায়ে পড়িয়া এ-ভাবে বিদ্রূপ করিতে আসে, এমন অসভ্য লোক! তার মনের মধ্যে রাগের উষ্ণ প্রস্রবণ টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল—চোখ দিয়া তার ঝাঁজও ফুটিয়া বাহির হইল; কিন্তু মুখে সে কিছু বলিতে পারিল না।

শচীনাথ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আগুন

পরদিন চাটগাঁ-মেলে চড়িয়া বেলা আটটার পরই শচীনাথ আসিয়া হাজির। তার হাতে একটা ব্যাগ। ব্যাগে দুখানা কাপড়, গেঞ্জি, তোয়ালে, সাবান, গিলেট-খুরের বাক্স প্রভৃতি। সে আসিয়া দেখে, বাড়ীটায় কোন সাড়া নাই। সে দোতলায় উঠিল, উঠিয়া ডাকিল,—কাকিমা—

ভিতরে কাকিমার স্বর শুনা গেল,—শচী এসেছে—ওরে অ খেঁদি, ওঠ্‌ একবার। খেঁদি আসিল না। তখন শচীনাথ নিজেই ঘরে ঢুকিল, ঢুকিয়া যা দেখিল, তাহাতে তার সব আনন্দ উবিয়া গেল। পার্ব্বতী হালদার একটা বালাপোশ মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া আছেন, তাঁর পাশে কাকিমাও অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে বিছানায় বসিয়া। আর খেঁদি খোলা জানলার ধারে বসিয়া একটা মস্ত মাসিকপত্র পড়িতেছে। কাকিমা কহিলেন,—এসো বাবা—

শচীনাথ ব্যাগটা রাখিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল, কহিল, —ব্যাপার কি কাকিমা?

কাকিমা বলিলেন,—দ্যাখো না গেরো! তোমার কাকা-বাবু কাল রাতে জ্বর নিয়ে হুগলি থেকে ফিরেছেন, গায়ে বেদনা, মাথায় খুব যাতনা—ঐ দ্যাখো না, বেঁহুশের মত রয়েছেন।

শচীনাথ উঠিল, উঠিয়া পার্ব্বতী হালদারের কপালে হাত রাখিয়া দেখিল, কপাল পুড়িয়া যাইতেছে। সে কহিল,—কত জ্বর?

কাকিমা কহিলেন,—তা তো জানি না বাবা, ঐ বুড়ো এক রেয়ৎ আছে, মাধব, তাকে পাঠিয়েছি ডাক্তার ডাকতে। কালিদাস। হোমিওপ্যাথি করে। তা এখনো আসেনি।

শচীনাথ কহিল,—গায়ে বেদনা বললেন না? এ ইনফ্লুয়েঞ্জা —কলকাতায় খুব হচ্ছে, দেখ্‌ছি তো এসে।

কাকিমা কহিলেন,—অদেষ্ট! হুগলির সারদা বড়াল এক কাপড়ের দোকান খুলেছে। ওঁকে বলেছিল, সে দোকান দেখতে হবে, মাসে একশো টাকা ক'রে দেবে। পরশু থেকে বেরুবার কথা। আর ইনি তো জ্বর ক'রে বসলেন!

শচীনাথ কহিল—এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার নেই?

কাকিমা কহিলেন,—আছে। দূরে আছে। কে ডাকে? তা ছাড়া কালিদাস ঘরের ছেলের মতন, ভিজিট নেয় না।

শচীনাথ কহিল,—আচ্ছা, আমি দেখছি। আমি কোথায় এলুম, গঙ্গায় একটু সাঁতার কাটবো, কাকাবাবুর সঙ্গে কত কথা ছিল—

কাকিমা কহিলেন,—তা তো বটে বাবা, তুমি মুখ ফুটে বললে, কত আহ্লাদ হলো, আমার। দু'চারখানা তরকারি করবো। কালই ব'লে পাঠালুম, খিড়কির পুকুরে মাছ ধরাবো ব'লে।

শচীনাথ কহিল,—তার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, কাকিমা। খাওয়া তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি সন্ধান ক'রে দেখি, এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার পাই কি না। সে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল!

কাকিমা কহিলেন,—কালিদাস আসছে।

শচীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তা বটে! কিন্তু হোমিওপ্যাথি কি আবার একটা জিনিষ? আমার তো হাসি পায়। তবে ভাবনা নেই, দু'তিন দিন ভোগ আছে। ভুগতে হবে।

শচীনাথ খেঁদির পানে চকিতের জন্য চাহিল। এ সব কথা তার কাণেও যাইতেছে না—যেন ভিন্ন জগতের জীব! নিজের মনে মাসিকপত্র খুলিয়া তন্ময় হইয়া আছে! শচীনাথের বিরক্তি ধরিল! বাপের এই অসুখ, মাথায় জলপটী দে, তা না, নভেল পড়িতেই মত্ত! ইচ্ছা হইল, বইখানা টানিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু—

কাকিমা কহিলেন,—আমারো বাবা, এই দ্যাখো না, ডান হাতে বাত এমন চাগিয়েছে।

শচীনাথ কহিল,—আমি আসছি এখনি। বলিয়াই সে চক্ষুর পলকে বাহির হইয়া গেল।

মা ডাকিলেন, খেঁদি, শুনছিস্?

খেঁদি কহিল, হ্যাঁ। বই হইতে মুখ সে তুলিলও না।

মা কহিলেন,—লোকটা এলো, খাবে বলেছে, এত ক'রে বলছি, তোর পাঁচু কাকার বাড়ী যা, সদু পিসীকে ডেকে আন্, বল্ গে যা, মা তোমাকে একবার ডেকেছে। কে যেন কাহাকে বলিল! মা'র কথা মেয়ের কাণেও গেল না। মেয়ে বইয়ের পাতা উল্টাইল। মা ধমক দিলেন,—শুনতে পাচ্ছিস্ হতভাগা মেয়ে? একটা মান-ইজ্জৎ অবধি থাকবে না তোর জন্যে? ওঠ্, বলছি।

খেঁদি ঝঙ্কার তুলিল,—কি? বাবা! বাবা! একটু বই নিয়ে বসবার যো নেই। লক্ষ ফরমাজ অমনি—

মা বলিলেন,—ওঃ, খেটে খেটে পায়ের পাতা খসে গেল! বুড়ো মেয়ে! একটু আক্কেল অবধি নেই!

খেঁদি উঠিল, কহিল—কি বলতে হবে, আজ্ঞা করো—

মা বলিলেন—বাড়ীতে এই অসুখ, একটা ভাবনা-চিন্তাও নেই!

খেঁদি কহিল,—আমি তো ডাক্তার নই!

মা বলিলেন,—হাতটা নাড়তে পারছি না, তার উপর এঁকে ফেলে নড়াও যায় না। তাই বলছি, দয়া হবে কি?

খেঁদি কহিল,—কি! বলো না, কি করতে হবে?

মা বলিলেন,—ও বাড়ী থেকে তোর সদু পিসীমাকে একবার ডেকে আনবি! তাকে বল্‌বো, সে যদি দুটি রেঁধে দেয়!

খেঁদি উঠিয়া বিরস মুখে সদু পিসীকে ডাকিতে গেল।

মা উঠিলেন, উঠিয়া জানালার দিকে চাহিলেন,—কালিদাস ডাক্তার আসিতেছে! মা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, —এসো বাবা—ওপরে—

কালিদাস উপরে আসিল, আসিয়া রোগী দেখিল। দেখিয়া কহিল,—ইনফ্লুয়েঞ্জা। রোদ লাগিয়েছিলেন, বুঝি?

মা কহিলেন,—হ্যাঁ। কাল হুগলি গেছলেন। সেখান থেকে জ্বর-গায়ে ফিরেছেন রাত্রে।

কালিদাস বুক পরীক্ষা করিল; টেম্পারেচার লইল, জ্বর ১০৩। কালিদাস কহিল,—মাধব এলো? আমার ওষুধের বাক্স নিয়ে আসছে। ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। খাবেন বার্লি, অল্প দুধ সেই সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন। আজ শুধু এই।

মা কহিলেন—আলু সেদ্ধ-টেদ্ধ দিতে পারি?

কালিদাস কহিল—না। শক্ত জিনিষটা জ্বরের উপর দেবেন না। মাথায় একটা জলপটী দিলে ভালো হয়।

মা কহিলেন,—এই জ্বরে মাথায় জল দেবে? বুকে সর্দ্দি-টর্দ্দি বসে যদি?

কালিদাস কহিল,—সে ভয় নেই।

এমন সময় শচীনাথ ফিরিয়া আসিল, তার হাতে ওষুধের ছোট বাক্স। শচীনাথ কহিল,—ইনিই ডাক্তারবাবু?

কাকিমা কহিলেন,—হ্যাঁ, বাবা।

শচীনাথ কহিল,—কেমন দেখলেন?

কালিদাস কহিল,—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। একোনাইট দিয়ে যাচ্ছি, এতেই কায হবে।

শচীনাথ পকেট হইতে ছোট একটা শিশি বাহির করিল, বেঙ্গল কেমিক্যালের ও-ডু-কলোঁ। সে কহিল,—মাথায় অডিকলোন দেওয়া চলে না? মাথায় অমন যাতনা! জ্বর কত দেখলেন?

কালিদাস কহিল,—Hundred and three. তা অডি-কলোনের পটী দিতে পারেন।

শচীনাথ কহিল—আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছিলুম। হোমিওপ্যাথি ওষুধ! ভারী নিষ্ঠা কি না! কি জানি, গন্ধে যদি কোনো কায না হয়! বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

কালিদাস কহিল—ওটা বাজে কথা। আমরা তো ব্যবস্থা দি অডিকলোনের—ওষুধ তাতে কোথাও বাধে না।

রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া আরো তিন বারের ঔষধ দিয়া ডাক্তার কালিদাস বিদায় লইল।

শচীনাথ গায়ের জামা খুলিয়া আল্‌নায় রাখিয়া কহিল,—কাকিমা, আপনার পুকুরের জল কেমন?

কাকিমা কহিলেন,—কেন বাবা?

শচীনাথ কহিল,—নাইবো কি না।

কাকিমা কহিলেন,—কেন, গঙ্গায়?

শচীনাথ কহিল,—আবার অত দূরে কে যায়!

কাকিমা কহিলেন,—জল ভালো। তবে পুকুরে চান করা অভ্যাস নেই তোমার, শেষে যদি ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া হয়!

শচীনাথ কহিল,—কিছু হবে না। আমরা সেখানে যে ডানপিটেমি ক'রে বেড়াই! রোগ? মা বলে, পাটনা সহরটার ফশল লোপ পেয়ে গেল তোর জালায়! তা যাক্, একটি কথা আছে, কাকিমা।

কাকিমা কহিলেন,—কি কথা বাবা?

শচীনাথ কহিল,—আপনার তো হাতে ব্যথা দেখ্‌ছি, অথচ আমাদের ডান হাতগুলি তো চুপচাপ থাকবে না!

কাকিমার মুখে চিন্তার রেখা ফুটিল। শচীনাথ তাহা লক্ষ্য করিল, তাই সে তাড়াতাড়ি বলিল,—আমার হাতের রান্নাটা নয় এক দিন খেলেনই,—ডাল-ঝোল যে রাঁধতে পারি না, এমন ভাববেন না!

কাকিমা চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—ষাট, ষাট! কি দুঃখে রাঁধবে তুমি, বাবা? তোমার হাতে খাবো বৈ কি। ম'রে গেলে পিণ্ডি দিয়ো, হাসি-মুখে খাবো,—আমি তো মরিনি, বাবা!

শচীনাথ কহিল—কিন্তু কাকাবাবুকে একলা রেখে আপনার রান্নার কাযে যাওয়া হবে না। তা হ'লে আমি খাবো না কখ্‌খনো—

কাকিমা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—বেশ, বাবা। রাঁধবার লোক আসছে। তবে বড় আশা করেছিলুম, নিজের হাতে দুটি রেঁধে খাওয়াবো,—তা, ভগবান্ সে সুখটুকুও অদৃষ্টে দিলেন না!

শচীনাথ কহিল,—তাই বুঝি! তবেই আমায় খুব চিনে-ছেন! আমি এখন ক'দিন এখানে শেকড় গেড়ে থাকি, দেখুন। কাকাবাবু সারুন, পথ্য পান—তার পর আমাদের কথাবার্ত্তা পাকা হোক্—

কাকিমা কহিলেন,—তাই না কি! আমার এমন ভাগ্য হবে, বাবা!

শচীনাথ কহিল,—বেশ, রান্না তো হবে। কিন্তু তার যোগাড় তো নেই। কোন্ দিকে কি আছে, আমায় বলুন,—তরকারী-টরকারী—

কাকিমা কহিলেন,—ব্যস্ত-বাগীশ ছেলে! সে কিছু করতে হবে না। খেঁদি আছে, ক'রে দেবে!

শচীনাথ একবার বাহিরের দালানের দিকে চাহিল, খেঁদি আসিতেছিল,—শচীনাথ তাহাকে শুনাইবার অভিপ্রায়েই একটু জোর গলায় কহিল,—খেঁদি! আপনার ঐ বিদ্যাবতী মেয়েটি! তবেই হয়েছে! ও যদি রান্নার জোগাড় দেবে তো পড়বে কখন্?

খেঁদি সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকিল। শচীনাথের কথাগুলা তার কাণে বেশ পরিষ্কার প্রবেশ করিয়াছিল, রাগে মুখখানা ঘুরাইয়া সে শচীকে লক্ষ্য করিল; কোনো কথা বলিল না, গুম্ হইয়া বইখানা টানিয়া পুরানো যায়গায় বসিল। শচীনাথ দেখিল, দেখিয়া হাসিল, তার পর কহিল,—কি বই ওটা? দেখি, বলিয়া দ্বিধামাত্র না করিয়া বইখানা খেঁদির হাত হইতে টানিয়া লইল। খেঁদি অবাক্! কাকিমারও চক্ষু পলকহীন। বইখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শচীনাথ কহিল, —'মাসিক বসুমতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। এ পুরোনো! তা এ নাম কার গা কাকিমা? শ্রীমতী মাধুরী দেবী? বইয়ের ললাট-পটে মেয়েলি হাতের বাঁকা অক্ষরে নাম লেখা ছিল, শ্রীমতী মাধুরী দেবী।

কাকিমা কহিলেন,—খেঁদির নাম।

শচীনাথ খেঁদির পানে চাহিল, খেঁদি রুক্ষ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল; শচীনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—ওঃ, ঐ তো মেয়ে, খেঁদিই ওর ঠিক নাম। উনি আবার মাধুরী!—তা এ সব বই মেয়েকে পড়তে দেন কেন? এতে যত সব লক্ষ্মীছাড়া গল্প আর উপন্যাস আছে,—এ-সব এ বয়সে পড়া ঠিক নয়।

কাকিমা কহিলেন,—বারণ করি, শোনে না! শুধু এই? কতগুলো মাসিক কাগজ নেয়, তা তো জানো না! এ সব বড়দের কাগজ, তা ছাড়া মৌচাক, যাদুঘর, পাততাড়ি—কিছুই বাদ যায় না! ওঁকে বলি এত! উনি বলেন,—আহা, নিক্, নিক্! যদি খুসী থাকে!

শচীনাথ কহিল—ঐ আদর দিয়েই কাকাবাবু দেখছি মেয়েটার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছেন! গুণের নিধি মেয়ে! বাপের এই অসুখ, মেয়ে ব'সে নভেল পড়ছে! ওর হাতে আপনি দেবেন রান্নার জোগাড় দেবার ভার!

কাকিমা একটু দুঃখিত হইলেন। মেয়ে বদ, তা তিনি জানেন; তবু এমন বদ যে, এক জন বাহিরের লোক দু দণ্ড আসিয়াই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল! স্বামীর উপর অভিমান হইল। তিনি কি বলিতে কসুর করেন? এর পর বিবাহ হইলে মেয়ের নিন্দা যে তাঁহাকেই শুনিতে হইবে! শচী যেন আপন-জন—ঠিক কথাই বলিয়াছে—ছেলেটি স্পষ্ট কথা কয় বেশ!

খেঁদি নিজের মনে গুমরিতেছিল—যেন হাউয়ের পলিতার

ডগায় জলন্ত দিয়াশলাই ছোঁয়ানো হইয়াছে—একটু ধরিলে হয়! শোঁ করিয়া অমনি—

দেরী হইল না! শচীনাথ কহিল,—ব'সে কেন? যাও, রান্নার জোগাড় দ্যাখো গে। আমি একটা বিদেশী লোক এসেছি, খেতে দিতে হবে—হুঁশ থাকে যেন।

সুযোগ পাইতেই খেঁদি ফোঁশ, করিয়া উঠিল। সে কহিল,—বয়ে গেছে! পশ্চিমী খোট্টা একটা খেলে না খেলে, আমার তো ভারী ইয়ে—বলিয়া সে শোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মা লজ্জায় কাঠ! শচীনাথ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাইজের প্রলোভন

বেলা প্রায় দশটা। শচীনাথ পার্ব্বতী হালদারের টেম্পারেচার লইল, জর কমিয়াছে। সে তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় অডিকলোনের পটী দিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। জোর করিয়া কাকিমাকে সে পাঠাইয়াছিল—মুখ-হাত ধুইয়া পূজা-আহ্নিক সারিয়া আসিবার জন্য। তিনি ঘরে ফিরিলে শচীনাথ কহিল,—আপনার পূজা আহ্নিক সারা হলো?

কাকিমা কহিল,—হ্যাঁ, বাবা, হয়েছে।

শচীনাথ কহিল,—জর একটু কমেছে, প্রায় দেড় পয়েন্ট। বলিয়া সে থার্ম্মোমিটারটা দেখাইল।

কাকিমা কহিলেন—জর দেখা কাঠি পেলে কোথায়, বাবা?

শচীনাথ কহিল—সেই যে বেরিয়েছিলুম, কিনে এনেছি তখন। এটা যত্ন ক'রে রেখে দেবেন। বাড়ীতে একটা থাকা দরকার।

কাকিমা কহিলেন,—সবই ছিল, বাবা!—তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

পার্ব্বতী হালদার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। এতক্ষণে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, জরটা কমিতে একটু ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি ডাকিলেন,—শচীনাথ!—

শচীনাথ কহিল,—এই যে আমি, কাকাবাবু—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—তোমার কথা কাল এসেই শুনেছি। তোমার বাবার চিঠিও পেয়েছি—

শচীনাথ কহিল—এখন সে কথা থাক্, আপনি আগে সেরে উঠুন। আমি এবার চান ক'রে আসি।

—তোমায় তেল দিই বাবা। বলিয়া কাকিমা ডাকিলেন,—ওরে খেঁদি!

কোনো সাড়া নাই। খেঁদি এ মুল্লুক ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! শচীনাথ কহিল,—তেলের জন্য আর খেঁদিকে ডাকতে হবে না, আমি নীচে থেকে নিচ্ছি, রান্নাঘরে কে আছেন? সদু পিসীমা? আমি যাবো? তিনি কিছু মনে ভাববেন না?

কাকিমা কহিলেন—না, বুড়ো মানুষ—

শচীনাথ চলিয়া গেল। কাকিমা পার্ব্বতী হালদারকে কহিলেন,—মেয়েকে এমনি তৈরী করছো যে, হাবুল দু'দণ্ড এসেই চিনে ফেলেছে—কত নিন্দে করছিল—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—খেঁদিকে ডাকো তো।

গৃহিণী কহিলেন,—মেয়েকে এই তো ডাকলুম—গেরাহ্যিই নেই! বই নিয়ে দিবেরাত্তির প'ড়ে আছে। এখন কি সাজে? তখন সাজতো! ঘরের কুটোটুকু নেড়ে সাহায্য করে না। তা না করুক, এত নবাবী চাল মেয়েমানুষের সাজে না। কোন্ নবাবের ঘরে যাবেন যে, পাঁচটা বাঁদী চামর ঢুলুবে, পাখা নাড়বে, আর উনি কিংখাপের আসনে ব'সে বই পড়বেন! মেয়েকে কায শেখাও গো, অত আদর দিয়ো না।

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—হুঁ!—বলিয়া পাশ ফিরিলেন।

গৃহিণী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন; গিয়া দেখেন, খেঁদি স্নান করিয়া আসিয়া গামছায় মাথার চুল মুছিতেছে। মা কহিলেন,—নাওয়া হলো?

খেঁদি তার চিরাভ্যস্ত ঝাঁজালো সুরে কহিল—হ্যাঁ, নাওয়া হলো বৈ কি! নাইতে নেমেছি, সাবানও গায়ে মাখিনি, আর তোমার ঐ খোট্টা নব কার্ত্তিক গিয়ে হাজির। এত-বড় অসভ্য—নাইচি, চ'লে যা—তা, না, ঝপাং ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন! জ্বালাতন করেছে! নিজের ঘরে মানুষ সুস্থির হয়ে নাইবে না, খাবে না, বই পড়বে না?

মা শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন—চুপ, চুপ, চুপ কর্, সর্ব্বনাশী! কাকে কি বলিস, তা জানিস না!

খেঁদি কহিল—ওঃ, বয়ে গেছে আমার। উনি রাজ-চক্রবর্ত্তীই হন আর দিল্লীর বাদশাই হন, তাতে আমার কি? আমার যেন ছাতা দিয়ে মাথা রাখবেন—দ্যাখো না!

মেয়ে গজ-গজ করিতে করিতে উপরে চলিয়া গেল—

বসুমতী প্রেস। বেদুইন [শিল্পী—ডি, পি, ঘোষ।

একটু পরেই ঝপ্ করিয়া ভিজা কাপড়খানা উপর হইতে নীচেকার উঠানে ফেলিয়া দিল। মা মুহূর্ত্ত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে রান্না-ঘরে গিয়া কহিলেন,—তোমার কতদূর হলো ভাই, ঠাকুরঝি?

সদু ঠাকুরঝি কহিলেন-ঝোলটা সাঁৎলাচ্ছি। ডাল হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে, মাছের চচ্চড়িও হয়ে গেছে, ঝোলটা নামলেই ভাত চড়িয়ে দেবো। তা, হ্যাঁ বৌ, একটা কথা বল্‌ছিলুম—

গৃহিণী কহিলেন,—কি?

সদু ঠাকুরঝি কহিলেন—মেয়ে নিয়ে ভাবছো এত! তা এ ছেলেটি তো পার্ব্বতীদার বন্ধুর ছেলে! কত নাম শুনেছি। সেই বন্ধুকে ধরো না, যদি—

বাধা দিয়া গৃহিণী কহিলেন—তেমন বরাতই যদি হবে, তা হ'লে আর তোমার দাদার বুড়ো বয়সে এ দশা হয়!—হুঁ, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এ যে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা, বোন্—

সদু ঠাকুরঝি কহিলেন—তা বটে! তবু,—হাঁ, চ'লে যাচ্ছো? পার্ব্বতীদার বার্লিটা হয়ে গেছে, নিয়ে যাও ভাই বৌ, একটু খাইয়ে দাও গে—জ্বরটা কমলো?

গৃহিণী কহিলেন—কমেছে। বার্লিটা নিয়ে যাচ্ছি, খেঁদির কাপড়খানা কেচে শুকুতে দিয়ে যাই। তোমরা পাঁচ জনে চোখ তুলে ছাখো বলেই দিন কাটছে, না হলে কি যে হতো—গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন।

গৃহিণী খেঁদির কাপড়খানা লইয়া পুকুরে গেলেন, শচী তখন মাঝ-পুকুরে গা ডুবাইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া শচী কহিল,—বেড়ে জল কাকিমা, উঠতে ইচ্ছা করে না—ও আপনি কি কর্‌ছেন? খেঁদির কাপড়?

কাকিমা কহিলেন,—হ্যাঁ, কেচে নিয়ে যাই।—তাঁর বেদনাগ্রস্ত হাতে কষ্ট হইতেছিল।

সাঁতরাইয়া ঘাটের কাছে আসিয়া শচীনাথ কাপড়খানা টানিয়া লইল, কহিল—ওই হাতে!—আপনি এ কি কচ্ছেন, কাকিমা? মেয়ে নিজে এটুকু করতে পারে না? আপনি যান, আমি কেচে দিচ্ছি!

কাকিমা কহিলেন—না রে পাগলা, না—ছি, ছোট বোন্ হয়!—

শচীনাথ কহিল—ছোট বোন্, তাতে কি! আপনাকে ও হাতে আমি কায করতে দেবো না।

শচীনাথ নাছোড়বান্দা। কাকিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাপড়টা নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে শচীনাথ কহিল—একটা কথা বল্‌বো, কাকিমা?

কাকিমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কহিলেন,—কি?

শচীনাথ কহিল,—আপনার মেয়েটিকে আমি দু'দিনে শুধরে দিতে পারি। দেবো?

কাকিমা কহিলেন—তা যদি পারো বাবা—

শচীনাথ কহিল—আপনি রাগ করবেন না? তাকে বকলে বা শাসনের ছল করলে?

কাকিমা কহিলেন—রাগ করবো! প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করবো তা হ'লে। ও যে কতখানি ব্যথা হয়ে ফুটে আছে আমার বুকে! সে মা আমি নই বাবা যে, মেয়ে দোষ করলে তার ভালোর জন্যে কেউ তাকে বকলে বা শাসন করলে রাগ করবো! আমি মা, ডাইনী মায়া নয় আমার!

শচীনাথ কহিল—আচ্ছা। এই কথা রইলো। আপনি যান্ তা হ'লে। আমি কি করি, শুধু দেখুন—

কাকিমা চলিয়া গেলেন। শচীনাথ স্নান সারিয়া উঠিয়া নিজের কাপড়খানা কাচিল এবং শুষ্ক কাপড় পরিয়া নিজের ও খেঁদির কাপড় দু'খানা কাঁধে ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া একবারে দোতলায় উঠিল; উঠিয়া দেখে, খেঁদি ভিজা চুল রৌদ্রে মেলিয়া সেই বই লইয়া জানালায় বসিয়াছে। সে কাছে গিয়া বইখানা টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল—নবাব সাহেব ব'সে বই পড়বেন! আর আমি ওঁর কাপড় কাচবো!

খেঁদি তীব্র চোখে চাহিল, শচীনাথের কাঁধে তার ভিজা শাড়ী। শচী কহিল—নিন, উঠুন মশাই। এই কাপড় দু'খানা শুকোতে দিন। ওটা আপনার, এটা আমার—বলিয়া কাপড় দুখানা খেঁদির হাতের উপর রাখিল।

কাপড় দু'খানা ছুড়িয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া খেঁদি দাঁড়াইল, কহিল,—বয়ে গেছে! আমি বাড়ীর ঝী কি না—

শচীনাথ হাসিল; হাসিয়া বলিল—তুমি ঝীই। বাড়ীর মেয়েকে ঝী বলে। উপস্থিত যখন ঝী বা চাকর নেই, তখন এ কায মা'র নয়, তোমার। বাড়ীর যে ঝী, তার। ওঠো—তোলো ও কাপড় দুটো মেঝে থেকে।

খেঁদি চোখ্ রাঙ্গাইয়া চাহিল। শচীনাথ তাহার হাত দুটা

সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—তোলো। কেচে এনেছি, ধূলো লাগিয়েছো—আবার কেচে আনবে, চলো,—বলিয়া ক্ষিপ্র হস্তে কাপড় দুটা কাঁধে ফেলিয়া খেঁদিকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া কহিল,--তবে রে, মেয়ের তেজ ছাখো! কাপড় কাচতে পারবেন না, তাতে ধূলো মাখাতে পারবেন! ঐ কাপড় তোমায় দিয়ে কাচাবো, তবে আমার নাম শচীনাথ—

খেঁদি হাত-পা ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু পারিবে কেন? শচীনাথ রীতিমত জোয়ান, স্যাণ্ডো করে—বাঙ্গালা দেশের 'বাদল-রাতের কাজল-আঁখি'র কবিতা-লেখা ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা রমণী-সুলভ ক্ষীণ দেহ তো তাহার নহে! খেঁদিকে ঘাটে লইয়া গিয়া সে দাঁড় করাইয়া দিল, কহিল,—কাচো কাপড়। আমি ছাড়বো না। আমার গায়ে বেশ জোর আছে, দেখেছো তো?

খেঁদি কাঠ! শচী সেই কাঠকে টানিয়া ধরিয়া জলে নামাইল এবং কাপড় জলে ফেলিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে দিয়া কাপড় কাচাইয়া লইল, তার পর নিজে নিংড়াইয়া খেঁদির হাতে কাপড় দু'খানা দিল; দিয়া কহিল,—ভালোয় ভালোয় নিয়ে গিয়ে শুকোতে দেবে? না, তেমনি পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাবো?

এ কথায় খেঁদি কাপড় লইয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল। শচীনাথ হাসিয়া মনে মনে কহিল, ঔষধ ধরিয়াছে! হুঁ, তুমি তো একটা একরত্তি মেয়ে—বলে, কত পাজী গুণ্ডাকে—

দুই চোখে আগুন ভরিয়া খেঁদি শচীর পানে চাহিল। ভাগ্যে মানুষের চোখের আগুন গায়ে তাপের সঞ্চার করে না, নহিলে—

শচীনাথ হাসিল; খেঁদি সবলে কাপড় দুটা টানিয়া লইয়া দোতলার ছোট ছাদে চলিয়া গেল এবং অত্যন্ত কঠিন ভঙ্গীতে কাপড় দুটা মেলিয়া দিল। তার পর দাঁড়াইয়া সে ডান হাতটার পানে লক্ষ্য করিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিল। চাপিয়া সেইখানেই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শরতের রৌদ্র তখন নির্ম্মল আকাশে আপনার দোর্দ্দণ্ড তেজ প্রসারিত করিয়া দিতেছে।

শচীনাথ উঁকি মারিয়া দেখিল, দেখিয়া ধীর পদে আসিয়া খেঁদির পাশে দাঁড়াইল, কহিল,—হাতে কি হলো? দেখি—

—কিছু নয়। বলিয়া খেঁদি কাপড়ে হাত ঢাকিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

—দেখি না,—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি! বলিয়া শচীনাথ ধীরে ধীরে তার হাতটা টানিয়া দেখিল, হাতে সোনার দু'গাছি চুড়ি—চুড়ির কোলেই হাতে রক্তের দাগ! নখ বসিয়া ছড়িয়া গিয়াছে! তারই জন্য—শচীনাথ কহিল,—আমিই ছড়ে দিছি—না?

খেঁদি সরোষে কহিল—না, ভূতে ছড়ে দেছে! কোথাকার পশ্চিমী খোট্টা! আমাদের বাড়ী এসে—

—দারুণ অত্যাচার করছি, না? বলিয়া শচীনাথ হাসিল, অপ্রতিভের হাসি! তার পর কহিল—এসো, ওষুধ দি, সেরে যাবে।

খেঁদি কহিল—থাক, আর দরদে কায নেই। বলিয়া সে দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। শচীনাথ নীচে নামিয়া গেল। পুকুরের দিকে বাগান। বাগানে প্রচুর ঘাস। দুই চারিটা গাঁদার চারাও মাথা তুলিয়াছে। শচীনাথ গাঁদার পাতা তুলিয়া হাতে পিষিয়া দোতলায় আসিল। খেঁদি তখন বই লইয়া বসিয়াছে, বাপের ঘরে। মা হাতে কেরোসিন তৈল মালিশ করিতেছেন।

শচীনাথ কহিল—ওষুধ দি, এসো খেঁদি—

খেঁদি চোখ তুলিয়া চাহিল, তার পর বইখানাকে উল্টাইয়া রাখিয়া চকিতে সরিয়া গেল।

কাকিমা কহিলেন—কিসের ওষুধ?

শচীনাথ কহিল—খেঁদির হাত ছড়ে গেছে; তাই, গাঁদাপাতা—

কাকিমা কহিলেন—ও, তাই বুঝি পালালো! এমন মেয়ে দেখবে না কোথাও, বাবা—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—শচীর খাওয়ার কি ব্যবস্থা হলো?

কাকিমা কহিলেন—সে সব হচ্ছে। আমার বরাত—ভেবেছিলুম নিজের হাতে—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—বরাত যখন মন্দ হয়, তখন এমনই হয়—তা শচী, আজ আছো তো?

শচীনাথ কহিল—নিশ্চয়। আপনার অসুখ না সারলে আমি যাবো না। আপনার জ্বর ছাড়ুক না, কুইনিন দেবো। আমার ব্যাগে sugar-coated বড়ি আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে।

শচীনাথ গিয়া মাসিক পত্রখানা তুলিল। একটা গল্প চোখে

পড়িল। এই গল্পটাই খেঁদি পড়িতেছিল না? ঠিক! তাকে জব্দ করিয়া দিব।

শচীনাথ বাহিরে গেল। দালানে এক জানলায় খেঁদি বসিয়া আছে। যেন কোন দিকে লক্ষ্য নাই! অথচ—

শচীনাথ পা টিপিয়া আসিয়া তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, কহিল,—এইবার!—ওষুধ দিয়ে দেবো তো—

খেঁদির রাগ তেমন নাই, তবু ঝাঁজ দেখাইল। কহিল—না—না—না—

আর না! শচীনাথ ছড়া যায়গাটায় গাঁদা-পাতাগুলা চাপিয়া দিল; দিয়া সেখানটা চাপিয়া ধরিয়া রহিল। খেঁদি চোখ বাঁকাইয়া শচীনাথের পানে চাহিল; শচীনাথ তার পানেই চাহিয়া ছিল। চোখে চোখ মিলিবামাত্র দু'জনে হাসিয়া ফেলিল। শচীনাথ কহিল,—রাগ পড়েছে! এবারে ভাব তো?

খেঁদি কোন কথা কহিল না। শচীনাথ কহিল,—লক্ষ্মী হয়ো, তা হলে ভালো একটা প্রাইজ দেবো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট মামীর দৌত্য

বৈকালের দিকে পার্ব্বতী হালদারের জর আবার বাড়িল। শচী কহিল,—এ্যালোপাথি ডাক্তার ডাকি—

কাকিমা কহিলেন,—কিন্তু কালিদাস কি মনে করবে?

শচীনাথ কহিল,—মনে করবার কিচ্ছু নেই। বলবেন, ঐ পশ্চিমী খোট্রাটার কায।

তা বটে! কিন্তু দু'দিন পরে আমি যখন চলিয়া যাইব, তখন অসুখ-বিসুখে ঐ কালিদাসই যে ভরসা—

শচী থামিল। বুঝিয়া কহিল,—পরে যদি দরকার হয় কখনো? তা বোধ হয় হবে না। কাকাবাবু সেরে উঠুন—আপনারা তখন এখানে থাকলে তো চলবে না—আমাদের কারবার হবে কলকাতায়—কাকাবাবু কি এখান থেকে টানা-পোড়েন করবেন?

আনন্দে কাকিমার বুক উথলিয়া উঠিল। ভাগ্যলক্ষ্মী বুঝি সদয় হইলেন! না হইলে ছেলেটি আসা অবধি চারিধারের আঁধারও কেমন ঝরিবার মত দেখাইতেছে—আকাশে রাঙ্গা আলোর আভাসও ঐ দেখা যায়! ছেলেটির এই গায়ে-পড়া ভাব, দুরন্তপনার মধ্যেও মমতার কি প্রাচুর্য্যই না চোখে পড়িতেছে! দুর্দিন কি মানুষের কাটে না? তিনিই পথ করিয়া দেন, তিনিই দেখেন। সকলই তাঁর ইচ্ছা! বিধাতার করুণার প্রতি তাঁর বিশ্বাসও ফিরিয়া আসিতেছিল।

শচীনাথ ছাড়িবার পাত্র নহে। খুঁজিয়া পাতিয়া এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার সে ধরিয়া আনিল। তিনি আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। শচীনাথ নিজে গিয়া ঔষধ আনিল; আনিয়া রোগীকে এক ডোজ খাওয়াইয়া দিল। কাকিমা কহিলেন,—মাধব কোথায় গেল?

শচীনাথ কহিল,—এসেছিল। বাসন-কোসন মেজে যাবার সময় বল্লে, তার গায়ে বেদনা, মাথা ধরেছে।

কাকিমা কহিলেন,—সে-ও তা হলে পড়লো! নিরাশার অন্ধকার দেখিয়া কাকিমা ভীত হইলেন।

কাকিমা কহিলেন,—তুমি বাবা একটু বসো—আমি রাত্রের খাবারের বন্দোবস্ত করি—

শচীনাথ কহিল,—সদু পিসীমা?

কাকিমা কহিলেন,—এ বেলায় তার মেয়ের বাড়ী কি কায আছে, সেখানে গেছে। কাল আসবে, ব'লে গেছে।

শচীনাথ কহিল,—বেশ তো, আমরা দেখি—খেঁদি কৈ?

কাকিমা কহিলেন,—শুয়ে ঘুমুচ্ছে ঐ যে—

শচীনাথ চাহিয়া দেখে, কাকাবাবুর ওধারে বিছানায় মুখ গুঁজিয়া সে ঘুমাইতেছে। শচীনাথ কহিল,—কিছু রান্না-বান্নার দরকার নেই, আমি যোগাড় দেখছি—

বলিয়া সে কাকিমাকে নিষেধ তুলিবার সময়-মাত্র না দিয়া আবার বাহির হইয়া গেল এবং আধ ঘণ্টা পরে একটা বড় চ্যাঙ্গারিতে করিয়া এক রাশ খাবার লইয়া ফিরিল। কলা, মিঠাই, গজা, রসগোল্লা, সন্দেশ, জিলিপি—একরাশ মুড়ি আর মুড়কি। শচীনাথ কহিল,—আজ রাত্রে ঐ গোরুর দুধ আছে—এই কলা আর মুড়ি-মুড়কি—খাসা ফলার হবে। বামুনের ছেলে ফলার পেলে আর কিছু চায় কখনো, কাকিমা?

কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা ফলারে বামুন কোথা-কার! বেশ বাবা, এলে এক দিন বেড়াতে, তা এমন কাকিমা যে—কাকিমার কথা শেষ হইল না, চোখে জল আসিল।

শচীনাথ কহিল,—খেঁদিকে তুলুন গায়ে ঠেলা দিয়ে—দুধটা গরম করুক। আপনি ফলার মেখে দিন। আপনিও ঐ খাবেন তো? না খান, মিষ্টি আর ফল আপনার থাক্—

কাকিমা কহিলেন,—আচ্ছা বাবা, তুমি একটু জিরোও—আমি দেখছি।

বলিয়া তিনি খেঁদিকে ঠেলিয়া তুলিলেন। খেঁদি চোখ মেলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেখে, শচীনাথ উপুড় হইয়া মেঝেয় শুইয়া মাসিক-বসুমতী পড়িতেছে। সে বিছানাতেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পরের দিন। খেঁদির ঘুম ভাঙ্গিতে চোখ চাহিয়া দেখে, শচীনাথ বাপের মাথায় পাখার বাতাস করিতেছে। মা ঘরে নাই।

শচীনাথ কহিল,—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও—ধুয়ে চা তৈরী করো—

খেঁদি কোনো জবাব না দিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। একটু পরে পার্ব্বতী হালদার চোখ চাহিলেন; শচীনাথ কহিল, কেমন আছেন?

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—জ্বরটা বোধ হয় ছাড়ছে—ঘাম হচ্ছে।

শচীনাথ তাঁহার কপালে হাত রাখিল; ঘাম হইতেছে। থার্ম্মোমিটর লইয়া টেম্পারেচার দেখিল, ৯৮।

শচীনাথ কহিল,—দেখলেন, ওষুধের গুণ। এ্যাকোনাইট্ খেয়ে থাকলে আরো তিন দিন সময় লাগতো।

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—তুমি সারা রাত ঘুমোও নি?

শচীনাথ কহিল,—ঘুমিয়েছিলুম বৈ কি, তবে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গেছিল।

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—বড় কষ্ট গেছে বাবা—

শচীনাথ কহিল,—আমার অসুখ হলে আপনিও ঘুমুতে পারতেন না। বাড়ীতে অসুখ থাকলে মানুষ কখনো ঘুমুতে পারে?

তা যে পারে, কথাটা বলিয়া শচীনাথের মনে পড়িল; তার সাক্ষী খেঁদি। কেমন অঘোরে সে ঘুমাইয়াছে!

শচীনাথ দালানে আসিয়া ডাকিল,—কাকিমা—

উত্তর হইল,—যাই বাবা।

কাকিমা আসিলেন। শচীনাথ কহিল,—উনি উঠেছেন, মুখ ধুইয়ে দিন্—তার পর ওষুধ খাবেন। ওষুধের পর ঐ হরলিক্স মিল্ক এনেছি, দেবেন। আমি তৈরী ক'রে দেবো। খেঁদি গেল কোথায়? ষ্টোভটা জ্বালুক না—

খেঁদি তখনি আসিল। শচীনাথ কহিল.—দিব্যি তো ঘুমিয়েছো, এখন তোমার জাগবার পালা।

খেঁদি কোনো কথা কহিল না। শচীনাথ কহিল,—হাতে বই নেই যে! বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে—শ্রী বিষ্ণু! বীণা নেই। ওটা বদলে বলতে হবে, মাসিক-বসুমতী সর্ব্বদা হস্তে, খাণ্ডারী-মেজাজিনী খেঁদি নমস্তে—কেমন? বলিয়া সে হাসিল।

খেঁদির চোখে আবার পরিবর্ত্তন দেখা দিল। মুখখানা তীব্র ঘুরাইয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

শচীনাথ কহিল,—দালানে ষ্টোভ আনো, চায়ের সরঞ্জাম আনো—ভুল না হয়—আমি ঘাট থেকে মুখ-চোখ ধুয়ে আসছি—

খেঁদি গুম্ হইয়া রহিল। লোকটা কে গো! এ দিকে ধমক আছে, আবার দরদ করিতেও ছুটিয়া আসে! হাত ছড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া ঔষধ লাগায়! ভারী মজার লোক!

শচীনাথ মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখে, ষ্টোভ বা চায়ের সরঞ্জাম দালানে নাই। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, খেঁদি বিছানার উপর শুইয়া আছে। শচীনাথ ডাকিল,—খেঁদি—

খেঁদি সে ডাকে কোনো সাড়া দিল না। শচীনাথ কহিল,—কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না? ওঠো—

খেঁদি উঠিল না। শচীনাথ ষ্টোভ ও চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া দালানে আসিল; ষ্টোভ জ্বালিয়া জল গরম করিল ও একটা পেয়ালায় হরলিক্স তৈরী করিয়া কাকিমার হাতে দিল; দিয়া কহিল,—খাইয়ে দিন আগে। ওষুধ পরে হবে—তার পর কহিল,—আপনি চা খাবেন, কাকিমা?

কাকিমা কহিলেন,—না বাবা! আমি ও সব খাই না। তোমার যখন শাশুড়ী আসবে, তখন ভালো ক'রে খাইয়ো—

শচীনাথ চলিয়া গেল—চা তৈরী করিল। দুটি বড় পেয়ালায় চা ভরিয়া নিঃশেষ করিল এবং পেয়ালা প্রভৃতি ধুইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া কাকাবাবুর পাশে গিয়া বসিল।

খেঁদি উঠিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিল, তার পর কহিল—আমার চা কৈ মা?

শচীনাথ কহিল—নেই। খেতে হয় নিজে তৈরী ক'রে খাও গে। আমি তোমার চাকর নই যে, চা ক'রে খাওয়াবো! অত বড় মেয়ে, বললুম—তা শোনা হলো না! আমি অতিথি, আমার কি চা ক'রে খাবার কথা তুমি থাকতে!

বটে! এমনি করিয়া—! রাগে অভিমানে তার চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার মত হইল! আবার কাল বলা হইল, ভাব হয়েছে! ছোট লোক, পাজী!—খেঁদি শুইয়া পড়িল।

শচীনাথ কহিল—রান্নার কি হবে, কাকিমা? আপনার মাছ তো আসেনি, যাবো বাজারে?

কাকিমা কহিলেন—না বাবা। সে সব আমি ঠিক করছি—

শচীনাথ কহিল—আপনার হাত কেমন? ঐ তো দেখ্‌ছি, নাড়তে পারছেন না। খেঁদি রাঁধুক—নইলে উপোস দিতে হবে।

খেঁদি কটমট করিয়া তাহার পানে তাকাইল।

কাকিমা কহিলেন,—সত্যি, ওঠ্ খেঁদি। তোর সদু পিসী মেয়ের বাড়ী থেকে ফিরলো কি না, খোঁজ নে—

খেঁদির বহিয়া গিয়াছে! খেঁদি নড়িল না। পার্ব্বতী হালদার ডাকিলেন,—খেঁদি!

খেঁদি উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—ত্যাখ্, তোর সদু পিসীকে—

খেঁদি কহিল,—সে তো তোমাদের মাইনে-করা রাঁধুনী নয় যে, রোজ রোজ রাঁধতে আসবে! নিজে খেতে ঠাঁই পায় না—আবার শঙ্করাকে ডাকে! ওঃ—

বাপ-মা দুজনে এতটুকু হইয়া গেলেন! বেয়াদব মেয়ে!

শচীনাথ কহিল,—শঙ্করা তা ব'লে নড়ছেন না! এ তেমন শঙ্করা পাওনি! তোমায় দিয়ে রাঁধিয়ে তবে খাবে। এ শঙ্করা—কাকাবাবু, আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাকিমা, আপনিও নড়বেন না। আমি দেখছি—হুঁ, বলে, আমার দাপটে পাটনার করিম গুণ্ডা অবধি জুজুটি হয়ে থাকে, এ তো একটা এক-ফোঁটা মেয়ে—

শচীনাথ কহিল,—ওঠো খেঁদি—

খেঁদি উঠিল না।

শচীনাথ কহিল,—তবে রে মেয়ে! কালকের কথা ভুলে গেছ! বলিয়া সে রুখিয়া খেঁদির সামনে দাঁড়াইল।

খেঁদি ভয়ে উঠিয়া পড়িল।

শচীনাথ কহিল,—রান্নাঘরে চলো। দু'জনে যা হয় চেষ্টা ক'রে দেখি গে।

কাকিমা কহিলেন,—তুমি? না, বাবা—ছি!

শচীনাথ কহিল,—লক্ষীটি কাকিমা, আপনি কোন কথা কবেন না—দেখুন না, আমরা চড়িভাতি করি কেমন, এসো খেঁদি—না এলে জানো তো—

খেঁদি বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরে ঢুকিল। শচীনাথও সেই সঙ্গে। শচীনাথ কহিল,—তুমি উনুনে আগুন দিতে জানো?

খেঁদি কহিল—না।

—তবে?

খেঁদি কোন জবাব দিল না।

শচীনাথ কহিল—আচ্ছা, ত্যাখো—কয়লা কোথায়? আনো!—

খেঁদি কাঠ! শচীনাথ কহিল,—আনো। নইলে খেতে পাবে না,—আমায় চেনো তো—

তা চেনে। খেঁদি কয়লা আনিতে গেল। ছোট ঝুড়ি ভরিয়া কয়লা আনিল।

শচীনাথ কহিল—দেশলাই?

খেঁদি জবাব দিল না। শচীনাথ কহিল,—ওপরে আছে, আনো; আর কেরোসিনের ডিপে? ঐ আছে।

ঘুঁটে ক'খানায় খেঁদি দেশলাই জ্বালিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। কোন মতে উনুন জ্বলিল, খেঁদি ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপাইয়া দিল।

শচীনাথ চাল ধুইয়া আনিল এবং হাঁড়িতে চাল দেওয়া হইলে সে উপরে গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তার হাতে এক পেয়ালা চা। শচীনাথ কহিল,—চা খাও,—তৈরী ক'রে আনলুম।

খেঁদি সে দিকে চাহিল না। শচীনাথ কহিল,—খাও,—লক্ষীটি। ছি, রাগ করতে আছে কি!

শচীনাথ খেঁদির মুখে চায়ের পেয়ালা ধরিল।

খেঁদি হাসিয়া কহিল,—কেমন! চা যে দেবে না বলেছিলে!

শচীনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তখন যে আড়ি ছিল। এখন তো ভাব হয়েছে—কেন যে অমন করো থেকে-থেকে? এই তো দিব্যি লক্ষী হয়েছো!

খেঁদি চা পান করিল।

শচীনাথ কহিল,—দু'চারটে আলু ছেড়ে দিয়ো। আলু ভাতে ভাত তোফা হবে-খন। তার পর গোরুর দুধ আছে। আর কালকের কলাও গোটাকতক আছে। হুঁঃ, বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর আবার খাওয়ার ভাবনা! হতো পাটনা, তো চিচিঙ্গে চিবিয়ে খেতে হতো, নয় তো ডালভাজা কালপুরী—রামচন্দ্র!

খেঁদি কহিল,—ভাল হবে না ?

শচীনাথ কহিল,—পারবে ?

খেঁদি কহিল,—মাকে বলি, মা দাঁড়িয়ে থেকে ব'লে দেবে'খন।

শচীনাথ কহিল,—ওঁকে না-ই ডাকলে। আমরাই করি এসো না। প্রাইজের কথা মনে আছে ?

খেঁদি কহিল,—কি প্রাইজ ? খেঁদির মুখে হাসি ফুটিল। শচীনাথ তাহা লক্ষ্য করিল। হাসিলে খেঁদিকে বেশ মানায় তো!

বাহিরে বাতাস বহিতেছিল। শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস! ভারী মিঠা!

শচীনাথ কহিল,—কি প্রাইজ নেবে, বলো—

খেঁদি কহিল,—বই ? না,—

শচীনাথ কহিল,—বেশ! বই-ই। তুমি ফর্দ্দ দিয়ো—

খেঁদি কহিল,—না, আমি দেবো না। যা খুসী—

শচীনাথ কহিল,—আচ্ছা। কাকাবাবু সারলেই কলকাতায় যাবো, আর যাবার সময়—

খাওয়া-দাওয়া চুকিল। পার্ব্বতী হালদার ভালো আছেন, জ্বর হয় নাই। শচীনাথের সঙ্গে তাঁহার কারবারের কথাও হইল। পাটনা হইতে সুধানাথ বাবুও চিঠি লিখিয়াছেন, কলিকাতায় বড় দোকান খুলিবার জন্য। আপাততঃ দশ হাজার লইয়া; তার পর তাঁর ইচ্ছা আছে, একটা ছোট-খাট মিল খুলিবার। তবে পার্ব্বতীকে সব ভার লইতে হইবে। কারবারের সঙ্গে দুরন্ত ছেলেটাকে বাগাইয়া মানুষ করিবারও—

পার্ব্বতী হালদার গৃহিণীকে বলিতেছিলেন,—কথায় বলে, বন্ধু! তা কি আজকাল মেলে? ভগবান্ সর্ব্বস্ব নিয়েও এই দয়াটুকু করেছেন যে, বন্ধুকে বন্ধু রেখেছেন!

সে-কথা কতখানি সত্য, তার পরিচয় গৃহিণীও পাইয়াছেন!

রান্নাঘরের ভার এখন খেঁদির হাতে, শচী তার এ্যাসিষ্টাণ্ট। সে-দিন পার্ব্বতী হালদার পথ্য করিবেন,—সদুপিসীকে ডাকিতে হয় নাই—খেঁদি রাঁধিবে, মা দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিবেন। খেঁদির বই এখন গিয়া উঠিয়াছে শচীর হাতে। আজ শচী বাজার ঘুরিয়া পলতা-পাতা আনিয়াছে, বাটা মাছ, ছোট মাগুর। দেখিয়া কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—ছেলের আমার সব জানা আছে। তিনি উপরে গেলেন, শচীর তাড়ায়—কাকাবাবু একা আছেন।

খেঁদি বাটা মাছ ভাজিতেছিল,—আগুনের আঁচে তার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। শচী ডাকিল,—খেঁদি—

খেঁদি মাছ ভাজিতে ভাজিতে কহিল,—কি ?

শচী কহিল,—এই গল্পটা পড়েছো ? সৌরীন মুখুয্যের 'জয়-যাত্রা' ?—

খেঁদি কহিল,—হুঁ। সেই তা নীলিমার মামা—

শচী কহিল,—হ্যাঁ।—তা, আমি কি ভাবছিলুম, জানো ?

—কি ?

শচী কহিল,—আমিও তো ট্রেণে ক'রে কাঁঠালপাড়ায় এসেছি। গল্পের নায়ক হিমাদ্রি গেছলো পলতায়।

—হ্যাঁ—খেঁদি ফিরিয়া শচীর দিকে তাকাইল।

শচী কহিল—তা, আমি যদি হিমাদ্রি হতুম ? আর তুমি হতে নীলিমা ?

এবার খেঁদির রাঙ্গা মুখ আরও রাঙ্গিয়া উঠিল। সে কহিল,—যাঃ, অসভ্য কোথাকার—

শচী কহিল—তা, পশ্চিমী খোট্টা আর সভ্য হয়ে থাকে কবে! বলিয়া সে থামিল। পরক্ষণে কহিল,—আজ কলকাতায় যাবো—গিয়ে যা করবো,—দেখো তখন—

খেঁদি কহিল,—কি ?

শচী কহিল,—সে আমি বলবো না—তখন দেখো—

খাওয়া-দাওয়ার পর শচী কলিকাতায় গেল। মামার বাড়ী; বলিয়া গেল,—পারি তো ওবেলায় আসবো, নয়, কাল সকালে।

মামার বাড়ীতে আসিয়া সে চুপি চুপি ছোট মামীকে ডাকিল,—ছোট মামী—

ছোট মামীর সঙ্গে শচীর ভারী ভাব। ছোট মামী তাহারই প্রায় সমবয়সী; সম্পর্কে মামী হইলেও বন্ধু। ছোট মামী তাকে নাম ধরিয়া ডাকেন না। এক ভাসুরের নাম শশী, আর এক মামা-শ্বশুর আছেন, তাঁর নাম হাবু। মামারা হাল ফ্যাশনের হইলেও ছোট মামীর বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, ভারী আচারনিষ্ঠ। ছোট মামী সেই বাড়ীর মেয়ে, কাযেই শচীকে শচী বলিয়া ডাকিতে পারেন না, শচীর সঙ্গে শশীর মিল আছে! আর হাবুল বলা তো চলেই না,—বাঙ্গালী বউয়ের কাছে মামা-শ্বশুরের মত অস্পৃশ্য ভয়ঙ্কর জীব দুনিয়ায় নাই! ছোট মামী শচীকে ডাকেন, বড়-ভাগ্নে বলিয়া।

ছোট মামী বলিলেন,—কি ভাই, বড়-ভাগ্নে'

দুষ্য হইলেও এ ভাই-সম্বোধন চলে। সকলে খুব পরিহাস করে, তবু এই ভাবেই এ ডাক চলিয়া আসিতেছে!

শচী কহিল,—আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে পারো?

ছোট মামী অবাক্! কহিলেন—বিয়ে করবে? তুমি? তা হ'লে সকলে বাঁচে।

বিবাহে শচীর দারুণ অনিচ্ছা ছিল। সেই শচী—নিজের মুখে বলে, বিবাহ করিবে। ছোট মামী ভাবিলেন বিবাহের এ কথা সকলকে জানাইয়া দেন!

শচী কহিল—কিন্তু ভারী কৌশলে, ভারী চুপি-চুপি ব্যবস্থা করতে হবে।

ছোট মামী কহিলেন,—করবো- বলো, কি করতে হবে?

শচী কহিল,—কাঁঠালপাড়ায়, পার্ব্বতী কাকাবাবুর মেয়ে—আহা, তারা এখন গরিব, মেয়েও ডাগর হয়েছে। তা তুমি এক কায করো—বঙ্কিমবাবুর বাড়ী দেখবে, বলেছিলে না? চলো আমার সঙ্গে—তার পর মেয়ে দেখবে ঐ ছলে গিয়ে। মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে মাকে চিঠি লিখবে, আর ওদের কাছেও কথাটা ফেলবে। কিন্তু ভারী হুঁশিয়ার! আমি যে কিছু বলেছি, তা যেন প্রকাশ না হয়!—আমি খুব না-না করবো, তুমি জোর দেখাবে—

ছোট মামী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—মেয়ের কি নাম?

—এর মধ্যে নাম নিয়ে কি হবে?

—তবু শুনিই না! তোমার বিয়েতে আমি পদ্য লিখবো কিন্তু—আর তুমি খুব ভালো ক'রে সে পদ্য ছাপিয়ে দেবে।

—মেয়ের নাম মাধুরী।

ছোট মামী কহিলেন,—তাই তুমি ক'দিন সেখানে প'ড়ে ছিলে? এঁ্যা—

শচী কহিল,—সে জন্যে নয়। সেখানে গিয়ে দেখি, কাকিমার বাত, পার্ব্বতী কাকাবাবুর জ্বর—ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ছোট মামী কহিলেন—আর নায়িকা মাধুরী দেবী?

শচী কহিল,—সত্যি, তা নয়—এ কথাটা আজ মনে হলো প্রথম। সে যখন মাছ ভাজছিল, আমি তখন গল্প পড়ছিলুম। গল্পটা পড়তে পড়তে কেমন মনে হলো—

—গল্প প'ড়ে প্রেম! হাসালে ভাই, বড় ভাগনে! ছোট মামী হাসিতে লাগিলেন।

শচী কহিল,—না, সত্যি, হাসি নয়। কালই চলো তুমি বঙ্কিমবাবুর বাড়ী দেখতে। ছোট মামার ক্যামেরাটাও সঙ্গে নেবো—

ছোট মামী কহিলেন,—কার ফটো নেবে? বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর? না মাধুরী দেবীর?

হাসিয়া শচী চলিল,—তা, দুটি বস্তুই ক্যামেরায় তোলবার যোগ্য! কেমন রাজী?

ছোট মামী কহিলেন,—আচ্ছা। তোমার ছোট মামাকে রাজী করাই। তিনিও যদি যেতে চান—

শচী কহিল,—বয়ে গেছে তাঁর! ও সব সহুরে বাবু—ওঁরা যাবেন পাড়াগাঁয়ে? কখনো না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—

তিন চার দিন পরেই পাটনা হইতে মা'র চিঠি আসিল। মা লিখিয়াছেন,—

তোর ক্ষমতা আছে ছোট বৌ,—আমরা ছেলেকে রাজী করাতে পারিনি—তুই পেরেছিস্। এতে ভারী খুশী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, কোলে যেন শীগ্‌গির একটি রাঙ্গা টুকটুকে খোকা দেখি!

উনি বলছিলেন, পূজার বন্ধে আমরা সকলে কলকাতায় যাবো। সেই সময় সব কথা পাকা ক'রে ফেলা যাবে। অগ্রাণের আগে আর তোমার বড়-ভাগনের জন্য বিয়ের দিন পাঁজিওলারা লিখছে না! কাযেই তোমার খুশী হওয়ায় একটু দেরী পড়বে।

পার্ব্বতী বাবুর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এঁর খুবই মনের মতন হয়েছে। উনি তাঁকে নিজের ভাইয়ের মত দেখেন। আর তা হ'লে ছেলেকেও কারবার করতে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দেওয়া যায়। মানী লোক, তাঁকে সাহায্য করতে আমাদের খুবই ইচ্ছা। তবে পাছে তিনি কিছু ভাবেন, এ জন্য কিছু বলা যায়নি। উনি বলছিলেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের কথা ওঁর মনে দিবারাত্রি জাগছিল, কিন্তু সাহস ক'রে সে কথা পাড়তে পারতেন না। অর্থাৎ তাঁর মেয়ের বিয়েয় সাহায্য করার কথা মুখে আনতে পারতেন না। উনি বললেন, ছোট-বৌ সব দিক দিয়ে আমার উপকার করলেন, তাঁকে খুব ভালো ঘট্‌কালী দেবো—

চিঠি পড়িয়া সকালের ট্রেণেই শচী কাঁঠালপাড়ায় ছুটিল। কাকিমা কহিলেন,—তোমার বাবার চিঠি এসেছে—খেঁদির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা—

শচীনাথ্ যেন শুনিতে পাইল না! তার ভারী লজ্জা

হইতেছিল। তার হাতে ছিল একগাদা বই, সাবান, এসেন্স আর পিছনে কুলীর মাথায় একটা গ্রামোফোন আর একরাশ রেকর্ড। সেগুলা নামাইয়া কুলীকে পয়সা দিয়া সে কহিল,—কাকাবাবু কোথায়?

কাকিমা কহিলেন—ভাটপাড়ায় গেছেন পাঁজি দেখাতে, কোন্ দিনটায় দুজনের নক্ষত্র ভালো—তাই দেখাতে। তোমার বাবা তোমার রাশিচক্র অবধি পাঠিয়ে দেছেন কি না—

কাকিমা চলিয়া গেলেন। পাশের ঘরে দ্বারের ফাঁকে একজোড়া চোখ দেখা গেল—পা টিপিয়া শচী দোরের কাছে গেল ও হাত বাড়াইয়া গেঁদির নাকটা নাড়িয়া দিল, কহিল,—তোমার জিনিষ—সাবান এসেন্স আর ঐ গ্রামোফোন প্রাইজ। আমি পালাই। বিয়ের আগে আর বোধ হয় দেখা হবে না। লজ্জা করছে—

গেঁদির চোখে-মুখে হাসির কি ঝিলিক! সে কোন কথা কহিল না, দ্বারটা ভেজাইয়া দিল। তার পর যখন আবার দ্বার খুলিল, শচী তখন চলিয়া গিয়াছে।

প্রাইজ পড়িয়া রহিল, গেঁদি দ্বারের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া—দৃষ্টি আকাশের দিকে—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"তোল নোঙর ক'ভাই মিলে"

(বাউলের গান)

আজ, বানের বেগে বাঁধ ভেঙেছে, কি ঝড় এসেছে
সে প্রাণের দেশ থেকে।
যাক্ অকেযো পাল ও দড়ি চৌচিরে ছিঁড়ে,—
মাঝি ডরাস্‌নে দেখে।

কোন্ সে ভোরে ভেসেছিস্ রে যেতে ওপারে—
গাঙের বুকে জল শুকাল,'
তলা না'য়ের বেধে গেল,
কত যে যুগ রইলি অচল, বাইতে নারলি রে,—
তুই শিখিস্ নে ঠেকে?
মাঝি, ডরাস্ নে দেখে।

আজ বান বহেছে, না' নেচেছে, প্রাণ জেগেছে, ভাই,
তরীকে তোর হাল্‌কা কর,
তোর ভাব ধারার যা কিছু পর—
তার বোঝা তুই ফেল জলে, চল সময় কিছু নাই,
সব ভাইরে নে ডেকে।
মাঝি ডরাসনে দেখে।

তোল্ নোঙর ক'ভাই মিলে, বা দড়িই দে কেটে,
যদি না পারিস ডরে,
সবার পিছে থাক্ প'ড়ে;—
মন ও মুঠির জোর থাকে তোর ঠিক যাবার ঘাটে,
তুই যাবিই না' হেঁকে।
মাঝি, ডরাস্‌নে দেখে।

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

বিড়ম্বনা কাব্য-রঙ্গ

কি গান গাহিবে ভক্ত, পূজার আসরে
কহ দেবি, লীলাময়ি—ভ্রান্তি-বিলাসিনি ;
নাহি দম্ভ রচিবারে মধুচক্র হেন,
গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি ; শুধু প্রকটিতে
ন্যাতা-যূথ-লীলা—পাঁচালীর রসরঙ্গ,
ভ্রান্তির প্রমোদ-উৎস—আশা-মরীচিকা।
বিছুটীর কুট্‌কুটী, সুজ্বালা বেতের
লক্‌লক্ করিত যা সুরেশের করে,
জ্বালার দাপটে যার শঙ্কিত কপটী ;
কোথা পাব সেই শক্তি দাম্ভিক-দলনি—
প্রভাবে যাহার ভাক্তের তাণ্ডব নৃত্য
হবে অবসান—লীলান্বিত হবে রঙ্গে
ভ্রান্তির নাচন ! মরমের অন্তস্তরে
গুঞ্জরিয়া উঠে নিত্য নির্ব্বাক্ বেদনা,
প্রকাশের ভাষা কলমে সঁপিয়া দাও
লো বরবর্ণিনি, ফুটিয়া উঠুক রঙ্গে
কবিতা-প্রসূন-হার—মসীদিগ্ধ নিবে ;
ফোটে যথা ভেকচ্ছত্র খড়ের পোয়ালে,
গোবর-গাদায় পদ্ম—কিম্বা স্বয়ংসিদ্ধ
নেতাদল বাঙ্গালার আঁদাড়ে পাঁদাড়ে !

আশার মদির গন্ধে করিয়া সুরভি
এ কি উন্মাদিনী ভ্রান্তিসুরা রচিয়াছ
ভ্রান্তি মায়াবিনি ! পান করি সেই সুধা
আশার চষকে, বাঙ্গালী ন্যাতার দল
মাতোয়ারা আত্মহারা—উল্লাসে প্রমোদে।
ধ্বংসের বিষাণ বাজে নব জনতন্ত্রে,
আশ্বাসে প্রলয় আশা নির্ল্লজ্জ হুঙ্কারে—
ধ্বংস কর প্রাচীনতা হিন্দুর গৌরব,
কালাপাহাড়ের কীর্ত্তি হয়ে যাক্ লোপ
হিন্দুর বিজয়-দীপ্তি হউক নির্ব্বাণ ;
নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও আর্য্য চিন্তাপ্রভা—
তা না হ'লে জাতীয়তা হবে ম্রিয়মাণ !

জাতীয়তা স্বপ্নে চাই বিলাতী-মদিরা—
উদ্দীপনা—শিহরণ—প্রেমের বিলাস—
সম্ভব কি সুপ্তবঙ্গে—প্রাণশক্তিহীন ?
পদাঘাতে কর চূর্ণ শাস্ত্রের নিগড়—
সংসারে সংহার হোক্ হিন্দুর বিধান !
অপরাধী যে ব্রাহ্মণ শত অপরাধে—
যার ত্যাগে রাজশক্তি ছিল অবনত –
শাস্ত্রের গৌরব-জ্যোতিঃ চির-বিবস্বান্—
শতসূর্য্যসম দ্যুতি—জ্ঞানের ভাস্কর—
বিশ্বহিত—কালজয়ী নশ্বর জগতে।
গর্ব্বদীপ্তি তার বুঝি হলো না নির্ব্বাণ।

এটনার ভায়রা-ভাই—বিষুবিয়সের
সমকক্ষ মিতা, তাই উল্লাসে ফুকারে
কর সমভূম মন্দির প্রাসাদ-চূড়া,
হোক একাকার—উচ্চ-নীচ ধনি-দীন
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—ধর্ম্মের নিশান ফেল
কর্ম্মনাশা-জলে—নোট ধর্ম্ম—চেক জাতি
সাধনা পকেট-প্রীতি—মুখে রণরঙ্গ,
শুধু কার্য্যে পরমাদ—জয়টীকা শোভে
ভালে জেলের প্রসাদ। নীরো না বাজালে
বীণা, রোমদাহ হেরি—আনন্দে অপার,
হীরো নামে খ্যাতি কেবা ঘোষিত জগতে ?
কিংবা সেই ঔরংজেব ধর্ম্মধ্বজী বীর,
না ধ্বংসিত বীরমদে হিন্দুর মন্দির
যদি, স্পর্শিত কি গর্ব্বচূড়া মোগলের
অভ্রভেদী স্পর্দ্ধাসম গগনস্পর্দ্ধিনী ?
কিম্বা সে কালাপাহাড় অক্ষম হইত
যদি ভাঙ্গিবারে বিগ্রহ, মন্দির, পূজা,
বিধান, আচার ; সম্ভব হ'তো কি কভু
একাকার—নিষ্ঠাবান হিন্দুর সমাজে—
অটল হিমাদ্রিসম—প্রাণশক্তিহীন ?
কিম্বা সে লেলিন—নহে স্মৃতি অতীতের,
না চূর্ণিত বীর যদি বিপুল বিক্রমে

জারের সাম্রাজ্যবাদ—অতীব ভীষণ
প্রকটিত হতো কি এ রুশো-সোশিয়াল,
একের প্রভুত্ব আর দাসত্ব দেশের !

স্বাধীনতা অর্থ নহে সকলে স্বাধীন ;
হিন্দুর সংহিতাকার, চিরভ্রান্ত পাজী
রচিয়াছে সেই নীতি অসম সাহসে !
প্রদানিয়া ন্যায্য কর রাজার ভাণ্ডারে,
ভোগ কর স্বাধীনতা জীবনে সমাজে,
রাজার পরশশূন্য— ভ্রূকুটী-বিহীন ;
রোষ প্রীতি সমজ্ঞান—অসার সম্মান—
উপার্জ্জনে কর্ম্মশক্তি—আত্মশক্তি গর্ব্ব—
বিরোধের পরিহার শান্তিমাত্র সার ;
বিলাস-বর্জ্জিত নীতি ধর্ম্ম জ্ঞানচর্চ্চা—
মুক্তিসিদ্ধি স্থির লক্ষ্য—স্বতন্ত্রতা কাম্য,
শক্তিসাধনায় হোক্ শক্তি উদ্দীপন,
আত্মত্যাগ, ভ্রাতৃপ্রীতি দেশের সাধন।
অসার এ বাক্যচ্ছটা—হিন্দুশাস্ত্রমর্ম্ম,
নিশ্চিহ্ন করিয়া ধোও স্বখাত-সলিলে।
প্রতীচীর শিক্ষাদীপ্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কে
ফুটিছে বচন-খই বালির খুলিতে—
লুচি যথা ফুলে উঠে ঘৃত কলকলে !

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মলোপ না হ'লে সমাজে,
স্বাধীনতা অভিযান ব্যর্থ চিরদিন !
বর্ণাশ্রম নহে ঘৃণ্য—সমাজের স্তর ;
শ্রেণীভেদে কর্ম্মভেদ—বিরোধ সংহার।
চতুর ইংরাজ উল্লাসে প্রচার করে
ভেদনীতি মন্ত্র—জাতিভেদ প্রচ্ছদনে।
তুলে দাও প্রাচীনতা, জাতিভেদনীতি
কাঞ্চন-কৌলীন্যে তুলি বসাও আসনে !
ব্যর্থ হয় পাছে, পুরাতন নীতি জাতিভেদ,
পেতেছে নূতন ফাঁদ অতি সযতনে,
রাজনীতি-বুদ্ধিবীর কৌশলী ইংরাজ,
ভোটযুদ্ধে ভ্রাতৃভেদ অতীব নিশ্চিত !
ডুপ্লেক্সষ্ট ভেদনীতি ডুব্রিসিটী-বলে
লাজে রাঙ্গা-মুখ ঢাকে মেঘের আড়ালে !

কাউন্সিলে নবমধু—নববধূরূপে,
লোভেতে পাগল পারা—ভ্রমরের পাল,
কিম্বা গোঠপানে ধায় যথা দড়ি ছিঁড়ি
হাম্বারবে উর্দ্ধপুচ্ছ, ধর্ম্ম-ষণ্ডযূথ,
মারামারি ঠেলাঠেলি অগ্রগতি হেতু ;
ভোটযুদ্ধে ভ্রাতৃভেদ নিষ্ফল আক্রোশে।
নাচনের ভঙ্গি দেখি হাসিছে কৌতুকে
সয়তান, বিন্দুমাত্র মধু ছিটাইয়া !
পায় লাজ চড়কের গাজন সন্ন্যাসী!
হাতে হাতে হাততালি নাচনের পণ—
এমন মজার রঙ্গ দেখেছ কি কভু ?
ভারত-শ্মশানচারী, দুরাশা নেশায় ;
স্বার্থসিদ্ধি আলেয়ার আলো অনুসারি
ফিরিছে ন্যাতার দল নাম-কামনায় ;—
বণ্ড-অণ্ড অনুসরি ধায় যথা বক ;
মাতৃহারা শিশু যথা টানে শুষ্ক-স্তন,
বন্ধ্যা নারী বক্ষঃস্থলে নিষ্ফল শোষণে।
ইংরাজের দয়াদত্ত দানে স্বাধীনতা,
সম্ভব কি কোন যুগে—আত্মশক্তি বিনা,
আত্মত্যাগে উদ্ভব যাহার—বিশ্বজয়ী ?
ভ্রান্তি মায়াবিনী দেবী—তুষ্ট সরস্বতী
প্রসীদ দাসেরে—তোমার লীলার খেলা
প্রকটিত কর রঙ্গে, এই বাঁশবনে,
কচুরীপানায় ভরা, কল্মীদাম-শোভা,
ডোবা খানা পাটবন ম্যালেরিয়া তীর্থে !

ভারতের রাজনীতি গুরুর সম্মান,
লভিত যে বঙ্গ গর্ব্বে শ্রদ্ধায় গর্ব্বিত ;
সে বঙ্গের—মুক্তিগুরু নিয়ন্তা আদর্শ,
মূর্ত্তবিকাশের কেন্দ্র, মাদ্রাজ পাঞ্জাব !
স্বাধীনতা ডঙ্কা বাজে বোম্বাই প্রয়াগে !
মুহ্যমান বঙ্গবাসী হও অগ্রসর—
নেতৃপদ অবসান—ভিখারী পদাতি।

স্বাধীনতা গণতন্ত্র—অভিমান-হীন !
পরমত শিরোধার্য্য বিনা প্রতিবাদে !
প্রাদেশিক আধিপত্য সর্ব্বকর্ম্মক্ষেত্রে—

বাণজ্যেতে বাঙ্গালীর নাহি অধিকার !
প্রদেশ বিভাগ—সীমাবদ্ধ প্রদেশীর
চাকরী বিস্তার হেতু, নির্দ্ধারিত এবে
সরকারী বিধানে—বাঙ্গালার বাহিরে
নাহি বাঙ্গালীর স্থান ! ঘরের দুলাল
বধূর অঞ্চল ছাড়ি সহিবে বেদনা—
করুণার ব্যথা তাই—সশব্দে ঝঙ্কৃত
সরকারী প্রাণে ! ঔদার্য্যে উদাস তাই !
নেতৃবৃন্দ হেথা ! অনাহারে স্বল্পাহারে
বাঙ্গালায় নিত্য মরে যারা, প্রেমানন্দে
খাট্‌মল খিলাক্ তারা মিলন-মন্দিরে !
শিক্ষকতা পদমাত্র আছে বাঙ্গালীর
যদবধি যোগ্য ছাত্র নহে সুপণ্ডিত ;
তিষ্ঠ কিছুকাল ;—বেত্রাঘাতে বিতাড়ন
যোগ্য পুরস্কার লভি পূরিবে কামনা—
লাঞ্ছিত স্বদেশী নাম হইবে সার্থক !

স্বাধীনতা হবে দেশে আইন-কৃপায় !
সমাজের স্বাধীনতা বিদায়ের তরে
মহোৎসবে ব্যগ্র তাই ন্যাতা-যূথ-চমূ ;
আস্ফালনে ব্যতিব্যস্ত আইন সৃজনে ।
বাল্য-বিবাহের ফল অতীব ভীষণ,
সম্ভব কি প্রেমকাব্য পূর্ব্বরাগ বিনা ?
আইনে বিবাহ হবে নাহি ভেদাভেদ,
ষোলবর্ষে গৌরীদান পাঞ্জাবীবিধান,
দীপ্ততেজ বীরপুত্র সাঙ্কর্য্যের ফল,
পাঞ্জাবী-বাঙ্গালী বধূ মনের মিলন !
আইন-দাপটে হবে, প্রেমরঙ্গ মেলা,
ডাইভোর্স অধিকারে নিত্য নব লীলা ।
ছিঃ ছিঃ মনু—লজ্জাহীন প্রবীণ গর্দ্দভ !
ব্যবস্থা-নৈপুণ্যে তব হের সর্ব্বনাশ !—
স্বাধীনতা চিরদীপ্ত হিন্দুর সমাজে !

লজ্জায় শিহরে অঙ্গ—স্তম্ভিত হৃদয়,
ব্রহ্মচারিণী বিধবা এত আজ বঙ্গে !
উপবাসে শীর্ণদেহ অটল বিশ্বাস !
বিকাশ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অনাদরে ঝরে
নিরাশার অন্ধকারে কুসুমকোরক !
ফাটে না কি বুক কারো ভণ্ডের তাণ্ডবে,
কাঠফাটা রৌদ্রে ফাটে যথা মাটী, কিম্বা—
ফাটিয়া চৌচির ফুটি যথা গাঙপারে ।
বিধবা-বিবাহ বিল চাই সর্ব্বব্যাপী ;
বিবাহেতে বাধা কর বিধবার দল,
কুমারী থাকুন ঘরে কিবা ক্ষতি তাহে ?
না হয় চালাও জোরে শুদ্ধি-আন্দোলন—
পাঞ্জাবীর ভোগে দাও বঙ্গের বনিতা !
নারীর সম্মান যায় সতীত্বের নিধি
চোখে দেখি বক্ষে বাজে, হই হতবুদ্ধি !
ধর্ষিতা হউক নারী, নিষ্ফল বিলাপ,
শুদ্ধির ঔষধি আছে বিশল্যকরণী !
আক্রমণ প্রতিরোধে ধরিবারে লাঠি
শঙ্কান্বিত বীরচমূ—খিল দেয় দ্বারে,
নির্ভয়েতে আস্ফালন সভার ভিতরে !
প্রতিবাদ কর যদি শুদ্ধি-আন্দোলনে,
ভাড়াটিয়া গুণ্ডা আছে মতের রক্ষণে—
ভাঙ্গিবে বিচার-সভা নির্ভীক চীৎকারে,
উপাড়িতে পারে টিকি নিষ্ফল আক্রোশে !
কিন্তু রাখিবারে ভগ্নী-কন্যা-জায়া-মান,
পলায়নপটু বীর, চম্পটে পণ্ডিত—
মহাবীর কর্ণ যথা চিত্রসেন-রণে !
মা দুর্গার ভয়ে ভীত কেরাণীরা যথা,
পালান সত্বর কাশী রেলের কৃপায় !
অবিনয় দম্ভ গর্ব্ব, বাণী তরুণের ;
অসহ্য বৃদ্ধের বাক্য—দল ছাড়া কথা,
বিরুদ্ধ মতের কথা, সভামাঝে বলে,
আস্পর্দ্ধার সীমা নাই ! যুগধর্ম্ম এই !
সভা পণ্ড করি মুহূর্ত্তেকে—মিটাইব
রণসাধ,—চিরজয়ী বীর মোরা রণে !
জ্বলন্ত উল্কার বেগে উঠিল আকাশে
মরি মরি কিবা দীপ্তি চোখ জ্ব'লে যায় ;
বুঝি এই সূর্য্যজ্যোতিঃ ম্লান হয়ে গেল—
সশব্দে প্রকাশ হ'লো গৌরব-বারতা,
ভারতের স্বাধীনতা চাই চাই বাণী ;

হাউয়ের দ্রুতগতি লাজে অবসন্ন,
বিদ্যুৎচমক জ্বালা শঙ্কা পেলে ডরে !
শব্দের ভৈরব রব—কি দিব উপমা—
বোমা ফাটা রব—অকস্মাৎ বজ্রাঘাত—
সমুদ্রগর্জ্জন—কিংবা প্রলয়-কল্লোল ?
নির্ব্বাক্ হইল বিশ্ব শঙ্কায় স্তম্ভিত !
ভাগ্যেতে জাহাজ ছিল চাঁদপাল ঘাটে,
পলায় ইংরাজ তাই সদলে স-পাটে !
স্বাধীনতা-সূর্য্যোদয়ে অজ্ঞান-তিমির
মুহূর্ত্তে হইল দূর—স্মৃতিশক্তিহীন !
অতীত চলিয়া গেছে আছে শুধু প্রাণ,
পেট্রিয়টরূপে মাত্র দেহে অধিষ্ঠান !
স্পর্শমাত্র যাঁর বাণী শ্রবণবিবরে,
মুক্তি এলো যাচি দ্বারে—স্বরাজের রণে ;
গুরুমন্ত্রে মোক্ষসম স্বপন অতীত !
স্বাধীনতা ধূমকেতু এই মহাবীরে
কোন্ উচ্চ গিরিচূড়া শিরে সসম্মানে
দিয়া যোগ্য স্থান ; রাখিবে জাতির মান—
অধীর চিন্তায় মগ্ন থাক বারমাস !
যদবধি উল্টাবাজী, না দেখ শ্রবণে,
কবিরা নয়নে খান, শুনেন বদনে !
শিশু যথা চাঁদ চায়, আবদার করি ; —
বায়না-হুঙ্কার দেখি, হাসিবে ইংরাজ
তথা—সপ্ত দিবানিশি, কাতুকুতু বেগে !

প্রয়াগের মুক্তিতীর্থে, ত্রিবেণীসঙ্গমে,
জীবন সাধনা করি বিচার-মন্দিরে !
আইনের ফাঁকীবাজী লাখ লাখ টাকা,
সাদরে চরণে যার দিয়াছে অঞ্জলি,
প্যারিস বৈভব আর চূড়ান্ত বিলাস,
দেশহিতে বলি দেন মানের খাতিরে ;
সেই বকধর্ম্ম-মতি বীর রচেছেন,
সংগোপনে, অতি যত্নে, জীবন-সায়াহ্নে,
সাম্রাজ্যবাদের নীতি—মণ্টেগু-বিজয়ী !
অভিমানে প্রতীক্ষায়, প্রাণ ফেটে যায়—
মালা যে শুকায়—ডাকো, সাইমন বধূ !

বিদেশীয়া বধূ তুমি কত দিন পরে
এলে দেশে, আশাদাতা, জলৌকারূপিণী,
কত সাধ প্রাণে, সেলামির পদপ্রান্তে,
আহা মরি, বুট-শোভা, প্লীহা-ফাটা-রঙ্গ
বসাতে হৃদয়াসনে হৃদয়ের রাজা—
ইঙ্গ-ভৃগু-পদচিহ্ন বক্ষেতে অঙ্কিত।
সাধে বাদ, এ কি পরমাদ, নির্ভয়েতে
বয়কট করে হাবাতে ছোঁড়ার দল !
নেশার স্বপন সম আশার উল্লাস !
যাইতে পারিনি তাই দেখিবার আশে
ও চাঁদবদন-কান্তি ! মানময়ী রাই,
মান-দায়ে পাগলিনী বিবশা ব্যথায়,
নিরালায় মুছিছেন তপ্ত আঁখিজল ;
কোট ভাসে অশ্রুনীরে, তিতিছে খদ্দর !
ডাকো, ডাকো, রাখো মান, বিদেশী অতিথি,
লাজ মান দল ত্যজি, সমর্পিব প্রাণ
ও রাঙ্গাচরণ-রজে—ভক্ত-মনোলোভা ;
সাজায়েছি স্তরে স্তরে অর্ঘ্য নিবেদন !
ভিক্ষা দাও ব্রজবাসী, করো না বঞ্চনা,
ইংরাজের জয় গাহি পূরিবে কামনা !

বাড়ুক ট্যাক্সের বোঝা, হবে ত' স্বরাজ ?
পার্লামেণ্টে বসি আলো করিব ত' মোরা,
উজলিয়া দশদিশি, খদ্যোতের তেজে—
বিদ্যুতের প্রভা ম্লান তাহে চিরদিন !
শ্রীবিলাত স্বর্গরাজ্যে বসিয়া বিরলে,
সেবিব চরণ দুটি জীবন-বাঞ্ছিত !

ভ্রান্তি-প্রমোদিনী দেবি, ওগো মায়াবিনি,
আর কিছু দাও মোরে রচিতে পাঁচালী।
করিছে গর্জ্জন রোটারী মুদ্রা-রাক্ষস,
কাপী চাই, প্রাণ যায় প্রিণ্টার-তর্জ্জনে।
বসেছে নূতন ট্যাক্স, খুলেছে বাহার,
লাখে লাখে লোক যায় কলিকাতা ফাঁকা—
ফাঁকা যথা হয়েছিল জেলের উৎসবে
স্বরাজের রণে—কিম্বা দাঙ্গার দাপটে !
পূজার আনন্দরোল উল্লাস-উৎসব,

অবসান চিরতরে—দেশে ফেরা দায়!
কন্সেসনে সেন্সেসন রেলের দয়ায়।
পূজার সওগাদে ব্যয় নিতান্ত অসার—
দেশেতে স্বজন আছে প্রতীক্ষার ব্যথা,
রেলে চ'ড়ে মারো পাড়ি ঘুচিবে বালাই!
পালাও, হাওয়া খেতে স্বাস্থ্যের নিশ্বাস—
দেশ-প্রেম সঞ্জীবন—উত্তম আহার!
কোম্পানীর আয় চাই—শাসনের ব্যয়
বেড়েছে জানো না কত—পেন্সন-পাহাড় ?
পূজার বাজার বন্ধ, সাজসজ্জা ম্লান;
কাশী আগ্রা দেওঘরে প্রমোদ-আহ্বান!
অল্প দূর গিয়া বুঝি ফাঁকি দিবে রেলে;
ত্রিরাত্রে ভারত-ঘোরা, নূতন কৌশলে,
মোটর, আহার, পাণ্ডা সব মোতায়েন;
টাকা দাও, মজা মারো, লভিবে আরাম।
আগামী কনসেশনে প্রমোদিনী পাবে,
তবু যদি দেশে যাও, স্ত্রীর লাথি খাবে!
আমরা কি করি বল অদৃষ্ট তোমার!

ছাগলে নিঃশেষ করে সাহিত্য-নন্দন!
পারিজাতরাজি সব দিব্যকান্তি-শোভা,
ফুটেছিল যে উদ্যানে অমরা-দুর্ল্লভ।
কাঁটাগাছে সমাকীর্ণ সে নন্দন আজ
খাদ্য দিয়ে পুষ্টি করে ছাগবৃত্তি-নেশা!
বিধ্বংসিয়া, প্রাচী-তীর্থ, জ্ঞানের মন্দির,
দম্ভভরে সুপ্রতিষ্ঠ কর বীররঙ্গে,
লালসা বিজলীদীপ্তি বিলাসের হর্ম্ম্য!
নূপুরের রুণুঝুণু নর্ত্তকী-চরণে
মুখর করিয়া তোল সাহিত্য-কানন।
হাব-ভাব লাস্য-হাস্যে কাম উদ্দীপনা—
প্যারিসি বিলাসে তৃপ্ত প্রমোদ-পিয়াসা।
শিক্ষিত দেশে আজও, সতীত্ব বালাই!—
মাতৃত্ব-গৌরব! সীতা সাবিত্রীর গর্ব্ব!
ইহাও কি সহ্য হয় শিক্ষাদীপ্ত প্রাণে ?
আমরা দেশের নেতা, শিক্ষিত বাঙ্গালী—
জাতির এ অপমান সহিব না আর!
আতপ-তণ্ডুল গন্ধ, হিন্দুর পুরাণে,

নাহি প্রেম-অভিনয় রামায়ণ-গানে
সাহিত্য-কলার তলে সতীত্বের বলি,
বিলাসিনী-বেশে নাচে সোনাগাছি-গলি।
বঙ্কিম জানিত কিবা প্রেমের বড়াই ?
প্রেমে নদী বহে যাক্—কামের প্রবাহ,
কলুষ দুর্গন্ধে কেন পালাও তরাসে ?
যেই মাতৃস্তন্য পানে পেয়েছি মগজ,
অপমানে প্রতিদান উপন্যাসে দিব!
নারী-উদ্দীপনা রঙ্গে সতীত্ব চূর্ণিব,
ব্যভিচার লাভাস্রোতে ধ্বংসিব সমাজ!

আপিসে বসিয়া সুখে ফ্যানের তলায়
নিদ্রা যাই মনঃসুখে, আফিম মৌতাতে;
নির্ব্বাপিত গুড়গুড়ি, ঝিমুনি প্রবল,
চমকিয়া ভীমরবে ভাঙ্গিল স্বপন,
সভয়ে চমকি ত্রাসে—বিস্ময়কৌতুকে
ভূমিকম্পে কাঁপে দেখি, সাহিত্য-মন্দির!
কাপী নাই—কাপী চাই চীৎকার হুঙ্কারে
গর্জ্জিছেন পূর্ণচন্দ্র—প্রলয় দাপটে;
কাপীরাশি ভস্ম যার ভস্মকীটদাহে,
মুদ্রারাক্ষসের পেট বিশাল প্রবল
পূর্ণ নহে, সাহিত্যের রাজ্য নিঃশেষিয়া!
কহিলাম—কাপী নাই, আছে বিড়ম্বনা
কুস্বপন! 'তাই দিন' রবে আশ্বাসিলা
বীর যবে—লিখিনু স্বপন-ঘোরে এই
বিড়ম্বনা কাব্য-রঙ্গ—ভ্রান্তির নাচন!

গড়িতে পারিনি কিছু, ভাঙ্গিব সকলি,
ইহাই ত বাহাদুরী, সাবাস্! সাবাস্!
নির্ব্বাক্ মজুর ভাঙ্গে সৌধ-হর্ম্ম্য-চূড়া;
গড়িতে শকতি কোথা অসুর-প্রকৃতি!
লঙ্কা দগ্ধ করে বীর হনুমান্ বলী—
আমাদের কীর্ত্তি-ধ্বজা তা হ'তে অধিক!
নিষ্ফল আঘাতে ক্ষুব্ধ হিমাদ্রি কি হয় ?
অটল হিমাদ্রিসম হিন্দুর সমাজ;
ইংরাজ কামান-গোলা ব্যর্থ যার পায় ?
গঠন ভাঙ্গিতে পারে আছে নানা খল;
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল!
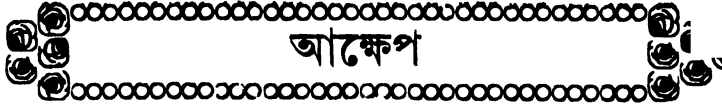
আক্ষেপ

[১]

গুরুহত্যা পাপে বঙ্গ,
হ'ল আজ ছত্রভঙ্গ,
অকালে মৃত্যুর কোলে চিত্ত পড়ে ঢ'লে।
বাঙ্গালা মশাল-করে,
ডঙ্কানাদে শঙ্খস্বরে,
ধ্বজা ধ'রে অগ্রসরে জোরে নাহি চলে।

[২]

কবিদের কচকচি,
সম্পত্তিতে জ্ঞাতি অছি,
নাবালক বঙ্গ আজি পালক-বিহনে।
দলিতা যে কলিকাতা,
হত মান নত মাথা,
প্রমত্ত প্রভু ত্ব-লোভে দলপতিগণে॥

[৩]

হতাশে সুভাষগতি,
তারে ঘেরে সপ্তরথী,
ক্ষুণ্ণ মন অভিমন্যু গুপ্তমন্ত্রণায়।
নবীন পবিত্র প্রাণ,
সহে না স্বার্থের ত্রাণ,
যন্ত্রপ্রায় চলে হায় চক্র যন্ত্রণায়॥

[৪]

জহরি হরির বরে,
উদ্দীপ্ত উত্তপ্ত স্বরে,
প্রয়াগে প্রয়োগ করে সঞ্জীবনী মন্ত্র।
বঙ্গ শুধু গায় জয়,
দেখিয়া অবাক রয়,
কনকপ্রতিম পুত্র জনকের তন্ত্র॥

[৫]

সুরেন্দ্রের একলব্য,
ক্রিয়াপ্রিয় শ্রীমালব্য,
নব্যসম কর্ম্মক্ষেত্রে আজো বিদ্যমান।
পাঞ্জাব মাদ্রাজ বম্বে,
প্রত্যেকে দাঁড়ায়ে দম্ভে,
অসাড় পড়িয়া বঙ্গ পুরুত-প্রধান॥

[৬]

কুক্ষণে আসিল দেশে,
রিফরম কম-বেশে,
বিলাতী বিস্বাদী এক বিবাদী আপেল।
রেশ তুলো পাট চুঁয়া,
ভোটের এ কূট জুয়া,
মিত্রঘাতী সর্পজাতি তিক্ত শক্তিশেল॥

[৭]

ডিপ্লোমেসি সিনিষ্টার,
সবেতন মিনিষ্টার,
বিকারে তৃষ্ণার চক্ষে রুক্ষ মরীচিকা।
ধূর্ত্ত কীর্ত্তনীয়া দল,
বিত্ততরে উৎপাগল,
পতঙ্গের প্রায় ধায় হেরে অগ্নিশিখা॥

[৮]

প্রভুত্ব চাপিলে ঘাড়ে,
ভূতের দৌরাত্ম্য বাড়ে,
হাঁড়িতে গোহাড় ফেলে অবলে জ্বালায়।
মুরুব্বীরা ভবিষ্যুক্ত,
দিব্যি তাই হয়ে মুক্ত,
ক্যান্সেল করিল দেশ কৌন্সিল-মেলায়॥

[৯]

বঙ্গে আজি যাহা ধার্য্য,
সমগ্র ভারত-গ্রাহ্য,
হবে কল্য প্রতিপাল্য বোলেছে গোখলে।
দেশ বোলে কাঁদাকাঁদি,
কায দল-বাঁধাবাঁধি,
ফাঁদে প'ড়ে হা বাংলা কি ঠকান্ ঠক্‌লে॥

[১০]

অধৈর্য্য জাগ্রত বীর্য্য,
অগ্রাহ্য রোগা গাম্ভীর্য্য,
অঙ্গ নাড়া দেছে বঙ্গে আজি যুবাজন।
দেহ কার্য্য দেহ কার্য্য,
দেহ পথ কোরে ধার্য্য,
ফুটেছে যুবক-মুখে ধ্বনি এ নূতন॥

[১১]

ছুটিতে ছুটিতে মুক্তি,
একমাত্র মনে যুক্তি,
প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি করে তিক্তজ্ঞান।
"পুরাতন কর চূর্ণ,
হবে তূর্ণ আশা পূর্ণ"
কর্ণহীন তরী হ'তে উঠে এই গান॥

[১২]

কভু বা পাঞ্জাবী পালে,
কি এলাহাবাদী দলে,
বোম্বেয়ে জুয়ারে কি মাদ্রাজী ভাঁটায়।
বঙ্গের বিজয়-তরী,
সে নিশান পরিহরি,
ঘোরে ফেরে যে যখন যেথায় পাঠায়॥

[১৩]

ইচ্ছা হয় কর তূর্ণ,
প্রাচীন সমাজ চূর্ণ,
পূর্ণ কর তরুণের উত্তপ্ত পিপাসা।
তোমার পৈতৃক ধন,
তুমি দেবে বিসর্জ্জন,
কে বা তাতে কথা কবে ফুটাইবে ভাষা॥

[১৪]

পুরাতন করে ভয়,
পাছে বঙ্গ পাছু রয়,
আগায়ে আবার গিয়ে দাঁড়াও বাঙ্গালী।
য'টা দিন আছে দেহ,
কাণে না শোনায় কেহ,
আমার দেশের ছেলে দোরের কাঙ্গালী॥

[১৫]

স্বাধীনতা-হীনতায়,
বাঁচিবারে কেবা চায়,
বলেছে বাঙ্গালী কবি প্রথম অতীতে।
মরতে অমর দান,
ভারতের জয়গান,
ফুটেছে প্রথমে যাহা বাঙ্গালীর চিতে॥

[১৬]

হৃদয়-মথিত ছন্দে,
বন্দে মাতরম্-গন্ধে,
আনন্দ-সন্ধ্যার দীপ বন্দনার গান।
সাক্ষী এ ভূগোলক,
সে আলোক সে পুলক,
শত রবি ছবি-দীপ্ত বঙ্গ কবি দান॥

[১৭]

রাজনীতি-গীতিকার,
শ্রেয়ঃ গৃহ স্মৃতিকার,
সেই সঙ্গে হাহাকার নেতার কারণ।
সেই বঙ্গ আজি চায়,
লুটাইতে পর-পায়,
দেখে বুক ফেটে যায় কে করে বারণ॥

[১৮]

ধ্বংসে যদি বংশ বাঁচে,
ডাল কেটে রাখ গাছে,
নারিকেল তুলে রেখে বসায়ো না পাম।
যা খুসী তা কর রঙ্গ,
ছেদন কোরো না অঙ্গ,
সঙ্গদোষে নাহি যায় যেন বঙ্গ-নাম॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

(শারদীয়া সংখ্যা, দৈনিক বসুমতী)
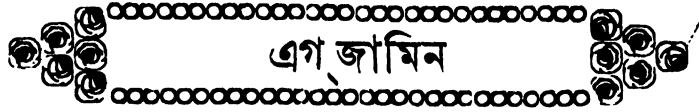
এগ্ জামিন

এই দেক্ করেছে এগজামিন,
ফি দিতে তার চেক্ জামিন।
এগজামিনে বিদ্যে জরিপ,
পাশ ক'রে হয় মেজাজ সরিফ!
এগজামিনে বিয়ের বাজার,
দর ক'সে দেয় ক'টি হাজার।
এগজামিন দে চাকুরির আশে,
ছুটোছুটি উর্দ্ধশ্বাসে।
এগজামিন দে ইকনমিক্,
রাতারাতি তৈরী বণিক্।
এগজামিনে মাপ চাকরীর সীমা,
অই এগজামিনে-ই জীবন-বীমা।
এগজামিনে পাশ করিয়ে বি, টি,
স্কুলমাষ্টার যোগায় যত সিটি।
এগজামিন দে নেচে গেয়ে,
হয় যাচাই বাছাই বিয়ের মেয়ে।
এগজামিনে সবার সেরা দাঁড়ায় ডাক্তারি,
কোথায় লাগে তা'র কাছে আজ উকীল মোক্তারি।
নাড়ী-টেপা শিঙে চাপা জিভের দেখা রং,
আটপৌরে হোয়ে গেছে সেকেলে সব ঢং।
পুতের মূতে কড়ি বোলে কথা ছিল ফাঁকা,
(এখন) মূৎ দেখে রোগ কুৎ কত্তে হয়, ভোগ দে ষোলো টাকা।
দেশে দেশে জন্মেছেন সব এক্সপার্ট অ্যানালিষ্ট,
অঙ্গে অঙ্গে রোগ-নির্ণয়ে করেন কি য্যাসিষ্ট।
চিকেগোতে ফি-খেগো এক ডাক্তার আছেন বেশ,
চুল চিরে ফুল, একজামিন করেন মাথার কেশ।
কিসের শোকে লোকের চোখে পড়ে কেমন জল,
জেগোভাল্গায় এগজামিন হয় আছে এমন কল।
কান্‌টি কেটে কামাস্কাটকায় পাঠাও পীলে রোগা,
এগজামিনে অষুধ বোলে দেবেন ডাক্তার ভোগা।
টাট্‌কা টাট্‌কা নাকটি কেটে পাঠাও জেনিভায়,
রক্তের চাপন ক'মে যাবে মুক্তির সদুপায়।
একান্নটি ভাগে কেটে য্যানাটমির অঙ্গ,
একান্নটি পীঠস্থানে পাঠাও তুমি বঙ্গ।
স্থানে স্থানে এগজামিনে রোগ নিরূপণ,
বাঁচা মরা রুগীর ভাগ্যে বিজ্ঞানের যজ্ঞ সমাপন।
কাউন্সেলেতে চ্যান্সেলরে চালায় এগজামিন,
পাশ হয়ে সব ডিগ্রী নিলে দেশ হবে স্বাধীন।

ফিঙের নাচন

ধিনিকেষ্ট ধিনিকেষ্ট—
কি মিষ্ট ম্যানিফেষ্টো রাষ্ট দেশময়।
ত্বরিতে ফির্‌লো বরাত ঢোল-সরতে গাও ভারতের জয়!
কোরে হিন্দুয়ানীর পিণ্ডিদান
হোয়ে গেছি ইণ্ডিয়ান
চণ্ডী ফেলে ব্রাণ্ডি আন্
ন্যাশনালের ফাউণ্ডেসন্ তা'তেই ভাল হয়॥
ঝাঁকিয়ে প্রাণটা কোরে চাগাড়,
সব সেকেলে কর সাবাড়,
চাড় কোরে ভাই কোল্লে যোগাড়,
পার্‌বো আছাড় মেরে ভাংতে ঐ রাংতা-সাজের প্রতিমায়॥
যদি চাও জ্যান্ত জাতীয়তা,
ঘুচিয়ে দাও অই জাতি-কথা,
করে অখ্যাতি ঐ সাহেব জাতি মাথা পাতি' সইতে হয়!
বামুনগুলো নামুন তলায়,
মাইতি মশাই পইতে গলায়
দু'হাত বেঁধে ফুলের মালায়
দিন, ষোলোর বালায় কুড়ির পোলায় প্রেমের পরিচয়!
দেশ যদি চায় হোতে নেশন,
তবে পর্‌তে হবে প্যারিস্ ফ্যাসান্
জুটুক না জুটুক রেশন,
সেসন্ সেসন্ ডিক্ল্যায়ারেসন্ জরুর কত্তে হয়।
বাপে-ব্যাটায় ডুয়েল ধন্য, ধন্য জুয়েল্ বয়॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।
(শারদীয়া সংখ্যা দৈনিক বসুমতী)

স্বরাজ-শিকার—

ইংরেজ দেবে স্বাধীনতা-ধন,
কিনতে হবে মুসলমানের মন,
তাই পণ করেছি এই অগত্যা,
গোড়ায় কোরবো ব্রহ্মহত্যা।

অন্ন-সমস্যায় অমাবস্যা—

জাহাজ-বোঝাই চাল চ'লে যায় ভেসে,
বাণিজ্য-বিস্তার দেখে নাও ভাই হেসে।
অন্ন বিনা শীর্ণদেহ হ'লে আরও ক্ষীণ ;
ইন্‌জেকৃশন তরে, দরে কিনো ভিটামিন।

প্রাণ ভ'রে পান ক'র 'রিফরম' সুধা ;
এ জনমে আর কভু নাহি পাবে ক্ষুধা।
প্রকৃতি-বিজয়ী বীর বৃটিশ পশারী।
ম্যালেরিয়া দূর করে কেনায়ে মশারি॥

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী]

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

বিচার অভিনয়—
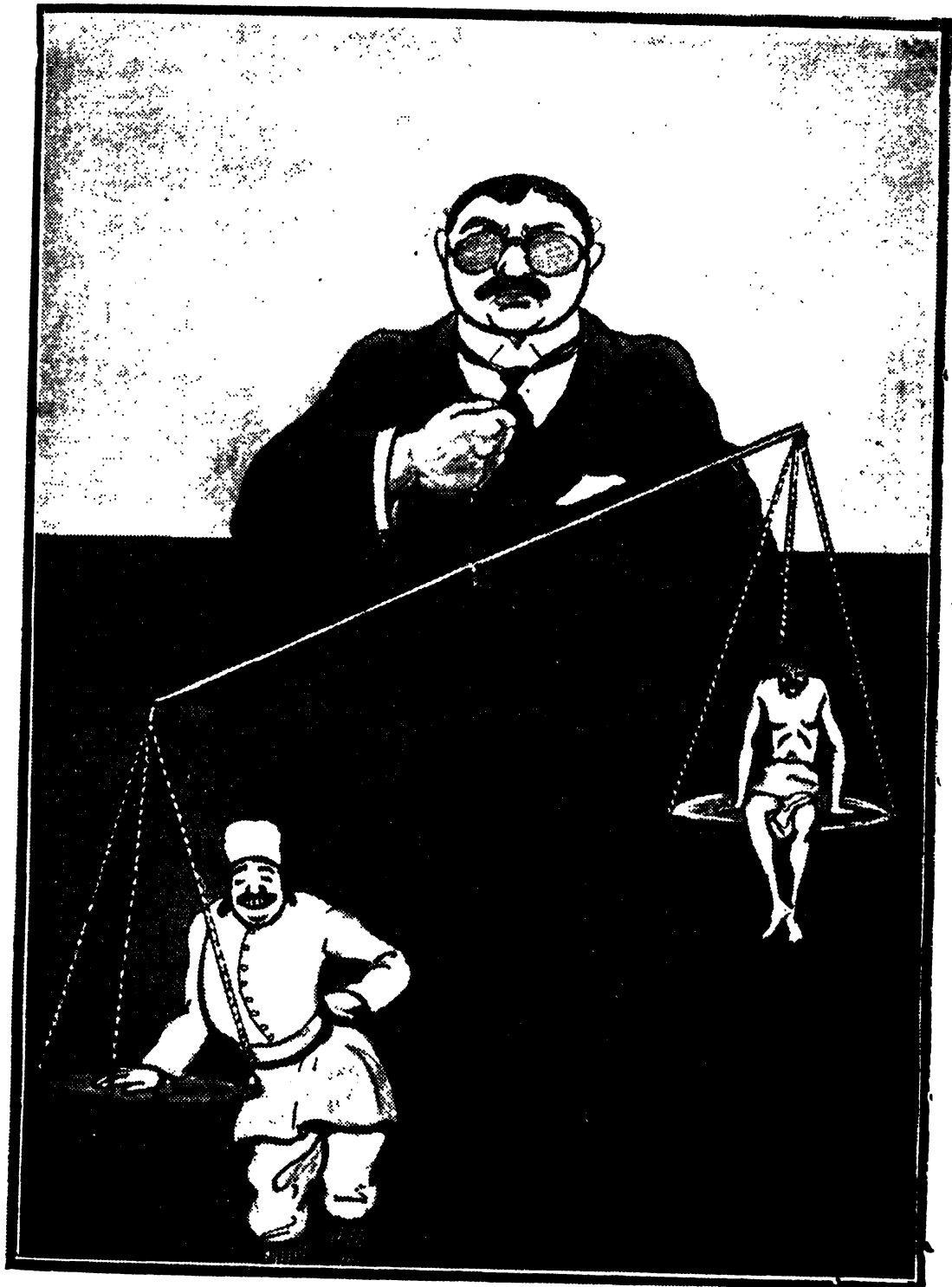
বিচারের দাঁড়িপাল্লা সাক্ষী তাতে চড়ে। হল্লার ওজনে পাল্লা ভারী হয়ে পড়ে ॥

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী]

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ ।

বঙ্গের গৃহস্থ—

হিন্দুর জীবন কাব্যে এই কবিতায় ; প্রস্ফুটিত হৃদিপদ্ম প্রেম-সবিতায়।

[শিল্পী—শ্রীসমরেন্দ্রমোহন দে।

• গুড-বাই মাদার !—
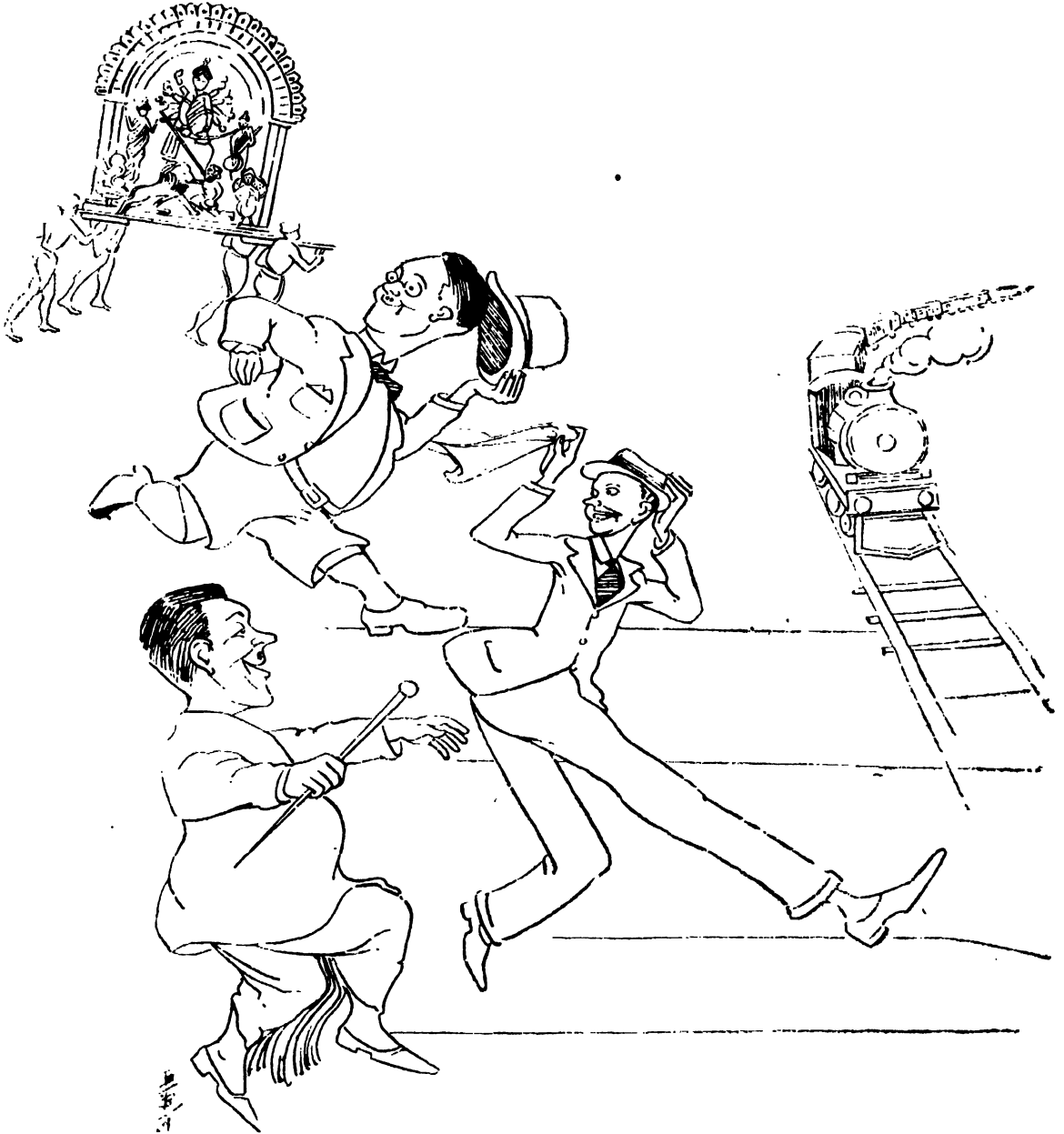
মা রইল, বউ রইল, রইল পূজোর দালান।
বাজলো ঐ রেলের বাঁশী, যাচ্ছি কাশী, আমরা যাব চালান ॥

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীনতার দান

তিন দিন বাকী আছে ষোল হোতে পূরো,
পাত্র পেয়ে মেয়েটিকে পার করে গুরো ;

পুলিসে খবর দেছে জ্ঞাতি সাতকড়ি,
ব্যাচারীর হাতে আজ তাই হাতকড়ি !

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চৌদ্দপুরুষ সাবাড়
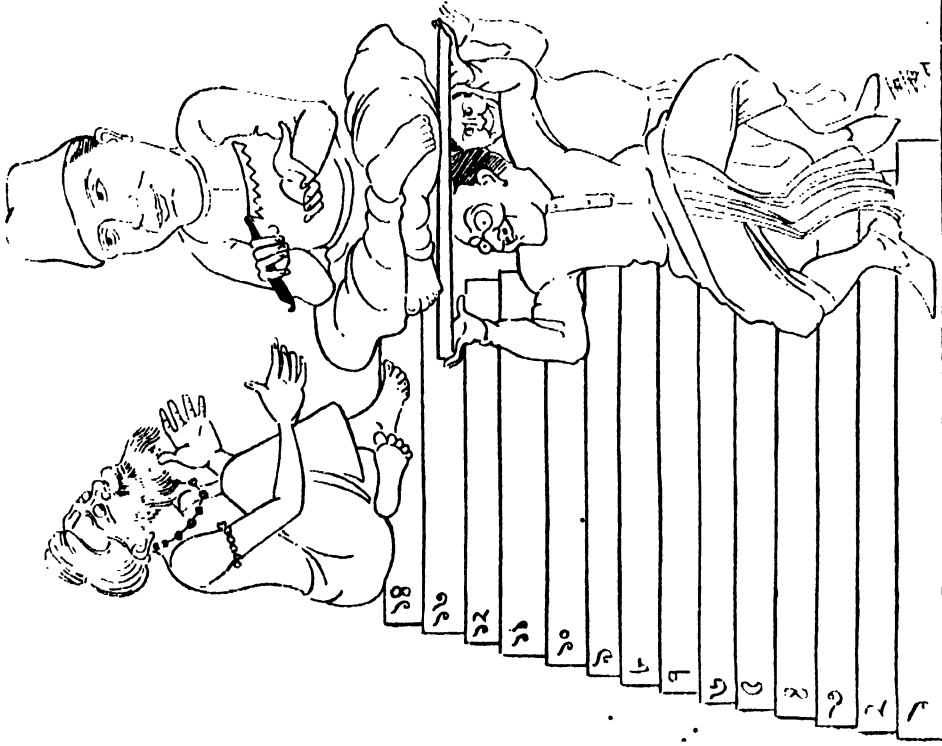
তোড়ো বাচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা তোড়ো নয়া জোয়ান।
চৌদ্দ পৈঠা উপর বৈঠা তেরা পরদাদা দেওয়ান ॥

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী] [শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মান-ভঞ্জন-

আই ঢাই, রাই-মন, সাইমন ডাকিছে
সেজে দাই, তেজে তাই, মানে ছাই মাখিছে
ৰি শিনী সেজে কালা, ভেঙ্গেছিল মান ;
নে র, নেহার, নারী সাজে কেবা জান !

দীয় দৈনিক ব মতী] [শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

ভারতের অপবাদ

লর্ড মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড কর্জ্জন লর্ড লিটন পর্য্যন্ত অনেক ইংরাজ মহাপুরুষ ক্ষণে অক্ষণে ভারতের ও ভারতবাসীর অযথা মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া গিয়াছেন। অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, সাইমন কমিশনের সমক্ষে কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী যে ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন এই ভাবে ভারতবাসীর কুৎসা প্রচার করিলে এই শ্রেণীর জীবের তৃপ্তি হয়। কেবল তাহাই নহে, তাহারা কেবল নিজের তৃপ্তির জন্য এমন ভাবে পরের কুৎসা প্রচার করিয়া আনন্দলাভ করিলে ভারতবাসী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিত না, সঙ্কীর্ণ নীচমনা লোকের স্বভাবই এই মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত; কিন্তু এই কুৎসা প্রচারের পশ্চাতে গুপ্ত ইঙ্গিত আছে বলিয়া এ সম্বন্ধে ভারতবাসী কখনও কখনও বিচলিত হয়।

বোম্বাই প্রদেশের পুলিসের ইনস্পেক্টর-জেনারল মিঃ গ্রিফিথস্ সাইমন-সপ্তকের সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন, "ভারতীয় মন্ত্রিগণের হস্তে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার ভার অর্পণ করা যাইতে পারে না; কারণ, তাঁহারা পক্ষপাতিত্ব-দোষ-রহিত হইয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ, পরন্তু সঙ্কটজনক অবস্থায় যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম।" অর্থাৎ তাঁহার মতে এ দেশের লোক সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতায় এরূপ আচ্ছন্ন যে, তাহারা নিরপেক্ষভাবে ও সমদর্শিতার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, তাঁহার মুখ আছে, অর্গল দিবার কেহ নাই, কমিশন ও তাঁহাদের তাঁবেদার কমিটীও এই উক্তির প্রমাণ দিতেও তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই, কাযেই তিনি যে বে-পরোয়া এই ভাবে ভারতবাসীর অযোগ্যতার কথা ঘোষণা করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্তু যদি তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, তিনি ভারতের কোন্ প্রদেশে কবে ভারতীয় মন্ত্রীর এই একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিতার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি জবাব দিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবেন। ইংরাজ এ দেশে আসিবার পূর্ব্বেও যে এ দেশের লোকের হাতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল, আর তাহারা যে সেই ভার যোগ্যতার সহিত পালন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ তাঁহারই দেশের ইতিহাস-লেখকের রচনায় পাওয়া যায়!

ইহা ত গেল এক প্রকৃতির মিথ্যা অপবাদ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরও এক প্রকার ভীষণ প্রকৃতির মিথ্যা অপবাদ আছে। সেই অপবাদ কিছু দিন পূর্ব্বে মেয়ো-পিলচার কোম্পানীর লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ক্যাথারিণ মেয়ো ও জর্জ্জ পিলচার ভারতবাসীর মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া যে কীর্ত্তি-ধ্বজা উড়াইয়াছে, তাহার কথা ভারতবাসীর সুবিদিত। উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহাদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদও যথেষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে লালা লাজপৎ রায় অগ্রণী হইয়া একখানি গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন। আরও এক জন ভারতবাসী গ্রন্থ রচনা করিয়া ক্যাথারিণ মেয়োর মুখের মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বিলাত হইয়া মার্কিণে পদার্পণ করিয়া ভারতের প্রকৃত চিত্র মার্কিণবাসীদের দৃষ্টির সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

মহাত্মা গন্ধী ক্যাথ্যারিণ মেয়োকে 'ড্রেণ-ইনস্পেক্টর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। এ হেন জীব ভারতের দয়ার পাত্র। ভারতের কুৎসা রটাইয়া যদি কেহ 'দু'পয়সার' সংস্থান করিতে পারে, তাহাতে হৃদয়বান্ লোক বাধা দিতে চাহে না। তবে মিথ্যার বিপক্ষে সত্য প্রচারও প্রয়োজন। সে হিসাবে শ্রীমতী সরোজিনী মার্কিণ দেশে বক্তৃতা দিয়া মার্কিণ জাতির অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিতে গিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অসাধারণ শক্তিশালিনী বাগ্মী। তাঁহার বক্তৃতার প্রভাবে দক্ষিণ-আফরিকার য়ুরোপীয় কর্ত্তারা মতপরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহার এই পরিশ্রম করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কেন না, এই ক্যাথারিণ মেয়োর নিজের দেশের লোকই তাহার কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, মার্কিণ দেশের মত সন্তান-প্রসবকালে প্রসূতির মৃত্যুর এত অধিক হার ভূমণ্ডলে কুত্রাপি নাই। অথচ ক্যাথারিণ মেয়ো এ সম্বন্ধে ভারতকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ভারতীয় প্রসূতির দুঃখে হা হুতাশ করিয়া বুক চাপড়াইয়াছিল!

ব্যাপারটা এই। মার্কিণ দেশে একটি সাধারণ স্বাস্থ্য-সমিতি (Public Health Association) আছে। এই সমিতি সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন,—"The mortality arising from child-birth is greater among American women than among any other nation." অর্থাৎ, জগতে যত জাতির প্রসূতি সন্তান-প্রসবকালে ইহলোক ত্যাগ করে, তন্মধ্যে মার্কিণ প্রসূতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ক্যাথারিণ মেয়ো ইহার বিপরীত কথাই ঘোষণা করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল,—(১) প্রসূতির মৃত্যুর হার ভারতবাসীদের মধ্যেই সমধিক, (২) ভারতের 'দাই'-(ধাত্রী) গুলার মত অশিক্ষিত, অকর্ম্মণ্য, সর্ব্বনেশে দাই ভূভারতে কোথাও নাই। তাহাদের হস্তে প্রসূতির ভারার্পণ করা—যমের হস্তে ভারার্পণ করারই সমতুল, (৩) ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারের নিতান্ত অভাব ভারতীয়দের মধ্যে অনুভূত হয়, (৪) যদিই বা ডাক্তার পাওয়া যায়, তাহা হইলেও ভারতীয় অভিভাবকরা এত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন যে, ডাক্তারকে দিয়া প্রসূতির চিকিৎসা করান লজ্জার বিষয় ও অপমানজনক বলিয়া মনে করে।

ইহা ঘোষণা করিয়া ক্যাথারিণ মেয়ো প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল যে,—প্রতীচ্যবাসীরা সভ্য, শিক্ষিত, আমরা অসভ্য ও অশিক্ষিত ; তাহারা লক্ষগুণে প্রকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ, আমরা লক্ষগুণে নিকৃষ্ট। কিন্তু এমনই ধর্ম্মের কল যে, উহা বাতাসে নড়িয়া উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞ উক্ত মার্কিণ সমিতিই বলিতেছেন,—"আমাদের দেশে ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কর্ম্মক্ষম লোকের (Qualified men) বিশেষ অভাব। আমাদের মাতৃমঙ্গল হাসপাতালসমূহে সুপটু চিকিৎসার (Skilled treatment) অত্যন্ত অভাব। আমাদের প্রসূতি হাসপাতালের ধাত্রীগুলা (nurses) একবারে অজ্ঞ (unskilled), এই হেতু আমাদের প্রসূতির মৃত্যুর হার এত অধিক।"

ক্যাথারিণ মেয়োর মিথ্যা বড়াই কোথায় রহিল ? মার্কিণের এ অবস্থার তুলনায় আমাদের ভারতের অবস্থা স্বর্গ বলিলেই হয়। ক্যাথারিণ মেয়োর নিজের ঘরে যে গলদ রহিয়াছে, তাহা সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া সে পরের গলদ বাহির করিয়া তাহাদের দুঃখে চোখে 'সাঁতার পানি' বহাইয়াছে ! কবি মনোমোহন গাহিয়াছেন, "ঘর দেখ্‌তে কাণা তুমি, পর দেখতে খোলো আঁখি দুটো।" মেয়োর শ্রেণীর নরনারীর কথা ভাবিয়া যে তিনি এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই !

মার্কিণ দেশের স্বাস্থ্য-সমিতি আরও লিখিয়াছেন,—"আদিম-নিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সন্তানপ্রসবকালে প্রসূতির মৃত্যু নাই বলিলেই চলে। তাহাদের পরে পর পর ইটালিয়ান, শ্লাভ এবং আইরিশ জাতীয় প্রসূতিদিগকে ধরা যায়। ইহাদের মধ্যেও সন্তানপ্রসবকালে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অল্প।" পরন্তু আমরা জানি, রেড-ইণ্ডিয়ান নরনারীর মত সুস্থ সবল দীর্ঘায়ু মানুষ মার্কিণ বা য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে নাই। প্রায়ই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায় যে, রেড-ইণ্ডিয়ান নরনারী শতবর্ষের উপরও বাঁচিয়া আছে। শুধু বাঁচিয়া থাকা নহে, পূর্ণ-স্বাস্থ্য উপভোগ করিয়া বাঁচিয়া আছে। ক্যাথারিণ মেয়ো এই রহস্তের সন্ধান জানেন কি ? বিজ্ঞানের বেড়া-ঘেরার মধ্যে থাকিয়া সুসভ্য সুশিক্ষিত মার্কিণ জাতি যাহা সাধ্যের আয়ত্ত করিতে পারে না, অসভ্য অশিক্ষিত আদিমনিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ান তাহা আয়ত্তাধীন করে কিরূপে ?

যে ভারতের কুকথায় ক্যাথারিণ মেয়ো পঞ্চমুখী হইয়াছিল, সেই ভারতীয়রাও যখন সংযম ও নিয়ম পালন করিয়া ধর্ম্মপথে পরিচালিত হইত, তখন তাহাদের মধ্যে শতায়ু পুরুষ ও নারী (ঋষি ও ঋষিপত্নী) দেখা যাইত বলিয়া কথিত আছে। বিকৃত শিক্ষার ফলে, বিজাতীয় বিধর্ম্মী আবহাওয়ার সংস্রবে ভারতবাসী সেই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া তাহার আজ এই দুর্দ্দশা। রেড-ইণ্ডিয়ানরা এখনও প্রাচীনকালের সরল সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই বলিয়াই এখনও সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হইতে সমর্থ হয়। আমাদের এই ভারতেও প্রাচীনকালের ধাত্রী ও বর্ষীয়সী গৃহিণীগণের বিধাতৃদত্ত যে ধাত্রীবিদ্যার ও সন্তানপালনবিদ্যার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল, এখনকার শিক্ষিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ধাত্রীদিগের মধ্যেও তাহা দুর্লভ। আমাদের প্রাচীনকালের ধাত্রীরা কিরূপ সহজ উপায়ে অতি দুরূহ ক্ষেত্রেও সন্তান প্রসব করাইত এবং নাড়ী কাটিতে মাত্র বাঁশের চেঁচাড়ি ব্যবহার করিত, তাহা এখনও অনেকে বিস্মৃত হন নাই। বর্ত্তমান কালের বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞ ডাক্তাররাই বলেন, তাজা চেঁচাড়ির মত দোষ-লেশ-শূন্য অস্ত্র নাই বলিলেই হয়, ইহার সহিত ধাতব অস্ত্রের তুলনা হয় না।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসাশাস্ত্রে রজস্বলা নারীকে এবং প্রসূতিকে বিষ-নারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সে জন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এ সংবাদ সংগ্রহ করিবার আগ্রহ কখনও ক্যাথারিণ মেয়োর হইয়াছিল কি ? অথচ তিনি এক নিশ্বাসে ভারতের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা উদ্গার করিয়া দিতে লজ্জানুভব করেন নাই !

যে কারণে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের মধ্যে গৃহ-চিকিৎসার বিদ্যা (টোটকাটুটকির বিদ্যা) লোপ পাইয়াছে, যে কারণে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের মধ্যে প্রাচীন যুগে নির্দ্দিষ্ট ঋতুর পরিবর্ত্তনানুযায়ী নিয়মকানুন পালনের ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে, সেই কারণে হয় ত তাঁহাদের মধ্যে বিধাতৃদত্ত ধাত্রীবিদ্যার জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সে জন্য আমরা উদাসীন নহি। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট, আমাদের অন্ধ কুসংস্কার অনেক আছে, এ কথা আমরা কখনও অস্বীকার করি না। আমাদের প্রসূতি-চিকিৎসার বা ধাত্রীবিদ্যায় কিম্বা সূতিকাগারের ব্যবস্থায় কোন দোষ বা ত্রুটি নাই, এমন কথা আমরা কখনও বলি না। বরং আমরা এ বিষয়ে সংস্কারের প্রয়াসী। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই সংস্কার-কামনা বর্ত্তমানে বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে ছায়াচিত্রাদি প্রদর্শন করিয়া, শিশু ও মাতৃমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া অবস্থার উন্নতিসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। ক্যাথারিণ মেয়ো কিন্তু নিজের দেশের প্রকাণ্ড ছিদ্র চাপিয়া রাখিয়া পরের দেশের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিদ্যা কিন্তু তাঁহার দেশবাসীই ধরাইয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে, প্রকৃতির প্রতিশোধ !

হিংসা বনাম অহিংসা

মহাত্মা গন্ধীর প্রতি আপামর হিন্দুসমাজের যতই শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকুক, 'নবজীবন' পত্রে তাঁহার হিংসা ও অহিংসার ব্যাখ্যা সকলে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সবরমতী আশ্রমে একটি পীড়িত বৎসতরের ভবযন্ত্রণার অবসানের জন্য তাহার শরীরে কোন এক বিষ ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে আমেদাবাদের মহাজন সভার প্রেসিডেণ্ট ও অপর কয় জন গণ্যমান্য সহরবাসী তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া এ বিষয়ে অনুযোগ করিয়াছিলেন। প্রতীচ্যে পীড়িত বা আহত কুকুর ও অশ্বদিগকে গুলী করিয়া মারিয়া তাহাদের ভবযন্ত্রণার অবসান করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই মনোবৃত্তিকে তাঁহারা humanity দয়া ও মানবতার দিক হইতে সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা প্রাচ্যদেশবাসী হিন্দু, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব এই মনোবৃত্তি হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিয়াছে। বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে গো-হত্যা যে দিক্‌ দিয়াই হউক, কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না। সুতরাং মহাত্মা গন্ধীর সবরমতী-আশ্রমে তাঁহারই অনুমতি ও সমর্থনক্রমে যদি

এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সে জন্ম নিশ্চিতই দায়ী—এ কথা হিন্দুসমাজ তাঁহাকে জানাইয়া নিশ্চিতই অনুযোগ করিতে পারে। মহাত্মা গন্ধী এই দায়িত্ব অস্বীকার করেন নাই; পরন্ত বলিয়াছেন,—"জনসাধারণ এই কার্য্যে হিংসার পরিচয় পাইয়াছে বটে, কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কায করিতে গেলে জনসাধারণের মুখ চাহিলে চলে না। আমি যাহা ধর্ম্ম ও ন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, অন্যে তাহা হয় ত অধর্ম্ম ও অন্যায় বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আমি অতীতের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি যে, যাহা আমি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব, তাহা অবশ্যই করিব। বৎসতর যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহা হইতে তাহাকে আশু মুক্তি দেওয়া আমি ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। তাহার ইহলীলার অবসান করিয়া দেওয়া হিংসার পরিচায়ক নহে, বরং অহিংসা-প্রণোদিত বলিয়াই বিবেচনা করি।" কেবল ইহাই নহে, মহাত্মা গন্ধী পশুর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে চাহেন, মানুষের সম্বন্ধেও তাহা করিতে প্রস্তুত।

কথাটা বিশেষ সমস্যার বলিয়া ধরিতে হইবে। এক দিকে মহাত্মা গন্ধীর ন্যায় সর্ব্বজনমান্য যুগপুরুষের উক্তি, অন্য দিকে হিন্দুজাতির জন্মগত সংস্কার ও ধর্ম্মোপদেশ। মহাত্মা গন্ধীর প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধায় আমরা কাহারও পশ্চাৎপদ নহি। তিনি আমাদের মত জীবন্মৃত জাতির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আনিয়া দিয়াছেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত অশিক্ষিত জন সাধারণের একটা ভাবের মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন,—ইহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ। কিন্তু তাহা বলিয়া যখন তাঁহার মতের সহিত আমাদের হিন্দুর জাতীয় সনাতন ভাব-ধারার অনৈক্য উপস্থিত হইবে, তখন আমরা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম সহকারে তাঁহার ত্রুটি দেখাইয়া দিতে পরাঙ্মুখ হইব না, হইলে আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। অবশ্য তিনি যাহা সত্য পথ বলিয়া মনে করিতেছেন, সেই পথেই চলিতেছেন। কিন্তু তিনি একটা কথা কেন বিবেচনা করেন নাই, বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তিনি চিরকাল হিন্দু বলিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন। আমরাও এই সত্যসন্ধ যুগপুরুষকে হিন্দু বলিয়া জানিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া থাকি। তিনি হিন্দু, হিন্দুর কর্ম্মফল অবশ্যই মানিয়া থাকেন। কর্ম্মফলে দেহী বা প্রাণিমাত্রেই দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যত দিন দেহী বা প্রাণীর দেহের ভোগ থাকিবে, বিধাতার বিধানে সেই ভোগ তাহাকে ভুগিতেই হইবে, খোদার উপর খোদকারী করা হিন্দুর জন্মগত সংস্কারের বিরোধী। বিশেষতঃ যে প্রাণ দিতে পারে না, সে প্রাণ লইবে কি হিসাবে, কোন্ সাহসে? বৃদ্ধ পিতামাতা যদি রোগ-যন্ত্রণায় বহুদিন ভুগিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গুলী করিয়া বা বিষপ্রয়োগ করিয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান করায় যদি মানবতার পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা ত আমাদের বুদ্ধির অতীত। ধর্ম্মের দিক দিয়া ধরিলে কর্ম্মফল মাথা পাতিয়া লইতেই হয়, সেখানে হিংসা অহিংসার কথা আসিতেই পারে না।

আর একটা কথা। মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, যে রোগাতুর বা আহত দেহীর প্রাণের কোনও আশা নাই, তাহার কষ্টময় জীবন দীর্ঘ করায় কোন ফল নাই। কিন্তু প্রাণের আশা কত ক্ষণ থাকে বা না থাকে, তাহা জীবনমৃত্যুর রহস্যে অনভিজ্ঞ মানুষ কিরূপে অবধারণ করিবে? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, ডাক্তার-কবিরাজ যাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে-ও অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। তবে? এ সমস্যার মীমাংসা মহাত্মা গন্ধী কিরূপে করিবেন?

স্বাধীনতাসঙ্ঘ ও পূর্ণ স্বাধীনতা

লক্ষ্ণৌ সহরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীনে একটি স্বাধীনতাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ভারতের নানা প্রদেশে উহার শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌএর সর্ব্বদল-সম্মিলন নেহেরু রিপোর্টের অনুযায়ী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা-সঙ্ঘ মান্দ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত স্বাধীনতা-মন্তব্য গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌএর সর্ব্বদল-সম্মিলনের সিদ্ধান্তকে প্রকারান্তরে নিম্নস্তরে স্থান দান করিয়াছেন।

স্বাধীনতাসঙ্ঘের গৃহীত মন্তব্য এই যে,—পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের লক্ষ্য ও কাম্য হওয়া উচিত। তাঁহাদের কার্য্যসূচি তিন দফায় বিভক্ত হইয়াছে;—অর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং সামাজিক। অর্থাৎ কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা তাঁহাদের কাম্য নহে, অর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের প্রয়াসী। অবশ্য সামাজিক স্বাধীনতার মধ্যে ধর্ম্মগত স্বাধীনতাকেও ধরা হইয়াছে।

অবশ্য স্বাধীনতা যে মানুষ ও জাতিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার ও কাম্য, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, অন্ততঃ যাহার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সে-ই এ কথা স্বীকার করিবে। তবে ব্যবহারিক জগতে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ভারতে এখন কোন নীতি অবলম্বনীয়, তাহাই বিচার্য্য। রাজনীতিক্ষেত্রে নিরস্ত্র দুর্ব্বল দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যে সমধিক শক্তিশালী প্রবলপ্রতাপ ইংরাজের বিপক্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম করা (অহিংসার পথে ত নহেই, হিংসার পথে প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে) সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের দাবী করাই যে ভারতের পক্ষে সমীচীন, ভারতের সকল দলের অধিকাংশ নেতাই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবাসী স্বাধীনতাকে আদর্শ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উহাকে লক্ষ্য করিয়া মুক্তি-সমরে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত নহে।

দ্বিতীয় দফার রাজনীতি-সংক্রান্ত স্বাধীনতা অথবা প্রথম দফার অর্থনীতি-সংক্রান্ত স্বাধীনতা (যথা—অর্থগত অসামঞ্জস্য দূর করা ইত্যাদি) সম্পর্কে বাদানুবাদের কারণ যত না থাকুক, তৃতীয় দফার সামাজিক স্বাধীনতার প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইবার কথা। এই দফার ৪টি প্রধান উপদফা—(ক) জাতি বা বর্ণ, (খ) নারী, (গ) বিবাহ, এবং (ঘ) পৌরোহিত্য। স্বাধীনতা-সঙ্ঘ তাঁহাদের প্রস্তাবের মারফতে (১) অস্পৃশ্যতা পরিহার, (২) আন্তর্জ্জাতিক ভোজন ও বিবাহ, (৩) নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা, (৪) নারীর বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও

ব্যায়ামচর্চ্চা, (৫) বিধবা নারীর পুনর্ব্বিবাহ, (৬) বহু বিবাহ রোধ, (৭) প্রদেশে প্রদেশে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন, (৮) বাল্যবিবাহ রোধ, (৯) পণপ্রথা নিবারণ, (১০) বংশানুক্রমিক গুরু পুরোহিতের ব্যবস্থা রোধ, (১১) পূজার্চ্চনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—এই কয়েকটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, স্বাধীনতাসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আমাদের সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন ওলটপালট করিতে চাহেন। কালের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী যুগে যুগে সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, এ কথা আমরা কখনও অস্বীকার করি না। কিন্তু জাতির যে সনাতন ভাবধারা জাতির বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া আসিতেছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইলে জাতি বর্ণসঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। এই হেতু স্বাধীনতাসঙ্ঘের এই সামাজিক পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থার অনুমোদন এ দেশবাসী কখনই করিবে না, এ কথা আমরা দৃঢ়স্বরে বলিতে পারি।

সঙ্ঘের কার্য্যতালিকা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা রুসিয়ার বৈপ্লবিক যুগের কমুনিষ্টদিগের কর্ম্মসূচির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রতীচ্যে গিয়া সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছেন, তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কমুনিষ্টদিগের প্রথম আমলের সামাজিক পরিবর্ত্তন কি স্থায়ী হইয়াছে? কার্ল মার্কস যখন তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, এবং যুগপ্রবর্ত্তক লেনিন যখন রুসিয়ায় বলশেভিক নীতির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন হইতে লেনিনের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রুসিয়ান সমাজে যে ভীষণ ওলট-পালট হইয়াছিল, তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ। জমী-জমা, অর্থ-সম্পত্তি,—এমন কি নারীকে পর্য্যন্ত জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার সঙ্কল্প এক সময়ে হইয়াছিল। তখন রুসিয়ায় কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা স্ত্রী-কন্যা বলিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার ছিল না, সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্ক। অবশ্য যতটা রটিত হইয়াছিল, ততটা সবই যে সত্য, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু তাহার কতকটা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু সেই ভীষণ ওলট-পালট রুসিয়ার সমাজ অবাধে গ্রহণ করিতে পারে নাই। লেনিন তাঁহার জীবদ্দশাতেই সমাজকে ক্রমশঃ বিধি-নিষেধের অনুযায়ী করিয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে রুসিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তারা বুঝিয়াছিলেন,—"রাজ (State) যতই দেশের বালক-বালিকাকে আশ্রয় ও আহার্য্য দান করুক, সে কখনও পিতামাতার স্থান পূর্ণ করিতে পারে না। সন্তান-প্রজনন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে রুসিয়ার বর্ত্তমান (বলশেভিক) রাজ যতই উৎসাহ প্রদান করুক, এখনও কিন্তু উৎপন্ন সকল সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।" এই হেতু তাঁহারা ক্রমে আবার প্রাচীন প্রথা অনুসারে বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে এবং পিতামাতার উপর সন্তানের দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অভিজ্ঞতার ফলে যাঁহারা ক্রমশঃ "বিজ্ঞ" হইয়াছেন, সেই বলশেভিক নেতারা এখন রহিয়া সহিয়া ওলট-পালট ব্যবস্থায় সায় দিতেছেন। এক জন বলশেভিক কমিশার-অফ জাষ্টিস বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান বিবাহ-ব্যবস্থার অরাজকতা বন্ধ করিতেই হইবে। আমরা মাতলামি নিবারণে যতটা শক্তি নিয়োজিত করিতেছি, তাহার একার্দ্ধও আমাদের নরনারীর লজ্জাকর অশ্লীল যৌন-সম্বন্ধ রদ করিবার জন্য করিতেছি না। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে?"

তবেই দেখা যাইতেছে, প্রথম উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লবের মুখে রুসিয়ার সমাজে যে ওলট-পালট আসিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে—সেই প্রথম উন্মাদনা অপসারিত হইয়া এখন মস্তিষ্কের স্থিরতা দেখা দিতেছে। যে ধর্ম্ম ও সমাজ-বন্ধনের উপর মানুষের সমাজের অস্তিত্ব আবহমান কাল হইতে নির্ভর করিতেছে, তাহা বিপ্লবের প্রথম মুখে আমূল ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন ক্রমশঃ সেই মনোবৃত্তি অন্তর্হিত হইতেছে, রুসিয়া আবার আপনাকে খুঁজিয়া পাইতেছে। এখন পূর্ণ Communism এর পরিবর্ত্তে Individualism, National propertyর স্থলে Private property স্বীকৃত হইতেছে, বলশেভিজমের কায়ার পরিবর্ত্তে এখন ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিয়া যাইতেছে। আমরা সমাজবদ্ধ জীব, নিত্য যেমন খাই-দাই, আবার তাহার নিকট দায়ীও থাকি, তেমনই রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারের অধীনে রুসিয়ার প্রজাও হইতেছে। প্রকৃতির ব্যতিক্রম মনুষ্য-সমাজের ধাতুসহ কোথাও অধিক দিন হয় না, ভবিষ্যতেও হইবে না।

এই হেতু আমাদের আশা হয়, এই যে স্বাধীনতাসঙ্ঘের প্রথম মুখপাতে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আবিল পঙ্কিল বন্যার জল দেশ প্লাবিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা কালে শান্ত ও সংযত হইলে হয় ত পলিমাটী উপহার দিয়া দেশকে উর্ব্বর করিবে। ইহার লক্ষণও দেখা দিতেছে। ইতোমধ্যেই ইহার মূল ও শাখা-প্রশাখার মধ্যে কার্য্যপদ্ধতি উপলক্ষে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

সাইমন কমিশন

বিলাতের পার্লামেণ্ট যে সাত জন 'বিজ্ঞ' ইংরাজকে আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সাইমন-সপ্তক এ দেশে আসিয়া নানারূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। এই সপ্তর্ষি যখন তাঁহাদের কার্য্যের 'মুখপাত' করিতে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের এ দেশে যেরূপ অভ্যর্থনা হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ হইতেছে। স্বরাজ সকল জাতিরই জন্মগত অধিকার, সেই অধিকার কেহ কাহাকেও দিতে পারে না বা কেহ কাহারও নিকট ভিক্ষা করিয়া দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং ভারতবাসীকে স্বয়ং তাহার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অবসর বা সুযোগ না দিয়া বিজাতি বিধর্ম্মী শাসকজাতির পক্ষ হইতে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার এই যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার সহিত প্রকৃত দেশহিতকামী ভারতবাসীর কোনও সংস্রব থাকিতে পারে না, থাকাও উচিত নহে।

তবে এ দেশে সকলই সম্ভব। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী এবং আপ-কি-ওয়াস্তে যো-হুকুমের দলের এ দেশে অভাব নাই। এই হেতু সাইমন-সপ্তকের সহিত 'সহযোগ' করিবার লোকেরও অভাব হয় নাই। প্রবলপ্রতাপ ভারত সরকারের মন যোগাইয়া

চলিলে অনেকের 'আপনার কোলে ঝোল টানিবার' সুবিধা হইতে পারে, এই ভাবের ভাবুককে লইয়া সহযোগ-কমিটী সমূহ গঠন করিবার পথে অথবা কমিশনকে অভ্যর্থনা করিবার পথে কাঁটা পড়ে নাই। কাউন্সিল সমূহের সরকারী সদস্য, মনোনীত সদস্য, এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক স্বার্থচালিত মুসলমান সদস্য এবং অন্য এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক স্বার্থচালিত অনুন্নত সমাজের সদস্যের সমবায়ে প্রাদেশিক সহযোগ-কমিটী সমূহ গঠনে বাধা পড়ে নাই। পরন্তু প্রবলপ্রতাপ সরকার বাহাদুরের নানারূপ উপায় গ্রহণে সাইমন-সপ্তকের অভ্যর্থনার জন্য দুই চারি জন দর্শকের ও উদ্যোক্তারও অভাব হয় নাই। সুখের বিষয়, কেন্দ্রীয় পরিষদ হইতে সহযোগ-কমিটী গঠিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে, তাহা কায়া নহে, ছায়া, সরকারের হাতে গড়া জিনিষ মাত্র।

এবারের অভ্যর্থনার উদ্যোগপর্ব্ব অতি চমৎকার। এবার যে স্থানে কমিশন পদার্পণ করিতেছেন, সেই স্থানেই সরকার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। অনেকে বলিতেছেন, পাছে বর্জ্জনকারীরা শোভাযাত্রাদি করিয়া সাইমন-সপ্তকের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করে, সেই জন্য এই আইন জারী করা হইতেছে। এই আইনের ভয়ে ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে শোভাযাত্রাদিতে যোগদান করিতে সাহসী হয় না। তাহার কারণ এই যে, এ দেশের অধিকাংশ লোক নিরীহ, দরিদ্র এবং পুলিসের সহিত কোনরূপ হাঙ্গামাহুজ্জৎ করিতে অনিচ্ছুক। তাহারা অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত। সুতরাং তাহারা জানে, তাহারা যতই কেন হিংসারহিত হইয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করুক না এবং 'সাইমন তোমায় চাই না, তুমি ফিরিয়া যাও' বলিয়া আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুক না, ১৪৪ ধারার অস্ত্রে সজ্জিত পুলিস ছুঁইলেই 'আঠারো ঘা'র' সম্ভাবনা সমধিক। এই হেতু তাহারা যে ভাবে বিরাট প্রতিবাদ-শোভাযাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা করিতে পারে নাই। তথাপি বোম্বাই, পুনা ও লাহোরে বর্জ্জনের শোভাযাত্রা রুদ্ধ হয় নাই। সাইমন-সপ্তক তাহাতেই বুঝিয়াছেন, এ দেশের জনসাধারণ তাঁহাদের সহিত সহযোগের কিরূপ পক্ষপাতী।

ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ কমিশনের বিপক্ষ দলের বহর সাইমন-সপ্তকের গোচর করিতে চাহেন না। তাঁহারা একরূপ 'ঘেরাটোপে' ঢাকিয়া কমিশনকে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে পথে কমিশন যাইবে, সেই পথ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া বর্জ্জনকারীদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। এমন কি, লাহোর ষ্টেশনে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া জনতাকে কমিশন হইতে তফাতে রাখা হইয়াছিল। আর অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিস রণসাজে সাজিয়া নিরস্ত্র অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত জনতাকে ভীত, চকিত বিধ্বস্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। লাহোরে পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং নেতৃত্ব করিয়া জনতাকে কমিশন হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে পরে জনতার উপর পুলিসের লাঠি চলিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। এমন কি, পঞ্জাব-নেতা লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ কয় জন নেতাও পুলিসের লাঠি ও গুঁতা খাইয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বয়ং লালা লাজপৎ রায় বলিয়াছিলেন যে, "পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং তাঁহার দলবল জনতার উপর চড়াও হইয়াছিল। অহিংস নিরস্ত্র জনতার উপর এই আক্রমণ কাপুরুষোচিত হইয়াছিল।" সুতরাং সাইমন-সপ্তককে জনতার প্রতিবাদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে রক্তপাতও করিতে হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লাজপৎ রায়কে এই ভাবে অপমান করা আর ভারতের অপমান করা এক ব্যাপার। এই অনাচারে ভারতের আত্মসম্মান আহত হইয়াছে। আমলাতন্ত্র সরকার ভারতের এই অপমানের পরও ভারতের মঙ্গলের জন্য কেন্দ্রে কেন্দ্রে কমিশন প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, যদি এই কথা বলেন, তাহা হইলে তাহার মূল্য কতটুকু, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

সার জন সাইমন

ইহা ত গেল অভ্যর্থনা পর্ব্ব। তাহার পর সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব্বও ইহার অনুরূপ। যাঁহাদের হস্তে সাক্ষ্যের উপকরণ সংগ্রহের ভার ন্যস্ত, যাঁহারা উপকরণ (সাক্ষ্য) যোগান দিতেছেন এবং যে ভাবে উপকরণ (সাক্ষ্য) গ্রহণ করা হইতেছে, তাহার পরিচয় দিন দিন কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

যিনি সাইমন সপ্তর্ষির প্রধান ঋষি, সেই সার জন সাইমনের 'ঠিকুজী কুলজী' অতি চমৎকার। তাঁহার মতের মূল্য কতটুকু, তাহা পরলোকগত লর্ড মরলের উক্তি হইতে জানা যায়। তখন জার্ম্মাণ যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরাজ যুদ্ধে অবতরণ করেন কি না, তাহাই তখন সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতে দুইটা দল হইয়াছে, এক দল শান্তিকামী, অপর যুদ্ধপ্রয়াসী। শেষোক্ত দলই সংখ্যায় প্রবল। মুষ্টিমেয় কয় জন উদারমতাবলম্বী রাজনীতিক তখনও যুদ্ধের বিপক্ষে আন্দোলন করিতেছেন। তন্মধ্যে লর্ড মরলে ও সার জন সাইমন অন্যতম। সার জন সেই সময়ে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—'যুদ্ধে অবতরণ করিলে আমাদের ইংরাজ জাতির সর্ব্বনাশ হইবে।' অন্ততঃ লর্ড মরলে তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা

লিখিয়া গিয়াছেন। সার জনের যুদ্ধ-বিরতির বক্তৃতায় তখন বৃটেনের জলস্থল কম্পান্বিত। কিন্তু বৃটেন যুদ্ধে মাতিবামাত্র সার জন একবারে সে মানুষ নহেন,—একবারে মত বদলাইয়া ফেলিয়াছেন! তখন তিনি মস্ত 'পেট্রিয়ট, মস্ত মস্ত বক্তৃতা করিয়া যুদ্ধ সমর্থন করিতেছেন। এই সার জন সাইমনই আমাদের ভাগ্য লইয়া খেলা করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন!

সার জন সাইমন এ দিকে কিন্তু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, স্থিরমস্তিষ্ক, ঠাণ্ডা মেজাজের রাজনীতিক। তিনি এমন ভাবে প্রশ্ন করিতেছেন ও করাইতেছেন, যাহা দ্বারা তাঁহার বৃটিশ সহকর্ম্মীরা ভাবতে সংস্কার আইনের কার্য্য কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারেন। ভারতের সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রভাব, ভারতের লোকের যোগ্যতার অভাব, ইংরাজের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ব্যুরো-ক্রেশীর অনুকূল সমস্ত বিষয় যাহাতে পরিস্ফুট হয়, তাহা সহযোগকামী সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী সাক্ষীর দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লওয়া হইতেছে। তাঁহার সহকর্ম্মী লর্ড বার্ণহাম কিন্তু তাঁহার মত অতটা রাজ-নীতিক চালবাজ নহেন, তাই তাঁহার প্রশ্নের ধারার ভাবে মনে হইতেছে, তিনি সাম্প্র-দায়িকতাকে মৌরসী পাট্টা দিবার ব্যবস্থা করিয়া ভারতে ইংরাজশাসন দৃঢ় করার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। কর্ণেল লেন্‌ফক্স জেরা করা আদৌ ভালবাসেন না, তিনি অধিকাংশ সময় শ্রোতার আসন অধিকার করিয়া থাকেন। মেজর এট্‌লি ভারতের মত এত বড় একটা দেশ আরও অধিক প্রদেশে বিভক্ত নহে কেন এবং দেশের উন্নতি হইয়াছে বুঝিতে হইলে দেশ কতটা শিক্ষিত হইয়াছে, তাহা জানিতে হইবে,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—তাঁহার শ্রমিক দলীয় হওয়ার পরিচয় ঐ পর্য্যন্ত! মিঃ ক্যাডোগান ভারতের সংস্কার-সমস্যার বিরাটত্ব দেখিয়া মাথা গুলাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা প্রশ্ন করান সম্ভবপর হইতেছে না। মিঃ হার্টসরণ শ্রমিক দলের বটে এবং ভারতের প্রাণের কথা জানিবার তাঁহার হয় ত ইচ্ছাও আছে, কিন্তু টাটার ব্যাপারে তাঁহার মাথা আজও গুলাইয়া রহিয়াছে, তাই নিজে প্রশ্ন না করিয়া চেয়ারম্যান সাইমনকে দিয়া প্রশ্ন করাইতেছেন। আর লর্ড ষ্ট্রাথকোণা ভালমানুষ লোক, এ সব গোলযোগের ধার

লালা লাজপৎ রায়

ধারেন না, তিনি ভারত দেখিতে আসিয়াছেন, পর্য্যটকদিগের মত দেশ দেখিয়া তামাসা উপভোগ করিয়া বেড়াইতেছেন। কাযেই একা সার জন সাইমনকেই কমিশন বলা যাইতে পারে। প্যারিস যাহা ভাবে, সমগ্র ফ্রান্স তাহা ভাবে; সেই মত সার জন যাহা ভাবেন ও করেন, কমিশনও তাহা ভাবেন ও করেন। এই হেতু সার জনের প্রশ্নের ধারা দেখিয়াই কমিশনের মনের ভাব বুঝা যায়। হাঁড়ীর একটা ভাত টিপিলেই ভাত সিদ্ধ হইল কি না বুঝা যায়। সুতরাং সার জন যে এ যাবৎ সাম্প্রদায়িকতা ও বৃটিশের উপ-স্থিতির প্রয়োজনীয়তাটাকেই বিশেষ ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

তাহার পর কমিশনের সম্বন্ধে এ যাবৎ যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক সার মহম্মদ সাফি ব্যতীত এক জনের নামও দেশবাসীর পরি-চিত নহে। যাঁহারা গণ্যমান্য, যাঁহাদের মতের মূল্য আছে, যাঁহাদের কথায় দেশবাসীর শ্রদ্ধা আছে—এমন এক জন লোকও সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হন নাই। আর সার মহম্মদ সাফি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ হিসাবে পরিচিত হইলেও জাতীয়তার দিক হইতে তিনি ভারতের কেহ নহেন, সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণদলের নেতা। তাঁহার মতামতের মূল্যের স্বরূপ সকলেরই বিদিত।

সরকার পক্ষের সাক্ষীর কথা ছাড়িয়া দিলে অন্য যে কয় জন বে-সরকারী লোক সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যের ভাবে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কেবল সাম্প্রদায়িকতা, বিশেষ অধিকার ও স্বতন্ত্র স্বার্থেরই দাবী করিয়াছেন; দেশের ও দশের দিক হইতে, জাতীয়তার দিক হইতে মুক্তির দাবী করা উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। এই সাক্ষ্যের মূল্য কি?

যে সকল প্রাদেশিক 'তাঁবেদার কমিটী' গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে তাঁহারাও যে এই সকল সাক্ষ্যের খণ্ডন করিয়া কোনও মতামত প্রকাশ করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। বরং তাঁহারা সাইমন-সপ্তকের মতে গণ্ডার এণ্ডা দিয়া যাইবেন—এইরূপই সম্ভব। এই তাঁবেদার কমিটী সমূহের উপরওয়ালা নেতার কমিটী গঠিত হইবার পর তাহার নামকরণ লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছিল। কমিটী নিজে নিজের নাম রাখিয়াছিল, 'পার্লামেণ্টারী কমিটী'। মাথা নাই

তার মাথাব্যথা! পার্লামেণ্টই নাই, তার পার্লামেণ্টারী কমিটী! এ ত সাইমন কমিশন নহে যে, পার্লামেণ্ট তাহাকে রয়্যাল কমিশন নামে অভিহিত করিবে। কাযেই ভারত সরকার সে নাম কাটিয়া নাম রাখিলেন, "সেণ্ট্রাল কমিটী"। এই অপমানের পরেও বোম্বাই ও পুনায় সাইমন কমিশনের অভ্যর্থনায় ও দেশী কমিটীর অভ্যর্থনায় কত বাচবিচার করাই না হইয়াছিল! অভ্যর্থনাকালে সাইমন কমিটী মঞ্চের উপর স্থান পাইয়াছিলেন, দেশীয় কমিটী ভিড়ের মধ্যে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া স্থান করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর সাইমনসপ্তককে লাটপ্রাসাদে মোটরযোগে অতিথিরূপে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, নাম্বার কমিটীকে যে যাহার গাড়ীতে তোটেলে উঠিয়া স্থান করিয়া লইতে হইয়াছিল। সাধে কি বাছিয়া 'তাঁবেদার কমিটী' নামটি দেওয়া হইয়াছে?

সাক্ষ্যও যে ভাবে লওয়া হইতেছে, তাহাও চমৎকার! বোম্বাই বিভাগের 'ইনামদার ও সর্দ্দার সমিতি' যে দাবী করিয়াছেন, তাহা সাইমনসপ্তকের সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহারা বলিয়াছেন, "সরকার একে একে তাঁহাদের হস্ত হইতে প্রজার মঙ্গলসাধন করিবার অধিকারগুলি কাড়িয়া লইতেছেন। অথচ সমাজে তাঁহাদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহাদের মত দেশে খোঁটা (stake) কাহার আছে? অতএব তাঁহাদিগকে পুনরায় নষ্ট অধিকারগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হউক এবং নির্ব্বাচনে বিশেষ অধিকার দেওয়া হউক। তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভাবের জোরে উত্তপ্তমস্তিষ্ক অসম্ভব-অধিকার-প্রার্থীর দলকে ঠাণ্ডা রাখিতে পারিবেন।" চমৎকার! এই ভাবের পরম আত্মত্যাগী পরহিতেচ্ছু মহাজন সাক্ষীর সংখ্যাই সমধিক। কোন কোন সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী সাক্ষী স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"তাঁহারা সরকারের দল, কাযেই তাঁহাদিগকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হউক।" এই ভাবের কথা মুসলমান ও অনুন্নত সমাজের পক্ষীয় সাক্ষীর মুখে শুনা গিয়াছে। মেজর এটলি বোম্বাইএর 'ইনামদার ও সর্দ্দার সমিতির' জবর সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আপনারা যদি এতই প্রভাবশালী খোঁটাওয়ালা লোক, তাহা হইলে আপনাদের বিশেষ নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় কেন?" জবাবে তাঁহারা বলেন, "তাঁহারা সরকারের দিকের লোক, এ জন্য তাঁহাদের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা আছে।" চমৎকার! চমৎকার!

এই ভাবের সাক্ষ্য ত লওয়া হইতেছেই, তাহার উপর আবার পর্দ্দার অন্তরালে সাক্ষ্য লওয়া হইতেছে—স্মারকলিপি গুপ্ত করিয়া ফেলা হইতেছে। বোম্বাই সরকারের কর্ম্মচারী (চিফ সেক্রেটারী) মিঃ টার্ণারের সাক্ষ্য প্রকাশ্যে গ্রহণ করা হইল, অথচ বোম্বাই সরকারের স্মারকলিপি গোপন করিয়া ফেলা হইল। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি অপ্রিয় সত্য কিছু ছিল?

ফল কথা, যে ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে এবং যে শ্রেণীর লোকের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছে, তাহাতে পরিণামে সাইমন-সপ্তকের সিদ্ধান্ত কোন দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রকৃত দেশহিতকামী মুক্তিপ্রয়াসী জাতীয় দলের লোকের সহিত এই সিদ্ধান্তের কোনও সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন নাই।

সার শঙ্করণ নায়ার

সতীশরঞ্জন

বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। বিগত ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার রাত্রিকালে সর্ট ষ্ট্রীটে ভগিনীর আবাসে সতীশরঞ্জন দাশের দেহত্যাগ হইয়াছে। তাঁহার এই আকস্মিক তিরোধানে সকলেই গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছেন।

সতীশরঞ্জন পরলোকগত দুর্গামোহন দাশের দ্বিতীয় সন্তান। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি বিলাতে বিদ্যার্জ্জন আরম্ভ করেন। লণ্ডনের 'য়ুনিভারসিটি কলেজ স্কুল' এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের গ্রামার স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া সতীশরঞ্জন আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'মিডল্ টেম্পল' হইতে বিদ্যার্জ্জন সমাপ্ত করিয়া তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি যথেষ্ট অর্থ ও যশঃ অর্জ্জন করেন। আইন শাস্ত্রে অশেষ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে সতীশরঞ্জন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। এ দেশের সরকার সতীশরঞ্জনের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের আইন-সদস্যের পদ শূন্য হইলে, উক্ত পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন।

সতীশরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠভ্রাতের পুত্র ছিলেন।

বাল্যকালে উভয়ে একত্র লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের সহিত সতীশরঞ্জনের বিস্ময়কর পার্থক্য ছিল ; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে উভয় ভ্রাতার সৌসাদৃশ্য সকলকেই মুগ্ধ করিত।

সাগরপারের আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সে দেশের শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া সতীশরঞ্জন যে বিলাতের মায়ায় বিলাতী জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, বিলাতী মানুষের গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন—বাঙ্গালার সামাজিক মানুষ ছিলেন, তাহাও অভ্রান্ত সত্য। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক মতের সহিত আমাদের মতের যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, তিনি যাহা দেশের জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেন, অকুণ্ঠিতভাবে নিষ্ঠাসহ তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার মধুর ভ্রাতৃভাবের প্রগাঢ়তা সত্ত্বেও, নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি দেশবন্ধুর মত ও কার্য্যের বিরুদ্ধে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উভয় ভ্রাতার মধ্যে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের যে বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার কাহিনী চির-মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় ভ্রাতার পারিবারিক জীবনে এক দিনের জন্যও মধুর সম্বন্ধ তিক্ততার রসে বিষাক্ত হইয়া উঠে নাই।

সতীশরঞ্জন

তিনি উদারমতাবলম্বী রাষ্ট্রনীতিক ছিলেন। সামাজিক ব্যাপারেও তিনি উদারনীতির ভক্ত ছিলেন। সমাজ-সংস্কারে সতীশরঞ্জনের প্রচেষ্টা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। নারীর শিক্ষার দিকে তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুকম্পা দেখা যাইত এবং যাহাতে এই সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকারে সমুন্নত হইতে পারে, সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

বাঙ্গালী ভদ্রলোক হিসাবে সতীশরঞ্জনের ব্যবহার প্রশংসনীয় ছিল। বিরুদ্ধ মতের কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তাঁহার আতিথেয়তা এবং অমায়িকতায় তাঁহাকে মুগ্ধ হইতে হইত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় তাঁহার দান অপর্য্যাপ্ত ছিল। অভাবপীড়িত কোনও ব্যক্তি কখনও তাঁহার নিকট হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। এমনও জানা গিয়াছে, অভাবপীড়িত বিরুদ্ধমতাবলম্বীকেও তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও সতীশরঞ্জন দেশকে ভালবাসিতেন। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা-দীক্ষার পর্য্যাপ্ত প্রভাব সত্ত্বেও বাঙ্গালার মাটীর প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল না। তিনি ফলিত জ্যোতিষে কতকটা আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভটপল্লীর স্বর্গীয় নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণের নিকট হইতে তিনি আপনার একখানি কোষ্ঠী করিয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ থাকিলেও এক জন কৃতী বাঙ্গালী হিসাবে আজ তাঁহার বিয়োগব্যথা আমরা অনুভব করিতেছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করুক, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। তাঁহার শোকসন্তপ্তা পত্নী ও সন্তানগণকে ভগবান্ সান্ত্বনা দান করুন।

শরৎচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা

বাঙ্গালী ইদানীং মহতের, বৃহতের, গুণীর সম্বর্দ্ধনা করিতে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছে, ইহা আশা ও আনন্দের কথা। বিগত ৩১শে ভাদ্র রবিবার বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার সারাজীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁহার স্বদেশবাসীরা য়ুনিভারসিটী ইনষ্টিউট-ভবনে উৎসব-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এ দেশের সাহিত্যিকগণের ভাগ্যে এরূপ ভাবের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন কদাচিৎ হইয়া থাকে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদ হইতে অভিনন্দন প্রদত্ত হইবার পর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রকে তাঁহার দেশবাসী ভক্তগণ তাঁহার ৫৩ বৎসর বয়সে—জন্মদিনের স্মৃতি উপলক্ষে অভিনন্দিত করিয়াছেন। প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের প্রতি এইরূপ ভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন জাতিকে

বড় করিয়া তুলে—জাতির গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করে। যিনি অভিনন্দিত হন, শুধু একাই তিনি আনন্দিত হন না। কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের যে একটা প্রকৃষ্ট দান আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার রচনাভঙ্গী অতুলনীয়, তাঁহার ঘটনা-সংস্থান-কৌশল বিচিত্র; তাঁহার দেশপ্রেম, দেশের ও জাতির প্রতি মমত্ববোধ সবিশেষ প্রশংসনীয়।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালী পাঠকবর্গের—তাঁহার স্বদেশবাসিগণের নিকট হইতে আধুনিক ভাবে কখনও অভিনন্দিত হন নাই। তখন বাঙ্গালী এমন ভাবে গুণীর পূজায় দীক্ষা-লাভ করে নাই। তবে জাতির—দেশবাসীর মনো-মন্দিরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। শরৎচন্দ্রও দেশবাসী ভক্ত-গণের নিকট হইতে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি পাইয়াছেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, উপন্যাস-জগতে তিনি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। নিপুণ মনস্তত্ত্ববিশারদ শরৎ-চন্দ্রকে অভিনন্দিত করা ব্যতীতও তাঁহার দেশবাসী ভক্তগণ তাঁহাকে রৌপ্যনির্ম্মিত গড়গড়া, চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পরাজি-পূর্ণ রৌপ্য আধার ও পঞ্চপ্রদীপ, সোনার দোয়াত-কলম, 'দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত' আধারে তালপত্রের আকার-বিশিষ্ট রৌপ্য-পত্রে মীনার অক্ষরে মুদ্রিত প্রশস্তি-পত্র উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের এই অভিনন্দনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। যাঁহারা প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় প্রদান করিয়া সাহিত্যে যশোলাভ করেন, তাঁহারা দেশ ও জাতির পরম সম্পদ। তাঁহাদিগের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা-নিবেদনে জাতীয় জীবনের স্পন্দন-প্রবাহ অনুভূত হয়। বাঙ্গালী গুণীর পূজা করিতে শিখিয়া ধন্য হইতেছে, ইহা জাতির পক্ষে বিশেষ লাভ।

অতীত ও বর্ত্তমান

অধুনা বাঙ্গালা দেশে নবযৌবনের উন্মাদনদৃপ্ত কোন কোন তরুণের মুখে মাঝে মাঝে পুরাতনের প্রতি বিদ্রোহের প্রলাপ-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন,—যাহা কিছু পুরাতন, সবই জঘন্য এবং অচল। সুতরাং জটাজীর্ণ অতি বৃদ্ধ পুরাতনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। তাঁহাদের মতে এই দেশটা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, অতএব ইহাকে চূর্ণ করিয়া নূতন দেশ গড়িতে হইবে; সমাজ বার্দ্ধক্যের জরাগ্রস্ত, জীর্ণ এবং নিতান্তই প্রাচীন, তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিতে হইবে; দেশের যাহা কিছু আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, নূতনের মায়া-দণ্ডাঘাতে তাহাকে চূর্ণ করিতে হইবে; ভাষা ও সাহিত্য খঞ্জগতি জরাজীর্ণ পুরাতনের দুর্ব্বল অনুর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত, উহাকে সর্ব্বাগ্রে অবাই করিয়া বঙ্গোপসাগরের অতল গহ্বরে সমাহিত করিতে হইবে। বোধ হয়, তাঁহাদের এমনও অভিমত যে, পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিতস্রোতঃ জীর্ণ পুরাতন ভাবধারার বীজাণুপূর্ণ হইয়া ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হই-তেছে বলিয়া তাঁহারা লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত!

বস্তুতঃ এ কথা অতি-রঞ্জিত নহে। অধুনা কোন কোন সংবাদপত্রের স্তম্ভে পুরাতনের প্রতি অশ্রদ্ধার ও তুচ্ছতাচ্ছীল্যের অশিষ্ট উক্তিও ঘোষিত হইতেছে। সে দিন পণ্ডিত জহরলালকে বাঙ্গালার তরুণ সমাজ অন্তরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকালে বলিয়াছেন,—"আমরা আপনাকে ভারতের তরুণসমাজের অন্তর্নিহিত বাণীর মূর্ত্ত প্রতীক বলিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছি। * * বর্ত্তমানের যে উত্তেজনাময় বাণী আমাদের কর্ণকুহরে পশিয়াছে, তাহা যেন অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতে থাকে। আপনি যেন এই জীবন্ত বর্ত্তমানের প্রতীকরূপে আমাদিগকে মৃত অতীতের ক্রোড়ে আরামপ্রদ গতিশূন্য নিদ্রালসতা হইতে জাগ্রত করিতে পারেন, ইহাই কামনা।"

এই অভিভাষণে এক শ্রেণীর তরুণের মনোভাব স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণায় অতীত মৃত—তাহার ক্রোড়ে তাঁহারা আরামপ্রদ গতিশূন্য নিদ্রালসতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যর্থ-জীবন যাপন করিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগকে এই নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া জীবন্ত বর্ত্তমানে ফিরাইয়া আনা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি তাই? যাহা চলিতেছে, তাহাই জগৎ, এ জগতে 'গতিশূন্য' কিছুই নহে। 'মৃত অতীত' বা 'জীবন্ত বর্ত্ত-মানের'ও কোনও অর্থ নাই। কারণ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক,

সাহিত্যিক,—সকলেরই মূল কথা,—জগতে নূতন কিছু নাই, সবই চিরপুরাতন অথবা পুরাতনের প্রকারভেদ বা রূপান্তর মাত্র। বাহ্য-প্রকৃতিতে যেমন চন্দ্র-সূর্য্য-তারকা-গ্রহ-নক্ষত্র ও ষড়ঋতু অনন্তকাল ধরিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে, অন্তর্লোকেও মনুষ্য হৃদয়ের মনোবৃত্তিসমূহ কাম-ক্রোধ-স্নেহ-করুণা-প্রেমরূপে চির-পুরাতনরূপে বিরাজ করিতেছে। যত দিন জগতের অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন ইহার পরিবর্ত্তন মনুষ্য-শক্তির সাধ্যাতীত।

নূতন কিছুই নাই, কিছুই থাকিতে পারে না। শুধু প্রকাশ-ভাবেরই উপর যাহা কিছু নূতনত্ব বা বিচিত্রতার আরোপ করা যাইতে পারে। ইহাকে যদি পরিবর্ত্তন বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ইহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু পুরাতনকে সমূলে ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ নূতনের সৃষ্টি করা এক প্রলয়ধ্বংসের মালিক বিধাতাপুরুষ ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই।

এই পরিবর্ত্তন বা বিচিত্রতা যুগে যুগে সংঘটিত হইতেছে। জগতে 'গতিশূন্য নিদ্রালসতার' অস্তিত্বই নাই। পরিবর্ত্তনই নিয়ম, স্থিতি ব্যতিক্রম। সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ যাবৎ কোন কিছুই স্থিতিশীল নাই, যাহা মৃত, তাহারও অস্তিত্ব নাই! যুগে যুগে, কল্পে কল্পে রাজ্যের উত্থান-পতন হইতেছে, জাতির ভাঙ্গন-গড়ন হইতেছে, কোনও রাজ্য বা কোনও জাতি একই ভাবে গতিশূন্য ও স্থিতিশীল হইয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে নাই।

ভাঙ্গন ও গড়ন জগতের নিয়ম, এ কথা সত্য। এই ভাঙ্গন-গড়নের উপরেই আমাদের অবতারবাদের অস্তিত্ব নিহিত। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই মহাবাণী ভাঙ্গন হইতে গড়িয়া তুলিবার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই ভাঙ্গাগড়ার গতিপ্রকৃতি কিরূপ? একবারে অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন বর্ত্তমানের সৃষ্টি করা একমাত্র অবতারেরই সম্ভব, মানুষে নহে।

মানুষ অতীতের ভিত্তির উপরেই বর্ত্তমানকে গড়িয়া তুলে। প্রাচীন গ্রীস ও রোম গিয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীনের ভিত্তির উপরে নূতন বর্ত্তমান নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রীক ও রোমান জাতির শোণিত ও অস্থিমজ্জায় পুরাতনের ধারা বহিতেছে—কেবল প্রকাশভঙ্গীতে বিচিত্রতার বিকাশ দেখা যাইতেছে। সমাজের যে অংশ জীর্ণ ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা সংস্কৃত বা পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত পুরাতনটাই বর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতনের উদ্ভব হয় নাই।

প্রত্যেক মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র—মানুষ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা। ব্যষ্টি হিসাবে যেমন, সমষ্টি হিসাবেও তেমনই সমাজ বা জাতি এক একটি বিশিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া আপনার মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া থাকে। ইহাকেই জাতির ভাবধারা বলে। জগতে প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশিষ্ট ভাবধারা আছে। এই ভাবধারা পরস্পর স্বতন্ত্র। উভয়ের প্রত্যেকের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট, সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত। এই ভাবধারা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়া কোনও জাতি এ যাবৎ বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। প্রতীচ্যের আদি যুগের ফিউডালিজম, মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধতা, বা বর্ত্তমান যুগের সাম্যবাদ (সোসালিজম, কম্যুনিজম ও নিহিলিজম)—এ সকলেরই মধ্য দিয়া প্রতীচ্যের বিশিষ্ট ভাবধারার একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। যুগে যুগে রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রজাবিদ্রোহ, সাম্রাজ্যধ্বংস, নব সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান,—কত কি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতীচ্যের সেই ভাবধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ অব্যাহত-গতিতে চলিয়া আসিতেছে। প্রতীচ্যের শাস্ত্র, সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, আইন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনের মধ্য দিয়া তাহার স্রোতঃ অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই স্রোতঃ নিরুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাব-প্রবাহ বহাইবার ক্ষমতা কাহারও হয় নাই, হওয়া সম্ভবপরও নহে। রোমান জাতির ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র প্রতীচ্যে রোমক আইনের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। অতি বড় আধুনিক ইংরাজ ও মার্কিণ তাঁহাদের যে আইনের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার জন্য তাঁহারা প্রাচীন রোমান জাতির নিকট ঋণী। প্রাচীন গ্রীক সৌন্দর্য্যোপাসনার ভাবধারা এখনও প্রতীচ্যের চিত্রশিল্পে, ভাস্করশিল্পে, সঙ্গীতে সজীব হইয়া রহিয়াছে। ইউরিপিডিস মরিয়াছে, সেক্সপিয়ার গেটে জন্মিয়াছে; সক্রেটিস, প্লেটো মরিয়াছে, কাণ্ট হেগেলের আবির্ভাব হইয়াছে; হোমার ভার্জ্জিল অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহার স্থানে দাঁতে মিল্টন দেখা দিয়াছে। নূতনের উদ্ভব হইয়াছে—কিন্তু পুরাতন হইতে। পুরাতন অতীত বটে, কিন্তু মৃত নহে, উহাও সজীব, সতেজ; উহারই প্রেরণা হইতে নূতনে প্রাণশক্তির স্পন্দন জাগিয়া উঠে। পুরাতন অতীত হয় বটে, কিন্তু নূতনে তাহার প্রভাব থাকে, কেবল নূতনের প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য থাকে মাত্র।

এই প্রাচ্যে, এই ভারতে ব্যাস-বাল্মীকিকে অতীত ও মৃত বলিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া কোনও সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। চিরপুরাতন উপনিষদের বাণী লইয়াই রাজা রামমোহন তাঁহার সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নূতন নহে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজ,—সকলেই চিরপুরাতনকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর নূতনের সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, শুধু তাহাদের প্রকাশভঙ্গীই তাঁহাদিগের শিক্ষাকে অভিনবত্ব প্রদান করিয়াছে। প্রাচীনের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস, কপিল, কণাদ,—অধিক কি, কালিদাস, ভবভূতি, শঙ্কর, চৈতন্য, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, বঙ্কিম, মাইকেলকে বিসর্জ্জন দিলে প্রতীচ্যের ভারতীয় জাতির কি বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে?

জাতির ভাবধারাই জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে, অন্যথা জাতি সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। আজ আমাদের প্রাচ্যের ভাবধারার বৈশিষ্ট্যকে মুছিয়া ফেলিয়া এই শ্রেণীর তরুণ কি প্রতীচ্যের সম্পূর্ণ বিজাতীয় উন্মাদনাময় ভাবধারাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে চাহিতেছেন? তাঁহারা ভবিষ্যতের ভরসা। আমরা তাঁহাদের বড় আশা করি। তাঁহারা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশজননীর একান্তনিষ্ঠ সেবকরূপে দেশের কাযে দশের মুখ উজ্জ্বল করুন, ইহা কাহার না কামনা? কিন্তু সে কোন্ পথে? নিশ্চিতই উহা ভারতের সনাতন ভাবধারাকে বিসর্জ্জন দিয়া সম্ভব হইবে না। প্রতীচ্যের আধুনিক সভ্যতা মাত্র তিন শত বৎসরের পুরাতন। রাসিয়ার সাম্যবাদ মাত্র সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। নূতনের জলুস চক্ষু ধাঁধিয়া দেয়, এ কথা সত্য, কিন্তু সেই 'নিতুই নবের' মূলেও পুরাতনের প্রেরণা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই।

সমাজ-সংস্কার

৩

আমি ইতঃপূর্ব্বে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য দুইটি প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। তাহার কারণ, বর্ত্তমান সময়ে সকলে সামাজিক ব্যাপারগুলির প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। সকল যুগেই এইরূপ জটিল বিষয়ে মতভেদ ঘটিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুগে সেই মতভেদের মাত্রা এবং পার্থক্য অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছে। সকল যুগেই সকল প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বিচার করা অতিশয় কঠিন ও জটিল। দুরূহতার এবং জটিলতার কারণ বুঝা সহজ। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কখনই একই কারণ হইতে উদ্ভূত হয় না। উহা বহু কারণ-সঞ্জাত। সকল কারণের বলাবল বিচার না করিয়া উহার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে যাইলে সেই সিদ্ধান্ত ভুল হইবেই। এই কারণগুলি সমস্তই বাহ্যব্যাপারসম্পর্কিত নহে। উহার কতকগুলি আন্তর-ব্যাপার-ঘটিতও বটে। দেশ, কাল এবং পাত্র হিসাবেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের মানব-প্রকৃতির মধ্যে কতকটা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকে, ইহা বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সম্মত সিদ্ধান্ত। এই পার্থক্য যে কেবল স্থূলভাবে এক দেশের লোকের সহিত অন্য দেশের লোকের আছে, তাহা নহে, একই দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যেও উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসকই অবগত আছেন যে, একই রোগে একই ঔষধ সকলের উপর সমান মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় না। কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের একটি মহৌষধ। এই ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা শতকরা ৯৮জন রোগীকে ম্যালেরিয়া ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত করা যায়। কিন্তু সকল ম্যালেরিয়া রোগীকে সমান মাত্রায় কুইনাইন দিলে সমান ফল পাওয়া যায় না। মানসিক দিক দিয়াও এইরূপ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কেহ গণিত ভালবাসে, এবং গণিতচর্চ্চায় তাহার বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে। কেহ সাহিত্য-সাধনায় বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকটিত করিয়া থাকে। সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনায় কাহারও বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশ পায়। এই বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির যেমন আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিগত পার্থক্যও লক্ষিত হইয়া থাকে।

এক জাতীয় মানবের মধ্যে যেমন সাম্যের মধ্যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন জাতীয় মানবের মধ্যে কতকগুলি জাতীয় বৈষম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই বৈষম্য আকৃতির এবং প্রকৃতির দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। উহা অস্বীকার করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। সেই জন্য বিজাতীয় শিক্ষালব্ধ জ্ঞান লইয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করিতে যাইলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য বিজাতীয় ভাবে শিক্ষিত পরাধীন জাতির পক্ষে সমাজ-সংস্কার করা বিড়ম্বনাবহুল হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সেই বিড়ম্বনা ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা জন্মিয়াছে বলিয়া আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল।

যাঁহারা সমাজ-সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মেধাবী এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা তীক্ষ্ণধী এবং জটিল সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের দেশাত্মবোধের পরিচয়ও পদে পদে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে অপহ্নব করা সঙ্গত নহে। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। বিষয়ের অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তির দ্বারা তাহা সমর্থন বা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করা কর্ত্তব্য।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা ও বিচার করা কঠিন। তাহার কারণ, আমরা বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষালাভ করি, তাহাতে আমাদের দেশীয় অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আমাদের ঘোর বিতৃষ্ণা এবং অশ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। আমরা মনে করিয়া থাকি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইতে পারেন নাই, তাঁহারা অর্দ্ধ-সভ্য বা প্রায় অসভ্য ছিলেন। আমরা অত্যন্ত রক্ষণশীল জাতি বলিয়াই সেই পুরাতন অসভ্য জাতির মস্তিষ্ক-প্রসূত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছি। নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্যসাধন করিয়া লইতে পারিতেছি না। সেই জন্যই এক দল সমাজ-সংস্কারক আমাদের সামাজিক বিন্যাস ও প্রতিষ্ঠানগুলি ঝাড়ে মূলে উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। বাল্যকালে মানুষ যে মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার প্রভাব সে সহজে পরিহার করিতে পারে না। উহা যেন তাহার সহজাত সংস্কারে পরিণত হয়। সুতরাং বাল্যে ও যৌবনের প্রারম্ভে মানুষ যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মন্দ বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, রাজনীতিক ব্যাপারে সে যতই দেশহিতৈষী হউক, সে ঐ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে কখনও প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে ভারতীয় ভাবে আমাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কাযেই আমাদের দেশের লোক তাহা বুঝে না। সেই জন্য আমরা কালাপাহাড়ের ন্যায় আগ্রহের সহিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিধ্বস্ত করিতে অগ্রসর।

ঐ কথা সত্য যে, স্বাধীন দেশেও সকলে জাতীয় ভাবে শিক্ষিত হইলেও অনেক সময় তাহাদের সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ বিশেষভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহারা এক একটি প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি দোষ বা গুণ দেখিয়া তাহার বিচার করে, কিন্তু উহার বহু দিকই দেখিয়া উঠিতে পারে না।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে আপনার পূর্ব্বগঠিত সংস্কারের অনুকূল তথ্যগুলি দেখিতে চাহে। দুই চারিটি অনুকূল তথ্য পাইলেই সে সন্তুষ্ট হয় এবং তাহারই উপর আপনার সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইতে চাহে। সেই জন্য যে সকল ব্যক্তি বা সভা-সমিতি এক একটা সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের কথায় সহসা বিচলিত হইয়া কোন কায করিতে যাওয়া বা সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। য়ুরোপের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সমাজবিজ্ঞান লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বকই বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের সত্যনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য বা সিদ্ধান্ত করিবার বাসনা থাকিলেও সে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাবে পড়িয়া সত্য পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সে তাহার পক্ষে সুবিধাজনক দিক ও তথ্যগুলির জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করে, কিন্তু প্রতিকূল তথ্যগুলিকে সহজে আমল দিতে চাহে না। সেই জন্য কোন বিষয়ের বা সিদ্ধান্তের সমর্থনকল্পে যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সভা-সমিতি গঠিত হয়, তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে, উহার অনেক কথা বাদ দেওয়া উচিত। অতীত এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমাদের অনেক তথ্য-সম্পর্কিত জ্ঞান ভ্রমসাধক মধ্যবর্ত্তী পাত্রের ভিতর দিয়া আইসে, সেই জন্য ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিবার পক্ষে বাধা জন্মে। *

যে দেশে লোক জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে দেশে লোক ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া না গিয়াছে, সে দেশের লোকও যদি কোনরূপ পরিস্ফুট বা অস্ফুট স্বার্থের প্রভাবে পড়িয়া এতই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে দেশে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার বিদেশী বিজেতা জাতির হস্তে সমর্পিত, এবং যদি সেই বিজেতা জাতি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের অনুশীলন করিবার উদ্দেশ্যেই সেই দেশ জয় না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দেশের সেই শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়া লোক যে সিদ্ধান্ত করে, তাহা যে কত ভ্রান্ত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে সেই বিজিত জাতি বিদেশীর দৃষ্টিতে সকল ব্যাপার দেখিতে অভ্যস্ত হয়। সেই জন্য বিজাতীয় শিক্ষাজনিত বুদ্ধি লইয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দোষ-গুণ বিচার করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে। মানুষ যদি বিদেশী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলোপের ইতিহাস পড়িয়া, সেই জ্ঞান লইয়া তাহাদের জাতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে যে কখন না কখন ভ্রান্ত পথে চালিত হইবে না, ইহা মনে করা বিষম ভুল। সেই জন্য আমরা রাজনীতিক ব্যাপারে যাঁহারা মনস্বিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদের মতের কোনরূপ মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। এক দিকে যদি কাহারও অসাধারণ মনস্বিতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সকল দিকেই যে তাহার মনস্বিতা প্রকাশ পাইবে, ইহা মনে করা উচিত নহে। তাহা যদি পাইত, তাহা হইলে সার আইজাক নিউটনের মত অসামান্য প্রতিভার অধিকারী তাঁহার পিঞ্জরস্থ বড় খরগসটির বাহির হইবার দ্বার প্রস্তুত করিয়া কখনই তাঁহার ছোট খরগসটিকে বাহির করিবার জন্য স্বতন্ত্র দ্বার প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না।

সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কি না, তাহা দেখা কর্ত্তব্য, এ কথা আমি সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলসাধনই আমাদের প্রধান প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আজকাল আমাদের সমাজসংস্কারকগণ পারত্রিক ব্যাপারটা তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয় হইতে বাদ দিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে মনে উহা কুসংস্কার বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমার সহিত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন বিশিষ্ট খ্যাতনামা এবং সুপণ্ডিত সমাজ-সংস্কারকের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধেই প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা কাল আলাপ হইয়াছিল। আমি তাঁহার সহিত আলাপে বুঝিয়াছিলাম, পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আস্থা নাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসের কোনরূপ দৃঢ়তাই নাই। ধর্ম্মবিশ্বাসের কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না। এক কথায় তিনি এক জন নাস্তিক,—অন্ততঃপক্ষে তিনি যে এক জন অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic), তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনই তাঁহার সমাজ-সংস্কার-সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়াই আমার ধারণা জন্মিয়াছিল। তিনি সেই কথা প্রকারান্তরে স্বীকারও করিয়াছিলেন। ইনি ভিন্ন আরও কয়েক জন ছোট বড় সমাজ-সংস্কারকের সহিত আলাপ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, অধিকাংশ সমাজ-সংস্কারকের ধারণা এই বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারকের ধারণারই অনুরূপ।

রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমাজ-সংস্কার সাধন করিতে ব্রতী হইবার আমরা একবারেই পক্ষপাতী নহি। সমাজের মঙ্গলের জন্যই সমাজ-সংস্কার করা আমরা কর্ত্তব্য মনে করি। য়ুরোপীয়রা বুদ্ধির ভুলেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত কুসংস্কারবিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের দিক দিয়া কতকগুলি যুক্তিও দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূল দিক দিয়া উহা সমর্থনের যোগ্য লোক ইদানীং অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় সমাজতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার আমাদের যতটা সুবিধা এবং অবকাশ

*"Clearly, then, where personal interests come into play there must be, even in men intending to be truthful, a great readiness to see the facts which it is convenient to see, and such reluctance to see opposite facts as will prevent much activity in seeking for them. Hence a large discount has mostly to be made from the evidence furnished by institutions and societies in justification of policies they pursue or advocate. And since much of the evidence, respecting both past and present social phenomena comes to us through agencies calculates thus to pervert, there is here a further impediment to clear vision of facts.

আছে, আমাদের সমাজতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার ততটা সুবিধা ও অবকাশ নাই। আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি, তাহাতে আমাদের পক্ষে অধ্যাপক নিউম্যান্, থিওডোর পার্কার, অধ্যাপক কিং, অধ্যাপক কার্পেণ্টার, অধ্যাপক কারি প্রভৃতির ধর্ম্মমত পরিপাক করা যত সহজ হয়,—আমাদের দেশের লোকের ধর্ম্মমত পরিপাক করা তত সহজ হয় না। ঐ সম্বন্ধে উপদেশ-প্রাপ্তিরও আমাদের তাদৃশ সুবিধা নাই। তাহার উপর হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান সময়ের বিদেশী শিক্ষায় প্রভাবিত বুদ্ধির পক্ষে উহা অত্যন্ত গহন বলিয়া মনে হয়। তাহার উপর উপযুক্ত উপ-দেষ্টারও একান্ত অভাব। অগত্যা আমরা বিদেশী প্রভাবে পড়িয়া আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ঘোর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের শিক্ষিত সমাজের শতকরা ৯৮ জন লোকের দশা অল্পাধিক এইরূপ।

তাহার উপর যে য়ুরোপীয় বুধমণ্ডলীর মূলমন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হইতেছি, তাঁহারা আমাদের কতকগুলি প্রধান প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ঘোর বিরুদ্ধ সমালোচক। অধিকন্তু আমরা যে উচ্চ রাজনীতিক অধিকার লাভের অযোগ্য, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বহু ইংরাজ আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রতি-ষ্ঠানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। উহাতে আমাদের মধ্যে কতকগুলি পাশ্চাত্য ভাবা-পন্ন লোক এতদূর হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা আর উহার পাল্টা জবাব দিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা মনে প্রাণে পাশ্চাত্য মতেরই অনুবর্ত্তী। অগত্যা তাঁহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েন এবং কার্য্যতঃ দেশাত্মবোধের গণ্ডী ছাড়িয়া দেশ-দ্রোহিতার গণ্ডীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, যখন আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহারা স্বাধীন দেশের লোক অর্থাৎ যাঁহাদের উপর কোনরূপ বিদেশী প্রভাব আসিয়া পতিত হয় নাই, তাঁহারা জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় প্রভাব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার বাসনায় এরূপ দিশা-হারা হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা সেই উৎকট বাসনার তাড়নায় দেশাত্মবোধের কক্ষপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া দেশদ্রোহিতার কক্ষপথের মধ্যে আপনাদিগকে নিক্ষিপ্ত করেন, তখন আমাদের দেশের লোক তদপেক্ষা অতি প্রবল কারণে যে ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে? *

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর সমাজ-সংস্কারক যে ঐরূপ দেশ-দ্রোহিতার কার্য্য করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের অতি কঠোর কারাদণ্ডের ভয় দেখাইয়া সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়াসেই সুপ্রকাশ। ইহাদের যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে ইহারা কামান ও বন্দুক দেখাইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইতেন। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারসাধন যতই প্রয়োজনীয়ই হউক না কেন, পশুবলের ভয় দেখাইয়া উহা করিবার প্রয়াস পাওয়া যে কত দোষের, তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা বাল্য-বিবাহ বা শৈশব-বিবাহের কোনমতেই সমর্থক নহি। বর্ত্তমান সময়ে লোকের মতিগতি যেরূপ হইয়াছে এবং লোকের আর্থিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কাহাকেও অতি শৈশবে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কঠোর কারাদণ্ডের ভয় দেখাইয়া অথবা আইন করিয়া আমরা সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী নহি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, উহাতে যতটুকু সুফল ফলিবে, তাহা অপেক্ষা কুফল অত্যন্ত অধিক জন্মিবে। কতকগুলি লোক বাল্যবিবাহের কুফল অতিশয় অতিরঞ্জিত করিতেছেন। ইহা স্বাভাবিক। তাঁহারা যৌবন-বিবাহের কল্পনামাধুর্য্যে এতই মুগ্ধ যে, নিরপেক্ষভাবে বাল্যবিবাহের দোষগুণ বিচার করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা অণুবীক্ষণের সোজা দিক দিয়া উহার দোষগুলি এবং বিপরীত দিক দিয়া উহার গুণ-গুলি দেখিয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত দোষজনক। সম্প্রতি দিল্লীর এক জন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, বাল্যবিবাহের ফলে এ দেশে সন্তানপ্রসূতি জননীরা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া মরিতেছে। ইদানীং এ দেশের বহু স্থানে ক্ষয়রোগ, বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগ যে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সন্তানজননী নারীরাও যে তাহাতে আক্রান্ত হইয়া মরিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার কারণ কি বাল্যবিবাহ? বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এ দেশে বাল্যবিবাহ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। কত কাল পূর্ব্বে উহা যে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। কিন্তু ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রসূতি যে ক্ষয়রোগে মরিয়াছে, বা সমাজে ক্ষয়রোগ এত প্রবল হইয়াছে, ইহা আমরা দেখি নাই। তখন পচন সাধক (septic) রোগে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসূতি ও সন্তান মরিত। কিন্তু সর্দ্দি, কাসি ও জ্বর প্রায় হইত না। তখন যক্ষ্মারোগ প্রায় দেখা যাইত না। এখন কেবল অল্পবয়স্কা প্রসূতি নারীরাই যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইতেছে, তাহা নহে — যুবকদলও অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিতেছে। বিবাহিত যুবক অপেক্ষা অবিবাহিত যুবক অধিক মরিতেছে বলিয়া ধারণা। অবশ্য আমার আত্মীয়-স্বজনের ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াই আমি এই কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে বিশাল ভারতব্যাপী অভিজ্ঞতা

---

* এই সম্বন্ধে বিখ্যাত য়ুরোপীয় দার্শনিক Herbert Spencer যাহা বলিয়াছেন,—তাহা হইতে কয়েক পংক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল।—

And it has even made manifest, also, that when he strives to emancipate himself from these influences of race, and country, and locality, which warp his judgment, he is apt to have his judgment warped in the opposite way. From the perihelion of patriotism, he is carried to the aphelion of antipatriotism, and is almost certain toform views that are more or less eccentric, instead of circular, all sided and balanced views.

এই দোষ যে কেবল সংস্কারকদিগেরই হয়, তাহা নহে; রক্ষণশীলদিগেরও এ দোষ হইতে পারে।

আমার নাই। তবে আমার ধারণা, যখন ক্ষয়রোগ ইদানীং বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে প্রসারলাভ করিতেছে, তখন বাল্যবিবাহ উহার মূল কারণ (predisposing casue) নহে, ক্ষেত্রবিশেষে উহা বড় জোর উত্তেজক কারণ (exciting cause) হইতে পারে। একের দোষ অন্যের স্কন্ধে চাপান কখনই বিচারবুদ্ধিসঙ্গত নহে।

আমাদের দেশে যেরূপ শিশু-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা রহিত করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আমি অস্বীকার করি না। তাহা করিতে হইলে উহার বিরুদ্ধে প্রবল লোক-মত গঠিত করিতে হইবে। লোককে শিশু-বিবাহের অপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিশুবিবাহের যে দোষ নাই, সেই দোষ তাহার স্কন্ধে আরোপিত করিয়া উহার উপর লোকের বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিলে তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আইন দ্বারা সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত বাতুলের কার্য্য। সামাজিক ব্যবস্থা পরস্পর কতকগুলি এমনভাবে অনুবন্ধী কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে যে, কঠোর আইন দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে গেলে তাহার ফল হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র রাজনীতিক বুদ্ধি লইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাঁহারা আইনের প্রভাবকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত মনে করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের একদেশদর্শী বুদ্ধিরই ফল। এ কথা সকল দেশের উদারধী ও সমদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরই অভিমত। দৃষ্টান্তস্বরূপ হার্বার্ট স্পেন্সারের উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। *

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ যখন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তখন এই সম্বন্ধে আইন করা কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। বাঙ্গালায় উচ্চবর্ণের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিম-বঙ্গে অশিক্ষিত উচ্চবর্ণের মধ্যে বাল্যবিবাহ এখনও লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলের উচ্চবর্ণের লোকও প্রায় কৃষিজীবী। কৃষিজীবী সমাজে বাল্যবিবাহের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহা হইলেও তথায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বিবাহ-বয়স ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সংস্কার আপনা আপনিই হইতেছে, তাহার জন্য আইন করিলে সমাজের ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। উহার ফলে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া এবং সমাজময় একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে।

আমাদের সমাজসংস্কারকরা বিবাহ-ব্যাপারকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, সামাজিকগণ বিবাহ-সংস্কারকে সে দৃষ্টিতে দেখেন না। হিন্দুরা বিবাহ-সংস্কারকে একটা ধর্ম্মসংস্কার বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা যে দম্পতি সম্মিলিত হইয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহাদের ঐহিক এবং পারলৌকিক উভয়বিধ মঙ্গল সাধিত হইবেই। আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক স্বামী লম্পট ও কুক্রিয়ায় আসক্ত হইলেও সে কোনমতেই তাহার স্ত্রীর অবমাননা সহ্য করিতে পারে না। স্ত্রীর সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্য তাহারা সদাই যত্নশীল হইয়া থাকে। কিন্তু য়ুরোপীয়রা বিবাহ-ব্যাপারকে সমাজরক্ষার্থ বেশ্যাবৃত্তি চালাইবার একটি বিধিবোধিত প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমর সঙ্ঘটিত হইবার বহুদিন পূর্ব্বে সার জে, ফিটজজেমস্ ষ্টিফেন তাঁহার General view of the Criminal Law নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "the Criminal Law stands for the passion of revenge in much the same relation as marriage to the sexual appetite." ইহার অর্থ এই যে, বিবাহ-বিধির সহিত যৌন-সম্মিলন-সাধন প্রবৃত্তির যে সম্বন্ধ, ফৌজদারী দণ্ডবিধির সহিত প্রতিহিংসাসাধন প্রবৃত্তির ঠিক সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ অপরাধীকে দণ্ডদান ব্যবস্থার মূলে প্রতিহিংসা সাধন-প্রবৃত্তি যেরূপ চৌদ্দ আনা বর্ত্তমান, বিবাহ-ব্যবস্থার মূলে সেইরূপ যৌন-লালসার তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে সেইরূপ চৌদ্দ আনা স্থান অধিকার করিয়া আছে। বলা বাহুল্য, সার ফিটজেমস্ ষ্টিফেনের আমলে বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের যে যৎকিঞ্চিৎ অন্য উদ্দেশ্যও স্বীকৃত হইত, এখন য়ুরোপের উন্নতিশীল দেশগুলিতে আর তাহা স্বীকৃত হয় না। ইহার ফলে তথায় ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা লক্ষিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ডারহামের ধর্ম্মযাজক ডাক্তার হেনলি হেনসন সে কথা চেল্টেনহামের ধর্ম্মসংসদে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। "পূর্ব্বে বিবাহ-প্রতিষ্ঠানকে নরনারীর স্থায়ী সম্মেলন বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন লাম্পট্যপ্রধান মতবাদ প্রবল হওয়াতে লোক আর তাহা মনে করিতেছে না। এখন বিবাহবিচ্ছেদ-ব্যবস্থা সহজ করা হইয়াছে বলিয়া তাহার বিষময় ফলস্বরূপ এই উৎপাত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "খৃষ্টীয় ধর্ম্মগত শিক্ষার মূলধন এখন ক্ষয় পাইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মবিষয়ে এক প্রকার নূতন অনাস্থার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান নহে; ইহা স্পষ্টাকারে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। এখন অধিকাংশ ইংরাজই নিয়ন্তাহীন বিশ্বাসবর্জ্জিত খৃষ্টধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন; কারণ, এখন সমাজ পদ্ধতিশূন্য এবং চপল হইয়া উঠিতেছে এবং সেই সমাজের সহিতই তাহারা তাহাদের জীবনকে সমঞ্জসীভূত করিতে চাহে।" ডারহামের

*There is this perennial delusion, common to Radical and Tory, that legislation is omnipotent, and that things will get alone because laws are passed to do them; there is this confidence in one or other form of Government, due to the belief that a Government once established will retain its form and work as was intended; there is this hope that by some means the collective wisdom can be separated from the collective folly, and set over in such a way as to guide things aright; all of them implying that general political bias which inevitably co-exists with subordination to political agencies.The effect on social speculation is to maintain the conception of a society as something manufactured by statesmen and to turn the mind from the phenomena of social evolution. While the regulating agency occupies the thoughts, scarcely any attention is given to those astounding processes and results due to the agencies regulated etc.

বিশপ বিলাতী সমাজ ও সামাজিকদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি আমাদের পক্ষে খাটে না? সত্য বটে, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের প্রবর্ত্তনফলে য়ুরোপে বিবাহ সম্বন্ধে ধারণার এই ঘোর ও দুষ্কারজনক অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ হীন ধারণা লোকের মনে উদিত হইতেছে কেন? এ দেশে ত বিবাহবিচ্ছেদ আইন এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই? ইহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। সেই জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক ব্যক্তি হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ ব্যবস্থার আইন রচনার প্রস্তাব করিয়া হিন্দুসমাজের ঘোর অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি সেই পাণ্ডুলিপি প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইদানীং আমাদের দেশের লোকের মতিগতি যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে অচিরে এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা যে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইদানীং য়ুরোপে বিবাহের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তথায় দাম্পত্যজীবন ও গার্হস্থ্যজীবন যেরূপ বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হওয়া উচিত। এই ভারতে বিবাহ সম্বন্ধে অনেক ব্যবস্থার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ইহা আমাদের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। অনেকগুলি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর তাহা পরিহার করিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় হঠকারিতার সহিত সমাজ-সংস্কার করিতে যাওয়াই বিষম ভুল। আজ হিন্দুজাতির এই বিড়ম্বনাময় জীবনে যদি গার্হস্থ্য জীবনও বিড়ম্বনাময় হয়, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। য়ুরোপে গার্হস্থ্যজীবন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তথাকার যুবকদলের বিবাহের উপরই বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। অনেকে ইচ্ছা না থাকিলেও দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিতেছে এবং সমস্ত জীবন ঘোর অশান্তিতে কাটাইতেছে। আমাদের দেশেও উহার তরঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার অনেক যুবক স্ত্রীকে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী করিবার জন্য বিবাহ করিতে চাহে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা দাসোচিত মনোবৃত্তিরই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এখন স্ত্রীকে লোক বিলাস-সঙ্গিনী মনে করিতে বসিয়াছে। নারীদিগের মধ্যেও এই ভাব সংক্রমিত হইতেছে। ইহার ফলে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিতেছে। এখন লোকের যেরূপ মনোবৃত্তি, তাহাতে আমাদের ন্যায় লোকের কথা কেহ শুনিবে না, কিন্তু পরিণামে এ জন্য তাহাদিগকে ঘোর পরিতাপ করিতে হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কাশীর ব্রাহ্মণ-সম্মেলন

পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে গত ১৯শে কার্ত্তিক নিখিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের বর্ত্তমান সমাজ-সমস্যার বিচার-সভার অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে উভয় পক্ষই (প্রাচীনপন্থী ও সংস্কার-পন্থী) বিচারের দ্বারা আত্মমত প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রাপ্ত হন, সে জন্য নিরপেক্ষভাবে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সার্থক হয় নাই। সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের সংস্কারপ্রয়াস শাস্ত্রযুক্তিবলে মীমাংসিত হওয়ার সুবিধা সভায় সম্ভব হয় নাই। আমাদের মনে হয়, যখন সনাতনপন্থী ও সংস্কারপন্থী উভয় পক্ষই হিন্দু শাস্ত্রের কালজয়ী গৌরবরক্ষা-কল্পে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান যুগের নানা সমস্যার সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধনে উৎসুক, তখন সেই কল্যাণ-উৎস-ধারা কোন্ পক্ষে প্রবাহিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাই বিচার দ্বারা মীমাংসা করা তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। সভায় তাহা হয় নাই। এ জন্য এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি-দোষে অপরাধী হইতে হয় না।

পরলোকে পীযূষকান্তি ঘোষ

১৯শে কার্ত্তিক রাত্রিকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' পীযূষ-কান্তি ঘোষ মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে পীযূষ বাবু যোগদান করিতেন। তাঁহার বিয়োগে 'অমৃতবাজারে' এক জন কর্ম্মীর অভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

কংগ্রেস

বহু দিন পরে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। কংগ্রেস জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষ এখন অত্যন্ত সঙ্কটসঙ্কুল পথে চলিয়াছে। স্বার্থান্বেষী, সঙ্কীর্ণচেতা, সাম্প্রদায়িক ভাবপুষ্ট কোন কোন দল সাইমন কমিশনে সাক্ষ্য দিয়া জাতির অগ্রগতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যাহাতে দেশবাসী একমত হইয়া দৃঢ়ভাবে জাতির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় আসিবেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনায় সমগ্র সহর-বাসীকে যোগ দিতে হইবে—শুধু অভ্যর্থনা সমিতির স্কন্ধে সে ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ [২য় সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

৭

ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

বাহিরের ভিড়ের মধ্য হইতে আমি যেন অন্তরের ভিড়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম, এইরূপ আমার মনে হইল। এদেশের যাঁহারা লেখক, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম, ততই অনুভব করিতে লাগিলাম, ইঁহাদের চিন্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল।

ইঁহাদের সমাজ সকলের শক্তিকে যে পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিতেছে, বাহিরে লোকের ছুটাছুটি, মোটর-যানের হুড়াহুড়িতে তাহা স্পষ্টই চোখে পড়ে। কাহারো সময় নাই; তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইবে; এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না; যে একটু পিছাইয়া পড়িবে, তাহাকেই হার মানিতে হইবে। এই সম্মুখে ছুটিবার ভয়ঙ্কর ব্যগ্রতা যখন দেখি, তখন মনে মনে ভাবি, সম্মুখে সে কে বসিয়া আছে! সে ডাক দেয়, কিন্তু দেখা দেয় না। নীল সমুদ্রের মত বহুদূরে তাহার ঢেউয়ের উপর ঢেউ নিশিদিন হাত তুলিতেছে, কিন্তু কোথায় কোন্ পর্ব্বতশিখরের গুহাগহ্বর হইতে ঝরণাগুলি পাগলের মত ব্যস্ত হইয়া ডাইনে বাঁয়ে নুড়ি পাথরগুলাকে কোনোমতে ঠেলিয়াঠুলিয়া কাহাকেও কোনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি, চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে ঊর্দ্ধশ্বাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষা-শালায়, পার্লামেণ্টে, পুঁথিতে, চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে। মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে, তাহার সমস্তটার উপর টান পড়িয়াছে। "চাই, আরো চাই," দেশের মর্ম্মস্থান হইতে এই একটা ডাক সর্ব্বদা পৌছিতেছে। এত বড় একটা ডাকে কাহারো সবুর সহে না, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিতে হইলে মন উতলা হইয়া উঠে। দেশের এই মানসভাণ্ডারে যে লোক একবার একটা কিছু জোগাইয়াছে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; সে লোকের উপর

আরোর তাগিদ পড়িল; খেজুর গাছের মত বৎসরের পর বৎসরে কাটের পর কাট চলিতে থাকে; কোনোবারে রসের একটু কমতি বা বিরাম পড়িলে সে পাড়াসুদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

কাজেই এখানকার মনোরাজ্যটা যদি চোখে দেখিবার হইত, তবে দেখিতাম, সদর রাস্তায় এবং গলিতে, আপিসপাড়ায় এবং বারোয়ারিতলায় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, ভিড় ঠেলিয়া চলা দায়। সেখানেও কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া চলে, কেহ বা মোটর-গাড়ি হাঁকায়, কেহ বা মজুরি করে, কেহ বা মহাজনী করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই বিষম ব্যস্ত। ভোর বেলা হইতে রাত দুপুর পর্য্যন্ত চলাচলের অন্ত নাই।

কথাটা নূতন নহে। আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্দ্ধেক চোখ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি, এ দেশের চিন্তার হাটে কি ভয়ঙ্কর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয়, তখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি, তাহার বেগ কতখানি। এ দেশে যাঁহারা মনের কারবার করেন, তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ইঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশী দিনেরও নয়, খুব অন্তরঙ্গও নয়; ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইয়াছি, সেটা ইঁহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেক্ট্রিক আলোর তারের মত সর্ব্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবামাত্র তখনি জ্বলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলিতা পাকাইয়া, তেল ঢালিয়া, চকমকি ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি; বিশেষ কোনো তাগিদ নাই; সুতরাং দেরি হইলে কিছুই আসে যায় না। অতএব আমাদের যেরূপ অভ্যাস, তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেক্‌ট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নূতন।

এখনকার কালের সুবিখ্যাত লেখক ওয়েল্‌স্ সাহেবের দুই একখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলাম। তাহাতেই জানিতাম, ইঁহার চিন্তাশক্তি ইস্পাতের তরবারির মত যেমন ঝক্‌ঝক্ করে, তেমনি তাহা খরধার। আমার বন্ধু যেদিন ইঁহার সঙ্গে এক-ডিনারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল, সংসারে খরতর বুদ্ধি জিনিষটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়, কিন্তু তাহার সংস্রব হয় ত আরামের নহে।

যাহা হউক, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইঁহার সঙ্গে অনেক ক্ষণের জন্য আলাপ-পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্বস্ত হইলাম, যখন দেখা গেল, মানুষটি সজারু-জাতীয় নহে। সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম, ইঁহার প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি ইঁহার আন্তরিক দরদ আছে; অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সার্ব্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে; সেইটে থাকিলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুবড়ীবাজি করিয়া সুখ পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিষ। মানুষ এখানে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। মানুষের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুর শস্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেন না, শুধু বীজে ও মাটীতে ফসল ভাল হয় না, জমিতে সর্ব্বদা রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস—যাহাতে করিয়া মনের সকল রকম ফসল একেবারে অপর্য্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংস্রব সুগভীর ও সর্ব্বদা বিদ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না। মানুষ তাঁহাদের কাছে তেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মানুষের ধন তাঁহারা পূরাপরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরলবসতি লোকালয়ে মানুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না; এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয়, ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ-বিরলে বাস; মানুষ ছাঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেই জন্য আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্য ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগ্‌নের বাহিরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।

যাহাই হউক, ওয়েল্‌সের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম, ইঁহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ; এইজন্য তাহা শিকারীর শিকার-ইচ্ছার মত কেবলমাত্র শক্তির খেলা নহে। এইজন্য ইঁহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা, তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতার মত নহে, তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।

আর একটা জিনিষ দেখিয়া বারবার বিস্মিত হইলাম, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে ইঁহাদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা। আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্‌সের যতক্ষণ কথা চলিল, ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্ত্তার প্রবাহ উজ্জ্বল চিন্তার কণায় ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। কথার সঙ্গে কথার স্পর্শে আপনি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে। ইঁহারা যে চিন্তা করিতেছেন, তাহা নহে, চারিদিকের ঠেলায় ইঁহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে; তাই ইঁহাদের মন ছুটিতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেও কথা কহিয়া যায়। ইঁহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ কথার কল্লোল কেবলি নানাদিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে, ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁহার নহে। তাহার সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে; সর্ব্বদা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি, যে কথাটাই ইঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জোরের সঙ্গে ভাবিতে পারেন ও জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন। সে জোর কিছুমাত্র গায়ের জোর নহে, তাহা চিন্তার জোর। ইঁহার অনুভূতিশক্তিও দ্রুত এবং প্রবল। যেটা ভাল লাগিবার জিনিষ, সেটাকে ভাল লাগিতে ইঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না—সে সম্বন্ধে ইঁহাকে আর কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে, সেটাকে ইনি একেবারেই অসংশয়ে গ্রহণ করেন। মানুষকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করিবার সহজ ক্ষমতা ইঁহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইঁহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্বপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা কবি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রসজ্ঞ; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধায় একক্ষেত্রে মিলিবার মত লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া আমার ইহাই মনে হইতে থাকে, অনেক বিষয়েই ইঁহাদিগকে এখন আর গোড়া হইতেই ভাবিতে হয় না; ইঁহারা অনেক কথা অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। ভাবনার প্রথম ধাক্কাতেই যত বিলম্ব, তখনি জড়ত্ব ভাঙিতে সময় লাগে; কিন্তু যখন তাহা কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন তাহার পক্ষে চলা সহজ। ইঁহাদের দেশে ভাবনা জিনিষটা চলার মুখেই আছে, তাহার চাকা আপনিই সরে; মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রাস্তায়। এইজন্য ইঁহাদের কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায়, তখন একেবারেই সুচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায় এবং সেই ধারা দ্রুত গতিশীল।

যেখানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে, সেখানে চিন্তার আনন্দ যে কতখানি, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সেই আনন্দ এখানকার শিক্ষিত সমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিত্তের লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিন্তার সঞ্চার কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখাসাক্ষাতে। অনেক সময় ইঁহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে, এ সব কথা লিখিয়া রাখিবার জিনিষ, ছড়াইয়া ফেলিবার নহে। কিন্তু মানুষের মন কৃপণতা করিয়া কোনো বড় ফল পাইতে পারে না। যেখানে ছড়াইয়া ফেলিবার যোগ্যতা নাই, সেখানে ভাল করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও নাই। প্রত্যেক বীজের হিসাব রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুঁতিতে গেলে বড় রকমের চাষ হয় না। দরাজ হাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া চলিতে হয়, তাহাতে অনেকটা নিষ্ফল হইয়াও মোটের উপর লাভ দাঁড়ায়। এইজন্য চিন্তার চর্চ্চায় সেই আনন্দ থাকা চাই—যাহাতে সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে চিত্তের সেই আনন্দ-লীলার অভাবটাই সকল দৈন্যের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।

কেম্ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি দিনদুয়েক বাস করিয়াছিলাম। ইঁহার নাম লোয়েস্ ডিকিন্সন্। ইনিই "জন্ চীনামেনের পত্র" বই-খানির লেখক। সে বইখানি যখন প্রথম বাহির হয়, তখন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত য়ুরোপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাসূত্রের চারিদিকে দানা বাঁধিয়াছে, তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এসিয়া এক সভ্যতার বৃন্তের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেদ্যরূপে জাগিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই চীনা-মেনের পত্র বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ

লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম, সে বই-খানি সত্যই চীনামেনের লেখা। যিনি লেখক, তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাম্যান নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ। যে দুইদিন ইঁহার বাসায় ছিলাম, ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে, তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ইহা বিশেষ কোনো উপার্জ্জন বা লাভের ব্যাপার নহে; ইহা কোনো বিশেষ বিষয়ের বইপড়া বা কলেজের বক্তৃতা শোনার কাজ করে না; ইহা মনের চলার আনন্দ। যেমন বসন্তে সমস্তই কেবল ফল ও ফুল নহে, তাহার সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়া আছে; সেই হাওয়ার উত্তাপে ও আন্দোলনে ফুলের আনন্দবিকাশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে; তেমনি এখানকার মনোবিকাশের চারিদিকে যে একটা আলাপের বসন্ত হাওয়া বহিতেছে, যাহাতে গন্ধ ব্যাপ্ত হইতেছে ও বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহাতে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎসব দিগ্‌দিগন্তরকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এই সহৃদয় চিন্তাশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটা প্রবল স্পর্শ পাইলাম। ইঁহার সঙ্গে একসময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত অধ্যাপক রাসেল সাহেব আসিয়া মিলিত হইলেন, তখন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারো মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারো মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্য্যাপ্ত হাস্য-রশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সব চেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম। সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত প্রাচীন-তরু-সভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সকল রকম জিনিষই ছিল। আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড় রমণীয়। একদিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশজোড়া নিস্তব্ধতা, আর একদিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মানুষের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্য অভিসারে চলিয়াছে। যেন পর্ব্বতমালা স্থির নিশ্চল গাম্ভীর্য্যের সহিত আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহারই পায়ের কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্ঝরিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; তাহার কলোচ্ছাস কেবলি প্রশ্ন করিতেছে এবং গভীর গিরিকন্দরগুলা তাহারই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি এবং চিত্ত এই দুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিদ্যালয়ের পুরাতন বাগানে বসিয়া অনুভব করিতেছিলাম। বৃহৎ বিশ্বের নীরবতা মানুষের মধ্যেই বাণী আকারে আপনাকে অবিশ্রাম প্রকাশ করিতেছে, এই বাণী-স্রোতেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরন্তর আনন্দ, ইহাই আমি সে দিন নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, জগতে অন্ধকারের মহাসত্তা অতি বিপুল। অনন্ত আকাশে সেই মহান্ধকার আপনাকে আলোকের লীলায় ব্যক্ত করিতেছে; সেই আলোকের আবর্ত্ত চঞ্চল, তাহা সর্ব্বদা কম্পমান; তাহা কোথাও বা শিখায়, কোথাও বা স্ফুলিঙ্গে, কোথাও বা ক্ষণকালের জন্য, কোথাও বা দীর্ঘকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এই চঞ্চল আলোকমালাই অবিচলিত মহৎ অন্ধকারের বাণী। মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলি বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত, সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্য্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠের কথাবার্ত্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ সেই ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতেছিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রসের প্রকাশ-ধর্ম্ম

স্বরূপ-অনুসন্ধান ও সৃষ্টি

অ-নির্ব্বাণ এক শাশ্বত ক্ষুধা মানবের অন্তরকে অহরহঃ পীড়া দিতেছে। অভাবের এক ঘনীভূত বেদনা মানবের হৃদয়-মর্ম্মকে মথিত করিয়া তুলিতেছে। সে যেন আত্ম-বিস্মৃত, আত্মবঞ্চিত, বুঝি হৃত-সর্ব্বস্ব, দীনহীন। তাই জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অন্তরের সহজ প্রেরণা-বশে আপন পূর্ণতার লক্ষ্যে ছুটিয়া সে কেবলই আপনার প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রকাশই সৃষ্টি এবং ইহা জীব-জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরম আত্মার মিলন-পিপাসু বেদনা-বিধুর এই অনাদি যাত্রী যখন পূর্ণ স্বরূপের সন্ধানে পাগল ধূর্জ্জটির ন্যায় ভাব-ভোলা হইয়া ছুটিতে থাকে, ভগীরথের শুভ শঙ্খ-ধ্বনি সম কিসের এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে আকুল হইয়া আত্ম-হারা জাহ্নবী-ধারার ন্যায় বহু-মুখে বহুরূপে আপনার অভিব্যক্তি করিয়া চলে, তখনই তাহার গায়ে গায়ে আনন্দের কুসুম-রাশি আপনি হাসিয়া উঠে। তাহাতেই রসের উল্লাস, ব্যঞ্জনার আবিষ্কার, আর্টের মূর্ত্তিলাভ; তাহাতেই সুরের স্পন্দন, ছন্দের গুঞ্জন, চিত্রের বিকাশ এবং সৌন্দর্য্যের বিলাস।

ভূমা ও আনন্দই স্বরূপ এবং লক্ষ্য

"নাল্পে সুখমস্তি"—অল্পে সুখ নাই, নাই। অনাদি কালের বিরহী জীব আত্ম-বিস্মৃত—অল্প, তাই তাহার সুখ নাই, নাই! শাশ্বত মানব-আত্মা তাই প্রতি-নিয়ত ছুটিয়াছে অনল্প সেই ভূমার সন্ধানে, পূর্ণ স্বরূপের লক্ষ্যে। ভূমাই যে সুখ! "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্।" ভূমার সন্ধানে সুখের লক্ষ্যে তাই জীব-জগতে এত গতি, এত ক্রিয়া, এত দ্বন্দ্ব, এত ছন্দ! কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই, স্থিতি নাই, বিরাম নাই। এ বিরাট তৃষ্ণা—এ নিত্য অভাব বোধ হয় অল্পে মিটিবার নহে। কারণ, যাহা অল্প, তাহা অল্প এবং তাহা অধ্রুব। মানুষের তপঃশীল মন তাই ছুটিতে চাহে বরুণ-পুত্র ভৃগুর ন্যায় অন্ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে বিজ্ঞানে এবং শেষে বিজ্ঞান হইতে আনন্দের অন্তরে। সেখানে পরম পূর্ণতা, সেখানে অভাবের নিবৃত্তি, বিরহের বিলয় এবং অনিত্যতার শেষ সে যে আনন্দঘন—রস! আনন্দই জীবের শুদ্ধ স্বরূপ, আনন্দই ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপ! আনন্দই নিত্য কাম্য! উপনিষদে ঋষির আশ্চর্য্য মন্ত্রানুভূতি! "আনন্দং ব্রহ্ম"—আনন্দই ব্রহ্ম "রসো বৈ সঃ!" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি!"—সেই ব্রহ্ম যে রস-স্বরূপ। এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়া যেন আনন্দই হয়। তাই সেখানেই চির-বিশ্রাম। যাবৎ এই আনন্দ-স্বরূপের লাভ না ঘটে এবং জীব আনন্দময় না হয়, প্রজাপতির আশ্রয়ে ব্রহ্মচর্য্যরত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাহার ভয়ের অন্ত থাকে না, "স ভয়ং দদর্শ"—তিনি ভয় দেখিলেন। আগে যাহা পরম ভোগ্য বিষয় মনে করিয়াছিলেন, সেখানেই নির্ম্মল-প্রজ্ঞা দ্বারা ভয় দেখিলেন এবং কাতরে কাঁদিয়া উঠিলেন—"নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি"—আমি এখানে ভোগের কিছুই দেখি না! কারণ, অল্প যাহা, সীমাবদ্ধ যাহা, সংশয়-সঙ্কুল অ-সত্য যাহা, তাহাতে জীবের আত্মোপলব্ধির পূর্ণতা কোথায়, তাহাতে স্থির আনন্দ কোথায়? সেখানে যে নিত্যই ভয়! তাই মানবের অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা—

"অসতো মা সদ্গময়!
তমসো মা জ্যোতির্গময়!
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"
অসত্য হইতে মোরে সত্যে লহ নাথ!
তিমির হইতে লহ জ্যোতির সাক্ষাৎ!
মৃত্যু হ'তে লহ মোরে অমৃতের ধাম!

জীব-জগতের আলম্বন-রূপ মূল অবশিষ্ট আনন্দ

এই অমৃতই আনন্দ আস্বাদনস্বরূপ! এই আনন্দই জ্যোতিঃ-প্রকাশস্বরূপ! এবং ইহাই সত্য সার্ব্বজনীন-রূপ এবং স্থিতি-স্বরূপ! এই আনন্দ সংসার-বিরাগী যোগাচারী ধ্যানীর যেমন কাম্য, ললিতকলা-সাধক সংসারে সৌন্দর্য্যের উপাসক শিল্পী প্রাণের তেমনই কাম্য এবং আত্মাহুতির পথে বিশ্ব-সেবায় ব্রতী কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণেরও তেমনই কাম্য। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই আনন্দ জীব-মাত্রেরই কাম্য। শুধু কাম্য নহে, সকলেরই জীবন এবং জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে এই অখণ্ড আনন্দের খণ্ডোপলব্ধিই জীবের আত্ম-প্রকাশের মূলীভূত কারণ। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" কে বাঁচিয়া থাকিত, কে নিশ্বাস ফেলিত যদি এই আকাশ আনন্দ না হইত? আনন্দ

ব্রহ্ম এবং আনন্দই জীবন। এই আনন্দ বা রসের কণিকাও অন্তরে অনুভূত না হইলে কোনও চেতন সত্তা সম্ভব নহে, কোন জীবের স্থিতি বা গতি সম্ভব নহে। জ্ঞাত হউক্ কি অজ্ঞাতই হউক্, জীবের অন্তরতম দেশে অণুতম এবং আবিলতম হইলেও আনন্দের স্পর্শ আছে, জীবন-নাট্যের অভিনয়ের অন্তরালে আনন্দের আস্বাদ হইতেছে। নতুবা মূল আলম্বন-শূন্য তাহার মন, প্রাণ ও দেহের বিধারণ হইত না এবং সংসারে তাহার কর্ম্ম-চক্র ঘাত-প্রতিঘাত সুখ-দুঃখ বিচিত্র দ্বন্দ্বও অসম্ভব হইত। আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দেই বিচিত্র বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে। তাহাতেই চরিতার্থতা! চরিতার্থতায়ই আনন্দ। নতুবা সবই অর্থহীন, প্রয়োজনহীন, মৃত জড়ের আবর্জ্জনা-স্তূপ! সৃষ্টির মূল এই আনন্দ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইহা আকাশের মত সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্ব-বিধায়ক এবং সাধারণ লক্ষণে বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত! তাই রস, আত্ম-প্রকাশ বা সৃষ্টির আলোচনায় তাহার বিশেষ অবতারণা একান্তই অনাবশ্যক।

বিশিষ্ট ঘনীভূত আনন্দ ও তাহার প্রেরণা-শক্তি, আত্ম-প্রকাশের বৈচিত্র্য ও সৃষ্টি

কিন্তু অলৌকিক প্রতিভার ক্ষেত্রে অনির্ব্বচনীয় কারণ এই আনন্দ যেন জমাট বাঁধিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠে। ঘনীভূত মূর্ত্ত আনন্দই স্পষ্ট আস্বাদ-গোচর হয় এবং তাহার এক মহতী প্রেরণা শক্তি সক্রিয় হইয়া দেখা দেয়। আনন্দই প্রেরণা এবং প্রেরণাই শক্তি। এই শক্তির ধর্ম্মই আত্মপ্রকাশ বা সৃষ্টি। মহত্ত্বের ও বৃহত্ত্বের প্রেরণামাত্রই সহজ ও নিবিড় আনন্দোপলব্ধি হইতে জন্মিয়া থাকে। আনন্দোপলব্ধি যদি সত্য হয় এবং ঘনীভূত হয়, তাহার প্রেরণা অমোঘ এবং প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সরস ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় সৃষ্টি সেখানে স্বাভাবিক। আনন্দের অনুভূতি অকৃত্রিম ও নিবিড় না হইলে কোনও রূপ মহত্ত্ব বা বৃহত্ত্বের স্পন্দন, আত্ম-প্রকাশ, আত্ম-প্রসার হইতে পারে না। প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই উপলব্ধি ও প্রকাশও বিশিষ্ট-রকমে হইয়া থাকে। কিন্তু সাধ্য আনন্দের স্পর্শ আদিতে অনুভূত না হইলে সাধনার প্রকৃত আরম্ভ হইতে পারে না এবং সাধকের সিদ্ধিও সুদূর-পরাহত হয়। যে প্রাণ বিষয়-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শাশ্বত-তত্ত্বের সন্ধানে অন্তর্ম্মুখী ধ্যানযোগে অথবা গভীর কীর্ত্তনানন্দে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে চাহে, এ কথা ধ্রুব, সেই সর্ব্ববন্ধধ্বংসী সর্ব্বনাশা সুর অন্তরে জাগিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। কাব্য-কলা-শিল্পী আপন মনে অকাতরে আপনাকে যে শিল্প-সৌন্দর্য্যের নব নব ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করিতেছে, ক্ষ্যাপার মত সে-ও ক্ষণিকের তরে স্পর্শমণির রসের স্পর্শে পাগল হইয়া গিয়াছে। আর ঐ যে বিরাট প্রাণ আপনার সুখ-দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া বিশ্ববাসীর মঙ্গল-সাধনে অনন্ত কর্ম্মের অনলে তিলে তিলে আপনাকে আহুতি দিয়া চলিয়াছে, তাহারও অন্তরালে এক অতি সবল আনন্দ-বোধ ও আনন্দ-ক্ষুধা জাগিয়া জাগিয়া মন্দর-শৈলের ন্যায় তাহার হৃদয়-সমুদ্রকে আলোড়িত ও মথিত করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর যে মহাপুরুষগণের জীবনে মহাকাব্যের স্পষ্ট উপকরণ বিদ্যমান, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, জীবন-কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ এক নিবিড় আনন্দ-বোধ ও আনন্দ-ক্ষুধাও সেখানে নিত্যই উৎসারিত কিম্বা ফল্গুধারার ন্যায় অন্তঃ-প্রবাহিত। ভগবান্ বুদ্ধ বা শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রিয়দর্শী অশোক কিম্বা দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন জনগণের কল্যাণ-সাধনে আত্ম-বলি দিয়া গিয়াছেন, কেবলই এই কথাটা বলিলে তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ করা হয়, বিশ্বকেও সঙ্কীর্ণ করা হয় এবং মূল ও সমগ্র সত্যটি নির্দ্দেশ করা হয় না। অন্তরে একটা অনন্ত উপলব্ধির নিবিড় বেদনা এবং প্রেরণাই তাঁহাদিগকে ঘর-ছাড়া লক্ষ্মী-ছাড়া করিয়া তাদৃশ ভাবে পাগল করিয়াছিল। নতুবা ত্যাগের মহিমা-পূত কর্ম্মের মাঝে তাঁহাদের আত্ম-প্রকাশ বা সৃষ্টির নিত্যধারা সম্ভব হইত না, তাহা সহজ ও সুন্দর হইত না এবং বিশ্বও তাঁহাদের আত্ম-দানে ধন্য ও পূর্ণ হইত না। নিবিড় উপলব্ধিই মহত্ত্বের আত্ম-দান ও আত্ম-প্রকাশের মূলীভূত কারণ। আনন্দের প্রেরণা স্বভাব-ধর্ম্মে এক এক প্রতিভার ক্ষেত্রে এক এক রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আত্ম-দানেই আত্ম-প্রকাশ এবং আত্ম-প্রকাশই সৃষ্টি। তপস্বী ধ্যানযোগে নব নব উপলব্ধিতে আপনার যেমন প্রকাশ করেন, শিল্পি-প্রাণ কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে ও শিল্পে নব নব সৌন্দর্য্যরচনায় আপনার রসাকুলতার তেমনই পরিচয় দেন এবং ত্যাগবীর মহৎপ্রাণ বিরাটের মুক্তির জন্য তেমনই নব নব কর্ম্মপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া আপন পরিপূর্ণ সত্তা অনুভব করেন। এই তিনের উপলব্ধ এবং শক্তির উৎস-স্থানীয় আনন্দবোধ প্রেরণার সাধর্ম্ম্যে এক, কিন্তু প্রকাশে ত্রিধারা ত্রিভঙ্গ,—তাঁহাতেও ক্রমে শত শত ধারা—শত শত ভঙ্গ।

আনন্দ ও রস, রসে শিল্পের প্রেরণা-শক্তি

আনন্দ ও রস শব্দ এতক্ষণ প্রায় একার্থবাচক ভাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শব্দ দুইটি মৌলিক অর্থে এবং অর্থের সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ এক নহে। উপনিষদে ঋষিগণ প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রহ্মকে "আনন্দ" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশে "রস" শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ মাত্র "রসো বৈ সঃ" এই প্রসিদ্ধ স্থলেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আবার কাব্যশাস্ত্রে "রস" শব্দ দ্বারাই কাব্যের আত্মাকে পরিভাষা করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেখানে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ বিরল এবং যেখানে আছে, সেখানেও অর্থ অতি সাধারণ। রসে আনন্দ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদন-ধর্ম্ম সমধিক পরিস্ফুট। উপনিষদেও "বৈ" শব্দ দৃষ্টে আস্বাদনাত্মক রসের সঙ্গে তুলনার ভাব অনুমিত হয়। রসের মূল অর্থ স্বাদ এবং স্বাদ-অর্থ হইতেই বিভিন্ন বিচিত্র অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। নাট্য ও কাব্যশাস্ত্রেও ইহা মূলতঃ আস্বাদনার্থক এবং আস্বাদনাত্মক। নাট্য-শাস্ত্র-গুরু ভরত-মুনি স্পষ্টভাষায় রসের স্বাদন ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন,—"অত্রাহ—রস ইতি কঃ পদার্থ উচ্যতে? আস্বাদ্যত্বাৎ।" আবার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন, "যথা নানা ব্যঞ্জনৌষধি-দ্রব্যসংযোগাৎ রস-নিষ্পত্তিঃ।" এবং আরম্ভেই রসের এই সাধারণ-ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,—"নহি রসাদৃ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ত্ততে।" পরবর্ত্তী আচার্য্যগণও কেহ "পানক-রস-ন্যায়েন চর্ব্ব্যমাণঃ" কেহ বা "স্বাদনাখ্যঃ কশ্চিদ্-ব্যাপারঃ" এবং কেহ বা "সর্ব্বেঽপি রসনাদ্ রসঃ" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ঐ একই কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশদভাবে রসের স্বরূপ ও লক্ষণ-বিচার প্রবন্ধান্তরে করা হইবে। এখানে কেবল বক্তব্য এই, এই রস ও আনন্দ সর্ব্বথা এক নহে। শিল্পীর অন্তরে যাহা অনুভূত ও আস্বাদিত হয় এবং বহিঃপ্রকাশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাই রস। আনন্দ সাধারণ ও ব্যাপকলক্ষণান্বিত। রস আনন্দাত্মক, অনুভবাত্মক, কিন্তু বিশেষ-ভাবে আস্বাদনাত্মক এবং ইহাই আর্টের বিবিধ ব্যঞ্জনায় প্রকাশাত্মক। বীজ একরূপ হইলে তাহার অঙ্কুর, অঙ্কুরোদগত বৃক্ষ, বৃক্ষের পুষ্প ও ফল একরূপই হইবে। মূল শক্তি একরূপ হইলে তাহার প্রেরণা প্রকাশও একরূপ হইবার কথা। যেখানে প্রকাশে ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, সেখানে শক্তি-ধর্ম্মেও ভিন্নতা স্বীকার্য্য এবং এই জন্যই আনন্দের সাধারণ ধর্ম্মেও শক্তির প্রেরণা ধর্ম্ম ললিত-কলা-সাধক ভক্তধ্যানী অথবা মহাপ্রাণ কর্ম্মীর তুল্য হইলেও অন্তরের বিশিষ্ট রস-ধর্ম্মিতা-হেতু তাঁহারই শুধু আত্মপ্রকাশ হয় ছন্দে, সঙ্গীতে কিম্বা চিত্রে। এইরূপ ভক্ত ধ্যানী অথবা মহাপ্রাণ কর্ম্মীরও অনুভূত আনন্দের বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে। আবার রস-শিল্পগণের মধ্যেও রসবোধ ও শক্তির সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য হেতু প্রকাশের বিচিত্র ধারা দৃষ্ট হয়। পুত্রবিয়োগবিধুরা জননীর কাতর আর্ত্তি দর্শনে করুণ-রসের সৃষ্টি হয়, তাহা কবি প্রকাশ করেন ছন্দোময় কাব্যে, সুর-শিল্পী প্রকাশ করেন সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীতে এবং চিত্রকর প্রকাশ করেন বর্ণে ও চিত্রে।

রসের আদি স্পর্শ ও সৃষ্টির স্পন্দন

অন্তরে অনির্ব্বচনীয় সুর না জাগিলে, রসের ক্ষণিক স্পর্শও না পাইলে সৃষ্টির প্রেরণা আসিতে পারে না। কে যেন রাধাকে শ্যাম নাম শুনাইতেছে! শ্যামনাম 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' রাধার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছে! রাধা শ্যামনাম জপিয়া চলিয়াছে! শ্যামনামে যেন কত মধু আছে! এখন রাধার একমাত্র ভাবনা, একমাত্র জিজ্ঞাসা—"সই, কেমনে পাইব বল তারে!" এই যে অল্প পাওয়া, ইহাতেই ব্যাকুলতা এবং প্রেরণা; ইহাতেই পূর্ণরূপে পাইবার জন্য গতি! তাই রসেই আরম্ভ, রসেই বিকাশ, রসেই সৃষ্টি এবং পূর্ণতা-লাভ ও পরিণতি। রাধার অন্তরের ঐ আকুল তরঙ্গরাশি হইতেই রাধা-কৃষ্ণের কাব্য-লীলার আরম্ভ; পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, বিরহ, ক্রমে ভাব-সম্মিলনে পূর্ণতার সমাপ্তি। পুণ্য-তমসা-তীরে সেই যে শুভক্ষণে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ঘনীভূত শোকরাশি আদি-কবি বাল্মীকির অন্তরে করুণরসের বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, তাহাই রাম-সীতার মর্ম্মব্যথায় প্রতিবিম্বিত হইয়া পূর্ণতার পথে রামায়ণ মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে। শোকই শ্লোকরাশিতে পরিণত হইয়া একটি অনন্ত করুণ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছে।

অল্প হইতে পূর্ণতার পথে তপস্যা ও রসের সৃষ্টি; রসে রহস্যের ব্যঞ্জনা

রসানুভূতি না জাগিলে সৃষ্টি হয় না, রসানুভূত পূর্ণ হইলেও সৃষ্টি হয় না। অল্প হইতেই পূর্ণতার পথে চলিবার বেগই সৃষ্টি। নর-নয়নের বহু ঊর্দ্ধে চিরতুহিনাবৃত হিমগিরির মর্ম্ম-মাঝে গোমুখীর পূত-প্রস্রবণধারা কি এক নিবিড় আকর্ষণে

সুদূর সমুদ্র-সঙ্গমে নাম-রূপ বিসর্জ্জন করিয়া যে নিঃশেষে বিলীন হইবার জন্য ছুটিয়াছে, সেই চলার বেগেই বহুমুখী ভাগীরথীপ্রবাহের সৃষ্টি। আবার বীজীভূত সূক্ষ্ম-শক্তির পল্লবিত শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধি এবং পুষ্প ও ফলে পরিণতি ও সৃষ্টি। বিচিত্র এই রসাস্বাদ না পাইলে সৃষ্টি হয় না এবং আস্বাদ পূর্ণ হইলেও সাধারণতঃ সৃষ্টি সম্ভব নহে। শিল্পের রস তাই পাইয়াও না পাওয়া এবং না পাইয়াও পাওয়া। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার পথে তপস্যাই রসের সৃষ্টি। বাস্তবিকই "নাল্পে সুখমস্তি"—অল্পে সুখ নাই। কিন্তু শিল্পীর এই অল্প সুখ অল্প রস আস্বাদন চাই এবং এই রস যে অল্প মাত্র, ভূমা যে সাধনলভ্য, তাহারও সজাগ অনুভূতি চাই। নতুবা চেতনায় স্পন্দনই বা হইবে কেন এবং প্রেরণাই বা আসিবে কোথা হইতে? অল্প হইতে ভূমার দিকে গতিতে পরম পূর্ণতা, পরম পরিতৃপ্তি ও পরম চরিতার্থতা লাভের জন্য রস-ব্যাকুল আত্মার সহস্রবিধ ব্যগ্র চেষ্টায় রসের স্ফুট প্রকাশ, ব্যঞ্জনার সৃষ্টি, সুর, ছন্দ ও চিত্রের নব নব উল্লাস ও ভঙ্গী। এই জন্যই শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের উত্তম রসরচনায় একটা অজ্ঞাত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সুর, একটা সূক্ষ্ম অভাববোধের স্পন্দন নিত্যই ধ্বনিত হয়; একটা অব্যক্ত রহস্য লোকের ছায়া নিত্যই ব্যঞ্জিত হয়। এই জন্য উত্তম সৃষ্টির অন্তরালে কারুণ্যের একটি ফল্গু-ধারা বহমান। হারান, পাওয়া অথচ না পাওয়া, ইহাই রসের গভীরতম ব্যঞ্জনা এবং এই একই কারণে ভাব-লোকে অনির্ব্বচনীয় রহস্যবাদের বা mysticismএর সৃষ্টি!

ব্রহ্মানন্দ ও কাব্যরস; কবি ও ব্রহ্ম

কবির অন্তরে যখন রসোপলব্ধি নিবিড় হইয়া তৈলধারাবৎ একাকারতাময় বিমল রসের প্রকাশ হইতে থাকে, তখন কবি ও অদ্বৈত, অনির্ব্বচনীয় রস-স্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন। কিন্তু কবি যেমন ব্রহ্ম নহেন, কবির উপলব্ধ রসও তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দ নহে। সাধক ধ্যানযোগে অন্তরের যে অন্তরতম রাজ্যে ব্রহ্মের সহজ আনন্দ সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধি করেন, কবির অনুভূত রসের রাজ্য সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের। বাস্তবিকও ব্রহ্মানন্দ নিত্যই অদ্বৈত, নির্ব্বিকল্প, অস্পর্শ-যোগ-গম্য এবং সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণাতীত। জীবের বোধগম্য না হইলেও তাহা সূর্য্য-দীপ্তিবৎ সদা জাজ্বল্যমান, উদয়-অস্তবিহীন। কবির উপলব্ধ রস বা কাব্য-রস সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত আনন্দ চৈতন্যের ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। তবে কাব্য-রস ব্রহ্মরসেরই এক স্ফুট প্রতিবিম্ব বলিয়া রসধর্ম্মে তাহা ব্রহ্মরসের স্ব-জাতীয় বলিয়া আভাস পাওয়া যায় এবং আলঙ্কারিকগণও তাহাই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রসকে বলিয়াছেন, "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।" কবিও তাই রসধর্ম্মে এবং সৃষ্টিধর্ম্মে ব্রহ্মের তুল্য।

"অপারে কাব্য-সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথেদং রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে॥"

অপার কাব্যসংসারে কবিই প্রজাপতি। বিশ্ব যেমন তাঁহার নিকট অনুভূত হয়, তেমনই তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অগ্নিপুরাণের এই উক্তি যথার্থ। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ব্রহ্মের ন্যায় কবিরও অনির্ব্বচনীয় কারণে এক আদিস্পন্দন বা উন্মেষ হয়। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।" তিনি ঈক্ষা বা ঈক্ষণ করেন। এই ঈক্ষণই দর্শন, বা রস-চৈতন্যের অনুভূতি। ঈক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রেরণা আসে "আমি সৃষ্টি করিব।" "একোঽহং বহু স্যাম"—"এক আমি বহু হইব।" এই বহুত্বের ইচ্ছাই সৃষ্টির প্রেরণা এবং বহুত্বই সৃষ্টি। প্রকৃতির মধ্যে জীবজগতে ভগবান্ আপনাকে আপনি বহুরূপে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। ঐন্দ্রজালিক শিল্পীও হৃদয়ের অমোঘ প্রেরণা লাভ করিয়া রস-ধর্ম্মে সুরে সঙ্গীতে বর্ণে চিত্রে কাব্যে ও সাহিত্যে আপনাকে আপনি বহুরূপে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। ব্রহ্মের রস-সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত। শিল্পীর হৃদয়-সৃষ্টিও তদ্রূপ অথবা তাহারই প্রতিধ্বনি। জীব-জগতের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্মের রস-সত্তায় অভিষিক্ত; রসের স্পন্দনে অহরহঃ স্পন্দমান। তাই আদি-শিল্পীর এই আদি আনন্দস্পন্দন বিশ্বের বিচিত্র সত্তার আশ্রয়ে কবির হৃদয়-বীণায় অনুরূপ স্পন্দন বা প্রতিস্পন্দন তুলে এবং সেই রসই নূতন ভাবে নূতন রূপে শিল্পের জগতে বিবিধ ব্যঞ্জনায় মূর্ত্তিলাভ করে। তাই শিল্পের রসসৃষ্টিও এক হিসাবে ব্রহ্মের রস-প্রকাশের প্রতিধ্বনি।

শিল্প-সাধনার বিশিষ্টতা, লক্ষ্য ও পথের ঐক্য; রস-দৃষ্টির তুল্যতা

অদ্বৈতে সৃষ্টি নাই। পূর্ণ রসোপলব্ধি সম্ভব হয় অদ্বৈতে, তাই পূর্ণ রসবোধের সময়ে সৃষ্টি সম্ভবে না। ব্রহ্মের সৃষ্টিও

দ্বৈতভাগে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী রহস্যময়ী মায়ার ছায়ায়ই সম্ভব হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধির অসম্প্রজ্ঞাত জ্ঞানে দ্বৈত-বোধ-বিবর্জ্জিত অবস্থায় আত্ম-প্রকাশ পূর্ণ হয়। কিন্তু সেখানে সৃষ্টির কথা মূকের কথার মতই মিথ্যা। তাই স্বরূপ-লক্ষণে নিরপেক্ষভাবে পূর্ণ রসবোধের আলোচনা একান্তই অনাবশ্যক। তাহা এ জগতে নিত্যই কাম্য এবং লক্ষ্য, নিত্যই সাধ্য; কিন্তু শিল্পীর ভাষায় ও মাপ-কাঠিতে কোনও দিন লভ্য নহে এবং মনে হয়, শিল্পীর একমাত্র লক্ষ্যও নহে। শিল্পীর অন্তরে যখন রসের প্রকাশ হয়, শিল্পী যখন রস-ময় রস-স্বরূপ হইয়া উঠেন, তিনি তখন অদ্বৈত। অনুভূতির সেই এক মুহূর্ত্তই তাঁহার অনন্ত মুহূর্ত্ত, এবং সে প্রকাশ তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ বলিয়াই মনে হয়। রস-তন্ময়তায় অন্য কোনও জ্ঞান থাকে না। তাহার পর সহসা স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসের বিলয় ঘটিলে প্লাবনের অন্তে পড়িয়া থাকে এক অনির্ব্বচনীয় স্মৃতি এবং জাগিয়া উঠে এক অতৃপ্তির বেদনা, এক অপূর্ণতার ছায়া এবং রসের এক নিবিড় ক্ষুধা। রসসাধক তখন নিজ জীবন এবং বিশ্বের প্রতি চাহিয়া অনন্ত মুহূর্ত্তের সেই পূর্ণ প্রকাশটিকে সুরে, শব্দে বা বর্ণে রূপ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া নানা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি তাই হারানকে পাওয়ার, অথবা পাওয়াকে পূর্ণরূপে পাওয়ার চেষ্টা। কিন্তু রসশিল্পীর এই পূর্ণতাকে ব্রহ্মানন্দের উপাসক পূর্ণতা বলিবেন না, তাঁহার মানদণ্ডে হয় ত বলা উচিতও নহে। এইখানে উভয় সাধকের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। শিল্পীও জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটিয়াছেন সেই পূর্ণরস-স্বরূপ অমৃততত্ত্বের দিকে। শিল্পিহৃদয়ের পূর্ণতাও হইবে সেই পূর্ণ রসের নিবিড় উপলব্ধি করিয়া। কিন্তু শিল্পীর জাগ্রত লক্ষ্য বা একমাত্র কাম্য সেই অখণ্ড রস-সত্তার কেবল পরম ও চরম রূপটিই নহে। রস-সত্তার প্রত্যেক রূপটিই শুদ্ধ রস-ধর্ম্মে প্রকাশিত হইলে শিল্পীর নিকট পরম বলিয়া তখন অনুভূত হয়। সিদ্ধিলাভ বা লক্ষ্যপ্রাপ্তিই মুখ্য হইয়া দাঁড়াইলে পথ হয় বাধাস্বরূপ, সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ এবং অনেকাংশে অনাবশ্যক জঞ্জাল। ব্রহ্মসাধকের সাধন-পথে তাই কখনও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, চিত্তবিনোদন বা আস্বাদন নাই। তাঁহার সর্ব্বত্রই "ভয়" "ভোগ্য" কোথাও নাই। পথের আস্বাদন আসিলে তাহা প্রলোভন, তাই লক্ষ্য-লাভের পরিপন্থী এবং একান্তই হেয়। রস-সাধকের দৃষ্টিতে পথ এবং লক্ষ্য, সাধনা এবং সিদ্ধি একই সঙ্গে চলে। পথের গতিতেই তাহার লক্ষ্যের উপলব্ধি, সাধনায়ই তাহার সাধ্যের উদয়। রস-স্বরূপে পাইলে সব পাওয়াই পরম পাওয়া। কবি অসাধারণকেও সাধারণের মধ্যে দেখিতে পারেন, চরমও তাঁহার নিকট বিশিষ্টের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়, এবং প্রত্যেক বিশিষ্টই তাঁহার সমক্ষে পরম রসের রূপে ফুটিয়া উঠে। তাই শিল্পীর জগতে অল্প নাই বৃহৎ নাই, প্রয়োজনীয় নাই, অপ্রয়োজনীয় নাই এবং ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বা হেয় বলিয়া কিছুই নাই।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?"

হরি যদি আরাধিত হইলেন, তবে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিই যদি আরাধিত না হইলেন, তবেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন?—এ কথা বৈরাগ্যবান্ ভক্তের। রস-শিল্পীর দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।

রস-ধর্ম্মই শুদ্ধ শিল্পি-ধর্ম্ম

রসধর্ম্মই শুদ্ধ শিল্পি-ধর্ম্ম বা কবি-ধর্ম্ম। তাহা দার্শনিক সত্য, জাতীয় আদর্শ, ভগবদ্ভক্তি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, মানব-প্রকৃতির বিচিত্র জটিলতা বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ বশতঃ বিভিন্ন বিষয় আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। যেখানে শুদ্ধ সৌন্দর্য্যধর্ম্মে আলোড়ন—সেখানে কবির লক্ষ্য ও পথ প্রায় এক, সেখানে সিদ্ধি সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে। যেখানে কবিজীবন পরিপূর্ণ লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হইবার জন্য জাগ্রত সাধনাময়, সেখানে তাহার পথ ও লক্ষ্যের ব্যবধান গোচর হওয়া অসম্ভব নহে। প্রতিভাশালী গুণিগণ অনেকেই একাধারে কবি, ঋষি, দার্শনিক, ভক্ত বা স্বদেশ-প্রেমিক। এই সমুদয় ক্ষেত্রেই রসধর্ম্মে অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশ দ্বারা তাহাদের কবিত্বের পরিমাপ হইবে; ভক্তি বা দার্শনিকত্বের পরিমাপ হইবে অন্য বিচার দ্বারা। আনন্দে সকলেরই জীবন, কবির জীবন রসে। আদি কবি ব্রহ্মের ন্যায় তিনিও রসস্বরূপ। রসেই জন্ম, রসেই বিকাশ এবং রসেই স্থিতি ও পরিণতি—রসের নিবিড় উপলব্ধিতে তাহার প্রেরণালাভ এবং রসেই তাঁহার আত্মপ্রকাশ বা মুক্তি।

রসোপলব্ধির কারণ—কবি-হৃদয়ের অনুরাগ এবং বিষয়ের সহিত সাধর্ম্ম্যভাব

কাব্যপাঠে "সহৃদয় সামাজিকের" অন্তরে রসাস্বাদ হয়। আলঙ্কারিকগণ আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব, ব্যভিচারী

ভাব, স্থায়ী ভাব, বাসনার উদ্রেক, সাধারণীকরণ, একাত্মীকরণ, অলৌকিকভাবে আনন্দময় সত্ত্ব-চৈতন্যের প্রকাশ ও স্থায়ী ভাবের রসনিষ্পত্তি প্রভৃতি নানা সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা দ্বারা রসগ্রাহী "সামাজিকের" মনে রসোৎপত্তির নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কাব্য কবির রসানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। তাই বিপরীত ধারায় চলিলে কবির রসপূর্ণ হৃদয় কি ভাবে কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাও অনেকাংশে বুঝা যায় এবং যথাস্থানে তাহার পর্য্যালোচনা করা হইবে। কিন্তু কবির রসোপলব্ধির কারণ কি, কেন হয়, কি ভাবে হয়, তাহার মীমাংসা কোথায় ? রস স্বয়ং সিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং স্বপ্রকাশ, ইহা বলিলেই সমগ্র সত্যটি বলা হয় না। পূর্ণিমা-রজনীতে চন্দ্রোদয়! নিম্নে মৌন প্রশান্ত জলধি! সহসা সে বিক্ষুব্ধ আলোড়িত স্ফীত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত জলরাশি লইয়া বেলা বিপ্লাবনপূর্ব্বক বিপুল ধ্বনিতে সীমাহীন প্রকাশের পরিপূর্ণতায় আপনি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এমন হয় কেন? কৈ, হিমালয়ের গগনভেদী তুষার-শৃঙ্গ ত চন্দ্রকরস্পর্শে এতটুকু কম্পনও লক্ষিত হয় না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দুইটি তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। এক পূর্ণচন্দ্রের প্রবল আকর্ষণ, দ্বিতীয় সমুদ্রের হৃদয়ের ধর্ম্ম। কঠিন তুষার-রাশি বিগলিত হইয়া সেখানে তরল সলিলে পরিণত। তাই চন্দ্রের আকর্ষণে তাহার শান্ত হৃদয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাস, মৌনকণ্ঠে মুখর সঙ্গীত এবং সীমাহীন আত্ম-প্রকাশে আপন পূর্ণতা-প্রাপ্তি। কবি-হৃদয়ের রসোল্লাসের কারণ অনুসন্ধান করিলেও বাহিরের একটি প্রবল আকর্ষণ এবং মুখ্য কারণরূপে কবি-হৃদয়ের বিগলিত স্বভাবই পরিলক্ষিত হইবে। হৃদয় কাঠিন্য-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া বিগলিত হয় প্রেমে বা অনুরাগে। তাই কবি-হৃদয়ের রসোপলব্ধির মূলীভূত কারণ বিষয়-বিশেষের প্রতি কবি-হৃদয়ের অনুরাগ। কোনও কামনা বা লক্ষ্য-লাভ হেতু নহে বলিয়া এই অনুরাগ অহৈতুক বটে; কিন্তু ইহারও মূল কারণ বিদ্যমান। প্রত্যেক বিষয়েরই ভাল লাগা বা না লাগার অন্তরালে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি বা এই দৃশ্যমান বিচিত্র বহিঃপ্রকৃতি ব্যক্তি-বিশেষের মন আকৃষ্ট করিয়া তাহাতে যে অনুরূপ তরঙ্গ বা প্রতিধ্বনি তুলে, ইহার কারণ সেই সেই বিষয়ের ও সেই সেই ব্যক্তির হৃদয়ের সাধর্ম্ম্য-ভাব। এই সাধর্ম্ম্য হেতু হৃদয়ের যেমন অনুকূল বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে, বিষয় বিশেষও তেমনই অনুকূল হৃদয়কে আকর্ষণ করে। অথবা কবি নিজ হৃদয়ের অনুভূতিকে যাহার মধ্যে লাভ করেন, যে বিষয়ের অনুভূতিতে কবি নিজেকে পূর্ণতর বলিয়া বোধ করেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ, প্রীতি বা প্রেম উপজাত হয়। এই অনুরাগ বা প্রেম তাই বস্তুতঃ আত্মানুরাগ বা আত্ম-প্রেমেরই নামান্তর। বিশ্বের দর্পণেই কবি আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া থাকেন। সমগ্র জীব-জগতের মধ্যে আত্মাকে দর্শন ও উপলব্ধি করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম চরিতার্থ হইলেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বের উপর তাই হৃদয়ের অধিকার যাহার যত সত্য, তিনি তত শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কবি।

আত্মানুরাগ হইতে বিষয়-বিশেষে অনুরাগ হয়। বিশেষ বিষয়ানুরাগ হইতে রসোপলব্ধি জন্মে। রসোপলব্ধি হইতে সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির মূলীভূত কারণ তাই অনুরাগ। অনুরাগ অন্তরের জিনিষ। সৃষ্টিও তাই অন্তরের ধর্ম্ম। অনুরাগ বশতঃ রসপূর্ণ অন্তরের বহিঃপ্রকাশই সৃষ্টি।

অনুরাগ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং যুগ-বৈশিষ্ট্য

রস-সৃষ্টি অনুরাগ-মূলক বলিয়া তাহা বিশেষ-ভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা করে। বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় তাহা নৈর্ব্যক্তিক নহে এবং সকল দেশে সকল কালে সকলের মনেই একরূপে উপলব্ধ হয় না। শ্যামনাম বৃন্দাবনবাসী সকলের কাণেই পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিয়াছিল শুধু তরুণী গোপীদের কাণে এবং "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" অনুরাগ সঞ্চার করিয়া "প্রাণ আকুল করিয়াছিল" শুধু রসময়ী শ্রীমতী রাধার। কোনও হৃদয় ভগবৎ-প্রেমের অমিয় মাধুর্য্যে বিগলিত হয়, কোনও হৃদয় দেশ-প্রেমিক বীর-চরিত্রের মহৎ প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়, কোনও হৃদয় বা আপন অন্তরের সহজ আবেগেই ব্যাকুল হইয়া পড়ে, আবার কোনও হৃদয় সমুদ্র-দর্শনে বসন্তের মলয়-সমীর-স্পর্শে কিম্বা ভূকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত-কল্পনায় আন্দোলিত হইয়া উঠে। সূর্য্যোদয়ে পদ্মদল বিকশিত হয়; কিন্তু কুমুদিনী নিমীলিত হইয়া পড়ে। সন্ধ্যাগমে পদ্মিনী নিমীলিত হয়, কিন্তু কুমুদিনী মোদিত হইয়া উঠে। মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া গিরিশিখরে ময়ূর-ময়ূরী কেকা-রবে নৃত্য করিতে থাকে। চাতক সে জলদ-জলের স্পর্শ ভিন্ন পিপাসা মিটাইতে পারে না। অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় বহিঃপ্রকৃতিও মানুষের

চৈতন্যে বিচিত্র আলোড়ন তুলে। কারণ, এই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, সমুদ্র, বসন্ত, বর্ষা, স্নিগ্ধতা, দীপ্ততা, ব্যাপকতা, গভীরতা, অথবা কোমলতা বা করুণতা প্রভৃতি নিজ নিজ ধর্ম্ম দ্বারা আমাদের অন্তরের ভাবোদ্দীপক বলিয়া এবং দীর্ঘকাল সাহচর্য্য বশতঃ নানা স্মৃতিময়, সংস্কারময় এবং কবিপ্রসিদ্ধি-পূর্ণ বলিয়া ইহাদের সত্তাও চেতনধর্ম্মীর মত নানা ভাবময়। এই বহিঃ-প্রকৃতি এবং কবির নিজ হৃদয় ও মানব-চরিত্র অর্থাৎ এই অন্তঃ-প্রকৃতি—এক কথায় জীব ও জগৎ এই সমস্তই সাহিত্যের বিষয়। কবির ব্যক্তিগত অনুরাগের বৈচিত্র্য-হেতু সামান্য একটি ছবিও তাহার নিকট অনন্তশ্রীপূর্ণ চিরবিস্ময়কর হইতে পারে; আবার যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রুচি ও অনুরাগেরও পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বকালে রাজন্যবৃন্দ, অভিজাতবর্গ এবং ঋষিগণের চরিত্রই কবির কল্পনা-ধর্ম্মকে উদ্দীপ্ত করিয়া রসানুভূতির উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিত। বর্ত্তমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক ও শ্রমিকের জীবনের সাধারণ ঘটনাই আশ্চর্য্য রসের রূপে প্রকাশিত হয়।

রসশিল্পীর অকৃত্রিম অদ্বৈত সত্তা এবং বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশ

অকৃত্রিম হৃদয় না হইলে অনুরাগ হয় না এবং অনুরাগ সত্য না হইলে রসোপলব্ধি জন্মে না। রসোপলব্ধি না হইলে আত্মপ্রকাশ বা সৃষ্টি অসম্ভব। যে কবির হৃদয় যতখানি অকৃত্রিম, তাঁহার অনুরাগ, রসোপলব্ধি, আত্মপ্রকাশ বা সৃষ্টিও ততখানি অকৃত্রিম, ততখানি কবির অন্তর জীবনের প্রতিবিম্ব বা আলেখ্য। খাঁটি শিল্পীর দ্বৈত-সত্তা সম্ভব নহে। খাঁটি ভগবৎ-সাধকের ন্যায় শিল্পের রস-সাধককেও অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে একই তপস্যার বহ্নি জ্বালাইয়া হৃদয় ও বুদ্ধির সম্মিলিত অর্ঘ্য দ্বারা জীবন-দেবতার সাধনা করিতে হয়। রসের রাজ্যে যতটুকু কৃত্রিমতা, মিথ্যাভাণ ও অভিনয় থাকিবে, সেই পরিমাণে তাহার আত্মপ্রকাশ ক্ষুণ্ণ হইবে। ইহা হৃদয়-রাজ্যের অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্ম; সেখানে বিজ্ঞান, দর্শন বা রাজনীতির নিছক বুদ্ধির শাসন প্রবেশ করিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বৈচিত্র্যের জন্য নিজ কালকে বঞ্চনা করা চলে। কিন্তু বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন নিবিড় রস-ধর্ম্ম না থাকিলে মহাকালের অমোঘ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। শিল্পীর চাই তাই অকৃত্রিম সরল দ্বৈতহীন রস-সাধনার জীবন। এই জন্যই ঋষিদের ভাষা, শ্রেষ্ঠ কবিতা অপূর্ব্ব মন্ত্র হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার ভক্তকবি চণ্ডিদাসের পদাবলী এবং রামপ্রসাদের গান অকৃত্রিমতা, রসতন্ময়তা, শক্তিমত্তা ও অমোঘতায় অনেক স্থলে মন্ত্রস্থানীয় এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যে আজিও অতুলনীয়, বাল্মীকি, দান্তে বা শেলিও একই কারণে মহনীয়।

শ্রীসুধীরকুমার দাস গুপ্ত (এম, এ)।

পতিত

যদি পারো কেহ, ধরে' তোল' মোরে,
ধরে' তোল হাত ধরে',—
তোমাদের পথে তোমাদের দেশে
নিয়ে চল সাথ করে'।
পিছনে কাঁদিছে মেঘলা অতীত,
বর্ত্তমানের ধ্বসে' গেছে ভিৎ,
ভবিষ্যতের আকাশ আঁধার—
কোথা যাব রাত করে'?

প্রলোভনে পথ পিছল করেছে,
সংসার-ডোর ছেঁড়া,
ঘর নাই—শুধু বিপথে বিপদে
ধূলি-মাটী মেখে' ফেরা।

শুধু 'সর্' 'সর্' শুধু 'দূর! ছাই!'—
মলিন পথিকে ডরায় সবাই,
ভাগ্য-দেবতা দিয়াছে যে ভালে
আঁকিয়া কালির ঢেরা!

জেনে' ভুল করি' শত অনুতাপে
জ্বলে'-পুড়ে' মরি সদা,
কত অভাবের শর বাজে বুকে,
হৃদয়ে হাজারো ব্যথা।
স্বভাব যা' ছিল এখনো সে তাই,—
কে আছে, কে দিবে পতিতেরে ঠাঁই?
যদি থাকো কেহ দরদী বন্ধু,
কহ, কহ মোরে কথা!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

অভিশপ্ত

১

দিগন্তে পাহাড়ের কোলে কৃষকের পর্ণকুটীরগুলি গোধূলির আলো-আঁধারে ক্রমেই মিলাইয়া যাইতেছে। পদতলে শীর্ণা তটিনীর ক্ষীণ রজতধারা বালুস্তর ও উপলখণ্ডসমূহের উপর দিয়া ধীরে বহিয়া যাইতেছে। পার্শ্বে শ্যামললতাপাদপবর্জ্জিত ক্ষুদ্র অনুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ কোনরূপে পাহাড় নামের ইজ্জৎ রক্ষা করিয়া লজ্জায় গাত্র সঙ্কুচিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। খণ্ড খণ্ড মেঘ গোধূলির রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রান্তর বায়ুলেশহীন, কেবল নদী-তটে রহিয়া রহিয়া অতি ক্ষীণ বায়ুস্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে। নিষ্কম্পবৃক্ষ নিভৃতদ্বিরেফ প্রকৃতি গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। নাতিদূরে গোপপল্লী হইতে মাদলের গম্ভীর অস্পষ্ট আরাব মাঝে মাঝে আকাশে ভাসিয়া আসিতেছে। নদীতটে উপবিষ্টা তরুণী একদৃষ্টে মেঘের উপর অস্তগমনোন্মুখ তপনদেবের রক্ত আভার তুলিকাপাত নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে তন্ময়তা দুষ্মন্তের বিরহে শকুন্তলার ভাব-তন্ময়তার সহিত তুলিত হইতে পারে।

অকস্মাৎ পার্শ্বে উপবিষ্ট বুল-টেরিয়ারটা ভীষণ রবে গর্জ্জন করিয়া শান্তপ্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিল, অদূরে অন্তরালে উপবিষ্ট পরস্পর কথোপকথনে রত আয়া ও আরদালী ছুটিয়া আসিল। নিকটেই একটি অপরিচিত মনুষ্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এতক্ষণ সকলে এমন তন্ময় হইয়াছিল যে, আগন্তুকের নিঃশব্দ-পদসঞ্চারের কোনও সাড়া প্রাপ্ত হয় নাই। 'জিম' কিন্তু মানুষের গন্ধ পাইয়াই বিষম লম্ফঝম্প আরম্ভ করিয়া দিল—তাহাকে চেইনে টানিয়া রাখাই দায় হইয়া পড়িল। তরুণী ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "চুপ, চুপ, জিম! দুষ্ট কোথাকারের।"

ততক্ষণে আগন্তুক তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। সে নির্ভয়ে জিমের পার্শ্বে আসিয়া তাহার মাথার উপর চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "থাম রে বেটা থাম!"

আশ্চর্য্য! জিমও একবারে ঠাণ্ডা হইয়া আনন্দের আতিশয্যে লেজ নাড়িতে ও আগন্তুকের হাত চাটিতে লাগিল—যেন সে আগন্তুকের কত কালের পরিচিত বন্ধু!

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিল, "মাফ করবেন, বড় আচমকা এসে পড়েছি—"

"এ কি, স্যার?" বলিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে তরুণী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

আগন্তুক বিস্মিত হইল। এই সাঁওতাল পরগণার ক্ষুদ্র পল্লীপ্রান্তরে এ কি অভাবনীয় যোগাযোগ! এই সৃষ্টিছাড়া জগতের কোণে অপরিচিতা তরুণী তাহাকে 'স্যার' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, এ কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা!

"মাফ করবেন—আমি ত—আমি ত—"

"এঃ, এত শীগ্‌গির ভুলে গেলেন—এই যে ড্যাডি ডিয়ার! দেখেছো কে এয়েছে?"—বলিয়া তরুণী এক প্রৌঢ়ের দিকে ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক আরও দুই তিনটি লোকের সহিত সেই মুহূর্ত্তে অপর দিক হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"চিনতে পারছো না বাবা? চল, যেতে যেতেই বলি, সন্ধ্যে হয়ে এল।"

সকলে বাসার দিকে চলিলেন। আগন্তুক কিন্তু সেই-স্থানেই দণ্ডায়মান রহিল। সে অস্পষ্ট গোধূলির আলো-আঁধারেও দেখিয়া লইয়াছিল,—আরদালীর চাপকানের উপর

তকমা-আঁটা ছিল। সে বুঝিয়া লইল, তরুণীর পিতা কোনও সম্ভ্রান্ত জমীদার অথবা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ হইবেন।

যাইতে যাইতে তরুণী পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল,—"এ কি, স্যার—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে! চলুন আমাদের বাংলোয়, আজ আপনাকে আমাদের এখানে খেতেই হবে। কেমন, না বাবা?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করিলেন,—"ইনি?"

তরুণী উচ্চ হাস্যরোল তুলিয়া বলিল, "সত্যিই চিন্‌তে পার নি, বাবা? উনি যে আমার মাষ্টার মশাই ছিলেন—সেই যে—যেবারে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠি! আমরা তখন আলিপুরে থাকি। সেই যে—ভুলে গেলে?"

মুহূর্ত্তে ঠিক চপলাচমকের মত আগন্তুকের মনের মধ্য দিয়া অতীত জীবনেতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা রেখাপাত করিয়া দিয়া গেল। ও! কনকলতা, আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামগোপাল দত্তের কন্যা;—যাহাকে সে ম্যাট্রিক ক্লাসের পড়া পড়াইয়াছিল!

সহসা তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রায় বাহাদুর রামগোপাল বাবু তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া করপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "ওঃ আপনি, মাষ্টার মশাই? আপনার জন্যেই ত কনক সেবার ম্যাট্রিকে স্কলারসিপ নিয়ে পাশ করেছিল। আসুন, আসুন, আপনাকে ত আমি আজ ছেড়ে দিতে পারছি না। এখানে কোথায় থাকেন?"

পরস্পর করমর্দ্দনের পর সকলে আবার বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখনও কিন্তু রায় বাহাদুরের কথার স্রোতঃ রুদ্ধ হয় নাই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি—ওঃ, আপনার নামটা—কি, কি যেন—ওঃ, সে আজ বছর তিন হ'ল—"

এতক্ষণ আগন্তুক নীরবে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। এইবার বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম—"

কনকলতা কথাটা শেষ করিয়া দিয়া বলিল,—"রমাপ্রসাদ, না মাষ্টার মশাই?"

"হাঁ, রমাপ্রসাদ ঘোষ।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাই বটে। তা তখন ত আপনি এম, এ, পড়ছিলেন, তার পর এখন কি করছেন? এখানে কি জন্যে এসেছেন?"

রমাপ্রসাদের মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে মুহূর্ত্ত পরে বলিল, "নানা ঝঞ্ঝাটে এম, এটা দেওয়া হয় নি। এখানে সবে কাল এইছি হাজারিবাগ স্কুলের সেকেণ্ড টিচার হয়ে।"

কনক বলিল, "তবে ত আপনার এখনও থাকবার কিছু ঠিক হয় নি। তবে চলুন, আজ রাত্রিটা আমাদের ওখানে গিয়ে থাবেন। বলুন, যাবেন? কেমন বাবা, আমরা ওঁকে ত পেয়ে ছাড়তে পারি নি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "হাঁ, তা ত বটেই। চলুন, আমার ওখানে গিয়ে আপনার হিষ্ট্রীটা সব শুনবো।"

রমাপ্রসাদ অন্যমনা হইয়া এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ রায় বাহাদুরের কথা সাঙ্গ হইলে চমকিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা, কি বলছিলেন আপনারা?"

কনক হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আপনি ত ভারি ভুলো-মন! বলবো আর কি, আজ আমাদের ওখানে আপনার নেমন্তন্ন।"

রমাপ্রসাদ কাতর স্বরে বলিল, "আজ থাক, আর এক দিন তখন—"

অনুযোগের স্বরে কনক বলিল, "এই ত! ছিঃ, আপনি আমাদের পর ভাবলেন?" তাহার পর কুন্দ-দন্তে অধর টিপিয়া বিভীষিকার ভাণ দেখাইয়া বলিল, "না গেলে, বুঝেছেন, ওয়ারেণ্ট ক'রে ধ'রে নিয়ে যাব। জানেন, বাবা হাজারিবাগের ম্যাজিষ্ট্রেট?"

রমাপ্রসাদের মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে কনকের সেই রহস্যে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া যোগদান করিতে পারিল না, কেবল কাতরকণ্ঠে বলিল, "দেখুন, আমি সামান্য স্কুল-মাষ্টার—"

কথাটা কণ্ঠে রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আর কোন কথা না বলিয়া ভিন্ন মুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া নিমিষে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রায় বাহাদুর ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, লোকটা যাই হোক্, বড় অভদ্র!"

একটা ক্ষুদ্র শ্বাস ফেলিয়া কনক বলিল, "না বাবা, আমার মনে হচ্ছে, ওঁর মনে কি একটা গভীর দুঃখ রয়েছে, নইলে আগে ত এমন ছিলেন না। কি ওঁর কষ্ট?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "যাক গে, অত ভেবে কায নেই। এক দিনের আলাপ—যেচে মেলামেশার দরকার কি?"

কনক কিন্তু সেই মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইল না। সে সারা পথটাই ভাবিতে ভাবিতে চলিল,—কিসের এই দুঃখ?

২

আজ দুই মাসের উপর হাজারিবাগ স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছন্নূলালদের একটা বাসা-বাড়ীর ঘরে বাস করিতেছে এবং শিক্ষকতা-কার্য্যেই কালক্ষয় করিতেছে। ছন্নূলাল হাজারিবাগের ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদার বাবু পান্নালালের আদরের পৌত্র, সে 'মাষ্টার মশাইকে' জগতের সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। তাহার মাষ্টার মহাশয়ের মত ক্রীকেট খেলিতে, ফুটবল খেলিতে, দৌড়ঝাঁপ করিতে অথবা জিমন্যাষ্টিক করিতে সে অঞ্চলে আর ত কেহ ছিল না।

বস্তুতঃ এই গুণে রমাপ্রসাদ ছাত্র-সমাজকে অতি অল্প-সময়েই বশ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কিন্তু জানিত না, ছাত্ররা তাহার এত গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সকল ব্যাপারেই ছাত্ররা তাহাকে ক্যাপ্টেন, সেক্রেটারী অথবা প্রেসিডেণ্ট না বানাইয়া ছাড়িত না। দুরন্ত ছেলেকে সায়েস্তা করিতে হইলে, হেড মাষ্টার মহাশয় তাহাকে রমাপ্রসাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতেন; কারণ, তিনি জানিতেন, রমাপ্রসাদের ছেলে সায়েস্তা করিবার যে ঔষধ আছে, তাহা অন্য কোনও মাষ্টারের নাই। রমাপ্রসাদ ছাত্রগণকে লইয়া অবসরকালে ব্যায়াম বা খেলায় মাতিয়া থাকিত বটে, কিন্তু পাঠে কাহাকেও অমনোযোগী হইতে দেখিলে এমন গম্ভীর ও কঠোর হইত যে, ছাত্ররা কেবল তাহার মুখের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিবার আশঙ্কায় পারতপক্ষে কচিৎ কখনও পাঠে অবহেলা করিত।

সুখে দুঃখে রমাপ্রসাদের মাষ্টারী জীবন একরূপ মন্দ কাটিতেছিল না। সে যেমন সঙ্গ ভালবাসিত না, তেমনই হাজারিবাগের এই নিঃসঙ্গ মাষ্টারী জীবনও তাহাকে প্রভূত নির্জ্জন চিন্তার ও আপনার ভিতরে আপনাকে ধরিয়া রাখিবার অবসর দিয়াছিল। যতটুকু সময় সে ছাত্রদের লইয়া থাকিত, ততটুকুই তাহার মানুষের সঙ্গলাভ ঘটিত, অন্যথা সে নির্জ্জন বাসায় আপনার ঘরে আপনার লেখাপড়া লইয়া থাকিত, অথবা আপনার মনে চিন্তা করিত, ভাল না লাগিলে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িত। তাহার সেই ভ্রমণের কালাকাল ছিল না, গভীর রাত্রিতেও চৌকীদার তাহাকে জনশূন্য প্রান্তরে আপন মনে বেড়াইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে, কত সময়ে চোর, ডাকাত বা বন্য জন্তুর ভয় দেখাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছে। কত সময়ে প্রবাসী বাঙ্গালী তাহাকে সহর হইতে দূরে সাঁওতাল পল্লীর কুটীরে বসিয়া সাঁওতাল যুবক-যুবতীর সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে; ভাবিয়াছে, যে বাঙ্গালী সাধিলেও নিজের জাতের লোকের সঙ্গে মিশে না, সে অসভ্য বন্য জাতির সহিত মিলামিশা করিতে দ্বিধা বোধ করে না কেন?

কিন্তু তাহার এই নিঃসঙ্গ জীবনাতিপাতের এক প্রবল অন্তরায় হইয়াছিল—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা কনকলতা। যে দিন সে তাহার ও তাহার পিতার সাদর নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যান করিয়া অসভ্য বর্ব্বরের মত ব্যবহার দেখাইয়া অর্দ্ধপথে ফিরিয়া গিয়াছিল, সেই দিন হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সেই অশিষ্টতা ও ধৃষ্টতা ক্ষমা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার আদরিণী কন্যা সেই অশিষ্টতাকে অশিষ্টতা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া তাহার কোন অজানা মনোবেদনায় সমব্যথিনী হইয়া উঠিয়াছিল এবং লোক-মারফতে ও পত্রসাহায্যে তাহাকে বারবার তাহাদের বাসায় যাইয়া একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে এ পর্য্যন্ত নানা ছুতার তাহাদের সংস্রব হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিল।

এমনই সময়ে এক দিন রমাপ্রসাদ স্কুলের ছুটীর পর বাসায় ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময় ও ভয়ের সীমা রহিল না। দূর হইতে সে দেখিল, আগাছা ও ঘাস-জঙ্গলে পরিপূর্ণ তাহার ভাঙ্গা ঝরঝরে বাসার দেউড়ির রোয়াকে বসিয়া একটি সুন্দরী বাঙ্গালী তরুণী বাসার মধ্যস্থ প্রাঙ্গণের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া (বোধ হয়) তাহারই অপেক্ষা করিতেছে এবং ভাঙ্গা ফটকের বাহিরে আয়া ও আরদালী দাঁড়াইয়া আছে। এ কি বিপদ! সে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা কনকলতা, তাহা সে অনুমানে বুঝিয়াছিল। যাহার সঙ্গ সে বিষবৎ মনে করিয়া ভয়ে এত দিন দূরে অবস্থান করিতেছিল, সে স্বয়ং আজ তাহার দ্বারে উপস্থিত!

রমাপ্রসাদ একবার মনে করিল, পলাইয়া যায়; কিন্তু পরক্ষণে ভাবিল, দ্বারে অতিথি, তাহাকে বিমুখ করা কোনও জাতির সভ্যতার অনুমোদিত নহে। সে ত অসভ্য ও অশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেই, তাহার উপর আরও অধিক পশুত্বের পরিচয় দিয়া তাহার লাভ কি? রমাপ্রসাদ বাসায় প্রবেশ করিল।

"এই যে, বাঃ, আপনি কি রকম লোক, মাষ্টার মশাই? দেখুন, নেমন্তন্ন নিলেন না ব'লে নিজে যেচে আমার এলুম

আপনার দোরে—পারেন ত অতিথিকে তাড়িয়ে দিন",—বলিয়া কনক উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে মুখে দুরন্ত হাসি চাপা রহিল না।

"তুমি, তুমি,—তুমি এখানে কেন? তোমার বাবা কি বলবেন?"

"সে যা বলেন বলবেন, সে জন্যে আপনার ভাবনা নেই। কিন্তু আপনি কি জন্যে বার বার আমার নেমন্তন্ন নেন নি, তার কৈফিয়ৎ কি দেবেন? হো হো, কেমন জব্দ করেছি! যাক গে, অনেকক্ষণ দেউড়িতে ভাঙ্গা রোয়াকে ব'সে আছি, ঘর খুলুন, ভাল ক'রে বসি গিয়ে। আচ্ছা মাষ্টার মশাই, এই এক উঠোন ঘাস-জঙ্গল, এর ভেতর যে সাপ-বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে, এখানে একলা থাকেন কি ক'রে? ভয় করে না?"

ততক্ষণ রমাপ্রসাদ দেউড়ীর পার্শ্বস্থ তাহার থাকিবার ঘর খুলিয়া ফেলিয়াছে। সে অতিথির বসিবার জন্য একখানা আসন খুঁজিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "এর চেয়েও ঘাস-জঙ্গলে একলা বাস করা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

কনক বিস্মিত হইয়া বলিল, "এর চেয়ে জঙ্গলে? সে কোথায়?"

রমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "তোমাকে যে বসতে দিই কিসে—একখানা মাদুর—"

"থাক, থাক, আমি বেশ বসবো'খন ঐখানাতে। কেন, এই ত একখানা বেশ ভাল কম্বলও রয়েছে দেখছি, বাঃ"—বলিয়াই কনকলতা কম্বলখানা বিছাইয়া দিব্য মেঝের উপরে বসিয়া পড়িল। পরে ঘরের চারিদিক্ একবার চকিতনেত্রে দেখিয়া লইয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "এইটেই বুঝি আপনার বিছানা—তা, একটা বালিসও নেই ছাই? আর ওটা কি—একটা কাঠের বাক্স—এখানকার হাটে পাওয়া যায়, খোলাই প'ড়ে রয়েছে—ওর ভেতরে কি, একরাশ বই আর খাতাপত্র বুঝি। তা কাপড়-চোপড় কোথায় রাখেন? ও মা, ঐ বাঁশের আলনাটার ওপর বুঝি—"

হঠাৎ শ্রোতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইল—তাহার ম্লান মুখের কাতর দৃষ্টি দেখিয়া সে একবারে নীরব হইয়া গেল। রমাপ্রসাদ ব্যথিতস্বরে বলিল, "এ গরীবের কুঁড়ে—গরীবের কুঁড়েই বা বলি কেন—এও ত আমার নয়—"

কনক নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে যে জ্ঞানতঃ অপরাধ করে নাই, তাহা মনে হইল না, বরং অনুতাপে দগ্ধ হইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা করতে বলবো না মাষ্টার মশাই, ক্ষমার যোগ্য আমি নই। তবুও—তবুও—ছোট বোন্ ব'লে—ছাত্রী ব'লে যেমন ক'রে আগে সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে এসেছেন—"

"থাক, থাক, অপরাধ ত আপনি কিছু করেন নি—যা সত্যি, তাই আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাই বলছিলুম, এ গরীবের সঙ্গে আপনাদের মেলা-মেশা—আমি ত দূরে থাকতেই চেয়েছিলুম, আমার সেই শাস্তির কেন বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন? আপনারা এখানকার রাজা—"

"ছিঃ ছিঃ মাষ্টার মশাই, তা হ'লে এখনও ক্ষমা করেন নি? আমরা যাই হই, আমি ত আপনার ছাত্রী—তা আমায় আপনি আপনি কচ্ছেন কি ব'লে? আপনিও ত দোষ কম করেন নি।"—বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

রমাপ্রসাদ অপ্রতিভ হইল, এমন লোকের কাছে সে কিরূপে গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে! সেও সেই হাসিতে যোগ দিল।

তখন কনক বলিল, "তা হ'লে দু'জনেরই দোষ কাটাকাটি হয়ে গেল, কি বলেন মাষ্টার মশাই? এখন চলুন, আমাদের ওখানে—বাবা কত দুঃখু করেছেন আপনি না যাওয়াতে। অন্ততঃ বুড়ো-মানুষের মানটাও রাখা ত' আপনার উচিত। না, আমি কোন ওজরই শুনবো না, আপনাকে যেতেই হবে, ছোট বোনের এ অনুরোধটা রাখবেন না? দেখুন, আমার ভাই-বোন্ কেউ নেই—মা ত ছেলেবেলায় মায়া কাটিয়ে চ'লে গেছেন,—"

বলিতে বলিতে কনক কাঁদিয়া ফেলিল।

রমাপ্রসাদ অস্থির হইয়া উঠিল। না, এই জঙ্গলেও ত তাহার স্বস্তি নাই! সে কর্ম্মকোলাহলময় জগৎ হইতে দূরে চলিয়া আসিল, কিন্তু এখানেও এ কি বন্ধন তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিতেছে! ইহা কি অদৃষ্টের পরিহাস? সে তাড়াতাড়ি বলিল, "এ কি ছেলেমানুষী করছ তুমি—চল, কোথায় যেতে হবে, আমি এখনই যাচ্ছি।" ধনীর আদরিণী কন্যাকে এই ভগ্ন জীর্ণ কুটীরে আর এক তিল অপেক্ষা করাইতেও তাহার মনে ব্যথা লাগিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া পথে নামিয়া পড়িল।

বাসায় যখন তাহারা পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

হইয়াছে, রায় বাহাদুর রামগোপাল বাবু তখন কাছারী হইতে বাসায় ফিরিয়াছেন। পথে যাইতে যাইতে কনক রমা-প্রসাদকে কথা কহিবার অবকাশ দেয় নাই, তাহাদের আলি-পুরে ছাড়াছাড়ির পর এত দিন তাহারা কোথায় কোথায় ছিল, সে কত দূর পড়িয়াছে, তাহারা তাহাকে কত খুঁজিয়াছে,—এমন কত কথাই সে কলকণ্ঠী বিহগীর মত এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়াছিল এবং বাসার কাছাকাছি আসিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এত দিন মাষ্টার মশাই কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, তাঁহার কে আছে, তিনি যে এই ক্ষণেক পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, ইহার অপেক্ষা বড় জঙ্গলে তিনি বাস করিয়াছেন, সেই জঙ্গল কোথায়? রমাপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিল, সে অনেক দূরে।

রামগোপাল কন্যার সঙ্গে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসুনেত্রে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তোতাপাখী তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়াই 'এক রাশ' কথা কহিয়া ফেলিল। কেমন করিয়া মাষ্টার মশাইএর বাসায় গিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে এবং তাঁহাকে কি কি বলিয়াছে, অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল। সে রাত্রিতে রমাপ্রসাদকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় আহারাদি করিয়া বাসায় ফিরিতে হইল। তাহার সমস্ত ওজর-আপত্তি কনকলতার উপরোধ-অনুরোধের স্রোতে ভাসিয়া গেল।

এইরূপ মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। সে প্রাণপণে তাহাদের সঙ্গ এড়াইতে চাহিলেও সেই সঙ্কল্প অটল থাকিল না। প্রায়ই তাহাকে অপরাহ্ণে স্কুলের ছুটীর পর আরদালী ও আয়ার তত্ত্বাবধানে কনককে লইয়া দূরে শালমহুয়ার বনে অথবা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নির্ঝরের তটে কিংবা শ্যামল শৈলতলে বেড়াইতে যাইতে হইত এবং সন্ধ্যার পর বাংলোয় তাহাকে কোন না কোন বিষয়ে পড়াইয়া আহার শেষ করিয়া ভগ্ন-কুটীরে ফিরিয়া আসিতে হইত। কিন্তু সে রায় বাহাদুরকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছিল যে, তিনি ইহার জন্য তাহাকে কোন পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন না, কেন না, সে মাষ্টারী করিবে বলিয়া কনককে পড়াইতেছে না, সে তাহার পাঠ বলিয়া দিতে আনন্দ পায় বলিয়া পড়াইতেছে, অন্যথা একবারেই তাঁহার বাংলোয় পদার্পণ করিবে না।

কিন্তু সত্যই কি বাংলোয় পদার্পণ করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন ছিল? সে ত কত দিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, আর বেড়াইতে যাইবে না, স্কুলের ছুটীর পর বাসায় বসিয়া থাকিবে অথবা নিজের মন যে দিকে চায় চলিয়া যাইবে। দুই এক দিন যে সে তাহা করে নাই, তাহাও নহে। কিন্তু সে এক দিন বাংলোয় না গেলেই পরদিন কনক তাহার ভগ্নকুটীরে ঠিক দেখা দিত এবং নানা অনুযোগ আবদার অভিমানের পর তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত—সে আবদার অভিমান, সে অনুযোগ,—দিন দিন তাহার এত মিষ্ট লাগে কেন? দূর হউক, কাঙ্গালের এ রাজতক্তের স্বপ্ন কেন? আলিপুরে থাকিতে যে ভাব মনের কোণে অতি গোপনে লুক্কায়িত ছিল, তিন বৎসরের অদর্শনে তাহা ত লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আকাশের চাঁদ হাতে ধরিবার কল্পনা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্যই ত সে সাঁওতালপরগণার এই জঙ্গলরাজ্যে আপনাকে কাযের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে আসিয়াছে, অদৃষ্টের এ কি পরিহাস!—এখানেও তাহার কল্পনা-রাজ্যের মানসী প্রতিমা তাহাকেই কষ্ট দিবার জন্য সাকার হইয়া তাহারই সঙ্গ কামনা করিতেছে, ছোট বোনটির মত আবদার করিয়া তাহাকে প্রতিপদে জড়াইয়া ধরিতেছে! দূর হউক, এ নেশার ঘোর কাটাইতেই হইবে—এই জঙ্গল ছাড়িয়া তাহাকে হয় ত আবার লোকালয়ে পলাইতেই হইবে। যাহা অসম্ভব, তাহার ধ্যান-ধারণা করিয়া সে কি শেষে উন্মাদগ্রস্ত হইবে! না, না,—স্থানত্যাগই তাহার একমাত্র শান্তির ও সান্ত্বনার পথ।

কিন্তু, কিন্তু,—না, থাক, তাহাকে এ স্থান ত্যাগ করিতেই হইবে। এজন্য তাহার ত আর উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়ো-জন নাই, যেমন এক কাপড়ে আসিয়াছে, তেমনই এক কাপড়ে যাইবে, এ ত আর রাজা-রাজড়ার যাওয়া-আসা নহে। রোজই সঙ্কল্প স্থির হয়, রোজই যাত্রার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কাহার নবকিসলয়-লাবণ্যমাখা একখানি মুখমণ্ডল মানস-সায়রে ভাসিয়া উঠে! আর ত যাওয়া হয় না। একটিবার—আর একটিবার! এমন করিয়া একটিবার দেখার তৃষা তাহার ত আর মিটে না!

সহস্রজিহ্ব জনরবও নীরব ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেটের তকমাধারী আরদালী,—লোক সভয়ে সাত সেলাম করিয়া দূরে নর্দ্দামার ধারে গিয়া দাঁড়াইত, ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যার পথ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু অন্তরালে তাহারা জিহ্বার বিষ ঢালিয়া দিত—সামান্য একটা পথের ভিখারী স্কুলমাষ্টার, তাহার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যার এই মিশামিশি—কি আছে ইহার

ভিতরে ? ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণে এ কথা উঠিত না, তাঁহার কন্যার কর্ণে ত নহেই, কাহার ঘাড়ে দুইটা মস্তক আছে! কিন্তু বেচারী দিনভিখারী গরীব স্কুলমাষ্টারের কর্ণকুহর এই বিষের রিষ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইত না। লোক আঁচে ইসারায় তাহাকে অনুক্ষণ 'কাঙ্গালের ঘোড়ার রোগের কথা' শুনাইয়া দিত। সরলা বালিকা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ভগিনীর অফুরন্ত ভালবাসা অকাতরে ঢালিয়া দিতেছে, আর বিনিময়ে সে তাহার কি সর্ব্বনাশ করিতেছে ? ধিক্ তাহার বিদ্যায়, ধিক্ তাহার জ্ঞানে, ধিক্ তাহার পুরুষত্বে, ধিক্ তাহার বংশ-মর্য্যাদায়! না—হাজারিবাগ তাহাকে ছাড়িতে হইবেই।

৩

প্রকৃতির এ কি সংহার-মূর্ত্তি! সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে ঝড় উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন ও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্বিকাশ। সাঁওতাল পরগণার ঝড়—যেন প্রলয়ের অনুচর! গাছের মাথা মাটীতে লুটাইয়া পড়িতেছে, প্রভঞ্জন ভীষণ শব্দে যেন ধরিত্রীকে দলিয়া মথিয়া চলিয়া যাইতেছে, ঘোর অন্ধকারে জল-স্থল ছাইয়া গিয়াছে, আর প্রকৃতির সেই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিকে আরও বিভীষিকাময়ী করিয়া কড় কড় শব্দে অশনিপাত হইতেছে। মুহূর্ত্ত পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল।

এই ভীষণ দুর্য্যোগে দুইটি প্রাণী মুক্ত প্রান্তরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একটি আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছে—তাহারা রমাপ্রসাদ ও কনকলতা।

সে দিন শনিবার। সকাল সকাল স্কুলের ছুটী। সে দিন রমাপ্রসাদ চুপি চুপি হাজারিবাগ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। হৃদয়ের উপর কতখানি পাষাণ-চাপ চাপাইয়া শেষ মুহূর্ত্তে সে এই সঙ্কল্প আঁটিয়াছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কে বলিবে! বাসায় আসিয়া সে সামান্য দুই একটা জিনিষ গুছাইয়া বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে তাহার দুষ্টগ্রহের মত যেন সেই স্থানে কনকলতা আসিয়া দেখা দিল! বাহিরে তাহার অনুচররা অপেক্ষা করিতেছিল।

তাহাকে চিন্তার অবসর না দিয়া কনক বলিল, "এ কি হচ্ছে, স্যর! জিনিষ-পত্তর গোছগাছ হচ্ছে কেন ? কোথাও যাচ্ছেন না কি ? বাঃ, বেশ ত, না ব'লে ক'য়ে চুপি চুপি কোথাও বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে বুঝি! বা রে!"

রমাপ্রসাদ মিথ্যা বলিল, "না, কোথাও যাচ্ছি না, স্কুলের ছুটী ত নেই—এমনই গোছগাছ করছি।"

"বটে! তবে পুঁটলী বাঁধা হচ্ছে কেন ? আমি বলি, আজ সেই পাহাড়টা দেখে আসব—সেই যে আপনি বলেছিলেন, যেটা ৪ মাইল দূরে—সেইটে! আজ তাই সকাল সকাল এসেছি। চলুন, এই বেলা বেরিয়ে পড়া যাক্, আবার সন্ধ্যের আগে ফিরতে হবে কি না। চলুন, উঠুন।"

রমাপ্রসাদ প্রমাদ গণিল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "শরীরটে তত ভাল নয়, আর এক দিন তখন যাওয়া যাবে, আজ তোমরা বেড়িয়ে এস খানিকটে।"

"না, না, এ সব ছুতো শুনবো না, আজই যেতে হবে আপনাকে। বা রে! আমি বলে কত কষ্টে বাবাকে ব'লে রাজী করলুম, হাঁ! অসুখ করেছে না হাতী করেছে! কৈ, কোথায় অসুখ ?"

সরলা বালিকার এ কথায় কি জবাব দিবে, তাহা রমাপ্রসাদ খুঁজিয়া পাইল না। তাহার কোন ওজর-আপত্তি টিকিল না, তাহার সহিত তাহাকে বেড়াইতে বাহির হইতে হইল।

পাহাড় দেখিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। আকাশে ঘোর ঘনঘটা করিয়াছিল। রমাপ্রসাদ পথে বহুবারই বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু নির্ব্বন্ধপরায়ণা কনকলতা তাহার কোনও কথায় কর্ণপাত করে নাই। পাহাড় না দেখিয়া ফিরিবে না, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা,—সে একরূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

পাহাড় পশ্চাতে রাখিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সে ঘোর ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিতে তাহারা প্রায় অন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সাঁওতাল পরগণার ঝড়বৃষ্টির এইরূপই প্রকৃতি, যেমন মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড বেগে নামে, তেমনই মুহূর্ত্তে সরিয়া যায়। দুরন্ত প্রান্তর, ক্বচিৎ কোথাও দুই চারিটা বৃক্ষ সেই ঘোর অন্ধকারে অঙ্গ মিলাইয়া রহিয়াছে, কেবল প্রবল প্রভঞ্জনের আঘাতে মড় মড় করিয়া শাখাপ্রশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে। ঘোর অন্ধকারে পথঘাট কিছুই লক্ষ্য হয় না। আয়া, আরদালী তাহাদের সান্নিধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—হয় ত তাহারাও তাহাদের মত প্রাণভয়ে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে!

রমাপ্রসাদ দৃঢ়রূপে কনকের একখানি বাহু নিজ বাহুমধ্যে

ধারণ করিয়া যতটুকু সাধ্য তাহাকে ঝড়-ঝাপ্‌টার আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া একটা আশ্রয়ের সন্ধানে অগ্রসর হইতেছিল। প্রকৃতি সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিবার মুহূর্ত্ত হইতেই কনকলতা ভয়ে বিবর্ণমূর্ত্তি ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া একবারে রমাপ্রসাদের বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়ে তাহাকে সঁপিয়া দিয়াছিল। রমাপ্রসাদ মাঝে মাঝে "ভয় কি কনক?" বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিতেছিল, আর মুহুর্মুহুঃ চপলাচমকের সাহায্যে সম্মুখের পথ দেখিয়া লইতেছিল। হা ভগবান্! একখানা ক্ষুদ্র কুটীর—দরিদ্রের একখানা সামান্য জীর্ণ কুটীর—সম্মুখে কি কিছুই মিলে না!

বোধ হয়, তাহার অন্তরের কাতর আহ্বান সর্ব্বশক্তিমানের চরণতলে পৌঁছিয়াছিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেই রমাপ্রসাদ পাশের মাঠে আশ্রয়ের মত কোন কিছু দেখিল। মুহূর্ত্তে কনকলতাকে একরূপ বহন করিয়া সে সেই ভগ্ন জীর্ণ কুটীরমধ্যে উপস্থিত হইল।

কুটীর জনশূন্য। বোধ হয়, কৃষকরা দিবাভাগে এই স্থানে রৌদ্রাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। একটিমাত্র প্রবেশ-পথ, তাহাও অনাবৃত, হিংস্র জন্তু আসিয়া অনায়াসে তথায় থাকিতে পারে। রমাপ্রসাদের তখন সে সব কথা মনেও উদিত হয় নাই। সে প্রায় অবসন্ন দেহে কনকলতাকে ধারণ করিয়া কুটীরের দেওয়ালে দেহ এলাইয়া দিয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল। দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ হানিতেই সে দেখিল, ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে একটি বংশমঞ্চ—তখনই সে তাহার উপরে কনকের দেহ এলাইয়া দিল।

কড় কড় শব্দে নিকটে বৃক্ষশীর্ষে বজ্রপতন হইল। আতঙ্কে চীৎকার করিয়া কনক রমাপ্রসাদের বিশাল উরসে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রমাপ্রসাদের শিরায় শিরায় একটা শিহরণ বহিয়া গেল কি? সে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এমন ক'রে কাঁপছ কেন? এ কি, কাঁদছ? কি হয়েছে, কনক?"

কিন্তু কনক কোনও উত্তর দিল না। রমাপ্রসাদ অনুভব করিল, তরুণীর সমগ্র দেহ বিপুল বেগে স্পন্দিত হইতেছে। একান্ত নির্ভরতার সহিত সে যেন তাহার দেহের আশ্রয়ে লুকাইতে চাহে।

রমাপ্রসাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে যেন অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার দীর্ঘ দিনের কামনা কি আজ সত্যই সার্থকতার আনন্দ আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইতে চলিয়াছে?

কনক যেন কি একটা কথা বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল।

রমাপ্রসাদ প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"কি বলছ কনক?"

কনক ধীরে ধীরে বলিল, "জানি না। কেবল এই মনে হচ্ছে, যে জগতে আমরা রইছি, সেখানে তুমি আর আমি, আর কেউ নেই।"

আত্মসংবরণের চেষ্টা প্রবল বন্যার প্রবাহে ভাসিয়া গেল। উন্মত্তের মত রমাপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, "কনক, কনক—এ কি বল্‌ছ? দরিদ্রকে, ভিখারীকে কোহিনুরের আশায় প্রলুব্ধ করছ কেন?"

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়ে তেমনই তন্ময়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্য তখনও থামে নাই।

হঠাৎ কনকলতা ক্ষিপ্তার মত তাহার নিকট হইতে দূরে গিয়া বলিল, "ঐ যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে—চলুন, বাংলোয় ফিরে যাই।"

রমাপ্রসাদ বিস্মিত হইল—এ কি অভাবনীয় ভাব-পরিবর্ত্তন!

* * *

পথে রামপ্রসাদ কথা কহিবার অনেক চেষ্টা করিলেও কনক অসম্ভব গম্ভীর হইয়া রহিল।

বাংলো হইতে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে এক দল লোক আলোক হস্তে হল্লা করিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রমাপ্রসাদ বুঝিল, হাকিম সাহেবের লোকজন তাহাদের সন্ধানে আসিতেছে। হয় ত আর সুযোগ হইবে না। তাই সে মিনতির সুরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"কনক, যাবার আগে একটা আশার কথা দিয়ে যাবে না?"

উত্তরে সে তাহার কঠিন হস্তে কনকের কুসুমপেলব কোমল চম্পকাঙ্গুলির স্নেহ-স্পর্শ অনুভব করিল। তাহার সমস্ত শরীর পুলকে শিহরিয়া উঠিল।

* * *

উজ্জ্বল আলোকে বাংলোর বাহিরের বারান্দা আলোকিত হইয়াছিল—সেই আলোকের কেন্দ্রমধ্যে রায় বাহাদুর পাদ-চারণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

হঠাৎ জনকোলাহলে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল, সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, প্রথমে সিক্তবসনা কন্যা, পশ্চাতে রমাপ্রসাদ।

কনক 'বাবা' বলিয়া এক পদ অগ্রসর হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—পিতার মুখে সে ত এমন গাম্ভীর্য্য ও কঠোরতার ভাব কখনও দেখে নাই। সে অমনই নিরস্ত হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

রায় বাহাদুর তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলেন, গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "এত দেরী হ'ল কেন, সেটাও কি ব'লে যাওয়া দরকার মনে কর না?"

কনক একবার কি বলিতে গিয়া মুখ অবনত করিল। তাহার মুখমণ্ডলে তখন লজ্জারুণরাগদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল কি? স্বচ্ছ দর্পণে অর্পিত আলেখ্যের মত যাহার রেখালেশহীন অন্তরের সমস্ত স্থানটাই পিতার নিকট অনুক্ষণ উন্মুক্ত থাকিত, আজ তাহাতে রেখাপাত হইয়া অস্পষ্টতা আনয়ন করিয়াছিল কি?

কনক ভিতরে চলিয়া গেল। রায় বাহাদুর দেখিলেন, তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায় তখনও রমাপ্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। সে তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়াই অভিবাদনান্তে বাসায় ফিরিয়া যাইতেছিল। রায় বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "শোন রমাপ্রসাদ বাবু, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি ড্রয়িংরুমে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। রমাপ্রসাদ ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল।

রায় বাহাদুর একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ব'স। ওঃ, ভিজে কাপড় বটে?—ওরে—"

"থাক, দরকার নেই," বলিয়া রমাপ্রসাদ দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে প্রথমাবধিই তাঁহার অসম্ভব গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়াছিল।

রায় বাহাদুর কোনওরূপ ভণিতা না করিয়াই বলিলেন, "তোমার এখানে যাওয়া-আসা বা আমার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশাটা আমি পছন্দ করি না। তুমি যদি অন্য কোথাও চাকরী করতে চাও, ক'রে দিতে পারি; কিন্তু হাজারিবাগ তোমায় ছাড়তেই হবে।"

রমাপ্রসাদ গম্ভীরভাবে বলিল, "তা হয় না। আগে যদিও না হ'ত, কনকের মনের ভাব জানবার পর তা আর হয় না।"

তাহার নির্ভীক গর্ব্বোন্নত দৃষ্টি রায় বাহাদুরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করিল, তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "আমার মেয়ের মনের ভাব? তার মানে?"

রমাপ্রসাদ তখনও অটল অচল, বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া সহজভাবেই জবাব দিল, "আজ জানতে পেরেছি, সে আমায়—আমি যোগ্য না হ'লেও—"

"খবরদার! আমার মেয়ের নাম মুখে এনো না—সে আমার মেয়ে,—তার আবার মনের ভাব কি? আমি যা ব্যবস্থা করব, তাই সে মাথা পেতে নেবে। ভেবেছ কি, তাকে আমি মেমেদের মত বেশী বয়েস পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়েছি ব'লে সে মেম হয়ে গেছে? তুমি কালই হাজারিবাগ ছেড়ে যাবে কি না, শুনতে চাই।"

"না, যাব না। সে আপনার মেয়ে হ'তে পারে—কিন্তু সে অজ্ঞান শিশু নয়—তার মুখে যে আশার কথা পেয়েছি, তার পর হাজারিবাগ কেন, যেখানে সে থাকবে, সেইখানেই আমার তীর্থস্থান হবে—আমি এক পা-ও নড়ব না।"

রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ বাক্‌শূন্য অবস্থায় বিস্মিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কঠোরস্বরে বলিলেন, "জান, তুমি পুলিসের মার্কামারা এক জন পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট? তোমায় এখনই জেল দিতে পারি, জান?"

রমাপ্রসাদের মুখমণ্ডল সহসা ম্লান হইয়া গেল। সে কোনও জবাব দিল না। রায় বাহাদুর মনে ভাবিলেন, এইবার সে জব্দ হইয়াছে, তাই উৎসাহভরে বলিলেন, "তুমি যে দিন হাজারিবাগে নেমেছ, সেই দিনই পুলিসের কাছে রিপোর্ট পেয়েছি—কেবল আমার দয়ায় তুমি এখনও পুলিসের নজর হ'তে দূরে রয়েছ, তা জান?"

রমাপ্রসাদ ধীরকণ্ঠে বলিল, "জানি, কিন্তু আমায় মিথ্যে ক'রে পুলিস ধরেছিল—তাই শেষে কোনও প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আমি গরীব হ'তে পারি, কিন্তু এনার্কিষ্ট বা বলশেভিক নই। আমি তার উপযুক্ত অন্য দিক্ দিয়ে না হ'তে পারি, কিন্তু বংশের মর্য্যাদায় আমি আপনার চেয়ে ছোট না। আপনি যতই বাধা দিন, তার যদি মতপরিবর্ত্তন না হয়, তা হ'লে আমি তার সুখ-দুঃখের ভার নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করব না।"

রায় বাহাদুরের ধৈর্য্যের বাঁধ এইবার সত্যসত্যই ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"কি, কি, র‍্যাস্কাল, ব্ল্যাগার্ড! পথের কুকুর!—আমার মেয়ের ভার নিবি তুই? এত বড় স্পর্দ্ধা! চাপরাশী!"

রমাপ্রসাদ তখনও ধীর, স্থির, অটল—সে কেবল বলিল,

"মিথ্যে মাথা গরম করছেন আপনি, চাপরাসীকে ডাকতে হবে না, আমি আপনিই যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রাখবেন, আপনার ভয় দেখানয় আমি সঙ্কল্পচ্যুত হব না। আমি গরীব ব'লে তার ভয়ে দূরে থাকতে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে যখন নিজে এ গরীবকে স্বপ্নরাজ্যের আশা দেখিয়েছে, তখন যতক্ষণ না সে আমায় চ'লে যেতে বলবে, ততক্ষণ এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না—ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিস এসে বাধা দিলেও না।"

কথাটা বলিয়া রমাপ্রসাদ উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া ঝড়ের বেগে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। রায় বাহাদুর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলেন।

৪

রমাপ্রসাদের মনে আজ তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। সত্যই ত, কে সে যে, স্বর্গের সুরভি প্রসূনকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে? সত্য, রায় বাহাদুর সত্যই বলিয়াছেন, যে পথের কুকুর, তাহার এ যজ্ঞভোজ্যে সাধ কেন? বাল্যে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক মাতুলের আশ্রয়ে মাতুলের দয়ায় প্রতিপালিত, কলেজে পাঠকালে নরেশের সহিত মিশামিশি করিয়া পুলিসে ধরা পড়িয়া প্রায় ৩ বৎসর নানাস্থানে আটক ছিল। জেল হইতে বাহির হইলে ভয়ে কুষ্ঠরোগগ্রস্তের মত তাহাকে তাহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বর্জ্জন করিয়াছিল, মাতুলও তাহাকে গৃহে আশ্রয় দিতে চাহেন নাই, তাহার সংস্রব পর্য্যন্ত রাখিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। স্রোতের শৈবালের মত সে হেথা-সেথা কোনওরূপে উদরান্ন সংস্থান করিয়া শেষে এই জঙ্গলে মাষ্টারী করিতে আসিয়াছে—লোকালয়ে আর ফিরিয়া যাইবে না।

কিন্তু কি অভিশপ্ত এই পুলিসে ছোঁওয়া মুক্ত আটক-আসামীর জীবন! এখানেও শান্তি নাই। কি কুক্ষণে আবার দেখা হইয়াছিল। যাহার মূর্ত্তি সে আটক-জীবনেও মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারে নাই, তাহার নির্জ্জন নিরবলম্ব জীবনে সহসা গোধূলির আলো-আঁধারে চপলাচমকের মত দেখা দিয়া সে কি অশান্তি আনিয়া দিল!

সরলা তরুণী তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অন্তস্তলে সঙ্গোপনে লুক্কায়িত চিত্র খুলিয়া দেখাইয়াছে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান তরুণীর অযাচিত প্রথম প্রেমের অধিকারী সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে হইতে পারে,—এই জ্ঞান যে মুহূর্ত্তে তাহার মানসে ফুটিয়া উঠিল, তপ্ত সুরার মত তখনই উহা রমাপ্রসাদের ধমনীর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে উন্মত্তের মত করিয়া তুলিল। স্বপ্ন—সুখস্বপ্ন—হউক উহা স্বপ্ন, কিন্তু কত মধুর, কত সুন্দর! রমাপ্রসাদ সে স্বপ্নের মদিরা পানে সারা জীবন বিভোর হইয়া থাকিবে, সে-ও স্বীকার, তথাপি তাহার আশা বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না। সে কাঙ্গাল, সে দরিদ্র, সে নগণ্য, সমাজ-পরিত্যক্ত, কিন্তু এ সম্পদের অধিকার হইতে সে কখনও আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে না।

না, না, তাহা হইতে পারে না—তাহার অভিশপ্ত জীবনের সহিত সে কেমন করিয়া এই ভুবন-সুন্দরী তরুণীর আশা-আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত উজ্জ্বল নবীন-মুকুলিত জীবনের সুবর্ণসূত্র গ্রথিত করিবে? এ কি প্রলোভন! তাহার নিঃসঙ্গ, অনাদৃত, লাঞ্ছিত জীবনাকাশে ভবিষ্যৎ এ কি সুখময় রামধনুর চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছে? এ কি অন্যায় আকর্ষণ! সেই সুখ-চিত্র টানিয়া ফেলিতে তাহার প্রাণও যে সেই সঙ্গে সে টানিয়া উপাড়িয়া ফেলিতেছে। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু! বলিয়া দাও, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানুষ সে,—এ সঙ্কটে সে কোন্ পথে যাইবে!

শক্তিমান রমাপ্রসাদ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল—তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

"বাবুজী",—বালকের সরল উদার উচ্চহাস্যে রমাপ্রসাদের ভাঙ্গা ঘরের ভাঙ্গা দ্বারগবাক্ষ যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল,—"এ কি, কাঁদছিস্ কেন? মুনিয়ার যে বেমার হয়েছে, তুই দুটো দিন যাস নি কেন?"

বালক মুন্নু, মুনিয়ার ভ্রাতা, নদীতটে শাল-মহুয়ার বনের মধ্যে ইহাদের ক্ষুদ্র কুটীর—রমাপ্রসাদ কত দিন ইহাদের সহিত খেলা করিয়াছে, মাছ ধরিয়াছে, গাছের ফল পাড়িয়াছে।

রমাপ্রসাদ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এঁ্যা, মুনিয়ার বেমার—খবর দিস্ নি কেন, মুন্নু? চল্, চল্, এখনই যাই, হয় ত আর যাওয়া হবে না।"

রমাপ্রসাদ তখনই মুন্নুর সহিত বাহির হইয়া গেল। এ কয় দিন তাহাকে পুলিসের হস্তে কি নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সে-ই জানে! রায় বাহাদুরের সহিত সেই সাক্ষাতের পর হইতে বাংলোর পথ তাহার পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কেবলমাত্র স্কুল ও বাসা এবং বাসা ও নদীতট,—ইহাই ছিল তাহার ভ্রমণের গণ্ডী। ইহার বাহিরে

এক পদ মাত্র যাইলে -অর্থাৎ ষ্টেশনে কি ডাকঘরে অথবা বাজার যাইবার সময় সে বুঝিতে পারে, পুলিস প্রচ্ছন্নভাবে তাহার অনুসরণ করে; কেন না, ঐ পথেই ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো। রমাপ্রসাদের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে পুলিস তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমনামা দেখাইয়াছিল, তাহাতে সে এক জন ভয়ঙ্কর বিপ্লববাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল।

আর কনকলতা? তাহাকে সে ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একটি বার দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারও ভ্রমণ কি নিষিদ্ধ হইয়াছিল? কে জানে! রমাপ্রসাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোনও খবর সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এক দিন গভীর রাত্রিতে সে বাংলোর রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া প্রায় পুলিসের হস্তে ধরা পড়িয়াছিল—সে দূর হইতে দেখিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর রাস্তার দুই মোড়ে দুই জন পাহারাওয়ালা মোতায়েন রহিয়াছে। তবে কি কনক বন্দিনী? পিতারই অনুরূপ তেজস্বিনী কন্যা কি তবে নীরবে এই অন্যায় সহ্য করিতেছে? নীরবে অনিচ্ছায়, না স্বেচ্ছায়?

এক দিন তাহার সেই সংশয়ভঞ্জন হইয়াছিল। সে দিন অপরাহ্ণে সে ডাকঘরে যাইতেছিল। বাংলোর পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপথে হঠাৎ চাতকের মুখে বৃষ্টিধারার মত বারান্দায় কনকলতা একখানা কাগজ হস্তে বাহির হইয়া আসিল। চারি চক্ষুতে দৃষ্টি-বিনিময় হইল। সেই দৃষ্টিতে রমাপ্রসাদ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা ইহজন্মে ভুলিবে কি? রমাপ্রসাদের আর হাজারিবাগ ছাড়া হইল না!

আর এক দিন রমাপ্রসাদ বাংলোর পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় দেখিল, ফটকে আয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সে মুষ্টির মধ্য হইতে একখানা চিরকুট কাগজ যেন অন্যমনস্কভাবে পথে ফেলিয়া দিয়া বাগানের মধ্যে চলিয়া গেল। রমাপ্রসাদের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। সে কোনও দিকে না চাহিয়া ক্ষিপ্রগতি কাগজখানা উঠাইয়া লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইল। মুহূর্ত্তে ছদ্মবেশী পুলিস তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "কি, দেখি!" "কিছু না" বলিয়া রমাপ্রসাদ সেখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। চিরকুটে মাত্র এই কয়টি কথা লেখা ছিল,—'মানুষ আশায় বাঁচিয়া থাকে!'

ইহার পর হইতেই রমাপ্রসাদ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। যদি সে একটিবার একান্তে কনকের সাক্ষাৎ পায়! তাহার সাক্ষাৎ পাইবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিল, এ জন্য সে কয়েকবার পুলিসের হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইল। কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একটিবার—একটিবার মাত্র যদি সে তাহার কাছে একবার মনের কবাট খুলিতে পায়—তবে সে লক্ষ অপমানও গ্রাহ্য করে না!

আজ কয় দিন হইতে সে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিল যে, কনক আর বন্দিনী নহে, এখন সে প্রায়ই প্রভাতে ও অপরাহ্ণে চার পাঁচটি যুবক-যুবতীর সহিত তাহারই ভাঙ্গা বাসার পার্শ্ব দিয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যায়। তাহাদের সরস রঙ্গালাপে ও উচ্চহাস্যে সে প্রায়ই কনকলতাকে যোগদান করিতে দেখিয়াছে। সে ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়া দেখিয়াছে, সেই সদা হাস্যাননা সুন্দরীর মুখে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই,—সেই চোখ-মুখ যেমন সদাই প্রফুল্ল থাকিত, তেমনই রহিয়াছে। তবে কি—তবে কি—না, না, যে অমন করিয়া চাহিতে পারে, যে অমন করিয়া লিখিতে পারে—দূর হউক, মিথ্যা সংশয়, তাহার নীচ সঙ্কীর্ণ মন ত বড় অবিশ্বাসী—ছিঃ!

আজ যখন সে মুনুদের কুটীর হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন দূর হইতে দেখিল, কনকলতা তাহার আত্মীয় তরুণ-তরুণীদের সহিত নদীর দিকে বেড়াইতে যাইতেছে। তাহার হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে ধপ ধপ করিয়া বাজিয়া উঠিল; মনে হইল, সে যেন সে শব্দ স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি মাঠের আম্র-মহুয়া-কুঞ্জের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে মানসে যাহাকে অহরহঃ দেখিতেছে, তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন?

আগন্তুকরা আম্রকুঞ্জের সম্মুখস্থ পথের পয়ঃপ্রণালীর উপরিস্থ সেতুর সন্নিহিত হইল; তাহারা উচ্চ হাস্যের সহিত কলরব করিতে করিতে আসিতেছিল। একটি যুবক—রমাপ্রসাদ খবর লইয়া জানিয়াছিল, সে রায় বাহাদুরের বাল্যবন্ধু সতীর্থ কোনও ধনী ব্যারিষ্টারের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র—বলিল, "এস, এই সাঁকোটায় খানিক বসা যাক, অনেকটা হাঁটা হয়েছে। কি বল হে যতীন?"

অন্য যুবকটি বলিল, "তা মন্দ কি, এঁরা তা হ'লে একটু রিফ্রেস্ট্ হয়ে নিতে পারবেন।"

নির্ম্মলচন্দ্র একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, "আচ্ছা, লোকটা কোথায় লুকুলো বল দিকি? পাতালে প্রবেশ করলে না কি?"

একটি যুবতী বলিল, "নিমুদা যেন কেমন এক রকম—কোথায় আবার লোক দেখলে তুমি ?"

নির্ম্মল বলিল, "বা, আমি ঠিক দেখেছি—ঐ যে রামুকাকা যাকে বলেন এনার্কিষ্ট—"

যতীন বলিল, "তুমিও যেমন, কোটর থেকে বেরোয় না ত সে—পুলিসের সাসপেক্ট—"

যুবতীটি বলিল, "জান নিমুদা, কাকাবাবু বলেন, ঐ লোকটা নাকি বোমা তৈরী করত—মা গো! কিন্তু যাই বল, ওর চেহারা দেখে ত তা মনে হয় না—"

নির্ম্মলচন্দ্র তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "চেহারা ভাল হলেই মানুষটাও ভাল হবে, এর মানে নেই। এদের দলই না কি দুর্ব্বল অসহায় বুড়ী-টুড়ীকে একলা পেলে গলা টিপে মেরে তার টাকা-কড়ি ডাকাতি ক'রে নিয়ে যায়, আর বলে দেশোদ্ধার করছি!—"

যুবক ও যুবতীর দল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। যুবতীটি বলিল, "হাঁরে কনক, তুই ত এখানে থাকিস, ও লোকটাকে দেখে কি তোর এনার্কিষ্ট ব'লে মনে হয়েছিল ?"

কনক বলিল, "কার মনে কি আছে, জানব কি ক'রে বল! যার চালচুলো নেই, অমনধারা লোক কি না করতে পারে ?"

নির্ম্মলচন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "বটে, তাই বুঝি ? তবে লোকটা যে ডুবে ডুবে জল খায়, তা ত জান না তোমরা। আমি ক'দিন ঐ নদীটার ওপারে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি,—একটা সাঁওতালনীর সঙ্গে হাসি-তামাসা করছে—"

পূর্ব্বোক্ত যুবতীটি বিস্ময় ও ঘৃণাভরে বলিল, "ও মা, সত্যি না কি ? এ গুণও আছে ? আমি বলি, এনার্কিষ্টরা খুনে, ডাকাত বা আর যাই হোক, ওদের ও স্বভাবটা নেই। তা কাকাবাবু ওকে পুলিসে ধরিয়ে দেন না কেন ?"

কনক হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "চল দিদি, বেড়িয়ে আসি, এখানটা বড় গরম।"

যুবক-যুবতীরা পুনরায় হাসি-তামাসা ও কলরব করিতে করিতে নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

ইহার কিছুক্ষণ পরে পয়ঃপ্রণালীর সেতুর নিম্ন হইতে রমাপ্রসাদ বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে—দেহ কম্পিত হইতেছে, সে মুহূর্ত্তকাল সেতুর গাত্র-প্রাচীরে দেহ ভর করিয়া চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার দিবা-স্বপ্নের নানাবর্ণরঞ্জিত রামধনু মানসাকাশের কোন্ কোণে উঠিয়াই মিলাইয়া গেল! ধনগর্ব্বিতা নারী তাহার হৃদয়টাকে লইয়া এ কি খেলা করিল! তাহার কাতর ব্যথাহত নয়ন হইতে জগতের সকল আলোক কি জন্মের মত নিভিয়া গেল ? সে ত এই হাস্য-কোলাহল-মুখরিত সুসভ্য সমাজ হইতে আপনাকে দূরে রাখিবারই প্রয়াস পাইয়াছিল, তবে কি পাপে তাহার ভাগ্যবিধাতা তাহার নবীন আশা-মুকুলিত জীবনকে সেই সমাজের ছায়ায় আনিয়া অভিশপ্ত করিয়া দিয়া গেল!

* * * *

তাহার পর ? তাহার পর এক দিন রায় বাহাদুরের সহিত নির্ম্মলচন্দ্রের কথা হইতেছিল। রায় বাহাদুর বলিলেন, "উঃ, খুব 'এস্কেপ' করা গেছে, কি বল নির্ম্মল ? রাস্কেলটা গেল কোথায় তার পর ?"

নির্ম্মল বলিল, "তা জানিনে, তবে যে দিন এখান থেকে চ'লে গেল, তার দু'দিন আগে পথে আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়েছিল। তাতে আমায় সঙ্গীদের নিয়ে বিকেলে নদীর পারে সাঁওতালপাড়ায় বেড়াতে যেতে অনুরোধ করে-ছিল, বলেছিল, গেলে আমাদেরই উপকার হবে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তার মানে ?"

নির্ম্মল বলিল, "শুনুন না বলি। আমরা বেড়াতে গিয়ে মহুয়া-বনের মধ্যে দেখলুম, লোকটা সাঁওতালদের সঙ্গে ব'সে খাওয়া-দাওয়া করছে, হাসি-খুসী করছে, আর—বলতে লজ্জা করে—একটা সাঁওতালনীর গায়ে গা দিয়ে যে অসভ্যতা করছে—তা ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। কনক দেখে একবারে মুখখানা ছাইপানা করে বল্লে,—চলুন, ফিরে যাই। বলেই কারুর অপেক্ষা না ক'রে হন্ হন্ ক'রে চ'লে এলো। তখন যদি কনকের মুখখানা দেখতেন! এমন ছোটলোক-ঘেঁসা শিক্ষিত বাঙ্গালী আমি দেখেছি ব'লে মনে হয় না। আপনি কি ক'রে যে ওটাকে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "যাক্—যেতে দাও, আপদ্ যখন আপনিই বিদায় হয়েছে, তখন আর ওর কথা কেন ? তোমরা আজ গিরিডি যাবে না কি হে ?"

সেই সময়ে কনক আসিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল, "হাঁ, বাবা, আজ সবাই গিরিডি বেড়াতে যাব।" তাহার মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

জীব

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে জীবতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, জন্ম মৃত্যু এ সব জীবের নহে, দেহেরই জন্ম-মৃত্যু হয়। শ্রুতির শিক্ষা, জীব নিত্য. জীবের উৎপত্তি নাই,

আত্মা শ্রুতেঃ নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।

এই পাদের ১৯ সূত্রে বলা হইয়াছে—
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্।

শ্রুতি জীব সম্বন্ধে উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। জীব এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করে, তাহা হইলে জীব বিভু বা সর্ব্বব্যাপী নহে, জীব অণুপরিমাণ। জীব হৃদ্দেশে বাস করে, কিন্তু গন্ধদ্রব্য এক স্থলে থাকিলেও যেমন তাহার গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনই জীবের চৈতন্যও সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়। জীব যখন এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে যায়, তখন এই চৈতন্যকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

গীতাতে আমরা জীবের এইরূপ বর্ণনাই পাই। শ্রুতিও জীবকে অণুপরিমাণ বলিয়াছে। তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়। কারণ, ব্রহ্ম অণুপরিমাণ নহে, ব্রহ্ম কোন এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহে, ব্রহ্ম বিভু, পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু জীব যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ কেমন করিয়া হয়? শ্রুতিতে জীবকে "তত্ত্বমসি"ই বা বলা হইয়াছে কেন? সূত্রকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্মেরই অংশ, অংশ অংশীর সহিত অনন্য।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ—২।৩।৪৩
তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ—২।১।১৪

কিন্তু ইহাতেই ত বিরোধের মীমাংসা হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরবয়ব নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, জড় বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মকে নানাভাগে বিভক্ত করা যায় না। তাহা হইলে ব্রহ্মের অংশ কেমন করিয়া হইতে পারে? বাদরায়ণের পক্ষে ইহার উত্তর খুবই সহজ, শ্রুতেস্তুশব্দমূলত্বাৎ। শ্রুতি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, ব্রহ্ম নিরবয়ব, আবার শ্রুতি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, জীব ব্রহ্মের অংশ; অতএব এখানে তর্কের কোন স্থান নাই।

শঙ্কর কিন্তু তর্কের দ্বারাই এই বিরোধের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রুতির মতে জীব নিত্য, উৎপত্তিরহিত, অতএব জীব এবং ব্রহ্মে কোন প্রভেদই নাই, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ, ব্রহ্মই জীব। জীবের অণুত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, অংশত্ব, কর্তৃত্ব দেখা যায় বটে, কিন্তু এ সব সত্য নহে, এ সব মায়া বা অবিদ্যার কার্য্য। জীব অজ্ঞানের বশেই আপনাকে ক্ষুদ্র, অংশপরিমাণ মনে করে। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলেই জীব বুঝিবে যে, তাহাতে আর ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই. অভেদ। কিন্তু এইরূপে জীবের অংশত্ব, অণুত্ব ও কর্তৃত্বকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন সমর্থন ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। শঙ্কর বলিয়াছেন, জীবের কর্তৃত্ব মিথ্যা ভ্রমমাত্র। ব্রহ্মসূত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন, জীবের কর্তৃত্ব ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ—২।৩।৪১

সূত্রকারের মতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও তেমনই ব্রহ্মের অংশ, স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি অনন্য হইলেও ভেদ রহিয়াছে। ফেন, তরঙ্গ এ সব সমুদ্রের অংশ হইলেও ফেন তরঙ্গই, সমুদ্র নহে। তেমনই, জীব ব্রহ্মের অংশ; কিন্তু ব্রহ্ম নহে। তবে, জীবের যে বিভুত্বের কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে,—জীব জ্ঞানলাভ করিলে ব্রহ্মভাব বা বিভুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই শ্রুতিতে জীবকে ব্রহ্মের সহিত এক বলা হইয়াছে, তত্ত্বমসি। শিশুর মধ্যে পুংস্ত্ব যেমন সম্ভাবনারূপে নিহিত থাকে, জীবের মধ্যেও ব্রহ্মত্ব সেইভাবে নিহিত রহিয়াছে।—

পুংস্ত্বাদিবৎ তু অস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ।২।৩।৩১।

অতএব, বাদরায়ণের মতে জীবই ব্রহ্ম নহে, কিন্তু জীবের মধ্যে ব্রহ্মভাব বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। সাধনার দ্বারা তাহার বিকাশ হয়, জীব বিভুত্ব, ব্রহ্মত্ব লাভ করে; তখন সে চিরকাল সেই ব্রহ্মত্ব ভোগ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ, ৪৬ এবং ৪৭ সূত্রে বলা হইয়াছে,—যদিও জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মের সহিত অনন্য, তথাপি জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করে বলিয়াই ব্রহ্ম সুখ-দুঃখ ভোগ করে না। জীব ব্রহ্মের সহিত অনন্য হইলেও ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক,—

অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ। ২। ১। ২৮, ২৯।

জীবই নিজের কর্ম্মের দ্বারা সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সে সব ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাদরায়ণের মতে জীব ব্রহ্মের সহিত ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। কিন্তু এরূপ ভেদাভেদ একসঙ্গে কিরূপে সম্ভব হয়? বাদরায়ণ বলিয়াছেন, শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। শঙ্কর বলিয়াছেন, অভেদই সত্য, ভেদ মিথ্যা মায়া।

এইবার গীতা এই বিরোধের মীমাংসা কি ভাবে করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। গীতা ব্রহ্ম বা আত্মাকে নিত্য, স্থাণু, নিরবয়ব, সর্ব্বগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মকে ভাগ করিয়া অংশ করা যায় না। অথচ, গীতা ব্রহ্মসূত্রের ন্যায়ই জীবকে অংশ বলিয়াছেন, মমৈবাংশঃ। গীতা জীবকে সর্ব্বগত ব্রহ্মের সহিত মূলতঃ প্রভেদ করে নাই।, জীব যতক্ষণ অহঙ্কার ও অজ্ঞানের বশ, ততক্ষণই সে আপনাকে ক্ষুদ্র "আমি" বলিয়া মনে করে; কিন্তু যখন তাহার জ্ঞান হয়, তখন সে জানিতে পারে যে,—তাহার আত্মা এবং সর্ব্বগত ব্রহ্ম একই

বস্তু,—তখন সে ব্রহ্মই হয়, ব্রহ্মভূতঃ। এ পর্য্যন্ত গীতার সহিত শঙ্করের মতের বেশ মিল আছে। কিন্তু জীবের ব্যষ্টি স্বরূপকে নামরূপকে শঙ্কর মিথ্যা, মায়া, অবিদ্যা বলিয়াছেন। গীতা কোথাও তাহা বলেন নাই। অজ্ঞানের বশে জীব আপনাকে যে ভাবে দেখে, তাহা মিথ্যা,—কিন্তু তাই বলিয়া জীবের ব্যক্তিত্ব জীবের নামরূপ মিথ্যা নহে। গীতা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—ভগবানের নিজেরই যে প্রকৃতি, স্বাম্ প্রকৃতিম্, তাহাই জীবের নামরূপ হইয়াছে,—

জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

ভগবানের চৈতন্যময়ী পরা প্রকৃতিই নানা নামরূপের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছেন,—যেন ভগবান্ সেই সকলের ভিতর দিয়া আপনাকেই নানাভাবে উপভোগ করিতে পারেন। ভগবানের অচল, অক্ষর, নির্গুণ সত্তাও সত্য, আবার প্রকৃতির এই লীলাও সত্য। জীব যে ভগবানের অংশ, ইহার অর্থ নহে যে,—ভগবান্কে কাটিয়া কাটিয়া ভাগ করা হইয়াছে, ভগবান্ যেমন তেমনই আছেন, কেবল তাঁহার প্রকৃতি তাঁহাকেই নানাভাবে দেখাইতেছেন। বিভিন্ন জীব, বিভিন্ন নামরূপ, বিভিন্ন কেন্দ্রস্থল—ভগবান্ এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের ভিতর দিয়াই নিজের অনন্ত সত্তাকে অনন্তভাবে দর্শন করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন এবং তাঁহার নিজেরই প্রকৃতি, চৈতন্যশক্তি এই ভোগলীলা প্রকট করিতেছে। এই লীলা মিথ্যা নহে, মায়া নহে,—এই লীলা ভগবানেরই অনন্ত আনন্দের স্ফুরণ।

তাহা হইলে গীতার ব্যাখ্যা অনুসারে জীব তাহার অন্তরতম সত্তায় ভগবানের সহিত, ব্রহ্মের সহিত এক, অভেদ। কিন্তু প্রকৃতিতে জীব পরা প্রকৃতির অংশ মাত্র। ভগবানের পরা প্রকৃতিই প্রত্যেক জীবের "স্বভাব" হইয়াছে এবং এই স্বভাবের বিকাশই প্রত্যেক জীবের জীবলীলা। জীব যতক্ষণ তাহার এই নিগূঢ় স্বভাবের সন্ধান না পায়, তাহার নীচের বিকৃত প্রকৃতিতে, ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণই তাহার বাসনা, অহঙ্কার, দ্বন্দ্ব-মোহ, সুখ-দুঃখের খেলা, অজ্ঞানের খেলা। এই নীচের খেলা ছাড়াইয়া উঠিলেই তাহার মধ্যে স্বভাবের খেলা, পরা প্রকৃতির খেলার বিকাশ হয়,—তখন আত্মাতে সে ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে। আর প্রকৃতিতে ভগবদ্লীলার শুদ্ধ, বুদ্ধ, রূপান্তরিত আধার হয়। গীতার মতে ইহাই জীবের পরমা গতি। মম সাধর্ম্ম্যমাগতা, মধ্যেব নিবসিষ্যসি, মদ্ভাবমাগতাঃ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা গীতা এই দিব্যজীবন, ভাগবতজীবনই নির্দ্দেশ করিয়াছে।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ বাহ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ণভাবে বুঝান সম্ভব নহে। দর্শনশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে নানা দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন দাড়িম্ব ও দাড়িম্ববীজ আকাশ ও ঘটাকাশ, অগ্নি ও অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি। সমুদ্রের সহিত সমুদ্রের তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। এক সমুদ্রের মধ্যেই অসংখ্য তরঙ্গ উঠিতেছে। তরঙ্গগুলি পরস্পর হইতে বিভিন্ন, তাহাদের বিভিন্ন "নামরূপ", কিন্তু যদি গভীরভাবে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যায় যে,—প্রত্যেক তরঙ্গের পশ্চাতেই সেই এক অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে। একই সমুদ্র অসংখ্য তরঙ্গের রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক তরঙ্গই সেই অনন্ত সমুদ্রের একটি চূড়ার মত। প্রত্যেক জীবও সেইরূপ মূলতঃ ভগবান্, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ভগবানের অনন্ত সত্তা নিহিত রহিয়াছে। এক ভগবান্ই লীলার বশে বহু হইয়াছেন এবং ভগবানের পরা প্রকৃতি বা চিৎশক্তিই এই লীলা প্রকট করিতেছে। কিন্তু এ দৃষ্টান্তও সম্পূর্ণ নহে। সমুদ্রের তরঙ্গের উৎপত্তি ও লয় আছে,—কিন্তু জীব নিত্য; সনাতন। সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠিতেছে, তখন সমুদ্র সচল ক্ষর; সমুদ্রে যখন তরঙ্গ নাই, তখন সমুদ্র অচল অক্ষর—সমুদ্র একই সময়ে দুই রকমই হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানে ইহা সম্ভব, ভগবান্ ক্ষররূপে নিজের প্রকৃতিকে ধরিয়া অসংখ্য জীব হইয়াছেন, জগৎ-লীলা করিতেছেন, আবার সেই সঙ্গেই অক্ষররূপে সকল গতি, সকল নামরূপের অতীত হইয়া রহিয়াছেন। আবার তিনি এই দুই অবস্থারই অতীত, অনির্দ্দেশ্য, অনন্ত। ইহা মনের দ্বারা ধারণা করা যায় না, বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ভগবান্কে এইরূপ সমগ্রভাবে কেবল সেই নিঃসংশয়ে জানিতে পারে—যে ভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত যোগসাধনা করে।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু। ৭।১ গীতা

জগৎ

বাদরায়ণের মতে ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ এবং ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ—

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। ১।৪।২৬

কুম্ভকার মৃত্তিকা হইতে ঘট নির্ম্মাণ করে। এখানে মৃত্তিকা ঘটের উপাদানকারণ এবং কুম্ভকার নিমিত্তকারণ। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইলেও ইহার এক স্বতন্ত্র নিমিত্তকারণের প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ম আপনাকেই জগৎরূপে বিস্তৃত করিয়াছেন,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; ইহাই বেদান্তের Pentheism, সাংখ্য পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়াছেন। পুরুষ কিছুই করে না, কেবল দেখে; প্রকৃতিই নিজের মধ্য হইতে জগতের বিস্তার করে। বাদরায়ণ এরূপ স্বতন্ত্র প্রকৃতি স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে ব্রহ্মই জগতের যোনি; ব্রহ্মই প্রকৃতি।

এবং ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বং সিদ্ধং

গীতারও মতে পরব্রহ্ম এবং তাঁহার পরাপ্রকৃতি অভিন্ন, দুইয়েই এক, একেই দুই, কেবল এক ব্রহ্মেরই দুইটা দিক, ঈশ্বর ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, পুরুষ তাঁহার প্রকৃতিকে ধরিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন—

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত। গীতা ১৪।৩

সূত্রকার বলিয়াছেন, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন।—এখানে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিতেছে।—মৃত্তিকাকে যখন ঘটে পরিণত করা

হয়, তখন মৃৎপিণ্ডকে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, কিন্তু, ব্রহ্মে এরূপ বিকার সম্ভব নহে, ব্রহ্ম অবিকার্য্য, অক্ষর, অপরিবর্ত্তনশীল, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে জগৎ কেমন করিয়া হয়? আবার, কার্য্য ও কারণ উভয়েই সমধর্ম্মী; কিন্তু ব্রহ্ম চেতন, জগৎ জড়, তাহা হইলে চেতন ব্রহ্ম হইতে জড় জগতের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? সূত্রকার তাঁহার প্রধামত উত্তর দিয়াছেন, শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ —শ্রুতি যখন বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, তখন এ বিষয়ে আর কোন তর্কই নাই, ব্রহ্মের অংশ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহাতে ব্রহ্মের নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধভাবের কোন বিকার হয় না, ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, ক্ষয় হয় না, কারণ, শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন।

কিন্তু এইভাবে "শব্দ বলেন বিরোধপরিহার:" আচার্য্য শঙ্করের মনোমত হয় নাই। তাই তিনি তাঁহার মায়াবাদের সাহায্যেই ইহার সমাধান করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই, জগৎই নাই, আমরা যে জগৎ দেখিতেছি, এটা কেবল আমাদের মনের ভ্রম, যেন নিদ্রিতের স্বপ্ন দেখা। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর আর কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। তেমনই জ্ঞানলাভ হইলে, আর কিছু থাকিবে না, থাকিবে শুধু নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিরুপাধি ব্রহ্ম। শঙ্করের এই ব্রহ্মের সহিত, বৌদ্ধদের শূন্য বা নির্ব্বাণ বা অসতের বড় বেশী পার্থক্য নাই। বৌদ্ধরা বলেন, সৎ কিছুই নাই সবই অসৎ। শঙ্কর বলেন, সৎ আছে, কিন্তু, তাহা শুধুই সৎ, শুধু আছে মাত্র, আর কিছুই নহে।—"আছি" শুধু এই মাত্র জানা এবং সেই জানার আনন্দ এই লইয়াই শঙ্করের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু, সে সব মিথ্যা, মায়া, মনের ভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, বাস্তবিক পক্ষে রজ্জু সর্পে পরিণত হয় না, রজ্জুর কোন পরিবর্ত্তনই হয় না, সে যেমন আছে, তেমনই থাকে, কেবল যে দেখে, তাহারই ভ্রম, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছে, ব্রহ্ম হইতে আদৌ জগতের উৎপত্তি হয় নাই, জগৎ মিথ্যা ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কাহার? শঙ্করের উত্তর, "যে জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহার," কারণ ব্রহ্মের ভ্রম হইতে পারে না, ব্রহ্ম মায়ার অতীত, ভ্রমের অতীত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে এরূপ সর্ব্ববিলোপী মায়াবাদের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না। শঙ্কর যে রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া নিজের মায়াবাদ বুঝাইয়াছেন, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্রে এ সব দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না। উপনিষদের দৃষ্টান্ত মৃৎপিণ্ড হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তি, (স্বর্ণ হইতে বলয়ের উৎপত্তি, লৌহ হইতে কটাহের উৎপত্তি।) এখানে ঘট মিথ্যা নহে, তবে ঘট একটা স্বতন্ত্র নাম হইয়াছে বলিয়া তাহা মাটী হইতে ভিন্ন নহে, মাটী ছাড়া তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ইহাই সম্বন্ধ। ব্রহ্ম ও জগৎ একও নহে, আবার জগৎ মিথ্যাও নহে, ব্রহ্মও সত্য। জগৎও সত্য, ব্রহ্ম ও জগৎ স্বতন্ত্রও নহে—ব্রহ্মই জগতের কারণ ও প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্ম ও জগৎ অনন্য বলিতে সূত্রকার ইহাই বুঝিয়াছেন—

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য:—২।১।১৪

কিন্তু, ইহাতে বিরোধের মীমাংসা করা হয় না, কেবল শ্রুতির প্রমাণে বলা হয় যে, ব্রহ্ম অবিকার্য্য তথাপি মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটের ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি। গীতা ইহার যে সমন্বয় করিয়াছে, পূর্ব্বেই আমরা তাহার ইঙ্গিত দিয়াছি। দেশ, কাল, নিমিত্তের মধ্যে যে জগৎলীলা চলিতেছে, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে দেশ, কাল, নিমিত্তের অতীত, অচল, অক্ষর ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অনাদি, স্বপ্রতিষ্ঠ,—অস্তিত্বের জন্য ব্রহ্ম আর কিছুরই উপর নির্ভর করে না; কিন্তু, এই স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম আছে বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিত্তের মধ্যে প্রকৃতির খেলা, জগৎলীলা চলিতেছে। অচল, অক্ষর, এক, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম জগৎকে ধরিয়া না থাকিলে জগতে বহুত্বের খেলা, কার্য্যাকারণের খেলা চলিতে পারিত না। কিন্তু এই অক্ষর ব্রহ্ম নিজে কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ নহে, কোন কিছুর নিয়ন্তা নহে। ব্রহ্ম নিরপেক্ষভাবে সকলকেই ধরিয়া আছে, সমং ব্রহ্ম, কিন্তু, নিজে কিছুই নির্ব্বাচন করিতেছে না, সঙ্কল্প করিতেছে না, সৃষ্টি করিতেছে না। তাহা হইলে এই বিশ্বলীলার দিব্য প্রেরণা কোথা হইতে আসিতেছে? অনাদি, অনন্ত সত্তা হইতে দেশ ও কালের মধ্যে এই জগতের বিস্তার কে করিতেছে? স্বভাবরূপে প্রকৃতি। পরমেশ্বর, ভগবান পুরুষোত্তম নিজের অনন্ত অক্ষরসত্তায় এই পরা প্রকৃতির খেলাকে ধরিয়া আছেন, তাঁহারই অধ্যক্ষতায় তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার প্রকৃতি জগৎলীলার বিকাশ করিতেছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি: সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ৯।১০

শঙ্করের মতে এ জগৎ মায়া হইতে উৎপন্ন, মিথ্যা। আমরা দেখিলাম, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার মতে জগৎ সত্য, উহা ভ্রম হইতে উৎপন্ন নহে, উহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মেরই অংশে অবস্থিত, ব্রহ্মের দ্বারাই বিধৃত। গীতা বুঝাইয়াছেন, কেমন করিয়া ভগবানের পরা প্রকৃতি এই জগতের বিস্তার করিতেছে। শঙ্কর মায়াকে যেরূপ প্রাধান্য দিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রে বা গীতাতে মায়ার সেরূপ প্রাধান্য নাই। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নসৃষ্টি মায়ামাত্র, কিন্তু ব্রহ্মসৃষ্টি সেরূপ নহে—

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।

জগৎ মায়ামাত্র নহে, উহা ব্রহ্মরূপ এবং ব্রহ্মানন্য। গীতা মায়া বলিতে ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতিকে বুঝিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

কিন্তু গীতার মতে এই ত্রিগুণময়ী মায়া হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু ইহারও উপরে আছে যে ভগবানের পরা প্রকৃতি, তাহা হইতেই জীব ও জগতের উৎপত্তি,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ৭।৫

জগতে যে ত্রিগুণের খেলা চলিতেছে, এইটাই প্রকৃতির স্বরূপের খেলা নহে, পরা প্রকৃতির খেলা নহে, এটা কেবল তাহার বিকৃত ছায়া, নীচের খেলা—এই অপরা প্রকৃতির নীচের খেলাকেই প্রকৃত জগৎ বলিয়া যখন আমরা গ্রহণ করি, তাহাই অবিদ্যা, ভ্রম, মায়া। আমাদের জীবনের ত্রিগুণের খেলাকেই

যখন আমরা জীবনের চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তখনই হয় রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম; কিন্তু রজ্জু সর্প না হইলেও প্রকৃত সর্প আছে, শুক্তি রজত না হইলেও প্রকৃত রজত আছে, তাই এইরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব। সেইরূপ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলা সত্য না হইলেও জীবনের সত্য খেলা আছে, জীবন মিথ্যা নহে। জীব যখন বাসনা, কামনা, ইচ্ছা, দ্বেষ, অজ্ঞান, অন্ধকার হইতে মুক্ত হয়, ত্রিগুণের খেলাকে, মায়ার খেলাকে অতিক্রম করে, তখন জগৎ লুপ্ত হয় না, কিন্তু পরা প্রকৃতির যাহা স্বরূপের খেলা, জগতের যে প্রকৃত সচ্চিদানন্দরূপ, তাহাই তাহার নিকট প্রকট হয়।

মুক্তি

ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বাদরায়ণ জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় বলিয়াছেন,—

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ—৩।৪।১

ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের শেষ হয়। কেবল যত দিন আরব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ না হয়, তত দিন ব্রহ্মবিদের দেহ থাকে; কিন্তু তখন যে কর্ম্ম করা হয়, সে কর্ম্ম আর তাঁহাকে স্পর্শ করে না, বদ্ধ করে না। দেহের পতন হইলে তিনি ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন,—

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সংপদ্যতে ৪।১।১৯।

মুক্তিলাভের সাধনায় জ্ঞান ও কর্ম্মের স্থান কি, এ সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের মধ্যে বিষম মতভেদ হইয়াছে। শঙ্করের মতে জ্ঞানই মুক্তির উপায়, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। তবে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে আর কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, জ্ঞান হইলে আর কর্ম্ম চলিতে পারে না। সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মের সহিত মুক্তির কোন সম্বন্ধই নাই, বরং বিরোধ রহিয়াছে, মুমুক্ষু ব্যক্তিকে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেই হইবে, তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ। শঙ্কর এই যে সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রের অন্যান্য ভাষ্যকার তাহা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিয়াই মুক্তির কারণ হয়, ইহাই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়। শঙ্করের পরবর্ত্তী রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্য এইরূপ সমুচ্চয়বাদী। শঙ্করের পূর্ব্বেও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ প্রচলিত ছিল, শঙ্করের ভাষ্যে তাহার আলোচনা আছে। যাহাই হউক, বেদান্তশাস্ত্রে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের উপরেই যে অধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং শঙ্করের ভাষ্যে এই ঝোঁক চরমে উঠিয়াছে। গীতা, বেদ ও উপনিষদের অন্যান্য অংশের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের যে সমন্বয় করেন, তাহাই কালক্রমে জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়বাদে পরিণত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে জগৎ অনিত্য, কর্ম্মবন্ধনের কারণ, এই শিক্ষা আবার প্রবলভাবে প্রচারিত হয়, ফলে গীতার কর্ম্মের শিক্ষা চাপা পড়িয়া যায়। * পরে শঙ্কর আসিয়া সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য এমন তীব্রভাবে প্রচার করেন যে, কালক্রমে লোক গীতার কর্ম্মের শিক্ষা একবারে হারাইয়া ফেলে। এত দিন পরে আবার গীতার সেই শিক্ষা ভারতবাসীর জীবনের উপর প্রকৃত কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গীতার যুগে মুক্তির দুইটি পথ সুপরিচিত ছিল;—জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥
গীতা ৩।৩।

গীতার এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানে বেদান্তদর্শন যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, জ্ঞানের পথ বলিতে বেদান্তকেই বুঝায়, গীতার সময়ে সেরূপ ছিল না। তখন জ্ঞানের পথ বলিতে সাংখ্যকেই বুঝাইত। গীতার পরেই বেদান্ত এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। বৈদান্তিক কাঠামোর মধ্যে গীতা অন্যান্য দার্শনিক মতের যে উদার সমন্বয় করিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তী কালে বেদান্তের প্রতিপত্তির প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গীতা যে সাংখ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার মত নহে। বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শনের সহিত গীতার মতের অনেক পার্থক্য। গীতা কোথাও বহু পুরুষ স্বীকার করেন নাই এবং গীতা নিরীশ্বরবাদী নহেন। উপনিষদের মধ্যে যে সাংখ্যমতের পরিচয় পাওয়া যায়, গীতা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, গীতা বেদান্ত ও সাংখ্যকে প্রভেদ করেন নাই, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদের ন্যায় গীতা বেদান্ত ও সাংখ্যের পরিভাষাকে মিশাইয়া দিয়াছেন, গীতার সাংখ্য বৈদান্তিক সাংখ্য, সাংখ্যের পুরুষ এবং বেদান্তের ব্রহ্ম গীতার মতে একই।

এই সাংখ্য বা বেদান্তের মতে শুদ্ধজ্ঞানই ছিল মুক্তির একমাত্র উপায়। কর্ম্ম জ্ঞানের ও মুক্তির পরিপন্থী, অতএব শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শান্ত, অচল, অক্ষর, ব্রহ্মের জ্ঞান, এই জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মের সহিত একত্বসাধন, সকল সম্বন্ধের অতীত, বিশ্বলীলার অতীত, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের সহিত জ্ঞানের দ্বারা যোগ সাধন, ইহাই জ্ঞানযোগ। গীতা এই জ্ঞানযোগ অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন, কেবলমাত্র এইরূপ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া অতি কঠিন,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
গীতা ১২।৫।

* আবার গীতাও মহাযান বৌদ্ধমতের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গীতার অনেক শ্লোক যেমনটি, তেমনই বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমতঃ জ্ঞানী কর্ম্মহীন শান্ত সাধুসন্ন্যাসীরই ধর্ম্ম ছিল, ক্রমে যে উহা ধ্যান, ভক্তি এবং জীবসেবা ও দয়ার ধর্ম্ম হইয়া এসিয়া মহাদেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, গীতার প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, অক্ষর, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত একত্ব সাধন করিতে হইলে জীবন ও কর্ম্মের ত্যাগ করিতেই হয়, সাংখ্যও বেদান্ত তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু গীতা দেখাইয়াছেন যে, এইভাবে কর্ম্মকে ছাড়িব বলিলেই ছাড়া যায় না। প্রকৃতির কর্ম্মশক্তি, অসীম অনন্ত, মানুষের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া চলিবেই, কেহই তাহা নিমেষের জন্যও বন্ধ করিতে পারে না।

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।৩।৫।

সন্ন্যাস মতাবলম্বীরা বলিবেন, কর্ম্ম যদি চলিবেই তাহা হইলে যতটুকু নিতান্তপক্ষে না করিলে নহে; কেবল সেইটুকু কর। গীতা বলেন, এরূপ কষ্ট করিয়া কর্ম্মত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম যখন চলিবেই, তখন সকল কর্ম্মই চলুক, সর্ব্বকর্ম্মাণি, কেবল কর্ম্ম যাহাতে বন্ধনের কারণ না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিলেই হইল। জ্ঞানলাভের পর কর্ম্ম করিলে তাহা আর বন্ধনের কারণ হয় না। আমাদের মধ্যে যে অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয় আত্মা রহিয়াছে, তাহার সহিতই জ্ঞানযোগের দ্বারা একত্ব সাধন করিতে হইবে; যখন জ্ঞান হইবে যে, আত্মা কিছুই করে না অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব করিতেছে, তখন আমাদের মধ্যে আর কোন কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হইবে না—পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ যে কর্ম্ম করে, তাহা তাহার কর্ম্ম নহে, তাহা ব্রহ্মকর্ম্ম, সে কর্ম্ম আর ব্রহ্মবিদকে স্পর্শ করিতে পারে না, "অশ্লেষ"। কিন্তু, গীতা আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি যাহা করিতেছে, তাহা পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে যজ্ঞার্থ করিতেছে, এই জ্ঞান যদি আমাদের হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্মের দ্বারাই আমরা পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হই। ইহাই গীতার সাধনার সার কথা। এই সাধনা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে, আত্মা কিছুই করিতেছে না, প্রকৃতিই সব করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম চলিতেছে, সে সকল বন্ধনের কারণ হইবে বলিয়া ভীত না হইয়া, প্রকৃত জ্ঞানের সহিত আমাদের মধ্যে প্রকৃতির সকল কর্ম্মকে পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করিতে হইবে। ইহাই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়। এই সাধনার দ্বারাই মানুষ নীচের জীবনের দুঃখ দ্বন্দ্ব অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে পাইবে, অক্ষর দিব্যজীবন লাভ করিবে, অক্ষরামৃতমশ্নুতে।

গীতা যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাতেও জ্ঞানই ভিত্তি, জ্ঞান না হইলে চলিবে না; কিন্তু গীতার মতে চাই, সমগ্র জ্ঞান—শুধু অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয় আত্মা বা পুরুষকে জানিলেই হইবে না। ভগবান্ তাঁহার সকল তত্ত্বের সহিত, পুরুষোত্তম, প্রকৃতি, জগৎলীলা সর্ব্বসমেত সমগ্রভাবে জানিতে হইবে, তত্ত্বতঃ। * নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম্ম করা, সর্ব্বকর্ম্মাণি, ইহা প্রথমেই চাই। কিন্তু গীতার মতে ভক্তি ও প্রেমই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মসিদ্ধি এবং অনন্ত আনন্দ লাভ করিতে হইলে ভক্তি ও প্রেমের ন্যায় শক্তি আর কিছুরই নাই। অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, সকল সম্বন্ধের অতীত ব্রহ্মকে এই ভক্তি এই প্রেম অর্পণ করা যায় না, প্রতিদানে স্নেহ, ভালবাসা না পাইলে কাহাকেও ভালবাসা বা ভক্তি করা সম্ভব হয় না, সকল সম্বন্ধের অতীত ব্রহ্মের সহিত নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না। জীবাত্মাকে যে ভগবানের সহিত ভক্তি ও প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, যাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত ও মিলিত হইতে হইবে, তিনি তাঁহার উচ্চতম সত্তার সকল সম্বন্ধের অতীত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম বটেন, কিন্তু, তিনিই আবার সকল বস্তুর পরমাত্মা। তিনিই পরমেশ্বর, সকল কর্ম্মের এবং বিশ্বপ্রকৃতির প্রভু, তাঁহাকেই কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,

> পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
> প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি—

জীবের দেহ, প্রাণ, মনের নিগূঢ় আত্মারূপে তিনি অধিষ্ঠিত, আবার তিনি তাহাদের উপরে, তাহাদের অতীতও বটেন। তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর পরমাত্মা এবং এই সকল ভাবই এক অনন্ত ভগবানেরই সমান ভাব। এই যে সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে সকল তত্ত্বের সমন্বয়, গীতার মতে কেবল এই জ্ঞানই জীবাত্মার পূর্ণ মুক্তির এবং প্রকৃতির পূর্ণতম সিদ্ধি ও বিকাশের প্রশস্ত দ্বার। সর্ব্বভাবে এই এক ভগবানকে জানিতে হইবে, আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান, সকল ভক্তি ও প্রেম অন্তরের যজ্ঞরূপে নিরন্তর এই ভগবানেই অর্পণ করিতে হইবে। এই পরমাত্মা পুরুষোত্তম, যিনি বিশ্বের অতীত অথচ বিশ্বকে ধরিয়া আছেন; সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতং জগৎ। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন যাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, জীব যখন ইহাকে সর্ব্বভাবে, সর্ব্বতত্ত্বের সহিত জানিতে পারিবে, তখন মুক্ত হইয়া ইহারই মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইবে, জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ।

শ্রীঅনিলবরণ রায় (এম্, এ)।

---

* গীতার মতে এই সমগ্র জ্ঞান অতিশয় দুর্লভ—
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। ৭।৩

উর্দ্দু ও বৈষ্ণব কবিতা

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে সাহিত্যানুভূতিরও যে এক একটা বিশিষ্টতা হয়, এটা খুব মোটা কথা। অস্থির এবং দুর্দ্ধর্ষ সমুদ্র-রাজ-(Vikings) গণের বংশধরদিগের সাহিত্য ও সভ্যতার ভিতরে একটা অনির্দ্দিষ্টের জন্ম আকাঙ্ক্ষা, একটা সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, একটা রোম্যান্টিক বেদনা লুক্কায়িত থাকিবে, ইহা যেমন স্বভাব-সিদ্ধ,অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল অনেকখানি স্থির সৌন্দর্য্যরসের পিপাসু, সংযত ও সামাজিক ল্যাটিন জাতির বংশধরগণের সাহিত্য ও সভ্যতা যে প্রকৃতিতে অনেকটা ক্ল্যাসিক্যাল ভাবাপন্ন হইবে, ইহা তেমনই স্বভাবসিদ্ধ। ইংরাজ জাতির মধ্যে কোল-রিজ, বায়রণ, শেলির প্রভবই সম্ভব এবং প্রকৃতি ক্ল্যাসিক্যাল। ফরাসী ও ইটালিয়ান জাতির মধ্যে ফস্কোলো, ডিভিগ্‌নি, এল-ফিরি, লিওপার্ডি, ভিক্টর হিউগোর প্রভবই সম্ভব। শেলি যে হিসাবে রোম্যান্টিক্, রোম্যান্টিকগণের শিরোমণি ভিক্টর হিউগো সে হিসাবে রোম্যান্টিক নহেন—তাঁহার আর্ট অনেকটা ইণ্ডিয়ান আর্ট, অব্যক্তকে রূপে প্রকট করাতে তাঁহার যত বিলাস, রূপকে রূপাতীতে পৌঁছাইয়া দেওয়ায় তত নহে। উদাহরণ তাঁহার গিলোটিন, উদাহরণ তাঁহার পেগাসাস্, উদাহরণ বোনাপার্টি, উদাহরণ কোয়াসিমোডো। প্রথম চার্লস্‌কে ধ্বংস করিয়া ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান ও ষোড়শ লুইকে ধ্বংস করিয়া ফরাসী জাতির অভ্যুত্থান যে প্রকৃতিতে এক নহে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন। একটিতে নিদ্রিত জাতির জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পর্ব্বতের বক্ষে সদ্যোজাগ্রত নির্ঝরের মত মাতিয়া উঠিয়া প্রবল আবেগে পাষাণ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া গতির প্রবাহে দেশ-বিদেশকে ভাসাইয়া দিয়া অসীম বিস্তৃতির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আর একটিতে হ্রদের বুকের নিদ্রিত লহরীলীলা অন্তর্গর্ভ অগ্ন্যুৎপাতে মথিয়া উঠিয়া প্রবল উদ্বেলনে দুই কূলের অনেকখানি ভাসাইয়া,ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে হয় ত গভীরতর হইয়াই স্থির ও সমাহিত হইয়াছে। ইংরাজ জাগরণের পরি-ণাম—ঔপনিবেশিক বিস্তার, ভারতবর্ষ—পৃথিবীর সাম্রাজ্য, স্থল ও জলের উপর আধিপত্য; ফরাসী জাগরণের পরিণাম—ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ান, য়ুরোপ বিজয়, ভারতের অধিকার বিস্তার; ফিরিয়া আবার ফ্রান্স ফরাসিস সাধারণতন্ত্র সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের উচ্চ বিকাশ ইত্যাদি। একটি extensive-dynamic-romantic, অপরটি intensive-static-classical.

এই নিয়ম সকল দেশের সকল জাতির ভিতরেই আছে—সূর্য্যের আলো ঝাড়ের কলমে, আয়নার কাচে, পুকুরের জলে প্রতিফলিত হয় বিচিত্ররূপে। আবেগপ্রবণ বাঙ্গালী চৈতন্যের কুলহারানো রোম্যান্টিক প্রকৃতির বৈষ্ণবিকতা হিন্দুস্থানী তুলসী-দাসের হাতে গিয়া হইয়াছিল নৈতিক এবং বৈধী ভক্তি; আবার সাধক ও অর্দ্ধ-মুসলমান কবীর এবং তাঁহার শিষ্য দাদু সাহেবের, সৌন্দর্য্যপিয়াসী পারসিক চিত্তে গিয়া তাহাই দাঁড়াইয়াছিল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও প্রেমতত্ত্বে। বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শাসন-বিমুখ অনির্দ্দিষ্টের আকাঙ্ক্ষার পিপাসিত চিত্ত যাহা পুরাণকাল হইতে নিত্য নূতন নূতন ক্ষেত্রে অনুভূতির প্রসারে জাগ্রত হইতে চাহে, তাহার সুর চিরদিনই কুলনাশা বাঁশীর সুর যাহার কাব্যের অভি-ব্যক্তি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" কিংবা "আমি যাব—আমি যাব, কোথায় সে কোন্ দেশ।"সুতরাং তাহার ধর্ম্মের অভিব্যক্তিও কুলত্যাগে—উদাহরণ, বাঙ্গালার তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তাহার অন্তর্গত পন্থা সহজিয়া, আউলিয়া, কর্ত্তাভজা ও নেড়া-নেড়ি। আর পশ্চিম ভারতীয় হিন্দুজনগণের চিত্ত যাহা অনেকখানি স্থিতিশীল এবং যাহা অনুশাসন লঙ্ঘন অপেক্ষা অনুশাসনের ভিতরেই সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুপন্থী, তাহার সাহিত্যের অভিব্যক্তি গার্হস্থ্য ও বৈধ এবং তাহার ধর্ম্মাদর্শও পবিত্র রামায়ণ-কথা হওয়াই উচিত। বলা বাহুল্য, এই রামায়ণকাহিনী ঐ দেশীয় আপামর ভদ্রাভদ্র সমাজে অতি সমাদরের সহিত পঠিত হয়।

> "তুলসী যব্ জগ্‌মে আয়ে জগ্ হাঁসে তুম্ রোয়
> অ্যায়সা কাম করকে চলো তুম্ হাঁসো জগ্ রোয়।"

তুলসীর কর্ম্ম-প্রচেষ্টা জগ্ অর্থাৎ লোক-সমাজকে লইয়া, ইহার বৈধ আইন-কানুনের ভিতর সমাজকে ডিঙ্গাইয়া নহে, প্রায় সমসাময়িক এক পথেরই পথিক চৈতন্যদেবের কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সামাজিক সঙ্কীর্ণতাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া। দেশ-ভেদে বৈশিষ্ট্যভেদ। চৈতন্যদেব হইতেই বাঙ্গালীর রিনাসাঁস্ (পুনর্জ্জন্ম), এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

হিন্দু ও উর্দ্দু সাহিত্য সমালোচনা করিতে গেলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্যেরও এই রকম পার্থক্য আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। মুসলমান সভ্যতার পারসিক প্রকৃতি অনুভূতির তীক্ষ্ণতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাহার—কবির

> "তার সে গালের কালো তিলটির বদলে গো
> দিয়ে দিতে পারি সমরখন্দ বোখারা আর।"—
>
> স্বপনপসারী।

হইতে তাহার কিংখাবের রং, আতরের গন্ধ,পোলাওয়ের আস্বাদ, এস্রাজের মীড়, জুল্‌ফির ফাঁসি, হীরকের জ্যোতিঃ সমান তীক্ষ্ণ (Intense)। পারস্য কবিতার দুহিতা উর্দ্দু কবিতার ভিতরেও এই অনুভূতির তীব্রতাটাই বেশী নজরে পড়ে। নিম্নে উর্দ্দু কবিতার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল, অবশ্য অনুবাদ আসল বস্তু নহে; তাহা হইলেও তাহা হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উর্দ্দু-কবিতার বিশিষ্টতা কি।

মূল—লুত্‌ফ্‌সে বাগে জাহাঁসে সুরতে সব্‌নম্ রহে
একোহি সব্‌গো রহে মগর গুলোঁমে হাম রহে। ইত্যাদি

ধরণীর এই ফুল-বাগিচায় একটি ফোঁটা শিশির প্রায়
মনের সুখে একটি রাতি কাটিয়ে দিছি শুধুই হায়
অনেক নহে একটি শুধু হলোই বা তা সেই ত ঢের,
ফুলের বুকে কাটিয়ে দিছি সেই সুখে দিল্ উথ্‌লে যায়।
আজকে যদি বুলবুলিটার বুকটা চিরে তীরের ঘায়—
পাখ্‌য়ারা তার পাখ্‌না বেঁধে ঘরের দিকে নিয়েই যায়
সবুজ এ তোর ফুল-বাগানে রইবে নাকো কিছুই আর
লহর ফোঁটা দুইটা যদি ছিটিয়ে থাকে ঘাসের গায়।

তোমার মত রূপের হুরী বক্ষেতে মোর লুটিয়ে পড়ে—
মরণে মোর দিল্ পিয়ারী যদিই কেহ রোদন করে,
মরণ সে ত সুখের শয়ন এই দুনিয়ায় বেহেস্ত,
সারা জগৎ আসবে ছুটে সেই মরণে মরার তরে।
তবুও মোর হে সুন্দরি, এই কথাটি বলতে চাই—
এই দুনিয়া রূপের মহল, রূপের তুহার তুল্য নাই;
তোমার রূপের নেশায় বিভোর হয় ত হেথায় মিলবে ঢের
সব খোয়ানো ফকির এমন মিলবে কোথায় জানতে চাই।

এখানে কবির জীবন ফুলের বুকে এক রাত্রির একটি শিশির-বিন্দুর মত, তাঁহার স্মৃতি প্রিয়ার যৌবন-উদ্যানে ছিটানো দুই চারিটি রক্তকণিকার মত, তাঁহার সাধ রোরুদ্যমানা সুন্দরীর অশ্রু-সজল মুখখানি বুকে লইয়া মরা—তাঁহার গর্ব্ব। তিনি প্রেমের জন্য সব খোয়াইয়া ফকির হইয়াছেন। সব কয়টি অনুভূতিই রূপবিকল, সব কয়টাই তীব্র। এই সৌন্দর্য্যপিপাসু চিত্তের দৃষ্টান্ত, এই রূপের পূজা, অন্যত্র অন্য এক কবির আক্ষেপের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়।

"বুঝ গয়া ফির্ শামা মহ্ফেল্
পরওয়ানাকে জল্ যানেকে বাদ।"

হায়, উৎসবের প্রদীপ পতঙ্গকে জ্বালাইয়া দিয়া নিভিয়া গেল। পতঙ্গের জ্বলিয়া যাইতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার দুঃখ এই যে, সে যে রূপজ্যোতির উৎসব দেখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা পরিশেষে নিভিয়া গেল।

কালিদাসের—"বয়ং তত্ত্বান্বেষণাৎ হতাঃ মধুকর ! ত্বং খলু কৃতী,—" ইত্যাদি ছত্রের ভোগলোলুপতা (sensuality) আর

"বখালে হিন্দ্ ভূয়াশ্ বখ্ সম্
সমর খন্দো বোখারারা।"

"তা'র সে গালের কালো তিলটির বদলে গো", ইত্যাদি লাইনের রূপবিহ্বলতা এক নহে।

অনুভূতির এই তীব্রতা মুসলমান সময়ের বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা বিদ্যাপতির—

"না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
পরাণ পায়ব হাম্ পিয়া দরশনে।"

কিংবা চণ্ডীদাসের—

"চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

কিন্তু ইহা কতখানি মুসলমান প্রভাব-সম্ভূত বা নহে, তাহা বলা কঠিন। কারণ, ঐ সমস্ত কবির ভিতরেই আবার স্থানবিশেষে—

"কতহুঁ মদন তনু দহসি হামারি
হাম্ নহি শঙ্কর হুঁ বর নারী।"

(তুলনা জয়দেব—হৃদি বিসলতা-হারো নায়ং ভুজঙ্গনায়কঃ, ইত্যাদি) ইত্যাদি শ্রেণীর কৃত্রিম (mechanical) ছত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার—মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবজাত এই কৃত্রিম রচনা-রীতির ভিতর হঠাৎ কয়েক জন বৈষ্ণব কবির মধ্যে খাঁটী রোম্যাণ্টিক রীতির সাহিত্যের বিকাশ দেখিলে বাস্তবিক একটু বিস্মিত হইতে হয়। আশ্চর্য্য যে, চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত Romantic movement এই পূর্ব্বগামী বৈষ্ণব কবিগণের নিকট হইতে অনেকখানি প্রেরণা লাভ করিয়াছিল।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর দিয়া বঙ্গ-সাহিত্য পর্য্যন্ত সাহিত্যের দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিয়া আসিতেছে। একটিকে বলা যায় রূপোচ্ছল, ভোগবহুল, কল্পনাপ্রবণ imaginative আর একটিকে বলা যায় রসঘন, অন্তর্গূঢ়, অনুভূতিপ্রবণ—emotional—একটির উদাহরণ কালিদাস, বিদ্যাপতি, সঞ্জীবচন্দ্র, দেবেন সেন, রবীন্দ্রনাথ, আর একটির উদাহরণ ভবভূতি, চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল; শরৎচন্দ্র। অবশ্য কোনও বিভাগই নিরবচ্ছিন্ন হয় না—কালিদাসেও স্থানবিশেষে ভবভূতির রসঘনতার অভাব নাই বা ভবভূতিতেও কালিদাসের রূপোচ্ছলতা নাই, এমন নহে। তবে বিচার সাধারণ প্রবৃত্তি লইয়া। ভবভূতির রামের বিরহের ক্রন্দনের প্রবৃত্তি—

"হা হা দেবি, স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ" ইত্যাদি, আর কালিদাসের দুষ্মন্তের বিরহের ক্রন্দনের প্রবৃত্তি—

"রম্যাণি বীক্ষ্য নিশম্য মধুরাংশ্চ শব্দান্" ইত্যাদি এক জাতীয় নহে। একটিতে emotionএর হাহাকার, অপরটিতে imaginationএর বিলাস; একটিতে রসের নির্ভরতার অভাবে অনুভূতির অসহায়ভাবে আছাড়ি-পিছাড়ি, আর একটিতে শূন্যতাকে ছাপাইয়াও কল্পনার সূক্ষ্ম উল্লাস; এক জনের কাছে বিরহ মৃত্যু, আর এক জনের কাছে বিরহ ভোগ। উর্দ্দু কবিতা এই দ্বিতীয় জাতীয়। অবশ্য কোন্ জাতীয় কাব্যধারার উৎস কোথায় এবং তাহা কিসের ভিতর দিয়া কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, প্রকৃত ত্যাগী হিন্দু জাতির এই সাধারণতঃ স্বভাববিরুদ্ধ শব্দ-স্পর্শ-রূপ রসের ভোগবিহ্বলতা হিন্দু-সাহিত্যে পূর্ব্বগামী কোনও গ্রীসীয় বা পারসিক সাহিত্যের প্রভাব কি না, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বিচার করিবেন। তবে কাব্যের এই সুন্দরের দিকটা পারসিক ও উর্দ্দু সাহিত্যে অতি চমৎকাররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আর সেখানে অনুভূতি কতই তীব্র—মাত্র দুই ছত্রের ভিতরে যে অনুভূতির গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র দুই দশ পাতাতেও তাহা মিলে না।

"দর্দ্দে দিল্কা ওয়াস্তে পয়দা কিয়া ইন্ সান্কো
বরণ সতেদ্কে লিয়ে কুছ্ কম নথি করবিয়া।"

ভগবান্ ব্যথা দিবার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, নতুবা করবীফুল বর্ণে ও মধুতে কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। পাঠক দেখিবেন, মাত্র দুইটি ছত্রে একটি সুন্দরী বালবিধবার ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘ নিশ্বাস কেমন করুণভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যত্র আর এক জন কবি বলিতেছেন—

"মেরে মেজাজ্ লড়কপন্সে আস্কানা থা
আজল্সে হুসেম পরস্তি লিখি থি মেরী কিস্মত্সে।"

আমার প্রকৃতি বাল্যকাল হইতেই প্রণয়পিপাসু। জন্মাবধি সৌন্দর্য্যের উপাসক হইব, এইরূপই আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল। এই "হুসেন পরস্তিস্" এই রূপের উপাসনা, ইহাই উর্দ্দু কবিতার বিশেষত্ব। আমরা উর্দ্দু সাহিত্যের প্রকৃতি দেখাইবার জন্ম যেখান সেখান হইতে যথেচ্ছা উদাহরণ তুলিয়া দিলাম। এইরূপ উদাহরণ অজস্র।

একটা বিশিষ্ট যুগে পশ্চিম-দক্ষিণ এসিয়ার জাতি-সমূহের মধ্যে একটা ভাবের জাগরণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্লামের ধর্ম্মগত ও রাজনৈতিক জাগরণের সহিত এই দূরদূরান্তর-বিস্তৃত জাগরণের এক যায়গায় একটা যোগ ছিল। তাহা ঐ সমস্ত জাগরণের মানবিকতা ভুদ্দমতা ইত্যাদি ইস্লাম-সুলভ বৈশিষ্ট্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। পারিপার্শ্বিক সাহিত্যেও এই জাগরণের একটা পরিচয় আছে। আমরা নিম্নে একটি উর্দ্দু কবিতার বঙ্গানুবাদ দিলাম—বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে ইহার অনেকখানি সৌসাদৃশ্য আছে। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দুই জাতির সাহিত্যের এইরূপ ভাবসাম্যের মধ্যে এই রকম কোনও একটা ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে কি না, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করিবেন।

উর্দ্দু—"ইয়ে ন থি হামারি কিস্মত্‌কে বিসালে ইয়ার হোতা
আগর আওর সবর কর্‌তে তো এহি ইন্তাজার হোতা
তেরে ওয়াদে পর্‌সিতম্‌গর আভি আওর সবর্‌ কর্‌তে
হামে জিন্দিগীপে আপনে আগর এৎবার হোতা"—ইত্যাদি।
এই ছিল না ভাগ্যে আমার মিল্‌বে হেথায় বন্ধু মোর
বৃথায় জনম কাটিয়ে দিলাম এম্‌নি আমার কপাল জোর
আর কত দিন দেখ্‌বো না কি? দেখেই মিছা লাভ কি আর
সার হবে ত ইন্তাজারি থাকবে না আর দুখের ওর।
তোমার তরে, অত্যাচারী, আরও সবুর কর্‌মু নয়
জীবন আমার অসীম নহে আমার হাতের মুঠোয় নয়
থাক্‌তো যদি আঁখির পরে একটুখানি শাসন মোর
একটা জীবন তোমার তরে গুজার আরও কর্‌মু নয়।
জন্মে এবং মরেই কেবল বদনামীটা হ'লুম সার
প্রেয়ের পেয়ার পেলুম নাক ধুলোর ধুলোই হলুম সার।
যেতুম্ যদি সাগরতলে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে না
উঠ্‌তো না এই শরীরখানা দেখ্‌ত না কেউ কবর আর।
হায় পেয়ারা! আধবেঁধা এই তোমার তীরের বিষম ধার
ঘায়েল ক'রে কাহিল করে দুখের কোথাও পাই না পার
জান্‌তুম হায় আস্‌বে নাক জীবনটা মোর যেতোই নয়
বুক চিরেই যে থাম্‌তো শুধু ধার্‌তুম্ না ব্যথার ধার।
আচ্ছা আমি শুধাই তোমায় একটি কথার জবাব দাও
আপন মনেই বিচার ক'রে দোষ কি আমার কইবে তাও
তোমায় যদি এমন ক'রে বারে বারেই ঠকায় কেউ
বিশ্বাস তায় কর্‌তে পার সত্যি কথা বল্‌বে তাও।
নিঠুর প্রিয়া বল্‌বো কি আর, দুখের রাতি সুখের নয়;
প্রেমের আগুন জীবনটাকে তিলে তিলেই কর্‌ছে ক্ষয়।
জীবন নহে সুখের এমন বাঁচার পিয়াস একটু নাই
জান্‌তুম যদি একবার শেষ এই সুখ-সাধ আবার নয়।

পাঠক, ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত জ্ঞানদাসের বিখ্যাত পদটির তুলনা করুন।

মাধব কৈছন বচন তোঁহার,
আজিকালি কর দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার।
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নোখ গেল,
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখ কত ভেল।
আওব করি করি কত পরোবধব
অব জীউ ধরই না পার,
জীবন মরণ অচেতন চেতন
নিতি নিতি ভেল তনু ভার।
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর
কতই করব বিশোয়াস,
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙাব
তব কি করব জ্ঞানদাস।

ও বিদ্যাপতির "কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়" ইত্যাদি পদটির

পিয়ার লাগিয়া আমি কোন্ দেশে যাব
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব
বন্ধু গেল দূরদেশে মরিব আমি শোকে
সাগরে তেজিব প্রাণ লোকে নাহি দেখে, ইত্যাদি অংশ

মিলাইয়া পড়িবেন।

আবার কোনও যায়গায় কোনও যোগের সম্পর্ক না থাকিলে একই ভাবের কবিতাও ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী কবির হাতে পড়িয়া কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাহা নিম্নের কবিতা দুইটি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। একটি ইংরাজী ও একটি উর্দ্দ কবিতার বঙ্গানুবাদ। পাঠক দেখিবেন, দুইটির মূল সুরে কত তফাত।

ইংরাজ ব্যক্তিত্বপ্রবণ জাতি। তাহারা প্রেমের ভিতরেও আপনার ব্যক্তিত্বকে ভুলিতে পারে না। সেই জন্ম তাহাদের ব্যর্থ প্রেমেও অনেক সময় আহত আত্ম-অভিমান গর্জ্জিয়া উঠে। কিন্তু এসিয়াবাসী অনেক পরিমাণে বৈষ্ণবভাবাপন্ন। উর্দ্দু পদকর্ত্তৃগণ প্রেমকে আপনাদের ভাগ্য ও প্রেয়সীর করুণা বলিয়াই জানেন। সেই জন্ম তাঁহাদের ব্যর্থ প্রেমেও একটা বিনতি—পদতলে লুটাইয়া পড়ার ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সেই জন্ম তাহা বিয়োগেও মধুর হয়।

(ইংরাজী হইতে)

দিবস ফুরাইয়ে এল মরণের অন্ধকার আসিতেছে নেমে,
আর সখি, আসিও না জীবনের পুরোভাগে দাঁড়াও না থেমে।
ঢালিও না চিতাভস্মে অকারণ অশ্রুরাশি অসার্থক জল—
কোরো না চরণপাত যে শিয়র মৃত্যু-হত লভেছে ভূতল।
যে হৃদয় বাঁচালে না মিছে আর কেন তারে কর জ্বালাতন,
যেতে দাও বোক্ বায়ু কলরবে শিবাকুল করুক রোদন।
নির্ব্বোধ! ভ্রান্তিই যদি কিংবা দোষ করিয়াছ মনে যদি লয়,
ক্ষতি নাই ক্ষোভ কিবা এবার ত এ জীবন হয়ে গেছে ক্ষয়।

যারে খুসী ভালবাস যারে প্রাণ চায় তব কর আত্মদান—
ঘুমাইতে চাই আমি বড় শ্রান্ত ওগো শুধু লভিব বিশ্রাম।
যেখানে পড়িয়া আছি সেইখানে শুধু মোরে থাকিবারে দাও,
আমারে একলা রাখি আপনার গম্য পথে যাও চ'লে যাও।

(উর্দ্দু হইতে)

কাহার কোমল স্পর্শে পায়ের কবরে বুক দুল্‌ল রে
ঘুমিয়ে ছিলুম স্বস্তি-সুখে আবার এসে তুল্‌ল কে ?
জীয়ন্তে যে নেয়নিক খোঁজ দগ্ধ বুকের বেদনা কি ?
ধূলায় মিশে হলুম ধূলা খবর নিলে আজ না কি ?
বুক বেঁধা এই বুল্‌বুলির সাধ নিরাশাতেই মিট্‌ল খাসা
নিঠুর মালী কলিতেই এর ফুরিয়ে দিলে ফুলের আশা।
তাই বা কেন ? দোষ কি কারও ? আমার কসুর আমার পাপ
জুল্‌ফি ফাঁসে পড়নু ধরা আপন ভুলেই মনস্তাপ।
বিদায় ! বিদায় ! পরাণপ্রিয়া বিধির আশিষ তোমার পর
ভাগ্যে থাকে মিল্‌ব আবার আখের শেষ এই এক স্তর।
হায় রে আমার দগ্ধ ললাট কাঁদ্‌লুম শুধু জীবন ভোর
চোখের কাজল বানিয়ে প্রিয়া বহালে ফের আঁখির লোর।

পাঠক ইহার সহিত বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অনুরূপ ছত্র মিলাইয়া পড়িবেন।

বৈষ্ণব কবিতা ও উর্দ্দু কবিতা তুলনায় আলোচনা করিলে ইহা ভিন্ন আরও অন্য অন্য অনেক বিষয়ে তাহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রধান সৌসাদৃশ্য যাহা, তাহা তাহাদের character ও formএর আকৃতির ও প্রকৃতির। আমরা প্রকৃতির কথা উপরেই বলিয়াছি এবং সেখানে দেখিয়াছি যে, এই আমিত্বের উগ্রতাবর্জ্জিত তুমিময় তুমিতে বিগলিত ললিত মধুর সুর ইহা এই দেশেরই বিশিষ্টতা, তাহা উর্দ্দু কবিতারও বটে এবং বৈষ্ণব কবিতারও বটে। য়ুরোপ আর যাহা ছাড়ুক, তাহার আমি ছাড়িতে পারে না, দীনের দীন হইয়া প্রেমসাধনা, ইহা তাহার সাড়ে বারায় হাত জন্মপত্রিকার কোনও স্থানে লেখে না। তা সে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি ভিক্টর হিউগোই হউন আর প্রেমতত্ত্বের সিদ্ধ সাধক শেলি রসেটিই হউন, আর অনেকখানি আমাদের বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ স্কট্‌লণ্ডের কৃষক কবি বার্ণস্‌ই হউন।

পিলা দে ওক্‌সে সাকী জব্‌ হাম্‌সে নফরত্‌ হ্যায়্‌
পিয়ালা নদো নদে সরাবতো দে।

"তোমার প্রেমের মদিরা হে সুন্দরী সাকী, না হয় নলে করিয়াই আমার কণ্ঠে ঢালিয়া দাও, যদি পেয়ালা ভরিয়া দিতে আমাকে ঘৃণা বোধ কর। পিয়ালা না দাও না দাও, দুঃখ নাহি, একটু সরাব্‌ দাও।" অর্থাৎ হে প্রেমময় ঈশ্বর, যদি ঐশ্বর্য্য ও বহুবিধ সম্ভোগের ভিতর দিয়া তোমার অপূর্ব্ব ভালবাসা আমাকে উপভোগ করিবার অধিকারী বলিয়া মনে না কর, আমার ঐশ্বর্য্যে সাধ নাই, তুমি তোমার প্রেম আমাকে একটুখানি দাও।

এই সরাব্‌ ত দে, নলে হউক, হাতে হউক, পিয়ালায় হউক, একটুখানি পিপাসায় বারি দে, এই বুকফাটা তৃষ্ণা, এই দীনের দীন হইয়া চাওয়া, এ বুঝি উক্ত প্রধান মণ্ডলেরই বিশিষ্টতা।

সেক্সপীয়রের অপূর্ব্ব প্রেমের সৃষ্টি জুলিয়েট্‌ তাঁহার সদ্যোজাগ্রত প্রেমের আবেগের মুখে প্রেমিককে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হায় রোমিও ! তুমি রোমিও হইলে কেন ?" অর্থাৎ তাহা না হইলে আমার এই তরুণ হৃদয়ের ভালবাসা নির্ব্বিঘ্নে তোমায় উপহার দিতে পারিতাম। ইহা আর যাহাই হউক, আপনা-ভোলা অবাধ ভালবাসা নহে, অনুরূপ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যের আভীর-যুবতী গ্রাম্য গোপবালিকা এবং সহজে পশু-পালিকা রাধা এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন—

"গোকুল-নগরী-মাঝে   আরও কত নারী আছে
তাহে কিছু না পড়িল বাধা.
নিরমল কুলখানি   যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।"

গোকুল নগরে আরও ত কত যুবতী আছে, তাহাদের কাহাকেও কিছু বলিল না, কুলনাশা বাঁশী আমার মাথা খাইতে আমাকেই বা ডাকিল কেন ? এখানে দেওয়া না দেওয়ার কথাও নাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ না হইয়া আয়ান ঘোষ হইল না কেন ইত্যাদি বিচার-বিতর্কের লেশও নাই, অপেক্ষা শুধু বাঁশীর ডাকের। সে প্রেমের বাঁশীর ডাক যাহাকে ডাকে, তাহার আর আমি আমার বলিয়া কিছু রাখিবার উপায় থাকে না, একবারে সব ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতে হয়। উপরি-উদ্ধৃত কবিতাখণ্ডে গোপগোয়ালিনী রাধা প্রেমের দায়ে বিব্রত ও গৌরবান্বিত। য়ুরোপীয় কবিতায় ও প্রাচ্য কবিতায় সুরের এইখানে পার্থক্য।

উর্দ্দু কবিতায় ও বৈষ্ণব কবিতায় এই কমনীয় তুমিময় ললিত মধুর সুর, এই মধুর রসের পদ্ধতিকে যদি প্রাচ্য কবিতারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও উভয় কবিতার মধ্যে এই গীতি-কবিতার formএর সাম্যটি বেশ একটু রহস্যজনক। বাঙ্গালা কবিতায় এই lyric formটি কোথা হইতে আসিল ? আমরা নীচে একটি উর্দ্দু কবিতা তুলিয়া দিলাম। দেখিবেন, আকৃতিতে, রসে, ভাবায় ইহার সহিত বৈষ্ণব কবিতার কোনওই পার্থক্য নাই। শুধু কথাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের মুখে বসাইয়া দিলে কবিতাটিকে বেশ বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া চালাইতে পারা যায়। (অবশ্য, বৈষ্ণব কবিতা বলিতে আমরা সর্ব্বত্রই চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির কবিতা লক্ষ্য করিলাম। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের রচনা তাঁহাদের আদর্শে ও অনুকরণে রচিত, তাহাদের স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা নাই।)

উর্দ্দু কবিতা :—

"খারাব, খাস্তা,জলিল রুস্‌হয়া ন তুম্‌সে মিল্‌তে ন অ্যায়সাহো
নেহি ভটক্‌তে শুহর্‌ শুহর হাম্ নেহি খুসামোদ কিসীকা কর্‌তে
তুম্‌হারা মশ্‌কান হ্যায় মেরা দিল্‌মে তুম্‌হে ন ভুলুঙ্গা মর্‌তে
মর্‌তে
তুম্‌হারা সায়দাকা হ্যায় কেয়া হালত্‌, কভি কিসীসে পুছা
তো কর্‌তে।"

"হে সুন্দরি, অপকৃষ্ট, বিকৃত, দাগাবাজ, বদ্‌নামী, তোমার সঙ্গে যদি আমার দেখা না হইত,তাহা হইলে আমি এ সব কিছুই হইতাম না। আজ যে আমাকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাহাও আমি বেড়াইতাম না এবং খোসামোদও কাহারও আমাকে করিতে হইত না। তোমার সদীল প্রেমভাব আমার

হৃদয়ের মধ্যেই গাঁথা আছে, আমি মরিতে মরিতেও তাহা ভুলিব না। তোমার রূপে যে পাগল, তাহার যে কি দুর্দ্দশা হয়, যদি কাহাকেও কখনও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে ত জানিতে পারিতে।”

আশ্চর্য্য, এই বিশেষত্ব ও বিশেষ আকৃতিটি বাঙ্গালা কবিতায় কোথা হইতে আসিল? ইহা ত ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কোথাও নাই, সংস্কৃত সাহিত্যেও নাই। সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উক্ত ভাষায় এক প্রকার গাথা-সাহিত্যের প্রচলন ছিল, কিন্তু ঐ রীতি যে কোনও দিনই প্রচলিত রীতি হয় নাই, তাহা অধুনা-প্রসিদ্ধ বিভিন্ন যুগের নাটকাবলী আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে সঙ্গীত অধিকাংশই চতুষ্পদী এবং তাহার বাচ্য হয় রাজা শিকার করিয়া ফিরিতেছেন, না হয় তপোবনে হাতী ঢুকিতেছে, না হয় ঐ রকম কোনও কিছু। এমন কি, সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত মূল গ্রন্থ আছে এবং সেই সকলে যে সমস্ত আদর্শ দেওয়া আছে, তাহাদের অবস্থাও তথৈবচ; সমস্তই শ্লোকরূপ এবং সমস্তই descriptive। যদি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ শতাব্দীর এই সমস্ত বৈষ্ণব কবিতার গীতি-কবিতা আকৃতি সেই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গাথা-সাহিত্যেরই পুনর্ভব (revival) বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী কোনও সাহিত্যে কি তাহার কোনও নিদর্শন থাকিত না?—জয়দেবের “ললিতলবঙ্গলতা” ইত্যাদি বা “চন্দনচর্চ্চিত-নীলকলেবর” ইত্যাদি বর্ণনা-প্রধান শ্লোকসমষ্টি এ জাতীয় জিনিষ নহে, তাহার রচনা-রীতি এবং রসসৃষ্টির পদ্ধতি কৃত্রিম। তাহার মধ্যে “এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে।” কিংবা “হরি যাবে মধুপুরে হাম কুলবালা বিপথে পড়িল যৈছে মালতীর মালা” কিম্বা “ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর” ইত্যাদি ছত্রে উভয় রস-ঘন মানবত্ব-(humanism) পূর্ণ ছত্র কোথাও নাই; তাহা ছাড়া প্রায় সমসাময়িক দু এক শতাব্দীর আগের পিছের জয়দেবও যে তাঁহার কবিতার এই বহিঃ রূপের জন্য একই প্রভাবের কাছে দায়ী নহেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তবে যতদূর মনে হয়, এই formটি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-জাত নহে এবং ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যেরও সহজ প্রবৃত্তি নহে। পারুক বা না পারুক, বাঙ্গালী বরাবরই মহাকাব্য বা খণ্ড-কাব্য রচনারই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার অবলম্বন বরাবরই প্রচলিত কাহিনী, পুরাণ-কথা বা ব্রতকথা; উদাহরণ—মহাভারত, রামায়ণ, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডী, পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদি। এই সব সাদা-মাটা ঘরের কথা নিতান্ত সোজাসুজি ভাবে বলিতে গিয়া বেচারী বঙ্গকবি যেখানেই একটু কল্পনার আশ্রয় লইতে গিয়াছেন, সেইখানেই হাস্তাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন; উদাহরণ—রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনা, কবিকঙ্কণের সমুদ্র-বর্ণনা। রামায়ণ-মহাভারতের পর্ব্বতবর্ণনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহার ভিতরে এই উদ্দাম আবেগের ঝঞ্ঝা, এই বিশ্বগ্রাসী হৃদয়ের ক্ষুধা, এই অদ্ভুত মানবতার বিকাশ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পড়িল? প্রভু গোরক্ষনাথের শিষ্যা ময়নামতীর অতিলৌকিক শক্তির কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বাঙ্গালা কোথা হইতে বলিতে শিখিল, “জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।” অথচ আমরা জানি, এই ভাবের জাগরণ ইহা চৈতন্য দেবেরও পূর্ব্বগামী। সুতরাং এই জাগ-রণের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বতঃই একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উদিত হয়। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা দেখিতে না পাওয়া যাইলেও সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান সাহিত্যে অনুরূপ জিনিষ যথেষ্টই পাওয়া যায়; অবশ্য আমাদের এই প্রবন্ধের গণ্ডী উর্দ্দু কবিতাতেই সীমাবদ্ধ। উর্দ্দু সাহিত্যের প্রভাব অনেকখানি আধুনিক যুগের কথা, তাহা হইলেও উর্দ্দু কবিতা ও বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যখন ভাবে ভাষায় সুরে আকৃতি প্রকৃতি ও বিবিধ খুঁটী-নাটীতে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই মনে হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কোনও দিন মুসলমান সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পড়ে নাই ত? আমরা নীচে কতকগুলি আদর্শ তুলিয়া দিলাম, পাঠক আমাদের কথার সত্যাসত্য বিচার করিবেন।

(ক) বৈষ্ণব—“দেখিয়া জুলুফে মদন কুলুপে মন যে হইল লোভা।” অর্থাৎ মদনের ফাঁসী জুল্‌ফি দেখিয়া মন লুব্ধ হইল।

উর্দ্দু—“হে সুন্দরি, এই উপেক্ষাতে তোমার কোনও দোষ নাই, আমি নিজেই জুল্‌ফির ফাঁসে ধরা পড়িয়াছিলাম।”

N.B—এই জুল্‌ফি কথাটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ। উর্দ্দু সাহিত্যের এই বিখ্যাত symbolটি বৈষ্ণব চণ্ডিদাসের কবিতায় কোথা হইতে আসিল?

(খ) বৈষ্ণব—“প্রিয় আমার চোখের অঞ্জন (সুর্ম্মা) আমার গলার হার, আমার মুখের পাণ, আমার মাথার ফুল” ইত্যাদি।

উর্দ্দু—“হায় রে, প্রিয়া আমাকে চোখের সুর্ম্মা করিয়া ফের চোখ হইতে বহাইয়া দিলেন।”

(গ) বৈষ্ণব—“হায় রে, আমি প্রদীপের রূপজ্যোতিঃতে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিলাম, তাহার ফলভোগ করিতেছি।”

উর্দ্দু—“হায় রে, রূপজ্যোতির প্রদীপ পতঙ্গকে পোড়াইয়া দিয়া নিভিয়া গেল।”

(ঘ) বৈ—“আমার এ মৃতদেহ থাকুক, কখনও যদি প্রিয়ের দৃষ্টি ইহার উপর পড়ে, আবার ইহা বাঁচিয়া উঠিবে।”

উর্দ্দু—“আমি কবরের মধ্যে মরিয়াছিলাম—তাহার বুকে আমার প্রিয়ের চরণস্পর্শ পড়ায় আবার আমি বাঁচিয়া উঠিলাম।”

(ঙ) বৈ—“প্রিয় আমাকে ত্যাগ করিয়াছে—এই অপমান লুকাইবার জন্য আমি সমুদ্রে গিয়া ডুবিয়া মরিব—যাহাতে আমার এ মরার লজ্জা লোক না জানিতে পারে।”

উ—“জন্মিয়া এবং মরিয়া এবং প্রিয়ের ভালবাসা না পাইয়া আমি কেবল দুর্নামের ভাগীই হইলাম—হায় রে, ইহার চেয়ে যদি আমি সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতাম, তাহা হইলে আমার মৃত দেহও কোথাও উঠিত না এবং আমার এই লজ্জাকর মৃত্যুর কথাও কেহ জানিতে পারিত না।”

(চ) বৈ—“জন্ম অবধি আমি রূপ দেখিয়া আসিতেছি, আমার চক্ষু তৃপ্ত হইল না।”

উ—"জন্ম অবধি আমি রূপের পাগল হইব, এইরূপই আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি

ইহা ব্যতীত আর একটি কথা আছে, মুসলমানের সাহিত্যের বিশিষ্টতা হইতেছে তাহার রূপবিহ্বলতার intensity, যাহার লক্ষণা (symbol) স্বরূপ ধরিতে পারি "আমার জীবন ফুলের বুকে এক রাত্রির একটি শিশিরবিন্দুর মত।" সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্টতা হইতেছে ভোগাসক্তি (sensuality)। অবশ্য সেখানেও intensity যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ভোগের intensity, বৈষ্ণব কবিতার এই উর্দ্দু কবিতাসুলভ রূপ-বিহ্বলতার intensity কোথা হইতে আসিল? উদাহরণ—

"চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, আমরা বৈষ্ণব কবিতাকে উর্দ্দু বা ফারসী কবিতার প্রকারভেদ বলিয়া বলিতেছি—বৈষ্ণব কবিতা উর্দ্দু বা ফারসী কবিতা নিশ্চয়ই নহে এবং তাহা হইতেও পারে না। যে আব-হাওয়ার (atmosphere) প্রভাবাধীনে বা যে ক্রিয়ার (stimulus) প্রতিক্রিয়াতেই উহার জন্ম হউক না, উহা বাঙ্গালার বুকে উৎপন্ন স্বতন্ত্র জিনিষ এবং আমার বিশ্বাস, এক বাঙ্গালার মাটী ছাড়া অন্য কোথাও উহার উদ্ভব সম্ভবপরও ছিল না। যে জাতি ভগবানের অমূর্ত্তরূপে তৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ইত্যাদি রসের অনুভূতির মধ্যে পাইবার তৃষ্ণায় তাঁহার প্রতীক-বিগ্রহকে গৃহকর্ত্তরূপে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে, যে জাতি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাইবার পিপাসায় আমাদের মানব-জীবনের নিয়ন্ত্রী শত শত ঐশী বিভূতিকে বিবিধ শক্তি-মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করে, যে জাতি ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি-অবলম্বিত বাস্তব-দর্শন-রচনার জন্য বিখ্যাত, সেই দারুণ মূর্ত্তি-পিপাসু, মানবীয় বাস্তব রসের একান্ত লিপ্সু বাঙ্গালীচিত্তেই এই চিরসুন্দরের মানবীয় প্রকাশরূপে, শত বিচিত্র মানব-প্রেমের লীলা-রসের কবিতার জন্মই স্বভাবসিদ্ধ। একেশ্বরবাদী অপৌত্তলিক ইস্‌লামীয় পদকর্ত্তৃগণ এই মান, মাথুর, দানলীলা, নৌকা-বিহারের রস-বৈচিত্র্য কোথায় পাইবেন? শুধু অনুমানে কি অতখানি সম্ভব হয়? অত কথা কি, বাঙ্গালীর বুকের ধন, সর্ব্ববিষয়েই বর্ত্তমান বাঙ্গালার ভাবজীবনের নিয়ন্তা, আবাল্য বৈষ্ণবকবিতারসে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথেরই নিরাকার তত্ত্বে অনুশীলিত চিত্তে গিয়া এই রস পূরাপূরি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই—

(ক) তরুণ মুরলী করিল পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে
সবারে বলিয়া বিদায় লইলাম কি করিবে দোসর পরে।

(খ) ঘরে ঘোর আঁধিয়ার কি কহব সখি
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি

(গ) হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া দীপ নিয়া নিয়া চায়
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন থুইতে ঠাঁই নাহি পায়,

ইত্যাদি ছত্র মত সোজাসুজি বাস্তব (direct) ছত্র তাহার কবিতার মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। আর সত্য সত্য তাহা হইতেও পারে না; বৈষ্ণব কবিগণের যাহা কিছু রসের আলম্বন শরীরী ও স্পষ্ট, তাহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু সম্বন্ধ, তাহাও সম্পূর্ণরূপে মানবীয়; সুতরাং এই অবলম্বনে যে বাস্তবরসের লীলাবৈচিত্র্য প্রকটিত হইয়া উঠিবে, জীবন-দেবতার ভাবময়ী কল্পনামূর্ত্তি অবলম্বনে কিছুতেই তাহা তত বিচিত্র ও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। সত্যকার চিনির আস্বাদ ও চিনির আস্বাদের কল্পনা কখনই এক জিনিষ নহে; একটি যদি রস হয়, আর একটি রসাভাস। আমরা নিম্নে রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিগণ হইতে কতকটা অনুরূপ বিষয়ের কয়েকটি কবিতা তুলিয়া দিলাম—দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে প্রভেদ কোন্‌খানে।

এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে ভিজিছে বঁধুয়া দেখিয়া পরাণ ফাটে।
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কত না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া মোর মনে হেন করে:
কলঙ্কের ডালি গলায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে—(চণ্ডিদাস)

শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে
* * * * *
কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে।
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে।
হে একা সখা হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সুমুখ দিয়া স্বপন সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।—
রবীন্দ্রনাথ

বলা বাহুল্য, এই অস্পষ্ট "স্বপন সম" এবং সুস্পষ্ট "আঙ্গিনার মাঝে ভিজিছে বঁধুয়া দেখিয়া পরাণ ফাটে" এক জিনিষ নহে, এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত রসও এক নহে।

অন্যত্র,—

পরাণ-বঁধুকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।
পিঙ্গল বরণ বসনখানি মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে রাখিয়া শুতল কাছে।
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন কুসুম কস্তুরী পারা,
পরশ করিতে রস উপজিল জাগিয়া হইনু হারা।
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল বাজিলে যেমন হয়
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে আর কি পরাণ রয়।—চণ্ডিদাস

সে যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগিনি,
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি,
এসেছিল নিশীথ রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে
স্বপন মাঝে বাজিয়েছিল গভীর রাগিণী।—রবীন্দ্রনাথ

এ অপূর্ব্ব। তবুও, "নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে" ইত্যাদির বাস্তব রস ও "স্বপন মাঝে বাজিয়েছিল গভীর রাগিণী" এক জিনিষ নহে; একটি যদি রস হয়, আর একটি রসাভাস। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে একবার বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব রসসাহিত্যের দিক দিয়া যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি কেবল পূর্ব্বরাগের মধ্যেই আবদ্ধ আছে—"এখনও তা'রে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।" কিংবা—

"ওহে সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও মধুর বাঁশরী
মোর পাখা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি।"

উত্তর-সাহিত্যের রসবৈচিত্র্য আর তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় না—কথাটার মধ্যে হয় ত খানিকটা সত্য আছে। ইহা যে তাঁহার প্রতিভার ত্রুটি, তাহা হয় ত না-ও হইতে পারে, ইহা তাঁহার আলম্বনেরই সঙ্কীর্ণতা। আদৌ নিরাকার ব্রহ্মের কতকটা সাকারীভূত ভাবময়ী মূর্ত্তি লইয়া খুব বেশী বাস্তব রস ফুটাইয়া তোলা চলে না, তাহা অনেকখানি ভাবাত্মক (abstract) হইতে বাধ্য। উর্দ্দু কবিতার ত্রুটিও ঠিক এইখানে। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, বৈষ্ণব কবিতার তুলনায় উর্দ্দু কবিতারই সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার বেশী সাদৃশ্য আছে এবং সেই জন্যই বোধ হয়, কোনও খৃষ্টান সমালোচক Davidএর Psalmsএর সঙ্গে তাঁহার কবিতার সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কবিতার কথা আরম্ভ করিলে টানে টানে অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। এ রকম একটি প্রবন্ধে তাহাদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভবপর নহে এবং বলা বাহুল্য, আমাদের তাহার যোগ্যতাও নাই। আমাদের বক্তব্য যাহা, তাহা উর্দ্দু কবিতা লইয়া। উর্দ্দু কবিতার সম্বন্ধে আমাদের শেষ কথা যে, উর্দ্দু সাহিত্য একটি সুবিশাল সাহিত্য; কোনও একটি পদে বা পদাংশে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করান কোনওরূপেই সম্ভবপর নহে এবং আমরা তাহার চেষ্টাও করি নাই। সুবিশাল উর্দ্দু সাহিত্যের প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়াইয়া নিতান্তই প্রথম দৃষ্টিতে তাহার যে বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার কথাই দুই একটি বলিলাম। ইহার পাঠে যদি কাহারও উক্ত সাহিত্যের আলোচনায় একটু উৎসাহ বাড়ে, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জাগৃহি

জাগ্‌তে হবে জাগ্‌তে হবে, নিদ্রা হ'ল অনেক দিন,
আপন কাযে লাগ্‌তে হবে, রাগ কোর না লজ্জাহীন!
হায় বাঙালী, আজকে শুনি তোমার দেশের লোকমুখেই,
সকল জাতির তোমরা অধম, প্রমাণ সবার চোখমুখেই।
সবাই তোমায় ঘেন্না ক'রে, নিন্দে ক'রে, যায় ঠেলে,
দশের মাঝে, দেশের মাঝে, আর কি তোমার ঠাঁই মেলে?

মুখোস খোল, মুখোস খোল, ভদ্রয়ানার মুখোস গো,
কলম পিষে আসছ ক'রে অনেক কালই উপোষ ত'।
মূর্খ শ্রমিক, জাগ্‌ল তারা, হচ্ছে তোমার বিদ্রোহী;
ভৃত্য তোমার জান্‌ল তোমায় জব্দ করার ছিদ্রই।
এক পেয়ালা চায়ের নেশায় রাজনীতিকে মারতে চাও?
মুখের তোড়েই বাদশাকুড়ে সব কিছু কায সারতে চাও?

পশুর হাতে সতীর ওপর অত্যাচার সে ক্ষিপ্ততার!—
ম্যাচ্ থিয়েটার বায়স্কোপে এই কি সময় ভিড় করার?
কাবুলবাসী সাইলকেরা তোমার তরেই ডাণ্ডা বয়,
হায় কাপুরুষ, রক্ত তোমার কেমন ক'রে ঠাণ্ডা রয়?
ভিন্‌দেশীতে দেশ লুটে নেয়, তোমরা ব'সে ঘাস খেলে?
ধিক্ শত ধিক্, চুরুট ফুঁকে আড্ডা জমাও তাস খেলে!

সাইকেলে কি সুখ পেয়েছ প্রতাপ রাজার বংশধর?
কুৎসা গেয়েই দিন কাটালে, হায় বিলাসী স্বার্থপর!
পণের টাকা আদায় করায় মেজাজ কড়া দেখতে পাই!—
চাপ্‌রাশীতেও ধমকে দিলে চোখরাঙানি কোথায় ভাই?
একচালাতে আপন জনের সঙ্গে থাকাও ভার বোঝ,
বেহার থেকে সব প্রদেশই দূর ক'রে দেয়,—ঘাড় গোঁজ!

দেশকে স্বাধীন করতে দেখি একশো রকম আস্ফালন!
জান্ দিতে চাও, ফক্কিকারী বক্তৃতাতে ঘর গরম!

'ভৈয়া' ব'লে ডাকলে পরে সকল জাতের লোক ছোটে,
তোমার ভায়ের বিপদ দেখে একটু তোমার রোখ ফোটে?
সকল দেশেই ঐক্য আছে, নেই কেবল এই বাংলাতে,
কেমন ক'রে ঢুকবে আলো বন্ধ ঘরের জানলাতে?

জাগ্‌তে হবে, জাগ্‌তে হবে, আজকে তোমায় অবশ্যই!
স্মরণ কর, বাংলা কবে ছিল ভারত-নমস্যই!
দূর ক'রে দাও হিংসা তোমার, অধঃপতন সেই আনে,
শাস্তি দিতে দাঁড়িয়ে পড়ো নিমকহারাম বেইমানে।
মনুষ্যত্ব হারিয়ো নাকো উপন্যাসের মন্তরে,
ঘর ভেঙেছে, বন্যা এল, বুঝ্‌তে শেখো অন্তরে!

সাহিত্য যায় জাহান্নামে, তোলাই তোমার কর্ম্ম আজ,
নিষ্ঠাবিচার নির্ব্বাসিত, লাঞ্ছিত যে ধর্ম্মরাজ!
চতুর্দ্দিকেই তাই কোলাহল, সমাজ ঘিরে অন্ধকার,
আজ প্রয়োজন নাই তোমাদের মিথ্যা কথায় বন্দনার।
নিজেই মোরা শত্রু নিজের, দোষ দিতে চাই ভিন্‌জাতির,
নাই একতা, নাই সাধুভাব, তাই ঝরে জল দুই আঁখির!

জ্ঞানপাপী যে ঘুমিয়ে আছে, জাগাই তারে কোন্ সুরে?
ধ্বংসপথের যাত্রী, তবু চিন্‌বে না তার বন্ধুরে!
জাতির মতন জাত হ'তে চাও, দাঁড়িয়ে পড় একসাথে,
ভাইকে ডেকে ভাই ক'রে নাও দুঃখদিনের শেষ রাতে।
শাসন যারা করছে তোমায়, নাও শিখে নাও তাদের গুণ,
জাগ্‌তে হবে, জাগ্‌তে হবে, আজকে তোমার ভাঙবে ঘুম!

বিদ্যাসাগর আশুতোষের জাতভায়েদের রূপ দেখে,
'হায় বাঙালী!' এই কথাটাই বেরিয়ে আসে মুখ থেকে,—
লক্ষ্যবিহীন এই যত সব ভবিষ্যতের ভরসাদের
কোথায় গতি, তার প্রতি কি চোখ পড়ে না কর্ত্তাদের?
আজকে যদি জাগ্‌তে না চাও চারণ-কবির সঙ্গীতে,
ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও তবে নিদ্রালসের ভঙ্গীতে!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (বি-এ)

নবদুর্গা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলির মহাদেব

মাণিক ঘোষ প্রভুর আদেশ অনুসারে মোহান্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি অস্থিরভাবে কক্ষতলে পদচারণা করিতেছেন। মাণিককে দেখিয়া মোহান্ত একটা সোফায় বসিয়া বলিলেন, "খেতে বসেছে এরা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মাণিক, কি করা যায় বল দেখি ? কিছু উপায় তুমি ঠাওরালে ?"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে, আমার যতটুকু বুদ্ধি, তাতে আমার যা মনে হয়েছে, তা ত আমি হুজুরকে পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি।"

মোহান্ত সোফা ছাড়িয়া আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আবার অস্থিরভাবে দুই তিন বার কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পদচারণা করিলেন। তার পর মাণিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মাণিক, ওকে আমি আজই চাই। এই রাত্রেই।"

মাণিক প্রায় মিনতির স্বরে বলিল, "তা কি ক'রে হবে হুজুর ! এ সব কাযে এত উতলা হ'লে কি চলে ?"

মোহান্ত প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কেন চলবে না ? আলবৎ চলবে। চলতেই হবে। কত চায় ওর বাপ ? হাজার ? দু'হাজার ? পাঁচ হাজার ? দশ হাজার ? গুণে দাও তাকে টাকা—এই রাত্রেই। আজই আমি নবদুর্গাকে চাই।"

"হুজুর !—ওর বাপ যদি রাজি না হয় ?"

"না হয়, ওর বাপকে মাকে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে, একটা ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখ। রেখে, নবদুর্গাকে আমায় এনে দাও। এত রূপ আমি ত আর কখনও দেখিনি, মাণিক! আমার বিয়াল্লিশ বছর বয়স হ'ল, এ বয়সে, আমি বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, কাশ্মীরী, আর্ম্মাণী—বহু বহু সুন্দরীকে হাতে পেয়েছি – কিন্তু নবদুর্গা ?—না, এর মতনটি কাউকে ত আমি দেখিনি! ওকে আমার চাই—চাই—নইলে আমি বাঁচবো না !"

মাণিক বলিল, "প্রভু—বসুন, বসুন। শান্ত হোন ! সব দিক ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে তার পর যা কর্ত্তব্য, তা স্থির করতে হবে। যাবে কোথা—ও নবদুর্গা ত আপনারই। তবে একটু ধীরে সুস্থে, রয়ে ব'সে, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। ইংরেজের রাজ্য, আইন যে বড় কড়া, হুজুর। সেবারকার সেই ঘটনায় কি বিপদেই না পড়া গিয়েছিল, মনে ক'রে দেখুন না। পুলিসকে ঘুষ দিতে, খবরের কাগজওয়ালাদের মুখ বন্ধ করতে, মেয়েটার বাপকে রাজি করতে, ৩০।৪০ হাজার টাকা বেরিয়ে গিয়েছিল। হুজুরকে গেরেপ্তার জন্যে ওয়ারেণ্ট পর্য্যন্ত বেরিয়েছিল,—মাসখানেক প্রায় হুজুরকে চন্দননগরে গিয়ে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস করতে হয়েছিল। ধৈর্য্য ধরুন, আমি সবই ঠিক ক'রে দেবো, তবে দু'দিন আগে আর পাছে।"

সেবারকার সেই ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে এই নরপশুর প্রাণের আবেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি সোফায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, "পারবে না ? আজ তা হ'লে নিতান্তই উপায় নেই ?"

মাণিক তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, "না মহারাজ —আজ কোনও উপায় নেই। ধৈর্য্য ধরুন,—ভট্‌চাযকে হাত করবার জন্যে ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করি—তার পর বীজ বপন করলে সুফল পাওয়া যাবে। আজ এক কায করুন। ভট্‌চাযকে দুটো মোহর ভোজন-দক্ষিণে দিন, ওর পরিবারকে, মেয়েকে এক এক মোহর আশীর্ব্বাদী। 'তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে মহারাজ চেষ্টা করবেন, যোগ্য পাত্র খোঁজবার জন্যে পরগণার নায়েব-গোমস্তাদের উপর কাল হুকুমনামা পাঠাবেন, দিন কতক এখানে থেকে যাও'—এই ভাঁওতায় ভট্‌চাযকে

এখন আট্‌কে রাখি। তার পর ভট্‌চাযের মন বুঝে, সময় বুঝে, আসল কথাটা ওর কাছে পাড়বো। টাকার লোভ দেখিয়ে বামুনকে রাজি করবো।"

মোহান্ত বলিলেন, "অন্য কোনও উপায় যদি না-ই থাকে, তবে তাই কর, মাণিক। কিন্তু আজ, আর একবার তাকে আমায় দেখাও। আমি আর একবার শুধু তাকে চোখের দেখা দেখ্‌বো।"

মাণিক বলিল, "সে ত আপনি দেখবেনই। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার তাদের বৈঠকখানায় নিয়ে আস্‌বো। আপনি তাদের ঐ মোহরগুলো দেবেন, ওরা আপনাকে প্রণাম করবে—নবদুর্গাকে আপনি দেখবেনই ত!"

মোহান্ত বলিলেন, "না না মাণিক, সে রকম দেখা নয়,—হাটের মাঝে নয়। কোনও কৌশলে তাকে নিয়ে এস না—এই ঘরে, এই সোফায়, আমার পাশে পাঁচ মিনিটটি সে বসবে। তার হাত দুটি কি নরম, যেন শিমুলতুলোর মত তুলতুলে—আর, আঙুলগুলি দেখেছ?—কবিরা যে চাঁপার কলির সঙ্গে সুন্দরীর আঙুলের তুলনা ক'রে থাকেন, সে এই রকম আঙুলের সঙ্গেই খাটে। তার সেই হাত দুটি আর একবার আমি নিজের হাতের মধ্যে নেবো—নিয়ে, দুটো চারটে—এই নেহাৎ মামুলি কথা—তাকে বলবো—সে উত্তর দেবে ত? তার গলার স্বরটি আমি শুনবো—ব্যস, তার পরই সে চ'লে যাবে—আপনার বাপ-মার কাছে চ'লে যাবে।—এইটুকুমাত্র, আজ রাতের জন্যে তুমি ক'রে দাও মাণিক, আমি তোমায় বখশিস দেবো।"

এরূপ করা সুযুক্তি হইবে কি না, তাহাই মাণিক বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। মোহান্ত বলিলেন, "এক কায কর না। এতক্ষণ বোধ হয় ভট্‌চাযের খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি গিয়ে তাকে বল, 'মেয়েরা ততক্ষণ খান, আপনি চলুন, তামাক-টামাক খাবেন, মহারাজ ডাকছেন।'—এই বোলে বুড়োকে তুমি বৈঠকখানা-ঘরে এনে বসাবে, তামাক দিতে বলবে।—খানিক পরে আমিও গিয়ে সেখানে বস্‌বো, ভোজন-দক্ষিণের দু'মোহর, গিন্নীর, মেয়ের আশীর্ব্বাদ মোহর, তাঁরই হাতে দেবো। যখন বুঝবে, মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেছে, তখন তুমি তেতালায় গিয়ে বলবে, নবদুর্গা, এস, তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন। তাকে সঙ্গে ক'রে একবারে এই ঘরে নিয়ে এসে এই সোফায় বসাবে। আমি বৈঠকখানা থেকে উঠে এসে ওর সঙ্গে দুটো চারটে কথা কয়েই ওকে বিদায় করবো—তুমি আবার তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে যাবে। কি বল?"

মাণিক মোহান্তের পদস্পর্শ করিয়া, তার পর হাত দুটি যোড় করিয়া বলিল, "মহারাজ, আজ না। তাড়াতাড়ি করবেন না,—তাতে কার্য্য নষ্ট হ'তে পারে। ওদের মনে একটা সন্দেহ জন্মাতে পারে। যখন এ কথা শুনবে, তখন ওর বাবা বল্‌বে, কৈ, আমি ত মেয়েকে ডেকে পাঠাইনি। তার পর মেয়ে বলবে, যে ঘরে তাকে আনা হয়েছিল, সে ঘরে খাট-পালঙ্ক রয়েছে—মহারাজ এসে তার পাশে বসেছেন—মনে একটা ঘোর সন্দেহ আসতে পারে। তা হ'লে কাল সকালের ট্রেণেই ওরা পালাবে।"

মোহান্ত ভাবিয়া দেখিলেন, মাণিক যাহা বলিতেছে, তাহা সমীচীন ও যুক্তিপূর্ণ বটে। হতাশভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, যা ভাল বোঝ, তাই কর।—একবার তামাক দিতে বল হে!"

মাণিক উঠিয়া গিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ জানাইল। ফিরিয়া আসিয়া আবার মোহান্তের পায়ের কাছে মেঝের উপর বসিয়া বলিল, "মহারাজ, একটা কায করলে হয় না?"

"কি, বল?"

"মহারাজের দান, পুণ্য, তপস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট সুনাম থাকলেও, একটা বিষয়ে একটু—কি বলে গিয়ে—অখ্যাতি আছে। ঐ ভট্‌চায বুড়ো দূরদেশ থেকে এসেছে, ও বোধ হয় সে সব কিছুই শোনে নি। কিন্তু যাত্রিবাড়ীতে বাস—মেয়েটার বয়সও হয়েছে, তায় কুমারী, অসাধারণ সুন্দরী। আমার ভয় হয়, পাছে রাজবাড়ীতে ভটচাযের যাওয়া আসা দেখে অন্য লোকে ওকে কিছু বলে—বা সাবধান ক'রে দেয়। তা হ'লে সব পণ্ড হবে। ওদের এই রাজবাড়ীতে এনেই অতিথি ক'রে রাখি না কেন? বলি, মহারাজ তোমার মেয়ের বিয়ের একটা কিনারা ক'রে দেবেনই; তোমার উপর ওঁর বিশেষ অনুগ্রহ—কিন্তু পাত্র ঠিক করতে কিছু সময় ত লাগবে। তত দিন সেই যাত্রিবাড়ীতে স্যাঁতসেঁতে মাটীর ঘরে প'ড়ে থেকে কষ্ট পাওয়ার দরকার কি? প্রকাণ্ড রাজবাড়ী, বিস্তর ঘর এখানে খালি প'ড়ে রয়েছে, মহারাজকে ব'লে এক দিক পানে গোটা দু' তিন ঘর তোমাদের দিচ্ছি। সেইখানেই তোমরা থাক, রাজবাড়ী থেকে সিধে পাবে, রাঁধ বাড় খাও দাও। তা হ'লে দুষ্ট লোকে কেউ আর ভটচাযের কাণ ভারী করতে পারবে না—

তারও যেতে আসতে, উঠতে নামতে, নবদুর্গাকে দিনে দশবার দেখতে পাবেন। কি বলেন?"

মোহান্ত বলিলেন, "এ পরামর্শ ভাল।"

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া প্রস্থান করিল। মোহান্ত তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "এ পরামর্শ তুমি ভালই দিয়েছ, মাণিকলাল। ওদের আজ রাতেই উঠিয়ে আন। সন্ধ্যার পর স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ভটচায পিছনের ফটক দিয়ে রাজ-বাড়ীতে এসেছে, কত লোক হয় ত দেখেছে। তার পর ফিরে যাবে—রাত ১১টার পর। হয় ত কাল সকালেই পাঁচ জন লোকে এই নিয়ে ভটচাযকে ঠাট্টা-তামাসা করবে। তার চেয়ে আজ রাতেই—বুঝেছ? আমি কিছু ভটচাযকে বলবো না। দক্ষিণে-টক্ষিণে দিয়ে আমি শুতে যাব,—তুমিই বুড়োকে বলবে, বুঝেছ?"

"যে আজ্ঞে—তাই করবো।"

"আচ্ছা, তুমি এখন যাও—ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল কি না দেখ।"

মাণিকলাল চলিয়া গেল। মোহান্ত বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তামাক ভাল লাগিল না। তখন তিনি উঠিয়া অদূরে টেবলের উপরস্থিত "কলিং-বেল-"এর বোতাম টিপিলেন।

বাহির হইতে এক জন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। এই ব্যক্তিই মোহান্ত মহারাজের খাস খানসামা। শয়নগৃহের কাম-কর্ম্ম করার ইহারই একমাত্র অধিকার। অন্যান্য ভৃত্য বিনা হুকুমে এ কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে না।

মোহান্ত বলিলেন, "দীনে, একটা পেগ দে।"

দীনু খানসামা আলমারির দিকে অগ্রসর হইয়া, আবার দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, হুচ্‌কি দেবো কি? না, বেরাণ্ডি?"

মহারাজ ব্র্যাণ্ডি দিতে আদেশ করিলেন।

দীনু আলমারির নিকট গিয়া নিজ কোমর হইতে চাবির গুচ্ছ লইয়া একটা আলমারি খুলিল। তাহার উপর দিকের থাকগুলিতে নানাবিধ বিলাতী সুরার বোতল, নিম্নের দুই থাকে "সাহেববাড়ী"র সোডার বোতল ঠাসা রহিয়াছে। দুই তিনটা ডিক্যাণ্টারও রহিয়াছে, কোনওটা ভর্ত্তি, কোনটায় বারো আনা, কোনটায় অর্দ্ধেক, কোনটায় সিকি ভাগ পরিমাণ পানীয় রহিয়াছে। উহার মধ্য হইতে একটা ডিক্যাণ্টার এবং সোডার বোতল বাহির করিয়া, কাচের গ্লাসসহ ট্রের উপর সাজাইয়া দীনু লইয়া আসিল। গ্লাসে পেগ ঢালিয়া দিয়া উহাতে সোডা মিশাইয়া, অন্য একটা আলমারি খুলিয়া রূপার বাক্সে ভর্ত্তি চুরুট আনিয়া দিল।

মোহান্ত গ্লাস উঠাইয়া এক চুমুক পান করিয়া বলিলেন, "আধ ঘণ্টা পরে খাবার আনিস।"

দুই তিন চুমুক ব্র্যাণ্ডি পান করিয়া মোহান্ত মহারাজ সেই রূপার বাক্স হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া ধরাইলেন। সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া নবদুর্গার নবযৌবন ও অলৌকিক রূপলাবণ্যের চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন।

প্রথম গ্লাস শেষ হইলে নিজেই দ্বিতীয় গ্লাস ঢালিয়া লইলেন। সুরার প্রভাবে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি বাবা কেদারেশ্বরের—মহাদেবের সেবাইৎ নন—তিনিই যেন স্বয়ং মহাদেব। আর তাঁহার নবদুর্গাকে, তাহার পিতামাতা অন্যায়ভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছে—তাঁহার নিকট আসিতে দিতেছে না। ভূত, প্রেত, পিশাচ সৈন্য লইয়া, গিরিপুর বিধ্বস্ত করিয়া, গিরিরাজকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া, তাঁহার নবদুর্গাকে কাড়িয়া আনাই উচিত কি না, তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বিবেচনাশক্তিকে প্রখর করিবার জন্য এই কলির মহাদেব, তৃতীয় গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া লইলেন।

মাণিক ঘোষ আসিয়া নিবেদন করিল, উহাদের সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে—মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার আশায় তিন জনেই বৈঠকখানা-গৃহে বসিয়া আছে।

মোহান্ত বলিলেন, "বাসার কথা বলেছ?"

"আজ্ঞে হাঁ। আমি নিজে কাল সকালেই গিয়ে ওদের তুলে আনবো, স্থির হয়েছে।"

"বেশ।"

"হুজুর কি একবার নীচে আসবেন?"

"না। বল, আমি এখন যোগমগ্ন।" বলিয়া তিনি গ্লাসে আর এক চুমুক দিলেন।

"আর, সেই দক্ষিণার, আশীর্ব্বাদীর হুকুম যা দিয়েছিলেন?"

"খাজাঞ্চীর কাছ থেকে চেয়ে নাও গে।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া মাণিক মোহান্তের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল।

দীনু খানসামা আসিয়া বলিল, "মহারাজ, এবার খাবার আনতে বলি?"

মোহান্ত বলিলেন, "ড্যাম ইওর খাবার! নেহি মাংতা। আমি শোব।"—বলিয়া তিনি গ্লাস শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। টলিতে টলিতে শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। খানসামা তাঁহার বাহু ধরিয়া শয্যায় লইয়া গিয়া সন্তর্পণে তাঁহাকে শোয়াইয়া দিল। তার পর মশারি ফেলিয়া দিয়া মোহান্তের প্রসাদী সুরাটুকু লইয়া বাহির হইয়া গেল।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভীষণ সংবাদ

ভোরে ভোরেই এক জন পাইক ও দুই জন ভৃত্য সহ মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। চারি দিনে যাত্রাওয়ালার ২৲ টাকা ঘর ভাড়া প্রাপ্য হইয়াছিল, মাণিকলাল নিজ ট্যাঁক হইতে তাহা দিতে উদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ও কি, তুমি দেবে কেন হে—আমি দিচ্ছি।"—বলিয়া নিজ কোমর হইতে একটি ক্ষুদ্র খেরুয়ার থলি বাহির করিলেন। মাণিক বলিল, "না না—আমিই দিচ্ছি। নিজের গাঁট থেকে কি আর দিচ্ছি? খাজাঞ্চীর কাছে গিয়ে খরচ লিখিয়ে সরকারী থেকে এ টাকা বের ক'রে নেবো এখন।" এ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিরস্ত হইলেন।

সামান্য জিনিষপত্র যাহা ছিল, ভৃত্যরা তাহা বহন করিয়া লইয়া চলিল। মাণিক ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাজারের ভিতর দিয়া সোজা পথে না গিয়া, মন্দিরের পশ্চাতের মাঠ দিয়া, কেদারগঙ্গা প্রদক্ষিণ করিয়া, নিম্ন-প্রাচীরযুক্ত এক বাগানের ফটক খুলিয়া প্রবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বাগানের অপর প্রান্তে "তপসাশ্রম" সৌধ দণ্ডায়মান রহিয়াছে—বস্তুতঃ ইহা আশ্রম-সংলগ্ন উদ্যান। নানাবিধ ফল-ফুলের গাছ, ক্রোটন, পাতা বাহারের গাছ রহিয়াছে। মালীরা কোথাও ফুলগাছের গোড়া খুঁড়িতেছে, কোথাও আগাছা উপড়াইতেছে, কোথাও অন্যবিধ কার্য্যে নিযুক্ত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বেশ বাগানখানি ত!—এটি বোধ হয় মোহান্ত মহারাজেরই বাগান?"

মাণিক বলিল, "হ্যাঁ, তাঁরই খাস বাগান। এই বাগানে আপনি বেড়াবেন চেড়াবেন। মহারাজও মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে এখানে আসেন; তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হবে—কথাবার্ত্তাও হবে।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বড় মনোরম স্থানটি!"

বাগান পার হইয়া, অট্টালিকা-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট গিয়া মাণিক ধাক্কা দিল। এক জন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিল। মাণিক তাহাকে বলিল, "কি রে, এতখানি বেলা হ'ল, এখনও তোর ঘর-দোর পরিষ্কার করা হ'ল না? তোকে ব'লে গেলাম রাত্রে, ভোরে উঠে সব সেরে সুরে রাখ্‌বি, সকালবেলা ভট্‌চায্যি মশাই আসবেন।"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে, সবই ধোয়া-পোঁছা হয়েছে, কেবল এই উঠানটুকু ঝাঁট দিতে বাকী ছিল, তাও হয়ে গেল।"

"আচ্ছা বেশ। আসুন ভট্‌চায মশাই।"—বলিয়া মাণিক অগ্রে অগ্রে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একটি সুপরিসর বারান্দা, লাল বিলাতি মাটী দিয়া সিমেণ্ট করা। বারান্দার পর পাশাপাশি দুইখানি মাঝারি আকারের কক্ষ। বারান্দার এক প্রান্ত হইতে, কোণা-কুনি আর একটি ঢাকা বারান্দা চলিয়া গিয়াছে, উহার প্রান্তে আর একখানি ঘর। মাণিক বলিল, "মফস্বলের নায়েব গোমস্তা কর্ম্মচারীদের পরিচয়ে কেউ তীর্থদর্শনে এলে, এখানেই তাদের বাসা দেওয়া হয়। ঘরগুলি কিছু মন্দ নয়—দেখুন না, ভিত কত উঁচু, একতালার ঘর হলেও শুকনো একেবারে খটখটে। ও দিকের ঐ ছোট ঘরখানাতে রান্না-বান্না হ'তে পারবে। আশ্রমে অবশ্য এর চেয়েও ভাল ভাল ঘর ঢের আছে,—দোতলাতেও আছে, কিন্তু এই মহলটি একবারে একটেরে—বেশ নিরিবিলি, বুঝতে পারছেন ত? তাই এইখানেই আপনাকে রাখা স্থির করলাম।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এ চার দিন যেখানে ছিলাম, তার তুলনায় এ ত স্বর্গ। এর চেয়ে ভাল ঘরে আমার দরকারই বা কি? এই বেশ হবে।"

মাণিক বলিল, "ভাঁড়ারীকে ব'লে যাচ্ছি, এখনই সিধে পাঠিয়ে দেবে এখন। চাকরটা রইল—এ আপনারই কায-কর্ম্ম করবে—অন্য সব কায থেকে একে অবসর দেওয়া হয়েছে। আপনি স্নান আহ্নিক করুন। আমি তা হ'লে এখন চল্লাম, বুঝলেন?"

ভট্টাচায্য বলিলেন, "আচ্ছা, তা এস। কিন্তু ওহে—কাল সন্ধ্যেবেলা মোহান্ত মহারাজ যে আমার মেয়ের করকোষ্ঠী পরীক্ষা করলেন, তার ফলাফল ত কিছুই আমি জানতে পারলাম না।"

"তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলেই সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা

করবো। যেমন বলেন, আপনাকে এসে জানাব।"—বলিয়া মাণিক প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই এক জন ভৃত্য সিধা আনিয়া উপস্থিত করিল। উত্তম মিহি চাউল, সোনা মুগের দাল, ময়দা, সুজি, গাওয়া ঘি, চিনি, নুণ, মশলা, তরী-তরকারী—সমস্তই প্রচুর পরিমাণ। জিনিষগুলি দেখিয়া ভগবতী দেবী ভারী খুসী। লোকটা বলিল, দুধ ও মাছ একটু বেলায় আসিবে।

গৃহিণী জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলেন। ভৃত্য উনান ধরাইয়া মশলা বাটিতে বসিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নান করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দুধ ও মাছও যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিল। ভট্টাচার্য্য স্নানাহ্নিক সারিয়া, কয়েকখানা ফুলকা লুচি, আলুভাজা ও মোহনভোগের দ্বারা জলযোগ সম্পন্ন করিলেন।

দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া, বারান্দায় মোহান্ত-প্রদত্ত মছলন্দ-মাদুর বিছাইয়া সেইমাত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তামাক সাজিতে বসিয়াছেন, মাণিক আসিয়া হাজির হইল। "কি খবর হে? এস এস।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য আহ্বান করিয়া তাহাকে বসাইলেন।

মাণিক বসিয়া, পকেট হইতে একটি থেলো হুঁকা বাহির করিয়া বলিল, "এই হুঁকোটা নিয়ে এলাম। এখানেই থাকবে এটা। যখন তখন আসবো, তামাক খাব কিসে?—কলকেটা দিন, আমি ধরাই।"

মাণিক তামাক ধরাইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হাঁা হে, মহারাজের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?"

"আজ্ঞে হাঁা, হয়েছিল বৈ কি।"

"কি বল্লেন তিনি?"

"আজকের ডাকে পরগণায় পরগণায় নায়েব-গোমস্তাদের নামে পাত্র খোঁজবার জন্যে পরোয়ানা চ'লে গেছে। গাঁই গোত্র সব কথাই পরোয়ানায় লিখে দেওয়া হয়েছে। পরোয়ানার নকল আমায় দেখালেন। সুশ্রী, সবল, শিক্ষিত ও যোত্রবান্ পাত্র অনুসন্ধান ক'রে, পাত্র ও তার পিতা বা অন্য অভিভাবকে একবারে হুজুরের কাছে এনে হাজির করবার জন্যে হুকুম হয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ। দেখা যাক্, এখন মেয়ের অদৃষ্টে কি রকম পাত্র যোটে। ভাল হ'ল। কাল সন্ধ্যায় সেই করকোষ্ঠী বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে কিছু শুনলে?"

মাণিক মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া বাম গণ্ডে বাম হস্ত স্পর্শ করাইয়া বলিল, "ঐ যাঃ—সে কথাটা ত ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে ভুল হয়ে গেছে!—আচ্ছা, এবার দেখা হলেই নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবো।"

"কখন্ তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে?"

"সন্ধ্যার পর।"

"সেই সময় আমিও যাব তোমার সঙ্গে?"

মাণিক মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "তিনি যদি নিজে থেকে আপনাকে ডেকে পাঠান, তা হ'লে যাবেন বৈ কি। নইলে. বিনা এত্তেলায়—"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা বটেই ত! তা বটেই ত! আচ্ছা, তুমি গিয়ে মহারাজকে জিজ্ঞাসা কোরো। তার পর, তিনি যদি আমায় যেতে বলেন, তা হ'লে তুমি এসে আমায় নিয়ে যেও কিম্বা কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠিও।"

কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া, দুই ছিলিম তামাক খাইয়া মাণিক বিদায় লইল।

মোহান্ত যদি ডাকিয়া পাঠান, সন্ধ্যা হইতে তীর্থের কাকের মত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দশটা বাজিল, তথাপি কোনও খবর নাই। অবশেষে তিনি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, স্নানে যাইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় মাণিক-লাল আসিয়া দর্শন দিল। তাহার মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কি হে, খবর কি?"

মাণিক চুপি চুপি বলিল, "খবর আছে—কিন্তু বড় ভাল খবর নয়। চলুন না, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সব কথা বলি।"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুকটা ভয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল। কে জানে কি মন্দ খবর লইয়া মাণিক আসিয়াছে। তিনি তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "চল তা হ'লে।"

বাগানে বাহির হইয়া মাণিক বলিল, "কাল সন্ধ্যার পর দেখা হ'ল মহারাজের সঙ্গে। আপনার মেয়ের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসাও করলাম। কিন্তু করকোষ্ঠী বিচারের ফল তিনি যা বল্লেন, তা বড় ভয়ানক।"

ভট্টাচার্য্য কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লেন হে?"

"বল্লেন, এ মেয়ে আজন্ম পতিহীনা।"

"তার মানে ?"

"মানেও আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বল্লেন, ধ্যানস্থ হয়ে তিনি শুধু এইটুকু জানতে পেরেছেন, 'এ মেয়ে আজন্ম পতিহীনা। এর মানে এখন যাই হোক। তিনি অনুমান করেন—হয় এ মেয়ের পাত্র জীবনে কখনও জুটবে না, নচেৎ—পতিহীনা শব্দে বিধবাকেও বোঝায়, পাত্র জুটলেও বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই এ মেয়ে বিধবা হবে।"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায়, যেখানে ছিলেন, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাণিক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, অদূরে স্থিত একখানা বেঞ্চি দেখাইয়া বলিল, "চলুন বসা যাক ঐখানটাতে।"—বলিয়া, তাঁহাকে একরকম হাত ধরিয়া টানিয়াই সেখানে লইয়া গিয়া বসাইল।

মাণিক কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "কি আর করবেন বলুন। অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই!"

ভট্টাচার্য্য একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে ত জানিই। এখন কি করবো, তাই ভাবছি। আচ্ছা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে এর কি কোনও প্রতীকার হয় না ?"

মাণিক বলিল, "কি জানি, তা ত বলতে পারি নে। আমরা হলাম মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—শাস্ত্রের কি জানি বলুন ?—যদি বলেন ত মহারাজকেই না হয় একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।"

"তাই জিজ্ঞাসা কর ভাই"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোঁচার খুঁট তুলিয়া চক্ষুজল মুছিলেন।

মাণিক বলিল, "কখন্ জিজ্ঞাসা করি ? সন্ধ্যার পর ভিন্ন মহারাজের ত নাগালই পাওয়া যায় না।"

"সন্ধ্যের পরেই জিজ্ঞেস কোরো।"

"তাই করবো। বরং বলবো, ভটচায মশায় খবরটা শুনে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন—যদি হুকুম দেন ত তাঁকেও এখানে ডাকাই, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথাটা হলেই ভাল হয়।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "যা ভাল বোঝ কর, ভাই।"

তার পর দুই জনেই কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে মাণিক বলিল, "ব'সে ব'সে এ রকম ক'রে ভেবে আর কি হবে ? বাসায় চলুন, স্নান আহ্নিক করতে হবে ত!"

আর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিলেন। স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে জলযোগে বসিয়া গৃহিণীকে চুপি চুপি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংবাদটা বলিলেন। সে দিন এ দম্পতির মুখে অন্নজল রুচিল না। নবদুর্গা পিতা-মাতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে খুবই ভীত হইয়া উঠিল,—তাঁহাদের এ ভাবান্তরের কারণ কিছুমাত্র অনুমান করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া কন্যার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় এক জন পাইক আসিয়া জানাইল, মোহান্ত মহারাজ বৈঠকখানা-গৃহে তাঁহাকে তলব করিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য উঠিয়া পাইকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দ্বিতলে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মোহান্ত মহারাজ বসিয়া আছেন। নিকটে মাণিকলাল বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নমস্কার প্রত্যর্পণ করিয়া মোহান্ত বলিলেন, "বসুন।"

ভট্টাচার্য্য বসিয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "প্রভু, আমার উপায় কি হবে ?"

মোহান্ত কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "উপায় ? উপায় আর কি ? অদৃষ্ট ছাড়া ত মানবের অন্য পথ নেই!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "সে কথা ত ঠিকই। কিন্তু কোনও দৈবকার্য্য—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে কি এর কোন প্রতীকার হ'তে পারে না ? আপনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, যদি কোনও উপায় এর থাকে ত আদেশ করুন, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রেও সে কার্য্যটি করাবো।"

মোহান্ত বলিলেন, "ভটচায মহাশয়, ঐ দৈবকার্য্য, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন যা সব বল্লেন, তাতে যদি অদৃষ্টের হাত এড়াতে পারা যেত, তা হ'লে কি আর ভাবনা ছিল ? ও সব ত কেবল মনকে প্রবোধ দেওয়া বৈ ত নয়! বামুনদের কিঞ্চিৎ প্রাপ্য হয় বলেই ওসবগুলো চ'লে আসছে আর কি!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা হ'লে আমায় কি করতে বলেন এখন ?"

মোহান্ত বলিলেন, "আমি আর কি করতে বলবো আপনাকে ? আমি নিজেই যে মহা ফেঁসাদে প'ড়ে গেছি। আমি কি করি, তাই এখন আমার চিন্তা হয়েছে। দেখুন, আমি পরগণায় পরগণায় হুকুম জারি করেছি, যেন আমার নায়েব-গোমস্তারা আপনার মেয়ের জন্য একটি ভাল পাত্র খুঁজে আনে। কিন্তু, দেখুন, এর পর আমার কি উচিত হবে, আমার

কোনও প্রজার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিই ? আমার হুকুম জানতে পারলে, অনেকেই ছেলে নিয়ে আসবে বটে, কিন্তু জেনে শুনে কারু সর্ব্বনাশ করা ? কারণ, যে আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে, সে ত আর বেশী দিন বাঁচবে না। আমি তাদের ভূস্বামী—জমীদার—প্রজারা আমার সন্তান তুল্য। আমি জেনে শুনে এমন অধর্ম্মটা কি ক'রে করি বলুন দেখি ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। মাণিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পানে চাহিয়া বলিল, "সেটা মহারাজ জেনে শুনে কেমন ক'রে করেন, আপনিই বলুন না।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "সে কথা ত ঠিক।"

কিয়ৎক্ষণ তিন জনেই নীরবে বসিয়া থাকার পর ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি তা হ'লে উঠি এখন ?"

"আচ্ছা, আসুন, নমস্কার।"—বলিয়া মোহান্ত তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলে মোহান্ত কহিলেন,"কি হে মাণিক, জমী তোমার প্রস্তুত হ'ল ?"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "অনেকটা হ'ল বৈ কি !"

"তা হ'লে কবে তুমি বুড়োকে সে কথা বলছ ?"

"আরও দুই এক দিন যাক্ না।"

"আর যে দেরী সয় না হে !—তা ছাড়া, ভটচায যদি তল্পী-তল্পা বেঁধে কালই স'রে পড়ে ?"

"একটা কোনও ভাঁওতা দিয়ে ওকে রাখবো।"

"কি ভাঁওতা দেবে ?"

"এই ধরুন, যদি বলি দিন কতক আপনি এখানে থাকুন। মেয়ের বিয়ে ত আপনাকে দিতেই হবে যে কোন প্রকারে হোক। অথচ টাকা-কড়ি আপনার নেই। মহারাজকে ব'লে কয়ে কিছু টাকা মেয়ের বিয়ের খরচ বাবদ যদি আপনাকে দেওয়াতে পারি, সে চেষ্টায় আছি।"

মোহান্ত মাণিকের পিঠ থাবড়াইয়া বলিলেন, "বেরি গুট, বেরি গুট। বুদ্ধি করেছ ভাল। দীনেকে ডাক ত—বুদ্ধির গোড়ায় লাল জল দিয়ে ভাল ক'রে পরামর্শটা করা যাক্।"

মাণিক উঠিয়া গিয়া দীনু খানসামাকে ডাকিয়া আনিল। মোহান্ত মহারাজ সুরা দেবীর অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন ও মাণিকও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইল না। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অনুভূতি

আমি একলা ব'সে সাঁঝের বেলা
পল্লী-নদীর তীরে,
তখন ঢেউ পরে ঢেউ রঙ্গ ক'রে
পড়ছে বেলায় ধীরে।
অস্ত-রবির রক্তরেখা
পশ্চিমেতে যাচ্ছে দেখা
আকুল ক'রে শাখীর শাখা
ফিরছে পাখী নীড়ে,
আমি একলা ব'সে সাঁঝের বেলা
পল্লী-নদীর তীরে।
দূরে তখন গ্রামের মাঝে
তুলসী-বেদীর তলে,
পল্লী-মেয়ের কমল করে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলে।
গোষ্ঠ-ফেরা রাখাল-গানে
উদাস করা করুণ তানে
কি রাগিণী বাজল প্রাণে
সুপ্ত মরমতলে
লাগল কাহার চরণ-পরশ চিত্ত কমল দলে।

আরতির ওই শঙ্খনাদে ভক্তি লহর ধারে,
বার্ত্তা কাহার প্রচার হ'ল বিশ্ব-ভবন-দ্বারে !
আকুল-করা এম্‌নি সাঁঝে
কাহার নূপুর ঐ রে বাজে
ঝিল্লী-তানে কুঞ্জ-মাঝে,
কাহার অভিসারে,
সন্ধ্যা উদার আকাশতলে
পল্লী-নদীর ধারে।
ওগো এম্‌নি ক'রে তোমার আভাস
পাচ্ছি হৃদয়-স্বামী,
তবু হিয়ার মাঝে ধরতে তোমায়
পাই না খুঁজে আমি।
কত দিন আর আকুল করি
দূরে সখা থাক্‌বে সরি
কবে পাব চরণ-তরী,
হে অন্তরযামী,—
হায় কবে আমার হবে প্রভাত
মোহ-আঁধার যামী।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অণু-পরমাণুর আকৃতি ও প্রকৃতি

বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে মানুষ বৈজ্ঞানিক জগতে কি যুগান্তর আনিয়াছে, তাহা গত ২৫।২৬ বৎসরের কার্য্য দেখিলে সম্যক্‌রূপে বুঝা যায়। এই সৌর জগতের অসংখ্য গ্রহের মধ্যে একটিতে বাস করিয়া মানুষ কি করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর লইতেছে, তাহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয়। মানবের অন্তর্দৃষ্টি কত দূর পৌঁছিয়াছে, তাহা অণু-পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। জগতের প্রত্যেক জড়বস্তু যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে গঠিত, এ ধারণা প্রাচীন সভ্য জাতিদিগের অগোচর ছিল না। ইহা এ যাবৎকাল সকল রাসায়নিক উপপত্তিতে কল্পনারূপে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব প্রকৃত পরীক্ষা দ্বারা বহুদিন পর্য্যন্ত দেখান সম্ভব হয় নাই। পরমাণুই সকল জড়বস্তুর অবিভাজ্য পরিণতি, এইমাত্র তখন ধারণা ছিল; কিন্তু গত ২৫।২৬ বৎসরের গবেষণার ফলে এ বিষয়ে অনেক নূতন ও আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহারই সামান্য আভাস দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পরমাণু (atom) কথাটির প্রকৃত অর্থ এই যে, ইহাকে পুনরায় ভাগ করা যায় না। যদিও প্রায় ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে (Lucretius, Democritus) প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকের লেখা হইতে জানা গিয়াছিল যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিমাত্র, কিন্তু তখন এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Cavendish, Boyle, Lavoisier, Dalton প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের ফলে জগতের প্রত্যেক বস্তুই যে অণুপরমাণুর সমষ্টিমাত্র, এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ইহা লোকের বিশ্বাসমাত্র ছিল এবং এ বিষয়ের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

এখন দেখা যাউক্ যে, কোন্ বস্তুর অণু বা পরমাণু বলিতে আমরা কত সূক্ষ্ম অংশ বুঝি। সামান্য লবণ লইয়া যত দূর সম্ভব তাহাকে সূক্ষ্মাতিতম অংশে ভাগ করিয়া উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা জোর ১/১০০০০০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এক কণা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে পারা যায়, কারণ, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র জিনিষ দেখা ঐ যন্ত্র দ্বারা সম্ভব নহে। তখনও পর্য্যন্ত ঐ ক্ষুদ্র লবণকণা লবণের গুণবিশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু ঐ লবণ জলে গুলিয়া ফেলিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যদিও লবণকণার অস্তিত্ব ধরা যাইবে না, তথাপি প্রত্যেক জলবিন্দুর আস্বাদ গ্রহণে বুঝা যাইবে যে, লবণের গুণ সেখানেও বর্ত্তমান আছে—যদিও ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতম অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এখন এই লবণাক্ত জল তাড়িতশক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে ক্লোরিণ নামক একটি বিষাক্ত বাষ্প ও সোডিয়ম নামক এক প্রকার ধাতু (metal) পাওয়া যায়; সুতরাং এই দুই বস্তুই লবণের উপাদান, এবং এই জন্যই লবণের বৈজ্ঞানিক নাম সোডিয়ম ক্লোরাইড্ (Sodium chloride)। একটি লবণ-কণা লইয়া ভাগ করিতে করিতে যখন এরূপ সীমায় পৌঁছান যায় যে, যাহার পরে ইহাতে আর লবণের গুণ বর্ত্তমান থাকে না, এবং ইহা সোডিয়ম ও ক্লোরিন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, সেই সূক্ষ্মতম অংশকে আমরা লবণের এক অণু (molecule) বলিতে পারি। ইহা সোডিয়মের এক পরমাণু (atom) ও ক্লোরিণের একটি পরমাণু লইয়া গঠিত।

বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের ফলে সোডিয়মের ন্যায় প্রায় বিরানব্বইটি মূল পদার্থের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। কোন অট্টালিকা যতই সুন্দর হউক না কেন, তাহার ভিতর যেমন ইট্, কাঠ, চুণ, শুরকী ইত্যাদি ছাড়া কিছুই নাই, তেমনই জগতের যে কোন জিনিষ দেখুন না কেন, তাহার গঠনের উপাদান ঐ মূল পদার্থ কয়টির মধ্যে একটি, দুইটি বা ততোধিক থাকিবেই। যেমন ঐ একই ইট, কাঠ, চুণ, শুরকী দ্বারা দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজার সুরম্য সৌধ পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন রকমের ইমারত প্রস্তুত হইতে পারে, সেইরূপ এই বৃক্ষলতাদি-পূর্ণ পৃথিবী, নদী ও সাগরের জলরাশি, মেঘ ও বাতাস, চন্দ্র ও সূর্য্য অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রকৃতির যে দিকে তাকাই, সকলেরই গঠনের উপাদান ঐ ৯২টি জিনিষের ভিতর বর্ত্তমান আছে। অট্টালিকা গঠনের সময় দেখা যায় যে, তত্ত্বাবধায়ক একখানি নক্‌সা অনুযায়ী তাঁহার মজুরদিগকে উপদেশ দেন, তেমনই প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর গঠনের নক্‌সা তাহাদের পরমাণু সমূহের ভিতর আছে। প্রকৃতির এই রহস্যের কথা ভাবিতে গেলে মন বিস্ময়ে ভরিয়া যায়। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে? বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন জিনিষের মত এই বিভিন্ন পরমাণু সমূহের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ? আমরা পরে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমরা দেখিয়াছি যে, সোডিয়মের একটি পরমাণু ও ক্লোরিণ বাষ্পের একটি পরমাণু লইয়া সোডিয়ম ক্লোরাইড্, বা লবণের

একটি অণু গঠিত হয়, সেইরূপ একটি জলের অণু লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে একটি অম্লজানের (oxygen) ও একটি উদজান বাষ্পের (Hydrogen) পরমাণু পাওয়া যায়। এইরূপ আরও বিভিন্ন বস্তুর অণুগুলি দুই বা ততোধিক মূল-পদার্থের (elements) এক, দুই বা ততোধিক পরমাণু লইয়া গঠিত হইয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন বস্তুর অণু সমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা সর্ব্বদাই একই উপাদান দ্বারা গঠিত এবং ঐ উপাদানগুলির পরস্পরের অনুপাতের কখনও তারতম্য হয় না। এই সকল অণুপরমাণুর যোগাযোগ কতকগুলি বিশেষ নিয়মাধীন। মোটের উপর এই দেখা যায় যে, যেমন কতকগুলি অক্ষর লইয়া অসংখ্য শব্দ এবং কতকগুলি শব্দ হইতে অসংখ্য বাক্য রচনা করা যায়, সেইরূপ কতকগুলি বিভিন্ন অণুকে লইয়া কত বিভিন্ন দৃশ্যমান বস্তুতে পরিণত করা যায়।

যদিও অণু-পরমাণু সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা দূরে থাকুক, অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও তাহাদের অস্তিত্ব ধরা যায় না, তথাপি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের মাপযোগ, ওজন ও সংখ্যাগণনা ইত্যাদি এরূপ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে যে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি লবণাণু-ভার ৫৮·৪৭ ; * তাহার মধ্যে সোডিয়মের একটি পরমাণু-ভার (atomic weight) ২৩ ও ক্লোরিণের একটি পরমাণু-ভার ৩৫·৪৭। ২ গ্রাম × উদজান (Hydrogen gas), ২৮ গ্রাম যবাক্ষরজান (Nitrogen gas) বা ৩২ গ্রাম অম্লজান (Oxygen gas) বাষ্পের প্রত্যেকের আয়তন প্রায় ১৩·৬৬ ঘন ইঞ্চি † এবং ইহাতে ৬৬ × $১০^{২২}$ সংখ্যক অণু বর্ত্তমান আছে। এই সংখ্যার ধারণা করা কঠিন ; কিন্তু ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সমস্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, একটি আলপিনের মাথা যতটা স্থান অধিকার করে, সেই পরিমিত স্থানে তাহার এক-কোটি গুণ অধিক বায়ুর অণু আছে।

পরমাণুর গঠন

গত ৩০ বৎসর কালের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা আমরা এমন নূতন দৃষ্টি পাইয়াছি—যাহা দ্বারা এখন আমরা অণু-পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী সম্যক্‌রূপে দেখিয়া তাহাদের আকৃতির প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি। Sir William Crookesএর উচ্চক্রম-বায়ুনিষ্কাশিত যন্ত্রে (High vacua) তাড়িত-নিঃসরণ-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা দ্বারা এই কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। তাহার পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক Rontgen কর্তৃক x-ray ও তৎপরে রেডিয়ম প্রভৃতি কতিপয় স্বতঃ কিরণ-বিসারী পদার্থ সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সমূহের (Radio activity) আবিষ্কার এই তথ্যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

Crookesএর উল্লিখিত যন্ত্রটি একটি বায়ু-নিষ্কাশিত বদ্ধ কাচের চোঙ্গ। উহার দুই প্রান্তে দুইটি platinumএর তার কাচের ভিতর দিয়া সংলগ্ন। ঐ দুইটি তার একটি তাড়িত-প্রবর্ত্তন কুণ্ডলীর (Induction coil) দুই সংযোজক পেঁচের সহিত যোগ করিয়া তাড়িত নিঃসরণ করিলে, কুণ্ডলীর ঋণাত্মক (negative) প্রান্তে সংলগ্ন তার (cathode) হইতে এক প্রকারের সূক্ষ্ম কণা সমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়া cathodeএর লম্বভাবে ধাবিত হয়। এই কণা সকল অনেক জিনিষের উপর পড়িয়া উহাদের স্বদীপকধর্ম্মের (Fluorescence) সৃষ্টি করে ; ও এই cathode-রশ্মি-পথে কোন ধাতু-দ্রব্য থাকিলে পশ্চাতে ঐ দ্রব্যের ছায়া পড়ে। Crookes দেখাইয়াছিলেন যে, এই কণাসকল প্রত্যেকেই ঋণ-তাড়িত ভার (negative charge) বহন করে ; এবং তিনি ইহার সমষ্টিকে cathode রশ্মি নাম দিয়াছেন। তাহার পর Rontgen দেখাইলেন যে, এই রশ্মি-প্রভাবে Baruim Platino Cyanideএর ন্যায় কোন স্বদীপকধর্ম্মা (Fluorescent) দ্রব্যের দ্বারা আবৃত কাগজ বা কাষ্ঠাদি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের সংক্রমণ পর্য্যবেক্ষণকারী কাচের চোঙ্গের (discharge tube) বাহিরে রাখিলে তাহারাও স্বদীপকধর্ম্মা হয় ; এবং মানুষের হাড় বা কতকগুলি ভারী ধাতু ছাড়া কাগজ, চামড়া, কাষ্ঠ ইত্যাদি সাধারণ অস্বচ্ছ জিনিষের ভিতর দিয়া এই রশ্মি সহজে যাতায়াত করে। এই

---

* ইহাদের ওজন একটি উদজান বাষ্পের পরমাণুর ওজনকে ১ বা একটি অম্লজান বাষ্পের পরমাণুর ওজনকে ১৬ ধরিয়া সেই অনুপাতে লওয়া হয়।

× বৈজ্ঞানিক ভাষায় ওজনের একক (unit) গ্রাম ও দৈর্ঘ্যের একক সেণ্টিমিটার লওয়া হয়। ১ গ্রাম=৩৫ ৩৪২ গ্রেণ বা ৪৫৩৬ গ্রাম=এক পাউণ্ড। ১ ইঞ্চি=২·৫৪ সেণ্টিমিটার।

† যখন তাপমাত্রা (tempe·ature) 0° c ও বায়বীয় চাপ (atmospheric pressure)=৭৬ সেণ্টিমিটার, তখন এই আয়তন পাওয়া যায়। তাপমাত্রা ও বায়বীয় চাপ পরিবর্ত্তিত হইলে অবশ্য আয়তনেরও পরিবর্ত্তন হইবে।

সময়ে এক্স-রে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলে। এক জন বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহা ঋণাত্মক তাড়িদ্দ্বার (negative electrode) হইতে বিক্ষিপ্ত জড়কণাসমূহ। আর এক দলের মতে সাধারণ আলোকের ন্যায় ইহার কম্পন। যাহা হউক, Sir J. J. Thomson তাঁহার নিপুণ এবং অত্যাবশ্যক পরীক্ষা সকল দ্বারা এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা তিনি cathode কণার গতিবেগ এবং তাহাদের তাড়িতভার (ত) জড়মান (জ) (mass) কি অনুপাতে আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, এই অনুপাতের পরিমাণ ক্যাথোডের ধাতুর বা কাচের চোঙ্গের ভিতরের অবশিষ্ট বাষ্পের উপর নির্ভর করে না—সকল সময়েই একই সংখ্যা পাওয়া যায়।

ক্যাথোড্ কণার গতিবেগ—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১ লক্ষ ফুট্, অর্থাৎ আলোকের বেগের প্রায় $\frac{১}{১৬}$ ভাগ—ক্যাথোড কণার $\frac{ত}{জ}$-১'৭৭ × ১০^{৭}।

বিভিন্ন ধাতু-নির্ম্মিত cathode ব্যবহার করিয়া বা বিভিন্ন অ-ঘন বাষ্পের ভিতর তাড়িত নিঃসরণ করিয়া $\frac{ত}{জ}$এর ফলের ঐক্য ইহাই প্রমাণ করে যে, ঐ কণা সমূহ প্রত্যেক বারেই অভিন্ন।

অনেকেই জানেন যে, অম্লজান ও উদজান নামক দুইটি বাষ্প জলের উপাদান। জলকে বিশ্লেষণ করিয়া যে উদজান বাষ্প পাওয়া যায়, তাহা মাপিয়া ও এই কার্য্যে আবশ্যক তাড়িতের পরিমাণ দেখিয়া গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক '০০০০১০৯ গ্রাম উদজান বাষ্প পাইতে হইলে এক coulomb * তাড়িতের প্রয়োজন হয়। ইহা হইতে উদজান বাষ্পের $\frac{ত}{জ}$ গণনার দ্বারা দেখা যায় যে, ইহা ১০,০০০ (অর্থাৎ ১০^{৪}) এর কাছাকাছি; অর্থাৎ cathode কণার $\frac{ত}{জ}$ (১৭০০ × ১০^{৪}) হইতে প্রায় ১৭০০ গুণ বেশী। ইহা কিসের আধিক্য? উভয়ের তাড়িতভাবের অথবা জড়মানের (mass)?

তাড়িত কণা (Electron)

সকলেই জানেন যে, আকাশে ভাসমান শ্বেতবর্ণ মেঘ সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টিমাত্র। বায়ুতে প্রায় সর্ব্বদাই জলবাষ্প (water vapour) আছে; এবং কোন কারণে বায়ুর উত্তাপ কম হইতে থাকিলে এমন এক সময় আসে—যখন জল-বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়। প্রভাতে যে কুজ্ঝটিকা দেখিতে পাই, উহা জলকণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, একবারে ধূলিকণাশূন্য বায়ু ঠাণ্ডা করিয়া এরূপ জলকণা পাওয়া যায় না; কারণ, এই ধূলিকণাগুলিকেই কেন্দ্র (nucleus) করিয়া জলকণার গঠন হয়।

C T R Wilson পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ধূলিকণাশূন্য বিশুদ্ধ বায়ু একটি কাচপাত্রে লইয়া তাহার আয়তন হঠাৎ বর্দ্ধিত করিয়া ঐ বায়ুর তাপ যথেষ্ট কম করিলেও জলকণা প্রস্তুত হয় না; কিন্তু ঐ পাত্রে cathode কণা প্রবেশ করাইলে তাহাদিগকে কেন্দ্ররূপে পাইয়া তৎক্ষণাৎ জলকণা প্রস্তুত হয়।

সার জে, জে টম্‌সন্ ও অধ্যাপক উইলসন্ এই পরীক্ষা হইতে জলকণা সকলের আকার ও তাহাদের পতনের বেগ হইতে তাহাদের জড়মান (mass) নির্ণয় করিয়াছেন; এবং ইহা হইতে cathode কণার তাড়িত-ভার গণনার দ্বারা ঠিক করিয়াছেন। ইহার ফল ১'৫৯১ × $\frac{২}{১}$÷ (E M U)। *

এই ঋণতাড়িত পরিমাণ পুনরায় অবিভাজ্য, এবং বৈজ্ঞানিকগণের মতে ইহাই তাড়িত পরমাণু (atomoic-electricity) J Steny ইহার নাম দিয়াছেন ইলেক্‌ট্রন, এবং এই নামেই ইহা এখন সুপরিচিত। এই ইলেক্‌ট্রনই সকল জড় বস্তুর পরমাণুর উপাদান।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, ইহার দ্বারা পরমাণু সকল দর্শন করা অসম্ভব। ইহার কারণ এই যে, আলোক তরঙ্গগতি মাত্র; এবং ইহার সাহায্যে কিছু দেখিতে হইলে তাহা আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (wave length) অপেক্ষা ছোট হওয়া চাই; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা নহে বলিয়া সাধারণ আলোক-সাহায্যে পরমাণুর আকার আমাদের দৃষ্টির গোচরে আসা সম্ভব নহে। যদি এমন কোন আলোক থাকে, যাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সূক্ষ্মতম পরমাণুর আয়তন অপেক্ষাও কম, তবে সেইরূপ আলোক আমাদের কার্য্যে সাহায্য করিতে পারে। রঞ্জন-রশ্মি আমাদের সেই অভাব পূরণ করিতেছে। ইহা হইতে মনে করিবেন না যে, সত্য সত্যই এই রশ্মি দ্বারা পরমাণু সকলের নড়াচড়া বা তাহাদের আকৃতি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ, আমাদের দৃষ্টির ততদূর ক্ষমতাই নাই। তবে নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা

* coulomb—তাড়িত পরিমাপক একক (unit)।

* e m u তাড়িতপরিমাপক একক (unit)।

তাহাদের কার্য্য হইতে প্রকারান্তরে সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিয়া লইতে পারি।

অনেকেই ম্যাদাম কুরী আবিষ্কৃত রেডিয়মের নাম শুনিয়াছেন। ইহার পরমাণু অদ্যাপি আবিষ্কৃত ভারী পরমাণু সকলের মধ্যে অন্যতম। ইহার আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে, ইহার পরমাণু স্বতঃই উদ্ভিন্ন হইয়া যায় এবং ইহা হইতে একটি অতি সূক্ষ্ম অংশ বন্দুকের গুলী অপেক্ষাও বেগে নিক্ষিপ্ত হয়। কেন ও কি উপায়ে ইহা হয়, তাহা আজও ঠিক হয় নাই। প্রথমে যে ক্ষুদ্রাংশ ছুটিয়া যায়, তাহাই হিলিয়ম নামক বাষ্পের পরমাণু, এবং অবশিষ্টাংশ আর রেডিয়ম থাকে না,—অন্য জিনিষে পরিণত হইয়া যায়। এই অংশ হইতে আবার সময়মত অন্য একটি অংশ বহির্গত হইয়া যায়। রেডিয়মের মত ইউরেনিয়ম, থোরিয়ম নামক আরও ২।১টি মূল পদার্থ আছে। ইহাদিগকে Radio-element নাম দেওয়া হইয়াছে। সার ই, রুথফোর্ড এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। উপরেই বলিয়াছি যে, প্রথমেই যে অংশ বিক্ষিপ্ত হয়, উহা হিলিয়মের পরমাণু। ইহার ওজন ৪টি উদজানের পরমাণুর সমান, আর ইহা ধনতাড়িত ভার বহন করে। ইহার নাম আল্‌ফা-কণা, এবং ইহার বেগ সেকেণ্ডে ১০ হাজার মাইল। ইহার পরে যে অংশ বাহির হয়, তাহার নাম বিটা-কণা। ইহা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ইলেক্ট্রন। ইহার বেগ সেকেণ্ডে ৫০ হাজার হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল (আলোকের গতিবেগ) পর্য্যন্ত। রেডিয়মই হউক বা ইউরেনিয়মই হউক, এই ভগ্নক্রিয়া প্রত্যেকটিতেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী চলে। কোন স্থানে উপরি-উক্ত কোন জিনিষের সহস্রটি পরমাণুই থাকুক আর লক্ষ পরমাণুই থাকুক, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট অংশই বরাবর বাহির হইবে—তাহার কম-বেশী হইবে না। যেমন রেড়িয়ম বৎসরে $\frac{১}{২৩০৯}$ অংশ হারায়; অর্থাৎ ২৩০৯ গ্রাম রেডিয়ম হইতে এক বৎসর পরে ২৩০৮ গ্রাম অবশিষ্ট থাকিবে। এই সময়ের পরিমাণ সকল পদার্থের পক্ষে এক নহে, এবং অধিকাংশের পক্ষেই ইহা অপেক্ষাকৃত দ্রুত। এই কার্য্য ইচ্ছামত বর্দ্ধিত বা বন্ধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহার কার্য্য স্বতঃই উদ্ভূত হয়। ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন হইলে পুরাতন কালের রসসিদ্ধগণের (Alchemist) লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করার স্বপ্ন সফল হইতে পারিত।

এখনই দেখিলাম যে, হিলিয়মের পরমাণুর অতিক্রমণের বেগ অনেকটা সেকেণ্ডে ১০ হাজার মাইলের মত; অর্থাৎ এই বেগে বরাবর চলিলে ইহা এক মিনিটেরও কম সময়ে এখান হইতে চন্দ্রে গিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিত; কিন্তু কোন জড়বস্তুর ভিতর দিয়া যাইবার কালে ইহার এরূপ বেগ ও শক্তি রাখা সম্ভব নহে। এমন কি, দুই কি তিন ইঞ্চ বায়ুর ভিতর দিয়া যাইতে হইলে ইহার বেগ অতি সাধারণ হইয়া আসে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহার গতি সাধারণতঃ সম্পূর্ণ সোজা। এই সরল গতি কিরূপে থাকিতে পারে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। হিলিয়ম পরমাণু অম্লজান বা যবক্ষারজান প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান সমূহের পরমাণু অপেক্ষা হালকা এবং আকারে ছোট। মনে করুন, একটি মসৃণ টেবলের উপরে অনেকগুলি ছোট ছোট গুলী (Ball) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। যদি ঐরূপ আর একটি গুলী টেবলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া গড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে গন্তব্য স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বে অন্য একটি গুলীর সহিত সংঘর্ষণের ফলে ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইবে; এবং পুনরায় আর একটির সহিত এরূপ সংঘর্ষণের ফলে ইহার গতি আবার অন্য দিকে পরিবর্ত্তিত হইবে। এইরূপে সোজা পথে চলা দূরে থাকুক, শীঘ্রই ইহার প্রথম গতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। টেবলে যথেষ্ট গুলী থাকিলে শেষের গুলীর বেগ কমই হউক আর বেশীই হউক, তাহার গতি নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে। এই ছবিটি মনের মধ্যে রাখিয়া ভাবিয়া দেখুন যে, একটি হিলিয়মের পরমাণু বায়ুর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে কত অসংখ্য বায়ুর অণুর সম্মুখীন হয়। আর বায়ুর অণুগুলি শুধু আকারে ও ওজনে বেশী নহে,—অতি অল্পস্থানের ভিতরও তাহাদের সংখ্যা কত বেশী। মোটামুটি গণনায় দেখা গিয়াছে যে, বায়ুর মধ্যে সামান্য ৩ ইঞ্চ সোজা পথে যাইতে যত অণুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার সংখ্যা লক্ষের ঘরে পৌছাইবে। ভাবিয়া দেখুন, একটি হিলিয়মের পরমাণুর এই ঘনসন্নিবিষ্ট রাস্তায় উহা অপেক্ষা ভারী অণুপরমাণুর সহিত ঠোকাঠুকি করিয়া সোজাপথে যাওয়া কি সম্ভব? কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষতঃ মিঃ উইলসন পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক, ইহা যে সোজাপথে যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহার কৈফিয়ৎ কি? ইহার একই কৈফিয়ৎ আছে। তাহা এই যে, পথে ইহার সহিত যে সকল অণুর সাক্ষাৎ হয়,

তাহাদের সহিত ঠোকাঠুকি করিয়াও ইহার অসাধারণ বেগের ফলে কোন পার্শ্বে না বাঁকিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া সোজা বাহির হইয়া যায়। ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? তবে কি অণু-পরমাণু সব ফাঁপা? যাহা হউক, বহু গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

প্রত্যেক পরমাণু এক একটি ছোট সৌরজগৎ। এই জগতে সূর্য্যের অনুরূপ একটি আকর্ষক কেন্দ্র (nucleus) থাকে, এবং তাহার চারিদিকে গ্রহ উপগ্রহের অনুরূপ ইলেকট্রন অবস্থিত আছে। ইলেকট্রন সবই সম্পূর্ণ অভিন্ন। পরমাণু-কেন্দ্রে (nucleus) ধনতাড়িত (positive charge) ও ইলেকট্রনে ঋণ-তাড়িত ভার (negative charge) থাকে। পরমাণকেন্দ্রের ধনতাড়িত অন্য সকল ইলেকট্রনের—ঋণতাড়িতের সমষ্টির সমান। ইলেকট্রনগুলি গ্রহের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে আবর্ত্তন করে।

যদি পরমাণু দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় ও একের কোন অংশ অন্যের কোন অংশকে সোজাসুজি ধাক্কা না মারে, তবে পরমাণুর উপরি-উক্ত ছবি ভাবিয়া লইলে কেমন করিয়া এক পরমাণু আর এক পরমাণুতে কোন ক্ষতি না করিয়া তাহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, অনেকটা অনুমান করা যায়।

ইহার পরে এই প্রশ্ন মনে হইতে পারে যে, এই যদি পরমাণুর প্রকৃতি হয়, তবে অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেগে দুই পরমাণুতে ধাক্কা লাগিলে কিরূপে একের পক্ষে অন্যকে তাহার ক্ষেত্রের বাহিরে রাখা সম্ভব হয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পরমাণু ইলেকট্রনের আবরণ দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত আছে, এবং আমরা জানি যে, সমধর্ম্মবিশিষ্ট দুই তাড়িতের মধ্যে বিকর্ষণ হয়, সুতরাং ধাক্কা লাগিবার পূর্ব্বে যখন দুইটি পরমাণু পরস্পরের কাছাকাছি আসে, তখন উভয়ে সমতাড়িত-বিশিষ্ট হওয়াতে তাহারা পরস্পরকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। অবশ্য যখন ধাক্কার বেগ খুব বেশী হয়, তখন একটি পরমাণু আর একটির ভিতর দিয়া সরিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য প্রকৃত ব্যাপারটি এত সোজা নহে, তবু মোটামুটি ভাবে এইরূপে প্রকৃত ব্যাপারের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী (অধ্যাপক)।

দীনের নিবেদন

এ বিশ্ব-মন্দিরে দেখি কত আয়োজন,
তোমার পূজার প্রভু সে উপকরণ।

স্বর্ণপ্রভা আসে ঊষা, শিশির-নিষিক্ত ভূষা,
ফুলে ফুলে নানারঙে দেয় আলিপনা।
চামর ঢুলাবে ব'লে সমীরণ কুতূহলে
পুষ্প-গন্ধ আহরিয়া করে আনাগোনা।
অরুণ কিরণ ঢালি' হোম অগ্নি দেয় জ্বালি',
চন্দন জোগায় যজ্ঞে হবিকাষ্ঠ যত।
হয় মহা দশদিক সাগ্নিক ঋত্বিক,
সমুদ্র-গর্জ্জনে ওঠে স্তোত্র অবিরত।

নির্ঝরিণী ভরে ঘট, রসাল, অশথ, বট
দেবদারু, বিল্বদল দেয় পঞ্চ শাখা।
শষ্প মেলে দর্ভাসন সুকোমল সুশোভন,
যাহা কিছু অপবিত্র প'ড়ে যায় ঢাকা।
বেদী ধরণীর বুক কম্পমান সমুৎসুক
বনানী কুন্তলে ধরা মুছায় চরণ।
তোমার পূজার দেখি কত আয়োজন!
আনত নয়নে সন্ধ্যা অঙ্গুলি রজনীগন্ধা—
তাই দিয়ে আঁকে ভালে চন্দ্রমাতিলকে।
জ্বালায় আলোর ঝারি তারা দীপ সারি সারি,
বন্দনা আরতি গাহে পাখীরা পুলকে।
প্রতীচীর ক্লান্ত ভালে তপন ধুনুচি জ্বালে,
দিনান্তের কর্ম্ম তার করে সমাপন।
পদ্মপাতে অর্ঘ্য ডালা সাজায় সে জলবালা,
প্রকৃতি সে ফুল ফল করে আহরণ।
অপরূপ হে অরূপ! শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ ভূপ,
মানসের তীব্র তৃষা কর নিবারণ।
পূজে গ্রহ শতকোটি, আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি
সফল হবে কি মোর দীন নিবেদন?

শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত (বি, এস্-সি, এম্-বি)।

সংস্কৃত-সাহিত্য

৯

শুভদৃষ্টি

[গ]

গত বৈশাখের 'মাসিক বসুমতীতে' "তিনখানি নাটকের নায়ক-নায়িকার প্রথম "শুভদৃষ্টি" বা "পাকাদেখার আলোচনা" করিবার প্রস্তাব করিয়া বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠে বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রের কথা বলিয়াছি। অদ্য শকুন্তলার বিষয় আলোচিত হইবে।

শকুন্তলা রচনার পূর্ব্বে কালিদাস পূর্ব্বোক্ত নাটকদ্বয় রচনা করেন। উহার আবার প্রথমখানির বিষয় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যাপার লইয়া। দ্বিতীয়খানির ঘটনাস্থল শুধু মর্ত্ত্য। প্রথমখানির নায়ক পুরূরবা মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও স্বর্গের দেবতাদের ন্যায় দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন এবং নায়িকা ত এক জন সম্পূর্ণরূপে স্বর্গবাসিনী, অপ্সরাদিগের সর্ব্বোত্তমা। দ্বিতীয়খানির নায়ক-নায়িকা মর্ত্ত্যের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ্যের রাজা ও রাজকন্যা। প্রথমখানিতে অতিমানুষ ঘটনাই অধিক। নিমেষমধ্যে নায়িকা মেঘের আকার ধরিতেছেন, আর নায়ক সেই মেঘময়ী প্রিয়তমার আশ্রয়ে শূন্যপথে স্বীয় রাজধানীতে ফিরিতেছেন ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়খানিতে কোনরূপ অবাস্তব, অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার নামগন্ধও নাই। দুইখানিই অপূর্ব্ব দৃশ্যকাব্য, হৃদয়গ্রাহী সত্য, কিন্তু উহার কোনখানিতেই আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি নাই; সমাজের হিতকর আদর্শ-চরিত্র উহাতে সৃষ্ট হয় নাই। কবি উল্লিখিত কাব্যে তাদৃশ চরিত্র-অঙ্কনে প্রয়াসও করেন নাই। উহাতে কবির প্রতিপাদ্য ছিল প্রণয় এবং প্রণয়ঘটিত উন্মাদের বর্ণনা। প্রণয়ের উন্মাদ যে কতদূর চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে, প্রণয়ীর নেত্রে প্রণয়ানুকূল বস্তু ব্যতিরেকে আর কিছুই যে লক্ষিত হয় না, হইতে পারে না, প্রণয়ের স্বরূপ তুমি যত বড়ই ভাব না কেন, তাহা যে তদপেক্ষাও বৃহৎ, অনেক উচ্চ, কল্পনাগ্রাহ্য নহে, ইহাই ঐ দুই কাব্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রণয় যে কেবল প্রণয়িযুগলের নহে, বিশুদ্ধ প্রণয় ... তরও অশেষ মঙ্গলের সাধন, ধর্ম্মভাবহীন প্রণয়ে অথবা ...জন্ম পাশ-বন্ধনে প্রণয়ীর এবং সমাজের যতটা ক্ষতি, ধর্ম্মভাবপ্রবণ প্রণয়ে সমাজের যে ততটা অথবা ততোধিক মঙ্গল, এ তত্ত্ব কবি ঐ দুই কাব্যে দেখান নাই। তাই ঐ দুই নাটকের পর, কবি তাঁহার সকল শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক রচনা করিয়াছেন। শকুন্তলায় এমন অনেক মূর্ত্তি —অনেক বস্তু আছে, যাহা নিজে বুঝিলেও অপরকে বুঝান যায় না। ইহা যথার্থই "সহৃদয়-সম্বেদ্য।" বাণীর বরপুত্রের অবিনাশী চিত্র।

গ্রীষ্মের দিবাবসানে, মালিনীতটে, কণ্বমুনির আশ্রমে, দুই সখীর সহিত শকুন্তলা আশ্রম-পাদপে জল-সেচন করিতেছে ও প্রাণ খুলিয়া কত মনের কথা কহিতেছে। সখীদের এক জন—অনসূয়া বড় ভাল মানুষ, সাত পাঁচের ধার ধারে না, অতি সরল। আর একটি—প্রিয়ম্বদা রসিকতার উৎস, অবসর পাইলেই ঠোকর মারিয়া কথা বলে, (সোজা কথাটাও রসের কটাহে ডুবাইয়া জিলাপীর মত করিয়া তোলে), কোনও লতা ফুলভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, শকুন্তলা দেখিতেছে, অমনই প্রিয়ংবদা ঠাট্টা করিতেছে,—"শকুন্তলা, শুধু ঐ লতার নয়, তোরও ফুল ফুটিল বলিয়া—অথবা তলিয়ে, নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখ, ফুল—ফুটিয়াছে!" কোনও গাছ হইতে অপরাহ্ণ-সমীরে হয় ত একটা লতা খানিক ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—শকুন্তলা তাহা তুলিয়া দিতে যাইতেছে; তুলিয়া দিতেছে,—অমনই প্রিয়ংবদা রহস্য করিতেছে। অনসূয়া শুনিয়া যাইতেছে, চোখে আঙ্গুল দিয়া প্রিয়ংবদা দেখাইয়া দিবার পর সে বুঝিতেছে যে, সত্যই ত শকুন্তলা নবযৌবনা, সে যেন একটু কেমন কেমন হইয়াছে ও ক্রমেই পলে পলে হইতেছে। মিথ্যা উপহাসে তত আসে-যায় না, গায়ও বাধে না, কিন্তু সত্য বিদ্রূপের আঘাত বড়ই তীব্র। প্রিয়ংবদার কথায় শকুন্তলার মনে আঘাত লাগিতেছে। সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বল্কল-বাস পরাইয়া দিয়াছে, হয় ত কোমরের বন্ধনটা একটু আঁটিয়া দিয়াছিল, শকুন্তলা অনসূয়াকে একটু শ্লথ করিয়া দিতে বলিতেছে, প্রিয়ংবদার বাঁধন বড় শক্ত। অমনই প্রিয়ংবদা ফণা ধরিয়া উঠিয়াছে; বলিতেছে, "প্রতিপলে যৌবনবন্যায় তোর দেহ ফুলিয়া উঠিতেছে, তাই অমন আঁটো আঁটো ঠেকিতেছে, আর দোষ হইল—যে পরাইয়া দিয়াছে তার!" এইরূপে তিন সখীতে কত রসিকতা হইতেছে, অথবা দুই সখী শকুন্তলাকে লইয়া কত

রসিকতা করিতেছে,—কত হাসি-ঠাট্টা করিতেছে; আর অদূরে পুরুষ-বর্জ্জিত সেই উদ্যানের এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত তাহা শুনিতেছেন ও তিন জনেরই উক্তিপ্রত্যুক্তিগুলি একটি একটি করিয়া মনে গাঁথিয়া লইতেছেন। রাজা আশ্রমে আসিবার পূর্ব্বে বৈখানসদের মুখে যে কণ্ব-দুহিতার নাম শুনিয়াছিলেন, এতক্ষণ স্থিরনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। রাজা উল্লসিত-যৌবনা শকুন্তলার বহিঃসৌন্দর্য্য দেখিলেন, আর সখীদ্বয় নানাবিধ কথোপকথনে রাজাকে শকুন্তলার অন্তঃসৌন্দর্য্য দেখাইলেন। রাজা প্রথমতঃ, দশ জন যেমন কোন সুদৃশ্য বস্তু দেখে, তেমনই ভাবে শকুন্তলাকে ও শকুন্তলার সৌন্দর্য্যরাশিকে দেখিতেছিলেন। সখীদের শকুন্তলার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি কটাক্ষগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া রাজা দেখিতেছিলেন। সখীদের সহিত বিশ্রব্ধ আলাপের সময়ে আড়ালে দাঁড়াইয়া যতটা সম্ভব, তাহা সম্পূর্ণরূপেই দুষ্মন্ত দেখিলেন ও শুনিলেন এবং মনে মনে গাঁথিয়া লইলেন। এক হিসাবে—এক তরফা দেখার চূড়ান্ত হইয়া গেল। সখীরা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। ক্রমে দুষ্মন্তের দেখার বাসনা আরও বলবতী হইতে লাগিল, অথবা এ ভাবে—আড়ালে দাঁড়াইয়া শুধু দেখায় আর চলে না, আর এক ধাপ না উঠিলে রাজার স্বস্তি হয় না, এমনই দশায় দুষ্মন্ত উপনীত হইলেন। দুষ্মন্ত যত রকমে পারেন, ঘুরিয়া-ফিরিয়া, সোজা হইয়া, বাঁকা হইয়া, কখনও আয়তনেত্রে বা কুঞ্চিত-নেত্রে—কত কি ভাবে শকুন্তলাকে দেখিয়া লইলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়া যোগীর মত সমাহিত-হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন ও এক এক পদ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কণ্ব এক জন অত বড় মহর্ষি, আর শকুন্তলা তাঁহার কন্যা। রাজা ত নিজে ক্ষত্রিয়। যতই দেখুন বা যত কিছুই ভাবুন,—মহর্ষি-কন্যার সহিত ক্ষত্রিয় রাজার ঐ দূর হইতে দেখাশোনার বেশী আর কিছু সম্ভব নহে। তাই রাজার মনে বিষম খটকা লাগিল। বার বার মনে প্রশ্ন উঠিল যে, এই বালিকা কি কণ্বের "অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা?" সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত হইলে ত সর্ব্বনাশ, তাই রাজার মনে শকুন্তলা কণ্বের "সবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা" কি না, এ প্রশ্ন উঠিল না, উঠিল "অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা" কি না। দুষ্মন্ত যতদূর গিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে অভিলাষের প্রতিকূল প্রশ্ন বা বিতর্ক আর উঠিতে পারেই না। উঠিলেও ও সব ক্ষেত্রে "ঠাঁই" পায় না; তাই একবারেই গাছের শিকড় ধরিয়া টান দিলেন। কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন? রাজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার কোমরের বাকল শিথিল করিয়া দিবার সময়ে,—আড়াল হইতে রাজা মনে মনে পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, এখন একা একা পুড়িতে লাগিলেন। যতই হৃদয়ের গতি দ্রুত হইতে লাগিল, আত্মগোপনের প্রবৃত্তিও তত বাড়িয়া চলিল। এমন সময়ে শকুন্তলা নবমল্লিকাগাছে এক ঘড়া জল ঢালিয়া দিল, আর অমনই উহার ফুটন্ত ফুলের উপর হইতে একটা ভ্রমর আসিয়া শকুন্তলার মুখে বসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শকুন্তলা তাহাকে যতই দুই হাত দিয়া তাড়াইতে প্রয়াস পাইল, দুষ্ট ভ্রমরও ততই জিদ করিয়া তাহার পিছনে লাগিল। শকুন্তলা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সত্যই আকুল হইয়া পড়িল। দুষ্মন্ত সব দেখিতেছেন, শান্ত-স্নিগ্ধ-নয়না শকুন্তলাকে, পরিহাস-স্মিত-মুখী শকুন্তলাকে, স্খলিত-বল্কলা শকুন্তলাকে তিনি দেখিয়াছেন এবং তত্তৎ অবস্থার প্রতি স্তরে সে ঋষি-কন্যা যে কত সুন্দর, কত অনুপম, তাহাও বুঝিয়াছেন। এক্ষণে এই ভ্রমরবাধাব্যাকুলা, ত্রস্ত-নয়না, কাতরা শকুন্তলাকেও দেখিলেন,—এবার রাজার এই দর্শন-মহাযজ্ঞের বুঝি পূর্ণাহুতি হইল। শকুন্তলা কাহার গর্ভজাত কন্যা, কোন্ বর্ণের গ্রহণ-যোগ্যা—এই প্রত্নতত্ত্ব লইয়া যখন মহারাজ ব্যস্ত, তখন ভ্রমরের এই লুঠপাট আরম্ভ হইল। শকুন্তলা গিয়া সখীদের কাছে পড়িল; কহিল—"তোরা আমাকে এ যাত্রা রক্ষা কর্", অমনই সখীদ্বয়ও সমস্বরে জবাব দিল,—"রক্ষা করা-না-করার কর্ত্তা ত আমরা নই, তপোবনের রক্ষা-কর্ত্তা হইলেন রাজা, সুতরাং তোর যদিই নেহাৎ রক্ষার দরকার হয়, সেই রাজা দুষ্মন্তের আশ্রয় ল' গিয়া, তাঁকে ডাক।" সখীদের এই রহস্যোক্তির সূত্র ধরিয়া দুষ্মন্ত গিয়া হাজির হইলেন,—একবারে তিন জনের সম্মুখে দেখা দিলেন। এতক্ষণ আড়ালে থাকিয়া দুষ্মন্ত যে শকুন্তলার ত্রাস-চঞ্চল নয়ন, কমলাভ গণ্ডস্থল, বাতেরিত চম্পক-কলিকাবৎ ইতস্ততঃ বিস্ময় অঙ্গুলির প্রভা ও ত্রাসার্ত্ত অধর-কান্তি প্রভৃতি দেখিতেছিলেন—দেখিয়া দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছিলেন,—অতর্কিতভাবে সেই শকুন্তলার সমক্ষে রাজা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন অনসূয়া-প্রিয়ংবদার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যেমন বলা—"রাজাকে ডাক", অমনি কে এ রাজাকৃতি পুরুষ সহসা উপনীত হইলেন? আর শকুন্তলার

ত কথাই নাই, সে সঙ্কোচে জড়তায় যেন ছোট হইয়া গেল।

সখীদের কথায়, ভ্রমরের তাড়নায় শকুন্তলার কাতর হওয়ার সংবাদে রাজা শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু শকুন্তলা কোনই উত্তর দিতে পারিল না। প্রিয়ংবদার অনুরোধে রাজা বসিলেন ও উহাদের তিন জনকেও বসিতে বলিলেন। অনসূয়া কহিল, "শকুন্তলে! অতিথির কথা অমান্য করিতে নাই, এস, আমরাও বসি", বলিয়া "সপ্তপর্ণ-বেদিকায়" সকলে উপবেশন করিলেন।

এই নবাগত অতিথিকে দেখা অবধি শকুন্তলা বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। এমনটা তাহার জীবনে আর ঘটে নাই। সে মনে মনে ভাবিল, "আমার মন এমন হইল কেন? এ আবার কি বিপদ্! এ ভাবের নাম কি? তপোবনে ত এমন ভাব, এমন অবস্থা আমার কখনও ঘটে নাই, এটা কি তপোবনের অনুকূল ভাব, না, এ যে ঘোর বিরোধী ভাব, কেন এমন হইল?" ইহার বেশী শকুন্তলা প্রথম প্রথম আর বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এই বিরুদ্ধ ভাবের সহিত তাহার মনে বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিল—ঐ নূতন লোকটির পরিচয় জানিতে। তবে সে ঔৎসুক্য সে মনে মনেই চাপিয়া গেল। মুখ ফুটিয়া আর বলিল না। শকুন্তলা আর কাহারও নিকটে ধরা পড়ুক-না-পড়ুক, নিজের কাছে কিন্তু ধরা পড়িল। অনসূয়া রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শকুন্তলা মনে মনে কহিল,—"হৃদয়, উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার আকাঙ্ক্ষা অনসূয়াই পূরণ করিতেছে।" এই উক্তিতে কণ্ব-দুহিতা নিজ হৃদয়ের নিকট ধরা দিয়া বসিল। তাহার পর রাজার যাহা হউক একটা পরিচয় পাইয়া অনসূয়া যখন বলিল, "আজ আপনার ন্যায় ব্যক্তির আগমনে তপোবনের অধিবাসীরা স-নাথ হইলেন", তখন ঐ "স-নাথ" শব্দে শকুন্তলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হৃদয়ের নিগূঢ় ছবি অরুণ কপোল-মুকুরে প্রতিফলিত হইল। রাজা দেখিলেন, সুদক্ষ ভ্রমর যে শুভ-কার্য্যের "ঘটকালি" করিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার "পাকাদেখা" সম্পন্ন হইল। সখীদ্বয়ও অনেকটা বুঝিল ও শকুন্তলাকে লইয়া বেশ খেলাইতে লাগিল। শকুন্তলা যতই "ভালো মানুষ" সাজিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের গুপ্তভাব ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে কবি দুষ্মন্তের নিকটে শকুন্তলাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শকুন্তলা প্রিয়ংবদার জেরায় যতই এড়াইতে প্রয়াস পাইতেছে, ততই যেন বেশী জড়াইয়া পড়িতেছে। সখীদ্বয় ব্যাপারটা কতক বুঝিয়া যখন গোপনে শকুন্তলাকে কহিল,—"সখি, আজ যদি তাত কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন—?" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শকুন্তলা বাধা দিয়া কহিল,—"থাকিলে কি হইত?" সখীরাও অমনই কহিল,—"তাঁহার যে জীবনেরও অধিক, তাহাকে দিয়া এই অতিথির সৎকার করিতেন।" শকুন্তলা বুঝিল যে, ধরা পড়িল। সে অমনই কহিল,—"তোদের মতলব ভালো না, আমি আর তোদের কোনো কথায় থাকিব না।" চতুরচূড়ামণি রাজা সব দেখিতে লাগিলেন ও ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার এই প্রথম সাক্ষাৎকার এতই স্বাভাবিক হইয়াছে যে, ইহার নিকট পূর্ব্বোক্ত নাটকদ্বয়ের প্রথমসন্দর্শন যেন কিঞ্চিৎ হীনাভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কোনরূপ বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন হয় নাই। স্বভাবের ফুল যেন ক্রমে আপনিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির এমন সার্থকতা সংস্কৃত অন্য কোনও দৃশ্য-কাব্যে দেখা যায় না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বিদগধি রাধা

আঘন আওল সহি, আনল নিভল নহি,
ভসম ছাতিয়া পুনি করু।
কান যতা বাণ হান, গেয়ান সে কিঅ জান,
আঁখি ততা লাগি তায় ঝরু॥
বাওত বংশী, শ্রবণকু বাজত,
দগধল হিয়া মতিবামা।
ললাটক লেখি— বিচিত রে সহি,
ভৈ গেল হুতাস হিমধামা॥

অমিয়া, গরল জনু,— তাতল, উতপত,
বিসরি'— জারল, তিরিভঙ্গ।
মন্দা ভাগি মঝু, চন্দা আগি আজু,
বজর সো ছোড়ি করু রঙ্গ॥
নিঠুরাই কাহ্নু সো পীরিতি বিছুরল,
ঝাঁঝর করল বনয়ারী।
ধুতক বচনক করু বিশোয়াসা,
তিরি বধ কয়ল ঢিট্ ভারি॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম-এ)।

ত্রিবেণী

সে অনেক দিনের কথা। 'মহাপ্রভুর টানে' দিক্‌বিদিক্‌ হইতে দলে দলে যাত্রী সংসারের সুখময় বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বামি-স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়া কাটাইয়া, পথের দুঃখ-কষ্টকে হাসি-মুখে মাথায় তুলিয়া, ভক্তি ব্যাকুল হৃদয়ে পদব্রজে ছুটিয়া আসিত —নীলাচলনাথের শীতল চরণের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইতে, কত লক্ষ যুগের অতীত পাপতাপের গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া পুণ্যময়ের পূতস্পর্শে মনপ্রাণ সফল করিতে। তখন সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া লৌহ-দানব ভারতের হৃৎপিণ্ড আঁকড়াইয়া ধরে নাই, মাসেক-সঞ্চিত তীব্র-ভক্তির ব্যাকুল-উন্মাদনা মাত্র দিবসের গতিমুখে মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিয়া উঠিয়াই সংসারের অনন্ত কোলাহলের মধ্যে মিশিয়া যাইত না।

সেই পুরাতন দিনের কথা। একখানি গরুর গাড়ী আশে-পাশে অনেক যাত্রীর ভীড় লইয়া মৃদু-মন্থর গতিতে ভুবনেশ্বরের জঙ্গলাকীর্ণ পথে চলিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে ছিলেন কটকের বিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় ধনেশ্বর ঘোষের বিধবা পত্নী, তাঁহার পুত্রবধূ মিনতি ও দাসী কদম—এই তিনটি প্রাণী। সঙ্গে শতাধিক যাত্রীর সহিত তাঁহাদের অভিভাবকস্বরূপ চলিয়াছিল —দুই জন চাকর, চারি জন দরোয়ান ও বৃদ্ধ সরকার মহাশয়। কটক হইতে তাঁহারা মাত্র এক দিনের পথ আসিয়াছেন।

বেলা ১০টা বাজে। প্রভাতের শীতল অরুণ ক্রমেই অগ্নিময় হইয়া পৃথিবীর বুকে তীব্র উত্তাপ ঢালিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া গৃহিণী গাড়োয়ানকে ডাকিয়া কহিলেন, "একটা পুকুর দেখে গাড়ী থামা, মধু। স্নান-টান পূজো-আহ্নিকগুলো সারতে হবে।"

গাড়ী একটু দ্রুতগতিতে যাত্রিদলকে পশ্চাতে ফেলিয়া পথের ধারে একটি ছায়াশীতল পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। কদমকে গাড়ীতে রাখিয়া, গামছা ও পুত্রবধূকে লইয়া গৃহিণী নামিয়া পড়িলেন; কিন্তু চাতালের উপর পা দিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহাতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! দেখিলেন, চাতালের উপর একটি যুবতী শ্যামল রূপের আঁচল বিছাইয়া, নয়ন নিমীলিত করিয়া পড়িয়া আছে। তাহার বুক আলো করিয়া একটি ২।৩ বৎসরের ফুটফুটে ছেলে! যেন নীলদীঘির জলে প্রফুল্ল কমল-কোরক শান্ত পবনে ফুটিফুটি করিতেছে! গৃহিণী বুঝিলেন, যুবতী চিরদিনের তরেই নয়ন মুদিয়াছে; তাই সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। বধূও তাঁহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া—ভীতিবিহ্বল নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। যাত্রাপথে এ কি বিঘ্ন!

গৃহিণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! কার বাছা গো? এইখানেই মাটী কেনা ছিল!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বধূকে উদ্দেশ করিয়া পরে বলিলেন, "এস বৌমা! আর একটা পুকুর দেখে স্নান-টান করি গে। আহা, দেখলেও বুক ফেটে যায়! হতভাগীকে বাবা পথ থেকেই মুক্তি দিয়েছেন।" বলিয়া, যাইবার জন্য বধূকে আকর্ষণ করিলেন। বধূ তখন একদৃষ্টে মৃতার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, কে জানে! সহসা সে দেখিল, বুকের উপর ছোট ছেলেটি যেন নড়িয়া উঠিল। এ কি! তবে কি ছেলেটি বাঁচিয়া আছে? ঐ যে মৃতার স্তনটি সে মুখে তুলিয়া লইল! শাশুড়ীকে মৃদু নিপীড়ন করিয়া সে বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলিল, "দেখ মা, দেখ, ছেলেটি বেঁচে আছে।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সত্যই ত শিশু জীবিত! সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটু যে ভয় না জাগিল, তাহা নহে। জনহীন পুষ্করিণীর ধারে বিগতজীবনা এক যুবতীর বুকের উপর জীবিত বালক! এ কি সত্য, না অলৌকিক কিছু? বধূকে টানিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "ও সব দেখতে নেই,—রাম রাম বল। চ'লে এসো।"

মিনতির ভয় টুটিয়া গিয়া কখন্ যে করুণার বেদনায় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। শাশুড়ীর এই ভীতিভাব লক্ষ্য করিয়া সে তাঁহার দিকে

মমতাভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "না মা, সত্যিই ছেলেটি বেঁচে আছে। ঐ দেখ কাঁদ্‌ছে।"

তথাপি গৃহিণীর ভয় গেল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "কদম! কদম! ও কদম! আ মরণ, ম'রে গেছিস না কি?"

কদম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন, "কি দেখছিস?—আ মরণ, মুখ দিয়ে যে কথা সরে না।"

কদম ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "তুমিও যা দেখছ মা, আমিও তাই দেখছি।" পরে আত্মগতভাবে বলিতে লাগিল, "এ ত আর নতুন কিছু নয়, আখ্‌ছার হচ্ছে। আহা! কলেরা-টলেরা হয়েছিল বোধ হয়। সঙ্গের লোকরা ফেলে চ'লে গেছে। আর থাকবেই বা কি কর্ত্তে? যে মরবে, সে ত মরবেই! তার তরে আটকে পরকাল নষ্ট করবে কেন?"

মিনতির তরুণ চিত্ত সংসারের ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের ঘা খাইয়া বড় একটা শক্ত হয় নাই, তাই এই ঘটনায় তাহার সমস্ত মন অভিভূত হইয়া ব্যথার ভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। সে দরদমাখা স্বরে কহিল, "আহা, দেখ, দেখি কদম, ছেলেটি কাঁদছে! আমরা যদি একে ফেলে চ'লে যাই, হয় ত শ্যাল-কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাবে।"

কদম নিতান্ত উদাসীনভাবে জবাব দিল, "সে ওর বরাত। আমরা দেখলেও বাঁচবে, না দেখ্‌লেও বাঁচবে। কথায় বলে—'রাখে কেষ্ট মারে কে'?"

গৃহিণীও এ যুক্তিতে সায় দিলেন। যদিও তাঁহার অন্তর সমবেদনায় আর্দ্র হইয়াছিল, তথাপি ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে সম্মত হইলেন না। সংসারে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে সমবেদনার অশ্রু ফেলিয়া মুখে ষোল আনার উপর আঠার আনা দরদ দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, তাঁহাদের অন্তরে এ বেদনা শেলের মতই বাজিয়াছিল; কিন্তু প্রতীকারের কথা হইলে ইঁহাদেরই কণ্ঠ সর্ব্বাগ্রে নীরব হইয়া যায়—দয়াধর্ম্মের কোমল স্পর্শে তাঁহাদের অস্তিত্বও বুঝি খুঁজিয়া মেলে না। গৃহিণী ছিলেন এই ধরণের।

কিন্তু মিনতির তরুণ প্রাণে ঐ মৃতা জননীর পাণ্ডুর আনন যেন একটা ব্যগ্র উৎকণ্ঠা ও বেদনার অনুরোধ ফুটাইয়া তুলিয়া বার বার তাহাকে যেন নীরব ভাষায় আহ্বান করিতে লাগিল। সে কদমের পানে চাহিয়া অনুনয় করিয়া কহিল, "ছি কদম! চোখের ওপর মানুষ মরবে, এ দাঁড়িয়ে দেখবো, কোন উপায় করবো না? আমরা যদি ফেলে যাই ত জেনে-শুনেই ওকে মরণের মুখে তুলে দিয়ে যাব। মন বুঝোনোর জন্যে ও কথাগুলো না বলাই ভাল। আহা! দেখ দেখি, কচি মুখে ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে কেমন পুট্‌ পুট্‌ ক'রে চাইছে! কোন্‌ প্রাণে একে ফেলে যাব?"

গৃহিণীর এ সব কথা ভাল লাগিল না। একটু রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিলেন, "তবে কি কত্তে হবে? ওকে কোলে তুলে নাচাতে হবে না কি?"

মৃদুস্বরে মিনতি কহিল, "অন্ততঃ বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত ত, মা!"

গৃহিণী কণ্ঠ চড়াইয়া বলিলেন, "তুমি ত বাছা কালকের মেয়ে, অত উচিত অনুচিত শিক্ষে দিতে এসো না। বুড়ো হয়েছি, ও সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম ঢের জানি। কথায় বলে—'আগু রেখে ধর্ম্ম, পিতৃলোকের কর্ম্ম।' কি জাত ঠিক নেই, অমনি ছোঁয়াছুঁয়ি করলেই হ'ল? আর কলেরারুগী ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হোক্‌ আর কি! চল, অনেক বেলা হ'ল। এক থাবলা জল মাথায় না দিলে এখনই আবার মাথা ধরবে।"

কদম সায় দিল, "ঠিকই ত! আগে শরীল—তার পর আর সব।"

মিনতি এক পা-ও নড়িল না। ঐ কচি কিশলয়ের মত স্নিগ্ধ ঢল ঢল মুখখানি তাহার অন্তরে তুমুল তুফান তুলিয়া চরণে নিগড় বাঁধিয়া দিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, রোগ? মানুষের দেহধারণ করিলেই সে ত বিনা আহ্বানে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়; শত সাবধানেও তাহার গতিরোধ করা যায় না। মৃত্যু? সে ত সকলেরই এক দিন আছে; তাহার ভয়ে ভীত হইয়া মানুষের কর্ত্তব্য পালন করিতে পরাঙ্মুখ হই কেন? আর জাতিত্বের কথা ভাবিয়া তাহার হাসিও পাইল। জাতিত্বটা কি মনুষ্যত্বকেও লাঞ্ছিত করিয়া চলিতে থাকিবে? ঐ দেবদূতের মত নির্ম্মল নিষ্পাপ শিশু, পাপ প্রলোভনের বিষাক্ত বায়ু যাহার তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ কখনও কোনও দিন বিন্দুমাত্রও মলিন করিতে পারে নাই—সে কি তুচ্ছ জাতিত্বের পঙ্কিল গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া অশুচি হইতে পারে?

কলরব করিতে করিতে যাত্রীর দল আসিয়া পড়িল। সকলেই সংসারী মানুষ। সে দৃশ্য দেখিল, নির্ব্বিকারচিত্তে ভগবানের হাতে শিশুকে সমর্পণ করিয়া জগদ্বন্ধুর কৃপালাভ করিবার জন্য তেমনই কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। দুঃখ-কষ্টের 'হা-হুতাশ' যাহা তাহাদের সমবেত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, তাহার লক্ষ অংশের এক অংশও যদি এই সদ্যো-মাতৃহীন শিশুর কল্যাণে যথার্থ ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে মিনতিকে অত আকাশ-পাতাল ভাবিয়া মাথা ঘামাইতে হইত না।

সকল লজ্জা-কুণ্ঠা দূর করিয়া দিয়া অটল সাহসে অগ্রসর হইয়া মিনতি মৃতার বুকের উপর হইতে শিশুটিকে কোলে তুলিয়া অতি যত্নে বুকে চাপিয়া ধরিল। রোরুদ্যমান বালক সেই সুকোমল বক্ষোনীড়ে আশ্রয় পাইয়া পরম আরামে মাথা লুকাইল। তাহার ক্রন্দন যেন মন্ত্রবলে থামিয়া গেল।

গৃহিণী একটা বিস্ময়সূচক অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া কদমকে বলিলেন, "ও মা! এ কালে কালে হ'লো কি! জানা নেই, শোনা নেই, অজাত-কুজাতের ছেলে কোলে করলে? হ্যাঁলা কদম! আমি কি মাথামুড় খুঁড়ে মরবো?" বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রন্দনসিক্ত ভাষা নাসিকায় আশ্রয় লইল। তিনি টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন ঐ মুদ্দোর নিয়ে যাই কোথায়? সব ছোঁয়া-নেপা হয়ে যাবে। তা হ'লে ঠাকুরদর্শনের কি ফল হবে? যত সব অনাচার!"

মিনতি মৃদুস্বরে কহিল, "আমি ঠাকুর দেখতে চাই না, মা। তুমি দেখে এসো। সরকারকে ব'লে দাও, আর একখানা গাড়ী ডাকিয়ে আমায় বাড়ী রেখে আসুন।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই যা হয় কর, বাপু। ও সব অনাচার নিয়ে আমি কিছুতেই শ্রীক্ষেত্র যাব না—ওতে পাপ বাড়বে। আর তোমারই বা কি কপাল, বৌমা, মায়ায় জড়িয়ে চল্লে বাড়ী ফিরে—দর্শন হ'লো না।"

কদম তাড়াতাড়ি বলিল, "ও যে হতেই হবে, মা। কথায় বলে 'প্রভুর কেরপা'। পাপ না কাটলে কার সাধ্যি তেনাকে দেখে।"

মৃদু হাসিয়া মিনতি কহিল,—"তুই পুণ্যি ক'রে আয়, কদম। আমাদের পাপের ধাতে—"

কদম ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন গা, বৌঠান্! অত আদিখ্যেতা কেন? ও পাপটা ফেলে রেখে আমাদের সঙ্গে চল।"

মিনতি বলিল, "পাপ যে আমায় ঘিরে ধরেছে রে! এ কি ছাড়ান যায়?" বলিয়া নিদ্রিত বালকের রুক্ষ কেশের উপর পরম সোহাগে সে হাত বুলাইতে লাগিল।

সরকার আসিয়া খবর দিল, গাড়ী ঠিক হইয়াছে।

মিনতি দূর হইতে শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গৃহিণী আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। ভাবিলেন, পুরী হইতে ফিরিয়া যাহা হয় করা যাইবে। ঝাঁটা মারিয়া ওটাকে দূর করিয়া দিবেন। উপস্থিত কিছু না বলাই ভাল। জানেন ত বধূটিকে! ছেলের অপরিমিত আদরে তাহার জিদটা অতিরিক্ত রকমেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন কিছু বলিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে। হয় ত তাঁহার ঠাকুরদর্শনেও ব্যাঘাত পড়িতে পারে। তবু একটু খোঁটা দিয়া বলিলেন, "যাচ্ছ বটে নিয়ে, কিন্তু পরেশ রাগ করবে শেষে।"

বধূ উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে একটু হাসিল মাত্র।

২

মিনতি যে দিন এ বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করিল, সেই দিন ধনেশ্বর বাবু একটা বড় মোকদ্দমা জিতিয়া প্রচুর অর্থ ও বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়া উকীলকুলের শিরোভূষণ হইলেন। জেলায় তাঁহার নাম সহস্র লোকের মুখে ফিরিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া তিনি স্নেহ-ভরা-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা লক্ষ্মী আমার!"

অর্থের অন্তরালে সকল সৌভাগ্যই প্রচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং শাশুড়ী– আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিলেন, সকলেই এই সুলক্ষণা বধূটিকে সোনার দৃষ্টিতে দেখিলেন। স্বামী পরেশের ত কথাই নাই। সে তখন কলেজে বি, এ পড়িতেছিল। নবীন যৌবনে রূপসী পত্নীর অসামান্য সৌন্দর্য্য এবং মধুর ব্যবহার তাহার নবোন্মেষিত বাসনার কুসুম-কোরকে বেশ একটু আন্দোলনেরই সৃষ্টি করিল। সে মিনতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিল।

তাহার পর আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে শুধু একটা অভাব রহিয়া রহিয়া খোঁচার মত আসিয়া বিঁধিত। ধনেশ্বর ভাবিতেন, একটি টুকটুকে কচি মুখ—

তাঁহার বিশ্রামের সহচর হইয়া কলহাস্যে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করুক, তাঁহার সকল অবসাদ স্নেহের স্পর্শে প্রাণ পাইয়া হাসিয়া উঠুক।

গৃহিণী আরও একটু বেশী ভাবিতেন। পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় তাঁহার পরকালের পথ কণ্টকময় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রতীকারের আশায় এক দিন কর্ত্তার কাছে কথা পাড়িয়াছিলেন; কিন্তু কর্ত্তা এমন তিরস্কার-গাম্ভীর্য্য মাখাইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন যে, গৃহিণীর মনের গোপন আশা আর দ্বিতীয়বার মনের কোণে উঁকি মারিতেও সাহস করে নাই।

ভাবনা-চিন্তা ছিল না শুধু দুইটি প্রাণীর। তাহারা বসন্তের দখিণাবায়ে বিকশিত পুষ্প-সৌন্দর্য্যে দেহ সাজাইয়া, সংসারের উপবনে শুধু হাসিয়া—শুধু ভালবাসিয়া আপনাদের সব-পাওয়ার মধ্যে কল্পনা-জগতে স্বর্গ-রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। সেথায় কোন অভাব—কোন অভিযোগ বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলিবার অবসর পায় নাই।

কর্ত্তা সম্পূর্ণ আশা বুকে বহিয়াই ইহকালের সীমারেখা ছাড়িয়া গেলেন। গৃহিণী শোকের মাঝে কথাটা নূতন করিয়া ভাবিতে বসিলেন। কিন্তু পুত্রের সদা-প্রফুল্ল বুকে চিন্তার তরঙ্গ তুলিতে সাহসী হইলেন না। এমনই সময়ে পুরী হইতে জগবন্ধুর ডাক আসিল। মিনতিকে লইয়া তিনি দেবোদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন।

* * * *

বৈকালে কোর্ট হইতে ফিরিয়াই মিনতিকে দেখিয়া পরেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার অভিমানক্ষুব্ধ মনের মাঝে আনন্দের কলরব উঠিয়া হাসির বাতাসে সব মেঘ নিঃশেষ করিয়া দিল। সে হর্ষোৎফুল্ল স্বরে ডাকিল, "মিনতি, সত্যিই তবে 'জগন্নাথের টান' তোমায় আকর্ষণ করতে পারলে না? আবার ছুটে এলে!"

স্বামীর আনন্দে মিনতিও প্রফুল্লমুখী হইয়া উঠিল। কহিল, "ইস্! তা বৈ কি! তুমি কি আমার জগবন্ধুর চেয়েও বড়?"

পরেশ বলিল, "আলবৎ—নয় ত কি? নৈলে তুমি পথ থেকে ফিরে এলে কেন? তখনই বলিনি যে, আমায় বাদ দিয়ে পুণ্যি করলে ফল হবে না? কেমন, এখন দেখলে ত।"

মিনতি দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "কি দেখলুম?"

পরেশ বলিল, "তোমায় প্রভু ফিরিয়ে দিলেন। এই স্বামিরূপ পাপের টানে আবার সংসারের মোহ-ফাঁসে—"

"থামুন, থামুন। ম'শায়ের জন্য প্রায় এসেছি কি না! অতটা বড়াই ভাল নয়।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "তবে কার তরে এলে গো? আমার প্রাণটার তরে বুঝি?"

"না গো মশাই, না। শুনবে? সে একটি ছোট্ট প্রাণের তরে। খুব—খুব ছোট্ট!"

পরেশ মিনতির গণ্ডে একটা মৃদু টোকা দিয়া সকৌতুকে কহিল, "আমার প্রাণটা বুঝি খুব বড়! জান মিনু, এখানে একটা লোক ছাড়া আর কারও ছায়া ফেলবার যায়গাটুকু পর্য্যন্ত নেই। এত ছোট এটা।"

মিনতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কে সে গো?"

পরেশ বলিল, "বল দেখি সে কে?"

তাহার উজ্জ্বল নয়ন হইতে প্রেমের স্নিগ্ধ কিরণ উছলিয়া উঠিয়া মিনতির অন্তর-মন শীতল করিয়া দিল। সে ধন্য হইয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সোহাগ-ভরা কণ্ঠে বলিল, "জানি গো জানি। সে আমার—আমার—আমার—"

সহসা সে স্বামীর বক্ষোদেশ হইতে মাথা তুলিয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিল। পরেশ বলিল, "কোথায় চল্‌লে?"

খোকার ক্রন্দন তখন আর এক গ্রামে উঠিয়াছিল। "ওগো, শীগ্‌গির এসো, একটা নতুন জিনিষ দেখাব।"

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত পরেশ দেখিল, তাহার সুকোমল দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যার উপর শুইয়া এক প্রস্ফুট কুসুম সোনার শিশু। মিনতি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিল, "ও আমার ধন! ও আমার যাদু! কান্না কেন? কান্না কেন? আমার সোনা—আমার যাদু—"

পরেশ শুধু বিস্মিত নহে, বিরক্তও হইল। দেখিল, শিশুর মূত্রে শয্যা সিক্ত। মিনতির সে দিকে লক্ষ্য নাই, আদর করিতেই ব্যস্ত। ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে পরেশ কহিল, "ও কে?"

হাসিয়া মিনতি বলিল, "তোমার সতীন।"

পরেশ বিরক্তি গোপন করিতে পারিল না, বলিল, "তা ত দেখছি। নৈলে বিছানাটার অমন দুর্দ্দশা হবে কেন?"

মিনতি সে দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা, তাই ত! একেবারে কাটজুড়ী বইয়ে দিয়েছে গো।"

পরে খোকার তুলতুলে গাল ঈষৎ টিপিয়া স্নেহোচ্ছ্বসিত

কণ্ঠে বলিল, "আঃ, দুষ্টু ! এমনি করেই সতীনকে জ্বালাতে হয় ? মারবো।"

খোকাও ক্ষুদ্র কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিল, "মাব্বো—মাব্বো।"

মিনতি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"দেখলে দেখলে, ছেলের রকম ! আমায় বলে কি না মাব্বো ! হ্যাঁ রে নেমকহারাম, এই বুঝি তোর ধর্ম্ম ?"

খোকা আধভাষে বলিল, "হুম্।"

মিনতি আবার হাসিয়া উঠিল।

পরেশ বলিল, "সত্যি মিনু, ঠাট্টা নয়। ও কে ?"

মিনতি স্বামীর প্রশ্নে বিরক্তি লক্ষ্য করিল। বলিল, "একটু ধর দিকি। বিছানার চাদরটা পাল্‌টে দিয়ে সব বল্‌ছি।"

পরেশকে দেখিয়া খোকা কাঁদিয়া মিনতির কোলে মুখ লুকাইল—দুই হাতে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া বলিল, "না।"

সঙ্গে সঙ্গে পরেশও বলিয়া উঠিল, "ও আমার কর্ম্ম নয়।"

মিনতি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা জানি। তোমরা শুধু ফুলের বাসই শুঁকতে জান—কাঁটার ঘা সইতে পার না।"

তাহার পর খোকার গালে চুমু খাইয়া বলিল, "জানো না ত এই কাঁটার ঘায়ে কত সুখ—সে তোমাদের কল্পনার বাইরে।"

পরেশ বলিল, "ও সুখ চিরদিনই আমার কল্পনার বাইরে থাক্—ওর তরে বিশেষ ব্যগ্র নই। কিন্তু বল্‌লে না ত ও কে ?"

মিনতি উত্তর দিল, "ও আমার পথে কুড়িয়ে পাওয়া সাত রাজার ধন—এক মাণিক।" বলিয়া মেঝের উপর বসিয়া একে একে সব খুলিয়া বলিল। বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু ব্যথার অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় ধরা গলায় কহিল, "তোমার দয়ার তলায় ওকে ফেলে দিলুম—যা হয় ক'রো।"

পত্নীর বিহ্বলতায় মুহ্যমান পরেশের কণ্ঠ হইতে নির্ভয়ের বাণী ধ্বনিয়া উঠিল। কহিল, "বেশ করেছ, মিনু,—ও আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে।"

এমনই করিয়া ক্ষুদ্র নবাগত এ সংসারে আপনার স্নেহের স্নিগ্ধ আসনখানি পাতিয়া বসিল। কিন্তু পরেশের উচ্ছ্বাস বেশী দিন স্থায়ী হইল না। সে দেখিল, মিনতি ক্রমেই তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। আর সে পূর্ব্বের মত আদর অভিমানে তাহার উৎসুক বিশ্রামের অবসর সরস করিয়া তোলে না—আর সে চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটিয়া বেড়ায় না। প্রাণের হাসি-সোহাগ-প্রীতির অর্ঘ এখন স্নেহের রূপ ধরিয়া খোকার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া ঝল্‌মল্ করিতেছে; তাহার দিকে পড়িয়া আছে শুধু নীরস কর্ত্তব্যের প্রাণহীন বোঝা !

মিনতির সমস্ত প্রাণ-মন ঐ শিশুর হাসি-কান্নার প্রতি স্পন্দনে উন্মুখ হইয়া উঠে ! যেমন অনশনক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বহুকাল পরে শুভ্র অন্ন দেখিয়া জগতের আর সব ভুলিয়া তাহাতেই একাগ্রমনা হইয়া ডুবিয়া যায়, তেমনই মিনতির বুভুক্ষু স্নেহ-তৃষিত মাতৃ-হৃদয়, প্রেমের পরিণতি সুমধুর স্নেহ-সলিলে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত—ধন্য হইয়া গিয়াছিল। তীরাপহত সমুদ্র-লহরী তীব্রটানে যেমন বেলাভূমির বালুরাশি আকর্ষণ করে, মিনতির পরিপূর্ণ হৃদয়ের মাঝে তেমনই অদম্য স্নেহের উচ্ছ্বাস উঠিয়া পূর্ণ নারীত্বের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল।—তাই সে সেই আনন্দকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। স্বামিময় জগৎ তাহার নিকট শিশুময় হইয়া গিয়াছিল, নারীত্ব—মাতৃত্বে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

৩

গৃহিণী বাড়ীতে পা দিয়াই দেখিলেন, রকের উপর বসিয়া সেই ছেলেটি খেলা করিতেছে। তাহার গায় দামী জামা, পায়ে মোজা-জুতা, মুখখানি যত্নের কনককিরণে মার্জ্জিত হইয়া একটি টিপ্ কপালে লইয়া প্রফুল্ল পদ্মের মতই হাসিতেছে ! দেখিয়াই তাঁহার গা জ্বলিয়া গেল। কি আপদ্ ! এখনও ওটাকে দূর করিয়া দেওয়া হয় নাই ? তিনি ভাবিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের খেয়াল দুই দিনেই মিটিয়া যাইবে; কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার সে ধারণার অনেক ওলট-পালট হইয়া গেল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"দেখলি কদম, ঐ অজাতের ছেলেটাকে নিয়ে দিব্যি ছোঁয়াছুঁয়ি করছে ! ও সব ম্লেচ্ছপানা চলবে না।"

কদম তখন পুরীর জগন্নাথের বর্ণনায় শতমুখ। সে বলিতেছিল, "আহা বৌদি, কি ছিরিই দেখলুম ! শরীলে আর রূপ ধরে না ! ঠিক যেন তোমার ঐ ছোট খোকাটি গো !"

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "মরণ ! কথার ছিরি দেখ। তিনি ঠাকুর—তিনি হলেন ঐ জাতকুল-খেকো ছেলেটার মত ! তোর চোখে আগুন লেগেছিল বুঝি ?"

কদম একটু ক্ষুণ্ণ হইল—রুষ্টও হইল। বলিল, "আমাদের "কাঁচা চোখ ঠিকই আছে, মা। তুমিই তখন বলেছিলে—" বলিয়া কথাটা চাপিয়া গিয়া মিনতিকে বলিল, "কি লোক থই থই করছে! আর সমুদ্দুরের ঢেউ বা কি! ঠিক যেন তালগাছ! আমরা ত লুটোপুটি—বালির গাদায়।"

মিনতি হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

পুত্র আসিয়া প্রণাম করিতেই মা কুশলপ্রশ্ন করিয়া বলিলেন, "ও ছেলেটিকে ঘরে রাখা হবে না। ঠাকুর-দেবতার ঘর। আমি ছিলুম না, যা করেছ—করেছ। এখন ঘর-দোর সব ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে খানিকটা গোবর গুলে ছড়া দাও। ও কদমের কাছে শোবে।"

পরেশ আনন্দিত হইয়া বলিল, "সেই ভাল।"—এত দিন পরে সে আবার মিনতিকে আগেকার মতই ফিরিয়া পাইবে!

মিনতি কিন্তু শাশুড়ীর কথায় যত না ব্যথা পাইল, তাহার শতগুণ আঘাত পাইল স্বামীর হাসিতে। হায়! যাঁহার ভরসায় বুক বাঁধিয়া সে ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল ছবিই না মনের মধ্যে আঁকিয়া চলিয়াছিল, আজ সে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত—কালবর্ণের প্রলেপে সে ছবি আঁধার করিয়া দিল! হৃদয় ত তাহার মিনতির কথা ভাবিয়া একটুও কাঁপিল না, বরং উল্লাসের সহিতই সে সম্মতি দিল। গভীর অভিমানে ক্ষুব্ধ নারী-হৃদয় নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিন সে আর খোকার পানে ফিরিয়াও চাহিল না। রাত্রিতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একটা মাদুর টানিয়া মেঝেয় বিছাইতেই প্রতীক্ষমাণ পরেশ খাটের উপর হইতে বলিয়া উঠিল, "ওখানে মাদুর পাতছো কেন? উঠে এস, মিনু!"

মিনতি কোন কথা না বলিয়া মেঝেয় শুইয়া পড়িল। পরেশ একটু ব্যথা বোধ করিয়া আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠে সান্ত্বনা মাখাইয়া বলিল, "রাগ করলে, মিনু?" সঙ্গে সঙ্গে সে শয্যায় উঠিয়া বসিতেই মিনতি বলিয়া উঠিল, "থাক্, আর উঠতে হবে না। এখানে বেশ আছি। যদি তোমার অসুবিধা বোধ হয় ত বাহিরে গিয়ে শুচ্ছি না হয়।"

চিরপরিচিত মাধুর্য্যরসের অভাব পরেশ কি পত্নীর কণ্ঠস্বরে অনুভব করিল? সহসা তার ছিঁড়িয়া আহত সেতার যেমন ঝন্ ঝন শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া থামিয়া যায়, তাহার ঝঙ্কৃত হৃদয়-বীণা বোধ হয় তেমনই গভীর আঘাতে স্তব্ধ হইয়া গেল। মুখে ভাষা ফুটিল না। যে আগ্রহে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল, বাধা পাইয়া তাহা যেন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। বুকের মাঝে হতাশা ও প্রচণ্ড অভিমান লইয়া নীরবে শুইয়া পড়িল।

মিনতিও নিজের রূঢ় কথায় নিজেই চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপায় ত নাই! তীর হস্তচ্যুত হইয়া বক্ষোভেদ করিয়াছে।

স্বামীর শুষ্ক বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তাহার অনুতপ্ত হৃদয় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; তথাপি সে অভিমান ত্যাগ করিয়া সহজভাবে ত্রুটি স্বীকার করিয়া সকল দ্বন্দ্বের অবসান করিয়া দিতে পারিল না। সে যে আরও লজ্জা, আরও দীনতা। সে ভাবিল, তাহার রসনা যে ধৈর্য্য হারাইয়া উষ্ণ বাক্যস্রোতে স্বামীর প্রাণ জ্বালাইয়াছিল, সে অসংযমের কারণ ত তিনি স্বয়ং। ঐ মাতৃহীন আশ্রয়-হারাকে আশ্বাস দিয়া আজ অনায়াসে, অম্লানবদনে জননীর ভয়ে তিনি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেন কেন?

রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। মিনতির চোখে নিদ্রা আসিল না। অভিমানাহত হৃদয় ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, একখানি কচি মুখের ম্লান ছলছল আঁখি দুইটি মরমের পটে আঁকিয়া বেদনার ভারে টন্ টন্ করিতেছিল। কদমের মলিন শয্যায় সে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? সমস্ত দিন 'মা' বলিয়া তাহাকে সে ডাকে নাই—কচি হাত দুইখানি দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোমল গণ্ডে গণ্ড রাখিয়া আদরে গলিয়া পড়িয়া মিষ্ট চুম্বন দেয় নাই। কত আব্দার, কত অভিমান, কত অর্থহীন আলাপ তাহাদের দীর্ঘ দিবসের প্রহরগুলি বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত—কত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের সুর ও রাগিণীর ঝঙ্কার মিনতির হৃদয়ে বিচিত্র রসের প্রবাহধারা বহাইয়া দিত! হায়, আজ সারাদিন—তৃষ্ণার্ত্ত মরুভূমির মত—তাহার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই বিনিদ্র নয়নে নিশীথের নীরব গাম্ভীর্য্য তাহার বুকে পাষাণের ভার লইয়া চাপিয়া বসিয়াছে। বায়ুর শব্দ-তরঙ্গে অস্ফুট বিলাপধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে না? এ কি জ্বালা! এ কি উৎকণ্ঠা! ওরে যাদুকর, ওরে মায়াবি! এ কি যাদুদণ্ড স্পর্শ করাইয়া নারীর বঞ্চিত হৃদয়ের সব ব্যর্থতা ঘুচাইয়া দিয়াছিস! উদ্দাম প্রেমকে সুরভি-স্নিগ্ধ করিয়া এ কি তোর রহস্যময় স্নেহ অভিসার? জীবনের বেলাভূমি

যে উর্ম্মিমুখর—তট যে কুসুমাস্তৃত! প্রবল বায়ুর গর্জ্জনে এই আনন্দকলোচ্ছ্বাসের সঙ্গীত-তরঙ্গের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া যাইবে? ফুলের মধুর সুরভি লুঠিয়া লইয়া মত্ত প্রভঞ্জন বিদ্রূপভরে গর্জ্জন করিতে থাকিবে?

মিনতি উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ও কি! সেই—সেই সুধা-বিগলিত সুমোহন স্বর! কেন এ ব্যাকুল রোদন? সে শুনিল, ধ্বনি সত্যই শিশুকণ্ঠোত্থিত।

মিনতি ছুটিয়া আসিয়া কদমের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। শিশুকণ্ঠের ক্রন্দন-গুঞ্জন রুদ্ধ কক্ষের বাতাসকে করুণ করিয়া তুলিতেছিল। মিনতি আকুল কণ্ঠে ডাকিল, "কদম! কদম!" কদম নিদ্রালস-নয়নে, শিথিলচরণে আসিয়া দ্বার খুলিতেই মিনতি ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকিয়া শিশুকে আপনার বক্ষঃপুটে সাপটিয়া ধরিয়া তেমনই দ্রুত গতিতে বাহির হইয়া গেল।

৪

পরদিন সকালে গৃহিণী নিশ্চিন্তমনে পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময় দুইখানি কোমল করের বেষ্টনী তাঁহাকে চমকিত করিয়া দিল। খিল্ খিল্ শব্দে শিশু হাসিয়া উঠিল। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিলে যেমন মুহূর্ত্তে উহা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মহাশব্দে বজ্রনাদ করে, তেমনই এই অশুচি-স্পর্শে তাঁহার সারা অন্তর গর্জিয়া উঠিয়া, দিক্ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। মিনতি পুষ্করিণীর ঘাটে ছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। শাশুড়ীর বিষাক্ত কথাগুলা অন্তরে খোঁচা মারিয়া তাহার স্থৈর্য্যের বাঁধন কাটিয়া দিল। যত অনর্থ ইহাকে লইয়া! ও ত শিশুকে তিরস্কার নহে, তাহারই মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া শাণিত শেলাঘাত! প্রচণ্ড অভিমান রুদ্ধ রোষে ফুলিয়া উঠিল—বালককে ধরিয়া নির্ম্মম হৃদয়ে মিনতি প্রহার করিতে লাগিল। সে কি প্রহার! ক্ষুদ্র কোমল কিশলয়ে প্রলয়-ঝঞ্ঝার বিলোড়ন! গৃহিণীর খর রসনা শব্দহীন হইল। কদম ছুটিয়া আসিয়া মিনতির হাত ধরিয়া কহিল, "আহা, একেবারে যে মেরে ফেললে, বৌদি? কর কি—কর কি?"

মিনতির নয়নে পৃথিবী তখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অভিমানে—অপমানে তাহার মন ক্রোধের অনল স্পর্শে তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই জ্ঞান হারাইয়া সে উত্তেজনা-বশে আঘাতের পর আঘাত করিয়া চলিয়াছে। সহসা বাধা পাইয়া চেতনা ফিরিয়া আসিতেই লুণ্ঠিত বালকের নিথর দেহের পানে চাহিয়া তাহার অবোধ মাতৃ-হৃদয় বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। শত শাণিত তীরের মত সেই সব আঘাত রক্তাক্ত মর্ম্মের মাঝে বিঁধিয়া যন্ত্রণায় তাহাকে উন্মত্ত করিয়া দিল। কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার ঘরে আসিয়া সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। অশ্রুর নদী তখন চোখের দুই কূল ভাসাইয়া বান ডাকাইয়া দিয়াছে।

রাত্রিকালে পরেশ মিনতির শিয়রে আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "মিনু!"

উত্তর নাই।

তাহার প্রাণ সত্যই মিনতির ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। শিশুকে আশ্রয় করিয়া এই যে ব্যবধান অন্তরের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর খাড়া করিতেছিল, তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও সে শান্তি পায় নাই। মিলনের আশায় মন তাহার ছটফট করিতেছিল। কিন্তু মিনতির দিক দিয়া এই মিলনের প্রচেষ্টা যে এতখানি বিষ উদ্গিরণ করিবে, তাহা সে কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। পারিলে শিশুকে মিনতির কাছছাড়া করিবার প্রস্তাবে সে অতটা আনন্দিত হইতে পারিত না। যাহাই হউক, মিনতির মনের রথ কক্ষচ্যুত উল্কার মত যে দিকে ছুটিয়াছে—সে দিক হইতে ফিরাইতে গেলে যে অবশ্যম্ভাবী অসন্তোষ ধূমায়িত বহ্নিশিখা লইয়া সংসারের সব সম্পদ্‌কেই ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া দিবে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিল। তাই আজ সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপে মিনতির ক্ষত-বিক্ষত অন্তরকে সুশীতল করিয়া দিতে তাহার এত আগ্রহ।

পরেশ সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আমায় মাফ কর, মিনু। বুঝতে পারিনি। যাও, খোকাকে কদমের কাছ থেকে নিয়ে এস।"

সহসা মিনতি গর্জ্জিয়া উঠিল, "কেন? কি দায় আমার? ও ত একটা মুচি-মেথরের জাত—ছুঁলে যে তোমাদের জাত যাবে!"

তাহার রোষদৃপ্ত নয়ন হইতে অনলকণা বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

পরেশ মনের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিয়াও হাল ছাড়িল না। আরও কোমলকণ্ঠে বলিল, "ছি লক্ষ্মীটি! আবার রাগ করে! বলছি ত অন্যায় হয়েছে।"

ক্ষুব্ধা নারী উত্তর দিল, "তোমার ন্যায় অন্যায়ে আমার

বসুমতী প্রেস] শবরী [শিল্পী—জে, সি, রায়।

এতটুকু বিশ্বাস নাই। মাপ চাইতে হবে না—আপনিই দূর হয়ে যাব। বাবাকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি।"

পরেশ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "কিন্তু—"

মিনতি কাঁদিয়া পরেশের পায়ে মাথা কুটিতে কুটিতে বলিল, "আর কিন্তু-টিন্তু নয়—কালই বিদেয় হব। দোহাই তোমার, রাতটুকু একটু নিশ্চিন্ত হ'তে দাও—আর জ্বালা বাড়িও না।"

মিলন-মরীচিকা পরেশের নয়ন হইতে বহু দূরে সরিয়া গেল। সে দেখিল, সম্মুখে সীমাহীন প্রখর রৌদ্রতরঙ্গ মরুভূমির বুকে জ্বালার আগুন জ্বালিয়া ধূ ধূ করিতেছে।

* * * * *

মিনতির পিতা বলিলেন, "হ্যাঁ রে মিনু—তোর টেলিগ্রাম পেয়ে কত ভাবতে ভাবতেই না আসছিলুম। ছিঃ! এমনই করে কি—"

মিনতি বলিল, "বাবা, আমায় নিয়ে চল।"

পিতা বলিলেন, "কেন? তা তোর শাশুড়ীকে একবার—"

মিনতি বাধা দিয়া উত্তপ্তকণ্ঠে বলিল, "না। বলবার দরকার নেই। তুমি নিয়ে যাবে কি না বল? না যাও ত আমি আত্মঘাতী হব।"

পিতা কন্যাকে চিনিতেন। পাগ্‌লী মেয়ে কোন কথা শুনিবে না—কোন বাধা মানিবে না—যাইবেই। তবু বলিলেন, "কেন, শুনতে পাই না? তুমি ছেলেমানুষ, মা—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে—"

মিনতি স্থিরস্বরে বলিল, "মাথা আমি ঠাণ্ডাই করেছি, বাবা। নিয়ে চল—গাড়ীতে সব বলবো।"

অগত্যা পিতা গাড়ী ডাকিবার ছলে বাহিরে গিয়া জামাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরেশ শুধু বলিল, "আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না—আপনার মেয়ের মুখেই শুনবেন।"

পিতা বুঝিলেন, ব্যাপার সামান্য নহে। তাই কন্যার হইয়া যতদূর সম্ভব কোমলভাবে কহিলেন, "জানই ত ওর মাথা খারাপ—বড্ড জেদী। কিন্তু বাবাজী! তোমরা যদি রাগ কর, ওর মুখ না চাও—বুঝলে—ওটা ভয়ানক রাগী—অবশ্য মেয়েমানুষের পক্ষে মস্ত দোষ। তবু তোমাদের মহত্ত্বে—"

পরেশ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্থির শান্ত স্বরে কহিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন। সে যাই করুক, আমি যখন অগ্নি সাক্ষী রেখে তাকে গ্রহণ করেছি, তখন যে কর্ত্তব্য আমার। সে আমার ধর্ম্মপত্নী। তার সুখ-দুঃখের জন্য ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ দায়ী আমি।"—বলিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে সে চলিয়া গেল। এই যুবকের মহত্ত্বের কাছে তাঁহার মাথা নত হইয়া গেল। ভাবিলেন—সার্থক আমার কন্যা-সম্প্রদান!

* * * * *

মিনতিকে দেখিয়া মাতা কি বলিতে যাইতেছিলেন—পিতা ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। পরে নির্জ্জনে বসিয়া সব খুলিয়া বলিলেন। মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হতভাগীর এমনও বুদ্ধি! একটা পরগাছা নিয়ে সব ত্যাগ ক'রে এল? এখন উপায়?"

পিতা বলিলেন, "পথে আসতে আসতে ভাবছিলুম—সব কাগজে বিজ্ঞাপন দেব—যদি কোন হদিস্ মেলে! এ ভিন্ন ত উপায় দেখি না।"

মাতা বলিলেন, "যদি কেউ না আসে?"

পিতা ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তা হ'লে এ দুঃখের বোঝা চির-জীবনটা ধ'রে বইতে হবে! তা ভিন্ন পথ কি?"

মাতা আকুল কণ্ঠে কহিলেন, "এমনও বুদ্ধি আবাগীর! হে বাবা সত্যনারাণ! তোমায় ষোল আনা পূজো দেব—এ বিপদ্ কাটিয়ে দাও। হে মা কালী—"

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল। মিনতি এ সব কিছুই জানিল না।

দিন দশেক পরে ঠাকুর-দেবতারা ঘুষ খাইবার লোভেই হউক, আর ভক্তির জোরেই হউক, মিনতির মা'র প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া খোকার অভিভাবককে তাঁহাদের দ্বারে টানিয়া আনিলেন।

৫

তখন মুস্কিল হইল এই, কে মিনতিকে এ সংবাদ জানাইবে? খোকা-অন্ত-প্রাণ মিনতি এ সংবাদ পাইলে না জানি কি করিয়া বসিবে? অবশেষে মা-ই এই সুসংবাদ বহন করিয়া মিনতির ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে তখন খোকার বেশভূষা শেষ করিয়া তাহাকে লইয়া চঞ্চলা বালিকার মত ঘরময় ছুটাছুটি করিতেছে। মায়ের মন সহসা মেয়ের এই আনন্দ-প্রবাহ রুদ্ধ করিতে বিমুখ হইয়া গেল। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎটা সেই মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে চমক দিয়া কেবলই তাঁহাকে অসীম অন্ধকারের ব্যথা-ভরা রাজত্বের শেষ

পরিণতি দেখাইয়া আকুল করিয়া দিতে লাগিল। তিনি সব সংশয় ঠেলিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মিনতি!"

মিনতি চমকিত হইয়া সে দিকে চাহিল।

মা কয়েক মিনিট থামিয়া বলিলেন, "খোকার বাপ এসেছে—ওকে নিতে।"

নির্ম্মল নির্মেঘ আকাশে সহসা বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া যেমন নির্জ্জন পথচারী পথিককে ভয়, বিস্ময়, উৎকণ্ঠায় মুহ্যমান করিয়া তাহার সমস্ত অনুভূতির লোপ করিয়া দেয়, মায়ের ঐ কথা কয়টিতে মিনতির অবস্থা ঠিক তেমনই হইল। সে পলকহীন দৃষ্টি মেলিয়া আড়ষ্টভাবে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "কি করবি বল। পরের ছেলে, জোর ত নেই।"

ততক্ষণে মিনতি একটু সামলাইয়া লইয়াছে। সে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "এ কায কে করলে?"

মা সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "তবে আগে দেখতে হবে, সেই ওর বাপ কি না? অবিশ্যি সে সব ঠিকঠাক না ক'রে উনি ছেলে দেবেন না। তবু ত—"

মিনতি অধীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মা, ওঁকে খবর দিলে কে?"

মা বলিলেন, "খবর দেওয়াটা কি অনুচিত হয়েছে? যার ছেলে, তার কতটা বেজেছিল বল্ দেখি! তোর ত নিজের ছেলে নয়, তবু ছেড়ে দিতে প্রাণ কাঁদছে; কিন্তু হাতে ক'রে মানুষ করা, আদরে গড়া—তাদের কি কষ্টটা, একবার ভাব্ দেখি?"

মিনতি স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মা পুনরায় বলিলেন, "তাই আমি-ই ওঁকে বলেছিলুম কাগজে ছাপিয়ে দিতে।" পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বছরের মধ্যে তোর কোলে অমনি একটি রাঙ্গা খোকা আসুক—দুঃখু কিসের?"

মিনতি সহজকণ্ঠে উত্তর দিল, "তুমি যাও মা, আমি খোকাকে দিয়ে আসছি।"

মা চলিয়া গেলেন।

মিনতি খোকার পানে চাহিয়া চাহিয়া পলক ফেলিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া—শত শত চুম্বনে গোলাপী গাল দুইখানি রাঙ্গাইয়া দিয়া—ছোট বালিকার মত কাঁদিয়া উঠিল।

* * * *

মিনতির পিতা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন। তাঁহার ঠিকানাটি লইতেছেন, এমন সময় ধীর অকম্পিত পদে খোকাকে লইয়া মিনতি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে খোকাকে তাহার পিতার পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "মা, তুমি আমার যথার্থ-ই মা। আমারও—খোকারও। তোমার মনে ব্যথা দিয়ে একে নিয়ে যাচ্ছি,—কি করবো মা—মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। দেখি, খোকা যদি না থাকতে পারে, তোমার জিনিষ তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব। ঠিকানা রেখে গেলুম—যখন ইচ্ছা হবে গিয়ে দেখে এসো।"

মিনতি শেষ অবধি শুনিল না, তেমনই ধীর পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তার পর? আপনার ঘরে আসিয়া খোকার ক্ষুদ্র শয্যা আঁকড়াইয়া ধরিয়া—ক্ষুদ্র বালিকার মতই সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হায় রে স্নেহকাঙ্গাল নিঃস্ব নারীহৃদয়!

* * * *

তিন দিন পরে মা আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "এম্‌নি ক'রে না খেয়ে ক'দিন কাটাবি, মিনু? বুড়ো মা'কে না খুন ক'রে ছাড়বিনি!"

মিনতি উঠিয়া বসিল; বলিল, "মা, খেতে বসলেই যে মাণিকের মুখ মনে পড়ে। সে আমার কোলে ব'সে 'এটা খাব, ওটা খাব'—" বলিতে বলিতে বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মত অশ্রুপ্রবাহ কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। মা সরিয়া আসিয়া মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "চুপ কর মা, চুপ কর।"

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিল। মা কাযের কথা পাড়িলেন, "তা হ'লে জামাইকে একখানা চিঠি লিখে দে, সে এসে তোকে নিয়ে যাক। সামনেই চোত মাস—"

মিনতি কোন কথা কহিল না। পূর্ব্ব-স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেই মনের মধ্যে পুরাতন অভিমান মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, ছিঃ, সাধিয়া যাইতে হইবে!

মা তাহার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া আশ্বস্তা হইয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গেলেন। মিনতি কল্পনার সূত্র টানিয়া আনিয়া পুরাতন কথা নূতন করিয়া ভাবিতে বসিল।

ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, স্বামীর ব্যবহার বড়ই বিসদৃশ। হউক না কেন—মাণিককে কদমের কাছে রাখার প্রস্তাবে তিনি

যত উল্লসিতই হউন না কেন, তথাপি তাঁহার সে ব্যগ্রতা তাহারই ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া নহে কি? তাহার মাতৃ-হৃদয় বিকশিত হইয়া প্রেমের পুরাতন বেষ্টনীকে শিথিল করিতে পারে—করিয়াছিলও, কিন্তু স্বামীর দিক হইতে দেখিলে তাঁহার আচরণের মধ্যে এতটুকুও অন্যায় খুঁজিয়া ত মিলে না! তাঁহার অযাচিত গভীর প্রেম, ভালবাসার স্নিগ্ধ-দীপ জ্বালিয়া প্রতিদিন—প্রতি রজনী তাহার আরতিতেই ত নির্বিঘ্নমনা হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল। সেই দীর্ঘ আটটি বৎসরের কত মান-অভিমান, আদর-সোহাগ, হাসি-কান্না—সবই কি মিথ্যা? না—না—না। সে মুক্তকণ্ঠে বলিবে, কখনই নহে। তাঁহার সেই সর্ব্বংসহ প্রেম, সে যে জরা-মরণকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া চির-অটুট চির-অমলিন। সেই স্বচ্ছ আকাশের মত উদার নির্ম্মল মনে আঘাত দিয়া মিনতি কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছে! তুচ্ছ একটা পরের ছেলে লইয়া সে এমনই করিয়া নিজের অশান্তি ডাকিয়া আনিল কেন? কাহার জন্য সে আজ সর্ব্বস্ব-হারা, রিক্তা? কোথায় সে? তাহার কোল শূন্য করিয়া, যাহার জিনিষ, সে লইয়া গিয়াছে! কতটুকু অধিকার তাহাকে দিয়াছে সে?

শুধু বেদনা—তীব্র ব্যথা। বুক-ভরা ক্রন্দনের আকুল উচ্ছ্বাস!

চক্ষু বড় অশান্ত, প্রবোধ মানে না, খালি অঝোরে ঝরিতে চাহে। অশ্রুর দরিয়া রচনা করিয়া সে বুকের মাঝে মহাশূন্যতার সৃষ্টি করিতে চাহে। ওরে অবোধ বাক্‌হীন শিশু! এত মমতা তোর ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলি? না—না, মনের এ গতি ফিরাইতেই হইবে। স্বামীর নিঃশঙ্ক ভালবাসায় সে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া পূর্ব্বের মত আবার হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে। অতীতের তুচ্ছ ঘটনা অতীতের অন্ধকারেই ডুবিয়া থাকুক। তাহার সোনার বর্ত্তমান রঙ্গীন আলোক জ্বালিয়া প্রেমের স্বর্ণ-সিংহাসন প্রদীপ্ত করুক—তাহাতেই তাহার সার্থকতা!

তাড়াতাড়ি কালি-কলম লইয়া সে পত্র লিখিতে বসিল, কিন্তু খানিকটা লিখিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিল। ভাবিল, সেখানে শাশুড়ীর টিটকারী, কদম্বের উপেক্ষা—সব কটাই যে তীক্ষ্ণ করে শাণাইয়া বসিয়া আছে! নিরবলম্বভাবে সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেই তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া সকলেই একসঙ্গে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কি বলিয়া উঠিবে না, যার জন্য এত, সে কোথায়? সে তেজ, সে দম্ভ কৈ? তখন স্বামী যদি অলক্ষ্যেও সে হাসিতে যোগ দেন? তাহা হইলে নারীর চরম হীনতা বহিয়া, সেই সব অপমান পরিপাক করিয়া সে কোন্ প্রাণে সংসারকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবে? সে ত দাসীত্ব! না, এই-ই ভাল। হউক অন্ধকার—তবু ভাল। তিনি যদি আবার 'মিনু' বলিয়া ডাকিয়া লইতে আসেন, তবেই সে যাইবে, নতুবা—এই-ই ভাল।

* * * *

শাশুড়ীর পত্র পাইয়া পরেশ মিনতিকে লইতে আসিল। দেখিল, সে মিনতি আর নাই। সেই অপরাহ্নের স্থলপদ্ম ভোরের বাতাসে রক্ত-সরসতা হারাইয়া পাণ্ডুর হইয়া শুধু বৃন্তে সংলগ্ন হইয়া আছে—বুঝি তীব্র সূর্য্যোত্তাপে ঝরিয়া পড়িবার অপেক্ষায়। পুরাতন স্মৃতি-সিন্ধু বিক্ষুব্ধ করিয়া হারানো দিনের ব্যথার কাহিনী তরঙ্গ আকারে মনের তটদেশে আছাড় খাইতে লাগিল। গদ্‌গদকণ্ঠে সে ডাকিল,—"মিনু!"

নদী সিন্ধুতে মিশিয়া গেল।

দুই দিন পরে বিদায় লইয়া তাহারা গাড়ীতে উঠিবে, এমন সময় মাণিকের পিতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শিশুকে মিনতির পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিলেন,"খুব সময়েই এসে পড়েছি। ওর যা কান্না, রাখ্‌তে পারলুম না। তুমিই নাও, মা!"

এ কি অভিশাপ! মিলনের মুহূর্ত্তে অশান্তির কোলাহলে জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দিতে এ কি বিধাতার পরিহাস!

মুখ ফিরাইয়া মিনতি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"রাগ কেন, মা? ও যে তোমারই ছেলে। নিঃশেষে ওকে তোমায় দিলুম।"

তথাপি মিনতি নিরুত্তর।

পায়ের কাছে বাঞ্ছিত স্বর্গ, কিন্তু শত অশান্তি কালফণা তুলিয়া সেথায় বিষ উদ্গিরণ করিতে উদ্যত। আড়ষ্ট হাত ত উঠিল না!

পরেশ হাস্যোচ্ছলিত কণ্ঠে বৃদ্ধকে বলিল,—"আপনি স্থির হোন।"

পরে মিনতির পায়ের তলা হইতে শিশুকে কোলে তুলিয়া দোলা দিতে দিতে বলিল,—"নাও তোমার দুষ্টুকে।"

মিনতি সঙ্কোচ-ভরা কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মা!—" প্রবল হাস্যতরঙ্গে সে ক্ষীণ আপত্তি ডুবাইয়া দিয়া পরেশ বলিল, "না

বুঝে যে দোষ করেছিলুম, তার শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে—আর কেন? ভগবানের দান। একে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আমারও নেই, মারও নেই। মিছে ভেবে অধীর হচ্ছ কেন? একটা ভার না হয় আমার ওপরই দিলে!"

মিনতি কোন কথা বলিল না। খোকাকে কোলে লইয়া তাহার ললাটে স্নেহ-চুম্বন আঁকিয়া দিয়া পরম শান্তিতে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর অবনত হইয়া পরেশের পায়ে মাথা রাখিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিল, "আমিও বুঝতে পারিনি, মাপ ক'রো।"

স্নেহ ও প্রেমের গঙ্গা-যমুনায় ভক্তি-সরস্বতী মিশিয়া গেল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ব্বরের ব্রহ্মজ্ঞান

সৃজনের প্রথম প্রভাতে
তন্দ্রা-জাগরণে ঘেরা মানবের নয়নের পাতে
তম-আবরণ ভেদি' মূর্ত্তি ধার' দেখা দিলে যবে
হে অব্যয়, আপনার বৈচিত্র্যের বিশাল বৈভবে,
আন্দোলিয়া, উচ্ছ্বসিয়া উঠেছিল বিরাট বিস্ময়ে
শিশু মানবের মন, অতর্কিত নব পরিচয়ে
বিপুল আবেগভরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাধা-বন্ধ টুটে
আত্মহারা মহানন্দে মত্তপারা যায় শুধু ছুটে
দীর্ণ করি শৈল-গুহা উন্মাদিনী স্রোতস্বিনী প্রায়,
সম্পদের আমন্ত্রণে।

কর্ণে পশে দিবস নিশায়
সিন্ধুর গর্জ্জন-গান, কি ভীষণ ভৈরব হুঙ্কার,
প্রলয়-ডঙ্কার মত লক্ষ সর্প করিছে বিস্তার
দর্পভরে কাল ফণা, শ্বসিছে, ফঁসিছে অহর্নিশ
ফেনায়ে উঠেছে নিত্য মরণের কাল-কূট বিষ।
নাহি কূল, নাহি পার, নাহি কোন আশ্রয় আধার
জীবনের মাঝে এই মরণের রুদ্র হাহাকার
কে আনিল? উদ্দাম উদ্দণ্ড নৃত্য না মানে বিরাম
নাহি ছন্দ তাল মান তবু এ কি নয়নাভিরাম
বিশাল উত্তাল শোভা! হেরিয়া যে তৃপ্ত নহে হিয়া
ইচ্ছা হয় যাক তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাণ, পড়ি ঝাঁপ দিয়া
সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ দোলে। সদ্য-জাগা প্রাণের মায়ায়
ধরণী জননী পানে নগ্ন শিশু পশ্চাতে তাকায়
ছুটে আসে অঞ্চলের তলে। আনন্দ-বিস্ময়-ভয়
বর্ব্বরের মর্ম্মখানি আন্দোলিয়া করে ঊর্ম্মিময়।

আবার অদূরে হেরে বিরাট পর্ব্বত
ভীমরুদ্র কলেবরে দাঁড়াইয়া রুধি যাত্রা পথ,
অভ্রভেদী তুঙ্গ-শির, চিরশুভ্র তুষার-সংহতি
ব্যর্থ প্রতিহত করি' মানবের ক্ষীণ ক্ষুদ্র গতি
পদে পদে সীমাহীন ক্ষমাহীন এ কি ভয়ঙ্কর
অটল গম্ভীর মূর্ত্তি! আচম্বিতে দাঁড়াল' বর্ব্বর
শঙ্কিত-কম্পিত চিতে!

হেরে পুনঃ পাদমূলে তার
অনন্ত প্রশান্ত স্নিগ্ধ কাননের শ্যামল সম্ভার
ধরণীর বক্ষ জুড়ে। কত বৃক্ষ শাখা-প্রশাখায়
দাবদগ্ধ ধরাতল অবিরল শীতল ছায়ায়
রাখিয়াছে চির-স্নিগ্ধ করি'; অযাচিত কত মিষ্ট ফল
জননীর ক্ষীর সম তটিনীর কত স্বাদু জল
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাশ করি' অসহায় মানবের প্রাণ
বাঁচায়ে রাখিছে নিত্য। কলকণ্ঠ বিহঙ্গের গান
ঢালিছে অমৃতধারা বনে বনে পুষ্প শত শত
অতিথির অভ্যর্থনা হাস্যমুখে করে অবিরত
কুসুমে কীটের মত উদ্বেজিত করি অতর্কিতে
মানবে নাশিতে কত হস্তী, ব্যাঘ্র, অজগর, ফিরে
পলায় সশঙ্ক নর।

হোথা ওই রুদ্র মরুস্থল-
জ্বলিছে অনন্ত তৃষা, নাহি দেয় এক বিন্দু জল,
নাহি তরু, নাহি ছায়া, বক্ষে জ্বলে নিত্য বহ্নি-শিখা—
পিপাসিত ভ্রান্ত আঁখি ছুটে গিয়ে পায় মরীচিকা!
হতাশ হৃদয়ে পান্থ বালুকার অন্তিম শয্যায়
তপ্ত মৃত্যু-আলিঙ্গনে জীবনের পিপাসা মিটায়
ইহজনমের মত।

ঊর্দ্ধে শোভে সুনীল অম্বর,
লক্ষ নক্ষত্রের হারে বক্ষ তার সুন্দর ভাস্বর,—
কখনো বা হাসে চাঁদ পূর্ণিমার অমল-প্রভায়
দিন দিন ক্ষীণ হয়ে এক দিন হাসি নিবে যায়,
ধীরে ধীরে পুনঃ ফোটে হাসি, নিশার আঁধার শেষে
পূর্ব্ব-গগনের কোলে নিত্য ভাসে কি অপূর্ব্ব বেশে
সোনার আলোর পিণ্ড, সে সোনার কাটির পরশে
রজনীর মৃত প্রাণ বেঁচে ওঠে জীবনের রসে—
এ লীলার নাহিক বিরাম।

শ্রান্তি ক্লান্তি দুঃখ-হরা
কখনো বা বহে বায়ু কুসুমের মৃদু-গন্ধে ভরা
মনঃপ্রাণ মুগ্ধ করি', অকারণে কখনো আবার
আয়ু হরে সেই বায়ু ধরি' ভীম ঝঞ্ঝার আকার
উৎপাটিয়া মহীরুহ চূর্ণ করি মহীধর-শির
উচ্ছ্বসিয়া সিন্ধু-বারি বিদারিয়া বক্ষ ধরণীর
আর্ত্ত করি' ত্রস্ত করি' এক সাথে শ্বাপদে-দ্বিপদে
ধ্বংস-দণ্ড হাতে ঘোরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, এ বিপদে
বিভ্রান্ত বিমূঢ় নর প্রাণভয়ে রহে কম্পমান—
অভয় আশ্রয় কেবা এ সঙ্কটে পেতে পরিত্রাণ?

এখনো অন্তরে তার জাগে নাই, স্ফুরে নাই কভু
বিশ্ব-নিয়ন্তার ছবি, মনে মনে বুঝিতেছে তবু
বিরাজে বিরাট শক্তি এই বিশ্বে, যাঁহার বিধান
অজেয়, অমোঘ, নিত্য, ভয় হ'তে পেতে পরিত্রাণ,
মানবের মন তাই অন্বেষণ করে দিকে দিকে
সেই মহাশক্তিধরে ব্যর্থ শ্রম, তাহারি প্রতীকে
খোঁজে শেষে সৃষ্টিমাঝে। উচ্চশির করি অবনত
পূজে নর বৃক্ষ, শিলা, ভূধর, সাগর অবিরত
ভয়ে ভয়ে পূজে সূর্য্য, পূজে চন্দ্র, পূজে গ্রহ-তারা,
পূজে ঝঞ্ঝা, পূজে বজ্র, পূজে মেঘ, পূজে বৃষ্টিধারা।
শক্তির আধার, হাসি ভাবে মনে এরি অন্তরালে
সৃজনের বীজ শক্তি ঘেরা আছে রহস্যের জালে
স্পষ্ট কিছু বোঝে না ক, তবু যেন ইঙ্গিতে আভাসে
সহস্র রূপের মাঝে অরূপের স্বরূপ প্রকাশে,—
সেই লক্ষ্যে বর্ব্বর দুর্ব্বার বেগে সংশয়ের পানে
জানার ভিতর দিয়া ধেয়ে যায় অজানা সন্ধানে,
চিরদিন, পূজে না পাথর, গাছ, জেনো ইহা ঠিক,
গাছ পাথরেরি লাগি' হেরে তারা স্রষ্টার প্রতীক
সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে, পূজে তাহা করি বহুমান
পৌত্তলিক নহে তারা, বর্ব্বরেরও আছে ব্রহ্মজ্ঞান
শিক্ষা-সভ্যতার দীক্ষা লভি' নর হয়ে অভিমানী
উপলক্ষে তুচ্ছ করি' লক্ষ্য ভেদে হইয়া সন্ধানী
দর্শন বিজ্ঞান রচি লভি' নিত্য নব নব জ্ঞান,
ব্রহ্ম নিরূপণ পথে দম্ভভরে করে অভিযান
অগ্রসর যত হয়, পথ কভু নাহি হয় শেষ—
অবসন্ন হয় জ্ঞান মেলে না ত ব্রহ্মের উদ্দেশ!
কখনো সন্দেহ জাগে, কভু তার হয় নিরসন,
আবরণ খোলে কত তবু কত রয় আবরণ,
অন্ত নাই, অন্ত নাই খুলিবে না মায়া-গ্রন্থি-ডোর
এ নিশার অন্ধকার কোনকালে হইবে না ভোর।
যত চল পথে পাবে নিত্য হায় নব নব বাধা—
পারিবে না কভু তুমি পার হ'তে এ গোলোক-ধাঁধা;

ক্ষান্ত হও সভ্য নর, সভ্যতার মান-দণ্ড দিয়া
পরিমাণ করিও না বর্ব্বরের সনুর্ব্বর হিয়া
দম্ভভরে, না জানিয়া, না বুঝিয়া চিন্তাধারা তার
সরাসরি এ বিচারে বিশ্বে কারো নাহি অধিকার!
বিচিত্র ব্রহ্মের লীলা, এড়াইয়া বিজ্ঞান দর্শন
কে জানে বা ধন্য করি বর্ব্বরের মানস-দর্পণ
প্রতিভাত হন নিত্য, তার যত ছোট বড় কাজে
বর্ব্বর হেরিয়া ধন্য বিশ্বপতি এ বিশ্বের মাঝে।
গগনে পবনে শৈলে সাগরের তরঙ্গ-সঙ্গীতে
মেঘে বজ্রে ঝঞ্ঝা-মাঝে দেখে তাঁরে সহস্র ভঙ্গীতে।
অচিন্ত্য ব্রহ্মের লীলা— তুমি হাস সত্যে ভেবে স্থূল
হে বিজ্ঞ, হাসেন ব্রহ্ম, হেরে তব এই সূক্ষ্ম ভুল;
তাঁর কাছে ভেদ নাই—অজ্ঞ বিজ্ঞ সবাই সমান
তাঁহারি ইচ্ছায় জাগে বর্ব্বরেরও মনে ব্রহ্মজ্ঞান।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রজাস্বত্ব আইন

প্রজাস্বত্ব আইন লইয়া কাউন্সিলে যে নিষ্ঠুর অভিনয় হইয়া গিয়াছে, দেশবাসীর তাহার সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় আছে। জমীদার-শাসিত কাউন্সিল যে আইন পাশ করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালার কৃষকদল অচিরে পথের ভিখারী হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই আইনের প্রণেতা জমীদার,—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়শনের এক জন প্রধান সভ্য কাউন্সিলে ইঁহার কর্ণধার হইয়াছিলেন। শুনা যায়, অনেক সরকারী সভ্যও ইচ্ছার নিতান্ত বিরুদ্ধে এই আইনের জন্য ভোট দিয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিক স্বরাজ্য দল—যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বাহিরে ভিতরে অসহযোগ করিতে সদা ব্যস্ত—তাঁহারা পদে পদে সরকারী সভ্যগণের সহিত একসঙ্গে ভোট দিয়া এই বিল কাউন্সিলে পাশ করিয়াছেন। স্বরাজ্য দলের স্বরূপ ক্রমশঃই দেশের নিকট প্রকাশিত হইতেছিল; বর্ত্তমান ব্যাপারে মুখোস্ একবারে খুলিয়া গিয়াছে। ভোট ও 'এম্ এল্ সি' ত্র্যক্ষর ব্রহ্ম যাঁহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহার বেশী কিছু আশা করাও অন্যায় ছিল।

জমীদার-সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ এবং স্বরাজ্য দলের মহারথীরা তর্কের কুজ্ঝটিকা দ্বারা লোকের সম্মুখে মায়াজাল বিস্তার করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকেই এই কথা বলিয়াছেন যে, জমীদার ও প্রজা উভয়ের বর্ত্তমান অধিকার সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে উভয়েরই কল্যাণ হয়, এমন ব্যবস্থা এই আইনে করা হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করাও সমীচীন হইবে না, ইত্যাদি অনেক লম্বা-চওড়া কথা স্বরাজীদের মুখে শুনা গিয়াছে। অনেকে এই কথা বলিয়াছেন যে, ইহাতে একটা compromise অথবা আপোষ মীমাংসা হইয়াছে। একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, এই ধারণা কত অলীক। জোত হস্তান্তর করিবার ও অপরাপর মূল্যবান্ অধিকার প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে, ইহা অনেকে খুব জোর গলায় বলিতেছেন। ইহা কতদূর সত্য, একবার তলাইয়া দেখা যাউক্।

(১) বর্ত্তমান আইন প্রণীত হইবার পূর্ব্বে প্রজার জোত হস্তান্তরের ক্ষমতা দেশপ্রথানুযায়ী নির্দ্ধারিত ছিল; এই বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট আইন ছিল না। এই ব্যাপার লইয়া অনেক মামলা-মোকদ্দমা আদালতে হইয়া গিয়াছে। অবশেষে "দয়াময়ী"র মোকদ্দমায় হাইকোর্টের "ফুল বেঞ্চে" ইহা সাব্যস্ত হয় যে, রায়ত জমী হস্তান্তর করিলে সে নিজে কবালাপত্রের সমস্ত সর্ত্ত দ্বারাই বাধ্য বটে, কিন্তু জমীদার ইচ্ছা করিলে ঐ বিক্রয় নাকচ করিয়া জমী দখল করিতে পারিবে। প্রজা যদি জোত-জমীর সমস্ত খণ্ড বিক্রয় না করিয়া অংশবিশেষমাত্র বিক্রয় করে, তবে সেই বিক্রয় জমীদারও বাতিল করিতে পারিবে না, যদি না প্রজা ইচ্ছা করিয়া স্বত্ব ত্যাগ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নূতন আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বেও জোত আংশিকভাবে বিক্রয় করিবার কিংবা বন্ধক দিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রজার ছিল। জমীদার ইচ্ছা করিলেও আইনতঃ তাহাতে বাধা দিতে পারেন না কিংবা নজরও দাবী করিতে পারেন না। জমীদারের পূর্ব্বানুমতিক্রমে রায়ত জোত জমীর সমস্ত খণ্ডও বিক্রয় করিতে পারে। অবশ্য এ সব স্থলে সামান্য সেলামী জমীদারকে সাধারণতঃ দিতে হয়।

নূতন আইনের ফলে আংশিকভাবে জমী বিক্রয় করিলেও নজরানা দিতে হইবে। সমগ্র জোত জমীই বিক্রয় হউক কিংবা অংশবিশেষই বিক্রয় হউক, জমীদারের সেলামী না দিয়া নিস্তার নাই। এই নজরানার পরিমাণ বিক্রয়মূল্যের এক-পঞ্চমাংশরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আইন যেখানে অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য ছিল, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাগতপ্রাণ স্বরাজ্য দল সেখানে আইনকে স্পষ্ট ও সুবোধ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ জমীদারের প্রাপ্যটা যে কি, তাহা বেশ ভাল করিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আংশিক বিক্রয়স্থলে—যেখানে পূর্ব্বে জমীদারের কোনরূপ দাবী-দাওয়া ছিল না—সেখানে শতকরা ২০৲ বাটপাড়ির ব্যবস্থা করিয়া ন্যায়ানুরাগ ও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অনেকে আবার নাকিসুরে জমীদারের অভাব ও দারিদ্র্যের বর্ণনা করিয়া অন্তর্নিহিত কারুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। প্রজাগণ দুর্ভিক্ষে পীড়িত ও মহাজনের কবলিত বটে; কিন্তু জমীদারগণ অধিকতর ঋণগ্রস্ত ও অভাবগ্রস্ত। গড়ে তাহাদের জনপ্রতি আয় ৫ শত টাকারও কম—সকলের পক্ষে চাল-চলন বজায় রাখিয়া চলা ভার। অতএব জমীদার বেচারীদিগকে সামান্য সাহায্য না করিলে চলে কি করিয়া ?

(২) বিক্রয়মূল্যের শতকরা ২০৲ (অথবা খাজানার ৬গুণ

যাহা অধিকতর হয়, তাহাই) জমীদারকে সেলামীস্বরূপ দিতে হইবে। কি ভিত্তির উপরে এই হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। যে সকল টীকা-টিপ্পনী আইনের খসড়ার পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। কাউন্সিলের সভ্যগণ রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, সেলামীর হার সম্বন্ধে কোনরূপ সত্যতা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। সরকারপক্ষ সেলামীর হার শতকরা ৩৪৲ নির্দ্ধারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রজাপক্ষ ইহা লোপ করিতে কিংবা কমাইয়া ৫৲ অথবা ১০৲ টাকায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অমনই জমীদারবর্গ আব্দার ধরিল, হার ৩০৲ টাকায় চড়াইতে হইবে, নতুবা তাহাদের বহুযুগসঞ্চিত অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে। অবশেষে স্বরাজ্য দল সেলামীর হার ২০৲ টাকা সাব্যস্ত করিয়া এই মানভঞ্জন পালার উপসংহার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, স্বরাজ্য দল ইহাও বলিয়াছেন যে, সেলামীর হার আরও নীচে ধার্য্য করিবার মহদিচ্ছা তাঁহাদের ছিল, কিন্তু নানা কারণে আপাততঃ তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে সুযোগ ও আবশ্যক হইলে সেলামীর হার কমান কিংবা সেলামী একবারে তুলিয়া দিতে পারা যাইবে। সকল সময়েই জমীদার জমীর সর্ব্বময় মালিক ছিল, স্বরাজ্য দলের অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ ইতিহাস-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই মহারত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। জমীদারের সেলামীর ব্যবস্থা প্রথমে না করিয়া যদি প্রজাকে জোত হস্তান্তরের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে ইহা নিতান্তই বলশেভিক কায হইবে। কিন্তু একবার জমীদারকে সেলামীর অধিকার দিয়া ভবিষ্যতে (স্বরাজ্য দলের নির্দ্দেশ অনুসারে ?) সেলামীর হার কমাইলে কিংবা সেলামী একবারে তুলিয়া দিলে তাহা বলশেভিজম্ হইবে না। এই সারবান্ স্বরাজী যুক্তি সাধারণ বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে।

(৩) শুধু বিক্রয়মূল্যের পঞ্চমাংশই রায়তের একমাত্র দেয় নহে। এই দেয় টাকা রায়ত কখনই জমীদারকে হাতে হাতে সমঝাইয়া দিতে পারিবে না। (ক) প্রথমতঃ প্রত্যেক খরিদ-বিক্রী যথারীতি রেজেষ্টারী করিতে হইবে অর্থাৎ সরকারকে কিছু ফি দিতে হইবে। (খ) দ্বিতীয়তঃ রেজেষ্টারী করিবার কালে নির্দ্দিষ্ট সরকারী ফারমে জমীদারের প্রতি বিজ্ঞাপন লিখিয়া দিতে হইবে এবং উক্ত বিজ্ঞাপন জমীদারের নিকট পাঠাইবার খরচ—(ডাক-টিকিটের মূল্য নহে—Process Fee)—দাখিল করিতে হইবে। (গ) তৃতীয়তঃ শতকরা ২০৲ টাকা হারে জমীদারের সেলামী ও তৎসঙ্গে উহা পাঠাইবার খরচ ও (prescribed cost of transmission) জমা দিতে হইবে। এই 'পাঠাইবার খরচ' শুধু মণি-অর্ডার কমিশন নহে। উক্ত সেলামীর টাকা আদায়, জমা ও প্রেরণ করিবার নিমিত্ত রেজেষ্টারী আফিস, কালেক্টরেট ও আদালতে যাহা কিছু ব্যয় হইবে, তাহা সমস্তই 'পাঠাইবার খরচের' অন্তর্ভুক্ত। সেলামীর আনুষঙ্গিক উপসেলামীও নেহাৎ অল্প হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(৪) সেলামীর পাকা বন্দোবস্ত করিয়াই ব্যবস্থাপকগণ ক্ষান্ত হন নাই। অগ্রক্রয়ের অধিকার জমীদারকে দিয়া প্রজার সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অগ্রক্রয়ের অধিকার জমীদারের হাতে কিরূপ মারাত্মক অস্ত্র হইতে পারে, তাহা ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। জোত বিক্রয় করিবার সময়ে জমীদারকে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞাপন পাইবার দুইমাসমধ্যে জমীদার আদালতকে জানাইতে পারে যে, সে জমী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। বিক্রয়মূল্য ও তাহার উপরে আরও শতকরা ১০৲ টাকা জমা দিলেই জোত জমীদারের হস্তগত হইবে,—পূর্ব্বক্রয়কারীর কোন অধিকার থাকিবে না। ইহারই নাম অগ্রক্রয়ের অধিকার। আইনের মারপ্যাঁচ যথেষ্ট আছে, তবে মোটামুটি এই ব্যবস্থা।

নূতন আইনের স্বপক্ষগণ বলিয়াছেন যে, সেলামী জমীদারের প্রাপ্য, ইহা একবার স্বীকার করিয়া লইলে জমীদারকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই; তাহা না করিলে বিক্রয়মূল্য মিথ্যা কম উল্লেখ করিয়া প্রজা জমীদারকে তাহার ন্যায্য সেলামী হইতে বঞ্চিত করিবে। ঠিক কথা। একবার অন্যায়ের পথে পা দিলে আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না; সর্ব্বদাই নীচের দিকে চলিতে হয়। সেলামী দেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া ব্যবস্থাপকগণ প্রজার প্রতি ঘোর অন্যায় করিয়াছেন। এখন সেই অন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত জমীদারকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এক অন্যায় আর এক অন্যায়ের জনক হইয়াছে।

জমীদারগণ যদি লোভ একটু সামলাইতে পারিত, তবে এই যুক্তি মানিয়া লইলেও জমীদারকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেলামী যদি বিক্রয়

খাজানার ছয় গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায়ই খাজানার ছয় গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত, তবে প্রজার পক্ষে জমীদারকে ঠকাইবার কোনই সুবিধা থাকিত না। খাজানার হার জমীদার ও প্রজার সুবিদিত এবং সকল ক্ষেত্রেই ইহার দলীল প্রমাণ আছে; অতএব প্রতারণার কোন সম্ভাবনাই উপস্থিত হইত না। যে আইন কাউন্সিলে পাশ হইয়াছে, তাহাতে প্রজা কখনও খাজানার ছয় গুণের কম সেলামী দিতে পারিবে না; অতএব প্রজার পক্ষে উক্ত ব্যবস্থা মোটেই খারাপ হইত না। কিন্তু জমীদার তাহার স্বার্থ এতটুকুও ত্যাগ করিতে নারাজ। বিক্রয়মূল্যের একটি নির্দ্দিষ্ট ভাগ তাহার সেলামী বাবত পাওয়া চাই-ই। প্রজা যাহাতে বিক্রয়-মূল্য মিথ্যা কম উল্লেখ করিয়া ঠকাইতে না পারে, তাহার জন্য পাকা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ সেলামী কোন অবস্থায় খাজানার ছয় গুণের কম হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ অগ্রক্রয়ের অধিকার জমীদারকে দেওয়া হইয়াছে।

যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রজার পক্ষে জমীর উপযুক্ত মূল্য পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ধরুন, পরাণ মণ্ডল তাহার জোতজমী বিক্রয় করিতে চাহে। সেই জমীর পার্শ্বে সংলগ্ন যাহাদের জমী আছে, তাহারাই ঐ জমী কিনিবার জন্য সমধিক ব্যগ্র এবং উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজী হইবে। ধরুন, নিতাই মণ্ডলের জমী পরাণ মণ্ডলের জমীর পাশাপাশি অবস্থিত। পরাণ মণ্ডলের জমী কিনিয়া নিতাই মণ্ডল যত লাভবান্ হইতে পারিবে, তত লাভবান্ অপর কেহ হইতে পারিবে না। অতএব সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে রাজী হইবে। ধরুন, নিতাই মণ্ডল ২ শত টাকা ঐ জমীর জন্য দিতে প্রস্তুত আছে। নিতাই মণ্ডল জানে যে, অগ্রক্রয়ের অধিকার জমীদারের আছে, জমীদারও জানে, এই জমী পাইবার জন্য নিতাইয়ের যথেষ্ট ব্যগ্রতা আছে। অতএব এরূপ স্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইবে;—বলবান্ দুর্ব্বলকে নিপীড়িত করিবে। জোত বিক্রয়ের পরেই জমীদার বলিবে, আমাকে এত টাকা দাও, নতুবা আমি জমী কিনিয়া লইব। নিতাই পূর্ব্ব হইতেই জানে যে, জমীদার এইরূপ ভয় দেখাইবে এবং অন্ততঃ ৩০৲ টাকা নজর না দিলে তাহাকে ক্ষান্ত করা যাইবে না। অতএব যদিও জমীর জন্য ২ শত টাকা দিতে নিতাই প্রস্তুত, তথাপি পরাণকে সে ১ শত ৭০৲ টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে না; বাকী ৩০৲ টাকা জমীদার বাবুর জন্য মজুদ রাখিতে হইবে। এখন এই ১ শত ৭০৲ টাকার মধ্যে কত টাকা পরাণের বাক্সে পৌঁছে, দেখা যাউক। বিক্রয়মূল্য ১ শত ৭০৲ হইলে জমীদারকে ৩৪৲ টাকা সেলামী দিতে হইবে। উপরের (৩) দফায় বর্ণিত উপসেলামী বাবতেও কমপক্ষে ১০৲ টাকা ধরিয়া রাখুন। তাহার পর রেজেষ্টারী আফিসে টাউট কর্ম্মচারিগণের পাণ-সিগারেটের খরচ, নিজের যাতায়াতের খরচ ও বৃথা সময়-নষ্টের জন্য রোজগারের ক্ষতি ইত্যাদি হিসাব করিলে, ৪।৫ টাকা হইবে। সর্ব্বশেষে পরাণ মণ্ডলের যাহা রহিল, তাহা প্রায় ১ শত ৩০ টাকা; অর্থাৎ ২ শত টাকা মূল্যের জোত বিক্রয় করিয়া প্রজা ১ শত ৩০৲ টাকা পাইল।

যথার্থ বিক্রয়মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ আইনতঃ জমীদারের প্রাপ্য। জমী ২ শত টাকা মূল্যে বিক্রয় হইলে জমীদার ৪০ টাকা সেলামী পাইত। যাহাতে ন্যায্য সেলামী হইতে জমীদার বঞ্চিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ক্রেতার নিকট হইতে কর আদায় কবিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া হইতেছে, ব্যবস্থাপকবর্গ তাহা বিবেচনা করেন নাই—অথবা বিবেচনা যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলা সমীচীন মনে করেন নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেখুন, জমী-দারের ন্যায্য সেলামী মাত্র ৪০৲ টাকা ছিল, কিন্তু জমীদার সেখানে ৬৪৲ টাকা (পরাণ মণ্ডল হইতে ৩৪৲+নিতাই মণ্ডল হইতে ৩০৲) আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতি-রিক্ত ২৪৲ টাকা বাস্তবিকপক্ষে পরাণ মণ্ডলের পকেট হইতেই আসিয়াছে। ইহা কোন্ ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা কোনও স্বরাজী নেতা বলিয়া দিবেন কি? যাহারা নিষ্ক্রিয় ও একমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে যাহারা অধিকারবান্—তাহাদের যথার্থ অথবা কল্পিত ক্ষতিই একমাত্র ক্ষতি; কিন্তু যে পরাণ মণ্ডল রৌদ্রবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় লোকের খাদ্য উৎপাদন করিতেছে, তাহার পক্ষে ১৪৲ টাকার লোকসান কোনরূপ ক্ষতি নহে!

জমীদারের কল্পিত স্বার্থ রক্ষা করিবার অজুহতে প্রজার প্রতি কিরূপ অন্যায় করা হইতেছে এবং জোতস্বত্বের ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া টাকা উশুল করিবার কিরূপ ভয়ানক অস্ত্র জমীদারের হাতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা

আরও গুরু অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গদেশে প্রতি বর্গ-মাইলে প্রায় ৫ শত ৮০ জন লোকের বাস। অন্যান্য যে কোন দেশের সহিত তুলনা করিলেই এই জনসংখ্যা অত্যধিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যেহেতু, দেশের সমস্ত শিল্পবাণিজ্য প্রায় লোপ হইয়াছে এবং যাহা আছে, তাহাও বিদেশীয়দের হাতে, তখন প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপরেই জীবিকার জন্য নির্ভর করিতে হয়। এই হিসাবে লোকসংখ্যার অনুপাতে জমীর পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। দিন দিন যতই লোকসংখ্যা বাড়িবে, এই অভাব ততই বেশী অনুভূত হইবে। দেশের জমীর পরিমাণ বাড়াইবার কোন উপায় নাই। জনতা যত বাড়িবে, জমীর জন্য কাড়াকাড়িও ততই বাড়িয়া চলিবে। জমীর খাজানা ও জমীর মূল্য আপনা হইতেই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। জমীদারদের যদি যথেষ্ট খাজানা বাড়াইবার অধিকার থাকিত, তবে বাঙ্গালাদেশে জোত জমীর খাজানার হার অনেকগুণ বাড়িয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে জমীদারবর্গ ক্রমশঃ খাজানার হার বাড়াইয়া প্রজাকে শোষণ করিয়া আসিতেছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইন প্রচলিত হওয়া অবধি এই শোষণ অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান আইনের ফলে কিন্তু তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

জোতস্বত্বের খরিদবিক্রয় প্রায়ই হইয়া থাকে। অগ্রক্রয়ের অধিকার বশতঃ প্রত্যেক খরিদবিক্রয়ের সময়েই জমীদার রায়তের জোতজমী নিজ অধিকারে আনিবার সুযোগ পাইবে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জমীদার কোনরূপ ইতস্ততঃ করিবে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, জমীদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার থাকাতে—জোত স্বত্বের বাজার দর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা সর্ব্বদাই কম থাকিবে। যে জমীর প্রকৃত মূল্য ২ শত টাকা, তাহার বিক্রয়মূল্য সাধারণতঃ ১ শত ৭০ টাকার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিক্রয়ের ২ মাসমধ্যে বিক্রয়মূল্যের শতকরা ১০ টাকা অধিক দিলেই জমীদার জমী কিনিতে পারিবে। কিন্তু অপরপক্ষে বিক্রয়মূল্যের শতকরা ২০ টাকা জমীদারের সেলামী বাবত প্রাপ্য। অতএব বিক্রয়মূল্যের শতকরা ৯০ টাকা দরে জমীদার জোতজমী হস্তগত করিতে পারিবে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, যে জমীর প্রকৃত মূল্য ২ শত টাকা, জমীদার তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব ১ শত ৫৩ টাকায় কিনিতে পারিবে। জমীদার যদি পুনরায় এই জমী কোন জোতদারকে দিতে চাহে, তাহা হইলে খাজানার হার যথেষ্ট বাড়াইয়া দিবে, যাহাতে টাকার সুদ উশুল হইয়া আরও প্রচুর লাভ থাকে। জমী বন্দোবস্ত দিবার সময়ে বেশ দুই টাকা নজরানাও পাওয়া যাইবে।

জমী নিজের হাতে রাখিলেও জমীদারের যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। যেহেতু, জমীর মূল্য দিন দিনই বাড়িতেছে, অতএব পরে উহা বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইবার আশা আছে। বিশেষতঃ জমী নিরুপদ্রবে বর্গাদারের নিকট দিয়া ফসলের অর্দ্ধেক দাবী করিবার সুযোগ নূতন আইনে দেওয়া হইয়াছে। নূতন আইন অনুযায়ী বর্গাদারের কোনরূপ জোতস্বত্ব নাই। বর্ত্তমানে মহাজন যেমন জমী বন্ধক রাখিয়া কিংবা দাদন দিয়া জমীর ফসল হইতে কৃষককে অনেকাংশে বঞ্চিত করে, ভবিষতে জমীদার একাধারে জমীর মালিক ও মহাজন হইয়া কৃষকের যথেষ্ট ক্ষতি করিবে। বহু অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করিবার পর নিজের জমীতে যেটুকু অধিকার বাঙ্গালার কৃষক পাইয়াছিল, অগামী ২৫।৩০ বৎসর মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। জমীদার, পত্তনীদার, মিরাশদার, কোর্ফাদার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তীর দল বাঙ্গালার মাটীর ষোল আনা মালিক হইয়া বসিবে—আর প্রজা তাহার জোতস্বত্ব হারাইয়া বর্গাদার কিংবা 'কুলী চাষীর' (serf) অবস্থায় পরিণত হইবে।

স্বরাজ্য দলের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আমাদের জমীদারবর্গ গরীব, নগদ টাকা তাহাদের নাই, অতএব ইচ্ছা থাকিলেও অগ্রক্রয়ের অধিকারের অপব্যবহার তাহারা করিতে পারিবে না। এইরূপ অদ্ভুত যুক্তির কোন উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে যথেষ্ট লাভ হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে মূলধনের টাকার অভাব হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। শুধু লোকদেখানো ও লোকভুলানো যুক্তি। সুযোগ পাইলে জমীদারবর্গ প্রজাকে কি রকম শোষণ করিতে ব্যগ্র, তাহা যাঁহারা বিগত শতাব্দীর ইতিহাস পর্য্যালোচন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। জমীদার যদি বাস্তবিক কৃষি ও কৃষকের হিতকামী হইত, তাহা হইলে কোনরূপ প্রজাস্বত্ব আইন বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত করিবার প্রয়োজন হইত না। জমীদার কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিবে, প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিবে, এইরূপ আশা করিয়াই লর্ড

কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই আশা কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া জমীদারদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করা ভার।

বিক্রয়-মূল্যের একপঞ্চমাংশ সেলামী ও অগ্রক্রয়ের অধিকার, এই দুইটি প্রধান অধিকার জমীদারকে নূতন আইনের বলে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ছোট-খাট অনেক নূতন অধিকারই জমীদারকে নানা ভাবে দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, যেমন জোতদার জমী পরিত্যাগ করিলে রায়তের নিকট হইতে সেলামী লইবার অধিকার (Clause 57 (c) of the Bill), কিংবা কোন জমীতে একাধিক জোতদার থাকিলে যে কাহারও নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার (Joint, and several liability for rent of co-sharer tenants in a tenure or holding; Clause 91 of the Bill)। আরও অনেক বিষয় আছে—যাহার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করা এখানে সম্ভবপর নহে। আইনের খসড়াটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই ধারণা হয় যে, জমীদারদের অধিকার বাড়াইবার নিমিত্তই ইহা প্রণীত হইয়াছে।

প্রজাদিগকে কি কি নূতন অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহা একবার তলাইয়া দেখা যাউক। গাছ কাটিবার, পুষ্করিণী খনন করিবার, পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিবার এবং জোত হস্তান্তর করিবার অধিকার নূতন আইনে প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমোক্ত তিনটি অধিকার চিরকালই প্রজার থাকা উচিত ছিল; নিতান্ত স্বার্থান্ধ ও ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া জমীদারগণ প্রজাদিগকে এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। বাড়ীতে পুকুর কাটাইলে কিংবা পাকা ইমারত তৈয়ার করাইলে জমীর মূল্যহ্রাস এবং তজ্জন্য জমীদারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কোন কালে ছিল না এবং থাকিতে পারে না। পূর্ব্বকালে গ্রামের জমীদার ও অন্যান্য সঙ্গতিপন্ন লোক পুকুর কাটাইতেন এবং সমস্ত গ্রামবাসী সেই সকল পুকুরের জল ব্যবহার করিতেন। এখন আর জমীদার গ্রামে কখনও 'পা' দেন না। চৈত্রমাসে যখন জলাভাবে লোক হাহাকার করে, তখন জমীদার বাবু দার্জ্জিলিং কিংবা মুসুরী পাহাড়ে ইংরাজ হোটেলওয়ালার লেহ্যপেয় উপভোগ করেন। প্রজা যে নিজের টাকায় পুকুর কাটাইয়া জল পান করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। বাসোপযোগী ঘরবাড়ী তৈয়ার করিবার অধিকার প্রজা পূর্ব্বেও ছিল (প্রজাস্বত্ব আইন ৭৬ ধারা দ্রষ্টব্য); তবে পাকা বাড়ী তৈয়ার করিবার অধিকার ছিল না। যাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নাই, খড়ের ঘর বজায় রাখা যাহাদের পক্ষে দুরূহ, তাহাদের পক্ষে পাকা বাড়ী তৈয়ার করিবার অধিকার যে একটা খুব আদরণীয় ও লাভজনক ব্যাপার, তাহা মনে করিবার কোন হেতুই নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত অধিকার ন্যায়তঃ চিরকালই প্রজার প্রাপ্য ছিল এবং ইহা দেওয়াতে জমীদারের কোনই ক্ষতি হয় নাই। যাঁহারা হৃদয়বান্ জমীদার, তাঁহারাও এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "গাছকাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অন্তরায়গুলো কোনমতেই সমর্থন করা চলে না।"

বাকী রহিল জোত হস্তান্তরের অধিকার। এই অধিকার যে সর্ব্বাবস্থায়ই খুব কল্যাণজনক, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাতে প্রজার ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা বেশী। জোত যদি খোলা বাজারে বিক্রয় হয়, তবে ইহা কৃষকের হাতে না গিয়া মহাজন কিংবা জমীদারের হাতে যাওয়ারই সম্ভাবনা। জমীদার কিংবা মহাজন ইহা নিজে চাষ করিবে না, বর্গা দিবে। অর্থাৎ এক জন জোতস্বত্ববান্ প্রজার (Occupancy Ryot) যায়গায় এক জন বর্গাদারের সৃষ্টি হইবে। পাঞ্জাবে মহাজন ও মধ্যবর্ত্তীদের হাত হইতে মাটীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আইন [Land Alienation Act] করিয়া জমীর অবাধ খরিদ-বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে মধ্যবর্ত্তীর সংখ্যা কিছু কম নহে; তাহাদের দর আরও বাড়াইবার কোন আবশ্যক নাই। কিসে মধ্যবর্ত্তীর সংখ্যা কমাইয়া কৃষককে জমীর মালিক করা যায়, তাহাই চিন্তনীয় বিষয়। অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই রাখিয়া কৃষককে শুধু জোত হস্তান্তরের ক্ষমতা দিলেই তাহাকে মুক্তির পথে টানিয়া লওয়া হইবে না। বর্ত্তমানে তাহাকে এই অধিকার দিবার ছল করিয়া তাহার অধোগতির উপায় করা হইয়াছে। জমীদারের সেলামী এবং 'অগ্রক্রয়ের অধিকার'ই একমাত্র বাস্তব; প্রজার অধিকারটি নিতান্তই মাকালফল বলিয়া আমাদের মনে হয়।

নূতন আইনে জমীদার ও প্রজার স্বার্থের কিরূপ আপোষ

মীমাংসা (Compromise) হইয়াছে, পাঠকবর্গ এইবার বিবেচনা করুন। এই মীমাংসা রায়তরা কোন দিন চাহে নাই। গায়ে পড়িয়া জমীদারদলের এই মীমাংসা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

এখন কয়েকটি গোড়ার কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। আইন খুব প্যাঁচালো করিলেই তাহাতে দেশের কল্যাণ হয় না। ইহাতে শুধু উকীল-মোক্তারেরই লাভ হয়, বাস্তবিক যাহারা ধনের স্রষ্টা (অর্থাৎ কৃষক, শিল্পী, মুটে, মজুর), তাহাদের ইহাতে লোকসানই হয়। বিগত শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশের জমী-সম্বন্ধীয় আইনের আলোচনা করিতে গিয়া স্যার রোপার লেথব্রিজ (Sir Roper Lethbridge) বলিয়াছিলেন যে, যদি উকীলমোক্তারের স্বর্গ কোথাও থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালা-দেশে। এখানে জমীজমা লইয়া যত মামলা-মোকদ্দমা ও অর্থের অপব্যয় হয়, তত আর কোথাও হয় না। নূতন আইনের ফলে মামলা-মোকদ্দমা আরও বাড়িয়া যাইবে।

২। কোন রকম জমীবন্দোবস্ত প্রণালীর দোষগুণ বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখা উচিত, ইহাতে কৃষির উন্নতি হওয়ার এবং কৃষকের লাভবান্ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু আছে। কৃষির উপর নূতন আইনের কিরূপ ফলাফল দাঁড়াইবে, তাহার কোন আলোচনা কাউন্সিলের ভিতরে কিংবা বাহিরে হয় নাই। শুধু আইনের তর্ক এবং জমীদার ও প্রজার আইনগত বাস্তবিক কিংবা কাল্পনিক অধিকার লইয়া মারামারি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ লোককে এতই অন্ধ করিয়াছে যে, কোনরূপ উদার ভাব কিংবা ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া বিষয়টিকে ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক দল লোক আবার এমন দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহারা কৃষকের অধিকার বাড়াইবার যে কোন প্রস্তাবেই বলশেভিজমের বিভীষিকা দেখিতে পান, এবং চীৎকার আরম্ভ করেন; অথচ নিজে সম্ভবতঃ বলশেভিজম্ কথার মানেই বুঝেন না কিংবা বুঝিবার চেষ্টা কখনও করেন না।

৩। সরকারপক্ষের অনুকরণ করিয়া এক দল লোক কৃষির উন্নতির জন্য প্রজাকে সমবায়পদ্ধতি অবলম্বন করিবার সদুপদেশ দিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, জমীবন্দোবস্ত প্রণালীর সংস্কার করিতে গেলে বৃথা সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি হয়। অতএব ইহা না করিয়া সমবায় প্রভৃতি উপায়ে কৃষির উন্নতি করাই সমীচীন। ইঁহারা ভিত্তি ঠিক না করিয়াই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। জার্ম্মাণী, আয়র্লণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমবায়মূলক কৃষি কৃতকার্য্য ও ফলদায়ক হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত দেশেই কৃষক জমীর সর্ব্বময় মালিক। যাঁহারা সমবায়প্রথা ভাল রকম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, যেখানে কৃষক জমীর সম্পূর্ণ মালিক নহে, সেখানে সমবায়মূলক চাষ-আবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। বাঙ্গলাদেশে কৃষক ও জমীদারের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী জোতদারের সংখ্যা অনেক; অনেক স্থলে বারো, চৌদ্দ কিংবা ততোধিক। ইহাও সমবায় প্রথার অন্তরায়। পাঞ্জাবে যেমন Consolidation of Holdings Actএর সাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড জমীকে একত্র করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বাঙ্গালাদেশে অসংখ্য মধ্যবর্ত্তী জোতদার থাকাতে সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবারও অন্তরায় অনেক। অতএব পথে ঘাটে যে সমবায়ের উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা নিতান্তই মুখের কথা কিংবা মূর্খের উপদেশ।

এই সমস্ত গোড়ার সমস্যার সমাধান করিবার কোন চেষ্টা নূতন আইনে হয় নাই। শুধু জমীদারদের ভাগ বাড়াইবার ব্যবস্থাই হইয়াছে। এই অন্যায় এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইনের যদি আশু সংশোধন না হয়, তবে কৃষকের সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

নিষিদ্ধ নগর

মানুষ স্বভাবতঃই অনুসন্ধিৎসু জীব—গুপ্ত বস্তুর রহস্য উদ্ধার করাই মানুষের প্রবৃত্তি। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ যাহা বুঝিতে পারে না, যাহা তাহার অন্তর ও বাহিরের দৃষ্টির অতীত, তাহাই বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, সে জন্য সে অসাধ্যসাধন করিতে, শ্মশানে শবসাধনায় বসিতে, দুঃখ-বিপদ বরণ করিতেও কখন পরাঙ্মুখ হয় নাই, অজানা অচেনার গুপ্ত কথা জানিবার আগ্রহ এতই প্রবল।

রত্নগর্ভা বসুন্ধরার অথবা অনন্ত রত্নাকরের গর্ভে লুক্কায়িত অনন্ত অপরিমেয় রত্নের উদ্ধারসাধন করিতে মানুষ কত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সৃষ্টির আদিযুগে যখন আর্য্যজাতি অনন্ত তেজের আকর দিবাকরের জ্যোতি কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া আকুল অন্তরে ভাবিয়াছিল,—কে তুমি, কোথা হইতে আগমন কর, কোথায় যাও,—তখনও মানুষের এই অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ, গোবীর মরুময় বালুকান্তরে, মানুষ কোথায় না অজানার রহস্যভেদ করিতে ইতস্ততঃ করে? এই জানিবার প্রবৃত্তি মানুষের রক্ত-মাংসের সহিত জড়িত, তাহার মজ্জাগত। তাই বহুকাল হইতে মানুষ জগতের নিষিদ্ধ নগর লাসার রহস্যোদ্ঘাটনে শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে।

এ যাবৎ জগতে আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল এবং তিব্বতের রাজধানী লাসা বিদেশীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। বরং কাবুলে দৌত্যকার্য্যের অছিলায় অথবা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিদেশীর পদার্পণ সম্ভব হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে কাবুল সকলের পক্ষে সুগম হইয়াছে, কিন্তু লাসা সত্য সত্যই এখনও 'নিষিদ্ধ নগর' রহিয়া গিয়াছে। যে দুই এক জন বিদেশী ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা হয় প্রাণ হারাইয়াছেন, না হয় অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়াছেন বা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। কেহ কেহ নিষিদ্ধ নগর না দেখিয়া কেবল তিব্বতের কতকাংশ দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আর যদি কেহ তথায় পদার্পণ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি লাসার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। লাসার চিত্র সংগ্রহ করা ত এত দিন অসম্ভব বলিয়াই জানা ছিল। বিখ্যাত সুইডেন দেশীয় পর্য্যটক স্বেন হেডিন (Sven Hedin) তিব্বত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার একখানি পরম মনোরম ভ্রমণবৃত্তান্তের গ্রন্থও আছে। তাহাতে তিনি কত কষ্ট—কত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার সহজে বাহিত হইবার যোগ্য ক্যাম্বিসের নৌকায় সান্‌পু (তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের অংশের নাম) নদ বাহিয়া কিরূপে তাহার উৎপত্তিস্থান মান-সরোবরে পাড়ি দিয়াছিলেন, কিরূপে তুফানে পড়িয়া তাঁহার নৌকা-ডুবি হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কোন কোন পর্য্যটকের বর্ণনায় মানসরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া থাকার কথা ভিত্তিহীন বলিয়া তিনি কেমন মিথ্যার মুখোস খুলিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, মানসরোবরের তটে কৈলাসপর্ব্বতমূলে প্রায় এক মাইলব্যাপী বৌদ্ধ মঠের বর্ণনা তিনি কি সুন্দরভাবে করিয়াছেন,—তাহা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় লাসার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য বা চিহ্ন পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা ডেভিড-নোয়েল নাম্নী এক বর্ষীয়সী পাশ্চাত্য-মহিলা ছদ্মবেশে তাঁহার তিব্বতভ্রমণ ও লাসা-দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিব্বতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি হিমালয়ের এক গুহায় এক সাধুর মন্ত্রশিষ্যারূপে ২ বৎসরকাল বসবাস করিয়াছিলেন। অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে তিনি ঐ সাধুর নিকট তিব্বতের ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ইত্যাদির বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি তিব্বতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, তিব্বতীয়ের মত আহার-বিহারে অভ্যস্ত হইয়া, নিজের শ্বেতবর্ণকে কৃত্রিম উপায়ে তিব্বতীয়দের বর্ণে পরিণত করিয়া, তিব্বতীয়দের মত কৃষ্ণবর্ণে নিজের কেশকে পরিণত করিয়া তিব্বত-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ধরা পড়িলে প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, এ কথা জানিয়াও তাঁহার অনুসন্ধিৎসার প্রবল আগ্রহের নিবৃত্তি হয় নাই। পথিপ্রদর্শকরূপে তিনি একটি তরুণ তিব্বতীয় পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাহাকে তিনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নাম ইয়ংডেন। মাতা-পুত্রে অতঃপর হিমালয় পার হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করেন। চারিমাসাধিককাল তাঁহারা দুই জনে নানা দুঃখ-বিপদের মধ্য দিয়া তিব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়েন

নামক স্থানে উপস্থিত হন। তাঁহাদের এই চারিমাসকালের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথার সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই। আমরা কেবল তাঁহার ডেচেন হইতে লাসা-যাত্রার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া লাসার পরিচয় প্রদান করিব। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এত মনোহর যে, উপন্যাসের বর্ণনাও ইহা হইতে কৌতূহলপ্রদ কি না সন্দেহ। লাসার এমন বর্ণনা মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম, এ কথা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের ভূমিকা-লেখকই বলিয়াছেন।

তখন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, উজ্জ্বল; বায়ু শীতল। শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা ও তাঁহার পোষ্যপুত্র ইয়ংডেন

মঠাধ্যক্ষ ও সন্ন্যাসিগণ

ঠিক সেই সময়ে ডেচেন হইতে লাসার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভোরের কন্‌কনে হাওয়ায় তাঁহাদের হাত-পা অসাড় হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু লাসা দেখিবার আগ্রহে তাঁহাদের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। যতই লাসার দিকে তাঁহারা অগ্রসর হন, ততই তাঁহাদের বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইতে থাকে। কিছু পথ অতিক্রম করিবার পর দূর হইতে বালারুণালোকে রাজধানী লাসার সৌধপ্রাসাদসমূহ ঝকমক করিতে লাগিল। শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের মত আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঐ প্রাসাদটির নাম কি ?" ইয়ংডেন বলিল, "বোধ হয়, পোটালা প্রাসাদ। উহাই দালাইলামার রাজপ্রাসাদ।"

আনন্দের আতিশয্যে শ্রীমতী বলিয়া ফেলিলেন, "এ্যাঁ, সত্যই কি আমরা তাহা হইলে আমাদের ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হইতে যাইতেছি ?"

ইয়ংডেন বলিল, "চুপ ! এখন বেশী কথা কহিবেন না। এখনও আমাদের কাই নদী পার হইতে হইবে। হয় ত সেখানে এক দল শান্ত্রী পাহারার নিকটে পরীক্ষা দিতে হইবে।"

নীরবে 'মাতা-পুত্রে' অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যতই অগ্রসর হন, ততই পোটালা প্রাসাদ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ আকার ধারণ করিতে লাগিল। ক্রমে দূর হইতেই পোটালার সুবর্ণমণ্ডিত ছাদসমূহ স্পষ্টই তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। সে কি

তিব্বতীয় মহিলা

সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য ! তিব্বতের গৌরব এই রাজপ্রাসাদের সুবর্ণময় ছাদের চারিদিক হইতে যেন অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল।

অশ্বাকৃতির চিত্রে চিত্রিত এক খেয়া-নৌকায় তাঁহারা কাই নদী পার হইলেন। শীতের শেষ, নদী শীর্ণকায়া, শান্ত, স্থির, পারাপারে কষ্ট নাই। খেয়া-নৌকায় তাঁহাদের সহিত বহু তিব্বতীয় নর-নারী ও গোমেষাদিও পার হইল। নদীর উভয় তটে শান্ত্রীপ্রহরী কিছুই ছিল না। প্রতিবৎসরই অসংখ্য আর্জ্জপা (যাত্রী) এই কাই-চু নদী পার হইয়া পবিত্র লাসাতীর্থ দর্শন করিতে যায়। অন্যান্য যাত্রী তাঁহাদিগকেও তাহাদের মত তীর্থযাত্রী বলিয়া মনে করিল।

তখন যদিও তাঁহারা লাসার হৃদ্দায় পৌঁছিয়াছেন, তথাপি তখনও লাসা বহুদূরে অবস্থিত। নদীর অপর তটে পদার্পণ করিতেই ঝড় উঠিল। সে ঝড় শ্রীমতী আলেকজান্দ্রার নিকটে সাহারার সাইমুমের মতই অনুমিত হইল,—বাতাসে ধূলিবৃষ্টি হইয়া গেল। সেই ধূলাবালির ঝড়ের মধ্যে যাত্রীরা মুখে চোখে কাপড় ঢাকিয়া ন্যুব্জ-দেহে অতিকষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক হস্ত অন্তরেও মানুষ দেখা যায় না, এমনই অন্ধকার নামিয়া আসিল। এই ঝড়ই পরে তাঁহাদের পরম সহায় হইয়াছিল, কেন না, ইহার আশ্রয়ে তাঁহারা নির্ব্বিবাদে লাসায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুই মাসকাল

নৃত্যশীল বালকদল

তাঁহারা লাসায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ তিব্বতীয় তীর্থযাত্রী ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া ধরিতে পারে নাই। বিশেষতঃ তখন নূতন বৎসর—তখন লাসায় নববর্ষের নানা উৎসব ও মেলা হইতেছিল। সেই অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ে কে কাহার তত্ত্ব লইবে? তীর্থযাত্রীরা থাকিবার স্থান না পাইয়া লোকের গোশালায়, আস্তাবলে, এমন কি, বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহারা সহরে একটা থাকিবার স্থানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ন স্থানং তিলধারণে! ভাগ্যক্রমে এক দরিদ্র রমণী তাঁহাদিগকে সহরের বাহিরে এক ভগ্ন কুটীরে থাকিবার জন্য একটি ঘর দিল। তীর্থযাত্রীর দণ্ডধারিণী, পথিকষ্টে শীর্ণকায়া, বর্ষীয়সী আলেকজান্দ্রাকে সে মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিল। পথে যাত্রাকালে তিব্বতীয় রমণীরা কৃষ্ণবর্ণের গালায় মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিয়া থাকে। সেই রমণীও আলেকজান্দ্রার মুখ ঐ ভাবে রঞ্জিত দেখিয়া তাঁহাকে য়ুরোপীয় মহিলা বলিয়া ধরিতে পারিল না। আর সেই জীর্ণ দরিদ্র-কুটীরে কোনও য়ুরোপীয় মহিলা বাস করিবে, ইহা সহরের শান্তিরক্ষকদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। সেই কুটীর হইতে সৌধ-কিরীটিনী লাসার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং পোটালার সুবর্ণ-শীর্ষের দৃশ্য উপভোগ করিবারও বিশেষ সুযোগ ছিল।

হিন্দুর যেমন বারাণসী, মুসলমানের যেমন মক্কা, রোমান-ক্যাথলিকদিগের যেমন রোম, লাসাও তেমনই লামাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। কিন্তু সে হিসাবে সহরটি আয়তনে বড় নহে। তথাপি কাই-চু নদীর তটে অবস্থিত লতাপাদপ-হীন উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-বেষ্টিত এই লাসা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র, ইহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। বিশেষতঃ পোটালা প্রাসাদের অবস্থিতি হেতু লাসা পৃথিবীর মধ্যে দ্রষ্টব্য সহর সন্দেহ নাই।

লাসা যে উপত্যকার ক্রোড়ে অবস্থিত, তাহার মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে; একটির নাম 'সাই পোটালা', অপরটির নাম 'চোগ বু রি'। প্রথমটির উপর পোটালা অবস্থিত; অপরটির উপর বৌদ্ধ লামাদিগের ভেষজ-বিদ্যালয় অবস্থিত। এই দুইটি হর্ম্ম্য এবং তিব্বতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র মন্দির "ঝোখং" এত সুন্দর ও বিস্ময়কর যে, ইহাদের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, ইহাদের সৌন্দর্য্য স্বয়ং দেখিয়া নয়ন-মন চরিতার্থ করা যায়।

পোটালা প্রাসাদ

মনে করুন, শঙ্খশ্বেত উজ্জ্বল কতকগুলি হর্ম্ম্যের বেদীর উপর একটি স্বপ্নরাজ্যের পুরী,—যাহার শীর্ষদেশ অস্তগামী সূর্য্যাংশুর ন্যায় গলিত সুবর্ণের আভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া ঝকমক করিতেছে,—তবেই পোটালা প্রাসাদের কতকটা ধারণা হইবে। পোটালা ও ঝোথংএর সুচিত্রিত কক্ষ অলিন্দ প্রভৃতিকে মনে হইবে যেন, দেবশিল্পীরা আসিয়া চিত্রাঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দালাই লামার প্রাসাদ এত বিশালকায় যে, ইহার অভ্যন্তরস্থ কক্ষ, অলিন্দ, নাটমন্দির, গর্ভ-গৃহ, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে, ইহার প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত দেব-দেবী ও সাধু ভিক্ষু-সমূহের জীবন-কথা-সমন্বিত চিত্রেতিহাস বুঝিয়া পাঠ করিতে বহু সপ্তাহ অতিক্রম করিতে হয়। ইহার অভ্যন্তরে অসংখ্য দেবস্থান (হ্লা খং) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। তন্মধ্যে বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত বৌদ্ধ দেবদেবীর বহু প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহাদের অঙ্গ বহুমূল্য মণি-মাণিক্য-খচিত স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত। একটি কক্ষে বর্ত্তমান দালাই (কেহ কেহ বলেন, দলুই) লামার পূর্ব্ববর্ত্তী দালাই লামাগণের প্রতিমূর্ত্তি সমূহ সংরক্ষিত আছে। বর্ত্তমান দালাই লামারও একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু সেটি ক্ষুদ্রাকারের। কোন কোনও অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষে বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের তিব্বতীয়দিগের ধর্ম্মোক্ত ভূতপ্রেতাদিরও প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই প্রাসাদের ছাদ এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত যে, ইচ্ছা করিলে উহার উপর একটি 'ছাদোদ্যান' (Hanging garden) অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়;—সেই ছাদোদ্যান এমন সুন্দর হইতে পারে যে, তাহার তুলনা জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা, ইয়ংডেন ও অপর দুইটি গ্রাম্য তিব্বতীয়ের সহিত পোটালা প্রাসাদ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রথমে পুরুষ তিনটি ও শেষে আলেকজান্দ্রা। যখন তাঁহারা প্রাসাদের দীর্ঘ সোপান বাহিয়া উপরের সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দ্বারদেশে একটি ১০।১২ বৎসরের পীতবসনধারী বালক বৌদ্ধ ভিক্ষু দাঁড়াইয়া ছিল। সে তিনটি পুরুষ যাত্রীকে দ্বার অতিক্রম করিতে দিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আলেকজান্দ্রা দ্বারপথে পদার্পণ করিলেন, অমনই বালক গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"মাথার শিরস্ত্রাণ নামাইয়া ফেল্, অর্ব্বাচীন! পোটালায় প্রবেশের নিয়ম জানিস্ না?" আলেকজান্দ্রা হতভম্ব হইয়া গেলেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পোটালায় নগ্ন-মস্তকে ভিন্ন প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। এ দিকে তিনি যে গালা দিয়া কেশ পিঙ্গলবর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও শুকাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং টুপী খুলিলেই তাঁহার স্বর্ণবর্ণ কেশরাশি বাহির হইয়া পড়িবে! সে কি সঙ্গীন অবস্থা! কিন্তু উপায় নাই, তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণ খুলিয়া তিনি কোনরূপে বালকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাত্রীর ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ইয়ংডেন তাঁহাকে দেখিয়াই শিহরিয়া

পোটালা প্রাসাদ—নিম্নে আলেকজান্দ্রা ও ইয়ংডেন

উঠিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! করেছেন কি? আপনাকে যে ভূতের মত দেখাচ্ছে। এখনই সবাই ধ'রে ফেলবে!"

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেহ তাঁহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। ইয়ংডেন প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্র এবং নানা দেবদেবীর তথ্য বুঝাইয়া যাত্রীদিগকে এমন মুগ্ধ করিয়া রাখিল যে, অন্য দিকে তাহাদের দৃষ্টি রহিল না। কত

পীতবসনধারী বালক লামা আলেকজান্দ্রাকে শিরস্ত্রাণ নামাইতে বলিতেছে

সোপান ও সঙ্কীর্ণ দ্বারপথ অতিক্রম করিয়া পোটালার শীর্ষদেশে উপস্থিত হইতে হইল, তাহা আর বলা যায় না। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহারা দেখিলেন, লাসার মঠ-মন্দিরাদি অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া কারুকার্য্যময় কার্পেটের মত বিস্তৃত রহিয়াছে! কি শোভা, কি শোভা! তাহা উপভোগ্য, বর্ণনীয় নহে।

কিন্তু এমন যে চমৎকার প্রাসাদ, বর্ত্তমান দালাই লামা ইহার সৌন্দর্য্যের উপাসক নহেন। তিনি মাঝে মাঝে এখানে বেড়াইতে আসেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি সহরতলীর এক প্রকাণ্ড পুষ্প-বাটিকায় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। যত্নাভাবে বাগানটি একটি প্রকাণ্ড জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। তাহার মধ্যে একটি ছোট-খাট পশুশালা আছে। একটি 'চিড়িয়াখানায়' প্রায় ৩ শত পক্ষী আছে। আশ্চর্য্য এই যে, সকলগুলিই পুরুষ-পাখী, নারী-পাখী একটিও নাই। সন্ন্যাসী দালাই লামার চিড়িয়াখানা কি না, তাই এই ব্যবস্থা! বহু যাত্রী ও, এমন কি, লাসাবাসীরাও তথায় গিয়া পক্ষীদিগকে ধান্য, মটর ইত্যাদি ছড়াইয়া খাইতে দেয়। দালাই লামার পক্ষী, সুতরাং তাহাদিগকে ভোগ দেওয়াও পুণ্যকার্য্যের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

গুম্ফা বা মঠ

লাসায় অনেকগুলি মঠ আছে। কিন্তু সহরের বাহিরের মঠ বা লামাসরাইগুলিই প্রসিদ্ধ। ইহাদিগকে গুম্ফাও বলে। একটি গুম্ফা পোটালা প্রাসাদ হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত, উহার নাম 'সেরা গুম্ফা'। দিপং গুম্ফা সহর হইতে ৬ মাইল দূরে ভারতে যাইবার পথে অবস্থিত। গ্যাল্ডেন গুম্ফা ২০ মাইল দূরে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

একটি বৃহৎ গুম্ফা বা মঠ ঠিক একটি বড় সহরের মত। কোন কোন মঠের অধিবাসীর সংখ্যা দশ সহস্রেরও উপর। এই মঠের মধ্যে সহরের মত শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি অট্টালিকা, অনেক প্রশস্ত পথ, সঙ্কীর্ণ গলি, বাগবাগিচা, ভ্রমণের স্থান, বাজার-হাট, দোকান-পাট থাকে। মঠের মধ্যে বহু দেবদেবীর মন্দির, বিদ্যালয় (টোলের মত), সাধারণ লোকের ও বড় বড় উচ্চপদস্থ পুরোহিতের বাসস্থান আছে। বড় লোকের অট্টালিকার ছাদ সুবর্ণ-মণ্ডিত, তাহার উপর কত পতাকা বায়ুভরে পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হয়। লামারা যে সকল গৃহে বাস করেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু জনসাধারণের নিজস্ব বলিয়া কোন আবাস-গৃহ মঠের মধ্যে নাই।

কোন কোন মঠ ঠিক যেন একটি মিউজিয়াম বা যাদুঘর। এই সকল মঠে বহু শতাব্দীর মঠাধীশগণের সঞ্চিত শিল্পকার্য্য

প্রসিদ্ধ গ্যালেন মঠ

সমন্বিত বিস্তর দ্রব্য সঞ্চিত থাকে। সে সকল প্রাচীন নিদর্শন দেখিবার জিনিষ। কেবল দেখিবার নহে, এই নিদর্শন-গুলি যে প্রাচীন যুগের তত্ত্ব উদ্ঘাটনের বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও জানা যায়।

সুদূর মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, শ্যাম, ইন্দোচীন হইতে কত শিক্ষার্থী এই সমস্ত মঠে বিদ্যালাভ করিতে আসে। ভারতে যেমন প্রাচীন যুগে ছিল তক্ষ-শিলা, নালন্দা, এখানেও তেমনই এই সকল মঠ। মঠে লামারা পার্থিব চিন্তা হইতে নিরস্ত হইয়া জ্ঞানলাভে ও পরমার্থচিন্তায় জীবন উৎসর্গ করেন। প্রত্যেক তিব্বতীয় পরিবার হইতে অন্ততঃ একটি করিয়া পুত্রকে মঠের লামা করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ

করে না, এমন তিব্বতীয় নাই বলিলেই হয়। ৮।৯ বৎসর বয়স হইতে মঠের লামা হইতে ছেলে দেওয়া হয়। বৌদ্ধরা চিরজীবন সন্ন্যাসী থাকিতে পারিবে বলিয়া শপথ গ্রহণ করে না, ইচ্ছা করিলে তাহারা পরে সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে।

লাসার বাজার ও পথ

লাসার বাজার তত সুবিধার নহে। যে সকল পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রাচ্যের বড় বড় সহরের বাজারের আশ্চর্য্য কারুকার্য্যসমন্বিত চীনামাটীর বাসন, চীনা ছড়ি, চেয়ার, টেবল, স্ক্রীণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা লাসার বাজারে এ সুখ, এ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন না,

লাসার বাজার

কেন না, তিব্বতের অথবা লাসার বাজার-সমূহ বর্ত্তমানে সন্তাদরের আমদানী মালে ভরিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আলুমিনিয়ম ধাতুদ্রব্যের আমদানীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লাসার বাজারে নিকৃষ্ট দরের সুতির জামা এবং রান্নাবান্নার পাত্রাদিও পাওয়া যায়।

লাসার সামান্য একটু অংশ ব্যতীত রাজপথগুলি সুপ্রশস্ত, প্রায় মোড়ে মোড়ে একটি করিয়া প্রমোদোদ্যান। পথের মজা এই যে, সারাদিনই পথে মানুষের ভিড়। লাসা ছোট সহর, লোকসংখ্যাও কম, অথচ দিনে যখনই পথে বাহির হওয়া যায়, তখনই দেখা যায়, পথে লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে!

লাসার নব-বর্ষোৎসব

সহরবাসীরা হয় অকারণ হেথাসেথা ঘুরিয়া বেড়ায়, না হয় পথে বা বাগানে বসিয়া গল্প-গুজব করে। তাহাদিগকে দেখিতে খুব প্রফুল্ল ও আমোদপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। দিনের আলোয় তাহাদের পথে আনন্দ উপভোগের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই যে যাহার ঘরের কোণে প্রবেশ করে। পথে চুরি, ডাকাতী ও রাহাজানির বিলক্ষণ ভয় আছে। সহরবাসীরাই বলে, সহরের শান্তিরক্ষকরাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় চোর ও বড় ডাকাত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেই এই সব মহাপুরুষ নিরীহ পথিকের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়।

মেলা ও উৎসব

প্রতি বৎসর নববর্ষের প্রথম মাসের পুর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার পর লাসায় একটি উৎসব হয়। ঝো-খং মন্দিরের মধ্যে বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বের রাজপথে এ জন্য নূনাধিক এক শতটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর তৈয়ার করা হয়। ঐ ঘরের অঙ্গে নানা দেবদেবী, মানুষ ও পশুপক্ষীর মূর্ত্তি সজ্জিত করা হয়। মূর্ত্তিগুলি মাখনে প্রস্তুত হয় এবং ঐগুলিকে নানা বর্ণে চিত্রিত করা হয়। এই কাঠের ঘরগুলির নাম 'তোরমা।' মন্দিরের মধ্য-বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজপথগুলির নাম 'পারবর।' প্রত্যেক 'তোরমার' সম্মুখে একটি বেদীর উপর ঘৃতপ্রদীপ সমূহ প্রজ্বালিত করা হয়।

সন্ধ্যার পরে যখন 'পারবরের' আলোক-মালা জ্বলিয়া উঠে, তখন দলে দলে তিব্বতীয়রা পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। সুদূর মফঃস্বল হইতে কত তিব্বতীয়ই যে ঐ দিন লাসায় সমবেত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ, ঐ দিন উৎসব দেখিতে স্বয়ং দালাই লামা পথে শোভাযাত্রা করিয়া নির্গত হন। পথের উভয় পার্শ্বে পুলিস শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শান্তি রক্ষা করে। তাহাদের হাতে বড় বড় লাঠি ও চাবুক থাকে। শান্তিরক্ষার অর্থ, মাঝে মাঝে দর্শকদিগের অঙ্গে ঐ চাবুক ও লাঠির আঘাত পড়া! তাহার উপর বিশালকায় গোপালরা মেষচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া যখন শোভাযাত্রা করিয়া পথে বাহির হয়, তখন তাহাদের সম্মুখে যাহারা পড়ে, তাহাদিগকে ঘুসি, চড়, কিল মারিয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া দেয়। যখন দালাই লামার আসিবার সময় হয়, তখন

পুলিসের চাবুক ও লাঠি নির্ব্বিচারে চলিতে থাকে। লোক যতই দালাই লামার দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া লাইন ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে, ততই তাহাদিগকে শান্ত ও সংযত রাখিবার জন্য পরম হিতৈষী পুলিস হাতের সুখ করিয়া লয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কেন না, সকল দেশে সকল যুগেই পুলিসের প্রকৃতি এক। রাজা দুষ্মন্তের পুলিস ধীবরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা শকুন্তলা নাটকেই প্রকাশ।

তাহার পর ধর্ম্ম-রাজ দালাই লামার আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বহু পুলিস ও সৈন্য-সামন্ত দেখা দিতে থাকে,— অশ্বারোহী, পদাতিক, ভেরী-তূরী-বাদক, মশালচী, কোন কিছুরই ত্রুটি থাকে না। এক একটা ভেরী ১৫ ফুট লম্বা, ঐ গুলি কয়েক জন লোকের স্কন্ধে বাহিত হয়। তখন তোরণগুলির আলোক-মালা জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, মনে হয়, যেন লাসা সহরে আগুন লাগিয়াছে! তাহার পর পাত্রমিত্র, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, প্রধান সেনাপতি, সৈন্য-সামন্ত ইত্যাদি বেষ্টিত হইয়া দালাই লামা দেখা দেন। তখন চারিদিকে বোমা, দমা, পটকা ফাটিতে থাকে, ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠে। দালাই লামার শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে পরে ছোটখাটো শোভাযাত্রা সমূহ যাইতে আরম্ভ করে। সহরের গণ্যমান্য ধনিসম্প্রদায়ের এই সমস্ত শোভাযাত্রা। মহরমের বড় শোভাযাত্রার পরে যেমন ছোট ছোট তাজিয়ার শোভাযাত্রা যায়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা ইহাদের মধ্যে নেপালের মহারাজার দূতকেও দেখিয়াছিলেন। বড় বড় লামা, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, ধনী, মহাজন এবং তাঁহাদের পত্নী-কন্যারা বহুমূল্যবান্ পরিচ্ছদালঙ্কারে ভূষিত হইয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে এই সকল শোভাযাত্রায় যাত্রা করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদিগকে সেই আলোকসজ্জার মাঝে দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা পৃথিবীতে দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না।

সেই পূর্ণিমার 'চাঁদনী রাতে' লাসার আকাশ-বাতাস সুধাংশুর স্নিগ্ধ মধুর ধবলিমায় স্নাত প্লাবিত হইয়াছিল। যতক্ষণ চাঁদের আলো ও মানুষের রোশনাই দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ আলেকজান্দ্রা ও ইয়ংডেন মহা আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পথে চলিতে চলিতে তাঁহারা দেখিলেন, সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন এক বিরাট অন্ধকার-রাক্ষস গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সে দিন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ।
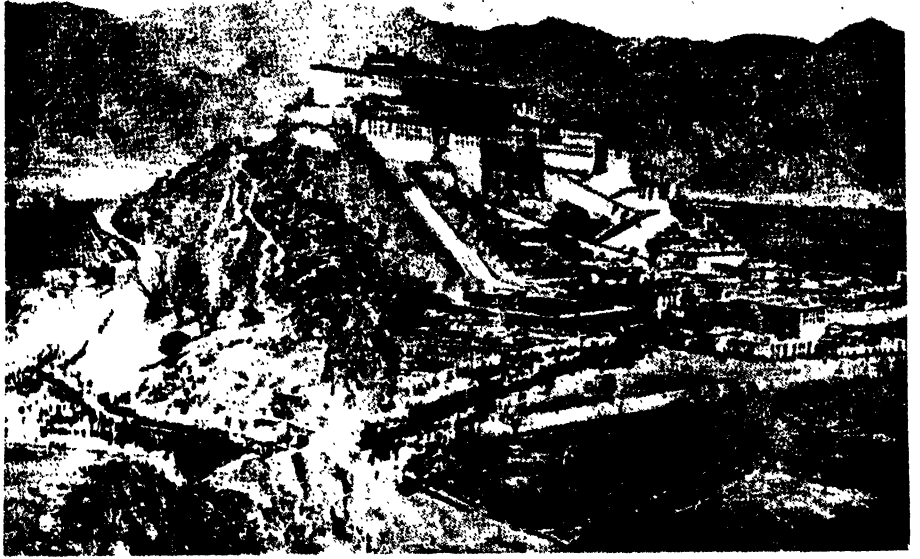
সার্পাং উৎসবের শোভাযাত্রা

সার্পাং উৎসব

লাসার 'সার্পাং' উৎসব দেখিবার জিনিষ। শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা বলেন, এত বড় এবং এমন নূতন ধরণের উৎসব তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। হাজার হাজার লোক একের পর একটি করিয়া সারি দিয়া ধ্বজা, পতাকা, স্বর্ণচ্ছত্র, চামরাদি হস্তে পোটালা প্রাসাদের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। মাঝে মাঝে চন্দ্রাতপতলে বড় বড় রাজপুরুষ ও লামা সন্ন্যাসী ধূপ-ধূনা-গুগ্‌গুলের ধুনী হস্তে স্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করেন। মাঝে মাঝে বাদ্যের সহিত বালকগণ নৃত্য করিতে থাকে। বহু সুসজ্জিত হস্তী শোভাযাত্রায় গমন করে।

তাহা ছাড়া কাগজে প্রস্তুত প্রকাণ্ডকায় ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ আদিকে লইয়া যাওয়া হয়, আর তাহাদের সঙ্গে নাচ-তামাসাও হয়।

পর্ব্বতশিখরে লাটুজা

সংখাপা

শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা বৎসরের ঐ মাসে প্রতিদিন ঝো-খং মন্দিরের সন্নিকটে এক চন্দ্রাতপতলে বেদীর উপর উপবিষ্ট সংখাপাকে কথকতা করিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশক। তাঁহার গদীর নাম সংখাপা, তাই তাঁহার ঐ নামেই প্রসিদ্ধি। তিনি যখন পথাতিক্রমণ করেন, তখন সেই পীতবাসপরিহিত সাধুর মস্তকের উপর স্বুবর্ণচ্ছত্র ধৃত হয়।

শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা তিব্বতে অবস্থানকালে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লাসা পৌঁছিবার পথে তিনি পর্ব্বতশিখরে অনেক 'লাটুজা' দেখিয়াছিলেন। এইগুলি সাধু-সন্ন্যাসীর সমাধি বলিয়া পরিচিত। কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্তূপের আকারে পর্ব্বতশিখরে সজ্জিত করা হয় এবং তাহার চারিদিকে বৃক্ষশাখায় লম্বিত নানা পতাকা ভূতপ্রেতের উপদ্রব হইতে তাহাকে রক্ষা করে। এই ভাবের প্রাচীন সংস্কারের নিদর্শন তিনি তিব্বতে অনেক দেখিয়াছিলেন।

আর একটা ব্যাপার শ্রীমতী আলেকজান্দ্রাকে চমৎকৃত করিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তিব্বতীয় সন্ন্যাসীরা স্বেচ্ছায় দেহের শীত বা আতপ হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারেন। বহুদিনের অভ্যাস বা যোগের ফলে তাঁহারা শীত-গ্রীষ্মকে সমান জ্ঞান করিতে সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারেন। তিনি তুষাররাশির মধ্যে নাগা সন্ন্যাসীদিগকে ধ্যানস্তিমিতনয়নে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। এমন এক দিন নহে, কত দিন, কত রাত্রি তিনি তাঁহাদিগকে সেই তুষাররাশির মধ্যে সম্পূর্ণ নগ্নগাত্রে যোগমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদিগের চারিদিকে শীতের তুষারবৃষ্টি হইতেছে, হাড়ভাঙ্গা কন্‌কনে বায়ু গর্জ্জন করিতেছে, অথচ তাঁহাদিগের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার তিনি এমনও দেখিয়াছেন যে, সন্ন্যাসীর শিষ্যদিগকে নদী বা হ্রদের বরফের মত ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া সেই কাপড় তাহাদের গাত্রে শুকাইয়া লইতে দেওয়া হইতেছে। ইহা দ্বারা তাহাদের শীত-গ্রীষ্মে সমান অনুভূতির পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। ইহা কি আমাদের প্রাচীন ভারতের ঋষি-তপস্বীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না?

তিব্বতের সৈন্য

তিব্বত পাশ্চাত্য প্রথায় তাহার সৈন্যগণকে খাকি পরিচ্ছদে মণ্ডিত করিয়াছে। তাহারা যখন ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে সগর্ব্বে পাদবিক্ষেপ করিয়া কুচ (মার্চ্চ) করে, তখন মনে হয়, যেন শীতের দেশে গ্রীষ্মমণ্ডলের বৃক্ষলতাকে 'হটহাউসে' আনিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে পুরাতন ইংলিস রাইফল। তিব্বতীয় সেনার কয়েকটা পার্ব্বত্য কামানও আছে। তিব্বতীয়রা এই কামানের গর্ব্বে একবারে আত্মহারা। কূপমণ্ডূক জাতি, বহির্জগতের রণপ্রণালীর উন্নতি দেখে নাই, কাযেই এই গর্ব তাহাদের স্বাভাবিক।

দুই মাসকাল নিষিদ্ধ নগরে অবস্থানের পর শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা গেয়াংসির পথে ভারতযাত্রা করেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

ভাদুড়ী মশাই

১৫

মধুপুরের জল-হাওয়া ভাদুড়ী মশায়ের দেহে কায করছে কি না, সেটা বাহিরের লোকের বোঝবার উপায় ছিল না। শরীরের বাড়তি কমতিটা ডাক্তারি মতে পাউণ্ড হিসাবেই হয়,—এ ক্ষেত্রে এক আধ পাউণ্ডের পাত্তা পাওয়া শক্ত।

কিন্তু পা দুটো তুলতে ফেলতে কেমন যেন বাধছিল—ভেরে গেলে যেমন হয়। একটু চলা-ফেরা বোধ হয় দরকার।

শালকাঠের নিরেট চৌকীখানায় বসেই মুখ-হাত ধুতেন। আজ আর অতটা যেতে গা বইল না, সামনের বারান্দায় উপু হয়ে ব'সে কায সারলেন। ওঠবার সময় কৃষ্ণনগরী আড়াইসেরী গাড়ুটায় দেহের চাপটা বাঁ হাতের মারফত চাপায়, তার পাঁচ ইঞ্চি গলাটা হঠাৎ গাড়ুর পেটের মধ্যে পৌছে গিয়ে সেটাকে বদ্‌না বানিয়ে দিলে।

মাতঙ্গিনী সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতেন, আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসে তাঁর বাপের দেওয়া দান-সামগ্রীর দুর্দ্দশা দেখে ব'লে উঠলেন,—"কি ক'রে এমন করলে? বাবা যে অনেক ঘুরে তোমার মাফিকসই জিনিষ এনেছিলেন। এ জিনিষ কি আর জন্মায়!"

"তখনকার মাফিকসই ত ছিল,—ওকে যে মধুপুরের ময়ড়া নিতে হবে, তা ত জানতেন না। যাক্, আবার জন্মাবে—জন্মাবে মাতু, সে দুঃখু কোরো না, লোক জন্মালেই জন্মাবে। এখন ধরো—উঠি।"

সে দৃশ্য টিকিট কিনে দেখতে হয়,—হরপে ফোটে না।

"বুঝলে মাতু, শরীরটে ভার্ ভার্ বোধ করছি।"

"অতো জল খেলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না। তেষ্টা পেলে দুধ খেলেই হয়—"

"সে তার নয়,—ওজনে—"

"তোমার বরাবর ঐ এক কথা! কিসে ভারটা বাড়বে শুনি! সে দিকে যেন আমার নজর নেই,—সবই ত নিজের ওপর নিচ্ছি—ফেলতে ত আর পারি না—"

"না মাতু. দিন থাকতে ফেলা একটু অভ্যেস কর! দিন আর আছে বলেও ত মনে হয় না।"

"সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি যেন নিজের শরীর বুঝি না! তোমার ওটা কাহিলের দরুণ হচ্ছে, তা-না-ত মানুষ ব'সে উঠতে পারে না! তারিণী ঠিক্ বলেছে, তুমি একটু একটু 'পোর্ট' খাও দিকি,—ভালো কথা ত শুনবে না। আরও কি যে বললে—একটু একটু এক্‌সেরসাইজ। সেটা কি গা?"

"ঐ ×এর মত,—ঢ্যারাকাটা আর কি, কখনও পায়ে পায়ে, কখনও হাতে হাতে ঢ্যারাকাটা। পোর্ট খেলে তা আপনিই হয়।"

"তবে আর কি! তোমাকে ত আর কষ্ট ক'রে করতে হবে না। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সন্ধ্যা থেকে এই দুবার দেখলুম—নবনী হল্‌ঘরে ওঠ-বোস্ করছে আর মাঝে মাঝে বুক ফুলিয়ে আর্‌সিতে মুখ দেখছে,—কত রকম করে।—জিজ্ঞেস করায় বললে—ওকে বলে বৈঠক্ করা, ওতে শরীর হাল্‌কা হয়, যা খাও, হজম হয়, পেট বাড়ে না,—বল বাড়ে, জড়তা যায়, শরীরে রক্ত-চলাচল হয়, আরও কত কি। সেই পর্য্যন্ত ভাবছি তোমাকে বোলব। তুমি ওই কর না কেন—ও ত আর শক্ত নয়।"

ভাদুড়ী মশাই মাতঙ্গিনীর মুখে নিষ্পলক হাঁ ক'রে চেয়ে শুনছিলেন। পরে চোখ বুজে একটা ঢোক গিলে বললেন, "হ্যাঁ, সহজ বই কি, করলেই হয়। তবে কি জানো, ওঠোক্ আর বৈঠক্ দুটো কায একসঙ্গে করতে যাওয়া ঠিক্ হবে কি? একটা একটা ক'রে অভ্যাস ক'রে নেওয়াই

ভালো,—তার পর। এখন দিন কতক বৈঠক্‌টাই চালাই, কি বল? ওটা সড়গড় হলেই—ওঠোক্।"

মাতঙ্গিনী এক চোখে হাসি ও এক চোখে রোষাভাস ফলিয়ে বললেন—"বৈঠক্ ত বরাবরই ক'রে আসছ, আজন্ম চল্‌বে না কি?"

"না, এত দিন ত তেমন মন লাগিয়ে করিনি। ওকে কাযে লাগাতে হ'লে,—শোনো শোনো—যেও না।"

মাতঙ্গিনী গম্ভীর মুখে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, "আর কেন?"

"বলি, তোমার ভাইটির মাথা খারাপ হয়েছে কি না, সেটা আগে দেখ। আমি ভাবছি, হঠাৎ তার এতটা ফুর্ত্তি এলো যে বড়! সে অত লাফায় কেন? না—না, তুমি—"

* * * * *

আচার্য্য আর নবনীকে আসতে দেখে মাতঙ্গিনী স'রে গেলেন।

নবনী সহাস মুখে জিজ্ঞাসা করলে, "গাড়ুটো হঠাৎ অমন বামন অবতার ধরলেন কেন?"

নবনীর মুখটা লক্ষ্য করবার মত। সে ভাদুড়ী মশার সামনে যথাসম্ভব সমীহ রক্ষা করেই কথা কইতো। আজ সামলাতে পারেনি।

আচার্য্য মশাই ক্রমেই বাড়ীর এক জন হয়ে পড়েছিলেন। সব কথাতেই যোগ দিতেন,—বাধা কেটে গিয়েছিল। বললেন—"সুন্দর হয়েছে, আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছে বুঝি? আমরা টো টো ক'রে ঘুরেই বেড়াই, আপনি ব'সে ব'সে brain work ত কম করেন না। ওতে নলচে বসিয়ে দিলে একদম পারসিয়ান গড়গড়া!—পেটেণ্ট নেওয়া চাই কিন্তু। খাসা হবে দেখবেন, Lord familyরা লুফে নেবে!"

নবনীর দিকে চেয়ে বলিলেন—"আর্ট্ আর কাকে বলে,—ভাঙ্গা-গড়ার নামই আর্ট। মালমশলা ত দুনিয়ায় পড়েই রয়েছে, কেবল মাথা চাই!"

ভাদুড়ী মশাই অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন, আর নবনীর চোখে মুখে পরিবর্ত্তনের ভাব লক্ষ্য করছিলেন, যেন কেমন একটা বসন্তাভাস। মধুপুরের কি জল-হাওয়া!

হাসি-মুখে বলিলেন, "পেটেণ্টের জন্যে তাড়াতাড়ি নেই। ওর এখন অনেক বাকি,—ভাববেন না—ও কায শুধু মাথার জোরে হয় না, বোসও মেরে নিতে পারবেন না—রায়ও পারবেন না।"

আচার্য্য বললেন, "আমারও ধারণা তাই। আপনি সাহায্য করেন ত নবনী একটা সুরকির কারখানা—"

"আপত্তি কি? শুনলুম, ও ত উপায় বার ক'রে ফেলেছে—"

কথাটা বাধা পেলে। তারিণীর কি একটু জরুরী কথা আছে, সে দেখা করতে চায়।

তারিণীর সঙ্গেই ভাদুড়ী মশার কাযের কথা বেশী। যেহেতু, মক্কেল, মামলা আর টাকা। সুতরাং সেটা জরুরীও।

আচার্য্য মশাই।—"শুভাংসি বহু বিঘ্নানি আছে, ওবেলা হবে" ব'লে, উভয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারিণী আধ ঘণ্টা কাযের কথা কইলে;—চেলোপটীর কে এক জন চাঁদ-সদাগরের শালীপোর গুদোম আগুন লেগে একদম ভস্ম। তিন লাখ টাকার বিমা করা ছিল।—বিলিতী কোম্পানী, বিশ্বাস করে না; বলে এটা তার নিজের কায। বেচারা আগুনের ভয়ে তামাক পর্য্যন্ত খায় না, প্রদীপ জ্বালে না, কায-কর্ম্ম সব অন্ধকারে! ওজন ক'রে পাঁচপো তুলসীর মালা পরে। মহা কৃষ্ণভক্ত, চাল তার কাছে লক্ষ্মী। এতেও সায়েব কোম্পানীর সন্দেহ! ইত্যাদি। তার পর পাঁচশো টাকার নোট আগাম।

"নম্বোরী নয় ত?"

"আমাকে তেমনি পেয়েছেন," ব'লে পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট গুণে সামনে ধ'রে দিয়ে গেল।

ভাদুড়ী মশাই "মাতু" বললেন কি হারমোনিয়মের গোড়ার পর্দ্দা টিপ্‌লেন, বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনী দেবীর যেন ভুঁই ফুড়ে আবির্ভাব!

নোট্ কখানা দুবার গুণে বললেন, "পাঁচশো"!

হাস্যোজ্জ্বল নয়নে—"ওটা পাতনামার পাঁচশো, অমন অনেক পাঁচশো ভস্ম থেকে বেরুবে।"

"আসছি" ব'লে মাতঙ্গিনী দেবী নোট কখানি মাথায় ঠেকিয়ে সিন্দুকে তুলে, পোর্সিলেনের একটা আধসেরি জগ্, হাতে ক'রে এসে বললেন—"এই ক্ষীরটুকু খেয়ে ফেলো, আর পিত্তি পড়িও না, খেতে এখনও ঘণ্টাখানেক। আমি দেখি গে।—এখুনি আমার মাথামুণ্ডু ক'রে রাখবে। আমার জন্যে যেন রেখো না,—আছে।"

"পিত্তি আর পড়াব কোথায়, মাতু—পড়ারও ত একটা যায়গা দরকার করে, সব নীরেট যে!"

"থামো—থামো!"—চ'লে গেলেন।

ভাদুড়ী মশাই প্রায় তিন ভাগ মাতুর পিত্তি রক্ষার্থেই রাখলেন।

* * * * *

মাতঙ্গিনী দেবী মহা বন্ধনে প'ড়ে গিয়েছিলেন,—রন্ধনের দিকে ঝোঁক ছিল না। আচার্য্য মশায়ের মুখে ডিপুটী সুবর্ণবাবুর বাড়ীর কথায় তাঁর প্রাণ পড়েছিল। তারিণীর কথাও তাগের জিনিষ নয়,—দুদিক রক্ষায় ছুটোছুটি চলছিল! বিশেষ আচার্য্য মশার কথায় বিচার্য্য বিষয় এসে পড়েছিল!

মন্দাকিনী দেবীর, বিশেষ মেয়ে দুটির রূপগুণের কথা আচার্য্য এমন মহিমা ও মাধুর্য্য মাখিয়ে পেস্ করলেন, শুনে মাতঙ্গিনী দেবীর অন্তরটা মুসড়ে গেল। মুখে বললেন, "বাঃ, বেশ মেয়ে দুটি ত। বয়স কত?"

"এই সতের থেকে বিশ একুশ হবে।"

"ও মা, এখনো বে হয়নি! বেম্মো কি খৃষ্টান বলুন?"

"ও ত মা এখন ঘর ঘর, 'ও দু' থাকের ত এক একটা নাম আছে, বলি যে সব বেম্মোদত্তি, তারা যে ওদের ওপর যায়, জননি!—বয়সটা শুনতেই বেশী, দেখতে কিন্তু একেবারেই তা নয়, দেখতে যেন দুটি টাট্‌কা ফুল। তাদের বয়সটার কথা যেমন কারুর মনেও আসে না, এদেরও তাই। একটি শুকতারা, একটি সন্ধ্যামণি—বয়সের দিকে নজর দেবার অবকাশই দেয় না, জেরা করবার জিনিষ নয় যে।"

আচার্য্য কথার ঝোঁকে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, সুন্দরীদের কাছে আবার মেয়ের রূপের বাড়াবাড়ি ব্যাখ্যা যে কত বড় অমার্জ্জনীয় অপরাধ,বা রন্ধনের সুখ্যাতিতে অসাবধানতা যে কত বড় অপমানকর আঘাত, সেটা ভুলে গিয়েছিলেন। চট্ সামলে নিয়ে বললেন—"আপনারা মায়ের জাত, আপনাদের কখনো ছোট ক'রে দেখতে যেন না হয়। আপনাদের কথা যতই বলি—আমার আর তৃপ্তি হয় না যেন সবই বাকি থেকে যায়। আপনার কথা বলবার সময়ও আমার ঠিক তাই ঘটেছিল। শেষ তাঁদের থামাতে পারি না, তখনি সব আপনার কাছে আসতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমি তাঁদের একটি কথাও বেশী বলিনি।"

আচার্য্যও বাঁচলেন, মাতঙ্গিনীও বাঁচলেন। নজরের বাইরে যে মেঘ জমেছিল, আচার্য্যের এক ফুঁয়ে উড়ে গেল, তিনি সহাস্য বদনে বললেন, "সে আমি জানি, আপনি আর কবে কাকে মন্দ বলেন, তা না ত আর আমার সুখ্যাত ক'রে বেড়ান—যার না আছে—"

"না না, ও কথা বললে ঝগড়া বাধবে, খাবার আগে সে কাযটিতে আমার অভ্যাস নেই।"

মাতঙ্গিনী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—"আচ্ছা, এখন আর সেটা কায নেই। তবে তাঁদের এখন আনবেন না। আমি একা মানুষ, খাতির-যত্ন ইচ্ছামত হয়ে উঠবে না। আগে আমিই তাঁদের দেখে আসি। একবার দেখা-শোনার পর মানিয়ে নিতে পারব। দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, এসে পর্য্যন্ত কারুর মুখ দেখতে পাই না।"

"এতটা তাঁরা আশা করতে পারবেন না,—আমিই কি বলতে পারি, মা। বেড়িয়ে এলুম, নূতন মা দেখে আমি যা ভালো লাগে, অপনাকে না ব'লে থাকতে পারি না, তাই এমনিই বলছিলুম। যাক, সে যা ভালো হয়, কর্ত্তার সঙ্গে কথা ক'য়ে করলেই হবে।"

"আচ্ছা, সে হবে'খন, এখন সব নেয়ে থুয়ে নিন তো"—বলতে বলতে মাতঙ্গিনী দেবী চ'লে গেলেন।

তাঁর মনটা থেকে কিন্তু স্বস্তি স'রে গেল। "যখন বিশ একুশ বলেছে, তখন ২।৪ বছর হাতে আছেই। দু'টা পাস্ দেবে—তায় অত রূপ, ডিপুটীর মেয়ে—সব দিকেই এঁদের স্বঘর দেখছি,—কিছু বিশ্বাস নেই!

—"ছেলে কি সবারই হয়! পুষ্যি পুত্তুর নিতে ত কেউ বারণ করেনি।

—"ওঁর কাছে কথাটা এঁরা বলেই থাকবেন—তা আর বলেননি? সব কথা শুনিই বা কখন্, পাঁচটা ত হ'তে পারি না! নিশ্চয় শুনেছেন।" (মাথাটা যেন ঘুরে গেল।) "কোথাকার পাপ কোথায় এসে জোটে দেখ দিকি। না, একাই যাব। কদ্দিনের জন্যে এসেছে, কে জানে। এত পাপও আছে! কোথাও স্বস্তি আছে কি!

—"পুরুষমানুষে মেয়েমানুষের রূপের কি বোঝে—ছাই বোঝে! ও সব কথাই নয়। ঠাকুর সাদাসিদে লোক, যা দেখেন, তাই ভাল। জাতটাই ঐ রকম। তাই ত ভয় করে।—

—"বলেন—শুকতারা। কদ্দিন—তাও জানি! ঢের শুকতারা দেখলুম!"

টেবলের দাঁড়া-আরসির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, নানা ভঙ্গীতে নিজেকে ভাল ক'রে দেখে ঠোঁটে হাসি টেনে, "ইস, ঢের দেখেছি,—ও কথাই নয়,—কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়।"

মানুষের মনই সব—সে একটা অবলম্বন ধ'রে কায করে। মাতঙ্গিনী দেবী দর্পণের মারফত সাময়িক শক্তি সঞ্চয় ক'রে কাযে মন দিলেন।

১৬

সে দিন ভাদুড়ী-ভবনে চায়ের বৈকালী-বৈঠকে আমাদের শ্রীযুত মতিলাল বাগচীও উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সেই আগেকারই সরল, সহাস মতিবাবু! মন্দাকিনী দেবীর আশঙ্কার কোন চিহ্নই—না মুখে না কথাবার্ত্তায়। স্ত্রীলোকদের কেমন সন্দেহ করা স্বভাব! বরং বল্‌লেন, "আপনার সঙ্গের লোভে অনেক দূর থেকে আসি—চায়ের লোভেও বটে, এমন তারটি কোথাও পাই না। একটু ঝুঁকি দিতে হবে,—এক কাপে হবে না।"—হাসলেন।

আচার্য্য বল্‌লেন, "প্রেমে, রণে, পলিটিক্সে—আর এই চা'য়ে কুণ্ঠার কারবার কর্‌তে নেই। সামনে পেলেই কাপ টেনে নিয়ে কাপ সাফ কর্‌তে হয়। নালিশ—আদালত নেয় না।"

"ঠিক্ বলেছেন, তবে দুঃখু এই—বাঙ্গালী চা খেতেই শিখেছে, সরঞ্জামও খুব রাখে, কিন্তু চা বানাতে জানে না, চা'র নামটাই খায়—চা খায় না। অনেক যায়গায়ই খাই, এমনটি পাই না, নিজের বাসাতেও না।"

"আমি ত সেটা ভালই বলি। খেতে ত হবেই, কবে কি পাব, তার ঠিকও নেই, ওর ঐ নামের স্বাদটাই ভাল। ঠাকুরদের বেলাও ত তাই—ঐ নাম-মাহাত্ম্য। মনে আছে ত—বড় যুদ্ধুটার সময় ডাঁটা, ছাল যা মুড়ে দিয়েছে, তাই উড়ে গেছে,—না, বলেছি কি? আমাদের ভক্তিটে ওরা বুঝেছে ত! ঠাকুরদের চরণ থাকুক না থাকুক—চরণামৃত খাই না? একেও ভাবতে হয়,—প্ল্যান্টার ঠাকুরদের—কি বলেন? ও জিনিষের স্বাদগন্ধ খুঁজতে নেই, বাঙ্গালী ধর্ম্ম-ভয় রাখে,—সে জানে, মন্দ বল্‌তে নেই। বাল্য-কাল থেকেই গোপাল,—যাহা পায়, তাহা খায়।"

কতটা মতিবাবুর কাণে গেল কে জানে, তিনি হেসেই সেরে নিলেন। মাত্র বল্‌লেন, "আপনি পণ্ডিত লোক—"

"ও অপবাদ দেবেন না, অন্ন জুটবে না, বিদ্রূপটা তো ফাউ আছে-ই।"

বুঝতে না পারলেও সেয়না লোক যেমন হাসে, ঠকে না—সেই হাসি।

সহৃদয় নবনীর বড় লাগে, আচার্য্যের দিকে চেয়ে বলে, "এর কি কোন প্রতীকার নেই? কলকেতার মত চাকাপেয়ে সহরে এঁর থাকা উচিত নয়, কোন্ দিন অপঘাত আছে।"

"সে ভয় নেই, বাবাজী! ভগবান্‌ও পাপের ভয় রাখেন—নিজেকে বাঁচিয়ে কায করেন। ওঁকে চার দিক দেখবার মত চোখ দিয়ে রেখেছেন। আবার চোখের কল-কব্জার লাইট্-হাউস্ পেছনে—সেটা জানো ত? ও বিদ্যেটা ঘাঁটোনি বুঝি! ভগবানের কাযে ভুল ধরতে যেও না, বাবাজী।"

মতি বাবু কাণে খুব কম শোনেন, তাই সকল কথাই বেশ অবাধে চলছিল—কারুর কোনও সঙ্কোচ সাবধানতার আবশ্যক ছিল না।

নিমকিখানা নিঃশেষ ক'রে, এক চুমুক চা চালিয়ে আচার্য্য বল্‌লেন, "তোমার তরেই দিনটা পেছিয়ে কালীপূজোর রাতে ফেলেছি, সেটাও ক্রমে এগিয়ে এলো। আর ইতস্ততঃ কোরো না। এখন জগদম্বার কৃপায় কাযটি নির্ব্বিঘ্নে শেষ কর্‌তে পার্‌লে বুঝতে পারি। আসাম অঞ্চলে বড় বড় জঙলী মহিষ বলিদানেও এত ইন্তেজার কর্‌তে হয় না। এ দেখছি বাইসনের বাবা! তা বাবাজী, তুমি যা হাঁড়িকাঠ বানিয়েছ, একবার যো-সো ক'রে ফেল্‌তে আর জয় মা বল্‌তে পার্‌লেই সাফ। তার পরের অঙ্ক দেখছি—ছত্রভঙ্গ। আমাকে লম্বা দৌড় মারতেই হবে,—সিংহলই ভাল। এক কালের জয়-করা জিনিষ, একটু দাবীও ত আছে।"

নবনী বল্‌লে, "অত ভাবছেন কেন, আপনি সাহস দিলেই হবে। তা না ত ঐ কাণ্ডের পর আমারই কি রক্ষে আছে, গা-ঢাকা দিতেই হবে।"

"কোন চিন্তা নেই বাবাজী, মা'র কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ সব কায তিন-কাণ হলেই মাটী, সোর-গোল না হয়! তোমরা বিশ্বাস কর না, সে দিন মন্ত্রবলটা মালুম করিয়ে দেব। দেখবে, নিজে ইচ্ছে ক'রে মাথা নীচু ক'রে দেবেন।"

একটু নিম্নকণ্ঠে—"সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন কারুকে বেগ পেতে হয় না, বাবাজী। বৃষকেতু স্ব-ইচ্ছায় মাথা

বাড়িয়ে দিয়েছিল। নাম বাজালেন কর্ণ। এও তোমারি কায, বাবাজী!"

বাগচী মশাই বেশ একমনে চা চালাচ্ছিলেন, দুনিয়ার কোন ঝঞ্ঝাটেই থাকেন না। হঠাৎ আচার্য্য মশাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ঠাকুর মশাই, গরুড়াসনটা কি রকম—ব'লে দিন না।"

উদ্গত হাসিটা ঢোক গিলে ঠেলে অবনী বল্‌লে, "অন্ধ কি বধির হ'লে দুনিয়ার পনের আনা বাদ প'ড়ে যায়। ওটা সাধন-ভজনে খুব সাহায্য করে বোধ হয়। ইনি দেখছি তাই নিয়েই আছেন। আমাদের অভিসন্ধি আর তার দুশ্চিন্তা এক—আর এঁর চিন্তা দেখুন!"

আচার্য্য নবনীর কথায় কাণ না দিয়ে বাগচীকে উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, "আপনি অনেকখানি এগিয়ে পড়েছেন ত, ওটা যে অনেক ওপরের ধাপ, বাঃ! গরুড়াসনটা ভারতের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ আসন হলেও য়ুরোপ কি আমেরিকার লোকের আসে না, এমনি বিষ্ণু-মায়া। ওটাতে গর্ভে থেকে আমরা পাকা হয়ে ভূমিষ্ঠ হই। গর্ভেও আমাদের ঐ ভাবেই পাবেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে অন্তর্য্যামী ঐ আসনটি আমাদের জন্য আলাদা আর বিঘ্নশূন্য ক'রে দিয়েছেন। তাঁর কৃপায় আমরা—দাঁড়িয়ে, শুয়ে, ব'সে, যে ভাবে যে অবস্থায় থাকি না কেন, জানবেন, গরুড়াসনে আছি। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তা জানেন। তাই চট্ সিদ্ধি লাভ করবার অমন আসন আর নাই। সকল দেবতাই সহজে তুষ্ট হন। সবই তাঁর কৃপা।"

পরে নবনীর দিকে চেয়ে সহজ মৃদু আওয়াজে বললেন—"তাই না দিল্লীর দাপটী-দরবারে বড় বড় ভক্তরা পরীক্ষায় অনায়াসে পাস্ হয়ে বেরুতে পেরেছিলেন। ত্রিভুবন অবাক্! উটি যে জগতে আর কোনো জাত পারে না।" শুনে নবনীও নির্ব্বাক্।

ঐ সম্বন্ধে আরও দুচার কথার পর বাগ্‌চীমশাই বললেন, "বড় উপকার করলেন। আজ তবে উঠি। বোধ হয়, এর মধ্যে আর দেখা হবে না—কালীপূজার সময়টা কালীঘাটেই কাটাবার—"

"বাঃ, বড় খুসী হলুম, এই ত চাই। বাঃ, ভারতে—তায় বাঙ্গালা দেশে জন্মেছেন, হতেই হবে—ধাতে রয়েছে যে! যা ক'রে নিতে পারেন, এই সময়। তার পরে আর ভাবতে হবে না,—উন্নতি আপ্‌সে চলবে। জানেন ত, বংশে এক জন গরুড়াসনসিদ্ধ হ'লে সাতপুরুষ সে পুণ্যের জোরে চলে।"

বাগচী বিদায় নিলেন, নবনী পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে হাঁ ক'রে তাঁকে দেখছিল, বললে,—"কি ভদ্রলোক!—আবার—"

আচার্য্য আর বেশী শোনবার আগেই বললেন—"হ্যাঁ, তোমরা যাকে—gentleman বল!"

"কেন,—আপনি তবে কি বলেন?"

"ঐ ত বললুম,—তার বেশী আর কি বলবো? কি জানি, মন এমনই বদ্ জিনিষ, সে অকারণেও কারু কারুকে তার বেশী দিতে চায় না।"

"এটা আপনার অবিচারের কথা।"

"তা হ'তে পারে। কিন্তু মনটার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। একটু আপোস ক'রে চলতে হয়। তার কথাটা না শোনা চলতে পারে, কিন্তু সেটাকে অস্বীকার করা ত চলে না।"

নবনীকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেখে আচার্য্য হেসে বললেন—"অমন লোককে সব কিছু বলা যায়, ওঁকে কিছুতে কম পাবে না। কোন দিক ভোলেন না। দেখলে না—এরি মধ্যে গরুড়াসন পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছেন। আর তোমাদের আসনের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু ভোজনের বেলা। এখন চল, একটু ক্ষিদে বাড়িয়ে আসি।" [ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺কেদার-বদরী

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)
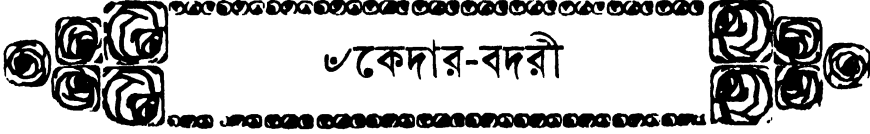
দেবপ্রয়াগ হইতে শ্রীনগর—১৮ মাইল

পঞ্চম দিন—২৫এ বৈশাখ ৮ই মে মঙ্গলবার

ভোর ৫টায় দেবপ্রয়াগ হইতে রওনা, বেলা ১০টায় রামপুর চটী (১১ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।

বেলা ৩॥০টায় রামপুর হইতে রওনা, রাত্রি পৌনে আটটায় শ্রীনগর (৭ মাইল)—রাত্রিযাপন।

পূর্ব্বদিনের বিবরণে বলিয়াছি (কার্তিক-সংখ্যা, ১২৬ পৃঃ) যে, কল্য পূর্ব্বাহ্নে গঙ্গাতীরে পৌছিয়া গঙ্গাপার হইয়া 'বা' সহরে গেলাম, এবং সেখান হইতে অলকনন্দা পার হইয়া দেবপ্রয়াগে গেলাম; আবার অপরাহ্নেও অলকনন্দা পার হইয়া দ্বিতীয়বার দেবপ্রয়াগে গেলাম এবং সায়াহ্নে আবার পার হইয়া 'বা' সহরে বাসায় ফিরিয়া রাত্রিযাপন করিলাম। কল্য বহুবার পারাপার হইয়াছিলাম (অবশ্য ঝুলান লৌহসেতু দিয়া), অদ্য আর পারাপার নাই। বরাবর অলকনন্দার ধারে ধারে চলিলাম (দেবপ্রয়াগ হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত অলকনন্দা সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন)। সে কি মধুর গম্ভীর কলকল ধ্বনি! মনের আনন্দে গৃহিণী ও আমি প্রথমে ৪॥০ মাইল পথ হাঁটিয়া চলিলাম।

পথে আনন্দচটীতে * (২মাইল) পাণ্ডার গোমস্তার সাহায্যে অনেক অনুনয়-বিনয়ে চারিটি কাঁচকলা চারি পয়সায় পাওয়া গেল। এ দেশে কাঁচকলা পাকাইয়া বিক্রয় করে, কাঁচা বিক্রয় করে না; গাছ হইতে কাটিয়া ২।৪টা দিতে চাহে না। পরে ৺কাশী ফিরিয়া শুনিলাম, এক জন ৺কাশীবাসী পেন্‌সান্-ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ (এক্ষণে ৺কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছেন) এই পথে যখন গিয়াছিলেন, তখন একেবারে দর করিয়া থোড়, মোচা ও কলার কাঁদি-সমেত কলাগাছ কিনিতেন (ছয় আনা মূল্যে!), এবং কয়েক দিন ধরিয়া এই রসদে চালাইতেন। এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ব্যবসায়-বুদ্ধি, ভোজন-ব্যবস্থা, (যে নামেই অভিহিত করুন), আমাদের মাষ্টারী-মাথায় আসে নাই। যাহা হউক, আমাদের কষ্টার্জ্জিত কাঁচকলা কয়টি দিয়া যখন বড়ী (সঙ্গে ছিল) ও আলু-সহযোগে মধ্যাহ্নে ঝালের ঝোল রান্না হইয়াছিল, তখন তাহা যে কি মধুর লাগিয়াছিল, তাহা মৎস্যমাংসের কালীয়া-কোর্ম্মা-ভক্ত কোনও পাঠককে বুঝান যাইবে না। পথে হয় খোসাসুদ্ধ ডা'ল ও আলুর তরকারী, না হয় আলুর ঝোল সম্বল ছিল। গুড়-তেঁতুলে অরুচি-নিবারণ করিত। অদ্য রাধা-দামোদর বা 'ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ' মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কয়েক দিন পরে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার হইল। তবে পাছে পাঠকবর্গ লেখককে নিতান্ত সাত্বিক প্রকৃতির লোক বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই আশঙ্কায় ইহাও বলিয়া রাখি যে, পাহাড়ের উপর বেশ নধরকান্তি 'পুরুষ্টু' পাঁঠা চরিতেছে দেখিয়া 'মানস পাপ' এড়াইতে পারি নাই। বলা বাহুল্য, হরিদ্বার অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মমণ্ডলে, তথা এ সমস্ত প্রদেশে মৎস্য-মাংস-ভোজন নিষিদ্ধ। হরিদ্বারে ত মাছ খাইলে 'চামার' বলে!

দেবপ্রয়াগের ৫ মাইল পরে গুলাসুচটী। (বিদ্যাকোঠী সীতাকোঠী নামও কোন কোন পুস্তকে দেখি।) এখানে ১টি ঝরণা আছে। ইহা ছাড়াইয়া এক স্থানে দড়ীর ঝুলা দেখিলাম। পথের এক স্থানে দুই পাশে অনেকখানি করিয়া সমতল জায়গা, নীচে চিল উড়িতেছে লক্ষ্য করিলাম, এরূপ আরও স্থানে স্থানে দেখিয়াছি। ২॥০ মাইল পরে রাণীবাগ চটী হইতে বেশ চড়াই। রাণীবাগে ২টি ঝরণা আছে। তামাকের চাষ দেখিলাম, কলাবাগান ত আছেই। এইখানে ছেলেরা জলযোগ করিল। ৩॥০ মাইল পরে রামপুর চটীতে বেলা ১০টায় পৌছিলাম এবং এখানেই আড্ডা লইলাম। এখানেও একটি দড়ীর ঝুলা দেখিলাম।

এখানে একটি একতালা ঘরে স্থান পাওয়া গেল। এই স্থান হইতেই লক্ষ্য করিলাম, দোকানে বসিবার জন্য চাটাই বিছান। ২।৪ জন 'পশ্চিমে' পূর্ব্বে এখানে 'ডেরা' লইয়াছিল, আমাদিগকে দেখিয়া সুট্ সুট্ করিয়া চলিয়া গেল ও অন্য দোকানে উঠিল। (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এখানে ঝরণার জলের খুব সুখ। সুবিধা পাইয়া ছেলেরা জামা সাবান করিয়া

* অন্য পুস্তক-প্রবন্ধে এ চটীর উল্লেখ দেখি নাই। এখানে ১টি ঝরণা ও মোটে একখানি ঘর। কলাবাগান আছে, ২।৪ কাঁদি কলা, তথা মোচা ঝুলিতেছে। সে দৃশ্য আমাদের চোখে গোলাপ-বাগ অপেক্ষাও সুন্দর লাগিল।

ফেলিল। আর একটি সুবিধা এখানে ছিল, এমন সুবিধা সারা-পথে আর কোনও চটীতে পাই নাই—শৌচক্রিয়ার জন্য অনেকগুলি কুঞ্জবন (প্রকৃতি-হস্তে প্রস্তুত) আছে; যদিও একটু সাবধানতার সহিত বিচরণ করিতে হয়, তথাপি ইহা বেশ আরামের। দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রেও কোনও কষ্ট বোধ করি নাই। পল্লীগ্রামে 'মাঠে যাওয়া' এককালে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু এমন সুবিধাটুকু সোনার বাংলার মাঠে বা বাগানেও পাওয়া যায় নাই। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই বর্ণনা পাঠকের বীভৎস বোধ হইতে পারে, কিন্তু যদি কখনও ভুক্তভোগী হইতে হয়, তখন বুঝিবেন, কেন এ সব কথার বার বার উল্লেখ করিতেছি।

আহার ও বিশ্রামের পর বেলা ৩টায় বোঝাওয়ালাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া ৩৷০টায় আমরা রওনা হইলাম। এখন অবশ্য ডাণ্ডীতে। পথ সমতল, দুধারে চাষের ক্ষেত, যেন বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের মাঠ। পথে যাইতে যাইতে এক স্থানে নীচের দিকে নজর করিয়া দেখিলাম, অনেক নীচে অনেকখানি সমতল জায়গা চাষের জন্য পাইট করা—ঠিক যেন একখানি শতরঞ্চ বিছান। পূর্ব্বে অনেক স্থানে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে পাইট করা চাষের জমী—কোথাও হরিৎ শস্য জন্মিয়াছে—দেখিয়াছি; কিন্তু এ দৃশ্য যেমন অভিনব, তেমনি মনোহর। ইহাতে দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইল, আর নিম্নগা অলকনন্দার উপল-প্রতিহত জলকল্লোলের কলকল ছলছল শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইল।

৪ মাইল গিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিল্বকেদার বা ভিল্লকেদার তীর্থে পৌঁছিলাম। এই স্থানকে ঢুণ্ঢপ্রয়াগও বলে। এখানে মার্কণ্ডেয়-গঙ্গা এক স্থানে ও খাণ্ডব-গঙ্গা আর এক স্থানে অলকনন্দায় পড়িয়াছে, সুতরাং ইহা সঙ্গম-তীর্থ ও অন্যতম প্রয়াগ। অর্জ্জুন কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত বরাহ-বধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরে তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ঘটনাস্থল বলিয়া এখানকার শিবলিঙ্গের ভিল্লকেদার নাম। মহাভারতে বনপর্ব্বে এই বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে। বি-এ শ্রেণীতে পাঠের সময় ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়ে' (১৩ হইতে ১৮শ সর্গে) উক্ত ঘটনার বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম; ভারবির 'নারিকেল-ফল-সম্মিত' ভাষা দন্তস্ফুট করিতে তখন যে পরিমাণে কষ্ট পাইয়াছিলাম, এখন উক্ত বর্ণনার ঘটনাস্থল-দর্শনে সেই পরিমাণে আনন্দ পাইলাম। এখানে অনেকখানি সমতল স্থান, বৃক্ষলতাবহুল, মনোরম। রাস্তা হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও আরও ২।১টি দেববিগ্রহ এবং মন্দির-চত্বরে পাষাণে ক্ষোদিত (শিবের? অর্জ্জুনের?) চরণচিহ্ন ও পদ্মচিহ্ন দর্শন করিলাম। প্রাঙ্গণে একটি কলিকা-ফুলের গাছ দেখিলাম। অলকনন্দা এখানে বেশী নীচে নহে; ওপারে যাইবার জন্য একটি দড়ীর ঝুলা রহিয়াছে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল। এখন বরাবর শ্রীনগর পর্য্যন্ত সমতল ও প্রশস্ত পথ।

এবার দুই মাইল সস্ত্রীক পদব্রজে গিয়া আবার ডাণ্ডী আরোহণ করিলাম। একটু পরেই বৃষ্টি নামিল। হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম বৃষ্টিতে ভিজিলাম। বর্ষাতি দিয়া পদদ্বয় ঢাকিয়া ও ডাণ্ডীর ঘেরাটোপ তুলিয়া দিয়া সম্মুখে ছাতা ধরিয়াও বেশ একটু ভিজিতে হইল; শ্রীনগরের কাছাকাছি এক স্থানে অনেকগুলি আম্রবৃক্ষ ও কয়েকটি অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিলাম। এ দিনের পরে পথে অনেক জায়গায় অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিয়াছি; সর্ব্বত্রই গাছের গোড়া পাথর দিয়া বাঁধান, কোথাও রীতিমত মশলা-সংযোগে পাকা গাঁথা, কোথাও শুধু উপর উপর পাথর সাজান। বাঙ্গালা দেশে সেকালে অশ্বত্থ-নারায়ণের প্রতিষ্ঠা হইত; জানি না, এ অঞ্চলেও এগুলি প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষ কি না।

এই পথেই নাকি শ্রীযন্ত্রঘাট ও কমলেশ্বর মহাদেব, তথা লক্ষ্মী-নারায়ণ আছেন, কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় ও বৃষ্টির উৎপাতে দর্শন-সৌভাগ্য হইল না। শ্রীনগরে প্রবেশের খানিক পূর্ব্বে এ দেশীয় এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক (বেশ ও আকৃতিতে এইরূপ অনুমান হয়) আমাদের সঙ্গের বিধবাটির ডাণ্ডীর এক জন বাহককে সরাইয়া দিয়া নিজে খানিকক্ষণ ডাণ্ডী বহন করিয়াছিলেন—পুণ্যলাভার্থ (শ্রাবণ-সংখ্যা, ৬৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পথে ছেলেদের টিহিরী-রাজের এক জন কর্ম্মচারীর সহিত দেখা ও আলাপ হইয়াছিল।

শ্রীনগরে [রাত্রি পৌনে আটটায়] পৌঁছিলে বৃষ্টি ছাড়িল; সন্ধ্যার অন্ধকারেও শ্রীনগর-প্রবেশ-পথে বেশ বড় একটি হাসপাতাল দৃষ্টিগোচর হইল; ক্রমে প্রশস্ত রাস্তা দিয়া দু'ধারে সারি সারি দোতলা দোকান দেখিতে দেখিতে কালীকমলীওয়ালীর ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম; পাশাপাশি দুইটি প্রকাণ্ড দোতলা ধর্ম্মশালা, বিস্তৃত আঙ্গিনা, পাইপ দিয়া পাহাড়ের উপরিস্থিত দূরবর্ত্তী ঝরণা হইতে জল আনিয়া যাত্রীদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; চৌবাচ্চা, ট্যাপ,

কিছুরই অভাব নাই; বেশ মোটা ধারায় জল পড়িতেছে। ধর্ম্মশালার একতলায় বাহিরের ঘরগুলিতে চাউল, ডাল, ঘি প্রভৃতির দোকান। পুত্র ও ভাগিনেয় পূর্ব্বে পৌছিয়া স্থান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; হৃষীকেশের কালীকমলীওয়ালীর ধর্ম্মশালা হইতে চিঠি আনিয়াছেন কিনা (স্বামীজি) ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধায়ক-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন; চিঠি না থাকিলেও ক্ষতি হয় নাই। [আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৪ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।] তত্ত্বাবধায়ক দোতলার একটি তালাবন্ধ ঘর খুলিয়া দিলেন; (জানি না, এই খাতির ভদ্র বাঙ্গালী বলিয়া অথবা সাহেবী পোষাকের দরুণ)। ঘরটি ছোট, আমাদের জিনিশপত্রে অর্দ্ধেকেরও অধিক স্থান যুড়িয়া গেল; বাহিরের বারান্দায় লোক থাকায় ঘর-বাহির করিবারও অসুবিধা হইল। যাহা হউক, ভিড়ে অসুবিধা-সত্ত্বেও এক রাত্রির জন্য মাথা গুঁজিবার আশ্রয় মিলিল, এই যথেষ্ট। ধর্ম্মশালার বাহিরে পায়খানার ব্যবস্থা ও খানিকটা ঘেরা জায়গায় 'জঙ্গল' যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে—যাহার যেরূপ রুচি, 'যদ্‌রোচতে!' প্রস্রাবের ব্যবস্থাও বাহিরে; এ বিষয়ে রাত্রিকালে বিশেষ অসুবিধা, অথচ এ পক্ষের বার বার যাওয়া অভ্যাস, কোনও প্রকারে গোপনে কার্য্য সারিতে হইল; ভবিষ্যৎ যাত্রীর 'জ্ঞাতার্থে' এইটুকু 'নিবেদন' করিলাম। নতুবা এই জুগুপ্সিত বিষয়ের ইঙ্গিত করিতাম না।

ধর্ম্মশালায় রাত্রিকালে রন্ধনের অসুবিধা (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৮ পৃঃ), এবং সহর জায়গায় দোকানে টাটকা-ভাজা 'পুরী' পাওয়া যায়, এই উভয় কারণে দোকান হইতে 'পুরী'-তরকারী, আচার-চাটনী, কালাকাঁদ আনা হইল; (এখানকার কালাকাঁদ ভাল; তবে এ দেশের যাহা নিয়ম, মিষ্টি একটু বেশী; তরকারীকে এ দেশে 'শাগ' বলে, আলুর তরকারী = আলুর 'শাগ'।) দেবপ্রয়াগের ন্যায় শুধু মিঠায় সন্তুষ্ট না হইয়া 'পুরী'-তরকারীতেও ভাগ বসাইলাম; এই যে অত্যাচার আরম্ভ করিলাম, ইহার ফলে কয়েক দিন পরে পেটের অসুখ হইল। যাক্‌, আপাততঃ আহারান্তে নিদ্রা যাওয়া গেল; একঘুমের পর যখন রাত্রি আন্দাজ ৩টার সময় উঠিলাম, তখন দেখিলাম, সব যাত্রী রওনা হইতেছে; অবাঙ্গালী যাত্রীদের এই পথ চলার নিয়ম; সুতরাং ধর্ম্মশালা ও চটীতে দুপুরে ও সন্ধ্যায় বেজায় ভিড় হয়; শেষরাত্রিতে একেবারে ভোঁ ভাঁ, যেন যাদু-মন্ত্রবলে সকলের অন্তর্ধান হইয়াছে।

শ্রীনগর নাম শুনিয়া অনেকে হয় ত ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কথা স্মরণ করিবেন। এ শ্রীনগর কাশ্মীরের নহে, স্বাধীন গাড়োয়ালের রাজধানী (ছিল); * রাজধানী বলিয়াই বোধ হয় এই নামকরণ। বর্ত্তমান সহর নূতন; পুরাতন সহর (ইং ১৮৯৪) ১৩০১ সালের প্রবল বন্যায় ধ্বংস পাইয়াছে। এ অঞ্চলের মধ্যে এটি বড় সহর, অনেক দোকানপাট, ডাকঘর, থানা ও হাই ইংলিশ স্কুলও আছে। এখানেও যাত্রীর প্রয়োজনীয় কম্বল, অয়েল্‌-ক্লথ্‌, জুতা, ছাতা প্রভৃতি মিলে। হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কোথাও মুসলমান দেখি নাই, এইখানে ২।৫ জন দেখিলাম।

১৯। মানবপ্রকৃতি—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

শ্রীনগরে ধর্ম্মশালায় ভিড়ের জন্য অসুবিধা ও কষ্ট হইয়াছিল বলিয়াছি, কিন্তু এখানে বেশ আনন্দও পাইয়াছিলাম, সে কথা না বলিলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অন্য প্রদেশের কয়েকটি নারীর মিলিত-কণ্ঠে যে সুন্দর ভজন-গান শুনিয়াছিলাম, তাহা বহুকাল মনে থাকিবে—বিশেষতঃ দুইটি নারীর সুকণ্ঠে যেন মধুবর্ষণ হইতেছিল। 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ওঁ মধু মধু মধু।' † কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্কট্‌ল্যাণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশের শস্যক্ষেত্রে নারীকণ্ঠে অতি সাধারণ রকমের গান শুনিয়াই ভাবভরে বলিয়াছেন "The music in my heart I bore Long after it was heard no more.' জানি না, এই উদাত্ত সঙ্গীত শুনিলে তিনি কি বলিতেন? এখনও যেন সেই সুরের রেশ কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে; আর কি কখনও সেই মূলসঙ্গীত শুনিতে পাইব? বাস্তবিক ধর্ম্মশালায়, চটীতে, পথে, ঝরণার ধারে, পাহাড়ের ছায়ায়, দেবালয়ের প্রাঙ্গণে, যেখানেই এই ধর্ম্মপ্রাণা নারীজাতি সম্মিলিত হইয়াছেন, সেখানেই অনেকবার এই মধুর পবিত্র

* এক্ষণে তাহা টিহিরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গাড়োয়ালের এই অংশ ইংরেজের অধিকারে আসাতে ইংরেজের হেড কোয়ার্টাস্‌ অলকনন্দার অপর পারে ৮ মাইল দূরে পৌড়ীতে হইয়াছে। পাঠক এই রাজ্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাসের পুস্তকে তথা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'উত্তরাখণ্ডের পত্রে' ('মানসী ও মর্ম্মবাণী'র ভাদ্র-সংখ্যায়) পাইবেন।

† বাঙ্গালী নারীরা কিন্তু এ রস-বঞ্চিত। সঙ্গীতশিক্ষা যে ক্ষেত্রে আছে, সে ক্ষেত্রেও এ শ্রেণীর সঙ্গীত অভ্যস্ত নহে। তাঁহারা, বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলের ধনি-সম্প্রদায়ের পুর-মহিলারা তীর্থপথে পরস্পরের সহিত দেখা হইলে কে কোন্‌ তীর্থ করিয়াছেন, কত 'ট্যাকা' খরচ করিয়াছেন, তাহারই আত্মগরিমা-প্রচার, পথে খাদ্য-সুখ ও অন্যান্য সুবিধা অসুবিধা, অথবা কাহার কয় ভরীর গহনা (তাহাতেও একটু অতিশয়োক্তি, মিথ্যা কথা থাকে) ইত্যাকার আত্মবিকথনা!

ভজন-গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছি। (যাঁহাদিগের এতদূর আসা ঘটিবে না, তাঁহারা হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাকালে এইরূপ মধুর-গম্ভীর ভজন-গান শুনিতে পাইবেন।)

এই সকল ব্যাপারে যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির প্রকৃতির প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিলাতের কাব্য-গগনের প্রভাত-তারা ('The morning-star of Song ') চসারের "Canterbury Tales"-নামক তীর্থযাত্রায় বর্ণনাত্মক কাব্যে দেখা যায়, যাত্রী ও যাত্রিণীগণ পথের ক্লান্তি ভুলিবার জন্য (এক আধটা ধর্ম্মবিষয়ক উপাখ্যান ছাড়া) কতকগুলা বাজে গল্প বলিয়া সময় কাটাইতেছে, ২।৪টা করুণরসের উপাখ্যান থাকিলেও অধিকাংশই 'ফক্কুড়ি'—পচা ইয়ারাকির গল্পও আছে—তীর্থপথের কি অদ্ভুত সম্বল !

আবার তীর্থযাত্রার পথে যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধার জন্য কালীকমলীওয়ালার ন্যায় সাধুগণ কত স্থানে ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, দাতব্য ঔষধালয়, জলসত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাতেও হিন্দুর সাত্ত্বিকী প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আর প্রতীচ্য জাতির মধ্যযুগের তীর্থযাত্রার—যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র সমাধিক্ষেত্র-দর্শনের বিবরণ পাঠ করিলে Crusades ধর্ম্মযুদ্ধের নররক্তপাতের কথাই মনে পড়ে—রাজসিকী প্রকৃতির লীলা। অবশ্য নিজধর্ম্মের পবিত্র তীর্থগুলি বিধর্ম্মীর অধিকার হইতে বিমুক্ত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা শৌর্য্যবীর্য্যের মহীয়ান্ প্রকাশ, তাহার জন্য প্রতীচ্যজাতি নিরতিশয় প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই। তথাপি এই প্রভেদটাই যে বড় বেশী করিয়া চোখে পড়ে। এখন ত প্রতীচ্যজাতির মধ্যে তীর্থভ্রমণের প্রথা রহিত হইয়াছে বলিলেও চলে।

তাহার পর, য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, দুর্গম গিরিশিখরে, নদীযুগলের সঙ্গমস্থলে বা বক্রগতি নদীতীরে দুর্ভেদ্য দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া দস্যুপ্রকৃতিক অভিজাতগণ নিজেদের ক্ষমতা প্রবল করিয়াছেন ও দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। অথবা নিজেদের ঐশ্বর্য্যপ্রচারের জন্য, ভোগবিলাসস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য, সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিয়াছেন। (কচিৎ কোথাও ক্যাথলিক্ রাজ্যে পর্ব্বতসানুদেশে 'Our Lady of the Snows' প্রভৃতি দেবীর উদ্দেশে মঠ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।)

'আর এই ভারতবর্ষে, কত দুর্গম গিরিশিখরে, কত নির্জ্জন সমুদ্রতীরে, কত দেবালয়, কত কলাশোভন পুণ্যকীর্ত্তি দেখিতে পাই।... সেখানে মানুষ তাহার নিজের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দ্বারা নিজের চেয়ে বড়র প্রতিই বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে।' (রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য' পুস্তকে 'সৌন্দর্য্যবোধ' প্রবন্ধ ৪১পৃঃ।) এখানেও সেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদ।

শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ—২০ মাইল

পাঠক-সম্প্রদায় বোধ হয় অধীর হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, ৺কেদারধাম ও ৺বদরীধাম আর কত দূর? তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতে পারি, শ্রীনগর ৺কেদারধামের অর্দ্ধপথ (৺কেদারধাম হরিদ্বার হইতে ১৫০ মাইল, শ্রীনগর হরিদ্বার হইতে ৭৬ মাইল)। এই পথের পাঁচটি (stage) পর্য্যায়—(১) হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ ৫৮ মাইল, (২) দেবপ্রয়াগ হইতে শ্রীনগর ১৮ মাইল, (৩) শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ ২০ মাইল, (৪) রুদ্রপ্রয়াগ হইতে গুপ্তকাশী ২৪ মাইল, (৫) গুপ্তকাশী হইতে ৺কেদারধাম ৩০ মাইল। পঞ্চাননের সন্নিধানে পৌঁছিবার পথের এই পাঁচটি পর্য্যায়ের দুইটিমাত্র পর্য্যায় আমরা এখন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছি এবং অর্দ্ধপথ আসিয়াছি। হরিদ্বার হইতে ৺বদরীধাম বরাবর গেলে ১৮৩ মাইল; কিন্তু ৺কেদারধাম গিয়া পরে ৺বদরীধাম যাইবার শাস্ত্রীয় বিধি থাকায় ৺বদরীর পথ আরও দূর পড়ে।

ষষ্ঠ দিন ২৬এ বৈশাখ ৯ই মে বুধবার

ভোর ৫।১৫মিঃ শ্রীনগর হইতে রওনা, ৮।১৫মিঃ ভট্টিসেরা (৭॥০ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।

বৈকালে ৩॥০টায় ভট্টিসেরা হইতে রওনা, ৪।৪৫মিঃ খাঙ্করা চটী (৪॥০ মাইল)—রাত্রিযাপন।

ভোর ৫।০টায় শ্রীনগর হইতে রওনা হইলাম। পথের দুই ধারে ফুলের বাগান। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে দেখিলাম, পাঠশালার পড়ুয়ারা (ছেলে মেয়ে দুই-ই আছে) এই ভোরে পাঠশালে যাইতেছে। একটি লেবুগাছে লেবু ফলিয়াছে দৃষ্টিগোচর হইল, গৃহস্থের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ভিক্ষা চাহিতে আসিলে তাহাদিগকে পয়সা কবলাইয়াও ২।৪টা লেবু সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে গরুর খাদ্য আউড়ের পালা মাটীর উপর বাঁধে, এখানে দেখিলাম, গাছের উপর বাঁধিয়াছে; আরও বহুস্থলে দেখিয়াছি। কয়েকটি আমগাছ ও তামাকের ক্ষেত এখানে আছে।

ব্যাপারীরা ছাগলের পিঠে ছোট ছোট বোঝা দিয়া লইয়া যাইতেছে, পালে ভেড়াও আছে। উচ্চ-নীচ ও সঙ্কীর্ণ দুর্গম পার্ব্বত্যপথে ছাগল-ভেড়াই ভারবাহী পশু, তবে বলদ, ঘোড়া, গাধা ও অশ্বতরও স্থানে স্থানে দেখিয়াছি। ছাগলগুলি আমাদের দেশের ছাগল অপেক্ষা বড় ও খুব লোমশ; শুনিয়াছি, ইহাদের লোমে কম্বল হয় (কাশ্মীরী শাল নহে); ভেড়াও সাধারণ ভেড়া অপেক্ষা লোমশ। ছাগলদের গলায় একটি করিয়া ঘণ্টা আছে, শব্দে জানা যায়, (যূথভ্রষ্ট হইলে) কোথায় আছে। ব্যাপারীরা ছাগলগুলিকে শীষ দিয়া আহ্বান করে। প্রত্যেক পালের রক্ষক-স্বরূপ মানুষ ত আছেই, একটি দুইটি কুকুরও আছে, কুকুরগুলি খুব লোমশ ও অতি সুদৃশ্য; অস্পৃশ্য জন্তু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ থাকিলেও গায়ে হাত বুলাইতে ইচ্ছা হয়—লেখকের মত কুক্কুরভীত লোকেরও। এ অঞ্চলে প্রায় সকল কুকুরই এই শ্রেণীর (কচিৎ কোথাও আমাদের দেশের মত কুকুর দেখিয়াছি); কুকুরের গলায় লোহার পাতের তৈয়ারী চওড়া কলার্ বা গলাবন্ধ, তাহাতে লোহার বড় বড় কাঁটা বসান, পাছে বাঘে ধরে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য। টুঁটী চাপিয়া ধরিতে গেলে বাঘের পো টের পান। চটীতেও পাহারা দিবার জন্য এই শ্রেণীর কুকুর দেখিয়াছি। কুকুরগুলি সাধারণতঃ ঠাণ্ডা মেজাজের, যাত্রীদিগকে ঘেউ ঘেউ করিয়া তাড়াইয়া আসে না, কিন্তু 'জঙ্গলে' অর্থাৎ 'মাঠে' গেলে বড় বিরক্ত করে, তাহাদিগের এ নোংরা স্বভাব ঠিক 'বাজারে' কুকুরের মতই। লোকালয়ে বিড়াল আছে,চেহারা জংলী গোছের, আমাদের দেশের মত সুশ্রী নহে।

অবশ্য পথে পার্ব্বত্য জঙ্গলে কোথাও বাঘ ত দেখি নাই, এমন কি, শিয়াল পর্য্যন্ত নহে। বনে-জঙ্গলে জন্তুর মধ্যে মুখপোড়া ও শাদামুখ দুই প্রকার বানর ও মর্কট (তাও ৺কাশী বা হরিদ্বারের মত বেশী নহে) এবং পাহাড়িয়া ইঁদুর দেখিয়াছি। আমাদের দেশের পরিচিত অনেক পাখী দেখিয়াছি যথা, 'বৌকথা কও,' 'চোখ গেল,' কোকিল, কাক, চিল, চড়াই। একটি পাখীর ডাক—'বদরী যাও'—অদ্ভুত ব্যাপার বটে! কাণে ঠিক এইরূপ শুনায়; ভ্রান্তি কি না, 'ভাবনা যাদৃশী যস্য' কি না, জানি না। তখন ধর্ম্মভাবভাবিত-চিত্তে এই অনুমান হইয়াছিল যে, পুণ্যাত্মা সাধুগণ কোনও সামান্য দোষের জন্য স্বর্গভ্রষ্ট বা শাপগ্রস্ত হইয়া পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হওয়াতে লক্ষবার বা কোটিবার যাত্রীদিগকে তীর্থযাত্রার পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহ দিলে শাপমুক্ত ও স্বর্গগত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। অবশ্য ঘরে বসিয়া পাঠক এই অনুমান-খণ্ডকে লেখকের নিরবচ্ছিন্ন খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিবেন।

৪ মাইল পরে শুক্রতা বা সুক্তা চটীতে দম লওয়া গেল। দন্তধাবনান্তে মিছরি-ভোগ (মাখন-মিছরি নহে) লাগান গেল। ছেলেরাও জলযোগ করিয়া লইল। এখানে কলাবাগান আছে, কিন্তু কাঁচকলার জন্য চেষ্টা ব্যর্থ হইল। চটীতে ও পথে অন্যত্র দুধ জাল দিতেছে, গরম দুধ পাওয়া যায়, চা-খোরদিগের খুব সুবিধা, চা না খাইয়া যাঁহারা প্রাতরাশ-হিসাবে শুধু দুগ্ধ পান করেন, তাঁহাদেরও সুবিধা। আমাদের কোনওটিই অভ্যস্ত নহে, সুতরাং এমন সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। আর ৩।৷০ মাইল পরে ভট্টিসেরা চটী; তাহার মাইল খানেক থাকিতে এক স্থানে ৺কালীমূর্ত্তি স্থাপিত (দেবীর উত্তমাঙ্গ-মাত্র)—অবশ্য ব্যবসা-হিসাবে। তথাপি ৺কাশীর দশাশ্বমেধ-ঘাটের নিকট কালীতলা ছাড়িয়া এই প্রথম ৺কালী-দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম (শাক্ত রক্ত আজও এতই প্রবল)। ঐখানে এক জন অন্ধ ভিখারী কালীমায়ীর সেবায়েত কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া 'শেঠজি'র (এ পক্ষের) মনোরঞ্জনের জন্য একটি সুন্দর গান গায়িল—বড় মিষ্ট লাগিল; গানটিতে হরিদ্বার হইতে ৺কেদারধাম ও ৺বদরীধাম পর্য্যন্ত সকল তীর্থের নাম, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, মায় চটীর নাম পর্য্যন্ত আছে, দেবলীলাকীর্ত্তন ও ভক্তিভাব ইহাতে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত; গানের ধূয়া—'শ্রীকেদার বদরীদর্শনকে চল্ রে'। 'গঙ্গা-যমুনা নাহ রে,' 'নয়ন সফল কর্ রে,' 'পাতক সব দল্ রে,' 'হৃষীকেশ বিমল-বেশ,' 'ত্রিযুগীনারায়ণ যাঁহা', তুঙ্গনাথ সম্বন্ধে 'শৈল তুঙ্গ, অতি উত্তুঙ্গ', ইত্যাদি। এইরূপ এক এক টুকরা মনে আছে, সমগ্র গানটি টুকিয়া লইতে পারিলাম না; অন্ধ সুরদাসকে বখশীশ সামান্য কিছু দিলাম, এই পথে ফিরিবার সময় সবটা টুকিয়া লইব আশা করিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ফিরিয়াছিলাম, তখন তাহার দেখা পাই নাই। আমি (৮৷০ বেলায়) ভট্টিসেরা পৌছিলে ছেলেরা আমার মুখে শুনিয়া তাহার সন্ধানে ছুটিল, কিন্তু খানিক গিয়া শুনিল, ভিখারী 'বস্তি'তে চলিয়া গিয়াছে। সুযোগ একবার হারাইলে আর দ্বিতীয়বার আসে না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

ভট্টিসেরা চটীতে ঝরণা আছে,(water-mill) 'পানচাকী'ও আছে (আশ্বিন-সংখ্যা ৯৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য); যে দোকানে

'পানচাক্কী' আছে, সেইখানে বাসা লইলাম। এবার একতালা। পুদিনা, ধানয়া, কচু, বেগুন ও তামাকের জমি পাশেই আছে। এখানে একটি ডাকবাক্স দেখিলাম। এখানে ও পরবর্ত্তী পথে আরও অনেক চটীতে ব্রাহ্মণ কেদারমাহাত্ম্য শুনাইতে আসে—পুঁথি বগলে—অবশ্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণার আশায়। এই ব্যবসাদারীতে আমাদের ইংরেজীনবিশ মেজাজ এতই গরম হইত যে কোথাও তাহাদিগকে আমল দিই নাই। এখন বুঝিতেছি, কাজটা ভাল করি নাই।

আহার ও বিশ্রামের পর এখান হইতে টাটকা-তৈয়ারী আটা কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া (সংগ্রহ করাও বিপজ্জনক, কেন না, পরের চটীতে না কিনিলে দোকানদার চটিবে—আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ৩৷৹টায় রওনা হওয়া গেল। (চড়াই) মাইল দুই পরে ছান্তিখাল চটী ছিল, ঝরণা শুকাইয়া যাওয়ায় চটী উঠিয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকখানি ভাঙ্গা ঘর অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৯ পৃঃ)। আমাদের 'সুজলা-সুফলা' বঙ্গভূমিতে মানুষের অধীন প্রকৃতি, মানুষ ইচ্ছামত কূপ-পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা খনন করিয়া বাসের সুবিধা করিয়া লয়। আর এ অঞ্চলে প্রকৃতির অধীন মানুষ, যেখানে প্রাকৃতিক ঝরণা বা নদী, সেখানেই চটী বসাইয়াছে, 'বস্তি' বসাইয়াছে, বসবাসের স্থান প্রস্তুত করিয়াছে।

বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সুতরাং আর ২৷৹ মাইল গিয়া থাঙ্করা চটীতে ৪।৪৫ মিনিটে অর্থাৎ বেলা থাকিতেই আড্ডা লইতে হইল। পথ প্রথমে খুব চড়াই, পরে উতরাই; পাকডাণ্ডী, অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে খাড়া হাঁটাপথ দিয়া আরও শীঘ্র যাওয়া যায় (ছেলেরা সেই পথেই গিয়াছিল), এরূপ পথ স্থানে স্থানে আছে। এখানেও 'পানচাক্কী' আছে—পট্টবতী নদীতে। এখানেও ডাকবাক্স আছে। দোকানগুলি একতলা, বড় বড় ঘর; খুব ভিড়, তবে শ্রীনগরের ধর্ম্মশালার তুলনায় কিছুই নহে। বেগুন গাছে বেগুন ঝুলিতেছে দেখিলাম, কিন্তু শুধু দর্শনসুখই হইল। যাহা হউক, এখানে বাঁধাকপি পাওয়া গেল। বাঁধাকপি এ অঞ্চলে লম্বা ধাঁচের, চওড়া গোলাকার নহে। আর দোকানে পেড়া পাওয়া গেল। সুতরাং রাত্রির আহারে একটু যুৎ হইল। বাঁধাকপিটির কম অর্দ্ধেক রাতে রান্না হইল ও বেশী অর্দ্ধেক পরদিনের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য সঞ্চিত থাকিল। 'সঞ্চয়ী নাবসীদতি'; বোধ হয়, 'কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ', এই নিষেধ-বাক্যের আমলে আসিব না।

সপ্তম দিন—২৭এ বৈশাখ ১০ই মে বৃহস্পতিবার

ভোর ৫টায় থাঙ্করা হইতে রওনা, বেলা ৯টায় রুদ্রপ্রয়াগ (৮ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।

বৈকাল ৪টায় রুদ্রপ্রয়াগ হইতে রওনা, সন্ধ্যা ৭টায় রামপুর চটী (৭৷৹ মাইল)—রাত্রিযাপন।

স্কুলে অঙ্ক কষিতে হইত, "যদি এক জন লোক প্রত্যহ ১৫ মাইল হাঁটে, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান কয় দিনে পৌছিবে? (কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান ৬৭ মাইল)।" এই সব অঙ্ক আমার মোটে কষিতে প্রবৃত্তি হইত না, কেন না, আমি ইহা ডাহা ভুল বলিয়া মনে করিতাম, যেহেতু, এক জন প্রথম দিন ১৫ মাইল চলিলে দ্বিতীয় দিন কখনই অত চলিতে পারিবে না। পাঠক মহাশয় হয় ত মনে ভাবিতেছেন, এক্ষণে লেখকেরও সেই দশা। প্রথম দিন ১৮ মাইল, দ্বিতীয় দিন ১৬ মাইল, তৃতীয় দিন ১৪ মাইল, এইরূপ কমিতে কমিতে সপ্তমে চড়িবার প্রাক্কালেই ১২ মাইলে নামিল! কিন্তু প্রকৃত কারণ তাহা নহে। রুদ্রপ্রয়াগে পূর্ব্বাহ্ণে না পৌছিলে তীর্থকৃত্য হইবে না, সুতরাং বেশী চলিয়া পূর্ব্ব-দিনই রাতারাতি রুদ্রপ্রয়াগে পৌছিয়া কোন লাভ হইত না, পূর্ব্বাহ্ণ সেখানেই কাটাইতে হইত—এই বিবেচনায় গতিবেগ মন্দ করা হইয়াছিল। (দেবপ্রয়াগের বেলায়ও এইরূপ করা গিয়াছিল, কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ।) আর বৈকালে বৃষ্টির জন্যও আটকা পড়া গিয়াছিল। নতুবা এক দিনে শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ ২০ মাইল, একটু চেষ্টা করিলেই যাওয়া যাইত!

ভোর ৫টায় রওনা হওয়া গেল। এ পথে বেশ চড়াই উতরাই আছে, বিশেষতঃ প্রথম অংশে। দেবপ্রয়াগে পাণ্ডাজী বলিয়াছিলেন, যাহা কিছু কষ্টকর পথ দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত, পরে সমতল রাস্তা। এখন বুঝিলাম, এটা আমাদিগের উৎসাহ-ভঙ্গ যাহাতে না হয়, সেই জন্য 'স্তোক'বাক্য। ২ মাইল পরে নরকোটা ও তাহার ৪ মাইল পরে গুলাবরায় চটী; উভয়ত্রই ঝরণা, খুব জলের সুখ—যদিও কোথাও থাকা হইল না। গুলাবরায় চটীতে কলাগাছ, আম, জাম ও অশ্বত্থগাছ স্থানটিকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর করিয়াছে। এখানে কয়েকটি বেগুন ও কাঁচালঙ্কা সংগ্রহ করা গেল। (রান্নার কথাটাও এইখানে সারিয়া রাখি। বেগুন তিত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া ভাজা

হয় নাই, নিরামিষ ঝোলে দেওয়া হইয়াছিল, একটু তিত হইলেও রকমারি বলিয়া ভালই লাগিয়াছিল।) এখানকার পেড়া ও মিঠাইও মন্দ নহে। অবশ্য পরে পরখ করিয়া দেখিয়াই কথাটা বলিতেছি। ছেলেরাও এখানে জলযোগ করিল।

পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি খেজুরগাছ দেখিলাম, পূর্ব্বেও ২।১ স্থানে দেখিয়াছি, গাছগুলি (একেবারে dwarf-palm না হইলেও) আমাদের দেশের তুলনায় বেশ ছোট, খেজুর ধরিয়াছে, তাহাও ছোট ছোট। অবশ্য এ দেশে 'শিউলি' নাই, সুতরাং গাছ কাটিতে জানে না, খেজুর-রস ও খেজুর-গুড়ের স্বাদ এদেশবাসীরা পায় না, কি দুর্ভাগ্য! এ যেন মৌচাকে মধু নাই, শুধু মৌমাছির হুলই সার—তীক্ষ্ণ কণ্টকাগ্র শাখাই বৃক্ষের সম্পদ্! এই পথে যাইতে (তখন পাদচারী ছিলাম) প্রথম সুচ-সুতা ও টিকলি বিলি করিলাম—(শ্রাবণ-সংখ্যা, ৬৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ৫টি পাহাড়ী সুন্দরীকে; ৪খানি-মাত্র বাহিরে ছিল সুতরাং ভাগে মিলিল না, এক জনকে মনঃক্ষুণ্ন করিতে হইল। সকলেরই নাকে বড় বড় নথ, গলায় লাল পলার মালা, পরণে ঘাগরা ও জামা; অনেকের মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, হাতে কাস্তে,—ঘাস, গাছের ডালপালা ও কাঠ কাটিয়া আনার জন্য। এই দলে বালিকা ও যুবতী ছিল; বর্ণ গৌর, মুখশ্রী সুন্দর, যদিও পরিচ্ছদ পরিপাটী ছিল না। বুঝিলাম, ইহারা গিরিরাজকন্যা গৌরীর সহিত নিঃসম্পর্কা নহে। পুণ্যবতী গৃহিণী ৺কামাখ্যা-পীঠে কুমারী ও সধবা-পূজা করিয়াছেন,তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তথাকার বালিকা ও যুবতীরা দেখিতে সাক্ষাৎ ভগবতীর মত। আমার ভাগ্যে সেই শরীরিণী মানবীরূপা ভগবতীর দর্শন-পূজন ঘটে নাই, সে ক্ষোভ কতকটা মিটিল। 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।'

আর দুই মাইল পরে (এ পথটা সিধা) রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছিলাম—বেলা ৯টায়। অলকনন্দার উপর ঝুলান লৌহসেতু পার হইয়া তথায় গেলাম। বাসায় পৌঁছিয়া শুনিলাম, তীর্থস্থানে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয় বলিয়া ডাণ্ডীওয়ালারা বিধবাটিকে (ভারলাঘবের জন্য) পুলের ওপার হইতে নামাইয়া দিয়াছিল! ছেলেরা পূর্ব্বাহ্ণেই ধর্ম্মশালায় স্থানসংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল—একতলায় একটি ঘর ও সম্মুখস্থ রক। ধর্ম্মশালাটি দোতলা, অলকনন্দার উপরেই,তবে নদী খানিকটা নীচে। খুব ভিড় ছিল বলিয়া ধর্ম্মশালার রান্নাঘরগুলি বেদখল হইয়া যাওয়ায় পার্শ্বস্থিত দোকানে রান্নার বন্দোবস্ত হইল। ২।১ দল যাত্রী স্থানাভাবে গাছতলায় রান্না চড়াইয়াছিল। এখানে ঘি ও আটা সস্তা, দুধ মিলিল না। (প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া গিয়াছে, এইরূপ কোথাও কোথাও মিলে নাই। সহর জায়গা হইলেই এই বিভ্রাট ঘটে।) এখানকার পায়খানা অতি পরিচ্ছন্ন, সর্ব্বদাই মেথরে পরিষ্কার করিতেছে, এক পয়সা সেলামী লাগে। দেবপ্রয়াগে যেমন নরকদর্শন করিয়া আসিয়াছি, এখানে ঠিক তাহার বিপরীত। পায়খানার এমন সুবন্দোবস্ত সারা পথে আর কোথাও দেখি নাই।

যাক্, আহার-নির্হারের কথা ছাড়িয়া এখন ধর্ম্ম-কর্ম্মের কথা বলি। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই এ পথে যাত্রা, তবে দেহ ও আত্মা লইয়া মানুষ, সুতরাং শারীর ক্রিয়া বাদ দিলেও চলে না। সকলে মিলিয়া পাণ্ডার গোমস্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সঙ্গম-তীর্থে যাওয়া গেল; দেবপ্রয়াগ অপেক্ষাও এখানে বিস্তর শিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সঙ্গমস্থলে যাইতে হইল; যথারীতি সঙ্কল্পস্নান ও ভোজ্য উৎসর্গ হইল (আর মস্তকমুণ্ডন নাই, কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; এখানে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম; জলের বেগ দেবপ্রয়াগ অপেক্ষাও প্রবল, গর্জ্জন ও উল্লম্ফন ভয়াবহ। উত্তাল তরঙ্গ ও গভীর গর্জ্জন পুরীর 'সাগর-লহরী-সমানা'। তাহার উপর জল তুষারশীতল, কাহার সাধ্য জলে নামিয়া স্নান করে? সুতরাং 'ঘটীগঙ্গা'তেই সারিতে হইল। পারে উঠিয়া রুদ্রেশ্বর শিব-দর্শন করা গেল; এখানেও দেবপ্রয়াগের ন্যায় মন্দির-চত্বরে একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে। এখানে ডাকঘর ও বাজার আছে—তবে দেবপ্রয়াগ ও শ্রীনগরের মত সমৃদ্ধ বাজার নহে। রুদ্রপ্রয়াগ একটি জংশন্। এখান হইতে মন্দাকিনীর ধারে ধারে ৺কেদারধামের পথ, ৺কেদারধাম এখান হইতে ৪৮ মাইল। আর অলকনন্দার ধারে ধারে ৺বদরীধামের পথ, ৺বদরীধাম এখান হইতে ৮৬ মাইল। বাঙ্গালা দেশ ছাড়া অন্য অঞ্চলের অনেক লোক ৺কেদারদর্শনে যায় না, তাহারা এখান হইতে ৺বদরীধামের পথ ধরে। শাস্ত্রবাক্য কিন্তু—অগ্রে কেদার-দর্শন না করিয়া ৺বদরীযাত্রা নিষ্ফল।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে গুপ্তকাশী—২৪ মাইল।

রুদ্রপ্রয়াগে আহার, বিশ্রাম ও ২।১ খানি চিঠি লিখিয়া বেলা ৪টায় ('বিষ্যুৎবারের বারবেলা'য়) * রওনা হওয়া গেল।

* এই দিনকার কথাটা মনে আছে বলিয়াই বারবেলার উল্লেখ করিলাম। নতুবা বারবেলা, কালবেলা, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ, যোগিনী,

শুনা ছিল, ৺কেদারধামের পথ কঠিন (তাই 'কঠিন কেদার' প্রবাদবাক্য), দেখিলামও, এখান হইতেই পথ সঙ্কীর্ণ ও প্রথম ২ মাইল চড়াই ; পাহাড়গুলি খাড়া উঠিয়াছে ও গাছপালা বিশেষ নাই। ২ মাইল পরে খানিক সমতল, সুন্দর বেদী-বাঁধান দুইটি অশ্বত্থগাছ (যেমন শ্রীনগরে প্রবেশের পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম)। এখানে একটি দড়ীর ঝুলা দেখিলাম ও মন্দাকিনীর ধারে ধারে কলকল্লোল শুনিতে শুনিতে চলিলাম। ৩য় মাইলে একটি ঝরণা, ৪র্থ মাইলে আবার একটি ঝরণা, কঠোর পথে পরম-পুরুষের বা পরমা প্রকৃতির করুণাধারা। এই পথে ত্রিযুগী নারায়ণের পাণ্ডা হংসরাম (কোট-প্যাণ্টালুন-পাগড়ী-পরিহিত) আমার কপালে ফোঁটা দিয়া শিষ্য-চিহ্নিত করিলেন।

'বিষ্যুৎবারের বারবেলা' ফলিতে বিলম্ব হইল না, মুষলধারে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, বাধ্য হইয়া ছত্তৌলি চটীতে (৫ মাইল) আশ্রয় লইতে হইল। এখানে ত্রিযুগী নারায়ণের অনেকগুলি পাণ্ডা আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রথমে আমাদিগকে পাকড়াইবার চেষ্টা করিলেন, পরে সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে জানিয়া কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিলেন। আমরা তাঁহাদিগের এই দীনতাস্বীকারে ক্ষুণ্ণও হইলাম, রুষ্টও হইলাম, ফলে তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম না। দোকানে বহু লোকই আশ্রয় লইয়াছিল, সুতরাং 'ন স্থানং তিলধারণম্।' অথচ বেহারারা শিলাবৃষ্টিতে এমন ভড়কাইয়া গিয়াছিল যে, ঐখান হইতে আর নড়িতে চাহে না। অনেক ধমক-চমকে তবে তাহাদিগকে (বৃষ্টি থামিলে) চলিতে রাজী করা গেল। এ চটীটি মন্দাকিনীর কূলে ; স্বচ্ছ হরিদাভ জল, তলদেশের উপলখণ্ড সুস্পষ্ট দেখা যায়। এখানেও বালক-বালিকারা সুন্দর গান গাহিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল, আধলা পাই কয়েকটি দেওয়া গেল। এখানেও 'বদরী যাও' পাখীর ডাক শুনিলাম। (যদিও আপাততঃ আমরা ৺কেদারধামের পথ ধরিয়াছি।) এই চটীতেও দেখিলাম, এধার ওধার অনেক দূর পর্য্যন্ত তারের ঘের দিয়া সযত্নে আম্রবৃক্ষ রোপিত। (কুণ্ডাচটীর কাছেও এই-রূপ দেখিয়াছি। কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২৩ পৃঃ)। এক মাইল পরেই আবার একটি ঝরণা। এ অঞ্চলে জলের সুখ বলিয়াই বোধ হয় চারা তৈয়ারীর এত উৎসাহ। খানিক গিয়া পথে আর একটি ঝরণা দেখিলাম, সরুধারে জল পড়িতেছে, ঝরণার মুখে কে একটি অশ্বত্থপত্র দিয়া রাখিয়াছে—জল-সংগ্রহের সুবিধার জন্য। আর একটি ঝরণা হইতে গিরিমাটী রংএর জল ঝরিতেছে। এই সব বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ৭৷৷০ মাইল দূরে (মাঝে তিলবাড়া ও মঠ চটী ছিল) রামপুর চটীতে সন্ধ্যা ৭টায় পৌছিলাম ও এখানেই রাত্রিবাস করিলাম। বেশ একটু শীত বোধ হইল। চটীটি মন্দাকিনী-কূলে। এখানেও দুধ মিলিল না (যদিও সহর জায়গা নহে)। এখানে গরুড়-নারায়ণের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

অষ্টম দিন—২৮এ বৈশাখ ১১ই মে শুক্রবার

ভোর ৫।০টায় রামপুর চটী হইতে রওনা,
১০৷৷০টায় ভীরী চটী (১০ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।
বৈকাল ৫।০টায় ভীরী চটী হইতে রওনা,
রাত্রি ৮টায় গুপ্তকাশী (৬৷৷০ মাইল)—রাত্রিযাপন।

ভোর ৫।০টায় রামপুর চটী হইতে রওনা হওয়া গেল, ৪ মাইল সমতল পথে হাঁটিয়া অগস্ত্যমুনি পৌছান গেল ; এখানে অনেকখানি সমতল জায়গা, বেশ একটা বড় মাঠ বলিলেও হয়। ১০।১২টা বেদী-বাঁধান অশ্বত্থগাছ, ছোট-বড় সব রকমই আছে ; বৃক্ষ-রোপণের জন্য মাটী খোঁড়া রহিয়াছে। এখানেও একটি দড়ীর ঝুলা দেখিলাম। অনেক-গুলি দোকানঘর (যাত্রীর বাসার জন্য) রহিয়াছে, ধর্ম্মশালা, সংস্কৃত পাঠশালা ও ডাকঘর আছে। অগস্ত্য মুনি, শৃঙ্গী মুনি, তথা অগস্ত্যেশ্বর শিব ও অন্যান্য দেবতার মন্দির দর্শন করিলাম। পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, এখানে রুদ্রাক্ষবৃক্ষ আছে, কিন্তু তাহার কোনও চিহ্ন দেখিলাম না। অগস্ত্যমুনি ছাড়াইলে আর পাওয়া যায় না বলিয়া এইখানে বিল্বপত্র সংগ্রহ করিতে উপদিষ্ট হইয়া-ছিলাম, কিন্তু কথাটা যথাকালে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম ; এখান হইতে খানিক দূর যাওয়ার পর গৃহিণীর মনে পড়িল ; যাহা হউক, সে জন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই, গুপ্তকাশী ও ৺কেদারধামে শিবপূজার জন্য তাজা বিল্বপত্র মিলিয়াছি(শ্রাবণ-সংখ্যা, ৬৪৪-৪৫ পৃঃ)।

এখান হইতে ডাণ্ডী-আরোহণে ২ মাইল গিয়া সৌ[illegible] চটীতে জলযোগ ও দুগ্ধ সংগ্রহ করা গেল ; পূর্ব্বদিন দুই বেলা দুধ না পাওয়ায় এবার পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হইয়াছিলাম।

দিকশূল মাসান্ত, পক্ষান্ত কিছুই বাছি নাই, অনেক সংয়ে লক্ষ্যও করি নাই।

যাত্রী ও কাণ্ডীওয়ালা

ভারবাহী পার্ব্বত্য ছাগল

অলকনন্দা

মন্দাকিনী

'মাসিক বসুমতী'র অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে এই আলোকচিত্র চারিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য উভয়কেই ধন্যবাদজ্ঞাপন করিতেছি।

(এখানে water-mill 'পানচাক্কী' আছে।) আরও ২ মাইল (খানিক চড়াইএর) পরে চন্দ্রাপুরী চটী—(এখানে চন্দ্রা নদী)। সুন্দর সুন্দর বাড়ী, বিশেষতঃ এক জন সদাগরের একখানি দোতলা (কাঠের) বাড়ী ; এখানকার বাজারে জুতা, ছাতা, লণ্ঠন, কম্বল, অয়েল্-ক্লথ্ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে দেখিলাম। কামারশালায় কেদারকঙ্কণ তৈয়ারী হইতেছে। এখানেও 'পানচাক্কী' আছে। এক স্থানে অশ্বত্থ ও বট পাশাপাশি রহিয়াছে, মন্দাকিনীর চরেও অশ্বত্থগাছ রহিয়াছে। নানা স্থানে এবং চন্দ্রানদীর ও-পারেও দেবালয় আছে। পথে আম, পেয়ারা ও কলাগাছ দেখা গেল। অগস্ত্যমুনি ও চন্দ্রাপুরী চটী দুইটি স্থানই সুরম্য দেখিয়া থাকিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু এত শীঘ্র হল্‌ট্ করিলে অন্যায় হয় বলিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। এই লোভ-সংবরণের পুরস্কার সত্বরই পাইলাম। চন্দ্রাপুরী চটী ছাড়াইয়া খানিক পরে তুষার-কিরীটী পর্ব্বত রৌদ্রে ঝক্-ঝক্ করিতেছে দেখিয়া চক্ষুঃ (ঝলসিয়া গেল না) জুড়াইল, সে যে কি সুন্দর ও মহীয়ান্ দৃশ্য, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। উল্লাসে মন ভরিয়া গেল, বাসনা হইল, পাখীর মত উড়িয়া গিয়া ঐ পর্ব্বতের উপত্যকায় অধিষ্ঠিত ৺কেদারনাথের দর্শন-স্পর্শনে জীবন সফল করি। সে বাসনা পূরণ করিতে না পারিয়া করযোড়ে গদ্‌গদ-কণ্ঠে 'প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্' ইত্যাদি স্তব আবৃত্তি করিলাম। ৺জগন্নাথের টানের কথা শুনি, এ ক্ষেত্রে ৺কেদারনাথের আকর্ষণ এত প্রবল হইল যে, সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্কল্প করিলাম, বৈশাখ-সংক্রান্তি সোমবারে ৺কেদার-দর্শন করিতেই হইবে। পুত্র ও ভাগিনেয়ের সহিত দেখা হইবামাত্র তাঁহাদিগকে সঙ্কল্পের কথা বলিলাম, তাঁহারাও সেই ভাবে প্রোগ্রাম্ আঁটিয়া ফেলিলেন। *

ক্রমে বেলা ১০।।০টায় চন্দ্রাপুরী চটী হইতে ২ মাইল পরে ভীরী চটীতে ভিড়িলাম। † স্থানটি মন্দাকিনী-কূলে। এখানে পৌঁছিতেই এক জন দোকানদার তাহার দোকানের পাশেই মন্দাকিনীতে অবতরণ করিবার শিঁড়ি আছে দেখাইয়া দিল, সুতরাং তাহার দোকানেই উঠিলাম (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৯ পৃঃ)। তবে বিষম ঠাণ্ডা বলিয়া এখানেও 'ঘটীগঙ্গা'য় সারিতে হইয়াছিল। বাড়াটি দোতলা, ঘরে দুয়ার-জানালা আছে, fire-place ও water-closet পর্য্যন্ত আছে—সুখ-সুবিধার চূড়ান্ত! বাজার, কামারশালা (কেদার-কঙ্কণ প্রস্তুত হই-তেছে), জুতা সারার দোকান ইত্যাদি আছে। আবার লোহার ঝুলান সেতু দিয়া ও-পারে গেলে ইহা অপেক্ষাও গুলজার বাজার দেখা যায়। ও-পারে দেবালয়ও আছে। আমাদের ও-পারে যাইবার সময় হয় নাই।

বৈকালে সামান্য বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে ডাণ্ডীওয়ালারা পথ চলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। শেষে বৃষ্টি ছাড়িলে রাজী হইল। ফলে রওনা হইতে বৈকাল ৫টা হইয়া গেল। প্রথমেই ঝুলান লৌহসেতু পার হইতে হইল। ২ মাইল পরে কুণ্ডচটী। গুপ্তকাশীর প্রত্যন্ত-প্রদেশে শম্ভুও বাম হইলেন! কুণ্ডচটীর পর দুই কি তিন মাইল বিষম চড়াই, ইহার মত খাড়া চড়াই পথে পূর্ব্বে বা পরে কোথাও পাই নাই। বোধ হয়, এই (অনুক্ত) কারণেই ডাণ্ডীওয়ালারা ভীরী চটী হইতে সে দিন আর নড়িতে চাহিতেছিল না। বেলা পড়িয়া আসাতে ডাণ্ডী হইতে নামিয়াছিলাম, খানিক চড়াই ভাঙ্গিয়াই রণে ভঙ্গ দিয়া ডাণ্ডী আশ্রয় করিলাম, রীতিমত (palpitation of the heart) বুক-ধড়ফড়ানি সুরু হইল। গৃহিণী আরও অনেকক্ষণ চলিয়াছিলেন, বিধবাটিকে বেহারারা খানিক খানিক হাঁটাইয়াছিল। বেহারারা ঘন ঘন দম লইতেছিল। এই বিষম চড়াই পথেও কিন্তু অপর লোকে খানিক ক্ষণ বেহারাদের পরিবর্ত্তে বিধবাটির ডাণ্ডী বহন করিয়াছিল (শ্রাবণ-সংখ্যা ৬৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এক জায়গায় রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ডিনামাইট দিয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইতেছে, সেখানে ডাণ্ডী হইতে নামিয়া এক জন বেহারার হাত ধরিয়া 'পাকডাণ্ডী' অর্থাৎ পাহাড়ের উপর খাড়া সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অতি কষ্টে পার হইতে হইল। (ছেলেরাও বিপজ্জনক পথ দেখিয়া সেখানে আমাদের খবরদারী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।) সরকারী পূর্ত্তবিভাগের সতর্ক দৃষ্টি ও ক্ষিপ্রকারিতা সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। সর্ব্বদা সরকারী লোক

* এখন ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না, ডায়েরীতেও লেখা নাই, কিন্তু ভাগিনেয়ের মুখে শুনিলাম, সৌরী চটীর পরেই, এমন কি, নরকোটার পরেই এই ধবল পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তবে বরাবর নহে। দৃষ্টি-গোচর হইলেও তখন বোধ হয় চৌম্বক আকর্ষণ এমন প্রবল হয় নাই।

† এই চটীতে পৌঁছিবার একটু পূর্ব্বে একটি অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম। বেগ অসহ্য হওয়াতে রাস্তা হইতে একটু নীচে নামিয়া মন্দাকিনী-কূলে প্রকৃতির প্রবল অনুরোধ রক্ষা করিয়া জলপাত্র সঙ্গে না থাকাতে মন্দাকিনীর পবিত্র জল নোংরা করিয়াছিলাম। হয় ত এই অনাচারের ফলেই পরে উদরভঙ্গ হইয়াছিল, পাপের শাস্তি যে অপ্রতিবিধেয়।

রাস্তা তদারক করিতেছে, কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার জন্য পাহাড়ের উপর 'বাংলো' (Inspection Bungalow) বহুস্থানে লক্ষ্য করিয়াছি। হিন্দুর তীর্থযাত্রাপথের সুশৃঙ্খলার জন্য বিদেশী বিধর্ম্মী গভর্ণমেণ্টের এই ঐকান্তিক চেষ্টা দেখিলে রাজভক্ত ও কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকা যায় না। (তবে রাজনীতিবিশারদরা অবশ্য বলিবেন, টাকাটা দেশের করদাতার, বিদেশীজাতির নিজের দেশ হইতে আনীত নহে।) আশা করি, যখন স্বরাজ মিলিবে, তখন এ সব বিষয়ে আরও যত্ন-আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। (তবে জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে এ সব ধর্ম্মানুষ্ঠান কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জিত হইবে কি না, তাহাও বিবেচ্য)।

যাক্, ও সব রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা। গুপ্তকাশীর কাছ হইতে মন্দাকিনীর ওপারে উখীমঠ বেশ দেখা যায়। (ফিরিবার সময় আর গুপ্তকাশী না আসিয়া অপর পার দিয়া উখীমঠ হইয়া ৺বদরীধামে যাইতে হইবে)। কলিকাতা ও হাওড়া-শালিখা বা শ্রীরামপুর ও বারাকপুর অথবা শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়ার ন্যায় এই দুইটি স্থান নদীর আড়াআড়ি। রাত্রিকালে ওপারের কাঠের বাড়ী ও আলোগুলি পাহাড়ের ধাপে ধাপে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, দেবপ্রয়াগে (কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২৮পৃঃ) দৃষ্ট আলোকমালা অপেক্ষাও সুন্দর।

শ্রান্তক্লান্ত হইয়া রাত্রি ৮টায় গুপ্তকাশী * পৌঁছিতেই এক বিভ্রাট্ ঘটিল। পাণ্ডার গোমস্তা পাণ্ডার নাম ভুলিয়া যাওয়াতে পাণ্ডার খোঁজ হইতেছিল না; শেষে সকলের সমবেত স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সে গলদ দূর হইল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বার হইতে বন্দরভেল পর্য্যন্ত যে পাণ্ডা আসিয়াছিল, সে গুপ্তকাশীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বরাবর ৺কেদারধাম-অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে; যাহা হউক, তাহার ভাগিনেয় মাতুলের প্রতিনিধিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা অকূলে কূল পাইলাম। (ভাগিনেয়রা নাকি খুব ধনী, বহু শাঁসাল যজমান আছে।) প্রথমে যে বাসা দিল (এখানে পাণ্ডারাই বাসা দেয়),সেখানে হিন্দুস্থানী প্রভৃতির বিলক্ষণ ভিড় থাকাতে আমাদের অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইল; পুত্র ও ভাগিনেয় অনেক বলিয়া কহিয়া অন্যত্র নিরিবিলি বাসার যোগাড় করিলেন। তবে আগে সুগঠিত দোতলাঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, এখন যুটিল নিতান্ত সাদাসিধা একতলা ঘর। যাহা হউক, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

এই সব গোলযোগে আর রান্না হইল না, রাত্রিকাল বলিয়া দুধের যোগাড়ও হইল না। বাজারের 'পুরী'-তরকারীতে উদর-পূর্ত্তি করিতে হইল। তখনকার মত ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ উদরভঙ্গের বনিয়াদে আর একখানি ইষ্টক বা প্রস্তর গ্রথিত হইল। (বনিয়াদ গাঁথা আরম্ভ হইয়াছিল, শ্রীনগর হইতে।)

পরদিন প্রাতঃকালে এক দল বাঙ্গালী (সম্ভবতঃ বরিশালের) যাত্রী ও যাত্রিণী আমাদের বাসার কাছেই বাসা লইলেন। পথে পূর্ব্বে ২।১ স্থানে ও পরেও ২।১ স্থানে ইঁহাদিগকে দেখিয়াছিলাম। ৮।১০ জন পুরুষ (সাধুও আছেন, গৃহীও আছেন) এবং অনেকগুলি গৃহস্থবধূ এই দলে, জননীদিগের কাহারও কাহারও ক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুও দেখিলাম। (এরূপ শিশু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালা আরও কোনও কোনও যাত্রিণীর ক্রোড়ে দেখিয়াছি। এই দুর্গম পথে কোন্ সাহসে তাঁহারা শিশু লইয়া চলেন, জানি না। অবশ্য সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান সহায়।) পুরুষরা পদব্রজে ও নারীগণ ডাণ্ডীতে যাইতেছেন। ইঁহাদিগের পথ চলার নিয়ম, যতদূর বুঝিলাম, এইরূপ ছিল। রাত্রি ১১।১১৷৹টার সময় রওনা হইয়া সারারাত চলিতেন—সঙ্গে উজ্জ্বল আলো, বোধ হয় 'Day-light'; প্রাতঃকালে যে চটীতে পৌঁছিতেন, সেইখানে সমস্ত দিন ও অর্দ্ধেক রাত্রি বিশ্রাম লইতেন।

নবম দিন—২৯এ বৈশাখ ১২ই মে শনিবার

এক রাত্রি তীর্থবাসের পর অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে তীর্থকৃত্য সম্পাদনের জন্য গুপ্তকাশীতেই স্থিতি। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে পাপের ভোগ আছে—'জঙ্গল যাওয়া'। এই ব্যাপারটি সমস্ত পথেই বড় অসুবিধাজনক, কিন্তু এখানকার মত এত নোংরা জঘন্য 'জঙ্গল' কোথাও দেখি নাই। অল্পস্থানের মধ্যে বন্দোবস্ত (নতুবা বাসা হইতে অনেক দূরে যাইতে হয়), এক ইঞ্চি স্থান নাই—যেখানে একটু পরিষ্কার দেখিয়া বসা যায়। যে সময়টুকু এই নরকে থাকিতে হইয়াছিল, কেবল গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়াছিল; ২।১ দিন পরেই যে উদরাময় উপস্থিত হইয়াছিল,

* এই গুপ্তকাশীর প্রসঙ্গে অনেকে উত্তরকাশী-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইতে পারেন। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বলিতেছি যে, উত্তরকাশী ৺কেদারধামের পথে নহে, গঙ্গোত্রীর পথে।

তাহার একটা অবান্তর কারণ বোধ হয় এই হুঙ্কারজনক স্থানে শৌচক্রিয়া।

২০। অথ শৌচক্রিয়া

এই কদর্য্য কথাটা যখন মাঝে মাঝে উঠিতেছে, তখন একবার খোলসা করিয়া বিবৃত করাই ভাল। তীর্থযাত্রার এ সব কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক, এই বিবেচনাতেই কথাগুলি বলা। প্রত্যেক চটীর কাছাকাছি উভয় দিক্ হইতে প্রবেশের পথে দুইটি লাল নিশান থাকে, ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা হয় যে, এই চৌহদ্দীর মধ্যে শৌচক্রিয়া-নিষেধ; ইহার বাহিরে রাস্তার ধারে বা পাহাড়ে যাইতে হইবে। রাস্তার ধারে বসিয়া গিয়াছে, লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুমাত্র নাই, এমন কি, স্ত্রীলোকরা পর্য্যন্ত, (অথচ রাস্তা দিয়া সর্ব্বদাই যাত্রী যাতায়াত করিতেছে), এই অশ্লীল দৃশ্য প্রায়শঃ দেখিয়াছি। নিজেরাও বাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে এই কদাচারে যোগ দিয়াছি।

যাহা হউক, নিষেধ থাকিলেও এই চৌহদ্দীর মধ্যেই অধিকাংশ লোকে উক্ত কার্য্য সমাধা করে। মেথর (ভাঙ্গী) তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, (ইহাদিগের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইবার যো নাই), পয়সা আদায়ের ফিকির, ২।১টা পয়সা দিলেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। চটীতে প্রবেশ করিতেই লম্বা সেলাম দেয়, 'গরীবকে মেহেরবাণী করিবেন,' ভাবটা এই। পাতের ভাত-তরকারীরও আশা রাখে। মূলে ব্যাপারটা এক পয়সার মামলা হইলেও তর্জ্জন-গর্জ্জনে মহা বিরক্তি হয়, মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া যায়; হয় ত দুপুরে রৌদ্রে গিয়াছি, তাহার উপর তাহারা আসিয়া এইরূপ বাধা দেওয়ায় এমন (upset) বদ্‌মেজাজী হইয়া যাইতাম যে, খোলসাই হইত না—মাথায় উঠিত; সে দিনকার মত একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহারে কিছুমাত্র শ্লীলতা রক্ষা করিত না, ঠিক কুকুরের মত তাড়া করিত, ঐ অবস্থায় স্ত্রীলোকের পিছু লইলে যে বেয়াদবি হয়, এ জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত নাই; যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত—পয়সার প্রত্যাশায়! অন্য অঞ্চলের স্ত্রীলোকরা এ সব বড় গ্রাহ্য করে না, স্বচ্ছন্দে বসিয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালী নারীর লজ্জা-সঙ্কোচ বেশী; তাঁহাদিগকে অনেক সময় ফিরিয়া আসিতে হইত। গুপ্তকাশীতে এবং আরও কোথাও গৃহিণীকে ও বিধবাটিকে এইরূপ অপমানিত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে।

এক স্থানে মেথরের একটি ৫।৬ বৎসরের কন্যা আমাকে তাড়া দেওয়াতে আমিও তাহাকে খুব তাড়া দিয়াছিলাম, সেজন্য মেথর বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে ধমক দেয়। অথচ পুত্র ও ভাগিনেয়কে দেখিবামাত্র একেবারে কেঁচো, সেলামের বহর দেখে কে? চটী ছাড়িয়া যাইবার সময় প্রায় সর্ব্বত্র মেথরকে ২।১ পয়সা দিয়াছি, ইহাকে (শেষে কাকুতি-মিনতি করিলেও) এক আধলাও দিই নাই। ইহাদিগের ঔদ্ধত্যের কঠোর শাসনের প্রয়োজন। শেষটা বিরক্ত হইয়া আর চটীতে পৌছিয়া পারতপক্ষে ও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না; পৌছিবার পূর্ব্বে যেখানে বেহারারা দম লইত, সেইখানে যাইতাম, ডাণ্ডীতে জলপূর্ণ ফ্ল্যাস্ক্ থাকিত; জলপূর্ণ না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কেন না, পথে প্রায়ই ঝরণা মিলিত। যাত্রীদিগকে (বিশেষতঃ পাদচারীদিগকে) এই প্রণালী অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছি।

এই কুৎসিত ব্যাপারের চূড়ান্ত আলোচনা হইয়াছে। এক্ষণে তীর্থকৃত্যের কথা বলি।

গুপ্তকাশীতে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, মণিকর্ণিকা কিছুরই অভাব নাই। তবে মন্দির ৺কাশীর তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র (যদিও পূর্ব্ব-বর্ণিত মহাদেব-চটীতে মহাদেবের মন্দির প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বড়); চত্বরের তিন ধারে যাত্রীদের বাসের জন্য পাকা দোতলা বাড়ী আছে; তাহা ছাড়া এখানে ৺কাশীর মত গঙ্গা নহে, গোমুখী ও গজমুখী দুইটি ধারা (ইহাদিগকে যথাক্রমে গঙ্গা-যমুনা বলে) হইতে একটি বাঁধান কুণ্ডে জল পড়িতেছে, ইহারই নাম মণিকর্ণিকা। এক হিসাবে ৺কাশীর মণিকর্ণিকা, কেদার-ঘাটের আদি-মণিকর্ণিকা বা গৌরীকুণ্ড অপেক্ষা ভাল, কেন না, বদ্ধ জল নহে, ধারার জল সর্ব্বদা পড়িতেছে। সকলে সেই জলে সঙ্কল্প-স্নান করিতেছে, আমার কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না, ধারার মুখ হইতে বাল্‌তিতে জল আনিয়া মন্দির-চত্বরে স্নান-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। যে ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করাইতেছিলেন, তাঁহাকে নগদ এক পয়সা দিয়া তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিলাম এবং অত ভিড়ে পিছল শিঁড়ি দিয়া কুণ্ডে অবগাহন-স্নান করিতে গিয়া পড়িয়া যাইব, এই বলিয়া পুরোহিতের মুখ বন্ধ করিলাম। পরে দেবদর্শন ও যথারীতি শ্রাদ্ধ এবং থালা, বাটী, জলপাত্র, বস্ত্র, ভোজ্য প্রভৃতি উৎসর্গ করিলাম—অবশ্য পুরোহিতের সাহায্যে। নিজের ও বিধবাটির একত্র করিয়া প্রায় ১৫৲ টাকা খরচ পড়িল। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ ও গুপ্তকাশী,

তিন স্থানেই ব্রাহ্মণভোজনের জন্য পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ 'মূল্য' ধরিয়া দিয়াছি।

এই সাধারণ তীর্থকৃত্য ছাড়া এখানে আর একটি অতিরিক্ত কার্য্য করিতে হয়। নারিকেলের (শুধু শুষ্ক শাঁস—'গোলা' বলে) ভিতরে এক খণ্ড স্বর্ণ ও এক খণ্ড রৌপ্য দান করিতে হয়—(স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডদ্বয় কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছিল; শ্রাবণ সংখ্যা, ৬৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) তাহাও করা গেল, এগুলি সঙ্গী ৺কেদারের পাণ্ডার গোমস্তার লভ্য হইল। (যদিও প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডার প্রাপ্য)। বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা ছাড়া এখানে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি আছেন। পঞ্চপাণ্ডবের একটি স্বতন্ত্র মন্দিরও বর্ত্তমান। এখানে মন্দির-দ্বারে এক পয়সা করিয়া লাগিল—৺কালীঘাটের মন্দিরের মত। (৺কাশীবিশ্বেশ্বরের কিন্তু অবারিত দ্বার।)

দেবদর্শন ও অন্যান্য তীর্থকৃত্য সমাধা করিয়া বাসায় ফিরিলে দক্ষিণহস্তের ব্যাপারের যোগাড় হইতে লাগিল। অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে পার্শ্বের দোকান হইতে গরম গরম জেলাপী আনিয়া জলযোগ সারা গেল। তাহার পর একবার বাজারটা ঘুরিয়া আসা গেল। দেবপ্রয়াগের মতই—এখানে কম্বল, অয়েল্-ক্লথ্, ছাতা, জুতা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই কয়দিন চলিয়াই ছেলেদের মোজা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, এখানে তাঁহারা এক এক যোড়া খরিদ করিলেন—মূল্য কলিকাতার সমান। দজ্জির দোকানে অনেকগুলি 'বাটুয়া' ঝুলিতেছে দেখিয়া একটি কিনিলাম—টাকা-পয়সা রাখার সুবিধার জন্য। দেবালয়ে ত চর্ম্মনির্ম্মিত মনিব্যাগ্ চলিবে না। বলা বাহুল্য, এখানেও ধর্ম্মশালা, সদাব্রত ও ডাকঘর আছে। পরে মধ্যাহ্নভোজন হইল, দুধও মিলিয়াছিল, ছয় আনা সের। এখানে মাছির উৎপাত পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানগুলি অপেক্ষা বেশী *—বোধ হয়, নিকটেই নরককুণ্ড বলিয়া।

পূর্ব্বদিনেই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, বৈশাখ-সংক্রান্তি সোমবারে অর্থাৎ আগামী পরশ্ব ৺কেদার-দর্শন করিব-ই। অদ্য সেই সঙ্কল্প পাকা হইল, কল্য ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন করিয়া পরশ্ব ৺কেদারধামে পৌছান চাই-ই। এই জন্য অদ্য বেশীক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া বেলা ১টার সময় পুত্র কাণ্ডীওয়ালাদিগকে লইয়া রওনা হইলেন—নারায়ণ চটীতে কতকগুলি আপাততঃ অপ্রয়োজনীয় জিনিশ রাখিয়া যাইবার জন্য—কেন না, ৺কেদারধামের পথ দুর্গম, বেশী জিনিশ থাকিলে বোঝা-ওয়ালাদিগের বড় কষ্ট হইবে। পরে স-ভাগিনেয় আমরা রওনা হইলাম বেলা ২টায়। এই যাত্রাপ্রসঙ্গ আগামী বারে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* মাছি-সম্বন্ধে একটু গবেষণা করিয়াছি। এই পাদটীকায় লিপিবদ্ধ করিলাম। পাহাড়ে মাছি প্রায় নাই, বোধ হয়, যেখানে আছে, সেখানে ঝরণার কাছে যাত্রীরা মলত্যাগ করিয়াছে বলিয়া। চটীতে (কেবল খুব ঠাণ্ডা জায়গায় নাই) মাছি খুব। কেন? অবশ্য অন্ন-ব্যঞ্জন, তপা গুড়, চিনি, পেড়া, কালাকাঁদ, জেলাপীর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আসে, কিন্তু ততোঽধিক প্রবল আকর্ষণ এবং ইহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য বিষ্ঠার গন্ধে। চটী নিকটে আছে, তাহা তিন প্রকারে জানা যায়—(১) বিষ্ঠা-গন্ধে, (২) মাছির আবির্ভাবে ও (৩) ঝরণা বা নদী, অপেক্ষাকৃত সমতল স্থান, চাষের জমি, অশ্বত্থ, আম, কলাগাছ প্রভৃতি অদূরে দর্শনে।

আমি তাঁরি পোষা পাখী

নিখিল ভুবনে শ্যাম জীবনেরি কুঞ্জে,
সুখ মধু লোটে প্রাণ ব্যথা-ফুল-পুঞ্জে।
বিরহ-বাতাসে দোলে প্রেম-মাধবী,
পাতায় কিরণে আঁকা কত না ছবি!
বিশ্বেরই বন্ধু সে রস খেয়ালিয়া,
পাখী মোরে পোষে সেথা স্নেহ পিয়াইয়া।
পাশে এসে দেয় শিষ্ মধু ফাগুনে,
মনখানি ওঠে জ্বলি সুর-আগুনে।
সারা মধু-মাস তাই মন প্রাণ ভরি
তাঁরি পানে চেয়ে চেয়ে তাঁরি গান করি।
বরষায় রাঙ্গাপায় বাজায়ে নূপুর,
ধরণীর বুকে ঢালে করুণা মধুর।
রস অভিলাষী মোর শত উপবাস,
সরস পরশে মিটে তৃষিত সে আশ।
শারদ আকাশে যবে নীল দরিয়ায়,
খেয়ালী সে শাদা নায়ে ভাসিয়া বেড়ায়।
পাখায় আকুল মোর কম্পন জাগে,
সঞ্চরি তাঁরে ঘিরি আমি অনুরাগে।
শীতের কুহেলী শ্বেত—দিবা অবসানে,
মৃত্যুর মায়া-জাল ধীরে যেই টানে,
আমি তাঁর পোষা পাখী তাঁরি সাথে চলি—
শূন্য কাননে কাঁপে শেষের কাকলী॥

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৭ই নভেম্বর বেলা সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ারোধের ফলে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শান্ত নির্ম্মল হাস্যোজ্জ্বল গগনে সহসা অশনিসম্পাতে মানুষ যেমন চমকিত হইয়া উঠে, এই নিদারুণ শেলসম সংবাদ তেমনই অতর্কিতভাবে আকুমারী হিমাচলের কোটি কোটি নরনারীর বক্ষে আঘাত করিয়াছে। সত্যই অসহনীয় এ সংবাদ—নির্ম্মম নিষ্ঠুর কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে দেশের ঘোর সঙ্কটকালে এমনই ভাবে যে দেশের ইন্দ্রপাত হইবে, তাহা ত মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কেহ জানিত না!

পঞ্জাবের সিংহ আজীবন দেশের মুক্তিসংগ্রামে সিংহ-বিক্রমে অগ্রণী হইয়া যেমন জনগণের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন, তেমনই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও লাহোরে সাইমন কমিশন বর্জ্জনে, জাতির আত্মসম্মান সংরক্ষণে, জাতির অগ্রণীরূপে, নেতৃরূপে সিংহ-বিক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহার স্বাস্থ্য আদৌ সন্তোষজনক ছিল না, কিন্তু সে জন্য দেশের দিক্‌পাল নিজ কর্ত্তব্যপালনে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই; সেই সদা হাস্যানন কর্ম্মবীর লালা লাজপৎ রায় লাহোর ষ্টেশনের সান্নিধ্যে সাইমন কমিশনের রক্ষী পুলিসের লাঠী বুক পাতিয়া লইয়াছিলেন, দেশমাতৃকার আহ্বানে অদম্য সাহসে লাঞ্ছিতের কণ্টক-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন মাতৃযজ্ঞে শেষ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন! সে সময়ে তাঁহার সিংহগর্জ্জনে দেশবাসী তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াছিল—তাঁহার সেই লাঞ্ছনাকে মায়ের দেওয়া সম্মানের শিরস্ত্রাণ বলিয়া সাদরে ধারণ করিয়াছিল। কি দুর্দ্দৈব—পঞ্জাবকেশরীর সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর আহ্বানের বাণী দেশের দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে না হইতে জন্মভূমির কৃতী সন্তান সমগ্র জাতিকে সীমাহীন শোকসাগরে ভাসাইয়া কোথায় কোন্ জগতে চলিয়া গেলেন! তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যভার আজ কে মাথায় তুলিয়া লইবে? পঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায় নাই, এ কথা ত এখনও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না!

লালা লাজপৎ রায়

অশুভক্ষণে এ দেশে এবার সাইমন কমিশনের পদার্পণ হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে যে বিস্ময়কর একতা সম্ভবপর হইয়াছিল, কোহাট দিল্লীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষহলাহলের ফলে সেই একতা বুঝি চিরতরে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু সম্মিলিত জাতির তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া যে দিন স্বেচ্ছাচালিত শাসকজাতি সমগ্র দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ দেশে সাইমন কমিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন ভারতে আবার সন্ধিক্ষণের উদয় হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যেন ঘোর দুর্য্যোগের ঘনান্ধকারের মধ্য হইতে সবেমাত্র বালারুণের কিরণসম্পাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জাতির পুণ্যফলে লক্ষ্ণৌ সহরে মিলনের যে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল, তাহাই ফলে ফুলে সুশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবে। এমন সময়ে আচম্বিতে মিলন-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতের হস্ত হইতে আরত্রিকের পঞ্চপ্রদীপ খসিয়া পড়িল, মাতৃমঙ্গলে নিবেদিতপ্রাণ পুরোহিতের জীবন-প্রদীপও সঙ্গে সঙ্গে অকালে নির্ব্বাপিত হইল! অভাগা দেশ! অভাগা জাতি! আশায় নৈরাশ্যই বুঝি তোমার ললাট-লিপি!

যে পুরুষসিংহ হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির অর্ঘ্যদানে জননী জন্মভূমির আজীবন পূজা করিয়াছিলেন,—দেশের মঙ্গলসাধনে—জাতির মুক্তিসাধনে যিনি আপনার স্বার্থ তুচ্ছজ্ঞানে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, স্বোপার্জ্জিত কষ্টলব্ধ অর্থ যিনি অকাতরে অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশের ও দশের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, ত্যাগের পথে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া আমলাতন্ত্র সরকারের বিরাগভাজন হইয়া যিনি কষ্টবিপদের কণ্টকমুকুট হাসিমুখে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন,—সেই লালা লাজপৎ রায় কাহার

উপর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া লোকান্তরে অন্তর্হিত হইলেন ? তাঁহার বিয়োগে কেবল ত পঞ্জাবের সর্ব্বনাশ হয় নাই,—এ যে সমগ্র জাতির সর্ব্বনাশ ! এ যে সমগ্র দেশের সর্ব্বনাশ ! জগতে যে স্থানে মহত্ব ও মনুষ্যত্বের সমাদর আছে, সেই স্থানের সর্ব্বনাশ ! সরল, শান্ত, নির্ভীক, তেজস্বী, সত্যসন্ধ, ত্যাগী, কর্ম্মী, দেশপ্রেমিক, শিক্ষানুরাগী, ছাত্র-বন্ধু লাজপৎ রায় জাতির বহু পুণ্যফলে কদাচিৎ কোন যুগে একটি আবির্ভূত হইয়া থাকে,—লাজপতের অভাব লাজপৎ না হইলে কে পূর্ণ করিবে ?

জীবন-কথা

বাল্যজীবন

লালা লাজপৎ রায় ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব প্রদেশে লুধিয়ানা জিলার অন্তর্গত জাগরাঁও নামক ক্ষুদ্র নগরে আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লালা রাধাকিষণ। যে সময় লালা লাজপৎ রায় জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা কোন সরকারী বিদ্যালয়ে উর্দ্দু ভাষার শিক্ষকতা করিতেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথিতনামা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উপদেশের প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন।

লালা রাধাকিষণ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি বিখ্যাত মুসলমান নেতা সার সৈয়দ আমেদের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু পরে সার সৈয়দ তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন করিয়া কংগ্রেসকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে লালা রাধাকিষণ তাঁহাকে যে সকল তীব্র মন্তব্যপূর্ণ খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি অনুসন্ধান করিলে, 'কোহিনুর' নামক উর্দ্দু পত্রিকার তৎকালীন সংস্করণে এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে।

মাতার দৃষ্টান্তে চরিত্রগঠন

লালাজীর মাতাও নানা সদ্‌গুণে প্রভূত গুণসম্পন্না মহিলা ছিলেন। পিতা অপেক্ষা মাতার প্রভাব লালাজীর জীবনে অধিকতর কার্য্যকর হইয়াছিল। লালাজী চিরজীবন মিতব্যয়িতা এবং কঠোর আড়ম্বরশূন্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সকল গুণ তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতার পুণ্যস্মৃতি লালাজীর হৃদয়ে আজীবন অনপনেয় ভাবে অঙ্কিত ছিল।

লালাজীর শিক্ষা

নিজে শিক্ষক এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন বলিয়া লালাজীর পিতা পুত্রকে উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য তিনি বিশেষভাবে যত্ন গ্রহণ করিতেন। গৃহে শিক্ষালাভের পর বালক লাজপৎ শিক্ষালাভার্থ সরকারী কলেজে প্রবেশ করেন। তথায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররূপে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আইন পরীক্ষা এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেষ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের ভিতর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি হিসার নগরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

পঞ্জাবে দয়ানন্দের প্রভাব

১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দ পঞ্জাবের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। উহার ১০ বৎসর পূর্ব্বে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দেশে জাতীয়তা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১০ বৎসরের ভিতর তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন ক্রমে ক্রমে তীব্র ভাব ধারণ করে। উহার ফলে পঞ্জাববাসীদিগের হৃদয় যে ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ড্যালহৌসী কর্ত্তৃক পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজাধিকারভুক্ত হইবার পর তেমন ভাবে কখনও বিচলিত হয় নাই। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের ভিতর যে অজ্ঞেয়তাবাদের সঞ্চার হইয়াছিল এবং মিশনারীদিগের কুশিক্ষা বশতঃ স্বধর্ম্মের প্রতি বিরাগের আবির্ভাব হইয়াছিল, স্বামীজীর আন্দোলনের ফলে তাহা প্রতিহত হয়। আবার কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে স্বামীজীর প্রতিপক্ষগণ পাল্টা আন্দোলন আরম্ভ করেন। এ দিকে স্বামী দয়ানন্দের অনুরক্ত ভক্ত লালা লাজপৎ রায়, দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ এবং পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থীর সহযোগে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের সমর্থনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন।

অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের প্রতিষ্ঠা

লালা লাজপৎ রায়, লালা হংসরাজ এবং পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় আর্য্য-সমাজের প্রভাব দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল। ঐ তিন জনের চেষ্টায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দী ভাষা ও হিন্দী সাহিত্যের প্রচার, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি লোকের অনুরাগবৃদ্ধি, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

লালাজীর দেশাত্মবোধ

আর্য্য-সমাজ ও তৎসংসৃষ্ট অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একান্ত প্রিয় কার্য্য হইলেও লালাজী মনে করিতেন যে, স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করা দেশমাতৃকার প্রত্যেক সন্তানের অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেই জন্য তিনি প্রথম হইতেই সমাজ সংস্কার ও রাজনীতি সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময়ে তিনি আর্য্য-সমাজ ও কলেজের উন্নত সাধনার্থ অধিকাংশ সময় ও আয়ের অনেক অংশ ব্যয় করিতেন। হিসারে ওকালতী কার্য্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হওয়াতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতেছিল। কিন্তু হিসারের মত ক্ষুদ্র নগরে জীবন আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার মত উৎসাহী যুবকের হৃদয় কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সে জন্য তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লাহোরে আগমন করিয়া তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

রাজনৈতিক জীবন

লালা লাজপৎ রায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। প্রথম জীবনে লালাজী আলিগড়ের সার সৈয়দ আমেদের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নাইট উপাধি

লাভের পূর্ব্বে সার সৈয়দ আমেদের রাজনৈতিক মত অন্য প্রকার ছিল। তিনি তখন কংগ্রেসের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। উত্তরকালে ভারতের যে সকল রাজনীতিবিদ্ মডারেট অর্থাৎ ধীরপন্থী নামে অভিহিত হইয়াছেন, রাজনীতি সম্বন্ধে সার সৈয়দের অভিমত তখন সেইরূপ ছিল। দেশে শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অভিমত বিশেষরূপ উদার ছিল। কিন্তু নাইট উপাধি লাভের পর তাঁহার অভিমত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি তখন কংগ্রেসের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। লালা লাজপৎ রায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইলেও এই মত-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার রাজনৈতিক গুরু-স্থানীয় সার সৈয়দকে ক্ষমা করেন নাই। তিনি অতীব তীব্র ভাষায় সার সৈয়দ আমেদের "আলিগড় নীতির" ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

দেশপ্রেমিকগণের জীবন-কথা পাঠে আসক্তি

গত শতাব্দীর ভারতের দেশপ্রেমিকগণের জীবন-কথা অভি-নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিবার ফলে যুবক লাজপতের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে দেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া-ছিল। তাঁহার উর্দ্দু ভাষায় লিখিত ম্যাটসিনি এবং গ্যারিবল্ডীর জীবনচরিত এখন পর্য্যন্ত পঞ্জাবে সাগ্রহে পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রণীত মারহাট্টা সাম্রাজ্যের সংস্থাপয়িতা শিবাজীর জীবন-কথাও একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার ধর্ম্মগুরু দয়ানন্দের জীবনচরিত উত্তর-ভারতে এখন পর্য্যন্ত সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। এই সকল মহাপুরুষের জীবন-কথা আলোচনার ফলে তাঁহাকে বিশেষভাবে কর্ম্মপ্রাণ করিয়া তুলিয়াছিল। নিরতিশয় ভাবপ্রবণ হইলেও তিনি মুখে যাহা বলিতেন বা কাগজে কলমে লিখিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেন। এই সকল গুণের জন্য তিনি পরবর্ত্তী জীবনে ভারতের অগ্রগণ্য নেতৃগণের অন্যতম হইতে পারিয়াছিলেন।

অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা

লাহোরে স্থায়ী হইবার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ হইলে আর্য্যসমাজের সংস্রবে একটি অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় কার্য্য। ইহার পর ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতব্যাপী ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষের জন্য তিনি যে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মধ্যভারতবর্ষ, রাজপুতানা এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার দুই সহস্রাধিক অনাথ বালক-বালিকা রক্ষা পাইয়াছিল। অনাথাশ্রমের কার্য্য করিবার ফলে লালাজী দুর্ভিক্ষ সাহায্যদান কার্য্যের অনেক তথ্য আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষ কমিশনে লালাজীর সাক্ষ্য

১৯১০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লালাজী দুর্ভিক্ষ কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। লালাজী ও তাঁহার সহযোগি-গণের প্রদত্ত সাক্ষ্যের জন্য গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের দুর্ভিক্ষে সাহায্যদাননীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে খৃষ্টীয় মিশনরীগণ সাহায্য-দানের ছলে অন্যূন ৭০ হাজার অনাথ বালক-বালিকাকে ধর্ম্মা-ন্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লালাজী এই অনিষ্টের প্রতীকারকল্পে গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে মিশনারীগণের তাদৃশ কুকার্য্য অনেক পরিমাণে প্রতিহত হইয়াছিল।

লালাজীর স্বাদেশিকতা

লালাজী এক জন একনিষ্ঠ স্বদেশিক ছিলেন। তিনি বলি-তেন, স্বাদেশিকতা এবং বিদেশিবর্জ্জন একই কথা। উহা দেশাত্মবোধেরই নামান্তর। তাঁহার অভিমত এই যে, দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে আমাদিগকে একান্তভাবে স্বদেশি-ভক্ত হইতে হইবে। ইহাতে জাতিধর্ম্ম কিছুরই বাধা নাই। আমরা নানা শ্রেণী, নানা বর্ণ, নানা জাতিতে বিভক্ত এবং নানা ধর্ম্মাবিলম্বী হইলেও এই স্বাদেশিকতাসূত্রে আমরা একতা-বদ্ধ হইতে পারি।

লালাজীর প্রতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিদ্বেষ

লালা লাজপৎ রায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর কংগ্রেসে বঙ্গদেশে গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত দমননীতির অতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। আমলাতন্ত্রের কৃত কোন অন্যায় কার্য্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, অতি কঠোর ভাষায় তাহার সমালোচনা করিতেন। এ জন্য তিনি ভারতের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণের, বিশেষভাবে আমলাতন্ত্রের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা এবং গভর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতা ইংরাজী সংবাদপত্র-সমূহ তাঁহাকে ঘোর বিপ্লববাদী আখ্যায় অভিহিত করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার জীবনে এমন একটি কার্য্য করেন নাই, যাহা বিপ্লববাদের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

লালাজীর নির্ব্বাসন

লালা লাজপৎ রায়ের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশ-নের বলে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত এই যে, লালাজীর নির্ব্বাসন গভর্ণ-মেণ্টের পক্ষে ঘোরতর অত্যাচারমূলক কার্য্য হইয়াছিল। তাঁহাকে এইরূপ অন্যায়ভাবে নির্ব্বাসিত করায় তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লের সুনাম বিশেষভাবে কলঙ্কিত হইয়া-ছিল। গভর্ণমেণ্টের উক্ত কার্য্যের ফলে বৃটিশ জাতির ন্যায়-বিচার সম্বন্ধীয় যশঃ প্রভূত পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

লাজপতের ব্যক্তিত্ব

লালা লাজপৎ রায় সুবিবেচক ব্যক্তি ও কর্ম্মী। কথা অপেক্ষা কার্য্যের তিনি অধিকতর পক্ষপাতী। তিনি উদারপন্থী ছিলেন না, গোঁড়া রক্ষণশীলও ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রে বা সামাজিক ব্যাপারে হঠকারিতার সহিত আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতীও ছিলেন না। তিনি বৈধ উপায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহারই

প্রভাবে নিবারিত হয়। তৎকালে জাতীয় দল তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতির পদে বরণ করিবার জন্ম যে দাবী করিয়াছিলেন, তিনি প্রকাশ্যভাবে তাহা গ্রহণে অস্বীকার করায় তাঁহার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শত্রুরা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি সুবিবেচনার পরিচায়ক ছিল। প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার আন্তরিকতা ছিল, সেই জন্ম জাতীয় হিতজনক কার্য্যে শঠতা, কপটতা, আন্তরিকতার অভাব তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং যাহারা এরূপ করিত, তাহাদিগকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন না। লালা লাজপৎ নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না. দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎসম্বন্ধে তিনি পূর্ণ আশান্বিত ছিলেন, এবং জাতীয় শুভাশুভ অদৃষ্টে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করিয়া এক বিশাল বিরাট ভারতীয় জাতি গঠন করা অসম্ভব, তাঁহাদের উদ্দেশে লালাজী জলদগম্ভীরস্বরে আশার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন যে, "হিন্দু-মুসলমানে মিলন অসম্ভব নহে। মিলন অসম্ভব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আশা ও বিশ্বাস আমার জীবনের মূলমন্ত্র, আমার ধর্ম।" লালা লাজপৎ কর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন, কর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করিতেন। পরাজয়ে অবিচলিত থাকিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে, এই ছিল তাঁহার রাজনীতিক কর্ম্মনীতি। বাধা-বিঘ্ন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না, প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া তিনি কখনও নিরুৎসাহ হইতেন না, নব উদ্যমে আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, জাতি স্বয়ং গড়িয়া উঠে, এবং সত্যের পথে থাকিয়া মহত্ত্ব অর্জ্জন করে। সে সময়ে জাতির সেই পরম দুর্দিনে, যখন শত্রুপক্ষের ভেদনীতি অতি প্রবলভাবে কার্য্য করিতেছিল, রাজনীতিক্ষেত্রে এক্সট্রিমিষ্ট ও মডারেট, চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী, নরম ও গরম দুই দলের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছিল, সেই দলাদলির সন্ধিক্ষণে ইঙ্গভারতীয় সমাজ এক দলের পক্ষসমর্থন করিয়া তাহাদিগকে "বাহবা" দিয়া, অপর দলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দলাদলি পাকাইয়া ও তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্ম প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছিল। তখন লালা লাজপৎ রায় নরম. গরম উভয় দলকে যে সদুপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যেরূপ সদ্বিবেচনাপূর্ণ, তদ্রূপ তাঁহার মিলনেচ্ছার পরিচায়ক। হিন্দু. মুসলমান, পার্শী প্রভৃতি ভারতের তাবৎ জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা, প্রতীচ্য রাজনীতির অনুকরণ করিয়া জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে দেখিয়া লালাজী ব্যথাকরুণকণ্ঠে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া দেখিতে, পরিণাম চিন্তা করিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এমন কথা অতি অল্পসংখ্যক রাজনীতিক নেতার মুখে শুনা যায়।

লালাজী

লালাজী—বক্তা

রাজনীতিক সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিবার শক্তি লালা লাজপৎ রায়ের অনন্যসাধারণ ছিল। উর্দ্দু ভাষায় তিনি অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সমগ্র ভারতে না হউক, পঞ্চনদ প্রদেশে এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ বক্তা কেহ নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর মরমে পাশাণে চিরদিনের জন্ম মুদ্রিত হইয়া যাইত। তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলির ভাষা সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যুক্তি অকাট্য ছিল। সে জন্ম প্রতিপক্ষের সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া তিনি অনায়াসে তাঁহার নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন।

লাজপৎ—গ্রন্থকার

উর্দ্দু ভাষায় তিনি যে জীবনী-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভারতীয় দেশ-সেবকগণের জীবনচরিত তিনি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহৎ লোকের জীবনচরিত অধ্যয়ন করিয়া জাতি তাহাতে তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্বের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে ও তদ্দ্বারা স্বয়ং মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে, এই মহান্ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া লালাজী সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষায় এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইদানীং তিনি সাময়িক সাহিত্য রচনায় অধিকতর অবহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—জাতির মঙ্গলজনক সকল বিষয়েই তিনি

লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতীয়, বিলাতী ও আমেরিকান অনেক সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"আর্য্য-সমাজ"

তাঁহার রচিত "আর্য্য-সমাজ" গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে ভারতে ও বিলাতে সমান সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। লালা লাজপৎ রায় আর্য্য-সমাজী—চিরজীবন আর্য্য সমাজের অনুরক্ত, ভক্ত ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আর্য্য-সমাজের মতবাদ দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। আর্য্য-সমাজ বেদান্তবাদী। পঞ্চনদে সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত-ধর্ম প্রচারিত হয়। আর্য্য-সমাজীদের নব বেদান্তধর্ম্মও সর্ব্বপ্রথম পঞ্চনদে প্রচারিত হয়। লালাজীর চেষ্টায় তাহা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। লালাজীকে এই সমাজের জীবন বলিলেও চলে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্য-সমাজ ও আর্য্য সমাজী এবং তৎপ্রচারিত বেদান্ত-ধর্ম্ম সম্বন্ধেও লালাজী অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রবাস-জীবন

লালা লাজপৎ রায়ের প্রবাসকালীন জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ৩ সপ্তাহের অধিক কাল থাকেন নাই। দ্বিতীয় বার আমেরিকা-ভ্রমণে গিয়া তিনি দেশের সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রের ন্যায় আমেরিকাবাসীর চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার ফল—তাঁহার "দি ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকা" নামক গ্রন্থ। ভারতবাসীর দিক হইতে মার্কিণচরিত্রে যাহা কিছু জানিবার আছে, এই গ্রন্থে তৎসমুদায় তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থোক্ত "শিক্ষা" শীর্ষক দুইটি পরিচ্ছেদ শিক্ষিত ভারতবাসিমাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের কোন্ কোন বিষয়ে কতখানি সাদৃশ্য এবং কতখানি বৈসাদৃশ্য, তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি হইতে পারে।

য়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ লালা লাজপৎ রায় স্বয়ং দর্শন ও প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন। এই লব্ধ-জ্ঞান তিনি ভারতহিতার্থ যথাসাধ্য প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লালাজী ও গত মহাযুদ্ধ

মূলতঃ লালা লাজপৎ বৃটিশ জাতির অনুরক্ত ছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি বৃটেন ও তাঁহার বন্ধুগণের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। তখন তিনি ভারতে ছিলেন না। লর্ড হার্ডিং একটি ভারতীয় সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবেন শুনিয়া লালাজী অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বড় লাটের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহা অনাবিল রাজভক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু লালাজী স্পষ্টবক্তা ও স্বাধীনচেতা ছিলেন, সেই জন্য কি সরকার কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ কোনও দিনই লালা লাজপৎ রায়ের প্রতি প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। সেই জন্য যুদ্ধের কয় বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইল না। দেশী বিলাতী বহু সংবাদপত্রে লালাজীর পক্ষসমর্থন করিয়া বহু প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইলেও সরকারের মন হইতে লালা লাজপতের প্রতি সন্দেহের ভাব কোনমতে দূর হইল না। এই ভাবে বহু বৎসর প্রবাস-যাপন করিবার পর সম্রাটের ঘোষণাবাণীর প্রচারের ফলে তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর হয়।

মণ্টফোর্ড স্কীম

ভারতীয় বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইলে লালাজী উহার সমর্থন করিয়া লণ্ডনের "নেশন" পত্রে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিদেশে প্রচার-কার্য্য

লালা লাজপৎ রায় আমেরিকাপ্রবাসকালে ভারতের কথার বিস্তৃতভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি আমেরিকাবাসীর গোচর করিয়াছিলেন। তাঁহার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পরেও তাহা বন্ধ হয় নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত লালা লাজপৎ রায় বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও দল-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী জনসাধারণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াই তরুণ ভারতকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এক বাণী প্রচার করেন।

অসহযোগ

শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে লালা লাজপতের মত সরকারের অনুকূল ছিল, এমন কি, তাহা সফল করিবার জন্য তিনি সহযোগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁহার স্বপ্ন টুটিয়া যায়। তিনি অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেই জন্য তিনি রিফর্মড কাউন্সিলের সদস্যপদ-প্রার্থী হন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে শেষ জীবনে তিনি "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" দলভুক্ত ছিলেন।

হিন্দু মহাসভার ক্ষতি

লালাজী হিন্দু মহাসভারও প্রাণ ছিলেন। শুদ্ধি ও সংগঠন কার্য্যে তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকই আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ডাক্তার মুঞ্জের ন্যায় তিনিও মহাসভার এক জন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। হিন্দু সভার অসংখ্য সদস্য ও সমর্থক তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিত এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিত। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর পণ্ডিত মদনমোহন ও ডাক্তার মুঞ্জের মত তাঁহাদেরও জীবন কিছু দিন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। আজ তাঁহাকে হারাইয়া হিন্দু সমাজ বলহীন হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কার আইন ও সাইমন কমিশন

লালা লাজপৎ রায়ের শেষ জীবনে ভারতে পর পর কত যে ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। রাউলট আইন ও জালিয়ানওয়ালার পর হিন্দু-মুসলমান একতা দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণযুদ্ধের সময়ে শাসক জাতি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পালিত হইল না, বরং তৎপরিবর্ত্তে চণ্ডনীতি প্রবর্ত্তিত হইল। মুসলমানরা অর্থে সামর্থ্যে তুর্কীর বিপক্ষে শাসকজাতিকে ইরাক ও অন্যান্য স্থানে সাহায্য দান করিয়াছিল। কিন্তু তাহারাও খিলাফৎ সম্পর্কে কোনও প্রতীকার প্রাপ্ত হইল না। তখন মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে হিন্দুমুসলমানের অপূর্ব্ব যোগাযোগ হইল, ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইল। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের সহিত অসহযোগ এই আন্দোলনের অন্যতম কার্য্য-পন্থা। শাসকজাতি প্রমাদ গণিয়া নানা প্রলোভনের সৃষ্টি করিলেন। তুর্কী স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল, খিলাফতের প্রতীকার হইল, মুসলমানরা সন্তুষ্ট হইল। তখন মণ্টেগু সংস্কারের কেন্দ্রা-মুড়া লইয়া হিন্দুমুসলমানে স্বার্থদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এক দিকে নির্ব্বাচনের ভোটাধিকার, অন্য দিকে সরকারী চাকুরী। সাহা-রাণপুর, কোহাট, দিল্লী, কলিকাতার দাঙ্গা ইহার ফল। যে সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দকে অসহযোগের প্রবল আন্দোলনের দিনে দিল্লীর জুম্মামসজেদে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেই শ্রদ্ধানন্দ সন্ন্যাসী মুসলমান ঘাতকের নৃশংস হস্তে নিহত হই-লেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষানল ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। লালা লাজপৎ রায়কে এ সময়ে অনেক মুসলমান তাঁহাদের শত্রু বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অথচ লালাজী কখনও অন্তরে বাহিরে পৃথক্ ছিলেন না, তিনি চিরদিনই হিন্দুমুসলমান মিলনের পক্ষপাতী। এ কথা মহাত্মা গন্ধীও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাই লালাজীকেও ডাক্তার মুঞ্জে ও মালব্যের মত হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এখন লালাজীর মৃত্যুর পর বিশিষ্ট মুসলমান নেতারা একবাক্যে তাঁহার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্যতার কথা স্বীকার করিতেছেন।

ভারতের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয়—যখন হিন্দুমুসলমানে স্বার্থদ্বন্দ্ব ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিতেছিল, সেই সময়ে বিলাতের পার্লামেণ্ট এ দেশে আর এক 'কিস্তী' সংস্কার দিবার অভিপ্রায়ে সাইমন কমিশন গঠন করিলেন। এই কমিশনের ইতিহাস অনেকেই জানেন, সুতরাং ইহার বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমগ্র ভারতের লোকমত পদদলিত করিয়া, শাসিত জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করিয়া, জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসকজাতি আপন ইচ্ছানুসারে কমিশন গঠন করিলেন, সেই কমিশনে সাত জন শ্বেতাঙ্গ সদস্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, ভার-তের ভাগ্য তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতে এ দেশে প্রেরিত হইলেন। বোধ হয়, ইহাতে বিধাতার মঙ্গল হস্তস্পর্শ ছিল। নতুবা হিন্দুমুসলমানের স্বার্থের সংঘর্ষ প্রবল হইলে অসম্ভাবিত অপ্রত্যা-শিতরূপে বিধাতা এই যোগাযোগ ঘটাইয়া দিলেন কেন? জন্মভূমির অপমানে হিন্দু মুসলমান সকল শত্রুতা ভুলিয়া গেল, তাহারা স্বার্থ-দ্বন্দ্ব বিসর্জ্জন দিয়া এক হইল। এই শুভ মিলনে লালা লাজপৎ রায় যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহা অপর কেহ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার শরীর বহুদিন হইতেই ভাল ছিল না। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের দিনে তিনি শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, হিন্দুমুসল-মানের মিলনের, সাইমন কমিশন বর্জ্জনের আন্দোলনের কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। লাহোরে যে দিন সাইমন কমি-শনের উপস্থিত হইবার কথা, সেই দিন তাঁহার নেতৃত্বে বিরাট প্রতিবাদের শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইয়াছিল। পঞ্জাব সরকার এ জন্য এতই ভীত হইয়াছিলেন যে, অতিরিক্ত শান্তি-রক্ষার আয়োজন করিয়া লাহোর রেলষ্টেশন ও কমিশনের যাত্রা-পথ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, এমন কি, কাঁটাতারের বেড়া দিয়া জনতার গতিরোধের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন! অথচ শোভাযাত্রাকারীরা নিরস্ত্র, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত!

পুলিসের আক্রমণে লালাজী

লালা লাজপৎ রায় ও অন্যান্য কয়জন নেতার অধীনে বর্জ্জন আন্দোলনের শোভাযাত্রা ষ্টেশনের সান্নিধ্যে যখন উপস্থিত হয়, তখন শান্তিভঙ্গের কোন সূত্রপাত হয় নাই। লালাজী স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, জনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্ত ও সংযত ছিল, পুলিস অকারণে অন্যায়রূপে অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের ফলে লালাজী বক্ষে লাঠির আঘাত পাইয়া-ছিলেন। সরকার পক্ষ বিভাগীয় (অর্থাৎ পুলিসের) এবং প্রকাশ্য (অর্থাৎ রাওলপিণ্ডির ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রয়েডের দ্বারা পরিচালিত) তদন্ত দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জনতা পুলিসের কাঁটাতারের বেড়া ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছিল ও লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই জন্য লাঠি সোজাসুজি ধরিয়া পুলিস জনতাকে পশ্চাতে হঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া-ছিল, তবে সেই সময়ে হয় ত জনতার অগ্রে দণ্ডায়মান নেতারা আঘাত পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আঘাত এমন গুরু হয় নাই, যাহার জন্য লালা লাজপতের মৃত্যু হইতে পারে। সহ-কারী ভারতসচিব পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, "এ বিষয়ে আর কোনও তদন্তের প্রয়োজন নাই!"

অথচ লালাজী স্বয়ং মৃত্যুর পূর্ব্বে দেওয়ান চমনলালকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং দেওয়ান চমনলাল যাহা প্রকাশ করিয়া-ছেন, পরন্তু লালাজীর দুই জন চিকিৎসক তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, পুলিসের লাঠীর আঘাতই তাঁহার মৃত্যুর মুখ্য কারণ না হইলেও গৌণ কারণ হইয়াছিল। ডাক্তার ধন্বীর ২১ বৎসর কাল ইংলণ্ডে ডাক্তারী করিয়াছেন, এবং ২০ বৎসর কাল তথায় কোনও সহরের স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—"মানসিক পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা লালা লাজপৎ রায়ের প্রধান রোগ ছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লালাজীকে ইংলণ্ডে একবার পরীক্ষা করেন, তখন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার প্লুরিসি রোগ বদ্ধমূল হইয়াছে। লালাজী তাঁহারই পরামর্শে সুইজারল্যাণ্ডে এক স্বাস্থ্যাবাসে চিকিৎসিত হন। যদিও লালাজী অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, তথাপি রেলের ষ্টেশনে প্রহৃত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। অপমানে তিনি বড় চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীতেও বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল। ফলে তাঁহার যে অবসাদের ভাব, সাধারণ বিশ্রাম, মালিস ও উন্মুক্ত স্থানে বায়ু

সেবনের ফলে কাটিয়া যাইত, ৩০শে অক্টোবরের ঘটনার পরে তাহা ধীরে ধীরে আরও বাড়িয়া যায়, ক্রমে তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়।"

ডাক্তার গোপীচাঁদ বলিয়াছেন,—"১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি লালাজীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি। কারাগারে অবস্থান-কালে তাঁহার যক্ষ্মা-সংসৃষ্ট প্লুরিসি রোগ হয়। পরে স্বাস্থ্য-কামনায় তিনি য়ুরোপ-যাত্রাও করিয়াছিলেন। অনিদ্রাই তাঁহার প্রধান রোগ ছিল। উহা সত্ত্বেও তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেন। ৩০শে অক্টোবরের প্রহারের ফলে তিনি যে ঘটনাস্থলেই মারা যান নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। এ আঘাত না পাইলে লালাজী বহু দিন বাঁচিতেন।"

অবশ্য সরকার এই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া যাহাই সিদ্ধান্ত করুন, লোকের মনের সন্দেহ কিছুতেই দূর করিতে পারিবেন না। 'অন্য পরে কা কথা', যিনি বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া ওজন করিয়া ভিন্ন কোন মতামত প্রকাশ করেন না, সেই মহাত্মা গন্ধী তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে এই ঘটনা সম্পর্কে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"এ দেশের সরকারের সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে—সে ধারণা আমার ভূয়োদর্শনে সঞ্জাত হইয়াছে—সেই ধারণা থাকায় আমি দুঃখিত হইলেও বলিব যে, যদি পরে প্রকাশ হয় পূর্ব্বে স্থির করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এই আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহা হইলে আমি তাহাতে বিস্মিত হইব না। আমি স্বীকার করি যে সরকারের ক্রোধের কারণ ছিল—কমিশন বর্জ্জন করা। তবু সরকারের ক্রোধ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া পুলিসের পক্ষ হইতে জুয়াচুরি করিয়া মিথ্যা কথা রচিয়া গল্প বানাইবার প্রয়োজন ছিল না। আমি পুলিসের বিবরণকে মিথ্যা রচা কথা বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, পুলিস যদি স্বার্থান্বেষী হাজার হাজার সাক্ষী যোগাড় করিয়া তাহাদের বর্ণনা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলেও আমি লালা লাজপৎ রায়ের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। যদি আমি দৃঢ় বিশ্বাস না করিতাম যে, এই সরকার বাহুবল ও মিথ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প অসহযোগী হইতাম না।"

তীরচিহ্নিত স্থানে লালাজী লাঠীর আঘাত পাইয়াছিলেন

লালাজীর স্মৃতি-তর্পণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুসংবাদের মতই লালাজীর দেহান্তরের কথা অতর্কিতভাবে দেশবাসীর নিকট পৌঁছিয়াছিল। যেমন দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদে সমগ্র দেশ শোকে ব্যথায় মুহ্যমান হইয়াছিল, লালাজীর মৃত্যুসংবাদেও তেমনই হইয়াছে। এই আন্তরিক অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক ও রাজনীতিক নেতা দেশবাসীর মন এমনই জয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে দেশের এমন স্থান ছিল না, যে স্থানে দেশবাসী তাঁহার স্মৃতিতর্পণ না করিয়াছিল। তাঁহার শবশোভাযাত্রায় লাহোরে লক্ষাধিক লোক-সমাগম হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান, শিখ, পার্শি, খৃষ্টান, জৈন,—কোন সম্প্রদায়ই দেশনেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে বিস্মৃত হয় নাই। বিশেষতঃ অসূর্য্যম্পশ্যা ভারতীয় নারীগণের এবং তাঁহার পরমপ্রিয় ছাত্রসঙ্ঘের সেই শোক-শোভাযাত্রায় যোগদানে তাঁহার প্রভাবের অতিমাত্রায় পরিচয় প্রকটিত হইয়াছিল। রাজ-প্রতিনিধি হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত এমন লোক ছিল না, যিনি গভীর ব্যথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুত্রকে সমবেদনা না জানাইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি-সম্মান রক্ষার নিমিত্ত দেশবাসীর পক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিবার আয়োজন হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের দিনে (২৯শে নভেম্বর তারিখ) শোভাযাত্রার পরিচালন করিতে গিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃগণ পুলিসের লাঠীর আঘাতে রক্তদান করিয়াছেন। কবি গাহিয়াছেন,—"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন তত টুটবে।" বরিশালে বঙ্গ-ভঙ্গের দিনে পুলিসের ও গুর্খার লাঠীতে বাঙ্গালীর মাথা ভাঙ্গিয়াছিল, সেই সুপারী আমলে বাঙ্গালী রক্তদান করিয়াছিল, তাই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইয়াছিল। আজও লালা লাজপৎ লাহোরে যে রক্তদান করিয়া গেলেন, তাহার স্রোত লক্ষ্ণৌ সহরের রক্তের সহিত মিলিত হইয়া স্বরাজ সাগরে গিয়া মিলিত হইবে, ইহাই কি ভারতের ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিত?
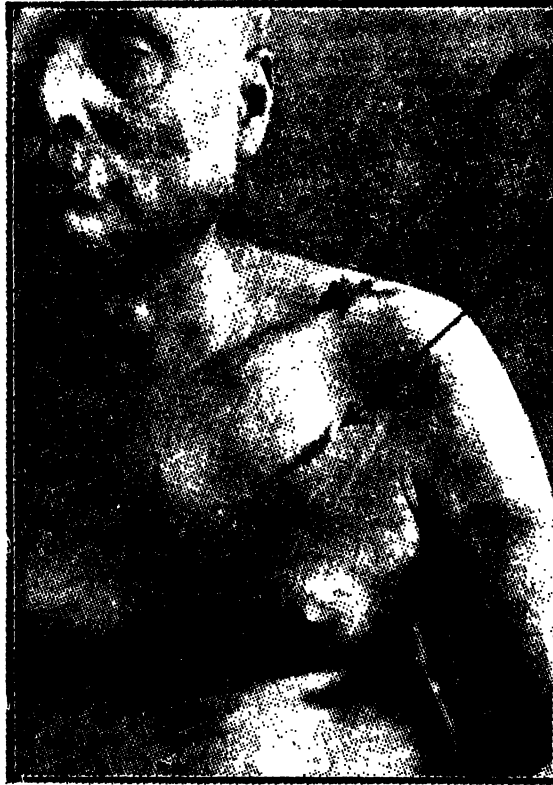
মানুষ লাজপৎ

এমন মানুষের মত মানুষ এই পৃথিবীতে কয় জন জন্মগ্রহণ করিয়া

থাকেন ? সাহস, নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা, তেজস্বিতা, আন্তরিকতা, স্বাদেশিকতা, পরার্থপরতা, দয়া, মায়া, পরদুঃখকাতরতা,—মানুষের যত প্রকার গুণ থাকিতে পারে, লালা লাজপৎ রায়ে তাহার অসদ্ভাব ছিল না। তিনি স্বয়ং অতি সহজ সরল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, অতি সামান্য আহারবিহারেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, অতি সাধারণ পরিচ্ছদেই তিনি আপনাকে মণ্ডিত করিয়া রাখিতেন। অথচ দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, সমাজের অস্পৃশ্যদের দুঃখে কাঁদিয়া, জননী জন্মভূমির অধীনতায় ব্যথা পাইয়া, অজ্ঞ নিরক্ষর দেশবাসীর শোচনীয় অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া তিনি মুক্তহস্তে স্বোপার্জ্জিত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। দয়ানন্দ কলেজের উন্নতিকল্পে ৫০ হাজার টাকা, অনুন্নত সম্প্রদায়ের দুঃখমোচনে ৫০ হাজার টাকা, নিজের গ্রামের স্কুল প্রতিষ্ঠায় ১০ হাজার টাকা, বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষে ১ হাজার টাকা,—এইরূপ তাঁহার দানের অন্ত ছিল না। জন্মভূমির আর্থিক ও রাজনীতিক দুঃখ দৈন্য দূর করিবার জন্য তিনি যেন উহা জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টাকে তিনি উগ্র তপস্যায় পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি যে পন্থাকে ভাল বলিয়া মনে করিতেন, অকপটে তাহা অনুসরণ করিতেন, সে জন্য কাহারও অনুগ্রহ-নিগ্রহের অপেক্ষা রাখিতেন না। মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব যখন অনন্যসাধারণ, তখনও তিনি প্রথমে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিপক্ষে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট পদে বসিয়া অসহযোগের পূর্ণ সমর্থন করেন নাই।

তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পক্ষপাতী ছিলেন, অথচ তিনি মনে-প্রাণে স্বদেশী এবং বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। একবার তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"দেশপ্রেমের যথার্থ অর্থ যে দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, সেই দিন হইতে পূর্ণ স্বদেশী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, স্বদেশী-ই আমাদের মুক্তিসাধন করিবে। আমার মতে সাম্মিলিত ভারতের স্বদেশী ই একমাত্র ধর্ম্ম হওয়া উচিত।"

তিনি জাতিকে রাজনীতি শিক্ষা দিবার জন্য "জনসেবক সমিতির" এবং "তিলক রাজনীতি বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠা করেন। মনে-প্রাণে দেশ ও জাতিকে ভালবাসিতেন এবং উভয়েরই অধীনতার বন্ধন মুক্ত করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিতেন বলিয়াই আমলাতন্ত্র সরকার তাঁহাকে ধরিয়া বার বার লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত করিয়াছেন। জীবনান্তকালেও তিনি সরকারের বিরাগভাজন ছিলেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, নবীন তন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার উপাসক কোন কোন দেশবাসী তাঁহার দেশপ্রেমে সন্দেহের কলঙ্কারোপ করিয়াছে বলিয়াও শুনা যায়। তিনি তাঁহার 'দি পিপল্' পত্রে ইহাদের অভিযোগের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। উহাই তাঁহার শেষ রচনা। উহার মর্ম্ম এইরূপ:—"পূর্ণ স্বাধীনতা মন্ত্রের উপাসকগণের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত জহরলাল ভারতীয় নেতৃগণের (নেহেরু সিদ্ধান্তের সমর্থকদিগের) বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা (১) সাম্রাজ্যিকতার কূট মর্ম্ম বুঝেন না, (২) সোসালিজমের অর্থ বুঝেন না।" এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি জগতের নানা দেশের সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদিগের সহিত মিশিয়াছি, উহাতে বুঝিয়াছি যে, আজ যাহারা কম্যুনিষ্ট আছে, কাল প্রয়োজন হইলে তাহারা সাম্রাজ্যিক হইতে পারে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ল্যান্সবারি বর্ত্তমানের ল্যান্সবারি হইতে অনেক তফাৎ। হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশের সোসালিষ্ট কম্যুনিষ্টরা প্রয়োজনকালে মতপারবর্ত্তন করিয়াছে। মাসোলিনী এক দিন ইটালীয় সোসালিষ্ট ছিলেন। মার্কিণের সোসালিষ্টদিগের পরীক্ষার অবসর হয় নাই। রাসিয়ার কম্যুনিষ্টরা এখন ত ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাহারা কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? আমি একবার জগতের আন্তর্জ্জাতিক সোসালিষ্ট বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। উহাতেও অশ্বেত জাতিদিগের শ্বেতজাতির উপনিবেশে প্রবেশের বিরুদ্ধে মন্তব্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাই পণ্ডিত জহরলাল যে বলিয়াছেন, ভারত ইংরাজের অধীনতার চাপ খসাইয়া ফেলিতে পারিলেই অন্য কোথা হইতে—বিশেষতঃ কাবুল হইতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই, এ কথার কোন মূল্য নাই। তাঁহার পূর্ব্বে মিঃ সতমূর্ত্তি বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ জগতে সকল জাতির নিকট ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কথা সত্য নহে। শ্বেতজাতির মধ্যে যাহারা কম্যুনিষ্ট বা সোসালিষ্ট, তাহারা অশ্বেত জাতিদের বেলা সাম্রাজ্যিক।"

এই বিশ্বাসবশেই তিনি নেহরু সিদ্ধান্ত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজের দায়িত্বহীন শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে ভারতকে একাকী নিজের পায়ে ভর দিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, জগতের কোন বিদেশী সোসালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট সাহায্য করিবে না। কাজেই ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজের সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবী করাই ভারতের কর্ত্তব্য। তিনি এই নীতিকেই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সাইমন কমিশন বর্জ্জনের আন্দোলনে এবং নেহরু সিদ্ধান্তের সমর্থনে আন্তরিকতা সর্ব্বাংশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আজ সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে তিনি জীবনাহুতি প্রদান করিলেন! আজ তাঁহার শোকে অধীর হইয়া মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন,—"লালাজী পঞ্জাবের সিংহ, ভারতের বীর পুত্র, যথার্থ সেবক ও যথার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বৎসরকাল তিনি দেশের যে সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব। যে দেশে তাঁহার মত সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে দেশ ধন্য!" ডাক্তার আনসারি, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী মিঃ জিন্না সার মহম্মদ সফি, সার আব্দার রহিম, মওলানা আক্রাম খাঁ, বড়লাট লর্ড আরউইন, মিঃ চার্টেস,—বলিতে কি, তাঁহার মতাবলম্বী, মতবিরোধী,—সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার বিয়োগে ব্যথা প্রকাশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার দেশপ্রেমের ও আন্তরিকতার প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। ভারতের এমন সন্তান আবার কবে জন্মগ্রহণ করিবে ?

তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আছে। আজ দেশের আশা, দেশের ভরসা তরুণ সম্প্রদায় তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জননী জন্মভূমির সেবায় কায়মনে অকপটে আত্মনিবেদন করিতে পারিলেই তাঁহার স্মৃতির সম্মান সম্যক্ রক্ষিত হইবে।

শাস্ত্র-সমস্যা

২

সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে শাস্ত্রব্যবসায়ী, প্রাচীন আচারসমূহের ঐকান্তিক পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ, অন্য দিকে নব্যভাবে শিক্ষিত, নূতন করিয়া সমাজ গড়িবার জন্য প্রস্তুত সংস্কারকদল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে হইলে ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, মনু প্রভৃতি ঋষিগণের রচনাবলীর উপরই ঐকান্তিক নির্ভর করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা ছিলেন সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহারা ছিলেন অভ্রান্ত; সুতরাং তাঁহাদিগেরই সংহিতাগ্রন্থ হইতে ধর্ম্মের যে স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহারই নাম ‘সনাতন ধর্ম্ম।’

প্রাচীনপন্থীদিগের এইরূপ মত গ্রহণ করিতে হইলে ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতারই উপর নির্ভর করিতে হয়। ঋষিদিগের সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রের ঐকমত্য নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কি লিখিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে। ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—
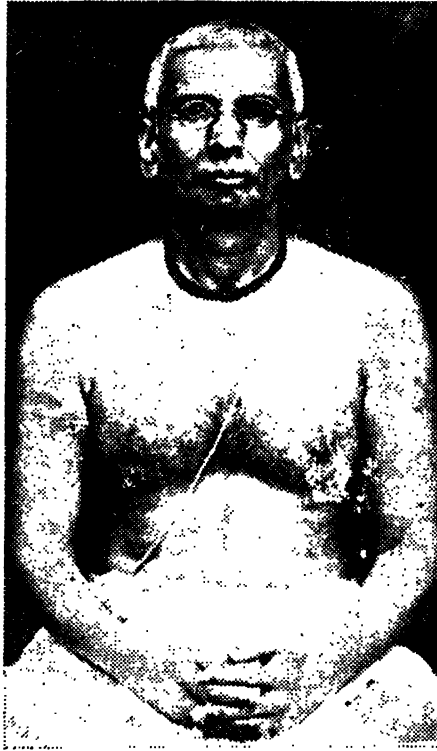
মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

“তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং” এই সূত্রটির অর্থ এই যে, সেই ঈশ্বরেই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া কোন জীবই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা সেই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও যে সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে, তাহা যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি বিশ্বাস করিতেন না।

মীমাংসাদর্শনের প্রধানতম আচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বীয় শ্লোকবার্ত্তিক-নামক গ্রন্থে বেদের প্রামাণ্য-বিচার প্রসঙ্গে, কোন মনুষ্যেরই যে সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে না, তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই মনুষ্যমাত্রের অসর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে বেদের প্রামাণ্যবিষয়ে মীমাংসক আচার্য্যগণের কি সিদ্ধান্ত, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সেই জন্য অগ্রে সেই বিষয়েরই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। সমগ্র বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্র-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য যে সকল ধর্ম্মাচার্য্য নানাপ্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহর্ষি জৈমিনি-প্রদর্শিত বেদ-ব্যাখ্যার নিয়মাবলী অকুণ্ঠিতচিত্তেও ঐকমত্য সহকারে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে মহর্ষি জৈমিনি-প্রদর্শিত নিয়মাবলীর অনুসরণ করিতে হয়। জৈমিনির মতানুসারে না চলিয়া যাঁহারা প্রকারান্তরের আশ্রয় ধরিয়া থাকেন, সনাতন হিন্দু-সমাজের আচার্য্যগণ একবাক্যে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা আমাদিগের দেশের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন ও বেদব্যাখ্যা বিষয়ে জৈমিনি-প্রদর্শিত মীমাংসাপদ্ধতিকে অসঙ্কুচিতচিত্তে মানিয়া থাকেন।

জৈমিনির মতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ। কেন বেদ স্বতঃপ্রমাণ, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া মহর্ষি জৈমিনি, জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার শবর স্বামী এবং সেই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ একবাক্যে ইহাই উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন যে, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ

কোনও মনুষ্যের দ্বারা রচিত হয় নাই, এই কারণে বেদ স্বতঃ-প্রমাণ। মীমাংসকগণের এই প্রকার সিদ্ধান্তের মূলে কি দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অগ্রে বুঝা আবশ্যক এবং তাহা বুঝিতে হইলে স্বতঃপ্রমাণ কাহাকে বলে, তাহাই বুঝিতে হইবে।

'প্রমা' শব্দের অর্থ—যথার্থ জ্ঞান। যে জ্ঞানের কোন অংশেই ভ্রান্তি নাই, তাহারই নাম 'প্রমা'। 'প্রমা' ও 'প্রমাণ' এই দুইটি শব্দই অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদিগের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ কি না, তাহা বুঝিতে হইলে সেই জ্ঞান যে কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যদি দুষ্ট হয়, তবে সেই দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহা ভ্রান্তি, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, ইহাই হইল নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত।

মীমাংসকগণ বলেন যে, দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে। এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের সহিত আমাদিগের মতভেদ না থাকিলেও জ্ঞানের যে যথার্থরূপতা, তাহা জানিবার উপায় কি, এই বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন, আমাদিগের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই সময় সেই উৎপন্ন জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান বা ভ্রান্তি, তাহা আমরা বুঝি না, জ্ঞানের স্বভাববশতঃ বিষয় প্রকাশ হয়, এই মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞান যে যথার্থ অথবা তাহা ভ্রান্তি, ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয় যে, ঐ জ্ঞান দুষ্ট বা অদুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কি না। যদি আমরা দেখি যে, উহা অদুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন আমরা ঐ জ্ঞানটিকে যথার্থ বলিয়া বুঝি, আর যদি দেখি যে, ঐ জ্ঞান দুষ্টকারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন আমরা স্থির করি যে, ঐ জ্ঞান যথার্থ নহে, উহা ভ্রান্তি। নৈয়ায়িকগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তিসহ নহে, কারণ, জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রামাণ্য যদি আমাদিগের জ্ঞাত না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানপ্রামাণ্যের নির্ণয় হওয়া এক-প্রকার অসম্ভবই হইয়া উঠে। অর্থাৎ এরূপ মত অবলম্বন করিলে আমাদিগকে একপ্রকার অনবস্থারূপ দোষের মধ্যে পতিত হইতে হয়। কেন, তাহা বলি—

কোন একটি জ্ঞানের যথার্থতা জানিবার জন্য তাহার কারণ দুষ্ট কি না, এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যখন সেই জ্ঞানের কারণকে অদুষ্ট বলিয়া বোধ করি, তখন সেই অদুষ্ট কারণবিষয়ক যে আমাদের জ্ঞান, তাহা যথার্থ কি না, তাহাও বুঝিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে হয়। অর্থাৎ উৎপন্ন জ্ঞানের এই কারণটি দুষ্ট নহে, এই প্রকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা প্রথম জ্ঞানের প্রামাণ্যে বিশ্বাস স্থাপন করি। কিন্তু 'ইহা অদুষ্ট কারণজন্য নহে', এইরূপ যে আমার দ্বিতীয় জ্ঞান, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা আমি তখন বুঝি না, এই দ্বিতীয় জ্ঞান যদি প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের প্রামাণ্যও ভাসিয়া যায়; সুতরাং বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্য আমাকে সেই দ্বিতীয় জ্ঞানটি কোন-প্রকার দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে। সেই অনুসন্ধানের ফলে আমার যে তৃতীয় জ্ঞানটি হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় জ্ঞানটি দুষ্টকারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এই প্রকার যে জ্ঞান হইবে, সেই জ্ঞানে অর্থাৎ তৃতীয় জ্ঞানে প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা যদি আমি স্থির না করিতে পারি, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্যের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না। এই ভাবে উত্তরোত্তর কারণপরীক্ষার ফলে যত জ্ঞানই আমার উৎপন্ন হইবে, তাহা-দিগের মধ্যে প্রত্যেক জ্ঞানটির প্রামাণ্য নিরূপণ করিতে গেলে আমাকে অলঙ্ঘনীয় অনবস্থারূপ দোষের মধ্যে পতিত হইতে হয়। ফলতঃ কোন জ্ঞানেরই প্রামাণ্য আমার জীবনকালের মধ্যে নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই কারণে জ্ঞানের প্রামাণ্য তার একটি জ্ঞানের সাহায্যেই বুঝিতে হয়, এইরূপ যে মত, তাহা যুক্তিসহ নহে, এইরূপ ভ্রান্ত-মতকেই মীমাংসকগণ পরতঃ প্রামাণ্যবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই পরতঃ প্রমোণ্যবাদের উপর নির্ভর করিলে আমা-দিগের কোনরূপ ব্যবহারই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই কারণে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য বুঝিতে হইলে সেই জ্ঞানব্যতিরিক্ত অন্য কোন জ্ঞানের সাহায্য অব-লম্বন করা যুক্তিসিদ্ধও নহে এবং মানবের প্রকৃতিসিদ্ধও নহে। মানুষের জ্ঞান হইবামাত্রই সেই জ্ঞানের যথার্থতাবোধ আপনা আপনি হইয়া থাকে, ইহাই হইল মানবের জ্ঞানের স্বভাব। ইহারই নাম স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ। জ্ঞান যে স্বভাব অনুসারে নিজের বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই স্বভাব অনুসারেই সে নিজের স্বরূপকেও প্রকাশ করে এবং নিজের উপর যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও সেই স্বভাব অনুসারেই প্রকাশ করিয়া

থাকে। ইহাই হইল জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। অর্থাৎ প্রকাশরূপ জ্ঞান একসঙ্গে ত্রিবিধ বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সে ঘটপটাদি বিষয়কে প্রকাশ করে, আপনাকে প্রকাশ করে, এবং আত্মগত যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও প্রকাশ করে। ইহারই নাম জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ।

মীমাংসকগণের মধ্যে গুরু বা প্রাভাকর নামে প্রসিদ্ধ যে দার্শনিক, তাঁহারা এইরূপ স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি বৈদান্তিক দার্শনিকগণও এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। মহর্ষি কপিল প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণও এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ মানিয়া লইয়াছেন।

এই স্বতঃ প্রামাণ্যের উপর এক্ষণে এইরূপ একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াই যদি আত্মগত যথার্থতাকে প্রকাশ করে, এবং ইহাই যদি জ্ঞানমাত্রের স্বভাব হয়, তাহা হইলে শুক্তিতে যে আমাদের রজত-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহাও যেহেতু জ্ঞান, সেই হেতু তাহাও স্বগত যথার্থতাকে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা স্বতঃ প্রামাণ্যবাদীকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, আমাদিগের জ্ঞানকে আমরা ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিব কি প্রকারে? সকল জ্ঞানই যে যথার্থ, তাহা ত সম্ভবপর নহে, 'ভ্রান্তি' বা অযথার্থ জ্ঞান বুঝিবার উপায় কি, তাহা স্বতঃ প্রামাণ্যবাদিগণের মতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করিতে যাইয়া স্বতঃ প্রামাণ্যবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, মানবপ্রকৃতি অনুসারে মানুষ জ্ঞানমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে, ইহা সত্য, কিন্তু সেই প্রকার বুঝার পর যদি তাহার সেই উৎপন্ন জ্ঞান দুষ্ট কারণ হইতে হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বজনিত জ্ঞানে অবগত যে প্রামাণ্য, তাহাকে সে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্ঞান হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুঝা আমাদিগের স্বভাব, কিন্তু সেই প্রকার বোধ হইবার পরে যদি আমাদিগের সেই জ্ঞানের কারণকে দুষ্ট বলিয়া বুঝিবার কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা তখনই সেই জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হইয়া থাকি।

এখন দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের কিরূপ কারণে দোষ-দর্শন হইলে আমরা জ্ঞানের অপ্রামাণ্য নির্ণয় করিয়া থাকি। প্রধানতঃ জ্ঞানকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শাব্দ। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধবিশেষ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান ছয় প্রকার হইয়া থাকে;—চাক্ষুষ, রাসন, ত্বাচ, ঘ্রাণজ, শ্রোত্রজ ও মানস। রূপের সহিত নয়নের সন্নিকর্ষ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ' বলা যায়। রসনেন্দ্রিয়ের সহিত মধুরাদিরসের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 'রাসন প্রত্যক্ষ।' ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত কোমল কঠিন অথবা উষ্ণ বা শীত স্পর্শের সহিত সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'ত্বাচ প্রত্যক্ষ' কহে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সুরভি বা অসুরভি গন্ধের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 'ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ।' শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শ্রোত্রজ বা 'শ্রাবণ প্রত্যক্ষ' বলা যায়। এইরূপ মনের সহিত সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 'মানস প্রত্যক্ষ'। এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের করণস্বরূপ যে চক্ষু প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং মনোরূপ যে অন্তরিন্দ্রিয়, তাহাতে দৌর্ব্বল্য বা কাচ-কামলাদি নামে প্রসিদ্ধ দোষ যদি থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাহার প্রামাণ্য-জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতীতি হইলেও পরে অপনোদিত হয় অর্থাৎ নিরাকৃত হয়। এইরূপ হইলেই আমরা এই সকল দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের ভ্রান্তিরূপতা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। অনুমিতিরূপ যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু তাহা পরোক্ষজ্ঞান। এইরূপ কোন প্রকার বাক্য শ্রবণ করিলে আমাদিগের সেই বাক্যের অর্থবিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে শাব্দ জ্ঞান কহে, সেই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু তাহা পরোক্ষ। পর্ব্বতে দূর হইতে ধূমদর্শন করিয়া সেই ধূম বহ্নি ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, এইরূপ জ্ঞান যদি আমাদিগের হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে আমরা ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিয়া থাকি। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়ার পর আমাদিগের সেই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এইরূপ যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে আমরা অনুমিতি বলিয়া থাকি।

বাস্তবিক যে হেতুর উপর এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেই হেতুতে যদি সেইরূপ ব্যাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হয়। এইরূপ ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে যে অনুমিতি হয়, তাহাকেও আমরা অপ্রমাণ

বলিয়া পরে বুঝিয়া থাকি। এইরূপ শাব্দবোধের কারণস্বরূপ যে শব্দ, তাহা স্বতঃ ধর্ম্ম না হইলেও সেই শব্দের উচ্চারণকারী পুরুষের যদি ভ্রম, প্রমাদ, চক্ষুরাদি করণের অপটুতা অথবা রাগদ্বেষাদিবশতঃ লোককে ভুল বুঝাইবার ইচ্ছা, এই চারি প্রকার দোষের মধ্যে কোন একটা দোষ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই পুরুষের উচ্চারিত বাক্য হইতে যে জ্ঞান বা শাব্দবোধ হইয়া থাকে, সেই শাব্দবোধকে আমরা পরে অপ্রমাণ বা ভ্রান্তি বলিয়া নির্ণয় করিতে সমর্থ হই।

এক্ষণে প্রকৃত প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতেছে। অর্থাৎ মীমাংসকগণ জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য মানিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে যথার্থজ্ঞান বলিয়াই আমরা বুঝিয়া থাকি। এই নিয়ম অনুসারে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" (স্বর্গকাম পুরুষ দর্শপূর্ণমাস নামক যাগের অনুষ্ঠান করিবে) এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে আমাদিগের এইরূপ বোধ হইয়া থাকে যে, দর্শপূর্ণমাস নামে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে যাগ, তাহা হইতে স্বর্গ উৎপন্ন হয়। এইরূপ যে বোধ, তাহা শাব্দবোধ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শাব্দবোধটি যখনই আমাদিগের উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞানের স্বভাবানুসারে ইহা যে যথার্থবোধ, তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। পরে এই বোধটি যথার্থ কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে যদি আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা এই শাব্দবোধের কারণস্বরূপ যে শ্রুতিবাক্য, তাহাতে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহারই অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হই। শ্রুতিবাক্য যেহেতুক শব্দস্বরূপ, এই কারণে স্বতঃ তাহাতে কোন দোষের সম্পর্ক নাই, তবে তাহার কর্ত্তা বা রচয়িতা যদি পূর্ব্বোল্লিখিত দোষচতুষ্টয়ের অর্থাৎ ভ্রান্তি, প্রমাদ, করণের অপটুতা ও পরপ্রতারণেচ্ছা এই চতুর্ব্বিধ দোষের কোন একটি দোষযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমরা এ স্থলে উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে উৎপন্ন যে শাব্দবোধ, তাহার ভ্রমরূপতা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারি। মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতিবাক্যসমূহ আমাদিগের মধ্যে অধ্যাপক-পরম্পরায় অনাদিকাল হইতে উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। তোমার বা আমার ন্যায় কোনও মানব এইরূপ বাক্য যে প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়াও এ পর্য্যন্ত আমরা পাই না।

তাহার পর দেখ, শাব্দবোধকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিবার আর একটি কারণ আছে। সে কারণের নাম হইল "বাধনিশ্চয়।" অর্থাৎ শ্রুতিতে যাহা বলিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি আমাদিগের লোকসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা বাধিত, এরূপ জ্ঞান আমাদিগের যদি থাকে, তাহা হইলেও আমরা সেই শ্রুতিবাক্য হইতে উৎপন্ন যে বোধ, তাহার ভ্রমরূপতা নির্ণয় করিতে বাধ্য হইতে পারি, কিন্তু প্রকৃতস্থলে এরূপ বাধ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। দর্শপূর্ণমাস যাগ করিলে যে স্বর্গরূপ সুখ উৎপন্ন হয় বলিয়া যে শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই স্বর্গরূপ সুখ আমাদিগের এই জীবনে অনুভবযোগ্য কোন পার্থিব সুখ নহে। তাহা বর্ত্তমান আমাদের এই দেহপাতের পর লোকান্তরে অন্য কোন প্রকার দেহের সহিত সম্বন্ধ হইলেই অনুভূত হয়। সুতরাং সেই লোকান্তরের সুখ আছে কি নাই, ইহা আমরা আমাদিগের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা তন্মূলক অনুমানাদির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়া আমাদিগের প্রত্যক্ষ লৌকিক বস্তুকেই গ্রহণ করিয়া থাকি, অলৌকিক বস্তু গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহাতে নাই। আর এইরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষমূলক যে সমস্ত অনুমান, তাহার সাহায্যেও আমরা লৌকিক বস্তুরই বোধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। স্বর্গসুখ যখন লৌকিক নহে, তখন তাহার সত্তা লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে তাহার বাধ নিশ্চয় হওয়াও সম্ভবপর নহে। কারণ, যে বস্তু প্রত্যক্ষের যোগ্য, তাহারই অভাব আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভব করিতে সমর্থ হই, যাহা প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, এরূপ বস্তুর অভাব আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না, ইহাই হইল লোকসিদ্ধ নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে স্বর্গ যে হইতে পারে না বা অসম্ভব বস্তু, ইহা আমরা প্রত্যক্ষের সাহায্যে বুঝিতে পারি না, প্রত্যক্ষ যাহার উপজীব্য বা আশ্রয়, এরূপ অনুমানও আমাদিগের নিকট স্বর্গের সত্তাকেও বুঝাইতে পারে না এবং স্বর্গের অভাবকেও বুঝাইতে পারে না, ইহা স্থির, অথচ শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারা দর্শপূর্ণমাস যাগ করিলে স্বর্গ হইতে পারে, এইরূপ যে অর্থ, তাহা আমরা বুঝিয়া থাকি। এইরূপ বোধ যে ভ্রমাত্মক, তাহাও আমরা বলিতে সমর্থ নই, কারণ, ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত পুরুষের বাক্য হইতে পারে, ইহা সত্য হইলেও শ্রুতির নির্ম্মাতা কোনও পুরুষের সন্ধান যখন আমরা পাই না, কোন্ দিন শ্রুতিবাক্য কোন্ পুরুষের দ্বারা জগতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে, তাহারও নির্ণয় করিবার সামর্থ্য যেহেতু আমাদিগের

বিদ্যমান নাই, তখন এইরূপ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্য হইতে যে জ্ঞান আমাদিগের উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে জ্ঞান যে ভ্রমাত্মক জ্ঞান, তাহা আমরা কিছুতেই নির্ণয় করিতে সমর্থ নহি। এই কারণে জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য নিয়মানুসারে শ্রুতিবাক্যজনিত জ্ঞানের প্রামাণ্য অপনোদিত হয় না, সুতরাং তাহা যে স্বতঃ প্রামাণ্য, তাহা আমরা অঙ্গীকার করিতে বাধ্য। ইহাই হইল মীমাংসক আচার্য্যগণের শ্রুতির স্বতঃ প্রামাণ্য বিষয়ে প্রধান যুক্তি।

এই যুক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া জৈমিনি, শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ শ্রুতিপ্রামাণ্যের ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের দেশের আস্তিক সম্প্রদায়ও এই যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বেদবাক্যজনিত বোধের অভ্রান্তত্ব মানিয়া লইয়াছেন ও শ্রুতিবিহিত সকল কার্য্যেরই অনুষ্ঠান এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছেন। ইহা আস্তিক সম্প্রদায়ের সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিনিচয় এইরূপ যুক্তির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন কি না, তাহা এ স্থলে নির্দ্দেশ করিতে চাহি না। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে আস্তিক ধর্ম্মাচার্য্যগণের এইরূপ বিশ্বাস যে সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতে দৃঢ় হইয়া আমাদের সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

বৃষ্টলে রামমোহন স্মৃতি-পূজা

বিলাতের বৃষ্টল সহরে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির আছে, এ কথা বাঙ্গালী পাঠক অবগত আছেন। এই সহরের 'আর্ণোর ভেল' (Arno's vale) নামক স্থানে পরলোকগত রাজা রামমোহনের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। এই হেতু ইহা বাঙ্গালীর তীর্থ-ক্ষেত্রবিশেষে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী ও অন্যান্য ভারত-বাসী রাজার স্মৃতিসম্মান রক্ষা করিতে এইস্থানে এক দিন সমবেত হইয়া থাকেন; অতীত যুগের এই যুগপ্রবর্ত্তক বাঙ্গালীর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন করিয়া থাকেন। এ বৎসর গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখেও বহু গণ্য-মান্য ভারতবাসী ঐ স্থানে রাজা রাম-মোহনের স্মৃতিসম্মান রক্ষার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন ও তাঁহার পত্নী 'রাণী' মৃণালিনী, সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পত্নী বনলতা দাশ মহাশয়া, ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী হেমলতা মিত্র, সস্ত্রীক মেজর মণিদাস, সস্ত্রীক মেজর ডি, এন, ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস, এবং সার আব্বাস আলি বেগ ও লেডী বেগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টল সহর কুমারী মেরী কার্পেণ্টারেরও লীলাভূমি। রাজা রামমোহন ও মেরী কার্পেণ্টার এই সহরের Uunitarian Church-এ ভজনা করিতে যাইতেন। সুতরাং সহরটি রাজা রামমোহনের সমাধি ও মেরী কার্পেণ্টারের লীলাভূমি বলিয়া সত্যই একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। আর্ণোর ভেলে সমাধি-স্থানে বহু সহস্র অনুরক্ত ভক্তের সমাগম ও সভা হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস, মহাশয় এতদুপলক্ষে একটি প্রাণ-স্পর্শিনী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—"আজ আমরা যে আদর্শ পুরুষকে সম্মান দেখাইবার জন্য এই স্থানে সমবেত হইয়াছি, তিনি মস্ত বড় ব্যবসাদার বা শাসক ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার এমন একটি বিশেষ গুণ ছিল, যাহার জন্য আজ প্রায় শত বর্ষ পরেও নানা জাতি নানা ধর্ম্মী তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। তিনি সকল দেশকে, সকল জাতিকে, সকল ধর্ম্মকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব।"

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বক্তৃতা করিতেছেন

নব্য ভারতে রসায়ন-চর্চ্চা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মারকিউরাস্ নাইট্রাইট আবিষ্কারই প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বিজ্ঞানের চর্চ্চা এখন এত বিস্তৃত ও বহুমুখী হইয়া পড়িয়াছে যে, গবেষক কোন বিশিষ্ট শাখার একটি বিষয় অবলম্বন করিয়াই সমগ্র জীবন অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারেন। জ্ঞানের সীমানা নাই, মানুষের কৌতূহলেরও নিবৃত্তি নাই; আপাত-দৃষ্টিতে যাহা ক্ষুদ্র মনে হয় এবং যাহার সম্বন্ধে আর কিছু অজ্ঞাত নাই বলিয়া মনে হয়, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আবর্ত্তে ফেলিলে তাহা এক প্রহেলিকাময় অনন্ত জগতের সৃষ্টি করে। মারকিউরাস্ নাইট্রাইট আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের খেয়াল চাপিল যে,ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বহুসংখ্যক জৈব ও অজৈব পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের প্রকৃতি যদি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে রসায়নের এক নূতন অধ্যায় প্রকাশিত হইতে পারে। ইহার ফলে বিশ বৎসর ধরিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে প্রফুল্লচন্দ্র এ সম্বন্ধে শতাধিক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে যে কি পরিমাণ শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের ধারণা করা অসম্ভব। প্রথম হইতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া বার বার বিফলমনোরথ হইবার পর হয় ত ঈপ্সিত বস্তু প্রস্তুত করিবার সন্ধান মিলিল। অভীষ্ট বস্তু প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু পরিমাণে এত কম হইল যে, পরিশুদ্ধি করিবার সময় প্রায় সমস্ত অংশই বাদ পড়িয়া গেল। অগত্যা প্রস্তুত-প্রণালী এরূপ ভাবে সংস্কৃত করিতে হইবে—যাহাতে নূতন পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে একত্র প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার পর নবাবিষ্কৃত বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার প্রকৃতি ও স্বভাবধর্ম্ম ও অন্যান্য সমধর্ম্মী পদার্থের সহিত সাদৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। এই প্রকার সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বহু প্রক্রিয়ার পর গবেষকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এক একটি নূতন রাসায়নিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। অবশ্য অনেক সময়ে আবিষ্ক্রিয়ার মূলে যে ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে না, তাহা নহে, কিন্তু সে সকলের পশ্চাতেও বহুকালব্যাপী সাধনা ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন বর্ত্তমান।

কিন্তু রাসায়নিক গবেষণা অন্যের সাহচর্য্য ব্যতীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। রাজমিস্ত্রী না থাকিলে শুধু কৃতী এঞ্জিনিয়ারের পক্ষে ইমারত নির্ম্মাণ করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ সহকর্ম্মী না থাকিলে রাসায়নিক গবেষণা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে এক এক জন মহারথ অধ্যাপকের উপদেশ অনুসারে বহুসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ছাত্র গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। একা বার্জ্জিলিয়সের নিকট লিবিগ্, হ্বেলার, মিট্সারলিশ্ গবেষণামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আর দেশে ফিরিয়া এক এক জন নিজ নিজ দেশে রাসায়নিক গবেষণার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই ঐ সকল পাশ্চাত্য দেশে এত অধিক মৌলিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরিয়া দেখিলেন যে, রাসায়নিক গবেষণা-ক্ষেত্রে তিনি প্রায় একক। অবশ্য দুই চারি জন বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র যে সে সময়ে রাসায়নিক গবেষণা প্রকাশ না করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় নিতান্তই মুষ্টিমেয় ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় অধ্যাপক জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের দুইটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাদুড়ী মহাশয়ও সম্পূর্ণরূপে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না, পেডলারের ছাত্র হইলেও ছাত্রজীবনের শেষ বৎসর তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রফুল্লচন্দ্রের দুঃখই ছিল এই যে, যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রে উচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাদের কাম্যই ছিল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ অথবা উকীল হওয়া। সুতরাং প্রথম কয়েক বৎসর প্রফুল্লচন্দ্রের নিতান্ত কষ্টেই কাটিয়াছিল; হয় ত কোন প্রতিভাশালী ছাত্রকে তিনি গবেষণার অংশীদার করিয়া লইয়া সোৎসাহে কায আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, তাঁহার প্রিয় ছাত্র ওকালতীর মোহে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার সরল স্বভাবের সঙ্গে চাতুরী করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; বাহিরে হয় ত কোন ছাত্র রসায়নের জন্য প্রাণপাত করিবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন এবং অভীষ্ট অনুগ্রহও লাভ করিয়াছেন। এক দিন হঠাৎ গেজেটে ওকালতীর ফর্দ প্রফুল্লচন্দ্রের নজরে পড়িল, দেখিলেন, তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক ছাত্র তাঁহাকে লুকাইয়া ওকালতীর ছাপ অঙ্গে ধারণ করিয়া বাঙ্গালীজন্ম সার্থক করিয়াছেন। এই সকল প্রবঞ্চনায় তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, টাকার জন্য উচ্চ উপাধিধারী দেশবাসী ছাত্র এরূপ মিথ্যা আচরণের * আশ্রয় লইতে পারে, ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল; তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

যাহা হউক, কয়েক বৎসর নিষ্ফল আক্ষেপের পর তিনি এমন তিন চারি জন ছাত্রের সাহচর্য্য লাভ করিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত গবেষণা কার্য্যে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসরের সহকর্ম্মিগণের মধ্যে আমরা যতীন্দ্রনাথ সেন, অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, পঞ্চানন নিয়োগী, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিতের নাম দেখিতে পাই। ইঁহারা সকলেই রসায়নশাস্ত্রে কৃতবিদ্য পণ্ডিত, সকলেই মৌলিক গবেষণার সাহায্যে অল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়ের গবেষণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি বা কোন উপাধির অধিকারী না হইয়াও যে রাসায়নিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইতে পারে, ইঁহারা তাহার প্রমাণ।

---

* বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা বৃত্তির অবশ্য-পালনীয় নিয়ম এই যে, বৃত্তিধারী ওকালতী করিতে পারিবেন না।

প্রায় বাইশ বৎসর ধরিয়া প্রফুল্লচন্দ্র শুধু একটি বিষয়ই আলোচনা করেন, নাইট্রাইট সম্বন্ধে যত প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে, একটি একটি করিয়া তিনি সকলের সমাধান করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া ডাইভার্সের (Dr Divers) বিলাতে খ্যাতি ছিল; প্রফুল্লচন্দ্র অনেক স্থলে ডাইভার্সের মত খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু ডাইভার্স প্রফুল্লচন্দ্রের সমালোচনা করিলেও তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে কার্পণ্য করেন নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ডাইভার্স কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রী সোসাইটীর এক অধিবেশনে এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাহাতে তিনি বলেন, অধ্যাপক রায় মহাশয়ের মারকিউরাস নাইট্রাইট সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ গত মাসে পঠিত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে নাইট্রাইট সম্বন্ধে বিশদ মত নির্দ্দেশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পরে কেমিক্যাল সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক সাপ্তাহ্য দৈনিক পত্র এম্পায়ার (Empire) এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র পারদ ও রৌপ্যকে এক পর্য্যায়ে ফেলিবার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কোন যৌগিক পদার্থে যদি পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম বিকৃত না করিয়া একটি মূল পদার্থ অন্য একটি মূল পদার্থের স্থান অধিকার করে, তবে মিট্‌সারলিশের নিয়মানুসারে এই উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকা উচিত। প্রফুল্লচন্দ্র এমন একটি পারদঘটিত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করেন, যাহাতে রৌপ্য পারদের স্থান আংশিক ভাবে অধিকার করিলেও পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম বিকৃত করে না; ইহা হইতেই রৌপ্য ও পারদের রাসায়নিক সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য, প্রফুল্লচন্দ্রের মত এখন সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

বহুকাল হইতে রাসায়নিকগণের বিশ্বাস ছিল যে, মেথিল-এমিন্ (methylamine) নামক জৈব পদার্থ নাইট্রাস্ এসিডের সঙ্গে কিছুতেই সম্মিলিত হয় না। এখন পর্য্যন্ত এমিনজাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে নাইট্রাস এসিডের সহযোগে ইহাকে উত্তপ্ত করিতে হয়; ইহাতে উভয়েই বিশ্লিষ্ট হইয়া নাইট্রোজেন প্রভৃতি উৎপন্ন করে। রায় এবং জিতেন্দ্র রক্ষিতই প্রথম প্রমাণ করিলেন যে, নাইট্রাস্ এসিড্ সংযোগে এমিন্‌কে বিনষ্ট না করিয়া ইহা হইতে এক যুগ্ম পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। এই আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রাথমিক বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে পঠিত হয় এবং অবশেষে প্রবন্ধাকারে কেমিক্যাল সোসাইটীর মুখপত্রে একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্রে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। "আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ডাক্তার রায় মহাশয় ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাসায়নিকগণের নিকট হইতে উচ্চ অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন ইহাতে যোগ দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আমাদের বিশ্বাস যে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পর অর্থাৎ মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করিয়া রাসায়ন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর, আজ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজ রসায়নাগারে এমন মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই।" এই আবিষ্ক্রিয়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র, নীলরতন ধর মহাশয়ের সহযোগিতায় এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট্ (Ammonium nitrite) নামক পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করিয়া ইহার আণবিক ভার নির্ণয় করেন। বাহির হইতে দেখিতে সহজ বোধ হইলেও এই প্রক্রিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক; কারণ, এখনকার প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররাও জানেন যে, এমোনিয়ম নাইট্রাইটকে সামান্যভাবে উত্তপ্ত করিলেও ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া নাইট্রোজেন বাষ্প উৎপন্ন করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ ইতালীয় পণ্ডিতদ্বয় আভো গেড্রো (Avogadro) ও ক্যানিজারো (Cannigaro) একটি বিশেষ মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করিয়া রসায়ন জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কোন বিশুদ্ধ বস্তুকে বাষ্পে পরিণত করিয়া বাষ্পের আয়তন মাপা যায়, তবে এই নিয়মের সাহায্যে উক্ত বস্তুর আণবিক ভার নির্ণয় করা যায়। যে সকল পদার্থ উত্তপ্ত করিলে বিকৃত হয় না, তাহাদের বাষ্পের ঘনত্ব (Vapour Density) হইতে সহজেই অণুর ভার নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে, তিনি এমোনিয়ম নাইট্রাইটের ন্যায় বস্তু যাহা সহজেই উত্তাপে বিকৃত হয়, তাহারও বাষ্পের ঘনত্ব মাপিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বস্তুর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক বার্থলো বলিয়াছিলেন যে, "এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট্ বিশুদ্ধাবস্থায় প্রস্তুত হয় নাই বা কখনও হইবেও না; কারণ, প্রস্তুতকালে ইহা বিস্ফোরকের ন্যায় বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।" প্রফুল্লচন্দ্র এই সময়ে কার্য্যগতিকে বিলাতে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সুযোগে কেমিক্যাল সোসাইটীর গৃহে স্বয়ং এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভা সম্বন্ধে লণ্ডনের কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট (Chemist & Druggist) পত্রে ১৯১২ সালের ৬ই জুন তারিখে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়, ডাক্তার ভীলে (Dr. Veley) রায় মহাশয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলেন যে, তিনি এক মহান্ আর্য্যজাতির কীর্ত্তিমান্ বংশধর, যে জাতি অতীতে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং যখন এ দেশ (ইংলণ্ড) কেবল অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিল। অধ্যাপক রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ পুস্তকে অন্যরূপ লিখিত হইলেও এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট বিশুদ্ধাবস্থায় প্রস্তুত করিয়া অবিকৃতভাবে বাষ্পে পরিণত করা যায়। উপসংহারে ডাক্তার ভীলে আচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার ছাত্রগণের এমিন্ ও এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট সংক্রান্ত মূল্যবান্ গবেষণার জন্য অশেষ প্রশংসা করেন। সভাপতি মহাশয়ও রসায়ন সমিতির তরফ হইতে ডাক্তার ভীলের প্রশংসা-বাক্য সমর্থন করিয়া রায় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। সেই বৎসর ১৫ই আগষ্ট তারিখের "নেচার" পত্রে লিখিত হইল, "অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট নামক পদার্থকে বিশুদ্ধাবস্থায় প্রস্তুত করিয়া এবং এই "অশান্ত" পদার্থের বাষ্পের ঘনত্ব নির্ণয় করিয়া তাঁহার সফলতার মাত্রা বাড়াইয়াছেন।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার।

সুন্দরবনে শিকার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হরিণ শিকার সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়—হরিণের গতিবিধি, অবস্থানস্থান প্রভৃতি। তৎপরে শিকারের কৌশল। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহারা অবস্থান করে। কারণ, ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের ফল, পাতা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জোয়ার ও ভাটার সময়ভেদে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করে। তবে সাধারণতঃ 'গেঁড়ো' কিম্বা 'বান' গাছের তলায় ইহারা বিশ্রাম করিয়া থাকে। কারণ, এই দুই জাতীয় বৃক্ষের তলদেশে সুলো কম। বিশেষতঃ গেঁড়ো গাছের তলায় সুলো একবারেই নাই। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরিবার স্থান সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকিলে হরিণ শিকার করা সুবিধাজনক হয় না। হরিণ প্রধানতঃ নদীর চড়ায়, যেখানে খুব 'ধানি' বন আছে এবং তাহার উপরিভাগে নদীর তীরে যদি কেওড়া গাছ থাকে, তবে সেই স্থানেই হরিণ চরিতে ভালবাসে। কেওড়া গাছের তলায় ইহারা বেশীর ভাগ সময় চরা ফিরা করিয়া থাকে। কারণ, ধানির পাতা ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। কিন্তু মাঘ ফাল্গুন মাসে ইহারা খলসে, বান এবং পশুর গাছের তলায় বেশী সময় অবস্থান করে। কারণ, এই সময় ঐ সকল বৃক্ষের পাতা পড়ে, উহা আহার করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে তাহারা আসিয়া থাকে। ঐ সময়ে যে সকল বৃক্ষ হইতে পরগাছার ফুল ফুটিয়া তলায় ঝরিয়া পড়ে, সেই সব বৃক্ষের তলদেশেও তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহারা কেওড়াতলায় বেশী সময় অবস্থান করে। কারণ, সে সময় পাকা কেওড়ার ফল বৃক্ষচ্যুত হইয়া তলদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইহা হরিণের খুব প্রিয় খাদ্য।

জঙ্গলের মধ্যে বানরের দল যখন যে স্থানে অবস্থান করে, হরিণের দলও তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। বানর গাছে বসিয়া বৃক্ষ হইতে পাতা ফেলিয়া দেয়, হরিণ তাহা আহার করে। সুন্দরবনে শাখামৃগের আধিক্য অধিক। প্রভাতকালে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হরিণ শিকার করিবার প্রশস্ত সময়। কারণ, এই সময় ইহারা চরা-ফিরা করিতে বাহির হয়। দ্বিপ্রহরে ইহারা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করে। ঐ বিশ্রামস্থানগুলি প্রায় জঙ্গলের ভিতর অবস্থিত। যে সকল উচ্চভূমি গেঁড়ো কিম্বা বান গাছের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহার তলদেশ হরিণের প্রিয় বিশ্রামস্থান। সকল সময় এই সকল নিভৃত স্থান সন্ধান করিয়া বাহির করাও শিকারীর পক্ষে কঠিন।

বর্ষাকালে হরিণের চরিবার প্রায়ই কোন নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে না। কারণ, বর্ষায় জোয়ারের জল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ইহারা ভাটার সময় চরা ফিরা করিয়া লয়। সাধারণতঃ হরিণ দলবদ্ধভাবেই জঙ্গলে অবস্থান করে। সুন্দরবনের ভিতর দুই জাতীয় হরিণ দৃষ্ট হয়। এক জাতীয় বৃহৎ, তাহাদের গাত্রে মধ্যে মধ্যে গোল গোল সাদা সাদা দাগ আছে, ইংরাজীতে ইহাকে Spotted deer বলে এবং আর এক জাতীয় হরিণ আছে, তাহাদের আকার ক্ষুদ্র। ইহাদের গায় অন্য কোনরূপ দাগ নাই। ইহাদিগকে Barking deer বলে; কিন্তু এই জাতীয় হরিণ সংখ্যায় অল্প দৃষ্ট হয়। জঙ্গলের কোন কোন স্থানে হরিণের সংখ্যা বেশী, কোন কোন স্থানে কম। সুন্দরবনের মধ্যে হরিণের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান ঘরাভোলা, কটকা, ডুবলা, ঝাঁপা, ধোদন। এই কয়টি স্থানে সাধারণতঃ হরিণের সংখ্যা অধিক।

হরিণ শিকার করিবার জন্য নানা সময়ে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, এক প্রকার নিয়মে শিকার করিতে যাইলে কখনও বারো মাস শিকার করা চলিবে না, শিকারও তাহাতে সব সময় পড়িবে না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে জীব-জানোয়ার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে, সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিকার করিতে হইবে। একটি প্রণালী বিফল হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিলে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইবে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ভাবের শিকার-প্রণালী শিক্ষা করা আবশ্যক।

সুন্দরবনের মধ্যে সাধারণতঃ ১০ প্রকার কৌশলে হরিণ শিকার করা যায়। কৌশল অবলম্বন না করিলে হরিণ শিকার কিম্বা কোন শিকার প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেকের এমন ধারণা আছে যে, শিকারের নিমিত্ত কৌশলের প্রয়োজন কি? জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া হরিণকে গুলী করিয়া শিকার করিলেই হইল। কিন্তু তাহা নহে। বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে কখন্ কোথায় বন্য পশুর দল অবস্থান করিতেছে, তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে পারা যায় না। তাহার উপর হরিণ অতি সতর্ক জাতি। মনুষ্যের সামান্য সাড়া পাইলেই দ্রুতবেগে পলায়ন করে। জঙ্গলের অবস্থা পরিষ্কার ময়দানের ন্যায় নহে যে, এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে। জঙ্গল ঘন বৃক্ষাদি দ্বারা আচ্ছন্ন, সুতরাং অরণ্যমধ্যে জীব অবস্থান করিলে অনেক সময় তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। অথবা তাড়িত হইয়া কোন পশু বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় লইলে আর তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় তাহাকে গুলী দ্বারা হত্যা করা অসম্ভব। সুতরাং তাহাকে যাহাতে সহজে শিকার করা যাইতে পারে কিম্বা শিকারী যাহাতে ইচ্ছামত বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আনয়ন করিতে পারে, এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাধারণতঃ এইরূপ দশ প্রকার কৌশল সুন্দরবন প্রদেশে প্রচলিত আছে। শিকারীরা যে সময়ে যে প্রকার কৌশল সুবিধাজনক বলিয়া মনে বিবেচনা করিবেন, তখন সেই প্রকার কৌশলই অবলম্বন করিতে পারেন। এই দশ প্রকার কৌশলের নাম অর্থাৎ সেখানকার প্রচলিত ভাষায় যাহা বলে, নিম্নে বিবৃত হইল :—

১। কেতেল মার, ২। গাছাল (অথবা কুই টানা), ৩। টোপ, ৪। যাইশিকার, ৫। নালিছুনা, ৬। মালহাটা, ৭। কলা ফাঁদ, ৮। ছিটেকল, ৯। পাতাদেওয়া, ১০। জালঘেরা। সাধারণতঃ এই দশ প্রকারের একটি না একটির দ্বারা ঐ জঙ্গলে হরিণ শিকার হয়। অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় এই সব কৌশলের নাম "মার।" সেই কারণেই কেতেল মার, গাছাল মার ইত্যাদি 'মার' বলিয়াই

উল্লেখ করা যাইবে। যে ঋতুতে যে সময় যে কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা জানা প্রয়োজন। "কেতেল মার"—এই মার দ্বারা বর্ষাকালে হরিণ শিকার করিবার সুবিধা। কারণ, বর্ষাকালে সমগ্র সুন্দরবন প্রদেশ জোয়ারের সময় জলে প্লাবিত হইয়া যায়। সে সময় ঐ স্থানের হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি যাবতীয় বন্য পশু জঙ্গলের মধ্যে উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকে, তখন উহাদের চরিবার সময় প্রভৃতির কিছুই বাঁধাধরা নিয়ম থাকে না, এ জন্য সে সময় চরিবার স্থান অন্বেষণ করিয়া হরিণ শিকার করিতে গমন করিলে প্রায় বিফলমনোরথ হইতে হয়। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে 'কেতেল মার' কৌশলই প্রশস্ত।

একখানি ছোট ডিঙ্গী নৌকা লইয়া পূর্ণ জোয়ারের সময় জঙ্গলের খাল বাহিয়া বেড়াইতে হইবে, কিন্তু এরূপ ভাবে সেই নৌকার বৈঠা ফেলিতে হইবে, যেন কোন প্রকারে জলের উপর শব্দ না হয়, নৌকার আরোহীরা নিঃশব্দে অবস্থান করিবেন কোনরূপ কথা বলিতে পারিবেন না। প্রয়োজন হইলে ইঙ্গিতের সাহায্যে কথার কায সম্পন্ন করাই বাঞ্ছনীয়। সেই নৌকার উপর এরূপভাবে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে যে,হরিণ দৃষ্ট হওয়া মাত্র তাহাকে গুলী করা যায়, ইহাতে কোনরূপ বিলম্ব হইলে চলিবে না। যখন চলিতে চলিতে দেখা যাইবে, মধ্যে মধ্যে খালের কিনারায় ৫।৬টা হরিণ এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে সেই সময় নৌকায় বসিয়া তাহাদের উপর গুলী করিতে হইবে। ইহাকেই "কেতেল মার" বলে।

এরূপ অবস্থায় যাইতে যাইতে যদি হরিণের দল নৌকা কিম্বা তাহার আরোহিবর্গের কাহাকেও দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা দৌড়িয়া পলায়ন করিবে। ইহারা অত্যন্ত সতর্ক ও ভীরু, সামান্যমাত্র শব্দ শ্রবণে চঞ্চল হইয়া পলায়ন করে। ঐ সময় ইহারা পলায়ন করে বটে, কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হয় না। তাহাদের পূর্ব্বাধিকৃত স্থান হইতে ৫০।৬০ হস্ত দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় দণ্ডায়মান হয়, ইহাই তাহাদের স্বভাব। তাহারা যে দিকে যত দূর পর্য্যন্ত গমন করে, তাহা তাহাদের পলায়নের সময় জলের উপর ঝপ্ ঝপ্ শব্দের দ্বারা নৌকা হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং কত দূর যাইয়া স্থির হইয়াছে, তাহাও অনুমান করা কঠিন হয় না। কারণ, যেখানে যাইয়া শব্দ মন্দ হইবে, বুঝিতে হইবে, তথায় তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় দুই জন লোক বন্দুক লইয়া নৌকা হইতে নিঃশব্দে ডাঙ্গায় উঠিয়া যাইবে। দুই জনের মধ্যে এক জন সেই হরিণের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিঃশব্দে গমন করিবে। আবশ্যক বোধ হইলে তাহাকে নত হইয়া, প্রায় বুকে হাঁটিয়াও গমন করিতে হইবে এবং অপর ব্যক্তি ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে গমন করিবে। সামান্য শব্দ হইলেই হরিণ পুনরায় পলায়ন করিবে।

এইরূপে গমন করিতে করিতে হরিণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে গুলী করিবে। বর্ষাকালে এই কেতেল মারই হরিণ শিকার করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট এবং সহজ উপায়। এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে অন্য উপায়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারা যায় না। বর্ষাকালে অন্যরূপ উপায় দ্বারাও হরিণ শিকার করা যায়; কিন্তু তাহাতে শিকারীর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যের প্রয়োজন। এই কৌশলটির নাম "গাছকেতেল"। এই প্রণালীতে শিকার সুবিধাজনক হয় এবং গাত্রে কর্দ্দম কিম্বা জল লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না, আর শিকারীও অনেকটা নিরাপদ থাকেন।

তবে শিকারীকে পূর্ব্ব হইতে একটু পরিশ্রম করিয়া জঙ্গলের মধ্যের উচ্চস্থানের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জোয়ারের জলের দ্বারা প্লাবিত হইলে হরিণ উচ্চস্থানে আসিয়া অবস্থান করে। এই উচ্চস্থান অনুসন্ধান করিতে হইলে, শিকারের দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে নৌকাযোগে খাল বাহিয়া পূর্ণ জোয়ারের সময় ভ্রমণ করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে, হরিণ সকল কোন্ কোন্ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিবস যদি হরিণকে এক স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই স্থান উচ্চ; প্রত্যহ জলমগ্ন হইলে এই স্থানে আসিয়া ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উচ্চস্থানকে চলিত কথায় "গোঠ" বলে। এইরূপে সেই গোঠের সন্ধান করিয়া জোয়ার আসিবার কিছু পূর্ব্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে।

প্রথমে দেখিতে হইবে, বাতাস কোন্ দিক হইতে প্রবাহিত হইতেছে। একখানি রুমাল কিম্বা পাতলা কাগজ উত্তোলন করিলেই বায়ুর গতি নির্ণীত হইবে। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মনুষ্যের গন্ধ কোন প্রকারে গোঠের মধ্যে প্রবেশ না করে। তাহা হইলে হরিণরা সেই গোঠের মধ্যে কখনই আগমন করিবে না। হরিণ দূর হইতে গন্ধের দ্বারা মনুষ্যসমাগম বুঝিতে পারে। বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিক ঠিক করিয়া লইয়া নিকটস্থ কোন একটি বৃক্ষের উপর উঠিয়া শিকারীকে উপবেশন করিতে হইবে।

উপবেশনের বৃক্ষও নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ বাতাস যদি দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে গোঠের উত্তরদিকে বৃক্ষে আরোহণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইলে পশ্চিম এবং পশ্চিম হইলে পূর্ব্ব। তবে আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যে দিক হইতে হরিণ আগমন করিবার সম্ভাবনা কম, অর্থাৎ যে দিকে নদী প্রভৃতি রহিয়াছে, সেই দিকের বৃক্ষে উপবেশন করাই সঙ্গত। কারণ, তাহা হইলে বাতাসের দ্বারা মনুষ্যগন্ধ সেই দিকে চলিয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, শিকারীকে সম্পূর্ণ নিঃশব্দভাবে অবস্থান করিতে হইবে। কোন কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে ইঙ্গিতের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। উপবিষ্ট অবস্থায় ধূমপান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। কারণ, অগ্নির গন্ধ দূর হইতে হরিণরা অনুভব করিতে পারে। এইরূপ ভাবে বসিয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে, জোয়ারের জলবৃদ্ধির সহিত হরিণ সকল সেই গোঠের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে যত জলবৃদ্ধি হইবে, হরিণরাও গোঠের মধ্যে আসিয়া গোল হইয়া পশ্চাদ্‌ভাগ এক দিকে করিয়া এবং মুখগুলি চতুর্দ্দিকে রাখিয়া শয়ন করে, অথবা দণ্ডায়মান থাকে। সেই সময় সেই বৃক্ষের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় তাহাদিগের উপর গুলী করিতে হইবে।

যে নৌকায় শিকারী আগমন করেন, তাহাকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথবা নৌকা হইতে কোনরূপ শব্দ যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। শীতকাল প্রভৃতি অন্য সময়ে 'কেতেল মার' কৌশলে হরিণ শিকার করিতে হইলে খুব প্রত্যূষে ঐরূপ একখানি ছোট ডিঙ্গী নৌকা লইয়া জঙ্গলমধ্যস্থ খাল বাহিয়া নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে হইবে। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সময় দেখিতে পাওয়া যাইবে, হরিণ সকল জঙ্গলের ভিতর হইতে নদীর কিনারায় আগমন করিতেছে। যে স্থলে নদী-কিনারায় ধান্যক্ষেত্র রহিয়াছে, তথায় বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যে মুহূর্ত্তে নদীতীরে ঐরূপ হরিণ দৃষ্ট হইবে, তখনই নৌকার উপর হইতে তাহাদের উপর গুলী করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যদি এরূপ অবস্থা ঘটিয়া যায় যে, হরিণ দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে গুলী করিবার সুবিধা হইতেছে না, অর্থাৎ সেই হরিণ এরূপ দূরে অবস্থান করিতেছে যে, বন্দুকের পাল্লা তত দূর পর্য্যন্ত যাইবে না, তখন অগ্রসর হইবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু হরিণ মনুষ্যপদশব্দ পাইবামাত্র তখনই পলায়ন করিবে। এমন অবস্থায় সেই স্থানেই নৌকা বন্ধন করিয়া নিঃশব্দে তীরে উঠিয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া গমন করিতে করিতে যে মুহূর্ত্তে সেই হরিণ বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিবে, সেই মুহূর্ত্তে গুলী করা কর্ত্তব্য, তাহাতে সেই হরিণ নিশ্চয়ই মারা পড়িবে। লেখক নিজে এইরূপ ভাবে এই বৎসর ২টি হরিণ শিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্য অত্যন্ত সাবধানতা এবং সতর্কতার সহিত করিতে হইবে।

সুন্দরবনের মধ্যে হরিণ শিকার করিবার জন্য যত প্রকার কৌশল আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, নিরাপদ এবং অব্যর্থ উপায় "গাছাল মার" কিম্বা "কুই দেওয়া"। এই প্রণালী অবলম্বনে শিকার বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল সময়ে এবং সর্ব্ব-ঋতুতে চলিতে পারে, এবং ইহাতে শিকারে নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা কম। "গাছাল মার" অর্থাৎ "কুই দেওয়া" মার দ্বারা শিকার করিতে হইলে, তাহার সময়—উষা হইতে বেলা ৮টা ৯টা অবধি এবং বৈকালে সূর্য্য অস্তের এক ঘণ্টা আন্দাজ পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যাসমাগম পর্য্যন্ত। দ্বিপ্রহরে কিংবা রৌদ্রের সময় এই প্রণালী অবলম্বনে শিকার হইবে না। এইরূপ প্রণালী অব-লম্বনে শিকার করিতে হইলে, শিকারীকে ভোরের সময় জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইবে, তৎপরে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন্ স্থানে হরিণ রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়াছে। কারণ, হরিণ ভ্রমণ করিলে মৃত্তিকার উপর তাহার টাটকা পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিংবা নদীতে ভাঁটার সময় হইলে সরু খালের ধার দিয়া চলিয়া যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, হরিণ সকল খালের এক পার হইতে অন্য পারে চলিয়া আসি-য়াছে এবং কর্দ্দমের উপর তাজা পায়ের দাগ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতেই ঠিক করিয়া লইতে পারা যায়, কোন্ জঙ্গল হইতে কোন্ জঙ্গলে হরিণ প্রবেশ করিয়াছে।

এইরূপে প্রথমে হরিণের অবস্থানস্থানটি ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রকার দুই উপায়ের একটির দ্বারা তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যদি তাহাও না করা হয়, তাহা হইলে নদীর চরে ধানী ক্ষেতের উপর যেখানে কেওড়া গাছের বন আছে, কিংবা ফাল্গুন চৈত্র মাস হইলে, গেঙো অথবা খলিসা কিংবা পশুর বৃক্ষের বনের নিকট বাতাস দেখিয়া লইয়া, অর্থাৎ মনুষ্যের গন্ধ যেন জঙ্গলের ভিতর না প্রবেশ করে, এইরূপ স্থানে কোন একটি বৃক্ষের উপর আরো-হণ করিয়া উপবেশন করিতে হইবে। সেই বৃক্ষটি কেওড়া, গেঙো, খলিসা কিম্বা পশুর ইহারই ভিতর যাহা হয় একটি হইলে ভাল হয়। অর্থাৎ যে বৃক্ষের পাতা হরিণের খাদ্য, সেইরূপ বৃক্ষে উপবেশন করিয়া, বানর যেরূপ শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ শব্দ করিতে হইবে। বানর যেরূপ পরস্পর ঝগড়া করে, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে ঝগড়ার শব্দ করিতেও হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শাখা আন্দোলিত করিয়া ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া,পাতা ছিঁড়িয়া নিম্নে বৃক্ষতলে ফেলিতে হইবে। শাখামৃগগণ পাতা চর্ব্বণ করিলে যেরূপ শব্দ হয়, তাহার অনুকরণে কতকগুলি পাতা হস্তের মধ্যে লইয়া মর্দ্দিত করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যাইবে যে, হরিণ বৃক্ষাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। হরিণ নিকটে আসিলে বৃক্ষ হইতে তাহাকে গুলী করা যাইবে। গুলী করিবার পর-মুহূর্ত্তে বানরের ঝগ-ড়ার অনুকরণজনিত শব্দ কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে করা কর্ত্তব্য। হরিণ সেই স্থলে তদবস্থায় পড়িয়া থাকুক। তখন বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসা সঙ্গত নহে। আবার ঐরূপ 'কুই' টানিতে আরম্ভ করিতে হইবে (বানরের ন্যায় শব্দ করাকে কুইটানা বলে)। তখন দেখা যাইবে, আবার ঐরূপ হরিণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার তাহাকে গুলী করিতে পারা যাইবে। এইরূপে বেলা ৮টা সাড়ে ৮টা অবধি এইরূপ ভাবে হরিণ আগমন করিতে পারে।

কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঐ বৃক্ষের উপর বসিয়া যেন কোনরূপ কথাবার্ত্তা কিংবা ধূমপান না করা হয়। ঐ হরিণ যখন বৃক্ষতলে আগমন করিবে, তাহাকে পাতায় মুখ দিবার পূর্ব্বে গুলী করিতে হইবে। একবার যদি কোন হরিণ বৃক্ষ-নিক্ষিপ্ত পাতার আঘ্রাণ লইতে পারে, তাহা হইলে সেই স্থান হইতে সে পলায়ন করিবে, আর তথায় আগ-মন করিবে না। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার ফলে ২ ঘণ্টার মধ্যে ৫.৬টি হরিণ কুই টানিবার সময় আগমন করিয়াছে, লেখক নিজে দেখিয়াছেন। বেলা ৯টার পর আর সে বেলা হরিণ আসিবে না বুঝিতে হইবে। উল্লিখিত প্রকার প্রক্রিয়ার পর যদি কোন স্থানে এক ঘণ্টার মধ্যে হরিণ না আসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নিকটে হরিণ নাই। সে যাহা হউক, বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার সময়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। হঠাৎ বৃক্ষের উপর হইতে তাড়াতাড়ি অবতরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এরূপ অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, কুই শব্দ হইলে হরিণ তথায় আগমন করে বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যাঘ্রও সেই স্থানে আসে। সে জন্য বৃক্ষ হইতে অবতরণ-কালে খুব ভাল করিয়া নিম্নদেশের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া তৎপরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করা কর্ত্তব্য। অসতর্ক শিকারী কুই টানিবার পর সহসা বৃক্ষ হইতে নিম্নে অবতরণ করার ফলে তখনই ব্যাঘ্রকবলে পতিত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের কথা লেখক অবগত আছেন।

শিকার অন্তে সেই সমস্ত হরিণ নৌকায় উঠাইয়া লইতে হইবে। বিদেশী ভদ্র শিকারিগণের পক্ষে কুই টানিবার লোক সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। জঙ্গলের নিকটস্থ আবাদে অর্থাৎ যে স্থান জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উঠিত করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক জমীদারী আবাদে অনুসন্ধান করিলে ঐরূপ লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই কুই টানা শিকারের সময় দুই ব্যক্তির গমন করা কর্ত্তব্য। এক ব্যক্তি কুই টানিবে, এক ব্যক্তি বন্দুক লইয়া শিকারের জন্য বসিয়া থাকিবে। কুই টানার কৌশল ৭।৮ দিবস চেষ্টা করিলে আয়ত্ত করা যায়।

শিকারীকে আর এক বিষয়ে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে। বৃক্ষের উপর বন্দুক লইয়া বসিবার সময় তাহাতে যেন দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, অনেক সময় আলগাভাবে বৃক্ষের উপর উপবেশন করিয়া থাকিলে বন্দুক ছাড়িবার সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। লেখক নিজে একবার এইরূপ পড়িয়া গিয়াছিলেন। বৃক্ষনির্ব্বাচনকালে দেখিতে হইবে, যেন একটি ডালে বসিয়া আর একটি ডালে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করা যায় এবং অন্য ডালে পায়ের ভর রাখা যায়। হরিণ শিকার করিবার যত প্রকার কৌশল বর্ত্তমান আছে, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা সহজ এবং অমোঘ উপায় আর নাই। ইহাতে যে ব্যক্তি কুই টানিতে অনভিজ্ঞ, তাহার পক্ষে একটি কুইদার সংগ্রহ করিয়া লইলেই হইল।

প্রভাতকালে যে স্থানে উপবেশন করা হইয়াছিল, বৈকালে সে স্থানে উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে। দেখা গিয়াছে, সকালের শিকারের স্থলে বৈকালে হরিণ আগমন করে না। সে কারণে বৈকালে বসিবার আবশ্যক হইলে অন্যত্র হরিণের অবস্থানস্থান অনুসন্ধান করিয়া বসা কর্ত্তব্য। এই শিকারের সফলতা নির্ভর করে হরিণের অবস্থানস্থান অনুসন্ধানের উপর। আর একটি বিষয় শিকারীর অবশ্য জ্ঞাতব্য। নিকটে ব্যাঘ্র অবস্থান করিলে তথায় হরিণ থাকে না। শিকার করিতে গমন করিয়া নৌকা হইতে তীরে উঠিয়া ভূমির উপর টাট্‌কা ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে কুই টানিতে না বলাই কর্ত্তব্য। কারণ, বুঝিতে হইবে, তথায় হরিণ নাই। এমন কি, যে স্থান দিয়া ব্যাঘ্র চলিয়া যায়, তত্রত্য সমস্ত হরিণ দূরে পলায়ন করে; ৫।৬ দিবস তথায় হরিণ আগমন করে না। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলে কিম্বা খুলনা জেলার সাতক্ষীরা অথবা খুলনা সদর মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলে সাধারণতঃ এইরূপ প্রণালী অবলম্বনে হরিণ শিকার-কার্য্য হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র।

বহুদিন পরে

ফিরে ফিরে মনে পড়ে
কবে প্রবাসের একটি সকাল
এসেছিল মোর তরে!
আমার কানন ভরেছিল ফুলে
কাহার পূজার লাগি;
আমার হৃদয় হ'ল তৃষাতুর
চরণ-পরশ মাগি;
আকাশ সে দিন চেয়েছিল মুখে
সুদূর নয়ন তুলে;
ডেকেছিল পাখী বন্ধনহারা
মদির-স্বপনে ভুলে;
মন্থর মৃদু বাতাসের সুরে
গুঞ্জন ওঠে বনে;—
বহু দিন আগে একটি সকাল,
তারি কথা পড়ে মনে।

বাতায়ন খোলা থাকে,
এত কাল পরে কে আজ আসিয়া
পুরাতন সুরে ডাকে?
নিরালা ঘরের সন্ধ্যা প্রদীপ
জ্বালায়ে জাগিয়া রই।
সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া
থকিত চকিত হই!
চন্দ্রালোকের মায়ার স্বপনে
আকুল অধীর মন।
সঙ্গীততানে কাছে এলে আজ
অন্তরতম জন!
পন্থ নেহারি শ্রান্ত নয়ন—
পরশপিয়াসী হিয়া;
বিস্মিত চিত অর্ঘ রচিল
পুষ্প-পরাগ দিয়া।

শ্রীমতী রুচিরা দেবী

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে—"

১

গৌরগোপাল গোস্বামী স-পারিষদ্ শিষ্যবাড়ী বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

শীতের প্রারম্ভেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শীত কাটাইয়া এখন বসন্তের বাতাস গায়ে লাগাইতে লাগাইতে, দুই মাসের উপার্জ্জিত অর্থ ও বস্ত্রাদির মাধুর্য্যভারে বিভোর হইয়া, তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, যেহেতু, সম্মুখেই দোল।

এই দোল উপলক্ষেই তাহার শিষ্যবাড়ী-ভ্রমণ। বহুকাল হইতেই তাহার গৃহে দোল হয়। বৎসরের মধ্যে ইহাই এক দিকে যেমন তাহার গৃহের উৎসব, অন্য দিকে তেমনই তাহার একটি প্রধান আয়ের পথ। এই দোল উপলক্ষ করিয়াই প্রতি বৎসর গোস্বামী ঠাকুর তাহার পিতৃপুরুষগণ কর্ত্তৃক হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিষ্যগণের বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিত, তাহার পরিমাণ চারি পাঁচ শত টাকা হইত। সুজন্মার বছর হইলে আরও বেশী হইত। কিন্তু দোলে গৌরগোপাল ব্যয় করিত সর্ব্বসাকল্যে পাঁচখানি দশ টাকার নোট্। সুতরাং বাকী টাকাটা তাহার সঞ্চিত টাকার অঙ্ককে বৎসরের পর বৎসর কেবল বাড়াইয়াই আসিতেছিল।

পারিষদরূপে জগন্নাথ গুঁই এবার তাহার সঙ্গী ছিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, তবে হইবার আর বড় বেশী দেরীও ছিল না। মস্তকে বস্ত্র ইত্যাদির বিপুল বোঝা লইয়া এবং দক্ষিণ হস্তে বিরাট-বপু সুস্পষ্ট ক্যাম্বিসের ব্যাগটি ঝুলাইয়া গোস্বামী ঠাকুরের পিছন পিছন দ্রুত চলিতে চলিতে জগন্নাথ কহিল,—"ঠাকুর, একটু ব'সে দম নিয়ে নিলে হয় না?"

গৌরগোপাল কহিল,—"আর ত এসে পড়েছি এইবার। ওই যে সামনে তালগাছগুলো দেখা যাচ্ছে—ওর পরেই একখানা বড় মাঠ, সেইটে পেরুলেই গোপীনাথপুর আর কি।" তার পর চলিবার গতি একটু কমাইয়া দিয়া কহিল,—"তা জিরিয়ে নিতে চাস্ ত একটু বসা যাক্। আয় ওই বট্‌গাছটার তলায়।"

বোঝা নামাইয়া, বটগাছের ছায়ায় বসিয়া, হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে জগন্নাথ বলিল,—"শুধুই বসবে ঠাকুর?—একটু—"

হাতের গামছাখানি ঘুরাইয়া অঙ্গে বাতাস করিতে করিতে গৌরগোপাল কহিল,—"চড়াবি একটু বলছিস?—আচ্ছা, চড়া তবে।" বলিয়া ব্যাগ হইতে ছোট্ট একটি ন্যাকড়ার পুঁটুলী, কলিকা, সাঁপি প্রভৃতি বাহির করিয়া জগন্নাথের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—"অল্প ক'রে নিস, মাল ফুরিয়ে এসেছে। এখানে আবার ও মেলেও না। গোপীনাথপুরে আর দেরী করা নয়। কালকেই এখান থেকে রওনা হয়ে একেবারে বাড়ী। অনেক দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। মনটা বাড়ীর জন্যে ছট্‌ফট্ কচ্ছে।" বলিয়া দিক্‌প্রান্তে আকাশের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জগন্নাথ কহিল,—"তোমার ত মাঠাকরোণ ছাড়া ঘরে আর ছেলেপুলের হ্যাঙ্গামা নেই, ঠাকুর। আমার একপাল ছেলে-মেয়ে। তাদের নিয়ে মাগী যে কি কচ্ছে!" তার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"তোমারও হবার কথা বই কি। ছেলে বল, পিলে বল, ভাই-বোন্ সবই ত হ'ল গিয়ে ঐ মা-ঠাকরোণ। মন চলঞ্চল হয় না আবার! বিয়ে করা ইস্তিরি!"

"দূর ব্যাটা গাধা কোথাকার! তোর মা-ঠাক্‌রুণের জন্যেই কি আর আমার মন ছট্‌ফট্ কচ্ছে?"

হস্ত-তালুস্থ মর্দ্দিত মালের উপর ফোঁটা কয়েক জল দিয়া ডলিতে ডলিতে জগন্নাথ কহিল,—"তবে?"

"তুই তার কি বুঝবি বল্? দু' একটা উপযুক্ত ছেলে-টেলে থাকলে আর ভাবনার কি ছিল? গরীব হই, যা হই, দু'দশ টাকা যা আছে, সে ত আর ব্যাঙ্কে জমা নেই রে,—

বসুমতী প্রেস] প্রসাধন [শিল্পী—যোগেশচন্দ্র শীল

ঘরেতেই ত আছে। তার পর ২।১ খানা সোনাদানাও আছে, এটা-সেটা আছে। বাড়ীতে পুরুষ ব'লে ত আর কেউ নেই,—গেরোর ফেরে কখন্ কি—বুঝতে পাল্লি না ?"

"তা যা বললে, তা ঠিক, ঠাকুর! গেল বছর তিনটি দিনের জন্যে শ্যামগঞ্জে কুটুমবাড়ী গেছলুম, ফিরে এসে দেখি, কাস্তে দু'খানা, মাল কাটবার ছুরিটা, গোয়ালের ভেতর একটা লাঙ্গলের মুড়ি রেখেছিলুম, এ সব একেবারে বেমালুম্ লোপাট্! ধর গিয়ে উপযুক্ত দু' একটা ছেলেও ঘরে রয়েছে, তা এরই মধ্যে থেকেও জিনিষ ক'টা গেল।—তা দেখছি, ও ছেলে থাকলেও যা, না থাকলেও তা। বেটাদের রশ্বি-দীরখি জ্ঞান—"

"অমন কথাটি বলিসনি রে, জগা! বলে, 'পুতের মূতে কড়ি।' বেশী নয়—একটা ছেলে যদি আমার থাকতো, তা' হ'লে কি আর—। এক একবার মনে হয়, এই যে প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে, খেটে খুটে ধুলো-গুঁড়ো যা একটু ক'রে যাচ্ছি, এ কার জন্যে!" বলিয়া মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ' বলিয়া জগন্নাথের দিকে ফিরিয়া বসিতেই জগন্নাথ কহিল,—"আর একটা বিয়ে কল্লে হয় না, ঠাকুর ?"

"দূর পাগল, ক্ষেপেছিস্ ? এই ৫২ বছর বয়সে কি আর বিয়ে করা চলে ?" খানিক নীরব থাকিবার পর গৌরগোপাল আবার কহিতে লাগিল,—"তবে, এর ভেতর একটা কথা আছে। বয়েস আমার ৫২ হ'লেও দেহ আর মন যা আছে, তা অমন ২৫।২৬ বছরের ছেলেদেরও নেই! উর্দ্ধ-শ্লেষ্মা আর বাতিকে যদি মাথার চুল আর দাড়ী-গোঁফ না পাক্‌তো, তা হ'লে ত—গোবিন্দ—গোবিন্দ—সকলি তোমার ইচ্ছা, দয়াময়!"

জগন্নাথ কলিকায় আগুন দিয়া গৌরগোপালের হস্তে দিয়া কহিল,—"ও সব কথা এখন থাক, লাগাও দিথি ঠাকুর, এখন জয় বাবা ভোলানাথ! বিশ্বম্ভর-বিশ্বনাথ! শিবশম্ভু-শূলপাণি, মহেশ-ধূর্জ্জটি, পশুপতি-পঞ্চানন—বোম্—বোম্—বোম্!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার কিছু পরেই গৌরগোপাল শিষ্যের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে জগন্নাথ-গোয়াল-ঘরে প্রভুর রাত্রির আহারের আয়োজনে উঠিয়া গেল এবং গৌরগোপাল শিষ্যবাড়ীর সকলকে পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ দেওয়ার পালা সাঙ্গ করিয়া জপ-আহ্নিকে বসিল। দীর্ঘ দুইটি ঘণ্টার পর আসন হইতে উঠিয়া গৌরগোপাল 'শ্রীগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ' বলিতে বলিতে গোয়ালে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের উদ্দেশে কহিল,—"কত দূর—জগ ? ওরে ব্যাপ রে! এই এত ময়দা মেখে ফেলেছিস্ ? এত খাবে কে রে ?"

ময়দার তাল ঠাসিতে ঠাসিতে জগন্নাথ বলিল,—"বোল্‌ছো বটে, ঠাকুর, কিন্তু তোমারই এ আঁটবে না, দেখে নিও। এই দু'মাস সঙ্গে থেকে দেখে আসছি ত। আচ্ছা ঠাকুর, বাড়ীতে ত এর সিকির সিকিও খাও না। শিষ্যিবাড়ীতে তোমার এত খাওয়ার বহর বাড়ে কি ক'রে ? ওই ত ছিটে বেড়ার দেহ, কি ক'রে ওরই ভেতর এতটা মাল সম্পত্তি কর বল ত ?"

দরজার ফাঁকে উঠানের দিকে একবার দেখিয়া লইয়া গৌরগোপাল চাপা গলায় ধমকাইয়া বলিল,—"চুপ্, চুপ্, ব্যাটা! কোথায় কি ব'লে ফেলে দেখ!"

"যাক্, তরকারীটা তুমি বসিয়ে দাও দিকি। আমি লুচিগুলো বেলে ফেলি।"

তরকারীর কড়া উনানে বসাইতে বসাইতে গৌরগোপাল কহিল,—"কতগুলো লুচি হবে বল দেখি ? আমার যে আজ তেমন ক্ষিদে নেই রে।"

"আরে, ক্ষিদে থাকলে ত এতে তোমার একেবারেই কুলোত না। গণ্ডাদশেক লুচি হবে আর কি। ক্ষিধে নেই বলেই ত কম ক'রে মাখলুম্। এইতেই দু'জনের হয়ে যাবে এখন।"

আহারের সময়, দশ গণ্ডা লুচির মধ্যে অক্ষুধায় গৌরগোপাল ছয় গণ্ডা গলাধঃকরণ করিয়া জগন্নাথের সক্ষুধায় খাইবার জন্য চারি গণ্ডা পাতে রাখিয়া উঠিয়া পড়িল।

জগন্নাথ কহিল,—"আর দু'চারখানা খেলে না কেন ঠাকুর!"

আসনের উপর দাঁড়াইয়া গৌরগোপাল বলিল,—"কি বলছিস রে জগা, পেটটা একবার দেখেছিস্ ? শেষকালে কি বিদেশে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলব!- ওরে, দুধটা ত খাওয়া হ'ল না।"

পাশের প্রকাণ্ড দুধের বাটিটির দিকে চাহিয়া জগন্নাথ কহিল,—"খাও নি, ভালই হয়েছে। অক্ষিদের ওপর এত-গুলো লুচি খেলে, আর দুধটা না হয় নাই খেলে, ঠাকুর ? যা বললে—বিদেশ-বিভুঁই।"

"খাব না তবে ?"

"না—ও আর খেয়ে কায নেই।"

"কতটা হবে বল্ দেখি ?"

"তা প্রায় সেরখানেক হবে। খুব ঘন ক'রে জ্বাল দিয়েছিলুম কি না।"

"আচমন ক'রে উঠে পড়লুম যে,—নইলে—"

"ও আর লোভ কোর না, ঠাকুর—হাজার হোক বুড়ো বয়েস ত! রক্তের জোর ক'মে এসেছে। এই খাওয়ার পর আর ঐ অতটা ক্ষীরের মত দুধ নাই খেলে।"

"আরে, তা ব'লে দুধটা খাব না ? ফেলে যাব ?"

"তাই যাও। রাত-বিরেতে শেষে একটা কাণ্ড—"

"দুর পাগল !"

"তবে খাও।"

"কিন্তু আচমন ক'রে উঠে পড়লুম যে !"

"তা হোক, কে আর দেখছে এখন ?"

মুক্ত দুয়ারের ফাঁকে বাহিরের দিকে একবার দেখিয়া গৌর-গোপাল পুনরায় আসনের উপর বসিল এবং সেই বৃহৎ বাটির এক বাটি গাঢ় 'ক্ষীরসরাটি' দুধ নিরতিশয় তৃপ্তি ও আনন্দের সহিত পান করিয়া, গোয়াল হইতে বাহির হইয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রিতে গৌরগোপাল ডাকিল,——"জগা—জগন্নাথ—বাবা !"

দুই চার বার ডাকিতেই জগন্নাথ সাড়া দিল। গৌরগোপাল কহিল,—"ওরে, পেটটা বড্ড ব্যথা করছে। অক্ষুধার ওপর খেয়েছি, বোধ হয়, কিছু হজম্ হয়নি, বুঝিছিস ?"

জগন্নাথ উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"সেই জন্যেই ত অত ক'রে বলেছিলুম ঠাকুর যে, ওই অতটা দুধ—"

"আরে, তাতে কি হয়েছে ? হজম্ আমি এক দণ্ডেই করিয়ে দেওয়াচ্ছি দেখ না। একটু মাল তৈরী ক'রে ফেল দিখি।"

জগন্নাথ দাঁড়াইয়া উঠিতেই গৌরগোপালও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"জগ,—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির—গাড় —গাড়ু।" বলিতে বলিতে গৌরগোপাল উঠানে নামিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি সদরের খিল খুলিতে খুলিতে কহিল,—"তবে রইলো গাড়ু,—এই পেছনের পাঁদাড়ে দিয়ে যাস্ !"

সে রাত্রিতে পিছনের পাঁদাড়ে গৌরগোপালকে বহুবার ছুটাছুটি করিতে হইল। সুতরাং পরদিন আর তাহার গৃহে আসা হইল না। তবুও অসুস্থ শরীরে প্রাতঃকালে তাহার দুই ঘণ্টা আহ্নিকের কামাই হইল না। শিষ্য মাধব স্বর্ণকার আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে নিবেদন করিল,—"এই অসুখ শরীরে এতক্ষণ ধ'রে জপ-আহ্নিক না ক'রে—"

গৌরগোপাল কহিল, "গোবিন্দ ! গোবিন্দ !—অসুখ ব'লে কি জপ-তপ বন্ধ রাখতে পারি রে, মাধব ? দেহ আগে—না, ধর্ম্ম আগে বাবা ?"

গৌরগোপাল সামান্য একটু জ্বরানুভব করিতে লাগিল। শিষ্য মাধবচন্দ্র তাহার বার্লি সেবনের আয়োজন করিয়া দিয়া, তাহার নাড়ীটি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাড়ার মতি ঠাকুরকে ডাকিতে গেল।

মতি ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মতিলাল পাঠক মাধবের সঙ্গে তখনই আসিল। আসিবার সময় তাহার একমাত্র নবমবর্ষীয়া কন্যা ময়না জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাও, বাবা ?"

মতি কহিল,—"মাধবের ঠাকুর মশাইকে দেখতে।"

বালিকা সাধারণ মেয়েদের তুলনায় একটু বোকাধরণের ছিল। সে মনে করিল,—মাধবের ঠাকুর মশাই—সে বোধ হয় একটা কিছু দেখিবার জিনিষ, তাই ময়নাও পিতার হাত ধরিয়া আসিল। কিন্তু সদর-দরজায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিল যে, ঠাকুর মশাই আর কিছু নহে, তাহারই মৃত ঠাকুরদাদার মত পাকা চুল ও পাকা দাড়ী-গোঁফবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ, তখন সে আর চণ্ডীমণ্ডপের উপর না উঠিয়া সদরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া দরজা ধরিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

গৌরগোপাল ময়নাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটি কি আপনার—"

"ওটি হ'ল আমার কন্যা। ঐ এখন আমার সব। ঐটিকে নিয়েই সংসার-বন্ধনে প'ড়ে আছি। ওকে দু'বছরের রেখে স্ত্রী মারা যায়। তার পর মা গেল, ভাই গেল, ভাজ গেল। বাপটি এত দিন ছিলেন, তিনিও গেল বছর বাগ্‌দীদের সঙ্গে তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে—দাঙ্গা করতে গিয়ে অপঘাতে গেলেন মারা। এমন যে খুব বুড়ো হয়েছিলেন, তাও না। এই আপনাদেরই বয়সী ছিলেন আর কি।" তার পর মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া কন্যার দিকে চাহিয়া কহিল,—"এখন এইটিকেই কারো হাতে একবার গছিয়ে দিতে পাল্লেই ঝঞ্চাট্ নিশ্চিন্দি।"

গৌরগোপাল ময়নার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার পর কহিল,—"মেয়ে আপনার খাসা মেয়ে,—

সুলক্ষণা কন্যা।" তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"আমারও প্রায় এই রকমই অবস্থা। বাড়ীতে এক স্ত্রী ছাড়া আর কেহই নেই,—তাও চিররুগ্ন—আর বাঁচবেও না বেশী দিন। শরীরের যা অবস্থা, কবে এক দিন টপ্ ক'রে ম'রে যায়! খেটে-খুটে বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি যা করেছি, তা ত আর নেহাৎ কম নয়। তাই ত গিন্নীকে বলি যে,'জমীদারী কেনো, জমীদারী কেনো' যে বল, তা কিনিই যদি—অবশ্য কিনতে ত এখনই পারি—কিন্তু তা ভোগ করবে কে? তাই ত তাঁকে বলি যে, যা রেখে গেলুম, একটা বড় জমীদারীরই আয়। হঠাৎ যদি একটা ভাল-মন্দই হয়ে পড়ে ত তুমি একটা স্ত্রী—আর একটা না হয়ে যদি দশ-টাই থাকতো—তা হ'লেও সাত পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়ে,—রাজার হালে খেয়ে প'রে চ'লে যাবে। গোবিন্দ! গোবিন্দ! রাধারাণীই ভরসা!"

রাত্রিকালে শুইয়া শুইয়া গৌরগোপাল জগন্নাথকে কহিল,—"আজকাল বছর যাচ্ছে না জল যাচ্ছে। পাঁচ ছয়টা বছর ত দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে যায়।"

জগন্নাথের ঘুম আসিয়াছিল, কহিল,—"তা যায় বৈ কি। কেন বল দেখি?"

"না—তাই বলছি। হাঁ রে, তোর ক্ষুদীর একটি ছেলে হয়েছে,—না?"

"হ্যাঁ ঠাকুর, আপনাদের আশীর্ব্বাদে একটি খোকা হয়েছে আজ মাস কতক হ'ল।"

"ত্যাখ একবার! সেই ক্ষুদী—এই সে দিনও ন্যাংটো হয়ে আমার সামনের পড়োটায় লুকোচুরী খেলে, ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত, আজ সে ছেলের মা হয়ে গেল। মেয়েমানুষের বাড় কি সোজা! কথায় বলে—মেয়েছেলের বাড়—না কলাগাছের বাড়!"

পরদিনও গৌরগোপালের গৃহে ফেরা হইল না। শরীর খারাপ।

নাড়ী দেখাইবার জন্য নিজেই সকালবেলায় পাইচারী করিতে করিতে গৌরগোপাল মতি পাঠকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পর অনেক বেলায় যখন ফিরিয়া আসিল, তখন জগন্নাথকে কহিল,—"জগ, অনেক কথা আছে, বাবা! কিন্তু, খবরদার, কারুর কাছে কোন কথা এখন যেন না প্রকাশ হয়। দিন দশ বারো এখন বাড়ী ফেরা বন্ধ রইলো আর কি।"

তাহার পর দুই এক দিন ধরিয়া গৌরগোপাল, মতি পাঠক ও মাধব তিন জনে মিলিয়া কিসের একটা শলা-পরামর্শ করিতে লাগিল এবং তাহারই ফলে পনের দিন গুপীনাথপুরে কাটাইয়া গৌরগোপাল শিষ্য মাধব স্বর্ণকারের প্রণাম ও প্রণামী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নবমবর্ষীয়া বালিকারও পাণিগ্রহণ করিয়া, এক দিন সকালে যখন আপন গৃহ-উদ্দেশে যাত্রা করিল, তখন পঁয়ত্রিশ বৎসরবয়স্ক শ্বশুর মতি পাঠক, বাহান্ন বর্ষবয়স্ক জামাতা গৌরগোপালের মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিল,—"পৌছেই একখানা পত্র দিতে ভুলো না, বাবাজী!"

৩

দোল শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গৌর-গোপাল এবার দোলে ব্যয়ও যেমন বেশী করিয়াছে, তাহার উৎসাহেরও তেমনই অন্ত ছিল না।

প্রাতঃকালে জগন্নাথ আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া কহিল,—"ঠাকুর, আমার পাওনাটা এবার চুকিয়ে দাও।"

গৌরগোপাল কহিল,—"তোর আমি হিসেব করেই রেখে দিয়েছি, নিয়ে যা", বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল ও কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জগন্নাথের হাতে তিনখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিল,—"দেখ বাবা জগ, তোর হয়েছে দু'মাস তিন দিন—অর্থাৎ তেষট্টি দিন, তা হলেই ॥০ আনার হিসেবে হ'ল ৩১॥০টাকা। এই ত্রিশ টাকা নিয়ে যা এখন। বাকী ১॥০টাকা দু'চার দিন পরে এসে নিয়ে যাস।"

জগন্নাথ নোট তিনখানি হাতে লইয়া কহিল,—"আট আনা ক'রে কি গো? দশ আনার হিসেবে ত কথা ছিল।"

"তা ছিল বটে, কিন্তু তুই নিজেই দেখ্‌লি ত পাওনা-থোওনা এবার একেবারেই কম। তা যা, পুরো দুটো টাকাই এসে নিয়ে যাস এক দিন।"

জগন্নাথ নারাজ হইল। ধান কাটিবার সময় সে কাষের ক্ষতি করিয়া গিয়াছে, সুতরাং দশ আনা রোজের কমে সে কিছুতেই লইতে স্বীকৃত হইল না।

গৌরগোপাল কহিল,—"হ্যাঁ রে, সামান্য দু-পাঁচটা টাকার জন্যে আমার সঙ্গে কি এতটা পেড়াপিড়ি কত্তে আছে রে? আমি যে তোকে আশীর্ব্বাদ করব, সেটা কি টাকার চেয়ে কিছু কম হবে রে, বাবা?" বলিয়া পৈতায় আঙ্গুল জড়াইয়া তাহার মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিল। কিন্তু জগন্নাথ অচল, অটল,

কহিল,—"আশীর্ব্বাদের বদলে আমার পাওনার টাকাটাই তুমি চুকিয়ে দাও, ঠাকুর।"

গৌরগোপালও আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর টাকা ছাড়িতে একবারেই নারাজ। সুতরাং এই লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা রাগারাগি ও বকাবকি হইয়া যাইবার পর জগন্নাথ গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রিতে গোস্বামি-গৃহিণী আসিয়া কহিল,—"হ্যাঁগা, জগন্নাথের সব টাকা চুকিয়ে দাও নি কেন?"

গৌরগোপাল একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল,—"দিইনি কি রকম? সে দিই না দিই, জগা আর আমি বুঝবো—তোমার মেয়েমানুষের সে সব কথার দরকার কি?"

"মেয়েমানুষের দরকারটা আজই হঠাৎ বুঝি উঠে গেল? তা, আহা-হা, সে বেচারা গরীব মানুষ, তার—"

"গরীব মানুষ ব'লে ত আর—লুটিয়ে দিতে পারি না। ও ব্যাটাদের কি, ওদের দিতে পাল্লেই ভাল। এদিক-সেদিক ক'রে আমায় ত দু'পয়সা সঞ্চয় ক'রে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, সঞ্চয় ক'রে যেতে হবে বৈ কি! দু'দিন বাদে ছেলে হবে—সঞ্চয় ত করতেই হবে!"

গৌরগোপাল আড় হইয়া শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"কি বলছো?"

"বলছি যে, কথাটা লুকোবার কি দরকার ছিল বল? কথা কি আর চাপা থাকে?"

"কিসের কথা?"

"এই বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবার জন্যে ছেলে হবে ত, সুতরাং সঞ্চয় চাই বৈ কি।" বলিয়া গোস্বামি-গৃহিণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"তবে তাই যদি ইচ্ছেই ছিল, তবে বছর দশ পনের আগে কল্লেই সব দিকে দেখতে শুনতে ভাল হ'ত কি না! এখন এটা কি জান—" বাকী কথাটা শেষ না করিয়াই করুণাময়ী যেমন আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়া গেল।

দিন পাঁচ সাত পরে এক দিন রায়েদের মহিম অন্দরে প্রবেশ করিতে করিতে জড়িত কণ্ঠে হাঁকিল,—"কোথা গো, বৌদি'। এই যে, দাদা। উঠোনে পাইচারী করতে করতে নতুন বৌদির মুখখানা ভাবছো না কি, দাদা!—হা হা হা হা! ভাগ্যিস ধ'রে ফেল্লুম্, নইলে এখনই টোক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলে আর কি। আচ্ছা দাদা, আমরা দিনরাত জলের পথে বেড়িয়েও ঠিক থাকি, আর তুমি শুক্‌নো পথে চলো দাদা, তবু ট'লে পড়?"

গৌরগোপাল কহিল,—"তৈরী হয়ে আছিস্ বুঝি?"

ঈষৎ টলিতে টলিতে মহিম কহিল,—"আজ হ'ল গিয়ে পয়লা বোশেখ—বছরের প্রথম দিন—আজ ২৪ ঘণ্টা তৈরী থাকতে হবে, তবে ত গোঁত বছরটা কাটবে ভাল।—বলি, নতুন বৌদিকে আনছ কবে বল? কোথা গো, বৌদি, বেরোও না একবার! এখন আর শুধু বৌদি ব'লে ডাক্‌লে হবে না, 'কেলাস্' ভাগ ক'রে ডাক্‌তে হবে—নইলে বুঝতে গোলমাল হবে। বলি, ও বড় বৌদি!"

"দেখ মোহে, তোর একেবারে হ্রস্বী-দীর্ঘী জ্ঞান নেই।"

"আরে হ্রস্বী-দীর্ঘি জ্ঞান থাকলে ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে যেতুম।—আচ্ছা দাদা, তোমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু মেয়ের বাপটি যে এই হত্যাকাণ্ডটা করলে, রাজার আইনে না হয় এর কোন প্রতীকার নেই, কিন্তু সমাজ থেকে কেউ এর কোন কঠিন শাস্তির বিধান করলে না? শাস্তির যদি ব্যবস্থা থাকতো, তা হ'লে এর উচিত শাস্তি কি জান—শূল! গুলী ক'রে মারা—কুকুরকে দিয়ে খাওয়ান। অন্ততঃপক্ষে, নাক-কাণ কেটে গাঁ থেকে বার ক'রে দেওয়া!"

গৌরগোপাল উঠান হইতে দালানে উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মহিম উঠানের ধূলার উপরেই বসিয়া পড়িয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল,—"আমি দাদা, একটু মুখ-ফোঁড় জানই ত। স্পষ্ট কথা বলবো, তা' তা'তে আমার চক্ষুলজ্জাও নেই, ভয়ও নেই। বৌদি আমার মা-লক্ষ্মী, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে, দাদা, আবার এই বুড়ো বয়সে এক হ্যাঙ্গাম জুটিয়ে ফেল্লে? কি 'গঙ্গা-মণ্ডল' তালুক তোমার আছে দাদা, যে, ছেলের অভাবে জমীদারী তোমার ভেসে যাবে? সম্পত্তির মধ্যে ঐ ত বিঘে বিশ পঁচিশ জমী। আর, সেই মৎলবই ছিল যদি ত বছর পনর ষোল আগে করলেই ত পারতে!"

ঘরের মধ্য হইতে দালানে বাহির হইয়া আসিয়া গৌরগোপাল কহিল, "তুই একটা মাতাল, মুখ্যু, জঘন্য, যাচ্ছেতাই! কেন যে বিয়েটা হঠাৎ করতে হ'ল, সে গূঢ় হেতুটা না জেনে শুনেই—কতকগুলো খালি মাতলামী করতে আরম্ভ করলি কি না!"

মহিম সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'খুড়ি', দাদা, বড্ড ভুল হয়েছে! শুভ বিবাহটির আবার যে কোন গূঢ়

হেতু আছে, তা জানতুম না। তাই ত বলি, দাদা আমার বিনা হেতুতে—'তা' হেতুটা কি, একবার শুনিয়ে দাও দাদা, তবু মনটাকে প্রবোধ—"

"তুই কি একটা মানুষ, না তোর কোন হেড্ আছে? তোকে বলায় না বলায় সমান।" মুহূর্ত্তখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরগোপাল একটু রুখিয়া কহিল,—"স্বয়ং গোবিন্দ যেখানে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, কন্যাকে নির্দ্দেশ ক'রে আদেশ কচ্ছেন, সেখানে—"

মহিমের উচ্চ হাস্যরবে গৌরগোপালের বাকী কথা মুখের মধ্যেই রহিয়া গেল। মহিম হাসিয়া লুটাইতে লুটাইতে কহিল,—"বলি হারি যাই, দাদা! তা হ'লে স্বপ্নাদ্য বিয়ে! দাদা গো, গায়ে এই দেখ কাঁটা দিয়ে উঠছে। উঃ—গোবিন্দ দেখা দিয়ে, স্বয়ং চার হাত এক—উঃ, বৌদি গো,—গোবিন্দ! শ্রীগোবিন্দ! তোমার এই লীলে? দাদা, আগে কাঁটা দিয়ে উঠছিল, এখন আবার দেখ দাদা, গা ঘামছে!"

গৌরগোপাল পূজার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে কহিল,—"দেখ্ মোহে, পূজোয় বস্‌তে যাচ্ছি আমি, বাজে বক্‌বক্ করিস্ নি কিন্তু, ব'লে দিচ্ছি।"

"আজ বছরের প্রথম দিনে দু'টো উচিত কথা ব'লে যাই, দাদা। বেশী বক্‌বক্ আর কোরবো না। ভগবান্ করুন, নতুন বৌদির পেটে তোমার, একটা কেন, শত পুত্র হোক।—কিন্তু, হ'বার যদি হোত দাদা, তা হ'লে, ঠিক বলতে পারি না,—হয় ত এই বৌদি থেকেই হোত। জান ত—পুলিন বিশ্বেস চার-চারবার বিয়ে করলে, কিন্তু একটারও ছেলে হ'ল না। কিন্তু শেষকালে ছোট বৌটা শাশুড়ী-ননদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর পুলিনের অত্যাচারে ঘরে তিষ্ঠুতে পারলে না ত? এখন গিয়ে দেখ গে যাও, যা'র আশ্রয়ে এখন সে আছে, ঠিক বিয়ে-করা স্ত্রীর মতই আছে। আর তার সেই ঘরে আজ ছেলে-মেয়ে আর ধরছে না। সুতরাং দোষটার শুধু একতরফা বিচার করলেই ত আর হয় না!—আর বেশী বোকবো না, দাদা। এর পর হয় ত লাঠি নিয়েই তেড়ে আসবে! সুতরাং, শ্রীযুত মহিমচন্দ্র রায়ের এখন প্রস্থান," বলিয়া মহিম দাঁড়াইয়া উঠিল এবং চলিতে চলিতে সুরাবিকৃত কণ্ঠে কহিল,—"শুধু প্রস্থান নয়, এই—এই—টলিতে টলিতে হেলিতে দুলিতে প্রস্থান।"

মহিম চলিয়া গেল। গৌরগোপাল তখন পূজার ঘরে বসিয়া স্তব পাঠ করিতেছিল,—

যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ায়া-
স্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয় সেবনায়।

৪

আশ্বিনে অম্বিকার পূজায় ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

করুণাময়ী গৌরগোপালকে কহিল,—"হ্যাঁ গা, ময়নাকে ত সেখানে ফেলে রাখলে চলবে না। তাকে তুমি নিয়ে এস এখানে। বাপের কাছে তা'কে আমি রাখবো না। সে এসে আমার কাছে থাকুক এখন থেকে।"

গৌরগোপাল কহিল,—"এখন একেবারেই ছেলেমানুষ, এখন বছর দু'তিন বাপের কাছেই থাক,—বুঝছ না?"

করুণাময়ী জেদ করিয়া বলিল,—"না—না—ছেলেমানুষ বলেই ত এখনি তাকে আমার কাছে এনে রাখতে হবে। এখন থেকেই তা'কে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে—"

সদর দরজা ঠেলিয়া পোষ্টাফিসের পিয়ন হরিচরণ বাটীর মধ্যে ঢুকিতেই করুণাময়ীর মুখের বাকী কথা আর বাহির হইল না। হরিচরণের হাতে একটি ছোট পার্শেল ছিল। তাহার পিছন পিছন মহিমও টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"কি এল দাদা, পার্শেলে? নূতন বৌদির কাছ থেকে বিজয়ার 'ষ্যাড্‌ভান্স্'—পেন্নাম,—না, শক্তি ঔষধালয় থেকে মোদক? তা এখন থেকেই নিয়ম ক'রে একটু একটু—"

মহিমের কথায় বাধা দিয়া করুণাময়ী তাহাকে বলিল,—"ঠাকুরপো, একটা কথা শুনবে ভাই, লক্ষ্মীটি? একবার এই রান্নাঘরের দিকে এস।"

মহিম রান্নাঘরের দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। করুণাময়ী কহিল,—"সংসারে একলা হওয়া যে কি পাপ, তা আর কি বলবো, ভাই! একটা তিন বছরের মেয়েছেলে পর্য্যন্ত নেই যে, তার সঙ্গে দু'টো কথা কই। বিয়ে করেছে, না বেঁচেছি ঠাকুরপো,—তবু একটা কথা কইবার জুটি পাব।"

মহিম কিছু বলিতে যাইতেছিল, তৎপূর্ব্বেই করুণাময়ী আবার কহিল,—"যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে! মানুষে তার কি আর কোন রদ্-বদল কর্ত্তে পারে?—ঠাকুরপো,

দাঁড়াও ভাই একটু", বলিয়া করুণাময়ী আঁশ-চুব্‌ড়ির ঢাকা খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে খানকতক কোটা পোনামাছ লইয়া মহিমের হাতে দিয়া কহিল,—"খিড়কীর পুকুর থেকে আজ ধরিয়েছিলুম। এই বেলা বাড়ী গিয়ে বৌকে দাও গে, ঠাকুর-পো—ঝোল রাঁধবে এখন!"

মহিম চলিয়া গেল।

রাত্রিতে করুণাময়ী গৌরগোপালকে আবার কহিল,—"তুমি ময়নাকে শীগ্‌গীর এখানে নিয়ে এস।"

কার্ত্তিকমাসেই গৌরগোপাল ময়নাকে এ বাটীতে লইয়া আসিল। কিন্তু সে বাপের অত্যন্ত আদুরে মেয়ে ছিল। বাপকে ছাড়িয়া সে এখানে কিছুতেই থাকিতে পারিল না, কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। সুতরাং কার্ত্তিকের শেষভাগেই আবার তাহাকে গোপীনাথপুর রাখিয়া আসিতে হইল।

বৎসর ঘুরিয়া আবার দোলের উৎসব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গৌরগোপাল যথাসময়ে শিষ্যবাড়ী-ভ্রমণে বাহির হইল এবং দোলের দিন দুই পূর্ব্বে সামান্য একটু জ্বর ও সর্দ্দি লইয়া এবার গৌরগোপাল গৃহে ফিরিল। তাহার পর দুই তিন দিন ধরিয়া অসুস্থ শরীরের উপর দিয়া বেশ একটু অনিয়ম, অত্যাচার, পরিশ্রমও হইয়া গেল। ফলে, দোলের পরই গৌরগোপালকে শয্যা আশ্রয় করিতে হইল।

দুই এক দিনের মধ্যেই অসুখ মারাত্মক হইয়া উঠিল। গ্রামের ডাক্তারের পরামর্শে করুণাময়ী মহকুমা হইতে ডাক্তার আনাইল এবং নিজে আহার-নিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিয়াই স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চৈত্রমাসের শেষ দিনে, রাত্রিশেষে, বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে গৌরগোপালের জীবন শেষ হইয়া গেল।

চোখের জলের সঙ্গে, ইহার পর, করুণাময়ীর ছয় মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর এক দিন গোপীনাথপুরের মতি পাঠক তাহার দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া হঠাৎ এ বাটীতে আসিয়া দর্শন দিল।

করুণাময়ী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে, মতি তাহার কন্যার হইয়া এখানকার বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া ভোগদখল করিতে আসিয়াছে। কিন্তু দুই দশ দিন পরে ইহা ভাল করিয়াই বুঝিল; এবং আরও ছয় মাস পরে বুঝিবার শেষ সীমায় আসিয়া ইহাই দৃঢ় স্থির করিল যে, এ সংসারে আর তাহার একটি দিনও থাকা চলিবে না।

প্রতিবাসীরা আসিয়া অনেক করিয়া করুণাময়ীকে বুঝাইল, ভরসা দিল; কিন্তু করুণাময়ী কিছুতেই এখানে আর থাকিতে চাহিল না।

ত্রিসংসারে করুণাময়ীর আর কেহই ছিল না,—ছিল কেবল একটি ছোট ভাই। এই ভাইটি চাকুরীসূত্রে পুত্র-পরিবার লইয়া কাশীতে থাকিত। চৈত্রের শেষে করুণাময়ী ভ্রাতাকে পত্র লিখিয়া আনাইল ও ৩১শে চৈত্র স্বামীর মৃত্যুদিনে সারা রাত্রি স্বামীর ঘরে কাঁদিয়া কাটিয়া, ২রা বৈশাখ চিরকালের জন্য স্বামীর ঘর ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত কাশীযাত্রা করিল।

৫

বারো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

করুণাময়ী কাশীতে ভ্রাতার সংসারেই তাহার শেষের দিনগুলি কাটাইতেছে। সমস্ত সকালটা মন্দিরে মঠে ঘুরিয়া, ঠাকুর-দেবতা দর্শন করিয়া আসিবার পর অবশিষ্ট দিনটা তাহার ভ্রাতার ছেলেমেয়েগুলি লইয়াই এক রকম গোলমালে কাটিয়া যায়।

তখনও সন্ধ্যার কিছু বাকী ছিল, কিন্তু নিকটস্থ কুচবিহারের কালীমন্দির হইতে সন্ধ্যার নহবৎ বাজিতে সুরু করিয়াছিল। তাহার তিন বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল,—"পিথিমা, দেখবে এথো, কালা থব দাঁলিয়ে লয়েতে।"

করুণাময়ী তাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া কহিল,—"কোথায়, বাবা?"

"ওই দে, থামনেল বালিল্ থাতে।"

করুণাময়ী বারান্দায় আসিয়া সামনের বাড়ীর ছাদের দিকে দেখিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। নীচে আসিয়া শরৎকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সামনের বাড়ীখানাতে কারা এসেছে রে?"

শরৎ কহিল,—"কলকাতা থেকে জনকতক বাবু দুতিনটে বেশ্যা সঙ্গে ক'রে এসেছে। বাড়ীটা এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছে।"

করুণাময়ী কহিল,—"তুই একবার খবর নিতে পারিস, বাবুরা সব এখন বাসায় আছে কি না?"

শরৎ যাইয়া খবর লইয়া আসিয়া কহিল,—"না, এখন তারা সব বেড়াতে গিয়েছে, সন্ধ্যার পর সব ফিরবে। কেন দিদি?"

"আমি একবার ঐ বাড়ীতে যাব।"

"সে কি গো?"

"হ্যাঁ, যাব,—আমার দরকার আছে। তুই একটিবার আয় না, ভাই, আমার সঙ্গে, সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবি এখন।"

বেশ্যা তিনটি ছাদের যেখানে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিক দেখিতেছিল, করুণাময়ী সেইখানে আসিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠা যুবতীটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে, বিশেষ তাহার বামচক্ষুর কোলে যে বড় একটি আঁচিল ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ময়না?"

বাইশ তেইশ বৎসরের সেই মেয়েটির মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না—অবনত মস্তকে কাঠের মূর্ত্তির মত সে শুধু মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করুণাময়ী চক্ষু অবনত করিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"বছর কয়েক হ'ল নন্দীদের ন'গিন্নী যেবার কাশী এসেছিল, এই রকম একটু আভাস যেন দিয়ে গিয়েছিল বটে!"

পরদিন করুণাময়ী শুনিল, সেই রাত্রিতেই তাহারা সে বাসা ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

পল্লী-জননী

তরুশাখা-ফাঁকে, তটিনীর বাঁকে, দূর পুকুরের পাড়ে—
দিগন্তের পারে, আকাশের দ্বারে, সুদূর বনানী আড়ে—
তখনো আঁধার লাগিয়া রয়েছে, তখনো ডাকে নি পাখী।
সকলে ঘুমায়, কে তুমি জাগিলে, মেলিয়া কমল-আঁখি!

দিলে ছড়াঝাঁট, সারি' বাসিপাট চলিলে তড়াগ-তীরে,
স্নানবন্দন করি' সমাপন মন্দিরে গেলে ধীরে;
গলে বাস দিয়া, দেবেরে নমিয়া, আঁচলে আশিস্ বাঁধি',
ঘরে ফিরে এলে, সবারে জাগালে, মধুর পরশে সাধি।

স্বামি-দেবতার চরণ-ধূলার, সব নিলে চুলে মুছি,
দেব-দেউলের, ধূলি মাখাইয়ে, তনয়ে করিলে শুচি।
বুকের অমিয়ে সোহাগের চুমে দিলে তার হৃদে দোল।
কোল ছাড়ি ছেলে খেলিবারে চলে মুখে মা মা কলরোল।

রন্ধন করি' শত তাড়াতাড়ি দিলে ভোগ দেবতার,
অমরপ্রসাদে খাওয়ালে, জননি, নিজ হাতে পরিবার;
অতিথি কাঙ্গালে করায়ে ভোজন, নরনারায়ণ-সেবা।
সকলের শেষ—মনে নাহি ক্লেশ—খেলে দুটি তুমি কে বা?

খুঁটিনাটি কায সংসার-সাজ শেষ করি' দিবাশেষে—
নিভে আসে আলো—তুমি দীপ জ্বালো কে মা দেববালা-বেশে!
আবার খাওয়া'য়ে সংসার-জনে, শয়নে লভিলে সুখ,
অন্নপূর্ণা কে তুমি, জননি, এত স্নেহভরা বুক?

পল্লী-জননি! এ ধরার তুমি নাহি লয় মা গো মনে।
হৃদয়ে তোমার স্বরগের সুধা, করুণা নয়ন-কোণে।
হস্তে তোমার, অভয় আশিস্, কণ্ঠে স্নেহের বাণী,
মঙ্গলময়ি, সদা শুভে শিবে জগতে এসেছ নামি'!

অসীমা অরূপা বিশ্বমাতার রূপ নিয়া এলে ঘরে,
কঠোর কর্ম্ম সাধিয়া, জননি, সংসার-মরু'পরে,—
কর্ম্মবিহীন শিখালে তনয়ে "জগত করমভূমি—
কর্ম্মের তরে শুধু যাওয়া আসা", তব পদ মা গো চুমি।

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায় (বি-এ)।
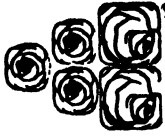
মুসৌরীর কথা

পূজার ছুটীতে রেলওয়ে কোম্পানীর সুবিধা ভাড়ার ব্যবস্থায় আজকাল অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেরাদুন, মুসৌরী প্রভৃতি স্থানে দুই-দশ দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়া থাকেন, কিন্তু এ সব স্থানের অনেক কথা জানা না থাকায় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে জানিয়া লইবার সেরূপ সুযোগ না হওয়ায় অনেক সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং কখন কখন অকারণ অধিক অর্থব্যয়ও হইয়া থাকে। আমি এবার পূজার পর এ দিকে বেড়াইতে আসিয়া মুসৌরী সম্বন্ধে যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই এখানে লিখিতেছি। এখানকার সৌন্দর্য্য শুধু অনুভূতিরই জিনিষ, সে দিকটা লেখনীমুখে ফুটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিব না।

দেরাদুন হইতে মুসৌরীর দূরত্ব পনের মাইল মাত্র। দিনের বেলা তথাকার গৃহ সকল এবং রাত্রিকালে দীপমালা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু তাহা হইলেও তথায় যাইবার জন্য রাজপুরের পর হইতে ট্রেণ, মোটর বা গাড়ীর পথ না থাকায় ঘোড়া, ডাণ্ডী ও রিক্‌শ করিয়া, না হয় পদব্রজে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পথ অপরিষ্কার নহে এবং ভয়েরও কোন কারণ নাই। সমস্ত দিবসব্যাপী প্রায় মালবাহী কুলী, ডাণ্ডিওয়ালা ও পথিকগণকে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। পথের স্থানে স্থানে চড়াই বড় বেশী এবং অনেক বাঁক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এই কারণ মোটর যাইতে পারে না।

দেরাদুন হইতে রাজপুর সাত মাইল। এখানে যাইবার জন্য টঙ্গা ত আছেই, তদ্ভিন্ন প্রায় সকল সময়ই মোটর বাস পাওয়া যায়। ভাড়া লোকপ্রতি চারি আনা হইতে ছয় আনা লইয়া থাকে। মোটর বাস ও টঙ্গার ভাড়া দেড় টাকা, দুই টাকা। রাজপুর পৌছিয়া অনেক ডাণ্ডীওয়ালা ও ঘোড়াওয়ালাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোড়ার ভাড়া দুই টাকা, ডাণ্ডীভাড়া ও উহার বাহক চারি-পাঁচজন ডাণ্ডীওয়ালার পারিশ্রমিক মোট চারিটাকা লইয়া থাকে এবং রিক্‌শ ও উহা লইয়া যাইবার কুলী খরচ মোট ছয় টাকা, প্রতি ডাণ্ডীতে এক-জন এবং রিক্‌শতে দুই জন আরোহী লইয়া থাকে।

ভিনসেণ্টহিল হইতে মুসৌরীর দৃশ্য

রাজপুর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটি টোল অফিস আছে। উল্লিখিত ভাড়া ভিন্ন তথায় ঘোড়া ডাণ্ডীর আরোহী এবং প্রত্যেক রিকশর জন্য দেড় টাকা টোল দিতে
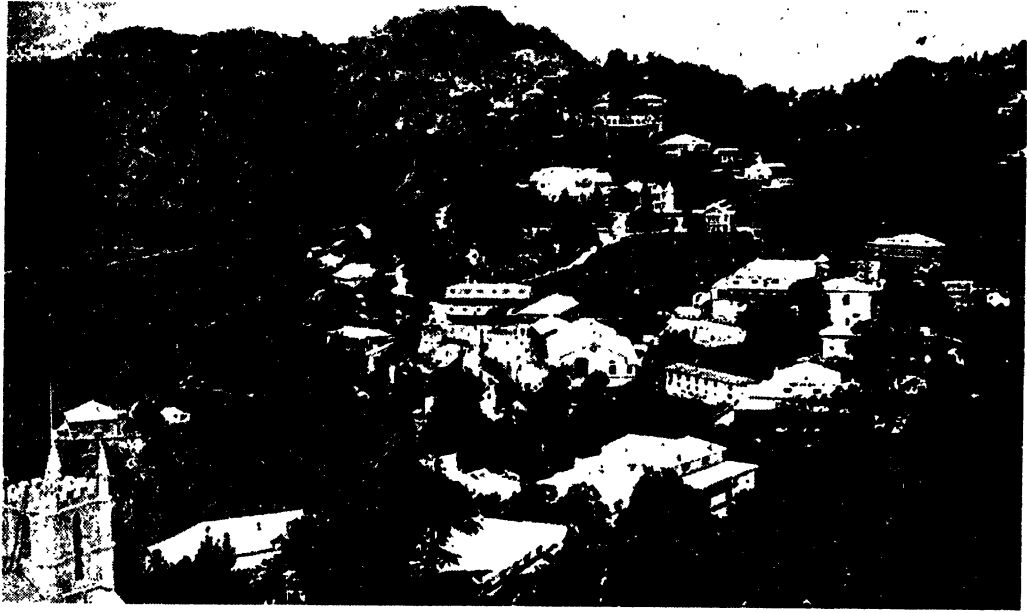
লাইব্রেরী ও ভিনসেণ্টহিলের সাধারণ দৃশ্য
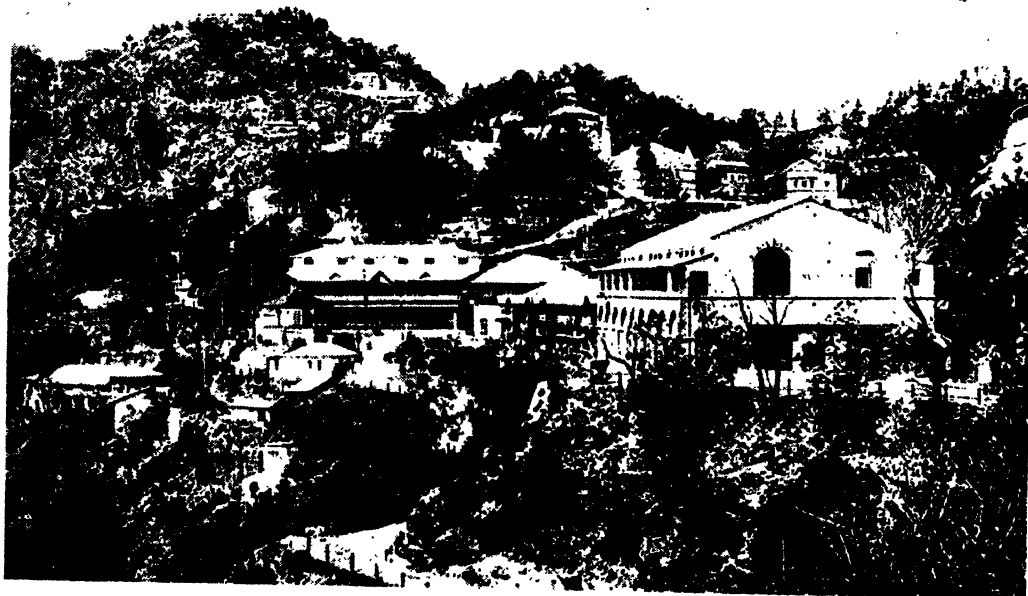
লাইব্রেরীর সাধারণ দৃশ্য

হয়। শুল্কঘর হইতেই মুসৌরী পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর প্রান্তসীমা। রাজপুর হইতে বিছানা-পত্র বা অন্য দ্রব্য-সামগ্রী কুলীর মারফৎ পাঠাইতে হয়। প্রত্যেক কুলীর মজুরী বার হইতে চৌদ্দ আনা এবং মালের ওজন পাঁচ সেরের অধিক হইলে প্রত্যেক কুলীর ছয় পয়সা হিসাবে টোল দিতে হয়। ব্যবসার্থ বা অন্য কারণে মাল-পত্র লইয়া যাইতেও টোল দিতে হয়। আমার মনে হয়, যাহাদের পার্ব্বত্য পথে যাতায়াতের অভ্যাস আছে বা শরীরে বেশ বল আছে, তাহারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে উঠিবার সময় ডাণ্ডীতে উঠাই ভাল। ডাণ্ডীতে এই পথ দিয়া উঠিলে প্রায় তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। রিক্শতেও সময় কম লাগে না। নামিবার সময় সবল লোক মাত্রই চেষ্টা করিলে চলিয়া আসিতে পারেন। পথে সামান্য বিশ্রাম করিয়াও আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ল্যাণ্ডোর বাজার হইতে রাজপুরে পৌঁছিতে পারা যায়। আর ডাণ্ডী বা রিক্শতেও প্রায় ঐ সময় লাগিয়া থাকে। নামিবার সময় ডাণ্ডী অপেক্ষা রিক্শতে আসাই শ্রেয়ঃ। তাহাতে কষ্ট কম হয় অথচ দুই জন একত্র আসিতে পারে বলিয়া খরচও অধিক পড়ে না। শুল্ক অফিস পর্য্যন্ত আসিয়া বাকি অংশটুকু হাঁটিয়া আসিলে ফিরিবার সময় টোলও লাগে না। যাহাদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস আছে, তাহাদের পনি লইয়া যাতায়াত অসুবিধার নহে। এখানকার পার্ব্বত্য ঘোড়াগুলি বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির।

এই পথের মাঝামাঝি ঝারাপানি নামক স্থানে শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় লোকদের স্বল্প বিশ্রাম ও আহারাদির জন্য হোটেল ও দোকান আছে। তথায় পানীয় জলের কলও দেখিলাম। এই স্থানটাকে অর্দ্ধপথ ("Half Way") বলিয়া থাকে। এখানকার গৃহাদি দেখিয়া ইহা একটি পল্লী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পথের পার্শ্বে "ওক গ্রোভ স্কুল" নামে একটি স্কুল এবং অন্য কতিপয় বাটীর সহিত একটি সুবৃহৎ বাটী দেখিলাম। মনে হইল, উহা শ্বেতাঙ্গদের একটি বড় হোটেল। আরও কিছু উপরে বারলোগঞ্জ নামক স্থানে পথিপার্শ্বে "সেণ্ট জন্"নামে একটি কলেজ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে আরও অল্প কয়েকটি ভিন্ন, ল্যাণ্ডোরের আগে পর্য্যন্ত আর বাড়ী-ঘর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। সমস্ত পথটি অতিক্রম করিতে দার্জ্জিলিং বা শিলংয়ের পথের ন্যায় খুব ঘন জঙ্গলও বিশেষ কোথাও দেখা যায় না।

কেম্‌টি ফল

মুসৌরী পাহাড়ে উঠিবার জন্য আরও দুই তিনটি পথ আছে; তন্মধ্যে যে পথ বাট্যা দিয়া গিয়াছে, সে পথে দেরাদুন হইতে বাট্যা পর্য্যন্ত মোটর যাইতে পারে। তথা হইতে যে তিন মাইল মাত্র বাকি থাকে, তাহা পদব্রজে যাওয়া কঠিন নহে। এখান হইতে ঘোড়া বা ডাণ্ডীও পাওয়া যায়। বাট্যা

স্যাভয় হোটেল

ক্যামেলব্যাক রোড

মুসৌরী হইতে তুষারের দৃশ্য

ল্যাণ্ডোর বাজারের সাধারণ দৃশ্য

পর্য্যন্ত মোটরে যাইতে ভাড়া অধিক লাগে, এই কারণ এ পথে অধিক লোক যায় না। শুনিলাম, মোটর ভাড়া প্রায় পনের টাকার কম হয় না। একত্র স্বল্প ভাড়ায় যাইবার জন্য বাস পাওয়া যায় না। এই পথে যাইতে দূর হইতে কাম্‌টি জলপ্রপাত, পাহাড় হইতে যমুনা ও গঙ্গার অবতরণ-শোভা প্রভৃতি দৃশ্যগুলি নয়ন-গোচর হয়। সুবিখ্যাত সহস্রধারা নামক জল-প্রপাতটি এই পথ হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুর হইতে গমন-পথের শেষ অংশটি নীচের গভীর খাতের মধ্যে, অসংখ্য হরিৎ বনানী, উপরেও বৃক্ষান্তরাল হইতে ছোট ছোট টীনের ঘরগুলি এবং অদূরে সহরের ক্রোড়ে স্তরে স্তরে বহুসংখ্যক শ্বেত বর্ণের ছোট বড় ঘরগুলির দৃশ্য অতি সুন্দর। রাত্রিতে যখন সহরটি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হয় এই স্থান হইতে তখনকার শোভা আরও মনোহর দেখায়।

সহরে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে ল্যাণ্ডোর বাজারে উঠিতে হয়। অন্যত্রও ছোট বড় বিপণি-শ্রেণী দেখা যাইলেও বাজার বলিতে এইটিই প্রধান। জামা-কাপড়, বহু প্রকার মনিহারী দ্রব্য, মিষ্টান্ন, শাকশব্জী, ফল-মূল ও আহারীয় দ্রব্যের দোকান এখানে অনেকটা স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও এখানকার লাঠী ও পার্ব্বত্য ফলমূলের জ্যাম জেলির দোকানগুলি বিশেষ-ভাবে আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই উভয় দ্রব্যই এখানকার উৎপন্ন। মূল্যও তুলনায় এখানে কম।

ল্যাণ্ডোর বাজার

দেরাদুনের লাঠী ও প্রসিদ্ধ এবং মূল্যও অধিক সুলভ। মুসৌরী... শ্বেতকায়দিগের বড় বড় দোকানও কম নাই, উহা অধিকাংশই মল্ এবং লাইব্রেরীর নিকট অবস্থিত। এই লাইব্রেরী সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা, এমন কি, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য স্থানের দূরত্ব প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে একটা কথা বলা দরকার, মুসৌরী ও ল্যাণ্ডোর ঠিক একটা স্থানেরই নাম নহে। উহা বিভিন্ন হইলেও এমন একসঙ্গে সংলগ্ন যে, আগন্তুকের নয়নে সহজে উভয় স্থানের সীমারেখা ঠিক করা যায় না। যে লাইব্রেরীর কথা উক্ত হইল, তাহা ল্যাণ্ডোরে নহে, মুসৌরীতে অবস্থিত।
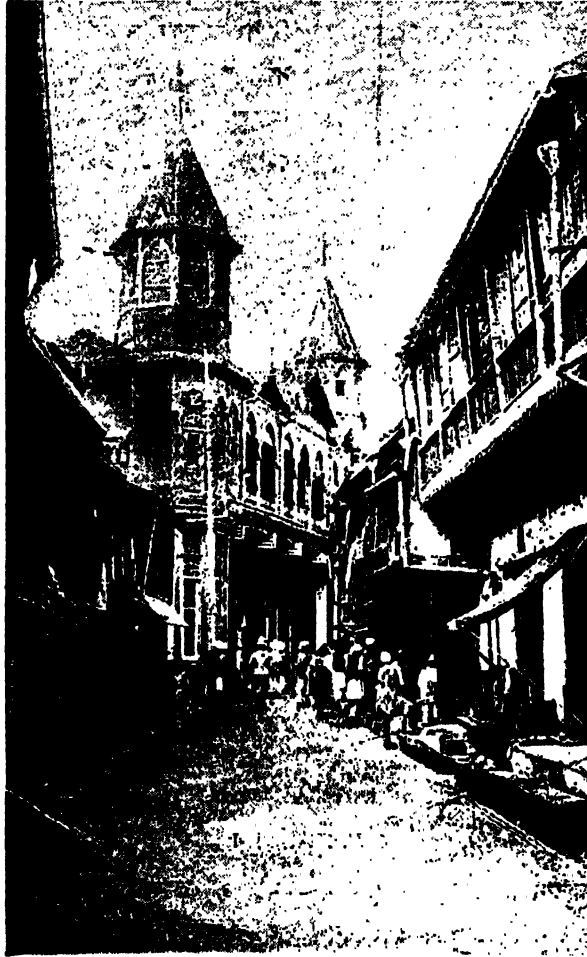
মুসৌরী পাহাড়ের মধ্যে ভ্রমণের জন্য মল্, ক্যামেল ব্যাক্ রোড্, লাইব্রেরীর উত্তর-পশ্চিমে ওয়েভারলি হিলের পৃষ্ঠদিকের সমতল রাস্তা, হ্যাপি ভ্যালি, এভারেষ্ট রোড্, রাসল্ হিল্ প্রভৃত সুন্দর স্থানগুলি থাকিলেও যেখানে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই স্থানে ব্যাণ্ডষ্টাণ্ড আছে। তথায় প্রতি বুধ ও শনিবার দিন মিলিটারি ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। ক্যামেল্ ব্যাক্ নামক পথটি বেশ নির্জ্জন এবং এখান হইতে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় হিমালয়ের চিরতুষারময় শৃঙ্গগুলির শোভা বড়ই নয়নবিমোহন। প্রভাতে শুভ্র রবি-কিরণপাতে মনে হয়, বুঝি উহা গলিত রজতের স্তূপ, সন্ধ্যার কিরণ-সম্পাতে কোন কোন দিন উহার কাঞ্চন-প্রভাও মনপ্রাণকে পুলকিত করে। এখানকার ষ্ট্যাণ্ড সুপরেণ্ট নামক

স্থান হইতেই এই তুষার-শৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখা যায়। এখানে আচ্ছাদনের মধ্যে বসিবার উপযোগী একটি স্থান আছে। এই স্থানে একটি মানমন্দির আছে। ল্যাণ্ডোরের যে স্থানকে ডিপো বলে, প্রভাতে তথা হইতেও এই তুষার-পর্ব্বতের শোভা খুবই মনোলোভা। এখানকার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গকে লালটিব্বা বলে, উহা ৭ হাজার, ৫ শত ৩৩ ফুট্ উচ্চ। এই শৃঙ্গোপরি সমতল স্থান হইতে পরিষ্কার দিবসে গঙ্গা ও যমুনার জলধারা দেখা যায়। এ সকল শোভা যাঁহার প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই, আমার বর্ণনার দ্বারা তাঁহাকে ইহার শতাংশের এক অংশ বুঝাইতে পারি, এ স্পর্দ্ধা আমার নাই।

কতকগুলি আবাদি জমী অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। বিপদা-শঙ্কা না থাকিলেও এখানে যাওয়া কিছু কষ্টসাধ্য। হার্ডি ফল নামক জলপ্রপাতটি দেখিতে যাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। তথায় সাধারণ বলসম্পন্ন লোকের পক্ষে না যাওয়াই ভাল।

মুসৌরীতে একটি বোট্যানিক্যাল্ গার্ডেন আছে। এখানে হিমালয়জাত নানা প্রকার বৃক্ষলতার একত্র সমাবেশ দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ হয়। এখানকার প্রসিদ্ধ সৌধ-সমূহের মধ্যে কপূর্রথালার মহারাজার প্রাসাদ, মহারাজা দলীপ সিংহের কাস্‌ল্, আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীরের গৃহবাস, মারল্‌ভিল্ হোটেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বন্ধুর পার্ব্বত্যসহরের

কেল্লগ মেমোরিয়াল

আশপাশের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের মধ্যে কেম্‌টি ফল্, লাল-টিব্বা, হার্ডি, মসি, হার্সি ও বাট্টা জলপ্রপাত পার্ক এবং বেনগ নামক স্থানটি উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে অনেকগুলিই কিছু দূরে দূরে অবস্থিত। কেম্‌টি ফল লাইব্রেরী হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে রিঙ্গল নদীর উপরে অবস্থিত। মসি ও হার্সি ফল দেখিতে হইলে বার্লোগঞ্জের নিকট মারিভিল ষ্টেটের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এখানে যাইতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির ভিতর দিয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বত্বাধিকারীকে কিছু দর্শনী দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। বাট্টা ফল্ দেখিতে যাইতে হইলে বাট্টাগ্রাম পর্য্যন্ত যে কার্টরোড গিয়াছে, তাহা ধরিয়া এবং

মধ্যেও ক্রিকেট ফুটবল খেলার, এমন কি, ঘোড়দৌড়ের জন্যও সমতল সুন্দর স্থান আছে, উহার নাম হ্যাপিভ্যালি। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ময় এই উপত্যকাটিও বেশ মনোরম স্থান। ইহা পূর্ব্বোক্ত হোটেলের ঠিক নিম্নে। এই উপত্যকায় কেবল-মাত্র হ্যাপিভ্যালি ক্লাবের সভ্যগণ ভিন্ন অপরের খেলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, ভাড়ার স্বরূপ কিছু দিয়া টেনিস, হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলিবার উপযোগী স্থান কনোট কাস্‌ল্ ও কাস্‌ল্ হিল্ নামক স্থানে আরও আছে।

সমস্ত মুসৌরী পাহাড়ে ছেলে-মেয়েদের ১৮।১৯টি বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে সহরের মধ্যে নয়টি। ভাল চিকিৎসক ও দাতব্য
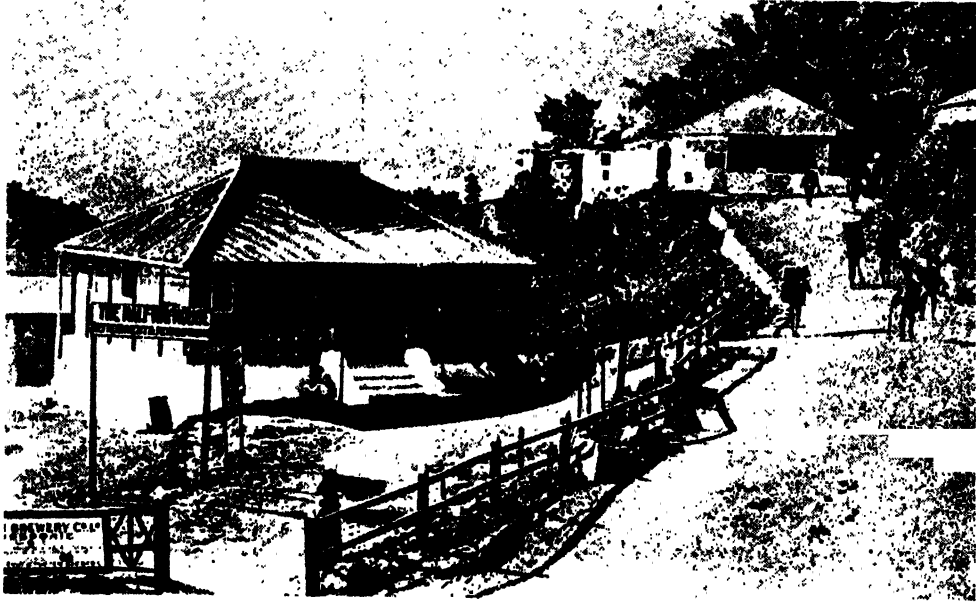
হাফ্‌ওয়ে হাউস —ঝরিপানি

ঔষধালয়েরও অভাব নাই। থিয়েটার, সিনেমা, বড় বড় হোটেল, পানাগার, ক্লাব, পুস্তকাগার, গীর্জ্জা প্রভৃতি সভ্য জনপদের সমস্তই এখানে আছে। ভারতীয় দেব-দেবীর কোন মন্দির এখানে আছে বলিয়া শুনি নাই। মুসৌরী টাইমস্ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও প্রতি শুক্রবারে এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, সিমলা, তিহরি প্রভৃতি স্থানে যাইবার ইহাই যে ঠিক পথ, তাহা না হইলেও এখান হইতেও এই সকল স্থানে যাওয়া যাইতে পারে।

ল্যাণ্ডোর ও মুসৌরীর সাধারণ দৃশ্য

গীর্জ্জা ও গানহিলের সাধারণ দৃশ্য

এই যে মুসৌরী আজ ইংরাজ জাতির চেষ্টায় এমন একটি আদরের স্থান এবং সুন্দর স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব-ইতিহাস বিশেষ কিছুই নাই। ইহার ঠিক নাম মুসৌরী অথবা মসুরী কি মনসুরী, তাহা বলা যায় না, এ দিকের লোকরা শেষোক্ত দুইটি নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। শতবৎসর পূর্ব্বে নগর-চিহ্ন দূরে থাকুক, উহা শ্বাপদসঙ্কুল জনমানব-হীন ভীষণ অরণ্য ভিন্ন আর কিছু ছিল না। কুত্রাপি পার্ব্বত্য নরনারীর দুই চারিখানি পর্ণকুটীর দেখা যাইত। দেরাদুন ইংরাজদের হস্তগত হওয়ার পর কোন কোন ইংরাজ শিকারী দ্বারাই এই ক্ষুদ্র নগরীর প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় বলা যাইতে

ল্যাণ্ডোরের সাধারণ দৃশ্য

রিজের দৃশ্য
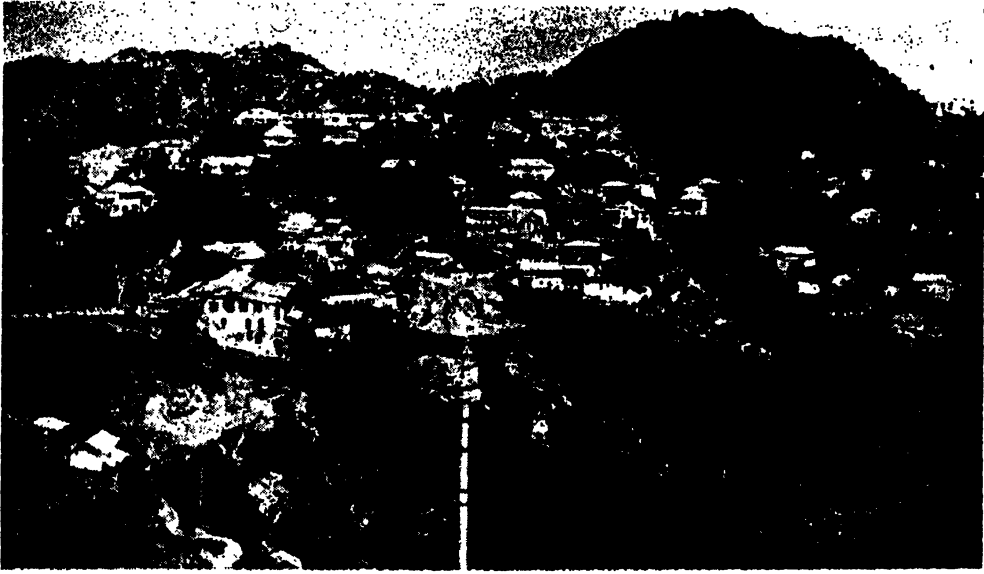
পা'র। মিঃ সোর ও কাপ্তেন ইয়ং নামক দুই জন ইংরাজ মধ্যে মধ্যে শিকার করিতে আসিতেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমানে ক্যামেল্ ব্যাক্ নামক স্থানে কখন কখন রাত্রিযাপন মানসে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ এই স্থানের মনোহারিত্বের কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে এখানে এক একখানি করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। ইহাই এই উপনিবেশ স্থাপনের আদি-কথা। ল্যাণ্ডোরে মলিঙ্গার নামক যে বাটীতে ফিলাণ্ডার স্মিথ ইনষ্টিটিউট্ অবস্থিত, উহাই এখানকার সর্ব্বপ্রথম সৌধ। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রুগ্ন ইংরাজ সৈনিকদিগের জন্য ল্যাণ্ডোরে একটি গোরাবারিক

হ্যাপি ভ্যালি

নির্ম্মিত হয়। তখন তথায় গড়ে প্রায় দুই শত রোগী বাস করিত। এই পাহাড় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সার্দ্ধ সাত সহস্র ফুট উচ্চ। অনেকে বলিয়া থাকেন, দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানগুলির তুলনায় এখানকার জলবায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর। ঐ সকল স্থানের বায়ুতে যে আর্দ্রতা আছে, এখানে তাহা নাই।

অধুনা বৎসরে বৎসরে ভারতের বহু স্থান হইতে বহু লোক, বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গরা এই স্থান পরিদর্শন করিতে বা স্বাস্থ্যলাভাশয়ে আসিয়া থাকেন। এখানে নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত চারি মাস কাল অত্যন্ত শীত ও তুষার-পাতের জন্য কাযকর্ম্ম দোকানপাট সব বন্ধ থাকে। এ উন্নতিও দ্রুত হইতেছে। ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনি-সিপ্যালিটীর আয় ছিল মোট ২ হাজার ৪ শত ৪০ পাউণ্ড, আর রাজপুর টোল অফিসে শুনিলাম, সে স্থলে এখন আয় হইয়াছে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। শুধু চারিটা উঠিবার পথের শুল্ক আদায় হয় প্রায় ১ লক্ষ টাকা। এরূপ একটি পার্ব্বত্য নগর রক্ষা করিতে মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ও অনেক হইয়া থাকে। এখানকার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নিন্দা করা যায় না। শ্বেতাঙ্গরা স্থানটির সাধ করিয়া নাম দিয়াছে "Queen of Hill Station"—গিরিনিবাসের রাণী।

প্রকৃতিরাণীর ক্রোড়ের মধ্যে এই নগরীর স্থান হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিতেই হয়, প্রকৃতির কমনীয়তা আকাশে,
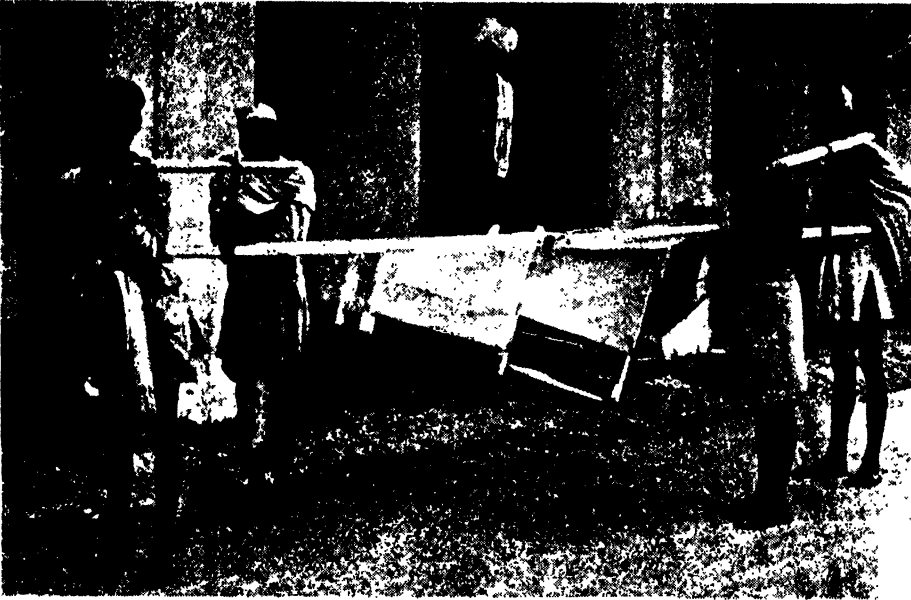
ডাণ্ডী ও উহার বাহক

সময় লোকজন খুবই কম থাকে। আমরা* নভেম্বর মাসের প্রথমেই এখানে আসি। শুনিলাম, এখন এখানে সিকি লোকের বেশী নাই। য়ুরোপ হইতে যাঁহারা ভারতে বেড়াইবার জন্য আইসেন, তাঁহাদের অনেকে এ স্থান দেখিতে আসিয়া থাকেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব এডিনবরা তাঁহার ভারতভ্রমণ-কালে যখন মুসৌরী পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ল্যাণ্ডোরের সমাধিক্ষেত্রে স্বহস্তে একটি দেবদারু তরু রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা এখন একটি মহাদ্রুমে পরিণত হইয়াছে। এই বৃক্ষকাণ্ডে একটি ফলকে লেখা আছে—"Planted by H.R.H. The Duke of Edinburgh, February 1870. এখানে যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বাতাসে, বনে, পাহাড়ে সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইলেও শুধু ভোগীদের কাছে ইহা শান্তির স্থান হইতে পারে, সংসার-সংগ্রামে—জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত নরনারীর পক্ষে জুড়াইবার স্থান ইহা নহে। এখানে যাহা কিছু মানুষে গড়িয়া তুলিয়াছে, সবই মানুষের ঐহিক সুখের জন্য; ভোগ-লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য, মুসৌরী শুধু বিলাসেরই তীর্থভূমি। এখানে আসিয়া খাও, বেড়াও, আমোদ কর, এই পর্য্যন্ত। এক কথায় মুসৌরীকে মোটামুটি দার্জ্জিলিংয়ের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক প্রকৃতি, শৈত্য, উচ্চতা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রায় সবই সেই প্রকারের হইলেও এখানে দুইটি জিনিষ দেখিলাম না। প্রথম, আকাশে অপরূপ অনির্ব্বচনীয় দুর্ল্লভ-দৃশ্য মেঘের খেলা—ভূতলে নাক-খাঁদা সুন্দরীর মেলা।

শ্রীহরিহর শেঠ।

*আমি, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে, শ্রীমান ভজকৃষ্ণ পাল ও শ্রীমান মনোরঞ্জন শেঠ।

সোনার পাহাড়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতার সংগ্রাম

সেই ভীষণ নৈশ দুর্য্যোগে যে মুহূর্ত্তে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের শতধা বিভক্ত লোলজিহ্বায় গগনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গগনব্যাপী বহ্নি-স্ফুরণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্তেই 'আগুন! আগুন!' শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় কারা-প্রহরিগণের ধারণা হইল, কারাগারের কোন অংশে আগুন লাগিয়াছে। বিদ্যুতের বিসর্পিত নীল আভা যেন সেই আকাশব্যাপী মেঘের কোলে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মনে হইল, সমগ্র আকাশ অগ্নিময় হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস হইল, প্রকৃতি দেবী আমাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, আমাদের উদ্ধারের জন্য যাশোটোয়ারোর ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছেন। প্রকৃতির সেই ভৈরব রঙ্গ দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলেও স্থানীয় কয়েদী ও কারাগারের প্রহরীর দল আতঙ্কে অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই বৃহৎ কারাগারের প্রত্যেক অংশ হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। কারাগারের প্রহরী ও সৈনিকরা আকস্মিক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, তাহাদের হাতের বন্দুক উর্দ্ধে তুলিয়া আকাশের দিকে গুলী চালাইল। সেই শব্দে আমরা ভীত না হইয়া এক-যোগে কারাগারের দেউড়ীর দিকে ধাবিত হইলাম। আমরা যখন দলবদ্ধ হইয়া কারা-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় কারাগারের এক জন ইকুইয়েটোরিয়ান প্রহরী বার্ণির ঠিক সম্মুখে আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড বেগে এক ধাক্কা মারিল। সেই ধাক্কায় বার্ণি মুহূর্ত্তের জন্য হটিয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে এক লম্ফে সেই প্রহরীকে আক্রমণ করিল, এবং চক্ষুর নিমিষে তাহার বন্দুকটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তাহার পর বার্ণি সেই বন্দুকের নল ধরিয়া তাহার কুঁদা দ্বারা প্রহরীর মস্তকে এরূপ বেগে আঘাত করিল যে, হতভাগ্য প্রহরীটা আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া বার্ণি উল্লাসভরে চীৎকার করিয়া বলিল, "ভাই সকল, উহাদের একটা বন্দুক দখল করিয়াছি। কুঁদার এক ঘায়ে এ বেটা কাবু হইয়াছে, উহার দলের আর কেহ বাধা দিতে আসিলে তাহারও মাথা গুঁড়া করিয়া দিব। চল; শীঘ্র ফটক পার হই, তার পর যা থাকে কপালে; মরিতে হয় ত মারিয়া মরিব। হুররা! হুররা!"

যাহা হউক, আমরা দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া বুঝিলাম, দেউড়ী অতিক্রম করা সহজ হইবে না। দেউড়ীর সম্মুখে দেখিলাম, এক দল লোক; তাহারা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত আমাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। প্রহরীরা বুঝিতে পারিয়াছিল, আমরা পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই সেখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই জন্য তাহারা আমাদের গমনে বাধা দান করিতে উদ্যত হইল। আমরা তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হইল। তখনও গগনমণ্ডল মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুতালোকে আলোকিত হইতেছিল। সেই আলোকে এক দল লোককে দেউড়ীর সম্মুখে বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। তন্মধ্যে একটি লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। সে পাঁচ হাত লম্বা জোয়ান; পালওয়ানের মত তাহার চেহারা। আমরা তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিলাম,

সে রক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক। সে দেউড়ীর রুদ্ধদ্বারে পিঠ লাগাইয়া একখান প্রকাণ্ড তলোয়ার বন্ বন্ করিয়া ঘুরাইতেছিল; সেই তলোয়ারের ধারে বিদ্যুতের আভা চিক্-মিক্ করিতে লাগিল। সে অতি ভীষণ তলোয়ার, তাহার এক আঘাতে একটা মহিষের ঘাড় দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সে এক প্রাণীকেও দেউড়ীর বাহিরে যাইতে দিবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল। তাহাকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে দেউড়ী খুলিবার কোন উপায় দেখিলাম না।

অতঃপর কি করিব ভাবিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম; বার্ণিকে আমার ঠিক পশ্চাতেই দণ্ডায়মান দেখিলাম। সে চক্ষুর নিমেষে তাহার হাতের বন্দুক সেই সেনানায়কের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া প্রসারিত করিল। পরমুহূর্ত্তেই গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, সেই বিশালকায় সেনানায়ক দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া উপুড় হইয়া আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যু-যন্ত্রণায় একবার তাহার দীর্ঘ দেহ নড়িয়া উঠিল, তাহার পর সম্পূর্ণ নিস্পন্দ! বুঝিলাম, বার্ণির অব্যর্থ গুলীতে তাহার ইহলীলার অবসান হইয়াছে। তাহার পর এক দল লোক মাতালের মত চীৎকার করিয়া তাহার মৃতদেহ টানিয়া দূরে লইয়া গেল, এবং আর এক দল দেউড়ী খুলিয়া ফেলিল। বুঝিলাম, তাহারা আমাদের উদ্ধারকর্ত্তার দলের লোক।

আমরা তাড়াতাড়ি দেউড়ীর বাহিরে আসিয়া নরমুণ্ডের তরঙ্গ দেখিতে পাইলাম। তাহাদের অধিকাংশ আমাদের হিতৈষী হইলেও কয়েক জন কারারক্ষী আমাদের পলায়নে বাধা দিতে আসিল; কিন্তু সেই বিশাল জন-সমুদ্রে শত্রুমিত্র চিনিবার উপায় ছিল না। বার্ণি যাহার দেহে কারারক্ষীর পরিচ্ছদ দেখিল, বন্দুকের কুঁদা দিয়া তাহারই মস্তকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিতে লাগিল। আমার সঙ্গীরাও সুশিক্ষিত বৃটিশ মুষ্টিযোদ্ধার ন্যায় দুই হাতে ঘুসি চালাইতে লাগল; সেই অব্যর্থ ঘুসিতে অনেকে আহত হইয়া ঘুরিয়া পড়িল। স্বাধীনতা-লাভের আশায় আমরা মত্ত মাতালের মত যুদ্ধ করিতে-লাগিলাম। সেই সময় কিছু দূর হইতে কে ইংরাজী ভাষার উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ভাই সকল, এ ধারে এস, এ ধারে এস, আর বিলম্ব করিও না।"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, বক্তা যাশোটোয়ারো। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই আমাদের উদ্ধারকর্ত্তার দীর্ঘ দেহ ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "বার্ণি, শীঘ্র সম্মুখে অগ্রসর হও। দলের পেছনেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না।"

আমি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক লোক যাশোটোয়ারোকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; তাঁহার নিকট অগ্রসর হইবার উপায় নাই, তথাপি আমি দুই হাতে ভীড় ঠেলিয়া কয়েক ফুট গিয়াছি, সেই সময় এক জন আমার মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল; আমি ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে কোন প্রকারে সাম্‌লাইয়া লইলাম। সেই সময় সেই জনতার ভিতর হইতে এক জন আমার হাতে একখানি তরবারি গুঁজিয়া দিল। সে হয় ত যাশোটোয়ারোর অনুচর। সেই তরবারিখানি হস্তগত হওয়ায় আমার সাহস যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। অতঃপর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আমি কোন দিন ভুলিতে পারি নাই। সে দৃশ্য পৈশাচিক! আমাদের সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে অসংখ্য লোক সরোষে গর্জ্জন করিতে-ছিল; সকলেরই মুখে 'মার্ মার্' 'ধর্ ধর্' শব্দ। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, আহতের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বন্-বন্ ধ্বনি, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝম্-ঝম্ রব, কারাগারের উচ্চ চূড়া হইতে 'এলার্মবেলে'র ভৈরব হুঙ্কার,—সকল শব্দ একত্র মিশিয়া কর্ণ বধির করিয়া তুলিল।

অন্য যে সকল কয়েদী কারাগারে আবদ্ধ ছিল, পলায়নের এইরূপ সুযোগ দেখিয়া তাহারা যে কারাকক্ষে নিরুদ্যমভাবে বসিয়া ছিল, ইহা বোধ হয় কেহই আশা করিবেন না। তাহাদের কেহই নিষ্ক্রিয় ছিল না। এই সুযোগে তাহারা সকলেই পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার তখন আমাদের অবসর ছিল না। আমি যাশোটোয়ারোর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইলাম এবং আমার সঙ্গীরা অনুসরণ করিতেছিল কি না, দেখিবার জন্য পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী নিক্‌সনের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। নিক্‌সনকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, এক জন কারারক্ষী একলম্ফে তাহার সম্মুখে পড়িয়া তাহার গতিরোধ করিল, এবং তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিল। হতভাগ্য নিক্‌সন তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ঘুরিয়া

পড়িল। অনন্তর সেই কারারক্ষী ভূতলশায়ী নিক্‌সনের দেহ পদদলিত করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহার তরবারি আমার দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহার স্কন্ধে প্রচণ্ড বেগে তরবারির আঘাত করিলাম। সেই আঘাতে তাহার মস্তক প্রায় দেহচ্যুত হইল; তাহার শোণিতাপ্লুত দেহ নিক্‌সনের দেহের পার্শ্বে নিপতিত হইল। আমি নিক্‌সনের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহার নিস্পন্দ দেহ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, দেহে প্রাণ নাই, তরবারির আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মাথা তুলিয়া আমার সঙ্গিগণকে কোন দিকে দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, আমি কারারক্ষিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়াছি। সশস্ত্র রক্ষিদল চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে আক্রমণ করিল। আমি একাকী, কেহই কোন দিক হইতে আমার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল না। আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাশোটোয়ারো বা তাঁহার দলের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, অবিলম্বে আমাকে শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে হইবে, নিক্‌সনের ন্যায় আমারও মৃতদেহ ধরাতলে লুণ্ঠিত হইবে; না হয় পুনর্ব্বার বন্দী হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইব। তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর প্রার্থনীয় মনে করিলাম; কিন্তু নিশ্চেষ্টভাবে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিব না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য আমি দানবের ন্যায় মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। আমার তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে তিন চারি জন রক্ষী চক্ষুর নিমেষে ধরাশায়ী হইল, তাহা দেখিয়া আমার সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। আমার তরবারি-চালন-কৌশল লক্ষ্য করিয়া অবশিষ্ট কারারক্ষীরা আর আমার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সেই সময় কিছু দূর হইতে কে আমাকে আহ্বান করিল। সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া আমার দেহে নববলের সঞ্চার হইল। আমি শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইলাম; কিছু দূরে গিয়া আমার অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে এক দল লোকের নিকট দেখিতে পাইলাম, তাহারা সকলেই যাশোটোয়ারোর অনুচর। যাশোটোয়ারোও সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ইঙ্গিতে সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলাম।

তখন পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে যাশোটোয়ারোর দলের ও আমাদের অস্ত্রাঘাতে বহু শত্রু আহত ও নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। যাশোটোয়ারোর কয়েক জন অনুচরও নিহত হইল। আহত ও নিহত শত্রু-মিত্রের দেহস্তূপে আমাদের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল এবং তাহাদের দেহনিঃসৃত শোণিত-স্রোতে আমাদের পদতলস্থ মৃত্তিকা কর্দ্দমে পরিণত হইল। যুদ্ধনিরত সৈনিকগণের রণহুঙ্কার, আহতের আর্ত্তনাদ, তরবারির ঝন্‌-ঝনা, এবং বন্দুকের সুগম্ভীর নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মনে হইল, প্রলয়কাল সমাগত হইয়াছে। সেই রাত্রিতে বৃদ্ধ যাশোটোয়ারোর যে শৌর্য্যবীর্য্য প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা অতুলনীয়। বুঝিতে পারিলাম, তিনি কেবল বীর নহেন, সেনাপতির সকল গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। সেই অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন রাত্রিকালে কেবল বিদ্যুতালোকের সাহায্যেই আমরা যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে বিদ্যুদ্বিকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর বজ্রনাদ! আমরা কেবল যাশোটোয়ারোর নেতৃত্বগুণেই সেই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তাঁহার অদম্য সাহস ও বীরত্বে শত্রুসৈন্য পরাভূত হইল। সম্মুখের বাধা অপসারিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা মহা উৎসাহে যাশোটোয়ারোর অনুসরণ করিলাম, বিশাল কারাগার আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

আমি যাশোটোয়ারোর ঠিক পার্শ্বেই ছিলাম; কিন্তু আমার সঙ্গীদিগকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। যাশোটোয়ারো উৎকণ্ঠিত স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দলের আর সকলে কোথায়? তাহাদের ডাক।"

আমি আমার সঙ্গীদের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম। তাহারা কয়েক গজ দূরে ছিল, প্রায় সকলেই সাড়া দিল। দুই তিন মিনিট পরে তাহারা আমাদের নিকট আসিলে দেখিলাম, আমাদের ছুতোর বন্ধু ম্যাকফার্‌সন আহত হওয়ায় বার্নি তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে।

আমি ম্যাক্‌ফার্‌সনের অবস্থা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম, বার্নিকে বলিলাম, "আঘাত কি সাংঘাতিক হইয়াছে?"

ম্যাক্‌ফার্‌সন হাসিবার ভঙ্গীতে বলিল, "বেশী কিছু নয়, জেলখানার একটা পাহারাওয়ালা আমার পাঁজরে তলোয়ারের একটা খোঁচা মারিয়াছিল। তেমন ভাবে ঘাল করিতে পারে নাই, তবে একটু কাহিল করিয়াছে বটে। দুশ্চিন্তার কারণ নাই।"

আমি আর কোন কথা না বলিয়া সদলে যাশোটোয়ারোর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। যাশোটোয়ারো চলিতে চলিতে আমাকে বলিলেন, "প্রথম ধাক্কা কোনও রকমে কাটিয়া গিয়াছে, সম্মুখের পথ পরিষ্কার। এখন কিছু কালের জন্য আমরা নিরাপদ, কিন্তু আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা হইবে না। নগরে যে সকল সৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যাও অল্প নয়; তাহারা শীঘ্রই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে। তাহার পূর্ব্বেই আমাদিগকে নগর অতিক্রম করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিতে হইবে।"

উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে দেখিলাম, নিক্‌সন ব্যতীত আমাদের দলের সকলেই যাশোটোয়ারোর অনুসরণ করিতেছে। হতভাগ্য নিক্‌সনকে হারাইয়া আমার হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে অভিভূত হইল। আমরা সকলে একই উদ্দেশ্যে একত্র আসিয়াছিলাম, এত দিন একসঙ্গে ছিলাম, সকল দুঃখকষ্ট সমভাবে ভোগ করিয়াছি, আজ সে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছে। জীবনে আর তাহার সহিত মিলনের আশা নাই। আমার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমরা নাবিক, আমাদের হৃদয় কঠিন, অল্প আঘাতে তাহা বিচলিত হয় না; কিন্তু কঠোর আঘাতে প্রস্তরও বিদীর্ণ হয়। তখন আর কোন কথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল না; পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, সুবিস্তীর্ণ কারাগারের সম্মুখে অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিয়াছে; কারাগারের দেউড়ীতে তখনও পলায়নোন্মুখ কয়েদীগণের সহিত কারারক্ষীদের যুদ্ধ চলিতেছিল। সেনাবারিকের সৈন্যগণকে রণসাজে সজ্জিত হইবার জন্য মুহুর্মুহুঃ যে ভেরীনিনাদ হইতেছিল, তাহা আমাদের কর্ণগোচর হইল।

আমরা কারাগার পরিত্যাগ করিবার পর দশ মিনিটের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিলাম বটে, কিন্তু সেই অল্পসময় এক যুগ বলিয়া আমাদের মনে হইতে লাগিল। আমরা তখন আহত, পরিশ্রান্ত; বৃষ্টিধারায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত। বহু চেষ্টায় আমরা যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে পারিব কি না, তখন আমাদের এই চিন্তাই বলবতী। আমাদের দলের লোকসংখ্যা মুষ্টিমেয়, আমাদের কয়েক জন সঙ্গী ব্যতীত চৌদ্দ পনের জন মাত্র ইণ্ডিয়ান যাশোটোয়ারোর নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল; অথচ শত্রুসংখ্যা অগণ্য। সৈন্যগণ শীঘ্রই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাদের হিতৈষী নেতা যাশোটোয়ারো আমাদের সেই ক্ষুদ্র দলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে দেশীয় ভাষায় তাঁহার অনুচরবর্গকে কি আদেশ করিলেন, তাহার পর ইংরাজী ভাষায় আমাদিগকে বলিলেন, "নিঃশব্দে ও সতর্কভাবে আমার অনুসরণ কর!—শীঘ্র।"

আমার ও আমার সঙ্গীদের খালি পা, আমাদের জুতা ছিল না; যাশোটোয়ারো ও তাঁহার অনুচরবর্গ 'আল্‌পারাগেট' নামক পাদুকায় সজ্জিত থাকিলেও চলিবার সময় তাহাতে শব্দ হইত না; সুতরাং আমরা নিঃশব্দেই দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। আমরা নগরের একটি উচ্চ পথ হইতে ক্রমশঃ সেই পার্ব্বত্য নগরের নিম্নভাগে অবতরণ করিতে লাগিলাম। পথের দুই পাশে নগরবাসিগণের অট্টালিকা ও কুটীরগুলি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইতেছিল। সেই সকল গৃহের বাতায়ন-পথে চঞ্চল দীপালোক দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম, গৃহবাসীরা জাগিয়া পথের জনতা লক্ষ্য করিতেছিল।

আমরা যথাসাধ্য দ্রুতবেগে নগর অতিক্রম করিয়া নগরপ্রান্তবর্ত্তী অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেই সময় বার্ণি যাশোটোয়ারোকে সম্বোধন করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "কাপ্তেন, আর আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইব না।"

যাশোটোয়ারো সবিস্ময়ে অথচ কিঞ্চিৎ বিরক্তিভরে বলিলেন, "মূর্খ, তোমার আপত্তির কারণ কি?"

বার্ণি বলিল, "স্বাধীনতালাভের আশায় আমরা বহু কষ্টে কারাগার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছি বটে, কিন্তু আমার প্রিয়তমা নসিস্‌কাকে আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। তাহাকে সঙ্গে না লইয়া আমরা অরণ্যে প্রবেশ করিব না। তাহার অনুসন্ধানের জন্য আমি ফিরিয়া যাইব।"

যাশোটোয়ারো দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আবার বলিতেছি, তুমি মূর্খ; এখনও তুমি সেই বালিকাকে চিনিতে পার নাই; তাহার সাহস, তাহার কৌশল বুঝিবার শক্তিও তোমার নাই। কে বলিল, তোমরা নসিস্‌কাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ? সে পূর্ব্বেই ঐ অরণ্যমধ্যবর্ত্তী আড্ডায় উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে, দশ মিনিটের মধ্যেই তাহাকে দেখিতে পাইবে—হে প্রেমিক যুবক!"

যাশোটোয়ারোর কথা শুনিয়া বার্ণি আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল, মনে হইল, হঠাৎ

তাহার কাঁধে দুইখানা পাখা গজাইয়াছে, তাহার সাহায্যে সে উড়িয়া চলিয়াছে। ভাবিলাম, প্রেমের আকর্ষণ কি প্রবল! সেই নিদারুণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না; আবার তাহাদের প্রণয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া দুঃখও হইল। পলাতক কয়েদীর প্রণয়, আর কুঁজোর চিৎ হইয়া শুইবার সখ, প্রায় একই রকম।

আমরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, নগরবাসী সৈনিকগণের বন্দুকের 'দুম্‌দাম' শব্দ ও উচ্চ কলরোল ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। দুর্ভেদ্য অরণ্য, সূচিভেদ্য অন্ধকার, কোন দিকে পথ ছিল কি না, জানি না; কেবল যাশোটোয়ারোর কণ্ঠস্বরে নির্ভর করিয়া আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। তখন আকাশে মেঘের অভাব না থাকিলেও ঝটিকা ও বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতেছিল। অরণ্যস্থিত বিশালকায় বিটপি-শ্রেণীর ঘন পল্লবের অন্তরাল হইতে নীলাভ শুভ্র দামিনীচ্ছটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। মুহূর্ত্ত পরে সেই গগনব্যাপী বিরাট অন্ধকারের গর্ভে আমরা যেন তলাইয়া যাইতে লাগিলাম!

প্রায় দশ মিনিট পরে আমরা সেই অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণকায়া স্রোতস্বতীর তীরে উপস্থিত হইলাম। স্থানটি ফাঁকা, সেখানে গাছপালা ছিল না; মেঘান্তরিত আকাশ চন্দ্রকিরণে সমুদ্ভাসিত; চন্দ্রালোক নদীজলে প্রতিফলিত হইতেছিল। চন্দ্রকিরণ বৃষ্টিবিধৌত সিক্ত বনভূমিকে চুম্বন করিতেছিল। নদীতীরস্থ উপলখণ্ডে চন্দ্ররশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া নয়নসমক্ষে লক্ষ হীরকের দীপ্তি বিকাশ করিতে লাগিল। নৈশ আরণ্য-প্রকৃতির কি মহান্, কি বিরাট্ সৌন্দর্য্য! আমরা মুগ্ধনেত্রে নদীতীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম, যাশোটোয়ারোর সাত জন অনুচর কয়েকটি অশ্বতর লইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদিগকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া একটি নারীমূর্ত্তি দ্রুতপদে আমাদের সম্মুখীন হইল। সে নসিস্‌কা। চক্ষুর নিমেষে সে বার্ণির সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার মুখচুম্বন করিল। আমার মনে হইল, এই নারীপ্রেমই জগতে সার পদার্থ। পৃথিবীর পুঞ্জীভূত স্বর্ণরাশি ইহার তুলনায় তুচ্ছ।

নসিস্‌কা যাশোটোয়ারোর ছয় জন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ছয়টি অশ্বতর ছিল; তন্মধ্যে চারিটি অশ্বতরের পৃষ্ঠে কতকগুলি বাণ্ডিল দেখিলাম, অন্য দুইটির পৃষ্ঠে বোঝা ছিল না। বুঝিলাম, অশ্বতর-চতুষ্টয় বোঝা বহিয়া দীর্ঘ পথ ভ্রমণে যখন পরিশ্রান্ত হইবে, তখন অন্য দুইটি অশ্বতর তাহাদের ভার গ্রহণ করিবে।

যাশোটোয়ারো আমাদিগকে বলিলেন, "প্রভুর আশীর্ব্বাদে আমরা নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু এখানে আমাদের সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। আমরা পরিশ্রান্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু এখন বিশ্রামের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। শত্রুদল আমাদের সন্ধানে এখানে আসিতে পারে। বহু সৈনিক কর্ত্তৃক আমরা এখানে আক্রান্ত হইলে তাহাদের সহিত যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। আমাদিগকে অবিলম্বে এই নদী পার হইতে হইবে। বৃষ্টিতে নদীর জল বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে এখনও এক বুকের অধিক জল নাই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই নদীতে বান আসিবে, তখন এ নদী হাঁটিয়া পার হওয়া আমাদের অসাধ্য হইবে। এই জন্য তাড়াতাড়ি নদী পার হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে আমাদের মঙ্গলই হইবে। সৈনিকগণ আমাদের সন্ধানে এখানে আসিলেও নদী পার হইয়া আমাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না; কারণ, আমরা অপর পারে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই বানের জলে নদী ভাসিয়া যাইবে।"

যাশোটোয়ারো নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন; তাঁহার অনুসরণ করিয়া আমরাও জলে নামিলাম; কিন্তু তিনি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার অনুমান সত্য নহে. নদীতে জল এখন এক বুকের অনেক বেশী; তোমাদের সকলকে সাঁতরাইয়া আসিতে হইবে। স্রোত এখনও তেমন প্রখর হয় নাই; কিন্তু আর দশ মিনিট পরে একগাছি কুটা পড়িলেও স্রোতে তাহা দ্বিখণ্ডিত হইবে।"

আমরা জলচর ইন্দুরের মত সাঁতার দিতে লাগিলাম। নসিস্‌কা তাহার প্রণয়ীর পাশে থাকিয়া সাঁতরাইতে লাগিল। যাশোটোয়ারোর অনুচররা অদ্ভুত দক্ষতার সহিত বোঝা সমেত অশ্বতরগুলিকে নদীস্রোতে পরিচালিত করিয়া অপর তীরে উঠিল। আমরা সকলেই নদী পার হইলে যাশোটোয়ারো বলিলেন, "বন্ধুগণ, শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করিয়া এই মুহূর্ত্তেই নদীতীরে আসিতে পারে। আমাদিগকে দেখিতে

পাইলে তাহারা এ পারে আসিয়া আক্রমণ করিবে। তাহারা সহজে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না; সুতরাং আরও দুই ঘণ্টা না চলিলে আমরা নিরাপদ হইতে পারিব না।"

নদী পার হইয়া পুনর্ব্বার আমরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এই অরণ্য যাশোটোয়ারোর সুপরিচিত; তিনি সুদক্ষ শিকারী ও অভ্রান্ত পথিপ্রদর্শকের ন্যায় আরণ্যপথে আমাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। আমরা অশ্রান্ত-ভাবে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে নিশাবসানের সূচনা-স্বরূপ পূর্ব্বগগন আলোকিত হইল, ঊষার অরুণালোকে নৈশ অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকা যেন মায়ামন্ত্রে অদৃশ্য হইল; দুই ঘণ্টা পরে আমরা একটি প্রশস্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম; তাহার প্রান্তভাগে সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি। যাশোটোয়ারো সেই স্থানে আমাদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। আমরা সকলেই তখন পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। কিন্তু এক ছটাক আহার্য্য দ্রব্য আমাদের সঙ্গে ছিল না; আমরা হতাশভাবে যাশোটোয়ারোর মুখের দিকে চাহিলাম। আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কৌতুকময়ী নসিস্কা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া বার্ণি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমরা ক্ষুধায় মরি, আর তুমি মজা দেখিতেছ।"

নসিস্কা হাসিয়া বলিল, "নদী পার হইবার সময় পেট ভরিয়া জল খাইয়া আসিলেই পারিতে। ক্ষুধায় যাহাদের পেট জ্বলে, তাহারা কোন্ সাহসে জেলখানা হইতে পলাইয়া আসে? কারারক্ষীদিগের পয়জার কি খুব মিঠা নয়?"

বার্ণি নসিস্কার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার অধর-সুধায় আমাদের ক্ষুধা মিটিবে না। এখন উপায়?"

যাশোটোয়ারো বলিলেন, "আমার মেয়ের উপর তুমি অকারণ রাগ করিতেছ, বার্ণি! তোমাদিগকে অনাহারে মারিবার জন্য শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করি নাই। আমার ঐ অশ্বতরগুলার পিঠে যে সকল গাঁটরি দেখিতেছ, তাহা খুলিলেই তোমরা আশ্বস্ত হইবে।"

যাশোটোয়ারো একটা অশ্বতরের পিঠের গাঁটরি খুলিলেন; তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি বন্দুক, পিস্তল এবং এক বাক্স টোটা বাহির হইল। আমাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র প্রায় কিছুই ছিল না। আমাদের চতুর্দ্দিকে শত্রু, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা শত্রু কর্ত্তৃক বিপন্ন হইতে পারি, এই আশঙ্কায় তিনি আমাদের সাহায্যের জন্য এই সকল অস্ত্র লইয়া আসিয়াছিলেন; আর একটি গাঁটরিতে কাটারী, সাবল, খন্তা, কুড়াল, বাটালি প্রভৃতি অস্ত্র এবং থালা, ঘটি, ডেক্‌চি, বাটি প্রভৃতি তৈজস-পত্র সংরক্ষিত। তিনি আর একটি গাঁটরি খুলিয়া আটা, চাউল, চা, চিনি, কৌটাভরা জমানো দুধ, মাখন এবং শুষ্ক মাংস প্রভৃতি বাহির করিলেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না, আমরা পথের কষ্ট বিস্মৃত হইলাম এবং সেই স্বজাতিবৎসল পরহিতব্রত বৃদ্ধের দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন কি আমরা এই সঙ্কটে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতাম? আমরা বিশ্রামের চেষ্টা না করিয়া প্রান্তর হইতে শুষ্ক গুল্ম সংগ্রহ করিয়া আনিলাম, এবং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, জলার জলে আটা ভিজাইয়া রুটী প্রস্তুত করিলাম, শুষ্ক মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রাঁধিয়া লইলাম। বহু দিন পরে আমরা উদর পূর্ণ করিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম; তাহার পর যাশোটোয়ারোর কয়েক জন অনুচরকে পাহারায় রাখিয়া আমরা প্রাতঃসূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত প্রান্তরে শয়ন করিলাম, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ওরিয়েণ্ট অভিমুখে যাত্রা

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে যাশোটোয়ারোর আহ্বানে আমাদের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তখন বেলা প্রায় এগারটা। দেখিলাম, আমাদের ছুতোর বন্ধু পূর্ব্বরাত্রির আঘাতজনিত যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্ করিতেছে। সে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার সময় বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করে নাই, সকল যন্ত্রণা ধীরভাবে সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু নিরাপদ স্থানে আসিয়া আহার ও বিশ্রামের পর সে আর সেই যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার ছট্‌ফটানি দেখিয়া আমরা উৎকণ্ঠিত হইলাম। তাহার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বগলের ঠিক নীচে বাম পাঁজরে তরবারির খোঁচা লাগিয়াছিল, সে বড় সহজ খোঁচা নয়! তাহাতে পাঁজরের অস্থি বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই ক্ষত হইতে প্রচুর পরিমাণে শোণিত নিঃসারিত হওয়ায় শয়ন করিয়াও সে সুস্থচিত্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারে নাই। অতিরিক্ত শোণিতক্ষয়ে তাহার মুখ এরূপ সাদা হইয়া গিয়াছিল

যে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে বড়ই ভয় হইল। আমার সন্দেহ হইল, সে হয় ত এই ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারিবে না। নিক্‌সনকে হারাইয়াছি, পথিমধ্যে তাহাকেও হারাইব না কি? বিশেষতঃ, আমিও তখন সুস্থ ছিলাম না। কারাগারের দেউড়ী হইতে বাহির হইবার সময় আমি মাথায় যে আঘাত পাইয়াছিলাম, সে আঘাত সামান্য নহে। বোধ হয়, কোন কারারক্ষী লাঠী অথবা বন্দুকের কুঁদা দ্বারা আমার মস্তকে প্রহার করিয়াছিল। আমার দেহে যথেষ্ট বল ছিল এবং কষ্টসহ নাবিকের মাথা বলিয়াই সেই আঘাতে আমাকে ভূতলশায়ী হইতে হয় নাই; আমি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সদলে এত দূর আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তখনও আমি মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম; সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও যে ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম, দীর্ঘ রাত্রি-জাগরণ ও পথশ্রমই তাহার কারণ; কিন্তু ম্যাক্‌ফার্‌সনের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া আমি সে যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইলাম। যাহা হউক, যাশোটোয়ারো যখন তাহার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে। তখন আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি ম্যাক্‌ফার্‌সনের ক্ষত ধৌত করিয়া তাহাতে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া দিলে সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। কিন্তু সে শোণিতস্রাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে দেখিয়া যাশোটোয়ারো তাহারও প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার এক জন অনুচরকে কি উপদেশ দিয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যে পাঠাইলেন। সেই লোকটি এক মুঠা ঘাস লইয়া ফিরিয়া আসিল। যাশোটোয়ারো সেই ঘাসগুলি আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "উহা 'যার্ব্বা লুইসা' নামক ঘাস, উহা একাধারে ঔষধ ও পুষ্টিকর পথ্য। পথিকরা দীর্ঘকাল আহারাভাবে ক্ষুৎকাতর ও অবসন্ন হইলে এই ঘাস জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করে, ইহাতে তাহাদের ক্ষুধা, ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা দূর হয়।" যাশোটোয়ারো সেই ঘাসগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া এক কেট্‌লি জলের ভিতর নিক্ষেপ করিলেন, এবং সেই কেট্‌লিটি কাঠের আগুনে বসাইয়া রাখিলেন। ঘাসগুলি সেই জলে প্রায় পনের মিনিটকাল সিদ্ধ হইল।

ইত্যবসরে যাশোটোয়ারোর অন্য কয়েক জন অনুচর অন্য এক জাতীয় বৃহদাকার বৃক্ষপত্র আনিয়া পাথর দিয়া তাহা ছেঁচিতে লাগিল। তাহা হইতে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ গাঢ় নির্য্যাস বাহির হইল। সেই নির্য্যাস একখানি রুমালে লাগাইয়া সেই রুমাল দ্বারা ক্ষত আবৃত করা হইল। অতঃপর 'যার্ব্বা' ঘাস-সিদ্ধ জল একটি বাটিতে ঢালিয়া ম্যাক্‌ফার্‌সনকে পান করিতে দেওয়া হইল। সেই জল পান করিবার কয়েক মিনিট পরে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল ও মুখ লাবণ্যময় হইল। সে বলিল, তাহার শরীর সবল ও সুস্থ হইয়াছে, তাহার দেহে আর বিন্দুমাত্র গ্লানি নাই। যাশোটোয়ারোর অনুরোধে আমিও 'যার্ব্বা' ঘাস-সিদ্ধ জল এক পেয়ালা পান করিলাম; তাহার পর আমার মস্তকেও সেইভাবে পাতার নির্য্যাস দিয়া পটী বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমি ভাবিয়াছিলাম, ঘাস-সিদ্ধ জল পান করিয়া আমার বমনোদ্রেক হইবে; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই জল সরবতের মত সুমিষ্ট ও মুখরোচক; তাহা পান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিলাম। কিছু কাল পরে আমি গোলাপী নেশায় আচ্ছন্ন হইলাম; আমার মাথার বেদনা, দেহের অবসাদ বিদূরিত হইল; আমি নব বল লাভ করিলাম।

আমাদের চিকিৎসা শেষ হইলে যাশোটোয়ারো কয়েক জন অনুচরকে অদূরবর্ত্তী নদীতে মাছ ধরিতে পাঠাইলেন। এই মাছের নাম 'ডামিটা'। ইকুয়েডর রাজ্যের প্রায় সকল নদীতেই এই জাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মাছগুলি ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু বেশ সুস্বাদ। স্থানীয় লোকরা অদ্ভুত উপায়ে এই সকল মাছ ধরিয়া থাকে। তাহারা এক মুঠা 'মাস্কা' (যবচূর্ণ) লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হয়, এবং অল্পপরিমাণে জলের উপর ছড়াইতে থাকে। মাস্কা ডামিটা মাছের উৎকৃষ্ট চার। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এই চার খাইতে জলের উপর ভাসিয়া উঠে; তখন সেই লোকগুলি ধীরে ধীরে জলে নামিয়া অঞ্জলির সাহায্যে মাছগুলিকে তীরে নিক্ষেপ করে। তাহারা এরূপ ক্ষিপ্রহস্তে মাছগুলিকে তীরে নিক্ষেপ করে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অল্পসময়ের মধ্যেই তাহারা এক রাশি মৎস্য ধরিয়া আনিল; আমরা তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। আহার শেষ হইলে যাশোটোয়ারো অতঃপর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাদের প্রকৃত হিতাকাজ্ক্ষী এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আমাদের গুপ্ত সঙ্কল্প প্রকাশ করাই সঙ্গত মনে করিলাম, এবং আমি পিটার ডন্‌কুমের যে সকল কাগজ-পত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা বাহির করিয়া

তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলাম। কারারক্ষীরা আমার পরিধেয় বস্ত্র খানাতল্লাস করিলে সেই সকল কাগজ-পত্র তাহাদের হস্তগত হইত, আর তাহা ফেরত পাইতাম না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেগুলি তাহারা দেখিতে পায় নাই; আমি তাহা সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম।

যাশোটোয়ারো সেই সকল কাগজ-পত্র কৌতূহলভরে পাঠ করিলেন। তিনি তাহা ঘাসের উপর প্রসারিত করিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে সেই অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি কয়েক মিনিট নতমস্তকে কি চিন্তা করিলেন; তাহার পর মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অদ্ভুত বটে, এখন বল, তোমার কি মত?"

আমি কি বলিব, স্থির করিতে পারিলাম না। আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন। তাহার পর পিটার ডনকুমের খাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই কথাগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। 'বিয়ার্স হেডের নিকট যে স্তম্ভশ্রেণী আছে, সেখানে নামিতে হইবে। তাহার পর সিকি মাইল দক্ষিণে। কুইটোর উত্তরে, সেখান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব। আইকা পার হইতে হইবে। কোটোপাক্সি ঠিক পশ্চিমে থাকিবে। আধ মাইল উত্তরে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে কোকোয়েটায় পৌঁছিতে হইবে। নদীর মাথা যেখানে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে'।"

আমি যখন পিটার ডনকুমের ভেলায় বসিয়া এই কয় ছত্র পাঠ করিয়াছিলাম, তখন ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। কারণ, সে সময় এই দেশের বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। তাহার পর নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা এই দেশে উপস্থিত হইয়াছি বটে, কিন্তু এই দেশের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই; কিন্তু এই দেশের সকল অংশই যাশোটোয়ারোর সুপরিজ্ঞাত, এই বিশ্বাসে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বিয়ার্স হেড সমুদ্রোপকূলস্থিত কোন স্থান বলিয়াই মনে হইতেছে। উপকূলের কোন্ অংশে ইহার অবস্থিতি, আপনি জানেন কি?"

যাশোটোয়ারো বলিলেন, "না। এ দেশের সমুদ্রোপকূলে যে সকল গিরিশৃঙ্গ ও উচ্চ পাহাড় আছে, সেগুলির অধিকাংশই অদ্ভুতাকৃতি; সকলেই স্ব স্ব খেয়াল অনুসারে যে কোন বস্তুর সহিত তাহাদের তুলনা করিতে পারে। পিটার ডনকুম ঐ সকল পাহাড়ের কোন কোন অংশ দেখিয়া স্তম্ভ-শ্রেণীর ও ভালুকের মাথার (বিয়ার্স হেড) সহিত তাহাদের তুলনা করিয়াছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

যাশোটোয়ারোর এই অনুমান সঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইল। বুঝিলাম, সেখানে নামিয়া কিছু দূর দক্ষিণে যাইতে হইবে; তাহার পর দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া কুইটো অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। কুইটোর উত্তরে গিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে চলিতে হইবে। তাহা হইলেই আইকা নদীর তীরে উপস্থিত হওয়া যাইবে। মিঃ যাশোটোয়ারো পাণ্ডুলিপির এই অংশটি দুই তিনবার পাঠ করিলেন; তাহার পর তাঁহার অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "এই আইকা নদী এ দেশে 'পুটুমায়ো' নামে পরিচিত। এই নদী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সুপ্রশস্ত। গ্রানাডার সীমান্তপ্রদেশে যে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী বর্ত্তমান, সেই পর্ব্বত হইতে ইহার উৎপত্তি। আমার অনুচরবর্গের নিকট জানিতে পারিলাম, সেই স্থান এত দূরে অবস্থিত যে, সেখানে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে দুই মাস চলিতে হইবে। কোকো-য়েটা নদীর অপর নাম যাপুরা, তাহাও এই স্থান হইতে বহু পূর্ব্বে অবস্থিত; ইহা পুটুমায়োর সহিত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু আমার অনুচররা সেই প্রদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তবে উহারা শুনিয়াছে, উহার পূর্ব্বাঞ্চল অতি ভীষণ স্থান; অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বন্য জাতি সেই প্রদেশের অধিবাসী। সেই দুর্গম প্রদেশে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ও অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঐ যে নাসিস্কা এই দিকেই আসিতেছে, উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ঐ প্রদেশ সম্বন্ধে উহার অভিজ্ঞতা থাকিতেও পারে।"

নসিস্কা আমাদের অজ্ঞাতসারে বার্ণির সঙ্গে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা আমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিলে যাশোটোয়ারো পিটার ডনকুমের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠ করিয়া নাসিস্কাকে শুনাইলেন। নসিস্কা তাহা স্তব্ধ-ভাবে শুনিয়া বলিল, "হাঁ, আমি শুনিয়াছি, আইকা ও কোকো-য়েটা দুইটিই অতি বৃহৎ নদী; তাহারা নানাদেশ অতিক্রম করিয়া আমেজন নদের সহিত মিশিয়াছে। এই উভয় নদীর তীরভূমি সুবিস্তীর্ণ ও দুর্ভেদ্য অরণ্যে আবৃত। সেই সকল অরণ্য নানা জাতীয় শ্বাপদ জন্তুর আবাসস্থল, প্রকাণ্ডকায়

বিষধর পার্ব্বত্য সর্পের বিচরণক্ষেত্র ; তদ্ভিন্ন যে সকল অসভ্য জাতি সেখানে বাস করে, তাহারা যেমন হিংস্রপ্রকৃতি ও দুর্দান্ত, সেইরূপ বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর। শ্বেতাঙ্গ জাতি সেই দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।”

নসিস্‌কার কথা শুনিয়া যাশোটোয়ারো হাসিয়া বলিলেন, “তুমি ত শুনিলে না, পিটার ডনকুম্ ও তাহার সহচররা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ; তাহারা ত শ্বেতাঙ্গ ছিল !”

নসিস্‌কা বলিল, “ঠিক কথা। তাহারা যদি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরাই বা পারিব না কেন ? কি বল বার্ণি, আমাদের কি ততটুকু সাহস নাই ?”

বার্ণি বলিল, “আলবৎ পারিব, কেন পারিব না ? তাহারা মানুষ, আমরাও মানুষ, গরু-ভেড়া নহি ত ; তবে পারিব না কেন ?”

যাশোটোয়ারো নসিস্‌কাকে বলিলেন, “তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। অরণ্যে তোমার জন্ম, তুমি বনবালা, সিংহীর মত তোমার সাহস। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য নানাবিধ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, সেখানে ভীষণদর্শন বিশালকায় সর্পসমূহ বিচরণ করিতেছে ; সেই অরণ্যের অধিবাসীরা অসভ্য, রাক্ষস তুল্য দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর ; কিন্তু বাহুবলে আমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিব। এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় ভীরু কাপুরুষের স্থান নাই। আমরা কাপুরুষ নহি ; প্রাণভয়ে আমরা কি সঙ্কল্প ত্যাগ করিব ? শোন বন্ধুগণ, আমি বৃদ্ধ শিকারী, বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার এই বাহুযুগলের ও পদদ্বয়ের মাংসপেশীতে এখনও বলের অভাব হয় নাই, আমার এই প্রশস্ত বক্ষে এখনও যৌবনের সাহস বর্ত্তমান। এখনও আমার বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ। সুতরাং এখনও আমি তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণের অযোগ্য হই নাই। এখানে আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই, চল, আমরা অগ্রসর হই। আর পশ্চাতে চাহিয়াও কোন ফল নাই, নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকার আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি ; সেখানে অগণ্য শত্রুসৈন্য আমাদের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের সম্মুখে ওরিয়েণ্টের অপরিজ্ঞাত দুর্গম অরণ্যভূমি ; তাহারই অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্যাবৃত গুপ্ত অন্তরালে আমাদের লক্ষ্যস্থল ‘এল ডোরাডো’ বর্ত্তমান। সেই স্বর্ণভূমিতে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষায় পিটার ডনকুম্ ও তাহার সহচরবর্গ বীরের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। আমি জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়াছি ; এই জীবনসন্ধ্যায় স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া ধনবান্ হইবার লোভ আর আমার নাই ; অধিকন্তু সুখশয্যায় শয়ন করিয়া জীবনের শান্তিময় সন্ধ্যা যাপনের আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। এই বিপৎসঙ্কুল দুর্গম পথের ভীম মাধুর্য্য আমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ করিতেছে ; আমি যৌবনের উৎসাহ ও আনন্দ যেন ফিরিয়া পাইয়াছি। আমার হৃদয়ের প্রত্যেক রক্তবিন্দু তারস্বরে বলিতেছে, আগে চল্, আগে চল্ ভাই।”

উৎসাহে ও উদ্দীপনায় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল। তাঁহার হৃদয়-নিহিত উন্মাদনার বহ্নিশিখা যেন তাঁহার নেত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম। তিনি সিংহবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে অনুচরবর্গ গাঁটরিগুলি পুনর্ব্বার বাঁধিয়া অশ্বতরপৃষ্ঠে স্থাপন করিল। আমি নসিস্‌কাকে একটি অশ্বতরে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলে সে অবজ্ঞাভরে হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, আমি বনবাসিনী, অরণ্যেই আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই অরণ্যে হাঁটিয়া যাইতে আমার কষ্ট হইবে না। আমি যাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি, আমার জীবনের অংশ মনে করি, তাহার পাশে পাশে হাঁটিয়া যাইতে আমার কত আনন্দ হইবে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে না।”

এই কথা বলিতে বলিতে নসিস্‌কার মুখমণ্ডল প্রণয়গর্ব্বে ও আনন্দোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার গর্ব্বোন্নত দেহযষ্টির অপরূপ মাধুরী দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। সে একখানি উজ্জ্বল বর্ণের রেশমী রুমাল সুকৌশলে ভাঁজ করিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে মাথায় বাঁধিয়াছিল, তাহার পাশ দিয়া কাকপক্ষবৎ কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় কুন্তলদাম উভয় স্কন্ধে লতাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরিহিত অনতিদীর্ঘ ‘স্কার্টে’ সুকুমার তনু আচ্ছাদিত ; পীনোন্নত বক্ষের মধ্যস্থলে তাহার সুদৃশ্য বোতামগুলি আঁটিয়া দেহের শোভা বিকশিত করিতেছিল। তাহা তাহার জানুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। তাহার সুগঠিত পদদ্বয় কারুখচিত সুদৃশ্য পদচ্ছদ দ্বারা আচ্ছাদিত। উভয় পদে সুচারু ‘আল্‌পারাগেট’ পাদুকা। তাহার পৃষ্ঠে একটি সুদীর্ঘ বন্দুক, তাহা রঙ্গীন ফিতায় দেহের সহিত আবদ্ধ। কটিদেশের বামপার্শ্বে চর্ম্মনির্ম্মিত কোষে আবদ্ধ তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ তরবারি। তাহার এই বেশ দেখিয়া মনে হইল, সে সেই অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী অপূর্ব্বমহিমময়ী রণদেবী। যেন

আমাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতেছে!

প্রথমে আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, কোমলাঙ্গী নসিস্‌কা সেই ভয়াবহ দুর্গম পথে আমাদের সঙ্গে সমতালে চলিতে পারিবে না, কিছু দূর গমন করিয়া সে পথশ্রমে কাতর হইবে, তাহার শ্রমখিন্ন ব্যথিত পদদ্বয় দেহের ভার বহনে অসমর্থ হইবে। কিন্তু তাহার গমনভঙ্গী দেখিয়া আমার এই অমূলক আশঙ্কার জন্য আমি আন্তরিক লজ্জা অনুভব করিলাম। বুঝিলাম, 'এ মেয়ে ত মেয়ে নয়, পুরুষমর্দ্দিনী!' তাহার কষ্ট-সহিষ্ণুতা আমাদের অপেক্ষা অল্প নহে, এবং তাহার শক্তি ও সাহসে সন্দেহ করিতেও আমার সাহস হইল না। বিশেষতঃ আমি জানিতাম, বার্ণি ফেগানের ন্যায় অকুতোভয় বলিষ্ঠ প্রণয়ী বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে প্রাণ দিয়াও তাহার সম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষা করিবে।

আমরা উন্নতদেহ বৃদ্ধ যাশোটোয়ারোকে আমাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া দৃঢ়পদে পূর্ব্বাভিমুখে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সেই পথ আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং বিচিত্র রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। কোন দিন কি আমরা সেই রহস্যান্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের কামনার কনকমন্দিরে উপনীত হইতে পারিব? স্বাধীনতার মুক্ত সমীরণ-হিল্লোল আমাদের দেহের শিরায় শিরায় উন্মাদনাস্রোত প্রবাহিত করিল; আমরা উৎসাহিতচিত্তে স্বর্ণ-ভূমির সন্ধানে ধাবিত হইলাম। সকল ভয়, সকল সংশয় আমা-দের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তখন কি একবারও আমাদের মনে হইল, কি ভীষণ বিপদ্‌রাশি আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য সুদূর-প্রসারিত দুর্গম অরণ্যে মুখব্যাদান করিয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে?

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অশ্রু-অর্ঘ্য

কবি রসময় লাহা—

২০শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় কবি রসময় লাহা পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। গীতি-কবিতা রচনায় যাঁহারা সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কবি রসময় তাঁহাদিগের অন্যতম। প্রচ্ছন্ন হাস্যরস তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালা দেশে নবীন লেখক-দিগকে সাহিত্যরচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য যে সকল সাহিত্যসেবী প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে "প্রয়াস" নামক একখানি মাসিকপত্রের প্রচার করেন, কবি রসময় তাঁহাদের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ছিলেন। "সাহিত্য" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মাসিকে লাহা কবির উপাদেয় গীতিকবিতা প্রকাশিত হইত। তাঁহার রচিত গীতিকবিতার গ্রন্থগুলি রসগ্রাহী পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। আলাপে ব্যব-হারে রসময়ের সহৃদয়তা প্রকাশ পাইত। রসময় বাবুকে হারাইয়া আমরা প্রিয়জন-বেদনা অনুভব করিতেছি। ৬২ বৎসর বয়সে কবি রসময় নিউমোনিয়া রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত গীতিকবিতাগুলি দীর্ঘকাল বাঙ্গালী পাঠককে তৃপ্তিদান করিবে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—

২রা অগ্রহায়ণ ঐতিহাসিক, সুলেখক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার হৃদ্‌রোগে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইতিহাস ও বার্ত্তা-শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি দীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন। পাটনা কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি অবসর-কালে সাহিত্যচর্চ্চায় অবহিত থাকিতেন। গুরু পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাদ্দার মহাশয়ের রচনার মধ্যে "সাহিত্য-পঞ্জী" নামক একখানি মূল্যবান গ্রন্থে সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যামোদীদিগের বিশেষ অভাব দূরী-ভূত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যিকবৃন্দের রচিত গ্রন্থরাজির নাম প্রভৃতি এই "পঞ্জী"তে সংগৃহীত হইয়া-ছিল। ইতিহাস ও বার্ত্তা-শাস্ত্রের পরম ভক্ত হইলেও সাহি-ত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার অনুরাগ সামান্য ছিল না। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জন একনিষ্ঠ ভক্তের অভাব ঘটিল। শিক্ষা বিভাগেও তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল বিয়োগজনিত দুঃখ শীঘ্র বিস্মৃত হইবার নহে। তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ-বিধান করুন।

শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ

[মাসিক বসুমতীর ভাদ্রসংখ্যায় প্রকাশিত শাস্ত্র-সমস্যা প্রবন্ধের উত্তর ও বিচার]

আম্নায়—বেদমন্ত্র সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌ভাগে তাহার বিস্তার। বেদের অংশবিশেষ বিলুপ্ত হইলে তাহার অর্থ স্মরণ করিয়া বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই উপদেশ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থ। মূল-পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিগণেরই উপদিষ্ট। অতএব বেদমন্ত্র হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রই এ জাতীয় মহর্ষির জ্ঞানবিজ্ঞানফলে সমুদ্‌ভাসিত। যথা—ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ৬৭ সূক্তের ঋষি পরাশর। পরাশর স্মৃতি-সংহিতাকার এবং বিষ্ণুপুরাণের উপদেষ্টা। তিন স্থানের পরাশরই শক্তি ঋষির পুত্র। ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৪ সূক্তের ঋষি—যম। স্মৃতিসংহিতাও যমকৃত আছে। ঐ ১০ মণ্ডল ১৫ সূক্তের ঋষি শঙ্খ; স্মৃতিসংহিতাকর্ত্তাও শঙ্খ ঋষি। ঐ ১ মণ্ডল ৫৮ সূক্তের ঋষি গোতম, সংহিতাকর্ত্তাও গোতম (মতান্তরে গোতম,—গোতম ১ মণ্ডল ৭৫ সূক্তের ঋষি, পৌরাণিক উপাখ্যানে জ্ঞাত হওয়া যায়, দীর্ঘতমার নামান্তর গোতম। ঐ ১ মণ্ডল ১৪০ সূক্তের ঋষি দীর্ঘতমাঃ) ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ১ হইতে বহু সূক্তের ঋষি বশিষ্ঠ, স্মৃতিসংহিতা বশিষ্ঠের রচিত। ঐ ৫ মণ্ডল ৩৭ সূক্তের ঋষি অত্রি, স্মৃতিসংহিতারচয়িতাও অত্রি। ঐ ৯ম মণ্ডল ৮৭ সূক্তের ঋষি উশনাঃ। স্মৃতি-কর্ত্তাও উশনাঃ। বেদব্যাসসংগৃহীত পুরাণমধ্যেও পুরাণাংশ উপদেষ্টৃরূপে ঐ সকল ঋষির মধ্যে অনেককে এবং অগস্ত্য, কশ্যপ, জমদগ্নি প্রভৃতিকে মন্ত্রদ্রষ্টৃরূপে ও স্মৃতিপ্রভৃতির প্রণেতৃরূপে দেখিতে পাই। আচার্য্য শঙ্করের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই কারণে নিশ্চয় করিয়াছেন,—'যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাঁহারা স্মৃতিকর্ত্তা।' ঐ সকল ঋষির নাম মহাভারতেও নানা স্থানে উল্লিখিত। অঙ্গিরাঃ ঋষি যে অতি প্রাচীন, তাহা 'ভৃগ্বঙ্গিরসকে কালে' ইত্যাদি অনুশাসনপর্ব্ব ৯১ অধ্যায় হইতেই প্রমাণিত। মনুর মতবাদের উল্লেখ মহাভারতে আছে—'অসপিণ্ডা যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। ইত্যেতামনুগচ্ছেত তং ধর্ম্মং মনুরব্রবীৎ।' অনুশাসন-পর্ব্ব ৪৪অ ১৮ শ্লোক। এই মত মনুসংহিতা ৩ অধ্যায় ৫ শ্লোকে দেখা যাইতেছে। উপনিষদের প্রসিদ্ধ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মহাভারতে উল্লিখিত (শান্তিপর্ব্ব যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদ) তিনি স্মৃতিকর্ত্তাও বটেন। অতএব মহাভারতের পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত স্মৃতির অস্তিত্বই অনুমিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

বেদব্যাস-সঙ্কলিত পুরাণসংহিতার মূল পুরাণ অতীব প্রাচীন। কারণ, বাল্মীকীয় রামায়ণে—আদিকাণ্ডে আছে:—'শ্রূয়তাং যৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ যথা-শ্রুতম্।' (৯অঃ ১ শ্লোক) রামায়ণে বেদব্যাসের নাম নাই, কিন্তু মহাভারতে বাল্মীকির নাম আছে, যথা—

"সনৎকুমারঃ কপিলো
বাল্মীকিস্তম্বুরুঃ কুরুঃ
(শান্তিপর্ব্ব—৪৭ অ)

সেই বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বাল্মীকীয় রামায়ণে পুরাণের উল্লেখই পুরাণের প্রাচীনত্বের প্রমাণ। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, মহাভারতের পূর্ব্বেও বেদাদির ন্যায় স্মৃতি, পুরাণও বর্ত্তমান ছিল। মহর্ষি অত্রিকৃত ধর্ম্মসংহিতায় দেখা যায়, বেদ এবং শাস্ত্র পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট, যথা—"বেদং গৃহীত্বা যঃ কশ্চিচ্ছাস্ত্রং চৈবাবমন্যতে। স সদ্যঃ পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্।" বেদজ্ঞানের অভিমানে শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা করিলে নরকভোগ হইয়া থাকে এবং অপর একটি বচনেও দেখা যায়

'চতুর্ণামপি বর্ণানামত্রিঃ' শাস্ত্রমকল্পয়ৎ'—কাযেই ঋষিপ্রণীত বিধিনিষেধগ্রন্থই সাধারণতঃ শাস্ত্র নামে অভিহিত, সে শাস্ত্র মহাভারতের পূর্ব্বেও ছিল, সময়েও ছিল এবং পরেও আছে।

এখন 'সাহেবী' মতের অনুসরণ করিয়া এই সকল প্রমাণ অস্বীকার করিলে মূলচ্ছেদী পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ তাহা হইলে গীতার সময়ও যীশুখৃষ্টের জন্মের পরে আসিয়া পড়ে। আর ভাগবত ত' অতলজলে পড়িয়া যান।

ব্রাহ্মণের যত দিন সাবিত্রীদীক্ষা ও সাবিত্রীজপ থাকিবে, তত দিন তাহার ব্রাহ্মণ্য থাকিবেই, সমগ্র বেদের অধ্যয়ন না হইলে যে শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হইবে, এমন সিদ্ধান্ত পণ্ডিতে করিতে পারে না। কারণ,—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

—মনু ২অঃ ১৬৮।

এইরূপ বচন আছে বটে, কিন্তু অন্য বচনও আছে,—

"সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥"

—মনু ২অঃ ১১৮।

এই দুইটি বচনের অর্থ মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই বেদ যদি কেবলমাত্র গায়ত্রীও হয়, সদাচারী থাকিয়া তাহা লইয়া থাকাও ভাল, কিন্তু অসদাচারপরায়ণ হইয়া ত্রিবেদজ্ঞ হওয়াও ভাল নহে। মনু বলিয়াছেন—প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বক গায়ত্রীজপ যদি প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় করা যায়, তাহাতেই সহস্র বেদপাঠের ফল হয়। মনু এতৎপক্ষে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রণবব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী বেদত্রয়ের সারভূত।—মনু ২।৭৬-৭৮।

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

—মনু ২।৮৭।

ব্রাহ্মণ কেবল গায়ত্রীজপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিবেন, আর কোন কার্য্য না করিলেও তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ। কেবল সাবিত্রী-জ্ঞানপ্রভাবে শ্রাদ্ধীয় পাত্রাসনলাভের উপযুক্ত হইবার কথা মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ২৩ অঃ ২৪ ও ২৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শঙ্খলিখিত স্মৃতিসূত্র উদ্ধৃত করিয়া কুল্লূকভট্ট দেখাইয়াছেন, ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেও বেদপাঠ না করার যে দোষ, তাহা হয় না।—মনু, ২।১৬৮ কুল্লূকটীকা দ্রষ্টব্য।

"অধীয়তে পুরাণং যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যথাপি বা" (মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৯০ অঃ ৩৪।৩৫) ইত্যাদি স্থলে বেদাধ্যয়নবৎ পুরাণাদি অধ্যয়নেরও প্রশংসা আছে।

অতএব উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাকরণ অধ্যয়ন, উপনয়নকালে সাবিত্রীগ্রহণ ও পরে বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় শিক্ষা, ত্রিসন্ধ্যা, সাবিত্রী-উপাসনা এবং সদাচার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য যে অদ্য পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে, তাহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যে সব শাস্ত্র মহাভারতের স্বীকৃত, সেই সকল শাস্ত্র ও স্বয়ং মহাভারত এ বিষয়ে প্রমাণ। যাহারা সদাচারভ্রষ্ট, তাহারা স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যচ্যুত হইয়া সদ্‌ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য অপলাপে মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করিতেছে।

মনু-সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংহিতা মহাভারতের সময়ে যে প্রচলিত ছিল, ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সেই সব শাস্ত্রেই বাল্য-বিবাহের সম্যক্ সমর্থন আছে। মনু বলিয়াছেন,—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥"

ব্রাহ্মণের উপনয়ন-সংস্কারে যেমন গুরুকুলে বাস ও অগ্নির উপাসনা আছে, সেইরূপ স্ত্রীগণের বিবাহেও গুরুকুলবাসস্থলে পতিসেবা এবং অগ্নির উপাসনাস্থলে গৃহকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট, অতএব স্ত্রীলোকের বিবাহ উপনয়নস্থলাভিষিক্ত। মনু ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে উপনয়ন-বিধান করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশে। অতএব গর্ভাষ্টম হইতে গর্ভদ্বাদশ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার বিবাহকাল, ইহাই মনুর মত। গর্ভাষ্টম শব্দের অর্থ ৬ বৎসর ৩ মাসের পর ৭ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত, গর্ভৈকাদশ ৯ বৎসর তিন মাস হইতে ১০ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত এবং গর্ভদ্বাদশ ১০ বৎসর তিন মাস হইতে ১১ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত। দ্বিজাতি-রমণীগণের এই বিবাহকালের কথা মনু সংক্ষেপে স্পষ্টাক্ষরে বচনান্তরে বলিয়াছেন,—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
চতুর্ব্বিংশোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।"

ঋতুমতী বিবাহ যে অকর্ত্তব্য, তাহার নিদর্শনও মনুবচনে যথেষ্ট আছে। পরাশরও বলিয়াছেন,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্।
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥"

অষ্টম বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ মুখ্যকাল বলিয়া দ্বাদশ বর্ষের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত গৌণকাল-রূপে পরাশর নির্দ্দেশ করিলেন। দ্বাদশবর্ষের প্রারম্ভেও যে কন্যাদান না করিবে, তাহার পিতৃগণ কন্যার মাসিক রজঃ-শোণিত পান করেন এবং কন্যার রজোদর্শনে মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নরক হইয়া থাকে। এই পরাশর মহাভারতকর্ত্তা বেদব্যাসের পিতা এবং স্বয়ং বেদব্যাস পিতার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই সকল কথা উপদেশ করিয়াছেন। আর এই পরাশরেরই একটি বচন লইয়া বিধবাবিবাহপক্ষপাতিগণ বড়ই প্রগল্‌ভতা করিয়া থাকেন, কিন্তু পরাশরের বাল্যবিবাহবিধান সম্পূর্ণরূপে অপলাপ করিয়া অলীক বচনে লোকপ্রতারণায় তাঁহারা অণুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী' ইত্যাদি বচন উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে কেহ বলিয়াছেন,—"এই ভাবের পৌরাণিক বচন ভারতযুদ্ধের সময় এ দেশে প্রচলিত ছিল না। এ বচনটি পৌরাণিক নহে, বেদব্যাসের পিতা মহর্ষি পরাশরের বচন, সুতরাং ইহা মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী।"

ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে কন্যাদানই প্রশস্ত বিবাহ, ইহা গৃহ্যসূত্রেও কথিত হইয়াছে,—"নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" (গোভিল) এবং গোভিলসূত্রে এই নগ্নিকা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নগ্নিকান্তু বদেৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ," অতএব বিবাহের পর দম্পতির যে ব্রহ্মচর্য্যের বিধান আছে, তাহা পাত্রালাভ-প্রযুক্ত অধিকবয়স্কা-বিবাহ-স্থলে যেমন পালনীয়, বাল্য-বিবাহেও সেইরূপ পালনীয়। ব্রহ্মচর্য্যের পালন করিতে হইলে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ, অনুরাগপূর্ব্বক অঙ্গস্পর্শও তন্মধ্যে অন্যতম। সেই নিষেধপালন বালিকাবিবাহেও কর্ত্তব্য, ইহাই ব্রহ্মচর্য্য-পালনবিধির তাৎপর্য্য।

"শ্রুতি, কল্পসূত্রে এবং মহাভারতের মধ্যে এরূপ একটি প্রমাণও বিদ্যমান নাই, যাহা দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহাভারতের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে সনাতন হিন্দুসমাজে অপ্রাপ্তযৌবনা কোনও কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল," (মাসিক বসুমতী ভাদ্রসংখ্যা ৭৪৫পৃঃ)—এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে আছে,—

"ত্রিংশদ্বর্ষো দশবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
একবিংশতিবর্ষো বা সপ্তবর্ষামবাপ্নুয়াৎ॥"

ত্রিশ বৎসরের পাত্র দশমবর্ষীয়া নগ্নিকা ভার্য্যা গ্রহণ করিবে। অথবা একবিংশবর্ষীয় পাত্র সপ্তম বৎসরবয়স্কা অর্থাৎ গর্ভাষ্টমবর্ষীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিবে। ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? উপযুক্ত গুণসম্পন্ন পাত্রের অভাবে যৌবন-বিবাহ হইত বটে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও নিন্দাশ্রুতি ধর্ম্মসংহিতাতে আছে।

শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাও প্রকাশ না করিয়া, প্রত্যুত শাস্ত্রে ঐ সকল কথা নাই, এরূপ মিথ্যা-প্রচারে যাহারা লোকের হৃদয়ে শাস্ত্রানুগত সদাচারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইতে অণুমাত্র শঙ্কিত নহে, তাহারা শাস্ত্রীয় বচনের অপব্যাখ্যায় যে সঙ্কোচ-বোধ করে না, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দুইটি বচন এ স্থলে উদ্ধৃত করিব,—

১। ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ! স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

২। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

ইহার অপব্যাখ্যা,—"এই অষ্টবিধ ভক্তি যে ম্লেচ্ছ ব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানী এবং সেই প্রকৃত পণ্ডিত, সে দানের যোগ্যপাত্র, তাহা হইতে প্রতিগ্রহও বিধেয়।" এবং "যেমন রসশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কাংস্য সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধি দ্বারা সকল মনুষ্যই দ্বিজত্ব লাভ করিয়া থাকে।" এই শ্লোকে 'দ্বিজত্ব' এই শব্দটির অর্থ 'বিপ্রত্ব' বা 'ব্রাহ্মণত্ব।'

এই দুইটি শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যাকে যে অপব্যাখ্যা বলিয়াছি, তাহার কারণ, ১ম শ্লোকে যে বিপ্রেন্দ্র পদ আছে এবং ২য় শ্লোকে যে দ্বিজত্ব পদ আছে, তাহার দ্বারা কৌশলে বুঝান হইয়াছে যে, ম্লেচ্ছ প্রকৃতই বিপ্রশ্রেষ্ঠ হয় এবং দীক্ষা দ্বারা সকল জাতিরই ব্রাহ্মণত্ব হইয়া থাকে। প্রকৃত ব্যাখ্যায় ঐরূপ ভাব প্রকাশিত হয় না। বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবদীক্ষার প্রশংসা-মাত্রই ঐ সকল বচনের প্রকৃত মর্ম্ম। যেমন 'সর্ব্বব্যাপ্তবরী

ঘণ্টা' এই বচন আছে, তাই বলিয়া ঘণ্টা হইতে ঢাক-ঢোল, বীণা-বেণু সকলের স্বর বাজিয়া উঠে না, সেইরূপ বিপ্রেন্দ্র বলিলে যে সেই ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিবে, তাহা নহে। অকপট বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ পালন করিলে পরলোকে তাহার ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গতি হইবে, ইহাই ঐ সকল বচনের ভাবার্থ।

১ম শ্লোকে 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' এই অংশে বিধিবাক্য থাকায়, ইহা অর্থবাদ বা প্রশংসামাত্র নহে, অপব্যাখ্যাকারেরা এরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধিবাক্য নহে, ইহা অন্যার্থবোধক অর্থবাদ। সে সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহা সাধারণের সহজবোধ্য নহে, এই কারণে এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ আলোচনা করা যাইতেছে। বিধিবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াই এই আলোচনা।

"তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই যে 'দেয়ং' ও 'গ্রাহ্যং' আছে, ইহাতে কোন্ বস্তু দেয় বা কোন্ বস্তু গ্রাহ্য, তাহার ত কোন নির্দ্দেশ নাই। ভক্ত অভক্ত নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণ-চাণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সামান্যতঃ দানবিধি আছে—বিশেষ ফলের জন্যই বিশেষ বিধি। যথা,—

"সর্ব্বত্র গুণবদ্দানং শ্বপাকাদিষ্বপি স্মৃতম্।

দেশে কালে বিধানেন পাত্রে দত্তং বিশেষতঃ॥"—(গীতা)

শ্বপাক প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিকে দান করিলেও ফল আছে। তবে দেশ-কাল-পাত্রে বৈধদানে বিশেষ ফল হয়। অতএব এখানে 'তস্মৈ দেয়ং' বলিয়া কি ফল হইল? 'গ্রাহ্যং' আর 'প্রতিগ্রাহ্যং' এক নহে। শ্বপাকাদি হীন জাতিও ব্রাহ্মণাদি ভূস্বামীকে যে নজরাণা দেয়, ব্যবস্থাপত্র লইয়া ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতকেও যে 'তৈলবট' প্রদান করে,—তাহা ত গ্রাহ্য আছেই। স্মৃতিগ্রন্থেও আছে,—"আনতিকরত্বেন ন দোষঃ" ইহা দৃষ্টার্থ দান, অদৃষ্টার্থ নহে,—দৃষ্টার্থ ত্যক্ত বস্তুর স্বীকার গ্রহণ-রূপে ও অদৃষ্টার্থ ত্যক্ত বস্তুর স্বীকার প্রতিগ্রহরূপে শাস্ত্রে ব্যবহৃত, শ্বপাক বা ম্লেচ্ছাদির দত্ত বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 'চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি' (মনু)। 'তস্মৈ দেয়ং' ইত্যাদি বচন দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রকথিত বিধি-নিষেধের অনুবর্ত্তনই করা হইয়াছে, ইহাতে ভক্তের প্রশংসাও হয় না, সকলকেই যাহা দান করা যায় ও সকলের নিকট হইতেই যাহা গ্রহণ করা যায়, ভক্তের পক্ষে তৎসম্বন্ধে বিশেষবিধি নিরর্থক। ভক্ত ম্লেচ্ছ হইলেও তাহাকে কন্যাদান করিবে এবং তাহার কন্যা গ্রহণ করিবে, এমন কথা বলিবার সাহস অপব্যাখ্যাকারিগণেরও এখনও হয় নাই। অতএব ভক্তের প্রশংসার জন্য ঐ সকল বচন হইলে তাহার ভাবার্থ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনীয়। মনু শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, শাস্ত্রে ম্লেচ্ছের সহিত ত সম্ভাষণ করিতেই নিষেধ আছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে পারিবে—ম্লেচ্ছও যদি ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহাকেও ধর্ম্মোপদেশ করিতে পারিবে। নারদ যে জন্মে দাসী-পুত্র ছিলেন, সে জন্মেও মুনিগণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াছিলেন। যজ্ঞাদি বৈদিক ধর্ম্মোপদেশদানে জাতি-বিচার আছে, ভক্তি-উপদেশদানে তাহা নাই—ইহাই 'তস্মৈ দেয়ং' ইহার অর্থ। শিবপুরাণে শৈবধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ অর্থবাদ বা প্রশংসা আছে। অধ্যাপনে অধিকার ব্রাহ্মণেরই। যথা মনু—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥"

অতএব জ্ঞানদানে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, কিন্তু স্থানান্তরে মনু বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

'পরং ধর্ম্মং' চাণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির নিকট হইতেও গ্রহণ করিবার বিধি এই মনুবচনে দেখা যায়; মনুসংহিতায় এই অন্ত্যজাতীয়ের বিশেষ পরিচয় এবং 'পরং ধর্ম্মং' কি, তাহা স্পষ্ট নাই।

'ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা' এই বচনে তাহাই স্পষ্টীকৃত। ভগবদ্ভক্ত ম্লেচ্ছের নিকট হইতেও ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে—ইহাই 'তস্মৈ গ্রাহ্যং' ইহার অর্থ।

'যথা কাঞ্চনতাং যাতি'—এই বচনে যে দ্বিজত্ব লাভের কথা আছে, তাহাও প্রশংসামাত্র, প্রকৃত দ্বিজত্ব নহে। সনাতনকৃত "নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা "এই যে অংশ আছে, তাহাও প্রশংসার্থে প্রযুক্ত, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব নহে। এ বিষয়ে হরিভক্তিবিলাসে স্বয়ং সনাতন গোস্বামী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দীক্ষাপ্রকরণ—পুরচরণপ্রকরণ হইতে তাহা দেখাইতেছি।

দীক্ষাপ্রকরণে আছে,—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, অন্যে নহে।

"ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষনুগ্রহম্।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যঃ স্যাদ্দ্বয়োর্নিত্যমনুগ্রহঃ॥"

দ্বয়োঃ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ, অন্যত্র প্রাতিলোম্যদোষাপত্তেঃ, তচ্চাগ্রে নিষিদ্ধমেব। (ইতি সনাতনকৃতটীকা)

"সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥
বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি চেদ্‌ বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥
বিদ্যমানে চ যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ।"

অত্রৈবাপবাদমাহ বর্ণোত্তম ইতি, ইদং অনুগ্রহাদিকম্।
(সনাতনকৃতটীকা)

"মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

ভাবার্থ,—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুপূজাপরায়ণ মানবই বৈষ্ণব, তদ্ভিন্ন সকলেই অবৈষ্ণব। অবৈষ্ণব ব্যক্তি যতই গুণসম্পন্ন হউন, তিনি গুরু হইতে পারিবেন না। পঞ্চরাত্রোক্ত কালবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রতি দীক্ষানুগ্রহ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণের অভাবে ঐরূপ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকে দীক্ষাদান করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে ঐরূপ গুণসম্পন্ন বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্রকে দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে। বৈশ্যের অভাবে ঐরূপ গুণসম্পন্ন শূদ্র—শূদ্রকে দীক্ষাদান করিতে পারিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বদেশে বর্ত্তমান থাকিতে বা বিদেশস্থ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ থাকিতে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষেও ক্ষত্রিয়াদির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্ব স্ব বর্ণ অপেক্ষা উচ্চবর্ণকে দীক্ষাপ্রদান করিতে পারিবে না।"

দীক্ষাবিধান দ্বারা সকলেই যদি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে বৈষ্ণবদীক্ষাপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়াদির ব্রাহ্মণকে এবং বৈষ্ণবদীক্ষাপ্রাপ্ত বৈশ্যশূদ্রের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে এবং বৈষ্ণব-দীক্ষাপ্রাপ্ত শূদ্রের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে দীক্ষাদানের অধিকার নাই, এরূপ উক্তি কি অসঙ্গত হইত না? যে সনাতন 'নৃণাং সর্ব্বেষামেব বিপ্রতা' বলিয়াছেন, তিনি এখানে দ্বয়োর্বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণবদীক্ষাপ্রাপ্ত বৈশ্যকেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দীক্ষাদানে অনধিকারী বলিলেন কিরূপে? তাহার পর পুরশ্চরণপ্রকরণে দেখ,—

"গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি।
পঞ্চাঙ্গোপাসনাসিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে॥"

দীক্ষাগ্রহণের পর পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিতে হয়। পঞ্চ অঙ্গ যথা,—জপ, হোম, অভিষেক, তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন।

"হোমকর্ম্মাণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ।
ইতরেষাস্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদির্বিধীয়তে॥"

সনাতনকৃত ব্যাখ্যা যথা,—"ইতরেষাং ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাম্। ত্রিগুণাদিঃ—ক্ষত্রিয়স্য ত্রিগুণঃ, বৈশ্যস্য চতুর্গুণঃ, শূদ্রস্য পঞ্চগুণ ইত্যর্থঃ।" মন্ত্রবিশেষে যত বার হোম করিবার বিধি—হোমে অশক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ জপ, অশক্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্রিগুণ, অশক্ত বৈশ্যের পক্ষে চতুর্গুণ এবং অশক্ত শূদ্রের পক্ষে পঞ্চগুণ। দীক্ষামাত্রে সকলেরই যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বলাভ হইত, তাহা হইলে সকলেরই দ্বিগুণ জপই হইত, জাতিভেদে ত্রিগুণ, চতুর্গুণ ও পঞ্চগুণ এইরূপ ব্যবস্থাভেদ থাকিত না। এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তিযুক্ত ম্লেচ্ছের যে শ্রেষ্ঠত্ব-কীর্ত্তন আছে, তাহাও প্রশংসামাত্র। জাতির পরিবর্ত্তন তাহার দ্বারা সাধিত হয় না। প্রশংসার ফল পারলৌকিক সদ্‌গতিলাভ এবং নিন্দার ফল পারলৌকিক অসদ্‌গতি। ইহজন্মে যে ব্যক্তি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহার সেই জাতিযোগ্য সংস্কারাদি হইবে এবং আমরণান্ত সেই জাতিই তাহার থাকিবে, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং অন্যান্য শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তবোধক শাস্ত্রসমূহ মহাভারতের পূর্ব্বকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। দেশমঙ্গলের দোহাই দিয়া কল্পিত যুক্তিবলে যাহারা সংযম, সদাচার ও ব্রাহ্মণ্যকে লোকের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই প্রকৃত দেশের শত্রুতা এবং ধর্ম্মের অকল্যাণ করিতেছে।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)।

পরিপাক-ক্রিয়ার সহিত হৃদয়াবেগের সম্বন্ধ

আহার্য্য বস্তু হইতে যথোপযুক্ত উপকার লাভ করিতে হইলে যে সকল নিয়ম পালন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেন না; কারণ, ভোজনের ন্যায় এরূপ সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়াও যে বিশেষ নিয়মসাপেক্ষ, তাহা স্থূল দৃষ্টিতে অনুভব করা যায় না।

হিন্দুশাস্ত্রে তাহার প্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম বিধিবদ্ধ করা আছে। এই সকল নিয়ম পালন করা দূরে থাকুক, তাহার অস্তিত্বও বোধ হয় অনেকেরই অবিদিত।

অধুনা অজাতশ্মশ্রু কিশোরগণও বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। সকলেরই মুখে স্বাধীনতা, সাম্য ও ব্যক্তিত্ববাদ। মনুষ্য কোন কালে বিধি-নিষেধের চেষ্টা সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে যে কোন বিধি বা নিষেধ হউক না কেন, তাহার মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিবার অধিকার সকলেরই আছে। যে সকল বিধান জীবের শারীরিক, মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য রচিত, সে সকল পালন না করায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করা হয় না। আহার-প্রণালী সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে বিধি প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচনা করিলে উক্ত বাক্যের সত্যতা ও প্রামাণ্য সহজেই উপলব্ধি হয়।

যে সকল গৃহে প্রাচীন ব্যক্তিগণ এখনও পুরাতন রীতি-নীতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, সেখানেও স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ অথবা ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণও প্রায়ই প্রাচীন রীতি-নীতির তেমন পক্ষপাতী নহেন। অনেক স্থলে ইঁহারা পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি আত্মীয়ের দ্বারা এই সকল নিয়মানুসারে চলিতে আদিষ্ট হইলে স্পষ্টতঃ এই সকল নিয়মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অনেক স্থলে শাস্ত্রীয় আদেশ কেন যে পালন করা উচিত, তাহার যুক্তির অভাবই এরূপ অবজ্ঞার প্রধান কারণ। ভালরূপে বুঝাইতে পারিলে অনেকেই এই সকল মঙ্গলদায়ক নিয়ম পালন করিতে যত্নবান্ হইতে পারেন। কিন্তু বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক।

আর্য্য ঋষিব্রাহ্মণগণ-প্রণীত সংহিতার বিধানরাশি এমনই অমোঘ ও স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহা তাঁহারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে সে সকল সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিলেও তাহা যে নিত্যসিদ্ধ, তাহা সপ্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না।

যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকল জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ছাত্রমহলে প্রচারিত হইলে সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

এই প্রবন্ধে আহারকালে মানসিক অবস্থা কিরূপ রাখা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ মনুর কয়েকটি অনুজ্ঞা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে আলোচিত হইবে। ত্রিকালজ্ঞ মনু বলিতেছেন :—

"উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।"

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৫৩ শ্লোক।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, মনের যে স্থিরতার উপর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও মনু সমভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, সে স্থিরতা-সাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর, চক্ষু ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন করা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে যেখানে শরীর প্রায় সর্ব্বদাই ঘর্ম্মাক্ত থাকে। অধিকন্তু এ দেশে খাদ্যদ্রব্য স্পৃষ্ট হইয়া পরিবেষিত হয় এবং হস্ত দ্বারাই ভোজন করা হয়। এ ক্ষেত্রে হস্ত বিশেষভাবে ধৌত না করিয়া আহার্য্য স্পর্শ করিলে কখনই তাহার পবিত্রতা রক্ষা করা যায় না। মুখগহ্বর প্রক্ষালন দ্বারা মুখ-মধ্যস্থ নানারূপ রোগবীজাণু দূরীভূত হইয়া জিহ্বা সরস হয় ও আহারে রুচি জন্মে। মুখমণ্ডল ও চক্ষুর্দ্বয় প্রক্ষালনে শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইয়া শরীরে এক অপূর্ব্ব সজীবতা ও মনে প্রফুল্লতা জন্মে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রক্ষালন দ্বারা শরীর ও মনের আহারের উপযোগী "সমাহিত" অবস্থা আনীত হয়।

এই 'সমাহিত' অবস্থা সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন :—

"পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ।"

মনু, ২য়, ৫৪।

প্রতিদিন আহারকালে সমাদরের সহিত অন্ন গ্রহণ করিবে, অন্নের নিন্দা করিবে না। অন্ন দেখিয়া হৃষ্ট হইবে, মনের সঙ্কোচ ভাব ত্যাগ করিবে ও যাহাতে নিত্য উত্তম অন্নলাভ হয়, এরূপ অভিনন্দন করিবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে অসংখ্য বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতী এই পরম মঙ্গলদায়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া

ভোজনের পূর্ব্বে ভোজ্য বস্তু দেখিয়া আনন্দিত হইবার পরিবর্ত্তে বিরক্ত হইয়া উঠেন। ইহাতে কেবলমাত্র যে নিজ নিজ পরিপাক-যন্ত্রের অকল্যাণসাধন করিতেছেন, তাহাই নহে; পরন্তু তদনু-পাতে নিজ নিজ নৈতিক জীবনেরও সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, স্কুল-কলেজের ছাত্রাবাসে ও সাধারণ ভোজনালয়ে খাদ্য ও সুপকার প্রত্যহই নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইবার যোগ্য। সে সকল স্থলে বৈতনিক ব্যক্তি অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে; তাহাদের সম্বন্ধ বেতনের সহিত, ভোক্তার স্বাস্থ্যের উন্নতি অবনতির সহিত নহে। যাঁহাদের গৃহে আহার করিবার সুবিধা ও সুযোগ আছে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের ভাগ্যে হোটেলে খাওয়ার ফল অনিবার্য্য; কারণ, কলিকাতা প্রভৃতি সহরে প্রায় সকল গৃহেই পাচক প্রবেশ করিয়াছে। মাতা, ভগিনী বা স্ত্রীর হস্তের প্রস্তুত খাদ্য অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে লাভ হয়।

রন্ধনের ব্যবস্থানুসারে তিন শ্রেণীর গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর গৃহে গৃহিণী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতির মধ্যে কেহ না কেহ রন্ধন করিয়া থাকেন। ইঁহারা অসমর্থ হইলে বরং অন্যান্য কার্য্যে ও পাকশালার আয়োজন প্রভৃতির জন্য দাসী নিযুক্ত করেন; কিন্তু প্রকৃত রন্ধনকার্য্য নিজেরাই সম্পন্ন করিয়া গৃহস্থের মঙ্গলসাধন করেন। বঙ্গদেশের কাশী প্রভৃতি পশ্চিমা-ঞ্চলে এরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত একবারে বিরল নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এরূপ ভদ্র গৃহস্থের গৃহেও প্রত্যহ আহারকালে যে দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কখনই তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। মাতা কর্তৃক প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন—যে মাতা অপেক্ষা পৃথিবীতে মনুষ্যের অধিকতর মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিণী হিতৈষিণী আর নাই, স্বয়ং তিনি সযত্নে রন্ধন করিয়া স্নেহসুধা মাখাইয়া যে অন্নব্যঞ্জন পুত্রের সম্মুখে রাখেন, তাহাও বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সন্তানের নিকট অযথাভাবে তিরস্কৃত ও অনাদৃত হইয়া থাকে।

এরূপ সন্তান জানেন না যে, তাঁহার পরিপাক-যন্ত্রের কি পরিমাণ অপকার হইতেছে ও তাঁহার নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি কতদূর শিথিলমূল হইতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহে রোগ, শক্তির অভাব, সামর্থ্যের অভাব, বিলাসিতা প্রভৃতি কারণে ইচ্ছা থাকিলেও মহিলাগণ রন্ধন-কার্য্যের ভার লইতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ নিকট-আত্মীয়া অনুসন্ধান করেন, পরে বাধ্য হইয়া হিন্দুস্থানী মহারাজ বা উড়িয়া ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেও রন্ধনশালার কার্য্যাবলীর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন ও যতদূর সম্ভব নিজের মনের মত খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া লন। কিন্তু আহারকালে অসমাহিত ভাব এরূপ গৃহেও বিরল নহে।

বঙ্গের প্রধান প্রধান নগরে প্রায় সকল গৃহেই, এমন কি, বহুস্থলে পল্লীগ্রামেও ধনিগৃহে—তৃতীয় শ্রেণীরূপে নির্দ্দিষ্ট সম্ভ্রান্ত ধনিগৃহে অমৃতপরিবেষণকারিণী জননী অন্নপূর্ণার স্থলে শৌচাচারবিহীন উৎকলনিবাসী বাবা জগন্নাথ রন্ধনশালায় বিরাজিত। দেব নীলকণ্ঠ সর্ব্বদা হিতার্থ সমুদ্রমন্থনকালে হলাহল পান করিয়াছিলেন, কলির পাচক জগন্নাথ গৃহস্থের হিতার্থ রীতিমত দুই বেলা অসাবধানতা ও অপবিত্রতার সহিত মিশ্রিত রোগবীজে পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর অন্নব্যঞ্জনরূপ হলাহল পরিবেষণ করিয়া শরীরে নানা রোগের সূত্রপাত করিয়া দিতেছে। মাতা-ভগিনীর প্রতি যত কোপ প্রকাশ করা যায়, পাচক প্রভুর প্রতি তাহার দশাংশের একাংশও সম্ভবপর নহে; কারণ, তিনি পাল্টা কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলে পরিবারস্থ প্রত্যেক প্রাণীকেই প্রয়োপবেশন করিতে হয়। সুতরাং ক্রোধের কারণ হইলেও মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন যে ক্রিয়া ক্রোধবশতঃ পাকস্থলীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সে ক্রিয়া ক্রোধ অব্যক্ত রাখিলে স্থগিত থাকে না।

বাঙ্গালী-চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক হিন্দু-মহিলা নিজ স্বামি-পুত্রের কল্যাণার্থ বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ও প্রত্যেক ভদ্রলোক স্ত্রী বা কন্যাকে নানারূপ রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কাশী, দেওঘর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থলে লইয়া যাইয়া বহু অর্থব্যয়ে চিকিৎসাদি করাইয়া থাকেন। কিন্তু যত দিন স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালিত না হইবে, তত দিন এ সকল বাহাড়ম্বরে কখনই মনোমত ফললাভের সম্ভাবনা নাই। মহিলাগণ যদি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া স্বামি-পুত্রের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতে বদ্ধপরিকর হন, দেখিবেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য অচিরে উন্নতিলাভ করিবে। পক্ষান্তরে, মহিলাদিগের রোগের জন্য স্বামি-পুত্রকেও তত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতই শ্রমবিমুখ; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিমিত পরিশ্রম অতি আবশ্যক। রন্ধনের দ্বারা শ্রমবিমুখতা দূরীভূত হইয়া মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তম ও পবিত্র অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যবহারে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাস্থ্য উন্নত হইবে। যাঁহারা একান্তই রন্ধনে অক্ষম, তাঁহারাও নিজ তত্ত্বাবধানে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইবেন।

যাহা হউক, এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনু এরূপ আদেশ কেন করিলেন যে, অন্নকে অভিনন্দন বা পূজা করিতে হইবে। ইহার উত্তর তিনি স্বয়ংই পরবর্ত্তী শ্লোকে দিয়াছেন। যথা,—

"পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্।"

পূজিত অন্নের দ্বারা বল-বীর্য্য উৎপন্ন হয়; অপূজিত অন্নের দ্বারা এতদুভয়ই নষ্ট হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আহার্য্য বস্তুর মানব-শরীরে বল-বীর্য্য উৎপন্ন করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহা অপূজিত বা অনাদৃতভাবে গৃহীত হইলে সে শক্তির বিকাশ না হইয়া বরং শরীরস্থ বল-বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। শুদ্ধভাবে যত্নের সহিত নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত অন্নও অযথাভাবে গৃহীত হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে মাত্র।

এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কোন এক বস্তুর রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে অন্য এক বস্তুর রাসায়নিক উপাদানের যে সকল স্বাভাবিক ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার ব্যত্যয় কিরূপে হইতে পারে? যেমন, গন্ধক-দ্রাবকে তাম্র গলাইলে তুঁতে উৎপন্ন হইবেই। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার কিরূপে ব্যাঘাত হইতে পারে? মিলনকারীর ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, উক্তরূপ রাসায়নিক

ক্রিয়া হইবেই। সেইরূপ অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া সেই অন্নব্যঞ্জন রস-রক্তে পরিণত হইয়া বল-বীর্য্যদানে বাধ্য। তাহার পূজা করার বিধি ভাবপ্রবণ মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

এরূপ আপত্তি স্থূল দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর।

যদি ভোজনকালে হৃদয়াবেগের সহিত পরিপাক-ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উক্ত আপত্তির বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই; কিন্তু মনুর অনুজ্ঞা যেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই দেখাইতেছে যে, পরিপাক-ক্রিয়া হৃদয়াবেগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

মনুর অনুশাসন স্বমতপ্রধান দোষদুষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কারণ, তাঁহার অনুজ্ঞায় কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। যুক্তি দ্বারা ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিবারও কোন প্রয়াস দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ভিন্ন যাঁহারা কোন মত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা উক্ত অনুশাসনগুলি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। কোন্ বৈজ্ঞানিক সত্য হেতুযুক্তি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ঐ সকল অনুশাসনে পরিণত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক সত্যই যে মনুর অনুশাসনের মূল ভিত্তি, একটু চিন্তা করিলেই ইহা সপ্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না।

পরিপাক-ক্রিয়া কিরূপে সংসাধিত হয়, ইহা স্মরণ করিলেই মনুর আদেশের মর্ম্ম বুঝা যাইবে।

মানব-শরীর নানারূপ তন্তু (tissue) দ্বারা গঠিত। অস্থি, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন তন্তুর সংস্কার ও পুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদান আবশ্যক হয়। ঐ সকল উপাদান খাদ্যবস্তু হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সকল তন্তুই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেই ক্ষতি পূরণের জন্য খাদ্যের আবশ্যক। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে রস সঞ্চারিত হইয়া তাহা হইতে রক্ত হয়। এই রক্তের দ্বারা সকল তন্তুর উপাদান যথাস্থানে যাইয়া তাহাদের ক্ষতি পূরণ করে। যে সকল উপাদান তন্তুর সহায়তার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহারা প্রথমে রক্তে পরিণত হয়। এই পরিণতি যে ক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয়, তাহাকেই পরিপাক-ক্রিয়া বলে। কঠিন পদার্থও আহারান্তে তরল পদার্থে পরিণত না হইলে শোষিত হইতে পারে না। এজন্য অদ্রবণীয় কঠিন বস্তুও প্রথমে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া তরল হয়, তাহার পর রক্তের সহিত মিশিতে পারে। এই পরিপাক-ক্রিয়া মুখ হইতেই আরম্ভ হয়। এক খণ্ড রুটী মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিলে প্রথমে কোনও স্বাদ অনুভব করা যায় না; কিন্তু কিছুকাল পরে মিষ্ট স্বাদ অনুভূত হয়; ইহার কারণ, রুটীর প্রধান উপাদান শ্বেতসার অদ্রবণীয় পদার্থ; এজন্য বার বার চর্ব্বণ দ্বারা মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে শর্করায় পরিণত হয়, এবং শর্করা দ্রবণীয় বলিয়া মুখের মধ্য হইতেই শোষিত হইতে থাকে। ইহাও পরিপাক-ক্রিয়া। মুখ-মধ্যে এইরূপ খাদ্যের কিয়দংশ পরিপাক হয়; কিন্তু পাকস্থলী ও অন্ত্রই পরিপাকের প্রধান যন্ত্র। মুখে উত্তমরূপে খাদ্য চর্ব্বিত হইয়া অতি ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয় ও পাকস্থলীতে যাইয়া পরিপাক হয়। এজন্য খাদ্য বিশেষরূপে চর্ব্বণ করিয়া পাকস্থলীতে প্রেরণ করা উচিত।

পাকস্থলীতে খাদ্য উপস্থিত হইলেই ঐ যন্ত্রের আভ্যন্তরিক গাত্র হইতে পাক-রসের (gastric juice) ক্ষরণ হয়। ঐ পাক-রসের সহিত মিলিত হইয়া আলোড়ন দ্বারা উভয়ে বিশেষরূপে মিশিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য দ্রবণীয় ও শোষণীয় রসে পরিণত হয়। পাক-রসের ক্ষরণ না হইলে খাদ্য পরিপাক হয় না।

পাকস্থলীর ক্রিয়া শেষ হইলে খাদ্য অন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়; তথায় ভিন্ন প্রকার পাক-রস সমূহের দ্বারা পরিপাক-কার্য্য সাধিত হয়। এ স্থলে কেবল পাকস্থলীর ক্রিয়া স্মরণ রাখিলেই মহাপ্রাজ্ঞ মনুর বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করা যাইবে।

মনুষ্য-শরীরের যাবতীয় কার্য্যকলাপ ও চেষ্টা পেশী সমূহ ও স্নায়ু সমূহের দ্বারা সাধিত হয়। হস্ত-পদাদি-সঞ্চালন যে স্নায়ু সমূহের দ্বারা হয়, তাহারা ইচ্ছাধীন। কিন্তু হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র যে সকল স্নায়ু দ্বারা চালিত, তাহারা মস্তিষ্কের (সুতরাং ইচ্ছার) অধীন নহে। ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জীব জাগ্রত থাকুক বা নিদ্রিত থাকুক, পাকস্থলী ও হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র সর্ব্বদা অনলসভাবে স্বকার্য্য করিতেছে।

যদিও পাকস্থলীর আলোড়ন ও রসক্ষরণ (অর্থাৎ পরিপাক-ক্রিয়া) ইচ্ছাশক্তির মুখাপেক্ষা করে না, তথাপি এই সকল ক্রিয়া মনুষ্যের ভাবরাজ্যের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ। যদি লজ্জার কোন কারণ হয়, অমনই শোণিত-প্রবাহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়োজিত না হইলেও স্বতঃই পথ পরিবর্ত্তন করিয়া মুখ-মণ্ডলে ধাবিত হইয়া গণ্ডদ্বয় আরক্ত করে।

ক্রোধী ব্যক্তিগণের মুখে শুনা যায়, ক্রোধ হইলে তাহাদের ক্ষুধা থাকে না ও প্রবল ক্রোধের আক্রমণ হইলে, এমন কি, ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাব থাকে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত ও ক্রোধী ব্যক্তিগণের স্বীকারোক্তি ভোজন-কালীন একাগ্রচিত্ততা ও চিত্তের সমতা-সম্বন্ধীয় মানব অনুজ্ঞার সমর্থন করে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর ও সন্তোষ-জনক প্রমাণ না পাইলে মনুর আজ্ঞা পালনীয় বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার না করিতে পারেন।

বর্ত্তমান যুগে জড়বিজ্ঞানের কল্যাণে স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবিষ্কার হইয়াছে।

এক্সরের (xray) সাহায্যে পাকস্থলীর ক্রিয়া-কলাপ অধুনা লোকলোচন-গোচরীভূত করিবার সুযোগ হইয়াছে, সুতরাং পাকস্থলীর আকুঞ্চন ও পাক-রস ক্ষরণের উপর হৃদয়াবেগের কোন আধিপত্য আছে কি না, তাহা সপ্রমাণ করিবার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখের 'ষ্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকার "শরীরের উপর মনের আধিপত্য" (Influence of Mind on Body) শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

লণ্ডন, ২১শে সেপ্টেম্বর।

'কু' মহোদয় শিক্ষা-প্রভাবে শরীরের উপর মনের আধিপত্য

বিশেষরূপে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অলিম্পিয়ার জাতীয় খাদ্য-প্রদর্শনীতে সে দিন আহারের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ডাক্তার হ্যাডফিল্ডের বক্তৃতা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পানাহারের সহিত মানসিক জীবনের যতটুকু সম্বন্ধ অদ্যাবধি কল্পিত হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে সে সম্বন্ধ তাহা হইতে বহু দূর ব্যাপৃত ও সমধিক দৃঢ়।

পাক-রস ক্ষরণের সহিত ক্রোধ, ভয়, প্রভৃতি হৃদয়াবেগের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিবার জন্য এক্সরের সহায়তা লওয়া হইয়াছে এবং এইরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, যখন মন ক্রোধ কিম্বা ভয়ে অভিভূত থাকে, তখন পাকস্থলীর সঙ্কোচ (অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিস্তার-যুক্ত অলোড়নকার্য্য ও তৎসহ পাকরসক্ষরণ) স্থগিত থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যখন আমরা আহার করিতে বসি, তখন মন হইতে সকল প্রকার ভাবনা-চিন্তা ক্রোধ উদ্বেগ পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। সে সময়ে কোন প্রকার ক্রোধযুক্ত তর্ক-বিতর্কে জড়িত হওয়া আমাদের পক্ষে কখনও উচিত নহে।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উচ্চারিত মনুর চির-অবিসম্বাদিত বাণী বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইল। উপরি-উক্ত শ্লোক কয়টিতে এই সত্যই নিহিত আছে, যদিও তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের সেই অতীত গৌরবের যুগে সংহিতা-নির্দ্দিষ্ট এই সকল বিধি-নিষেধের যুক্তি দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে ঋষিবাক্য অভ্রান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মান্য করিতেন। আধুনিক যুগেও এই সকল সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত। এই সকল বিধিনিষেধ নিজ নিজ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রতিপালনে কাহারও বিমুখ হওয়া সঙ্গত নহে।

বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কি অভ্রান্তরূপে ত্রিকালদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ মনুর মতের সমর্থন করিতেছে না? ঋষিবাক্য অভ্রান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ, ইহার প্রমাণ-প্রয়োগের কোন আবশ্যক না হইলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

যে সকল বিধি-নিষেধ প্রায় সকল সংহিতাকারের গ্রন্থেই বিদ্যমান, সে সমস্তই সমাজের গতিশীল (dynamic) অবস্থায় ভূয়োদর্শনের ফলে স্বীকৃত হইয়া সমাজের স্থিতিশীল (static) অবস্থায় নির্ব্বিবাদে পালিত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে। গতিশীল অবস্থায় পরীক্ষা, গবেষণা, বিচার প্রভৃতির প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা সত্য নির্ণীত হইয়া সিদ্ধান্তরূপে পরিণত হইলে সমাজের স্থিরতা আসে। তখন সেই সিদ্ধান্তগুলিই স্মরণ থাকে ও ব্যবহৃত হয়। বহু পরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ আদেশাবলীই শাস্ত্রাকারে পরিণত হয়, সুতরাং নিজ দেশের এইরূপ প্রচলিত ও আচরিত রীতি-নীতিগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া চিন্তা ও আচরণ দ্বারা তাহাদের সত্যতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করাই মঙ্গলজনক। ডাক্তার হ্যাডফিল্ডের সদুপদেশ আমাদিগকে কতকগুলি কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছে। মনুর অনুজ্ঞায় এই নিষেধার্থক অঙ্গ পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। অধিকন্তু স্পষ্টতঃ আমাদিগকে ভোজনকালে স্থির, ধীর, সমাহিত হইয়া অন্নকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে অসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ ও ভোজন করিবার বিধি আছে। কারণ, ভয়, ক্রোধ, চিন্তা, অস্থিরতা এ সকল পরিপাকক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। এ সকল বর্জ্জন করিয়া হৃষ্টচিত্তে আহার করিলে পরিপাকক্রিয়া সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়া বলবীর্য্য, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। এই সকল আলোচনা করিলে মনে হয় যে, যে সকল ব্যক্তি বা জাতি অতিশয় ক্রোধ-ভয়াদি-প্রবণ, তাহাদের অজীর্ণ-রোগে আক্রান্ত হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

অজীর্ণ আহার্য্য দ্বারা প্রথমতঃ অভীপ্সিত শারীরিক পুষ্টি-লাভ হয় না, সুতরাং আহার্য্য সংগ্রহের অর্থ ও রন্ধনের পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হয়, অধিকন্তু পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া স্থায়ী অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি করে।

এই অপব্যয় ও পরিপাকযন্ত্রের শক্তিহীনতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান উপায় স্নেহময়ীর প্রস্তুত প্রীতিপ্রদ আহার্য্য মহামনীষী মনুর আদেশানুযায়ী সংযত ও হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করা।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষাল (এম্-এ অধ্যাপক)

৺মায়ামরা-পুরণিমাটী সত্র

'সত্র' সব্দের অর্থ—যজ্ঞ বা যজ্ঞস্থান, তীর্থস্থান ও হরিসংকীর্ত্তন-ক্ষেত্র। কোন সাধু-সন্ত বা মোহান্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া কতিপয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে লইয়া পারত্রিক মঙ্গল অথবা মোক্ষ কামনার উদ্দেশ্যে যে স্থানে একত্র অবস্থান করিয়া 'হরি-গুণ-নাম-যশ' শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, সেই স্থানকেও সত্র বলে। 'সত্রাবলী'তে সত্র শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝায়:—

বহু সন্ত সাধু ভক্ত গোস্বামী সহিত।
ধর্ম্মর প্রসঙ্গ করি থাকয় যাদত।
আশ্রমী হোক বা যদি উদাসীন হয়।
তাহাক বোলয় সত্র শাস্ত্রর নির্ণয়। ৩২৮

অভিধান মতে সত্রের অর্থ যজ্ঞ ও যজ্ঞস্থান। আসাম অঞ্চলের গোঁসাঞী বা মোহান্তদিগের অবস্থান যজ্ঞাদিবাচক নহে। যজ্ঞার্থ সত্রের প্রমাণস্বরূপ নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল:—

"হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ।
ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি।"—রঘুবংশম্।

"কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেন কথায়াং সক্ষণা হরেঃ।"—ভাগবত

বড়পুজিয়া মৌজার ৺কাংসপার সত্রের শ্রীযুত চৈতন্যচন্দ্র দেব অধিকার গোস্বামী মহোদয় অসমীয়া সত্রের এইরূপ সংজ্ঞা লেখককে প্রদান করিয়াছেন—"সত্ত্বগুণীর নাম ধর্ম্মাদি থিঠাইত প্রকাশ হয়, তাকে সত্র বোলে। শিষ্য-সমাজর উপকার অর্থে এই সত্ত্ব গুণর লগত রজ ও তম গুণর অলপ সম্বন্ধ আছে।"

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'পরমব্রহ্ম গিরি' নামক সূর্য্য-বংশীয় জনৈক কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে কোচবিহারে এবং তৎপরে কামরূপে আসেন এবং এখানে তিনি দারপরিগ্রহ করেন। তৎপুত্রের নাম হরিহর বা হরিবর গিরি এবং পৌত্রের নাম গোমস্তা গিরি (নামান্তর মহীপাল)। এই গোমস্তা গিরির বংশে মহাপুরুষ অনিরুদ্ধ দেব ১৪৪২শকে নারায়ণপুর মৌজার অন্তর্গত 'বিষ্ণুবালি-কুঞ্জি' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মায়ামরা সত্রের সংস্থাপক। কোন একটি আসাম বুরঞ্জীর মতে "৺অনিরুদ্ধ দেব আহোমরাজ

বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর দেব ও ৺মাধব দেবের ন্যায় ইনিও রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই।"

'ভূঞা চরিত'এ উল্লেখ আছে—"অনিরুদ্ধ দেব ছাত্রাবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের সাক্ষাৎ পান। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া অনিরুদ্ধ দেবকে "তাম্রক্ষরী" নামক একখানি সংস্কৃত পুথি প্রদান করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ দেব ৺কালঝার সত্রে ভবানীপুরীয়া গোপাল আতার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সৌমার পিঠে তাহা প্রচার করেন। ইনি গুরুর নিকট নূতন ধর্ম্মমত গ্রহণ না করিয়া প্রাচীন ধর্ম্মমত গ্রহণ করায় তৎ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্রের অন্যতম নাম হয় "পুরণি পন্থি সত্র"। পুরণি পন্থী সত্র পরবর্ত্তী কালে পুরণিমাটী মায়ামরা সত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইঁহার প্রথম শিষ্যের নাম ঢলি বরা। ইনি জাতিতে যবন ছিলেন। ঢলি বরার বংশীয়-গণ লাহোয়াল মৌজাস্থ ইকরাতলি গ্রামে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা এক্ষণে হিন্দু। ঢলিবরার বংশের দুই জন ব্যক্তির নাম —শ্রীযুত ধনীরাম গাঁওবুড়া ও শ্রীযুত পাটেশ্বর। ইঁহারা আজিও ৺দীনজয়-মায়ামরা সত্রাধিকার গোস্বামীর শিষ্য। দিহিংয়ের বড়যদুমণি দেব (১) অনিরুদ্ধ দেবের প্রাণসম প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের সময়ে আসামে খোলের প্রচলন ছিল। অনিরুদ্ধ দেব ও বড়যদুমণি দেব আসামে সর্ব্বপ্রথম মৃদঙ্গের প্রবর্ত্তন করেন। অনিরুদ্ধ দেব বিষ্ণুপুরীয়া মৌজার ডিব্রাং নদীর তীরদেশে নাহর আতি নামে পরিচিত স্থানে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা মোহনমুরারি দেব (২) বেজেনাআটী সত্রের সংস্থাপক। নিম্নে অনিরুদ্ধ দেবের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল :—

(১) বড়যদুমণি দেব—শ্রীশ্রীযুত বৈকুণ্ঠশোভনচন্দ্র অধিকারী গোস্বামী মহোদয় বলেন—"শঙ্কর দেব ও বড়যদুমণি দেব একই বংশের লোক।" আমরা কিন্তু আদিচরিত নামক একখানি কল্পিত পুথি ব্যতীত অন্যত্র এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাই নাই।—লেখক

(২) বেজেনা-আটী সত্র হইতে দেবানন্দ অধিকার লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য। —লেখক

* কামদেব—ইঁহার পুত্রের নাম মহাদেব, পৌত্রের নাম নির্ব্বিকার দেব এবং প্রপৌত্রের নাম ভরত সিংহ। ভরত সিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।

[এখানে উল্লেখযোগ্য—নিত্যানন্দ দেবের বংশধর পণ্ডিত শ্রীশ্রীযুত উৎসবানন্দ (জন্মশক—১৮৭৫) ৺মায়ামরা-পুরণিমাটী সত্রের এবং ভবানন্দ দেবের পৌত্র শ্রীশ্রীযুত হৃদয়ানন্দ চন্দ্র (জন্ম শক—১৭৮১) ৺মায়ামরা-দীনজয় সত্রের বর্ত্তমান অধিকার গোস্বামী।]

মোঁয়ামরীয়া শব্দের উৎপত্তি

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—মহাপুরুষ অনিরুদ্ধ দেব ৺মায়ামরা সত্র স্থাপন করেন। মায়ামরা সত্রের অর্থ—"সংসার-নির্লিপ্ত ব্যক্তির সত্র।" 'মায়া', শব্দে সংসার, 'মরা' শব্দে নির্লিপ্ত বুঝায়। 'মায়ামরা'র অর্থ হইতেছে—মায়ার মধ্যে থাকিয়াও উহাতে নির্লিপ্ত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকরা যে কারণে পূর্ব্বে মায়ামরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শিষ্যগণকে ব্যঙ্গচ্ছলে মোঁয়ামরিয়া বলিতেন, তৎসম্বন্ধে ইতিহাস হইতেছে—"অনিরুদ্ধ দেবের পুত্র কৃষ্ণানন্দ দেব কতকগুলি অসুবিধা বশতঃ ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে মলোপাথারের অন্তর্গত মোঁয়ামারী নামক একটি বিলের নিকট ৺মায়ামরা সত্র স্থানান্তরিত করেন। তৎপৌত্র প্রভুদেবের সময় হইতে দুষ্ট লোকরা ব্যঙ্গচ্ছলে রটাইয়া দেয় যে, ঐ সম্প্রদায়ের লোকরা অত্যন্ত 'মোয়া' ভক্ত। তাহা শুনিয়া অন্যান্য নিরীহ লোকও ৺মায়ামরা সত্রের শিষ্যগণকে অজ্ঞতা বশতঃ 'মোঁয়ামারীয়া' নামে অভিহিত করেন। 'মোয়া' শব্দের অর্থ —মৌরলা মাছ। যাহারা মৌরলা মাছ ধরে, অসমীয়ারা তাহা-দিগকে মোঁয়ামারীয়া বলেন। ভারতের ইতিহাসেও এই সম্প্র-দায়ভুক্ত অন্য এক দল বৈষ্ণবের রাজদ্রোহিতাকে "Moamoriah insurrection" বলা হইয়াছে।

৺মায়ামরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকার গোস্বামিগণ দারুময়, প্রস্তরময় অথবা মৃন্ময় দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা করেন না। "ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবা ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে। ভাবে হি বিদ্যতে দেবো তস্য ভাবো হি কারণম্।" নীতিশাস্ত্রের এই বিধির বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা কেবল মানস-মূর্ত্তির ধ্যান করেন। অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গুরু শঙ্করদেব-বিরচিত কীর্ত্তন পুথির অন্তর্গত 'পাষণ্ড-মর্দ্দন'এ আমরা দেখিতে পাই :—

তীর্থ বুলি করে জলত শুদ্ধি।
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি।
বৈষ্ণবত নাই ই সব মতি।
গরুতো অধম কৃষ্ণ বদতি।

এই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকরা একমা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবীর সমক্ষে কদাচ শির নত করে না। লেখক সবিশেষ অনুসন্ধানান্তে জানিয়াছেন যে, ৺মায়ামরা-পুরণিমাটী কিংবা মায়ামরা-দীনজয় সত্রাধিকার গোস্বামিদ্বয়ের সহিত 'রাতিখোয়া' বা অরাতিয়া ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। মঙ্গলদৈ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলের বহু মৌজায় রাতিখোয়া সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোক আছেন। যাহা হউক, মায়ামরা-পুরণিমাটী সত্রের কোন ভক্তের গুরু অপরাধ হেতু তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইলে 'অধিকার গোস্বামী' মহোদয়ের তরফের লোক আসিয়া তাহার বাটীর

সদর দরজার সম্মুখে একটি সুদীর্ঘ বংশ অথবা কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত করেন। উহাতে 'অধিকার গোস্বামী'-প্রদত্ত লাল কাপড় জড়ানো থাকে। গুরু অপরাধ হেতু গুরু কর্তৃক শিষ্যকে সমাজচ্যুত বা একঘরে করণকে 'তাপমরা' বা 'তাবমরা' বলে।

অধিকার গোস্বামী সহ মলোপাথার পরিদর্শন

বিগত ১০।১০।২৭ তারিখে (২৩শে আশ্বিন, সোমবার) ৮৷০ ঘটিকার সময় লেখক বর্ত্তমান মায়ামরা-পুরুণিমাটী সত্র হইতে অধিকার গোস্বামী মহোদয় সহ হস্তি-পৃষ্ঠে উঠিয়া মলোপাথারে এই সত্রের প্রাচীন চিহ্ন পরিদর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দক্ষিণ-দিকস্থ গড়আলি দিয়া প্রথমে যাওয়া হইল। এই রাস্তাটি পূর্ব্বদিকে ভোগদৈ হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমদিকে কাকদঙ্গা নদী-তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। গড়আলি ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে কিছুক্ষণ যাইবার পর পুরুণিমাটী ভকতগাঁও লেখকের বামদিকে দেড় মাইল দূরে পড়িল। যাহা হউক, গড়আলি অতিক্রম করিয়া ধলী নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী আর একটি রাস্তা দিয়া উত্তরমুখ হইয়া সোজাপথ দিয়া,কিঞ্চিন্ন্যূন এক ঘণ্টা চলিবার পর আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মলোপাথারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎকালে সেখানকার স্থানে স্থানে ১ হাত, ১৷ হাত ও ২ হাত পর্য্যন্ত জল। মলোপাথারের ৺মায়ামরা সত্রের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন চিহ্ন হইতেছে—১। গোঁসাই ভেঁটি, ২। ভেলিয়া ভেঁটি, ৩। হাঁতি গড়, ৪। বৌমারী পাথারের ভেঁটি, ৫। বরভেঁটি, ৬। শিঙীয়া জানর কান—প্রভৃতি। এইগুলি পূর্ব্বে মায়ামরা সত্রাধিকার গোস্বামিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। কেন না, গোঁসাই ভেঁটি নামকরণ হইতে বুঝা যায় যে, এই স্থানটি আদিতে কাহার অধিকৃত ছিল। ভেলিয়া ভেঁটিতে ভেলিয়া সইকীয়া নামে জনৈক 'আলধরা' (Guru's attendant) ঘরবাড়ী, কৃষিক্ষেত্র ও 'পাইক' ছিল। তদীয় বংশধর শ্রীমান্ গঙ্গাধর এক্ষণে বর্ত্তমান। ১৮৬০ সনের পূর্ব্বে হাঁতিগড়ে অধিকার গোস্বামিগণের অনেকগুলি হাতী থাকিত। লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস,—"বৌমারী পাথারেই ৺মায়ামরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন সত্র ছিল।" বরভেঁটি অষ্টভুজ মোহান্তের অধিকৃত ছিল। আসামবুরঞ্জী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, রাজদ্রোহিতা হেতু আহোমরাজ লক্ষ্মী সিংহ ২৪ জন পরিবার সহ তাঁহাকে এখানেই বধ করেন। বরভেঁটি আজিও ৺মায়ামরা-মদার খাট গোস্বামীর অধিকৃত। যাহা হউক, মলোপাথারে মায়ামরা-পুরুণিমাটী সত্রের যে সকল অস্পষ্ট ধ্বংসাবশেষ আমরা (লেখক) পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি, অদূর-ভবিষ্যতে সেগুলি যে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহাতে সংশয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মলোপাথার মায়ামরার বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। কালপ্রভাবে এখানকার পূর্ব্ব-চিহ্ন লোপ পাইলেও আমরা (লেখক) প্রাচীন লোকদিগকে বলিতে শুনিয়াছি—"মলোপাথার ৺মায়ামরা সত্রাধিকার গোসাঞীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। কোন্ সূত্রে এই স্থান গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল, লেখক তাহা অবগত হইতে পারেন নাই।

উপসংহার

৺মায়ামরা সত্র হইতে পরবর্ত্তী কালে চারিটি শাখা সত্র হইয়াছে। এইগুলির সংস্থাপকের নাম, যথা:—১। মায়ামরা-পুরুণিমাটী সত্র সংস্থাপক ৺প্রভুদেব, ২। মায়ামরা-দীনজয় সত্র সংস্থাপক ভক্তানন্দ দেব, ৩। মায়ামরা-গড়পরা সত্র সংস্থাপক ৺পরশুরাম দেব ও ৪। মায়ামরা-মদারখাট সত্র সংস্থাপক ৺চিদানন্দ দেব (ওরফে চিকণচন্দ্র)

৺মায়ামরা-পুরুণিমাটী সত্রাধিকার গোস্বামীদিগের ধর্ম্মাধিকারের নির্ব্বাণপ্রাপ্তিকাল:—১। অনিরুদ্ধ দেব ১৫০৯ শক, ২। কৃষ্ণানন্দ দেব ১৫৩৪ শক, ৩। হরিরাম দেব ১৫৫৯ শক, ৪। নিত্যানন্দ দেব ১৫৬৬ শক, ৫। জয়রাম দেব ১৫৭৫, ৬। মধুরমূর্ত্তি দেব ১৬১৭ শক, ৭। প্রভুদেব ১৬২৬ শক, ৮। অজিতানন্দ দেব ১৬৭৮ শক, ৯। শিবানন্দ দেব ১৬৮৯, ১০। পূর্ণানন্দ দেব ১৬৯১ শক, ১১। পরমানন্দ দেব ১৭০৪, ১২। মাধবানন্দ দেব ১৭১৬ শক, ১৩ যাদবানন্দ দেব ১৭১৮ শক, ১৪। বৈষ্ণবানন্দ দেব ১৭৪৩ শক, ১৫। অচ্যুতানন্দ দেব ১৭৬১ শক, ১৬। চিদানন্দ দেব ১৭৬৮ শক, ১৭। অজ্ঞানন্দ দেব ১৭৯৮ শক, ১৮। কেশবানন্দ দেব ১৮১৩ শক এবং ১৯। শ্রীশ্রীযুত উৎসবানন্দ ১৮৩৪ শক। চতুর্থ অধিকার নিত্যানন্দ দেবের দেহত্যাগের পর ৺মায়ামরা-পুরুণিমাটী সত্রের ধর্ম্মাগদি ৪ বৎসর, জয়রাম দেবের দেহত্যাগের পর ১২ বৎসর, মধুরমূর্ত্তি দেবের দেহত্যাগের পর ৮ বৎসর, ১০ম অধিকার পূর্ণানন্দ দেবের দেহত্যাগের ৪ বৎসর এবং ১৮২৫ শকের ৩রা আষাঢ় কেশবানন্দ দেহত্যাগের পর ৯ বৎসর শূন্য থাকে।

বর্ত্তমান দীনজয় সত্রাধিকার গোস্বামী (১) মহোদয় বলেন, —"অনিরুদ্ধদেব ১৪৭৫ শকে জন্মগ্রহণ, ১৫২২ শকে ধর্ম্ম প্রচার এবং ১৫৪৭ শকের পৌষ-শুক্লা দশমী তিথিতে দেহত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাস দ্বিজ ইঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। অষ্টভুজ মোহান্ত ১৬৯২ শকের ৩রা বৈশাখ রবিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে দেহত্যাগ করেন। ভক্তানন্দ দেব ১৭৫৫ শকে মলোপাথারে দীনজয় সত্র স্থাপন করেন। ১৭৫৯ শকে তিনি সত্রটিকে ডিব্রুনদীর তীরস্থ রঙ্গাগড়ায় স্থানান্তরিত করেন। সেখানে ইহা দুই বৎসরকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর অদ্যাবধি বর্ত্তমান স্থানে (P. O. Chabuah) ৺মায়ামরা-দীনজয় সত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই সত্রের বহুঘর ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ শিষ্য ১২ ঘর।"

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

(১) দীনজয় সত্রাধিকার—ইনি এক জন বিচক্ষণ, গুণগ্রাহী ও পণ্ডিত ব্যক্তি।—লেখক।

বিচিত্র মোটর গাড়ী

বরযাত্রিগণ চীনদেশে বর-কন্যাকে সুচিত্রিত আসনে বসাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া থাকে। দেশীয় প্রথা অনুসারে সাংহাইস্থিত
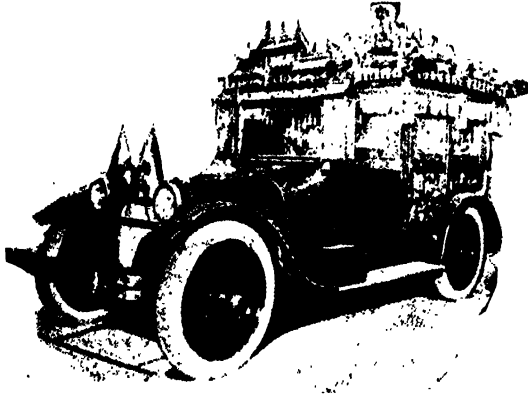
প্রাচ্য প্রথায় সজ্জিত মোটর গাড়ী

চীনারা সম্প্রতি একখানি মোটর গাড়ীকে চমৎকারভাবে সাজাইয়া শোভাযাত্রায় বাহির করিয়াছিল। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে, প্রতীচ্য মোটর গাড়ীর উপর প্রাচ্য কারুকার্য্য-সমন্বিত বসিবার আসন, রেশমী ঝালর প্রভৃতির দ্বারা যান-খানির আকৃতির কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

দস্যুদলনের নূতন পন্থা

মোটর গাড়ীর সাহায্যে অধুনা দস্যুগণ চুরী, ডাকাতি প্রভৃতি কুকার্য্য করিয়া বেড়ায়। ঐরূপ মোটর গাড়ীর আরোহী দুর্ব্বৃত্তগণকে অনেক সময় অন্য মোটরের সাহায্যে ধৃত করাও কঠিন হইয়া উঠে। এজন্য সম্প্রতি এক অভিনব উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত এক প্রকার মাদুর-জাতীয় পদার্থ অধুনা পুলিস বিভাগে ব্যবহৃত হইতেছে। এই পদার্থটিকে সহসা পথের উপর বিস্তৃত করা যায়। উহার তীক্ষ্ণমুখ কাঁটা থাকে। দস্যুর মোটর গাড়ী সেই পথে

মোটর গাড়ীকে অচল করিবার নূতন উপায়।

আসিয়া উক্ত পদার্থের উপর পড়িবামাত্র উহার চাকাগুলি কাঁটার আঘাতে ছিন্ন হয় এবং তখনই গাড়ী থামিয়া পড়ে। তখন দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করা বিশেষ কঠিন হয় না।

ঘটিকাযন্ত্রে ফনোগ্রাফ

ঘটিকাযন্ত্রে ফনোগ্রাফ

ক্ষুদ্র পকেট-ঘড়ীর আধারে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি ফনোগ্রাফ যন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা অধুনা প্রতীচ্য দেশে বহুলভাবে প্রচলিত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র স্প্রীংএর সাহায্যে ফনোগ্রাফ যন্ত্রটি

চলিতে আরম্ভ করে। উহার 'রেকর্ড' বা শব্দসংগ্রাহক অংশে ১৫টি শব্দ মাত্র সংগৃহীত হইতে পারে। অভিনেত্রীরা কণ্ঠস্বরের নমুনা ইহার সাহায্যে অনেক স্থানে দেখাইয়া থাকে। সমগ্র যন্ত্রটি নারীর হস্তবিলম্বিত আধারে অনায়াসে রাখা চলে।

আলোকচিত্রে কুম্ভীর-শাবকের জন্ম-ইতিহাস

কোন প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক জাভার কোন নদীতীর হইতে কতিপয় কুম্ভীরের ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া আনেন। গবেষণাগারে

ডিম্ব-নির্গত কুম্ভীর-শাবক
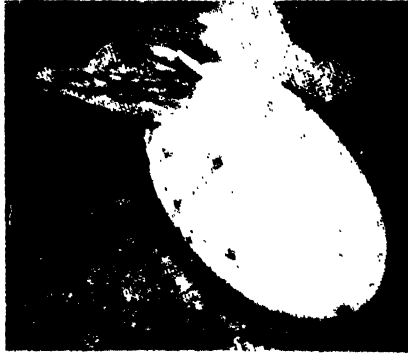
উক্ত ডিম্বগুলি রাখিয়া তিনি ডিম্ব হইতে শাবক কিরূপ ভাবে জন্মগ্রহণ করে, তাহার আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য যেরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ডিম্ব হইতে শাবক জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা তিনি গবেষণাগারে করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে যখন শাবক ডিম্ব ভেদ করিয়া নির্গত হইতে থাকে, তখন তিনি ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। উহার একখানি চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল। এই চিত্রে শাবকের উত্তমাঙ্গের কিয়দংশ ডিম্ব ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। এই নবজাত সরীসৃপের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক যখন এই নবজাত শাবকের দংষ্ট্রাসঙ্কুল মুখবিবরের সম্মুখে একটি অঙ্গুলি প্রসৃত করেন, তখনই হিংস্র নক্রশিশু প্রকৃতিসিদ্ধ হিংসাপ্রণোদিত হইয়া বদনব্যাদান করিয়াছিল।

অঙ্গুলি-বন্ধনী

হাতকড়ার দ্বারাই এ যাবৎ পুলিস অপরাধীকে বন্ধন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু সম্প্রতি ইভান্‌স্টন্ ইল্‌এর পুলিস বিভাগ আঙ্গুল-কড়া বা অঙ্গুলি-বন্ধনীর দ্বারা বন্দীদিগকে বন্ধন করিবার পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছে। যে সকল বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ

আঙ্গুল-কড়া

রাখা প্রয়োজন, তাহাদিগের প্রত্যেকের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযুগল এই নবোদ্ভাবিত কড়া বা বন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া পুলিস বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে। দেখা গিয়াছে, হাতকড়া অপেক্ষাও এই আঙ্গুলকড়া বিশেষ দৃঢ় এবং বন্দী কোনক্রমেই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে না।

যষ্টির অভ্যন্তরস্থ ক্যামেরা

অধুনা আমেরিকার কোন কোন স্থানের পুলিস-প্রহরীদিগের হস্তধৃত দণ্ডের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রায়তন ক্যামেরা যন্ত্র রাখিবার

পুলিস প্রহরীর দণ্ডের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রায়তন ক্যামেরা

ব্যবস্থা হইয়াছে। এই যন্ত্র দণ্ডের মধ্যে এমন গুপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট যে, দর্শক কোনমতে ক্যামেরার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। এই ক্যামেরার মধ্যে একক্রমে ২০ হইতে ২৫ খানা 'প্লেট' ভরিয়া রাখা যায়। এই প্লেটগুলি এক বর্গ-ইঞ্চ আয়তনের হইলেও উহা হইতে ৪|৫ বর্গ-ইঞ্চ বড় চিত্র অনায়াসে তৈয়ার করা যায়। একটা বোতাম চাপিয়া ধরিলেই ছবি গৃহীত হইবে। অতি সহজে এই ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়।

গ্যাসের বিচিত্র বন্দুক

মার্কিণের ব্যাঙ্কসমূহে সম্প্রতি এক প্রকার গ্যাসের বন্দুক ব্যবহৃত হইতেছে। এই [illegible]কগুলির আকৃতি সাধারণ 'ফাউণ্টেন পেনে'র ন্যায়। [illegible]র সাহায্যে এই ফাউণ্টেন পেন হইতে এক প্রকার গ্যাস [illegible]ভাবে বহির্গত হয়। প্রায় ১২ ফুট পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী ব্যক্তি এ[illegible] গ্যাসের আঘাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। দস্যু-তস্করদিগের [illegible]সদভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্কসমূহে এইরূপ [illegible]ক ব্যবহৃত হইতেছে। আততায়ী কোনমতেই বুঝিতে[illegible]রে না যে, উহা সাধারণ ফাউণ্টেন পেন নহে। বন্দুকটির [illegible]শ পেচ আছে। ফাউণ্টেন

গ্যাসের বন্দুক

পেন যেমন পেঁচ ঘুরাইয়া খোলা যায়,ইহাও সেইরূপে দ্বিধাবিভক্ত হয়। তার পর বন্দুকের মধ্যে গ্যাস সঞ্চারিত করা চলে।

দ্বারসংলগ্ন কাচ

কোনও গৃহস্থবাড়ীর দরজায় বাহির হইতে কেহ আঘাত করিলে দরজা খুলিবার পূর্ব্বে কে আঘাত করিতেছে, তাহা জানিতে

দ্বারসংলগ্ন কাচ

পারা যায় না। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, বাড়ীর দরজা খোলা হইবামাত্র দস্যু-তস্কর অথবা অপ্রীতিভাজন কোন ব্যক্তি গৃহকর্ত্তার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই অসুবিধার প্রতীকারের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সদর দরজার ছিদ্রে এক প্রকার কাচ সংলগ্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কাচের সাহায্যে বাহিরের লোকের মূর্ত্তি ভিতর হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। সুতরাং দরজা খুলিবার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা গৃহস্থ অনায়াসে স্থির করিয়া লইতে পারে।

পারাবতবাহী কুকুর

পারাবতের সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল হইতে নানাদেশে প্রচলিত আছে। রণক্ষেত্রে পারাবতের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত আছে। বহু-দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে শীঘ্র এবং নিরাপদে কোন বিশেষ সংবাদ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে সেনাদল এখনও শিক্ষিত পারাবতের সাহায্যে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অধুনা মার্কিণের কোনও সেনাদলে এইরূপ শিক্ষিত পারাবতকে শিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কুকুরের পৃষ্ঠদেশের দুই পার্শ্বে দুইটি সুকৌশলে নির্ম্মিত খোপ বা আধার থাকে। তন্মধ্যে পারাবত রক্ষিত হয়।

পারাবতবাহী কুকুর

মুক্তা-পরীক্ষার ক্যামেরা

ফরাসী বিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি মুক্তার অভ্যন্তরভাগের চিত্র গ্রহণ করিবার উপযোগী এক প্রকার ক্যামেরা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই ফটোগ্রাফ হইতে আসল ও নকল মুক্তার পার্থক্য অনায়াসে ধরিতে পারা যায়। সাদা চোখে যে সকল সূক্ষ্ম ত্রুটি কখনই ধরিতে পারা যায় না, আলোক-চিত্র হইতে তাহা স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করা চলে। এইরূপ ক্যামেরা উদ্ভাবিত হওয়ার পর নকল মুক্তা আসলের স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।
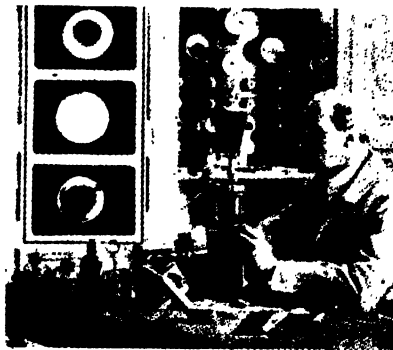
মুক্তা-পরীক্ষার ক্যামেরা

সতীনাথের শ্লীলতা

১

পাকুই গাঁয়ের রামগতি ন্যায়ালঙ্কার ওরফে "পোন্‌মশাই" (পণ্ডিত মহাশয়ের অপভ্রংশ) ওরফে "ভস্‌চাযি্য" ঠাকুরের ছেলে সতীনাথ যে দিন সেকেণ্ড্‌ ক্লাস্‌ থেকে হেড্‌ ম্যাষ্টার হরি মণ্ডলের অত্যধিক দ্বিজপদে মতি-গতি এবং ব্রহ্মশাপ-ভীতির কারণে নির্ব্বিবাদে "প্রোমোশান"—ফল লাভ ক'রে অকুতোভয়ে বুক ফুলিয়ে বীরদর্পে গ্রামের ইংরাজী হাই ইস্কুলের ম্যাট্রি-কুলেশান্‌ ক্লাসের ভাঙ্গা বেঞ্চের ওপোর আধ-হাত-টাক্‌ জায়গা অধিকার ক'রে বস্‌লো,—গাঁয়ে ঘরে ঘরে সে দিন যথার্থই রীতিমত একটা সাড়া প'ড়ে গেল। ছোট গ্রামখানিতে মাত্র দু' চার ঘর ব্রাহ্মণের বাস,—তার মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী; কেবল রামগতি ঠাকুরই গ্রামের মধ্যে "মান্তি-মান" ব্যক্তি, নামজাদা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। নবদ্বীপে রামগতি মাতুলালয়ে বাল্যকালে বাস করতেন। সেখানে তিনি রীতিমত টোলে বিদ্যাভ্যাস ক'রে "সমাস্‌কির্ত্তে" একেবারে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে—মস্ত এক ন্যায়ালঙ্কার (মুক্ষু চাষীরা বল্‌তো, "ন্যাজে-লঙ্কা") উপাধি নিয়ে নবপরিণীতা বালিকাবধূটি সমেত পিতৃবিয়োগের পর নিজগ্রামে এসে ভরন্তর করেন, পাকুই এবং আশে-পাশে কয়েকটি গ্রামে রামগতির বাপের যজমান-শিষ্য কিছু ছিল, তার ওপোর পৈতৃক জমীজমাও কিছু আছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজে চাষবাস করাতেন, তাতেই বেশ স্বচ্ছলে সংসার চ'লে যেতো। "টোলে-পড়া" রামগতি একে পণ্ডিত, তাতে আবার "ন্যায়ালঙ্কার"; পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়ের অধিকারী হয়ে তিনি বিবেচনা ক'রে দেখলেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চাষ-বাস করানো, পণ্ডিত হয়ে চাষীদের সঙ্গে বেশীরকম মেলা-মেশা ঘনিষ্ঠতা করা একেবারেই অকর্ত্তব্য! চাষীদের ডেকে জমীজমা সমস্ত "ভাগে" দেবার ব্যবস্থা ক'রে গাঁয়ে নিরক্ষর ব্যক্তিদের "বিদ্যাসাগর" করাবার জন্যে এক পাঠশালা খুলে বস্‌লেন। বিদ্যাদানের চেয়ে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যটা যে তাঁর খুবই প্রধান, এটা গাঁয়ের লোকেরা নিরক্ষর হ'লেও বুঝতে বেশী বিলম্ব কল্লে না। "পোন্‌-মশায়ের" ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বেজায় কম্‌তে সুরু ক'ল্লে। কম্‌তে কম্‌তে শেষে একেবারে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, শূন্য পাঠশালার একাধারে তিনিই "পোন্‌-মশাই", তিনিই ছাত্র হয়ে রইলেন। পৈতৃক যজমান-শিষ্য যাঁরা ছিলেন, "কালো ভস্‌চার্য্যি"(রামগতির পিতা) মরবার পর অন্য "পুটু-ঠাকুর" বন্দোবস্ত ক'রে রামগতির পৌরোহিত্য কাযে অনাস্থা দেখে ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রাপ্য আদায়ের পথ বন্ধ ক'ল্লেন। তখন রামগতি কাযের সেরা কায, ব্যবসার সেরা ব্যবসা আরম্ভ কল্লেন—"টাকা ধার দেওয়া!" ব্যস্‌—আর রাম-গতির পয়সা খায় কে? "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি!" মাস কতক তেজারতি কারবার ক'রেই রামগতি "পোন্‌-মশাই" রীতিমত এক জন পাকা মহাজন, বড় দরের মামলাবাজ, নামজাদা সুদ-খোর হয়ে পড়লেন! শুধু পাকুই গাঁয়ে নয়,—আশপাশের ভিন্ন ভিন্ন গাঁ থেকে ইতর-ভদ্র, চাষা-ভুষো, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নবশাকাদি ক'রে "পোন্‌-মশাইর" কাছে দলে দলে ঋণ-প্রার্থীরা সব এসে তাঁকে রীতিমত খাতির খোসামোদ করতে লাগ্‌লো। রামগতি মনে মনে হাস্‌তেন আর ভাব্‌তেন—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ!" ঘণ্টা নাড়লে, লাঙ্গল ঠেল্‌লে কিম্বা গুরুমশাইগিরি ক'ল্লে এ খাতির[illegible] রকম মান-সম্ভ্রম কি পাওয়া যেতো?"

আলালের ঘরের দুলাল [illegible]র একমাত্র বংশধর সতীনাথ দিব্যি ছেলে। শান্ত [illegible]—তার ওপোর ছোক্‌রা অল্পবয়েস থেকেই বিমিয়ে [illegible] কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়। দিন-রাত্তির বই [illegible], কিন্তু বরাতক্রমে এক্‌জামিনের সময় হলেই কেমন [illegible] তার খারাপ হয়, এক্‌জামিন দিতে যেতেই পারে না[illegible]মগতি পোন্‌-মশাই-

গাঁয়ের বর্দ্ধিষ্ঠ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, তায় আবার তাঁর ন্যায়ালঙ্কার উপাধি, টাকার মালিক, তার ওপোর টাকা ধার দেন! আরে বাপ্ রে—সতীনাথের ক্লাসে ওঠা রোখে কে?

এই অবস্থায় এক দিনের একটা মজার ঘটনায় সতীনাথের স্কুলে খুব পসার বেড়ে গিয়েছিল!

হরি মাষ্টার ক্লাশে ছেলেদের গ্রামারের Parsing (পদ-নির্দ্দেশ) শেখাচ্ছিলেন। সতীনাথ, (grammar) গ্রামার্ জিনিষটাকে ভীষণ ভয় করতো, সুতরাং শিখ্তেও পারতো না বা শেখ্বার চেষ্টাও করতো না। গ্রামারের ভেতর একটি কথা তার বেশ ভীষণ লেগেছিল (I-by--itself I) আই-বাই-ইট্সেল্ফ্-আই! সতীনাথ এ কথাটি কণ্ঠস্থ ক'রে রেখে-ছিল। (Grammar Translation) গ্রামার ট্রানস্লেশানের কেউ কোনো প্রশ্ন কল্লেই সতীনাথ অম্লানবদনে উত্তর করতো "আই-বাই-ইট্সেল্ফ্-আই"!

হরি মাষ্টার প্রথম প্রথম তাকে বুঝাতেন, কথাটা কি—কথাটার মানে কি ইত্যাদি। সতীনাথ ও সব মানে টানে গ্রাহ্যই করত না; কথাটা ভাল লাগতো,—ইংরাজী পড়া জিজ্ঞেস্ কল্লেই ঐটাই আউড়ে দিত! ঠিক হোক্, ভুল হোক্, কিছুই যায় আসে না! মাষ্টারও সতীনাথকে ভস্চায্যি পোন্-মশায়ের ছেলে ব'লে আর্ কিছুই বল্তেন না! স্কুল-ইনস্পেক্টার পাকুই গ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে বরাতক্রমে সতীনাথকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "গরুর ইংরাজী কি বল তো, বাপু!" সতীনাথ তিলমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে ব'লে ফেল্লে, "আই-বাই ইট্সেল্ফ্-আই!"

ইন্স্পেক্টার বাবু নিজে বেশ রসিক লোক, প্রাণটিও তাঁর খুব সরল। উত্তর শুনে ভারী খুসী হয়ে তিনি এক পেট্ হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। ভাবলেন, ওইটুকু ছেলে, এর মধ্যে এর প্রাণে এত রস এই বয়সে তার এত রসিকতা, বড় হ'লে ত সে একে বারে রসকুম্ভ হয়ে উঠবে! ভিতরকার ব্যাপার ইন্স্পেক্টর বাবু কিছু জান্লেম না, কাউকে জিজ্ঞাসাও কল্লেন না। সতীনাথের এটা নিছক রসিকতা বুঝে তিনি তাকে যথেষ্ট আ[illegible] ক'রে, তার বুদ্ধি-বিবেচনা এবং "চমৎকারিণী রস-প্রতিভার" (Ready wit) যথেষ্ট প্রশংসা কোল্লেন। ইংরাজীটা [illegible] নাথ দায়ে প'ড়ে এবং বাপ-মা'র খাতিরে একটু আধটু [illegible] কখনো পোড়্তো বটে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তার [illegible] অনুরাগ ও ভক্তি। সতীনাথ খুব ছেলেবেলায় রামায়ণ-মহাভারত প'ড়ে বাপ-মাকে শোনাতো। শুধু পড়তো না, পোড়ে পোড়ে সকলকার কাছে এক একটা পালা গল্প ক'রে শোনাতো! এই সব শোন্বার জন্যে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই ছোট্ ঠাকুরকে যত্ন করত, আদর ক'রে বাড়ী নিয়ে যেতো!

হঠাৎ সতীনাথের রামায়ণ-মহাভারতের ওপোর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। পাকুই গাঁয়ে এক জন বইওলা নানা রকম বটতলার উপন্যাস, গল্পের বই, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-ভাগবত ইত্যাদির মোট নিয়ে ফেরি করতে আস্তো। সতী-নাথ তার বড় খদ্দের। ক্রমে তার কাছ থেকে সতীনাথ বাঙ্গালা নাটক, উপন্যাস, গল্পের বই, কবিতা, মাসিকপত্র কিনে কিনে পড়তে আরম্ভ কল্লে। ওরে বাপ রে! সে কি যেমন তেমন পড়া! যাকে বলে হাত-পা ভেঙ্গে পড়া! দিন-রাত্তির সতীনাথ উপন্যাসই পড়ছে! ভাত খেতে বসেছে, এক হাতে বই এক দৃষ্টে পাতা খুলে দেখ্ছে, মনে মনে পড়ছে, ভাবে বিভোর হয়ে কখনো হাস্ছে, কখনো মুখ ভার করছে,—কখনো রাগ্ছে, কখনো ভয়ে বিহ্বল হচ্ছে, কখনো ভীষণ "কৌতুহলাক্রান্ত" হচ্ছে, কখনো আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠছে! কখনো আত্ম-হারা হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমোচ্ছ্বাসের দু'ছত্র আউড়েই দিচ্ছে!

ডান হাতটা ভাতের থালায় আছে বটে, কিন্তু সব সময় সেটা তার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ঠিক কচ্ছে না! সতীনাথ ডাল দিয়ে ভাত মাখ্ছে ত মাখ্ছেই! গরাস তুলে অর্দ্ধেক পথ থেকে সে হাত আবার থালায় ফিরে আস্ছে!

মা বল্লেন, "ভাত খা না, বাবা!" মায়ের তাগাদায় বিরক্ত হয়ে সতীনাথ বইয়ের পাতায় দৃষ্টি বদ্ধ রেখেই সপাসপ দু এক গাল মুখে পুরেই—অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ স্ফীত মুখে আবার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়লো! সর্ব্বাঙ্গে ভাত প'ড়ে এঁটো হচ্ছে দেখে মা বল্লেন, "বাবা সতীনাথ!" "চুপ—" বলেই সতীনাথ ঝোলের বাটিভ্রমে জলের গেলাসটা থালায় উপুড় ক'রে দিয়ে ভাত মাখ্তে সুরু কল্লে।

রান্নাঘর থেকে মা দুধের বাটি এনে দেখেন, থালায় জল ঢেলে ফেলে সব একাকার ক'রে চোখের সামনে বই ধ'রে ব'সে আছে। "ও আমার মাথা খেতে—এ কি কল্লি বাবা? বইখানা একটু মুড়ে রেখে ভাত কটা খেয়ে সমস্ত দিন ধ'রে বই পড়্ গে না!"

"দূর্ তোর—" ব'লে সতীনাথ ভাত ফেলে রাগ ক'রে না খেয়ে উঠে চ'লে গেল !

ছেলের অত্যধিক পাঠানুরাগে "পোন্-মশাই" মনে মনে ভারি প্রীত হয়ে ব্রাহ্মণীকে বল্লেন,—"এক কাষ কর গিন্নি! তুমি বরং ওকে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা কর—"

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুত্রকে রাজী করিয়ে মা ১৬।১৭ বছরের 'কচি' ছেলেটিকে খাইয়ে দিতে বস্লেন ! কিন্তু এ কার্য্যটা বেশী দিন ব্রাহ্মণী চালাতে পাল্লেন না। পাঠে মগ্ন পুত্রকে খাওয়াতে ব'সে পাক্কা দুটি ঘণ্টা তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়! "ও বাবা, এই গরাসটা খা— ! খা—বাবা ! কতক্ষণ মুখের কাছে হাত নিয়ে ধ'রে থাক্‌বো !" ছেলে কোনো কথাও কয় না, গরাসও নেয় না, মা'র কথায় কাণও দেয় না ! জ্বালা কি শুধু এই গা ? গিন্নী ছেলের মাথাটি ধ'রে ভাতের গরাসটি ছেলের মুখের কাছে জোর ক'রে নিয়ে যেমন খাওয়াবার চেষ্টা কল্লেন, ছেলে ভাবের চোটে তেউড়ে উঠে মা'র হাতে মাল্লে সজোরে এক ধাক্কা ! সমস্ত মাখা ভাতের গরাস ব্রাহ্মণীর হস্তচ্যুত হয়ে তাঁরই নিজের মুখে চোখে কাপড়ে-চোপড়ে ছড়িয়ে প'ড়ে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড হয়ে গেল !

২

পণ্ডিতেরা বলেন, প্রেম জিনিষটি সকল মানুষেরই প্রাণে আছে। কিন্তু কি ভাবে আছে জানেন ? একেবারে বীজ-আকারে—এঁটেল মাটী চাপা ! কাব্য-উপন্যাসরূপ নিড়েন দিয়ে যত্ন ক'রে সেই এঁটেল মাটাকে খুঁড়তে হবে, তাকে নরম করতে হবে—তাতে কল্পনাবারি সেচন করতে হবে, দস্তুরমত নায়ক-নায়িকার ভাব দিয়ে তাকে "পাট" করতে হবে, তবে সেই প্রেমবীজ ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হবে, তাতে চারা গজাবে, দেখতে দেখতে গাছ হবে, তাতে ফুল ধরবে, তার পরই একেবারে পাকা ফল হাতে হাতে !

সতীনাথ ম্যাট্রিকুলেশান্ ক্লাসে ঢোকবার আগেই "বটতলা" থেকে আরম্ভ ক'রে "ভারতচন্দ্রের" বিদ্যাসুন্দর পর্য্যন্ত একেবারে গলাধঃকরণ ক'রে ফেল্‌লে ! তার পর পোড়লো 'তরুণসাহিত্য' নিয়ে ! শুধু তাই নয়,—বাঙ্গালায় এমন ঔপন্যাসিক নাই,—সতীনাথ যার হাড়-হদ্দ মেরে দিতে বাকী রাখলে ! দেখতে দেখতে সতীনাথের প্রাণে প্রেমের দিগন্ত-শাখা-প্রসারী অশ্বত্থবৃক্ষ গজিয়ে উঠলো ! সতীনাথ ভীষণ প্রেমিক হয়ে পোড়লেন !

প্রেমের ধমকে সতীনাথ বিষম ভাবুক হয়ে এখানে ওখানে উদাস প্রাণে কি জানি কিসের অন্বেষণে গ্রামের চাদ্দিকে ঘু'রে বেড়াতে লাগলো ! যে ঘাটে গেরোস্তোর বৌ-ঝিরা কাপড় কাচে, স্নান করে, বাসন মাজে, সতীনাথ সেই ঘাটের এক ধারে গিয়ে ব'সে মানবদেহে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য দেখে তন্ময় হয়। মেয়েরা যতক্ষণ সতীনাথকে দেখতে না পায়, ততক্ষণ তারা কোন রকম লজ্জা-সঙ্কোচ না ক'রে মনের আনন্দে নির্ভয়ে পুকুরঘাটে যে যার কার্য্য নিষ্পন্ন করতে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সতীনাথকে কেউ দেখে—সঙ্গে সঙ্গে অমি ঘাটশুদ্ধ মেয়েদের ভাবপরিবর্ত্তন হয় ! সকলেই কাপড়-চোপড় সাম্‌লে, বৌয়েরা ঘোম্‌টা দিয়ে জড়সড় হয়ে, কোন রকমে তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে যেন পালাতে পাল্লেই বাঁচে। ওরই মধ্যে যদি কেউ বর্ষীয়সী থাকেন, প্রথম প্রথম দু'এক দিন ভাল কথায় সতীনাথকে ঘাট থেকে চ'লে যেতে বলেন, তৃতীয় দিনের দিন আর খাতির থাকে না। ঠাকুরুণটি একেবারে মারমুখী হয়ে সতীনাথকে তেড়ে গিয়ে বল্লেন, "কেমন ভদ্রলোকের ছেলে তুমি বাছা ? ঘরে কি তোমার মা-বোন্ নেই ? তাদের কাপড় কাচবার সময় সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পার না ?"

প্রেমিক সতীনাথ সেই অপ্রেমিকা বর্ষীয়সীকে মনে মনে অভিসম্পাত করতে করতে অগত্যা সেই প্রেমের পীঠস্থান "পুকুরঘাট" পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র নারী-সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার প্রত্যাশায় প্রস্থান করে।

খোদন চাষীর বিধবা মেয়ে গোকুলী বালবিধবা। খোদন সতীনাথদের জমীতে চাষ করে। গোকুলী যখন তখন পোন্-মশায়ের বাড়ীতে আসে, পেসাদ খায়, বাপের তরে পেসাদ নিয়ে যায় ! খোদন মাঠে কাষ ক[illegible]—গোকুলী দিন-দুপুরে বাপের জন্যে মাঠে ভাত-তরকারী [illegible] যায়। সতীনাথের পড়বার ঘরের জান্‌লার সাম্‌নে [illegible]াকুলীর মাঠে যাবার পথ। যাবার সময় ঘরের ভেতর [illegible]াকুরকে (সতীনাথকে) দেখ্‌লেই গোকুলী চেঁচিয়ে ব[illegible]পেরণাম্ গো ছোট্-দা-ঠাউর !" সতীনাথের সঙ্গে চো[illegible]চোখি হ'লেই গোকুলী ফিক্ ক'রে একটু সরল হাসি হে[illegible] যায় !

কিন্তু অহো—যৌন মনস্তত্বের [illegible]sychologyর) কি অপূর্ব্ব মহিমা ! সেই চাষী-ক[illegible]লীর তাম্বুলরাগরঞ্জিত

"পুরু" ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি! সে হাসি সরল হোক্, নির্দ্দোষ হোক্, সে ত হাসি বটে? আবার সে হাসি রমণীর—যুবতী রমণীর অধরে। তা সে রমণী ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা হোক্ বা চম্পকবরণীই হোক্; কিন্তু সে ত রমণী এবং যুবতী! সতীনাথের মন খারাপ হয়ে গেল। ভীষণ খারাপ! এই রকম কৃষককন্যার সঙ্গে ভদ্র-যুবকের প্রেমের কাহিনী সতীনাথ আজকাল প্রতি মাসিকপত্রে দুটো চারটে প'ড়ে থাকে। এ মনস্তত্ত্ব—মনস্তত্ত্ব! এ গল্প নয়, নিছক সত্য! এ কল্পনা নয়—এ একেবারে ষোলো আনা বাস্তব! হাতাহাতি—চোখো-চোখি—পাষাণী—সেই অহল্যার চেয়েও পাষাণী "গোকুলী" একবার পেছন ফিরে সতীনাথের দিকে চেয়ে দেখলে না! গোকুলী চলেছে ত আপন মনেই গন্তব্যপথে ভাতের থালা নিয়ে চলেইছে!

"ওঃ—প্রাণ যায়—" ব'লে সতীনাথ একেবারে খোদন চাষীর পায়ের তলায় মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়লো! আর তার কোন জ্ঞান নেই!

মূর্চ্ছা-ভঙ্গে সতীনাথ দেখ্‌লে—গোকুলী একটা পানের বরোজের তলায় তার মাথাটা কোলে ক'রে নিয়ে ব'সে নিজের

সতীনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত গোকুলীর পেছনে পেছনে ছুটেছে!

প্রত্যক্ষ ব্যাপার! [illegible] যেন লাক্‌লাইন দড়ী দিয়ে সতীনাথের প্রাণের প্রে[illegible] [illegible]পৃষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে সেই ভীষণ রোদে সতীনাথের ধড়টাকে [illegible] দিকে টেনে নিয়ে চল্ল! আহা, দেখ দেখি—সত্যি [illegible]—সতীনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পেছনে পেছনে ছুটে[illegible] উঃ—একে জ্যৈষ্ঠ মাস, তায় বেলা একটা বাজে! গোকু[illegible] পশ্চাদনুসরণ ক'রে মনস্তত্ত্ববিদ্ প্রেমিকপ্রবর সতীনা[illegible] মনেই চলেছে! প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপে মাথার চাঁদি ফেটে [illegible]পক্রম—গলদ্‌ঘর্ম্মে বেচারীর সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে, তৃষ্ণা[illegible] শুকিয়ে কাঠ মেরে যাচ্ছে! হায়! ময়লা কাপড়ের আঁচল দিয়ে তাকে বাতাস করছে, আর পাশে খোদন তার মুখে-চোখে মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে! সতীনাথ "আঃ" ব'লে একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ফেল্লে। ওঃ—এই ত স্বর্গ; প্রণয়িনীর উরুদেশে মস্তক রেখে রুগ্ন সতীনাথ শায়িত! এর চেয়ে জ্যান্ত প্রেমের চিত্র বাস্তব-জীবনে আর কি হ'তে পারে? গোকুলী বল্লে, "বাবা! এবারে বুঝি চ্যাতন হয়েছে।"

"তাই ত দেখছি! আরে বাপ রে বাপ! এই হুকুর ও[illegible] আমাদেরই মাথা ঘুরে যায়, তুমি ছোট্ট ঠাউর—মাঠকে এলে

কিসের লেগে কও ত? আর এট্টু হলিই—যদি ছর্দ্দিগর্ম্মি লেগে যেতো—" ব'লে খোদন নিজের গামছা দিয়ে সতীনাথের সর্ব্বাঙ্গটা আর একবার মুছিয়ে দিলে! সতীনাথ কোন কথা না ব'লে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগলো—"দিব্যি প্রেমটি হ'ত—যদি এই মাঠের মাঝখানে এই চাষা খোদনা ব্যাটা না থাক্‌তো! এখানে—এই সুশীতল পর্ণাচ্ছাদনের তলায় এই বালবিধবা যুবতী গোকুলবালা কিম্বা গোকুলমণি (এই রকম যা হোক্ একটা কিছু এর ভাল নাম) একাকিনী,—আর অন্তরে প্রেমানলদগ্ধ—আর বাহিরে মার্ত্তণ্ডতাপবিদগ্ধ আমি সতীনাথ এই রকম ক'রে

৩

চাঁদনী রাত। গ্রাম্যকথায় বলে "জোছনার ফটিক্ ফুট্‌ছে!" হঠাৎ কি জানি কি ভেবে সতীনাথ ঘরের বার হ'য়ে সটান পল্লীপথ ধ'রে চল্লো! কিছু দূরে একটা কুঁড়ে ঘরের সাম্‌নে এসে সতীনাথ দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তার পর আগড়টা ঠেলে উঠোনে এসে নিস্তব্ধ রাত্রে চাপা গলায় ডাক্‌লে—"গোকুলবালা!" গোকুলী দাওয়ায় ব'সে "জলপান" চিবুচ্ছিল। "মনিষ্যির" গলার আওয়াজ তার কাণে যেতেই—"কে—" ব'লে উঠোনের দিকে চেয়ে দেখলে! উত্তর না দিয়ে সতীনাথ গোকুলীর দাওয়ার দিকে অগ্রসর হ'তেই,—খোড়ো চালের
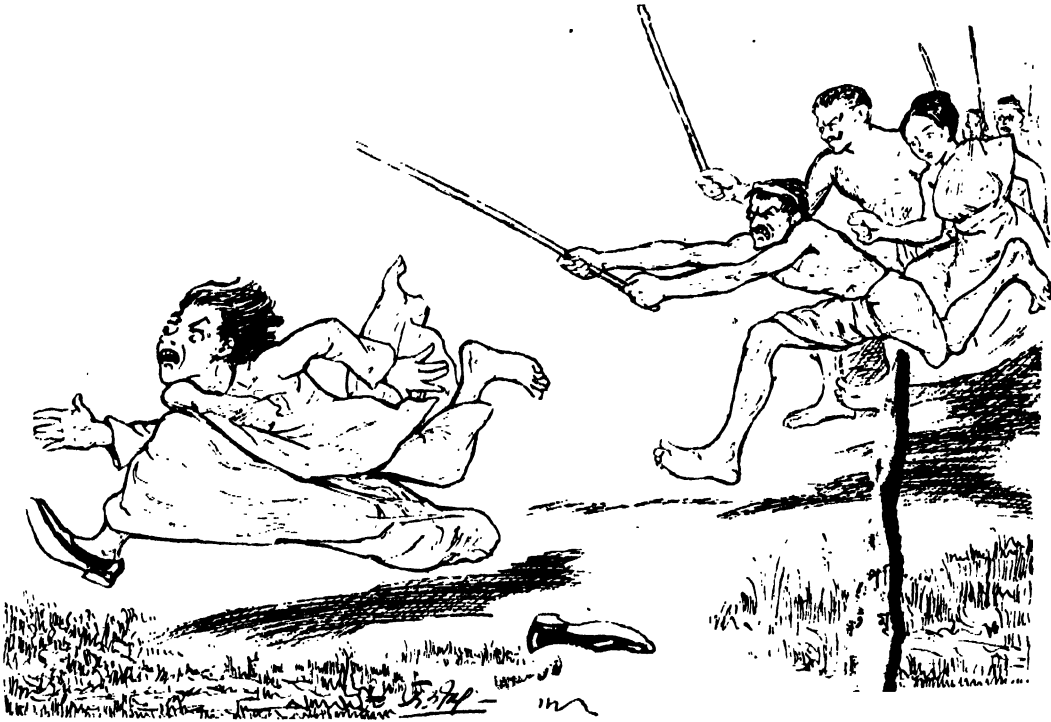
"ঐ ঐ—ধর্ ধর্—ঐ চোর—"

তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে! সব মাটী হয়ে গেল এই খোদন বেটার জন্যে!"

"আর এট্টু জল খাবে, ছোট্-ঠাউর?" বামাকণ্ঠে (তেমন মধুর না হোক্—তবু নারী-কণ্ঠ,—মিষ্টতা একটু না একটু থাক্‌তেই হবে) স্নেহপূর্ণ স্বরে গোকুলী জিজ্ঞাসা কল্লে।

সতীনাথ উত্তর দিলে না। চোখ চেয়ে গোকুলীর শ্যামবর্ণ মুখের শোভা তন্ময় হয়ে দেখ্‌তে লাগলো!

ছাওয়ার অন্ধকারে কে মানুষটা ঠাওর করতে না পেরে গোকুলী "চোর চোর" ব'লে চীৎকার ক[illegible]লো! ভয়ে প্রেমময় সতীনাথের আত্মাপুরুষ তখন [illegible]ছাড়া হবার যোগাড়! দাওয়ার আর এক ধারে "মাজুরি" [illegible]ছিয়ে খোদন আর তার মামা "অচিন্ত্যে" শুয়ে নাক ডা[illegible]। গোকুলীর মুখে "চোর চোর" শুনে তারা ধড়মড়ি[illegible] পড়তেই—উপায়ান্তর না দেখে সতীনাথ এক লা[illegible]ফে উঠানে পড়েই—সেখান

থেকে টেনে ছুট! খোদন, অচিন্ত্য আর "জলপানের" ধামী হাতে গোকুলী "চোর চোর" ব'লে তারস্বরে রকমারি আওয়াজে পাড়ার লোকজনকে ডাকতে ডাকতে সতীনাথকে তাড়া ক'রে ছুটতে লাগলো! চীৎকারের চোটে এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে আরও সব লোকজন বেরিয়ে পড়লো! এরাও ছোটে,—তারাও ছোটে—সতীনাথও ছোটে! পাকুই গাঁয়ে প্রথম প্রহর রাত্রে একটা ভীষণ হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। চান্দিক থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়াতে সতীনাথের পালাবার আর পথ রইল না। "ঐ ঐ ধর্ ধর্ ঐ চোর—" ব'লে সতীনাথকে মাগী-মদ্দ একেবারে ঘেরাও ক'রে ফেল্লে! উপায়ান্তর না দেখে সতীনাথ সামনে একটা পুকুরে মাল্লে তড়াং ক'রে লাফ!

"আর যায় কোথা? বেটা চোর এইবারে ধরা পড়েছে! ডাক চৌকীদার—মার ঢ্যালা—" সকলেই একবাক্যে এই রকম অভিমত প্রকাশ করতে লাগলো!

যেমন কথা, তেমনি কাজ! "উঠে আয় বেটা চোর, নইলে ইট মেরে তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো" এই কথা ব'লে আর চোরকে লক্ষ্য ক'রে—চান্দিক থেকে মেয়ে-মদ্দ সবাই ঢ্যালা ছোড়ে! সতীনাথ বেচারা মাঝ-পুকুরে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়া-সাঁতার কাটছে। [illegible]ক একবার মাথা তুলছে—আবার টুপ ক'রে ডুব মাচ্ছে! র[illegible] ঘেঁসে ঘেঁসে ঢ্যালা পড়ছে। কি ভাগ্যি এখনও পর্য্যন্ত এক[illegible] লাগেনি! প্রাণের দায়ে সতীনাথ চীৎকার ক'রে কাঁদতে [illegible]দতে বল্লে—"ওরে খোদ্‌না,—আমি—আমি!" "কে রে [illegible] চোর? আমি কে?" ব'লে খোদন আবার ঢ্যালা ছোড়ে!

ভীড় ঠেলে "[illegible]াই" সামনে এসে চোরকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন,—"কে-[illegible] তুমি? ঘাটের দিকে এস—তোমার ভয় নেই!"

"আমি—আমি—[illegible] এই আমাকে বাঁচাও—" ব'লে সতীনাথ কাঁদতে লাগলো[illegible]

সকলকে ঢ্যা[illegible]ড়তে নিষেধ ক'রে—"পোন্-মশাই" বল্লেন,—"তু[illegible] আস্তে আস্তে এ দিকে এস—তোমার কোন ভয় নে[illegible] এই,—খবরদার—যে ব্যাটা ঢিল ছুড়বে—"

"বাবা, আমি [illegible]—" বলতে বলতে প্রেমিকপ্রবর সতীনাথ সাঁতরে [illegible] ডাঙ্গায় উঠে এসে ধড়াস ক'রে [illegible]র তলায় প[illegible]গেল!

৪

বাপ-মা'র মহা জ্বালা! ছেলে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না,—আর এ রকম প্রেমের বেগও সাম্‌লাতে পারে না। "পোন্-মশাই" ত ভেবেই অস্থির—! কি জানি কোন্ দিন কোন্ শক্ত চাষাভুষোর পাল্লায় পড়বে, আর বাছাধন বেঘোরে প্রাণটি হারাবে!

নব চাটুয্যে "পোন্-মশায়ের" ভাগ্নে, পাবনা জেলায় শালুকপুরের পোষ্টমাষ্টার। সস্ত্রীক কল্‌কাতায় যাবার পথে পাকুই গাঁয়ে মামার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছে। কলকেতায় শ্যামবাজারে তার নিজের বাড়ী আছে। সে বাড়ী প্রায়ই ভাড়া দেওয়া থাকে,—কারণ, নব বিদেশে চাকরী করে, কার্য্য-স্থল ছেড়ে আসবার বড় সুযোগও হয় না, তেমন ছুটীও বড় পায় না। ছুটী নিলে নব'র যথেষ্ট লোকসান হয়। কিন্তু পত্নী—বিন্দুমতীকে নিয়ে বেচারা বড়ই মুস্কিলে পড়েছে। বিন্দুর শালুকপুরে কিছুতেই শরীর ভাল থাকে না। আশ্বিন মাস থেকে ম্যালেরিয়া ধরে—আর বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত তার ধাক্কা সামলাতে যায়। কাযেই সে সময়টা বিন্দুর শালুকপুরে থাকা কোনমতেই চলে না। নব চাটুয্যে বড় বংশের ছেলে;—জ্ঞাত-কুটুম তার অনেক, কিন্তু পার্টিশন হবার দরুণ আপনার লোকেরা পাশা-পাশি কিম্বা (পাঁচীল দিয়ে) পৃথক করা এক বাড়ীতে থাকলেও কেউ কারও খবর রাখে না! নব'র একটি সম্বন্ধী ছিল;—নাম তার—ভুবন। ১৬।১৭ বছর বয়স। নব'র স্ত্রী বিন্দুমতীকে তারই রক্ষণাবেক্ষণে কল্‌কেতায় রেখে নব নিশ্চিন্ত হয়ে চাকরীস্থানে থাকতো। ছেলেটি আই, এ পোড়তো,—দিদির কাছেই থাকতো। নব কল্‌কেতার বাড়ীতে ঝি, চাকর, বামুন, সবই রাখিয়ে দিয়েছিল; মধ্যে মধ্যে শালুকপুর থেকে দু'দশ দিনের ছুটী নিয়ে কল্‌কেতায় আস্‌তো। বিন্দুমতী, বোশেখ মাসে ভুবনের কলেজে গ্রীষ্মের ছুটী হ'লে, ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে শালুকপুরে স্বামীর কাছে যেতো। আবার কলেজ খুল্‌লে—ভুবন কলকেতায় ভগ্নীপতির বাড়ীতেই চ'লে এসে পড়া-শুনো করতো, থাকতো—খেতো—শুতো! ঝি-চাকর ত ছিলই, সুতরাং দুঃখী পিতৃ-মাতৃ-হীন অনাথ বালক "ভুবন" মাতৃস্বরূপিণী জ্যেষ্ঠার আশ্রয়ে পরম সুখেই বাস করত। ঠিক আশ্বিন মাসের গোড়ায় নব বিন্দুমতীকে কল্‌কেতায় রেখে আস্‌তো। বিন্দুমতীর দুরদৃষ্ট, গত বৎসর প্রাণের ভাইটি তার ব[illegible]

রোগে মারা পড়েছে। বিন্দুমতী এমন শেলাঘাত এ জীবনে আর কখনও পায়নি। নব তাই মহা চিন্তিত—কার তত্ত্বাবধানে বিন্দুকে এখন কল্‌কেতায় রাখে!

দিন তিন চার মামা-মামীর অনুরোধে নব পাকুই গাঁয়ে সস্ত্রীক মামার বাড়ীতে যাপন কল্লে। বিন্দুমতীর ব্যবহারে "পোন্‌-মশাই", গৃহিণী,—এমন কি, সতীনাথ পর্য্যন্ত এমন মোহিত হয়ে পড়্‌লো যে, কেউ আর তাকে ছাড়তে চায় না। বিশেষতঃ সতীনাথ ছু চার দিনের মধ্যে বৌদিদির এত "ন্যাওটা" হয়ে পড়্‌লো যে, তা আর বল্‌বার কথা নয়। নবকে ব'লে—"দাদা,—বৌদি এখানেই থাকুন্‌ না! পাকুই গাঁয়ে ত ম্যালেরিয়া নেই!" বিন্দুকে ব'লে—"তুমি দিন কতক এখানে থেকেই দেখ না বৌদি! যদি তোমার এতটুকু কষ্ট হয়—কি সেবার ত্রুটি হয়, তা হ'লে আমাকে ধ'রে জুতো-পেটা কোরো!"

"মেয়েমানুষ ত জুতো পরে না ঠাকুরপো যে, দেওরকে পেটবার সুবিধে হবে" বলেই বিন্দু সরল সুধাময় হাসিতে "পোন্‌-মশাই"য়ের বাড়ী যেন আলোকিত ক'রে ফেল্লে! সতীনাথকে দেখে পর্য্যন্ত প্রাণতুল্য ছোট ভাই ভুবনটিকে কেবলই বিন্দুর মনে পড়তে লাগলো। ছুজনের একই বয়স। মুখের চেহারা তফাৎ হলেও, দেহের গড়ন, গায়ের বর্ণ—ভুবনের সহিত সতীনাথের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে ব'লে বিন্দুমতীর মনে হয়। তাই সতীনাথকে বিন্দুমতীর এত অল্প দিনে এত আপনার লোক ব'লে মনে ধরেছে!

আর সতীনাথ? বিন্দুমতীর মত এমন সুন্দরী, (যাকে বলে, নিখুঁত সুন্দরী রমণী) এমন লেখাপড়া জানা "বিদুষী", এমন রসিকা, এমন সদানন্দময়ী হাস্যপ্রতিমা, সে কেবল উপন্যাস আর মাসিক পত্রিকার গল্পেই পড়েছে; কিন্তু চক্ষুতে ইতঃপূর্ব্বে আর—অন্য কোথাও কখনও দেখেনি! আজ সেই মানস-প্রতিমা—সেই নবযুগপ্রবর্ত্তক—নবপ্রেমের প্রেমিক ঔপন্যাসিকদের কল্পনার "রঙ্গিলা ছবি"—সেই "প্রেমিকা বৌদিদি—" সেই সভ্য জগতের সেই "উড়ু উড়ু ভাবাপন্ন" নবীন ছোকরা বাবুদের প্রণয়সম্ভাষণযোগ্য সেই "বৌ-ঠান" তার সম্মুখে!

৫

কল্‌কেতায় সতীনাথকে ভুবনের স্থলাভিষিক্ত ক'রে নব চাটুয্যে বিন্দুমতীকে রেখে নিশ্চিন্ত কার্য্যস্থানে চ'লে গেলেন। পোন্‌মশাই এবং তাঁর ব্রাহ্মণী ভাগ্নে নব'র সঙ্গে ছেলেকে কল্‌কেতায় লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়ে দিয়ে জ্বালাতনের হাত থেকে নিস্তার পেলে। সতীনাথ গাঁয়ে আর একদমই যেতে চায় না। ছেলে দেশে না এলে বাপ-মার মনে কষ্ট হয় বটে; কিন্তু দেশে ছেলের কেলেঙ্কারী দেখার চেয়ে সে কষ্ট বরং সহস্র গুণে ভাল, "পোন্‌-মশাই" মনে মনে এই রকম বিচার ক'রে নিশ্চিন্ত থাকেন, ব্রাহ্মণীকেও বোঝান। "পোন্‌-মশাই" সস্ত্রীক মাঝে মাঝে কলকেতায় গিয়ে ভাগ্নের বাড়ীতে দুচার দিন থেকে আসেন। ছেলে দেশেও ফিরতে চায় না,—বিয়েও করতে চায় না।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলকেতায় এলে হঠাৎ তার চাল-চলন কেমন অদ্ভুত রকমের বদ্‌লে যায়। লোকে বলে, সেটা না কি কলকেতার মাটী এবং জল-হাওয়ার গুণ। সতীনাথেরও আগাপাশতলা সমস্তই বদ্‌লে গেছে। "তরুণ সাহিত্য বা ছাগ সাহিত্যের" উপন্যাসরাশি পাঠে "অবাধ" প্রেমের পাথারে সাঁতার দিয়ে সতীনাথ সর্ব্বক্ষণই অবাধ প্রেমের স্বপ্নে তন্ময়। তার বাহ্যচৈতন্য যেন লোপ পেয়েছে। পল্লীগ্রামে ব'সে এ সকল উপন্যাস পাঠের সৌভাগ্য তার হয়নি—এ সকল প্রেমকাহিনীর লীলা-বৈচিত্র্যে সে পাগলপারা আত্মহারা হয়ে উঠলো! সতীনাথ প্রত্য[illegible]াপ কামায়, সামনের চুল নাকের ডগা পর্য্যন্ত লম্বা রেখে, সেটাকে উল্টে পেছন দিকে মেয়েদের মত "পাট" ক'রে [illegible]ল তাতে সোজা সীঁথি কাটে! পায়ের তলা পর্য্যন্ত হাঁটুর কা[illegible] নামানো, তাতে মাল-কোঁচা বাঁধা—পরবার কায়দায় [illegible] ধুতিখানা অনেকটা যেন মুসলমানী পায়জামার মত[illegible] গায়ে একটা গরদের পাঞ্জাবী—ঝুল কোমর থেকে আ[illegible]ঙ্গুল নীচে পর্য্যন্ত। পোষাকের রকম দেখে বিন্দুমতী [illegible]থকে জিজ্ঞাসা করতো, "ঠাকুরপো! এ কোন্‌ দিশী সাজ [illegible]

"একে কি সাজ বলে, জান [illegible]

"না, জানি না,—তাই জিজ্ঞা[illegible]—"

বিন্দু লক্ষ্য করেছে—সতীনা[illegible]কাল তাকে "বৌদিদি" না ব'লে—"বৌঠান" ব'লে ডা[illegible] বিন্দু মনে মনে হাসে—কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

"একে কি সাজ ব'লে, [illegible] বৌঠান? একে বলে 'স্বাধীন সজ্জা।'

"স্বাধীন সজ্জা? তার মানে

"মানে কি তোমায় ব'লে দিতে হবে, বৌ-ঠান্? এ সাজে পুরুষের অবাধে সর্ব্বত্র গতি।"

"লাটসাহেবের দরবারে?" ব'লে বিন্দু খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো!

"তার চেয়ে দুরভিগম্য স্থান আছে—বৌ-ঠান্। সে স্থান বড় সুখের, বড় আরামের, বড় আনন্দের!"

"পরীস্থান বুঝি? রাম রাম, অমন কাযও কোরো না! পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেলে আর তোমায় খুঁজে পাওয়া যাবে না!"

একটু খোলাখুলি ভাবেই প্রেমিক সতীনাথ বিদ্রূপের ছলে বিন্দুকে বল্লে, "পরীস্থানেই ত আটক প'ড়ে আছি, বৌ-ঠান্! এ স্থান ছেড়ে যাব সে দিন, যে দিন মহাপ্রস্থানে যাবার ডাক্ পড়বে।"

"ষাট্-ষাট, বালাই! বালাই! অমন কথা বোলো না, ঠাকুর-পো! জন্ম জন্ম বাপ-মা'র কোল-জোড়া হয়ে বেঁচে থাক,—আমরা দেখে সুখী হই—" বলেই মৃত সোদরের কথা মনে ক'রে বিন্দুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে ফোঁটাকতক জল পড়লো! কিন্তু সতীনাথ বুঝ্লে অন্য রকম! একটা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ "বৌ-ঠানের [illegible]পানে চেয়ে সতীনাথ অন্যদিকে চ'লে গেল। কি এক নূতন র[illegible]মর ভাবনার ঘোর অনিদ্রায় সতীনাথের সে রজনী প্রভাত হ'ল[illegible]ক জানে কিসের ভাবনা! কিন্তু এই রকম ভাবনায় আজকাল [illegible]তীনাথ যখন তখন মগ্ন হয়!

বিন্দু থিয়েটার দে[illegible] বড্ড ভালবাসে। সতীনাথ বলে—"কি সমস্ত অশ্লীল থিয়ে[illegible]থতে যাও, বৌ-ঠান্! তার চেয়ে চল, বায়স্কোপ্ দেখে [illegible]ক্।"

বিন্দু কিছুক্ষণ অব[illegible]য়ে রইল!—ব'ল্লে, "থিয়েটারে, বিশেষতঃ বাংলা থি[illegible]র অশ্লীলতা কোথায় দেখলে, ঠাকুরপো?"

"অশ্লীলতা নেই? [illegible] নিয়ে যেখানে কাণ্ড-কারখানা, সেখানে শ্লীলতা থাকে [illegible]?"

এ কথার ওপোর [illegible] তর্ক চলে না। সতীনাথ বল্লে, "এক দিন একটা [illegible]কের অভিনয় দেখতে গিছলুম বৌ-ঠান্, জানলে? [illegible]ন একটা বেশ্যাবাটীর দৃশ্যে, দুটো বয়াটে ছোঁড়া [illegible]সিকতা আর ইয়ারকি কচ্ছে যে, বাপ-বেটায় এক[illegible]কাণে শোনা যায় না, চোখে [illegible] আমি তা[illegible]ড় উঠে আসতে পথ পেলুম না!"

বিন্দুমতী বল্লে, "হ'তে পারে,—দৃশ্যটা ঠাকুরবাড়ী নয়, বেশ্যাবাড়ী! সেখানে ত আর ভাগবত পাঠ হ'তে পারে না; হয় ত দুটো বখামি ইয়ারকির কথা কয়েছে। কিন্তু এমন অশ্লীল কথা নিশ্চয় কেউ রঙ্গমঞ্চে কখনও কইতে পারে না, যা শুনলে ভদ্রলোকেরা কাণে আঙ্গুল দিয়ে উঠে আসে। এ রকম নাটকই বা কোম্পানীতে অভিনয় করতে দেবে কেন? আমি ত অনেক নাটকের অভিনয় দেখেছি, কৈ—তুমি যে রকম ভাবে তাদের ব্যাখ্যানা কোচ্ছো, অতদূর ইতরোমি বাংলা থিয়েটারে কখনও হ'তে দেখি নি!"

বিন্দুমতীর কথা শুনে একটু যেন হতাশ হয়ে সতী-নাথ বল্লে, "তোমার সরল প্রাণ, বুঝলে বৌ-ঠান্, তুমি সে সকল কথার চাপা মানে ত বুঝতে পার না! আর এই যে এক দঙ্গল বেশ্যা রকমারি সাজ-গোজ ক'রে অঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে, এর চেয়ে অশ্লীল যে পৃথিবীতে কি হ'তে পারে, আমি ত ভেবে ঠিক করতে পারি না, বৌ-ঠান্! নাচ দেখতে হয় ত বায়স্কোপে চল,—এমন সব চমৎকার সাহেব-মেমেদের নাচ দেখতে পাবে যে, তুমি জীবনে কখনও ভুল্তে পারবে না!"

"তাণ্ডব নাচ?"

"তাণ্ডব নয় বৌ-ঠান, তাকে বলে 'বল্ ড্যান্স্'! চমৎ-কার! জোড়া জোড়া সাহেব-মেম—মুখোমুখী হয়ে হাত ধরা-ধরি করে, বুকে বুক মিশিয়ে কি সুন্দর নাচে, তুমি দেখ নি?"

"না ভাই, দেখিনি! তা সাহেব মেমেদের বল বেশী, তারা জোড়ে জোড়ে তাই 'বল্ নাচ' নাচে! আমাদের এটা দুর্ব্বলের দেশ, এখানে ঐ দুর্ব্বলের নাচই ভাল। ও রকম 'বল্ নাচ' আমাদের কি ধাতে সহ্য হবে, ভাই?"

৬

"কি পড়ছো বৌ-ঠান্?"

"বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী!"

"ছি ছি বৌ-ঠান্, তুমি এমন রূপসী বিদুষী—"

"পাপীয়সী—রাক্ষুসী! ব'লে যাও, ব'লে যাও, ঠাকুরপো!" ব'লেই আপনার রসিকতার আনন্দে বিন্দুমতী আপনিই হেসে ঢ'লে পড়লো!

"কোন্ মুক্ষু তোমাকে পাপীয়সী বল্তে পারে, বৌ-ঠান্! তুমি হ'লে স্বর্গের কুসুম, অনাঘ্রাতা, উপেক্ষিতা, দলিতা—"

"তার মানে ?"

বিন্দুমতী সতীনাথের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল !

"রাগ কোরো না বৌ-ঠান্ ! তুমি উপেক্ষিতা— দলিতা বল্‌ছি কেন, তা জান ?"

"না—" বলেই বিন্দুমতী গম্ভীর হয়ে ঠাকুর-পোর মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল ! "তোমার মত অমূল্য

"বঙ্কিমচন্দ্র কেন যে উপন্যাস লিখে ধাষ্টামো করতে গেছলেন, তা তো জানি না !"

[illegible]ত্রকে ফেলে নব-দা কি সুখে কোন্ প্রাণে বিদেশে প'ড়ে থাকে ?"

"নইলে পেট চল্‌বে কিসে ? আর আমাকে কি তুমি সেই-[illegible]নে ম্যালেরিয়ার ভুগে ভুগে মরতে বল ? বাঃ—ঠাকুর-পো, আমায় তুমি খুব ভালবাসো দেখছি !"

"তোমায় আমি কত ভালবাসি, বৌ-ঠান্,—যদি সুযোগ হয়, এক দিন বোঝাব !"

"ও বাবা, সময়-সুযোগ না হ'লে বুঝি বৌ-দিদিকে (দুর হোক্ গে ছাই—) বৌ-ঠান্‌কে ভালবাসা বোঝানো যায় না, ঠাকুর-পো ? তা হ'লে সে ত দেখ্‌ছি বড় সর্ব্বনেশে ভালবাসা !"

"না না, সে ভালবাসা হ'ল পবিত্র—বাস্তব ! আসল খাঁটি মনস্তত্বের ওপোর তার ভিত্তি !"

"কোন রকম অশ্লীল-টশ্লীল নয় ত ভাই ?"

"ছি ছি, সে ভালবাসা আগা-গোড়া শ্লীল-তায় পরিপূর্ণ ! সে এই নবযুগের ভালবাসা !"

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বিন্দু জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, "তুমি মৃণালিনী পড়েছ, ঠাকুরপো !"

"বহুকাল আগে পড়েছি। এখন বঙ্কিম-চন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মাইকেল, নবীন সেনের বই পড়লে আমার হাসি পায় ! ও সব বই আমি আর ছুঁই না !"

"বল কি ঠাকুর-পো ! বঙ্কিম বাবুর বই পড়লে তোমার হাসি পায় ? এই তুমি 'প্রেম-প্রেম' ক'রে এত পাগ[illegible] হয়ে বেড়াও, আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস [illegible]ড়তে তোমার ভাল লাগে না ?"

খুব গম্ভীর হয়ে [illegible]তীনাথ বিজ্ঞের মত বল্‌তে লাগ্‌লো, "[illegible]কাল মনস্তত্বের ওপোর যে সব উপন্যাস বে[illegible] একবার খানকতক যদি পড় বৌঠান্, [illegible] মৃ[illegible]ল আমার মত তুমিও 'মৃণালিনী', 'চন্দ্র[illegible] 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষ-বৃক্ষ' প'ড়ে হাস্‌বে [illegible]ঙ্কিমচন্দ্র কেন যে উপ-ন্যাস লিখে ধাষ্টা[illegible]তে গেছলেন, তা তো জানি না ! আস[illegible] পদ্ম [illegible] যে কি জিনিষ, কি থেকে সত্যিকার [illegible]াড়ায়, কোথায় আর কিসে যে প্রেমের [illegible]তি, এ যাঁর বোঝ্‌বার শক্তি নেই, তাঁর প্রেমের উপন্য[illegible]খা কেন ? আরে, ঐ "প্রতাপ-শৈবলিনীর" প্রেম [illegible]ন্তটা করেছিলেন বেশ ! সব মাটী কল্লে প্রতাপের ঐ [illegible]একটা বিদ্‌ঘুটে চরিত্র ক'রে ! এঁ্যা, কি কল্লে বল [illegible]-ঠান্ ? শৈবলিনীটা প্রতাপের জন্যে ঘর থেকে [illegible]য়ে পোড়লো ! বেশ

মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে দেখলে এ পর্য্যন্ত বেড়ে চলেছে! আর ঐ প্রতাপ বেটা, নচ্ছার, বদমায়েস্, মুক্খু, গোঁয়ার, সে কি না অমন সুযোগ পেয়ে—শৈবলিনীকে একা নিজের ঘরে পেয়ে—রাত্রিকালে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে দেখে, একটা চুম্বন করা চুলোয় যাক্, তার প্রাণঢালা ভালবাসার প্রতিদানে পাজি ব্যাটা সেই যুবতী প্রেমিকাকে কি না গালাগালি দিলে —অপমান কল্লে? মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে এত বড় বাঁদরামী আর পৃথিবীর কোথায় কেউ দেখেছে—না শুনেছে?"

এই রকম ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে এক একটা স্ত্রীচরিত্র ধ'রে ধ'রে মনস্তত্ত্ববিৎ সতীনাথ এমন ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সেকেলে সেই বুড়ো সাহিত্যিকের খোয়ার করতে লাগলো যে, তার প্রতিবাদ ক'রে একটা কথাও বিন্দুমতীর কইবার শক্তি রইল না!

সতীনাথ নিজে লাইব্রেরী থেকে বেছে বেছে বৌ-ঠানের জন্যে আধুনিক ভাল ভাল উপন্যাস এনে পড়তে দিতে সুরু কল্লে! দু চারখানা উপন্যাস পড়বার পর বিন্দুমতী বল্লে, "ঠাকুরপো! ক্ষান্ত দাও ভাই! আমার উপন্যাস প'ড়ে দরকার নেই!"

"কেন, কেন [illegible]ী-ঠান্! এমন সব চমৎকার-চমৎকার নামজাদা লেখকের উপন্যাস তোমার ভাল লাগছে না?"

"সব লোকের রু[illegible]ত সমান নয়, ভাই! আমার ভাল না লাগলে তোমার[illegible]ত ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, লেখক মশাইদেরও তাতে কিছুমাত্র যাবে[illegible]ব না।"

"বড় দুঃখের বি[illegible]ঠান্, এমন সব বাস্তব (Realistic) জিনিষ তোমার ভা[illegible]গলো না! এই সব বই প'ড়ে সমস্ত বাংলা দেশটা [illegible]কাল মেতে উঠেছে! দেশের ধারা বদ্‌লে গেছে। [illegible]কর মান-সম্ভ্রম হাজারগুণ বেড়ে গেছে—"

সতীনাথের কথা[illegible]দিয়ে বিন্দুমতী হেসে হেসে বল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে, "আর [illegible]পাপ করবার—ব্যভিচার করবার রাস্তাও বেশ সরল আর [illegible]হয়ে উঠ্‌ছে। ভাই-বোনের পবিত্র সম্বন্ধ ঘুচে যাক্, [illegible]ী-খুড়ী-জ্যাঠাই সম্বোধনের কোন মর্য্যাদা না থাকুক, [illegible]লই পরস্ত্রীকে—বন্ধুপত্নীকে কুলের বাহিরে টেনে আ[illegible]র বৌদিদি-ঠাকুরপোর সম্পর্ক স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ হয়ে যাক্, তাতে আর কোন রকম প্রতিবন্ধক যেন না থাকে, এই ত এই সমস্ত ঔপন্যাসিক মহাপুরুষগণের মতলব! মন্দ নয়—মন্দ নয়, ঠাকুরপো! বেড়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে! বাঃ—বাঃ—তবে ত বাঙ্গালী মেয়েরা সব 'মার্ দিয়া কেল্লা'!" এই সব এক নিশ্বাসে ব'লে জোর হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে বিন্দুমতী ঘরের কায কর্ত্তে চ'লে গেল। সতীনাথ বুঝতে পাল্লে না—এটা বিন্দুমতীর (অর্থাৎ তার মানসী প্রতিমা বোঠানের) বিরক্তি না আসক্তির ভাব? এই রকম প্রেমের সে পক্ষপাতিনী কিংবা বিরোধিনী?

পরদিন দুপুর-বেলায় নিজের শোবার ঘরে শুয়ে সতীনাথ তরুণ সাহিত্য-গুরুর উপন্যাস পড়ছিল। বিন্দুমতী ঘরে এসে তার পাঠ্য উপন্যাসখানা দেখে ঘৃণায় নাক-মুখ কুঁচকে ব'লে উঠ্‌লো, "ছ্যা ছ্যা ঠাকুরপো! ও বইখানা ছুঁয়ো না!"

"কেন বৌঠান্? ওখানা ত একেবারে ভয়ঙ্কর মনস্তত্ত্বের উপর লেখা!"

"মাথায় থাক্ তোমার মনস্তত্ত্ব! ছিঃ, ও বই ভদ্রলোকের বাড়ীতে আনে? অ্যাঁ, এ কি কল্পনা রে বাবা! ছোঁড়াটা 'মা' ব'লে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ক'রে ঢুকে তারই সঙ্গে স্বামি-স্ত্রীর মত প্রেম করতে সুরু কল্লে!"

সতীনাথ বিছানায় শুয়ে ছিল, কথা পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বিন্দুমতীকে কাছে বসিয়ে নিজে তার পাশে বেশ ক'রে জেঁকে ব'সে খুব সরলভাবে বোঝাতে লাগলো "সম্পর্ক বা কোন রকম গুরু সম্বোধনে বাস্তব জগতে প্রেমের গতি কিছুতেই রোধ হ'তে পারে না, বুঝলে বৌঠান্! প্রেমের আকর্ষণ হ'ল অত্যন্ত স্বাভাবিক! লৌহ যেমন অন্তরায়শূন্য হ'লে চুম্বককে আকর্ষণ করে, যুবক-যুবতীর প্রেমও ঠিক সেই রকম। কোন-রূপ বাধা-বিঘ্ন মাঝখানে না থাক্‌লে প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনে মিলিত হবেই হবে। কোন কোন স্থলে এমনও দেখা যায়, শত অন্তরায় বিদ্যমান থাক্‌লেও তা ভেদ ক'রে প্রেম জোর ক'রে তার নিজের পথ প্রস্তুত ক'রে নেয়।"

"কিন্তু সেটা কি ভাল, ঠাকুরপো? এ ব্যাপারটা হ'লে সমাজে—সংসারে শৃঙ্খলা থাক্‌বে কেন, ভাই? সব যে একাকার হয়ে পড়বে! এই যে সে দিন একখানা উপন্যাস পড়ছিলুম,—ভদ্রলোকের বাড়ীর বৌ—কুলের কুলবধূ সদ্যোবিধবা, অম্লান-বদনে কচি দেওরটিকে সঙ্গে নিয়ে কুলত্যাগিনী হ'ল! দেওর

বেচারা ভয়ে যত শিঁটকে যায়, পাপিষ্ঠা বৌদি তত তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে চেপে ধরে!"

শুনতে শুনতে সতীনাথের বুকের ভিতরটা গুর্-গুর্ ক'রে উঠ্‌লো, মুখের ভিতরটা শুকিয়ে "আটা বাট্‌তে" লাগ্‌লো! ভাঙ্গা গলায় কাঁপানো আওয়াজে সতীনাথ বল্লে, "তা ধল্লেই বা!"

একগাল হেসে বিন্দুমতী বল্লে, "ধল্লেই বা! বেশ ত, ঠাকুরপো! এই রকম বর্ণনা পড়তে পড়তে আমারই যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়,—হা-হা-হা—ও কি ঠাকুরপো? উপুড় হয়ে শুয়ে পোড়লে যে? পাঁচটা বেজে গেল! কখন্ বায়স্কোপে যাবে?"

"চল" ব'লে কম্পিত দেহে শুষ্কমুখে সতীনাথ বিছানা ছেড়ে উঠে খানিকক্ষণ বিন্দুর মুখপানে চেয়ে রইল! পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ব'লে ফেল্লে, "উঃ—বৌ-ঠান্ তুমি আমার—"

বিন্দুমতী একটু অপ্রস্তুত হয়ে অথচ সেই রকম সরল হাসি হেসে বল্লে—"ভয় নেই—ভয় নেই—ভয় নেই, ঠাকুরপো! তোমাকে আমি টেনে নিয়ে কুলের বাইরে যাব না। আর আমার যাবারও কোন দরকার কখনো হবে না! হা-হা-হা!!" ব'লে আবার সেই সরল প্রাণের সরল হাসি!

সতীনাথ মর্ম্মে মর্ম্মে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে লাগলো!

৭

"এ কি ঠাকুর-পো? ও কোথায় নিয়ে বসাচ্ছ—ও যে পুরুষদের যায়গা!" বলেই বিন্দুমতী ঘোম্টা টেনে বায়স্কোপ-বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

"আঃ, এখানে গোলমাল কর কেন, বৌ-ঠান্? যায়গায় ব'সে যা বল্‌বার হয় বোলো—" বলেই বিন্দুর হাত ধ'রে অতি সমাদরে সতীনাথ একখানা চেয়ারে তাকে বসালে এবং নিজে ঠিক তার পাশে বোস্‌লো। সেই রকম ঘোম্টা টেনে বিন্দু চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কল্লে, "এখানে কি মেয়েদের আলাদা বস্‌বার যায়গা নেই?"

"না।"

মিথ্যা কথা বলে সতীনাথ বিন্দুর কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা কল্লে।

"তবে এ বায়স্কোপে এলে কেন, ঠাকুরপো?"

"এইটেই হ'ল ভাল বায়স্কোপ! আরে, ঘাবড়াচ্ছ কেন, বৌ-ঠান্? তুমি কি একা স্ত্রীলোক এখানে আজ নূতন এসেছ? ঐ দেখ, চাদ্দিকে তোমার মতন ভদ্রমহিলারা সব বসেছেন। তুমি এমন ছেলেমানুষি ক'চ্ছ কেন? ছিঃ—! কোনো ভয় নেই—ঘোম্টা খোলো! এখন আর সে দিন নেই যে, এক জন স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষরা সব হাঁ ক'রে তার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌বে! আর একটু পরেই চাদ্দিক অন্ধকার হবে—"

ভয়ে বিন্দুমতীর প্রাণ শুকিয়ে গেল! বেচারার মনে হ'ল—"কি মহাপাতকই করেছি! আজকের দিনটা কোন মতে নিষ্কৃতি পেলে হয়,—আর জীবনে স্বামী ছাড়া কারও সঙ্গে কোথাও যাব না!"

বায়স্কোপ সুরু হ'ল। এক একটা দৃশ্য হয়, আর তন্ময় হয়ে সতীনাথ বিন্দুমতীকে বলে, "কি সুন্দর—কি চমৎকার দেখছ, বৌ-ঠান্!" বিশেষতঃ যে যে স্থানটা প্রেমিক-প্রেমিকা হঠাৎ আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে প্রেমের আবেগে মুখে মুখ দিয়ে ভীষণভাবে পরস্পরের মুখচুম্বন করে, সেই-খানে সেই সেই দৃশ্যে সতীনাথ বিন্দু[illegible] বলে—"উঃ—দেখছ, বৌ-ঠান্! প্রেমের কি তীব্রতা, কি [illegible]ীরত্ব! একেই বলে যথার্থ প্রেম!"

একটা দৃশ্যে "বল্-নাচ" হচ্ছে! [illegible]মতী দেখ্‌লে, এ নাচ স্বামি-স্ত্রীতে মিলে হচ্ছে না! এ[illegible]ল্ নাচ" পরস্ত্রী-পর-পুরুষের সম্মেলন-আনন্দ! এর স্ত্রী প[illegible] সঙ্গে নাচছে, ওর স্ত্রী তার সঙ্গে নাচছে! সে যে কি [illegible] ব্যাপার,—বিন্দু এই নাচের রকম দেখে শিউরে শিউরে [illegible] লাগলো!

সতীনাথ বল্লে, "ভাল ক'রে—[illegible]য়ে দেখ, বৌ-ঠান্!" বিন্দু বেশীক্ষণ আর সে দিকে চে[illegible]তে পাল্লে না। চক্ষু বুজে চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে ল[illegible] "কতক্ষণে এ নরক থেকে বাড়ী ফিরে যাব!"

বায়স্কোপে সে দিন একটা [illegible]রকমের প্রেমের" চিত্রা-ভিনয় হচ্ছিল! এক জন (Lord [illegible] যেতে যেতে বাড়ী থেকে বহুদূরে [illegible] অচল হয়ে পোড়লো। মোটর[illegible]গাড়ীখানা ঠিক করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ[illegible] কিছুতেই কিছু হ'ল না! অগত্যা মোটরচালক গাড়ী[illegible]

মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় খুঁজতে চ'ল্ল। অনেক দূর চল্‌তে চল্‌তে মেয়েটি রাস্তার এক ধারে ক্লান্ত হয়ে ব'সে পোড়লো! উপায়ান্তর না দেখে মোটরচালক তখন মেয়েটিকে "পাঁজা কোলা" ক'রে নিয়ে চল্‌তে সুরু কল্লে। মেয়েটি মোটরচালকের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে তার মুখচুম্বন কল্লে। প্রেমিক মোটরচালক তার উচিতমত শোধ দিলে। অনেক দূর এসে তারা একটি কাঠুরের কুটীরে আশ্রয় পেলে। মোটরচালক অতি যত্ন ক'রে সেই কুটীরের এক পাশে শয্যা রচনা ক'রে দিলে। নিজের হাতে মেয়েটির জুতো জামা খুলে দিয়ে তাকে পরম আদরে স্বহস্তরচিত শয্যায় শয়ন করিয়ে নিজে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সে মেয়েটি আস্তে আস্তে উঠে ভাবে গদগদ হয়ে মোটরচালকের হাত ধ'রে তাকে সেই শয্যায় শোয়ালে,—তার পর নিজে তার পাশে শয়ন ক'রে একদৃষ্টে তার চোখের পানে চেয়ে, তার মুখে মুখ রেখে, তার হাত দুটি নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে নিজের কোমল একটি হাত বাড়িয়ে কুটীরের আলোটি নির্ব্বাণ ক'রে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সে দৃশ্যের শেষ হ'লো!

যমযন্ত্রণারও অধিক যন্ত্রণা ভোগ ক'রে বিন্দু বায়স্কোপশেষে উঠে পড়লো। বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে সতীনাথ বিন্দুকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কেমন বায়স্কো[illegible] দেখলে, বৌ-ঠান্‌?"

"চমৎকার! ভদ্র[illegible]কের মেয়েছেলে এই রকম ছবিই ত দেখবে!"

"নিশ্চয়। এতে [illegible]বার জিনিষ কত আছে বল দিকি, বৌ-ঠান্‌!"

"আগা-গোড়াই [illegible]শিক্ষা! অশ্লীলতার নামগন্ধ নেই, কি বল ঠাকুর-পো?"

"রামঃ! অশ্লীলতা [illegible] আস্‌তেই পারে না। কি রকম মনস্তত্বের কাণ্ড-কারখ[illegible] যেন প্রেমের নন্দনকানের ব্যাপার!"

সতীনাথের শ্লীল[illegible]র বহর দেখে বিন্দুমতী নির্ব্বাক হয়ে রইল।

সতীনাথ বুঝলে—[illegible] জলন্ত চিত্র দেখে বৌ-ঠানের প্রাণ আজ বেজায় ঘা[illegible]গেছে। কিছুক্ষণ দুজন নীরব থাক্‌বার পর গম্ভীরভাবে [illegible]নাথ ডাক্‌লে—"বৌ-ঠান্‌!"

"কি?"

বিন্দুমতী যে দ[illegible]য় পেয়েছে, তা তার কথার আওয়াজেই বেশ স্পষ্ট [illegible]য়।

"তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে—"

বিন্দুমতীর বুকের ভিতরটা সত্যিই ভয়ে কেঁপে উঠলো। কিন্তু প্রাণের ভয় চাপা দিয়ে সাহস ক'রে বিন্দু বল্লে,—"ও কি ঠাকুরপো? আমাকে কি রোহিণী মনে ক'রে গোবিন্দলালের মত গুলী করবে নাকি—" ব'লে জোর ক'রে বিন্দু একটু কৃত্রিম হাসি হেসে উঠলো!

কম্পিতকণ্ঠে সতীনাথ বল্লে—"ঠাট্টা নয়, বৌ-ঠান্‌! সত্যি তোমার সঙ্গে আমার খুব কতকগুলো দরকারি কথা আছে—" বলেই সতীনাথ বিন্দুর হাত ধ'রে ফেল্লে। সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিন্দু গম্ভীর হয়ে বল্লে,—"ছিঃ ঠাকুর-পো, বৌ-দিদির গায়ে হাত দিতে আছে কি?"

হঠাৎ সতীনাথের যেন চমক্ ভাঙ্গলো! সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পোড়লো!

বিন্দু সতীনাথকে হঠাৎ নীরব দেখে মনে মনে বাড়াবাড়িরও কিছু আশঙ্কা ক'রে তাকে স্তোক দিয়ে বল্লে, "এখানে আর গাড়ীর ভিতর কেন, ঠাকুর পো! এই ত বাড়ীতে এসে পড়লুম! যা বল্‌বার হয়, বাড়ী গিয়ে বোলো!"

সতীনাথ মৃতদেহে যেন প্রাণ পেলে।

গাড়ী থেকে নেমেই বিন্দুমতী তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়ে হাঁফ ছাড়লে!

রাত্রি প্রায় ৯টা বাজে। সতীনাথ খানিকক্ষণ বাইরের ঘরে ব'সে ব'সে কি ভাবলে। প্রাণের ভিতর তার প্রলয়ের ঝড় বয়ে যাচ্ছে! সতীনাথ কোন কথা না কয়ে, রান্নাঘরের দিকে না গিয়ে—সটান বিন্দুমতীর শোবার ঘরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘর অন্ধকার। বোধ হয়, আলো নিবিয়ে বিন্দুমতী খাটের ও-পার শুয়ে বিশ্রাম কচ্ছে। বিন্দুমতীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ সতীনাথের কাণে গিয়ে পৌঁছুলো। "বৌ-ঠান্" ব'লে সতীনাথ ঘরের ভিতর প্রবেশ কল্লে।

সতীনাথ বুঝলে—"স্ত্রীলোকের বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না!" উন্মত্ত সতীনাথ বিছানার এক ধারে কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়লো! আবার ডাকলে—"বৌদিদি! বৌঠান! বিন্দুমতী!" বিন্দুমতী তবুও নিরুত্তর!

সতীনাথ আর ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে পাল্লে না!—"উঃ—প্রাণ যায় বৌঠান্—" বলেই শয্যায় শায়িতা বিন্দুমতীর বুকের উপর প'ড়ে তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধ'রে প্রেমান্ধ হয়ে, তার মুখচুম্বন ক'রে ফেল্‌লে!

"ওরে সতে—ষ্টুপিড্—ছাড়্—ছাড়্—আমি—আমি—"

খিল খিল ক'রে হেসে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আলোর সুইচ্‌টা টেনে দিয়ে বিন্দুমতী ব'লে উঠলো—"আমি এখানে লুকিয়ে আছি, ঠাকুরপো—বিছানায় খুঁজলে হবে কি ?"

ইলেক্‌ট্রিক্ আলোকে ঘর আলোকিত হয়ে উঠলো।

প্রেমোন্মত্ত সতীনাথ সে তীব্র আলোকে চোখ চেয়ে দেখলে, ঘরের কোণে বৌঠান বিন্দুমতী দেবী প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌ছে,—আর বৌঠান-ভ্রমে যাকে আলিঙ্গনে বেঁধে সে চুম্বন করেছিল, সে তার পিস্‌তুতো ভাই নব-দাদা !

বৌ-ঠান্ ভ্রমে যাকে আলিঙ্গনে বেঁধে সে চুম্বন করেছিল, সে তার পিস্‌তুতো ভাই নব-দা

শ্রী পরি[illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতসরকারের পরলোকগত আইন-সচিব সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত [illegible]পেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার স্থানে বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারল নিযুক্ত হইয়াছেন।

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

মিঃ এস, প্রতাপ

মিঃ এস, প্রতাপ পঞ্জাবের সিভিলিয়ান। শিখ-বংশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার পিতার নাম লেফটানেণ্ট কর্ণেল হীরাসিং। তিনি সম্প্রতি দিল্লীর ডেপুটী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। এ পদে ভারতীয় নিয়োগ এই

কংগ্রেস

এবার কলিকাতা মহানগরীতে কংগ্রেসের ত্রিচত্বারিংশ অধিবেশন হইতেছে। যে পুণ্যক্ষণে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরে উহাকে মূর্ত্তিদান করিয়াছিলেন, সেইক্ষণ হইতে আজ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরের অধিককাল দেশের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করিয়া আসিতেছে। আরম্ভ কত সামান্য, অথচ আজ পুষ্টি ও পরিণতি কত বৃহৎ! ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন ভাগ্যবিধাতা লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসকে লক্ষ্য করিয়া উপেক্ষাভরে ইহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রেক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। আর আজ? আজ শাসক জাতির মধ্যে এমন কোন শক্তিধর পুরুষ নাই যে, কংগ্রেসকে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহসী হন। মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে দিন কংগ্রেসকে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে, সেই দিন হইতে ইহার দুর্জ্জয় শক্তি কাহারও উপেক্ষার বিষয় হয় নাই।

এ যাবৎ কলিকাতা মহানগরীতে ৯ বার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; এইব দশম অধিবেশন। সুতরাং কলিকাতাবাসীর পক্ষে কংগ্রেসে অভ্যর্থনা এই নূতন নহে। সেই অভ্যর্থনারও বিপুল াজন হইয়াছে। কড়েয়া অঞ্চলের পার্কসার্কাস পল্লীতে শবন্ধু নগরের' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিরাট বস্তী ধ্বংস করি মৃপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যাহাকে ময়দানে পরিণত করিয়াছিল, স-কর্ম্মীরা সেই স্থানে স্বপ্নে গড়া পল্লীরাজ্যের রাজধানীর ম বিরাট নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উহারই নাম দেশবা । নগরের মধ্যে সুপ্রশস্ত সুন্দর সুন্দর পথ, দুই অং ি প্রতিষ্ঠান, একটি প্রদর্শনীক্ষেত্র, অপরটি কংগ্রেস মণ্ডপ রের জল, বায়ু, আলোক, বাজার, হাট, ডাক, তার, য াচ প্রভৃতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যতদূর সুব্যবস্থা হইতে পা হার আয়োজনে প্রাণপণ করা হইয়াছে। এ জন্ত যে ক বিভাগ সমূহ সৃষ্টি করা হইয়াছে, নানা বিভাগের উপর কর্ত্তব্যের ভারার্পণ করা হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতি আ তিথি সজ্জনের, নিখিল ভারতীয় নেতৃগণের এবং দর্শক গণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে যথাসম্ভব তৎপর হইবার ত হইতেছেন। ফল কথা, এই নগর প্রতিষ্ঠায় দেশবাসী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে এ দেশে যে গঠনকার্য্যে যোজপ্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহা প্রতিপ অস্বীকার করিতে পারেন না।

বিংশতি সহস্র লো ত অনায়াসে আসন গ্রহণ করিতে পারেন, এমনই ভাবে ণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। মণ্ডপের গ্যালারি থাকি বক্তৃতামঞ্চ হইতে এই বিরাট মণ্ডপের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ বক্তৃগণের ক... শুনিতে পান, তাহার জন্ত যন্ত্রাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মণ্ডপের দক্ষিণাংশে সভাপতির আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড মঞ্চের উপর অভ্যর্থনা সমিতির সদস্তদিগের, মহিলাদিগের এবং বিশিষ্ট অভ্যাগতদিগের আসন থাকিবে।

কংগ্রেসমণ্ডপের পার্শ্বে থাকিবে অভ্যর্থনা সমিতির মণ্ডপ, 'কনভেনসন' মণ্ডপ, সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বিশ্রামগৃহ ও অন্যান্য কংগ্রেস আফিস।

অপরাংশে বহুবিস্তৃত জমীর মধ্যে প্রদর্শনী বসিবে। ইহার প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই দেশবন্ধু হল, তাহার পর নেতৃগণের বৈঠকখানা, ভোজনাগার, প্রদর্শনী কার্য্যালয়। উত্তরদিকে প্রদর্শকগণের আস্তানা, তাহার দক্ষিণে খদ্দর-প্রদর্শনী। দক্ষিণদিকে স্বেচ্ছাসেবকগণের আস্তানা, মহিলা-মহাল, চারু-শিল্পভবন ইত্যাদি। প্রদর্শনীর সাফল্য-লাভের জন্ত উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি হয় নাই। এ দেশের কলজাত বস্ত্র প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বর্জ্জিত হইয়াছে, কেবল খদ্দরই এবার বস্ত্রশিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধী এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাপত্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন, নিখিল ভারতীয় কাটুনি সমিতিও পূর্ণোদ্যমে প্রদর্শনীকে সাহায্য করিতেছেন, ফল কথা, সকল দিকেই সুব্যবস্থা করা হইতেছে।

এবার কংগ্রেসের বিশেষত্ব বিলক্ষণ আছে। দেশের সমক্ষে গুরু সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন আমাদের বরণীয় হইবে, ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। দেশের অধিকাংশ লোক নেহেরু সিদ্ধান্তমত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনকেই বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। তাঁহাদেরও পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য ও কাম্য; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা এইক্ষণেই উহা দেশের পক্ষে লভ্য বলিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় এক দল পূর্ণ স্বাধীনতাকেই লক্ষ্য ও কাম্য বলিয়া মনে করেন এবং উহার ন্যূন কোন নীতিই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত নহে বলিয়া বিবেচনা করেন। এবার কংগ্রেসে এই মতবিরোধের অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য ভারতের স্বার্থের বিরোধী দল ভয় দেখাইতেছেন যে, এই মত-বিরোধ উপলক্ষে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবে, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, যেমন পূর্ব্বেও নানা মত-বিরোধ, হিংসা-দ্বেষ ও কলহ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কংগ্রেস নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে, এবার তেমনই হইবে।

নেহেরু সিদ্ধান্তে হিন্দু-মুসলমান স্বার্থসংঘর্ষের যে মীমাংসার পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে, উক্ত শ্রেণীর মুসলমানের তাহাতে আপত্তি আছে। মুসলিম লীগেরও প্রায় কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় অধিবেশন হইতেছে। তথায় মুসলমান

একমত হইয়া এ বিষয়ে কংগ্রেসের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিবেন, এইরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং এই দিক দিয়াও এবারের কংগ্রেসের উপকারিতা অল্প নহে।

কংগ্রেস এবার সহরে ও মফঃস্বলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে নষ্টপ্রায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার এবং পল্লীকে বাঁচাইবার বিষয়ে বিশেষ যত্নসহকারে বিচার আলোচনা করিবেন, এ আশাও করা যায়। পল্লী না বাঁচিলে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে ফল কি?

দেশের নষ্টশিল্পের উদ্ধারসাধনে, বেকার-সমস্যার সমাধানে নারীধর্ষণ নিবারণে এবং অন্যান্য দেশহিতকর স্বাস্থ্যশিক্ষাদি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে আমাদের বর্ত্তমানে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, আশা করা যায়, কংগ্রেস সেই পথও দেশবাসীকে দেখাইয়া দিবেন।

প্রাচ্যের যাদুকর

দেশের গৌরব, বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার সার জগদীশচন্দ্র বসুর সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি 'বোস ইনষ্টিটিউট' বাণীমন্দিরে তাঁহার দেশবাসীরা এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। যিনি নিজের প্রতিভাবলে দেশ ও বিদেশে দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, উদ্ভিদজগতে যাঁহার আশ্চর্য্য আবিষ্কার দেখিয়া প্রতীচ্য বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অবনতমস্তক হইয়া তাঁহাকে 'প্রাচ্যের যাদুকর' আখ্যা প্রদান করিয়াছে, তাঁহারই জীবদ্দশায় তাঁহারই দেশবাসী যে তাঁহারই নিকটে শ্রদ্ধাপ্রীতির অর্ঘ্য সাজাইয়া উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহারাই ধন্য হইয়াছে বলিতে হইবে।

কত বাধা-বিঘ্ন, কত সংশয়-বিদ্রূপের নৈরাশ্যজড়িত পথ দিয়া প্রাচ্যের এই মনীষীকে বাণীর সাধনায় সাফল্যলাভ করিতে হইয়াছে, তাহা তাঁহার 'উদ্ভিদের জীবন' আবিষ্কারের ইতিহাস পাঠ করিলেই জানা যায়। কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্যের বিজ্ঞানবিদ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার জীবনের সাধনাকে সফল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আজ জগতের সুদূর প্রান্ত হইতে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মনীষী মহাজনমাত্রেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছেন। রোঁমে রোলা, জর্জ্জ বার্ণার্ড শ, অধ্যাপক গোয়েবেল, সার জন কারমার প্রমুখ জগতের শীর্ষস্থানীয় মনীষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন দেশের শিক্ষাসচিব, মিশরের শিক্ষা-সচিব নাথলা, এল, মোস্তল পাশা, নেপালের মহারাজা, ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান পর্য্যন্ত গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ সার জগদীশের স্বাস্থ্যকামনা করিয়া তাঁহাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। জগতের এমন শ্রদ্ধাঞ্জলিলাভ মানুষের জীবিতকালে অতি অল্পই ঘটিয়াছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এতদুপলক্ষে একটি বিশেষ কবিতা রচনা করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। চীনের শিক্ষাসচিব তাঁহার সম্ভাষণ-বাণীতে বলিয়াছেন,—

"বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের রাজ্যে উন্নীত করিবার জন্য জগৎ আপনার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র এসিয়া আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত।"

রোঁমে রোলার বাণী এইরূপ:—"আমি জগতের অন্যান্য অংশের লোকের সহিত আপনার জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি, অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। অন্যে আপনাকে প্রতিভাবান্ বৈজ্ঞানিক বলিয়া অভিহিত করিতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে ভবিষ্যদর্শী (ঋষি) বলিয়াই ঘোষণা করিব। আপনি নির্ব্বাক উদ্ভিদ্গণের নিকট হইতে তাহাদের গোপন কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহাদের অনন্ত মানসিক ভাষা জানিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের মত যিনি অজানার দেশ জয় করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এখনও এই পরিণতবয়সে যৌবনের উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় হইতে বিচ্যুত হন নাই। এখনও দীর্ঘকাল তিনি ভাবরাজ্যে নিত্য নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিতে থাকুন, ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী ও নীরোগ করুন, ইহাই কামনা।

সাইমন কমিশন

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, সাইমন কমিশন এ দেশের যে কেন্দ্রেই পদার্পণ করিতেছেন, সেই কেন্দ্রে যে ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে, তাহাতে এক দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিকটতা এবং অন্য দি[...]আমলাতন্ত্র সরকারের ইজ্জৎ ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করিব[...]চেষ্টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রদায়গত বৈষম্য ও দা[illegible] উপভোগের অবসরহীনতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ কিরূপে প্রকৃ[illegible]রিপূর্ণ শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে কমিশ[illegible] অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আদৌ পাওয়া যাইতেছে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি, প[illegible]পাঞ্জাব সরকার একটি স্মারকলিপি সাইমন কমিশনের নি[illegible]শ করিয়াছেন। শুনা যায়, এই রচনা-রত্নটি সার ম্যা[illegible]হলি ও সার জিওফ্রে মণ্টমোরেন্সির সম্মিলিত পরিশ্রমের [illegible] সার ম্যালকম এখন যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর এবং শেষোক্ত [illegible]পুরুষ পঞ্জাবের গভর্ণর, কিন্তু স্মারকলিপি রচনাকালে সা[illegible]লকম ছিলেন পঞ্জাবের গভর্ণর এবং সার জিওফ্রে তাঁহার [illegible] কর্ম্মচারী। সার ম্যালকম, সার মাইকেল ওডয়ারে[illegible]্য, এবং সার জিওফ্রে আবার তস্য শিষ্য,—এমনই এ[illegible] পঞ্জাবে প্রচলিত। ইহা সত্য হউক বা না হউক, এ[illegible]ন্তু সত্য যে, এই দুই জন রাজপুরুষ মাথা ঘামাইয়া [illegible]কার স্মারকলিপি রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন স[illegible]বিরোধী খুনা ব্যুরো-ক্রাটেরই যোগ্য বটে। তাঁহারা [illegible]লিপির মারফতে সরকারের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য যে আগ্রহ [illegible]ন করিয়াছেন, তাহা সার মাইকেল ওডয়ারেও সম্ভব হ[illegible]না সন্দেহ।

অবশ্য স্মারকলিপিতে সংস্ক[illegible]নের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই, বরং নানা মিষ্ট কথায় [illegible]সমর্থনই করা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ সঙ্গে উহার জন্ত যে সকল 'রক্ষাকবচ' প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা দেওয়া হইলে সংস্কার নামে সংস্কার থাকিবে বটে, কিন্তু সংস্কারের কায়ার পরিবর্ত্তে দেশের লোক ছায়াই প্রাপ্ত হইবে। অন্তে পরে কা কথা, স্বয়ং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখপত্র 'পাইওনিয়ার' বলিয়াছেন,—

"সার ম্যালকম ও সার জিওফ্রে সমস্ত শাসন বিভাগের ভার মন্ত্রীদিগের হস্তে দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে কয়েকটি 'রক্ষাকবচেরও' ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। এই হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্ত সমস্ত দায়িত্বই পার্লামেণ্টের থাকিবে। পরন্তু ভারতসচিব, সকাউন্সিল বড় লাট এবং গভর্ণরকে হস্তক্ষেপ করিবার নূতন নূতন অধিকার প্রদত্ত হইবে। অর্থাৎ এখন যে ক্ষমতা তাঁহাদের আছে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর স্বেচ্ছাচার-মূলক ক্ষমতা তাঁহাদিগের হস্তগত হইবে। প্রদেশের শাসন-ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিবেন গভর্ণর, তাঁহার মনোনীত সিভিল সার্ভিসের এক জন য়ুরোপীয় সদস্ত এবং মন্ত্রিমণ্ডল। য়ুরোপীয় সদস্তকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা মন্ত্রিমণ্ডলের বা ব্যবস্থা পরিষদের থাকিবে না। য়ুরোপীয় সদস্তকে শাসনের একটি বিভাগের ভার দেওয়া হইবে। গভর্ণরের ক্ষমতা এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে, তিনি সকাউন্সিল বড় লাটেরই মত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, স্থানীয় সরকারের শীর্ষস্থানীয় নিয়মানুগ শাসনকর্ত্তা হইবেন না। তাঁহার এই অবাধ ক্ষমতার বলে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলকে সকাউন্সিল বড় লাটের উপদেশমালা বুঝাইয়া দিবেন।

কেমন সুন্দর দায়িত্বপূর্ণ শাসনের ব্যবস্থা! এই ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রীগুলি যে এখনকার অপেক্ষাও ব্যুরোক্রেশীর ক্রীড়া-পুত্তল হইবেন, তাহ[illegible]য় সন্দেহের অবকাশ নাই। যথার্থ ক্ষমতা এই ব্যবস্থায় ন্যস্ত হই[illegible] গভর্ণর, বড়লাট ও ভারতসচিবের উপর। মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাদের [illegible]ত অনুসারে চলিবেন ফিরিবেন। ইহা কি পূর্ণ স্বায়ত্তশাস[illegible] প্রকৃষ্ট নমুনা নহে? মন্ত্রীরা একই সময়ে একই বিষয়ে [illegible]মেণ্টের বিশ্বাসভাজন এবং ব্যবস্থাপক সভারও বিশ্বাসভাজ[illegible]তে পারেন না। আর যে ভাবের গভর্ণর গঠনের পরা[illegible]ওয়া হইয়াছে, সেই গভর্ণর কোনমতে নিয়মানুগ গভর্ণর [illegible]stitutional) হইতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ঝুনা ব্যু[illegible] শাসকের সংস্কারের সমর্থন কোন্ ধাতুর ও কোন্ প্রক[illegible]াহা ত সহজেই বোধগম্য হইতেছে।

তাহার পর সা[illegible]তার বিকটতা সাক্ষ্যের মধ্য দিয়া কিরূপ ফুটিয়া উঠিতে[illegible] এই [illegible]াহা এক শ্রেণীর মুসলমান সাক্ষীর সাক্ষ্যেই প্রকাশ পা[illegible] যুক্তপ্রদেশের এক জন বলিয়াছেন, "যুক্তপ্রদেশে মুসলম[illegible]ংরাজের পূর্ব্বে শাসকজাতি ছিলেন, হিন্দুরা বিজিত শাসি[illegible] সম[illegible]ছিল। হিন্দুরা ইংরাজ শাসনের আমলে আসিয়া শিক্ষা[illegible] এখন [illegible]ত লাভ করিয়া সরকারী চাকুরী আদি নানা অধিকারে[illegible]ানদিগকে হঠাইয়া দিয়াছে এবং তাহারা যুক্তপ্রদেশে সংখ্যা[illegible] অধিক, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া মিশ্র নির্ব্বাচনাদি[illegible] দিয়া এ দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা আদৌ কর্ত্তব্য ন[illegible]লে এ দেশে হিন্দু-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদপেক্ষা বৃটি[illegible]কাট শাসনও ভাল! মুসলমানরা এই প্রদেশে সংখ্যায় [illegible]উ[illegible]য়া এখন বহুদিন এই প্রদেশে [illegible]লিত রাখা কর্ত্তব্য। সরকারী চাকুরীতেও যোগ্যতার মাপকাঠি খুব কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে হিন্দুরা মুসলমানদিগের মনে কতকটা বিশ্বাস জন্মাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পর আর কিছু করে নাই। সুতরাং হিন্দুদের উপর বিশ্বাস কি? তাহারা ক্ষমতা পাইলে মুসলমানের সমূহ ক্ষতি হইবে।" এই সাক্ষীকে যখন কমিশনের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তাহা হইলে বর্ত্তমান সংস্কার আইনের আর অধিক সংস্কার করা কি এখন কর্ত্তব্য নহে?" তখন তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই। বর্ত্তমান অবস্থায় বরং যে সংস্কার দেওয়া হইয়াছে, তাহাও তুলিয়া লইতে আমরা অনুরোধ করিব।" আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, যে প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা কম, সে প্রদেশেও হিন্দুর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-কেন্দ্র থাকা উচিত এবং হিন্দুদিগকে সরকারী চাকুরীতে বিশেষ-ভাবে গ্রহণ করা উচিত।"

যে কমিশন এই ভাবের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত কি ভাবের হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 'ওয়েষ্টার্ণার' নাম দিয়া কোনও বৃটিশ লেখক এই সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন, তাহা এইরূপঃ—

(১) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে। তবে ব্যবস্থাপক সভার উপর একটি 'মনোনীত' সভা থাকিবে, ঐ সভা সরকারের অননুমোদিত ব্যবস্থা মাত্রই রদ বাতিল করিয়া দিতে পারিবে। অর্থাৎ ভিটোর ক্ষমতা এই সভার হস্তে ন্যস্ত হইবে। সরকারের খয়ের খাঁ দলীয় লোক এই সভায় সদস্য মনোনীত হইবে।

(২) সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন প্রথাই কিছু অদল-বদল করিয়া রাখা হইবে।

(৩) সিভিল সার্ভ্যাণ্টরা মন্ত্রী বা কাউন্সিলের অধীনে আসিবেন না।

(৪) সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ ব্যবস্থা কাগজে কলমেই থাকিবে, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কিছুরই পরিবর্ত্তন হইবে না। পিওন ও পেয়াদার সংখ্যাবৃদ্ধি দেখাইয়া ভারতীয় নিয়োগের নমুনা দেখান হইবে।

(৫) সমর বিভাগে ভারতীয় সেনানী নিয়োগেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে।

(৬) বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে বড় লাট ও তাঁহার কার্য্য-করী সভার পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) রাজস্বের ভার শাসন বিভাগের হস্তেই থাকিবে তবে 'খোঁয়াড়ে গরু আটক রাখা' প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারের অ[illegible] কাউন্সিলের হস্তে দেওয়া হইবে।

(৮) বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথক করা হইবে না।

—

পুলিসের লাঠী

লাহোরে পুলিসের লাঠী চলিবার পর লক্ষ্ণৌ সহরে সাইম[illegible] কমিশনের পদার্পণ উপলক্ষে সেই লাঠীর পুনরভিনয় হইয়াছি[illegible] গত ২০শে অগ্রহায়ণ হজরৎগঞ্জের নিকট অরহাই নামক স্থা[illegible] কমিশন বর্জনকারীদের এক সভা হইয়াছিল। সভায় পরলোক[illegible]

দেশনায়ক লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া মন্তব্য গ্রহণের পর নেতৃগণ এক এক দলে বিভক্ত হইয়া আমিনাবাদের ঐরূপ বিরাট সভায় যোগদান করিবার জন্ম যাত্রা করিতেছিলেন। পথে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নেতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের শোভাযাত্রার লাইসেন্স আছে কি না। নেতৃবর্গ উহার জবাব দিতে অস্বীকার করেন। তাহার পর শোভাযাত্রার উপর লাঠী ও রুলের গুঁতা চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, জনতা নিরস্ত্র ছিল এবং শান্ত ও সংযত ভাবে গমন করিতেছিল। তাহার পর কমিশন যে দিন লক্ষ্ণৌ পদার্পণ করেন, সে দিনও বর্জ্জন শোভাযাত্রার শত শত লোকের উপর পুলিসের লাঠী চলিয়াছিল, পরন্তু অশ্বারোহী পুলিস জনতাকে তাড়া করিয়াছিল, কাহারও কাহারও উপর ঘোড়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ উপলক্ষে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং শ্রীমতী মিত্র আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে স্থানীয় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান যে দিন কমিশনকে ভোজ দিয়াছিলেন, সে দিনও পুলিস লোককে ছাদের উপর হইতে ধরিয়া আনিয়াছিল।

লালা লাজপতের মৃত্যু উপলক্ষে শ্রীমতী বেশাণ্ট থিওজফিক্যাল সোসাইটীর মুখপত্রে লিখিয়াছিলেন,—"যে পশুত্ব মানুষের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সেই পশুত্বই লালাজীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। যদি আজ বল্ডুইন কি ম্যাকডোনাল্ড এই ভাবে পরলোক-প্রয়াণ করিতেন, তাহা হইলে সারা জগতে বৃটিশ জাতি ক্রোধে ঘৃণায় কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। লালাজী লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজা হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি তিনি ভারতীয়। তাঁহার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে ভারতীয়দের অন্তর বিদেশীয় শাসনের প্রতি বিরক্তি ও তিক্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছে।"

পঞ্জাবের কোনও দেশীয় পত্র লিখিয়াছেন,—সাইমন কমিশন রক্তরঞ্জিত পথ দিয়া ভারতে ভ্রমণ করিতেছেন। লাহোর ও লক্ষ্ণৌএ যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাতে এমন কথা নিতান্ত অশোভন হয় না। কিন্তু এ জন্ম দুঃখ বা ক্রোধ প্রকাশের প্রয়োজন কি? বঙ্গভঙ্গের আমলেও পুলিস ও গুর্খার লাঠী অবাধে চলিয়াছিল। তাহাতেও নিরস্ত্র জনতা ও নেতৃবর্গের মাথা ভাঙ্গিয়াছিল। জালিয়ানাওয়ালাবাগেও ডায়ার ওডয়ারের আমলে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী চলিয়াছিল। লাহোরে লালা লাজপৎ রায় লাঠী খাইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌএ জহরলাল খাইয়াছেন। মুক্তিসংগ্রামে এমন ত হইয়াই থাকে। রক্তদানই ইহার প্রথম সোপান।

ভারতবাসীর মন অনেক বারই তিক্ত হইয়াছে, বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিলকের লাঞ্ছনা, গন্ধীর কারাদণ্ড, চিত্তরঞ্জনের অপমান,— এমন ত অনেক ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে! আর এমন অনেক ঘটনাই ঘটিবে। কিন্তু সে জন্ম কি মণ্টেগু কাউন্সিলে সদস্যের অভাব হইয়াছে, না, সাইমন কমিশনের তাঁবেদার কমিটীতে ভারতীয় সদস্যের অনাটন হইয়াছে?

শ্রীমতী বেশাণ্ট উপসংহারে বলিয়াছেন,—"দুর্ব্বলের অশ্রু রাজার সিংহাসনও টলাইয়া দেয়। ইংলণ্ডের জনমত জাগ্রত হউক এবং লালাজীর মৃত্যুর প্রতিশোধ প্রদান করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।" এ দুরাশা কিসে হয়, তাহা ত বুঝিয়া উঠা যায় না। মহামতি বার্ক জলন্ত ভাষায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পাপানুষ্ঠানের কথা পার্লামেণ্টে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কি শাস্তি হইয়াছিল?

পুলিসের লাঠীর প্রতীকার এ সব হাহুতাশে হইবার নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ধারাবাহিক পুলিসের লাঠীর পশ্চাতে কোন এক গুপ্ত ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে হাহুতাশে কি ফল হইবে? তৎপরিবর্ত্তে যদি ভারতবাসী এই অবস্থার প্রতীকারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে, তবেই সুফল পাওয়া যাইতে পারে। অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাইমন কমিশনের সহিত প্রথমাবধি পূর্ণ অসহযোগ করিলে সেই ফল নিশ্চিতই লাভ হইত। আজ লালাজীর মৃত্যু ও পণ্ডিত জহরলাল আদি [illegible]াঞ্ছনার পর পণ্ডিত মতিলাল কমিশনের সহিত সকল সংস্রব-[illegible]মন কি, সামাজিক সংস্রব পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে দেশবাসীকে [illegible]বান করিতেছেন। সংবাদপত্রে কমিশনের কার্য্যাবলীর ([illegible] গ্রহণাদির) সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বি[illegible]নেতৃবর্গের এই পন্থা প্রথমেই অবলম্বন করা উচিত ছিল না? কমিশন কোথাও পদার্পণ করিলে তথায় বর্জ্জন শো[illegible]াদি করিবারই কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমাবধি যদি [illegible] মৃদু কমিশনকে উপেক্ষা করিয়া যাইতাম, তাহা হইলে উ[illegible]ত্বও অনুভূত হইত না। আমরাই ত বর্জ্জন শোভাযা[illegible]য়া উহাকে জাহির করিয়া দিয়া আসিয়াছি। এ পাপের [illegible] আমাদিগকেই ভোগ করিতে হইতেছে।

যুবক-জীবন

১৭
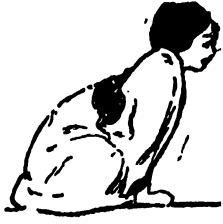
শ্যামাপদর বয়স একুশ, কৃষ্ণনগর সমাজের সান্নিধ্য হ'তে অন্তরে অবস্থিতি মাত্র বৎসরেক; ব্রজমোহনের নূতন বৈঠকখানায় মিনিট দশেক ব'সেই কিন্তু সে বুঝতে পাল্লে যে, এরি মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে রৌদ্রে দিলে ভিজে কাপড় পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুকিয়ে খটখটে হয়ে ওঠে, এটা যেমন বিস্ময়ের বিষয় নয়, উকীল-কুলোজ্জ্বল ব্রজমোহন-ও যে রাতারাতি বসতবাড়ীর চেহারাটা বদলে দেবে, সেটা-ও তেমনি আশ্চর্য্যের কথা নয়। ফটকের চটক, বাগানের বাহার, ড্রয়িংরুমের ঐশ্বর্য্য, বৈঠকখানার সৌন্দর্য্য, আফিস-ঘরের গাম্ভীর্য্য, সব-ই সহজ ও সম্ভব।

এক অস্তাচলাভিমুখী প্রাচীন প্রতিবেশীর অত্যুন্নত গৃহ-প্রাচীরের প্রতিকূলতায় দক্ষিণ চাপা থাকায় আফিস-ঘরটিতে বাতাস ভাল ক'রে [illegible]বেশ করে না। এক প্রাতঃকালে কোনো বিলাত-ফেরৎ ডা[illegible]-বন্ধু বলেছিলেন, This room is as hot as [illegible] oven। ব্রজমোহন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, So it is [illegible] bake my bread here; অর্থাৎ "যখন এই ঘরেই [illegible] আমার রুটী সেঁকে নিই (আহার্য্য উপার্জ্জন করি) [illegible] তুঁহুরের মত গরম হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।"

পরে বন্ধুকে প্র[illegible] দিয়ে বলেন, পড়তি অবস্থা, অনেক দিন মামলা চলছে [illegible]লের রায় হাইকোর্ট থেকে এখনো পার হয় নি, ওদের এই [illegible]কট ছিলেন হরেন বাবু—বোধ হয়, শেষে ভদ্রাসনটা আ[illegible]ড়েই পড়বে।

ডাক্তার সাহেব [illegible] শুনেছি, রজনী পালিত প্রথম অবস্থা ফিরোয়, ওদের [illegible]টা সরিকানি বিবাদ থেকে; ত্রিশ বছর ধোরে তারিণী [illegible]জর দুর্গোচ্ছবের সমস্ত খরচ ঐ পালেরা-ই দিয়ে এসে[illegible]; but you know টাকার টাকা আছে।

ব্রজ। আসতে [illegible] quite true; টাকার লোভ যে লোকে কেন করে, আ[illegible]ত পারি না। আমার যা সামান্য কিছু আছে, তা সমস্ত "হরমোহন-ভাণ্ডারের" নামে লিখে দিয়েছি; দু'বেলা দু'মুঠো খাই মাত্র, নইলে আমি মনে করি না যে, এক পয়সা আমার।

এইরূপ কথোপকথন কোয়াটারখানেক চলবার পর দুই বন্ধুতে একমত হয়ে মন্তব্য প্রকাশ কল্লেন, টাকা ধূলো বই আর কিছু-ই নয়, ধুলো—ধূলো।

ডাক্তার-উকীল আলাপে উভয়ের প্রাণে এই বেদান্ত-দর্শনের পরশ ও কাঞ্চনের সঙ্গে ধূলির তুলনার সংবাদ শ্যামাপদ অবগত ছিল না; অথচ বৈঠকখানার সাজ-গোজ দেখতে দেখতে তার মনে হ'তে লাগলো যে, বৈঠকখানার ভিতরে বারান্দায় দেউড়ির বেঞ্চে ইতর ভদ্র যতগুলি লোক ব'সে আছে, সকলের-ই হাতে এক এক মুঠো ধূলো; ব্রজমোহনের নিজের-ও দু'হাতে দু'মুঠো ধূলো।

সাবেক বৈঠকের ছকে এই ধূলি-ধরা খুঁটির সংস্থাপন সংসারানভিজ্ঞ যুবকের বিষয়চশমাবিহীন চক্ষুতে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ব'লে বোধ হ'তে লাগলো।

আগেকার ছোট বৈঠকখানায় যে ক'টি লোক এসে মিলিত হোতো, তাদের বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্র, দু' তিন জন নবীন আশায় ভাসমান স্বপ্ন-তরী-আরোহী উকীল-মুকুল; বাকি চাকুরে বা অলস প্রতিবেশী। দশ জন শিক্ষিত ভদ্র সন্তান তাঁর নিত্য সঙ্গী, এই আনন্দেই তখন ব্রজমোহন মহা সুখী। যে পুরাতন কুঠুরীটিতে তাঁর পিতামহের আমলে ভজনের ভাবে দেহতত্ত্বের গান হ'ত, সেইখানে মাইকেল, মিল্টন, সেক্স্পীয়ার, গিরিশের কবিতা আবৃত্তি হয়, এতে-ই তাঁর তৃপ্তি। দশ-পঁচিশের যায়গায় কেরোম লুডোর আড্ডা বসেছে, বাতাসা বিলির বদলে চা-বিস্কুট চলছে, এই উন্নতি টুকুতে-ই ব্রজমোহন তুষ্ট। যুবক-সমাগমে, হাসির ধুমধামে, গল্পের গমকে, পরিহাসের উচ্ছ্বাসে প্রাণের অনুরাগ দু'হাতে ক'রে সে-ই মিলন-মজলিসে ঢেলে দিলে-ও ব্রজমোহন মনে মনে আপনাকে অনুগৃহীত ভাবতো। তার পিতা পিতামহ স্বাচ্ছল্য, সচ্চরিত্র ও শিষ্টতা গুণে প্রতিবেশী ও পরিচিত

জনের নিকট সহিষ্ণুতার সম্ভ্রম মাত্র লাভ করেছিলেন, সে ক্রমে শিক্ষিত সমাজের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে; কুঠুরীটি আর আড্ডা বা আখড়া নামে অভিহিত নয়, দুর্লভ ক্লাব উপাধিতে ভূষিত, গৌরবের এই প্রভাত-সৌরভে-ই তার প্রাণ তখন পরিতৃপ্ত।

কিন্তু আজ যে ব্রজমোহন ফরাসের ওপর বার দিয়ে বসেছেন, তিনি আলাদা লোক। "ছিলেন নীত," এখন "নেতা।" গণ্ডায় এণ্ডা দেবার জন্য গায়কদের সঙ্গে মন্দিরে হাতে পিছনে দাঁড়াতেন, এখন চামর হাতে আসরে এগিয়ে শ্রোতাদের আশীর্ব্বাদ করেন; অনুগৃহীত হ'তে অনুগ্রাহক। ড্রয়িং-রুমের মত তাঁর বুকের ভিতর-ও গদিওলা কেদারা পাতা, আর প্রভুত্বের পরিচ্ছদ-পরিহিত তাঁর মন স্ব-রূপে সেই চেয়ারে উপবিষ্ট। মদ খেলে-ই পা ঠিক থাকে না, কথা-ও জড়ায়, ব্রজমোহন পাকা মাতাল, এঁকে বেঁকে চলবার কি বেফাঁস বলবার ছেলে-ই সে নয়; তবু প্রভুত্বের বোতলের মাল গলায় ঢেলে তার যে একটু নেশা হয়েছে, তা শ্যামাপদর মত কাঁচা কলিজিয়ান-ও বুঝতে পাল্লে।

রঙ্গমঞ্চের নক্ষত্র ব'লে যে অভিনেতারা গর্ব্ব করেন, তাঁরা জানেন না যে, তাঁদের গুরুস্থানীয় কত গ্যারিক, গিরিশ বিচরণ কচ্চেন ধর্ম্মের নাট্যশালায়, দাতব্যের উৎসবে, নেতার যাত্রার দলে, বড়লোকের পাদালোকমালার পশ্চাতে। নাট্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদের মঞ্চের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, তাঁদের ভেতরে খুঁজলেই সকলের চেয়ে ভাল অভিনেতা পাওয়া যায়; নটের আয়ে তাঁদের পোষায় না বলে-ই শক্তি গোপন রাখেন। চির-প্রতারিত বিষয়বুদ্ধিহীন ধর্ম্মভীরু বোকার চক্ষু, অধর ও স্বরের অনুকৃতি আয়ত্ত করবার আশায় এক গুপ্ত নটের বুকের কল-ঘরের দরজায় অনেক ধন্না দিয়ে-ও আমি বিফলমনোরথ হয়েছি।

ব্রজমোহনের দ্বারস্থ তিলক-কণ্ঠীধারী দ্বিজপদ-রজো-ভিখারী গোয়ারাম ঠিকাদার অইরূপ চরিত্র-অঙ্কনপ্রয়াসী যে কোনো নাট্যকারের আদর্শ। আমাদের ভাগ্যচক্র দিশি কারখানায় ঢালাই করা, তাই এত কাল সমাজে এমন সব মহাপুরুষের ছাঁচ প্রস্তুত হয়নি, যা থেকে বাঙ্গালী নাট্যকার প্রাচীন গ্রীক আদর্শে রক্ত-করাল ট্রাজিডি বা বর্ত্তমান নরোয়েজিয়ান, রুসিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি কলারস-রঞ্জিত জীবন স্বদেশি-দেহে আরোপিত ক'রে কাঞ্চন অর্জ্জনে ব্যঞ্জনাপ্রয়োগের নৈতিক ব্যবস্থা ও ইন্দ্রিয়গ্রামে জমী বিলির আইনে প্রজাপতির একাধিপত্য বাতিল ক'রে প্রজ-প্রজা উভয়কেই যদৃচ্ছা দান-বিক্রয়ের অধিকার দিয়ে সুখের নাট্যোজ্জ্বল ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

কোনো "বিশেষজ্ঞ" 'প্রফুল্ল' নাটক প'ড়ে বলেছিলেন, গিরিশ ঘোষ অই রাম-লক্ষ্মণ, চৈতন্য-বুদ্ধ-টুদ্ধ-গোছের ছোট ছোট চরিত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রে গেলেই পাত্তো; রমেশের মত একটি জীবন্ত জলন্ত প্রত্যক্ষ ক্যারেক্টারে হাত দিতে গিয়ে ভুল করেছে। যে এটর্ণি জগা-ক্যাঙালী-গোছের লোকের কাছে আপনার মনের অভিসন্ধি খুলে বলতে পারে, ক্লায়েণ্ট তাকে কখন বিশ্বাস করে? একটি ছোট মেয়ের কাছে যে নিজের টেম্পার রাখতে পারে না, সে ক্লায়েণ্টের টেম্পার নিয়ে খেলা করবে কেমন ক'রে? আর প্রফুল্লকে সরানো যদি একান্তই আবশ্যক ছিল, তবে গাঁজাখোরের মত অমন গলা টিপে মেরে ফেল্লে কেন? বিজ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ, মার্ডার কত আর্টিস্‌টিক্ কোরে তুলেছে, রমেশের মত এটর্ণি তা' কি মেডিক্যাল জুরিস্‌প্রুডেন্স প'ড়ে দেখেনি?

যাক, নাট্যমঞ্চকে নবদ্বীপে পরিণত ও আর্টের মহিমা নষ্ট করতে গিরিশচন্দ্র আর ফিরে আসছে না।

জাতীয় ভাবের বন্যা যুরোপের [illegible] রভূমি-ধৌত টেম্‌স্-টাইন-সিন-লোরেন-রাইল-ভল্গার জ[illegible] গাঙ্গেয় উপত্যকা যেরূপ প্ল[illegible]বত কোত্তে আরম্ভ ক[illegible] তাতে আশা করা যায়, ঐ জলের সারবান্ পলিতে [illegible]তজীয়ান্ জীবন-শস্য জন্মাবে, তা থেকে বঙ্গের ভবিষ্যৎ না[illegible]র লোমহর্ষণ যম-দর্শন নাটক লেখবার অনেক উপাদা[illegible]বেন। বর্ত্তমানে যা অদ্ভুত, আসন্ন ভবিষ্যতে তা' [illegible]র দৌরাত্ম্যে পরাভূত হবে। আইনের ভয়ে আকুল এ[illegible]ফীল কি নাট্য-চিত্রের মহিমায় মণ্ডিত হ'তে পারে! [illegible] এক একটি মার্জ্জিত মক্কেলের অর্জ্জন-কৌশল দেখে আ[illegible]কীল 'থ'।

একটি দাম্পত্য-জীবন ধ্বংস [illegible]দি না হিংসাকে কর্ম্মঠ ক'রে তুলতো, তবে সামান্য [illegible]য়াগোকে আজ কে চিনতো? রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে[illegible] কৌশলেই ব্রুটস-বুদ্ধিনাশী কেসিয়সের সৃষ্টি। [illegible] ভরতের দেশেই জড়-ভরতের উৎপত্তি; তাই বলি ক্লি[illegible]কে, শ্রবণ-পথে মরণ প্রেরণ আর একসঙ্গে রাজ ভাজ দুই-[illegible]হরণ। অবরোধে আত্ম-শক্তিহারা বাঙ্গালী স্ত্রী স্বামীর [illegible]ারোগ্য-কামনায় [illegible] দেবের দ্বারে হত্যা দেয়, আর

কত্তে শিক্ষা দেন ; আ মরি মরি ! কি সে নাট্যোক্তি। "I have given suck,—" এক দিকে পত্নী-রূপে, অন্য দিকে মা-রূপে ; দেবি ! তোমার কোন্ ভাবের উপাসনা করব ! যাজ্ঞসেনী যদি রাজসূয়ের রাত্রে বীররসের বক্তৃতায় যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত ক'রে তাঁর দ্বারা নিদ্রিত দুর্য্যোধনকে হত্যা করাতে পাত্তেন, তা' হ'লে আজ তিনি উচ্চাঙ্গ নাটকের নায়িকারূপে প্রশংসিতা হতেন।

ছেলের বিবাহ দিতে গিয়ে-ও মুচির মুখে যেমন সহজে চামড়ার কথা এসে পড়ে, সংসার-নাট্যশালার ঘটনার প্রতি দেখতে দেখতে রঙ্গমঞ্চের ভূত-ও আমার মনের মধ্যে তেম্নি উঁকি মারে, মনে যথনি যা আসে, মুখে ব'লে ফেলি ; যতবার-ই মনের জন্য কুলুপ কিনেছি, ততবার-ই চাবি হারিয়ে ফেলেছি ; নাট্যতুলনার ছত্রগুলি যাঁর ভাল লাগবে না, তিনি আমার দৌর্ব্বল্যটুকু মার্জ্জনা করবেন।

ব্রজমোহন বার দুই ঘড়ির দিকে চাইতে-ই, "রাত হয়ে যাচ্ছে, আজ তবে আসি" ব'লে যে কয়টি ভদ্রলোক বৈঠকখানায় ব'সে ছিলেন, উঠে চ'লে গেলেন। "তোমাদেরও কষ্ট হচ্ছে খোয়ারাম, আর কেন রাত কচ্ছ", মুরুব্বিমুখ-নিঃসৃত এই অনুমতিবাক্য নির্গত হতে-ই ধনুবৎ নমস্কার ক'রে খোয়ারামাদি বিদায় নিলে। শ্যামা[illegible]দ উঠে জুতো পায়ে দিচ্ছিল, ব্রজমোহন তাকে বল্লেন, "তুমি[illegible] চল্লে শ্যামাপদ,—কাল আসছ ত ?"

শ্যামা। কাল [illegible] ট্রেণেই বোধ হয় একবার কলকাতায় যাব।

ব্রজ। ওঃ, তা হ[illegible] দেখছি আর দেখা হচ্ছে না। আছ কোথায় ? রজনী বাবু[illegible]ী ?

শ্যামা। আজ্ঞে ন[illegible] সকালে-ই বাড়ী থেকে এখানে এসেছি।

ব্রজ। সকালে—[illegible]-দাওয়া করলে কোথায় ?

শ্যামা। একটা [illegible]—

ব্রজ। ব'স—ব'[illegible] না ; এহে—হে ! তোমার সঙ্গে একটা-ও কথা কওয়া [illegible]'স—ব'স।

শ্যামাপদ পুনরায় আ[illegible]গ্রহ করিল।

ব্রজ। তা বরাবর [illegible]ন আসনি কেন ? দোকানে গেলে কি করতে ?

শ্যামা। বাবার সঙ্গে [illegible] বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাই প্রথমে-ই রজনী বাবুর [illegible] করতে গিছলুম।

ব্রজ। তা তিনি [illegible]তে বল্লেন না ?

শ্যামাপদ মাথা নত করিয়া রহিল।

ব্রজ। ঈস্ !

ভাগ্যবান্ উকীল নয়, মিউনিসিপ্যালিটীর হর্ত্তা-কর্ত্তা নয় ; ধর্ম্মপ্রাণ সাধুচরিত্র মসলা-বেচা পিতামহ হরমোহন দত্তের দান বিরাট প্রাণ তাঁর যে বুকের মধ্যে আছে, সেই বুকের ভিতর থেকেই ব্রজমোহনের মুখ দিয়ে দীর্ঘশ্বাসবাসিত এই "ঈস্" শব্দটি বহির্গত হয়েছিল। দারুণ উচ্চাভিলাষের পাশব পেষণে-ও অতিথি-সেবার কুলগত ধর্ম্মশাসন ব্রজমোহনের অন্তরের মধ্যে বিনষ্ট হয় নাই।

ভৃত্য আসিয়া শ্যামাপদকে মুখ ধুইবার ঘরে লইয়া গেল, সেখান হইতে কাপড় বদলাইয়া পরিষ্কার হইয়া আসিলে ব্রজমোহন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আহারের জন্য অন্দরে লইয়া গেলেন।

দুই দিন ব্রজমোহন শ্যামাপদকে আপনার বাড়ীতে ধরিয়া রাখিলেন ; তাহার সংসারে অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিবরণ শুনিয়া স্থির হইয়া রহিলেন ; প্রবোধ, সান্ত্বনা, পরামর্শ, উপদেশ কিছুই দিলেন না ; কেবল বলিলেন, "দুর্দ্দশা আমাদের এই শিক্ষা-প্রণালীর, চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বইয়ের বোঝা বহনের পর আজ তোমার মত বরিষ্ঠ শিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের জন্য কোথাও কোন কর্ম্ম নাই ! আমার পিতামহ শুনেছি বছর পাঁচ ছয় মাত্র পাঠশালে তালপাতে লিখেছিলেন, এখন-ও তাঁর মুশাবিদা করা যে পাঁচ সাতখানা দলিলপত্র দেখেছি, তার মত অত সহজ সংক্ষিপ্ত পাকা লেখাপড়া আমাদের পাস-প্র্যাক্‌টিস করা উকীলী মাথায়-ও আসে না ; হাতের হরপগুলি যেন মুক্ত সাজিয়ে রেখেছে।"

১৮

কলিকাতায় শিমলা অঞ্চলে এক গলির ভিতর একটি বাসা-বাড়ী ; বাড়ীটি পুরাতন ও একতলা ব'লে সেখানে স্কুল-মাষ্টারে ও কেরাণীতে যে গুটি আষ্টেক ভদ্রলোক বাস করেন, সেটির নাম 'মেস' দেন নাই। বাগেরহাটে উমাপদ বাবুর বাসা থেকে অরুণ মাষ্টার এক সময়ে লেখাপড়া করে ; পরে কলকেতায় এসে প্রথম বার এল, এ, দ্বিতীয় বার আই, এ ফেল হবার পর ঐ শিমলা অঞ্চলের একটি স্কুলে ছোটখাট মাষ্টারী কায ক'রে আসছে ; ২২ টাকায় ঢুকে এখন মাসিক বেতন দাঁড়িয়েছে ৩৭ টাকা। তা ছাড়া ৩টি প্রাইভেট টিউসান

আছে, তা'তে-ও টাকা ১৬।১৭ মাসে আসে। অনন্যোপায় হয়ে শ্যামাপদ খুঁজে খুঁজে অরুণ মাষ্টারের বাসায় গেল। অরুণ কত বোঝালে, কাকুতি-মিনতি ক'রে বল্লে, "এই যে কটা টাকা এখন-ও রোজগার ক'রে কলকেতার বাসা খরচ চালাচ্ছি, বাড়ীতে-ও কিছু পাঠাচ্ছি, এ তোমার-ই বাপের খেয়ে, আর দু'দিনের জন্যে এসে তুমি এই তক্তোপোষখানার এক পাশে শোবে, আর ডালের জল দিয়ে দু'টি মোটা চালের ভাত খাবে, এর জন্যে যদি আমি তোমার কাছে হাত পেতে পয়সা নি, তা হ'লে যে আমার এই হাত মুখ দুই-ই পুড়ে যাবে।"

শ্যামা। অরুণদা, বাবার মৃত্যুসংবাদ আর আমাদের অবস্থান্তরের কথা শুনে যে জল তোমার চোখ থেকে উথলে উঠে গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে, তাতে তোমার মুখ উজ্জ্বল-ই হয়েছে; আমি তোমার মন জানি, এ পাঁচটি টাকা নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

অরুণ জানত, শ্যামাপদ উমাপদ বাবুর ছেলে, লোককে অন্ন দেওয়াই এদের বংশের রীতি; তাই অগত্যা টাকা ক'টি নিয়ে বাক্সয় বন্ধ ক'রে রাখলে। একটু পরে বল্লে, "কিন্তু দিন আষ্টেক দশ পরে-ই পূজোর ছুটী সুরু হবে, বাসা-ও আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে, তখন—"

শ্যামা। এর মধ্যে কলকাতায় আমি যদি কোনো আশা না পাই, তবে অন্য পথ দেখতে-ই হবে।

ঠাকুরকে খাওয়া-নাওয়ার কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে অরুণ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, তার স্কুলের সময় হয়েছে। বিনোদ বাবু বল্লেন, "অরুণ বাবু, তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি ত এখনো ঘণ্টাখানেকের উপর বাসায় আছি, ওঁর কোনো কষ্ট হবে না, তুমি এস।"

বিনোদ বাবু সারারাত জেগে 'বসুমতী' আফিসে প্রুফ কারেক্ট ক'রে ভোরবেলা বাড়ী এসেছেন, আবার বেরুবেন [illegible]টার পর বালীগঞ্জ থেকে কাপী আনতে, সুতরাং তাঁর এই একটু জিরেন আছে। তাঁর এই দিবা-রাত্র পরিশ্রমের কথা শুনে শ্যামাপদ চমকে উঠলো। বিনোদ বাবু বল্লেন, "হাঁ ভায়া, খেটে খেটে ক্ষিদে আর মোটে হয় না, ঐ একটা লাভ—কিছু [illegible] বেঁচে যায়।"

অরুণের-ও অই, সকালে একটা আর বিকেল থেকে রাত্রি [illegible] অবধি দু'টো টিউসন; তবে মাষ্টারী কাযের একটা [illegible], ছুটীও অনেক আর স্কুলেও ক'ঘণ্টা বলতে গেলে এক রকম জিরেন; ছেলেদের গোটা পাঁচ ছয় আঁক কষতে বা ট্রান্‌শ্লেসন-ফ্রানশ্লেসন যা হয় একটা লিখতে দিয়ে চক্ষু মুদে যত পার ভাব।

বিনোদের যত্ন-আয়ত্তিতে শ্যামাপদর কেবল স্নান ক'রে পিত্তি রক্ষা করা হ'ল না, ঠাকুরের রান্না সেই মোটা চালের ফাটা ভাত, খ্যাঁসারির ডাল নিঙড়ানো হলুদজল, ট্যাড়শ ভাজা, কাটা রুয়ের ঝোল হেন অমৃত বোধ হ'ল; মৎস্যরাজ যে সপ্তাহাধিক কালের উপর বরফের বাক্সে বন্দী ছিলেন, তজ্জনিত দুর্গন্ধটুকু বিনোদের আদরের গন্ধে শ্যামাপদ বুঝতে-ই পারলে না। খেয়ে উঠতে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, আধ ঘণ্টা পরে-ই দেখে যে, অরুণ হাসি মুখে বাসায় ফিরে এল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে, এরির মধ্যে যে?"

অরুণ উত্তর করলে, "স্কুলের ছুটী হয়ে গেল।"

বিনোদ। কেন?

অরুণ। ত্রম্বক্কুর দেশনায়িকা মিসেস সঙ্কটা বাইয়ের একটি তোতা পাখী মারা গিয়েছে, পাখীটিকে তিনি 'জয় চরকা কি জয়' বলতে শিখিয়েছিলেন!

বিনোদ। এর জন্য ছুটী! ও-রকম নায়ক-নায়িকা ম'লে আমাদের ত দেখি কায বেড়ে যায়। তবে পাখী মরার খবর-টবর আমাদের কাগজে ছাপে।

অরুণ। আমরা-ও কেউ জানতুম 'বজ্রগর্জ্জন' ব'লে নাকি একখানা কাগজ আছে, গজে[illegible]বু সেইখানা হাতে ক'রে তাড়াতাড়ি এসে-ই ফিপ্‌থ ক্লাসে[illegible] ছেলেদের সেইখানা প'ড়ে অই খবরটা শোনান। অমনি [illegible] স্কুল দেশ-নায়িকার মনোব্যথায় সহানুভূতি দেখাবার [illegible]তে উঠল। হেড মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন, [illegible] ছেলেরা তখন শোকে আচ্ছন্ন, কে কার কথা শোনে; [illegible] শেষ দেশবন্ধু পার্কে আজ ম্যাচ, আগে থাকতে যায়গা [illegible] জন্যে সবাই সেই দিকে ছুটলো। এক রকম ভাল-ই [illegible]। আসবার সময় দেখি, প্রোমিথিয়াস স্কুলের সামনে [illegible]সযোগ। শুনলুম, হেড মাষ্টার ভয়ে বেরুতে পারছেন [illegible] দিতে চাননি ব'লে অ-দেশ-হিতৈষী হেড মাষ্টার রামগ[illegible]কে ছেলেরা মারবে।

শ্যামা। এত ছুটী, অভিভাবকরা কিছু বলেন না?

অরুণ। বলেন বৈ কি; অনেকে [illegible]ত, বালকদের স্বাধীন ইচ্ছা বলবতী হ'তে দেওয়া উচি[illegible] ছেলেরা-নাগরিক।

বিনোদ। নাগর ত বটে-ই, যে রকম চুলের বাহার এখন থেকে সুরু।

তার পর বেলা প্রায় সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত অনেক রকম কথাবার্ত্তা চল্‌ল; মাষ্টারীর চেষ্টার কথাটা পাড়তে অরুণ বল্‌লে, "লজ্জার কথা তোমায় বলব কি ভাই, আমাদের ত এই ছোট স্কুল, এখানে-ই প্রায় প্রত্যহ দু'তিন জন গ্রাজুয়েট আফিস-ঘরে ব'সে থাকেন, যদি কোনো শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে অন্ততঃ দু'এক দিনের ঠিকে সাবষ্টিটিউটী জোটে। তা ছাড়া যদি-ও তুমি কতটা সত্যি লেখাপড়া শিখেছ, তা আমি জানি, কিন্তু গ্রাজুয়েট ছাপ ত তোমার গায়ে নেই।"

পাঁচটার একটু আগে-ই শ্যামাপদ বাসা থেকে বেরিয়ে প'ড়ে ভাবতে লাগল, কোথায় যাবে। ইনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউটে তাকে অনেকে চেনে, ৫।৭ জন বড় দরের লোকের সঙ্গে-ও তার পূর্ব্বে আলাপ হয়েছে, তার মধ্যে দু'এক জনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা-ও আছে; ব্রজমোহন-ও এক জন বিশিষ্ট লোকের নামে চিঠি দিয়েছেন। একটা রাস্তায় এক দল লোক গান গাইতে গাইতে আসছে দে'খে শ্যামাপদ সেই দিকে একটু এগুলো; প্রথমে-ই সামনে পড়ল লাল কাপড়ে লেখা একখানা সাইনবোর্ড, তাতে ...া, "নবদ্বীপ-দীপিকা সমিতি।" নবদ্বীপ কথাটা দেখে-ই শ্যা...দের কৌতূহল আর-ও একটু বৃদ্ধি হ'ল। যে ছোকরাটির ... র একটা হারমোনিয়ম্ বাঁধা, সে চাদরে গোঁজা তাড়া থে... একটা ছোট ছাপান কাগজ নিয়ে শ্যামাপদর হাতে ...ি। কাগজখানি পড়ে-ই শ্যামাপদ বুঝতে পারলে যে ...দ্বীপে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এ খবর সে কৃষ্ণনগর থেকে ...র আসে নি, দীপিকা সমিতির নাম-ও কখনো তার কর্ণ...চর হয় নি; নিজের বা পরের ক্ষুধায় কাতর এই সম্প্রদা...য়ী ভিক্ষার জন্য কলকাতায় এসেছেন। কাগজে যে গানটি ...ছাপা হ'ল, তা কতকটা এইরূপ :—

...গিণী ... গীত

...সম

নদে ভেসে ... ওরে নদে ভেসে যায়।
এবার হরিনা... রে, হরিনামে নয়,—
...ম বন্যায় দুর্ভিক্ষের দায়॥

...ধেছিলেন, তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বন্যা কথাটা ...ি ভয়ানক কবিতার ভাবে ব্যবহার ... করবে, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা দুই-ই বুঝি ঘটেছে, আর খুঁত ধরা লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যাবে যে, দুর্ভিক্ষরূপ বন্যা। তার পর :—

ক্ষুধায় পীড়িত খোদায় তাড়িত,
(এটি মুসলমান ভ্রাতাদের সন্তোষের জন্য)
উনানে কাহারো চড়ে না হাঁড়ি ত
বাড়ী বাড়ী বাড়ী কাঁদে ডাক ছাড়ি,
কলিকাতাবাসী বাঁচাও উপাসী প্রাণ যায় যায় যায়॥

শ্যামাপদ বুঝিল, নিশ্চয়-ই প্রাণ যায় যায়, নইলে ভদ্র-সন্তানরা সহজে এমন কায করে না। তার নিজের অবস্থা ত এখন বোঝা-ই যাচ্ছে, তবু একটি সিকি তাদের ঝোলায় ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। শ্যামাপদ! তোমার জীবনের কারবার সুরু হয়েছে, এই সিকিটি তোমার মূলধন!

দুর্ভিক্ষ নবদ্বীপে দেখা দিক বা না দিক, অন্নের জন্য হাহাকার কাহারো না কাহারো সংসারে উঠিয়াছে, তাহা ভদ্র ভিক্ষুক সম্প্রদায়ভুক্ত যুবা ক'টির মুখ দেখিয়া-ই তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে, সেই জন্য-ই সিকিটি দিলে। অই ক্ষুদ্র রজত-চক্রটির মূল্য আজ তোমার কাছে যে কত টাকা, তাহা আমি জানি। দুঃখীরাম গুরুমশায়ের বেতের তাড়নায় আজ দয়া শ্যামাপদর ইংরাজী-পড়া হিসাবী মস্তিষ্ক ত্যাগ করিয়া বুকের ভিতর নামিয়া বসিয়াছে; ভিক্ষার প্রকরণের ন্যায্যান্যায্যের বিচার না করিয়া গৃহস্থ ভদ্রসমাজভুক্ত এই কয়টি যুবকের পথে পথে গান গাহিয়া ঝুলি কাঁধে ঘুরিয়া বেড়াইবার মূল কারণের প্রতি লক্ষ্য করিল।

শারীরিক সমস্ত অভাব পূরণের ভার পিতামাতাদির হস্তে ন্যস্ত থাকায় মানব-শরীর শৈশবে ও বাল্যে চাঞ্চল্য এবং আনন্দ লাভের প্রয়োজন অনুভব করে এবং সেই প্রয়োজন পূরণার্থ সে সঙ্গী খুঁজিয়া খেলায় উন্মত্ত থাকিতে চাহে; তাহার পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষাদান-প্রণালী যদি অই অভাব অনেকটা পূরণ করিয়া দিতে পারিত, তবে স্কুলের পড়ার প্রতি-ও তার মন আকৃষ্ট হইত। তরুণ মন উদ্দীপ্ত হয়—উত্তেজনা, ... প্রেম, ত্যাগের পিপাসায়; তাই যুবক কপাটী, ক্রিকেট, ফুট-বল, হকী প্রভৃতি খেলিতে যায়, সাঁতারে বাজি জিতিতে চায়, যাহাকে দেশের কর্ম্ম মনে করে, জীবন-ভয় উপেক্ষা করিয়া সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। নারী-প্রেমের উপন্যাস কবিতাদি পাঠ করে, আর যে কোন একটা ...

কল্পিত উপাস্যের মন্দিরে আপনাকে বলিদান দেওয়ার জন্য আকুল হয়।

ভোজ্য ও অন্যান্য চারু ব্যবহার্য্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া নারী যখন স্বামি-পুত্রের হৃদয় জয় করিব মনে করিতেন, তখন তিনি রন্ধন করিতেন, সূচী'ও তাঁহার সহচরী ছিল; এখন দেখেন যে, স্বামী জয়ের যোগ্যই নয়—স্বতঃই সারমেয়, আর মাতার স্নেহমাখা ভাতের পাতা অপেক্ষা হোটেলের ডিস পুত্রের রসনায় সমধিক প্রলোভনীয়, দোকানের এগু কোঁ তাহার ঘেরাটোপ প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, তখন তিনি আলস্যের উপাসনায় সংসারের ঔদাস্যসিদ্ধি-লাভের জন্য এবং বিবিধ রচিত দুঃখের ভাষ্য রচনায় অনন্যমন হইয়া পড়েন।

শ্যামাপদর কোনো অভাব ছিল না, কোনো অভাব ঘটিতে পারে, এ চিন্তা-ও তাহার তরুণ মনে কখনো প্রবেশ করে নাই। নানালঙ্কার-ঝঙ্কৃত শব্দ-সৌন্দর্য্য সে স্কুল-কলেজ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। প্রতিমালার ছলে সেইগুলি শুনাইয়া সজ্জন-সমাজের স্তুতি অর্জ্জনেই তাহার আনন্দ, তাহার আত্মপ্রসাদের জয়পতাকা দোদুল্যমান। আর তার আশার স্বপ্ন ছিল, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ বিজয়ের হৃদয়ে তৃপ্তি প্রদান করিবে, পিতা-মাতাকে সুখী করিবে, এবং দেশের কি-জানি-কি-একটা ভয়ানক উপকার করিবে।

পিতৃহীন, অর্থহীন, কর্ম্মহীন জীবন লইয়া একুশ বৎসর বয়সে শ্যামাপদ কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম বুঝিতে পারিল, কলেজে সংসারে অনেক প্রভেদ। রজনী বাবুর রুক্ষ আচরণ তাহাকে বুঝাইয়া দিল, মানুষের পরিচয় তার নিজের নামে-ও নয়, পিতৃনামে-ও নয়—প্রয়োজনের ওজন বুঝিয়া-ই লোকের কাছে সে প্রীতি বা বিরাগভাজন হইয়া থাকে।

সেই প্রাচীন ক্ষুদ্র সহরটির রাস্তা-গলি ঘুরিয়া সে কর্ম্ম-শক্তির মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিল; ইতর বলিয়া তিন মাস পূর্ব্বে যাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই, সেই ইতর কোথায় কেমন করিয়া তাহার অপেক্ষা অধিক মহৎ, সে দেখিতে পাইয়াছিল। কলিকাতা মহানগরীর বিচিত্র বিপুল জনতা-পূর্ণ প্রকাশ্য পথে ঘুরিতে ঘুরিতে মনুষ্যত্ব বিচারের এই জ্ঞান তাহার চোখে স্পষ্টতরভাবে প্রকটিত হইতে লাগিল। সে দেখে বিষাদের বিরক্তি—হতাশের কাল ছায়া কেবল অধিকাংশ ভদ্রবেশধারী জনগণের মধ্যে। দর্পণের সমক্ষে না দাঁড়াইয়া-ও তাহার নিজের মুখ-চোখের ছবি যে এখন কিরূপ, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। আর সেই মুখের প্রতিরূপ ব্যথিত স্কন্ধে বহন করিয়া কত শিক্ষিত যুবক পথে পথে ফিরিতেছে, তাহা দেখিয়া আতঙ্কে তাহার বুক ধ্বসিয়া যায়। সে ভাবে, এই কর্ম্মান্বেষী নিরাশ জনতার মধ্যে হয় ত অনেক গ্রাজুয়েট পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষিত দাস্যের হাটে হেটোর সংখ্যা এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে যে, ঠেলাঠেলি করিয়া-ও সেখানে বসিবার স্থান পাওয়া সুকঠিন। আবার দৈনিক শ্রমে জীবিকা অর্জ্জনকারী পান্থের মুখপানে চাহিলে-ই যেন একটা স্বাধীনতার গরিমা—সন্তোষের উল্লাস দেখিতে পায়। ট্রামে উপবিষ্ট কোট-পরিহিত বাবুর অসন্তোষের দৃষ্টি এক দিকে, আর এক দিকে পাট-বোঝাই মোষের গাড়ীর জোয়ালের উপর গোরখপুরী গাড়োয়ান যেন বাদশাই দেওয়ানখানা খুলিয়া বসিয়া আছে। দশ বারো বছরের ছোঁড়া-গুলো ট্রামগাড়ীর বোর্ডে উঠিয়া খবরের কাগজ, জাপানী কৌটা, কাগখুঙ্কী, কাচের মালা, রুমাল প্রভৃতি বেচিতেছে; দোকানে বসিয়া বিড়ি পাকাইতেছে; ময়রার পাটাতনে ঠোঙ্গা গড়িতেছে; টিনের দোকানে কাতুরি চালাইতেছে—পাইপ কাটিতেছে; এরা সন্ধ্যার পরে ঘরে [illegible]রিয়া আপনার মায়ের হাতে তিন আনা ছ' আনা দশ বারো [illegible]না দিতে সমর্থ হইবে, আর আমি বায়রণ-ব্রাউনিং, [illegible]ীয়ার-শেলি পঠনক্ষম, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনাদি রসা[illegible]স্ত্রে ফর্মুলা কণ্ঠস্থকারী বলিষ্ঠ যুবক, বাসভাড়ার চারিটা প[illegible]রোজগার করিবার শক্তি আমার নাই!

গোলদীঘির ভূমিখণ্ডের মধ্যে [illegible] দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তথায় ভ্রমণকারী যুবকদিগের [illegible]তুজনাপূর্ণ প্রফুল্ল মুখ দর্শনে তাহার প্রাণে কতকটা শান্তি [illegible]সিল। গ্রামে, কৃষ্ণনগরে, পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রায় [illegible] কাল নিরাশা-ঘনাচ্ছন্ন চাকুরী-চাকুরী ধ্যানে তার মন [illegible]রে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যেন একটু আ[illegible]ইল। কি একটা নূতন অথচ আশাপ্রদ চিন্তার দিকে [illegible]হার দিবাস্বপ্নের ধারাটা ফিরাইয়া দেবে, এইটা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বিদ্যাসাগর-মূর্ত্তির সম্মুখে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া [illegible]। যাঁর ওই প্রতি সেই মহাপুরুষের পাণ্ডিত্য, কর্ম্ম [illegible]হস, তেজ, স্বাধীনতা, দয়া প্রভৃতি কোনো গুণের কং

উদ্দীপ্ত করিল না; একটা বিদ্‌ঘুটে কথা প্রশ্নের আকারে তাহার মস্তিষ্কে মাত্র প্রতিভাত হ'ল। সে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা শ্যামাপদ, গ্রন্থগত বিদ্যার সাগরকূলে নেমে লোণা জলে ডুব দিতে না গিয়ে, তুই যদি পাথর কেটে এই রকম বিদ্যাসাগর গড়তে শিখতিস, তা হ'লে তোর ও দেশের একটু কি উপকার হ'ত না?" তার পর কত টাকা এ মূর্ত্তির জন্য খরচ হয়েছে, সেই টাকাগুলো পেয়েছে কোন্ দেশের লোক, মনে মনে এই সব আলোচনা করছে, এমন সময় শৈবাল এসে তাকে দেখে-ই জিজ্ঞাসা করলে, "এ কি, এলেন কবে আপনি কলকেতায়, এমন অজানা আচম্বিতে দখিণা হাওয়ার মত?"

আবৃত্তি-পরীক্ষাক্ষেত্রে-ই শ্যামাপদর সহিত শৈবালের পরিচয়ের সূচনা। শৈবাল যে কবি, তাহা তাহার বালবিধবা-প্রতিম মুখে চোখে, গ্রীবাচুম্বিত কেশে ও আধ-বিমলিন বেশে উজ্জ্বল অক্ষরে বিজ্ঞাপিত। বিধবা হইলে-ও আধ-আয়তির চিহ্ন রিষ্টওয়াচরূপে বাম প্রকোষ্ঠে বিজড়িত। শৈবাল যে তাহার তরুণ মনটিকে শৈবালের-ই মত কোমল ও সবুজ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাহার কণ্ঠস্বরের মিহি আওয়াজেই বোঝা যায়; সে এখন বি, [illegible] পড়িতেছে, আর আ-উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, ভুজলতার ললিত লা[illegible] ও মেয়েলা সুরের আবৃত্তিতে এক্ষণে বঙ্গভূমে তাহার দ্বিতী[illegible]ন।

শ্যামাপদ কলেজ ছাড়িয়াছে ও সেই দিন প্রাতে মাত্র কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে শুনিয়া শৈবাল তাহার বাঁ হাতখানি আপনার পেলব হাতে আলগোছে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কি যে স্বপ্নময় সুখের হিল্লোলে উথলে উঠছে আমার এই পিপাসিত চোখ দু'খানা, আপনার ওই কঠোরে কোমল, তুষারে বিজলী, শুভ্র সবুজ মু'টুকু দেখে—আসুন একবার ইনস্‌টিটিউটে সঙ্গে আমার, দু'টা কথা কই প্রাণের আগল খুলে।"

শ্যামাপদ সঙ্গে চলিল। উত্তরদিকের ফটক পার হবার সময় দেখা হ'ল জয়ডঙ্কা বক্সীর সঙ্গে।

বক্সী মহাশয়ের বাড়ী ফরিদপুর, সেখানকার বড় উকীল, পৈতৃক জমা-জমী বাড়ী ঘর-দোরও মন্দ নয়। যে সময় তিনি নতুন প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন, সেই সময় তাঁর পিতৃব্য একটা জাল দলিল-জড়ানো নোংরা মামলা হাতে নিতে তাঁকে মানা করেন, সেই অবধি খুড়োর উপর তাঁর মনে মনে রাগ ছিল; কিছুকাল পরে যখন তদ্‌বিরের জোরে বুড়োকে মোকর্দ্দমায় হারিয়ে পৈতৃক বিষয়ের অধিকাংশ ভাগ নিজে আয়ত্ত ক'রে লন, সেই সময়ে এই ছেলেটি ছিলেন গর্ভস্থ, তাই বাপ সগর্ব্বে এর নাম রেখেছিলেন—জয়ডঙ্কা।

শৈবালের মধ্যে যেমন কবিতার কোমল আঘ্রাণ, জয়ডঙ্কার বাগ্‌ঝঙ্কারে তেমনি বীরত্বের লঙ্কার ঝাল। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সোম

১

নমি সোম তোম[illegible]ামের সুষমা
এই তোমার বিশদ হাস্য-রুচি,
হ্লাদিনী তোম[illegible]চর মালা
[illegible]ীযূষ-গর্ভা, শীতল, শুচি।
স্বর্গঙ্গার অমৃতহ[illegible]
[illegible]মা দেব, হে দ্বিজপতি,
বিহার করেন তোম[illegible] বাহন
[illegible]করি বুঝি মহাসরস্বতী?
যাঁহার বীণার [illegible]সরি
ব্রহ্মা বিশ্ব সৃজন করে,
প্রতি-ঝঙ্কারে চন্দ্রিকাতারে
সে তানের সুধা গড়িয়ে পড়ে।
বয়ানে দেবতা যেই সুধা সেবে
নয়ানে আমরা পিই গো তাহা।
হে অসেচনক, কি মাধুরী তব
এ আঁখি ফিরাতে পারি না, আহা।
কোটি কোটি তারা-কহ্লারে-ভরা
বুঝি, কূলহারা ব্যোমের হ্রদে
বিষ্ণু-নাভিজ অমৃত-কমল
ফুটে আছ তুমি ধাতার পদে?

ওগো সোম তুমি কৌমুদীরূপে
　　প্রতি রোমকূপে দেহান্তরে,
পশিয়া অঙ্গে দেছ লাবণ্য,
　　হাস্য হয়েছ দন্তাধরে।
রমা-সহোদর, শ্রী তব অনুজা
　　তোমারি সুবাদে তাঁহারে চিনি,
তোমার বিভবই হিরণে রজতে
　　শোভা-লাবণ্যে বিলান তিনি।
কৌস্তুভ তব লভেছে মরীচি
　　সিন্ধু-গর্ভে সকাশে রহি,
পারিজাত, সুরনন্দনে তব
　　দ্যুতি-সৌরভই আনিল বহি'।
শম্ভুর শিরে গঙ্গার নীরে
　　শত শত প্রতিবিম্ব হানি'
চন্দ্রমালায় ভূষিয়াছ তায়,
　　গৌরীর তুমি মুকুরখানি।
তব ধবলিমা পেয়েছে শঙ্খ,
　　কুমুদী তোমার ধরার বধূ
কর্পূরে তব সিত-সৌরভ,
　　নিশিগন্ধায় দিয়াছ মধু।
শারদ-শরীরে পারদ মাখায়ে
　　করেছ শরতে সরস্বতী,
ঢুলায় তোমারে কাশের চামর
　　পুষ্পিত তায় তোমারি জ্যোতিঃ।
কৈরব তব সৌরভ হরি
　　মাতায় সরোজশূন্য নিশা,
ন্দ্র-মল্লী তব বৈভবে
　　দূর করে রাতে অলির তৃষা।
নারিকেল-তরু বট-দেবদারু,
　　চিক্কণ চারু তোমার স্নেহে,
মুদিতাম্বুজ সরোবর ধরে
　　আলোর অযুত কমল দেহে।
দ্রবহেমময়ী শোভে নদীতনু
　　লক্ষ হীরার চন্দ্রহারে,
গিরিগুলি নৈ-বেদ্য সমান
　　শোভে যেন তব ভোজ্যভারে।

যা কিছু কুশ্রী জীর্ণ দগ্ধ,
　　যা কিছু ভীষণ ধ্বংসশেষ,
সবি শোভমান, ছিন্নবিতান
　　তরী ধরে রাজহংসবেশ।

নবনব রূপে পরকাশ তব
　　প্রতিপদ হ'তে পৌর্ণমাসী,
চির-নবীভূত, নিতি অপুরুব
　　সুষমানন্দে বেড়াও ভাসি'।
ক্রম-লীয়মান উপচীয়মান
　　গতি তব লীলা-লহরী-স্রোতে
চির-নূতনের চারু সরসতা
　　ঘুচিতে দেয় না সৃষ্টি হ'তে।
বৃদ্ধি-ক্ষয়ের ক্রমাবর্ত্তনে
　　রেখেছ শোভন সৃষ্টিধারা,
উদানে পতনে বিশ্ব-বীণায়
　　বাজাও উদারা-মুদারা-তারা।
তোমার রূপের স্বরগ্রামের
　　কড়ি-কোমলের উর্ম্মিদোলা,
নিখিল জীবন করে যন্ত্রিত,
　　নিখিল সৃষ্টি [illegible]ন্দ-লোলা
নানা ভঙ্গীতে কল-সঙ্গীতে [illegible]
　　পারাবার [illegible] ছন্দোনুগ,
ডম্বরু বাজে, মহাকাল নাচে [illegible]
　　তালে তা[illegible] পরি[illegible]ড়ে চরণযুগ।
জীব-বিধিলিপি-নিয়ামক চি[illegible] মৃদু
　　তব যো[illegible] অয়ন-গতি,
ষোড়শ কলার ষোড়শোপচা[illegible]
　　বিশ্ব পা[illegible] কাথ[illegible]পতি।
'পূষা' তব জীবে পুষ্টি বিতরে পদ্ম [illegible]ক্তিকে
　　'যশা' [illegible] অপব্যয় [illegible]তু,
'ঋদ্ধি' তোমার বিশ্ববিজয়[illegible] সেথান হ[illegible]
　　ন[illegible] [illegible]ক্ষুষ্মান্ প্রাণীরা [illegible]
'সুমনসা' তব সুমনসে ফুটে, [illegible] তাহারা দৃষ্টিশক্তি
　　[illegible], এই অসঙ্গতি
'সৌম্যা' স্বস্তি শান্তি কুশল [illegible]শা নাই, অথচ
　　বিলায়

'তুষ্টি' তোমার বৃষ্টি যোগায়
সৃষ্টি বাঁচায় অন্নজলে, *
'অমৃতা' মৃত্যু-রোগ-শোকহরা
'রতি' প্রেম-ঘনহর্ষে গলে।
তপনের ভীম চণ্ডিমা হ'তে
চন্দ্রমা তুমি রক্ষা করো,
সূর্য্যমরীচি মন্থিয়া তুমি
পক্ষে পক্ষে কুম্ভ ভরো।
আপনি দহিয়া, স্নিগ্ধতা দিয়া
হে সোম, তোমার সৃষ্টি পালো,
চন্দ্রচূড়ের মত বিষ পিয়ে
কল্যাণসুধা বিশ্বে ঢালো।
বহ্নিবেদনা সহিয়া হে সোম
কেমনে অমন হাসিটি আসে ?
কর্ম্মশালায় সহি শত জ্বালা
পিতা যেন গৃহে মধুর হাসে।
রবির মমতা আদায় করিতে
তুমিই গোপন পন্থা জানো,
তার সুষুম্না-নাড়ীপথ দিয়া
সন্তর্পণে মাধুরী টানো।
কঠোর শাসনে হে দিনকর
'জাগ্রত রহ—সাধনা করো',
মায়ের মতন [illegible] পাড়ায়ে
তুমিই মোদের শ্রান্তি হরো।
সূর্য্য-শাসিত [illegible] ভূখণ্ডে
শৈত্যের বড় কাঙাল মোরা,
হে শীতমরীচি [illegible] না উদিলে
জুড়াত এই পরাণ পোড়া ?
আজি নয় শু[illegible] এই [illegible] মর্ম্মে
[illegible] দকাল হ'তে এ কথা বুঝি।
আর্য্যেরা তাই [illegible] র ধূমে
[illegible] র্য্যর সাথে এসেছে পূজি।

বেদের শ্রেষ্ঠ পানীয় অর্ঘ্যে
ডেকেছে তাহারা তোমারি নামে,
ঘৃত-পায়সের ভোজ্য নিবেদি
বন্দিল তোমা মধুর সামে।
বেদের সূক্তমণ্ডলগুলি
তব চন্দ্রিকা-মাধুরী-মাখা,
প্রতি কলা তব লভেছে হব্য
অমা-সিনিবালী হইতে রাকা।
শুক্ল যজুর তুমিই দেবতা,
নিশীথকৃত্য তোমারি স্তুতি,
তোমারি মধুর করুণার রসে
তোমারেই পুন পূজেছে শ্রুতি।
করেছে লুব্ধ দেবতা ঋভুরে
সোমলতা তব অমৃত লভি',
সিন্ধু-নবনী, তব স্নেহরস
ধেনুর আপীনে হয়েছে হবি।
ওষধির ফল-পুষ্পে পশিয়া
তোমারি মাধুরী, ওষধিপতি,
ব্রীহিযবে চরুকব্য-বিকিরে
অন্নে হয়েছে জীবনবতী।
স্বধামৃতময়ী সুধায় তোমার
পিতৃগণের পিপাসা হরি',
রিক্ত হইয়া মাসে মাসে দাও
দেবতার পানপাত্র ভরি'।
পাঠালে মোদের হাত দিয়ে পুন
ভোজ্য, পানীয়, আহবনীয়,
সে শুধু মোদেরে মর্য্যাদা দিতে
করিতে মোদেরে দেবপ্রিয়।
দেবতারে আর পাই না দেখিতে
হারাইনি তবু তাঁদের প্রীতি,
নিখিল দেবের মমতা লুটিয়া
তুমি আজো সোম বিলাও নিতি।

শ্রীকালিদাস রায়

* পুষা, যশা, সুমনসা, [illegible], সৌম্যা, তুষ্টি, অমৃতা, রতি ইত্যাদি চন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন কলার নাম।

দ্রষ্টব্য—[illegible] াদে ২৯৬ পৃষ্ঠার পর কতকগুলি পৃষ্ঠা নম্বর ভুল ছাপা হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সচিত্র
মাসিক বসুমতী

৭ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৫ [৪র্থ সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

লক্ষ্য ও শিক্ষা।

আমার কোনো এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যে-সব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিষটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের ফল কি, তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে, তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুই দিনের রাস্তা একদিনে চলিয়া যাইবে, এ কথা বলিতে সময় লাগে না, কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে, কি ডুবিয়া যাইবে, কি, কি হইবে, তাহা বলা যায় না; যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই, তাহার অতীতই বা কি আর ভবিষ্যৎই বা কি? সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে? তাহার আশাতাপ-মানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চ[illegible] রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি। [illegible]

আমাদের দেশের বর্ত্তমান স[illegible] মৃত অবস্থাটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদে[illegible] সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কি হইতে পারি, কত[illegible] করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড় রেখায় [illegible] কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানু[illegible] ক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় [illegible] অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এই জন্য আশা যেখানে না[illegible] সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে[illegible] প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে, ত[illegible] তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি[illegible], এই অসঙ্গতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তে[illegible] আশা নাই, অথচ শক্তি আছে, ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অ

পলায়নের যখন উপায় নাই, পলায়নের শক্তিও তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড় হইলেই মানুষের শক্তিও বড় হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড় জিনিষ যাহা মানুষকে দিতে পারে, তাহা সকলের চেয়ে বড় আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায়, তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে এই আশার অভিমুখে সর্ব্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই—কিন্তু সমাজে যতগুলি লোক আছে, তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তিসম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে, সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে, সেইখানেই ঐশ্বর্য্য।

এই পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের [illegible]পর সকলেই জানে, সে কি চায়; এইজন্য সকলেই আ[illegible]র ধনুকবাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যথাসম্ভব [illegible]াজ্ঞসেনাকে পাইবে, এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুল[illegible], তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই [illegible] বেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কি পাইতে হই[illegible]র বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক [illegible] কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট ক[illegible]নির্দ্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনত[illegible]শ্ন শুনি, "আমরা কি শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব; এই [illegible]কার কোন্ প্রণালী কোথায় কি ভাবে কাজ করিতেছে[illegible]ন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিষটা ত জ[illegible] সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিষ নহে। আমরা [illegible] এবং আমরা কি শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে[illegible] সংলগ্ন। পাত্র যত বড়, জল তাহার চেয়ে বেশী ধরে[illegible]।

চাহিবার জিনিষ [illegible] বেশী কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়[illegible]ডাকিতেছে না, কোনো বড় ত্যাগে টানিতেছে না,—[illegible]া খাওয়াছোঁওয়ার কতকগুলা কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ৎ চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই, তাহাও অতি যৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড় করিয়া তোলা এবং বড় করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই, তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই, সেটুকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরো বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্ত্তের জন্য খুলিয়া দেয় না, তাহারাই রাত্রিদিন বলে, তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই। পাখীর ছানা ত বি, এ, পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজন সমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে, সে নিশ্চয় জানে, তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায়, সে কোনো বড়নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যে দিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্য্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে, সে দিন সে মনে করে, আমি অবিকল কলম্বসের সমতুল্য কীর্ত্তি করিয়াছি।

তুমি কেরাণীর চেয়ে বড়, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ, তাহা হাউয়ের মত কোনোক্রমে স্কুলমাষ্টারি পর্য্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, এই কথাটা আমাদের

নিশদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু যদি কেহ মনে করেন, তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক, তবু সেটা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আমরা এ পর্য্যন্ত বার বার নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্ব-সংসারের সকল সমাজের সেরা; এত বড় একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি, যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আড়ম্বর সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়ের জোরী কৈফিয়ৎ; যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না, সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই। বিস্ফোড়ায় চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে, তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলি ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু সুচিকিৎসক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয়, ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিস্ফোড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে! সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে, চিকিৎসকের আঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন সুস্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়া দেওয়া আকস্মিক জিনিষ নহে। ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি; কেবল বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্ব্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল ~~~~~~~~~~ রাখিতে পারে না। স্থিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত ক নিজের সমাজই আমাদের ইহার বুদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে সেই জন্যেই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। ই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই মোহের পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্ব্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরী হয় না, খাদ্যই তৈরী হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল, সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়? কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র ত সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন জাতির কাছে শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্ হে। বস্তুত শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনে কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্ব্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং হিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে পরি করিয়া লয়। এই সীমানির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের দরকা মূহ রণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা, শক্তিকে ব্যবহার করা নহে নো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত অধিক সুযে না, কারণ, তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহ হং তাহা ভাগ করিয়াই দেয়,—একদিকে যাহার ভাগে পদ্ম ড়ে, অন্যদিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই। ঙ্গ অ

অতএব, কি পাইলাম, সেটা র পক্ষে ততবড় কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ বহার করিব, সেইটে যত বড়। সামাজিক বা মানসিক যে নো অবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারে কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্ব্বনাশের মূল। মানুষ কোনো জিনিষকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছো সকল জিনিসকেই বাধা

... ব্যবহার বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা ... হউক না কেন, করিতে বলে, সেখানে ... আমাদের অবস্থার সঙ্কীর্ণতা মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই ... লইয়া আমরা আ... রিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থত কি ... আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে ... করিয়া দেখি নাই; সেই পরথ করিয়া দেখিবার ...ত্তকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্ব্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি; মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভাল হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকলদিকেই খর্ব্ব করিয়া ভালমানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতর যাহাদের ব্যবস্থা, তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত-পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে ...জের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মত দীনতা ... কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তি... স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হ... উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহার এমন ...নো বাহ্য অবস্থাই নাই, যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠি...রে না; এমন কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তা... ড় হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠালগাছকে ...বেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার ...ক বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে ...ই আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজন্য ...তে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জ... আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা ...ন আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু সেই চারাটির মজ্জার ... এই দুর্নিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, আমাকে ...তেই হইবে, বাড়িতেই হইবে; আলোককে যদি পাশেই ...ই, তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব, মুক্তিকে ... দিকে না পাই, তবে তাহাকে অন্তদিকে ল্রান্ত করিবার ...ষ্টা ছাড়িব না। চেষ্টা করাই অপরাধ, যেমন আছি, তেমনিই থাকিব, কোনো প্রাণবান্ জিনিষ এমন কথা যখন বলে, তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত, আকাশও তেমনি।

মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী, তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে, তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা এক মুহূর্ত্ত ভুলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকে বাড়াটাকেই আমরা চারিদিকে দেখিতেছি, এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি; সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, একদিকে হউক বা আর একদিকে হউক, ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড় হইতে হইবে, আরো বড় হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে. যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব, তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সঙ্কোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্ত্তমানের ইতিহাসকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্য যখন আলোক আসন্ন, তখনো অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু আমি ত স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হোক, তাহাকে বাঁচিতেই হইবে;—সেই আমাদের দুর্জ্জয় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে, সেইখান দিয়াই এখনি আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্ব্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে; রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্ম্মের পথ আমাদের এই সর্ব্বত্র প্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে

টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথযাত্রার আহ্বান বারম্বার নানাদিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্ম্ম-বোধের জাগরণের মত এত বড় জাগরণ জগতে আর কিছু নাই, ইহাই মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সঙ্গীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানব-জীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে, ততই আপনাকে অকৃপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঘী

উত্তর তোরণ-দ্বার খুলি'
ঐ, ঐ এল শীত-রাজ
শুভ্র-সাজ—
শ্বেত অশ্বারোহী; ওড়ে তুষারের ধূলি
বেগবান্ অশ্ব-পদতলে;
পথ-তলে
রাজ-পদে ধরণীর প্রণামের মত
শত শত
ঝরে' পড়ে' যায়
কত ফুল;—হায়,
উদাসীন রাজা নাহি চায়,
ফুল-দল দলে'
যায় চলে'
সুদূরের দক্ষিণের পানে,
কোথা? কে তা' জানে!
ধরণীর চোখে অশ্রু-জল
বিন্দু বিন্দু করে টল-মল
শিশির উতল;
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস করে 'হায়-হায়!'
ব্যর্থ আরতির ধূপ বৃথা ব্যেপে' যায়
গাঢ় কুয়াসায়!

আঁখি মোছ, মোছ আঁখি রাণি!
আমি জানি,
তোর রাজা তোর সখা তোর শীত-স্বামী
অ-দূর আগামী
মাঘ-শেষ উৎসবের আয়োজন লাগি'
অশ্ব হাঁকি'
চলে—চলে দক্ষিণের দিকে—যেথা তার
চিরন্তন রহস্য-ভাণ্ডার।
দেখ দৃষ্টি করে,'—
তোরি দোরে
রেখে যায় সে যে সেই ভবিষ্যৎ বাণী
অতসীর স্বর্ণ-লিপিখানি।

দেরি নাই, দেরি নাই আর, সম্ভাবনা তার
দিকে দিকে উঠে ফুটে' ফুটে';
শুভ্রতার আবরণ টুটে'
শিশু শ্যাম ধীরে জেগে' উঠে;
'বোলে' 'বোলে' ভরে' উঠে আম্র-কুঞ্জাগার;
বন-বীণা-তার [illegible]
বাঁধা বুঝি হয়ে গেল সারা—[illegible]কের প্রথম সাড়া
উঠে কেঁপে
ঐ কুহু-কুহু; পলাশ-তলা[illegible]ব্যেপে'
আবীর-বরণ [illegible]
কি জানি কখন্ এসে কে বিছাবে [illegible]

আঁখি মোছো, মোছো [illegible] রাণি!
অশোকের আল্‌তায় ত্বরা করে' মৃদু [illegible] পা দু'খানি!
কেশে পরো কুর[illegible]ী,
কর্ণে কৃষ্ণচূড়া[illegible]
অতর্কিতে এখনি [illegible]
উৎসব-লগ[illegible]
আসে বুঝি,—আসে বু[illegible] শীত-রাজ
পরি' নব সজ্জ [illegible]
বসন্তের রাজ[illegible]
পূজা আসে প্রেম হয়ে—নব[illegible]গন্ধ-সমারোহ ল'য়ে;
ও ধরণি, বুক তোর থা[illegible]পেতে' থাক্,
বকুলের মালা এনে দে[illegible]হাসি-মুখে
দেবে তোরে,—[illegible]মুখে
হেসে, বুকে [illegible]

বিবাহকালে সীতার বয়স কত?

বিগত আষাঢ় মাসের বসুমতীতে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সংস্কৃত সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বিবাহকালে সীতার বয়স কত ছিল, এই প্রশ্ন তুলিয়া, সমস্ত বাল্মীকি-রামায়ণ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যে সকল স্থান হইতে সীতার বয়স সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেইগুলি একত্র করিয়াছেন এবং তিনি মনে করেন, সেগুলি অসংলগ্ন এবং তাহার সামঞ্জস্য হইতে পারে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রশ্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাম-সীতা তখন যুবক-যুবতী, ইহাই তাঁহার মত, তাহা একরূপ স্পষ্টই লিখিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের শেষে—"ক্রমশঃ" থাকার নিমিত্ত অপর অসামঞ্জস্যের কথা পরে বাহির হইবে, এই নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু এতাবৎ বাহির হয় নাই এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য-কথা তিনি পরে লেখায় বুঝা যাইতেছে যে, সীতার বয়স সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আর কোন প্রবন্ধ বাহির হইবে না। তজ্জন্য এখন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

উক্ত প্রবন্ধ হই[illegible] দেখা যায় যে, সীতা এক স্থলে নিজের মুখে যখন নিজের বয়[illegible] কথা বলিতেছেন, * তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, বিবা[illegible]ল তাঁহার বয়স ছয় বা সাত বৎসর; সুতরাং সেই শ্লোকগুলি[illegible] প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়, না হয়, বলিতে হয়, সীতা নিতান্ত [illegible] মেয়ে, তাঁহার বয়স কত, সে বিষয়ে তাঁহার কোনওরূপ [illegible]ছিল না। সীতা যে নেহাত বোকা মেয়ে, তাঁহার বিবা[illegible]য় তাঁহার বয়স ছয় কি সাত অথবা ১২, ১৩ বা ১৬ কি ১৮ [illegible]হাও তাঁহার না জানারই সম্ভাবনা, এরূপ বিবেচনা করা [illegible] রামায়ণের সহিত অসঙ্গত হয়। সীতার কার্য্যকলাপ দৃ[illegible]এই তাহা দেখা যায় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, সীতার বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল। তবে যাহারা তাঁহার রাজ্যসুখ ছাড়িয়া রামের সহিত বনে যাওয়াটাই অত্যন্ত বোকামীর কার্য্য মনে করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সুতরাং বিবাহকালীন সীতার বয়স তদপেক্ষা অনেক বেশী বলিতে গেলে এই শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রক্ষিপ্ত বলিতে গেলে কিন্তু একটু বিশেষ গোলযোগ আছে। কেন না, দশরথ নিজ মুখেই রামের বিবাহকালীন বয়স ১৫ বলিতেছেন †। আদিকাণ্ড ১৯ সর্গেও যখন বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট হইতে রামকে মারীচ ও সুবাহু রাক্ষস বধ করিবার নিমিত্ত চাহিতেছেন, তখন "কাকপক্ষধর" রামকে চাহিতেছেন †। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং এগুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিতে হয়। শুধু এই শ্লোকগুলিকে বাদ দিলেও চলিবে না, আরও অনেক কাট-ছাঁট করিতে হয়। কেন না, দশরথ অত ছেলেমানুষ রামকে রাক্ষসবধের নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে এবং তৎপরিবর্ত্তে নিজে ষষ্টি সহস্র সেনা সহিত রাক্ষসবধের নিমিত্ত যাইতে প্রস্তুত বলিয়াও—যখন বিশ্বামিত্র সেই "কাকপক্ষধর" রামকে ছাড়িলেন না, তখন দশরথ একবারে মূর্চ্ছা গেলেন। ইহাতে দশরথের রামের প্রতি অগাধ ভালবাসা সূচিত হইতেছে এবং যখন কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনায় সেই অতি প্রিয়পুত্র রামকে বনে পাঠাইলেন, তাহাতে তাঁহার সত্যসন্ধতা কত বেশী, তাহাও কবি বাল্মীকি এই ভাবে দেখাইয়াছেন। সুতরাং ইহা কাব্যের একটা সঙ্গত বর্ণনা। আবার অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বনবাসকালে কৌশল্যার খেদোক্তির সময়ে রামের যে বয়স বলা হইয়াছে, তাহাও সীতার নিজের মুখের কথায় বলা বয়সের সহিত সঙ্গত। "কাকপক্ষধর" অর্থে—এক রকম করিয়া মাথায় চুল রাখা, ইহা কেবল অল্পবয়সের ছেলেরাই রাখিত। সুতরাং সেটা হইল একটা চোখে দেখিবার জিনিষ। বিশ্বামিত্র

অরণ্যকাণ্ড ৪৭ সর্[illegible] ৫, ১০

দুহিতা জনক[illegible]থিলস্য মহাত্মনঃ।
সীতা নামাস্মি [illegible] রামস্য মহিষী প্রিয়া ॥ ৩
উষিত্বা দ্বাদশ স[illegible]কূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ [illegible]ান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী ॥ ৪
তত্র ত্রয়োদশে ব[illegible]জামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং [illegible] সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ ॥ ৫
*　　　*　　　*
মম ভর্ত্তা মহাতে[illegible] পঞ্চবিংশকঃ।
[illegible]জন্মনি গণ্যতে ॥ ১০

* আদিকাণ্ড ২০ সর্গ—২ শ্লোক।
ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যু[illegible]যোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥

† ১৯ সর্গ—৮ ও ৯ শ্লোক।
স্বপুত্রং রাজশার্দ্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্।
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি ॥

চোখে তখন ভাল দেখিতে পান না, এ কথা না বলিলে আর কাকপক্ষধর এই রামের বিশেষণ-সংযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই—রাম নিতান্তই ছেলেমানুষ, বয়স ১৫র বেশী নহে, এইটিই প্রমাণ হয়। রামের এই বয়স যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সীতার বয়সের কথাটা প্রক্ষিপ্ত বলা বড় সঙ্গত হয় না। সুতরাং রামায়ণের অনেক স্থল প্রক্ষিপ্ত না বলিলে চলে না। এখন দেখা যাউক, উপরি-উক্ত স্থলগুলি প্রক্ষিপ্ত বলা হইতেছে কেন এবং সেগুলির সহিত অন্য কোন স্থানের কোন অসামঞ্জস্য আছে কি না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সর্ব্বশুদ্ধ আটটি অসামঞ্জস্যের কথা তুলিয়াছেন। প্রথমে এবং সপ্তমে বলিতেছেন, রামের বনবাস যাইবার সময় সীতা তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলে রাম তাঁহাকে বারণ করিয়া অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু সীতা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাকে আমায় কর্ত্তব্যের কথা বুঝাইতে হইবে না—আমি আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার মাতা-পিতার নিকট হইতে বিশেষরূপে শিখিয়াছি।" (অযোধ্যাকাণ্ডে ১০ সর্গ ৮-৯ শ্লোক)।

আবার অযোধ্যাকাণ্ডে ১৮ সর্গে সেই কথাই অত্রি-পত্নীকে সীতা বলিয়াছেন, "পতি-সেবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তপস্যা স্ত্রীলোকদিগের আর নাই, এই কথা মা আমাকে বিবাহকালীন শিখাইয়া দিয়াছেন।" ইহা হইতে সীতা যে বেশ বয়স্থা, তাহা বুঝিবার ত কোন আবশ্যক দেখিতেছি না—সীতার যদি বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, তখন মা-বাপ কন্যা ৬, ৭ বৎসরের হইলেও সেই কথা তাঁহাকে বলায় বেজায় অসঙ্গত বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যেখানে পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত, সেখানে যখন কন্যা শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন যাহাতে সে স্বামীর কথা শোনে, তাহার অনুরূপ ও প্রিয় কার্য্য সর্ব্বদাই করে, সে কথাটা বুঝাইবার জন্য এ কথা বলা যে কেন ভয়ানক অসঙ্গত, তাহা ত বুঝিতে পারা যায় না।

আবার যখন আমরা মনে রাখি যে, আমাদের দেশে কোন কিছু পাঠ করিবার সময়ে, বুঝিবার আগে ছেলেদের আবৃত্তি করিবার বিধি প্রচলিত আছে—তখন পত্নীর ধর্ম্ম কি, তাহা সীতার কাছে বিবাহের সময়ে বলায় এমন কি ভয়ানক অসঙ্গতি হইল, তাহা ত আমার মত হীনবুদ্ধির হৃদয়ঙ্গম হইল না। যেখানে ব্যাকরণ পড়া আরম্ভ করিবার সময়ে সূত্রের অর্থ না বুঝাইয়া দিয়া তাহার পূর্ব্বে সেইগুলি হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত আবৃত্তি করান পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেখানে অতি অল্পবয়স্কা কন্যাকে পতিসেবা যে নারীর প্রধান ধর্ম্ম, এ কথা শিক্ষা দেওয়ায় উহা সেই পদ্ধতি অনুযায়ী হইল—ইহাতে কোন প্রভেদ রহিল না। হইতে পারে, এরূপ আবৃত্তি করানর ফল ভাল হয় না—কিন্তু সেই প্রথানুযায়ী কন্যাকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়াতে কোন মারাত্মক অসঙ্গতি হয় না। এই হেতু সীতার নিজের মুখে বলা বয়সের কথা প্রক্ষিপ্ত বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

তাহার পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দর্শিত দ্বিতীয় অসামঞ্জস্য। সীতা বিবাহের পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কপালে বনবাস আছে। এই কথা শুনিতে পাওয়ায়, সীতারও তাহাতে বিশ্বাস করায় তাঁহার বয়স বেশী—ইহা কোন্ যুক্তিসিদ্ধ, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। অল্পবয়সে কি লোক কাণে কম শুনে? বনবাসের কথা শুনিয়া সীতার তাহাতে বিশ্বাস করা এবং পরে বন দেখিবার ইচ্ছা হওয়া—আমাদের দেশে যেখানে সকলেই জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে বিশ্বাস করে—কপালের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না এ কথা বিশ্বাস করে—কেন অসঙ্গ[illegible] তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বিদ্যাভূষণ-প্রদর্শিত ৩ ও ৪ অসা[illegible] রামের বয়স-সংক্রান্ত, তাহা পরে আলোচনা করিব।

তাহার পর তাঁহার প্রদর্শিত [illegible] ও অষ্টম অসামঞ্জস্য। পঞ্চমটিতে রামায়ণের ৬০ সর্গে [illegible] ১৮, ১৯, ২০ শ্লোক পাওয়া যায় :—

"ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্দ্ধ[illegible] মমাত্মজাম্।
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো [illegible]ঙ্গব ॥"

ইহার মানে—ভূতলোত্থিত সী[illegible] "বর্দ্ধমানা" দেখিয়া অনেক রাজা আসিয়া তাঁহাকে চা[illegible]।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদিও [illegible] তুলিয়াছিলেন, তথাপি তাহার বাঙ্গালা অর্থ লিখিবা[র] সময় লিখিলেন,—"ক্রমে আমার অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতা যখন 'বর্দ্ধমানা' (প্রাপ্ত-যৌবনা) হইলেন, তখন বহু রাজন্য তাঁহার পাণিগ্রহণের আশায় আসিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। কেহই হরধনু

উত্তোলন করিতে পারেন নাই।” তিনি ইহ[illegible] পর লিখি-লেন, “মূলে আছে—‘বৰ্দ্ধমানা’। ব্যাখ্যা[illegible]তারা কেহ ‘যৌবন-সম্পন্না’ কেহ ‘প্রাপ্তযৌবনা’ [illegible]র্থ করিয়াছেন। এই স্থলে দেখিতেছি, বিবাহের পূর্ব্বেই সীতার যৌবনোদ্গম হই-য়াছে। অতএব নবীন যুবক রামের সহিত সীতার যখন পরিণয় হয়, তখন তিনিও ‘বৰ্দ্ধমানা’ অর্থাৎ নবীনা যুবতী।” কোনও অভিধানে ‘বৰ্দ্ধমানা’ এই কথার মানে ত “যৌবনসম্পন্না”; “প্রাপ্তযৌবনা” বা “নবীনা যুবতী” দেখি না। “বৰ্দ্ধমানা” এই কথার অর্থ,—যে বাড়িতেছে, তাহা ছাড়া ত অন্য কোন অর্থ কোন অভিধানে নাই—ব্যাকরণ হইতেও অন্য অর্থ হয় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কোন মান্য মত উদ্ধৃত করেন নাই। এ স্থলে যদি কোন ব্যাখ্যাকার এরূপ উদ্ভট অর্থ করেন, তাহার জন্য বৃদ্ধ বাল্মীকিকে দায়ী করা ও তাহার নিমিত্ত কৈফিয়ৎ তলব করা ন্যায়সঙ্গত কি না, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। ইহার নিমিত্ত সীতার মুখের কথা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত বলা কি সঙ্গত? সোজা অর্থ,—‘সীতাকে বাড়িতে দেখিয়া’ এইরূপ করিলে কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না।

তাহার পর তাঁহার প্রদর্শিত অষ্টম অসামঞ্জস্য এই—“আমার পতিসংযোগ-[illegible]ভ বয়স দেখিয়া পিতা একান্ত চিন্তিত হইলেন, দরিদ্রের [illegible]নাশ হইলে যেরূপ বিষাদ জন্মে, সেইরূপ।” ইহা হ[illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুমান করিলেন যে, কন্যা প্রাপ্তযৌব[illegible]তাহা না হইলে এরূপ চিন্তা হওয়ার কোন কারণ নাই; [illegible]রাং নিশ্চয়ই সীতার বয়স ১৩, ১৪, ১৫ না হইলে এইরূ[illegible] পারে না। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এই বিংশ শতা[illegible]—যখন যৌবন-বিবাহই প্রশস্ত, এই-রূপ শিক্ষিত-সম্প্রদা[illegible]তখন তাহা সত্ত্বেও মিথিলা প্রদেশে দ্বারভঙ্গ জেলায় [illegible]র ৫ হইতে ১০ বৎসরের কন্যার মধ্যে ৫ শত ৬৫ বিবা[illegible] Census Report 1911 and Tables Vol. X[illegible]খুন)। সুতরাং বহুপূর্ব্বে যখন সমাজ-সংস্কারকদের এ[illegible]বে ছিল না, তখন ঐরূপ বয়সেই বা তদল্পবয়সে কন্যা বিবা[illegible]ইত, এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। আপস্তম্ব, গোভিলপুত্র, যম, অঙ্গিরা, মনু, পরাশর প্রভৃতি সকল স্মৃতিশাস্ত্রকারই অতি অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবার যুক্তি দিয়াছেন, ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহাই প্রশস্ত বলা আছে। সুতরাং সমাজে তৎকালে যেরূপ বয়সে বিবাহ প্রচলিত ছিল, সেইরূপ বয়স হইলে চিরকালই পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন। আমরা বাল্যকালে ৯, ১০, ১১ বৎসরের বালিকাদের বিবাহের জন্য অভিভাবকগণকে বিশেষ চিন্তিত দেখিয়াছি। এখন ১২, ১৩, ১৪ বৎসর বয়সেও সেইরূপ চিন্তিত হইতে দেখা যায় না। এখনও যে সব জাতির ভিতর ৭, ৮, ৯ বৎসরের বয়সে বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের কন্যারা এই-রূপ বয়স প্রাপ্ত হইলে অভিভাবকগণ ঐরূপই চিন্তিত হয়েন। এ স্থলে জনক রাজার অধিক চিন্তিত হইবার একটি বিশেষ কারণ আছে। যে হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি সীতা দান করিবেন, অন্য কাহাকেও কন্যাদান করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আছেন; কিন্তু হরধনু ভঙ্গ করিতে পারে, এরূপ বীর্য্যশালী মনঃপূত বর পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার—হরধনু ভাঙ্গা ত দূরের কথা, রাজারা অনেকে ত তাহা তুলিতেই পারে না—সুতরাং তাৎকালিক প্রথানুযায়ী সীতার বিবাহবয়স হওয়াতে জনক রাজার অত্যধিক চিন্তাভারগ্রস্ত হইবার বিশেষ কারণ আছে। তাঁহার এরূপ চিন্তা দেখিয়া সীতা যে যৌবনে পদার্পণ করিয়া-ছেন, এরূপ অনুমান করার কোন সঙ্গত কারণ নাই এবং সীতার নিজের কথা যে প্রক্ষিপ্ত এবং তৎসঙ্গে অন্য স্থান-গুলিও প্রক্ষিপ্ত, এ কথা বলিবার কোন ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত কারণ দেখা যায় না। বরং সীতার এই ছয় সাত বৎসরে তাঁহাকে পতিসংযোগসুলভ বয়ঃপ্রাপ্ত বলায় তৎকালে সচরাচর ঐরূপ বয়সে কন্যাদের বিবাহ হইত, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই বিবাহকালে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনক, কামদেব, জাবালি, কশ্যপ, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষি এবং মিথিলার ও অযোধ্যার অমাত্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন ও একবাক্যে ঐ বিবাহে অনুমোদন করিয়াছিলেন। (আদিকাণ্ড—৬৮, ৭৩ সর্গ)। সীতার এইরূপ অল্পবয়সে বিবাহ হওয়ায় প্রমাণ হয় যে, তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অল্পবয়সে বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তাহাই আমাদের পুরাতন প্রথা—ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

তাহার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রদর্শিত ষষ্ঠ অসামঞ্জস্য,—সীতা ও তাহার ভগিনীগণ বিবাহের পরেই স্ব স্ব পতির সহিত “রহঃ (নির্জ্জনে) রেমিরে”। এখন এই “রেমিরে” কথার অর্থ কি? যদি “রেমিরে” এই কথার অর্থ রতিক্রীড়া ধ[illegible]

যায়, তবে অবশ্য অসামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃত 'রম্' ধাতুর প্রধান অর্থ ক্রীড়া করা, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি অভিধান দেখিলেই পাঠকবর্গ তাহা দেখিতে পাইবেন। যদি সীতা প্রভৃতি তাঁহাদের অল্পবয়স্ক পতিদের সহিত খেলাধুলা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন অসামঞ্জস্যই হয় না। এখানে যে কেবল এই খেলাধুলা করা বুঝাইতেছে, তাহা ধরিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। "রেমিরে"—যদি রতিক্রীড়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধ বাল্মীকি একালের অশ্লীল নাটক-উপন্যাস-লেখকদিগের ন্যায় অকারণেও অশ্লীলতার বর্ণনা অবতারণাকারী বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। কারণ, এখানে এইরূপ রতিক্রীড়ার কথা বলিয়া কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র-বিকাশের কোন সহায়তাই করিলেন না। জানি না, এ কালের রুচিতে রামায়ণ অশ্লীল কাব্য বলিয়া গণ্য কি না—আমরা ত বাল্মীকিকে এরূপ অকারণ অশ্লীলতা-বর্ণনাকারী বলিয়া জানি না। সুতরাং এখানে রমণ অর্থে খেলাধূলাই বুঝি এবং তাহা হইলে—সীতার বয়স সম্বন্ধে মোটেই কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। সুতরাং সীতার বিবাহের সময় বয়স ৬ কিম্বা বড় জোর ৭ হইতে পারে। কারণ, আমরা কখন কখন ইংরাজী ধরণে ৭ পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৬ বলি। জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই ভাবেই সংখ্যানির্দ্দেশ আছে। ইহার ঊর্দ্ধ বয়স ছিল, এ কথা বলার কোন সঙ্গত কারণ নাই এবং রামায়ণে সীতার মুখে তাঁহার বয়স নির্দ্দেশের এইরূপ অসার নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া প্রক্ষিপ্ত বলা একান্তই অন্যায়—প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ অসামঞ্জস্য রামের বয়স সম্বন্ধে। এখানে রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে "দেবতুল্য পরাক্রমশালী, অশ্বিনীকুমারদিগের ন্যায় রূপবান্, গজসিংহের ন্যায় গতি, সমুপস্থিতযৌবন এই দুইটি কুমার কে ?"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রামের ১৫ বৎসর বয়স—এবং তাহা বিশ্বামিত্র-উক্ত 'কাকপক্ষধর' রামের কথার সহিত ও কৌশল্যা-উক্ত রামের বয়সের সহিত সঙ্গত। এখানে তাহার বিরোধী কথা ত এমন কিছু পাওয়া গেল না। অসামান্য বীর রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া যদি জনক রাজা তাহাদিগকে তদপেক্ষা কিছু বেশী বয়সর মনে করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ দেখা যায় না। ইহাতে রাম-লক্ষ্মণের অসাধারণ শারীরিক বিকাশই সূচিত [illegible]—কোন বিরোধের কারণ কিছু পাওয়া যায় না। ১৬ [illegible]লই সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী যৌবন প্রারম্ভ—ইহাতে [illegible]মঞ্জস্য কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না।

আজকাল, হিন্দুসমাজে আমূল সংস্কার বি[illegible], আমাদের সমস্ত সমাজগঠন একবারে না ভাঙ্গিলে আর আমাদের কোন উন্নতির আশা নাই, এইরূপ কথা আমাদের সংস্কারধ্বজীরা বলিতেছেন এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না, বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়াই আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণে দেখা যায়, রাম-সীতার বাল্যবিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বিবাহকালে যাবতীয় রাজর্ষি মহর্ষি ঋষি উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহারা একবাক্যে তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে আমাদের শাস্ত্র জানিতেন না, পুরাতন প্রথা জানিতেন না, আমাদের সংস্কারকগণই জানেন, এ কথা বলিতে আমাদের সংস্কারধ্বজীরাও কুণ্ঠিত হন। রামায়ণের কাল আমাদের গৌরবের দিন, তৎকালে ও তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন আমরা হীনবীর্য্য ছিলাম না—তখন আমাদের দেশে অ[illegible]লমৃত্যু বড় একটা হইত না; সুতরাং বাল্যবিবাহ যে অকালমৃত্যু, দাসত্ব, স্বাস্থ্য-হানি, দারিদ্র্য প্রভৃতি সকল অনর্থের মূ[illegible], এ কথা বলা চলে না। আমাদের সংস্কারধ্বজীরা রাম-সীতার বিবাহ নেহাৎ অল্পবয়সে হয় নাই—এই কথা বাহাল [illegible]রিতে যত্নবান্। সেই জন্য এইরূপ ভিত্তিহীন তর্কের উপর [illegible]রাম-সীতার বয়স অত কম ছিল না, এ সকল কথা প্রক্ষিপ্ত মূঢ় [illegible] বলিয়া বিচারাক্ষম বালকবালিকাদের ভুল বিশ্বাস ক[illegible] দেওয়া হয়। অত অল্পবয়সে বিবাহ হইত বলিয়াই, সীতা [illegible]মের বনবাসের কথা শুনিবামাত্রই বিনা দ্বিধায় তাঁহার [illegible] করিলেন—যাইবার আবশ্যক কি, তাহাও জিজ্ঞাসা [illegible]লেন না। অল্পবয়সে বিবাহ না হইলে স্বামিস্ত্রীতে এইরূপ [illegible]ভূত হওয়া একরূপ দুঃসাধ্য হয়। বেশী বয়সে বিবাহ [illegible] সচরাচর কলহ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই নিমিত্তই পাশ্চাত্যদেশে এত বিবাহবিচ্ছেদ বাড়িতেছে। আমরা দারিদ্র্যগ্রস্ত। সংসারের সুখের ভিতর আছে কেবল গার্হস্থ্য সুখ। তাহাও নষ্ট করিতে আমাদের অশনে, বসনে, বিলাসে, রুচিতে, হাসিতে, কাসিতে পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণপ্রিয়, ইংরাজীতে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি

বিহীন সংস্কারধ্বজীরা বদ্ধপরিকর। আমাদের শতকরা ... জন অত্যন্ত দরিদ্র—তাহারা পেট ভরিয়া খাইতেই পায় না—তাহাদের কোন সংস্থানই নাই। দরিদ্রের পক্ষে যুবতী কন্যা গৃহে রাখার যে কত দায়, তাহাদিগকে প্রলোভিত ও প্রতারিত করিতে যে কত লোক উদ্‌গ্রীব থাকে, একবার পদস্খলন হইলে, তাহাদের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হয়—বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিগের পিতা বা অন্য অভিভাবক মরিয়া গেলে বা এক বৎসর অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা মহামারী হইলে,—এরূপ দুর্দ্দৈব ত আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এ সকল কন্যা কিরূপ আশ্রয়হীন, সহায়হীন হইয়া বিপদ্‌সাগরে পড়ে, তাহাও আমাদের সংস্কারধ্বজীরা ভাবেন না। বিবাহ দিলে তাহারা যে স্বামিগৃহে আশ্রয় পায়—ইহা যে তাহাদের মঙ্গলের জন্যই একান্ত আবশ্যক, তাহাও ভাবিয়া দেখেন না। পাশ্চাত্যদেশে আজকাল এরূপ অল্পবয়সে বিবাহ নাই, সুতরাং ইহা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচারের নিদর্শন—আমাদের অসভ্যতার নিদর্শন, ইহাই সংস্কারধ্বজীদের ধারণা। সুতরাং আমাদের গৌরবের দিনে, রামায়ণের সময়ে এইরূপ বিবাহ ছিল না—রাম-সীতা যুবক-যুবতী ছিলেন, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)।

অতীত না বর্ত্তমান !

লোকে বলে —আজকে যেটা দেখ্‌ছি মোরা বর্ত্তমানে,—
মিশে যাবে কালকে সেটা কোন্ অতীতের মধ্যখানে !
অতীত ও বর্ত্তমানে এই যে দুটো পৃথক চিন্—
মোর চোখে তা এক হ'য়ে যে ভাস্‌ছে আজি রাত্রিদিন !

আজো যখন কল্ কল্ কল্ গায় যমুনা কল্লোল গান,—
যায় যে শোনা তারি মাঝে শ্যামের মোহন বাঁশীর তান !
আজো তারি বালুকাটি ঢেউয়ে রাই-কিশোরীর ব্যাকুলতা
জাগে যে গো, জাগে ব্রজের গোপাঙ্গনার কতই কথা !

সন্ধ্যা-সুধীর বাতাস দোলা তীর-তরুর দোদুল শাখে,—
ব্রজের কালা তেমনি যে হায় সঙ্কেত দেয় গোপন ডাকে !
আজো যখন বাদল রাতে ঝর ঝর ঝর ঝরে ধারা—
বাহিরে যত গাছপালা বর্ষা-বায়ে ভিজে সারা,—

ঠাকুমা এসে রূপকথায় মাসী পিসী পাড়ায় ঘুম —
ঘুমের দেশের পরী এসে চোখের পাতে খায় যে চুম !
আজো যখন চাঁপার বনে কোটা কোটা চাঁপার শাখে,—
পারুল—ছোট বোনটি সে সাত ভাইকে ফুটতে ডাকে !

আজো যখন ঘুমের দেশে প্রিয়ায় চুমে চন্দ্রকর,—
বেশ দেখা যায় পালঙ্কে ঐ রাজকন্যার সোনার ঘর !
'রাজকন্যা' ঘুমিয়ে আছে সোনার খাটে এলিয়ে কায়—
'জীয়ন-কাঠি' 'মরণ-কাঠি'—প'ড়ে আছে ডাইনে বাঁয় !

আজও মেঘের আড়ম্বরে যখন 'মণিকর্ণিকাতে'—
ঝঞ্ঝা নামে দুর্য্যোগেতে কাশীর ঘাটে আঁধার রা'ত,—
'হরিশ্চন্দ্র' শ্মশান রাখে গুণে নিয়ে 'ঘাটের কড়ি'—
মরা ছেলে 'রোহিত' কোলে শৈব্যা কাঁদে বুক চাপড়ি !

আজো যখন বজ্রনাদে বিশ্ব কাঁপে থরথরে,—
দেব-দানবের যুদ্ধ বাধে স্বর্গ-সিংহাসনের তরে—
বেশ দেখা যায় দেবের লাগি মুখে মধুর হাসির ধার—
বৃত্রবধে 'দধীচি' যে ঐ দিতেছেন অস্থি তাঁর !

আজো যখন চেয়ে দেখি 'মেঘমেদুরমম্বরম্'—
বেশ শুনা যায় গাইছে কবি "স্মরগরলখণ্ডনম্—" !
'আষাঢ় দিনের চল্‌তি মেঘে বিরহী সে যক্ষ তার
প্রিয়ার কাছে বার্ত্তা পাঠায় আজো হিমাচলের পার !

কলনন্দিনী তমসা-তীরে স্নিগ্ধ বনের মর্ম্মরে—
ঋষি কবির ব্যথা যে গো বাজে অনুষ্টুপের স্বরে !
আজো যখন পড়ে ছায়া সেই বারুণীর কাল জলে—
কোকিল-বধূ 'কুউ-উ' ডেকে যায় তীরের তরুর পাতার তলে।

রোহিণী তার কলস ফেলে বসে তারে পাড়তে গালি—
ঘাটের উপর কাঁদ্‌তে বসে মিছে মিছে খালি খালি !
আজো যখন সন্ধ্যা নামে ঐ নদীরই পরপারে—
'কবি' তাহার "নৌকাখানা ভিড়ায় নাকো" তারি ধারে,—

সাঁঝ আঁধারে বেশ দেখা যায় 'স্বর্ণলতা' 'চিতার পরে'
"শিথিল বকুল" তাহার পরে 'ঝর্ ঝর্ ঝর্' পড়ছে ঝ'রে !
অতীতে কেউ যায়নি চ'লে—মিশেই আছে বর্ত্তমানে,
এই প্রকৃতির রূপান্তরে জাগছে ধরার মধ্যখানে !

তাই অনুরোধ আভিধানিক ! অতীতেরই সংস্কারে—
বর্ত্তমানে দাও মিশায়ে ভাবরসেরই সম্ভারে !

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি-এ)।

শঠে শাঠ্য

কল্‌কাতার চৌরঙ্গী রোডের উপর সন্তরাম জীবনরাম ভাটিয়ার মস্ত বড়ো দোকান; সেই দোকানে অতি পুরাতন দুর্লভ ও নানা দেশ-বিদেশের বিচিত্র শিল্পসম্ভারের কারবার করে সে। তিব্বতের তৈরী মণিপদ্মে হুং, নেপালের যুগনদ্ধ মূর্ত্তি, চীনের প্রাচীন পোর্সিলেন, জাপানের সাৎসুমা পোর্সিলেনের বাসন, বর্ম্মার ছাতা, চীনা মান্দারিনের প্রাচীন ড্রাগন-আঁকা জোব্বা, চীনা চিত্রকরের প্রাচীন ছবি, জাপানী কিমোনো, জাপানী ছবি, সামুরাইয়ের তরোয়াল, বলীদ্বীপের ঘণ্টা, যবদ্বীপের দেবমূর্ত্তি, সিংহলের রূপা-বাঁধানো নারিকেল-মালার বাটি, গান্ধারের মূর্ত্তি, ওয়াজিরিদের চাপ্‌লি জুতা, মেক্‌সিকোর ডাকাতদের ছোরা, কর্সিকার ডাকাতের কোমর-বন্ধ, বেলোয়ারী কাচের স্থতায় বোনা নেকটাই, র‍্যাফেল মুরিলো জশুয়া রেনলড্‌সের ছবি—এমনি কতো কি দামী আর দুর্লভ অদ্ভুত শিল্পসম্ভারে তার দোকান সৌন্দর্য্য আর ঐশ্বর্য্যের বিলাসভবন হয়ে আছে। দেশ-বিদেশের রাজা-মহারাজারা আর আমেরিকার মাল্‌টি-মিলিওনিয়ার বা ক্রোর-পতিরা শীতকালে যখন কলকাতায় আসে, তখন জীবনরাম বেশ মোটা রকম লাভ করে। অন্য সময়েও তার দোকানে লোকের ভিড় কম হয় না; ক্রেতা বেশী না থাকুক, কৌতূহলী দর্শকের আনাগোনায় জীবনরামের দোকান সর্ব্বদাই সরগরম থাকে। তার দোকানে দামী জিনিস যেমন আছে, সস্তা অথচ সুন্দর জিনিসেরও অভাব নেই;—সিংহলের তাল-কাঠের ছড়ি, বর্ম্মার গালার রঙে ছবি আঁকা বাঁশের কৌটা, দার্জিলিঙের রংচঙা পাথরের চেন হার দুল, জাপানের খড়ের চটি জুতা, উড়িষ্যার আব্‌লুশ কাঠের উপর হাড়ের কাজ-করা লাঠি আর বাক্‌স খুব অল্প দামেই বিক্রী হয়। যারা দোকানের শোভা আর দুর্লভদর্শন দ্রব্য দেখ্‌তে দোকানে যায়, তারা চক্ষুলজ্জার খাতিরে অল্পদামী একটা দুটো জিনিস কিনে আনে। এতেও জীবনরামের জীবনযাত্রা বেশ সুখস্বচ্ছন্দেই চল্‌তে থাকে।

কিন্তু পুলিশের সন্দেহদৃষ্টি লেগে থাকে এমনি প্রাচীন আর দুর্লভ মণিহারী ও মনোহারী দোকানের উপর। পুরাণো জিনিসের বেশীর ভাগ চোরাই মাল হওয়া সম্ভব, নইলে এমন সব দুর্লভ দ্রব্য স্বেচ্ছায় হস্তান্তর কর্‌বে, এমন হতভাগা লক্ষ্মী-ছাড়া জগতে খুব বেশী আছে ব'লে মনে হয় না। পুলিশ খবর পেয়েছে, জীবনরাম চোরাই মালের কারবার করে; চোরাই মাল কিনে সে এমন নিপুণভাবে সেগুলির গঠনে আর চেহারায় অদলবদল ঘটায় যে, সেই দ্রব্য যার চোখের সামনে থেকে থেকে অতি পরিচিত হয়ে গেছে সেই মালিকও আর তার নিজের মাল চিন্‌তে বা সনাক্ত কর্‌তে পারে না। পুলিশের গোয়েন্দারা সাধারণ ভদ্রলোক ক্রেতার বেশে প্রত্যহ দোকানে এসে ঘোরাফেরা করে; অদ্ভুত বা দামী বা দুর্লভ জিনিস চুরি যাওয়ার খবর পেয়েই পুলিশের লোক জীবনরামের দোকানে ছদ্মবেশে এসে ঘুরে যায়; পরিচিতি তাকে ঘুণাক্ষরেও কলঙ্কভাগী কর্‌তে পারে, এমন চিহ্ন বা সূত্র তারা আবিষ্কার কর্‌তে পারেনি।

পুলিশের কাছে খবর এলো, এক সম্ভ্রান্ত ধনীর বৈঠকখানা থেকে একটি তিব্বতী মণিপদ্মে হুং চুরি গেছে। সেই জিনিসটি হচ্ছে একটি রূপার অষ্টদল পদ্ম; পদ্মকোষটি সোনার, তার উপরে অষ্টধাতুর একটি বজ্র আছে, বজ্রটির দুই মুখে আর মধ্যদেশে তিনটি মরকতমণি বসানো আছে; পদ্মের আটটি পাপ্‌ড়িতে বিচিত্র কারুকার্য্য করা, একটি পাপ্‌ড়ি একটু ভাঙা; পদ্মকেশরগুলি সোনার তারের মুখে মুক্তা লাগিয়ে তৈরি; পদ্মটি একটি বেদীর আকারের যন্ত্রের উপর স্থাপিত; সেই যন্ত্রবেদী ধ'রে পদ্মটি শূন্যে তুল্‌লে পদ্মের অষ্ট-দল মুদ্রিত হয়ে পদ্মকোষস্থিত বজ্রটিকে আবৃত করে, আর

পদ্মটিকে শূন্য থেকে নামিয়ে যন্ত্রবেদীকে কোনো আধারের উপর স্থাপন করলে পদ্মটির অষ্টদল বিকশিত হয়ে খুলে ছড়িয়ে পড়ে আর পদ্মকোষস্থ বস্তুটি প্রকাশিত হয়ে যায়। পুলিশের সন্দেহ হলো, এমন দুর্লভ বিচিত্র দ্রব্য নিশ্চয় জীবনরামের দোকানে গোপন অভিসার করেছে বা করবে। পুলিশ বহু দিন তর্কে তর্কে ফিরলো, কিন্তু চোরাই মালের কোনোই সন্ধান মিললো না।

এক দিন জীবনরাম তার দোকান থেকে বেরিয়ে মোটর-গাড়ীতে চড়তে যাবে, এমন সময় এক জন পুলিশ-অফিসার এসে তাকে বললে—আপনার নামে একটা ওয়ারাণ্ট্ আছে।

জীবনরাম আশ্চর্য্য ও ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আমার নামে ওয়ারাণ্ট্?

পুলিশ অফিসার বললে—হাঁ, এই দেখুন।

পুলিশ অফিসার জীবনরামের সাম্নে একখানা ওয়ারাণ্ট্ মেলে ধরলে।

জীবনরাম সেই কাগজখানার উপর চোখ ফেলেই প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে—এ ওয়ারাণ্ট্ তো নেকিরাম জীবন-রামের নামে; আমার নাম তো সন্তরাম জীবনরাম। এ ওয়ারাণ্ট্ আমার ন[illegible]।

অফিসার বললে[illegible] আপনি হয় তো নাম বদ্লেছেন।

জীবনরাম হেসে[illegible]লে—বদ্লাতে হ'লে লোকে নিজের নামটাই বদ্লায়, বা[illegible] নাম কেউ বদ্লায় না। আমি সন্ত-রামের পুত্র জীবন[illegible] আর এই ওয়ারাণ্ট্ যার নামে, সে নেকিরামের পুত্র জী[illegible]।

অফিসার বল[illegible] হবে। তা হ'লে আপনি যদি একবার অনুগ্রহ ক[illegible]লিশ-কমিশনারের আফিসে গিয়ে কমিশনার সাহেবকে [illegible] কথাটা বুঝিয়ে বলেন, তবে সকল গোল মিটে যায়।

জীবনরাম বললে—চলুন; কমিশনার সাহেবের সঙ্গে তো আমার পরিচয় আছে; তিনি তো আমার দোকানের খরিদদার।

অফিসার বললে—তা হ'লে তো আর কোনো ভাবনাই নেই। আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, আমরা হুকুমের চাকর, আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।

জীবনরাম এ কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ ওয়ারাণ্ট্ কিসের জন্যে?

অফিসার বললে—এ সি আই ডি'র ওয়ারাণ্ট্, এর কারণ বল্বার নয়। তবে আপনি যখন সেই লোকই নন, তখন আপনাকে বলি—রাওলপিণ্ডিতে যে পুলিশ-অফিসার খুন হয়েছে, সেই সম্পর্কেই।

জীবনরাম বললে—ওঃ! আমার কোনো পুরুষের সঙ্গে রাওলপিণ্ডির কোনো লোকের সম্পর্কই নেই। আর আমি তো ছ মাসের মধ্যে কল্কাতা ছেড়ে কোথাও যাই-ই নি, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

অফিসার বললে—তা হ'লে আপনি একবার গিয়ে এই কথাটা বললেই হবে। আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি, মাপ করবেন।

জীবনরাম মনে মনে বিরক্ত ও একটু ভীতও হয়েছিল, তাই পুলিশ অফিসারের ক্ষমা-প্রার্থনার উত্তরে সে বিনয় প্রকাশ ক'রে বলতে পারছিল না যে, আপনার আর দোষ কি অথবা আমার এতে আর কষ্টই বা কি। সে অফিসারের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের দোকা-নের কর্ম্মচারীকে ডেকে বললে—এ ভাই দৌলতরাম, আমি পুলিশ-কমিশনারের আপিসে যাচ্ছি; এই অফিসার এক নেকি-রাম জীবনরামের নামে ওয়ারাণ্ট্ এনে আমাকে গেরেপ্তার করতে চান। আমি পুলিশ-কমিশনার সাহেবকে বললেই তিনি এই অফিসারের ভুল বুঝতে পারবেন, কারণ, তিনি তো আমাকে ভালো রকমই চেনেন।

এই বলে জীবনরাম পুলিশ-অফিসারের মোটরে চ'ড়ে চ'লে গেল।

জীবনরাম পুলিশ-কমিশনারের আপিসে গিয়ে পুলিশ-কমি-শনারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার বললেন—পুলিশ-কমিশনার এখন নেই। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না, আপনার কোনো আশঙ্কাও নেই। আপনি যে এক জন বড় নামজাদা ব্যবসাদার, তা কল্কাতা সহরের কে না জানে? তবে একটা সন্দেহ মীমাংসা করবার জন্যই আপনাকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। আপনি আমাদের সেই বেয়াদপি মাপ করবেন। আপনি বসুন। হর্ষ-বাবু, সেই নেকিরাম জীবনরামের ফাইলটা নিয়ে আসুন দেখি।

যে পুলিশ-অফিসার জীবনরামকে গেরেপ্তার ক'রে এনে-ছিল, সে ঘরের এক পায়রা-খোপ আলমারী থেকে একটা ফাইল এনে ডেপুটি পুলিশ-কমিশনারকে দিলে।

ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার সেই ফাইলের ভিতর থেকে একখানা লেখা কাগজ বাহির ক'রে জীবনরামকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন তো, এ লেখা কি আপনার ?

জীবনরাম সেই গুজরাটী-লেখা কাগজখানা হাতে নিয়ে প'ড়েই বললে—না, এ লেখা আমার নয়।

ডেপুটি কমিশনার বললেন—আপনি একখানা কাগজে এই কাগজের লেখা কথা কটা অনুগ্রহ ক'রে লিখুন ; আমাদের হ্যাণ্ড্‌রাইটিং এক্‌সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চাই। সে যদি বলে, এই দুই কাগজের লেখা এক হাতের নয়, তা হলেই আপনাকে আর আমরা কষ্ট দেবো না।

জীবনরাম একখানা কাগজের উপর পূর্ব্বপ্রদর্শিত কাগজের লেখা কথাগুলি লিখ্‌ল—তার মর্ম্ম হচ্ছে—'পুলিশ সব টের পেয়েছে ; এই পত্রবাহক যা বল্‌বে, সেই রকম ব্যবস্থা করবে। বেশী লেখ্‌বার সময় ও সুবিধা নেই।'

লেখা শেষ করে জীবনরাম কাগজখানা ডেপুটি কমিশনারকে দিতে উদ্যত হ'ল।

ডেপুটি কমিশনার বল্‌লেন—ওর নীচে আপনার নামটা সই করুন, তা হ'লে আমরা বুঝতে পারব, কোনটা আপনার লেখা।

জীবনরাম নামসই ক'রে দিলে।

হর্ষ-বাবুকে সেই কাগজ দু'খানা দিয়ে ডেপুটি কমিশনার বল্‌লেন—হর্ষ-বাবু, হ্যাণ্ড্‌রাইটিং এক্‌সপার্টকে লেখা দু'টো দেখিয়ে তাঁর অভিমত লিখিয়ে নিয়ে আসুন।

হর্ষ-বাবু কাগজ নিয়ে চ'লে গেল।

জীবনরাম ব'সেই আছে। হর্ষ আর ফেরে না। প্রতীক্ষার প্রত্যেক ক্ষণ জীবনরামের কাছে যুগান্ত ব'লে মনে হচ্ছিল।

অনেক ক্ষণ পরে ডেপুটি কমিশনারের ঘরের টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। ডেপুটি কমিশনার টেলিফোন্ ধ'রে কথা শুনে বল্‌লেন—আচ্ছা।

তার পর টেলিফোনের চোঙ্ রেখে দিয়ে ডেপুটি কমিশনার জীবনরামকে বল্‌লেন—আপনি এখন যেতে পারেন। আমাদের হস্তাক্ষর-পরীক্ষক বল্‌লেন যে, আপনার হস্তাক্ষরের সঙ্গে আমাদের কাগজের লেখা মিল্‌ল না। আপনাকে যে আমরা অকারণে একটু কষ্ট দিলাম, তার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন।

জীবনরাম খুবই রুষ্ট হয়েছিল ; সে কোনো কথা না ব'লে ডেপুটি কমিশনারকে অভিবাদন করলে এবং জোরে জোরে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

জীবনরাম একটা ট্যাক্‌সি ডেকে নিজের দোকানে ফিরে গেল। সে গাড়ী থেকে নেমেই দেখ্‌লে একখানা মোটর-লরীতে তার দোকান থেকে বহু সামগ্রী বাহির ক'রে এনে তোলা হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার দোকানের কর্ম্মচারী দৌলতরাম আর একজন অপরিচিত গুজরাটী-পোষাক-পরা লোক।

জীবনরাম আশ্চর্য্য হয়ে দৌলতরামকে জিজ্ঞাসা করলে—এ-সব জিনিস কোথায় যাচ্ছে ? সব কি বিক্রী হয়েছে ?

জীবনরামের এই প্রশ্নে দৌলতরাম আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—বিক্রী তো হয় নি ; এই বাবু আপনার চিঠি নিয়ে এসে বল্‌লেন যে, পুলিশ চোরাই মালের খবর পেয়েছে ; এখনই খানা-তল্লাসী করতে আসবে, তার আগে সব মাল সরিয়ে ফেল্‌তে হবে।—এই তো আপনার চিঠি—

দৌলতরাম জীবনরামের হাতে চিঠি দিলে। জীবনরাম বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষুর উৎসুক দৃষ্টি কাগজের উপর স্থাপন ক'রেই দেখ্‌লে—পুলিস আপিসে যে কাগজে সে লিখেছিল—'পুলিশ সব টের পেয়েছে ; এই পত্রবাহক যা বল্‌বে সেই রকম ব্যবস্থা করবে। বেশী লেখ্‌বার সময় ও সুবিধা নেই।'

জীবনরাম বিহ্বল দৃষ্টি তুলে অপরিচিত গুজরাটী লোকটির দিকে তাকাল। সেই লোকটি মৃদু হেসে বল্‌লে—আমি পুলিশের লোক।

ঠিক সেই সময়ে হর্ষ-বাবু হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বল্‌লে—জীবনরাম বাবু, আমি আপনাকে ব-মাল গেরেপ্তার করছি। আপনাকে আর-একবার কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে। তবে এবার একলা নয়, আপনার সঙ্গী হবেন দৌলতরাম।

জীবনরাম বজ্রাহতের মতন নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের ধূর্ত্ত কৌশলের কথাই ভাবতে লাগ্‌ল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলাবাগান দেখিলাম। এই পথে ভাগলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত প্রভাচরণ বাবুর সহিত আবার দেখা হইল (কার্ত্তিক-সংখ্যা ১২৫ পৃঃ), তিনি ৺কেদারদর্শনে যাইতেছেন। আরও বিস্তর যাত্রী দেখা গেল, সকলেই ৺কেদারধামের অভিমুখে যাইতেছে। পাণ্ডার ভ্রাতা নারায়ণ চটী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল ; টাকা প্রত্যাখ্যান করাতে আমরা অপমানিত হইয়াছি, এই কথা পুত্র ও ভাগিনেয় তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তবে সে বয়সে যুবক, তাহার উপর অশিক্ষিত, ধারণা করিতে পারিল কি না সন্দেহ। বিদায়কালে হয় ত' টাকা দিতে চাহিলে লইত, কিন্তু আমরা দ্বিতীয়বার অপমানিত হইবার আশঙ্কায় সে মতলব করিলাম না, হরিদ্বারে পৌছিয়া বড় পাণ্ডার হাতে দিব, মনে মনে এই স্থির করিলাম।

এইখানে ৺কেদারনাথের পাণ্ডার গোমস্তা বিদায় লইল। তাহাকে পাঁচ টাকা ইনাম দেওয়া গেল—এ কয় দিন বাসন মাজিয়া দিয়াছে ও কোনও কোনও দিন জল আনিয়া দিয়াছে বলিয়া ; (ইহা ছাড়া তাহাকে প্রায় প্রত্যহ ২।৪ খানা করিয়া 'পুরী' জলখাবার দেওয়া হইয়াছিল।) কিন্তু সে ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। যেমন মনিব, তেমনি চাকর ; 'যাদৃশী দেবতা তস্যাস্তাদৃগ্ভূষণবাহনৌ।' ৺বদরীনাথের পাণ্ডার গোমস্তা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইলে শেষে সে গ্রহণ করিল এবং (দেবপ্রয়াগের কাছে) স্বগৃহাভিমুখী হইল। (এ লোকটিও পাণ্ডার ভ্রাতার মত যুবক ; পক্ষান্তরে, অপর গোমস্তাটি প্রৌঢ়-বয়স্ক।) ৺বদরীনাথের পাণ্ডার গোমস্তা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল, এখন হইতে এক জন বাচ্ছা কাণ্ডীওয়ালা বাসন মাজিয়া দিবে ঠিক হইল। ৺কেদারনাথের পাণ্ডার গোমস্তার ইচ্ছা ছিল, বরাবর আমাদের সঙ্গে যায়, খোরাকী দিয়া লইয়া যাইতে হইবে, বেশী ইনামও দিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত খোরাকী অবশ্য পাণ্ডাই যোগাইয়াছেন। আমরা এ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় সে স্ত্রীলোকদিগকে ভয় দেখাইয়াছিল যে, হাজার টাকা দিলেও কাণ্ডীওয়ালারা বাসন মাজার কার্য্য করিবে না। এটা অবশ্য ধাপ্পা। (এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২১ পৃঃ, এ দেশের লোক সরলপ্রকৃতি সত্য-বাদী নহে।)

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বেই (দুই আনা মাত্র গুদামভাড়া দিয়া) পুত্র মাল খালাস করিয়া আনিলেন ও দুই ভাইএ আবার নূতন করিয়া তিন কাণ্ডীর জিনিশ (এ দেশে 'সামান' বলে) সাজাইলেন। আমার আজ অন্ন পথ্য হইল। এবার কিন্তু বার্লির কৌটা—ভবিষ্যতের ভয়ে—পুত্রের ব্যাগে চড়িল। বেলা ২টায় নূতন পথে (নালা চটী পর্য্যন্ত পুরাতন পথ) ৺বদরী-অভিমুখে জয়-শব্দ উচ্চারণ করিয়া যাত্রা করা গেল। এ দিনও পথে খানিক বৃষ্টি হইল। পথ প্রথমে উতরাই, পরে মন্দাকিনীর পুল পার হইয়া চড়াই। তদুপরি সঙ্কীর্ণ, পার্শ্বে গভীর খদ, বেলা ৪টায় উখীমঠ পৌছান গেল। এই পথে অনেক ৺কেদারযাত্রী বাঙ্গালীর সহিত দেখা হইল—সকলেই অপরিচিত। উখীমঠের সন্নিহিত হইলে কয়েকটি অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল, এ কয় দিন দেখি নাই, আমগাছও দেখি নাই। প্রবেশপথে যুগপৎ ছয় ঢোলে কাঠি পড়িল (এ যেন রূপকথার রাজার আগমন) ; ঢুলী প্রৌঢ়, যুবা, বালক, তিন বয়সেরই ছিল, ঢোলের আকার তাহাদিগের বয়সের অনুপাতে ! সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগান ও 'মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক' ইতি শুভেচ্ছা-প্রকাশ। কয়েকটি আধলা-পাই দাতব্য করিতে হইল। থানা, ডাকঘর, মধ্যশ্রেণী স্কুল, দোকান-পসার দেখিতে দেখিতে চলিলাম ; হাসপাতাল, ধর্ম্মশালা, সদাব্রতও আছে। শ্রীনগরের মত না হইলেও সমৃদ্ধ স্থান বটে।

কাছেই একটি দোতলা বাড়ী পাওয়া গেল। জলের ব্যবস্থা ধারা ও কুণ্ডের। স্কুলের ছাত্রগণ সুন্দর একটি 'ভারত-মাতা' (হিন্দী) গান সমস্বরে গায়িল ; ভাগিনেয় বাপাজী হিন্দীতে লায়েক, সন্ধ্যার পর বাসায় ছাত্রগণ আসিলে তিনি তাহাদিগের সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। তাহারা বেশ ভদ্র ও বিনয়ী। আলাপের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গানটির কিয়দংশ লিখিয়া লইলেন। যথা—

হম সব যোধা মিল কর ভাই রণভিক্ষা-কো যাতে হৈ।
ভারত-মাতা জননী হামারি উস্‌কা কষ্ট মিটাতে হৈ॥
নির্ব্বলতা ঔর স্বার্থ যো রিপু হ্যায়।
নিষ্ঠুরতা অরু দ্রোহ যো হ্যায়।
উন্‌কো মার ভাগাতে হৈ॥
আপনমে তুম লড়না ছোড়ো
প্রীত পরস্পর করনা শিখো।
যহ সন্দেশা লাতে হৈ॥

উখীমঠে নানা দেবতাদর্শনান্তে ২।১ খানি পত্র লিখিলাম। ২।১ খানি পত্র এই ঠিকানায় পাঠাইতে বলিয়াছিলাম, না পাওয়াতে চিন্তিত হইলাম—বিশেষতঃ প্রাণপ্রিয় পৌত্রটির

কুশলসংবাদ না পাওয়ায়। * সম্ভবতঃ আমরা অনুমিত দিনের পূর্ব্বেই আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া পত্র তখনও পৌছে নাই। রাত্রির আহার অন্ত সকলের 'পুরী'-তরকারী প্রস্তুত হইল, আমার পথ্য বার্লি, তাও লেবু নাই।

উখীমঠ না কি বাণরাজকন্যা উষার নামের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। ('উষা' নাম বিকৃত উচ্চারণে বাঙ্গালায় উখী হয়, হিন্দীতে 'ষ'এর 'খ' উচ্চারণ হয়, যথা—বর্ষা = বর্খা, ভাষা = ভাখা। এই ব্যুৎপত্তি কতদূর বিচারসহ, তাহা জানি না।) এই স্থানে না কি বাণরাজার রাজধানী ছিল। উষা-অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয়ের পৌরাণিক উপাখ্যান আশা করি পাঠকবর্গ জানেন। উখীমঠের আধুনিক প্রসিদ্ধির কারণ, এখানে ৺কেদারনাথের 'রাওল সাহেবে'র অর্থাৎ মোহান্তের স্থায়ী বাস। বৎসরে ৬.৭ মাস (বৈশাখ-অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে কার্ত্তিক-দীপান্বিতা পর্য্যন্ত) ৺কেদারনাথের মন্দির খোলা থাকে, পরে প্রচণ্ড শীতে বরফে প্রোথিত হয়। তখন 'রাওল সাহেব' ত এই উখীমঠে থাকেন-ই, ৺কেদারনাথের পূজাভোগ প্রভৃতিও এইখানে হয়।

মঠটি বৃহৎ, ফটক পার হইয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, ফটকটিও জমকালো। ফটকে ও মঠের ভিতরে কাঠের কারুকার্য্য অতি পরিপাটী। কয়েকটি মন্দির আছে, সেগুলিতে মান্ধাতা, ওঁকারেশ্বর, পঞ্চমুখ কেদারেশ্বর (দুইটি স্বর্ণময়, তিনটি রৌপ্যময়), উষা ও অনিরুদ্ধ, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতির মূর্ত্তি বিরাজিত। সর্ব্বত্রই অবশ্য 'ভেট চড়াইতে' হয়। ৺কেদারনাথের (কারুকার্য্যময়) গদিও একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। উখীমঠ হইতে ২১ মাইল দূরে মধ্যমহেশ্বর (পঞ্চ-কেদারের অন্যতম), রাস্তা দুর্গম, চটী নাই শুনিয়াছি। আমরা ৺বদরীধামে সরাসরি-ভাবে যাইবার জন্যই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সুতরাং এ সব ঘুর-পথের আর চেষ্টা করিলাম না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৬২ পৃঃ), উখীমঠ ও গুপ্তকাশী পরস্পর মন্দাকিনীর বিপরীত তীরে। চন্দ্রালোকিত রাত্রিকালে গুপ্তকাশী হইতে উখীমঠের বাড়ী ও আলোগুলি যেমন সুন্দর দেখাইয়াছিল, এখন উখীমঠ হইতে গুপ্তকাশীর বাড়ী ও আলোগুলিও সেইরূপ সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

১৪শ দিন—৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে বৃহস্পতিবার

প্রাতঃ ৫।৪৫ মিঃ উখীমঠ হইতে রওনা, বেলা ১০৷৷০টায় পোথি-বাসা (৮ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন। বেলা ৩টায় রওনা, বৈকালে ৫৷৷০টায় চোপতা চটী (৪ মাইল)—রাত্রিযাপন।

উখীমঠ পর্য্যন্ত ৺কেদারনাথের রাজ্য, পরে ৺বদরীনাথের রাজ্য আরম্ভ হইল (যদিও নালা চটী হইতেই ৺বদরীর পথ আরম্ভ)। প্রাতঃ ৫।৪৫ মিনিটে উখীমঠ হইতে রওনা হওয়া গেল। রাস্তা প্রথমে খুব চড়াই, এক স্থানে ভাঙ্গা, হাঁটিতে হইল; পরে উতরাই, পরে আবার চড়াই। আকাশ-গঙ্গা এখানে প্রবাহিতা। পথের দু'ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছায়া-শীতল বিহগকাকলী-মুখরিত বন—মহাবন বলিলেই ঠিক হয়; ইংরেজী কবিতার ভাষায় "forest primeval"; * বহুকালের বড় বড় গাছ ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; অনেক বড় গাছে কি এক প্রকার জটাজালের মত ঝুলিতেছে, moss কি lichen—উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞ নহি, সুতরাং জানি না। বেলা ১০৷৷০টায় পোথিবাসায় বাসা লইলাম। এখানে তিনটি ঝরণা আছে। পার্ব্বত্য দৃশ্য সুন্দর। শীত বেশ আছে। এখানে আলু পাওয়া গেল না (অন্য সর্ব্বত্র মিলিয়াছে). বিলাতী কুমড়া (এ দেশে 'কদু' বলে) পাওয়া গেল—তিন আনা সের। পথে কিন্তু এক জন যাত্রী এক আনা মূল্যে তিন সের ওজনের একটা মস্ত কুমড়া কিনিয়াছিলেন। বহিয়া আনাই যে লেঠা। কুমড়া অনেক চটীতে ছাদের উপর মঙ্গলঘটের ন্যায় (!) স্থাপিত র

---

* লোকপ্রিয় ইংরেজ লেখক Jerome. K. Jerome বলিয়াছেন, দেশভ্রমণে বাহির হইলে সংসারের সকল ভাবনা ঘরে রাখিয়া আসিতে হয়, চিঠিপত্রের আশা করিতে নাই, চিঠিপত্র পাইলে ভ্রমণের আরাম-আনন্দটুকুই নষ্ট হয়, রসভঙ্গ হয়। অবশ্য তখন তিনি আইবুড় কার্ত্তিক ছিলেন, পরিবার-পরিজনের মায়া যে কি বস্তু, তাহা জানিতেন না। বিশেষতঃ পৌত্রদৌহিত্রের মায়া—টাকার চেয়ে টাকার সুদ মিষ্টি। যাহা হউক, তাঁহার সুন্দর কথাগুলি পাঠকের আনন্দ-বিধানের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'No one should have any correspondence on a journey; it is bad enough to have to write but the receipt of letters is the death of all holiday feeling' ('An Inland Voyage, Ch. 19.) বিস্তৃতিভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না।

* R. L. Stevenson, *Travels with a Donkey* পুস্তকে (১৩শ পরিচ্ছেদে) একটি মহাবনের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন, 'A humble sketcher here laid down his pencil in despair'; আমি বর্ণনার চেষ্টা না করিয়াই ঐ কথায় কবুলজবাব দি[য়া] রাখিলাম।

সংগ্রহও করা গেল এবং সুচসুতা বিলি করা গেল ১০।১২ জনকে (সবই পুরুষ), শেষে দেওয়া বন্ধ করাতে এক জন বলিল, 'না দিলে পাপ হয়।' অথচ এক জায়গায়ই যদি একেবারে দানসত্র খোলা যায়, তাহা হইলে সেইখানেই ত সব ফুরাইয়া যায়; সামান্য জিনিশ লইয়াও এই ফ্যাসাদ!

এখানে অল্প অল্প ঝড় উঠিল। বৃষ্টি সৌভাগ্যক্রমে সামলাইয়া গেল। আর তিন মাইল উতরাই গিয়া অলকনন্দা-তীরে উপস্থিত হইলাম। ঝুলান লৌহসেতু দিয়া ওপারে চমৌলি যাইতে হয়। এখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বেহারারা দম লইল, তামাক সাজিয়া আয়েস করিয়া খাইল, এক জন গানও ধরিল। পরে তাহারা বদমায়েসী যুড়িয়া দিল। তাহাদের মতলব, নদী পার না হইয়া সোজা পথে আর দুই মাইল গিয়া মঠ-চটীতে থাকিবে। আসল কথা, আজ ও-পারে গিয়া আবার কল্য এ-পারে আসিয়া ৺বদরীনারায়ণের পথ ধরিতে হইবে, এই দুনো খাটুনি তাহারা খাটিতে চাহে না। অথচ আমাদের আগে হইতে বন্দোবস্ত চমৌলিতে থাকা। (কেন না, সেখানে চিঠি পাওয়ার আশা আছে এবং বাড়্‌তী জিনিশপত্র তথায় রাখিয়া যাওয়া হইবে)। অদ্য বৈকালে রওনা হইবার পূর্ব্বে ছেলেরা এই বন্দোবস্তের কথা তাহাদিগকে বলিয়াও গিয়াছে এবং পূর্ব্বেই পার হইয়া তথায় পৌঁছিয়াছে। যাহা হউক, খানিক ধমক দেওয়ার পর তাহারা সিধা হইল। (যাত্রীরা ইহাদিগের আচরণের এই সব বিশিষ্টতা জানিয়া রাখার দরকার বলিয়াই এ সব কথা বলিতেছি); রাগভরে ডাণ্ডী ঘাড়ে করিয়া পুল পার হইল এবং অত্যন্ত খাড়া ও খারাপ (এবড়ো খেবড়ো পাথরের চ্যাঙড় বিশৃঙ্খলভাবে ফেলা) রাস্তা দিয়া উঠিয়া বৈকালে ৬টায় অলকনন্দার তীরবর্ত্তী কালীকমলীওয়ালীর ধর্ম্মশালায় তুলিল। (এ খারাপ রাস্তায় ডাণ্ডী হইতে নামিতে বলিলেই আমরা নামিতাম।)

ধর্ম্মশালায় স্থান সঙ্কীর্ণ, যাহা হউক, তাহাতেই চলিয়া গেল—দোতলার বারান্দায়। এখানে শীত নাই বলিলেই হয়, চোপতা চটীর সহিত কি প্রভেদ! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শীততাপের কি পরিবর্ত্তন!—অবশ্য স্থানভেদে। প্রাচীরের মত পাহাড় সম্মুখে উঠিয়াছে, সে জন্যও স্থানটি গরম—বায়ুর চলাচল অবরুদ্ধ হওয়ায়। সারারাত অলকনন্দার কলকল ধ্বনি—স্রোতের বেগ আছে, তবে দেবপ্রয়াগের ও রুদ্রপ্রয়াগের সে উদ্দাম ভাব নাই। এখানে প্রত্যাশিত পত্র পাইলাম, বাজারে ও অলকনন্দার ... দুর্ব্বল শরীরেও খানিক বেড়াইলাম, ঘোড়াভাড়া দেওয়া ... দেখিলাম, দুই জন প্রবীণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল—তাঁহারা পদব্রজে যাইতেছেন, সঙ্গে কাণ্ডীওয়ালার পরিবর্ত্তে এক জন হিন্দুস্থানী চাকর মালপত্রের চার্জ্জে।

ধর্ম্মশালায় এক জন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-বিধবাকে দেখিলাম, সঙ্গে পঞ্জাব-প্রবাসী বাঙ্গালী যুবক 'সাধু'। বৃদ্ধা কলিকাতার লোক, কাশীবাসিনী, কলিকাতার এক জন ভদ্রলোক সপরিবার তীর্থ-দর্শনে যাইতেছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে অ-বনিবনাও হওয়াতে বাধ্য হইয়া সঙ্গ ছাড়েন; পরে এই সাধুজীর সৌজন্যে তীর্থ-ভ্রমণ সমাধা করিয়া ফিরিতেছেন, সাধুজী হরিদ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া আসিবেন।

রাত্রিতে সকলের বাজারের 'পুরী'-তরকারী, আচার-চাটনী আহার হইল। এখানে দুধ মিলিল না। আমার পথ্য হইল চিড়া অনেকক্ষণ ভিজাইয়া সেই গলাগলা চিড়া তেঁতুলগোলা ও চিনি-সহযোগে। এই দ্বিতীয়বার চিড়ের পুঁটুলি কাযে লাগিল। 'যাকে রাখ, সেই রাখে।' এখানে পাণ পাওয়া গেল—গৃহিণী খুব খুশী।

হিন্দুস্থানীদিগের অভদ্র ব্যবহারের কথা পূর্ব্বে এক বার বলিয়াছি (আশ্বিন-সংখ্যা ৯৬০ পৃঃ)। এখানেও আবার সে ভোগ ভুগিতে হইল। একটি যাতায়াতের সরু পথ বারান্দার সামনে আছে, কিন্তু তাহারা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কিছুতেই সেখান দিয়া যাইবে না, ধূলাসুদ্ধ পায়ে আমাদের বিছানার উপর দিয়া, এমন কি, গা ঘেঁসিয়া যাইবে, বহু চেষ্টায় নিবৃত্ত করিতে হইল।

ধর্ম্মশালার এক জন কর্ম্মচারী আমাদিগের স্বাক্ষরিত চিঠি লিখাইয়া লইল যে, আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নাই, বেশ যত্ন-খাতির পাইয়াছিলাম। এই চিঠি নাকি উপরওয়ালাদিগকে পাঠানর বন্দোবস্ত আছে। আরও কোনও কোনও ধর্ম্মশালায় এইরূপ চিঠি লিখিয়া দিতে হইয়াছিল।

চমৌলি একটা বড় জংশান্—৺কেদারধাম, ৺বদরীধাম ও কর্ণপ্রয়াগের পথ এখানে মিলিত হইয়াছে—ডাঙ্গায় ত্রিবেণী-সঙ্গম! বদরীধাম হইতে আমাদিগকে এইখানে ফিরিয়া নূতন তীর্থ নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ-অভিমুখে যাইতে হইবে। সেই জন্যই এখানে অতিরিক্ত মালপত্র রাখিয়া যাওয়া সুবিধা।

এখানে আদালত, কাছারী, পুলিশ-ষ্টেশন, ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে; তবে শ্রীনগরের মত সমৃদ্ধ নহে, সুন্দরও নহে। ইহার আর এক নাম লালসাঙ্গা।

৺কেদারধামের ন্যায় ৺বদরীধামের পথেরও কয়েকটি (Stage) পর্য্যায় আছে। (১) ৺কেদারধাম হইতে নালাচটী পর্য্যন্ত (২৪ মাইল) পুরাতন পথে ফিরিয়া, উখীমঠ (২৮ মাইল)। (২) উখীমঠ হইতে চমৌলি বা লালসাঙ্গা (২৮ মাইল)। (৩) চমৌলি হইতে জোষীমঠ (২৮ মাইল)। (৪) জোষীমঠ হইতে ৺বদরীধাম (১৯ মাইল)। আমরা ৺কেদারধাম হইতে চারিদিনে ইহার দুইটি (Stage) পর্য্যায় (৫৬ মাইল) অতিক্রম করিয়াছি। আর দুইটি (Stage) পর্য্যায় অর্থাৎ প্রায় ৫০ মাইল বাকী। ফলতঃ চারিদিনে যখন অর্দ্ধেকের বেশী পথ আসিয়াছি, তখন আর ৩।৪ দিনে অভীষ্ট স্থানে পৌছিবার সম্ভাবনা খুবই আছে। এখন শ্রীভগবানের দয়া।

১৬শ দিন—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯এ মে, শনিবার

প্রাতঃ ৫॥০টায় চামৌলি হইতে রওনা, বেলা ১০টায় পিপ্পল-কুঠী (১০ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন। বৈকালে ৩॥০টায় রওনা, ৭।১৫ মিঃ পাতালগঙ্গা (৮ মাইল)—রাত্রিযাপন।

কতক জিনিশ চমৌলি ধর্ম্মশালায় রাখিয়া (কেন না, এই পথেই আবার ফিরিতে হইবে) প্রাতঃ ৫॥০টায় অলকনন্দা পার হইয়া নদীর ধারে ধারে চলিলাম। এক মাইল পরে মঠচটী, দুইটি ঝরণা রহিয়াছে, একটায় খুব মোটা ধারে জল পড়িতেছে; জলের সচ্ছলতার জন্য এখানকার ক্ষেত্র খুব উর্ব্বর ও সরস, কলাবাগান, আমগাছ, পেয়ারাগাছ, ডালিমগাছ, প্রকৃতি-দেবীর স্বহস্ত-গঠিত রম্য উদ্যান; একটি রক্তকরবীর গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল গাছ আলো করিয়া আছে। চটীতে মূলা, শাক-সব্জী থরে থরে সাজান রহিয়াছে; ডাণ্ডীতে স্থানাভাব-বশতঃ কিছু কিনিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেনা হইল না। (আর এ দেশের মূলা সিদ্ধ হয় না)। আর এক মাইল পরে একটি ছোট চটী; আরও এক মাইল পরে ছিন্‌কা চটী, একটি ঝরণা আছে। জুতা, ছাতা, লণ্ঠন, ৺কেদার-বদরীনারায়ণের ছবি, শিলাজতু ইত্যাদির দোকান রহিয়াছে দেখিলাম। আর দুই মাইল পরে কুমারচটীতে দম লওয়া হইল; ছেলেরা রামদানা (টাট্‌কা ভাজিতেছে) কিনিয়া খাইল, আমাকে দু'টিখানি খাইতে বলিল, উদরভঙ্গ সারিয়া আমাশয়ে দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং ভাজাপোড়ার দিকে ঘেঁসিলাম না। (দুধে ভিজাইয়া না কি খাইতে বেশ লাগে)।

ইহার পরে বিরহীগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম। প্রায় সমস্ত পথই পাশে পাশে অলকনন্দা চলিয়াছেন, কোথাও কোথাও অদর্শন। শিব সতী-বিরহে উক্ত নদীকূলে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইতি প্রসিদ্ধি। (উত্তরবঙ্গে 'বিরহী' ষ্টেশন আছে, এ ক্ষেত্রে কাহার বিরহ স্থানের নামে সূচিত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ অনুসন্ধান করিবেন কি?) এ দেশে বহু গঙ্গা দেখিলাম ও দেখিব, যথা—আকাশ-গঙ্গা, পাতালগঙ্গা বা গণেশগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, সোমগঙ্গা বা শোণগঙ্গা ইত্যাদি, সবগুলিই কি পুণ্যতোয়া গঙ্গা? না আমাদের অঞ্চলে যেমন নদীমাত্রই 'গাং' (গঙ্গার অপভ্রংশ), তেমনি এ দেশেও শব্দটির ব্যাপ্তিগ্রহ (extension of meaning) হইয়াছে? যাক্, ভাষাতত্ত্বের ভূত ঘাড়ে চাপিলে আর রক্ষা নাই। কলিকাতার এক দল সম্ভ্রান্তবংশের স্ত্রীলোক ডাণ্ডীতে যাইতেছিলেন, সঙ্গে দুই জন পুরুষ; ও-পারে পাহাড়ে খেজুরগাছ দেখিয়া এক জন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন, "মেজ কাকা, ঐ দেখ, নারিকেলগাছ!" আমার পুত্রটি আর থাকিতে পারিল না, বলিল, "নারিকেলগাছ নহে, খেজুরগাছ"; 'মেজকাকা'ও সারিয়া লইলেন। খাস কলিকাতার লোক ফেরিওয়ালার প্রসাদে খেজুর-রস ও 'নলেন' গুড়ের পাটালির তথা 'পয়রা'-গুড়ের স্বাদ পাইলেও খেজুর গাছ কখনও দেখে নাই, সুতরাং এরূপ ভ্রম খুব স্বাভাবিক।

ইহার পরে সিয়া চটী, কয়েকটি অশ্বত্থগাছ আছে, একটি যোড়া অশ্বত্থগাছও দেখিলাম। ইহার পরেই আম-গাছ প্রভৃতির চারা ঘেরের মধ্যে সযত্নে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিলাম। (কুণ্ডাচটী ও ছতৌলী চটীর কাছেও পূর্ব্বে দেখিয়াছি।) সিয়া চটীর পরে এক স্থানে ৪।৫টা ঝরণা দেখিলাম, অথচ সেখানে চটীর পত্তন হয় নাই কেন, বুঝিলাম না। এই পথে বহু ফেরত যাত্রীর সহিত দেখা হইল। অনেকের হাতে এক রকম কাঁটা-গাছের ছড়ি, অনেকটা মনসাসেজুর মত, তবে তাহা অপেক্ষা সরু, শক্ত ও বেশ লম্বা। শুনিলাম, ইহার কি দ্রব্যগুণ আছে। (আমাদের যে চাকরটি ৺কেদারবদরী গিয়াছিল, তাহার মুখে কলিকাতায় ফিরিয়া শুনিলাম, গাছের নাম 'তেজবল', ইহা প্রস্তুতির

সম্মুখে ধরিলে সুপ্রসব হয়। 'জন্তুলা নাম রাক্ষসী'র হাড়-গোড় সজীব বৃক্ষে পরিণত হয় নাই ত ?)

শেষে খানিকটা চড়াই ভাঙ্গিয়া ১০টার সময় পিপ্পলকুঠীতে পৌছিলাম এবং একটি সুন্দর দোতলা 'কুঠী' পাইলাম। ছেলেরা আগে আসিয়া অবশ্য যোগাড় করিয়াছিল। ইংরেজী harbinger (অগ্রদূত) কথাটির মূল অর্থ এই যাত্রাপথে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। স্থানটি চমৌলি অপেক্ষাও বড় বলিয়া বোধ হইল। কয়েকটি দোকানে শিলাজতু, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম, চমরীপুচ্ছ (চামর), ৺কেদার-বদরীনারায়ণের ছবি, কেদার-মাহাত্ম্য, ব্রহ্মানন্দভজনমালা (হিন্দী ভজন, সুন্দর জিনিশ, এখানে কিনি নাই, শেষে হরিদ্বারে কিনিয়াছিলাম) ইত্যাদি বই এবং ছাতাজুতা প্রভৃতি রহিয়াছে। তরী-তরকারীও যথেষ্ট, পাণ ও বাঁধাকপি পর্য্যন্ত। একটি দোকানে গোঁড়ালেবুর মত এক রকম লেবু দেখিয়া একটি ৵১৫ পয়সায় কিনিলাম; দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার 'কুঠী'তে থাক ?" আমি বলিলাম, "না"; তখন জানিতাম না যে, আমাদের বাসাবাড়ীটিও তাহার সম্পত্তি; পরে বুঝিলাম, এই অজ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলায় উপকার হইয়াছে, তাহার ভাড়াটিয়া জানিলে চারি পয়সা চাহিত! (আশ্বিনসংখ্যা, ৯৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এখানে ধোয়া (অর্থাৎ খোসাফেলা) মুগের ডাল পাওয়া গেল। চামৌলীতে যে দুই জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল, তাঁহারা পাশের বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন। এখানে একটি ঝরণা আছে। ডাকঘর আছে; দোকানে নোট ভাঙ্গান যায়—অবশ্য বাটা লাগে।

অথ নাপিতপর্ব্ব

দেবপ্রয়াগে মাথা মুড়ানর পর কোথাও কামান হয় নাই। এখানে নাপিত পাওয়া গেল। মহা স্ফূর্ত্তিতে নাপিত ডাকিতে বলিলাম। বিশেষতঃ আজ আরোগ্যস্নান করিব। সে জন্য জল গরম করিতে বলিলাম। অবগাহন-স্নান ত দেবপ্রয়াগে শেষ; তাহার পর নদী বা ঝরণায় ঘটীগঙ্গায় সারিতে হইয়াছিল। জল তুষার-শীতল, কাহার সাধ্য জলে নামে ? উদরাময় ও পরে আমাশয় হওয়ার জন্য কয়েক দিন স্নান বন্ধ ছিল; গৌরীকুণ্ডে তপ্তকুণ্ডের জলে গা মুছিয়াছিলাম; আরও বোধ হয় ২।১ স্থানে গরম জলে গা মোছা ও অল্প ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোয়া হইয়াছিল (কলিকাতায় প্রথাটি প্রচলিত, ইহা বোধ হয় বিলাতী French bath এর দেশী সংস্করণ)। অদ্য অভ্যঙ্গ তৈলমর্দ্দনান্তে কবোষ্ণজলে স্নান করিব, এই প্রতিজ্ঞা। (সর্দ্দি-জ্বর প্রভৃতি হইলে রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা অস্নাত থাকার যন্ত্রণা আমার বেশী হয়। সেই আমাকে কর্ম্মবিপাকে দিনের পর দিন অস্নাত থাকিতে হইয়াছিল)।

নাপিত ডাকিতে বলায় ছেলেদের মুখে শুনিলাম, তিনি আসিবেন না, তাঁহার কাছে গিয়া কামাইতে হইবে, "The mountain will not come &c." পরিপাটী পোষাক-পরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া কোন্ দোকানঘরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহাও পরিজ্ঞাত হইলাম। নির্দ্দেশ-মত অকুস্থলে গিয়া যাঁহাকে নাপিত সম্বোধন করিলাম, শুনিলাম, তিনি এক জন ভদ্রবংশীয় মহাজন! কি ভাগ্য, লোকটি রাগ করিল না, আনাড়ী দেখিয়া মৃদুহাস্যে নাপিতকে দেখাইয়া দিল; নাপিতকে দেখিয়া উক্ত মহাজনের যমজ ভ্রাতা বলিয়া ভ্রম হয়; দিব্য ফোঁটাকাটা জবরজং জামাযোড়া-আঁটা 'রইস্' লোক বলিয়াই ধারণা হয়। সঙ্গে বহু তাঁতবাত রহিয়াছে—শাণ-পাথর প্রভৃতি; এই উপলক্ষ্যে অবশ্য চেনা যায়। আমার আজ্ঞি পেশ হইলে সে ২।৩খানি ক্ষুর লইয়া শাণে ঘষিতে লাগিয়া গেল—শাইলক্ অপেক্ষা উৎসাহ কিছুমাত্র কম নহে; ঝাড়া আধ ঘণ্টা এই পর্ব্ব চলিল; তাহার পর আধ ঘণ্টা ধরিয়া দাড়ীর মূলে জল-সেক, মাথা কামাইব কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল; উদ্-যোগপর্ব্বে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া দাড়ী চাঁচিতে লাগিল, পূর্ব্বেই তাহার বিলম্বে পিত্ত ও গাত্র জলিয়া গিয়াছিল, এবার গণ্ডদেশ ও চিবুক জলিতে লাগিল; পরিত্রাণ নাই; যখন শেষ হইল, তখন আমি হতভম্ব; চক্ষের নিমেষে সে ভুরু কামাইতে ক্ষুর উচাইল, আর এক সেকেণ্ড হইলেই সাবাড় হইত, নিতান্ত গুরুবলে যে, আসন্ন বিপৎপাতে হতভম্ব ভাবটা ঘুচিয়া উপস্থিত-বুদ্ধি যোগাইল, তাহার উদ্যত হস্ত নিবৃত্ত করিলাম। অথচ গোঁফ কামাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে হইল! এই উৎকট উদ্ভট ক্ষৌরকর্ম্মের দক্ষিণা লাগিল দুই আনা। প্রাণে প্রাণে বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, গরম জল ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, ভাত নামার জন্য আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল; তাহার পর দ্বিতীয়বার জল গরম হইলে উঠানে বসিয়া আরামে স্নান করিলাম। বিখ্যাত হাস্যরসিক মার্কিণ লেখক মার্ক টোয়েনের

ক্ষৌরকর্ম্মের বর্ণনাটিকে * অতিরঞ্জিত বা কল্পনাপ্রসূত মনে করিতাম। অদ্য ঠেকিয়া শিখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।

স্নানাহার-বিশ্রামের পর বেলা ৩॥০টায় রওনা হওয়া গেল। পথে দুই একটা 'মরুক্ষে' ঘোড়া চরিতেছে দেখিলাম; অথচ যাত্রীদিগের চড়ার ঘোড়া দেখিয়াছি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। অনেক দিন পরে আবার পাহাড়ে চীরগাছ দেখিলাম। ৪ মাইল পরে গরুড়গঙ্গা; এখানে পেড়াসমেত থালা উৎসর্গ করিতে হয়। পাণ্ডার গোমস্তার প্রাপ্য। অপরাহ্নে পুণ্যকর্ম্ম হয় না বলিয়া ফেরার সময় করিব সঙ্কল্প থাকিল। এখানে গরুড়গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম। গরুড়-ভগবান্ দর্শন করিলাম; দুইটা (watermill) পান-চাকীও দেখিলাম। যে পাহাড়ের পাশ দিয়া রাস্তা, সেটি সতেজ সবুজ গাছপালায় ভরা, অপর পাহাড়টি নেড়া ও কালো রঙের। পর্ব্বতচূড়ায় সূর্য্যকিরণ ঝলমল করিতেছে; আবার বেলা পড়িলে দেখিলাম সুনীল-সুন্দর; নবঘনশ্যাম নারায়ণের নিত্য নবলীলা।

* I said I wanted to be shaved...The doctor said he would be shaved also. Then there was an excitement among those two barbers. There was a wild consultation, and afterwards a hurrying to and fro, and a feverish gathering up of razors from obscure places, and a ransacking for soap...One of the villains lathered my face for ten terrible minutes, and finished by plastering a mass of suds into my mouth...Then this outlaw strapped his razor on his boot hovered over me ominously for six fearful seconds, and then swooped down upon me like the genius of destruction. The first rake of his razor loosened the very hide from my face...I stormed and raved...Let us draw the curtain over this harrowing scene. Suffice it that I submitted and went through with the cruel infliction of a shave by a French barber; tears of exquisite agony coursed down my cheeks now and then but I survived. Then the incipient assassin held a basin of water under my chin and slopped its contents over my face, and into my bosom, and down the back of my neck, with a mean pretence of washing away the soap and blood. He...was going to comb my hair; but...I said with withering irony, that it was sufficient to be skinned—I declined to be scalped, &c. &c., (MARK TWAIN : *The Innocents Abroad*, ch. 12).

অবশ্য মার্কিণ লেখকের যন্ত্রণাও যেমন অপরিসীম হইয়াছিল, বর্ণনাও তেমনই অনুপম হইয়াছে। এই অধম লেখকের যন্ত্রণা তাঁহার তুলনায় নগণ্য, সুতরাং বর্ণনাও তথৈব চ। এই অদ্বিতীয় হাস্যরসিকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কাহার সাধ্য?

(গণেশগঙ্গা বা) পাতালগঙ্গার কাছে পাহাড়টা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, নদীগর্ভে পাথরের বড় বড় নুড়ী; এখানে পাতালগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম সুস্পষ্ট।

১০।১৫ মিনিটে চটীতে পৌঁছিলাম। চটীটি বড় নীচু জায়গায়, রাস্তা ও ঘর বড় অসমান, আগোছাল। এখানেও অশ্বত্থগাছ আছে; লোমশ কুক্কুর দোকানে পাহারা দিতেছে। ঝড়জল আসিবার উপক্রম হইয়া খুব সামলাইয়া গেল। এমন কি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যদেব একটিবার দেখা দিলেন। রাত্রিকালে বেশ শীতবোধ হইল—বোধ হয় স্থানটি নীচু বলিয়া। যথারীতি 'পুরী'-তরকারী প্রস্তুত হইল। আমি এক প্রকার একাহারীই আছি। রাত্রির পথ্য বার্লি, অদ্য তাহাতে লেবুর রস পড়িল। পেটের অসুখের ভয়ে (মহিষের) দুধ পর্য্যন্ত ছাড়িয়াছি। ফলে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। ৺কেদারদর্শনের সময়ে যেরূপ অশুচি অবস্থা ছিল, পাছে ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনের সময়েও সেইরূপ হয়, সেই আশঙ্কায়ও এই অতিসাবধানতা।

১৭শ দিন—৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০এ মে, রবিবার

প্রাতঃ ৫।১৫ মিঃ পাতালগঙ্গা হইতে রওনা, ১০।২০ মিঃ জোষীমঠ (১১ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।

ভোরে উঠিয়া ৫।১৫ মিনিটে পাতালগঙ্গার পাতালপুরী ছাড়িয়া রওনা হইলাম। প্রথম প্রথম ২।৪টা চীরগাছ দেখিলাম। তাহার পর নেড়া পাহাড় (২ মাইল)। গুলাবকোঠীর পরে পাহাড় ভয়াবহ, যেন দেবদানবের যুদ্ধে অথবা প্রবল ভূকম্পনে একটা বিষম ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে, বড় বড় কালো কালো পাথরের চ্যাঙ্গড় বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া আছে, কোনও কোনওটা পথিকের মাথার উপর ঝুঁকিয়া আছে, খসিয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ! হেলঙ্গ বা কুমারচটীর আরও কাছাকাছি একটু বৈচিত্র্য হইল, কতকগুলি ঝুঁপো গাছ দেখা দিল, বামে এক স্থানে শ্বেতবর্ণের পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল (মার্‌বেল্ পাথর অবশ্য নহে)। উভয় চটীতেই বেহারার দম লইল; কুমারচটীতে ডাকঘর, ধর্ম্মশালা, সদাব্রত আছে; অনেকগুলি দোকান; ২।১ খানি সুন্দর ঘর আছে; এখানে ৩টি ঝরণা, চটী ছাড়াইয়া আরও ২টি ঝরণা এবং কর্ম্মনাশা নদী, কাঠের পুল পার হইয়া যাইতে হইল; এখানে জল সঞ্চিত হইয়া একটা চৌবাচ্চার মত হইয়াছে।

সুতরাং সরস জমিতে বহুতর গুল্মের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু সবই কাঁটাগাছ (এই সুন্দর চটীতে থাকা হইল না, বড় আপশোষ)। এই চটী হইতে অল্প পথ নিম্নদিকে গেলে কল্পেশ্বরগঙ্গা, কর্ম্মনাশা ও অলকনন্দার সঙ্গম ও ৺কল্পেশ্বর-শিব (পঞ্চকেদারের অন্যতম) আছেন। দর্শন হয় নাই। এই পথে ডাণ্ডীতে আপাদমস্তক কম্বলে আবৃত গুম্ফশ্মশ্রুরহিত মূর্ত্তি দেখিয়া আমাকে ভিখারী বালক বালিকারা 'বাঙ্গালী মায়ি' সম্বোধন করিল! ৺কাশী হইতে হরিদ্বার ট্রেণে যাইতে সদ্যঃ প্রয়াগে মুণ্ডিতমুণ্ড আলখাল্লার ন্যায় গেরুয়া-সেমিজ-পরিহিত বিধবাটিকে মেয়ে-কামরায় এক জন মুসলমান সহ-যাত্রিণী 'মর্দ্দানা' বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল; পরে সে কথা শুনিয়া খুব হাসিয়াছিলাম; এবার তাহার শোধ উঠিল।

পূর্ব্বে অনেক স্থানে গরু, ভেড়া, ছাগলের গলায় ঘণ্টা দেখিয়াছিলাম, এখানে ঘোড়ার গলায়ও দেখিলাম; কেবল গাধা ও অশ্বতরের পোড়া কপালে এ অলঙ্কার যোটে নাই! কুমারচটীতে দুইটি নেপালী যুবতীকে বিশ্রাম লইতে (ডাণ্ডীতে যাইতেছে) দেখিলাম, অনিন্দ্যসুন্দরী, বর্ণ ও মুখশ্রী চমৎকার, তবে পূর্ব্বদৃষ্ট পাহাড়ী সুন্দরীদিগের ন্যায় (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা, ২৫৯ পৃঃ) অকৃত্রিম বেশভূষা নহে, বাঁকা সীঁথি, চুলে ক্লিপ্ লাগান, কাপড়ে ব্রোচ্ আঁটা—খুব (up-to-date) হাল ফ্যাশানের। কুমারচটীর পর খানিক দূর ঝোড়-জঙ্গল, তাহার পরেই আবার ভয়াবহ পাহাড়; ঝড়কুল্লা (আরও ৩ মাইল) ছাড়াইয়া বহু চীরগাছ ও অন্যান্য বড় গাছ। মাইলে মাইলে প্রকৃতি-বৈচিত্র্য। ঝড়কুল্লার পর খনোটি চটী। এখান হইতে 'ধ্যানবদরী'-দর্শনে যাইতে হয়—পঞ্চবদরীর অন্যতম। আমাদের যাওয়া হয় নাই। ঝড়কুল্লার এক মাইল নীচে অনীমঠ—'বৃদ্ধ-বদরী' আছেন; ইনিও পঞ্চবদরীর অন্যতম। আমাদের অদৃষ্টে দর্শন ঘটে নাই।

এই পথে হাতে হাতকড়ি দেওয়া কোমরে দড়ি বাঁধা এক জন অপরাধীকে (চোর কি খুনে জানি না) পুলিশের লোক লইয়া যাইতেছে দেখিলাম; বেহারারা জোরের সহিত বলিল, 'এ আমাদের দেশের আদমী নহে, অন্য দেশের; আমাদের দেশের লোকে চুরী-ডাকাতী খুনখারাপী করে না।' গেজেটিয়ারেও এ সুখ্যাতি আছে বটে। কিন্তু চুরী ত খুব স্বাভাবিক কার্য্য। 'তোমার আছে, আমার নাই, কেন কাড়িয়া লইব না?' এ যুক্তি ত সহজেই আদিম মানবের মনে আসে! সিংহধারের (আর এক মাইল) পরে ২।৪টি ফুলগাছ দেখিলাম। আর এক মাইল পরে জোষীমঠে একেবারে গোলাপের বাগান, বড় বড় লাল লাল গোলাপ অজস্র ফুটিয়া আছে, বন্য গোলাপ নহে—উদ্যানজাত। ইংরেজ লেখক ডি কুইন্সির (The English Mail-Coach সন্দর্ভে Fanny & the Bath Road) 'Roses and Fannies, Fannies and roses without end, thick as blossoms in paradise' ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পঠিত সুন্দর বর্ণনা মনে পড়িল, তবে দেখিলাম, শুধু (roses) গোলাপ, গোলাপের মতই সুন্দরী ফ্যানিকে ত দেখিলাম না! * যেরূপ সযত্নে গোলাপগাছগুলি বর্দ্ধিত, অনুমান হইল, হয় ত রাওল সাহেবের বাগানবাড়ী। এ স্থানটি আসল জোষীমঠের উপকণ্ঠ। আরও মাইল খানেক গিয়া আসল জোষীমঠে পৌঁছিলাম। পথ সিধা।

প্রবেশ করিতেই নাগারা বাজিয়া উঠিল; (যাত্রীদের এ আদর-অভ্যর্থনা স্থানে স্থানেই আছে, উখীমঠে প্রবেশ স্মর্ত্তব্য)। ছেলেরা আগে আসিয়া ধর্ম্মশালায় দোতলার বারান্দায় স্থান সংগ্রহ করিয়াছিল; আশে-পাশে ভিন্নদেশীয় যাত্রীরাও ছিল। পাশেই রান্নাঘর। নিকটেই একটা ঝরণা আছে; ঝরণার ধারেই 'জঙ্গল যাওয়া'র স্থান। গরম-জলে স্নানান্তে আহারাদির পর 'সহর' দেখিতে যাওয়া গেল। ছেলেরা পূর্ব্বেই এক চোট 'সহর' ঘুরিয়া আসিয়াছিল; আরম্ভেই ডাকঘর ও তারঘর; চিঠি উখীমঠ হইতে এখানে (redirect) ঠিকানা বদলাইয়া পাঠাইতে বলা গিয়াছিল, কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল না। এবার চামোলীতে পাঠাইতে বলা গেল। থানা, বাজার, রাওল সাহেবের সুন্দর আবাস-গৃহ (এখানেও গোলাপগাছ দেখিলাম) ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা গেল। এখানেও পিপ্পলকুঠীর মত একটি লেবু কেনা হইল ও ছয় পয়সা সের দেখিয়া আলু এক সের কেনা হইল। (পথে সব চটীতে দেখা গিয়াছে পাঁচ ছয় আনা সের; এখানে দোকানে বাসা লই নাই, বাজারে কিনিলাম বলিয়া বোধ হয়

---

* ফ্যানিকে দেখিলাম না বলিয়া যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা আসল জোষীমঠে পৌঁছিয়া মিটিয়াছিল। এক ফ্যানির পরিবর্ত্তে পরীর মত সুন্দরী একাধিক পাহাড়ী যুবতী ধর্ম্মশালায় অবস্থানকালে টিক্লি চাহিতে আসিয়াছিল। পুঁজি কম থাকাতে সকলকে যোগাইতে পারিলাম না, 'এ দুঃখ পরাণে' রহিয়া গেল। গৃহিণী এই প্রসাধনের দ্রব্যটি ৺কাশী হইতে অল্পই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বড় অন্যায়!

সস্তায় পাওয়া গেল) ! এখানে আলুও সস্তা, গোলাপও অজস্র—(the useful) দরকারী ও (the beautiful) 'বাহারী'র অপূর্ব্ব মিলন !

শ্রেষ্ঠ কার্য্যটি রাখিয়াছিলাম শেষের জন্য। ৺কেদারনাথের মন্দির যেমন শীতের ছয় মাস বন্ধ থাকে, তখন তাঁহার পূজা হয় উখীমঠে, তেমনই ৺বদরীনারায়ণের মন্দিরও শীতের ছয় মাস বন্ধ থাকে, তখন তাঁহার পূজা হয় জোষীমঠে। এ কয় মাস উখীমঠে ৺কেদারনাথের রাওল সাহেব ও জোষীমঠে ৺বদরীনারায়ণের রাওল সাহেব থাকেন। উভয় মঠই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। ইহার বিশুদ্ধ নাম নাকি জ্যোতির্ম্মঠ; জ্যোতিষী (?) বা 'জ্যোতিষ্মৎ' হইতে 'জোষী' হইয়াছে। এই ব্যুৎপত্তি প্রকৃত হইলে 'যশী'মঠ, 'যোশী'মঠ, 'জোশী'মঠ প্রভৃতি বাণান ভুল বলিতে হইবে। যাক্, এ সব বাণান-সমস্যার বিচার। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

এখান হইতে তিন মাইল দূরে 'ভবিষ্যবদরী', যাওয়া ঘটে নাই। জোষীমঠ হইতে মানস-সরোবর যাত্রার পথ (নীতি-পাস্ passএর দিকে এই পথ গিয়াছে)।

এইবার দেবদর্শনে চলিলাম। একটা মুলুক যুড়িয়া নানা দেবতা বিরাজিত; প্রধান দেবতা নৃসিংহদেব বা নৃসিংহ-বদরী; ৺বদরীনারায়ণের মন্দির যে ছয় মাস বন্ধ থাকে, সে ছয় মাস ইনিই তৎস্থলাভিষিক্ত; তাহার পর বাসুদেব, উদ্ধব, কুবের, রামসীতা, গরুড়নারায়ণ, সূর্য্যনারায়ণ, গণেশ, কৃষ্ণ-বলরাম, নবদুর্গা, অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি দেবদেবী—রীতিমত Pantheon অর্থাৎ নিখিলদেবায়তন। এখানে দেববিগ্রহ রাশি রাশি পুষ্পমাল্যভূষিত। 'ভেট চড়াও' বলিয়া পূজারীদিগের চীৎকার যাইবামাত্র শোনা গেল। পুত্র বলিলেন, গণেশ ও অর্দ্ধনারীশ্বরের pose অর্থাৎ উপবেশনের ভঙ্গী অতি সুন্দর, কলাবিদ্যা-হিসাবে গবেষণার বস্তু। আমাদের মত 'সেকেলে' কলান্ধ আনাড়ীর নিকট এই মন্তব্য নিতান্তই 'বেণাবনে মুক্তা ছড়ান।' মন্দিরচত্বরে এক স্থানে দেখিলাম, (গুপ্তকাশীর ন্যায়) একটি গোমুখী ও একটি হস্তিমুখী দিয়া ধারার জল প্রভূত পরিমাণে প্রবাহিত হইতেছে, একটির নাম নভোগঙ্গা, অপরটির নাম দণ্ডধারা; দুইটিই কিন্তু শীতল জল, গৌরীকুণ্ডের (ও ৺বদরীধামের) মত তপ্তকুণ্ড ও শীতলকুণ্ড দুই প্রকার নাই।

ধারার শীতল জলের জন্য একটি অত্যাহিত ঘটিয়াছিল, এইবার সেই কথা বলি। আমরা যদিও শেষের জন্য দেবদর্শনকার্য্য রাখিয়া দিয়াছিলাম, (ক্লান্ত দুর্ব্বল উপবাসী দেহে রৌদ্রে খানিকটা হাঁটিয়া দেবদর্শন মধ্যাহ্নে করিতে পারি নাই —অবহেলা নহে, অসামর্থ্য); কিন্তু গৃহিণী ও বিধবাটি পৌঁছিয়াই সে কার্য্য সারিয়াছিলেন; যেহেতু 'শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা', অতএব 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য,' এ ক্ষেত্রে এই বিপরীত মত মানিয়া লইয়াছিলাম। কাণ্ডীতে কাপড় ছিল, আমি সে জন্য অপেক্ষা করিতে * পর্য্যন্ত সময় না দিয়া শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া লইতে তাগিদ দিয়াছিলাম—(নতুবা রন্ধনব্যাপারে অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া পড়িবে) ও ভিজা কাপড়েই আসিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু ভিজা কাপড়ে এতগুলি স্থানে দেবদর্শন করিতে বেশ একটু বিলম্ব হওয়াতে (জলও দারুণ ঠাণ্ডা) গৃহিণীর ঠাণ্ডা লাগিল; তখনই তেমন বুঝা না গেলেও পরে ইহা প্রবল হইয়া ব্যাপার খুবই (serious) কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল, সে কথা ভবিষ্যতে বলিব। জোষীমঠ হইতে যাত্রাকালে দুইবার বাধা পড়িয়াছিল; তাহা মানিয়া যাত্রা বদলাইলাম না ছেলেদের তাগিদে, ইহার ফল সুদূরকালব্যাপী হইয়াছে। এখনও নয় মাস পরেও সেই সর্দ্দিকাসির জের চলিতেছে, 'জড়' কিছুতেই মরিতেছে না, জানি না, শেষ কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াইবে; এই সব কথা যখন ভাবি, তখন আত্মধিক্কারে মন ভরিয়া যায়। আমারই বিবেচনার দোষে তাঁহার এই রোগযন্ত্রণা। 'গতস্য শোচনা নাস্তি' বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা বিফল হয় এবং এরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী সর্দ্দিকাসি পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিলেও আত্মগ্লানির তীব্রতা কমে না।

৺বদরীধামের পথের চারিটি (stage) পর্য্যায়ের তিনটি শেষ হইল, বাকী থাকিল একটি—১৯ মাইল। আগামী বারে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* পূর্ব্বে বলিয়াছি, (কার্ত্তিকসংখ্যা, ১২১ পৃঃ) কাণ্ডীওয়ালারা আগে আগে রওনা হইয়াও অনেক পরে পৌঁছিত। তিন জন কাণ্ডীওয়ালা ছিল—দুইটি বুড়া, একটি ছোঁড়া; ছোকরাটি এক বুড়ার ছেলে, অন্য বুড়ার ভাগিনেয়। ছোকরাটি স্বভবতঃ বেশ দ্রুত চলিত, কিন্তু বুড়ারা চলিত কম, আবার ছোকরাটিকে দিয়া তামাক সাজাইত বলিয়া তাহাকেও দ্রুত চলিতে দিত না। এই রহস্য ভেদ করিয়া ভাগিনেয় বাপাজী ইহার পর হইতে বন্দোবস্ত করিলেন, ছোকরা তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিবে, বুড়ারা আগে রওনা হইবে; ইহার ফল ফলিয়াছিল। বাছুরের টানে গাই-গরুর ন্যায় বালকের টানে বৃদ্ধদ্বয়ের গতি-বেগ (appreciably) বর্দ্ধিত হইল বেশ বুঝা গিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে এই ব্যবস্থা করিলে অনেক সুবিধা হইত। যাহা হউক, Better late than never.

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

নুরবাঈএর পোষাক

শহরময় হাহাকার রব উঠিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে, চারিদিকে হতাশার আর্ত্তনাদ কারণ খিজিল-বাস, তুর্কমান ও তাতারজাতি নির্ব্বিশেষে সুন্দরী রমণী দেখিলেই বিনা বাক্যব্যয়ে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। বিশাল দিল্লী নগর নিরানন্দ, পিতাপতিপুত্রের আর্ত্তনাদে, মাতা-ভগিনী-কন্যার করুণ ক্রন্দনে দিল্লী যখন পরিপূর্ণ, তখন নিত্য উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে চাঁদনী চৌক মুখরিত। শারেঙ্গী, বীণা ও মৃদঙ্গের মধুর আওয়াজে পথে তখনও লোক দাঁড়াইয়া যায়। নুরবাঈএর ব্যবহারে হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে মর্ম্মাহত। হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ সংবাদ শুনিয়া মস্তক অবনত করিলেন, শাহান শাহ নাদির শাহ ঈষৎ হাসিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, নর্ত্তকী নুরবাঈ তাঁহার উদীয়মান গৌরব-সূর্য্যের প্রভায় মোহিত হইয়াছে।

হঠাৎ নুরবাঈ দরখাস্ত করিল যে, তাহার এলবাস পোষাক সে কিছু দিন পূর্ব্বেই ইরাণে পাঠাইতে চাহে, সুতরাং তাহাকে নিত্য দশ গাড়ী মাল পাঠাইতে হুকুমনামা ও দস্তক দেওয়া হউক। তহমাস্প খাঁজল অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু নাদির শাহ তাহা মানিলেন না। হুকুমনামা ও দস্তক চলিয়া গেল। পরদিন দশ গাড়ী মাল কাশ্মীর ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল, দস্তক ও হুকুমনামা সত্ত্বেও তহমাস্প খাঁ গাড়ী আটকাইয়া সমস্ত মাল নামাইয়া সন্ধান করিয়া কিছুই পাইলেন না। সংবাদ নাদির শাহের কর্ণে পৌঁছিল, সুতরাং তহমাস্প খাঁ প্রভুভক্তির ফলে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কার লাভ করিলেন। তখনও দিল্লীতে যত শারেঙ্গী, সেতার, সুরবাহার, এস্রাজ, বীণ ও রবাব ছিল, নুরবাঈএর লোক কিছু কিছু করিয়া সমস্তই কিনিয়া আনিল। বড় বড় কাঠের খাঁচায় বাদ্যযন্ত্র, বড় বড় কাঠের বাক্সে নানাবিধ পোষাক ব্যতীত প্রথম দিনে তহমাস্প খাঁ আর কিছুই দেখিতে পান নাই, ভয়ে ভয়ে আনন্দরাম ও আক্রমজমান দ্বিতীয় দিনেও আর কিছুই পাঠান নাই। তৃতীয় দিনে উপরে দুই চারিটা বাদ্যযন্ত্রের কাঠের খাঁচা ব্যতীত বাক্সভরা স্ত্রীলোক ও বালিকা নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া গেল। কলকণ্ঠ ও অতুলনীয় রূপ দিল্লীর পথে পথে বিক্রয় করিয়া যে অগাধ ধনসম্পত্তি সে এত দিনে সঞ্চয় করিয়াছিল, মহীয়সী নুরবাঈ আজ তাহা অকাতরে দিল্লীবাসীর জন্য আবার দিল্লীর পথে লুটাইয়া দিল। তাহার গৃহে বীণা ও মৃদঙ্গের মধুর রব ও নৃত্যচটুল চরণে নূপুরনিক্কণ শুনিয়া হিন্দু ও মুসলমান দিল্লীবাসী যখন নুরবাঈকে অশ্রাব্য কটু ভাষায় প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করিতেছিল, তখন বেশ্যাকন্যা নুরবাঈ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার যথাসর্ব্বস্ব দিল্লীর নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় করিতেছিল। সঞ্চিত ধন ফুরাইল, অঙ্গের বহুমূল্য রত্নখচিত অলঙ্কার বিক্রীত হইল, বহুমূল্য শাল, জামিয়ার, কিংখাব ও তাসা অর্দ্ধমূল্যে হস্তান্তর হইয়া গেল, তখন নিরলঙ্কারা কসবী নুরবাঈ ভিক্ষায় বাহির হইল।

সে কথা শুনিয়া বহুদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ কিলীচ খাঁ নিজাম-উল-মুলুক আসফ, জাহ, তাহার গৃহে আসিয়া তাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাহার পদতলে উষ্ণীষ রাখিয়া গেলেন। নুরবাঈ সেই দিন আনন্দরামকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

আনন্দরাম ও আক্রমজমান অতি ধীরে, অতি সঙ্গোপনে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাছা বাছা বিশ্বাসী লোক ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত কথা জানিতে পারে নাই। দশ দিন ধরিয়া নিত্য দশ গাড়ী পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র দিল্লীর বাহিরে চলিয়া গেল, আনন্দরামের ব্যবস্থায় পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র ময়দার থলিয়ায় ও তরকারীর বাজরায় চারিদিক হইতে আবার দিল্লীতে ফিরিয়া রাত্রিকালে নুরবাঈএর গৃহে পৌঁছিতে লাগিল। ক্রমে তহমাস্প খাঁর সন্দেহ আবার বাড়িয়া উঠিল। তিনি এক দিন প্রকাশ্য দরবারে নাদির শাহের নিকটে নুরবাঈএর তরকারীর

গাড়ী সন্ধান করিবার অনুমতি চাহিলেন ; কিন্তু পাইলেন না। দশ দিনে আন্দাজ দুই সহস্র দিল্লীবাসী রমণী দিল্লীর বাহির হইতে পারিয়াছিল, কিন্তু তখনও শত সহস্র হিন্দু ও মুসলমান নারী দিল্লীতে অবরুদ্ধ। উপায়ান্তর না দেখিয়া আনন্দরাম ও আক্রমজমান বিদ্রোহের ব্যবস্থা করিলেন।

ফকীর শাহ লুৎফুল্লা দীর্ঘকাল লচ্ছেদার রাবড়ী ভোগ করিয়া দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাবড়ী খোদার আদেশে বন্ধ হইবার ভয় দেখাইয়া আনন্দরাম তাহাকে সত্য সত্যই বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। ছিটার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া শাহসাহেব এক দিন ফতেপুরী মসজেদে আসিয়া ডঙ্কার আওয়াজে জারী করিয়া দিলেন যে, খোদাতালা কাফের মহম্মদ শাহের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী দিয়া শিয়া নাদির শাহকে দূর করিয়া দিতে হুকুম দিয়াছেন, আক্রমজমান পেশ ইমাম সাজিয়া নূতন বাদশাহের নামে খোৎবা পড়িল, ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, শহরময় সোরগোল পড়িয়া গেল, ক্রমে খবর তহমাস্প খাঁর কর্ণে পৌঁছিল। তিনি প্রথমে সংবাদ বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই,কিন্তু ক্রমশঃ যখন খবর আসিতে লাগিল যে, ফটকে ফটকে সিপাহী তাড়াইয়া দিয়া নূতন বাদশাহের লোক রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছে,তখন তহমাস্প খাঁকে বাধ্য হইয়া শাহান শাহের দরবারে খবর দিতে হইল। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ফৌজ ছুটিল, মুর্দ্দা হইতে তোপ নামাইয়া পথে বসান হইল, দেখিতে দেখিতে চারিদিকের সমস্ত ফটক আবার বন্ধ হইয়া গেল। নাদির শাহের তরফে তহমাস্প খাঁজলের ও মহম্মদ শাহের তরফে লুৎফুল্লা খাঁ সাদেক মোরী ফটকের নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, পথের ধারে একটা মসজেদের সম্মুখে দুই তিন শত লোক ফকীরের সবুজ পোষাক পরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে দীন দীন বলিয়া চেঁচাইতেছে। তাহাদিগের দিকে সওয়ার ছুটাইবামাত্র তাহারা অদৃশ্য হইল, সওয়াররা মসজেদের সম্মুখে গিয়া দেখিল যে, একটা উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপরে ঝুটা জরীর পোষাক পরিয়া ও রাবড়ীর ভাঁড় সম্মুখে লইয়া এক জন আধা-বয়সী মুসলমান বসিয়া আছে। তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল যে, সে হিন্দুস্থানের বাদশাহ, তাহার নাম লুৎফুল্লা শাহ। তাহার আকার ও ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া তহমাস্প ও লুৎফুল্লা খাঁ সাদেক দুই জনেই হাসিয়া আকুল হইলেন। বাদশাহ লুৎফুল্লা শাহ গম্ভীরভাবে তাহা-দিগকে জানাইল যে, নাদির শাহ শিয়া, সুতরাং কাফের, মহম্মদ শাহও কাফের। কারণ, তাঁহার রাজ্যে ভক্ত মুসলমান ফকীর রাবড়ী পায় না, সুতরাং পবিত্র মুসলমানধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য খোদা তাঁহাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী দিয়াছেন। তহমাস্প খাঁ নূতন বাদশাহকে উঠিতে বলিলে সে তঞ্জাম অথবা পাল্কী চাহিল। পল্লী হইতে তঞ্জাম যোগাড় করিয়া আনিয়া তহমাস্প খাঁ ও লুৎফুল্লা খাঁ সাদেক নূতন বাদশাহকে লইয়া প্রাসাদে যাত্রা করিলেন।

প্রকাণ্ড দরবার-ই-আমে শাহান শাহ নাদির শাহ ও বাদশাহ মহম্মদ শাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লুৎফুল্লা তাহার বাদ-শাহীর ইতিহাস আনন্দরামের মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই বলিয়া গেল। সে কহিল যে, কাফের মহম্মদ শাহের অত্যাচারে দিল্লী শহরে যখন দুধ মিলিল না, তখন সে চিটাগুড় গুলিয়া শোলা ভিজাইয়া চুষিতে চুষিতে অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল ; ঈশ্বর হিন্দুস্থানের গুলীখোরদের দুঃখে অভিভূত হইয়া রাবড়ীর বাগান সমেত এক দেবদূতকে পাঠাইয়া দিলেন, সে বাগানে ডালে ডালে দুধের জালা এবং পাতায় পাতায় লচ্ছেদার রাবড়ী। রাবড়ী পাইয়া দুনিয়ার গুলীখোর বাঁচিল এবং দুই হাত তুলিয়া ঈশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিল। দুই দিন পূর্ব্বে ঈশ্বর আবার তাহার নিকটে ২ জন দেবদূত পাঠাইয়া দিয়া জানাইয়াছেন যে, কাফের নাদির শাহকে হিন্দুস্থান হইতে দূর না করিলে তাহার বাদশাহী যাইবে এবং রাবড়ীর রসদ বন্ধ হইবে।

নাদির শাহ গম্ভীর হইয়া সকল কথা শুনিয়া গেলেন এবং নকারাখানার উপরে নূতন বাদশাহকে কয়েদ করিতে হুকুম দিয়া পুরাতন বাদশাহ মহম্মদ শাহের সহিত গোসলখানায় চলিয়া গেলেন। রাবড়ীর ভাঁড় কাড়িয়া লওয়ায় নূতন বাদশাহ লুৎফুল্লা শাহ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

সকল উপায় শেষ করিয়া আনন্দরাম ও আক্রমজমান নূরবাঈ-এর নিকট বিদায় লইতে আসিল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নূরবাঈ তখনও যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই জপ করিতেছিল। তাহার অনুগ্রহে, তাহার সুপারিসে তখনও শত শত হিন্দু ও মুসলমান মহিলা মুক্তি লাভ করিতেছিল। শাহান শাহ নাদির শাহের তখনও নূরবাঈএর উপরে অগাধ বিশ্বাস, তখনও

নূরবাঈএর খাতিরে প্রাণদণ্ড রদ হইতেছে, বন্দী মুক্তি পাইতেছে এবং ফকীর রাজ্যেশ্বর হইতেছে।

আনন্দরাম যখন আসিল, তখন নূরবাঈ রাস্তার উপরের বারান্দায় বসিয়া সটকায় তামাকু টানিতেছিল। বিনানুমতিতে দুই জন পুরুষ তাহার নিকটে আসিল, দেখিয়াই সে বুঝিল যে, তাহারা আনন্দরাম ও আক্রমজমান। নূরবাঈ তাহাদিগকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি ?"

আনন্দরাম বলিল, "একটা কথা আমরা দু'জনে মীমাংসা করতে পারছি না, সেই জন্য তোমার কাছে এসেছি।"

নূরবাঈ একটু হাসিয়া বলিল, "বাবুজী, তোমরা বিদ্বান্-বুদ্ধিমান্ পুরুষমানুষ হয়ে যে জিনিষের মীমাংসা করতে পারছ না, আমি স্ত্রীলোক হয়ে কি করব ?"

"এ সকল কথার মীমাংসা তোমরাই ভাল রকম পার। আমরা কোন দিন পারি না। সাহেবজাদা আক্রমজমানকে বলছি যে, আপনার কায যখন শেষ হয়েছে, তখন আপনি গোলাপীকে নিয়ে এলাহাবাদ, না হয় আওরঙ্গাবাদে চ'লে যান।"

আক্রমজমান সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আর তুমি ?"

আনন্দরাম একমুখ হাসিয়া বলিল, "এইমাত্র দিব্য করেছ সাহেবজাদা যে, আগে আমাকে আমার কথাটা ব'লে শেষ করতে দেবে।" আক্রমজমান মুখ নীচু করিয়া বলিলেন, "তাই কর।"

তখন আনন্দরাম আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখ বহিন্, এ সংসারে আপনার বলতে আমার কেউ নেই, যারা আছে, দেশে ফিরে না গেলে তারা খুসী হবে। আনন্দরাম ম'লে কাঁদবে কেবল বাবার আমলের বুড়া বাগ্দী চাকরটা। সেই জন্য পরম নিশ্চিন্তমনে তলোয়ারের নীচে মাথাটা পেতে দিতে পারি। আর নিজের জীবনটা নিয়ে নিত্য প্রমারা খেলি।"

হঠাৎ নূরবাঈ বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু বাবুজী, পদ্মিনী ?" আনন্দরাম কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিল, "ও কথা বলবে, তা জানি বহিন্, কিন্তু ভেবে দেখ, পদ্মিনী আমার কে ? আমি বাঙ্গালী কায়স্থ, সে পঞ্জাবী বিধবা, ক্ষত্রিয়াণী, এ দেশে এসে লক্ষ্মীর কাছে আর পদ্মিনীর কাছে ভগিনীর স্নেহ পেয়েছি, দীর্ঘকাল তাদের বাড়ীতে ছিলাম, তাদের বিপদের সময়ে প্রাণ দিতে করেছি, কিন্তু আর কি করব ? তাদের কাছে শেষ বিদায় নেবার পূর্ব্বে সকলকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। আর কি বল ?"

কোনও অজ্ঞাত কারণে নূরবাঈএর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। সে চোখে রুমাল দিয়া বলিল, "তোমরা পুরুষরা যত সহজে ছাড়িয়ে যেতে চাও, আমরা যে তত সহজে ছাড়তে পারি না। দেখ বাবুজী, বাঙ্গালী আর পঞ্জাবী আমাদের রাখা নাম, আমাদের হুকুমের তফাৎ; কিন্তু যে উপর-ওয়ালা বাঙ্গালী আর পঞ্জাবীকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সে প্রভেদ গ'ড়ে তোলেননি। যদি তুমি কেবল বাঙ্গালী, তবে ইরাণীর খোলা তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দিয়ে দিল্লীতে বেড়াচ্ছ কেন ? তোমার ধন আছে, দৌলত আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে, শান্তিময় দেশ আছে, দিল্লীর পঞ্জাবীর জন্য তোমার প্রাণ আকুল হয় কেন ?"

"কেন হয়, তা বলতে পারি না বহিন্, তবে হয় যে, সে কথা লুকান অসম্ভব। গোলাপীর জন্য যতটা চিন্তিত হয়েছিলাম, তোমার জন্যও ঠিক ততটা ভাবিত হয়ে পড়ছিলাম—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আক্রমজমান বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু পদ্মিনীর জন্য সকলের চেয়ে বেশী।"

নূরবাঈ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—আনন্দরাম ভীষণ অপ্রস্তুত হইয়া গেল, অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। যখন তাহার কথা ফুটিল, তখন উপহাসের ভয়ে সে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "তোমরা যাই বল, আমি নিজের মন স্থির ক'রে ফেলেছি, পদ্মিনী আর লক্ষ্মীর কাছে চির-বিদায় নিতে যাচ্ছি। সাহেবজাদা, তুমি বলেছ যে, বাঙ্গালা দেশে আর কখনও ফিরবে না, যদি পার, লক্ষ্মী আর তার অনাথিনী ভগিনী পদ্মিনীকে দেখ। বহিন্, যদি আমাকে কণামাত্র ভালবেসে থাক, তা হ'লে সেই দূর ইরাণ দেশ থেকে যতদূর পার, লক্ষ্মীকে আর পদ্মিনীকে বিপদ্ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর।"

আনন্দরামের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূরবাঈ তাহার হাত দুইখানা টানিয়া ধরিল। আনন্দরাম বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার দুঃখ দেখিয়া নূরবাঈ ও আক্রমজমান কেবল হাসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে নূরবাঈ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ, ভাই ?"

আনন্দরাম চোখ মুছিয়া বলিল, "যাচ্ছিলাম লক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিতে, তুমি যদি এখন আটকে রাখ, তা হ'লে আর

এক দিন যাব। কারণ, তোমার হাত ছাড়িয়ে যাবার শক্তি আমার আর নেই।"

সহসা আনন্দরামের হাত ছাড়িয়া দিয়া নূরবাঈ উঠিয়া দাঁড়াইল, আক্রমজমান আলবোলায় মুখ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সে নূরবাঈএর মুখের ভাব দেখিয়া চমকিয়া গেল। নূরবাঈ বলিল, "ভাই, যাব মনে করলেই কি যাওয়া যায়? বিদায় নিতে ইচ্ছা করলেই কি বিদায় পাওয়া যায়? একবার আমার কথাটা মনে ভেবে দেখ। এক দিন হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ আমার গোলাম ছিলেন, সুতরাং কেবল দিল্লী শহরে কেন, সারা হিন্দুস্থানে আমার মত ক্ষমতা আর কারও ছিল না। ইরাণী শাহান শাহ যখন এলেন, তখন মনে করেছিলুম যে, পালিয়ে যাব। যত দিন রূপ আছে, যৌবন আছে, তত দিন যেখানে যাব, সেইখানেই রোজগার। তখনও ধন-দৌলত লোকজন সমস্তই ছিল, কিন্তু যেতে পেরেছিলাম কি? কোথায় যাবে তুমি ভাই? আমার চোখের বড় নজর তুমি ফুটিয়ে দিয়েছ, অথচ আজ তুমিই এই মোটা কথাটা বুঝতে পারছ না। দেখ, আমি কেমন আনন্দে সোনার হিন্দুস্থান ছেড়ে শাহান শাহের সঙ্গে ইরাণে চলেছি।" আনন্দরাম অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নূরবাঈ আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "এখন বুঝতে পারবে না। একবার মনে ক'রে দেখ, কার জন্য জাল নূরবাঈ সেজে খিজিলবাসের তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দিতে গিয়েছিলে? আমার গর্ভধারিণী মাত্র দশটি টাকার জন্য আমাকে আর এক কসবীর কাছে বেচে, চিরজীবন দিল্লীর পথে দেহ বিক্রী করতে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তোমার কে? তুমি আমার মাসুক নও, কোন দিন একটা ফুল, অথবা এক ফোঁটা আতর দিয়ে আমাকে মনের ভাব জানাও নাই, অথচ আমার যে দিন বিপদ্ হ'ল, যে দিন আমার হাজার হাজার প্রেমিক ছিল, সে দিন মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, আমার তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মনে হয় নি কেন জান? সে দিন মনে হ'ল যে, দিল্লীতে তুমিই একটা মানুষ, আর সব পশু। ভাই,—সবাই খায়, সবাই ঘুমায়, সবাই—কাক, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত রোজগার ক'রে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করে; কিন্তু পরের জন্য যার প্রাণ কাঁদে, সেই মানুষ। অথচ এমন মানুষ অনেক আছে, কিন্তু সহজে তাদের চিনতে পারা যায় না। সকল মানুষের উপরওয়ালা এক জন আছে, সেই তোমার মত মানুষ কখনও কখনও চিনিয়ে দেয়। যা কচ্ছিলে, তাই কর, যা করবে মনে করেছ, তা হবে না, সুতরাং ছেড়ে দাও। যে তোমায় চিনিয়ে দিয়েছে, সেই ব'লে দিয়েছে, আমি বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, অথচ তুমি কেন শুনতে পাচ্ছ না, জানি না।"

আক্রমজমান এতক্ষণ একদৃষ্টিতে নূরবাঈএর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বিবিসাহেবা, একটা ছিলিম হুকুম কর। বাবুজী, পাগল হয়ো না। দেখ, আমি মাতাল ব'লে আমার কথা অবহেলা কর না। বিবিসাহেব যা বলছেন, খুব ঠিক। দেখ বাবুজী, খোদার মরজিতে সময়ে সময়ে সকল দেশে এক একটা মহাপ্রলয় আসে। আজ হিন্দুস্থানে খোদার মরজিতে তুফান এসেছে। এমন সময়ে জাতি থাকে না, ধর্ম্ম থাকে না, মান-ইজ্জৎ থাকে না, আর পরে কি হবে, কেউ বলতে পারে না। দেখ বাবুজী, তুমি যা করছ, তোমার হুকুমে বনমালী আর কালেখাঁর মত বিবিসাহেবা আর আমিও ঠিক তাই করছি। অথচ বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, আর এক জন উপরওয়ালা তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ তোমার বিপদ আছে, কারণ, তোমার মগজ বিগড়েছে। একটু ব'স, তামাকটা টেনে নিই, তার পর যেখানে যাবে, চল।"

সেই সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, শোভারাম সংবাদ দিতে আসিয়াছে। সে নূরবাঈএর হুকুম লইয়া পাঠানবেশী শোভারামকে সেই ঘরে আনিল। শোভারাম জানাইল যে, প্রাণের ভয়ে দুই চারি জন দিল্লীবাসী নূতন বাদশাহ লুৎফুল্লা শাহের বিদ্রোহের সকল কথাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। লুৎফুল্লা ফকীর ও পদ্মিনীদের বাড়ী ইরাণী ফৌজ লুঠ করিয়াছে। আনন্দরামকে যে যেখানে চিনিত, শাহান শাহ নাদির শাহ তাহাদের সকলের উপরে হুকুম করিয়াছেন যে, যেমন করিয়া পারে, আনন্দরামকে ধরিয়া আনিতে হইবে। আনন্দরামের দুঃখ-শোক এক মুহূর্ত্তে অতীত হইল। সে হাসিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। নূরবাঈ উল্লাসে পান সাজিতে বসিয়া গেল। আক্রমজমান নূতন ছিলিম পাইয়া নূতন উৎসাহে টানিতে আরম্ভ করিল। শোভারাম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের ব্যাপার কি? আমি এমন কি খোস-খবর এনেছি?"

আনন্দরাম হাসিয়া বলিল, "এত বড় খোসখবর আনন্দরামকে সারা জীবনে কেউ কখনও শোনায় নাই।

দেখিস ভাই, ইরাণী বাদশাহ যেন শেষটা আমাকে তিন মণ বাবলাকাঠ থেকে বঞ্চিত না করে।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বয়ম্বর-সভা

পঞ্চনদের বসন্ত যখন হেমন্তের অন্তে পঞ্চনায়কের সঙ্গে দেখা দিয়াছে, তখন মোগল-গৌরবরবি প্রায় অস্তাচলগামী। যথাসর্ব্বস্ব পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধনরাশি, এমন কি, কুলকন্যা পর্য্যন্ত উপঢৌকন দিয়াও মহম্মদ শাহ নিষ্কৃতি পাইলেন না। জনার্দ্দনের চূড়ারত্ন বিশ্ববিখ্যাত কোহ্-ই-নুর মণি এবং প্রপিতামহের নয়নের মণি ময়ূর-সিংহাসন ছাড়িয়া গজভুক্ত কপিত্থবৎ হিন্দুস্থানের বাদশাহী ফিরিয়া পাইলেন। দিল্লী তখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে। পদনির্ব্বিশেষে প্রতি গৃহে হাহাকার, রাজধানীর চারিদিকে ঘোর দুর্ভিক্ষ। মোগল বাদশাহী এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নাদির শাহ দিল্লীর বাহিরে পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষ বন্দী হইয়া চলিল, রূপবতী নারী ইরাণের হাটে রূপ বেচিতে চলিল, কারিগর চলিল—গজদন্ত, মণি-মুক্তা ও রেশম দিয়া ইরাণের নগর ও রূপসী সাজাইতে, হতভাগ্যারা চলিল—পরাজিত ভারতবাসীর ধন-দৌলৎ-বিজেতা ইরাণীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে, কেবল নূরবাঈ চলিল তাহার নৃত্যচটুল নূপুরশিঞ্জনে ইরাণীর চিত্ত চঞ্চল করিতে।

বসন্তের মরুৎ যখন হেমন্তের তীব্র বায়ু কোমল করিয়া তুলিয়াছে, দূরদেশাগত কোকিল আবার যখন আর্য্যাবর্ত্তের কুঞ্জে গান ধরিয়াছে, অথচ বিস্তৃত ভারতের রাজধানী যখন নিরানন্দ, তখন শাহানশাহ নাদির শাহ ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানের শোণিত শোষণ শেষ করিলেন। ইরাণী ফৌজ দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বাহ্ণে আনন্দরাম পদ্মিনীর ও লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইতে চলিল। লক্ষ্মীর পিতামহী তখন তাহারই প্রতীক্ষায় বাড়ীর সদরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দিল্লীর সমস্ত সংবাদই তাঁহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীর বাহিরে হিন্দু পল্লীতে থাকা সত্ত্বেও ভয়ে আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঁচকুয়া পাহাড়ী ধিরাজ প্রভৃতি দিল্লী শহরের বাহিরের গ্রামগুলির প্রায় সকলেই পলাইয়াছিল, কেবল যাহাদের অন্য উপায় ছিল না, তাহারাই পড়িয়াছিল। আনন্দরামকে জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, সে শব্দ শুনিয়া পদ্মিনী ও লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের ভাব দেখিয়া আনন্দরাম হতভম্ব হইয়া গেল। সে কয় দিন আসে নাই কেন? সকলেই পলাইয়া গিয়াছে, কেবল তাহারাই পড়িয়া আছে, সে তাহাদিগকে কবে লইয়া যাইবে? কোথায় লইয়া যাইবে? নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তিনটি রমণী আনন্দরামকে এমনভাবে ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, সে বিদায়কথা ভুলিয়া গেল। সে যখন প্রস্তাব করিল যে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই গুর্জ্জর গ্রামে গোলাপীর নিকট রাখিয়া আসিবে, তখন পদ্মিনী নিঃসঙ্কোচে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আর তুমি? তুমি কোথায় যাবে, আনন্দরাম?" তাহার কালো চামড়ার নীচে লাল হইয়া উঠিল। চিরসঞ্চিত অধিকারের বলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ যেমন বলিয়াছিলেন, "মেরী ঝাঁসী নেহি দেওয়েঙ্গে", ঠিক সেইভাবে আনন্দরামের হাত দুইখানা সবলে টানিয়া ধরিয়া অজ্ঞাত-কুলশীলা বালবিধবা পদ্মিনী বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে আর কোথাও যেতে দেব না।" এই সময়ে জিনিষ-পত্র গুছাইবার অছিলা করিয়া লক্ষ্মীর পিতামহী সরিয়া গেলেন। আনন্দরাম পদ্মিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দুই তিন বার কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন পদ্মিনী সেই ঘরে একটা চাটাই বিছাইয়া আনন্দরামকে বসাইল। অনেকক্ষণ পরে তাহার মুখ ফুটিল, কিন্তু সে যখন বলিল যে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাকে নূরবাঈএর সঙ্গে বিদেশে যাইতে হইবে, তখন পদ্মিনী হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিল। লক্ষ্মীকে পাণের বাটা আনিতে বলিয়া সে চিরাভ্যস্ত গৃহিণীর মত তাহার নিকটে বসিয়া পাণ সাজিতে আরম্ভ করিল। আনন্দরাম অনেক বার বিদায়ের কথা তুলিল, কিন্তু পদ্মিনী তাহাকে শেষ করিতে দিল না।

আনন্দরাম যখন বলিল যে, তাহাকে তখনই যাত্রা করিতে হইবে, পদ্মিনী উত্তর দিল যে, সে-ও সেই অবস্থায় যাত্রা করিতে প্রস্তুত। পথে বিপদের কথা জানাইলে পদ্মিনী বলিল, তাহার সঙ্গে গেলে কোনই বিপদ থাকিবে না। আনন্দরাম যখন উঠিতে গেল, তখন লক্ষ্মীর সম্মুখেই পদ্মিনী তাহার পা দুইখানা জড়াইয়া ধরিল, আনন্দরাম অবশদেহে বসিয়া পড়িল এবং লক্ষ্মী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠি[ল]। আনন্দরাম যখন বিদায়ের আশা পরিত্যাগ ক[রিল]

তখন লক্ষ্মীর পিতামহী তাহার জন্য ষোড়শব্যঞ্জন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাঙ্গালী-সুলভ উচ্ছিষ্টবিচার ভুলিয়া গিয়া সে শয্যার উপর আহার করিতে বসিয়া গেল। লক্ষ্মীও তাহার সঙ্গে বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া আহার করিয়া আনন্দরাম সেইখানেই তাম্বূল গ্রহণ করিল। তখন তাহার সম্মুখে বসিয়া পদ্মিনী যখন তাহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন আহার করিতে আরম্ভ করিল, তখন আনন্দরাম লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠিল। আহারান্তে পাত্র পরিষ্কার করিয়া পদ্মিনী আবার তাহার নিকটেই আসিয়া বসিল।

গোধূলিলগ্নে শ্যামায়মান, জনশূন্য রাজপথে সহসা শারেঙ্গী বাজিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার রবে বাঙ্গালী আনন্দরাম শিহরিল। কারণ, গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে সুদীর্ঘ প্রান্তরের অন্তে শ্যাম আম্রকুঞ্জে সেই শারেঙ্গী বাজিত। রব শুনিয়া আনন্দরাম পলাইতে চাহিল, কিন্তু দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যা পদ্মিনী তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন আনন্দরামের বিভ্রমের মাত্রা পরিপূর্ণ করিবার জন্য দুয়ারে দাঁড়াইয়া কোকিলবিনিন্দিতকণ্ঠে এক জন শ্যামসোহাগিনীর চিরমধুর গান ধরিল। আনন্দরাম লজ্জায় বসিয়া পড়িল, পদ্মিনীর পদ্মরাগবর্ণ মুখখানি রক্তাভ হইয়া উঠিল, তাহার পিতামহী কিন্তু আনন্দে হাসিয়া ফেলিলেন।

গান চলিল। যে কণ্ঠের গীত দিল্লীবাসী অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ভুলিতে পারে নাই, সে কলকণ্ঠ জনশূন্যপ্রায় নগরোপকণ্ঠের গৃহদ্বারে চুম্বকের ন্যায় শত শত নরনারী আকর্ষণ করিয়া আনিল। দেখিতে দেখিতে বনমালী ও কালেখাঁ হইতে শোভারাম পর্য্যন্ত অনেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া পড়িল। পদ্মিনী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া মনের আনন্দে আনন্দরামের হাত ধরিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

গান থামিল, আক্রমজমানের হাতের শারেঙ্গী নামিল, নূরবাঈ একগাছি মালা বাহির করিয়া পদ্মিনীর হাতে দিয়া সভার সকলের অনুমতি চাহিল। সকলেই সদানন্দ মনে অনুমতি দিল। তখন পদ্মিনীকে উঠাইয়া নূরবাঈ তাহাকে বলিল, "বহিন্, তোমার মনের ভাব সকলের সম্মুখে ব্যক্ত কর।" পদ্মিনী লজ্জানতনেত্রে আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিল। আনন্দে বান্দীপুত্র বনমালী একটা খাস বাঙ্গালা মুলুকের উলু দিয়া ফেলিল।

কিন্তু নূরবাঈ যখন পদ্মিনীকে মথুরার দিকে যাইতে অনুরোধ করিল, তখন সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মী ও তাহার পিতামহী পদ্মিনীকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন। প্রথম প্রহর রাত্রিতে শোভারাম দুইটা দ্রুতগামী উট আনিয়া হাজির করিল, লক্ষ্মী ও তাহার পিতামহী তখনই মথুরা যাত্রা করিল।

তখন আক্রমজমান, নূরবাঈ ও আনন্দরাম পদ্মিনীকে শিক্ষা দিতে বসিল। যথাসময়ে মুসলমানী কশ্‌বী সাজিয়া, সানন্দে আনন্দরামের হাত ধরিয়া নূরবাঈ ও আক্রমজমানের সঙ্গে আজমীর কটক দিয়া পদ্মিনী যমালয় সদৃশ দিল্লীনগরে প্রবেশ করিল। ফটকের ইরাণী কর্ম্মচারী নূরবাঈকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল; বলা বাহুল্য, আনন্দরাম ও আক্রমজমান ভেড়ুয়া সাজিয়া চলিয়াছিল। গৃহের দুয়ারে পৌছিয়া নূরবাঈ দেখিল যে, বাদশাহের নসকচী তাহার জন্য পরওয়ানা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে পরওয়ানা তস্‌লিম্ করিয়া বলিল যে, সে হুকুম হইলেই কুচ করিতে প্রস্তুত। পদ্মিনী তখন আনন্দরামের দিকে চাহিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

দিল্লী নগরের প্রকাশ্য রাজপথে অবগুণ্ঠনহীনা অপরূপরূপ-লাবণ্যবতী নূতন নর্ত্তকীকে দেখিয়া ইরাণী, খিজিলবাস, মোঙ্গোল ও তাতার মুহূর্ত্তের জন্য কুৎসিত পরিহাস করিতে ভুলিয়া গেল। এত রূপ ইরাণীর দাসত্ব করিতে যাইবে ভাবিয়া সহৃদয় দিল্লীবাসী গোপনে অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিল; কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, রমণী সহাস্যবদনে চলিয়াছে। পদ্মিনীর অধরের কোণে একটা অব্যক্ত মধুর হাসির ঈষৎ রেখা ফুটিয়াছিল, কারণ, সে নির্নিমেষ নয়নে আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

নূরবাঈ দিল্লীর পথে হাঁটিয়া চলিয়াছে শুনিয়া দুই দশ জন মাসুক তাহার সঙ্গ লইল। কেহ কেহ নূতন নর্ত্তকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। নূরবাঈ উত্তর দিল যে, সে তাহার বহিন্। অনেক গতযৌবন মাসুক প্রকাশ্যে আপশোষ করিয়া বলিল যে, এমন রত্ন লইয়া নূরবাঈ শেষটা ইরাণের মরুভূমিতে ডালি দিতে চলিয়াছে। মহা সমারোহে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে নূরবাঈ ও তাহার দল চাঁদনী চৌকের মধ্যে তাহার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। খবরটা দিল্লী শহরময় জাহির হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ইতর ভদ্র বহু নরনারী চাঁদনী চৌকের চারিধারে জমায়েত হইয়াছিল। দুই ধারে দুই হাতে সেলাম করিতে করিতে নূরবাঈ নিজের কাটরায় প্রবেশ করিল।

লোকের ভিড় কমিতে লাগিল, ক্রমে সুবিধা বুঝিয়া আনন্দরাম ও আক্রমজমান কাটরার বাহিরে ভিড়ে মিশিয়া গেল।

—

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইরাণ-যাত্রা

শাহান শাহ নাদিরশাহ চলিলেন, ইরাণী সিপাহী চলিল, ভারতীয় বন্দী চলিল, হাতী, উট ও ঘোড়া বোঝাই হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের শত শত বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন চলিল। তাহাদের মধ্যে মাননীয়া মহারাণীর মত চলিল নূরবাঈ, আর তাহার নূতন বহিন ভাগবাঈ ওরফে পদ্মিনী। যেখানেই সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই বৃক্ষতলে অথবা মুক্ত আকাশের তলে নূরবাঈ গানের মজলিস আরম্ভ করিয়া দেয়। আহার-নিদ্রা ভুলিয়া চারিদিক হইতে ইরাণী সেনা ছুটিয়া আসে। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত পূরাদমে মজলিস চলে এবং সেই অবসরে বন্দী পলায় কোন দিন দুই দশ জন, কোন দিন বা দুই চারি শত; বন্দী ও বন্দিনী মুক্তিলাভ করিয়া কোথায় যে যায়, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। ভূতে যেন তাহাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়, দূরে অশ্বপদশব্দ শুনা যায়; কিন্তু ইরাণী ফৌজ ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ধূলা পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না। অধিক দূর গেলে কৃতান্তসদৃশ গুজর ও মেওয়াতী কাহাকেও জীয়ন্ত ফিরিতে দেয় না।

দুই তিন দিন পরে ইরাণী ফৌজের সকলেই চটিল; কারণ, হিন্দুস্থানের সেরা শহর দিল্লী হইতে পছন্দমত তাহারা যে বিনা অনুমতিতে রমণীরত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলিই উধাও হইল। সিপাহী চটিল, কারপরদাজ রাগিল, কড়া পাহারা বসিল, তথাপিও বন্দী পলাইল, এক দিন তাম্বুতে আগুন লাগিল, তাহার পরদিন ঘোড়া ও উটের মধ্যে আট দশটা নেকড়ে দেখা দিল। তৃতীয় দিনে অতিরিক্ত ভাঙ্গ খাইয়া দশ বারটা হাতী শিকল ছিঁড়িয়া অনেক লোক মারিয়া ফেলিল! আশ্চর্য্যের বিষয়, যতগুলি লোক মরিয়াছিল, সবই ইরাণী, একটাও হিন্দুস্থানী নহে। ক্রমে তহমাস্প খাঁর সন্দেহ বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে নূরবাঈএর দলের উপরে নজর পড়িল। তাহাদের তাম্বুর চারিদিকে একটার পরিবর্ত্তে চারিটা চৌকি বসিল, কিন্তু সেই রাত্রিতে সকলের অধিক বন্দী পলাইল।

বন্দিনীর সংখ্যা অর্দ্ধেকের কম হইয়া দাঁড়াইলে, সংবাদ শাহান শাহের কর্ণে পৌছিল। লোক বলে যে, হিন্দুস্থানী রমণী ইরাণে লইয়া যাওয়া নাদির শাহের মত ছিল না; কিন্তু বন্দিনী মুক্তি পাওয়াতে তিনি চটিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু প্রতি রাত্রিতে বন্দিনীদের গড়বন্দী করিয়া রাখিবার হুকুম হইল। সেই রাত্রিতে নূরবাঈ নাদির শাহের মৃত্যুবাণ ছাড়িল। তাহার নূতন বহিন্ ভাগবাঈ সেই রাত্রিতে প্রথম শাহান শাহের মজলিসে পেশোয়াজ পরিয়া নামিল। ভাগবাঈ-এর মূর্ত্তি দেখিয়া কেবল শাহান শাহ মজিলেন না, ইরাণী চোবদার ও নসকচী পর্য্যন্ত মোহিত হইল। নূতন নর্ত্তকী হতভাগ্য মোগল বাদশাহের প্রাসাদ হইতে লুণ্ঠিত মুক্তামালা শিরে পরিয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিল, গুর্জ্জরের গড়বন্দী ভাঙ্গিয়া শতেক বন্দিনী কাহারা উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে! ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শাহান শাহ নাদির শাহ চারিদিকে হাজার হাজার সওয়ার ছুটাইলেন, তাহারা বহুদূরে গিয়াও দূর হইতে ধূলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিল।

পরদিন প্রভাতে শাহান শাহের আদেশে যাত্রা বন্ধ রহিল। সংবাদ শুনিয়া আনন্দরাম পদ্মিনীর মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিপাতে নবরবিকরোদ্ভাসিত কমলিনীর মত বিকশিত জ্যোতিঃ পদ্মিনী আনন্দে আত্মহারা হইয়া দয়িতের প্রেমদৃষ্টি প্রত্যর্পণ করিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ, অধ্যাপক)।

ভগবান্ এবং স্বামী

সতীত্বের যে ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, তাহার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যদি শ্রীভগবানে প্রেমই যথার্থ সংযম বা সতীত্ব হয়, তবে স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রকৃত সতী হইতে হইলে স্বামীকে ভগবানের স্থানে বসাইতে হইবে। পুরুষেরও স্ত্রীকে দেবীস্থানে বসাইতে হইবে। সাধক রামপ্রসাদ ইহার দৃষ্টান্ত। এ জন্য হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে, ভগবদারাধনার ফল স্ত্রীজাতি স্বামীকে পূজা করিলেই পাইবেন। এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, আভাসে ভগবানের স্বরূপ কি এবং তাঁহাকে আরাধনার ক্রম কিছু কিছু জানিতে হইবে। শাস্ত্রে দেখান হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ চারি প্রকার;—(১) অবাঙ্মনস-গোচরম্ অর্থাৎ যাঁহাকে বাক্যে এবং মনের দ্বারা পাওয়া যায় না। যাহাকে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন,—"The unknown and the unknowable।" (২) বিশ্বরূপ (The all pervading God), (৩) অবতার (Incarnation), (৪) আত্মা (Soul)। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথমটি বাদ পড়ে। কারণ, যদি তিনি বাক্য এবং মনের অগোচর, তবে মানুষ তাঁহার নাগাল পায় না। কারণ, "To think is to limit," কিছু চিন্তা করিতে গেলেই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে হয়।

বিশ্বরূপ ধারণার জন্য গীতায় অর্জ্জুনের স্তব দ্রষ্টব্য—"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্। ব্রহ্মাণমীশ কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।" ইত্যাদি, এবং অনেক সাধ্যসাধনায় ইহা হয়। বিশ্বরূপ-সাধনা উচ্চশ্রেণীর সাধকদের জন্য। যাঁহারা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—অর্থাৎ কর্ম্মফলশূন্য সাধনা করিতে পারেন, তাঁহারা বিশ্বরূপে পৌছিতে পারেন। নিষ্কাম অর্থে শ্রীভগবানের প্রীতিই লক্ষ্য।

সাধারণের জন্য হিন্দু অবতার-পূজাই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কারণ, ভগবানের এই ভাবটি অন্য ভাবগুলির অপেক্ষা সহজে ধরা যায়। এই অবতার অনেক। যথা—কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব, রাম, বুদ্ধ ইত্যাদি। সাধনার পথ এবং মতও বিভিন্ন, কিন্তু পূজা একেরই হয়, প্রকার বা নামরূপভেদে। পূর্ব্বোক্ত চারিটি ভাব স্মরণ রাখিলে আর কাহারও সহিত অন্য সম্প্রদায়ের লোকের বিরোধ থাকে না। যেমন—

"হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।"

যিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই শিব। ইহা বুঝিতে হইলে চাই জ্ঞান। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভক্তি হয় না। আবার বিনা সৎকর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয় না। ইহাই ক্রম। যদি হৃদয়ে রাসমন্দির রচনা করা না হয়, তবে মা ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবেন কোথায়? এই হৃদয়কে রাসমন্দির করিবার জন্যই না সাধনা। কিন্তু সাধনা করিতে গেলে একটা ভাব চাই। তাঁহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। নচেৎ সাধনায় রস পাওয়া যায় না; শিথিলতা আসিয়া যায়; সাধনায় উন্নতি হয় না। পিতা-পুত্র, প্রভু-স্বামী, মা-ছেলে এইরূপ সম্বন্ধ। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর এবং পরকীয়া, এই ছয়টি ভাব এই সম্বন্ধ-জ্ঞাপক। ইহার মধ্যে একটি না হয় অন্যটি সকল ধর্ম্মেরই অঙ্গ। কিন্তু এই ভজনার প্রাণ প্রেম। "রাম কহো প্যারে", "মীরা কহে প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।" সবই এক কথা। এই প্রেম অপার্থিব জিনিষের—আমরা সহজে দিতে পারি না। কারণ, আমরা অনভ্যস্ত। এ জন্যই একটা আধার চাই, একটা প্রতীক চাই। খৃষ্টানরাও যীশুর মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। আমরা রক্তমাংসের মানুষকে ভালবাসিতে অভ্যস্ত। এ জন্যই সাধনায় মানুষকে অবলম্বন করা ব্যবস্থা। ইহাই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সাধনা; ভৈরব-ভৈরবীর সাধনা। ইহাই কুমারীপূজা। বড় শক্ত পথ ইহা। কাউণ্ট টলষ্টয় তাঁহার পুস্তক Social evils and their remedies এর এক স্থানে বলিয়াছেন যে, কামকে প্রেম বিবেচনা করিয়া আত্ম-প্রতারণা মানুষে যত করে, এত আত্ম-প্রতারণা কোথাও করে না। কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এ বিপদ্ নাই। অথবা থাকিলেও সাধনায় তাহা প্রকৃতিস্থ করা যায়; যদি স্বামি-স্ত্রী যথার্থ ধর্ম্মরত হন, যদি স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হন এবং স্বামীও সেই পথ অনুসরণ করেন। কারণ, উভয়ের চিত্ত একমুখী না হইলে প্রকৃতভাবে ধর্ম্ম আচরণ করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে স্বভাবজাত প্রণয় হয়, সাধনা তাহারই চরম সার্থকতার জন্য। ইহকালে এবং পরকালে উভয়ের সদ্গতির জন্যই স্বামীকে নারায়ণ বোধ করিবার বিধি। ভগবান্-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় ইহা। স্বামীও সতী পত্নীর উৎসাহে, আদর্শে খাঁটি হইতে বাধ্য। বলা বাহুল্য যে, আন্তরিক যদি কোন সতী এরূপ আচরণ করিতে পারেন, তাঁহার স্বামী কখনও মন্দ হইতে পারে না। ইহাই গুরু এবং গোবিন্দ এক কথা। নারীজাতি স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। তাঁহাদের পক্ষে মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধন করা যত সহজ, পুরুষের পক্ষে তত সহজ নহে। ইহাও স্বামী নারায়ণব্রত উদ্বোধনে সহায়তা

করে। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই জন্ত ইহা। ইহা না হইলে সতী বলিতে পারেন—

"সজ কর চুর, বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা-সলিলে সব ডার রে।"

কারণ, এই ভাবে স্বামীকে না পাইলে যথার্থ পাওয়া হয় না।

এখন এই নারী-জাগরণের দিনে, যখন ইহাই সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে, পুরুষমানুষগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত এবং নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্তই নারীর উপর এই সব বিষম আইন-কানুন সৃষ্টি করিয়া, ধর্ম এবং নীতির গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া, তাহাকে নিষ্পেষিত করিতেছে, তখন নবীন যে পূর্ব্ব-লিখিত পতিনারায়ণব্রতকে সতীর উপর অত্যাচার বলিয়া গণ্য না করিবেন, তাহা বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, এই নবীন এবং প্রাচীনের মতভেদের মূল—ইহাদের আদর্শের বিভিন্নতা। "Human nature must be modified according to a definite ideal." মনুষ্যপ্রকৃতি একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের দ্বারা পরিবর্তিত হইবে। (Metchnikoff. Prolongation of life Page 325)। প্রাচীন ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কোন কাষ করিতে চাহিত না। তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—একমাত্র কাম্য—একমাত্র শ্রেয়: ছিল ভগবান্-প্রীতি, ভগবান্ লাভ; এবং তৎসঙ্গে অন্তদিকে জগতের অভ্যুদয়। তাহার সুখ ছিল ত্যাগে, তপস্তায়। কারণ, সে জানিত যে, জীবনে আস্থা করিবার কিছুই নাই। তাই সে জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া, অপর বিষয়ে আস্থা ত্যাগ করিয়া আত্মার কল্যাণের জন্ত গুরুবাক্যমত শ্রীপার্ব্বতীকে ভজনা কর—'আস্থৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ। স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্।' (শঙ্করাচার্য্য) এই বাক্যের মর্ম্ম যথার্থ জীবনে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিত। সে জানিত যে, ভূমাতেই সুখ। জীবন ক্ষণভঙ্গুর, যাহাতে আত্মার যথার্থ কল্যাণ হয়, সেই পথই প্রশস্ত। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব ছিল। তাই মানুষ—

'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।'—(গীতা)

আমাকে যজ্ঞ এবং তপস্তার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ (অহেতুকবন্ধু) জানিয়া শান্তি ইচ্ছা করে। অন্ত দিকে নবীন চাহেন যুক্তি—মুক্তি বা পরলোক মানেন না। তিনি চান ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ঋষিবাক্য বা আপ্তবাক্য তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। ভগবানের ধার বড় একটা ধারেন না। অর্থ, সম্পদ, প্রভুত্ব, শারীরিক আরাম প্রভৃতিই তাঁহার কাম্য বস্তু। এই দুই মতের মধ্যে ভাল-মন্দর বিচার করিবার কষ্টিপাথর কি? "Greatest good to the greatest number?" যদি তাহাই প্রকৃত জগতের কল্যাণকর হয়, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাগ লোকের পক্ষে অধিক কল্যাণকর যাহা, তাহাই যদি সনাতন পথ হয়, তবে এই কল্যাণটি কি পদার্থ? ইহার নিরপেক্ষ বিচার কে করিবে? যদি স্বয়ং ভগবান্ মূর্ত্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তথাপি তাঁহার কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করিবে না। এই অবিশ্বাসের যুগে কাযে কাযেই কোন কথার সঠিক মীমাংসা হয় না; মতভেদ থাকিবেই। সুতরাং যাহার যাহা অভিরুচি, সেইরূপই সে করিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা ডাক্তার ডাকি, রোগবিষয়ে—তিনি বিশেষজ্ঞ বলিয়া। উকীল ডাকি, তিনি মামলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া। বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় কন্‌ট্রাক্টারকে ডাকি—এই কারণে। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে, নীতিবিষয়ে, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানবিষয়ে যাঁহাদের তুল্য বিশেষজ্ঞ আজিও জন্মায় নাই বলিয়া সভা-সমিতিতে বড় গলায় বক্তৃতা করি—সেই সনাতন ঋষিদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিই। দেশের এক জন কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক "Transcendental nonsense of the sages" ঋষিদের কথা, বাজে কথা এই ভাবে বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু যাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া আমরা মানিয়া লই, তাঁহারাও অনেকে এই ঋষিদের শ্রদ্ধা করেন। কেবল আমরাই মানি না। আজ কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশপূজ্য; কিন্তু তাঁহার গীতি-সাহিত্যে কোন্ ভাব বিদ্যমান? মহাত্মা গন্ধী আজ জগৎপূজ্য কোন্ ভাবসাধনায়? বিশ্বাস না হয়, রবি বাবুর "সাধনা" নামক পুস্তক পাঠ করুন, পরে তাঁহার গীত পাঠ করিবেন। গন্ধীর মতামত পাঠ করুন, দেখিবেন, গীতা উপনিষদ্‌ই তাহাদের ভাবের ভিত্তি। এটা কবি-কল্পনা নহে, সোপেনহায়ার বলিয়াছেন যে, উপনিষদ্ পাঠ করিয়া তিনি ইহার অপেক্ষা উচ্চ ভাব আর কোথাও পান নাই। "It has been the solace of my life and it will be the solace of my death" "ইহা আমার জীবনের শান্তি, মরণেও ইহা আমায় শান্তি দিবে।" এই তাঁহার উপনিষদ-পাঠের পর উক্তি। সত্য যাহা, তাহা সব কালেই সত্য, তাহার ব্যতিক্রম হইলেই তাহা মিথ্যা।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয় বলিতে হয়। কারণ, সতীত্বই ইহার মূল। আজও হিন্দু নর-নারী প্রাতঃকালে দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া, ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করেন। এই সঙ্গে তাঁহারা নিম্নলিখিত শ্লোক স্মরণ করেন, যথা—

'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্তাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।'

এখন এই যে পাঁচ জনের নাম প্রাতঃস্মরণীয় করা হইয়াছে।—সীতা, সাবিত্রী, সতী প্রভৃতি থাকিতেও এই পাঁচ জনের নাম করিবার সার্থকতা কি? ইঁহাদের মধ্যে এক জন ব্যভিচার করিয়াছেন, এক জনের পঞ্চ স্বামী, কন্যাকালে এক জন পুত্রের জননী, এক জন বানরী এবং এক জন রাক্ষসী। আবার শেষোক্ত দুই জন বিধবাবস্থায় বিবাহ করেন, মৃত স্বামীর ছোট ভ্রাতাকে। ইঁহাদের এত উচ্চাসনে স্থান দিবার প্রধান কারণ এই যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই ভগবানে অশেষ ভক্তি করিতেন, অশেষ পুণ্যবলে তাঁহাদের কাহারও কাহারও স্বামিগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের সখা এবং সকলেই ভগবানের লীলার সহায়তা করিয়াছেন। কেহ বা পাপ করিয়াও তাহার ফলে পাষাণী জন্ম পাইয়াও, অহরহঃ রাম-নাম জপ করিয়া, সকল প্রকার ঋতুর প্রকোপ সহ্য করিয়া, যুগ যুগ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

শেষে রাম অবতারে তাঁহারই শ্রীচরণস্পর্শে সব পাপ হইতে মুক্ত হন। উদ্দেশ্য দেখান, পাপ যতই হউক না কেন, যথার্থ অনুতাপ করিয়া ঈশ্বর-শরণাপন্ন হইলে পাপ কাটিয়া যায়।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্য..." (গীতা)

যদি কেহ দুরাচারও হয় এবং আমাকে অনন্যশরণ হইয়া ভজনা করে, তবে সেও সাধুগতি পায়। গীতার এই মহাসত্য যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পাপমাত্রেরই ক্ষমা আছে। শুধু তাহাই নহে, পাপীও নিজ কর্ম্মানুসারে—এমন কি, প্রাতঃস্মরণীয় পর্য্যন্ত হইতে পারেন। তুমি আমি সদাই পাপ করিতেছি। মানসিক পাপ হয় নাই, এমন লোক বিরল। কাযেই সৎত্ব বা সতীত্ব কাহারও অক্ষুণ্ণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি-দোষ আসে না। এই পঞ্চ কন্যার জীবন দেখাইয়া, জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই দেখান হইল যে, দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে বিবাহপ্রথা ভিন্ন, এবং পাপ যতই হউক, "ক্ষমাসারো হি মাধবঃ"—তিনি ক্ষমাসার, আমরা অপরাধের সমষ্টি। প্রকৃত সতীত্ব, বিবাহপ্রথাভেদানুসারে বিচার করা হয়। যিনি পাপ করিয়াও—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।" আমায় মন দিয়াছেন, আমার ভক্ত হইয়াছেন, আমায় যজন ও নমস্কার করেন। আবার "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্" (গীতা) অর্থাৎ ভগবান্‌ই একমাত্র পতি, ভরণপোষণকর্ত্তা, প্রভু, সর্ব্বদ্রষ্টা, তাঁহাতেই আমরা বাস করিতেছি, তিনিই একমাত্র শরণ্য এবং অহেতুক বন্ধু ইহা বুঝেন, আমায় মন সমর্পণ করেন, আমার ভক্ত হয়েন, আমার ভজনা ও আমায় সর্ব্বদা নমস্কার করেন, তাঁহার সবই হইবে। এই আদর্শ প্রাচীনের। আমরা পরে দেখিব যে, এই প্রকার পঞ্চ স্বামী গ্রহণ বা বড় ভ্রাতার মৃত্যুতে ছোট ভাইকে বিবাহ করা পদ্ধতি এখনও ভারতের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। ইহাও বিবাহ, সুতরাং এ বিবাহেও অসতীত্ব-কলঙ্ক লাগিতে পারে না। তাঁহাদের শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ছিল। ভগবদ্ভক্তির মূল বিশ্বাস। এ সব বিশ্বাসের কথা। যুক্তিতর্ক এ স্থানে খাটান উচিত নহে। কারণ, যুক্তিতর্ক এ স্থলে কোন সিদ্ধান্ত আনে না। বিশ্বাসই ইহার কষ্টিপাথর। এই প্রকারের আশাবাণী না থাকিলে দুর্ব্বলচিত্ত নর-নারী দাঁড়াইবে কোথায়? হতাশেরই বা গতি কি হইবে? সাধু হরিদাস এবং যে পতিতা নারী তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের কথা স্মরণ করুন—

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।"

পরশমণিস্পর্শের গুণ এই। আজ আমাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই, নচেৎ যদি নিজের অসতীত্ব বুঝিতে পারিতাম, তবে ব্যাকুল হইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ব্যবস্থা করিতাম; আর প্রাতঃস্মরণীয়দের কাহিনী ভাবিয়া তাঁহাদের আচরিত পথ অনুসরণ করিতাম। নলরাজা, রাজা যুধিষ্ঠির, বৈদেহী ইঁহারা পুণ্যশ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয়, তাহার কারণ—অশেষ বিপদে পড়িয়াও তাঁহারা ভগবানে বিশ্বাস হারান নাই; ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত প্রত্যহ স্মরণ করা আবশ্যক।

"সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।"

বিপদে পড়িয়া 'আমি তোমার' বলিয়া একবারও ডাকে, আমি তাহাকেও অভয় দিই। কারণ, আমার কাযই সকলকে অভয় দান করা।

সতীত্ব-উৎপত্তি

আমরা এতক্ষণ আদর্শ বা পূর্ণ সতীত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইবার লোকাচারে যাহাকে সতীত্ব বলে, তাহার এবং তাহার উৎপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিব। সতীত্বের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই।

ক্রমবিকাশ বা Evolutionবাদীরা স্থির করিয়াছেন যে, অবিভাজ্য, অমর এক বিন্দু জীবাণু (amceba or protoplams) হইতে ক্রমবিকাশবশে কীট, পতঙ্গ, জলচর, সরীসৃপ, উভচর, পক্ষী, তির্য্যক্ প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা সব ক্ষেত্রেই যে ক্রম-উন্নতিবশে জন্মিয়াছে, তাহা নহে, কারণ, কোন কোন জীবজাতি জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পর্য্যায়ক্রমে এই সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে বলিয়া মানুষ তাহার দেহ এবং মনে আজও পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রাণীর মধ্য দিয়া তাহাকে এই পরিণত অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রাণীর দেহ এবং প্রকৃতির গুণ সে কম-বেশী পরিমাণে আহরণ করিয়াছে। তন্ত্রে উক্ত আছে যে, চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষজন্ম লাভ হয়, ইহা এই মতের সপক্ষে। ক্রমবিকাশবাদীরা ইহাও বলেন যে, মানুষ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বানর-জাতির এক শাখা (Authropoid-apes) হইতে জন্মিয়াছে। এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি এই যে, ভ্রূণ অবস্থায় কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই সব জাতীয় বানর এবং মানুষ দেখিতে প্রায় সম্পূর্ণ একই প্রকারের। এমন কি, তরুণ অবস্থায় মানুষে কুকুর, সীল মৎস্য, বাদুড় প্রভৃতির ভ্রূণের সৌসাদৃশ্য এমন অপূর্ব্ব যে, তাহাদের পৃথক্ করা দুষ্কর, (Hird, Evolution P. 30.) আদিম অবস্থায় মানুষ গরিলা, ওরাংওটাং প্রভৃতি বানর-জাতি হইতে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। কিন্তু বুদ্ধির অধিকতর প্রখরতা পাইয়া মানুষ একটু একটু করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। শিকারলব্ধ কাঁচা মাংস আহার, বল্কলে শরীর আবরণ, পর্ব্বত-গুহায় বাস, মৃত্তিকার তৈজসপত্র, যথেচ্ছ বিহার প্রভৃতি অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মানুষ আজ প্রায় সর্ব্বভুক্। নানারূপ রাঁধা ব্যঞ্জনাদি তাহার আহার, বিচিত্র বসন-ভূষণ তাহার পরিধান, অট্টালিকায় বাস, সহর-নির্ম্মাণ, কল-কব্জার দৌলতে আজ জগৎ স্তব্ধ—তটস্থ; জল, স্থল, মরুৎ, ব্যোম আজ সর্ব্বত্র মানুষের গতিবিধি। অধুনা যেরূপ সমাজ, বিবাহ

প্রভৃতি আছে, তাহা তখন সৃষ্ট হয় নাই। কাযেই তখন আদিম মানুষ বাহুবলে যতগুলি পারিত, নারী সংগ্রহ করিত * এবং তাহাদিগকে তৈজস-পত্রেরই মত ব্যবহার করিত। আজিও অসভ্য জাতিদের মধ্যে উহা কম-বেশী দেখা যায় এবং অতি সভ্য জাতিদের মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত আজিও বিরল নহে। কেহ কেহ বলেন যে, অনেক সময় আদিম মানুষ এক বা দুইটি নারী লইয়া জীবনপাত করিত। নারীকে কিন্তু ঠিক তৈজসপত্র অথবা গরু-ঘোড়ার মতই শুধু ব্যবহার করা যায় না। নারীরও ঠিক নরেরই মত স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য প্রভৃতি ছিল এবং আছে, কাযেই নর শুধু জোর-জুলুম করিয়া সব সময়ে নারীকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। আবার অন্য নরও জোরে বা কৌশলে, অপরের অধীনস্থ নারীদের লইয়া কাড়াকাড়ি করিত। ইহার ফলে নর, এই নারী লইয়া বড়ই দাঙ্গা, ফ্যাসাদ লাঠালাঠির মধ্যে দিনপাত করিত। মানুষ কিন্তু শান্তি চাহে। কলহ সহজে কেহ করিতে চাহে না। গোলযোগ দিবারাত্রি হয়, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এবং স্বভাবজাত herd instinct অর্থাৎ একত্র সংবদ্ধ হইবার প্রেরণায় সে একটা আপোষ করিতে শিখিল। নিজের সম্পত্তি পর-হস্তগত হইবার আশঙ্কার নাম ঈর্ষ্যা অথবা পরহস্তগত পদার্থে লোভের নাম ঈর্ষ্যা। এই ঈর্ষ্যার তাড়নায় সে সমাজ সৃষ্টি করিল, যাহাতে সমাজভুক্ত সকলে কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলে। আবার ভালবাসার গতি প্রতিহত হইলেই বা প্রণয়িনীর অপর প্রণয়প্রার্থী থাকিলেই ঈর্ষ্যা হয়। নর-নারী উভয়েরই এই গতি। এই ঈর্ষ্যার জন্ম, প্রথমে মাতৃস্নেহের ভাগ যে ভাই-বোন্ পায়, তাহা হইতে, পরে বয়সের বৃদ্ধির সহিত "আমার" "আমার" সম্বন্ধ স্থাপন যে কোন দ্রব্য বা ব্যক্তির উপর করা হয়, তাহাদের হস্তান্তর বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হইলেই ঈর্ষ্যা জন্মে। জগতে অনেক পাপ-কার্য্য ইহার মূলে আছে। নিজের জিনিষ অবাধে ভোগ করিতে বাধা পাইলেই ঈর্ষ্যা হয়। ইহা অত্যন্ত বলবান্ মনোবৃত্তি, এ জন্য এই ঈর্ষ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ স্থির করিল যে, নরনারী কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে দোষী সাজা পাইবে। বিবাহ মোটামুটি এই নিয়মের ফলমাত্র। যখন মানুষ বিবাহপ্রথা সৃষ্টি করিল, তখন হইতেই স্বামি-স্ত্রীর অধিকার স্থির হইয়া সতীত্ব-সৃষ্টি হইল। কিন্তু শুধু সামাজিক শাসনই যথেষ্ট নহে, ইহা বুঝিয়া তাহার উপর ধর্ম্মের বন্ধনও আসিল। এই জন্য ব্যভিচার, ধর্ম্ম এবং সমাজের উভয়েরই বিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইল। পরে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নরনারী পরস্পরের মুখ চাহিয়া এবং গৃহস্থ, সংসার, সমাজ ও জগতের মঙ্গলকামনায় এই সতীত্ব অটুট রাখিবার বিধি-ব্যবস্থা চালাইল। ফলে সহমরণপ্রথা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইল। এই সহমরণপ্রথা ভারতে ছিল, জগতের অন্যান্য স্থানেও আছে। এই প্রকারে সতীত্ব মনুষ্যজীবনে এবং সমাজ-জীবনে একটি সর্ব্বপ্রধান ভাব, সংস্কার এবং প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইল। ইহার ধারণা যে পূর্ব্বাপর একই আছে বা ছিল, তাহা নহে; তবে ইহার বিকাশ ক্রমশঃই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানদের বা সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই কম-বেশী এক প্রকার বলা যাইতে পারে। তবে দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে বিবাহ এবং সমাজ-প্রথা ভিন্ন বলিয়া সকলে ইহাকে সমানভাবে দেখে না বা সমান মূল্য দেয় না। মর্য্যাদাও সব স্থলে এক নহে। ইহার একটি কারণ এই যে, নারী নরকে সাধারণতঃ চারি প্রকারে ভজনা করে। যেমন ভগবান্‌কে চারি রকম মানুষ ভজনা করে। যেমন ভগবান্‌কে আর্ত্ত, অর্থার্থী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার লোক ভজনা করে, নারীও তাই। কেহ আর্ত্ত অর্থাৎ স্বামীর প্রহার বা ভৎর্সনার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার বাধ্য হয়। কেহ অর্থার্থী—অর্থাৎ কি না গহনা দাও, কাপড় দাও, আজ নাচ, কাল তামাসা, পরশ্ব থিয়েটার চাই, এইরূপে মনের সাধ বা খেয়াল মিটাইতে পারে বলিয়া স্বামীর বাধ্য হয় এবং তাহার ত্রুটি হইলেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। কেহ কেহ স্বামীকে বুঝিবার চেষ্টা করে—প্রণয়, সেবা, যত্নাদি দিয়া। শেষে স্বামীকে বুঝিয়া যথার্থই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহার এবং নিজের জীবন পবিত্রভাবে কাটায়। আর এক প্রকার স্ত্রী আছেন, তাঁহারা স্বামীকে ভাল না বাসিয়া থাকিতেই পারেন না। ভাল-মন্দ ইহাদের বিচার নাই। ভালবাসা ইহাদের অহেতুক, স্বামীই ইহাদের সর্ব্বস্ব। ইহারা ভগবান্ ভক্তের তুল্য।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

* In primitive conditions…man's superior force served him principally in fighting with other males, the object of the combats usually being possession of women—Metchnikoh ; Prolongation of Life p. 272.

বিদায়-কালে

সজল চোখে, আগুন জ্বাল, কেন হিয়া ভাগ কর?
বিদায়-কালে বিরাগ ভাল, রাগ কর, ভাই, রাগ কর।
ওগো, আমার ব্যথার ব্যথী জীবন-সাথী দীর্ঘশ্বাস,
জ্বালাও বুকে আগুন-বাতি দিবস-রাতি সর্ব্বনাশ।

অশ্রু-বিষে, চক্ষু-বাণে, তীক্ষ্ণ করি' ত্যাগ কর!
শেষের বেলা বিদায়-গানে কেন পুনঃ "জাঁক্" কর?
বিদায়-কালে বিরাগ ভাল,
রাগ কর ভাই রাগ কর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

সুন্দরবনে হরিণ-শিকার

হরিণ শিকার করিবার তৃতীয় উপায় "টোপ" দেওয়া। সুন্দরবনের পশ্চিমপ্রান্তে মাতলার নিম্ন হইতে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলে এই প্রণালী অবলম্বনে শিকার করা হয়। কারণ, সুন্দরবনের এই প্রান্তের জঙ্গলে বানর দৃষ্ট হয় না। সেই কারণে এই প্রান্তের শিকারিবর্গ টোপে বসিয়া হরিণ শিকার করে। টোপে বসিয়া হরিণ শিকার করিতে সুবিধাও আছে—বিপদ্‌ও আছে। বিপদের কারণ এই যে, অনেক সময় টোপের নিকটে ব্যাঘ্র আগমন করে। ১৩৩৩ সালে ট্যাংরাখালি জঙ্গলে ঐরূপ টোপে বসিয়া মাতলার দুই তিন ব্যক্তি ব্যাঘ্র-হস্তে প্রাণ দিয়াছে। ইহাতে সুবিধা এই যে, বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিম্বা কুইটানা শিকারের পর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার সময় যেরূপ সশঙ্কচিত্তে অবতরণ করিতে হয়, ইহাতে সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। জঙ্গলের মধ্যে এরূপ অনেক স্থান আছে, যেখানে উচ্চ বৃক্ষ নাই, সেরূপ স্থানেও টোপে বসিয়া হরিণ শিকার করা ভিন্ন উপায় নাই।

এই টোপ দেওয়া অতি সহজ ব্যাপার। শিকারের পূর্ব্বদিবস সকালে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, হরিণ কোন্ স্থানে চরা করিয়াছে। হরিণের চরিবার স্থান দেখিয়া লইয়া, তাহার নিকটে একটি সুবিধাজনক স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, হেতাল বৃক্ষের পাতা প্রভৃতি কাটিয়া লইয়া তাহা দ্বারা একটি কৃত্রিম আবেষ্টনী প্রস্তুত করিতে হইবে। হেতালের পাতা দেখিতে সম্পূর্ণ খেজুরের পাতার ন্যায়। যাহা হউক, এই আবেষ্টনী এরূপ আয়তনযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে অনায়াসে ৫।৬ জন ব্যক্তি বসিতে পারে এবং উচ্চতা দণ্ডায়মান মানুষের মাথা পর্য্যন্ত হইবে। এই ঘেরাটি গোলাকার আকৃতিবিশিষ্ট হইলে ভাল হয়।

শিকারের পূর্ব্বদিন বৈকালে অথবা শিকারের দিন অপরাহ্ণকালে উক্ত ঘেরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। তৎপরদিবস নৌকাযোগে এরূপ সময় তথায় উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য যে, প্রত্যুষেই টোপের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। তথায় প্রবেশ করিয়া নীরবে অবস্থান করাই বিধি। দিবার আলোক উজ্জ্বল হইলে দেখা যাইবে, ক্রমে ক্রমে হরিণের দল চরা করিতে জঙ্গল হইতে বহির্গত হইতেছে। ভ্রমণ করিতে করিতে হরিণ যে মুহূর্ত্তে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আগমন করিবে, তখনই তাহাকে গুলী করা কর্ত্তব্য। যদি তাহার সহিত অন্য দুই চারিটি হরিণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা প্রথমে বন্দুকের শব্দে পলায়ন করিবে; কিন্তু দেখা গিয়াছে, কিছুক্ষণ পরে সেই পলায়িত হরিণ সকল পুনরায় তথায় আগমন করিয়া সেই মৃত হরিণটিকে আঘ্রাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সময় আবার তাহাদের উপর গুলী করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে এক স্থানে উপবেশন করিয়া দুই তিনটি হরিণ শিকার করা যায়। প্রথম হরিণ-শিকারের পর পুনরায় শিকার করিবার ইচ্ছা থাকিলে ঝোপের মধ্যে নীরবে অবস্থিতি করিতে হইবে। তাহা হইলে পলায়িত হরিণ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, কিন্তু মনুষ্যের বাক্যালাপ শ্রবণ করিলে কখনই সেখানে থাকিবে না। যদি প্রভাতে টোপে বসিয়া হরিণ-শিকার না হয়, তাহা হইলে বৈকালে সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে আবার তাহাতে বসিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাতে হরিণ পড়িতে পারে। এইরূপ উপর্য্যুপরি এক দিন কিম্বা দেড়দিন যদি তথায় হরিণ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেখানে আর হরিণ-শিকার হইবে না। কারণ, হরিণের দল সেখান হইতে চরা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যত্র টোপের আয়োজন করাই সঙ্গত। বৈকালে টোপে বসিলে সে দিন যদি জ্যোৎস্না-রাত্রি হয়, তাহা হইলে রাত্রি ৮টা ৯টা অবধি অপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার পর আর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, ব্যাঘ্রের আগমনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। অন্ধকার রাত্রি হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া আসা কর্ত্তব্য। এই হরিণ শিকার করিবার জন্য টোপ করিলে তাহাতেও হরিণ অব্যর্থভাবে শিকার করা যায়। তবে এইরূপ প্রক্রিয়ায় শিকারচেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, যদি হরিণের চরিবার স্থান ঠিক না হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অনেক সময় টোপের নিকট ব্যাঘ্র আসিবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, যেখানেই হরিণ যাতায়াত করে, ব্যাঘ্রও প্রায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি এরূপ কখনও হয়, অর্থাৎ টোপের নিকট ব্যাঘ্র আগমন করে, তাহা হইলে সেই টোপের মধ্যস্থিত শিকারিগণের কর্ত্তব্য—তাঁহারা যেন কখনও ভয়ে বিহ্বল হইয়া না পড়েন। তাঁহারা সেই সময় বিশেষ সাহস অবলম্বন করিয়া টোপের মধ্য হইতে যতগুলি বন্দুক থাকিবে, সব যেন একবারে আওয়াজ করেন। সেই সঙ্গে খুব গোলমাল এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলে ব্যাঘ্র পলায়ন করে।

জনৈক বৃদ্ধ শিকারী বলিয়াছিল যে, যদি টোপের নিকট ব্যাঘ্র আগমন করে এবং সেই সময় কিছুতেই তাহাকে তাড়াইতে না পারা যায়, তাহা হইলে কোনক্রমে আগুন প্রজ্বালিত করিয়া ধরিলেই ব্যাঘ্র পলায়ন করিবে। অনেকে সেই জন্য বিচালি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। তাহা দ্বারা দুই কার্য্য সমাধা হইতে পারে। প্রথমতঃ সেই বিচালি বিছাইয়া তাহার উপর উপবেশন করা চলে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করা যাইতে পারে। ইহা এক জন বৃদ্ধ শিকারীর অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে। এই টোপের দ্বারা হরিণ অব্যর্থভাবে শিকার করা যায়। এ সম্বন্ধে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা আছে।

চতুর্থ উপায় "যাই শিকার।" এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ডায়মণ্ডহারবরের নিকটস্থ লোক শিকার করে। এই উপায়টি সহজ হইলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই প্রণালীর উপকরণ একটি হরিণী। উহা সকলের পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ নহে। যদি কোনও ব্যক্তির এইরূপ মৃগী থাকে, তাহার নিকট হইতে শিকারীকে ঐটি ভাড়া করিয়া লইতে হয়। মৃগীকে শিকারের যাইরূপে প্রস্তুত করিতে

এক বৎসরের উপর সময় আবশ্যক। উক্ত হরিণীকে অতি যত্নে লালন-পালন করিয়া রক্ষা করা প্রয়োজন। যদি কোন-ক্রমে সেই ঘাই হরিণ মারা যায়, তাহা হইলে শিকার করা বন্ধ হইবে।

এই ঘাই হরিণকে শিক্ষিত করিতে হইলে প্রথমে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। অতি শৈশব হইতে সেই মৃগীকে আনিয়া পোষ মানাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে, হরিণী বেশ পোষ মানিয়াছে, তখন তাহাকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাকে শিক্ষিত করিবার পূর্ব্বে যাহাতে সেই মৃগী বন্দুকের শব্দে ভয় না পায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে, প্রথম প্রথম তাহাকে প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় জঙ্গলের ধারে লইয়া যাইতে হইবে এবং তাহার সম্মুখে বন্দুকের শব্দ করিতে হইবে। ইহাতে যখন দেখা যাইবে, সেই হরিণী আর বন্দুকের শব্দে ভয় পায় না, তখন ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরের নিকটে বন্দুক রাখিয়া ছুড়িতে হইবে। ইহাতে সে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার পিঠের উপর বন্দুক রক্ষা করিয়া ছুড়িতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখা যাইবে, সেই হরিণী বন্দুকের শব্দে আর কোনরূপ ভয় পায় না, তখন বুঝা যাইবে, সে শিক্ষিত হইয়াছে। তাহার পর তাহাকে লইয়া শিকারে গমন করিতে হইবে।

ঘাই হরিণ লইয়া শিকারে গমন করিলে প্রথমে জঙ্গলে যাইয়া হরিণের অবস্থানস্থান ঠিক করিয়া অর্থাৎ কোন্ স্থানে হরিণ চরা করিয়াছে, তাহা দেখিয়া লইয়া, তাহার নিকটে সুবিধাজনক স্থানে একটি গর্ত্ত করিতে হইবে। সেই গর্ত্তটি এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তাহার মধ্যে তিন চারি জন লোক বসিতে পারে। উহার গভীরতা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মানুষ গর্ত্তের মধ্যে উপবিষ্ট হইলে তাহার মাথা যাহাতে বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়, গর্ত্ত এমন গভীরভাবে করিতে হইবে। অনেক সময় গর্ত্ত না কাটিয়া টোপ প্রস্তুত করিলেও চলে কিম্বা কোন বৃক্ষের নিম্নবর্ত্তী শাখায় উপবেশন করিলেও হয়। তাহার পর জ্যোৎস্না রাত্রিতে জঙ্গলে যাইয়া সেই নির্ব্বাচিত শিকারের স্থানে হরিণীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। শিকারিগণ তখন উল্লিখিত গর্ত্তে কিম্বা টোপের মধ্যে অবস্থান করিবে। ঘাই হরিণ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। তখন দেখা যায়, তাহার চীৎকারশব্দে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে বনের হরিণ সকল আসিতে আরম্ভ করিতেছে। এ দিকে যতই হরিণ আসিতে আরম্ভ করিবে, ঘাই হরিণও ততই তাহার মুনিবের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যে মুহূর্ত্তে হরিণ বুঝিতে পারিবে যে, সে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে, সেই স্থানেই মাটীর উপর সে শয়ন করিবে। ইহাই তাহার শিক্ষা। সেই ঘাই হরিণ যে মুহূর্ত্তে শয়ন করিবে, অন্য অন্য হরিণ তাহার গাত্র আঘ্রাণ করিতে থাকিবে। সেই অবসরে শিকারীরা তাহাদের লুক্কায়িত স্থান হইতে বন্য হরিণদের উপর গুলী বর্ষণ করিবে। তবে ইহাতে দেখা যায়, সেই স্থানে একবারে যাহা শিকার করা যায়, উহাই চরম। সে স্থলে পুনরায় ঘাইয়ের চীৎকারে আর হরিণ আগমন করিবে না।

দিবাভাগেও ঘাই দ্বারা শিকার হয়। তাহাতে শিকারীকে কোন বৃক্ষের উপর বসিতে হইবে। ঘাই হরিণের চীৎকারে বন্য হরিণ নিকটে আসিলে তাহাকে বৃক্ষের উপর হইতে গুলী করিতে হয়। অনেক সময় নৌকায় বসিয়াও ঘাই দ্বারা শিকার করা যায়; কিন্তু সে জন্য জ্যোৎস্না-রাত্রির প্রয়োজন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই জ্যোৎস্নালোকই এই শিকারের পক্ষে প্রশস্ত। নৌকা করিয়া ঘাই মৃগীর সহিত চলিতে চলিতে যদি নিকটে জঙ্গলের মধ্যে হরিণের ডাক শ্রুত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, সেই স্থলে হরিণ রহিয়াছে। সেই সময় ঘাইকে তীরে উঠাইয়া দিয়া (কিন্তু ইহা বেশ সুবিধামত অর্থাৎ ফাঁকা স্থান না হইলে হরিণ দৃষ্টিগোচর হইবে না।) শিকারীরা নৌকার উপর প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিবে। ঘাইও ঐরূপ জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া চীৎকার করিয়া হরিণ ডাকিয়া সুবিধামত স্থানে শয়ন করিবে। শিকারিগণ তখন নৌকা হইতে গুলী করিতে পারিবেন।

নদীর চর হইলেই শিকারের সুবিধা হয়। অনেক সময় ঘাই মৃগীর চীৎকারে ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্যাঘ্রের গন্ধ পাইলেই ঘাই ছুটিয়া ঠিক তাহাদের মনিবদিগের নিকট উপস্থিত হইবে। সেই সময় শিকারিগণ বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারাও সেই সময় ঘাইকে মধ্যস্থানে রাখিয়া চারি দিক হইতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে। টোপের নিকট ব্যাঘ্র আসিলে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেই ব্যাঘ্র পলায়ন করে। গর্ত্তের ভিতর অবস্থান করিলেও অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়। একটা কথা মনে রাখিলে ভাল হয়। ব্যাঘ্র অতি ভীরু, হঠাৎ তাড়া পাইলে পলায়ন করে।

"নালিছলা শিকার"

হরিণ মারিবার পঞ্চম উপায় "নালিছলা শিকার।" কিন্তু ইহা নূতন শিকারী কিম্বা বিলাসী ভদ্রলোক শিকারীর পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে। কারণ, এই প্রণালীতে শিকার করিবার সময় কর্দ্দমের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয়। যাঁহারা কর্দ্দমের ভিতর হাঁটিতে অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা এইভাবে চলিতে যাইলে তাঁহাদের পায়ের শব্দ হয়। কর্দ্দমের ভিতর এক পা রাখিয়া অন্য পা উঠাইতে যাইলেই শব্দ হইবে; কিন্তু তাহা হইলে চলিবে না। ইহাতে এরূপ ভাবে পা ফেলিতে অভ্যাস করিতে হইবে যে, কর্দ্দমের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইলে কোনরূপ শব্দ উত্থিত হইবে না। কিন্তু উহা সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের লোক অনেক সময় এইরূপ ভাবে চলিয়া হরিণ-শিকার করে। কারণ, ইহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। ইহাতে অন্যান্য প্রণালীর ন্যায় কোনই উপ-করণের প্রয়োজন হয় না।

"নালিছলা" প্রণালীর দ্বারা হরিণ-শিকারের উপযুক্ত সময়

প্রত্যুষ—সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্ব হইতে, কিম্বা বৈকালে সন্ধ্যার পূর্ব্বে। কিন্তু সে সময় নদীতে ভাঁটা থাকা অত্যাবশ্যক। জোয়ারের সময় এই প্রণালীতে শিকার করা চলিবে না। অর্থাৎ জঙ্গলের ভিতর যে সমস্ত খাল আছে, তাহার জল যখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়, সেই সময় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই শুষ্ক খালের ভিতর দিয়া, নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে হইবে। তখন খালের দুই তীর নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়া চলাই সঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রভাতকালে এবং সন্ধ্যার সময় হরিণমাত্রেই জঙ্গলের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া নদীর কিনারায় চরা করিতে আরম্ভ করে।

খালের দুই তীরে দৃষ্টি রাখিলে, প্রায়ই দেখা যাইবে, খালের পাড়ের উপর কোন না কোন স্থানে হরিণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই সময় তাহাকে গুলী করিতে হইবে, কিন্তু ভাঁটার সময় খাল কর্দ্দমপূর্ণ থাকে বলিয়া সাবধানে চলিতে হয়। কারণ, কোনরূপ শব্দ হইলেই হরিণ পলায়ন করিবে। গুলী দ্বারা নিহত হরিণকে সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া, আবার চলিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঐরূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় হরিণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহাকে আবার গুলী করা হউক। এইরূপে "নালিছলা" প্রণালীতে, হাঁটিতে পারিলে এক দিনে সকাল ৮টার মধ্যে ৩।৪টা হরিণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। লেখক এক দিনে তিনটা হরিণ পাইয়াছিলেন। হরিণ বন্দুকের শব্দে পলায়ন করে না; কিন্তু কর্দ্দম হইতে পা তুলিবার সামান্য শব্দ পাইয়া পলায়ন করে, ইহা দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাদায় প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেলে পা তুলিয়া পুনরায় পা ফেলিবার সময় বক্ বক্ করিয়া শব্দ হয়। তাই কাদা হইতে পা উঠাইবার সময় একটু পা বাঁকাইয়া উঠাইতে হয়। ইহাতে কর্দ্দমমধ্যস্থিত পায়ের স্থানটি একটু বড় হয়। পা ফেলিবার সময়ও গর্ত্তটি বড় করিয়া পা ফেলিতে হইবে অর্থাৎ পা ফেলিয়া একটু বাঁকাইয়া দিলেই গর্ত্ত বড় হইয়া যাইবে। ৭।৮ দিন কর্দ্দমের ভিতর চলিয়া চলিয়া অভ্যাস করিলেই ইহাতে অভ্যস্ত হওয়া যায়। এইরূপ প্রণালী অবলম্বনে শিকার বলবান্ লোকের উপযোগী; কারণ, দেখা যায়, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কর্দ্দমের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইলে লোক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় বন্দুক ছুড়িলে প্রায়ই হাতের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বলবান্ লোক হইলে তাহার শীঘ্র ক্লান্ত হইবার সম্ভাবনা কম। কর্দ্দমের ভিতর দিয়া চলিয়া বিশেষ ক্লান্ত হইলে হরিণ দেখা গেলেও সে সময় গুলী করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহাতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই নালিছলা শিকারে মাত্র দুই জন লোক হইলে ভাল হয়। এক জন একমনে হরিণ দেখিতে দেখিতে যাইবে, অপর ব্যক্তি তাহার রক্ষকস্বরূপ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চতুর্দ্দিক নজর রাখিয়া চলিবে।

"মালহাটা শিকার"

সুন্দরবন অঞ্চলের নিকটস্থ প্রদেশের লোক, যাহারা কোন প্রকার শিকারে অভ্যস্ত নহে, তাহারাই এইরূপ মালহাটা শিকার প্রণালী অবলম্বনে শিকার করে। ইহাও বিদেশী ভদ্রলোকের পক্ষে একবারে সম্ভব নহে। নালিছলা শিকারে কেবলমাত্র কাদায় হাঁটা অভ্যাস করিলে শিকার করা যায়; কিন্তু ইহাতে জঙ্গলের মধ্যে স্থলভাগের উপর হাঁটিতে হইবে। সুন্দরবনের মধ্যে অভ্যাস না থাকিলে জঙ্গলের মধ্যে ডাঙ্গার উপর দিয়া গমন করা কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের বোধের অগম্য। কারণ, সুন্দরবন প্রদেশের স্থলভাগ সমান; উচ্চাবচ নহে। তথাপি জঙ্গলের মধ্যস্থিত সমস্ত ভূমির উপর ২ ইঞ্চি এক ইঞ্চি অন্তর ১ ফুট ২ ফুট উচ্চ ঠিক কালসার হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় 'সুলো' হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে প্রতি পদবিক্ষেপে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। জুতা পায়ে দিয়া নিঃশব্দভাবে চলা যায় না। সামান্য শব্দেই হরিণ পলায়ন করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আর এক অসুবিধা, সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ছোট বড় খাল আছে। কিছু দূর গমন করিলেই হয় ত সম্মুখে খাল পড়িয়া যায়, জোয়ার হইলে তাহা জলপূর্ণ এবং ভাঁটার সময় তাহা গভীর কর্দ্দমে পূর্ণ থাকে। সুতরাং জুতা সে সকল স্থানে অচল। উল্লিখিত কারণে ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব বলিলেই হয়। তবে যাহাদের সদাসর্ব্বদা চলা অভ্যাস আছে, তাহারাই নগ্নপদে স্থলভূমিতে চলিতে পারে। অনভ্যস্ত ভদ্র সাধারণ স্থানীয় লোকের সহিত কিছু দিন ধরিয়া চলা অভ্যাস করিলে তবে এই প্রণালীমতে শিকার করিতে পারেন। এই সুলো বনের ভিতর দিয়া নগ্নপদে চলিতে হইলে, পা বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে ভাবে 'কুশপায়ে'র লোক চলে।

জঙ্গলের মধ্যে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে চলা অভ্যাস করিতে পারিলে ইহা দ্বারা হরিণ-শিকারকার্য্য হইতে পারে। এই মালহাটা শিকারের সুবিধা এই যে, ইহাতে সময় অসময় নাই, দিবসের মধ্যে যে কোন সময়ে এরূপ প্রণালী-অবলম্বনে শিকারকার্য্য হইতে পারে। তবে ইহা দ্বিপ্রহরের সময় বিশেষ সুবিধাজনক হয়। কারণ, এই সময় হরিণদল চরা করিয়া কোন স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকে।

"মালহাটা" প্রণালীতে শিকার করিতে হইলে, জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন্ স্থানে অল্প হরিণ চরা করিয়াছে। সেই স্থান সামান্য অনুসন্ধানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে দেখিতে হইবে, হরিণ সকল চরিতে চরিতে কোন্ দিকে গমন করিয়াছে, পদচিহ্ন দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তখন সেই হরিণের টাটকা পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। এই পায়ের দাগকে ঐ প্রদেশের সাধারণ কথায় পায়ের "খুট" বা পায়ের "খোঁচ" বলা হয়। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্নিগ্ধ ছায়াপূর্ণ স্থানে হরিণ শয়ন করিয়া আছে, অথবা দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থাতেই অবিলম্বে তাহাকে গুলী করিতে হইবে। এইরূপ পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাইলে প্রায় কখনও শিকার নিষ্ফল হয় না। হরিণ সকল দ্বিপ্রহরে জঙ্গলের মধ্যে গেঙো কিম্বা বানগাছের নিম্নে কোন ঝোপের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে; কিম্বা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে,

ভো গাছের নিম্নে সুলো জন্মায় না। সেই কারণে উহারা ভো বৃক্ষের নিম্নে বেশী সময় আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে চ'লবার সময় খুব সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য। এই মালহাটা শিকার অন্য প্রকারেও করা যায়। যদি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরিণের টাটকা পদচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে জঙ্গলের মধ্যে হরিণের চলিবার রাস্তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সর্ব্বদা ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক, জঙ্গলের মধ্যে হরিণ কখনও দুই পথ দিয়া চলা-ফেরা করে না। জঙ্গলের মধ্যে হরিণের চলিবার নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। তাহারা বরাবর সেই পথ ধরিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। এই পথ হরিণ চলিয়া চলিয়া এরূপ হইয়াছে যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ইহাদের স্বভাব—পুরাতন, পূর্ব্ব-প্রচলিত পথ অবলম্বন করিয়া চিরকাল দলবদ্ধভাবেই হউক, কিম্বা একাই হউক চলিবে। হরিণ-চলা পথ দেখিতে পাইলে শিকারীকে আবিষ্কার করিতে হইবে, হরিণ সকল অন্য এই রাস্তায় চলিয়াছে কি না, যদি চলিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ দিকে গমন করিয়াছে। যদি তাহাতে দেখা যায়, অন্য হরিণ সকল সেই রাস্তায় চলে নাই, কারণ, তাহাতে টাটকা পদচিহ্ন নাই, তাহা হইলে সেই রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া অন্য রাস্তার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেইরূপ রাস্তা প্রাপ্ত হইলে, পদচিহ্ন দ্বারা বুঝিতে হইবে, হরিণ সকল কোন্ দিকে গমন করিয়াছে। অনেক সময় আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তন উভয় প্রকার পদচিহ্ন দেখিতে হইবে, শেষ দাগ কোন্ দিকে দেখিলেই তাহা বেশ অনুভব করিতে পারা যায়। কারণ, প্রত্যাবর্ত্তনের দাগের উপর আগমনের দাগ পড়িয়াছে। এখন সেই শেষ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলে সম্মুখে নিশ্চয় হরিণ পড়িবে। তবে শিকারের হরিণ অনুসরণ অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে এবং খুব সতর্কভাবে করিতে হইবে। শব্দ হইলে সেই হরিণ পলায়ন করিতে পারে। আবার এইরূপ চলিতে চলিতে অনেক সময় ব্যাঘ্র কিম্বা বন্য বরাহের সম্মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেরূপ অবস্থা হইলে সেই সময় নিজের বিবেচনামত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মালহাটা শিকারের বিপদ্ এই ব্যাপারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মালহাটা শিকার দিবসের অন্য সময় অপেক্ষা দ্বিপ্রহরে ফলদায়ক হয়। কারণ, হরিণ সকল স্থির হইয়া থাকিলে তাহাকে অনুসন্ধানের দ্বারা বহির্গত করা যায়। এইরূপ ভাবে হরিণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে ১ ঘণ্টার মধ্যে শিকার হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র।

ঘুমের গান

নিশুত রাতি—নাই রে সাড়া
ঢুল ঢুল ঢুল নয়ন-তারা
কুল কুল কুল গাইছে নদী
বুলবুলদের প্রায়,
শ্রান্তিহরা শান্তিভরা ঘুম রে ত্বরা আয়।

ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ সেতার ঝিঁঝির
ঘুমের নেশা লোগায় নিশির
ঝির ঝির ঝির বইছে হাওয়া
কানন-বীথিকায়,—
শ্রান্তিহরা শান্তিভরা ঘুম রে ত্বরা আয়।

পাতার দোলায় অঙ্গ রাখি'—
ফুলপরীরা থাকি' থাকি'
দুল্‌ছে দোদুল তন্দ্রা ঝুলে
মৃদুল মধুর বায়,—
শ্রান্তিহরা শান্তিভরা ঘুম রে ত্বরা আয়।

চুর হয়ে চাঁদ জোছ্‌না-মদে
ঢুল্‌ছে গগন-মসনদে
ঝিলমিল তার করছে দিঠি
নীল নভে ঝিল গায়,—
শান্তিহরা শ্রান্তিভরা ঘুম রে ত্বরা আয়।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভাদুড়ী মশাই

১৭
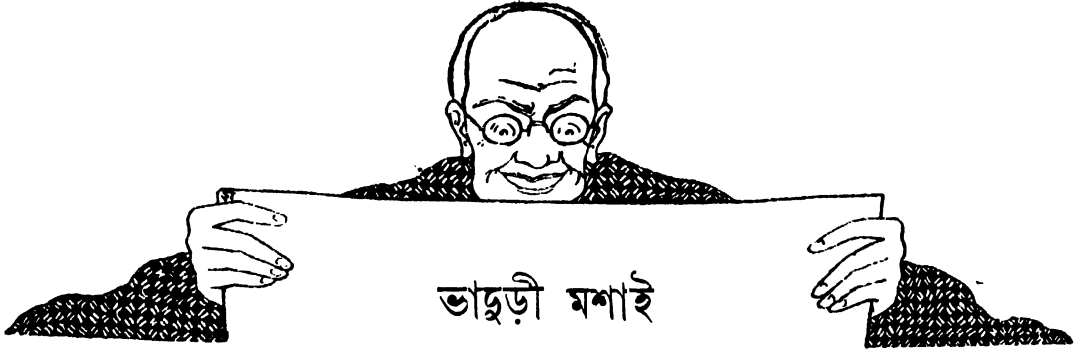
অবিশ্রাম বিশ্রামে ভাদুড়ীমশাই ভট্‌কে উঠছিলেন। বল্‌লেন,—"শুয়ে শুয়ে টোল্ খেয়ে যাচ্ছি; চল না মাতু, ডেপুটীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি; বাইরের হাওয়াটাও গায়ে লাগান হবে,—আর···"

"আর কি শুনি?"

সহাস্যে বললেন, "মধুপুর নামটাই শোনা হয়েছে, সেটার,—এই আর কি!"

"ওঃ" মাত্র ব'লে মাতঙ্গিনী দেবী এখন একটি কড়া কটাক্ষ হানলেন—যেটি সহজও নয়, অর্থহীনও নয়,—একদম্ দিক্‌শূলের সিম্বল্।

ভাদুড়ী মশাই রহস্যের সুর বাহাল রেখেই বললেন, "নজর লাগবার ভয় পাচ্ছ! তা একটা কাজলের টিপ,—না সেও ত এ বাড়ীতে···"

এই পর্য্যন্ত বলেই ভাদুড়ী মশাই সামলে সব্‌ট্রাক্‌শন্ সুরু করতে বাধ্য হলেন।

"তুমি কি পাগল হয়েছ মাতু,—আমি যাব কোথায়? আমার আবার সে-ই উল্টো রথে ওঠা! আমার মত আর মাত্র ব্রিক্‌ জেণ্টেল্‌ম্যান্ আছেন শ্রীক্ষেত্রে।"

এই ব'লে হাসবার চেষ্টা পেলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনীর মুখ দেখে সেটা তেমন ফুটল না।

"কাজল"টা তখন যথাস্থানে পৌছে কায সুরু ক'রে দিয়েছিল। সন্দেহ নিঃসন্দেহের কোঠায় ঢুকে সত্যের পোষাক পরছিল।

তাতে মাতঙ্গিনী দেবীর ডেপুটি-বাড়ী যাবার সঙ্কল্পটাকে দৃঢ় করেই দিলে। মুখে বল্‌লেন—"বেশ ত, যাও না,—আমি যাচ্ছি না।"

"আমার যাওয়া আসা স্বপ্নে,—এই চল্‌লুম," বলেই ভাদুড়ী সটান্ শুয়ে পড়লেন।

মাতঙ্গিনী দেবী মিনিটখানেক চুপ্‌চাপ্ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে "আমারই যেন মাথাব্যথা" ব'লে দ্রুত কক্ষান্তরে চ'লে গেলেন।

ভাদুড়ী মশায়ের চাপা হাসির ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দও তাঁর কাণে গেল। তিনিও গিয়ে সশব্দে শয্যা নিলেন,—অবশ্য পা দুখানি পালঙ্কের বাইরেই প্রলম্ব রইল।

আধ ঘণ্টা এইভাবেই কাটল, ঘুম ঘেঁস্‌তে পেলে না। তার ওপর স্বামীর নিশ্চিন্ত নিদ্রার সাড়া যেন বিদ্রূপের মত বিঁধতে লাগল। রোষে, অভিমানে—অশ্রু মুছলেন।

"সেটাও কি আমার দোষ, আমি কি করেছি যে, এ সব আমাকে সইতে হবে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালেই কি সব দোষ তার! করুন গে না পঁচিশটা বে, কে মানা করতে যাচ্ছে! কাজলের···"

আরও কিছুক্ষণ কাট্‌লো। সহসা—"যাবো, তার আবার ভয়টা কিসের—যাবোই ত" ব'লে ধড়মড় ক'রে উঠে নবনীকে গাড়ীর কথা ব'লে এসে নিজের প্রসাধনে মন দিলেন।

"দেরী হবে না—মিনিট পাঁচেক" ব'লে এসেছিলেন। চট্ তিন কোয়ার্টারে সেরে নিলেন। দু'বার বিনুনী ক'রে খুলে ফেল্‌লেন।—"নাঃ এলো খোঁপাই ভাল—"

সীঁথেটা বাঁকাই কাটলেন—"তাতে হয়েছে কি, কে না কাটে; এই ত জজ সাহেবের ধুম্‌সী—সাত ছেলের মা,—মরণ আর কি,—কাটেন না! তাঁদের বুঝি টাকায় ঢাকা পড়ে!"

দুহাতের চেটো দিয়ে দুরগোর দুপাশ চেপে, নেড়ে, একটু ফাঁপিয়ে নিলেন।

"আবার টিপ কেন!"

শেষ "টেবল-আরশির" সামনে দাঁড়িয়ে দেখেন,—কখন্ সেটা প'রে ফেলেছেন!—"বেশ করেছি—যাক্ গে। পোড়ার-মুখো হার দু'ছড়া জ্বালিয়ে মারলে, যেমনটি রাখতে চাই—থাকে না—স'রে স'রে মরেন। মরুক গে—আর পারি না—।

"ঘামেই আমায় খেয়েছে! পাউডার কি রুজ কোন দিনই কাযে এল না। দরকারই বা কি,—এই রঙেরই দাম দেয় কে!" আরশির সামনে চোখ ঘুরিয়ে একটু হাসলেন।

সৌন্দর্য্যে, সুগন্ধে, মনের আবহাওয়া মদির হয়ে উঠেছিল,—বেশ একটু ফুর্ত্তি এনে পূর্ব্বভাবটা কাটিয়ে দিয়েছিল।

এতটা পরিশ্রমের ফল, স্বামীকে দেখাতে বা তাঁকে জানিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনায়,—ঠিক বলা কঠিন,—মাতঙ্গিনী দেবী হাসি-ঢাকা গম্ভীর মুখে ভাদুড়ী মশায়ের ঘরে ঢুকেই বললেন—"যাবে ত চলো।"

তিনি তখন মুন্সীগঞ্জের মক্কেলের আক্কেল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা-মগ্ন ছিলেন। কক্ষমধ্যে সহসা বসন্তাগম লক্ষ্য ক'রে সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "এ কি,—কোথায়— ?"

"আহা,—আর নেকা সাজতে হবে না, মধুপুর নামটাই শুধু শোনা থাকবে কেন……"

রহস্য রি-ওপন্ (re-open) করবার (ওস্‌কাবার) সাহস আর তাঁর ছিল না। বললেন, "শাস্ত্রমতে আমরা উভয়ে ভিন্ন ত নই, তবে দেহ দুটো এক ক'রে দিলে,—অন্ততঃ তোমায় আমায়—Jack ছাড়া নড়ার উপায় থাকত না। আর্টেও আটকাতো, সম্ভবতঃ গগন বাবুর চিত্রভবন চিড় খেতো! ভগবান্ সে ভুল করবেন কেন? তুমি গেলেই আমার যাওয়া হবে, শাস্ত্রের সম্মান রাখাও হবে।"

"ইস্—অ্যাতো! বাঁচব না দেখছি।"

"অন্যের বাঁচার কথাও ত একটু ভাবতে হয়, যদি দাঁড়িয়ে থাকতুম, এখুনি ত নির্ঘাত অপঘাত ছিল। একটু সতর্ক হ'তে বলাও ত উচিত ছিল, ভাগ্যিস শুয়ে ছিলুম।"

"কেন—ঘুরে পড়তে না কি?"

ইত্যাদি কথার পর শেষ মাতঙ্গিনী দেবীই নবনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন। ইচ্ছাটাও ছিল তাই।

মাতঙ্গিনী দেবীর নানা বিরুদ্ধ ভাবনা সত্ত্বেও তিনি ভাদুড়ী মশায়ের ভেতরটা আনন্দস্পর্শে দুলিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাদুড়ী প'ড়ে প'ড়ে দোল খেতে লাগলেন। মাতুর রূপের বৈশিষ্ট্য যে কোথায়, সেটাও আবিষ্কার ক'রে ফেললেন,—বয়সের সঙ্গে সেটা নাকি বেড়ে চলেছে!

১৮

সারা বৈকালটা এই মধুর কল্পলোকেই তাঁর কাট্‌তো, কিন্তু হতভাগা তারিণীর সময় অসময় নেই। সে ফাঁক পেয়েই এসে উপস্থিত।

সে বেচারাকেও দোষ দেওয়া যায় না। তার যথাসর্ব্বস্ব ঐ এটর্ণীর পাল্লায়। তাই সর্ব্বদাই সে নানা উপায়ে সেবা-তৎপর। নিজের ত আছেই, আবার বাইরের লোকও জোটায়। রত্ন থাকে নাকি অকূল সমুদ্রের অতল স্পর্শে—সেইটে স্পর্শ করবার হর্ষ নিয়ে লোক আসে যায়।

ভাদুড়ী মশাই যে বড় এটর্ণী—যার ওজনজ্ঞান আছে, তাকে আর বোঝাতে হয় না।

তারিণী সিরাজগঞ্জের এক শাঁসমলকে ফাঁস-কলে ফেলেছে। সেই প্রসঙ্গ পাড়তেই সে এসেছিল।

ঢুকেই হাসিমুখে বল্‌লে, "হুজুরের সুনাম মুখে মুখে দুনিয়ার সব দিক দখল ক'রে বসেছে—পাঞ্জাব পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ সিরাজগঞ্জ থেকে এক যজমান হাজির।"

বাধাজনিত বিরক্তিটা চেপে ভাদুড়ী মশাই বল্‌লেন,—"তোমার কি আর কোনও চিন্তা নেই তারিণী,—ভগবান্‌কে ডাকোটাকো কি?"

"আজ্ঞে, আপনিই আমার ভগবান্, সর্ব্বক্ষণই যে মনটা জুড়ে উপ্‌চে আছেন। তাঁকেও ভাবি বৈ কি হুজুর। তাঁর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা,—আপনার একটি পুত্র-সন্তান হয়। এই দেখুন না, যে লোকটি পাক্‌ড়েছি—তার এগারটি ছেলে—অবশ্য তিন পক্ষের রোজগার।"

"চুপ চুপ! তুমি ত ওঁর কাছেও সব কথা কও। ওই পক্ষ তিনটে বাদ দিয়ে বোলো।"

"আজ্ঞে, সে আর আমাকে বলতে হবে না। কিন্তু আপনার ওপর ভগবানের দয়া দেখুন,—প্রথম দু'টির পাঁচ পাঁচ আর হালিরটির একটি।"

"এতে দয়ার কি পেলে?"

"আজ্ঞে, এই আপনার প্রতি……এই বুঝেই দেখুন না…"

ভাদুড়ী হাসিমুখে তারিণীকে দেখতে লাগলেন আর মাঝে মাঝে ভাবতে লাগলেন—"দুনিয়ায় বোকা লোক আর জন্মায় না, একেবারে পাকা হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়।"

"এখন শাঁসমল চায় ছোটর ছেলেটিকে দিতে অর্দ্ধেক আর বাকি দশটিকে দিতে অর্দ্ধেক—"

"ছোট গিন্নী চান বলো।"

"আজ্ঞে, তা ত বটেই। সেই মর্ম্মেই উইল। এখন সেই উইল নিয়েই হুইল ঘুরতে সুরু হয়েছে।"

"তাই ত, ছেলেগুলোর তরে যে দুঃখু হয়।"

"আহা,—ছেলেদের দিকে টান আপনার হবে না ত কার হবে?"

"হবে না!—ওরা না জন্মালে কি হাইকোর্ট থাকতো, না হরিণবাড়ী থাকতো, না আমরা থাকতুম—। আহা, বেঁচে থাকুক;—সংখ্যাটা এগার বল্লে না—! বাঃ, এইবার শাঁসমলের মাসকলটায় নজর রাখতেও যেও। খোসামলে দাঁড়াতে দেরী নেবে ত। ইস্, বেলা গেল যে। ধর ত উঠি। চলো, বারান্দায় গিয়ে বসা যাক। পাটের মহাজন বুঝি? গাঁঠ খুলতে হবে, খোলা হাওয়া দরকার।"

*   *   *   *

দরওয়ান চতুরী সিংয়ের ছ' বছরের ছেলে মথুরা বারান্দায় তার ছাগলছানাটির সঙ্গে আনন্দে ছুটোছুটি করছিল।

তারিণী সামন্ত—"এই—ক্যা করছিস্" বলায় সে চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চাতে মুক্তকচ্ছ কতলু খাঁর মত ভাদুড়ী মশাই ছিলেন, সেটা সে দেখতে পায় নি। ছাগলছানাটাকে কোলে তুলে পালাবে, এমন সময় সহসা ভাদুড়ী মশাই একটি বিরাট হাঁচি ছাড়ায় বারান্দাটা কেঁপে উঠল। কতকগুলো চামচিকে তীরবেগে বেরিয়ে পালাতে গিয়ে মথুরার মাথায় গচ্চা মেরে গেল। বালক ভয়ে "আরে বাপ্পা রে" ব'লে লাফ্ মারতেই ছাগল সমেত প'ড়ে চোট খেয়ে ছুট দিলে; ছাগলটা চীৎকার ক'রে উঠল।

বারান্দার এক প্রান্তের একটা ছোট কুঠুরী থেকে এক পায় চটি আচার্য্য মশাই কাপড় সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে পড়লেন।

"ব্যাপার কি?"

ভাদুড়ী মশাই বেশ সহজ সহাস্যভাবেই বললেন—"সারাদিন কি একা প'ড়ে থাকা যায়, বেরিয়ে বারান্দায় একটু বসতে এলুম।"

"এতেই এই খণ্ডপ্রলয়" ব'লে আচার্য্য হাসলেন।

"কৈ, আপনি যাননি,—ত জানলে ত কাটতো বেশ। ঐ দেখুন না—সামন্ত আবার কাকে জুটিয়েছে; এখানেও সেই, দশ জনে আমাকে খেলে দেখছি।"

"সাধ্য কি—সে আশঙ্কা রাখবেন না,—দশবিশের—"

ভাদুড়ী মশাই সমজদার লোক, উপভোগের হাসি হেসে বললেন—"তা হ'লে অভয় দিচ্ছেন! হ্যাঁ, এঁরা ত অনেকক্ষণ গেছেন। সে কত দূর?"

"মোটরে মিনিট দশেকেরও কম।"

"তবে?"

"নবনী বাবু সঙ্গে আছেন কি না, তিনি ত তাড়া দেবেন না।"

"তাই নাকি,—তার মানে?"

আচার্য্য হেসে বললেন, "আপনারা লয়ের (Lawএর) লোক, জেরা করলে পারব কেন? সব কথার কি মানে থাকে? নবনী শিক্ষিত যুবক। সেখানে দুটি শিক্ষিতা এবং অপরিণীতা মেয়ে,—সম্ভ্রম রক্ষা ক'রে আসা চাই ত। আপনাদের নজর রাখতে হয়—কেস্ (case) না কাঁচে। নবনী আবার এঞ্জিনীয়ার, গড়নের দিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকবে ত!"

তারিণী কখন্ স'রে গেছে।

ভাদুড়ী মশাই অবাক্ বিস্ময়ে আচার্য্য মশায়ের কথা শুনছিলেন, বল্লেন, "কিছু বুঝলুম না ঠাকুর।"

"সহজ বলেই বুঝতে পারেন নি,—এটা ভদ্রতা রাখবার ভোগ,—তাঁদের অনুরোধ এড়িয়ে আসতে পাচ্ছেন না। সেটা ভালও দেখায় না,—প্রথম দিন কি না।"

"ওঃ—তা হলেই বা দেরী। তার জন্যে নয়। আমার ভাবনা নবনীর জন্যে। সে ইট, কাঠ আর লোহার আস্বাদ পেয়েছে, দুনিয়ায় তাদেরই চেনে। মোলায়েমের ধর্ম্মজ্ঞান আজও হয় নি, তার মিষ্টতায় না শিষ্টতার বাড়াবাড়ি ক'রে বসে। বলছিলে না, দুটি শিক্ষিতা কন্যা মজুত।"

"তাতে হয়েছে কি?"

"না, হবে আর কি, মোলায়েম বজ্রও সঙ্গে আছেন!"

"আপনি যখন এতদূর গিয়ে পড়েছেন, তখন আমিও না হয় একটা কথা বলি। সুবর্ণ বাবুর বড় মেয়ে—সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়া, যদি কোথাও না বাধে ত—"

"এমন না কি! কিন্তু সহোদরাটির ধনুকভাঙা পণ জানেন না ত। নবনীর নিজের রোজগার চল্লিশ হাজার আর মেয়ের বাপের কাছে নজরানা পাওনা দশ হাজার এই পঞ্চাশ হাজারের বনিয়াদের উপর তাঁর ভায়ের বিবাহের ভিৎ

থাড়া হবে। অর্থাৎ এখন সাত বছর নয়। আমি তাঁকে ভালমতেই চিনি—"

"রামঃ, মা'র এরূপ শুভ আর সমীচীন সঙ্কল্পের ওপর কথা কইতে নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের এরূপ সুবুদ্ধি এলে দেশের শ্রী ফিরতে ক'দিন লাগে! যে দেশে সব কাযের চেয়ে বিবাহ করাটাই সহজ, সে দেশের কথা ভেবে হতাশ হয়েছিলুম। আবার ঐ যে বললেন, 'আমি ওঁকে ভালমতেই চিনি' এমন কথা বড় বড় বিদ্যেসাগরও বলতে পারেন না, স্বয়ং বিষ্ণুও নন। ওঁরা মহামায়ার জাত, ও কথা বললে ওঁদের অপমান করা হয় বলেই আমার বিশ্বাস। ওঁদের এত থাট করবেন না। যা হোক, এই সব আশার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন।"

তারিণীকে আসতে দেখে আচার্য্য উঠে পড়লেন।

"চা খাবেন না?"

"সন্ধ্যা হুশটে চট ক'রে সেরেই আসছি।"

চ'লে গেলেন।

* * * *

চতুরীর ডেরায় আজ ভাববৈলক্ষণ্য। ছেলেটার হাতে ভিজে ন্যাকড়া জড়ান, হাঁটুতে রেড়ির তেলের পটী। ছাগলছানাটারও পায়ে আকন্দপাতা বাঁধা। চতুরীর পরিবার রামদেইয়ার বেজার-বেজার মুখ। চতুরী উদাসভাবে ব'সে।

অন্য দিনের মত আচার্য্য মশাই আজ আর সহাস আহ্বান পেলেন না, নিজেই কথা কইলেন,—"কি রে, আজ যে সব চুপচাপ,—মথুরার হাতে কি হ'ল—দেখ দেখি।"

মথুরা কাছে এসে হাত দেখিয়ে বললে—"টুট গিয়া।"

তিনি একটু ধুলো মন্ত্রপূত ক'রে তিনটি ফুঁ মেরে দিয়ে বললেন—"ব্যস, অচ্ছা হো যায়গা।"

রামদৈয়া রাগে ফুলছিল, বললে—"কাঁহা কে দৈত আয়া, লেড়কা কো মার ডালা, বকরীকে বাচ্চাকো পটক্ দিয়া"—ইত্যাদি;—অর্থাৎ এমন নোকরীতে কায নেই।

আচার্য্য মশাই বললেন, "আরে, না না—ছেলেকে কেউ মারধোর করেনি। ছেলেমানুষ ওঁদের দেখে ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে চোট খেয়েছে। ছেলেকে মারবে কেন, আমি নিজে দেখেছি।"

ছেলেটাকে পাঁচ জনে প'ড়ে আধমরা ক'রে ছেড়েছে শুনলে রামদৈয়া যে তৃপ্তিটা পেতো, আচার্য্য মশায়ের ও কথায় তা একটুও পেলে না।

চতুরী বোধ করি বুঝলে, সে বললে—মথুরা ওঁকে দেখলেই ভয়ে ছুটে ঘরে এসে লুকোয়, তা আমি জানি। জন্মে পর্য্যন্ত "তয়েসা মুরত" আর কারুর দেখেনি। ওর আর আগেকার মত খেলা-ধূলো নেই, আনন্দ নেই, ফুর্ত্তি নেই, সে চেহারা নেই, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চায়। এখানে থাকলে ও বাঁচবে না।

আচার্য্য অভয় দিয়ে বললেন—"ভেব না চতুরী—বাবু আর বড় জোর দশ পনের দিন থাকবেন। ওঁরা কি বেশী দিন কোথাও থাকতে পারেন—দিন তিন হাজার টাকা কামাই।"

"অ্যাঁ, তিন হাজার!—দারোগা হোঙ্গে!"

স্ত্রী-পুরুষের মনের হাওয়া যেন হুস্ ক'রে বদলে গেল। চতুরী স্বীকার করলে—"মথুরা শালা আস্‌লি শয়তান হ্যায়। হামারি জান্ খানে আয়া। বাচ্চা হ্যায়, আপনি ওকে মাপ দিলিয়ে দেবেন।"

আচার্য্য মশাই বললেন, "ওঁরা ছেলেদের কোনও দোষ নেন না, বড় ভালবাসেন,—নিজেদের ছেলে নেই কি না।"

"অ্যাঁ—লেড়কা নেই! আউর দুনিয়াকা জেতনা চোট্টা ভুট্টা থাকে মরণেকে লিয়ে এই দরিদ্দিরকে ঘরমে ঘুস্‌তা হ্যায়!"

আচার্য্য দু'চার কথায় তাদের তবিয়ৎ খুশ্ ক'রে মুখে হাসি এনে দিলেন।

ভাং প্রস্তুতই ছিল, চতুরী সভক্তি লোটাটি এনে সম্প্রদান করলে। আচার্য্য চক্ষু বুজে—কপালে একটি ফোঁটা টেনে "জয় ঝাড়খণ্ডীবাজ" ব'লে চড়িয়ে ফেললেন।

"বড় বঢ়িয়া বানিয়েছ মিশির জী! বদনে গেল যেন বেদানার রস।" এই ব'লে তারিফ ক'রে—চায়ের চাবুক চালাতে চললেন।

এটি তাঁর নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যা হুশ। তবে কোন কোন দিন তারিণীকে নিয়ে জঙ্গলের সেই সাধনক্ষেত্রেও গিয়ে পড়েন। তান্ত্রিক পূজারী খুবই খবর নেয়। সে দিন হয় তাঁর— Mail day) মেল্-ডে।

[ক্রমশঃ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদার্থের অবস্থান্তর

কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই অবস্থাত্রয়ের সীমার মধ্যে যাবতীয় পদার্থকে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত 'ইলেকট্রন' নামক যে অবস্থায় সমগ্র পদার্থকে এক হইতে দেখা যায়—তাহা হইল সমগ্র পদার্থের চরম অবস্থা। ইলেকট্রনবাদ হইতেছে আধুনিক বিজ্ঞানের কথা। এ বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। এই তিন অবস্থাকে ছাড়াইয়াও আজকাল যে ভৌতিক অবস্থার কথা শুনা যায়, তাহার প্রমাণও নাকি ফোটোগ্রাফের কাচের প্লেটে ধরা পড়িয়াছে। অর্থাৎ আজকাল ভূতের ছবিও উঠানো হইয়া গিয়াছে এবং তাহা লইয়া পাশ্চাত্যদেশে কম আন্দোলন চলিতেছে না। যাহা হউক্, আমরা যখন ভৌতিক অবস্থা ছাড়িয়া অবশিষ্ট তিনটি অবস্থার মধ্যেই বর্ত্তমানে বাঁচিয়া আছি ও বাঁচিয়া থাকিবার আশা রাখি, তখন ভৌতিকটাকে বাদ দিয়াই আলোচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা সংক্ষেপে এই তিন অবস্থার কথা আলোচনা করিব।

উত্তাপ বা Heat দিয়া বা উত্তাপ কাড়িয়া লইয়া আমরা যে কোনও পদার্থকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারি। বরফ কঠিন, জল তরল। ফুটন্ত জলের উপর হইতে যে বাষ্প উঠে, তাহা হইতেছে বায়বীয় পদার্থ। একই পদার্থ হইতে উত্তাপ-ভেদে পদার্থের এই আকার ও প্রকারভেদ কিরূপে সংঘটিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, একমাত্র অণুর গতিবেগের (velocity) তারতম্যের জন্যই পদার্থের এই অবস্থান্তর সম্ভবপর হইতে পারে। ইংরাজীতে যাহাকে Molecule বলে, তাহার বাঙ্গালা নাম হইতেছে অণু। ইংরাজীতে যাহাকে Atom কহে, তাহার বাঙ্গালা নাম পরমাণু। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, জগতের সমস্ত জিনিষ এই অণু লইয়া প্রস্তুত। অণুকে যদি কাঁকরের সহিত তুলনা করা যায় ত পরমাণু বালুকণার সহিত তুলনীয়। একটা মুটরের ভিতর যেমন দুইখানা ভাঙ্গা মটর দেখা যায়, তেমনই ঐ [illegible] অণুর মধ্যে হয় ত দুই বা ততোধিক পরমাণু পাওয়া যাইতে পারে। এই অণু এত ছোট যে, চোখে বা অণুবীক্ষণে ধরা যায় না, সুতরাং অণু হইতেছে একটা নিছক্ কাল্পনিক জিনিষ। অণুকে রাসায়নিকগণ যখন [illegible]গারে বসিয়া অ্যাসিড-যোগে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন, তখনই আমরা অণু হইতে পরমাণু নামক একটা কাল্পনিক সূক্ষ্ম জিনিষের নাম পাই। সুতরাং পরমাণুও চোখে বা অণুবীক্ষণে দেখা যায় না। এই প্রবন্ধে আমরা পরমাণু বা atomকে বাদ দিয়া 'অণু' বা Molecule-এর খেলাই দেখিব। সুতরাং 'পরমাণুর' কথা এখন না ধরাই ভাল।

'হাইড্রোজেন্' নামক গ্যাসের অণুর কথা ধরা যাউক্। ইহার অণুর মধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রেই দুইটা পরমাণু দ্বিদল-বীজের মত লুকাইয়া থাকে। তাই হাইড্রোজেন্‌কে বলা হয় দ্বি-পরমাণুময় অণু। এই রকম দ্বি-পরমাণু-পরিমাণ অণু লইয়া কত গ্যাস যে পৃথিবীতে আছে, তার ইয়ত্তা নাই। অক্সিজেন্, ক্লোরিন্, ব্রোমিন্ প্রভৃতির গ্যাসের এক একটা অণুর মধ্যে দুইটা পরমাণু রহিয়াছে। কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থাভেদে ঐ অণুর বিশেষত্ব সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষালব্ধ সত্য। ইহাও বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষালব্ধ সত্য যে, সব জিনিষেরই (তাহা ইট, কাঠ, হীরা, তামা, মণি-মাণিক্য আর রত্নই হোক্) তিন অবস্থার অস্তিত্ব একমাত্র তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অণু লইয়া সম্ভবপর হয়। তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এই তিন অবস্থার প্রত্যেকটিতেই অণুগুলি কদাপি স্থির নাই। প্রতিনিয়ত প্রতি পদার্থের অণুই প্রতি অবস্থাতেই প্রবলবেগে কম্পিত হইতেছে। এই কম্পন এস্‌রাজের তারের কাঁপুনির মত একবার এক পার্শ্বে ও একবার অপর পার্শ্বে হয় বলিয়া অণুগুলি নিজ নিজ স্থান পরিবর্ত্তন করে না। বেহালার তার যেমন স্বীয় তন্তুপথের উভয় পার্শ্বে ঘন ঘন কম্পিত হইয়াও নিজের স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় না, অণুরাশিও তদ্রূপ নিজ নিজ অবস্থিতির উভয় পার্শ্বে প্রবল গতিতে কম্পিত হইয়াও স্থানভ্রষ্ট হয় না। কঠিন আকারে থাকিয়াও সেই জন্য অণুরাশি প্রবলবেগে কম্পিত হইতে পারিতেছে।

অণুগুলির এই কম্পনের মাত্রাধিক্যের তারতম্যের জন্যই পদার্থ কঠিন হইতে তরল ও তরল হইতে বাষ্পাবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। এক খণ্ড হীরককে উত্তাপ দাও,—হীরকের অণুরাশির কম্পন বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। এই কম্পনবৃদ্ধি হেতু অণুরাশির মধ্যে যে আণবিক শক্তি আছে, তাহা কমিয়া যায়; সুতরাং পূর্ব্বের তুলনায় তাহাদের মধ্যবর্ত্তী বিচ্ছিন্ন অংশগুলির বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাধারণ উত্তাপে হীরকের অণুগুলি

যে বিচ্ছেদ রাখিয়া অবস্থান করিতেছিল, উত্তাপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ বড় হইয়া অণুগুলিকে ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া সাজাইয়া দেয়। এই কারণেই হীরকখণ্ড উত্তাপ পাইলে আকারেও বড় হইয়া পড়ে। কেবল হীরক নহে, জগতের কঠিন পদার্থমাত্রেরই ধর্ম্ম এই যে, উত্তাপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অণুরাশি—দূর-অবসরে চট্‌পট্ সজ্জিত হইয়া পদার্থটাকে আকারে বড় করিয়া তুলে।

হীরকখণ্ডকে প্রবল উত্তাপ দিয়া যখন নিঃশেষে গলাইয়া ফেলা যায়, তখন তাহার অণুরাশির কম্পনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। অর্থাৎ কঠিন পদার্থের অণুসমূহ যদি 'সা' সুরে কাঁপিতে থাকে, তবে তরল পদার্থের অণুসমূহ একবারে 'মা' সুরে আসিয়া ঠেকে। তাই তরল অবস্থায় অণুরাশি পরস্পরের আকর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যেন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, এবং আর একটু উত্তাপ পাইলেই যেন তাহারা খাঁচা ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। এই 'মা' সুরের কাঁপা তরল অবস্থার অণুরাশি, আমাদের দৃষ্টিতে বাস্তবিকই দয়ার পাত্র। প্রকৃতপক্ষে হয়ও তাই—নদী-পুষ্করিণীর জল যখন রৌদ্রে আপনা হইতে নিঃশেষে শুকাইয়া যায়, তখন একমাত্র তাহার অণুরাশির কম্পনকে দোষী করা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন যুক্তিসঙ্গত পথ থাকে না।

তাহার পর বায়বীয় অবস্থায় আসিয়া পড়িলে ত কথাই নাই। অণুসমূহের কম্পনের মাত্রা আরও চড়িয়া যায়। তখন তাহারা একেবারে 'নি' সুরকেও ছাড়াইয়া চলে। তখন আর অণুরাশির মধ্যে আণবিক আকর্ষণ বলিয়া যে একটা পদার্থ থাকে, সেটা এককালীন লোপ পাইয়া যায়। সুতরাং এই 'নি'এর চড়া সুরে বাঁধা বাষ্পরাশির অণুর রণন মুক্তপিঞ্জর পারাবতদলের ন্যায় আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং বাষ্পকে ধরিতে হইলে রীতিমত কঠিন আধারের প্রয়োজন হয়। হয় তাহাকে লোহার পাত্রে আবদ্ধ কর, আর না হয় তাহাকে বেলুনে পুরিয়া ছাড়িয়া দাও, আকাশে উড়িয়া চলিবে। সুতরাং বাষ্পকে আবদ্ধ করা কম কথা নহে। কারণ, বাষ্পের অণুসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে কাঁপিয়া থাকে। আমরা উপমাচ্ছলেই "নি" সুরের কথা উল্লেখ করিলাম। বাষ্পের অণুসমূহ যে ঠিক্ 'নি' সুরেই কাঁপে, তাহা বলা যায় না।

তাহার পর ইলেক্‌ট্রন্‌বাজের কথাও একটু বলা যাউক। ইলেক্‌ট্রনে অণুসমূহ "নি" সুর ছাড়াইয়াও কাঁপিতে থাকে। "নি"র অপেক্ষা চড়া আর সুর নাই। সুতরাং ইলেক্‌ট্রন্ অদৃশ্য শক্তিতে কম্পমান। তখন অণুরা আর অণু থাকে না, পরমাণুতে ভাগ হইয়া যায় এবং তার পর পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মতম অংশ "ইলেক্‌ট্রনে" বিভক্ত হইয়া পড়ে। "ইলেক্‌ট্রন" বিষয়ে ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে।

ঈথারে যেমন কাঁপুনির দোলার কম-বেশীর জন্য লাল, গোলাপী, হলদে, সবুজ, আস্‌মানী প্রভৃতি সাতটি বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমস্থিত পদার্থের অণুর কাঁপুনির মাত্রার কম-বেশীর জন্যই পদার্থের রূপ বদল হইয়া কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে পদার্থের অণুরাশির কম্পন ও ঈথারের আলোকপ্রদ কম্পন সম্পূর্ণ পৃথক্,—প্রথমটি তন্তু-যন্ত্রের তন্তু-কম্পনের সহিত তুলনীয় এবং দ্বিতীয়টি নদীবক্ষে তরঙ্গাকারের সহিত তুলনীয়। ইহা দেখিয়া মনে হয়, যেন কোন গুণী পদার্থনিচয়ের অণুসমষ্টিকে এক মহান্ সুরে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই গুণীর হাতের স্পর্শেই অক্সিজেন্ বাষ্পের অণুসমূহ বরফের ঠাণ্ডায় ঘণ্টায় হাজার মাইল গতিতে কাঁপিতেছে। ঐ একই ক্ষেত্রে ইহা শব্দের গতির সহিত পা ফেলিয়া চল। এই অণুর কল্পনাও মানব-মস্তিষ্কে অসম্ভব মনে হয়। ইংরাজ রাসায়নিক ধীমান্ পণ্ডিত রাদারফোর্ড হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, একের পিঠে (২৪) টা শূন্য দিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহা দিয়া ছয়কে ভাগ করিবার পর যে অতি—অতিসূক্ষ্ম উত্তরটা কল্পনায় আসে, তত গ্রাম্ (Gms.) হইতেছে এক একটা হাইড্রোজেনের অণুর ওজন। এই কল্পনাতীত কল্পনা লইয়া আজ রাসায়নিকগণ প্রমত্ত। এই কল্পনাতীত কল্পনার সাহায্যে তাঁহারা আজ পারদের ন্যায় ইতর ধাতুকে সুবর্ণের ন্যায় উত্তম ধাতুতে পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন। অণুর যে কম্পনে বস্তুপিণ্ড ক্রমে তরল, তরল হইতে বাষ্প ও বাষ্প হইতে চরমতম অবস্থা ইলেক্‌ট্রনে নীত হয়, তাহা একবার ঈথারের কম্পনের স[illegible]ত তুলনা ক[illegible] যাউক। ইহা ঈথারের আলোকপ্রদ কম্পনে[illegible] ভাগের এক ভাগ মাত্র। অর্থাৎ অণুর [illegible] দুই ঘণ্টায় পৃথিবী হইতে সূর্য্যে পৌঁ[illegible] হইতে সূর্য্যের দূরত্ব হইতেছে, নয় কো[illegible] অর্থাৎ রেল কোম্পানীর ঘণ্টায় ত্রিশ ম[illegible]ন.

একটা এনজিন্‌কে যদি অহোরাত্র পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দিকে ছুটিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্যে পৌছাইতে এন্‌জিন্‌টির তিন শত পঞ্চাশ (৩৫০) বৎসর লাগে। অর্থাৎ আকবর যে সালে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেই সালে এন্‌জিন্‌টিকে ছাড়িলে, তাহা সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের বৎসরে সূর্য্যে পৌছিতে পারিত। এই দূরত্বটা অণুর গতি যখন মাত্র দুই ঘণ্টায় সারিয়া ফেলে, তখন ব্যাপারটা কল্পনার জিনিষ সন্দেহ নাই। নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দুই ঘণ্টায় এক একটা অণুর গতির পরিমাণ। ইহা কল্পনা নহে, এই প্রবল গতিই প্রত্যেক পদার্থের অণুরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। সার জে, জে, টমসন্-প্রমুখ ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই কল্পনাতীত কল্পনা আজ বৈজ্ঞানিকগণের অমোঘ অস্ত্র। এই কল্পনার শক্তি লইয়া তাঁহারা যে বিজয়যাত্রায় বাহির হইয়াছেন, তাহা আজ বিংশ শতাব্দীতে কতকটা সাফল্যের দিকে যেন ছুটিয়া চলিতেছে। আশা আছে, তাঁহারা যেমন পারদকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, তেমনই একদিন-না-একদিন তাঁহারা এই অণুরাশিকে মানবচক্ষুর গোচরীভূত করাইতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় (বি, এস-সি)।

শৈশব বরণ
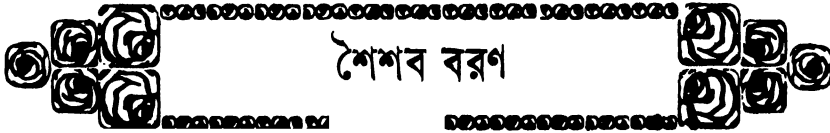
শিশুর মতন আজি পরাণ আমার
চাহে যেন নাচিবারে। সহসা আবার
পশ্চাতের পানে যেন ফিরে যেতে চায়
জীবনের স্রোতখানি !—যেন পুনরায়
মনে হয় একবার ছুটে যাই ওরে,
তরল আনন্দে ভাসি' চপল অন্তরে,
রাশি রাশি কলহাস্যে খল-খল করি'
চঞ্চল দু'বাহু দিয়া আঁকড়িয়া ধরি
সম্মুখে যাহারে পাই। উন্মুক্ত পরাণে
পুলকে নাচিয়া উঠি উৎফুল্ল নয়ানে,
চপল চরণলাস্যে, করতালি দিয়া
অর্থহীন কলরবে। পরাণ ঢালিয়া
একবার মিশে যাই অতি সহজেই
এই প্রভাতের বুকে। সাথী ক'রে নেই
এই আলো, এই বায়ু, এই ধূলিকণা,
প্রান্তরের পাখীদের এই অন্যমনা
গীতগুলি ! যে পুলকভরে
কচি কিশলয়গুলি মৃদু ঝরঝরে
উঠিছে কাঁপিয়া, হায়, যে সহজ সুখে
ফুলগুলি প্রাণ খুলি' চাহে উর্দ্ধমুখে,
এই তরুশাখাগুলি যে সোহাগভরে
নাচায়ে ফিরিছে বুকে পত্রে পত্রে করে
প্রভাতকিরণখানি,—সেই সরলতা,
সেই স্বপ্ন, সেই সুখ, সেই ব্যাকুলতা,
সে নির্ম্মল অন্তরের সে আনন্দখানি
ইচ্ছা করে একবার আহরিয়া আনি
আমার বুকের কাছে ! একবার আজি
উলঙ্গ উল্লাসে আমি অঙ্গে উঠি নাচি,'
একবার নগ্নমুখে মুঠা ভরি' তুলি'
এই স্নিগ্ধ ধরণীর স্নেহমাখা ধূলি
মাখি মোর সর্ব্বদেহে। চপল ইচ্ছায়
ছুটাছুটি ক'রে ফিরি, যখন যেথায়,
জড়াই পরাণ দিয়ে যারে খুশী তারে
শুধু এক নির্ব্বিচার স্নেহ-অধিকারে ॥

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা।

বাহার—খং।

তুমি জান না সুবল—(সুবল রে)
আমি কি আর তেমনি আছি হয়েছি পাগল
ক্ষণে ক্ষণে এমন হই, আমি যেন আমি নই—এমনি বিভোর
তবে যে এ দেহ দেখ সে মিছে কেবল।

কহিতে কহিতে বিনোদ হইল অবোধ।
নয়ন-জলে ভেসে গেল হলো কণ্ঠরোধ॥
প্রাণের সখা সুবল দেখে শ্যামের আকার।
সুবল কেঁদে অস্থির—তায় ধ'রে রাখা ভার।
কাঁদিতে কাঁদিতে সুবল শ্যামেরে বুঝায়।
কেঁদো না কেঁদো না ব'লে চোখের জল মুছায়।
শুন বংশীধারী হরি করি প্রণিপাত।
নিজদাস সুবল থাক্‌তে কেন কাঁদ নাথ।
শ্রীমতীর সন্নিধানে এখনি যাইব।
তার সনে তব প্রাণ এখনি মিলাব॥
আজ্ঞা কর রাখালরাজ দূর কর হেন লাজ।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি সাধিব সকল কাজ। ১॥

শ্রীকৃষ্ণ সুবলের এই কথা শুনিয়া কি কহিতেছেন—

মল্লার—আড়খেমটা।

যাবে বটে সুবল এই ভয় কেবল
অমৃত তুলিতে গরল বা উঠে।
নারীর মন রাখা, বিষম ওহে সখা, কি হ'তে কি হবে
পড়িবি সঙ্কটে।
করিতে যাইবি মম উপকার, কি কথা কহিবি একে হবে আর,
না হইতে প্রেম মিছে পরিশ্রম,
লাভে হ'তে প্রেমের আশা যাবে মিটে।
তোমারে জানালাম,—জানিলে রাধে প্রমাদ ঘটাবে এ প্রেম সাধে
মানিনী রমণী সে রাজনন্দিনী
প্রকাশে অমনি না জানি কি ঘটে। ১৮।

আমি যেন শিশুমতি অতি অল্প জ্ঞান।
ঐ কথায় বুঝিলাম সখা পীরিতের সন্ধান।
তোমার সঙ্গে ফিরি হরি! আজ কি নারীর কাছে ঠকবো।
ইঙ্গিতে ভাব বুঝে নিলাম এ আবার কি শিখ্‌বো॥
আগে মন বুঝতে তার, অনুগত হবো।
তোমার ভালবাসা শেষে সকল কথা কবো।
ওহে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
তাই বলি ভাই কানাই! করো না সংশয়।
মৌন হ'লেন শুনি সুবলের বচন।
মৌনভাবে বুঝে শ্যামের সম্মতি-লক্ষণ।
তখন চঞ্চল-চরণে চলে চতুরের চেলা।
নগর ফিরিছে করি বৎসচুরীর ছলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাজধানী-সন্নিধান।
উপস্থিত হয়ে সুবল হ'ল হতজ্ঞান।

তখন সুবল কি প্রকার দেখিতেছেন—

দেখে চৌদিকে বেষ্টিত গড় পাহাড় সমান পাড়
(দেখে) গড় করে যত রিপুগণ।
এ গড় দেখিয়ে শির নত করে যত বীর
ভয়েতে অস্থির হয় প্রাণ॥
ইহার ভিতর এলে পরে লঙ্ঘিতে পারে না পরে
ভানু পারে ভানু নাম ধ'রে।
গভীর পরিখা যার লঙ্ঘন করিতে তার
কেমনে যাইব অন্তঃপুরে॥
যারে এমনি আঁটা-আঁটি তল্লাসি নেয় বাঁটি বাঁটি
মাছিটি না পারে এড়াইতে।
এর পর অন্তঃপুরে হাজার খোজার ডরে
বায়ু নাহি পারে সঞ্চালিতে॥
তখন সুধু নয় সুবল সে যে কথায় সুবল
যার সনে সে কথা কয় তার মন করে চঞ্চল।

কৃষ্ণ অনুরূপ কিবা নটবর বেশ।
পরা ধড়া বাঁধা চূড়া শিরে চাঁচর কেশ॥
অলকা-তিলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল।
প্রবল প্রদীপ্ত তাহে মকরকুণ্ডল।
কৃষ্ণনামাঙ্কিত দেহ—নাসায় তিলক।
এ বালক দেখিলে চক্ষে না পড়ে পলক।
একে বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণ ভালবাসে।
এ বেশে প্রবেশে তারে সকলে জিজ্ঞাসে॥
এ সময়ে গোষ্ঠ হ'তে কেন সুবল এসেছ।
ভ্রমিয়া বেড়াও কেন কিবা কাজে ফিরিছ।
এ প্রশ্ন শুনিয়া অমনি আঁখি ছল ছল।
সখারে পড়িল মনে পরাণ চঞ্চল।
সে কথা চাপিয়ে ছলে বলে এই দায়।
বৎস একটি হারায়েছে পাওয়া নাহি যায়।
ঘাটে মাঠে খুঁজে তার পেলাম না সন্ধান।
কার বাটী—কার পালে মিশে—করেছে প্রস্থান।
অবশেষে এ নগরে ঘরে ঘরে খুঁজলাম।
পেলেম না কোথাও—বুঝি এবার প্রাণে মজলাম।
সম্প্রতি নৃপতি-বাটী অনেক বাঁধা গাই।
হুজুরের হুকুম হ'লে—তথায় খুঁজে যাই।

তখন সুবল রাজবাটীর অন্তঃপুরে বৎস অনুসন্ধান [illegible]
আদেশ পাইয়া প্রবেশ করায় শ্রীমতীর সহিত [illegible]ৎ হইলে—
শ্রীমতী উৎকণ্ঠা সহকারে সুবলকে শ্যামের [illegible]
করায় সুবল কি পরিচয় দিতেছেন, শুনুন—

ঝিঁঝিট—তিওট।

আর কি সুধিয়া সুমঙ্গল, [illegible]
সাধে কি রাধে করি গো রোদ[illegible]
বনে মাধব আজ ধূলায় ধূসর অচে[illegible]

মলিন সে বিধুমুখ দেখে বিদরে বুক
আমাদের তার সুখে সুখ দুখে দুখ
বুঝি আজ হ'তে হলো প্রেমের সমাপন ॥
ত্যজে রাখালি মূর্চ্ছিত রাখালরাজ উলঙ্গ অঙ্গে
নাহি কথায় আর সে সব কাজ
বুঝি হারাই, রাই ! প্রাণের ধন সেই কৃষ্ণধন ॥

কি ক্ষণে হেরিয়ে হরির প্রাণ হ'রে নিলে ।
সাধের কালাচাঁদ রাধে বিবাদে ডুবালে ॥
বনমালী গোষ্ঠকেলি নাহি করে আর ।
রাখালের অস্নেহ মোহ ক্ষণে শতবার ॥
প্রেমাগ্নিতে মগ্ন হয়ে—ভগ্ন হলো বোধ ।
মানে না সান্ত্বনা মানা শুনে না অনুরোধ ॥
এরূপ আকার তার হইল যখন ।
আপনি অনুমান করে মরণ-লক্ষণ ॥
বনে মরি তাই সখে ! নাহি খেদ মনে ।
যার লেগে প্রাণ যায় সে যে কিছুই নাহি জানে ॥
মরণ তো বিলম্ব সয় না যে জানিয়ে আসি তায় ।
কি জন্যে মলেম এটি জানাতে রাধায় ॥
এ ভেবে বনমালী ভাবিছেন তখন ।
শ্রীমতীর স্বরূপরূপ করিব গঠন ॥
কোকনদে প্রপদ গড়ে পদে পদ্ম দিয়া ।
চম্পকের কলিতে তব অঙ্গুলি নিরমিয়া ॥
মল্লিকা-পাপড়ী ছিঁড়ে নখের বিধান ।
চম্পককোরকে গড়ে তব উরুস্থান ॥
কটি আঁটিবার তরে না পাইল ফুল ।
দেখে শেষ মধ্যদেশ শূন্য সমতুল ॥
ফুলের স্তবকে করে কুচের আকার ।
কান্ত কিন্তু গড়িল হৃদয় পাষাণে তোমার ॥
আবার মৃণালেতে ভুজলতা পদ্মকরে কর ।
জবাদল দলন ক'রে করে ওষ্ঠাধর ।
কুন্দেতে গড়িল দন্ত নাসা তিল-ফুলে ।
ইন্দীবরে আঁখি করে, আঁখি রইল ভুলে ।
আর যত ভাল ভাল ফুল ছিল ব্রজে ।
তাহাতে গড়িল অঙ্গ যে অঙ্গে যা সাজে ।

যদিও আমি কুলবালা তথাপি ভজিব কালা
কৃষ্ণবিরহেরই জ্বালা সহ্য করা ভার ।
কৃষ্ণ উদয় হ'লে মনে বাসনা যাইতে বনে
কি হবে আর ধন-জনে সংসার অসার ॥
কুলে জল[illegible]ল দিয়ে যৌবনের ডালি ল'য়ে
বনমালী এখনি ভজিব ।
[illegible] হয়ে কৃষ্ণেরে হৃদয়ে ল'য়ে
[illegible]-দেশান্তরে আমি যাব ।
[illegible] রহি যদি কুল রাখিতে যাই
[illegible]'লে হারাই শ্যামরায় ।
[illegible]গৃহে রব এখনি নিকুঞ্জে যাব
এড়াইব গুরুজনার ভয় ।

রমণীর বুদ্ধি যত পুরুষের কি আছে তত
সুবলেরে বলেন রাই ফিকির ।
মম বেশ তুমি লও রাখাল-বেশ আমাকে দেও
এইরূপে ফাঁকি দেওয়াই স্থির ।
রমণীর শিরোমণি প্রেমের দায়ে কমলিনী
রাখাল-বেশ ধরেন চমৎকার ।
উচ্চকুচ লুকাইতে বৎস ধরেন হৃদয়েতে
চিরপরিচিতের চেনা ভার ॥

বৃন্দা শ্রীমতীকে রাজপথে এই নববেশে দেখিয়া কিরূপ তিরস্কার করিতেছেন—

এ কি দেখি ভাব নূতন তোমার রাধে এত গুণ
দেখে শুনে অবাক্ হলেম আমি ।
এ কি দেখি বিপরীত ত্যজেছ নিজ সুহৃদ্
পিরীতভাবে মগ্ন হ'লে তুমি ।
ব্রজে তুমি ছিলে মাজে সকলের কাছে ধজে
কেন এমন অন্তভাব হ'ল ।
হইয়ে রাজার কন্যে কাননে কিসের জন্যে
কি লাগিয়ে এমন হলো বল ।

এই বলিয়া বৃন্দা কি বলিতেছেন—

সুরট-মল্লার—ঠেকা ও তাল-ফেরতা ।

কি দুখে এমন দুখী আঁখি ছল ছল ।
মণিহারা ফণীর মত ভ্রমিছ হ'য়ে চঞ্চল ॥
ত্যজিয়া রমণীসজ্জা, এ কি লজ্জা—রাখালবেশ
নীলাম্বর সাড়ী ছাড়ি ধড়ায় সেজেছ বেশ ।
এ কোন্ রীতি কুলবতী বনে বনে কি উদ্দেশ ?
কুলে যে কলঙ্ক হবে নাহি তার ভয়-লেশ
রাজার কন্যা মান্যা হয়ে এই কি হ'ল অবশেষ ?
যে-না সে-না দোষে রাই—কেন এমন হ'ল বল ।

এই ব্রজেতে তোমার মত গরবিণী নাই ।
সকলে তো শ্যামকে ভজে শুধু কলঙ্কিনী রাই ।
এ মন্ত্রণা বল রাই কে দিল তোমায় ।
জটিলে কুটিলে শুনলে ব্রজে থাকা দায় ।
বড়াই বড়াই ক'রে গোকুলে রটাবে ।
এ সব শুনিলে জ্বালায় অঙ্গ জ'লে যাবে ।
বুঝিলিনে রাই মজলি কিন্তু ভজলি বংশীধারী ।
আয়ান নয়ানে দেখলে বয়ান করবে ভারী ।
শান্ত হও ক্ষান্ত দাও ভ্রান্ত কেন এত ।
নন্দের নন্দন লাগি এত উৎকণ্ঠিত ।
শ্যামকে প্রেমে বাঁধতে গেলে কষ্টে পড়বে রাই ।
(লোকে) দেখলে তায় ঘটবে দায় আমরা বলি তাই ।

আর রাই এ কি তোমার বিপরীত ভাব—এই বলিয়া বলিতেছেন—

এ কি ধনি ! বিনোদিনী দেখালি নূতন ।
ভাল ভাল—ভালবাসায় হয়েছ নিপুণ ।
সরোবরের আগুসার—পিপাসার কারণ ।
ভ্রমরের অন্বেষণে পদ্মিনীর গমন ।

চাতক লাগিয়া মেঘের উৎকণ্ঠিত মন।
যাচকেরে যেচে বেড়ায়—অমূল্য রতন।
চকোরেরে সুধা দিতে ভূমে নাম্‌ল চাঁদ।
নদীর নিকটে যেতে সমুদ্রের সাধ।
লৌহ-সন্নিধানে ধায় অয়স্কান্ত মণি।
নারী যায় পুরুষের কাছে—তেমনি বাখানি।

ছি ছি রাই, স্ত্রীলোকের যে গৌরব, তা তোমা হ'তেই আজ নষ্ট হ'ল,—কেন বলি শুন—

আমরা ডাগর ক'রে কইলে কথা দেমাকেতে থাকি।
কারু পানে চাইনে কেবল আপনি আপনায় দেখি।
অনিমিখে বুকে আঁখি রাখি দিবানিশি।
মদগর্ব্বে খর্ব্ব দেখি পদ্মিনী কি শশী।
যখন ঠমকে ঠমকে চলি ঠ্যাকরা-জ্যাকরা ক'রে।
যৌবনের আতসে কত ড্যাকরা জ'লে মরে।
খটাসপানা চেয়ে থাকে—আমি ত না চাই।
চাইলে তারে মদনের বাণে—অমনি জ্বালাই।

রঙ্গে ভঙ্গে কোন কথা কব সঙ্গে যার।
আমার আশায় ব'সে রইবে শিকড় নাম্‌বে তার।
পিরীতে কটাক্ষ একবার লক্ষ্য করি যারে।
কলুর ঘানির গরুর মত সেটা ঘুরে ঘুরে মরে।
কথা কইলাম তো ভ্যাড়া কল্লেম রাখলাম নিজ ক'রে।
গরুড় হইয়া থাকে সে তো—মরতে বল্লে মরে।

বৃন্দা এরূপ ব্যঙ্গ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যে কি বস্তু, শ্রীমতী তাহা বৃন্দাকে বুঝাইতেছেন—

দূতীর কথা শুনি প্যারী কহিছেন তখন।
আমার শ্যাম কি বৃন্দে যেমন তেমন।

খট—যৎ।

জান না শ্যামেরে সখি! শ্যাম ত সামান্য নয়।
যোগিজনে সেই জনে ধেয়ানে নাহিক পায়॥
ব্রহ্মা যারে নারেন চিন্‌তে—শিব জ্ঞান হারায়।
শিরোমণি জনে ভণে কাজ কি সে সব কথা শুনে
রাধে গিয়ে কুঞ্জবনে ভজে শ্যামরায়॥ ২২।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ (এম, এ—সঙ্কলিত)।

পরলোকে তুলসীদাস

গত ১৩ই পৌষ রায় সাহেব তুলসীদাস কুমার তাঁহার ভবানীপুরের বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সাধুপথে থাকিয়া একনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া কর্ম্মজগতে সাধনার পথে অগ্রসর হইলে লোক বিজয়-লক্ষ্মী কিরূপে করায়ত্ত করিতে পারে, তুলসী বাবু তাঁহার জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

১২৭৯ সালে বর্দ্ধমান জিলার সুলতানপুর গ্রামে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লৌহব্যবসায় তাঁহার ইহলৌকিক উন্নতির প্রধান সোপান। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। ব্যবসায়ে সাধুতা, অধ্যবসায় ও উদ্যমের গুণে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি দরিদ্র ও অভাব-গ্রস্তের বেদনা বুঝিতেন এবং তাহাদের দুরবস্থা-মোচনে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতেন। তাঁহার সদনুষ্ঠানের মধ্যে "বিন্ধ্যবাসিনী (তাঁহার জননী) অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়", "সুলতানপুর অখিলচন্দ্র (পিতা) দাতব্য ঔষধালয়", কালনায় যাইবার জন্য সুপ্রশস্ত পথ ও সেতু, "রামসুন্দরী (পত্নী) হাঁসপাতাল", গ্রামের পাকা বাজার, অন্নপূর্ণাবাড়ীর অন্নসত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত দরিদ্র নরনারীকে বস্ত্র বিতরণ, দরিদ্রছাত্রগণকে মাসিক অর্থ-সাহায্যদান, অবীরা অসহায়া নারীগণকে মাসিক বৃত্তিদান প্রভৃতি তাঁহার দানবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিত।

সু[illegible]নপুর [illegible]নিয়ন বো[illegible] প্রেসিডেন্[illegible] [illegible] [illegible] এমন লোকের অভাবে সুলতানপুর [illegible] হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হাতে করিয়া মানুষ-করা ছোট ভাইটিকে যে দিন অমূল্যকুমার সহসা পৃথক্ করিয়া দিলেন, সে দিন পাড়ার সকলেই একবাক্যে বলাবলি করিতে লাগিল যে, 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' এ মহাজন-বাক্যের অনুসরণ না করিয়া অমূল্যকুমার এত দিন যে মূর্খতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। এইবার নিশ্চিন্তমনে পাড়ার আর পাঁচ জনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া—তাহাদের সমতালে পা ফেলিয়া চলিতে তাহাকে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

অমূল্যকুমার সহসা আপন বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কারে ও এই সব পরম মুখরোচক বাক্যধারায় অভিষিক্ত হইয়াও কিন্তু উৎফুল্ল হইতে পারিল না এবং কতখানি অন্তর্নিহিত গূঢ় বেদনা যে তাহাকে অনন্যোপায় হইয়া এ পথের পথিক করিয়াছিল, তাহা তাহার অন্তর্য্যামীকে জানাইয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

পত্নী মোক্ষদা ঠাকুরাণী নূতন গৃহস্থালীর গোছ-গাছ করিতে করিতে সহসা কর্ত্তার এই ম্লান-গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "শোক যে উথলে উঠছে! এত যদি প্রাণের টান ত এ সব করতে গেলে কেন? আমি ত কারও কাণে ইষ্টিমন্তর দিয়ে—"

কারণটা বোধ হয় অমূল্যর অজানা ছিল না—তাই সে শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "তোমার দোষ কি? সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।"

[illegible]ক্ষদা [illegible] নাড়িয়া বলিল,—"তা ত ভালই। রাত-[illegible] খিটিমিটি [illegible] হাড়ের লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। এ, জোটে [illegible] তেমনই [illegible] জোটে, উপোস ক'রে প'ড়ে থাকবো।"

[illegible] পরমাণু পাওয়া [illegible]টা কাহার অধিক, সে কথা মনে [illegible] চোখে বা অণুবীক্ষণে [illegible] অমূল্যর বুক ঠেলিয়া বাহিরে [illegible] নেহক্ কাল্পনিক [illegible] সেটাকে চাপিয়া সে হুঙ্কার দিয়া [illegible]গারে ব[illegible] না!—"

যে কারণটুকুকে আশ্রয় করিয়া এত বড় বিরোধের প্রাচীর মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহা অতি সামান্যই।—সেই চিরন্তন উপার্জ্জনের খুঁটিনাটি, কম-বেশীর তর্ক-বিতর্ক। তর্কের প্রাবল্যে কলহ—আর কলহের শেষ ফল এই নির্ব্বিঘ্ন শান্তি!

উপার্জ্জনটা অমূল্যরই ছিল বেশী। গুটিকতক পুত্রকন্যা থাকিলেও সে উপার্জ্জনে স্বচ্ছন্দ-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহাতে পত্নীর প্রকোষ্ঠ ও কণ্ঠ সুদৃশ্য স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইতে পারিত এবং দশ জনের এক জন হইয়া সে-ও স্বামীর গৌরবটাকে সাধারণের দ্বারে দ্বারে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু অনাবশ্যক অন্তরায়স্বরূপ ঐ স্বল্প উপার্জ্জনক্ষম দেবর ও তাহার স্ত্রী-কন্যা এত দিন তাহার সেই বাসনার মূলে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া পরম নিশ্চিন্তে বাবুগিরি করিয়া দিনপাত করিতেছিল। আজ সে বাধা দূর হইতেই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া মোক্ষদাসুন্দরী মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

বেড়ার পাশ হইতে মোক্ষদাসুন্দরী উঁকি দিয়া দেখিল, অপর পক্ষের রন্ধনের কোন উদ্যোগই নাই।—হৃষ্ট-মনে ছোট-বধূকে ডাকিয়া বলিল,—"বলি ঘরদোর গোছানো হ'লো? রান্নার উদ্যুগ নেই যে!—"

ছোটবধূ বড়জায়ের তাম্বুলরাগরক্ত প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া উত্তর দিল, "কাল থেকে ওঁর অসুখ—কি যে করি, দিদি!—"

দিদি তাড়াতাড়ি মুখ সরাইয়া বলিল, "ডাক্তার ডাক।"

বলিয়া পাছে সাহায্যের জন্য কোন নূতন অনুরোধ আসে, এই ভয়ে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

ছোটবধূ উত্তর দিল, "বড়দি।—জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেন খাওয়া-দাওয়া হয়নি ?"

"হুঁ" বলিয়া প্রফুল্ল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছোটবৌ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা ভেবে কি করবে বল, বরাত ছাড়া পথ নেই। কাল থেকে কিছু খাওনি—ছুটি চাপিয়ে দি—"

প্রফুল্ল কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।—পরে কোঁচার খুঁটে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "আমি ভাবছি অমিয়া,—দাদা আমার মুখের দিকে চাইলেন না।" বলিতে বলিতে তাহার গণ্ড অশ্রুসিক্ত হইল।

ছোটবৌও মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

প্রায় দশ মিনিট এইরূপ নিঃশব্দ রোদনের মধ্য দিয়া কাটিবার পর প্রফুল্ল বলিল, "মাইনে ত মোটে ২৫টি টাকা! কচি মেয়েটার দুধ,—ছুটি লোকের খাওয়া—কোত্থেকে কি হবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

ছোটবৌ আশ্বাস দিয়া বলিল, "ওতেই আমি চালিয়ে নেব'-খন। সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিল, "সে তুমিই জান। আমি ত অকূল পাথার দেখছি।"

তাহার পর দিনও চলিতে লাগিল—দুঃখও অনেকটা সহিয়া গেল। যাহার হাতে দিন চালাইবার ভার—সে এক বেলা খাইয়া—সংসারে গতর জল করিয়া খাটিয়া, প্রাণপণে মুখের হাসিটুকু অম্লান রাখিয়া বিশ্রামের অবসরটুকু নিরুদ্বেগে ভরিয়া দিতে লাগিল। বেড়ার অপর প্রান্ত হইতে মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণ আসিয়া তাহার অসীম ধৈর্য্যে আঘাত করিত; কিন্তু সে বিষজ্বালা নীরবে পরিপাক করিয়া বিনিময়ে সে সহিষ্ণুতার অমল হাসিটুকুই উপহার দিত। কখনও বা নির্জ্জন গৃহমধ্যে মুখ গুঁজিয়া নীরবে কাঁদিতে বসিত।

এক দিন অফিস হইতে ফিরিবার মুখে রেলওয়ে ব্রীজের কাছে দুই ভাইয়ে মুখোমুখি হইয়া গেল। প্রফুল্ল কি বলিবার উপক্রম করিতেই অমূল্য তাড়াতাড়ি দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া খালের জলরাশির পানে ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রফুল্লর মুখখানা আজ বড় শুষ্ক—বড় মলিন।—সারা দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সামান্য উপার্জ্জনে হয় ত সে এক পয়সার মুড়ি খাইয়াও জলযোগ করিতে পায় না—আর অমূল্যর হাতে টিফিনবাক্স! তাহার বুকটা মোচড় দিয়া উঠিতেই চোখ হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কম্পিত করে টিফিনবাক্সটা খালের জলে নিক্ষেপ করিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল ও চক্ষু পরিষ্কার করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন মোক্ষদা জলখাবার তৈয়ারী করিয়া বলিল, "বাক্সটা নিয়ে এস—গুছিয়ে দি।"

অমূল্য ঢোক গিলিয়া বলিল, "কাল সেটা খালে প'ড়ে গেছে। দেখ, আজ থেকে আর খাবার-টাবার দিও না, খেলে অম্বল হয়।"

মোক্ষদা বলিল, "সে কি! সারাদিন না খেয়ে কাটাবে?"

অমূল্য বলিল, "দু'এক পয়সার ফল-পাকড় কিনে খাব'খন। পাণ কটা দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

প্রফুল্ল ছোটবৌকে বলিল, "দেখ অমি, কাল দাদার সঙ্গে দেখা হ'লো—ডাকতে গেলুম, তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।"

ছোটবৌ দেখিল, স্বামীর গণ্ড অশ্রুপ্লাবিত।

সামান্য কিছু জমী-জমা ছিল, তখনও বিভাগ হয় নাই। ধান বিক্রয়ের টাকা কটা অমূল্য বড়বৌয়ের হাতে [illegible] "আজ রেখে দাও, কাল ওকে অর্দ্ধেক দিলেই হবে।" [illegible]

বড়বৌ টাকাগুলি গণিয়া গাঁথিয়া বাক্সে তুলিয়া স্বামীকে বলিল, "কি জন্যে শুনি? এত দিন যে সাতগুষ্ঠী খেলেন—মাখলেন, সে কোত্থেকে? ওর একটি পয়সা আমি [illegible] করছি না—পূজোয় ইলেক্‌ট্রিক চুড়ি গড়াবো।"

অমূল্য বলিল, "সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন থেকে—"

বড়বৌ ঝাঁকিয়া উঠিয়া জবাব দিল, "একটি পয়সাও নয়। জান না, জমী কেনবার সময় আমার বালা অনন্ত বাঁধা পড়েছিল?"

যুক্তি অকাট্য—কাযেই অমূল্য গড়[illegible] মনোনিবেশ করিল।

এমনই সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার [illegible] সুরু হইয়া গেল।

আনন্দময়ীর আগমনে দরিদ্রের [illegible] বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিল। [illegible]

ছোট মেয়ে—যা হোক্ একটা [illegible] কাপড় চাই। স্ত্রী—তাহারও শুধু [illegible]

সাড়ী এক জোড়া চাই। কিন্তু ২৫৲ টাকা সম্বলের মধ্যে দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইয়া এ আশা যে নিতান্তই বামনের চন্দ্রস্পর্শের ন্যায়। কোথা দিয়া কি হইবে ভাবিয়া সে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল।

বাহিরে পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। প্রফুল্ল মলিন শয্যা-প্রান্তে আপনার বিষাদ-চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি লুকাইয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

অমিয়া আসিয়া বলিল, "ওগো, ওঠো—ভর-সন্ধ্যেবেলায় অমন ক'রে প'ড়ে থাকতে নেই।—এই দেখ, বট্‌ঠাকুর আমাদের কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তড়িৎস্পৃষ্টের মত শয্যায় উঠিয়া বসিয়া প্রফুল্ল বলিল—"দাদা!—"

অমিয়া বলিল,—"হাঁ—বিধুর মাকে দিয়ে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।—বোধ হয়, বড়দি না জান্‌তে পারেন, এই জন্যে!—তোমার এক জোড়া,—আমার আটপৌরে এক জোড়া, শান্তি-পুরী একখানা, খুকীর জামা জুতো টুপি—"

প্রফুল্ল বলিল, "কিন্তু আমাদের না নেওয়াই উচিত ছিল, [illegible]"

[illegible] সবিস্ময়ে বলিল,—"কেন?"

[illegible] অভিমানস্ফুরিত কণ্ঠে বলিল,—"কেন?—দাদা বৌদি[illegible] ভয়ে আমাদের সম্বন্ধটাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার ক'রে চল্‌তে চান। তাঁর এটুকু সাহস যদি না থাকে ত লুকিয়ে চোরের [illegible] করায় কোন সার্থকতা নেই। তুমি রেখে দাও [illegible] ফিরিয়ে দিয়ে আসবো।"

অমিয়া [illegible] বলিল,—"ছি! তা কি হয়?"

[illegible]

[illegible] স্বরে বলিল,—"তাতে কতখানি ব্যথা পাবেন [illegible] তা [illegible] তে পারছ না! এক ত লুকিয়ে এই দান [illegible] তিনি ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন, তার ওপর [illegible] যে অপমান করবে, তার জ্বালা সইতে [illegible] আত্মহত্যা করবেন। তুমি ছোট [illegible] তেমনই [illegible] অপমান হোক, তোমার সহ্য করাতে পরমাণু পাওয়া [illegible]

[illegible] চোখে বা অণুবীক্ষণে [illegible] ইতে কে যেন অভিমানের কালো [illegible] নিছক কাল্পনিক [illegible] সরাইয়া দিল। সে উৎফুল্ল হইয়া [illegible] গারে ব[illegible] অমিয়া! আজ থেকে মান অপমান সবই মাথা পেতে নিলুম। তিনি জ্যেষ্ঠ—পূজ্য—তাঁর আসন অনেক উঁচুতে।"

বিজয়া-দশমীর রাত্রিতে প্রফুল্ল এ বাড়ীর উঠানে আসিয়া ডাকিল,—"দাদা!"

গৃহমধ্য হইতে মোক্ষদা ঠাকুরাণী উত্তর দিলেন, "তিনি পাড়ায় বেরিয়েছেন।"

প্রফুল্ল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ ফিরবেন?"

ঠোঁট উল্টাইয়া বড় বধূ উত্তর দিলেন—"যম জানেন! আমায় কি কিছু ব'লে যায়। তা ভাই, ছোটবৌ ত চটা রসগোল্লা হাতে ক'রে একবার পা ছুঁয়ে গেল, তুমি না হয় একটু বসো।"

শ্লেষটা পরিপাক করিয়া প্রফুল্ল হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বৌদির ত অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, না হয় একটু বসছি।"

বড়বৌ ফোঁস করিয়া জবাব দিলেন, "পাঁচ জনে লুটে-পুটে খেয়েই ত ফতুর করলে, নৈলে আমার অভাব কি? একখানা বাড়ী—যা দু' পাঁচ ভরি গয়না—কারো কাছে মেগে পেতে পরতে হয় না—আর ভাসুর দেওরের মুখ চেয়েও দিন কাটাতে হয় না।"

আঘাতটা অত্যন্ত কঠিন ও তীক্ষ্ণ। প্রফুল্ল বিবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আচ্ছা, আমি ততক্ষণ পাড়া থেকে ঘুরে আসি, দাদা এলে আসবো" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রফুল্ল আসে নি?"

বড়বৌ তাচ্ছীল্যব্যঞ্জক স্বরে উত্তর দিল, "হাঁ, একবার ধর্ম্মের ডাক দিয়ে গেছেন। তোমার আসতে দেরী হবে শুনে চ'লে গেলেন। লক্ষ্মণ ভাই! তুমিই মর ভাই ভাই ক'রে—ভাই ত ফিরেও চায় না।"

অমূল্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

পূজার বন্ধের পর অফিস খুলিয়াছে, কিন্তু ৫।৭ দিন কাটিয়া গেলেও প্রফুল্ল ফিরিবার পথে দাদার দেখা না পাইয়া সে দিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খালের পোলের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর চিন্তাভারাক্রান্ত মন লইয়া বাড়ীতে আসিয়া অমিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওদের খবর কিছু জান?"

অমিয়া বলিল, "আজ বিকেলে বিধু ঠাকুরঝির মুখে শুনলুম, বটঠাকুরের জ্বর হয়েছে।"

সোদ্বেগে প্রফুল্ল প্রশ্ন করিল, "ক'দিন হ'লো ?"

"বোধ হয় দিন পাঁচেক। শুন্‌ছিলুম, বড়দির ভাই এসেছেন।"

জামা-কাপড় না ছাড়িয়াই প্রফুল্ল ও বাড়ীর উঠানে আসিয়া ডাকিল, "বৌদি—"

বৌদি তখন রান্না-ঘরে ময়দা মাখিতেছিল। মাথা তুলিয়া জবাব দিল, "তবু ভাল! পাঁচ দিন জ্বরে বেহুঁস, একবার কাগের মুখে বার্ত্তাটি নেই! ভাগ্যি যাই হিরণ এসে পড়েছিল।"

প্রফুল্ল অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "বড় অন্যায় হয়ে গেছে, বৌদি। তা এখন কেমন আছেন ?"

"থাকা-থাকি আর কি—সেই এক ভাব।"

"হরিশ ডাক্তার দেখছে ত ?"

বৌদি মুখ মচকাইয়া বলিল, "ডাক্তার এখনও ডাকা হয় নি। শিউলি-পাতার রস ক'দিন দেওয়া হয়েছিল, কাল হিরণ এক্‌টা জারমলীন এনে দিয়েছে, তাই খাচ্ছেন।"

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে বলিল—"সে কি! কি জ্বর, কিছু ঠিক নেই, যা-তা ওষুধ খাওয়ানো ঠিক নয়!—আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।"

বৌদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "অত সস্তা পয়সা আমার নেই, ডাক্তার ডেকো না বল্‌ছি—"

প্রফুল্ল থমকিয়া দাঁড়াইয়া খানিক কি ভাবিল। তার পর দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

যাহা ভয় করা গিয়াছিল, তাহাই। জ্বরটা সোজা নহে—টায়ফয়েড। ঔষধের অপেক্ষা শুশ্রূষার প্রয়োজন বেশী।

রাত্রি জাগিয়া প্রহরে প্রহরে ঔষধ-পথ্য খাওয়ান, বুকে মালিষ করা, মাথায় আইস্‌ব্যাগ ধরা, বেডপ্যান্ ঠিক করিয়া দেওয়া—সবই নিয়মমত করিতে হইবে। শুনিয়া বড়বৌ শয্যা গ্রহণ করিল, হিরণ তাহার জারমলীনের শিশিটা পকেটে ফেলিয়া সেই যে অন্তর্দ্ধান করিল, আর এ-মুখো হইল না; কাযেই প্রফুল্লর ঘাড়ে আসিয়া সব পড়িল। সে প্রাণ ঢালিয়া জ্যেষ্ঠের শুশ্রূষায় আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

বড়বৌ শয্যা-গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে চাবিটিকে এমন দৃঢ় অঞ্চলাবদ্ধ করিয়া রাখিল যে, শত প্রয়োজনেও তাহার গ্রন্থি শিথিল হইল না। সুতরাং প্রফুল্লকে শেষ সম্বল ছোটবৌয়ের চুড়ী ক'গাছা বাঁধা দিয়া রোগের খরচ চালাইতে হইল। এই ভাবে মাসখানেক কাটিবার পর বিপদের আশঙ্কা কমিয়া আসিল। বড়বৌও উঠিয়া হাঁটিয়া স্বামীর পরিচর্য্যায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিল।

সে দিন অন্ন পথ্য করিয়া অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "প্রফুল্ল আর আসে না কেন ?"

বড়বৌ উত্তর দিল, "কি জানি!"

অমূল্য সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখের সময় দিনরাত প'ড়ে থাকতো নয় ? যখনই চোখ চাইতাম, দেখতাম, সে মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ভয়ে ভয়ে কি দেখছে।"

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিকট আবরণ—ভাস্বর সূর্য্যের উপর ক্ষণস্থায়ী মেঘেরই মত। বড়বৌ কোন উত্তর দিল না।

বছর কয়েক পরে এক দিন কোর্টের পেয়াদা আসিয়া ছোটবাবুর অংশে ডিক্রীজারি করিয়া গেল। অমূল্য সবিস্ময়ে বাহিরে আসিয়া জানিল—ঋণ করিয়া প্রফুল্ল এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর [illegible]লিয়া উঠিল। হতভাগা মূর্খ! বাপ-পিতামহের ভিটা [illegible] পর্য্যন্ত অবশেষে বাঁধা দিয়া টাকা ধার করিল! [illegible]

সুদীর্ঘ কাল পরে সে প্রফুল্লর উঠানে দাঁড়া[illegible] গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "প্রফুল্ল!" [illegible]

ছোটবৌ তুলসীতলায় সন্ধ্যা-দীপ [illegible]খিয়া প্রণাম [illegible] ছিল। তাড়াতাড়ি রান্নাঘ[illegible] রোয়াকে দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, [illegible]

অমূল্য বিষম রাগিয়াছিল—[illegible] হতভাগা মুখ্যু কোথাকার, বাপ-পি[illegible] একটুও বাধলো না! আর বাধবেই [illegible] কাণ্ডজ্ঞানহীন পশু! মান-সম্ভ্রম ত বোঝে [illegible]

প্রফুল্ল নীরবে নতমুখে সে তিরস্কার স[illegible]

অমূল্য বলিল, "এত দিনে জানল[illegible] নাঃ—আর মায়া-মমতা কিসের? [illegible] বিঘে জমী আছে, ভাগ ক'রে নি[illegible] পাকা পাঁচীল তুলতে হবে। [illegible] দর্শন করতে চাই নে—" ব[illegible] পরিত্যাগ করিল।

প্রফুল্ল স্থাণুর ন্যায় সেখানে [illegible]

ফেলিয়া আপন মনে বলিল, "তাই হোক। মান-অপমান, লাঞ্ছনা-নিগ্রহ আমারই থাক। আমি ছোট, আমি অক্ষম—কুলাঙ্গার। এই তিরস্কারই আমার ভূষণ হোক।"

ছোটবৌ মৃদুস্বরে বলিল, "সব খুলে বল্লে না কেন, ওঁরই অসুখে—"

প্রফুল্ল বলিল, "ছিঃ!"

৫।৭ দিনের মধ্যে জমী বিভাগ হইয়া গেল। বাড়ীর মাঝখানে পাকা প্রাচীর উঠিবার মাপজোক মিস্ত্রী আসিয়া ঠিক করিল; কিন্তু মোক্ষদা ঠাকুরাণীর হঠাৎ জ্বর হওয়াতে কার্য্য বন্ধ রহিল।

হরিশ ডাক্তার দেখিয়া মুখ বাঁকাইলেন, বলিলেন, "জ্বরের ধরণটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—টায়ফয়েডের টারণও নিতে পারে! যাই হোক, এখন এই ওষুধ চলুক;—হাঁ, ভাল কথা, আপনার ভাইকে একটা খবর দেবেন, অমন চমৎকার নার্সিং কিন্তু আমি দেখিনি।"

অমূল্য বলিল, "হাঁ—তা খবর দিতে হবে বৈ কি। তবে আপন[illegible] কাছে আমার একটি নিবেদন আছে—"

[illegible] হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! কি, বলুন না।"

[illegible] বেদনা-সে [illegible] কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "সেবারকার বিলটা যদি দয়া ছিল, ভ্রা[illegible]য়ে দেন ত কিছু টাকা—"

[illegible] হাস্য করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "বেশ লোক ত বৌদি[illegible] সে ত স[illegible] সঙ্গেই আপনার ভাই শোধ ক'রে চান[illegible] সাহস[illegible] ভাবনা থাক, আগে ওষুধটা [illegible] করায় কোর[illegible] [illegible]নী লইয়া তিনি গাড়ীতে উঠি-[illegible] সব [illegible] ফিরিয়ে দি[illegible]য় [illegible] ভুলিয়া একমনে ভাবিতে লাগিল [illegible] বলি [illegible]াকা মাহিনার কপর্দ্দকহীন কেরাণী [illegible] এত বড় রোগের খরচ চালাইল? [illegible] স্বরে [illegible]ক পয়সাও দেয় নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

[illegible]

[illegible]স্মাৎ তাহার সব সংশয় দূরীভূত হইল [illegible] [illegible]ত্যের উজ্জ্বল কিরণ উদ্ভাসিত হইয়া [illegible] তেমনই [illegible] ঔষধ-পথ্যের মূল্য বাবদে ভিটা [illegible] পরমাণু পাওয়া [illegible] [illegible] চোখে বা অণুবীক্ষণ[illegible] [illegible]নমুখে দাঁড়াইয়া জ্যেষ্ঠের সেই [illegible] ছক্ কাল্পনিক [illegible] না প্রতিবাদে পরিপাক করার [illegible]গারে [illegible] যে লুকানো ছিল, তাহা ভাবিয়া এত দিন পরে অমূল্য একেবারে লজ্জায় ঘৃণায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিল। পিতৃ-পিতামহের মান-মর্য্যাদা এই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব দুর্ব্বল প্রাণের জন্যই না ডুবিতে বসিয়াছে!

ছুটিয়া সে উত্তমর্ণের বাড়ী আসিয়া ঋণের পরিমাণ জানিয়া লইল ও আপন অর্থ দিয়া গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিতে অনুরোধ করিল। তিনি রাজী হইলেন। অমূল্যও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ঔষধ আনিতে চলিল।

দিন দুই পরে মোক্ষদা ঠাকুরাণী উঠিয়া বসিলেন, এবং স্বামীকে বলিলেন, "এইবার মিস্ত্রী ডেকে পাঁচীলটা গাঁথিয়ে নাও। রাত-বিরেতে বড় ভয় করে।"

অমূল্য হাসিয়া বলিল, "তার আগে আমার একটু বলবার আছে। প্রফুল্ল সে দিন আমায় যা অপমান করেছে—" বলিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "প্রফুল্ল!"

অপর প্রান্ত হইতে উত্তর আসিল, "কি বলুন।"

"একবার এ বাড়ী এসো, কথা আছে।"

প্রফুল্ল আসিতেই সে বলিল, "মনে করেছ, তুমি খুব চালাক, বোকা দাদাটি কিছু বোঝে না, নয়? বেড়া উঠলো, কথা নেই,—জমীজমা ভাগ হ'লো, কথা নেই। তার পর দিন-রাত্রি এসে আমার অসুখের সেবা ক'রে খুব বাহাদুরীটা দেখিয়ে গেলে। লোক ধন্য ধন্য করছে—বলছে, অমন ভাই হয় না। আর আমি—"

তাহার কথাটা অকস্মাৎ অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল কি?

মোক্ষদা ঠাকুরাণী পরম আগ্রহে শয্যায় বসিয়া স্বামীর কথাগুলি উপভোগ করিতেছিলেন।

একটু থামিয়া একবার কাসিয়া অমূল্য পুনরায় বলিতে লাগিল, "কিন্তু ফাঁকী বেশী দিন চলে না, ভাই, সব ধ'রে ফেলেছি। আমায় না মানো ক্ষতি নেই—"

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি অশ্রুসিক্ত নয়নে ধরা-গলায় বলিল, "সে কি, দাদা, তোমায় মানি না?"

"না গো, না। সম্বন্ধটা স্বীকার না করলে আর কিসের মান্য হ'লো রে, নেমকহারাম! তোর ভিটে নীলেমে ওঠে আর তোর দাদা বেঁচে! হাঁ রে অকৃতজ্ঞ, এত বড় আঘাতটা দিয়েও তুই নিশ্চিন্ত রয়েছিস?"—বলিতে বলিতে সে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।

প্রফুল্ল দাদার পায়ের উপর পড়িয়া আকুলকণ্ঠে বলিল, "দাদা—দাদা—বুঝতে পারি নি—আমায় মাপ কর।"

অমূল্য ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মাপ করতে পারি—তার আগে ঐ বেড়াটাকে লাথি মেরে ভেঙ্গে আমায় জানিয়ে দে যে, ওর শক্ত বাঁধনের চেয়ে আমাদের সম্পর্কটা ঢের কঠিন। এত দিন বুকের মধ্যে কুল-কাঠের আগুন জ্বেলে রেখেছিলুম, আজ আর পারি না। সব যাক—সব যাক—শুধু থাকুক ঐ—মিষ্ট মধুর সম্পর্ক—ভাই!

বড়বৌ লেপটা ভাল করিয়া গায়ের উপর চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

অদূরে এক জন বৈরাগী তখন গাহিতেছিল—

"এমন ঘরের হয়ে পরের মত—
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।"

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

করপোরেশানের কিউরেটার

বিগত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা করপোরেশানের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় করপোরেশানের কিউরেটার নিযুক্ত হইয়াছেন। টাউন-হল এবং করপোরেশান কার্য্যালয়ে যে সকল চিত্র সংরক্ষিত আছে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ভার অতঃপর তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। মিঃ এ, ই, হ্যারিস (আর্টিষ্ট) এবং মিঃ এফ, হ্যারিসন কিউরেটার পদে পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবার বাঙ্গালীর সহর কলিকাতায় এক জন বাঙ্গালী চিত্র-শিল্পী যে সেই পদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন, ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দিত হইবার কথা। আমরা এ জন্য কেবল শিল্পীকে নহে, করপোরেশানকেও অভিনন্দিত করিতেছি।
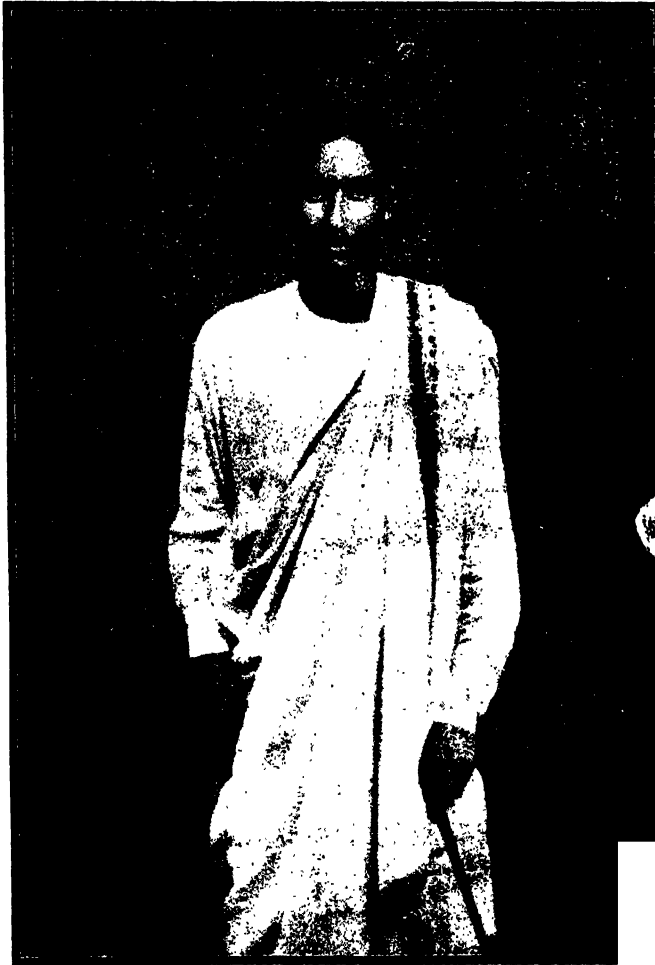
প্রকৃতিরাণীর লীলাস্থল চট্টলের সুলতানপুর গ্রামের প্রাচীন জমীদার-বংশে শিল্পী যোগেশচন্দ্রের জন্ম। প্রকৃতির ক্রোড়ে বাল্যে ও কৈশোরে লালিত ও বর্দ্ধিত যোগেশচন্দ্রের চিত্র-শিল্পের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। তিনি চিত্রাঙ্কনে সু[illegible] অর্জ্জন করিয়া[illegible] তা[illegible] 'শবরী', 'মু[illegible] [illegible] আসান', [illegible]র, স্বপন প্রভৃতি [illegible] তিনি যে [illegible]ণীয়ন্ত্র প্রদর্শন [illegible] পারি-ছেন, তা[illegible] আমরা নিঃ[illegible] [illegible]তে পারি, [illegible] [illegible]বার তাঁহা দেখাইতে[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]শব যোজনার আয়োজন করিতেছে[illegible]

আশা করি, শিল্পী যোগেশচন্দ্র [illegible] শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্[illegible]ন।

হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

সভ্যসমাজে আদৃত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই প্রবন্ধের আলোচ্য। প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে দুইটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এক শ্রেণীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস জীব ও পরমেশ্বরের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আর এক শ্রেণীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াই মানবগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে এইরূপ। সুতরাং এই পক্ষে মানবের নিজ সামর্থ্যের উপরই তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার শ্রেয়ঃ নির্ভর করিয়া থাকে।

এই দ্বিবিধ ধর্ম্মমতই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। নিরীশ্বরধর্ম্মমতগুলির মধ্যে কাপিলসাংখ্য বৌদ্ধ ও জৈনমত এ দেশে যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও এই দুই প্রকার মতও দেখিতে পাওয়া যায়। মীমাংসাদর্শন-রচয়িতা জৈমিনি, সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপি[illegible] উভয়েই এই নিরীশ্বরবাদের প্রচার করিয়াছেন। অমূল[illegible] মতাবলম্বিগণও কিন্তু হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আপন[illegible] অতি প্রাচীনকাল হইতে পরিগণিত হইয়া থাকেন। [illegible]রের অস্তিত্বের উপর নির্ভর না করিলে যে হিন্দু [illegible] যায় না, তাহা নহে, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য যাহারা [illegible] করে, তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে [illegible]ক কথায় বলিতে গেলে ঈশ্বর থাকুন বা না-ই থাকুন, [illegible] কিছুই আ[illegible] না। হিন্দু হইতে হইলে বেদের [illegible] করায় কো[illegible] বেদবিহিত কর্ম্মসমূহ নিজের [illegible] করিতেই হইবে। না করিলে [illegible]ধোগতি হইবে। এইরূপ যে বিশ্বাস, [illegible] মূল ভিত্তি এবং ইহাই হিন্দুধর্ম্মের [illegible]স্বরে

[illegible] যে নিরীশ্বর মত প্রচার করিয়াছেন, [illegible] কালে তন্মতাবলম্বী দার্শনিকগণের মধ্যে [illegible] ছে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

[illegible] বিজ্ঞানভিক্ষু—কপিলের "ঈশ্বরা-[illegible] তেমনই ঐ [illegible]-অপর্য্য-বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন [illegible] পরমাণু পাওয়া [illegible] নাই যে, ঈশ্বর নাই, কিন্তু, ঈশ্বরের চোখে বা অণুবীক্ষ[illegible]র দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। [illegible] কাল্পনিক [illegible] লৌকিক প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের [illegible]গারে ব[illegible]

জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসাশাস্ত্রের আচার্য্যগণের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই ঈশ্বরের সত্তা যে অঙ্গীকার করিতেই হইবে, তাহাও নিজ নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সত্তার উপর বিশ্বাস করিলে তাঁহার অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া, কর্ম্মিগণ হয় ত বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের যথাবিহিতভাবে অনুষ্ঠান বিষয়ে কথঞ্চিৎ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারে। যাহাতে এরূপ না হয়, সেই জন্যই জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপালন করিতে বিমুখ হইয়াছেন, এই মাত্র। বাস্তবিক তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা মানিতেন না, এ কথা বলা যায় না। এই ভাবে পরবর্ত্তী মীমাংসক আচার্য্যগণ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়াও আপনাদিগের সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ দেখা যায় না। এই ঈশ্বরের স্বরূপ কি এবং ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ কিরূপ, ঈশ্বরোপাসনার ফলই বা কি, এই সকল বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের যে বিশ্বাস, তাহার সহিত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বিশ্বাসের কিরূপ পার্থক্য আছে, তাহারও আলোচনা করিলে হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা বুঝা যাইবে। সুতরাং এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা, ঈশ্বরের স্বরূপ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং উতামৃতত্বস্যে-শানোঃ যদন্নেনাতিরোহতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—যাহা জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, যাহা জন্মিবে এবং যাহা কিছু আমাদিগের সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সকলই পরমেশ্বরের স্বরূপ। পরমেশ্বরই পুরুষ, জগতের সকল লোক যে বাঁচিয়া থাকে, তাহার নিয়ন্তাও তিনি, যে প্রাণনব্যাপার অন্ন হইতে সম্পাদিত হয়, তাহাও তিনি। ঋগ্বেদের আরও একটি মন্ত্রে বলিতেছেন—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥"

"হে মনুষ্যগণ! তাঁহাকে তোমরা জান না, যিনি এই বিশ্ব-ভুবন উৎপাদন করিয়াছেন, এবং যিনি তোমাদের সকলে

আতিরিক্ত হইয়াও তোমাদেরই অন্তরে রহিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে জানিলে না। অথচ তিনি তোমাদের শরীরের মধ্যস্থ আত্মারও অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমরা কেন জান না, তাহার কারণ এই যে, তোমরা অজ্ঞানরূপ নীহারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ, বৃথা জল্পনাতেই সময় নষ্ট করিতেছ, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখে মোহিত এবং পরিতৃপ্ত হইয়া যজ্ঞের আড়ম্বরেই সময় অতিবাহিত করিতেছ, তোমরা সেই বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ব-নিয়ামক, বিশ্বব্যাপক পুরুষকে জানিতে চেষ্টাও করিলে না, ধর্ম্মেরও অনুগত হইলে না, একান্তচিত্তে তাঁহার উপাসনায়ও রত হইলে না, এই কারণেই তোমরা তাঁহাকে জানিতে পারিলে না।"

ঋগ্বেদের আর একটি মন্ত্রে বলিতেছেন—

"একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি"

"এক, অদ্বিতীয় পরমার্থ সৎ বস্তুকেই বিপ্রগণ বহুপ্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন"—এই সকল মন্ত্রের দ্বারা হিন্দুজাতির উপাস্য পরমেশ্বর যে সর্ব্বাত্মক, এক হইয়াও তিনি নানা রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সর্ব্বাত্মক ঈশ্বর অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাস্য ঈশ্বর হইতে যে বিভিন্ন স্বরূপ, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝা যায়।

জীব ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্, তিনি উপাস্য, জীব তাঁহার উপাসক, নিজের ভোগে বা অপবর্গের জন্যই জীবের পক্ষে সেই ঈশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। ইহা ঈশ্বরবাদী অন্যান্য সকল ধর্ম্মমতেই একবাক্যে উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল মতে উপাস্য ও উপাসক উভয়েই বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুর উপাস্য উপাসক হইতে ভিন্ন নহেন। হিন্দুর বিশ্বাস—যিনিই উপাস্য, তিনিই উপাসক এবং ইহাই হইল হিন্দুশাস্ত্রের প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত।

হিন্দুর প্রাচীনতম শাস্ত্র এই যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী কালে রচিত হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রই এই ঈশ্বরতত্ত্বেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

একই বস্তু কেমন করিয়া অনেক হয়, ব্যবহারিকদৃষ্টিসম্পন্ন [illegible]ক্তির নিকট এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা [illegible] থাকিলেও সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ভারতের মহাত্মাগণ এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, সেই উত্তরের উপরই [illegible]স্ত হিন্দুধর্ম্মের উপাসনাতত্ত্ব নির্ভর করিতেছে। সে উত্তর [illegible] এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এক শত সাতাত্তর সূক্তে একটি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"পতঙ্গমক্তং অসুরস্য মায়য়া
হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রেঽন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে
মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ॥"

"বিদ্বান্‌গণ মনে মনে বিচার করিয়া, মানসদৃষ্টিতে একটি পতঙ্গের—অর্থাৎ জীবের স্বরূপ দেখিতে পান। তাঁহারা দেখেন যে, অসুরের মায়া ঐ জীবকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ঐ জীব এই অজ্ঞানরূপ সমুদ্রের মধ্যেই বিরাজমান রহিয়াছে। এই ভাবের দৃষ্টিসম্পন্ন বিদ্বদ্‌গণ বিধাতার কিরণসমূহের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করেন।"

এই মন্ত্রটির মধ্যে যে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ—অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই অবিদ্যার দ্বারাই [illegible] হইয়া, জীব বা পতঙ্গ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলি[illegible] করিয়া থাকে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, অবিনাশী, [illegible] সকলের আত্মভূত হইলেও, এই অবিদ্যার প্রভাবেই [illegible] পৃথক্ পৃথক্ জীবভাব ও জড়ভাব কল্পিত হইয়া [illegible] ইহারই নাম ভেদদৃষ্টি। সকল ব্যবহারের ইহা [illegible] মূল।

এই অবিদ্যার স্বরূপ যাহারা [illegible] পারে [illegible] সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার [illegible] দেখাইতে [illegible] করিতে ইচ্ছা করে—ইহাই হইল [illegible] বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য এই মন্ত্র [illegible] করিয়াছেন। বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিগ[illegible] মানবের যত প্রকার দুঃখ আছে, সে সক[illegible] এই অবিদ্যা বা মায়া। এই মায়া হইতেই—[illegible] প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। [illegible] আত্মাভিমানী মানবের সকল দুঃখ ও [illegible] মূল কারণ। এই অজ্ঞানের নিরাক[illegible] মানব কখনই শাশ্বত শান্তিলাভে[illegible] দেহাভিমান বিদ্যমান থাকিতে মা[illegible] বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতিসা[illegible] সুখী করিবার জন্য যত চেষ্টাই [illegible] চেষ্টাই তাহার নিষ্ফল হইতেছে ও হই[illegible]

এই দেহাভিমাননিবৃত্তির একমাত্র উপায়—পরমাত্মদৃষ্টি বা আত্মস্বরূপজ্ঞান। এ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, মানবের এ সংসারে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয় ও শাশ্বত শান্তি অনন্তকালের জন্য তাহার করায়ত্ত হয়। এ জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব কর্ম্মকেই সকল সিদ্ধির সাধন বলিয়া বিবেচনা করে। "আমি কর্ত্তা, তুমি আমা হইতে ভিন্ন, তোমাকে অধীন করিয়া তোমার দ্বারা আমার ইষ্টসিদ্ধি করাইয়া লইব, আমার সুখের জন্য এ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সুখের উৎপাদনে যে বিঘ্ন করে, সেই আমার শত্রু, তাহাকে দমন করাই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।" এইরূপ জ্ঞানও এই দেহাত্মাভিমান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান থাকিলে এ সংসারে বিদ্বেষমূলক—লালসামূলক যত প্রকার কলহ উৎপন্ন হয়, তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা কোন মানবের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। ... মো মানব এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মভূত পরমার্থসৎ ব্রহ্ম- অমূল ... জড় অমর নিজের আত্মাকে বুঝিতে সমর্থ না হয়, সে আপন ... শাশ্বত শান্তিলাভের আশা বিড়ম্বনামাত্র হিন্দুসভ্যতা- ... এ পৃথিবীতে যত সভ্যতা দেখা দিয়াছে, সেই বেদনা যে ... তার মূলে এই দেহাত্মাভিমানের দৃঢ় বন্ধন লাগিয়াই ছিল, ... এক কথায় বলিতে গেলে, অবিদ্যামূলক—আত্মার বৌদ্ধ ... জ্ঞানই পৃথিবীর অন্যান্য সকল সভ্যতারই মূল ... হিন্দুসভ্যতা ... এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করায় কোন ... দৃঢ় বন্ধনের উচ্ছেদের সাধনরূপ ... জ্ঞান, তাহাই হইল হিন্দুসভ্যতার ... বলিয়া বেদ বলিতেছেন—

"... ন প্রজয়া ন ধনেন
... নকেঽমৃতত্বমানশুঃ।"

... করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। ... পাইবার সম্ভাবনা নাই। অপরিমিত ... অমৃতত্বলাভ হয় না, কিন্তু ত্যাগের ... তেমনই ... ত্যাগের দ্বারাই মানব অমৃতত্ব বা ... সমর্থ হয়।

পরমাণু পাওয়া ... চোখে বা অণুবীক্ষণ ... আত্মা হইতে আপনাকে অভিন্ন ... নিছক কাল্পনিক ... তাহার মানব হইয়া জন্ম নিরর্থকই ... ভূত আত্মার তত্বজ্ঞানই মানবজীবনের চরম বা পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া সমষ্টির আত্মার সহিত আপনার আত্মাকে অভিন্ন করিয়া লওয়াই মানবকুলের শাশ্বত শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। এইভাবে আত্মস্বরূপের যে জ্ঞান, তাহাই হইল হিন্দুর—কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত সকলেরই উপাসনার ভিত্তি। তাই হিন্দু কোন বিহিত কর্ম্ম করিবার সময় উপাস্য দেবতার পূজা করিতে যাইয়া ভাবিয়া লয়—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

"আমি যাঁহার উপাসনা করিতেছি, সেই দেবতা আমা হইতে ভিন্ন নহেন। আমিই সেই দেবতা, আমিই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সুতরাং কোন প্রকার শোকই আমার হইতে পারে না। আমি সৎ, আমি চিৎ ও আমিই আনন্দ, আমার স্বভাব নিত্যমুক্ত। বন্ধন আমার মায়াকল্পিত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। তাই জ্ঞানী ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এইমাত্রই কামনা করে—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

ঈশ্বরের নিকট আমি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত সারূপ্যরূপ গতি চাহি না—আমি কেবল আমারই জন্য নির্ব্বাণ ও কামনা করি না, আমি চাহি—আমি যেন সকল দুঃখভাক্ জীবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের যত প্রকার ক্লেশ আছে, তাহা সকলই আমার করিয়া লইতে পারি, যাহার ফলে তাহারা যেন সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে

এইভাবে বিশ্বাত্মা ভগবানের সহিত ব্যষ্টিস্বরূপ জীবাত্মার ভেদবাসনাপ্রতিকূল আত্যন্তিক অভেদদৃষ্টিরূপ উপাসনাই ভক্তজীবনেরও চরম লক্ষ্য ছিল, তাহাও দেখিতে পাই—প্রেম-ভক্তির মূর্ত্ত আদর্শ শ্রীরাধার অনন্যসুলভ ভক্তির স্বরূপ কি, তাহার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তাই ভক্তশিরোমণি রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে বলিয়াছিলেন,—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।

ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি-
স্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি চ বিচিত্রং কিমপরম্ ॥"

সেই এক সময় ছিল, যখন আমি তোমার কান্তা আর তুমি আমার কান্ত এইরূপ দ্বৈতবুদ্ধি ছিল না—তখন মনের অন্যান্য বৃত্তিও বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, এমন কি, তুমি ও আমি এইরূপ ব্যবসায়ও লুপ্ত হইয়াছিল; আর অন্য কি ঘটিয়াছে? তুমি ভরণ-কর্ত্তা হইয়াছ, আমিও তোমার ভরণীয় আশ্রিত হইয়াছি—এমন হইয়াও যে এখনও বাঁচিয়া আছি, ইহা অপেক্ষা রাধার পক্ষে বিচিত্র ভাগ্যবিপর্য্যয় আর কি হইতে পারে?

ইহাই হইল হিন্দুর উপাসনা। এ উপাসনায় যাহার সিদ্ধি-লাভ হয়, সেই প্রকৃত মানুষ। প্রারব্ধ কর্ম্মের বশে প্রাকৃত জীবের ন্যায় সকল প্রকার ব্যবহাররাজ্যে বিচরণ করিলেও কোন ব্যবহারই তাহার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না। সে সংসারে কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবিতে পারে না। সে আত্মারাম, নিত্যতৃপ্ত ও অশোকভাক্ হয়। ইহাই হইল হিন্দুর সনাতন উপাসনাতত্ত্ব। বেদেও ইহাই বিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত এই ত্রিবিধ হিন্দুসাধকের মধ্যে ব্যবহারদশায় উপাসনার বাহ্য আকারের বহুবিধ তারতম্য বিদ্যমান থাকিলেও উপাসনার যাহা পারমার্থিক স্বরূপ, তাহা সকলেরই পক্ষে এক। এই উপাসনার তত্ত্ব হিন্দুর শ্রুতিতে, স্মৃতিতে, পুরাণে, ইতিহাসে, কাব্যে ও অলঙ্কারে নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবহারক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন ভিন্ন আকারের হইলেও পরমার্থতঃ ইহা এক—অভিন্ন। ইহাই হইল বেদমূলক সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতাবলম্বী মানবজাতি যত দিন পর্য্যন্ত এই উপাসনার সারবত্তা বুঝিয়া ইহাকে অবলম্বন না করিবে, তত দিন পৃথিবীর বিরাট্ মনুষ্যসমাজের শাশ্বত শান্তির সম্ভাবনা নাই। এই কথা এখনও জগৎকে বুঝাইবার জন্য হিন্দু বাঁচিয়া আছে ইহা যেন প্রত্যেক হিন্দুর মনে থাকে।

শুধু জগৎকে বুঝাইবার জন্য নহে, আগে স্বয়ং ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। ভাসা ভাসা বুঝিলে চলিবে না। অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। নিজে এই অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া অপর সকল মানবকে ইহা বুঝাইতে হইবে। তাহাই যদি হিন্দু বুঝাইতে পারে—বুঝাইয়া দেহাত্মাভিমানী জাগতিক মানবকে পরমাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারে—তবেই ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের জন্ম-ভূমি ও লীলা ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে হিন্দুর জন্মলাভ সার্থক [illegible] হিন্দুসভ্যতার বিশিষ্ট আলোকে জগতের ভ্রমান্ধকার [illegible] হইবে এবং শান্তির স্বর্গসাম্রাজ্য আবার এ সংসারে [illegible] হইবে। ইহাই হিন্দুর আশা, ইহাই হিন্দুর ভরসা। [illegible] হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। *

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্[illegible]

* বিশ্বধর্ম্মমহাসম্মেলনে মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ।

দ্রোণ-পুষ্প

['দ্রোণ' এক প্রকারের সাদা রঙের মেঠো ফুল—রাঢ়দেশে ইহাকে 'গলগেসে' বলে।]

শ্রী-হারের দুল, নীহারের ভুল, উহরের ফুল তুই,
বাগ-বাগিচায় ঠাঁই নাই তোর,—মাঘ-ফাগুনের যুঁই!
বাণীর চরণে ফুটুক কুন্দ ভক্তের প্রাঙ্গণে,
রমার চরণে ফুটে থাক্ তুই ক্ষেতের একটি কোণে।
তারা হয়ে তুই উজল করিস্ মাঠের আঁধার ঘোর,
শীতের নিশীথে একলা ও মাঠে ভয় করে না'ক তোর?
শুধু আনন্দ সদা অতন্দ্র হাসিয়া ভাঙায় ভয়,
রাখাল কেন বা কচি বাছুরের কাছে কাছে সদা রয়।
ক্ষেত্রমাতার নব আতঙ্কের শুভমঙ্গলাচারে,
খই হয়ে তুই ছড়ানো আছিস্ প্রান্তরে কান্তারে?
নব-বসন্ত প্রসূত বুঝি রে ব্যোমের সূতিকাগারে,
[illegible]ধে হাসি তার ক্ষুদে ফুল হয়ে ফুটিলি কি থরে থরে?
[দ্রো]ণ তোর নাম,—দ্রোণ-পুত্রের দুধের তৃষ্ণা বুঝি
[illegible]দের মধ্যে উঠেছিস্ ফুটি—কাঙাল গুরুর পুঁজি?

তপন-রথের অয়নযাত্রা – পথতলখা[illegible]
তুই কি ফেনিল স্বেদের বিন্দু অশ্বকে[illegible]
অথবা শুনিয়া হৈমবতীর হিমময় [illegible]
মুচ্ কি হাসিল শঙ্কর, – তোরা পুষ্পিত [illegible]
হরের বৃষভ নিজ শৃঙ্গের বপ্রতুষার[illegible]
গ্রীবা আস্ফাল' দিয়াছে ছড়ায়ে—[illegible]
তৃপ্ত ভুবন শস্যসিন্ধু নিঃশেষে পান [illegible]
সৈকতে তার শঙ্খশুক্তি তোরা বুঝি [illegible]
নিঃস্ব আজিকে প্রান্তর-ভূমি—তুই [illegible]
কাঙাল বধূর আয়তিচিহ্ন যেমন শ[illegible]

* রচনাটি উৎপ্রেক্ষার মালা ছাড়া আ[illegible] মনে করিলে চলিবে না।—ইতি লেখক।

নদীয়া ও যশোহরের গাজন-গীতি

নদীয়া ও যশোহর হইতে সংগৃহীত "গাজন-গীতি" বা গম্ভীরা গাথাকে ছড়া ও গান এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ছড়াগুলি গাজন-উৎসবে অর্চ্চনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলি "বালার শ্লোক" নামে অভিহিত। গানগুলি গাজন উৎসবের সময় ভক্তরা পল্লীবাসী গৃহস্থের বাড়ীতে গাহিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। গানগুলি প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা ও হরপার্ব্বতী-প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। এবার কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীতে মালদহের গম্ভীরাগাথা গীত হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে ইংরাজী দৈনিক 'বসুমতী' বিগত ৩রা জানুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন, "আমরা শুনিতেছি, কংগ্রেস-প্রদর্শনীতে অদ্য ও কল্য প্রাতঃকালে মালদহ জিলা হইতে আগত এক কীর্ত্তনীয়া দল মালদহের বিখ্যাত গম্ভীরার গীত গাহিবেন। বহু দিন যাবৎ মালদহ এই সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ—মালদহ নিশ্চিতই ইহার জন্য গৌরব অনুভব করিতে পারে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, কলিকাতার অধিকাংশ লোকই এই সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না, অথচ গম্ভীরার গান বাঙ্গালার গীতি-কবিতার একটা বিশিষ্ট প্রকাশ।"

[illegible]য়া ও যশোহরের গম্ভীরার ছড়া ও গানগুলির সহিত [illegible]র গম্ভীরা-গাথার তুলনা করিলে মনে হয়, যশোহর ও [illegible]কুল্তে আসিয়া যেন গম্ভীরা সাহিত্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে [illegible]। ("আদ্যের গম্ভীরা" ১৮ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠায় মালদহের [illegible]থা দ্রষ্টব্য)।

পুরাণোক্ত * বৌদ্ধ-উৎসব ধর্ম্মপূজাকেই হিন্দুত্বের [illegible]স্থানসময়ে শিবের গম্ভীরায় পরিবর্ত্তিত করিয়া উৎসবের [illegible]তা ধর্ম্ম বা বুদ্ধদেবের স্থানে শিবকে বসান হইয়াছে, [illegible] উৎসবের [illegible] প্রণালী এবং গাথাসমূহ কিছুতেই বৌদ্ধ-[illegible]ক্ত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান [illegible] কবিগণকে প্রতিভা ও কবিশক্তি [illegible] প্রদান করিয়া এক দিক দিয়া বঙ্গীয় [illegible] আনিয়াছিল। তাই আমরা গাজনগাথা [illegible]থাসমূহেও দেবদেবীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে ধর্ম্ম-[illegible]থাক। সম্ভবতঃ এই গাজন গাথার [illegible] আমাদের কৃষক সাহিত্যের সুমেরু-শিখরে [illegible] প্রভৃতির পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। [illegible]াচনা করিলে দেখা যায় যে, গাজনের উপর [illegible] মতের যথেষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া [illegible] যে বৌদ্ধ আদর্শটি এখনও অনেক পরিমাণে [illegible]

[illegible]র গাজন উৎসবের বিবরণ

[illegible]র্ব্বে ভক্তরা (সন্ন্যাসী) ব্রত গ্রহণ [illegible] গান গাহিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া [illegible]-সংক্রান্তি বা নীল সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে ছড়া আবৃত্তি করিয়া পাট বা শিবের সিংহাসন জাগরিত করা হয়। এই রাত্রিতে ভক্তরা ধূপচি ইত্যাদি লইয়া নৃত্য করে। গাজনের পরিভাষায় ইহাকে "খাট্নি" বলে। তৎপরদিন বিকালে হাজরা নিমন্ত্রণ ও কাঁটা ভাঙ্গা হয়; রাত্রি দ্বিপ্রহরে শ্মশানে হাজরা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভোগ প্রেরিত হইবার পর পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে (ভোগ-নিবেদন শীর্ষক ছড়ার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এই সময়ে ভক্তদিগের মধ্যে কোনও প্রকার ভেদাভেদ নাই। পুরোহিত ব্রাহ্মণও এই সময়ে পূজার আসনে বসিয়া সকলকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তরা একত্র আহারাদি করিতে কোনও প্রকার দ্বিধা বোধ করে না। ধর্ম্মপূজার মধ্য দিয়া প্রদত্ত উদার বৌদ্ধনীতির দানের এই শেষ স্মৃতিটুকু বৃথা জাত্যভিমান ও ভেদাভেদে পর্য্যুসিত বঙ্গের পল্লীসমাজ আজিও একবারে মুছিয়া দিতে পারে নাই।

ছড়া ও গানের সংগ্রহ-বিবরণ আমরা পরে দিব। ছড়াগুলির রচয়িতাদিগের সন্ধান পাওয়া বড়ই দুঃসাধ্য। অনেক স্থলেই রচয়িতার ভণিতা নাই। গানগুলির অনেকগুলিতেই রচয়িতার ভণিতা আছে। আমরা দুই এক জন জীবিত কৃষক-কবির রচনাও পাইয়াছি।

যশোহর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার মধুহাটী গ্রামে "নব দোয়ার" চড়ক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাগুরা মহকুমায় গাজন উৎসব অপেক্ষাকৃত অধিক। নদীয়া কুষ্টিয়া মহকুমার শিলাইদহ, চাপাইগাছী ও আলমডাঙ্গার চড়ক এতদঞ্চলে বিখ্যাত।

* [illegible]১১ হইতে ২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গুরু-বন্দনা

প্রণাম গুরুদেব, অখিল ভুবনে সেব্য
গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।
যাঁহার চরণ ধরি, এ ভবসংসার তরি
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ।
(আহা) অন্ধের লোচন গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু
ভক্তজনার প্রতি গুরুর দয়া।
শিবের সেবক নন্দী, শিবের চরণ বন্দি,
আর বন্দি মা মহামায়া।
গুরু-গোঁসাই কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
ও রাঙ্গা চরণ বিনে গতি নাই।
অন্তিমকালে, যমদূতে লয়ে যায়,
সেবক বলিয়া প্রভু দেখ রাঙ্গা পায়।

দেবদেবী-বন্দনা

প্রণাম করিয়া ভক্তি, আগ্যদেব আগ্যাশক্তি,
প্রণম বিষ্ণু শিব আদি দেবা।
দিবাকর নিশাপতি, দেবরাজ গণপতি,
স্বর্গাবাসে দেবদেবী যেবা।
প্রণাম করিয়া মনে, কুম্ভ আদি নাগগণে,
বাল আদি তলাতলবাসী।

প্রত্যক্ষ দেবতা যত,　　দ্বিজ অঙ্গে আবির্ভূত,
সে বিপ্রের চরণে ভক্তি রাখি।
ত্রিশূল যতি সতী　　বৈষ্ণব নরপতি,
জনকজননী দুই জন।
গঙ্গা আদি তীর্থ যত,　　শাস্ত্র আদি ভাগবত,
ভক্তি-স্তুতি শ্রীগুরু-চরণ॥

দিক্‌-বন্দনা

পূর্ব্বদিক

পূর্ব্বেতে প্রণমি সূর্য্য অখিলের অধিপতি।
সপ্ত অশ্ব বাহন রথ অরুণ সারথি॥
সেই ত সূর্য্যদেব তুমি আমাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে হব বালা হরের কিঙ্কর॥
হরের চরণে মোর এই আরাধন।
অন্তিমেতে শিব নাম করিব স্মরণ॥

উত্তরদিক

উত্তরে প্রণাম করি পর্ব্বত হিমালয়।
ভ্রূকুটী ভূষণ যাঁর—শিবের আলয়॥
সেই ত পর্ব্বত হিমালয় তুমি আমাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে হব বালা হরের কিঙ্কর॥
হরের চরণে মোর এই আরাধন।
অন্তিমেতে শিব নাম করিব স্মরণ॥

দক্ষিণদিক

দক্ষিণে প্রণাম করি গঙ্গা ভাগীরথী।
এক বিন্দু মাহাত্ম্য বর্ণিব কি আছে শকতি।
ভগীরথকে করিলে কৃপা মা গো শতমুখী হয়ে।
সাগরসঙ্গমের ফল বিধাতা না পান গিয়ে।
সেই ত গঙ্গাসাগর তুমি আমাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে হব বালা হরের কিঙ্কর।
হরের চরণে মোর এই আরাধন।
অন্তিমেতে শিবনাম করিব স্মরণ।

পশ্চিমদিক

পশ্চিমে প্রণাম করি ঠাকুর জগন্নাথ।
প্রসাদ বলিয়া নরে কিনে খায় ভাত॥
জগন্নাথের মাহাত্ম্য-কথা কহনে না যায়।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়॥
সেই ত ঠাকুর জগন্নাথ তুমি আমাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে হব বালা হরের কিঙ্কর।
হরের চরণে মোর এই আরাধন।
অন্তিমেতে শিব নাম করিব স্মরণ।

পাট জাগরণ

না ছিল খাট না ছিল পাট না ছিল সিংহাসন।
এত দিনে ছিলি রে পাট কাহার আসন।
এগার মাস ছিলি রে পাট আজ্ঞায় জীবের।
মধু-মাসে মনে প'ল গাজন শিবের॥
আদ্যাশক্তি নিরঞ্জন ক'রে আছি সার।
সম্মুখেতে দেখি পাটের ত্রিশূল শিবের॥
আগায় ব্রহ্মা গোড়ায় বিষ্ণু মধ্যেতে শঙ্কর।
পাটশুদ্ধি করেন শ্রীভোলা মহেশ্বর॥

ঢাকশুদ্ধি

সীতা অন্বেষণে গেল পবন-কুমার।
লঙ্কা পুড়ায়ে বীর করে ছারখার॥
(লঙ্কার মধুফল কিছু বা খাইল কিছু বা আনে দেশে)
কাঁচায় অম্বল খান পাকিলে অনুপম।
স্কন্ধে করি বহে ঢাক কাষ্ঠ ভাল আম॥
ছুতারে চাচেন ঢাক নামেতে শ্রীহরি।
ঢাকের দুই তালায় লাগাইলেন কড়ি॥
বাম তালায় লাগাইলেন গোধনের ছড়ি।
ডান তালায় লাগাইলেন ছাগলের কড়ি॥
শিবশক্তি দুটি কাঠী তুলি নিল করে।
ঢাক শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে॥

অগ্নিশুদ্ধি

হনন পালন ব্রহ্মা সর্ব্ব-নিবারণ।
অগ্নিরূপে আছ ব্রহ্মা এ তিন ভুবন॥
রামের জানকী যেমন রেখেছিলে কোলে [illegible]
তেমনি মত রেখো ব্রহ্মা তোমার পদতলে [illegible]
পদতলে থাকিলে যমের নাহি দায়।
কোটি কোটি প্রণাম হই মহাদেবের পায় [illegible]
কহেন ত সদ্‌গুরু মনে [illegible]র।
অগ্নিশুদ্ধি করেন শ্রী[illegible]

শঙ্খ[illegible]

ক্ষীরোদ মথনে উপজি[illegible]
গরুড় বীর ধরিল শঙ্খ [illegible]
শাঁস জল ভক্ষণ করে গ[illegible]
পবন বাতাসে শঙ্খ শিব-[illegible]
শঙ্খ কাটে বিশ্বকর্ম্মা পার্ব্বতী [illegible]
হেন শঙ্খ পরি মোরা হাতে [illegible]
হেন শঙ্খ পরে মোরা এ[illegible]
শঙ্খ ঘণ্টা শুদ্ধ করেন হ[illegible]

ধূপশুদ্ধি

লঙ্কায় ছিল ধূপ ধূপ[illegible]
হনুমান আনিয়া ধূপ [illegible]
ধূপে ব্রহ্মা ধূপে বি[illegible]
ধূপ ধূপচি লয়ে ন[illegible]
স্বর্গে উঠে ধূপচির [illegible]
ধূপের গন্ধে নাচে বা[illegible]

কহেন শত গুরু মহেশের বরে।
ধূপশুদ্ধি করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে ॥

সপ্তসাগরের জল আনয়ন

সত্যযুগে হইল প্রভু সাগরের উৎপত্তি।
ত্রেতায় প্রবেশে যম তেজে তেজপতি ॥
শুষ্ক সিন্ধু ব্রহ্মশাপে অনেক বৎসর।
শাপ-মুক্ত করিল জন্মিয়া ভগীরথ ॥
সেই ত সপ্ত সাগরের জল মোরা আনি শিববরে।
স্নান পূজা স্তুতি ভক্তি করেন গঙ্গাধরে ॥

গম্ভীরে আনা

জট লট পট পিঙ্গল কেশ।
বাঘচর্ম্ম পরিধান দিগম্বর বেশ ॥
ত্রিলোচন শিঙ্গা ডুম্বুর হস্তে।
গম্ভীরেতে আওত নাথ নমস্তে ॥

ভৈরবী অষ্টক

আনিয়া সুরথ রাজা সংসারের মাঝেতে।
করিল তোমার পূজা নানা উপহারেতে ॥
পূজা পেয়ে তুষ্ট হয়ে বর দিলেন মা আপনি।
বন্দন জগতমাতা ভৈরবী দুর্গা ভবানী ॥

বিষ্ণু অষ্টক

(শঙ্খধারী)

প্রভু হে, [illegible] রূপধর গরুড়-বাহনে চড়
[illegible] আরোহণ।
[illegible] কণ হস্তে শঙ্খধর
[illegible] হয় দেবগণ ॥
[illegible] থ তুলে নাও করে।
[illegible] তুমি হরি দয়াময়,
[illegible] র কর মোরে ॥

(চক্রধারী)

[illegible] লইলে করে, ত্রিভুবন কাঁপিল ভরে,
[illegible] উড়িল পরাণ।
[illegible] যে চক্র তুলে নাও করে,
[illegible] তুমি হরি দয়াময়,
[illegible] র কর মোরে ॥

([illegible] ধারী)

[illegible] করে, বসুধা কাঁপিল ভরে,
[illegible] ল পরাণ।
[illegible] তুলে নাও করে,
[illegible] হরি দয়াময়
[illegible] পার কর মোরে ॥

মরাজীয়ান *

কাউসেনের পুত্র লাউসেন মহাজন।
বাসিপুষ্প দিয়ে পূজেছিল ত্রিলোচন ॥
দৈবযোগে পাপীর মরণ হইল।
সমুদ্রের তীরে আসি পড়িয়া রহিল ॥
চুনা মরা দেখি দেবী রাখিল যতনে।
বুঝিতে হরের মন ভকত কারণে ॥
বনাশ্রমে সিন্ধুতটে আসিল সন্ন্যাসী।
যেথায় সে চুনা মরা পড়েছিল আসি ॥
দুই ধারে পর্ব্বত মধ্যে বহে ধারা।
শিবের বরে জীয়াইল বার বৎসরের মরা ॥

নিদ্রাভঙ্গ

প্রভু হে যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, দেখ সেবকের রঙ্গ,
তোমা পদে করি নিবেদন।
তোমা দেখে ভয় করি, খুব শাপে ডর করি,
তোমা দেখে লাগে বড় ভয়।
অপরাধ ক্ষমা কর শিব মহাশয় ॥

পার্ব্বতীর নিদ্রাভঙ্গ

মা গো যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, দেখ সেবকের রঙ্গ,
তোমা পদে করি নিবেদন।
কার্ত্তিক-গণেশ সঙ্গে ক'রে, রয়েছ মা নিদ্রাভরে,
আমি প্রণাম হইব কেমনে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শারঙ্গ করে ধরি।
অপরাধ ক্ষমা কর ও মা শঙ্করী ॥

বাণশুদ্ধি

লৌহাসুর † বধিয়া গোঁসাই লোহার দিলেন জন্ম।
কামার ভায়া গড়িয়ে দিলেন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥
বাণ পিনাক বঁটি গড়িয়ে নানাবুদ্ধি।
ক্ষীরোদ জলে মহাপ্রভু বাণ করিলেন শুদ্ধি।

কাঁটাভাঙ্গা

খাজুরগাছের কাঁটা যমের দোসর।
শরীরে বিঁধিলে কাঁটা হয় জরজর ॥
কাঁটা দেখে তোমার সেবকের লাগে ডর।
আনন্দে কাঁটা নত কর ভোলা মহেশ্বর ॥
নিবেদন করি শুন শিব মহাশয়।
পদ্মহস্ত বুলায়ে দাও সেবকের গায় ॥

---

* গাজন উৎসবের শেষ দিন সন্ন্যাসীরা কালাখেলা করিয়া মাটশয়ান দিয়া নিয়মভঙ্গ করে। মূল সন্ন্যাসী পাট লইয়া জলাশয়ে নামিবার সময় এক জন লোক পথ আটকাইয়া মড়ার মত হইয়া পড়িয়া থাকে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে তাহার জীবনলাভ হইয়াছে, মনে করা হয়।

† পুরাণাদিতে লৌহাসুরের কোনও উল্লেখ নাই। উহা প্রাকৃতপ্রভাবে মনগড়া নাম।

মাটী মাটী মেদিনী মাটী জীবেরে করে দিলে স্থান।
পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তোমা বিনা নাহি গতি আর।
মাটীতে উৎপত্তি মাটীতে বিপত্তি মাটীতে নানা শস্য ফলে।
মাটী শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে।

হাঁড়িশুদ্ধি

ঘট কর্প পালেরা তিন চারি ভাই।
মাটীখানি ছেনিয়া করিল এক ঠাই।
মাটীখানি ছেনিয়া তুলে দিল চাকে।
হাঁড়িটি গড়িয়া দিল আড়াই বার পাকে॥

রবি দিলেন শুকিয়ে,
ব্রহ্মা দিলেন জুড়িয়ে
গুরু দিলেন হস্তে,
মুই নিলাম মস্তে;

কহেন ত সদ্‌গুরু মহেশের বরে।
হাঁড়ি শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে॥

দেউল-পত্তন

চাহিয়ে নলের পানে বলেন শ্রীরাম।
সেতু পরে করে দাও দেউলের স্থান॥
একে নল মহাবীর আরে আজ্ঞা পায়।
বড় বড় পাথর উলটায় আছাড়ের ঘায়॥
চাষ দিয়ে বীর ঘন দিলেন মই।
লাঙ্গুল বুলায়ে বীর শোধন করিল ঠাঁই॥
গাছ পাথর বয়ে দিল বানরের দলে।
দেউল নির্ম্মিত হ'ল বটবৃক্ষতলে।
স্ববর্ণের চাল তার স্ফটিকের খুঁটি।
চালের উপরে স্বর্গপুর দুয়ারে বারাণসী।
এ দেউলে সবার পরে ধর্ম্ম অধিকারী।
ষোল সন্ন্যাসী সাধুলিবালা আমি ভক্তি প্রণাম করি।

ভোগচালনার মন্ত্র *

কালী কালী বর্ণ কালী গলে মুণ্ডমালা।
অন্তরে আছেন কালী সর্ব্বমঙ্গলা।
সহিয়ে যে কালী মা গো সহনে না যায়।
মরার শ্মশানে মা গো ধীরে ধীরে আয়।
মরার শ্মশানে মা গো এসে কর ভর।
শঙ্খ ঘণ্টা দুর্গা নাম জপ করি নিরন্তর।
আমার পাটের সিন্দুর নিয়ে ভূষিত হও।
আও কালী আও।

রঙ্গ দেখিয়ে মা গো করে দাও তালি।
খঞ্জন বাহনে মা গো চড় জয় কালী।
হাঁড়ির ভাত খাও মা স্ফটিকের গেলাস।
মায়ে ঝিয়ে ঘর কর দেখে লাগে ত্রাস।
দোহাই কালী মা গো হরের মাথা খাও।
ঢাক বাজা ছেড়ে যদি অন্তরে যাও।

ধূপ চালক ধূপচি চালক চালক মহেশ্বর।
নাগ চালক নর চালক চালক দেবতার।
যত দেবতা চালক মন্ত্র নাহি মোর ঠাঁই।
স্থির হয়ে থাক গে তোমার বাসুকির [illegible]
দোহাই কালী মা গো হরের মাথা খাও।
ঢাক বাজা ছেড়ে যদি অন্তরে যাও।

ভোগনিবেদন

আতাল পাতাল সাতাল তাল।
শিব বাঁধলেন ভিটে
লোহার মুগুর হাতে।
হাজরা ঠাকুর ভোগ ন[illegible]
ভোগ খা[illegible]

* গাজন পূজার রাত্রিতে মড়া[illegible] মাথায় করিয়া অন্ন পাক করা হয়। পোড়া একটি হাঁড়িতে পূরিয়া তৃতীয় [illegible] (প্রধান ভক্ত) দ্বারা শ্মশানে হাজরা [illegible] হইয়া থাকে।

করিয়াছেন। এই মুখোস ধারণ করিলে পেঁয়াজের ঝাঁজ নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করে না। এই মুখোস অতি সহজেই ধারণ করা যায় এবং খুলিয়া ফেলা সম্ভব।

আলোক-সাহায্যে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি

মার্কিণে এক প্রকার আলোক উদ্ভাবিত হইয়াছে। উহার সাহায্যে দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়। উল্লিখিত আলোক গাত্র-চর্ম্মের রোমকূপগুলি পরিষ্কার করিয়া দেয়। চর্ম্মের অন্যান্য দোষও

আলোক-সাহায্যে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি

আলোকসম্পাতে দূরীভূত হয়। মার্কিণ বিলাসিনীরা এই আলোক-সাহায্যে দেহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ইহাতে নাকি প্রত্যেকের বৎসরে প্রায় পৌনে দুই শত টাকা ব্যয় পড়ে। সৌন্দর্য্যরক্ষাকল্পে ইহা সে দেশের বিলাসিনীর পক্ষে বেশী নহে।

ব্যাঙ্করক্ষার বিচিত্র ব্যবস্থা

প্রায়ই আগ্নেয়াস্ত্রধারী দস্যু সুসভ্য আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের ব্যাঙ্কগুলিতে প্রবেশ করিয়া ভয় দেখাইয়া লুণ্ঠন করিয়া থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য নানা উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ওক্ল্যাণ্ড, কালিফোর কোন ব্যাঙ্কে ইস্পাত-নির্ম্মিত একটি যবনিকা রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গুলীনিবারক ইসপাতের যবনিকা

এই যবনিকা গুলীতে বিদ্ধ হয় না। উহার অন্তরালে আগ্নেয়াস্ত্র-ধারী রক্ষী সর্ব্বদা প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যবনিকার দেহে কতিপয় ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রপথে বন্দুক রাখিয়া গুলী করিতে পারা যায়। সহসা কোন দস্যু ব্যাঙ্কের কেরাণীদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে রক্ষী যবনিকার অন্তরালে নিরাপদে থাকিয়া দস্যুকে কাবু করিতে পারে।

দর্পণ-সাহায্যে শব্দময় আলোক

৫০ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজান্দার গ্রাহাম বেল বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, শব্দকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে এবং আলোককে শ্রুতিগোচর করা যায়। জন নেলামী টেলর নামক জনৈক বৈদ্যুতিক বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ার সম্প্রতি এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, তাহার সাহায্যে কক্ষমধ্যে কোনও আলোক-রশ্মিধারা প্রবাহিত

দর্পণ-সাহায্যে শব্দক

করিলে সেই আলোকধারা হইতে
ঘরের মধ্যে একটি দর্পণ থাকিবে।
কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রতিহত হইলেই
আলোক-প্রবাহ দর্পণ হইতে অন্যত্র
প্রাপ্ত হইলে সঙ্গীত তখনই থামিয়া
আলোকধারা নিঃসৃত হয়, তাহাতে
হয়। সুতরাং উল্লিখিত রেকর্ডই শব্দের
ধারার উপর হাত রাখিলে সঙ্গীত তখনই
হাত সরাইয়া লইলেই সঙ্গীত চলিতে

শব্দময় চ

মার্কিণের কোন কোন চলচ্চি
কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে শব্দময় চ
ছেন। প্রবন্ধের বর্ণিত চিত্রে
তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবে
আছে। সেই ছিদ্রপথে নির্দ্দিষ্ট

দর্শকের সম্মুখে ছিদ্রপথে শব্দময় চলচ্চিত্র আবির্ভূত হইবে। পাঁচ সেণ্ট মূল্যের মুদ্রা ছিদ্রপথে নিক্ষেপ করিলে পাঁচ মিনিটব্যাপী একটি চিত্র দর্শক দেখিতে পাইবেন। যদি চিত্রটি দীর্ঘ হয়, তবে পাঁচ মিনিটের পর উহার অপরাংশ আবার পাঁচ সেণ্ট নিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শব্দময় চলচ্চিত্র

বিচিত্র মোটর-গাড়া

কোনও মোটর-গাড়ীনির্ম্মাতা প্রদর্শনীক্ষেত্রে দেখাই-এক প্রকার মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। [illegible]
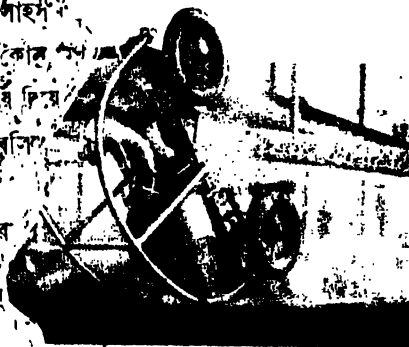
বিচিত্র মোটর-গাড়ী

[illegible] বেগে চলিতে চলিতে এমন ডিগ-[illegible] তে গাড়ীর ত ক্ষতিই হয় না—[illegible]। এক ঊনবিংশবর্ষীয়া যুবতী [illegible] গাড়ী চালাইবার সময় ডিগবাজী দিয়া [illegible] করে। অবশ্য যুবতীর দেহ [illegible] আবদ্ধ ছিল।

দ্রুতগামী মোটর-বোট

কালিফোর্ণিয়ার 'মিস্ লস্ এঞ্জেলস্' নাম্নী একখানি মোটরচালিত নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নৌকার সংলগ্ন মোটর ৭ শত

দ্রুতগামী মোটর-বোট

৫০ ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট। এই নৌকার সাধারণ গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল। সময়ে সময়ে ইহা ঘণ্টায় ৮০ মাইলেরও অধিক বেগে জলপথে চালিত হইয়া থাকে।

সুবৃহৎ তাপপরিমাপক যন্ত্র

তাপপরিমাপক যন্ত্র

মিউনিক সহরের অধিবাসীরা দিনের উত্তাপ বাড়িল কি কমিল, তাহা কোনও 'অবজারভেটরীতে' না গিয়াও জানিতে পারে। জার্ম্মাণ বাড়্-ঘরের অত্যুচ্চ মীনারের গাত্রদেশে একটি তাপপরিমাপক [illegible] একটি বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। [illegible] দুইটি অত্যন্ত বৃহৎ [illegible] উহার ডিগ্রীপরিমাপক অংশগুলি [illegible] বড় বড় অক্ষরে অঙ্কিত এবং রেখা[illegible]
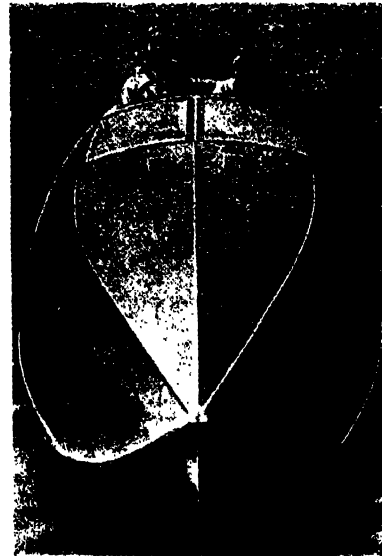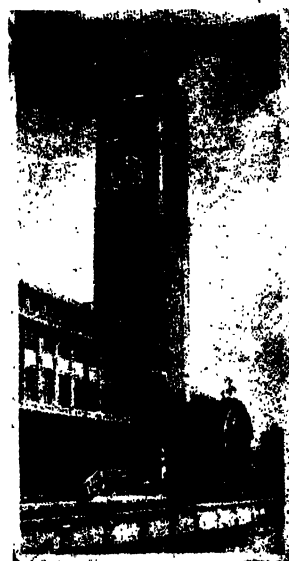
এমন বৃহৎ ও সুস্পষ্ট যে, রাজপথ হইতে যে কোনও লোক বায়ুর চাপ ও উত্তাপের মাত্রা কতদূর উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, তাহা দেখিতে পায়।

অল্প জলের উপযোগী নৌকা

নয় ইঞ্চ মাত্র গভীর জলের উপর দিয়া মোটর-বোট অনায়াসে চালাইতে পারা যায়, ইহার ব্যবস্থা জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী করিয়াছেন। চিত্র দেখিলেই মোটর-বোট ও তাহার নিয়ন্ত্র
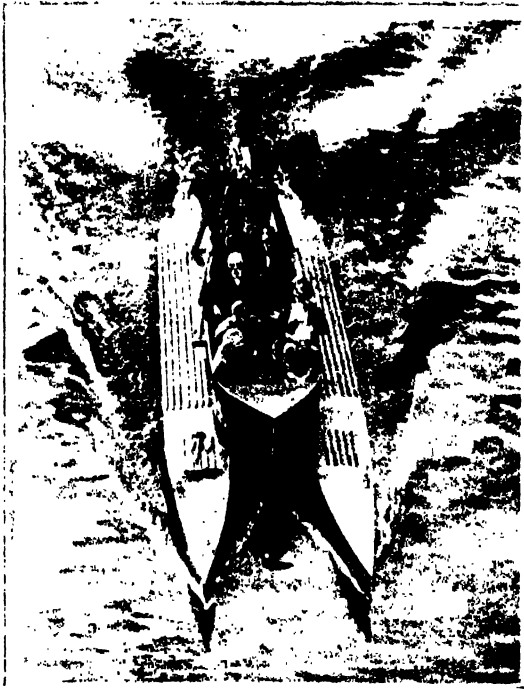
মোটর-চালিত বিচিত্র নৌকা

নৌকাযুগলের পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে। লণ্ডনে সম্প্রতি এই নৌকার পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে। নয় জন আরোহী লইয়া এই নৌকা ঘণ্টায় দশ মাইল গতিতে নয় ইঞ্চ গভীর জলের উপর দিয়া চলিয়াছিল। দুইখানি নৌকা থাকায় এই মোটর-বাহিত বোট কখনও উল্টাইয়া যায় না।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

ইংলণ্ডের কোন দুগ্ধব্যবসায়ী তাঁহার কারখানায় একটি ঘোরান সোপানসমন্বিত মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুগ্ধপরিপূর্ণ বোতলগুলি এই মঞ্চে থাক দিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য যন্ত্রযোগেই তাহা সম্পাদিত হয়। তার পর যখন লরীযোগে দুগ্ধের বোতলগুলি স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হয়, তখন

বিজ্ঞানের [illegible]

মঞ্চ হইতে বোতল নামাইবার জ[illegible] মাধ্যাকর্ষণের ফলে একে একে [illegible] থাকে। মানুষের শ্রমকে পরিহার ক[illegible] এই প্রচেষ্টা অপূর্ব্ব বটে, কিন্তু কালে ই[illegible] সংগ্রামের কঠোরতাও বৃদ্ধি হইবে না কি [illegible]

অব্যক্ত

আমি—তোমারে কত যে ভালবাসি প্রিয়
প্রকাশিব তাহা কেমনে,
লুকায়ে রেখেছি হৃদয়ের প্রেম
হৃদয়ের মাঝে গোপনে।

নীরব ভাষায় যুগল নয়ন
দিবানিশি করে তব উপাসন ;
জাগরণে তব ধেয়ানে মগন
তোমারে নেহারি স্বপনে।

তোমা ছাড়া কিছু জানি [illegible]
তুমি [illegible]
কি যে মন্ত্র দিয়া [illegible]
—দেখ[illegible]

এ শিকল কেটে যেতে [illegible]
আমি যে তোমারি [illegible]
—মধুর স্মরণ করো [illegible]

নবদুর্গা

নবম পরিচ্ছেদ

(শেষাংশ)

পরদিন মোহান্ত এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ভট্টাচার্য্যের বাসস্থান জুড়নপুর গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। সে ফিরিয়া জানাইল, সেখানেও তাহারা ফিরে নাই।

... দিনে বিপিন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিল। ... সন্ধান নাই। পরদিনই বিপিনকে আবার কলিকাতায় ... হইল। সপ্তাহকাল নিমাইয়ের সহিত সে অনু- ... চালাইয়া তার পর ফিরিয়া আসিবে।

... দিনে বিপিনের তার আসিল, "অদ্য পৌছিয়াছে।" ... ঘাট হইতে প্রেরিত। পরদিন তাহার নিকট একখানা ... পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ...

... করায় ... গে তিনি সপরিবারে শিয়ালদহ ... ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া কালীঘাট ... আমিও অপর একখানি গাড়ী ভাড়া ... পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। তিনি যে ..., আমিও যাত্রী সাজিয়া সেই বাড়ীতে ... লইয়াছি—তাঁহার সহিত আলাপও করি- ... জানিতে পারিলাম, তাঁহার স্ত্রী পথে ... ড়ায়, কেদারেশ্বর হইতে দশ মাইল দূর- ... ক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইতে ... রোগী আরোগ্যলাভ করার পর ... ছেন। কন্যার বিবাহ জন্য পাত্র ... এরূপ প্রকাশ করিলেন। পাণ্ডা ... ঘটকীগণকে তিনি এ বিষয়ে সংবাদ ... হুজুরের হুকুমের প্রত্যাশায় রহিলাম।"

পত্র পাঠ করিয়া মাণিক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া মোহান্তকে উহা দেখাইল।

সন্ধ্যার পর উভয়ের পরামর্শ-সভা বসিল,—এখন কি করা প্রয়োজন?

নবদুর্গাকে উধাও করিয়া লইয়া আসার নানারূপ ফন্দির কথা মাণিক বলিল, কিন্তু কোনটাই মোহান্তের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, "ওতে আবার পুলিস-হাঙ্গামা বাধতে পারে। এবার এমন একটা উপায় ঠাওরাও, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।"

মাণিক বলিল, "আচ্ছা, যদি এ রকম করা যায়—ধরুন। বছর বিশ-বাইশ বয়স, বেশ সুশ্রী চেহারা হবে,- বেশ সভ্য ভব্য ফিট-ফাট একটা ছোঁড়াকে যদি টাকা খাইয়ে হাত করা যায়। ধরুন, সে কালীঘাটে গেলে, নিজেকে কলিকাতাবাসী ব'লে জানিয়ে, ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলে;—মেয়েটারও ত ধরুন বয়স হয়েছে—সে যদি তাকে ফোস্‌লাতে পারে—অবশ্য আসল কথা সে কিছুই ভাঙ্গবে না—নিজেই যেন সে ছুঁড়ীটার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, তাকে নিয়ে ত উধাও হ'তে পারে। তার পর, যার জিনিষ, তার কাছে এনে দেবে।"

মোহান্ত বলিলেন, "হয়েছে হয়েছে। না না, ফোস্‌লানো-টোস্‌লানো নয়। তাতেও পুলিস-হাঙ্গামা বাধতে পারে। তোমার কথায় আর একটি খাসা কৌশল আমার মাথায় এসেছে। এমন একটা ছোঁড়া খুঁজে বের কর, যে টাকা খেয়ে, ভট্‌চায্যির কাছে নিজেকে তার স্বশ্রেণীর ব'লে পরিচয় দেবে—গাঁই-গোত্র সব মিলিয়ে ব'লে মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইবে। বিবাহ ক'রে আমাকে এনে দিক্ সে—আমি তাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেবো। তাতে আর কোনও হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকবে না, নির্ব্বিবাদে কার্য্য উদ্ধার হবে।"

মাণিক বলিল, "হ্যাঁ, এতক্ষণে এ সমুদ্রে কূল পাওয়া গেছে!

এই সব চেয়ে ভাল উপায়। আর, ছোঁড়া হবারও দরকার নেই। একটু বয়স হলেও চলবে—দ্বিতীয়পক্ষ তৃতীয়পক্ষ হলেও, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ভট্‌চায তাকে বাবা ব'লে মেয়ে দেবে এখন। বাঃ, চমৎকার উপায়। এ সব কি আর আমাদের মাথায় আসে ছাই! তবে আর রাজবুদ্ধি বলেছে কেন!"

মোহান্ত বলিলেন, "তবে সেই রকম এক জন লোকের সন্ধান কর।"

—

দশম পরিচ্ছেদ

মোহান্ত মহারাজের জমীদারীর অন্তর্গত হরিশপুর কাছারীর নায়েব শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বয়সে যুবক হইলেও এক জন দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত। বিগত পাঁচ বৎসরকাল সে এই কাছারীর ভারপ্রাপ্ত নায়েব। কিছু দিন হইতে এষ্টেটের দেওয়ানজীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল যে, অধরের দাখিল করা হিসাবপত্রের মধ্যে গলদ আছে, সে এইরূপ মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়া জমীদারের টাকা আত্মসাৎ করিয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কেদারেশ্বরে আগমনের কিছু দিন পূর্ব্বে দেওয়ানজী স্বয়ং হরিশপুর কাছারীতে গিয়া স্থানীয় তদন্ত আরম্ভ করেন। ফলে অধরের অনেক দফা অপহরণের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

দেওয়ানজী নিজ তদন্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট মোহান্ত মহারাজের নিকট দাখিল করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। অদ্য অপরাহ্ণে দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া মোহান্ত সেই সকল কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। লোকটার চাতুরী ও ফন্দিবাজির কায়দা দেখিয়া মোহান্ত চমৎকৃত হইলেন। চুরি করিয়াছে বটে, কিন্তু চুরির বাহাদুরী আছে।

এরূপ ঘটনা ঘটিলে, থানা-পুলিস মামলা-মোকর্দ্দমা না করিয়া, জামিনের টাকা জব্দ করিয়া অপরাধীকে বিদায় করাই এই এষ্টেটের রীতি। মোহান্তের আদেশ অনুসারে দেওয়ানজী হুজুরে অধরের তলব করিলেন। ইহা পলায়িত ভট্টাচার্য্যের সন্ধান মিলিবার পরদিনের ঘটনা।

সন্ধ্যার পর মাণিককে ডাকাইয়া অধর সম্বন্ধে মোহান্ত অনেক গোপন পরামর্শ করিলেন।

তৃতীয় দিনে অধর সদরে আসিয়া পৌছিল। আসিয়াই সে কর্ম্মচারীদের মুখে শুনিল, মহারাজ বোধ হয় এবার মামলাটি পুলিসের হাতে দিবেন। শুনিয়া অধরের মুখ শুকাইয়া গেল।

সকলে বলিল, "তুমি ঘোষজাকে ধর। উনি যদি ব'লে কয়ে মহারাজকে রাজি করিয়ে, জামিন জব্দের উপর দিয়ে তোমায় নিষ্কৃতি দেওয়াতে পারেন।"

অধর সদরের খবর ভালরূপই রাখিত। মাণিক ঘোষ যে মোহান্ত মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাহাও অবগত ছিল। সুতরাং সে অবিলম্বে মাণিক ঘোষের সন্ধানে ছুটিল।

অধর মাণিককে অনেক স্তুতি-মিনতি করিল, তাহার কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিল। বলিল, জেল হইলে তাহার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে মারা যাইবে। মাণিক খুব গম্ভীর হইয়া রহিল। অবশেষে বলিল, "দেখি মহারাজের সঙ্গে কথা কয়ে। তুমি কাল আবার আমার সঙ্গে এসে দেখা ক'রো।"

পরদিন যথাসময়ে অধর গিয়া মাণিক ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন আমার বিষয়?"

"কয়েছিলাম।"

"কি বল্লেন তিনি?"

"তুমি যদি মহারাজের একটি উপকার করতে [illegible] হ'লে তিনি তোমায় ম[illegible] করেন।"

অধর আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উ[illegible] কি আমায় করতে হবে, বলুন।"

মাণিক গম্ভীরভাবে বলিল[illegible] শুনেছি। কিন্তু তোমায় আর এ[illegible]

শুনিয়া অধর ফ্যাল-ফ্যাল [illegible] চাহিয়া রহিল। অবশেষে বলিল, [illegible] তামাসা করছেন?"

"না, তামাসা করিনি। মহারাজ অ[illegible] করেছেন, তাই আমি তোমায় জানাচ্ছি ম[illegible]

"বিবাহ করতে হবে? কার [illegible] করলে মহারাজের কি উপকার হ[illegible] পারছিনে, ঘোষজা মশাই।"

মাণিক বলিল, "সব কথা [illegible] বুঝতে পারবে। কিন্তু, কথাটা [illegible] আমি তোমার কাছে যে প্রস্তা[illegible] তাতে সম্মত না-ও হ'তে পার[illegible]

লোকের দ্বারা সে কাযটুকু আমরা করিয়ে নেবো, মাত্র জামিন জব্দ ক'রে তোমায় বিদায় দেওয়া হবে। কিন্তু তুমি যদি ঘুণাক্ষরে কারু কাছে তা প্রকাশ কর, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো, মোহান্ত তোমায় জেলে পুরবেনই পুরবেন।"

অধর কাতরভাবে বলিল, "না ঘোষজা মশাই—আমার মুখ থেকে প্রাণান্তেও কোনও কথা বের হবে না। ব্যাপারটা কি, আমায় খুলে বলুন আপনি। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি মহারাজের আদেশ প্রতিপালন করবো।"

মাণিক তখন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার কন্যাঘটিত সমস্ত বিষয় অধরের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে কলকাতায় গিয়ে, এক জন বড় লোক সেজে, ভট্টাচা'র্যর সেই মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে মহারাজের হাতে তাকে এনে দিতে হবে।"

অধর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আইনতঃ এতে আমি কোনও অপরাধে অপরাধী হব না ত?"

...চু না। তুমি বরং উকীল-ব্যারিষ্টারদের কাছে গিয়ে, জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো। নিজের নাম ক'রে কি আর বলবে, তোমাদের দেশের কোনও লোকের মেয়েকে বিয়ে ক'রে তার স্ত্রীকে অর্থলোভে এক জন বড় হাতে সমর্পণ করেছে, সেই নরাধম স্বামীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চলতে পারে কি না? তুমি যেন সেই বাপের ত... ...লোক, এই রকম ভাবটা প্রকাশ

...ণ ভাবিল। তার পর বলিল, ... বিবাহিতা স্ত্রীকে এনে, মহারাজের ...। কিন্তু তার বাপ-মা—আমার নতুন ...জি হবে কেন?"

"তুমি হ'লে স্বামী—স্ত্রীর উপর সম্পূর্ণ ...। বাপ-মায়ের কি সাধ্য যে, তোমার বিবাহের পর, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে ...য় দিলেই হবে। মাসে মাসে তুমি ...জই সে সমস্ত ব্যয় বহন করবেন। ...ম তোমার শ্বশুরকে চিঠি লিখো—' আপনার কন্যা কাল বিসূচিকা ... এ ঘটনায় প্রাণে আমি যার-পর- ...নই জন্য স্থির করিয়াছি, কিছু দিন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ প্রণামান্তে বিদায়।'"

এ কথা শুনিয়া অধর হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ঘোষজা মশাই, আপনার মাথা ত খুব খেলে দেখ্ছি।"

মাণিক বলিল, "তা হ'লে তোমার মত কি বল? মহারাজকে গিয়ে কি বল্‌বো আমি?"

অধর চিন্তিতভাবে বলিল, "কাযটা ত বড় সোজা নয়, ঘোষজা মশাই, সে ত আপনি বুঝতেই পারছেন! ধরুন, যদিই আমি রাজি হই, পুরস্কার কি পাব তা হ'লে?"

মাণিক বলিল, "পুরস্কার? এক নম্বর, ধর, তোমায় জেলে যেতে হবে না। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণাদি যা পাওয়া গেছে, সে সব ত তুমি জান—মোকর্দ্দমা করলে, জেল ত তোমার অনিবার্য্য! দুই নম্বর, ধর, তোমার জামিন আছে দু'হাজার টাকার—সে টাকা জব্দ হবে না। তিন নম্বর, তুমি যে হাজারখানেক টাকা খেয়েছ, সেটা তোমায় ওগরাতে হবে না। চার নম্বর, তোমার চাকরি বজায় থাক্‌বে—যে পরগণায় তুমি ছিলে, সে পরগণাতে না হোক, মোহান্ত এষ্টেটের অন্য কোনও পরগণাতে তোমায় নায়েবী পদ দেওয়া হবে।"

অধর চক্ষু নত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তার পর চোখ তুলিয়া বলিল, "ঐ চার নম্বর যেটা বল্লেন, ওটা ত আপনার মত প্রবীণ, বুদ্ধিমান্ লোকের বলা সাজে না, ঘোষজা মশাই?"

"কেন, অসাজন্ত কথা কি আমি বলেছি?"

"এ ঘটনার পর, ধরুন, আর কি আমি লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবো? যতই আপনারা গোপন রাখতে চেষ্টা করুন না, সময়ে কথাটা জানাজানি হবেই হবে। লোকে তখন বলবে, এই ব্যাটা টাকার লোভে মোহান্তকে নিজের বিবাহিতা পরিবার দিয়েছে। গায়ে আমার থুথু দেবে যে লোকে!"

মাণিক এ কথা শুনিয়া একটু রুষ্ট হইল। বলিল, "তা হ'লে তোমার দ্বারা এ কায হবে না বল? তাই তা হ'লে মহারাজকে বলি গে,—অন্য লোকের সন্ধান আমরা দেখি?"

অধর বলিল, "আহা, চটেন কেন? চটেন কেন? পারবো না, এ কথা কি আমি বলেছি? তবে সব দিক্ ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে দেখতে হবে ত? এ এষ্টেটে নায়েবী কা...

আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না—এটা ঠিক। নগদ টাকা কিছু না পেলে—”

মাণিক বাধা দিয়া বলিল, “তা যদি দুই এক হাজার চাও, তার জন্যে কি আটকাবে হে?”

অধর বলিল, “আপনি রহস্য করছেন? দু'হাজার টাকা আমি ক'দিন খাব মশাই! এ ঘটনার পর, নায়েবী করা ত আমার পক্ষে সম্ভব হবেই না,—দেশে থাকাও দায় হবে। স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে, দেশত্যাগ ক'রে, আমায় অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে হবে। কাশী কি বৃন্দাবন কি হরিদ্বার—এই রকম কোনও এক দূরদেশে, নাম ভাঁড়িয়ে গিয়ে বাস করতে হবে। চিরজীবনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাটা না হ'লে, আমি কি ক'রে এ কাযে হাত দিই বলুন? একটা লোকের চির-জীবন ভরণ-পোষণে কত ব্যয় হয়, হিসেব ক'রেই দেখুন না কেন? আর শুধু খাওয়া-পরা ত নয়,—ছেলে-মেয়ের বিয়ে আছে, পৈতে আছে, লেখাপড়া শেখানোর খরচ আছে—কোন খরচটাই বা নেই?”

মাণিক বলিল, “বেশ, কত চাও তুমি, তাই বল।”

অধর একটু মুস্কিলে পড়িল। “আমার এত চাই”—বলিলে শেষে ঠকিয়া যাইবে না ত? মোহান্তের জীবনের পূর্ব্ব-ইতিহাস সে শুনিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে মোহান্তের কতদূর ঝোঁক, তাহাও সে অনুমানে বুঝিল। সে ঝোঁক পরিতৃপ্ত করিতে তিনি মুক্তহস্তেই ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইবেন। আগে হইতে “এত টাকা হইলেই আমি রাজি”—এ কথা বলা কি যুক্তি-যুক্ত?

সুতরাং সে সাবধানে বলিল, “এ বিষয়ে আমি নিজে কি বলবো বলুন?—আমার তরপের সমস্ত কথাগুলো দয়া ক'রে মহারাজকে আপনি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবেন।”

“আচ্ছা, আজ রাত্রে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বলবো এখন। কাল তুমি আবার এই সময়ে এস,—তিনি কি বলেন, তাও তোমায় জানাব।”

অধর বলিল, “সেই ভাল কথা। আমিও আজ রাতটা একটু ভেবে চিন্তে দেখি। হাঁা, আর একটা কথা। মহা-রাজকে আমার আর একটা প্রার্থনার কথা জানাবেন। আমি এ কাযে হাত দেবার আগে, তিনি যেন দয়া ক'রে এই মোকদ্দমা-টোকদ্দমার বিভীষিকা হ'তে মুক্তি দেন। কেন না, আমার মনে যদি সেই বিভীষিকাটা থেকে যায়, মন চঞ্চল থাকবে,—এ ব্যাপারে আমায় যা করতে কর্ম্মাতে হবে, সে সব কিছুই আমি ভাল ক'রে করতে পারবো না। আর কিছু নয়, শুধু তিনি লিখে দেবেন—'তোমার নায়েবী কার্য্যকালে হিসাবে যা কিছু গোলমাল ঘটিয়াছিল, সে টাকা তোমার নিকট আমি বুঝিয়া পাইয়া, আইনঘটিত কোনও প্রকার দেওয়ানী বা ফৌজদারী দায়িত্ব হইতে আমি তোমায় রেহাই দিল' মহারাজের সই-করা এই রকম একটা হুকুমনামা যদি পাই, তা হ'লে সেইটেই হবে আমার রক্ষা-কবচ। দশটা হাতীর বল নিয়ে, যাতে তাঁর কার্য্যসিদ্ধ হয়, ... পারবো।”

মাণিক মনে মনে বলিল, “লোকটা কি ধড়িবাজ। এ কায হাঁসিল করতে হ'লে এই রকম লোকেরই দর... প্রকাশ্যে বলিল, “বেশ, এ সব ... আমি ম... বলবো। কাল তুমি এই সময়... কোরো তা হ'লে।”

অধর তখন বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীপ্রভাতকু...

প্রার্থনা

দাও গো ঢালিয়া দগ্ধ পরাণে, বিমল-শান্তি-ধারা,
মোহের ছলনে ভুলিয়া আজিকে, হয়েছি সকল-হারা।

চাহি নাক আর ধরণীর ওই, অলীক সুষমা-রাশি,
জ্যোৎস্না-প্লাবিত চাঁদনী রাতের, স্নিগ্ধ মধুর হাসি।
চাহি নাক আম ঝঙ্কারে ঘেরা, ভোরের ললিত গান,
...ফুল মলয়ে ভেসে আসা সেই, পাপিয়া-কণ্ঠ-তান।

চাহি না উজল কাঞ্চনস্তূপ, মণি-...
কিম্বা প্রিয়ার রূপের মাধুরী, মুক্ত...
পিশাচের পাপ, দেবের পুণ্য, কি...
(শুধু) মরুময় প্রাণে শান্তির বারি, ঢা...

রামরাবণের যুদ্ধকাল এবং রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা

উক্ত দুই বিষয়ে সম্প্রতি অনেকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন—কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়া আশ্বিনমাসে স্বয়ং দুর্গাদেবীর বোধন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন এবং দশমীতে বিসর্জন করিয়া রাবণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত :হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাস কোথা হইতে পাইলেন ?

বলেন, বোধনের মন্ত্রে আছে—

"রাবণস্থ বধার্থায় রামস্থানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।"

বিল্ববৃক্ষ !) রাবণের বধ ও রামের প্রতি অনুগ্রহ জন্ত ব্রহ্মা অকালে (অর্থাৎ দেবতাদিগের রাত্রিকাল ার মধ্যে আশ্বিনমাসে) তোমাতে দেবীর বোধন .লন। ইত্যাদি।

এব দেখা যাইতেছে, আশ্বিনমাসে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা ন এবং তা বহ্মা পুরোহিত হইয়া বোধনাদি কার্য্য ন।

.াছে—

.শৈচত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশী।
.ন্তব মধ্যং পঞ্চদশাহকম্।
ামো দ্বাসপ্ততিদিনান্তভূৎ।"
(পাতাল, ৬৮।২১)

দ্বিতীয়া হইতে চৈত্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী মধ্যে ১৫ দিন যুদ্ধ বন্ধ ছিল, ৭২ দিন যুদ্ধ

রামরাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, স্পষ্টই াসের পুষ্যানক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক

াসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
র সর্ব্বমেবোপকল্প্যতাম্।"
(অযোধ্যা, ৩।৪)

মৎ পুষ্যাং পূর্ব্বং পুনর্ব্বসুম্।
তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ।"
(অযোধ্যা, ৪।২১)

(দশরথ বলিয়াছিলেন) এই চৈত্রমাস। রামের যৌবরাজ্যের জন্ত সমস্ত আয়োজন কর। আজ পুনর্ব্বসুর পর পুষ্যানক্ষত্র পড়িবে ; কল্য সমস্ত দিনই পুষ্যানক্ষত্র থাকিবে, এই কথা দৈবজ্ঞরা বলিতেছেন। ইত্যাদি।

সুতরাং চৈত্রমাসে রাবণবধ না হইলে বনবাসের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হয় না।

কেহ বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—

"পূজিতঃ সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিহারিণী।
মধুমাসসিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্ব্বকম্।
তৎপশ্চাদ্ রামচন্দ্রেণ রাবণস্থ বধার্থিনা।
তৎপশ্চাত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিমানবৈঃ।"

প্রথমে সুরথ রাজা চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমীতে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। তার পর রাবণবধের জন্ত রামচন্দ্র এবং তৎপরে ত্রিভুবনের দেবতা, মুনি ও মানবরা পূজা করেন।

এতাবতা চৈত্রমাসেই দুর্গাপূজা সিদ্ধ হইতেছে।

কেহ বলেন, মার্কণ্ডেয়পুরাণে (চণ্ডীতে) আছে—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ।"

প্রতি বৎসর শরৎকালে আমার যে পূজা করা হয়, তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য শুনিলে—

ইহা দ্বারা আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা পাওয়া যাইতেছে। কালিকাপুরাণেও (৬০ অঃ) আছে—

"রামস্থানুগ্রহার্থায় রাবণস্থ বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।"

রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণকে বধ করিবার জন্ত রাত্রিকালেই (দক্ষিণায়নে) ব্রহ্মা মহাদেবীকে জাগরিত করিয়াছিলেন।

বাল্মীকি-রামায়ণের প্রাচীন টীকাকার তীর্থ ও কতক-কারের মতে—

"ততোঽস্তমগমৎ সূর্য্যঃ সন্ধ্যয়া প্রতিরঞ্জিতঃ।
পূর্ণচন্দ্রপ্রদীপ্তা চ ক্ষপা সমতিবর্ত্ততে।"

(লঙ্কা, ৩৮।১৩) ইত্যাদি বর্ণনায় পূর্ণিমায় রাত্রিতে রামচন্দ্রের লঙ্কাদর্শনার্থ সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ। তার পর কৃষ্ণা প্রতিপদে যুদ্ধারম্ভ। সেই দিন রাত্রিতে নাগপাশে বন্ধন ও মুক্তি। দ্বিতীয়ায় ধূম্রাক্ষবধ। তৃতীয়ায় বজ্রদংষ্ট্রবধ।

চতুর্থীতে অকম্পনবধ। পঞ্চমীতে প্রহস্তবধ। ষষ্ঠীতে রাবণের যুদ্ধে ভঙ্গ। সপ্তমীতে কুম্ভকর্ণবধ। অষ্টমীতে অতিকায় প্রভৃতির বধ। নবমীতে ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগ। দশমীতে দিবাভাগে নিকুম্ভবধ; রাত্রিতে মকরাক্ষবধ। একাদশী হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত তিন দিনে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ও বধ। চতুর্দ্দশীতে মূলসৈন্য-সংহার। অমাবস্যায় রাবণের যুদ্ধ ও বধ। এইরূপে ১৫ দিনের মধ্যেই যুদ্ধের আরম্ভ ও সমাপ্তি হইয়াছিল।

বিজ্ঞজনদিগের এই সকল মতভেদ সত্ত্বেও মাদৃশ অজ্ঞজনের স্বকৃত সিদ্ধান্ত কাহারও মনোরম হইবে না। এ কারণ, বাল্মীকি-রামায়ণের অবাচীন সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক টীকাকার রামানুজের সিদ্ধান্তই সাধারণের গোচর করিব। তৎপূর্ব্বে বক্তব্য এই যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে স্বকপোলকল্পিত অনেক কথা রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি উল্লেখ করিতেছি। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, রামজন্মের পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্র জন্মিয়া তদনুরূপ সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। যথা—

"ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হ'তে তব নাম বাল্মীকি হইল।
বল্মীকেতে ছিলা যেই সেই এ বিধান।
সাত কাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ।
* * *
শ্লোকছন্দে পুরাণে কহিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা।"

কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র রাবণবধ করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাল্মীকি নারদের মুখে সংক্ষেপে তাঁহার চরিত্র শুনিয়া বিস্তৃতি সহকারে বালকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত ৬ কাণ্ড লিখিয়াছিলেন। তৎপরে সীতানির্ব্বাসনাদি ভবিষ্যৎ চরিত্র স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া উত্তরকাণ্ড বা পরিশিষ্টরূপ সপ্তম কাণ্ড প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যথা—

"তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্ম্মুনিপুঙ্গবম্। ১
কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ। ২
শ্রুত্বা চৈতৎ ত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ। ৬
(বাল, ১ম সর্গ)

"স যথা কথিতং পূর্ব্বং নারদেন মহাত্মনা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্মুনিঃ।"
(বাল, ৩।৯)

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ।
চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ, ষট্‌, কাণ্ডানি, তথোত্তরম্।"
(বাল ৪।১-২)

কালিকাপুরাণের বচনে রামচন্দ্রের বিজয়লাভ ও রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা নিজলোকে দেবীর বোধন ও পূজা করিয়াছিলেন। "রাবণস্য বধার্থায়" ইত্যাদি বোধনমন্ত্রেও তাহাই বুঝাইতেছে। রামচন্দ্র স্বয়ং দুর্গাপূজা করেন নাই; এই জন্য বাল্মীকি-রামায়ণে উহার উল্লেখ নাই।

লঙ্কাকাণ্ডের ১১০ সর্গের শেষে রামানুজ পূর্ব্বোক্ত তীর্থ ও কতকের উক্তি উল্লেখ করিয়া যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই—

"চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ" ইত্যাদি (পূর্ব্বোক্ত) শ্লোকদ্বয়ে জানা যায়, চৈত্রমাসে পুষ্যা নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে চৈত্রের শুক্লা নবমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত যে কোনও দিনে পুষ্যানক্ষত্র হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নবমী রিক্তা তিথি বলিয়া অভিষেকের অযোগ্য। পূর্ণা তিথি দশমীই রাজ্যাভিষেকের যোগ্য। অভিষেকদিবসেই বনগমন হওয়ায় চৈত্রী শুক্লা দশমীতেই বনবাস আরম্ভ হইয়াছিল।

"পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং ভরতাগ্রজঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ববন্দে নিয়তো মুনিম্।"
(লঙ্কা ১২৬।১)

পঞ্চমীতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে, সেই দিনেই রামচন্দ্র (লঙ্কা হইতে) ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিয়া মুনিকে [illegible] করিয়াছিলেন।

মুনি রামকে বলিয়াছিলেন—

"অহমপ্যত্র তে দদ্মি বরং শস্ত্রভৃতাং বর।
অর্ঘ্যং প্রতিগৃহাণেদমযোধ্যাং শ্বো গমিষ্যসি [illegible]
(লঙ্কা [illegible]

আমি তোমাকে এইখানেই বর দিতেছি। [illegible] এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। কল্য (ষষ্ঠী[illegible]) অযোধ্যা[illegible] করিবে।

তাহা হইলে কোন্ মাসে [illegible] হইয়া অমাবস্যায় সমাপ্ত হইয়া[illegible] যুদ্ধসমাপ্তি ধরিলে, ফাল্গুনী শুক্লা[illegible] বর্ষ পূর্ণ হয় না; ৩৬ বা ২১ দি[illegible] শুক্লা পঞ্চমী ধরিলে ৫ দিন ন্যূন[illegible] অমাবস্যায় যুদ্ধসমাপ্তি ধরিলেও [illegible] চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হয় না। চৈত্রী কৃ[illegible] অধিক হয়। অধিক দিন বনবাসে থা[illegible] ছিল না। বিশেষতঃ চিত্রকূট পর্ব্বতে [illegible] প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

"চতুর্দ্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষে[illegible]
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বান্তু প্র[illegible]

চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে, প[illegible] যদি আপনাকে অযোধ্যায় দেখি[illegible] আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব।

অতএব ১০ দিন পরে অ[illegible] প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়। সুতরাং রা[illegible]

পুরাণ ও কালিকাপুরাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে।

পদ্মপুরাণের মতে—দ্বাদশ বর্ষ সমাপ্তির পর ত্রয়োদশ বর্ষের কিঞ্চিৎ অতীত হইলে ফাল্গুনমাসের অষ্টমীতে সীতাহরণ। চতুর্দ্দশ বর্ষের কিঞ্চিৎ অতীত হইলে রামের লঙ্কাসমীপে গমন। মার্গ (অগ্রহায়ণ) শুক্লা দশমীর পর দুই দিনে হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ। পৌষ শুক্লা চতুর্দ্দশী বা পূর্ণিমায় রামের ত্রিকূটশিখরে আরোহণ। তার পর ১৫ দিন সেনানিবেশ, দূতপ্রেরণাদি কার্য্যে গত হইয়াছিল। তার পর মুখ্য শ্রাবণ ও গৌণ ভাদ্রের অমাবস্যা পর্য্যন্ত লঙ্কাপুরীর বাহিরে উভয় সেনার সঙ্কুল যুদ্ধ।

"ততো জজ্ঞে মহাযুদ্ধং সঙ্কুলং কপিরক্ষসাম্।
মধ্যাহ্নে প্রথমং যুদ্ধং প্রা-ব্ধং প্রতি-ভভূৎ।"

উক্তরূপে কপিরাক্ষসদিগের সঙ্কুল যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে মুখ্য ভাদ্রের শুক্লা প্রতিপদে মধ্যাহ্নসময়ে (লঙ্কাপুরীর ভিতরে) প্রথম যুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছিল।

"দ্বি-ীয়েঽহনি ধূম্রাক্ষং হনূমান্নিজঘান বৈ।
তৃতীয়েঽহ্নি বজ্রদংষ্ট্রং খড়্গাচ্চিচ্ছেদ চাঙ্গদঃ।
-ঘান হনূমান্ ভূয়শ্চতুর্থেঽহন্যকম্পনম্।
প্রহস্তং পঞ্চমীতথ্যাং নীলশ্চিচ্ছেদ মূর্দ্ধনি।
-াবণঃ পরিভূতোঽভূৎ ষষ্ঠ্যাং রামেণ ধন্বিনা।
-থ লঙ্কেশ্বরঃ খিন্নঃ কুম্ভকর্ণং সহোদরম্।
-সমুদ্যা-যা তাম্বধাবনাদ্যৈরবোধয়ৎ।
-ঘান তং কুম্ভকর্ণং রামঃ সপ্তমবাসরে।"

-র হনুমান্ ধূম্রাক্ষকে বধ করিয়াছিল। তৃতীয়ায় -দংষ্ট্রের শিরশ্ছেদন করে। চতুর্থীতে হনুমান্ -বিনাশ- পঞ্চমীতে নীল প্রহস্তের শির- -। ষষ্ঠী- -নিকট রাবণ পরাভূত হয়। -। নানা উপায়ে কুম্ভকর্ণের -সপ্তম দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমায় -য়াছিলেন।

-হত্যারতিকায়ং দশা-ন্তকম্।
-ব্রহ্মাস্ত্রেণ নৃপো কপীন্।"
(লক্ষ্মণ ও অতিকায় উপলক্ষণ)

(অর্থাৎ ভাদ্রী কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে -লক্ষ্মণ, অঙ্গদ ও হনুমান্ কর্ত্তৃক অতিকায়, -ক, মহোদর ও মহাপার্শ্বের বধ। -জিৎ রাম, লক্ষ্মণ ও বানরদিগকে

-চৌষধমহীধরঃ।
-র্ব্ব এতে সমুত্থিতাঃ।
-ং নিকুম্ভং বায়ুজোঽবধীৎ।
-ঘান মকরেক্ষণম্।
-দনং যোধয়ন্ বলী।
সা-গাদে -- -ং রামধ্যানেন হেতুনা।"

(অষ্টমীতে) হনুমান্ ওষধিপর্ব্বত আনিলে তাহার বায়ুস্পর্শে সকলের উত্থান। পরদিন (নবমীতে) হনুমান্ কর্ত্তৃক কুম্ভ ও নিকুম্ভের বধ। নবমীর রাত্রিতে রাম মকরাক্ষকে বধ করেন। লক্ষ্মণ (দশমী হইতে) তিন দিন যুদ্ধ করিয়া ত্রয়োদশীতে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছিলেন।

"ততোঽবধীন্মূলবলং চতুর্দ্দশ্যাং রঘূত্তমঃ।
দর্শে চ নির্যযৌ রাজা যোদ্ধুং রামেণ সংযুগে।
* * *
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা রাঘবো রাক্ষসান্তকঃ।
জঘান রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ শরৈঃ কালান্তকোপমৈঃ।
ভয়াৎ প্রাদুদ্রাব রণে লঙ্কাং প্র-ত নিশাচরঃ।
জগ্রামমরং পশ্যন্ নির্ব্বেদাৎ স্বগৃহং বিশৎ।
নিকুম্ভিলাং ততঃ প্রাপ্য হোমং চক্রে জিগীষয়া।
ধ্বংসিতং বানরৈস্তস্য-ভিচারাস্ত্রকং রিপোঃ।
পুনরুত্থায় পৌলস্ত্যো রামেণ সহ যোধিতুম্।
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য রাক্ষসৈর্নির্যযৌ বহিঃ।"

চতুর্দ্দশীতে রামচন্দ্র মূলসৈন্য নিহত করিলে রাবণ অমাবস্যায় রামের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইল। তার পর রামচন্দ্র রাবণানুচর সমস্ত রাক্ষসকে বধ করিলে রাবণ ভয়ে লঙ্কার মধ্যে নিজ গৃহে প্রবেশ করিল। জয়েচ্ছায় নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হোম করিতে থাকিলে বানররা তাহা নষ্ট করিয়া দিল। তখন রাবণ উঠিয়া রথারোহণপূর্ব্বক (আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদে) পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইল।

"ততঃ শতমখো দিব্যং রথং হর্য্যশ্বসংযুতম্।
রাঘবায় স্বসূতেন প্রেরয়ামাস ভক্তিমান্।"

তার পর (দ্বিতীয়ায়) ইন্দ্র নিজ সারথি মাতলি দ্বারা রামের জন্য রথ পাঠাইয়াছিলেন।

"ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং রামরাবণয়োর্ম্মহৎ।
সাপ্তাহিকমহোরাত্রং শস্ত্রাস্ত্রৈরতিভীষণৈঃ।"

তার পর (তৃতীয়া হইতে) সাত দিন ধরিয়া রামরাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল।

এতাবতা আশ্বিনী শুক্লা নবমীতে রাবণবধ হইয়াছিল, বুঝা যাইতেছে।

কালিকাপুরাণেও এই কথাই আছে। যথা—

"রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।
ততস্ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্ রাঘবঃ পুরা।
* * *
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সপ্তাহং সা ত্বযোজয়ৎ।
ব্যতীতে সপ্তমে রাত্রে নবম্যাং রাবণং ততঃ।
রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী।"

রামের প্রতি অনুগ্রহ ও রাবণের বধের জন্য ব্রহ্মা (নিজ লোকে) রাত্রিতে মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। দেবী নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষে প্রতিপদে লঙ্কায়

গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সেখানে পূর্ব্বেই উপস্থিত ছিলেন। দেবী সপ্তাহকাল (দ্বিতীয়া হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত) রামরাবণের যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। সপ্তমী-রাত্রি গত হইলে (অর্থাৎ সাত দিন অতীত হইলে) নবমীতে রামের দ্বারা রাবণের বধ করাইলেন।

এখন (পূর্ব্বোক্ত) "পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং ভরতাগ্রজঃ" ইত্যাদি রামায়ণের উক্তি দ্বারা স্থির হইতেছে যে, রাবণবধের পর আশ্বিনী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল এবং তৎপরদিন ষষ্ঠীতে রামচন্দ্র অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইতেছে—চৈত্রী শুক্লা দশমীতে বনগমন ধরিলে (পূর্ব্বোক্ত ৫ দিন, ২১ দিন বা ৩৬ দিন নহে), ১১০ দিন ন্যূন থাকিতে আশ্বিনী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে কিরূপে ১৪ বৎসর পূর্ণ হইল ?

তদুত্তরে বক্তব্য—পাণ্ডবদিগের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের ১৩ বৎসর যেরূপে গণিত হইয়াছিল, সেইরূপে গণনা করিলে ১১০ দিনের ন্যূনতায়ও ১৪ বৎসর পূর্ণ হইয়া থাকে। যথা—

বিজয়া-দশমীতে পাণ্ডবদিগের বনবাস আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে কৌরবেরা বিরাটের গোহরণ করিতে গিয়াছিলেন। তৎকালেই পাণ্ডবেরা প্রকট হইয়াছিলেন দুর্য্যোধনের ধারণা ছিল, আগামিনী বিজয়া-দশমীতে ১৩ বৎসর পূর্ণ হইবে। তৎপূর্ব্বেই প্রকট হওয়ায় পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার ১২ বৎসর বনবাস ও ১ বৎসর অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভীষ্মের নিকট প্রস্তাব করিলে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন, পরমধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির যথাতথই প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছেন। যেহেতু—

> "তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
> পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপচীয়তঃ ॥
> এষামভ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
> ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥"
>
> (বিরাট, ৫২।৩-৪)

গ্রহনক্ষত্রের ব্যতিক্রমে কালের আধিক্য ঘটায় প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে ২ মাস বৃদ্ধি পায়। অতএব বিজয়া-দশমীর ৫ মাস ১২ দিন পূর্ব্বে (অর্থাৎ বিগত চৈত্রী কৃষ্ণা সপ্তমীতে) ইহাদিগের ১৩ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয় নাই।

ইহার বিবৃতি—৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে সৌর বৎসর, ৩৬০ দিনে সাবন বৎসর এবং ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে। সুতরাং সাবন বৎসর অপেক্ষা চান্দ্র বৎসরে ৬ দিন ন্যূন হয়। অতএব প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে চান্দ্রমানে সাবনমান অপেক্ষা দুই মাস (৬০ দিন) অধিক হয়। ৫×৬=৩০ দিন এবং মলমাসের ৩০ দিন। সুতরাং চান্দ্রমানে ১৫ সাবন বৎসরে ৬ মাস (১৮০ দিন) অধিক হইত। তাহা হইতে ১ বৎসরের ১২ দিন বিয়োগ করিলে ১৬৮ দিন থাকে। ৩০ দিনে সাবন মাস, ২৯। দিনে চান্দ্রমাস বলিয়া ১৭০ দিন (অর্থাৎ ৫ মাস ২০ দিন) হইতে ২। দিন বাদ দিলে অবশিষ্ট ১৬৭। দিনকে ১৬৮ দিনই ধরিতে হইবে। অতএব চান্দ্রমানে মুখ্য আশ্বিনের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ১৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কোনও বিসংবাদ থাকিতেছে না এবং সকল পুরাণের সামঞ্জস্যও রক্ষিত হইতেছে।

যাঁহারা "মাঘশুক্লদ্বিতীয়ায়াং" ইত্যাদি এবং "ততো মাঘ-সিতাষ্টম্যাং" ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় বচন নির্দ্দেশ করেন, তাঁহা-দিগকে রামানুজের টীকানুসারে স্ব স্ব উদ্ধৃত পাঠের সমালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বচনে চৈত্রমাসে সুরথ রাজারই দুর্গাপূজা বুঝাইতেছে। তার পর রামচন্দ্র করিয়া-ছিলেন বলায়, অন্যান্য পুরাণের সহিত একবাক্যতায় আশ্বিন-মাসেই রামের পূজা সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা যে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা রামেরই মঙ্গলকামনায় বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পরম্পরাসম্বন্ধে তাহাকে রামের পূজা বলা হইয়াছে বলিলে কোনও বিরোধই থাকে না।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

লক্ষ্মীলাভের উপায়

বঙ্গবাসী মা'লক্ষ্মীর পূজা রীতিমত বৎসরে চারি ব[illegible] থাকেন। অথচ বাঙ্গালীজাতির প্রতি যে মায়ের কৃপা আছে, এমন বোধ হয় না। অশন-বসনা[illegible] বঙ্গবাসী সবিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহাতে স[illegible] অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধানে সমর্থ বাঙ্গালী অল্পই। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকে অভাব-অভিযোগ। অন্নকষ্ট বস্ত্রকষ্ট ত আছেই, তদ্ব্যতীত গ্রীষ্মকালে জলকষ্টও হয়। ভক্তিভাবে মা'র পূজা করিয়াও [illegible] সন্তানগণ তাঁহার প্রসাদলাভে অসমর্থ[illegible]

হয় ত কেহ বলিতে পা[illegible] বর্ণি[illegible] করা হইতেছে, তাহা [illegible] অনেক ব্যক্তি মায়ের অপার ক[illegible] এই যে, সেরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা [illegible] মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ধনশালী [illegible] জাতীয় দারিদ্র্য গোপন করা যায় না।

প্রশ্ন এই যে, বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ [illegible] ভক্তিরসাপ্লুত অঞ্জলি কেন মা গ্রহণ ক[illegible] করেন, তবে তিনি কেন সন্তানের দু[illegible] অভয়দানে সন্তানকে আশ্বস্ত করেন না, তাঁহার হৃদয়ে কি করুণার সঞ্চার হয়[illegible] ঐশ্বর্য্যের অধিকারী জগতের সর্ব্বত্র ধ[illegible] গণকে তুষ্ট ও পুষ্ট করিতেছেন, [illegible] সন্তানগণের প্রতি কৃপাকটাক্ষ[illegible] কারণ কি ?

তবে কি বাঙ্গালীর ভক্তি—[illegible] পূজা—পূজা নহে ? যদি পূজা [illegible] বাঙ্গালীর গৃহে ধন কৈ ? গো[illegible]

গাভী কৈ? অমৃতোপম দুগ্ধ ঘৃত নবনীত কৈ? অঙ্গে বস্ত্র কৈ? পুষ্করিণীতে বিশুদ্ধ পর্য্যাপ্ত জল কৈ?

নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর লক্ষ্মীপূজায় কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়। পূজার কোন অঙ্গে, কোন অনুষ্ঠানে, কোন প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি লুকায়িত থাকে, সেই জন্যই লক্ষ্মীপূজা করা সত্ত্বেও বাঙ্গালী লক্ষ্মীলাভে সমর্থ হয়েন না।

বালকগণ যেমন সম্বৎসর অধ্যয়ন না করিয়া কেবলমাত্র সমারোহে সম্পাদিত শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজার দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে না, তেমনই সর্ব্বদা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী মাতার প্রিয়কার্য্য না করিয়া বৎসরে চারিবার ঘটে, পটে বা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিলেও তাঁহার কৃপালাভ করা যায় না। বাস্তবিক তাঁহার আগমন হয় কি না সন্দেহ। যদি তাঁহার আগমনই হয়, তবে কি সে গৃহে কোন অভাব থাকিতে পারে?

মনুষ্য যেমন নিমন্ত্রিত হইলেই সকল গৃহেই যায় না, মাতাও তেমনই আবাহনমাত্রেই সকল গৃহে উপস্থিত হন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার বড় শক্ত নিয়ম। এ বিষয়ে অনেক শাস্ত্র-বচন আছে, এ স্থলে মাত্র একটির অবতারণা করা যাইতেছে, কেন না, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইবে, কিরূপ গৃহ তাঁহার প্রিয়, কিরূপ প্রবেশ ও অবস্থান করিতে ভালবাসেন :—

"অনাগতবিধাতারমপ্রমত্তমকোপনম্।
চিরারম্ভমদীনং চ নবং শ্রীরুপতিষ্ঠতি॥"

ভাবার্থ এই যে, অনাগতবিধাতা, অপ্রমত্ত, অকোপন, দীন ব্যক্তি লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ইহার প্রত্যেক শব্দ ব বুঝিতে হইবে।

তঃ 'অনাগতবিধাতা' কি, দেখা যাউক। যাহা আগত তাহাই অ... তাহার যে পূর্ব্ব হইতেই বিধান ...য মনুষ্য কেবল বর্ত্তমানই দেখে, তাহার লক্ষ্মীলাভ হয় না। একটি ...া বুঝা যাইবে। যে ব্যক্তি বর্ষা- ...সংস্কার করে, সে অনাগতবিধাতা। ...ধ্য হইয়া বর্ষা আরম্ভ হওয়ার জন্য ... আয়াসে, অধিক মূল্যে সংগ্রহ করিতে ...নেক সাধ্যসাধনা করিয়া অধিক পারি- নিয়োগ করিতে হয়। এইরূপ আরও ...শা ও লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী। শেষোক্তরূপ ...লোক বলে—"লক্ষ্মীছাড়ার অমনি দশা

...ন করিতে হইলে অপ্রমত্ত হওয়া অবহিত, সাবধান, সতর্ক না হইলে ...পৈতৃপিতামহাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ... সতর্ক না থাকিলেই নানা প্রমাদ ... বিষয়ে নানারূপ ক্ষতি হইতে ...কর্মচারিগণ প্রভুকে প্রতারণা ...্য লাভ করে। অসতর্ক হইলেই চরিত্রদোষ ঘটে; চরিত্রদোষ ঘটিলে প্রায়ই সে স্থলে মায়ের অপমান হয়। তিনিও দূরে পলায়ন করেন।

তার পর 'ক্রোধ'। ক্রোধপরবশ হইলে লক্ষ্মীলাভ হয় না। রগচটা লোকের দোকানে খরিদদার যায় না, ইহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রোধের দ্বারা অন্যান্য অনেক অনর্থ সংঘটিত হয়। যেখানে অনর্থ, সেখানে মা থাকিতে পারেন না। সুতরাং ক্রোধহীন হওয়া আবশ্যক।

'চিরারম্ভ' হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বাঙ্গালীজাতি স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। সে জন্য বাঙ্গালী কোন বিষয়ে স্থিরচিত্তে বহুকাল নিযুক্ত থাকিতে পারে না বা চাহে না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন" বাঙ্গালী কবির উক্তি হইলেও বাঙ্গালীর জীবনে ইহার সার্থকতা প্রতিফলিত হয় না। বলা বাহুল্য, বঙ্গে বহু অনুষ্ঠান ভাবাবেগের প্রাবল্যের সহিত মুকুলিত হইয়া চিরা-রম্ভতার অভাবে অকালে ফলোৎপাদনের পূর্ব্বেই বিনষ্ট হয়। আজি যে কার্য্য আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র ইষ্টজ্ঞানে আরম্ভ করা হইল, কয়েক দিন পরে যখন দেখা গেল যে, কেবল কথায় কার্য্য হয় না, বিশেষ একাগ্রতার সহিত অনবরত প্রাণান্ত পরিশ্রম না করিলে কিছুতেই সে কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে, তখনই ক্রমে ক্রমে আবেগের বেগ কমিয়া আসে ও আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। জাতিগত ও ব্যক্তিগতভাবে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু এ ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে, চিরারম্ভ হইতে না পারিলে লক্ষ্মীলাভের আশা নাই। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়া একবারও বিমুখ হইলে চলিবে না। একবার হউক, দুইবার হউক, তিনবার হউক, যতক্ষণে কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, ততক্ষণ বিরাম নাই, ততক্ষণ অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা, অন্য লক্ষ্য, অন্য কর্ম্ম কিছুই নাই; কেবল সাধনা—মনপ্রাণধন সমর্পণ পূর্ব্বক কেবল সাধনা—এই সাধনাই মা-লক্ষ্মীর আবাহন, প্রকৃত আরাধনা ও উপাসনা।

উল্লিখিত গুণাবলীর সঙ্গে আর একটি বিশেষ গুণ চাই 'অদীনতা।' অদীন অর্থে যে দীন নয়। তবে কি মায়ের আমার 'তেলা মাথায় তেল' দিবার রোগ আছে? যিনি স্বয়ং ধনী, তাঁহার পূজাতেই মা সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকে অধিকতর ধন-ধান্য দান করেন? দরিদ্রের প্রতি কি মায়ের স্নেহদৃষ্টি একবারেই নাই? যে দীন, সে কি মায়ের করুণার আশা করিতে পারে না? ইহা কখনই হইতে পারে না। দীন কে? যাহার ধন-ধান্য নাই, সেই কি দীন? যাহার ধন-ধান্য আছে, সেই কি অদীন? না, তাহা নহে। বাস্তবিক দীনতার লক্ষণ আত্মনির্ভরশীলতার অভাব, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাব। যে মনে করে—এ কার্য্য কঠিন, এ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না, সেই দীন। যে বলে, 'বস্ত্রের বোঝা স্কন্ধে লইয়া নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া বিক্রয় করা আমার সাধ্য নহে, আমায় ১৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি দাও'—সেই দীন। যে সকল বিষয়ে সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী, তাহার ধন থাকিলেও সেই দীন। পক্ষান্তরে, ধন না থাকিলেও যাহার আত্মশক্তির উপর দৃঢ়বিশ্বাসরূপ মহাধন আছে, সেই প্রকৃত

অধীন। লক্ষ্মীলাভের জন্য এই অধীনতার অলৌকিক প্রভাব জগতের বহু ধনী ব্যক্তির জীবনে প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, রং যতই ভাল হউক, বস্ত্রখণ্ড যদি নির্ম্মল ও শুভ্র না থাকে, তাহা হইলে কখনই সে বস্ত্র সুন্দরভাবে রঞ্জিত হইতে পারে না। সেইরূপ যতই ভক্তিভরে, যতই সুন্দর উপচারে মায়ের পূজা হউক না কেন, প্রথমে পূজা করিবার উপযোগী হইবার জন্য এই সব গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে। এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। বঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণ প্রত্যেক ব্যক্তি এ বিষয়ে যত্নবান্ হইলে অচিরে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষাল (এম, এ, অধ্যাপক)।

উন্মাদনা

উন্মাদনাই জীবের জীবন। যে হৃদয়ে উন্মাদনা নাই, ভাবের তরঙ্গ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহা স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ, আবিল জলরাশির তুল্য। ঐ জল যেমন অপেয়, অগ্রাহ্য, অস্পৃশ্য ও সংক্রামক রোগের আকর, তদ্রূপ উন্মাদনা-হীন, তরঙ্গহীন হৃদয়ও এই সংসারের অযোগ্য, অরম্য, অভোগ্য ও সমীপবর্ত্তী জীবকুলের নানা রোগের উৎপাদক। তপস্বীর তপস্যায়, বিষয়ীর বিষয়বাসনায়, ভোগীর ভোগলালসায় সমান উন্মাদনা বিদ্যমান। হৃদয়ের উন্মাদনা বশতই দেবর্ষি নারদ বিরক্তচিত্তে নিশিদিন ভগবৎসঙ্গীতে আত্মবিস্মৃত। হৃদয়ের উন্মাদনা প্রযুক্তই রাবণ, শিশুপাল, বৃত্র, তারক প্রভৃতি তাদৃশ বিমূঢ় ছিলেন। হৃদয়োন্মাদনায় আত্মহারা হইয়াই এই সে দিন বঙ্গীয় মহাকবি-রচিত বিল্বমঙ্গল গলিত—পূতিগন্ধময় শবকে রত্নাতক ভ্রমে জড়াইয়া ধরিয়া নদীপার হইয়াছিলেন এবং কাল-বিষধরকে রজ্জু ভ্রমে আকর্ষণ করিয়া চিন্তামণির প্রাসাদকক্ষে উঠিয়াছিলেন। হৃদয়োন্মাদনার প্রেরণাতেই একদা অগ্নি-উপাসক পারসীকগণ মুসলমানদলের নিকট পরাভূত হইয়া সাধের ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন, আবার হৃদয়োন্মাদনা নিবন্ধনই শক্তিশালী পিউরিটানগণ প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার গহন কাননে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কি যোগী, কি ভোগী, সকলের হৃদয়েই উন্মাদনা আছে, এবং সেই উন্মাদনার পরিমাণানুসারে, তাঁহাদিগকে ফল ভোগ করিতে হয়।

বহু শতাব্দী যাবৎ পরাধীনতার লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকায় দেহের অনুপাতে স্বল্পপরিসর স্থানে আবদ্ধ জন্তুর মত আমাদের মেরুদণ্ড একবারে ভাঙ্গিয়া না যাউক, অনেকটা যে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, ইহা গায়ের জোরে ছাড়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়াছে যে, যাহা মনে মনে সত্য বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাও দশ জনের মতবিরুদ্ধ হইলে প্রকাশ করিতে পারি না; কুণ্ঠিত হই। হৃদয়ের এতটা সঙ্কোচ জন্মিয়াছে যে, ভিক্ষা করিতে গিয়া, এক অঞ্জলি চাউল চাহিবার সাহস আমাদের নাই, এক মুষ্টি চাই। বেশী চাহিলে যদি না দেয়, এই ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। অন্তরের এই প্রকার হীনতা জন্মিলেও বাহিরে কিন্তু আমরা চাই, সেই ঐতিহাসিক যুগের ব্যাস-বশিষ্ঠের মত, অথবা ততটা না হউক, ৫।৭ শত কি হাজার বৎসর পূর্ব্বের লোকের মত ব্যবহার করিতে এবং সমাজের নিকট হইতে তদ্রূপ ব্যবহার পাইতে। ভারতবর্ষ যখন ভারতবাসীর ভারতবর্ষ ছিল, দেশ যখন প্রকৃতই আমাদের স্বদেশ ছিল, তখনকার অবস্থাকে, আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, যত বচন-প্রমাণই দেখাই না কেন, আর ফিরাইয়া আনিতে পারিব না। আর রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী আসিয়া বুনো রামনাথের পর্ণশালার দ্বারে যুক্তকরে "অনুপপত্তি" জিজ্ঞাসা করিবেন না, বা আচার্য্য দণ্ডীর দ্বারে দিগ্‌বিজয়ী বীর দাসানুদাসের মত আসিয়া দাঁড়াইবেন না। তখন বিদ্যার্থীর মনে বিদ্যার্জ্জনের নিমিত্ত, আচার্য্যের মনে বিদ্যাদানের জন্য সমান উন্মাদনা ছিল। তখন ভিতর-বাহির সব এক ছিল, দর্পণের মত স্বচ্ছ ছিল। তাই তাহাতে বিশ্বের প্রতিবিম্ব দেখা যাইত। ব্রাহ্মণ তখন যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহাই অকপটে করিতেন, অসঙ্কোচে বলিতেন। এখন আমরা কয় জন তাহা পারি? যে উন্মাদনায় নিশিদিন আত্ম-বিস্মৃত থাকিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন, মুক্তির জন্য আত্মচিন্তা করিতেন, আত্মচিন্তার পরিপন্থী বলিয়া ঐশ্বর্য্যের শিরে পদাঘাত করিতেন, সে ব্রাহ্মণ কৈ? সে ভূ-দেব কৈ? সে দীন-হীন সম্রাট্ কৈ? আর তাঁহাদের সে উন্মাদনা কৈ—শি
সেই উন্মাদনার এক ভগ্নাংশও আজ ব্রাহ্মণের থাকি
আপনিই নত হইত। বিনানুরোধে, বিনা বচন
বিনা তর্জ্জনগর্জ্জনে সমাজ মাথা পাতিয়া ব্রাহ্মণের পাদ
করিত। এই সে দিন পতিতপাবন, ভক্তাবতার
প্রাণে উন্মাদনা আসিয়াছিল, সারা ভারতবর্ষ
মস্তকে তাঁহার পদরেণু লইয়া ধন্য হইল। এই স
দিন বলিলেও চলে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রাণে উ
তরঙ্গ দেখা দিয়াছিল, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে "
নার জন" বলিয়া জড়াইয়া ধরিল। সদেব শ্রীরা
উন্মাদনার তরঙ্গে প্রাচ্য ভূখণ্ড
হাবুডুবু খাইল, এখনও বিরতি না
বল, উন্মাদনা ব্যতিরেকে শুধু দোঃ
আর যে চলিবে না, তাহা আমরা ম
সে ব্রাহ্মণপ্রভাব, সেই সমাজ-পরিচাল
কম্পনের ভীতি আর যে ফিরিয়া পাইব
আমরা জানিতেছি এবং জানিতেছি বা
তনয় ডিপুটী, তর্করত্নতনয় এম, এ, তর্কভূ
এল। এইরূপ শত সহস্র। অথচ, লোক
প্রদাতৃগণের মনস্তুষ্টির জন্য উচ্চকণ্ঠে
প্রাচ্য শিক্ষা-দীক্ষার সর্ব্বনাশ হইল, সব
কপট ব্যবহারের পটহধ্বনি যত সত্বর নি
মঙ্গল। দেশবাসীর কাণ ঝালাপাল
কেহ ও-সব কথায় তেমন কর্ণপা
দুর্দ্দিনে, দেশের এই জীবন-মরণের স
উপর ঐরূপ ভূয়োভূয়ঃ তাণ্ডবনর্ত্ত
দলাদলি বাধাইয়া, গৃহবিবাদ বাধা
ধারায় গতিরোধ করিতে বৃথা প্রয়া
যখন [illegible]

তাঁহারাই চিন্তা করিতেন, জলহীন পল্লীতে একটা কূপ বা তড়াগ প্রতিষ্ঠার দ্বারা জীবন কৃতার্থ মনে করিতেন, একটা অকালমৃত্যু হইলে রাজার চিন্তার অবধি থাকিত না, কোন্ অনাচারের ফলে ঐরূপ অত্যাহিত ঘটিল ভাবিয়া তিনি দিশাহারা হইতেন, তখন দেশের ভূদেবগণ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মচিন্তায় জীবন সঁপিয়া যে সমুদয় তদানীন্তন কল্যাণকর বিধিনিষেধ নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি ঠিক তেমনই ভাবে, অবিকৃতরূপে, এখন এই পরাধীন যুগে, স্বদেশে প্রবাসীদের পক্ষে কল্যাণজনক ? সেই শ্রৌতযুগ হইতে শেষ নিবন্ধকর্ত্তা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কাল পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কি বরাবর অবিকৃত অথবা অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই চলিয়া আসিতেছিল ? সেই দীর্ঘকাল সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ, দেশের কোনরূপ রাজনৈতিক চিন্তা ব্রাহ্মণদিগকে করিতে হইত না। দেশের ক্ষাত্র শক্তি তখন সজীব ছিল। দেশের রাজন্যবৃন্দ তখন নাভা-ভরতপুরের অবস্থায় আসিয়া পৌঁছান নাই, দেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারাই চিন্তা করিতেন, তাঁহারাই—সেই সকল ক্ষত্রিয় শক্তিই অন্য তিন বর্ণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তখন ব্রাহ্মণদিগকে ঐহিক দেশের কথা ভাবিতে হইত না। দেশান্তরের চিন্তায় তাঁহারা আত্ম-
নি... করিতেন। এমন যে সুখের সময়, ভারতের এমন যে
...। যুগ,—তাহাতেও দেখিতেছি, শাস্ত্রকারগণ যখন যখন
বুঝিয়াছেন, সমাজের হিতকামনায় আমাদের লৌকিক
বেদের অবিরোধিভাবে সংস্করণ করিয়া গিয়াছেন।
তাহা প্রদর্শিত হইবে।) আর এখন, সে রাম নাই,
...া নাই, সে অযোধ্যার নাম এখন "আউধ," সে মত্র
...াজ, সেই বারাণসী এখন "বেনারস," এখনও কি
...ীন যুগের আইন-কানুন তেমনই থাকিবে ? সমাজ
জড় পদার্থ একটা প্রস্তরময় বৌদ্ধস্তূপের মত বস্তু,
...ন নাই, ...শক্তি নাই, উহা কি এমনই একটা
...াধীন যুগে যেমন ছিল, এখনও
...বৎসর পরেও সেইরূপই রহিবে ?
...ল ও অকপটভাবে স্বীকার করিলে
...িন যে, চারি বর্ণের মধ্যে কোন্
...পতন ঘটিয়াছে ? গায়ের জোরে বলিলে
...ের ব্রাহ্মণত্ব কি ভাঙ্গিয়া চুরমার হই-

... সংস্কার—উপনয়ন। পূর্ব্বে আটচল্লিশ
... করিতে হইত, পরে কমিতে কমিতে
...াইল। এই যে কমিয়া আসা, ইহা কি
...লের বশেই করিয়াছিলেন, না দরকার
...িলেন ? পরে আরও কমিতে কমিতে
...র দিন অন্ততঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন
...বিধামত ব্যবস্থা আপনারাই করিয়া
...—আরও কমিতেছে। এখন এক
...ে গিয়া ঠেকিয়াছে। তার পর
...এখন এই উপনয়ন একটা গ্রহ-
...ীঘাটের কি গঙ্গাতীরের অন্যান্য
...যাও, দেখিবে, হাজার হাজার উপনয়ন ঘড়ী ধরিয়া সম্পন্ন হইতেছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে "মাণবক"—সংসারের মানব হইয়া, জগন্মাতার মহাপ্রসাদ রক্তাক্ত রুমালে বাঁধিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। পুরোহিত, আচার্য্য,—সকলেই দুই ঘণ্টার জন্য আসিয়া "মাণবককে" পারত্রিক মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়া প্রণামী লইয়া চলিয়া গেলেন। সমাজের কি চোখ নাই ? এই জবরদস্তি কি ব্রাহ্মণেতর জাতি দেখিতেছেন না ? সর্ব্বভুক্ অনলের মত ব্রাহ্মণ-সমাজ কি এই অদাহ্য অপাচ্য বস্তু দহন বা হজম করিতে পারিতেছেন ? ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের সহিত—যাঁহারা বর্ণাশ্রমের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি করণ-কারণ হইতেছে না ?—এ সব কথা কি মনে মনে ভাবিতেও দোষ ? দিনদুপুরে ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মকর্ম্মের নামে যে ব্যভিচার হইতেছে, তাহার ফলভোগের কাল, প্রায়শ্চিত্তের কাল আজ উপস্থিত। রাজ-দণ্ডের ন্যায় ভীষণ, বজ্রাঘাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর, যম-দণ্ডের ন্যায় অপরিহার্য্য ও অপ্রতিবিধেয় সামাজিক দণ্ড আজ ব্রাহ্মণকে মাথা পাতিয়া লইতে হইতেছে। এখন আর চীৎকারে লাভ নাই। দণ্ড-গ্রহণ করিতেই হইবে।

চোখ মেলিয়া দেখ, হাজার হাজার "শূদ্র" গণ্যমান্য কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। তোমাদের অপেক্ষা মানে, প্রতিপত্তিতে, বিদ্যায় তাঁহারা কম কিসে ? তাঁহারা প্রথমে তোমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তোমাদের গৃহবিবাদ বাধিল, দলাদলি বাধিল, কতক এ-দিক কতক ও-দিক হইলে, তাঁহারা প্রণাম করিয়া দূরে সরিয়া গেলেন এবং নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিতে লাগিলেন। কৈ, পারিলাম কি আমরা ঠেকাইতে ? তাঁহাদের হুঁকা বন্ধ করিতে গিয়া, ক্রমে আমাদের হুঁকাই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। "গ্রাম শুদ্ধকে একঘরে" করিতে গিয়া মুষ্টিমেয় আমরাই "একঘরে" হইতে বসিয়াছি। ঐ উপবীতী শূদ্রগণ, যেমন প্রয়োজন, দলে দলে ব্রাহ্মণ কি স্বপক্ষে পাইতেছেন না ? তুমি আমি না যাই, তোমার আমার অপরিত্যাজ্য স্বজন-কুটুম্ব কি উঁহাদের পক্ষভুক্ত হইতেছেন না? চটিয়া লাভ নাই। বুকে হাত দিয়া একবার আমাদের প্রকৃত অবস্থাটা ভাবিয়া দেখিলে ত ক্ষতি নাই। পরকে যাহাই বলি না কেন, নিজেকে মনেমনে প্রবঞ্চনা করিয়া কি লাভ হইবে ?

একবার স্মরণ কর ত—সেই স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ীর ছেলেদের বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে প্রবেশের আন্দোলনটা। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে সেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উক্তি ও ব্রাহ্মণ-সমাজের তীব্র উত্তরগুলি। কত বাধা, কত বচন-প্রমাণ, কত অভিশাপ,—একবার মনে করিয়া দেখ। পারিলাম কি বিলাত-প্রত্যাগতদের বর্জ্জন করিতে ? তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পরিশুদ্ধ হইয়া তাঁহারা তোমাদের ছায়ায় আসিতে চাহেন, আর তোমরা আসিতে দিবে না। ফলে হইল, এখন আর তোমাদের তাঁহারা জিজ্ঞাসাও করেন না। তাঁহাদের সমষ্টি-শক্তি এখন ব্যষ্টি-শিথিল তোমার আমার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমারের ন্যায় সারস্বতদিগকে, আচার্য্য জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় সবল জ্ঞানবীর ও সাধুচরিত মনস্বীদিগকে বাদ দিলে তোমার দেশের ও সমাজের কি শক্তি থাকে, মা

কমে ? তুমি আমি বাদ দিলেও তাঁহাদের আসন আজ দেশের ও সমাজের কোন্ স্থানে, একবার তাহা মনে মনে ভাবিতেও কি দোষ ? সংবাদপত্রে কি দেখ না,—যে, দেশে বিধবা-বিবাহ কিরূপ হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে ? সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে না চলিলেও উহা যে ক্রমেই চল্ হইতেছে,—ইহা কি অস্বীকার করিতে পার ? যদি আজ মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ন্যায় কোনও সুপণ্ডিত ব্যক্তি তোমার নিকটে তোমারই ধর্ম্মসংহিতা খুলিয়া—

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্য-যোগ--বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে।"

এই ঋষিবচনটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ইহার কি অর্থ করিবে ? সেখানে ত বাগ্‌বিন্যাস খাটিবে না। তার পর সেই তিনিই যদি আবার বলেন যে,—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।" *

ইহারই বা মানে কি ? এই দুই বচন অনুসারে, এখন ব্রাহ্মণ কোথায় এবং কয় জন ?—তখন ? চটিয়া মটিয়া "অনধিকারী" বলিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কোন শাণিত অস্ত্র আছে কি ?

তাই নিবেদন, দেশের প্রাণে আজ যে উন্মাদনা আসিয়াছে, ডাক আসিয়াছে, দেশ সজাগ হইয়া দীর্ঘনিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া সবে অবশ চিত্তে ও অস্পষ্ট নয়নে "আমি কোথায় ? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, আর যাইতেছিই বা কোথায়" ভাবিতেছে, এমন সময়ে, বৃথা আত্মবিচ্ছেদ বাধাইয়া, ঘরের মধ্যে সাত হাঁড়ী করিয়া দেশদ্রোহিতা, সমাজদ্রোহিতা, তথা আত্মদ্রোহিতা করিও না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

* "যিনি প্রত্যহ বেদান্তপাঠী, সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্যজ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' নামে অভিহিত হন।"

"যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অর্থাৎ বেদ এবং পরমাত্মার তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত।"—অত্রি-সংহিতা। ৩৭১ এবং ৩৭২ শ্লোক।

মানসী

মরম নিভৃতে সখি যুগ যুগ ধরি
যে রূপ-মূরতিখানি তিল তিল করি
আপনি ফুলের মত হইল প্রকাশ,
ভরিল গোলাপী বাসে আমারি আকাশ,
ধরণীর ধূলি পরে জাগ্রত তাহারে
পেল না ত দু-নয়ন খুঁজি দ্বারে দ্বারে।

* * *

শারদ প্রভাতী স্বর্ণ মোর দ্বারে আসি
লুটাইয়া পড়ে যবে দূর হ'তে ভাসি,
মনে পড়ে ফুল-ঝরা সেই তার হাসি;
মরমে বাজিয়া ওঠে অরূপের বাঁশী!
সন্ধ্যায় তারা-বধূ মধুময় ক্ষণে
সংশয় প্রীতি-ভরা সচকিত মনে
দয়িত মিলন লাগি আকুল আশায়
আধ আলো-ছায়া পথে সঘনে তাকায়,
ভাবি মনে এ কি তারি আঁখি-তারা দুটি
ইসারায় কহে মোরে বেদনায় লুটি ?—
"মুছ আঁখি বঁধু মোর, কেন কাঁদ হায়!
জান না কি আছি ঢাকা নীলিমার গায় ?

জান না কি সখা ওগো তোমার লাগি
এ নয়ন রহে মোর সদাই জাগিয়া,
জ্যোতিভরা রজনীর নীরব সভায়
উজল নিমেষ হারা তারায় তারায় ?
সুধা পরিমলে মাখা [illegible] বুকে
আমি হেসে ফুটে [illegible]
তোমারে তুষিতে [illegible]
তটিনী আকুল করি [illegible]
ফাগুনে মলয় বহে এ [illegible]
বরষার মেঘে মেঘে [illegible]
এ প্রেম-পরশ নিয়ে দিকে [illegible]
শ্রান্তি-বিহীন ঘন বাদল-ধা[illegible]
বিরহী এ নয়নের ব্যথা[illegible]
আকুল করে গো ঝরি [illegible]
হের না কি সখা তু[illegible]
যৌবন ফিরে নব [illegible]
স্বপনে তোমারি বু[illegible]
জাগরণে আমি [illegible]

শ্রীঅমূল[illegible]

'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও বিচার

২

'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধের প্রথমেই প্রতিবাদকর্ত্তার উক্তি এইরূপ—'বেদব্যাস-সংকলিত পুরাণসংহিতার মূল পুরাণ অতীব প্রাচীন। কারণ, বাল্মীকীয় রামায়ণের আদিকাণ্ডে আছে—'শ্রূয়তাং যৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ যথাশ্রুতম্' ইত্যাদি।

প্রতিবাদকর্ত্তার মতে মূলপুরাণ কি, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। বেদব্যাস-সঙ্কলিত পুরাণসমূহ ব্যতিরিক্ত মূলপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলপুরাণ যে ছিল, তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদ-কর্ত্তার সহায় হইয়াছে রামায়ণের কেবল একটি বচন। ঐ রামায়ণের বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনত্ব আছে কি না, এ বিষয়ে কিন্তু পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে যায়। মহাভারতে রামায়ণকথার উল্লেখ আছে, ত্য, কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত তাহাই যে মহাভারতের পূর্ব্বে ছিল, এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই হ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বর্ত্তমানকালের প্রচলিত রামায়ণ ভারতের পূর্ব্বে ছিল, তাহা স্বীকার করেন নাই; রামায়ণ যে ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহার প্রতি ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ প্রতীতি আকারে প্রচলিত রামায়ণ মহা-মহাভারত-রচনার পূর্ব্বে রামচন্দ্রের ছিল না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। মান সময়ে বাল্মীকি বিরচিত-রামায়ণ আছে, সেই গ্রন্থই যে মহাভারত রচনার ছিল, এ বিষয়ে প্রতিবাদকর্ত্তার আবিষ্কৃত র্য্যন্ত সাধারণসমক্ষে প্রচারিত না হই-র সিদ্ধান্তের উপর কেহই আস্থা স্থাপন ব্যাস-রচিত পুরাণসমষ্টির মূলভূত পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রমাণ কর্ত্তা যে রামায়ণমাত্রের উল্লেখ রই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, খিতে পাওয়া যায় যে, নারদ দেবের অধীত গ্রন্থসমূহের পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ-মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।"

"ভগবন্! আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছি এবং পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি।"

নারদের এই উক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বেদের ন্যায় আদৃত ইতিহাস-পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বৈদিক যুগেও বিদ্যমান ছিল। তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, মহাভারতে রামায়ণের কথা আছে এই কারণে, বর্ত্তমান সময়ে বাল্মীকির রচিত বলিয়া প্রচলিত রামায়ণও মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ যে যুক্তি, তদনুসারে চলিতে গেলে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নাস্তিক-মতাবলম্বনে উপদেশ দিতে উদ্যত জাবালিকে ভগবান্ রামচন্দ্র যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধদেবকে তিনি চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরই এই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। ইহা রামায়ণের উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। তাহাই যদি হইল, তবে এই রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে কি করিয়া রচিত হইতে পারে? তাহার পর রামায়ণের পূর্ব্বে মূল পুরাণ ছিল, প্রতিবাদকর্ত্তার এই কথা মানিতে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু সেই মূল পুরাণরূপ শাস্ত্র যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা স্থির। সেই পুরাণশাস্ত্র অনুসারে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজ কি করিয়া পরিচালিত হইবে, তাহার উত্তর প্রতিবাদকর্ত্তার লেখনীমুখে শুনিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

আমি শাস্ত্রসমস্যায় লিখিয়াছিলাম, মহাভারত রচনার সময় যে শাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহার দ্বারাই হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইবে বা তাহার পরবর্ত্তী কালের রচিত শাস্ত্রের দ্বারাও হিন্দু-সমাজ চলিবে, তাহারই নির্ণয় করিতে হইবে।

প্রতিবাদকর্ত্তা মহাভারত রচনার পূর্ব্বে মূল পুরাণ ছিল, এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন, সে মূল পুরাণ কি, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, সে সমস্ত পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। অথচ প্রতিবাদকর্ত্তা বলিতে চাহেন যে, ঐ সকল মূল পুরাণ অনুসারে আমাদিগকে চলিতে হইবে।

ব্যবস্থা মন্দ নহে। এ বিচিত্র যুক্তির সারবত্তা পাঠকগণের উপভোগ্য, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ (মনু ২অঃ ৪৮ শ্লোঃ)

এইরূপ বচন আছে বটে, কিন্তু অন্য বচনও আছে—

সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।

নায়ন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥

মনু ২ অধ্যায় ১১৮।

এই দুইটি বচনের অর্থ মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই বেদ যদি কেবলমাত্র গায়ত্রীও হয়,সদাচারী থাকিয়া তাহা লইয়া থাকাও ভাল, কিন্তু অসদাচারপরায়ণ হইয়া ত্রিবেদজ্ঞ হওয়াও ভাল নহে। মনু বলিয়াছেন—'প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বক গায়ত্রীজপ যদি প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় করা যায়, তাহাতেই সহস্র বেদপাঠের ফল হয়।' মনু এতৎপক্ষে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রণবব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী বেদত্রয়ের সারভূত।—মনু ২।৭৬—৭৮।

মনুর উক্ত দুইটি বচনের অর্থ মিলাইয়া দেখিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা বুঝিয়াছেন,তাহা নহে। মেধাতিথি প্রভৃতি মনুসংহিতার ব্যাখ্যাতৃগণ উহা অন্য প্রকারেই বুঝিয়াছিলেন,—"সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি" এই বচনটির অর্থ করিতে যাইয়া মেধাতিথি বলিয়াছেন—"অভিবাদনাদ্যাচারবিধেস্তুতিরিয়ম্" অর্থাৎ এই বচনে যাহা বলা হইতেছে, তাহার দ্বারা পূর্ব্বে কথিত যে গুরু প্রভৃতির অভিবাদনবিধি, তাহারই প্রশংসা বা স্তুতি করা হইতেছে, অর্থাৎ ইহার দ্বারা এমন কিছু বলা হয় নাই, যাহাতে এরূপ বোধ হয় যে, বেদের অধ্যয়ন না করিয়া কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলেই ব্রাহ্মণ্যরক্ষা হইবে। "প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বক গায়ত্রীজপ যদি প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় করা হয়, তাহাতেই সহস্র বেদপাঠের ফল হয়" এইরূপ উক্তি দ্বারাও গায়ত্রীপাঠের প্রশংসামাত্র করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। বেদপাঠ না করিয়া কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলেই যে বেদাধ্যয়নের বিধি চরিতার্থ হইবে, তাহা কোন মীমাংসকই কল্পনা করিতে পারেন না। বেদপাঠের ফল দ্বিবিধ;—ঐহিক ও পারত্রিক। ঐহিক ফল হইল বেদার্থজ্ঞান। বেদ না পড়িয়া কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলে এবং প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে হাজারবার জপ করিলেও বেদপাঠের ঐহিক ফল যে বেদার্থজ্ঞান, তাহা হইতে পারে, এ কথা প্রতিবাদকর্ত্তা বলিলেও প্রমাণবাধিত বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। বেদার্থজ্ঞান করিতে হইলে বেদের রীতিমত অধ্যয়ন করিতে হইবে, ইহাই হইল সকল শিষ্ট পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় যদি বলেন যে, মনু যখন বলিতেছেন যে, কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলে ও তাহার হাজারবার প্রত্যহ জপ করিলে তাহাতেই সহস্র বেদপাঠের ফল হয়, সেই ফল ঐহিক অর্থজ্ঞানও বটে এবং পারলৌকিক স্বর্গাদিও বটে, তাহা হইলে মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে সমগ্র বেদপাঠের কোন আবশ্যকতাই থাকে না। শাস্ত্রে আছে—

'অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ'

ঘরের কোণে বা আকন্দগাছে যদি মধু পাওয়া যায়, তবে পাহাড়ে যাইবার আবশ্যকতা কি? গায়ত্রী জপ করিলেই যদি বেদোদিত নিখিল ধর্ম্মকর্ম্মের জ্ঞান হয়, তবে আবার নানাবিধ ব্রতের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া গুরুগৃহে বাস পূর্ব্বক জ্ঞানের জন্য পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা কি?

বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লুপ্ত হইতে লাগিল, ততই সমগ্রবেদাধ্যয়নবিরহিত সার ব্রাহ্মণকুলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য এই জাতীয় অন্যান্য শাস্ত্রীয় বচনের এইরূপ বি[illegible] উদিত হইতে লাগিল এবং তাহাই ভা[illegible]র্ষে প্রকৃত ও ব্রাহ্মণের বিলোপের হেতু [illegible]ড়াইয়া[illegible] সঙ্কোচের কারণ—অশক্ততা। জাতির প্রয়োজনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, অর্থশাস্ত্র পর্য্যন্ত সক[illegible] হইয়া রঘুনন্দনের স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্রে তান্ত্রিক দীক্ষাপদ্ধতিমাত্রে এ দেশে মনীষার শোচনীয় পর্য্যবসান ঘটি[illegible] কোন্‌টা স্তুতিপর আর কোন্‌টাই ব[illegible] করিবার বুদ্ধি লুপ্ত হওয়ায় দেশে এই হইয়াছে—ইহাই বুঝাইবার জন্য অবতারণা করিয়াছি। ব্রাহ্মণো[illegible] তিনি অগ্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হউন' পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ এখনও কেবল গায়ত্রী পড়ি, আর গায়ত্র[illegible] বুঝে, তাহা বুঝি না, সুযন্ত্রিত হইব।

নিতান্ত প্রাকৃত লোকের মত সকল কার্য্যই করিয়া থাকি অথচ উহার অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে বলিয়া লোককে বুঝাই—এইরূপ বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পরিচালনায় ধর্ম্মলোপই হইয়া থাকে, অধর্ম্মও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 'শাস্ত্রসমস্যা' প্রবন্ধে ইহাই আমি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে অন্যত্র লেখা হইয়াছে—

"শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাও প্রকাশ না করিয়া প্রত্যুত শাস্ত্রে ঐ সকল কথা নাই, এরূপ মিথ্যা প্রচারে যাহারা লোকের হৃদয়ে শাস্ত্রানুগত সদাচারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইতে অণুমাত্র শঙ্কিত নহে, তাহারা শাস্ত্রীয় বচনের অপব্যাখ্যায় যে সঙ্কোচ বোধ করে না, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দুইটি বচন এ স্থলে উদ্ধৃত করিব—

১। ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
২। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

অপব্যাখ্যা—"এই অষ্টবিধ ভক্তি যে ম্লেচ্ছব্যক্তিতে থাকে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানী ...ই প্রকৃত ...ণ্ডিত। সে দানের যোগ্যপাত্র, তাহা পতিগ্রহও ... এবং "যেমন রসশাস্ত্রোক্ত বিধি ...ে হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধি দ্বারা ...ভ করিয়া থাকে।" এই শ্লোকে 'বিপ্রত্ব' বা 'ব্রাহ্মণত্ব।' ইত্যাদি।

...' এই শব্দটির অর্থ যে 'বিপ্রত্ব' করা ...র কল্পনাপ্রসূত নহে, কিন্তু হরিভক্তি-... বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থের টীকাকার শ্রীমৎ ...রিভক্তিবিলাসধৃত উক্ত বচনের ব্যাখ্যা-...ছেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং

...জ না রাখিয়া ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ...দকর্ত্তা কেবল আত্মকল্পনার উপর-...ক 'অপব্যাখ্যা' বলিতে সাহসী ...জানিব বটে, এই জিদের বশবর্ত্তী ... নির্ণয় করিতে উদ্যত হয় এবং অপরের প্রামাণিক ব্যাখ্যাকে 'অপব্যাখ্যা' বলিতে বৃথা সাহস করে, তাহা হইলে তাহার ধার্ম্মিকতার উপর লোকের বিশ্বাস কিরূপে থাকিতে পারে?

ইহার মধ্যে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই যে বিধিবাক্য, তাহাকে—নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য প্রতিবাদকর্ত্তা 'অর্থবাদ' বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি বলিতেছেন,—"প্রথম শ্লোকে 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' এই অংশে বিধিবাক্য থাকায় ইহা অর্থবাদ, প্রশংসামাত্র নহে। অপব্যাখ্যাকাররা এরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধিবাক্য নহে, ইহা অন্যার্থবোধক অর্থবাদ, সে সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহা সাধারণের সহজবোধ্য নহে, এই কারণে এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ আলোচনা করা যাইতেছে। বিধিবাক্য-রূপে গ্রহণ করিয়াই এই আলোচনা।" ইত্যাদি

'অপব্যাখ্যাকারীরা' এইরূপ বাক্যকে বিধিবাক্য বলিয়া মানিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যাখ্যা 'অপব্যাখ্যা' নহে, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। কারণ, এরূপ ব্যাখ্যার কোন দোষই প্রতিবাদকর্ত্তা উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধিবাক্য নহে, ইহা অন্যার্থবোধক অর্থবাদ।" ইহা যে 'অন্যার্থবোধক অর্থবাদ', তাহা প্রমাণ করিবার ভার কিন্তু প্রতিবাদকর্ত্তা নিজে গ্রহণ করেন নাই, চালাকী করিয়া তাহা তা-না-না-না করিয়াই সারিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এ সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহা সাধারণের সহজবোধ্য নহে; এই কারণে এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ আলোচনা করা যাইতেছে।" স্পষ্টশ্রুত বিধিবাক্যকে বিনা প্রয়োজনে অর্থবাদরূপে কেন নির্দ্দেশ করিতে হইবে, ইহা সাধারণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা দেখাইতে চাহেন না; কারণ, ইহা 'সাধারণের সহজবোধ্য নহে।' তাঁহার প্রবন্ধে 'সাধারণের সহজবোধ্য নহে' এরূপ কথাই শত করা ৯৯টি আছে। তাহা সত্ত্বেও এইখানে আসিয়া, প্রতিবাদ-কর্ত্তা মহাশয়ের এই অত্যাবশ্যক বিচার সাধারণের সহজবোধ্য হইবে না বলিয়া, কৃপাবশে তিনি আর তাহা করিতে উদ্যত হইলেন না। দর্শন, বিজ্ঞান বা ধর্ম্মশাস্ত্রের এমন কোন্ জটিল তত্ত্ব আছে, যাহা পরিষ্কাররূপে অধিগত হইলে এবং উপযুক্ত প্রকাশক্ষমতা থাকিলে ব্যাখ্যাতা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বোধগম্য করিতে পারেন না? পাঠকের বুদ্ধিকে গালি পাড়িয়া, নিজ বক্তব্যের গলদ ঢাকিবার এইরূপ চেষ্টা চাতুরী

ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, সে চাতুরী অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষু এড়াইতে পারে না। এইরূপ বিধিবাক্যকে 'অর্থবাদ' বাক্যরূপে নির্দ্দেশ কোন মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। প্রতিবাদকর্ত্তা মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করুন যে, "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই বচনে দান ও প্রতিগ্রহের বিধান করা হয় নাই, কিন্তু ইহা অর্থবাদমাত্র। যে পর্য্যন্ত এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আর অধিক বলা বৃথা। তাহার পর বিধিবাক্যরূপেই গ্রহণ করিয়া তিনি বিধিবাক্যবাদিগণের মতে দোষ দিবার জন্য যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অসার এবং তাহা অনভিজ্ঞের মুখেই শোভা পায়। তিনি বলিয়াছেন,—"তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই যে 'দেয়ং' ও 'গ্রাহ্যং' আছে, ইহাতে কোন্ বস্তু দেয় বা কোন্ বস্তু গ্রাহ্য, তাহার ত কোন নির্দ্দেশ নাই। ভক্ত-অভক্ত-নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণ-চাণ্ডাল-নির্ব্বিশেষে সামান্যতঃ দানবিধি আছে—বিশেষ ফলের জন্যই বিশেষ বিধি। যথা—

"সর্ব্বত্র গুণবদ্দানং শ্বপাকাদিষপি স্মৃতম্।
দেশে কালে বিধানেন পাত্রে দত্তং বিশেষতঃ॥" (গীতা)

শ্বপাক প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিকে দান করিলেও ফল আছে, তবে দেশকালপাত্রে বৈধদানে বিশেষ ফল হয়। অতএব এখানে 'তস্মৈ দেয়ং' বলিয়া কি ফল হইল? 'গ্রাহ্যং' 'প্রতিগ্রাহ্যং' নহে। শ্বপাকাদি হীন জাতিও ব্রাহ্মণাদি ভূস্বামীকে নজরাণা দেয়, ব্যবস্থাপত্র লইয়া ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতকেও যে 'তৈলবট' প্রদান করে, তাহা ত গ্রাহ্য আছেই। স্মৃতিগ্রন্থেও আছে "আনতিকয়স্থেন ন দোষঃ।" ইহা দৃষ্টার্থ দান, অদৃষ্টার্থ নহে—দৃষ্টার্থ ত্যক্ত বস্তুর স্বীকার গ্রহণরূপে ও অদৃষ্টার্থ ত্যক্ত বস্তুর স্বীকার প্রতিগ্রহরূপে শাস্ত্রে ব্যবহৃত। শ্বপাক বা ম্লেচ্ছাদির দত্ত বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 'চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ, পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি।' (মনু) 'তস্মৈ দেয়ং' ইত্যাদি বচন দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রকথিত বিধিনিষেধের অনুবর্ত্তনই করা হইয়াছে, ইহাতে ভক্তের প্রশংসাও হয় না, সকলকেই যাহা দান করা যায় ও সকলের নিকট হইতেই যাহা গ্রহণ করা যায়, ভক্তের পক্ষে তৎসম্বন্ধে বিশেষবিধি নিরর্থক।"

চমৎকার যুক্তি বটে, স্মৃতিশাস্ত্রে সকলকেই দেওয়া যায় বলিয়া বিধি আছে। 'তস্মৈ দেয়ং' এই বিধির দ্বারা অতিরিক্ত ফল কি লাভ হইল, ইহাই প্রতিবাদকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহা যখন বিধিবাক্য বলিয়া, তিনি নিজেই বিচারের অনুরোধে মানিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন ইহার ফল যে কিছু আছে, তাহা ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে মানিতে হইবে। স্মৃতিশাস্ত্রে সকল ব্যক্তিকেই দান করিবার যে বিধি আছে, প্রতিবাদকর্ত্তা বলিতে চাহেন যে, এখানেও এই বিধির দ্বারা তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছু বুঝাইতেছে না। প্রতিবাদকর্ত্তার এই মতই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বাক্য অনুবাদমাত্রই হয়, ইহার বিধিরূপতা থাকিতে পারে না। কারণ,যাহা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা অনধিগত, তাহারই বোধক কার্য্যকর বাক্যকে বিধিবাক্য বলে। স্মৃতিশাস্ত্রে যেরূপ দান চণ্ডালকে করা যাইতে পারে বা দৃষ্টফলের জন্য চণ্ডালকে যে লৌকিক দান প্রসিদ্ধ আছে, এই বাক্যের দ্বারা যদি তাহাই প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে ইহার বিধিরূপতা থাকে কিরূপে? প্রতিবাদকর্ত্তা কিন্তু বিচারের খাতিরে 'অপব্যাখ্যাকারী'দিগের উপর [illegible] হইয়া 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' এই দুইটিকেই বি[illegible] বলিয়া নিজেই মানিয়া লইয়াছেন, অথচ ইহার যেরূ[illegible] করিতেছেন, তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, দুইটি লোকপ্রসিদ্ধ বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত যে দান তাহাই প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং ইহা বিধিবাক্য[illegible] বিধিবাক্য বলিয়া মানিয়াও লওয়া [illegible] অথচ ইহা [illegible] স্মৃতিপ্রসিদ্ধ দান ও গ্রহণের অ[illegible] প্রতিবাদকর্ত্তার মুখে শোভা পায়, যাহার ব্যুৎপত্তি আছে, তাহার মু[illegible] সম্ভবপর নহে।

আরও একটি কথা এই যে, ম্লেচ্ছ[illegible] হয়, তাহা হইলে সে 'বিপ্রেন্দ্র' হইবে, 'পণ্ডিত' হইবে, এই কথা পূর্ব্ব-শ্লোকে 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' এই প্রকার[illegible] ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং [illegible] সিদ্ধ হইতেছে যে, ম্লেচ্ছ যদি [illegible] হইলে তাহার ম্লেচ্ছত্ব নিবৃত্ত হয়, [illegible] যে দান করা যায় বা তাহার [illegible] ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন ম্লেচ্ছকেও সেই[illegible] করা উচিত, তাহার নিকট সেইরূ[illegible]

এবং করা উচিত। জ্ঞানী ও পণ্ডিত বিপ্রেন্দ্রকে দান করিলে যে পুণ্য হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে যে পুণ্য হয়; যথার্থ ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন ম্লেচ্ছকেও দান করিলে সেই প্রকার পুণ্যই হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলেও সেইরূপ পুণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ যে ফল, তাহা স্মৃতি ও লোকে প্রাপ্ত না হইলেও এই বিধিবাক্য-প্রভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা যিনি না বুঝেন, তিনি কখনই মীমাংসকের মধ্যে স্থান পাইতে পারেন না। মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিধিবাক্যের এইরূপ ফলই কল্পনা করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ব্যবহারের দ্বারাও ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, বৈষ্ণব ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিতে স্পষ্টই নির্দিষ্ট আছে যে, —শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে অন্য বিদ্বান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া ভগবদ্ভক্তচূড়ামণি যবন শ্রীহরিদাসকে আদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধে পাত্রীয় অন্ন ...াইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধে পাত্রীয় অন্ন ভোজনের অধি-...া, বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরই আছে—ইহা স্মার্ত্ত-...নেন, সুতরাং শ্রীপাদ আচার্য্য গোস্বামী প্রভুর ...রাও ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ভগবদ্ভক্ত ...লও সে—পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে যেরূপ অদৃষ্টার্থ ...ায়—সেইরূপ দানেরই পাত্র হইয়া থাকে। ইহা ...কারীদিগের ... 'প্রসূত' বস্তু নহে, কিন্তু গৌড়ীয় ... এবং এই সিদ্ধান্তের মূলভূত

...ং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।"

...র্থবাদ নহে, তাহা স্থির এবং এই ...বঙ্গের শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়প্রবিষ্ট শিষ্ট-...কন; ইতিহাসও তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য

প্রতিবাদ-কর্ত্তা মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধের প্রথমার্দ্ধাংশে যে রাশি রাশি ভুল আছে, তাহারই মধ্যে গোটাকয়েক দেখান গেল। পাঠকগণের যদি ধৈর্য্য থাকে, তাহা হইলে আর অর্দ্ধাংশে যে কিরূপ মারাত্মক ভুল আছে এবং কেমন অসম্বদ্ধ প্রলাপ আছে, তাহা অগ্রিম প্রবন্ধে দেখাইব। ইহার পর তাঁহার 'মাসিক বসুমতীর' ২২ কলমব্যাপী দ্বিতীয় প্রবন্ধ আছে। তাহার মধ্যে দেখিতে পাই, প্রায় অর্দ্ধাংশে, তিনি নিজেরই বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন। কেন যে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়া, তাঁহার প্রবন্ধ যে কেহ বুঝিবে না, কেহ শুনিতে চাহিবে না, তাহা বুঝিয়াও, নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ কিছুতেই তিনি হাতছাড়া করিতে চাহেন না, তাহাই প্রকারান্তরে প্রমাণিত করিয়া তিনি অপূর্ব্ব করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রসিক পাঠকবর্গের তাহা যে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এমন সুযোগ পাইয়া বুদ্ধিমান্ প্রতিবাদ-কর্ত্তা কেবল নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন, তাহা কি সম্ভবপর? কিছুতেই নহে, তাই তিনি বড়ই সুরুচিসঙ্গতভাবে কৌশলের সহিত নিজ পুত্রগণেরও অলোক-সামান্য গুণের পরিচয় দিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাহার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির 'মধুবিদ্যাসম্পন্ন' বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, এ 'মধুবিদ্যা'টি কি, তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি এখনও প্রকাশ করেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে প্রতিবাদী মহাশয় সেই 'মধুবিদ্যা'র পরিচয় দিয়া এই মধুহীন দেশে আবার—"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' এই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখাইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের জীর্ণমূলকে মধুবৃষ্টির দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিবার এমন সুবর্ণসুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করিবেন না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ

৩

বিপ্লবের ইতিহাস

[বসুমতী পৌষসংখ্যা—৩৬০-৩৬২ এবং ৩৮০-৩৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

যে ভাবের প্রত্যুত্তর ও সমস্যা, তাহাতে মনে হয়, এ আলোচনা লোকের যত দিন বিরক্তিকর না হইবে, পাঠক 'অতিষ্ঠ' না হইবেন, তত দিন চলিবে, আমি দুই দিকে চালাইব না, আমার মাথার মণি শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ, আমার যেন চির আশ্রয় হইয়া থাকেন।

প্রথমে আমি বিপ্লবের ইতিহাস শুনাইব—তাহাতে আমা-দের মতটা শুনিলে সমস্যা-সমাধানে পাঠকের একটু সুবিধা হইবে। তৎপরে প্রত্যুত্তরের খণ্ডন থাকিবে, অতএব বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধের দুইটি অংশ, হয় ত ভবিষ্যতেও এইরূপ দুই অংশই চলিবে।

পূর্ব্ব-মীমাংসাশাস্ত্রের দর্শনত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতাবাদ খণ্ডন বিষয়ে কতিপয় কথা, এই অংশে থাকিবে। ইহাতে ধর্ম্মবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আছে,—এইজন্য এই অংশের নাম 'বিপ্লবের ইতিহাস।'

গতবারে বলিয়াছি, প্রকৃতির প্রতিকূলে গমন আমাদিগের ধর্ম্মসাধনা। এই প্রতিকূল-গমন যে কত কঠিন, তাহাও বলিয়াছি। এই কঠিনতা-বশতঃই সমাজে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রধান পুরুষগণের পদস্খলন দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গৃহীত হইলে অনাচারের প্রসার হয়—প্রকৃতির প্রবর্ত্তন তাহার অনুকূল হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ—বর্ণাশ্রমি-সমাজের প্রধান,—ত্যাগশীল ব্রাহ্মণ, ভোগে অভিলাষী—ভোগমগ্ন হইলে, ধর্ম্মের মূলসূত্র সংযম বিস্মৃত হইলে, প্রকৃতির প্রতিকূল গমনে পরাঙ্মুখ হইলে, ধর্ম্ম-বিপ্লব আরম্ভ হয়। যখন যেমন ইন্ধনলাভ ঘটে, সেই বিপ্লবানল তখন সেইরূপ বলযুক্ত হয়। দিন-রাত্রির মত, শীত-গ্রীষ্মের মত, এই বিপ্লব ও তাহার সমাপ্তি যুগে যুগে পর্য্যায়ক্রমে চলিয়াছে।

সনাতন ধর্ম্ম, নিবৃত্তিপ্রধান;—সেই ধর্ম্মের সাধনাঙ্গে তিনটি স্তর আছে—বেদে—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে, সেই স্তর-বিন্যাস; স্মৃতিতে তাহার উপযুক্ত ব্যাখ্যা বর্ত্তমান। মানবসমাজ রজঃপ্রধান; কাযেই কর্ম্মের সহিত মানবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; সাধারণতঃ কর্ম্ম প্রবৃত্তি-প্রধান; অনন্তমুখী কর্ম্ম-প্রবৃত্তির এক মুখে পরিচালন কর্ম্ম-কাণ্ডের—কর্ম্মোপদেশ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যথেচ্ছ আহারে, যথেচ্ছ বিহারে, প্রবৃত্তির অবারিত দ্বার থাকিলে, নিবৃত্তির ছায়াও মানবের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই যথেচ্ছতা নিবারণ কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা হইয়া থাকে। মাংস আহারে মানবের সাধারণ প্রবৃত্তি, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস ব্যতীত অন্য মাংস ভোজ্য নহে—এই বিধান থাকায় মাংস আহারে স্বৈর প্রবৃত্তির সঙ্কোচ হয়। মানবসমাজ প্রবৃত্তি-প্রধান হইলেও ধর্ম্মে নিবৃত্তি-প্রধানতা এইরূপ সোপানে ক্রমে সাধিত হইয়া থাকে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ প্রবৃত্তি-সঙ্কোচের ফলে নিবৃত্তির অস্পষ্ট ছায়া অনুভব করিয়া সেই নিবৃত্তি-অভিমুখে ধাবিত হয়—তাহার আকর্ষণে আত্মহারা হয়, তাহার উচ্চ [illegible] অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া নিবৃত্তির শান্তিময় [illegible] তাহাকে অনতিচিরকালমধ্যে স্থাপিত করে; কিন্তু এরূ[illegible] সংখ্যা অতি বিরল। সৎসঙ্গ—ত্যাগশীল ব্রাহ্মণ[illegible] সমাজে বিশেষভাবে থাকিলে,—নিবৃত্তির পুণ[illegible] সমাজ বঞ্চিত হয় না, কিন্তু প্রকৃতি এই নিবৃত্তির [illegible] চিরকালই করিয়াছে, এখনও করিতেছে. ভবিষ্যতেও [illegible] কর্ম্মকাণ্ডের যে পথ প্রবৃত্তি-সং[illegible] [illegible]ন্য উন্মুক্ত [illegible] প্রকৃষ্ট সহায় কালের প্রভা[illegible] বিভক্ত হইয়া পথিককে দিগ্‌ভ্রান্ত [illegible]

কোন সময়ে ব্রাহ্মণও এই [illegible] সাধন মনে না করিয়া ধনার্জ্জনের [illegible] এখন যেমন জ্ঞান অপেক্ষা, ধর্ম্ম [illegible] সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত; পূর্ব্বেও কোন [illegible] হইয়া গিয়াছে। যখনই তাহা হইয়াছে [illegible] দিয়াছে।

যে সময়ে জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম [illegible] পূর্ব্ব হইতেই ত্যাগশীল ব্রাহ্মণের [illegible] দ্বারা প্রচুর দক্ষিণা লাভই বহ [illegible] মাংস-ভোজনলোভও অত্যধিক [illegible] জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের বিরলতা [illegible] শীত-গ্রীষ্মের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে [illegible]

মধ্য দিয়া নিবৃত্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম-বিপ্লব ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

পূর্ব্বে কোন সময়ে ব্রাহ্মণের ধনলোভ ও আহারলোলুপতা, সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, প্রধানতঃ তাহার ফলে ক্রমে ৩ শত ৬৩খানি দর্শনের এবং জৈন-দর্শনের সৃষ্টি হয়। কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূল ও অনুকূল বিচারই এই দর্শনশাস্ত্রসমূহে ছিল। প্রাচীন জৈনসূত্রে ইহার পরিচয় আছে,—

"অসিঅ সঅং কিরিআণং
অকিরিঅবাঈণ হুন্তি চুলসাঈ।
অন্নাণি অ সত্তট্ঠী
বেণইআণং অ বত্তীসং॥"

অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীদিগের ১ শত ৮০খানি, কর্ম্মকাণ্ডবিরোধীদিগের ৮৪খানি এবং অজ্ঞ ৬৭খানি, আর বৈনয়িক অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের ৩২খানি দর্শন। এই যে ৩ শত ৬৩খানি দর্শন, দিনে বা দুইদশ বৎসরে হয় নাই। জৈন ও বৌদ্ধ-আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এবং সেই ধর্ম্মের পর পর্য্যন্ত যে ন্যূনাধিক সার্দ্ধ-সহস্র বৎসর, তাহার দর্শনের উৎপত্তি। এই ৩ শত ৬৩খানি দর্শনের মধ্যে নাই, জৈন-দর্শন তাহার অতিরিক্ত। সাংখ্যদর্শন, কর্ম্মকাণ্ডের অংশতঃ বিরোধী, লোকায়ত দর্শন গাদি দর্শন) তাহার পরে, কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ পূর্ণ

শত ৮০খানি দর্শনের উৎপত্তি, আক্রমণের প্রত্যাক্রমণ। ৩ শত ৮০ বাদে যে ১ শত ৮৩খানি দর্শন—পরোক্ষতঃ কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। এই নের জন্য—"কর্ম্মকাণ্ডই প্রকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ, নিবৃত্তিধর্ম্ম—ধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত নহে"—এই কর্ম্মকাণ্ডের অনুকূল দর্শনের সৃষ্টি। ধূর্ত্তরচনা, হিংসাদি-প্রধান যাগযজ্ঞ প্রসার-প্রয়াসে কর্ম্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষতঃ পূর্ব্ব হইতে হয়। কর্ম্ম হইতে পরম পুরুষার্থসাধন নহে—এই গুর পরোক্ষতঃ বিরোধী দর্শনের পরোক্ষতঃ বিরোধী দর্শনে কর্ম্ম-পূর্ত্তাও ছিল।

প্রথমে বলিয়াছি, "কর্ম্মের সহিত মানবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ" দর্শনশাস্ত্রে যত বিচারই থাক না কেন, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ইহা সার সত্য। কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূল বিচারে লোকের বৈদিক কর্ম্ম—যাগযজ্ঞে শ্রদ্ধা শিথিল হইল, বৈদিক কর্ম্মের হ্রাস হইল, কিন্তু কর্ম্মের হ্রাস হইল না; স্বৈরাচার বৃদ্ধি পাইল। এই যে বিচার এবং তাহার ফল, তদ্দারা সাক্ষাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হইল—কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড—ত্রয়ী বিদ্যা; জৈমিনীয় শাস্ত্র বা পূর্ব্ব-মীমাংসা তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা-বোধক মাত্র ছিল, জৈমিনীয় শাস্ত্রের দর্শন-পদবীতে স্থান মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে রচিত কৌটিলীয় অর্থনীতিতে দেখিতে পাই, বিদ্যা চতুর্ব্বিধ,—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, দণ্ডনীতি ও বার্ত্তা। তন্মধ্যে সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত, আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা নামে অভিহিত, ইহারই নামান্তর দর্শন। ইহার মধ্যে জৈমিনীয় সূত্র বা পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন নাই।

সাংখ্য, কপিলোক্ত; যোগ, কণাদ ও গৌতমোক্ত; লোকায়ত বৃহস্পতি ও চার্ব্বাকাদি-কথিত। পতঞ্জলি-কথিত যোগ, তখন দর্শনাংশে সাংখ্যেরই অন্তর্গত, অপরাংশে তাহা উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয়রূপে ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রও তাহাই, উহাও অধ্যাত্মবিদ্যা বা জ্ঞানকাণ্ড, মতান্তরে উপাসনাকাণ্ডের অন্তর্গত।

যোগ যে ন্যায় বৈশেষিকের নামান্তর, তাহা ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "অসদুৎপদ্যতে উৎপন্নং নিরুধ্যতে"—(ন্যায়সূত্রভাষ্য ১।১.২৯) এই যোগমতের বিবরণ প্রদানে পরিস্ফুট হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা থাকে না, তাহার উৎপত্তিকাল হইতে আত্মলাভ হয় এবং উৎপন্ন বস্তর বিনাশ হয়,—ইহা যোগমত বলিয়া ন্যায়ভাষ্যে কথিত। কিন্তু এই মত পাতঞ্জলের নহে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল—সৎকার্য্যবাদী, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, বিনাশের সময়ও কার্য্য সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন হয়। কচ্ছপের চরণ-প্রসারণের ন্যায় কারণ হইতে কার্য্যের নিঃসরণই উৎপত্তি; কারণে প্রবেশই বিনাশ। কচ্ছপ যখন তাহার শরীরমধ্যে চরণ তিরোহিত রাখে, তখন তাহা দেখা যায় না, কিন্তু তাহা থাকে—অস্তিত্বহীন হয় না; উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যও কারণমধ্যে সেইরূপ তিরোহিত থাকে—অস্তিত্বহীন নহে। উৎপত্তি আবির্ভাব—আবির্ভূতের পুনঃ তিরোভাবই বিনাশ—ইহাই সাংখ্যপাতঞ্জলের মত। বাৎস্যায়ন

"যোগানাং" বলিয়া সৎকার্য্যবাদ প্রদর্শন করেন নাই, "অসৎকার্য্যবাদ" যাহা ন্যায় বৈশেষিকসম্মত,তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। জৈনসূরি হেমচন্দ্র-কৃত 'অভিধান চিন্তামণিতে' "যৌগ ও নৈয়ায়িক" একার্থে জ্ঞাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যোগ ও ন্যায় যে একার্থক শব্দ ছিল, তাহা ইহার দ্বারাও বুঝা যায়। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং কৌটিল্য যে অভিন্ন, তাহা আমি কামসূত্রের ভূমিকায় প্রমাণিত করিয়াছি। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠাতা। বাৎস্যায়নের সময়ে বৌদ্ধগণের সহিত বিচার চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা দার্শনিক বিচার, ধর্ম্মবিচার নহে বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। ত্রয়ী-বাদিগণের সহিতই ধর্ম্মবিচার হয়। পঞ্জাব যেমন প্রতীচ্য আক্রমণের দ্বার, প্রতীচ্যের প্রথম আঘাত পঞ্জাবেই আপতিত হয়,—সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী সাংখ্য ও চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের মত, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি তাৎকালিক নবধর্ম্মেরও প্রথম আক্রমণ বৈদিক ধর্ম্ম বা ত্রয়ী বিদ্যার উপরেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। এই সকল আক্রমণ প্রতিরোধার্থ ১ শত ৮০খানি দর্শনের প্রাদুর্ভাবের কথা পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছি। ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত পূর্ব্ব-মীমাংসাশাস্ত্র সম্ভবতঃ অশোকের সময় হইতে দর্শনরূপে সংস্থাপিত হয়। উৎপল, বামন প্রভৃতি বহু আচার্য্য, এই সকল দর্শন গ্রন্থের পরবর্ত্তী নির্ম্মাতা।

ব্রাহ্মণগণের লোভমোহপ্রযুক্ত যে অধঃপতন, তাহা হইতে যে বিপ্লবের সূচনা হয়, ছোট ছোট আক্রমণ ও বিরুদ্ধ সমালোচনার তরঙ্গ সমাজ-বক্ষকে চঞ্চল করে, তাহার প্রবলতর স্বরূপ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ, যে বৈদিক ধর্ম্মের আশ্রয়ে ছিলেন, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ অল্পে অল্পে সেই বৈদিকধর্ম্ম ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এই ধর্ম্মত্যাগের প্রধান হেতু জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর ও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহের প্রতি সর্ব্বজ্ঞতা বিশ্বাস। তখন মহাবীরও ছিলেন না, শাক্যসিংহও ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের অম্লান খ্যাতি ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্তগণের সাধারণ নাম ছিল, 'সর্ব্বজ্ঞ'। এই সর্ব্বজ্ঞের চলিত ভাষার স্পষ্ট উক্তিতে অবিশ্বাস করিয়া দুর্ব্বোধ্য অজ্ঞাতবক্তৃক বেদের উক্তিতে এবং ব্রাহ্মণপ্রাধান্য-বোধক স্মৃতির উক্তিতে বিশ্বাস করা কথনই সঙ্গত নহে—ইহাই হইল তাৎকালিক জনমত।

সেই সময়ে কর্ম্মকাণ্ডের অনুকূলে জৈমিনীয় পূর্ব্ব-মীমাংসার আশ্রয় করিয়া যে সকল দর্শন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,—তন্মধ্যে শবর স্বামীর ভাষ্য প্রধান। তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডনার্থ বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি, বেদেরই স্বতঃপ্রামাণ্য, বেদানুগত না হইলে আর্ষ স্মৃতিরও প্রামাণ্য নাই—অবৈদিক জৈন বৌদ্ধ মতের অপ্রামাণ্য স্থাপনের অভিপ্রায়ে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিলে, তিনি যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের জন্য সাম্প্রদায়িকতার অধীন হইয়া পড়েন নাই, স্মৃতিকেও উপেক্ষা করিতে বলিতেছেন, এই ভাব মনে করিয়া অনেকে তাঁহার মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিলেও স্বধর্ম্মে আস্থাহীন এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণেও ইচ্ছুক হইয়াছিল—তাহারাও শবর স্বামীর মত শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ইচ্ছা ত্যাগ করে, ইহাই মনে হয়। বহু ক্ষত্রিয়-বৈশ্য অন্য ধর্ম্ম গ্রহণে দ্বিজত্বভ্রষ্ট,—এ অবস্থায় অনুষ্ঠানকারী বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে বা দীর্ঘকালীন ব্রহ্মচর্য্যে বাধা উপস্থিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া শবর স্বামী ঐ সকল স্মৃতির অপ্রামাণ্য [illegible] করিলেন। এই অপ্রামাণ্য ঘোষণায় ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন হ[illegible] কারণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বা দীর্ঘকালীন ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য-[illegible] ধর্ম্ম নহে,—তাহার বৈকল্পিক ধর্ম্ম ঐ সকল শাস্ত্রেই আছে। যে যুক্তিতে তিনি স্মৃতিরও অংশতঃ [illegible] স্বীকার করিলেন, সেই যুক্তিতেই জৈন বৌদ্ধ মতও [illegible] বলিয়া প্রতিপাদিত হইল। ইহার ফলে, অন্যমত[illegible] প্রবল আকর্ষণে একটু বাধা প[illegible] দ্বিজগণের [illegible] প্রযুক্ত বংশবৃদ্ধি হইতে লা[illegible] মহাবীরের প্রতি সর্ব্বজ্ঞতা বি[illegible] থাকিল,—সেই বিশ্বাস বর্দ্ধনের জন্য প্রচারাদি চলিতে লাগিল। এই সময়ে [illegible]গণের প্রবল আক্রমণই কর্ম্মকাণ্ডী ও [illegible] অপরাপর দার্শনিক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। [illegible] বিদ্যার রক্ষার্থ যে মহাপুরুষ প্রাণপণ যত্ন ক[illegible] প্রাতঃস্মরণীয় কুমারিলভট্ট। তিনি বৌ[illegible] করিবেন বলিয়া তাহাদিগের শাস্ত্রর[illegible] বৌদ্ধভাবে আত্মগোপন করিয়া বৌ[illegible] অধ্যয়ন করেন। তাহার পর তি[illegible] যাহা যাহা করেন, সর্ব্বজ্ঞতাবাদখ[illegible] বৈদিকধর্ম্ম-বিরুদ্ধবাদীকেও যদি [illegible] থাকে, তাহা হইলে তাৎকালিক স[illegible]

খণ্ডন অসর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতের কর্তৃত্বে সম্পন্ন হইলেও সেই খণ্ডনে বিশ্বাসী হইতে পারে না। "ইনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তাই বৌদ্ধগণ বিচারে ইঁহাকে জয় করিতে পারিল না, নিজেরাই পরাজিত হইল; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবের মত কি কখন মিথ্যা হইতে পারে ?"• লোকের মনের এই ভাব বুঝিয়াই আচার্য্য কুমারিল, সেই সর্ব্বজ্ঞতাবাদের বিরুদ্ধে বিচার করিলেন। (বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা-বাদখণ্ডনের জন্য যে বিচার কুমারিল করিয়াছেন—শাস্ত্রসমস্তায় তাহার পূর্ব্বাপর শ্লোক ত্যাগ করিয়া সাধারণের নয়নে ধূলি-মুষ্টি প্রক্ষেপের জন্য তাহার কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, অতঃপর এই অসত্য আচরণ প্রদর্শন করিব)। তিনি বৌদ্ধ-মতের বিরুদ্ধবাদই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন—বৌদ্ধ-গণের তাৎকালিক প্রধান সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদী; বিজ্ঞান অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানই—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান; বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই, বাহ্যবস্তু নাই, আত্মা নাই, বিজ্ঞানই স্বপ্রকাশ।

খণ্ডনের জন্য প্রতিভাশালী কুমারিল বলিলেন, বিজ্ঞান [illegible]ন—স্বপ্রকাশ ত নহেই—অতীন্দ্রিয়, একবারে [illegible] বাহ্য বস্তুতে যে জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়—'জ্ঞাতো ঘটঃ' ব্যবহার দ্বারা যে জ্ঞাততাকে বুঝা যায়, তদ্দারা [illegible]পলব্ধি হয়। বাহ্য বিষয় না থাকিলে জ্ঞাততারও [illegible]তে পারে না; জ্ঞানের জ্ঞান ত সুদূরপরাহত। [illegible] ভট্টের এই সকল বিচার, কেবল বেদবিরুদ্ধ [illegible]র জন্য, ব[illegible]র্ম-রক্ষণের জন্য; এখন সেই সব [illegible]শ্রম-বিধ্বংসের জন্য শাস্ত্র-বিরুদ্ধ [illegible] সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন আরব্ধ হইয়াছে। [illegible] দিয়াশলাই কাঠিতে মশারি ধরিয়া [illegible]লের ছিল না; আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ [illegible] বা কুমারিল ভট্টের এরূপ বিচার [illegible] বহু জনের ধর্ম্মরক্ষার্থ, নিজ সন্তানদিগকেও [illegible] করিতেও ব্রাহ্মণগণ পরাঙ্মুখ হন নাই। [illegible] সর্ব্বজ্ঞতাখণ্ডন বিচার গ্রহণ—আর [illegible] তুল্য; বিপদে ধর্ম্মরক্ষার্থ যাহার [illegible] তাহার আশ্রয়-গ্রহণ—মাদৃশ মূর্খ [illegible]কান্ত অসঙ্গত মনে করে। বিপন্ন [illegible] কি করিয়াছিলেন, তাহার একটু [illegible] মুসলমানের অত্যাচার বড়ই [illegible]লেই তাহার তিলক মুসলমানে জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া লইত, যজ্ঞোপবীত দন্ত দ্বারা ছিঁড়িয়া দিত। এইরূপে নিপীড়ন হইতে থাকিলে ব্রাহ্মণগণের পথে বাহির হওয়া কঠিন হইল; তখন তাঁহারা যুক্তি করিলেন, চতুরধিক সন্তানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পরিবারের এক এক জন সন্তান বিষ্ঠার তিলক ও শূকরের অন্ত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া পথে বাহির হইবে এবং এই ভাবে তাহারা 'হাট-বাজার' করিবে। প্রকৃত যজ্ঞোপবীতশূন্য অমেধ্যকলুষিত এই সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান যে ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট হইল, তাহা অভিভাবকগণ জানিতেন, কিন্তু 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে' ভাবিয়া বহু ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষার্থ, কতিপয় সন্তানকে ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট করিতে ও সোনার চাঁদকে জলে ভাসাইয়া দিতেও তাঁহারা দ্বিধা করেন নাই। এই সকল ব্রাহ্মণসন্তান পথে বহির্গত হইলে, তাহাদিগের তিলক-লেহনে অত্যাচারকারী মুসলমান বুঝিল, এ তিলক কোন্ বস্তু দ্বারা রচিত, যজ্ঞোপবীত-চ্ছেদনের সময় জানিল, এই সূত্র কার্পাস-তন্তুজাত নহে, শূকরের অন্ত্রজাত। মুসলমান কিছু দিন এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া ঐরূপ নির্য্যাতন ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। নিজ জাতির ব্রাহ্মণ্যরক্ষক অথচ স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট— এই ব্রাহ্মণ-কুমার-গণ সমাজের বিধানে যত্নতঃ পোষিত হইতে লাগিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদিগের বংশ বর্ত্তমান—এই সকল সমানকর্ম্মী ব্রাহ্মণবংশীয়-দিগের আদান-প্রদান পরস্পরের মধ্যেই হইয়া থাকে। ভিক্ষাই তাঁহাদিগের প্রধান জীবিকা, সমাজ তাঁহাদিগকে সাদরে প্রচুর ভিক্ষা অদ্যাবধি দিয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন বিচার যদি এখন সিদ্ধান্তরূপে মানিতে হয় ত পঞ্জাবের বিপদে অনুষ্ঠিত সেই আচরণের প্রামাণ্যে সকল ব্রাহ্মণকেই বিষ্ঠার তিলক প্রদান ও শূকরান্ত্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ ব্যবস্থা এখন কর্ত্তব্য কি না, তাহাই সুধীগণকে জিজ্ঞাসা করি।

শবরস্বামী আমাদিগের স্মৃতির কতকগুলি বচনকে পঙ্‌ক্তি-ভ্রষ্ট করিয়া বেদ-বাহ্য বাক্যকে অগ্রাহ্য বলিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে তাৎকালিক বিপ্লব বলহীন হইয়াছিল। ইহার জন্য শবর-স্বামী প্রভৃতি মীমাংসকাচার্য্যদিগের নিকটে সনাতনধর্ম্মী সমাজ চিরঋণী, কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ সকল মত প্রৌঢ়িবাদ মাত্র—উহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে,—আস্তিক সম্প্রদায় ইহা মনে করেন। এমন কি, মীমাংসকাচার্য্য কুমারিলও স্থানে স্থানে শবর-স্বামীর ঐ মত খণ্ডন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। লোভমূলক স্মৃতি-বিধানের উদাহরণস্বরূপে শবরস্বামীর পঙ্‌ক্তি শাস্ত্র সমস্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে,—"লোভাদ্ বাস আদিৎসমানা উদন্বরং

কুশৈঃ বেষ্টিতবস্ত্রঃ কেচিৎ" ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতা কুমারিল ভট্ট তাহার খণ্ডন স্বরূপে বলিয়াছেন,—"কুশবেষ্টনবাক্যে চ ন কিঞ্চিদ্ধেতু দর্শনম্। নিয়মেঽপি চ তদ্দৃষ্টং নৈবোর্দ্ধদশবাসসঃ। ক্রীতরাজক ভোজ্যান্নবাক্যঞ্চাথর্ব্ববৈদিকম্। ন চ তস্যাপ্রমাণত্বে কিঞ্চিদপ্যস্তি কারণম্।"

কুশদ্বারা বেষ্টন বিধি হইলে লোভের কথাই ত উঠিতে পারে না,—স্মৃতির বিধিবাক্যে বস্ত্রের কথাই নাই,—সোমক্রয়ের পরে দীক্ষিতের অন্ন-ভোজন বিধি—অথর্ব্ববেদে আছে—তাহার দোষ প্রদানও অনুচিত। অতএব মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস-পুরাণ ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রসম্মত সর্ব্বজ্ঞতা উড়াইয়া দিয়া যাহা ঋষিবচন নহে, পরস্পর বিসংবাদী পণ্ডিতের বিচারমাত্র, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

হেতু দর্শনে শবরস্বামী যেমন স্মৃতির অপ্রামাণ্য বলিয়াছেন, আমরাও সেই হেতু দর্শনেই তাঁহাদিগের বাক্যেও অপ্রামাণ্য নির্ণয় করিতেছি। মীমাংসক ঈশ্বর মানেন না, যাগযজ্ঞে হবনীয় দেবগণের চৈতন্য বা শরীর স্বীকার অনেকেই করেন না, এ সমস্তই জৈন-বৌদ্ধ বিচার-বিপ্লবের ফল। ম্লেচ্ছযবনের প্রথম আক্রমণ-স্থান পঞ্জাবের আচারভ্রংশের মত, চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির প্রথম আক্রমণ-ক্ষেত্র মীমাংসায় আস্তিকসিদ্ধান্তের আংশিক স্খলন হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস। সেইজন্যই ন্যায়াচার্য্যগণ এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আস্তিকশিরোমণিগণ ঐ সকল মীমাংসক-মত খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞতালাভ সাধনা-প্রভাবে যে হয়—তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ পৌষ মাসের প্রবন্ধে দিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করের মতও উদ্ধৃত করিতেছি—

'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিধানাচ্চ।' ৪।৪।১৭ ব্রহ্মসূত্র, শারীরিকভাষ্য হইতে বুঝা যায়—জগতের সৃষ্টিস্থিতি-সংহার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনপ্রভাবে মুক্তপুরুষগণের হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বজ্ঞতা যে তাঁহাদিগের হয়, ইহা বলা বাহুল্য। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত। এই কারণে বলিয়াছি—আর্য সর্ব্বজ্ঞত্বখণ্ডন শিষ্টজনপরিগৃহীত নহে।

পাঠক, বিপ্লবের পুরাতন সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইহা হইতেই সংগ্রহ করিবেন, নবীন ইতিহাস এখন অতি-সংক্ষেপে শুনাইতেছি। ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে এই বিপ্লবের আরম্ভ, এখন বিপ্লবের বল অধিক—ইহার প্রভাবে অনেকেই বিভ্রান্ত, এমন কি, সত্য গোপনে অনেকে সর্ব্বদা সচেষ্ট। এই বিপ্লবের অন্যতম ফল 'শাস্ত্র-সমস্যা।' বিপ্লবকারিগণ ধর্ম্ম চাহে না, শাস্ত্র মানে না, তাহারা যাহা যাহা করিবে, তাহাই যদি শাস্ত্র দ্বারা সমর্থন করা যায় ত বহুৎ আচ্ছা, নতুবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন। তথাপি কোন কোন প্রাচীন তাহাদিগের বিপ্লবে ইন্ধন যোগাইতেছেন। সে ইন্ধন কিন্তু অযথাভাবে সংগৃহীত, তাহাই দেখাইতেছি।

শাস্ত্র-সমস্যার (১) সংখ্যায় তাৎপর্য্য বুঝা গিয়াছিল,—গীতায় যে 'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ' আছে—সেই শাস্ত্র বেদ ও কল্পসূত্র,—সুতরাং গীতায় ভগবান্ বেদ ও কল্পসূত্রকে প্রমাণ বলিতেছেন, পুরাণ প্রভৃতি নহে, ইহা প্রত্যুত্তরবাদীর স্বীকৃত। শাস্ত্র-সমস্যার (৩) সংখ্যায় তাঁহার উদ্ধৃত মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামীর উক্তি দ্বারা যে যে বিধি লোভমূলক বা নপুংসকত্বপ্রচ্ছাদনের উপায় বলিয়া অপ্রমাণস্বরূপে নির্ণীত, সেই উক্তিগুলিই তাঁহার মানিত শাস্ত্র-কল্পসূত্রের বিধিবাক্য।

অতএব গীতার সময়ে যাহা শাস্ত্র, শ্রীভগবান্ যাহা [illegible] বলিয়া স্বমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই ভাব একবার [illegible] করিয়া শবরস্বামীর উক্তি দ্বারা সেই শাস্ত্রকেই উপেক্ষণীয়ত্ব প্রতিপাদন, শাস্ত্র-সমস্যা-রচয়িতার কেমন স্থিরসিদ্ধান্তের পরিচায়ক, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকের বিচার্য্য। ঐ বিধিগুলি মন্বাদি সংহিতার নহে, পুরাণের নহে, কল্প[illegible]; মন্বাদি সংহিতা[illegible] পুরাণের কোন উক্তিই শবরস্ব[illegible] হইয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হয় নাই।

এখন আমার বক্তব্য এই—স্বয়[illegible] স্বামী, কুমারিল প্রভৃতি মীমাংসকগণ স[illegible] যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা জৈমিনী অধ্যায় তৃতীয় পাদ ২য় সূত্র ও তাহার ভাষ্য

অপি বা কর্ত্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং

শবরভাষ্য

"অপি বেতি পক্ষো ব্যাবর্ত্ততে· প্রত্যক্ষ অনুমীয়েত··· কর্ত্তৃসামান্য

ব্যাখ্যা—

ইহা স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণ, সূত্রে, স্মৃতির অপ্রামাণ্য আশঙ্কিত

পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সিদ্ধান্তসূত্র। 'অপি বা' এই শব্দ দ্বারা পক্ষান্তর সূচিত হইল, পূর্ব্বপক্ষে যে মত উক্ত হইয়াছে, তাহার বিপরীত মত এই সূত্রে প্রদর্শিত হইতেছে—অনুমান শব্দের অর্থ স্মৃতি, স্মৃতি—প্রমাণ, স্মৃতিকর্ত্তা এবং বৈদিক পদার্থের কর্ত্তার ভেদ নাই, যাঁহারা স্মৃতিকর্ত্তা—তাঁহারা বৈদিক-পদার্থ-কর্ত্তা, এই কারণে স্মৃতির মূলে যে বেদপ্রমাণ আছে, তাহা অনুমান করা যায়।

ইহার পরে শবর ভাষ্যেই আছে,—

"ননু নোপলভন্তে এবং জাতীয়কং গ্রন্থম্, অনুপলভমানা অপ্যনুমিমীরন্ বিস্মরণমপ্যুপপদ্যতে।"

অর্থাৎ—স্মৃতিশাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে, তাহার মূল বেদ কেহ ত দেখিতে পান না,—না দেখিলেও তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। এখন তাহা বিস্মৃতিগর্ভে লীন, ইহাও অসম্ভব নহে।

শ্লোকবার্ত্তিকে যে সর্ব্বজ্ঞতা-বাদের খণ্ডন আছে, তাহার মুখ্য ...দেশ্য ইতঃপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, উক্ত শ্লোকবার্ত্তিক হইতে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

"বুদ্ধাদীনামসার্ব্বজ্ঞ্যমিতি সত্যং বচো মম।
মহত্ত্বাদ্ যথৈবাগ্নিরুষ্ণো······ভাস্বর ইত্যপি॥ ১৩০
ন চাপি স্মৃত্যবিচ্ছেদাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ পরিকল্প্যতে।
বিগানাচ্ছিন্নমূ...লত্বাৎ কৈশ্চিদেব পরিগ্রহাৎ॥" ১৩৩॥

...শ্লোকের পরেই

...
...ব তৎকালে তু বুভুৎসুভিঃ।
...নরহিতৈর্গম্যতে কথম্" ॥ ১৩৪ ॥

ইত্যাদি, 'সমস্যা'য় উদ্ধৃত।

...গ্রাহ্য, তাহা কুমারিল ভট্ট প্রতিপাদন ...ঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে—এতৎপ্রসঙ্গে ...র্থ "বুদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, আমার ...ক্যই তাহার হেতু; অগ্নি উষ্ণ ও ভাস্বর ...সত্য, ইহা সেইরূপই সত্য।" তৎপরে ...তুর উপযুক্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে। ...ক, তাহার ভাবার্থ এই যে, বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ, এ...াহিক স্মৃতি বা স্মরণ চলিয়া আসিতেছে— ...ঃ বলিয়া নিশ্চয় করা উচিত,— ...উত্তর এই—যেমন সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া এক সম্প্রদায়ের স্মৃতি বা স্মরণ চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ, বুদ্ধ প্রতারণাভিলাষী হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, এমন নিন্দাও চলিয়া আসিতেছে, বিশেষতঃ ঐরূপ স্মরণের মূল নাই, আর বুদ্ধের মত সামান্য ব্যক্তিগণেরই পরিগৃহীত (শিষ্টপরিগৃহীত নহে)—এই সকল কারণ বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা-নিশ্চয়ের প্রতিকূল। ইহার পরেই সেই সমস্যারচয়িতার উদ্ধৃত ১৩৪ শ্লোক, তাহা আমিও উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার ভাবার্থ, বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ এইরূপ ধারাবাহিক স্মরণ চলিয়া আসিতেছে—এইরূপ উক্তিও অসঙ্গত; কারণ, স্মরণের মূল অনুভব, কেহ কোন বিষয়ে যদি স্মরণ করে, তাহার মূলে প্রত্যক্ষাদি অনুভব থাকা আবশ্যক, অনুভব না থাকিলে তদ্বিষয়ে স্মৃতি বা স্মরণ হইতে পারে না,—অসৌ (বুদ্ধঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ—অর্থাৎ বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহা সেই সময়ের লোক যদি অনুভব করিত, তাহা হইলে ধারাবাহিক স্মরণের সম্ভাবনা থাকিত—কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই, সর্ব্বজ্ঞের যাহা জ্ঞেয়, তদ্বিষয়ে যাহাদিগের জ্ঞান নাই তাহারা, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ নিশ্চয় করিবে কিরূপে? আমার যাহা জ্ঞানের অতীত, সে বিষয়ে অপরের জ্ঞান আছে কি না, ইহা নিশ্চয় করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

আমার কথিত বিবরণ স্মরণ করুন এবং কুমারিল ভট্টের শ্লোকগুলি পাঠ করুন, দেখিবেন, বুদ্ধ-প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডনের জন্যই তাঁহার প্রযত্ন। ১৩৩ শ্লোকে যে 'ছিন্নমূলত্বাৎ' আছে, তাহারই বিবরণ 'সর্ব্বজ্ঞোঽসৌ এই শ্লোকটি। শ্লোকবার্ত্তিকের সুপ্রসিদ্ধ টীকা পার্থসারথি-মিশ্রকৃত ন্যায়-রত্নাকরে আছে, "ছিন্নমূলতাং বিবৃণোতি সর্ব্বজ্ঞ ইতি", ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডনের ইহা প্রকরণ নহে, ১৩৩ শ্লোকের অপর হেতু দু'টি, ঋষিগণের পক্ষে খাটে না, বুদ্ধ প্রভৃতি বেদ-বহির্ভূত মতবাদীর সর্ব্বজ্ঞতাখণ্ডনেরই ইহা প্রকরণ,—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি পাঠ করিলে সকলেই এই তথ্য বুঝিবেন। এ ক্ষেত্রে 'সমস্যা'-রচয়িতা আদি অন্ত বাদ দি... মাঝের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া যে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অশোভন নহে। ইহার ... প্রতিবাদীর অনুবাদে, 'অসৌ' কথাটি হয় পরিত্যক্ত, না হয়— 'কোন মানুষ' এইরূপ অর্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কি... প্রকরণ-বশতঃ 'অসৌ' ইহার অর্থ 'বুদ্ধঃ' হওয়াই উচিত, ... কুমারিল ভট্টের যে বিচার উদ্ধৃত করিলে এইরূপ অসত্য প...

অবলম্বন করিতে হইত না, 'সমস্যা'-রচয়িতা সে বিচার দেখেন নাই। এই ইঙ্গিতে যদি সূচীপত্র দেখিয়া 'সমস্যায়' সেই বিচার অতঃপর প্রদর্শিত হয় ত, তাহার উত্তর এ পক্ষে প্রস্তুত হইয়া আছে।

মীমাংসক মতের অনুবর্ত্তী 'সমস্যা'-রচয়িতার উক্তিতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাও যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা ঈশ্বরের সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ, মীমাংসকমতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে। এক্ষণে এই অংশ হইতে পাঠক ইংরাজীশিক্ষাজনিত বিপ্লবের ইতিহাস সংগ্রহ করুন।

খণ্ডন

প্রত্যুত্তর বটে,—একেবারে 'কস্যং'এর উত্তরে খস্যং হইতে চস্যং পর্য্যন্ত।

দুঃখ এই, ইহারও আবার খণ্ডন লিখিতে হইল।

আম্নায় শব্দে যে মন্ত্র ব্রাহ্মণ—সমগ্র বেদ বুঝায় না, এ কথা আমি কোথাও বলি নাই, আম্নায় ও বেদ যে একার্থক শব্দ, তাহার পরিচয় দশ বৎসর বয়সে অমরকোষেই পাইয়াছি। তাহার জন্য মীমাংসাদর্শনের সূত্র-ভাষ্য ও বার্তিক উদ্ধৃত করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

আমি বলিয়াছি, 'আম্নায়—বেদমন্ত্র' এই আমার অপরাধ, বেদমন্ত্র যদি আম্নায় না হইত, তাহা হইলে আমার কথা জৈমিনির বিরুদ্ধ হইত, ইহাতে বিরুদ্ধ হইল কিরূপে?—প্রত্যুত্তর-দাতার অভিপ্রায়—কেবল বেদমন্ত্র কেন, ব্রাহ্মণও আম্নায়;—আমার কথা, দুই-ই আম্নায় হউক না, এক জন ব্রাহ্মণকে যদি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলা যায়—তাহাতে আর সকল ব্রাহ্মণ কি চটিয়া লাল হইবেন, বলিবেন 'আমাদের সকলকে ব্রাহ্মণ বলা হইল না কেন?'

বস্তুতঃ প্রয়োজন মতে ব্যাপক অর্থের শব্দকে ব্যাপ্য অর্থে প্রয়োগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কেহ পিপাসায় জল চাহিলে, আমাকে যে ব্রহ্মাণ্ডের সব জল একত্র করিয়া তাহাকে দিতে হইবে, তাহা নহে,—'জল দেও' এই কথায় যে 'জল' শব্দ আছে, তাহার ব্যাপক—অর্থ, সমস্ত জলই সেই শব্দ দ্বারা বুঝায়, কিন্তু জলপ্রার্থীর প্রয়োজনীয় জল—যাহা ব্যাপ্য অর্থ, এ স্থলে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। এই ত শব্দপ্রয়োগের রীতি। এতদনুসারে—ব্যাপক—সামান্যবাচক আম্নায় শব্দের ব্যাপ্য—ছোট অর্থ—লওয়ায় দোষ হইতে পারে না।

আমার প্রয়োজনানুসারে আমি প্রয়োগ করিয়াছি, যে শব্দ বাচক নহে—সে শব্দ প্রয়োগ করি নাই, ছোট করিয়া ব্যাপ্য অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি এইমাত্র।

আমার প্রয়োজন কি, এখন তাহাই বলি,—আমি ঐ স্থানে আম্নায় শব্দটি যদি প্রয়োগ না করিতাম, তাহা হইলেও—আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিবার পক্ষে কোনই ক্ষতি হইত না—'বেদমন্ত্র—সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ ভাগে তাহার বিস্তার'—ইহা ত বলিতে পারিতাম; বলি নাই কেন? ভগবান্ বেদব্যাসের দুইটি জটিল বচনের স্পষ্ট ব্যাখ্যার অনুসরণ করিব বলিয়া; প্রতিপক্ষের বিদ্যা ধরাইয়া দিবার ইচ্ছাও একটু ছিল।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ আমাদিগের মাননীয়, কিন্তু তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র-বিদ্বেষ ও পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসায় পক্ষপাত প্রভৃতি কারণে কতিপয় স্থানে ব্যাখ্যার দোষ হইয়াছে—তদনুসারে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় গুরুপরম্পরাক্রমে সেই সকল স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না, অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহা জানেন। সেই পদ্ধতিমতে আমি ভগবান্ বেদব্যাসের মহাভারতস্থ দুইটি বচনের তদীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া সরল অনুবাদ করিয়াছি, আবশ্যক হইলে সেই শ্লোকদ্বয়, নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা ও আমার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিব। "আম্নায়—বেদমন্ত্র, সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ ভাগে তাহার বিস্তার" আমার এই বাক্য—ভগবান্ বেদব্যাসের মহাভারতীয় সেই দুই শ্লোকের যে চরণদ্বয়ের অনুবাদ, তাহা দেখাইতেছি—

"[illegible]

প্রসৃতাঃ সর্ব্বতোমুখাঃ

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

এই স্থলে আম্নায় ও বেদের স্পষ্ট ভেদ বুঝা যাইতেছে— ভেদ সহজভাবে রক্ষা করিতে হইলে, ব্যাপক [illegible] আম্নায় শব্দ এবং বেদ শব্দের ব্যাপ্য বা বিশেষ অর্থে [illegible] বুঝিতে হয়। সামান্যবাচক শব্দের যে [illegible] প্রয়োজনানুসারে হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখাই[illegible] বচনে আম্নায় শব্দের বিশেষ বা ব্যাপ্য বেদশব্দের বিশেষ বা ব্যাপ্য অর্থ ব্রাহ্মণ, [illegible]নিষদ্ ভাগ। মহাভারত-রচয়িতা ভগবান্ সূত্র-কর্ত্তা জৈমিনির গুরু, সেই

পুনর্ব্বেদাঃ প্রস্তুতাঃ" বলিয়া আম্নায় ও বেদের ভেদ বুঝাইতে পারেন, তখন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাঁহার ভেদনির্দ্দেশের সরল সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ প্রদর্শনের জন্য এই জরদ্ বালকের যে উক্তি—তাহা মহর্ষি জৈমিনির নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, এমন আশা এই অজ্ঞ ব্যক্তি করিতে পারে না কি?

প্রত্যুত্তর-দাতার কথা,—

"এই প্রকার উক্তি কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রবিরুদ্ধ।" আমরা "মুখ্যুসুখ্যু" লোক, আমরা বুঝি—যদি 'হাঁ'কে 'না' বলা হয়, বা 'না'কে 'হাঁ' বলা হয়, তবেই বিরুদ্ধ হয়,—আমি এখানে পূর্ব্ব-মীমাংসাশাস্ত্রের কোন 'হাঁ'কে 'না' বলি নাই, বা কোন 'না'কেও 'হাঁ' বলি নাই, তবে আমার ঐ প্রকার উক্তি বিরুদ্ধ হইল কিরূপে? (তবে যে স্থানে গৌতমীয় মতের সহিত বিরোধ, সে স্থানের কথা স্বতন্ত্র, জৈমিনি আম্নায় শব্দের ব্যাপক—বড় অর্থ ধরিয়াছেন, আমি তাহার ব্যাপ্য—ছোট অর্থ ধরিয়াছি, ছোটটি কি বড়র ভিতরেই নাই? আমার বড় একটা বাগান, তাহার এক কোণে আমি একখানা ঘর করিলে আমার ব্যাপক স্বত্বের সহিত ঐ ঘরের স্বত্বের কি বিরোধ হইবে? আচ্ছা, প্রত্যুত্তরদাতার প্রমাণ হইতেই দেখাইতেছি, ইহা বিরুদ্ধ নহে।

প্রত্যুত্তরদাতা ত স্বীকারই করেন—"আম্নায় শব্দের অর্থ সমগ্র বেদ" অথচ তিনি শবরভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'বিধায়ক বাক্যকেও আম্নায় এই শব্দের অর্থ বলিয়া মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামী বহু স্থানেই দেখাইয়াছেন'—উদ্ধৃত স্থানে সমগ্র বেদকে আম্নায় বলা হয় নাই, বিধায়ক বাক্যকে বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার শবরস্বামীর এই ছোট—অতি ছোট অর্থে আম্নায় শব্দের প্রয়োগ, ইহা কি সমগ্র বেদের আম্নায়ত্ববাদী মহর্ষি জৈমিনির মতবিরুদ্ধ হইবে? অথবা তাঁহার স্বমত বিরুদ্ধ হইবে? যদি না হয় ত আমারই বা উক্তি বিরুদ্ধ হইবে কেন?

এই ত গেল, 'খণ্ডং'এর পালা। ইহার পর আরও চার পালা, দেখা যাক্।

'গণ্ডং' [illegible]পা—প্রত্যুত্তরদাতার আরম্ভ—"সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত শাস্ত্রের যে বিভাগ" "তাহা বিভাগ-লক্ষণাক্রান্ত হয় [illegible] তাহার কারণ এই যে, "আরণ্যক ও উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে [illegible] বলিয়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ [illegible] [illegible] না।"

আমার কথা, আমি কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত শাস্ত্রের বিভাগ করি নাই। আমি স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি—"যুধিষ্ঠির ক্ষুদ্র রাজ্য পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণের সহায়তায় এবং ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে ও অস্ত্রবলে তাহার বিস্তার" এইরূপ বাক্যমধ্যে যেমন বিভাগের সম্ভাবনা আসে না, সেইরূপ "আম্নায়—বেদমন্ত্র সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ ভাগে তাহার বিস্তার" আমার এই উক্তিতেও বিভাগের আশঙ্কা আসিতেই পারে না। বিশেষতঃ সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র ত এক বেদমন্ত্র, তাহার বিভাগ হইল কোথায়? আর যদি ইহা হইতে 'বিভাগ' আনিতেই হয় ত তাহা এইরূপ,—শাস্ত্র দ্বিবিধ—সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত; সংক্ষিপ্ত যথা—বেদমন্ত্র; বিস্তৃত যথা—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ ভাগ; উপনিষদের ভাগ—অংশবিশেষ। এই বিভাগে বিভাগলক্ষণের কি দোষ হইল? বিভাগলক্ষণটাই বা কি? তাহার বিচার হউক না।

তবে এখন একটা কথা হইতে পারে, 'ব্রাহ্মণে তাহার বিস্তার' ইহা বলিলেই ত আরণ্যক ও উপনিষদ্ভাগকেও বুঝাইত, তাহার পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই—পূর্ব্ব-মীমাংসক মতের প্রথম কল্পে আরণ্যক ও উপনিষদের স্বতন্ত্র প্রতিপাদ্য নাই, কর্ম্মকাণ্ডের ব্রাহ্মণভাগে যে বিধি-নিষেধ আছে, উক্ত অংশদ্বয়ে তাহারই অর্থবাদমাত্র, সেই যে বিধিনিষেধ, তাহা এই দুই অংশেরও প্রতিপাদ্য। 'ব্রাহ্মণে তাহার বিস্তার' বলিলে এই কল্পেরই সমর্থন করা হয়, আমার তাহা অভিপ্রেত নহে। উত্তর-মীমাংসা ও অন্যান্য মত এই যে, আরণ্যক এবং উপনিষদেরও স্বতন্ত্র প্রতিপাদ্য আছে। ঐ দুই অংশ কর্ম্মকাণ্ডের 'নেজুড়' নহে,—যোগ, উপাসনা, ভক্তি, জ্ঞান—এই সকল বিষয়ের বিস্তার উক্ত দুই অংশ হইতে হইয়াছে, কাষেই পৃথক্ করিয়া নামনির্দ্দেশ আবশ্যক, তাহাই করিয়াছি। আরণ্যক ও উপনিষদ্ সংজ্ঞার সহিতও শাস্ত্র-বিস্তারের সম্পর্ক আছে, যথা—'আরণ্যকমধীত্য চ' এই মনুবচনে যে আরণ্যক অধ্যয়নান্তে বেদপাঠে অহোরাত্র অনধ্যায়বিধি বা অধ্যয়ন নিষেধ, তাহার সহিত আরণ্যকের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মনু বলিয়াছেন,—

"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা।"

কুল্লূকভট্ট ইহার ব্যাখ্যায় বলেন,—

"সমগ্রো বেদো মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ সোপনিষৎকোঽধ্যেতব্যঃ। রহস্যমুপনিষৎ। প্রাধান্যখ্যাপনায় পৃথঙ্নির্দ্দেশঃ।"

সমগ্র বেদ অধ্যয়নের বিধিসত্ত্বেও উপনিষদের নাম পৃথক্‌ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে—'প্রাধান্যখ্যাপন পৃথক্ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য'—ইহা কুল্লূকভট্টের কথা। শাস্ত্রবিস্তারে অধিকতর উপযোগিতারূপে এই প্রাধান্যখ্যাপন আমার পক্ষে আরণ্যক ও উপনিষদের পৃথক্ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য।

'ন্যায়-দর্শনে'র 'প্রমাণ প্রমেয় সংশয়' ইত্যাদি প্রথম সূত্রে যে প্রমাণ-প্রমেয়াদির পৃথক্ নির্দ্দেশ দেখা যায়, তাহাতেও প্রমাণমধ্যে প্রমেয়ের অন্তর্গত ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান প্রবিষ্ট আছে, এইরূপ পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিশ্রণ থাকিলেও প্রয়োজনানুসারে তাহার পৃথক্ নির্দ্দেশ। বিভাগজ্ঞাপন করিতে হইলে সেখানে যে উপায়—এখানেও তাহার অভাব নাই। সংক্ষেপেই কথাটা শেষ করিলাম।

'ঘস্তং'—খুব জবর! কুমারিলভট্টের বার্ত্তিক উদ্ধৃত করা আছে, তাঁহার গভীর সংস্কৃত ভাষায় গদ্য-পদ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, আমার মত তাহার দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই, বরং সমর্থিতই হইয়াছে। আমার কথা, "বেদের অংশবিশেষ বিলুপ্ত হইলে তাহার অর্থ স্মরণ করিয়া বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।" এই কথায় দোষপ্রদর্শনার্থ প্রত্যুত্তরবাদীর উদ্ধৃত কুমারিল সন্দর্ভের একাংশ—

"তে হি প্রযত্নেন শাখান্তরাধ্যায়িভ্যঃ শ্রুত্বা অর্থমাত্রং স্ববাক্যৈরবিস্মরণার্থং নিবধ্নীয়ুঃ ন চ বাক্যবিশেষো জ্ঞায়তে।"

প্রত্যুত্তরদাতার অনুবাদ—"মনু-প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ··· শাখান্তরাধ্যায়ী ব্যক্তিগণের মুখে বেদের অপেক্ষিত অর্থমাত্রই শুনিয়া লইতেন এবং যাহাতে ভুলিয়া না যান, তাহার জন্য স্বরচিত বাক্যের দ্বারা তাহা নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেইজন্য সেই মূলভূত বাক্যবিশেষ জ্ঞাত হয় না।"

এ অনুবাদ ঠিক হয় নাই,—তাহা পরে দেখাইব, এখন যাহা এই অনুবাদে আছে, তাহার দ্বারা বুঝা যায়, 'ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ স্বয়ং যে সব শাখা পাঠ করেন নাই, সেই সকল শাখার অধ্যেতা ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহার প্রয়োজনীয় অংশ শুনিয়া লইয়া ভবিষ্যতে তাহার বিস্মরণ যাহাতে না হয়, তাহারই জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, সেই স্মারকলিপি হইতেই ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহা বলা বাহুল্য। শুনিয়া লইবার পর সংস্কার হয়, সেই সংস্কার হইতে যে স্মরণ, তাহারই ফল ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহাই ভাবার্থ। শ্রবণের পর স্মরণ না হইলে নিবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, ইহা সকলেরই বোধগম্য। আর তাহার মূলও কুমারিলের সময়েও দৃষ্টির অতীত 'স্মৃতের্মূলং ন দৃশ্যতে' (বার্ত্তিক)। বেদার্থ স্মরণ করিয়া যে ধর্ম্মশাস্ত্র-রচনা, ইহা কুমারিলের কথা, আমিও সে কথা বলিয়াছি। কুমারিল বলেন, সেই বেদ দৃষ্টির অতীত, আমি বলিয়াছি—বিলুপ্ত, অতএব ভাব একই। এ পর্য্যন্ত এই মীমাংসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা অজ্ঞাতসারে মীমাংসাশাস্ত্রের অনুগমন করিয়াছে। কেবল আমি বলিয়াছি, 'বেদ বিলুপ্ত হইলে তাহার অর্থ স্মরণ' কুমারিল তাহা বলেন নাই। কিন্তু ইহাও বলেন নাই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যখন অন্যের নিকট হইতে সেই বেদার্থ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন, তখন তাঁহাদিগের উপদেশক মহাশয়েরা জীবিত এবং সে শাখা তখনও বর্ত্তমান। তাহা যদি না বলিতেন, তবে আমার উক্তিকে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডিত করিবার প্রয়াস কি অসঙ্গত নহে?

কুমারিল-বাক্যের যথাযথ অনুবাদ হইলে, তাহার দ্বারা শাখালোপেরই আভাস পরিস্ফুটভাবে পাওয়া যায়—তাহা দেখাইতেছি। কুমারিল-বাক্যস্থ "প্রযত্নেন" পদটি প্রত্যুত্তরবাদী স্বকৃত অনুবাদে ছাড়িয়াছেন,—'বেদের অপেক্ষিত' এবং 'সেই জন্য' এই অংশদ্বয় তিনি বাড়াইয়াছেন। আর 'নিবধ্নীয়ুঃ' এই ক্রিয়াপদের অনুবাদ করিয়াছেন—নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এই অনুবাদ ব্যাকরণদুষ্ট।

'প্রযত্নেন' ইহার অনুবাদ 'অতি যত্নসহকারে', 'নিবধ্নীয়ুঃ' ইহার অনুবাদ 'নিবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব', নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এইরূপ—নিশ্চিত অতীতকাল লিঙ্ বা বিধিলিঙের অর্থ নহে। সম্ভাবনা অর্থই এ স্থলে সঙ্গত, বিধিলিঙের সম্ভাবনা অর্থ শব্দশাস্ত্রেরও সম্মত। এখন যথাযথ অনুবাদ এই—'ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অপরশাখাধ্যায়ীদিগের নিকট হইতে অতি যত্নসহকারে শুনিয়া, পরে বিস্মরণ না হয়, এই নিমিত্ত স্বরচিত বাক্যে তাহার অর্থমাত্র সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু সেই বেদবাক্য জানা যায় না।' কুমারিল এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হ'ন নাই, একটা সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। যদি সেই শাখা লোপের আশঙ্কা না থাকিবে, তবে অতি যত্ন সহকারে ··· পদটি কুমারিল প্রদান করিবেন কেন? বিস্মরণভয়ে তাহার অর্থমাত্র নিজের ভাষায় লেখা, ইহাও উপদেশকের বিরলতা এবং মূলগ্রন্থ দুর্ল্লভতার সূচক। এই লেখা হইতে ··· ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যখন দেখিলেন, অপ···

সেই সময়ে বৃদ্ধদিগের নিকটে অতি-যত্নসহকারে উপদেশ লইলেন,—তাহার পরে উপদেশকগণেরও তিরোধান ঘটায় তাহার অর্থ-মাত্র স্বীয় রচনায় লিপিবদ্ধ করিলেন, নতুবা বিস্মৃত হইবারই আশঙ্কা। অন্ততঃ তখন স্মরণোপযোগিভাবে লিপি-বদ্ধ হইলেও শিষ্যের প্রতি উপদেশসময়ে—অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রা-কারে যখন প্রবর্ত্তন হয়, সেই সময়ে—সেই শাখা যে বিলুপ্ত, তাহা মানিতেই হয়; নতুবা সেই বেদ হইতেই যে সকল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিত, তাহার স্বরচনায় উপদেশ প্রদান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না কি? বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ বেদ সত্ত্বে তদর্থজ্ঞাপক স্মৃতি মীমাংসকমতে প্রমাণ হইতে পারে না, —অনুবাদক মাত্র হয়। যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ বেদ নাই, সেই বিষয়ে কারণান্তর-নিরপেক্ষ স্মৃতি—প্রমাণ, ইহাই শবর-স্বামী প্রভৃতির মত সুতরাং বেদের সেই সেই অংশ বিলুপ্ত হইলে, স্মরণকর্ত্তা ঋষির বিধান বা স্মৃতি—প্রথম হইতেই প্রমাণ;—বিলুপ্ত না হইলে সেই বিধান প্রথম হইতেই প্রমাণ হয় না, যত দিন বেদের সেই সেই অংশ দৃষ্টি-গোচর ছিল, তত দিন 'প্রমাণ'রূপে গণ্য হয় নাই, পরে হইয়াছে; ইহা স্বীকার করিলে, একই শাস্ত্র প্রমাণত্ব ও অপ্রমাণত্বের মিশ্রণ হইল, ইহা মীমাংসকমতে দোষ, অতএব কুমারিলের অভিপ্রায় এই—বেদের অংশবিশেষ বিলুপ্ত হইবার পরেই তদর্থস্মারক ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত, এবং উহা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক বলিয়া সেই সেই অংশে প্রমাণ-স্বরূপ। তবে এই প্রামাণ্য বেদমূলক, অনুমিত লুপ্ত-বেদের দ্বারা ইহার প্রামাণ্য। প্রত্নতত্ত্ববাদীর উদ্ধৃত কুমারিলের কারিকায় স্পষ্ট আছে—'শাখানাং বিপ্রকীর্ণত্বাৎ।' বিপ্র-কীর্ণত্বের অনুবাদ আছে 'বিপ্রকীর্ণতা', এই বিপ্রকীর্ণত্ব বা বিপ্রকীর্ণতা কি, তাহার অর্থ করা নাই। গমনাগমনবর্জ্জিত বিভিন্ন দ্বীপে বিক্ষিপ্তভাবে স্থিতি—বিপ্রকীর্ণতা শব্দের অর্থ, তাহা এক এক দ্বীপে সেই শাখার লোপের মধ্যেই গণ্য হয় না কি? অতএব কুমারিল বলিতেছেন, দ্বীপান্তরে বিক্ষিপ্তভাবে অব-স্থিতি হেতু "স্মৃতের্মূলং ন দৃশ্যতে" স্মৃতির মূল যে শ্রুতি, তাহা দেখা যায় না। এখন সুধী পাঠক দেখুন, কুমারিলভট্টের মতের সহিত আমার অজ্ঞতাপ্রযুক্ত মতবিরোধ এ স্থলে হইতেছে কি?

সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্ববেদজ্ঞতা মন্বাদির ছিল না, কুমারিলের এই মত যদি কেহ [illegible]াইতে পারেন, তাহা হইলেও জ্ঞানপূর্ব্বকই [illegible]মি তাহা [illegible]; তাহার কারণ, ঋষি অপেক্ষা কুমারিলের কথা অধিক মান্য নহে, ঋষিবাক্য যেখানে কুমারিলের প্রতিকূলে, সেখানে ঋষিবাক্যই মানিব, কুমারিলের বাক্য মানিব না। বিশেষ কথা এই যে, মহামান্য কুমারিল কেন সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন-মত খ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহা বিপ্লবের ইতিহাসে বলিয়াছি।

'ওস্তং'—মাথায় পাগড়ী, কাযেই 'ভেতো' বাঙালী—সেকেলে 'বামুণ পণ্ডিত'—আমি, আমার ভয় হইতেছে বৈ কি। তথাপি সভয়ে বলিতে বাধ্য হইতেছি,—

'মনুস্মৃতি সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি কেন'—তাহার উত্তর 'বেদার্থো-পনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্'—স্মৃতিতেই আছে। মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রাধান্য নহে, বসিষ্ঠাদি অনেক ঋষিই ত মন্ত্রদ্রষ্টা,—যাহা বেদার্থ, তাহাই মনুস্মৃতিতে উপনিবদ্ধ, সেইজন্যই তাঁহার প্রাধান্য। অন্য ঋষিগণ অনেকে মনুর অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, প্রথম যিনি বেদার্থপ্রকাশক, অনুবর্ত্তন-কারী অপেক্ষা তাঁহার প্রাধান্য থাকিবেই। অনুবর্ত্তনকারী ঋষিগণের স্মৃতিতে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ বেদার্থ উপনিবদ্ধ হয় নাই, মনু-স্মৃতির অর্থও উপনিবদ্ধ হইয়াছে, এই কারণেই মনুর প্রাধান্য। যে ঋষিই মূল-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা, তিনি যোগবলে অতীন্দ্রিয়দর্শী, ইহা কিন্তু সর্ব্বদাই স্মরণীয়।

তবে যে মতভেদ দেখা যায়, তাহার কারণ পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলি-য়াছি। প্রত্নতত্ত্ববাদীর কথা, মনু মন্ত্রদ্রষ্টা নহেন, মন্ত্রদ্রষ্টৃনামের তালিকা হইতেও মনুকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এক জন মনু নহেন, ৪ জন মনু ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি। আমি গত বারে মন্ত্রদ্রষ্টার মধ্যে মনুর উল্লেখ করি নাই, তাহার কারণ, মহাভারতে মনুর বচন উদ্ধৃত হওয়ায় মনু-স্মৃতি যে মহাভারতের সময়ে শাস্ত্র বলিয়া গণনীয় হইত, তাহা দেখাইয়াছি, তদ্বিষয়ে যে কোন কথা উঠিবে, তাহা এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে নাই। যে সকল স্মৃতিতে বাল্যবিবাহ সমর্থিত এবং অন্যান্য অনেক কথা আছে, যাহা নূতন পন্থী-দিগের প্রতিকূল, ঐ সকল শাস্ত্র নূতন, মহাভারতের সময় ছিল না,—প্রত্নতত্ত্ববাদীর পূর্ব্বপ্রচারিত শাস্ত্রসমস্যায় এই ভাবের কথা ছিল, ঐ উক্তি যে অসত্য, তাহা বুঝাইবার জন্য যাহা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম, সেই সকল স্মৃতিও মহাভারতের পূর্ব্ব-বর্ত্তী, কেবল যে বেদ ও কল্পসূত্র প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ মহা-ভারতের সময়ের শাস্ত্র, তাহা নহে; উদাহরণস্বরূপ অনেক স্মৃতি-রচয়িতার নাম নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছি, ইঁহারা বেদমন্ত্রদ্রষ্টা

এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও কেহ কেহ পুরাণবক্তা। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মহাভারতের সময়ে ছিল, ইঁহাদের রচিত পুরাণ মহাভারতের সময়ে ছিল। আর কোন মন্ত্রদ্রষ্টা ধর্ম্মশাস্ত্রকার নহেন, ইহা আমি বলি নাই, বলিতে প্রবৃত্তও হই নাই, কারণ, তাহা সে ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

ইংরাজী ক্যাটালগের সাহায্যে বিদ্যা জাহির করা যাহাদের উদ্দেশ্য, এইরূপ অনর্থক দোষপ্রদর্শন করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর কি আছে!

কিন্তু ক্যাটালগি বিদ্যা কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অতঃপরেই ধরাইয়া দিব। প্রকৃত কথা এই, চারি জন মন্ত্রদ্রষ্টা মনুর সন্ধান দিতেছি,—(১) বৈবস্বত মনু ৮।৪।৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা, (২) মনু ৮।৪।৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। এই শেষোক্ত মনু প্রথম মনু হইতে অভিন্ন বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও, তৎপরবর্ত্তী সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নির্দ্দেশস্থলে 'বৈবস্বত মনু' বলিয়া পুনর্ব্বার উল্লিখিত হওয়াতে, মধ্যবর্ত্তী মনু যে বৈবস্বত নহেন, স্বনামপ্রসিদ্ধ মনু, ইহা বুঝা যায়। পিতৃপরিচয়শূন্য 'মনু' নাম বেদে যেখানে আছে, সেখানেই সেই 'মনু' প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রকাররূপে প্রমাণিত, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির উক্তি দ্বারা প্রমাণিত, যথা—

ভবতি চান্যা মনোর্ম্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ,
'যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজং'(তৈ, সং ২।২।১০) ২১। মনুনা চ
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্নাত্মযাজী চ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ (১২ অঃ)
ইতি সর্ব্বাত্মদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি গম্যতে। (শারীরিকসূত্র ২।১।১ ভাষ্য)

অর্থাৎ মনুর মাহাত্ম্যবোধক অপর শ্রুতিও আছে, যথা—"মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঔষধস্বরূপ" (এই শ্রুতির প্রমাণ দেখাইয়া যে মনুবাক্য আচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মনুসংহিতায় ১২শ অধ্যায়ে আছে)। মনুর সেই বচনে সর্ব্বাত্মদর্শনের প্রশংসা থাকায় উহার দ্বারা কপিলমতের নিন্দা সূচিত; (কারণ, কপিল নানাত্মবাদী)।"

(৩) সাংবরণ মনু, ইনি ৯।৬।৫ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা, (৪) আপ্সব মনু, ইনি ৯।৭।৩ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। এই যে 'আপ্সব' নাম, ইহা স্বায়ম্ভুব শব্দের প্রতিরূপ।

'তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা' ১।৯।
"আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ" ।১।১০।

ইত্যাদি মনুবচন দ্বারা বুঝা যায়, যিনি স্বয়ম্ভু, তিনিই 'অপ্সব' জলে তিনি প্রসূত, স্বয়ম্ভুর সম্বন্ধ হেতু যিনি স্বায়ম্ভুব নামের অধিকারী, অপ্সবের সেই সম্বন্ধ হেতু তিনিই 'আপ্সব' নামের অধিকারী। বেদের অন্যত্র পিতৃপরিচয়ে এই মনুর নাম উল্লিখিত না হইলেও ইনি যে বৈখানসের অন্তর্গত নহেন, ইহা বুঝাইবার জন্য এক স্থানে পিতৃপরিচয় থাকাও অসম্ভব নহে।

কেবল ইহাই নহে—ধর্ম্মশাস্ত্রকার স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ধ্রুব, সেই মনুর বংশসম্ভূত হবির্দ্ধান, পৃথু, ঋষভ ইত্যাদি অনেকেই মন্ত্রদ্রষ্টা। এই মনুকে মন্ত্রদ্রষ্টার তালিকা হইতে অপসৃত করিলে বুঝিতে হইবে, ইনি এত প্রাচীন যে, ইঁহার দৃষ্ট মন্ত্র এখন বিলুপ্ত। 'মনুমেকে বদন্ত্যগ্নিং', মনুকে কেহ কেহ অগ্নি বলেন, অগ্নি বহু সূক্তে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। 'মনুমেকে প্রজাপতিম্' মনুর প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধির কথাও মনুসংহিতাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদে ৩ জন প্রজাপতির নাম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিমধ্যে আছে, এক জন বৈশ্বামিত্র, এক জন বাচ্য এবং এক জন পরমেষ্ঠী। এই পরমেষ্ঠী প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনুর নামান্তর স্বীকার করিলে 'মনুমেকে প্রজাপতিম্' এই মনুবচনের সহিত একবাক্যতা হয়। মনুর নানা নাম, একই মনু, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিরূপে আখ্যাত হওয়া অযুক্ত নহে। আজীগর্ত্তি শুনঃশেপ, বৈশ্বামিত্র দেবরাত নামেও মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছেন। অধিকন্তু মনুসম্মত অর্থপ্রতিপাদক প্রচলিত মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত, ভৃগু মন্ত্রদ্রষ্টা, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত, সুতরাং যে দিক্ দিয়াই হউক, মনুসংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে গণিত না হইবে কেন? যদিই বা স্বীকার করা যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু মন্ত্রদ্রষ্টা নহেন, তাহাতেই বা আমার কোন্ উক্তি ব্যাহত হয়? প্রত্যুত্তরবাদীর কথা, "মনু-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার মতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ, তিনি বলিয়াছেন, যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।"

এ স্থলে প্রত্যুত্তরবাদীর উত্তম ব্যাপ্তিজ্ঞানের পরিচয় পাইলাম। 'যাঁহারা' 'তাঁহারা' এ কথা দু'টি যে ভাবে আছে, তাহাতে আমার উক্তির এরূপ দোষ মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভিন্ন অপরে প্রদান করিতে পারে না। আমি যদি বলি, "যেখানে ভেকের কলরব শুনিবে, বুঝিবে, সেখানে জলাশয় আছে", এই কথায় অন্য কেহই মনে করিবে না, যেখানে

ভেকের রব শুনিতে পাইবে না, সেখানে জলাশয় নাই, ইহা আমার উক্তির মধ্যে নিহিত আছে।

আমি বলিয়াছি, "যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, "যাঁহারা যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা" ইহা বলি নাই, তবে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃত্ব অস্বীকৃত হইল কিরূপে? যাঁহারা যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, এমন কথাও বলি নাই, যে, 'বৎসপ্রি' প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্টৃগণের ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকায় ব্যাপ্তিদোষ ঘটিবে। আমার উক্তিতে ব্যাপ্তি বা নিয়ম প্রদর্শিত হয় নাই, "এমন অনেক ঋষি আছেন, যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টাও বটেন, ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাও বটেন। তাঁহাদিগের রচিত শাস্ত্রও মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী" ইহা জ্ঞাপন করাই আমার সেই উক্তির উদ্দেশ্য। প্রত্যুত্তর প্রবন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের নামের তালিকায় যে সকল ঋষির নাম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অনেকের নাম শান্তিপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে আছে। অন্যান্য অনেক নাম শান্তি, অনুশাসন, সভা ও বনপর্ব্বে আছে—কাযেই সেই সকল ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রও মহাভারতের সময় বর্ত্তমান, ইহা প্রত্যুত্তরবাদীকে মানিতে হয়। অতএব মহাভারতের সময়ের শাস্ত্র, আর এখনকার প্রচলিত শাস্ত্রে বিশেষ প্রভেদ থাকিতেছে না, ইহা পাঠকগণ মনে রাখিবেন।

এইবার 'চক্তং'। কত জন ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা এবং কত জন ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, তাহার তালিকা দেখাইয়া বিস্থার প্রভাবে লোককে চমকিত করিয়া 'বাজিমাৎ' করিবার চেষ্টাই এই 'চক্তং' পালার মর্ম্ম।

দুঃখের বিষয়, মন্ত্রদ্রষ্টার তালিকা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমসঙ্কুল। মুদ্রিত ঋগ্বেদেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সংখ্যা অন্যূন দুই শত ত্রিশ। প্রত্যুত্তরদাতার তালিকায় ৬২ জন মন্ত্রদাতার নাম আছে; আর আছে, "মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ ঋষিগণের নামও নিম্নে লিখিত হইতেছে" এই নির্দ্দেশ; ইহার দ্বারা বুঝা যায়, সেই তালিকায় লিখিত মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যতীত আর মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ ঋষি নাই। কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। অন্যূন দুই শত ত্রিশ জন মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ ঋষির নাম নির্দ্দেশ ত আছেই, 'শতং বৈখানসাঃ' এইভাবে ঋষির উল্লেখ বিচার করিলে বিশেষ নামশূন্য মন্ত্রদ্রষ্টার সংখ্যা আরও অন্ততঃ ১ শত বাড়িয়া যায়। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, প্রত্যুত্তরবাদী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন, অন্ততঃ এক জন ইংরাজ ও এক জন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইংরা[illegible] অক্ষরে লিখিত নামনির্দ্দেশ সূচী—'ক্যাটালগ' বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। দু'টি উদাহরণ দিব—প্রত্যুত্তরবাদী, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে প্রথমতঃ বামদেবের উল্লেখ করিয়া শেষে 'ভামদেব' নামেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ভামদেব' কোন্ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা, প্রত্যুত্তরবাদী ভবিষ্যতে তাহা স্পষ্ট জ্ঞাপন করিতে পারেন ত এই উদাহরণটি অগ্রাহ্য হইবে, নতুবা এ উদাহরণ প্রবলই থাকিবে। আমার নিশ্চয় হইয়াছে—ভামদেব, বামদেব বা বামদেব্য ব্যতীত অপর কেহ নহেন, একখানি ক্যাটালগে বী (B) আদি বামদেব আছে, আর যে ক্যাটালগে ইংরাজী অক্ষরের 'ভি' (V) আদি বর্ণ ধরিয়া 'বামদেব' বা 'বামদেব্য' লিখিত হইয়াছে—তাহারই 'পণ্ডিতী' নকল 'ভামদেব'। 'বামদেব্য' নাম নহে—'যামায়ন' প্রভৃতির ন্যায় পিতৃপরিচয়ার্থ বিশেষণ। প্রত্যুত্তরবাদী বিশেষণকেও নামরূপে যে ভ্রান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দেখিয়াই 'বামদেব্যের' কথা তুলিয়াছি। ঐ বামদেব্যের প্রকৃত নাম বৃহদুক্থ।

আর একটি উদাহরণ 'জামায়ন'। বাঙ্গালীর যদুনাথ লিখিতে ইংরাজী অক্ষরে 'জে' (J) ব্যবহার দেখা যায়, যামায়নেও সম্ভবতঃ 'জে' আদি বর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিত মানুষ ত 'জে'কে 'য' করিতে পারেন না, তাই নকলে 'জ' হইয়াছে, ইহার ফলে 'যামায়ন' 'জামায়ন' হইয়াছেন। 'জামায়ন' বা 'যামায়ন' নামে মন্ত্রদ্রষ্টা নাই, ১০।১।১৫ হইতে ১০।২।৩ এবং ১০।৭।১১ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টারূপে শঙ্খ, দমন, বেদশ্রবাঃ সঙ্কীসুক, মথিত এবং কুমার নামক ঋষিগণ যথাক্রমে উল্লিখিত, তাঁহাদিগের পিতৃপরিচয় স্থলে 'যামায়ন' শব্দ বিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। যমের বংশধর বলিয়া তাঁহারা যামায়ন। ১০।১।১৪ ঋগ্বেদীয় সূক্তে বৈবস্বত যম মন্ত্রদ্রষ্টা। তৎপরেই পিতৃপরিচয়ার্থ যামায়ন শব্দের উল্লেখ, 'যামায়ন' শব্দ যে 'যম' হইতে উৎপন্ন, ইহ[illegible] একটু জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই বুঝিবেন।

মুদ্রাকরপ্রমাদে বর্ণাশুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু নূতন না[illegible] যোজিত হয় না—বামদেবের পরে আর একবার ভামদেব হ[illegible] না; ঠিক ইংরাজী অক্ষরের নকলও মিলে না। অতএব বু[illegible] গেল, প্রত্যুত্তর প্রবন্ধেই যামায়নগণকে ইংরাজী প্রসাদী 'জামা[illegible]' আশ্রয়েই আনয়ন করা হইয়াছে। পাঠক দেখুন, ভি ও [illegible] ইংরাজী ক্যাটালগের এই দুই হরপ কেমন 'হুবহু' নকল হই[illegible] ক্যাটালগী বিস্থার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যাহা মুদ্রাক[illegible] প্রমাদে ঘটিয়াছে বুঝিলাম, সে বর্ণাশুদ্ধিগুলি ধরিলাম না।

ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ,—এই চারি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা অনেক আছেন, আমি তন্মধ্যে ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্রদ্রষ্টার নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছিলাম ;- ইঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার এবং পুরাণোপদেষ্টা। প্রত্যুত্তরবাদীর তালিকায় যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নাম আছে, তাহা অত্যল্প। তাঁহার অনুল্লিখিত ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্রদ্রষ্টার নাম প্রদর্শন করিতেছি।

জেতা, শুনঃশেপ (দেবরাত), হিরণ্যস্তূপ, কণ্ব (প্রত্যুত্তর-বাদীর লিখিত 'কাণ্ব' নামে কোন মন্ত্রদ্রষ্টা নাই। পিতৃ-পরিচয়ার্থ, প্রস্কণ্ব প্রগাথ প্রভৃতি ঋষির বিশেষণরূপে 'কাণ্ব' শব্দ যোজিত) সব্য, গোতম, রহূগণ, কুৎস, কক্ষীবান, পরুচ্ছেপ, কূর্ম্ম, ঋষভ, উৎকীল, কত (১) গাথী, দেবশ্রবাঃ, দেববাত, কুশিক, প্রজাপতি, গয়, সুতম্ভর, পূরু, বিশ্বসামা, দ্যুম্ন, বসুযব, অশ্বমেধ, নৃমেধ, গৌরিবীতি, বভ্রু, (২), বসূয়ু, গাতু, সংবরণ, প্রভূবসু, অবৎসার, সদাপৃণ, অবস্যু, আত্রেয়, সপ্তবধ্রি, সত্যশ্রবাঃ, সুহোত্র, শুনহোত্র, নর, গর্গ (৩), শংযু, ঋজিশ্বা, কুমার (৪), দেবাতিথি, ব্রহ্মাতিথি, বৃহস্পতি (৫), বৈখানস এক শত (৬), বিরূপ, ত্রিশোক, ত্রিত, কুশ, মন্যু, ব্যশ্ব, বিশ্বমনাঃ, অসিত দেবল (৭), উর্দ্ধসদ্মা, কৃতযশাঃ, বৎস (৮), বিষ্ণু (৯), ব্রাহ্ম (১০) রক্ষোহা, বাতরশন, (জূতি হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ পর্য্যন্ত ১১), বুধ (১২), ব্রহ্মপুত্র উর্দ্ধনাভ (১৩), হিরণ্যগর্ভ (১৪), পূতদক্ষ (১৫)। এতদ্ভিন্ন অযাস্য প্রভৃতি আঙ্গিরসগণ, অত্রিবংশোদ্ভব, বশিষ্ঠবংশোদ্ভব ও বিশ্বামিত্রবংশোদ্ভব বহু ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা আছেন। মন্ত্রদ্রষ্টা যাঁহারা নহেন, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা হইবেন না, এ কথা আমি কুত্রাপি বলি নাই, এ সিদ্ধান্তও আমার নহে। আমার অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ পাঠ করিলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তথাপি প্রতিবাদীর চাতুরী প্রদর্শনার্থ আমি দেখাইতেছি, প্রতিবাদীর উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের নাম ঋগ্বেদীয় মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে অধিকাংশই সন্নিবেশিত। প্রতিবাদীর উদ্ধৃত স্মৃতি-চন্দ্রিকা-কথিত প্রমাণে যে ৩৬ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকারের নাম উল্লিখিত, তন্মধ্যে ১৩ জন তাঁহারই স্বীকৃত মন্ত্রদ্রষ্টা। সেই ১৩ জন যথা,—অঙ্গিরা, গোতম, অত্রি, উশনাঃ, যম, বশিষ্ঠ (বেদে 'বসিষ্ঠ' আছে), সংবর্ত্ত, পরাশর, শঙ্খ, নারদ, কশ্যপ, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ। মনু মন্ত্রদ্রষ্টা বা বেদ-প্রশংসিত, তাহা আমি দেখাইয়াছি। আর আমার উপরি প্রদর্শিত তালিকায় মন্ত্রদ্রষ্টা কতিপয় ঋষির নামের পূর্ব্বে (১।২ ইত্যাদি ক্রমে ১৫ পর্য্যন্ত সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছি।) স্মৃতি-চন্দ্রিকায় উক্ত ৩৬ জনের অতিরিক্ত যে কতিপয় নাম আছে, তন্মধ্যে দেবল, বৎস ও ঋষ্যশৃঙ্গ যে মন্ত্রদ্রষ্টা, তাহা আমার প্রদর্শিত তালিকার ৭।৮।১১ সংখ্যায় দেখিবেন। বভ্রু, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, ব্রহ্মসম্ভব (ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মপুত্র) এবং পিতামহ (হিরণ্যগর্ভ, 'পিতামহঃ। হিরণ্যগর্ভঃ' অমরকোষ) দক্ষ, ইঁহারা স্মৃতিচন্দ্রিকার ৩৬ জনের মধ্যে ; মদীয় মন্ত্রদ্রষ্টার তালিকার (২।৫।৯।১০।১৩।১৪।১৫) সংখ্যায় ইঁহাদিগের উল্লেখ আছে। আপস্তম্ব, শাতাতপ প্রভৃতি ঋষি শতবৈখানস (৬) মধ্যে পড়িতে পারেন।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মশাস্ত্রকার কুমারের নাম আছে, প্রতিবাদীর তালিকায় তাঁহার নাম না থাকিলেও আমার তালিকায় (৪) সংখ্যার মন্ত্রদ্রষ্টার মধ্যে কুমারের নাম আছে। কাত্যায়ন এবং বৌধায়ন (১।১২) সংখ্যায় উক্ত মন্ত্রদ্রষ্টৃ-দ্বয়ের জীবদ্দশায় পরিচিত বংশধর। (৩) সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রদ্রষ্টা গর্গে অপত্য গার্গ্য। (কতঃ, কাত্যঃ অপত্যো, জীবতো বংশ্যে যুনি কাত্যায়নঃ। বুধঃ—বৌধঃ—যুনি বৌধায়নঃ, গর্গস্যাপত্যং গার্গ্যঃ, এইরূপ নামব্যুৎপত্তি পাণিনিসম্মত) শেষোক্ত তিন জন ও বৎস, দেবল এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে বাদ দিলেও ৩৬ জনের ২১জন মন্ত্রদ্রষ্টা, মনু বেদ-প্রশংসিত এবং মন্ত্রদ্রষ্টা। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র-কারগণের মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সংখ্যা অধিক। ঋগ্বেদব্যতীত মন্ত্রদ্রষ্টা ধরিলে, প্রায় সকল ঋষিই মন্ত্রদ্রষ্টা। বেদব্যাস বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা, সুমন্তু তাঁহার শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদ-প্রকাশক এবং উপনিষৎপ্রসিদ্ধ—ইঁহারা এবং অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা না হইলেও যোগপ্রভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়-বিষয়ে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, সেই কারণে ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া যে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের নামনির্দ্দেশ, তাহা তাঁহাদিগের প্রাচীনত্ব-জ্ঞাপনের জন্য। যে সকল মন্ত্রদ্রষ্টা যোগবলে অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ এবং যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা না হইয়াও ঐরূপ অতীন্দ্রিয়-দর্শী, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণয়নে অধিকারী, ইহাই আমার মত।

অতএব যাহা আমার মত নহে, কথাও নহে, তাহা আরোপ করিয়া তাহার উপর যে দোষপ্রদর্শনে প্রয়াস, তাহা কিরূপ সঙ্গত, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লউন, এইখানে 'চক্তং' পালা সমাপ্ত ; আমিও অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ([illegible] পাধ্যায়)।

সোনার পাহাড়

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লোমহর্ষণ কাণ্ড

রাত্রিকালে আমাদের নিদ্রার কোন বিঘ্ন ঘটিল না। প্রভাতে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, আরণ্য প্রকৃতি প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে; আকাশ নির্ম্মল। প্রকৃতি দেবীর হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল—আমাদের বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে; পথে আর আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের ছুতোর বন্ধুকে অসুস্থ দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম। একে পথের শ্রম, তাহার উপর দীর্ঘকাল তাহাকে জলে ভিজিতে হইয়াছিল, এ জন্য তাহার ক্ষত ফুলিয়া উঠিয়া অত্যন্ত টাটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাশোটোয়ারোর দেশীয় অনুচরগণ তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্ষত ধুইয়া পূর্ব্ববৎ পটি বাঁধিয়া দিল, বার্ব্বা লুইসার সিদ্ধ জল পান করাইল। ইহাতেই তাহার অবসাদ দূর হইয়া দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। সে উৎসাহভরে বলিল—তাহার জন্য আমাদের দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ নাই; অতঃপর সে আমাদের সঙ্গে সমানভাবে পরিশ্রম করিতে পারিবে। আমাদের সঙ্গে যে সকল ভোজ্যদ্রব্য ছিল, তদ্দ্বারা তৃপ্তির সহিত ভোজন শেষ করিলাম। নেটিভগুলা আমাদের জন্য 'তারাপৎ' নামক এক প্রকার পানীয় সংগ্রহ করিয়া আনিল। 'তারাপৎ' এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি তালবৃক্ষের রস, অর্থাৎ 'তালের তাড়ি।' তারাপতের আস্বাদন সুমিষ্ট, এবং তাহা অবসাদনাশক। আমরা তাহা তৃপ্তিভরে পান করিলাম। আহারান্তে আমাদের যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

কম্পাসের সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় করিয়া আমরা পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য ও জলাভূমি অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইল। আমাদের কয়েক জন 'নেটিভ' পথিপ্রদর্শক এই অঞ্চলের পথঘাট চিনিত; তাহারা আমাদিগকে উত্তরদিকে চলিতে অনুরোধ করিয়া বলিল—যদি আমরা সে দিকে না যাই, তাহা হইলে একটি উচ্চ পর্ব্বত আমাদের সম্মুখে পড়িবে এবং তাহা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। কিন্তু যাশোটোয়ারো তাহাদের এই উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বদিকেই পরিচালিত করিলেন। সেই পথে দুই ঘণ্টা চলিবার পর যাশোটোয়ারো বুঝিতে পারিলেন—তিনি দেশীয় অনুচরবর্গের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ভুল করিয়াছেন। তখন আমরা উত্তরপূর্ব্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু কাল পরে আমাদিগকে একটি পাহাড়ে উঠিতে হইল; সেই পাহাড়ের সানুদেশে একটি গলীপথ পাইলাম। তাহার দুই দিকে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। আমরা সেই গলী দিয়া ক্রমশঃ নীচে নামিতে লাগিলাম। অবশেষে একটি সঙ্কীর্ণকায়া গিরিতরঙ্গিণী আমাদের পথ রুদ্ধ করিল। এই নদী গভীর এবং তাহার স্রোত প্রখর বলিয়া তাহা অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইল।

এই সময় একটি কৌতূহলজনক ঘটনা ঘটিল, তাহা আমাদের সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছিল। আমাদের দলের কতকগুলি লোক নদী পার হইয়া অপর তীরে উপস্থিত হইল; তাহার পর আমাদের ভারবাহী অশ্বতরগুলিও নদীর পরপারে প্রেরিত হইল; তাহাদের পিঠে যে সকল গাঁটরী ও বোচকা ছিল, তাহাদের অধিকাংশই নদীর জলে ভিজিল না। সুতরাং আমাদিগকে কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হইল না

আমরা একটু কষ্ট করিলেই নদী পার হইতে পারিব, ইহাও বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু নসিস্‌কার জন্যই আমাদের বড় দুশ্চিন্তা হইল; আমরা সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে উৎসুক হইলাম। নসিস্‌কা গোঁ ধরিল, সে আমাদের কাহারও সাহায্য না লইয়া একাকী নদী পার হইবে; আমাদের কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না!

নসিস্‌কার কথা শুনিয়া আমরা তাহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা না করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নসিস্‌কা একাকিনী নদীকূলে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল; জলে নামিতে তাহার ভয় হইতেছিল কি না, বুঝিতে পারিলাম না। বার্ণি তাহাকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও দূরে থাকিত না। সে গুপ্তভাবে নসিস্‌কার পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং নসিস্‌কা জলে নামিতে ভয় পাইতেছে মনে করিয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত তাহাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া নদীতে নামিয়া পড়িল। নদীর জলে বার্ণির বুক পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল, তথাপি সে নসিস্‌কাকে মাথার উপর হইতে নামাইল না, অবশেষে অপর তীরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নামাইয়া দিল। নসিস্‌কার স্কার্টের কিনারাতেও জল ঠেকিল না।

নসিস্‌কা প্রণয়ীর এই ব্যবহারে অপমানবোধ করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। নদী পার হইবার সময় সে বার্ণির কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বার্ণি তাহাকে উভয় হস্তে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছিল। সে নসিস্‌কাকে অপর তীরে নামাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি আমার মাথার উপর ও রকম ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলে কেন প্রেয়সি? নদীর স্রোত কিরূপ প্রখর, দেখিতেছ ত? যদি তোমাকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া পা পিছলাইয়া জলের ভিতর পড়িয়া যাইতাম, তাহা হইলে আমাদের দু'জনকেই ডুবিয়া মরিতে হইত, না হয় কোথায় যাইতাম, কেহই আমাদের সন্ধান পাইত না।"

নসিস্‌কা ক্রোধে চোখ-মুখ লাল করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি আমার অসম্মতিতে এ কায কেন করিলে? এভাবে আমাকে অপদস্থ করিবার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি অত্যন্ত গর্হিত কায করিয়াছ।"

নসিস্‌কার কণ্ঠরোধ হইল, সে বন্দুকটা কাঁধ হইতে খুলিয়া সবেগে তীরে নিক্ষেপ করিল, তাহার পর নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইল। তাহার এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম; কিন্তু বার্ণি আতঙ্কে অধীর হইয়া বলিল, "হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ হইল! আমার প্রিয়তমা অভিমানভরে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল। এখন কি উপায়ে উহার প্রাণ রক্ষা করিব?"—বার্ণিও তৎক্ষণাৎ জলের ভিতর লাফাইয়া পড়িল!

কিন্তু বার্ণি নসিস্‌কার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই, আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সে জলে পড়ে নাই; বার্ণির সাহায্য ব্যতীত সে নদী পার হইতে পারে, ইহা সপ্রমাণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। বার্ণি মনে করিয়াছিল, নসিস্‌কা জলে নামিতে ভয় পাইয়াছিল এবং এই জন্যই তাহাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া পরপারে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নসিস্‌কার সাহস ও আত্মনির্ভরতা অসাধারণ ছিল, কেহ তাহাকে ভীরু বা দুর্ব্বল মনে করিলে সে অপমানবোধ করিত। আমি পূর্ব্বেই তাহার তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। দৈবদুর্য্যোগে এক দিন পথে বাহির হওয়া কষ্টকর মনে হইয়াছিল; বিশেষতঃ নসিস্‌কার চলিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া আমরা পথে বাহির হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম; ইহাতে সে অপমানবোধ করিয়া যে কথা বলিয়াছিল, তাহা আমি ভুলিতে পারি নাই। সে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই দুর্গম পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সাহস দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। আজ বার্ণির ব্যবহারে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল এবং তাহার ধৃষ্টতার প্রতিফল প্রদানে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

নসিস্‌কা জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া বার্ণিকে তাহার অনুসরণ করিতে দেখিল; তখন সে সীল মাছের মত সবেগে সাঁতার দিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। বার্ণি তাহাকে ধরিবার জন্য শূকর-শাবকের মত সাঁতার দিতে লাগিল। যাশোটোয়ারো নসিস্‌কার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বার্ণিকে বলিলেন, সে যতক্ষণ না ফিরিয়া আসিবে, ততক্ষণ নসিস্‌কার সাঁতার বন্ধ হইবে না। বার্ণি অগত্যা বহু দূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তীরে উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, কপাল বহিয়া জলের ধারা ঝরিতেছিল, তাহার মুখে হতাশভাব পরিস্ফুট; সে করুণনেত্রে সন্তরণরতা নসিস্‌কার দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে লাগিল দেখিয়া আমাদের হাস্যসম্বরণ করা অসাধ্য হইল। আমাদিগকে হাসিতে দেখিয়া বার্ণি সক্রোধে

আমাদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইল; দাঁত বাহির করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "তোমরা ও রকম করিয়া হাসিতেছ কেন? এই সুন্দরী যদি জলে ডুবিয়া মরে, তাহা হইলে কি তোমাদের মনে আনন্দ হইবে?"

যাশোটোয়ারো অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বার্ণি, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই; মাছের যদি ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে তোমার নসিস্কারও সে ভয় নাই। তুমি নসিস্কার গর্ব্বে আঘাত করিও না, উহার স্বজাতীয়া রমণীগণের ন্যায় উহার দম্ভ অত্যন্ত অধিক; এ জন্য সামান্য কারণে উহার মনে আঘাত লাগে। তুমি সতর্কভাবে না চলিলে তোমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।"

বার্ণি বলিল, "আমি ত উহার উপকারই করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ও আমার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া রাগ করিলে আমি নিরুপায়! দেখুন—দেখুন, নসিস্কা জলের ভিতর ডুব দিয়াছে; বোধ হয়, অত্যন্ত হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আমি জলে নামিয়া উহাকে টানিয়া আনি।"

বার্ণি পুনর্ব্বার নদীতে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল, তাহা দেখিয়া যাশোটোয়ারো তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন। বার্ণি তাঁহার হাত ছাড়াইতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। নসিস্কা বুঝিতে পারিল—সকলেই তাহার সন্তরণ-দক্ষতার পরিচয় পাইয়াছে, তাহার শক্তিসামর্থ্যে আর কাহারও সন্দেহ নাই—তখন সে ধীরে ধীরে তীরে উঠিল। অতঃপর আমরা নদী পার হইয়া অগ্রসর হইলাম; নসিস্কার মানভঞ্জনের জন্য বার্ণিকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিলাম। বার্ণি তাহার প্রণয়িনীর হাত ধরিয়া আমাদের অনুসরণ করিল। নসিস্কা কিছু দূর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে চলিল, বার্ণির সঙ্গে কথা বন্ধ! কয়েক মিনিট পরে পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, তাহাদের গল্প আরম্ভ হইয়াছে, হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। নসিস্কার অভিমান দূর হইয়াছে বুঝিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। বার্ণি নসিস্কার হাত ধরিয়া তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল।

অতঃপর আমাদিগকে অত্যন্ত বন্ধুর পথে চলিতে হইল। মৃত্তিকা কঙ্করাবৃত; চতুর্দ্দিকে গভীর অরণ্য; আরণ্য বৃক্ষগুলি নানা জাতীয় সুদৃঢ় লতা দ্বারা এ ভাবে আবৃত যে, সেই সকল লতা কুঠার দ্বারা ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে পথ পরিষ্কার করিতে হইল। তিন চারি ঘণ্টার পর আমরা সেই অরণ্য অতিক্রম করিয়া একটি উচ্চ পার্ব্বত্য প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম—সেই প্রান্তর শ্যামল তৃণরাশি দ্বারা সমাচ্ছাদিত। আমরা ক্রমাগত পাহাড়ের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম; এ জন্য সুশীতল বায়ুপ্রবাহে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অরণ্য পার হইবার সময় বাতাস গরম ছিল, কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রচণ্ড শীত! আমাদের পথিপ্রদর্শকরা বলিল, আমাদিগকে পর্ব্বতের আরও অধিক ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে হইবে, এবং সম্ভবতঃ বরফের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে। পাহাড়ের কিনারা দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম, এই পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, অশ্বতরগুলি বোঝা পিঠে লইয়া সেই পথে কিরূপে চলিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলাম। কোন কোন স্থানে পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং তাহার এক কোণ হইতে অন্য কোণে যাইতে তাহা এ ভাবে হঠাৎ নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, অশ্বতর-চালকরা অশ্বতরগুলির পিঠ হইতে মোটগুলি নামাইয়া লইয়া তাহা মাথায় করিতে বাধ্য হইল, এবং অশ্বতরগুলির লাগাম ধরিয়া সতর্কভাবে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। এই ভাবে তাহাদিগকে শত শত ফুট পার হইতে হইল। যদি তাহারা সেই সকল বোঝা মাথায় তুলিয়া না লইত, তাহা হইলে পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া অশ্বতরগুলি ভারসহ পার্শ্বস্থ গিরিগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইত এবং অতলস্পর্শ গুহায় মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইত।

যাহা হউক, আমরা অতি কষ্টে সেই সঙ্কটজনক পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি শুষ্ক নদীগর্ভে প্রবেশ করিলাম। আমাদের পথিপ্রদর্শকরা বলিল, নদীগর্ভ এ সময় শুষ্ক থাকিলেও বর্ষাকালে পাহাড় হইতে বরফগলা জল সবেগে নামিয়া আসিয়া নদীগর্ভ প্লাবিত করে এবং এরূপ প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে যে, সে সময় এই নদী পার হওয়া অসাধ্য। নদীর উভয় তীরের পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ, এবং তরু-তৃণ-বর্জ্জিত; কেবল স্থানে স্থানে এক এক গুচ্ছ 'ফার্ণ'-জাতীয় উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হইল। এতদ্ভিন্ন এক একটি গুল্ম পীতবর্ণ পুষ্পরাশিতে সমাচ্ছন্ন দেখিলাম। ঐ সকল পীত পুষ্পের নাম জানিতাম না; পরে শুনিয়াছিলাম, এই পার্ব্বত্য পুষ্পের নাম 'রোডোডেনড্রন'; ইকুয়েডর রাজ্যের অনেক পর্ব্বতে এই পুষ্প প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা সেই শুষ্ক নদীগর্ভের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা এ পর্য্যন্ত আসিতে যেরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলাম,

তাহা সামান্য নহে; সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু এই নদীগর্ভ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দুর্গম; কারণ, শুষ্ক নদী-গর্ভে যে সকল শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের আকার গোল-আলু হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি গম্বুজের মত বৃহৎ! আমাদিগকে সেই সকল বিভিন্ন আকারের শিলাখণ্ড পদদলিত করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইল। ইহার উপর পাহাড়ের উর্দ্ধদেশ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড নদীগর্ভে গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের কোন একটা গড়াইয়া আমাদের মাথায় বা ঘাড়ে পড়িলে তৎক্ষণাৎ আমাদের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইত; এজন্য আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চলিতে হইল। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই; এক একবার তুষারশীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাদের হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। আমাদের দেশের ডিসেম্বর মাসের রাত্রিকালের মেঠো হাওয়াও সেরূপ অসহ্য শীতল নহে। শুষ্ক নদীগর্ভ দিয়া আমাদিগকে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে হইল, তখন সেই বায়ুপ্রবাহের শীতলতা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। আমরা স্থানে স্থানে জমাট বরফরাশি দেখিতে পাইলাম; মাথার উপর পাহাড়ের ফাটল হইতে বরফ-গলা জলও টুপ্-টাপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এই ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিব, তাহার পর অপর দিকে অবতরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে উপস্থিত হইব—এই আশায় যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল, কারণ, সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বে গিরিশিখরে আরোহণ করা অসাধ্য হইল। রাত্রিকালে পর্ব্বতশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে, প্রচণ্ড শীতে আমাদের প্রাণ রক্ষা করা দুরূহ হইবে বুঝিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হইবার পূর্ব্বেই আমরা উপযুক্ত আশ্রয় সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ন্যাড়া পাহাড়; কোথাও কোন আচ্ছাদন নাই। নগ্ন পর্ব্বত-পৃষ্ঠে বৃক্ষ বা লতাগুল্মের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল স্থানে স্থানে এক জাতীয় নীরস ও বিবর্ণ শক্ত ঘাস ও শৈবাল-দল লক্ষিত হইল। যাহা হউক, সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে অনেক অনুসন্ধানে আমরা একটি বৃহৎ গিরিগুহার আবিষ্কার করিলাম। বর্ষাকালে নদীর জল সবেগে এই গুহায় প্রবেশ করিবার সময় পর্ব্বতগাত্রের অনেক তৃণ ও লতাগুল্ম উৎপাটিত করিয়া এখানে ভাসাইয়া আনিয়াছিল; সেগুলি গুহার ভিতর সঞ্চিত ছিল,—তাহা ভাসিয়া যাইতে পারে নাই। সেই সকল শুষ্ক তৃণ-গুল্ম দ্বারা আমরা গুহামধ্যে শয্যা রচনা করিতে পারিব, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া গুহায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গুহার ভিতর একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনিতে পাইয়া আমরা সভয়ে প্রায় ২০ গজ দূরে পলায়ন করিলাম। কিন্তু যাশোটোয়ারো আমাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা অনর্থক ভয় পাইয়াছ, তোমরা ভীত না হইয়া আনন্দিত হও; কারণ, তোমরা যাহার গর্জ্জন শ্রবণ করিলে, উনি একটি বিশালদেহ ভল্লুক ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। আমরা বহু দিন তাজা জানোয়ারের মাংসের সুমধুর আস্বাদনে বঞ্চিত আছি। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের সেই অভাব পূর্ণ করিলেন। আজ রাত্রিকালে এই ভল্লুকের মাংসে আমরা উদর পূর্ণ করিব।"

যাশোটোয়ারোর কথা শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম; কিন্তু ভল্লুক গুহার এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কি কৌশলে তাহাকে বধ করিয়া ক্ষুধানলে আহুতি প্রদান করিব, তাহা হঠাৎ স্থির করা কঠিন হইল। কয়েক মিনিট তর্ক-বিতর্কে কাটিল—তাহার পর যাশোটোয়ারো এই ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, এবং বন্দুক লইয়া গুহাদ্বারে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি গুহাদ্বারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গুলী করিবার পূর্ব্বেই গুহার ভিতর হইতে এরূপ ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি উত্থিত হইল যে, সেই শব্দে আমাদের শ্রবণ-বিবর বধির হইল এবং সেই শব্দ সঙ্কীর্ণ গলীর বিভিন্ন অংশে প্রতিধ্বনিত হইয়া যে সুগভীর নির্ঘোষের সৃষ্টি করিল, তাহা অত্যন্ত আতঙ্কজনক! সেই শব্দ শুনিয়া আমাদের দেশীয় অনুচরেরা প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিল, এবং অশ্বতরগুলা বোঝা পিঠে লইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। গাঁটরীগুলি তাহাদের পিঠের উপর হইতে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু যাশোটোয়ারো বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, ভল্লুক শিকারের আশায় দুই হাতে দুইটি বন্দুক লইয়া গুহাদ্বারে অগ্রসর হইলেন। তাহার পর সেই গুহার সম্মুখে বসিয়া একটি বন্দুক উভয় জানু দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন, অন্য বন্দুকের নল গুহার অভ্যন্তরে প্রসারিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ঘোড়া টিপিলেন। বন্দুকের গম্ভীর শব্দে অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহা যেন কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড ভল্লুকী সক্রোধে গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া

বিদ্যুদ্বেগে গুহাদ্বারে লাফাইয়া পড়িল। সেই সময় সে এভাবে মুখব্যাদান করিয়াছিল যে, তাহার সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্তগুলি সমস্তই দৃষ্টিগোচর হইল। সেই দৃশ্য অতীব ভয়াবহ!

ভালুকীটা যাশোটোয়ারোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িবামাত্র যাশোটোয়ারো অদ্ভুত তৎপরতা সহকারে এক পাশে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং দ্বিতীয় বন্দুকটি ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া ধরিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে গুলী করিলেন। সেই গুলীটা ভালুকীর দেহে বিদ্ধ হইলেও তাহাকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিতে পারিল না। ভালুকী আহত হইয়া পুনর্ব্বার সক্রোধে গর্জ্জন করিল এবং সবেগে যাশোটোয়ারোকে আক্রমণ করিল। যাশোটোয়ারো পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। গুহাদ্বারে অদূরবর্ত্তী একখানি আল্‌গা পাথরে বাধিয়া তাঁহার পদস্খলন হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎ হইয়া পড়িয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইলেন; কারণ, জানোয়ারটা তাঁহার বুকের উপর লাফাইয়া পড়িল! আমরা তাঁহার এই বিপদে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলাম।

আমাদের দলের কেহই যাশোটোয়ারোকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইল না, তাহা দেখিয়া নসিস্‌কা তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ভালুকীটার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার বক্ষঃস্থলে এরূপ বেগে তলোয়ারের খোঁচা মারিল যে, সেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের অর্দ্ধাংশ তাহার বুকের ভিতর প্রবেশ করিল। আহত ভালুকীর ক্ষতমুখ হইতে নির্ঝরধারার ন্যায় রক্তধারা নিঃসারিত হইতে লাগিল। সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া যাশোটোয়ারোকে পরিত্যাগ করিল এবং পুনর্ব্বার গম্ভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিয়া নসিস্‌কাকে আক্রমণ করিল। নসিস্‌কার বামহস্তে বন্দুক ছিল, ভালুকী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাফাইয়া পড়িবামাত্র সে পশ্চাতে হটিয়া গিয়া ভালুকীটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িল। সেই গুলীর আঘাতে ভালুকী কাত হইয়া এক পাশে পড়িয়া গেল। যাশোটোয়ারো সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছুরিকাঘাতে তাহাকে নিহত করিলেন।

সেই গুহা হইতে ভালুকের আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলাম; কিন্তু সেইরূপ সঙ্কটকালে নসিস্‌কার সাহস, কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আমাদের হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। যাশোটোয়ারোকে ভালুকের আক্রমণে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া নসিস্‌কা তাড়াতাড়ি তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর না হইলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইত। আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিতাম বটে, কিন্তু নসিস্‌কার ক্ষিপ্রতাতেই তাঁহার জীবনরক্ষা হইল। বার্ণি নসিস্‌কার সাহস ও বীরত্বে এরূপ মুগ্ধ হইল যে, সে নসিস্‌কাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া প্রেমভরে তাহার মুখচুম্বন করিল, তাহার পর আবেগে কম্পিতস্বরে বলিল, "তুমি আমার হৃদয়রত্ন, তোমার মত বীরনারী পৃথিবীতে আর এক জনও নাই, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতেছি। তোমার ভালবাসা লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

যাশোটোয়ারো পাথরের উপর পড়িয়া যাওয়ায় পিঠে সামান্য আঘাত পাইয়াছিলেন; ভালুকটা তাঁহাকে জখম করিতে পারে নাই।

যাশোটোয়ারো ভালুকীর মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার বন্দুকে পুনর্ব্বার টোটা ভরিয়া লইলেন। সেই সময় গুহার ভিতর হইতে গোঁ গোঁ শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল। সেই শব্দ শুনিয়া যাশোটোয়ারো বলিলেন, "ভালুকীটা গুহার ভিতর একা ছিল না, বোধ হয়, উহার বাচ্চাও দুই একটা আছে। তাহাদেরও সন্ধান লইতে হইবে।"

কিন্তু গুহার অভ্যন্তরভাগ তখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; এই জন্য যাশোটোয়ারো গুহামধ্যে অবতরণ না করিয়া কতকগুলি শুষ্ক তৃণ-গুল্ম সংগ্রহ করিয়া আনিলেন; তাহাতে অগ্নিসংযোগমাত্র সেগুলি মশালের মত দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে গুহার ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইল। যাশোটোয়ারো সেই আলোকের সাহায্যে গুহায় প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট পরে বাহিরে আসিলেন; আমরা সবিস্ময়ে তাঁহার হাতের দিকে চাহিয়া তিনটি ভালুক-শাবক দেখিতে পাইলাম। তাহাদের বয়স এক সপ্তাহের অধিক বলিয়া মনে হইল না। যাশোটোয়ারো ছানা তিনটিকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই এই তিনটি বাচ্চা হস্তগত হইল। ইহাদের কোমল মাংস কিরূপ উপাদেয়, তাহা বোধ হয় তোমাদের অজ্ঞাত। বহুদিন পরে আমরা পরম মুখরোচক খাদ্যে পরিতৃপ্ত হইব।"

ক্ষুদ্র ভল্লুক-শাবকত্রয়ের পলায়নের শক্তি ছিল না, তথাপি যাশোটোয়ারো তাহাদের মস্তকে প্রস্তরের আঘাত করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন। শাবক তিনটিকে ও-ভাবে হত্যা

করিতে দেখিয়া আমার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা কিরূপ তৃপ্তিকর খাদ্যে পরিণত হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। যাশোটোয়ারো অতঃপর অনুচরদিগকে আহ্বান করিয়া বিক্ষিপ্ত গাঁটরীগুলি সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে কয়েক জন ভৃত্য অশ্বতরগুলিকে খুঁজিয়া আনিতে চলিল। যাশোটোয়ারো বুঝিতে পারিলেন, আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; তখন তিনি ছুরীর সাহায্যে বাচ্ছা তিনটির চর্ম্ম উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আমাদিগকে বলিলেন, "ভাই সকল, আমি খানার আয়োজন করিতেছি, কিন্তু তোমরা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। এই বাচ্ছাগুলির মাকে আমরা সাবাড় করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহাদের বাবা অর্থাৎ ভল্লুক মহাশয় বোধ হয় আহারান্বেষণে বাহিরে গিয়াছেন, তিনি হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পান—আমরা তাঁহার বাসগৃহ অধিকার করিয়াছি, এবং স্ত্রীপুত্রাদিকে হত্যা করিয়া ভোজনের আয়োজন করিতেছি, তাহা হইলে তিনি খাপ্পা হইয়া আমাদের সাধু অনুষ্ঠানে বাধা দিতে পারেন, অতএব তাঁহাকেও তাঁহার পরিজনবর্গের অনুসরণে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত থাক।"

আমরা যাশোটোয়ারোর উপদেশে ভল্লুক মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রহিলাম। কিন্তু শীঘ্র আমাদের আশা পূর্ণ হইল না। আমরা নিশ্চিন্তচিত্তে রন্ধনের আয়োজনে যাশোটোয়ারোর সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশীয় ভৃত্যরা অতঃপর আশঙ্কার আর কারণ নাই বুঝিয়া অশ্বতরগুলিকে পর্ব্বতের বিভিন্ন অংশ হইতে ধরিয়া আনিল, এবং বিক্ষিপ্ত গাঁটরীগুলি সংগৃহীত করিয়া গুহার অদূরে স্তূপাকারে রাখিয়া দিল। তাহারা অশ্বতরগুলিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিরাশি প্রজ্বালিত করিল। আমরা সেই অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে উপবেশন করিয়া ভল্লুক-মাংসের 'শিক-কাবাব' প্রস্তুত করিলাম। সেই রাত্রিতে আমরা যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম, জাহাজত্যাগের পর আর কোন দিন সেরূপ তৃপ্তিকর খাদ্য ভোজনের সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই। কারণ, দীর্ঘকাল যাবৎ শূকরের লবণাক্ত শুষ্ক মাংসই আমাদের সম্বল ছিল, তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলেও টাটকা ও সুকোমল ভল্লুক-শাবকের মাংসের তুলনায় তাহা আদৌ রুচিকর নহে।

সেই রাত্রিতে গিরিশিখরে শীতের আতিশয্যে আমাদের বুকের রক্ত জমিয়া বরফ হইত; কিন্তু সেই সুপ্রশস্ত গুহায় আশ্রয়লাভ করায় শীতে আমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। বিশেষতঃ গুহাদ্বারে অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত থাকায় তুষার-শীতল নৈশ বায়ুপ্রবাহ গুহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই।

আমরা আহারান্তে সেই গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহ্নিসেবন করিতে করিতে নিদ্রার আয়োজন করিতেছি, সেই সময় যাশোটোয়ারো হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ভল্লুক মহাশয় বোধ হয় তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইতে আসিতেছেন। আমি জানি, তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। আমরা তাঁহার বংশ-নিপাত করিয়া তাঁহার আশ্রম পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবেন—এরূপ আশা করিতে পারিতেছি না।"

শিকারীর দৃষ্টিই কেবল তীক্ষ্ণ নহে, কর্ণও বিলক্ষণ সজাগ। কয়েক মিনিট পরে আমরা ভল্লুক মহাশয়ের ফোঁস-ফোঁস নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইলাম; এবং তাঁহার আগমনের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকখানি আল্‌গা পাথর তাঁহার পাদতাড়নে স্থানভ্রষ্ট হইয়া গড়াইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির শোচনীয় পরিণাম বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহার বাস-গৃহে অগ্নি-রাশির উজ্জ্বল আভা নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে এরূপ প্রচণ্ড বেগে গর্জ্জন করিলেন যে, আমরা সকলেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিলাম; আমাদের বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সেই সুগম্ভীর ধ্বনি স্তব্ধ নিশীথে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল। আমরা ভল্লুকের ভাষা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার সেই গর্জ্জনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু ঋক্ষরাজ বোধ হয় মনে করিলেন—নিহত পত্নী-পুত্রের শোক নিবারণের জন্য জীবন বিপন্ন করা পশুনীতির অনুমোদিত বিধান নহে; বিশেষতঃ, স্ত্রী-বিয়োগের পর ভল্লুক-সমাজে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণেরও বাধা নাই। সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রমে প্রবেশের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' এই নীতির অনুসরণ করিয়া গুহার কিছু দূরে থাকিতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। আমরা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গুহাদ্বার হইতে দুই তিনবার গুলীবর্ষণ করিলাম, কিন্তু একটি গুলীও অন্ধকারে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিল না। আর তাঁহার সন্ধানও পাইলাম না। আমরা

অগ্নিকুণ্ডে আরও কতকগুলি শুষ্ক গুল্ম নিক্ষেপ করিয়া ঋক্ষরাজের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় কিছুকাল বসিয়া রহিলাম, তাহার পর রাত্রি গভীর হইলে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর জন্য পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া, হাত-পা গুটাইয়া শয়ন করিলাম। সেই রাত্রিতে আর আমাদের শান্তির ব্যাঘাত হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভীষণ সঙ্কট

আমরা সেই গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সারা রাত্রি শীতের ভীষণতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; সুতরাং প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে আমরা যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলাম। আমরা গুহা ত্যাগ করিয়া প্রথমেই ভল্লুকের মাংসগুলি লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া ফেলিলাম, এবং তাহা রৌদ্র ও বাতাসে শুকাইবার জন্য লম্বা শিকে ঝুলাইয়া রাখিলাম। উহা শুকাইলে তিন চারি দিন ব্যবহারযোগ্য থাকিবে বুঝিয়াই ঐরূপ করা হইল; বিশেষতঃ শীতের মাংস শীঘ্র পচিবারও আশঙ্কা ছিল না। অতঃপর আমরা ভল্লুক-শাবকের অবশিষ্ট মাংস দ্বারা প্রাতর্ভোজন সুসম্পন্ন করিয়া রৌদ্র উপভোগে প্রবৃত্ত হইলাম। সারা রাত্রি শীতের আতিশয্যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়াছিল, প্রভাতের রৌদ্র বড়ই মধুর বোধ হইল; তথাপি সুশীতল সমীরণ-প্রবাহ আমাদের দেহে যেন ছুরিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

যাহা হউক, কয়েক ঘণ্টা রৌদ্র সেবনে আমাদের দেহের জড়তা বিদূরিত হইলে আমরা বোঁচকা-বুঁচকীগুলি অশ্বতরগুলার পিঠে তুলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। তখনও আমাদিগকে গিরি-শিখরের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে হইল। তৃণ-লতাবর্জ্জিত বৈচিত্র্যহীন নীরস পাহাড় ভেদ করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। অশ্বতরগুলি ভারি বোঝা লইয়া অতি কষ্টে 'চড়াই' ভাঙ্গিয়া পর্ব্বতের দুরারোহ শৃঙ্গে উঠিতে লাগিল। তাহারা চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে থামিয়া দম্ লইতে লাগিল। সেই অত্যুচ্চ পাহাড় 'ভাঙ্গিতে' আমাদের সকলেরই অত্যন্ত কষ্ট হইল, এক একবার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; কিন্তু যেরূপে হউক—সেই পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও চলিতে লাগিলাম, এবং বহু কষ্টে যখন পর্ব্বতের শিখরস্থিত পথে উপস্থিত হইলাম, তখন মধ্যাহ্নকাল সমাগতপ্রায়। সেই স্থানে উপনীত হইয়া আমরা চতুর্দ্দিকে যে বিরাট্ দৃশ্য সন্দর্শন করিলাম, তাহাতেই পথের সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। আমি মুগ্ধনেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া অভিভূতের ন্যায় স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম; বোধ হয়, তখন আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। বোধ হয় আমার সঙ্গীরাও সেই বিরাট্ গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া আমার ন্যায় মুগ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃতির এরূপ মহান্ দৃশ্য আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি; তাহা দেখিয়া আমি পথের সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। এরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে কি না জানি না। পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি যে চির-তুষার-মুকুটিত উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গগুলি দেখিতে পাইলাম—তাহা সমুদ্রতল হইতে কুড়ি পচিশ হাজার ফুট উচ্চ। যাশোটোয়ারো বলিলেন, এগুলি যে দুই পর্ব্বতের শৃঙ্গ—তাহাদের একটির নাম সিম্বোরাজো, অন্যটির নাম কারাহুইরাজো। ইহাদের মধ্যে না কি পতি-পত্নী সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এই দুইটি পর্ব্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গ ব্যতীত আর যে কয়েকটি পর্ব্বতের শৃঙ্গ-শ্রেণী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল—তাহাদের নাম ইলিনিজা, কোটাকাচি, কোরাজন, পিচিন্চা এবং রুমিনাগুই। এই শেষোক্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অনুচ্চ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক অপেক্ষা কয়েক শত ফুট উচ্চ; অথচ সেই মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের প্রতি সমগ্র য়ুরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট! কোটোপাক্সি নামক আগ্নেয়গিরি অতি নিকটেই দেখিতে পাইলাম, তাহার চূড়াকার শৃঙ্গ হইতে ধূমরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। এই পর্ব্বত সমুদ্রতট হইতে শত শত মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত। কাম্বি আর একটি আগ্নেয়গিরি; ইহা কোটোপাক্সির ন্যায় উচ্চ নহে, কিন্তু তাহার অদূরে অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গ ব্যতীত আরও অনেকগুলি অপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতের শৃঙ্গ আমাদের নয়নগোচর হইল, সেগুলিরও উচ্চতা অল্প নহে। যাশোটোয়ারো সেই সকল পর্ব্বতের নাম জানিতেন; তিনি সোৎসাহে তাহাদের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ পার্ব্বত্য দেশ আর কোথাও নাই। এই সকল পর্ব্বতের দুই একটি ভিন্ন অন্যগুলিতে কখন মানুষের পদধূলি পড়ে নাই। প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে এই সকল পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি দেখিয়া মনে হইল, তাহা সুবিশাল হীরকক্ষেত্র; লক্ষ লক্ষ হীরক ঝলমল করিয়া চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে! এই সকল ইকুয়েডোরিয়ান পর্ব্বতের নিভৃত কন্দর অনেকের

বংশীরব

বসুমতী চিত্রবিভাগ]　　　　[শিল্পী—শ্রীগোপালচন্দ্র কানুনগো।

সুবৃহৎ নদীর উৎপত্তিস্থান। সেই সকল নদী বিশাল অরণ্য-প্রান্তর ভেদ করিয়া নদরাজ আমেজনে তাহাদের বিপুল জলরাশি ঢালিয়া দিতেছে।

আমরা কিছুকাল ধরিয়া সেই সকল গিরিশৃঙ্গের অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিলাম; আমাদের নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হইলে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। সেই দিকের দৃশ্য আর এক প্রকার। যতদূর দৃষ্টি চলে—কেবল অরণ্যের দৃশ্য! যেন শত শত ক্রোশব্যাপী অরণ্য ধরিত্রীর শ্যামলাঞ্চলের ন্যায় দিগন্ত-সীমা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত। সেই সকল অরণ্যে অসংখ্য প্রকার বন্যজন্তু ও সরীসৃপের বাস, এবং কত বিভিন্নজাতীয় রাক্ষস-প্রকৃতি অরণ্যচর দুর্দ্দান্ত অসভ্য হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিয়া সেই সকল দুর্গম মহারণ্যে বাস করিতেছে, তাহা কাহারও ধারণা করিবারও শক্তি নাই। আমাদিগকে সেই সকল অরণ্য ভেদ করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে; প্রতিদিন আমাদিগকে কত অচিন্ত্যপূর্ব্ব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে, নরভোজী রাক্ষসগণের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে হইবে—এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে আমরা চলিতে লাগিলাম। কিন্তু পথের বিপদের কথা শুনিয়া আমরা ভীত বা নিরুৎসাহ হইলাম না। নসিস্কা নানা কথায় আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কোন শ্বেতাঙ্গ জাতি এই সকল দুস্তর অরণ্যে প্রবেশ করে নাই শুনিয়া, এই অনাবিষ্কৃত রাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমাদের আগ্রহ প্রবল হইল; কিন্তু আমাদের দেশীয় অনুচরেরা অরণ্যবাসীদের লোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইল। তাহারা কম্পিত-হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে এই অরণ্য সম্বন্ধে তাহাদের শোচনীয় অভিজ্ঞতার কথা বলিতে লাগিল। তাহারা আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, এই সকল অরণ্যে ভীষণদর্শন বিশালকায় সর্প, জাগুয়ার, কুম্ভীর ও নানাবিধ হিংস্র জন্তুর বাস; বহুদূরব্যাপী জলাভূমি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী পার হইবার সময় আমাদিগকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে; তাহার উপর যে সকল নরভোজী রাক্ষস আমাদের পথরোধ করিয়া 'বোদোকুয়েরা' দ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে—তাহা ব্যর্থ করিয়া প্রাণরক্ষা করা আমাদের অসাধ্য হইবে। তাহাদের ব্যবহৃত 'বোদো-কুয়েরা' কিরূপ সাংঘাতিক অস্ত্র, তাহা তাহাদের নিকট শুনিতে পাইলাম। ইহা বাঁশের চোঙের মত একরকম চোঙ; 'চৌটা পাম্' নামক তালজাতীয় বৃক্ষের সুদৃঢ় সারাংশ দ্বারা এই চোঙ-গুলি নির্ম্মিত হয়। এক একটি চোঙ সাত ফুট হইতে নয় ফুট দীর্ঘ। এই চোঙের ভিতর আর একটি চোঙ প্রবিষ্ট হয়, এবং তাহা পিচকিরির দাণ্ডির মত ব্যবহৃত হয়। চোঙের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রের ব্যাস প্রায় আধ ইঞ্চি। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া যে তীক্ষ্ণধার বাণ সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়-তাহার ফলায় তীব্র বিষ লিপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল বাণ ধাতু-নির্ম্মিত নহে, তাহা সুদৃঢ় কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু তাহার অগ্রভাগ সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ। তাহাতে যে বিষ লিপ্ত হয়, তাহা বিশুদ্ধ বিষ। সেই বিষ যে কোন প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে, তাহার জীবনের আশা থাকে না। বাণগুলির আকার ক্ষুদ্র, এবং সেগুলি অত্যন্ত পাতলা। অরণ্যচর নররাক্ষসরা তিন চারি শত গজ দূর হইতে সেই সকল বাণ বর্ষণ করিয়া শত্রু-নিপাত করে; তাহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ। এই বাণে দেহচর্ম্ম বিদীর্ণ না হইলেও, যদি তাহার অগ্রভাগ দেহ-শোণিত স্পর্শ-মাত্র করে—তাহা হইলেও আহত প্রাণীর মৃত্যু অনিবার্য্য! তাহারা এই বাণের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানোয়ার পর্য্যন্ত বধ করে। এই সকল বন্যজাতি 'বোদোকুয়েরা' হাতে লইয়া গভীর অরণ্যে কোন বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে, এবং বহু দূর হইতে বাণ নিক্ষেপ করিয়া শত্রুনিপাত করে। সুতরাং ইহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের সকলকেই তাহাদের আক্রমণে নিহত হইতে হইবে।

দেশীয় অনুচরবর্গের নিকট এই সকল বিবরণ শুনিয়া আমাদের মনে দুশ্চিন্তা বা ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা সে ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আমরা কি সেই রাক্ষসগুলার ঐ সকল বাণ গ্রাহ্য করি? আমাদের কাছে যে সকল অস্ত্র আছে—তাহা মেঘের মত গর্জ্জন করে এবং তাহা হইতে যে 'বাণ' বাহির হয়, তাহা বজ্রের মত শত্রু-ধ্বংস করে। তাহা 'বোদোকুয়েরা' অপেক্ষা অনেক অধিক দূর হইতে গুলী নিক্ষেপ করিয়া শত্রু-দলকে ধরাশায়ী করিবে; তাহারা পড়িবে আর মরিবে।—" কিন্তু আমাদের কথা শুনিয়াও তাহাদের আতঙ্ক দূর হইল না। তাহারা বোধ হয় সেই স্থানেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত; কিন্তু যাশোটোয়ায়ো বন্দুক দেখাইয়া তাহা-দিগকে বলিলেন, যদি তাহারা আমাদের অবাধ্য হয়, তাহা

হইলে তিনি তাহাদের সকলের মস্তকে বজ্রাঘাত করিবেন। সুতরাং ভবিষ্যতে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিলেও বর্ত্তমানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা তাহারা সঙ্গত মনে করিল না।

অতঃপর আমরা গিরিশিখর হইতে পর্ব্বতের পাদদেশে অবতরণ করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বোক্ত অরণ্যই আমাদের লক্ষ্য। পাহাড় অত্যন্ত পিচ্ছিল, এবং 'পাকদণ্ডি' খাড়া বলিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চলিতে হইল। যাশোটোয়ারো আমাদের পথিপ্রদর্শক হইলেন। অশ্বতরগুলি আমাদের অনুসরণ করিতেছিল, এজন্য গাঁটরীগুলি পিঠে লইয়া তাহারা কিরূপে নামিতেছিল, তাহা দেখিতে পাই নাই। বোধ হয়, তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগ 'ছেঁচড়াইয়া' নামিতে হইল।

অবশেষে আমরা গিরিপাদভূমি অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রের অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। সেই অরণ্য যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেইরূপ দুর্ভেদ্য। দিবাবসানকালে আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম না; অরণ্যের এক অংশে আশ্রয় গ্রহণের জন্য সেই স্থানের কতকগুলি গাছ কুঠার ও টাঙ্গির সাহায্যে কাটিয়া ফেলিলাম। এই স্থানে অরণ্যচর শ্বাপদ জন্তু ভিন্ন অন্য কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। আজোগুয়েসের সৈনিকরা সেখানে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে—তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা এতদূর পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিতে সাহস করিবে না; এবং যে সকল অসভ্য নররাক্ষস আমাদের পথ-রোধ করিবে—তাহাদের অধিকার-সীমায় তখনও আমরা প্রবেশ করি নাই। কিন্তু এখানেও আমাদের শত্রু-সংখ্যা অল্প নহে। রাত্রিকালে লক্ষ লক্ষ মশা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এই সকল মশার আকার অতি বৃহৎ এবং তাহারা অত্যন্ত শোণিত-লোলুপ। কিন্তু এই সকল মশা অপেক্ষা একজাতীয় মাছি মানুষের অধিকতর ভয়ানক শত্রু। এই মাছির নাম 'পিউম' মাছি; তবে দিবাভাগেই ইহারা দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। ইহারা রাত্রিকালে আমাদের আক্রমণ করিল না। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ দেশের অরণ্যে একজাতীয় কীট দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল কীট দেহের অনাবৃত অংশ আক্রমণ করে, এবং ইহারা দেহ স্পর্শ করিবামাত্র সেই স্থান হইতে শোণিতের স্রোত বহিতে থাকে। সেই ক্ষত দুই এক দিনের মধ্যেই বিষাক্ত হয়। তাহার পর মৃত্যু অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

এই অরণ্যে 'পিউম' মাছি ব্যতীত আরও দুই জাতীয় কীট-পতঙ্গ আছে। ইহারা যাহাতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে—এজন্য যাশোটোয়ারো এবং নসিস্কা আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন। এই পতঙ্গগুলি এক জাতীয় চক্ষুহীন বোল্‌তা, এবং কীটগুলি লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি ছারপোকা। এই ছারপোকাগুলি দক্ষিণ-আমেরিকার কোন অংশে 'বিষোকলারেছো' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।—শুনিলাম, উক্ত চক্ষুহীন বোল্‌তা কাহারও দেহচর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র প্রাণবিয়োগ হয়! (if it touches the flesh it produces almost instant death!) বিশেষতঃ লোহিতাভ ছারপোকাগুলি এরূপ ক্ষুদ্র যে, চর্ম্মচক্ষুতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল ছারপোকা মনুষ্যদেহ ভেদ করিয়া ত্বকের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহার পর তাহাদের দংশনে সেই স্থান ভয়ঙ্কর টাটাইতে আরম্ভ করে। সেই টাটানি নিবারণের জন্য সবেগে চুলকাইতে হয়; এবং চুলকাইতে চুলকাইতে যে ক্ষত হয়, সেই ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না, অবশেষে তাহা পচিতে দেখা যায়! এইভাবে অনেকেই পচিয়া মরে। সৌভাগ্যক্রমে সকল ঋতুতে এই বোলতা ও ছারপোকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'পিউম' মাছি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সকল ঋতুতেই সমভাবে বর্ত্তমান।

যাহা হউক, সেই অরণ্যে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রত্যূষে পুনর্ব্বার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে সম্মুখেই একটি খরস্রোতা সুপ্রশস্তা নদী দেখিতে পাইলাম। ইহার স্রোতের প্রখরতা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। বিশেষতঃ, আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইলাম—তাহার সিকি মাইল দূরে একটি গভীর জলপ্রপাত থাকায় তাহার সুগভীর শব্দে সমগ্র বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল; যেন প্রতি মুহূর্ত্তে শত কামান একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল! অতিবৃষ্টিনিবন্ধন নদী তখন বানের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং নদীর উভয় কূল প্লাবিত করিয়া যেরূপ বেগে স্রোত বহিতেছিল—সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

আমরা নদীতীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি উপায়ে এই দুস্তর নদী পার হইব? এই স্থান হইতে নদী ঠিক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছিল; যদি আমরা এখানে নদী পার না হইয়া ইহার তীরে তীরে দক্ষিণদিকে চলিতে থাকি—তাহা হইলে আমাদিগকে গন্তব্য পথ হইতে বহুদূরে যাইতে হইবে।

কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য আমরা পরামর্শ করিতে বসিলাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা-প্রকার বাদানুবাদের পর এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল যে, আমাদের ছুতোর বন্ধু একখানি ভেলা নির্ম্মাণ করিবে; সেই ভেলার সাহায্যে আমরা নদী পার হইব।

অতঃপর পরামর্শানুযায়ী কায আরম্ভ হইল। ছুতোর বন্ধুর নেতৃত্বে আমরা সকলেই ভেলা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলাম। কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ বন হইতে কাটিয়া আনা হইল। তাহাদের শাখা-প্রশাখা কাটিয়া ফেলিয়া কেবল গুঁড়িগুলি পাশাপাশি সাজাইয়া লইলাম, এবং 'শিয়ানা' নামক সুদৃঢ় লতা দ্বারা সেগুলি বাঁধিয়া ফেলিলাম। এই লতাগুলি রজ্জুর অভাব পূর্ণ করিল।

দুই ঘণ্টার পরিশ্রমেই ভেলা নির্ম্মিত হইল। আতটপূর্ণ নদী-জলের অদূরে ভেলাখানি নির্ম্মিত হইয়াছিল; দুইটি গাছের গুঁড়ি ভেলার নীচে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের সাহায্যে ভেলা জলে ভাসাইতে অধিক কষ্ট হইল না। অতঃপর একটি অশ্বতরের পিঠের বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া সেই অশ্বতরটাকে দুই জন দেশীয় অনুচরের জিম্মায় সেই ভেলার উপর তুলিয়া দিলাম, শিয়ানা লতাগুলিকে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া তাহার এক প্রান্ত বাঁধিয়া দিলাম, অন্য প্রান্ত আমাদের হাতে থাকিল। অনুচর-দ্বয় ভেলা লইয়া নদীর পরপারে চলিল; তাহারা অপর পারে নামিলে আমরা সেই লতার সাহায্যে ভেলা এ-পারে টানিয়া আনিতে পারিব, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

এই ব্যবস্থায় আমরা আশানুরূপ ফল পাইলাম। অশ্বতর-গুলিকে একে একে অপর পারে পাঠাইয়া আমাদের গাঁটরী-গুলিও পার করিলাম। এই ভাবে অনেকেই নদী পার হইল, কোন বিঘ্ন ঘটিল না দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু এই ভাবে নদী পার হইতে অনেক সময় লাগিল। অনেককে অপর পারে পাঠাইয়া বার্ণি নসিস্‌কা ও দুই জন অনুচরসহ ভেলায় উঠিল। আমি যাশোটোয়ারো, জিম স্মিথ এবং চারি জন দেশীয় অনুচরসহ নদীর এ-পারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। স্থির হইল—বার্ণি সদলে অপর পারে উপস্থিত হইলে শেষ খেপায় আমরা পার হইব।

ভেলা নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে, যে অনুচর লগী ঠেলিতেছিল, তাহার হাত হইতে লগীখানি হঠাৎ খসিয়া জলে পড়িয়া খরস্রোতে ভাসিয়া গেল; অন্য অনুচর ভয় পাইয়া লগী ছাড়িয়া দিল, সেই মুহূর্ত্তে ভেলাখানি তীরবেগে ভাসিয়া চলিল! আমরা প্রথমে ভয়ের কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই; যে লতায় ভেলা বাঁধা ছিল—সেই লতার অপর প্রান্ত আমাদের হাতে থাকায় আমাদের আশা ছিল—ভেলাখানি টানিয়া নদী-কূলে আনিতে পারিব। আমরা সেই লতা টানিয়া ধরিয়া ভেলার গতিরোধ করিতে না পারায় লতার প্রান্তভাগ তাড়া-তাড়ি অদূরবর্ত্তী একটি গাছের গুঁড়িতে জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য ভেলার গতিরোধ হইল; কিন্তু নদীর স্রোত এরূপ প্রখর যে, সেই স্রোতের মুখে ভেলা দাঁড়াইতে পারিল না, 'ফটাং' করিয়া শব্দ হইল, লতা ছিঁড়িয়া গেল, এবং ভেলাখানি লঘু তৃণখণ্ডের ন্যায় সেই প্রচণ্ড স্রোতে অদূরবর্ত্তী প্রপাতের অভিমুখে ভাসিয়া চলিল। আমরা বজ্রাহতের ন্যায় নদীকূলে দাঁড়াইয়া রহিলাম; বুঝিলাম, বার্ণি, নসিস্‌কা ও দেশীয় অনুচরদ্বয় অবিলম্বে সেই ভীষণ জলপ্রপাতে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইবে; তাহাদের প্রাণরক্ষায় কোন উপায় নাই—নাই!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পূত প্রেম-প্রহরণে

এ জয়ে হাসিছ, বীর!
অসি-ঝনুঝনা আনত করেছে
কেবল কায়িক শির।
হৃদয় রয়েছে মস্তক তুলি,
স্বাধীনতা সেথা সদাই উথলি'
নাচিতেছে, তব খড়্গের জয়
র'বে কি হে চির-স্থির?

পূত প্রেম-প্রহরণে
যে জন নরেরে চায় জিনিবারে
সেই ত বিজয়ী রণে।
তার জয়-গান পরাজিত গায়,
বন্দী-আঁখির বারি ছুটি' যায়
ধূলিমা ধোয়ায়ে চরণে তাহার
বসাতে হৃদয়াসনে॥

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

শৈত্য-মূলক সংরক্ষণ-প্রণালী

বৈজ্ঞানিকপ্রবর বার্থেলো (Berthelot) এক সময় বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত এমন যুগ আসিবে, যখন কৃষি অনাবশ্যক অথবা সখের জিনিষ হইয়া পড়িবে। শরীর-পোষণের জন্য মূল দ্রব্যাদি রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই প্রস্তুত হইতে পারিবে। সে যুগ এখনও আসে নাই। এখনও খাদ্যদ্রব্যাদির সমধিক উৎপাদন জগতের প্রধান সমস্যা। কিন্তু আমিষ কিম্বা নিরামিষ খাদ্য উৎপাদিত হইলেই হইল না; উহা যাহাতে অপচিত না হইয়া পূর্ণরূপে মানবের ব্যবহারে আসিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া দরকার। শীত-প্রধান দেশের জল-বায়ু খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অবিকৃত থাকার সহায়ক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উত্তাপ কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক খাদ্যদ্রব্যকে আহারের অনুপোযোগী করিয়া দেয়। ইহাতে শুধু যে আর্থিক অপচয় হয়, তাহা নহে: বিকৃত খাদ্য অবলম্বন করিয়া অনেক রোগবীজ আমাদিগের শরীরে প্রবেশলাভ করিয়া জীবন নষ্ট করে। সেই জন্য খাদ্য-সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা মানব চিরকালই করিয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে এ সম্বন্ধে যে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ফলে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেশসমূহের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান চলিতেছে। কিন্তু ভারতে এ পর্য্যন্ত খাদ্যসংরক্ষণ-প্রণালীর যথেষ্ট প্রচার হয় নাই; তাহার ফলে এক দিকে যেমন আর্থিক ক্ষতি ও খাদ্যের অনাটন ঘটিতেছে, তেমনই অন্য দিকে নানাবিধ ব্যাধি প্রসার লাভ করিতেছে।

সংরক্ষণের উপায়

সাধারণতঃ দুই প্রকারে খাদ্যদ্রব্যাদি সংরক্ষিত হইয়া থাকে। একটিকে শুষ্ক ও অন্যটিকে আর্দ্র উপায় বলিতে পারা যায়। কাশ্মীর প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে শীতকালে ব্যবহারের জন্য কয়েক প্রকার সব্জী ও ফল-মূল শুষ্ক করিয়া রাখা হয়; সমতল প্রদেশে বড়ি, আম্সী প্রভৃতি শুষ্কীকৃত খাদ্যদ্রব্যের উদাহরণ। এই সমুদয় অবশ্য সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করা হয়। উত্তাপ-প্রয়োগে আর্দ্র প্রথায়ও কতিপয় খাদ্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে; যথা—চাট্নি, মোরব্বা ইত্যাদি। কিন্তু শৈত্য-প্রয়োগ দ্বারা সংরক্ষণ-প্রথা এখনও এতদ্দেশে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই; যদিও কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরে ইহার সূচনা হইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই প্রথা বিশেষ আবশ্যক। এই প্রথায় শুধুই যে স্বল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়, তাহা নহে, ইহার দ্বারা একই সময়ে ভূরিপরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত হইতে পারে।

শৈত্যমূলক সংরক্ষণ-প্রণালীর বিশেষ বিবরণ এ স্থলে দেওয়া অসম্ভব; এ সম্বন্ধে প্রধান জ্ঞাতব্য দুই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র। তাপের মাত্রা হ্রাস করিয়া বর্ত্তমান সময়ে দুই প্রকারে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত হইতেছে :— প্রথম প্রকার উপায়কে Chilling বলা হয়; ইহাতে খাদ্যদ্রব্যকে জলের বরফ হইবার তাপে কিম্বা তাহার কিঞ্চিদূর্দ্ধে রাখা হয়; খাদ্যদ্রব্য উক্ত উপায়ে জমিয়া গেলেও উহার প্রাকৃতিক (Physical) অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে। কিন্তু উত্তাপের মাত্রাধিক্য বশতঃ খাদ্যদ্রব্যের পেশীসমূহের শীঘ্র খারাপ হইবার এবং সামান্য আর্দ্রতা থাকার জন্য নানাপ্রকার ছত্রক ও জীবাণু জন্মিবার আশঙ্কা যায় না। ফল ও গোমাংস সংরক্ষণে এই প্রথা প্রযুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার উপায়ের নাম Freezing; ইহাতে খাদ্যদ্রব্য জমিয়া যাইবার বিন্দুর (Freezing point) যথেষ্ট নিম্নে উহাকে রাখা হয়। তাহাতে খাদ্যদ্রব্য জমিয়া একবারে বরফের চাপ বাঁধিয়া যায়; কয়েক প্রকার মৎস্য ও ছাগ-মাংস এই প্রথায় সংরক্ষিত হইতেছে। ইহাতে খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রথা অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে ভাল; কারণ, এতদ্দ্বারা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে অনেক বিলম্ব হয় এবং জীবাণু প্রভৃতিও জন্মিতে পারে না।

গোমাংসে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় ; Chilled গোমাংস মাসাধিককাল ভাল থাকে না ; কিন্তু Frozen গোমাংস তিন বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, Freezing প্রথায় খাদ্যের অত্যাবশ্যক উপাদান এন্‌জাইম্‌ (Enzyme) ও ভাইটামিন্‌ (Vitamine) আদৌ নষ্ট হয় না। কিন্তু এই প্রথারও একটি অসুবিধা আছে। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি অনেক খাদ্য-দ্রব্যকে এক বাক্স বরফের ন্যায় জমাইয়া দিলে উহাদের স্বাভাবিক গঠন-পরিবর্ত্তনের সহিত পুষ্টিকর গুণেরও কিছু পরিবর্ত্তন হয়। ডাক্তার ষ্টাইলাস্‌ (Dr. Stilas)-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে, যদি খাদ্যদ্রব্যকে খুব শীঘ্র জমাইয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে একবারেই পুষ্টিকর গুণের হানি হয় না, অথবা যাহা হয়, তাহা নগণ্য। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, লবণযুক্ত জলকে জমিয়া যাইবার বিন্দুর ১৫ ডিগ্রি নিম্নে নামাইয়া তাহাতে যে কোন দ্রব্য জমাইয়া লইলে, জমাইবার কাল যেরূপ খুব সংক্ষিপ্ত হয়, তেমনই মৎস্য, মাংস প্রভৃতির পুষ্টিকর শক্তির হ্রাস হয় না। এই প্রথাই বর্ত্তমান সময়ে নানা স্থানে খাদ্যসংরক্ষণে প্রযুক্ত হইতেছে। বলা আবশ্যক যে, লবণ-জলে জমাইয়া লইলেও খাদ্যদ্রব্যে প্রায় লবণ প্রবেশ করে না। যে সামান্য মাত্রায় করে, তাহাও রান্নার পর বুঝা যায় না।

আবশ্যক যন্ত্রাদি

বলা বাহুল্য যে, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যতীত শৈত্য-প্রথায় সংরক্ষণ করা চলে না। এই শ্রেণীর যন্ত্রাদির সাধারণ নাম Refrigerator। পূর্ব্বে Refrigeratorএর চলন কম ছিল ; কারণ, যে সকল শৈত্য-উৎপাদক যন্ত্র প্রস্তুত হইত, সেগুলি বড় ধরণের ছিল। গৃহস্থ অথবা ক্ষুদ্র হোটেল প্রভৃতির ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র প্রায়ই ছিল না। এখন কিন্তু সে অভাব-মোচন হইয়াছে। মার্কিণ ও জার্ম্মাণী, উভয় দেশেই এমন অনেক রকমের কল তৈয়ারী হইয়াছে, যদ্দারা সামান্য পরিমাণে বরফ, কুলপীবরফ প্রস্তুত করা এবং খাদ্য সংরক্ষণ করা সম্ভবপর। কৃত্রিম উপায়ে শৈত্য উৎপাদনের প্রথম যুগে কাঁচা বরফের সাহায্যেই কোন খাদ্যদ্রব্য জমান হইত। কিন্তু সর্ব্বস্থলে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কাঁচা বরফ সুলভ নহে। সেই জন্য আজকাল এরূপ প্রথা অবলম্বিত হইতেছে, যাহাতে কাঁচা বরফের উপর নির্ভর করিতে হয় না ; কলে স্বতঃই বরফ প্রস্তুত হয় ও তাহার সাহায্যে খাদ্যাদি জমাইয়া অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। এইরূপ কলগুলি Automatic Refrigerator
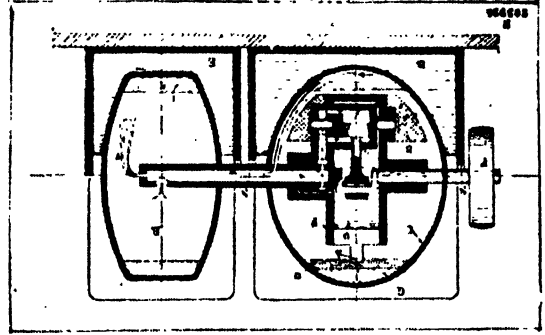
এই চিত্রে ছোট শৈত্য-উৎপাদক কলের সাধারণ গঠনপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে

নামে অভিহিত। দুই প্রকার শৈত্য-উৎপাদক কলের চিত্র এ স্থলে প্রদত্ত হইল। কি প্রকারে কলে কার্য্য হয়, তাহা বর্ণনা করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। স্থূলতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, লবণ, সোরা এবং অ্যামোনিয়া অথবা ক্ষার ও গন্ধকদ্রাবকঘটিত পদার্থাদির সংমিশ্রণে Freezing mixture প্রস্তুত হয় ; এবং এই মিশ্রিত চূর্ণই জলকে বরফে পরিণত করে। Freezing mixture আজকাল ট্যাবলেট্‌ (Tablet) আকারেও পাওয়া যায়। নিম্ন-প্রদর্শিত কলে

শৈত্য-উৎপাদক ছোট 'গ্লেসিয়া' কল। ইহার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতীকৃত শৈত্য-উৎপাদক চূর্ণ ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়

উক্ত প্রকার ট্যাবলেট দ্বারাই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। কাঁচা বরফের সহিত ট্যাবলেট চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ

করিলে তাপের পরিমাণ জল জমিবার বিন্দুর অনেক নিম্নে নামিয়া যায়।

ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, শৈত্য-উৎপাদক কল যেমন তাপ কমাইতে থাকে, কলের বাহিরের অবস্থা-সমূহ তেমনই তাপের মাত্রা বাড়াইতে থাকে। সেই জন্য কলের বাহ্যদেশে এরূপ আবরণ থাকা দরকার, যাহা তাপপ্রবেশ প্রতিরোধ করিতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সেই জন্য ক্ষুদ্র শৈত্য-উৎপাদক কলের সহিত কাচের প্রায় দশ সের আয়তনের insulating পাত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতর খাদ্যাদি রাখিলে উহা দীর্ঘকাল ভাল অবস্থায় থাকে। পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ মার্কিণে ছোট বড় নানাবিধ রকমের শৈত্য-উৎপাদক কল হোটেল, মিষ্টান্নের দোকান, মাংসের দোকান ও দুগ্ধের কাযে প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতায়ও কোন কোন স্থানে এই প্রকার কলে কার্য্য চলিতেছে।

সংরক্ষণোপযোগী দ্রব্যাদি

সহজে নষ্ট হইয়া যায় (perishable), এরূপ অনেক ফল-মূল এবং মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় প্রত্যহ কাটতি হয়। কিন্তু মূল্য সুলভ নহে এবং টাট্‌কা জিনিষও অনেক সময় পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ, মাল অনেক দূর হইতে আসিবার কালে নষ্ট হইয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া যাওয়ার ভয়েও ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে মাল চালান দিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, সামুদ্রিক মৎস্য কলিকাতায় আমদানী করিলে মাছের বাজার অনেক সস্তা হইতে পারে; কিন্তু শৈত্য-উৎপাদক কলযুক্ত জাহাজ আবশ্যক এবং কলিকাতায়ও ঠাণ্ডা গুদাম দরকার। তৎসমুদয়ের অভাবেই মৎস্যাভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন শৈত্য-মূলক সংরক্ষণ-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার কল্পনা করিতেছেন; দুই একটি বিদেশীয় কোম্পানীও এই ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণের উপকারে আসিতে হইলে কেন্দ্রীয় সুবৃহৎ শৈত্য-উৎপাদক কারখানা ব্যতীত স্থানে স্থানে ঠাণ্ডা গুদামেরও প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শুধু কলিকাতাতেই এইরূপ ব্যবস্থা হইলে কার্য্য চলিবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের উৎপাদন-কেন্দ্রে ও রেলগাড়ীতে শৈত্য সাহায্যে সংরক্ষণের উপায়বিধান প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে ফল-মূল, সব্জী,
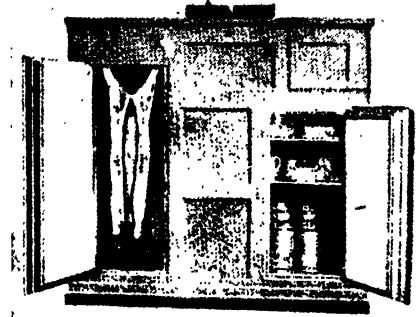
খাদ্য-সংরক্ষণ করিবার বিশেষ কামরাযুক্ত ক্ষুদ্র কল

মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি অধিক মাত্রায় কলিকাতায় আসিতে পারিবে; কিম্বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে পারিবে। প্রস্তুতীকৃত অথবা কাঁচা—প্রায় সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই শৈত্য-প্রথায় সংরক্ষিত হইতে পারে। ব্যবসায়িক হিসাবে এই প্রণালী প্রয়োগ করিতে হইলে জনসাধারণ, রেল, জাহাজ ও মোটর কোম্পানী প্রভৃতির সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। গৃহস্থগণও ইহা হইতে যথেষ্ট ফল পাইতে পারেন। আজ-কাল অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ গৃহে বরফ ও কুলপী তৈয়ারী করিবার কল রাখিয়া থাকেন। তদপেক্ষা কিছু অধিক খরচ করিলেই ছোট অটম্যাটিক্ শৈত্য-উৎপাদক কল পাওয়া যাইতে পারে। বরফ, কুলপী ইত্যাদি ব্যতীত এইরূপ কলে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি সংরক্ষিত হইতে পারে। যে দেশে সামান্য সময়ের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য খারাপ হইয়া যায় এবং দূষিত খাদ্যের জন্য যে দেশে বহুসংখ্যক লোক প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেরূপ দেশে শৈত্য-উৎপাদক কল যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এতদ্ভিন্ন এইরূপ কল-দ্বারা যে অনেক অপচয় নিবারিত হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।
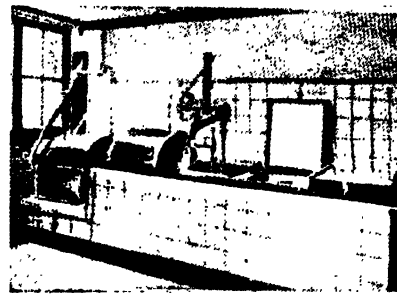
এই কলে কুলপী বরফ ও বরফ প্রস্তুত হইতে পারে এবং খাদ্য-সংরক্ষণ-কার্য্যও চলে

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

রাজকন্যা

আকড়ার প্রবলপ্রতাপ জমীদার অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক দিন শীতের অপরাহ্লে তাঁহার কাছারীবাড়ীর সুবৃহৎ দপ্তরখানায় সমবেত আমলা ও পারিষদবর্গের সমক্ষে সহর্ষে ঘোষণা করিলেন,—"শুনেছ হে, দেবীপুরের রাজকন্যা এই বংশের বধূ হয়ে আসছেন!"

এই শুভসংবাদে হুজুরের সমক্ষে আমলা ও পারিষদবর্গের যেরূপ ভাব-ভঙ্গী ও উল্লাসপ্রকাশ আবশ্যক, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

দেওয়ান হুজুরের সমীপবর্ত্তী হইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কথাবার্ত্তা তা হ'লে পাকা হয়ে গেছে, হুজুর?"

হুজুর বলিলেন,—"হাঁ, এক রকম পাকাই বৈ কি। আমি রাজা বাহাদুরের কলকাতার প্রাসাদেই মেয়ে দেখে এসেছি। খাসা মেয়ে, রাজকন্যা ত রাজকন্যাই! তবে বয়েস কিছু বেশী হয়ে গেছে এই যা—"

জনৈক পারিষদ্ অমনি বলিয়া উঠিল,—"ওতে কিছু কিন্তু করবেন না হুজুর! আজকাল গরীবদের ঘরেই যখন বয়স বেশী ক'রে বিয়ে দেওয়া প্রথা হয়ে পড়েছে,—তখন রাজা-রাজড়ার ঘরে এ যে হবে, তাতে আর কথা কি!"

হাসিয়া জমীদার বাবু বলিলেন, "তা ত বটেই! বিশেষতঃ আজকাল বড় লোকদের ঘরেও মেয়েদের রীতিমত লেখা-পড়া শিখিয়ে বিয়ে দেবার রীতি আরম্ভ হয়েছে। কাযেই মেয়েরা একটু বড়-সড়ই হয়। আমার ভাবী বউমাটিও খুব শিক্ষিতা। রাজাবাহাদুরের একান্ত ইচ্ছা, আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা।"

আর এক জন পারিষদ্ বলিয়া উঠিল,—"এটা হুজুর, উভয় পক্ষেরই সৌভাগ্যের কথা। এমন সম্ভ্রান্ত নৈকষ্য কুলীনবংশ কোথায় দেখা যায়? বিশ ক্রোশের মধ্যে হুজুরের মত প্রবলপ্রতাপ, কুলে-শীলে, ধনে-ঐশ্বর্য্যে আর কে আছে? হাঁ, তবে রাজা বাহাদুরের কথা, সে আলাদা! অত বড় ধনী জমীদার কি আর বাঙ্গালা দেশে আছে? দেশদেশান্তরের মুখ্যি কুলীন ওঁদের দুয়ারে বাঁধা হয়ে আছে। আর ঐশ্বর্য্য? বাঙ্গালায় এমন পরগণা নেই, যেখানে ওঁদের জমীদারী না আছে!"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"শুধু বাঙ্গালা কেন, বাঙ্গালার বাইরে, বিহারেও ওঁদের জমীদারী; শুনেছি, কাশীতেও বড় অল্প সম্পত্তি নেই। আর এই আকড়ায়? যদিও আমি এখানে জমীদার, কিন্তু এখানেও দেবীপুররাজের সম্পত্তি কি বড় সামান্য?"

দেওয়ান বলিলেন,—"সামান্য! গঙ্গার ধারে এক শ বিঘে জমীর ওপর রাজপ্রাসাদ! ইউল কোম্পানীর জুটমিল চলেছে দেবীপুরের রাজার জমীর ওপর, বর্ণ কোম্পানীর ইটখোলা, সুতোর কল,—সবই দেবীপুরের রাজার জমীতে। অবশ্য এদের আশে-পাশে হুজুরেরও জমী যথেষ্ট, কিন্তু বিদেশে দেবীপুরের রাজারা যে রকম সম্পত্তি করেছেন,এমনটি খুব কমই দেখা যায়।"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"তাতে আর কথা কি! মিত্তিরজা যে বললে, দেবীপুরের দোরে যত সব মুখ্যি কুলীন বাঁধা হয়ে আছে, সেটা মিথ্যে কথা; সে সব কাল চ'লে গেছে। তখন তখন দেবীপুরের রাজারা এক একটা কুলীন পাত্রের জন্য দশ বিশ লাখ বার করতে দ্বিধা করিতেন না, কিন্তু এখনকার রাজা পয়সাটাকে বিলক্ষণ চিনে নিয়েছেন। রাজবাড়ীতে কুলীন হাতী বাঁধবার সখটুকু এঁর মোটেই নেই, তার স্থলে বড় বড় জমীদারী হাতী বেঁধে রেখে তাদের মাথা কিনে নিয়েছেন। হুঁসীয়ার হিসেবী লোক হে, সে যুগের দাতাকর্ণ নয়।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"এখনকার রাজার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা শুনতে পাই বটে, তাতে তাঁকে খুব চোস্ত বিচক্ষণ বলেই মনে হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও তাঁকে দর্শন করার ভাগ্য আমাদের হয়ে ওঠে নি।"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"এইবার হবে হে, এইবার হবে, দেওয়ান। আর তিনি তাঁর আকড়ার বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত কখনও আসেন নি। এই প্রথম আসছেন—আসছে শ্রীপঞ্চমীর দিন।"

সমস্বরে সহর্ষে সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—"বটে! বটে!"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"ঐ দিনই তিনি পাত্র আশীর্ব্বাদ করবেন।"

এই সুসংবাদে সকলের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মিত্তিরজা বলিলেন,—"বেশ, বেশ, তা হ'লে এই ফাল্গুনেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে!"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"ইচ্ছা ত এইরূপ, তবে সমস্তই ভবিতব্যের হাত। আর এ শুভসংযোগের আসল অর্থ কি জান?—রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে দেবীপুর-রাজের সমস্ত সম্পত্তিই আমার পুত্রের আয়ত্তে আসা। কারণ, রাজার এই কন্যাটিই তাবৎসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাঁর আর অন্য সন্তান নাই, নিজে বিপত্নীক।"

আবার সভাসদ্‌গণের বদন হর্ষোজ্জ্বল হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে সমর্থ হইলেন যে, তাঁহাদের ধনগর্ব্বিত হুজুর, এতক্ষণ দেবীপুর-রাজের ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে শতমুখ হইয়াছিলেন কেন।

সেই দিন গ্রামমধ্যে জমীদার অনুকূল বাবু ও তৎপুত্র শ্রীমান্ মহীপতি মুখোপাধ্যায়ের ভাবী সৌভাগ্যের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলেই একবাক্যে বলিল,—"ভাগ্যেই ভাগ্যের সংযোগ হয়, জলেই জল বাধে।"

২

অনুকূল বাবু কায়মনপ্রাণে যে স্মরণীয় দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে দিনটি উপস্থিত হইবার এক পক্ষ পূর্ব্বেই, তাঁহার জীবনের শেষ দিন সহসা এমন অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিতে হইল।

তারযোগে দেবীপুরের রাজাকে এই শোকসংবাদ জানান হইল। উত্তরে রাজাবাহাদুর তারে সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। মহাসমারোহে স্বর্গগত জমীদারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

অনুকূল বাবু বিচক্ষণ জমীদার ছিলেন। জমীদারীর জমীমাত্রই তাঁহার কাছে কল্পতরু বা কামধেনু তুল্য ছিল। জমীর গায় হাত বুলাইলেই যে তাহার মধ্য হইতে কাম্য নিঃসৃত হয়, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং হাত বুলাইবার মোহময় প্রণালীর সহিত তিনি উত্তমরূপেই পরিচিত ছিলেন, কাযেই তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহারের গুণে জমীর উপস্বত্ব নানা প্রকারে প্রজাদের বক্ষাস্থলির মধ্য দিয়া সুশৃঙ্খলে তাঁহার ভাণ্ডারে প্রবেশ করিত। তিনি যেমন নানা উপায়ে লইতে জানিতেন, তেমনই সঞ্চয়ের সহিতও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মনে মনে আভিজাত্যের অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তিনি আবশ্যক স্থলে সময় সময় পাত্রবিশেষে এরূপ উদারতার ভাব প্রকাশ করিতেন যে, তাঁহার স্তাবকদল মুগ্ধভাবে তাঁহার গুণগান করিত।

আবার এই হুজুরেরই স্থাপিত গ্রাম্য বিদ্যালয়ে হুজুরের পুত্রের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা থাকিত বলিয়া দীননাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একটি তেজস্বী ছাত্র যখন প্রতিবাদ করে এবং এই প্রতিবাদের কথা শুনিয়া, হুজুর সক্রোধে তাহার শাস্তির ব্যবস্থায় অবহিত হইলে, এই স্তাবকেরাই দল তাহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছিল,—হুজুরের রাগ ত হবারই কথা, বড় লোকের ছেলের বড়মানুষী দেখে গরীবের ছেলের চোখ টাটানই দোষ!

এ হেন বিচক্ষণ হুজুরের পুত্র শ্রীমান্ মহীপতি মুখোপাধ্যায় যখন জমীদারী-তক্তে আসীন হইলেন, তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্যময় ভাবভঙ্গী, আভিজাত্যের অহঙ্কার, ধনগৌরবের স্পর্দ্ধা, তাঁহাকে এভাবে পাইয়া বসিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই দেশমধ্যে তিনি সিরাজদ্দৌলার সহিত সমালোচিত হইলেন।

স্বর্গীয় জমীদার কাছারী-বাড়ীতেই মজলিস করিয়া বসিতেন। মজলিসস্থলেই তিনি প্রজাগণের অভাব অভিযোগ শুনিতেন এবং যাহাতে নিজের স্বার্থের কিছুমাত্র অপচয় না হয়, বরং কিছু আরও হইবার সম্ভাবনা থাকে, তৎসম্বন্ধে সুবিচারও করিতেন। কিন্তু নবীন জমীদার পিতার এই উদারতা, জনসাধারণের সমক্ষে কারণ অকারণে মুলভদর্শনদানরূপ দুর্ব্বলতা এক জন জমীদারের পক্ষে নিতান্ত অসমীচীন মনে করিয়া, প্রহরিরক্ষিত স্বতন্ত্র সুসজ্জিত সুবৃহৎ কক্ষে জমীদারের খাস-কামরা বাহাল করিলেন। আভিজাত্যের স্পর্দ্ধার দিকে এই নবীন জমীদারটির প্রকৃতি নিত্যই এ ভাবে অগ্রসর হইতেছিল যে, সাধারণের সংস্পর্শে আসা বা সাধারণ কোনও ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকারকে তিনি নিতান্ত সম্ভ্রম-হানিকর ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন।

প্রবীণ সমাজ নানা কারণে সবই সহিয়া যাইতেন; কিন্তু তরুণ-দল গর্জ্জন করিয়া প্রতিবাদ করে,—সিরাজদ্দৌলার যুগ এখন নেই; আমরা গরীব হলেও মানুষ।

দেওয়ান এক দিন জমীদার বাবুর খাস-কামরায় গিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"নানা জনে নানা রকম নিন্দা করছে,—আমার বিবেচনায় সাধারণকে বর্জ্জন না ক'রে তাদের সঙ্গে মেলামেশা—"

দেওয়ানজীকে আর বলিতে হইল না, বারুদের স্তূপে যেন জ্বলন্ত অগ্নিগোলক আসিয়া পড়িল। গর্জ্জন করিয়া মহীপতি বলিলেন,—"কি ভাবে মেলামেশা করতে হবে সাধারণ ছুঁচোদের সঙ্গে শুনি? ধেই ধেই ক'রে নৃত্য করতে হবে, না তাদের সঙ্গে কোমর বেঁধে চাকরী করতে ছুটতে হবে? নিন্দা করছে! নিন্দে ক'রে ত আমার তালুক নীলেমে তুলবে! যাও—যাও—নিজের কায কর গিয়ে।"

পিতৃবয়সী চিরহিতৈষী দেওয়ান পুত্রতুল্য স্নেহভাজন জমীদার-পুত্রকে সম্যক্‌রূপে চিনিয়াও কারণে অকারণে উপদেশ দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। লোকনিন্দার কথা স্তাবকবৃন্দ-প্রমুখাৎ আজ পূর্ব্বাহ্ণেই মহীপতি শুনিয়াছিলেন; যে যত বড় অহঙ্কারী, নিন্দাবাদ তাহাকে তত বড় আঘাতে কাতর করিয়া তুলে; ক্রোধে ক্ষোভে মহীপতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, দেওয়ানের বার্ত্তা তাঁহাকে একবারে ধৈর্য্যচ্যুত করিল। বিনা বাক্যব্যয়ে দেওয়ান কাছারীঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহীপতি দেওয়ানকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ কোন্ সাধারণ অনুষ্ঠানে আমাদের চাঁদা দিতে হয়, তার একটা ফর্দ্দ পেশ কর। আজই আমি চাই।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফর্দ্দ লইয়া দেওয়ানজী উপস্থিত হইলেন। মহীপতি দেখিলেন—বিদ্যালয়, পাঠাগার, অনাথালয়, হরিসভা, হাসপাতাল প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়মিতরূপে প্রতিমাসে এক একটা নির্দ্ধারিত চাঁদা দেওয়া হয়।

তখনই মহীপতি বাবু হুকুমনামা লিখিয়া দিলেন,—বর্ত্তমান মাস হইতে কোনও সাধারণ অনুষ্ঠানে আর মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। হুকুমনামা লেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বহস্তে জমীদারের শীলমোহর মুদ্রিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ দেওয়ান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নবীন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৩

সাধারণ অনুষ্ঠানে জমীদারের সাহায্য রহিত হইবার সংবাদে জনসাধারণ স্তম্ভিত হইল। প্রবীণগণ তরুণদের উদ্দেশে গরল উদ্গার করিতে লাগিলেন। তরুণগণ তাহার প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হইয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সকল অনুষ্ঠানে জমীদার-পক্ষ হইতে যে পরিমাণ সহায়তা আসিত, সেইমত অর্থের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

গ্রামের তরুণসঙ্ঘের কর্ণধার ছিলেন দীননাথ চট্টোপাধ্যায়। এই উৎসাহী, উচ্চশিক্ষিত, সকল সদনুষ্ঠানে তৎপর, মেধাবী যুবক গ্রামের ভূষণস্বরূপ সকলেরই স্নেহ-শ্রদ্ধা অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্যোগে অল্পদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট সাহায্যে

প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। তরুণসঙ্ঘ মহোল্লাসে পাঠাগারের বার্ষিকোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের বিপুল উৎসাহ দর্শনে প্রবীণ সমাজকে মৌন মুগ্ধ হইতে হইল।

মহীপতি বাবু মনে করিয়াছিলেন, সাধারণ অনুষ্ঠান-সমূহে সহায়তা সম্বন্ধে জমীদার নির্দ্দয় হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার দয়া আকর্ষণ জন্য সাধারণ সমাজ তাঁহার দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িবে, তখন তিনি রীতিমত এক হাত লইবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, কেহই তাঁহার সিংহদ্বারে হত্যা দিল না, সাধারণের মধ্যে কোনও প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না, বরং যখন সংবাদ পাইলেন যে, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় জমীদারী-আনুকূল্যের অনুরূপ অর্থ সাধারণের মধ্য হইতেই সংগ্রহের উপায় হইয়াছে, তখন রুদ্ধ রোষে এই স্পর্দ্ধিত যুবক ক্রুদ্ধ হইলেন। এত দিন পরে দীননাথের দৃপ্ত মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষুর উপর উজ্জ্বলরূপে ভাসিয়া উঠিল! গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক সমক্ষে বারো বৎসরের বালকের কি তীব্র তেজস্বিতা!—'বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রই সমান, বড়লোকের ছেলে ব'লে এর এত খাতির কিসের?'—শঙ্খনাদের মত সেই কথা এখনও মহীপতির কর্ণে বাজিতেছিল।—সেই দীননাথ আজ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী! দন্তে অধর-দংশন করিয়া মহীপতি তীব্র ভ্রূকুটি করিলেন।

এই সময় দেওয়ান ধীরে ধীরে মহীপতির খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন।

মহীপতি দেওয়ানের দিকে চাহিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিশু পণ্ডিতের ছেলে সেই বওয়াটে দীনে চাটুয্যে বুঝি আজকাল গ্রামের মোড়ল হয়ে বসেছে, না?"

জমীদারী সেরেস্তায় কায করিয়া যাঁহারা মস্তকের কেশ পক্ক করিয়াছেন, জমীদারীর সহিত মালিক জমীদারের হৃদয়খানিও তাঁহাদিগকে সেরেস্তার খাতার মত পাঠ করিয়া রাখিতে হয়। মহীপতি বাবুর প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে দেওয়ানজীর বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন,—"গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল, এই রকম কিছু হবে। আকড়ার জমীদারবংশই বরাবর এ অঞ্চলের দশখানা গ্রামের মাথা, সমাজপতি।"

মহীপতির গুরুগম্ভীর মুখখানি এই মুখরোচক উত্তরে ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"সাহায্যগুলো বন্ধ ক'রে দেওয়াতে এই সূত্রে দীনে বেটা একটা দল পাকাবার চেষ্টা করছে বোধ হয়?"

শুষ্ককণ্ঠে দেওয়ান বলিলেন,—"হাঁ, এই রকম শুনতে পাচ্ছি বটে।"

"হুঁ! ও এখন কি করে, জান?"

"ছাই করে! এম, এ, পাশ ক'রে এসে কি না ইউল কোম্পানীর পাটের কলে দালালী করছে!"

স্মিতহাস্যে মহীপতি বলিলেন,—"বল কি! দালালী?—আমি মনে করি বা বড় পায়া কিছু পেয়েছে। তা এতে উপায় কি হয়?"

দেওয়ান অবজ্ঞাভরে বলিলেন,—"পাট কলের কায, দুহাতে লুঠ, কাযেই উপায় মন্দ হয় না; কিন্তু হ'লে কি হবে, বাপের যে এক কাঁড়ি দেনা আছে; তাই শুধছে, আর লাইব্রেরীর গর্ত্তে গুঁজছে।"

"বিয়ে করেছে?"

"রাধামাধব! কে বে দেবে বলুন! বাপ নেই, মা নেই, আপনার বলতে কেউ নেই, অথচ এক পাল পুষ্যি আছে।"

"কি রকম? পুষ্যি আবার কারা?"

দেওয়ান তাচ্ছীল্য সহকারে বলিলেন,—"যাদের তিন কুলে কেউ নেই, তারাই ওর পুষ্যি,—এই সব বেওয়ারিশদের নিয়ে ওর একপাল সংসার! তার ওপর গরীবের ঘোড়া রোগ, লাইব্রেরী, অনাথ-আলয়, হরিসভা, এ সব দিকেও দিতে হয় ত।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া মহীপতি বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"ওঃ, দাতাকর্ণের অবতার বটে! হাঁ, ভাল কথা, শুনছিলেম, কয়েক সপ্তাহ ধ'রে রাজবাড়ীর সংস্কার চলেছে, খবর কিছু পেয়েছ?"

দেওয়ান ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "আমি ত এ সম্বন্ধেই কথা কইবার জন্য হুজুরের কাছে এসেছি। হুজুর কি কোন পত্র পান নি?"

আগ্রহের সহিত হুজুর জিজ্ঞাসিলেন,—"কি পত্র?"

দেওয়ান বলিলেন,—"রাজা বাহাদুর আমার পত্রের উত্তরে ওয়ালটিয়ার থেকে লিখেছিলেন যে, বৈশাখমাসে তিনি এখানে এসে পাত্র দেখবেন ও শুভকার্য্যের সমস্ত স্থির করবেন। এ পত্রের কথা আমি জানি। এর পরে আর কোনও পত্র হুজুর পেয়েছেন কি?"

মহীপতি বাবু ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "না, আমি এ সম্বন্ধে আর কোন পত্র পাই নি।"

বিস্ময়ের স্বরে দেওয়ান বলিলেন, "অত ঘটা ক'রে বাড়ী বাগান মেরামত হচ্ছে, রাজা বাহাদুর আসছেন ব'লে শোনাও যাচ্ছে, অথচ হুজুরের কাছে কোন খবরই এল না!"

মহীপতি বাবু বলিলেন,—"আসবার পূর্ব্বেই হয় ত তার করবেন।"

দেওয়ান বলিলেন,—"তাই সম্ভব।"

৪

পরদিনই দেওয়ান খবর আনিলেন,—দেবীপুরের রাজবাড়ীতে রাজা বাহাদুরের পরিবর্ত্তে তাঁহার এক বর্ষীয়ান্ আমলা সকন্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজকন্যা পুরীতে আসিয়া সহসা অসুস্থ হওয়ায় রাজা বাহাদুরের এ যাত্রা আকড়ায় আসা ঘটিল না, জ্যৈষ্ঠমাসের শেষা-শেষি আসিবার সম্ভাবনা আছে।

এই সংবাদে মহীপতি বাবু যতটা হতাশ হইলেন, বিরক্ত হইলেন তদপেক্ষা অনেক বেশী। রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজ-জামাতার গৌরব আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়াই প'ড়িয়াছিলেন।

দিন দুই তিন পরের কথা। সে দিন ছুটীর বার। বেলা-বেলিই মহীপতি বাবুর মজলিস বসিয়াছে। মজলিসে আজ প্রধান আলোচ্য বিষয়—লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র। মহীপতি বাবুর নামে পত্র আসিয়াছে। পত্রে লেখা আছে, পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিকোৎসবে দেবীপুরের স্বনামখ্যাত রাজকবি সভাপতির আসন গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ইত্যাদি।

মহীপতি বাবুর অন্তরঙ্গ পারিষদ্ ভজহরি বলিল,—"আর কেউ হ'লে ত কোন কথা ছিল না, কিন্তু হুজুরেরই ভাবী শ্বশুরের যে অন্নদাস, তাঁরই বাড়ীতে এসে উঠেছে, সে কোন্ ভরসায় এই সভায় সভাপতি হ'তে চলেছে ?"

দেওয়ানজীও এই সভায় আহূত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"উনি কি ক'রে জানবেন বলুন যে, হুজুরের ওপর টেক্কা দিয়েই এ সভা হচ্ছে !"

ভজহরি উত্তর দিল,—"তার জানা উচিত ছিল না ? হুজুরের কাছে এক দিন আসাও ত তার উচিত ছিল।"

মহীপতি বলিলেন,—"দেবীপুরের এক আমলাই ত এখানে এসেছে, এই রকম শুনেছিলাম। এখন সেই আমলা রাজকবি হয়ে গেল, ব্যাপার কি, দেওয়ানজী ?"

দেওয়ান বলিলেন,–"উনি আগে আমলাই ছিলেন, এখন অবসর নিয়ে, মধ্যে মধ্যে রাজাকে বইটা আসটা পড়িয়ে শোনান, কবিতা ছড়াটা লেখবারও ক্ষমতা আছে। রাজা ভালবেসে রাজকবি উপাধি দিয়েছেন। এই রকম শুনেছি।"

মহীপতি বলিলেন,—"লাইব্রেরীওলারা এর পাত্তা পেলে কি ক'রে ?"

দেওয়ান উত্তর করিলেন,—"লোকটার পড়াশুনার ভারি বাতিক, লাইব্রেরীতে বইটা আসটা খুঁজতে গিয়েছিল, তাইতে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে থাকবে। তবে বৃদ্ধটি খুব সদালাপী ব'লে শুনেছি।"

ভজহরি বলিল,—"কিন্তু হুজুর, এ আমি বলে রাখছি, যে কোনও রকমেই হোক সভায় যোগ দিতে যদি ওকে না রোখেন, তখন কিন্তু পস্তাতে হবে ! কাঙ্গালের কথা বাসী হ'লে তখন হুজুরের মনে ধরবে।"

এই সময় সহসা পেস্কার শশব্যস্তে মজলিসে আসিয়া সংবাদ দিল,—"দেবীপুরের রাজবাড়ী থেকে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসেছেন, হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চান।"

অমনই মজলিস-ভবন আচম্বিতে স্তব্ধ হইল। সকলেই কৌতূহলভরে প্রভুর দিকে চাহিল। মহীপতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা, আসতে বল।"

দেওয়ান বলিলেন,—"আমি এগিয়ে গিয়ে আনব কি ?"

উপেক্ষার সহিত মহীপতি বলিলেন,—"কে এমন মাতব্বর আসছেন যে অত খাতির ক'রে আনতে হবে ? চাকর চাকরের মতই আসবে,দেখা করবার হুকুম দিয়েছি,এই তার পক্ষে যথেষ্ট। লাইব্রেরীওলাদের কাছে সে রাজকবি হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে—"

সহসা স্বর রুদ্ধ হইল, মহীপতি দ্বারের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন,—এক দীর্ঘদেহ দীর্ঘশ্মশ্রু ঋষিতুল্য বর্ষীয়ান্ পুরুষ এক অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীর হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেছেন।

বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদের উদ্দেশ্যে ডান হাতখানি তুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তরুণী দুই হাত যুক্ত করিয়া মস্তকে ধরিলেন। দেওয়ানজী সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"আসুন, আসুন।"

বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"কদিন হ'ল এসেছি, কিন্তু হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আর সুযোগ হয়ে ওঠে নি। আজ ভাবলেম, একবার পরিচয়টা ক'রে আসি। মেয়েটিও ছাড়লে না, বললে, বাবা ! রাজাবাবুর ভাবী জামাই বাবুকে আমিও দেখে আসব, তাই সঙ্গে এনেছি। হুজুরের সব কুশল ত ?"

হুজুরের মনোরাজ্যে এতক্ষণ বিষম গোলযোগ বাধিয়াছিল,—এই বৃদ্ধের উদ্দেশে সঞ্চিত শাণিত অস্ত্রগুলি বৃদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অথবা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী লজ্জাসঙ্কোচশূন্যা তরুণীর অসামান্য রূপলাবণ্যের ধাঁধায় এতক্ষণ বুঝি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধের কথায় তাঁহার আভিজাত্যের স্পন্দন এতক্ষণে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। তিনি চিন্তার খেই হারাইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"রাজা বাহাদুরের খবর কি ? তিনি এখন কোথায় ?"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ স্মিতবদনে বলিলেন,—"পুরীতেই এখন তাঁরা আছেন। রাজকন্যা অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। শীঘ্রই এখানে আসবেন।"

মহীপতির মনে এখন এই সমস্যা প্রবলভাবে গোল তুলিয়াছে—বৃদ্ধকে কি ভাবে সম্বোধন করিবেন ! আপনি বলিয়া তাহাকে মর্য্যাদা দিবেন, কিম্বা তুমি বলিবেন ? বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্যময় ব্যক্তিত্ব ও সুন্দরী তরুণীর পিতৃত্ব তাঁহাকে সম্মান দিতেই চাহিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণে আভিজাত্যের দিক দিয়া এই আমলাস্থানীয় নগণ্য মানুষটিকে সম্মানজনক ভাষায় সম্বোধন করিতে তাঁহার দ্বিধা হইতেছিল।

সহসা তরুণী বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা, দেখা ত হ'ল, কথাও হ'ল ; চলুন, আমরা বাড়ী যাই। আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকব ?"

দেওয়ান এবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রভুর হুকুম না হইলে অভ্যাগতকে প্রভুর সমক্ষে বসিতে বলিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। তিনি হুজুরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি অতি দীনভাবে পাতিলেন।

হুজুরের সম্মুখে ও আশে-পাশে অনেকগুলি সোফা খালি ছিল। একখানি সোফার দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া, তরুণীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি বসুন না।"

তরুণী শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"এ বুঝি হুজুরের আকড়াই ভব্যতা ! বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন, আর আমাকে বসতে বললেন। আমার প্রতি হুজুরের এতটা অনুগ্রহের কারণটা কি শুনি ?"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মহীপতি উত্তর দিলেন,—"কারণ এই, আপনি ভদ্রমহিলা, আপনার সম্মান আগে।"

দৃপ্তস্বরে তরুণী বলিলেন,–"অভ্যাগতের সম্মান তারও আগে। হিন্দুর ধর্ম্ম এই বলে যে, অভ্যাগত বাড়ীতে এলে তখনই তাকে বসতে আসন দিতে হয়, নতুবা গৃহস্বামীর পিতৃপুরুষ এসে মাথা পেতে দেন। হুজুর হয় ত এ সব মানেন না ?"

তরকারি অতি সুপাচ্য ও উপাদেয় হইলে, তীব্র ঝালের জন্য যেমন তাহা পরিত্যক্ত হয় না,—লালানিঃসারিতমুখে ভোক্তা তাহার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে থাকে, এই তিক্তভাষিণী সুন্দরী তরুণীর মুখের তীব্র বাণীও বোধ হয়, আজ

মহীপতিবাবুর নিকট তেমনই উপভোগ্য হইল। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধকে সম্ভাষণ করিলেন,—"বসুন নায়েব মশাই, কিছু মনে করবেন না।"

বৃদ্ধ হাসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তরুণীও পিতার পার্শে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এ যেন আমাদের জোর ক'রে হুজুরের কাছে আসন আদায় ক'রে নেওয়া হ'ল।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"আমার মেয়েটি কিছু প্রগল্‌ভা; দেবীপুরের রাজকন্যার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থেকে এমনই হয়েছে। হুজুর অবশ্য কিছু মনে করবেন না।"

মহীপতি বলিলেন,—"ইনি বুঝি খুব লেখাপড়া শিখেছেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"লেখাপড়া রীতিমত শিখেছেন রাজকন্যা; তবে মা আমার সদাসর্ব্বদা সঙ্গে থাকতেন কি না, কিছু কিছু শিক্ষা করেছেন।"

ভজহরি এই সময় গলাটা একটু ঝাড়িয়া বলিল,—"আপনি লাইব্রেরীর সভাপতি হয়েছেন না?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—"পাকে চক্রে হ'তে হয়েছে বটে। আমার অপরাধ, আমি এখানে এসে লাইব্রেরী থেকে খানকতক বিলিতী কেতাব পড়বার জন্য আনাই। তাইতেই এঁরা আমার বিশ্বে ধ'রে ফেলে একবারে সভাদিগ্‌গজ ক'রে তুলেছেন আর কি!"

ভজহরি বলিল,—"কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, আমাদের হুজুরের ঐ বওয়াটে দলের সঙ্গে কোনও সংস্রব নেই,—এমন কি, হুজুর চাঁদা দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছেন!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বটে! কিন্তু লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আর উদ্যোক্তাদের উদ্যম দেখে লাইব্রেরীর ওপর আমার ত বেশ শ্রদ্ধাই হয়েছিল,—বিশেষ যখন দেবীপুরের রাজাই এই লাইব্রেরীর বিল্ডিং তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন।"

ভজহরি এবার উষ্ণ হইয়া বলিল,—"তাইতেই ত ওখানে ছুঁচোর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে মশাই! দেবীপুরের রাজার টাকায় লাইব্রেরী তৈরী হয়েছে বললেন না, কিন্তু এখন লাইব্রেরীর পাণ্ডারা রাজার ভাবী জামাইকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না।"

মহীপতি বলিলেন,—"আমার মনে হয়, আপনি এর মধ্যে না গেলেই ভাল।"

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একবার কন্যার দিকে চাহিলেন মাত্র। কন্যা অসঙ্কোচে মহীপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, বলুন ত?"

বোধ হয়, সুন্দরীর কণ্ঠস্বরে একটু জ্বালা ছিল।

মহীপতি স্তব্ধ হইলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের উপর কেহ এরূপ দৃপ্ত স্বরে প্রশ্ন তুলিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু আজ তাঁহার মস্তিষ্কে বিষম গোলযোগ বাধিয়াছিল, আভিজাত্যের দৃঢ়তা পদে পদে শিথিল হইতেছিল। তিনি তরুণীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"সাধারণের সংস্রবে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।"

তরুণী হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু হুজুর ত জানেন, আমরাও সাধারণের সামিল। আবার বাবা দেবীপুররাজের সামান্য এক নায়েব মশাই, হুজুরও তা জেনেছেন; কিন্তু সাধারণে তাঁকে রাজকবি ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছে, বাবা তাদের কি ক'রে ত্যাগ করবেন বলুন?"

মহীপতি বলিলেন,—"বেশ, তা হ'লে ওদের নিয়েই থাকুন। আমার এখানে আসবার ত কোন প্রয়োজন ছিল না, আর আমি আসবার জন্য আমন্ত্রণও করি নি—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, না, সে কি কথা, হুজুর! আপনি রুষ্ট হ'লে আমাদের ত মঙ্গল নেই। তবে কি করি বলুন, কথাটা দিয়ে ফেলেছি; আর এ সব অতি তুচ্ছ বিষয়, হুজুরের উপেক্ষা করাই উচিত।"

এই সময় সদর-নায়েব আসিয়া হুজুরকে রীতিমত অভিবাদন করিয়া বলিল,—"হুজুর, এক জন মাতব্বর প্রজা বিশেষ প্রয়োজনে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

এইবার হুজুরের আভিজাত্যের দ্যুতি অকস্মাৎ বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "মাতব্বর প্রজা,—কত টাকার জমা রাখে?"

সদর-নায়েব সবিনয়ে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, পঞ্চাশ টাকা।"

তাচ্ছীল্যসহকারে হুজুর বলিলেন,—"পঞ্চাশ টাকার মাতব্বর প্রজা আকড়ার জমীদারের সামনে এসে দাঁড়াতে চায়! স্পর্দ্ধা ত কম নয়।"

সদর নায়েব গাঢ়স্বরে বলিল,—"হুজুর, তার বিশেষ দরকার।"

হুঙ্কার দিয়া হুজুর বলিলেন,—"দরখাস্ত করতে বল, দেখা হবে না; যাও।"

নতদৃষ্টি হইয়া নায়েব বাহির হইয়া গেল। এইরূপ বীরত্ব প্রকাশের পর মহীপতি বাবুর দুই চক্ষু তরুণীর উপর পড়িল। তরুণীর দীর্ঘায়ত নয়নযুগল হইতে তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছিল।

সুন্দরীর স্ফুরিত অধরপথে সহসা ধীরে ধীরে উচ্চারিত হইল,—"পঞ্চাশ টাকার প্রজা হুজুরের কাছে আমোল পেলে না, কিন্তু এক টাকার প্রজাও দেবীপুরের রাজার সামনে আসতে বাধা পায় না।"

মহীপতির সর্ব্বশরীরে কে যেন উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিল। তিনি এবার তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিলেন,—"হ'তে পারে, কিন্তু ব্যবস্থা সবার সমান নয়। ভগবান্ যাকে ছোট ক'রে জগতে পাঠিয়েছেন, তাকে সেইভাবেই দাবিয়ে রাখাই হচ্ছে শক্তিমানের কায।"

তরুণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"মাপ করবেন, হুজুর। এই ছোটই যদি হঠাৎ শক্তিমান হয়ে মাথা তুলে জগতের সামনে দাঁড়ায়, তা হ'লে তাকে দাবিয়ে রাখা কার কায হবে হুজুর!"

ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হুজুর উত্তর দিলেন,—"আমাদের মত শক্তিমান জমীদাররাই তখন পয়জার মেরে তাদের শায়েস্তা করবে।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—"হুজুর বনেদীবংশের জমীদার কি না, তাই আভিজাত্যের তত্ত্বটুকু উত্তমরূপেই আয়ত্ত করেছেন।"

মহীপতি গর্ব্বভরে বলিলেন,—"ছেলেবেলা থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়ে আসছি। আমি যখন স্কুলে যেতেম, আমার জন্য আলাদা চেয়ার থাকত, দুজন বরকন্দাজ আমার পেছনে খাড়া থাকত—"

তরুণীর আননে মৃদু হাস্যরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অস্ফুট স্বরে যেন আত্মগতভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—"জোড়া বরকন্দাজ!

পাছে কেউ কাণ ম'লে দেয়, এই ভয়ে বুঝি ? ওঃ,—এই নিয়েই বুঝি দীননাথ বাবুর সঙ্গে হুজুরের মনকষাকষি ?"

আর যায় কোথায় ? একটি বিস্ফোরক বোমা যেন সশব্দে বিদীর্ণ হইল। মর্ম্মর-টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া মহীপতি বাবু হাঁকিলেন,—'দরোয়ান !' ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হইলে তিনি এমনই ভীষণ হইতেন।

তরুণীর সমগ্র আননে তখন হাসির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"থামুন, থামুন, দরোয়ান ডাকতে হবে না, আমরা চোর-ডাকাত বা মেয়ে-বোম্বেটে নই। আমরা আপনার সঙ্গে লড়াই করব না নিশ্চয় ! আপনি শান্ত হ'ন, আমরা বিদায় নিচ্ছি, চলুন বাবা !"

বৃদ্ধও উঠিয়া তরুণীর হাত ধরিলেন, যাইবার সময় দ্বারপ্রান্ত হইতে তরুণী পুনরায় সেই দুষ্টুমীর তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, —"কিন্তু লাইব্রেরীর মিটিংএ যোগ দিতে ভুলবেন না যেন !"

সকলের স্তব্ধ দৃষ্টি সেই দিকে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

৫

কোন একটা বিশিষ্ট লগ্নে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় আকড়া লাইব্রেরীর সাধারণ সভায় প্রবন্ধ পড়িতে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় তরুণ লেখকের প্রবন্ধ যে সঙ্গে সঙ্গে প্রমাদ উপস্থিত করিবে, কেহই এ কথা কল্পনাও করে নাই। সভাভঙ্গের পর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই গ্রামময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সভায় শ্রোতার সংখ্যা ছিল দুই তিন শত, কিন্তু আন্দোলনের কল্যাণে দুই তিন হাজার লোকের মধ্যে প্রবন্ধের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

দীননাথের প্রবন্ধের মর্ম্ম এই যে,—দেশের যে সব লোক আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহারাই প্রকৃত বড়লোক। আর যে সব ধনবান্ লোকের পুত্রগণ পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়া নবাবীর চূড়ান্ত করিয়া থাকে, তাহারা কখনই বড়লোক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ হইলে যেমন সে পিতার পাণ্ডিত্যের দাবী করিতে পারে না, তদ্রূপ ধনাঢ্য পিতার অক্ষম নির্গুণ পুত্র কখনই বড়লোক-পদবাচ্য হইতে পারে না।

ফলে দীননাথের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। এক দল বলিল,—অতি সত্য কথাই বলা হয়েছে। অপর দল বলিল,—পুরো বলশেভিক আইডিয়া নিয়ে বড়লোকদের খর্ব্ব করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্য দীননাথ বেচারী স্বাভাবিক ভাবপ্রেরণায় এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই যে, প্রবলপ্রতাপ জমীদার মহীপতি মুখুজ্জ্যে তাঁহার দীন প্রবন্ধের আলোচনার বস্তু হইবেন। কিন্তু যখন তাঁহারই গুণমুগ্ধ হিতৈষি-গণ অপরূপ টীকা-টিপ্পনীর সহায়তায় মহীপতি বাবুকেই প্রবন্ধের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল, পক্ষান্তরে, জমীদার বাবুর অনুগৃহীত ভক্তবৃন্দ এই তিলবৎ ব্যাপারটিকে তালে পরিণত করিয়া একটা প্রকাণ্ড ঘোঁট পাকাইয়া তুলিতেছিল, তখন দীননাথকে যুগপৎ চমৎকৃত ও চমকিত হইতে হইল। মহীপতির প্রকৃতি দীননাথ বাল্যকাল হইতেই ভালরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি স্থির বুঝিলেন যে, এইবার তাঁহার কাঠোর পরীক্ষা উপস্থিত।

দীননাথের প্রকৃতিটি ঠিক স্বাভাবিক ও সাধারণ ধাতুতে গঠিত হয় নাই। এই সদানন্দ সদাপ্রসন্ন নির্ম্মল-হৃদয় সুস্থ সবল মানুষটির মনের মধ্যে কোনও অশান্তিকর বিক্ষোভ ক্ষণমাত্রও স্থান পাইত না। সংসারে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচ এমন এক এক জন মানুষ দেখা যায়, যাহার ডিক্রীতেও উল্লাস নাই, ডিসমিসেও দুঃখ নাই ! দীননাথ ঠিক এই প্রকৃতির মানুষ। ঘোর দুর্দ্দিনে বিপদ বা অভাবের সময়ও তাঁহার স্বাভাবিক সদা-প্রফুল্ল ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। যখন দীননাথ বুঝিলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না ; তখন এ সম্বন্ধে যাহা কিছু চিন্তা, সমস্তই ভবিতব্যের উপর সর্ব্বান্তঃ-করণে সমর্পণ করিয়া মুক্তপ্রাণে আপনার কার্য্যে লিপ্ত হইলেন।

মহীপতিবাবু পুরুষানুক্রমে জমীদার এবং বড়লোক। দীননাথ চট্টোপাধ্যায় যে প্রবন্ধে ইঁহাকেই আক্রমণ করিয়াছে, দশের ও দেশের নিকট হুজুরকে হেয় করিবার জন্যই যে এই রচনা, এ কথা তাঁহার স্তাবকবৃন্দ তাঁহাকে বিধিমতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে। গ্রামের জমীদার, সমাজের মাথা, তাঁহাকে লইয়া মস্করা ? কলমবাজী ?

ভজহরি বিজ্ঞের মত ভণিতা করিয়া বলিল,—"সেই আগেই বলেছিলেম বুড়োকে রুখতে ! হুজুর তখন গা করলেন না,—বুড়োর বেহায়া মদ্দা মেয়ের পাকা পাকা কথা শুনেই চেপে গেলেন !"

মহীপতি বলিলেন,—"বুড়োকে রুখলে কি এমন গঙ্গামণ্ডপ রক্ষা হত শুনি ?"

ভজহরি বলিল, "হুজুর ত মিটিং দেখতে যান নি, বুঝবেন কি বলুন ? দীননাথ যেই প্রবন্ধ পড়তে আরম্ভ করলে, তখন কি হাততালির ধূম ! আর হুজুরের নাম নিয়ে চারিদিক থেকে কি 'সেম্-সেম্' ধিক্কার ! আমি দেখেছি, হুজুর, ঐ বুড়ো বেটা মুখ টিপে টিপে হেসে দাড়ী দুলিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে দুলালী মেয়ের সঙ্গে কথা কইছে। আর মেয়ের মুখেও সেই দুষ্টুমীর হাসি ! বাপে-ঝিয়ে যে খুব খুসী হয়েছে, তা দেখেই বেশ বুঝা গিয়েছিল। হুজুর যদি তখন রুখতেন, এতটা হ'ত না, হয় ত মিটিংই বসত না।"

মহীপতির মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। ভজহরির দিকে তাকাইয়া উদাসভাবে বলিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে, তা নিয়ে অনুতাপ ক'রে এখন কোনও লাভ নেই। এর প্রতীকারের ব্যবস্থা করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য।"

ভজহরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"নিশ্চয় ; এর এমন প্রতীকার করতে হবে হুজুর, যাতে সমস্ত গ্রাম টিট হয়ে যায়। জমীদারের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করার কি পরিণাম, সেটা সকলকেই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।"

মহীপতি সহসা সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, বুড়ো আমার সম্বন্ধে ইঙ্গিতে আভাসে কিছু বলেছে ?"

ভজহরি বিকৃত মুখে বলিয়া উঠিল,—"রামঃ ! বুড়োকে তেমনই কাঁচা লোক ঠাওরেছেন কি না ! ভাঙ্গে ত মচকায় না। দীননাথ যখন প্রবন্ধ পড়ে, তখন বাপে-ঝিয়ে কি হাসি ! কিন্তু বুড়ো শেষকালে নিজে বক্তৃতা করতে উঠে, এ সবের ধার

দিয়েও গেল না। লেখা পড়া, মেয়েদের শিক্ষা, পল্লীসমাজের কথা, দেশের কথা এই সব কত কি আবল-তাবল ব'কে গেল,—কিন্তু দীনোর প্রবন্ধের দিক দিয়ে ভুলেও একটি কথা বলে নি, এটা সত্যি। হাঁ,—শেষকালে বুড়ো একটি কথা হুজুরের সম্বন্ধে বলেছিল যে, গ্রামের জমীদার এ উৎসবে যোগ দিলে উৎসবটি পরিপূর্ণ হত। কিন্তু তখনই হুজুর চারদিক থেকে আবার সেই সেম্-সেম শব্দ উঠে বুড়োর মুখ বন্ধ ক'রে দিলে।

মহীপতিবাবুর মুখচন্দ্রিমায় প্রসন্নতার ঈষৎ আলোকপাত হইতে না হইতে শেষোক্ত সংবাদে আবার তাহার উপর অন্ধকারের গাঢ় প্রলেপ পড়িয়া গেল।

ঠিক এই সময় দেওয়ান মহাশয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহীপতি ও ভজহরি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন, দেওয়ানের পশ্চাতেই বৃদ্ধ রাজকবি, পার্শ্বে সে দিনের সেই প্রগল্‌ভা তরুণী!

মহীপতির অন্ধকারময় মুখমণ্ডলে একবার বিজলী চমকিল।

তরুণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—"আজ বোধ হয় আর বসবার জন্ত হুজুরের অনুমতির অপেক্ষা করতে হবে না; আসুন বাবা, বসি।"

তরুণী ক্ষিপ্রহস্তে মহীপতির টেবলের সম্মুখস্থ একখানি সোফা পিতার দিকে ঠেলিয়া দিয়া, আর একখানি সোফায় স্বচ্ছন্দে বসিয়া পড়িলেন।

অর্থপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষে মহীপতি দেওয়ানের দিকে চাহিলেন।

তরুণী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মহীপতির দিকে তাকাইয়া স্মিত-হাস্যে বলিলেন, "ওঁর কোন অপরাধ নেই, বিনা এত্তেলায় উনি আমাদের আনতেই চান নি, আমিই এক রকম জোর ক'রে ওঁকে আমাদের এখানে আনতে বাধ্য করেছি। সুতরাং এর যা শাস্তি, তা আমরাই বহন করতে প্রস্তুত আছি।"

মহীপতি রাজকবির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি মনে ক'রে এখানে আপনাদের আগমন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, যে কোন কারণেই হোক, হুজুরের কাছে আমি অপরাধী হয়েছি, আর হুজুরও আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর এই অপ্রীতিকর অবস্থার কারণ হচ্ছে সে দিনের মিটিং। আমার ঐ মিটিংএ যোগ না দেওয়াই উচিত ছিল। শুনতে পাচ্ছি, দীননাথ বাবুর উপরও হুজুর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন আমার এই প্রার্থনা, হুজুর দয়া ক'রে এর একটা মীমাংসা ক'রে দেন,—যাতে রাজা-প্রজার এ ঝগড়া না বাড়বার ফুরসৎ পায়—একটা মিটমাট হয়ে যায়।"

ভজহরি তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হুঁ, বটে, গোড়া কেটে এখন আগায় জল!"

মহীপতি একবার ভজহরির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া তৎপর বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এর আবার মিটমাট কি? কয়েকটা কুকুর আমার দিকে তাকিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছে,—সেই কুকুরদের সায়েস্তা করবার মত চাবুক আমার আছে, আর চাবুক হাঁকাবার চাকরেরও অভাবও নেই।"

তরুণী হাসিয়া বলিলেন,—"তা ব'লে দেখবেন হুজুর, যেন আমাদের ওপরেই চাবুক হাঁকরাবেন না!"

মহীপতি তরুণীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া পরক্ষণে বৃদ্ধের মুখের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার এ মেয়েটি ত খুব বেপরোয়া দেখছি! এঁর নামটা কি শুনি?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"ওর নাম ত ছিল্ল কল্যাণী, কিন্তু রাজা বাহাদুর আদর ক'রে ওর নাম দিয়েছেন—'রাজকন্তে'।"

ভজহরি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বটে?—কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন!"

তরুণীর উপর ভজহরি খুবই চটিয়াছিল, কাযেই সুযোগ পাইয়া এই অশোভন টিপন্নী প্রয়োগের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না।

তরুণীর আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সংযত স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক বলেছেন আপনি, যেমন এই আকড়ার মত একটা জমীদারীর মালিকের নাম মহীপতি, আর তাঁরই স্তুতিবাদকের নাম ভজহরি,—তেমনই তুচ্ছ এক নায়েব-কন্তার নামও—রাজকন্তে!"

মহীপতির মুখ আবার অন্ধকার হইল, দেওয়ান মুখ টিপিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলেন। ভজহরি মুখ ফিরাইয়া বসিল। এই স্পষ্টবাদিনী মুখরা মেয়েটির ভয়ডরহীন তীক্ষ্ণ কথাগুলি এ-হেন দৃঢ়চেতা দাম্ভিক জমীদারের গাম্ভীর্য্যময় মজলিসের বিশাল বক্ষ যেন ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

রাজকন্যা শান্তভাবে বলিলেন,—"বাবা, তা হ'লে চলুন আমরা যাই; হুজুর ত মিটমাট করবেন না, উনি ত চাবুক দেখিয়ে দিলেন।"

উত্তেজিতভাবে এবার মহীপতি বলিয়া উঠিলেন,—"মিট-মাটের জন্ত তোমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? আর মেয়ে-মানুষ হয়ে তুমিই বা এর মধ্যে কেন মাথা দিতে এসেছ শুনি? তোমাদের ব্যবহার আমাকে স্তম্ভিত করেছে।"

আবার সেই দুষ্টামীর হাসির সঙ্গে রাজকন্যা বলিলেন,—"দীননাথ বাবুর লেখার চেয়েও?"

সরোষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত টেবলের উপর চাপিয়া ধরিয়া মহীপতি বাবু বলিলেন,—"সেই কুকুরটাকে তিন দিনের মধ্যে আমি মুগুর দিয়ে চূর্ণ করব।"

রাজকন্যা উভয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"এবার মুগুর? চাবুকে বুঝি সুবিধা হ'ল না! এখন আপনার আর দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে যে বাকি আছে। শুনবেন কি?"

মহীপতি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বলতে পার।"

রাজকন্যা বলিলেন,—"বাবা সেই মিটিংএর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন কি না, মিটিংএর ফলে কোন কিছু গোলযোগ উঠলে, সভাপতিরই উচিত তার মিটমাট ক'রে দেওয়া; তাইতেই বাবার এত মাথাব্যথা, শুনলেন? আর আমার সম্বন্ধে যা বল্লেন, তারও উত্তর দিচ্ছি;—বড়লোকের খর মেজাজের বিরুদ্ধে গরীবের একটা মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে দেখে, সেই মূল্যবান্ মাথাটাকে বাঁচাবার জন্ত মেয়েমানুষকে মাথা দিতে হয়েছে।"

মহীপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"হুঁ!" তাহার পর কয়েক

মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন,—"আমি রাজাকে আপনাদের এই অনধিকারচর্চ্চার কথা জানাব।"

হাসিয়া রাজকন্যা বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে। না হয়, রাজা আমাদের মাসোহারা বন্ধ ক'রে দেবেন, এই ত ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"দোহাই হুজুর, অমন কাবটি করবেন না; এ ক্ষেপা মেয়ের কথায় উষ্ণ হয়ে আপনি যেন এই বৃদ্ধকে শেষবয়সে পথে বসাবেন না। কি করছ, কি বলছ তুমি মা, এত বুদ্ধিমতী হয়ে ?"

নতমুখে রাজকন্যা বলিলেন,—"আচ্ছা বাবা, আর আমি কিছু বলব না। আমার ঘাট হয়েছে।"

এই সময় পেস্কার শশব্যস্তে আসিয়া সংবাদ দিল, মিলের খোদ ম্যানেজার দেখা করিতে আসিয়াছেন।

তাঁহাকে আনিবার হুকুম দিয়া মহীপতি বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"বসুন একটু; এখনই দেখবেন যে, ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতায় যে ক্ষমতাবান্, তার পক্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চূর্ণ করবার সুযোগ আপনিই এসে যায়।"

এক প্রবীণবয়স্ক ইংরাজ দ্বারদেশ হইতে বলিলেন,—"ভিতরে যেতে পারি, স্যার ?"

আসিবার আদেশ দিয়া মহীপতি হাত বাড়াইয়া দিলেন। করমর্দ্দন পালা সাঙ্গ করিয়া আগন্তুক আসন গ্রহণ করিলেন।

মহীপতি বাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ইংরাজ ম্যানেজারের দিকে চাহিলেন।

তিনি একখানি মুসাবিদা বাহির করিয়া জমীদার বাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন,—"ড্রাফ্‌ট তৈরী হয়ে গেছে, এখন স্যার মঞ্জুর করলেই দলিলে চড়িয়ে রেজেষ্টারী হবে।"

মুসাবিদাখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া মহীপতি বাবু বলিলেন, "দেখুন মিষ্টার হুইলার, আমার আর কোন আপত্তি এতে নেই, মিল বাড়াবার জন্য যখন আপনাদের জমীর দরকার এবং আপনারা তার উপযুক্ত নজরানা ও খাজনা দিতে প্রস্তুত, তখন এতে আর কথা কি ? কিন্তু শুধু একটি সর্ত্ত আপনাকে এই ড্রাফ্‌টে সংযোগ করতে হবে।"

উৎকণ্ঠিতভাবে ম্যানেজার বলিলেন,—"সে সর্ত্তটি কি ?"

মহীপতি বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না, বলছি। আচ্ছা, মিষ্টার হুইলার, আপনাদের মিলে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় ব'লে একটা ছোকরা চাকরী করে না,—জুট ডিপার্টমেণ্টে ?"

ম্যানেজার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—জুট ডিপার্টমেণ্ট—দীননাথ,—চাকরী,—ওহোহো— হয়েছে, জুটমার্চ্চেণ্ট দীননাথবাবু! তিনি কি এই নগরেরই অধিবাসী নন ?"

মহীপতি বলিলেন, "হাঁ, এইখানেই তার বাড়ী।"

ম্যানেজার উল্লাসভরে বলিলেন, "হাঁ, তাঁকে খুব জানি, তবে তিনি আমাদের মিলে ত চাকরী করেন না, জুট সাপ্লাই করেন। এই একমাত্র বাঙ্গালী জুট মার্চ্চেণ্টের সংস্রব এখনও আমাদের মিলে আছে।"

মহীপতি বলিলেন,—"আপনি কি এ খবর রাখেন মিষ্টার হুইলার, যে, এই ব্যক্তি আপনাদের মিল থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণ টাকা উপরী উপায় করে,—অর্থাৎ চুরী করে ?"

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ম্যানেজার বলিয়া উঠিলেন, "চুরী করে ? বাবু দীননাথ ? এ হতেই পারে না স্যার, আপনি ভুল সংবাদ শুনে থাকবেন। আপনি বোধ হয় জানেন না স্যার, এ পর্য্যন্ত যে কোন সূত্রেই হোক, মিলের সংস্রবে যারা এসেছেন, এই দীননাথ তাঁদের মধ্যে একমাত্র সাধু ব্যক্তি। তাই আমাদের আফিসে এঁর নাম রটেছে—সাধু দীননাথ। আমাদের ডাইরেক্টররা বাঙ্গালী পাটওয়ালাদের কাছ থেকে পাট নেওয়া একদম বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। তার কারণ, এঁরা মিলের জুটবাবু ও জুটের খেতাঙ্গদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে পুকুর চুরী করতেন,—তাইতে এখন দেশী পাটওয়ালারা সস্তায় দিলেও, তাদের পাট নেবার হুকুম নেই। শুধু এই দীননাথ বাবু এখন পর্য্যন্ত সম্মানের সঙ্গে টেঁকে আছেন।"

মহীপতি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ যে চুরী করছে না, তার সম্বন্ধে তদন্ত আপনারা কিছু করেছেন ?"

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন, "আপনি স্যার, জমীদার, আপনার কর্ম্মচারীদের কোথায় কোন্‌খানে কি ভাবে গলদ হবার সম্ভাবনা, তা যেমন আপনি জানেন,—আমিও তেমনই মিলের ম্যানেজার, সব ডিপার্টমেণ্টে আমাকে চোখ রাখতে হয়। মিলে যে চুরী হয় না, তা আমি বলছি না,—প্রতি হপ্তায় এত চুরী হয় যে, তা বলবার কথা নয়,—কিন্তু সহসা সে সব চুরীর পথ বন্ধ করবার উপায় নেই,— তবে আমাদেরও চোখ ফুটেছে, আস্তে আস্তে সবই আয়ত্তে হয়ে যাবে। এখন আমাদের সমস্ত চোখ জুটের দিকেই পড়েছে, কেন না, মোটা মোটা চুরী হ'ত এইখানে। দীননাথবাবুর কথাবার্ত্তা শুনে ও চালচলনে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাঁকে বাহাল রেখেছিলেম বটে, কিন্তু পেছনে গোয়েন্দা রাখতে কসুর করি নি। অনেক সময় গোয়েন্দাদের নিয়ে খুব কৌশলে আমি পরীক্ষাও করেছি, হাজার হাজার টাকা এক এক চালানে উপায় হবার প্রলোভন দেখিয়েছি, কিন্তু ঐ বাবু কিছুতেই টলে নি। আমি ওকে মনুষ্যসমাজের গৌরব ব'লে শ্রদ্ধা করি।"

ম্যানেজারের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মহীপতির মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যাহাকে তিনি কীটের ন্যায় পদদলিত করিতে উদ্যত, সেই অধমকেই কি না এই ইংরাজ দেবতার আসনে বসাইয়া তাহার প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ! বিরক্তির সুরে মহীপতি বলিলেন, "আপনি এখন অনুগ্রহ ক'রে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন। আমার এত সব শোনবার বিশেষ অবসর নাই। এখন আমার সর্ত্তের কথা শুনুন। এই দীননাথ চ্যাটার্জ্জীকে আপনারা কখনও আপনাদের মিলের সংস্রবে রাখতে পারবেন না, আর তার স্থলে আমার এই লোক, ভজহরি ভট্টাচার্য্য আপনাদের জুট সাপ্লাই করবে, এই হচ্ছে আমার নূতন সর্ত্ত।"

বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে ম্যানেজার কিছুক্ষণ মহীপতিবাবুর দিকে চাহিয়া তাহার পর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "আপনি কি পরিহাস করছেন স্যার।"

মহীপতিবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "জমীদার কখনও প্রজার সহিত পরিহাস করেন না।"

ইংরাজ ম্যানেজার কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আপনি কি আমাকে এই আদেশ করতে চান যে, আপনাদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের ফলে, আপনার স্বার্থকে পরিপুষ্ট করবার জন্য, আমি আমার এত বড় একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিকে অন্যায়ভাবে চূর্ণ করি ?"

মহীপতি স্থির সংযত স্বরে বলিলেন, "সে আপনি বুঝবেন। আমার কথা এই যে, যদি আমার জমী নেওয়া আপনারা একান্ত প্রয়োজন ব'লে মনে করেন, আমার সর্ত্ত আপনাদের মানতেই হবে।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "কিন্তু এই বাবুকে ত আমি চিনি না। এঁকে—"

বাধা দিয়া মহীপতিবাবু বলিলেন, "আপনি আমাকে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেন—আপনাদের দীননাথ বাবুর চেয়েও ?"

ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, "তুলনার কথা ত হচ্ছে না, স্যার, আপনি জমীদার, আপনাকে অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি।"

মহীপতি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে এই ভজহরি ভট্টাচার্য্যকেও আপনি বিশ্বাস করবেন। এ আমার লোক, এর জন্য আমি দায়ী।"

ম্যানেজার বলিলেন, "উত্তম। কিন্তু স্যারকে এর জন্য জামীননামা লিখে দিতে হবে।"

মহীপতি বলিলেন, "তাই হবে।"

ম্যানেজার উঠিলেন। যাইবার সময় গাঢ়স্বরে বলিয়া গেলেন, "আমরা সাগর পার হয়ে এ দেশে রোজগার করতে এসেছি; কোম্পানীর স্বার্থ দেখতে আমরা আগে বাধ্য। কোম্পানীর স্বার্থের অনুরোধেই আমাকে এমন অন্যায় কায করতে হ'ল। কম্পিতকরে এ কথা আমাকে লিখে দীননাথকে পাঠাতে হবে। তার এত বড় একটা আয়ের পথ সহসা রুদ্ধ হয়ে গেল! কিন্তু এর জন্য দায়ী আমি নই, দায়ী তার দেশবাসী ভাই। ঈশ্বর তা বুঝেছেন। কিন্তু স্যার, আপনাকে ব'লে যাচ্ছি আমি, চল্লিশ বছর পাটকল চালিয়ে অনেক দেখেছি, আর দেখে শিখেছি,—অন্যায় কখনও ন্যায়কে জোর ক'রে দাবিয়ে রাখতে পারে না। সাধু দীননাথকে আপনি এ ভাবে দাবাতে পারবেন না, বরং সেই এক দিন আপনাকে দাবাবে।"

সে দিন আর মজলিস জমিল না। সকলে বৃদ্ধ যখন বিদায় লইয়া উঠিয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবারও স্পৃহা মহীপতিবাবুর ছিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝরা পাতা

নৈশান্তিকা রাত্রি শেষে পড়ে আছি বৃক্ষতলে ঝরা পাতা আমি,
সবুজের উৎসবের ঘণ্টা গেছে বাজি'—
নিঃশেষিত পানপাত্র, আমি পড়ে আছি,
অতীতের স্বপ্নসাধ জড়াইয়া বৃক্ষতলে
মর্ম্মের নিভৃত মর্ম্মস্থলে।
আসিয়াছি পল্লবের বুক হ'তে নামি ঝরা পাতা আমি।
আকুলিত মর্ম্মরধ্বনিতে সচকিয়া উঠে মোর তনু,
রিক্ততার বেদনার হাহাকার করে প্রতি অণু—
বহে যবে উত্তরের সূচীভেদ্য বায়ু—
শিথিল শরীর স্নায়ু,
থাক পড়ে' সঙ্কুচিত ধরণীর কোলে দীনহীন ঝরা পাতা আমি।
আশাহীন, ভাষাহীন নিরুদ্দেশ যাত্রাপথ পথিকের পারা
সকল উদ্দেশ্যহারা;
প্রথম ভোর গগনের শুকতারা ভেদি' ছেদি' তিমিরের কারা,
আলোকের কলকোলাহলে হ'ব হারা।

বিদায়ের ব্যথা ভরা সন্ধিক্ষণে আজি, বন্ধু-তরু মোর,
তব কাছে এই ভিক্ষা যাচি;—
হৃদয়ের মৌনভাষা যে অমূর্ত্তবাণীর সন্ধানে
গুমরিয়া কাঁদিয়াছে ফিরি'
কত স্তব্ধ অর্দ্ধ রাতে, যে বাণী
রচিল মায়া নবোদ্গত পল্লবেরে ঘিরি',
আজিকে বলিব তাহা,—ওগো বন্ধু মোর,
এক বিন্দু আঁখি-লোর ফেলো মোর তরে
মিশে যাবে যবে তনু মোর রুক্ষ শুষ্ক ধরণীর পরে।
বিদায়ের শেষ ক্ষণে দিয়ো মোরে
একটি উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস—
তাহারি সঞ্চয় বুকে বহি'
কেটে যাবে দীর্ঘ বর্ষ মাস।

শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত।
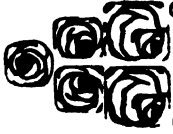
ইন্দ্রপ্রস্থ

১

ইন্দ্রপ্রস্থ !—ভারতের হে মহাশ্মশান !
দেখিয়াছ কত তুমি পতন-উত্থান ॥
কত হাসি কত কান্না আঁধার আলোক ।
মিলন ও বিচ্ছেদের কত হর্ষশোক ।
কত ফুল কত ফল, কত পরিণতি ।
অস্ফুট কলির কত অকালে দুর্গতি ॥
আশীর্ব্বাদ দেবতার,
দানবের অত্যাচার,
অমৃত ও গরলের প্রবাহ উচ্ছল,
বহিত তোমার বক্ষে প্লাবিয়া ভূতল ॥

২

ইন্দ্রপ্রস্থ, ভারতের হে মহাশ্মশান !
গর্ব্ব-দৃপ্ত জগতের কি শিক্ষার স্থান !
মহত্বের প্রভুত্বের বিশীর্ণ কেতন !
সম্পদের গরিমার স্খলিত তপন !
এক দিন তোমারি' না বক্ষে ছিল সব ।
ভূতলে অতুল দীপ্তি—অতুল বিভব ।
রাজসূয়-যজ্ঞে যত,
পূর্ণাহুতিরূপে গত,
ভারতের ক্ষাত্র-শক্তি—যাহার বক্ষের,
তুমি কি সে তীর্থরাজ সাক্ষী ত্রিকালের ?

৩

ইন্দ্রপ্রস্থ, গর্ব্বিতের অক্ষয় দর্পণ,
পীড়িতের, হতাশের মন্ত্র সঞ্জীবন ।
কূটনীতি শকুনির পাশার ছলনে
দেখিলে মজিতে তুমি দৃপ্ত দুর্য্যোধনে ।
তোমারি' বক্ষের সেই কৌস্তুভ-রতন
বিচূর্ণিল সপ্তরথী মিলিয়া যখন ।
শিশুপাল গর্ব্বভরে—
অপমানি' পরাৎপরে—
নাশিতে বিশ্বের শান্তি যবে গরজিলা ।
না জানি তখন তুমি কত হেসেছিলা ॥

৪

তোমার বক্ষের শোভা রাজপুত্রগণ
জতুগৃহে পোড়াইতে কৌরব যখন
মাতিল, না জানি তুমি হে তীর্থ তখন
কত কষ্টে করেছিলে হাস্য-সংবরণ ।
শুধু পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা মেগেছিল,
দম্ভভরে কুরুপতি তাহাও না দিল ।
যার পরিণাম-ফলে
কুরুক্ষেত্র মহানলে,
সোনার ভারত-রাজ্য হ'ল ছারখার ।
ইন্দ্রপ্রস্থ, একমাত্র তুমি সাক্ষী তার ॥

৫

তার পর হ'ল কত শত যুগ গত
ইন্দ্রপ্রস্থ, তুমি কিন্তু পাষাণের মত ।
দেখিলে, আবার যবে কনোজের রাজা
জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজে প্রদানিতে সাজা,
দুয়ারে স্থাপিয়া তাঁর মৃন্ময়-মূরতি
রাজসূয়-যজ্ঞে দিল ভারত আহুতি ।
মহম্মদ-ঘোরী করে,
তুলি দিল গর্ব্ব-ভরে,
সোনার ভারতবর্ষ—কাম্য দেবতার,
ইন্দ্রপ্রস্থ, একমাত্র তুমি সাক্ষী তার ॥

৬

স্বদেশীরে বিনাশিতে আনি' বিদেশীরে
ভারতের অধিবাসী ডুবিল অচিরে ।
সে অতল পারাবারে, দেখ মনে করি',
জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী ।
কেহ নাই তাহাদের, কিছু নাই এবে !
কালজয়ী তুমি শুধু আছ এক ভাবে ।
ছায়া-বাজিসম কত,
উত্থান-পতন শত,
স্তব্ধ নেত্রে নিরখিছ—যোগমগ্ন প্রায় ।
গণিছ কি ঊর্ম্মি কাল-সিন্ধুর বেলায় ?

৭

লক্ষ যোধ সহ যবে বাবর আসিয়া,
লোদীর মুকুট নিল বলে ছিনাইয়া ।
পরে যবে কক্ষচ্যুত উল্কার মতন,
কর্ম্মবীর হুমায়ুন দিলা দরশন ।
অদৃষ্টের খরস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
তুলি দিলা বক্ষ পাতি' হাসিতে হাসিতে ।
ক্লান্তকায়ে পড়ি' শেষে,
আহা ফকিরের বেশে,
তোমার সোপানে বীর জুড়াইল ব্যথা,
ইন্দ্রপ্রস্থ, তুমি ছাড়া কে জানে সে কথা ?

৮

তুমি ছাড়া কে দেখেছে সে রম্য-পতাকা,
মৈত্রী-সমতার শত ইন্দ্রধনু আঁকা ।
তীক্ষ্ণ-মতি আকবর যে পতাকা নিয়া,
নব আলিম্পনে তোমা দিলা সাজাইয়া ।
নবীন মোগল-রাজ্যে নবীন ভাস্কর,
দেখিলে উদিতে জিনি শত প্রভাকর ।
জ্বলিতে দেখিলে কত
আশার প্রদীপ শত,
অসময়ে অস্তমিত কত রবি-শশী,—
সস্মিত বদনে একা এই স্থানে বসি ।

৯

তুমি ছাড়া কে জানে সে বেদনা ভীষণ,—
সেই কোহিনুর, সে ময়ুর-সিংহাসন ।
নাদিরের আক্রমণ লক্ষ নরবলি !
তব বক্ষে শোণিতের প্রবাহ উচ্ছলি ।
তৈমুর ও জেঙ্গিসের তাণ্ডব নর্ত্তন,
কত দেবমন্দিরের কত বিবর্ত্তন ?
মহারাষ্ট্র সুখ-শশী,
দেখেছ পড়িতে খসি',
ভারতের পার্শ্বপলি পাণিপথে তুমি,
তুরাণী সে আমেদের তরবারি চুমি' ॥

১০

কত শত অশ্বমেধ নরমেধ যাগ,
ত্যাগের কঞ্চুকাবৃত ভোগে অনুরাগ
দেখিয়াছ, হাসিয়াছ বসি' একা একা
পড়িয়া ভারত-ভাগ্যে কত গুপ্ত লেখা ।
আবার পুত্রের করে পিতার বন্ধন,
নিরখি' করেছ কত অশ্রু বিসর্জ্জন ।
দেখেছ ন্যায়ের ছলে,
অন্যায়ের পদতলে,
বিদলিত আহা কত ধার্ম্মিকের শির,
নীরবে ফেলেছ কত নয়নের নীর ।

১১

সাম্রাজ্যের সুপবিত্র হে মহাশ্মশান !
ঐহিকের ইতিহাস কি শিক্ষার স্থান !
অতীত ফেলেছ মুছি',—আছে শুধু স্তূপ
চারিদিকে সমাহিত কত শত ভূপ !
তব পাদপদ্ম চুমি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
কালিন্দী কি গান গাহি' যেতেছে বহিয়া
মগ্ন-নেত্রে একমনে,
একা বসি' যোগাসনে,
শুনিছ কি হে শিক্ষক ! যুগ যুগ ধরি'—
অতীতের মর্ম্মব্যথা—সঙ্গীত-লহরী !

১২

কালের অক্ষয়-শিলা-ফলকের প্রায়,
কত কি তোমার বক্ষে অস্পষ্ট লেখায়
আছে লেখা, না জানি কি নিগূঢ় ইঙ্গিত
তব ও পাষাণ-বক্ষে রয়েছে খোদিত !
দাও সে নয়ন দিব্য—ওহে তীর্থরাজ !
আমি শুনাইব পড়ি' ত্রিজগতে আজ ।
কত শত যুগ ধরি',
বসি দিবা-বিভাবরী,
কত কি যে দেখিতেছ ওহে পুণ্যভূমি !
হয় ত বা আরো কত নিরখিবে তুমি ॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূ[illegible]

সুইডেনের কথা

পল্লীর বিবাহ উৎসব

সুইডেনের কথা এ দেশবাসীর কাছে উপভোগ্য হইবে। জাগরণের দিনে দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক তত্ত্ব শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করে না, জ্ঞানবৃদ্ধিরও সহায়ক। বালটিক সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী, সুইডেন দেশের রাজধানী ষ্টক্‌হলম্ ৭ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও, নগরের বাহ্য দৃশ্য হইতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এক সময়ে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম্ দারুনির্ম্মিত সৌধমালায় সমাকীর্ণ ছিল, ইহা সত্য। কিন্তু আড়াই শত বৎসরের মধ্যে ৬ বার ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের পর নাগরিকগণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যে প্রস্তরনির্ম্মিত ভূমির

পার্লামেণ্ট ভবন—সম্মুখে গষ্টেভস আডলফসের প্রস্তর মূর্ত্তি

নগরী বাল্‌টিক সমুদ্রের জলদস্যুদিগের আক্রমণ প্রতিরোধে দুর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

ষ্টক্‌হলমের ধন-সম্পদের বৃদ্ধি, ক্রমোন্নতি, সমগ্র দেশের ন্যায়, বিশেষ ভাবে বনজাত সম্পদের প্রভাবেই ঘটিয়াছে। নগরের নাম—দারুদ্বীপ হইতেই, অবশ্য বনসম্পদের প্রাচুর্য্যের উপর তাহাদের বাসগৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, নিরাপদে থাকিতে গেলে সেই প্রস্তর দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়।

অধুনা ষ্টক্‌হলমের প্রত্যেক গৃহ স্ফটিক প্রস্তর নির্ম্মিত। কোনও জমীর মালিক, যে প্রস্তরভূমির উপর তাঁহার সৌধ

গ্রীষ্ম-সম্বর্দ্ধনা

নির্ম্মাণ করেন, তিনি সেই জমী হইতেই পর্য্যাপ্ত স্ফটিক প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এ জন্য অধুনা ষ্টক্‌হলম্ নগরটিকে দেখিলেই মনে হইবে, ধূসর প্রস্তর নির্ম্মিত এই নগর যেন অনন্তকালের জন্য বিদ্যমান থাকিবে।

ষ্টক্‌হলমে কোনও দর্শক উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পৌরাণিক গ্রীক স্থপতিশিল্পের নিদর্শন এখানে নাই। দক্ষিণ, মধ্য এবং পশ্চিম য়ুরোপের যে কোনও নগরে প্রবেশ করিলেই গ্রীকস্থপতিশিল্পের প্রভাব দর্শককে অভিভূত করে; কিন্তু ষ্টক্‌হলমে তাহার একান্ত অভাব।

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ষ্টক্‌হলমের 'টাউন হল' নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। সুইডেনের প্রথম রাজা গষ্টেভস্ ভাসা; তাঁহার বংশাবলীই—৪ শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। উল্লিখিত গষ্টেভস্ ভাসার স্মৃতি-পূজার উৎসব ক্রিয়া, টাউনহল

বিদ্যালয়ে সুইডিস বালকগণের স্নান

সমাপ্ত হইবার পর, তথায় সম্পাদিত হয়। সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা হইতেই টাউন হল নির্ম্মিত হইয়াছে—সামান্য অর্থও যিনি চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহার নাম টাউনহলের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে।

সুইডেনবাসীরা জমী ও তাহার উৎপন্ন পণ্যের একান্ত ভক্ত। এই মনোবৃত্তি তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এ জন্য ক্রমবর্দ্ধমান নগরের উপকণ্ঠে অসংখ্য বিঘা পরিমাণ জমী উদ্যানে পরিণত করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে প্রতি একার পরিমিত জমী আনুমানিক

সুইডেনের শ্রেষ্ঠপ্রপাত

১৫৲ টাকা হারে চাষীকে বিলি করা হইয়া থাকে। জমী খাজনা করিয়া লইয়া শ্রমিক সেই ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করে। সমগ্র গ্রীষ্মকাল সে আপন স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া তথায় বাস করে। শ্রমিক কোনও কারখানা বা পোতাশ্রয়ে নিয়মিত ভাবে কায করিতে থাকে। কিন্তু প্রাতঃকালে কর্ম্মস্থলে যাইবার পূর্ব্বে এবং কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্ত্রীর সহিত সে শাক-সব্জী উৎপাদনে যোগ দিয়া থাকে। ইহা তাহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। শুধু শস্যোৎপাদন নহে, নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষের দ্বারা সে ক্ষেত্রটিকে মনোরম ভাবে সজ্জিত করিয়াও থাকে।

গ্রীষ্ম ঋতুর শেষভাগে গৃহকর্ত্রী তাহার উদ্যানজাত শস্য-সম্ভার সংগ্রহে মন দেয়; স্বামী—পুষ্পসংগ্রহ ব্যাপারে মনোনিবেশ করে। আগষ্ট মাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট রবিবারে প্রত্যেক পরিবার তাহার শ্রমজাত শস্য এবং পুষ্প প্রভৃতি লইয়া টাউন-হলের বিরাট 'নীল কুঠি'তে সমবেত হয়। সে দিন তাহাদের কৃষকসুলভ পরিচ্ছদে তাহারা দেহ আবৃত করিয়া প্রত্যেকে স্ব স্ব শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

নাগরিকগণ তাহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকে। অবশ্য যাহার ফল, শস্য বা পুষ্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, সে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এই প্রদর্শনী জাতীয় উৎসব মধ্যে

অধুনা লুপ্ত প্রাচীন যুগের দারুনির্ম্মিত গৃহ

পরিগণিত। ব্যাণ্ডের বাদ্যও সে দিন উৎসব-কক্ষকে মুখরিত করিয়া তুলে। য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় যখন চারিদিকে সকল বিষয়ে নিদারুণ অভাবের পীড়ন অনুভূত হইয়াছিল, সুইডেন সেই সময় শ্রমিকদিগের উদ্যানরচনার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। সে সময় সুইডেন সমগ্র য়ুরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার খাদ্য-শস্যের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছিল। সেই জন্যই সুইডেনের এই প্রচেষ্টা।

এখন অবশ্য আর সে অভাব ও দৈন্যের অবস্থা নাই; কিন্তু সুইডেন সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নাই। নগরোপকণ্ঠস্থিত

উত্তর সুইডেনে রুটী প্রস্তুতের দৃশ্য

জমী হইতে উৎপন্ন ফলশস্যাদি হইতে বর্ত্তমানে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা শ্রমিকরা পাইয়া থাকে। সুইডেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন দেশ। নগরের মধ্যে বা বাহিরে কোথাও বিন্দুমাত্র আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া রালফ্‌ গ্রেভস্‌ নামক জনৈক মার্কিণ পর্য্যটক পত্রান্তরে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রচুর পুষ্প ও শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্ররাজি নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র শ্রমিক সম্প্রদায়ের পুত্র-কন্যা-গণের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ বিষয়ে সুইডেনের ছাত্র-ছাত্রীদিগের মত সৌভাগ্য অন্যত্র দুর্লভ। ষ্টকহলমের ছাত্রজীবন ৬ বৎসর বয়স হইতেই আরম্ভ হয়। শীতকালে কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে ছাত্র ও ছাত্রীগণকে বেশভূষা করিতে হয়। রাজপথের আলোক নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। পৌনে ৮টায় ক্লাশে পাঠ আরম্ভ হয় এবং পৌনে ১১টায় ছাত্রগণ গৃহে
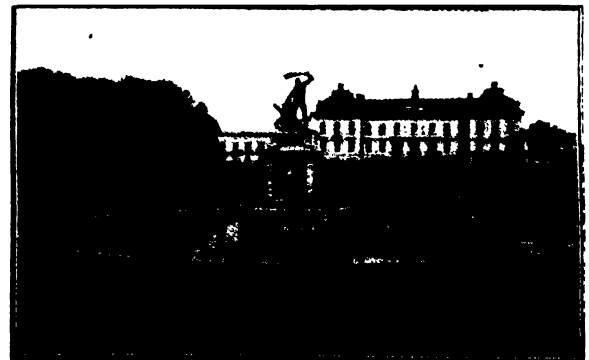
সুইডেনরাজের গ্রীষ্মাবাস

প্রতরাশের জন্ত ফিরিয়া যায়। তার পর ক্লাশে ফিরিয়া আসিয়া আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঠ আরম্ভ করে। ২টা ৩৫ মিনিটে বা সাড়ে ৩টায় বিদ্যালয়ের ছুটী হয়। অবশ্য ছাত্রের বয়স অনুসারে। শীতের মাঝামাঝি সময়ে অপরাহ্নকালে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আইসে।

গৃহে আসিয়া ছাত্রকে অনেক কার্য্য করিতে হইয়া থাকে। লিখিত ভাষায় তাহাদের যে সকল পাঠ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা গৃহে অবস্থানকালেই সমাপ্ত করিতে হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক ছাত্রকে সুইডিস্, জার্ম্মাণ, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিখিতে হয়। প্রত্যেক বৎসরের ২৬শে আগষ্ট হইতে ৬ই জুন পর্য্যন্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে। বড় দিন উপলক্ষে ১ মাস এবং ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে বিদ্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে।

মলিন্ রচিত ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত দ্বন্দ্বযোদ্ধযুগলের মূর্ত্তি

প্রথম তুষারপাত আরম্ভ হইলেই ছাত্র-ছাত্রীরা 'স্কী' সহযোগে বিদ্যালয় অভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকে। ৬ বৎসর বয়স্কা বালিকাও স্কী ব্যবহারে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করে। সহরের বালক-বালিকারা প্রায় ১২ টাকা বাৎসরিক মূল্যে নগরে প্রচলিত গাড়ীতে আরোহণ করিতে পারে।

ষ্টকহলমের ছাত্র-ছাত্রীরা মার্কিণ ছাত্র-ছাত্রীদিগের তুলনায় পাঠাভ্যাসে অধিক মনোযোগ দিয়া থাকে; কিন্তু গ্রীষ্মের অবকাশকালে

ষ্টকহলম্ বন্দরের দৃশ্য

তাহাদের মত কোন দেশের ছাত্রছাত্রীই বাহিরের ক্রীড়ায় অধিক অনুরাগ প্রকাশ করে না। অপেক্ষাকৃত ধনীর সন্তানগণ নগরের বহির্ভাগ-স্থিত গ্রীষ্মাবাসে অবসর-যাপন করিবার জন্য পিতামাতার সহিত গমন করিয়া থাকে। বলটিক সমুদ্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ সকল দ্বীপে ধনীদিগের গ্রীষ্মাবাস-সমূহ বিদ্যমান। সুইডেনের ছাত্রগণ প্রাকৃত-বিজ্ঞানের বিশেষ ভক্ত। তাহারা ক্রীড়াচ্ছলে প্রাকৃত-বিজ্ঞান, অবসর-কালেও অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

সুইডেনের গায়ক

নানাবিধ ক্রীড়ায় ষ্টকহলমের কিশোর ও যুবক সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব অনুরাগ আছে। দেশবাসী নানাবিধ ব্যায়ামের ভক্ত। অশ্বারোহণ-ক্রীড়ায় সুইডেনবাসীরা অত্যন্ত অনুরক্ত। নানাবিধ ক্রীড়ায় বাজি রাখার প্রথাও তথায় বিশেষভাবে প্রচলিত। সুইডিস্ সরকার দেশবাসীর এই জুয়া-খেলার প্রবৃত্তি দমন না করিয়া বরং অধিকতর উৎসাহই দিয়া থাকেন। কিন্তু দেশের অর্থ অন্য দেশে যাহাতে না চলিয়া যায়, সে দিকেও সরকারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিবার অবসান ঘটিতে থাকিলে, মধ্যবিত্ত ও ধনিসম্প্রদায় নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকেন। তখন নগরের সামাজিক জীবন আবার ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে।

সুইডেনের সামাজিক জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সুইডেনের কোনও পুরুষ বা নারী বিনা নিমন্ত্রণে কখনও কোন গৃহস্থ-গৃহে গমন করে না। টেলিফোন-যোগে কোনও

শত বৎসরের পুরাতন বোহস্ দুর্গ

সুইডেন নারী কোনও বন্ধুকে এ কথা বলে না যে, সে তাহার গৃহে বেড়াইতে যাইবে। কোনও বন্ধু-গৃহে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইলেই তবে পুরুষ বা নারী তথায় গমন করিবে।

নিমন্ত্রণ-সভায় পুরুষরা অধুনা সামান্য পরিমাণ সুরাপান করে; কিন্তু নারীরা কোন প্রকার সুরা গ্রহণ করে না। কোন পুরুষ বা নারীকে কেহ মিঃ বা মিসেস্ অমুক বলিয়া সম্বোধন করে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার পুরা নাম ও কর্ম্মের উপাধি দ্বারা অভিহিত করা হইয়া থাকে। "মিঃ অমুক ভিষ্টের" পরিবর্ত্তে বলিতে হইবে, "মিঃ অমুক্ ভিষ্ট, শিক্ষা-সচিব," "মিঃ অমুক, জেনারেল ম্যানেজার, ওষ্ট" প্রভৃতি পুরা উপাধি ধরিয়া প্রত্যেক বারে সম্বোধন করিতে হইবে।

ভোজশেষে, মহিলারা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে, গৃহস্বামীকে মধুর ও সুন্দরভাবে একটি বক্তৃতা করিতে হয়। এই বক্তৃতার বক্তব্য বিষয়, অতিথিরা অনুগ্রহ করিয়া ভোজসভায় যোগ দিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত ও আনন্দিত করিয়াছেন। অতিথিরা যে দেশের লোক, গৃহস্বামী সেই ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। সুইডেনবাসীরা রুসদিগের ন্যায় বহুভাষাবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসারে অতিথিরা গৃহকর্ত্রী ও গৃহস্বামীর চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। প্রত্যেকেই দম্পতির করকম্পন করিয়া ভোজের জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন। এই ধন্যবাদ প্রদানের ভাষা—"ট্যাক্ সা মাইকেট" অর্থাৎ আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। উহার অপভ্রংশ "ট্যাক্"—সাধারণতঃ টেলিফোন যোগে কোনও সংখ্যা চাহিলে, প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপনই সুইডেনের প্রথা। কোনও দোকানে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার পর ক্রেতা বিক্রেতাকে "ট্যাক" বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেনই। ট্রাম গাড়ীতে কনডক্টর টিকেট দিল, অমনই বলিতে হইবে, "ট্যাক।" ধন্যবাদ-জ্ঞাপন প্রত্যেক ব্যাপারেই করিতে হইবে। সুইডেনে এই প্রথা শিষ্টাচারের অন্তর্গত এবং প্রত্যেক সুইডিশ্ নরনারী উহা অভ্রান্তরূপে পালন করিয়া থাকে।
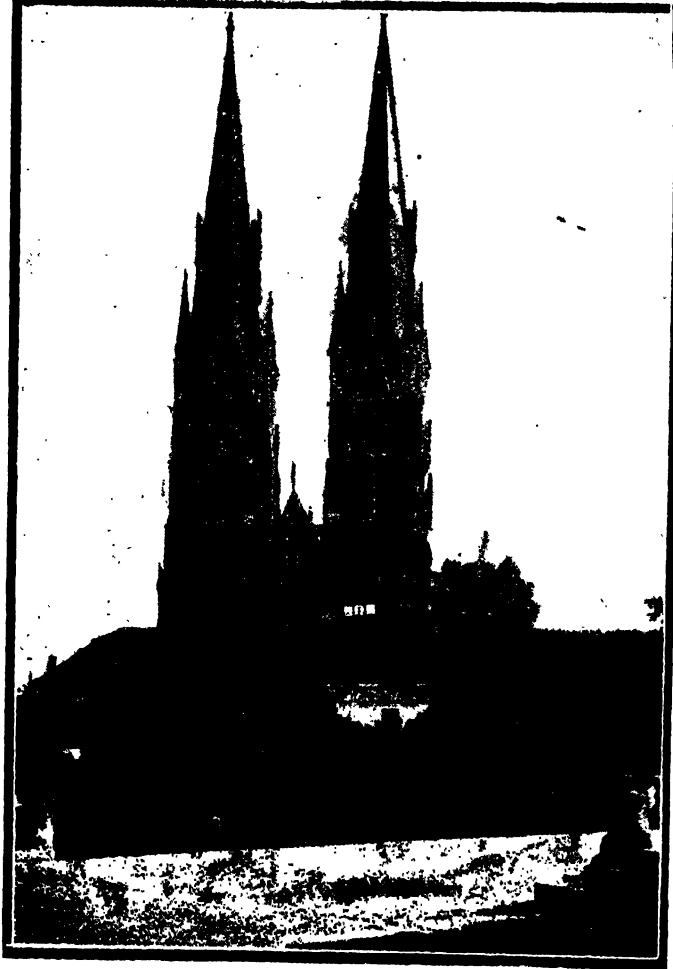
অপ্‌সালার সুবৃহৎ গির্জ্জা।

গৃহস্থগৃহে ভোজনের পর সন্তানগণ পিতামাতাকে প্রত্যহ এই ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বালক-বালিকা বলিবে, "মা, তুমি প্রচুর খাদ্য দিয়াছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।" পিতার সম্বন্ধেও বালক-বালিকা ঐ কথাই বলিবে। বাস্তবিক গতানুগতিক প্রথা হিসাবে সন্তানগণ এই ধন্যবাদ-জ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ করে না। তাহারা

আন্তরিক ভাবে জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যই উক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ষ্টক্‌হলমে বেকার-সমস্যা নাই। দেশীয় সরকার, মিউ-নিসিপ্যালিটী প্রভৃতি বেকার লোকের সন্ধান পাইলেই কায দিয়া থাকেন। মিঃ রালফ্‌. গ্রেভস্‌ লিখিয়াছেন, একবার তিনি কোন প্রসিদ্ধ সুইডিস্‌ সংবাদপত্রে একটি সংবাদ দেখিতে পান। তাহাতে লিখিত ছিল যে, গত সপ্তাহে ষ্টকহলম সহরে মোট ৯ শত ৮৩ জন বেকার লোক ছিল। তন্মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীতেই ৯ শত ৮১ জন কায পাইয়াছিল। শুধু দুই জন মাত্র সেই সপ্তাহে বেকার ছিল। এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার য়ুরোপের কোন দেশের কোন নগরেই সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষ ত বেকার-সমস্যার ভারে পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে।

ষ্টকহলমের গৌরব—মালারন্‌ হ্রদের উপরিস্থিত টাউনহল

পুষ্পপ্রীতি, বৃক্ষলতার প্রতি অনুরাগ সুইডিস্‌দিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। শৈশবকাল হইতেই সুইডিস্‌ শিশু পিতামাতার শিক্ষাব্যবস্থা হইতেই উহা লাভ করিয়া থাকে। সমগ্র বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে ফুলদানী সজ্জিত থাকে—তাহাতে সত্যচয়িত বিবিধ কুসুমরাজি সুশোভিত। শীতকালে পুষ্পবিক্রেতারা বাড়ী বাড়ী পুষ্প ফিরি করিয়া বেড়ায়। গ্রীষ্মকালে যখন অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ গ্রীষ্মাবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ষ্টকহলমের নারীগণ প্রত্যহই একবার করিয়া ফুলের বাজারে যেন তীর্থ-যাত্রা করিয়া থাকেন। এই ফুলের বাজার অতি অপূর্ব্বদর্শন। সমগ্র য়ুরোপের কোথাও নাকি এমন অসংখ্য বিচিত্র পুষ্পরাজির সমন্বয় দেখা যায় না।

ষ্টকহলমের প্রত্যেক প্রমোদোদ্যানে অসংখ্য ফুলের গাছ দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্যান্সী, ডালিয়া, গোলাপ, পদ্ম, কুমুদ নানাজাতীয় পুষ্প উদ্যানমধ্যে যথাযথ স্থানে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের বিদায়কালে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দেওয়া সুইডেনের প্রথা। রেলগাড়ীর কামরাগুলি কুমুদ, ডালিয়া প্রভৃতি উপহৃত পুষ্পভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

সুইডেন স্বাধীন দেশ—কখনও উহা বিদেশীয়গণের দ্বারা শাসিত হয় নাই। একবার সওয়া এক শত বৎসর সুইডেন ডেনমার্ক ও নরওয়ের সহিত যুক্ত হইয়া, সমবায়রাজ্য শাসনের-পরীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সুইডেনবাসীরা দিনেমার জাতিদিগের কঠোর শাসন পছন্দ করে নাই। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ক্রীশ্চিয়ান্‌ সুইডেনের ৮০ জন ওমরাহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই রাজা ক্রীশ্চিয়ানের

সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হয়। তরুণ গষ্টেভস্ ডালিকার্লিয়ার শক্তিশালী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সুইডেনকে স্বাধীন করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুইডেনের প্রধান সম্পদ অরণ্যানী। সমগ্র দেশের প্রায় অর্দ্ধাংশই অরণ্যে আবৃত। অবশ্য প্রাচীন যুগের অরণ্য প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নূতন নূতন বৃক্ষরাজি—শাল, দেবদারু, ফার প্রভৃতি বৃক্ষের শ্রেণী উদ্ভূত হইয়া অরণ্যের শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। কয়লাও সুইডেনে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কয়লা অন্যত্র কৃষ্ণবর্ণের, কিন্তু সুইডেনের কয়লা শ্বেত।

সুইডেনের কামার

রেলগাড়ীর এঞ্জিনসমূহে এই শ্বেত কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রায় ১ শত বৎসর ধরিয়া সুইডেন কোনও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয় নাই। কোনও যুগেই সুইডেনকে জয় করিবার জন্য কোনও জাতি চেষ্টাও করে নাই। এ জন্য সুইডেনে জাতিসঙ্করত্ব নাই। বিগত ৪ বৎসর ধরিয়া সুইডেন মানব-প্রেমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রায় দ্বাদশ জন বিভিন্ন য়ুরোপীয় প্রতিবেশী শক্তির সহিত সুইডেন যুদ্ধ-পরিহার-সংক্রান্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। সুইডেন ও নরওয়ের মধ্যে যে সন্ধি আছে,

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কামার দুর্গ

তাহাতে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, যদি কখনও জাতীয় সম্মান আহত হয়, তাহা হইলেও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনই যুদ্ধ-ঘোষণা করিবে না।

সুইডেনের কোনও উপনিবেশ কোথাও স্থাপিত হয় নাই, সুতরাং সুইডেনের শত্রুও কেহ নাই। সুইডেনের প্রথম অভ্যুদয়যুগে সাম্রাজ্য-গঠন-প্রবৃত্তি একবার জাগ্রত হইয়াছিল। সে যুগে সাহসী জলদস্যুগণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আইস্‌ল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া তথায় তাহাদের কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছিল। এখনও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু কোথাও গিয়া তাহারা আপনার অধিকাররক্ষার কোন চেষ্টাই করে নাই।

শূকরছানা-বিক্রেত্রী

শুধু সুইডেনের রডরিক নামক এক পরাক্রান্ত জলদস্যু ৮৬২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ বিবরণ সন্ন্যাসী নেষ্টরের লিখিত বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। রডরিক রুসিয়ার তদানীন্তন অসভ্য অধিবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে থাকেন। রডরিক তথায় স্বেচ্ছায় যান নাই, আমন্ত্রিত হইয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্মিলিত সম্প্রদায় ৭ শতাব্দী ধরিয়া রুস্‌-সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিল।
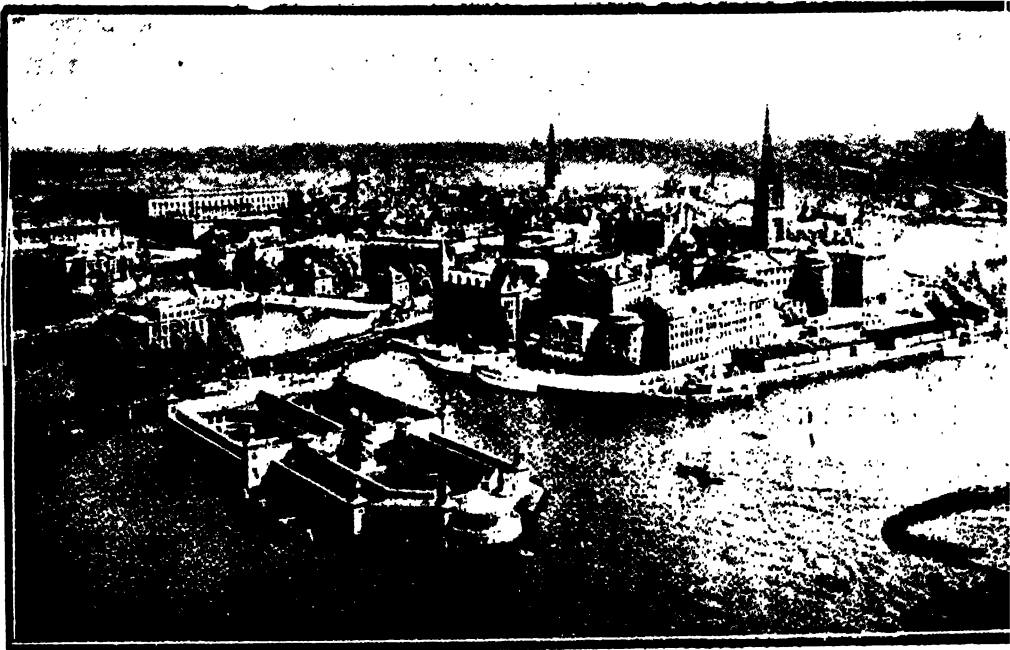
সমগ্র ষ্টক্‌হলম্‌ নগরের দৃশ্য

সুইডেনের আদালতগৃহ

সুইডেনের ৬০ লক্ষ অধিবাসীর শতকরা ৯৯ জন স্বদেশেই অবস্থান করিয়া থাকে; দেশান্তরে গিয়া বসবাস করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের নাই।

দেশাত্মবোধ সুইডিস্‌দিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহাদের সঙ্গীতে শুধু দেশমাতৃকার বন্দনা। সুইডেনের কবিগণ নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে দেশজননীর স্তুতিগান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।

ঋতুর উৎপীড়নপ্রভাবে সুইডিস্ জাতি অতিরিক্ত মাত্রায় নৈরাশ্যবাদী, হেমন্ত ঋতুর আগমন শীতের সূচনা করে বলিয়া সেই সময় হইতেই যেন তাহারা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। কিন্তু বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠে। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অমনই তাহাদের মধ্যে আনন্দের প্রেরণা জাগিয়া উঠে। গ্রীষ্ম ঋতু যেন অকস্মাৎ তথায় আবির্ভূত হয়।

এই সময়ে সুইডেন য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্যতম ছিলেন। বল্‌টিক সমুদ্রই সুইডেনের অধিকারভুক্ত ছিল। গষ্টেভস্ আডল্‌ফস্—সংস্কারযুগের নায়ক, তখন য়ুরোপের একটা বিশিষ্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুইডেন ফিন্‌ল্যাণ্ড, বল্‌টিক উপকূলবর্ত্তী ইষ্টোনিয়া, লিভোনিয়া, ইঙ্গার ম্যাস্‌ল্যাণ্ড এবং ওয়েমার, ওডার ও এল্‌ব প্রভৃতি নদীর মোহানার সন্নিহিত উত্তর-জার্ম্মাণীর স্থানসমূহ শাসনাধীন রাখিয়াছিল।

৩০ বৎসরব্যাপী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধে সুইডেনের মধ্যবর্ত্তিতায় য়ুরোপের ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা পর্য্যুদস্ত হইতে পারে নাই। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের পর বল্‌টিক সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের কর্ত্তৃত্ব সুইডেনের হস্তচ্যুত হয়। তখন হইতেই সুইডেনের ক্ষমতাহ্রাস হইতে থাকে। সেই সময় হইতেই সুইডেন রাজ্য-বিস্তারের দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া প্রশান্তভাবে সুইডেনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। সুইডেনের প্রধান কাম্য শান্তি—যুদ্ধ নহে।

সুইডেনের আইন-রচনাকারী ও অন্যান্য নেতৃগণ জাতীয় উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কারকার্য্য করিয়া থাকেন। ধ্বংসনীতির পক্ষপাতী তাঁহারা নহেন। কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার সংস্কারসাধনের জন্য

মালারন্ হ্রদে দরিদ্র নারীরা বস্ত্র ধৌত করিতেছে
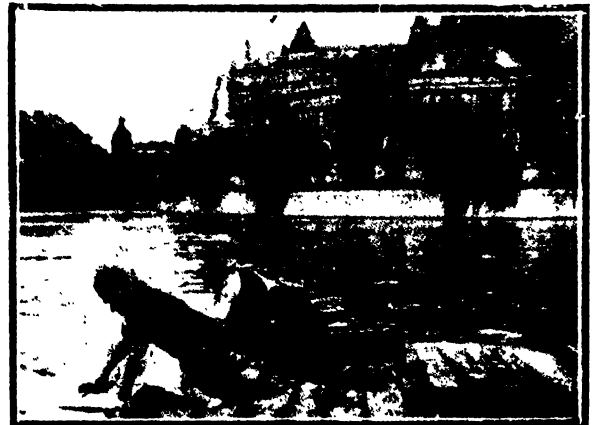
তাঁহারা যুগনীতির অগ্রগামী চিন্তা ও ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। সুইডেনের সুরা-নিয়ন্ত্রণ-সমস্যার সমাধান তাহার অন্যতম। উনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগে সুরা প্রস্তুত করিবার ভার সুইডেনের সরকারের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উহা আর কেহই করিতে পারিত না। রাজকোষ পূর্ণ রাখিবার জন্য, কৃষকদিগের পানস্পৃহা বলবতী রাখিবার জন্য সরকার হইতে উৎসাহও প্রদত্ত হইত। সুতরাং সুইডেনে সুরাপান-প্রথা জাতীয় আচারে পরিণত হইয়াছিল। সুরাপান-প্রথা রহিত করিবার জন্য বহু আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও কোনও সুফল প্রথমতঃ দেখা যায় নাই। কিন্তু অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সুরা বিক্রয়ের এমন সুবন্দোবস্ত হইয়াছে যে, কোনও পুরুষ মাসে ৮ পাঁইটের অতিরিক্ত সুরা ক্রয় করিতে পারিবেন না। আর সেই পানীয় সুরায় শতকরা ২২ ভাগের অধিক সুরা-সার কখনই থাকিবে না। অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদিগের সম্বন্ধে আরও কড়া বিধান। তাহাদিগকে উহার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রত্যেক ক্রেতার কাছে একখানি করিয়া ছাপান ফরমের বই থাকে। প্রথম বোতল ক্রয়ের রসিদসহ দ্বিতীয়
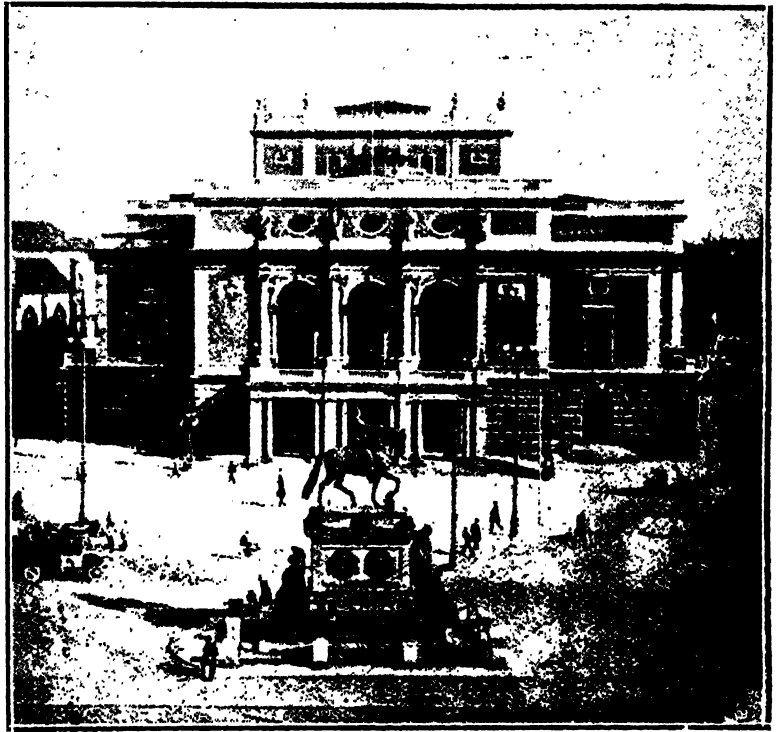
সুইডেনের প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়

প্রসিদ্ধ 'নীলমুঠী' হল

সুইডেনের খনির শ্রমিক

সুইডেনের একটি দৃশ্য

হাস্জোর প্রসিদ্ধ ঘণ্টাঘর

বারের আবেদনপত্র দোকানে পাঠাইতে হইবে। যে সকল দোকান সুরাবিক্রয়ের আইনসঙ্গত অধিকার বা লাইসেন্স পাইয়াছে, শুধু সেইরূপ দোকান ব্যতীত অন্যত্র সুরা বিক্রীত হইতে পারিবে না। এইরূপে সুরাপানস্পৃহা দেশনেতৃগণ এমন ভাবে সংযত করিয়াছেন যে, কৃষক-কুলের মধ্যে সুরাপান-প্রবৃত্তি বহুলভাবে হ্রাস পাইয়াছে।
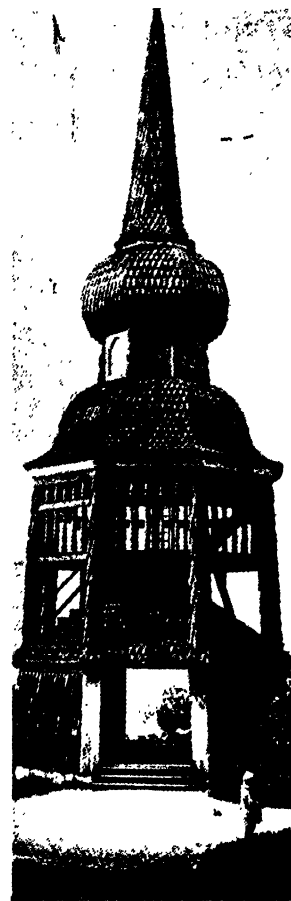
পঞ্চদশ শতাব্দীর সুইডিস্ বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনকে উপভোগ করা সুইডেনবাসীদিগের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তাহারা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী নহে। তাহারা প্রশান্তভাবে, সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত। তাহাদিগের নিকট ঐশ্বর্য্যের উন্নতির কথা বলিতে গেলেই তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বসিবে। কিন্তু তথাপি য়ুরোপের অন্য কোন দেশেই জীবনযাপনের এমন উচ্চতর মাপকাঠি আর কোথাও লক্ষিত হইবে না।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেস

স্থান—খেলার ঘর। কাল—কলির শেষ
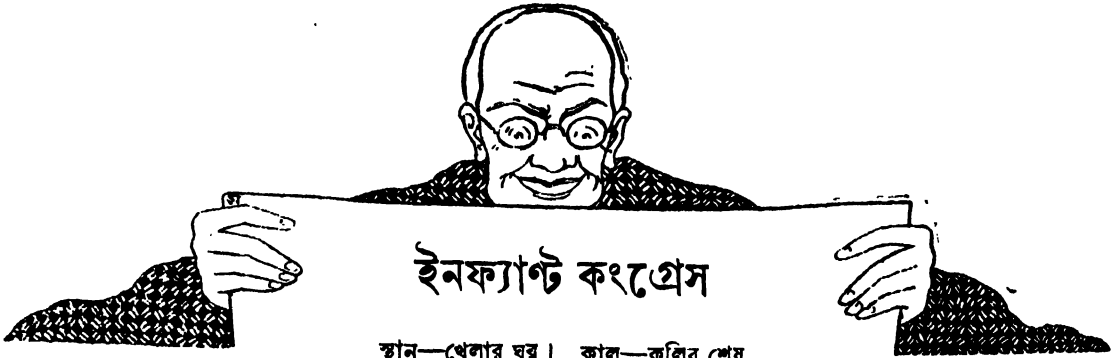
[এবার বড়দিনের বন্ধে সহর কলিকাতায় রকম-বেরকমের কংগ্রেস কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সেগুলির রাশি রাশি রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কিন্তু একটি কনফারেন্সের রিপোর্টের কথা দূরে থাকুক, উল্লেখমাত্র কোথাও দেখিলাম না। অথচ প্রয়োজনীয়তার হিসাবে তাহার মূল্য অন্যান্য কংগ্রেস কনফারেন্স হইতে বিন্দুমাত্র ন্যুন নহে। সম্ভবতঃ রিপোর্টারের অভাবে এই প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের পল্লীর 'নীলু খুড়ো' মহাশয়ের প্রত্যহ গোলদীঘির পার্কে (যদিও তথায় সার্কাস নাই) বায়ু-সেবনের অভ্যাস আছে। তথায় প্রায়শঃ তিনি মৌতাত চড়াইয়া ভ্রমণ করিতে যান এবং পরিণত বয়স হেতু ক্লান্ত হইলে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকেন। কয়েক দিন যাবৎ বায়ুসেবনকালে তিনি শিশুগণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি নিম্নলিখিত কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা অবগত হন। তাঁহারই বর্ণনামত পাঠকবর্গের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে।].

মহা সমারোহ, দলে দলে লোকসমাগম, গোলদীঘি গুলজার! অদ্য "অল্ ইণ্ডিয়া ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেসের" অধিবেশনের দিন। ভেঁপুধ্বনি সহযোগে সংবাদ সহরের খেলার ঘর-সমূহে প্রচারিত হইয়াছে। এ বিষয়ে অল্ ইণ্ডিয়া ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেস কমিটী বণ্টনের জন্য হস্তে অতি হ্রস্ব সময় প্রাপ্ত হইয়াও যথেষ্ট কার্য্য-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেসের 'খোকার ঝি, খুকীর ঝি, ধাইমা, রাণীর মা'রূপ বৃহৎ প্রচার বিভাগের সাহায্যে গোলদীঘি, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, হরিশ পার্ক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্রে অধিবেশনের বাণী পূর্ব্বাহ্নে প্রচারিত হইয়াছে।

সহরের একটিমাত্র সার্কাসের পার্ক অন্য এক কংগ্রেস কর্ত্তৃক এবং অন্যান্য সার্কাসের পার্ক সেলার, কার্লেকার প্রভৃতি কোম্পানী দ্বারা পূর্ব্বাহ্নে অধিকৃত হওয়ায় অগত্যা গোলদীঘিতেই ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কলির সন্ধ্যার পর কলির রাত্রি, সেই কলির রাত্রিশেষের পর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক রাত্রিশেষের সময়টা অল ইণ্ডিয়া ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেস কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের মনোনীত না হওয়ায় সময় পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই হেতু এই মর্ম্মে কমিটীর পক্ষ হইতে ইস্তাহারও জারি হইয়াছে :—

"রাত্রিশেষ অত্যন্ত বদ সময়, কেন না, সেই সময়ে জগতের অন্যান্য জীবজন্তু গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকিলেও আমাদের ইনফ্যাণ্ট সম্প্রদায় ভীষণ অ্যাজিটেশান করিতে থাকেন। তাহার কারণ এই যে, সেই সময়ে তাঁহাদের জঠরস্থ অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। সুতরাং সেই সময়ে হরলিক্স্, মেলিন্স ফুড অথবা অন্য নামধেয় টিনজাত কামধেনু দোহন করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়বিধান করিয়া দিতে হয়, অন্যথা পিসীমাতা, দিদিমাতা প্রভৃতি নার্সিং স্কুলের সদস্যারা সেই চীৎকারান্দোলনে নাড়ীহারা হইবার উপক্রম করেন।

"ইনফ্যাণ্ট রেজিমেণ্টের প্রথম নিত্যকৃত্য ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, তাহার পরের প্রাতঃকৃত্যটিও সারিয়া লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমানের যুগোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তন্য ফল্গুর মত হয় অন্তঃসলিলা, না হয় সরস্বতীর মত গুপ্ত বা লুপ্তসলিলা। গোদুগ্ধও তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। কাযেই তদভাবে কর্ণ ফ্লাওয়ার, এরারুট বা বার্লি নামধেয় অমৃতবিন্দু-নিচয়-মিশ্রিত খড়িগোলা বিশুদ্ধ পানীয় সেবন প্রথম নিত্যকৃত্যের পর দ্বিতীয় প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে ধর্ত্তব্য। ইহার পর অবশ্য ইনফ্যাণ্ট সম্প্রদায়ের সময় ও অবসর যথেষ্ট থাকিবারই কথা।

আরম্ভে

"এই হেতু আমরা স্থির করিলাম যে, দ্বিতীয় প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। নিখিল ভারত শিশু মহা-সম্মেলনের বিষয়নির্ব্বাচন সমিতি দ্বিপ্রহর হইতে অপরাহ্নের মধ্যে সময় নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দুই এক দিন ঐ সময়ে এই বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরও কি জানি কেন, ইনফ্যাণ্ট সম্প্রদায় সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সেই সমাধি সারারাত্রি থাকে। রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বে সেই সমাধিভঙ্গ হয়। কাষেই বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রভাতে দুইবার প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হইবার পর হইতে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সময়টুকুই ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেসের অধিবেশনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়। সদস্য ও সদস্যাগণ যথানির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সভাস্থ হইবার চেষ্টা করিবেন।

"আরও প্রকাশ থাকে যে, যাঁহারা ধাত্রী বা দাস-দাসীর ক্রোড়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা সঙ্গে ধাত্রী বা দাস দাসী আনয়ন করিতে পারিবেন। যাঁহারা হামাগুড়ি দিয়া অথবা টলিতে টলিতে কোনওরূপে টাল সামলাইয়া আসিবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটিবে। যাঁহারা হাঁটিতে বা দৌড়াদৌড়ি করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, যাঁহারা মার্ব্বেল বা লাট্টু খেলিতে অথবা 'পি-চক্-চক্' শিশ দিয়া পায়রা ও ঘুড়ি উড়াইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা অপরের মাথায় গাঁট্টা মারিয়া শ্লেট-পেনসিল কাড়িয়া লইতে বা গুরুজন অদৃশ্য হইলেই দুগ্ধের সরটুকু, অলুর দমের আলুটা পটোলটা নিমিষে আত্মসাৎ করিতে কিম্বা অভিভাবকের আফিসের জামার পকেট হাতড়াইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন,—বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না।

"নারী শিশু-প্রতিনিধিগণ সম্বন্ধেও এই সাধারণ নিয়ম খাটিবে। কেবল প্রভেদ এইটুকু থাকিবে যে, পুরুষ শিশুগণের সম্বন্ধে ১৪ আনা দুই আনা ঘাড়কামান চুল ছাঁটাটা বাধ্যতামূলক রাখিলেও বাটারফ্লাই গোঁফ বা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ীটা বাদ দিলেও ক্ষতি হইবে না, (যেহেতু তাহার সম্ভাবনা নাই) কিন্তু নারী শিশু-প্রতিনিধিগণ সম্বন্ধে এই ব্যতিক্রম থাকিলে চলিবে না,—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কেশোদ্গম হইয়াছে, তাঁহাদিগের 'বব্‌ড্‌ হেয়ার' রাখিতে হইবেই, পরন্তু সর্ট স্কার্টও পরিধান করিতে হইবে।

সভাধিবেশন ও অভিভাষণ

সহরে এই সংবাদ প্রচারিত হইবার পর যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে, নিখিল ভারত শিশু-মহাসম্মেলন আরম্ভ হইল। সভাপতির শোভাযাত্রা উপভোগ্য, বর্ণনীয় নহে। চারিচক্রোপরি স্থিত কাষ্ঠ-অশ্ব সমাসীন শিশু সভাপতি মহাশয়কে যখন ইনফ্যাণ্ট রেজিমেণ্ট মহোল্লাসে আনন্দ-কাকলী তুলিয়া অশ্বমুখসংলগ্ন রশ্মি সহযোগে সভাস্থলের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল, যখন শত শত শিশু-হস্তে পুত্তলিকা, নানাবর্ণের পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড-সমূহ ও নানাবর্ণের ঘুড়ী পত পত শব্দে আকাশে উড্ডীয়মান হইল, যখন কে অগ্রে যাইবে, এই তর্কবিচারের মীমাংসার্থ সেই শিশুমণ্ডলীর মধ্যে হেথা সেথা পরস্পর কেশাকর্ষণ, নখদন্তদ্বারা

দেহবিদারণাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, যখন পরস্পর প্রচণ্ড চপেটাঘাতের চট্‌চটারব গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল, যখন ক্রন্দনরোলে বায়ুমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন সেই সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া যে নন্দন-শোভার সৃষ্টি করিল, তাহা কেবলমাত্র কবির তুলিকায় চিত্রিত হইবার যোগ্য। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের ও বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠের সেই বলবীর্য্য প্রকাশ জগতে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদানুগামী মহাশক্তিগণের ম্যাণ্ডেট অস্ত্র দ্বারা আদিম নেটিভগণের শোষণ ও মারণের সহিত তুলিত হইতে পারে! সেই দৃশ্য দেখিয়া আকাশ হইতে দেবগণ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মর্ত্ত্যে মানবমণ্ডলী বিস্ময়াতিশয়ে 'ধাৎ-ছাড়া' নামধেয় দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

যথারীতি ভেঁপু-ব্যাণ্ড বাদন, আসন-গ্রহণ, সভাপতি-বরণ, সঙ্গীত ইত্যাদি পরিসমাপ্তির পর শিশু সভাপতি মহাশয় নানাবিধ চীৎকার, গল্প, হাস্য ও কোলাহলের মধ্যে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে লাগিলেন,—

ভবিষ্যৎ নাগরিক ও নাগরিকাগণ! আপনারা অবগত আছেন যে, নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, অস্তুদন্তহীন, কর্ম্মবিমুখ প্রাচীনগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, অদ্যকার তরুণ কল্যকার নাগরিক। পরন্তু দেশের ইয়ুথগণকে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এ অপমান আপনারা কি চুষিকাঠি চুষিতে চুষিতে সহ্য করিবেন? (সভা হইতে 'না', 'না', 'কখনই না')। না, কখনই না। দেশের আশা-ভরসা কাহারা? আমরা, এই ইনফ্যাণ্ট পুরুষ ও ইনফ্যাণ্ট নারীরা (সভা হইতে 'নিশ্চয়' 'নিশ্চয়')। ইয়ুথরা কল্যকার নাগরিক, আমরা তৎপরদিনের নাগরিক, আর আমাদের ইনফ্যাণ্ট ভগিনীগণ ভবিষ্যৎ নাগরিকা। অতএব আপনারা সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বদ্ধপরিকর হইয়া মন্তব্য গ্রহণ করুন যে, নাগরিক বা নাগরিকার অধিকার একমাত্র ইনফ্যাণ্ট পুরুষ ও ইনফ্যাণ্ট নারীগণের প্রাপ্য—ইহা তাহাদের জন্মগত অধিকার,—ইহা হইতে তাহাদিগকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না, করিতে আসিলে আমরা দন্তনখাদিরূপ অহিংস-অসহযোগ অস্ত্র দ্বারা অথবা ক্রন্দন-কোলাহলরূপ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উত্থিত করিব।

(ঝুমঝুমিধ্বনি এবং অষ্টমাসের শিশুর 'হুম্ হুম্' শব্দ)

তাহার পর আমার বক্তব্য এই যে, ইয়ুথরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়া জননী জন্মভূমির বদনে ঘোর কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে। ইহাতে তাহাদের ঘোর কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে। ('শেম্' 'শেম' !) এই দাবী করিয়া তাহারা আমাদের দেশের মুক্তি ও উন্নতি এক লক্ষ বৎসর পিছাইয়া দিয়াছে। এই অপরাধের ক্ষমা নাই!

(না না, ক্ষমা নাই!)

অতএব আসুন, হে আগামী কল্যের পরদিনের নাগরিক নাগরিকা ইনফ্যাণ্ট ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! আমরা আজ হইতে ইয়ুথগণের এই কাপুরুষতার ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করি। আসুন, আমরা ভারতমাতার ইনফ্যাণ্ট রেজিমেণ্ট (যাহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যমান) সমস্বরে বলি, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইব না, পরি-পূর্ণ স্বাধীনতার কমে আমাদের আত্মার তৃপ্তি নাই! ইয়ুথরা পলিটিক্যাল, সোসাল, রিলিজাস ও ইকনমিক পূর্ণস্বাধীনতার দাবী করিয়াছে, —আমরা তাহার উপর পলিটিক্যাল সোসাল রিলিজাস ইকনমিক—সকল ক্ষেত্রে পরি-পূর্ণ স্বাধীনতা চাই! এতদর্থে এই ইনফ্যাণ্ট কংগ্রেস হইতে আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, অতঃপর আমরা কোনও গভর্ণমেণ্টই মানিব না। আমাদের মন যাহা চাহিবে, দেহ যাহা চাহিবে, রুচি যাহা চাহিবে, প্রবৃত্তি যাহা চাহিবে,—আমরা কাহারও নিষেধ না শুনিয়া, কোন বাধা না মানিয়া, কোন অন্তরায় গ্রাহ্য না করিয়া তাহাই করিব।

('নিশ্চয়', 'নিশ্চয়' ! ঘন ঘন ঝুমঝুমিধ্বনি ও চুষিকাঠির ঠকঠকানি)

পলিটিক্স্ বা রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা পিতা, অভিভাবক বা গুরুজনের শাসন মানিব না। স্বাধীনতাই জীবন, বন্ধন মৃত্যু, স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে! ইচ্ছামত পাঠ করিব, ইচ্ছা না হইলে খেলা করিব, অভিভাবক বা মাষ্টার ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিব। প্রায়োপবেশন-ব্রত ধারণ আমাদের ধাতুসহ নহে, এই হেতু বাক্যালাপ-বর্জ্জনরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিব। আমাদিগকে অনুক্ষণ 'এটা করিও না', 'ওটা খাইও না', প্রভৃতি নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলিতে হয়, না হইলে চোখরাঙ্গানি, ভর্ৎসনা, কাণমলা, চড়, আহার-বন্ধ, অন্ধকার ঘরে ইন্টারণ করা ইত্যাদি দণ্ডে অযথা দণ্ডিত করা হয়। (শেম্! শেম্!) আমি

জিজ্ঞাসা করি, আমার গলার যত জোর আছে, তত জোরের সহিত,—ইহার নাম কি শাসন না স্বেচ্ছাচার ?

('স্বেচ্ছাচার' ! 'ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচার' !)

অতএব হে আমার প্রিয় ইনফ্যাণ্ট নাগরিক, নাগরিকাগণ ! আমাদিগকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্ব্বোন্নত শির তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে, বলিতে হইবে, আমরা ভবিষ্যতের নাগরিক-নাগরিকারা তোমাদের পুরাতন জরাজীর্ণ অলস অকর্ম্মণ্য নিস্তেজ নিরুদ্যম সেকেলে যথেচ্ছাচার শাসন মানিব না, আমরা আমাদের নূতন তেজীয়ান পথ আপনারা খুঁজিয়া লইব, আমরা আমাদের এক নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিব, যেথানে কাহারও কাহাকে মানিবার প্রয়োজন থাকিবে না, সকলেই হাম-বড়া মুরুব্বি হইয়া যে যাহার কার্য্য করিয়া যাইব।

(নিশ্চয় ! নিশ্চয় !)

মানুষের নিজের একটা চিন্তাশক্তি আছে, নিজের একটা ইচ্ছাশক্তি আছে, নিজের একটা কর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে। অনুক্ষণ তাহাতে বাধা দিলে তাহার সম্যক্ স্ফুরণ হইবে কি প্রকারে ? অর্ব্বাচীন প্রাচীনরা বলে, রোদে পুড়িলে আমাদের অসুখ হইবে, জলে ভিজিলে আমাদের নিউমোনিয়া হইবে ও তাহার জন্য তাহাদের ডাক্তার-খরচা লাগিবে, আগুনে হাত দিলে আমাদের হাত পুড়িয়া যাইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জলে নামিতে না দিলে লোক সাঁতার শিখিবে কিরূপে ? ডেঙ্গায় হাত-পা ছুড়িলে সাঁতার শেখা যায় না। অতএব এবার হইতে জননী ভগিনী পিসীমা দিদিমারা হাজার বাধা দিলেও আমরা জলে ভিজিতে ক্ষান্ত হইব না, রৌদ্রে পুড়িতে পশ্চাৎপদ হইব না, আগুনে হাত দিতে ভীত হইব না।

('কখনই হইব না' ! 'কখনই হইব না' ।)

ইহা ত গেল পলিটিক্যাল স্বাধীনতার কথা। তাহার পর সোসাল, রিলিজাস ও ইকনমিক। ইয়ুথ কংগ্রেস এ বিষয়ে অত্যন্ত কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছে। তাহারা বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিতে, বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে, জাতির বেড়া ভাঙ্গিয়া দিতে এবং গুরু-পুরোহিতকে জল-সই করিতে চাহে। ইহাই কি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ও উন্নত ভারতের পক্ষে সব ?

('কথনই না' ! 'কথনই না' !)

নিশ্চয়ই নহে। বিবাহমাত্রই বন্ধন। পরি-পূর্ণ স্বাধীনতার অভিধানে কোন বন্ধনের ছায়ামাত্র থাকিতে পাইবে না। আমরা বিবাহই চাহি না !

('বিবাহ চাহি না ।' 'কথনই চাহি না')

কে একটা শ্বেতকেতু নামক অর্ব্বাচীন না কি এই কুসংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ইহাতে নর ও নারী পরস্পর একটা অন্যায় বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আবহাওয়ায় কোন কিছু বন্ধনই থাকিতে পারে না। অতএব সধবাই হউক, আর বিধবাই হউক, কোন বিবাহই আর আমরা সমাজে থাকিতে দিব না। যতটুকু সময় পুরুষ ও নারীর দেহ-মন মিলনের ইচ্ছা হইবে, ততটুকু সময় পরস্পর বাধাহীন বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে, ইচ্ছা এক পক্ষে অন্তর্হিত হইলেই সম্বন্ধও অন্তর্হিত হইবে।

বন্ধুগণ ! ভগিনীগণ ! দাদা-দিদিদের মুখে কতবার আবৃত্তি শুনিয়াছি,—"ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় !" আর এক জন কবি ইহার প্রতীকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না !" অতি সত্য কথা। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি ভারতের নারী-জাগরণ হইয়াছে, নানা দিকে নানা ভাবে তাহার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু,—কিন্তু, গভীর পরিতাপের বিষয়, নারী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত জাগিতেছে না। তাহার একমাত্র কারণ, ভারতের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সে কুম্ভকর্ণ কে ?—আমরা এই শিশুরা !

(শেম, শেম)

কমরেড ও কমরেডাগণ ! এবার আইস, আমরা ইন-ফ্যাণ্টরা বীরবলে নিদ্রার জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠি। আমরা লক্ষ লক্ষ শিশু জাগিয়া উঠিব, দেখিব,—ভারত কেমন করিয়া ঘুমাইয়া থাকে ! এই শিশু-জাগরণ হইলেই জাতির জাগরণ হইবে। কেন না, পুরুষ ও নারীরা যেমন সমাজের অঙ্গ, শিশুরাও তেমনই সমাজের অঙ্গ। শিশুদিগকে বাদ দিয়া জাতি কথনও উন্নতির পথে ধাবমান হইতে পারে না।

তবে আপনারা ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, একটি বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে, এখানে যদিও আমরা মুখ খুলিব, তথাপি বাড়ী ফিরিয়া যেন কোনমতে আধ আধ বুলী

ছাড়া অন্য কথা না বলি ; কেন না, তাহা হইলেই আমাদিগকে স্কুলে পাঠাইয়া দিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা লোপ পাইবে। (না! না! স্পষ্ট উচ্চারণ করিব না!)

তাহার পর সমাজের আর একটা দিক্ লক্ষ্য করুন। জাতি বলিলেই এখন হইতে বুঝিতে হইবে মনুষ্যজাতি, সেকেলে বামুন শূদ্দুর ইত্যাদি অসভ্য জাতি নহে। জাতি একমাত্র মনুষ্যজাতি—

(কেন, পশুজাতি ? পক্ষিজাতি ?)

কোনও ইনফ্যাণ্ট প্রতিনিধি প্রস্তাব করিতেছেন যে, জাতির মধ্যে পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আদিও ধরা হউক। আমারও ইহাতে আপত্তি নাই। কেন না, বিশ্বপ্রেমিক এই বিশ্বে সকল শ্রেণীর সৃষ্ট জীবকেই আপনার বলিয়া মনে করেন। আপনারা এই প্রস্তাবে সম্মত আছেন ?

('অল্' ! 'অল' !)

তবে সাব্যস্ত হইল, ভবিষ্যতে জাতি বলিলেই বিশ্বজাতি বুঝাইবে, প্রেম বলিলেই বিশ্বপ্রেম বুঝাইবে, ধর্ম্ম বলিলে বিশ্ব-ধর্ম্ম বুঝাইবে, সমাজ বলিলে বিশ্বসমাজ বুঝাইবে। জাতি এক, সমাজ এক, ধর্ম্ম এক হইলে আর গুরু-পুরোহিতের মত পরভুজের ত প্রয়োজন থাকিবেই না, পরন্তু সামাজিকতার বা প্রার্থনা আরাধনারও কোন প্রয়োজন হইবে না। যাহাতে আমরা যথাসময়ে হরলিক্, মেলিন্‌স ফুড্ পাই, যাহাতে আমরা স্বেচ্ছামত পাঠ বা খেলা করিতে পাই, যাহাতে আমরা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার খেয়ালমত কার্য্য করিয়া যাইতে পাই, যাহাতে আমরা আমাদের মনের মত নূতন সমাজ গড়িয়া ইনফ্যাণ্ট নর-নারীর মধ্যে স্বেচ্ছা-সম্বন্ধ ও স্বেচ্ছা-বন্ধুত্ব গঠনে পূর্ণ অবসর ও সুযোগ পাই, যাহাতে আমরা জরাজীর্ণ প্রাচীন জাতি-ধর্ম্ম-বিবাহ আদি বন্ধনরূপ পাপকে পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া এই পরিপূর্ণ কলির শেষে পরিপূর্ণ-তায় এক নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহাই আমাদের লক্ষ্য হউক, তাহাই আমাদের কাম্য হউক। তাই বলি, উত্তিষ্ঠত,—

(সভামধ্যে ভীষণ গোলযোগ। ঝুমঝুমিধ্বনি, চুষিকাঠি ঠক্‌ঠকানি ও 'পি চক্‌চক্' শিষধ্বনির মাঝে হঠাৎ ১০টার ছোট হাজরি বার্লি-এরোরুট-মিশ্রিত দুগ্ধ ইত্যাদি আত্মীয় ও দাসী ইত্যাদির দ্বারা আনীত হওয়ায় ইনফ্যাণ্ট প্রতিনিধিগণের পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি। চীৎকার, ক্রন্দন, উল্লম্ফন, আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে সভাভঙ্গ !)

অন্তে

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

ভ্রাতৃত্ব

১

অকস্মাৎ কলগুঞ্জন থামিয়া গেল। নায়েব মহাশয় মৌজ করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, তিনিও সহসা হুঁকা তাড়াতাড়ি বৈঠকের উপর রাখিয়া দিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আমলা-গোমস্তরা যে যাহার কাযে অখণ্ড মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল।

জমীদার দেবীপ্রসন্ন কোন দিকে না চাহিয়াই সম্মুখবর্ত্তী চারি জন উপবিষ্ট নবাগতের দিকে ফিরিয়া মিষ্টস্বরে বলিলেন, "একটু বিলম্ব হয়ে গেছে, অপরাধ নেবেন না।"

তটস্থভাবে তাঁহাদের এক জন বলিলেন, "সে কি কথা!—আমাদের ও কথা ব'লে লজ্জা দেবেন না।"

দেবীপ্রসন্ন নায়েবের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "তামাক, পাণ—সব দেওয়া হয়েছে?"

নায়েব উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আগন্তুকগণ প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিলেন, "সে জন্য আপনার ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমরা সব পেয়েছি।"

দেবীপ্রসন্ন ধীরে ধীরে তাঁহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আমার ছ'টি ছোট ভাই আছে, তা বোধ হয় আপনারা শুনে থাক্‌বেন। দুই ভাইয়ের জন্যই দু'টি সদ্বংশের কন্যা আমার প্রয়োজন। একসঙ্গেই দুই ভাইয়ের বিয়ে দেবার আমার ইচ্ছা।"

আগন্তুকগণের এক জন বলিলেন, "সে জন্য আপনার ভাবনার কোন কারণ নেই। ঘোষ ও বসু দুই বংশের দু'টি মেয়েই আছে। এখন যদি মহাশয়ের পছন্দ হয়, আমরা ভীষণ কন্যাদায় থেকে মুক্ত হ'তে পারি।"

বক্তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন—তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী বসুজা মহাশয়েরও আননে আশা ও নৈরাশ্যের আলো ও ছায়া রেখাপাত করিতেছিল।

দেবীপ্রসন্ন রায় আপনার কৃতিত্বের ফলে আজ বাৎসরিক আশী হাজার টাকা মুনাফার সম্পত্তির মালিক, এ কথা দেশ-বিদেশের অনেকেই জানিত। বিশ বৎসরের মধ্যে, পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ-সমাজের এই স্বজনবিহীন, আশ্রয়শূন্য, অপরিচিত যুবক শুধু বিপুল কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও স্বাবলম্বনের সাহায্যে এখন সম্পত্তি ও প্রতাপশালী জমীদার হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কলিকাতার মত বিরাট্ সহরে জমীদারবাটীতে প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি, স্বল্পবেতনের চাকুরীয়া, আশ্রয়হীন ছাত্র, অন্নহীন দরিদ্র দুই বেলা উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার্য্য পাইত—কোথাও আশ্রয় না মিলিলে, এই জমীদারবাটীর গৃহে অনায়াসে বাসস্থান পাইত। প্রতি বেলা ৪ জন পাচক দুই মণ চাউলের অন্ন ও তদনুরূপ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিত। কোনও অতিথি অভুক্ত থাকিতে গৃহকর্ত্তা অন্ন গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক অতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী, পরিজন-সমূহ—প্রত্যেকের জন্য একই প্রকারের অন্ন-ব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্বামী যদি দুইটি আম্র ভোজন করিতেন, তবে ভিক্ষুক অতিথির ভাগেও তাহার সংখ্যা সমানই হইত। লোকের মুখে মুখে এ সকল কথা রূপকথার কাহিনীর মত দেশ-দেশান্তরেও রটিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এরূপ ধনশালী, কীর্ত্তিমান, সদ্বংশজ জমীদারের গৃহে কন্যা-সম্প্রদানের ইচ্ছা যে কোন অবস্থার লোকের পক্ষে স্বাভাবিক—দরিদ্রের ত কথাই নাই।

দেবীপ্রসন্নের স্বভাবপ্রসন্ন সুন্দর আনন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মেয়ে দু'টি সদ্বংশজাতা এবং অপ্রিয়দর্শনা না হলেই আমার আর কোন আপত্তি হবে না।"

বসুজা বলিয়া উঠিলেন, "আমরা কিন্তু বড় গরীব—"

ঈষৎ হাসিয়া, বাধা দিয়া দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "আমার ভাইরা মেয়ে বিয়ে করেই আনবে, কন্যার পিতার অবস্থাকে নয়। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বিশিষ্টরূপে কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করবার, সকল রকম ভার বহন করবার ক্ষমতা তাদের আছে।

সে জন্য কুণ্ঠিত হবার কোন প্রয়োজন আপনাদের নেই, বোস্‌জা মশাই।"

হর্ষোৎফুল্লমুখে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে বসুজা বলিলেন, "তা হ'লে কবে দয়া ক'রে মেয়ে দেখতে আমাদের ওখানে পায়ের ধূলো দেবেন?"

জমীদার কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দেখুন, আপনারা যে ভাবে কথা বল্‌ছেন, তাতে আমায় অপরাধী হ'তে হচ্ছে। যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে, আপনারা আমার ছোট ভাইদের শ্বশুর হবেন। এ অবস্থায় পায়ের ধূলো দেবার কথা ব'লে আমায় শুধু লজ্জা নয়, আমার ঘাড়ে অপরাধের বোঝা চাপাচ্ছেন। তা ছাড়া আপনারা বয়সেও আমার চেয়ে বড়। কোন দিক্‌ দিয়েই আমি ও রকম সম্ভাষণের যোগ্য নই।"

আগন্তুকগণ বুঝিলেন, ইহা দেবীপ্রসন্নের বিনয় নহে—আন্তরিক উক্তি। তাঁহারা সঙ্কোচে, লজ্জায় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

দেবীপ্রসন্ন কথার মোড় ঘুরাইয়া সহজভাবে বলিলেন, "আমি একটা ভাল দিন দেখে পরে আপনাদের সংবাদ দেব। এক দিনেই দুই মেয়ে দেখে আস্‌ব। আপনারা কল্‌কাতাতেই আছেন ত?"

ঘোষজা ও বসুজা উভয়েই পাটের কলে সামান্য বেতনে কায করিতেন। উপস্থিত সপরিবারে তাঁহারা কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন।

ঘোষ ও বসুজা মহাশয়ের সহিত যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?"

দেবীবাবু বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে।"

"আপনার সন্তানাদি কি? কোথায় বিবাহ করেছেন?"

সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা আপন মনে কায করিতেছিল। এই প্রশ্নে তাহারাও চকিতভাবে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

দেবীপ্রসন্নের সুগৌর মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তমধ্যে যেন একটা মৃদু হাস্যরেখা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। তিনি সহাস্যমুখে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সন্তান আমার হয় নি—হবার সম্ভাবনাও নেই। বিবাহ কি সকলের পক্ষেই প্রয়োজন? আপনারা কিছু ভাব্‌বেন না, আমি ছোট ভাইদের বিয়েতে অনুমতি আগেই দিয়েছি।"

এই বাড়ীতে দেবীপ্রসন্নের বিবাহ-প্রসঙ্গের আলোচনা এই প্রথম। এ পর্য্যন্ত এই সদানন্দ, কিন্তু রাশভারী চির-কুমার জমীদারের সম্মুখে এ প্রসঙ্গে কেহ আলোচনা করিতে সাহস করে নাই।

একবার—বহুকাল পূর্ব্বে, কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের মধ্যে যখন এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছিল, সেই সময় দেবী-প্রসন্ন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়েন। আপন কার্য্যে অব-হেলা করিয়া যাহারা বাজে অসার কথার আলোচনা করে, তাহারা ক্ষমার অযোগ্য, জমীদারের মুখে এই কঠোর মন্তব্য শ্রবণের পর ভ্রমক্রমেও কেহ তাঁহার কাছে এ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। দূর-সম্পর্কের যে সকল আত্মীয়-স্বজন জমীদারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, তেমনই ভয়ও করিত। বন্ধু বলিতে দেবীপ্রসন্নের কেহ ছিল না। অক্লান্ত কর্ম্মই তাঁহার সুহৃদ্‌। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহার অবসর-বিনোদনের সহায় ছিল। ইহা আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই বিশেষরূপে জানিত।

এই সুগঠিত-দেহ, গৌরবর্ণ, ইন্দিরার আশীর্ভাজন পুত্র—যৌবন যাঁহার দেহে তখনও তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, যশঃ ও কর্ম্মপ্রতিভা যাঁহার নামকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে—সে ব্যক্তি চিরকুমারব্রত ধারণ করিয়া ভোগবিলাসকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, ইহা কোনও সাংসারিক ব্যক্তি কল্পনা করিতে অসমর্থ।

আগন্তুকগণ কয়েক মুহূর্ত্ত বিস্ময়স্তিমিত-নেত্রে দেবীপ্রসন্নের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জমীদার মুখ ফিরাইয়া নায়েব মহাশয়কে অস্ফুটস্বরে কি বলিয়া দিলেন। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা যখন অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন, তখন পাত্র দু'টিকে দেখেই যান। দেখা ত শুধু এক পক্ষেরই কর্ত্তব্য নয়।"

ঘোষজা ও বসুজা মহাশয়ের মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইল। তাঁহারা মনে মনে ইহাই কামনা করিতেছিলেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রস্তাব করিবার সাহস হইতেছিল না।

অল্পক্ষণ পরে দুই জন যুবক কাছারী-ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের দিব্য কান্তি ও বিনয়নম্র ভঙ্গী আগন্তুকদিগকে মুগ্ধ করিল।

দেবীপ্রসন্ন সহাস্যমুখে বলিলেন, "প্রণাম কর।"

অনুজগণ একে একে আগন্তুকদিগকে প্রণাম করিয়া জ্যেষ্ঠের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

জমীদার বলিলেন, "শ্যামাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন আমার সর্ব্বস্ব। ইহাদের সুখী কর্‌তে পারলেই আমার সকল সাধ মেটে।—তোমরা ব'স।"

উভয় ভ্রাতা আসন গ্রহণ করিলে, দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "একবারে এদের মূর্খ ভাববেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। আমারই ভাই কি না!"

আগন্তুকগণ প্রসন্নমুখে বলিলেন, "সে জন্য আমাদেরও দুঃখ নেই। এখন মশায়ের মেয়ে পছন্দ হলেই আমরা কৃতার্থ হব।"

২

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পুরুষের পক্ষে খুব অধিক নহে। এ বয়সে বিবাহ করিলে এই ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের কোন লোকও কোন প্রকার অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু কনিষ্ঠ সহোদর-যুগলকে বিবাহিত করার পূর্ব্বে অথবা পরেও যখন দেবীপ্রসন্ন নিজের দাম্পত্য-জীবন অবলম্বন সম্বন্ধে কোনও প্রকার উদ্যোগ আয়োজন করিলেন না, তখন সে পল্লীর অনেকেই বিস্মিত হইল। পরিজনবর্গের নিকট কিন্তু এ বিষয়টা বিন্দুমাত্র বিসদৃশ বোধ হইল না। ১২ বৎসর বয়স হইতে যে কিশোর, জীবন-সংগ্রামে একাকী অবতীর্ণ হইয়াছিল, কয়েক বৎসর পরেই তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় সে ঐশ্বর্য্যকে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দশ বৎসর পরে তাহার সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যগগনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই গুণবান্, কমলার স্নেহভাজন পরম সুন্দর যুবাকে জামাতৃপদে বরণ করিবার আগ্রহ তখন বহু ব্যক্তিরই হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কেহ কেহ তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়া প্রস্তাবও উত্থাপিত করিয়াছিল; কিন্তু তরুণ যুবক কেন যে তখন বিবাহ-প্রস্তাবে কর্ণপাতও করেন নাই, ভোগসুখের অজস্র উপাদান থাকিতেও কেন যে অতি সাধারণভাবে দিন-যাপন করিতেন, তাহার কোন হেতুই কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। নানা ব্যক্তি নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিত; কিন্তু এই যুবকের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে এমন শৃঙ্খলা ও সরলতা ছিল যে, কাহারও কল্পিত মন্তব্যে বস্তুতান্ত্রিকতার আভাসমাত্রও দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেই স্বচ্ছন্দ, অনাড়ম্বর এবং অনুদ্দাম জীবন-গতির প্রবাহে কেহ কখনও বিরুদ্ধ স্রোতোধারার তরঙ্গ উঠিতে দেখে নাই।

অনেকে মনে করিয়াছিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃযুগলকে সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার পর, হয় ত দেবীপ্রসন্ন স্বয়ং বিবাহ করিতে পারেন। ভোগস্পৃহা মানুষকে কোন না কোন সময়ে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। নিঃসঙ্গ যৌবন, প্রলোভনের মদিরা-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকে, সংসারী জীবের পক্ষে ইহা ত নিত্যপ্রত্যক্ষ ব্যাপার। দেবীপ্রসন্ন যখন সন্ন্যাসী নহেন, তখন কি ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন? বিশেষতঃ এত ধন-দৌলত, সম্পত্তি, সুখের উপাদান বিদ্যমান থাকিতে মানুষ কেনই বা তাহা ভোগ করিবে না? সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে, লগ্নী কারবারে বিপুল অর্থ খাটিতেছে, কোম্পানীর কাগজের পরিমাণ অল্প নহে।

কিন্তু শ্যামাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্নের বিবাহের পর সাত বৎসর চলিয়া গেলেও, যখন দেবীপ্রসন্নের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না, তখন অনেকে হতাশ হইয়া পড়িল। কেহ কেহ শ্যামাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্নকে উপদেশ দিত যে, দাদাকে সংসারী হইবার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা দেবীপ্রসন্নকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, মাথা তুলিয়া জ্যেষ্ঠের কাছে কখনও কোন কথা বলিবার সাহস তাঁহাদের হইত না। শুধু জ্যেষ্ঠের আদেশপালনই তাঁহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এই বিপুল সম্পত্তি দাদার অক্লান্ত চেষ্টার ফল। অবশ্য জ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে জমীদারী কার্য্য শিক্ষা দিয়া কি ভাবে সম্পত্তি-বৃদ্ধি ও রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহাদিগকে হাতে-কলমে শিখাইয়া দিয়াছেন, জমীদারীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাঁহারা স্বয়ং কার্য্য করিয়াও থাকেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠকে কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার দুঃসাহস তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা মনে করিতেন, উহা অনধিকার-চর্চ্চা। সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনা নিরর্থক মনে করিয়াছিলেন।

দেবীপ্রসন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃযুগলের সংসার-সুখেই যেন আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ উমাপ্রসন্নের পত্নী ষষ্ঠীদেবীর কৃপালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্যামাপ্রসন্নের অদৃষ্টের প্রতি দেবী বিমুখ হইয়াই রহিলেন। দেবীপ্রসন্ন অক্লান্ত পরিশ্রমের অবকাশে ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগের কলহাস্যে সানন্দে যোগ দিয়া যে আনন্দ লাভ করিতেন, তাহার পরিমাণ

অন্তে হয় ত উপলব্ধি করিতে পারিত না। ৪২ বৎসর বয়সেও প্রথম যৌবনের উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি দেবীপ্রসন্নের দেহ ও মনে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। ৩৪ ও ৩২ বৎসরের যুবা শ্যামাপ্রসন্ন এবং উমাপ্রসন্নের তুলনায়, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য-পূত দেহে কালের রেখাপাত এতটুকু অশোভন ইঙ্গিত করিতে যেন সাহস পায় নাই।

মধ্যাহ্ন-ভোজন-শেষে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রী দেবীপ্রসন্নের কাছে বসিয়া খেলা ও গল্প করিতেছিল। দেবীপ্রসন্ন তাহার সহিত অর্থহীন কত কথাই আলোচনা করিতেছিলেন। পাঁচ বৎসরের কমলা সহসা বলিয়া উঠিল, "জেতা মণি, বল-মা নেই কেন?"

বড়-মা!—এই বালিকাকে কে এ কথা শিখাইল?

দেবীপ্রসন্ন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আজ পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে বড়-মা শব্দ কেহ উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া তিনি শুনেন নাই। যাহা শুধু কল্পনা, অবাস্তব—কোন কালে যাহা ছিল না, থাকিবার সম্ভাবনা নাই, এই জ্ঞানহীনা বালিকা আজ কোথা হইতে সেই প্রশ্ন উত্থাপিত করিল?

আদরিণী কমলা তাহার বড় জ্যেঠা মহাশয়কে স্তব্ধভাবে থাকিতে দেখিয়া, বিস্মিত, কৌতূহলী নেত্র তুলিয়া স্থির-দৃষ্টিতে সেই সদাপ্রফুল্ল মুখের উপর চাহিল।

"মা কমু, কে তোমাকে এই কথা শিখিয়েছে?"—জ্যেঠা মহাশয়ের কণ্ঠস্বর পূর্ব্ববৎ কোমল, স্নেহধারাসিক্ত।

বালিকা অপূর্ব্ব ভঙ্গিসহকারে বলিল, "মেজ-মা বল্‌তিল, বল-মা নেই। বল-মা কোতা গেল, জেতা মণি?"

সস্নেহে কমলাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া দেবীপ্রসন্ন তাহার ক্ষুদ্র, কুন্দশুভ্র গণ্ডদেশে অজস্র চুম্বন করিয়া বলিলেন, "পাগলী মা, বিস্কুট খাবি?"

বালিকা কিন্তু এ প্রলোভনে ভুলিল না। সে বলিল, "না, জেতা মণি! তুমি বল, বল-মা কেন নেই?"

দেবীপ্রসন্ন বুঝিলেন, অন্তঃপুরে এ সম্বন্ধে আলোচনা না হইলে, বালিকা কখনই এ সকল প্রশ্ন তুলিবার অবকাশ পাইত না। তিনি সম্ভবতঃ মনে মনে কিছু ক্ষুন্ন হইলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পরিবারবর্গের কেহই অনুরোধ করিতে সাহস করে নাই। এ প্রস্তাবের আলোচনা করা পর্য্যন্ত যে নিষিদ্ধ, তাহা জমীদারবাটীর সকলেই জানিত। তবে কেন এই বালিকার সম্মুখে এ সকল ব্যাপারের আলোচনা হয়?—দেবীপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি জানিতেন, সকলেই তাঁহাকে বড় বাবু বলিয়া সম্বোধন করে। কনিষ্ঠদিগকেও যথাযোগ্য সম্ভাষণ সকলে করিয়া থাকে। তিনিই শ্যামাপ্রসন্নের স্ত্রীকে 'মেজ-মা' বলিয়া ডাকিবার জন্য দাসদাসী প্রভৃতিকে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই কি বড়-মা'র সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে?

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কোলে করিয়া দেবীপ্রসন্ন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

বালিকা কয়েক বার প্রশ্ন উত্থাপন করিবার পর, জ্যেঠা মহাশয়ের তরফ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া শিশুসুলভ চাঞ্চল্যবশে সে তাহার প্রশ্নের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু দেবীপ্রসন্নের অন্তরের আলোড়ন নিবৃত্ত হইয়াছিল কি?

৩

গুরুগর্জ্জনে আকাশ ও মেদিনী শিহরিয়া উঠিতেছিল। দিগন্তব্যাপী মেঘ দুর্ভেদ্য—জটাশীর্ষ। বাতাসের প্রচণ্ডতা ক্রমেই যেন বাড়িতেছিল।

রুদ্ধদ্বার কক্ষমধ্যে দেবীপ্রসন্ন নীরবে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে প্রদীপ্ত আলোকাধার—বাতায়নের সামান্য ছিদ্রপথে বাহিরের মত্ত ঝটিকার রুদ্ধগতির প্রবাহ মাঝে মাঝে কাচ-আবরণে ঘেরা আলোকশিখাকে আন্দোলিত করিতেছিল।

দেবীপ্রসন্নের প্রসন্ন ললাটে চিন্তার রেখা। বাহিরের দুর্য্যোগ সম্ভবতঃ তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করে নাই। আজ তাঁহার সযত্ন-প্রতিষ্ঠিত সংসারে সর্ব্বপ্রথম স্বার্থবুদ্ধির সংঘাতের পরিচয় পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ, আহত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন কি? বাহিরের দুর্য্যোগ কি আসন্ন বিপ্লবের কাছে তুচ্ছ বোধ হইতেছিল?

তাঁহারা তিনটি সহোদর—বাহিরের লোক দেখিয়া বলিয়া থাকে, এক বৃন্তে তিনটি পুষ্প। সৃষ্টির বিচিত্র রহস্যের মধ্যে ইহা অত্যন্ত অপূর্ব্ব। শ্যামাপ্রসন্ন, উমাপ্রসন্ন তাঁহার অন্তরের কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা শুধু বিশ্বস্রষ্টা ব্যতীত আর কে অনুমান করিবার শক্তি রাখে? অনাবিল প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসার পবিত্র বন্ধনে তাহারা সারা জীবন এই দুঃখময়, স্বার্থসর্ব্বস্ব সংসারে একটা আদর্শ স্থাপন করিয়া যাইবে, প্রেমের বন্যায় সংসারকে মধুময় করিয়া তুলিবে, এই আশায় দেবীপ্রসন্ন কি এই পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন নাই?

এত দিন তাঁহার সে সাধনা ত অব্যাহতই ছিল! কিন্তু তাঁহার ৪৭ বৎসর বয়সে—৩২ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা, তপস্যা—সাধনার ফল, কোন্ দুষ্টবুদ্ধি, স্বার্থসর্ব্বস্ব পাপীর লোলুপদৃষ্টির কলুষিত আঘাতে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে?

শ্যামাপ্রসন্ন নিঃসন্তান। উমাপ্রসন্ন ইতিমধ্যে ৫টি সন্তানের জনক। দেবীপ্রসন্নের সকল আনন্দ ও তৃপ্তির নির্ঝর-স্বরূপ এই পঞ্চ সন্তান তাঁহার পিতৃত্বের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে। তিনি কনিষ্ঠের প্রত্যেক সন্তানের অন্নপ্রাশনের সময় প্রচুর অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, প্রত্যেকের জন্য একখানি করিয়া স্বতন্ত্র বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে অপরের কি বলিবার আছে? সমস্ত সম্পত্তি তিনি আপন প্রতিভা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে অর্জ্জন করিয়াছেন—নিজের ভোগের জন্য নহে। দুই ভ্রাতাকে সুখী করা ছাড়া তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কখনও হৃদয়ের প্রান্তে ক্ষণিকের জন্যও উঁকি মারিয়াছে কি? সেই সন্তানতুল্য পরম স্নেহ-ভাজন ভ্রাতাদের সন্তানগণ তাঁহার বক্ষঃপঞ্জরের এক একখানি অস্থি, ইহা বাহিরের লোক কেমন করিয়া বুঝিবে? তাহাদের সুখের জন্যই ত এই বিপুল সম্পত্তি।

তাঁহার সহোদরযুগল ত্রেতার আদর্শ, ভরত-লক্ষ্মণের ন্যায় অগ্রজভক্ত। ভ্রমেও তাহারা কখনও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকার ইঙ্গিতেও সামান্যমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই, ইহা কি দেবীপ্রসন্ন অবগত নহেন? বধূমাতারাও পরম আনন্দে ও প্রীতিতে তাঁহার সংসারে নন্দন সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আজ কাছারীঘরে প্রবেশ করিবার সময় কেন এমন প্রসঙ্গের আলোচনা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল?

কনিষ্ঠ উমাপ্রসন্নের অংশ বাড়িয়া যাইতেছে!

এমন শোচনীয় অধঃপতনের চিত্র—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ইহার অভাব নাই। কিন্তু ইহা তাঁহার পরিবারে কখনই ঘটিতে দিবেন না বলিয়াই কি তিনি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছেন না? অংশ?—এক মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া, একই স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া, হীন স্বার্থবুদ্ধির এই লজ্জাকর অভিনয় যাহারা করে, দেবীপ্রসন্ন তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন কি?

কাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এই ভেদনীতির জঘন্য পরিকল্পনা তাঁহার শান্তিময়, সুপ্রতিষ্ঠিত সংসারে অশান্তির অনল প্রজ্বালিত করিবার জন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে? মধ্যম ভ্রাতা নিঃসন্তান। তাহার দত্তক পুত্র গ্রহণের প্রস্তাবের আলোচনা, আমলা-গোমস্তারা করিতেছে, অথচ তিনি কিছুই জানেন না!

বাহিরে বজ্র ভীষণ রবে গর্জ্জিয়া উঠিল।

দেবীপ্রসন্নের ললাট কুঞ্চিত হইল। হাঁ, এত দিন বৃথাই তিনি লোকচরিত্র অধ্যয়ন করেন নাই। তাঁহারই অদূরদর্শী নীতির ফলেই এত দিন পরে ক্রূর সর্প ফণা উদ্যত করিতে পারিয়াছে। শ্যামাপ্রসন্নের শ্যালককে সদর নায়েবের পদে নিযুক্ত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। পরমাত্মীয় দরিদ্র যুবক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন উপায় করিতে না পারিয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। অনুকম্পাবশে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণায় তিনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। হিংসা-বুদ্ধিবশে সে-ই আজ এই আগুন জ্বালিয়াছে।

দেবীপ্রসন্ন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাচীরবিলম্বিত ঘটিকা-যন্ত্রে সশব্দে একটা বাজিয়া গেল। রুদ্ধ বাতায়নে বাতাস বল পরীক্ষা করিতেছিল। বৃষ্টির ঝম্-ঝম্ শব্দের সহিত বজ্রের গর্জ্জন অবিশ্রান্তভাবেই চলিতেছিল। প্রৌঢ় জমীদার হৃদয়ের উত্তেজনা শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

সহসা বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঠিক এইরূপ দুর্য্যোগময়ী এক রজনীর চিত্র তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরের অভ্যন্তরে দুইটি বালক নিদ্রিত—৭ বৎসরের শ্যামা ও ৫ বৎসরের উমা। তাহাদের শয্যা ছিন্ন কন্থা। অদূরে অনুরূপ ছিন্ন কন্থার উপর মুমূর্ষু জননী। পার্শ্বে ১৫ বৎসরের দেবীপ্রসন্ন। ঝম্ঝম্ করিয়া বৃষ্টির ধারা পর্ণকুটীরকে অভিষিক্ত করিতেছিল—ছিদ্রপথে দরিদ্র কুটীরের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা ভিজিয়া উঠিয়াছিল। ম্লান দীপালোক-শিখা মৃত্যুপথযাত্রী রমণীর মুখের উপর নৃত্য করিতেছিল। চারিদিকে দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের তীব্র ভ্রূকুটি!

সে দৃশ্য দেবীপ্রসন্নের অন্তরে কি চিরমুদ্রিত নাই?

জননী জ্যেষ্ঠ সন্তানের দক্ষিণ করপল্লব শীর্ণ করে ধারণ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাই ত দেবীপ্রসন্নের ঝঞ্ঝাপূর্ণ কর্ম্মসমুদ্রের মধ্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মত জীবন-তরণীকে পরিচালিত করিয়াছে—পথ দেখাইয়া দিয়াছে। জননীর আবেগপূর্ণ আবেদনকে বালক দেবীপ্রসন্ন ভগবানের আদেশ বলিয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছিল। অবোধ ভ্রাতৃযুগলের

মঙ্গলের জন্য সে জননীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজীবন দেবীপ্রসন্ন তাহাতে অবিচলিত নহেন কি? বিবাহ করিলে পাছে স্বোপার্জ্জিত অর্থ ও সম্পত্তিতে লোভ জন্মে, পাছে সহোদরযুগলকে আংশিকভাবেই বঞ্চনা করিবার মোহ হৃদয়কে অভিভূত করে, তাই ত—

থাক্, সে চিন্তার প্রয়োজন ত অনেক দিনই শেষ হইয়া গিয়াছে! কৈশোর জীবনের সকল কথা এখন স্মরণ করিয়া কোন লাভ নাই। আত্মজীবনের ভোগসুখের লাভ-লোকসানের হিসাবনিকাশ বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহারই চরণে দেবীপ্রসন্ন নিবেদন করেন নাই কি? লোভ, মোহ প্রথম-যৌবনে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বৈ কি! অবশ্য তখন কৈশোরের স্বপ্নকে সার্থক করিবার যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ আসিয়াছিল। সে স্বাভাবিক লোভ বা মোহের জন্য পৃথিবীর কোন লোকই তাঁহাকে দোষ দিতে পারিত না। বরং তাহা না করায় অনেকেই তাঁহাকে নির্ব্বোধ আখ্যা দিয়াছে। তা দিক্, জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহে ধন্য হইতে হইলে, সেই পথ ছাড়া তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না।

কড়-কড় শব্দে নিকটেই কোথাও বাজ পড়িল।

দেবীপ্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। না, ইহার প্রতীকার করিতেই হইবে। তাঁহার সারাজীবনের সাধনাকে তিনি কখনই ব্যর্থ হইতে দিবেন না।

কাহার উদ্দেশে দেবীপ্রসন্ন উভয় কর যুক্ত করিয়া নিমীলিত-নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহার নয়নপথে তখন ধারায় ধারায় অশ্রু নামিয়া আসিল।

৪

'মেঘ ও রৌদ্রের' ক্রীড়া সকলেই দেখিয়াছে—কবি ও অকবি সকলেরই নেত্রপথে কখন না কখনও এ দৃশ্য পড়িয়াছে; কিন্তু দেবীপ্রসন্নের আননে আজ আলোক ও অন্ধকারের যে খেলা সকাল হইতে চলিতেছিল, শ্যামাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন কখনও তাহা পূর্ব্বে দেখেন নাই। দাদা আজ মধ্যাহ্নে তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরে সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন কেন? উভয় ভ্রাতা একটু বিচলিতভাবেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের পারিবারিক ব্যবহারাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘরের মধ্যে বসিয়া জ্যেষ্ঠের সহিত কি আলোচনা করিতেছেন। পুরাতন সদর নায়েব দে মহাশয় বকুলগঞ্জের কাছারীতে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চিরপরিচিত মূর্ত্তিও অনেক কাল পরে তাঁহারা দেখিলেন। শ্যামাপ্রসন্নের শ্যালক তারাচরণ বসু সদর নায়েবের পদে বহাল হইবার পর হইতে দে মহাশয় মফঃস্বলের ভার লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু আজ এ সভায় তাঁহার কি প্রয়োজন?

কনিষ্ঠ সহোদরযুগলকে আসিতে দেখিয়া দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "ব'স, আজ একটা জরুরী কায আছে, ভাই।"

দাদার মুখে তখন আলোক-রেখাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে সদর নায়েব তারাচরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "বসুন, তারাচরণ বাবু।"

শ্যামাপ্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন। এ পর্য্যন্ত দাদা কখনও বয়সে অনেক ছোট তারাচরণকে এমন সম্ভ্রমভরে সম্বোধন করেন নাই ত! উমাপ্রসন্ন দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের আননে সে আলোকদীপ্তি নাই, মেঘের কালো ছায়া যেন প্রসন্ন রৌদ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

গম্ভীরভাবে দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "তারাচরণ বাবু, আপনার কাছে আমি যা যা চেয়েছিলাম, সব সংগ্রহ ক'রে এনেছেন?"

সদর নায়েব বড় কর্ত্তার এমন ব্যবহার কয় বৎসরের মধ্যে দেখে নাই। কি জানি কেন, তাহার বুকের মধ্যে সমুদ্র-মন্থনের সূত্রপাত হইল। আত্মসংবরণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সব আমি ঠিক ক'রে এনেছি।"

বিনা ভূমিকায় দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "মিত্র-বংশের জমীদারীর মোট আয় কত?"

শ্যামাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন বিস্মিতভাবে জ্যেষ্ঠের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই বসিয়া রহিলেন।

"আজ্ঞে, জমীদারীর আয় প্রায় ৯৪ হাজার টাকা।"

"লগ্নী কারবারে কত টাকা খাট্‌ছে?"

পকেট হইতে একটা ফর্দ্দ টানিয়া বাহির করিয়া তারাচরণ বলিল, "এক লাখ পঁচাশী হাজার।"

খোলা জানালার দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্ত নিবিষ্টমনে দেবীপ্রসন্ন যেন কি চিন্তা করিলেন। তার পর বলিলেন, "জমীদারী ও লগ্নী কারবার কার নামে চল্‌ছে?"

"আজ্ঞে, সবাই জানে, সম্পত্তি আপনারই অর্জ্জিত—

জমীদারী ও লগ্নী কারবার সবই ত আপনার নামে চ'লে আসছে, আমি দেখছি।"

কনিষ্ঠ সহোদরযুগল অবাক্-বিস্ময়ে জ্যেষ্ঠের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

দেবীপ্রসন্নের ওষ্ঠপ্রান্তে সহসা হাস্যের একটা মৃদু তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। তিনি প্রবীণ উকীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে নায়েব মশায় সে কথা মানেন ?"

কথাটা তিরস্কারসূচক অথবা ব্যঙ্গপূর্ণ ?—তারাচরণ বিহ্বল-ভাবে দেবীপ্রসন্নের দিকে চাহিয়া রহিল।

"যাক্, কোম্পানীর কাগজ কত টাকার আছে, তার হিসাব আপনি রাখেন ?"

শ্যামাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতে এ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠকে কথনও এভাবে আলোচনা করিতে শুনেন নাই। তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

কনিষ্ঠ সহোদরযুগলের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেবীপ্রসন্ন পুনরায় সদর নায়েবের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

তারাচরণ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কোম্পানীর কাগজের ঠিক হিসাবটা আমার জানা নেই।"

দেবীপ্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক। কাগজের সুদ আমি নিজেই নিয়ে আসি। তবে দে মশাই হয় ত জানেন। কারণ, ও কায আগে উনিই করতেন।"

পুরাতন সদর নায়েব ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "প্রায় ৭৷৮ বছরের খবর ত আমি রাখিনে, তবে তার আগে ৫০ হাজার টাকার কাগজ ছিল।"

"ঠিক কথা। তার পর আর ১০ হাজার বেড়েছে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নিমীলিত-নেত্রে দেবীপ্রসন্ন বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চিত্তে তখন কি ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া সকলেরই মুখে অল্পাধিক উদ্বেগের চিহ্ন প্রকাশিত হইল।

কিয়ৎকাল পরে প্রৌঢ় জমীদার অত্যন্ত মৃদুস্বরে, যেন আত্মগতভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "যে নিজের হাতে সম্পত্তি উপার্জ্জন করে, সঞ্চয় করে,—সে যদি নিজের ইচ্ছামত কিছু খরচ করে, তাতে আপত্তি করবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় কি ?"

শ্যামাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন। উভয়ে প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিলেন, "কে বলেছে, দাদা ? কার এমন স্পর্দ্ধা ?—"

তারাচরণ যেন সচকিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর রেখায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কণ্ঠে জোর দিয়া সে বলিল, "আপনার টাকা, আপনি খরচ করবেন, তাতে—"

মৃদু হাসিয়া দেবীপ্রসন্ন বাধা দিয়া বলিলেন, "থামুন বোস মশাই! অভিনয় আমি পছন্দ করি না।"

তাহার পর শ্যামাপ্রসন্নের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পোষ্যপুত্র তুমি নিতে চাও, শ্যাম্ ?"

বিস্মিতভাবে শ্যামাপ্রসন্ন বলিলেন, "আমি ? কে এ কথা আপনাকে বলেছে, দাদা ?"

"তুমি যদি নিতে ইচ্ছা ক'রে থাক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দিন দাঁড়াই নি। আমি জানি, তোমার মনে সে ইচ্ছে নেই; কিন্তু একবার কথাটা যখন উঠেছে, তখন তার শেষ সেখানেই নয়—আবার ও কথা উঠবে, এবং হয় ত কালে তা সার্থকও হবে। তাই আগে হতেই আমি সমস্ত সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে চাই। বাঁড়ুয্যে মশাইকে তাই এখানে আজ পায়ের ধুলো দিতে হয়েছে।"

কক্ষ নিস্তব্ধ—কিন্তু প্রত্যেকেই যেন একটা অশরীরী চাঞ্চল্যের বেগ অনুভব করিতে লাগিল।

দেবীপ্রসন্ন মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"মিত্র-বংশ এক দিন নিঃস্ব, সহায়হীন, আশ্রয়চ্যুত হয়ে ভেসে বেড়িয়েছিল। আজ তারা লক্ষপতি। মানুষ কল্পনা করে এক, হয় আর এক রকম। অভগ্ন, অক্ষুন্ন ঐশ্বর্য্য বা শক্তি কল্পনায় গড়া সহজ, বাস্তব জগতে তাকে মূর্ত্তি দিয়ে রাখা যায় না। যাক্—বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার কায আরম্ভ করুন।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পকেট হইতে যে কাগজের তাড়া বাহির হইল, তাহা তিনি পড়িয়া শেষ করিলেন।

পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র উভয় ভ্রাতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিলেন, "দাদা!"

হস্তের ইঙ্গিতে কনিষ্ঠ সহোদরযুগলকে বসিতে বলিয়া দেবীপ্রসন্ন কহিলেন, "চুপ কর, ভাই। এত দিন তোমরা আমার কোন কথার প্রতিবাদ কর নি, আশা করি, আজও

বসুমতী প্রেস]　　অভিসারে　　[শিল্পী—শ্রীগোপালচন্দ্র কানুনগো।

করবে না। আমার কাষ—যা আমার করা দরকার, করেছি। এখন আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।"

উমাপ্রসন্ন আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু এ ত ঠিক হ'ল না, দাদা! বিষয় আপনার—সব আপনার। কিন্তু আমাদের দুই ভাইকে সব দান ক'রে আপনি নিজে নিঃস্ব হবেন, এ আমরা সহ্য করব কেমন ক'রে?"

উমাপ্রসন্নের নেত্রপথে দরদর ধারে অশ্রুবন্যা নামিয়া আসিল।

স্নেহবিনম্র স্বরে, মৃদু হাসিয়া দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "তোমরা দুই ভাই ছাড়া, আমার আর কে আছে? আমার সম্পত্তির প্রয়োজন ত তোমাদের জন্যই।"

কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া কক্ষমধ্যে ঘোর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে এমন একটা সঙ্গীতের বিচিত্র মাধুর্য্য ও পবিত্রতার মোহ ছিল যে, সহসা কেহ যেন তাহা কোন প্রকার শব্দের দ্বারা ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হইতে চাহিতেছিল না।

দেবীপ্রসন্ন অল্পক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "শ্যামু, উমা, কিছু ভেব না, ভাই! আমি সকল দিক্ বিবেচনা করেই ব্যবস্থা করেছি। আগামী পঞ্চমী তিথিতে আমি কাশীযাত্রা করব। যত দিন আমি সেখানে থাকব, তোমরা মাসে ৫০টি ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিও। তার বেশী প্রয়োজন আমার হবে না। তবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত কাযগুলি যেন কখনও বন্ধ না হয়, তোমরা দুই ভাই তা দেখ্‌বে। তোমাদের অংশমত টাকা খরচ ক'রে দেশের পূজা-পার্ব্বণ চালাবে। শ্যামু, তোমার সন্তানাদি নেই; সুতরাং আমার উইলে এ সকল চালাবার দায়িত্ব তোমার উপর দিতে হয়েছে।"

শ্যামাপ্রসন্ন আরক্তমুখে বলিলেন, "দাদা, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার ইচ্ছা এবং সাধ্য কারও নেই। কিন্তু একটা কথা, বিদেশে একা আপনার কষ্ট হবে। যদি বিয়ে করতেন, বৌদি থাক্‌তেন, এ বয়সে সেবার কষ্ট হ'ত না; কিন্তু—"

দেবীপ্রসন্ন বাধা দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তা ত নেই; কিন্তু তোরা কি একবার মুখ ফুটে সে কথা আমাকে বলেছিলি, ভাই?"

লজ্জায় ধিক্কারে কনিষ্ঠ সহোদরযুগল মাথা নত করিলেন।

দেবীপ্রসন্নের কণ্ঠে চিরপরিচিত স্নেহের সুর আবার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এতে তোমাদের কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই। ৪৭ বছর ত হয়ে গেল, আর কত দিন আর বাঁচব? বাবা ত চল্লিশ বছরের আগেই চ'লে গিয়েছিলেন। কিছু ভাবিস্‌নে তোরা, আমার সেখানে কোন কষ্ট হবে না। গোপাল আমার সঙ্গে যাবে। ভাল কথা, দে মশাই জমীদারী পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এ সরকারে প্রাণ-মন দিয়ে সেবা ক'রে আসছেন। ওঁর কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও বিশ্বস্ততার উপযুক্ত পুরস্কার এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। উইলে আমি ওঁর সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিনি এই ভেবে যে, তোমরাই ওঁর সম্বন্ধে বিবেচনা করবে। তোমরা দু'ভাই বিবেচনা ক'রে ওঁর কাযের পুরস্কার দেবে, এটা আমার ইচ্ছা।"

উমাপ্রসন্ন বলিলেন, "ওঁর ঋণ শোধ দেবার নয়। আমাদের দেশে ওঁর গ্রামের কাছে যে তালুকটা আছে, তার আয় ২ হাজার টাকা। সেটা ওঁকে দেওয়া হোক্, আর—"

শ্যামাপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন, "আর ১০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ওঁর নামে লেখাপড়া ক'রে দিলে ভাল হয়।"

দেবীপ্রসন্ন বলিলেন, "তাই ভাল। তবে দে মশাইয়ের কাছে আমার অনুরোধ, তিনি যত দিন বাঁচবেন, আমার ভাই দুটিকে যেন ত্যাগ ক'রে যাবেন না। ওঁর মত হিতৈষী এই সরকারে আর কেউ নেই।"

তারাচরণের মুখ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ সকল ব্যাপারে কোন কথা বলিবার শক্তি এবং সাহস তাহার ছিল না।

দেবীপ্রসন্নের নির্দ্দেশে দে মহাশয়ের সম্বন্ধে ব্যবস্থা তখনই কাগজে-কলমে সম্পন্ন হইয়া গেল।

দে মহাশয়ের তরফ হইতে একটা শ্রদ্ধার নতি দেখিবামাত্র উমাপ্রসন্ন তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি কর্ম্মচারী হলেও আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় সম্মান করি। আপনি দাদার বিশ্বাসভাজন, এর চেয়ে বড় কিছু গুণ মানুষের থাক্‌তে পারে, আমরা মনে করি না।"

দেবীপ্রসন্ন মৃদু হাসিয়া দে মহাশয়ের দিকে চাহিলেন। দে মহাশয়ও বড় কর্ত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাথা নত করিলেন।

৫

প্রাপ্তযৌবনা কমলা দ্রুতপদে পিতার কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা, কাশী থেকে নাকি তার এসেছে?"

উমাপ্রসন্নের উদ্বেগব্যাকুল মুখমণ্ডল দেখিয়া তরুণী যেন অস্থির হইয়া উঠিল।

তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কার কাছে শুন্‌লে, মা?"

"মেজ-মা বলছিলেন। কাল তিনি পোষ্যপুত্তুর নিলেন, আজ লোকজন খাওয়ানো। এমন সময় বড় জ্যেঠা মশাইয়ের অসুখ, তাই তিনি বলছিলেন—"

তরুণী কথা সমাপ্ত করিল না। উমাপ্রসন্ন কন্যার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

কমলা বলিল, "বাবা, আজকের ট্রেণে যাওয়া যায় না?"

অন্যমনস্কভাবে উমাপ্রসন্ন বলিলেন, "যায়; কিন্তু মেজদা ত যেতে পারবেন না। তাই ভাবছি।"

কন্যা বলিল, "আমি কাশীতে যাবই, বাবা। আপনি খাশুড়ীর কাছে খবর পাঠিয়ে দিন, এ সময় জ্যেঠামহাশয়ের কাছে না গেলে সারা জীবন মনে কষ্ট থেকে যাবে, বাবা।"

উমাপ্রসন্ন জানিতেন, দাদার কাছে কমলা কত প্রিয়। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া তিনি কমলার বিবাহ সুপাত্রে দিয়া কলিকাতাতেই জামাতার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এ জন্য সংসারে যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়াছিল, পরে তাহা কি প্রকাশ পায় নাই?

"ছোট বাবু!"

উমাপ্রসন্ন চাহিয়া দেখিলেন, দ্বারপথে এ সংসারের চির-হিতৈষী নায়েব, দে মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্তঃপুরে তাঁহার অবাধ প্রবেশের অধিকার ছিল। কমলা তাঁহার অঙ্কে লালিতাও হইয়াছিল।

"আপনি হঠাৎ এ সময়ে যে, দে মশাই?"

"মেজ বাবু নেমন্তন্ন ক'রে পাঠিয়েছেন, তাই সকালেই এসেছি। তা ছাড়া কাশী থেকে পরশু একখানা তারও এসেছে। আমি আজই সেখানে যাচ্ছি, ছোট বাবু।"

"আমিও যাব, কিন্তু মেজদার পোষ্য গ্রহণ উপলক্ষে উৎসবভোজ আছে, তাই ভাবছি।"

স্বল্পভাষী দে মহাশয় বলিলেন, "বড় বাবুর এ অসুখের সময় সকলেরই যাওয়া দরকার। উৎসব পরে হ'তে পারবে। সেই কথাটা বলবার জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি। বড় বাবু সকলকে দেখতে চেয়েছেন।"

"মেজদাকে আপনি কিছু বলেন নি?"

"বলেছি, আপনারা আমাকে হিতৈষী বন্ধু ব'লে মনে করেন বলেই বলবার সাহস আমার আছে। আপনারা জানেন না—"

সহসা দে মহাশয় স্তব্ধ হইলেন। উমাপ্রসন্ন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে দে মহাশয়ের দিকে চাহিলেন।

কমলা বলিল, "কি বলছিলেন, রাঙ্গা জ্যেঠামশাই?"

কি ভাবিয়া দে মহাশয় কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "না, আপনাদের জানান আমি উচিতই মনে করি। বড় বাবু আপনাদের খুব ভালবাসেন, তা আপনারা জানেন; কিন্তু তার পরিমাণ কি, কত ত্যাগস্বীকার, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তার মধ্যে আছে, তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। এই সূর্য্যকান্ত দে তার কিছু কিছু জানে। তৃতীয় প্রাণী যে জানত, সে-ও আজ দশ বছর হ'ল এ জগতে নেই।"

দে মহাশয় নিবিষ্ট দৃষ্টিতে প্রাচীরবিলম্বিত দেবীপ্রসন্নের তৈলচিত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তখন বড়বাবুর ১৫ বছর বয়স। আপনাদের মা তখনও মারা যান নি। পাশের গ্রামের একটি দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে স্কুলে যাবার পথে তাঁর দেখা প্রায় হ'ত। মেয়ের বিধবা মা বড়বাবুর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেবার ইচ্ছে করেছিলেন। তখন ত ছেলেবেলায় বিয়ের রেওয়াজ খুবই ছিল। কিন্তু অবস্থা ভাল নয় ব'লে বড়বাবু রাজি হন নি। বড়বাবুর সঙ্গে এক স্কুলেই আমি পড়তাম। আপনারা সে সব কথা জানেন না।"

কমলা গভীর আগ্রহে বলিল, "তার পর কি হ'ল?"

উমাপ্রসন্নও বিস্মিত দৃষ্টিতে বক্তার পানে চাহিয়াছিলেন।

দে মহাশয় বলিলেন, "আপনারা তখন মাতৃহারা হলেন। মেয়ের মা বড়বাবুর জন্য আরও ২।১ বছর অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন; কিন্তু তিনি তখন আপনাদের দু'ভাইকে নিয়ে কলকাতায় চ'লে এলেন। কেমন ক'রে তিনি তুলসীপুরের জমীদারের নেকনজরে পড়েছিলেন, কেমন ক'রে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অবস্থার গতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তার কিছু কিছু ইতিহাস হয় ত আপনারা জানেন। কিন্তু বিয়ের দিকে তিনি মন দিতে পারলেন না। কেন জানেন, ছোট বাবু?"

উমাপ্রসন্নের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি শব্দও বাহির হইল না।

দে মহাশয় বলিলেন, "বড় বাবু ভেবেছিলেন, বিয়ে করলেই তাঁর ছেলে-মেয়ে হবে। তখন স্বার্থ-প্রবল হয়ে উঠবে। যাঁ'র মৃত্যুশয্যায় যে ভার তিনি কায়মনোবাক্যে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, তাতে স্বার্থবুদ্ধি হয় ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এ সব কথা বড় বাবু আমাকে খুলে বলেন নি বটে; কিন্তু তবু আমি জানতাম। সে কন্যাটি তখন ১২ বছর পার হয়েছে। মেয়ের মা আর মেয়েকে ঘরে রাখতে পারেন না। বড় বাবু তখন আমার ঘাড়েই মেয়েটিকে তুলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তভাবে আমাকে পাশে দাঁড় করালেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অটল ছিল ব'লেই আজ আপনারা দশ জনের এক জন।"

কমলার নয়নে সহসা অশ্রু ছল ছল করিয়া উঠিল। যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া আপ্লুত কণ্ঠে বলিল, "জ্যেঠামশাই মানুষ নন।"

উমাপ্রসন্ন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দে মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "মেজদাকে আমি সব বলছি। তিনি যদি না যেতে পারেন, আমরা আজই কাশী রওনা হব।"

বিপত্নীক দে মহাশয় বলিলেন, "আর একটা আরজি আছে। বড় বাবুর সেবার জন্য আমার ছুটীর প্রয়োজন। যত দিন তিনি আরাম না হন, আমাকে অবকাশ দিতে হবে।"

"নিশ্চয়।"

কমলা অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিল, "ভ্রাতৃত্বের কাছে এ যুগে মানুষ এমন ক'রে আত্মবিসর্জ্জন করে না, বাবা।"

উমাপ্রসন্ন কন্যার মস্তকে নীরবে হাত রাখিয়া প্রাচীর-বিলম্বিত জ্যেষ্ঠের তৈলচিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

স্বরলিপি

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

অনুগত জনে কেন তুমি এত কর প্রবঞ্চনা।
(যখন) তুমি আমায় মারিলে মারিতে পার,
তখন রাখিলে কে করে মানা॥
আমি ক'রে থাকি অপরাধ,
প্রেম-ডুরি দিয়ে বাঁধ,
আমায় বিনা অপরাধে বধ,
এ কি রে তোর বিবেচনা।

লালচাঁদ বড়াল কর্ত্তৃক গীত। [স্বরলিপি—শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ (বি, এস্-সি, বি-এল্)।

বাদী—স। সম্বাদী—স, ম।

স্থায়ী—

০ ১ + ৩
রজ্ঞা রজ্ঞমা জ্ঞরসা | রা মা । । | পা । । পা | মা মা ম মপা মগমা |
অনু ০০০ ০গত | জ নে ০ ০ | কে ০ ন | তুমি এত ক র ০০০ |

০ ১ + ৩
মপা মপা ধণসা | ণধা পমা জ্ঞরসা রজ্ঞা | মপা ধণা র্সর্রা | র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা |
প্রব ঞ্চনা ০০০ | ০০ ০০ ০০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

০ ১ + ৩
রজ্ঞরা সরণ্া সরজ্ঞরসা | রা মা । । | পা । পা | মা মা মমপা মজ্ঞরা |
অনু০ ০গত ০০০০০ | জ নে ০ ০ | কে ০ ন | তুমি এত কর ০০০ |

০ ১ + ৩
সরা জ্ঞা । | রা জ্ঞা । মা | মপা ধপা ধণা | র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা |
প্রবঞ্চ না ০ | প্র ব ঞ্চ না | প্রব ঞ্চনা ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

০ ১ + ৩
রজ্ঞা মপা ধণা | র্সর্রা র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা | ধণা । ধা | পমা পমা জ্ঞরা সা |
০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০ ০ | ০০ ০০ ০০ ০ |

০ ১ + ৩
রজ্ঞা রজ্ঞমা জ্ঞরসা | রা মা । । | পা । পা | মধা ধণা পধা পধণা |
অনু ০০০ ০গত | জ নে ০ ০ | কে ন ওগো | যখন তুমি ০০ ০০০ |

০ ১ + ৩
ণা ধা । | ণা ধা ণা ণা | ধপা ধণপমা । | মা পা পধপা ধণা |
আ মায় | মা রি লে মা | রিতে পার ০ ০ | তথ ন রাখিলে ০০ |

০ ১ +
ধপা মপা মজ্ঞ সর । | রজ্ঞা মজ্ঞা রা | মা পা । ||
কে করে মা না০ ০ ০ | অনু গত জ নে | কে ন ০ ||

(সরগম্)—

৩ ০ ১ +
র্সণা ধপা মপা জ্ঞমা | জ্ঞরা সা ‌‌। | সরা জ্ঞা রজ্ঞা মা | জ্ঞমা পা পমা |

৩ ০ ১ +
পা ধা ণা ‌। | র্সা র্রা র্সা | র্রর্মা জ্ঞর্রা র্সণা ধপা | মপা জ্ঞমমা জ্ঞরসা |

৩ ০ ১ +
সরজ্ঞা রজ্ঞমা জ্ঞমপা মপধা | পধণা ধণর্সা ণর্সর্রা | র্রা র্রা র্রা ‌। | র্রা র্জ্ঞা র্রা |

৩ ০ ১ +
র্সা র্সর্রা ণর্সা ধণা | পধা মপা জ্ঞমা | রজ্ঞরসা জ্ঞরা সরা রমা | পা পা ‌। |
অনু গত জনে | কে ন ০ |

অন্তরা—

৩ ০ ১ +
মপা নি ‌। ‌। র্সা | র্সা র্সনা র্সণধণর্সা | ণধা ধা ধধা ণর্সা | ণধা পমা পনর্সা |
করেথা কি ০ ০ | যদি অপরা ধ ০০০০ | আমি করে থাকি ০০ | ০০ ০০ ০০০ |

৩ ০ ১ +
র্সা নর্সা নর্সা র্রজ্ঞা | র্সর্রা র্রা র্রর্সণা | র্সর্রা জ্ঞা জ্ঞর্মজ্ঞা র্রর্সণা | ধা ‌। পমা |
অপ রাধ ক্ষমা ডুরি | দিয়ে বাঁধ ০০০ | প্রেমডু রিদি য়ে ০ ০ ০০০ | বাঁ ০ ধ |

৩ ০ ১ +
মপা না ‌। র্সা | র্সা নর্সা ‌। | নর্সা র্রজ্ঞা র্রা র্রা | র্রজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞর্মা |
করে থাকি ০ | অপ রাধ ০ | প্রেম ডুরি দিয়ে বাঁধ | ক্ষমা ডুরিদি য়ে ০ |

৩ ০ ১ +
জ্ঞর্রা জ্ঞর্রা র্সণা ধপমা | মধা ধণা পধা | ধা ধণা ণা ণা | ‌। ‌। ধপা |
০ ০ ০ ০ ০ ০ বাঁধ০ | বিনা অপ রাধে | বধ বিনা অপ রাধে | ০ ০ ০ ০ |

৩ ০ ১ +
মপা ধণা র্সা ণধা | ধা ‌। পা | মা ণা ‌। ধা | মা জ্ঞা সরা |
০০ ০০ ০ ০০ | ব ০ ধ | একি রে ০ তোর | বিবে চ না |

৩ ০ ১ +
রজ্ঞমা জ্ঞরসা রা মা | ‌। পা ‌। | পপধা ণর্স ণা ধা | পা মা ‌। |
অনু০ ০গত জ নে | ০ কে ন | এত০ ০০ ক র | প্র ব ০ |

৩ ০ ১ +
জ্ঞা রা সা রজ্ঞরা | জ্ঞমা জ্ঞরা সা | রা মা ‌। ‌। | পা ‌। পর্সা |
ঞ্চ না ০ অনু০ | ০০ ০গ তো | জ নে ০ ০ | কে ০ ন ০ |

৩ ০ ১ +
ণধা ণধা পমা পমা | জ্ঞরা সা রা | ‌। মা ‌। ‌। | পা ‌। পা ||
অনু ০০ ০০ ০গ | ত০ ০ জ | ০ নে ০ ০ | কে ০ ন ||

তান—

মপ ধণ র্সর্রা র্সণ ধপ মজ্ঞা মপ রজ্ঞ মপ ০ধণ র্সর্রজ্ঞা র্রর্সণ ধপ মজ্ঞ রস।

আফগান-বিদ্রোহ

আফগান রাজ্য আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ইহার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। এই হেতু ভারতে ইংরাজ-রাজের সীমান্ত-নীতি এত অধিক সমস্যাসঙ্কুল বলিয়া পরিগণিত। সীমান্তের অশান্ত মুসলমান পাঠান জাতি যেরূপ স্বাধীনতার উপাসক, সমরপ্রিয়, দুর্দ্ধর্ষ, আফগানিস্থানের আফগান মুসলমানরা যে তদপেক্ষা কোন অংশে নূন, তাহা নহে। সুতরাং সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গ পতিত হইলেই এই জাতির ধাতুগত ক্রোধস্তূপ দাউ দাউ জলিয়া উঠে। ইংরাজীতে যাহাকে বলে—The atmosphere is electric অর্থাৎ আবহাওয়া বিদ্যুতের গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ সামান্য কারণেই উত্তাপ ও আলোক প্রকাশের সম্ভাবনা, আফগানের চরিত্রগত সেইরূপ একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই কারণে তাহাদের প্রতিবেশী জাতিদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় বাস করিতে হয়।

আমীর আমানুল্লা

এই কারণে আফগান রাজ্যের শাসক আমীরগণ এ যাবৎ আপনাদের সিংহাসনকে কখনও নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। বহুকাল পরে আমীর আমানুল্লা খাঁ এই ধারণার পরিবর্ত্তন করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কাবুলের রাজতক্তে সমাসীন হইয়া ভারত সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। বৃটিশ সরকার তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সিংহাসন সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর, প্রজাবর্গের ভক্তিশ্রদ্ধা, ভালবাসা অর্জ্জন করিয়া কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর, গত বর্ষে তিনি বিদেশভ্রমণে যাত্রা করেন। এ যাবৎ কোন আমীর আফগানিস্থান ত্যাগ করিয়া বহুদিন বিদেশে ভ্রমণ করিতে সাহস করেন নাই; কেবল রাজা আমানুল্লার পিতা আমীর হবিবুল্লা খাঁ একবার কিছু দিনের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সে অল্পকালের জন্য এবং আফগান রাজ্যের সন্নিকটে মাত্র ভারত-সাম্রাজ্যে। রাজা আমানুল্লা সস্ত্রীক সপারিষদ বহুকাল নিজ রাজ্য ছাড়িয়া ভারতে, মিশরে, য়ুরোপে, তুর্কী ও পারস্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অথচ এ যাবৎ তাঁহার শাসনের বিপক্ষে—তাঁহার সিংহাসনের বিপক্ষে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই।

সত্য বটে, তিনি যখন য়ুরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিবার পর সোভিয়েট রাসিয়া যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্রে রটিয়াছিল যে, কাবুলরাজ্যে তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু তথাপি সে কথা জনরবমাত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার সুশাসনের গুণে দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতি তাঁহার ভক্ত অনুরক্ত শান্তশিষ্ট প্রজায় পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার শ্বশুর পররাষ্ট্রসচিব মহম্মদ তরজির নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার অনুপস্থিতিতেও তাঁহার শাসন মানিয়া চলিতেছে, এইরূপ ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি যত দিন বিদেশে ছিলেন, তত দিন তাঁহার রাজ্যে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইহাতে আফগান জাতির মনোভাব পরিবর্ত্তনের বিষয়ে আশান্বিত হওয়ার বিস্ময়ের বিষয় ছিল না।

তাই যখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে, রাজা আমানুল্লার বিপক্ষে আফগানিস্থানে ঘোর ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাঁহার বিপক্ষে পূর্ব্বাঞ্চলে

জালালাবাদের সন্নিকটে শিনওয়ারীরা বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে, তখন সহসা সে কথা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু ক্রমে যখন কাবুল সহরের উত্তর ও পশ্চিমদিক্ হইতে বিদ্রোহের এবং খাস কাবুল সহর আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইবার সংবাদ প্রকাশিত হইল, তখন আফগান প্রজাবিদ্রোহের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর রহিল না। তখন মনে হইল, আফগান জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনা গিয়াছিল, তাহা অতিরঞ্জিত, দুর্দ্ধর্ষ সমরপ্রিয় ধর্ম্মান্ধ আফগান জাতি তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করে নাই, শান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনের মর্য্যাদা তাহারা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তখন মনে হইল, পঞ্জাব-কেশরী রাজা রণজিৎ সিংহের আমলের কথা। আমীর সাসুজার সিংহাসনারোহণে, দোস্ত মহম্মদের রাজ্যলাভের চেষ্টায় যুদ্ধে, সাসুজার পলায়ন ও রণজিতের আশ্রয় লাভ, ইংরাজের সহিত আফগানের যুদ্ধ, দোস্ত মহম্মদের সিংহাসনচ্যুতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যের কথা একে একে মনে পড়িল। তখনও আফগান জাতি যাহা ছিল, আফগানিস্থানে বিমান-পোত আমদানীর পরও তাহাই আছে, তাহাদের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমীর আবদর রহমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আফগানরাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে প্রজা সন্তুষ্ট থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার দণ্ডের ভয়ে সকল প্রজাই অবনতশিরে তাঁহার শাসন মান্য করিয়াছিল। তাহারা শক্তির প্রভাবই যে ভাল বুঝে, তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। তাঁহার পুত্র আমীর হবিবুল্লা খাঁ তাঁহার ন্যায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী না হইলেও তাঁহার সময়েও আফগান প্রজা রাজদণ্ড মানিয়া চলিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এনায়েৎউল্লা খাঁ তাঁহার মত ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। আমীর হবিবুল্লার পর তাঁহারই রাজা হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স আমানুল্লাকেই প্রজারা রাজা বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, আমানুল্লার এমন কোন গুণ ছিল—যাহার জন্য প্রজারা প্রথমাবধি তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পিতামহ আমীর আবদর রহমানের মত শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন শাসকের গুণবিশিষ্ট ছিলেন। আফগানের মত বীর সমরপ্রিয় জাতি তাই তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমানুল্লা আমীর হইবার পর, ইংরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় হয়। এ জন্য ইংরাজপক্ষে সংবাদপত্রমহল হইতে আমীর আমানুল্লার প্রতি বিবকটাক্ষ প্রদত্ত হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, "ইংরাজের তখন অধিকাংশ সেনা য়ুরোপের রণক্ষেত্রে, তাই আমানুল্লার এই সাহস হইয়াছিল; আমানুল্লা ভ্রাতৃদ্রোহী, অন্যায়পূর্ব্বক সিংহাসনের অধিকারী, ইত্যাদি।" যাহা হউক, সেই বিরুদ্ধ সমালোচনায় আমীর আমানুল্লার বিন্দুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই। ইংরাজ তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

বাচ্চা-ই-ডাকাও—আমীর হবিবুল্লা

সন্ধি অনুসারে তাঁহার খেতাব His Majesty হয়, অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের ন্যায় কাবুলে ইংরাজের ও অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের দূত নিযুক্ত হন, কাবুলের দূতও জগতের যত্র তত্র প্রেরিত হন। অন্য সমস্ত স্বাধীন রাজ্যের সহিত রাজা আমানুল্লা পূর্ণ স্বাধীনভাবে যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন, এইরূপ স্বীকার করা হইল।

ইহার জন্য আফগান জাতির রাজা আমানুল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা দোষের কথা নহে। তিনি শৌর্য্যবীর্য্য ও রাজনীতিক বিচক্ষণতার ফলে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য

আমীর এনায়েৎ উল্লা

আফগান রাজ্যকে জগতের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিলেন, ইহা অবশ্যই তাঁহার রাজোচিত গুণের পরিচায়ক। আফগান জাতি তদবধি জগতে স্বাধীন শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিগৃহীত হইল। ইহাতে আফগানদের গর্ব্ব করিবার কথা।

সম্ভবতঃ রাজা আমানুল্লা সে কথা বুঝিয়াই নিজ রাজ্যের উন্নতিসাধনের অভিপ্রায়ে নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দকে যে অমূল্য সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা-মদিরার প্রভাবে তাহারা তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিয়া ক্রমশঃ সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে অসম্মত হইবে না। তাই তিনি কাবুল রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারে, পথঘাট-নির্ম্মাণে, সেনাগণের মধ্যে শৃঙ্খলা-রক্ষণে এবং রাজকোষের অর্থের সুব্যবস্থা-বিধানে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে একাধিক বিশেষজ্ঞকে বেতন দিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, সন্দেহ নাই। কিসে তাঁহার জন্মভূমি আফগান রাজ্য জগতে শীর্ষস্থানীয় হয়, কিসে তাঁহার আফগান প্রজা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সভ্যতায় জগতে অন্যান্য সভ্য ও উন্নত জাতির পর্য্যায়ে উন্নীত হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল

এনায়েৎউল্লার পুত্র প্রিন্স খলিলুল্লা

আফগানিস্থানের একটি গ্রামের দৃশ্য

কিন্তু তিনি এক মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। শীতপ্রধান দেশের বৃক্ষ-লতাকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আনয়ন করিয়া রোপণ করিলে, সে আবহাওয়ায় যেমন সেই বৃক্ষ-লতা বাঁচিতে পারে না, তেমনই প্রতীচ্যের সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারকে প্রাচ্যদেশে আনয়ন করিয়া বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা ফলবতী হয় না। সেই প্রতীচ্যের ভাবধারার ভাল দিক্‌টা প্রাচ্যের ভাবধারার অনুযায়ী করিয়া সংস্কারের চেষ্টা করিলে, বরং সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে। রাজা আমানুল্লা এই সহজ সরল সত্য কথাটার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়াই মনে হয়। তিনি তাঁহার আফগান রাজ্যের প্রজাকে পাশ্চাত্য হাবভাবে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুসলমান আফগান প্রজার মধ্যে হারেম, অবরোধ ও বোরখা প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত, উহা জাতির মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ এক-কালে সেই প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়ায় যে অনর্থপাত হইতে পারে, তাহা বোধ হয় তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বিদেশভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া দেশে ফিরিয়া, দেশে নরনারীর মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের প্রয়াসী হন। যদি

সীমান্তের নারী
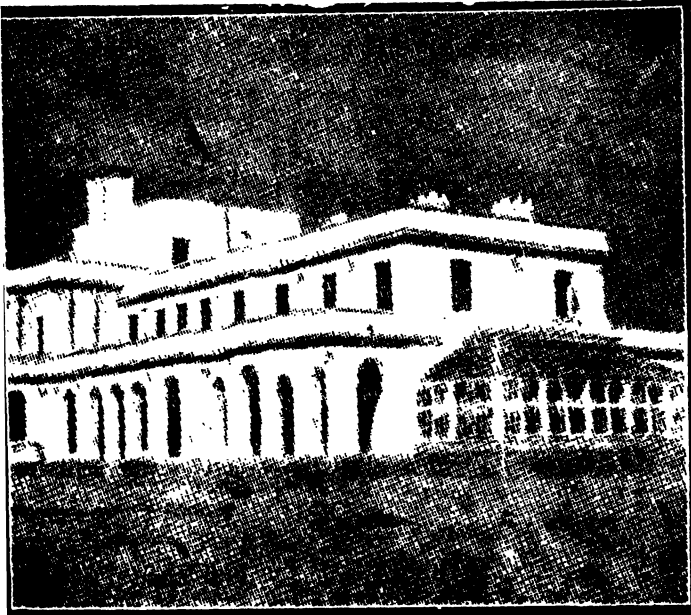
তিনি মুসলমানধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের অনুযায়ী করিয়া সেই সংস্কার সাধন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কোন গোলযোগ উপস্থিত হইত না। কিন্তু তিনি কাবুলে তাঁহার সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে এবং হারেম ও বোরখার উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হন। এই সংস্কার বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কাবুলে দেশীয় পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ এবং পাগড়ীর পরিবর্ত্তে টুপী বাধ্যতা-মূলক করা হইয়াছিল, কাবুল সহরে কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আফগান বালিকাগণকে তথায় বিদ্যার্জ্জনে বাধ্য করা হইয়াছিল। বিংশতিটি আফগান বালিকাকে শিক্ষালাভের জন্য তুর্কীরাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তুর্কী ও পাশ্চাত্য-দেশীয় শিক্ষকের আমদানী করিয়া নানা বিষয়ে আফগানদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শুনা যায়, ইহাতে মোল্লা-মৌলভীরা অসন্তোষ প্রকাশ করিলে

কাবুলের ব্রিটিশ দূতাবাস

ও আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি কয়েক জনকে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

এ সকল কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক রাণী সৌরিয়া। তিনি সিরিয়া দেশের রাজকুমারী। শুনা যায়, তিনি প্রথম-যৌবনে প্যারিসে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনক-জননী ও ভ্রাতাও প্রতীচ্যের প্রথার সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব রাজা আমানুল্লার উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। রাণী সৌরিয়া স্বামীর সঙ্গে বিদেশভ্রমণে
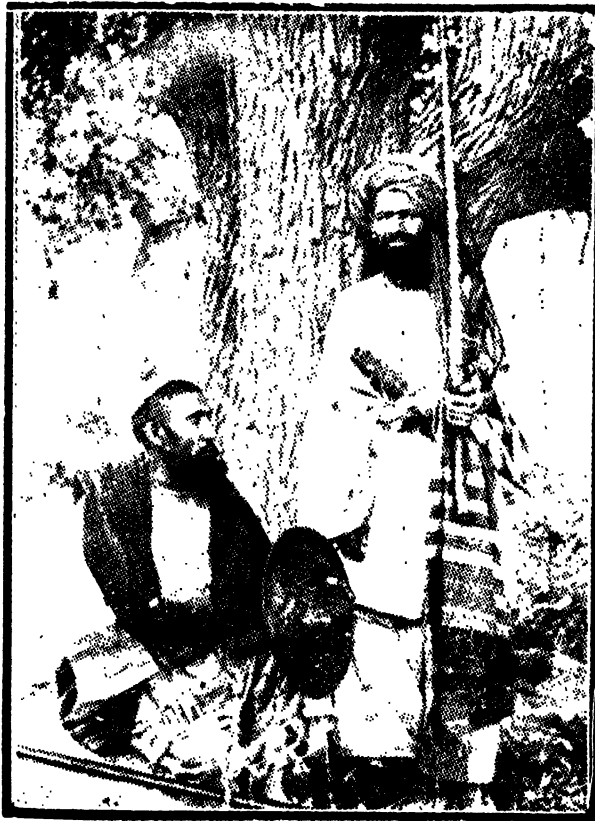
সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ উপজাতি

বহির্গত হইয়া য়ুরোপে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া পূর্ণ য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় আফগানিস্থানে বালিকাদিগের শিক্ষা কতক পরিমাণে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। তিনি হারেম, বোরখা ও অবরোধের ঘোর বিরোধী। ইসলামধর্ম্মে নারীর অধিকার যে ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, জগতের কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই,—এই মর্ম্মে তিনি একটি সন্দর্ভও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতরুচি বলিয়া তাঁহার প্রভাবে রাজা আমানুল্লা ইসলামধর্ম্মে একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই।

রাজা আমানুল্লা ভারতে আসিয়া করাচী সহরে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, "অন্ধ ধর্ম্মান্ধ মোল্লা-মৌলভীরা যত অনিষ্টের মূল। তাহারাই ভারতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়াছে। আমার আফগান রাজ্যেও তাহারা অনিষ্টের সূচনা করিতেছে। তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিলে শান্তি সংস্থাপিত হইবে।" শুনা যায়, এই বক্তৃতার ফলে আফগানিস্থানে অসন্তোষের সূচনা হয়। বিশেষতঃ রাণী সৌরিয়ার অবগুণ্ঠনত্যাগে ও য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণে বহু মোল্লা-মৌলভী ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। প্রকাশ, তখন হইতেই রাজা আমানুল্লার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল। আগুনে বাতাস দিবার লোকের অভাব হয় না।

জনরব রটে, কর্ণেল লরেন্স নামক ইংরাজ সেনানী আফগান নারীর বেশে আফগান রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আফগানদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। অবশ্য এই জনরবের কোন ভিত্তি নাই। ভারত সরকার ঘোষণা দ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন যে, কর্ণেল লরেন্স পেশোয়ারে ছিলেন, তাঁহাকে ছুটী দেওয়া হয় নাই, তিনি সাধারণ ইংরাজ সীমান্ত-সেনানীর কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন। সম্প্রতি 'স্মিথ' নামে পরিচিত এই কর্ণেল লরেন্স বিলাত গিয়াছেন। এখনও তাঁহাকে কেহ কেহ 'যাদুকর', 'বহুরূপী' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করিতেছে। কিন্তু এ সকল জনরবের মূল নাই। বৃটিশ সরকার আফগানিস্থানের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন।

যাহা হউক, য়ুরোপে রাজা আমানুল্লার কিরূপ অভ্যর্থনা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। পাঠক উহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাতে তাঁহার ও তাঁহার রাণী সৌরিয়ার যে অভ্যর্থনা হইয়াছিল, এযাবৎ কোনও স্বাধীন নরপতির ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আমানুল্লার বন্ধুত্ব লাভ করিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী, রাসিয়া,—সকল শক্তিই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা আমানুল্লা আফগান রাজ্যকে সভ্যজগতের দৃষ্টিতে কত উন্নত করিয়াছেন, তাহা ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়।

দেশে ফিরিয়া রাজা আমানুল্লা সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তখন তিনি সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাঁহার এই উদ্যম পরে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কারণ হইবে। প্রথমে গোলযোগের সংবাদ আসে আফগানিস্থানের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে। খাইবার গিরিসঙ্কটের পরপারে ডাকা ও জালালাবাদ অঞ্চলের শিনওয়ারী নামক উপজাতিরা প্রথমে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করে। রাজা আমানুল্লার জালালাবাদের শাসনকর্ত্তা আলি আমেদ জান বিদ্রোহদমনে সচেষ্ট হন। তিনি পূর্ব্বে কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজা আমানুল্লা বিদ্রোহদমনে অধিকাংশ রাজসৈন্য পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীরা অবশেষে সন্ধি করিতে

সম্মত হয়। কিন্তু তাহারা সন্ধির সর্ত্তে বলে যে, রাজাকে তাঁহার সমস্ত সংস্কারকার্য্য প্রত্যাহার করিতে হইবে। সর্ত্তগুলি মোটামুট এইরূপ :—(১) বালিকা-বিদ্যালয়গুলিকে উঠাইয়া দিতে হইবে, (২) তুর্কী হইতে আফগান বালিকাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, (৩) বিদেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রত্যাহার করিতে হইবে, (৪) এক মন্ত্রণা সভার পরামর্শে রাজাকে রাজ্য শাসন করিতে হইবে, সেই সভায় মোল্লা-মৌলভীদিগের প্রাধান্য থাকিবে, (৫) সেই সভা যে ভাবে শিক্ষার বিস্তার করিতে পরামর্শ দিবেন, সেই ভাবে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, ইত্যাদি। আর একটা সর্ত্ত ছিল যে, রাণী সৌরিয়া ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।

রাজা আমাহুল্লা আর সকল সর্ত্তে সম্মত হইয়াছিলেন, কেবল রাণী সৌরিয়াকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। করিলে তিনি নিশ্চিতই কাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু রাজা আমাহুল্লা শূরবীর, তিনি এমন অন্যায় অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিয়া সিংহাসনে ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইতে চাহেন নাই। তিনি ভাবিলেন, সময় হয় নাই, সময় হইলে আফগানদের মধ্যে আপনিই সংস্কার ও পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

যাহা হউক, এইভাবে সন্ধির কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, কাবুলের উত্তরপশ্চিমদিকে আর এক রাজদ্রোহী দেখা দিয়াছে। তাহার নাম বাচ্চা-ই-স্যাকাও; কেহ বলেন, বাচ্ছা সেকো। প্রকাশ যে, সে কাবুলের উত্তরে কোহিদামন নামক স্থানের এক ভিস্তীর বংশধর এবং এক বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার। সে প্রথমে কাবুলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে রাজ-সেনার সহিত তাহার কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। একবার সংবাদ রটে যে, তাহার সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, সে পলায়ন করিয়াছে এবং তাহার ভ্রাতা ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহার পর রটে, বাচ্ছা স্বয়ং নিহত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ পায়, সে একবারে মাত্র ১ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়া কাবুল অবরোধ করিয়াছে, রাজা আমাহুল্লা তাঁহার ভ্রাতা প্রিন্স এনায়েৎ উল্লাকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া বিমানযোগে কান্দাহার যাত্রা করিয়াছেন। অতঃপর বাচ্ছা সেকো কাবুল অধিকার করিয়া প্রিন্স এনায়েৎ উল্লাকে দুর্গে বন্দী করিয়াছিল। রাণী সৌরিয়া ও তাঁহার আত্মীয়স্বজন পূর্ব্বে কান্দাহারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এনায়েৎ উল্লাও শেষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কান্দাহার যাত্রা করেন।

বাচ্ছা সেকো, আমীর হবিবুল্লা নাম ধারণ করিয়া কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তাহার নামে বিপরীত দুই প্রকারের সংবাদ রটিয়াছে। এক পক্ষ হইতে প্রকাশ, সে কোনও রূপ অত্যাচার করে নাই, বরং কাবুলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতেছে। অন্য পক্ষে প্রকাশ, সে ঘোষণা করিয়াছে যে, "আমাহুল্লা কাফের, পৌত্তলিক। আমাহুল্লা ধর্ম্মবিগর্হিত যে সকল সংস্কার করিয়াছে, তাহা সমস্তই উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কাবুলের সমস্ত বালিকাবিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বোরখা ও অবগুণ্ঠন আবার বহাল হইয়াছে, ইত্যাদি।" আরও প্রকাশ যে, সে লুঠতরাজ করিতেছে, রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন কোহিদামনে স্থানান্তরিত করিয়াছে, কাবুলের সম্ভ্রান্ত ধনিগণের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহার সেনাপতি সৈয়দ হোসেন রাজবংশীয় এক সম্ভ্রান্ত আফগানের দুইটি অনূঢ়া হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহারা তাহার প্রাসাদে নীতা হইবার পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিয়া অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

খাইবার গিরিপথের বিদ্রোহী উপজাতি

এ দিকে আলি আমেদ খান প্রভুর প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহারও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে কাবুলের গভর্ণর ছিলেন। শিনওয়ারীরা পূর্ব্বাহ্ণে বিদ্রোহী হইলে রাজা আমাহুল্লা তাঁহাকে জালালাবাদের গভর্ণর করিয়া প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়াই কিন্তু তিনি মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আপনাকে পূর্ব্বাঞ্চলের স্বাধীন আমীর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; পরন্তু কাবুলের সিংহাসনপ্রার্থী হইয়া

হবিবুল্লা খাঁ বা বাচ্ছা সেকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। এখন তাঁহার ও বাচ্ছা সেকোর মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। সে সকল বিশেষ বিবরণের সহিত এই প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই।

ইহা ছাড়া কাবুলরাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে আর এক উপজাতি বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে। তবেই হইল, কাবুলরাজ্যে এখন চারিটি পরস্পর-বিরোধী দলের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা আমানুল্লা কান্দাহারে শক্তিসঞ্চয় করিতেছেন। প্রকাশ, তিনি শীতের অবসানে কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ক্রমে তাঁহার দলপুষ্টিও হইতেছে। কাবুল ও জালালাবাদে সংঘর্ষ চলিতেছে। আর পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেছে না।

অবস্থা এইরূপ। তবে আমাদের পক্ষে কাবুলরাজ্যের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা দুষ্কর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রের পক্ষে এ বিষয়ে যে সুবিধা আছে, আমাদের তাহা নাই। তাহাদের পত্রে সংবাদ যে সময়ে প্রকাশিত হয়, সেন্সরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাহা আমাদের নিকট পৌঁছাইতে তদপেক্ষা বিলম্ব হয়। এই হেতু আমরা এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি কাবুলের ট্রেনিং কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের ও ইতিহাসের অধ্যাপক, তাঁহার নাম সেখ বসির আহম্মদ। তিনি "এসোসিয়েটেড প্রেসের" মারফতে এই সংবাদ দিয়াছেন :—

জেনারেল নাদির খাঁ

আফগানিস্থানের চাঞ্চল্যের কারণ

ভূতপূর্ব্ব নৃপতি আমানুল্লা তাঁহার প্রকৃতিবর্গ অপেক্ষা ২শত বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দ্রুতগতিতে সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোঁড়া এবং অজ্ঞ মোল্লারা দেশাধিবাসিগণকে উত্তেজিত করায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। বিশেষভাবে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রচলন, অবগুণ্ঠন মোচন এবং বালিকাগণকে কনস্তান্তিনোপলে প্রেরণ করায় প্রজাবর্গ অত্যধিক পরিমাণে কোপান্বিত হয়। আমানুল্লা খাঁর রাজ্যত্যাগের অব্যবহিত-পূর্ব্বে শিনওয়ারী সম্প্রদায় পূর্ব্বাঞ্চলে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং উত্তরাঞ্চলে বর্ত্তমান নৃপতি হবিবুল্লা একটা বিদ্রোহী দল গঠন করেন। হবিবুল্লা-পরিচালিত ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আফগান সৈন্যবাহিনীকে পরিচালিত করিয়া সুলতানকে পর্য্যন্ত রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য করিল, ইহাতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আফগান সৈন্যবাহিনী মোটেই শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ নহে। তাহারা সম্পূর্ণ রাজভক্ত নহে বলিয়া যুদ্ধবিগ্রহও পছন্দ করে নাই। রাজা আমানুল্লা তাহা বুঝিয়া সুঝিয়াই তাঁহার ভ্রাতা এনায়েৎউল্লাকে রাজ্যদান করিয়া সরিয়া পড়েন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না।

হবিবুল্লার রাজ্যাধিকার

আমানুল্লার রাজ্যত্যাগের পর তাঁহার সৈন্যসামন্ত সামরিক স্থান শূন্য করিয়া যায়। সেই দিন সন্ধ্যাকালেই হবিবুল্লা সদলবলে কাবুলে প্রবেশ করিয়া সহর অধিকার করে। এনায়েৎউল্লাকে ৩৷৪ দিন দুর্গে অবরোধ করিয়া রাখে। অবশেষে সহর লুঠ এবং অধিবাসিগণের মুণ্ডচ্ছেদের ভয়ে এনায়েৎউল্লা আত্ম-সমর্পণ করেন। হবিবুল্লা তখন রাজ্য দখল করে।

বিপৎসঙ্কুল কাবুল

ইহার পর হইতে বাহ্যতঃ কাবুলে শান্তি বিরাজিত বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু কেহই তাহার ধনপ্রাণ নিরাপদ মনে করিতেছে না। সেখানে যত ভারতীয় আছে, সকলেই ভীত ও কাতর হইয়াছে। এই মুহূর্ত্তেই তাহাদের স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। এখনও যদিচ লুঠতরাজ আরম্ভ হয় নাই, তথাপি ২৷১ জনের গৃহ-লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া যায় এবং সেগুলি সমুদয়ই ভারতীয়দের গৃহ। ভূতপূর্ব্ব নৃপতির অধীনে যাঁহাদের পদমর্য্যাদা ছিল, এখন তাঁহারা বন্দী ; তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত। সাধারণভাবে ভারতীয়দের উপর অত্যাচার হয় নাই। হিন্দুদের কোন বিপদ হয় নাই। তাহাদের ধর্ম্মের স্বাধীনতায়ও কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই।

আমানুল্লার রণসজ্জা

আফগানিস্থানের বর্ত্তমানে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ভীষণ অনর্থপাতের সম্ভাবনা আছে। আলি আহম্মদ জান ও তাহার অধীনস্থ শিনওয়ারীগণ বর্ত্তমান নৃপতিকে স্বীকার করিতে স্পষ্টাক্ষরে অসম্মত হইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরাও তদ্রূপ করিয়াছে। রাজা আমানুল্লা খাঁ কান্দাহারে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। শিনওয়ারী কান্দাহারীরা শীঘ্রই কাবুল আক্রমণ করিবে, ইহাই সকলে মনে করিতেছে। এত দিন তাহারা আক্রমণ করিত ; কিন্তু বোধ হয়, অতিরিক্ত তুষারপাতহেতু সেই লোমহর্ষক রক্তপাত ও লুণ্ঠনের সময় আসন্ন হয় নাই।

আমানুল্লার পাপের প্রায়শ্চিত্ত

বর্ত্তমান নৃপতি সমুদয় বিদ্যালয়ের সমূলে উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। আর আমানুল্লা যত 'পাপ' করিয়াছেন, তাহা ঘোষণাপত্রে

বাহির করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান এই যে, তিনি বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এবং যাবতীয় ভাষা শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। সেই ঘোষণাপত্রের সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যাস্পদ অংশ, যেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, ইসলামধর্ম্মানুসারে বালক ও যুবতী একই শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের বিদ্যালয়ে না দিয়া গৃহে রক্ষা করাই উচিত।

সম্প্রতি ধ্বংসপ্রাপ্ত বৃটিশ দূতাবাসের অংশ

ইহা হইতে মোটামুটি কাবুলের অবস্থার সম্বন্ধে একটা ধারণা হইতে পারে। মোট কথা, কাবুলরাজ্যে এখন অরাজকতা বিদ্যমান। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, রাজা আমানুল্লা এখনও কাবুলের ন্যায়সঙ্গত রাজা। তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়াছে, এ কথা সত্য, তাঁহার বিপক্ষে বিদ্রোহ হইয়াছে, এ কথাও সত্য। কিন্তু এমন ত অনেক রাজ্যে হইয়া থাকে। বুয়ররা ইংলণ্ডের রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, আইরিশ জাতি অল্পদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ইংলণ্ডের রাজা ইংলণ্ডের রাজাই ছিলেন। তবে একটা কথা, ইংলণ্ডের রাজা আফগানরাজ আমানুল্লার মত সিংহাসনচ্যুত হন নাই। রাজা আমানুল্লা সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করেন নাই। সে দিন পার্লামেণ্টে বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বার্লেন বলিয়াছেন, "রাজা আমানুল্লা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বৃটিশ সরকারকে জানাইয়াছেন। সুতরাং যত দিন কাবুলে কোনও শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং সমগ্র কাবুলরাজ্য সেই শাসন না মানে, তত দিন রাজা আমানুল্লার গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না।" এ কথার অর্থ কি? রাজা আমানুল্লা প্রথমে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি ভ্রাতা প্রিন্স এনায়েৎ উল্লাকে সিংহাসনে বসাইয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কান্দাহারগমনের পর যখন বাচ্ছা সেকো প্রিন্স এনায়েৎ উল্লাকে দুর্গে অবরুদ্ধ করে ও এনায়েৎ উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া কান্দাহার যাত্রা করেন, তখন রাজা আমানুল্লা পুনরায় সিংহাসনে দাবী করেন। এ সংবাদ কি সার অষ্টেন প্রাপ্ত হন নাই? তবে? প্যারিস ও মস্কৌ হইতে সংবাদ রটিয়াছে যে, বৃটিশ শক্তি আমানুল্লার পতনের মূল। অবশ্য এ সংবাদ সত্য নহে। সার ডেনিস্ ব্রে ব্যবস্থাপরিষদে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, "আফগানিস্থান সুসভ্য, উন্নত, শক্তিশালী হয় এবং তথায় এক কেন্দ্রীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও আফগান জাতি পূর্ণ স্বাধীন হয়, ইহা বৃটিশ সরকারের আন্তরিক কামনা।" এই ঘোষণার পর ভিন্ন দেশের জনরব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

আফগান যোদ্ধা

শেষ কথা, রাজা আমানুল্লা পুনরায় সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রজার মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া রাজ্য শাসন করুন, ইহাই ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান মাত্রেরই কামনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী

ত্রিচত্বারিংশৎ কংগ্রেসের অঙ্গস্বরূপ যে কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী হইয়া গেল—অর্দ্ধোদয় যোগ অথবা দ্বাদশ বাৎসরান্তিক মহাকুম্ভ যোগের ন্যায় এরূপ সুযোগ প্রাদেশিক জাতীয় জীবনে বড় সুলভ নহে। কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পুরুষ, মহিলা ও বালক-বালিকার পদরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। তথাপি, ইহা অসম্ভব নহে যে, "মাসিক বসুমতী"র সহস্র সহস্র পাঠক-পাঠিকা এই প্রদর্শনী দর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীর কিঞ্চিৎ বিবরণ সম্ভবতঃ তাঁহাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হইবে না।

কংগ্রেস যেমন বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস প্রদর্শনীর বিশালত্বও তাহার যোগ্যই হইয়াছিল। পার্ক সার্কাসের প্রকাণ্ড ময়দানে এই প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর চতুর্দ্দিক করোগেটে ও টীনের প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিবার দ্বার বা প্রধান তোরণটিই একটি স্বতন্ত্র দ্রষ্টব্য বস্তু হইয়াছিল। তোরণের উপর আমাদের জাতীয় ধরণে আমাদের সনাতন নহবৎ সুমধুর নিনাদে বাজিয়া বাজিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেছিল।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। সমগ্র প্রদর্শনী-ক্ষেত্র অনেকগুলি খণ্ডে (courtএ) বিভক্ত হইয়াছিল। এক একটি খণ্ডে এক এক শ্রেণীর বস্তু প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা—(১) স্বাস্থ্য-বিভাগ, (২) শিক্ষা-বিভাগ, (৩) মহিলা-বিভাগ, (৪) কলা-বিভাগ, (৫) leaders' kiosk, (৬) দেশবন্ধু হল, (৭) কৃষি-বিভাগ, (৮) কল-কব্জা বিভাগ, (৯) অন্তরীণ, (১০) খদ্দর-বিভাগ, (১১) আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইতে ষষ্ঠ এবং নবম বিভাগটি প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের খাসে ছিল; অবশিষ্টগুলি প্রদর্শকদিগের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

স্বাস্থ্য-বিভাগ

এই বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল; যথা—(১) মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল, (২) বিসূচিকা, (৩) যক্ষ্মা, (৪) বসন্ত ও তৎসংক্রান্ত জরজ্বাড়ি, (৫) ম্যালেরিয়া, (৬) কালাজ্বর, (৭) সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা, (৮) চক্ষুর যত্ন, (৯) কর্ণের যত্ন, (১০) মাদক দ্রব্য সেবন (মদ, অহিফেন, কোকেন, গাঁজা, গুলী, সিদ্ধি প্রভৃতি), (১১) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও অখাদ্যের প্রভেদ, (১২) Safety first (আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা, বিপদ হইতে সতর্কতা ও আত্মরক্ষা প্রভৃতি), (১৩) গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, (১৪) সরল শারীর-তত্ত্ব (simple anatomy and physeslogy) ও শরীরগঠন, (১৫) পল্লী সংগঠন, পল্লীর স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, (১৬) শ্রমিক-মঙ্গল (কারখানা ও শ্রমিকদিগের বাসগৃহ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গঠন প্রভৃতি।

নানাপ্রকার চিত্র-পরিচয় পত্র (chart), আদর্শ (model) প্রভৃতি সহযোগে প্রত্যেক বিষয়টি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রত্যেক বিষয় দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক স্থলে এক জন বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া demonstration দ্বারা সকলকে বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালীন পীড়া, শিশু-মৃত্যু, বালকগণের স্বাস্থ্য, দন্তরোগ ও তাহার কারণ এবং দন্তরোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য সতর্কতার ব্যবস্থা প্রভৃতি চিত্রাদিসাহায্যে উত্তমরূপে দর্শকবৃন্দের হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা ছিল।

Safety first শাখায় ambulance work, ট্রাম বা বাসে উঠিবার ও নামিবার সময় সতর্কতা, সন্তরণকালীন বিপদ, শরীরপালনের প্রাথমিক নীতিজ্ঞান, জলে ডোবা, বিষসেবন প্রভৃতি আকস্মিক বিপদে সাধারণ লোকও প্রথমে কিরূপে সাহায্য করিতে পারে, তাহা চিত্রাদি সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে, তাহাদের স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ প্রভৃতি নক্সা ও মডেল সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কারখানায় শিশু শ্রমিকদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, তাহাদের দ্বারা যেরূপ সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করানো হয়, সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের মডেল বা চিত্রসমূহ দর্শন করিলে অশ্রু সংবরণ করা দায় হইয়া উঠে।

আমাদের দেশের লোক অবশ্য স্বভাবতঃ, এবং আমাদের ধর্ম্মের অনুশাসনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পাশ্চাত্য ধরণে গঠিত নগরগুলিতে, এবং পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সে কালের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; অথচ; নব্য ও পাশ্চাত্য ধরণের পরিষ্কারপ্রিয়তা সম্যক্‌রূপে অবলম্বিত হয় নাই। ময়লা ও আবর্জ্জনা দূরীকৃত না হইলে কি ভাবে সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হইতে পারে, প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহা দর্শকগণকে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

নেশার জিনিষ দেশের কি যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, দেশের লোক তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। কলিকাতায় মাদক-সেবন নিবারণের জন্য আন্দোলন চলিতেছে—পিকেটিং করিবার প্রস্তাবেরও আলোচনা হইতেছে। উত্তর-কলিকাতা মাদকতা নিবারিণী সমিতি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে চিত্রসাহায্যে মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল প্রদর্শন করিয়া এই আন্দোলন পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মদ্যপ ব্যক্তিরা, মদ্য ব্যবসায়ীরা মদের লাইসেন্স ও টেক্স হইতে যাঁহারা আর্থিক হিসাবে লাভবান্ হইয়া থাকেন, পরোক্ষভাবে তাঁহারা মদ্যপানের সমূহ উপকার প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এই সকল যুক্তি যে বিচারসহ নহে, অন্তঃসারশূন্য, ভুয়া—প্রদর্শনীতে চিত্র দ্বারা তাহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মদ্যপরা মদের বোতল হস্তে যেরূপ নির্লজ্জভাবে নৃত্য করে, মাতাল অবস্থায় যে সকল অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মদ্যপানের ফলে স্নায়ুমণ্ডলী অসাড় হইয়া গিয়া মানুষের কর্ম্মক্ষমতা যেরূপে ক্ষুণ্ণ করে, মদ্যপানের ফলে প্রথমে স্নায়ুমণ্ডলী অযথা উত্তেজিত হইয়া পরে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যেরূপ অবসাদ আনয়ন করে, এ সমস্তই চিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, মদে আমাদের জাতীয় আর্থিক ক্ষতিও কম করে না। মদে কত সমৃদ্ধ সংসার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রদর্শন করিয়া প্রদর্শনী দেশের মহোপকারসাধন করিয়াছেন।

Physical Culture বা শরীর-চর্চ্চা শাখাও বেশ শিক্ষাপ্রদ। এটি বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের উপযোগী হইয়াছিল। পানীয় জল, দুগ্ধ প্রভৃতির বিশুদ্ধিতা রক্ষা যে অতীব আবশ্যক, তাহা প্রদর্শনে কর্তৃপক্ষ ত্রুটি করেন নাই। এতদ্ব্যতীত, সমবায় সমিতির দুগ্ধ, পথ্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগ, কলেরা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আয়ুর্ব্বেদ, দন্ত-চিকিৎসা, এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটী প্রভৃতি শাখাগুলিও উল্লেখযোগ্য। রক্ষক সিংহ কর্তৃক রাজস্বপিষ্টকের প্রধান অংশ সমর-বিভাগে গ্রাস করা হইতেছে এবং অর্থাভাবে দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইতেছে না—ভারতের মানচিত্র ও অন্যান্য চিত্রসাহায্যে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগ

এই বিভাগটি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল; যথা—(১) প্রাথমিক শিক্ষা—(ক) কিণ্ডারগার্টেন, (খ) বোর্ষ্টাল শিক্ষাপ্রণালী; (২) মাধ্যমিক শিক্ষা (secondary education) ও তাহার পঠিতব্য বিষয়; (৩) উচ্চ শিক্ষা, কার্য্যকরী শিক্ষা; (৪) ঐতিহাসিক তথ্য—বঙ্গের তুলাশিল্পের সৃষ্টি, পরিণতি ও পতনের ইতিহাস; (৫) বঙ্গ-গৌরব—অতীত গৌরব-কাহিনীর সহিত বর্ত্তমান হীনাবস্থার তুলনায় সমালোচনা; (৬) বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ; (৭) অবরোধ; (৮) জাতিভেদ। চিত্র, চার্ট ও মডেলের সাহায্যে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা গিয়াছিল।

ইংরাজী শিক্ষা দেশের লোককে কিরূপ অমানুষ করিয়া তুলিতেছে, তাহার একটা জলন্ত পরিচয় দেখা গিয়াছিল একটি কাচের বাক্সের ভিতর। একটি কেরাণীগিরি চাকুরীর জন্য সহস্রাধিক দরখাস্ত পড়িয়াছিল! সেই দরখাস্তগুলি এই কাচের বাক্সের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সাত শত উমেদার নিজেদের পরিশ্রমের ও যোগ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিল মাসিক ত্রিশ টাকা বা তদপেক্ষাও অল্প! দেশের কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ এতদ্দ্বারা দর্শকগণের চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন! দরখাস্তকারীদের মধ্যে ২৩ জন এম-এ, এম-এসসি, বি-এল এবং আড়াই শতাধিক বি-এ ও অন্যান্য উপাধিধারী ছিলেন! শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা এ দেশের কারিগর শ্রেণীর আয় অধিক। একখানি চার্টে তাহাই দেখানো হইয়াছে। এক জন ছুতারের দৈনিক আয় পাঁচ সিকা, রাজমিস্ত্রীর এক টাকা, অন্য মিস্ত্রীর তের আনা, মুটে-মজুরের নয় আনা, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের আট আনা এবং কেরাণীর ছয় আনা মাত্র। শিক্ষাদান বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার ইংরাজ ও দেশীয়ের মধ্যে ব্যয়ের যে তারতম্য করিয়া থাকেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক জন য়ুরোপীয় ছাত্রের জন্য সরকার গড়ে ব্যয় করেন বাৎসরিক ১০৩/০ এবং দেশীয় শিক্ষার্থীর জন্য ২।৵০ মাত্র। অথচ সরকারের রাজস্ব যোগায় এই দেশীয় লোকরাই। স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ কিরূপ পশ্চাৎপদ, তাহাও প্রদর্শনীর শিক্ষা-বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে বর্ণজ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীদিগের সংখ্যা ছিল শতকরা ১, ত্রিবাঙ্কুরে ৫, বরোদায় ২, মহীশূরে ৩; ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়া অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়,—বঙ্গদেশ পোনে ২, ত্রিবাঙ্কুর ৯, বরোদা ১৩ ও মহীশূর ১২। আর পুরুষদের শিক্ষার অবস্থা

কিরূপ ? তাহাও দেখুন।—লিখিতে ও পড়িতে পারে, এরূপ পুরুষের সংখ্যা শতকরা ত্রিবাঙ্কুরে ২৯, বরোদায় ২৪, বাঙ্গালায় ৯·৭, মাদ্রাজে ৯·২, বোম্বাই প্রদেশে ৭·৬, বিহার ও উড়িষ্যায় ৫·৭, যুক্তপ্রদেশে ৫ ও পঞ্জাবে ৪·৯।

এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগে আরও নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ হইয়াছিল। বৃটিশ ভারতে প্রত্যহ ২ হাজার ১ শত ২৭ জন লোকের মৃত্যু হয়। ম্যালেরিয়ায় প্রতি মিনিটে দশ জন করিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে। প্রতি বৎসর গড়ে চৌদ্দ লক্ষ শিশু লীলা-সম্বরণ করে।

প্রদর্শনীতে লোকশিক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থাও ছিল। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা শিশু-মঙ্গল, মাতৃ-মঙ্গল, শিশু-পালন প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও ল্যাণ্টার্ণ শ্লাইড প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সুখের বিষয় এই যে, প্রদর্শনীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিভাগে সংগৃহীত উপকরণাদি লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন একটি স্থায়ী মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছেন। ইহা যদি হয়, তাহা হইলে একটা কাযের মত কায হইবে, এবং জনসাধারণও মহা উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

মহিলা-বিভাগ

বাঙ্গালার মেয়েদের হাতের শিল্পকার্য্য প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শনীর খাস তত্ত্বাবধানে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিভাগে কয়েকটি মহিলা শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হাতের কায, এবং অনেক গৃহস্থ-মহিলার হস্ত প্রস্তুত শিল্প সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালার কন্যারা শিল্পশিক্ষায় কিরূপ অগ্রসর হইয়াছেন ও হইতেছেন, এই বিভাগে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গালার অন্তঃপুরবাসিনীরা শিল্পবিষয়ে আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। হয় সময়াভাবে, না হয় যথেষ্ট উদ্যমের অভাবে, অথবা বাঙ্গালার অন্তঃপুরের সংবাদ ভালরূপ জানা না থাকার জন্য এই বিভাগে উৎকৃষ্টতর নারীশিল্প সংগৃহীত হয় নাই, চেষ্টা করিলে বোধ হয়, অনেক ভাল ভাল জিনিষ দেখাইতে পারা যাইত। সে যাহা হউক, সংগ্রহ নিতান্ত মন্দ হয় নাই, এবং নারীশিল্পের কতকটা পরিচয় ইহাতে পাওয়া গিয়াছে।

কলা-ভবন

প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের খাস তত্ত্বাবধানে এবং বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কলাশিল্পিগণের সহযোগে এই কলা-ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্রও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই কলা-ভবনে প্রবেশ করিবার দর্শনী দুই আনা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই জন্য ইহা কেবল সমঝদার লোকদের উপভোগ্য হইয়াছিল—সর্ব্বসাধারণ চিত্র-সংগ্রহ দর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

Leaders' Kiosk.

Leaders' Kiosk বা নেতৃমণ্ডলীর চারু-কুটীরে ভারতের বহু নেতার চিত্র বিলম্বিত ছিল। এই জিনিষটি বিলক্ষণ নূতনত্বের পরিচায়ক হইয়াছিল। অন্য অন্য বারে কংগ্রেস-মণ্ডপে নেতাদের চিত্র বিলম্বিত থাকিতে দেখা যাইত। এবার দেখিলাম, তাঁহারা প্রদর্শনীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেশবন্ধু হল

নেতাদের চারু-কুটীরের সান্নিধ্যে পরলোকগত দেশবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে একটি স্বতন্ত্র হল-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এটিও একটি সুন্দর দর্শনীয় বস্তু।

অন্তরীণ

বাঙ্গালার অন্তরীণদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র ষ্টলের ব্যবস্থা করিয়া প্রদর্শনী সুবিবেচনা এবং সুব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই গৃহে অন্তরীণগণের চিত্র রক্ষিত হইয়াছিল। ঘরের দ্বার বন্ধই থাকিত—কক্ষমধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না—দর্শকরা বাহির হইতে তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া যাইতেন।

কৃষি-বিভাগ

এই বিভাগটি প্রদর্শনীর খাস সম্পত্তি না হইলেও ইহাতে দ্রষ্টব্য বস্তু-সমূহের সমাবেশ যেমন সুন্দর হইয়াছিল, শিক্ষণীয় বিষয়ের তদ্রূপ প্রাচুর্য্য ছিল। এই বিভাগে চাষ-বাস-সংক্রান্ত তাবৎ বস্তু ত ছিলই, তদ্ব্যতীত সেচ-সংক্রান্ত সকল ব্যাপার, টিউব ওয়েল, পাম্প, ড্রেজার-পাম্প, পশু-পালন, নার্শারী প্রভৃতি নানা জিনিষ ছিল।

চাষ-বাস বলিতে মাঠে বলদ সাহায্যে লাঙ্গল দিয়া বীজ বপন পূর্ব্বক শস্যোৎপাদনই সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আরও দুই একটা দিক্ আছে—বড় ও ছোট। আমাদের দেশে চাষবাসের ভার সম্পূর্ণরূপে কৃষকদের হস্তে অর্পিত। তাহাদের এক এক জনের জমীর পরিমাণ

দুই দশ বিঘার অধিক নহে। গোরু ও সাধারণ লাঙ্গলই তাহাদের চাষের কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু প্রতীচ্যে চাষের ব্যবস্থা একটু বিভিন্ন প্রকার। সেখানে এক এক জন লোকের একবন্দে দুই দশ হাজার একার জমী আছে। গোরু ও সাধারণ লাঙ্গলে এত জমীর চাষ একেবারে হইতে পারে না। সেই জন্য তথায় কলের লাঙ্গল, ষ্টীম-চালিত লাঙ্গল, ট্র্যাক্টর প্রভৃতির সাহায্যে চাষ করা হয়। চাষ-বাসের এটা বড় দিক্। আমাদের দেশে এই প্রণালীতে চাষ-বাসের কল্পনা হইতেছে। সেই জন্য তদুপযোগী সাজ-সরঞ্জামেরও আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে। প্রদর্শনীতে তজ্জন্য কলের লাঙ্গল, ষ্টীম-চালিত লাঙ্গল প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আর চাষ-বাসের যেটা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিক্, সেইটা প্রদর্শনীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রাণ পল্লীতে। পল্লীগ্রামেই দেশের অধিকাংশ লোকের বাস। চাষের জমী অবশ্য সকলের নাই, কিন্তু গৃহস্থমাত্রেরই আঙ্গিনায় অল্পস্বল্প জমী আছেই। বাল্যকালে আমরা দেখিয়াছি, গৃহস্থমাত্রেই, বিশেষতঃ পুরমহিলারা ঘরের আঙ্গিনায় দু'চারিটা লাউ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, ঝিঙ্গে, বরবটি, করলা, উচ্ছে, পুঁই, শিম প্রভৃতির বীজ, অথবা কিছু ফুলের বীজ ছড়াইয়া দিতেন এবং সন্তান-স্নেহে তাহাদের পালন করিতেন। গোরু-ছাগল-পাখীর উপদ্রব হইতে তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। জল সেচন করিতেন, মাচা বাঁধিয়া দিতেন। গাছ-পালাগুলিও কৃতঘ্নতা করিত না—গৃহস্বামিনীর ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের স্নেহের প্রতিদান ভাল রকমেই করিত—গৃহস্থের অনেক সাশ্রয় হইত। এই আঙ্গিনায় অনায়াস-লব্ধ ফলমূল ও শাকসব্জী খাইয়া, বিলাইয়া, ছড়াইয়া শেষ করা যাইত না। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এই সদনুষ্ঠানটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ফলে পল্লীগ্রামে তরী-তরকারী দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রদর্শনীর কৃষি-বিভাগ এই বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া ভালই করিয়াছেন। গৃহ-সংলগ্ন দুই চারি কাঠা জমীতে বেগুন লাগাইয়া একটা বড় 'যজ্ঞি'র কায সারিয়া লইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বিলাতী বেগুন, ফুলকপি, বাঁধা কপি, কড়াইশুঁটি, পেঁয়াজ প্রভৃতি আরও অনেক রকম শস্য গৃহ-সংলগ্ন জমীতে অল্পপরিমাণে উৎপাদন করিতে পারা যায়। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রদর্শনীর কৃষি-বিভাগে পুস্তিকা, আদর্শ, চার্ট প্রভৃতির সাহায্যে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। বাগান-বাগিচা করিতে গেলে কোদাল, কুড়ুল, খন্তা, খুরপি প্রভৃতি যে সব যন্ত্র আবশ্যক, তাহা আমাদের দেশের কামাররা তৈয়ার করিয়া থাকেন। এই সকল যন্ত্র এবং জল-সেচনের ও সার-প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

নানারূপ জীবজন্তু ও পশুপক্ষী মানবের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পরম সহায়। গোরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ত মানবের নিত্যসঙ্গী ও মানব-জীবনের অপরিহার্য্য অংশ। তদ্ব্যতীত সখ করিয়াও অনেকে অনেক রকম জীবজন্তু পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল সখ থাকিলেই যথেষ্ট হয় না। জীবজন্তু পালন করিতে জানা চাই। অবলা জন্তুর সুখ-দুঃখ, অসুখ-বিসুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয়। ব্যায়াম করাইতে হয়। অনেক জীবজন্তু অত্যন্ত পেটুক—লোভে পড়িয়া অখাদ্য খাইয়া পীড়িত হয়। তাহাদের খাদ্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর জীবজন্তুর শৈশব অবস্থায় তাহাদের আরও যত্নের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। জীবজন্তু কিরূপে পালন করিতে হয়—যে সকল জন্তুর দুগ্ধ পান করা যায়, তাহাদের স্বাস্থ্য কিরূপে ভাল থাকে, এই সমস্ত বিষয় কৃষি বিভাগে শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত ছিল।

কলকব্জা-বিভাগ

বর্ত্তমানে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে যুগ চলিতেছে, ইহা যন্ত্র-যুগ—কলকব্জা এ যুগের সর্ব্বস্ব। কলকব্জার সহিত সম্বন্ধরহিত জীবনের কল্পনা এ যুগে করিতে পারা যায় না। সুতরাং প্রদর্শনীতে যে একটা কলকব্জার বিভাগ থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, এবং ছিলও।

এই বিভাগে প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল:—(১) গভীর নলকূপ ও পাম্প, (২) জল-উত্তোলক যন্ত্র (disc pattern water lifting machines), (৩) চূর্ণ করিবার যন্ত্র, (৪) কলের লাঙ্গল, (৫) ষ্টীম প্লাউ, (৬) আটা, ময়দা ও চালের কল, (৭) ছাপার কল, (৮) ডাক্তার বোসের ল্যাবরেটারীর ট্যাবলেট প্রস্তুত করিবার কল, (৯) বোতাম প্রস্তুত করিবার কল, (১০) দেশলাই প্রস্তুত করিবার কল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নানা কার্য্যের উপযোগী বিবিধ

কল-কব্জা আমদানী হইয়াছিল। আজ এই কঠোর জীবন-সংগ্রাম ও ঘোর প্রতিযোগিতার দিনে কলকব্জার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। কেবল বিলাতী কল আনিয়া ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হইবে না। আমাদের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য বস্তু সকল প্রস্তুত করিবার উপযোগী কল-কব্জা মাথা খাটাইয়া আমাদিগকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী এ বিষয়ে দেশবাসীকে পন্থা নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়া দেশের মহোপকারসাধন করিয়াছেন।

খদ্দর-বিভাগ

খদ্দর-বিভাগে নানারূপ খদ্দর সংগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সংগ্রহ আশানুরূপ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেস প্রদর্শনী যখন নিখিল ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনী এবং খদ্দর যখন জাতীয় শিল্প, তখন খদ্দর সংগ্রহ আরও অধিক এবং বিচিত্র হইলেই শোভন হইত। সে যাহাই হউক, এই জাতীয় শিল্পের সকল অবস্থা প্রদর্শনের চেষ্টা প্রদর্শনীতে হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে এক দল সুদক্ষ কাটুনী আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দর্শকদের সম্মুখে ৪০ হইতে ১২০ নম্বরের সূতা কাটিয়া দেখাইয়া দিতেছিলেন। ইঁহারা ঘণ্টায় ৮ শত গজ পর্য্যন্ত সূতা কাটিতে পারেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, অভ্যাস করিলে চরকায় হাতে মিহি সূতা যথেষ্ট পরিমাণে কাটা যায়, এবং মিলের সঙ্গে অল্পাধিক প্রতিযোগিতাও করিতে পারা যায়। অন্ধ্র দেশের খদ্দরের সুজনী, চাদর, সতরঞ্চ প্রভৃতি খদ্দর-বিভাগের বৈচিত্র্যবিধান করিয়াছিল। খদ্দর হইতে ধুতি, শাড়ী, শয্যাদ্রব্য, গৃহসজ্জা, কোট ও সার্টের কাপড়, ঝাড়ন, টেবল ক্লথ প্রভৃতি নানা রকমের জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। খদ্দর-বিভাগে পার্শী মহিলারা খদ্দরের উপর রেশম, পশম ও জরির ফুল ও নক্সা তুলিয়া, খদ্দর-শিল্পকে কতখানি উন্নত করা যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিতেছিলেন।

খদ্দর-বিভাগে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, ইণ্ডিয়ান কটন স্পিনিং মিলের ষ্টল। শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ তিন থাকের একটি সূতা কাটা কল প্রস্তুত করিয়াছেন। গাছ হইতে যে অবস্থায় তুলা পাওয়া যায় অর্থাৎ বীজশুদ্ধ তুলা এই কলে ফেলিয়া বীজ ছাড়ানো, পাঁজ প্রস্তুত করা এবং ১৪টি টাকুতে সূতা কাটা হইয়া একেবারে নলীতে জড়ানো হইয়া যায়। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন থাকে তিন দফা স্বতন্ত্রভাবে কাষ করিতে হয়। প্রথম ও তৃতীয় থাকের কলে সাইকেলের প্যাডেল সংযুক্ত থাকায় পায়ে চালানো যায়, এবং দ্বিতীয় থাকের যন্ত্রটি হাতে চালাইতে হয়।

পল্লী-সংস্কার

কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীতে আর একটি শিক্ষাপ্রদ দর্শনীয় বিভাগ ছিল দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি। এই সমিতি অনেক দিন ধরিয়া পল্লী-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই অভিজ্ঞতার ফল তাঁহারা যত্ন সহকারে প্রদর্শনীর দর্শকদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কিরূপ সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল, আর এখনই বা তাহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, নানারূপ তথ্য এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তখন দেশের ধন-সম্পদ্ দেশেই থাকিত, দেশের মধ্যেই তাহার লেন-দেন চলিত, এই ধনের অংশ সকলেই সমানুপাতে ভোগ করিতে পাইত। কিন্তু এখন নানাদিক্ দিয়া দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে—দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক দিক্ দিয়া যেমন দেশের শস্যসম্ভার ও কাঁচা মাল বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, তদ্রূপ রেলওয়ে বাঁধের দরুণ জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া দেশ ম্যালেরিয়ায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে দেশের লোকের মন অন্তর্মুখী ছিল, তাহারা গ্রামের মঙ্গল চিন্তা করিত। এখন লোকের মন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বহির্মুখী হওয়ায় গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাহারা উদাসীন, আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সার উইলিয়ম উইলকক্স এ দেশে আসিয়া দেশের অবস্থা দেখিয়া স্থির করেন যে, বাঙ্গালা দেশের যে সকল জলাশয় অধুনা নদী নামে পরিচিত, তাহাদের সকলগুলি স্বাভাবিক নদী নহে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মানুষের দ্বারা কাটা খাল মাত্র—নদীমাতৃক বঙ্গদেশে জলপথে যাতায়াতের সুবিধার্থ এবং কৃষি-ক্ষেত্রে জলসেচনের সুবিধার জন্য এই সকল সুবৃহৎ খাল খনিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায়ী ইংরাজ জলপথ অপেক্ষা রেলপথ অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া রেলপথের প্রসারবৃদ্ধিকল্পে আরও মনোযোগ দেওয়ায় সংস্কারাভাবে জলপথগুলি মজিয়া গিয়া দেশ ক্রমে অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। সেকালের

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা পুষ্করিণী ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতেন; অধুনা বস্তুতান্ত্রিক প্রতীচ্য শিক্ষার ফলে তাঁহাদের ভাবান্তর ঘটিয়াছে; এখন আর নূতন জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হয় না, পুরাতন পুষ্করিণীগুলিও সংস্কারাভাবে মজিয়া গিয়া রোগের আকরে পরিণত হইতেছে। পল্লী-সংস্কার সমিতি দেশের লোকের মন পুনরায় অন্তর্মুখী করিয়া জলদানে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রতি তাহাদের প্রবৃত্তি দেওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ শাসনে যেরূপে যে দিক্ দিয়াই হউক দেশের জাতীয় শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমিতি সাধ্যমত সেই সকল নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। নষ্টস্বাস্থ্য, কলাশিল্প, কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে দর্শকদিগকে তাঁহারা তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে চিত্রপট, পুতুল প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা দেশের অবস্থা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার আদর্শ গ্রাম কিরূপ হওয়া উচিত, তাহারও একটা নক্সা তাঁহারা খাড়া করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রাচীন সুসমৃদ্ধ চিত্র ও আধুনিক দরিদ্র-মূর্ত্তি পাশাপাশি স্থাপন করিয়া তাঁহারা উভয়ের পার্থক্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পল্লী-সংস্কার সমিতি আরও একটা বড় কায করিয়াছিলেন—বাঙ্গালার অতীত গৌরব-কাহিনীকে তাঁহারা মূর্ত্ত করিয়া লোকচক্ষুর সমক্ষে ধরিয়াছিলেন। বাঙ্গলা এককালে নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মে বিশ্বের আদর্শ ছিল। যুগে যুগে বাঙ্গালা নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়া বিশ্ব-প্রেমের আদর্শ ধরিয়া দিয়াছিল। এক এক যুগে বাঙ্গালায় এক জন বা একাধিক ঋষি আবির্ভূত হইয়া নব নব যুগপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পল্লী-সংস্কার-সমিতি সেই সকল ঋষির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের উদ্যোগে এইরূপ ২২টি মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। শ্রীবুদ্ধদেব, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, রজকিনী রামী, শ্রীচৈতন্য, স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনাথ, রাজা সিংহবাহুর পুত্র সিংহল-বিজয়ী বিজয়সিংহ, বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্য, রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সাধকচূড়ামণি রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নব নব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, প্রেমধর্ম্ম প্রচার, সমাজ-শৃঙ্খলা স্থাপন, দিগ্বিজয় প্রভৃতি বাঙ্গালার অতীত ও আধুনিক গৌরব-কাহিনী প্রচার করা হইয়াছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎসহ বাঙ্গালার দীনাহীনা ভিখারিণী মাতৃমূর্ত্তি, রাজনীতিক বীর সুরেন্দ্রনাথ, ভক্ত অশ্বিনীকুমার, শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন, বাঙ্গালার বাঘ আশুতোষ, ত্যাগের আদর্শ চিত্তরঞ্জন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লকুমার, কর্ম্মযোগী রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

"গ্রাম্য বিভ্রাট" চিত্রে দলাদলিতে বাঙ্গালার পল্লীগুলি কিরূপে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ষ্টল

কতকগুলি ষ্টল বিশেষ উদ্যোগ-আয়োজন সহকারে প্রদর্শনীকে সফল করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন। টাটা আয়রণ ওয়ার্কস বড় একটি ষ্টল খুলিয়া বায়স্কোপের সাহায্যে লৌহ-শিল্প-সংক্রান্ত সকল ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "বসুমতী সাহিত্য-মন্দির" প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সুলভ সাহিত্য-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওর্যান্স কোম্পানী মহিলা দর্শকদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী দেশীয় জাহাজের কারবারের অবস্থা বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের কয়েকখানি জাহাজের মডেল প্রদর্শন করিয়াছিলেন ও তাহাদের সুচারু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। মার্টিন কোম্পানী রেলপথে ব্যবহারোপযোগী নানা প্রকার কাষ্ঠের নমুনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। বার্ড কোম্পানী পেটেণ্ট ষ্টোন প্রস্তুত-প্রণালী দেখাইয়াছিলেন। হুকুমচাঁদ ষ্টীল ওয়ার্ক রেলগাড়ীর নানা অংশ ও স্প্রীং প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী একটা গাছে ব্রডকাষ্ট যন্ত্র স্থাপন করিয়া এক মাইল দূরের লোকদিগকেও গান, বক্তৃতা ইত্যাদি শুনাইয়াছিলেন। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কলিকাতা সহর ভাঙ্গিয়া গড়িবার সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা জল্পনা-কল্পনার মডেল ও নক্সা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশন সহরে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থার মডেল প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ছোট-খাট ষ্টলগুলির মধ্যে হিমানী ষ্টলটি দেখিবার মত হইয়াছিল। ইঁহাদের ষ্টলটি সত্যকার ষ্টল ছিল, কারণ—ইঁহারা কোন জিনিষই বিক্রয় করেন নাই, কেবল প্রদর্শনের জন্যই সমস্ত জিনিষ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সাইনবোর্ডটি করিয়াছিলেন

ইঁহাদের নবপ্রচলিত হিমানী সাবানের লেবেলের মত। 'হিমানী' সাবান যে অদূর-ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুটীর-শিল্প

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল তাঁহার শিল্প-কৌশল প্রদর্শন করিয়া বিশ্বশিল্পী সভায় উচ্চ সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজা, ডিউক অব কনট প্রভৃতি ৭৫জন অভিজাত-শ্রেণীর ব্যক্তির অবিকল মূর্ত্তি মাটী ও প্লাষ্টার অব প্যারিস সহযোগে প্রস্তুত করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে তিনি যথাক্রমে ডাক্তার আনসারি, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি দেশনেতৃগণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া দর্শকগণকে বিমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এক একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ৫।৭ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। মূর্ত্তিগুলি মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় দেখিতে সুঠাম ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসমন্বিত হইয়াছিল। অপর এক জন শিল্পী বিলাতী মাটী দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। বিলাতী মাটীর উপর তিনি যেরূপ বিচিত্র রং ফলাইয়াছিলেন, তাহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বিশ্বাস করা যায় না।

এল, সি, ধাড়া কোম্পানী বেত ও দড়ির সাহায্যে কত রকম গৃহসজ্জা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিলেন।

আর এক জন নীরব বৌদ্ধ সাধক প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে একটির পর একটি বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিয়াছিলেন। মূর্ত্তিগুলি এরূপ ভাবোদ্দীপক হইতেছিল যে, তাহাতেই তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। ইনি তিব্বতী লামা—বুদ্ধের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণই তাঁহার একমাত্র সাধনা ছিল।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েসন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি আরও অনেক ষ্টল বাঙ্গালার কুটীর-শিল্পের নানা রূপ ও বিবিধ অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ডাক্তার বসুর ল্যাবরেটারী লিমিটেড ট্যাবলেট প্রস্তুত করিবার কল এবং আরও চারি পাঁচ রকম কুটীর-শিল্পের উপযোগী অল্প দামের কল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় যে তিনটি চরকা-যন্ত্র দেখাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য মাত্র ৬শত টাকা। সুতরাং ইহা কুটীর-শিল্পের সম্যক্ উপযোগী এবং অনেকের পক্ষেই সাধ্য।

আমোদ-প্রমোদ

এত বড় একটা বিরাট ব্যাপার—যেখানে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তির শুভাগমন হইত, তথায় আমোদ-প্রমোদের যথোচিত বন্দোবস্ত না থাকিলে অনুষ্ঠানটি অঙ্গহীন হইয়া পড়ে নিশ্চয়ই। প্রদর্শনীর কর্ত্তারা সেই জন্য আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন, এবং এইগুলি কেবল আনন্দ দান করে নাই—ইহাদের মধ্যে কয়েকটি আমোদের সঙ্গে শিক্ষাও প্রদান করিয়াছিল।

বৈদ্যুতিক আলোক-স্তম্ভ

এফেল টাওয়ারের ধরণে একটি সুউচ্চ লৌহস্তম্ভের গাত্রে অসংখ্য বৈদ্যুতিক ফানুষ সংলগ্ন করিয়া এমন একটি আলোক-মালা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যে আলো বহুদূর হইতে পথিকদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল।

পুতুল-নাচ

কৃষ্ণনগরের পুতুল লইয়া প্রত্যহ রাত্রিতে বহু প্রকার দৃশ্যাভিনয় করিয়া দেখানো হইয়াছিল। একে ত কৃষ্ণনগরের সুদক্ষ কারিগরের হাতে গড়া পুতুল, তাহা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। পুতুলগুলির মুখের ভাবব্যঞ্জক গঠনভঙ্গী, তাহাদের অঙ্গসঞ্চালনের ভাব-বৈচিত্র্য এমন চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, প্রতি রাত্রিতে পুতুল-নাচ দেখিবার জন্য অত্যন্ত জনতা হইত।

বায়স্কোপ, র‍্যাডিও লাউড স্পীকার প্রভৃতিও বহু দর্শককে আকর্ষণ করিত। বোম্বাইয়ের একটি সার্কাস কোম্পানী নানারূপ নূতন ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করিতেন। প্রদর্শনীর সংস্রবে একটি মল্লভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল। ভারতের সকল প্রসিদ্ধ মল্লবীরগণ তথায় সমবেত হইয়া বহুদিন ধরিয়া ব্যায়াম-কৌশল ও কুস্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কুস্তি-প্রদর্শনে তরুণ বঙ্গের হৃদয়ে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা দেখিবার বস্তু। শ্রীযুক্ত পুলিন দাসের দল লাঠি ও অসি-চালন-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রফেসর রামমূর্ত্তিও নিয়মিতভাবে তাঁহার অদ্ভুত বাহুবল ও ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করিতেন।

যাদুকর গণপতি প্রদর্শনীক্ষেত্রে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন।

রেমনের ব্ল্যাক আর্টও প্রদর্শিত হইয়াছিল। বরিশালের ঢোল-বাদ্য, ঐক্যতান বাদ্য, গোলকধাঁধা, মহীশূরের যমজ কন্যা, কয়েকটি অদ্ভুত আকৃতির শিশু—কাহারও দুই হাত, চারি মস্তক, কাহারও বা তিন মাথা, চারি হস্ত প্রভৃতি।

বিক্রমজিৎ ওরফে শ্যামাকান্ত নামক একটি সাড়ে তিন বৎসর-বয়স্ক শিশু অদ্ভুত শক্তির ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল। এই শিশু নিজ বক্ষে তিন মণ ওজন ধারণ করিতে পারিত, কটিদেশে এক মণ পাঁচ সের, স্কন্ধে ও হস্তে ত্রিশ সের ও চিবুকে অর্থাৎ দন্তের সাহায্যে দশ সের ওজন উত্তোলন করিতে পারিত।

রেনার্ডের ওয়াণ্ডারস্কোপে বহু আশ্চর্য্যজনক তামাসা দৃষ্ট হইয়াছিল। জিকালির আবাস, সুনীল দত্তের ইজিপ্সিয়ান ব্ল্যাক আর্ট, হাস্যোদ্দীপক কক্ষ, ধনুর্ব্বিদ্যা ও অন্য প্রকার তামাসার অভাব ছিল না।

মালদহের গম্ভীরা অতি সুবিখ্যাত। ইহা মালদহের জাতীয় আমোদ-অনুষ্ঠান। কলিকাতায় পূর্ব্বে কখনও ইহার আমদানী হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীতে দর্শকগণ মালদহের গম্ভীরার গান শুনিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই গম্ভীরার বিবরণ দেওয়া সহজ নহে। ইহা মালদহের জাতীয় উৎসব। জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় এই উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসবের অঙ্গ 'বোলবাহি' বা 'বোলাই' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারা বৎসরের সমুদায় প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া গান, ছড়া ও সঙ বিরচিত হয়, এবং আনুষঙ্গিক অভিনয়ও হইয়া থাকে। সমাজ-সংস্কার, সামাজিক দুর্নীতি-দমন, এবং সাধারণভাবে লোকশিক্ষাও গম্ভীরার গানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই গানের সুর মালদহের নিজস্ব।

মোমের মূর্ত্তি

প্রদর্শনীর আর একটি আমোদ ছিল বোম্বায়ের বিখ্যাত শিল্পী-প্রোফেসর ফাড়্কের চিত্রশালা। এই শিল্পশালায় মোমের যে সকল মনুষ্যমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কলা-কুশলতা অনিন্দনীয়, অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয়। সহসা দেখিলে তাহাদিগকে জীবন্ত মানুষ বলিয়া বোধ হয়। তড়িৎ-শক্তি-প্রয়োগে এই সকল মূর্ত্তি সচল ও সক্রিয়। ইহাতেও তাহাদের জীবন্ত ভাব অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই প্রদর্শনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। এক জন ব্রাহ্মণ বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া গীতা-পাঠে নিরত। ব্রাহ্মণ পূজারীর মুখে ভক্তির ভাব সুপরিস্ফুট, পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মস্তকসঞ্চালন অপূর্ব্ব ভাব-ব্যঞ্জক। সমবেত ভাবে সমগ্র চিত্রটি এমন জীবন্ত সুষমামণ্ডিত ভাব প্রকাশ করিতেছে—কে বলিবে, ইহা জীবন্ত নহে! ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে বসিয়া এক বৃদ্ধ গীতাপাঠ শুনিতে শুনিতে ভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছে! আর একটি মোমের পুতুল—শোকার্ত্তা ভারতমাতা দেশবন্ধু সি, আর, দাশ মহাশয়কে কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অপর একটি চিত্রে মহাত্মা গন্ধীর দেহে অস্ত্রোপচার দেখানো হইয়াছে। একটি চিত্রে মহাত্মা গন্ধী অসহযোগ প্রচার করিতেছেন। একটি বৃদ্ধার তরকারী বিক্রয়, সেক্রেটারীর কর্ম্মকক্ষ প্রভৃতি আরও অনেক জীবন্তবৎ সক্রিয় মোমের পুতুল এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পুরী হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উড়িষ্যার অতীত গৌরবের নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সকল সংগ্রহের মধ্যে একখানি তালপত্রে লিখিত সচিত্র রামায়ণ অতুলনীয়। ইহার কালী অক্ষয়, চিত্রগুলি সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচায়ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালপত্রের সংযোজনে নির্ম্মিত জগন্নাথ দেবের মন্দিরের আদর্শ এ কালে রচনা করিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারেন না।

প্রদর্শনীকে জনসাধারণ কিরূপ সুনজরে দেখিয়াছিলেন, তাহার একটা নিদর্শন দিতেছি। কোন একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের একশতটি ছাত্রী লইয়া প্রদর্শনীর খদ্দর কোর্টে জাতীয় সঙ্গীত, স্কিপিং, শারীরিক ব্যায়াম, জাতীয় সঙ্গীত সহ জাতীয় পতাকা হস্তে ড্রিল, লাঠিখেলা, মুষল-খেলা, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমাতার বন্দনাগীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

দোষ পরিচ্ছেদ

এতক্ষণ ধরিয়া প্রদর্শনীর গুণকীর্ত্তনই করিলাম; এইবার একটু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও বলি। নচেৎ এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

(১) প্রথমতঃ প্রদর্শনীর 'বন্দোবস্ত' নিখুঁত, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই। ষ্টলগুলির অবস্থানে শৃঙ্খলা ছিল না। এক এক শ্রেণীর বস্তুর ষ্টল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করা উচিত ছিল, তাহা না হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বাস্থ্য-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ ও কুটীর-শিল্প-বিভাগ স্থাপনের স্থাননির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই। এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রদ বিভাগগুলিকে এমন অনুপযুক্ত স্থানে কোণ-ঠাসা করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল যে, ইহারা অনেকেরই দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল।

(২) ষ্টলগুলির শ্রেণী বিভাগ ও Range allotment-এর জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ দায়ী। এ দায়িত্ব তাঁহারা সম্যক্‌রূপে পালন করিতে পারেন নাই। Range আদৌ ঠিক হয় নাই। ইহাতে দর্শকদের অনেক অসুবিধা হইয়াছিল।

(৩) ষ্টলগুলি সাজানো ভাল হয় নাই। সে জন্য ষ্টল-হোল্ডাররা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবার ও সাহায্য করিবার জন্য রূপদক্ষের অভাব ছিল। সে জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে দায়ী।

(৪) প্রদর্শনীর জন্য যতটা স্থান লওয়া হইয়াছিল, একজিবিটের পরিমাণ তাহার অনুপাতে অল্প ছিল। সেই জন্য বড় ফাঁক ফাঁক দেখাইতেছিল এবং দৃষ্টিকটু হইয়াছিল।

(৫) Overbridge connecting the outer section বৃথা ব্যয়—annexe কোন কাযেই লাগে নাই। Boxing ও কুস্তির বন্দোবস্ত সেই স্থানে সহজেই হইতে পারিত—প্রদর্শনীক্ষেত্রও অতটা ফাঁক ফাঁক দেখাইত না।

(৬) যেরূপ দর্শক ও গাড়ী-ঘোড়ার ভীড় হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, প্রধান তোরণ ভিতর দিকে আরও সরাইয়া প্রস্তুত করিলে ঠিক হইত,—গাড়ী-ঘোড়া, মোটর-বাসের যাতায়াতের জন্য আরও যায়গা থাকিত, ভীড়ের দরুণ লোকজনের, বিশেষতঃ মেয়েছেলের ও বালকবালিকাদের অসুবিধা অনেকটা কম হইত। কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্লে সেটা বোধ হয় অনুমান করিতে পারেন নাই। এই ক্রটির জন্য বাহিরে ভীড়ে বিস্তর অসুবিধা হইয়াছিল।

(৭) Latrine ও urinalএর বন্দোবস্ত উত্তম ছিল না। Ladies' Courtএ যা হোক এক রকম মন্দ ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আর সব যায়গায় বন্দোবস্ত খারাপ ছিল। ভলান্টিয়ারদের এ সম্বন্ধে সম্যক্‌ উপদেশ না দেওয়ার দরুণ তাহারাও সব জানিত না, দর্শকদের সাহায্যও করিতে পারিত না।

(৮) বাহিরে ফটকের পাশেই একটা নহবৎখানা করা উচিত ছিল—হয় নাই।

(৯) অর্থ-ব্যয় করিয়া প্রদর্শনীর পশ্চাদ্ভাগে Band stand নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে Band বাজাইবার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে"র আশে-পাশে অনেক খোলা যায়গা ছিল। সেইখানে কোথাও Band stand নির্ম্মাণ করিলে দেখিতে শোভন হইত; সেখানে Band বাজিলে দর্শকরা উপভোগও করিতে পারিতেন, প্রদর্শনীক্ষেত্র আরও কম ফাঁক ফাঁক দেখাইত।

(১০) লোকশিক্ষার উপযুক্ত মুকুন্দ দাসের যাত্রা তিন দিনমাত্র দিয়াই হাঁপাইয়া পড়া উচিত হয় নাই। সমগ্র প্রদর্শনীর মাসটা না হউক, আরও কিছু দিন চালাইলে ভাল হইত। অন্য অনেক আমোদ-প্রমোদের স্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল, আর লোকশিক্ষক মুকুন্দ দাস কি অপরাধ করিলেন?

(১১) কথকতার বন্দোবস্ত করিলে খুবই ভাল হইত—প্রত্যহ না হউক, অন্ততঃ শনি ও রবিবারে।

(১২) ভলান্টিয়ারদের কার্য্যের অনেকেই সুখ্যাতি করিয়াছেন—আমরাও নিন্দা করিতে চাহি না; তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, সর্ব্বস্থলেই তাহাদের ব্যবহার শোভন হয় নাই।

(১৩) প্রদর্শনীতে গাইডের অভাবে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের পয়সা খরচ করিয়া প্রদর্শনী দেখিতে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। গাইড না থাকায় তাঁহারা সকল অংশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই।

মোটের উপর, কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী প্রকাণ্ড ব্যাপার। সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানে তাহার সম্যক্‌ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে, আমিও পারি নাই। আমার মনে হয়, যাঁহারা এই প্রদর্শনী দেখেন নাই, তাঁহারা একটা দেখিবার মত দৃশ্যে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। জীবনে এ সুযোগ আর না-ও ঘটিতে পারে। *

---

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে প্রদর্শনীর অন্যতম পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

রাজদ্রোহ

'ফরওয়ার্ড' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ কথা সকলে জানেন। এ দেশে এমন কারাদণ্ড নূতন নহে। সুতরাং ইহাতে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। এ দেশের দেশীয় সংবাদপত্র পরিচালন বা সম্পাদনের পথ যে কুসুমাস্তৃত নহে, ইহাতে যে পদে পদে বিপদ, তাহা ভুক্তভোগী জানেন। যাঁহারা নির্ভীকভাবে দেশের ও দশের কথা কহিবার কালে সরকারের কার্য্যের বিরুদ্ধ ও তীব্র সমালোচনা করেন, তাঁহাদের মস্তকের উপর বিপদের বজ্র সর্ব্বদা উত্থিত থাকে। বিশেষতঃ আইনের বেড়াজাল যে ভাবে পাতান থাকে, তাহাতে উহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজসাধ্য নহে। এমন দেখা যায়, যে রচনা উপলক্ষ করিয়া মামলা রুজু হয়, তাহা হইতে বহু তীব্রতর রচনা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। কোন্‌টায় রাজদ্রোহ হয় আর কোন্‌টায় হয় না, তাহা অনেক সময়ে সরকারের মনের ও দৃষ্টির গতির এবং বিচারকের মরজির উপরে নির্ভর করে। ইহার উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমাবেশ আছে। সুতরাং যে রচনার ('মুনিফরমর্ড' প্রবন্ধ) জন্য সত্যরঞ্জনের কারাদণ্ড হইয়াছে, উহা দেশবাসীর মতে রাজদ্রোহ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত না হইতে পারে, কিন্তু সরকারের অথবা বিচারকের মতে রাজদ্রোহ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের কিছু বলিবার নাই।

তবে ইহাতে অন্য দিক্ দিয়া বলিবারও যে একবারে কিছু নাই, তাহা নহে। ইংরাজ আইন-সংস্কারক ভারতে disaffection অর্থে want of affection অর্থ করিয়াছিলেন। ভারতের রাজদ্রোহ আইনে creating disaffection against the government established by law অর্থে সরকারের বিপক্ষে creating want of affection ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা যে কিরূপ অপরূপ ব্যাখ্যা, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। জগতের কোনও সভ্যদেশে এই ব্যাখ্যা ধরিয়া রাজদ্রোহ অপরাধের বিচার হয় কি না, জানি না। disaffection কথার সহজ অর্থ বিদ্বেষ। সরকারের বিপক্ষে কেহ যদি বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, তাহা হইলে ন্যায়তঃ সে রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হইতে পারে। কিন্তু সরকারের বিপক্ষে 'ভালবাসার অভাব' সৃষ্টি করিলে রাজদ্রোহ হয় কিরূপে, তাহা সহজ বুদ্ধির বোধগম্য নহে। ইহা কি 'ধরিয়া বাঁধিয়া পীরিত করার' অনুরূপ নহে?

এত দিন এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জনের মামলায় রাজদ্রোহের অদ্ভুত ব্যাখ্যা আর এক ধাপ উপরে চড়িয়াছে বলিয়া ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে। পূর্ব্বে government established by law বলিলে কখনও পুলিসকে বা সিভিল সার্ভ্যাণ্টকে বুঝাইত না, গভর্ণমেণ্ট বলিলে খোদ সরকারকে বা ব্যুরোক্রেশীকে বুঝাইত। এই মামলায় পুলিসের পাহারাওলাকে ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে গভর্ণমেণ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে!

যদি একটা ডেপুটী বা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই অপব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে কথা ছিল না। খোদ মহামান্য হাই-কোর্টের জজ রায়ে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! সত্যরঞ্জন বাবুর মামলার ইহাই বিশেষত্ব।

এ বিষয়ে দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কি এই সিদ্ধান্তকে কায়েম মোকাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, না যাহাতে এই অপব্যাখ্যা নাকচ হইয়া যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন? পাহারাওয়ালা চৌকীদার যদি গভর্ণমেণ্ট হয় মহকুমা বা জিলা হাকিম যদি গভর্ণমেণ্ট হন, তাহা হইলে এ দেশের সংবাদপত্র তুলিয়া দিলেও চলে, কেন না, সাধারণের অভাব-অভিযোগ প্রায়শঃ যাহাদের বিপক্ষে উত্থিত হইয়া থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা হইলে তাহা ত রাজদ্রোহ-মূলক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আর সে জন্য সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত ও সম্পাদক দণ্ডিত হইতে পারে। ইহার অপেক্ষা সরাসরি প্রেস এ্যাক্ট বহাল করাও যে ভাল বলিয়া মনে হয়!

এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে কি না, জনসাধারণ বিচার করিয়া দেখিবেন। কলিকাতার সংবাদপত্র-সেবিসঙ্ঘ এক সভায় মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, অতঃপর রাজদ্রোহ মামলায় জুরীর দ্বারা বিচারের জন্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ইহা ভাল কথা। ইহাতে বেপরোয়া সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তে কতকটা সুবিচারের আশা করা যায়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। উপরে উক্ত অপরূপ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও প্রবল আন্দোলন আশু প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সে আন্দোলন কেবল সংবাদপত্রের প্রবন্ধে বা সংবাদপত্রসেবীর সভার মন্তব্যে সীমাবদ্ধ হইলে চলিবে না, জনসাধারণেরও এ বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সংবাদপত্রসেবী তাঁহাদের সেবা করিয়াই বিপদে পতিত হন, এ কথাটা তাঁহাদের বিশেষরূপে মনে রাখাও কর্ত্তব্য।

সহযোগের অভাব

ব্যবস্থাপক সভার শীতের অধিবেশনের উদ্বোধনকালে বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতের হিতৈষিরূপে অনেক উপদেশ-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বৃটিশ জাতি এবং ভারতবাসী উভয়ে যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে উহা বিশেষ ক্ষতিকর হইবে. উহার ফলে বর্ত্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান হইবে না। মিঃ গন্ধী ইংলণ্ডকে চরমপত্র দিয়াছেন, এক বৎসরের মধ্যে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন না দিলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোল-

উপস্থিত করিবেন বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসী এক বৎসরের মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে কি না, তাহা বিবেচনা করেন নাই। মিঃ মণ্টেগু ভারতবাসীকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি প্রদান করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, বৃটেন কখনই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে না। অতএব ভারতবাসীর পক্ষে বৃটেনের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া সহযোগ ও সহানুভূতির পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।"

ইহাই হইল মোটামুটি উপদেশ। প্রথমেই বিশ্বাসের অভাবের কথা ধরা যাউক। বিশ্বাসের অভাব কোন্ পক্ষে হইয়াছে, তাহা ভারতীয়দের পক্ষ হইতে একাধিকবার প্রদর্শিত হইয়াছে। লর্ড ক্লাইভের আমল হইতে ভারতবাসী বিদেশীর সাধুতায় বিশ্বাস করিয়া বিদেশীর হস্তে রাজ্য তুলিয়া দিয়া আসিতেছে। আর্কট অবরোধকালে ভারতীয় সিপাহী নিজে ফেন খাইয়া গোরা সেনাকে ভাত খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সিপাহী-যুদ্ধকালে দেশের লোক ইংরাজের পক্ষে দাঁড়াইয়া কত নিরাশ্রয় ইংরাজ নরনারী ও বালকবালিকাকে রক্ষা করিয়াছে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ইংরাজকে আশ্রয় দিয়াছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে যখন ভারতে মাত্র ১০হাজার গোরা সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট য়ুরোপের রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তখন ভারতবাসীই ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছে, ইংরাজের ইজ্জৎ ও মানরক্ষা করিয়াছে। ফ্রান্স ও গ্যালিপোলির রণক্ষেত্রে ইংরাজের সাম্রাজ্যের বিপদের দিনে ভারতীয় সেনা অকাতরে রক্তদান করিয়াছে। এমন কি, মুসলমান সেনা ইরাকে মুসলমান তুর্কীর বিপক্ষে ও ইংরাজের সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বলিতে লজ্জা করে, চীন ও মিশরের মত প্রাচ্যদেশে ভারতীয় শিখ সেনা ইংরাজ সাম্রাজ্যের হইয়া কার্য্য করিয়া সে সব দেশে দুর্নাম অর্জ্জন করিয়াছে। রৌলট আইন ও জালিয়ানওয়ালার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাত্মা গন্ধী প্রমুখ ভারতীয় নেতারা ইংরাজের বুয়র যুদ্ধে ডুলিবাহকের কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

সুতরাং বিশ্বাসের অভাব ভারতীয়ের পক্ষে হয় নাই। প্রকৃষ্ট নিকৃষ্টের অথবা অভিভাবক নাবালকের সম্বন্ধের ভাব ত্যাগ করিয়া ইংরাজ যদি ভারতবাসীর সহিত সমানে সমানের ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে বৃটিশ নাগরিকের অধিকার প্রদান করেন, তাহাদিগের নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করিতে দেন, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন,—তাহা হইলে ভারতবাসী ইংরাজের কিরূপ শক্তিশালী বন্ধু হয় ও সাম্রাজ্যের সম্মান-রক্ষায় কিরূপ বদ্ধপরিকর হয়, তাহা কি লর্ড আরউইন জানেন না?

লর্ড আরউইন বলিয়াছেন, ইংরাজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না। ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধি-রূপে ব্যবস্থাপরিষদে দাঁড়াইয়া তিনি ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া এত বড় গুরু কথা বলিয়াছেন। আমরা এমন কথা অবিশ্বাস করিতে চাহি না। সাম্রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার ঘোষণা-বাণীর প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইয়াছে, সে সকলের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, বর্ত্তমানে লর্ড আরউইনের আশ্বাসবাণীই মানিয়া লওয়া যাউক। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার কোথাও ত নেহেরু কমিটীর সিদ্ধান্ত অথবা কংগ্রেস ও কনভেনশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। তবে কি তিনি ভারতবাসীর সিদ্ধান্ত মানিতে প্রস্তুত নহেন? সাইমন কমিশন ভাগ্যবিধাতৃরূপে যাহা সিদ্ধান্ত করেন, ভারতবাসীকে কি তবে তাহা মানিয়া লইতে হইবে? ইহাই কি তাঁহার সহযোগ ও সহানুভূতির এবং বিশ্বাসের অভাব-মোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা?

ভারতবাসী এই দাবীদাবী করিতে সম্মত নহে। তাহারা নিকৃষ্ট, তাহারা নাবালক, সুতরাং কোনও বিদেশী প্রকৃষ্ট জাতি অভিভাবকরূপে তাহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিয়া দিবে,—এ কথা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। নেহেরু সিদ্ধান্তই ভারতবাসীর জন্মগত অধিকারের দাবীর সর্ব্বনিম্ন স্তর। উহা এক বৎসরের মধ্যে স্বীকৃত না হইলে মহাত্মা গন্ধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করিবেন। ইহাতে অন্যায় কথা কি আছে? ইহাতে ভয়প্রদর্শনই বা কি করা হইয়াছে? দুর্ব্বল নিরস্ত্র জাতির পক্ষে ইহা ছাড়া অন্য উপায় কি আছে?

বড়লাট প্রতিশ্রুতির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কথা ও কায এক নহে। বড়লাট স্বয়ং তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে, কথা অপেক্ষা কাযের প্রভাব বড়। কিন্তু এ যাবৎ আমরা কথাই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজে না। অতি সামান্য ব্যাপারেও এ দেশের লোককে বিশ্বাস করিয়া কোনও দায়িত্বপূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে কি? হইলে সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের মত লোককে ন্যায্যপ্রাপ্য ছোটলাটের পদ হইতে 'ফিসারি সাইডিংএ' সরাইয়া দেওয়া হইত না। এ দেশের লোককে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করা যাঁহাদের ধাতুসহ নহে, তাঁহারা মুখে প্রতিশ্রুতি দিলে কার্য্যে তাহা কতটা অগ্রসর হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অথচ হাতে-কলমে কায করিতে না পারিলে লোক সকল বিষয়েই কাযের 'লায়েক' হইতে পারে না। লর্ড মরলে বলিয়াছিলেন, "It is liberty alone which fits men for liberty. অর্থাৎ স্বাধীনতালাভ দ্বারাই মানুষ স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করে।" জগতে কোন জাতি প্রথমে যোগ্য হইয়া তাহার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত লর্ড আরউইন দেখাইতে পারেন কি? জাতি ক্রমাগত পরাধীন এবং পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া পরের নিকট "স্বাধীনতা বিদ্যা" লাভ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের কথা ত আমরা জানি না। হাতে-কলমে কায করিতে করিতে লোকের সেই অভ্যস্ত কার্য্যে ব্যুৎপত্তি জন্মে। ভুলের ভিতর দিয়াই মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয়। জলে না নামিয়া কেহ সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে না। মেকলের মত মনীষী ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—

Many politicians of our time are in the habit of laying it down as the self-evident proposition that no people ought to be free until they are fit for their freedom. The maxim is worthy of the fool in the old story who resolved not to go into the water until he had learned to swim. If men are to wait for liberty till they become wise and good in slavery, they may indeed wait for ever.

(Essay on Milton)

অর্থাৎ,—'আমাদের সমসাময়িক অনেক রাজনীতিক স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় এই কথা বলিয়া থাকেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত কোন জাতি তাহাদের স্বাধীনতা ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ না করে, তত দিন তাহাদের স্বাধীন হওয়া উচিত নহে। পুরাতন গল্পে এক নির্ব্বোধের কথা আছে। সে বলিত, সে সাঁতার না শিখিয়া জলে নামিবে না। এমন কথা নির্ব্বোধের মুখেই শোভা পায়। মানুষ যত দিন ক্রীতদাসত্বক বুদ্ধিমান্ এবং সাধু বলিয়া বিবেচিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যদি স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত কেবল অপেক্ষাই করিতে হইবে।'

সুতরাং লর্ড আরউইনের মতে চলিয়া আমাদিগকে যদি ক্রমাগত 'যোগ্যতা' অর্জ্জনের পরীক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে হয় ত কল্পান্তকালে আমরা পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিব!

নিখিল বিশ্ব ধর্ম্মসভা

গত ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে নিখিল বিশ্ব ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে য়ুরোপ, আমেরিকা, এসিয়া মহাদেশের নানা স্থান হইতে ধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতমণ্ডলী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সভায় নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু মনীষী ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মসভার অধিবেশন তাহারই ফল। এই সভায় জগতের সেই নিয়ত বর্দ্ধমান বিপদ বিদূরিত করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাঁহারা আগ্রহের সহিত এই মহা ধর্ম্মসম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চিকাগোর রেভারেণ্ড সাউথওয়ার্থ, রেভারেণ্ড আর্কার্ট, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্য, অধ্যাপক যোধ সিং, অধ্যাপক তারাপোরওয়ালা, ডাক্তার ন্যাস, রেভারেণ্ড পপলে, রেভারেণ্ড কেটল্, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মৌলভী আবদুল করিম, মিসেস উডহাউস, সামশুল উলেমা হেদায়েৎ হুসেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ভারতেই বহু প্রাচীনকাল হইতে এই ভাবের ধর্ম্মসম্মেলন হইত। সমাজে কোনরূপ ধর্ম্ম বা সমাজ-সমস্যা উপস্থিত হইলে প্রাচীন ঋষি তপস্বিগণ কোন এক ধর্ম্মস্থানে সমবেত হইয়া শাস্ত্রাদির ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন সংশোধনের জন্য বিচার-আলোচনা করিতেন। মানব-মঙ্গলের জন্য তাঁহারা সংসারত্যাগী হইয়াও চিন্তা করিতেন, ইহা তাহারই প্রমাণ। নৈমিষারণ্য এইরূপ একটি ধর্ম্মস্থান ছিল। আর্য্য হিন্দুগণের পরে বৌদ্ধযুগেও সম্রাট অশোক ও তাঁহার পরে কনিষ্ক ও হর্ষবর্দ্ধন কয়েকটি ধর্ম্ম-সম্মেলন সংঘটন করাইয়াছিলেন।

এই কলিকাতায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাহার সভাপতি এবং পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। অবশ্য, এই সভা বসাইবার কল্পনা 'চিকাগোর' ধর্ম্মসভার আদর্শে সঞ্জাত হইয়াছিল। পাঠকবর্গের স্মরণ

ধর্ম্ম-মহাসভায় স্যার জগদীশ বসু প্রমুখ প্রতিনিধিগণ

থাকিতে পারে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের চিকাগো সহরে এ যুগের প্রথম বিশ্ব ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় যুগ-মানব স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া জগদ্বাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মসভাই জগতের আদি ধর্ম্মসভা নহে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় বিহারের রাজগীর নগরে রাজা অজাতশত্রু খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে একটি মহা ধর্ম্মসভার

কলিকাতার ধর্ম্মমহাসভার য়ুরোপীয় ও মার্কিণ প্রতিনিধি

অধিবেশন করাইয়াছিলেন। তাহার পর সম্রাট অশোক ৪৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে বৈশালি নগরে এবং ২২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে পাটলিপুত্র নগরে দুইটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন করাইয়াছিলেন। ৭৮খৃষ্টাব্দে রাজা কনিষ্কের শাসনকালে পঞ্জাবের জালন্ধরে তৃতীয় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে ৭মখৃষ্টাব্দে প্রতি ৫বৎসর অন্তর একটি করিয়া কয়েকটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। জৈনদিগের আমলেও কয়েকটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়, তন্মধ্যে ২য় খৃষ্টাব্দে মথুরার সভা বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যও এইরূপ ধর্ম্মসভার অধিবেশনের পক্ষপাতী ছিলেন। বাদশাহ আকবরের সময়ও নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সহযোগে এইরূপ ধর্ম্মসভার আয়োজন হইত।

যে চিকাগো ধর্ম্মসভার আদর্শে এবার কলিকাতায় এই বিশ্ব-ধর্ম্মসভার অধিবেশন সুসম্পন্ন হইল, তাহার অধিবেশনের পর প্যারিস নগরীতে, লণ্ডন সহরে এবং অন্য দুই এক স্থানে ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। চিকাগোর ধর্ম্মসভায় ভারতের সনাতন ধর্ম্মের প্রতিভূরূপে তরুণ তপন-কান্তি স্বামী বিবেকানন্দ গম্ভীর উদাত্তস্বরে ভারতের মর্ম্মবাণী ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সকল ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ এক।" স্বামীজীর পাশ্চাত্য জীবনচরিত-লেখক লিখিয়াছেন, "চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে অপূর্ব্ব আশার বাণী শুনাইয়াছেন—যে মহা সত্যের প্রচার করিয়াছেন,—যীশুখৃষ্টের পর আর কোনও প্রাচ্যদেশবাসীর নিকট পাশ্চাত্য জগৎ তেমন কথা শুনে নাই।"

সেই স্বামী বিবেকানন্দের দেশে বিশ্ব ধর্ম্মসভার অধিবেশন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি। সুতরাং তাঁহার নিকট জগতের লোক অনেক কিছু নূতন আশার বাণী শুনিবারই প্রত্যাশা করিয়াছিল। তাহাদের আশাও সফল হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"কালের আহ্বানে কর্ণপাত করিতেই হইবে; ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা, নাস্তিকতা অপেক্ষা ধর্ম্মজগতের প্রবলতর শত্রু; সকল সত্যই এক ঈশ্বরে পর্য্যবসিত। সেই সত্যের উপলব্ধি মানবের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষাপ্রকাশই ধর্ম্ম।"

ধর্ম্ম-মহাসভায় স্যার জগদীশ বসু ও মার্কিণ মহিলা প্রতিনিধি

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সকল কথার সহিত অনেকে একমত হইবেন, এমন কথা আমরা বলি না। তবে তাঁহার বক্তৃতায় অনেকেই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে নূতন আলোক পাইয়াছেন, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্ম কথার অর্থ সকল দেশে সমানভাবে গৃহীত হয় না। হিন্দু যে ভাবে ধর্ম্ম কথাটি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত অন্যান্য দেশের ব্যাখ্যার প্রভেদ আছে। এইখানেই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। তবে সাধারণভাবে ধর্ম্ম কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার এক দিকের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মের মূল সত্য। মিথ্যার উপরে কোনও ধর্ম্মের পবিত্র বেদী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানের আলোচনাফলে লোকের মন ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রণালী লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু সৃষ্টির মূল কারণ বা অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য করে না। তবে আজকাল যেন মনে হইতেছে, উহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, লোকের মন ফিরিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ যে আশার আলোক দেখাইয়াছেন, তাহা সার্থক হউক, ইহাই প্রার্থনা। জগতের লোক যেরূপ স্বার্থ-সংঘর্ষে মারণাস্ত্র প্রয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহাতে এই প্রতিক্রিয়ার ফল ফলিবে ত? ইহাই সন্দেহের কথা।

যুবক-জীবন

২৩

ইন্‌স্পেক্টরটি খাঁটী ইংরাজ এবং যথার্থ ভদ্রলোক। ইন্‌স্পেক্টররা, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ইন্‌স্পেক্টররা প্রায়-ই ভদ্র-বংশজাত এবং শিক্ষিত; কিন্তু সেই যে নীলদর্পণে রোগ সাহেব বলিয়াছিল, "আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, কিন্তু নীল করমে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি করিয়াছে;" ইঁহাদের অনেকের অবস্থাও ঠিক ওই রোগ সাহেবের মত। কেবল চোর ছ্যাঁচোড় নয়, থানার ভিতরে ও বাহিরে অধিকাংশ সময়েই নীচ সঙ্গের মধ্যে ইঁহাদের থাকিতে হয়; কার্য্যগতিকে অবাঞ্ছনীয় স্থানে যাইতে যাইতে লোকলজ্জা কমিয়া যায়, আকর্ষণের মোহ-প্রলোভন-ও অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়; প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ করিবার সুবিধা সকলে গ্রহণ করেন না,—মর্য্যাদাহানিকর মনে করেন কি না বলিতে পারি না; যাঁহারা গোয়েন্দাগিরি কি রাইটার কনেষ্টবলী প্রভৃতি নিম্নতর পদ হইতে উন্নীত হইয়া সাব-ইন্‌স্পেক্টরে দাঁড়ান, তাঁহারা পানের দোকানে বসিয়া বিড়ি খাইয়া, গাড়োয়ান ঠ্যাঙাইয়া আর খোলার ঘরে আলাপচারী করিয়া প্রায়-ই ভদ্র ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান; তাহার উপর লোককে অপমান ও পীড়ন করিবার এক রকম অবাধ ক্ষমতা ইঁহারা নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন; এই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সত্ত্বেও যে ২।৫ জন আপনাদিগের ভদ্রতা ও চরিত্র বজায় রাখিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তাঁহারা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

আমাদের বর্ণনীয় ইন্‌স্পেক্টর সাহেবটি পুলিসকর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে ঐরূপ উচ্চশ্রেণীভুক্ত। ইনি কলিকাতা পুলিসে কর্ম্ম লইবার পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে সার্জ্জেণ্ট ছিলেন এবং প্রথম যৌবনে শাসনশক্তিলাভজাত নূতন মাতলামীটি এক প্রকার সেইখানে-ই নিঃশেষ করিয়া আসিয়া পুলিসে প্রবেশ করেন; সেখানে বন্দুকধারী ব্যাঘ্র শাসাইয়া আসার পর আর ছিঁচকে চোর, রাস্তার মাতাল কি ধুতিপরা বাঙ্গালী ভদ্র লোককে শীকারের মত শীকার বলিয়া-ই সাহেবের মনে হইত না। বিশেষতঃ সাহেব নিজে এক জন পাকা খেলোয়াড়, হকিতে তাঁ'র একটা নাম-ডাক আছে; শ্যামাপদর সুগঠিত দীর্ঘ দেহ দেখিয়া সে যে এক জন ভাল খেলোয়াড়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এবং জাতিগর্ব্ব ঠেলিয়া-ও তাঁহার মন প্রশংসার চক্ষে চাহিয়াছিল এমন একটি বাঙ্গালী যুবকের পানে, যে বিলাতী চক্র চৌরঙ্গীর মাঝখানে দিবালোকে দাঁড়াইয়া এক জন প্রহর্ত্তা অতিকায় শ্বেতকায়কে একটি ঘুসির ঘায়ে লম্বা করিয়া দিতে পারে।

শ্যামাপদর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর ইন্‌স্পেক্টর আবার বলিলেন, "গোটা পঞ্চাশেক টাকার জামানতে সই করবার উপযুক্ত তোমার পরিচিত আত্মীয় কল্‌কাতায় নাই, এটা প্রত্যয় কত্তে আমার মন চাচ্চে না; মিছামিছি কেন হাজতে যেতে চাচ্চ?"

শ্যামাপদ। যেখানে ২।৪ দিন এসে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে গৃহকর্ত্তা আপাততঃ উপস্থিত নাই. বাড়ীতে তাঁ'র জননী মাত্র আছেন, বিধবা স্ত্রীলোক, আমায় পুত্রের মত স্নেহ করেন, আমি ফৌজদারীতে জড়িয়ে পড়েছি জানিয়ে তাঁ'র মনে কষ্ট দিতে চাই না।

ইন্‌স্পেক্টর। কিন্তু দু'রাত্রি দু'রাত্রি,—লক্‌আপে বাস বিশেষ সুখকর নয় বোধ হয় জান?

শ্যামাপদ। বাবা বড় বাবু ক'রে দিয়ে গেছেন, একটু কষ্টের 'ট্রেনিং' আমার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক।

ইন্‌স্পেক্টর। কিন্তু এক জন 'জেণ্টেলম্যানের' পক্ষে—

শ্যামাপদ। অপমানকর? (ঈষৎ হাস্যে) আপনাদের আশীর্ব্বাদে—কিছু মনে করবেন না, আপনার মত পুলিস অফি-সার আমি বেশী দেখিনি,—কিন্তু সরকারের অনুগ্রহে এখন এ দেশে সাধারণ অপরাধীদের মন থেকে-ও জেলে যাবার ঘৃণ্য ভাবটা অনেক পরিমাণে স'রে গ্যাছে। সমাজের আবর্জ্জনাদের অবরোধের জন্য যে স্থান প্রস্তুত, বহু পূজনীয় ব্যক্তির পদার্পণে সেই জেল-ও এখন গৌরবপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ দিন তিনেক পূর্ব্বে একটা কাযের চেষ্টায় হাওড়ায় গিয়েছিলুম,

টাউনহলের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি গোটাকতক লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে জন চারেক পাহারাওয়ালাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর সেই লোকগুলো খুব স্ফূর্ত্তি ক'রে "গান্ধী মহারাজকি জয়, গান্ধী মহারাজকি জয়" ব'লে চীৎকার করছে; বিস্মিত হয়ে একটি পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম যে, তা'রা পুরোনো চোর, ডোমজুড়ের এলাকায় চুরী ক'রে ধরা পড়েছে।

ইন্‌স্পেক্টর। বোধ হয় রাস্তার লোককে জানাতে চায় যে, তারা 'প্যলিটিক্যাল অফেণ্ডার।'

শ্যামাপদ। অথবা দেশভক্ত।

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি-ও বোধ হয় পেট্রিয়ট?

শ্যামাপদ। মানুষমাত্রে-ই তাই; আমি সামান্য লোক—তবু মানুষ। কিন্তু সম্প্রতি জীবিকার জন্য আমায় নিজে স্বাধীন হয়ে দাঁড়াতে হবে, নইলে দেশ স্বাধীন করা দূরে থাক, আমি সপরিবারে দেশের ঘাড়ে একটি বোঝা হয়ে পড়ব।

ইংরাজের মতন ইংরাজী কথা, ইংরাজের মতন আত্মনির্ভরতার আগ্রহ, ইংরাজের মতন ঘুসির বদলে ঘুসি দিবার সহজ অভ্যাস দেখিয়া শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর সাহেব পরিষ্কার বুঝিলেন যে, শ্যামাপদ শুধু জামায় জেণ্টেলমান নয়। ভদ্রলোককে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতে হয়, সেই ভাবে-ই তিনি শ্যামাপদকে একটু চা খাওয়াইলেন; জানিতেন, রাতে হাজতে একাদশী, সুতরাং টি'র সঙ্গে রুটিটুটী গোছ-ও কিছু ছিল। কাল কোট থাকিলে রাত্রিটা তিনি মিঃ ল্যাহিরিকে তাঁ'র থানাতে-ই স্থান দিতে পারিতেন, কিন্তু দু'দিন—দু'দিন—

শ্যামাপদ বলিল, "আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? পাঠ্যাবস্থায় অনেক ভদ্র ইংরাজের সঙ্গে আমার মিশিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, 'এডেনের' বাতাসে আপনার-ও ইংরাজ মন যে নষ্ট হয় নাই, তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম এবং কখনও ভুলিব না।"

২১

শনিবার রাতে লালবাজারের লক্‌আপ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেরূপ সরগরম থাকিত, ইদানীং আর তাহা নাই, তবে পরব একেবারে ফাঁক যায় না। দোতলায় সেলার মাতালের সে দাপাদাপি এক প্রকার বন্ধ হইয়া-ই গিয়াছে বলিলে হয়, আর নীচের তলায় পাহারাওলারা কষ্টে-সৃষ্টে যে দুই চারিটি মস্তক্লান্ত বা অশান্ত পান্থকে ধরিয়া আনিয়া তস্করাদির সহচর করিয়া দেন, তদ্দ্বারা হাজতের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় মাত্র।

রাত্রি দশটার পর শ্যামাপদ যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া আশু লব্ধ কম্বলখানির উপর উপবেশন করিল, তখন সংলগ্ন ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্য হইতে আগত প্রস্রাব ও ফিনাইলে মিশ্রিত একটা রাসায়নিক গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করিল যে, সেটা সামলাইয়া লইতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল; তার পর উপরে চাহিয়া লাল কড়ি-বরগাগুলি গণিয়া লইয়া চক্ষু অবনত করিয়া দেখে যে, মেজের উপর বিবিধ রকমের জ্যামিতিসঙ্গত রেখাপাত করিয়া সাত আটটি লোক শয়ন করিয়া আছে; অবয়ব ও বেশ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ-ই যে ভদ্রসমাজভুক্ত, তাহা মনে হইল না।

কম্বলখানির উপর দেহ ঢালিয়া শ্যামাপদ-ও ঘণ্টাখানেক এ-পাশ ও-পাশ ওঠ-বস করিল, কিন্তু কোনমতেই ঘুম আসিল না। তাহার দেহের স্বাস্থ্য এত সম্পূর্ণ এবং সমস্ত দিন ঘোরা-ফেরা প্রভৃতি জনিত শ্রান্তি বিশ্রাম-সুখের এত অনুকূল ছিল যে, সেঁতসেঁতে মেজে কি কুটকুটে কম্বল কিছুই তাহার নিদ্রার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিত না—যদি নানা চিন্তার উত্তাপে তাহার মস্তিষ্কটা ভরিয়া না উঠিত।

মানুষের চিন্তা যে কখন্ কোন্ অচিন্তিত অপ্রত্যাশিত পথে আপনার গতি প্রবাহিত করিয়া ফেলে, তাহা অনেক সময়ে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া পড়ে। মা'র কাছ থেকে বিদায় লইয়া আসার পর এ পর্য্যন্ত শ্যামাপদর মন একবার-ও বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহে নাই; তাহার সমস্ত দৃষ্টি একনিষ্ঠ আগ্রহে কুজ্ঝটিকাবৃত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া ছিল; আজ এখন এই পাপী তাপী সরাপীর রক্ষা-কক্ষমধ্যে দস্যু তস্কর হত্যাকারী প্রভৃতির স্পর্শ-দুষ্ট দুর্গন্ধ-জীর্ণ কম্বলের উপর শয়ন করিয়া, কোথা হইতে কে জানে মনে হইল তাহার ফুলশয্যার মধুর রজনীর কথা। সেই কুসুমদামালঙ্কৃত সুসজ্জিত সুন্দর গৃহ, সেই সুবাসিত শুভ্র শয্যাধার পালঙ্ক, আর তাহার সেই পঙ্কজনয়না কিশোরী অঙ্কলক্ষ্মী বিভাবতীর লজ্জা-রক্তাভ আনত আনন। ছুটিয়া যাইল শ্যামাপদর মন রাঘবপুর হইতে একেবারে রাণাঘাটে মহিম লাহিড়ী মশায়ের বাসায়। ভাবিতে লাগিল, আমি ত অনির্দ্দিষ্ট আশায় কয় দিন কলিকাতার পথে পথে দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; আজ আবার না জানি কি অশুভ মুহূর্ত্তে বহুবাজার হইতে

যাত্রা করিয়াছিলাম, প্রথমেই রঘুনাথের ন্যায় নীচমনার মুখ দর্শন,—পরে পথে একটা সাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষণ—ফলে এই অস্পৃশ্য স্থানে নিশাযাপন ; এর শেষ কি দাঁড়াইবে, তাই বা কে বলিতে পারে? অপরাধ কি গুরুতর! এই কাল অঙ্গ ধাক্কা দিয়াছে সিতাঙ্গীর শরীরে, এই কৃষ্ণ মুষ্টি ঘুসাইয়া দিয়াছে বিলাতী নাসিকা ;—এ ব্রহ্মহত্যা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত যে জরিমানাতেই শেষ হইবে, তাহা ত সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মরুক, সে যা হবার হবে, কিন্তু "বিভা" এখন কি করিতেছে? সে ত আমায় চিনিয়াছে, আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ, তাহা বুঝিয়াছে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রেমবন্ধন চির-জীবনের মত সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও তাহার ন্যায় সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর কাছে অপরিজ্ঞাত নহে, তবে সে কি ভাবিতেছে—কি করিতেছে?

স্বামি-গৃহবাসিনী হইবার পর নারীমন পিতৃ-ভবনকে কোনমতেই আর আপনার বাড়ী বলিয়া মনে করিতে পারে না। কেমন ধীরে ধীরে শান্তভাবে "বিভা" তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সকল অভ্যাস, সকল কর্ম্ম, প্রবৃত্তির সমস্ত গতি আমাদের সংসারের ধারার সঙ্গে মিশাইয়া লইতেছিল ; আস্তে আস্তে আমার মায়ের স্নেহটুকু দখল করিয়া লইতেছিল আর আমার চোখের নেশাটুকুকে বুকের ভালবাসায় পরিণত করিয়া দিতেছিল ; এই কাঞ্চন-কঠিন, কুসুম-কোমল জীবন-কুঞ্জ যেন এক নিশ্বাসে বায়ুতে বিলীন হইয়া গেল!

বিভার পেটীতে গহনা আছে, এত কষ্টে-ও মা তার এক-খানিতে হাত দেন নাই ; তাহার তোরঙ্গ বসন-সম্ভারে ভরা ; পিতার গৃহে তাহার অন্ন আছে ; মায়ের অঙ্কে আদর আছে ; সোম-বধূর হৃদয়ে তাহার জন্য স্নেহের অমৃত আছে ; কিন্তু শাস্ত্রের ইঙ্গিত দেখাইয়া না দিলে-ও প্রবাস-গত পতির সহ-ধর্ম্মিণী স্বতঃই গহনা পরে না, কেশ রচনা করে না, বসনের শোভায় অঙ্গ রঞ্জিত করে না ; যিনি যত-ই যত্ন করুন আদর করুন, স্বামী নিকটে না থাকিলে সব-ই যেন একটু আলুনী লাগে। নারী পিতৃগৃহে স্নেহের পাত্রী মাত্র, স্বামি-গৃহে সে কর্ত্রী ; খাশুড়ীর মুখ চাহিয়া বালিকা বধূ-ও এ কথা বুঝিতে পারে। নবীন প্রণয়ের এই স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চরণ দুখানি যেন শ্যামাপদর মনে পড়িতে লাগিল ; এই সদ্যঃসিংহাসনচ্যুতা সংসাররাজ্যের ঈশ্বরীর হতাশ মুখ-পানে তাহার মন যেন আর চোখ তুলিয়া উঠাইতে চাহিল না ; এই চির-স্নেহময়ী জননীর অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যখন তাহার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, তখন হঠাৎ তাহার চমক জাগিয়া উঠিল এক তানসেনের তাড়নায় ;—

পিয়ালা মুঝে ভরি দে রে, পিয়ালা মুঝে ভরি-ই-ই—
অ পাহারাঅলা—আ—আ—আ——
অ প্রাণের পাহারাঅলা।
লাট সাহেব তো তোমার নীচে,
নী—নী—নীচে—(মিছে কথা নয় ভাই)
লাটসাহেব নীচে, তুমি ওপরঅলা।
সেঁইয়া বেচে পান-সুপারি আমি বেচি কেলা—আ—আ—আ

তড়াক্ ক'রে উঠে ব'সে শ্যামাপদ দেখে যে, অদূরে শায়িত গায়কের চক্ষু এখনো আধ-মুদ্রিত, কিন্তু কণ্ঠ সজাগ। গায়ক ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, দুই হাতে দুই চক্ষু একবার মুছিয়া লইল, তার পর এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ডাকিতে লাগিল,—"সক্র ভাই'—ও সক্র ভাই—কোথা গেলি রে শালা? শালার ঘরের শালা দোকানে-ও যেমন, এখানে-ও তেমনি কুড়ে ; সেই কখন্ আনতে গেছে ;—শুলি, ও শুলেনা, গোলাপী বেটী আবার (শ্যামাপদকে দেখিয়া) এ কি হোল—ছোট বাবু এখানে যে! সাধে কি চাকরীর জন্য জান্ কবুল করেছি ; মনিব যাকে বল্‌তে হয় ; এখান পর্য্যন্ত মেহেরবাণী ক'রে এসেছেন। ও শুলে, বিড়ি ফিড়ি নয়, ছোট বাবুকে একটা ভাল সিগরেট দে। কাষ একটু-ও খারাপ পাবেন না ছোট বাবু, সোমবারে গিয়ে আপনি দেখে লেবে ছারডিনের নূতন প্যাক খুলে বেবাক কৌটো পনিরের সেলপোর সাজান মজুত ; একটা পিকিলের বোতল ভেঙে গ্যাছল, সেইটে সাথে আনছিলেম ; কি জানেন, এই শালী মাতাল-ই হোক আর যাই হোক, আদতে মানুষটা খুব জেণ্টলম্যান, তাই ছুটীর রাতটা-আসটা—আপনি জেনো ছোট বাবু, এই দেদার বস্তু যতই খাগ, নেশা কখনো হয় না—"

শ্যামাপদ অবাক্ ; প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি কাকে মনে ক'রে আমার সঙ্গে কথা কইছ?"

দেদার। তা' ঠিক আছি, এক পাঁট গলায় ঢেলে-ও দেদার মাতাল হয়, এ কথা কোনো মিঞার বলবার যো নেই। আপনি হোলে বড় বাবুর বুনির জামাই, আপনারে কি অতুচ্ছ কোত্তে পারি।

হগ্ সাহেবের বাজারে কুণ্ডু কোম্পানীর যে অয়েলম্যান্স

ষ্টোরের দোকান আছে, সেখানে দেদার দেশী চাটনির যোগান দেয়, আর প্রয়োজন হ'লে মাঝে মাঝে দোকান সাজানো প্রভৃতি কাযে সাহায্য-ও করে। দেদারের বাড়ী তারকেশ্বর লাইনে কোনো গ্রামে; আজ দোকানের কায সেরে পুরোনো ইয়ার সক্র মিয়ার সঙ্গে শনিবার চালাতে চালাতে কোনো জায়গা থেকে ছটকে বেরিয়ে পড়ে; কেরাণীবাগান অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে এক জন পাহারাঅলা শান্তিরক্ষার জন্ম একান্তমনে শিকার অন্বেষণ করিতে করিতে দেখে যে, একটি বছর এগারোর কালো-কোলো মেয়ে একখানা খোলার ঘর থেকে বেরিয়ে কোণের উড়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফুলুরি কিনছে; ইদানীং শান্তিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থার ভার-ও পুলিসের হস্তে ন্যস্ত, সুতরাং পাহারা-অলা সাহেব মেয়েটিকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্ম খপ কোরে গিয়ে তার হাতখানি ধ'রে ফেল্লে; কুরুচিপরায়ণা মেয়েটা কেঁদে পাড়া জাগিয়ে তুল্লে, শুনে তার মা পিশাচী ছুটে বেরিয়ে প'ড়ে অনেক কাকুতি-মিনতি কোরে পাহারাঅলা সাহেবকে বুঝিয়ে পেটের মেয়েটাকে তার কলঙ্কিত কোলে তুলে নিলে, যাবার সময় পাহারাঅলা সাহেবকে সে নিরানব্বইএর ধাক্কায় ফেলে গেল; ৯ আনা পয়সা সে শান্তিরক্ষকের হাতে দক্ষিণা-স্বরূপ দিলে, এই বই আর তার ঘরে কিছু ছিল না।

হাতাহাতি আর ৭ আনা না জোগাড় হ'লে ঘুম ত ঘুম—সে রাত্রে তেওয়ারীজীর রুটী পর্য্যন্ত মুখে রুচবে না; এমন সময় নজরে পড়ল, একটা লোক যেন একটু ঢেউ খেলতে খেলতে আসছে; বাস! আর যায় কোথা! "কৌন্ হায় রে শালা?" এতেও দেদার কালা হয়ে রইল, তখন তেওয়ারী মশাই হাঁক দিলেন, "আরে মাতোয়ালা শুয়ারকি বাচ্ছা"; বাস্তবিক মুসলমানের ছেলের পক্ষে এ গালাগালটা বরদাস্তর বার;—দেদার-ও একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে বসল; তার পর যা যা হয়েছে, বুঝতে-ই পাচ্ছেন।

ঘুম ভেঙ্গে, মাঝের ঘটনাটা দেদার একেবারে-ই ভুলে গিয়েছিল; সে ভাবছিল, সক্র ভাই-টাইএর সঙ্গে ব'সে গোলাপ জানের বাড়ী আমোদ-আহ্লাদ কচ্ছি, আর কুণ্ডু কোম্পানীর জামাই বাবু—যাকে সকলে ছোট বাবু বলে—অনুগ্রহ কোরে হঠাৎ সেই মজলিসে হাজির হয়েছেন; দেদারের চোখের অবস্থাটা এখনও ঠিক মানুষ চেনবার মত হয় নি।

শ্যামাপদ প্রথমটা এই মাতলামীতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আজ কয় মাস ধ'রে তার নিত্য নতুন নতুন শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে; আজ হাজতে ব'সে বুঝলে যে, অবস্থা-বিশেষে হীন সঙ্গ-ও উপেক্ষণীয় নয়। দেদারের সঙ্গে বেশ আলাপী লোকের মত সে তখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলে; তার বাড়ী-ঘর, জমী-জমা, গরু-বাছুর, আচারের কারবার, রোজগার, আর-ও কত কথা। দেদার-ও অবোধ্য ভদ্র ভাষায় হেসে কেঁদে গম্ভীর হয়ে সত্য ও স্বপ্ন মিলিয়ে কত গুপ্ত কথা পর্য্য... ব্যক্ত কোরে ফেল্লে; পিঁয়াজের পিকল প্রস্তুতের ও গুলি বর্ণনা করতে করতে দেদারের কল্পনা এত ছাপিয়ে উঠল। বিবিধ হাত জোড় কোরে নিবেদন করলে যে, "আপনি এটে লোক তুলে কাত হয়ে পড়;—" শ্যামাপদ-ও শোবে না, সে-ও ছুঁ... মধ্যে না, তখন অগত্যা শ্যামাপদকে কাত হতে-ই হ'ল। এইবার দেদার আরম্ভ কোরে দিলে তার পা টিপতে; কাঁধ থেকে আরম্ভ কোরে পায়ের তলা পর্য্যন্ত এমন সুন্দর মোলায়েম ভাবে সম্বাহন-ক্রিয়াটা সে আরম্ভ কোরে দিলে যে, অনন্যোপায় হয়ে তার কল্পিত ছোট বাবুকে সে আরামের অত্যাচারটুকু সহ্য করতে-ই হ'ল। গা টেপে, আর দেদার বলে, "ছোট বাবু, খুব কুস্তি-টুস্তি লড়, না? বাঙ্গালী বাবুর শরীল এমন গোল-গাল মজবুত এতটা বয়স পর্য্যন্ত আমি ত দেখলাম না।"

জীবের মঙ্গলমাত্র যে চিন্তামণির চিন্তা, তিনি নিশ্চয়ই কোনো শুভ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শ্যামাপদর অদৃষ্টে আজ কারাগৃহে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! আবার তিনিই তাহার দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্কা করিবার নিমিত্ত দেদারের কাছার খোঁটে কিছু টাকা বাঁধা থাকিতে থাকিতে গোলাপ বিবির গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া পূর্ব্ব হইতে-ই এই হাজত-ঘরে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। পাহারাঅলা সাহেব টাকাটা গাঁথাবার মতন পয়সা পেলেই দেদারকে ছাড়িয়া দিত, কিন্তু দেদার পকেট ঝাড়িয়া, কোঁচা খুলিয়া সাহেবকে দেখাইয়া দিয়াছিল, তাহার কাছে কিছুই নাই।

আলাপের প্রলাপবাক্যে দেদার শ্যামাপদকে অন্যমনস্ক করিল, পরে অঙ্গ-সেবার আরামে নিদ্রাদেবী-ও তাহার নয়নে আসন পাতিলেন।

'ছোট বাবুর' চরণতলে মাথাটি রাখিয়া দেদার মাত্র ভূমি-শয্যায় সমকোণ রেখাপাত করিয়াছে, এমন সময়ে দরজা খোলার শব্দে সে চাহিয়া দেখিল যে, এক জন বাবুর মতন

"অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে—"

[বসুমতী-চিত্র বিভাগ]　　[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা]

৭ম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৫ [৫ম সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

১০

আমেরিকার চিঠি

আজ রবিবার। গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে "আধ আঁচরে বস!" মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধূলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা নাই; শুক্রম্ শুদ্ধমপালবিদ্ধম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রাস্তার দুই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মত এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাখীরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোনো শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদসঞ্চার কিছুমাত্র শুনা যায় না।

বর্ষা আসে বৃষ্টির শব্দে ডাল-পালার মর্ম্মরে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবদুন্নতধ্বনিঃ,—কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতেছিলাম, আকাশের তোরণদ্বার তখন নীরবে খুলিয়াছে, সংবাদ লইয়া কোনো দূত আসে নাই, সে কাহারো ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। স্বর্গলোকের নিভৃত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতেছেন; তাঁহার ঘর্ঘরনিনাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিদ্যুতের কশাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন ইহার শাদা পাখা মেলিয়া দিয়া, অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি, কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অপ্রগল্‌ভ দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতায় সুসংবৃত, ইহার অবগুণ্ঠনই ইহার প্রকাশ।

স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপরূপ শুভ্রতার নির্ম্মল

আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্কার করি—ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেল, আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্ম্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক্, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিয়ো না। তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র, আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অখণ্ড শুভ্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করিয়া দাও।

অন্ধকার প্রভাতের এই অতলস্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড় শীত, বড় কঠিন এই স্নান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মত নগ্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না—উর্দ্ধে শুভ্র, অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র—শিব এব কেবলম্—সমস্ত দেহমনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার—নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।

বার্দ্ধক্যের কান্তি যে কি মহৎ, কি গভীর সুন্দর, আমি তাহাই দেখিতেছি। যত কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা শাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু এ ত মরণের ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি, সে যে কালো; শূন্যতা তো আলোকের মত শাদা নয়, সে যে অমাবস্যার মত অন্ধকারময়। সূর্য্যের শুভ্র রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তাহাকে ত বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ নিস্তব্ধতার অন্তর্নিগূঢ় সঙ্গীত আমার চিত্তকে অন্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকী রাখে নাই, সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচুর্য্যকে অন্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনশ্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঁকার মন্ত্রটি নীরবে জপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্ত পুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ তো বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; যতদূর দেখা যায়, একেবারে শাদায় শাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ন, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুণ্য আলোকে যাহার বার্ত্তা লিখিত আছে, এই তপস্যার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগূঢ় আয়োজন চলিতেছে; উৎসবের সঙ্গীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি, বিশ্বচক্ষুর অগোচরে, সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্যাকে বরণ কর, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও,—শুভ্র শান্তি তোমাকে স্তরে স্তরে আবৃত করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গূঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ করিয়া লউক, নির্ম্মলতার দেবদূত আসিয়া একবার এ জীবনের সমস্ত আবর্জ্জনা একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক; তাহার পরে এই তপস্যার স্তব্ধ আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে, একেবারে দিগ্‌দিগন্তর আনন্দ কলসীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নূতন জাগরণ, নূতন প্রাণ, নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব!

[ক্রমশঃ।

১০

বর্ণ গুণগত না জন্মগত ? (ক)

সম্প্রতি সমগ্র ভারতে বর্ণ লইয়া একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা সংবাদপত্রে, সভা-সমিতিতে, নানারূপ আলোচনা হইতেছে। "শুদ্ধি" হইলে 'অন্ত্যজরা' কোন্ বর্ণে স্থান পাইবে, অথবা আদৌ কোনও বর্ণের মধ্যে স্থান হইবে কি না, যদিই হয়, তবে তাহা কিরূপ—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন ও তাহার স্ব-স্ব-মত-স্থাপনপ্রয়াসিগণ কর্তৃক স্বানুকূল সমাধান হইতেছে। জিগীষা-বুদ্ধি উভয় পক্ষেই প্রবল। এরূপ একটি অত্যাবশ্যক ব্যাপারের আলোচনাও যে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধারণ লোকও ঐ সকল শাস্ত্রীয় তর্কজাল ভেদ করিয়া প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ উৎসুক। সকলেই জানিতে চাহেন যে, "কঃ পন্থাঃ।" এ সময়ে, নিরপেক্ষভাবে, আমাদের যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে এ সম্বন্ধে কি আছে না আছে, তাহা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিয়া সাধারণে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করা অসঙ্গত বা অসময়োচিত হইবে না। বিরাট হিন্দু-সমাজের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে এবং তজ্জন্য বিরাট পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়ন করিতে যতটা সহিষ্ণুতা এবং পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহা এই দীন লেখকের নাই। ক্ষমাশীল পাঠকগণ লেখকের অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

আমি কোন স্থলে, পরস্পরবিরোধী বচনাবলীর "একবাক্যতা" বিধান পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করিব না। সাধারণ পাঠক, লিখিত বিবরণ দৃষ্টে, যতটা সম্ভব, সিদ্ধান্ত করিয়া যদি লইতে পারেন, তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

বর্ণ জন্ম-গত না গুণ-গত ?—এই প্রশ্ন শুধু আজ নহে, সহস্র সহস্র বৎসরাবধি আমাদের দেশে যে চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ আমাদের বেদাদি পুরাণ পর্য্যন্ত শাস্ত্ররাজি। বিষয়টি সহজে বুঝিবার জন্য "গুণ-গত" "জন্ম-গত" উভয় পক্ষেরই পোষক প্রমাণরাজির কতকগুলি করিয়া উদ্ধৃত করিব। তদ্দর্শনে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কত প্রাচীনকাল হইতে এই "গুণ-গত না জন্ম-গত" লইয়া কিরূপ মতবৈষম্য চলিয়া আসিতেছে।

বর্ণ গুণগত

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষসূক্তের একাদশ মন্ত্রটিতে একটি প্রশ্ন দেখিতেছি—

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূকাবূরূপাদাবুচ্যেতে।"

দেবতারা বিরাট পুরুষকে যে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলেন,—সে কয় খণ্ড ? তাঁহার মুখ কি হইল ? বাহুদ্বয়ই বা কি ? উরুদ্বয় কি হইল ? এবং পাদদ্বয়ই বা কি ? অর্থাৎ দেবগণ কর্তৃক খণ্ডীকৃত বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ—কি কি রূপে পরিণত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে, উহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে উক্ত হইল যে,—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥" ১২

ব্রাহ্মণ ঐ খণ্ডীকৃত বিরাট্ পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহুদ্বয়, বৈশ্য উরুদ্বয় এবং শূদ্র পদদ্বয় হইয়াছিলেন। একাদশ মন্ত্রে প্রশ্ন হইল যে, মুখ, বাহু, উরু এবং পদ—বলিতে কি বুঝিব ?—উত্তর,—দ্বাদশ মন্ত্র—ব্রাহ্মণ হইল মুখ, রাজন্য হইলেন বাহু, বৈশ্য হইল উরু এবং শূদ্র হইলেন পদ। "পদ্ভ্যাং" এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি লইয়াই যত গোল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ স্থলে, অনেক পণ্ডিতের মতে প্রথমার্থে তৃতীয়ার ছান্দস প্রয়োগ বলা হয়। মুখ কি ? বাহু কি ? উরু কি ? পদ কি ? এবং ইহারই উত্তর হইল দ্বাদশ মন্ত্র। অর্থাৎ মুখ এই, বাহু এই, উরু এই, পদ এই। এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন, বাহু হইতে রাজন্য উৎপন্ন, উরু হইতে বৈশ্য উৎপন্ন এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল,—এ সব কথা আসিবার কোন প্রসক্তি দেখা যায় না। কিন্তু ঐ দ্বাদশ মন্ত্রের সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এই :—

"অস্য" প্রজাপতেঃ "ব্রাহ্মণঃ" ব্রাহ্মণত্ব-জাতিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ "মুখং" আসীৎ, মুখাৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যঃ অয়ং "রাজন্যঃ" ক্ষত্রিয়ত্ব-জাতিমান্ পুরুষঃ সঃ "বাহূ"—কৃতঃ, বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ, বাহুভ্যাং উৎপাদিতঃ ইত্যর্থঃ। "তৎ" তদানীং "অস্য" প্রজাপতেঃ "যদ্" যৌ উরূ, তদ্রূপঃ বৈশ্যঃ

সম্পন্নঃ, উরুভ্যাম্ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথা অস্য "পদ্ভ্যাং" পাদাভ্যাং "শূদ্রঃ" শূদ্রত্ব-জাতিমান্ পুরুষঃ অজায়ত।" ইহার সোজা বাঙ্গালা এই—ইহার মুখ ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইল। এইরূপ অপর তিন অঙ্গ হইতে তিন জাতি উৎপন্ন হইল।

প্রশ্ন হইল একাদশ মন্ত্রে—মুখ, বাহু প্রভৃতি কি কি হইল? ভাষ্যকারের মতে উত্তর হইল,—মুখ হইতে অমুক উৎপন্ন হইল। কোন্ অঙ্গ হইতে কি কি উৎপন্ন হইল,—এরূপ কিন্তু প্রশ্ন করা হয় নাই। অথচ উত্তর হইল। বেদে বর্ণ উৎপত্তির মূল এই ভাষ্য, এবং এই ভাষ্যের পরবর্ত্তী কালের রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই উহার প্রতিধ্বনি। সায়ণাচার্য্যের আবির্ভাবকাল অনেক ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশশতক। যাহা হউক, ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে চারিবর্ণের উল্লেখ পাওয়া গেল মাত্র। নতুবা "আর্য্য" ও "অনার্য্য" ছাড়া বর্ণবিভাগ-ব্যঞ্জক তেমন স্পষ্ট আর কিছু দেখা যায় না। তার পর বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে চারিবর্ণের সৃষ্টির কথা পাইতেছি।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব। তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ।"

প্রথমতঃ একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। সকলেই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—অতএব ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেন। আর কোনও বর্ণ ছিল না। তার পর "তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্, তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরো নাস্তি।"

সেই ব্রাহ্মণ হইতেই বলবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয় অতিসৃষ্ট হইল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে শৌর্য্যযুক্ত এক সম্প্রদায় নির্ব্বাচিত হইয়া ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন, এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তার পর—

"স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত।
স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রবর্ণমসৃজত"

শেষে যখন শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়তে হইল না, তখন সেই ব্রাহ্মণ হইতেই বৈশ্য এবং পরে ব্রাহ্মণ হইতেই শূদ্রবর্ণ সৃষ্ট হইল।

এই শ্রুতি অনুসারেও দেখিতেছি—এক ব্রাহ্মণ হইতেই গুণকর্ম্মভেদে—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতা, অথর্ব্ববেদ প্রভৃতিতেও গুণ ও কর্ম্মভেদে এক ব্রাহ্মণ হইতেই অপর তিন বর্ণের বিভাগের কথা আছে।

বজ্রসূচিকোপনিষদের প্রথমেই দেখিতেছি,—চারি বর্ণের উল্লেখ-পূর্ব্বক প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণ কাহাকে কহে, ইহারই সমাধান করা হইয়াছে। "কো বা ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ, কিং দেহঃ, কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানং, কিং কর্ম্ম, কিং ধার্ম্মিকঃ—ইতি।" এই প্রকার প্রশ্নের পর প্রদর্শিত হইয়াছে যে,—জীব দেহ জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক—ইহার কোনটাই ব্রাহ্মণত্বের প্রতিপাদক নহে। কেন—তাহার কারণ-পরম্পরাও সুস্পষ্টরূপে উক্ত উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। তবে ব্রাহ্মণ কে? কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিব?—"তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম।" ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, "যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীনং" (ইত্যাদি প্রকারে আত্মার বহু বিশেষণ দিয়া) যে ব্যক্তি এই প্রকার আত্মসাক্ষাৎকার লাভপূর্ব্বক "কৃতার্থ" হইয়া "কামরাগাদি-দোষ-রহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নঃ ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতসা বর্ত্ততে" এইরূপ লক্ষণযুক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদিরও এই অভিপ্রায়। নতুবা ব্রাহ্মণত্বের সিদ্ধি হইতে পারে না। "এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব-সিদ্ধির্নাস্ত্যেব। সচ্চিদানন্দমাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভাবয়েৎ।"

এত দৃঢ়তার সহিত, বর্ণ যে গুণগত, ইহা আর কেহ বলেন নাই।—পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতিশঙ্কায় তর্কাংশ উদ্ধৃত হইল না।

সংহিতাকার অত্রির মতে আবার শুধু বেদজ্ঞান থাকিলেই ব্রাহ্মণ "ব্রাহ্মণ" হয় না, ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতেও তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান আবশ্যক।

"তস্মাদ্ বেদেন শাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণস্য তু।
ন চৈকেনৈব বেদেন ভগবানত্রিরব্রবীৎ॥"

শ্রুতির পর পঞ্চম বেদ মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ-ইতিহাসেও দেখিতেছি, গুণকর্ম্মভেদে বর্ণবিভাগের কথা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব্বের তৃতীয়াধ্যায়ে অশ্বত্থামার উক্তিতে পাইতেছি :—

"প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম্ম তাসু বিধায় চ।
বর্ণে বর্ণে সমাধত্ত হ্যেকৈকং গুণভাগ্ গুণম্॥" ১৮

প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি পূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদে গুণভেদ বিধান করিলেন। আবার শান্তিপর্ব্বে, ১৮৮ অধ্যায়ে ভরদ্বাজের প্রশ্নে ভৃগু কহিতেছেন—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব-সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ ১০
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়-সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥ ১১
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ ১২
হিংসানৃত-প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ ১৩
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥" ১৪

এই ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদেও এক ব্রাহ্মণ হইতেই গুণকর্ম্ম-ভেদে অপর তিন বর্ণের উৎপত্তিবিবরণ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতোক্ত গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ॥"

বায়ুপুরাণের ত্রিশ অধ্যায়ে দেখা যায়,—গৃৎসমদের পৌত্র শৌনকের পুত্রগণই কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন।—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥"

("এতস্য" শৌনকস্য)
বায়ুপুরাণের মতে ত্রেতাতেই ব্রাহ্মণ-ঋষিগণ কর্ত্তৃক বর্ণচতুষ্টয়ের বিধান এবং সংহিতামন্ত্র প্রভৃতি প্রকীর্ত্তিত হইয়াছিল।

"বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্ত তে॥"
বায়ুপুরাণ। ৫৭।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গের রামজটায়ুসংবাদে দেখিতেছি,—জটায়ু কহিতেছেন যে, পূর্ব্বকালীন প্রজাপতি-দিগের শেষ প্রজাপতি কশ্যপ, অন্যতম প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে আটটির পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন,—সেই আট কন্যার অন্যতমা মনুর গর্ভে কশ্যপের যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

"মনুর্ম্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ॥" ২৯

এই ঋষিগণানুসারে যথারীতি মাতৃগর্ভেই চারিবর্ণের উৎপত্তিবিবরণ পাইতেছি। বিষ্ণুপুরাণেও এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে :—

"গৃৎসমদস্য শৌনকঃ চাতুর্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তকঃ অভূৎ।"

মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন—ধর্ম্মানুশীলনে জঘন্য বর্ণও জাতি-পরিবৃত্তি পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার অধর্ম্মচর্য্যায় উৎকৃষ্ট বর্ণও জাতিচ্যুত হইয়া অপকৃষ্ট বর্ণতা ভজনা করিয়া থাকেন।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণঃ জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ॥"

গৌতম-সংহিতায় দেখিতেছি—গুণেরই আদর, জাতিই একমাত্র বর্ণ-গরিমার কারণ নহে।

"ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" ২১ অধ্যায়।

মহর্ষি পরাশর বলেন :—বর্ণ-গরিমা জন্মগত নহে,—গুণগত।

"শূদ্রোঽপি শীল-সম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণোঽভবৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরোঽভবৎ॥"

অর্থাৎ শীলসম্পন্ন শূদ্রও গুণবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। আবার ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে অপকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

মনুরও ঐ মত।—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।"

শিবপুরাণের মতে—কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত এবং শূদ্র হন, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"এতৈশ্চ কর্ম্মভির্দেবি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্॥"

বর্ণ গুণ-গত কি জন্মগত—ইহার অতি সুস্পষ্ট আভাস, অথবা আভাস বলি কেন, নির্দ্দেশ অত্রি-সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥" ৩৬৪

"দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ, এবং চণ্ডাল—এই দশবিধ (দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট।” অর্থাৎ যেমন “দেব-ব্রাহ্মণ” “মুনি-ব্রাহ্মণ” “দ্বিজ-ব্রাহ্মণ”, সেইরূপ “শূদ্র-ব্রাহ্মণ” “পশু-ব্রাহ্মণ” “ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ” এবং “চণ্ডাল-ব্রাহ্মণও আছেন। এই ব্রাহ্মণ গুণ-কর্ম্মভেদে উক্ত দশবিধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। মহর্ষি অত্রি এই ভাবে দশবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ পূর্ব্বক, পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—প্রবন্ধবিস্তৃতিশঙ্কায় মূল বচনগুলি মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

“সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেব-ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩৬৫
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোহহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥ ৩৬৬
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্যযোগ-বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ ৩৬৭
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ ৩৬৮
কৃষি-কর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ ৩৬৯
লাক্ষা-লবণ-সম্মিশ্র-কুসুম্ভ-ক্ষীর-সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৩৭০
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্য-মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ৩৭১
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৩৭২
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ৩৭৩
ক্রিয়া-হীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥” ৩৭৪

এবংবিধ বহু বচনপ্রমাণ শাস্ত্রাদি হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সে সমস্ত দেখাইতে গেলে,—বর্ণ যে গুণগত, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে একখানা বৃহদ্গ্রন্থ হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালে বর্ণ যে কি ভাবে শাস্ত্রকারগণ দেখিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস উদ্ধৃত প্রমাণাদিতে কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বর্ণ যে জন্মগতও ছিল, তদনুকূল বচনাদিও ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।—এই উভয় দিক দেখিলে, পাঠকগণ সহজেই বুঝিবেন যে, কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই অধিকারবাদ লইয়া বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে এই অধিকারবাদের তর্ক, দলাদলি আজ নূতন নহে। শুধু তাহাই নহে, ক্রমে দেখাইব যে, এই জন্মগত অধিকারস্থাপনের জন্য আমাদের শাস্ত্রাদিতে, কত দিক হইতে কত অবাস্তব বিষয় আসিয়া জুটিয়াছে। কত নূতন নূতন পরস্পরবিরোধী প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। এ সব বিষয়ে, পাঠকগণকে কৃপাপূর্ব্বক একটু ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

দীনের প্রার্থনা

নিঃস্ব হৃদয়ে বিশ্বের দ্বারে এসেছি আজ।
জানি না ক্ষুদ্র জীবনে আমার কি ছিল কাজ!
আকাশে, সাগরে যে দেছে নীলিমা,
পর্ব্বতে বনে যে দেছে গরিমা,
তাঁহারি সৃজিত আমি এত হীন—মরি কি লাজ!
এ মহাবিশ্বে জানি না কি কাজে এসেছি আজ!

শূন্য হৃদয়ে বিশ্বের মাঝে এসেছি ভাই!
রাখিতে জীবন তোমাদের স্নেহ,করুণা চাই।
তোমরা মহান্, তোমরা উচ্চ,
আমি যে ক্ষুদ্র, আমি যে তুচ্ছ,
যেন তোমাদের এক পাশে শুধু থাকতে পাই।
তোমাদেরি' পরে নির্ভর ক'রে এসেছি তাই।

তোমরা এসেছ বিশ্বেরে শুধু করিতে দান।
আমি কি বা দিব, কি আছে আমার—ছোট যে প্রাণ!
তোমরা জগতে যা দিবে ছড়ায়ে,
দীন আমি তাহা লইব কুড়ায়ে,
ধন্য তোমরা যাইবে চালায়ে, গাহিয়ে গান।
শুধু মৌন, মুগ্ধ, শুনিব একাকী পাতিয়া কাণ।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য।

জাগৃহি *
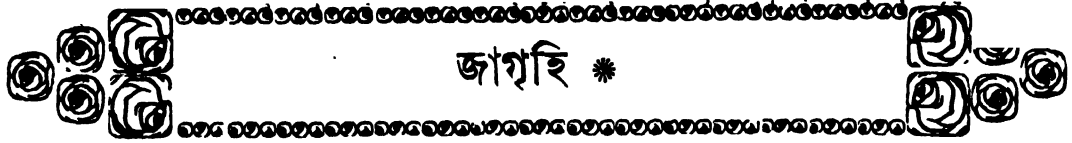
আপনারা আজ আমায় এই যে সমাদর প্রদর্শন করিতে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে আমি আপনাদের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞতানুভব করিতেছি। আপনারা এইখানে সমবেত আমার মাতৃস্থানীয়াগণ, ভগিনীবৃন্দ ও কন্যাপ্রতিমা সকল! যথোচিতভাবে আমার সম্মান, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে আপনাদের নিকটে আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে, যে প্রীতি-প্রবণচিত্ততার বশে আপনাদের মধ্যে সমাগতা আপনাদের এই দূরস্থা ভগিনীকে আপনারা আপনাদের মধ্যে সযত্নে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার শত ত্রুটি পাইলেও আর এই আত্মীয়তার স্নেহপাশ হইতে তাহাকে কখনই বিযুক্ত করিবেন না; পরন্তু আপনাদের মধ্যেরই এক জন মনে করিয়া অবসরমত কখন স্মরণ করিবেন, এই অনুরোধ।

আজিকার এই মেলামেশায় আমি নিজে যে বিশেষ উপকৃত বোধ করিব, ইহা আমার বিশ্বাস আছে। আমাদের মধ্যে এই প্রকার সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আমি বিশেষভাবেই অনুভব করিয়া থাকি; যেহেতু, অদেখা লোককে আমরা প্রায়শঃই অভাবনীয়রূপে কল্পনা করিয়া ফেলি। অজ্ঞাত বস্তুমাত্রই আমাদের কল্পনা-জগতে হয় খুব বড়, না হয় খুবই ছোট হইয়া প্রবেশ-পথ পায়। সে কখন বা আমাদের মানসনেত্রে দেবতার আসন পরিগ্রহ করে, কখনও বা দানবের। তাহার আসল মূর্ত্তিটি যে ঠিক আমাদেরই মত সাধারণ হওয়া আশ্চর্য্য নহে—সে কথাটা হয় ত সকল সময় আমাদের মনেও পড়ে না।

তাই বলিলাম, আমাদের মধ্যে পরস্পরকে জানিবার, চিনিবার, পরিচয় দিবার এবং লইবার জন্য এই মেলামেশার ব্যবস্থাটা সর্ব্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়।

আমি জানি, এই সামান্য এক জন আমারই সম্বন্ধে আমার স্বজাতীয় ভাই-ভগিনীগণের মধ্যেই অনেক প্রকারের ভ্রান্ত ধারণা কিছু দিন পূর্ব্বেও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছিল। আমার সহিত নব-পরিচিত বা পরিচিতা অনেককেই আমায় এমনই সাধারণ মানুষ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে আমি শুনিয়াছি। কাহারও মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, আমি না কি চেয়ারে বসিয়া বই লিখি আর বই পড়ি, সময়মত শ্বাশুড়ীসম্পর্কীয়া-বাহিত চা-পানাদি করিয়া থাকি, এতদ্ব্যতীত অপর কোন কার্য্য আমার দ্বারা সাধিত হইতেই পারে না। অন্যত্র কোন কোন তরুণচিত্ত, আমার রচনা পাঠে আমার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়াও আমায় স্বামী হইতে বিযুক্তা স্বেচ্ছাতন্ত্রা জানিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছে এবং আমারই কোন সুপরিচিতার সহিত এ সম্বন্ধে তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, তাহাদের প্রাপ্ত সংবাদটাই সমূলক। কেহ বলিয়াছেন, ইনি ব্রাহ্ম সমাজের। এক জনের ভাই আবার তাঁহার ভগিনীর অ-দেখা আমার প্রতি পক্ষপাতিত্বে কৌতুকচ্ছলে রাষ্ট্র করিয়াছিলেন যে, অনুরূপা দেবী গোঁড়া খৃষ্টান, আবার তাঁহার গলায় একটি গলগণ্ড আছে ইত্যাদি। আমার উত্তরকালের প্রিয়সখী এই সংবাদে নাকি মনের কষ্টে শয্যা গ্রহণ করেন। তার পর আমি যদি বিদ্যাগর্ব্বে কথা না কই, এই ভয়ে অনেক মহিলা একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও নাকি আমার সহিত মিশিতে আসেন নাই, এমন হাস্যকর সংবাদও আমায় মধ্যে মধ্যে পাইতে হয়। আমার পক্ষে এগুলি সুখেরও নহে, গৌরবেরও নহে। আপনারা যে আপনাদের মধ্যে ও-ধরণের একটা হাস্য-করুণ রসের সৃষ্টি না করিয়া সোজাসুজি ভাবেই এই সহজ মানুষটাকে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সে জন্য আপনাদের বিবেচনার আমি প্রশংসা করিতেছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ, ও দুইটি রস উপভোক্তাদের পক্ষে যেরূপই হউক না, যাহাকে দিয়া সঞ্চারিত হয়, তাহার নিজের পক্ষে বিশেষ মধুর রসের সঞ্চার করে না।

অবশ্য এটুকুও বলা কর্ত্তব্য যে, আমার বিপক্ষের ওই দৃষ্টান্তগুলির অপেক্ষাও অনেক বেশী পক্ষপাতিত্বপূর্ণ উপন্যাস রচনা আমার সপক্ষেও হইতে যে না শুনিয়াছি, তাহাও নহে; কিন্তু সেও যখন আমার স্বরূপ নহে, তখন তাহাও আমার পক্ষে চৌর্য্য। অসত্যের গৌরবে কখনই গৌরবান্বিত হইতে পারা যায় না; আমি যাহা, আমায় আপনার ঠিক তাহাই জানিলেই আমি ধন্য হইব।

তার পর আপনাদের কাছে আমার বলিবার কথা বিশেষ কিছুই দেখি না। যেহেতু, আমি আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করি যে, আজিকার এই সভাক্ষেত্রে সমুপস্থিত মহিলাবৃন্দের

* হাজারিবাগ মহিলা-সভায় পঠিত।

মধ্যে আমাপেক্ষা বিদ্যা-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতরা অনেক মহিলা নিশ্চয়ই বর্ত্তমানা আছেন। তাঁহাদিগকে কোন উপদেশের বাণী শুনাইতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন, এবং আমার পক্ষে হয় ত বা ধৃষ্টতা। তবে আমার যেটি অন্তরের কথা, আমি শুধু আপনাদের কাছে সেইটুকুই বলিব। তাহা এই—

আপনারা আপনাদের কন্যা-ভগিনী-পুত্রবধূগণকে যথা-সাধ্য বিদ্যাশিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহা অতি সুখের বিষয়, তাহাতে সংশয় নাই। 'বিদ্যাবিহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ' এ সব প্রাচীন বাক্য নিশ্চয়ই কেবলমাত্র পুরুষের উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য হয় নাই। ইহার প্রয়োগ নরনারী উভয়েরই উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সঙ্গে আমি আপনা দগকে একটি প্রধানতম কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে বলি। এই বিদ্যা শিক্ষাটি যেন কোনমতেই নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার বহির্ভূতভাবে না হয়, এবং আপনাদের ঘরের মেয়েরা কেবলমাত্রই যেন বিদুষীই না হইয়া তাঁহারা যেন যথার্থই শিক্ষিতা নারীনাম গ্রহণে সমর্থা হন। এই শিক্ষার আদর্শটি যেন সম্পূর্ণরূপেই ভারতবর্ষীয় হয়। তাঁহারা যেন স্বদেশের পুরাতন নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার পূর্ণ ভিত্তির উপরেই নূতনকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা যেন ভারতীয়া নারীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন—বিদেশীয় ভাবাপন্ন না হইয়া পড়েন। যেন নারী-পুরুষের সর্ব্বত্র সমানাধিকারলাভকেই নারী-জীবনের চরমপ্রাপ্তি বোধে পুরুষের সহিত সমর-ঘোষণায় ব্যাপৃতা না থাকিয়া পাতিব্রত্য ও মাতৃত্বতেই নারী-জীবনের পূর্ণ গৌরব বোধ করিতে শিক্ষা করেন। গুরুজনে ভক্তিমতী হইতে পারেন, আতিথ্যপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযমকে নারীধর্ম্ম বলিয়া সম্মান করিতে পারেন। আর সর্ব্বোপরি সতীত্বই যে নারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য বস্তু, তাহা আর পাঁচটা গুণ, যাহা মানুষের মধ্যে থাকিলেও চলে, না থাকিলেও কিছু আসে যায় না, তাহারই মধ্যের একটি, এ শিক্ষা না পান, পরন্তু উহাই নারী-জীবনের সার,—শ্রেষ্ঠ বস্তু, হৃদয়ের অমূল্যহার, মস্তকের মুকুটমণি, সর্ব্বান্তঃকরণেই এই মহত্তম সৎশিক্ষা লাভে সমর্থা হন, সে বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইতে বলি। পাশ্চাত্যদেশের বিপ্লব-নীতি আজ ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্রই ভাসিতেছে। ইহার আপাত মধুরবাণী যাহাতে আমাদের তরলমতি সরলচেতা বালক-বালিকাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিতে না পারে, তাহার জন্য আমাদের বিশেষ সাবধানতার কাল উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার একটি-মাত্র প্রতীকারের উপায়, তাহা কেবল তাহাদের গৃহশিক্ষার উপরে—তাহাদের মা-বাপের হাতেই নির্ভর করিয়া আছে, তাহা তাহাদের শৈশবকাল হইতেই যথার্থ উচ্চনীতি ও উদার ধর্ম্মের সহিত সযত্নে পরিচিত করিয়া রাখা। নিজধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জাত হইলে, পরধর্ম্মে প্রীতি জন্মে না, আবার উদার শিক্ষার ফলে পরধর্ম্মবিদ্বেষও আসিতে অসমর্থ হয়। তেমনই নিজের সমাজ, স্বধর্ম্ম, স্বজন প্রভৃতির প্রতি প্রকৃত-প্রস্তাবে পূর্ণাকর্ষণ থাকিলে বাহিরের সহস্র প্রলোভন দ্বারা প্রলোভিত হইলেও সে প্রলুব্ধচিত্ত হইতে পারে না। প্রকৃত নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে, তবে পুরুষধর্ম্মে পর-ধর্ম্মের মোহ তাহাকে নিজের ছন্দ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। অর্থাৎ নারীকে নারীর পরিবর্ত্তে পুরুষে পরিণত করিতে পারে না। তবে এ স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি, নারী বলিতে আমি তাহার অবলা-ভাবকেই লক্ষ্য করি নাই। নিতান্ত পর-নির্ভরশীলা, ভূতভয়গ্রস্তা, সকল প্রকার অত্যাচারের পদতলে আত্মবিক্রয়কারিণী মাটীর দলা আমার কাছে আদর্শ নারী নহেন। নারী—লক্ষ্মী, গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী। তিনি জননী, ভগিনী, কুল-কন্যা, কিন্তু তিনি বিলাসের পুত্তলী নহেন, বিনা মূল্যে ক্রীতা দাসী নহেন। দুশ্চরিত্র স্বামীর, অত্যাচারী পুত্রের বা ভ্রাতার অসহকর অত্যাচার অসহায়ভাবে সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার আদর্শ রক্ষা আমার কাছে সম্মানের হইলেও শ্লাঘার বস্তু নহে। নারী কোমলা, আবার কঠিনা, তিনি সর্ব্ব-শোভার আধারভূতা। কোমলা কমলার আর সর্ব্বশক্তির সারভূতা আদ্যাশক্তির—এই উভয়ের সংমিশ্রণে নারী সংগঠিতা। তাই তিনি কুসুম-কোমলা হইলেও শরীর-মনে কুলিশ-কঠোর হইবেন। ৺ইন্দিরাদেবী তাঁহার "ভানুমতীর প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি" নামক কবিতায় দ্রৌপদীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"কোমল কুসুমে বিধি গড়েছে রমণী-হৃদি
তা'তেও নিহিত আছে, কঠোর পাষাণ।"

নারীপ্রকৃতি ঠিক এইরূপই হইবে। তিনি সতী, অন্যের মুখে পতিনিন্দায় প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, আবার তিনি সেই সতীতেজোদৃপ্তা বলিয়াই অন্যায় অত্যাচারের পদতলে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজের নারীমর্য্যাদাকে অকলুষ-ভাবে রক্ষা করিবেন। "পড়িয়া মার খাওয়া"—যাহাকে

বলে, সেই কাযটার আমি পোষকতা করিতে পারি না। অথচ তাই বলিয়া অন্যায়ের পরিশোধ অন্যায়ে নহে। এইখানেই আমাদের য়ুরোপীয় আদর্শ গ্রহণ না করিয়া, স্বদেশের সতীত্ব-মহিমার প্রভাব স্থির রাখিতে হইবে। এমন কি, স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কেও আমি বলিতে বাধ্য, ক্রূরকর্ম্মা, ভীষণ অত্যাচারী স্বামীর সম্বন্ধেও সতী স্ত্রীকে এ জীবনের সেই বন্ধনকেই মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া লইয়াই স্বতন্ত্রভাবে পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করিতে হইবে। ডাইভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু জুডিশিয়াল সেপারসনের অবস্থা-বিশেষ সমর্থন করি। এরূপ সুপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। যেখানে এই সকল নারীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহার জন্য হে আমার ভগিনীগণ! তোমরাই অগ্রণী হও! নারীর দুঃখ দুর করিতে নারীর হস্ত ভিন্ন আর কাহার রক্ষা-হস্ত—সাহায্য-হস্ত বিস্তৃত হইবে? আর কাহার হৃদয় কাঁদিবে? প্রথমতঃ তোমাদের ভগিনীদিগকে—কন্যা-দিগকে এমন শিক্ষা দান কর, যাহাতে তাহারা পতিতোদ্ধারিণী-রূপে পাপীকেও ত্রাণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যদি তাহা অসম্ভব হয়, সেই সব স্থলে তাহাদের জন্য আমাদের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন আছে।

তার পর আরও একটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে দিন দিনই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহা দুর্ব্বৃত্ত দ্বারা নারীনির্য্যাতন। আপনারা নিশ্চয়ই এই ভয়াবহ ও অসহনীয় দুঃসংবাদ সর্ব্বদাই সংবাদপত্রে দেখিতে পাইয়া থাকেন। দূর পল্লী অঞ্চলের ত কথাই নাই; বিশেষতঃ মুসলমান-প্রধান স্থানসকলে দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু-নারীর নির্য্যাতনের সংবাদ ত ক্রমশঃই দৈনিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এমন কি, সহরের বুকের উপর গাড়ী ও রিক্সা-চালকের দ্বারা নারীর প্রতি অমানুষিক অত্যা-চারের সংবাদও বিরল নহে। এ সকলের মুলেই নারীর দৈহিক শক্তির অভাব অনেকখানি; এমন কি, প্রায় সম্পূর্ণরূপেই দায়ী। নারীকে অবলা বলিয়া বোধ না থাকিলে অত্যাচারের সংখ্যা এত অধিক হইতে পারিত না। পুর্ব্বোত্তর-বঙ্গেই এই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পশ্চিম-বঙ্গেও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে, পঞ্জাবে এই সকল মুসলমান-প্রধান স্থানেও নারী-নির্য্যাতন এরূপ প্রবল নহে; ইহার কারণ, ঐ সকল অঞ্চলের মেয়েরা বঙ্গনারীর মত "অবলা" নহেন। সে দিন সংবাদপত্রে দেখিলাম, তিন জন মহারাষ্ট্রীয় মহিলা কয়েক জন দস্যুকে বিতাড়িত করিয়াছেন! আমাদের বাল্যকালে একবার এক জমীদার-পত্নীর বঁটি দিয়া দস্যু-সর্দ্দারকে হত্যার বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তিনি বঙ্গনারী। আরও দুই একটি নারী-বিক্রমের কাহিনীও শোনা গিয়াছিল, কিন্তু দিন দিন তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। এখন আমাদের ঘরে ঘরে সকলেই প্রায় যথার্থ অ-বলা অর্থাৎ একান্ত বলহীনা জীর্ণা-শীর্ণা রোগিণী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ইহার প্রতীকার আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য আপাততঃ সমাজের—সংসারের অপর সকল ভাল মন্দ সংস্কারাদিকে পশ্চাতে ফেলিতে হইবে। বৃহৎ প্রয়োজনে ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে পরিত্যাগ করিবার বিধি শাস্ত্র এবং লোকাচার উভয়ত্রই আছে, ইহা শাস্ত্রজ্ঞমাত্রই জানেন। মেয়েদের স্বাস্থ্য যাহাতে রক্ষিত হয় এবং দক্ষিণী ও পশ্চিমাদি স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় দৈহিক বলে তাঁহারা সবলা হইতে পারেন, ইহার জন্য ব্যায়ামাদি তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার পর সুস্থ ও সবল সন্তানের জন্ম-কামনায় জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে কেনই বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, ইহার বিচার করিবার কাল আসিয়াছে। বঙ্গনারী পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে স্থান না পাইবেন কেন? এবং উঁহাদেরই বা বাঙ্গালায় আসায় আপত্তি কিসের? রাঢ়ে বঙ্গের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ কনৌজে গিয়া বিবাহ করিলে বাস্ত-বিকই ত কোন ক্ষতির কারণ ঘটে না? অবশ্য এত বড়, সামাজিক সমস্যায় হাত দিবার অধিকার আমাদের কেহ দিবেন না জানি। তথাপি কথা এই, যদি এত দিনে অথবা কখনও অশিক্ষিত ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানের হাতের মার খাইয়া ও নারী-নির্য্যাতন সহিয়া হিন্দুদের আত্ম-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠায় সকল হিন্দুই যে সুখে দুঃখে এক, এ বোধটা জন্মিয়া থাকে, অথবা জন্মায় এবং তখন 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' না থাকিয়া যদি তাঁহারা নিজেদের যথার্থ শ্রেয়োলাভাশায় একত্র হইতে সমুৎসুক হইয়া উঠেন, তবে যেন আমাদের দিক হইতে তাঁহারা বাধা না পান। বাস্তবপক্ষে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণে বা বেহারী কায়স্থে বাঙ্গালী কায়স্থে বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য হিন্দুর জাতিভেদে আঘাত লাগিতে পারে না, এবং এই একমাত্র উপায়েই সমুদয় ভারতবাসীর মধ্যে আত্মীয়তাবোধ এবং সকল হিন্দুর মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার পূর্ণতালাভ সম্ভব। এই আদান-প্রদানের ফলে বাঙ্গালীর মেয়েছেলেরা শারীরিক শক্তি এবং

অপরে হয় ত কতকটা মানসিক শক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে আপনারা সময়মত ভাবিয়া দেখিবেন। আপনাদের সন্তানদিগকেও এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। সতীদেহ-মহাপীঠ দ্বারা একীকৃত এই আর্য্যভূমি, আসমুদ্র হিমাচল একই মহাদেশ, ইহার অধিবাসিবর্গ বস্তুতঃ পরস্পরের পর নহে।

স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা, স্বসমাজে প্রীতি ও তাহার জন্য আত্মত্যাগ, এই দুইটি মহদ্ধর্ম্মের সহিত আর্য্যনারীর নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রা-প্রণালী, ত্যাগ-সংযম-পূত-পবিত্র চরিত্রগঠন, এই ভাবে শিক্ষিতা হইলেই ভারতীয়া নারী তাঁহার সুমহান্ উচ্চাদর্শে জগতের অনুকরণীয়া হইবেন, সন্দেহ নাই। ভোগবিলাসের সাজান পুতুল না করিয়া ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে, নীতিজ্ঞানে এবং বিদ্যা ও চরিত্রগৌরবে, সহৃদয়তায় এবং সত্ত্বগুণোৎপন্ন প্রকৃত তেজস্বিতায় এই দুই দিকের দুই সুমহৎ শিক্ষায় তাঁহাদের মহিমান্বিতা করিয়া ভারতের অচির-ভবিষ্যৎকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে।

তবেই ভারতনারীর বিশেষত্ব সংরক্ষিত হইবে। সুদূর অতীতে ভারতের পুণ্যতপোবনে এক দিন ভারতনারীর পূর্ব্ব-প্রপিতামহীগণ এইরূপই উচ্চাদর্শ লইয়া তাঁহাদের যোগী-গৃহী এবং গৃহী-যোগী পতিপুত্রের পার্শ্বে উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মানা হইয়াছিলেন। এই উচ্চাদর্শে দীক্ষিতা হইয়াই এক দিন ভারতের সতী তাঁহার তপশ্চর্য্যার্থ প্রস্থানোদ্যত বিত্তৈশ্বর্য্য-প্রদানেচ্ছুক পতিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং,
যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥

কালচক্র ত অবিরতই ঘূর্ণিত হইতেছে, আবার সে দিনের পুনরাবর্ত্তন কি এতই অসম্ভব?

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

দুই তার

চাঁদের আলোতে গীতি-আলাপন—
আমি ভালোবাসি তাই গো;
নিভৃত নিশীথ, উজল ধরণী,
কোন কলরব নাই গো!
কত কৌমুদী দুয়ারে আমার
আসে, হাসে,—ফিরে যায় বারে বার,
গাহি-গাহি করি, তবু যে আমার
গানটি হয় না ভাই গো,—
কি জানি কেমন সুর সে লাগে না
যখনি গাহিতে যাই গো!

সুন্দরি, তুমি হাস না,—
তোমারি অধর-জ্যোৎস্নার তলে
বসিয়া গাহিতে বাসনা!
নীলের পাথারে বেয়ে তরীখানি
ঐ পারে যেতে মন চায়,
তবু এই পারে পড়েই যে আছি,—
কেন আছ, কে তা ক'বে হায়!
সাগরের নীলে নেয়ে পাল তুলে,
আকাশের নীলে পাখী পাখা খুলে,
তরী কাঁপে নীরে, আমি তীরে বসি'
কি করি ভেবে না পাই গো—
কি জানি কেমন ভুল হয়ে যায়
যখনি সে যেতে চায় গো।
সুনয়নি, তুমি চাহ না,—
তোমারি নয়ন-নীলে যাব ভেসে',
মনোভেলা মোর বাহ না!
সাঁঝের বাতাসে বিরলে একেলা
বনচ্ছায়ায় শুয়ে,
মনে করি, মোর দিনের ক্লান্তি
নিদ দিয়ে নিব ধুয়ে।
কত না তমাল, কত ঝাউ-বন
শত মর্ম্মরে করে আবাহন,
আমি থাকি ব'সে—কেন থাকি তা কি
জানি-বুঝি কিছু ছাই গো—
কি জানি কেমন ভুল হয়ে যায়,
মাটী পানে মুক চাই গো!
পিয়া, তুই বেণী দে না খুলে',—
তোরি কোলে শুয়ে ঘুমুব যে আমি,
তুই মোরে ঢেকে নে না চুলে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

রাজকন্যা

৬

যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এত সব উদ্যোগ-আয়োজন, সেই সাধারণ মানুষটি কিন্তু দিব্য নির্ব্বিকার ও নিশ্চিন্ত মনে স্বাভাবিক প্রেরণার বশেই নিজের অনুষ্ঠানে লিপ্ত রহিলেন। জমীদারের ক্রোধ-বিদ্বেষ, জমীদারী প্রতিপত্তির প্রভাবে কর্ম্মহানি, আয়ের উপায়-বিলোপ,—কোন কিছুই তাঁহাকে উত্তেজিত বা অবসন্ন করিতে পারিল না।

এই সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রামখানির যে অংশ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া বহুদূরব্যাপী সুবিশাল জলাভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই অংশেই দীননাথের পৈতৃক ভদ্রাসন। দীননাথ তাঁহার রুচি অনুসারে পৈতৃক বসতবাটীকে সুসজ্জিত ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিয়া লইয়াছেন। তোরণপথের দুই পার্শ্বে সুবিস্তৃত পুষ্পবীথিকা,—তাহার পরেই উলুর ছাওয়া চালযুক্ত সুবৃহৎ পর্ণশালা,—এই পর্ণশালায় দীননাথের কর্ম্মশালা বিদ্যমান। দক্ষিণদিকের পর্ণশালায় কয়েকখানি তাঁত স্থান পাইয়াছে; বামদিকের পর্ণশালায় চরকা, সূতা ও রং করিবার সাজ-সরঞ্জাম। ইহার পাশেই অন্দরমহলের দরজা। একটি ছোট অঙ্গনের তিন দিক বেড়িয়া খোলার ছাদযুক্ত কয়েকখানি খটখটে ঘর ও দালান,—এক দিকে রন্ধনশালা, মধ্যস্থলে ভাণ্ডার ও অন্যদিকে শয়নকক্ষ;—অঙ্গনের মধ্যস্থলে বড় বড় দুইটি মরাই বা ধান্যের গোলা,—দুইটি গোলাই ধান ও নানাবিধ শস্যে পূর্ণ। বাগানের এক প্রান্তে কৃষিশালা,—গোলপাতার ছাওয়া ঘরে যথাক্রমে কৃষি-যন্ত্রপাতি, কৃষাণ ও গোকুলের থাকিবার স্থান ও অঙ্গন।

বৃদ্ধ রাজকবি ও তাঁহার কন্যা আজ পূর্ব্বাহ্নেই দীননাথের এই ক্ষুদ্র কর্ম্মশালা, উদ্যান, পুষ্করিণী, শস্যের গোলা প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া যখন দালানে আসিয়া প্রসারিত ফরাসের উপর ক্লান্তভাবে আশ্রয় লইলেন, ঠিক সেই সময় দীননাথ সেইখানে আসিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "এই যে দীননাথ বাবু, আসুন, আমরা আজ আপনার অতিথি।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ঘণ্টা দুই ধ'রে আপনার কর্ম্মশালা দেখে আমরা একবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

অঞ্জলিবদ্ধকরে দীননাথ বিস্ময়োল্লাসে বলিলেন, "আমার আজ এ কি সৌভাগ্য যে, আমার মত দরিদ্রের ঘরে—"

সহজ সরল হাস্যে রাজকবি বলিলেন, "আমরাও যে দরিদ্র দীননাথ বাবু! বড়লোক না হলেও মানুষ আমরা, তাই মানুষের বাড়ীতে এসেছি। আপনিও ক্লান্ত হয়ে এসেছেন দেখছি,—বসুন।"

দীননাথ কুণ্ঠিতভাবে ফরাসের এক পার্শ্বে বসিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আমি আপনার পুত্র তুল্য, রাজকবি! আমাকে যদি 'আপনি' ব'লে কথা কন, তা হ'লে আমাকে শুধু লজ্জা দেওয়া নয়—পল্লী-সমাজের চিরাচরিত সৌজন্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।"

হাসিয়া রাজকবি বলিলেন,—"কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু আজকালের আন্তরিকতা ক্রমশঃই পরস্পরের মধ্য থেকে এমন ভাবে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে যে, শ্লীলতা জিনিষটা ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে! মৌখিক মর্য্যাদা আর বাহ্য সম্মান আদায় করবার জন্যই এখন নব্য সমাজকে খুব লোলুপ বলেই মনে হয়।"

রাজকন্যা বলিলেন,—"এই দেখুন না, মহীপতি বাবুকে কথায় কথায় 'হুজুর' না বললে তিনি চ'টে যান! তা তাঁর পক্ষে চটা নিতান্ত অন্যায়ও নয়, কেন না, তিনি হচ্ছেন দেশের জমীদার, বড়লোক! আপনি আবার বড়লোকের ওপর কলম ধরেছেন, তাইতে আমি ত এতক্ষণ ভেবেই সারা হচ্ছিলেম যে, আপনাকে আরও কি উঁচু সম্বোধন করা যেতে পারে। এখন জেনে সুখী হলেম, আপনি এ সবের মোটেই পক্ষপাতী নন। কথায় কথায়—হুজুর, মহারাজ, ধর্ম্মাবতার, স্যার, খোদাবন্দ,—এ সব বলা কি কোন ভদ্রলোকের পোষায়? আপনিই বলুন ত!"

সহজ সুরে দীননাথ বলিলেন—"যিনি ভদ্রলোক, তিনি এ সব বলবেনই বা কেন? সামান্যকে বড় ব'লে প্রচার করা অন্যায়, অপরাধ, তোষামোদ।"

রাজকন্যা কিছু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"আর বড়কে সামান্য ব'লে উপেক্ষা করা?"

দীননাথ বলিলেন,—"সে-ও অন্যায়। বড় যদি নিজে ছোট হয়ে নিজেকে সামান্য ব'লে প্রচার করেন, সে তাঁর মহত্ব। কিন্তু অন্যে যদি তাঁর মহত্ত্বকে খর্ব্ব করবার প্রয়াস পায়, সে তার নীচতা।"

উৎফুল্ল হইয়া রাজকন্যা বলিলেন,—"হাঁ, এইবার পথে আসুন ত মশাই! বলুন ত এবার, প্রবন্ধ লিখে যিনি বড়লোকদের খর্ব্ব করতে চান, সেটা তাঁর পক্ষে কি?"

পূর্ব্ববৎ সরল সহজ ভাবেই দীননাথ বলিলেন,—"সে-ও নিশ্চয়ই নীচতা,—অবশ্য যদি প্রবন্ধকার ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থবশে নির্দ্দিষ্ট কোন বড়লোককে খর্ব্ব করতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন।"

হাসিয়া রাজকন্যা বলিলেন,—"আশ্চর্য্য! আপনি ত অদ্ভুত মানুষ দেখছি! আপনি এত বড় কথাটাও নিজের ওপর প্রযোজ্য মনে ক'রে চ'টে লাল হয়ে উঠলেন না ত!"

দীননাথ বলিলেন,—"চ'টে যে কায করা যায়, উত্তেজনায় যেটা গ'ড়ে ওঠে,—তাতেই চটাচটি আসে।"

"তা হ'লে আপনি কি বল্‌তে চান স্বাভাবিক প্রেরণাতেই আপনি আপনার প্রবন্ধ রচনা করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে মহীপতি বাবুকে আক্রমণ করেন নি?"

দীননাথ এতক্ষণে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের উপর চাহিলেন, তাহার পর রাজকবির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলিলেন,—"আশা করি, মহীপতি বাবুর পক্ষ থেকে আমার কাছে এ কৈফিয়ৎ চাওয়া হচ্ছে না!"

বৃদ্ধ হাস্যমুখে বলিলেন,—"এ কথার মানে কি, দীননাথ বাবু?"

দীননাথ গাঢ় স্বরে বলিলেন,—"এই প্রবন্ধকে উপলক্ষ ক'রে মহীপতি বাবু অতর্কিতভাবে আমাকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর তূণে যতগুলি বাণ ছিল, সমস্তই আমার ওপর ছুড়েছেন; তা ছাড়া তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় ক'রে আমাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁর পক্ষীয় লোকের কাছে আমার কৈফিয়ৎ দেওয়াটা ভীতির নিদর্শন বা কাপুরুষতার লক্ষণ ব'লে মনে হ'তে পারে।"

রাজকন্যা বলিলেন,—"এতে পক্ষাপক্ষ কিছু নেই, আমি কেবল কৌতূহলবশেই কথার সূত্রে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি। যদি একে আপনি কৈফিয়ৎ ব'লে মনে ক'রে থাকেন, বলবার প্রয়োজন নেই।"

দীননাথ ধীরস্বরে বলিলেন,—"মহীপতি বাবুর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন বিদ্বেষ আমার থাকতে পারে না, নাইও। তবে আমি এই গ্রামেরই ছেলে। আমার গ্রামের, আমার দেশের উন্নতির পথ, মুক্তির পথ নির্ণয় করবার অধিকার অবশ্যই আমার আছে। দেশের চাষী ও শিল্পীর দল আভিজাত্যের গণ্ডীর শত হস্ত দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে শ্রদ্ধায় পূজা-উপচার যোগাবে আর অভিজাতসমাজ তাদের উপেক্ষা করবে—এ আমার অসহ্য। এই জাতীয় অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধেই আমার আন্দোলন। এই রকম অভিজাত বড়লোক—আমাদের দেশের প্রত্যেক গ্রামেই আছে। শুধু মহীপতি বাবুকে লক্ষ্য করলে আমার প্রবন্ধ ছোট হয়ে যায়,—বাঙ্গালা দেশের সমস্ত মহীপতির বিরুদ্ধেই আমার লেখা।"

হাসিয়া রাজকন্যা বলিলেন, "আপনি যে দেখছি বাঙ্গালা দেশের লেনিন! তা দেখুন, ঘণ্টা দুই ধ'রে আপনার সমস্ত কীর্ত্তি দেখে নিয়েছি। আপনার লোকজনরাই সব দেখিয়েছে। তাঁতশালা, কৃষিশালা, গোশালা, গোলা, বাগান, পুকুর সবই দেখেছি। এ ত আপনার একখানি দিব্যি ছোটখাট রাজ্য-বিশেষ। এখন এই দুঘণ্টার পরিশ্রমে আমরা খুবই ক্ষুধার্ত্ত হয়ে পড়েছি, বুঝেছেন?"

ব্যস্তভাবে দীননাথ বলিয়া উঠিলেন,—"এ ত আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, আমি এখনই—"

বাধা দিয়া রাজকন্যা বলিলেন, "কথাটা শুনুন আগে। আমরা মশায়ের আগমনের অপেক্ষায় ব'সে থাকবার পাত্র কি না! বাগানের এমন টাটকা তরি-তরকারী, পুকুরের মাছ, ঘরের গায়ের দুধ—এ সবের লোভ সম্বরণ করা সোজা কি না! নিজে সব তুলে কুটনো পর্য্যন্ত কুটে দিয়ে এসেছি, কি কি রান্না হবে, তার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি,—পেট ভ'রে গরম দুধ পান করেছি,—বুঝলেন? আজ যে আমরা আপনার অতিথি।"

দীননাথ আনন্দে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজী, আমার এই পাগ্‌লী মেয়েটির সবই অদ্ভুত! বাপের সামনে বয়স্থা মেয়ের এ রকম স্বচ্ছন্দ ভাব ও খোলাখুলি কথা, তোমাদের চোখে হয় ত কিছু অদ্ভুত ব'লে মনে হবে, কিন্তু একে আমি ছেলেবেলা থেকেই এই ভাবে গ'ড়ে তুলেছি। আমি এর সামনে কখনও কোন বিষয়ে সঙ্কোচের একটা পর্দ্দা খাটিয়ে দিই নি। সত্যই পাগ্‌লী মেয়ে তোমার কর্ম্মশালা আর গৃহস্থালী দেখে বড় খুসী হয়েছে, নিজের হাতেই শাক-সব্জী তরিতরকারী তুলে এনে রাঁধবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসেছে। তোমার সংসারের সমস্তই আমরা জেনে নিয়েছি। পিতৃমাতৃহীন অসহায় দরিদ্রদের প্রতিপালনের জন্য কর্ম্মশালা গড়েছ, অনাত্মীয়া অসহায়া বিধবাদের যথাযোগ্য কায দিয়ে পরিপোষণ করছ, এ যুগে এর চেয়ে বড় কায আর কি হ'তে পারে? এ গ্রামে—এ অঞ্চলে তোমার চেয়ে সত্যকার বড়লোক আর কে আছে? তোমার এই কীর্ত্তি দেখেই পাগ্‌লী মেয়ে যেচে নিমন্ত্রণ নিয়েছে, আমিও তাতে সানন্দে সায় দিয়েছি। যাও বাবা, তুমি একবার বাড়ীর ভেতর ঘুরে এস। যাও মা কল্যাণি, তুমিও দেখে শুনে ব্যবস্থা ক'রে এস।"

স্বপ্নাবিষ্টের মত দীননাথ চাহিয়া রহিলেন। এই বৃদ্ধ ও তরুণীর কৃত্রিমতা-শূন্য ব্যবহারে—অনাড়ম্বর আলাপে যুবক অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

৭

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দীননাথ দেখিলেন, সত্যই তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই ভোজের রীতিমত আয়োজন চলিয়াছে। উচ্ছ্বসিত হাস্যধারায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া রাজকন্যা বলিয়া উঠিলেন,—"দেখছেন, বাগান থেকে সব লুঠপাট ক'রে এনে কেমন ভোজের জোগাড় করেছি!"

এক বর্ষীয়সী মহিলা নিমকির লেচি বেলিতেছিলেন, তিনি উৎফুল্ল মুখে বলিলেন,—"মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, এক দণ্ডের মধ্যেই ঘর-বাড়ী আপনার ক'রে নিয়েছেন!"

যিনি কড়ায় নিমকি ভাজিবার জন্য ঘৃত চড়াইয়া আঁচের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"যেমন পাগ্‌লী মেয়ে, তেমনই আমুদে বাপ, যেন বশিষ্ঠ ঋষি!"

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি উনানের নিকট গিয়া পাচিকার হাত হইতে খপ করিয়া ঝাঁঝরিখানি লইয়া বলিলেন,—"দিন দিকিন্ আমাকে, আমি খানকতক আগে ভাজি।"

"ও মা, সে কি? সোনার প্রতিমে তুমি, কেন কষ্ট—"

বাধা দিয়া রাজকন্যা কলহাস্য করিয়া বলিলেন,—"সোনার প্রতিমে আগুনের আঁচে কিছুতেই গলবে না,—দেখি না, ভাজতে পারি কি না।"

দীননাথ প্রশংসমান-নয়নে সেই কলহাস্যময়ী তরুণীর অরুণরাগদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে শিহরিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

নিমকি ভাজিয়া স্বহস্তে থালায় ভরিয়া, আসন পাতিয়া দিয়া রাজকন্যা দীননাথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এখন বসুন ত—"

বিস্ময়ে দীননাথ বলিলেন,—"সে কি? আগে আপনারা—"

রাজকন্যা বলিলেন,—"আমরা সকলেই সদ্ব্যবহার করব, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করবেন না। এই দেখুন, বাবার জন্যও সাজিয়েছি; বাবা আমাকে না নিয়ে ত খান না, কাযেই আমাকে বাবার সঙ্গে খেতে হবে। আপনি বসুন।"

তরুণীর অবাধ স্বচ্ছন্দ ভাব, আন্তরিকতাময় আচরণ, কুণ্ঠাশূন্য, নির্ম্মল, প্রীতিপূর্ণ সহৃদয়তা দীননাথের অন্তর অভিভূত করিল। শৈশব হইতে দীননাথ মাতৃহীন, পঠদ্দশায় পিতাকে হারাইয়াছেন, ভাই, ভগিনী বা আত্মীয় বলিতে কেহ তাঁহার নাই, পর লইয়া তাঁহার সংসার;—এই সম্পর্কশূন্যা তরুণী অল্পক্ষণের পরিচয়ে তাঁহারই সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়া এ কি মধুর মোহময় স্নেহধারায় তাঁহার চিত্তকে অভিষিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে! এ কোন্ মহিমময়ী দেবী কোন্ স্বপ্নরাজ্য হইতে অমৃতের উৎস লইয়া তাঁহার বর্ত্তমানের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ প্রচ্ছন্ন উদ্বেগভরা হৃদয়মধ্যে পুলকস্পন্দন প্রবাহিত করিতেছে!

স্বপ্নাবিষ্টের মত দীননাথ আসনে বসিয়া পড়িলেন।

জলযোগ-অন্তে বৃদ্ধ রাজকবি ও রাজকন্যা সহসা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলেন। বৃদ্ধ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় দীননাথ আসিয়া পড়ায়, চতুর বৃদ্ধ সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"অত সকাল সকাল আজ কোথায় গিয়েছিলে, বাবা?"

দীননাথ বলিলেন,—"লাইব্রেরীতে। নিত্য সকালে সেখানে আমায় এক ঘণ্টা সময় দিতে হয়।"

"আফিসের কাযে কখন্ বেরুতে হয়?"

দীননাথ বলিলেন,—"সে পাট চুকে গেছে। মহীপতি

বাবুর কৃপায় পাটকলের সঙ্গে আমার সংস্রব আর নেই। আমার কায তিনিই নিয়েছেন। আমিও বেঁচে গেছি।"

রাজকন্যা বলিলেন,—"উপার্জ্জনের উপায় গেল, এ ত ভাবনার কথা,—বেঁচে গেলেন, মানে কি?"

"সে আপনি বুঝবেন না! পাটকলের কল্যাণে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের যেমন উপকার হচ্ছে, তেমনই অপকারও হচ্ছে প্রচুর। হিসেব দেখলে বেশ বুঝা যায় যে, ক্ষতির পরিমাণই বেশী।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"সে কি? এখানে এসে অবধিই ত শুনছি, কলের কল্যাণে এ অঞ্চলে আর গরীব নেই।"

দীননাথ হাসিয়া বলিলেন,—"সে কথা মিথ্যে নয়। কলের কাযে ঢুকে যারা একটু ওপরপায়া পেয়েছে, তাদের! কিন্তু তাদের এই অস্বাভাবিক রোজগার,—গরীব সাধারণ মজুরদের মেরে। তাদেরই রক্ত এরা সব শুষে নিয়ে নবাবী করে, আর সেই দুর্ভাগ্য শ্রমিকরা কলের মোহে প'ড়ে এই ভাবে মৃত্যুর দ্বারে এগিয়ে যাচ্ছে! তাঁতে তাদের আর অনুরাগ নেই, চাষে তাদের আর ভরসা নেই,—কলের চাকার পেষণে স্বাস্থ্য, শক্তি, উদ্যম সব হারিয়ে তারা আজ অকর্ম্মণ্য।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বল কি! এমন ব্যাপার এখানে?"

দীননাথ বলিতে লাগিলেন,—"পাটকলে শুধু থ'লে তৈরী হয় না, চুরীর নূতন নূতন উপায়ও তৈরী হয়। কারখানার আনুষঙ্গিক মালপত্র যেমন এক স্থান থেকে খরিদ হয়ে মিলের ষ্টোরে ঢুকছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনই সেই সব জিনিষ বিবিধ বিধানে বেরিয়ে এসে অন্যত্র বিক্রয় হচ্ছে,—এ সব চোরাই মাল কেনবারও দোকানের অভাব নেই,—আবার এই সব মালই মিলে বিক্রী হয়। এমন কত বলব? যদিও আমার সংস্রব ছিল কনট্রাক্ট দরে পাট সরবরাহ করার সঙ্গে, তবু আমার মনে হ'ত, বিক্রীর উপর যে মুনফা আমার হাতে আসত, আমারই দেশের সাধারণ মজুরদের হৃদয়ের রক্ত তাতেও জড়িয়ে আছে। কাযেই মহীপতি বাবু দয়া ক'রে আমাকে মুক্তিই দিয়েছেন দেখছি। এর জন্য তাঁকে আমি অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—"বটে! কিন্তু তোমার আয়ের এত বড় একটা উপায় বন্ধ হয়ে গেল, এ সব প্রতিষ্ঠান চলবে কি ক'রে?"

দীননাথ হাসিয়া বলিলেন, "চালাবার মালিক ত আমি নই, যাঁর কায, তিনিই চালাবেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা, মহীপতি বাবু তোমার বিরুদ্ধে আরও অনেক কিছু উদ্যোগ-আয়োজন করছেন শুনছিলেম। তোমারও কথায় একটু আগে ও রকম কি যেন শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে। সত্যি না কি?"

দীননাথ বলিলেন, "আমার ওপর আদালত থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি নোটিশ এসেছে। আমার এ ভদ্রাসন ব্রহ্মোত্তর; এর কোন খাজনা না থাকলেও, একটা রিটার্ণ ফি কালেক্টরকে দিতে হয়। বছর কয় থেকে স্থানীয় জমীদার-সরকারেই এই টাকা জমা দেবার হুকুম কালেক্টরী থেকে জারী হয়। আমি সেইমত জমীদার-সেরেস্তাতেই এটা দাখিল ক'রে এসেছি, কিন্তু কোনও রসিদ এর দরুণ নিই নি। এখন জমীদার না কি আমার সম্পত্তি তাঁর জমার অধীন ব'লে নালিশ করেছেন।"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বল কি?"

দীননাথ হাসিয়া বলিলেন,—"শুধু কি এই একটা ব্যাপার? প্রায় সতেরোটা পাওনাদার আমার নামে সমন পাঠিয়েছে, অথচ তাদের ষোল জনকে আমি চিনি না বা জীবনে কখনও তাদের সঙ্গে লেন-দেন করি নি।"

রাজকন্যা অবাক্ হইয়া এই ইতিহাস নিবিষ্টমনে শুনিতেছিলেন। এইবার প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, ষোলজন ত হ'ল আপনার অজানা, আর সতের জনেরটির ব্যাপার কি?"

দীননাথ বলিলেন,—"ইনি কলকাতার একজন বড় ব্যাঙ্কার। আমি যখন মিলে পাট সরবরাহ করতে আরম্ভ করি, ইনি আমাকে টাকা যোগাতে সম্মত হন। পাটের কাযে যা লাভ হ'ত, তার অর্দ্ধেক তিনি নিতেন। কায বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলের ম্যানেজার সমস্ত পাওনা বিলের টাকা আমাকে মিটিয়ে দেন, আমিও তদ্দণ্ডে ঐ ব্যাঙ্কারের মূল টাকা সায় লভ্যাংশ মিটিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু তিনিই এখন সমস্ত টাকার দাবী দিয়ে নালিস করেছেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বল কি? তা তুমি বাবা, টাকা মিটিয়ে দিয়ে রসিদ নাও নি?"

দীননাথ বলিলেন, "সাত বছর পরস্পর পূর্ণ বিশ্বাসে কায চ'লে আসছে, কিন্তু রসিদের আদান-প্রদান কখনও হয় নি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এই ব্যাঙ্কারটির এরূপ বিরূপ হবার হেতু কিছু শুনেছ?"

দীননাথ বলিলেন, "শুনতে পাচ্ছি মহীপতি বাবু তার

সঙ্গই বখরার কায করবেন। তিনি না কি মহীপতি বাবুর আত্মীয়স্থানীয় ও বিশেষ বন্ধু।"

"ওঃ! তবেই বুঝছি। তা হ'লে তোমার সমূহ বিপদ দেখছি! কি সর্ব্বনাশ!"

রাজকন্যা অবাক্ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি রকম অদ্ভুত মানুষ আপনি বলুন ত! আপনার মাথার ওপর এই বিপদ, আর আপনি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন? লাইব্রেরীতে গিয়ে সখের চাকরী ক'রে এলেন? এত বড় বিপদ আপনার চারদিক্ দিয়ে ছুটে আসছে, অথচ আপনার মুখে ত ভয়-ভাবনার চিহ্নমাত্র নেই?"

দীননাথ স্বচ্ছন্দ সহজভাবে বলিলেন,—"মুখে ভয়-ভাবনার ভঙ্গী অভিনেতাদের মত ফুটিয়ে তুললেই কি বিপদ স'রে যাবে বলতে চান?"

রাজকন্যা বলিলেন, "তবে বুঝি মনের ভেতর সমস্ত ভাবনা ভয় পুষে রেখে তুষের আগুনে জলছেন?"

দীননাথ হাসিয়া বলিলেন,—"তা হ'লে কি এতক্ষণ এমন স্বচ্ছন্দে আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে পারতেম, না—পরম তৃপ্তির সঙ্গে আপনারই সামনে অতগুলো নিমকি উদরসাৎ করতে সমর্থ হতেম?"

বৃদ্ধ এবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"হাসির কথা নয়, বাবাজী, বুড়োর কথাটা তলিয়ে বোঝ,—সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, যখন তোমার শত্রুপক্ষ তোমার বিরুদ্ধে দেনা দাঁড় করিয়ে নালিস করেছে, তখন তোমার ত আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা উচিত নয়।"

"আমাকে কি করতে বলেন?"

"মহীপতি বাবুর সঙ্গে একটা রফা করলে হয় না? আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, সে-ই এই সব হাঙ্গামা বাধিয়েছে। এখন তাকে তুষ্ট করতে পারলেই সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। আমি যতদূর জেনেছি বাবাজী, তাতে মনে হয়—তুমি যদি ঐ লাইব্রেরীর উঠোনে আর একটা সভা ক'রে, বড়লোকদের বাড়িয়ে একটু স্তুতিবাদ কর, আর আগেকার প্রবন্ধের জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে মহীপতি বাবুর কাছে মাপ চাও, তা হ'লে সব গোলমাল চুকে যায়।"

দীননাথের হাসিমাখা অনিন্দ্যসুন্দর দৃপ্ত মুখখানির উপর সহসা কে যেন কালি ঢালিয়া দিল! পিতা-পুত্রী এই যুবকের তাৎকালীন মুখভঙ্গী দেখিয়া যুগপৎ চমকিয়া উঠিলেন।—দীননাথ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে অথচ তেজোদৃপ্ত স্বরে বলিলেন,—"দেখুন, কি জানি, কি মুহূর্ত্তে আপনাকে লাইব্রেরীতে প্রথম দেখেছিলেম! দেখেই আপনার পদতলে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করেছিলেম,—সে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বেড়েই এসেছে,—আমার একান্ত অনুরোধ,—এ শ্রদ্ধাকে ম্লান ক'রে দেবেন না! আপনার মুখে ত এ কথা খাপ খায় না,—কি ক'রে আপনি আমাকে এত হীন হ'তে উপদেশ দিচ্ছেন! আমি গরীব অসহায় বিপদাপন্ন ব'লে আমার ব্যক্তিত্ব—আমার মনুষ্যত্ব ত এখনও হারাই নি! তবে আপনি—"

অভিমানে দীননাথের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। রাজকন্যা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। বৃদ্ধ ঈষৎ গদগদস্বরে বলিলেন,—"সাধ ক'রে আমি তোমাকে এতটা হীন হ'তে বলিনি, বাবাজী! আমি শুনতে পেয়েছি, মহীপতি নাকি তার সেই আত্মীয় আর তোমার সেই ধর্ম্মপুত্র বখরাদারকে বাধ্য ক'রে মামলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পত্তিই ক্রোক করবার চেষ্টায় আছে। যে কোনও মুহূর্ত্তে আদালতের কুর্কি আসা আশ্চর্য্য নয়।"

দীননাথ সহজভাবেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—"আমিও যে এ কথা না শুনেছি, তা নয়!"

সবিস্ময়ে বৃদ্ধ বলিলেন,—"তবু নিশ্চিন্ত হয়ে আছ?"

দীননাথ পূর্ব্ববৎ সহজ সুরে বলিলেন,—"কি করতে বলেন? চিন্তাকে ব্যাধির মত মনের মধ্যে পুষে ফল? সত্য আমার সহায়।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"যদি সত্যই তারা ক্রোক করতে আসে, কি করবে?"

"কি আর করব? সব ছেড়ে দেব।"

হঠাৎ ফটকের সম্মুখে এই সময় কতকগুলি ঢোল কঠোর রোলে বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা, হিন্দী ও উর্দ্দু-ভাষায় মিলিত বিশ্রী একটা হল্লা শোনা গেল।

কর্ম্মশালার কর্ম্মিগণ, গোশালা ও কৃষিশালার কৃষাণ ও গোয়ালাগণ হল্লা শুনিয়া অঙ্গনে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে একখানি রৌপ্যখচিত সুসজ্জিত পাল্কী ফটকের মধ্য দিয়া দালানের পথে অগ্রসর হইল। পাল্কীর অগ্রপশ্চাতে আট জন লাঠি ও সড়কিধারী ভোজপুরী বরকন্দাজ। প্রথম পাল্কীর পরেই আর একখানি পাল্কী,—তাহার পশ্চাতে আদালতের তকমাধারী ছয় জন পিয়াদা, জমীদারী কাছারীর আমলা ও পারিষদবর্গ। পাল্কী আসিয়া থামিতে না থামিতে জমীদার-বাড়ীর কয়েক জন পাইক ক্ষিপ্রতার সহিত কয়েকখানি চেয়ার আনিয়া দালানের বারান্দায় পাতিয়া দিল।

পাল্কী হইতে প্রথমে নামিলেন, খোদ জমীদার মহীপতি বাবু। অন্ত পাল্কী হইতে নামিলেন জেলা আদালতের নাজীর মইমুদ্দীন মোল্লা। দুই জনেই ধীরপদবিক্ষেপে বারান্দায় উঠিলেন। জমীদার মদমত্তভাবে একখানি কেদারায় বসিয়া পড়িলেন,—নাজীর সাহেব একবার ফরাসের দিকে চাহিয়া তিনটি আঙ্গুল ললাটে ছোঁয়াইয়া একখানি কেদারা দখল করিলেন।

আমলা ও পারিষদ্‌বর্গকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে দীননাথ তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র এখানে এঁদের জন্য একখানা লম্বা সপ্ বিছিয়ে দাও।"

ভজহরি সকলের আগে দাঁড়াইয়া ছিল। সে দাঁত বাহির করিয়া রূঢ়স্বরে বলিল,—"থাক্ থাক্, ভয়ে প'ড়ে আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না।"

দীননাথ কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া সহজ সুরেই বলিলেন,—"একে ভয়ে প'ড়ে ভদ্রতা বলে না, এ হচ্ছে—অভ্যাগতের প্রতি গৃহস্থের ধর্ম্ম।"

পিতার পার্শ্বে তরুণী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দীননাথ বাবু, আপনি কি জানেন না, আমাদের আকড়াই হুজুরের সামনে কুকুরের বসবার অধিকার আছে, কিন্তু চাকরের সে ক্ষমতা নেই?"

রাজকবি ও রাজকন্যাকে এখানে উপস্থিত দেখিয়াই মহীপতি বাবু জলিয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজকন্যার এই রহস্যধ্বনিই তাঁহার কর্ণে যেন শূলের মত বিদ্ধ হইল। তিনি বক্র দৃষ্টিতে পিতা-পুত্রীর দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন,—"এই যে নায়েব নন্দিনী—না নবাবনন্দিনী এখানেও ধাওয়া করেছেন দেখছি?"

তাঁহার এই অশিষ্ট উক্তি শুনিয়া নাজীর মহাশয়ও মুখ নত করিলেন। রাজকন্যা বলিলেন,—"শুনতে পেলেম, জমীদার হুজুর মুখের চূণকালি ঘুচাবার জন্ম দীননাথ বাবুর সঙ্গে এখানে আজ ডুয়েল লড়বেন,—তাই লড়াইয়ের খবরটা রাজকন্যাকে দেবার জন্যই. এখানে আসা হয়েছে।"

ক্রোধে এবার মহীপতি ধৈর্য্য হারাইলেন। তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মুখ সামলে কথা কও বলছি,—বাঁদীর মুখে রাজকন্যার নাম ফের যদি শুনি—"

দীননাথের তেজোদৃপ্ত রূঢ় স্বরের সংঘাতে মহীপতির তীব্র তর্জ্জনধ্বনি বাধা পাইয়া রুদ্ধ হইল। দীননাথ তখন সিংহের মত ফুলিয়া উঠিয়া মহীপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আদেশের স্বরে বলিলেন,—"অসভ্য নরপশু! এই মুহূর্ত্তে এঁর কাছে ক্ষমা চাও বলছি!"

এ হেন অভাবনীয়, অসম্ভব ব্যাপারে মহীপতি বাবু ক্ষণিকের জন্ম মুহ্যমান হইলেন—দীননাথের দুই দৃপ্ত চক্ষু হইতে বিচ্ছুরিত অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। দীননাথ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আমার বাড়ীতে এসে আমার সম্মানীয় অতিথির ওপর কটূক্তি করবার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে শুনতে চাই আমি? রহস্যচ্ছলে ইনি যা বলেছেন, আমি সত্য ভেবে তাই তোমাকে বলছি;—তোমায় আমায় আজ পরীক্ষা হয়ে যাক।—তুমি যখন আমাকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করেছ,—তখন এস—যদি মানুষ হও, মানুষের চামড়া তোমার গায়ে থাকে—উঠে এস,—আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাক্ সকলের সামনে।"

বলিতে বলিতে দীননাথ গায়ের খদ্দরের চাদরখানা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর সার্টের আস্তিন গুটাইয়া রণোন্মত্ত সিংহের মত ফুলিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার সেই দৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

মহীপতি বাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া রক্তনেত্রে দীননাথের দিকে চাহিলেন। এতটা যে হইবে, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। এক্ষণে তিনি যে কি করিবেন—দীননাথের সহিত লড়িবেন, অথবা কি কঠিন আঘাতে তাহার বক্ষ দীর্ণ করিবেন, কিম্বা তাঁহার বরকন্দাজদের ডাকিবেন—কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া শেষে অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমার মত ছোটলোক নই যে, হাতাহাতি করব। ইচ্ছা করলে যাকে আমি—"

বৃদ্ধ রাজকবি ঠিক এই সময় উভয়ের মধ্যস্থলে তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিরক্তির সুরে মহীপতি বাবুকে বলিলেন, "আর থাক্ মহীপতি—থাম তুমি।"—বৃদ্ধের সে তেজোদৃপ্ত ঝঙ্কার মহীপতির বক্তব্য রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বৃদ্ধ স্নেহভরে দীননাথকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া গিয়া ফরাসে বসাইয়া দিলেন।

নাজীর এই ব্যাপারে বিশেষ বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—"এ সব কি ছেলেমানুষী করছেন, হুজুর? আদালতের হাতিয়ার আপনার হাতে থাকতে, এ সব কি করছেন?"

মহীপতি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"এই দণ্ডে কাষ সেরে ফেলুন।"

নাজীর তখন নথী বাহির করিয়া, একবার তাহার আষ্টে-পৃষ্ঠে চক্ষু বুলাইয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"দীননাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদী,—বাদী—কিরণচন্দ্র রায়,—তিনি জজকোর্টে পতিবাদীর বিরুদ্ধে মায় খরচা বাইশ হাজার তিন শ বাষট্টি টাকা এগার আনা তিন পাই আদায়ের জন্য নালিস দায়ের করেছেন এবং প্রতিবাদী তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বেচবার চেষ্টা করছেন জানতে পেরে অ্যাটাচমেণ্ট বিফোর জাজমেণ্ট, অর্থাৎ নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আদালতের সহায়তায় ক্রোক করবার অনুমতি পেয়েছেন। এখন প্রতিবাদীকে জানান যাচ্ছে মহামান্য জজ বাহাদুরের হুকুমমত, তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি সে সমস্ত ফিরিস্তিবন্দী ক'রে শিল করব।"

দীননাথ প্রশান্তভাবে বলিলেন,—"করুন, আমার কোন আপত্তি নেই। যখন নালিস হয়েছে, স্থাবর ভূসম্পত্তির ফিরিস্তি ও চৌহদ্দী আপনাদের কাছেই আছে। অস্থাবর সম্পত্তি যা যা রয়েছে, তা ত দেখতেই পাচ্ছেন।"

নাজীর উঠিয়া দালানের দুই পার্শ্বের ঘরের তৈজসপত্র দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সব ত দেখতে পাচ্ছি; আর সব কি কোথায় আছে?"

দীননাথ বলিলেন,—"আমার সমস্ত ভূসম্পত্তিই এই দেনার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

নাজীর বলিলেন, "যথেষ্ট হলেও আমাকে তাবৎ সম্পত্তিই ক্রোক করতে হবে।"

দীননাথ বলিলেন,—"বাইরের ঘরের এই সব তৈজসপত্র, তাঁতশালার তাঁত ও যন্ত্রপাতি রয়েছে, ক্রোক করুন।"

ভজহরি সহসা বলিয়া উঠিল,—"আর বাড়ীর ভেতরে ধানের গোলা, মালপত্র, বিছানা-মাদুর, বাসনকোসন রয়েছে, —সে সব অনেক টাকার জিনিষ।"

দীননাথ নাজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে-ও কি আপনি ক্রোক করতে চান?"

নাজীর বলিলেন,—"সে না করলেও চলতে পারে, যদি অবশ্য বাদীপক্ষ আপত্তি না করেন।"

দীননাথ বলিলেন,—"অপর কোন কারণে আমি এ অনুরোধ করছি না। বাড়ীর ভেতর হচ্ছে—অন্দরমহল। সেখানে আমাদের দেববিগ্রহ আছেন, পাকশালায় পাক হচ্ছে—এখনও দেবতার ভোগ হয় নি। সেই জন্যই আমার এই সামান্য প্রতিবাদ।"

নাজীর মহীপতি বাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হুজুর কি বলেন?"

হুজুর তখন কি ভাবে দীননাথ-দত্ত অবমাননার প্রতিশোধ লইবেন, তাহার সূত্র আবিষ্কার করিতেছিলেন। নাজীরের প্রশ্নে কঠোরস্বরে উত্তর দিলেন,—"সমস্ত ক্রোক করা চাই, কুলো ধুচুনীটা পর্য্যন্ত বাদ পড়বে না, কিরণের এই ইচ্ছা। আপনি একটু তাড়াতাড়ি সব সেরে নিন। আর আগে বাড়ীর ভেতরের মালপত্র শিল ক'রে আসুন,—এ সব পরে হবে।"

নাজীর দীননাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি কি করতে পারি বলুন, হুজুর নারাজ; চলুন, ভিতরে যাওয়া যাক—"

বৃদ্ধ এবার অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"ভিতরে এখন ত যাওয়া হ'তে পারে না। এখনও বিগ্রহের ভোগ হয় নি। আমরাও অভুক্ত। মহীপতি বাবু ছেলেমানুষ, পাগল হতে পারেন; কিন্তু আপনি ত পাগল হন নি, নাজীর সাহেব?"

নাজীর কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমাদের এতে কোন হাত নেই। বাদীর কথামত কায করতে আমরা বাধ্য।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তা সত্য, কিন্তু মহীপতি বাবু ত এ মামলার বাদী নন, বাদী হচ্ছেন—কিরণচন্দ্র রায়। আপনি তাঁকে আনান—"

নাজীর বলিলেন,—"তাঁকে এখন কোথায় পাই বলুন?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"জমীদার-বাড়ীতেই তাঁকে পাওয়া যাবে।"

মহীপতি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মিথ্যা কথা।"

ধীর সংযত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন,—"সত্য কথা। আমি তাকে দেখেছি।"

মহীপতির ধূমায়মান প্রতিহিংসা বহ্নি এবার ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শক্তির দিক্ দিয়া একটা কিছু কাণ্ড ঘটাইবার জন্য তিনি যে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা স্বাভাবিক পথেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মহীপতি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও সব বাজে কথায় কাণ দেবেন না, নাজির সাহেব, আপনি জোরসে অন্দরে ঢুকুন,—বরকন্দাজ!"

আট জন ভোজপুরী বরকন্দাজ বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া সমস্বরে 'হুজুর' বলিয়া সেলাম বাজাইল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলের দ্বারদেশ হইতে এক জন গর্জ্জিয়া

বলিল,—"কার বাবার সাধ্য আছে দেখি, অন্দরের দোরে পা বাড়ায়! দুষমনের যম গোবিন্দ মোড়ল দেউড়ী নিয়েছে ;—নিশ্চিন্ত থাক তুমি, দাদা বাবু! ছাতুর পিণ্ডি আজ এইখানে চটকাবো না—"

সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন, দীননাথের গোশালারক্ষক গোবিন্দ মণ্ডল খোলা গায়ে প্রকাণ্ড এক বংশদণ্ড হস্তে অন্দরের দ্বার রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৃদ্ধ এই সময় হাঁকিলেন —"কর্ত্তার সিং কোথায় রে!"

সে কি গুরুগম্ভীর আওয়াজ! যেন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।—সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ের মধ্য হইতে চারি জন কুকরীধারী রণবেশী গুর্খা প্রহরী বারান্দার সোপানে দাঁড়াইয়া সামরিক প্রথায় বৃদ্ধকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল। বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"ঐ যে লোকটি অন্দরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওর দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াও,—যে কেউ এদের ভেতর থেকে অন্দরে ঢুকতে যাবে, তাকে তখনই কেটে দু-টুক্‌রো করবে।—"

গুর্খা-চতুষ্টয় দ্বারের দিকে ছুটিল। নাজীর বলিলেন,—"এ সব কি বে-আইনী কায করছেন, মশাই ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"আমি বুড়ো মানুষ কি না, তাই আমার কথা বাজে, কায বে-আইনী;—আর আপনারা হচ্ছেন—হুজুরের তরফের; সব কথাই কাযের, আর কাযও আইন-সঙ্গত! এখন আর আইনের দোহাই না দিয়ে উপায় নেই!"

নাজীর হতাশভাবে বলিলেন,—"তা হ'লে আপনি কি করতে বলেন ?"

বৃদ্ধ সহজভাবেই বলিলেন,—"আগেই ত বলেছি। আবার বলছি,—কিরণচন্দ্র রায়কে আনান।"

নাজীর বিরক্তিভরে বলিলেন,—"তা'তে কি হবে মশাই ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"সমস্ত হাঙ্গামা এখনই মিটে যাবে,—আমরা তাঁর সঙ্গে এখনই মীমাংসা ক'রে ফেলব, তিনি আমাকে বড়ই দয়ার চোখে দেখেন। আর আমি এ-ও প্রতিশ্রুত দিচ্ছি আপনাকে—যদি তিনি এসেও না মেটাতে চান, তখন আপনি অন্দরমহলে ক্রোক করতে ঢুকবেন, আমরা কোন বাধা দেব না।"

তখন নাজীর ও জমীদারে কিছুক্ষণ পরামর্শ হইল। তাহার পর বেহারারা জমীদারের হুকুমে পাল্কী লইয়া ছুটিল। মহীপতি বাবু বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরণ বাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় কোথায় হয়েছিল ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"দেবীপুরে। যে ফার্মে কিরণ বাবু আছেন, তার বারো আনা মালিক হচ্ছেন দেবীপুরের রাজা,—কিরণ বাবু ওয়ার্কিং পার্টনার।"

ভজহরি বলিল,—"তাই বুঝি কিরণ বাবুর কাযে বাধা দিতে রাজবাড়ীর গুর্খাদের লেলিয়ে দিয়েছেন। দিব্যি হিতৈষী আপনি!"

মহীপতি বলিলেন,—"রাজবাড়ীর গুর্খাদের ওপর হুকুম চালাবার আপনি কে ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—"আমি যতক্ষণ রাজবাড়ীতে আছি, আমার হুকুমমতই কায হবে, রাজার এই রকম আদেশ।"

এই সময় ভীড় ঠেলিয়া ইউল মিলের ইংরাজ ম্যানেজারকে বারান্দায় উঠিতে দেখিয়া মহীপতি ও দীননাথ উভয়েই চমৎকৃত হইলেন।

দীননাথ করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে সমাদরে বসাইলেন। ম্যানেজার সবিস্ময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

দীননাথ সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলে, ম্যানেজার একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহীপতি বাবুর দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন,— "এই যে স্যর! আপনিও যে ?"

মহীপতি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এখানে কি মনে ক'রে, মিষ্টার হুইলার ?"

ম্যানেজার বলিলেন,—"আমি আশ্চর্য্যভাবে এখানে এসে পড়েছি। এই দীননাথ বাবুর বাড়ীতে এই সময় দেবীপুরের রাজা বাহাদুর আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেছেন।"

দীননাথ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"রাজা বাহাদুর এনগেজমেণ্ট করেছেন,—আমার বাড়ীতে? আপনি কি বলছেন, মিষ্টার হুইলার ?"

হুইলার স্থির স্বরে বলিলেন,—"আমি প্রকৃত কথাই বলছি, দীননাথ বাবু।"

মহীপতি বাবু বিদ্রূপের সুরে বলিলেন,—"রাজা বাহাদুর তোমার সঙ্গে আর এনগেজমেণ্ট করবার স্থান খুঁজে পান নি দেখছি!"

হুইলার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"রাজা তাঁর মনোগ্রাম করা চিঠির কাগজে নিজে আমাকে পত্র লিখেছেন। দুঃখের বিষয়, সে পত্র আমি আফিসে ফেলে এসেছি। আমাকে এ ভাবে হায়রাণ ক'রে রাজার লাভ ?"

মহীপতি ব্যঙ্গভরে বলিলেন,"রাজা কোথায় এখন জানেন ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"রাজা যেথানেই থাকুন না, তাতে কি আসে যায় ? ঐ ত রাজার এক পার্টনার আসছেন পাল্কী চেপে,—রাজার আসাও বিচিত্র নয়।"

বেহারাদের হুঙ্কার শোনা গেল,—দেখিতে দেখিতে পাল্কী দালানের সম্মুখে আসিয়া থামিল। সৌখীন পরিচ্ছদ-পরিহিত সুন্দর মূর্ত্তি, সোনার চশমা পরা এক প্রৌঢ় ব্যক্তি পাল্কী হইতে নামিয়া সোপান বাহিয়া বারান্দায় উঠিতে লাগিলেন। ইনিই কিরণচন্দ্র রায়।

কিরণবাবু বারান্দায় উঠিয়া বৃদ্ধ রাজকবিকে দেখিবামাত্র একবারে বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল! কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া উন্মত্তের মত তিনি বৃদ্ধ রাজকবির পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন,—"এ কি! হুজুর! রাজা বাহাদুর! আপনি! আমি—আমি—আমি—"

সকলেই তখন বিস্ময়ে পুলকে আকস্মিক উন্মাদনায় অধীর হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন! কি আশ্চর্য্য! এই সৌম্যমূর্ত্তি, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদপরিহিত সাধারণ বৃদ্ধটি স্বয়ং দেবীপুরের লোকবিশ্রুত রাজা বাহাদুর!

হুইলার উল্লাসধ্বনি সহকারে টুপী খুলিয়া রাজা বাহাদুরকে অভিবাদন করিলেন। রাজা বাহাদুর সাদরে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। তাহার পর তিনি কম্পিতকলেবর কিরণ বাবুর হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন,—"এখন আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করছি, একটি একটি ক'রে তার উত্তর দাও। দীননাথের নামে এই মামলা আর অগ্রিম কুর্কির ব্যবস্থা তুমিই করেছ ?"

কম্পিত কণ্ঠে কিরণ বাবু বলিলেন,—"হাঁ, হুজুর।"

"দীননাথ বাবু তার আগেই ফার্ম্মের সমস্ত পাওনা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছিল, কেমন ?"

কিরণ বাবু নির্ব্বাক্। রাজা বাহাদুর বলিলেন,—"বল, বল,—মনে রেখো, আমি অন্তর পর্য্যন্ত পড়তে পারি।"

ধীরে ধীরে কিরণ বাবু বলিলেন,—"হাঁ।"

"ফার্ম্মের খাতায় সে টাকা জমা করেছিলে ?"

ঢোক গিলিয়া কিরণ বাবু উত্তর দিলেন, "না।"

রাজা বাহাদুর দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার প্ররোচনায় এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাযে নেমেছিলে ?"

কিরণ বাবু নতমুখে ব'লিলেন, "মহীপতি আমাকে—"

গম্ভীর স্বরে রাজা বাহাদুর বলিলেন, "তা জানি, কিন্তু এখন সে তোমাকে রক্ষা করবে ?"

গাঢ়স্বরে কিরণ বাবু বলিলেন, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন, রাজা বাহাদুর! আমি অপরাধ করেছি, গুরুতর অন্যায় করেছি—"

রাজা বাহাদুর তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিলেন, "তুমি না শিক্ষিত? বড়লোক ব'লে না অহঙ্কার কর? তোমার এই কায? জান—পাওনা থাকলেও কুর্কি এনে একটা তৈরী টাট্‌কে উল্‌টে দেওয়া পাপের কায?—আর তুমি কি না মিছিমিছি এই সত্যাশ্রয়ী যুবার সর্ব্বনাশে হাত বাড়িয়েছিলে! উঃ,—তুমি কি? যাও,—এখনই নাজীরের কাগজে এই কথা লিখে দাও—ভুল বশতঃ এ মামলা হয়েছে। যাও, আইন বাঁচিয়ে নাজীর যে ভাবে বলেন, সেইভাবে লেখ গে—"

কিরণ বাবু নাজীরের পার্শ্বে গিয়া নথী লইয়া বসিলেন।

মহীপতি বাবু তখন আড়নয়নে একবার রাজা বাহাদুর, একবার রাজকন্যা আর একবার দীননাথের দিকে ঘন ঘন তাকাইতেছিলেন। রাজা বাহাদুরকে সম্ভাষণ করিবার তাঁহার আর মুখ ছিল না।

তখন রাজা বাহাদুর মিলের ম্যানেজার মিষ্টার হুইলারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, মিষ্টার হুইলার, আমার এই একমাত্র মেয়েটিকে আমি আমার নিজের আদর্শে মনের মত ক'রে তৈরী করেছি। এর উপযুক্ত পাত্র আমি পাঁচ বছর ধ'রে খুঁজে আস্‌ছি। এ পর্য্যন্ত একশোর ওপর ছেলে দেখেছি—জমীদার-পুত্র দেখেছি, মহাধনীর ছেলে দেখেছি, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ দেখেছি,—কিন্তু মানুষ একটি দেখিনি;—এই গ্রামে এসে প্রথম একটি মানুষের মত মানুষ আমার চোখে পড়েছে, সে—এই দীননাথ! আপনি সে দিন এঁর সম্বন্ধে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা আজ সার্থক হবে বলেই, আর আপনি তা দেখে অত্যন্ত তুষ্ট হবেন মনে ক'রে আমি আপনাকে এখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেম। আপনি শুনে সন্তুষ্ট হোন,—এই দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ই অতঃপর দেবীপুর ষ্টেটের সর্ব্বময় মালিক, কেন না—এই মাসেই এঁর সহধর্ম্মিণী হবেন আমার একমাত্র কন্যা—এই রাজকন্যা!"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের শিক্ষা ও রাজনীতি

(১৯০৬—১৯২৮)

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের ইতিহাসের ধারা এক সঙ্কটময় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। অতীত গৌরবের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত সেই ধারা যখনই পথে রাজশক্তির সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকে প্রতিহত হয়, তখনই বিক্ষোভে স্ফীত হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া দুকূল প্লাবনে স্বকীয় বিক্ষুব্ধ বেগ পর্য্যবসিত করে। তরুণ ভারত বুঝিতে পারিয়াছে, 'নিজ ভূমে সে পরবাসী' এবং মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা ও তাহার সফলতা সম্পাদনের জন্য বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণাদি তাহাকে লাভ করিতেই হইবে। কিন্তু রাজশক্তি তাহাতে সম্মত হইবার নহে। তাই অসহায় প্রজাশক্তির সহিত প্রবল রাজশক্তির প্রতি পাদক্ষেপেই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া নানা বিভাগে নানাবিধ আন্দোলন ও পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করে। ইহাই উল্লিখিত সময়ের ইতিহাসের বিশিষ্ট ধারা। প্রথমতঃ আমরা, শিক্ষা বিভাগে যাহা যাহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া পরে রাজনৈতিক বিভাগীয় পরিবর্ত্তনগুলির কথঞ্চিৎ আভাস পাঠকদিগকে দিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব ও তৎপ্রতীকারার্থ ইংরাজ-শাসনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেহ কেহ জগতের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু গত দেড় শত বর্ষের ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য দেশের তুলনায় বিদেশীয় শাসক-সম্প্রদায় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। বৃটিশ-ভারতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনাতে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি হাজারে মাত্র ৭২ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে হাজারে ১ শত ১২ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী। বলা বাহুল্য, এই অতি সাধারণ শিক্ষালাভও জনসাধারণের চেষ্টার ফল। দেশীয় করদ ও মিত্র রাজ্যসমূহের শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, বিদেশী শাসনতন্ত্র জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্য কি পরিমাণে দায়ী। একমাত্র ব্রহ্মদেশ ভিন্ন (যেখানে ফুঙি-চঙ বা প্রাচীন আমলের মন্দির-পাঠশালাতেই বহু লোকের সাধারণ শিক্ষালাভ হইয়া থাকে) বৃটিশ শাসিত ভারতের অন্য যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা কতিপয় দেশীয় মিত্ররাজ্যের অর্থাল্পতা প্রভৃতি নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বেশী। ত্রিবাঙ্কুরে শতকরা ২৪ জন, বরোদাতে শতকরা ১০.৫ ও মহীশূরে ১৬ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে। আমেরিকাধিকৃত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৭০.৫ জন পুরুষ ও ৬১ জন নারী লিখন-পঠনক্ষম ছিল। স্বাধীন জাপানে শতকরা ৯৮ জন পুরুষ ও ৯৬ জন নারী লিখিতে ও পড়িতে পারে। সুবিজ্ঞ ইংরাজ জাতির ১ শত ৫০ বৎসরের আন্তরিক চেষ্টার ফলে শিক্ষোন্নতিতে আজ ভারতের স্থান কোথায়!

স্থাপিত শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনা ও অন্যান্য দিকে শিক্ষা-প্রসারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯০৬-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিন কোটি টাকা, ১৯১৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ছয় কোটি ও ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে তের কোটি টাকা রাজস্ব হইতে ব্যয় করিয়াছেন। তথাপিও ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত শিক্ষা বাবদ ব্যয় গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয়ের ৪৭.৯ অংশ মাত্র। কিন্তু দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সম্বলহীন জেলা বোর্ড প্রভৃতি হইতে শতকরা ১৩.১ টাকা, ছাত্র-বেতন হইতে ২২.৪ টাকা এবং অন্যান্য দিক হইতে ১৬.৬ টাকা রাজকোষে সঞ্চিত করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রজাবর্গ নানাপ্রকারে জন প্রতি ৫।৶০ আনা রাজস্ব দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিয়া থাকেন জন প্রতি ৶০ আনা মাত্র। বলা বাহুল্য, জাপানে শিক্ষার জন্য জন প্রতি ব্যয় ৮৲ টাকা ও এমন কি, ডেনমার্কের মত যুরোপের একটি অতি ক্ষুদ্র দেশেও শিক্ষা বাবদ জন প্রতি ১৭।৶০ আনা ব্যয়িত হয়। অপরন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে দেশীয় ও যুরোপীয় ছাত্রের স্কুল শিক্ষার বাবদ সরকার কর্ত্তৃক জন প্রতি ব্যয়ের তারতম্য দেখিলে অতীব বিস্মিত হইতে হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট প্রতি বাঙ্গালী ছাত্রের জন্য ২॥৶০ আনা এবং প্রতি যুরোপীয় ছাত্রের জন্য ১ শত ৩।০ আনা ব্যয় করিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ব্যয়িত অর্থ যথাযথ শিক্ষাপ্রদানকার্য্যে সম্যক্ ব্যয়িত হয় না, ইহার অধিকাংশই

অর্দ্ধাহারী কুটীরবাসী গ্রাম্য ছাত্রদিগের প্রাসাদোপম ছাত্রাবাসাদি ও বিদ্যালয়ের জন্য অট্টালিকাদি নির্ম্মাণকার্য্যে এবং বিদেশীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের অত্যধিক বেতন প্রদানে ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে।

এইরূপে শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতবাসীকে সুশিক্ষিত করিয়া ভারতের প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্য যথোপযুক্তভাবে বণ্টন করা হয় না। ভারত গবর্ণমেণ্টের সংবাদবিতরণকর্ত্তা মিঃ কোটম্যান বলেন, "শিল্পশিক্ষাও একপ্রকার অনাদৃত রহিয়াছে......। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের সাড়ে ৮৭ হাজার ছাত্রের মধ্যে ৭০ হাজার আর্ট ও সায়েন্স কলেজে এবং ৮ হাজার আইন অধ্যয়ন করিতেছে। মাত্র ৯ হাজার ৫ শত ছাত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্য-বিজ্ঞান ও শিক্ষকতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতেছে এবং মাত্র ৬ শত ৪১ জন কৃষি, ১ শত ১৯ জন জীবন-রক্ষা ও ২ শত ৭২ জন পশু-চিকিৎসা শিক্ষা করিতেছে।" * ফলে এই শিক্ষার দ্বারা দেশের অন্ন-সমস্যার অথবা বেকার-সমস্যার কোন প্রকার সমাধান হইতেছে না। সেই কারণে বর্ত্তমানে এই শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য দেশবাসীদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের সভায় মহামতি গোখলে দেশে অল্পপরিমাণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। তথাকথিত খরচ কমান সত্ত্বেও কয়েক বৎসর পরে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের শতকরা ২৮৲ টাকা সামরিক বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, গণপ্রতিনিধিগণ আটটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তন করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই প্রদেশে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে বিহার ও উড়িষ্যায়, মে মাসে বাঙ্গালায় ও জুন মাসে যুক্তপ্রদেশে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয়, এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তন করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশ নূতন শাসনতন্ত্রের কতকগুলি আইন-কানুনের সুযোগ লাভ করিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। সরকার প্রথমতঃ নানাবিধ কারণ দর্শাইয়া প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে স্বীয় সামর্থ্যাভাব ও অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু অতঃপর বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার ব্যয়ভার বর্ত্তমানে ক্রমশঃ স্থানীয় জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর উপর ন্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং তজ্জন্য প্রদেশসমূহে বিশেষ শিক্ষা-কর ধার্য্য করিবার আয়োজনও করিতেছেন। মোটের উপর দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচারের প্রতি বর্ত্তমানে বিশেষভাবে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা এই সময়ের এক বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে নূতন কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিবার প্রস্তাব পাশ করেন, কিন্তু দেশে তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতাবশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সার মাইকেল্ স্যাডলার (লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার)এর সভাপতিত্বে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার জীয়া উদ্দীন আহাম্মদ ও অপর চারি জন ইংলণ্ডদেশীয় সভ্য লইয়া 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠিত হয়। তাঁহারা নানা স্থান পরিভ্রমণ ও নানা কলেজ পরিদর্শন করিয়া ও রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুই বৎসর পরে তাঁহাদের কমিশনের বিশাল রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। তখন (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাহাদের প্রত্যেকের কলেজ ও ছাত্রসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা—

বিশ্ববিদ্যালয়	কলেজ-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
কলিকাতা—	৫৮	২৮,৬১৮
মাদ্রাজ—	৫৩	১০,২১৬
বোম্বাই—	১৭	৮,০০৯
পঞ্জাব—	২৪	৬,৫৫৮
এলাহাবাদ—	৩৩	৭,৮০৭

স্যাডলার কমিশন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া বোর্ড (Board of Secondary and

* India in 1926—27 by J, Coatman, Director of Public Information, Government of India.

Intermediate Education) গঠিত করিতে হইবে, এবং কলেজের প্রথম দুই বৎসরের শিক্ষার পরিচালনা ও তাহার আয়-ব্যয়াদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অপসারিত করিয়া সরকারের হস্তেই ন্যস্ত হইবে। তাঁহাদের মতে ইংরাজী ভাষাকে সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা-বাহন (medium) রূপে ব্যবহার করিলে চলিবে না, কেবল-মাত্র ইংরাজী সাহিত্য ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান ইংরাজী ভাষার সহায়তায় প্রদত্ত হইবে; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সমুদয় বিষয় মাতৃ-ভাষাতেই পড়াইতে হইবে, বেতনাদি বৃদ্ধি দ্বারা শিক্ষকদিগের অবস্থা ও পদমর্য্যাদা অধিকতর উন্নত করিতে হইবে।

সরকারের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া তাঁহারা সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক কতকগুলি প্রস্তাব করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরস্পরের মধ্যে অধ্যাপক আদান-প্রদানের পরামর্শ দেন। উপরন্তু মুসলমানদিগের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষার কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহারা মোসলেম সভ্যতা আলো-চনার জন্য ঢাকাতে এক বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত করিবার ব্যবস্থা দেন। অতঃপর সরকার শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষার বাহন-ভাষা পরিবর্ত্তন বা অধ্যাপক আদান-প্রদান প্রভৃতি কমিশনের সুচিন্তিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত না করিয়া তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক প্রস্তাবগুলিই কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং স্যাডলার কমিশনের জন্য এত অর্থব্যয় জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকাংশে দেশীয় খ্যাতনামা মনীষিগণের স্বাধীন মতানুসারে পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ প্রতিভা, সার রাসবিহারী ঘোষ ও সার তারকনাথ পালিতের বদান্যতা ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের সমবেত চেষ্টায় বি, এ উপাধির পর উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতেই অর্পিত হয়। তদবধি বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন, বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ শিক্ষা প্রদান করিয়া ও প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের মৌলিক গবেষণার সহায়তা করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার শ্রীসম্পন্ন করিয়া আসি-তেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকারী এক নূতন আইনের ফলে গভর্ণর জেনারেলের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালার গভর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শতকরা ৮০ জন মনোনীত সভ্য লইয়া বাঙ্গালার সরকারী দপ্তরের অধীন হইয়া পড়ে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয় এবং ইহা কোন প্রকার মৌলিক গবেষণাদিতে কৃতিত্ব না দেখাইয়া কিংবা মোসলেম সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়াও সরকারী অর্থে দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতেছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অস্তিত্বের বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াও সরকারের চিরন্তন অর্থাভাবের ভ্রূকুটি হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না।

অবশিষ্ট চারিটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এক আইনে পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের হাত হইতে তথাকথিত মুক্তিলাভ করিয়া স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী গঠিত হয়। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে হায়দরাবাদের ওস্-মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজামের ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এক ফরমানের বলে গঠিত হয়। উর্দ্দু এখানে শিক্ষার বাহন, কিন্তু ইংরাজী অবশ্য-পাঠ্য বিষয়। মহীশূরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রণালীতে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গৌরব বিখ্যাত দার্শনিক শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রথম হইতেই ইহার ভাইস্-চেন্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অপরিমিত উৎ-সাহ ও অক্লান্ত চেষ্টায় কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, শুধু শিক্ষা-পরিচালনা নহে। এই কয়েক বৎসরে ইহা হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্ররূপে জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, অধিকন্তু ইহার এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাচ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইতোমধ্যে আলিগড়ের মুস্‌লিম্ বিশ্ববিদ্যালয় সার সৈয়দ আহাম্মদের এংলো ওরিয়েণ্টাল স্কুলের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আগা খাঁর চেষ্টায় মুস্‌লিম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা সংগৃহীত হয়, কিন্তু ভারতের অন্য কোন স্থানের কলেজকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব ভারত-সচিব গ্রহণ করিলেন না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-সভা (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত) শুধু আলিগড়ের কলেজ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মত হইলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এক তদন্ত সমিতি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলাদলি নিবারণের জন্য অধিকতর য়ুরোপীয় অধ্যাপক ও পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন।

সর্ব্বশুদ্ধ ভারতবর্ষে আজ ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে;—

পাটনা (১৯১৭), রেঙ্গুন (১৯২০), [বার্ম্মানদিগের আন্দোলনের ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এক নূতন নিয়মানুসারে জনসাধারণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন করিবার ক্ষমতা লাভ করে] ঢাকা (১৯২০), দিল্লী (১৯২২), [প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে ভারত গবর্ণমেণ্টই ইহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন], নাগপুর (১৯২৩), অন্ধ্র (১৯২৬), [তেলেগু ভাষাভাষীদিগের জন্য], ও আগ্রা (১৯২৬)। ২০ লক্ষ টাকার এক দানের উপর নির্ভর করিয়া একটি "আন্নামালাই" তামিল বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের অর্থ দ্বারা বাঁচিয়া আছে এবং অপর কয়েকটি শুধু সাধারণের দানের ভিত্তির উপর গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। সরকারের প্রদত্ত মিশ্র শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব-লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 'শান্তিনিকেতন' (বোলপুর), গুরুকুল ও সবরমতির বিদ্যালয়ত্রয় এবং দাক্ষিণাত্যে অধ্যাপক কার্ভের নারী-বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) বিশ্ব-ব্যাপিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-শাসন-সংস্কার আইনানুসারে বর্ত্তমানে শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু সরকার হইতে প্রয়োজনমত অর্থ না পাওয়ায় ও স্বকীয় চিন্তানুযায়ী স্বাধীনভাবে শিক্ষা-প্রচারের পশ্চাতে সরকারের আনুকূল্য না থাকায়, তাঁহারা অতি সামান্য কার্য্যই করিতে পারিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত য়ুরোপীয়দিগের শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ সরকার নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন এবং বস্তুতঃ এ দেশ-বাসীর শিক্ষার অর্থ দ্বারা বিদেশীয় ছাত্রেরাই জাঁকজমকের সহিত শিক্ষালাভ করিতেছে।

ভারতের নেতৃবর্গ মনে করেন, বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যা দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার সহিত এমনই ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, স্বরাজলাভ ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টার অসাফল্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বরাজ ভিন্ন এ বিষয়ে জাতীয় উন্নতিসাধনের আশা সুদূরপরাহত। সেই জন্য কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন, "শিক্ষা এখন থাকুক, আগে স্বরাজ লাভ করি, (Education may wait, but Swaraj cannot)। সুতরাং স্বরাজ লাভের জন্য এই কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশে কি চেষ্টা হইয়াছে, এবার তাহারই পর্য্যালোচনা করা যাউক।

রাজনীতিক্ষেত্রে এই কয় বৎসরে ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে। নব-জীবনের তোরণে এক মহাজাতির প্রগতি আমলাতন্ত্রের শাসনে নানা ভাবে নিতান্ত বাধা পাই-য়াছে; আমলাতন্ত্র 'অসার খেলনা' দিয়া একটা জাগ্রত জাতিকে ভুলাইতে চাহিয়াছেন; স্বাধীনতার সৈনিকদল নানা ভাবে লাঞ্ছনা পাইয়াছেন এবং দমননীতির সহায়ক 'বে-আইনি আইন' ও কঠোর শাসনে একটা বিশাল জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু জাগ্রত ভারত কিছুতেই নিরস্ত হয় নাই। সাম্প্রদায়িক কলহ, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও সম্প্রদায় হিসাবে চাকুরী বিতরণ-প্রথা এই কয় বৎসরে পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভারতের গলে দৃঢ়তর করিয়াছে এবং এক দল মেরুদণ্ডবিহীন খয়ের খাঁ অর্থ ও তথাকথিত সম্মানে প্রলুব্ধ হইয়া স্বাধীনতার সমরে জাতির প্রেরণাকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই এই সময়ের নিতান্ত শোচনীয় দৃশ্য।

লর্ড কর্জ্জন তাঁহার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা আইনের জন্য লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করিয়া তিনি মুসলমানদের নূতন মুসলমান প্রদেশের লোভ দেখাইলেন এবং তাহারাই যে সরকারের "সুয়ো রাণী" এ কথা জানাইলেন, তখন সারা বাঙ্গালার সঙ্গে ক্ষুব্ধ ভারত এই অপমানের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া এমন করিয়া দাঁড়াইলেন যে, "কর্জ্জনী গর্জ্জন" * আকাশে মিলাইয়া গেল—বঙ্গভঙ্গ রদ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত জন্মগ্রহণ করিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ্চ সার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলের এক বিরাট সভায় ভারতের ইতিহাসে প্রথম বার বড় লাটের উপর অনাস্থাজনক প্রস্তাব পাশ হয়। ভারত-সচিবের বঙ্গ-ভঙ্গে সম্মতির সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল, এবং ৩০শে আশ্বিন সন ১৩১২ তারিখে রাখিবন্ধন উৎসবে জনসঙ্ঘের অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল। বিলাতী সংবাদপত্রগুলিও বঙ্গভঙ্গের ভীষণ ফল দেখিয়া সরকারের নীতির নিন্দা

* লর্ড কর্জ্জনের বৃথা আস্ফালন।

করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরোজী সভাপতির অভিভাষণে স্বরাজের কথা উচ্চকণ্ঠে উল্লেখ করিলেন, তৎকালীন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যানের কথায় বলিলেন যে, "সু-শাসন কখনও স্বরাজের সমান হইতে পারে না।" সিপাহী-বিদ্রোহের পর প্রথমবার ভারত আবার অসন্তোষ ঘোষণা করিল। বঙ্গ ও মারাঠা তিলক ও অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক হইয়া ভারতবর্ষে নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিল। এ দিকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীরা ও গরমপন্থীরা পৃথক্ হইয়া গেলেন এবং পর-বৎসরের কংগ্রেস হইতে বক্তৃতা ও আবেদন-নিবেদনের জন্ম নরমপন্থীদের রাখিয়া, গরমপন্থীরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তরুণদল বাঙ্গালায় 'যুগান্তর' ও পুনায় 'কেশরীর' অনুপ্রেরণায় চরম বিদ্রোহের পথে গুপ্ত সমিতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নিয়মানুবর্ত্তী সুগঠিত দলের ভারতে ও ভারতের বাহিরে গুপ্তহত্যার কাষ এক বিলাতী রাষ্ট্রবিদের মতে প্রতিভাশালী উচ্চ যুবকদের * লইয়া ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল এবং তিলক ও বাঙ্গালার ৬ জন নেতাকে তাঁহারা নির্ব্বাসনে পাঠাইলেন।

ইহার পরেই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিণ্টোমর্লি শাসন-সংস্কার আইন বে-সরকারী সভ্যদের ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পথ খুলিয়াছিল; এক জন ভারতীয়কে বড় লাটের পরিচালনা পরিষদে (Executive Council) ঢুকিতে দেওয়া হইল এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে দুই জন ভারতীয়ের স্থান হইল। এই সামান্য, অনুদার সংস্কারে ভারতের জাতীয় দল মোটেই সন্তুষ্ট হইলেন না। স্যার ভালেণ্টাইন চিরলের কথায় মর্লি-সংস্কার শুধু ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে সামান্য নির্ব্বাচনের প্রথা দ্বারা প্রসারিত করে এবং তাহাদের শুধু মত প্রদানের (যাহা গ্রহণ করিতে সরকারের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না) ক্ষমতা রাখিয়াও যে আলোচনা কংগ্রেসেই শুধু হইত, তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন থামিল না, কারণ, স্বাধীনতার প্রেরণা সহজে নিভে না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মহা সমারোহে দরবার করিয়া সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে ভারতের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী করা হইল; উদ্দেশ্য—লোকের মনে রাজভক্তির উদ্রেক করা! কিন্তু দিল্লীর সমারোহের সময় অর্দ্ধাহারী ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের অনাহারে জর্জ্জরিত। সম্রাট্ বঙ্গভঙ্গ রদ করিলেন। আসাম প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন এবং বিদ্রোহের কেন্দ্র কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী সরাইয়া লইয়া গেলেন। গরমপন্থীদের ইহাতে কাষের জোর কমিল না। পরন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান নেতৃগণ মুসলীম লীগের প্রবর্ত্তন করিয়া কংগ্রেসের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ অনেককে খুসী করিয়াছিল, এবং মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হইল, তখন ভারত সৈনিকরাই ফ্রান্সে যুদ্ধের প্রথম অগ্নুদগার বুক পাতিয়া লইয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড (তখন স্যার) সিংহ মহাশয় সাম্রাজ্যের বিপদে ভারতকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বলিলেন, যেন অতঃপর ইংরাজের ধর্ম্মবুদ্ধি ভারতের ন্যায্য দাবী পুরণ করিতে পারে। বিপদের সময় মুসলমানদিগকে ইস্‌লামের ক্ষতিকর কিছু করা হইবে না—আশ্বাস দিয়া এবং ভারতকে অনেক আশার কথা বলিয়া, অন্য সমস্ত ইংরাজ উপনিবেশ বা প্রদেশের অপেক্ষা বেশী সৈন্য ও অর্থ ভারত হইতে ইংলণ্ড পাইয়াছিল; কিন্তু বিপদের পর ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই। এই সময় এক দল হিন্দু ও মুসলমান দেশপ্রেমিক আন্তর্জ্জাতিক গণ্ডগোলের সুবিধা লইয়া অন্য দেশের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সরকার সন্ধান পাইয়া নূতন আইনের সাহায্যে দোষী নির্দ্দোষ বহু দেশপ্রেমিককে নির্ব্বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী আস্‌কুইথ বলিলেন যে, "এখন হইতে ভারতীয় সমস্যাকে নূতন চোখে দেখিতে হইবে।" ইহাতে প্রথমে আশান্বিত হইলেও যখন "নূতন চোখে" সমস্যার সমাধানে কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তিলক তাঁহার "স্বরাজ" কাগজে এবং শ্রীমতী বেশেণ্ট তাঁহার "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজে স্বাধীনতা-যুদ্ধ আবার জোরে আরম্ভ করিতে বলিলেন। এই সময়ে "কোমাগাতা মারু" জাহাজে এক ক্যানাডাপ্রবাসী শিখদলের কয় জন ফিরিয়া আসিয়া বজবজে পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গায় হতাহত হয় এবং এই ঘটনায় ভারতকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। এক বৎসরের ভিতর শ্রীমতী বেশেণ্টের স্বায়ত্ত-শাসন সভার Home Rule League পঞ্চাশটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। যুদ্ধে আর এক দিকে ইংরাজ সজাগ হইয়া উঠেন,

* Sir Valentine Chirol

শিল্প কমিশন যুদ্ধের সময় ভারতের পাট ও অন্যান্য জিনিষ দিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগানর বাধ দেখিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে যে শিল্প বিদেশীরা ইচ্ছা করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা সরকারী চেষ্টায় বাঁচাইয়া তোলা দরকার; ইংলণ্ডও বুঝিতে পারে যে, ভারতের সামগ্রীর ব্যবহারের উপরই তাহার সাম্রাজ্যে শক্তির দৃঢ়তা নির্ভর করে এবং জাতীয় আন্দোলনের ফলে ভারত যেন শীঘ্র হাতছাড়া না হয়, তজ্জন্য ইংলণ্ড আর এক কিস্তি 'সংস্কার' দিয়া ভারতকে সুখী করিবার প্রয়াস পান।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ভারত-সচিব মণ্টেগু পার্লামেণ্টে বক্তৃতাতে বলেন যে, ভারতে ইংরাজশাসন-নীতি হইতেছে শুধু রাজ্য-শাসনের সকল বিভাগে ভারতীয়দের সুবিধা দেওয়া নহে, পরন্তু ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক অংশ হিসাবে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত-শাসনে শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে স্বরাট্-শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি নিজে ভারতে আসিয়া বড় লাট চেমস্‌ফোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া এক রিপোর্ট দাখিল করেন, তাঁহাদের প্রস্তাবমত আইন পার্লামেণ্টে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে যখন উপস্থিত করা হয়, তখন শ্রীমতী বেশেণ্ট বলেন যে, "ভারতের জন্য চিরন্তন দাসত্ব শুধু বিদ্রোহেই যাহার অবসান সম্ভব" এমন ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাতী পার্লামেণ্টের দুই সভার দ্বারা অদল-বদলের পর আইন হইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এক "দ্বৈ ইয়ার্কি" বা দ্বৈরাজ্য-শাসন আনিয়া দিল, তাহাতে প্রদেশগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জিলা বোর্ড ইউনিয়নে তদ্বির প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু অর্থ বিষয়ে এক দল সরকারী ও সরকার-মনোনীত সদস্যের ভোটের দড়া-দড়ী দিয়া এই মন্ত্রীদিগকে এমন ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যেন তাঁহারা সরকারের হুকুম তামিল ছাড়া বেশী নড়া-চড়া না করিতে পারেন। যদিও মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট বিশদভাবে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিষফলের কথা বলিয়াছেন, তবুও নূতন আইনে ঐ বিষই ভারতের দেহে ছড়ান হইয়াছে। ইহার ফলে গত কয়েক বৎসরে এক দল স্বার্থান্ধ চাকুরী-মোহাচ্ছন্ন লোক বিদ্বেষ-বহ্নি ছড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি করিয়া ভারতকে হীন করিয়াছে। নূতন সংস্কার আইন কাউন্সিল অব ষ্টেট, লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লি ও চেম্বার অব প্রিন্সেস নামে যে তিন সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানে সরকার গলাবাজির সুবিধাই দিয়াছেন; কারণ, যখনই এই সভাগুলির প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের সুবিধাজনক হয় নাই, তখনই বড় লাট তাহা এক কলমের খোঁচায় রদ করিয়া দিয়াছেন। আর বৃটিশ ভারতের ২৫ কোটি লোকের ভিতর মাত্র ৭৪ লক্ষ লোক প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা পাইয়াছেন। এই আইন পাসের সঙ্গে সরকার রাউলাট কমিটী নামক বিদ্রোহ তদন্তের এক কমিটীর প্রস্তাবমত দুইটা আইন করেন, যাহাতে বিনা বিচারে গবর্ণমেণ্ট যাহাকে ইচ্ছা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (interned) আটক করিয়া রাখিতে পারেন। মহাত্মা গন্ধী এই সময় তাঁহার সত্যাগ্রহ মন্ত্র লইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় অপূর্ব্ব শক্তি দেখাইয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এই দীক্ষা লইবার দিন ধার্য্য হয় এবং রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার জন্য শিখ উৎসবের দিনে আহুত জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত এক নিরস্ত্র জনসঙ্ঘকে ইংরাজের এক জন সেনাপতি জেনারেল ডায়ার ভাল লক্ষ্যস্থল মনে করিয়া গুলী করিয়া নৃশংসভাবে (সরকারী হিসাবে) ৩ শত ৭৯ জনকে খুন এবং ১ হাজার ২ শত জনকে জখম করেন! শুধু তাহাই নহে, তাহাদের কোন ডাক্তারের সাহায্য দিবার দরকারও মনে করেন নাই। তাহার পর পঞ্জাবের নর-নারীর উপর যে অনাচার আচরণ করা হয়, তাহা ভারত কখনও ভুলিতে পারিবে না। সরকারের তদন্ত সমিতি অবশ্য ডায়ারের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এক মানহানির মোকদ্দমায় (Tilak Vs. Chirol) এক বিলাতী জজ ডায়ারকে সমর্থন করেন, যদিও বৃটিশ মন্ত্রিসভা আবার তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করেন। কিন্তু যে অপমান ও অনাচার পঞ্জাব হইয়াছিল, তাহার প্রতীকার কখনও হয় নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগ, ঠুনকা শাসন-সংস্কারের পুতুলবাজী এবং খালিফতের উপর অত্যাচার ভারতকে আবার মহাত্মার নেতৃত্বে স্বরাজের জন্য পাগল করিয়া তোলে। ইংরাজের আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং কাপড় বর্জ্জন ও স্বদেশী চরকা-মন্ত্র গ্রহণ এই চারি মন্ত্র লইয়া মহাত্মা গন্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং লালা লজপত রায় প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত অসহযোগ ভারতে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করিল যে, সরকার এক গোল-বৈঠক ডাকিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু নেতারা তাহা গ্রহণ না করিয়া আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করিবার জন্য যখন দেশকে তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় মহাত্মা গন্ধী চৌরিচৌরার দাঙ্গার সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া বার্দ্দোলী

আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধের প্রথম প্রচেষ্টাকে বন্ধ করিয়া দেন। কিছু কাল পরেই তাঁহাকে ৬ বৎসরের জন্য জেলে পাঠানো হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ছোট বড় বহু চেলা সরকারের দণ্ডনীতির কল্যাণে তাঁহার পূর্ব্বেই বন্দী হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাজভ্রাতা ডিউক অব কনট যখন দিল্লীর তিন সভার দ্বারোদ্ঘাটন করেন, তখন দিল্লীর পথ জনহীন এবং বহু দিল্লীবাসী ৬ মাইল দূরে মহাত্মার বাণী শুনিতেছে। নির্জ্জন রাজধানীতে রাজপিতৃব্য তাঁহার বক্তৃতা সমাপন করেন। তৎপরে ইংরাজ যুবরাজ এ দেশে জনগণের অভ্যর্থনা না পাইয়াই ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রথম তিন বৎসর কোন অসহযোগী সংস্কারদত্ত সভাগুলিতে যান নাই। এক দল স্বার্থান্ধ অথচ অদূরদর্শী লোক লইয়া যন্ত্রের মত এই সভাগুলি সরকারের কথামত এই কয় বৎসর চালিত হয়, কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত নেহেরু গভর্ণমেণ্টের সভাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিরত বাধা প্রদান ও বাহিরে দেশকে স্বরাজ অভিযানের জন্য প্রস্তুত করার প্রস্তাব লইয়া কংগ্রেসকে স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপদ্ধতিতে রাজী করাইয়া লন। দেশ উৎসাহের সহিত তাঁহাদের কথামত কায করে এবং এসেম্ব্লী ও বিশেষতঃ বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সরকার, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধে বার বার হারিয়া গিয়া দেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মতের বিরুদ্ধে আপনার মত বহাল রাখিয়া সংস্কারের অলীকতা দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মুডিম্যান সংস্কার তদন্ত কমিটীতে যে সব মন্ত্রীরা লোকমতের বিরুদ্ধে সংস্কার-শাসনে কায করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, শুধু যে মেকী সংস্কারের ব্যবস্থায় কোন কায অসম্ভব, তাহা নহে, সরকার স্বায়ত্ত-শাসন দিবার নাম করিয়া নিজ হাতে আরও বেশী ক্ষমতা লইয়াছেন; কেন না, সাধারণতঃ গভর্ণররা তাঁহাদের পরিচালন সভা (Executive Comittee)র মতের বিরুদ্ধে কায করিতে পারেন না, কিন্তু এক কলমের খোঁচায় তাঁহারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারীদের মত কায করিবার ক্ষমতা সংস্কার আইন অনুসারে পাইয়াছেন। স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস হইতে, কংগ্রেস আবার জোরে দেশে তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতেছে এবং কিছুকাল হইল, বার্দ্দোলী তালুকে আবার ট্যাক্স অনাদায়ের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে অনেকবার অনেক উপায়ে বন্ধুত্ব রক্ষার সুবিধা দিয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডের নির্ব্বুদ্ধিতা ও দণ্ডনীতি ভারতের বন্ধুভাব হরণ করিয়া লইয়াছে। বিশেষ করিয়া সরকার বিনা বিচারে বাঙ্গালার প্রায় ২ শত স্বদেশ-প্রেমিককে আটক করিয়া রাখিয়া, তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া দিয়া গত কয়েক বৎসরে ভারতের ঘরে ঘরে এবং যুবকদের ভিতর যে বিতৃষ্ণা জাগাইয়া দিয়াছেন, সে আগুন সহজে নিভিবে না, এবং এই বহ্নি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক দিন প্রলয় ডাকিয়া আনিতে পারে।

কংগ্রেসের মতে, ইংলণ্ড মুখে "রাজ্যশাসনের সকল বিভাগে ভারতীয়দের সুবিধা প্রদানের" কথা বলে, আর সেনাদলে, নৌবহরে এবং রেলওয়ে বোর্ডে ভারতীয়দের কোন যায়গা দেয় না; মূলে তাহার সাম্রাজ্যের একত্ব ও সাম্রাজ্য-প্রস্তুত জিনিষের আদরের প্রস্তাব, আর কাযে সাম্রাজ্যের বহু অংশে, এমন কি, বিলাতেই বহু অংশে ভারত-সন্তানদের অপমান চলে। সাম্প্রদায়িক কলহের মূলে জাতীয় নেতারা সভা ও আলোচনা দ্বারা কুঠারাঘাতের চেষ্টা না করিলে ভারত এত দিনে শ্মশানে পরিণত হইতে অগ্রসর হইত; কংগ্রেসদল আরও বলেন, ইংলণ্ড ভারতকে দারিদ্র্যের চরমে লইয়া আসিয়াছে এবং বিদেশের সহিত ব্যবসায়ের দেনা-পাওনার হিসাবে বিলাতের ব্যবসায়ের সুবিধাজনক নিয়ম ও ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ড ভারতকে শোষণ করিবার নব নব উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত আছে; আর ইহার উপরে সে দিন সাত জন পার্লামেণ্টের শ্বেতচর্ম্ম সভ্যকে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা বিচার করিতে পাঠাইয়া ভারতকে যে অপমান করিয়াছে—এই সকলের বিরুদ্ধে ভারতের সর্ব্বদল কংগ্রেসের পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু যে এই কমিশন কংগ্রেস চাহে না, তাহা নহে, কংগ্রেস ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্য আর ইংরাজ সৈন্যদল ভারতে রাখিতে চাহে না; ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য ইংরাজের শাসন ও ইংরাজবণিকের শোষণ চায় না; দাস-তৈয়ারীর কলস্বরূপ শিক্ষা চাহে না। কংগ্রেস ইংরাজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য গোরা সৈন্যের পিছনে বার্ষিক ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চাহে না; যে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ইংরাজ এঞ্জিনিয়ার *

* Sir William Willcocks at the British Indian Association on 7th March, 1928.

বলিতে বাধ্য হন যে, গবর্ণমেণ্ট দায়িত্বজ্ঞানশূন্য কায করিয়া অসংলগ্ন ব্যবস্থার দ্বারা ম্যালেরিয়া ও মৃত্যুতে দেশকে ছারখার করিয়া দিতেছে, সে জলসেচের জন্য ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চায় না এবং যে রেলওয়ে নীতির ফলে ভারতকে অনাহারী করিয়া ভারতের সামগ্রী বিদেশে সহজে যাইতে পারে এবং বহু শ্বেতাঙ্গ ভারতের অন্নে পুষ্ট হইয়া ভারতীয় যাত্রীর অপমান এবং ভারতীয় ব্যবসায়ের ক্ষতিসাধন করিতে পারে, সেই রেলের পিছনে কংগ্রেস ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চাহে না; যে জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) সভার শতকরা ৬ শত ৬০ খরচ দিয়াও নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা পায় নাই এবং ইংলণ্ডের অর্দ্ধেক খাজনা দিয়াও লীগের আফিসে—যেখানে ইংলণ্ড ইংরাজের জন্য ২ শত ১৭টি চাকুরী আদায় করিয়াছে ও ভারতীয়দের জন্য মাত্র ২টি পাইয়াছে, কংগ্রেস ভারতকে সে জাতি-সঙ্ঘের সভ্য হইতে দিতে চাহে না; এক কথায়—জাগ্রত ভারত স্বরাজ চাহিতেছে। তাই গত মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯২৭) সঙ্কল্প করিয়াছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতালাভই ভারতের লক্ষ্য।

কংগ্রেস যে ইংলণ্ডকে ভুল সংশোধনের কত সুবিধা দিয়াও অবশেষে ইহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও রাজনৈতিক শুভদর্শিতা সম্বন্ধে নিরাশ হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের বর্ত্তমান আকার-বিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস যে উদ্দেশ্যকে কংগ্রেসের বলিয়া নির্দ্ধারিত করে, তাহা এই—"যে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্য হইতেছে, ভারতীয়দের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনপ্রাপ্ত প্রদেশগুলির ন্যায় শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয়দের সুবিধা ও দায়িত্বে সেই প্রদেশগুলির সমান অধিকার ভোগ, এই উদ্দেশ্য আইনসঙ্গতমতে বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রের ক্রমিক সংস্কারসাধন করাইয়া জাতীয় একত্বসাধন করিয়া গণবুদ্ধি প্রবোধিত করিয়া এবং দেশের মানসিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া, সফল করিতে হইবে;" ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আরও সংক্ষেপে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য "ভারতবাসী দ্বারা সকল বৈধ এবং শান্তি-সঙ্গত উপায় স্বরাজলাভ বলিয়া" মানিয়া লন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস বলিয়াছেন যে, "পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতালাভই ভারতবাসীর উদ্দেশ্য।"

আজ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সকল দল সাইমন কমিশন বর্জ্জনের উপলক্ষে একত্র হইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অধিনায়কত্বে সর্ব্বদল-সম্মেলন (মে, ১৯২৮) লক্ষ্ণৌতে ভারতের ন্যূনতম দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। জগতের সকল ন্যায়শক্তি এই স্বাধীনতা-সমরে ভারতের চতুর্দ্দিকে একত্র হউক, যেন স্বাধীন ভারত দৃপ্তভাবে শীঘ্রই তাহার বাণী জগৎ-সভায় প্রচার করিতে সমর্থ হয়।

স্বামী অভেদানন্দ।

লালে লাল

আজ পুণ্য নিধুবনে ফাল্গুনের পূর্ণিমায়
প্রেমানন্দ অনুরাগে দিক্ দেশ ভেসে যায়।
আবির-কুঙ্কুম-ভারে আজ মধু নিধুবন,
লালে লাল হইয়াছে—লালে লাল বৃন্দাবন।

লাল পাখী, লাল শাখী, লাল ভৃঙ্গ লাল ফুল,
লালে লাল শ্রীযমুনা, লাল পথ লাল ধূল।
আকাশ হয়েছে লাল—আজ কোথা' কৃষ্ণ নাই,
শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে কোথা আজ কৃষ্ণ পাই!

স্থাবর জঙ্গম আজ হইয়াছে লালে লাল,
কেমনে রহিবে কাল শ্রীরাধার নন্দলাল!
লীলাময় লীলারাগে কভু কৃষ্ণ কভু কালী,
কভু লাল হেমকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বনমালী।

হৃদি-বৃন্দাবন মোর অনুরাগে হও লাল,
দেখিবে সেথায় লাল শ্রীরাধা ও শ্রীগোপাল।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

বাঙ্গালার হাল

সেই অফুরন্ত হাসি, সে আনন্দ রাশি রাশি,
বাঙ্গলার পল্লীবাসী হারিয়েছে সব।
পাল্-পার্ব্বণের ঘটা, আনন্দ-উৎসবচ্ছটা,
ঘরে ঘরে নাই আর,—সকলি নীরব॥

উদরে অশন নাই, পরণে বসন নাই,
পরাণে পরাণ নাই বাঙ্গালীর আর।
নয়নে ভাসিছে ত্রাস, দিবানিশি হা-হুতাশ,
স্ত্রী-পুরুষ—সবলের মুখে হাহাকার॥

কচি শিশু নিয়ে কোলে, জননী চোখের জলে,
ভাসিতেছে,—মিলে না'ক এক ফোঁটা দুধ।
গোয়ালেতে গরু নাই, ভাঁড়ারে তণ্ডুল নাই,
পড়শীর বাড়ী ধার মেলে না'ক সুদ॥

বাস্তুভিটা চিরতরে, ছাড়ি দেশ-দেশান্তরে,
প্রতিবেশিগণ গেছে অন্বেষিতে সুখ।
যার কিছু টাকা আছে, থাকে না সে মা'র কাছে,
খালি প'ড়ে আছে পল্লী-জননীর বুক॥

কোনমতে অর্দ্ধাশনে, থাকিয়াও ক্ষুন্ন-মনে,
সহরে সাজিয়া মোরা "সভ্য-ভব্য বাবু"।
দেশ-উদ্ধারের ব্রতে, উঠেছি সকলে মেতে,
বুক পোড়ে ক্ষুধানলে, মুখে নহে কাবু॥

এ দিকে বাংলার হাল, দিনে দিনে নাজেহাল,
জল বিনে ছাতি ফাটে বাঙ্গালীর হায়।
বিল-খাল নদী যত, রেলের কৃপায় গত,
যা ছিল বা বাকি, গেলো কচুরি-পানায়॥

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, হাতে ধ'রে দেবে চাঁদ,
রিফর্ম্ম-কৌটায় পুরে ইংরাজ আমায়—"
এই আশে আসে-পাশে, ঘুরিতেছি নানা বেশে,
কেহ বিভীষণ কেহ শকুনির প্রায়॥

ইলেক্‌সন-পূর্ব্বে কত, খৈ ফোটে অবিরত,
বক্তৃতায় ভোটারের কাণ ঝালা-পালা।
আগে যত গলাগলি, পরে তত ঢলাঢলি,
চৌষট্টি হাজার লোভে অনেকে উতালা॥

"হই যদি 'মিনিষ্টার', নাহি তাহে 'সিনিষ্টার
মোটিভ' আমার কিছু, শুধু দেশ-সেবা।
একমাত্র লক্ষ্য মোর, দেশ-প্রেমে হয়ে ভোর—
সব খেলা ছেড়ে এবে খেলিতেছি দাবা॥"

মুখে বড় বড় বোল্, "দেবো আমি দেবো জল,
যদি পাই মিনিষ্টারি হাতে একবার।
কৃষক আমার প্রাণ, কৃষকের তরে প্রাণ,
দিতে হয় দেবো,—ভোট দাও গো এবার॥"

বলিহারি ইংরাজ, এই ত তোমার কায,
যত ইচ্ছা টানো ডুরি,—নাচাও নাচাও।
চার কোটি লোক নিয়ে, এক খণ্ড মাংস দিয়ে,—
নিমেষে হাসাও তুমি নিমেষে কাঁদাও॥

কে ভাবে পল্লীর কথা, পল্লী-জননীর ব্যথা,
ধামা চাপা দিয়ে চায় দেশের কল্যাণ।
বিরাট দেশের তরে, সতত নয়ন ঝরে,
থাকে থাক্ যায় যাক্ পল্লীর প্রাণ॥

দেশের তরুণ যারা, নবভাবে মাতোয়ারা,
পল্লী মা'র পানে তারা ফিরি ফিরি চায়।
তারাই এগিয়ে গিয়ে, মা'র পদধূলি নিয়ে,
মুমূর্ষু বাঙ্গালী-প্রাণে সু-আশা জাগায়॥

এখনো বাঁচিয়া কত, পুত্র মা'র শত শত,
হায় রে চাঁদের মত বিরাজে বিদেশে।
ভ্রমেও ভাবে না তারা, কাঁদে ঐ পুত্রহারা,
অনাথিনী পল্লী-মাতা ভিখারিণী বেশে॥

জঙ্গলে ঘিরেছে গ্রাম, ঘাট-বাট, শূন্যধাম,
পড়ি আছে—অন্ধকার, কে নেহারে তায়।
আছে যা দু'চার জন, পল্লীকোলে পুত্রগণ,
জীর্ণ-শীর্ণ তারা রোগ-শোক-দুর্দ্দশায়॥

গোধূলি বেলায় আর, হাম্বা রবে চারিধার,
মুখর করিয়া গৃহে ফেরে না গোধন।
মরে ছেড়ে গেছে কত, যা আছে তা হয় হত,
প্রতিদিন শত শত কে করে গণন॥

গোচর নাহি রে আর, পেয়েছে তা জমীদার,
হিন্দু সেজে অ-হিন্দুর মত ব্যবহার।
সহরে গোয়ালা যারা, হিন্দু মতে করে তারা,
অবাধ গোমেধ-যজ্ঞ দিনে চার বার॥

টাকায় দু'সের দরে, উকীল-এটর্ণি-ঘরে,
দেয় তারা খাঁটি দুধ, চাকুরের দল।
মাটা-তোলা সাদা জলে, সুখে খায় দুধ ব'লে,
বলিহারি যাই তোরে সহরের কল॥

অভাব লাগিয়া আছে, সহরে বাবুর পাছে,
নিত্য নব নব রোগ নব নব জ্বালা।
অজীর্ণ উদরাময়ে, বসন্তে দারুণ ক্ষয়ে,
বঙ্গবাসি-জীবনের সাঙ্গ হলো খেলা॥

আরো কত উপ-রোগে, সহরবাসীরা ভোগে,
কে করিবে সংখ্যা তার,—নাহি লেখা-জোখা।
তবুও কি ঘুম-ঘোরে, সহরে পাচয়া মরে,
পেটে নাই অন্ন মুখে বোল চোখা চোখা॥

দিনে দিনে শত শত, ডাক্তার বাড়িছে যত,
বাড়িতেছে 'ফিস্' তত, নাহি তার শেষ।
কাল যার ছিল চা'র, আজ চার গুণ তার,
কাল আরো চার গুণ, তা-ও নহে 'বেশ'।

রাত্তিরে চৌষট্টি হাঁকে, মোটরগাড়ীর ডাকে,—
গরীব রোগীর হয় ওষ্ঠাগত প্রাণ।
এক দিকে যমে ধ'রে, যত টানাটানি করে,
অন্য দিকে ডাক্তারেরা তত মারে টান॥

হায় রে রোগীর বন্ধু, কোথা তুমি 'জগবন্ধু',
'মহেন্দ্র', 'দয়াল-সোম' সে 'ইন্দু-মাধব'।
ধন্বন্তরি সম সেই, 'ব্রজেন্দ্র' 'অমূল্য' কৈ?
সে 'বিপিন চট্টো' কৈ দীনের বান্ধব?

কোথা সে ভিষগবর, যশোরের 'গঙ্গাধর',
'শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ', 'গোপী', 'দ্বারিক', 'বিজয়'।
পরহিতপ্রাণ সেই, 'যামিনীভূষণ' কৈ,
পঞ্চানন সম 'পঞ্চাননের' তনয়?

কলিকাতাবাসী যারা, দীনহীন রোগী তারা,
তোমাদের হয়ে হারা,—দেখে অন্ধকার।
ষোল টাকা 'ইন্‌জেক্‌সন' যাচে, এতে কি 'নেশন',
বচনে স্বদেশী, কার্য্যে এ কি ব্যবহার!

হায় রে দেশের হাল, দশ টাকা মণ চা'ল,
ইথে কি বজায় 'চাল' রাখা চলে আর?
ঘির নামে চর্ব্বি খায়, নির্ব্বিচারে সম্প্রদায়,
সমাজ তখন কিন্তু ঘোর নির্ব্বিকার!

'কোকোজেম', 'ভেজিটিন্',নামে লাখে লাখে টিন,
সহরে ও পাড়াগাঁয়ে সমান বিকায়।
ছাড়ি' কসাইয়ের হাত, বাঁচিল গোঁসাই জাত,
'ভেয়াগি' আমিষ ঘৃত নিরামিষ খায়॥

বাড়ীভাড়া দুধ আর, সিনেমা ও ডাক্তার,
হায় রে শুষিয়া লয় বাবুদের 'পার্শ'।
পুকুর হইলে কাসি, লক্ষ্মী আসি হাসি হাসি,
অমনি অর্ডার' দেন পাশ-করা 'নার্শ'॥

বাঙ্গালার অন্নপূর্ণা, কোথায় লুকালি ও মা!
উড়ে আসি কেড়ে নিল অন্নদা-আসন।
কি পাপে কি অভিশাপে, বল্ কোন্ মনস্তাপে,
জগদ্ধাত্রী মা আমার হলি অদর্শন॥

আবার বাঙ্গালী-ঘরে, বরাভয় লয়ে করে,
আয় গো মা আয় ফিরে গৃহদেবীরূপে!
তুই মা দাঁড়ালে আসি', আবার ফুটিবে হাসি,
নতুবা যে ডোবে বঙ্গ চির-অন্ধকূপে॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

৺কেদার-বদরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জোষীমঠ হইতে ৺বদরীধাম—১৯ মাইল

১৭শ দিন—৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০এ মে, রবিবার

বৈকালে ৪।১৫ মিঃ জোষীমঠ হইতে রওনা,
সন্ধ্যা ৭টায় ঘাট চটী (৬ মাইল) রাত্রিযাপন।

বৈকালে ৪।১৫ মিনিটে জোষীমঠ হইতে নূতন উদ্যমে রওনা হওয়া গেল—কেন না, আর ১৯।২০ মাইল গেলেই লক্ষ্যস্থলে পৌছিব, কল্য নাগাইদ সন্ধ্যা ৺বদরীধামে না পৌছিতে পারিলেও পরশ্ব পূর্ব্বাহ্ণে পৌছিব—খুবই ভরসা হইল। পূর্ব্ববারে বলিয়াছি, যাত্রাকালে দুইবার বাধা পড়িল, ছেলেদের তাগিদে পুনর্যাত্রার অবকাশ পাইলাম না। ভবিষ্যতে ইহার ফল ফলিয়াছিল, সে কথা যথাস্থানে বলিব।

জোষীমঠে প্রবেশ করিবার সময় নাগারা পড়িয়াছিল, আবার বাহির হইবার সময় পড়িল—তিন জায়গায়। জোষীমঠ ছাড়াইয়াই পথ উতরাই ও খারাপ। উতরাই নামিবার সময় দেখিলাম, অনেকগুলি ঝরণা, সুতরাং ভূমি সরস ও উর্ব্বরা, নীচে অনেকখানি জমিতে ফসল হইয়াছে। ২ মাইল পরে বিষ্ণুপ্রয়াগ, উত্তরাখণ্ডের পঞ্চপ্রয়াগের তৃতীয়। (পূর্ব্বে দেবপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া গিয়াছে; ৺বদরীধাম হইতে চমৌলি হইয়া নূতন পথে ফিরিবার সময় বাকী দুইটি প্রয়াগ—কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ—দর্শন হইবে।) এখানে অলকনন্দা ও (বিষ্ণুগঙ্গা বা) ধবলীগঙ্গার সঙ্গম। সঙ্গম সুস্পষ্ট, বিষ্ণুগঙ্গার একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি, স্রোতোবেগ ও গর্জ্জন প্রবল। দেবপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগ অপেক্ষাও ভীষণ, জলের তোড়ে ঝুলান লৌহসেতু কাঁপিতেছিল; ডাণ্ডী পার করিতে সেতুর শেষপ্রান্তে মোড় ঘুরিতে বাধিয়া গেল, অনেক কৌশলে বাহির হইল; এ সব সাঁকোর উপর হাঁটিয়া যাওয়াই নিরাপদ। পারের পূর্ব্বে এক স্থানে পাহাড় যেন মাথার উপর পড়িতেছে; বিষ্ণুপ্রয়াগের সন্নিকটে অশ্বত্থ ও অন্যান্য বড় বড় বৃক্ষ আছে। ডাণ্ডী হইতে নামিয়া নদীকূলে একটু বিশ্রাম ও (নারায়ণ) দেব-দর্শন হইল, কিন্তু অবেলা বলিয়া সঙ্কল্প-স্নান ও অন্যান্য তীর্থকৃত্য হইল না। ফিরিবার সময় হইবে বলিয়া মনকে ও ঘাটের পুরোহিতকে আশা দিলাম। (সে আশা কিন্তু পূর্ণ হয় নাই। যাক্, সে পরের কথা পরে বলিব।)

ইহার পর এক স্থানে একটি চটী ছিল, কিন্তু এখন উঠিয়া গিয়াছে, কেন জানি না। তাহার নিকট একটি চমৎকার জলপ্রপাত; ধোঁয়ার মত, ধোনা তুলার মত, চূর্ণ মুক্তার মত জল অবিশ্রান্ত ঝরিতেছে, যতক্ষণ দেখা গেল, ডাণ্ডী হইতে ঘাড় ফিরাইয়া এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গেলাম; বিষ্ণুপ্রয়াগ ছাড়াইয়া এই অবস্থায় সে দিকে মুখ ফিরাইতে গিয়া আর একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম, অমলধবল পর্ব্বতচূড়া, যেন একখানি আঁকা ছবি। দুঃখের বিষয়, ইহা পিছনে পড়িয়া থাকিল। শুনিলাম, এই পর্ব্বতেরই সানুদেশে জোষীমঠ প্রতিষ্ঠিত। ইহার পর খানিক পথ নেড়া পাহাড়, আবার এক এক স্থানে সতেজ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ। এক স্থানে বেমেরামত ভাঙ্গা রাস্তা, তবে ডাণ্ডী হইতে নামিতে হইল না; এবার রাস্তা বড় সঙ্কীর্ণ, এক এক স্থানে চীর গাছ আছে। ভয়াবহ পাহাড়, ডাহিনে গভীর খদ, সে দিকে আল্‌সে গাঁথা। পথ উতরাই বেশী, কোথাও চড়াই, সমতলও আছে। এই পথে কুষ্টিয়ার এক জন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। সন্ধ্যা ৭টায় ঘাট চটী পৌছিলাম (৬ মাইল); সন্ধ্যা হইলেও তখনও বেশ আলো ছিল। চটীটি নিতান্ত (wretched) 'রতো' গোছের; তবে উপায় নাই, আর অগ্রসর হওয়া চলে না। এখানে খুব হাওয়া ও বেশ শীত, তবে চোপতার তুলনায় খুবই কম। ঝরণা নাই, কিন্তু স্বয়ং অলকনন্দা আছেন, এবং বেশী নীচেও নহে। জোষীমঠের যেমন দুই অংশ দেখিয়াছিলাম, এখানেও তেমনি চটীটি দুই অংশে বিভক্ত—মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান। ৺কেদারধামের পথে রামপুর ও রামবাড়া দুই স্থানে কম্বল ভাড়া পাওয়া যায় বলিয়াছি (পৌষ-সংখ্যা ৩৯৮ পৃঃ), এ পথেও ঘাট চটী ও পরে হনুমান্ চটীতে পাওয়া যায়। এখানে ৺বদরীধামের ফেরত কয়েকজন বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলাম।

১৮-শ দিন—৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১এ মে, সোমবার

প্রাতঃ ৫৷৹টায় ঘাট চটী হইতে রওনা, বেলা ১০টায় হনুমান্ চটী (৮ মাইল)—মধ্যাহ্ন তথা রাত্রিযাপন।

কল্য সারারাত বেশ শীত ছিল, অদ্য প্রাতঃকালে আরও বাড়িল; রীতিমত ধড়াচূড়া পরিয়া এবার বাহির হইতে হইল,

সুতরাং সাজগোজ করিতে একটু (৫৷৽টা) বিলম্ব হইল। পথে দুই জন এঞ্জিনিয়ার সাহেব দেখিলাম, (এ স্থানেও সাহেব!) বীরদর্পে পাদচারী, কিন্তু সঙ্গে ঘোড়া ও সহিস মোতায়েন। দুই মাইল গিয়া (পথ সমতল) পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছিলাম; স্থানটি বেশ বড় একটি গ্রাম; অনেকগুলি দোকান এবং ধর্ম্মশালা, দাতব্য ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে। নিম্নে অলকনন্দা, আবার কয়েকটি ঝরণাও আছে। একটিতে ট্যাপ লাগান। এখানে নামিয়া ৺যোগবদরী দর্শন করিলাম, ইনি পঞ্চবদরীর অন্যতম। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একখানি তাম্রশাসন আছে, মন্দির-মধ্যেও নাকি তাম্রশাসন আছে, অস্পষ্ট আলোকে লক্ষ্য করি নাই। (প্রত্নতত্ত্ববিশারদদিগের গবেষণার বস্তু; পদ্মনাথ বাবু ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন)। পথে অনেক স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের, দ্রৌপদীর, কুন্তীর মূর্ত্তি দেখিয়াছি (যথা গুপ্তকাশীতে, জোষীমঠে), এবার খোদ পাণ্ডুরাজার পালা; মূর্ত্তি না থাকিলেও তাঁহার স্মৃতির সহিত স্থানটি জড়িত। পাণ্ডুরাজার তপস্যার স্থান, পঞ্চপাণ্ডবের জন্মস্থান, মৃগরূপী মুনি-কর্ত্তৃক পাণ্ডুরাজাকে অভিশাপ-প্রদানের স্থান ইত্যাদি প্রসিদ্ধি। তাঁহারই নামে স্থানের নাম।

দ্বাপরের ব্যাপার ছাড়িয়া একটু কলির তথা কলিকাতার কথাও বলি। ৺কেদারধামের পথে স্যর ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ উমাপ্রসাদকে দেখিয়াছিলাম, এখানে তাঁহার তীর্থ-সঙ্গী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিলাম। ৺আশুবাবুর পত্নী পুত্র প্রভৃতি ৺বদরীধামে ত্রিরাত্র বাস করিয়া এখানে ফিরিবেন, ইনি এক রাত্রি থাকিয়াই সস্ত্রীক ফিরিয়াছেন। (হনুমান্ চটীর কাছাকাছি তাঁহাদিগকেও পরে দেখিয়াছি)। ইনি এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ৺সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। আমার পুত্রের সহিত একটু দূর-কুটুম্বিতা আছে। সেই সূত্রে প্রথমে পুত্রের সহিত, পরে আমার সহিত আলাপ হইল। এরূপ দূর ও দুর্গম প্রদেশে বাঙ্গালীর মুখ দেখা, তাহার উপর দূর আত্মীয় হইলেও তৎসূত্রে পরিচয় উভয়েরই আনন্দের বিষয়।

পাণ্ডুকেশ্বরের নিকটে অনেক গাছপালা আছে। ৺কেদারধামের পথের এক স্থানে যেমন শাদা শাদা ফুলের শোভা দেখিয়াছিলাম, এখানেও কতকটা সেই প্রকার আছে। তাহার পর পাণ্ডুকেশ্বর ছাড়াইয়া গাছপালার আরও শ্রীবৃদ্ধি, ক্রমে বড় বড় গাছ, অবশেষে রীতিমত জঙ্গল। নয়নাভিরাম দৃশ্য বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ বিপজ্জনক পথ আরম্ভ হইতেও বিলম্ব নাই। প্রথমে এক স্থানে খানিকটা বরফ পার হইলাম, ডাণ্ডী চড়িয়াই। সম্মুখে শাদা পাহাড় দেখিলাম, সূর্য্যকিরণও তাহার উপর পড়িয়াছে, কিন্তু এ স্থানে তাহার বাহার বিশেষ খোলে নাই, কেন জানি না। জামগাছের মত একরকম বড় বড় গাছে অজস্র শাদা ফুল ফুটিয়া আছে, ৺বদরীনারায়ণের উদ্দেশে প্রকৃতি-দেবীর নীরবে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান। অলকনন্দা পার্শ্বে ও নিকটে ছিলেন, এখন ক্রমেই নিম্নে পড়িতেছেন। পাণ্ডুকেশ্বরের এক মাইল পরে ও আরও পরে দুইটি ছোট ছোট চটী ছাড়াইয়া গেলাম। শেষধারা ও শেষনাগ এইখানেই কোথায়, দেখা হয় নাই। আর দুই মাইল দূরে লামবগড় চটী—এখানে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। প্রশস্ত একটা ঝরণার জল অলকনন্দায় পড়িতেছে। ইহার কাছে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তাহার পর বড় একটা গাছপালা নাই। এক স্থানে ভাঙ্গা রাস্তায় হাঁটিয়া যাইতে হইল—ভাগ্যে বরফে আবৃত নহে। তাহার পর ঝরণার উপর কাঠ-পাথর দিয়া কায-চলা গোছের (makeshift) পুল করিয়া দিয়াছে, তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইলাম। পাশেই পাকা পুল প্রস্তুত হইতেছে। এইখানে আবার একটি জলপ্রপাত (cataract) দেখিলাম। (পদ্মনাথ বাবুর পুস্তকে ৫৮ পৃঃ ইহার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে)।

ফলতঃ এইবার ভাঙ্গা দুর্গম পথ আরম্ভ হইল। 'কঠিন কেদার' নামটাই খুব শুনা যায়, কিন্তু ৺বদরীধামের এই পথটুকুও বড় কম যান না। শীতও বেশ বাড়িতে লাগিল। এক স্থানে পথ সারাইতেছে, ডাণ্ডী হইতে নামিয়া খানিক হাঁটিতে হইল; তাহার পরই আবার ভাঙ্গা রাস্তা, ডাল-পালা ও পাথর দিয়া যোড়া-তাড়া দেওয়া, কোনও প্রকারে বেহারাদের হাত ধরিয়া পার হইতে হইল। ঝরণার উপরও এই রকম ডাল-পালা ও পাথর দিয়া পুল করিয়া দিয়াছে, পার হওয়া বেশ একটু বিপজ্জনক। এইরূপ দুইটা পুল পার হইতে হইল—অবশ্য পায়ে হাঁটিয়া। ৪।৫ জায়গায় বরফ পার হইতে হইল, কোথাও হাঁটিয়া, কোথাও ডাণ্ডীতে চড়িয়া; কিন্তু ডাণ্ডীতে চড়িলেই আরও আতঙ্ক বেশী, পাছে বেহারাদের পা হড়কাইয়া যায়। আশে-পাশেও বরফক্ষেত্র। ৺কেদারধামের কাছাকাছি যেমন শীতবস্ত্র ও কম্বল

জড়াইয়াছিলাম, এবারও সেইরূপ করা গিয়াছে, তথাপি শীত-নিবারণ হয় না, কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে, 'নাকের জলে চোখের জলে' (প্রচলিত অর্থে নহে) হইতে হইল। এক স্থানে রাস্তায় একটা কাটা ভূর্জ্জবৃক্ষ কে ফেলিয়া রাখিয়াছে, যাত্রীরা ভূর্জ্জপত্র (ভূর্জ্জত্বক্ বলিলেই ঠিক হয়) সংগ্রহ করিতেছে। (জিনিশটি আমাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে, বৈঠকখানার হাটে একবার ভুটিয়াদিগের দ্বারা গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া রাশি রাশি বিক্রয়ার্থ আনীত হইতে দেখিয়াছিলাম, নূতন জিনিশ বলিয়া সংগ্রহও করিয়াছিলাম)।

৺বদরীধামের ৮ মাইল থাকিতে একটা লোহার ঝুলান সেতু পার হইলাম। এখানে বেশ জঙ্গল, কোথাও ছায়াশীতল (এই শীতে প্রাতঃকালে অবশ্য আরামের নহে), কোথাও রৌদ্র, ছাতা খুলিতে হয়, তবে অধিকাংশ স্থানেই উচ্চ পাহাড়ে সূর্য্যকিরণ আটকাইয়া গিয়াছে। ৺বদরীধামের ৭ মাইল থাকিতে বড় বড় গাছ, চারাগাছও আছে। রাস্তা দুই স্থানে খারাপ, তবে ডাণ্ডীতেই পার হইলাম। এতক্ষণ উতরাই ছিল, এইবার চড়াই আরম্ভ হইল। কত জায়গায় ঝরণার জল রাস্তায় পড়িতেছে, জলের উপর দিয়া যাইতে হয়, কোথাও বা উপর হইতে মাথায় পড়ে; কোথাও কোথাও ঝরণার উপর পুল বাঁধান আছে। এখানেও একটা (cataract) জলপ্রপাত দেখিলাম, পূর্ব্বের দুইটির মত অত সুন্দর নহে। ৺বদরীধামের ৬ মাইল থাকিতে রাস্তা আরও দুর্গম, আখোব্দা, দুই ধারে বড় বড় পাথরের চ্যাঙ্গড়, চড়াই; রাস্তার ধারে কাঁটা গাছ, ঝুপো গাছ, নদীর ধারে ও উপর পাহাড়ে চীরগাছের বাহার। সম্মুখে পাহাড়ে স্থানে স্থানে জমাট বরফ। এক স্থানে ভুটিয়ারা সারি সারি তাম্বু খাটাইয়াছে, চমরী গাই তাহাদিগের কাছে দেখিলাম। হনুমান্ চটীর কাছে ছোট ছোট লাল ও হলদে ফুল একেবারে মাটী (?) ও ঘাস ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। "You scarce could see the grass for flowers." *Tennyson: The two voices* — এই বরফের রাজ্যেও প্রকৃতি-দেবীর কি প্রাচুর্য্য! এই সব দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে (এবং পথের কষ্ট ভোগ করিতে করিতে) ৺বদরীধামের আর ৫ মাইল থাকিতে বেলা ১০টায় হনুমান্ চটীতে পৌছিলাম। বলা বাহুল্য, এখানে হনুমান্-জীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে, সেই জন্য চটীর এই নাম। আশ্চর্য্য এই যে, ৺বদরীনারায়ণের এত নিকটে গরুড়-ভগবানের মন্দির না থাকিয়া ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানের মন্দির! কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে এরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ (anachronism) ঐতিহাসিক অসঙ্গতি বলিয়া দোষ ধরিতাম! কিন্তু 'দেবতার বেলায় লীলাখেলা'—সুতরাং কথাটি কহিবার যো নাই!

এখানে ঘৃতগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম, কাঠের পুল পার হইয়া চটীতে পৌছিলাম। এখানে ধর্ম্মশালা আছে, 'মাটকোঠা'; নগরাজের প্রসাদে কাঠ-পাথরের অভাব নাই, তথাপি ছাদ খড় দিয়া ছাওয়া; খুঁটি দেওয়ার প্রয়োজনে ডালপালা কাঁটা-গাছ তাহার উপর চাপান। ঘরগুলি নীচু, চৌকাঠ কপালে ও মাথায় ঠেকে। দেবতার মাহাত্ম্যেই মাথা ফাটিয়া কপাল কাটিয়া রক্তারক্তি হয় না! এ সব স্থানে অবশ্য চারিদিকে দেওয়ালে ঘেরা ঘর, ঠাণ্ডা বাতাস আসিতে পায় না। ধর্ম্মশালার দোতলায় বাসা পাওয়া গেল, ধর্ম্মশালার চৌকীদার খুব খাতির করিল (পরে তাহাকে সামান্য কিছু 'ইনাম', দুই আনা, দেওয়া হইয়াছিল)। চমৌলির ন্যায় এখানেও চৌকীদার আমাদিগের স্বাক্ষরিত একখানি পোষ্টকার্ড লেখাইয়া লইল যে, আমাদিগের কোনও অসুবিধা হয় নাই এবং চৌকীদার আমাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে। (মাঘ-সংখ্যা ৫৩৫ পৃঃ)। পাশের দোকানে রান্নার বন্দোবস্ত হইল। দোকানে বাসা না লওয়াতে জিনিশপত্র একটু সস্তায় পাওয়া গেল। মাছির উৎপাত নাই—শীতের প্রাবল্যবশতঃ। জানালা হইতে অলকনন্দা-দর্শন হইল, কিন্তু দারুণ শীতে স্নান, এমন কি, 'মাথা ধোয়া' পর্য্যন্ত হইল না। এই স্থান হইতে পশ্চাৎ দিকে ফিরিলে, সুন্দর শ্বেতবর্ণ পাহাড় দৃষ্ট হয়—সেই জোষীমঠের পাহাড়। পাহাড়ের উপর ছোট ছোট চীরগাছ।

পথে আসিতে গৃহিণীর সংবাদ রাখা হয় নাই; পাণ্ডুকেশ্বরে দম লইবার সময় একবার দেখা হইয়াছিল, তিনি অসুস্থতাবশতঃ দেবদর্শন করিতে যাইতে পারিলেন না। ঠিকানায় পৌছিয়া জানা গেল, তিনি সারাপথ সর্দ্দিতে আচ্ছন্ন-অভিভূত ছিলেন, এখানে আসিয়াও সে ভাব কাটিল না, অজ্ঞান-অচৈতন্য রহিলেন। জোষীমঠে ধারার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে অনেকক্ষণ দেবদর্শন করিয়া যে ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল, তাহার ফলে এই অবস্থা; আমারই অবিমৃষ্যকারিতার ফল বুঝিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলাম (মাঘসংখ্যা ৫৪০ পৃঃ)। তাঁহার ডাণ্ডীওয়ালারা বড় সজ্জন, সমস্ত পথ ডাণ্ডী কাঁধে

করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়াছে, অতি দুর্গম স্থানেও নামায় নাই ; এবং এখানে ও পরে ৺বদরীধামে আমরা যতক্ষণ ছিলাম, দণ্ডে দণ্ডে বিষণ্ণমুখে খবর লইতে আসিয়াছে, "ছোটা মায়ী" কেমন আছেন। আত্মীয়জনের মধ্যেও এমন দরদী অনেক সময়ে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের দোষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (কার্ত্তিক-সংখ্যা ১২১ পৃঃ), গুণের কথাও মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেছি।

ভাগ্যে সঙ্গে বিধবাটি ছিলেন, সে-বেলার মত তিনিই রান্নাবান্না করিলেন ; রাত্রিভোজন হইল সকলের বাজার হইতে ক্রীত 'পুরী', তরকারী, আর আমার দুধ-চিড়া—চিনি-সহযোগে। এই আবার 'চিড়ে' বাঁধিয়া আনার উপকারিতা বুঝা গেল। আমাশয়ের জন্য দুধ এক দম ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু ভাগিনেয় বাপাজী বুঝাইলেন, যাহারা দুধ খাওয়ায় অভ্যস্ত, তাহারা দুধ না খাইলে আমাশয় হয় দুধ খাইলে সারে। গরজে পড়িয়া কথাটা মানিয়া লইলাম। ফল ভালই হইল। এক দিনমাত্র দুধ খাওয়াতে আমাশয়-ভাব একেবারে কাটিয়া গেল। তবে এখন হইতে মাত্রা অতিক্রম কিছুতেই করিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম।

গৃহিণী উঠিলেনও না, জলস্পর্শও করিলেন না। এখানেও বেশ ভাল জেলাপী পাওয়া গিয়াছিল—৷৴৹ সের। ছেলেরা পূর্ব্বাহ্ণে তাহা দিয়া জলযোগ করিয়াছিল। এক জন মাড়োয়ারী হনুমানজীকে হালুয়াভোগ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ছেলেরা পাইয়াছিল, তাহাও খুব সুন্দর ছিল।

গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া অবশ্য সে দিনকার মত আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইল ; পূর্ব্বে এমন জানিলে ঘাট চটী হইতে রওনা না হওয়াই ভাল ছিল, কেন না, এখানকার দারুণ শীতে তাঁহার রোগবৃদ্ধির আশঙ্কা। বড় আশা ছিল, অদ্য বৈকালে রওনা হইয়া বাকী ৫ মাইল গিয়া সন্ধ্যাকালে ৺বদরীধামে পৌঁছিব, সে আশা ভগ্ন হওয়াতে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলাম। পাঁচ মাইল মাত্র গেলেই প্রদোষে দেবদর্শন হইত, তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না বলিয়া অবসাদে, 'হরিষে বিষাদে', মুষড়াইয়া পড়িলাম ; আমারই অবিবেচনার দোষে তাঁহার এই দারুণ কষ্ট ও সকলেরই এই আশাভঙ্গ, ইহা ভাবিয়া মন আত্মধিক্কারে পূর্ণ হইল। যাহা হউক, সেখানে যেরূপ বিষম শীত, তাহাতে সন্ধ্যাকালে পৌঁছান অপেক্ষা দুপুরে পৌঁছান সুবিধা, এই ভাবে মনকে বুঝাইলাম।

১৯শ দিন—৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২এ মে, মঙ্গলবার

প্রাতঃ ৬টায় হনুমান্ চটী হইতে রওনা, বেলা ৯টায় ৺বদরীধাম (৫ মাইল)—দিবারাত্রি ও তৎপরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত স্থিতি।

কল্য ত বিধিবিড়ম্বনায় দেবদর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি, অদ্য আবার অদৃষ্টে কি ঘটিবে জানি না। বাঞ্ছাকল্পতরু বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, এই আশায় বুক বাঁধিলাম। গৃহিণীর অবস্থা পূর্ব্ববৎ ; একপ্রকার অজ্ঞান-অভিভূত অবস্থায়ই তাঁহাকে ডাণ্ডীতে তোলা গেল ; ভরসা, বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন ; এখানে থাকিয়া যাওয়া অপেক্ষা ঠিকানায় দাখিল হওয়াই ভাল, এই বিবেচনা করিয়া যাত্রা করা গেল। ভোরে তাঁহার বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া একটু বেলা করিয়া—৬টায় রওনা হইলাম। আজ প্রথম হইতেই বরফের রাজ্যে প্রবেশ। হনুমান্ চটী ছাড়াইয়া একটু পরে এক জায়গায় খানিকটা বরফ পার হইতে হইল ; তাহার পর কাঠের একটা পুল (পুলের ধারে বড় বড় চীরগাছ) পার হইয়া ভীষণ রাস্তা,—তাহার উপর ঝরণার জল পড়িয়া খুব পিছল—ডাণ্ডীতেই পার হইলাম, কেন না, হাঁটিবার শক্তি নাই, কিন্তু বড়ই (nervous feel করিলাম), ভয় ভয় করিতে লাগিল, বেহারারা যদি পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় ও ফেলিয়া দেয়। পাশে বরফক্ষেত্র। দ্বিতীয়বার একটি কাঠের (make-shift) কায-চলা-গোছ পুল, একেবারে বেশী লোক উঠিতে দিতেছে না, পাছে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখানে হাঁটিয়া পার হইতে হইল ; তবে বেহারাদের বাহাদুরী, তথা দরদজ্ঞান এমন যে, এ সব স্থানেও 'ছোটা মায়ী'কে নামায় নাই। পরে আবার আশে-পাশে বরফ, ওপারে বিস্তৃত বরফক্ষেত্র, পাহাড় বরফে ঢাকা, অলকনন্দাও খানিক দূর বরফে ঢাকা। কোথাও পুরু বরফের ছাদ, নীচে মধ্যে মধ্যে সুড়ঙ্গ দিয়া জল দেখা যায়। দেখিবার জিনিশ বটে।

আবার বরফ পার। পথ কোথাও উতরাই, কোথাও চড়াই। ২৷৹ মাইল পরে আবার বরফ পার। ক্রমে গাছপালা বিরল হইয়া আসিল। কন্‌কনে হাওয়ায় হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত শীত প্রবেশ করিতেছে ; বর্ম্মচর্ম্মশিরস্ত্রাণও আটকাইতেছে না। কথায় বলে, 'কষ্ট না করিলে কেষ্ট (কৃষ্ণ) মেলে না।' এ ক্ষেত্রে তাহা বেশ বুঝিলাম। এক

বরফে আচ্ছন্ন নদী

৺বদরীধামে যাত্রিনিবাস

৺বদরীনারায়ণের মন্দিরের সিংহদ্বার

ব্রহ্মকপালীতে পিণ্ডদান

মাইল থাকিতে মন্দিরচূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। এই স্থানকে 'দেবদর্শন' বা 'দেবদেখনা' বলে। কষ্টের শেষ নাই; এ সবই লীলাময়ের ভক্তকে পরীক্ষা। এখানে দর্শনমাত্র যাত্রিগণ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে 'জয় বদরী-বিশাল-লালকি জয়'-ধ্বনি করিল। কি আনন্দ! এখানেও একটা দড়ীর পুল অকেযো হইয়া পড়িয়াছে, পাশে আর এক স্থানে কাঠ-পাথর দিয়া কায-চলা-গোছের (make-shift) পুল তৈয়ারি হইয়াছে, তাহা পার হইতে হইল। এখানেও ভুটিয়াদের তাম্বু, চমরী গাই এবং 'মরখুণ্ডে' ঘোড়া দেখিলাম (মাঘ-সংখ্যা, ৫৩৮ পৃঃ)। ইহার পর হইতে প্রশস্ত রাস্তা, পাশে ফসলের ক্ষেত। পাহাড়ে বরফ, সমতলে নাই। অনেকখানি সমতল স্থানের উপর ৺বদরীধাম বিরাজিত —কেদারধাম অপেক্ষা অনেক বড় জায়গা এবং পরিচ্ছন্ন। পথে যতটা শীত, এ স্থানে ততটা নহে। স্থানটি ৺কেদারধামের মত অত উচ্চ নহে—সমুদ্রবক্ষঃ হইতে দশ হাজার ফুট (৺কেদারধাম বারো হাজার ফুট উচ্চ)। সহরে প্রবেশ করিতে একটি ডাকবাংলার কর্ম্মচারী আমাদের নাম-ধাম লিখিয়া লইল। শুনা গেল, আজ পর্য্যন্ত ৮ হাজার যাত্রী আসিয়াছে। এখানে ডাকঘর, তারঘর, থানা, বাজার, ধর্ম্মশালা আছে। তবে পাণ্ডারাই যাত্রীদিগকে বাসা দেয়।

বহু আয়াসে ৺বদরীধামে বেলা ৯টায় (৫ মাইল আসিতে তিন ঘণ্টা!) পৌছিলাম, তবে ৺কেদারধামে গৌরীকুণ্ড হইতে (দূরত্বও বেশী, ৮ মাইল) পৌছিতে ইহা অপেক্ষা বিলম্ব হইয়াছিল। হরিদ্বার হইতে ৺কেদারধাম পৌছিতে ১১ দিন (১০।৷০ দিন) লাগিয়াছিল; ৺কেদারধাম হইতে ৺বদরীধাম পৌছিতে ৮ দিন (৭।৷০ দিন) লাগিল। মন্দ কি? বীরেশবাবুর লাগিয়াছিল ১০ (৯।৷০)+৫ (৪।৷০) দিন; পদ্মনাথবাবুর লাগিয়াছিল ১৪ (১৩।৷০)+৮ দিন।*

ঠিকানায় পৌছিলাম, এক্ষণে পাণ্ডা ও বাসার প্রয়োজন। দেবপ্রয়াগে যে পাণ্ডার সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি তখনও পৌছিতে পারেন নাই (৺বদরীধাম হইতে ফিরিবার পথে পরে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল), তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার খুড়াকে পাওয়া গেল। বাসা পছন্দমত পাইতে একটু বিলম্ব হইল; প্রথমে যে বাসা দেখাইয়াছিলেন, তাহা ছেলেদের পছন্দ হয় নাই (আমরা তখনও পৌছাই নাই); পরে আর একটি ঠিক করিয়া দিলেন, একতলা বাড়ী, সম্মুখে অনেকখানি উঠান, রৌদ্র পাওয়া যায়, অন্য লোকজন নাই; এ সবই ভাল, কিন্তু ঘোড়ার আস্তাবলের মত একটা উৎকট দুর্গন্ধ; পরে বুঝা গেল, অশ্ববিষ্ঠার নহে, মনুষ্যবিষ্ঠার গন্ধ; চারিদিকে বিষ্ঠার রাজ্য;* স্থানটি সম্পূর্ণ সমতল নহে, উচ্চ-নীচ আছে, ফলে আমাদের ছাদের সহিত যাহাদিগের উচ্চভূমিস্থিত বাসগৃহ সমতল, তাহারা আমাদের ছাদেই স্বচ্ছন্দে পুরীষোৎসর্গ করে; আশে-পাশে সম্মুখে-পশ্চাতে সর্ব্বত্রই এই কুকীর্ত্তি; পাশে ঝরণা, তাহার ধারে ধারেও ঐ কাণ্ড। উপায় নাই, এখানেই থাকিতে হইল। কিন্তু সেই যে সকলের গা বমি দিতে লাগিল, যে দেড় দিন ছিলাম, সে সমস্ত সময়ই আহারে রুচি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। হায় রে দেবস্থান!

দেবস্থানে পৌছিলাম, এখন দেবালয়ে দেবদর্শনে যাইতে হইবে। কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'; লীলাময় আর একবার পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িলেন না। গৃহিণী আসিয়াই শয্যা লইলেন এবং নিদ্রাভিভূত হইলেন, রোগের প্রকোপই ইহার কারণ। তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিয়া অন্য সকলে পাণ্ডার গোমস্তার সঙ্গে দেবদর্শনে গেলেন। (পাণ্ডার খুড়া বাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া অদর্শন হইয়াছিলেন, পরে শুনিলাম, নিজস্ব যজমানদিগকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। যাক্, তাহাতে কোনও অসুবিধা হয় নাই)। আমি গৃহিণীর পার্শ্বে বিমর্ষচিত্তে বসিয়া রহিলাম। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ', সুতরাং একা গিয়া আর কি করিব? আর তাঁহাকে এ অবস্থায় একা ফেলিয়া রাখিয়াও যাওয়া যায় না। ৺কেদারধামের মত এখানেও কাষ্ঠ আনিয়া অগ্নি জ্বালিবার, অগ্নিসেকের ব্যবস্থা হইল; তবে এখানে পাণ্ডা কাষ্ঠ যোগান নাই, কাঠের মূল্যও এখানে চতুর্গুণ। পাণ্ডার গোমস্তা তপ্তকুণ্ড হইতে জল আনিয়া দিল—হস্তমুখ-প্রক্ষালনের জন্য। স্নানটাও আরামে সারিয়া

---

* শুনিয়াছি, পূর্ব্বে উভয় স্থানের মধ্যে 'একটি সোজা রাস্তা ছিল, তাহাতে ২।৩ দিন মাত্র লাগিত; এক্ষণে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া সে পথ লুপ্ত হইয়াছে।' (বীরেশবাবুর পুস্তক ৭৫ পৃঃ)।

* মার্কিণ লেখক W. D. Howells এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে একটি স্থানের বর্ণনা এইরূপ:—"It is to the nose that it makes its chief appeal. It is chiefly the odor of world-old human occupation, otherwise indescribable, that pervades the air of Villeneuve and makes the mildest of foreign sojourners long for the application of a little dynamite to its ancient houses."—"A LITTLE SWISS SOJOURN." সুসভ্য য়ুরোপেও দেখিতেছি এই বীভৎস প্রথা একেবারে অজ্ঞাত নহে।

লইলাম। ইত্যবসরে সকলে ফিরিলেন, বিধবাটি স্নানান্তে রন্ধনের উদ্‌যোগ করিলেন, ছেলেরা যোগাড় দিতে লাগিল।

এতক্ষণে (বেলা ১০॥০টায়) ব্যথাহারী হরি এ অধমের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন; গৃহিণীর চৈতন্য হইল; তিনি দেবদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলেন; এইবার 'সস্ত্রীকো' দেবোদ্দেশে যাত্রা করিলাম, পুত্র ও ভাগিনেয় সঙ্গে গেলেন। পথে অনেক উচ্চ-নীচ স্থান, স্থানে স্থানে সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হইল। ভেট—সচন্দন তুলসী, সোণার তুলসীপত্র ও রূপার ছোট্ট নারিকেল (শ্রাবণসংখ্যা ৬৪৫ পৃঃ), ক্ষুদ্র এক খণ্ড গীতা, মেওয়া ফল ইত্যাদি ও নগদ পঞ্চমুদ্রা লওয়া গেল, মন্দির-সন্নিকটে ফুল ও অলকনন্দার পবিত্র জল সংগ্রহ করিয়া (প্রবেশের পূর্ব্বে ৩।৪টি নাগারা বাজিল) সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে গরুড়-ভগবান্—স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মীদেবী, অন্যান্য ক্ষুদ্র মন্দিরে অন্যান্য দেবতা; প্রধান মন্দিরে ৺বদরীনারায়ণ ও তাঁহার আশে-পাশে নর ও নারায়ণ, কুবের ও নারদ প্রভৃতির দর্শন ও অর্চ্চন করা গেল, (নারায়ণকে স্পর্শন ত বিধি নহে); নারায়ণদর্শনে চক্ষুঃ সার্থক, জন্ম সার্থক করিলাম। পথের কষ্ট, রোগের যন্ত্রণা, শ্রম ও অর্থব্যয় সবই সার্থক হইল। বহুদিনপোষিত যে দুইটি সঙ্কল্প লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, অষ্টাহের ব্যবধানে সে দুইটিই যথাক্রমে সিদ্ধ হইল। ৺কেদারের মন্দিরের মত এখানে পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি নাই—ইনি যে ভক্তবৎসল হরি। তবে মন্দিরে প্রবেশের একটা ব্যবস্থা আছে, তজ্জন্য লোক নিযুক্ত আছে; এক এক দল লোক এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে, তাহারা অল্পক্ষণ দর্শনান্তে অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলে আবার এক দল প্রবেশ করিতে পাইতেছে। আর যে গর্ভগৃহে দেব-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, সেখানে কেহ যাইতে পায় না, সম্মুখস্থ দালান হইতে দর্শন করিতে হয়। অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এখানেও আধ-অন্ধকারে সুস্পষ্ট দেখা যায় না। পুরীতে শ্রীমন্দিরেও এই ব্যাপার। দেবতা দুর্নিরীক্ষ্য না হইলে তাঁহার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়, সেই জন্যই কি এ ব্যবস্থা? অথবা ইহা মিল্‌টন্-বর্ণিত 'dim, religious light?'

৺বদরীনারায়ণের ও প্রাঙ্গণের অন্যান্য মন্দির উচ্চতম স্থানে নির্ম্মিত। অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরে ৺কেদার ও অন্যান্য দেবতা আছেন, তপ্তধারা, শীতলধারা, কূর্ম্মধারা প্রভৃতি ধারা আছে, তপ্তধারার কাছাকাছি স্থানে উঠান পর্য্যন্ত গরম—বড় আরাম বোধ হইল। নিম্নে অলকনন্দা। ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণী আবার শয্যা লইলেন, বিধবাটিই পাকসাক করিলেন। দুধ পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখানে ও হনুমান্ চটীতে ৮০ সের। কেরসিনও উক্ত চটীতে ৮/০ বোতল, এখানে আর লই নাই।

আমরা মন্দির হইতে ফিরিলে পাণ্ডা দর্শন দিলেন এবং মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। (অথচ পূর্ব্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ১০টার সময় মন্দির বন্ধ হইবে, অতএব ওবেলা দর্শন হইবে।) বুঝিলাম, তিনি এতক্ষণে অবসর পাইয়াছেন। আমাদের দর্শন হইয়াছে বলিয়া ফিরাইয়া দিলাম। বৈকালেও আবার ঐ উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, সেবারেও ফিরাইয়া দিলাম—কেন না, আমরা 'স্বয়ংসিদ্ধ' হইয়া পড়িয়াছিলাম অর্থাৎ ছেলেরা ও পাণ্ডার গোমস্তাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। এখানে পাণ্ডারা মন্দিরে বিশেষ আমল পান না, তাহাও দেখিলাম। ৺কেদার-দর্শনের সময়ে কিন্তু পাণ্ডার সাহায্য ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হইত না। যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ৺কেদারধামের ন্যায় এখানেও মন্দির হইতে ফিরিবার সময় ভোগের জন্য একটি টাকা জমা দিয়া রীতিমত রসিদ পাইলাম; জানিয়া আসিলাম যে, বৈকালে ৫টার সময় দেবতাকে ভোগ দেওয়া হইবে এবং তৎপরে প্রসাদ পাওয়া যাইবে।

বৈকালে ৫টার সময় সকলে (গৃহিণী উঠানে রৌদ্র পোহাইয়া তখন একটু চাঙ্গা হইয়াছেন) দেবদর্শনে গেলাম। পূর্ব্বাহ্ণে বিধবাটির ভেট (তাড়াতাড়িতে পুঁটলী হইতে বাহির করার সময় না হওয়াতে) দেওয়া হয় নাই; এ বেলা লইয়া যাওয়া হইল; বাজার হইতে দুইটি সুন্দর আংরাখা দেব-বিগ্রহের অঙ্গে চড়াইবার জন্য কিনিয়া লওয়া হইল; দুই বেলাই গীতাখানি ও সোণার তুলসীপত্র ও রূপার নারিকেলের জন্য বেশ একটু খাতির পাওয়া গেল, গীতাখানি একজন দেবসেবক হাতে করিয়া লইল এবং সোণার তুলসীপত্র ও রূপার নারিকেল স্বতন্ত্র স্থানে রক্ষিত হইল; অন্যান্য দ্রব্য সেখানকার থালায় ঢালিয়া দেওয়া হইল। এ বেলাও অন্যান্য দেবদেবীদর্শন ও ভেট দেওয়া হইল -বিশেষতঃ লক্ষ্মীদেবীকে। কেদার-কঙ্কণের মত বদরী-কঙ্কণ দেব-অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া ধারণ করিতে হয়, তাহা করা হয় নাই। আবার সন্ধ্যাকালে আরতি-দর্শনের জন্য যাওয়া গেল, কিন্তু ভিড়ের

জন্য দর্শন করিয়াই ফিরিতে হইল, সেই সময়ে নিম্নলিখিত সুন্দর স্তবটির আবৃত্তি করে, তাহা আর শোনা হইল না।

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল হেম-মন্দির-শোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন ধ্যান ধরত মহেশ্বরম্।
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের দিনকর ধূপ দীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ-মুনিজন করত জয় জয় শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদ মুনি উচ্চারণম্।
যোগ ধ্যান অপারলীলা শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
যক্ষ কিন্নর করত কৌতুক জ্ঞান গন্ধর্ব্ব প্রকাশিতম্।
শ্রীলক্ষ্মী কমলা চামর ডোলে শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
কৈলাসে এক দেব নিরঞ্জন শৈল-শিখর মহেশ্বরম্।
রাজা যুধিষ্ঠির করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
শ্রীবদরীনাথ স্তুতিপাঠে সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
কোটি তীর্থ হওত পুণ্য প্রাপ্ত ইহ ফলদায়কম্॥

ফিরিবার সময় প্রসাদ লইতে গিয়া জানা গেল, সমস্ত প্রসাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। ৺কেদারনাথের প্রসাদে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, আবার এখানেও বঞ্চিত হওয়াতে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলাম। কিন্তু দয়াল হরির এটুকু লুকোচুরি লীলামাত্র; বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, পাণ্ডা প্রভূতপরিমাণ প্রসাদ (ভাত, ডা'ল, ৺জগন্নাথের প্রসাদের মত ইহাও শূদ্রস্পৃষ্ট হইলে দোষ হয় না; ডালটা একটু অম্লরসযুক্ত) ও বাজার হইতে সংগৃহীত তরকারী, ভাজা, আচার, চাটনী; মিষ্টান্ন, মোরব্বা আনিয়াছেন—৩.৪ খানা থালা বোঝাই। * নিজেরা পেট ভরিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইলাম (গৃহিণী সারাদিন অভুক্ত ছিলেন, সেই কৃচ্ছ্রসাধনের পুরস্কারস্বরূপ প্রসাদ সভক্তি ও রুচিপূর্ব্বক পাইলেন), তাহা ছাড়া পাণ্ডার গোমস্তা, ডাণ্ডীওয়ালা, কাণ্ডীওয়ালা, সকলকেই পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান গেল; এ যেন দ্রৌপদীর অন্নস্থালীর (শ্রীকৃষ্ণ ভুক্ত) শাকান্নের ন্যায় অফুরন্ত। এই ব্যাপারে মনটা নিরতিশয় প্রফুল্ল হইল, 'আনন্দ আর ধরে না রে।' পরদিন ব্রহ্মকপালীতে পিণ্ডদানের জন্য এই প্রসাদ হইতে সর্ব্বাগ্রে কিঞ্চিৎ 'আগ' রাখা হইল; প্রসাদের অন্নে পিণ্ডদানই বদরীক্ষেত্রের বিধি।

বৈকালে ৫টার সময় নারায়ণের ভোগ হয়, এই বিলম্বের জন্য গৃহিণী একটু তীব্র মন্তব্য করিলেন। আমি বুঝাইলাম, "ইহার কারণ বুঝা ত শক্ত নহে। যেখানে নারায়ণ লক্ষ্মীকে নিজ বাম পার্শ্বে স্থান না দিয়া * স্বতন্ত্র মন্দিরে তাঁহার স্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ গৃহিণীর সহিত পৃথক্ হইয়াছেন, সেখানে এইরূপ ভোগের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে বৈ কি? যে লক্ষ্মী সত্যযুগে বদরীবৃক্ষ (কুলগাছ) হইয়া তপোনিরত নারায়ণকে সূর্য্যাতপে ছায়াদান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি এই প্রতিদান; ইহার ফলে নারায়ণের এরূপ ভোজন-বিভ্রাট ঘটিবে না? পক্ষান্তরে, ৺জগন্নাথদেব রুক্মিণী-সত্যভামাকে স্বতন্ত্র মন্দিরে রাখিলেও ভগিনী সুভদ্রাকে কাছ-ছাড়া করেন নাই, ভগিনীর যত্ন-আত্তিতে তাঁহার ৫২ ভোগ!" প্রথম কথাটায় বোধ হয় গৃহিণী খুব খুসী হইলেন, তবে শেষ কথাটা হয় ত তেমন পছন্দ (relish) করিলেন না, কেন না, এ যে সেই বাঙ্গালী সংসারের সুবিদিত ননদ-ভাজের ব্যাপার!

রাত্রির আহার এইভাবে শেষ করিয়া সকলে নিদ্রা গেলাম। এখানকার শীত ৺কেদারধামের মত অসহ্য নহে। তবে এখানে শীতের জ্বালায় ও স্নান বন্ধ করায় তৈল-জলের অভাবে গা ফাটিতে, ঠোঁট ফাটিতে সুরু হইল, তাহার জের কয়েক দিন চলিয়াছিল, ঠোঁট ফাটিয়া, আঙ্গুলের ডগা ফাটিয়া, রক্তপাতও হইত।

২০শ দিন—৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩এ মে, বুধবার

পূর্ব্বদিন হইতে এই দিন বেলা ২॥০টা পর্য্যন্ত—
৺বদরীধামে স্থিতি ও তীর্থকৃত্য।

৺কেদারধামে এক দিন থাকিয়াই শীতের প্রকোপে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল; এখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম বোধ হওয়াতে এবং আর একটি অতি প্রয়োজনীয় অবশ্যকর্ত্তব্য তীর্থকৃত্য বাকী থাকাতে পরদিনও মধ্যাহ্নের পর পর্য্যন্ত এখানে রহিয়া গেলাম। তীর্থকৃত্যটি ব্রহ্মকপালীতে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান ও ব্রহ্মকুণ্ডে তর্পণ। যেমন দেবপ্রয়াগে মস্তকমুণ্ডন করিলে

* ইহার মধ্যে কাগজে জড়ান একরকম মিষ্টান্ন ছিল, বড় সুস্বাদু। কাগজে জড়ান বলিয়া পাঠক যেন দুর্নিদান। বুঝিবেন না।

* ৺বদরীনারায়ণের যে ছবি বাজারে বিক্রী হয়, তাহাতে লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশাপাশি আছেন; কিন্তু তাহা প্রকৃতের প্রতিরূপ নহে।

আর কোন তীর্থে মুণ্ডন করিতে হয় না, তেমনি এখানে পিণ্ড-দান করিলে আর কখনও পিণ্ডদান করিতে হয় না—বার্ষিক শ্রাদ্ধের প্রয়োজন হয় না, ইহাই না কি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

এই তীর্থকৃত্যের পূর্ব্বে ৺বদরীনারায়ণের শয়ান ও নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি-দর্শন একটি কর্ত্তব্য। দেববিগ্রহের বেশভূষা খুলিয়া লইয়া প্রাতঃস্নান করান হয়, সেই নিরলঙ্কার মূর্ত্তির নাম নির্ব্বাণমূর্ত্তি। তদ্দর্শনে (যেমন শ্রীক্ষেত্রে 'রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা) 'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'; সুতরাং এত কষ্ট সহিয়া, অর্থব্যয় করিয়া, এরূপ দূর-তীর্থে যখন আসা গিয়াছে, তখন আমাদের মত পাপীর ও তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির 'তত্ত্বাববোধেন বিনাঽপি ভূয়ঃ' 'নাস্তি শরীরবন্ধঃ' এ আশা ত্যাগ করা যায় না। প্রাতঃ ৬টার সময় হইতে 'ধরণা' দিয়া সকলে মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানের এক নিভৃত কোণে বসিয়া থাকার চেষ্টা করা গেল; কিন্তু বারে বারে বিতাড়িত হইতে হইল; বেশীক্ষণ কাহাকেও অপেক্ষা করিতে দেয় না; 'দর্শন করিয়াই চলিয়া যাও, অন্য যাত্রীদিগকে দর্শনের অবসর দাও', দ্বাররক্ষকদিগের এই হুকুম। 'অনেক দূর হইতে অনেক কষ্ট করিয়া আসিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া দর্শন করিতে দাও,' বলিয়া তাহা-দিগকে অনেক কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলাম, বিশেষ ফলোদয় হইল না। যাহা হউক, মন্দিরের দালান হইতে বহিষ্কৃত হইবার ফাঁকে ফাঁকে দেখিয়া লইলাম, বহু সেবক (সকলেই কোটপ্যাণ্টধারী) ভারে ভারে জল বহিয়া আনিতেছে, পুষ্প চন্দন ধূপ দীপ থালায় থালায় সাজাইয়া আনিতেছে, আয়োজনের যেন আর শেষ হইতে চাহে না। শেষে আসিলেন স্বয়ং 'রাওল সাহেব'—বিগ্রহকে স্নান করাই-বার অধিকার একমাত্র তাঁহার, অন্য কেহ বিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারে না। রাওল সাহেব যুবা পুরুষ, কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত, হৃষ্টপুষ্ট 'গজকলভ ইব'—মোহন্তের মূর্ত্তি ঠিক যেমনটি হয়;—ধর্ম্ম অর্থ কাম যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই শরীরের মেদমাংসমজ্জাও বৃদ্ধি পাইবে, শেষে সম্ভবতঃ নর-নারায়ণ পর্ব্বতের আকারই ধারণ করিবেন। (বদরীক্ষেত্রের উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-যুগলের নাম নর-নারায়ণ; সত্যযুগে নর-নারায়ণ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন যুগ্ম পর্ব্বতে পরিণত metamorphosed)।

শেষে নিরলঙ্কার বদরীনারায়ণমূর্ত্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণমূর্ত্তির দর্শন-সৌভাগ্য হইল। মূর্ত্তি ক্ষুদ্র (রাওল সাহেবের স্থূল দেহের সহিত কি বৈষম্য—Contrast!) ও সুন্দর; দেবমূর্ত্তি সকলেই সমান ভক্তির পাত্র, তথাপি বলিতে ইচ্ছা হয়, জয়পুর-মথুরা-বৃন্দাবনের দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তির মত, এমন কি, খাস বাঙ্গালার বল্লভপুরের বল্লভজী, খড়দহের শ্যামসুন্দর, সাঁই-বনের নন্দদুলাল, শান্তিপুরের মদনমোহন, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবন-চন্দ্র, প্রভৃতির মত তেমন মধুর-মোহন-মূরতি নহেন। বলা বাহুল্য, দর্শনমাত্র তথা হইতে চলিয়া যাইতে আদিষ্ট হইলাম, স্নান পর্য্যন্ত থাকিতে পাইলাম না। অথচ দেখিলাম, এক দল বোম্বাইওয়ালা, পুরুষ ও স্ত্রী, গর্ভগৃহে সাদরে স্থান পাইলেন, তাঁহাদিগের সকলকে যথোপযুক্ত আসন দিতে পূজারীরা মহা-ব্যস্ত। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ১০১৲ টাকা নজর দিলে ও সেদিনকার পূজার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলে এই (privi-lege) বিশিষ্ট অধিকার পাওয়া যায়। সবই টাকার খেলা!

দেবতার উপর শুদ্ধা ভক্তি ও দেবসেবকদিগের উপর অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা লইয়া দালান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, এবং মন্দির হইতে অনেকটা দূরে অলকনন্দা-তীরে ব্রহ্মকপালীতে পিণ্ডদান ও ব্রহ্মকুণ্ডে তর্পণ করিতে গেলাম। তপ্তকুণ্ডের জলে বা হিমনদীর জলে স্নান হইল না, মস্তকে ও বস্ত্রে অলক-নন্দার পবিত্র বারি ছিটাইয়া দিয়া তীর্থকৃত্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আরও বহুলোকে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিতেছে, পুরোহিত সকলকেই একসঙ্গে মন্ত্র পড়াইতেছেন; ব্রহ্মকপালীর পুরোহিতটি বুঝিলাম বিদ্বান্, উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট; তর্পণ-ঘাটের পুরোহিতটি তেমন সুবিধার নহে। ব্রহ্মকপালী-তীর্থে পিণ্ডদানের রেট্ বাঁধা—১।০; তাহার উপর ১৲ করিয়া দক্ষিণা দিয়া অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৬৷০ তিন জনে মিলিয়া দিলাম। বস্ত্রাদিতেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। তর্পণের বেলায় রেট্ বাঁধা নাই, দুই আনা করিয়া দক্ষিণা দিলাম। ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মকপালীর পুরোহিত দেবপ্রয়াগে পাণ্ডার মুখে শ্রুত (কার্ত্তিক-সংখ্যা ১২৮ পৃঃ) শ্লোকটির পুনরাবৃত্তি করিলেন—'নমস্কারপ্রিয়ঃ সূর্য্যো জলধারাপ্রিয়ঃ শিবঃ। অলঙ্কারপ্রিয়ো বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণো ভোজন-প্রিয়ঃ।' উচ্চারণ-গুণে শ্লোকটি পূর্ব্বাপেক্ষাও মধুর লাগিল, শেষ চরণে আমার প্রশ্নের উত্তর মিলিল। আর একটি ব্রাহ্মণ, এবং পাণ্ডার খুড়া, তস্য পুত্র (বাচ্ছা, তবে পৈতাধারী) ও পাণ্ডার গোমস্তা, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা গেল। ফিরিবার পথে কূর্ম্মধারা ও বহু দেবতা ('ভেট চড়াও' চীৎকার সর্ব্বত্র) দর্শন করিয়া উচ্চনীচ পথে বাসায় ফিরিলাম। এখানেও

(গুপ্তকাশীর মত) গুপ্তদান করিতে হয় শুনিলাম (তপ্তকুণ্ডে), করা হয় নাই।

বাসায় ফিরিয়া নিজেদের রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে দোকানের 'পুরী' তরকারী চাটনী ও মিঠাতে; ইহাই এ অঞ্চলের প্রথা। আমাদের দেশের সদ্‌ব্রাহ্মণের মত বাজার হইতে আনীত আচমনীয় আহার্য্য-আস্বাদনে আপত্তি নাই; গৃহস্থের খুবই শ্রম-লাঘব হয়। মধ্যাহ্নে কোটপ্যাণ্টধারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিলেন। একখানি কম্বল বিছাইয়া সকলেই তাহাতে বসিয়া গেলেন; (এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালা দেশের আচারের সহিত কি বৈষম্য! অথচ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কদাচারী বলিয়া অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন—অপরাধ আমরা মৎস্যাশী।) ব্রাহ্মণ-ভোজনে আরও দুইটি নূতনত্ব দেখিলাম। প্রথম—ভোজনপাত্র ভূর্জ্জপত্র (ভূর্জ্জত্বক্); (পূর্ব্বদিন আমাদেরও এই পত্র যুটিয়াছিল; কলিতে ভোজনপাত্র-বিচার নাই—তাই এনামেল্ ও এলুমিনিয়াম্‌ও এলোমেলো ভাবে চলিয়া গিয়াছে—তথাপি একটা 'নূতন কিছু' বটে। কদলীপত্রে ভোজ্যে-কাযে চিরদিন অভ্যস্ত; রাঢ় অঞ্চলে শালপাতায়, 'পশ্চিমে' পলাশপাতায়, আমাদের নদীয়া জেলারই স্থানবিশেষে পদ্মপাতায় ও শ্বশুরালয় রঙ্গপুরে কলাগাছের খোলায় (যে খোলায় আমরা শ্রাদ্ধ করি!) ভোজন করিয়াছি, এখানে আর একটা নূতনতর হইল। 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' দ্বিতীয় নূতনত্ব, ইঁহারা আগে 'মিঠা' খাইলেন (এ দেশের এই রীতি, ব্রাহ্মণোচিত বটে! যদিও শাস্ত্রে আছে, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'; পরে শ্রীনগরে কাণ্ডী-ডাণ্ডীওয়ালাদিগের বেলাও দেখিয়াছি) এবং প্রচুর-পরিমাণে; পরে পুরী, তরকারী, চাটনী অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে, যদিও আমাদের পক্ষে পর্ব্বত; পরিশেষে পাঁপরভাজা পেটে প্রবেশপথ পাইল না! এই প্রথম ও শেষ ব্রাহ্মণ বাসায় আবাহন করিয়া আনিয়া মধ্যাহ্নভোজন করাইলাম, অন্য সর্ব্বত্র 'মূল্য' ধরিয়া দিয়াছিলাম। আহার্য্যের ব্যয় পড়িয়াছিল আন্দাজ তিন টাকা (পাঁচ জনের); ভোজনান্তে ভোজনদক্ষিণা প্রত্যেককে দুই আনা করিয়া দেওয়া হইল ও তৎসহ এক একটি 'যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রম্।'

নিমন্ত্রিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লইলে আমাদের আহার হইল—ভাত, ডা'ল, তরকারী। অন্তও বিধবাটিই পাক করিলেন, গৃহিণী সামান্য অন্নগ্রহণ করিলেন। এ দিনও দুধ পাওয়া গিয়াছিল।

এই বার শেষ পালা পাণ্ডা-বিদায় বা 'সুফল'। ৺কেদার-ধাম-প্রসঙ্গে পাণ্ডাদের খাঁইএর কথা বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং পাণ্ডা (যাঁহার সহিত দেবপ্রয়াগে পরিচয় হইয়াছিল) উপস্থিত না থাকিলেও খুড়া মহারাজ তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিলেন। সর্ব্বাগ্রে যথারীতি 'মোকাম বানাইয়া' দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল; সে প্রস্তাব একদম প্রত্যাখ্যান করাতে দর-কষাকষি আরম্ভ হইল—৫০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲, ৩০০৲, ২৫০৲, ২০০৲ পর্য্যন্ত 'দর' নামিলে এ পক্ষ স্পষ্টবাক্যে বলিলেন, ১০০৲ টাকা নিজের তরফ হইতে ও ১০৲ টাকা বিধবাটির তরফ হইতে দেওয়া হইবে, ইহার ঊর্দ্ধ এক পয়সাও নহে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর আমার তহবিল হইতে আর ৫৲ টাকা দিতে হইল (২৫৲ টাকা হইতে সুরু করিয়াছিলেন); বিধবাটিকে আর অন্ততঃ দুইটি টাকা দিতে অনেক করিয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাহাতে রাজি হইলাম না। বাড়তী টাকা কয়টি কি জন্য—তাহার একটা কি কৈফিয়ত দিয়াছিলেন, ঠিক ধরিতে পারি নাই; আমাদের অনুমান, ১০০৲ + ১০৲ টাকা আসল পাণ্ডার প্রাপ্য, উহাতে খুড়া মহাশয়ের দাঁত বসান চলিবে না, তাই নিজের মেহনত-আনা বা দস্তুরিস্বরূপ ঐ টাকাটির দাবী করিলেন। যাহা হউক, ৺কেদারধামের পাণ্ডার আচরণে সুফলদান ব্যাপারের একটা আঁচ পাইয়াছিলাম বলিয়াও বটে, এবং 'এ সব দূর ও দুর্গম তীর্থে আসিলে এরূপ খরচ করিতে হয়, অতিরিক্ত ব্যয় হইলেও ইহাকে অযথা ব্যয় মনে করা উচিত নহে, ইহা তীর্থকৃত্যেরই একটা অঙ্গ,' ইত্যাদি উপদেশ কয়েক দিন ধরিয়া গৃহিণী ও বিধবাটির নিকট হইতে পাইতেছিলাম, সেই জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নগদ এক শত টাকা প্রণামী দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম।

এ সম্বন্ধে অর্থনীতিশাস্ত্রের দিক্ হইতে পুত্রটি যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। "পাণ্ডাদিগের ইহাই একমাত্র জীবনোপায়, অর্থার্জ্জনের পন্থাঃ। উকীল-ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় চালাইতে যেমন বহু সরঞ্জামী খরচা হয়, ইঁহাদিগেরও সেইরূপ আছে। দেবপ্রয়াগে (৺বদরীধামের) ও গুপ্তকাশীতে (৺কেদারধামের) পাণ্ডাদিগের পরিবার-পরিজন লইয়া স্থায়ী বাস; যাত্রি-সমাগমের কয়েক মাস ৺বদরীধামেও একটা

'ডেরা' রাখিতে হয়, সেটাও একরকম পাকা বন্দোবস্ত ; ইহা ছাড়া যাত্রিসংগ্রহের জন্য হরিদ্বারে ত বটেই, কলিকাতায়ও অনেকের এক একটা অস্থায়ী 'ডেরা' আছে। রেলে কলিকাতা পর্য্যন্ত অনেকেই যাতায়াত করেন, অনেকে আবার বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত 'ধাওয়া' করেন ; এইরূপ অন্যান্য প্রদেশেও যাওয়া আসা আছে। এ সমস্ত খরচা তথা খাই খরচা নিজের 'ট্যাক্' হইতে যোগাইতে হয়। ভদ্রশ্রেণীর যাত্রীদিগের সঙ্গে সে গোমস্তা মোতায়েন করিয়া দেন, তাহার খাইখরচা তাঁহাদিগকেই দিতে হয়, যাত্রীরা শেষে কেবল 'ইনাম' দেয়, এইমাত্র। আবার যাত্রীদিগকে প্রভূত-পরিমাণে আহার্য্য-প্রদান (অনেকে ত্রিরাত্রও বাস করেন), লেপ-কম্বল ধার দেওয়া, ৺কেদারধামে অগ্নিকুণ্ডের জন্য অগ্নিমূল্যে কাষ্ঠ কিনিয়া বিনামূল্যে সরবরাহ করা—এ সব ব্যাপারেও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। সুতরাং এতগুলি বাবদ খরচ করিয়া তাঁহাদিগের যে (net income) মুনফা খুব বেশী থাকে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে।" এক জন স্পষ্টবাদী কবিরাজ বলিয়াছিলেন যে, 'কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করার খরচাটা ধনশালী রোগীর নিকট হইতেই আদায় করিতে হয়, দরিদ্র রোগীরা নাম-মাত্র একটা মূল্য দেয়।' এ ক্ষেত্রেও পাণ্ডারা এই নীতি অনুসরণ করেন, শাঁসাল যজমানের নিকট হইতে 'মোড়া' দিয়া বেশী টাকা আদায় করেন, দরিদ্র যাত্রীর কাছ হইতে যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিয়া রেহাই দেন। কথাগুলি সঙ্গত বটে। হরিদ্বারে একজন (৺কেদারধামের কি ৺বদরীধামের ঠিক মনে নাই) পাণ্ডা নিজেকে 'সন্তোষী পাণ্ডা' বলিয়া জাহির করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ তিনি অল্প প্রণামীতে সন্তুষ্ট—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজের নিজের আর্থিক ক্ষমতানুসারে যে যাহা দেয়, তাহাই লইয়া খুসী হন, উৎপীড়ন করেন না। ইহা কতদূর প্রকৃত, বলিতে পারি না। আমার ত সন্দেহ হয়, উক্ত সম্প্রদায়ের সকলেই এক প্রকৃতির। হরিদ্বার, গয়া, পুরী প্রভৃতি বহু তীর্থস্থানেই এই জুলুম আছে। পুষ্করে অতটা দেখি নাই, অবশ্য আমাদের পাণ্ডার ব্যবহারের কথাই বলিতে পারি। কেবল ৺কামাখ্যাপীঠের পাণ্ডাদিগের সদ্ব্যবহার সৌজন্য স্বপ্নে সন্তোষের সুখ্যাতি শুনিয়াছি। গৃহিণী এ বিষয়ে একজন 'সম্মানিত সাক্ষী' (সাক্ষিণী ?)। নিজের আজও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয় নাই। জানি না, কবে মায়ের দয়া হইবে।

যাক্, এক্ষণে আসল কথায় ফিরিয়া আসি। প্রণামী-দান-ক্রিয়ার অবসানে পাণ্ডার প্রসাদ (ছোলার ডাল, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস; শুক্‌না-নারিকেল-কুচি, গুঁড়া তুলসীপত্র, জংলী ফুল) দিলেন। তাহার পর, একবার বাজারে গিয়া ৺কেদার, ৺বদরীনারায়ণ প্রভৃতির কয়েকখানি ছবি কেনা গেল (চামর, বাঘছাল, শিলাজতু প্রভৃতি বহু বিক্রেয় দ্রব্যও ছিল) ; বাসায় ফিরিয়া আসিয়া জিনিশপত্র গোছগাছ করিয়া বেলা ২॥০টার সময় রওনা হইলাম, ৺নারায়ণকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পুণ্য-ক্ষেত্র ত্যাগ করিলাম। শীতের জন্য সকলেই কাবু, বেহারারা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত।

এতদিনে পাঠকবর্গকে ৺কেদার ও ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনের আনন্দদান করিয়া ধন্য হইলাম—যদিও দীর্ঘ নয় মাস কাল ধরিয়া এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিরক্তিরও সঞ্চার করিয়াছি। এখন পুরাতন পথে চামৌলি পর্য্যন্ত গিয়া নূতন পথ ধরিয়া নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ দুইটি নূতন তীর্থ দর্শন করিতে হইবে এবং আবার নূতন পথে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত গিয়া পুরাতন পথে হৃষীকেশে তথা হরিদ্বারে ফিরিতে হইবে। সে সব কথা আগামী বারে বলিব—(যদি পাঠকবর্গের ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া না থাকি)।

[ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তি

অন্তরের প্রান্তর ব্যাপিয়া
সীমাহীন অগাধ অকূল,
বিস্তারিত শান্তি-পারাবার
স্নিগ্ধ শান্ত বিরাট বিপুল!

নিস্তরঙ্গ নিস্পলক স্থির
শব্দহীন স্তব্ধ বারি-রাশি
ঊর্দ্ধে নীল অনন্ত আকাশ
শশী হাসে সুনীরব হাসি!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

শাঁখের করাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ

গরলগাছার বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অভিনয় হইত। পত্নী সুভাষিণীর বৈচিত্র্যহীন তীক্ষ্ণ কাংস্য-কণ্ঠের ঝঙ্কার, বিদ্যাভূষণের ভাঙ্গা গলার ঘড়-ঘড় শব্দ ও পুত্র-কন্যার চ্যাঁ-ভ্যাঁ হট্টগোল সে পাড়ার বায়ুমণ্ডলকে নিয়তই উত্তপ্ত রাখিত। প্রতিবেশীরা ইহাকে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের একটা অতি সাধারণ অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়া সে দিকে বড় একটা কাণ দিত না।

সে দিন হঠাৎ কলহের মাত্রাটা চিরাচরিত প্রথা ছাড়িয়া একবারে এমন সপ্তমে চড়িয়া গেল যে, দেখিতে দেখিতে এক মিনিটের মধ্যে পাড়ার ছেলে-বুড়ো, বৌ-ঝিতে বিদ্যাভূষণের গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কর্ত্তার হাতে একখানা অর্দ্ধদগ্ধ চেলাকাঠ, গৃহিণী—অসংবৃতবসনা, আলুলায়িতকুন্তলা ঘূর্ণিত-লোচনে আপন অনাবৃত পৃষ্ঠদেশটি কর্ত্তার সম্মুখে পাতিয়া দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতেছে—"যদি না মারবি—ত—"

পিতৃ-পুরুষের সম্বন্ধে যে সকল অখাদ্য দ্রব্যের তালিকা ব্রাহ্মণগৃহিণীর রসনা হইতে নির্গত হইতেছিল, তাহা লিপিবদ্ধ না করাই সঙ্গত।

শঙ্কিত পুত্র-কন্যারা চালার এক পাশে জড় হইয়া তখন সমস্বরে বিকট ক্রন্দন জুড়িয়া দিয়াছে।

ক্ষণেকের তরে হয় ত গৃহিণীর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কর্ত্তা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন, হয় ত বা আপন দৈহিক শক্তির উপর সেরূপ আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই; কিন্তু এখন এক-উঠান লোক দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার লুপ্ত বীরত্ব জাগিয়া উঠিল। ভাঙ্গা গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ করিয়া অর্থাৎ হুঙ্কার দিয়া বীরদর্পে হস্তস্থিত কাঠটাকে বাগাইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"তবে রে, আজ তোকে খুনই করবো—না হয় ফাঁসী যাব।"

কিন্তু ফাঁসী হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন ও পাড়ার তারিণী চাটুয্যে। তিনি খপ্ করিয়া বিদ্যাভূষণের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কাঠখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং এক প্রান্তে টানিয়া আনিতে আনিতে বলিলেন,—"ছি! ছি! করছো কি! মেয়েমানুষের গায়ে হাত—ছি!"

আরও তিন চারি জন আসিয়া বিদ্যাভূষণকে ধরিল।—বিদ্যাভূষণ তাহাদের বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিতে লাগিলেন এবং তেমনই ভাঙ্গা গলায় ঘড়-ঘড় করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি,—খুন করেঙ্গা—খুন করেঙ্গা—"

অপর পক্ষও এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল না। সমস্ত উঠানটা দলিয়া চষিয়া কলহের সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে বলিতেছিল,—"যদি না মারবি" ইত্যাদি।

গৃহিণীর গালি-গালাজের সারাংশটুকু ও তাহার পূর্ব্বের খানিকটা ইতিহাস সংগ্রহ করিলে মোটামুটি এই কুরুক্ষেত্র-রণের কার্য্যকারণপরম্পরার একটা সামঞ্জস্য মিলে।

নবাবী আমলের কিংবা ঐরূপ কোন ভূস্বামীর দেওয়া উপাধি 'বিদ্যাভূষণ' পুরুষপরম্পরায় ভোগ-দখল করিতে করিতে একমাত্র করালীতে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তাই তাঁহার আসল নামের পরিবর্ত্তে সকলেই উপাধিটি ব্যবহার করিত। কিন্তু উপাধি অনুযায়ী 'বিদ্যা' কোন দিন তাঁহার জ্ঞানকে অলঙ্কৃত করিতে পারে নাই। কয়েক ঘর যজমান ছিল,—তাহাদেরই অনুগ্রহে কোনরূপে পেটের ভাত, পরণের কাপড় ও চালের খড় জুটিয়া যাইত।

সংসারে বাস করিতে হইলে ধর্ম্মকার্য্য অবশ্য আচরণীয় এবং ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। বিদ্যাভূষণের বিদ্যা না থাকিলে কি হয়, এ জ্ঞানটুকু পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কাযেই গৃহের অভাব মোচন করিতে গৃহিণী আসিয়াছিলেন ও তাহার কয়েক বৎসরের মধ্যে 'নেড়ীগেঁড়ী'

পুত্র-কন্যা তাঁহার গৃহাঙ্গন কোলাহলমুখর করিয়া তুলিয়াছিল। অভাবের সূত্রপাত ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন এইখান হইতে সুরু হয়।

শৈশবে যমপুকুর, পুণ্যিপুকুর, কৈশোরে মধুসংক্রান্তি, সুবচনীর ব্রত প্রভৃতি শেষ করিয়াও কিন্তু সুভাষিণীর প্রিয়ভাষণের কিছুমাত্র সংস্কার সাধিত হয় নাই। এখন নিত্য অভাবের ইন্ধন পাইয়া দিবারাত্রির প্রতিক্ষণেই সে রসনা লেলিহান বহ্নিশিখার মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিত।

ফুলশয্যার তিন দিন পরে নববধূ সুভাষিণী মুখ বাঁকাইয়া স্বামীকে বলিয়াছিল,—"বলি, তোমারই না হয় তিনকুলে কেউ নেই, লোকলজ্জার ধার ধার না—কিন্তু কথা শুনতে হবে ত আমাকেই—"

বিদ্যাভূষণ সুভাষিণীর মধুর বচনে পরিতৃপ্ত হইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সহসা মধুযামিনীর স্বপ্ন কাটিতে না কাটিতে এ সব বাস্তব স্বপ্ন কেন?

উত্তরে বধূ বলিয়াছিল, "ও সব ন্যাকামী আমি ঢের বুঝি। বলি, বিয়ে না হয় নাই করেছো, চখেও কি দেখনি এর আগে! যার যেমন জোটে, সোনাদানা একটু ছোঁয়ায় বিয়ের কনেকে; কিন্তু রাংরত্তির ভাঁজ নেই—পোড়াকপাল!"

বিদ্যাভূষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া পত্নীর ক্রন্দনসিক্ত মুখমণ্ডলের মনোলোভা শোভা দর্শন করিয়া আর কোন উত্তর দেন নাই।

তরুতল যাহার আশ্রয়, ভিক্ষা যাহার উপজীবিকা, সে-ও বিবাহ করিয়া সংসার বাঁধে। এ তবু কয়েক কাঠা জমী আছে, তাহার বুকে দুইখানা ভাঙ্গা চালাও রহিয়াছে—উদরান্নের সংস্থানস্বরূপ কয়েক ঘর যজমানও বিদ্যমান। সুতরাং পাঁচটি কন্যার পিতা ভুবনমোহন—এই মহাদেব তুল্য পাত্রে কন্যাদান করিয়া দায়-মুক্তির গুরু নিশ্বাস মোচন করিয়াছিলেন।

নিয়মরক্ষার জন্য বধূবেশিনী সুভা কয়েক মাস পিতৃগৃহে কাটাইয়া পুনরায় স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল ও আপন গৃহিনীপনার মৌরসী পাট্টা দখল করিয়া জাঁকিয়া বসিল।

ক্রমে সুভাষিণী আবিষ্কার করিল—বিদ্যাভূষণের বিদ্যা ত নাই-ই—আছে নানা রকমের উপসর্গ। যথা—উঠিতে তাঁহার বেলা ৮টা বাজে, সব কাযেই কেমন আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব, কথার কোন শ্রীছাঁদ নাই—গলার আওয়াজটা পর্য্যন্ত কেমন বিট্‌কেলে ঘড়্‌ঘড়ে। অষ্টপ্রহর হুঁকা-কলিকা লইয়া ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খান এবং শ্লেষ্মার ধাত বলিয়া হাঁচি-কাসিগুলাও অতিরিক্ত! ঘর-দ্বার ভাঙ্গা-চুরার জন্ত যত না হউক, এই অপূর্ব্ব-লক্ষণযুক্ত লোকটির নিষ্ঠীবন—টিকা-তামাকে এমন থিক থিক্ করে যে, মেঝেয় পা দিতে হইলে গা ঘিন-ঘিন করে—বুক ঠেলিয়া বমি আসে।

ইহাতেও কি কলহের কারণাভাব ঘটে? তবে ও বিদ্যাটা এত দিন এক-তরফাই ছিল। আজ বিদ্যাভূষণের কি কুমতি ঘটিয়াছিল—ভগবান্‌ই জানেন! কখনও কখনও তিনি সামান্য প্রতিবাদ করিতেন বটে, তবে সে প্রতিবাদ স্তুতিরই নামান্তর। আজ সহসা কথার পৃষ্ঠে কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"একটু থাম—দিনরাত কিচিকিচি ভালও লাগে। কাঠের মুখ হ'লে যে ফেটে যেতো।" ব্যস্—আর যায় কোথা! রণরঙ্গিণী খর রসনা চালাইতে চালাইতে ছুটিয়া আসিয়া বিদ্যাভূষণের সাজা কলিকাটা হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া উঠানে ফেলিয়া দিল ও অকথ্য ভাষণে তাঁহার শ্রান্ত দেহকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সাজা তামাক নষ্ট হওয়ায় বিদ্যাভূষণেরও মেজাজ গেল বিগ্‌ড়াইয়া, এবং দুই এক কথা হইতে না হইতে ছুটিয়া রান্নাঘর হইতে একখানা অর্দ্ধদগ্ধ চেলা-কাঠ তুলিয়া 'যুদ্ধং দেহি' রবে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তার পর এই ব্যাপার!

জনতা স্বামি-স্ত্রীর নিন্দা শতমুখে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেল। সুভাষিণীর কণ্ঠস্বর তখনও সপ্তম গ্রামে। জনশূন্য উঠানের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সে স্বামীর কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। অতঃপর উদ্দেশে তাঁহার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করিতে করিতে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। বিদ্যাভূষণ সে দিন ত বাটী ফিরিলেনই না,—উপর্য্যুপরি কয়েক দিন কাটিয়া গেলেও যখন তাঁহার ফিরিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন পত্নী সুভাষিণীর খর রসনা শব্দহীন হইয়া গেল। স্বামীর অবর্ত্তমানে চারিটি পুত্রকন্যা লইয়া কাহার দ্বারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইবে, সেই ভাবনাই হইল প্রবল। খাইবার লোক অনেকগুলি হইলেও উপার্জ্জনের ব্যক্তি ঐ একটিই ছিল এবং সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটি তাহাকে অকূলে ভাসাইয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে! আসুক সে একবার, তার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে। উপস্থিত ঘরে অন্নাভাব—তাহার একটা বিধান করা চাই। সুতরাং এক-গলা ঘোমটা টানিয়া সুভাষিণী প্রথমে চাটুয্যেদের বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানা-ঘরের মধ্যে

ধূমপান-রত কর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"কি যে করি ঠাকুরপো, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। উনি ত আজ পাঁচ দিন বাড়ী-ছাড়া, কাচ্চাবাচ্চাগুলো নিয়ে কোথায় দাঁড়াই, কি-ই বা খেতে দিই বল?—জান ত আমার অবস্থার কথা।"

ঠাকুরপো গড়গড়ায় টান দিতে দিতে উত্তর দিলেন—"আসবে বৈ কি বৌ—দু' এক দিন এমনি চালিয়ে নাও। তার পর রাগটা পড়লে—"

সুভাষিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"রাগ? কিসের রাগ? ওঃ, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কোর! দেখেছিলে ত সেই চেলাকাঠ বিনি-দোষে শুধু শুধু আমার পিঠে ভাঙ্গতে এসেছিলেন। কেন, কি দোষ—কি তক্কির করেছিলাম—"

চাটুয্যে তাহার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিলেন,—"আহা-হা! তা নয় বৌ, এই ধর গিয়ে—মানুষ যদি সব সময় মাথা ঠিক রাখতে পারতো, ভাবনা কি?"

বৌ জবাব দিল,—"মাথা না ঠিক রাখবার কোন কায ত করিনি। যাই হোক ঠাকুরপো, সে ফিরে আসুক, তার পর তার ঘর, তার দোর, তার ছেলেমেয়ে সব তাকেই দিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায়, চ'লে যাব। অমন দাসী-বাঁদী-গিরি করলে যেখানে হোক দু'মুঠো জুটবে।"

বাড়ীর ভিতর হইতে চাটুয্যের দিদি ডাকিয়া কহিলেন,—"ওগো ছোটবৌ,—আজ ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখানে চাট্টি খেয়ে যাবি—বুঝলি? একটু সকাল সকাল আসিস ভাই—"

অতঃপর সুভাষিণী বড় ছেলেটিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চাষীপাড়ার মধু মণ্ডলের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। মধু তাহাদেরই যজমান এবং বেশ অবস্থাপন্ন। কয়েকটা ধানের মরাই, গুটি চারেক দুগ্ধবতী গাভী, বাসগৃহসংলগ্ন পুষ্করিণী ও তরি-তরকারীর বিস্তৃত ক্ষেত্র তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতেছে। মধু তাহাকে অভয় দিয়া বলিল,—"যদ্দিন দা'ঠাকুর না ফেরে, তদ্দিন তোমার কোন চিন্তে নেই—মা ঠাকরোণ। তবে আমাদের ষষ্ঠী-মাকালপুজো-টুজোগুলো—"

সুভাষিণী বলিল,—"তা বাবা, ষষ্ঠীপুজো, মনসাপুজো আমিই ক'রে দেব'খন—অন্ত সব পুজোর জন্তেও বামুন ঠিক ক'রে দেব, ভেব না। কি আর বলবো, বাবা, রেত্তের প্রাতঃবাক্যে চিরজীবি হয়ে থাক, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

দেখিতে দেখিতে ছয়টি মাস কাটিয়া গেল; বিদ্যাভূষণ গৃহে ফিরিলেন না। লোকমুখে সুভাষিণী তাঁহার সংবাদ পাইয়া মনে মনে সুখীই হইয়াছিল। স্বামী বাঁচিয়া আছেন ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, উপার্জ্জনের বিত্ত না লইয়া গৃহে পদার্পণ করিবেন না। যে অভাবের জন্য কলহের নিত্য-বহ্নি রাবণের চিতার মত অহরহ জ্বলিয়া থাকিত, তাহা—অর্থবারিসেকে চির-নির্ব্বাপিত করিতে বিদ্যাভূষণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার না আসার জন্য সুভাষিণীর একটুমাত্র আক্ষেপ ছিল না। মধু মণ্ডল সংসারের ভার লইয়াছিল; সুভা পুত্র-কন্যার উপর অবাধ রসনার সদ্ব্যবহার করিয়া স্বচ্ছন্দমনে দিনপাত করিতেছিল।

আরও একটি বৎসর পরে—গোরুর গাড়ী বোঝাই—ছোট দুইটা আলমারী,—একটি টেবল, দুইখানা চেয়ার,—বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথির কয়েকখানা চিকিৎসা-পুস্তক, ছোট-বড় শিশিতে নানা রকমের ঔষধ এবং আরও না-জানা কত কি দ্রব্যের সহিত অগাধ বিদ্যা পেটে পুরিয়া ও কয়েক শত রৌপ্যমুদ্রা ক্যাশ-ব্যাক্সে ভরিয়া বিদ্যাভূষণ বৈশাখের অপরাহ্ণে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।—পুত্র-কন্যারা আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। বিদ্যাভূষণ গাড়োয়ানের সাহায্যে একে একে জিনিষ-পত্রগুলি ভগ্ন গৃহ-দাওয়ায় তুলিয়া সুভাষিণীর দর্শনলাভাশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, গৃহিণী রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বেশ আগ্রহ-কৌতুকে দাওয়া-ভর্ত্তি জিনিষ-পত্র লক্ষ্য করিতেছে। অন্নাভাবে শরীরের কোথাও টোল পড়ে নাই বা বিদ্যাভূষণের বিরহে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া নামে নাই। পরণের কাপড়খানাও বেশ—ফরসা এবং বোধ হয় সবে মাত্র দুই এক ধোপ পড়িয়াছে।

পত্নীর স্বাস্থ্যপূর্ণ নিটোল দেহের পানে চাহিয়া বিদ্যাভূষণ একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলিলেন; পরে বড় মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"ওরে পুঁটি—একবার এ দিকে আয় না! জিনিষপত্তরগুলো কি দাওয়ায় প'ড়ে থাকবে? সব গেল কোথায়? ক্যাশ-ব্যাক্সটা যে ঘরে রাখতে হবে—জুতো প'রে কি ক'রে ঘর ঢুকি?"

সুভাষিণী রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বিদ্যাভূষণের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, "বলি, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ

কেন? কেউ ত কাণাও নয়—কালাও হই নি। সব দেখিছি। 'হেঁসেলটা সামলে তবে আসবো ত—! কৈ—দেও তোমার ক্যাশ-বাক্স—দাঁড়াও—দাঁড়াও, আগে একটা পেন্নাম করি।"

বিদ্যাভূষণ:কে বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাওয়াইয়া সেই অপ্রিয়-ভাষিণী নারী সত্যই তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

"হাঁ—হাঁ, থাক্ থাক্" বলিতে বলিতে পুলকিত বিদ্যাভূষণ ক্যাশ-বাক্সটি পত্নীর করে অর্পণ করিলেন।

সুভাষিণী সেটি কাঁকালে লইয়া বলিল, "পুরুষ নেমক-হারামের জাত! এক-কথায় মাগ-ছেলে ভাসিয়ে দিয়ে উধাও হ'তে পারে; আমরা ত আর তা পারি নে! তাই লাথি-ঝেঁটা খেয়েও দু'মুঠো ভাতের জন্যে মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকি।" বলিতে বলিতে গৃহিণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিদ্যাভূষণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, প্রথম পত্তনে মধু এবং তিক্ত আস্বাদ—মন্দ কি! ফাঁড়া বোধ হয় কাটিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, সে দিন আহারের পারিপাট্য উত্তমরূপেই হইল। রাত্রিতে শয়ন করিয়া বিরহসন্তপ্তা পত্নী সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করিল,—"বাক্সটা ত ভারী মন্দ নয়, ওতে কত টাকা আছে?"

বিদ্যাভূষণের একটু রহস্য করিবার সাধ হইল। কৌতুক-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন,—"বল দিকি কত?

গৃহিণী একটু উচ্চস্বরে বলিল—"আমি গণককার কি না যে গুণে বলবো! নাও, ঢং রাখ।"

অগত্যা নিরাশ বিদ্যাভূষণ ক্ষুব্ধস্বরে উত্তর দিলেন,—"৪ শো টাকা হবে। মনে করিছি, বাইরে একখানা ঘর তুলে ডাক্তারীটা ভাল ক'রে চালাব।"

সুভাষিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—"ও মা গো—তা আর নয়! আমি বলে কদ্দিন ধ'রে মনে করেছি দু'গাছা অনন্ত গড়াবো! তবু অসময়ের স্থিতু। উনি ঘরে টাকা ওড়াবেন, পোড়া-কপাল বুদ্ধির!"

মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বিদ্যাভূষণ কহিলেন,—"দূর পাগল! কি বলে দেখ। আগে পসার হোক, তখন শুধু অনন্ত কেন—বালা, চুড়ি, হার, সব গড়িয়ে দেব। এখন কি ও সব মতলব করে? লক্ষ্মীটি!"

সুভাষিণী কহিল,—"ধর, যদি পসার না জমে? তখন এ-কূল ও-কূল দু'ই যাবে। তার চেয়ে—"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বিনীত কণ্ঠে বিদ্যাভূষণ কহিলেন,—"মানুষ জীবন-ভোর চেষ্টা করে,—না হ'লে পয়সা-কড়ি আসবে কেন? আর পসার হবে না তোমায় কে বলেছে! ঐ ত রতনা ডাক্তার এত বড় গাঁয়ে টিম্-টিম্ করছে—ও কি কখনো ক'লকাতা দেখেছে—না মেডিকেল কলেজ কেমন ধারা, কোন্‌মুখো জানে? এই তোমায় ব'লে রাখছি, এক বছরের মধ্যে যদি ২৫ ভরির অনন্ত গড়িয়ে দিতে না পারি ত আমার নামই নয়। দাঁড়াও না, আগে একবার বাইরের ঘরখানা তুলে, শিশি আলমারী সাজিয়ে বসি, তখন দেখবো—কে কত বড় নামজাদা ডাক্তার! এই শর্ম্মার ঠেলায় বাপ বাপ ব'লে পালাতে পথ পাবে না।"

স্বামীর বাক্যে পরিতৃপ্ত হইয়া সুভাষিণী কহিল,—"তা বেশ ত, তুমি যা ভাল বোঝ, কর। তবে ও থেকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমায় দিও, দু'গাছা রুলীই এখন গড়াই। পাঁচ জনের সাম্নে নেহাৎ খালি হাতে বেরুতে—আমার মাথা কাটা যায়।"

গৃহিণীর সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য বিদ্যাভূষণ ইহাতে সম্মতি দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'অম্বলের' অসুখ

বাহিরের ঘর উঠিয়াছে। দুয়ারের মাথায় মস্ত বড় এক ইংরাজী-বাঙ্গালা-মিশ্রিত সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে। তাহাতে লেখা আছে—ডাক্তার কে, সি, বিদ্যাভূষণ এম্, বি (হোমিও) এম্, এচ, এম্, এ। মাত্র দেড়টি বৎসরে এত বড় গাল-ভরা নাম—দাঁত-ভাঙ্গা উপাধি তিনি সহর কলিকাতায় উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং ইহার অন্তরালে কত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, তাহা বিস্ময়চকিত পল্লী-বাসীরা রূপকথার মত বলাবলি করিতে থাকে।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাভূষণের পসার জমিয়া উঠিল। সকাল-বৈকাল এক এক ঘণ্টা বিনা দর্শনীতে রোগী দেখিয়া ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া,—লোককে মিষ্ট কথায় পরিতুষ্ট ও রতন ডাক্তারের চিকিৎসার শতমুখে নিন্দা করিয়া অচিরেই

তিনি ইতর-ভদ্রের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে গৃহিণীর প্রকোষ্ঠ ১৫ ভরির অনন্তে সুশোভিত হইল, ছেলে-মেয়েরা বই বগলে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যাতায়াত করিতে লাগিল ও একটি সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণের—ক্ষুদ্র গোয়ালঘরে স্থান পাইল।

হইল সব, কিন্তু সুসময় পাইয়া পত্নীর মনের সন্দেহ একে একে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

এক দিন বিশ্রান্ত স্বামীর শিয়োদেশে বসিয়া সুভাষিণী কথা পাড়িল,-"বলি, এত দিন যে কলকাতায় প'ড়েছিলে—তা দেশভূঁই ব'লে একবারও মনে হয় নি বুঝি? কোন্ একখানা চিঠি দিয়ে খোঁজ নিয়েছিলে—কেমন আছি?"

বিদ্যাভূষণ হাসিমুখে জবাব দিলেন,—"কি জান, পড়াশুনো নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, নাবার খাবার সময় ছিল না।"

সুভাষিণী শ্লেষ মাখাইয়া বলিল,—"হাঁ.গো হাঁ, দেড় বচ্ছর চান করনি—খাওনি, ঘুমোওনি! ও সব চালাকী কার কাছে করছো! মনে কর, আমি কচি খুকী—কিছুই বুঝি না?"

ঈশান কোণে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া বিদ্যাভূষণ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"যাক্—যাক্ ও সব কথা। যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর—"

গৃহিণী মুখ মচ্‌কাইয়া কহিল,—"কথা তুলি সাধে! আমার যে বুকের ভেতর জ্ব'লে যায়। এমন নেমকহারাম তুমি যে, হাড়মাস ভাজা-ভাজা ক'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে! একবারও ভাবলে না, একা মেয়েমানুষ কাচ্চাবাচ্চাগুলো নিয়ে কি করবে—কি খাবে—কি পরবে? তার পর বছরাবধি একখানা পত্তর পর্য্যন্ত দিলে না! ও সব আমরা ঢের বুঝি—গোড়ায় রস থাকলে এক বছর কেন, দশ বছর পরিবার ছেড়ে থাকা যায়।" বলিয়া সে চক্ষুতে অঞ্চল তুলিয়া দিল।

বিদ্যাভূষণ প্রমাদ গণিয়া কহিলেন,—"দেখ দেখি একবার, কি কথায় কি উত্তর! পাগল আর কারে বলে? তবু কাঁদে—এই—এই আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলছি,—যে দিব্যি করতে বল, তাই করছি—ও সব প্রবৃত্তি আমার কখনও হয়নি। সত্যি—"

হাতখানা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"অত দিব্যি-দিপাস্তরে দরকার কি? আমি ঢের জানি। কি বলবো—নেহাৎ ছেলেগুলোর মায়ায় প'ড়ে তোমার ঘর করছি, নৈলে সত্যি বলছি—এত দিনে কোন্ বেটী না ঘরকন্নায় নাথি মেরে এক দিক পানে চ'লে যেত। ইঃ—ভারী—ভাতের ভবভবানী। এই যে বছরাবধি কোন্ চুলোয় ছিলে—অভাব হয়েছিল কোন দিন?"

বিদ্যাভূষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

পত্নী সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া কহিল,—"বলি, ও পাড়ার ধরণীদের বাড়ী কার অসুখ করেছে যে, রোজ রোজ ডাক পড়ে?"

এতক্ষণে বিদ্যাভূষণের বোধগম্য হইল—এতখানি ভূমিকার মূল সূত্র কোথায়। সে দিন ধরণীদের বাড়ীর সংবাদ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—একটি ছোট ছেলের অসুখ হইয়াছে। এ কয় দিনে ছেলেটি নিরাময় হইয়া উঠিয়াছিল ও তাহার স্থলে তাহার মা অসুস্থা হইয়া তাঁহার চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। গৃহিণী জানিত, ছেলেরই অসুখ—সুতরাং আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। তিনিও বাহুল্য বোধে নূতন রোগীর সংবাদ দেন নাই, এবং বিভ্রাট হয় ত এইখানেই বাধিয়াছে অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "সেই যে চিন্তার ছোট ছেলেটির ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, সারাতে এ কদিন গেল।"

সুভাষিণী বাধা দিয়া বলিল,—"তবে যে নাপিত-বৌ বলছিল—চিন্তার বৌয়ের কি হয়েছে? আমার কাছে সব লুকোচুরী!"

মরিয়া হইয়া বিদ্যাভূষণ বলিলেন,"হ্যাঁ—তা তো হয়েইছে। কাল ছোঁড়াটা পথ্যি পেয়েছে—কাল থেকেই বৌটির অসুখ; তা ডাকলে কি চিকিৎসা করতে পারবো না বলা চলে?"

গৃহিণী বলিল,—"চিকিচ্ছে কর্ত্তে তোমায় কে বারণ করছে! তবে মনে পাপ না থাকলে এত ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় আসে না—এই আমি স্পষ্টই বলছি। কালী ঠাকুরঝি ঠিকই বলেছিল—কলকেতায় গেলে মনিষ্যির স্বভাব-চরিত্তির বিগড়ে যায়। তা বৌয়ের অসুখটা কি?"

গম্ভীর মুখে বিদ্যাভূষণ বলিলেন,—"সে তুমি বুঝবে না—অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও রোগ হয়।"

গৃহিণী চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল,—"বল কি—এমন! তবে বাপু কাল থেকে একটা ঝি-টি রেখো। ও গরুর জাব দেওয়া—উঠান ঝাঁট, কাপড় কাচা, জল তোলা,—আমার দ্বারা আর হয়ে উঠবে না। বলি, দিন দিন বয়স বাড়ছে—না কমছে? বারো মাস শীত-গ্রীষ্মি ঠেলে সংসারের হাড়ভাজা

খাটুনি খাটতে পারি ? আবার কাল থেকে বুকের গোড়ায় কেমন ব্যথা ধরেছে—বোধ হয় অম্বলের ব্যথা।"

বিদ্যাভূষণ মনে মনে আপন বুদ্ধিকে শত ধিক্কার দিয়া ভাবিলেন,—কি কুক্ষণেই ডাক্তারী শিখিয়াছিলেন! সুদে আসলে সমস্ত রোগের উপসর্গগুলি গৃহিণীর মারফৎ ফেরৎ আসিতেছে। এখন উপায়!

কর্ত্তাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গৃহিণী উচ্চস্বরে বলিল,—"কি—মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো না কি!—এই রইলো তোমার সংসার—"

বলিয়া যেমন উঠিতে যাইবে—অমনি কর্ত্তা হাত ধরিয়া কহিলেন,—"কি পাগল!—আমি ভাবছিলুম কি—কাকে রাখা যায়!—ও পাড়ার ক্ষীরিকে রাখলে চলবে বোধ হয়—কি বল? খোরপোষ বাদ—যা চায়, দেওয়া যাবে।"

অতঃপর গৃহিণী বিছানায় বসিয়া কহিল,—"আর অম্বলের একটা ওষুধ—"

হাসিয়া বিদ্যাভূষণ কহিলেন,—"ও কিছু নয়—এক ফোঁটা নাক্স খেলে ব্যথাট্যাথা পালাবার পথ পাবে না। আন ত ছোট ওষুধের বাক্সোটা।"

ইহার কয়েক দিন পরে বিদ্যাভূষণ বাড়ী ঢুকিতে না ঢুকিতে সুভাষিণী চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল,—"বলি, এত বেলা অবধি কোন্ চুলোয় ছিলে? হাঁড়ী হেঁসেল আগলে ব'সে রয়েছি।"

ক্ষুধার তাড়নায় বিদ্যাভূষণের মাথা ঘুরিতেছিল। তিনিও অল্প উত্তেজিত হইয়া জবাব দিলেন—"আমার সখ কি না—তাই—দুপুর রোদে টো-টো ক'রে হাওয়া খাচ্ছিলুম—" বলিয়া হস্তস্থিত ছাতাটা সবেগে দাওয়ার উপর আছড়াইয়া ফেলিলেন।

সুভাষিণী ছুটিয়া আসিয়া ছাতাটিকে সেখান হইতে ছুড়িয়া উঠানের এক পাশে ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"পুরুষের তেজ দেখ! বলে ভাত দেবার কেউ নয়—নাক কাটবার গোঁসাই!—সেই ভোর বেলা—কাক-কোকিল ডাকতে না ডাকতে উঠে—উঠোন ঝাঁট রে,—গরুকে জাব দেওয়া রে,—ঘর নিকোন রে,—কি না করছি! তার পর হাঁসের পুরীর গেলা-কোটার জোগাড়—অসুখ ব'লে দু'দণ্ড বিছানায় শুয়ে রয়েছি কি না—তাই পুরুষ এলেন তেজ দেখাতে! সাত ঝাঁটা মারি তোর তেজের মাথায়।"

সহসা বিদ্যাভূষণের মনে—আড়াই বৎসর পূর্ব্বের—একটা দুঃস্মৃতি জাগিয়া উঠিল,—তৎক্ষণাৎ উগ্র ক্রোধকে হাসির আবরণে শান্ত করিয়া মৃদু চাপা গলায় কহিলেন,—"আঃ, কি কর, চুপ কর—চুপ কর। ঘাট হয়েছে—বুঝতে পারিনি।"

রান্নাঘরে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে পুঁটি বলিল,—"এই দুলে—দেখ দেখ, বাবা—হাত জোড় ক'রে মার কাছে—ঘাট মানছে! হি-হি।"

দুলে বলিল,—"দেখ দিদি, বাবাটা কোন কম্মের নয়।—আমি হ'লে ঐ বাঁশখানা না দিয়ে—দিতাম মা'র মাথায় কসে এক-ঘা বসিয়ে! ব্যস্, মাথা ফটাং।"

পুঁটি তাড়াতাড়ি কহিল,—"চুপ চুপ। মা আসছে, খেয়ে নে।—"

পরদিন প্রত্যূষে ক্ষীরি আসিয়া কাযে ভর্ত্তি হইল ও সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর অম্বলের ব্যথা বাড়িয়া উঠিল।—নিতান্ত দুই মুঠা সিদ্ধ না করিলে নহে—স্বামি-পুত্র-কন্যারা উপবাসী থাকে, তাই যেন অতি কষ্টে রান্নাঘরে আসিয়া বসিল। পুঁটি কুটনা, বাটনা ও জলের ঘটী আগাইয়া দেয়—পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সুভাষিণী রন্ধন করে।—আহারান্তে বেলা দু'টায় শয়ন ও রাত্রি ১০৷১১টায় পুনরায় আহারের আয়োজন, ইহাতেই যেন সময়ে কুলাইয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু শরীর অসুস্থ বলিয়া রসনার দুর্ব্বলতা মোটেই অনুভূত হয় না।—ইলেকট্রিক মেসিনের মত তাহা অবিরত চলিয়া থাকে। সব কাযে থিম্ থিম্ করা, রোগের অনুপাতে বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর বাড়িয়াছে বিদ্যাভূষণের গতিবিধির খুঁটিনাটি খবরটুকু লওয়া। দিনান্তে কতগুলি রোগী—তিনি দেখেন! তাহারা পুরুষ, না স্ত্রী, না শিশু? বয়স কত? কি অসুখ ও কাহার বাড়ীতে দিনে কতবার যাতায়াত করিতে হয়—ইত্যাদি। কলিকাতা-প্রত্যাগত স্বামীকে সে মোটেই বিশ্বাস করে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোগীর সঙ্গে বকিয়া বকিয়া একে ত বিদ্যাভূষণের মাথা খারাপ হইবার উপক্রম, তাহার উপর গৃহে ফিরিয়া নিত্য লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করা। এক একবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, সব ত্যাগ করিয়া এক দিক্ পানে দৌড় দেন। এ ভাবে দিবা-রাত্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও খর-রসনার শিকার হইয়া থাকার অপেক্ষা বনবাস ঢের বেশী শ্রেয়ঃ। এই 'সংসার-ধর্ম্মের' অপেক্ষা ঘোরতর অধর্ম্ম বুঝি সারা বিশ্বের কোথাও আর নাই।—যে শাস্ত্রকার বিধান দিয়াছিলেন—'গৃহিণী গৃহে লক্ষ্মী' তাঁহার দর্শন পাইলে বিদ্যাভূষণ চোখে আঙ্গুল দিয়া

দেখাইয়া দেন, কত বড় ভুল তুমি ছাপার হরফে তুলিয়া দিয়া বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করিয়াছ, একবার বুঝিয়া দেখ!

যাহা হউক, খর-রসনাসঞ্চালনের ফলে ক্ষীরি এক দিন সুভাষিণীর মুখের উপর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র দুলাইয়া জবাব দিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর অম্বলের ব্যথা চাগাইয়া উঠিল।—শয্যায় শয়ন করিয়া সে এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রোগ আরোগ্য

বেলা দ্বিপ্রহর। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিদ্যাভূষণ বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন,—ছোট ছেলেটাকে কোলে করিয়া পুঁটি ম্লানমুখে দাওয়ায় বসিয়া আছে, রান্নাঘরে শিকল বন্ধ, চারিদিক্ নিস্তব্ধ। ছাতাটা আস্তে আস্তে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে মেয়েকে মৃদুস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরা সব গেল কোথায়—? রান্নাঘর বন্ধ কেন?"

পুঁটি ফিস্ ফিস্ করিয়া জানাইল,—মা'র অসুখ, ক্ষীরি কাষ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং আজ রান্না হয় নাই।

শুনিয়া ক্ষুধিত, শ্রান্ত বিদ্যাভূষণের অঙ্গ শীতল হইয়া গেল। ধপ করিয়া জলচৌকিটার উপর বসিয়া পড়িয়া বিরক্তিমাখা স্বরে তিনি বলিলেন,—"জ্বালা ছুতো হয়েছে এক অম্বলের ব্যায়রাম! পয়সার সঙ্গে সঙ্গে যেন নানানখানা জুগিয়ে থাকে। এই যে এ্যাদ্দিন জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সব করতে হ'তো—কৈ, কোন অসুখের নামগন্ধ ত শুনি নি—?"

পুঁটি চোখ টিপিয়া কহিল,—"চুপ চুপ! মা ও-ঘরে শুয়ে আছে, শুনতে পাবে!"

বিদ্যাভূষণের সারা অন্তর রি-রি করিয়া জ্বলিতেছিল। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—"ওঃ, বড় বয়েই গেল তাতে! আজ অসুখ—কাল অসুখ—লেগেই আছে। এই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরছি—কৈ, অসুখ ত আমাদের হয় না। সময়ে যদি দু'মুঠো খেতেই না পেলুম—ত বনে গিয়ে বাস কল্লেই হয়। অম্বল—অম্বল! অম্বল আবার অসুখ নাকি?"

গৃহমধ্যে তক্তপোষের ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হইল। ঝনাৎ করিয়া দুয়ারটা খুলিয়া গেল ও প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শয্যাশায়িনী রোগিণী আপন রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া দুই নয়নে অগ্নিকণা ঢালিয়া উগ্রমূর্ত্তিতে বিদ্যাভূষণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর—?

আড়াই বৎসর পূর্ব্বের সেই ভীষণ সম্মুখ-সমর,—সেই উঠানের মাঝে পাড়ার যুবকবৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষের সমাগম,—কুৎসিত গালিগালাজ ও আস্ফালনে ভাদ্রের নিদারুণ গুমোটের বক্ষোভেদ এবং বিদ্যাভূষণের অন্তর্দ্ধান।

সময়ে সময়ে বনবাস শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেও পাঁচ দিনের দিন হিরু মণ্ডলের বাটীতে স্বপাক অন্নের সহিত ঘন দুগ্ধটুকু চুমুক দিয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে গৃহত্যাগী বিদ্যাভূষণ মনে করিলেন,—"আর ছন্নছাড়ার মত—এ-ধার ও-ধার ঘোরা ভাল দেখায় না। যা হোক গাঁয়ে পসার হয়েছে—দু' এক টাকার মুখও দেখতে পাচ্ছি। ছেলে-মেয়েগুলোর উপরও কেমন মায়া প'ড়ে গেছে! গৃহত্যাগ বল্লেই কি এক কথায় সব ছেড়ে-ছুড়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায়। মরুক গে—ও শাঁখের করাত যেতেও কাটবে—আসতেও কাটবে। যখন দু'বেলা পেট পুরে জুটতো না—তখনও যা, আর—এখন সোনাদানা গায়ে দিয়ে, দুধ ঘি মাছের দাগা খেয়েও তাই! যাক্—ফেরাই যাক। অম্বল হয়—বাক্‌সো ভর্ত্তি ওষুধ আছে—খাইয়ে পেটে চড়া পড়িয়ে দেব, গাল দেয়—এ কাণ দিয়ে শুনবো—ও কাণ দিয়ে বার করবো—আর যদি দু'ঘা মারে, না হয়—পিঠই পেতে দেব!"

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রন্ধনগৃহে 'ছ্যাঁক' 'ছোঁক' শব্দ হইতেছিল ও ভর্জ্জিত তাল-ফুলুরীর সুগন্ধ ভাসিয়া আসিয়া নাসারন্ধ্র আকুল করিতেছিল। পুঁটি দাওয়ায় আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া ছোট খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা রান্নাঘরে বসিয়া সদ্যোভর্জ্জিত ফুলুরীর জন্য কোলাহল জুড়িয়া দিয়াছিল।

বিদ্যাভূষণ পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহের দাওয়ায় উঠিয়া পুঁটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ রে—পুঁটি—তোর "মা কি কচ্ছে?"

পুঁটি পিতাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া—ডাকিল—"মা! বা—"

বিদ্যাভূষণ তাড়াতাড়ি পুঁটির মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "চুপ—চুপ—রাক্ষুসী।"

রন্ধনগৃহ হইতে চিরপরিচিত কাংস্য বিনিন্দিত কণ্ঠে শব্দ আসিল,—"আ—মরণ! চেঁচিয়ে মচ্ছ— কেন? দু' দণ্ড আর তর সয় না! এই হ'লো ব'লে।"

বিদ্যাভূষণ মৃদু নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন,—"তোর মা'র অম্বলের অসুখ সেরে গেছে?"

পুঁটি কহিল,—"সে—ক—বে। তুমি যে দিন পালাও, সেই দিন থেকে।"

"রুগী পত্তর আসে?

"হুঁ। মা-ই তো—শিশিতে জল ভ'রে ভ'রে ওষুধ দেয়।"

"তার পর তোদের বকে-টকে না?"

"না, তা বকবে কেন? কাল খোকাকে এমন দুম ক'রে মাটীতে বসিয়ে দিয়েছিল—যে ককিয়ে যায় আর কি!"

বিদ্যাভূষণ শুষ্ককণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার কথা কিছু বলেছিল না কি?"

পুঁটি এক গাল হাসিয়া বলিল—"মা বলেছে—একবার এলে হয় বাড়ী—ঐ চালের বাতায়—মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি—" বলিয়া সেই দিকে সে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল।

বিদ্যাভূষণের বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কপাল বহিয়া দরদর ধারে ঘাম ঝরিতে লাগিল। মুখে আর প্রশ্ন জোগাইল না।

পুঁটি তাহার পানে চাহিয়া কহিল,—"ও কি বাবা, তুমি কাঁদছো কেন?—"

কম্পিত কণ্ঠে বিদ্যাভূষণ কহিলেন,—"বড় পেট ব্যথা করছে মা! কৈ—গাড়ুটা কোথায়?" বলিতে বলিতে এক হাতে কচ্ছ মুক্ত করিয়া ও অপর হাতে উঠানের এক প্রান্তে নিপতিত জলশূন্য গাড়ুটা তুলিয়া লইয়া—পাশের মাঠের উদ্দেশে ছুটিলেন।

রান্নাঘর হইতে তীক্ষ্ণ কঠোর শব্দ—আসিল—"কে রা ছুটে পালায়?

পুঁটি কহিল—"ও বাবা।—"

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বসন্তের জাগরণ

আজকে হঠাৎ ভেঙ্গেছে ঘুম চোখে কিরণ লাগে।
শান্ত পূত তৃষিত প্রাণ হর্ষ শুধু মাগে॥
আজকে স্নেহ নয় রে দূরে ঠেকছে কোলে পিঠে।
দৃষ্টি আমার সবায় চুমে বল্‌ছে মিঠে মিঠে!

বাতাস বলে এসো এসো—আলোক্ বলে ভাই!
বনাঞ্চলা পৃথ্বী বলে—আয় রে বুকের ঠাঁই!
কচি পাতার আঙ্গুল মেলি তরু আমায় ডাকে।
দিগন্ত আজ বাড়ায় বাহু দূর বনানীর ফাঁকে॥

কাননচারী পশুরা আজ চাটছে স্নেহে গা।
শান্ত কপোত ঠোঁট চুমে কয় নাই রে ভাবনা॥
দেশের সীমা হারিয়ে গেছে—জাতির ছোট বড়।
বুকের দ্বারে ভাই-বোনেরা সবাই হলো জড়॥

অসীম থেকে সোনার হাতে আজকে ধীরে ধীরে,
প্রেম চপল ওই অঙ্গুলেতে হৃদয়-বন্ধনীরে,
এই যে খুলে দিল ঢেলে আঁধারে তাঁর হাসি।
ভুবন ভ'রে উঠল জেগে শত যুগের বাঁশী॥

আর ত কেহ নয় অচেনা—নয় রে কেহ পর।
মনের তীরে সৃষ্টি নিখিল বাঁধল প্রীতির ঘর॥
ওই যে নভে জলের স্থলে যতেক লোকে লোকে;
সবার হাসি প্রেম আবাহন দেখছি মনের চোখে।

আর ত আমি ক্ষুদ্র নহি—নই রে এমা দীন!
ভূমার সুরে আজকে বাজে আমার মনোবীণ!
নই আমি আর ধরার, ধূলায়—অনন্তের ওই কোলে।
চিরন্তনের অশ্রু হাসি আজ বুকে মোর দোলে॥

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী

শাস্ত্রজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

আজকাল আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তার একটা তরঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন। এই বিষয়ে লোক কথায় যেরূপ স্বাধীন চিন্তার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছে, সেই আগ্রহ যদি তাহারা কার্য্যে পরিণত করে, তাহা হইলে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, বরং লাভই হয়। কিন্তু স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইলে ঐরূপ করিবার শক্তি থাকা চাই। নতুবা স্বাধীনভাবে বিচার করা যায় না। যে ব্যক্তির বুদ্ধির স্বাধীনতা নাই, সে ব্যক্তি কখনই স্বাধীনভাবে বিচার করিতে পারে না। যে ব্যক্তির বুদ্ধি যে বিষয়ে পরাধীন, সে ব্যক্তি সে বিষয়ে কখনই স্বাধীনভাবে বিচার করিতে সমর্থ নহে। স্বাধীন চিন্তার প্রথম অন্তরায় আত্মগত (subjective)। অর্থাৎ আমার বুদ্ধি যেরূপ হইবে, বিচারও সেইরূপ হইবে। আমার বুদ্ধি যদি কতকগুলি সংস্কার দ্বারা উপহত হয়, তাহা হইলে আমি কিছুতেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ হইব না, আমার বিচারবুদ্ধি সেই সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেই হইবে। এ সম্বন্ধে একটা ব্যাপার বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রাজাকে বলা হয় যে, শীতে জল জমিয়া পাথরের মত শক্ত হয়। রাজা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করেন নাই। কারণ, তিনি কখনও জল জমিয়া বরফ হইয়া যাইতে দেখেন নাই। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা বা সংস্কারই ছিল যে, জলের সহিত তরলতার সম্বন্ধ নিত্য, উহা কিছুতেই বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না। তাঁহার এই সংস্কার যে ভ্রান্ত অর্থাৎ উহা যে কুসংস্কার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সেই কুসংস্কার বহুদর্শনজনিত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যেখানেই জল দেখিয়াছিলেন, সেইখানেই জলের তরলতা দেখিয়াছিলেন, তরলতাবর্জ্জিত জল তিনি কখনই দেখেন নাই; সুতরাং তাঁহার ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, জলের সহিত তরলতার নিত্য সম্বন্ধ। এরূপ কত কুসংস্কার যে মানুষের বুদ্ধির সহিত জড়াইয়া বুদ্ধিকে তাহার অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যিনি মনে করেন যে, তিনি কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিও বিষম ভ্রান্ত। কারণ, মানুষ কোনমতেই কুসংস্কারের হাত এড়াইতে পারে না। কতকগুলি কুসংস্কার ছায়ার ন্যায় মানুষের বুদ্ধির অনুগামী হইয়া থাকে। সেই জন্য আপনাকে কুসংস্কারশূন্য মনে করাও একটা কুসংস্কার— এ কথা এডমণ্ড বার্ক বলিয়া গিয়াছেন।

ভূয়োদর্শনের উপরও যে কুসংস্কারের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা অনেকেই বুঝেন না। শ্যাম দেশের রাজা জল অনেক স্থলেই দেখিয়াছিলেন,—হয় ত অনেক অবস্থায় জল দেখিয়াছিলেন। তিনি উত্তপ্ত জলও দেখিয়াছিলেন— শীতল জলও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ অবস্থায় জল জমিয়া বরফ হয়, জলের সেরূপ অবস্থা কখনই দেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তরলতা জলের নিত্য ধর্ম্ম—জল সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় জল জমিয়া যে পাথরের মত কঠিন হইতে পারে, এ ধারণা তিনি মনের মধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই কুসংস্কার ভূয়োদর্শনের অভাবজনিত নহে, অসমগ্র দর্শনজনিত। তিনি জলের বহু অবস্থা দেখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সকল অবস্থা দেখেন নাই। কাযেই তিনি ঐরূপ কুসংস্কারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। গ্রীণলণ্ডের কোন এস্কিমো যতই নির্ব্বোধ ও জড়মতি হউক না কেন, সে যদি শুনিতে পায় যে, এসিয়ার কোন রাজা জল জমিয়া কঠিন হয়, এ কথা শুনিয়া হাসিয়াছেন, তাহা হইলে সে নিশ্চিতই মনে করিবে যে, ঐ রাজার ন্যায় ঘোর নির্ব্বোধ ব্যক্তি আর পৃথিবীতে নাই। সে যে কি বলিয়া রাজ্যশাসন করে, তাহাই তাহার বুদ্ধির অগম্য হইয়া থাকে। এ জন্য শ্যামরাজকেও দোষ দেওয়া যায় না, এস্কিমোকেও দোষ দেওয়া যায় না। একই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তিতাফলে উভয়ের বুদ্ধি যেরূপভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহারই প্রেরণায় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিয়াছে।

কুসংস্কার যে কেবল অসমগ্র তথ্যদর্শনের ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়, তাহা নহে, উহা বাল্যকালীন ভ্রান্ত শিক্ষার ফলেও বিশেষভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে। বাল্যশিক্ষার প্রভাব মানুষের বুদ্ধিকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, লোক কিছুতেই তাহার প্রভাব

অতিক্রম করিতে পারে না। এই ধরণের কুসংস্কার জনসমাজে অধিক মাত্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিব। আমরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই শিক্ষা করি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় পতিত ছিলেন, তখন তাঁহারা উত্তরমেরু প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর অসভ্য এ দেশের প্রদেশের লোককে জয় করিয়া এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণাটুকু আমাদের মনে এতই দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, ইহার প্রতিকূলে বহু প্রকারের প্রমাণ পাওয়া যাইলেও সে প্রমাণ যেন আমাদের মনঃপূত হয় না। য়ুরোপীয়দিগের ধারণা অথবা প্রদত্ত শিক্ষা এই যে, আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এ দেশে আদি দ্রাবিড়ীদিগের (Dravadian) বাস ছিল। তখন সেই আদি দ্রাবিড়ীজাতি অত্যন্ত অসভ্য ছিল। বলা বাহুল্য, ইদানীন্তন অনুসন্ধানের আলোকে যতদূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, আদি দ্রাবিড়ীজাতিরা গারো, সাঁওতাল প্রভৃতির ন্যায় নিতান্ত অসভ্য ছিল না; শিল্পে ও সাহিত্যে তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহারা গৃহনির্ম্মাণ করিত এবং সেই গৃহাদির নির্ম্মাণ-কৌশল নিতান্ত অসভ্যজনোচিত ছিল না। অতি প্রাচীনকালে তাহাদের যে সাহিত্য ছিল, সে সাহিত্য একবারে অসভ্য জাতির প্রাথমিক স্তরের আদি অভিব্যক্তিসূচক বলিয়া মনে হয় না। যদি এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, আদি দ্রাবিড়ীজাতি সভ্যতার পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, যে আর্য্যগণ ভিন্ন রাজ্য হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়াছিল, তাহারাও নিতান্ত অসভ্য ও বন্যভাবাপন্ন ছিল না। কারণ, অল্পসংখ্যক আগন্তুক অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক সুসভ্যজাতিকে জয় করা কঠিন; একরূপ অসম্ভব কার্য্য বলিয়াই মনে হয়। সত্য বটে, গল এবং ভ্যাণ্ডাল নামক অসভ্যজাতি সুসভ্য রোমকজাতিকে সংগ্রামে পরাজিত এবং পদানত করিয়াছিল, কিন্তু তাহার অন্য প্রবল কারণ বিদ্যমান ছিল। ইদানীং অনুসন্ধান দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণফলে রোমকজাতি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহাদের শারীরিক এবং মানসিক অবনতি ঘটিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা সহজেই অপেক্ষাকৃত অসভ্য এবং শক্তিশালী জাতি কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রোমকদিগের সভ্যতায় বাহ্য ঠাট বজায় ছিল, কিন্তু সে সভ্যতা তখন অন্তঃসারশূন্য আচারমাত্রে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। কাযেই সেই অসভ্য বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু বলীয়ান্ মানব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ঐ সুসভ্য বলিয়া পরিচিত, কিন্তু রোগজীর্ণ এবং অবনতির পথে প্রধাবিত জাতি বিজিত হইয়াছিল। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে সুসভ্যজাতি অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই সেই সুসভ্যজাতি বিলাসে বা ব্যাধিতে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক সুসভ্যজাতিকে জয় করা নিয়ম নহে, উহা ব্যতিক্রম। নিয়মকে মানিয়া লইয়াই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত। সুতরাং ভারতে যদি কখন আর্য্যবিজয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতে আক্রমণকারী আর্য্যগণ যে সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর ছিল, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বাল্যশিক্ষার প্রভাবে আমরা যে ধারণা করিয়া লইয়াছি যে, আগন্তুক আর্য্যগণ অসভ্য ছিল, সে ধারণা আমরা কিছুতেই মন হইতে দূরীভূত করিতে পারি না। সেই জন্য আমরা আমাদের পূর্ব্বজগণের অতি সমুন্নত সভ্যতাকে অবমাননা করিতে বাধ্য হই।

বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত প্রতীচ্যখণ্ডের অনেক কুসংস্কার আমাদের মনের উপর আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া আছে, তাহা অনেক সময় আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাইবেলের হিসাব হইতে বুঝা যায়, আমাদের এই পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে; ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নোয়ানামক জনৈক ব্যক্তির আমলে এই পৃথিবী অতি প্রবল বন্যায় প্লাবিত হয়, তাহার ফলে সমস্ত মানবজাতি ও জীবকুল ধ্বংস হইয়া যায়। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এই সংস্কার প্রতীচ্যজাতির মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান এখন তাঁহাদের মনের সেই কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা সেই কুসংস্কারের হস্ত হইতে এখনও সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এখনও তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২ হাজার অথবা ২ হাজার ২ শত বৎসর পূর্ব্বেকার মানুষের আর কোনরূপ সভ্যতা ছিল না। তাঁহারা বলেন, খৃঃ পূঃ ২২০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা নিম্রড প্রথমে স্বায়ী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার পূর্ব্বে মানবজাতির মধ্যে কোন রাজতন্ত্র ছিল না। মানুষ বন্য-পশুর ন্যায় বনচর হইয়া ঘুরিয়া

বেড়াইত। মিশরে ভূগর্ভে অতি প্রাচীনকালের মানবসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি পুরাবস্তু পাওয়া যায়। ভূস্তরের যে স্থানে উহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইতে স্বভাবতঃ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর অতীত হওয়া আবশ্যক হয়। তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হয় যে, ১৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও মিশরে সুসভ্য লোকের বাস ছিল। কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা তাঁহাদের পূর্ব্বসংস্কারে বাধিত বুদ্ধির দ্বারা সে তথ্য স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা স্থির করিলেন, বোধ হয়, কেহ কূপ খনন করিয়া ঐ দ্রব্যগুলি তাহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। নতুবা মনুষ্য-সভ্যতা অত প্রাচীন হইতে পারে না। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, ভারতে ৩ হাজার অথবা সাড়ে ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতারূপ উষার আলোক সুদূর দিক্‌চক্রবালে জ্যোতিরিঙ্গনের ন্যায় প্রথম দেখা দিয়াছিল। তখন সেই শিরালজঙ্ঘ, জটাজালমণ্ডিত, প্রায় মর্কটবৎ বুদ্ধিসম্পন্ন বৈদিক ঋষি নিশাবসানে তাহার সেই গুহাবাস ছাড়িয়া বনানী পার হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে আচম্বিতে এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহার নয়নসমক্ষে উদীয়মান বিবস্বানের জবাকুসুমসঙ্কাশ মনোহর মূর্ত্তি যেমন পতিত হইল, অমনই সে প্রকৃতির অনন্ত গৌরবে বিভোর হইয়া উদাত্ত স্বরে গাহিল :—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অর্থাৎ যিনি ভূলোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোক—এই ত্রিলোকের প্রসবিতা অর্থাৎ যাঁহা হইতে ঐ তিন লোক বাহির হইয়া আসিয়াছে, আমরা সেই জগৎপ্রসবকারীর বরণীয় তেজকে ধ্যান করি, যাঁহার প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।

স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার নাম ভূলোক। কল্পান্তে উপভোগের নিমিত্ত যে স্থানে প্রাণিগণ জন্মধারণ করে, তাহার নাম ভুবর্লোক, আর সুকৃতিসম্পন্ন লোকদিগের আলয়ের নাম স্বর্লোক বা স্বর্গলোক।

এখানে বলা আবশ্যক যে, য়ুরোপীয় বুধগণ স্থির করিয়াছেন যে, সপ্ত ব্যাহৃতির তিনটিমাত্র ব্যাহৃতি এই গায়ত্রী মন্ত্রে উত্তরকালে সংযোজিত হইয়াছে। আসল মন্ত্র এই—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

সেই সবিতৃদেবতার তেজ আমরা চিন্তা করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিশক্তিকে প্রেরণ করেন। য়ুরোপীয়রা সবিতৃদেব অর্থে কেবল সূর্য্যই বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার অর্থ The sungod বলিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুরা বলিয়া থাকেন ;—

সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥

যাঁহা হইতে প্রাণিগণের সর্ব্বপ্রকার ভাবের—মতিগতির উদ্ভব হইয়া থাকে, যিনি সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম সবিতা। ইহা ব্রহ্মেরই ধ্যান। কারণ, এই গায়ত্রীমন্ত্র জপের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর স্বরূপ এই ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন :—

ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, গায়ত্রী দেবী কুমারী, ঋগ্বেদযুক্তা, ব্রহ্মরূপা (অর্থাৎ ব্রহ্মার ন্যায় রূপবিশিষ্ট), হংসারূঢ়া, কুশহস্তা এবং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা। অর্থাৎ ইঁনি সূর্য্যমণ্ডল নহেন, সূর্য্যমণ্ডলে যে পরমব্রহ্মের বিভূতি বা শক্তি বিরাজমানা, তাঁহারই উপাসনা। এইরূপে মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ ও সায়াহ্নে শিবরূপা ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা পরমব্রহ্মের বিভূতিরূপে গায়ত্রীর বা সাবিত্রীর ধ্যান করিতে হয়। ব্রহ্ম নির্গুণ; কিন্তু তাঁহার শক্তি সগুণ। প্রভাতে ব্রহ্মার রূপে তাঁহার রজোগুণের, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে তাঁহার সত্ত্বগুণের এবং সায়াহ্নে তাঁহার তমোগুণের চিন্তা করিতে হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম মানুষের ধারণার অতীত। তাই হিন্দু সগুণ ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মবিভূতির বা আদ্যাশক্তিরই ধ্যান করিয়া থাকেন। সগুণ ব্রহ্মের বা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত আদি দেবতার তিনটি রূপে তিনটি শক্তি সুপ্রকাশ ; যথা :—ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুরূপে পালিকা শক্তি এবং শিবরূপে সংহারিণী শক্তি। সূর্য্যদেবই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ মূর্ত্তি। সেই জন্য সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া ভাগবতী শক্তির ধ্যান করিতে হয়। ইহাই হিন্দুর গায়ত্রী বা সাবিত্রীমন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা। এ ধারণা হিন্দুর শাস্ত্রজ্ঞানপ্রসূত।

কিন্তু য়ুরোপীয় বুধমণ্ডলী যখন এ দেশে আসিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম এবং রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে থাকিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এ দেশের যাহা কিছু সিদ্ধান্ত, তাহাই তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞানের (common sense) বিরোধী। হিন্দুরা বলে যে, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া কত খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই, কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্মসেবী য়ুরোপীয়গণের কাণ্ডজ্ঞান তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী খৃষ্টানদিগের মনে ধারণা ছিল যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪০০৪ অব্দে পৃথিবী সৃষ্ট হয়, এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৩৪৮ অব্দে নোয়ার আমলে সমস্ত পৃথিবী জলে প্লাবিত হইয়াছিল। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৫ হাজার ৯ শত ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে এবং খৃষ্ট জন্মিবার ৪ হাজার ২ শত ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে নোয়ার আমলে জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে। নোয়ার আমলের জলপ্লাবনে পৃথিবীর সকল জীব মরিয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র নোয়া তাঁহার জাহাজে এক এক জোড়া সকল জীব লইয়া ছিলেন বলিয়া তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। সুতরাং উহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি। পৃথিবীর সকল মানুষ সেই নোয়ারই বংশধর, সকল জীবই সেই নোয়া কর্তৃক রক্ষিত এক এক জোড়া জীবের বংশধর। য়ুরোপীয়গণ এই সংস্কারে লালিত-পালিত বলিয়া তাঁহারা আর কোন দেশের সভ্যতাকে ৩ হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন বলিয়া মনে করিতে পারেন না, কারণ, জলপ্লাবনের ১ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে আর সেই এক দম্পতির সন্তানে বা একই জীবযুগলের বংশধরে পূর্ণ হইতেই পারে না। ১ হাজার বৎসর অপেক্ষা অল্পসময়ে এক পিতামাতা হইতে উদ্ভূত সন্তানে এই বিশাল ধরা পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু এ দিকে বেদের কালকে ৩ হাজার বৎসরের কম বলিয়া ধার্য্য করা অসম্ভব। কারণ, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কাল আড়াই হাজার বৎসরেরও পূর্ব্ব-বর্ত্তী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার পূর্ব্বে আর অন্ততঃ ৫ শত বৎসর না সময় রাখিলে বৈদিক যুগের ভাষা কোনমতেই বৌদ্ধ যুগের ভাষায় পরিণত হইতেই পারে না। কাযেই তাঁহারা বৈদিক যুগের লোক ৩ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধারণার মধ্যেই আনিতে পারেন না। তাঁহারা আরও দেখিতেছেন যে, ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক ইটালী ও গ্রীস ভিন্ন সমস্ত য়ুরোপের অধিবাসীরা অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সকল জাতিরই আপনার দিকে একটা টান থাকে,—আপনাদের সভ্যতা সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা সকলেই পোষণ করে। ইহা মানুষের স্বভাব। সেই জন্য তাঁহারা বৈদিক যুগের ঋষিগণকে সভ্যতার উষাকালের বন্যভাবাপন্ন লোক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

য়ুরোপীয়দিগের এই সংস্কার যে কুসংস্কার, তাহা বর্ত্তমান যুগে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মানুষ কুসংস্কারের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাইতে পারে না। উহার প্রভাব মানুষের মন হইতে সহজে যাইতে চাহে না। অত্যন্ত অলক্ষ্যভাবে উহা মানুষের মনের উপর আধিপত্য করিতে থাকে। সেই জন্য অধিকাংশ য়ুরোপীয়ই এখনও মনে করিয়া থাকেন যে, মানবজাতির সভ্যতা কখনই ৪ হাজার বা বড় জোর সাড়ে ৪ হাজার বৎসরের পুরাতন হইতে পারে না। এই পৃথিবী যে কোটি কোটি বৎসর সৃষ্ট হইয়াছে,—ইহাতে মানবজাতির বহুরূপ সভ্যতার উদয় ও বিলয় হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই বিশ্বাস করিতে পারেন। উহা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী। আমরা এখন বাল্যকালে য়ুরোপীয় সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদের কাণ্ডজ্ঞানও সেই জন্য ঐরূপভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে সভ্যতায় উত্থান এবং পতন আছে, তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন না। আসল কথা, কাণ্ডজ্ঞান বা common sense শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। উহা সত্য-সন্ধানের অমোঘ পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

আমাদের দেশের এই সভ্যতা যে কত কালের প্রাচীন, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। সম্প্রতি মহেন্দোজোড়ো এবং হারাপ্পায় ভূগর্ভে যে পুরাকীর্ত্তি ও পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এই ভারতে সভ্যতার সূর্য্য সমুদিত হইয়া ভারতবর্ষে জ্ঞানের প্রখর আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিল। ঐ সকল পুরাবস্তু নিঃসন্দিগ্ধভাবে সপ্রমাণ করিতেছে যে, পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের অধিবাসীরা অতি সুদৃশ্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিতে, পাথর কাটিতে এবং কাচ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিত। তাহারা অতি সুন্দর কার্পাস-বস্ত্রও বয়ন করিত। যাহারা বাহ্য সভ্যতায়, পার্থিব ভোগ বিলাসের বস্তু নির্ম্মাণে এতদূর দক্ষতালাভ করিয়াছিল, তাহারা

যে আগুর সভ্যতায়, মানসিক জ্ঞানে নিতান্ত অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ইহা মনে করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য। সেই সভ্যতা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, কি ভাবে উহা উদ্ভূত এবং বিকশিত হইয়াছিল, তাহা জানিবারও আর কোন উপায়ই নাই। সে ইতিহাস এখন বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। কস্মিন্‌কালেও যে উহার উদ্ধারসাধন সম্ভব হইবে, তাহা আর আশা করা যাইতে পারে না। সভ্যতার আলোক অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় না। যদি কোন জাতি অন্য সভ্যজাতির সংস্পর্শে না আইসে, তাহা হইলে তাঁহাদের সভ্যতা-বিকাশের গতি অত্যন্ত মন্থর হইয়া থাকে। ইহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। মহেন্দোজোড়ো ও হারাপ্পায় যে সভ্যতার বাহ্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসী হিন্দুজাতির পূর্ব্বপুরুষদিগের সভ্যতা কি অন্য জাতির সভ্যতা, তাহা শুনিতেছি এখনও নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয় নাই। তবে ঐ সভ্যতাধারা পূর্ব্বদিকেও প্রসারিত ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ মিলিয়াছে। এই তথ্য এবং অন্যান্য কতকগুলি পুরাবস্তু দেখিয়া আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, উহা প্রাচীন আর্য্যগণের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের পূর্ব্বজগণের প্রাচীন সভ্যতার বাহ্য নিদর্শন। সে সভ্যতা যে কত পুরাতন, তাহা বলা কঠিন।

মহেন্দোজোড়োতে এবং হারাপ্পায় যে সকল পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতীয় সভ্যতার বাহ্য নিদর্শন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহার আন্তর নিদর্শনের কোন প্রমাণ আছে কি না, তাহাই এখন চিন্তা করা যাউক। আমরা দেখিতে পাই যে, মানসিক উন্নতির নিদর্শন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই পাওয়া যায়। এই ভারতে যত প্রাচীন সাহিত্য রক্ষিত হইয়াছে, তত আর কোন দেশেই হয় নাই। স্বর্গীয় পুরুষসিংহ বালগঙ্গাধর তিলক সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছে। তিনি বেদের মধ্য হইতেই অকাট্য প্রমাণবলে উহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু য়ুরোপীয়রা তাঁহাদের কুসংস্কারের ফলে উহা অত প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মহেন্দো-জোড়ার এবং হারাপ্পায় আবিষ্কৃত পুরাবস্তুগুলি যেন কতকটা তাঁহাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, এই প্রাচীন ঋগ্বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ গ্রন্থরচনাকালে একটি হিন্দুজাতির জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞান ছিল। ঋগ্বেদের ঋকের অর্থ এইরূপ :—

"এই যে গমনশীল চন্দ্র দেখিতেছ, ইহা স্বীয় আলোকে আলোকিত নহে; সূর্য্যের কিরণ ইহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে উহা আলোকিত হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করি, যে জাতি কেবলমাত্র বন্যভাব পরিহার করিয়া সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিতেছে, যাহারা অনন্ত গৌরবময় প্রাকৃতিক বস্তুর সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে কি এই সত্য আবিষ্কৃত করা সম্ভবে? যাঁহারা স্থিরভাবে এই কথার আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, উহা কখনই সম্ভবে না। বেদের সংহিতা-ভাগ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নহে, উহা স্তোত্র গ্রন্থ। সুতরাং উহাতে বৈজ্ঞানিক কথার বহুলভাবে সমাবেশ থাকিবে মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে বিক্ষিপ্তভাবে যে দুই চারিটি কথা পাওয়া যায়, তাহাতে উহার রচয়িতাদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও জ্যোতিষজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উহা অধিক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। আমরা পূর্ব্বে যে গায়ত্রীমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার দুইটি ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। একটি সূর্য্যপক্ষে আর একটি ব্রহ্মপক্ষে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার সবিতৃপক্ষে ব্যাখ্যাই সমীচীন মনে করেন। যদি উহার সূর্য্যপক্ষের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সবিতৃদেব যে এই জগতের (সৌরজগতের) প্রসবিতা অর্থাৎ এই সৌরজগতের গ্রহগণ সমস্তই সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই তথ্য তাঁহারা অবগত ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা তাহা বুঝিতেন এবং সূর্য্যদেবকে জীবনীশক্তির কারণ বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা যে অসভ্য ও বর্ব্বর ছিলেন না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বজগণ অতি প্রাচীনকালেই যে সভ্যতার উচ্চশিখরে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুর বহু প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ সভ্যতার অতি উচ্চস্তরে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বহু সিদ্ধান্ত এখন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ও আংশিকভাবে সমর্থিত হইতেছে। সেই সিদ্ধান্তগুলি মাত্র এখন প্রায় সূত্রাকারে শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। আবার সেই

সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় সভ্যতার অবনতিকালীন অনেক অপসিদ্ধান্তও গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। অনেক সিদ্ধান্তপূর্ণ শ্লোক অজ্ঞ টীকাকারদিগের দুর্ব্ব্যাখ্যার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য অনেকে শাস্ত্রবাক্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে সহসা বীতশ্রদ্ধ না হইয়া তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, উহার মধ্যে সাগরগর্ভে শুক্তিরাজির ন্যায় এক প্রাচীন সুসভ্য-জাতির যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক অমূল্য উপদেশ বিরাজ করিতেছে। উহা উপেক্ষায় পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা যে কমন্ সেন্স বা কাণ্ডজ্ঞানের অহঙ্কার করিয়া থাকি, তাহা প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় শিক্ষার দোষে আমাদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়া থাকে। আমরা বুদ্ধির অভ্রান্তবাদে বিশ্বাসী (Intuitionalist) নহি। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষার দোষে সহজজ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞান ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। প্রায়ই দেখা যায় যে, দুই জনের সহজজ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞান সমান হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে অতি প্রাচীন যুগের মনীষাপ্রসূত অনেক অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কালসহকারে হিন্দু-প্রতিভার অবনতির সহিত সেই সুসিদ্ধান্তের সহিত অনেক অপসিদ্ধান্তও জড়িত হইয়া গিয়াছে। যদি শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবুদ্ধি সহকারে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক পক্ষপাতশূন্য হইয়া উহার আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেই শাস্ত্র হইতে সমস্ত অপসিদ্ধান্ত বাদ দিয়া সুসিদ্ধান্তগুলি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহা করিতে হইলে শাস্ত্রালোচনাকারীর শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বাভাবিক প্রতিভা থাকা আবশুক। নতুবা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। স্বয়ং শাস্ত্রকারগণই বলিয়াছেন :—

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি॥

যাহার স্বীয় স্বাভাবিকী প্রতিভা নাই, শাস্ত্র তাহার কি করিবে? যাহার দুই চক্ষুই নাই, দর্পণে তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।

তবে এখানে একটা কথা বলা নিতান্তই আবশুক। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করা নানা কারণে অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, উহার লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ঠিক ধরিতে না পারিলে অনেক সময় শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝা কঠিন হয়। সেই জন্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি অগ্রে বুঝা চাই। তাহা হইলে আমার মনে হয়, শাস্ত্রার্থ বুঝিতে কোনরূপ কষ্ট হয় না। আবার অনেক সময় টীকাকারও একটু সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া গোল বাধাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ভাষ্য ও টীকা প্রচলিত আছে, তাহা শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইবার বহু পরবর্ত্তী কালে রচিত। অধিকাংশই বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী কালে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবকালে শাস্ত্রগুলির মধ্যে অনেক শাস্ত্র কোনক্রমে রক্ষা পাইলেও উহার প্রাচীন টীকাগুলি অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। কাযেই পরবর্ত্তী কালে যখন শাস্ত্র দুর্ব্ব্যাখ্যা-বিষমূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তখন কতকগুলি মনীষী আবার উহার ভাষ্য এবং টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল ভাষ্য এবং টীকা যে শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ের বিশেষ সহায়ক, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে মানুষমাত্রই ভ্রমপ্রমাদের অধীন। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। মনীষীরাও একবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহেন। কাযেই তাঁহাদের টীকা-টিপ্পনীতে দুই এক স্থানে যে ভুল হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? উদাহরণস্বরূপ আমি দুই তিনটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাংখ্যকারিকায় একটি সূত্র আছে :—

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"

এই সূত্রে এই কয়টি কথা আছে। জাতি,+অন্তর+পরিণাম+প্রকৃতি+আপূরাৎ অর্থাৎ জীবের যখন এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে (জাত্যন্তরে) পরিণাম বা পরিণতি হয়, তখন প্রকৃতি তাহার অভাব (প্রথম জাতি হইতে দ্বিতীয় জাতির যে প্রকৃতিগত পার্থক্য তাহা) পূরণ করিয়া দেন। ইহাই হইল সূত্রের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু অনেক টীকাকার ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, এক জাতীয় জীব যদি পুণ্যফলে সেই জন্মেই অন্য (উন্নততর) জীবদেহ ধারণ করে, তাহা হইলে প্রকৃতি তাহার প্রথম দেহ হইতে দ্বিতীয় দেহ গ্রহণকালে যে দেহগত অভাব ঘটিয়াছিল, প্রকৃতি তাহা পূরণ করিয়া দিয়া থাকেন। যেমন নহুষ রাজা যখন ঋষি-শাপে সর্প হইয়াছিলেন, তখন প্রকৃতিই তাঁহার মানুষদেহটাকে সর্পদেহে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। আবার তিনি যখন

সর্পদেহ ছাড়িয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করেন, তখনও প্রকৃতি তাঁহার সর্পদেহে মনুষ্যদেহের যাহা কিছু অভাব বিদ্যমান ছিল, প্রকৃতি তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। নন্দিকেশ্বর ষণ্ডদেহ হইতে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলে ঐরূপ হইয়াছিল। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার লইয়া দর্শনের সূত্র লিখিত হয় নাই। ভাষ্যকার সূত্রকারের স্থূল অর্থ বুঝিলেও লক্ষিত অর্থ বুঝিতে গোল করিয়াছেন।

আবার আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি ঐ সূত্রটিকে ডারউইনের থিয়রী অনুযায়ী বিবর্ত্তনের অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ অবস্থার চাপে বংশানুক্রমিক জীবপ্রবাহে কালে এক জাতীয় জীব যে অন্য জাতীয় জীবে পরিণত হয়, সেই পরিণামজনিত যে দৈহিক পরিবর্ত্তন, তাহা প্রকৃতিই সাধিত করেন। সূত্রার্থের সহিত এই থিয়রীর সঙ্গতিসাধন অতি সহজ। কিন্তু ইহাও যে সূত্রকারের অভিপ্রেত, তাহা মনে হয় না। কারণ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের মত ঠিক বংশপ্রবাহ ধরিয়া অভিব্যক্তিবাদ ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল কি না সন্দেহ। তবে ইহার অর্থ কি? আমার মনে হয়, ইহা ভারতীয় জন্মান্তরবাদের সহিত অনুস্যূত যে ক্রমবিকাশবাদ, তৎ-সম্পর্কে প্রযোজ্য। ভারতবাসী ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব তাহার কর্ম্মফলে প্রতি জন্মেও একটু একটু করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। হিন্দুর মতে জীব স্থাবর যোনিতে ২০ লক্ষ, জলজ প্রাণীতে ৯ লক্ষ, কূর্ম্মাদি সরীসৃপে ৯ লক্ষ, পক্ষিযোনিতে ১০ লক্ষ, পশুযোনিতে ৩০ লক্ষ, বানরযোনিতে ৪ লক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ এই ৮২ লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। এই ৮২ লক্ষ যোনি-পরিভ্রমণ স্বভাবের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই যে জন্মগত ক্রমবিকাশ, এক জাতীয় জীব হইতে অন্য জাতীয় জীবে ক্রমবিকাশ—এবং এক জাতীয় জীবের দেহ ছাড়িয়া অন্য উন্নত জাতীয় জীবের দেহগঠন প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ "প্রথমং স্থাবরা জাতিস্ততঃ সারীসৃপী মতা" হিসাবে জন্মান্তরপ্ররোহে জীবের যে ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক পরিণাম হয়, প্রকৃতিই তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। এই অর্থ সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। টীকাকার ভুল বুঝিয়াছেন।

স্মৃতিতে আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। মনু কতকগুলি কার্য্য করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, অথচ তিনি বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং..................(মনু ১১।৬৪)

ইহার অর্থ—সর্ব্ব আকরে অধিকারস্থাপন, মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তনা, ওষধিগুলির হিংসা ইত্যাদি ইত্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ। যে সময়ে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল, মেধাতিথি তাহার বহু সহস্র বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনুর আমলে যে সমস্ত সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল,—তাহা তাঁহার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সেই জন্য তিনি তাঁহার ভাষ্যে একটু গোল করিয়াছেন। তিনি সর্ব্ব আকরে অধিকারস্থাপন এবং মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনও নিষিদ্ধ, ইহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু মহাযন্ত্র কি, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি এক জনের দ্বারা বহু লোকের কায করা যায়, এরূপ যন্ত্র (labour-saving machine) দেখেন নাই, উহার কল্পনাও করিতে পারেন নাই। যন্ত্র শব্দের অর্থ কোন কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন করিবার জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ম্মিত পদার্থ। যন্ত্ ধাতুর অর্থ সঙ্কোচসাধন করা অর্থাৎ যাহাতে পরিশ্রমের সঙ্কোচসাধন করা যায়, তাহাই যন্ত্র। কেবল হাতে কোন কায করিতে গেলে যত পরিশ্রম করিতে হয়, যন্ত্রে সেই কায করিতে গেলে সেই কায সহজে ও অল্পায়াসে করা যায়। মহাযন্ত্র অর্থে খুব প্রকাণ্ড যন্ত্র। ঐ প্রকাণ্ড যন্ত্র কি, তাহা মেধাতিথি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, মহাযন্ত্র অর্থে সেতু। কারণ, সেতুর দ্বারা লোক বিনা পরিশ্রমেই নদী পার হইয়া যায়। অতএব সেতুই মহাযন্ত্র। কিন্তু সেতু-নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ কেন? কারণ, উহাতে জলপ্রবাহ রুদ্ধ হয়। এ অর্থ ঠিক হয় নাই। কারণ, সেতুদান পুণ্যকর্ম্ম। আসল কথা, মনু অল্প আয়াসে বহু পণ্য উৎপাদিত হইতে পারে, এইরূপ যন্ত্রের প্রবর্ত্তন নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, উহাতে অতিরিক্ত পণ্য প্রস্তুত হেতু শিল্পীর অন্ন মারা যায়। ইহাতে মনে হয়, মনুর পূর্ব্বে এ দেশে বহু পরিমাণ পণ্যোৎপাদক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে আরব্ধ হয়, সেই জন্য বেকার-সমস্যার উদ্ভব হওয়াতে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সেতু কখনই যন্ত্র নামে অভিহিত হয় নাই। সকল আকরে এক জনের অধিকারস্থাপন যেমন অন্যের অনিষ্টসাধক, তেমনই মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তনও অন্যের অনিষ্ট-সাধক, এই হেতু উহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। গীতা হইতে শুধু একটি

দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল। গীতায় কর্ম্ম কাহাকে বলে, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।"

ভূত = প্রাণী ; ভাব = সত্তা ; উদ্ভব = উন্নতি ; কর = সম্পাদক ; বিসর্গ (বি + সৃজ্ + ঘঞ্) = ত্যাগ বা স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মসংজ্ঞিত = কর্ম্ম নামে অভিহিত। যাহাতে প্রাণিগণের অস্তিত্ব থাকে এবং অভ্যুদয় হয়, তাহা সম্পাদনার্থ যে ত্যাগ, যে আত্মত্যাগ, তাহাই কর্ম্ম নামে অভিহিত। কিন্তু এই বিসর্গ শব্দ লইয়াই এক বিষম গোল ঘটিয়াছে। গীতার টীকাকার অনেক। সুতরাং নানা জন নানা অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বিসর্গ অর্থে বিশেষ সৃষ্টি। সকামভাবে যাহা করা যায়, তাহার ফলে জীবের সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয়। সুতরাং ঐরূপ পুনর্জ্জন্মজনক অনুষ্ঠানই কর্ম্ম। তাহার সেই পুনর্জ্জন্ম স্বকৃত বিশেষ সৃষ্টিই বটে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বিসর্গ অর্থে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান এবং হোমাদির জন্য দ্রব্য (ঘৃতাদি) ত্যাগ। উহা সকাম বিধায় প্রাণিগণের অস্তিত্বের উৎপন্নকারী। আমার মনে হয়, গীতায় যখন নিষ্কাম কর্ম্মেরই প্রশংসা আছে, তখন সকাম কর্ম্মই কর্ম্ম, ইহা বলা ঠিক হয় না। বিসর্গ অর্থে কেহ কেহ সঙ্কল্পও করিয়াছেন। সুতরাং বিসর্গ শব্দের তিনটি অর্থ পাওয়া গেল। স্বকৃত বিশেষ সৃষ্টি ; দ্বিতীয় সঙ্কল্প (ব্রহ্মের) এবং তৃতীয় দেবোদ্দেশে দ্রব্যাদির ত্যাগ বা দান = যজ্ঞ। আমার ধারণা, শেষোক্ত অর্থই ঠিক। বিসর্গ ও বিসর্জ্জন প্রায় একার্থবোধক। প্রাণিগণের বা মানবসমাজের অস্তিত্ব ও উন্নতিসাধক কার্য্যে যে আত্মত্যাগ (self sacrifice), তাহাই কর্ম্ম। যজ্ঞও পারলৌকিক ভাবোদ্ভবকর ব্যাপার, অতএব উহা কর্ম্ম। যজ্ঞ শব্দের ও দান শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরিলেই এই শেষোক্ত অর্থ দাঁড়ায়।

সুতরাং শাস্ত্রের অর্থ ভালভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। এখানে বলা আবশ্যক, গোঁড়ামী কোনদিকেই ভাল নহে। শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে গোঁড়ামীও একটা প্রবল অন্তরায়। এই গোঁড়ামী নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন অতিনিষ্ঠার (Orthodoxy) দিকে গোঁড়ামী লক্ষিত হয়, তেমনই বিরুদ্ধবাদিতার (Heterodoxy) দিকেও গোঁড়ামী লক্ষিত হইয়া থাকে। উভয়বিধ গোঁড়ামীই সত্যসন্ধানের পরিপন্থী। আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর গোঁড়ামীই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইঁহারাই বলেন, শাস্ত্র এবং সরিয়ৎ সমস্ত জলে ফেলিয়া দাও, কেবল কাণ্ডজ্ঞানকে সম্বল করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও। ইঁহারা যে ভিতরে ভিতরে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, তাহা ইঁহারা বুঝেন না। দুনিয়ায় ইহাই মহামায়ার মায়া।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

শ্মশানের বালিস্

নদীর কিনারে শ্মশানের বুকে ঘাসের বিছানা 'পরে,
ছিন্ন মলিন একটি বালিস্ হোথা ওই আছে প'ড়ে।
ও যে ছিল আহা সঙ্গী যাহার নিত্য শয়ন-শিয়রে
মরণ-পাথারে সে যে গেছে ডুবে আজি চিরদিন তরে।
হয় ত ছিল সে সুন্দর শিশু আলো করি মা'র কোল,
হয় ত কণ্ঠে ফুটেছিল তার আধ 'মা' 'মা' বোল.
চ'লে গেছে সে যে কোন অভাগার কুটীর করিয়া খালি,
কোন জননীর চিত্তমাঝারে চিতার অনল জ্বালি।
হয় ত ছিল সে রূপসী তরুণী স্বামিসুখে গরবিণী
নিত্য মিলনে হয়েছে তৃপ্ত ফুল্ল মরমখানি,
প্রেম-গুঞ্জন শুনিয়াছে তার হয় ত ও সারা রাতি,
দিয়েছে গণ্ড কেশের পরশ ক্ষুদ্র বক্ষ পাতি।
হয় ত ছিল সে বালিকা বিধবা দগ্ধ দুঃখানলে
সিক্ত করেছে বক্ষ উহার নিত্য নয়নজলে।
হয় ত বা ভ্রাতা ভগ্নী কন্যা জনক জননী কার,—
চ'লে গেছে হায় চির অজানায় গৃহে তুলি হাহাকার।
হেরিয়া উহারে ঝরিছে আমার তপ্ত নয়নবারি
পড়িতেছে মনে আপনার জন গিয়াছে যাহারা ছাড়ি।

* * * * *

এই ত রে হায় মানব-জীবন দু'দিনের কাঁদা হাসা—
শ্মশানে নিত্য হইছে ভস্ম কত না তাহার আশা!
তাই মনে হয় যত প্রিয়জন থাক সদা পাশে পাশে,
কি জানি করাল মৃত্যু আসিয়া কখন্ কাহারে গ্রাসে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

বসন্ত এসেছে বটে, নাই কোকিলের ডাক ;
সকাল বিকাল কা কা ক'রে ডাক্‌ছে শুধু কাক।

মানভঞ্জন !—

সতীশ
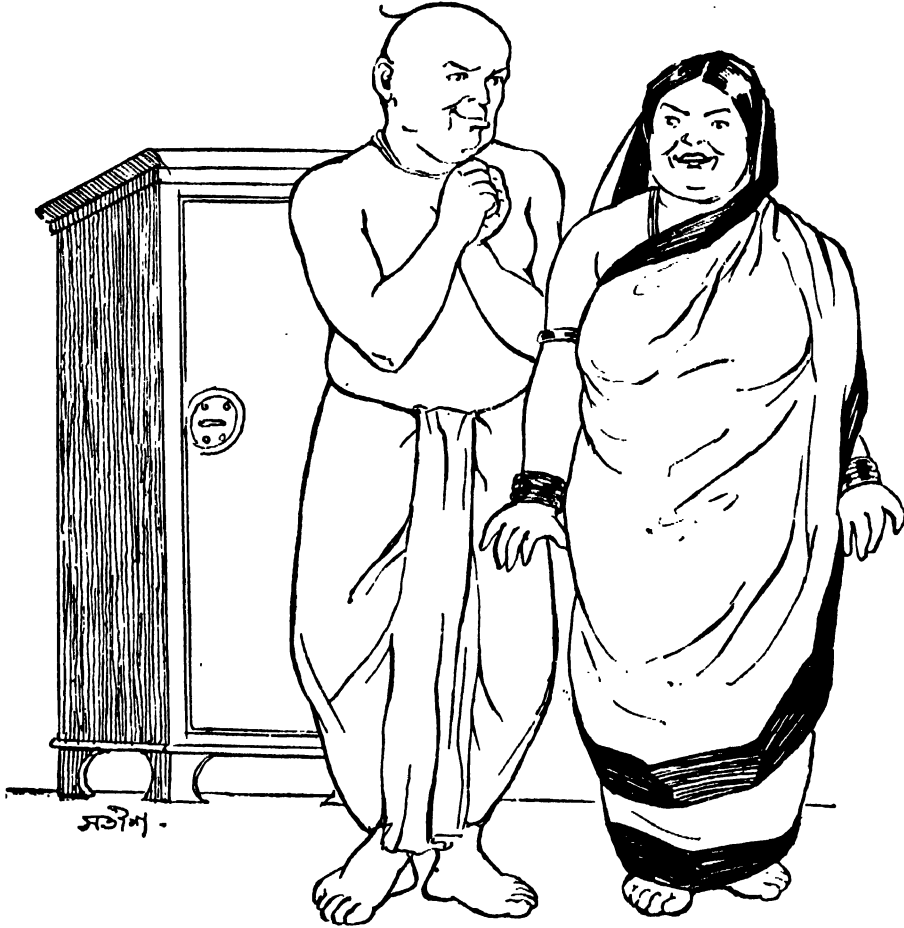
বসন্ত এসেছে সখি, সখা তোমার তাই
জান্‌তে এলো এ মর্ম্মে গয়না কি কি চাই

প্রবীণ প্রেম !—
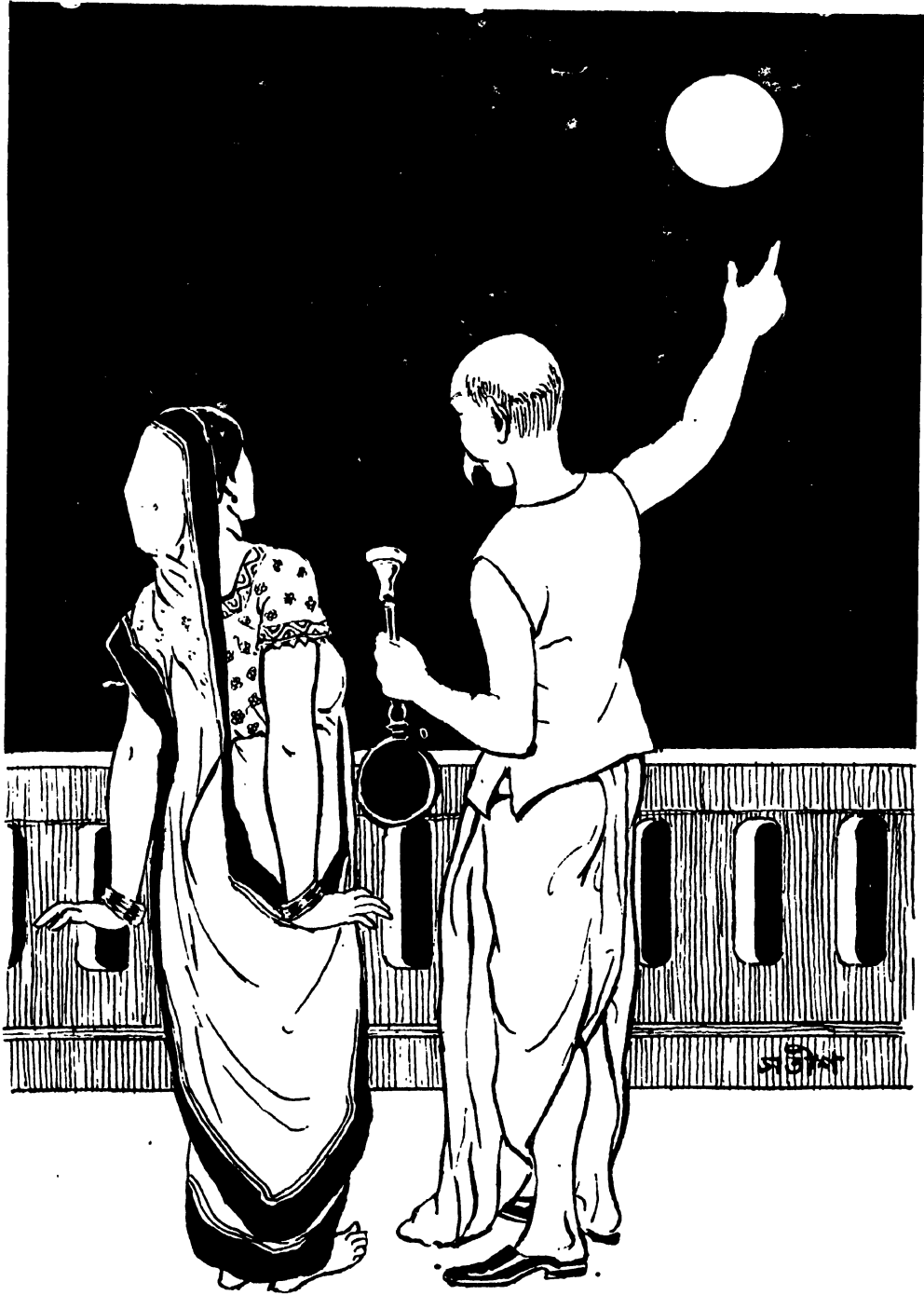
বইছে মলয় ধীরে ধীরে ফুলের সুবাস নিয়ে !
আকাশে কি চাঁদ উঠেছে দেখ দেখি প্রিয়ে !

প্রেমের দিবাস্বপ্ন !—

কেমন ক'রে সামলাই ছাই একজামিনের ঘানি ;
বই খুললেই মনে পড় শুধুই সে মুখখানি !

বিরহের নূতন জ্বালা !-

এত মশা মাছি ঘরে রেখে গেছে ছাই।
চিঠি প'ড়ে শান্তি পাবো তারও উপায় নাই !

বসন্ত-বাহার রাগিণী !—

বসন্ত এসেছে, সখি, দেখেছ কি তা ?—

গা-গা-রে-সা মা-গা-রে-সা সা-রে-গা-মা-পা—

বসন্তে প্রেম-অভিযান !—

ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়—সুখের সীমা নাই ;
কুল-মান সব ভাসিয়ে দিয়ে চল মাঠে যাই ।

বসন্তে নবভোল !—

গোঁপ-দাড়ি সব ফেল্‌তে হলেম রক্তে রক্তময় ;
গিন্নী পাছে চিন্তে নারেন হচ্ছে মনে ভয় !

বসন্তে কাব্যউচ্ছ্বাস !—

বসন্তে নাই কোকিল এবার, কাকের ডাকই সার
হ'লে কি হয় কবির কলম—বিশ্রাম নাই তার !

সতীত্ব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লৌকিক সতীত্ব

লৌকিক সতীত্ব বিষয়টি আমরা লৌকিক ধারণা ও ভবিষ্যৎ গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ, সাহিত্যিক শরৎ বাবু বারংবার ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, সাহিত্য আজ যাহা দেখাইতেছে, তাহা ভবিষ্যতের জন্য। উপস্থিতটাই তাহার সব নহে। সাধারণতঃ সতীত্ব-ধারণা এইরূপ মনে হয়—

১। কুমারী বা অবিবাহিত অবস্থায় যাহারা পুরুষকে দেহ দান বা মন বিনিময় না করিয়া মোটামুটি স্বসমাজ এবং স্বধর্ম্মের নিয়ম মানিয়া চলেন, তাঁহারা সতী।

২। বিবাহ হইলে যাঁহারা স্বামীকে ভালবাসিয়া, শ্রদ্ধা, সেবা-যত্নাদি করিয়া লোকধর্ম্ম এবং সমাজ-দৃষ্টিতে ব্যভিচার-দোষরহিত হইয়া, স্বামীর সংসারের যথাসাধ্য কল্যাণসাধন করেন এবং সন্তান, কুটুম্ব-বান্ধবাদিকে তুষ্ট করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা সতী।

৩। জীবদ্দশায় স্বামী গত হইলে, সমাজ ও ধর্ম্মানুসারে অপর স্বামী গ্রহণ করিয়া উল্লিখিতভাবে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত জীবন যাপন করিলে তিনি সতী।

৪। যে সমাজে বিধবা-বিবাহ নাই, সে সমাজের প্রচলিত আচার, নিয়ম ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বিনা ব্যভিচারে যিনি জীবন যাপন করেন, তিনি সতী।

৫। ডাইভোর্স (পতি বা পত্নী স্বেচ্ছায় ত্যাগ) হইলেও যিনি নিজে ব্যভিচার-দোষরহিত, তিনি অন্য পতি গ্রহণ করিলেও সতী।

মোটামুটি এইগুলি প্রাচীন মতের আধুনিক সংস্করণ। সম্পূর্ণ আধুনিক মত এই:—

১। যে সমস্ত ব্যভিচার পুরুষমানুষ করিয়াও সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে দূষণীয় হয় না, নারীই বা কেন সে দোষে দূষিত হইলে সাজা পাইবে, এই বিচার করিয়া নবীনরা নারীকে ব্যভিচার-দোষমুক্ত করিতে চাহেন। ইঁহারা প্রণয় অর্থাৎ রূপজ বা কামজ ভালবাসাকেই নর-নারীর যৌনসম্বন্ধ স্থাপনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মানেন। বিবাহ হউক, আর না-ই হউক, যদি পরস্পর প্রণয় থাকে, তবে তাহাদের শরীর-মিলনে কোন দোষ নাই এবং প্রণয় ব্যতীত দেহ-মিলনই ব্যভিচার:—বিবাহিত নর-নারীর মধ্যেও যদি প্রণয় না থাকে, তবে দেহের মিলনকে ব্যভিচার বলিয়া গণ্য করেন। ইঁহারা অবাধ মেলা-মেশার পক্ষপাতী। ইঁহারা প্রণয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—physical (দৈহিক), intellectual (বুদ্ধি বা জ্ঞানাত্মক) এবং spiritual (আধ্যাত্মিক) এবং কেহ কেহ বলেন যে, এই ত্রিবিধ মিলনই নর-নারীর সম্পূর্ণ মিলন। বিবাহ-বন্ধনের আবশ্যকতা যে যৌন সম্বন্ধ-স্থাপনার জন্য, ইহা ইঁহারা মানেন না। যদি প্রণয়ের জন্য কেহ ভ্রষ্টা বা পতিতা হয়, অথবা ভ্রষ্টা বা পতিতা যদি প্রণয়-পাশে কোন নরকে দেহ দান করে, তবে সে সতী ত বটেই—সে সতীশিরোমণি। স্বাধীন চিন্তার ইঁহারা পক্ষপাতী। ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা ইঁহাদের মূল মন্ত্র, যতক্ষণ ইহা পরের দাবীতে আঘাত না করে। প্রাচীন নীতিবাক্য বেদবাক্যেরই ন্যায় সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাহিরে। নবীন নীতি ইঁহারা প্রচার করিতেছেন। নবীন সমাজ ইঁহারা গঠন করিতে চাহিতেছেন।

২। যাহারা প্রাচীন পঙ্গু সমাজের কঠোরতা, অবিচার, হৃদয়হীনতা প্রভৃতি কারণে বাধ্য হইয়া অথবা পুরুষের অত্যাচারে বিনা দোষে দোষী, বা যাহারা ভ্রষ্টা বা পতিতা হইয়াও সৎবুদ্ধিচালিত হইয়া সমাজের বক্ষে স্থান চাহে, যাহারা পেটের দায়ে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, যাহারা ভ্রষ্টা বা পতিতার গর্ভজাত অথচ নিজে ভাল বা ভাল হইতে চাহে, ইত্যাদি ইত্যাদি সকল প্রকারের নারীকেই ইঁহারা সতী বা তদূর্দ্ধে স্থান দিতে চাহেন। শুধু তাহাই নহে, আধুনিক আর্ট, কাব্য, কবিতা, সাহিত্য, উপন্যাস প্রভৃতির মনস্তত্ত্ব আজ এই মহা সত্য ঘরে-বাহিরে জোর গলায় প্রতিপন্ন করিতেছে যে,

গৃহস্থ-বধূমাত্রেই সাধারণতঃ সতী নহেন, বিবাহের সঙ্গে সতীত্বের কোন সম্বন্ধ নাই, ভ্রষ্টা এবং পতিতা যাহাদের বলা হয়, তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সতী। নর-নারীর দেহসম্বন্ধ কোন রকমেই দোষগ্রস্ত বা কোন কালেই সাধারণতঃ দোষযুক্ত ত নহে-ই, বরং ভাল। একমাত্র প্রণয়েই দেহদানের সার্থকতা, ইহাই সর্ব্বত্র কষ্টিপাথর।

এ হেন অবস্থায় নবীনদের মনোভাব বুঝিবার নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহাদেরই হাতে। নবীন যেরূপ ডাক-হাঁক করিয়া তাহার মত প্রচার করিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করা বাতুলতা। সুতরাং আমরা তাহাদের মধ্যে এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির বচন উদ্ধার করিয়া দেখি, তাঁহাদের মনোভাব কি। C. G. Jung, M. A. L. L. D. কৃত Analytical Psychologyতে আছে—

"আজ আমাদের যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে বাস্তবিক কোন নীতিবাদ নাই, কেবল আইনমাত্রই আছে। আমরা এখনও যৌন সম্বন্ধ ব্যাপারে এতটা উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই, যাহাতে ন্যায় অন্যায় সর্ব্বত্র ঠিক বুঝিতে পারি। ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত সমাজের অবিবাহিত মাতৃত্বের উপর অবৈধ পীড়ন। ইহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, আজ যাহা নীতিশাস্ত্রবিধি, কাল বা দুই দিন বাদেই তাহার অবস্থান্তর ঘটিয়া উহা নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারে। সভ্যতার ইতিহাস এই শিক্ষাই দিতেছে যে, যাহা নীতিবাক্য বা কার্য্য, তাহা অতিশয় ক্ষণস্থায়ী পদার্থেরই মধ্যে।

"আমরা স্বীকার করি যে, সভ্যতার গতি অর্থে মানুষের মধ্যস্থ পশুবৃত্তিগুলিকে উত্তরোত্তর বশে আনা। কিন্তু এই বশীকরণ করিতে গেলে, মানুষের মধ্যে যে পশুভাব আছে তাহা বিদ্রোহী হইবেই। কারণ, তাহা এখনও মুক্তিপিপাসু। মানুষ বিশেষ কষ্ট করিয়া এই বিদ্রোহ সহ্য করে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এই পশুবৃত্তি সব বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলে। জননী প্রকৃতি দেবী মানুষকে অসীম কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছেন এবং এই সহ্যগুণেরও যথেষ্ট মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন। সভ্য জাতিরা প্রায়শঃ উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষিত। কাযেই তাহার অতিরিক্ত প্রলোভন সর্ব্বদাই আছে। কারণ, মানুষের পশুবৃত্তি ক্ষেপিয়া উঠিবেই—যদি তাহাকে কোন না কোন বিষম বন্ধনে অবরুদ্ধ করা না হয়। আমাদের নীতিজ্ঞান আমাদের পশুশক্তির স্রোত বহির্মুখ হইতে দেয় না। মানুষ চারিদিকে নানা প্রলোভনের মধ্যে বাস করিতেছে। সমাজমধ্যে নানা প্রকার সন্তানের জন্ম বন্ধ করিবার প্রণালী প্রচলিত থাকায়, এইগুলি গুপ্তভাবে মানুষকে স্বকর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি দিয়াই যেন প্রলুব্ধ করিতেছে। তবে নীতিবাদ দিয়া তাহাকে বাঁধিবার প্রয়াস কেন? ভগবান্ কুপিত হইবেন বলিয়া? আজ জগতে অধিকাংশই ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, যিনি ঈশ্বর মানেন, তিনিই যদি ঈশ্বরস্থলাভিষিক্ত হইতেন, তবে কি করিতেন? তিনি কি তরুণ তরুণী জন্ এবং মেরীর কামজ অসংযমের জন্য তাহাদের বিশ বৎসর কারাবাস এবং তপ্ত তেলে ভাজা হইবার সাজা দিতেন? আজকাল ঈশ্বর বিষয়ে যে সভ্য ধারণা হইয়াছে, তাহাতে এরূপ সাজা অসম্ভব। আধুনিক ঈশ্বর এমন ক্ষমাশীল যে, তিনি এরূপ অপরাধে কোনই উচ্চবাচ্য করিবেন না। ভণ্ডামী এবং জুয়াচুরী ইহার অপেক্ষা সহস্র গুণে বেশী পাপ বলিয়া আজকাল গণ্য। ভণ্ড নীতিবাদীদের হাত হইতে এইরূপে এই যৌন সম্বন্ধ বিষয়টি অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। তবে কি আমরা অধিক জ্ঞানী হইয়া ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতেছি? দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও নহে। ইহাও অনেক দূরে।"

উপরি-উক্ত বচন পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের নবীন সাহিত্যিক, কলাবিদ্, কবি, মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতরা কাহাদের নিকট হইতে এই সব শিক্ষা পাইয়াছেন, আমরা আরও দুই তিনটি কথা উল্লিখিত বচনের মধ্যে পাই, যেমন (১) নর-নারীর দেহব্যাপার দোষাবহ নহে। (২) যাঁহারা ভগবান্‌কে এই দোষে দোষী নর-নারীকে সাজা দিবার উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহারা ভুল বুঝেন। (৩) নবীন নিজের মতানুসারে জগদীশ্বরের মতামত ধার্য্য করেন। (৪) ঈশ্বরকে যাঁহারা দয়া করিয়া একবারে বাদ দেন নাই, তাঁহারা নিজের সুখ-সুবিধামত তাঁহাকে ভাঙ্গেন গড়েন।

আবার আজকাল এ দেশের মহারথগণ শিক্ষা দিতেছেন যে, এ দেশ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই উৎসন্ন গিয়াছে। "ত্যাগ ত্যাগ" করিয়া আজ দেশের লোক জড়তা প্রাপ্ত হইয়া মৃতপ্রায় কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন—

জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা।
এ সকলে এবে কিছুই হবে না॥

* * * *

এই জাতীয় উক্তি আজকাল সর্ব্বত্র দেখা যায়।

মাতৃস্নেহ

বসুমতী চিত্রবিভাগ ।

[শিল্পী—শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

আজ দেশব্যাপী যে তমোভাব আসিয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া যদি সাত্ত্বিক বা রাজসিক ভাবের উদয় করার জন্য এ কথা বলা হয়, তবে ইহার বিরুদ্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু যুক্তি-তর্ক যেরূপ দেওয়া হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, ধর্ম্ম এবং ত্যাগই তাড়ান তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের প্রকৃত আচরণে বা প্রকৃত ত্যাগ দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয়, যাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম এবং ত্যাগ প্রকৃত কি, তাহা জানেন না। বরং যাহাতে ভণ্ডামী ছাড়িয়া যথার্থ এই দুইটির পুনঃ স্থাপনা দেশময় হয়, তাহাই সকলের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। এত বড় ঈশ্বরবিশ্বাসহীনতার কর্ম্ম আর নাই। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের কাছে কি ভগবান্ এতই নিষ্প্রয়োজন, এতই হেয়, এতই তুচ্ছ যে, যে পথে তাঁহার দিকে মতি হয়, তাহাই সর্ব্বনাশ করিতেছে বলা হয়? এ কি বিবেকহীনতার লক্ষণ নহে? আজিও কি জগতের অধিকাংশ লোকই, অন্ততঃ বিপদের সময়েও তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চাহে না? এই শরণাপত্তির মূল কি ত্যাগ এবং ধর্ম্ম নহে? যাঁহারা এই সব তাড়াইতে চাহেন, তাঁহারা ইহার পরিবর্ত্তে কি দিয়া এই মানুষের সদাদগ্ধ হৃদয় শান্ত করিতে চাহেন বা পারেন? জীবনের যে প্রধান অবলম্বন, তাহাকে তাড়াইয়া তাঁহারা কত বড় একটা পঙ্গুত্ব মানুষের মধ্যে আনিতেছেন, তাহা কি ভাবিয়াছেন? হিন্দুর আজ এত বড় একটা জড়তা আসিয়াছে যে, সে কেবল পশুত্বকেই সব বলিয়া মানিয়া লইতেছে। যদি পশুশক্তিই এত আদরের—এত শ্রেয়ঃ, তবে রাজার নিন্দায় আজ পঞ্চমুখকেও পরাস্ত করা হয় কেন? হিন্দুর দেব-দেবী-মূর্ত্তি যে পশুপ্রকৃতির উপরে স্থাপিত। দুর্গা-জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি যে পশুশক্তির প্রতীক সিংহের উপরে প্রতিষ্ঠিত। মদমত্ত করী পশুশক্তির দ্বারা বিজিত, জগদ্ধাত্রী মাতৃমূর্ত্তি যে সেই পশুশক্তির উপরে স্থাপিত, এ কথা আজ হিন্দু ভুলিয়া গিয়াছে। আজ পশুশক্তির বিকাশ এবং প্রাধান্য সর্ব্বত্র দেখিয়া আমরা হিপ্‌নোটাইজড্ হইয়া গিয়াছি, নচেৎ পরকে যাহার জন্য ঘৃণা করি, ঘরে তাহাকে এত আদর করিবার চেষ্টা কেন? এত আবাহন কেন? কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!

নবীন এই যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু আজ বিধিমত চেষ্টা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে,—এই যে আবর্ত্ত, ইহার শেষ কোথায়? এখনও নবীন ইহাকে সমস্যার মধ্যেই গণ্য করে। যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিগত দাবী বা পরের দাবী অক্ষত রাখিয়া, অবাধ প্রণয় চলা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়, তবেই এ প্রশ্নের মীমাংসা, নচেৎ শৃঙ্খল কাটিয়া স্বাধীন হইতে চাহিলেই যৌনসম্বন্ধক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া যায় না। প্রত্যেকের উপস্থিত বা ভবিষ্যৎ দাবী অক্ষত রাখা এরূপ ভীষণ আকর্ষণের পদার্থমধ্যে অসম্ভব নহে কি? এই জন্যই কি এত বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হয় নাই?

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

কবির প্রতি

কবি! তোমার হৃদয়-সরে ভাবের শতদল,
অহর্নিশি উঠ্‌ছে ফুটে শোভায় ঢল ঢল!
দুঃখ-দৈন্যে অচল অটল চালাও লেখনী—
প্রাণটি তোমার শান্ত উদার কাঁদতে শেখনি!
অনেক লোকে পাগল বলে লজ্জা তাহে নাই,
মনে ভাব এমন পাগল সাজতে সদা চাই!
গিরির মত শুদ্ধ তাহে সুরের ফল্গু নদী
মনের তটে আছড়ে গাহে ছন্দ নিরবধি।
তাহার মাঝে পদ্ম ফোটে মধুপ আসে ছুটে
গগন-মাঝে পূর্ণ শশী ফুলের মত ফুটে।
ভেসে যাও যে নদীর মাঝে নাইক তাহার তল,
বুকখানি তা'র 'স্বপ্নে গড়া' দীপ্ত ভাবোজ্জ্বল!
সোনার পাতা হীরার ফলে গাছগুলি সব নত
হৃদয়খানি রাঙিয়ে দেয়—বরণ কত শত।
হঠাৎ তোমার স্বপ্ন টুটে কি এক বাণীর তারে;
চম্‌কে দেখ আছ ব'সে, নদীর কিনারে!
ধন্য তুমি, পূজ্য তুমি—ধন্য সাধনা,—
গ্রহণ করো হৃদয়-অর্ঘ্য কবির বন্দনা।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার

সুন্দরবনে শিকার

কলা ফাঁদ

এই উপায়ে জীয়ন্ত হরিণ ধৃত করা যায়। ইহা বড়ই কৌতুককর শিকার। যাহাদের বন্দুক নাই, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে হরিণ শিকার করিবার জন্য যে পাস লইবার আবশ্যক হয়, তাহা নাই, তাহারাই বেশীর ভাগ এই প্রণালীর দ্বারা হরিণ শিকার করে। কিম্বা যাহারা সখ করিয়া জীয়ন্ত হরিণ ধৃত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষেও এই পদ্ধতি বিশেষ উপকারী। এইরূপ ভাবে হরিণ শিকারের সময় বন্দুক কিম্বা অন্য কোনরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। একটি বড় বঁড়শী, একহস্ত-পরিমিত লম্বা মোটা সূতা, আর একটি ৪ অঙ্গুলি আন্দাজ মোটা কাঠী হইলেই হরিণ শিকার হইবে।

প্রথমতঃ একটি বঁড়শীতে এক হস্তপরিমিত সূতা ভাল করিয়া খাটাইয়া ঐ সূতার অন্য প্রান্ত ঐ কাঠীটির মধ্য-ভাগে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিবে। এইরূপ বাঁধা হইলে যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া গেল। তখন জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে, কোন্ স্থানে হরিণ চরা করিয়াছে, কিম্বা হরিণ চলিবার রাস্তা কোথায়। তাহাও না প্রাপ্ত হইলে, হরিণের গোঠের সন্ধান থাকিলে, সেখানে ঐরূপ ৮টি কিম্বা ১০টি বঁড়শীতে এক একটি পাকা কলা গাঁথিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। তাহা হইলেই তৎপরদিবস সকালে দেখিতে পাওয়া যাইবে, একটি কিম্বা দুইটি বঁড়শীতে হরিণ পড়িয়াছে।

এই হরিণ পড়িবার কারণ এই, হরিণ চরা করিবার সময় ঐ বঁড়শী সমেত কলা খাইয়া ফেলে, এবং ঐ কলা চর্ব্বণ করিবার সময় হরিণের গালের ভিতর বঁড়শী বিদ্ধ হইয়া যায়। কেবল ঐ সূতাটি তাহার মুখের ভিতর হইতে বাহিরে ঝুলিতে থাকে। তখন সম্মুখের পায়ের দ্বারা হরিণ ঐ সূতাটি ছাড়াইতে চেষ্টা করে, দুই একবার নাড়া-চাড়া করিবার পরই হরিণের পায়ের খুরের ভিতর সেই কাঠী সমেত সূতা আবদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, হরিণের পায়ের খুর বিভক্ত। সূতা একবার আবদ্ধ হইলে আর খুলিয়া যায় না, এবং হরিণও সেই পায়ের দ্বারা দুই একবার সূতাটি টানিলে বঁড়শীটি হরিণের মুখের ভিতর আরও গভীরভাবে বিদ্ধ হয়।

এ দিকে তাহার একখানি পা আটকাইয়া উচ্চ হইয়া থাকে। তখন হরিণ পলায়ন করিতে অসমর্থ হয়। সূতা টানিলেও মুখে যন্ত্রণা হয়, সেই কারণে হরিণ আপনা হইতে সেই স্থানে ভূমির উপর পড়িয়া থাকে। তাহার উত্থানশক্তি থাকে না। তখন তাহাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। যে সকল কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতি সুন্দরবনের মধ্যে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে লোক বুনো নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহারা এইরূপ উপায় দ্বারা বন্য বরাহ শিকার করে। কারণ, তাহাদের নিকটে হরিণ অপেক্ষা শূকরই প্রিয় খাদ্য।

ছিটে কল

সুন্দরবনের মধ্যে বিনা বন্দুকের সাহায্যে আর একরূপ ভাবে হরিণ শিকার করা যায়। তাহাকে "ছিটে কল" বলে। এই প্রণালীতেও হরিণ জীয়ন্ত অবস্থায় ধৃত হয়। এই কল পাতিতে হইলে নারিকেল কিম্বা পাটের দড়ির দ্বারা হইবে না। ইহার নিমিত্ত 'বলার' দড়ি আবশ্যক। সুন্দরবনে বলা নামক একরূপ সরু গাছ আছে; তাহার আঁশ হইতে এক প্রকার দড়ি নির্ম্মিত হয়। এই রজ্জু খুব শক্ত এবং তাহাতে ফাঁস প্রস্তুত করিলে, অতি সহজে সেই ফাঁস সরিয়া যাইতে পারে।

সেই কারণে এই কলে বলা গাছের আঁশের দড়ি ব্যবহৃত হয়। বলা গাছ হইতে দড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে, উহা কাটিয়া আনিয়া ত্বক্ তুলিয়া লইতে হয়। তৎপরে সেই ছাল দুই তিন দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তার পর উহা জল হইতে উঠাইয়া ভাল করিয়া পেষণ করিলে তাহা হইতে একরূপ আঁশ বাহির হয়। সেই আঁশকে পাকাইয়া লইলে খুব শক্ত মসৃণ দড়ি প্রস্তুত হইবে। সেই দড়ি দ্বারা এই কল প্রস্তুত করিতে হইবে।

হরিণ ধরিবার ফাঁদ প্রস্তুত করিতে হইলে, বলাগাছের দড়ি একটি সরু সুন্দরীগাছের অগ্রভাগে বন্ধন করিতে হইবে। সেই সুন্দরীগাছটি এরূপ ভারসহ হওয়া কর্ত্তব্য যে, তাহা দেড় মণ দুই মণ ওজনের ভারে যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ে। ফাঁসের রজ্জু বৃক্ষসংলগ্ন করিবার পর দুইখানি ছোট তক্তার প্রয়োজন। একখানি তক্তা মাটীতে বেশ করিয়া প্রোথিত করিয়া আর একখানি তক্তা তাহার উপর রাখিতে হইবে। তৎপরে সেই সুন্দরীগাছকে নোয়াইয়া তাহার ফাঁস তক্তার সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখিতে হইবে।

হরিণ চলিতে চলিতে তাহাতে পা দিলে হয় তাহার পায়ে ফাঁস লাগিয়া সেই গাছটি উঠিয়া যাইবে, নচেৎ তাহার গলদেশে

উহা বন্ধ হইতে পারে। এই কল পাতিবার কৌশল লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। তবে ঐ কল হরিণ চলিবার রাস্তার উপর পাতিতে হইবে। সুন্দরবনের নিকটস্থ সাধারণ লোক অনেক সময় এইরূপ ফাঁদ পাতিয়া হরিণ ধৃত করে। এই কল পাতিবার প্রণালী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে গেলে স্থানীয় লোকের সাহায্য আবশ্যক। লেখক স্বয়ং দেখিয়াছেন, এইরূপ ফাঁদে হরিণ ধৃত হইয়াছে।

হরিণ শিকার করিবার অন্যান্য কৌশল সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, এ স্থলে শিকার করিবার জন্য কৌশলের আবশ্যকতা অনিবার্য্য কেন, তাহার সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করিব, তাহা হইতেই ব্যাপারটি বিশদ হইবে। লেখকের জনৈক সাহসী শিকারী বন্ধু কোনরূপ কৌশল অবলম্বন না করিয়া শিকার করিতে গিয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া শিকারে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে বর্ণিত হইল।

লেখকের এই বন্ধুটি অত্যন্ত সাহসী এবং অব্যর্থ-লক্ষ্য। তাহা ছাড়া তিনি খুব মূল্যবান্ একটি রাইফেল খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও শিকার করিতে জঙ্গলে গমন করেন নাই। তবে দুই এক সময় কার্য্য উপলক্ষে জঙ্গলপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে বলা হইল, অনর্থক জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া শিকার হইবে না, কৌশল করিয়া হরিণকে নিকটে আনয়ন করিতে না পারিলে, কখনই হরিণ শিকার হইবে না। তিনি অভিজ্ঞগণের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন যে, বিনা কৌশলেই তিনি হরিণ শিকার করিবেন।

তিনি কাহারও বাক্য শ্রবণ না করিয়া তাঁহার রাইফেলটি লইয়া একাকী নৌকা হইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি অত্যন্ত সাহসী। এইরূপে তিনি প্রভাতকাল হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গল ভ্রমণ করিয়া শিকারে বিফল হইয়া যে সময় নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার মৃতকল্প অবস্থা। একে জল-কাদায় হাঁটিবার কষ্ট, তাহার উপর জঙ্গলের ভিতর সুলো দ্বারা তাঁহার পদ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। বুঝা গেল, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন। যখন সকলে তাঁহাকে এ সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, "এরূপভাবে কখনই হরিণ শিকার হয় না। তোমরা যাহা বলিয়াছিলে, কৌশল অবলম্বন না করিলে হরিণ শিকার হয় না, তাহা সত্য। জঙ্গলের ভিতর ভ্রমণ করিতে পারিলে যে হরিণ দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। বহু হরিণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু সেই হরিণ সকল দূর হইতে মানুষের সাড়া পাইলেই এরূপ ভাবে পলায়ন করে যে, বন্দুক উত্তোলন করিবার অবসর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর কখনও আমি এরূপভাবে শিকার করিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিব না।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র।

অযোধ্যা

এস, এস রাম, নব-ঘন-শ্যাম, এস এস রঘুরাজ
অতিথি যে আমি, দুয়ারে তোমার, তোমারে দেখিতে আজ!
যুগ-পরমায়ু বুঝিব না অত, কত কাল ব্যবধান
এই ত সে দিন—সে দিনের কথা, এখনি কি অবসান?
চাই, চাই, চাই— চাই-ই তোমারে—দাঁড়াও সুমুখে মোর
চাই পদধূলি, চাই গো মিতালি, প্রণয়ে হইতে ভোর!

এই অযোধ্যা, ধূলিপরে' যার 'চরণ' পড়েছে কত,
কত না এ মাটী ছুঁয়েছে তোমায়— গর্ব্বে হয়েছে নত!
এই মাঠ-ঘাট, ওই রাজবাটী— ওই ত সরযূ বয়,
সব যদি আছে, কেন তুমি নাই—এ কথা কেমনে সয়?
হবে না হবে না, বোঝাতে হবে না সুপ্ত অতীত বলি'
সাক্ষাৎ তুমি হও গো শ্রীরাম, অনিত্য কাল দলি!

নির্ব্বোধ এরা, দুর্ব্বল-চিত, মন্দির গ'ড়ে কত
পাথরে তোমার মূর্ত্তি এঁকেছে প্রাণহীন রূপ যত!
অযোধ্যা যদি শ্রীরাম-বিহীন তীর্থ কেন সে তবে
আশ্বাস যদি নিঃশেষ হয়, অবশেষ কিবা রবে?
পূজুক্ ইহারা—পূজুক্ পুতুল, আমি চাই সেই রাম,
গুহকের মিতা, শবরী-বন্ধু, শরীরী সে—নহে নাম!

তোমার নামের কেমন তীর্থ, না যদি দাঁড়াও এসে?
রাজবাড়ী হ'তে অতিথি ফিরিবে? বিফল হইয়া শেষে!
এ নহে মথুরা, নহে বারাণসী—সম্বল স্মৃতি যার
অযোধ্যা এ যে শাশ্বত ভূমি, তুমি যেথা অবতার!
এ যদি কাহিনী, শুধু ইতিহাস—পুড়ে যাক্ রামায়ণ
চাহি না অমন রাম নামে আমি অর্পিতে প্রাণ-মন!

শ্রীচরণদাস ঘোষ

আমাদের নারী-জাগরণ

পূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে প্রাচ্যের নানা দেশের নারী-জাগরণের পরিচয় 'মাসিক বসুমতীতে' প্রদত্ত হইয়াছে। এবার আমাদের এই দেশের নারী-জাগরণের কিছু পরিচয় দিতেছি। আমাদের এই ভারতের নারী যে এখন নানা দিকে নানা-রূপে কূপমণ্ডূকতা পরিহার করিয়া বাহিরের জগতের সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয়ে পুরুষের সহিত স্পৃহণীয় প্রতিযোগিতা করিতেছেন, ইহা নিশ্চিতই দেশের পক্ষে আনন্দের ও মঙ্গলের কথা। আর্য্য হিন্দু শিক্ষা-দীক্ষার ইহাই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, অতি প্রাচীন যুগ হইতেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন করিতে নারীর শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকার কারায় রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সমাজের একাঙ্গ পঙ্গু হইয়া যায়, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

মিস বাপসী কারসেটজী পাভরী
জেনেভার ধর্ম্মসম্পর্কিত নিখিলবিশ্বশান্তি সম্মেলনে বোম্বাইয়ের অন্যতম প্রতিনিধি

বহুকাল যাবৎ নানা কারণে সেই শিক্ষার নানা ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। কিসে, কাহার দোষে সে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, উহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে এখন —যখন প্রাচীন-পন্থী ও নবীনপন্থী,—সকল শ্রেণীর মধ্যেই নারীকে শিক্ষিত

করিবার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তখন মানিয়া লও-য়াই যাউক যে, নারীর শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে এখন বিবেচ্য, নারীর শিক্ষা কি ভাবে হওয়া উচিত। কেহ কেহ প্রাচীন পন্থার সহিত কোনও সম্বন্ধই রাখিতে চাহেন না, তাঁহারা সমস্ত আচার-ব্যব-হার রীতি-নীতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন, আবার কেহ কেহ বা নূতনের যেটুকু ভাল, তাহা লইয়া

বিলাতের রাজপথে শিক্ষিতা ভারত-মহিলা

গড়িয়া তুলিতে চাহেন। প্রথম পক্ষ নারীজাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভের উপযোগী শিক্ষাদানের পক্ষ-পাতী। অপর পক্ষ বলেন, আমাদের আর্য্য-হিন্দু সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার অনুযায়ী করিয়া—আমাদের দেশের সনাতন ভাবধারার অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিয়া আমা-দের নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এতদুভয় পরস্পর-বিরোধী অভিমত কেবল যে হিন্দু সমাজেই দৃষ্ট হয়,

প্রাচীনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া আমাদের নারী-সমাজকে তাহা নহে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজেও এই ভাবের

মিসেস্ ইরাবতী কার্ভে এম্-এ, উচ্চশিক্ষার্থে বার্লিন গিয়াছেন

মিস্ এ, এম, করিম। সঙ্গীতশিক্ষার জন্য প্যারিসে গিয়াছিলেন

মিসেস্ টি, কে, বাপপু মধ্যপ্রদেশের হায়দার মিউনি-সিপ্যাল সভ্যা

পরস্পর-বিভিন্ন দুইটি মত আছে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, হিন্দুরা যতটা অগ্রগামী, মুসলমানরা ততটা পরিমাণে রক্ষণ-শীল। মুসলমানদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন (সম্ভবতঃ তাঁহাদের সংখ্যাই সমধিক), যাঁহারা অবরোধ ও বোরখার এখনও ঘোর পক্ষপাতী এবং নারীর শিক্ষা ও অধিকারবিস্তারে আদৌ সম্মত নহেন। হিন্দুদের মধ্যে বোধ হয়, এতটা রক্ষণ-শীল এখন অতি অল্পই আছেন। এখন প্রায় অধিকাংশ হিন্দুরই বিশ্বাস এই যে, আমাদের দেশে অবরোধ থাকা উচিত নহে, তবে অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় এবং নারীর শিক্ষা ও অধিকার দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। অবশ্য হিন্দুদের মধ্যে এমন লোকও যে একবারে নাই, যাঁহারা মুসলমান রক্ষণশীলদের মত নারীর সর্ব্ববিধ অবস্থা-সংস্কারের বিরোধী, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের আপনার ঘরের নারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। তাঁহারা মুখে এক বলেন, কাযে অন্যরূপ করেন, তাঁহাদের মতের কোনও মূল্য নাই।

ডাক্তার শ্রীমতী অন্নটদাস
বাঙ্গালোরে প্রসূতি-শিশুমঙ্গলসম্পর্কিত ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত

পুরুষের মধ্য হইতে এ সম্বন্ধে যে আলোচনাই হউক, এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিতা নারীদের মতামতের মূল্য সমধিক। তাঁহারা স্বয়ং উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া নারীর শিক্ষা ও অধিকার সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত পত্রান্তর হইতে একটি শিক্ষিতা বঙ্গনারীর মতামত এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। লেখিকা—শ্রীমতী আশালতা দেবী 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে নূতনত্বের মোহে জীবনের আদর্শকে খাটো ক'রে বিলাতী কুসংস্কারটাকেও আমরা বড় ক'রে দেখেছিলাম। ধর্ম্মে, সমাজে, বিশেষভাবে হিন্দু-পরিবারে সেই সময় থেকে যে খাদ মিশেছে—বর্ত্তমান সময়ে আমরা তার নামকরণ করেছি সভ্যতা ও কাল্‌চার। পাশ্চাত্য সভ্যতার কদর্য্যতা আমাদের হিন্দুগৃহের রূপটিকে পর্য্যন্ত আবৃত ক'রে রেখেছে। মায়ের আপন বুকের যত্নে ও মমতায় পালিত শিশু যেমন সহজ আনন্দে বর্দ্ধিত হয়ে উঠে, ধাত্রীর হাতে গড়া ছেলে তেমন পরিপূর্ণ শ্রী ও পূর্ণতা লাভ করে না। হিন্দুর বিশিষ্ট

যদি হিন্দু নারীর মধ্যে না থাকে—তা হ'লে মস্ত একটা অভাব ও অসম্পূর্ণতা মনকে পীড়িত ক'রে তোলে। বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতা মেয়েদের এমনই বিকৃত ক'রে তুলেছে যে, আজ আর তারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না। এই এক শত বৎসরমাত্র ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। এক শত বৎসরের মধ্যে যে Cultural Evolution হয়েছে, তার মধ্যে হিন্দুস্থানী যতটুকু, ততখানিই সমাজের নিজস্ব। বাকী যে সামান্য, তার মধ্যে এত বেশী বিলাতী গিল্‌টী আছে যে, সেটাকে ভারতীয় বলা চলে না। * * * * 'স্ত্রী-শিক্ষা' বা

উচ্চ-শিক্ষিতা মন্দ্র-দেশীয়া মহিলা

'স্ত্রী-স্বাধীনতা' জিনিষগুলির একটা যথার্থ সংজ্ঞা এখনও ঠিক হয় নাই। এক শত বৎসরের ইংরাজী ফ্যাসানের বাঙ্গালা মুলুকে তাই এই 'শিক্ষা' ও 'স্বাধীনতা' শব্দগুলিকে নিয়ে যথেচ্ছাচার চলেছে। শিক্ষা, স্বাধীনতা, সভ্যতা বা সাধনা সম্বন্ধে হিন্দুর যে ধারণা—ইংরাজী স্কুলের মেয়ের ধারণা ঠিক তার বিপরীত। এই বিপরীত বুদ্ধির ফলেই সমাজ ও ও ধর্ম্মে প্রকাণ্ড একটা অসামঞ্জস্যতা সম্ভব হয়েছে। Cultural Evolution না হয়ে এক শত বৎসরের বাঙ্গালা মুলুকের উপর যে Cultural Revolution চলেছে—তার মূল্য হিন্দুনারীকে পর্য্যাপ্ত দিতে হচ্ছে। * * * ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ ক'রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকলেই স্বাধীনতার জন্য মানুষকে দাস্যভাব অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ আমরা সেই ভাবকে পদদলিত ক'রে স্বামীর কাছ থেকে পর্য্যন্ত সমান অধিকার দাবী করছি। এ দেশে অধিকারিভেদে ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের ইংরাজী শিক্ষার মোহ এমনই প্রবল যে, আমরা আদর্শকে অবজ্ঞা ক'রে—বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পেষণে নিজেদের নষ্ট করতে বসেছি।"

'আত্মশক্তি' পত্রে 'মেয়ের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমতী কুসুমকুমারী সেনগুপ্তা অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"যে মেয়ে মায়ের কাছে থেকে ভোজনপাত্রে নুণটুকু নিতে বা দিতে শিখে নি, শুধু পুথিগত বিদ্যার্জ্জনই করেছে, সে পানা-পুকুরের পচা জল ঘাঁটা ত দূরের কথা, পল্লীগ্রামে যেতেও ভয় পায়। কাজেই দিনে দিনে পল্লীগ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতেছে। সংসার-অনভিজ্ঞ মেয়ে বা বধূর স্বেচ্ছাচারিতায় সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। শিক্ষা শুধু পুথিপড়া নয়, নারীশিক্ষার বহু বিষয় রহিয়াছে। দয়া, মায়া, ধৈর্য্য, লজ্জা, বিনয়, গৃহকার্য্যে সুনিপুণতা, সেবাপরায়ণতা, এই সকল গুণ মেয়েদের থাকা চাই। আর মেয়েরা মায়ের কাছে থেকেই এ সব গুণাবলী গ্রহণ ক'রে থাকে। যিনি মেয়ের মা, তিনিই আবার পুত্রবধূর শাশুড়ী। মেয়ের গুণাগুণের জন্য মাতাই সম্পূর্ণ দায়ী। মায়ের জাতি যত দিনে গড়িয়া না উঠিবে, তত দিন কল্যাণ নাই। মায়ের জাতির হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছাদিত। তজ্জন্য বিদ্যালোক চাই, তৎসঙ্গে গৃহে সুশৃঙ্খলা যাহাতে থাকে, তদনুরূপ শিক্ষাও চাই।"

শিক্ষিতা হিন্দু মহিলার রচনায় যখন এই মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ইহা অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিবার নহে। এ সম্বন্ধে এক্ষণে দেশে বিশেষ আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করার ভার প্রধানতঃ নারীর উপরেই যে ন্যস্ত, ইহা শিক্ষিতা নারীই স্বীকার করিতেছেন। এই শৃঙ্খলার অভাব যে এখন প্রতীচ্যে কোন কোন দেশে

ঘটিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি য়ুরোপে একটি "লাঞ্ছিত স্বামিসঙ্ঘের" (An International Congress for Abused Husbands) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 'পুরুষের অধিকার' রক্ষাকল্পে ভায়েনা সহরে একটি লীগ আছে, হার হোবার্থ ইহার প্রেসিডেণ্ট। তিনি এই নূতন লীগ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী। জগতের সর্ব্বত্র সভ্যতা নারীদিগের স্বার্থরক্ষার্থ পুরুষের উপর যে অত্যাচার অনাচার আচরণের প্রশ্রয় দিতেছে, তাহার বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করা এই লীগের উদ্দেশ্য। একটা অত্যাচার—নারীর খোরপোষ সম্পর্কে। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিলে আদালতের বিচারে নারী খোরপোষ পাইয়া থাকে। অথচ পুরুষ খোরপোষ পায় না। ইহা মস্ত অবিচার,—লীগ এই কথা বলিয়াছেন। এই ভাবের অনেক অনাচার আছে। ইহা গেল সাধারণ দিক। ইহার বিশেষ দিকও আছে। প্রতীচ্যে আজকাল "রাত্রি ১টার নারীর" উৎপাতের জ্বালায় গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চলচ্চিত্রে এ সম্বন্ধে চিত্রও প্রদর্শিত হইতেছে। —গৃহস্থ পুরুষ বালক-বালিকা লইয়া রাত্রিতে অপেক্ষা করিতেছে, গৃহের নারীরা নাইট ক্লাব অথবা অপেরা সিনেমা হইতে রাত্রি ১টায় ঘরে ফিরিতেছে; গৃহে শৃঙ্খলা নাই, দাসদাসীরা গৃহকর্ত্রীর শাসনের অভাবে যদৃচ্ছা আচরণ করিতেছে, সংসার অচল! এ সকল অত্যাচারের বিপক্ষেও লীগ যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সুতরাং নারী সংসারের শৃঙ্খলারক্ষণে অমনোযোগী হইয়াও শিক্ষিতা ও স্বাধীনা হইবার দাবী রাখিতে পারেন কি না, তাহাও প্রতীচ্যে সমস্যাসূচক প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের দেশে সৌভাগ্যক্রমে এখনও ব্যাপকভাবে এই ভাবের নারী-জাগরণ দেখা দেয় নাই। ইহা বাঞ্ছনীয় কি না, তাহা দেশের বর্ত্তমান চিন্তাশীল নরনারী বিচার করিবেন।

পাঞ্জাব—মণ্ডলীর রাজমাতা
পাটনার নিখিল ভারত মহিলা শিক্ষা সম্মিলনের সভানেত্রী

নারীর সম্বন্ধে পুরুষের সহিত যে সমান অধিকারের দাবী করা হইতেছে, তাহা জগতের অন্যান্য সভ্য দেশে হয় কি না, দেখা যাউক। প্রতীচ্য এক্ষণে আমাদের এ বিষয়ে আদর্শস্থল হইয়াছে; কেন না, ভোটাধিকার আমরা প্রতীচ্যের অনুকরণে আপনাদের করিয়া লইতেছি। ইংলণ্ডে এই ভোটাধিকার নারীরা অল্পদিনমাত্র লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা সফ্রেজিষ্ট আন্দোলনের অগ্রণী শ্রীমতী পাঙ্খার্ষ্টের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা জানেন। এখন কেবল ইংলণ্ডে নহে, প্রতীচ্যের অনেক দেশে নারীর ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকার লইয়া আন্দোলন হইতেছে। সে আন্দোলনের ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

হাওয়াই, ফিলিপাইন, পোর্টো রিকো প্রতীচ্য জাতির দ্বারা অধ্যুষিত দেশ নহে। তথাপি সে সকল স্থান ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতীচ্যভাবে প্রভাবিত। অথচ সে সকল দেশে এখনও নারীর ভোটাধিকারের কথা কেহ আলোচনা করে না। পরন্তু সে সব দেশে পুরুষের ও ভোটাধিকার লাভের জন্য আগ্রহ নাই।

আইসল্যাণ্ডে পুরুষ ও নারীর সমান ভোটাধিকার, ২৫ বৎসর-বয়স্ক নর-নারীমাত্রেই ভোটের অধিকারী। ফিনল্যাণ্ডে তাহাই, তবে তথায় ২৪ বৎসর নির্দ্দিষ্ট বয়স। ল্যাটভিয়ায় ২০ বৎসর। এসথোনিয়ায় পুরুষ ও নারীর আইনঘটিত সকল ব্যাপারেই সমান অধিকার। পোলাণ্ডে বিবাহিতা নারী ডাক ও তার বিভাগে চাকুরী করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে নিয়ম এই যে, যে সকল নারী চাকুরী করিবে, তাহাদিগকে খাটো কাপড় (সর্ট স্কার্ট) পরিধান করিতে দেওয়া হইবে না। বেলজিয়ামে নারীর ভোটাধিকার লইয়া বাদানুবাদের মীমাংসা হয় নাই। ফরাসী সিনেট মনে করেন, নারীকে ভোট দিলে জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহার কারণ এই যে, তাঁহাদের বিশ্বাস, নারী রোম্যান ক্যাথলিক

পুরোহিতদের দ্বারা বড়ই প্রভাবান্বিতা, এই হেতু তাহারা ভোট পাইলে শাসন-ব্যাপারে পুরোহিতের প্রভাব বিস্তার করিবে। কেবল ফরাসী নহে, ল্যাটিন জাতিমাত্রেই নারীর ভোটাধিকারের বিরোধী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল স্পেনীয়রা এ বিষয়ে অন্য ল্যাটিন জাতি হইতে বিভিন্ন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রাজা এলফন্সো ও মন্ত্রী প্রাইমো ডি রিভেরার উদ্যোগে ২৩ বৎসরের নর ও নারী ভোটের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হাঙ্গারীর নারীরা ২৪ বৎসর বয়সে পুরুষের সহিত সমান ভোটাধিকার পাইয়াছে।

মিসেস্ পদ্মাবতী কনকরত্নম্—বারাণসী উইমেন্‌স্ কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলিতে এখন সর্ব্বসমেত ১ শত ৪৫টি নারী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা। নারী ভোটারদের সে দেশে একটি জাতীয় সমিতি আছে। সেই সমিতি রাজনীতিক্ষেত্রে নারী-প্রগতি সম্বন্ধে একটি হিসাব বাহির করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে, গত বৎসর যতগুলি নারী ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্যা ছিলেন, এ বৎসর তদপেক্ষা ১৯ জন অধিক নারী ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাইয়াছেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে একটা সাড়া পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু লোক বিশেষ আশ্চর্য্যবোধ করে নাই। কারণ, সম্প্রতি যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে অসংখ্য নারী ভোট দিয়াছিলেন, আর সম্মিলিত রাষ্ট্রের কংগ্রেসে পূর্ব্বে চারি জন মাত্র নারী সদস্যা ছিলেন, এবার নারী ভোটাররা ৭ জন নারীকে সদস্যা নির্ব্বাচন করিয়া কংগ্রেসে পাঠাইয়াছেন। এই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে ও কংগ্রেসে নারী সদস্যা স্থায়ী হইয়া গেলেন। আর ইহাও স্থির হইল যে, নারী সদস্যার সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি না পাইলেও বৃদ্ধি যে নিশ্চিত, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত ১ শত ৪৫ জন নারী সদস্যার মধ্যে ৬৮ জন পূর্ব্বেও সদস্যা ছিলেন; অবশিষ্ট সদস্যরা নূতন। আবার চারি জন এইবার লইয়া চতুর্থবার নির্ব্বাচিত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদের জনপ্রিয়তাও উল্লেখযোগ্য।

এই ঘটনার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া একখানি প্রাদেশিক সংবাদপত্র বলিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ড নামক প্রদেশটি অত্যন্ত রক্ষণশীল; অথচ নারী-প্রগতি বিষয়ে এই প্রদেশটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কনেকটিকাট প্রদেশে মাত্র পাঁচটি নারী সর্ব্বপ্রথম সদস্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রতি ষাণ্মাসিক নির্ব্বাচনে এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নারী সদস্যা প্রেরণ বিষয়ে এই প্রদেশটি অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এ বৎসর এই প্রদেশের সিনেটে ১ জন ও ব্যবস্থাপক সভায় ১৯ জন নারী সদস্যা আছেন। হার্টফোর্ড প্রদেশের সভায় নারী-সদস্যার সংখ্যা সমগ্র রাষ্ট্রের নারী সদস্যা-সংখ্যার শতকরা ১৩ অংশ, আর নিউ হ্যাম্পসায়ারে সদস্যা-সংখ্যা ১৩ এবং ভারমণ্টে ১০ জন।

নারী সদস্যাগণ ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া কেবল সভার শোভাবর্দ্ধন করেন না,—তাঁহারা রীতিমত কায করিয়া থাকেন—তর্ক-বিতর্ক, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি কোন কার্য্যই বাদ দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থরক্ষায় তাঁহারা সতত তৎপর থাকেন। আর সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গলচিন্তাও তাঁহারা তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

মিসেস্ রামিনি
মান্দ্রাজ বেল্লারীর প্রথম মিউ-
নিসিপ্যাল কাউন্সিলার

যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা—এখনও নয় বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই—নির্ব্বাচনাধিকার পাইয়াছেন। ইহার মধ্যেই ব্যবস্থাপক সভায় নারী সদস্যা প্রেরণে যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ৩৮টি রাষ্ট্রেই ব্যবস্থাপক সভায় নারী সদস্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কেবল ১০টি

প্রদেশে নারীরা এখনও নির্ব্বাচিত হন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রেই যে কেবল নারীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, এমন নহে; তাঁহারা নাগরিক, রাষ্ট্রীয় ও বিবিধ জাতীয় ক্ষেত্রে নিজেদের আশ্চর্য্য কার্য্য-নিপুণতা প্রকাশ করিতেছেন।

কোন কোন প্রতীচ্যের মনীষী বলেন, জার্ম্মাণ যুদ্ধ নারীর নানা অধিকারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। অনেক বণিক্, ডাক্তার বা উকীলের বিধবা বা কন্যা তাহাদের যুদ্ধে নিহত অভিভাবকের শূন্য পদ পূর্ণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক নারী যুদ্ধের সময় হইতে পুরুষের অভাবে চাকুরী পাইয়াছে এবং এখনও অনেক চাকুরী দখল করিয়া রহিয়াছে।

প্রাচ্যদেশে তুর্কীতেও নারী-আন্দোলন অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তথায় নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই। "তুর্কীর উইমেনস য়ুনিয়ন" এ বিষয়ে কামাল পাশার নিকট ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ইসমেত পাশা বলেন,—"নারী ভোটাধিকার বা চাকুরী পায়, ইহা ত খুব ভাল কথা, কিন্তু দেশের আইন ত তাহা দিতে বলে না।" চীন দেশের আইন সর্ব্বত্র সমান নহে। চিহিলি প্রদেশে চীনা নারীর প্রতীচ্যের নারীর অনুকরণে 'উন্নত' হইবার উপায় নাই, অথচ পিকিনে 'ববড্ হেয়ার ও সর্টস্কার্ট' নারীর পোষাকের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ভারতেও নারীর ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধে খুবই আন্দোলন চলিতেছে। এখন নারী ভারতে ভোটাধিকার পাইতেছেন এবং নানা পেশা ও চাকুরী অবলম্বন করিতেছেন। এ সকল কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও এখন প্রতীচ্যেও সর্ব্বত্র নারীর সমান অধিকার সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

বর্ত্তমান সংখ্যার 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রে মাদাম সিগ্রিড আণ্ডসেটের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে একটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। মাদাম সিগ্রিড আণ্ডসেট এ বৎসরে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, এ কথা সকলেই জানেন। জগতে যাহারা নূতন চিন্তার ধারা আনয়ন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়, এইরূপ প্রকাশ। সুতরাং তিনি যে শিক্ষিতা, চিন্তাশীলা, বিদুষী মহিলা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উল্লিখিত পত্র তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"তিনি সাংবাদিকগণকে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই চমৎকার, তেমনই সুন্দর। তিনি বলিয়াছেন,—'আমাকে বেশী কিছু প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন। আমি অল্প সময় হইল, মাত্র কেবল্ পাইয়া জানিয়াছি যে, আমি এই পুরস্কার পাইয়াছি। কিন্তু ইহা লইয়া কোনপ্রকার দার্শনিকতা প্রকাশের আমার অবসর নাই। এখন আমি আমার খোকা-খুকীদের ঘুম পাড়াইবার জন্য বিছানায় লইয়া যাইব। স্বভাবতঃই এই সম্মানে আমি আহ্লাদিত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার গৃহে আমার শিশুদের সাহচর্য্যে যে আনন্দ আমি লাভ করিয়া থাকি, তাহার কাছে ইহা কিছুই নহে।'......আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আধুনিক নারী আন্দোলন এবং পুরুষের সমান নারীর অধিকারপ্রাপ্তির প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই। তিনি বলেন, ইহাতে সুখের সংসার বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া যাইবে, কারণ, নারীর মন বহির্ম্মুখ হইয়া গৃহকর্ত্তব্যে অবহেলা আনয়ন করিবে। স্ত্রীলোক গৃহলক্ষ্মী হইয়া থাকুক—এক কথায় ইহাই তাঁহার মত। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সাংসারিক কাযেই অধিকতর আনন্দ পান। ......শ্রীমতীর শেষ কথা এই যে, 'আমি গৃহের বাহিরে গিয়া কাযে আনন্দ পাই না। আমি ১০ বৎসর ৩ মাস টাইপিষ্টের কায করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই কষ্টকর দিনের স্মৃতি কদাচ ভুলিতে পারিব না। প্রথম প্রথম সকলই আমার নূতন বলিয়া বোধ হইত—সে জন্য উহার ভীষণতা আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু কিছু দিন পরই উহা আমার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক জন বাইরের লোকের হুকুম তামিল করার চেয়ে গৃহে পিতার বুট পালিশ করা আমি শতগুণে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি'।" ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক বলিয়াই বিবেচনা করি।

এখন কথা, সকল দেশের নারী জাগরণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করা আমাদের কর্ত্তব্য? উহা কি প্রতীচ্যের গৃহীত পথানুযায়ী হইবে, না, আমাদের দেশের ভাবধারার অনুযায়ী হইবে?

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ

(পূর্ব্বভাগ)

মাঘ মাসের বসুমতীর 'প্রত্যুত্তরে' বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। বিস্ময়ের হেতু,—প্রত্যুত্তরবাদীর সত্য গোপনে সাহস ও নির্লজ্জতা। আনন্দের কারণ, তাঁহার লুক্কায়িত বিড়ালবৎসের শনৈঃ বহিষ্করণ।

সত্য গোপনে সাহসের একটা উপমা দিতেছি,—আমি যদি লিখিয়া থাকি, 'মিথ্যা কহিবে না' কিছুকাল অতীত হইলে প্রত্যুত্তরবাদী স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন, 'মিথ্যা কহিবে' এ কথা যে ব্যক্তি লিখিতে পারে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান কতদূর, পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন।' পাঠক আমার লেখা মুখস্থ করিয়াও রাখেন নাই এবং প্রত্যুত্তরবাদী বহু বাঙ্গালী পাঠককে জানেন, তাঁহারা আমার লেখা প্রবন্ধটি বাহির করিয়া মিলাইয়া যে দেখিবেন, সে আশঙ্কাও তাঁহার নাই। বিশেষতঃ তিনি মিথ্যা ত লিখেন নাই, 'মিথ্যা কথা কহিবে না' লিখিতে হইলে প্রথমেই ত 'কহিতে' পর্য্যন্ত লিখিতে হইয়াছে, পরে যে 'না' টা আছে, সেটা না তুলিলেই ত হইল। ঠিক এইরূপ করিয়া লোক ঠকাইবার চেষ্টা 'প্রত্যুত্তরে' আছে। কিন্তু ভয় হইল না, যদি কোন পাঠক এই ভাব ধরিয়া ফেলেন! প্রত্যুত্তরবাদীর এই নির্লজ্জ সাহস দেখিয়া আমি বিস্মিত। খণ্ডনস্থলে সেই চেষ্টাটা ধরাইয়া দিব। আনন্দের কারণ, ধীরে ধীরে মুখোস খোলা হইতেছে—এবার বাল্মীকি-রামায়ণ অপ্রমাণ হইয়াছেন, ক্রমে সকল শাস্ত্রই এইরূপ হইবেন, তাহা হইলেই স্বরূপ-প্রকাশ হইবে, সমাজও নিশ্চিন্ত হইবেন। পাঠকগণের নিকটে নিবেদন —তাঁহারা যদি আমাদিগের এই বিচারকে মল্লযুদ্ধ বা মেড়ার লড়াইরূপে পরিগণিত না করেন, তাহা হইলে—আমাদিগের উভয়ের কথাই পূর্ব্বাপর মিলাইয়া দেখিবেন। আমি ফাঁকা গালাগালি দিয়া বিচারে জয়ী হইতে বা পাঠকের নিকট বাহবা পাইতে চাহি না, যথার্থ শাস্ত্রার্থ কি, তাহাই জানাইতে চাহি; এই কারণে এ পর্য্যন্ত আমাদিগের উত্তর-প্রত্যুত্তর কিরূপ হইয়াছে—তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই স্থানে প্রদান করিতেছি,—

ভাদ্রমাসের বসুমতীতে 'শাস্ত্র-সমস্যা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবৃত ছিল,—

(১) গীতায় যে "শাস্ত্রং প্রমাণং তে" আছে, সে শাস্ত্র—বেদ, কল্পসূত্র ও কতিপয় প্রাচীন সংহিতা মাত্র। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল না, পুরাণাদিও ছিল না। (২) যৌবন-বিবাহই প্রচলিত ছিল। তখনকার শাস্ত্রে ও মহাভারতে বাল্যবিবাহের কোন প্রমাণ নাই। (৩) মনু বলিয়াছেন, দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এখন বেদাধ্যয়ন নাই, কাযেই ব্রাহ্মণ নাই। (৪) ভাগবত দীক্ষা গ্রহণে মনুষ্যমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাসস্থ' টীকা প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হয় এবং "ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।" এই বচনও প্রমাণ-স্বরূপে প্রদর্শিত হয়। (ভাদ্র সংখ্যার 'বসুমতী' আমার নিকটে নাই, অগ্রহায়ণ মাসের 'বসুমতীতে' আমি এই সকল বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছি, তাহা হইতেই বিষয়গুলি উদ্ধৃত হইল)।

অগ্রহায়ণ মাসের 'বসুমতীতে' আমি ইহার প্রতিবাদে বলি,—(১) মহাভারতের সময়ে বেদ, কল্পসূত্র ছিল, মনু, পরাশর, বসিষ্ঠ, গৌতম, উশনাঃ, অত্রি, যম, শঙ্খ, অগস্ত্য, কশ্যপ, জমদগ্নি প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল—পৌষ মাসের 'মাসিক বসুমতীতে' প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করিয়াছেন, কেবল মন্ত্রদ্রষ্টা নহেন বলিয়া মনুকে বাদ দেওয়ার কথা বলেন। অধিকন্তু আরও কয় জনের নাম তিনি করিয়াছেন, যথা—অঙ্গিরাঃ, সংবর্ত্ত, নারদ, ভরদ্বাজ। এ নামগুলি তিনি করিয়াছেন অবশ্য বাহাদুরী দেখাইবার জন্য; আমি 'জমদগ্নি প্রভৃতি' বলিয়া যাঁহাদের নাম প্রভৃতির মধ্যে ধরিয়াছিলাম, তিনি বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, মাঘমাসে আমি আরও কয়েকটি নাম দেখাইয়াছি। আর মনু যে মন্ত্রদ্রষ্টা, তাহাও দেখাইয়াছি। উভয়ের মত হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, মহাভারতের সময়ে বহু ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল। আর আমি বলিয়াছিলাম, "পরাশর প্রভৃতির উপদিষ্ট পুরাণও তখন ছিল; কারণ, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণে পুরাণের উল্লেখ আছে।"

(২) মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতীতেই' দেখাইয়াছি, "ত্রিংশদ্বর্ষো দশবর্ষাং

ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।” দশমবর্ষীয়া কন্যাকে ত্রিংশদ্বর্ষীয় বর বিবাহ করিবে। বেদব্যাসের পিতা পরাশর তাঁহার সংহিতাতে যে “অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী” ইত্যাদিরূপে বাল্য-বিবাহের বিধান করিয়াছেন, তাহাও দেখাইয়াছি। গোভিলও অপ্রাপ্ত-রজস্কার বিবাহেরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও দেখাইয়াছি।

(৩) গায়ত্রী পাঠ এবং স্মৃতি ও বেদাঙ্গ অধ্যয়নেও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হয়, শূদ্রত্ব হয় না, ইহা বলিয়াছি। প্রত্যুত্তরবাদীও বলিয়াছেন, গায়ত্রীপাঠে বেদাধ্যয়নের দৃষ্টার্থ-সিদ্ধি হয় না। তবেই হইল, অদৃষ্টার্থ যে ব্রাহ্মণত্ব, তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(৪) সনাতন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, বৈষ্ণব দীক্ষায় দীক্ষিত সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম বৈষ্ণব শূদ্র—শূদ্রই থাকে,—তাহার বৈশ্যাদিকে দীক্ষাদান করিবার অধিকার হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণ—‘হরিভক্তিবিলাসের’ দীক্ষাপ্রকরণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ‘ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা’ ইত্যাদি বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা অগ্রহায়ণ মাসের বসুমতীতে ‘শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণে’ আছে,—মাঘ মাসে প্রতিবাদী তাহার আংশিক প্রতিবাদ করিলেও সত্যটা তাঁহার লিখিতাংশ হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, “জ্ঞানী ও পণ্ডিত বিপ্রেন্দ্রকে দান করিলে যে পুণ্য হইয়া থাকে এবং তাহার নিকটে প্রতিগ্রহ করিলে যে পুণ্য হইয়া থাকে, যথার্থ ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন **ম্লেচ্ছকেও** দান করিলে সেই **প্রকার** পুণ্যই হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলেও **সেইরূপ** পুণ্য হইয়া থাকে।” অতএব সেই ম্লেচ্ছ, ভগবদ্‌ভক্তি-সম্পন্ন হইলেও ম্লেচ্ছই থাকিবে, বিপ্রেন্দ্র হইবে না, কেবল তাহাকে দান করিলে উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করিবার ফল হইবে, এইমাত্র এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

‘**সেইপ্রকার**’ ‘**সেইরূপ**’ ইহা উপমা-বোধক, চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলিলে, মুখখানি চন্দ্র হইয়া আকাশে উঠে না।

“পুণ্যং দত্যাদপি শতগুণং বাজিমেধাযুতস্য।”

ভগীরথ-দশহরায় গঙ্গাস্নানে অযুত অশ্বমেধ-যজ্ঞের শতগুণ অর্থাৎ দশলক্ষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়; তা বলিয়া গঙ্গাস্নান আর দশলক্ষ অশ্বমেধ-যজ্ঞ এক হইয়া যায় না। আমার মত, ঐ বচনটিতে ভগবদ্ভক্ত ম্লেচ্ছের প্রশংসা আছে, প্রতিবাদীও তাহাই বলিয়াছেন, তবে আমার ভাষাটা তিনি গ্রহণ করেন নাই, এই যা প্রভেদ। ফলতঃ বর্ণবাহ্য পাহাড়িয়া জাতি যে ভাগবতধর্ম্ম দীক্ষায় ক্ষত্রিয় হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বথা সিদ্ধ হইয়াছে।

ভাদ্র মাসের শাস্ত্র-সমস্যায় ‘ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনীয়’ এই ভাব প্রচারিত হয়, তাহারই সমর্থনকল্পে অগ্রহায়ণের বসুমতীতে ‘শাস্ত্র-সমস্যা’ প্রবন্ধে, ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন, স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ প্রমাণের আলোচনা থাকে। পৌষ মাসে আমি তাহার খণ্ডন করি। সেই পৌষ মাসেই শাস্ত্র-সমস্যায় শবর স্বামীর ভাষ্য ও কুমারিল ভট্টের বার্ত্তিক উদ্ধৃত হয়, রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল, তাহার দ্বারা ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন এবং স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্থাপন। আমি মাঘ মাসের বসুমতীতে দেখাইয়াছি, কুমারিল ভট্টের সেই বার্ত্তিক, বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডনার্থই রচিত, প্রতিবাদী সেই বার্ত্তিকের পূর্ব্বাপর গোপন করিয়া নিজের মীমাংসাশাস্ত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আর জৈমিনি, শবর স্বামী, কুমারিল প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও মীমাংসাদর্শন ১ম অঃ ৩ পাদে ২য় সূত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। শবর স্বামী কল্পসূত্রের কতিপয় বিধিবাক্যকে অপ্রমাণ বলিয়াছিলেন, কুমারিল ভট্ট তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও দেখাইয়াছি। মাঘ মাসের মদীয় প্রবন্ধ বিশেষ বিস্তৃত হওয়াতে একটি কথা বলা হয় নাই, তাহা এই ক্ষেত্রে বলিতেছি,—কুমারিল ভট্ট ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা একটি কারিকায় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যথা,—

“বচনাদৃত ইত্যেবমপবাদো হি সংশ্রিতঃ।
যদি ষড়্ভিঃ প্রমাণৈঃ স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ কেন বার্য্যতে॥”

সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক-কেশরী পার্থসারথি মিশ্র এই কারিকার টীকায় লিখিয়াছেন, “অনিরাকরণীয়ত্বাদপি সর্ব্বজ্ঞস্য ন তন্নিরাকরণপরং শাস্ত্রমিত্যাহ যদীতি।”

ভট্টমতে প্রমাণ ষড়্‌বিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। এই ষট্ প্রমাণের যথাযথ প্রয়োগে সর্ব্বজ্ঞতা হয়, তাহার নিবারণ হয় না। ইহা কারিকার মর্ম্ম।

সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন অকরণীয়, এই হেতু তাহার খণ্ডনার্থ ভাষ্যের সন্দর্ভ নহে। ইহা টীকার মর্ম্মার্থ।

সুতরাং যে স্থলে বার্ত্তিকাদিতে সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন আছে,—বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডনই সে স্থলে স্পষ্টভাবে কথিত। কারণ, তাঁহারা বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার না করায় যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই, ইহাই মীমাংসাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

ক্যাটালগী-বিদ্যায় সাহেবী ছাঁচে ভুঁইফোড় মীমাংসকগণের মত অবশ্যই পৃথক্।

যে বিষয়ে মীমাংসক মতের সহিত ন্যায়মতের বিরোধ আছে, সে বিষয়ে আমি ন্যায়মতের অনুবর্ত্তী, তাহা স্পষ্টই বলিয়াছি।

যোগবলে সর্ব্বজ্ঞতা কুমারিল ভট্ট স্বীকার করেন নাই। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণবলে সর্ব্বজ্ঞতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। নৈয়ায়িকাচার্য্যগণ— যোগবলে স্বীকার করেন,—এ সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন, প্রশস্তপাদ, বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, উদয়নাচার্য্য, শ্রীধর, বল্লভাচার্য্য, গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই একমত। উদয়নাচার্য্যের কোন স্থানের সন্দর্ভ দ্বারা বুঝা যায়, সেই যোগ, বেদার্থ আশ্রয় করিলে তদ্দ্বারা বেদজ্ঞের অতীন্দ্রিয় দর্শন হইতে পারে, নতুবা হয় না, ইহা তাঁহার মত। যাহা হউক, যোগজ প্রত্যক্ষে যে অতীন্দ্রিয় দর্শন হয়, ইহা সর্ব্বসম্মত; আমি সেই মতই আশ্রয় করিয়াছি। আর কুমারিল ভট্ট যে যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ বৌদ্ধ-বিভীষিকা।

"আম্নায় বেদমন্ত্র, সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র" আমি এ কথা লিখি, ইহার প্রতিবাদ হইয়াছিল, আমি মাঘ মাসে তাহার—সপ্রমাণ খণ্ডন করিয়াছি,—প্রমাণ—"আম্নায়েভ্যঃ পুনর্ব্বেদাঃ প্রসৃতাঃ সর্ব্বতোমুখাঃ।" (শান্তিপর্ব্ব)

"আমার কৃত বিভাগ" অসঙ্গত, এই যে প্রতিবাদীর উক্তি, ইহা একান্ত অমূলক, তাহাও দেখাইয়াছি। প্রতিবাদীর দম্ভমূলক যে যে উক্তি, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটা কথা এই স্থানে বলা প্রয়োজন বোধ করি, এ পর্য্যন্ত আমি পরমত খণ্ডন বা স্বমত স্থাপনের জন্য যে যে স্থলে বহুযুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার কোন কোনটি প্রতিবাদীর বিদ্যা পরীক্ষার্থও আছে; সময়ে তাহা বুঝাইব। মাঘমাসে প্রতিবাদীর যে বিদ্যাপরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমার সাধ মিটিয়াছে। অতঃপর সে জন্য আর যত্ন করিব না। এই স্থানেই পূর্ব্ব-বিচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত করিলাম। মাঘ মাসের 'মাসিক বসুমতী' ৫৯৬ পৃষ্ঠায় যে 'প্রত্যুত্তরের' অনুবৃত্ত,-তাহার খণ্ডন অতঃপর করিতেছি।

উত্তরভাগ বা খণ্ডন

'প্রত্যুত্তর' ৫ পৃষ্ঠাব্যাপী, তাহার ভাবার্থ,—মহাভারতের পূর্ব্বে যে পুরাণ ছিল, তাহার প্রমাণ বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে 'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণে' দেওয়া হইয়াছে, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে দেওয়া হয় নাই। ইহা অল্পজ্ঞতার পরিচায়ক। বাল্মীকি-রামায়ণ জাল. এখানি মহাভারতের পরে রচিত, ভাষা তাহার একতম প্রমাণ। রামায়ণে একটি শ্লোকে বুদ্ধদেবকে চোর বলা হইয়াছে—অতএব এই জাল বাল্মীকি-রামায়ণ বুদ্ধের পরে রচিত। এই রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণ না করিলে, রামায়ণ-প্রমাণে মহাভারতের সময় পুরাণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। মহাভারত রচনার পূর্ব্বে কোন্ মূল পুরাণ ছিল, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই, অতএব তাহাও অসঙ্গত উক্তি। গায়ত্রী-জপে বেদপাঠের কার্য্য হয় না, দৃষ্ট ফল যে বেদার্থজ্ঞান, তাহা কি গায়ত্রীপাঠে হয়? অতএব গায়ত্রীজপ দ্বারা যে বেদপাঠের ফল হয়, এইরূপ উক্তি, তাহা প্রশংসা মাত্র। অর্থাৎ গায়ত্রী উপদেশ পাইলেও ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়—এই মতের খণ্ডন হয় নাই। 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' ইহা বিধি বলিয়া মানিয়াও তাহাকে 'অনুবাদ'রূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আর বিধি নহে বলিয়া তাহার বিচার যে শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণে করা হয় নাই, তাহা "অজ্ঞতা প্রচ্ছাদনের কৌশল" ইত্যাদিরূপে গালাগালি আনুপাতিক তিন পৃষ্ঠা। ঐরূপ গালাগালির উত্তর আমি তেমন দিতে চাহি না। তাঁহার প্রত্যুত্তরের উত্তর প্রদান করিতেছি:—

ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ইতিহাসপুরাণং' আমার প্রদত্ত প্রমাণ হইলে, প্রত্যুত্তরদাতা বলিতেন, ইহা সাধারণ পুরাণ নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাস ও পুরাণ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট, "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ" ইত্যাদি অনেক প্রমাণ আছে, ছান্দোগ্যে যে ইতিহাস পুরাণ—তাহা পুরাতন ইতিহাস মাত্র—পুরাণশাস্ত্র নহে। যাহাতে এমন কথা উঠিতে পারে, তাহা ত্যাগ করিয়া যাহা সুস্পষ্ট, রামায়ণের সেই প্রমাণ দিয়াছি। এখন তাহার খণ্ডনের জন্য যে সব উক্তি তাহা পাঠে বুঝিয়াছি, ছান্দোগ্যের নাম আমার না করাই ভাল হইয়াছে। আমার প্রদর্শিত বলিয়া বাল্মীকি-রামায়ণ জাল হইলেন, ছান্দোগ্যও অব্যাহতি পাইতেন না। বুদ্ধের নাম থাকায় রামায়ণ বুদ্ধের পরবর্ত্তী হইলেন, "ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই সকল

কথা ছান্দোগ্যে থাকায় প্রত্যুত্তরদাতা ছান্দোগ্যকেও বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, ইহা বেশ বুঝা যাই-তেছে। এ অধমের কৃত কার্য্যের ফলে শ্রুতির যে এই অবমাননা হয় নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য।

রামায়ণ যে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী. তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পুনঃ প্রদর্শন করিতেছি—মহাভারতে যত জনপদ উল্লিখিত হইয়াছে, রামায়ণে তাহা নাই। মহাভারতে বাল্মীকির নাম আছে,রামায়ণে বেদব্যাসের নাম নাই। মহাভারতে রাজপুরোহিত ধৌম্যের নাম আছে, রামায়ণে তাঁহার নাম নাই, পক্ষান্তরে রামায়ণের রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠের নাম মহাভারতে আছে। রামায়ণোল্লিখিত রাজগণের নাম মহাভারতে আছে, মহাভারতোল্লিখিত বৃহদ্বল প্রভৃতি পরবর্ত্তী রাজগণের নাম রামায়ণে নাই। বাল্মীকিকৃত রামায়ণ পাঠে বুঝা যায়, রামরাজত্বকালে এই রামায়ণ রচিত, মহাভারত শ্রীরামের বহু অধস্তন বংশধর বৃহদ্বলের সমসাময়িক কুরুপাণ্ডবের চরিত বর্ণনার্থ রচিত। এতদ্দেশীয় শিষ্টগণ রামায়ণকে প্রমাণ গ্রন্থ বলিয়াই মানিয়া আসিয়াছেন, সেই রামায়ণের উক্তিতে অবিশ্বাস করা অনুচিত, এই সকল কারণে রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বিশ্বাস করি। 'প্রত্নতত্ত্ববিৎ' য়ুরোপীয় বা তদনুসারী যাঁহারা ভগবদ্গীতাকেও খৃঃ ২য় শতাব্দীর রচিত ও প্রক্ষিপ্ত বলিতে সঙ্কুচিত নহেন, তাঁহাদিগের মত যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিচার করা কেন, প্রতীচ্যের পণ্ডিতরা যাহা বলে, 'যো হুকুম' বলিয়া তাহা মানিবার যে আয়োজন চলিয়াছে, তাহাই পুরা দমে প্রকাশ্যে চলুক, আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি।

সরল ও জটিল ভাষা দ্বারা সময়ভেদ নিরূপণ হয় না। প্রত্যুত্তরদাতাই বলিয়াছেন, এই লেখকের ভাষা শতকরা ৯৯টি পাঠক বুঝে না। অবশ্য সকল লেখকের ভাষা যদি এমনই হইত, তাহা হইলে সেকালের 'বঙ্গদর্শনের' অনন্তসাধারণ খ্যাতি ও মাসিক বসুমতীর ১৫ হাজার গ্রাহক হইত না। ভাষা রচয়িতার। রচয়িতার শক্তি-ভেদে ভাষার প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। অতএব প্রতিবাদীর ভাষাঘটিত যুক্তি অসার।

বুদ্ধ বলিলে যে কেবল শাক্যসিংহকেই বুঝিতে হয়, তাহা নহে; শাক্যসিংহ পরবর্ত্তী কালের এক জন বুদ্ধ এই মাত্র। অমরকোষপাঠীরাও জানেন—

'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ' ইত্যাদি নাম বুদ্ধের। আর 'শাক্য-মুনিস্তু যঃ স শাক্যসিংহঃ' ইত্যাদি নাম শাক্যসিংহের।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ লঙ্কাবতারসূত্রে আছে—'পৃষ্টা ময়া পূর্ব্বকাঃ তথাগতাঃ অর্হন্তঃ সম্যক্ সংবুদ্ধাঃ" "অয়ঞ্চ বুদ্ধৈঃ ত্বয়া চ অনুবর্ণিতং ভবিষ্যতি।"

লঙ্কাধিপতি ভগবান্ শাক্যসিংহকে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বতন তথাগত সম্যক্ সংবুদ্ধ অর্হৎগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

"ইহা (পূর্ব্ব) বুদ্ধগণ বর্ণনা করিয়াছেন, আপনিও অবশ্যই করিবেন।"

পূর্ব্বতন বুদ্ধগণ ছান্দোগ্যবর্ণিত অসদ্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পূর্ব্বতন বুদ্ধ তথাগতই রামায়ণে বর্ণিত। পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ চতুর্থ, কনক মুনি পঞ্চম এবং কাশ্যপ ষষ্ঠ বুদ্ধ, ইঁহাদের উল্লেখও লঙ্কাবতারসূত্রে আছে। এ সকল প্রমাণে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারাই বুদ্ধের নাম দেখিয়া রামায়ণকে শাক্যসিংহের পরে আনিতে চাহে। রামায়ণে বুদ্ধদেব বলা নাই, শাক্যসিংহের নামও নাই।

"যথাহি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।"

রামায়ণের এই শ্লোকে বুদ্ধ ও তথাগত শব্দ আছে। ইঁহারা অতি পূর্ব্বতন। অতএব রামায়ণ যে মহাভারতের পূর্ব্ব-বর্ত্তী—ইহা নিঃসন্দেহ।

একখানি পুরাণও যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মূল পুরাণের সন্ধান পাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদ. মার্কণ্ডেয়পুরাণের অলর্ক-মদালসা-সংবাদ, মৎস্যপুরাণের মনুমৎস্য-সংবাদ ইত্যাদি অংশ সেই মূল পুরাণ হইতেই সংগৃহীত। এমন পুরাণ নাই, যাহার মধ্যে মূল পুরাণ-সমূহের তথ্য নিবেশিত হয় নাই। বেদব্যাসের পুরাণ-রচনায় যেগুলি উপকরণ—উপাখ্যান তাহার অন্যতম, পূর্ব্ব-শাস্ত্র হইতে যাহা শ্রুত, তাহা উপাখ্যানের অন্তর্গত। অতএব মূল পুরাণ অনির্দ্দিষ্ট নহে। অন্ততঃ ২১খানি মন্বাদি সংহিতা, মূল পুরাণস্থিত আচার-শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, কাপিল দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র এ সমস্তই মহাভারতের সময়ে ত ছিলই, আরও অনেক শাস্ত্র ছিল যাহা এখন বিলুপ্ত; উপপুরাণাদিতে তাহার ভাবমাত্র আছে। অতএব মহাভারতের পূর্ব্ব হইতেই অদ্য পর্য্যন্ত শাস্ত্রপ্রবাহ একরূপই আছে। ধর্ম্ম একরূপই আছে, অশক্তিবশতঃ আচরণের হ্রাস হইয়াছে, এই মাত্র। অশক্তিবশতঃ হ্রাস আর পরিবর্ত্তনসাধন এক নহে। যথাযথ প্রমাণপ্রয়োগে সর্ব্বজ্ঞ (পরমতে)

বা যোগজ প্রত্যক্ষবলে সর্ব্বজ্ঞ (স্বমতে)—এখন নাই, সুতরাং ধর্ম্মনির্ণয়ে ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত কোন মতেই গত্যন্তর নাই।

'সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি' ইত্যাদি বচন অর্থবাদ, 'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদম্' এ বচনটি কি—অর্থবাদ নহে? বিধিবাক্য হইবে কি? তাহা যদি হয়, মীমাংসক-পুঙ্গবের বিধিলক্ষণটা এ স্থলে যোজনা করা উচিত। শবর স্বামী বলিয়াছেন, 'নাত্র বিধির্গম্য ত বর্ত্তমানকালপ্রত্যয়নির্দ্দেশাৎ' শবরভাষ্য। ১।৩।১৩। কুল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যায় যে শঙ্খলিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহাও কি বক্তৃতার প্রভঞ্জনে উড়াইয়া দিতে হইবে?

"বেদমনধীত্যাপি স্মৃতিবেদাঙ্গাধ্যয়নে বিরোধাভাবঃ। অতএব শঙ্খলিখিতৌ ন বেদমনধীত্যান্যাং বিদ্যামধীয়ীতান্যত্র বেদাঙ্গস্মৃতিভ্যঃ।" ইতি কুল্লুকভট্টঃ।

বেদাঙ্গ ব্যাকরণাদি এবং স্মৃতি ব্যতীত অপর বিদ্যা অধ্যয়ন—বেদ অধ্যয়ন না করিয়া করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এই ভাবার্থ শঙ্খ-লিখিত বচনানুসারে কুল্লুক ভট্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদপাঠের যে দৃষ্টার্থ, তাহা গায়ত্রীপাঠে হয় না—এই আপত্তি? বলি, দৃষ্ট অর্থ কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? ব্রাহ্মণ্যই যে অদৃষ্টার্থ,—এই অদৃষ্টার্থ দারিদ্র্যভূত ব্রাহ্মণ্য যদি গায়ত্রীপাঠে হয়, প্রত্যুত্তরবাদী এ বিষয়ে আপত্তি প্রদর্শিত না করিয়া—মৌনং সম্মতিলক্ষণং করিয়াও মানরক্ষার্থ লোকনয়নে ধূলিপ্রক্ষেপের অভিপ্রায়ে—বক্তৃতা জুড়িয়া দিয়াছেন। আরও এক কথা, যদি তাহাতে ব্রাহ্মণ্য না-ই হয়, তবে পৌত্রের উপনয়নের প্রহসনটা করা হইল কেন? প্রত্যুত্তর-লেখকের এ বিষয়ে বক্তব্য কি আছে?

ফল কথা—গায়ত্রীজপে যখন 'সংসিধ্যেৎ' তখন সর্ব্ববেদার্থজ্ঞানই হয়। গায়ত্রীর অর্থ ধ্যান করিয়া—গায়ত্রী জপ যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল—এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান। সুতরাং সর্ব্ববেদার্থজ্ঞান না হইবে কেন? এই যে ভাবনাময় সংসিদ্ধিপ্রদ জপ—ইহা ঘরের কোণও নয়, আকন্দ গাছও নয়, ইহাও দুরারোহ পর্ব্বত। সুতরাং মধু সুলভ নহে, পর্ব্বতে উঠিতেই হয়, তবে সে পর্ব্বত হিমালয়ই হউক আর কৈলাসই হউক। পিতৃ-পিতামহকে শূদ্র করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ 'ভাগবত ধর্ম' দীক্ষায় ব্রাহ্মণ হওয়াটা কি এতই বাঞ্ছনীয়?

ফলে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

"তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যম্" ইতি প্রতীকযুক্ত—বচন যে বিধি নহে, তাহার বিচার আমি অজ্ঞতা বশতঃ করি নাই, এই ত কথা? ইহাতে আমার কোনই দুঃখ নাই। 'পাঠকের সহজ-বোধ্য হইবে না' ইহা ত আমার লেখারই দোষ-স্বীকার। আমার কথা লোকে ত বুঝিতে পারে না, তবু শতকরা একটাও বুঝে, বিধিবিচারে মোটেই বুঝিতে পারিবে না, ইহা পাঠকের দোষ নহে, আমারই ত দোষ। তথাপি প্রত্যুত্তরবাদীর কর্ণকণ্ডুয়নাপনোদনের জন্য দু'চার কথা এবারে বলি;—

'ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে' এই 'অপি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় ইহা বিধিবাক্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

"বরং ভক্ষ্যমভক্ষ্যঞ্চ পিবেদ্ বা গর্হিতঞ্চ যৎ।
মাঘে মাসি ন ভুঞ্জীত মূলকং মদিরাসমম্॥"

ঐ স্থলে 'ভক্ষ্যং' যৎ প্রত্যয় ও 'পিবেৎ' লিঙ্ প্রত্যয় থাকিলেও উহা বিধি নহে, অভক্ষ্য-ভক্ষণের বিধি বা অপেয়-পানের বিধি ঐ স্থলে নাই, উহা মাঘ মাসে মূলক-ভক্ষণের নিন্দার্থবাদ, নিষেধের আতিশয্যদ্যোতক; সেইরূপ এখানেও 'দেয়ং গ্রাহ্যং' ইহা ভক্তির প্রশংসা, ভজনবিধির প্রকর্ষ-দ্যোতক। ম্লেচ্ছ, ভজনে অধিকারী নহে—ইহা চৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত বিষ্ণুপুরাণবচনে কথিত;—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

ম্লেচ্ছের বর্ণাশ্রমাচার নাই, অতএব তদধীন ভজনও নাই। তবে যে 'ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে' আছে, তাহা "সর্পাঃ সত্রমাসত বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত" আদির ন্যায় অন্যার্থক। শবরভাষ্য ১।১।৩২।

অর্থাৎ সর্পও যাগ করিতে পারে না, বনস্পতিও পারে না। তথাপি তাহার যে যাগানুষ্ঠান বেদে বর্ণিত, তাহার কারণ এই যে, অজ্ঞ সর্প, স্থাবর বৃক্ষ যে কার্য্য করিতে তৎপর—ইহা বলাতে বিদ্বদ্ ব্রাহ্মণের পক্ষে সেই যাগ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানেও তাহাই হইয়াছে, ম্লেচ্ছের অধিকার না থাকিলেও তাহার কথা উল্লেখে ইহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে যে, অধিকারী বর্ণাশ্রমাচারীর পক্ষে বিষ্ণুভক্তি একান্ত আবশ্যক। অতএব ম্লেচ্ছের পক্ষে উহা বিধিই নহে। এবার মীমাংসক-পুঙ্গবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তজ্ঞানের বড়াইটা খুব জবর; কিন্তু তাহা 'তিলকও কাটিব, নমাজও পড়িব' এই

সিদ্ধান্ত জ্ঞানের বড়াই! ফলতঃ, কোন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তেই জাতির নাশ বা উৎপত্তি কল্পিত হয় নাই। যেরূপ কর্ম্মফলে নীচ জাতিপ্রাপ্তি হয়, তাহার নিবৃত্তি এবং যেরূপ কর্ম্মফলে উৎকৃষ্ট জাতিপ্রাপ্তি হয়, তাহার উৎপত্তিই স্বীকৃত হইয়াছে, সেই কর্ম্মফল জন্মান্তরে উৎকৃষ্ট জাতিপ্রাপ্তির কারণ। দেশ একেবারেই মূর্খ হইয়া যায় নাই—মীমাংসাদর্শনসিদ্ধান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত যে কত বিরুদ্ধ, তাহা জানেন, এমন লোক এখনও অনেক আছেন। অদ্বৈত মতের সহিত বৈষ্ণব রাধাতত্ত্ব জুড়িয়া দেওয়া—অদ্বৈতাপরোক্ষের পর—শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ণ অভেদজ্ঞানের পর, আবার দ্বৈতজ্ঞান—ভেদজ্ঞান অর্থাৎ জীবন্মুক্তির পর সংসার-বন্ধন যে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিদের এ সব প্রলাপ 'হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যে'র প্রসঙ্গে একাকার মজলিসে শোভা পায়, তাঁহার কিন্তু ভাবা উচিত, এ বড় কঠিন ঠাঁই! 'কুঁদের মুখে বাঁক থাকিবে না'।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত কেন, বীর শৈব-সিদ্ধান্তও ত আছে,

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী—ইত্যাদি,—

(হরিভক্তিবিলাস হইতে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোক)

মূল শিবপুরাণে—এই সব শ্লোক দেখিতে পাই; কেবল অস্মৎশব্দের অর্থ লইয়াই ভেদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে অস্মৎশব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, বীর শৈবসিদ্ধান্তে মহেশ্বর শিব। শিবপুরাণ বায়ুসংহিতা উত্তর ভাগ একাদশ অধ্যায় মিলাইয়া দেখিলেই আমার কথার সত্যতা বুঝিবেন। এ সকল সিদ্ধান্তের সমন্বয় করিতে হয়। উপর উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বুঝিলে চলিবে না। সমন্বয় শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্রের অধীন। পুরাণও স্মৃতিরই অন্তর্গত। সমন্বয়স্থলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত যদি শ্রুতি-স্মৃতিবিরুদ্ধ হয়, তবে তাহা উপাদেয় হইতে পারে না। যদি বিরুদ্ধ না হয়, কিন্তু মতান্তর হয়, তাহা হইলেও—'যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং' পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত সৎপথ ত্যাগ অকর্ত্তব্য। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জাতিব্রাহ্মণ স্থলে নিম্ন-জাতীয় দৈক্ষ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধপাত্রান্ন দান করেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমার কিছু বক্তব্য নাই, তবে অদ্বৈতাচার্য্যের যে পাত্রান্ন দান, তাহা সেরূপ নহে; কাযেই এ স্থলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না;—সে বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব। যদি কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন ত তাঁহাদিগের উদ্দেশে এবং যাঁহারা স্মার্ত্তাচারে রত, আমি তাঁহাদিগের জন্যই বিচার করিতেছি। এই কারণে আমি লিখিয়াছিলাম, এ বিচার সহজবোধ্য নহে।

সনাতন যে "নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা" এই অংশ লিখিয়াছেন, তাহা আমি নিজেই উদ্ধৃত করিয়াছি, (বসুমতী, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ৩১৬ পৃঃ ২ কলম ৩০ পঙক্তি) তবে বলিয়াছি, তাহাও প্রশংসার্থ প্রযুক্ত, ইহজন্মে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব বিধানার্থ নহে। তাহা হইলে, 'দ্বিজত্বং জায়তে' এই 'জায়তে'র বাধ হয়। জাতির উৎপত্তি নাই। জাতি যে নিত্য—উৎপত্তিবিনাশশূন্য, এই স্থূল কথাটাও জানা নাই, ছিঃ!

দীক্ষাপ্রাপ্ত সদ্গুণসম্পন্ন পরম বৈষ্ণব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে, সনাতন যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রই যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণত্ব অর্পণ করেন নাই, তাহা হরিভক্তিবিলাস ও সনাতন-কৃত টীকা উদ্ধৃত করিয়া অগ্রহায়ণের বসুমতীতে প্রমাণ করিয়াছি। অতএব দীক্ষাবিধান দ্বারা সকল জাতির ইহজন্মে ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি সনাতনের সম্মত নহে। ব্রাহ্মণোচিত সদ্গতি ও জন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্বলাভ তাহার হইতে পারে। সনাতনের এই অভিপ্রায় গোপন করত তাঁহার অভিমত অস্ফুটার্থক অক্ষর কয়টি প্রকাশ করিয়া অন্য জাতির ইহজন্মে ব্রাহ্মণত্ব-প্রতিপাদনই অপব্যাখ্যা, ইহাই আমার বক্তব্য। অপব্যাখ্যাতা কিন্তু সাধারণকে বুঝাইতে চাহেন, আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোন তত্ত্বই জানি না—সনাতনের মত জানি না, তাঁহার ব্যাখ্যাও দেখি নাই, আর প্রতিবাদী সনাতনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও আমি তাহাকেই অপব্যাখ্যা বলিতেছি। ইহা সেই 'মিথ্যা কথা কহিবে'র এক নিদর্শন। অপর নিদর্শন,—

প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিয়াছেন, "বিধিবাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল, অথচ ইহা লোক ও স্মৃতিপ্রসিদ্ধ দান ও গ্রহণের অনুবাদকও হইল। এরূপ কথা প্রতিবাদ-কর্ত্তার মুখে শোভা পায়, মীমাংসা ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাহার ব্যুৎপত্তি আছে, তাহার মুখে এরূপ প্রলাপ কথনও সম্ভবপর নহে।"

প্রতিবাদকর্ত্তার এরূপ অপলাপের উত্তর, সুধী পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, আমি 'দেয়ং' বা 'গ্রাহ্যং' যে প্রকৃত বিধি হইতে পারে, অনুবাদ হয় না, তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি। যথা;—"ভগবদ্ভক্তকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে পারিবে—ম্লেচ্ছও যদি ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহাকেও ধর্ম্মোপদেশ করিতে পারিবে।" (মাসিক বসুমতী ৩১৬ পৃঃ) কিন্তু

'মথ্যা কথা কহিবে না' ইহার 'না'টুকু ছাড়িয়া দেওয়ার ন্যায় ঐটুকু প্রত্যুত্তর লেখক ছাড়িয়া দিয়াছেন। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" অর্থাৎ শশকাদি পঞ্চনখযুক্ত জীবমাংস ভক্ষণীয় হইতে পারিবে—এ স্থলে ভক্ষণের জন্য বিধি করিতে হয় না, মাংসভক্ষণে মানুষের ঐচ্ছিক প্রবৃত্তি। তবে কি না, ঐ বিধি দ্বারা শশকাদি ব্যতীত ঐরূপ মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই বিধির নাম পরিসংখ্যা।

আমার প্রদর্শিত বিধিবাক্যেও সেইরূপ পরিসংখ্যাবিধি। অর্থাৎ অন্য ম্লেচ্ছকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিবে না। 'গ্রাহ্যং' এই স্থলেও ঐরূপ পরিসংখ্যাবিধি। তাহারও স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে (মাসিক বসুমতী ৩১৬ পৃঃ) 'ভগবদ্‌ভক্ত ম্লেচ্ছের নিকট হইতে ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে"—অন্য ম্লেচ্ছের নিকট হইতে নহে। এই যে দুই স্থানেই 'পারিবে' বলিয়া বিধিবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যুত্তরদাতা অপলাপ করিয়া আমার উপর প্রলাপের আরোপে কৃতিত্বের বেশ পরিচয় দিয়াছেন।

মধুবিদ্যার সোপহাস প্রশ্নের উত্তর—ছান্দোগ্য উপনিষদে, 'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু' ইত্যাদি মধুব্রাহ্মণে নিগূঢ়। বর্ণবিভাগ, তাহার সৃষ্টি, সেই 'মধুবিদ্যা' হইতে জানা যায়। বিদ্যা সম্বন্ধে প্রকৃত উপদেশ যোগ্য অধিকারীকে প্রদান করার বিধি আছে,—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রহ্মাণমাজগাম,
গোপায় মাং শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবে সথায়
ন মাং ব্রূয়াঃ———"

এই নিষেধ থাকায় আমি এ ক্ষেত্রে উপদেশ দানে অধিক অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

'মধু বাতা ঋতায়তে' মন্ত্রও উপহাস্য নহে; তাহা মধুবিদ্যা না হইলেও যে উপযুক্ত সাধক, সে উহা হইতেও মধু আহরণ করিতে পারে। ফলতঃ, সত্যেই—সকল মধু আছে— অসত্যে নহে—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)।

রূপের পরশ

অমল ধবল জোছনা-ছটায়
টলমলে শ্যাম সাগর-জল,
তোমার অতল রূপের লহরে
ঝলমলে মম মর্ম্মতল।

তোমার চোখের চকিত চাহনি,
তোমার মনের নিটোল হাসি,
তোমার প্রেমের দোদুল পুলক
আমার মাঝারে উঠিছে ভাসি'।

আমি আনমনে বিরলে বিজনে
ভুবনে ভুবনে তোমারে খুঁজি,
তোমার আশায় জীবন ফুরায়
ফুরায় আমার সকল পুঁজি।

অমল ধবল জোছনারে কভু
পরশিতে নারে সাগর-জল,
তবু তার প্রাণে ছলছল গানে
খেলে যায় হের উর্ম্মিদল।

তোমার উজল রূপের পরশ
যদি নাহি মিলে জীবনে মোর,—
তোমার রূপের উজল ধেয়ানে
রহিব তা হ'লে আপনা-ভোর।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

টাইম্-টেবল্

এক

পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। তাই সে চৌরাস্তার মোড়ে ঝাউতলার ছায়ায় বসিয়া থাকিত।

আজ বিশ বৎসর যাবৎ এই ক্ষুদ্র সহরের সকলেই জানে যে, ঐ ঝাউতলাই তাহার ঘর-বাড়ী। তাই তাহার নামানুসারে ঐ চৌরাস্তার মোড়ের নাম হইয়া গিয়াছিল, ফকিরের ঝাউতলা।

সহরটির এই প্রান্তে লোক-চলাচল কম। এমন কি, আদালত ও রেলগাড়ীর সময় ভিন্ন অন্য সময় ফকিরের ঝাউতলায় বেশী লোক চলিত না। সে যে ঝাউ-গাছটির তলায় বসিত, তাহার দক্ষিণে একটা পাণের দোকান ছিল। দোকানে ডাব, বিড়ী, পাণ, সিগারেট বিক্রয় হইত।

রাত্রিকালে পাশের গলির কতকগুলি হতভাগী দোকানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত।

দিনের বেলা সে গাছের তলায় বসিয়া থাকিত। ছায়ার জন্য রৌদ্রে তাহার অসুবিধা হইত না। বৃষ্টি হইলে সে পাণওয়ালার টিনের চালার নিম্নে কিম্বা রাস্তার অপর পারের ডাক-বাংলোর বারান্দায় আশ্রয় লইত।

ডাক-বাংলোটি লাল ইটের তৈয়ারী। ছোট এই ডাক-বাংলো প্রায়ই বন্ধ থাকিত। মধ্যে মধ্যে দুই এক রাত্রির জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা আসিয়া সেখানে বাস করিতেন। রাজধানী হইতে দুই এক জন ব্যারিষ্টারও আসিয়া এইখানে অবস্থান করিতেন।

ফকিরের ভিক্ষুক-জীবনে অনেক খানসামা আসিয়াছে; অনেকে চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

ছোট ছোট সহরের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের চরিত্রের খুঁটি-নাটি সংবাদও ডাক-বাংলোর খানসামাদের অজানা থাকে না। ফকির ইহাদের নিকট হইতে সব খবরই জানিয়া লইত এবং এই বৃদ্ধবয়সেও পাশের গলির অধিবাসিনীদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিত। সে তাহাদের কাছে ঠাকুরদার আসন গ্রহণ করিয়াছিল।

পুরুষ ও স্ত্রীজাতির যে কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহার সরল সহজ আলোচনায় তাহা বুঝা যাইত না। অসুখ হইলে এই পতিতারাই তাহার সেবা করিত। প্রয়োজন হইলে তাহার আহার্য্য ইহারাই সংগ্রহ করিয়া দিত। কোমরে বাত বাড়িলে মাঝে মাঝে ফকিরের নড়িবার সামর্থ্য লোপ পাইয়া যাইত। তখন তাহার শুশ্রূষার ভার সমাজের এই অবলম্বনহীনা কন্যারা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিত।

মাঝে মাঝে ফকিরের কাঁপিয়া জ্বর আসিত এবং জ্বরের পূর্ব্বে বেদনা বাড়িত। বেদনা ও জ্বরে এই বিরাটকায় মানুষটাকে প্রায় বিশ বৎসর কাবু করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ভগবান তাহাকে আশ্রয় জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাই তাহারই মত ব্যাধিগ্রস্তা, তাহারই মত অবলম্বনহীনা পতিতারা ফকিরের বার্দ্ধক্যের অবলম্বন ও বিপদের বন্ধু।

এ ছাড়া ফকিরের আরও বন্ধন ছিল। ঝাউগাছের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে সে যেন একটা প্রাণের সাড়া পাইত। পাতার ফাঁকের মধ্য দিয়া আলোর রেখাসম্পাতে গাছের ছায়া তাহার কাছে নিত্য নূতন রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিত। গাছের ছায়ার সঙ্গে ট্রেণের সম্বন্ধটা সে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা আমাদের জ[illegible] নাই। তবে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী ষ্টেশনের গাড়ীর যাওয়া-আসার সংবাদ সঠিকভাবে রাখিত বলিয়া সহরের লোকের কাছে সে যেন রেলের 'টাইম-টেবল্'।

রেলের যাত্রীরা হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। ফকির তাহাদের ডাকিয়া বলিল, "অত দৌড়ে যাবার দরকার নেই চারটের গাড়ীর দেরী আছে।"

কোন দিন বা সে মন্থরগতি পথিককে স্বেচ্ছায় ডাকিয়া বলিয়াছে, "ছুটে যান্। নইলে গাড়ী পাবেন না।"

অন্তের চরিত্রের বিচিত্র রহস্য জানিত বলিয়া তাহার মনে একটা গর্ব্ব ছিল। কিন্তু যখন সহরের কোন নামী উকীল কিম্বা গণ্যমান্য লোক তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"ফকির, বল ত গাড়ী পাব কি না?" তখন তাহার চিত্ত গর্ব্বের আনন্দে অধিকতর স্ফীত হইয়া উঠিত—তখন ফকিরের মনে হইত যে, ভিক্ষুক হইলেও সে লোকের কাযে লাগে। সমাজের কাছে তাহার প্রয়োজন সামান্য নহে। অম্বিকাবাবুর মত উকীল, তাঁহাকে সহায়তা করা ত' সামান্য ব্যাপার নহে। অম্বিকাবাবুর কলিকাতায় যাওয়ার ফলে কত বার কত লোকের ফাঁসি রদ হইয়াছে। ফকির তাঁহাকে তাড়াতাড়ি না যাইতে বলিলে তিনি হয় ত ট্রেণ ফেল করিয়া বসিতেন। তাহাতে হয় ত কত লোকের ফাঁসি হইয়া যাইত।

যে দিন অম্বিকাবাবুর মত উকীল, কালীপদবাবুর মত কবিরাজ কিম্বা নলিনীবাবুর মত ডাক্তার তাহাকে সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে দিন ফকির পল্লীর রূপজীবিনী-দিগকে, পার্শ্ববর্ত্তী পাণওয়ালাকে এবং ডাক-বাংলোর খানসামাকে পল্লবিত করিয়া সংবাদটি জানাইত। বলার ভঙ্গীতে তাহার প্রাণের কথা বাহির হইয়া পড়িত। সে এই ঝাউতলার অবলম্বনহীন ভিখারী হইলেও তাহাকে দিয়া সমাজের অনেক উপকার হয়। অম্বিকাবাবুর মত লোকও কাযের জন্য তাহার নিকট আসেন।

তাই কোনও গাড়ীর সময় পরিবর্ত্তিত হইলে, সে যাত্রীদের নিকট হইতে সঠিক সময়টা জানিয়া লইত এবং বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিত যে, ঝাউগাছের ছায়া কোন্ পর্য্যন্ত পৌঁছিলে ঐ মোড় হইতে যাইয়া গাড়ী ধরা যায়। গাড়ীর সময়-বদলের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিত এবং বিনা প্রয়োজনেও এই নূতন খবরটি পথিকদের কাছে বলিয়া সে মনে করিত যে, একটা গুরু কর্ত্তব্য সে সাধন করিতেছে।

দুই

ফকিরের আজ কয়েক দিবস জ্বর হইয়াছে। প্রথমে সে জ্বরটা গ্রাহ্য করে নাই। আর সকলেও ভাবিয়াছে যে, এই জ্বর অন্য বারের মত অল্পেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু বুকে এবার সর্দ্দি বসিয়াছিল। বাতের বেদনাও পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী। তিন চার দিনে খুব বাড়াবাড়ি হইল। কয়েক জন দেশসেবক তরুণ উকীল যখন তাহাকে ডাক-বাংলোর বারান্দা হইতে হাঁসপাতালে লইয়া যায়, তখন ফকির সম্পূর্ণরূপে চেতনাশূন্য।

কয় দিন পরে জ্ঞান হইলে, সে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কোথায় সেই ঝাউগাছ, কোথায় পাণওয়ালার দোকান এবং সেই লাল ইটের ডাক-বাংলো! সে ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিল। জ্ঞানসঞ্চারের সময় ফকির বাহিরের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া ছিল। তাই অন্যান্য রোগীর শয্যা তাহার চোখে পড়ে নাই।

পাশে একটি রোগী কাঁপিতেছিল, আর এক জন পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত গোঁ গোঁ করিতেছিল। হঠাৎ এই সময় পাঁচ ছয় বৎসরের একটি সুন্দর শিশু রোগী ডাকিল—'দুই নম্বর কুলী।' শিশুর কোমল করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফকির ফিরিয়া চাহিল। কুলীর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। ফকির বলিল,—"খোকা, তুমি চুপ কর, আমি ডেকে দিচ্ছি", বলিয়াই জোরে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"দু'নম্বর কুলী!"

তার পরদিন প্রভাতে সূর্য্যের আলো সবেমাত্র হাঁস-পাতালের ঘরে শিশুর চপল হাস্যধারার মত লুণ্ঠিত হইতেছিল, ফকির নিমগ্ন দৃষ্টিতে সূর্য্যের আলোর দিকে চাহিয়া ছিল। সে নানারূপে হিসাব করিয়া দেখিতেছিল, সাতটার গাড়ী ছাড়িবার দেরী কত।

খানিকক্ষণ চিন্তার পর সে এক জন কুলীকে ডাকিয়া বলিল,—"সাতটার গাড়ী বোধ হয় এখন ছাড়বে?"

কুলী একটু হাসিয়া বলিল—"আটটাও ত বেজে গেছে।"

ফকিরের মুখে অকস্মাৎ বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এরূপ ভুল ত' তাহার কখনও হয় নাই! কিন্তু সে ত জানিত না যে, ঘরের কিছু পূর্ব্বদিকে একটা বটগাছ সূর্য্যকে এতক্ষণ আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

মুখ ফিরাইয়া সে পার্শ্বের শয্যায় শায়িত শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

খোকা সুন্দর মুখে একটু হাসিয়া বলিল—"চারু। তবে সকলে ডাকে খোকন ব'লে।"

ফকির প্রত্যেক দিনই গাড়ীর সময়ে রৌদ্রের দিকে চাহিয়া হিসাব করিতে আরম্ভ করিল, ট্রেণ আসিবার কিম্বা ছাড়িবার দেরী কত। কিন্তু আজকাল তাহার অনুমান প্রায়ই ঠিক

হয় না। তাহার মনে হইতে লাগিল, হাঁসপাতাল যেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের সঙ্গে লড়াই করিতেছে। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত যে, হাঁসপাতাল ছাড়িয়া সে পলাইয়া যায়,—আবার ঝাউতলায় বসিয়া লোককে গাড়ীর সময় বলিয়া দিয়া সে সমাজের উপকার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। বিশেষতঃ 'খোকনের' প্রতি তাহার কেমন একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। বালক একটু সুস্থ হইয়া আজকাল ফকিরের দীর্ঘ দাড়ি লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাসিয়া হাসিয়া খোকা প্রায়ই তাহাকে বলে, "বুড়ো, তুমি বড্ড কালো।" ফকির ঐ শিশুর হাসির মধ্যে সূর্য্যের আলোর অভাবটা অনেকটা পূরণ করিয়া রাখিয়াছিল।

এই সময় এক দিন খোকনের কাকা তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে লইয়া গেলেন। সেই দিনই বৈকালে ফকির ছোট ডাক্তারকে বলিল—"আমার আর এখানে থাকা হচ্ছে না।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

ফকির বলিল,—"বাহিরে না গেলে আমার শরীর সারবে না, ডাক্তারবাবু।"

তাহার মনের গোপন কথা সে প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার বলিলেন,—"তোমার শরীরের অবস্থা বড় সিরিয়াস্। একটু চলাফেরা করলে ?ড সার্‌কুলেশন্ বেড়ে আর্টারী ছিঁড়ে যেতে পারে।"

ফকির ডাক্তারের কথার অর্থ বুঝিল না; কিন্তু অনুমান করিয়া উত্তর করিল, "সে ভয় করবেন না। গরীবের মরণ নেই, ডাক্তারবাবু।" ডাক্তার কোন উত্তর করিলেন না। ফকির মনে মনে তাঁহার উপর রাগিয়া গেল।

পরদিন সিভিল সার্জ্জন স্বয়ং রোগীদিগকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি জাতি ও আকৃতিতে, বিশেষতঃ ভুঁড়ির গঠন হিসাবে পূরাদস্তর বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার স্বভাবটা পাকা 'সাহেবী' ধরণের। তিনি মনে করিতেন, হাঁসপাতালে ইংরাজীতে কথা না বলিলে তাঁহার পদমর্য্যাদা নষ্ট হইবে। তাই রোগীদিগের কোন প্রশ্নের উত্তর তিনি বাঙ্গালায় দিতেন না, সহকারী ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিতে হইত।

তাঁহার ইংরাজী পোষাক, জার্ম্মাণ গোঁফ, বাঙ্গালী ভুঁড়ি ও হাবসীনিন্দিত বর্ণের জন্য সহরের লোকরা তাঁহার নাম্‌করণ করিয়াছিল—'ডক্টর যমদূত।'

বৃষ্টিনিবারক অঙ্গাবরণে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ঘাড় বাঁকাইতে বাঁকাইতে সিভিল সার্জ্জন রোগীদের শয্যার কাছে পায়চারী করিতেছিলেন। তাঁহার বাম চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত, আর দক্ষিণ দিকের অধর, উপরের দন্তপংক্তির পেষণে প্রায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল।

রোগীরা তাঁহাকে যুক্তকরে নমস্কার করিতেছিল। বড় ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া দুই এক জন যন্ত্রণার কথা বলিতেছিল। ডাক্তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীদের দিকে চাহিয়া মধ্যে মধ্যে গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিতেছিলেন—"ইয়েস্, ইয়েস্।"

এক জন রোগী বলিল,—"আপনাদের চিকিৎসায় ত' কোন উপকার হচ্ছে না। হাঁসপাতালে এলেম কি মরতে?"

ডাক্তার তাহাকেও গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ইয়েস্, ইয়েস্।"

এই সময় ফকির জোর গলায় ডাকিল,—"ডাক্তার বাবু!"

সিভিল সার্জ্জন হাঁসপাতালে এই রকম স্বর শুনিতে অভ্যস্ত নহেন; তাই ফকিরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

ফকির আবার ডাকিল,—"ডাক্তার বাবু!"

ডাক্তার সহকারীর দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "আমায় লোকটা বাবু ব'লে ডাকছে?"

সহকারী ফকিরকে ধমক দিয়া বলিলেন—"এই, বল্‌বি 'ডাক্তার সাহেব'। বাবু নয়। বুঝলি?"

ফকির ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার!"

ডাক্তার সহকারীকে ইংরাজীতে বলিলেন, "ও কি চায়?"

সহকারী বলিলেন, "রোগী হাঁসপাতাল হইতে 'চলিয়া' যাইতে চাহে।"

ডাক্তার ফকিরের শয্যাপ্রান্তসংলগ্ন রোগের বিবরণ পড়িয়া, তাহার বুকে ষ্টেথিস্কোপ্ লাগাইয়া ইংরাজীতে বলিলেন, —"হৃদ্‌যন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল। অবস্থা নিরাপদ নহে।"

সহকারী ফকিরকে বড় ডাক্তারের কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

ফকির একটু নীরব থাকিয়া ডাক্তারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"বারটার গাড়ীর দেরী কত?"

সিভিল সার্জ্জনের কালো মুখে ক্রোধের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল।

সহকারী সন্ত্রস্তভাবে ইংরাজীতে বলিলেন,—"ও কিছু নয়, হুজুর! লোকটার মাথা ঠিক নেই।"

ডাক্তার বাম নেত্র সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"বটে!"

তিন

রাত্রি তখন তিনটা। চন্দ্রালোকে শিশিরসিক্ত গাছের পাতাগুলি ঝিক্-মিক্ করিতেছে। ক্ষুদ্র সহর সুষুপ্ত, নিস্তব্ধ। কুলায়ে কুলায়ে পাখীগুলি বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটা কুকুরের ডাক শোনা যাইতেছিল।

হাঁসপাতালের আলো কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রোগী-দের মধ্যে অনেকে ঘুমাইতেছিল। শুধু মাঝে মাঝে দুই এক জনের যন্ত্রণাসূচক কাতরোক্তি প্রকৃতির নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

ফকির বাতায়ন লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর একবার ভাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে ঝাউগাছের দিকে চলিয়া গেল।

ঝাউতলাও তখন শব্দহীন। ফকির তাহার চিরপরিচিত গাছের তলদেশে আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চাঁদের আলো কবে কোথায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা বুঝি-য়াই ফকির সকলকে গাড়ীর সময় বলিয়া দিত। আজ প্রায় মাসাবধিকাল সে হাঁসপাতালে, তাই সে ঠিক করিতে পারিতে-ছিল না, এখন কোন্ গাড়ীর সময় হইয়াছে।

তাহার মনে হইল, চারিটার গাড়ীর বেশী দেরী নাই। কিন্তু কৈ, ট্রেণের যাত্রীরা ত আসিতেছে না!

সে তখন লাঠি দিয়া গাছের তলা হইতে মাপিয়া দেখিল যে, ছায়া দুই লাঠি আন্দাজ—পূর্ব্বের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এখন ত চারিটার গাড়ীরই সময়। যাত্রীরা আসিতেছে না কেন? কি হইল তাহাদের?

অস্থিরভাবে সে আপন মনে বলিতে লাগিল,—"চারটের গাড়ীর সময় হয়েছে। চারটের গাড়ীর—চারটে।"

হারিকেন লণ্ঠন হাতে একটি লোক আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ফকির চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল—"শীগ্‌গীর যান্। দৌড়ে যান্। নইলে চারটের গাড়ী পাবেন না।"

লণ্ঠন হাতে ভদ্রলোকটি রেলের গার্ড সুরেশ মুখোপাধ্যায়। ফকির তাঁহাকে চিনিত।

তিনি নিকটে আসিলে, ফকির বলিল—"দৌড়ে যান্, গার্ড-বাবু। গাড়ী যে এক্ষুণি ছেড়ে দেবে।"

গার্ডবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"গাড়ীর সময় যে বদ্‌লে গেছে, ফকির।"

ফকির বিষণ্ণ মুখে বলিল,—"এই বিশ বছরের সময়টা বদ্‌লে গেল!"

তাহার কণ্ঠস্বর তখন বড়ই করুণ। যেন এই চারিটার গাড়ীর সময় বদলাইয়া যাওয়ায় তাহার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে! সে গার্ডবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ক'টা বাজে?"

গার্ডবাবু বলিলেন—"চারটে।"

ফকির তখন গাছের ছায়া মাপিতে মাপিতে গার্ডবাবুর নিকট হইতে গাড়ীর পরিবর্ত্তিত সময়গুলি জানিয়া লইল।

পথে ক্রমে ট্রেণ-যাত্রীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ফকির চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল, "গাড়ীর সময় বদলে গেছে, মশাই! গাড়ীর সময় বদলে গেছে। চারটে নয়, পাঁচটা, পাঁচটা।"

পরদিন প্রভাতে পাণওয়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি হাঁসপাতাল থেকে চ'লে এলে যে, ফকির? তোমায় শুনেছিলাম বড্ড অসুখ।"

ফকির হাসিয়া বলিল, "আমি এখানে না থাকলে যাত্রী-দের অসুবিধা হবে যে। এই ত মনে কর, গাড়ীর সময় বদলে গেছে। লোকে ত আর এ সব খবর রাখে না। এখন আর কথা বলবার ফুরসৎ নেই, ভাই। গাড়ীর সময় হয়ে এল। নতুন সময় কি না, মেপে ঝুপে ঠিক রাখতে হবে ত!"

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন (বি, এ)।

হিন্দু কি চাহে ?

হিন্দু চাহে স্বরাজ, এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই—তাহা আমরা সকলেই বুঝি ও বলিয়া থাকিও তাই ; কিন্তু এ স্বরাজ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা কিন্তু হিন্দু এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই ; তাই সকল হিন্দু স্বরাজকামী হইলেও তাহাদের মধ্যে স্বরাজলাভের কি উপায়, কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিলে সেই উপায়ের সফলতা-লাভ হইবে, তাহা লইয়া হিন্দুর মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে ; তাহার ফলে বিবাদ, কলহ ও পরস্পর বিদ্বেষের কর্ণভেদী কোলাহলে আজ ভারতের আকাশ-পবন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজ এক দল আর এক দলকে শত্রু বলিয়া ভাবিতেছে, পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট-চিন্তায় আত্মহারা হইয়া আত্মনাশের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। তাই বলি, অগ্রে এই স্বরাজ যে কি, তাহা সকলকে বুঝিতে হইবে। এই স্বরাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্বরাজ নহে, ইহা ক্ষত্রিয়ের স্বরাজ নহে, ইহা গোঁড়া হিন্দুর স্বরাজ নহে—পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত উদার দলের স্বরাজ নহে, ইহা স্বতন্ত্র-দলের স্বরাজ নহে—ইহা অ-ব্রাহ্মণদলের স্বরাজ নহে—কিন্তু ইহা হিন্দুর স্বরাজ—এই কথাটাই ভাল করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে। হিন্দুর স্বরাজ শব্দের অর্থ আত্মোদ্ধার, এই আত্মোদ্ধারই হিন্দুর পরমপুরুষার্থ। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥"

বিবেকসম্পন্ন মনের দ্বারা আত্মাকে দুঃখময় অজ্ঞানমূলক সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে হইবে এবং আত্মাকে কোন প্রকারেই অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে না। কারণ, এ সংসারে আত্মাই আত্মার একমাত্র বন্ধু, আবার এই আত্মাই যদি কলুষিত-বিবেক হয়, তাহা হইলে সেই আত্মাই আত্মার শত্রুরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

অন্তঃকরণ বিবেকরহিত হইলে তাহাই আত্মার শত্রু হইয়া থাকে এবং সেই অন্তঃকরণই যদি বিবেকসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাই আত্মার পরম হিতকর অথচ সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তক অনন্তশক্তিশালী বন্ধু হইয়া থাকে,—অন্তঃকরণ বা হৃদয়কে আত্মার বন্ধু করিয়া তুলিতে পারিলেই যে অনাবিল ও শাশ্বত শান্তি অনন্তকালের জন্ম মানবের করতলগত হয়, তাহাই হইল হিন্দুর স্বরাজ। এই স্বরাজ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হিন্দুকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে, পরমুখাপেক্ষা একবারে বিসর্জ্জন করিতে হইবে, বহিঃশত্রুর জয়ের জন্য বৃথা চেষ্টা ও শুষ্ক আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমার দেহেরই ভিতরে আমারই অনিষ্ট করিতে সর্ব্বদা সমুদ্যত বিবেকহীন আমার হৃদয়রূপ অন্তঃশত্রুকে জয় করিতে হইবে, ইহাই হইল হিন্দুর একমাত্র স্বরাজ-সাধনা, ইহা যেন আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে।

সমগ্র পৃথিবীর মানব-জাতিকে আসুরবলের সাহায্যে বশীভূত করিয়া নিজের বিষয়ভোগবাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন করা হিন্দুর স্বরাজ-সাধনার ফল নহে. হিন্দুর স্বরাজ-সাধনার চরম বা পরম ফল হইতেছে—জগতের সমগ্র মানব-জাতিকে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া এ সংসার হইতে ভোগাভিলাষমূলক জাতিসমূহের মধ্য হইতে বিবাদ, কলহ, দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা এবং তন্মূলক বিশ্বতোমুখী অশান্তিকে একবারে বিদূরিত করা।

আজ সমগ্র পৃথিবীতে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে অহিন্দু-ভাব বা আসুরী বৃত্তি বদ্ধমূল হইয়া উত্তরোত্তর সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য হিন্দুকে প্রস্তুত হইতে হইবে ; ইহারই জন্য হিন্দু এখনও বাঁচিয়া আছে, এই কথা আজ হিন্দু পাশ্চাত্য সভ্যতার করাল সম্পর্কে ভুলিতে বসিয়াছে,—জাতীয় জীবনের যাহা সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বনাশের পথে তীব্রবেগে অগ্রসর হইতেছে—হিন্দুর এই ভীষণ বিপত্তি হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু-জাতির হৃদয়ে যে নবীন আশা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে. হিন্দু সভা, হিন্দু সংগঠন, হিন্দু মিশন তাহারই মূর্ত্তিমান্ আংশিক বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাই এই প্রবন্ধে বিস্তৃত-ভাবে ও সরলভাবে বুঝাইবার জন্য প্রয়াস করা যাইতেছে। জাতীয়ভাবে উদ্দীপ্ত শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেরই নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ধৈর্য্য সহকারে এই বৃদ্ধ সেবকের প্রাণের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ না হয়েন।

অহিন্দুভাব বা আসুরী বৃত্তি যে কি প্রকার, তাহা গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥"

এই আসুর দৃষ্টি, (যাহা এখনই আমি তোমাকে বুঝাইব) ইহাকেই অবলম্বন করিয়া অল্পবুদ্ধি মানবগণ আত্মনাশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা মানব-জাতির সর্ব্বনাশের জন্য অতি ভীষণ কার্য্যসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিসম্পন্ন মানবসমূহ সমগ্র মানব-জাতির শত্রু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে—ইহা জানিও। সেই আসুরদৃষ্টি কি ?

"ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"

আজ আমি এই ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়াছি, ভবিষ্যতে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইবে, পুরুষকারের প্রভাবে এই ধন আমি সংগ্রহ করিয়াছি, আবার আমার ইহা অপেক্ষা অধিক ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি মারিয়াছি, যাহারা আমার অপর শত্রু আছে, তাহাদিগকেও আমি এমনই করিয়া বিনাশ করিব, আমি অসীম শক্তিশালী, আমি সুখভোগ করিবার জন্যই এ সংসারে আসিয়াছি, আমার সাধনায় আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, বুদ্ধিতে আমার সমান আর কে আছে ? আমি যাগ করিব, আমিই দান করিব আর তাহা করিয়া আমি স্ফূর্ত্তি করিব, এইরূপ অজ্ঞানমোহে আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবগণ পতিত হইয়া থাকে। তাহারা একচিত্ত নহে, সর্ব্বদাই নানা প্রকার খেয়ালের বশে পরিচালিত হইয়া থাকে, সর্ব্বদা কামভোগসমূহে প্রসক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে অশুচি নরকে পতিত হয়।

এই প্রকার আসুরদৃষ্টি বা অহিন্দুভাবের পরিণাম হইতেছে নরক। নরক বলিলে যে কেবল পুরাণপ্রথিত পরলোকস্থিত অবীচি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নরক বুঝায়, তাহা নহে, নরক শব্দের আর একটি অর্থ আছে, সে অর্থ ক্ষুদ্র মনুষ্যভাব বা নরত্বের সঙ্কীর্ণতা, ইহা সদ্যঃ সদ্যই হইয়া থাকে। পার্থিব ভোগলালসায় অন্ধ মানব যে সঙ্কীর্ণ মানব বা ক্ষুদ্র মানব, সে যে পূর্ণ মানবত্বের মহনীয় গৌরবের অযোগ্য, তাহা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই নরক বা সঙ্কীর্ণ মানবতার পরিহারই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের চরম আদর্শ বা লক্ষ্য। বিদেশী মানব সমাজের অধীনতা অর্থাৎ তথাকথিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্বাতন্ত্র্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই যে মানব আসুরদৃষ্টি বা অহিন্দুভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পূর্ণ মানবতা লাভের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে, তাহা নহে—পূর্ণ মানবতা লাভ করিতে হইলে মানবকে সর্ব্বাগ্রে হিন্দু বা হিন্দুভাবাপন্ন হইতেই হইবে, ইহাই হইল উল্লিখিত শ্লোক কয়টির মূল তাৎপর্য্য। এক কথায় বলিতে গেলে, যে বিজ্ঞানের বলে মানব পরকে আপনার করিতে সমর্থ হয়, শত্রুকে মিত্র করিয়া লইতে পারে—ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর উপেক্ষা করিয়া পূর্ণ মানবতা লাভের একমাত্র উপায় সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানব-জীবনের সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই হইল হিন্দুর বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই হিন্দু সভ্যতা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। দেহাত্মবাদী জড়ভাবাপন্ন পরাক্রান্ত জাতি সমূহের অহিন্দু সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে আত্মহারা হইয়া আমরা এই হিন্দু বিজ্ঞানের সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা সহস্র বৎসর ধরিয়া বিসর্জ্জন দিয়া আসিতেছি, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যাহা সার, তাহার মর্ম্ম বুঝিবার সামর্থ্য হারাইয়া বসিয়াছি, বিরাট্ পুরুষের অত্যাবশ্যক সমভাবাপন্ন স্বজাতি-নিবহের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভাবের সৃষ্টি করিয়া নিত্যশুদ্ধ নিত্য-বুদ্ধ নিত্যমুক্ত ত্রিলোকপাবন শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন মানবদেহকে অস্পৃশ্যতা-মলের লেপ দিয়া আপনাদিগকেই অস্পৃশ্য করিয়া জগতে মূর্খতার বড়াই করিতেছি। এই মূর্খতা-মল হইতে হিন্দু জাতির উদ্ধারসাধন করিতে না পারিলে, জগতের শান্তিপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়স্বরূপ হিন্দু সভ্যতা বিলুপ্ত হইবে, এ কথা হিন্দুর দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া হিন্দুকে সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে যে, হিন্দু সভ্যতার মূল ভিত্তি হইতেছে সর্ব্বভূতে নারায়ণ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা করিতে হইলে সর্ব্বভূতে সমতাজ্ঞানই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারপ্রভাবে আমাদের মধ্যে নব্যভাবে শিক্ষিত অধিকাংশ লোকের মনে এইরূপ এক বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে যে, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিলেই আমরা চরিতার্থ হইব। এই রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আমাদের পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত আচারপদ্ধতিই হইতেছে প্রধান অন্তরায়, সুতরাং যত

শীঘ্র পারি, যেমন করিয়া পারি, সেই সকল আচারপদ্ধতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের যাহা কিছু বিরোধী, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইলেও তাহা আমরা পরিবর্জ্জন করিব, আমাদের জাতিকে প্রতীচ্য সভ্যতার আদর্শে নূতন করিয়া গড়িব, যেরূপেই হউক না কেন, বৈদেশিক পারতন্ত্র্য হইতে মুক্তিলাভ আমাদিগকে করিতেই হইবে। ইহাই হইল, বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই মত, বিশেষতঃ যুবকগণের মধ্যে এই মতের প্রাবল্য অত্যধিকভাবেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই প্রকার মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মের সকল প্রকার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন। প্রাচীন আচার হইলেই তাহা তাঁহাদের পক্ষে পরিবর্জ্জনীয়, এই প্রকার মনোভাব কিন্তু হিন্দু-মনোভাব নহে—এই ভাবের পরিপুষ্টি দ্বারা জগতে শান্তিরাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, মনুষ্য-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়া থাকে, মানুষ অসুরভাবাপন্ন হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের পথকে ভীষণ কণ্টকাবৃত করিয়া থাকে; সুতরাং ইহা হিন্দু স্বরাজ-সাধনার বিরোধী। এই প্রকার মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে হিন্দুর পক্ষে হিন্দু সভ্যতার চরম লক্ষ্যস্বরূপ যে স্বরাজ, তাহা আমরা কখনই লাভ করিতে পারিব না, ইহা ধ্রুব সত্য।

বিশ্বজনীন শান্তি ও প্রেমময় সাম্রাজ্য সংস্থাপনই হিন্দুর স্বরাজ-সাধনার চরম লক্ষ্য, এই কথা হিন্দুমাত্রকেই সর্ব্বদা মনে রাখিয়া স্বরাজ-সাধনার কঠিন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রুতি, স্মৃতি-পুরাণবিহিত শাশ্বত ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতিরেকে এই স্বরাজ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ একবারেই অসম্ভব, তাহা সর্ব্বাগ্রে হিন্দুমাত্রকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণবিহিত শাশ্বত ধর্ম্মের দুইটি রূপ আছে;—একটি আন্তর রূপ, আর একটি বাহ্য রূপ। আন্তর রূপ অপরিবর্ত্তনশীল, তাহার পরিবর্ত্তন কখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই—এখনও হইতেছে না—ভবিষ্যতেও হইতে পারে না; সেই সনাতন ধর্ম্মের নিত্যসিদ্ধ অপরিবর্ত্তনশীল রূপের কথা পরে বলিব। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যাহা বাহ্যরূপ, কালভেদে, দেশভেদে, পারিপার্শ্বিক নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার বৈলক্ষণ্যে, হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যরূপ যে আচার, তাহার পরিবর্ত্তন প্রাচীন কালে বহুবার হইয়াছে—এখনও দ্রুতবেগে হইতেছে—পরেও হইবে। এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, এই পরিবর্ত্তন শাস্ত্রসম্মত নহে—ইহা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিধ্বংসকারী—এইরূপ যাঁহাদের মত, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝেন না। অজ্ঞান ও কু-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারাই—অভ্যুদয়োন্মুখ হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই অভ্যুদয়োন্মুখ হিন্দুজাতির সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু। এই সত্য সৌভাগ্যক্রমে সহস্রবর্ষব্যাপী অজ্ঞানাবসাদের করাল গ্রাস হইতে সদ্যোবিমুক্ত শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের সৌভাগ্যলব্ধ এই নবজাগরণ ব্যর্থ হইবার নহে। শাস্ত্রসমুদ্র মথন করিয়া বিবেক-বিশুদ্ধ সত্যপ্রতিষ্ঠিত স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সময়োপযোগী নূতন আচার কিরূপ হইবে, তাহা বাছিয়া হিন্দু আজ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাকারী, স্বার্থমোহকলুষিত-হৃদয়, অনুদারভাবে অর্দ্ধশিক্ষিত, পুথিগত-বিদ্যামাত্রোপজীবী—তথাকথিত বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই নবজাগরিত স্বজাতিহিতৈষী শিক্ষিত সমাজের সহিত বিরোধ করিবার জন্য যতই বদ্ধপরিকর হইবেন, ততই এই জাগরণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। তাহার ফলে হিন্দুর নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় জীবন নূতন বল পাইবে, নূতন আশার স্নিগ্ধ কমনীয় নূতন আলোকে সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অজ্ঞানময়—অবসাদময়—বিষাদময় অন্ধকার চিরদিনের জন্য হিন্দু-হৃদয়াকাশ হইতে অপসারিত হইবে, আবার এই পুণ্যভূমিতে সর্ব্বভূতহিতে রত, ত্যাগী, তপস্বী, অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের শ্রুতিমনোহর উদাত্ত সামগানের বিশ্ববিজয়ী কলকাকলীধ্বনিতে আকাশ-পবন মুখরিত হইবে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকুলের পৌরোহিত্য বিলয়প্রাপ্ত হইবে। সুরগুরু বৃহস্পতিকুলের পৌরোহিত্য-প্রভাবে ভারতে আবার সুরসাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, হিন্দু-স্বরাজ-সাধনা পূর্ণসাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

খাদ্য-সমস্যা *
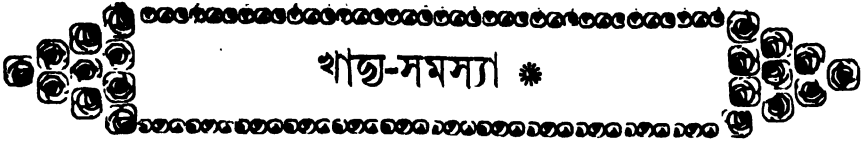
আজিকার সভার সভাপতি মহাশয় যে শুধু এক জন কৃতবিদ্য চিকিৎসক, তাহা নহে; রাসায়নিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতিও বড় সামান্য নহে। দীর্ঘকাল রসায়নের অধ্যাপক ও রাসায়নিক পরীক্ষক হিসাবে তিনি আমাদের খাদ্যাখাদ্যের স্বরূপ আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন এবং এ বিষয়ে নিজের মতামতও পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আজিকার বক্তব্য বিষয় আমি একটু নূতনভাবে পেশ করিতে ইচ্ছা করি।

খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; কিন্তু কি ভাবে এই খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং কি অবস্থায় ইহা আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে,—বিশেষতঃ জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকবৃন্দের গঠনোন্মুখ শরীরের উপর কার্য্য করে, এ বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করেন নাই। শুধু কলিকাতা সহরের যুবকবৃন্দের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতেছি না; সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই আমি ভীত হইতেছি। ঘটনাচক্রে আমাকে সহরে থাকিতে হইলেও পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। গত ষাট বৎসরের কলিকাতা-প্রবাস সত্ত্বেও বাঙ্গালার পল্লীর সুখদুঃখের কাহিনী আমার অজ্ঞাত নহে—বিশেষতঃ গত আট বৎসর কাল বাঙ্গালার যত্র-তত্র ভ্রমণ করিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই ইনষ্টিটিউট-গৃহেই, স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আমি "বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা" সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা বক্তৃতা দিয়াছিলাম; সেই সকল বক্তৃতায় আমি দেখাইয়াছিলাম যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে; ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ নিঃসম্বল অবস্থায় বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডার লুঠিয়া লইতেছে, আর বাঙ্গালী দার্শনিক নিশ্চেষ্টতার সঙ্গে এই লুণ্ঠন প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। আমি আজ প্রমাণ করিতে চাহি যে, বাঙ্গালীর এই শৈথিল্য ও অলসতার সঙ্গে তাহার দৈহিক দৌর্ব্বল্যের নিকট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান, আর এই শারীরিক দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ,—সারবান্ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং অপ্রচুর সুখাদ্য ও অপরিমিত কুখাদ্য আহার।

সত্তর, পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি; তখন টাকায় ৩২ সের দুধ মিলিত, ঘরে ঘরে গোলায় ধান, গো-শালায় গরু। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে তখন শান্তি ছিল, এখনকার মত কঙ্কালসার ব্যাধিগ্রস্তের নিশ্বাসে পল্লীর বাতাস তখন দুষ্ট হয় নাই; ম্যালেরিয়ার করাল ছায়া তখনও বাঙ্গালার পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করে নাই। অবশ্য জিনিষের রপ্তানী ছিল না বলিয়া দেশে টাকা কম ছিল, কিন্তু টাকার মূল্য এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল। আমার মনে আছে, আমাদের বাল্যকালে ১৮৭০।৭১ খৃষ্টাব্দ কড়ির সাহায্যে ছোটখাট বেচাকেনা চলিত, আর এখন আধ পয়সার কিছু কিনিতে গেলে দোকানীর ধমকের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতে হয়। ৭০.৮০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে আহারের কি সুব্যবস্থা ছিল, তাহা সে সময়ে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ হইতে জানা যায়। "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত হয়; প্রসঙ্গক্রমে নাট্যকার ত্রিবিধ 'ফলারের' (ফলাহারের) বর্ণনা করিয়াছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম।

"উত্তম ফলার:—

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'চারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছক্কা আর শাক ভাজা, মতিচুর বঁদে গজা,
ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুঁতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিতে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে,
উত্তম ফলার তারে কই॥

---

* ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ভবনে, রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক অনু-লিখিত।

মধ্যম ফলার :—

সরু চিঁড়ে শুকো দই, মর্ত্তমান ফাকা খই,
খাসা মোণ্ডা পাতা পোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটী ইহাতেও রয়॥

অধম ফলার :—

গুমো চিড়ে জলো দই, তিত গুড়, ধেনো খই,
পেট ভরা যদি কিছু হয়!
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাতা চাটে,
অধম ফলার তাকে কয়॥"

আমি নিজে পল্লীগ্রামে ১৮৲ টাকা মণ খাঁটী গব্য ঘৃত বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি, আর এখনকার ঘৃতের দাম চতুর্গুণ বা পাঁচগুণ হইলেও তাহার ভিতরে যে কি থাকে, তাহা রাসায়নিক আমি, আমার অজ্ঞাত নাই। যত প্রকার "হারাম পদার্থ" কল্পনায় আনা যাইতে পারে, অর্থাৎ গরু, শূকর, মহিষ, সাপ প্রভৃতির চর্ব্বি সকলই একাধারে ঘৃতের মধ্যে বিরাজ করে। কলিকাতায় ও তাহার উপকণ্ঠে যে সকল মৃত গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রত্যহ মিলে, তাহার জন্য প্রতি বৎসর ডাক উঠে; ধাপার মাঠে সেই সকল জন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্ত্তিত হইয়া এক বৃহৎ কটাহে উত্তপ্ত করা হয়; উত্তাপের ফলে চর্ব্বি বাহির হইয়া উপরে ভাসতে থাকে। দুই চারিটি সরল প্রক্রিয়ার পর এই চর্ব্বির রং ও গন্ধ সম্পূর্ণ দূর হয়; তখন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের মারফৎ টিনে করিয়া এই বস্তু দ্বারভাঙ্গা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে চালান হয়। আমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতৃবৃন্দের গোমাতার প্রতি অচলা ভক্তি, পিঞ্জরা পোল স্থাপনের জন্য অসম্ভব উৎসাহ, কিন্তু ইঁহাদেরই কৃপায় এই চর্ব্বি ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসে, মূল্যের তারতম্য অনুসারে শতকরা পঁচিশ ভাগ হইতে পঁচানব্বুই ভাগ পর্য্যন্ত এই বস্তু ঘৃতের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার পর বর্ত্তমানে আর এক বিষম উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, "ভেজিটেবল ঘি" (নিরামিষ ঘৃত) নামে এক পদার্থ বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। উদ্ভিজ্জ তৈলের সঙ্গে হাইড্রোজেন সম্মিলিত করাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়; রাসায়নিক হিসাবে দেখিতে গেলে, ভাল চর্ব্বি ও ঘৃতের বড় একটা প্রভেদ নাই; কিন্তু এই 'নকল' ঘৃতে ভাইটামিন নামক শরীরগঠনের অত্যাবশ্যক উপাদান একবারেই নাই। এই কারণে এই সকল ঘৃতের ব্যবহার কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ঘৃতের এই অপ্রাচুর্য্য ও দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ গো-জাতির অবনতি।

অধিক দিনের কথা বলিতেছি না, সত্তর পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার পল্লী-জীবনে গো-সেবা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত গো-সেবা না করিলে জলগ্রহণ করিতেন না। আর এখন গো-মড়কের প্রভাবে গো-জাতি নির্ব্বংশপ্রায়; যাহা আছে, তাহাও সুপ্রজনন অভাবে, খাদ্যের অভাবে কঙ্কালসার হইয়াছে। তরকারীর খোসা, ফেন, জল, পর্য্যাপ্ত খড়,—ইহাই হইল গরুর খাদ্য। খড় এখন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। গোচারণের জমীর তখন অভাব ছিল না, স্বচ্ছন্দমনে ঘাস খাইয়া সন্ধ্যার সময় গরু গোয়ালে ফিরিত। আর এখন জমীদারের বিলি বন্দোবস্তের গুণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, দেখিতে পাই, গ্রামের গোচারণ-ভূমি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, সুতরাং অনাহারে গরু শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। নব্যতন্ত্রের যাঁহারা যুবক, পল্লীবাটীতে হয় ত তাঁহাদের পিতামহী বা অন্য বয়স্কা আত্মীয়ার মধ্যে গো-সেবা কোনরূপে টিকিয়া আছে, কিন্তু এক দিন যদি কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদিগকে "গো বাড়ান" করিতে বলা হয়, তবে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা আমি কল্পনায় বেশ আনিতে পারি। আর নব্য যুবতীদের কথা না বলাই ভাল, হয় ত "গো বাড়ানের" প্রস্তাবেই তাঁহাদের মধ্যে "হিষ্টিরিয়া" দেখা দিবে।

এই সব বাবুয়ানার ফলেই, গৃহস্থের নিত্য-কর্ত্তব্য অবহেলার ফলেই পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত আজ দুগ্ধের দুর্ভিক্ষ। রেলষ্টীমারের কাছাকাছি পল্লীতে এখন টাকায় দুই সের হইতে আড়াই সেরের অধিক দুধ পাওয়া যায় না। আর সুদূর পল্লীতে (যেখান হইতে দুধ সহসা রপ্তানী হয় না) হয় ত কালে ভদ্রে টাকায় আট সের দুধ মিলে, তাহাও আবার পরিমাণে যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থকে পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণ দুগ্ধ একত্র সংগ্রহ করিতে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। আমাকে গত আট বৎসরের মধ্যে কার্য্যোপলক্ষে দুই বার (১৯২০ ও ১৯২৬) বিলাত যাইতে হয়; দুই বারই আমি বিলাতের দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের সরবরাহের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমি লণ্ডনে উপস্থিত ছিলাম; বিলাতে সেবার প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল, রাস্তা-ঘাট বরফের সাদা আস্তরণে ঢাকা পড়িত;

মধ্যে কি কেহ সকাল সাড়ে আটটা নয়টার আগে শয্যা ত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃতির এই নির্ম্মম খেয়ালের মধ্যেও দেখিতাম যে, ভোরের আলো ফুটিবার আগেই দরজার গোড়ায় দুধের বোতল হাজির হইয়া রহিয়াছে। দস্যু-তস্কর কেহই এই বোতল স্পর্শ করিবে না, যথাসময়ে গৃহস্বামী বাহির হইয়া বোতল ভিতরে লইবেন। লণ্ডন অতি বিশাল নগরী, সত্তর লক্ষ লোকের বাস। লণ্ডনে পল্লী উপকণ্ঠ হইতে শেষ রাত্রিতে রেলযোগে ভিন্ন ভিন্ন সহরতলীর ষ্টেশনে এই সত্তর লক্ষ লোকের উপযুক্ত দুধ জীবাণুশূন্য পাত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত হইয়া হাজির হয়, সেখান হইতেই মোটর-যান, ঠেলা-গাড়ী প্রভৃতি বাহনে পাড়ায় পাড়ায় সরবরাহ হয়। তাহা ছাড়া, পল্লীতে পল্লীতে দুই তিন রশি অন্তর গব্য পদার্থের দোকান (Dairy), তাহাতে দুধ, মাখন, পনির, ডিম (ডিম, সেখানে 'গব্য' পদার্থের অন্তর্ভুক্ত) প্রচুর পরিমাণে মিলে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানকার দুধ এখানকার দুধের অপেক্ষা অনেক সারবান্ হইলেও দামে সস্তা! হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, প্যারিসে দুধের দাম টাকায় আট সের, আর এই দুধ আমাদের দেশের "মাঠা তোলা" দুধ নহে। অথচ ইংরাজ বা ফরাসী গো-খাদক জাতি,শুধু দেশের গরু ভক্ষণ করিয়া ইহাদের ক্ষুধা মিটে না, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফে সংরক্ষিত "জমান" মাংস প্রতি বৎসর ইহাদের ভোগে লাগে। আমার মনে আছে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-প্রবাসকালে গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভুলক্রমে একটি গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। ঢুকিয়াই সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, রাস্তার দুই ধারে কাতারে কাতারে অগণ্য নিহত পশুর মৃতদেহ ঝুলিতেছে। লণ্ডনের ক্ষুদ্র এক পল্লীর মাংসের বাজারের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আমি ভাবিলাম যে, সমগ্র লণ্ডনে, প্রত্যহ এইরূপ কত পশুই না বলি হইতেছে। মাংস ছাড়া মাছও ইংরাজ বড় কম খায় না; হেরিং, ট্রাউট, স্যামন, কড প্রভৃতি কত প্রকার মাছ নদী ও সমুদ্র হইতে সাধারণভাবে সংগৃহীত হইতেছে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইংরাজের দুধে অরুচি নাই। যেখানে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ্ আসিয়া জমিয়াছে, সেই কলিকাতার বাজারে দৈনিক মাত্র তিন হইতে চারি হাজার মণ দুগ্ধ বিক্রয় হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতাবাসী প্রতিদিন লোকপ্রতি পৌনে দু'ছটাক মাত্র দুধ প্রাপ্ত হন। তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, শতকরা ৮০ জন লোক বৎসরে দুগ্ধের স্বাদ পায় না, কয়েক জন সঙ্গতিপন্ন লোক ও অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন আর কাহারও ভাগ্যে দুধ জোটে না। খাঁটী দুগ্ধের জন্য আমাদের বিজ্ঞান কলেজে পশ্চিম হইতে কয়েক জন হিন্দুস্থানী গোয়ালা আনাইয়া সংলগ্ন আঙ্গিনায় বাস করিতে দিয়াছি, প্রতিদানস্বরূপ তাহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে টাকায় তিন সের খাঁটী দুধ দেয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র দেখি, গরুগুলি জীর্ণ-শীর্ণ। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে পাহাড়-প্রমাণ বিচালি জমান দেখিতাম, এখন সে সব লোপ পাইয়াছে—কঙ্কালসার গরুগুলি কোনমতে ঘাস চাটিয়াই ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। সুন্দরবনে পর্য্যন্ত গরুর এই দুর্দ্দশা, অথচ সেখানেও দোকানে সুইডেনে প্রস্তুত গাঢ় দুগ্ধের অভাব নাই। গরুগুলার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় করুণা হয়, তৃষ্ণার সময় জলটুকু পর্য্যন্ত পায় না; কারণ, জল একে লোণা, তাহার উপর কুমীরের ভয় আছে; এক একটি গরু গড়ে আধসের হইতে তিন পোয়ার বেশী দুধ দিতে পারে না।

ভারত গভর্ণমেণ্টের গো-বিশেষজ্ঞ স্মিথ বলেন, "গরুর দরুণ ভারতবর্ষ বৎসরে ষাট কোটি টাকার অপচয় করে।" স্মিথের মতে লণ্ডনে দুধ ভারতবর্ষ অপেক্ষা এক শত গুণ সস্তা; টাকা হিসাবে লণ্ডন ও কলিকাতায় দুধের দাম প্রায় সমান, কিন্তু লণ্ডনের দুধ এ দেশের দুধের অপেক্ষা অনেক গুণ সার-বান্ এবং লণ্ডনবাসী কলিকাতাবাসী অপেক্ষা অন্যূন তিরিশ গুণ ধনী।

ডেনমার্ক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, আয়তনে মাত্র ১৬ হাজার বর্গমাইল, বাঙ্গালাদেশের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র, কিন্তু এই বর্দ্ধিষ্ণু স্বাধীন দেশের আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ গব্যজাত পদার্থ হইতে সম্ভূত। মেকলে তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বসময়ে ইংলণ্ডের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সে সময়ে ইংলণ্ডেও এই ভাবে গোধন অপচয় হইত। শীতের সময় যখন চারিদিক্ বরফে ঢাকা পড়িয়া কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকিত ও ঘাস অপ্রাপ্য হইত, তখন মাংসের জন্য অবাধ গো-হত্যা চলিত; কয়েক মাস যাবৎ লোক লবণে জারক মাংসের সাহায্যে প্রাণধারণ করিত এবং ইহার ফলে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইত। কিন্তু গাজর, শালগম প্রভৃতির চাষ প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে

সঙ্গেই এই ভাবে পশুধ্বংস অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

রাজকীয় কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় আমি জোর করিয়া বলিয়াছিলাম যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ, দৈনিক আহার্য্যে দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের অভাব। বাঙ্গালোরে ভারত-গভর্ণমেণ্টের যে আদর্শ গোশালা আছে, তাহা আমি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। কিসে গোজাতির উন্নতি হয়, দুগ্ধ ও গব্য পদার্থ যথানিয়মে সংগৃহীত ও প্রস্তুত হয়, এই সকল বিষয়ে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করাই এই পরীক্ষাগারের কার্য্য। দোহনের পর দুধ বীজাণুশূন্য (Pasteurise) করা হয়। গোমূত্র, সিমেণ্টের নালা বহিয়া পাত্রে জমা হয়। চোনায় যথেষ্ট পরিমাণ এমোনিয়া-ঘটিত পদার্থ থাকে, ইহা জমীর উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাঠ্যাবস্থায় এডিনবরায় দেখিতাম, স্কচ গোয়ালা চোনা, গোবর, খড় ও চূণ একত্র মিশাইয়া মাটীতে পুতিয়া রাখিত এবং কয়েক মাস পরে সার হিসাবে ব্যবহার করিত।

তৈলে ভেজাল আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার আর একটি কারণ; পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে "ঘানি গাছ" ছিল, কলের তেল বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। তেল কলের হইলেই যে অশুদ্ধ হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলে সরিষার পরিবর্ত্তে এত সম্ভব ও অসম্ভব ভেজাল চলে যে, তাহা না দেখিলে সহসা প্রত্যয় করিতে মন উঠে না। পাকুড়ের বীজ ভেজাল যে একবার কলিকাতায় সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। আর গ্রামের 'ঘানি' হইতে যে খইল বাহির হইত, তাহা গ্রামের গরুর আহার্য্যরূপ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন গ্রামের কলু পিতৃ-পিতামহের পেশা ছাড়িয়া চাকরীর উমেদারী করিতেছে, খইলের অভাবে গরু শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং কলিকাতার কলে যে খইল প্রস্তুত হইতেছে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বায়না হইয়া বরাবর জাপানে চলিয়া যাইতেছে—দেশের গরু অভুক্তই থাকিতেছে।

মেডিক্যাল কলেজের শারীর বিদ্যার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাক্তার ম্যাকে বাঙ্গালীর খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যে শুধু শ্বেতসারের প্রাচুর্য্য থাকে, নাইট্রোজেনের ভাগ এত অল্প থাকে যে, তাহাতে দেহ পুষ্টি-লাভ করিতে পারে না। শ্বেতসার, প্রোটীন্, শর্করা, স্নেহ ও লবণ-জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে আমাদের খাদ্যবস্তু গঠিত, ইহার মধ্যে শুধু প্রোটীনে নাইট্রোজেন থাকে। খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ দুধ, ডিম, ডা'ল, মাছ ও মাংসে প্রোটীন্ থাকে। দুধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, ডিম অনেকেই খান না, মাংস কিনিবার সঙ্গতি অনেকেরই নাই। বাকি রহিল ডা'ল ও মাছ। মাছ আমরা বাঙ্গালীরা খাই বটে, কিন্তু অনেক সময়েই শুধু মনকে প্রবোধ দিবার জন্য অথবা সধবার "সধবাত্ব" বজায় রাখিবার জন্য! আসলে অনেক সময়েই একরাশ মশলা, বাটনা ও তরকারীর মধ্যে দুই একখানি ক্ষুদ্র মৎস্যখণ্ড আত্ম-গোপন করিয়া থাকে, নানান্ কসরতের পর আবিষ্কৃত হইলেও শরীর-গঠনের যে বিশেষ সহায়তা করে, তাহা মনে হয় না। কারণ, পরিমাণে তাহা অতি অল্প। মোটের উপর আজকাল কলিকাতার ডোবা ও জল ভরাট করিবার সময় মুন্সিপাল গাড়ী যেমন অনবরত আবর্জ্জনা, রাবিশ ঢালিয়া যায়, অদৃষ্টের বিধানে আমরাও সেইরূপ কোনক্রমে ক্ষুধা-নিবারণের জন্য কচু, ঘেঁচু যাহা সম্মুখে পাই, তাহাই উদরে নিক্ষেপ করি। অবশ্য কচু-ঘেঁচু আহারে যে উপকার হয়, তাহা পরে বলিতেছি। ইহার ফল এই হয় যে, খাদ্যের অধিক ভাগ শরীর-গঠন ও সংরক্ষণের কাযে বড় একটা লাগে না, প্রায় সমস্ত অংশই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। মেডিকাল কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ ডাক্তার কোটস্ বলিয়াছিলেন, "ওজন অনুপাতে বাঙ্গালী খায় অনেক, কিন্তু খাদ্যের অনুপাতে তাহা সারহীন; শরীর বিশেষ কিছুই পায় না। ফলে এ দেশের কোন সহরের ড্রেণের সমস্যা অতি জটিল হইয়া দাঁড়ায়।" এই কারণেই এক জন বাঙ্গালী ইংরাজের চেয়ে ওজনে কম হইলেও, তাহার পাকস্থলী আয়তনে ইংরাজের পাকস্থলী অপেক্ষা অনেক বড়। বাল্যকাল হইতেই সারশূন্য অথচ পরিমাণে অধিক খাদ্য দ্বারা পাকস্থলী পূর্ণ হওয়ার জন্য পাকস্থলীর পেশী ক্রমঃ বিস্তৃত হয় এবং স্বতঃসঙ্কোচধর্ম্ম হারাইয়া ফেলে।

মাদ্রাজের কনুর ইনষ্টিটিউটের লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ম্যাক্‌ক্যারিসন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্যসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মাদ্রাজীর খাদ্য ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং পঞ্জাবের খাদ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই দুই প্রদেশের খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার, স্নেহ প্রভৃতি উপাদানের অনুপাতে নাইট্রোজেনের স্বল্পতা বিশেষভাবে অনুভূত

হয়; দিনের পর দিন শরীরকে প্রোটীন খাদ্য হইতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়, আর এই "নাইট্রোজেন অনাহারের" (Nitrogen Starvation) ফলেই এই দুই জাতি সারা ভারতে শীর্ণকায় ও দুর্ব্বল। ম্যাকক্যারিসন আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, গোদাবরী-বদ্বীপের ন্যায় উর্ব্বর ও শস্যবহুল ভূমিখণ্ডে পর্য্যন্ত দুই চারি জন ব্রাহ্মণ ও সঙ্গতিপন্ন লোক ভিন্ন সকলেরই অবস্থা এইরূপ, এই 'সম্মানিত' ব্যতিক্রমের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত অধিবাসিগণ আহারের সঙ্গে সামান্য একটু গব্য পদার্থ ব্যবহার করেন। সেখানকার চাষীরা আর এক কারণে সহজেই বেরীবেরীতে আক্রান্ত হয়; রাত্রিকালে ভাত ভিজাইয়া সকালে সেই ভাত-ভিজান জলে সামান্য একটু লঙ্কা ও লবণ মিশাইয়া তাহারা প্রাতরাশ সমাধা করে; এই জন্য ভাইটামিনের অভাবে সহজেই তাহারা বেরিবেরীর কবলে পড়ে।

তরি-তরকারী, খাদ্যশস্য, দুগ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ভাইটামিন নামে এক জাতীয় পদার্থ থাকে। ফলমূলে সাধারণতঃ খোসার মধ্যেই ইহার স্থান, পুরু করিয়া খোসা ফেলিয়া দিলে ভাইটামিনও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। আহার্য্যে যদি শুধু শ্বেতসার, স্নেহ, শর্করা, প্রোটীন প্রভৃতি যথোচিত পরিমাণেও থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, পুষ্টিকর আহার সত্বেও শরীর ক্রমশঃ কাহিল (Ricketty) হইয়া পড়ে এবং স্কার্ভি, প্রভৃতি রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। কয়েক বৎসর হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন থাকা প্রয়োজন এবং ভাইটামিন অভাবেই শরীর বেরীবেরীতে আক্রান্ত হয় এবং গঠনোন্মুখ দেহ ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। আমরা সাধারণতঃ যাহাদের "ছাতুখোর খোট্টা" বলিয়া উপহাস করি, তাহাদের ভুষিমিশ্রিত লাল আটার মধ্যে (whole meal) ভাইটামিন যথেষ্ট বর্ত্তমান। তাহাদের ক্রোরপতি পর্য্যন্ত এই জাঁতা-ভাঙ্গা লাল আটা ছাড়েন না। আর আমাদের চাই সাদা ধবধবে ঢেঁকীছাঁটা চাউল, সফেদ কলের আটা,—অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াই যেন আমরা চাউল আর ময়দার মধ্যে যেটুকু সার পদার্থ আছে, তাহাও বাহির করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হই। ইহাকে স্বকৃত পাপ; ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি বলিব?

বাঙ্গালীরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়েরা ডিম খায় না; কারণ, জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাই, জীবহত্যা ও ভ্রূণহত্যা মহাপাপ। কিন্তু হত্যা কি শুধু—ডিমের বেলায়ই হয়, ছাগ-হত্যায় অথবা সদ্যোধৃত মৎস্যের প্রাণ সংহারে কি প্রাণিহত্যার পাপ অর্শে না? ডিমের অনুভূতি আছে কি না, জানি না, আচার্য্য জগদীশ বলিতে পারেন; কিন্তু সদ্যশ্ছিন্ন ছাগদেহের ও কই মৎস্যের ধড়ফড়ানি দেখিয়াও যে জীবহত্যার বৈক্লব্য মনে আসে না, ইহাই আশ্চর্য্য। খাদ্য হিসাবে মাছ ভাল, কিন্তু তুলনায় ডিম আরও ভাল, ডিমের সবটাই সারবান্ খাদ্যে ভরা। আস্ত মাছের আঁস ও মাথা বাদ দিয়া সাধারণতঃ পঞ্চাশ ভাগ মাছ পাওয়া যায়, মাছের আবার আশী ভাগ জলীয় অংশ, মাছের মোট ওজনের উপর শতকরা দশ হইতে পনেরো ভাগের অধিক খাদ্য-অংশ আমরা পাই না, অর্থাৎ এক সের মাছে প্রকৃতপক্ষে "আসল মাছ" থাকে, খুব বেশী হইলে, আধ পোয়া। কিন্তু ডিমের শুধু খোলাটি বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহার সমস্তটাই খাদ্য এবং বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। ডিমের সাদা অংশে বিশুদ্ধ এলবুমিন, হলদে অংশে লেসিথিন ও ফস্ফো-গ্লিসিরণ প্রভৃতি বিশেষ পুষ্টিকর উপাদান থাকে। অনেকের মুখে শুনি যে, মুরগীর ডিম না খাইলে না কি ডিম খাওয়ার ফল হয় না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, সামান্য একটু গন্ধ ভিন্ন হংসী ও মুরগীর ডিমে কোন প্রভেদ নাই। উভয়ই শরীরের পক্ষে সমান উপকারী, খাদ্য হিসাবে উভয়েরই মূল্য খুব বেশী।

মিঠাই খাওয়া আজকালকার দিনে একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; দীনতম দরিদ্রের পর্য্যন্ত মিঠাই না খাইলে ভদ্রতা থাকে না। রসগোল্লার আকৃতি ত ক্রমশঃ দেখিতেছি, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, শীঘ্রই দেখিবার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে। মুন্সীপ্যালিটীর নিয়ম অনুসারে সকল মিঠাইয়ের দোকানে কাচের আলমারী থাকা প্রয়োজন, আইন বাঁচাইবার জন্য একটা আলমারী থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে কাচ অনেক সময়েই থাকে না। রসগোল্লার গামলার মধ্যে মাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি সব রকম রোগবাহী কীট-পতঙ্গ আনন্দে সাঁতার দেয়, মাঝে মাঝে দমকা বাতাস একরাশি রাস্তার ধুলা গামলার মধ্যে আনিয়া দেয়—আর কলিকাতার ধুলাতে যক্ষ্মা, বসন্ত, কলেরা হইতে কি রোগের বীজাণু যে নাই, তাহা আমি জানি না, আর আমরা মহানন্দে অক্লেশে সেই মিঠাই ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি! যদি কেহ বলেন যে, নিত্য এত রোগের মধ্যে থাকিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি কি করিয়া, তাহা হইলে আমার উত্তর এই যে, বাঁচিয়া

আছি নেহাৎ বরাত জোরে! বাঁচিয়া না থাকিবার যত রকম চেষ্টা থাকিতে পারে, তাহার কোনটিরই আমাদের ত্রুটি নাই। তবে বাঁচিয়া যে আছি, তাহা আমাদের চেষ্টার ফলে নহে, ঘোর চেষ্টার বিরুদ্ধ।

মুড়ি, খই, চিঁড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর জল-খাবার; আমি নিজে এই সকল খাবার পাইলে আর কিছু চাহি না। মুড়ি আমাদের দেশী বিস্কুট, ইহাতে শ্বেতসার আংশিক ভাবে ডেক্সট্রীণে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে। আমার মতে মুড়ি ও বিস্কুটে কোনই প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু দামে; অথচ "সভ্যতার" খাতিরে অতিথিকে বিস্কুট না দিয়া মুড়ি দেওয়া চলে না; কারণ, মুড়ি দিলে অতিথির অপমান করা হয়। যেখানে চৌদ্দ ছটাক বিস্কুটের দাম আড়াই টাকা, সেই পরিমাণ মুড়ির দাম মাত্র দুই চারি আনা। কিন্তু মুড়ির ন্যায় এক পদার্থ Puffed Rice অর্থাৎ বিলাতি মুড়ি বারো আনা পাউণ্ডে কিনিয়া অনায়াসে অতিথির পাতে পরিবেষণ করা যাইতে পারে! আমার শুধু দুঃখ হয় যে, প্রতিবৎসর এত ছেলে রসায়ন পড়িতেছে, কিন্তু এই সামান্য সত্যটি বুঝাইয়া দিবার কাহারও সামর্থ্য নাই! তাহার উপর গুড় খাওয়া চলিতে পারে না! কারণ, চিনির তুলনায় গুড় সস্তা অথচ গুড়ে ভাইটামিন ও লবণ-জাতীয় পদার্থ পুরা মাত্রায় থাকে, চিনিতে একবারে অবর্ত্তমান। মুড়ি অথবা চিঁড়ে এবং উত্তম গুড় সহযোগে যে চাকতি প্রস্তুত হয়, তাহা এই বৃদ্ধবয়সেও আমার কাছে অমৃত বলিয়া মনে হয়, অথচ মাণিকতলা অঞ্চলে মুড়ি ও চিঁড়ার দোকান খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে হয়রাণ হইতে হইয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের শিবমন্দিরের নিকট একটি ছোট দোকান আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাও চলে বোধ হয় আমার মত দুই পাঁচ জন "বিকৃত-মস্তিষ্কের" খেয়ালের ফলে। *

ছেলেবেলায় কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে দেখিতাম, অতিথিগণের মধ্যে মুগ ও বুটের অঙ্কুর, নারিকেল-কোরা, কচি শশা, আখের খণ্ড ইত্যাকার জলপান বিতরণ করা হইত; আজকাল বোধ হয় এ সকল লোপ পাইতেছে। এই সকল জিনিষে ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। নারিকেল সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এমন সুখাদ্য বোধ হয় জগতে আর নাই। নারিকেলের শাঁসে মাখনের উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে। টাটকা নারিকেল-তৈলে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিউটিরিক এসিড্ থাকে। তাহাতে অনায়াসে লুচি ভাজিয়া খাওয়া চলে, গরম অবস্থায় কোন গন্ধ থাকে না। আমি রসায়নাগারে স্বয়ং এ সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। নেয়াপাতি ডাবের শাঁসে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও উদ্ভিজ্জ এলবুমিন থাকে, কিন্তু কলিকাতার 'সভ্যতা' অনুসারে এ হেন পুষ্টিকর খাদ্য নারিকেলের জল খাইয়া শাঁস ফেলিয়া দেওয়াই রীতি, অর্থাৎ বাজে অংশ রাখিয়া সারাংশ ফেলিয়া দিতে হইবে, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না! আমি জানি, শিক্ষা-বিভাগের এক বড় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর (Clarke) টিফিনের বন্দোবস্ত ছিল শাঁস-জল সমেত শুধু একটি আস্ত নারিকেল।

আমাদের দেশের কেরাণী বাবুদের অনেককেই সকাল আটটার সময় কোনমতে চারিটি আলুভাতে ভাত মুখে গুঁজিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দশটায় আফিসে হাজিরা দিতে হয়। সুতরাং একটা বাজিতে না বাজিতে অনেকেরই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই সময়ে নানাপ্রকার মুখরোচক খাদ্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়; লোভে পড়িয়া অনেকেই দুই আনা, চারি আনা, এমন কি, ছয় আনার পর্য্যন্ত মিঠাই খাইয়া বসেন। কিন্তু এ সব খাদ্য দুষ্পাচ্য ও সারহীন, অধিকন্তু স্বল্পবেতন কেরাণীর আয়ের পক্ষে দুর্ম্মূল্য। আমার মতে কেরাণী বাবুরা যদি এলুমিনিয়মের কৌটা করিয়া এক পয়সার মোটা আটার রুটী, দুই তিনটি সিদ্ধ আলু, ও 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসাবে কিছু সুগন্ধ গুড় লইয়া যান, তবে অল্প পয়সার মধ্যে পুষ্টিকর জলখাবারের বন্দোবস্ত হইতে পারে। মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার জন্য একটি সিদ্ধ ডিম ও ভিজা ছোলা সামান্য ভাজিয়া লইয়া মুড়ির সঙ্গে খাওয়া যাইতে পারে; এই প্রকার জলখাবার খাইলে শুধু যে পয়সা বাঁচিবে, তাহা নহে, স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়াও বিশেষ রকম লাভ হইবে।

এ বিষয়ে যতই ভাবি, ততই দেখিতে পাই যে, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের খাদ্যে প্রোটীন, স্নেহ ও ভাইটামিনের অভাব ছিল না। বিলাতেও ভাইটামিনতত্ত্ব আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ইংরাজের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ লেটুস্ (বাঁধা-কপি শ্রেণীর সব্জী), বিলাতী বেগুণ, লেবু প্রভৃতি থাকিত। আর এখন দেখা যাইতেছে যে, এই সকল তরকারীতে কাঁচা

* এইখানে শ্রদ্ধেয় বক্তা, বক্তব্য বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য সম্মুখস্থ শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে নলিনগুড়ের ঘরে প্রস্তুত মুড়ির চাকতি বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, আস্বাদকারিগণের সকলেই এক-বাক্যে আচার্য্য মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন।—অনুলেখক।

অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ ভাইটামিন থাকে। আমরা এত দিন বিলাতী বেগুণ স্পর্শ করিতাম না, এখন খাইতে শিখিতেছি। প্রায় দুই বৎসর হইল, লণ্ডনের পশুশালার উদ্যানে একটি বর্ষীয়সী মহিলাকে স্যাণ্ডউইচের সঙ্গে একটি বৃহৎ লাল ফল কামড়াইয়া খাইতে দেখিয়াছিলাম; সন্দেহ হওয়ায় কাছে গিয়া দেখি, মহিলাটি একটি পাকা বিলাতী বেগুণ চিবাইয়া খাইতেছেন। আমাদের সাধারণ তরকারীর মধ্যে মূলা, বরবটী ও পেঁয়াজে যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে। দেশী পেঁয়াজ বড় উগ্র, বোম্বাই পেঁয়াজ অপেক্ষাকৃত কম ঝাঁঝাল। পেঁয়াজ আমরা বাঙ্গালাদেশে প্রকাশ্যতঃ খাই না, কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণও পেঁয়াজের শ্রাদ্ধ করে, অথচ মৎস্য-ভোজী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট জল খায় না। ধনের শাক, শল্প, পুদিনা এই সকলের মধ্যে ভাইটামিন অল্লাধিক পরিমাণে থাকে, সুতরাং তরি-তরকারীর বিষয়ে যদি আমরা সামান্য একটু বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমার মনে হয়, এই অল্প পয়সার মধ্যেই বেশ পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কেশব একাডেমী মাসে চারি আনা করিয়া লইয়া ছাত্রগণের জলখাবারের বন্দোবস্ত করিতেছেন; আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষও এই উদ্দেশ্যে কিছু দিবেন। চার আনা বা আট আনায় অবশ্য মিঠাইর বন্দোবস্ত হইতে পারে না; কিন্তু অনায়াসে আলুসিদ্ধ, লাল আটার রুটি, নূতন গুড়, ছোলা ও মটর সিদ্ধের ব্যবস্থা হইতে পারে। কলেজের হষ্টেলগুলিতে শুনি, ভাতের পরিবর্ত্তে অন্ততঃ একবেলাও রুটী বা চাপাটী দেওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ যেখানে যাই, সেখানেই চা'য়ের ছড়াছড়ি দেখি। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই একটি করিয়া প্রাইমাস ষ্টোভ, অষ্টপ্রহর চায়ের জল তৈয়ারী হইতেছে ও 'চা গলাধঃকরণ' চলিতেছে। অতিরিক্ত চা'-পানের ফলে ক্ষুধা মরিয়া যায় ও প্রথমটা কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে অবশেষে অবসাদ আসে। ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্যের এত প্রাদুর্ভাব। শিক্ষিত লোকের অনুকরণে রাস্তার মুটে-মজুর পর্য্যন্ত এই বিষ-পান আরম্ভ করিয়াছে, পথের ধারে সকাল-বিকাল দেখি, অগণ্য স্ত্রী-পুরুষ সতৃষ্ণনয়নে চা'য়ের আশায় বসিয়া আছে। বোম্বাই সহরেও দেখিয়াছি, "বিশ্রান্তি-ভবনে" কেরাণীগণ পেয়ালার পর পেয়ালা চা' 'সাবাড়' করিতেছে। এ সর্ব্বনাশী নেশা ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়া পলে পলে জীবনীশক্তির নাশ করিতেছে। অতিরিক্ত চা'-পানের বিষময় ফল আমি "চা'-পান না বিষ-পান" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-ডি মহাশয় আমার মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়া আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে আমি কলিকাতাবাসী ছাত্রগণের মধ্যে সংক্রামিত চা' ও বায়স্কোপের নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করি। অনেকের ধারণা যে চা' খাদ্যবস্তু; কারণ, অতিরিক্ত চা'-পানের ফলে ক্ষুধা সম্পূর্ণ লোপ পায়। বাস্তবিক চা'য়ের শতকরা ৯৮ ভাগ জল, দুই ভাগ মাত্র অন্য বস্তু থাকে। চা'পানে উত্তেজনার কারণ ক্যাফিন্ (Caffeine) নামক উত্তেজক পদার্থের অস্তিত্ব। ক্ষুধা নষ্ট হয় বলিয়া প্রমাণ হয় না যে, উহা খাদ্যবস্তু। তাহা হইলে স্যার চার্লস এলিয়টের মত আমাদিগকেও বলিতে হয়, "গঞ্জিকা নিশ্চয়ই খাদ্যবস্তুর গাঢ় নির্য্যাস; কারণ, গঞ্জিকায় দম দিয়া পাল্কী বেহারারা হ'ন হ'ন করিয়া অনায়াসে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে।"

তাহার পর সভ্যতা-বৃদ্ধির আর একটি লক্ষণ, অলিতে-গলিতে, কোণায়-কানাচে, বর্ষার আগাছার মত রেষ্টোরাঁর (Restaurant) প্রাদুর্ভাব। দরিদ্র পিতা বা অন্য অভিভাবক নিজের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া বংশের দুলালের শিক্ষার জন্য যে অর্থ পাঠান, তাহার মোটা রকম একটি অংশ এই সকল রেষ্টোরাঁ প্রতিপালনে ব্যয় হয়। আর এই সকল দোকানের খাবার সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। দিনের উদ্বৃত্ত মাংস পরের দিন কিমার আকার ধারণ করিয়া চপের মধ্যে প্রবেশ করে, ধরিবার উপায় নাই। কোন্ জন্তুর মাংস হইতে চপ, কাট্‌লেট প্রস্তুত হয়, তাহা অবশ্য ভোক্তাদের জানা নাই। শুনা গিয়াছিল, উত্তর অঞ্চলের নামজাদা এইরূপ একটি খাবারের দোকানদার চপে কুকুরের মাংস দিয়া আইনের জালে ধরা পড়িয়াছিল। মোটের উপর, সাধারণ ছাত্রের বিলাস-ব্যসনে যে অপব্যয় হয়, তাহা যদি পুষ্টিকর খাদ্যে ব্যয় হইত, তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গালী ছাত্রের স্বাস্থ্য অন্যরূপ দাঁড়াইত। ৭।৮ টাকা কমের জুতা ব্যবহার করিলে ছাত্রমহলে নাম থাকে না। চুল কাটিবার সেলুনে ক্ষৌরী না করিলে আদব-কায়দাদুরস্ত হয় না, সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার থিয়েটার, বায়স্কোপ না দেখিলে "অজ পাড়াগেঁয়ে" নাম অনিবার্য্য; বাঙ্গালী ছাত্রকে অগত্যা "পেটের উপর বাণিজ্য"

করিতে হইতেছে। শরীরের সকল অবয়বের মধ্যে পাকস্থলীকে ফাঁকি দিয়াও বাহিরের চাকৃচিক্য বজায় রাখা যাইতে পারে; ডাইং ক্লিনিং দোকান হইতে ধোপদোরস্ত পোষাকে দেহ আবৃত করিয়া, মুখে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া দক্ষিণ-হস্তে রিষ্টওয়াচ লাগাইয়া হালফ্যাসানের বাঙ্গালী ছাত্র "উন্নতির পথে" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, এ উন্নতিতে বাদ সাধিতে যায় কাহার সাধ্য? এই ছাত্রসমাজই বৃহত্তর সমাজের মেরুদণ্ড, কিন্তু মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিলে সমাজ কয় দিন টিকিবে?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, দারিদ্র্য-রোগক্লিষ্ট বাঙ্গালীজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সকাল-সন্ধ্যা সকলের ঘি, দুধ, মাখন জুটিবে না, ইহা নিশ্চিত। তবে দুঃখ এই যে, অনায়াসলভ্য সাধারণ খাদ্যের মধ্যেও যাহা সারবান্, তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং সারবান্ খাদ্যের সারাংশ ফেলিয়া দিয়া বাজে অংশ গ্রহণ করিতেছি। আমি অনুরোধ করি যে, সকলেই যেন খাদ্যসম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখেন এবং প্রয়োজন হইলে ব্যয়বাহুল্য না করিয়াও চিরাচরিত প্রথার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া খাদ্যের উৎকর্ষ-সাধন করেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

বাউল গান *

(১)

রসিক যে জন ভঙ্গীতে যায় চেনা।
সদাই থাকে রূপের ঘরে,
রূপনয়নে সদাই হেরে,
ভঙ্গীতে ধরা পড়ে,
আর ত সুখ জানে না।

শুদ্ধমতে শান্ত পতি বর্ণে কাঁচাসোনা।
লোকে কয় চণ্ডীদাস-রজকিনী,
তারা প্রেমের শিরোমণি,
এমন প্রেম জানে কয় জনা॥

ঈশান কয় দুগ্ধ জলে
একত্রে মিশাইলে (পরে)
হংস তাহার লাগাল পাইলে
করে অরূপ সাধনা।

ভাণ্ডার মাঝে চুমুক দিয়ে,
যায় সে দুগ্ধ খেয়ে,
ভাণ্ডের জল ভাণ্ডে থাকে
রসিকের তেমনি ঘটনা॥

(২)

মন লও রে গুরুর উপদেশ।
জানতে পার সহজে॥
পাচ মশলা যোগ করিয়ে লাগাইয়াছে অন্ধাবেশ
মারুল পাড়া সবাই জোড়া (?)
ছানি চাম্‌বা কাগজে,
জানতে পার সহজে।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত আদি অন্ত তার কাছে,
মহাসাগর করিয়া লয়া পদ্মপাতে বসিয়াছে।
অধীন শ্রীনাথ বলে ভুলিয়াছি মায়াপাশে,
মায়া-বন্ধন হবে ছেদন গুরু যদি পরশে,
জানতে পার সহজে।

(৩)

ভবের হাটে দিছেন খেয়া গুরু কর্ণধার
কত হইতেছে রে পাড়।
ধনী মানী পার করে না, পার করে কাঙ্গাল
কত হইতেছে রে পাড়।

বেলা থাকতে দাও রে পাড়ি সময় নাই রে আর,
অসময়ে পারের ঘাটে গিয়ে ঠেকবে রে এবার
কত হইতেছে রে পার ভবের ঘাটে॥

মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (এম, এ)।

---

* এই গান কয়েকটি ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুর হইতে বন্ধু শ্রীযুক্ত অমিয়কণ্ঠ নিয়োগী বি, এ, মহাশয়ের সাহচর্য্যে সংগৃহীত।

গোলাকার ধাতব নৌকা

জলক্রীড়ার উদ্দেশ্যে ধাতুনির্ম্মিত গোলাকার এক প্রকার নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। জলক্রীড়ার সময় ইহাতে বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত অল্প। ৮ জন নর-নারী এই নৌকায় বসিতে পারে। বায়ুপূর্ণ একটি কক্ষ এই নৌকার তলদেশে বিদ্যমান। উহাতে
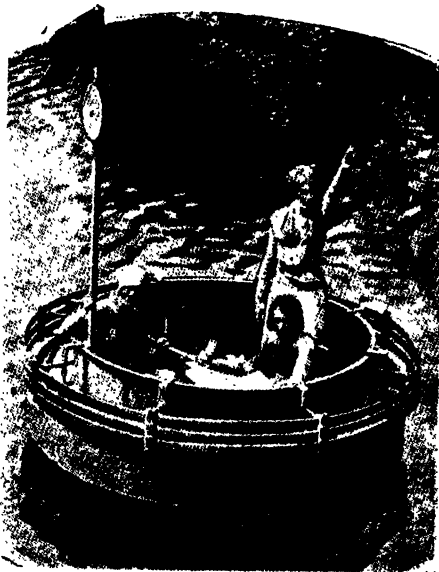
গোলাকার ধাতব নৌকা

নৌকা স্থিরভাবে থাকে—বিশেষ আন্দোলিত হয় না। এই নৌকা চালাইবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। গোলাকার বলিয়া উহা উল্টাইয়া যায় না এবং কোন পদার্থে আহত হইলে সহসা ভগ্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পথে যান-নিয়ন্ত্রণের কৌশল

লস্ এঞ্জেলেস্‌এর রাজপথ-সমূহে যানাদি-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ফুট-পাথের উপর সাঙ্কেতিক চিহ্নজ্ঞাপক স্তম্ভ-সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। রাজপথের এক দিক্ হইতে পাদচারীরা অন্য দিকে গমন করিবার সময় উক্ত স্তম্ভের গাত্র-সংলগ্ন একটা বোতাম টিপিলে, স্তম্ভের উপরিভাগে থামিবার সঙ্কেতপূর্ণ একটি পতাকা বাহির হইয়া আইসে। সেই চিহ্ন দেখিবামাত্র গাড়ী অমনই

রাজপথে যান-নিয়ন্ত্রণের কৌশল

থামিয়া পড়ে। তখন পথিক নিরাপদে অপর পারে উপনীত হয়। ১৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত উক্ত সাঙ্কেতিক পতাকা স্থিরভাবে থাকে। তাহার পর আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার ২৫ সেকেণ্ড পরে আর এক জন পথিক ঐ ভাবে পথ পার হইতে পারে। পুলিসের সাহায্য ব্যতিরেকে পথিকগণ ইচ্ছানুরূপ গাড়ী নিয়ন্ত্রণ করিয়া যাহাতে রাজপথ নিরাপদে উত্তীর্ণ হইতে পারে, এই নিমিত্তই ঐ প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বনভোজনের বিচিত্র সরঞ্জাম

সাধারণ স্যুটকেসের অপেক্ষা সামান্য বড় আকারের একপ্রকার বাক্স বাজারে বাহির হইয়াছে। যাহারা বনভোজন অথবা বাহিরে গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা এই

বনভোজনের সরঞ্জামসহ বাক্স

বাক্সে ভাঁজকরা চেয়ার ও আহার্য্যের উপযোগী পাত্রাদি সঙ্গে লইতে পারে। বাক্সটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, উহাকে ভোজন-টেবলে পরিণত করা যায়। চারি জনের উপযোগী পাত্র ও চেয়ার একটা বাক্সে ধরে।

অভিনব দোলনা

নিউইয়র্কের হিব্রু শিশু-আশ্রমে শিশুদিগের আনন্দবিধানের জন্য এক প্রকার দোলনা ব্যবহৃত হইতেছে। এই দোলনা-যন্ত্রের উপরে একটি বসিবার আসন আছে। যন্ত্রটি স্প্রীংযুক্ত,
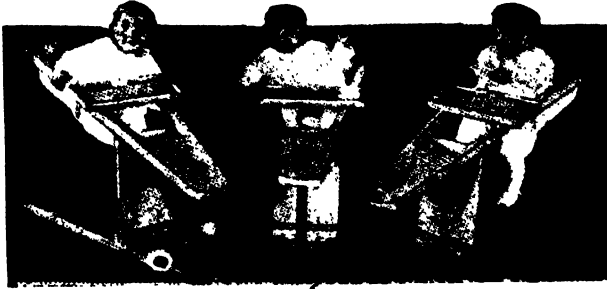
স্প্রাংএর দোলনা

সুকৌশলে নির্ম্মিত। শিশু আসনে বসিয়া সামান্য নড়িলেই যন্ত্রটি আন্দোলিত হইতে থাকে। শিশু একবার উপরে উঠে, আবার নাচে নামে, এই ভাবে শিশুও কৌতুক অনুভব করিয়া বসিয়া থাকে। বসিবার আসন হইতে তাহার পড়িয়া যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ইস্পাত-নির্ম্মিত নৌকা

জনৈক জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ার ভারী ও দৃঢ় ইস্পাতের সাহায্যে একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই নৌকার চাকা

ইস্পাত-নির্ম্মিত নৌকা

বায়ু ও জলের চাপে চালিত হয়। আর্কটিক প্রদেশের তুষার-রাজ্যে ভ্রমণ করিবার জন্যই এই নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। বৃহদাকার শ্লেজ গাড়ীর আকারেই এই নৌকা গঠিত।

স্যুটকেশে দ্বিচক্রযান

ফ্রান্সের বাজারে সম্প্রতি একপ্রকার দ্বিচক্রযান দেখা দিয়াছে। এই যানারোহণে ঘণ্টায় ২০ মাইল পথ অনায়াসে পর্য্যটন করা চলে। দ্বিচক্রযানটিকে ভাজ করিয়া একটি স্যুটকেশে রাখিবার

ভাঁজ করা দ্বিচক্রযান

ব্যবস্থা আছে। সমগ্র জিনিষটির ওজন ১০ সেরের অধিক নহে সাধারণ লগেজের ন্যায় ইহাকে অনায়াসে সঙ্গে লওয়া চলে।

ভাঁজকরা গাড়ী

চরণের শক্তির দ্বারা তাড়িত একপ্রকার ভাঁজকরা স্বয়ং-চালিত গাড়ী লণ্ডনের বাজারে বিক্রীত হইতেছে। এই গাড়ীর গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ হইতে ৩০ মাইল। উহাকে ভাঁজ করা

ভাঁজকরা দ্রুতগামী গাড়ী

যায়। তখন সাধারণ দ্বারপথে গাড়ীখানিকে ভিতরে লওয়া চলে। এই গাড়ী চালাইতে চালককে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। গাড়ী থামাইবার জন্য হস্ত ও পদ উভয়ই ব্যবহার করা যায়। গাড়ীর চারি পার্শ্বে পর্দ্দা আছে।

সঞ্চরণশীল কাঠের ঘোড়া

বালকদিগের চিত্তবিনোদন ও ক্রীড়ার জন্য চলমান কাঠের ঘোড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঘোড়াগুলি চতুষ্পদ নহে—

চলমান কাঠের ঘোড়া

ষট্‌পদ। সম্মুখ ও পশ্চাতের পদচতুষ্টয়ের মধ্যে আর এক জোড়া চরণ আছে। এই চরণগুলি সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট। বালক ঘোড়ার উপর চড়িয়া একটু সম্মুখভাগে জোর দিলেই ঘোড়ার সম্মুখের চরণ চলিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াও অগ্রসর হয়। ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ ইহাতে বালকরা অনুভব করিয়া থাকে।

পেয়ালাখচিত স্তম্ভ

জার্ম্মাণীর লিপজিগ নগরে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। জনৈক পোর্সিলেনের পেয়ালা-ব্যবসায়ী একটি স্তম্ভের চারি পার্শ্বে ১ হাজার ২ শত পোর্সিলেন-নির্ম্মিত পেয়ালা সজ্জিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে সমুজ্জ্বল আলোকসম্পাতে ইহার দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইত। বহু ক্রোশ দূর হইতে এই স্তম্ভটি দৃষ্টিগোচর হইত।

পেয়ালাখচিত স্তম্ভ

গুলীনিবারক বর্ম্ম

আত্মরক্ষা ও শত্রুদমনের জন্য এক প্রকার বর্ম্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। বক্ষোদেশে এই বর্ম্ম ধারণ করিতে হয়। শত্রুর নিক্ষিপ্ত গুলী বক্ষোদেশ বিদ্ধ করিতে পারে না। বর্ম্মের ঠিক মধ্যস্থলে একটি কলের

বিচিত্র বর্ম্ম

আগ্নেয়াস্ত্র লুক্কায়িত থাকে। বর্ম্মধারী দুই হাত তুলিবামাত্র তন্মধ্য হইতে গুলী নির্গত হইতে থাকে। সুতরাং এই বর্ম্ম ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা ও শত্রুদমন উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

বিচিত্র নৌকা

ছোট ছোট নৌকাগুলি যাহাতে কোনমতেই জলে ডুবিয়া যাইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ইদানীং এইরূপ নৌকার চারি-পার্শ্বে বায়ুপূর্ণ, দৃঢ় রবারের নলের বেষ্টনী সংলগ্ন করা হইয়া থাকে। নৌকায় অপর্য্যাপ্ত জল উঠিলেও নৌকা জলমগ্ন হয় না।

রবার-বেষ্টনীযুক্ত নৌকা

আরোহী নৌকা বাহিয়া অনায়াসে তীরে যাইতে পারে। রবার-নলের বেষ্টনীর অভ্যন্তরস্থ বায়ুর পরিমাণ এত অধিক থাকে যে, আরোহী ও নৌকাগর্ভস্থ জলরাশি সহ নৌকাকে ভাসাইয়া রাখে।

সমুদ্র-হস্তী

সমুদ্র-হস্তীর নানা প্রকার বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বার্লিন নগরের পশুশালায় একটি বৃহৎ জল-হস্তী আছে। যে ব্যক্তি ইহাকে প্রত্যহ আহার্য্য দেয়, সে উহার এত বশীভূত যে, ঐ ব্যক্তি যখন তাহার মুখে আহার্য্য নিক্ষেপ করে, তখন সে জলহস্তীর পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া থাকে। পশুটি তাহাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয় না, বরং গলাটি বাড়াইয়া দিয়া তাহার হস্ত

সমুদ্র-হস্তীর আহার্য্য

হইতে ব্যাদিত-মুখে আহার্য্য গ্রহণ করিতে থাকে। বৃহদাকার এই জাতীয় হস্তী প্রত্যহ ১ মণ ১০ সের মৎস্য ভোজন করিয়া থাকে।

শতবর্ষজীবী দ্রাক্ষালতা

ইংলণ্ডের হ্যাম্পটন কোর্ট রাজপ্রাসাদে একটি দ্রাক্ষালতা আছে, তাহার মত বিখ্যাত ও প্রাচীন দ্রাক্ষালতা পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। গত শত বৎসর ধরিয়া ইহা জীবিত রহিয়াছে এবং ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঋতুতেও এই দ্রাক্ষাকুঞ্জে ৬ শত গুচ্ছ চমৎকার আঙ্গুর ফল জন্মিয়াছিল। এই দ্রাক্ষালতাটির জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট যত্ন লইয়া থাকেন।

শতবৎসরজীবী দ্রাক্ষালতা

যুবক-জীবন

২২

সাতটা বাজিতে হাজত ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং এক জন মুক্‌তি কাপড় পরা ধামা-হাতে কনষ্টেবলের পশ্চাতে হাজতের হাওলদার প্রবেশ করিলেন। এই লোকটির মস্তকের কেশে প্রফুল্ল মল্লিকা, গুম্ফে শশ্মের শুভ ঔজ্জ্বল্য, নয়নদ্বয়ে ঘৃত-প্রদীপের শান্ত জ্যোতিঃ, আর দেহের গঠনায়তনে সচেতন যৌবনের শক্তি অভিব্যক্ত। উপবীত আংরাখার আবরণমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকিলে-ও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া ইঁহার সম্মুখে মস্তক প্রণামে অবনত করিতে স্বত-ই ইচ্ছা করে। কারুণ্য-ধন্য হাস্যের মেখলা ইঁহার তরল অধরে সহজ মাধুর্য্যে লীলায়িত থাকিলে-ও হাওলদার সাহেব যে একটি মাত্র তর্জ্জনী-তাড়নে অতি দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ও বিদ্রোহী বন্দীকে দমন করিতে পারেন, সে সংবাদ তাঁহার শুভ্র ভ্রূলতাতে-ই লিখিত আছে। ইনি পশ্চিমপ্রদেশবাসী হিন্দুস্থানী হইলে-ও বহু বর্ষের কর্ম্মস্থল বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসেন, বাঙ্গালীকে ম্লেচ্ছাচারী ভীরু বলিয়া ঘৃণা করেন না, আর ইঁহার মুখের বাঁকা বাঙ্গালা কথা বেশ মিষ্ট লাগে। পাহারাওয়ালাটি যখন অপর কয়েদীদিগের কোঁচড়ে এক এক সরা মুড়ি ঢালিয়া দিয়া শ্যামাপদর সম্মুখে আসিয়া ধামা হাতে দাঁড়াইল, তখন পদ একবার তাঁ'র মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাইয়া লজ্জায় চক্ষু দু'টি মাটীর দিকে নত করিল। ব্যাপার বুঝিয়া লইতে প্রবীণ বন্দিকক্ষ-কর্ত্তার বিলম্ব হইল না; কনষ্টেবলকে বলিলেন, "এই ক্যা করতা, আদমী পছান্তা নেই? যাও উধার লে যাও।" শ্যামাপদ অবাক্ মুখে হাওলদারের দিকে চাহিল; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক অবাক্ হইল মাতাল দেদার, সে হারু চক্কোত্তিকে ডাকিয়া বলিল, "অ বেম্মা, শাপ দিবি বলছিলি না, এই দেখ, চেয়ে দেখ, বামুন কাকে বলে!"

পরে হাওলদারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "না ঠাকুরজী সায়েব, আর আমার আপশোষ নেই, ভাগ্যি কাল একটু বেঁহুষ পেয়ে ধ'রে এনেছিল, তা'ই আপনকার মত মানুষের কদমের তলায় দু'রাত আচ্ছরয় পেলেম।"

হাওলদার। বাবুজী, তা আপনার ভোজনের কি হবে? এখানে একবেলা চাউল দাল দেবার হুকুম আছে, কিন্তু রসুই ক'রে নিতে হয়।

শ্যামা। না খেলেও চল্‌বে, আমার ক্ষিদে নেই।

হাওলদার। ক্ষিদের ওয়াক্‌ৎ হোলে-ই ভুখ্‌ আপনি লাগবে; লেকিন এখানকার সে চাউল কি আপনি খেতে পারবে?

শ্যামাপদ। আমায় মাপ করবেন, খাবার মোটে ইচ্ছে নেই।

হাওলদার। হোবে হোবে, ভদ্দর আদ্‌মি, এ পাজী যায়গামে—

চক্কোত্তি। পাজী বোলো না, হাওয়ালদার ঠাকুর, সরকারের ওমন হুকুম নেই।

হাওলদার। চোপরাও চকত্তি, বেসরম্! বরাহ্মণ কওলাতে, আউর্ আধা সাল জেহেল্‌মে,——জনুউ জালায় দেও, ম্যাচিস্ দেগা?

চক্কোত্তি। (নিম্ন স্বরে) খোট্টা বামুন আবার বামুন, হাতে-মাটী করে না।

হাওলদার আবার শ্যামাপদর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কেনো অত ভাবছো বাবু; আপকা মোকর্দ্দমার হাল আমার জানা আছে; চোরি বি না, ফেরাবি বি না——"

দেদার। মদ খাকে রাস্তামে দুরবস্থ বি না।

হাওলদার। আউর কা! মরদের কাম ক'রে আসছো বাবু, সরম কা? বুঢ়া হোয়ে গিয়া বাবু সরকার কা নিমক খাকে, আউর কা বোলে, লেকিন্ মরদকা মাফিক কাম করছো আপনে। হামি শুনছে, ফেরিস্ সাব বি আপনার তারিফ করছে, ও একটা সাফ্ এংরাজ আছে।

শ্যামাপদ। আমার কি সাজা হবে, আপনি বলতে পারেন?

হাওলদার। মামুলী দাঙ্গাকা মোকর্দ্দমা, পাঁচ দশ রোপিয়া জরমানা; লেকিন্ ফরিয়াদী এংরাজ,——

শ্যামাপদ। তা'তে জেলে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়।

এই সময়ে কোণ থেকে মুড়ি চিবুতে চিবুতে মহেশ হঠাৎ বোলে উঠলো, "থানটি-ও খুব আশ্চয্যি; আলিপুরের এক ধারে জানোয়ারের চিড়িয়াখানা, আর এক ধারে মনুষ্যরের চিড়িয়াখানা। এই যে দেখছেন আমরা, সব চিড়িয়া—পক্ষী জাতি, কারুর অধীন নই; মাঝে মাঝে খাঁচায় পোরে, বেরুলে-ই যে পক্ষী সে-ই পক্ষী।"

হাওলদারের চাহনিতে-ই মহেশের মুখ বন্ধ।

হাওলদার। দু'টো গাওয়া যদি খাড়া করিয়ে বলাতে পার যে, সে সাহেবটা পহেলা মার দেছে,——

শ্যামাপদ। আমি বিদেশী, তা'তে একা ছিলেম, সাক্ষী পাব কোথায়?

হাওলদার। হাঁ, বুঝছে বুঝছে, সে লোক তুমি না। নেহি তো গাওয়া মিল যায়—মিল যায়।

শ্যামাপদ। যা হয় হবে।

হাওলদার। ঠিক ঠিক, বিশ্বনাথজী ভরোসা! ফরিয়াদী এংরাজ, দেশী গাওয়ার কোথা হাকিম কি শুনবো! আপনি কোন্ জাত?

শ্যামাপদ। ব্রাহ্মণের ছেলে বটে।

হাওলদার। আমি ভি কনোজিয়া। সুপরনটন মলক্ আদমি খারাপ না। আপনা হাতসে কুছু চাউল পাকাবো, তুমি আমার ছেলিয়াসে বি ছোটা, মুঠি ভোর হামার সাথে খাব?

শ্যামাপদর চোখ দুটো খপ কোরে ভিজে উঠলো; "আমি পাতে প্রসাদ পাব" কথাটা যে রকম জড়িয়ে তা'র মুখ থেকে বা'র হোলো, তা' হাওলদার বুঝতে পাল্লেন কি না জানি না; তিনি বাইরে গেলেন, দরজায় আবার চাবি পড়ল।

শ্যামাপদ কোনো নিন্দনীয় অপরাধে ধৃত হইয়া হাজতে আনীত হয় নাই, বরং এক হঠকারী শ্বেত প্রেতের বল-দর্প মুষ্টাঘাতে চূর্ণ করিয়া সহায়হীন প্রবাসে আপনাকে বিপন্ন করিয়া বসিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া কক্ষস্থিত কয়টি লোকের প্রাণে-ই তাহার প্রতি একটা নূতন রকমের সম্ভ্রমের সঞ্চার হইল; এমন কি, হারু চক্রবর্ত্তীর মত কলুষ-কঠিন দুর্ব্বৃত্তের চিত্ত-ও যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। সে কহিল, "বাবাজী, কাযটা যা করেছ, তা'তে বাহাদুরী আছে বটে; কিন্তু ইংরেজের গায়ে হাত তোলা, এ যে তোমায় অন্নে ছাড়বে, তা' তো মনে নেয় না।"

দেদার। ঠাকুর, এ বাজারে আর তোমার বেহ্মশাপ চলে না, এখন তরোয়ালের খাপ খুলতে হবে।

হারু। তরোয়াল কোথা রে বেটা যে খাপ খুলবি? অন্তরের মধ্যে যা আছে কাঁচিখানি, আমরা তাই নিয়ে যা একটু নাড়া-চাড়া করি।

শ্যামাপদর চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল, যা'তে গত রাত্রে নেশার ঝোঁকে-ও দেদারের অন্তঃকরণে তা'র প্রতি যেমন সেবা-ভক্তির উদ্রেক হয়েছিল; কিন্তু এখন তা'র মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ; নিজের অবস্থা বুঝে লজ্জা-ও তা'র হয়েছে, আর দু'দিন বাড়ী ছাড়া নিরুদ্দেশ হওয়ায় সেখানে সব কি মনে কচ্ছে, এ দুশ্চিন্তাতে-ও সে মনে মনে বিলক্ষণ অস্থির, তথাপি এই চির-অপরিচিত ভদ্র যুবক কেবলমাত্র আত্ম-সম্মান রক্ষার অপরাধে পাছে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এই আশঙ্কায় সে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিল।

জাতি, ধুতি ও পুথির অভিমানে মত্ত হইয়া আমরা যে শ্রেণীর লোককে "ছোটলোক" বলিয়া অন্তর্নিহিত ইতরতার নির্লজ্জ পরিচয় দিই, তা'দের মধ্যে যে দেব-দত্ত মহত্ত্ব কতটা সহজ ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা তখন-ই বুঝিতে পারি, যখন করুণাময়ের কৃপায় ঘোর বিপন্ন অবস্থায় অনন্যসহায় হয়ে তা'দের নিকট হ'তে অযাচিত অপ্রত্যাশিত সহানুভূতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রাণ-তুচ্ছকরী সেবায়, কলঙ্ক-গ্রহণকরী ক্ষমায় ও সঞ্চিত-সমর্পণকারী দানে প্রাপ্ত হই। আমি এ নীতি-শাস্ত্রের বচন রচনা করিতেছি না; ভুগিয়া বুঝিয়াছি, চোখে দেখিয়াছি, অ'ত বিশ্বস্তমুখে শুনিয়াছি, তবে কালী-কলমে লিখিতে সাহসী হইয়াছি। উপন্যাসের 'শ্যামাদাসী,' 'কবির 'পুরাতন ভৃত্য' কল্পনা নয়; আমার এ হাজতের কাহিনীর বীজ-ও সত্যের নর্সারী হইতে সংগৃহীত।

বড় মানুষ বন্ধু ভাড়া করিতে হয় টাকা দিয়া বা টাকা দেখাইয়া; বিবর্ণমুখ নিরীক্ষণ করিলে-ই সুবর্ণ গোলক গা-ঢাকা দেন।

দেদার বলিল, "বাবু, আপনকার মুখের পানে তাকিয়ে কথা বলতে মাথাটা যেন কাটা যাচ্ছে; রেতের ওক্তে এট্টা কুকায তো আগে-ই কোরে ফেলেলাম, তা' বাদে পাওরলাটা খামকা খামকা রাগ চড়িয়ে দিয়ে কেমন বেহুঁস কোরে ফেলালে, কি বেফাঁস সব কইছি ভাল মনে-ই আসতিছে না, একে চাষার ছেলে—তা'তে মুখ্খু মোছলমান গোঁয়ার——"

শ্যামাপদ। রোসো রোসো দেদার বক্স, রাত্রে তোমার অনেক গল্প আমি শুনেছি, ছোট ভাই ব'লে যত্নে গায়ে হাত বুলিয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছ, তা-ও এর মধ্যে ভুলে যাইনি। কিন্তু অজ্ঞানে তুমি তো ছিলে ভাল, এখন জ্ঞান পেয়ে মাৎলামো আরম্ভ কল্লে কেন,——"চাষার ছেলে, মুখ্‌খু মোছলমান"—ও সব কি কথা ?

দেদার। এজ্ঞে, অপমিথ্যেটা আর কি কইছি ? চাষীর ঘরে-ই জন্ম, আর দেখে দেখে শিশির গায়ে নেবেলের মেখাটা যা পোড়ে লিতি পারি।

শ্যামাপদ। আর সে-ই বিদ্যার জোরে মা-বোন-পরিবারকে খেতে পরতে দিয়ে-ও এক-আধ দিন একটু আমোদ করবার অবসর পাও। কিন্তু বছর চৌদ্দ-পোনেরো ক্রমাগত পড়েছি; পড়ার চোটে আর একজামিনের খরচ সাম্‌লাতে বাপকে দেউলে দাঁড় করিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় দিছি; অথচ এমন কিছু শিখিনি, যা'তে সমস্ত দিন এত বড় সহরটায় ঘুরে চারটে পয়সা ট্যাঁকে কত্তে পারি।

ট্যাঁক কথাটা কাণে যাবা মাত্র চকোত্তি ঠাকুরের জিভ জেগে উঠ'লা; ব্রাহ্মণ বল্লেন, "বাবুজী, কথায় বলে 'বিদ্যে সাধ্যি', তোমার বিদ্যে-ই হয়েছে কিন্তু সাধ্যিটা তো কেউ শিক্ষে দেয় নি, সেটা দৈবীশক্তি; তোমার অর্দ্ধেক লেখা-পড়া শিখে যদি আমি ইংরিজীটা ভাল ক'রে কইতে পাত্তেম, তা' হলে কি আর এই ছুটলো পাকিটের কায ক'রে ধরা পড়ি; এই মাথার ভেতর যা সব মৎলব আছে, তা'তে বিলিতী তালিম পেলে মাসে হাজার টাকা রোজগার, চাই কি নিজে-ই একটা ব্যাং খুলে ফেলতেম; ব্যাং কাযটার ওপর আমার বরাবর ঝোক; শাস্তরে আছে 'পরের ধনে পোদ্দারী'।"

ইংরাজী না জানার ফলে এমন একটা জিনিয়স মাটী হয়ে গিয়ে আফশোষ করছে শুনে শ্যামাপদর মুখে একটু হাসি এল; কিন্তু তার মনটা বেশী ক'রে কাছের গোড়ায় এনেছিল দেদার। দেদাররা আজ-ও চাষ ছাড়ে নি, জমী তাদের খেতে দেয়; দেদার চাটনীর কায করে, তার এক চাচাতো ভাই ভাল গামছা বোনে, তা'তে সাল-সাল নগদ যা আসে, তা থেকে জমীর খাজনা দিয়ে-ও দু' দশ ভরি চাঁদি মেয়েদের গায়ে ওঠে, হাতে-ও কিছু থাকে। শ্যামাপদ বলিল, "যদি চাষটা করতে-ও শিখতাম, তাহা হ'লে আজ ভাবনা কি ?"

দেদার বলিল, "বড় মেহন্নতের কায, পারতে না বাবু।"

শ্যামাপদ জামার হাতা গুটাইয়া নিজের দৃঢ় পুষ্ট পেশী দেখাইল।

দেদার। হ্যাংলা নয়, তা বুঝতে পেরেছি বাবু রেতের বেলাই; কিন্তু শুধু গায়ের জোরেই তো হয় না। বাবুদের তাকুত জারী করতে ঐ এসেছে এক ফুটবলের খেলা; চাষের কাযের মেহন্নত জুদো; জল রোদ্দুর সহ্যি করতে হবে; এক বার যদি দেখ আপনি পাটের সিজিনে এসে আমাদের কায তো অবাক্ হয়ে যা'বে; যখন পুকুরে নেমে পাট আছড়াই, তখন সেই জলের রং দেখলেই তোমরা ওঁৎকে উঠে নাকে রুমাল দেবে। চাষটা আমাদের ছোট নোকেরি কায, বাবুদের নয়।

শ্যামাপদ। তার মানে, বাবুরা অকর্ম্মণ্য, কেমন ? কেবল পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খেতে পারে; এই তো ? যদি কখনো আমার ছেলে হয়, আশীর্ব্বাদ করো, যেন তাকে তোমাদের মত 'ছোট লোক' তৈরী ক'রে তুলতে পারি। একশ' জন রোজগেরে বাবু ম'লে পৃথিবীর কি ক্ষতি হয় ? কিন্তু একটা চাষী গেলে দশটা বাবুর মুখের অন্ন কম প'ড়ে যায়। আমরা এর পয়সা-ও নিই, তার পয়সা—সে নেয়, আর চাষী —ধানে কড়াইএ আনাজে পাটে যা ছেল না, তাই মাটীর ভেতর থেকে উৎপন্ন ক'রে দিয়ে অন্নের সংস্থান করে!

দেদার। কথাটা অমন্দ বলছ না বাবু, দুক্ষু পেয়ে তোমার জ্ঞান হয়েছে, তুমি বড় লোকের ছাওয়াল।

শ্যামাপদ। বাবা সত্যই ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু আমাদের পাঁচ জনের জন্যে খরচায় খরচায় তিনি কিছু রেখে যেতে পারেন নি।

দেদার। আপনাকে একটা বাত নিবেদন করি, যদি শোন, তবে ছিরটা কাল তোমার কদমের গোলাম হয়ে থাকব।

শ্যামাপদ। কি কথা, বল না।

দেদার। এ ইংরেজের আদালত বাবু, ইংরেজের মামলা, এখানে হ'ক্ কথা যে কইবে, তারই মুক্‌সিল। আমাকেও ঠেলবে ঐ বাঞ্চশালে; তুমি কবুল কর না যে মেরেছ, কবলালেই জেল—এ আর জরিমানা নয়; বলবে যে, একটা মাতাল মোছলমান ঐ ম্যাম সাহবের ঘাড়ে পড়েছিল, সেই হাঙ্গামা বাধালে, আমার সার্জ্জনরা ভুলে ধ'রে এনেছে; ডাক হ'লেই আমি কবুল দেবো, তুমি স্বচ্ছন্দে খালাস হয়ে বাড়ী চ'লে যাবে।

শ্যামাপদ। আর তুমি জেলে ঢুকে ঘানি টানবে, কেমন?

দেদার। লাঙ্গল-চষা গতর, ঘানি ঘুরুলে তো ক্ষয়ে যাবা না। বড় জোর দু' হপ্তা।

শ্যামাপদ। নাঃ, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, তুমি সত্য-ই ছোট লোক, আর আমি একটা মস্ত ভদ্দর—

দেদার। চোখে জল এনো না বাবু, ওটা আমি দেখতে পারি নি।

চক্কোত্তি তিনকড়ির কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, "বেটা একটা দাঁও মারবার চেষ্টায় আছে। তুই রাজী হ' না কবুল দিতে। তিন মাসের ওপর আর হপ্তা দুই বই ত নয়। বল যে, আমি পনর টাকাতেই রাজি আছি।"

বেলা প্রায় দশটা, এমন সময় সেই ভদ্রলোকের ছেলেটির বোধ হয় নেশা কাটল, ঘুম ভেঙ্গে উঠে ব'সে চারদিক্ পানে চেয়ে যেন সে ভেবড়ে গেল; আপনা আপনি বিড় বিড় ক'রে বললে, "এ কোথায়—আমি এ কোথায়?"

চক্কোত্তি। শ্বশুরবাড়ী হে শ্বশুরবাড়ী।

শ্যামাপদর মুখ পানে চাইতেই ছেলেটি যেন লজ্জায় সরমে একেবারে মুসড়ে গেল। শ্যামাপদ ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে নিলে, ছেলেটি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করলে। মহেশ বললে, "তোমার বুঝি এই প্রথম চালান? এই যে আমারে দেখছ, আমার-ও এ গ্রেহে পদাপ্যাণ প্রেথম ঐ সুত্তুরে। আমি একজন সাহির্ত্তিক বটতলার জগর্ব্বিখ্যাত গ্রেন্থকার শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার বিদ্যেভৈরব। 'মাছে পোকা' 'কলের জলে সাপ' 'গোলাপীর খুন' 'মচ্ছ পুরাণ' এই সব নিখে এক রকম চলত মন্দ নয়; তার পর ক্রমে ইঙ্গিরি পড়া সাহির্ত্তিকরা 'পিসীর প্রেম' 'দিদি না নিধি' 'কুলটার সতীত্ব' গোছ উর্ত্তম উর্ত্তম কেতাব সব নিখে আমাদের কারবার মাটী ক'রে দিলে; মোশাই, আমি একখানা বোয়ে নিতুম্বো নিখিছিনু বোলে পুলিসে ধরে; নিতুম্বো লিখলেই দোষ—থাঁকলে বাহবা বাহবা! শেষ অপঘেন্নায় সাহির্ত্ত ছেড়ে দিয়ে এই শিল্পীকাব্য চক্কোত্তি মশায়ের পায়ের ধুলো পেয়ে শিখে নিইছি। তুমি ভেব না ছোকরা, দু'চার বার এখানে এলেই সব স'য়ে যাবে।"

ছোকরার কিন্তু এখন তো সইছে না; সে কাঁদে আর বলে, "এ কি হোলো—আমায় আর বাড়ী ঢুকতে দেবে না—মদ খেলে তো জরিমানা করে—সে কোথায় কখন্ হবে?"

চক্কোত্তি। খন নয়—খন নয়, আজ স্যানডে—রোববার, আজ-ও এখানে রাত্তির বাস।

ছোকরা। ও বাবাঃ! আমি জন্মের মত গেলুম! জরিমানার টাকাই বা পাব কোথায়?

তিনু। পায়রলা সঙ্গে দেবে, বাড়ী গিয়ে দিও।

সুন্দর টুকটুকে মুখখানি পাঁশের মতন ক'রে ছোকরাটি—দেদারের মুখপানে চেয়ে রইল। দেদার বল্লে, "যা হবার হয়েছে বাবু, আর এমন কাম্যি কোরো না, নাকে কাণে খত দাও। পাঁচটা টাকা আর ক'গণ্ডা পয়সাতে আনিতে হাবলদার সাহেবের কাছে আমার জমা আছে; দু'টাকার যাস্তি আমার ফেইন্ করবে না। ভয় নেই তোমার, দু'টাকা না হয় আপাততঃ আমিই দেবো।"

নিজের হাতখানি দিয়ে শ্যামাপদ দেদারের পিঠটা একবার আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিলে।

শ্যামাপদর অনুরোধে হাওলদার সাহেব ছোকরাটিকে-ও যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ দিলেন। বাকী কয়েদীরা বাইরে থেকে রান্না ক'রে খেয়ে আবার ঘরে ঢুকল। রবিবারের বাজার, বেলা পাঁচটার পর থেকে হাজত-ঘরের চাবি ঘন ঘন খোলা আরম্ভ হ'ল; নূতন নূতন লোকের আমদানী—কেউ নেশার বশে, কেউ পেশার বশে। রাত্তিরের গোলমালের মধ্যে-ও শ্যামাপদর একটু ঘুম হয়েছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডল
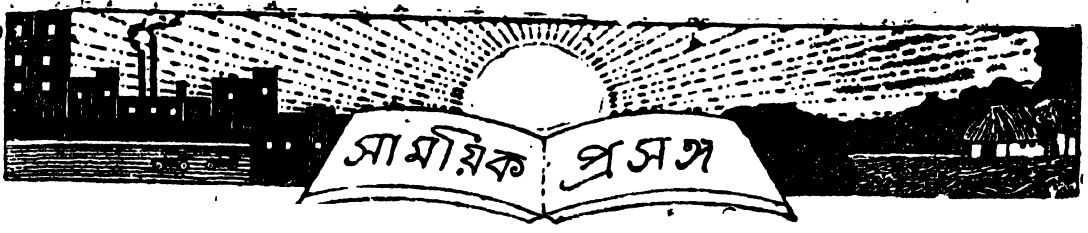
বাঙ্গালা কাউন্সিলে এবারও মন্ত্রিমণ্ডলের বিপক্ষে অনাস্থা প্রদর্শনসূচক মন্তব্য ভোটের জোরে গৃহীত হইয়াছিল এবং উহার ফলে মন্ত্রী নবাব মোসারফ হোসেন ও নশীপুরের রাজা বাহাদুর পদত্যাগ করিয়াছেন। কাউন্সিলে এ খেলা নূতন নহে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা কাউন্সিলে ত নহেই। কাউন্সিলে Walk out খেলাও যেমন প্রহসনে পরিণত হইয়াছে, এই মন্ত্রিনিয়োগ এবং মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শন-ব্যাপারও প্রায় তদ্রূপ প্রহসনে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, বিস্ময়েরও বিশেষ কোন কারণ নাই।

তবে এবারের মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শন-ব্যাপারে একটু বিশেষত্ব আছে। এবার কাউন্সিলে কয়েক জন কাউন্সিলার মন্ত্রীদের—বিশেষতঃ মুসলমান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সকল গুরু অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার শতাংশের একাংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, মণ্টেগু-মাকাল সত্যই স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে! দুই জন মুসলমান কাউন্সিলার এবং এক জন হিন্দু কাউন্সিলার উৎকোচ প্রদান, অযথা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, বেতন দিয়া কাউন্সিলারগণকে বশীকরণ প্রভৃতি অপরাধে বাঙ্গালার মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করিয়াছেন! কোন এক সংবাদপত্রের মালিককে আবকারী লাইসেন্স দেওয়া সম্পর্কে যে দুর্নীতির প্রশ্রয়দায়কতা এবং একদেশদর্শিতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্য হইলে বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পক্ষে কলঙ্কের কথা। লোক বলিতেছে, যদি যথার্থই বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ, কলঙ্কপ্রচারক দুর্নীতিপরায়ণ সংবাদপত্রের লেখার ভয়ে গুরু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়া সেই সংবাদপত্রের লেখককে নানারূপ সাহায্য দান করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ক্রমশঃ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? প্রতীচ্যে এক শ্রেণীর Blackmailer আছে, যাহারা বড় বড় লোকের মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া আপনাদের উদরান্নের সংস্থান করে। ইহাদের কথা সত্য হউক বা না হউক, তথাপি ইহাদের মুখ বন্ধ করিতে পারিলে মিথ্যা আলোচনাও বন্ধ হইতে পারে, এই আশায় বড় বড় লোক ইহাদিগকে নানারূপে অর্থ বা চাকুরী দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া লেখককে ইঁহারা Party Politics খাড়া করিয়া রাখিবার জন্য গোপনে সাহায্য দান করিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ভাড়াটিয়া লেখক যাহার দ্বারা কুক্কুরের মত ব্যবহৃত হইয়াছে, কেবল পয়সার লোভে তাহারই পদলেহন করিয়া বিনামার অন্তরালে নিরীহ নির্দ্দোষ লোকের মিথ্যা কুৎসা প্রচার করে; পরন্তু যিনি তাহাদের উপকার করিয়াছেন, বা তাহাদিগকে অন্নদানে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহাকেই সর্পের মত দংশন করে। বড় বড় লোক এই শ্রেণীর লোককে প্রতিপক্ষের স্বার্থহানি করিবার উদ্দেশ্যে দুধ-কলা দিয়া পুষিয়া থাকেন!

আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে কিছু দিন হইতে এই শ্রেণীর ভাড়াটিয়া লেখক ও সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। যদি আমাদের দেশেরও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ইহাদিগকে দুধকলা দিয়া পুষিতে থাকেন, তাহা হইলে কত পরিতাপের বিষয় হয়!

অবশ্য এ সকল কাউন্সিলের অভিযোগ মাত্র, ইহার মূলে সত্য আছে কি না, আদালতের বিচার ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কাউন্সিলে যখন এ ভাবের অভিযোগ উঠিয়াছে, তখন এ ভাবের মন্ত্রিমণ্ডল না থাকাই ভাল। আমরা ত বলি, ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন হইলে আরও ভাল। এই সকল অনর্থের মূল দ্বৈতশাসন উঠিয়া গেলে দেশ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। হয় সত্যই স্বায়ত্ত-শাসন বহাল হউক, না হয় নিছক 'বাপ-মা শাসন' পুনঃ প্রবর্ত্তিত হউক, তথাপি এই দুই নৌকায় পা কিছুই না!

বলশেভিক বিভীষিকা

ভোটের জোরে বলশেভিক-বিতাড়ন বিল সিলেক্ট কমিটীতে পেশ হইয়াছে। হয় ত বিল পরে গৃহীত ও বিধিবদ্ধও হইয়া

যাইবে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। জুজুর ভয় না থাকিলেও যাঁহারা জুজুর ভয় আছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের নিকট কোনও যুক্তিতর্কই খাটে না। এ দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা, যে কারণে ট্রেড্‌স্ ডিস্‌পিউট্‌স্ বিলের অবতারণা, সেই কারণেই পাবলিক সেফটি বিল বা বলশেভিক-বিতাড়ন বিলের অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রমিক-চাঞ্চল্য ও আন্দোলন এবং শ্রমিক-ধর্ম্মঘট ইহার মূল বলিয়া অনেকে মনে করে।

বাহিরের লোক অর্থাৎ বিলাতী বা অন্য বিদেশী কম্যুনিষ্ট এ দেশে আসিয়া এ দেশের শ্রমিককে ক্ষেপাইতেছে এবং কম্যুনিষ্ট অর্থ শ্রমিক আন্দোলনের পশ্চাতে রহিয়াছে, এ ধারণা সরকার পক্ষের বদ্ধমূল। এমন কি, এ দেশেরও কোন কোন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এই মতে সায় দিয়া থাকেন। আপাততঃ তাহাদের বিপক্ষেই আইন প্রস্তুত হইতেছে। পরে এই অস্ত্র যে ভিন্নাকারে গঠিত হইয়া এ দেশীয়ের বিপক্ষে প্রযুক্ত হইবে না, তাহারই বা স্থিরতা কি?

আমরা এ যাবৎ ব'লয়া আসিতেছি যে, সকল নীতি অপেক্ষা পেট-নীতিই বড়। পেট কাঁদে বলিয়া এ দেশে শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিক-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অসন্তোষের জমী না থাকিলে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয় না। সোসালিজম্, নিহিলিজম্, বলশেভিজম্,—কোন ইজমই এ দেশের দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষক বুঝে না। সেই হেতু শত কম্যুনিষ্ট বাহির হইতে এ দেশে আসিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেও তাহারা উত্তেজিত হয় না। তাহাদের অসন্তোষের, অভাব-অভিযোগের কারণ আছে বলিয়াই তাহারা উত্তেজিত হয়। অবশ্য এ দেশে হয় ত দুই চারি জন লোক কম্যুনিষ্ট মন্ত্রে প্রভাবিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এ দেশের জনসাধারণ সাধারণতঃ অদৃষ্টবাদী এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। সুতরাং তাহারা সহজে কম্যুনিষ্টপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। দুই চারি জন শ্রমিক বা কৃষক অন্যায় আবদার যে করে না, এমন কথা বলিতেছি না। দুই চারি জন শ্রমিকের অবস্থা যে এ দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক লোকের অপেক্ষা ভাল, এ কথাও অস্বীকার করি না। অথচ তাহারা যে কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব বাহানা লইয়া থাকে, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণতঃ এ দেশের শ্রমিকের অবস্থা মন্দ, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহারা যে অবস্থায় বাস করে, সে অবস্থার উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য, ইহা কি সরকার পক্ষ স্বীকার করেন না?

সুতরাং ধর্ম্মঘট হইলেই যে, তাহার মূলে বলশেভিষ্ট বা কম্যুনিষ্টের গন্ধ থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এই যে বোম্বাইএ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গেল, ইহার মূলেও স্বার্থান্বেষীরা বলশেভিক প্ররোচনা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন! অবশ্য কেহ কেহ উহার মূলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি অসার।

দাঙ্গা প্রথমে কি সূত্রে আরম্ভ হয়, তাহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করিবার জন্য বিস্তর আবেদন-নিবেদন হইয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। জনসাধারণ যতটুকু জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, কলের ধর্ম্মঘটের সময়ে পাঠানগণকে শ্রমিকের কায দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া উভয় পক্ষে মনোমালিন্য হয় এবং তাহার পরে পাঠানরা ছেলে ধরিতেছে, এইরূপ জনরব রটে। ইহা হইতে দাঙ্গার সূত্রপাত। সুতরাং ইহার সহিত সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষের সম্পর্ক কি আছে, বুঝিয়া উঠা যায় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বাবুলা ট্যাঙ্ক রোড পল্লীর হিন্দু অধিবাসীরা পুলিস কমিশনারকে লিখিয়া পাঠাইত না যে, দাঙ্গার সময় তাঁহাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা যথার্থ প্রতিবেশীর মত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। পরন্তু একটি মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক দাঙ্গা থামাইতে গিয়া পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিতেন না। জাতির মুক্তির ইতিহাসে এই মহানুভব মুসলমান যুবকের নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া থাকিবার যোগ্য।

দাঙ্গার মূল কম্যুনিষ্ট-প্ররোচনা, ইহাও সত্য নহে। আমাদের সহকারী ভারত-সচিব (ছোট বিধাতাপুরুষ) আর্ল উইণ্টার্টন পার্লামেণ্টে মুক্তকণ্ঠে পাঠানদের ওকালতী করিয়া বলিয়াছেন, পাঠানরা আইন-ভীরু, তাহারা সাধারণতঃ সরকারকে বেগ দেয় না। যেন শ্রমিকরাই যথার্থ অপরাধী! অথচ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের বোম্বাই সরকারের শাসন-রিপোর্টে বোম্বাইএর পুলিস কমিশনার এই পাঠানদের 'শান্তি ও আইন-প্রিয়তার' কি-সুন্দর পরিচয়ই না প্রদান করিয়াছেন! সম্ভবতঃ শ্রমিকরা কম্যুনিষ্টপ্রভাবে প্রভাবান্বিত, এই ধারণা সরকার পক্ষের বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়াই আর্ল উইণ্টার্টনের এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। অন্যথা বিনা নিরপেক্ষ

উদ্দেশ্যে তিনি বিবদমান পক্ষের এক পক্ষকে এমন সার্টিফিকেট দিবেন কেন?

এ বিষয়ে আমরা সরকারকে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি। যদি যথার্থই কম্যুনিষ্ট-প্রভাবে এ দেশের শ্রমিকরা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য আইনের বাঁধন-কষণ হউক, ক্ষতি নাই! কিন্তু বিনা বিচারে তাহাদিগকে অপরাধী করিলে ন্যায়ের অমর্য্যাদা হইবে।

আফগান-সংবাদ

আফগানিস্থানের প্রকৃত অবস্থা কি, জানিবার উপায় নাই। কখনও সংবাদ আসিল, কাবুলের বাচ্ছাই সেকো বা হবিবুল্লা ভাল লোক, সে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে স্বার্থান্ধ লোক নহে, রাজা আমানুল্লার উপর মোল্লা-মৌলভীরা অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল বলিয়া সে রাজা আমানুল্লার বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিয়াছিল, অন্যথা সিংহাসনে তাহার লোভ নাই, সে ইসলামের বিরোধী আমানুল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আফগান প্রজার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যই করিয়াছে। আলি আমেদ জান তাহার বিপক্ষতাচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহারই অধীনস্থ লোক তাহাকে অস্বীকার করায় সে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাবুল রাজ্যের প্রজা তাহাকেই চাহে, অতএব সে কাবুল শাসন করিবে।

আমীর আমানুল্লা ও রাজ্ঞী সৌরিয়া

আমীর আমানুল্লার সৈন্যদল

অন্য দিকে শুনা গেল, বাচ্ছাই সেকো ক্রমশঃ লোকের শ্রদ্ধা হারাইতেছে, সে ও তাহার সেনাপতি নানা অনাচার করিতেছে, ক্রমশঃ আফগানরা রাজা আমানুল্লার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্রতা ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

সপরিবারে ভূতপূর্ব্ব আমীর এনায়েতুল্লা

রাজা আমানুল্লা কাবুলের বিপক্ষে রণযাত্রা করিয়াছেন, কাবুল হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যের সহিত বাচ্চার সেনার সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং সেই সংঘর্ষের ফলে বাচ্চা পরাজিত হইয়াছে। পরে এ সংবাদ মিথ্যা বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সংঘর্ষ হইয়াছিল ঘিলজাই উপজাতির সহিত বাচ্চার সৈন্যের। ঘিলজাইরা কাবুল ও কান্দাহারের মাঝামাঝি ভূখণ্ডে বাস করে। তাহারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া কাবুলের সৈন্যকেও কান্দাহারের দিকে যাইতে দিতেছে না, আর কান্দাহারের সৈন্যকেও কাবুলের পথে আটক করিতেছে। তবে এখন শুনা যাইতেছে, তাহারা নাকি কান্দাহারে রাজা আমানুল্লার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এক ডেপুটেশান প্রেরণ করিয়াছে।

যাহা হউক, রাজা আমানুল্লা হিরাট যাত্রা করেন নাই। তবে তাঁহার পরিবারবর্গ হিরাটে স্থানান্তরিত হইয়াছেন

রাজা আমানুল্লাও সসৈন্যে কাবুল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত বটে। তিনি কান্দাহারেই অবস্থান করিতেছেন এবং আফগান হইতেছেন। একবার রটিল, কান্দাহারীরা প্রথমে রাজা আমানুল্লার প্রতি যেমন আনুরক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, পরে যেন কেমন সে বিষয়ে অনাস্থাই প্রদর্শন করিতেছে, আর সেই হেতু রাজা আমানুল্লা হিরাটে চলিয়া যাইতেছেন এবং সেখান হইতে রুসিয়ার বলসেভিকদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে উদ্যোগী হইতেছেন। অবশ্য পরে এ সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন আর একটা সংবাদও মিথ্যা বলিয়া জানা গিয়াছে—রটিয়াছিল,

কাবুলে বিধ্বস্ত বৃটিশ দূতাবাস

জাতি তাঁহাকে চাহে কি না, জানিবার চেষ্টা করিতেছেন। আফগানদের মধ্যে কে কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। আলি আহ্‌মদ জান রাজা আমানুল্লার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। এক সময়ে তিনি কাবুলের শাসনকর্ত্তাও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে রাজা আমানুল্লা তাঁহাকে জালালাবাদের গোলযোগের সময় তথাকার দুর্গের সর্দ্দার ও শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। তিনি প্রথমটা যে ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি রাজা আমানুল্লার হইয়াই বিদ্রোহীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু পরে তিনি স্বয়ং 'আমীর' উপাধি ধারণ করিয়া পেশোয়ারের কাবুলের প্রতিনিধিদের নিকট অর্থ ও বশ্যতা দাবী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন আবার শুনা যাইতেছে, তিনি পদচ্যুত ও পলাতক অবস্থায় পেশোয়ারে ফিরিয়া বলিতেছেন, তিনি রাজা আমানুল্লার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত সেনাপতি, শীঘ্রই তিনি কান্দাহারে গিয়া তাঁহার পক্ষে থাকিয়া শত্রুর বিপক্ষে রণযাত্রা করিবেন। এ হেন চরিত্রের মর্ম্ম বুঝা কঠিন নহে কি?

জেনারল নাদির খাঁ যখন সদলে য়ুরোপ হইতে প্রাচ্যে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন কত কথাই না উঠিয়াছিল! কোন্ পক্ষে তিনি যোগদান করিবেন, বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অস্ত্রধারণ করিবেন, তাহা তখন কেহই জানিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি বোম্বাইএ পদার্পণ করার পর হইতে বোম্বাইএ, দিল্লীতে এবং পেশোয়ারে তিনি বা তাঁহার ভ্রাতারা যাহা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি বা তাঁহার ভ্রাতারা নিজ স্বার্থসাধনের জন্য আফগানিস্থানে যাইতেছেন না, এ কথা নিশ্চিত; তবে তাঁহারা কাবুল কি কান্দাহার—কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় নাই। একবার শুনা গেল, তিনি না কি বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তিনি রাজা আমানুল্লাকে সিংহাসনে বসাইতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার মন তিনি শান্তি ও তৃপ্তি প্রাপ্ত হইবেন না। কিন্তু পরে পেশোয়ারে তিনি বা তাঁহার পক্ষীয়রা যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা বিনা রক্তপাতে কাবুলে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইবেন, আফগান প্রজারা যাহাকে চাহে, তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কথাটাও কুহেলিকাময় বলিয়া মনে হয়।

জেনারল নাদির খাঁ

যাহা হউক, যাহা ঘটিবার, তাহা আর কিছুদিনের মধ্যেই ঘটিবে। তখন সকল সংশয়ই দূর হইবে। তবে এই উপলক্ষে রাজা আমানুল্লার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের জানিয়া রাখা উচিত।

রাজা আমানুল্লা কোন সাংবাদিককে বলিয়াছেন,—"যখন আমার বিপক্ষে কোথাও কোথাও প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তখন আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আমার প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি অহর্নিশি চিন্তা করি, সেই প্রজা কি আমাকে চাহে না? আমি ইহা বিশেষরূপে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম এবং যাহাতে বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহ উপশমিত হয়, তাহার জন্য উপদেশ দিলাম।" সকলেই জানেন, ইহাই আমানুল্লার পতনের মূল কারণ। নতুবা তিনি যদি প্রথমাবধি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত।

সেই সময়ে এক মোল্লা তাঁহাকে বিনা রক্তপাতে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বলেন। তিনি কাবুলে মহামান্য, রাজা আমানুল্লাও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। রাজা আমানুল্লা তাঁহার কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া বিষম ভুল করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পরে বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন,—তিনি যদি তখন ঘুণাক্ষরে জানিতেন যে, এক দস্যুসর্দ্দার কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিবে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া কান্দাহারে চলিয়া আসিতেন না! মার্কিণ পত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছে যে, "ছাগচর্ম্মপরিহিত অসভ্য আফগানদের সঙ্গে চালাকি করিতে গিয়া (সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া) আমানুল্লার প্রাণসংশয় হইয়াছিল, তাই তিনি কান্দাহারে প্রাণভয়ে পলাইয়াছিলেন।" সত্যবাদী সংবাদ-প্রচারকদের এ

সংবাদটা কতদূর সত্য, তাহা রাজা আমানুল্লার কথাতেই প্রকাশ।

আমানুল্লা বলেন,—প্রজা আমাকে চাহে না, এই ভাবিয়াই আমি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলাম, মোল্লার মিথ্যা কথায় ভুলিয়া আমি কাবুল হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

ইহা হইতেই কি বুঝা যায় না, রাজা আমানুল্লা কিরূপ দেশ-প্রেমিক, কিরূপ প্রজাবৎসল ? রাজাদের ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়া থাকে ; রাজা আমানুল্লার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, ইহা নিশ্চিত স্বীকার্য্য যে, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য এবং প্রজার হিতার্থে ত্যাগস্বীকার প্রতীচ্যের সভ্যতাভিমানী অনেক রাজার অনুকরণীয় !

সংবাদপত্র-সেবা

য়ুরোপে সংবাদপত্রকে 'চতুর্থ ষ্টেট' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। এ কথা দ্বারা অনুসূচিত করা হয় যে, কোন রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের মতামত উপেক্ষণীয় ত নহেই, বরং মূল্যবান্। বস্তুতঃ শাসক ও শাসিতের মধ্যে মধ্যস্থ সংবাদপত্র। সংবাদপত্র উভয়কে উভয়ের মনোভাব জ্ঞাত করাইতে সমর্থ। এই হেতু সভ্য জগতে সংবাদপত্রের এত সম্মান। সংবাদপত্র-লেখকের তথায় রাজা মহারাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অবাধ গতি, সর্ব্বত্র সম্মান ও মর্য্যাদা।

সুসভ্য ইংরাজ ভারতের শাসক, সুতরাং আশা করা যায়, এ দেশেও সংবাদপত্রের স্থান উচ্চে এবং সংবাদপত্র-সেবীর মর্য্যাদা ও মান সর্ব্বত্র। কথাটা যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। যথার্থই এ দেশেও সংবাদপত্র-সেবীর যত্র-তত্র অবাধ গতি, যত্র-তত্র সম্মান। কিন্তু তাহা বলিয়া সংবাদপত্র পরিচালনা করার পথ এ দেশে কুসুমাস্তৃত নহে। এ পথে সর্ব্বদাই আশঙ্কা,—শিরোপরি ধৃত বিধিবজ্র কখন্ নিক্ষিপ্ত হয়। অন্যান্য সভ্য দেশে সংবাদপত্র-পরিচালনসম্পর্কে যতটা স্বাধীনতা ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, এ দেশে তাহা হয় নাই, বরং সে বিষয়ে আইনের বাঁধন-কষণ কঠিন হইতে কঠিনতর করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কারণ এই মাত্র যে, এ দেশে শাসক ও শাসিত একই জাতি নহে, উভয়ের মধ্যে বর্ণ-ধর্ম্ম ও প্রকৃতিগত আকাশ-পাতাল প্রভেদ এবং সেই জন্য উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস ও পূর্ণ সহানুভূতির নিতান্ত অভাব আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদে বৈদেশিক সচিব সার ডেনিস ব্রে আভাস দিয়াছিলেন, যদি কোনও সংবাদপত্র এমন কোন সংবাদ বা প্রবন্ধ প্রকাশ করে, যাহাতে বুঝা যাইবে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজা আমানুল্লার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আফগান বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য বা উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাহা হইলে সেই পত্র দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অর্থাৎ রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইবে। তবেই বুঝিয়া দেখুন, ১২৪ (ক) ধারার বিরাট উদরে কত কি অভাবনীয় অচিন্তনীয় অপরাধেরই না স্থান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ! চীন দেশে যখন গৃহযুদ্ধ হইতেছিল, তখন এমনভাবের অনেক সংবাদই এ দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, চীনের ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমরাভিযান করিতেছেন, অথবা তাহার চেষ্টা করিতেছেন। সে সময়ে সে সকল রচনা অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আজ আফগানিস্থানের গৃহযুদ্ধের সম্পর্কে এই ভাবের সংবাদ অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে কেন ?

তবে কি আফগানিস্থান প্রতিবেশী রাজ্য এবং আফগান প্রজা বৃটিশ-ভারতের মুসলমান প্রজার মত মুসলমান বলিয়া এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল ? নতুবা উভয় দেশের অবস্থার মধ্যে প্রভেদ ত কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। উভয় দেশই বিদেশ, উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সহিত ভারতের কোনও সম্পর্ক নাই। চীনের ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টও যেরূপ ভারতবাসীর প্রিয়, রাজা আমানুল্লার গভর্ণমেণ্টও তেমনই ভারতবাসীর প্রিয়। যদি বিদেশী কাগজে প্রকাশ পায় যে, রাজা আমানুল্লার বিপক্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহ বা সাহায্য দিতেছেন, তাহা হইলে সে সংবাদ এ দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেই রাজদ্রোহ হইবে কেন ? চীনের ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সমরাভিযানের উদ্যোগের কথা যখন অপরাধজনক হয় নাই, তখন এইটাই বা হইবে কেন, রাজা আমানুল্লাই কি আর চীনের ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টই কি,—উভয়েই ত ভারতের আপনার নহে। তবে ?

সুতরাং মনে হয়, ভারত সরকারের কোন কোন কর্ম্মচারী সুবিধা বুঝিয়া রাজদ্রোহ আইনের কথনও কথনও অপর[illegible]

আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যাখ্যা অনুসারে আইনটিকে ব্যাপকভাবে নানা দিকে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করেন। সম্প্রতি বৈদেশিক ব্যাপারমাত্রেই রাজদ্রোহ আইনটিকে এইভাবে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এ দেশের সংবাদপত্র-সেবীর বিপদ ত এইখানেই। তিনি জানিতে বা বুঝিতে পারেন না, কোন্ রচনাটা আইনের কবলে আসিবে—কোন্‌টাই বা আসিবে না। যখন বৃটিশ আইন ব্যাখ্যাকারী Disaffection অর্থে want of affection বুঝিতে পারেন, তখন এ দেশের সংবাদপত্র-সেবকের বিপদশূন্যতা কোথায়?

'ফরওয়ার্ড' মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের রায় দেখিয়া এই আশঙ্কা ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। অধ্যাপক ডিসি তাঁহার "The Law of the Constitution" নামধেয় আইন-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"The legal definition of sedition libel may easily be so used as to check a good deal of what is ordinarily considered allowable discussion and would, if rigidly enforced, be inconsistent with a revailing form of political agitation." 'ফরওয়ার্ড' মামলার রায়ে রাজদ্রোহ আইন কিরূপ 'rigidly enforce' করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট বলিতে গভর্ণমেণ্টের নানা বিভাগের কর্ম্মচারীকে—এমন কি, পুলিসের সামান্য কনষ্টেবলকে পর্য্যন্ত বুঝায়, এই নূতন ব্যাখ্যাও উহাতে পাওয়া গিয়াছে। এই হেতু সংবাদপত্রসেবিসঙ্ঘ তাঁহাদের সভায় এই আইনের ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ করিতে ও জুরি দ্বারা এই ভাবের মামলার বিচার করাইবার ব্যবস্থা করিতে অভিমত প্রকাশ করিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর সরকার যখন 'ফরওয়ার্ড' মামলার আসামীর দণ্ডবৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন প্রধান বিচারপতি ও জজ সার চারুচন্দ্র ঘোষ আসামীর দণ্ডবৃদ্ধি করিয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন,—প্রথম দণ্ড হইয়াছিল, ৩ মাস বিনা শ্রমে কারাদণ্ড। এমন অসাধারণ রায় বহুকাল ভারতের কোন হাইকোর্ট হইতে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। সাধারণতঃ হাইকোর্ট আপীলে দণ্ডবৃদ্ধি করেন না। বিশেষতঃ রাজনীতি-ঘটিত মামলায় কোন হাইকোর্ট ৩ মাস স্থলে তাহার দ্বিগুণ কাল কারাদণ্ডের এবং বিনা শ্রম স্থলে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

রায়ের এক স্থলে প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন,—"There is a distinct element of rascality about the offence." মামলা উঠিয়াছিল একখানি প্রকাশিত পত্রসম্পর্কে। সকলেই জানেন, একখানা দৈনিক পত্রের সম্পাদক পত্রের সাধারণ policy নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভের কতকাংশ রচনা করেন। অবশিষ্ট অংশ তাঁহার সহকর্ম্মীরা এবং রিপোর্টার ও পত্র-প্রেরকরা পূর্ণ করিয়া দেন। এ বিষয়ে এ দেশের প্রায় নিরক্ষর মুদ্রাকরের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। না থাকিলেও তাঁহার আইনতঃ দায়িত্ব আছে। সম্পাদকের দায়িত্ব অনেক অধিক, এ কথা সত্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পত্র-প্রেরকের অপরাধে সম্পাদকের rascality বা বদমায়েসী কোথা হইতে আসিল, তাহা ত সহজবুদ্ধিতে বুঝা যায় না। হইতে পারে, তিনি পত্রখানি ভাল করিয়া না পড়িয়া অথবা অপরের উপর সেই ভার দিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এমন অনেক ক্ষেত্রে অনেক সম্পাদকই করিয়া থাকেন। কেন না, একাকী সম্পাদকের পক্ষে একখানা বৃহৎ দৈনিক পত্রের সমস্ত অংশ আমূল দেখিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে তাঁহার সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য তিনি আইনতঃ দায়ী বটে। কিন্তু সে জন্য তিনি 'বদমায়েস' আখ্যা লাভ করেন কোন্ হিসাবে, তাহা ত বুঝা যায় না।

তাহার পর আর একটা কথা আছে। পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, বিচারকালে তাহা হয় ত প্রমাণিত হয় নাই, হয় ত সাক্ষীর কথায় বিচারকের বিশ্বাস হয় নাই। মামলায় এমন ত হইয়াই থাকে। কিন্তু সে জন্য রায়ে মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির "It is a case of bad character and a deliberate piece of rascality on the part of the accuesd persons" বলা শোভন হইয়াছে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। Accused persons বলিতে এখানে সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে বুঝাইতেছে। উহারা উভয়েই 'দুষ্টচরিত্র ও বদমায়েস' বিবেচনা করিয়া উহাদিগকে শিক্ষা দিবার মত সাজা (Deterrent) নিশ্চিতই দেওয়া হইয়াছে। যদি মুদ্রাকরের কথা ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার আইনের মারপেঁচের (technically) দায়িত্ব থাকিলেও

অন্ত কোন দায়িত্ব কিছুই ছিল না। কেন না, এ দেশের মুদ্রাকর সম্পাদকের হুকুমমত রচনা মুদ্রিত করে, তাহাতে সাপ ব্যাঙ কি আছে দেখে না, বা দেখিবার মত তাহার বিদ্যা-সামর্থ্য থাকে না। এ কথা সকলেই জানে। তবে যখন সে চাকুরী গ্রহণ করে, তখন জানিয়া শুনিয়াই করে যে, এ চাকুরীতে লেখার জন্য জেল যাইবার ভয় আছে। এইটুকু মাত্রই তাহার দায়িত্ব। সুতরাং যে প্রবন্ধের জন্য তাহার কারাদণ্ড বর্দ্ধিত হইল, তাহা 'দুষ্টচরিত্র ও বদমায়েসী'প্রসূত কি না, তাহাই জানিবার তাহার সুযোগ ছিল না, অতএব সে নিজে কিরূপে 'মন্দচরিত্র বা বদমায়েস' হইতে পারে? তবে কি হেতু তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য সাজা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল? সম্পাদকও 'অপরাধজনক' রচনাটি নিজে রচনা করেন নাই, উহা প্রেরিত পত্র মাত্র; সুতরাং উহা প্রকাশের জন্য তাঁহার আইনের ভুল হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি কিরূপে উহার জন্য 'মন্দচরিত্র ও বদমায়েস' আখ্যায় বিভূষিত হইতে পারেন? এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া বিচারক তাঁহাকে শিক্ষা দিবার অনুযায়ী সাজা (Deterrent) দিতে পারেন, তাহা ত সহজবুদ্ধির অগম্য।

Deterrent punishment কখন্ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা পাটনা হাইকোর্টের জজ সার জন্ বাক্‌নিল একটি মামলার রায়ে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"Deterrent punishments are not regarded only as of utility......in what are luckily as a rule exceptional circumstances. When waves of imitative crime, such, for example, (and I speak from personal experience) as garroting, gang-robbery or dacoity as it is called here, and forgery of counterfeit coin or notes commence to sweep over a State, judicious and increasing severity may properly be utilised to Check and Deter an innnndation. Again in times of public tumult when there is a danger of a wide breach of the public peace or security, or where a highly organised or what one may call semi-proffesional association of persons engineer series of offences such as swindling or burglary, deterrent punishments may be with caution advantageously inflicted."

এই মামলার আসামীদ্বয়ের বিপক্ষে উপরে নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছিল কি? তবে? শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাজার তবে কি জন্য প্রয়োজন হইল? এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, রাজদ্রোহ আইনের ব্যাখ্যা ও বিচার সম্বন্ধে একটা বোধগম্য, বাঁধাধরা পথ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য জনসাধারণের বিশেষরূপ আন্দোলন করা কর্ত্তব্য।

—

বাল্য-বিবাহ

বিলাতের লর্ড-সভায় বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যাহাতে বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর হইতে ১৬ বৎসরে উন্নীত হয়, তাহারই চেষ্টা হইতেছে। যে দেশে নর-নারী গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নর-নারীর অপেক্ষা অনেক অধিক বয়সে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হয়, যে দেশে নারী আন্দোলনের ইতিহাস সফ্রেজিষ্ট কীর্ত্তিকলাপে পূর্ণ, যে দেশে ইচ্ছা-বিবাহ, সাময়িক বিবাহ, প্রজনন-রোধ, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ভোগ প্রভৃতি ব্যাপার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইতেছে,—সে দেশেই বিবাহের বয়স ১৪ হইতে ১৬ বৎসরে উঠাইয়া তুলিতে আইনের সাহায্য গ্রহণের কথা চলিতেছে; আইন করা উচিত কি না, এখনও তাহা সাব্যস্ত হয় নাই, অথচ আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমাজ-সংস্কারক রাজনীতিকরা বাল্য-বিবাহনিষেধক আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অতিমাত্র উতলা হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে?

হরবিলাস সর্দ্দার আইনের পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করিবার প্রস্তাব ব্যবস্থাপরিষদে ২৯শে জানুয়ারী তারিখে পেশ হইয়াছিল, উহা অল্প দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বহু সদস্য "কি ঘৃণা! কি লজ্জা!" রবে সভাস্থল প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা সমাজ-সংস্কারক না সমাজ-সংহারক?

নিতান্ত বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী এ দেশে অতি অল্প ব্যতীত কেহই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ পূর্ব্বের মত একান্নবর্ত্তী পরিবারে বালিকা বধূকে পরিবারের 'কন্যার' মত গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তির অভাবে এখন অনেকেই বাল্যবিবাহের পক্ষপাতিতা পরিহার করিতেছেন। সমাজ আপনিই ক্রমে বাল্য-বিবাহ পরিহার করিতেছে। বিহার

প্রভৃতি প্রদেশে এখনও কোথাও কোথাও বালিকা বধূর বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে "হাঁ, ও তো থোড়া থোড়া চল্‌তে হ্যায়" রূপ জবাব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখনকার কালে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ১২।১৪ বৎসরের কমে বালিকার বিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। বরং আজকাল অনেক ক্ষেত্রে ১৫।১৬ অথবা ১৭।১৮ বৎসরে বালিকার বিবাহ হইতে দেখা যাইতেছে। নানা কারণে এরূপ ঘটিতেছে। উহার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মোটের উপর এইটুকু সত্য যে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বালিকা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হইলেও সমাজে ক্রমশঃ বয়ঃসন্ধি-প্রাপ্তির পরেও বিবাহ 'চল' হইয়া যাইতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবে আইনের জন্য এত হাহুতাশ কেন? পাছে প্রতীচ্যের লোক আমাদিগকে অসভ্য বলে, পাছে আমরা তাহাদের হিসাবে স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য হই নাই বলিয়া বিবেচিত হই, এই জন্যই কি "কি লজ্জা! কি ঘৃণা!" (shame! shame!) ধ্বনি উত্থিত হয়?

কথা উঠিয়াছে, বাল্য-বিবাহের সন্তান দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়। এ ধারণা এখন মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। জার্ম্মাণীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হার উইজম্যান বলেন,—"জীবদেহের অন্যান্য স্থানের জৈব কোষগুলি পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবার বহু পূর্ব্বে উহার প্রজনন-সম্পর্কিত কোষসমূহই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।" তবে?

ইংলণ্ডের যৌন-বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হেনরী হ্যাভলক ইলিস তাঁহার Studies in the Psychology of Sex গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "নারীর যৌবনাগমনলক্ষণ প্রকটিত হইলেই তাহার প্রজননশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় দেখা যায়, নারীর যৌবনাগমলক্ষণ প্রকাশিত হইলে নারী মাতৃত্বপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।" এই উক্তি আজিও কোনও বৈজ্ঞানিক খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সুতরাং মাতৃত্বপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করিলে নারীকে যথাকালে পাত্রস্থ করাই কি সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার পক্ষে মঙ্গলকর নহে?

প্রতীচ্যে নারী অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহিত হয়, তথাপি সেখানে বহু স্থানে ১৪ বৎসর অথবা তন্নিম্ন বয়সে নারীর বিবাহিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে বালিকা ১৩ বৎসর বয়সে সন্তান-জননী হইয়াছে, ইহারও দৃষ্টান্ত আছে। তবে অবশ্য আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে, এমন দৃষ্টান্ত অধিক। সাধারণতঃ প্রতীচ্যে নারীর অধিক বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে। ২০।২১ হইতে ২৬।২৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্তই অধিক সংখ্যায় নারী বিবাহিত হয়। কিন্তু অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার ফলে প্রতীচ্যের পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে, প্রতীচ্যের কোন কোন চিন্তাশীল লোকের ইহাই অভিমত। শ্রীমতী এলেন কী প্রতীচ্যের বিদুষী চিন্তাশীলা লেখিকা। তিনি তাঁহার "Love and Marriage" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"It is evident to every thoughtful person that a real sexual morality is impossible without early marriage; for, simply to refer the young to abstinence as the true solution of the problem is, as we have already maintained, a crime against the young and against the race, a crime which makes the primitiv force of nature, the fire of life, into a destructive element."

ইহার ভাবার্থ:—"প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যবিবাহ ব্যতীত যৌন ব্যাপার-সম্পর্কিত ধর্ম্মনীতি রক্ষা করা অসম্ভব। কারণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা সংযমই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান, তরুণ-তরুণীদিগকে এ কথা বলা তরুণের ও জাতির বিপক্ষে ঘোর অপরাধ। সেই অপরাধের ফল প্রকৃতির আদি শক্তিকে, জীবনী শক্তিকে ধ্বংসকর শক্তিতে পরিণত করে।"

যৌবনের ক্ষুধা—বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তির পর আসঙ্গলিপ্সার তৃপ্তিসাধন করিতেই বাল্যবিবাহের প্রয়োজন। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে যখন প্রণয়িগণ ফরাসীদেশের অথবা গ্যালিপোলির রণক্ষেত্রে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন ইংলণ্ডে বিরহিণী প্রণয়িনীগণের এই যৌবনের ক্ষুধা বা বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তির পর আসঙ্গলিপ্সার তৃপ্তিসাধনের ফলেই অসংখ্য War babiesএর সৃষ্টি হইয়াছিল, অসংখ্য হাঁসপাতাল foundlingএ ভরিয়া গিয়াছিল। এই হেতু শ্রীমতী এলেন কী লিখিয়াছেন,—"Never do greater possibilities exist for the happiness both of the individuals and of the race than in a love which begins so early that the two can grow together in a common development."

যাহারা সখ করিয়া সমাজের ও জাতির এই পারিবারিক সুখটুকু পরের অনুকরণপ্রিয়তার ফলে ভাঙ্গিতে চাহিতেছে, তাহারা সমাজের বন্ধু না শত্রু?

ছাত্র ও রাজনীতি

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশানে ভাইসচ্যান্সেলার ডাক্তার আর্কার্ট বলিয়াছিলেন,—"To my mind the relation between academic authorities and the student is of the nature of a solemn contract in which the teacher promises to respect the rights and privileges and personality of the student, and on the other hand the guardian promises to support the authority of the teacher."

কথাটা ঠিক। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র কোমলমতি শিশু নহে, তাহার নিজের বিবেকবুদ্ধি আছে, সে নাগরিকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ। আজ না হউক, অচির-ভবিষ্যতে যে গৃহের কর্ত্তা হইবে, সংসারের ভার গ্রহণ করিবে, দেশের ও সমাজের দশ জনের এক জন হইয়া সমাজের মঙ্গল চিন্তা করিবে, নাগরিকরূপে অধিকারের দাবী করিবে,—তাহাকে এ দেশে রাজনীতির সম্পর্কে আসিতে দেখিলেই কর্তৃপক্ষ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। ছাত্রজীবন হইতে তাহাকে নাগরিকের রাজনৈতিক জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে না দিলে সে ভবিষ্যতে কিরূপে নাগরিক হইবে? তবে তাহাকে রাজনীতিক ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে বটে।

ডাক্তার আর্কার্ট ছাত্রের এই অধিকার স্বীকার করিয়া তাঁহার উদার মতের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশে দুইটি মত বিদ্যমান,—(১) ছাত্রকে রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করা কর্ত্তব্য, (২) ছাত্রের কর্ণে রাজনীতির কথা প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ডাক্তার আর্কার্ট ইহার মধ্য-পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই মত সমর্থনযোগ্য বটে, তবে, এ দেশের এক মত ছাত্রকে নেতৃত্ব দেওয়া,—এ কথা তিনি কোথায় পাইলেন? আমাদের দেশে কোনও রাজনীতিক দলে ছাত্রের কর্তৃত্ব নাই। তরুণ-দলের নেতৃত্ব যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহারা তরুণ হইলেও ছাত্র নহেন, বহুকাল ছাত্রজীবন সাঙ্গ করিয়াছেন।

ডাক্তার আর্কার্ট আর একটা কথা বলিয়াছেন, উহার সহিতও আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তিনি বলেন, ছাত্রদিগকে প্রথমে রাজনীতিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ছাত্ররা যত দিন শিক্ষালাভ করিবে, তত দিন তাহারা কোন রাজনীতিক ব্যাপারে যোগ দিতে বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে, বুঝা যায় না। ছাত্র রাজনীতি শিক্ষা করিবে, অথচ রাজনীতিক ব্যাপারে যোগদান করিবে না, কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না,—ইহার অর্থ কি? শিক্ষা কি তবে কেবল কিতাবতী শিক্ষা হইবে, হাতে-কলমে নহে? Swimming এর text-book পাঠ করিয়া যেমন সন্তরণ-শিক্ষা হয়, ইহাও তেমনই না কি? রাজনীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক ব্যাপারে সর্ব্ববিধ মতের সহিত পরিচিত হওয়াও কি ছাত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে? প্রথমাবধি যদি ছাত্র রাজনীতিক ব্যাপারে একটু একটু করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে দায়িত্বপূর্ণ নাগরিকের কর্ত্তব্য পালন করিতে শিখিবে কিরূপে?

তবে একটা কথা, ছাত্রজীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করা একবারেই সঙ্গত নহে, এ কথা আমরা স্বীকার করি।

তরুণের বিদ্রোহ

ডাক্তার জন মট জেনিভার তরুণ খৃষ্টান-সঙ্ঘের বিশ্ব-সমিতির (World-Committee) চেয়ারম্যান এবং জগতের যত তরুণ খৃষ্টান-সঙ্ঘ (Y.M.C.A.) আছে, তাহার প্রেসিডেণ্ট। সম্প্রতি তিনি ৩ মাস কাল এ দেশের তরুণ খৃষ্টান-সঙ্ঘসমূহ পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন। গত ১৭ই ফেবরারী তারিখে কলিকাতার বৃহৎ গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে তাঁহার সম্মানার্থ এক ভোজ-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তিনি তথায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জগতের তরুণগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান যুগকে প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তরুণের বিদ্রোহের যুগ বলিতে পারা যায়। জগৎকে যেন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়া হইতেছে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পক্ষে এমন বিপদের যুগ কখনও উপস্থিত হয় নাই। আমি যেখানেই গিয়াছি, সেইখানেই এই নবজীবনের

স্পন্দন অনুভব করিয়াছি, নূতন জাতিকে গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি, পুরাতন জাতিকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।

"প্রশ্ন এই, নূতন জগৎ কোন্ ছাঁচে ঢালা উচিত? আমাদের তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিষ্টকর প্রভাব দ্রুতগতি বিস্তারলাভ করিতেছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতির মধ্যে সেই প্রভাবের বিষের পচনক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আর ইহার উপর এমন এক নূতন তরুণ দল উদ্ভূত হইতেছে, যাহারা সমস্ত বাধা বন্ধন এবং কর্ত্তৃত্ব দূর করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে,—'প্রাচীন সমাজের প্রভুত্বের ও দেশাচারের কর্ত্তৃত্বের মূল কোথায়? এ কর্ত্তৃত্ব, এ প্রভুত্ব কে দিয়াছে?'

"প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় সকল দেশেই দেখিয়াছি, তরুণগণের উপর ধর্ম্মের প্রভাব অন্তর্হিত হইয়াছে।"

ডাক্তার জন মট যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা তাহা ঘরের দুয়ারেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদের—এই রক্ষণশীল জাতির দেশে কালাপাহাড়ী চীৎকার শুনা যাইতেছে,—ভাঙ্গিয়া ফেল, যত সব প্রাচীন প্রাণহীন সব ভাঙ্গিয়া ফেল! তবে একটা ভরসার কথা, ডাক্তার মটের মত আমাদিগকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না; কেন না, তাঁহাদের দেশে ও আমাদের দেশে অনেক প্রভেদ আছে। এ বড় কঠিন ঠাঁই! এখানে অনেক লীলাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিত্তি শিথিল কখনও হয় নাই। সমাজ যেটুকু চাহে—তাহা লইবে, বাকি আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিয়া দিবে!

—

ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা

সিরাজগঞ্জে পাবনা জেলা শিক্ষক সম্মেলনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহা সরকার ও অভিভাবকগণের বিশেষভাবে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে ডাক্তার সেন বলিয়াছেন,—"আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি একঘেয়ে মৃতকল্প একটানা পথেই পরিচালিত হইতেছে, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ববিকাশের বা মস্তিষ্কচালনার অবকাশ বা সুযোগ নাই। ছাত্র যেন যন্ত্রের মত ক্লাসের পাঠ পড়িয়া যায়, রুটিন মাফিক কায করিয়া গেলেই যেন তাহার দায়িত্বের বা কর্ত্তব্যের অবসান হইয়া গেল। ছাত্র কি চাহে, তাহার রুচি কোন্ দিকে, কোন্ পাঠ সে পছন্দ করে,—সে সকল দেখার প্রয়োজন হয় না। এই হেতু আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য,—একটা-না-একটা পেশা, হয় ডাক্তারী, না হয় ওকালতী।" কথাটা সত্য। এই হেতু শিক্ষা জিনিষটাকে জাতির ভাবধারানুযায়ী করিয়া বর্ত্তমান কালের উপযোগী করা প্রয়োজন। এ দিকে সকলের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার সেন আরও বলিয়াছেন,—"ছাত্ররা বিদেশের কথা ভূগোলে ইতিহাসে অনেক শিখে, কিন্তু দেশের কথা বা নিজ গ্রামের কথা কিছুই শিখে না। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতেও তাহাদের অনেক সময় অপব্যয়িত হয়।" এ কথাও সত্য। শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করা কি এই হেতু প্রয়োজন নহে? এ বিষয়ে আরও একটা কথা আছে। ছেলের উপর পাঠ্যের যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহার ভারে অনেক ছেলে অল্পবয়সেই কুব্জদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর নূতন পাঠ্য ভারে ভারে নির্ব্বাচিত হয়, ইহাতে নানা সহি-সুপারিশ আছে, স্বার্থরক্ষার চেষ্টা আছে। এ দিকেও সংস্কারসাধন করা প্রয়োজন নহে কি?

—

পরলোকে কৃষ্ণভাবিনী দাসী

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের মাতৃদেবী কৃষ্ণভাবিনী দাসী গত ৬ই ফাল্গুন কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্মে তাঁহার অচলা মতি ছিল। তাঁহার অন্তরের মাধুর্য্যে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির অঞ্জলি প্রদান করিত। শক্তি ও ভক্তিময়ী জননীর প্রভাবে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মাতার জীবনাদর্শে আত্মজীবন যে অনেকাংশে গঠিত করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দননগরে নারী-শিক্ষা-মন্দির, অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয়, বিরাট পুস্তকাগার প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানস্থাপনে তিনি মাতার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন। হরিহর বাবুর অনুজ শ্রীযুক্ত শিবরাম শেঠ উদারহৃদয়, দরিদ্র-বান্ধব এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ দুর্গাদাসবাবু "স্বদেশী বাজার" পত্রিকা লইয়া দেশসেবা করিতেছেন। ভক্তিশীলা, মমতাময়ী আদর্শ জননীকে হারাইয়া সানুজ হরিহরবাবু শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের শোকে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

—

সোনার পাহাড়

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গহন বনের জীব-জন্তু

ভেলাখানি নদীর প্রবল স্রোতে প্রচণ্ড বেগে পূর্ব্বোক্ত জল-প্রপাতের অভিমুখে ধাবিত হইলে, আমরা ভীতিবিহ্বল চিত্তে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; ভেলার আরোহিগণের মৃত্যু অপরিহার্য্য, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। জল-প্রপাতের নিকট নদীর বিস্তার আশী গজের কম নহে; পাহাড়ের উপর হইতে জলরাশি সুগম্ভীর গর্জ্জনে ষাট ফুট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছিল! সেই ঘূর্ণিত ফেনিল জলরাশির আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইলে কাহারও জীবনরক্ষার আশা নাই বুঝিয়া আমাদের মন অবসন্ন ও সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল; কিন্তু বিপন্ন সঙ্গিগণের প্রাণরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা না করিয়া হতাশ-ভাবে জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ, এ কথা স্মরণ হওয়ায় আমরা আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলাম না। যাশো-টোয়ারো আমাদের দলপতি; এই বিপৎকালে সেই বৃদ্ধের উৎসাহ ও শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। তিনি আমাদের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ লিয়ানা-লতা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা সুদৃঢ় রজ্জু নির্ম্মাণ করিলেন। আমরা ক্ষিপ্রহস্তে যে লতারজ্জু প্রস্তুত করিলাম, তাহা পঞ্চাশ গজ দীর্ঘ, তাহা এরূপ দৃঢ় হইল যে, তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারিতাম! অতঃপর যাশোটোয়ারো ছয় সাত সের ভারী এক খণ্ড কাঠ আনিয়া সেই লতা-রজ্জুর এক প্রান্তে বাঁধিয়া দিলেন। আমরা সেই রজ্জু তারের বাণ্ডিলের মত জড়াইয়া লইয়া নদীর তীরে তীরে দৌড়াইতে লাগিলাম, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ভেলা ছাড়াইয়া কয়েক গজ অগ্রসর হইলাম। আমি সেই রজ্জুর বাণ্ডিল ধরিয়া রহিলাম, যাশোটোয়ারো রজ্জুর প্রান্তস্থিত কাঠখানি ভেলা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু প্রথম বার আমাদের এই চেষ্টা সফল হইল না। কাঠখানি ভেলার অদূরে নদীগর্ভে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। যাশোটোয়ারো তাড়াতাড়ি কাঠখানি টানিয়া লইলেন এবং পুনর্ব্বার কিছু দূর দৌড়াইয়া গিয়া, তাহা ভেলা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করি-লেন। রজ্জুপ্রান্তস্থিত কাঠখানি সবেগে বার্ণির পদপ্রান্তে পড়িবামাত্র বার্ণি তাহা দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল। বার্ণি সেই দড়ি ভেলার একখানি কাঠে জড়াইয়া তিন চারিটা প্যাঁচ দিল। যে দুই জন অনুচর ভেলার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও এই কার্য্যে বার্ণিকে সাহায্য করিল; এক জন অনুচর ভেলার ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দড়ি বাঁধিতেছিল; রজ্জুর আকর্ষণে হঠাৎ ভেলার গতিরোধ হওয়ায় ভেলাখানি সবেগে দুলিয়া উঠিল, ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া সেই অনুচরটা ঘুরিয়া নদীর ভিতর পড়িয়া গেল! সে যখন নদীর প্রখর স্রোতে জলপ্রপাতের দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই সময় আমরা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মাথা জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে দেখিলাম; কিন্তু তাহার প্রাণরক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। আমরা তাহাকে আর দ্বিতীয় বার দেখিতে পাই নাই।

যাহা হউক, আমরা ভেলার গতিরোধে সমর্থ হইলাম বটে, কিন্তু নদীর স্রোত সেখানে এরূপ প্রখর যে, তাহার আকর্ষণে সেই লতারজ্জু মট্ মট্ শব্দ করিতে লাগিল; সুতরাং আমাদের আশঙ্কা হইল, রজ্জু হয় ত ছিঁড়িয়া যাইবে, এবং সেই ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া ভেলা উল্টাইয়া যাইতেও পারে। এই জন্য আমরা সেই একগাছা রজ্জুর উপর নির্ভর করিতে

না পারিয়া, তাড়াতাড়ি আর একগাছা লতারজ্জু প্রস্তুত করিলাম; তাহাও ঐভাবে ভেলার উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সেই উভয় রজ্জু নদীতীরস্থ বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম; বুঝিলাম, স্রোত সেখানে যতই প্রখর হউক, তাহা দুইগাছা রজ্জু ছিঁড়িয়া ভেলাখানি ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। অতঃপর আমরা সেই রজ্জু দ্বারা ভেলাখানি নদীকূলে টানিয়া আনিলাম এবং তাহার সাহায্যে সকলেই নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপে আমরা দারুণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম।

সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে—যখন ভেলাখানি সবেগে জলপ্রপাত অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, এবং নসিস্‌কা ও বার্ণি আসন্ন মৃত্যুর দ্রুত স্পন্দন স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভব করিতেছিল, তখন নসিস্‌কার মুখের দিকে চাহিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। আমি নির্নিমেষ নেত্রে তাহার ভাব-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। নসিস্‌কা দৃঢ়মুষ্টিতে প্রণয়ীর হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, সেই দৃষ্টিতে আতঙ্কের কোন চিহ্ন ছিল না, অচিরসম্ভাবিত মৃত্যুর প্রতি অবিচল উপেক্ষা তাহাতে সুপরিস্ফুট; যেন সে তাহার প্রিয়তমকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া মৃত্যুগহ্বরে প্রবেশের জন্য অসঙ্কোচে অপেক্ষা করিতেছিল! যাহা হউক, আমরা সকলে নদী পার হইতে পারিলাম—ইহাই পরম সৌভাগ্য মনে করিলাম; কিন্তু আমাদের বিশ্বস্ত অনুচরটিকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা সকলেই ক্ষুব্ধ হইলাম। পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই এ যাত্রা বার্ণি ও নসিস্‌কার প্রাণরক্ষা হইল।

নদী পার হইয়া আমরা প্রত্যহ কত দূর চলিলাম, এবং পথিমধ্যে কোন্ দিন কি ঘটিল—তাহার বিবরণ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। দিনের পর দিন প্রায় একভাবেই কাটিতে লাগিল; মনে হইল, সেই দুস্তর অরণ্যের অন্ত নাই! কিন্তু যতই দুর্গম হউক, সেই বিশাল অরণ্যের শোভা ও সম্পদ দেখিয়া আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতেই পথের কষ্ট ভুলিতে পারিয়াছিলাম। বিভিন্ন বৃক্ষের শাখাপত্রের বিশিষ্টতা, তাহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য, নব নব রূপ-মাধুর্য্য, বহু জাতীয় বনকুসুমের মধুর সৌরভ, উজ্জ্বল বর্ণের নানা প্রকার বিহঙ্গের কল-কাকলি—সকলে মিলিয়া আমাদের মনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল যে, মনে হইল, আমরা কোন মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি। সেই অরণ্যে আমরা জন-মানবের সাড়া-শব্দ না পাইলেও, মানবেতর জীব-জন্তুতে বনস্থলী পূর্ণ দেখিলাম। সহস্র সহস্র বানর বৃক্ষ-শাখায় বিচরণ করিতেছিল; তাহারা শতাধিক বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। কোন জাতীয় বানর এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহারা মনুষ্যের করতলে অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে; আবার কোন কোন জাতীয় বানরের দেহ পাঁচ ছয় ফুট দীর্ঘ, যেন এক একটি বিশালদেহ লোমশ পালওয়ান! এক জাতীয় বানরের মুখে মানুষের দাড়ির মত দাড়ি দেখিলাম; তাহাদের মুখাকৃতি ও চলিবার ভঙ্গীও মানুষের মত। আমাদের অনুচরেরা বলিল—উহাদের নাম 'দেড়ে বানর।'—সেই অরণ্যে এক জাতীয় মাকড়সা আছে—তাহাদের আকার কচ্ছপের অনুরূপ; তাহাদের দংশনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু অনিবার্য্য! এই সকল মাকড়সা যে সকল জাল প্রস্তুত করে, সেই সকল জালের ঊর্ণা এরূপ সুদৃঢ় যে, বলবান্ মনুষ্যেও তাহা টানিয়া ছিঁড়িতে পারে না। সেই জালে নানা জাতীয় পক্ষী আবদ্ধ হইয়া পলায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কোনও পক্ষী সেই ফাঁদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।

যে সকল সরীসৃপ এই অরণ্যে বিচরণ করে, তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় 'কেন্নো' দেখিতে পাওয়া যায়—সেগুলি দৈর্ঘ্যে এক ফুট; তাহাদের স্পর্শেও দেহ বিষাক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ভীষণদর্শন বৃশ্চিকগুলি হঠাৎ আক্রান্ত হইলে এ ভাবে হুল বিদ্ধ করে যে, তাহার বিষের যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। সর্পের সংখ্যাও অগণ্য। সেই সকল সর্পের আকার ও বর্ণ বহু প্রকার। এক জাতীয় সর্পের বর্ণ সিঁদুরের মত লাল—দৈর্ঘ্যে তাহারা চারি ফুট। তাহাদের বিষ অত্যন্ত তীব্র। বোড়া সর্পগুলি ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ! আমরা অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম, ইহারা বৃক্ষের উচ্চ শাখা লেজে জড়াইয়া ধরিয়া অধোমুখে ঝুলিতেছিল; দেখিলে প্রথমে গাছের 'বয়া' বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু যখন তাহারা দেহ আন্দোলিত করে, তখনই বুঝিতে পারা যায়—সেগুলি গাছের বয়া নহে, বিশালদেহ সর্প! আমাদিগকে কখন কখন এই সকল অতিকায় সর্পের পাশ দিয়া যাইতে হইয়াছে; কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবকে বোধ হয় তাহারা তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল। বস্তুতঃ এই সকল সর্প অপেক্ষা সেই অরণ্যচর মাকড়সা, "কেন্নো" এবং বৃশ্চিকগুলি অধিকতর বিপজ্জনক।

এই অরণ্যের সর্ব্বত্র জাগুয়ারের দল দেখিতে পাওয়া যায়; কোন কোন দিন রাত্রিকালে তাহারা আমাদের তাম্বুর সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইত; আমরা অসতর্ক থাকিলে আমাদের দলের দুই এক জনকে আক্রমণ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে তাম্বুর নিকট দেখিলেই আমরা গুলী করিতাম। অন্ধকারে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও তাহারা নিরাশ হইয়া পলায়ন করিত; কিন্তু তাহাদের গর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। এক এক দিন এক জাতীয় বনবিড়াল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। ইহারা গৃহপালিত মার্জ্জার অপেক্ষা বৃহদাকার না হইলেও অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতি। ইহাদের লোম সুচিক্কণ ও উজ্জ্বলবর্ণ, নখরগুলি দেহের তুলনায় অত্যন্ত বৃহৎ; চক্ষু হইতে যেন অগ্নি-শিখা নির্গত হইত। আমরা ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে—এই ক্ষুদ্র জানোয়ারগুলি ভয় পাইয়া পলায়ন করিত না, কখন কখন আমাদের উপর বাঘের মত লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিত; কখন বা গাছে উঠিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া বেড়াইত, এবং দাঁত-মুখের বিকট ভঙ্গী করিয়া "ফ্যাঁচ্" "ফ্যাঁচ্" শব্দে ভয় দেখাইত, কখন কখন উচ্চ বৃক্ষশাখা হইতে আমাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িত। সেই অবস্থায় তাহাদিগকে গুলী করিবার সুযোগ হইত না; কিন্তু আমাদের লাঠীর আঘাতে দুই একটি নিহত হইত। আমাদিগকে দেখিতে পাইলেই ইহারা বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত করিয়া 'ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্' শব্দে ক্রোধ প্রকাশ করিত, তাহা শুনিয়া আমরা সতর্ক হইতাম।

অরণ্যে যে সকল পক্ষী দেখিলাম, তাহাদের আকার ও বর্ণের বর্ণনা আমার অসাধ্য। কোন কোন জাতীয় পক্ষীর বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, কোন কোন পক্ষীর গঠন এরূপ সুন্দর যে, বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়; তাহাদের অপরূপ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু চক্ষু ক্লান্ত হয় না। অরণ্যের ঐশ্বর্য্যদর্শনে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হয়; কিন্তু তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা মূঢ়তা মাত্র। মানবকণ্ঠেরও তাহা বর্ণনার শক্তি নাই, ভাষা সেখানে মূক।

অরণ্যের মধ্যে মধ্যে কর্দ্দম ও জলাকীর্ণ নিম্নভূমি; স্থানে স্থানে অরণ্য ভেদ করিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল জলাশয়ে বৃহদাকার 'ঘড়িয়াল' ও কুম্ভীর অগণ্য। সুযোগ পাইলে তাহারা আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করিত সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা সতর্কতা-সহকারে তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চলিতাম। এক জাতীয় বৃহদাকার ভেক দেখিলাম, যেন এক একটা গামলা উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল; কিন্তু তাহাদের মক-মকধ্বনি ব্লড হাউণ্ডের গর্জ্জনের অনুরূপ! কোন কোন নদীতে নামিয়া নদী পার হইবার সময় তিন জাতীয় মৎস্যের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল; এ জন্য আমাদিগকে সতর্কভাবে জলে নামিতে হইত। এই তিন জাতীয় মৎস্যের নাম,—স্কাইট্, পিরান্হা এবং কানীরো। প্রথমোক্ত দুই জাতীয় মৎস্যের মুখে করাতের দাঁতের মত তীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণী বর্ত্তমান, তাহারা দেহের কোন স্থানে দংশন করিবামাত্র সেই স্থানের মাংস কাটিয়া লয়; তৃতীয় প্রকার মৎস্য অধিকতর ভয়াবহ। ইহাদের মুখ হাতুড়ীর মত; ইহারা শিকার দেখিলে সবেগে ধাবিত হইয়া এই হাতুড়ীর আঘাত করে সঙ্গে সঙ্গে মুখব্যাদান করিয়া সেই স্থানের মাংস গভীরভাবে কাটিয়া লইয়া গ্রাস করে। এই দেশের কোন কোন লোক জলে নামিয়া ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে; এই জাতীয় মৎস্য তাহাদের উরু হইতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে এ ভাবে মাংস কাটিয়া লইয়াছে যে, উরুর অস্থি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই! এই সকল মৎস্যকে দূরে বিতাড়িত করিবার জন্য নদীর জলে নামিয়া জলের ভিতর সুদীর্ঘ যষ্টি আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়; নতুবা ইহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

রাত্রিকালে সহস্র সহস্র কীট-পতঙ্গ, নিশাচর পক্ষী এবং পশুর কণ্ঠনাদে সমগ্র অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, সারা রাত্রি সে ধ্বনির বিরাম নাই; এতদ্ভিন্ন নানা জাতীয় খদ্যোৎ ও কীটের পুচ্ছ হইতে এরূপ উজ্জ্বল আলোকপ্রভা নিঃসৃত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে এ ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে যে, মনে হয়—তাহা লক্ষ-কোটি দানবের ক্রুর নেত্রের স্পন্দন!

এই প্রকার বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ অরণ্য ভেদ করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম; দিন আসে—যায়, ক্রমে কত দিন চলিয়া গেল; কিন্তু অরণ্যের আর শেষ হয় না!—এই অরণ্যে আর কখন কোন মনুষ্য প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সেই অরণ্য ভেদ করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চলিতে লাগিলাম। কম্পাসের সাহায্যেই সেই বিশাল অরণ্যে দিক্‌নির্ণয়ে সমর্থ হইলাম। কিন্তু অরণ্য অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই আমরা যে কয়েক জন য়ুরোপী

ছিলাম—সকলেই জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। আমাদের অশ্বতর-গুলি একে একে পঞ্চত্ব লাভ করিল। দুইটি অশ্বতর সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিল, এক রাত্রিতে একটিকে বাঘে লইয়া গেল; অন্য তিনটি কি এক অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল, তাহার পর ছয় ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া গেল। অশ্বতরগুলির পিঠে যে সকল গাঁটরী ছিল, তাহা খুলিয়া ছোট ছোট বাণ্ডিল করিলাম, এবং তাহাই সকলে পিঠে বাঁধিয়া চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে চলিতে বাধ্য হওয়ায় আমাদের গতি মন্থর হইয়া আসিল।

এই অবস্থায় আরও কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে এক দিন আমরা অরণ্যমধ্যে পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম, যেন একটি সঙ্কীর্ণ পথ দূর-দূরান্তে চলিয়া গিয়াছে—মনে হইল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, সেই পথের শেষে আমরা কোন গ্রামে উপস্থিত হইব। কিন্তু সেই গ্রামের অধিবাসীরা আমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা অনুমান করিতে না পারায় আমাদের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামবাসীরা আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে আমরা কিয়ৎ-পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব, তাহাদের সাহায্যে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহারা আমাদের সহিত শত্রুবৎ আচরণ করে, তাহা হইলে এই শ্রান্তদেহে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। নসিস্‌কা বলিল, আমরা শীঘ্রই আর একটি বৃহৎ নদীর তীরে উপস্থিত হইব; সেই নদীর উভয় তীরে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। আমাদিগকে হঠাৎ কোন শত্রুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে গ্রামবাসী-দের ভাবভঙ্গী বুঝিবার জন্য আমি যাশোটোয়ারোর সঙ্গে সকলের আগে চলিলাম; নসিস্‌কা, বার্গি, জিম, স্মিথ ও আমাদের ছুতার বন্ধু আমাদের অনুসরণ করিল।

নসিস্‌কার কথাই সত্য; দুই ঘণ্টা পরে আমরা একটি নদীর নিকট উপস্থিত হইলাম; এই নদীর স্রোতও অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু তাহা পার হইবার জন্য ভেলা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইল না; কারণ, তাহার উপর একটি 'তারাভিটা' ছিল। 'তারাভিটা' রজ্জুনির্ম্মিত সেতু। দুইটি সমান্তরাল রজ্জুর উপর কাষ্ঠফলক আড় করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল; তাহার উপর পদবিক্ষেপ করিয়া এবং ঊর্দ্ধস্থিত আর একটি রজ্জু ধরিয়া পথিকরা নদী পার হয়। এই রজ্জুনির্ম্মিত সেতুর সাহায্যে নদী পার হওয়া সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে; কারণ, দীর্ঘকাল রজ্জু পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় তাহা পচিয়া যায়। কোন পথিকের পদভরে তাহা ছিঁড়িয়া জলে পড়িয়া যাইতে পারে। ঐ ভাবে তাহা না ছিঁড়িলে এবং দুই এক জন পথিক জলমগ্ন না হইলে সেই রজ্জু পরিবর্ত্তিত হয় না।

আমরা রজ্জু-সেতুর নিকট কোন পারে কুটীরাদি দেখিতে পাইলাম না, নিকটে লোকালয় আছে বলিয়াও মনে হইল না। নসিস্‌কা বলিল, নদীর অপর পারে বৃক্ষান্তরালে স্থানীয় অধিবাসি-গণের কুটীর দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাশোটোয়ারো তাহার এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে করিলেন। সেই সকল কুটীরের অধিবাসী আমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা সতর্কভাবে অগ্রসর হইলাম। নদী পার হইবার পূর্ব্বে একবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া গ্রামের কোন লোক কুটীরের বাহিরে আসিল না; কতকগুলি বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ কুম্ভীর নদীতীরে বালুকারাশির উপর দীর্ঘদেহ প্রসারিত করিয়া রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল, বন্দুকের শব্দে ভয় পাইয়া তাহারা জলে নামিয়া গেল, বৃক্ষশাখায় শাখামৃগের দল কিস্‌-মিস্‌ শব্দ করিয়া উল্লম্ফন করিতে লাগিল, এবং পাখীর দল সভয়ে উড়িয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম, বন্দুকের শব্দ শুনিয়া গ্রামের কোন না কোন লোক উহার কারণ জানিতে আসিবে। কিন্তু কাহাকেও কোন দিকে না দেখিয়া নসিস্‌কা একাকিনী সেই নদী পরীক্ষা করিতে চলিল। কয়েক মিনিট পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নদীটি কোন বৃহৎ নদীর শাখা মাত্র, তাহা মূল নদী নহে। যাশোটোয়ারোও সেইরূপ অনুমান করিলেন। অতঃপর আমরা সেই রজ্জু-সেতুর সাহায্যে একে একে নদী পার হইলাম। রজ্জু এরূপ পুরাতন যে, আমাদের পদভরে তাহা মট্‌ মট্‌ শব্দে দুলিতে লাগিল, প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল—আর এক পা বাড়াইলেই তাহা ছিঁড়িয়া পড়িবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দড়ি ছিঁড়িল না; আমাদের সকলের নদী পার হইতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। নদীর অপর পারে উপস্থিত হইয়াও আমরা পূর্ব্ব-বৎ সঙ্কীর্ণ পথ পাইলাম, কিন্তু কেহই আমাদের সম্মুখে আসিল না, এবং কোন দিকে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। আমরা সেই পথে আড়াই ঘণ্টা চলিয়া সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিতে পাইলাম, তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না!

বিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের আয়োজন

একটি স্বচ্ছসলিলা সুবিস্তৃত নদী কলনাদে আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছিল; নসিস্কা এই নদী দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইল, এবং নদীতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া বালিকার মত চারিদিকে ছিটাইতে লাগিল। তাহার এই প্রকার আনন্দের কারণ—তাহার বিশ্বাস হইল, ইহা তাহার জন্মভূমি-প্রবাহিত নাপো নদী। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম, এই নদীর নাম বোবোনাজা—ইহা পাস্তাসা নদীর বৃহত্তম শাখা। আমরা পূর্ব্বে রজ্জু-সেতুর সাহায্যে যে নদী পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা এই নদীরই একটি খাঁড়ি। আমরা নদীতীরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম; গ্রামের অধিকাংশ গৃহ মৃৎকুটীর। কয়েকটি গ্রাম্য শূকর আমাদের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একটি খোঁয়াড়ের ভিতর কতকগুলি গো-মেষাদি আবদ্ধ ছিল—এই সকল দৃশ্য সভ্যতারই নিদর্শন। আমরা আজোগুয়ে পরিত্যাগের পর এরূপ গ্রাম্যদৃশ্য আর কোন স্থানে দেখিতে পাই নাই।

আমরা কয়েক গজ অগ্রসর হইতেই এক জন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক আমাদের দিকে আসিতে লাগিলেন। সভ্যতার সংস্পর্শহীন সুবিশাল অরণ্যের প্রান্তে, নির্জ্জন নদীতীরে, কয়েকখানি জীর্ণ পর্ণকুটীরের অন্তরাল হইতে এক জন বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সম্মুখে আসিতে দেখিয়া আমার বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রহিল না। ভদ্রলোকটি আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ের পুরোহিত। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দুই এক মিনিট নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর প্রকাণ্ড টুপীটা মাথার উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "আপনারা এখানে আসিতেছেন—বন্ধুভাবে না শত্রুভাবে?"

যাশোটোয়ারো টুপী খুলিয়া ধর্ম্মাত্মা পাদরীর সম্মুখীন হইলেন, এবং দক্ষিণ হস্ত সাগ্রহে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমরা শান্তিপ্রয়াসী পর্য্যটক।"

পাদরী বলিলেন, "আপনারা কি বণিক?"

"না।"

"আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন? এ দেশের এই অঞ্চলে কোন বিদেশী পর্য্যটককে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।"

যাশোটোয়ারো মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমরা স্বর্ণের সন্ধানে পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতেছি।"

যাশোটোয়ারোর কথা শুনিয়া পাদরী হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনারা অত্যন্ত কঠিন কার্য্যের ভার লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন; আপনাদের এরূপ দুরাশা কেবল স্বপ্নেই শোভা পায়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বাঞ্চলে স্বর্ণের অভাব নাই, এ সংবাদ আমিও শুনিয়াছি; কিন্তু সেখানে স্বর্ণসংগ্রহ করিতে যাওয়া এবং তাহা লইয়া ফিরিয়া আসিবার আশা করা বাতুলতা মাত্র!"

যাশোটোয়ারো সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাতুলতা মাত্র!—কেন?"

পাদরী বলিলেন, "এই পথে অগ্রসর হইলে আপনারা চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীষণ বিপদে আক্রান্ত হইবেন; সেই সকল প্রাণান্তকর বিপদে পরিত্রাণ লাভ করা আপনাদের অসাধ্য।"

যাশোটোয়ারো পাদরী-পুঙ্গবের মন্তব্য শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নিরাপদ শয়ন-কক্ষের সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া মুদ্রিত নেত্রে মাথার কাছে হাত বাড়াইলে সোনার চ্যাঙড় হস্তগত করা যায় না—এ তথ্য আমাদের অজ্ঞাত নহে, ধর্ম্মাত্মা! আমরা স্বর্ণসংগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যে পথে এখানে আসিয়াছি, সেই পথে আমাদিগকে যে সকল সাংঘাতিক বিপদে পড়িয়া উদ্ধারলাভ করিতে হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক বিপদে পড়িব, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। আমরা চরম বিপদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াই এখানে পৌঁছিয়াছি।"

পাদরী বলিলেন, "আপনারা যদি সমুদ্রতট হইতে এখানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন ও বিপদ্ অতিক্রম করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদিগকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইবে; কারণ, আপনারা 'জিভারো ব্রেভো' নামক দুর্দ্দান্ত অরণ্যচর অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবেন। তাহারা অত্যন্ত ভীষণ-প্রকৃতি, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর ও নির্য্যাতনপ্রিয়।"

বৃদ্ধ পুরোহিত হঠাৎ হাত তুলিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র সেই গ্রামের শতাধিক অধিবাসী—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা তাঁহার অদূরে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইহারা আমার শিষ্য, আমারই আশ্রিত। আমাদে

কলি ও কুসুম

বসুমতী-চিত্র বিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র।

এই গ্রামের কিছু দূরে এক দল 'জিভারো' আসিয়াছে; শুনিয়াছি, তাহারা আমাদের গ্রাম লুণ্ঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই এই অঞ্চলে আসিয়াছে। তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছি; কিন্তু তাহারা কখন্ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই জন্যই আপনাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া এখানে আসিতে দেখিয়া আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, এবং আপনারা শত্রুভাবে কি মিত্রভাবে আসিয়াছেন, ইহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। আপনারা বন্ধুভাবে আসিয়াছেন শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। আপনাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমাদের সম্বল অতি সামান্য, কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা অতিথি-সৎকারের ত্রুটি করিব না।"

আমরা বৃদ্ধ পাদরীর সদাশয়তায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহাকে জানাইলাম যে, খাদ্যদ্রব্যাদি আমাদের সঙ্গেই আছে, আমরা তাঁহাদের নিকট ভোজ্যদ্রব্যের প্রার্থী নহি, কেবল কয়েক দিন বিশ্রামের জন্য আশ্রয়প্রার্থী। পাদরী আমাদের প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমরা যখন তাঁহার অতিথি, তখন আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করাও তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্য পালন করা তাঁহার অসাধ্য নহে। গ্রামবাসীরা ধনবান্ না হইলেও তাঁহাদের অতিথি-সৎকারের উপযুক্ত সম্বলের অভাব হইবে না।

অতঃপর পাদরী মহাশয় আমাদের পর্য্যটন-সংক্রান্ত সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা সকল কথাই সরলভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম। তিনি সেই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই জনরব শুনিয়াছি —এক দল শ্বেতাঙ্গ কিছু দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বাঞ্চলের দুর্গম অংশে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু পথের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আপনারা স্বর্ণের লোভে আর অধিক দূর অগ্রসর হইলে আপনাদের অবস্থাও সেইরূপ সাংঘাতিক হইবে। সম্ভবতঃ আপনারাও প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যদি তাহা আপনাদের ভোগে না লাগে, সেগুলি ফেলিয়া রাখিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় পরলোকে প্রস্থান করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রকার কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন কি?"—কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা নিরুৎসাহ হইলাম না, তাঁহাকে বলিলাম—মৃত্যুভয়ে আমরা সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না। আমরা স্বর্ণরাশি সংগ্রহ না করিয়া ফিরিব না; এ জন্য যদি বিপদে পড়িয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়—তাহাও শ্রেয়ঃ!—ইহার উপর আর কোন কথা নাই; পাদরী মহাশয় আর আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিলেন না।

আমরা সেই গ্রামে পাদরীর আশ্রমে কয়েক দিন শান্তিসুখ উপভোগ করিলাম। দীর্ঘপথ-ভ্রমণে আমরা পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং বিশ্রামের মাধুর্য্যও আমরা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিলাম। সেই পল্লীতে যে সকল 'ইণ্ডিয়ান' বাস করিতেছিল—তাহারা সকলেই খৃষ্টান। সেই বৃদ্ধ পাদরী মহাশয়ই তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া গিয়াছিলেন; গাছ-পাথরের পূজা ছাড়িয়া তাহারা সপরিবার সদাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিল। এই বৃদ্ধ পাদরীর ধর্ম্মানুরাগ ও পরোপকারপ্রবৃত্তি এরূপ অসাধারণ যে, প্রভুর কার্য্যে তাঁহার আত্মোৎসর্গের পবিত্র কাহিনী শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইল। মনে হইল, ইঁহারা মনুষ্য-দেহে দেবতা, ইঁহাদের জীবন ধন্য, সার্থক। আমরা সোনার লোভে কি কষ্টই না সহ্য করিতেছি!—কিন্তু ইনি?—ইনি যৌবনকালে সুখ-সম্পদের সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, সমাজ ত্যাগ করিয়া, সুসভ্য দেশসমূহ হইতে বহুদূরে মধ্য-আমেরিকার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন অন্তর্দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং এই স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনের জন্য জীবনের অপরাহ্নকালেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আত্মীয়-স্বজন, সুখ, বিলাস, সমাজের আকর্ষণ - কিছুই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অবিচলিত চিত্তে যে কঠোর ব্রত উদ্যাপন করিতেছেন—কোন্ তপস্বী, কোন্ মুমুক্ষু সন্ন্যাসী তাঁহার অপেক্ষা অধিক ত্যাগস্বীকার করিয়াছে?

পাদরী মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিলাম—এই পবিত্র ব্রত অবলম্বন করিয়াও তিনি শান্তিতে সেখানে বাস করিতে পারেন না; তিনি ও তাঁহার সহযোগী পাদরী মহাশয়রা এইরূপ এক একখানি গ্রামে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া স্থানীয় নরনারীবর্গের মধ্যে নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সভ্যতা সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক চিত্তে কালযাপন করিতে হয়। অরণ্যবাসী অসভ্য বন্য জাতি দলবদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে এই সকল খৃষ্টান পল্লী

আক্রমণ করে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা এবং গৃহপালিত গোমেষাদি পশু বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করে; গ্রামস্থ কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিয়া গ্রামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে।—সুতরাং এই সকল গ্রামের অধিবাসিগণের জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ্ নহে; গবর্মেণ্ট তাহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে না; এমন কি, এই সকল স্থানে গবর্মেণ্টের অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে পাদরী মহাশয়রা গ্রামবাসীদের কেবল পরলোকের শুভাশুভ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন না, ইহলোকেও তাহাদের রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাহারা পাদরীদের নেতৃত্বে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করে, অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ করে, এবং অসভ্য আরণ্য জাতি দলবদ্ধ হইয়া ঝড়ের ন্যায় বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে, তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। পাদরীই তাহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা, চিকিৎসক, মন্ত্রণাদাতা, সেনাপতি—একাধারে সমস্তই।

গ্রামের অধিবাসীরা নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্যে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। আমরা প্রচুর পরিমাণে টাট্‌কা মাছ, তরকারী, দুগ্ধ, মাখম আহার করিতাম। মেষমাংসেরও অভাব ছিল না। এতদ্ভিন্ন আমাদিগকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া "চিকা" পান করিতে দেওয়া হইত। "চিকা" একজাতীয় বৃক্ষ-মূল সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করা হইত। ইহা পুষ্টিকর, সুমিষ্ট পানীয়, কিন্তু অধিক পরিমাণে পান করিলে নেশা হয়।

সেই শান্তিপূর্ণ পল্লীতে এক দিন বিশ্রামের পর বার্ণি আমাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইল। বুঝিলাম, তাহার কোন গোপনীয় কথা আছে; এই জন্য অন্যান্য সঙ্গীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলাম, এবং একখানি ডোঙ্গার উল্টা পিঠে বসিয়া বার্ণির মনের কথা শুনিতে লাগিলাম।

বার্ণি আগ্রহভরে বলিল, "ফেল্‌জি, তুমি আমার পরম বন্ধু, আমরা সকলেই তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তুমিও সকল বিষয়ে আমাদিগকে সুপরামর্শ দিয়া থাক। এই জন্য আজ তোমাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব, তুমি ভাবিয়া উত্তর দিও। তুমি ত বুঝিয়াছ, আমি আমার ক্ষুদে প্রণয়িনীটিকে কি সাংঘাতিক রকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি! পৃথিবীতে কোন পুরুষ কি কোন নারীকে তাহা অপেক্ষা বেশী ভালবাসিতে পারে? আর এই মেয়েমানুষটিও আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ছায়ার মত আমার সঙ্গে ঘুরিতেছে। আমার সুখের জন্য ও জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছে; এ প্রেম স্বর্গীয়। এই জন্য আমি মনে করিতেছি, উহাকে সঙ্গী করিয়া ফেলি; কিন্তু ঐ কার্য্যটা না কি পুরুতের হাতে। সৌভাগ্যক্রমে এখানে একটা পুরুতও জুটিয়া গিয়াছে। আমার ইচ্ছা, পাদরীকে আমাদের সাদী দিতে অনুরোধ করি। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া কিছু ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছি। আমাদিগকে এই অজ্ঞাত দেশে নানা বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কোথায় যাইতে হইবে, জানি না। উহাকে সাদী করিয়া হঠাৎ যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে যে তৎক্ষণাৎ উহাকে বিধবা হইতে হইবে। আর ও যদি হঠাৎ আগে মরে, তাহা হইলে উহার শোকে আমিও মরিয়া যাইব। তখন কি আমরা খুব অসুবিধায় পড়িব না?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "ভয়ঙ্কর অসুবিধা; তোমরা এক জন মরিলে আর এক জনের জীবনধারণ করা কঠিন হইবে বটে।"

বার্ণি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাহা হইলে এখন কি করা যায়, বল দেখি, ভাই! এই সুন্দরীকে আমার নিজস্ব করিতে না পারিলে আমার বুক ফাটিয়া দু'খানা হইয়া যাইবে। আমার প্রাণের ছট্‌ফটানী থামিবে না।"

আমি বলিলাম, "কুচ্ পরোয়া নেই, বার্ণি! তোমার বুক ফাটিয়া দু'খণ্ড না হয়—আমি তার উপায় করিব। আমরা অত্যন্ত ভয়ানক দেশে আসিয়া পড়িয়াছি, প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা, চারিদিকে অসংখ্য শত্রু, পথ অজ্ঞাত; পিটার ডন্‌কুমের দলের যে অবস্থা হইয়াছিল—আমাদেরও সেই অবস্থা ঘটিতে পারে। যদি মরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার প্রণয়িনীর কি দুর্দ্দশা হইবে, ভাবিয়াছ কি? তাহাকে বিধবা করিয়া তোমার কোন লাভ নাই। এই জন্য আমার উপদেশ, তুমি উহাকে বিবাহ না করিয়া যেমন উহার প্রণয়ী আছ—তাহাই থাক। ঐ ভাবেই উহাকে সঙ্গে লইয়া চল, ইহার পর যদি আমরা নিরাপদে কোন সভ্যদেশে উপস্থিত হইতে পারি—তখন উহাকে বিবাহ করিও।"

আমার প্রস্তাব শুনিয়া বার্ণি অত্যন্ত ব্যথিত হইল, তাহার নীল চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সে কাতরভাবে আমার হাত ধরিয়া কি বলিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে আর কোন

সঙ্গ বাহির হইবার পূর্ব্বেই নসিস্কা তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। নসিস্কা বার্ণির পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই আমি উঠিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। নসিস্কা পরিপাটীরূপে প্রসাধন শেষ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল; সে দিন তাহার রূপ যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল! আমি সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মুগ্ধনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলাম, "তোমার ঐ রূপের কাছিতে আমার এই মন-বজরা বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু তুমি বার্ণিকে ভালবাস, তাহাকে ভালবাসিয়া তুমি সুখী—সে তোমাকে বিবাহ করুক, কিন্তু আমি বাঁচিয়া থাকিতে যদি তুমি বিধবা হও, তাহা হইলে আমি, সুন্দরি, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী হইবার জন্য উমেদারী করিব।"

সেই রাত্রিতে পাদরী মহাশয় তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা যে পরস্পরের প্রতি আসক্ত, ইহা তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "নসিস্কা বার্ণির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাড়ীঘর ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। উহাদের প্রেম পবিত্র। বার্ণি নসিস্কাকে লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।"

পাদরী বলিলেন, "তাহা হইলে উহারা আমাকে বলুক, আমি উহাদের বিবাহ দিয়া ফেলিব। কোন অসুবিধা হইবে না।"

পাদরীর কথা শুনিয়া আমি বার্ণির মনের কথা তাঁহার গোচর করিলাম এবং আমি বার্ণিকে কি উপদেশ দিয়াছিলাম—তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া পাদরী মহাশয় বলিলেন,"কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষাও সৎপরামর্শ দিতে পারি। তোমরা যে কার্য্যের ভার লইয়া এই বিপৎসঙ্কুল দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছ, সেই কার্য্যে তোমরা সফল-মনোরথ হইবে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। তোমরা লোভান্ধ হইয়া আকাশ-কুসুম চয়নের আশায় মৃত্যুর পথে ধাবিত হইয়াছ; আমার আশঙ্কা, তোমাদের কেহই সেই অজ্ঞাত রাজ্য হইতে ফিরিতে পারিবে না, সকলকেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এ অবস্থায় এই সুন্দরী তরুণীর জীবন বিপন্ন করা তোমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আমার ইচ্ছা, তোমরা এই প্রণয়ি-যুগলকে এখানে রাখিয়া যাও। আমার বিশ্বাস, নসিস্কা আমার আশ্রয়ে থাকিলে বার্ণি তাহাকে ফেলিয়া সোনার সন্ধানে তোমাদের সঙ্গে যাইতে চাহিবে না। সোনার পাহাড়ের সমস্ত সোনা অপেক্ষা নসিস্কা বার্ণির নিকট অনেক অধিক মূল্যবান্। উহাদের উভয়কে আমার কাছে রাখিয়া যাও; আমি উহাদের বিবাহ দিব। এখানে থাকিলে উহারা সুখে থাকিবে, আমি উহাদিগকে অনেক ভাল কাযে লাগাইতে পারিব। উহাদের জীবন সফল হইবে। আমি উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহাদিগকে এখানে রাখিতে চাহি না; কিন্তু উহারা স্বেচ্ছায় এখানে থাকিলে উহাদের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। উহাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় আমি তোমাকে এ সকল কথা বলিলাম।"

আমি পাদরী মহাশয়কে বলিলাম, "আপনার সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ আজ রাত্রেই বার্ণিকে বলিব। সে আমার বন্ধু, যে কার্য্যে তাহার ও তাহার প্রণয়িনীর উপকার হয়, তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

সেই রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বেই পাদরীর উপদেশ বার্ণির গোচর করিলাম, এবং তাহাকে সেখানে রাখিয়া আমরা সোনার পাহাড়ের সন্ধানে যাইব—এ কথাও তাহাকে জানাইলাম।

বার্ণিকে সেই স্থানে রাখিয়া আমরা চলিয়া যাইব শুনিয়া বার্ণির মুখের যে ভাব হইল, তাহা চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হইবার উপযুক্ত! সে আমার কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমরা আমাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবে! ইহা কি সত্যই তোমার অন্তরের কথা?"- হঠাৎ তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বক্ষঃস্থলে হাত রাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "ফেলজি, আমি তোমাদের সঙ্গে জাহাজ ছাড়িয়া আসিয়াছি, পথেই যদি মরিতে হয়—আমরা একত্র মরিব। আমি তোমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না; যদি কেহ সুখের লোভ দেখাইয়া, আমাকে তোমাদের ছাড়িয়া স্বর্গে লইয়া যাইতে চায়, সেখানেও আমি যাইব না। যদি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া মৃত্যুর সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হয়, আমি বীরের মত যুদ্ধ করিব, তাহার পর মরিতে হয়—তোমাদের পাশেই মরিব। বিপদের ভয়ে বার্ণি ফেগাজ তাহার বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিবে—সে সে রকম কাপুরুষ নয়, ইহা কি তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে? আমার ইচ্ছা, আমার প্রণয়িনীকে এখানে রাখিয়া যাইব; যত দিন আমরা এখানে না ফিরিব, তত দিন সে এখানে আমাদের প্রতীক্ষা করিবে। এ কথা তাহাকে বলিয়া এই প্রস্তাবে

রাজী করিতে হইবে। হাঁ, কাল সকালে এ কথা আমিই তাহাকে বলিব।"

আমি এই সরলপ্রকৃতি অকপট 'আইরিস্‌ম্যান'কে অনেক দিন হইতেই জানি; জানি, তাহার সঙ্কল্প অটুট এবং তাহার হৃদয় ইস্পাতের মত দৃঢ়। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণা আরও উচ্চ হইল। বীরপুরুষের সকল গুণই তাহাতে বর্ত্তমান। তাহার সাহস ও সহিষ্ণুতা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। শক্রর সহিত যুদ্ধে সে অজেয়; সুতরাং সে আমাদের সঙ্গে থাকিলে আমাদের ক্ষুদ্র দলের যথেষ্ট উপকার হইবে, সঙ্কটে আমরা তাহার সহায়তা লাভ করিব, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। সে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সেখানে থাকিতে অসম্মত হওয়ায়, আমি তাহার মনুষ্যত্বের পরিচয় পাইলাম।

বার্ণি পরদিন প্রভাতে নসিস্‌কাকে সকল কথা বলিল। সে নসিস্‌কাকে সেখানে রাখিয়া দলের লোকের সহিত চলিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে শুনিয়া নসিস্‌কা ক্রোধে ও ঘৃণায় বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি বলিলে? তোমরা সকলে চলিয়া যাইবে, আর আমি একাকিনী এখানে পড়িয়া থাকিব?—না, কখন তাহা হইবে না। এ রকম অসঙ্গত কথা কে বলিল শুনি? যে এ কথা বলিয়াছে—তাহার হৃদয় নাই, প্রেম কি সামগ্রী, তাহা সে জানে না; সে জানে না, প্রকৃত প্রেম কখনও বিরহ সহ্য করিতে পারে না। যদি তুমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর, আমারও মৃতদেহ তোমার দেহের পাশে পড়িয়া থাকিবে। তোমাকে ছাড়িয়া আমি আমার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না।"

ইহার পর আমাদের আর কিছুই বলিবার রহিল না। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাদরী মহাশয়ও আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। বার্ণি নসিস্‌কার নিকট প্রতিশ্রুত হইল—তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে না। তখন নসিস্‌কার ক্রোধ ও অভিমান দূর হইল।

বস্তুতঃ কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের যাত্রার কোন ব্যবস্থা হইল না। আমাদের দিনগুলি সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হইতে লাগিল; তৃপ্তির সহিত দুই বেলা আহার চলিতে লাগিল; আমরা সকলেই পাদরী মহোদয়ের আশ্রমে বাসগৃহ পাইয়াছিলাম। রাত্রে সুনিদ্রারও বিঘ্ন হইত না। আমাদের ইচ্ছা হইল, এই ভাবে আরও কিছুদিন কাটাইয়া দিই; ইতিমধ্যে যদি বার্ণি ও নসিস্‌কার মন পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাদিগকে রাখিয়াই আমরা সোনার পাহাড়ের সন্ধানে বাহির হইব। পাদরী মহাশয়েরও আশা পূর্ণ হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমরা সেই গ্রামেই বাস করিতে লাগিলাম।

কিন্তু নিষ্কর্ম্মা হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল সেখানে বসিয়া থাকিতে কাহারও আগ্রহ হইল না। সাত আট দিন পরে আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল; পরদিন আমরা আমাদের গন্তব্য পথে যাত্রা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পরামর্শ আরম্ভ করিলাম; এবং আমাদের জিনিষপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া আমাদের আশ্রয়দাতা ধর্ম্মাত্মা পাদরী মহোদয়ের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার এক জন দূতকে সেখানে দেখিতে পাইলাম। সে সংবাদ দিল, এক দল বন্য দস্যু তাহাদের পল্লী আক্রমণ করিবার জন্য বহু দূর হইতে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিতেছে! দূতের নিকট এই সংবাদ পাইয়া পাদরী মহোদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং আমরা তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা খৃষ্ট-শিষ্য, আমি সদাপ্রভুর পবিত্র নামে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আমাদিগকে আসন্ন বিপদে সাহায্য কর। অসভ্য বর্ব্বর দস্যুদলের কবল হইতে আমাদের ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা কর। আমরা বন কাটিয়া কঠোর পরিশ্রমে এই ক্ষুদ্র উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছি, সদুপায়ে ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছি, আমাদের আশ্রিত গ্রামবাসীরা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গ সহ এখানে সুখে কালযাপন করিতেছে; কিন্তু সংবাদ পাইলাম, বনচর দুর্দ্দান্ত রাক্ষসরা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে! তাহারা নরমাংসলোলুপ জাগুয়ার অপেক্ষা হিংস্রপ্রকৃতি; অরণ্যে যে সকল বিষধর সর্প ও মনুষ্য-জাতির অন্যান্য মহাশক্র বাস করে, তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা অধিকতর খল, অধিকতর অপকারী। আমাদের রমণী ও বালক-বালিকাগণকে তাহারা লুঠিয়া লইয়া যাইবে, আমাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবে, আমাদের গৃহগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মে পরিণত করিবে, আমাদের সকলকে হত্যা করিবে। আমরা নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বালিত করিয়া প্রভুর মহিমা প্রচারিত করিতেছি; তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, কিন্তু বনচর লোভী রাক্ষসগুলি

আমাদের এই দীর্ঘকালের কঠোর সাধনার ফল বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। বন্ধুগণ, এই সঙ্কটে আমি তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা বাহুবলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্রভুর আশীর্ব্বাদভাজন হও। আমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব। আমাদের সাহস ও বীরত্ব ব্যর্থ হইবে না।”

ধর্ম্মাত্মা পাদরী মহোদয়ের আন্তরিকতাপূর্ণ আকুল প্রার্থনা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। আমরা বিচলিত হইলাম, আমাদের দেহের শোণিত উত্তপ্ত হইল। আমরা উত্তেজিত হৃদয়ে উৎসাহভরে যে সকল কথা বলিয়া বৃদ্ধ পাদরীকে আশ্বস্ত করিলাম, তাহা শুনিলে শত্রুরাও বুঝিতে পারিত, আমরা গ্রামবাসীদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য দেহের শেষবিন্দু শোণিত নিঃসারিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। “আমরা আমাদের মাতৃভূমি ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়র্লাণ্ডের প্রতিনিধি-স্বরূপ সেখানে উপস্থিত ছিলাম; স্বীকার করি, আমরা মূর্খ নাবিক মাত্র, কিন্তু স্বদেশের কোন বিপদ ঘটিলে তাহার সুখ, শান্তি ও সম্মানরক্ষার নিমিত্ত আমরা মহাজ্ঞানী স্বদেশপ্রেমিক পণ্ডিতমণ্ডলী অপেক্ষা কি কোন দিন আত্মবিসর্জ্জনে কাতর বা কুণ্ঠিত হইয়াছি? স্বদেশকে আমরা ভালবাসি, আমরা—নাবিকরা বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ সমুদ্রে সমুদ্রে আমাদের স্বদেশের গৌরব-পতাকা সমুন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। সেই পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এইভাবে আত্মবিসর্জ্জনের কামনাকে হয় ত অনেকে ভাবপ্রবণতা বলিয়া উপহাস করিবে। কিন্তু এই ভাবপ্রবণতার জন্য বৃটিশজাতি আজ জগতে অজেয়, পৃথিবীর সকল অংশেই আমরা প্রাধান্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছি। জলে জঙ্গলে, মরুবক্ষে, তুষারসমাচ্ছন্ন শৈল-শিখরে—সর্ব্বত্র আমরা বৃটনের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রীতিতে আমাদের হৃদয় পূর্ণ বলিয়াই আমরা বাহুতে দানবের শক্তি অনুভব করি, এবং সমরে জয়লাভের জন্য, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমাদের হৃদয় বিপুল আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমাদের এই ভাবপ্রবণতায় যেন কোন দিন বঞ্চিত না হই, ইহাই পরমেশ্বরের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।”

আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এই সকল কথা বলিয়া উপসংহারে নিজেদের পক্ষ হইতে বলিলাম, “ধর্ম্মাত্মা, আমরা মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয় আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিব। আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিব।”

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত হর্ষাভিভূত হইয়া দুই হাতে আমার হাত দুইখানি জড়াইয়া ধরিলেন; তিনি নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিলেন। অতঃপর যাশোটোয়ারো বলিলেন, “ধর্ম্মাত্মা, আমার ‘ইণ্ডিয়ান’ অনুচররা এরূপ প্রভুভক্ত যে, গৃহ, পরিজন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই দুর্গম প্রদেশে আমার অনুসরণ করিয়াছে; প্রয়োজন হইলে তাহারাও আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য অসঙ্কোচে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। আমার বিশ্বাস, আমার অনুচররা আমার উক্তির সমর্থন করিবে।”

যাশোটোয়ারোর কথা শুনিয়া আমাদের অনুচররা সমস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিল। মুহূর্ত্ত পরে নসিস্‌কা বৃদ্ধ পাদরীর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, “পুরোহিত মহাশয়, আমি স্ত্রীলোক মাত্র, আমি এই দলে একাকিনী, সুতরাং নারীজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ আমি কোন কথা বলিব, সে অধিকার বা সুযোগ আমার নাই; কিন্তু আমার নিজের যাহা বলিবার আছে—তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ দেখি না। আমি যুদ্ধ করিতে জানি, আমার বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ; নারী হইলেও আমি আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব, এরূপ অঙ্গীকার করিতে পারিব না; তবে আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিব না—আমার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পারেন, এবং যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া যাহারা যুদ্ধ করিবে, তাহাদের মৃতদেহের স্তূপের ভিতরেই আমার মৃতদেহ দেখিতে পাইবেন। শত্রুর বর্শা আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু আমার পৃষ্ঠদেশ অক্ষত থাকিবে।”

নসিস্‌কার তেজঃপূর্ণ নির্ভীক্ উক্তি শুনিয়া সকলে উৎসাহভরে হুঙ্কার দিল। বার্ণি আমাদের পশ্চাতে ছিল, সে দ্রুতবেগে নসিস্‌কার পার্শ্বে উপস্থিত হইল, এবং এক হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাত উর্দ্ধে তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “পাদরী মহাশয়, নসিস্‌কা একাকিনী হইলেও—সে কেবল নিজের নহে, আমারও প্রতিনিধি। আমরা উভয়ে একপ্রাণ হইয়া যে ভাবে যুদ্ধ করিব, সেই যুদ্ধে মৃত্যুকে আমরা আলিঙ্গন করিতেও পারি, কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু শত্রু আমাদের হস্তে নিহত হইয়া-

তাহাদের হৃদয়-শোণিতে রণভূমি কর্দ্দমিত করিবে, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপ নিঃসন্দেহ।”

বার্ণির বক্তৃতা শুনিয়া সমবেত জনমণ্ডলী আনন্দে ও উৎসাহে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। সেই শব্দ গগনে পবনে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইল। পাদরী মহাশয় নসিস্‌কা ও বার্ণির কথায় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উহাদিগকে তাঁহার সম্মুখে জানুতে ভর দিয়া বসাইয়া উভয়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং প্রণয়ি-যুগলকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তকরে পরমেশ্বরের করুণা প্রার্থনা করিলেন।—এই দৃশ্য এরূপ সকরুণ ও গম্ভীর যে, ইহা সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করিল। আমি কঠোর-হৃদয় নাবিক, কিন্তু কেন জানি না, আমারও চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। নদীর দিক্ হইতে তখন যে গরম বাতাস বহিতেছিল, তাহারই স্পর্শে এরূপ হইল না কি?

অতঃপর কি ভাবে শত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, আমাদের যাত্রার আয়োজন বন্ধ হইয়া গেল। প্রথমেই বন হইতে শত শত গাছ কাটিবার ব্যবস্থা করা হইল। সেই দেশের লোকগুলি এরূপ তৎপরতার সহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে যে, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কাটিয়া ফেলিল, এবং সেই সকল গাছ গ্রামের চতুর্দ্দিকে পুঁতিয়া দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হইল। নদীর দিকে ‘এক হারা’ ও অন্য সকল দিকে ‘দুই হারা’ করিয়া গাছগুলি প্রোথিত হইল; সেই শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষগুলি লিয়ানা লতা দ্বারা পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইল। কাষ্ঠনির্ম্মিত দুর্গের কেন্দ্রে গ্রামস্থ রমণী, বালক-বালিকা ও বৃদ্ধগণকে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা হইল; স্থির হইল, দস্যুরা গ্রাম আক্রমণ করিবামাত্র গ্রামস্থ রমণী, বালক-বালিকা, রুগ্ন ও বৃদ্ধগণকে লইয়া গিয়া সেই স্থানে বসাইয়া রাখা হইবে। গ্রামস্থ প্রত্যেক যুবক তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া গড়ের ভিতর হইতে যুদ্ধ করিবে; আততায়ীরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না করিয়া সেই কাঠের দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শত্রুদের অস্ত্রে এক দল গ্রামবাসী নিহত হইলে, অন্য দল তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া যুদ্ধ করিবে, এবং প্রাণ থাকিতে তাহারা শত্রুদলকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে না।

দুর্গনির্ম্মাণের আয়োজন শেষ করিতেই সন্ধ্যা হইল। অতঃপর আমরা গ্রামস্থ যোদ্ধাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলাম। বৃদ্ধ পাদরী গ্রামবাসীদের সঙ্গে থাকিয়া শত্রুদলের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে রমণী ও বালক-বালিকাগণের রক্ষকস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলাম, তাঁহাকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। কাষ্ঠনির্ম্মিত দুর্গের যে অংশ নদীর দিকে রহিল, সেই অংশ রক্ষার ভার বার্ণি ও নসিস্‌কার হস্তে অর্পিত হইল। আমাদের কয়েক জন অনুচর তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য প্রেরিত হইল। আমাদের ছুতোর বন্ধু, জিম স্মিথ ও আমি অন্য তিন দিক্ রক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম; আমাদের বৃদ্ধ অধিনায়ক যাশোটোয়ারো প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। কারণ, বৃদ্ধ হইলেও তিনি বহুদর্শী যোদ্ধা; ইকুয়েডোরিয়ান সৈন্যদলে বহু দিন সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সমর-কৌশল তাঁহার সুবিদিত ছিল। বিশেষতঃ, বনচর অসভ্য বর্ব্বরগুলা কি প্রণালীতে যুদ্ধ করে, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্দুক ও পিস্তল ছিল, টোটা এবং গোলা-গুলী বারুদ প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন লাঠী, বল্লম, রাম দা, কিরীচ, তলোয়ার, দীর্ঘ ছোরা প্রভৃতি হাতিয়ারেরও অভাব ছিল না। যদি আমাদের সঙ্গে দুই তিনটি ছোট কামান থাকিত, তাহা হইলে আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ নিখুঁত হইত। কিন্তু কামানের অভাবেও আমরা দস্যুদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব বুঝিয়া উৎসাহিত হইলাম। তবে আমরা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিলেও ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া সহজেই যে শত্রু-জয় করিতে পারিব, ইহা দুরাশা বলিয়াই ধারণা হইল; কারণ, সেই সকল অরণ্যচর দুর্দ্দান্ত দস্যু যেরূপ সাহসী ও লুণ্ঠনপ্রিয়, সেইরূপ নিষ্ঠুর ও শোণিতলোলুপ। নরহত্যার লোভেই তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে অকারণে মনুষ্যের প্রাণবধ করে। তাহাদের সহিষ্ণুতা অসাধারণ, এবং ভয় কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। পলায়ন অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই তাহারা গৌরবের বিষয় মনে করে; পরাজিত হইয়া পলায়ন করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অপমান-জনক। ইহা ‘জিভারো’ নামক বনচর নর-রাক্ষসগণের সাধারণ বিশেষত্ব। এই সকল

বন্যজাতি সাধারণতঃ জিভারো নামে পরিচিত হইলেও তাহারা ওরিজোন, পিয়োজি, মাকাওয়াজি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সকল সম্প্রদায়ই শত্রুগণকে আক্রমণের পূর্ব্বে 'আয়াহুয়াস্কা' নামক মদ্যপান করিয়া ক্ষেপিয়া উঠে এবং শত্রু-শোণিতদর্শনে আনন্দে অধীর হয়; তাহারা তীক্ষাগ্র, পাতলা বর্শা লইয়া যুদ্ধ করে, বর্শাগুলির অগ্রভাগ বিষদিগ্ধ। প্রত্যেক যোদ্ধার নিকট আট দশটি বর্শা থাকে, তাহাই তাহারা ক্ষিপ্রহস্তে তীরের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়া শত্রুবধ করে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি সুবৃহৎ চর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল থাকে, তাহা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, আমরা শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল দমন করা ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেও দস্যুদলের সন্ধান মিলিল না। তখন আমাদের সন্দেহ হইল, দস্যুরা আমাদিগকে আক্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে, আর তাহারা আসিবে না; আমাদের সকল শ্রম অনর্থক হইল! কিন্তু পাদরী মহাশয় বলিলেন, আমরা অসতর্ক হইলে সর্ব্বনাশ হইবে; দস্যুরা হঠাৎ এক দিন বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে। তাহারা অত্যন্ত নিকটে আসিলেও মনে হইবে, তাহারা বহু দূরে আছে! নসিস্‌শাও বলিল, রাত্রিকালে হঠাৎ এইভাবে আক্রমণ করাই তাহাদের নিয়ম।

অবশেষে এক দিন রাত্রিকালে আমি অরণ্যের দিক্ হইতে মৃদু নাগারাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অবিলম্বে যাশোটায়ারোকে সে কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, উহা 'টুনডুলির' শব্দ। 'টুনডুলি' এক প্রকার ডঙ্কা, তাহার আকার সুবৃহৎ, তাহা কুম্ভীরের ত্বকে আচ্ছাদিত। দস্যুদল 'টুনডুলি' বাজাইয়া যে ইঙ্গিত করে, তাহাদের অনুচররা সেই ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। বুঝিলাম, দস্যুদল আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

লোকান্তরে নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশীর খ্যাতনামা জমীদার রায় বাহাদুর নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুমূত্র রোগে ৬৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কাশীধামে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটীর কমিশনাররূপে দীর্ঘকাল বহু জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর প্রদত্ত দেবত্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দেবসেবা যখন অচল হইবার উপক্রম হয়, তখন নীলরত্ন বাবু উক্ত সম্পত্তির উদ্ধারসাধন করিয়া দিয়াছিলেন। এই জনপ্রিয় বাঙ্গালী কর্ম্মীর তিরোধানে আমরা তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

সাইপ্রস

ভূগোল-পাঠকের কাছে সাইপ্রস্ দ্বীপ সুপরিচিত। এই দ্বীপ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে এই দ্বীপ অরণ্যপরিপূর্ণ ছিল। তাম্র প্রচুর পরিমাণে এখানে পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম তদনুসারে সাইপ্রস হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের সভ্যতার সময় সাইপ্রসের প্রসিদ্ধি ছিল। ছিল—এখন অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দুই একটি ধর্ম্মমন্দিরে এখন উপাসনা হয়, একটি গির্জ্জা মুসলমানদিগের মসজেদে পরিণত হইয়াছে।

ফামাগষ্টার দুর্গের প্রাচীর যেমন সুদৃঢ়, তেমনই উচ্চ। দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া উত্তরাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে ৬ মাইল

ফামাগষ্টা বন্দর

ফামাগষ্টা সাইপ্রসের প্রসিদ্ধ বন্দর। এই বন্দরটি, মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার রচিত বিখ্যাত নাটকের নায়ক ওথেলোর দুর্গের পার্শ্বেই অবস্থিত। এই দুর্গে ওথেলো সুন্দরী-শিরোমণি ডেস্‌ডিমোনাকে নিহত করেন। সুতরাং ঐতিহাসিক ও কাব্যামোদীরাও সাইপ্রস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইবেন।

ফামাগষ্টা বন্দরের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতির সঙ্গে তাহার নানা প্রকার দুর্নামও আছে। এখানে অনেক ধর্ম্মমন্দির

নারীরা ভারী প্রস্তর বহন করিতেছে

দূরে সালামিস্ নগর দৃষ্টিগোচর হইবে। পল্ ও বারনাবস্ যে সময়ে সাইপ্রস দ্বীপে অবতীর্ণ হন, তখন সালামিস্ নগর রোমকদিগের প্রধান সহর ছিল।

সাইপ্রসের পশ্চিম দিকে কারাভস্ট্রেসি বন্দর। এইখানে মার্কিণদিগের পোতাশ্রয় আছে। এই বন্দর হইতে সালামিস পর্য্যন্ত বিরাট মালভূমি প্রস্তুত। উহাতে একটিও বৃক্ষ নাই। এই মালভূমির নাম মেসাওরিয়া।

সাইপ্রসের উত্তরাংশে কাইবেনিয়া অদ্রিমালা।

ওথেলোর দুর্গ—এইখানে ডেস্‌ডিমোনা নিহত হন

মেসাওরিয়া মালভূমির দক্ষিণভাগে অনেকগুলি পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই অংশ পরম রমণীয়। সালামিসের উত্তরে কাণ্টারা দুর্গ অবস্থিত। এই দুর্গে এক শত কক্ষ বিদ্যমান।

সাইপ্রসের নগরসমূহে কদাচিৎ মেঘাবৃত সূর্য্য দেখা যায়। দিবাভাগে নগরগুলি সর্ব্বদাই সূর্য্যালোক উপভোগ করিয়া থাকে—সূর্য্য কদাচিৎ মেঘাবৃত হইয়া থাকেন। সঞ্চরণশীল মেঘ অনেক দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাইপ্রসে মেঘ এমন দ্রুতগামী যে, দর্শক উহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে।

কমলালেবুর জন্ত গাড়ী বোঝাই ঝুড়ি

মিঃ কেনার্ড ওয়েল উইলিয়াম্‌স্‌ এক জন বিখ্যাত মার্কিণ ঐতিহাসিক। তিনি ফামাগষ্টা বন্দরের নারীদিগের মধ্যে অতি অল্পই সুন্দরী রমণী দেখিয়াছেন। তাঁহার কথা,—"কদাচিৎ তাহাদের মধ্যে সুন্দরী দেখা যায়—রমণীয়তা সুদুর্লভ। উহাদের দেহ ভারী এবং অঙ্গসৌষ্ঠব নাই বলিলেই চলে। এখানকার নারীদিগের কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য নাই, অত্যন্ত কর্কশ। সামান্ত অর্থার্জ্জনের জন্ত যে দেশের নারী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, তাহারা সুন্দরী হইবে কিরূপে ?"

রিজোকার্পাসো সাইপ্রসের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তরে একটি নগর। এখানকার নারীরা প্রিয়দর্শনা। তাহারাও কঠোর পরিশ্রম করে সত্য ; কিন্তু তথাপি তাহাদের দেহে সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা আছে। এখানকার নারীরাও পাথর ভাঙ্গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সাইপ্রসের মধ্যে বেল্লাপ্যায়ে আবের ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান। ধ্বংসাবশেষ হইতে বুঝা যায়, কালে ইহা পরম রমণীয় ছিল। এই কারুকার্য্যখচিত ধর্ম্মমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ হইতে বহু সুদৃশ্য ও মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড অপহৃত হইলেও, যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে, শিল্পী কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

এই ধর্ম্মমন্দির বা মঠ কোন পাহাড়-সন্নিহিত ক্ষুদ্র সহরের ধারে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে ফলের গাছ—তৃণ-শ্যামল ক্ষেত্র। মিঃ জর্জ্জ জেফ্রে সাইপ্রসের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল ;—

"বেল্লাপ্যায়ে আবে" বা মঠটি সাইপ্রসের মধ্যে স্থপতিশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

লুসিনান্‌ বংশের রাজত্বকালে সাইপ্রসে উহা নির্ম্মিত হয়। লিভাণ্ট অঞ্চলে এই শ্রেণীর একটিও মঠ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। স্পেন বা
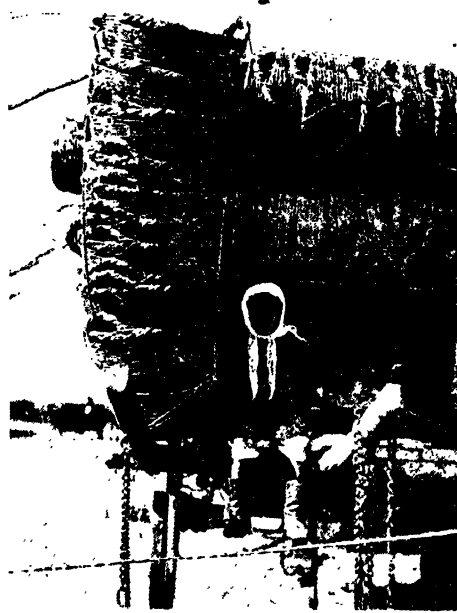
কৃষিক্ষেত্রে শস্ত সংগ্রহ

ইটালীর কোন কোন মঠের সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে।”

‘বেল্লাপ্যায়ে’ কথাটার মোট অর্থ, ‘স্নিগ্ধ শান্তি’ বা ‘রমণীয় দেশ’। উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি খণ্ডশৈলের উপর হইতে এই মঠের দৃশ্য চমৎকার দেখিতে পাওয়া যায়।

সাইপ্রসের উত্তরপশ্চিম দিকে লাপিথস্ নগর অবস্থিত। এখানে প্রচুর লেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪ শত ৫০টি বৃহদাকার লেবুর দাম এক শিলিং মূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, এ কথা একাধিক পরিব্রাজক বলিয়া গিয়াছেন। তত্রত্য অধিবাসীরা লেবুর রস বোতলে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দেয়। এক বা দুই বৎসরেও তাহার কোন বিকৃতি ঘটে না।

সাইপ্রস নারীরা বস্ত্র ধৌত করিতেছে

সাইপ্রসের কিক্কো মঠটি সর্ব্বপ্রধান। এখানকার সন্ন্যাসীরা বহু দর্শককে পান-ভোজনে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। মঠে বিদ্যুতালোকের ব্যবস্থা আছে। উহার কল মঠের সন্ন্যাসীরাই স্থাপন করিয়াছেন। কিক্কো মঠ সহর হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

সাইপ্রসে টেলিফোন যন্ত্রের বালাই নাই। বড় বড় নগরের সহিত তারের সংবাদ আদান-প্রদান হইয়া থাকে, অন্যত্র তাহা নাই। অবশ্য ডাকের ব্যবস্থা আছে।

নেফকারার তরুণীরা সূচিকর্ম্ম করিতেছে

গির্জ্জার বাহুল্য ব্যতীত সমগ্র সাইপ্রসে জনসাধারণের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তাহারা ক্ষেত্রে চাষ-আবাদ করে, শস্য কর্ত্তন করিয়া ঘরে তুলে। জলপাই, কমলা, দাড়িম্ব ও লেবু সংগ্রহ করে, ছাগ মেষ চরায়, সুমিষ্ট সুরাদার বোতল পূর্ণ করিয়া সঞ্চয় করে, আর ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করে। ধর্ম্মবিশ্বাসহীনতা তাহাদের মধ্যে নাই। এ বিষয়ে তাহাদের ‘চরিত্র’ নষ্ট হয় নাই।

বড় বড় শ্রমশিল্পসংক্রান্ত কারখানা বা কল সাইপ্রসে অধিক নাই। আস্‌বেসটস্ সংগ্রহের জন্য একটা বৃটিশ কোম্পানী এবং মার্কিণ তাম্র-সংগ্রাহক কোম্পানীই সর্ব্বপ্রধান। আস্‌বেসটস্ খনির মুখ হইতে লিমাসল্ বন্দর পর্য্যন্ত একটা ট্রামপথ আছে। লিমাসল্ বন্দরটি আধুনিক। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্ণবপোতসমূহ আমথস্ বন্দরে সমবেত হইত। তত্রত্য দুর্গ যে বহু প্রাচীন, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু তথায় একটি ধর্ম্মমন্দির বিদ্যমান—সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ড নাভারীর রাজকুমারী বেরেন্‌গ্যারিয়ার সহিত এই ধর্ম্মমন্দিরে পরিণীত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শতকক্ষবিশিষ্ট দুর্গ

সাইপ্রসের রেশম প্রসিদ্ধ হইলেও এখানকার লেসের কা

ফামাগস্টা বাজারের একাংশ

বেলাপ্যায়ে অ্যাবের ধ্বংসাবশেষ

ফামাগষ্টা নগরের রাজপথ

ও সীবন-নক্সা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। লেফকারা নগর এই কার্য্যের কেন্দ্রস্থল। এখানকার সূচের কায এত সূক্ষ্ম ও চমৎকার যে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ তাহার প্রতিযোগিতায় সমর্থ নহে। সূক্ষ্ম সূচি-শিল্পের জন্য অনেককেই অকালে চশমা ধারণ করিতে হইয়া থাকে। শীতকালে রৌদ্রালোকে, এবং গ্রীষ্মকালে প্রাঙ্গণের ছায়াশীতল স্থানে বসিয়া তরুণী ও প্রবীণারা সূক্ষ্মতম সূচিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

সাইপ্রস দরিদ্র দেশ সত্য; কিন্তু নারীরা না থাকিলে এ দেশ একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইত।

প্রতিমূর্ত্তি নারীরা কাযে নিযুক্ত থাকিয়া গৃহের অর্থাভাব দূর করিয়া থাকে। লেফকারা নগর বেশ সমৃদ্ধ। দূর হইতে এই নগরকে স্বর্গ বলিয়া দর্শকের মনে হইবে। পুরুষেরা যদি লক্ষ্মীস্বরূপিণী লেফকারা নাগরিকাগণের ন্যায় কর্ম্মঠ হইত, তাহা হইলে এখানকার সম্পদ আরও বর্দ্ধিত হইতে পারিত।

লারনাকা সাইপ্রসের আর একটি নগর। এখানকার প্রধান দর্শনীয় বিষয় সমাধিস্তম্ভসমূহ। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ সমাধির নাম "উম্ হারম্"। কথিত আছে, মহম্মদের কোন আত্মীয়া—মহম্মদ তাঁহাকে মাতৃসমা
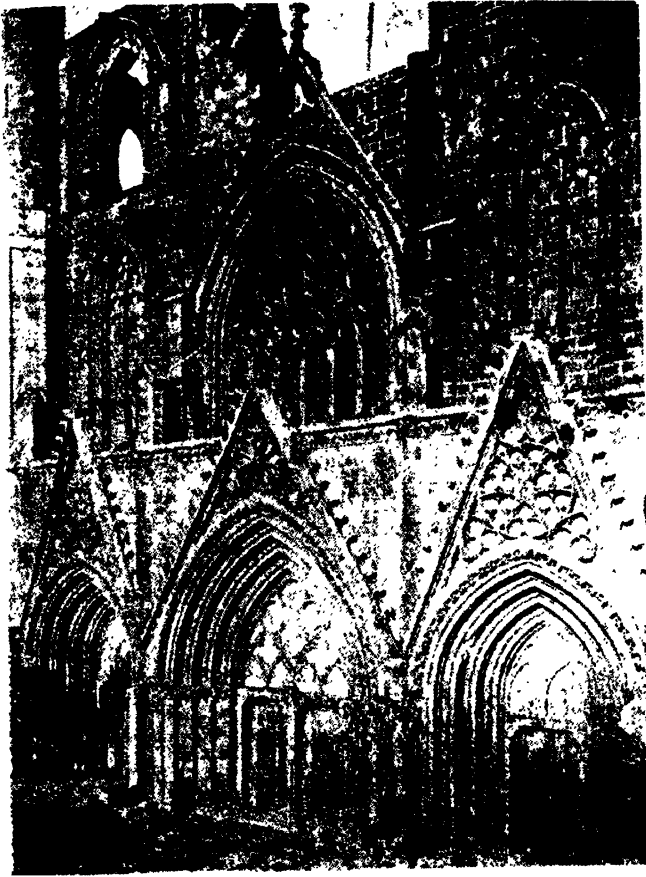
জননী বলিয়া উল্লেখ করিতেন,—এইখানে সমাহিতা হন।

এই সমাধির সন্নিহিত একটি মসজেদের আকাশ-

সাইপ্রসের পাহাড়ীয়া কিশোরী

চুম্বী গম্বুজ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারি-দিকে শ্যামল পত্রবল্লরীসমাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজি সযত্নবিন্যস্ত ভাবে রোপিত হইয়াছে।

১৪শ শতাব্দীর সেণ্ট নিকোলাস্ গির্জ্জা—অধুনা আয়-সোফিয়া

সাইপ্রসের কৃষি-পদ্ধতি

লিমাসল দুর্গের একাংশ

লারনাকার পার্শ্বেই লিভাডিয়া নগর। ঐতিহাসিক জেফ্রের মতে, ইহা অত্যন্ত আধুনিক এবং কৌতূহল চরিতার্থ করিবার মত দর্শনীয় বিষয়

ফামাগষ্টের তরুণীরা চরকায় সূতা কাটিতেছে

সাইপ্রসে নারীর অধিকার

এখানে বিশেষ কিছুই নাই। কমলালেবু যখন পরিপক্ক হইতে থাকে, সেই সময় এই সহরের অধিবাসীরা ঝুড়িনির্ম্মাণে মন দিয়া থাকে। বাঁশের মত

এই স্থানটি শুধু পরম রমণীয় নহে—এমন রমণীয়তা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। মসজেদের অভ্যন্তরভাগও সুন্দর। এই স্মৃতিসৌধের উপর একখানি প্রকাণ্ড শিলা সংস্থাপিত। এই শিলাখণ্ডের সকল প্রান্ত চারিদিক হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, এই শিলাখণ্ডের ওজন প্রায় ২ হাজার মণ হইবে। চূড়ার উপরে অবস্থিত এই বিরাট শিলাখণ্ড যেন শূন্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

মুসলমানের মসজেদ ও সমাধি ব্যতীত, লারনাকায় খৃষ্টানদিগের সমাধিসমূহ বিদ্যমান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ বণিক ও ভাগ্যান্বেষীরা লিভাণ্টে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ এইখানে সমাহিত হয়। দারুণ গ্রীষ্মের প্রভাবে, যৌবনে অধিকাংশেরই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। এই সমাধিক্ষেত্র সেণ্ট ল্যাজেরস্ গির্জ্জার সংলগ্ন।

সাইপ্রস-নারী তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিতেছে

সাইপ্রসের আধুনিক মৃন্ময় পাত্রসমূহ

হইত, তাহার কতিপয় দ্রব্য সম্বন্ধে সংগৃহীত হইয়াছে। পৌত্তলিক যুগের পূজার উপকরণ, সমাধিক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্রব্য, বিস্মৃত পৌরাণিক যুগের নামহীন রাজার ব্যবহৃত রাজদণ্ড, টুট-আনখ-আমেন নামক মিশরের ফারোয়া-রাজের সময়ে যেরূপ সুবর্ণ ব্যবহৃত হইত, সেইরূপ কোমল স্বর্ণনির্ম্মিত হার এই যাদুঘরে রহিয়াছে। স্মরণাতীত যুগে এই স্বর্ণহার কোনও সুন্দরীর কমনীয় মসৃণ গলদেশে বিলম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। সাইপ্রস "ব্রোঞ্জ ফুলের" দ্বীপ। সুতরাং টুট-আনখ-আমেনের যুগে ইহা সুসভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

এফ্রোডাইটের এই দ্বীপ, থথ্‌মেস্ (Tho- thmcs) ও ক্যাম্বিসেস দ্বারা অধিকৃত হয়। প্রণয়পীড়িত এণ্টনি ইহা ক্লিওপেট্রাকে দান করেন। পল ও বারনাবাস্ এই দ্বীপে একদিন ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। অপমানের প্রতিশোধ কামনায় রাজা রিচার্ড (সিংহহৃদয় রিচার্ড) এই দ্বীপ অধিকার করার পর এক বৎসরের মধ্যেই উহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন। একরের (Acre) যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পরাজয় ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মযুদ্ধে সমবেত যোদ্ধবৃন্দ এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। লিসুইনান্ রাজবংশ এই সাইপ্রস দ্বীপে রাজত্ব করিয়া এই দ্বীপকে একদিন গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরে তুর্কীরা

এক প্রকার আরণ্য উদ্ভিদ হইতে এই সকল ঝুড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমলালেবুর সময় রাজপথগুলিতে ঝুড়িপরিপূর্ণ যানের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

নিকোসিয়া নগর দেখিতে বর্ত্তুলাকার—প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রাচীনতার নিদর্শন এই নগরে নাই। এখানকার তরুণদল বেশ সপ্রতিভ এবং পরিচ্ছন্ন। নগরোপকণ্ঠস্থিত বাসভবনগুলি সুদৃশ্য, পরিষ্কার এবং প্রিয়দর্শন। নগরবাসীরা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

আর্ম্মেনীয় গির্জ্জাগুলির কক্ষতল মধ্যযুগের সমাধিপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত। এখানে একটি যাদুঘর বিদ্যমান। লুণ্ঠনকারী-দিগের আক্রমণ হইতে যে সকল প্রাচীন রত্ন অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে, এই যাদুঘরে সে সকল দ্রব্য সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে যে সকল তৈজসপত্র ব্যবহৃত

লেসবয়নে নিযুক্তা নারীর দল

এই দ্বীপ জয় করে। অধুনা অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজ এই দ্বীপের মালিক।

সাইপ্রস আধুনিক নহে, অতি পুরাতন। কত বিভিন্ন

বেল্লাপ্যায়ে মঠের স্থপতি শিল্প

সাইপ্রসের নারী—প্রস্তর ভাঙ্গিতেছে

সালামিসস্থিত রোমানযুগের ধ্বংসস্তূপ

সভ্যতার সংঘর্ষে এই দ্বীপের অধিবাসীরা আসিতেছে। ইহার প্রাচীনতা এখনও সকল আঘাত সহ্য করিয়াও বিদ্যমান। সহসা আধুনিক সভ্যতা ইহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে না।

সাইপ্রস দ্বীপে সর্ব্বশুদ্ধ ৩ লক্ষ ১১ হাজার লোক বাস করে। ইহার এক-পঞ্চমাংশ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। অধিকাংশ গ্রামের লোকই মুসলমান, অথবা গোঁড়া খৃষ্টান। গ্রামের

সালামিসের রুটী বিক্রেতা

মসজেদ অথবা গির্জ্জার চূড়া দেখিয়াই কোন্ গ্রাম মুসলমানপ্রধান বা খৃষ্টানদিগের দ্বারা অধিকৃত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পরলোকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

'ভারতী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও খ্যাতনামা লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন! প্রসিদ্ধ শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক কন্যার তিনি পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলেখক মণিলাল "জাপানী ফানুস," "মহুয়া" "ভুতুড়েকাণ্ড" প্রভৃতি গল্পের রচয়িতা। ছোট গল্প রচনায় মণিলালের কৃতিত্ব ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪০ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তাঁহার অকাল বিয়োগে আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিতেছি। তাঁহার আত্মীয়-বর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন।

[প্রহসন]
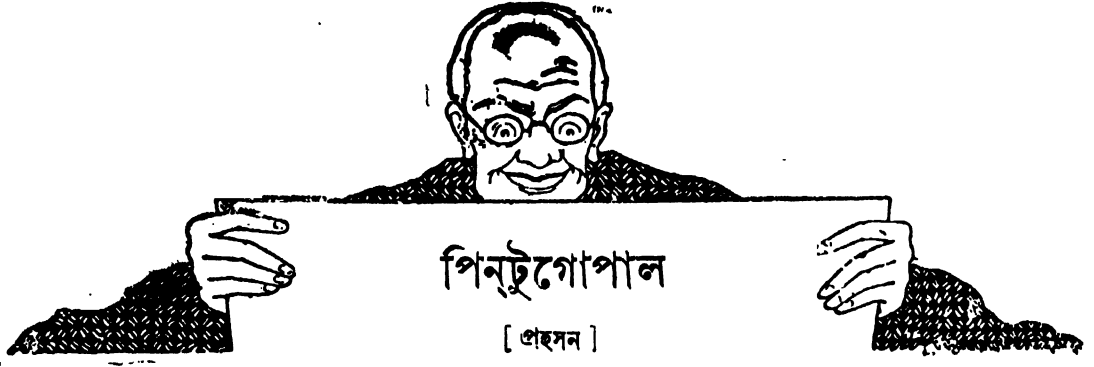
প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিধু ডাক্তারের ডাক্তারখানা

বিধু ও তাহার শ্যালক নিধু উভয়ে দ্বৈতগীত

উভয়ে। রোগের মত ওষুধ যদি চাও—
এস কে পেসেণ্ট আছে প্যাটেণ্ট কিনে নাও।
বিধু। খুলেছি ডিস্পেন্সারী শালা-ভগ্নীপোত,
নিধু। লুটতে সহর দিনে রেতে পেতে আছি ওৎ,
বিধু। আমি তালিম দিচ্ছি—
নিধু। আমরা মেরে নিচ্ছি শিকারের ঘাঁৎ-ঘোঁৎ,
বিধু। প্লেগ বসন্ত কলেরাতে
নিধু। বাঁচ যদি জোর বরাতে—
উভয়ে। এড়ান্ নেই আমাদের হাতে গুটি গুটি পা বাড়াও।
বিধু। আছে রকম রকম সাল্‌সা মুষ্টিযোগ—
নিধু। খেলে খাঁদা খেঁদি দাদা দিদি দেবে মাল্‌সা-ভোগ,
বিধু। কবিতা চাপ্‌বে ঘাড়ে—
নিধু। পোড়াবে হাড়ে নাড়ে,
উভয়ে। অ্যাকোয়া পাৎকোয়ার গুণে বোবায় বোল ছাড়ে;
বিধু। ধরাবে প্রেমের টীকে—
নিধু। মজাবে মেসের ঝিকে,
উভয়ে। ভুতুড়ে তান ছেড়ে গান গাবে চাম্‌চিকে;
বিধু। নব্যি দলে ছবি তুলে—
নিধু। বস্তিমূলে কাটবে যোগ,
উভয়ে। নোব ডবল্ প্রাইস্ বাড়লে রোগ;
বিধু। প্রেমের বণিক্ খেলে টনিক্ চাঁদ দেবে ধরা,
নিধু। একটি ডোজে খেঁদি পেঁচি বনবে অপ্সরা,
বিধু। হবে হয় জ্যান্তে মরা—
নিধু। নয় স্বয়ম্বরা,
বিধু। তরুণ প্রেমে এক গা ঘেমে—
নিধু। বল্‌বে ক্রেমে বাতাস দাও।
উভয়ে। আছে শিল্-ধোয়া জল বোতল বোতল যত পার খাও—
খাও বা না খাও গেঁটের কড়ি গুণে দিয়ে যাও॥

বিধু। ও রে ও রে নিধু, সেই কাব্যি-নবিস্ আসছে।

নিধু। বটে বটে! দেখ ভায়া, ও যে কেবল গেঁটের পয়সা দিয়ে বোতল বোতল শিল্-ধোয়া জল নিয়ে যাবে, তা হবে না। ওকে দিয়ে আমাদের টেঁপীর একটা পাত্র খোঁজাতে হবে।

বিধু। আরে রাম রাম, ব্রাদার! তুমি এখনও মানুষ চিন্‌লে না! ও কেবল চোখ বোজে আর কথার মিল খোঁজে, ওর কর্ম্ম পাত্র সন্ধান!

নিধু। না হে ব্রাদার, মাইকেল সায়েব লিখে গেছেন, পড়নি—'শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন'—ও-ও ত এক রকমের যোটক! তুমি ত ঘটক্-ঘটকী ঘেঁষতে দাও না।

বিধু। না, ব্রাদার! বাড়ীতে পা দিয়েই বল্‌বে, বাস্-ভাড়া ট্রাম্-ভাড়া দাও, আর পাত্র তোমরা খুঁজে নাও, তা'তে আমি নেই! শুধু কি তাই? বাগে পেলে ত এটা-ওটা হাতালে! ভায়া, অনেক ঘটকালি—শেষে চাদর নিয়ে সটকালি!

নিধু। ভায়া, এখানে ত শিল্-নোড়া-ধোয়া জল-ছাড়া আর কিছু নেই!

বিধু। বোতল ত আছে! ভায়া, শিশি বোতল বেচে বড় মানুষ হয়েছিল, শোন নি?

নিধু। তা বটে! আসুন আসুন!

(কাব্যি-নবিসের প্রবেশ)

বিধু। এই যে! আস্তাজ্ঞে হ'ক—অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি নামটি আপনার?

কাব্যি। সে কি মশায়! এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

বিধু। আজ্ঞে নাঃ, ভুলিনি! তবে মনে নেই! কি জানেন, আপনার নামটা ট্যাঁকে করেই রেখেছিলুম, কাপড় ছাড়তে প'ড়ে গেছে! তা খুঁজব এখন! এখন আপনি চট ক'রে ব'লে ফেলুন!

কাব্যি। আমার নাম কবীন্দ্র সুরভীন্দ্রনাথ ছবি শর্ম্মা—

নিধু। বাপ! আপনার বাবার ত বেশ পছন্দ! বেড়ে নাম রেখেছেন!

কাব্যি। আজ্ঞে তিনি ত রাখেন নি। ও নাম আমি বেছে নিয়েছি!

বিধু। বাঃ বাঃ, স্বনামো পুরুষোধন্য! আপনার বাবা কি নাম রেখেছিলেন?

কাব্যি। মশায়, সে ভদ্র সমাজে বলবার নয়! আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

নিধু। বলুন না, মশায়! রোগ লুকুলে চিকিৎসা হবে কেমন ক'রে?

কাব্যি। মশায়, তিনি আমার অন্নপ্রাশনের সময় নাম রেখেছিলেন, প্যালারাম চক্রবর্ত্তী।

বিধু। আরে ছি ছি ছি! আপনার তখনই প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। তা আপনি বদলে ফেল্‌লেন—কপীন্দ্রনাথ গবিধর্ম্মা।

কাব্যি। কি বল্‌লেন মশায়? গবিধর্ম্মা?

বিধু। আজ্ঞে হাঁ! অবশ্য গবিধর্ম্মা। গাভী দেয় গোরস—কি না দুগ্ধ। আপনি দেন কাব্যরস, তা'তে গবা হয় মুগ্ধ!

কাব্যি। কি মিল, কি ঝঙ্কার—চমৎকার! কি বল্‌লেন, গবিধর্ম্মা? মশাই যদি অনুমতি করেন, ওটাও আমার নামের সঙ্গে জুড়ে দি! কি বলেন?

বিধু। নিশ্চয় নিশ্চয়!

কাব্যি। তা হ'লে কথাটা পারি কি নিতে টুকে আমার নোট-বুকে?

বিধু। বুক ঠুকে!

নিধু। বল না কেন তাল ঠুকে?

বিধু। আরে ভায়া, এ ত কুস্তির আখড়া নয় যে, তাল ঠুকে বলব! তুমি রোজ এক ডোজ ক'রে কবিতা-সবিতা ভাব-ভবিতা খাও। তা হ'লে শ্রীমার্কা ঘৃতের মত বিশুদ্ধ ভাব আসবে।

কাব্যি। কি কি মশাই? কবিতা-ভবিতা গাব-গবিতা? ওটা আমাকেও ত এক বোতল নিতে হচ্ছে? কত দাম?

নিধু। মশাই, গরিব দেশ! এখানে কি বেশী দাম করা যায়! বেচি সাড়ে চার টাকায়।

কাব্যি। দিন মশাই! কি ক'রে খাবো?

বিধু। চিৎ হয়ে প'ড়ে, পা দুটি উঁচু ক'রে, গালটা চ্যাগারে ধ'রে, ঢক্কাস ক'রে খাবেন।

কাব্যি। দেখুন, ডাক্তার বাবু, কাটলেট সম্বন্ধে একটা সনেট লিখছি, তা মিল খুঁজে পাচ্ছি নি।

বিধু। কি লিখেছেন?

কাব্যি। আজ্ঞে গোড়া ধরেছি—একদিন ছিলে তুমি মুরগীর ঠ্যাং—

বিধু। বাঃ, এখনি আমার মুখে জল আস্‌ছে!

নিধু। জল কি ভায়া, আমার মুখে ঢল নাবছে! তার পর, তার পর?

কাব্যি। তার পর এক মিল পাচ্ছি কোলা ব্যাং, কিন্তু ভাব পাচ্ছিনি!

বিধু। বেশ! আপনি আমার উদ্ভাবিত নিখিল ছন্দ-মিলনগন্ধ-মগজোগজ-গর্জ্জরী বোতল কয়েক খান, কেমন ভাব না পান দেখি!

কাব্যি। সে ত খাবই! কিন্তু তিন রাত্তির ঘুমুই নি মশাই! এইটের একটা উপায় করুন।

নিধু। আচ্ছা মশাই, বলুন না কেন—

এক দিন ছিলে তুমি মুরগীর ঠ্যাং—
লাফাতে লাফাতে যেতে যেন কোলাব্যাং।

কাব্যি। হয়েছে বটে, কিন্তু—

নিধু। এর আবার কিন্তু কি মশায়? কোলা ব্যাং ত কিন্তু হয়ে লাফায় না, একেবারে তড়াক্ ক'রে লাফ মারে!

কাব্যি। তা বটে! তবে কি জানেন! কবিরা বলেন, জগতে সব চেতন। মুখে তোল্‌বার সময় কাট্‌লেটের যদি মনে পড়ে যায় যে, এক দিন আমি কোলা ব্যাঙের মত লাফাতুম, আর অমনি লাফ মারে!

বিধু। ঠিক্ ঠিক্! আচ্ছা বলুন না কেন,—একদিন ছিলে তুমি মুরগীর ঠ্যাং, আড়ি ক'রে কবে কারে মেরেছিলে ল্যাং।

কাব্যি। এইবার ঠিক হয়েছে। আঃ বাঁচালেন! তার-পর লিখেছি—

টেবিল্ উপরে ডিস্ তদুপরি তুমি—
আলো ক'রে ব'সে আছ সারা বিশ্বভূমি।

তারপর একটু উদার ভাব দিয়েছি—

নাহি তব ভেদাভেদ সাদা আর কালা—

এরপর জালা, মালা, ডালা, গালা অনেক মিল আছে—এমন কি সেকেলে সদরালাকে পর্য্যন্ত টেনে আনা যায়, কিন্তু ঐ ভাবের অভাব।

নিধু। কাটলেটে ভাবের অভাব!

বিধু। কোন্ বেরসিকে এ কথা বলে? বেশ আপনি লিখুন—

নাহি তব ভেদাভেদ সাদা আর কালা
গরম্ গরম্ না খাবে সে শালার বেটা শালা!

কাব্যি। চমৎকার মিল, কিন্তু একটু আপত্তি আছে।

নিধু। আপত্তি কি মশাই! গরম গরম কাটলেটে আপত্তি! তা হ'লে দেখছি সত্যিই কলিকাল পড়েছে!

কাব্যি। তা নয়, মশাই! ঐ শালা কথাটা একটু অশ্লীল।

বিধু। উঃ, আপনি যে আমাকেও তাজ্জব ক'রে দিলেন! শালা অশ্লীল?

কাব্যি। আজ্ঞে, এখনকার যাঁরা রুচির হাল ধরেছেন, তাঁরা বলেন, শালা কথায় স্ত্রীকে মনে পড়িয়ে দেয়।

নিধু। তা হ'লে স্ত্রী অশ্লীল?

কাব্যি। আজ্ঞে ঘরের স্ত্রী অশ্লীল, পরস্ত্রী অশ্লীল নয়। আপনি ব্রাদার-ইন্-ল বলুন, অশ্লীল হবে না।

নিধু। কেন, মশাই? ব্রাদার-ইন্-ল বল্‌লে কি, মা গোঁসাইকে মনে পড়ে?

বিধু। যাক্, নিধু, আপোষে মিটিয়ে ফেল! গরম গরম না খাস্ ত পালা বেটা পালা!

কাব্যি। এইবার ঠিক হয়েছে। কি, ডাক্তার বাবু, ঐ ছন্দ-ছেঁচড়া, মিল চচ্চড়ি কি বল্‌লেন, ও-ও এক বোতল দিন। কত দাম?

নিধু। ঐ সব এক দর। সাড়ে চার টাকা।

কাব্যি। এ যে কে, এম্ দাসের চটির চেয়েও সস্তা!

বিধু। তবু ত লোকে খায় না।

কাব্যি। আর কেউ না খাক, আমি খাবো। কি নামটি বল্‌লেন? আর একবার বলুন! আর এই দামটা নিন্।

নিধু। নিখিলছন্দ-মিলগন্ধ মগজোগজ-গর্জ্জরী।

কাব্যি। বাঃ! কি নাম! একেবারে মধুমাখা! গদ্-গদ্ পদ-নন্দ-ছন্দমন্দমদনমঞ্জরী মশাই; যে উপকার করলেন, সে ত জীবনে শোধ কর্‌তে পারব না!

নিধু। কেন পারবেন না? পারতেই হবে!

কাব্যি। কি ক'রে মশাই, কি ক'রে?

নিধু। আপনিও আমাদের উপকার করুন।

কাব্যি। বলুন মশাই, বলুন, কি উপকার?

বিধু। দেখবেন, অনেকেই উপকার করবার বেলা নিরাকার হ'য়ে যান!

কাব্যি। আজ্ঞে, আমি সাকার থাক্‌ব, বলুন!

নিধু। বেশ! একটি মেয়ের পাত্র সন্ধান ক'রে দিন!

কাব্যি। মেয়েটি কার? আপনার?

বিধু। আজ্ঞে, আমার একলার নয়। আমার আর আমার সেই অশ্লীলের, অর্থাৎ পরিবারের। আমার একলার ব'লে দাবি করলে পুলিস কোর্টে দাঁড়াতে হবে।

কাব্যি। কেন মশাই?

বিধু। নালিশ ঠুকে দেবে ক্রিমিন্যাল্ মিস্ অ্যাপ্রো-প্রিয়েশন (Criminal misappropriation) অবৈধ আত্মসাৎ করণ।

কাব্যি। বটে বটে! আপনার আর আপনার পরি-বারের কন্যা! তিনি তা হ'লে ত—তা হ'লে ত—

বিধু। একেবারে বানানের বন্যা।

কাব্যি। বলেন কি!

নিধু। আজ্ঞে হাঁ! বানান না ক'রে জলগ্রহণ করে না।

কাব্যি। তাই ত!

নিধু। ভেবড়ে যাবেন না। পাত্র তার আগেই জন্মেছে। সেটিকে খুঁজে বার করতে হবে, আপনি করুন। বর-ক'নের মিলের মত আপনার কবিতার মিল হড়্ হড়্ ক'রে আস্‌বে। পার্‌বেন?

কাব্যি। নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিছু নেই ভয়, হবে জয়—

নিধু। এই দেখুন, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! কথাতেই লেগেছে মিলের গাঁদি, কাযে হ'লে একেবারে—একেবারে—

বিধু। ছাঁদা বাঁধি।

কাব্যি। বাঃ, এমন না হ'লে মিল—যেন কাক আর চিল! তবে এখন আসি, নমস্কার!

[কাব্যিনবিশের প্রস্থান।

বিধু। ওহে নিধু! সেই গীতগোবিন্দ ছুচ্ছুন্দর আস্‌ছে!

নিধু। আসুক, ভায়া, আসুক! টেঁপীর বে'র খরচটা ত যোগাড় চাই!

বিধু। এঃ, ব্রাদার, তোমার এখনও একটু তালিম বাকি আছে। একেবারে কেলেবর্ হ'তে পার নি!

নিধু। সে কি!

বিধু। তা বৈ কি! টেঁপীর বে'তে খরচ! একটি পয়সা নয়! সব বেয়ারিং পোষ্ট!

(গীতগোবিন্দ ছুচ্ছুন্দরের প্রবেশ)

আরে কও কথা! কালোয়াৎ যে! কেমন কিছু উপকার হচ্ছে?

গীত। হচ্ছে বৈ কি! একটু শুনুন দিকি!

গীত

মদনগোপাল—উঁহু।
তোমার চরণে হব চাম্‌চিটা লিহুঁ॥

নিধু। চাম্‌চিটা লিহুঁ কি মশাই?

গীত। জানেন না? আমাদের চট্টগ্রামের ভাষা! চাম্‌চিটা লিহুঁ মানে চাম্‌ড়ার এঁটুলি।

বিধু। কেষ্টর পায় এঁটুলি!

গীত। আজ্ঞে হাঁ! কিন্তু পাছে এঁটুলি বল্‌লে প্রভু ভয় পেয়ে পা গুটিয়ে নেন, তাই বল্‌ছি,—

চাম্‌চিটা লিহুঁ হব, না খাব রকত,
জনম জনম রব পরম ভকত,
দ্বিজ রামদাস ভণে পদে দিয়ে হুঁ-হুঁ!

নিধু। পদে দিয়ে হুঁ হুঁ?

গীত। নিশ্চয়! ওটা মিলের পদ!

দ্বিজ রামদাস ভণে পদে দিয়ে হুঁহুঁ,
ছাড়ালে না ছাড়ি বাবা যত ঠেল তুঁহুঁ!

বিধু। আহা—উহু-হু-হু—

গীত। কেমন? হয়েছে?

বিধু। হয়েছে। তবে আর একটু ভূতুড়ে তান ছাড়তে হবে। তা কোন চিন্তা নেই, আর বোতল দুই—তান-মান গীত-চীত সুর-পুর-ধূর্জ্জটী খেলেই একেবারে কম্ম কেয়ালো!:

গীত। যে আজ্ঞে! কিন্তু ভূতুড়ে তান কি রকম, একটু দেখিয়ে দিন!

বিধু। কি রকম জানেন?—

গীত

সেঁইয়া তেরি মেরি ঘেউ!
আরে সেঁইয়া—ওরে সেঁইয়া ঘেউ!
হেঁইয়া মারে জোয়ান্ ভেইয়া
রোয়ে ভেউ ভেউ!
হুঁসিয়ার হোকে সড়ক্ চল্ না
শুন্ ফুকারে ফেউ!
হিল্লি-দিল্লী যাকে বিল্লি
চিল্লে মেউ মেউ!

গীত। চমৎকার, চমৎকার! ঐ রকমটা না করতে পার্‌লে জন্মই বৃথা!

নিধু। ঘাব্‌ড়াবেন না! আর বোতল কয়েক সুর-পুর-ধূর্জ্জটি সেবন করুন, ঠিক্ চাম্‌চিকের আওয়াজ বেরুবে!

গীত। দিন মশাই! সাড়ে চার টাকা ত? এই নিন্।

(টেঁপীর প্রবেশ)

টেঁপী। বয়ে আকার বা, বয়ে আকার বা, বাবা, তয়ে আকার ত, ভাত হয়েছে। ময়ে আকার মা, ময়ে আকার মা মামা, এস!

[টেঁপীর প্রস্থান।

গীত। মশাই, মশাই!

বিধু-নিধু। আজ্ঞে আজ্ঞে—

গীত। এ ত বড় চমৎকার!

নিধু। আজ্ঞে হাঁ, যেজায় চমৎকার!

গীত। মেয়েটি কার?

বিধু। ওর বাবার।

গীত। বিবাহ হয়েছে?

বিধু। আজ্ঞে না!

নিধু। কেন বলুন দিকি? সন্ধানে পাত্র আছে না কি?

গীত। আছে, মশায়! তবে কি না, কিছু ছাড়তে হবে।

বিধু। তার অর্থ?

গীত। আজ্ঞে বরপণ ব'লে একটা প্রথা আছে।

বিধু। তেমনি বরপণ-নিবারিণী সভা আছে।

গীত। থাকলে কি হবে, মশায়! এক ভদ্রলোক বরপণ-নিবারিণী সভায় সই ক'রে এসে ছেলেকে পুলিন্দায় পু'রে ভি, পিতে বর পাঠিয়ে দিলেন।

বিধু। ভ্যালু পেয়েবল্ ডাকে!

গী। আজ্ঞে হাঁ—মূল্য-আদায়ী ডাকে।

বিধু। তার জন্য ভাবনা কি! আমি আগে থাকতে মিছেরাম রাম-রামের গদিতে বরাতী-হুণ্ডি কেটে দেব। মশায়, কিছুকাল ধরে প্রথা হয়েছে, বে হবে ব'লে মেয়েকে মাষ্টার রেখে গান শেখায়, আমি পয়সা খরচ ক'রে বানান্ শিখিয়েছি। লোকে এখন নতুন চায়, আমি নতুন পথ বার করেছি। তার একটা মূল্য নেই? আবার বরপণ?

গীত। ঠিক ঠিক! আমি এটা ভাবি নি। যে আজ্ঞে, আপনি আহার করুন গে। নমস্কার।

[গীতগোবিন্দ প্রস্থান।

নিধু। ভায়া, বোতলটা ফেলে গেল যে!

বিধু। টাকা ত দিয়েছে—খাও বা না খাও, গেঁটের কড়ি গুণে দিয়ে যাও। চল, ভাত জুড়োয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। বলেন কি, মশাই? আপনি যে অবাক্ করলেন! ঐ যে কথায় বলে গরু হারালে পাওয়া যায়—

২য়। সব সত্যি মশায়, সব সত্যি! বিধু ডাক্তারের প্যাটেণ্ট ওষুধ কথা কয়! এই সে দিন আমাদের পাড়ার মিত্তিরদের ছেলে হারিয়েছিল, এক বোতল ওষুধ খেতে না খেতে এসে হাজির। কত লোক কবি হ'ল, কালোয়াৎ হ'ল! কেবল এর প্যাটেণ্টের গুণে।

৩য়। মশাই, আমার মেয়েটির পাত্র জুটছে না, একটু মন্তরা ব'লে—

২য়। বেশ, এক ডোজ খেলে একেবারে অপ্সরার মত রূপ হবে!

৪র্থ। দেখুন, মুনসবের কোর্টে একটা মোকদ্দমা আছে—

২য়। বেশ, এক বোতল কিনে নিয়ে গিয়ে সেই মোন্-সবকে এক ডোজ খাইয়ে দেবেন—

১ম। মশাই, চাকরী-বাকরীর কিছু সুবিধে হয় বলতে পারেন?

২য়। নিশ্চয়! রোজ দরখাস্ত হাতে ক'রে বেরুবার আগে এক ডোজ খেয়ে বেরুবেন!

৫ম। মশায়, ভোট জোগাড় হয়?

২। অব্যর্থ! পোলিং ডে'তে লুচি কচুরি, সন্দেশ, লেম-নেড না খাইয়ে এক ডোজ ক'রে বিধু ডাক্তারের প্যাটেণ্ট খাইয়ে দিন, আপনাকে ভোট দিতে পথ পাবে না।

৪র্থ। মশায়, একটা কথা বলছিলাম কি, মোনসোবটা ভারি পাজি, কারুর কিছু খায় না।

২য়। হাঁ, এক একটা লোকের অমনি শুচিবাই আছে বটে! তা এক কায করুন, আপনার উকিলকে এক ডোজ খাইয়ে দেবেন।

৪র্থ। দুঃখের কথা বলব কি, মশাই! আমার উকিলটা বেজায় মুখচোরা।

২য়। মুখচোরা? আপনি এক বোতল অ্যাকোয়া পাৎকোয়া কিনে নিয়ে যান, এক মাত্রা খাইয়ে দেবেন, মুখে খই ফুটবে। বোবার বোল্ ছাড়ে, মশায়!

৪র্থ। আজ্ঞে বটে বটে!

২য়। বটে নয়, মশায়! গড'ড্যাম্ ইউ, মাই লর্ড ব'লে টেবিল্ চাপড়ে যখন দাঁড়াবে, হাকিম চচ্চড় ক'রে রায় লিখে ফেলবে।

৪র্থ। কিন্তু ডাক্তারখানা বন্ধ—

২য়। আপনি কিছু বায়না দিয়ে যান, আমি কিনে রাখব, কাল এসে নেবেন! যদি ফুরিয়ে যায়—

৪র্থ। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, বড় উপকার করলেন।

২য়। যাক্, বাবা, সিকেটা সিকেটাই লাভ!

[সকলে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধু ডাক্তারের অন্তঃপুর

টেপী। (ঠাঁই করিতে করিতে) অয়ে আকার আ আস্ সন—আসন। জি, এল্, এ, ডবল্এস্—গ্লাস। এস্, এ, এল্, টি—সণ্ট্ মানে নুন্।

(নেপথ্যে টেপীর মা)—ওলো টেপী, ভাত বাড়্ব ?

(বিধু-নিধুর প্রবেশ ও আসনে উপবেশন)

ওরা এসেছে ?

টেপী। হয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার—হাঁ।

(টেপীর মা অন্ন লইয়া প্রবেশ)

টে-মা। পোড়ারমুখি! বানান্ শোনাস তোর শাউড়িকে।

টেপী। আ চয়ে ছয়ে আকার চ্ছা—আচ্ছা।

টে-মা। আবার!

টেপী। না, মা, ভুল করে ফয়ে একার ফে লয়ে একার লে আর ছি—ফেলেছি।

নিধু। আচ্ছা, দিদি, করলেই বা দু'ট বানান্।

বিধু। আরে ভায়া, চেপে যাও না। মেয়ের যেমন বানান্, মেয়ের মার তেমনি বকা রোগ!

টেপী। রয়ে ওকার রো আর গ—রোগ—

টে-মা। ফের পোড়ারমুখি!

টেপী। পয়ে ওকার পো, ড়য়ে আকার ড়া আর র—পোড়ার—না, মা আর ক আর র ব আর না।

টে-মা। হার মান্ছি, বাছা! নাও ভাত ভাঙো, ঘি দি—

টেপী। ঘয়ে হস্তি ঘি আর দয়ে হস্তি দি—

[অপ্রতিভ হইয়া টেপীর প্রস্থান।

নিধু। ঘয়ে হস্তি ঘি আর দিতে হবে না, দিদি! অমনিই তোমার রাঁধুনী-পাগ্লা চালের যে গন্ধ বেরিয়েছে!

টে-মা। আহা, শালা-ভগ্নীপোতে মিলে যে গন্ধ বার কর রেতে—

বিধু। দেখ্ছিস, নিধু! মেয়েমানুষের বুদ্ধি কি না—

টে-মা। কেন, মেয়েমানুষের বুদ্ধি কি করলে ?

বিধু। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—ঐ যাঃ, ফস্ করে অশ্লীল কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল!

টে-মা। আর মিন্সেদের বুদ্ধি বুঝি—

বিধু। উ হুঁ হুঁ—বোল না—বোল না—ভয়ঙ্কর অশ্লীল—

টে-মা। মিন্সে বুঝি অশ্লীল ?

নিধু। কেন, দিদি, শোন নি! থিয়েটারে গান হচ্ছিল—বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দোব না! শুনে অডিয়েন্স একেবারে ক্ষেপে উঠ্ল! চেঁচামেচি করতে লাগ্ল, টিকিটের দাম ফিরিয়ে দাও, নয় গাও—বাজে কাজে কর্ত্তাকে আর যেতে দোব না।

টে-মা। ও মা কি হবে!

নিধু। তাতেই কি মিট্ল, দিদি! থিয়েটারের অন্দরমহল থেকে তখন আপত্তি হ'ল ওটাও বলা হবে না! স্বামী বলে কি তিনি হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা না কি? অ্যাক্ট্রেস্রা আবার চুপ করলে। তখন ম্যানেজার বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কুত্তা বল্লে কোন আপত্তি আছে? তখন ঐটেই চরম নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

টে-মা। গড় করি মা! তাই বুঝি স্ত্রীবুদ্ধি ?

বিধু। আরে না না!

টে-মা। তবে ?

বিধু। মেয়েমানুষদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি নেই। বোঝে না, যে ধানে ভাত, সেই ধানেই ধান্যেশ্বরী।

টে-মা। একেই বলে বুদ্ধির বেস্পতি! তবে টাট্কা ফল আর পচা! এখন থেকে তা হলে পান্তা পচিয়ে রাখ্ব ?

বিধু। তা হলে সত্যি সত্যিই প্রলয়ঙ্করী হয়ে দাঁড়াবে।

টে-মা। ওলো টেপি, দুধের বাটী এনে দে!

নেপথ্যে টেপী। দয়ে হ্রস্ব ধ, গ-র-ম করে নিয়ে যাব ?

টে-মা। শুন্লে মেয়ের আক্কেল! ওলো ঠাণ্ডা দুধ খাওয়াস্ তোর শ্বশুরকে। এই মেয়ে আমাকে পাগল করে দেবে, মা!

নিধু। তোমার ধম্কানিতে এখন ত দিদি অনেকটা কমেছে। সব কথা বানান্ করে বলে না। একটা একটা করে ফেলে!

টে-মা। বল্‌, মেয়েকে ত মাতৃকুলেশান না কি ছাই-ভস্ম পড়াচ্ছ। মাতৃকুল পিতৃকুল দুই কুলই উদ্ধার করবে আর কি! গেরস্তর মেয়ে, রান্নাবান্না মাথায় থাক্, দুধ জাল দিতে জানে না! কাল দুধটা চড়িয়ে বল্লাম, টেপি একটু দেখিস্ ত মা, যাই দুধ উথ্লে উঠেছে, মেয়ে অমনি তিড়িং মিড়িং করে নাপিয়ে উঠে চীৎকার—মা, মা, তালব্য শয়ে দীর্ঘ ইকার ঘয়ে রফলা—শীঘ্র এস, দুধ কয়ে চন্দ্রবিন্দু ওকার দন্ত্য

স—ফোঁস্ ফোঁস্ করে কড়া থেকে পালাচ্ছে! কি ঘেন্না, মা! বলি, কথা কও না যে!

বিধু। হুঁ!

টে-মা। হুঁ কি? হ্যাঁ রে নিধু, তুইও যে কথা কচ্ছিস্ নি?

নিধু। কথা কইবার মুখ আর রেখেছ কৈ, দিদি! অন্ন-ব্যঞ্জনে গাল ভরা! যে মাছের ঝোল্ রেঁধেছ, দিদি! তাই ভাবি! বোকা বেটারা বলে কি জানো, ব্রাত্তার? বলে, ভগবান ছিষ্টি করেছেন নির্ব্বোধের মত! আচ্ছা, বল ত দিদি, মাছগুলোকে ছোট ছোট পাখনা না দিয়ে যদি বড় বড় পাখা দিতেন, তা হলে কি বিপদ হ'ত?

টে-মা। বিপদ আবার কি হ'ত?

নিধু। নয়? তা হ'লে জালে পড়ত না টোপ গিল্ত? সব উড়ে পালাত!

টে-মা। আহা, ছিষ্টি বুঝি হয়েছে, তোমাদের খাবার জন্তে?

বিধু। নইলে ত পাঁঠার রাং মুর্গীর ঠ্যাং গড়বার কোন মানেই পাওয়া যায় না।

নিধু। ভায়া, শুধু কি তাই? মুর্গীর দেহটা গড়েছেন কেন?

টে-মা। কেন শুনি?

নিধু। কাট্‌লেট্, কারি, চপ এই সব হবার জন্তে।

(টেপীর দুধ লইয়া প্রবেশ)

টেপী। সি—এচ্—ও—পি—

টে-মা। দেখ হারামজাদি! ফের আমার সাম্‌নে বানান্ করবি ত মুখে গোবর গুঁজে দেব! পোড়ারমুখী বরের সঙ্গে কথা কবে বানান্ করে! মুখে ঝাঁটার বাড়ি মারবে।

নিধু। মেয়েটার ত ভারি বিপদ হল দেখছি! এখানে মুখে গোবর, শ্বশুরবাড়ী ঝাঁটা—

টেপী। ঝয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার ঝাঁ—

নিধু। থাক্ মা, ঐ অবধি! তুমি গোটা কতক পান সেজে ফেল ঝাঁ করে!

টেপী। পয়ে আকার দন্ত্য ন—পান

[বলিতে বলিতে টেপীর প্রস্থান।

টে-মা। হ্যাঁ গা, মেয়েকে ত বিউমি দোলানি ঝিবি করে তুলছ। তা কি মেমেদের মত স্বয়ম্বরা হবে, না, সেকালের সাবিত্রীর মত বর খুঁজতে বেরুবে! রাত্তিরে ত মদের নেশায় মোষের মত ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুবে। নাকের ডাকে পাড়ার লোক ঘুমুতে পারে না। পাশের বাড়ী থেকে জান্‌লা খুলে গাল দিতে লাগল, শোর খা মিন্‌সে শোর খা!

বিধু। আবার মিন্‌সে! তোমাদের কুরুচি কিছুতেই শোধরাবে না।

টে-মা। না শোধরাক্, বাপু! লোকের গালমন্দ আর খেতে পারি নি। সে দিন পাক্‌ড়াসী মাসী রাত তিনটের ডেকে তুলে বল্‌লে, বউমা, নাক-ডাকানো ত অনেক শুনেছি, বাছা! এমন সোরগোল্ তুলে রকম রকম রাগ-রাগিণীর আলাপ কারু সাধ্যি নেই, কালোয়াৎ হার মেনে যায়!

বিধু। ওরে নিধু! গীত-গোবিন্দ ছুচ্ছুন্দরকে ডেকে এনে একদিন শোনাতে পারিস্?

টে-মা। আহা, শোন্‌বার জন্তে আর লোককে নেমন্তন্ন করতে হবে না। অমনিতেই আসর সরগরম্! তারিপ করে দশ জনে দশ মুখে দশ কথা শোনাচ্ছে!

বিধু। কোন বেটা-বেটীর নাক ত ধার করে এনে ডাকাইনি যে দশ মুখে দশ কথা শোনাবে।

টে-মা। শোনায় সাধ করে! ঘুম যে এ পাড়া দিয়ে চলে না।

বিধু। কেন চল্‌বে না? আমি ত দিব্যি ঘুমুই। কিছু টের পাইনি।

টে-মা। এইবার তুমি হাসালে! নিজের নাকডাকা বুঝি নিজে শোনা যায়! তা এমন করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে ত চল্‌বে না, মেয়ের একে ছেয়ালো গড়ন।

বিধু। ঐ ত বিপদ! বছরের সঙ্গে সঙ্গে বয়সও বেড়ে যায় আর মেয়েও মাথা কাড়া দেয়। এটা স্বভাবের নিয়ম, তার জন্তে আমায় দোষী কোর না।

টে-মা। না—না, তামাসা করে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না। কথাটা মন দিয়ে শোন।

বিধু। বল, কান খাড়া আছে।

টে-মা। থাক্‌লে কি হবে! এ-কান দিয়ে সেঁধুবে, ও-কান দিয়ে বেরুবে ত! তা যাক্! সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণী তোমার সঙ্গে পড়ত না?

(পান লইয়া টেপীর প্রবেশ)

টেপী। এ-টি-টি-ও-আর-এন্-ই-ওয়াই—এটর্ণী মানে কি, বাবা ?

টে-মা। অ্যাটর্ণী মানে তোর শ্বশুর। পান সেজে সব ছড়িয়ে রেখে এসেছিস্ ত ?

টেপী। ঐ যাঃ! ভয়ে হ্রস্ব ভু, লয়ে একার লে—ভুলে গেছি—

[টেপীর প্রস্থান।

টে-মা। অবাক্ করলে মা! কোথা থেকে এ রোগ জুটল বাপু!

নিধু। তুমি ত বেশ, দিদি! ছেলেবেলা বানান্ পারত না বলে কত মার খেয়েছে। তুমিই না বলে দিয়েছিলে সর্ব্বদা বানান্ করবি ?

টে-মা। ঝকমারি করেছি বাপু! এখন সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণীর কথাটা মনে রেখ।

বিধু। কেন বল দিকি, খামকা সিধু অ্যাটর্ণীকে মুখস্থ করব কেন ? একটু অন্তরা ভাঙো।

টে-মা। বলি, তার ছেলেও টোর্ণী হয়েছে না ?

বিধু। ওঃ তাই বল, এক ঢিলে দুই পক্ষী সংহার! মেয়ে পার, বানানের অত্যাচার হতে নিস্তার! কিন্তু টোর্ণীর ত ছড়াছড়ি, বেশীর ভাগই হাঁড়ি চড়িয়ে বসে আছে!

টে-মা। না গো! শুনেছি ওর মাতামোর অগাধ বিষয়, ছেলে-পুলে নেই। ঐ ছেলেই সব পাবে।

বিধু। ভায়া, তবে ত লাগতে হচ্ছে!

নিধু। তা বটে! কিন্তু—

বিধু। ভায়া, আবার পেছু ডাকো কেন ? কাজ মাটী করতে কিন্তুর মত বালাই আর নেই! কিন্তু তোমার কিন্তুর ভিতর কি আছে, বার করে ফেল!

নিধু। ভাবছি কি জানো, ছেলে-পুলে নেই। হঠাৎ বৈরাগ্য হয়ে স্বদেশের হিতার্থে বিষয়টা উড়িয়ে দিয়ে যাবে না ত ?

টে-মা। না রে না! শুনেছি তার ঐ নাতি-অন্ত প্রাণ! ওলো টেপি, তোর মামার থালাটা তুলে নিয়ে খেতে বস্‌গে যা!

বিধু। আর আমার পাতটা বুঝি মাঠে মারা যাবে ?

টে-মা। তোমার পাতে খাবার লোক আছে।

বিধু। বল কি! পতিভক্তি! স্বর্গে যাবার ফন্দি!

(টেপীর প্রবেশ)

টেপী। ফ, দন্ত্য নয়ে দয়ে হ্রস্ব ইকার না দীর্ঘ ইকার মামা ?

নিধু। দু-ই হয়, মা। ফন্দিটা যদি বড় রকমের হয় তা হলে দীর্ঘ ইকার। আর ছোট খাট ফন্দি হলে হ্রস্ব ইকার।

(টেপীর মা বিধুর আসন থালা প্রভৃতি লইতে লইতে)

টে-মা। ওলো হস্তি দীর্ঘি পরে করিস। এখন থালা তুলে নে।

(থালা প্রভৃতি লইতে লইতে)

টেপী। থ য়ে আকার থা আর লা—

[উভয়ের প্রস্থান।

বিধু। ভায়া, একটা মৎলব আঁটতে হচ্ছে।

নিধু। চল, পরামর্শ করিগে। কিন্তু—

বিধু। তোমার অভিধান থেকে ও কথাটা তুলে দাও।

নিধু। না হে! অ্যাটর্ণী পাস্, তার ওপর বিষয় আছে। নিখরচায় কাজ হাঁসিস্ হবে কি ?

বিধু। বটে, কিন্তু—

নিধু। তা বটে, কিন্তু—

বিধু। চল, ঠাওরানো যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণীর আপিস

সিদ্ধেশ্বর ও ক্লার্ক

ক্লার্ক। মশাই, চাক্‌রীতে ঢুকে এস্তক ত একটি পয়সাও উপুড়হস্ত করেন নি, আর কিছু না দিলে চলছে না।

সিধু। কেন বল দিকি খামকা তুমি এমন মরিয়া হয়ে উঠেছ ?

ক্লার্ক। মশাই, পাঁচ বচ্ছর সিকিটি পয়সার মুখ দেখলাম না, তবু বলেন খামকা!

সিধু। ও হে, এই অ্যাটর্ণীপাড়াটা ঘুরে এস, ক'জন অ্যাটর্ণী মাইনে দিয়ে ক্লার্ক রাখে!

ক্লার্ক। মশাই, তারা কমিশন্ পায়।

সিধু। তুমিও পাবে।

ক্লার্ক। কবে ?

সিধু। কেস্ আনবে যবে।

ক্লার্ক। আপনাকে কেউ কেস্ দিতেই চায় না, তার আনব কি ? মিথ্যে কথা কয়ে কয়ে ত মুখ দিয়ে আর সত্যি বেরয় না।

সিধু। এটাও তা হলে মিথ্যে বল্‌ছ।

ক্লার্ক। দোহাই ধর্ম্ম। এ কথাটা সত্যি। মশাই, আপনার শ্বশুরমশাই-ই মুখ বেঁকান্!

সিধু। ব্যাকাগ, বেটা চশমখোর! তার কেস্ দিলেই আমি করব না কি ?

ক্লার্ক। আজ্ঞে তাঁর অপরাধ কি ?

সিধু। অপরাধ! ষষ্টিবাঁটায় আমায় নেমন্তন্ন করলে, আমি গেলাম, খেলাম। তার পর বিল্ করলাম।

ক্লার্ক। ও বাবা, বিল্!

সিধু। করব না! সে সময় বাড়ী থাকলে আমার হয় ত মক্কেল আস্‌ত!

ক্লার্ক। কোন ভদ্রলোক বাড়ীতে আত্মীয়তা করতে এলে—

সিধু। ওহে, অ্যাটর্ণীর আত্মীয়-স্বজন নেই। বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার দরুণ বিল্ করতে হবে। আমার সময়ের মূল্য আছে।

ক্লার্ক। মশাই, সব অ্যাটর্ণীই কি এই রকম ?

সিধু। গাছের সব ফল কি সমান হয় ? এ সব শিক্ষা তোমার এখনও বাকি।

ক্লার্ক। আমার শিখেও কাজ নেই, মশাই! এখন কিছু দিন।

সিধু। হবে, হবে! পিনুটুগোপালের বে'টা আগে হয়ে যাক্ না।

ক্লার্ক। আজ্ঞে এখন বল্‌ছেন বে'টা, তখন বল্‌বেন, আগে ব্যাটা হ'ক।

সিধু। ওহে কুড়োরাম! আমাদের দেশে বৈষ্ণব মহাজনরা একটা নীতি শিখিয়েছেন—রহু ধৈর্য্যং!

ক্লার্ক। মশাই, রহু ধৈর্য্যং যে বহু ধৈর্য্যং হয়ে গেছে।

সিধু। দেখ, এ সব পয়সা-কড়ির ব্যাপার, ব্যস্ত হলে চলে ? আমাকে দেখ না—যাচ্ছি কোথায় ঠিক্ নেই, তবু মাকড়্‌সার মত জাল পেতে বসে আছি। যাও, মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করগে!

ক্লার্ক। বাবু, কাজ কোথায় যে করব! আপনার কাজের ভিতর ত কোন ভদ্রলোক এলে লোহার সিন্দুক খুলে থলেভরা খোলামকুচি বাজানো আর বলা যে বেয়ারাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি টাকা জমা দিতে!

সিধু। কুড়োরাম যে ধর্ম্মের দোহাই তুমি দিলে, সেই ধর্ম্মই বলে, টাকাও যা, খোলামকুচিও তা! এখন যাও। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। খোলামকুচিগুলো আজ একটু ভাল করে বাজিয়ো আর ব্যাঙ্কে জমার টাকাটা দু'হাজার আড়াই হাজার অবধি বাড়িয়ে বোল। ধর্ম্ম-সত্য-মিথ্যা এ সব শুচি-বাই থাক্‌লে অ্যাটর্ণী উকীলের হাঁড়ি চড়ে না।

ক্লার্ক। মশাই, না থেকেই কোন চড়্‌ছে।

সিধু। যাও, আর আমার সময় নষ্ট কোর না।

ক্লার্ক। দোহাই মশাই! তার জন্যে বিল্ করবেন না যেন!

[ক্লার্কের প্রস্থান।

(বিধু ডাক্তারের প্রবেশ)

সিধু। আরে কও কথা! সিভিল সার্জ্জন্ যে।

বিধু। হেরে গেছি, ব্রাদার, হেরে গেছি।

সিধু। কি রকম, কি রকম ?

বিধু। আর রকম কি! একেবারে যখম্! গিন্নীর সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম যে, তুমি কিছুতেই চিন্‌তে পারবে না।

সিধু। চিন্‌তে পারব না! বাপ্‌ রে! সে কি ভোল্‌বার! আমার কম পেন্সিল্‌টা তুমি গেঁড়া দিয়েছ! এখনও পেন্সিল্ হারালে আমার বিধুকেই মনে পড়ে।

বিধু। তুমিও, ভায়া, আমার কাছ থেকে কম ভোগা দাও নি! ভাজা মসলা পান, সুপুরি—

সিধু। যাক্, ভায়া, শোধ-বোধ! (শেক্‌হ্যাণ্ড্ করিতে করিতে) এখনও তেমনি পান খাও ত ?

বিধু। একে ত ছেলেবেলায় বদ-অভ্যাস, তার ওপর গিন্নি বেজায় পান খান্। তাই ভাবলাম্ যৌথ-কারবার, আমি বা ঠকে যাই কেন ?

সিধু। বটে! বটে! তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়। পান আনাই দাঁড়াও! বেয়ারা, বেয়ারা!

(ক্লার্কের প্রবেশ)

ক্লার্ক। বেয়ারাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি।

সিধু। ও, তাই বল! আজ আদায় কত? কত জমা দিতে পাঠালে?

ক্লার্ক। আজ আদায় বড় বেশী হয় নি—সতের শ' পঞ্চাশ।

[ক্লার্কের প্রস্থান।

বিধু। বাবাজিও শুন্‌ছি অ্যাটর্ণী হয়েছেন? এইবার বাপ-বেটায় সহরটা লুটবে আর কি!

সিধু। তুমিও কি কসুর করছ, ভায়া! যে বাড়ীতে যাই, দেখি বিধু ডাক্তারের প্যাটেণ্ট্। তারপর আছ কেমন?

বিধু। ভাল আর থাকতে দেয় কৈ, ব্রাদার? ঘরে আছেন এক গিন্নি। মেয়ে জন্মাবার আগে থেকে তিনি গৌরীদানের তাড়া লাগিয়েছেন।

সিধু। মেয়ে জন্মাবার আগে?

বিধু। ঐ হ'ল। আগে থাক্‌তে দাবিটা দিয়ে রাখলে আর তামাদি হবার ভয় থাকে না।

সিধু। ঠিক্ ঠিক্! তারপর?

বিধু। তারপর আজ বছর বারো হ'ল, তিনি বছর বছরই তাড়া লাগাচ্ছেন।

সিধু। তা হলে গৌরীদান আর হল না?

বিধু। হবে, হবে! আমার ত একটি বৈ মেয়ে নয়। এই পনেরয় পড়েছে, ষোল বছরে একেবারে ডবল্ গৌরীদান করব।

সিধু। বা, বেড়ে সোজা হিসেব করে রেখেছ ত?

বিধু। আরে, ব্রাদার, মেয়েমানুষ কি হিসেব বোঝে! এই ত গেল ঘরের খবর।

সিধু। তারপর বাইরের?

বিধু। ইংরেজটোলায় খান্‌কতক্ ভাড়াটে বাড়ী আছে। ভাড়া কেউ একটি পয়সা বাড়াতে চায় না। বরং কমাবার দিকেই ঝোঁক। একজন ত ছিল পঁচাশি, করলে সত্তর। তার ওপর আবদার কত! আজ কলি ফিরিয়ে দাও, তাও সারা বাড়ীটা। আমি বল্লাম্ তার দরকার কি! তোমায় গায়ে এক পোঁচ কলি যদি ধরিয়ে দি, সে ত একই কথা হবে!

সিধু। ঠিক্ ঠিক্! তাই দিলে ত?

বিধু। কৈ আর দিতে দিলে! বুড়ো বল্‌লে, ভগবান্ আমার মাথায় চুণকাম্ করে দিয়েছে, আপনি যদি গায় কলি ধরিয়ে দাও, তা হলে খোদার ওপর খোদ্‌কারি হবে বটে! তা যা হ'ক, ক্ষেমা-ঘেন্না করে যদি ফেরালুম, ত বলে ছাতের বালি ঝরে পড়ছে, মেরামত কর।

সিধু। বটে, বটে! তুমি বল্‌লে না কেন যে, তোমার মুখে চুণ-কালি লেপে দিলেই বালি পড়া বন্ধ হবে।

বিধু। বল কি, ভায়া!

সিধু। হু-হুঁ, ব্রাদার! আমার আধখানা বাড়ী ভাড়া দি। মাঝখানে একটা বাঁশের পার্টিশন্ আছে। বাঁশ-গুলোর আক্কেল্ নেই, ব্রাদার, বর্ষার জলে প'চে ভেঙ্গে পড়্‌তে সুরু করলে! বলে মেরামত কর! আমি বল্লাম, বাঁশ পচালে বর্ষা, আমি করবো মেরামত? বল্‌লে কি জানো?

বিধু। কি?

সিধু। বল্‌লে, আপনি অ্যাটর্ণী কি না? চিরকেলে প্রবাদ আছে—চোর চায় ভাঙা বেড়া। যাক্, ব্রাদার! তোমার ভাড়াটেদের আমি জব্দ করে দেব। কিন্তু তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। ভয় নেই, এক লাফে হিমা-লয়ের চূড়ায় উঠতে বল্‌ব না। আমার ছেলের একটি পাত্রী খুঁজে দাও।

বিধু। কার?

সিধু। আমার ছেলে হে—পিন্টুগোপাল।

বিধু। পাত্রীর অভাব কি! কিন্তু তুমি অত ব্যস্ত হয়েছ কেন? অরক্ষণীয়া কন্যা ত নয়।

সিধু। ব্যস্ত হয়েছি কেন? (এদিক-ওদিক চাহিয়া) দেখ দিকি দরজার বাইরে কেউ আছে কি না?

বিধু। (বহির্দ্দেশ দেখিয়া আসিয়া) কি! ব্যাপারখানা কি?

সিধু। (চাপা গলায়) ব্যাপার আর কি! এস্রাজ শিখ্‌ছে।

বিধু। কে? পিন্টুগোপাল? তাতে অপরাধটা কি?

সিধু। অপরাধ? অপরাধ—পাবলিক্ নুইস্যান্স (Public nuisance)—পিনাল্ কোডের ২৬৮ ধারা।

বিধু। কেন, ব্রাদার, এস্রাজের আওয়াজ ত বেড়ে মিঠে।

সিধু। মিঠে? রোজ সন্ধ্যার পর গিয়ে একটু করে শুনে এস না! এস্রাজের আওয়াজ মিঠে, একশ'বার স্বীকার

ধরি। কিন্তু আমার বংশধর যে কেমন করে সেই সড়ঙ্গে যন্ত্রটার ভিতর থেকে তেমন সব বিটকেল আওয়াজ বের করে, ভেবে ত পাই নে!

বিধু। তায় আশ্চর্য্য কি! নাক ত এত ছোট, কিন্তু যখন ডাকে, পাড়ায় খুন্‌খারাপি উপস্থিত হয়।

সিধু। ঠাট্টা নয়, ব্রাদার! একটাও ভাড়াটে টেঁকাতে পারছিনি!

বিধু। কেন হে?

সিধু। কেন? রাত দুকুরে যখন কসরৎ সুরু হয়, মনে হয়, যেন দশ লাখ নরকের আসামী আমার বাড়ী ঢুকে দুকুরে মাতন্ সুরু করেছে। তখন আর আমার ছেলে বলে জ্ঞান থাকে না। ইচ্ছে করে যন্ত্রটা ওর মাথায় ভেঙ্গে ফেলি। কেবল গিন্নির জন্যে পারি নি। তার আদুরে গোপাল। তার ওপর মাতামহর বিষয় পাবে।

বিধু। কে? পিন্টু?

সিধু। হাঁ হে! আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরের এক মেয়ে। বিষয় অগাধ আর পিন্টুই সব পাবে।

বিধু। তার ঠিক কি! হঠাৎ স্বদেশী খেয়াল ঘাড়ে চাপলে—

সিধু। আরে রাম-রাম! স্বদেশী দেখলে তাড়া করে। বাড়ীতে বেয়ারাটার নাম রেখেছে বিদেশী।

বিধু। তাই ত ভায়া, বড় মুস্কিলে পড়েছ!

সিধু। রক্ষা কর, ভাই!

বিধু। দিন-রাত কস্‌রৎ করে বুঝি?

সিধু। সুধু কি কস্‌রৎ! আবার গৎ আউড়ে যখন মুখে বাজনার বোল দেয়, মাথায় খুন চড়ে যায়!

বিধু। বেশ ত, খুনোখুনির দরকার কি! বারণ করলেই ত হয়।

সিধু। বারণ! ত্যাজ্যিপুত্তুর করবার ভয় দেখিয়েছি!

বিধু। কি বলে?

সিধু। বলে, দাদামশায়কে বলে তোমার মাসহারা বন্ধ করে দেব।

বিধু। শ্বশুর বুঝি মাসহারা দেন?

সিধু। সে আমাকে নয়, তাঁর মেয়েকে।

বিধু। ঐ হ'ল! কান টান্‌লেই মাথা আসে।

সিধু। কান কি, ভায়া, এ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি! একটা উপায় কর।

বিধু। বেশ! তোমার দর কত?

সিধু। তার মানে?

বিধু। কি হলে ছেলেকে বেচবে হে?

সিধু। ঘরের কড়ি দিয়ে। আমি সিকিটি পয়সা চাই নি।

বিধু। (সোল্লাসে) রাজি, ব্রাদার, রাজি।

সিধু। অর্থাৎ? রাজি কে? তুমি? ডবল্ গৌরীদান করবে না?

বিধু। তোমার হিতার্থে স্বার্থ ত্যাগ।

সিধু। (আলিঙ্গন করিয়া) কিন্তু, ভাই, এক সর্ত্ত। তোমার কন্যা পিন্টুর এস্‌রাজ রোগ সারাতে পারবে ত?

বিধু। তিন দিনে।

সিধু। তা হ'লে ছেলে দেখ।

বিধু। কিছু দরকার নেই।

সিধু। না না, সে কি হয়! এক পয়সার একটা হাঁড়ী কিন্‌তে লোক তিনবার বাজিয়ে নেয়!

বিধু। আচ্ছা বেশ! যখন জেদ করছ! কিন্তু তোমার ঘড়ীটা দেখ দিকি, কটা বাজল?

সিধু। ঘড়ীটা, ব্রাদার, মেরামত করতে দিয়েছি।

বিধু। তবে কি সুধুই চেন্ ঝুলিয়ে রেখেছ?

সিধু। ভড়ং চাই হে! নইলে ব্যবসা চলে? কিন্তু তোমার সময়ের দরকার কি? বারবেলার ভয়?

বিধু। ও সব শুচি-বাই নেই, ব্রাদার! তবে একটা জরুরী কন্‌শালটেশন্ আছে।

সিধু। কার সঙ্গে হে?

বিধু। ঐ যে নতুন এসেছে, রাসিয়ান্ ডাক্তার—ভেদ্ বমনফ্-শমনফ্—ওলাউঠোর এক্সপার্ট (Expert) ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে সহর ওজোড় করলে! আমি এলাম বলে।

সিধু। ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—আমারও যে কন্‌শালটেশান্!

বিধু। কার সঙ্গে হে?

সিধু। ঐ যে জার্ম্মান্ কৌন্‌সুলি—হার্ ভন্ বন্ বন্ শুটকে ছিচকে চোর। সহরটা লুটে নিলে।

বিধু। তুমি ত, ব্রাদার, তার পকেট লুটছ? বেশ আমি ঘণ্টাখানেকের ভিতর আসছি! [বিধুর প্রস্থান।

(ক্লার্কের প্রবেশ)

ক্লার্ক। মশাই, এর নামে কি বিল করতে হবে।

সিধু। একটু সবুর কর! একটা বড়গোছের দাঁও আছে।

ক্লার্ক। আমাকে কিন্তু পাঁচ পার্সেণ্ট কমিশন দিতে হবে।

সিধু। নিশ্চয়, নিশ্চয়! রহু ধৈর্যং!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পিন্টুগোপালের আপিস ঘর

পিন্টুগোপাল

পিন্টু। পা—পা—পা মা—ধা—পা—পা
গা—মা—গা—রে সা—সা—রে—গা—
ও পাড়ায় দুধ যোগাতে যাই গো আমার বেলা হল—
পা—পা—পা—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্
দুধ যোগাতে—মা—ধা—পা—পা
ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্
গা—মা— গা—রে—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্
যাই গো আমার—সা—সা—রে—গা—
ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্—বেলা হল—
ও পাড়ায় দুধ যোগাতে যাই গো আমার বেলা হল—
ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্
তা—ধিন্—ধিন্—তা—তিন্—তিন্—
পা—পা—পা—তিন্—তিন্—তা—তিন্—তিন্

(নেপথ্যে পদশব্দ)

কে আবার আসছে! আদালতে প্র্যাক্‌টিস্ ত ফ্যান্‌চাটিস্! একটু নিরিবিলে যে গান-বাজনা প্র্যাক্‌টিস্ করব, তারও যো নেই! কোন বেটা মূর্তিমন্ত এসে খাড়া হবে! (ভেংচাইয়া) এক গাল দাঁত বার করে বলবে—মশাই আমার দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন দিতে বছর তিনেক দেরি হয়ে গেছে, দেখুন দিকি, তামাদি হয়েছে কি না! কারুর গুষ্টির পিণ্ডি দেওয়া হয় নি, তারা খোর-পোষের নালিস্ করতে পারে কি না! ও হো! পরাণে যে ক্লায়েণ্ট্ পাঠাবে বলেছিল, সেই না কি? নাঃ, এ চেনা জুতো! এ ছেঁড়া চটি, ছুকড়ের মত ছ্যাচ্ছ্যাড় করছে!—পা—পা—পা—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্! বন্ধু ত পরাণ! একেবারে নিরেট্ গন্নাণ! নইলে আমার কাছে মক্কেল্ পাঠায়! মা—ধা—পা—পা—দুধ যোগাতে—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্—আঃ বেটা যে আস্‌তেই চায় না। কিছু হাতাচ্ছে না কি!

(দুই পকেটে দুই ছেঁড়া চটি পুরিয়া গীতগোবিন্দ ছুচ্ছুন্দরের প্রবেশ)

আরে আসুন, আসুন। গীতগোবিন্দ ছুচ্ছুন্দর! গা—মা—গা—রে—যাই গো আমার—সা—সা—রে—গা—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্—

গীত। পিন্টুগোপাল মশাই আছেন?

পিন্টু। কি আপদ! চোখের সাম্‌নে দেখছ!

গীত। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে! তা হলে আছেন? আঃ বাঁচলাম্!

পিন্টু। এর আগে কি মরেছিলেন?

গীত। বাঃ, কি রসিকতা! পিন্টু বাবু, আপনি অত্যন্ত রসিক!

পিন্টু। কিন্তু আপনার চেয়ে নয়!

গীত। কেন, কেন?

পিন্টু। ছেঁড়া চটি জোড়াটা পকেটে পুরে এসেছেন কেন? ওটা কি পকেটে করেই বেড়ান হয়?

গীত। বাঃ, আপনি একান্ত, নিতান্ত, অত্যন্ত, প্রাণান্ত রসিক!

পিন্টু। না, না! জুত আছে, এটাও জানানো হল, আর রাস্তা চলায় বেশী ক্ষইবেও না! কেমন তাই ত?

গীত। আজ্ঞে ঠিক্ তা নয়! কি জানেন, অ্যাটর্ণী বাড়ী এসেছি! আমার এক বন্ধু বাইজীর বাড়ী গান শুনে এসে বলেছিল, বাবা—পিরীতি এক কাননই বটে! চাদরখানা চাদরখানাই গেল! সেই অবধি আমার আক্কেল্ হয়েছে মশাই!

পিন্টু। ও বাবা! পা—পা—পা—মা—ধা—পা—পা—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্—আচ্ছা, গীতগোবিন্দ মশাই, আপনার ঐ ছুচ্ছুন্দর পদবীটা কি চাটুয্যে মুকুয্যের মত জাতীয়—

গীত। 'আজ্ঞে না না—ওটা আমার স্বোপার্জ্জিত। কালোয়াৎ-সমিতি থেকে প্রাপ্ত। সম্মানের উপাধি। আমি ঐ যে কীর্ত্তনটা গাই (সুর করিয়া) মদনগোপাল—উহুঁ—

পিন্টু। তা—ধিন্—ধিন্—তা, তা—ধিন্—ধিন্—তা।

গীত। তারা সবাই শুনে তারিফ ক'রে বল্লেন, আজ ছুঁচোর কেত্তন প্রত্যক্ষ শুন্লাম! সেই অবধি তাঁরা উপাধি দিলেন, ছুচ্ছুন্দর! দেখুন, আপনি যে রকম রসিক—তাতে রসিক-মূষিক-চণ্ড কৌশিক খেতাব অনায়াসে পেতে পারেন!

পিন্টু। দরকার নেই, মশাই! পা—পা—পা—মা—ধা—পা—পা—গা—মা—গা—রে—সা—সা—রে—গা—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্, তা—ধিন্—ধিন্, ঘা—ছ—ত্তিন্।

গীত। বাঃ, বেজায় চমৎকার বোল বার করেছেন ত? ওটা আমাকে লিখে দিতে হবে, অভ্যাস করব।

পিন্টু। পা—পা পা—মা—ধা—পা—পা—ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্—

গীত। (সুর করিয়া) ঘিন্—ঘিন্—গা—ঘিন্—ঘিন্—করছে আমার সকাল থেকে—ঘিন্—ঘিন্—গা—ঘিন্—ঘিন্ করছে আমার সকাল থেকে! বাঃ, চমৎকার বোল বার করেছেন! কিন্তু পিন্টু মশাই! সে দিন যা দেখে এসেছি! ও হো-হো-হো! কি আপনারা এগজিবিশন্ করেন!

পিন্টু। কি রকম, কি রকম?

গীত। আর রকম কি! এবার গান-বাজনার বীজ বদ্লে ফেলে একেবারে আসর সরগরম্ ক'রে তুল্ব। নতুন রকম ছিষ্টি হবে। একেবারে সুধা-বিষ্টি! ভিষ্টিরিয়া ধ'রে যাবে, মশাই!

পিন্টু। বলেন কি!

গীত। আর বলাবলি কি! কথা কইছে খালি বানান্! মুখে খই ফুটছে!

পিন্টু। সত্যি না কি?

গীত। (চটী বাহির করিয়া) মশাই, মিথ্যে কই ত এই ছেঁড়া চটী খাই!

পিন্টু। ধিন্—ধিন্—তা—ধিন্—ধিন্, ঘা—ছ—ত্তিন্—খালি বানান্?

গীত। আজ্ঞে বানান্ না ক'রে একটা কথা ত কয়ই না, বোধ করি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বানান্ করে।

পিন্টু। সে কি!

গীত। আপনি সোজায় বল্লেন, সে কি'! সে হ'লে বলত (সুর করিয়া) সয়ে একার সে, কয়ে হস্তি কি—সে—এ—কি!

পিন্টু। বলেন কি! স্ত্রীলোক না পুরুষ?

গীত। ঐ ত মজা! স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়! একেবারে মহামারী ব্যাপার—কুমারী।

পিন্টু। বটে, বটে!

গীত। তাই ত বল্ছি! একে পেলে গান আর বানান্ এক ক'রে বাংলা দেশে একটা নতুন কাণ্ড কারখানা করা যাবে। কিন্তু ভয়, পাছে বেহাত হয়।

পিন্টু। বে-হাত কি রকম?

গীত। বুঝলেন না! বে ক'রে নে যাবে কোন্ মড়া—মাজাবে কড়া—ভাজাবে বড়া, দেওয়াবে গোবর-ছড়া—নয় জল তোলাবে ঘড়া ঘড়া!

পিন্টু। দড়ি—দড়া দিয়ে ত আর বেঁধে রাখা যাবে না। উপায় কি?

গীত। উপায় আপনি।

পিন্টু। আমি!

গীত। নিশ্চয়! আপনি বে ক'রে ফেলুন।

পিন্টু। সেই বানান্‌কে?

গীত। আপনি বুঝছেন না। আপনার জিনিয়াস্ যেমন এস্রাজ আর বাজনার বোল, তার তেমনি বানান্। এই দুই জিনিয়াস্ এক হলে, কাঠায় কাঠায় ধূল্‌পরিমাণ!—শুভঙ্কর, মশাই!

পিন্টু। কি, গায় ধূলো দেবে?

গীত। দেয় দেবে! কিন্তু কি মজাটা হবে, ভাবুন দিকি—ফুলশয্যার রাত্তিরে আপনি সোজায় বল্বেন, তোমায় ভালবাসি, কিন্তু সে বল্বে—(সুর করিয়া) ভয়ে আকার ল, বয়ে আকার সি—ভালবাসি, তয়ে ওকার—ময়ে আকার রে—তোমারে, পয়ে হস্তি, আন্টু, গয়ে ওকার, পাল—পিন্টুগোপাল—ভালবাসি তোমারে পিন্টুগোপাল—(ভঙ্গী করিয়া) পিন্টু আন্টু—আন্টু—পিন্টু—

পিন্টু। বেরো বেটাচ্ছেলে! (ভ্যাংচাইয়া) পিন্টু—আন্টু—পিন্টু—আন্টু (চটী কাড়িয়া লইয়া) ফের এলে তোর এই চটী পেটা করব!

গীত। তা যাচ্ছি, কিন্তু আপনি আমার প্রস্তাবটা ভাববেন। (সুর করিয়া) ভয়ে আকার ব, বয়ে একার ন ভাববেন—অ-অ-অ—

পিন্টু। হুঁ, ভাব্‌ব! তোর মুণ্ডু করব! বেরো!

গীত। পয়ে রফলা পার অ—প্রণাম।

পিন্টু। ফের! ছুচ্ছুন্দর বেটা! ছুঁচো বেটা!

গীত। (প্রস্থান করিতে করিতে) ছয়ে চন্দ্রবিন্দু উকার চয়ে ওকার চো—

[গীতের প্রস্থান।

পিন্টু। আপদ গেল! (কান পাতিয়া) আবার ফেরে না কি?

(গীতের পুনঃপ্রবেশ)

গীত। চ—টয়ে হস্তি ফেলে গেছি।

পিন্টু। তুই নেহাত একটা খুন-খারাপি করবি?

[গীতের প্রস্থান।

পিন্টু। (কান পাতিয়া) এইবার নিশ্চয় পরাণের ক্লায়েণ্ট আস্‌ছে।

(বিধু ডাক্তারের প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক, আসুন, আসুন! আমি ভাবছিলাম, আপনি বুঝি এলেন না। তা যাক্! আমার কাছে যখন এসেছেন, আপনার কোন চিন্তা নেই। যেমন ক'রে পারি, আপনাকে দায় থেকে উদ্ধার করব।

বিধু। দেখো, বাবাজী, কথা দিচ্ছ!

পিন্টু। বাবাজী কি রকম? মনে রাখবেন, এটা বৈরিগীর আখড়া নয়, অ্যাটর্ণীর আপিস্। এখানে বাবাজী-টাবাজি বলে ফাঁকি চল্‌বে না। চাকি চাই।

বিধু। কিসের চাকি?

পিন্টু। ন্যাকা না কি? চাকি—চাকি—রূপোর চাকি! টয়ে আকার টা, কয়ে আকার কা—টাকা! এই রে! আমার ঘাড়েও দেখছি, বানান্ চাপিয়ে গেছে!

বিধু। কে, বাবাজী!

পিন্টু। সে যেই হ'ক্! টাকা বার কর।

বিধু। সে হবে হবে! আশীর্ব্বাদের সময়।

পিন্টু। বটে! আশীর্ব্বাদে কাজ সারবে! ফাঁকির মৎলব! সে পাত্তর পিন্টুগোপাল নয়। টাকা বার কর। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে!

(বিধুর চেয়ারে উপবেশন)

পিন্টু। কোথাকার বেহায়া তুমি হে! শেকড় গেড়ে বস্‌ছ? পরাণে ত আচ্ছা এক জোচ্চোরকে পাঠিয়েছে দেখছি!

বিধু। পরাণে ত আমায় পাঠায় নি, বাবাজী।

পিন্টু। তবে কোন্ গাধা পাঠিয়েছে?

বিধু। তোমার বাবা।

পিন্টু। আবার বাপ তুলে ঠাট্টা! দেখ, আগে এক জনের সঙ্গে বকাবকি ক'রে আমার মেজাজ চ'টে আছে। ঠাট্টা ভাল লাগে না।

বিধু। ঠাট্টা কি, বাবাজী! আমি আসতে চাই নি। তোমার বাবা জোর করে পাঠিয়েছেন।

পিন্টু। বাবাই হ'ক আর খুড়োই হ'ক, বেয়ারিং পোষ্টে আমি কারুর কাজ করি নি। এতক্ষণ আমার সময় নষ্ট করলে, টাকা দাও নইলে চাদর কেড়ে নোব।

বিধু। তোমার মৎলবটা কি, বাবাজি! আমি ত আইন আদালত করতে আসি নি।

পিন্টু। তবে কি জন্য আসা হয়েছে? সং দেখতে, না, রং-তামাসা করতে?

বিধু। না, সম্বন্ধ করতে।

পিন্টু। ওঃ, তাই বল! অন্তরা ভাঙো! তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়! ঘট-কচু-ড়ামণি! কিন্তু বাবা, আমার কাছে পষ্ট কথা। বাবাকে যা দেবে, তার ওপর আমাকে কিছু নগদ ছাড়তে হবে!

বিধু। বেশ ত, বাবাজী; আগে মেয়ে পছন্দ কর।

পিন্টু। কিছু দরকার নেই! নগদ, নগদ—

বিধু। সে কি, বাবাজী, যদি কাণা-খোঁড়া হয়—

পিন্টু। হ'ল হ'লই! মূল্য ধ'রে দিলেই হবে।

বিধু। কি রকম?

পিন্টু। এক চোখ কাণা হ'লে একশ', দু চোখ হ'লে দু'শ। কি বল, তোমার ক্লায়েণ্ট পারবে? কার মেয়ে?

বিধু। আমার।

পিন্টু। (অপ্রতিভভাবে) তাই ত! (পরে অন্যমনস্ক হইয়া) নি-সা-ধা-নি-পা-ধা কিটি-কিটি-তাক্, ধুম্-কিটি-কিটিতাক্

বিধু। গাম্মা-পাম্মা-গা-রে-সা—ধাক্-কিটি-কিটিতাক্; নাক্ কাটি-খুড়ি থাক,—গাও, বাবাজী, বেহাগ খাম্বাজ। চলুক চলুক—সাগ্‌গা সাগ্‌গা-মাপ্পা-নিপ্পা, কোথা যাও, বাবাজী! গৎটা শেষ ক'রে যাও।

পিন্টু। (প্রস্থান করিতে করিতে) আস্‌ছি, আস্‌ছি! আপনি ততক্ষণ চালান! আমি এস্‌রাজটা আনি—

[পিন্টু প্রস্থান।

বিধু। এমন নইলে ছেলে! জামাই করতে হয় ত এমনি!

(সিধু অ্যাটর্ণীর প্রবেশ)

এই যে বরের বাপ!

সিধু। পিন্টু চ'লে গেল কেন? কেমন? ছেলে পছন্দ?

বিধু। খুব! খুব!

সিধু। বোল্-টোল্ কিছু শুন্‌লে নাকি!

বিধু। শুন্‌ব না! তুমি না বল্‌ছিলে, হাঁড়ী কেন্‌বার সময় বাজিয়ে নিতে হয়। ভুল, ব্রাদার, ভুল! তোমার হাঁড়ী বাজাতে হয় না, আপনি বাজে।

সিধু। তা হ'লে হাঁড়ী পছন্দ?

বিধু। খুব।

সিধু। তবে দিনস্থির ক'রে ফেল। কিন্তু ভায়া, সর্ত্তটা মনে আছে?

বিধু। নিশ্চয়। এক দিন আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবে চল। সেই দিন দিনস্থির করা যাবে। কিন্তু ভায়া, ভাবছি, ঐ বাজনার বোল কি বন্ধ করা ভাল হবে!

সিধু। তা হ'লে তুমি ঘরজামাই রেখো। আমার কাছে, ভাই, স্পষ্ট কথা।

বিধু। সেটা তোমাদের বাপ-বেটা দুজনেরই গুণ! পষ্ট ক'রে বল্‌লে কিছু নগদ চাই। সে পরের কথা! আগে দিন-স্থির হ'ক! (কৃত্রিম বোতলের ইঙ্গিত করিয়া) চলে ত?

সিধু। খুব, খুব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রেয়সী পার্ক

যুবতীগণের নৃত্য-গীত

রমণীর মোহন বেণী দোলাব না আর—
ঝাঁকড়া চুলে ফ্যাসান্ তুলে বাহার দেবে—
(bobbed hair) ববড্ হেয়ার।
আড়নয়নে মুচকে হাসি,
হয়ে গেছে নেহাৎ বাসি,
পট্‌কে যাবে লট্‌কে প্রেম-ফাঁসী—
স্বাধীনভাবে স্বাধীন (love) লাভে
ঘোমটা হবে পগার-পার,
ডিয়ার (dear) ব'লে পিয়ার ক'রে
যে চাবে সই হব তার।

(এন্‌কোর এন্‌কোর বলিতে বলিতে জনৈক মাতালের প্রবেশ)

যুগণ। পাহারোলা পাহারোলা—

(পাহারোলা প্রবেশ)

[যুবতীগণ প্রস্থান।

মাতা। যাঃ, ঝাঁক্-কে ঝাঁক্ উড়ে গেল!

পাহা। যাও, বাবু, উধার, ইধার পিয়সী পার্ক, আওরৎ লোকোন্‌কা ওয়াস্তে।

মাতা। কেন বাবা, এরা প্রেয়সী, আমিই কোন্ একাদশী?

পাহা। আপ মরদ্ হায়।

মাতা। আমি মরদ্ কিসে দেখলে? আমার গোঁপ আছে?

পাহা। উ তো নেহি, বাবু।

মাতা। তবে? দাড়ি আছে?

পাহা। নেহি বাবু।

মাতা। তবে? গোঁপ নেই, দাড়ি নেই, ঘোমটাও টানি নি, আর সিগারেটও খাচ্ছি নি, তবু বল্‌বে মরদ? অবলার ওপর এ কি জুলুম!

পাহা। আরে এ কেয়া মজেকা বাত! দারু পিকে আপনাকো আওরৎ সমঝ্ লিয়া! আপকো ঘর কাঁহা, বাবু?

মাতা। ঘর, দোর, বাসন-কোসন্, ঘটী, বাটী, ঘড়া,

গাড়, কিছু নেই, সাহেব! কুলের কুলবালা, এক মিন্‌ষের পাল্লায় প'ড়ে অকূলে ভেসেছি, বাবা! প্রাণনাথ, তুমি যদি কূল দাও, তবেই বাঁচি, নইলে এই ডুবলাম! (উপবেশন)

পাহা। আরে উঠো, বাবু! সড়কপর কেয়া শোনেকা জায়গা?

মাতা। পথে ত দাঁড়িয়েছি, বাবা, না হয় একটু শুলাম! (শয়ন)

পাহা। (হাত ধরিয়া) আরে উঠো, বাবু!

মাতা। (দূরে বিধু ডাক্তারকে দেখিয়া) বিধু-দা! বিধু-দা!

(বিধু ও নিধুর প্রবেশ)

বিধু। কে, ভাইপো?

মাতা। হাঁ, মাসি! এই মিন্‌ষে হাত ধরে টানাটানি ক'রে আমায় বে-ইজ্জৎ করছে! আমি কুলের কুলবধূ!

(ক্রন্দন)

পাহা। রাম-রাম ডাগ্‌তার বাবু! শুনিয়ে দারু পিকে বোল্‌তা হাম বহুড়ি—

নিধু। তা ও বলে, তা ও বলে। ভাগনে, ওঠ ত বাপ! চাঁদ আমার!

মাতা। না, পিসিমা, আমি এখন একটু ঘুমুবো!

(বাউল ও কতিপয় ভদ্রলোক প্রবেশ)

বাউল গীত

উঠিয়ে নে তোর পশরা।
স্থয্যি মামা বসেছে পাটে—

(মাতাল সহসা উঠিয়া—'হায় হা—য়' বলিয়া পাহারোলাকে ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে উভয়ের পতন)

বাউল। আর কেন মন ভূতের লাটে ভাঙ্গা হাটে হাট করা।

নিধু। ভোলা মন, ধাপার মাঠে মোষ চরা।

পাহা। ছোড় দিজিয়ে, বাবুজি, ছোড় দিজিয়ে!

মাতা। বল্‌-ড্যান্স (Ball-dance), প্রাণনাথ, বল্‌-ড্যান্স!

বিধু। বাবাজী, একটা রসের গান জান ত গাও! তা ভূতের নাট, ভাঙ্গা হাট, দড়ির খাট, মড়ী ঘাট—নাঃ, বেজায় হল!

বাউল। গীত

এ বড় বেজায় হ'ল, বগা ম'ল মাছের শোকে—
সেই খেদে এক বক্‌না বেঁড়ে
উঠল তেড়ে তমাল-ডালে নেশার ঝোঁকে।
ইসারায় গা ছ'ড়েছে,
দুকূলে দ' পড়েছে,
মরা গাঙ্গে কোলা ব্যাঙের হিড়িক্ বেড়েছে,
প্রাণ এবার থাকে কি যায়, ধরেছে হায়
কালবরণ ছিনে জেঁাকে ॥

মাতা। প্রাণনাথ, আবার আমার নাচ পাচ্ছে।

পাহা। আরে রাম-রাম!

[বেগে প্রস্থান।

মাতাল। প্রাণনাথ, অকূলে ফেলে কোথা যাও!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

বাউ। বাবা, গাঁজা খেতে দু'একটা পয়সা দেবে না?

বিধু। গাঁজা কেন খাবে, বাবাজী, তার চেয়ে আমার ডাক্তারখানায় যেয়ো, দু' ঢোক ওষুধ খেয়ো।

বাউ। আমার ত কোন ব্যামো নেই, বাবা!

নিধু। আরে ব্যামো হলে ত সবাই ওষুধ খায়! লোকে এখন নতুন চায়। হয় হুমড়ি খেয়ে পড়, নয়, চড়কগাছে চড়!

বাউ। না, বাবা, ব্যামো হ'লে তখন ওষুধ খাব। চড়ক-গাছে চড়তে পারব না।

[বাউল প্রস্থান।

(কতিপয় ভদ্রলোক প্রবেশ)

বিধু। ওহে সাহিত্যিক, একটা বড় সঙ্কটে পড়েছি, সৎপরামর্শ দাও দিকি! তোমার ঘাড়েতে বাত্তিক আছে—

১ ভদ্রলোক। শুধু বাত্তিক কেন? ঘাড়ে যেমন বাত্তিক, পেটে তেমনি পৈত্তিক! ঘাড়ে যেমন খুন চড়ে, পেটে তেমনি চড়া পড়ে! কিন্তু তোমার সঙ্কটটা কি, ডাক্তার?

বিধু। ওহে, টেঁপীর সম্বন্ধ করছি, এক জন বড় অ্যাটর্নীর ছেলের সঙ্গে। তাকে নৈশ-ভোজের নেমন্তন্ন করতে হবে। কি রকম চিঠিখানা লেখা যায়? সাহিত্যিক, কি বল?

সাহিত্যিক। রমুন, আগে চিন্তা করি।

২ ভদ্র। সর্ব্বনাশ! ঐটি করবেন না, মশাই! চিন্তা! এক অন্ন-চিন্তায় পেট ভ'রে রয়েছে! তার ওপর চিন্তা করলে বদ-হজম হবে। কি বলেন?

সাহিত্যিক। রসুন, আগে কথাটা ভেবে দেখি!

ভদ্র। তা ভাবুন! কিন্তু চিন্তা করবেন না।

নিধু। যাক্! আপোষে মিটিয়ে ফেল। এই যে উমেদার। তোমার পরামর্শ কি শুনি? আমরাও ত মেয়ে পার করবার উমেদার। আগে উমেদারের যুক্তি শোনা যাক্। কি রকম চিঠি লেখা যায়?

উমেদার। আরে, ও ত বাঁধি গৎ—Being given to understand that there is a vacancy in your belly, I beg to offer myself as chop, cutlet, curry, কোরমা—

বিধু। এই যে! সমালোচক! তুমি ওটার সমালোচনা কর।

সমা। মশাই, যদি বস্তিতে বের সম্বন্ধ হ'ত, ঐ এক কিস্তিতে বাজিমাৎ! কিন্তু একে অ্যাটর্নী, তায় হবু বেই! এদের টেষ্ট (taste) অর্থাৎ রুচি নেই। ছেলের বে'তে দেড়গজী ফর্দ্দ বার ক'রে ফেলবে! তখন?

নিধু। আরে ফর্দ্দ বার ক'রে নেহাৎ ফেলে, আমরাও ফেলে দেব। জমীদার মশাই, আপনারা ত সর্ব্বদাই খানা দেন, কি বলেন?

জমী। আমরা ত ভাই কার্ড ছাপাই— I shall deem it a great honour—

সাহিত্যিক। হয়েছে, হয়েছে!

বিধু। কি হয়েছে!

সাহিত্যিক। ভাব ঠিক হয়েছে, ভাষা তেমন জোরালো হয় নি। ওটাকে ওলোট-পালোট খাওয়াতে হবে— I shall deem it a great honour না ব'লে ঘুরিয়ে লিখুন—I shall honour it a great deem!

১ ভদ্র। চমৎকার! great deem না ব'লে ঘোড়ার ডিম বললে আরও জোরালো হয়। কেন না, ঘোড়ার ডিমটা হ'ল সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক। ওর মধ্যে সার বস্তু আছে।

সাহিত্যিক। আপনারা ঠাট্টা করেন! কিন্তু কত মাথা ঘামাতে হয় জানেন?

ভদ্র। ঘামাতে হয়, না কামাতে হয়?

সাহি। কেন মশাই?

ভদ্র। আপনি চিন্তা করুন! না কামালে মাথায় হাওয়াও লাগবে না, ঘোল ঢাল্‌বারও সুবিধে হবে না।

বিধু। চল হে নিধু! great deem-ই লেখা যাক।

[বিধু-নিধুর প্রস্থান।

সাহি। দেখলেন! যে বোঝদার, সে বোঝে।

ভদ্র। বটেই ত! মশাইয়ের নাম?

সাহি। মিয়াজান্ মুস্তোফী।

ভদ্র। তোফা! কিন্তু এমন দো-আঁশলা নাম কেন?

সাহি। প্যাক্ট করেছি, মশাই!

ভদ্র। বটেই ত! কাজে ত হয় না, নিদেন নামে প্যাক্ট।

সাহি। তার আবার বটেই ত কি!

ভদ্র। বটেই ত!

সাহি। দু'ত্তোর বটেই ত। মাথা ধরিয়ে দিলে।

ভদ্র। মিথ্যা কথা! মাথা থাকলে ত ধরবে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(টেঁপী ও সহপাঠিনীর প্রবেশ ও দ্বৈত গীত)

সহ-পা। টেঁপী তোর বিয়ে হবে আস্‌ছে নাকি বর?

টেঁপী। টয়ে ওকার পর – মাথায় দে টোপর।

সহ। শ্বশুরবাড়ী থাক্‌বি গিয়ে,

টেঁপী। দন্ত্য নয়ে আকার দিয়ে,

সহ। পরবি কত গয়নাগাটি সাজিয়ে দেবে ঘর।

টেঁপী। এম-ও-টি-ও-আর—খুব চালাবো মোটর!

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

বিধুর ডাক্তারখানা-ঘর

(বিধু ও সিধুর প্রবেশ)

বিধু। টেঁপীর মার হাতের রান্না কেমন খেলে বল, ব্রাদার?

সিধু। রান্না কি, ব্রাদার! রান্না বল্‌লে তাঁর অপমান করা হয়। সে একেবারে—শব-কম-ক্রম!

বিধু। আর ঐ সুখেই বেঁচে আছি, ব্রাদার!

সিধু। কেন, ভায়া, শুধু ঐ সুখ কেন? তোমার বাড়ীতে ত এসরাজের উপদ্রব নেই, ধিনিকিটি ধা নেই!

বিধু। তা নেই বটে, ব্রাদার! কিন্তু যে বানান্ আছে, সে ধিনি কিটিধার বাবা! হাঁ,ভাল কথা, টেঁপীকে একবার দেখ!

সিধু। কিছু দরকার নেই, ভায়া! যিনি অমন রান্না রাঁধেন, তাঁর কন্যা কখন কুচ্ছিত হ'তে পারে না! তার চেয়ে একটা গান গাও, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি!

বিধু। বেশ ব্রাদার। তা হ'লে একটা নতুন বোতল খুলি, গলাটা ভিজিয়ে নি। তুমিও কান দুটোকে একটু রসিয়ে নাও। (বোতল খুলিতে খুলিতে) আচ্ছা, ভায়া, তোমরা ত আইন-কানুনের মালিক, এই যে নম্বর ওয়ান্ (Number One) বোতলের তলাটা ভিতর দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে কমসে কম দেড় ছটাক মাল ফাঁকি দিচ্ছে, এর একটা উপায় করতে পার না? এই যে সব মালসী মশাইরা আছেন, তাঁরা করেন কি?

সিধু। বক্তৃতা করেন।

বিধু। না না, এর একটা উপায় করতে হবে।

সিধু। বেশ! একখানা ভাল সংবাদপত্রে আন্দোলন করা যাবে। এখন তুমি একটা গাও!

বিধু। বেশ! (মদ্য দান) কান দুটো একটু ভিজিয়ে নাও। নইলে মিষ্টি লাগবে না।

(মদ্য পান করিয়া গীত)—

দিল্-পেয়ারা শাকি আমার
শুধ্‌বে কে তার ঋণ।
দিচ্ছে ভ'রে পিয়ার ক'রে
পিয়ালা রঙীন॥
টলছে আঁখি বলছে শাকি—
জীবন একটা মস্ত ফাঁকি,
এক চুমুকে পান ক'রে নাও
যেটুকু বাকি,
পলকটি না ফেলতে আঁখি
ফুরায় গণা দিন।

সিধু। যা বলেছ! মলেই সব ফুরিয়ে গেল। উঃ, ভগবানের কি আশ্চর্য্য নিয়ম, ম'লে আর এক দণ্ড বাঁচে না!

বিধু। কেন বাঁচবে না, ব্রাদার? আমার প্রাণ-বিনাশিনী শমন-ত্রাসিনী আসব সপিণ্ডকরণের পিণ্ডির ওপর এক ডোজ (dose) ঢেলে দাও, সদ্য সদ্য ফিরে আসবে। স্বচক্ষে দেখেছি!

সিধু। বল কি, ভায়া! ভূত হয়ে নয় ত?

বিধু। নয় ত কি, জ্যান্ত?

সিধু। বল কি, ব্রাদার! যমের বাড়ী গিয়েও তোমার হাত থেকে রক্ষে নেই!

বিধু। তোমার হাত থেকেও নিস্তার পাবে না, ভায়া! যেমন শমন-ভবন থেকে ফিরে আসবে, অমনি সমন ধরাবার নোটিস্ দেবে।

সিধু। ভাল কথা মনে করেছ। তোমার সেই ভাড়াটেদের এক মাসের টাইম দিয়ে নোটিস্ দাও।

বিধু। আর আমি কেন, ব্রাদার? খুদকুঁড়ো যা আছে, সবই ত ঐ মেয়ের। আর তা হলেই সব তোমার। যা করতে কর্ম্মাতে হবে, সব তুমিই কোর। এখন একটা দিনস্থির করা যাক্, এস। এই মাসেই? কি বল?

সিধু। আমার আপত্তি কিছু নেই। তবে একটু গোল বেধেছে।

বিধু। (ত্রস্ত হইয়া) কি গোল?

সিধু। আমার পরিবারের ঊর্দ্ধ-শ্লেষ্মার ব্যামো আছে কি না! যখন দাঁত-কন্‌কনানি সুরু হয়, বাড়ীতে কাক-চিল বসবার যো থাকে না।

বিধু। ইস্ ব্রাদার! তোমারও যে দেখ্‌ছি ঘরে-বাইরে! ঘরে দাঁত-কন্‌কনানি, বাইরে এস্‌রাজ! কিন্তু তার জন্যে ভাবনা নেই, ভায়া! আমার 'বদন-রদন-রোদন-নিসূদন-মধুসূদন' এক কৌটা নিয়ে যাও, এখনি দিচ্ছি—(আলমারীর চাবি খুলিয়া ঔষধ বাহির করিয়া দেওয়া) নাল ভাঙ্গে ত?

সিধু। ভাঙবে না! যা হয়েছে!

বিধু। চমৎকার হয়েছে! বেশ হয়েছে! অতি পরিপাটী হয়েছে! বাড়ী গিয়েই সদ্য সদ্য দাঁতে লাগিয়ে দাও গে। সেবামাত্রই সর্ব্বাপদঃ শান্তিঃ!

সিধু। বল কি, ভায়া, বল কি! সর্ব্বাপদ? ঘরে-বাইরে দুই রোগই সারবে?

বিধু। আগে ত গিন্নীকে সারো।

সিধু। কিন্তু যেমন দাঁতের রোগ, তেমনি দাঁত ভাঙা নামও করেছ! আমার বোধ হয়, না লাগালেও চলে। বার দুই নামটা আওড়ালেই—বস্! কি বল্লে! বদন-মধুসূদন! এ যে ত্রাহি মধুসূদন! এমন নাম ত শুনিনি!

বিধু। ঐ নামেতেই সব, ব্রাদার! নামেতেই সব! বলে বটে, নামে কি এসে যায়! গোলাপকে যদি বল, রেলি ম্যাত্রাজানি, কি পিট্রোকোচিনো ব্রাদার্স—সমান খোস্‌বো পাবে। পাবে বটে, কিন্তু একটু তিসি-মস্‌নের গন্ধ-মাখানো। নামেতেই সব পরিচয় পাওয়া যায়। পরাণ মণ্ডল বল্লেই তোমার মনে হবে, মেদনীপুর অঞ্চলে বাড়ী। সহরে আসবার সময় রাজ্যের ফরমাস নিয়ে আসে। ঠকে আর গ্রামে গিয়ে মুখ-সাপোট করে—কষ্ট্ প্রাইসে (cost price) এনেছি। তেমনি মদনমোহন নামটি শুনলেই তোমার মনে হবে, টেরি-কাটা ফিট বাবু, সদা হাস্যবদন, চাঁদের পানে চায় আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, কবিতা লেখে আর ছেঁড়ে! নামে কিছু নেই! তুমি যা তা লিখে এক জন বড় লেখকের নামে ছাপাও, হুহু ক'রে কেটে যাবে। নামেই বিক্রয়, ব্রাদার, নামেই বিক্রয়। আর বিধু ডাক্তারের প্যাটেণ্ট্ মধু গুঁইয়ের নাম দিয়ে এক ফোঁটা বেচ দিকি!

সিধু। সে যাই হউক, ভায়া, এবার এস্‌রাজ-যমরাজ গোছের একটা প্যাটেণ্ট বার ক'রে ফেল। আমার মাথার দিব্যি।

বিধু। তুমি দেখ ত, ভায়া, আমি কি করি!

সিধু। তুমি সব পার, ব্রাদার, সব পার। তোমার অসাধ্য কিছু নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা! ব্রাদার, কিছু মনে কোর' না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওষুধ লাগালে কিছু হবে না ত? দাঁত এখনও তার অনেকগুলি আছে, কিন্তু প্রাণ একটি।

বিধু। তুমি লাগিয়েই দেখ না।

সিধু। আচ্ছা, ভায়া, রাত হচ্ছে। এখন যাই।

(বিধুর সহিত কোলাকুলি ও করমর্দ্দন ও গমনোদ্যত)

বিধু। দাঁড়াও, ব্রাদার! আমি কোলাকুলি করি।

সিধু। এই ত হ'ল।

বিধু। ও ত তোমার কোলাকুলি হ'ল। এইবার আমার পালা।

[সিধুর সহিত কোলাকুলি, করমর্দ্দন ও সিধুর প্রস্থান।

(টেপীর মা'র প্রবেশ)

টে-মা। বেই ত চুচ্চুরে হয়ে চল্ল। যদি রাস্তায় পড়ে?

বিধু। আরামে ঘুমুবে।

টে-মা। যদি পাহারোলা ধরে?

বিধু। জরিমানা হবে। আর কি কি জিজ্ঞাসা করবার আছে, খপ্ খপ্ ক'রে ব'লে ফেল। আমার ঘুম পাচ্ছে। মদ খেলে খানায় পড়বে না, পাহারোলা ধরবে না, আফিং খেলে ঝিমুবে না, গাঁজা খেলে ছেঁড়া চেটাইয়ে রাজা হয়ে বস্‌বে না, গুলী খেলে এক পা এগুবে, তিন পা পেছুবে না, চরস খেলে রগ টিপ টিপ করবে না, তবে নেশা করা কেন?

টে-মা। বের কি ঠিক্ হ'ল?

বিধু। সে সব ঠিক হয়েছে।

টে-মা। কবে?

বিধু। যবে হবে তবে। খোদা জানে। মানুষের হাত নেই। এই যে সিধুকে খাওয়াবে ব'লে নিধুকে দেশে পাঠালে তরকারিপাতি আনতে, এসে পৌঁছুল? যা হবার তাই হবে—খোদা মালিক। এখন অনুমতি কর ত শুই গে।

টে-মা। যে আজ্ঞে মশাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

সিধু অ্যাটর্ণীর শয়ন-কক্ষ

সিধুর স্ত্রী শায়িতা

সি-স্ত্রী। উহুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হু-ও-মা-গেঁলুম—গেঁলুম!

(পিন্টুগোপালের প্রবেশ)

পি। ও ম্যা—ম্যা—

সি-স্ত্রী। ওঁরে—বাঁবা রে—গেঁলুঁম রেঁ—মঁরে গেছি রেঁ।

পি। ম্যা-ম্যা—তুই ম'রে গেছিস্ না কি?

সি-স্ত্রী। ওঁ হোঁ—হোঁ—হোঁ—হোঁ—হোঁ—

পি। ওরে কথা ক' না, আমার যে ভয় করছে। তুই ম'রে গেছিস্?

সি-স্ত্রী। হুঁ, মঁরে গেঁছি—উ—হুঁ—হুঁ—

পি। মরিস্ নি?

সি-স্ত্রী। ওঁ—রেঁ—না—না!

পি। তুই পেত্নী হস্ নি?

সি-স্ত্রী। ওঁরে—না—জাঁলাতঁন কঁরিস্ নি!

পি। পেত্নী হস্ নি, তবে খোনাখোনা কথা কচ্ছিস্ কেন? ভয় করে যে!

সি-স্ত্রী। আঁমার দাঁত কঁন্কঁন্ কঁরছে।

পি। আমি এস্রাজ বাজাবো শুন্বি? সব ভাল হয়ে যাবে।

সি-স্ত্রী। নাঁ, বাঁছা—

পি। তবে বাজনার বোল্ বল্ব? ধা-কেটে-তাক্-ধুম্-কেটে-তাক্—

সি-স্ত্রী। তুই থাম্ বাছা! আমার এখন কিছু ভাল লাগছে না!

পি। ভাল লাগবে, লাগবে, শোন—ত্রে-কেটে—তে—তুম্—তে—

সি-স্ত্রী। তুঁই আঁর আঁমাকে জাঁলাতঁন কঁরিস্ নি।

পি। জালাতন কর্ছি আমি, না তুই! রাত দুপুরে বাঁপ রেঁ—মাঁ রেঁ! যেন পেত্নীতে বাসা বেঁধেছে! শোন্ না, দাঁতগুলো ভেঙ্গে দেব?

সি-স্ত্রী। তুই শুগে যা বল্ছি, নইলে আমি মাথাখোড় খুঁড়ে মর্ব!

পি। মর গে যা! ম'রে আর বেশী কি করবি! এমনি ত খোনা খোনা কথা কইবি? ধা-কেটে—ধুম-কেটে—

[বেগে প্রস্থান।

সি-স্ত্রী। ওঁরে বাঁপ্—বাঁপ্—

(সিধুর প্রবেশ)

(উচ্চৈঃস্বরে) উ—হুঁ—হুঁ—বাঁবা রে—

সি। ও গো জেগে আছ, না, ঘুমুচ্ছ?

সি-স্ত্রী। গেঁলুম—গেঁলুম—

সি। একটু জাগো দেখি! একবার উঠে ব'স!

সি-স্ত্রী। ওঁরে—রেঁ—রেঁ—রে—রেঁ—

সি। শোন না, একটু জাগো না! এই ওষুধ এনেছি। আর ও রকম হারে—রে—রে—ক'রে গরু তাড়াতে হবে না।

সি-স্ত্রী। কতকগুলো মদ-মাংস গিলে এলেন আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে!

সি। ঠাট্টা কর্ছে কোন্ চণ্ডাল! বিধু ডাক্তারের ওষুধ কথা কয়! নাম করলেই ব্যামো আরাম হয়! কি বললে ভাল! মদন-সদন-নাচন-কোঁদন ধমাধম্—আর বাকীটা মনে নেই! তুমি একবার লাগিয়েই দেখ না। এই নাও! লক্ষ্মীটি! দিতে না দিতে জল!

সি-স্ত্রী। ঠিক্ বলছ? বিষ নয় ত? ম'রে যাব না ত?

সি। ম'রে যাবে? তেমন বরাত, আমার নয়!

সি-স্ত্রী। আচ্ছা, দাও, দিচ্ছি। কিন্তু যদি কিছু হয়—

সি। ড্যামেজ (damage) আদায় হবে। তুমি লাগাও ত, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।

সি-স্ত্রী। আচ্ছা, দাও! (ঔষধ লাগান) বাপ!

(সিধুর বুকের উপর ঔষধের কৌটা ছুড়িয়া মারা ও সিধুর হাঁচি ও কাসি)

সি-স্ত্রী। কি খুনে রে! মলুম! মলুম!

সি। তুমি ত ম'লে (ফ্যাঁচ্)! আমার যে (ফ্যাঁচ্) দু' বোতল হুইস্কির (ফ্যাঁচ্) নেশা ছুটে গেল (ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ—খক্-খক্)!

সি-স্ত্রী। মিন্সের আক্কেল দেখ! আমি একে মরছি দাঁতের জালায়! তার ওপর বিষ দিয়ে ফ্যাচ্! ঠাট্টা!

সি। ঠাট্টা (ফ্যাঁচ্)! একটু নাকে ঢুকিয়ে (ফ্যাঁচ) দেখ না (খক্-খক্)! মনে করেছিলুম, পরের পয়সায় আজ নেশাটা জমল ভাল (ফ্যাঁচ্)!

সি-স্ত্রী। ফের যদি তুমি ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করবে আর খক্-খক্ করবে ত আমি গলায় দড়ি দেব।

সি। বিধু ডাক্তারের প্যাটেণ্ট বেচা পয়সা, হজম করা কি যার তার কর্ম্ম। (ফ্যাঁচ্) আচ্ছা, আগে বেটা হয়ে যাক্, তার পর বুঝে নেব!

সি-স্ত্রী। বে' করতে হয়, বিধু ডাক্তারকে তুমি বে' কর গে। আমি যদি ওর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে' দি ত আমার যেন তে-রাত্তির পেরোয় না!

সিধু। ফ্যাঁচ—

(পটক্ষেপণ)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণীর আপিস

সিধু ও ক্লার্ক

ক্লার্ক। মশাই, ঐ যে চলিত কথায় বলে—

সিধু। কি বলে ?

ক্লার্ক। ঐ যে বলে বাবারও বাবা আছে, এ তাই! মশাই, আপনি ত শ্বশুরের নামে বিল করেন ? আপনার যিনি বেই হবেন—

সিধু। বেই হবেন না আমার সম্বন্ধী হবেন !

ক্লার্ক। মশাই আগে শুনুন্, তার পর রাগ করবেন! বিধু ডাক্তার আপনার নামে বিল পাঠিয়েছেন।

সিধু। কিসের বিল ?

ক্লার্ক। (বিল্ বাহির করিয়া পাঠ)

১ দফা—নিমন্ত্রণ-পত্র লেখা ও পাঠানর মজুরী	৫৲
২ „—ভোজ	৭৲
৩ „—এক বোতল মদ্য	১২৲
৪ „—গীতবাদ্যের পারিশ্রমিক	১০৲
৫ „—স্ত্রীর পীড়া হেতু বাটীতে আসিয়া ব্যবস্থাগ্রহণ অর্দ্ধদর্শনী	৪৲
৬ „—বদন-রদন-রোদন-নিসূদন-মধুসূদন ১ কৌটা	১৲
মবলকে—	৩৯৲

সিধু। বটে! চোখ কাণা ক'রে দেবার মৎলব ক'রে আবার বিল্! বেটা হাতুড়ে, গ্রেট ডীম!

ক্লার্ক। মশাই, দাঁতের ওষুধে চোখ কাণা হবে কি ক'রে ?

সিধু। কি ক'রে ? এক কৌট কিনে আন না। তোমার মুখের ওপর ছুড়ে মারি, দেখ, চোখ কাণা হয় কি না! পাজি!

ক্লার্ক। মশাই, আমায় গাল দিচ্ছেন কেন ?

সিধু। তোমাকে নয় হে, সেই শালাকে। কিন্তু আমিও ছাড়ছিনি। প্যাটেন্ট বেচে খান, একবার অ্যাটর্ণীর ঘানিটা বুঝুন! তুমি বিল্ কর!

ক্লার্ক। সে কি মশাই! তার বাড়ীতে চপ কাটলেট, খেয়ে এলেন!

সিধু। এইবার তার মুণ্ড খাব। তুমি লেখ—

১ দফা আপিসে ক্লায়েন্ট অ্যাটেণ্ড (attend) করা—	৪৲
২ „—নিমন্ত্রণ-পত্র রিসিভ করা—	২৲
৩ „—বাড়ীতে ক্লায়েন্ট অ্যাটেণ্ড করা—	১৬৲
৪ „—ভাড়া-বাড়ী সম্বন্ধে ইন্সট্রাক্‌শন্ (instruction) দেওয়া—	৮৲
৫ „—যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া—	৪৲
৬ „—ওয়েটিং (waiting) চার্জ—	৫৲
৭ „—গীতবাদ্য শ্রবণের পারিশ্রমিক প্রতি ঘণ্টা ৫৲ হিসাবে—	১০৲
মবলকে	৪৯৲

ক্লার্ক। মশাই, আপনি যে দশ টাকা বেশী ক'রে ধরলেন। তার ছিল উনচল্লিশ, আপনার বিল হ'ল উনপঞ্চাশ!

সিধু। হুঁ-হুঁ-উ! উনপঞ্চাশ বাই আছে, জান ত ? এ অ্যাটর্ণীর বিল। হাতে পেলেই উনপঞ্চাশ বাই জেগে উঠবে আর ধেই-ধেই ক'রে নাচবে।

ক্লার্ক। মশাই, তিনিও ত কম নন্! খানা দিয়ে মদ খাইয়ে দাম ধ'রে নিচ্ছেন!

সিধু। ধ'রে নেওয়া বার করছি! বিলের নীচে লিখে দাও যে, তার মদ বেচবার লাইসেন্স (license) আছে কি না। যদি লাইসেন্সের নম্বর তারিখ দিতে না পারে, কর্ত্তৃপক্ষকে লিখে আমি তার দণ্ডবিধান করব।

ক্লার্ক। দিন, মশাই, একটু পায়ের ধূল দিন!

সিধু। কেন হে, খামকা এমন ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়লে!

ক্লার্ক। আপনার অদ্ভুত মাথা!

সিধু। মাথা অদ্ভুত ত পায়ের ধূল নেবে কেন ?

ক্লার্ক। মশায়ের মাথায় ত ধূল নেই।

সিধু। তবে কি আছে ?

ক্লার্ক। আজ্ঞে, জুয়া—

সিধু। বলেই ফেল না। অত কিন্তু হচ্ছ কেন ? জুয়াচুরি ?

ক্লার্ক। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

সিধু। দেখ, কুড়রাম, ভারি খুসি হলাম! অ্যাটর্ণীর পক্ষে জুয়াচোর গাল নয়—কম্‌প্লিমেণ্ট (compliment)—প্রশংসা। থাক, থাক, থাক্‌তে থাক্‌তেই শিখবে।

ক্লার্ক। মশাই, পেটে খেয়ে ত শিখব!

সিধু। দেখ, কুড়রাম, তোমার স্মৃতি-শক্তি অতি প্রখর। পুরাণো পড়া দেখছি খুব মুখস্থ। কিছুতেই ভোল না।

ক্লার্ক। আজ্ঞে, আমি ত ভুলতে চাই, পেট যে মনে পাড়িয়ে দেয়। আশা ছিল, পিন্‌টুবাবুর বে'তে কিছু পাব। তা, বোধ হয়, এ বে ভাঙল।

সিধু। ভাঙল! পিন্‌টুর সঙ্গে ওর মেয়ের বে' ত হবেই না। এখন ওর মেয়ের বে কেমন ক'রে হয় দেখব।

[সিধুর প্রস্থান।

ক্লার্ক। ঐ যে কথায় বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

[ক্লার্কের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুর অন্তঃপুর

বিধু, নিধু ও টেপীর মা

টে-মা। হ্যাঁগা, সিধু অ্যাটর্ণী ত সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে—

বিধু। হা—হা—হা—

টে-মা। হাসছ যে, এ কি হাসবার কথা।

বিধু। বাপ রে। হাসবার মত কথা ক'টা পাওয়া যায়।

নিধু। দিদি, তুমি ভাবছ কেন? টেপীর বের ফুলও ফুটবে, বরও জুটবে।

বিধু। চেপে যাও, ভায়া, চেপে যাও! মেয়েমানুষকে যে বোঝাতে পারে, সে আজও জন্মায় নি। কিন্তু আমাদের যে বড্ড ভুল হয়ে গেছে! তাই ভাবছি।

নিধু। ইস্‌! আজ দেখছি ভাবনাগুলো আর কোথাও না গিয়ে এই বাড়ীতেই বাসা বেঁধেছে। কিন্তু ব্যাপারখানা কি?

বিধু। ভায়া, নেমন্তন্ন চিঠিখানা পাঠিয়েছিলাম খাবে পুরে মুখামৃত দিয়ে এঁটে। পাঠাবার মজুরী ধরেছি, কিন্তু প্যাকিং (packing) খরচাটা ধরা হয় নি।

টে-মা। তাই ত, নিদেনপক্ষে চার আনা ত বাড়ত? কিন্তু তোমার চেয়ে যে দশ টাকা বেশী ক'রে বিল করেছে।

বিধু। করুক না যত খুসী। টাকা পেলে ত? চাইলেই যদি পায়, তা হ'লে তুমি এত দিন ধ'রে যে আমার কাছে কত কি চেয়েছ, কবে কি পেয়েছ?

টে-মা। না, সে অপবাদ তোমার শত্তুরও কখন দিতে পারবে না।

বিধু। থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ডিয়ার (thank you my dear)! কিন্তু, নিধু, সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণীকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

নিধু। খুব রাজী। এঁটো বেটা।

টে-মা। এঁটো আবার কে রে?

নিধু। ঐ অ্যাটর্ণী গো! বেটা আমাদের প্যাটেণ্টের নিন্দে ক'রে বেড়াচ্ছে! অয়ে হাত! টেপীর যাতে বে না হয়, সেই মতলব। বল ত, ব্রাদার, পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে দি।

বিধু। রামঃ! খুন-খারাপিতে আমি নেই।

নিধু। তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ? হাতাহাতি? তাতেও পেছপাও নই। দিদি এত ক'রে যে ঘি খাওয়াচ্ছে, তার জোরটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

বিধু। নাঃ, ও-সব আরও পুরণো। সেই ভীম-অর্জ্জুন-ভীষ্ম! ওগুলো এখন যাত্রাতেই চলে।

নিধু। তবে? অস্তরা একটু ভাঙ্গো। নইলে অকূল-পাথারে আর কত হাবুডুবু খাবো।

বিধু। ভায়া, শিক্ষা দিতে হবে একটু সভ্য এবং সূক্ষ্ম ভাবে। বেটা একটা এস্‌রাজের ক্যাঁ-কোঁর জ্বালায় অস্থির, আমরা ওর কানের কাছে লক্ষ ক্যাঁ-কোঁর গাঁদি লাগিয়ে দেব।

নিধু। বাঃ, কেয়াবাত মতলব!

বিধু। কিন্তু, ব্রাদার, তোমাকে এক কাজ করতে হবে।

নিধু। প্রস্তুত! কি করতে হবে বল?

বিধু। সিধু অ্যাটর্ণী আধখানা বাড়ী ভাড়া দেয় শুনেছ ত। সেই অংশটা বেনামী ক'রে ভাড়া নিতে হবে। তোমাকে ত সে চেনে না?

নিধু। না। দিদি সে দিন তরীতরকারি আন্‌তে দেশে পাঠালে

বিধু। ভগবান্ যা করেন, ভালোর জন্যই। নিধু, তুমি যাও, যেমন ক'রে পার সিধুর ভাড়ার অংশটা ঠিক ক'রে এস।

নিধু। শুভস্য শীঘ্রং! এখনি চল্লুম। [প্রস্থান।

টে-মা। ওরে, ভাত খেয়ে যা। ও কি, তুমিও যে যাচ্ছ! খেয়ে যাও, নইলে পিত্তি পড়বে।

বিধু। কার?

টে-মা। কার আবার! আমার।

বিধু। তাই ত বলি! আমি ভাবছিলাম, হঠাৎ এ কি হ'ল! আমার পিত্তি-পড়বার ভাবনা! আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি! তা আমার যদি বেলা হয়, তুমি মিছে গর্ভ-যন্ত্রণা পেয়ো না। আহারটা সেরে নিও।

টে-মা। তা হ'লে তোমার জন্য কিছু থাক্‌বে না।

বিধু। বল কি প্রেয়সি! একেবারে একাদশীর ব্যবস্থা। উপবাসটা আমার বড় অভ্যাস নাই। তার-চেয়ে তুমি যেমন পতি-ভক্তির প্রশ্রয় দিয়ে প্রসাদ পাও, সেই প্রথাই বজায় রেখো।

টে-মা। যে আজ্ঞে! কিন্তু এখন যাওয়া হচ্ছে কোথা?

বিধু। টেপীর বিয়ের বাজনা ফরমাস্ দিতে।

টে-মা। সে কি! বর কোথায় ঠিক নেই!

বিধু। সব ঠিক আছে। কিন্তু টেপীর গর্ভধারিণী, তুমি অকারণ উতলা হ'য়ো না। টেপীকে নির্ব্বিঘ্নে বানান ক'রে যেতে দাও। আমার নাক ডাকার হিংসে কোর না আর পুরুষমানুষের অধিকারে অযথা হাত দিয়ো না। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি আর কিছু দিন মেয়েমানুষ থাকো। তোমার সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া আর হাতা-বেড়ী-নাড়ার ক্ষমতা অক্ষয় হ'ক্।

টে-মা। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

সিধু অ্যাটর্ণীর আপিস

সিধু ও ক্লার্ক

সিধু। দেখ হে, তোমার ঐ কুড়রাম নামটা বদ্‌লাতে হচ্ছে।

ক্লার্ক। সে কি, মশাই! অন্নপ্রাশনের নাম—পিতৃদেব আদর ক'রে দিয়েছেন।

সিধু। আদর! নামের চেয়ে অন্নপ্রাশনের সময় যদি একটু অন্নের সংস্থান ক'রে দিতেন, তা হ'লে খেয়ে বাঁচতে! এখন নাম নিয়ে ধুয়ে খাও!

ক্লার্ক। কি নাম নোব?

সিধু। কুড়রামের বদলে বেণীকাটারাম বলো।

ক্লার্ক। এ আবার কোন্ দেশী নাম?

সিধু। মাদ্রাজী হে! ভেন্‌কাটারাম শোন নি? তারই অপভ্রংশ।

ক্লার্ক। মশাই, যা-ই বলুন, অপভ্রংশ হ'তে পারব না।

সিধু। আচ্ছা, তবে গাঁটকাটারাম বল! কিন্তু তোমার তত বড় ছাতি নেই—

ক্লার্ক। নাম-বদ্‌লে লাভ কি বলুন?

সিধু। অনেক লাভ। পাওনাদার তাগাদায় এলে বল্‌বে, তোমাদের কি রকম আক্কেল, জিনিস নিলে কুড়রাম, দাম দেবে বেণীকাটারাম? তার পর, এ পর্য্যন্ত যত হ্যাণ্ডনোট লিখেছ, সব বাজে হয়ে যাবে।

ক্লার্ক। কিন্তু নূতন নামে আমাকে লোকে চিন্‌বে কেন?

সিধু। আরে! চিনে ত লাভ এই যে, হয় সমন ধরাবে, নয় আদালতে সনাক্ত করবে। আর চেনাতে চাও, তারও উপায় আছে।

ক্লার্ক। কি উপায় বলুন।

সিধু। মাসিকে আজগুবি গল্প লেখ।

ক্লার্ক। মাসিকে?

সিধু। হাঁ! প্রথম ছোট মাসিকে, তার পর বড় মাসিকে।

ক্লার্ক। মশাই, আমার মাসিও নেই, পিসিও নেই যে, ছোট মাসিকে, বড় মাসিকে গল্প শোনাবো।

নিধু। (নেপথ্য হইতে) সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণী বাবু আছেন, মশাই?

সিধু। ফস্ ক'রে জবাব দিয়ো না। আগে দোরের ফাটল্ দিয়ে দেখ, পাওনাদার কি না।

ক্লার্ক। আজ্ঞে, নূতন গলা। আছেন, মশাই, আসুন!

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু। আজ্ঞে, এই এলুম! খুসি হয়েছেন?

সিধু। আজ্ঞে!

নিধু। আজ্ঞে না, মশাই! আগে বলুন, খুসি হয়েছেন

কি না। আমার কাছে স্পষ্ট কথা, মশাই! আপনিই ত সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণী ?

সিধু। আজ্ঞে হাঁ।

নিধু। তার প্রমাণ ? কেমন ক'রে বিশ্বাস করি ?

সিধু। আজ্ঞে, আমিই সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণী। একে জিজ্ঞাসা করুন।

নিধু। কি, মশাই ? ইনিই তিনি ?

ক্লার্ক। আজ্ঞে হাঁ!

নিধু। বেশ! বিশ্বাস করলাম! এখন, বলুন, আমি আমাতে আপনি খুসি হয়েছেন কি না। অবাক্ হয়ে দেখছেন কি ? খুসি হয়ে থাকেন ত লাগাম কষি, বসি, নইলে উকীল-পাড়া চষি।

সিধু। খুসি হয়েছি বৈ কি।

নিধু। মাইরি বল্‌ছেন ?

সিধু। মাইরি।

নিধু। থ্যাঙ্ক ইউ (thank you) মশাই! এই শেকড় গাড়লুম।

ক্লার্ক। দেখবেন, মশাই, ও চেয়ারখানায় বসবেন না। ওর পায়াগুলো সব ভাঙ্গা।

নিধু। সত্যি নাকি ?

সিধু। আজ্ঞে হাঁ! ফিউডেটরি চীফদের (feudatory chief) মত ওর পায়াগুলো খালি শোভা বৰ্দ্ধন করছে। চারটে পায়াই ঠেকনো দেওয়া।

নিধু। বাঃ, এমন নইলে অ্যাটর্ণী! দেখুন, আপনার সঙ্গে একটা গোপন ইয়ে আছে।

সিধু। কি আছে ?

নিধু। ইয়ে মশাই, ইয়ে। এখন, আপনি যদি একটু ইয়ে করেন, তা হ'লে সব দিকে ইয়ে হয়।

সিধু। তা বটে! কিন্তু কিছু ত বুঝতে পারলাম না।

নিধু। পারলেন না ? ঐখানেই এখানকার বিশেষত্ব! যা বলব, তা যদি বোঝাই গেল, তা হ'লে আর বাহাদুরি কি ? যা হ'ক, খুলেই বলি। আপনার সঙ্গে কন্‌ছাল্‌ঠ্যাশন্ (cosultation) আছে, গোপনে—

সিধু। ও ঘরে যাও ত হে গাঁটকাটারাম—

নিধু। বেড়ে নামটি ত ?

সিধু। নামটি বেড়ে, কিন্তু কোন কাজে এল না। আজ পাঁচ বচ্ছর আমার কাছে রয়েছে—

নিধু। আপনার গাঁট কাটতে পারে নি ?

সিধু। তা ত পারেই নি। আমার ক্লায়েণ্ট্ (client)-দেরও নয়। কিন্তু আপনার কি দরকার বল্‌লেন না ত ?

নিধু। গোপনে বলব।

সিধু। মশায়, আরও গোপন হতে হ'লে আমাকে শুদ্ধ সরতে হয়!

নিধু। বাঃ, আপনি ত দেখছি, বেজায় রসিক! কিন্তু দেখুন দিকি গাঁটকাটারাম গেছে কি না ?

সিধু। এখান থেকে গেছে, তবে আপিসে আছে।

নিধু। বাঃ, আরও রসিক! এই জন্তই ত মশাইয়ের কাছে এলুম।

সিধু। বেশ ত, কেন এলেন ? আপনি কে ?

নিধু। চটবেন না। আমাকে চিন্‌তে পারছেন না ?

সিধু। আজ্ঞে না।

নিধু। বেশ ক'রে দেখুন! ও কি! একবার চাইলে কি হবে ? আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করুন।

নিধু। (বিস্ফারিত চক্ষে আপাদমস্তক দেখিয়া) কে মশাই, চিন্‌তে ত পারলাম না!

নিধু। কেমন ক'রে পারবেন ? পরিচয় ত পূর্ব্বে হয় নি।

সিধু। এখনই সেটা হ'ক। আপনার পরিচয় দিন।

নিধু। তবে শুনুন্! জেলা মুস্কিলাবাদের এক নম্বর তৌজিভুক্ত, চৌকি চর্ম্মচটিকা পরগণে পিসি-মাসির অন্তর্গত থানা থ্যাবড়ানাকীর এলাকায় সবরেজিষ্ট্রী শিল-নোড়ার অধীন ডিহি ডাবাডোল্‌পুরের সামিল মৌজে মজামারীর রকম পোণে পোণ আনীর জমীদার রায় শ্রীল শ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত সার গুম্ফরাম টাকী বাহাদুর—

সিধু। (চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া) বাপ! আপনিই টাকী বাহাদুর ?

নিধু। সে কি, মশায়! অন্যায় বল্‌লে হবে কেন ? আমার কোথায় টাক্ ?

সিধু।. বটে, বটে! আপনি তা হ'লে ?

নিধু। অধীন তাঁর সদর আমলা, নাম—শ্রীমজারাম গোলমরিচ।

সিধু। কি বল্‌লেন ? গোলমরিচ ?

নিধু। আজ্ঞে হাঁ! অবশ্য গোলমরিচ! আপনার তা'তে আপত্তি কি, মশায়?

সিধু। আজ্ঞে, আপত্তি আর কি! তবে কি না—

নিধু। কখন শোনেন নি! মারীচের বাপ মরিচের গোত্র মশাই। বুঝতে পেরেছেন?

সিধু। পেরেছি বৈ কি! রায়-বাহাদুর ভাল আছেন?

নিধু। কেন থাক্‌বেন না! কি জন্য থাক্‌বেন না! আপনার তা'তে আপত্তি কি?

সিধু। সে কি! আপত্তি কি! তিনি ভাল থাকুন, এই ত চাই।

নিধু। তা হ'লে ভালই আছেন। তবে—

সিধু। তবে কি?

নিধু। একটু বিপদে পড়েছেন।

সিধু। কি, কি, কি বিপদ?

নিধু। বল্‌ছি, মশাই! একটু হাঁপ ছাড়তে দিন।

সিধু। বিপদ?

নিধু। আজ্ঞে হাঁ! বেজায় বিপদ, খুব বিপদ! নিশ্চয় বিপদ: তাই ত আপনার শরণাপন্ন হ'তে বল্‌লেন।

সিধু। তা বল্‌বেন বৈ কি! এত দিনের জানা-শোনা!

নিধু। এক ক্লাসে পড়েছিলেন বুঝি?

সিধু। হাঁ-হাঁ, সে এক রকম পড়াই!

নিধু। আচ্ছা, টৌর্ণিবাবু, তিনি আপনার সঙ্গে পড়েছিলেন, না, আপনি তাঁর সঙ্গে পড়েছিলেন?

সিধু। (চিন্তিত অবস্থায়) আজ্ঞে—

নিধু। কি, মশাই, জবাব দেন না যে! আপনি কি তবে তিনি ন'ন্?

সিধু। হাঁ-হাঁ, তিনি বৈ কি! আমিই তিনি। ও কি জানেন? ও-টা উভয়ত। তিনিও আমার সঙ্গে পড়েছিলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে পড়েছিলাম।

নিধু। ওঃ, তাই বলুন! তাই আপনাদের দুজনে এত ভাব।

সিধু। ভাব আর কি! তিনি যে আমাকে মনে রেখেছেন—

নিধু। মনে কি, মশায়! পাছে ভুলে যান ব'লে শ্রাদ্ধের খাতায় আপনার নাম টুকে রেখেছেন।

সিধু। কিসের খাতায়?

নিধু। শ্রাদ্ধের খাতায়। বড়লোকের বাড়ী শ্রাদ্ধের খাতায় নাম উঠলেই পাকা হ'ল। সে ত আর বদল হবে না। যাঁর নাম উঠবে, তাঁর তিন পুরুষের পিণ্ডদান হয়ে গেলেও সে নাম আর পাল্‌টাবে না। নেমন্তন্ন ত হবেই। বেশির ভাগ ভোট্ পর্য্যন্ত রেজেষ্ট্রী হবে। সে যাক্। এখন আমাদের শ্রীযুতকে উদ্ধার করবেন কি না, বলুন!

সিধু। অবশ্য করব।

নিধু। মশাই, তিন সত্যি করুন, তবে শ্রীযুত বিশ্বাস করবেন।

সিধু। করব, কর্‌ব, কর্‌ব।

নিধু। যে আজ্ঞে! আর আপনার সময় নষ্ট করব না। এখন প্রস্থান।

সিধু। আরে মশায়, চ'লে যান যে! আমাকে তিন সত্যি করিয়ে নিলেন, কিন্তু বিপদ কি, তা'ত বল্‌লেন না।

নিধু। সে কি, আপনি বুদ্ধিমান্, আপনাকে আবার বিপদ কি বল্‌তে হবে। বুঝতে পারলেন না?

সিধু। লঙ্কামরিচ মশাই, আমি বুদ্ধিমান্ হ'তে পারি, কিন্তু হাত গুণতে ত শিখি নি।

নিধু। ঠিক্ ঠিক্। আপনারা কেবল টাকা গুণতেই শিখেছেন! বটে বটে! বিপদ কি জানেন, শ্রীযুতের কন্যার শুভ বিবাহ।

সিধু। এ আর বিপদ কি! শুভ সংবাদ। কবে?

নিধু। আগামী লগ্নে, মশায়!

সিধু। পরশু? তা বেশ ত! আমাকে কি করতে হবে? কন্‌ভেয়ান্স (conveyance)? না না, থুড়ি—ডীড অফ্ গিফট (deed of gift)? আরে রাম রাম! রেজিষ্ট্রেশন্? (Registration)? না, থুড়ি! কি বিপদ বলুন দিকি?

নিধু। তাঁর লোকজনের থাকবার জন্য একখানি বাড়ী ভাড়া ক'রে দিতে হবে। তার জন্য আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে।

সিধু। আরে রাম রাম! এই সামান্য কাজের জন্যে আবার পারিশ্রমিক! কি রকম বাড়ী চাই?

নিধু। এই ছোট একখানা; দু-তিনখানা ঘর থাকলেই চল্‌বে। বাজে লোক থাক্‌বে, মশায়! সন্ধানে আছে?

সিধু। তা—তা—

নিধু। পারবেন না ?

সিধু। নিশ্চয় পারব ! আমার নিজেরই বাড়ী রয়েছে। তার আধখানা ছেড়ে দেব। কদিনের জন্ম চাই ?

নিধু। পনের দিন, মশাই! কিন্তু গিরিমেণ্ট করতে হবে। কত ভাড়া ?

সিধু। না-না, ভাড়া আবার কি !

নিধু। সে কি! আপনি তাঁর ক্লাস-ফ্রেণ্ড (class friend) বলেই না এমন কথা বলতে সাহস করলেন! জমীদার, একটা পোজিশন্ (position) আছে ত! আপনাকে ভাড়াও নিতে হবে আর গিরিমেণ্টও করতে হবে। আপনার অনুগ্রহ তিনি নেবেন কেন ?

সিধু। দেখুন, ঝাল-হলুদ মশাই—

নিধু। গোলমরিচ মশাই—

সিধু। হাঁ-হাঁ, গোলমরিচ মশাই! গোলমরিচ—

নিধু। হাঁ, বেশ ক'রে মুখস্থ ক'রে নিন—মন্দারাম গোলমরিচ।

সিধু। আর বলতে হবে না। আমার স্মরণশক্তি খুব ধারালো আছে।

নিধু। নইলে তিন বার ফেল করেই পাস ক'রে ফেলেন।

সিধু। কে এ কথা বলে ?

নিধু। শ্রীযুতের মুখেই শুনেছি।

সিধু। আমার কথা হয় না কি ?

নিধু। খুব হয়! আপনার নাম না ক'রে তিনি জলগ্রহণ করেন না। কিন্তু গিরিমেণ্টের (agreement) কি হবে বলুন ?

সিধু। দেখুন, সামান্ত দিনের জন্তে আর এগ্রিমেণ্ট কেন ? পরস্পরকে দুখানা চিঠি দিলেই হবে।

নিধু। বেশ, যা ভাল বোঝেন! ভাড়া এক শ' টাকা ঠিক রইল। আপনি আপিসে আছেন ত ? আমি আহারাদি করেই জমীদার মহাশয়ের সই করা চিঠি নিয়ে আসছি! কেমন ? কি ভাবছেন ?

সিধু। ভাবছি, আমার ছেলের একটু এস্রাজ বাজাবার সখ আছে—

নিধু। বাবুজী একসঙ্গে ক'টা এস্রাজ বাজান ? দু' হাতে দু'ট ত ?

সিধু। দুহাতে দুট।

নিধু। আজ্ঞা হাঁ, শুনেছি দু'হাতে দু'ট এস্রাজ ধরেন আর দাঁত দিয়ে ছড়ি টানেন।

সিধু। কে এ কথা বলে ?

নিধু। বিধু ডাক্তার।

সিধু। কি বলে ?

নিধু। বলে, আপনার পরিবার ভারি দজ্জাল, চেঁচিয়ে বাড়ীতে কাক-চিল বসতে দেন না, আর আপনার বাবাজী দু'হাতে দু'ট এস্রাজ বাজান।

সিধু। বিধু ডাক্তার ? আপনাদের সঙ্গে জানা-শোনা হ'ল কি ক'রে ?

নিধু। সে কি মশাই! তিনি যে গুম্ফরাম টাকী বাহাদুরের ফ্যামিলি ডাক্তার।

সিধু। বটে ?

নিধু। বটে নয়, মশাই, বিধু বলেন, খবরদার, গিরিমেণ্ট কোর না। বাড়ীতে টেক্‌তে পারবে না। চেঁচিয়েই মাত ক'রে দেবে। টেক্‌তে দেবে না, উলটে গিরিমেণ্টের বলে পয়সা আদায় করবে।

সিধু। এই সব বলে! বেটা গ্রেট ডীম! বদন-রদন-ত্রাহি মধুসূদন! বেশ! আপনাদের চিঠি দরকার নেই। আমি লিখে দিচ্ছি, যদি আমার দিক থেকে কোন রকম গোলমাল হয়ে আপনাদের উঠতে হয়, আমি হাজার টাকা খেসারত ধ'রে দেব। এই নিন্ চিঠি—(পত্র লেখা ও নিধুকে দান)

নিধু। ধন্তবাদ, মশাই! কালই আমরা দখল নেব। নমস্কার!

[চিঠি লইয়া নিধুর প্রস্থান।

সিধু। ওহে গাঁটকাটারাম!

(ক্লার্কের প্রবেশ)

ক্লার্ক। মশায় যে এরই মধ্যে নামজারি করলেন।

সিধু। ওহে, দখল নিয়েই নামজারি করতে হয়। এখন একটা কাজ পারবে ?

ক্লার্ক। মশাই, খোলামকুচি বাজানো ছাড়া নতুন কিছু হয় ত পারি। খাই-না-খাই মুখের তার বদলায়। কি বলুন ?

সিধু। বেশি কিছু নয়! পিনুটুর এস্রাজটা চুরি করতে পারবে ?

ক্লার্ক। অনায়াসে। কিন্তু কোম্পানীর আইন বড় খারাপ। ধার করলেই শোধ দিতে হবে; জিনিস কিনলেই দাম আদায় করে; চুরি করলেই জেলে দেয়। সুসভ্য দেশে এ কি অন্যায় ব্যবস্থা। আপনারা সহ মাল্‌সী (M. L. C.) হয়েছেন। এই ক'টা অসভ্য আইন রদ করতে পারেন না?

সিধু। হবে না কেন? হয়। কিন্তু তা হ'লে আমরা খাই কি? ভায়ে-ভায়ে যদি মামলা না হয়, পার্টিশন্ স্যুট না বাধে, পাওনাদার ডিক্রি না করে, খুনে ডাকাত যদি ফাঁসি-জেল এড়াতে চেষ্টা না পায়, তা হ'লে আমাদের উপায় কি হবে? খাব কি? চল্‌বে কি ক'রে? এখন যা বললাম, তা করবে কি না বল?

ক্লার্ক। কি, চুরি! চুরি আমার চোদ্দ-পুরুষে জানে না।

সিধু। তবে যে বল্‌লে পারি?

ক্লার্ক। মশাই, কথাটা যদি একটু সভ্য ক'রে বলেন, তা হ'লে পারি।

সিধু। কি রকম?

ক্লার্ক। চুরি না ব'লে বলুন না কেন সরাতে পার। আমরা চুরি করি নি, মশাই। বাজারে গিয়ে আলুটা-পটলটা মাছটা-আস্‌টা সরাই।

সিধু। বেশ, তাই—তাই! কিন্তু আজই করা চাই।

ক্লার্ক। কিন্তু—

সিধু। আবার কিন্তু কি?

ক্লার্ক। আপনার যে ছেলে! একটু অঙ্কুশ পেলে পুলিসে টেনে নিয়ে গিয়ে ধিন্-তা, তা-ধিন্ নাচিয়ে দেবে!

সিধু। হাজতে দেবে ত? আমি জামিন্ হয়ে খালাস ক'রে আন্‌ব।

ক্লার্ক। আপনাকে ফি (fee) দিতে হবে?

সিধু। নিশ্চয়।

ক্লার্ক। পাঁচ বছর এক পয়সা দিলেন না, আবার ফি? দরকার নেই, মশাই! আমার হাতের সাফাই বেঁচে থাক!

সিধু। বাবা, একটা সত্যি কথা বল! পাঁচ বছর কি তুমি না খেয়ে মরছ? কেস্ আনতে পার না, আবার টাকা চাও? তোমার লজ্জা নেই?

ক্লার্ক। মশাই, কেস্ না পেলে আমি কি গড়ব?

সিধু। গড়বে বৈ কি! এই যে, তোমাদের পাড়ায় সেঠেদের দু'ভাই রয়েছে। লোকে বলে, রাম-লক্ষ্মণ। বাধিয়ে দিতে পারে না? এই যে বুড় মিত্তিরের তেজ পক্ষের পরিবার ঝগড়া ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গিয়েছে, খোরাকীর নালিস্ রুজু করিয়ে দিতে পারে না? এই যে সনাতন মল্লিকের পরিবারের সঙ্গে বন্‌ছে না। ফারখৎ স্যুট (suit) আনাতে পার না? আবার কথা কও, পাঁচ বছর এক পয়সা দিলেন না! টাকা কি খোলামকুচি?

ক্লার্ক। মশাই, এ আপিসে ঢুকে এস্তক ত তাই দেখছি। বাজিয়ে বাজিয়ে আমার হাতে কড়া প'ড়ে গেল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বিধু ডাক্তারের অন্তঃপুর

টেঁপীর মা ও বিধু

টে-মা। হাঁ-গা, শুন্‌লুম, রায়েদের একটি ছেলে আছে—

বিধু। তা থাক্ না, মা-বাপের কোল জোড়া ক'রে দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক্, তুমি তার ওপর নজর দিয়ো না।

টে-মা। কেন, আমি কি ডাইনী?

বিধু। নয় ত কি! তোমার নজরের গুণ কত!

গীত

কিয়া দিল্ চোরি তেরি নয়না।
কলিজা মেরি ক্যায়সে সামহারি,
ক্যায়সে গুজারি রয়না॥
আয়া বেগানা, কিয়া দেওয়ানা
তেরি মিঠি বুলি মেরি ময়না॥

প্রিয়ে, ভর্ত্তৃদারিকে, হাতা-বেড়ী-ধারিকে, মনোরঞ্জন-দ্রৌপদী-গঞ্জন-অন্ন-ব্যঞ্জন-প্রস্তুত কারিকে, শাকশালাভিসারিকে!

টে-মা। যে আজ্ঞে, মশাই! একটু মনোযোগ করুন! শিবি-ঘটকী অনেকগুলি সম্বন্ধ এনেছে—

বিধু। কি রকম সম্বন্ধ? সব দামী-দামী ছেলে ত?

টে-মা। তা বাপু, কিছু খরচ না করলে কি আজকাল মেয়ের বিয়ে হয়? বে দেওয়া ত দরকার।

বিধু। দরকারটা শুধু এক পক্ষের ভাবছ কেন? দরকার মেয়ের বাপেরও যেমন, ছেলের বাপেরও তেমনি। দিন

কতক মেয়ে আট্‌কে দেখুক দিকি, কেমন না বরের বাপ সিধে হয়! যাদের মেয়ে আছে, তারা প্রতিজ্ঞা করুক যে, নিখরচায় না হ'লে মেয়ের বে দেবে না।

টে-মা। মেয়ের বয়স ত আর ধ'রে রাখা যাবে না।

বিধু। বে দিলেই কি মেয়ের বয়েস ধ'রে রাখা যাবে? তোমায় ত বলছি যে, এক একটি বছর যাবে আর মেয়ের এক এক বছর বয়েস বাড়্‌বে।

টে-মা। কিন্তু জাত যাবে যে!

বিধু। জাত কার আছে যে যাবে? কে কি না করছে? কে কি না খাচ্ছে? আমাদের তর্কপঞ্চানন—

টে-মা। থাক্ থাক্, আর নিন্দে ক'রে কাজ নেই।

বিধু। নিন্দে কি বৃন্দে! গুণ-ব্যাখ্যা!

টে-মা। মেয়ে আট্‌কে রাখো! মেয়ে থুবড়ো হয়ে করবে কি?

বিধু। কেন, দেশের কাজ।

টে-মা। ছাই দেশের কাজ! সোয়ামীর সেবা করা হ'ল মেয়েমানুষের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম, তা জানো?

বিধু। হাড়ে হাড়ে তা ভুগ্‌ছি।

টে-মা। দেখ, তোমার ঠাট্টা-সত্যি বোঝা যায় না।

বিধু। সত্যি বল্‌ছ, না, তুমিও ঠাট্টা করছ? বুঝ্‌বে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে!

(নিধুর প্রবেশ)

টে-মা। হা রে নিধু, তোদের মতলবটা কি বল্‌তে পারিস্? কি সব গুজ-গুজ ফুস্-ফুস্ করিস্?

নিধু। দিদি, তুমি সব ভাবনা ছেড়ে, টেপীর বে'র বরণডালা সাজাও গে।

বিধু। কি, কি হ'ল? সব ঠিক্?

নিধু। ঠিক। সিধু অ্যাটর্ণীর চিঠি দেখ।

বিধু। বাঃ, ব্রাদার, তুমি খেলোয়াড় বটে! কিন্তু এত দেরি হ'ল কেন?

নিধু। চুনো গলিতে গিয়ে ব্যাণ্ড্ ঠিক্ ক'রে এলাম।

টে-মা। কিসের ব্যাণ্ড্ রে?

নিধু। টেপীর বে'র দিদি!

টে-মা। তোমাদের বাপু সকলই অনাসৃষ্টি! মেয়ের বে'তে আবার বাজনা করে কে?

বিধু। রসুনচৌকি বসায় ত। তার বদলে না হয় ব্যাণ্ড্ বাজবে।

টে-মা। তবে যে বল, একটি পয়সা খরচ করবে না? ব্যাণ্ড্ বসাতে ত টাকা চাই।

বিধু। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। কিন্তু তুমি উতলা হয়ো না। ধীরে ধীরে বে'র সব যোগাড় কর।

টে-মা। কিন্তু পদ্য ছাপা চাই।

বিধু। ওরে নিধু, এ আবার কি বায়না করে! তা হ'লে ত কবীন্দ্র সুরভীন্দ্রনাথকে পাক্‌ড়াতে হয়। কি ভাবছ, ভায়া?

নিধু। এ সব ব্যাণ্ড্-ম্যাণ্ড না ক'রে গীতগোবিন্দ ছুচ্ছুন্দরকে আসরে নামিয়ে দিলে হ'ত না?

বিধু। না রে! আমি যে দিন পিণ্টুকে দেখতে যাই, দেখলাম, ছুচ্ছুন্দর সেখান থেকে বেরুল। নইলে ত একাই সে মাৎ করত! সে দিন রাস্তা দিয়ে তান ছাড়্‌তে ছাড়তে যাচ্ছিল, একটা বৌএর কাঁক্ থেকে কল্‌সী প'ড়ে ভেঙ্গে গেল। দু'টি ছেলে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। তার পর দেখতে দেখতে রাস্তা ফাঁক্।

টে-মা। রাস্তা ফাঁক কি?

বিধু। বাস্ ফেলে ড্রাইভার্ (Driver) কন্‌ডাক্‌টার (conduct r); ট্যাক্সি ড্রাইভার মোটর ড্রাইভার যে যার গাড়ী ছেড়ে ছুট! দিনের বেলা এই! রাত্তিরে রক্ষে আছে!

টে-মা। তা হ'লে সব যোগাড় করি?

নিধু। নিশ্চয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সিধু অ্যাটর্ণীর অন্তঃপুর

সিধু ও পিনুটুর মা

পি-মা। বলি, এত রাত্তিরে যাওয়া হচ্ছে কোথা?

সিধু। যাব না ত কি? তোমার ছেলের জ্বালায় ঘরে টেকবার যো আছে? ভদ্রলোক যখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে যাবে, ওর তখন এস্‌রাজ নিয়ে দুপুরে মাতন সুরু হবে!

(পিন্টুর প্রবেশ)

অই নাম করতেই এসে হাজির! এখনও অনেক দিন বাঁচবে!

পি-মা। বালাই—ষাট! যা মুখে আসে, মিন্ষে তাই বলে।

পিন্টু। (এদিক-ওদিক দেখিতে দেখিতে) মা, আমার এস্রাজ?

সিধু। গিন্নি, যাই, রায়-বাহাদুরের আমলাদের একটু আপ্যায়িত ক'রে আসি।

পিন্টু। মা, আমার এস্রাজ দিয়ে যেতে বল।

সিধু। ওর এস্রাজ আমি কি জানি!

পিন্টু। তবে কে জানে?

সিধু। যমরাজ।

পি-মা। মিন্ষের বাওয়াত্তুরে ধরেছে! ষাট—ষাট! তবু যদি দু'কড়া আনবার মুরদ্ থাকত!

সিধু। গিন্নি, তোমার ছেলেকে পথ ছাড়তে বল। দোর আট্‌কে দাঁড়িয়েছে।

পিন্টু। মা, তুই বল্, এস্রাজ না দিলে আমি পথ ছাড়ব না।

সিধু। তোর এস্রাজ আমি কি জানি!

পিন্টু। দেখ্ মা, ভাল হবে না বলছি। তুই-মুই করছে! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না।

সিধু। ওঃ, ভারি ভদ্রলোক! রাত দুপুরে ক্যাঁ-কোঁ! বাড়ীতে টেকবার যো নেই! পথ ছাড়!

পিন্টু। এসরাজ না দিলে ছাড়ব না।

সিধু। এস্রাজ কি আমি কাছায় বেঁধে রেখেছি!

পিন্টু। বটে, চালাকি! জানো, দাদামশাইকে ব'লে এখনি তেরে-কেটে তাক্ লাগিয়ে দোব!

সিধু। তেরে-কেটে-তাক লাগিয়ে দেবে! আমি টাইটেল-সুট (Title-suit) করতে জানি নি!

পিন্টু। শুন্‌লি, মা, শুন্‌লি! মাসহারা বন্ধ করলে হকিয়ৎ করবে!

পি-মা। আহা বলুক না! ও যদি আইন-আদালত জান্‌ত, দু পয়সা ঘরে আন্‌ত!

সিধু। আহা, তোমার ছেলে ত কেমন লায়েক!

পি-মা। তবু তোমার চেয়ে ভাল! দু'ট গৎ, দু'ট বাজনার বোল্ জানে!

সিধু। আমিও আইনের বয়েদ জানি! তুমি মেয়েমানুষ বুঝবে কি! সেক্‌সনকে সেক্‌সন্ (section) আউড়ে দিতে পারি!

পি-মা। আমার কাছে আওড়ালে কি হবে! আদালতে আওড়াও গে না!

সিধু। জজ বেটারা যে শোনে না!

পিন্টু। ও-সব বাজে কথা রাখো! আমার এস্রাজ এনে দাও। নইলে তোমার নামে আর কুড়ো বেটার নামে থানায় ডায়ারি (Diary) করব।

সিধু। কুড়োরাম তোমার কি করলে?

পিন্টু। সেই বেটা সরিয়েছে, আর তুমি এডিং অ্যাণ্ড অ্যাবেটিং (aiding and abetti g)? দেখবে ধুম! তখন ধামার বাজবে—কধেটে-ধেটে-ধা, বাবাগিরি চল্‌বে না!

সিধু। বেশ! তুমি থানায় ধামার বাজাও গে! আমিও চার্জ্জ (charge) দোব—বে-আইনী আটক (illegal confinement), কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধা প্রদান।

পিন্টু। (পথ ছাড়িয়া) বেশ! কিন্তু মনে রেখ এর পর—ধুমতাক্, ত্রেকেটে তাক্, গদি-ঘিনা-ধা!

সিধু। তুমিও মনে রেখ, আমি তোমার বয়ে আকার বা, বয়ে আকার বা! [রাগে বেগে পিন্টুর প্রস্থান।

পি-মা। বলি, তুমি কিসের বাবা! দশ মাস দশ দিন পেটে ধরলাম আমি, ব্যথা খেলাম আমি, বিউলাম আমি, ঝাল খেলাম আমি, উনি এখন বাবা, আমরা এমনি হাগা! লজ্জা করে না।

(সহসা বিকট স্বরে বাদ্য)

সিধু। গিন্নি, গিন্নি, শুন্‌ছ?

পি-মা। রাম-রাম-রাম-রাম! দোরে খিল দাও!

সিধু। রাম রাম করছ কেন? এ কি ভূত! (দোরে খিল দিয়া) এ নিশ্চয় চোর।

পি-মা। হাঁ, তোমার বাড়ীতে ভেঁপু বাজিয়ে চুরি করতে এসেছে!

সিধু। আহা-হা, এ স্বদেশী চোর! এরা ভেঁপু বাজিয়ে চুরি করে।

পি-মা। তোমার বাড়ীতে স্বদেশী চোর কি করতে আসবে?

সিধু। আমার বাড়ী কেন? ও বাড়ীতে জমীদার এসেছে! একটু কান পেতে শোন না!

(নেপথ্যে বাদ্য)

পি-মা। রাম-রাম-রাম-রাম! তুমি শোন! এ দুপুর রেতে ভূতের ভেঁপু শোনবার আমার সখ নেই। মিন্‌সে কা'কে ভাড়াটে আনলে তার ঠিক্ নাই! রাম-রাম! ভালয় ভালয় রাতটা পোয়াক্, গোপালকে নিয়ে আমি কালই বাপের বাড়ী যাব।

সিধু। আমাকে একলা ফেলে?

পি-মা। একলা কেন? তোমার ত এখন ঢের সঙ্গী জুটল। ওদের নিয়ে থাক। মিন্‌ষে বাড়ীতে ভূত ডেকে আনলে গা!

সিধু। দেখ আপনার বুকে হাত দিয়ে কথা কও! ভূত ডাক্‌লাম আমি! তোমরা মায়ে-পোয়ে যে রকম আওয়াজ কর, ভূতকে আর ডাকতে হয় না। হাঁ, সত্যি কথা বল!

(নেপথ্যে বাদ্য)

পি-মা। ও-মা! রাম-রাম! দু'টো এয়েছে গো! সেটা সরু—পেত্নীর, এটা মোটা আওয়াজ—তাঁদের।

সিধু। তাঁদের—কাদের?

পি-মা। তোমার ভাই-ভগ্গের গো, আবার কাদের! তোমার কাছে যখন বাড়ী ভাড়া নিতে এসেছিল, পায়ের দিকে চেয়ে দেখেছিলে?

সিধু। পায়ের দিকে কেন চাইব?

পি-মা। কচি খোকা আর কি! জানো না তাঁদের সামনের দিকে গোড়ালি, পেছন্ দিকে পা হয়! আচ্ছা, কথা ত কয়েছিলে? তা'তেও বুঝতে পারনি, খোনা-খোনা আওয়াজ কি না?

(নেপথ্যে বাদ্য)

রাম-রাম! কালই যদি না ওদের বিদেয় কর ত আমি গলায় দড়ি দেবো।

সিধু। তা হ'লে ওরাই দলে পুরু হবে। অপঘাতে ম'লে পেত্নী হয়, জানো না? হুকুম দিচ্ছেন, বিদেয় কর! হাজার-খানি চকচকে চাকি ঝাঁকবে, তা জানো?

পি-মা। ওদের জোটালে কে, বল্‌তে পার?

সিধু। হ্যাঁ, জোটালে কে? তাই ত, জোটালে কে? জোটাবে আবার কে!

পি-মা। তুমি তবে ভূতের সঙ্গে সাঙাতি করেছ বল?

সিধু। আরে রাম-রাম! তা কেন?

পি-মা। তবে? কে জোটালে?

সিধু। বিধু ডাক্তার।

পি-মা। বিধু আবার কবে তোমার কাছে এল?

সিধু। আহা, বিধু আসবে কেন?

পি-মা। তবে কে এসেছিল?

সিধু। কে এসেছিল?

পি-মা। হ্যাঁ গো! কে এসেছিল, তার নাম জানো না?

সিধু। কেন জানবো না! অ্যাটর্ণীগিরি করি, এগ্রিমেণ্ট (agreement) করেছি, আর নাম জানি নি!

পি-মা। জান ত বল না কে?

সিধু। কে আবার! গোলমরিচ।

পি-মা। দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। আমি কি খুকী?

সিধু। ঠাট্টা করছে কোন্ চণ্ডাল!

পি-মা। আমার গা জলে যাচ্ছে!

সিধু। আহা, এ ত সত্যিকার গোলমরিচ নয় যে গা জলবে।

পি-মা। গোল্‌মরিচ মানুষের নাম হয়?

সিধু। কেন হবে না? গরম-মসলা, গোলমরিচ, পাঁচ-ফোড়ন, এমনি কত রকম পদবী আছে, তুমি তার জানবে কি? মেয়েমানুষ ঘরের ভেতর থাকো।

পি-মা। সাম্‌লা পরে বাইরে বেরিয়ে যে বুদ্ধি খরচ করেছ, গাম্‌লা ভরে জাব দেবে! ঐ হেতুড়ে ডাক্তারটার যে বুদ্ধি আছে, তোমার তা নেই! মিনসে জব্দ করবার জন্যে বাড়ীতে ভূত ছেড়ে দিলে গা! যেমন করে পারো—বিধুর হাতে পায়ে ধরে, তার মেয়ের সঙ্গে পিন্টুর বিয়ে দাও।

(নেপথ্যে ভীষণ বাদ্য ও পিন্টুর মা-মা বলিয়া চীৎকার)

ঐ গো, ধাঁই-ধাঁই ক'রে দোর ঠেলাঠেলি করছে! আমি কোথায় যাব!

(নেপথ্যে) পিন্টু। শীগগির দোর খোল, নইলে ভাঙলাম!

পি-মা। ঐ শোন, বল্‌ছে ঘাড় ভাঙব! তোমার পায়ে প'ড়ি, আমায় লেপখানা মুড়ি দিয়ে দাও।

সিধু। কেন, তুমি লেপখানা মুড়ি দিতে পার না!

পি-মা। না,আমার পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে গেছে।

(নেপথ্যে) পিন্টু। মা—মা, শীগগির দোর খোল্! পোড়ারমুখী।

পি-মা। ও গো ঐ শোন। মুখ পুড়িয়ে দেবে বল্‌ছে!

সিধু। কি শুনব! তুমি কান পেতে শোন, আর আল্‌মারীর চাবি দাও, এক পাত্তর টেনে নিয়ে দেখি, কেমন ভূত!

পি-মা। ও-গো, না-গো না! তুমি যেয়ো না। বিধবা হ'লে মাছের একটি আঁষও দাঁতে কাটতে দেবে না।

সিধু। তুমি চাবিটা দাও ত। (আঁচল হইতে চাবি লইয়া মদ্যপান) দেখি কেমন ভূত!

পি-মা। ও-গো যেয়ো না, যেয়ো না! আমি মুচ্ছ যাব।

সিধু। বেশ! আমি দরজা থেকেই মুখ বাড়িয়ে দেখছি!

(দোর খোলা ও পিন্টুর প্রবেশ)

পি-মা। ঐ গো ঘরে এসে ঢুকল!

সিধু। কি বিপদ! ও তোমার আদরের গোপাল।

পিন্টু। মা, তুই জেগে আছিস্ না মুচ্ছ গেছিস্।

পি-মা। ও বাবা, আমার ঘাড় মটক না, বাবা!

পিন্টু। আ মর, কে ঘাড় মট্‌কাবে! দেখ না, আমি তোর পিন্টু!

পি-মা। সত্যি বলছিস্? তুই ভূত হ'স্‌নি!

পিন্টু। আ মর, আমি মলাম কখন যে, ভূত হব? চোখ চেয়ে দেখ না।

পি মা। না, বাবা, আমি চোখ চাইব না! তা হলে মুচ্ছ যাব!

সিধু। ও-গো উঠে এসে দেখ না, ভূতে কি ক্লারিয়নেট্, আল্‌থরণ, ব্যাগ্‌পাইপ, বাজায়!

পিন্টু। ওরা সব বাজায়! হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি ক'রে বাজাতে পারে আর বাঁশী বাজাতে পারে না! বিধু ডাক্তার কি ভূতুড়ে, মা।

(নেপথ্যে ভীষণ বাদ্য ও সিধুর কানে আঙ্গুল দেওয়া)

সিধু। বাপ্! গেলুম, গেলুম!

পি-মা। ঐরে ওর ঘাড় মট্‌কাচ্ছে! বাবা, তুই আমার কাছে সরে আয়। বিধু ডাক্তার ভূতের রোজা!

সিধু। আরে ঐ যে বিধু ডাক্তার!

পিন্টু। মা, তুই বাবাকে বল্, আজই ওর মেয়ের সঙ্গে বে দিক, বানান্ বানান্‌ই সই!

সিধু। (উচ্চৈস্বরে) বাঁচাও, ব্রাদার, বাঁচাও! সম্বন্ধ ঠিক রইল। আগামী লগ্নে।

(নেপথ্যে) বিধু। সে কি ক'রে হবে। তোমার ছেলের ধনুক-ভাঙ্গা পণ, নগদ কিছু হাতে না পেলে বে করতে রাজি হবেন না। ওহে বাজনা থামিয়ো না, চালাও, চালাও।

পিন্টু। রাজি, হবু শ্বশুরমশাই, রাজি! একটি পয়সা চাই নি।

বিধু। কিন্তু আমার যে কিছু যোগাড় নেই। না টাকা, না গয়না। চলুক হে চলুক।

সিধু। তোমায় একটি পয়সা খরচ করতে হবে না!

(নেপথ্যে) বিধু। বরযাত্রীও খাওয়াতে হবে না?

সিধু। সব খরচ আমার।

(নেপথ্যে) বিধু। অ্যাটর্ণীর কষ্ট্ (cost) বাবদ যে বিল (bill) করেছ?

সিধু। চাই না।

(নেপথ্যে) বিধু। আমার মেয়ে যদি তোমার পিন্টুর এস্রাজ রোগ না সারাতে পারে? চালাও, চালাও!

পিন্টু। দোহাই ধর্ম্ম, হবু শ্বশুরমশাই, আর যদি এস্রাজ ছুঁই ত আমি—আমি—আমি ধাকেটে তাক্—ধুম কেটে তাক —গদি ঘিনা ধা!

(নেপথ্যে) বিধু। ওহে চালাও, চালাও!

সিধু। আবার চালাও কেন? থামাও!

(নেপথ্যে) বিধু। তুমি থামাও না।

সিধু। কি ক'রে?

(নেপথ্যে) বিধু। এদের পারিশ্রমিক দিয়ে।

সিধু। বেশ! রাজি! যা বলবে, দোব।

(নেপথ্যে) বিধু। তা হলে সব ঠিক্?

সিধু। সব ঠিক্—সব ঠিক্—সব ঠিক্।

(নেপথ্যে) বিধু। কেমন বাবাজি?

পিন্টু। রাজি—রাজি—রাজি। [পিন্টুর প্রস্থান।

পি-মা। চলে গেছে ত?

সিধু। সব—সব।

পি-মা। আর কেউ নেই?

সিধু। এই যা তুমি আর আমি। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাসর গৃহ

(টেপীর মা ও রঙ্গিনীর প্রবেশ)

টে-মা। কেমন জামাই হল বল্?

রঙ্গি। যেন সোনার চাঁদ!

টে-মা। যাক্ ভাই, চার হাত এক ক'রে দিয়ে বাঁচলুম। পেটের একমুঠো ভাতের ভাবনা নেই। অগাধ বিষয়। এখন মেয়েটাকে গছলে হয়।

রঙ্গি। সে ভয় নেই, দিদি! গছ্‌বে, গছ্‌বে।

টে-মা। তাই বল্, ভাই, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আজ-কালকার ছেলেদের ভয় করে। তার ওপর টেপীর যে বানান্।

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু। দিদি, এইবার বর-কনে এনে বাসরে বসিয়ে দি?

টে-মা। ভয় কি, ভাই, এখনও গেছে? তোমার ভাগ্‌নীর যে বানান্ রোগ!

নিধু। কিছু ভেব না! তোমার জামাইয়ের যে বাজনার বোল্ আওড়ানো রোগ আছে!

টে-মা। পুরুষমানুষ ত রোগে ভরা রে। কে তা ধরে বল্? কিন্তু মেয়েমানুষের রোগ কি কেউ মাপ্ করে, ভাই? কেবল খোঁটা আর খোঁটা!

নিধু। সে কাল আর নেই, দিদি! এখন সমান অধিকার। এর দু'বার নিউমোনিয়া (Pneumonia) হয়ে থাকে ত ওরও হওয়া চাই। এর ডান পা খোঁড়া হয় ত ও বাঁ পা খোঁড়া করবে। সমান অধিকার।

রঙ্গ। তা হগ্‌গে, দাদা, তুমি এখন বর-কনে নিয়ে এস। [নিধুর প্রস্থান।

টে-মা। ওলো রঙ্গি, এরা বলে কি রে! পা খোঁড়া করবে কি?

রঙ্গি। তাই ত করবে! না ক'রে ছাড়বে! মল্লিকদের মেজ-বৌ বরের সঙ্গে টক্কর দিয়ে জলে ডুবে ম'ল।

টে-মা। কেন লো?

রঙ্গি। তার বর ভাল সাতার কাটতে পারত। বল্লে তুমি সাতার কাটতেই পারো, ডুবে মরতে ত পার না!

(নিধু, বর-কনে ও পুরনারীগণের প্রবেশ ও বর-কনের আসন গ্রহণ)

নিধু। দিদি, তুমি বলেছিলে কবিতা চাই। তা ভাই, কবিতা হয়েছে, কিন্তু ছাপানো হয় নি।

রঙ্গি। কে লিখলে, দাদা?

নিধু। আজ-কালকার যে খুব ডাক্‌সাইটে কবি, কবীন্দ্র সুরভীন্দ্রনাথ ছবি শর্ম্মা ওরফে প্যালারাম চক্রবর্ত্তী, তারই লেখা।

টে-মা। তা ছাপালে না কেন? আমরা না হয় খরচ দিতাম।

নিধু। তার পয়সার কি কমি আছে। তা নয়। সে বলে ছাপার চাপে তার কবিতার মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। সে প'ড়ে শোনায়।

টে-মা। তবে ডাক না। মেয়েমানুষ, না, পুরুষমানুষ?

নিধু। ঐটি, দিদি, এ পর্য্যন্ত বোঝা গেল না। মেয়েমানুষের মত চেহারা, পুরুষমানুষের মত কাপড় পরে।

রঙ্গি। তাঁকে ডাক না, দাদা।

নিধু। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে কবীন্দ্র মশাই!

(কবীন্দ্র সুরভীন্দ্রের প্রবেশ)

আজ্ঞে হ'ক! আপনার কবিতাটি বর-কনেকে শোনান্।

কবীন্দ্র। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে—

বর আর কনে যেন ক্ষীর আর সর!
বাসর আসর মাঝে বাজায় কাঁশর!

নিধু। বাঃ, কি অনুপ্রাস!

কবীন্দ্র। মশাই সে আপনাদেরই গুণে! ঐ যে ওষুধ—অনুপ্রাস-হনুত্রাস-কণ্ঠশ্বাস কামরাঙ্গা—ও-টা এক ডোজ (Dose) খেতেই হুড়-হুড় করে এসে পড়ল। পড়ল যখন, তখন আর কি করি বলুন! লিখে ফেল্লাম!

নিধু। বলেন কি! হুড়-হুড় করে?

কবীন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ! সে কি যেমন তেমন হুড়-হুড়! বর্ষাকালে ভাঙ্গা নর্দ্দামা দে যেমন জল পড়ে, তেমনি! যখন লিখলাম, তখন কলমে কি কালী ছিল? খালি অশ্রু—প্রেমাশ্রু!

নিধু। সেই প্রেমাশ্রু বুঝি কাঁশর হয়ে বেজে উঠ্‌ল! একখানা কিন্তু সার্টিফিকেট (certificate) দিতে হবে! চলুন দেবেন।

কবীন্দ্র। যে আজ্ঞে! আমি লিখতে চললাম্।

[নিধু ও কবীন্দ্রের প্রস্থান।

১ রমণী। ওহে বর, কনে পছন্দ হয়েছে?

২ রমণী। বলি, এরা যে পুটলী বেঁধে তোমাকে কি দিলে, একবার চেয়ে দেখ!

৩ রমণী। ওলো টেপি, বল্ দিকি ও তোর কে?

টেপী। পয়ে হাস্য আন্টু।

৪ রমণী। পয়ে হুস্যি কি রে পোড়ারমুখি? বরের নাম ধরতে আছে?

টেপী। তবে কি, ও আমার বিনামা?

১ রমণী। তুমি বল ত, ভাই, উটি তোমার কে?

পিন্টু। উনি আমার—আমার ধিনি-কিটি-ধা!

রমণীগণ। হা-হা-হা!

(নিধুর পুন প্রবেশ)

নিধু। রঙ্গি রঙ্গি, কালোয়াৎ ছুচ্ছুন্দর আস্‌ছেন, বর-কনেকে গান শোনাবেন। সকলে কানে আঙুল দিয়ে বোস।

(গীত-গোবিন্দ ছুচ্ছুন্দরের প্রবেশ)

গীতগোবিন্দ — গীত

উহুঁ-উহুঁ-উহুঁ—
তুঁহুঁ আর তুঁহুঁ মিলে হ'ল তুঁহুঁ।
ভঁনে রাঁমদাস পাঁদে দিঁয়ে হুঁ-হুঁ।
প্রেম বৃক্ষে তুঁহুঁ ডাকে কুঁহু-কুঁহু॥

(নেপথ্যে গোলমাল) ওরে স'রে পড়্, ট্যাক্সী ডাক। বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে।

সমবেত সঙ্গীত

ধিন-ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ রাজী হ'ল ভোর।
উঠল রবি, ফুট্‌ল ছবি, কেটে গেল মেঘের ঘোর।
বানান্-বোলের মিলন বাসর—
বাজায় কবি প্রেমের কাঁশর,
প্রেমের কীর্ত্তন করে ছুচ্ছুন্দর!
সাগগা-সাগগা-মাপ্পা-নিপ্পা—
নাকের ডাকের বেজায় জোর,
হাততালি দে বল সবাই এঙ্কোর—এঙ্কোর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

পরলোকে কৃষ্ণভাবিনী দাসী

বাঙ্গালার একটি মহাপ্রাণ পুণ্যবতী মহিলা ৬ই ফাল্গুন কাশীলাভ করিয়াছেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সাধক— স্বদেশহিতব্রত —মুক্তহস্ত দাতা—নীরব দেশ-সেবক শ্রীযুত হরিহর শেঠের জননী কৃষ্ণভাবিনী দাসী। এই উদারহৃদয়া দয়াবতী নারীর পুণ্যপ্রভাবে প্রভাবিত—অনুপ্রাণিত হইয়াই শেঠ মহাশয় চন্দননগরে কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দির ও অঘোরচন্দ্র প্রাথমিক অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় নামে দুইটি নারী শিক্ষা-মন্দির, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির নামে বিরাট লাইব্রেরী ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নারীগণের শিক্ষা ও সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তিনি নারীশিক্ষা মন্দিরে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি দরিদ্রের কন্যা, অর্থশালী শ্বশুরের গৃহে আসিয়াছিলেন; কিন্তু বিলাস-বাসনা কোন দিন তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। চিরদিন দরিদ্র বিপন্নের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরোপকার ও সেবাধর্ম্ম তাঁহার জীবনব্রত ছিল। শেষ জীবনে ভিখারিণীবেশে তিনি বিভিন্ন তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া ৬৬ বৎসর বয়সে কাশীলাভ করিয়াছেন। তাঁহার মত আদর্শচরিত্রা পুণ্যবতীর নীরব সাধন-কাহিনী শুদ্ধান্তঃবাসিনীগণের অনুকরণযোগ্য। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"এই যে, কিশোর কোমল তৃণের সহাস শ্যামলি
চুম্বনে যা'র রোমাঞ্চিত নদীর অধর-সীমা,
স্নিগ্ধ-করা যাহার বুকে শুয়েছি আজ আমরা সুখে,
সাবধানে সই পা ঢাল গো, সামলে দেহের ভার!"—ওমর-খৈয়াম।

[শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার।

৭ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

১১

আমেরিকার পত্র

১

সিকাগো, ২৬এ ফেব্রুয়ারী।

বস্তুত বাইরে যখন সমস্তই অনুকূল হয়, তখনই নিজেকে সত্য রাখা শক্ত হয়ে উঠে—কারণ, সত্যের তখন কোনো পরীক্ষা হয় না—তখন মনে হয়, সত্যকে না হলেও যেন চলে, আসবাব থাকলেই যথেষ্ট; এই জন্যই ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যের অধিকার দুর্লভ। টাকার প্রতি আমাদের যে অন্ধ বিশ্বাস কোনো মতেই আমাদের ছাড়তে চায় না, তার জাল আমি ছিন্ন ক'রে ফেলে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে চাই—"চাইনে কিছু"র দেশে পরমানন্দ মনে বাসা বাঁধতে চাই। এ দেশের লোকে মনের এই ভাবটাকে fatalism ব'লে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এ fatalism নয়। যারা জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলে, fatalism তাদেরই ধর্ম্ম—তারাই অদৃষ্টকে স্পর্শ করবার জন্য অন্ধকারে ঢেলা মারে—এ দেশে তাদের অভাব নাই। কিন্তু আমি ত অদৃষ্টকে হাৎড়ে খুঁজে বের করতে চাইনে—যে পূর্ণতা আমাকে ঘিরে আছেন—ভ'রে আছেন, তাঁকেই আমি উপলব্ধি করিতে চাই—বাইরের অভাবেই যে তাঁকে বেশী ক'রে পাওয়া যায়—রাণীর সাজসজ্জা যতই দামী হোক, স্বামীর ঘরে গিয়ে সে সমস্ত খুলে ফেলতে হয়—অন্যত্র যেমনি হোক, কিন্তু স্বামীর কাছে এই সাজ খুলে ফেলা ত দারিদ্র্য নয়। আমাদের আশ্রমে সেই স্বামীর সঙ্গেই আমাদের কারবার—এইজন্যে সেখানে দারিদ্র্যে আমাদের লজ্জা নেই—আমরা রিক্ত—একেবারে রিক্ত হয়েও পূর্ণ হব। আমাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই, কিচ্ছু নেই—তোমরা নিরুদ্বিগ্ন হও, আনন্দিত হও এই আমি দেখতে চাই—অন্ধভাবে নয়—সমস্ত জেনে শুনে বুঝে পড়ে—চক্ষু মেলে, দুই হাত আকাশে তুলে, বক্ষ প্রসারিত ক'রে। অভাব জিনিষটা পিছনে থাকবার জিনিষ, কিন্তু আমরা তাকে সামনের দিকে ধ'রে তাকাই, তখন তার কোনো মানে বুঝতেই পারিনে, সমস্তই ফাঁকা দেখতে থাকি—এ ঠিক যেন ছবির পিছন দিকটাকে সামনে ক'রে

দেয়ালের উপর টাঙ্গিয়ে রাখা। কেবল দেখি ফাঁকা ক্যান্‌ভাস—চিত্রকরের উপর বিশ্বাস একেবারে চ'লে যায় এবং নিজে যে এই ফাঁকা কেমন ক'রে ভর্ত্তি করব, তা ভেবে পাইনে —তখন আর কোনো উপায় দেখিনে, এর উপরে পর্দ্দা ফেলে কোনোমতে এই শ্রীহীনতা ঢাক্‌তে চাই—সেও যে শূন্যকে দিয়ে শূন্য ঢাকা—যতই পর্দ্দা বাড়াই না কেন, সে শূন্যতা ত কোনো-মতেই যাবার নয়—কিন্তু একবার কেবল ছবির দিক্‌টাকে পাল্‌টে ধরলেই সমস্ত ধাঁধা এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যায়। ছোট ছেলে অন্ধকারটাকে সত্য পদার্থ ব'লে গ্রহণ করে বলেই তাকে ভূতের ভয় দিয়ে ভরিয়ে তোলে—আমরাও অভাবটাকে তেমনি ক'রেই নিয়েছি, তাকে এমন ভয় দিয়ে ভরিয়েছি যে, সে ভয় বাইরের দিক্ থেকে ঘোচানো অত্যন্ত শক্ত,—সে ভয় বস্তুত নেই, এ কথা জানলেও মন সান্ত্বনা মানে না এবং বাইরের দিক থেকে সে ভয় ঘোচাতে চেষ্টা করি—কিন্তু ঘুচবে কেন? অন্ধকারের সীমা কোথায়? তাকে ভেঙ্গে-চুরে ধুয়ে-মুছে ফেল্‌ব কোন্‌খানে? অথচ ভাবের দিকে কতই সহজ—একটুমাত্র ছোট আলোর শিখা। অভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন দেখি, তখন সমস্ত ডালপালাসমেত একটা বট-গাছকে এমন প্রকাণ্ড যাদু ব'লে বোধ হয়, কিন্তু ভাবের দিকে একটিমাত্র ছোট বীজ। এইটেই বিধাতার কৌতুক হাস্য—তিনি অভাবটাকেই প্রকাণ্ড দৈত্যদানবের মত গড়েন, কিন্তু কার হাতে তার পরাভব ঘটান? ভীমসেনকে দিয়ে নয়—ছোট শিশু তার তৃণ নিয়েই তাকে জয় করে। তাঁর না-সরোবর অতলস্পর্শ, তার কূল দেখা যায় না, তার জল মৃত্যুর মত কালো—কিন্তু তাঁর হাঁ-পদ্মটি এরই ভিতর থেকে মাথা তুলে জেগে ওঠে। সে ত প্রকাণ্ড ব্যাপার নয়, সে ত পর্ব্বত পাহাড় নয়, সে একটি ফুল, সে আপনার ছোটর মধ্যেই সব চেয়ে বড়—তার কোনো হাঁক-ডাক নেই, সে হাসি-মুখেই সমস্ত জয় করেছে—সে বার বার মুদে যায়, ঝ'রে পড়ে, কিন্তু আবার ফুটে ওঠে, তার অমরতা মৃত্যুহীন অমরতা নয়, সে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই অমর, তার পূর্ণতা অভাবের ভিতর দিয়েই পূর্ণতা—সে যে প্রবল সে ত বল দিয়ে নয়, বলকে বিসর্জ্জন দিয়েই প্রবল। পৃথিবীতে এই অভাবের দিকেই যারা চোখ মেলে আছে, তারা অহরহ ভয়েতে চিন্তাতে জর্জ্জর হয়ে রয়েছে, তারা বিষয়ের বস্তা বয়ে বয়ে এনে এই মায়া-গর্ত্ত ভরাবার জন্যে ইহজীবন গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে খেটে মরছে,—পৃথিবীতে ভাবের দিকে যাঁদের চোখ পড়েছে, তাঁরাই মানুষকে চির-সম্পদ্‌—চির-সান্ত্বনার পথ দেখিয়েছেন—তাঁরা দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে যে দুঃখ থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তা নয়—তাঁরা দুঃখকে মৃত্যুকে গ্রহণ করেই মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন—তাঁরা ছবির উল্টো পিঠটাকে মেরে খেদিয়ে দেন নাই—ছবি শুদ্ধ তাকে সম্পদ্‌রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরাই মানুষকে অসঙ্কোচে অসাধ্যসাধন করবার উপদেশ দেন—তাঁরাই বলেন, বিশ্বাসের জোরে পর্ব্বত টলানো যায়—তাঁরা সত্যকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছেন—তাঁরা কলসীর বাইরের তলায় জল খুঁজে খুঁজে বেড়ান না—তাঁরা নিশ্চয় জেনেছেন, কলসীর ভিতরটা জলে ভরা। যারা তাঁদের সে কথা বিশ্বাস করে না, তারা কলসীর নীচেকার বিড়ে নিংড়ে জল বের করবার চেষ্টা করছে—সেইটেকেই তারা সহজ প্রণালী মনে করে—কেন না, বিড়েটাকে চোখে দেখতে পাওয়া যায়, কলসীর ভিতরটা যে ঢাকা।

২

সিকাগো।

আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ডযোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই—কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয়, কিন্তু চারি-দিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতাসাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এটা যে কত বড় জিনিষ, তা এ দেশে এসে আমরা আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারি। এখানে মানুষের শক্তির মূর্ত্তি যে পরিমাণে দেখি, পূর্ণতার মূর্ত্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে। আমাদের দেশে মানুষের যেমন একটা সামাজিক জাতিভেদ আছে—এদের দেশে তেমনই মানুষের চিত্তবৃত্তির একটা জাতিভেদ দেখতে পাই। মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্যে উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম ক'রে যোগলাভ করার কোনো সাধনা নেই। এ রকম জাতিভেদের উপযোগিতা কিছু দিনের জন্যে ভাল। যেমন কোনো কোনো সবজির বীজ প্রথমটা টবে পুঁতে ভাল ক'রে আজিয়ে নিতে হয়, তার পরে তাকে ক্ষেতের মধ্যে রোপণ করা কর্ত্তব্য—এও সেই রকম। শক্তিকে তার টবে পুঁতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে

তোলার কৃষিপ্রণালীকে নিন্দা করতে পারিনে, যদি তার পরে যথাসময়ে তাকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই দেখি, নিজের সফলতার চেয়ে নিজের অভ্যাসকে সে বেশি ভাল বাসতে শেখে—এই জন্যে টবের সামগ্রীকে ক্ষেতে পোঁতবার সময় প্রত্যেকবারে মহা দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে—যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্ত্তন করিতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ক'রে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরবো না? এ দেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে—সেই অভাব মোচন করবার জন্যে এরা হাৎড়ে বেড়াচ্ছে—এদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এদের দোষ হচ্ছে এই যে, এরা প্রণালী জিনিষটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে—যা কিছু আবশ্যক, সমস্তকে এরা কলে তৈরি ক'রে নিতে চায়—সেটি হবার জো নেই। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃতউৎস আছে, এরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না—এই জন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবলি কঠিন ক'রে তুলচে। তাতে এক দিকে মানুষের শক্তির চর্চ্চা খুবই প্রবল হচ্চে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিষটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে—কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই, এও যেমন আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠচে—অথচ তার ফল নেই, এও তেমনি। মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখীদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না? সেটি সৌন্দর্য্যের সুর, সেটি আনন্দের সঙ্গীত, সেটি আকাশের ও আলোকের অনির্ব্বচনীয়তার স্তবগান, সেটি বিরাট প্রাণসমুদ্রের লহরীলীলার কলস্বর—সে কারখানা ঘরের শৃঙ্গধ্বনি নয়। সুতরাং ছোট হয়েও সে বড়, কোমল হয়েও সে প্রবল—সে কেবলমাত্র চোখ মেলা, কেবলমাত্র জাগরণ, সে কুস্তি নয়, মারামারি নয়, সে চেতনার প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে তোমরা ফুলের মত সেই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলো—কেন না, সবই যখন তৈরি হয়ে সারা হয়ে যাবে—মন্দিরের চূড়া যখন মেঘ ভেদ ক'রে উঠবে, তখন সেই বিনা মূল্যের ফুলের অভাবেই মানুষের দেবতার পূজা হ'তে পারবে না, মানুষের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই একশো এক পূজার পদ্ম যখন সংগ্রহ হবে, পূজা যখন সমাধা হবে, তখনি সংসার-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করতে পারবে—কেবল অস্ত্রশস্ত্রের জোরে জয় হবে না, এই কথা নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মাঝখানে আমাদের কাজ আমরা যেন নিঃশব্দে ক'রে যেতে পারি।

৩

আর্ব্বানা, ইলিনয়।

এখানে বিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকদের মনে ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সকলেই এর বিবরণ বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন। কাল Atlantic monthlyর Editorএর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি—তিনি লিখ্চেন—"I want to ask you whether it would not be possible for you at your leisure to write for us a general description of your school, but more especially of the philosophy of Education which underlies it. To the Atlantic's audience a discussion of this kind would be exceedingly interesting." এই পত্রিকা এ দেশে সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাশালী, সুতরাং এখানে যদি আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তা হ'লে সেটা শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেটার দ্বারা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা কিছু হবে কি না হবে, সে কথা নিশ্চয় জানিনে, কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় লাভের কথা আছে। আমাদের কাজের ক্ষেত্রকে পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে পারলে আপনিই তার সমস্ত কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়কে যদি দেশে কালে সঙ্কীর্ণ ক'রে জানি, তা হ'লে আমাদের শক্তি ম্লান হয়ে থাকে, আমাদের নৈবেদ্যের পরিমাণ ক'মে যায়। কি উপায়ে ছেলেদের পূর্ণভাবে মানুষ ক'রে তোলা যেতে পারে, এই ভাবনা আজ সমস্ত সভ্যজগতে জেগে উঠেছে—নানা জায়গায় নানা রকম পরীক্ষা হচ্চে—সমস্ত পৃথিবীর সেই ভাবনা যে আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ের মধ্যে ভাবিত হচ্চে এবং সমস্ত পৃথিবীর সভায় এর হিসাব আমাদের দাখিল করতে হবে, এই কথা মনে রাখতে পারলে

চেষ্টার দীনতা ঘুচে যাবে। তা হ'লেই এ জিনিষটাকে আমরা একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল মাত্র ক'রে তুলতে লজ্জা পাব। পৃথিবীতে এণ্ট্রেন্স স্কুলের অভাব অতি অল্প—মানুষের শক্তির প্রতি সে অভাবের দাবীও অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু ছেলেরা আশ্রম-জননীর কোলের উপর শুয়ে বিশ্বজীবনের বিগলিত অমৃত স্তন্যধারা পান ক'রে পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে উঠবে, এ অভাব সমস্ত পৃথিবীর অভাব—আমাদের সমস্ত জীবন দিতে না পারলে এ অভাব-মোচনের আমরা আয়োজন করতে পারবো না। কিন্তু কোণের মধ্যে ব'সে ব'সে কাজ করতে করতে এ কথা আমরা কেবলি ভুলে ভুলে যাই—আমাদের সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য ধূলায় আবৃত হয়ে যায় এবং আমাদের শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সেই জন্যে আমাদের সেই প্রান্তরপ্রান্তের বিদ্যালয়কে বিশ্বদৃষ্টি সামনে তুলে ধরতে পারলে আমরা নিজেকে নিজে সত্যভাবে দেখতে পাব—সেই দেখতে পাওয়াই আমাদের সকল ধনের চেয়ে বড় ধন। সকলের কাছে এই আমাদের প্রকাশ—আমাদের গর্ব্বের বিষয় নয়, আমাদের লজ্জার বিষয়ও হ'তে পারে—কেবলমাত্র সত্যকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাবার উপায় মাত্র ব'লে একে গণ্য করতে হবে—সত্যের দ্বারা সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগের পথ উদ্ঘাটন করতে হবে—স্কুল মাষ্টারি ক'রে সে কাজ হবে না। আমাদের প্রত্যেককে সাধক হতে হবে, তপস্বী হ'তে হবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্র

চৈত্র জেগেছে অঙ্গনে বনে
ঋতুপূর্ণের উৎসবে,
পল্লবে ফুলে বর্ণে গন্ধে উচ্ছলি';
দিকে দিকে ফিরে কূজি' ও কুহরি'
কপোত কোকিল দূত সবে—
দিবস হাসিছে আলোকে ভূলোক উজ্জ্বলি'।

পথ-তৃণ প'রে দুকূল বিছায়ে
বসেছে বকুল-বালিকা,
মালিকা গাঁথিছে বুকের বাসনা কুড়ায়ে;
উতল বাতাস দ্রুত মর্ম্মরে
বাজাইয়া কর-তালিকা,
করিছে নৃত্য পরাগোত্তরী উড়ায়ে।

কামিনী করিছে লাজ-বর্ষণ
ভরিয়া শুভ্র অঞ্জলি;
অশোকের মুঠি উপচি' পড়িছে আবীরে;
মৌমাছি দিল ঘন গুঞ্জরি'
চম্পক বন চঞ্চলি'—
মদির গন্ধে আকাশ গিয়া'ছ ছাপি' রে!

চৈত্র জেগেছে ঋতুপূর্ণের
উৎসবে বনে অঙ্গনে—
অন্তরে মনে আমারো যে জাগে পূর্ণতা;
হারায়েছি যাহা, যাহা আছে তাহা,
আজি কল্পনা-রঙ্গনে
রাঙা হয়ে সব ঢেকেছে বুকের শূন্যতা!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

৺কেদার-বদরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ফিরিবার পালা

২০শ দিন—৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩এ মে, বুধবার

বেলা ২॥৹টায় ৺বদরীধাম হইতে রওনা,
সন্ধ্যা ৭॥৹টায় ঘাট চটী (১৩ মাইল)—রাত্রিযাপন।

এইবার ফিরিবার পালা। আর মহাতীর্থে আগমন নহে, প্রত্যাগমন; অধিরোহণ নহে, অবতরণ। প্রথমে বদরীধাম হইতে জোষী মঠ হইয়া চমৌলি পর্য্যন্ত পুরাতন পথে; পরে চমৌলি হইতে (অলকনন্দা আর পার না হইয়া) অলকনন্দার ধারে ধারে নূতন পথে নূতন তীর্থ নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ; তথা হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত নূতন পথে গিয়া রুদ্রপ্রয়াগ হইতে শ্রীনগর দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি পুরাতন পথে।

পূর্ব্ববারে বলিয়াছি (ফাল্গুন-সংখ্যা ৭৩০ পৃঃ), শীতের জন্য ডাণ্ডীওয়ালা কাণ্ডীওয়ালা সকলেই বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত। বেলা ২॥৹টার সময় রওনা হওয়া গেল। পথের কষ্ট যাইতেও যেমন, আসিতেও তেমন; যেন স্ক্রুপের প্যাঁচ বা শাঁখের করাত—যাইতেও কাটে, আসিতেও কাটে; তবে চড়াই এখন উতরাই হইল, এইটুকু সুবিধা। এবারও কয়েক স্থানে হাঁটিতে হইল, বরফ পার হইতে হইল, এক স্থানে রাস্তা যাইবার সময় অপেক্ষাও ভাঙ্গিয়াছে, হাঁটিয়া পার হইবার সময় পাশের পাহাড়ে হাতের ভর দিলে ঝুরঝুর করিয়া খসিয়া পড়ে, এক এক জন করিয়া পার হওয়াও কঠিন। ডাণ্ডী-কাণ্ডীওয়ালা বোঝা কাঁধে করিয়াও হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল—শীতাতঙ্কে যেন 'পালাই পালাই' ডাক ছাড়িতেছে, শীত-দৈত্য যেন পিছু লইয়াছে, আর উহারা মরণভীত মৃগের মত প্রাণপণ বেগে ছুটিতেছে। মনে হইল, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উত্তর-মেরুর অধিবাসিগণ এইরূপ ব্যস্ত-সমস্তভাবেই তথাকার কঠোর শীত হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানাদেশে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল; (বিদ্বৎপ্রবর বালগঙ্গাধর তিলকের সিদ্ধান্ত স্মর্তব্য।) ইহারা যে তাহাদিগেরই বংশধর। ইহারা এক দমে ৫ মাইল চলিয়া হনুমান্ চটীতে বেলা ৪টায় (অর্থাৎ ১।৹ ঘণ্টায়; যাইবার সময় লাগিয়াছিল ৩ ঘণ্টা, ঠিক ডবল সময়;) দম লইল; আবার ৩ মাইল চলিয়া লামবগড়ে, আরও ৩ মাইল চলিয়া পাণ্ডুকেশ্বরে, পরে ৩ মাইল চলিয়া ঘাট চটীতে দম লইল; এক বেলায় (৫ ঘণ্টায়) ১৩ মাইল চলা (record speed) উল্লেখযোগ্য গতিবেগ বলিতে হইবে। ছেলেরাও কম যায় নাই। অবশ্য পথ অধিকাংশই এখন উতরাই। সবুজ গাছ-পালা দেখিয়া চোখের তৃপ্তি (relief) হইল; জোষী মঠের যে পাহাড় পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা সম্মুখে—কি নয়নাভিরাম দৃশ্য, যেন প্রকৃতিহস্তনির্ম্মিত সুধাধবলিত প্রাসাদাবলী শোভা পাইতেছে—'হসন্তীব সুধাধৌতৈঃ প্রাসাদৈরমরাবতীম্।'

কোথায় এক জায়গায় দেখিলাম, এক জন দেশীয় লোক সানন্দে বরফ খাইতেছে—আমি যখন মন্তব্য করিলাম, 'এত ঠাণ্ডায় বরফ খাইতেছ ?' সে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া উল্টা জবাব দিল, 'তুমিও খাও না।' বলিয়া খানিকটা দিতে আসিল। আমার ত দেখিয়াই দাঁতে দাঁতে লাগিবার উপক্রম! অবশ্য এ বরফ (Linde Ice) লিণ্ডি আইসের ন্যায় পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না, রাস্তার আশে-পাশে চাপ বাঁধিয়া আছে, এক চ্যাঙ্গড় ভাঙ্গিয়া লইলেই হইল; গাছ হইতে ফল পাড়িয়া লইলেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এ ক্ষেত্রে সে আশঙ্কাও নাই। পথে (বোধ হয় লামবগড়ের কাছে) সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হইয়াছিল, বেহারারা তাহা গ্রাহ্য করিল না; আবার ঘাট চটীর কাছেও বজ্রবিদ্যুদ্বিকাশ হইল, কিন্তু বৃষ্টিটা সামলাইয়া গেল। এই ভাবে 'স্ফূর্ত্তিসে' চলিয়া শেষে সন্ধ্যা ৭॥৹টায় ঘাট চটীতে আড্ডা লওয়া গেল। এক স্থানে দেবপ্রয়াগের পাণ্ডার সহিত দেখা হইল, তিনি আমাদের (ও অন্যান্য যাত্রীর) জন্য ৺বদরীধাম-অভিমুখে চলিয়াছেন, যথাসময়ে অবশ্য আমাদিগকে ধরিতে পারেন নাই; দেখা হইবা-মাত্র প্রশ্ন করিলেন, 'কত টাকা দিলেন ?' খুড়া ঠাকুর যদি কিয়দংশ আত্মসাৎ করেন, এই জন্য বোধ হয় কথাটা বাজাইয়া লইলেন।

পাণ্ডার গোমস্তা নিজের 'পাওনা-গণ্ডা' বুঝিয়া লইবার জন্য ৺বদরীধামে একটু বিলম্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সুতরাং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে পারে নাই। শেষে ঘাট চটীতে আমাদের সহিত মিলিল। লোকটি প্রবীণ, এবং খুব মজলিশী অর্থাৎ গল্পের গাছ বলিলেও হয়; বেশ সজ্জন। লোকটিকে প্রথম প্রথম তেমন চিনি নাই, পরে তাহার মূল্য বুঝিয়াছিলাম; নাম 'রতনমণি'—খুব মহামূল্য না হইলেও প্রকৃত

রত্ন বটে, ঝুটা নহে। তাহার কর্ত্তব্য যদিও ফুরাইয়াছিল, তথাপি ব্যাস চটী পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাইবে ঠিক হইল; কারণ, ব্যাস চটীর কাছে তাহার বাসগ্রাম; ইহার জন্য খোরাকীর ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইবে না; কেন না, এ পথে ত তাহাকে ফিরিতেই হইবে, তবে জল আনা ও অন্যান্য ফাই-ফরমাইসের জন্য 'ইনাম' দিতে হইবে; (সে ব্রাহ্মণ, বাসন মাজিবে না, সে কার্য্য ত এক জন বাচ্ছা কাণ্ডী-ওয়ালা নালা চটী হইতে ৺বদরীনাথের পাণ্ডার গোমস্তা চলিয়া যাওয়ার পর বরাবর করিতেছে, মাঘ-সংখ্যা ৫৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য); হরিদ্বার পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত, প্রয়োজন হইলে, যাইতে রাজি ছিল—কিন্তু তাহা হইলে ব্যাস চটী হইতে হরিদ্বার যাতায়াতের পথের খোরাকি আমাদের দিতে হইত। সুতরাং আমরা তাহাতে রাজী হইলাম না। তাহার অবর্ত্তমানে জল আনার বন্দোবস্ত যা' হয় একটা হইবে বলিয়া 'যদ্‌ভবিষ্য' সাজিলাম।

রাত্রিভোজন—ঘরে প্রস্তুত 'পুরী'-তরকারী। নির্ব্বিঘ্নে দেবদর্শন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আর আহারে অধিক সাবধানতার প্রয়োজন নাই বলিয়া আমিও অনেক দিন পরে উহাতেই ভাগ বসাইলাম—তবে অতি-সাহসিকতা না দেখাইয়া 'পুরী'র ফুলকা খাইলাম—পুরু পিঠটা বাদ দিয়া। আমাশয় যদিও সারিয়াছিল, তথাপি এ পথের অনিয়মে আবার হইতে কতক্ষণ? লুচির ফুল্‌কা গরম গরম লবণযোগে আমাশয়ের পক্ষে উপকারী শুনা ছিল, তাই আগে হইতে সাবধান হইলাম, অর্থাৎ আহার ঔষধ দুই-ই হইল। দুধও এখানে মিলিয়াছিল—আট আনা সের।

২১শ দিন—১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪এ মে, বৃহস্পতিবার

ভোর ৫টায় ঘাট চটী হইতে রওনা;
বেলা ৯৷৷৹টায় ঝরকুল্লা (৯ মাইল)—মধ্যাহ্ন-যাপন।
বেলা ২৷৷৹টায় ঝরকুল্লা হইতে রওনা;
সন্ধ্যা ৭৷৷৹টায় গরুড়-গঙ্গা (১২ মাইল)—রাত্রিযাপন।

ভোর ৫টায় ঘাট চটী হইতে রওনা হওয়া গেল; পথে দেখিলাম, একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক হাঁটিয়া ৺বদরীধামে যাইতেছেন, সঙ্গে দুইখানি ডাণ্ডী আছে, আরামের সময় খুলিয়া হাঁটিতেছেন; আমাদের হাঁটার পা'ট উঠিয়া গিয়াছে, গৃহিণী অসুস্থ, নিজে দুর্ব্বল; বিধবাটি শীতে তথা দন্তশূলে কাতর; কিন্তু মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা বাহকদিগের প্ররোচনায় হাঁটিতেছেন। ৪ মাইল পরে বিষ্ণুপ্রয়াগে দম লওয়া হইল; যদিও পূর্ব্বাহ্ণ—তথাপি স্নান-দান এবারেও হইল না। কারণ, সকলেই অসুস্থ। কর্ত্তব্য একবার অবহেলা করিলে তৎপালনের অবসর চিরদিনের মত হারাইতে হয়, এই শিক্ষা বিষ্ণুপ্রয়াগে তথা গরুড়গঙ্গায় লাভ করিয়াছিলাম। বুড়া বিষ্ণুশর্ম্মা অনেক ঠেকিয়া শিখিয়াই বলিয়া গিয়াছেন—

'আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্॥'

আর ২ মাইল পরে রামবাগ চটীতে দম লওয়া হইল। পরে জোষী মঠের নিকটবর্ত্তী হইতেই ডঙ্কা পড়িল। জোষী মঠ সহরে প্রবেশ করা হইল না, বাহির পথে ('short cut') রাস্তা সংক্ষেপ হয় বলিয়া সেই পথ ধরিয়া আসা হইল। (বেহারারা ইহাকে বলে 'ছোটি সড়ক'।) তবে রাস্তা সংক্ষেপ হইলেও চড়াই ও ভাঙ্গা রাস্তা, আসিতে বেশ বেগ পাইতে হইল। অনেক কষ্টে বেলা ৯৷৷৹টায় ঝরকুল্লায় পৌঁছিলাম। আরও ৩ মাইল গেলে কুমার চটীতে জলের সুখ ছিল, কিন্তু বেলা হওয়ায় গরম বোধ হইতেছিল এবং চড়াই ভাঙ্গিয়া বেহারারাও ক্লান্ত হইয়াছিল।

ঝরকুল্লায় জল থাকিয়াও জলকষ্ট। দূরবর্ত্তী পাহাড়ের এক স্থান হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল ঝরিতেছে, তাহাই একটি গভীর চৌবাচ্চায় সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়; দড়ীতে বাল্‌তী বাঁধিয়া চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিতে হয়, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এভাবে জল তোলা মহাকষ্ট। জলও অপরিষ্কার। এখানে বেশ গরম, মাছির উৎপাতও আরম্ভ। অত্যন্ত 'কুশ্‌খি' হওয়াতে স্নান করিলাম (তবে গরম জলে) এবং মিছরির সরবত খাইলাম। অন্ন প্রস্তুত হইলে মধ্যাহ্নভোজন হইল। এখানেও দুধ মিলিল—ছয় আনা সের।

এখানে জলকষ্টের জন্য বেশীক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া ২৷৷৹টার সময়ই রওনা হওয়া গেল। একটু মেঘলা মেঘলা করাতে মনে করা গেল, ছায়ায় ছায়ায় বেশ আরামে যাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরাও বাহির হওয়া, আর মেঘ কাটাইয়া বিষম রৌদ্র। মাইল খানেক গিয়া কি ভাগ্যে একটা ঝরণা পাওয়া গেল, একটু ছায়াও মিলিল; দেখিলাম, পথচলতি বহু লোকই তথায় জমায়েত, সকলেই ক্লান্ত, ছেলেরাও সেখানে; সকলেই

খানিক বিশ্রাম করা গেল ও সুশীতল জলে তৃষ্ণার্ত্ত শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইয়া লওয়া গেল। ৩ মাইল পরে আবার কুমার চটীতে দম লওয়া গেল—আবার ২ মাইল পরে গোলাপ চটীতে। আরও ৩ মাইল পরে পাতালগঙ্গা চটীর কাছে দুইটি অশ্বত্থ-গাছ আছে; পথটা খারাপ, একটু ঝড় উঠাতে পাথরের কুচি উড়িয়া গায়ে পড়িতে লাগিল, পাছে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে বেহারারা ডাণ্ডী ঘাড়ে করিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল; ডাণ্ডী ঘাড়ে করিয়া এরূপ দৌড় যে সম্ভব, না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। শুনিয়াছি, বাঘ-শীকারে হাতী বাঘ দেখিয়া আতঙ্ক-গ্রস্ত (panic-stricken) হইলে ঘোড়ার মত দৌড়ায়, তখন আর গজগতিচ্ছন্দঃ থাকে না, দাবা খেলার ঘোড়ার চা'ল হয়! এও যেন সেই রকমই। পাতালগঙ্গা ও টাঙ্গনী চটীর মাঝামাঝি, আবার টাঙ্গনী চটী ও গরুড়গঙ্গার মাঝামাঝি চীর গাছ কয়েক দিন পরে দেখিলাম। পিপ্পল কুঠীতে কলা-বাগান, তামাক গাছ ও অশ্বত্থ বৃক্ষ—এ সবও কয়েক দিন পরে দেখিলাম। (যাইবার সময় পাতালগঙ্গায় রাতে থাকা হইয়াছিল। এবার গরুড়গঙ্গায়।)

গরুড়-গঙ্গায় পৌছিলাম সন্ধ্যা ৭॥০টায়; পৌছিতে একটু কষ্ট পাইতে হইল; অন্ধকারে ডাণ্ডীওয়ালারা ঠাহর করিতে পারিল না, ছেলেরা কোথায় বাসা লইয়াছে; ধর্ম্মশালায় গিয়াছে অনুমান করিয়া আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া সেখানে খোঁজ করিতে গেল; সেখানে ব্যর্থশ্রম হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আর আমাদিগকে ডাণ্ডীতে উঠাইল না, অন্ধকারে সকলে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়া চটীর দিকে যাওয়া গেল, শেষে একটি একতলা দোকানঘরে ছেলে-দের সন্ধান পাওয়া গেল। পার্শ্বেই গরুড়গঙ্গা। গরুড়গঙ্গায় স্নান * ও থালা ও পেড়া পাণ্ডার গোমস্তাকে দান করিতে হয়। যাইবার বেলায় হয় নাই, এখনও রাত্রি বলিয়া হইল না। তবে দানের পাত্রটিকে শুনাইয়া রাখিলাম, 'সঙ্কল্প এখানে মনে মনে করা থাকিল, শ্রীনগরে গিয়া দান করিব।' রাতে স্ত্রীলোক-দিগের শ্রম বাঁচাইবার জন্য ছেলেরা অন্য পাঁচ জন যাত্রীকে (তাহারা বাঙ্গালী নহে) ভজাইয়া দোকানীর কাছে 'পুরী' ও 'শাকে'র (তরকারীর) অনেকগুলি খরিদ্দার যোটাইল। দোকানী খুসী হইয়া পুরী ভাজিয়া ও তরকারী বানাইয়া দিল; এক খোলা ফুরাইলে আবার চড়াইল; গরম গরম পুরী-তর-কারী তোফা লাগিল—বিশেষতঃ আলুর তরকারীটি যেন অমৃতস্বাদ হইয়াছিল। এ দিনও আমি ফুলকায় সারিলাম—তবে অম্ল আর লবণ-যোগে নহে, তরকারী দিয়া। দোকানে প্রস্তুত 'পুরী'-তরকারী ঘরের চেয়ে সস্তাও পড়িল। এখানে দুধ পাওয়া গেল না। কেরসিন ।৵০ বোতল। আজ দুই বেলায় ২১ মাইল চলা হইয়াছে—record march বটে।

২২শ দিন—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫এ মে, শুক্রবার

শেষ রাত্রি ৪।০টায় গরুড়গঙ্গা হইতে রওনা,
বেলা ১০টায় চমৌলি (১৩ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।
বৈকালে ৫টায় চমৌলি হইতে রওনা,
সন্ধ্যা ৬॥০টায় মাটিয়ানা চটী (৪ মাইল)—রাত্রিযাপন।

বেশী বেলা না হইতে চমৌলি পৌছিতে হইবে বলিয়া শেষ রাত্রি ৪।০টায় গরুড়গঙ্গা হইতে বাহির হওয়া গেল; আর তেমন শীত নাই, সুতরাং কোনও কষ্ট হইল না। বেহারারা এই দুই দিনের পরিশ্রমে বেশ একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সিয়া চটী (৭ মাইল) পর্য্যন্ত আসিতে ৪ বার দম লইল; মধ্যে পথে পিপ্পল কুঠীতে আধ সের কুমড়ার ভাগা কিনিয়া লওয়া গেল—একঘেয়ে আলুর তরকারীতে অরুচি জন্মিয়া গিয়াছিল, অথচ দ্বিতীয় আনাজ কুমড়া অনেক জায়গায়ই মিলে না। সিয়া চটীটি সুন্দর, অলকনন্দার ধারে, রাস্তার দু'ধারে সযত্নে আম, লিচু প্রভৃতি গাছের চারা লাগান। এখানে বাঁধা কপি (ছয় পয়সায় একটা) ও রামদানা কিনিয়া লওয়া গেল—পথে বাহির হইয়া এই দ্বিতীয়বার কপি পাওয়া গেল। (প্রথমবার পাওয়া গিয়াছিল খান্করা চটীতে—রুদ্র-প্রয়াগ যাইবার সময়; অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৫৮ পৃঃ।) এই চটীর পর বামপার্শ্বের পাহাড়ের উপর স্তরে স্তরে সাজান সারি সারি চীর গাছ দেখা গেল, যেন এক একটি সজীব খুঁটি। এইরূপ চমৌলি পর্য্যন্ত বরাবর চলিয়াছে। (চোপতা চটীর কাছেও এইরূপ দেখিয়াছিলাম, মাঘ-সংখ্যা ৫৩৩ পৃঃ।) ইহার দুই মাইল পরে বাবলা চটী, সেখানে বিরহী গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম। এক মাইল পরে ছিন্‌কা চটী, এখানে

---

* স্নানকালে এক ডুবে পাথরের নুড়ী নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া আনিতে হয়; প্রত্যহ ইহার পূজা করিলে সর্পভয় থাকে না। পদ্মনাথ বাবুর পুস্তকে দেখিলাম (৬৪ পৃঃ), ৺বদরীধামে যাইবার সময় লইতে হয় ও শিলাখণ্ড গরুড়শিলা ও ৺বদরীনাথের মন্দিরে ছুঁয়াইয়া আনিতে হয়। এই পাথরের নুড়ীকেও গরুড়শিলা বলে। (কেদারখণ্ডে আছে, গরুড়গঙ্গায় স্নান ও জলপানেও সর্পভয় থাকে না।)

গৃহিণী মূলার শাক দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, দুই পয়সার কিনিয়া ফেলিলেন; কাঁচকলাও এখানে পাওয়া গেল, পয়সা পয়সা; যথাস্থানে কেদারকঙ্কণ কেনা হয় নাই (পৌষ-সংখ্যা, ৪০২ পৃষ্ঠা), এখানে রহিয়াছে দেখিয়া কেনা গেল, ৵০ আনা এক এক গাছা।

পিপ্পল কুঠীর পর ৪ বার অলকনন্দা পার হইতে হইল, কোথাও কাঠের পুল, কোথাও ঝুলান লৌহসেতু; নদী অনেকখানি পথেই চওড়া, পরে সরু, পরে আবার চমৌলির কাছে চওড়া। বরাবরই নদীর কলকল ছলছল শব্দ শুনিতে শুনিতে, আর পর্ব্বতে চীর গাছের বাহার দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি, দুই-ই সুন্দর। বেলা ১০টায় চমৌলি পৌছিয়া পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মশালার দোতলায় আশ্রয় লওয়া গেল; এবার লোকের ভিড় মোটে ছিল না। রান্নাঘর নীচে; গরম জলে স্নান করিলাম, যদিও ধর্ম্মশালার নীচেই অলকনন্দা, অবগাহন-স্নানের খুব সুবিধা। দুপুরে গরম হাওয়া দিতে লাগিল, নদীতরঙ্গ-স্পর্শেও তাহা ঠাণ্ডা হইল না। আহারাদির পর বধূমাতাকে ও দৌহিত্রকে পত্র লিখিলাম ও শ্রীনগরে উত্তর দিতে বলিলাম; আর কাশীবাসী একটি বন্ধুর নিকট কয়েক শত টাকা রাখিয়াছিলাম, সেই টাকার কতক অংশ টেলিগ্রাফিক্ মনি অর্ডারে পাঠাইবার জন্য তার করিলাম। কেন না, শ্রীনগরে কাণ্ডী ও ডাণ্ডীওয়ালাদিগকে বিদায় করিতে হইবে (ও নূতন বাহক নিযুক্ত করিতে হইবে)। এখানে যে সব মাল রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, সে সব খালাস করিয়া আবার নূতন করিয়া বাঁধাছাঁদা করা হইল। প্রচণ্ড রৌদ্র বলিয়া বৈকালে ৫টার কম বাহির হওয়া গেল না। এবারেও চৌকীদার 'আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নাই' ইত্যাদি একখানি পোষ্টকার্ডে লেখাইয়া লইল (মাঘ-সংখ্যা, ৫৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য); চৌকীদারকে একটি 'চৌআনি' (সিকি) 'ইনাম' দেওয়া গেল। এখানে কেরসিন কিনিয়া লওয়া গেল, চারি আনা বোতল। দুধও মিলিয়াছিল, ছয় আনা সের।

নূতন পথে—নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ (২০ মাইল)

বৈকালে ৫টায় চমৌলি হইতে রওনা হইলাম—নূতন পথে, নূতন তীর্থ নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ-অভিমুখে। ২ মাইল পরে কুবের চটী, এখানে তিনটা ঝরণা, অলকনন্দাও খুব নীচে নহে, (চমৌলি হইতে বাহির হওয়ার সময় চড়াই পথ)। কুবেরচটীতে পেয়ারা, বাতাবী লেবুর গাছ এবং মাচায় শিম ও কপির ক্ষেত দেখিলাম। নদীর চরে অনেকগুলি অশ্বত্থ বৃক্ষ ও কৃষিক্ষেত্র। উলঙ্গ পাহাড়ে চীরগাছ এক একটা রহিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের পথের মত বাহার নাই। আর ২ মাইল পরে মাটিয়ানা চটীতে পৌছিলাম—সন্ধ্যা ৬।০টায়। চটীটি সুন্দর। দোকান অনেকগুলি আছে, সবগুলিই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; যে দোকানে উঠিলাম, সেটি সব চেয়ে সুন্দর, যদিও একতলা; উঠানে জলের কল। পীচ, পেয়ারা, শিউলি গাছ ও লঙ্কার চারা—রমণীয় (the Beautiful) ও প্রয়োজনীয়ের (the Useful) কি সুন্দর সমন্বয়! দোকানীর ঘরের দেওয়ালে রবিবর্ম্মার ছবি; লোকটার (Æsthetic sense) সৌন্দর্য্যবোধ আছে। যথারীতি 'পুরী'-তরকারী বানান হইল; দোকানে আদার চাটনী পাওয়া গেল; দুধও মিলিল, ছয় আনা সের।

২৩শ দিন—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬এ মে, শনিবার

ভোর ৫টায় মাটিয়ানা হইতে রওনা,
বেলা ৯॥০টায় লঙ্গাসু (১০ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।
বৈকালে ৪টায় লঙ্গাসু হইতে রওনা,
সন্ধ্যা ৭॥০টায় কর্ণপ্রয়াগ (৬ মাইল)—রাত্রিযাপন।

ভোর ৫টায় মাটিয়ানার রমণীয়ত্বের মায়া কাটাইয়া রওনা হওয়া গেল। উভয় দিকের পাহাড়ে, রাস্তার ধারে ও নদীকূলে বড় ও মাঝারী চীরগাছ। ৩ মাইল পরে নন্দপ্রয়াগ—এখানে দম লওয়া হইল ও দেবদর্শনও হইল, তবে নন্দা ও অলকনন্দা-সঙ্গম অনেক নীচে, সঙ্গমস্থলে আর যাওয়া হইল না; পথে অনেকগুলি সঙ্গম দেখিয়া খেদ মিটিয়াছিল। এত সকাল ও পথচলতি অবস্থায় সঙ্কল্পস্নানও হইল না; রুদ্রপ্রয়াগের পর আর কোনও সঙ্গমেই তীর্থকৃত্য সম্পাদন করা হয় নাই। গৃহিণী তখনও এমন অসুস্থ যে, ডাণ্ডী হইতে নামিয়া দেবদর্শনে যাইতে পারিলেন না। অন্য সকলে গেলাম। নন্দ রাজার স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম—সম্মুখেই উঠানে গোলাপ গাছ, গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে; পিছনে বাগিচা, পার্শ্বে ধর্ম্মশালা; স্থানটি স্নিগ্ধ নিরিবিলি—যেন শ্রীবৃন্দাবনের একটি টুকরা কোন্ ভক্ত এই উত্তরাখণ্ডে বসাইয়া রাখিয়াছে। (কেহ কেহ বলেন, এখানে কণ্ব মুনির আশ্রম ছিল; পদ্মনাথ বাবু আপত্তি করেন, মালিনী নদী কই? তাঁহার পুস্তকের ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পার্ব্বত্য চীরগাছ

চমরী ও ভুর্ণা

[শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে।
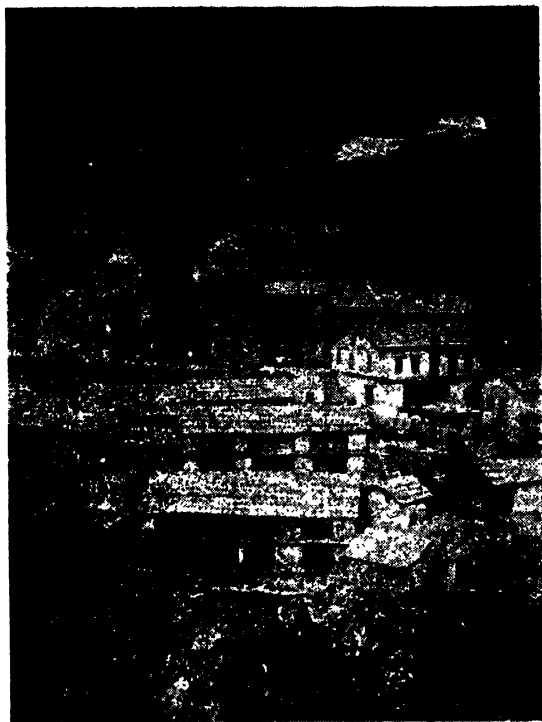
৺বদরীধাম ও মন্দির

কর্ণপ্রয়াগ

[শ্রীযুক্ত শর্ব্বরীভূষণ চৌধুরীর সৌজন্যে ।

নন্দপ্রয়াগ স্থানটিও (বোধ হয় শ্যামসুন্দরের নিত্য-দর্শনে মধুর-ভাবের সঞ্চারে) সুন্দর; সব বাড়ীর দোতলার বারান্দায় টিনের ক্যানাস্তারায় ফুল গাছ, ফুলও ফুটিয়াছে। এখানে বাজার ও ডাকঘর আছে। মহেশানন্দ পুস্তকালয়ে পিপ্পলকুঠীর ন্যায় কেদার-মাহাত্ম্য, ব্রহ্মানন্দ ভজনমালা প্রভৃতি পুস্তক রহিয়াছে। ভাগিনেয় বাপাজী এই পুস্তকালয়েই তাঁহার জ্যেঠামহাশয়ের ঔষধালয়ের জন্য এক টাকার শিলাজতু কিনিয়া লইলেন।

চটী ছাড়াইয়া নন্দার উপর ঝুলান লৌহসেতু; সঙ্গম দেখা গেল—স্রোত প্রবল নহে, সবুজ জল ও ঘোলা শাদা জলের প্রভেদ সুস্পষ্ট। নদীকূলে অশ্বত্থ ও আম গাছ এবং কলা-বাগান; আমের সবে মাত্র গুটি হইয়াছে! (আর আমাদের দেশে এত দিন পাকিয়াছে।) তিন মাইল পরে সোনালা চটীতেও অশ্বত্থ গাছ দেখিলাম; আরও ২।১ স্থানে আম গাছ আছে। লঙ্গাসু পৌছিবার পূর্ব্বে (হরকুঠীর পর) চড়াই উতরাই। এই পথে এক স্থানে রাস্তা সারাইতেছে; কাঠ-পাথর দিয়া ঘোড়াতাড়া দেওয়া একটি পুল আছে। পথে একটা কামারশালা দেখিলাম। বেলা ৯৷৷০টায় লঙ্গাসু পৌছিলাম। দোকানের পাশেই ঝরণা। এখানেও একতলা ঘর। যথাসময়ে গরম জলে স্নান করিয়া আহার করিলাম। দুধ এখানে পাঁচ আনা সের। দুপুরে খুব গরম, মাছির উৎপাত এখানে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

বিশ্রামান্তে লঙ্গাসু হইতে বেলা ৪টায় রওনা হওয়া গেল, গরম ও রৌদ্রে একটু কষ্ট হইল, কিন্তু নাগাইদ সন্ধ্যা কর্ণ-প্রয়াগ (৬ মাইল) পৌছিবার তাড়া ছিল। চটীর শেষে অশ্বত্থ, আম, পেয়ারা গাছ ও কলাবাগান, একটি ছোট্ট শিব-মন্দির। ২ মাইল পরে জয়খণ্ডী চটী—কল বন্ধ, জলাভাব—অথচ আমরা তৃষ্ণার্ত্ত; মাইল খানেক পরে একটি নূতন চটী বসিয়াছে, সেখানে ঝরণার ঠাণ্ডা জল খাইয়া তৃষ্ণা দূর করি-লাম। এখানে কলাবাগান, অশ্বত্থ, বাতাবীলেবুর গাছ; ছায়াশীতল স্থান দেখিয়া একটু বিশ্রাম করা গেল; সকলেই রৌদ্রে হায়রাণ। আবার দুই মাইল পরে একটি চটী, এখানেও কলাবাগান ও যোড়া অশ্বত্থবৃক্ষ; বৃক্ষতলে আবার বিশ্রাম করা গেল; এখানে জলের তত সুবিধা নাই—২টি ঝরণা আছে, কিন্তু সরু ধারে জল পড়িতেছে। এইবার খানিক পথ চড়াই উতরাই—বিশেষতঃ কর্ণপ্রয়াগে প্রবেশ-পথে খুব চড়াই।

কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডরগঙ্গা (বা কর্ণগঙ্গা) ও অলকনন্দার সঙ্গম; নিকটস্থ পর্ব্বতে কর্ণ কঠোর তপস্যার ফলে সূর্য্য-দেবের নিকট হইতে অভেদ্য কবচ ও বর লাভ করিয়া-ছিলেন; কর্ণেশ্বর মহাদেব ও উমাদেবীর মন্দির আছে; সঙ্গমস্থলে কর্ণকুণ্ডে সঙ্কল্পস্নান করিতে হয়। সন্ধ্যার ঘুলি ঘুলি অন্ধকারে সঙ্গমস্থলে পৌছিলাম; খুব উচ্চে একটি মন্দির আছে, প্রথমতঃ অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সেখানে গেলাম, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা 'ভেট চড়াও, পয়সা দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সঙ্গ লইল, কিন্তু আলো আনিতে বলিলে সে কথায় কর্ণপাত করিল না, সুতরাং দর্শন নামমাত্র হইল, মন্দিরের দেবতা শঙ্কর কি শঙ্করী, তাহাও বুঝিলাম না। (বোধ হয়, উহাই উমা দেবীর মন্দির।) নীচে রাস্তায় নামিয়া সঙ্গম দেখিলাম—অলকনন্দা দুই ধারা হইয়াছেন, মধ্যে একটি শাদা পাথরের প্রায়োদ্বীপ, পিণ্ডরগঙ্গাও আসিয়া অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এখানেও স্রোত প্রবল নহে। সঙ্গমের দৃশ্যটি সুন্দর। রাস্তা হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামিয়া শিবমন্দিরের সম্মুখীন হইলাম, আমাদের সাড়া পাইয়া এক জন পূজারী পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া শিবপূজায় বসিয়া গেল! সন্ধ্যাকালে (আরতি নহে) কিরূপ পূজা বুঝিলাম না; অবশ্য 'ভেট চড়ান' হইল। সঙ্গমঘাটে আমরা (বিধবাটি ও আমি) উপস্থিত হইলে ঘাটের পাণ্ডারা পুষ্পপাত্রে কলিকা-ফুল লইয়া সঙ্কল্প করিতে বলিল; আমরা সন্ধ্যাকালে স্নান হইবে না বলাতে তাহারা বিস্মিত হইল, কেন না, তখনও বিস্তর (হিন্দুস্থানী প্রভৃতি) লোকে স্নান করিতেছে; স্নান না করিলেও সঙ্কল্প করা চলে, এ কথাও বলিল; যাহা হউক, আমরা এক জন পাণ্ডাকে এক একটি পয়সা দিলাম ও জলস্পর্শ করিয়া মাথায় ছিটাইলাম। তবু বিষ্ণুপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগের তুলনায় উত্তরাখণ্ডের এই পঞ্চম ও শেষ প্রয়াগে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ম রক্ষা হইল।

গৃহিণী শক্তিহীন হইয়া পড়াতে ডাণ্ডী হইতে নামিতে পারেন নাই, বরাবর সহরের মধ্যে নীত হইয়াছিলেন। ছেলেরা অনেক পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। বেহারারা এবার আমাকে ও বিধবাটিকে আর ডাণ্ডীতে তুলিতে ইচ্ছুক ছিল না। কেন না, ভয়ানক চড়াই রাস্তা; কিন্তু আমরাও চড়াই উঠিতে অশক্ত; সুতরাং লইতে হইল। অন্ধকারে লক্ষ্য হইল, এখানেও শ্রীনগরের ন্যায় প্রবেশপথেই হাসপাতাল ও দুইটা বড় অশ্বত্থ গাছ। ডাকঘর, তারঘর, স্কুল ও থানাও এখানে আছে।

এখানেও শ্রীনগরের ন্যায় ধর্ম্মশালায় থাকা হইল। দুধ পাওয়া যায় নাই। দোকানের 'পুরী'-তরকারী জেলাপী সকলের রাত্রিভোজন হইল; আমার পূর্ব্বের মত পুরীর ফুলকা। এখানে শীত বোধ করি নাই।

এখান হইতে সাধারণতঃ যাত্রীরা নূতন পথে (২৯ মাইল) মেলচৌরী গিয়া সেখান হইতে ৭০ মাইল দূরে রামনগর ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়া মোরাদাবাদ হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। (বীরেশ বাবু ও পদ্মনাথ বাবুর পুস্তক দ্রষ্টব্য।) এ পথে গেলে প্রায় অর্দ্ধপথে আদিবদরী-দর্শন হয়। ইনি পঞ্চবদরীর অন্যতম। আমরা কিন্তু এই পথে গরম ও জলকষ্টের কথা শুনিয়া রুদ্রপ্রয়াগ দিয়া পুরাতন পথে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিলাম (এখান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত অবশ্য নূতন পথ, ২০ মাইল)। বিশেষতঃ আমাদের হরিদ্বারে কিছু দিন বাস করিবার সঙ্কল্প থাকাতে এই পথে ফেরারই প্রয়োজন।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে রুদ্রপ্রয়াগ (২০ মাইল)—নূতন পথে

২৪শ দিন—১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭এ মে, রবিবার

রাত্রি ৩টায় কর্ণপ্রয়াগ হইতে রওনা; প্রাতঃ ৮।৪৫ মিঃ শিবানন্দী চটী (১৩ মাইল)—মধ্যাহ্ন-যাপন।
বৈকালে ৪টায় শিবানন্দী চটী হইতে রওনা;
সন্ধ্যা ৭॥০টায় রুদ্রপ্রয়াগ (৭ মাইল)—রাত্রিযাপন।

অদ্য দুই বেলায় ২০ মাইল গিয়া নাগাইদ সন্ধ্যা রুদ্রপ্রয়াগ পৌছিতে হইবে, পুত্র ও ভাগিনেয় এই স্থির করিয়া রাত্রি ৩টার সময় রওনার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং কাণ্ডীওয়ালা তিন জনকে তাহারও পূর্ব্বে রওনা করিয়া দিলেন। আমাদের আগে আগে পাণ্ডার গোমস্তা হারিকেন লণ্ঠন ধরিয়া অন্ধকারে পথ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে। ভাবিলাম, পূর্ব্ববর্ণিত (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৬২ পৃঃ) বরিশালের যাত্রী ও যাত্রিণীদিগের মত 'Daylight' থাকিলে বড়ই সুবিধা হইত। বাইবেলের কথা মনে পড়িল, য়িহুদীগণ যখন মিশর দেশ ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছিল, তখন জিহোভার আদেশে তাহাদিগের আগে আগে রাত্রিকালে অগ্নিস্তম্ভ (pillar of fire) পথ দেখাইয়া চলিত! যাহা হউক, আমাদিগের জিহোভার অনুগ্রহ-লাভের আশা নাই, মধুসূদন নাম জপ করিতে করিতে যাওয়া যাইতে লাগিল; একে উচ্চনীচ পথ, তাহাতে পরের স্কন্ধে ভর। খানিক পরে দেখা গেল, কাণ্ডীওয়ালারা তিন জনে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়া বোঝা রাখিয়া ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুখে-চোখে ভীতি-চিহ্ন—পাহাড়ে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে! ভূত শুধু বাঙ্গালা দেশে কেন, এই দেবভূমিতেও তাহা হইলে অধিষ্ঠান করে! এখন বোঝাওয়ালারা আমাদিগকে দেখিয়া সাহস পাইল ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। লোকবল দেখিয়া ভূতও বোধ হয় ভাগিল। কিন্তু শুধু হাতে গেল না, সঙ্গের বিধবাটির একপাটি ক্রেপসোল্ জুতা লইয়া বিদায় হইল।

পাহাড়ের গায়ে বস্তির বাড়ীগুলির আলো তারামালার মত দেখাইতে লাগিল—দেবপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, উখীমঠে দৃষ্ট আলোকমালা অপেক্ষাও সুন্দর। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে মাইল-পোষ্ট, দড়ীর পুল, খেজুর গাছ, অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল; ক্রমে ভোর হইল, বিহঙ্গকাকলী শ্রুত হইল—বিএ শ্রেণীতে ৪০।৪১ বৎসর পূর্ব্বে পঠিত 'the earlist pipe of half-awakened birds'—ইংরেজ কবি টেনিসনের এই কবিতা-পংক্তিটির ভাবটুকু এত দিনে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল—প্রথমে একটিমাত্র পাখীর কলধ্বনি, পরে অনেকগুলির। ৪ মাইল পরে পিপ্পল চটী পৌছিলাম—এই চটীতে দম লওয়া গেল। এখানে দুইটি অশ্বত্থ গাছ রহিয়াছে। বেশ বড় ঝরণা, কলাবাগান, বাতাবী লেবু ও পেয়ারা গাছ, তথা গোলাপ গাছ। এমন রমণীয় স্থানে একবেলা থাকিয়া উপভোগ করা গেল না, আপশোষ রহিল। স্নিগ্ধ প্রভাতে খানিক পথ হাঁটিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ নিবৃত্ত হইতে হইল—অল্পদূর চলিয়াই। ইহার পর প্রশস্ত নদী, নদীতীরে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং আমবাগান; আরও পরে নদীকূলে অনেকখানি সমতলভূমি, বট, অশ্বত্থ আমবাগান। বস্তি, আবাদ; রাস্তার ধারে বহু বট অশ্বত্থ ও আম্রবৃক্ষ; যত দূর যাই,—তত দূরই এই দৃশ্য দেখিতে পাই।

এক স্থানে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষ বোয়া নামাইয়া মুলুক যুড়িয়া আছে; আবার একটি বিরাট্ অশ্বত্থ-বৃক্ষ যেন বটবৃক্ষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার স্পর্দ্ধায় প্রকাণ্ড ডাল লম্বাভাবে ফেলিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ভূমি স্পর্শ করাইয়া আছে। কাছেই একটি চারা অশ্বত্থ; এত অশ্বত্থ গাছ আর কোথাও দেখি নাই; বোধ হয়, পিপ্পল বা অশ্বত্থ

বৃক্ষের এই বাহুল্যবশতঃই স্থানটির নাম পিপ্পল চটী। এই অঞ্চলটা শ্রীনগর অঞ্চলের মতই সমতল ও বৃক্ষবহুল। ইহার পরে কমেড়া চটী, সেখানেও কলাবাগান। তাহার পর খুব খানিকটা চড়াই। এই স্থানটায় অনেক চারা খেজুরগাছ—একত্র এত খেজুরগাছ অন্য কোথাও দেখি নাই। নদীয়া-যশোর হইলে ইহা একটা সম্পত্তি হইত; কিন্তু এখানে কণ্টকাগ্র শাখাই সার। পরে নগরাসু চটী—এখানেও কলাবাগান। পরে নেড়াসেজুর জঙ্গল; বেলগাছও দেখিলাম। এখানে প্রকাণ্ড মাঠ, ছাগল চরিতেছে (পূর্ব্বের মত লোমশ নহে), বট-অশ্বত্থগাছও আছে।

এখানে স্নিগ্ধ অশ্বত্থচ্ছায়ায় একটি জলসত্র রহিয়াছে—সুন্দর ঠাণ্ডা জল; তৃষ্ণার সময় না হইলেও লোভে পড়িয়া (মিছরি খাইয়া) খানিকটা জলপান করিলাম। একটু গিয়াই পূর্ত্তবিভাগের ডাকবাংলা এবং বহু খেজুরগাছ ও ন্যাড়াসেজু। বেলে রাস্তা, দুধারে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মাঠ, নেড়াসেজুর বেড়া, ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশের পল্লীপ্রান্তর। চাষারা লাঙ্গল দিয়া চাষ দিতেছে—কোট-প্যাণ্টুলন পরিয়া! যাক্, বিলাত না গিয়া কোট-প্যাণ্টধারী লাঙ্গলহস্ত কৃষক দেখিলাম! এক স্থানে একটি ঝরণা, তাহার উপর কাঠের সাঁকো, নীচে আমবাগান ও অশ্বত্থগাছ, পাহাড়ে ২।৪টি মাঝারী চীরগাছও দেখিলাম; গাছে আম ধরিয়াছে—ছোট ছোট, ফটিক-ঝোলের জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইল; পরস্বাপহরণ করা পাপ (বিশেষতঃ তীর্থযাত্রার পথে), এই বিবেচনায় পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে আম পাড়িয়া লইবার চেষ্টায় নিবৃত্ত হইতে হইল, যাহা হউক, সঙ্গের বিধবাটি একটি বালিকার নিকট হইতে দুই পয়সায় ১০।১২টি সংগ্রহ করিলেন। নদীপারে এক স্থানে বেশ সমৃদ্ধ একটি বস্তি দেখা গেল। কয়েকখানি সুন্দর দ্বিতল বাড়ীও আছে। এই সমস্ত মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পৌনে ৯টার সময় শিবানন্দী চটীতে পৌছিলাম। বেলা বেশী না হইলেও চটীটি ভাল বলিয়া এবং ইহার পরে রুদ্রপ্রয়াগের আগে আর চটী নাই বলিয়া এবেলার মত এইখানেই স্থিতি হইল। চটীতে কয়েকজন যাত্রী দেখিলাম; তবে সাধারণতঃ এ পথে লোকজন কম; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফেরত যাত্রীরা অন্য পথে ফেরে। পথে স্থানে স্থানে দেখিলাম, রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য সার্ভে হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ এক একটা 'পিন' গাঁথা রহিয়াছে। শুনিলাম, রামনগর হইতে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত রেলপথ হইবে।

দোতালায় বাসা হইল, ঘরগুলি পরিচ্ছন্ন, অশ্বত্থবৃক্ষ সম্মুখেই ছায়াদান করিতেছে। পাশে ঝরণা, মোটা ধারায় জল পড়িতেছে। কিন্তু পান ও পাকের জল দোকানদার নিজে গঙ্গা (অলকনন্দা) হইতে দুইবার তুলিয়া আনিয়া দিল—বোধ হয় পুণ্যসঞ্চয়ের আশায়। (অলকনন্দা সম্মুখেই প্রবাহিতা, তবে কিঞ্চিৎ নিম্নে।) পরে বুঝিলাম, ঝরণার জল পান না করিয়া ভালই করিয়াছি—উপরে এক স্থানে গোশালা, তথাকার গরুর স্রাব, গোময়, গোমূত্র প্রভৃতির উপর দিয়া ঝরণার জল আসিতেছে। উপরে কয়েকটি দেবালয় আছে, বেশ শান্তিময় স্থান, সেগুলিও দর্শন করিলাম। গরম জলে স্নান, মধ্যাহ্ন-ভোজন, (কচি আমের ফটিক ঝোল অনেক দিন মনে থাকিবে), দিবানিদ্রা, আরামে সবই হইল; মায় 'জঙ্গল যাওয়া,' এখানে মেথরের উৎপাত দেখিলাম না—তবে মাছির উৎপাত আছে। দুধ পাঁচ আনা সের, পথে এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছিল ছয় আনা সের। এইখানে এক রকম অম্লমধুর বন্যফল—গৌরীফল খাইলাম (ছেলেরা পূর্ব্বে অন্যত্র খাইয়াছিল)—বেহারারা কিন্তু বার বার নিষেধ করিল—খাইলেই জ্বর হইবে।

বৈকালে ৪টায় রওনা হওয়া গেল। পথে ঝোড়-জঙ্গল, খেজুর গাছ (পাকা পাকা ছোট ছোট খেজুর ঝুলিতেছে), আম জাম বাতাবী লেবু গাছ, অশ্বত্থ গাছ—কোনওটা বা নেড়া, কোনটায় নব পত্রোদ্গম হইয়াছে। তৃতীয় মাইলে উতরাই, দৃশ্যবদল, পথের পাশে ও উপর পাহাড়ে চীর গাছ—ছোট বড় মাঝারি; পাশে বা নীচে চাষের জমি। চতুর্থ মাইল কলাবাগান ও একটি ক্ষীণ ঝরণা; বা নদীর গভীর খাত শুষ্ক; এখানে অলকনন্দাও অদর্শন হইয়াছেন; বুঝিলাম, এখানে জলকষ্টের জন্যই চটীর পত্তন হয় নাই; অর্দ্ধেক পথ আসা গিয়াছে, সুতরাং এখানে আর একবার দম লওয়া গেল।

পঞ্চম মাইলে অলকনন্দা আবার দেখা দিলেন। এ দেশে নদীর বাঁক ও পথের বাঁক অত্যন্ত। অনেক সময়ে একটু দূরেই মাইল-পোষ্ট বেশ দেখা যায়, কিন্তু সেখানে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হয়—ক্রমাগত ঘুর পথ। অলকনন্দার ওপারে একটি সুন্দর শিবালয় (কোটেশ্বর শিব) দেখা গেল, স্থানটি মনোরম ও নিরিবিলি। বড় ইচ্ছা হইল, এখানে গিয়া শান্তিতে

রাত্রিযাপন করি। (রুদ্রপ্রয়াগের পার হইতে হাঁটা পথ আছে, পরে জানিলাম।)

ষষ্ঠ মাইলে রুদ্রপ্রয়াগের কাছাকাছি বামপার্শ্বস্থ পাহাড়ের রুদ্রমূর্ত্তি, ভগ্ন বিপর্য্যস্ত প্রস্তরস্তূপ, বৃক্ষলতাশূন্য, কেবল নেড়া সেজুর বন—যেন শিবশিরঃস্থিত সর্পসমূহ মাথা তুলিয়া আছে! আর একটু পরে ঝোড়-জঙ্গল, দক্ষিণের পাহাড়ে কিন্তু শ্যাম শোভা—তবে বড় বড় গাছ নাই—ছোট ছোট গাছ ও ঘাস। বেলা পড়িয়া আসাতে এইখানে একবার হাঁটিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ওবেলার মত এবেলাও একটু হাঁটিয়াই হাঁফাইতে লাগিলাম, সুতরাং আবার ডাণ্ডীতে উঠিতে হইল।

ক্রমে অলকনন্দাতীরে রুদ্রপ্রয়াগের সম্মুখীন হওয়া গেল। এ-পার ও-পার দুই পারেই থাকিবার স্থান আছে। বেহারারা এক দিনে ২০ মাইল হাঁটিয়া হয়রাণ হইয়াছে, ৺বদরীধাম ছাড়িয়া অবধিই তাহাদিগের পরিশ্রম বাড়িয়াছে, ২৪ দিন সমানে ভার বহন করিয়া তাহারা পথের কষ্টে শীতের কষ্টে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বলহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে তাহাদিগের ইচ্ছা যত শীঘ্র বোঝা নামাইতে পারে। এ ইচ্ছা স্বাভাবিক, কিন্তু এ-পারে থাকার তেমন সুবিধা নাই বলিয়া পুত্র ও ভাগিনেয় ও-পারে গিয়াছেন। বেহারারা এ-পারে ডাণ্ডী নামাইয়া প্রথমে গোমস্তাকে পাঠাইয়া, পরে নিজে এক জন গিয়া, দোকানগুলি খুঁজিয়া আসিল—যদি ছেলেরা এ-পারে থাকে। ও-পারে যাইতে একেবারে নারাজ—বিশেষতঃ ঝুলান লৌহ-সেতুর উপর দিয়া ডাণ্ডী ঘাড়ে করিয়া। ছেলেদিগকে না পাইয়া তাহারা এ-পারে থাকিবার ইচ্ছা জানাইল ও আমাদিগকে হাঁটিয়া ও-পারে যাইতে বলিল। আমরা দুর্ব্বল শরীরে ও এই সন্ধ্যার অন্ধকারে হাঁটিতে রাজি হইলাম না। অগত্যা বিরক্তভাবে গজ্ গজ্ করিতে করিতে আবার ডাণ্ডী ঘাড়ে করিল। পরে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিয়া তাহারা এ-পারে আসিয়াই থাকিল। কাণ্ডীওয়ালারা পার হইয়া গেলই না।

এবারও ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাওয়া গেল, তবে এবার এক-তলায় নহে, দোতলার বারান্দায়; ভিড় বেশ ছিল—তবে শ্রীনগরের মত নহে। পূর্ব্ব-বারেই বলিয়াছি, ধর্ম্মশালাটি অলকনন্দার উপরেই। আমরা যে বারান্দায় থাকিলাম, অলকনন্দা তাহার নীচেই। বেশ আরাম পাইলাম। দোকান হইতে 'পুরী'-তরকারী আসিল। আমার আহার হইল দুধ-চিড়া। এখানকার সেবা-সমিতির একটি বালক আমাদিগের বড়ই উপকার করিয়াছিল, সেই অন্ধকারে ভাগিনেয়ের সহিত 'পাকডাণ্ডী' দিয়া বস্তিতে গিয়া আমাদিগের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল; সেবা-সমিতির 'Visitor's Book'এ আমরা এই সেবা যত্নের উল্লেখ ও প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

এইখানে নূতন পথের শেষ হইল; কল্য প্রাতঃকাল হইতে পুরাতন পথে শ্রীনগর এবং তথা হইতে দেবপ্রয়াগ, হৃষীকেশ, হরিদ্বার ফিরিতে হইবে। নূতন পথের শেষেও কিন্তু নিস্তার নাই—পাণ্ডার উপদ্রব হইতে। রুদ্রপ্রয়াগে ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী হইতেই এক জন যুবক পাণ্ডা মামুলি প্রথামত "কোন্ জিলা, কি নাম" ইত্যাদি প্রশ্নবৃষ্টি আরম্ভ করিল; তাহার উত্তর দিতে অসম্মত হওয়াতে বেশ একটু বচসা হইল। আমি তাহাকে প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, 'তুমি কোন্ দেবতার পাণ্ডা?' (অর্থাৎ ৺কেদারনাথ না ৺বদরীনারায়ণের?) সে একটু রসিকতার প্রয়াস করিয়া উত্তর দিল, "পেট দেবতার!" এমন বিশ্রী মন, অমনই মিল্টনের তীব্র মন্তব্য "Whose gospel is their maw" মনে পড়িয়া গেল; সুতরাং তাহার এই উত্তর শুনিয়া বেশ দু'চার কথা শুনাইয়া দিলাম; আমরা ৺কেদার-বদরী দর্শন করিয়া ফিরিতেছি কি দর্শনে যাইতেছি, এ কথা তাহার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, এই ন্যায়বাদ আরম্ভ করিলে সে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিল না। (সাধারণতঃ এ পথে যাত্রীরা ফেরে না, এ কথাটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল;) যাহা হউক, তাহার ভাগ্যে শিকার ত জুটিল-ই না, পরন্তু কিঞ্চিৎ বাক্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল; সে-ও রুখিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভাগিনেয় বাপাজী আসিয়া পড়ায় উচিত জবাব পাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল, জোঁকের মুখে চুণ পড়িল। ইহারা যেমন মূর্খ, তেমনই উদ্ধত, অসহায় যাত্রী পাইলে কিরূপ উৎপীড়ন করে, এই ঘটনা হইতেই তাহা অনুধাবন করা যায়।

ফিরিবার পালা—পুরাতন পথে

২৫শ দিন—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮এ মে, সোমবার

ভোর পৌণে ৫টায় রুদ্রপ্রয়াগ হইতে রওনা, বেলা ৯টায় খাঙ্করা চটী (৮ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন। বৈকালে ৪টায় খাঙ্করা হইতে রওনা, রাত্রি ৮টায় শ্রীনগর (১১ মাইল) রাত্রিযাপন।

আজ হইতে পুরাতন পথে ফিরিবার পালা। কল্য রুদ্রপ্রয়াগে

পুল পার হইয়া আসিতে ডাণ্ডীওয়ালারা মহা আপত্তি করিয়াছিল; আজ আবার তাহারই পুনরভিনয়; তাহাদের ইচ্ছা, আমরা হাঁটিয়া পার হই, তাহার পরে তাহারা ডাণ্ডী কাঁধে করিবে। অনেক ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি বকাবকি করিয়া তাহাদিগকে আনিতে হইল, অন্য দিন ডাণ্ডীতে যে সব জিনিশ লইত, আজ তাহা লইতেও গজ্ গজ্ করিতে লাগিল, এমন কি, গৃহিণীর ডাণ্ডীওয়ালারা বরাবর খুবই সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারাও আজ বিগড়াইয়া গেল, রীতিমত উদ্ধত- (insolent) ভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিল, (temper) বদমেজাজ দেখাইল। আজ তাহাদিগের কাষের শেষ দিন, কেন না, শ্রীনগর পর্য্যন্তই তাহাদিগের যাইবার চুক্তি, সেখানে অন্য লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। শেষ দিনে কোথায় হাসিমুখে বিদায় হইবে, চুক্তির প্রাপ্য ছাড়া 'ইনাম' পাইবে, আর শেষ দিনেই এই ব্যবহার। আসল কথা, এ কয় দিন বেশী চলা হইয়াছিল, আর সমানে এত দিন ধরিয়া খাটিয়া খাটিয়া তাহারা হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছিল, বিধবাটির এক জন বেহারার ত কাঁধে ঘা হইয়াছিল; অন্য লোক প্রতিনিধি দিয়াছিল, সে-ও টিকিল না, এই সব কারণে তাহারা খিট্খিটে হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, খানিক বকাবকির পর, ভোর ৪-৪৫ মিনিটে 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া রওনা হওয়া গেল। পথে কলাবাগান, অশ্বত্থ ও আমগাছ—আমগাছ এ সব অঞ্চলে হয় অফলা না হয় কষি ধরিয়াছে; জামগাছ, ছোট ছোট খেজুরগাছ, ঝোড়-জঙ্গল আছে। মাইল দুই পরে গুলাবরায় চটীতে আমবাগান, কষি ধরিয়াছে। তৃতীয় মাইলের পরে মাইল খানেক পথ চড়াই। চড়াইএর পর বেহারারা দম লইল। এখানে ২টা অশ্বত্থগাছ; দুধ জাল দিতেছে ও বিক্রয় করিতেছে, গরুড়-ভগবান্ একস্থানে আছেন। বহু লোক ৺কেদারধামে যাইতেছে, বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়, সব ভিন্ন প্রদেশীয়; বাঙ্গালীরা চৈত্র-বৈশাখেই যায়। আট জন বেহারায় ডাণ্ডী লইয়া যাইতেছে, আরোহী প্রকাণ্ড-কলেবর; তিনখানি ডাণ্ডী এইরূপ আট আট জন বেহারায় লইয়া যাইতেছে; একখানির আরোহী কিন্তু ক্ষীণকায়; বোধ হয়, অপর দুই জন অপেক্ষা কম খরচ করিলে মানের হানি হয় বলিয়া তাঁহারও এই বন্দোবস্ত; যেমন আমাদের দেশে সেকালে ষোল বেহারার পাল্কী চড়া বড়-মানুষীর অঙ্গ ছিল। অথবা আনাড়ী আরোহী পাইয়া বেহারাদিগের বেশী আদায় করিবার ফিকির। এইখানে এক জন ভিন্নদেশীয়া যুবতী যাত্রিণী আমাদিগকে দেখিয়া "জয় বদরীবিশাললালজী জয়" ধ্বনি করিলেন, সে জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখমণ্ডলে যে প্রসন্নতা, পবিত্রতা, আনন্দ-জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইল, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। তদ্দর্শনে মনে কোনও বিকার উপস্থিত হয় না, যেন অঙ্কশায়ী শিশুর মুখ চাহিয়া জননীর বিমল আনন্দ-হাস্যালোকিত প্রসন্ন আনন। সেই প্রসন্ন আস্য হইতে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, ভক্তি শতধারায় বিনিঃসৃত হইতেছে।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই প্রকৃতির প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইল, ঝোড়-জঙ্গলের বদলে পাহাড়ের চূড়ায় চীরগাছ, পথে বড় বড় গাছ, তন্মধ্যে চীরগাছও আছে। নরকোটা চটীতে আবার দম লওয়া হইল, এখানে দুইটি ঝরণা আছে, একটি পূর্ত্ত বিভাগ বাঁধাইয়া ট্যাপ বসাইয়া দিয়াছে। এখানে কাঠ-পাথর-ফেলা একটা পুল পার হইতে হইল। এই পথে দুই জন সাহেব দেখিলাম—শীকারে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে ঘোড়া, কুকুর, সহিস, 'বেয়ারা', শীকার রাখিবার ঝোলা (game-bag), ঝোলায় কতকগুলি মরা বড় বড় পাখী রহিয়াছে। এই তীর্থপথেও হিংসার অভিযান! যে জাতির যেমন রীতি! পক্ষান্তরে, আমরা এখানে কয়েকটি পাকা কাঁচকলা কিনিলাম! সাত্ত্বিকতার চূড়ান্ত! স্থানে স্থানে শাদা শাদা জংলী ফুলগাছ আলো করিয়া আছে—এই সজীবতার শোভা বর্ষার পূর্ব্বাভাস; না বসন্তের শেষদান? কোনও কোনও গাছ পোড়া পোড়া—বোধ হয় নিদাঘশুষ্ক, এখনও ত রীতিমত বর্ষা নামে নাই; কোনও কোনও বৃক্ষলতা আবার সতেজ, হয় ত যে কয় দিন বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই সরস হইয়াছে; অথবা মাটীর দোষ-গুণে এই প্রভেদ। ষষ্ঠ মাইলে আসিয়া আবার দম লওয়া হইল—পথটা চড়াই। তাহার পর চড়াই উত্তরাই ভাঙ্গিয়া (চটীর কাছে চড়াই) পট্টবতী নদীর উপর পাকা পুল পার হইয়া (৮ মাঃ) খাঙ্করা চটীতে বেলা ৯টায় পৌঁছিলাম।

এখানকার দোকানঘরগুলি খুব বড় বড়; বহু লোকের স্থান হয়; আমরা বেশী লোকের ভিড়ে না গিয়া ভাগ্যক্রমে একটি ছোট ঘর পাইলাম, বেশ ঘেরাঘোরা (এ অঞ্চলে এরূপ খুবই কম মিলে), ঠিক আমাদের কয় জনের কুলাইয়া গেল। এখানে মাছি কম। অদূরে একটি ষণ্ডি আছে। সকলে নদীতে স্নান করিল (নদীটি ঝরণার সামিল), আমি ঠাণ্ডা

লাগার ভয়ে গরম জলে স্নান করিলাম, কিন্তু পরে দ্বিপ্রহরে শৌচে গিয়া দেখিলাম, নদীতে স্নান করিলে পারিতাম, জল খুব ঠাণ্ডা নহে (মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রতাপেও এরূপ হইতে পারে)। জল বেশ স্বাদুও নহে। এখানেও 'পানচাক্কি' দেখিলাম। দুধ মিলিল, পাঁচ আনা সের। যাইবার সময় এখানে পেড়া ও কালাকাঁদ পাওয়া গিয়াছিল; এবারও কালাকাঁদ মিলিল, কিন্তু তত ভাল নহে,—বোধ হয়, যাত্রীর চলাচলে মন্দা পড়িয়াছে বলিয়া।

এখানে বেশ একচোট মারামারি দেখিলাম। এক জন মাড়োয়ারী এক দোকানে বাসা লইয়াছিল, অন্য এক জন দোকানদার কিন্তু তাহার ডাণ্ডীওয়ালাদিগকে ডাকিয়া নিজের দোকানে বাসা দিয়াছিল : পরে মাড়োয়ারী জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইল। ইহাতে অপর দোকানদার আপত্তি করিল। ফলে উভয় দোকানদারে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল; এক জন মৃদুপ্রকৃতিক, সে অপরের হস্তে প্রহৃত হইল, 'মৃদুর্হি পরিভূয়তে'; শেষে পাণ্ডার গোমস্তা আসিয়া গুণ্ডাপ্রকৃতির দোকানীকে 'কাবুলী দাওয়াই' দেওয়াতে সে একেবারে ঠাণ্ডা। মাড়োয়ারী এই গণ্ডগোল দেখিয়া ডাণ্ডীওয়ালাদিগকে লইয়া তৃতীয় এক দোকানে উঠিল। পূর্ব্ব দুই জনের প্রহার-লাভই সার হইল।

এই চটীতে কয়েক জন নূতন ডাণ্ডীওয়ালা আমাদিগের নিকট হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করিল ও ডাণ্ডীপিছু ৪০৲ টাকা দর হাঁকিল—শ্রীনগর হইতে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত। আমরা শ্রীনগরে গিয়া রেট্ জানিয়া পাকা কথা দিব, এই জবাব দিলাম ও তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনগরে চলিতে বলিলাম।

আহারাদি ও বিশ্রামের পর বৈকালে ৪টায় রওনা হওয়া গেল। ১ মাইল পরে দম লওয়া ও পথিপার্শ্বস্থ ঝরণার ঠাণ্ডা জল পান করা গেল। প্রচণ্ড রৌদ্র ও গরম হাওয়া—তবে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ, সে জন্য অসহ্য নহে—জঙ্গলে চীর গাছও দেখিলাম। অনেক নীচে চাষের সমতল মাঠ। এক স্থানে (পিয়াও, জলসত্রে) ঠাণ্ডা জল দিতেছে, তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করা গেল। এখানে কলাবাগান ও সুন্দর চীর গাছ (একটি ডাকবাক্সও) দেখিলাম। ভট্টিসেরা চটীর কাছাকাছি সমতল মাঠ, আবাদ, বস্তি; প্রকৃতি প্রাচুর্য্যময়ী; মনে হয়, ভট্টিসেরা না বলিয়া 'চট্টিসেরা' বলিলেই প্রকৃত নামকরণ হইত। খানিক আগে অলকনন্দা অনেক নীচে ছিলেন, এখানে একেবারে অদর্শন—পাহাড়ও অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। (যাইবার সময় ভট্টিসেরায় মধ্যাহ্নযাপন করা গিয়াছিল।) এই চটীর খানিক পরেই এক স্থানে ৺কালীস্থাপনা আছে (যাইবার সময়ে এইখানেই অন্ধ ভিক্ষুকের মুখে সুন্দর গান শুনিয়াছিলাম, অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৫৭ পৃঃ); ৺কালীর সেবায়েত জালা হইতে ঠাণ্ডা জল দিয়া যাত্রীর তৃষ্ণা দূর করিতেছে; তাহার ৭।৮ বছরের ফুটফুটে মেয়েটিকে যাচিয়া 'টিকলি' দিলাম, পিতা খুব খুসী হইল ও আমাদিগের কাছ হইতে পৈতা (এ দেশে 'জনৌ' বলে) চাহিয়া লইল।

ইহার একটু দূরে খুব বড় একটা বস্তি দেখিলাম, অলকনন্দা পার্শ্বেই বহিয়া যাইতেছেন, কয়েকটি অশ্বত্থ-বৃক্ষও রহিয়াছে। রাস্তার দক্ষিণে চীর গাছ; পরে বড় বড় আমগাছ—কষি হইয়াছে। আবার এক স্থানে দম লওয়া ও ঠাণ্ডা জল পান করা গেল।

(অগ্রহায়ণ-সংখ্যার ২৫৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি) সাধারণতঃ ধর্ম্মশালায় সন্ধ্যাকালে খুব ভিড় হয়, শেষ রাতে সব লোক চলিয়া যায়, প্রাতঃকালে একেবারে খালি পড়িয়া থাকে। সেই জন্য পুত্র ও ভাগিনেয় যুক্তি করিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যার পরে শ্রীনগরে না গিয়া ৪।৫ মাইল থাকিতে শুকরৃতাচটীতে রাত্রিযাপন করিয়া ভোরে উঠিয়া শ্রীনগরে যাওয়া যাইবে—তখন বেশ ফাঁকা পাওয়া যাইবে। তাহার পর মধ্যাহ্নে আহারাদির পর পুরাতন ডাণ্ডী-কাণ্ডীওয়ালাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া বৈকালে আবার যাত্রা করা যাইবে। কিন্তু 'Man proposes, God disposes' এ কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। শুকরৃতাচটীতে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন, আমরা তখনও পৌঁছাই নাই, লোকে লোকারণ্য, মাথা গুঁজিবার স্থান নাই; সুতরাং ভাগিনেয় শ্রীনগরে স্থান সংগ্রহ করিতে ছুটিলেন, পুত্র আমাদিগকে (change of programme) বন্দোবস্ত-বদলের কথা জানাইবার জন্য রহিয়া গেলেন; কিন্তু আমরা পৌঁছিলে এই কথা-শ্রবণমাত্র ডাণ্ডীওয়ালারা তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিল; পুত্র অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাদিগকে নিমরাজি করাইয়া আগাইয়া গেলেন। তাহারা ব্যর্থ রোষে ফুলিতে ফুলিতে আমাদিগের উপর ভাল করিয়াই প্রতিশোধ লইল। পথে ক্রমাগত দম লইতে লাগিল; এক কিস্তি ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গেল, আরও হইবার আশঙ্কা রহিল। শ্রীনগর

অঞ্চলটা বোধ হয় ঝড়জলের কেন্দ্র (Storm-zone), যাইবার সময়ও শ্রীনগরের কাছে (তবে এ পিঠে নহে, ওপিঠে) ঝড়-জলে কষ্ট পাইয়াছিলাম। ঝড়-জল আসিবার উপক্রম, অথচ বাহকদিগের কিছুমাত্র তাড়া নাই, মাইলে মাইলে দম লইতেছে ও তামাক খাইতে খাইতে গল্প যুড়িতেছে; রাগে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র জলিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদিগের উপর রাগ করিয়া দুর্ব্বল শরীরে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম—তাহাদিগকে একচোট বকিয়া। তাহারা দৃক্‌পাতও করিল না। সমানে তামাক টানিতে ও গল্প করিতে লাগিল।

অন্ধকার, অপরিচিত রাস্তা (যদিও যাইবার সময় এই পথে গিয়াছি), মধ্যে মধ্যে ঝড়ের ঝাপটা ও বৃষ্টির ছাঁটও আছে, কিন্তু রাগভরে চলিয়াছি। অনুমান করিয়াছিলাম, মাইল খানেক রাস্তা, কিন্তু বোধ হয় ২।৩ মাইল হইবে। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে (ভয়ে নহে, পরিশ্রমে), তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে (পথে একটি ঝরণা ছিল, বহু উচ্চে, নাগাল পাইলাম না), হাঁটিতে আর পারিতেছি না, তথাপি গোঁ-ভরে চলিয়াছি। আরও এক কথা। বুকপকেটে ছয় সাত শত টাকার নোট, বহু অপরিচিত লোক পথে চলিতেছে, এক জন একটা তাড়া দিয়া তাড়াসুদ্ধ নোট কাড়িয়া লইলে বাধা দিবার ক্ষমতা নাই—কিন্তু তবুও এই অসমসাহসিকতার কার্য্য করিতেছি—রাগ এমনই চণ্ডাল! ভয়ে কাহাকেও 'শ্রীনগর আর কতদূর' জিজ্ঞাসা করিতেছি না, জিজ্ঞাসা করিলেই হয় ত বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবে ও রাহাজানি করিবে। যখন শ্রীনগরের কাছাকাছি গিয়াছি, তখন বেহারারা সঙ্গ ধরিল এবং ডাণ্ডীতে উঠিতে বিস্তর অনুরোধ করিল। কিন্তু এমন একটা বীররসের ব্যাপারে রসভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হইল না, সুতরাং তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাকি পথটুকু সায় করিলাম; ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়াই কিন্তু অতিরিক্ত উত্তেজনার পর অবসাদে উঠানেই শুইয়া পড়িলাম এবং পুত্র ও ভাগিনেয়কে পাইয়া উপস্থিত বেহারাদিগের দুর্ব্যবহারের কথা তারস্বরে ঘোষণা করিলাম। ধর্ম্মশালার কর্ম্মচারী মৃদুবাক্যে আমাকে ঠাণ্ডা করিলেন। এই হঠকারিতার ফলে যে হার্টফেল করিয়া মারা যাই নাই, নিতান্তই গুরুবল বলিতে হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে ধর্ম্মশালায় ভিড় বিশেষ ছিল না। (পরদিন কিন্তু বেলা হইলে বেশ ভিড় হইয়াছিল।) এবারেও গত বারের ন্যায় নারীকণ্ঠে সুমধুর গম্ভীর ভজনগান শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হইল (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা, ২৫৫ পৃঃ)। দোতলায় ঘরে ও বারান্দায় বেশ স্থান পাওয়া গেল। দোকানের 'পুরী'-তরকারী আচার-চাটনীতে সকলের রাত্রিভোজন হইল। আমি পূর্ব্বের মত 'ফুলকা'য় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। রাত্রি-কালে দুধ মিলিল না।

২৬শ দিন—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ২৯এ মে, মঙ্গলবার

শ্রীনগরে স্থিতি—অহোরাত্র।

অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—দশহরায় গঙ্গাস্নান; প্রতি বৎসর কলিকাতায় হয়, যেবার দেবতার বিশেষ কৃপা থাকে, সেবার ৺কাশীতে ঘটে, এবার আশা ছিল, হরিদ্বারে ঘটিবে; কিন্তু হরিদ্বার এখনও ৩।৪ দিনের পথ, সুতরাং শ্রীনগরে অলকনন্দায় স্নানই গঙ্গাস্নানের তুল্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইল; অলকনন্দাও ত ধরিতে গেলে গঙ্গাই। অলকনন্দা অনেকটা নীচে; জলও বেশ ঠাণ্ডা; সুতরাং পুণ্যতিথিতেও জলে অবগাহন করা গেল না, 'ঘটি-গঙ্গা'তেই সারিতে হইল; গৃহিণীর কপালে তাহাও হইল না—শরীর অসুস্থ ও অশক্ত, অতদূর নামিবার সামর্থ্য নাই। এই সঙ্গে আর একটি কর্ত্তব্য সারিয়া লওয়া গেল। গরুড়-গঙ্গায় পাণ্ডার গোমস্তাকে থালা ও পেড়া দেওয়ার কথা ছিল, তাহা এইখানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সম্প্রদান করা গেল। থালা খানি ১৲ টাকা ও পেড়া ৸৹ আনা পড়িল, দক্ষিণা ।৹ আনা দিয়া পূরা দুই টাকা করিয়া দেওয়া গেল।

ধর্ম্মশালার নিকটে ও গঙ্গার উপরেই দুইটি দেবমন্দির—গরুড়নারায়ণ ও হনুমান্‌জীর; দর্শন ও 'ভেট চড়ান' হইল; কাছেই সেবা-সমিতির ভবন, তথায়ও দেবালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলিও দর্শন করা গেল; স্থানটি পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত; মনে হইল, ধর্ম্মশালার ভিড় ছাড়িয়া এখানে স্থান সংগ্রহ করিতে পারিলে বেশ আরামে থাকিতাম। এবারেও (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৫৪ পৃঃ) কিন্তু কমলাক্ষ মহাদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন হইল না, অনেকটা দূরে। শুনিয়াছি, যাত্রা করিয়া যদি বিঘ্নবশতঃ ৺বদরীনাথ-দর্শন না ঘটে, তাহা হইলে এখানে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলে সেই পুণ্যফল হয়; যা... আমাদের যখন আসলই হইয়াছে, তখন আমি হিসেব প্রয়োজন কি? তবে দেবদর্শন যতই ক...

ও পুণ্য। বৈকালে বাজারে বেড়াইতে গিয়া চৌমাথায় একটি সুন্দর মন্দির দেখিলাম—গণেশজীর।

স্নানদান-দর্শনাদির পর আর একটি কর্ত্তব্য সম্পাদন করা গেল। ডাণ্ডী ও কাণ্ডীওয়ালাদিগকে বরাবর বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, তীর্থদর্শন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে এক দিন পেট ভরিয়া খাওয়াইব। আজ তাহাদের বিদায়ের দিন, সুতরাং তাহাদিগের পারণের ও আমার প্রতিশ্রুতিপালনের দিন। শেষ দিন দুই বেলাই তাহারা যেরূপ দুর্ব্যবহার করুক না কেন, বরাবর খুবই খাটিয়াছে—বিশেষতঃ ৺বদরীধাম হইতে ফিরিবার পথে। এত শীঘ্র শীঘ্র বাহকেরা সাধারণতঃ চলে না; তাহাদিগের বদমেজাজও এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে হয়রাণ হওয়ার দরুণ। এই সব বিবেচনা করিয়া বাজার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ 'পুরী'-তরকারী বানাইয়া লইয়া এবং 'মিঠা' ও আচার চাটনী খরিদ করিয়া তাহাদিগকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়ান হইল; পাণ্ডার গোমস্তাও তাহাদিগের দলভুক্ত হইল; ৺বদরীধামের ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের ন্যায় (ফাল্গুন-সংখ্যা, ৭২৯ পৃঃ) ইহারাও আগে 'মিঠা', পরে 'পুরী'-তরকারী খাইল। 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।' খরচা পড়িল ১১॥৹ টাকা—১২ জন ডাণ্ডীওয়ালা, ৩ জন কাণ্ডীওয়ালা ও ১ জন গোমস্তা, একুনে ১৬ জন; অনেকেই ব্রাহ্মণ, সুতরাং ইহাও এক প্রকার ব্রাহ্মণভোজন, তবে ভোজনদক্ষিণা ছিল না। পুরী-মিঠাই ছাড়া প্রত্যেকে এক পোয়া করিয়া দুধ খাইয়াছিল। শুনিলাম, (পাণ্ডার গোমস্তা) রতনমণি একা এক সের মিঠাই সাবাড় করিয়াছিল—ইহা ছাড়া পুরী-তরকারী ও দুধ।

নীচেকার রান্নাঘরে নিজেদের রান্নার বন্দোবস্ত হইল; পুত্র দুই সের ওজনের একটি প্রকাণ্ড বাঁধাকপি আনিলেন, সাত আনায়—এটির বেশী অংশই ডাণ্ডীতে হাঁড়ীর ভিতরে করিয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছিল; দুধ, ধোয়া মুগ, বেগুন, কচি আম, পাণ পাওয়া গেল; সুতরাং আহার পরিপাটীরূপেই হইল; ইহা ছাড়া দুই বেলাই পেড়া, কালাকাঁদ, জেলাপী জলযোগ! মাছি এখানে খুব কম; ধর্ম্মশালায় গরু, কুকুর, বিড়াল আছে। কুকুর-বিড়াল অপেক্ষা গরুর উপদ্রব বেশী, যো পাইলে গলা বাড়াইয়া ভাত-তরকারীতে মুখ দেয়। প্রকাণ্ড উঠানে দূর পাহাড়ের ঝরণা হইতে পাইপ দিয়া জল আনার ব্যবস্থা আছে, চৌবাচ্ছায় মোটা ধারায় জল পড়িতেছে, এ কথা যাওয়ার সময়কার বিবরণেই বলিয়াছি। ধর্ম্মশালার বাহির-মহলে পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান আছে, ইহা ছাড়া প্রাচীরে ঘেরা সুপরিসর জমী 'জঙ্গলে যাওয়া'র জন্য আছে—এ কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি; তবে সেবার রাত্রির অন্ধকারে তত ঠাহর করিতে পারি নাই, এবার বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলাম। মেথরের উৎপাত ত নাই-ই, পরন্তু ঐখানেই তাহাদিগের 'ডেরা।' গৃহিণী ও বিধবাটি ও'দিকে গিয়া মেথরের যুবতী রূপসী বিদুষী কন্যাকে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া আসিলেন ও পঞ্চমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন—যেমন বর্ণ, তেমনি গঠন, তেমনি মুখশ্রী, তেমনি বেশ—আর স্কুলে ইংরেজী পড়ে! এ 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' দেখা আমার অদৃষ্টে হয় নাই, তবে তাঁহাদিগের মুখে যে প্রশংসা শুনিলাম, তাহাতেই যথেষ্ট হইল। শ্রীনগরে ভাগিনেয় বাপাজীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ-করা একটি পরিচিত যুবকের সহিত দেখা হইল—পথেও (ঘাটচটীর কাছে) পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল, যুবকটি এই প্রদেশেই এঞ্জিনিয়ারের কায করে, তদারকে বাহির হইয়াছে, ফাঁকতালে তীর্থদর্শনও হইতেছে।

প্রাতঃকালে এক কিস্তি 'বাজার' হইয়াছিল—পুত্রের মারফত; বৈকালে আবার গেলাম—অজুহাত 'ব্রহ্মানন্দ-ভজনমালা, 'কেদারখণ্ড' প্রভৃতি পুস্তকের সন্ধান করা; ২।৩টি পুস্তকালয় দেখিলাম, সেগুলির মলিন অবস্থা। এখানে 'কুমারে'র চাক আছে, মাটীর হাঁড়ী, খুরী, প্রদীপ, 'ছোবা' (ঘট), কুঁজো, কলিকা প্রভৃতি রহিয়াছে। পিতলের জিনিশও শ্রীনগরে তৈয়ারী হয়। রাত্রির আহারের জন্য কালাকাঁদ কেনা গেল, পরদিনের জন্য পাণ ও বেগুনও লওয়া গেল। বেশীক্ষণ বেড়াইতে পাইলাম না, একটা ঝড় উঠিয়া ধূলা উড়াইয়া অন্ধকার করিয়া দিল (আঁধি নহে—dust-storm); একটু বৃষ্টিও হইল; সেই জন্যই বলিয়াছি জায়গাটা বোধ হয় (storm-centre) ঝড়-বৃষ্টির কেন্দ্র।

ও সব বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাযের কথা বলি। প্রথম কায, পুরাতন বাহকদিগকে বিদায় দেওয়া। কতক টাকা হাতে মজুত ছিল; ইহা ছাড়া কাশীবাসী একটি বন্ধুকে গচ্ছিত টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা পাঠাইতে চমোলি হইতে তার করিয়াছিলাম; পুত্র ডাকঘরে সন্ধান লইলেন, টাকা পূর্ব্বেই আসিয়াছে এবং সেনাক্ত করিবার জন্য পাণ্ডা গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাও জানি-

আসিলেন। (কয়েকখানি চিঠি আসিয়াছিল, তাহাও লইয়া আসিলেন, এগুলির জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। এগুলির উত্তরও লিখিয়া দিলাম ও হরিদ্বারে পত্র দিতে বলিলাম।) তাহার পর পিতাপুত্রে গেলাম, পুত্র হ্যাটকোট পরিয়া, নিজে আধ-ময়লা ধুতীজামা পরিয়া; উভয়েরই পরিচয় দেওয়া গেল; আমি বসিতে একটি টুল পাইলাম, আর পুত্রের জন্য পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় পিয়নকে কড়া ধমক দিয়া খাতাপত্র সরাইয়া একখানি চেয়ার খালি করিয়া বসিতে সাদরে আহ্বান করিলেন; সাহেবী পোষাকের এত মর্য্যাদা! কায হাসিলও ঐ কারণে সহজেই হইল। পথে সর্ব্বত্র উভয় যুবক পুলিশের লোক অথবা ভলণ্টিয়ার বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন এবং তদনুরূপ খাতির পাইয়াছিলেন। রবি বাবু কোথায় যেন সাহেবী পোষাকের উপর তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন যে, (সংসাজা, দাঁড়-কাক ও ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি মামুলি টিটকারী ত আছেই) রাজ-প্রালক সাজিলে রাজার রাজ্যে খুব খাতির পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কি আত্মসম্মানের হানি হয় না? কথাটা বড় রূঢ় অথচ খাঁটি সত্য; কিন্তু উপায় কি? রেলগাড়ী, ষ্টীমার, ডাকঘর, আফিস, আদালত, সর্ব্বত্রই এই লীলা। ইহাতে ইংরেজের প্রতাপ কতদূর, তাহা বুঝা যায়। ('দাস-মনোভাব' হইল কি?) যত দিন স্বরাজ না মিলিবে, তত দিন ইহার উচ্ছেদ হইবে না; গরজ বড় বালাই; 'যেন তেন প্রকারেণ' কার্য্য-উদ্ধার সকলেই করিতে চাহে; 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।' ইহা প্রাণিজগতের তথা উদ্ভিদ্-জগতের (Camouflage) ছদ্মরূপধারণ-শ্রেণীতে ধরিতে হইবে; স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই যে এই শিক্ষা সহজাত করিয়া দিয়াছেন!

যাক্, বাহকদিগকে হিসাব বুঝাইয়া শোধ করিয়া দেওয়া গেল (কতক টাকা হৃষীকেশে ও কতক পথে স্থানে স্থানে দেওয়া হইয়াছিল); এখানে তাড়া তাড়া নোট লইতেও তাহাদিগের আপত্তি নাই, সহর জায়গায় ভাঙ্গাইবার সুবিধা; অন্যত্র লইতে চাহে না। পূর্ব্বদিনের দুর্ব্যবহারের জন্য 'ইনাম' মিলিল না, ন্যায্য প্রাপ্যই শুধু পাইল। শুনিলাম, এ জন্য তাহারা পুত্র ও ভাগিনেয়ের তথা গৃহিণী ও বিধবাটির নিকট 'দরবার' করিয়াছিল, আমাকে বলিতে সাহস করে নাই। কিছু দিলেই ভাল হইত, তবে বেয়াদবির জন্য শিক্ষা দেওয়ারও দরকার। গৃহিণীর বাহকেরা সজলনয়নে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়াছিল। তাহাদিগকে বাকী পথটাও যাইতে বলা গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা রাজী হয় নাই; অধিক পরিশ্রমে ('hors de combat') ঘায়েল হইয়াছিল, 'আর গেলে মরিয়া যাইব' এই আশঙ্কা প্রকাশ করিল। তাহা ছাড়া, তাহাদিগের এখন চাষবাসের সময়, গেলে ক্ষতি হয় (যদিও ৪।৫ দিনের বিলম্ব-মাত্র হইত)।

এবার আসল কাযই বাকী। নূতন বাহক সংগ্রহ করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। পথে খুব কম যাত্রী ফেরে, সুতরাং চাহিদা কম থাকাতে যোগানও কম, এবং সেই জন্য দরও চড়া ও বাঁধা রেট নাই। খাঙ্করা হইতে যে দল পিছু লইয়াছিল, তাহারা আসিল, আরও অনেক দল আসিল; কিন্তু আসিলে হয় কি? যাত্রাকালে হরিদ্বারে যে ব্যাপার হইয়াছিল, (ভাদ্র-সংখ্যা ৮৯ পৃঃ) তাহারই পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। ৪০৲ হইতে ৫০৲। ৬০৲—যা খুসী দর হাঁকে; একবার যাহা বলিয়া যায়, ঘুরিয়া আসিয়া আবার সে কথা পাল্টাইয়া অন্য রকম বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি (কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২১ পৃঃ) দরদস্তুর করিতে ইহারা একেবারে ঝুনো ('Shrewd at driving a hard bargain'); মোটেই সত্যবাদী ও সরলপ্রকৃতি নহে। দেওঘরে মাছের দর করা হইয়াছিল বলিয়া লোকটা চলিয়া গেল, আর কোনও দিন আসিল না—জিনিশের যে দুই রকম দর হয়, তাহাই জানে না! সে জাতির সহিত কত প্রভেদ! নিজেরা হারি মানিয়া সেবা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের শরণ লওয়া গেল, তাঁহারাও খানিক যুঝিয়া হা'ল ছাড়িয়া দিলেন।

শেষে তাঁহাদের পরামর্শে ধর্ম্মশালার স্বামীজীকে ধরা গেল; স্বামীজী (যমুনাদাসজী মহারাজ) বড় সজ্জন, পরোপকারী, অমায়িক (আমাদের ১০০৲ টাকার কয়েক-খানি নোট বিনা বাটায় ভাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন); কল্য রাত্রিতে তাঁহারই ধীর গম্ভীর প্রকৃতির প্রভাবে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়াছিল; তিনি চৌধুরীজীকে ডাকাইলেন; চৌধুরীজীর বাহক-শ্রেণীর উপর অমোঘ প্রভাব; চৌধুরীজীর কথায় যেন মন্ত্রশক্তির মত (অথবা গোঁড়াদের মতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত) কায করিল; তিনি সকলের চুক্তিপত্র লিখিয়া দিলেন; তিন দল ডাণ্ডীবাহক (৪ হিসাবে) ও মালের জন্য এক জন বাহক ও একটি ... হইল। চৌধুরীজীকে ৪৲ টাকা কমিশন লাগিয়াছি হিসেব সার্থক। তিনি সাহায্য না করিলে আ...

সেইখানেই পড়িয়া থাকিতাম। তাঁহার নাম শ্রীমৎ নারায়ণ-পুরী; পাঠকের জানিয়া রাখা ভাল, যদি কখনও আমাদের মত মুস্কিলে পড়েন, ইঁহার সৌজন্যে 'মুস্কিল আসান' হইবে। আমার হরিদ্বার হইতে আনীত পাখাখানি চৌধুরীজীর বড় পছন্দ হইয়াছিল; বেশ (diplomacy) কূটনীতি খেলিয়া পুত্রের নিকট বলিলেন, 'কি বলিব ? বাবুজীর একখানা বই পাখা নাই, নতুবা ওখানি চাহিয়া লইতাম, এখানে অমন পাখা পাওয়া যায় না।' অগত্যা পুত্র প্রভৃতির পরামর্শে তাঁহাকে দিতে হইল, তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করিলেন ও বহু ধন্যবাদ দিলেন।

এক্ষণে সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়া নিশ্চিন্তমনে দোকানের 'পুরী'-তরকারী কালাকাঁদ রাত্রিভোজন করিয়া সুখে নিদ্রা গেলাম। কল্য পুরাতন পথে কিন্তু নূতন বাহকের স্কন্ধে চলা সুরু হইবে। এই শেষ কয় দিনের কথা আগামী বারে বলিব (যদি পাঠকবর্গের ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া থাকি)। এবারকার বিবরণ সুদীর্ঘ হইয়াছে, আর চলিবে না। [ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাবানল

কোন্ দূর-বনে আগুন লেগেছে, ঊর্দ্ধ আকাশে তা'র—
রুদ্ধ শিখার সুষমায় হলো ভীষণতা বিস্তার!
ধূমকুণ্ডলী অজগর প্রায়
জড়াইয়া যেন ধরিবারে চায়
শূন্য আকাশ—দিকে দিকে ধায় সহস্র ফণা মেলি'!
মুহূর্ত্তে যেন করিবে দগ্ধ মৃত্যুরে অবহেলি'!

ওরে জ্বাখ জ্বাখ হিংসার লীলা ধ্বংসের গৌরবে!
গিরিবনশ্রেণী মাতিয়া উঠেছে বহ্নির উৎসবে!
লক্ষ যুগের শিখা লক্ লক্
পর্ব্বত-ভালে জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্—
কোন্ কামনার বহ্নি-নরক, অকাল-মৃত্যু-স্তূপে;
দেখা দিল এই শ্যামা ধরণীর পীন-বক্ষের বুকে?

পর্ব্বতচারী দুঃসহ বায়ু দেয় এ কি ফুৎকার!
কোন্ বেদুইন্ উৎসাহে দেয় উল্লাস-চীৎকার!
এ কোন্ দস্যু জ্বালিয়া মশাল
বিস্তারি' ভীম বাহু সুবিশাল
অন্ধকারের চিরিয়া কপাল, গহনারণ্য হ'তে—
লুণ্ঠন-তরে বাহিরিয়া যায় নিশীথ-পল্লী-পথে!

নিশ্বাসে কা'র ভস্ম উড়িছে;—লক্ষ বরাহ বুঝি
সন্ধানি' ফিরে বন-সঞ্চয় পাষাণ-গর্ত্ত খুঁজি'!
আশ্রয় লাগি' যে দিকে তাকাই—
নিশ্বাসে আসে ভস্ম ও ছাই;
কালানল-শিখা, আর কিছু নাই, হায় এ কি বিভীষিকা!
জ্বলে দাবানল, পথ-সম্মুখে মৃত্যুর যবনিকা!

আহা বন-শিশু, হরিণশাবক, কালো চোখ দুটি তা'র;—
অগ্নিশিখায় খসিয়া পড়েছে, এ কি রে অত্যাচার!
শৃঙ্গ জড়ায়ে কোন্ মৃগ হায়
শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িল শাখায়—
কৃষ্ণসারের কণ্ঠে কে দিল কণ্টক-লতা-ফাঁস!
অনলকুণ্ডে মরে সন্তান,—নিষ্ঠুর পরিহাস!

কোথায় হিংস্র-ভীষণ-সর্প দুরন্ত ফণা মেলি,'
শাসাইয়া ফিরে বনচর জীবে?—আজি গেল সব ভুলি'!
ভেকের গর্ত্তে মাগি' আশ্রয়
বিষধর বুঝি লুকাইয়া রয়!
কোথায় ব্যাঘ্র? তা'র পরিচয় হিংসার উৎসবে—
নাহি দিল আজ, হেন অরণ্য-বহ্নির বৈভবে?

তুলিয়া শুণ্ড, ঘোর গর্জ্জনে ছুটিছে বন্য-করী!
শাখামৃগ হায়, ত্বরিতে পলায় গিরির শৃঙ্গ ধরি'!
দুর্ব্বলদেহ কত পশু হায়
দগ্ধ যে হলো অগ্নি-গুহায়!
কত বিটপীর শাখায়, শাখায় শাবকেরে বুকে ধরি'
অসহায় পাখী মরিল আপন-ডানায় দগ্ধ করি'!

এ কোন্ রাজার রাজ্য জ্বলিয়া হয় আজি ছারখার!
গিরি-প্রান্তরে দগ্ধ প্রাণীর যন্ত্রণা-হাহাকার!
কীচকের কাঁচা রন্ধ্রে, বাতাস
ফেলে যায় এ কি ক্রন্দন-শ্বাস,
বুকফাটা কোন্ কাঠের হতাশ, চিতার চুল্লী ভরি';—
ধ্বনি উঠে কা'র দিগন্তময় নিরাশায় সঞ্চরি'?

নির্ঝরিণীর স্রোত যেন আজ ফুটন্ত-ফেন-জল
অনল-উৎসে উপলখণ্ড বেদনায় বিহ্বল।
সিংহাসনের শৈল-আসনে
কোন্ রাজা আজ অগ্নিশাসনে
কাঁপে থর থর, বনচর সনে? কোথায় রাজ্যপাট?
আজি দাবানল-শ্মশানে জ্বলিছে বনভূমি সম্রাট্!

এ কি দুঃসহ খাণ্ডবদাহ, ক্ষুধা জাগিয়াছে কা'র?
বৈশ্বানরের উদরে কি জাগে বিশ্বের হাহাকার?
আরও কত চাই, ওরে ক্ষুধাতুর,
মাংস, চর্ম্ম, অস্থি ও খুর,
তোমার লোভের সীমা কত দূর?—জীবের রাজ্যটুক—
আরো কতখানি গ্রাসিবারে চাও, হে অনল-ভিক্ষুক!

ওরে দাবানল, তোর মুখে এ কি ভয়ঙ্করের রূপ?
আঁখি-বহ্নিতে বিপ্লব-রোষ, অধরেতে বিদ্রূপ!
কালো ধূমরেখা পৃথিবী ব্যাপিয়া
দূরে—বহুদূরে উঠিছে কাঁপিয়া—
দগ্ধ-তরুর ভস্ম উড়িয়া আসিছে তপ্ত বায়!
ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে এ কি কৌতুক খেলে যায়!

মোর জীবনের যৌবরাজ্যে, দাঁড়াও বৈশ্বানর!
নয়ন ভরিয়া হেরি হে ভীষণ, ওইরূপ সুন্দর!
ওই যে নীলিম, ওই যে করাল,
সহস্র শিখা, স্পর্শ-ভয়াল,
দাও মোরে তাপ দস্যু দয়াল, তোমার যজ্ঞ-শিখা,
এই ভারতের যৌবনে দিক্ মুক্তির জয়টীকা!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৯
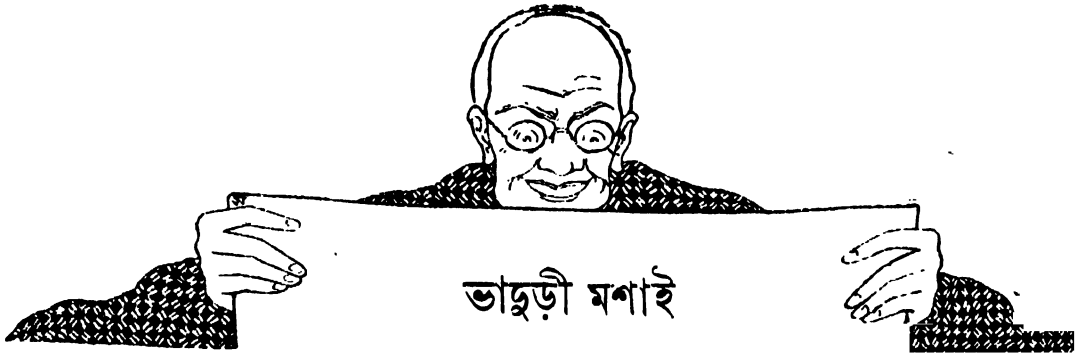
আহারান্তে তখনও বিশ্রামের ঘোর কাটেনি। সুবর্ণবাবু সংবাদপত্রখানা হাতে ক'রে বারান্দায় এসে ইজি-চেয়ারে বসলেও, যা প'ড়ছেন, তা চোখেই জড়িয়ে থাক্‌ছে—ভেতরে পৌঁচচ্ছে না।

"গোরা পুলিস যা মাইনে পায়, তার চেয়ে অনেক বেশী কায করে,—এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বাপ-মা'র নেই। ছেলে মানুষ করা বাপ-মা'র কায, তাঁরা তা পর্য্যন্ত পারেন না, পুলিসকে সে ভারও নিতে হচ্ছে—অথচ বেতনের বেলা একশোর মধ্যেই! কলেজের কর্ত্তাদের এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আর ভালো দেখায় না। বাপ-মা যেমন তাঁদের তাঁবে ছেলেদের ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদেরও তেমনি উচিত—যাঁদের দ্বারা তাদের সায়েস্তা কল্লে সুফল পান, তাঁদের উদারতার মূল্য"—ইত্যাদি।

"কি—কি হলো—বুঝলুম না;—এটা যে বড় দরকারি কথা।"

আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করলেন। তিন লাইনের পরই নাকটা কাগজে ঠেকে ছড়ানো হরপগুলো খুঁটতে লাগলো!

ভিতরে মীরা আর ইরাণী এক একখানা বই নিয়ে খাটে শুয়ে। মীরার চোখের পাতা ভিজে ভিজে, বুকের ওপর 'অরক্ষণীয়া'খানা উপুড় হয়ে প'ড়ে। ইরা ওপাশ ফিরে 'পরিণীতা' পড়ছে।

মন্দাকিনী দেবী একটু গড়িয়ে উঠে, চোখে মুখে জল দিয়ে একটা পাণ মুখে দিতে দিতে ডাকলেন—"কোথায় গো সব, পাঁপর তয়ের করা দেখবি ত আয়।"

"যাই,—তুমি যেন মা আরম্ভ ক'রে দিও না—" বল্‌তে বল্‌তে মীরা উঠে আরসীর কাছে গিয়ে ঢিলে খোঁপাটা খুলে একটু এঁটে নিয়ে, কাপড় ঠিক ক'রে—"আয় ইরা"—ব'লে, বেরিয়ে এলো।

"চলো—আমার এই—এই প্যারাটা।"

ইরাণী এসে দেখলে, মা একটা মোড়ায় ব'সে।—সামনে—ময়দা, ডাল বাটা—জলের ঘটী।

মীরা জিজ্ঞাসা করছে,—"হাঁ মা—বাঁ চোখ নাচলে কি হয়?"

মা কিছু বলবার আগেই—"ভয় নেই,—শুভদৃষ্টি হয় গো, শুভদৃষ্টি হয়!" বল্‌তে বল্‌তে ইরা এসে পড়লো।

"দেখলে মা,—এসেছে আর"—

"কেন গো,—কি করলুম?"

"আমার সঙ্গে কথা কইতে হবে না।"

"ও—মা! তবে কি বলবো—'হোঁচট খেয়ে প'ড়ে নাক থেঁতো হয়'।"

"তোমায় কিছু বলতে হবে না।"

মন্দাকিনী দেবী ইরাকে শাসনের সুরে কিছু বলতে গিয়ে হেসে ফেল্‌লেন।—"ওর কথায় কাণ দিস কেন, মীরা।"

"কোথায় একটা পাণ দেবেন, না—। দাও না দিদি, আলিস্যি ছাড়ছে না।"

"আগে একটা কুল্‌কুচোই কর।"

পাণ খাওয়ার মধ্যে দুই ভগিনীর মিটমাট হয়ে গেল।

ইরাণী একটা পাণ এনে মায়ের মুখে দিতে গেল। তিনি বল্‌লেন—"আমি খেয়েছি।"

"তা হোক্‌—খাও খাও, বাড়ীর গিন্নী—খেলে ত কেউ হিসেব চাইবে না," বলতে বল্‌তে মা'র মুখে গুঁজে দিলে।

"মেয়ের কথা শুনলি!—তোরা খেলে আমি হিসেব নি বুঝি!"

"আসছি" ব'লে ইরা বাইরে যাচ্ছিল; মন্দাকিনী দেবী বললেন—"তিনি নাক দিয়ে পড়তে অভ্যেস করছেন।"

"তোমার মত চোখ বুজে যে পারেন না!"—ব'লে চ'লে গেল।

পোড়ারমুখী! একবার না দেখে এলে ওর স্বস্তি আছে! শীগ্‌গির আসিস।"

মীরা বললে—"ও না থাকলে আবার ভালোও লাগে না। দস্যি কিন্তু বড় জ্বালাতন করে, মা!"

মন্দাকিনী দেবী মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। এই বিভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে দুটির চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তার ঝগড়া-মিলন, হাসিকান্না—সবগুলির মধ্যেই, মাতৃগর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ তিনি সর্ব্বক্ষণই উপভোগ ক'রে থাকেন। তাই মধ্যে মধ্যে তাঁর মনে হয়—ভগবান্ এত সুখ দিয়েছেন, কেবল স্বামীকে যদি একটু বুদ্ধি দিতেন!—অন্ততঃ তাঁর বুদ্ধি নিয়ে যদি চলেন——

ইরাণী এক মুখ হাসি নিয়ে ছুটতে ছুটতে,—"ওসব সরিয়ে ফ্যালো—সরিয়ে ফ্যালো—শীগ্‌গির," বলতে বলতে উপস্থিত।

"কি লো কি! সরাবো কেনো?"

"আসছেন,—(মীরার প্রতি)—ননদিনী সাথে!"

"কে আসছেন,—কি?"

"আসবেন না—বাঁ চোখ নাচিয়েছেন—(মীরার দিকে ফিরে)—মেয়েটি কেমন!"

"পোড়ারমুখো মেয়ে কি বলে যে—বুঝবার জো নেই।"

মোটর এসে লাগবার শব্দ পেয়ে—

"সত্যিই ত—ও মা, কি হবে! আমার যে"—

"তোমার আবার কি,—তুমি ত মা, বেশ নেড়ু গিন্নী ব'নে ব'সে আছ।"

"হতভাগা মেয়ে!—যা যা, সব ঠিক হয়ে নে।"

মন্দাকিনী দেবী লাল টকটকে রেশম-পেড়ে মান্দ্রাজি সাড়ী পরেছিলেন—জরির একটু আঁচ দেওয়া আঁচলা। দু'বোনের জয়পুরী ফুল-ছাপের সাধারণ সাড়ী,—মূল্যবান্ না হলেও সারা বাড়ীটাকে শ্রীদান করছিল।

"এগিয়ে যাও না দিদি,—বাবা সঙ্গে ক'রে আনবেন না কি?" বলেই, ইরা বাইরের দিকে গেল,—মন্দাকিনী দেবী মন্দগতিতে অনুসরণ করলেন।

মীরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগলো; কিছু না ঠিক করতে পেরে—দ্রুত ঘরে গিয়ে ঢুকে ধূপছায়া মারতে লাগলো। বাঁ চোখটাও ঘন ঘন নাচে!

বাম বাহুপাশে বদ্ধ ইরাণীকে নিয়ে সহসা সপ্রতিভ নেত্রে মাতঙ্গিনী দেবী—"বাড়ীতে অতিথ এলো গো—" ব'লে, উঠানে পা বাড়াতেই দিনের যৌবন-দীপ্তিটা যেন বেড়ে গেলো!

মন্দাকিনী দেবী চমকিত নেত্রে মুহূর্ত্তমাত্র চেয়ে—দু'পা এগিয়ে—"আসুন, আসুন" ব'লে হাত ধ'রে—

"আমি কি বলবো, কথা খুঁজে পাচ্ছি না, এত বড় সৌভাগ্য" ইত্যাদি বলতে বলতে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন।

ইরাণী নিজেকে বন্ধনমুক্ত ক'রে—মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রণাম ক'রে, পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। তিনি চিবুক ছুঁয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, "তুমি ত আমার বন্ধু। বাঃ, যেমন সুন্দরী—তেমনই সুন্দর স্বভাব!"

তিনি ভাবলেন, এইটির কথাই ঠাকুর বলেছিলেন। নাঃ, এর জন্যে ভাবনা নেই, সুন্দরী বটে, কিন্তু এ ত মেয়ের বয়সী।—তাঁর বেশ একটু স্বস্তি আর স্ফূর্ত্তি এল। বল্‌লেন, "ঠাকুরের কাছে আর নবনীর কাছে শুনেই ত থাকতে পারলুম না। ছুটে দেখতে এলুম।"

মন্দাকিনী দেবী বল্‌লেন, "ঠাকুর ত সাধু পুরুষ, আর নবনী ত ঘরের ছেলের মত—ওঁরা সকলকেই ভাল দেখেন। আপনার আসাটাই আমাদের ভাগ্যের কথা।"

ইরাণী তাড়াতাড়ি গালচে পাতছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী হাসতে হাসতে বল্‌লেন, "ও আর পাততে হবে না মা—ও সুখে আমি বঞ্চিত। দেখছ না, কেমন রোগা পাতলা মানুষটি, ওঠ-বোস্ করতে কষ্ট হয়, আমি খাটেই বস্‌ছি। তোমার মা'র পায়ের ধুলো মনে মনেই নিলুম। এই ব'লে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন।

মন্দাকিনী দেবী হাসিমুখে বল্‌লেন, "তাই ত বলি—এক ধাত না হ'লে আর দয়া ক'রে আমাকে দেখা দিতে এসেছেন,—আমারও যে ঐ রোগ! ঐ দেখুন না, আর কিছু না-থাক, উঠোনে ঘরে মোড়া না হয় চৌকী পাবেন—ও না হ'লে এক দণ্ড চলে না। দু'খানা লুচি ভাজতেও মোড়া চাই, বড়ী দিতেও মোড়া চাই—পাণ সাজতেও ঐ।"

দু'জনেই হাসলেন।

"ইরাণী বলে—বাড়ীর গিন্নীদের বুঝি ও রকম না হ'লে মানায় না,—ভাঁড়ার হাতে কি না! ও তাই গিন্নী হ'তে চায় না।" এই ব'লে ইরার দিকে চাইলেন।

"ও মা, কি হবে! এত বড় বদনাম। হাঁা, বন্ধু! আচ্ছা দেখবো।"

মন্দাকিনীর দিকে ফিরে—"আমার বন্ধুর নাম বুঝি ইরাণী? শুনেছিলুম দুটি মেয়ে না—আর একটি কোথায়?"

ইরা উঠে গেল। মন্দাকিনী দেবী বল্লেন, "বোধ হয়, কাযে-কম্মে আছে, জান্তে পারেনি। তার আবার যেমন ঠাণ্ডা স্বভাব, তেমনি সে লাজুক।"

ইরাণীর সঙ্গে মীরা পায়ে পায়ে জড়াতে জড়াতে আড়ষ্টের মত এসে মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে। তিনি চিবুকে হাত দিয়ে—আলো-করা মুখশ্রীর ওপর আনত চক্ষু দুটি দেখে অন্তরে চম্‌কে মুহূর্ত্তেক আবিষ্টের মত থেকে বল্লেন, "বাঃ, দুটি বোন্ লক্ষ্মী সরস্বতীই বটে!"

তাঁর মনটা ভিতরে বেশ একটু দ'মে গেল।—এইটিই ত বড়, এর কথাই ত ঠাকুর বিশেষ ক'রে বলেছিলেন। নিঃশব্দে একটা নিশ্বাসও প'ড়লো। "কর্ত্তা বুঝি মেয়েদের বে' দিয়ে পরের বাড়ী পাঠাতে চান না। তা সত্যি—এত আদরের, আনন্দের জিনিষ ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও কষ্ট হয়,—বাড়ীর শোভাই চ'লে যায়! মেয়ে জন্মটাই—"

মন্দাকিনী দেবী অঞ্চলে চোখ মুছে বল্লেন, "ঠিক বলেছেন। উনি বড্ডই ভালবাসেন, তাই বোধ হয় ও সম্বন্ধে এত উদাসীন। ও-কথা পাড়তেই দেন না। বলেন—তাড়াতাড়ি কি, সময় হলেই হবে। তুমি ওদের বিদেয় করবার জন্যে এত ব্যস্ত হও কেন?

"আবার মেয়ে দুটিও তেমনই। কে এক বড় জ্যোতিষী হাত দেখে ব'লে গিয়েছিলেন,—মীরার দুটি ছেলে, একটি মেয়ে হবে। তাই ওর বিবাহে ভয়; বলে, সে সব আমি সামলাতে পারবো না! শুনেছেন কথা!" এই ব'লে হাসলেন।

মাতঙ্গিনী দেবীর কাণে যেন মেঘ ডেকে প্রাণের ভিতর ঝড় প্রবেশ করলে। ছেলে-পুলের—কথা ওঠে কেনো! ঠাকুর নিশ্চয়ই শুনে গেছেন। আজ আবার একা বাড়ীতেই আছেন!

তিনি মীরার গায়ে হাত বুলিয়ে সাম্‌লে হেসে বল্লেন, সে আবার কি কথা মা, ও-কথা বলতে নেই। মেয়েদের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্যই ত মা হওয়া, কোলে একটি পেলেই বুঝতে পার্‌বে।"

মীরার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠলো।

মাতঙ্গিনীর মনে নানা তোলাপাড়া—নানা সন্দেহ চলছিলো,—"বেটাছেলেরা কি ভেবে-চিন্তে কথা কইতে জানে,—হুঁ—ঠাকুর শুনিয়েই থাকবেন—"

তার পর উভয় পক্ষের বাপের বাড়ীর কথা আরম্ভ হ'ল। সে সব ওঁরা পরস্পরই ভালো বোঝেন;—কিছু কিছু রাজতরঙ্গিণীতে মেলে। যথা—বাবা মস্ত বড় জমীদার; দেশে রাজা বলেই ডাক। জেলার ম্যাজিষ্টার সাহেব বাড়ীতে এসে কলাপাতা পেতে ভাত খেয়ে যায়! মিস্সে মুসুর-ডাল আর চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাক চড়চড়ি খেতে এতো ভালবাসে—ছিবড়ে ফেলতেই চায় না! যায় কি, আমাদের বাড়ীতে ব'সে বাবাকে রায় বাহাদুর ক'রে দিয়ে তবে উঠলো।—

—আমার হাত আর ছাড়ে না, কেবল উলটে পালটে দেখে বলে—এমন রং তোমাদের কি ক'রে হয়! আমাদের দেশে হ'লে এ মেয়ে কাউন্টেস্ হত! সে আবার কি ছাই জানি না!

ইত্যাদি চল্‌তে লাগলো। উভয়েরই ঝোঁক—পাল্লায় ঝুঁকতি পাবার।

ইরাণীর চুপ ক'রে থাকা অসহ্য বোধ হচ্ছিল, মুখ চুলকুচ্ছিল। হাসিমাখা মুখে সবই গিল্‌তে হচ্ছিল। মীরা স্থির হয়ে শুনছিল।

—তার সংসার, স্বামীর রোজগার, মধুপুরে বেড়াতে আসা—প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে চলতে লাগলো।—

—"বছরে ৫।৭টা ফাঁসী বাঁচিয়ে দেন, একটু কড়া হ'তে পারলে আজ ভাবনা কি!"—ইত্যাদি।

"সব শুনতে কি পাই ছাই—কটাই বা বলেন! ভাল মানুষ হবার যায়গা কি নেই—বলুন ত? বাড়ী ত রয়েছে। বুদ্ধির দোষেই খেয়েছে! সব ভালো—বুদ্ধিটি সেই কাঁচাই রইলো! আমরা থাক্‌তে—আর পাকবে না! নিজেরটা যদি বুঝতেন!"

"ও কথা আর কাকে শুনাচ্ছো, দিদি! কাযের বেলা সব এক, সব এক! বেশ ভালো মানুষটির মত সব শুনবেন,—কাযের বেলা উল্টোটি! লোকে সেলাম করলে—বিল (bill) পাঠাতে ভুলে যান—আর কি বলবো!"

"সে আবার কি ?"

—"ও মা, জান না ! এই—রাস্তার লোক সেলাম করলে বিল্ পাঠালেই টাকা—টৌর্ণী যে, সে অনেক কথা,—ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন।"

"দেখছো—কিছু বলেন কি ! এঁকে ত রাস্তার দু'ধারের লোকে সেলাম করে—হাকিম যে ! সাধে কি বলি—সব ভালো, কিন্তু বুদ্ধি তেমন নয় ! আচ্ছা বলুন ত—আমার কাছে লুকোনো কেনো ?—আমি কি"—

"দিদি—এসো না একবার"—ব'লে ইরাণী মীরাকে ডেকে বেরিয়ে গেলো। আর থাকতে পারলে না।

"বাপ-সোহাগী মেয়ে বাপকে একটু কিছু বললে গায় সয় না"—ব'লে, মন্দাকিনী দেবী মৃদু হাসলেন।

"ও—তাই বুঝি বন্ধ উঠে গেলো"—ব'লে মাতঙ্গিনী দেবীও হাসলেন।—"খাসা মেয়ে।"

ইরাণী একটি রূপোর ডিসে ক'রে—পাণ মসলা জরদা এনে মাতঙ্গিনী দেবীর হাতে দিলে।

"বন্ধ কি সাধে বলেছি"ব'লে, তিনি আদর ক'রে নিলেন।

"আসছি"—ব'লে ইরাণী মীরাকে নিয়ে চ'লে গেলো।

ঘরের বার হয়েই—"মিষ্টিমুখ করাতে হবে না ? সুখিয়াকে দিয়ে ফুলকপি আনিয়েছি—ওর যা হয় তুমি কর দিদি,—লুচি হালুয়া পাঁপর আমার ভার। রাজার মেয়েরা ব'সে ব'সে বুদ্ধি খেলান আর বাঘ মারুন !"

*　　*　　*　　*

মাতঙ্গিনী দেবী বললেন—"যেন ছবি দু'খানি ! আবার সাদাসিদে ছাপের কাপড় দু'খানিতে কি মানিয়েছে। যেন—এক জোড়া ঝুমকো লতা !"

"এখন ভালো হাতে পড়েন—তবেই।"

"এ সব মেয়ের জন্য ভাবনা দিদি ! তবে অতি বড় আদরের জিনিষ হ'লেও মেয়ে,—নিশ্চিন্ত থাকলেও ত' চলবে না।"

"তা কি চলে, না থাকা যায়। ওঁকে ত রোজই বলছি, মেয়ে মানুষ—আর কি করতে পারি ! ওঁরও ছুটি-ছাটা নেই, দিন-রাত কায—তায় বিদেশে বিদেশে।"

"তা ত ঠিকই দিদি—আমরা আর কি পারি, কেবল ভাবতেই পারি। আচ্ছা, আমার ত দেখাই হ'ল—ঠাকুরও দেখেছেন, নবনীও বোধ হয় দেখে থাকবে।"......

মন্দাকিনী দেবী চঞ্চলভাবে ব'লে উঠলেন—"ভালো কথা, নবনী বাইরে রইলেন কেনো ? তাঁকে ত একদিনেই ঘরের ছেলের মত পেয়েছি। আহা, কি রূপ, তেমনি স্বভাব।

—"সুখিয়া—সুখিয়া"—ব'লে ডেকে নবনীকে ভেতরে আনতে ব'লে দিলেন।

মাতঙ্গিনী ভ্রাতার সুখ্যাতির সুযোগ পেলেন।

—"ওর কথা বলবেন না—এখনো সেই বারো বছরেরটিই আছে ! ওযে চার পাঁচশো টাকার চাকরী কি ক'রে করবে, আমার সেই ভাবনা ! সায়েবরাও ছাড়বে না—ডাকের ওপর ডাক"—ইত্যাদি।

"ভাবনা কি, পুরুষমানুষ—জন্ম জন্ম করুক,—দেখবে তখন,——ও ছেলে আবার"——

২০

নবনী আনত-মস্তকে উপস্থিত হয়ে, অভিবাদনান্তে আসন নিলে।

"মীরাকে দেখেছিস ত !"

আচমকা দিদির এই আধখানা কথায় তার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ চমকে গেল, আর তার আভাটা চকিতে তার চোখে মুখে ছড়িয়েই মিলিয়ে গেল। নবনী বুঝতেই পারলে না, তাকে ডেকে এনে এ প্রশ্ন কেন ! স্বীকার করতেও আটকায়, অস্বীকারেরও উপায় নেই। সঙ্কোচের মধ্যে শব্দ বাদ পড়েই রইলো।

দিদি কথাটা সবিস্তারে বুঝিয়ে আর প্রশ্ন ক'রে চললেন,—মেয়েদের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য, স্বভাব—সবই অসামান্য এবং তদনুরূপ পাত্র নবনীর পরিচিতের মধ্যে আছে কি না ! যেহেতু, তাদের এই প্রীতি-মিলনের সার্থকতা ও স্মৃতির সুখানুভূতি-কল্পে—এ চেষ্টা পাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, ইত্যাদি।

—"তোর জানাশোনা যোগ্য পাত্র আছে কি ?"

হঠাৎ এ সব কথা কেন ! দিদিকে এঁরা চেনেন না। এ নিশ্চয়ই তাঁর কোন একটা লক্ষ্যের মৃত্যুবাণ। অথবা আমাকে দিয়েই আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা !

দিদির সুমধুর সৌজন্যের সবটা শোনবার মত অবস্থা সে হারিয়ে ফেলেছিল। তাঁর তাৎপর্য্যই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাতের আঘাত তাকে অপ্রতিভ আর অন্যমনস্কই ক'রে দিলে। ইতিমধ্যে সে যে কতবার রং বদলেছে—সে তা জানতেই পারে নি।

"ভেবে দেখিস ত, ভাই।"

মতিবাবুর কথা মুখে এসেও সেটা বলতে নবনীর আটকালো। বেরুলো কেবল—"দেখবো দিদি।"

মন্দাকিনী দেবী তেমন উৎসাহের সহিত যোগ না দেওয়ায় কথা তেমন বাড়ছিল না। তিনি সুযোগমত নবনীর প্রশংসা নিয়েই রইলেন।

ইরাণী দু'খানা আসন হাতে ক'রে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে, ঠাঁই করতে লাগলো।

মাতঙ্গিনী দেবী হাসতে হাসতে বললেন—"এ আবার কি বন্ধু—"!

"বেলা গেল যে, এখনও সব চা' খাওয়াও হয় নি,—দিদি রাগ করছেন। একটু ছুতো পেলে আর",—এই ব'লে ইরাণী মা'র দিকে চেয়ে—রাজহংসীর মত গলা বেঁকিয়ে এক চোখে পাতলা-হাসি হেসে চ'লে গেল।

"শুনলেন!"

মাতঙ্গিনী দেবী হেসে বললেন—"ঠিকই ত, বাঃ,—আমার বড়ো ভাল লাগে, যেন দোলন-চাঁপার দোলা!"

মন্দাকিনী দেবী একটু সন্তপ্ত সুরে,—"আহা, ছেলেপুলে হয় নি,—ছেলেপুলে দেখলে——ভগবানের কি"——কথাটা মাতঙ্গিনীকে উপহাসের মত বাজে। এ আত্মীয়তা কেন! বারবার শোনানোই বা কেন!

শুনলেই তাঁর মনটা কোন্ এক ঠিকানায় গিয়ে ঠেকে! তাঁকে কেমন ক'রে দেয়! অন্যের মুখ থেকে এ দয়ার আঘাত—বিষের মত বাজে!

দুই ভগ্নীর হাতেই "ট্রে",—জলখাবারের ডিস্,—চায়ের পট,—গোলাপী কাপ্।

"এবার না দিদি—আবার ডেকে আনতে হবে!—ঠাণ্ডা হয়ে না যায়," বলতে বলতে ইরাণী আগেই ঘরে ঢুকে মাতঙ্গিনী দেবীর সামনে সাজাতে বসলো।

মীরা চৌকাঠ পেরিয়ে চেয়েই কাঠ! নবনীর চোখে ধাক্কা খেয়ে—তরুণ অরুণ কান্তি!

নবনীর চোখের ওপর পাতা যেন কিসের প্রাপ্তি ভারে নিমেষে নুয়ে পড়লো। আচ্ছাদনের অন্তরালে তারা দু'টির অবস্থা অন্ততঃ স্বভাব-সহজ রইল না।

মীরা আশা করেছিল, ইরা তাকে সাহায্য করবে।

মন্দাকিনী দেবী ডাকলেন—"মীরা—দিয়ে যাও না, মা।"

অগত্যা তাকেই সে কায করতে হ'ল। চা ঢালতে হাতের ঠিক থাকছিল না দেখে নবনী বললে—"দিন—যতটা আমার দরকার, আমি ঢেলে নিচ্ছি।"

ইরার দুষ্ট-হাসি যেন ভাষায় ব্যক্ত হয়ে বলছিল—"কেমন হয়েছে!"

মাতঙ্গিনী দেবী হাসি মুখে এ সব লক্ষ্য করলেও—উপভোগ করছিলেন কি না বলা কঠিন।

মন্দাকিনী দেবী মীরার অসম আড়ষ্ট ভাবটিকে সহজের সামিল ক'রে নেবার জন্যে লজ্জার পর্য্যায় ফেলে বললেন—"ওর এই লজ্জা-সঙ্কোচের মেয়েলি ভাবটি রয়েই গেল। উটি আমার সে-কেলে মেয়ে।" এই ব'লে মৃদু হাসলেন।

নবনী জলযোগে মনোযোগ দিয়ে আত্মরক্ষার অন্তরাল পেলে।

"সত্যি—সন্ধ্যে হয় রে নবনী"—ব'লে, মাতঙ্গিনী দেবীও চায়ের বাটি টেনে নিলেন।

—"এত সব করা কেন,—এই সময়ের মধ্যে করলেই বা কি ক'রে! আমার সাদ্দি হত' না, দিদি।"

"আমাকে বলা কেন ভাই—ওরাই জানে—"

ইরাণী বললে—"'ওরা' ব'ল না মা, দিদিই করেছেন;—আমি কেবল চায়ের জলটা ফুটিয়ে দিয়েছি।"

"ওঃ, তবে আবার কি—ওইটেই ত শক্ত কায ছিল, বন্ধু",—ব'লে মাতঙ্গিনী দেবী হাসতে লাগলেন।

ইরা হাসিমুখে নিম্নকণ্ঠে তাঁকে বললে—"তা হ'লে সবার চেয়ে শক্ত কাযটা মা'ই করেছেন বলুন! ঘোড়াটা মোলো"!...

মাতঙ্গিনীর মুখের চা সুমুখে পড়তে পড়তে সামলে গেল!

—"আমার নিন্দে হচ্ছে বুঝি!"

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে—বন্ধুকে জলযোগের সাথী ক'রে নিলেন। মীরার হাত ধ'রে একটি মিষ্টি দিয়ে বললেন—"এটি তোমাকে খেতে হবে, মা।"

অন্যের শ্রবণ এড়িয়ে মীরা তাঁকে মৃদু মধুর কণ্ঠে জানালে—"আপনি দিয়েছেন—আমি খাব বই কি।" এই ব'লে হাতে ক'রে রইল।

* * * *

মোটর যখন ছাড়লো—তখন সন্ধ্যা। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ—শাস্ত্রের বা সাইকলজির অলিখিত সার্টিফিকেট

মাতঙ্গিনী দেবী রাখতেন। তাঁর চক্ষুও সার্চ-লাইটের কায করতো।

রাত্রির প্রস্তাব থেকে মীরার আবির্ভাব পর্য্যন্ত নবনীর মুখের ও মনের রেখায় ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে এবং মীরার রক্তাভ মাধুর্য্যের মধ্যে তিনি ও শাস্ত্রের শেষ অক্ষরটি পর্য্যন্ত প'ড়ে নিয়ে স্বাক্ষর ডেলে ফেলেছিলেন।

তাঁর অজ্ঞাতে এত বড় ব্যাপারটার জন্য, তাঁকে ভিতরে ভিতরে অপমান ক'রে পীড়া দিচ্ছিল।—"এর মধ্যে নবনী এত বড় হয়ে গেল,—আমি কেউ নই!" তাঁর অন্তরটা অভিমানের আঘাতে বিদ্রোহ ক'রে উঠছিল।

"মন্দাকিনীর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! ডিপুটীর পরিবার ফলানো। ওলো, আমিও মাতঙ্গিনী, এটর্ণীর পরিবার! মাগী কেবল কেবল আমার কাণে ছেলে হয়নি এইটে শোনাতে চায়। আ—মর্! আমার হয়নি ত তোর এত ভাবনা কেন! গণৎকারে বলেছে, ওঁর মেয়ের দু'দু ছেলে হবে। তার মানে তা হ'লে আমি একটিকে পুষ্যি-পুত্তুর নিতে পারবো! হুঁ—সব বুঝি, এতো ন্যাকা পাস্‌নি! আচ্ছা—হওয়াচ্ছি!"

দিদিকে গম্ভীর আর নীরব দেখে নবনী অপরাধীর মত ব'সে রইলো, কথা কইতে সাহস পেলে না।

এই ভাবে প্রায় ক' মিনিট কাটলো,—নীরবে হলেও—নিরুদ্বেগে নয়।

কথায় বলে—"বোবার শত্রু নেই।" এর সত্য মিথ্যা নবনীই অনুভব করছিল। মৌনতারও একটা তীব্রতা আছে—সেটাও নিরঙ্কুশ নয়।

অশব্দ-মাতঙ্গিনী তাকে স্তব্ধ ক'রে রেখেছিল। মোটরের গতি যে তাকে কোন্ দুর্গতির মধ্যে নিয়ে চলেছে, সে তার ঠিকানা পাচ্ছিল না।

যেন সন্ধ্যাপূজার আসন্ন সন্ধিক্ষণে সহসা দক্ষিণা বাতাস বইলো! মাতঙ্গিনী মোলায়েম সুরে কথা কইলেন, "মীরা মেয়েটির যেমন রূপ, তেমনই মিষ্টি স্বভাব—না! তোর কেমন লাগলো?"

নবনী শিউরে উঠলো। মাথা মন দুই ঘুলিয়ে গেল। সে যেন ফাঁসীর আগে পাদরী সায়েবের কল্‌মা শুনছে! কথা ফুটল না।

"নাঃ, ও-মেয়ে আনতেই হবে ভাই—কি বলিস?"

নবনী জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মীরাকে ভালোবেসেছে, কি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এ সব ভেবেও দেখেনি। ভাল লাগার টান্‌টা সে অনুভব করেছে বটে। কিন্তু ভালো লাগলেই যে আপন করা যায়, এমন কথা ত তার বিশ্বাসের মধ্যে কখনও পথ পায়নি!

বরং তার জানা বাধাগুলির মধ্যে যেটি সব চেয়ে সঙ্গিন, যা তাকে ও বিষয় ভাববার ভরসা পর্য্যন্ত দেয় না, সেই দিক্ থেকেই এ কি প্রস্তাব! সে কিছু বুঝতে পারলে না। বল্‌লে, "ও-সব কথা এখন কেন দিদি—আমার এখন—"

"ও আবার এখন তখন কি! তোর কায ত পাকাই হয়ে রয়েছে। না হয় কাযে বসবার পরেই হবে, কিন্তু অমন মেয়ে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌ব না। তোর পছন্দ হয় না?"

"সে ত যখনি হবে—তোমার পছন্দ হলেই হবে, দিদি।"

মাতঙ্গিনী দেবীর ভ্রাতৃ-গর্ব্বটা আজ খাটো হয়ে তাঁর মনটাকে অনেকখানি নীচে নামিয়ে রেখেছিল। শব্দের কি শক্তি!

নবনীর কথায় পলকে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলেন, মনটা তাঁর যথাস্থানে পৌঁছে গেল, কোয়াসা এক ফুঁয়ে কেটে গেল! এ সব এমন সহজে আর অজ্ঞাতে ঘটে—যা মানুষের লক্ষ্যের বাইরে!

তিনি স্নেহ-মধুর স্বরে বল্‌লেন, "আমি কথা এক রকম দিয়েই এসেছি, ভাই।"

মোটর পৌঁছে গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
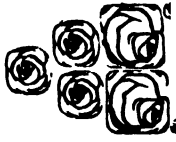
'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও বিচার
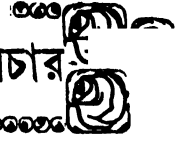
"শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় ৩১৬ পৃষ্ঠে প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"দীক্ষা প্রকরণে আছে—'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন—অন্যে নহে'" ইত্যাদি। ইহারই প্রমাণরূপে তিনি সনাতন গোস্বামীর মত বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচারের বিরুদ্ধ হইয়াছে; কেন তাহা বলি—

আমি বৈষ্ণব-দীক্ষা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়, এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ময়মনসিংহের অভিভাষণে প্রকাশ করিয়াছি, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, অন্য কোন বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও হইতে পারেন না, এরূপ কোন উক্তি আমার অভিভাষণে বা শাস্ত্র-সমস্যা প্রবন্ধে নাই, এরূপ অবস্থায় আমার মতের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া এই বিচারের অবতারণা যিনি করিতে পারেন, তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বিচার করা যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিলে মানবমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে, এই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তই আমি বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি, সেই দীক্ষাদানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের অধিকার আছে কি নাই, এ বিষয়ে যখন আমি কিছুই এখনও বলি নাই, তখন প্রতিবাদকর্ত্তার এই বিচার 'ধান ভাঙিতে শিবের গীত' ছাড়া আর কি হইতে পারে? সুতরাং এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

তাহার পর এই বিচার দ্বারা তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে অভিমত নহে, প্রত্যুত তাহার বিরুদ্ধ, তাহাও দেখাইতেছি। আমাদিগের দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দীক্ষাদাতা গুরু ব্রাহ্মণেতর বর্ণও যে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তিরোভাবের পর হইতেই হইয়া আসিতেছেন, তাহা কি প্রতিবাদকর্ত্তা এখনও শুনেন নাই? শ্রীখণ্ডের পরম ভাগবত বৈদ্য গোস্বামিগণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বহু কায়স্থ গুরু এখনও বহু কুলীন ব্রাহ্মণবংশের দীক্ষাগুরুর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দীক্ষিত শিষ্যগণ কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এখনও বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন বিনা বাধায় করিয়া আসিতেছেন, প্রায় ৪ শত বৎসর হইতে চলিল, এইরূপ অব্রাহ্মণ-দীক্ষিত উচ্চকুলজাত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ সমাজের বরণীয় আসনে এখনও অবস্থিত আছেন, ইহা যিনি না জানেন, তিনি কি করিয়া শিষ্টসম্মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কি সিদ্ধান্ত, তাহা খ্যাপন করিতে নির্লজ্জভাবে সাহস করেন, তাহা পাঠকমাত্রেই বিবেচনা করিবেন, এ স্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলার আবশ্যকতা দেখি না।

তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে ঋষিদিগের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিবার জন্য, তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেই সকলের অসারত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব এক্ষণে দেখান যাইতেছে—

প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আত্মপাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য তাঁহার যে বলবতী প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধেও যেমন প্রকাশ পাইয়াছে—তৃতীয় প্রবন্ধেও তাহাই প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি যে পাঠকবর্গকে 'অতিষ্ঠ' করিয়া তুলিতেছেন, ইহা তাঁহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—"যে ভাবের প্রত্যুত্তর ও সমস্যা, তাহাতে মনে হয়, এ আলোচনা লোকের যত দিন বিরক্তিকর না হইবে, পাঠক 'অতিষ্ঠ' না হইবেন, তত দিন চলিবে। আমি দুই দিকে চালাইব না, আমার মাথার মণি শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ, আমার যেন চির-আশ্রয় হইয়া থাকেন।"

এইরূপ গৌরচন্দ্রিকার মধ্যে যে কি অপূর্ব্ব রসিকতা রহিয়াছে, পাঠকবর্গ নিজেরাই তাহার আস্বাদন করিবেন, আমি বিশেষ কিছু বলিব না, তবে এইটুকু বলিতে চাহি যে—"আমি দুই দিকে চালাইব না" ইহার অর্থ কি? এ কোন্ দুই দিক্? কে তাহা চালাইতেছে? তাহা যতক্ষণ প্রতিবাদকর্ত্তা খুলিয়া না বলিতেছেন, সে পর্য্যন্ত এরূপ উক্তি যে অসভ্যতার পরিচায়ক, তাহা শিষ্ট পাঠকগণ ভাল করিয়াই বুঝেন, "শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ" যে কেবল প্রতিবাদকর্ত্তারই মাথার মণি, তাহা নহে; আমারও মাথার মণি—শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

অজ্ঞানের বিষময় পরিণামে পরম্পরাগত জীবিকা ও সম্মান রক্ষার বিষম লোভে পড়িয়া, যে সকল প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যবর্জিত ব্রাহ্মণনামধারী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি অপব্যাখ্যার দ্বারা সনাতন

ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র-সমূহের মালিন্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই অপব্যাখ্যাজনিত কলঙ্ক হইতে শাস্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি "শাস্ত্র-সমস্যা" প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, শাস্ত্রের প্রতি তিনি যেরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আমার শ্রদ্ধা তাহা হইতে তিলমাত্রও ন্যূন নহে, শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে শাস্ত্র রক্ষিত হইতে পারে না, ইহাই আমার মত। শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার যে রীতি কুমারিল ভট্ট, শবরস্বামী প্রভৃতি শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমি সেই রীতিই অবলম্বন করিয়াছি, এবং যত দিন জীবন থাকিবে, সেই রীতিই আমার অবলম্বনীয় থাকিবে। ব্রাহ্মণও আমার মাথার মণি, হিন্দু সভ্যতার যাহা কিছু সার, যাহা কিছু অনুকরণীয়, যাহা কিছু গৌরবাবহ, তাহা সকলই ব্রাহ্মণ আমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ—বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছেন, ব্রাহ্মণ্যশক্তির জাগরণ ব্যতিরেকে এই অধঃপতিত পরপদলেহী কর্ত্তব্যভ্রষ্ট মোহান্ধ হিন্দু জাতির পুনর্জীবনলাভ অসম্ভব, ইহা কে অস্বীকার করিবে ? ব্রাহ্মণ আবার প্রকৃত ব্রাহ্মণ হউন, নিজের তপস্যার ও জ্ঞানের প্রভাবে পূর্ব্বের ন্যায় অসীম শক্তি সঞ্চয় করিয়া হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের পথ সুগম করিয়া দিউন, ইহাই হইল আমার শ্রীভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা। যথার্থ ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব হিন্দু সমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ময়মনসিংহের অভিভাষণে ইহাই আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছি ও এখনও করিতেছি, সুতরাং ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রকে 'মাথার মণি' বলিয়া ঘোষণা করিবার এবং তাদৃশ ঘোষণা দ্বারা আত্মগৌরব অনুভব করিবার অধিকার কেবল যে প্রতিবাদকর্ত্তারই আছে, তাহা আমি স্বীকার করি না।

প্রতিবাদকর্ত্তা তৃতীয় প্রবন্ধে 'বিপ্লবের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিয়া সনাতনধর্ম্মের স্বরূপনির্ণয় যে ভাবে করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই পাঠকবর্গ শুনুন—"গতবারে বলিয়াছি, প্রকৃতির প্রতিকূলে গমন আমাদের ধর্ম্মসাধনা, এই প্রতিকূলে গমন যে কত কঠিন, তাহাও বলিয়াছি, এই কঠিনতা বশতঃই সমাজে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রধান পুরুষগণের পদস্খলন দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত হইলে অনাচারের প্রসার হয়, প্রকৃতির প্রবর্ত্তন তাহার অনুকূল হইয়া থাকে।"

ধর্ম্মসাধনার এরূপ বিকৃতব্যাখ্যা প্রতিবাদকর্ত্তার উদ্ভট-পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে, আমরা কিন্তু শাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই, শোকমোহাদির বশে ক্ষাত্রধর্ম্মযুদ্ধে বিরত হইতে উন্মুখ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥"

গীতা ১৮ অঃ ৫৯ শ্লোক।

"অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এইরূপ সঙ্কল্প যে করিতেছ, তোমার এরূপ সঙ্কল্প—মিথ্যা, যেহেতু, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে।"

এই ভগবদ্‌বাক্যের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্মাচরণে যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রকৃতির প্রতিকূল। প্রকৃতিই তাঁহাকে স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করাইবে। ইহাই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইল, তবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও ইহাই বুঝা গেল যে, প্রকৃতির অনুকূলভাবে গমন করিতে পারিলে ধর্ম্মসাধনা হইয়া থাকে, প্রকৃতির প্রতিকূলভাবে গমন ধর্ম্মহানিকর ও অধর্ম্মের হেতু হইয়া থাকে। প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় কিন্তু, তাহা মানেন না, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নেতৃত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনার যে স্বরূপ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর সকল শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। শ্রীভগবানেরও তাহা সম্পূর্ণরূপে অনভিমত, তাহা শ্রীভগবানের উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

এই শ্লোকে যে প্রকৃতিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কি বলিতেছেন, তাহাও দেখা যাউক্।

"যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।"

মধুসূদন সরস্বতীও 'প্রকৃতি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রকৃতিঃ ক্ষত্রজাত্যারম্ভকো রজোগুণস্বভাব-
স্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে।"

আচার্য্য শঙ্কর প্রকৃতিশব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ক্ষাত্রস্বভাব'। মধুসূদন সরস্বতী আচার্য্য শঙ্করেরই মতানুসরণ করিয়া 'প্রকৃতি' শব্দের আরও একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন;

তিনি বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়জাতির আরম্ভক যে রজোগুণস্বভাব, তাহাই 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ, সেই 'প্রকৃতি'ই অর্জ্জুনকে তাহার যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। উল্লিখিত আচার্য্যদ্বয়ের ব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মানবের যে স্বধর্ম্মাচরণ-প্রবৃত্তি, তাহা তাহার জন্মারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের পরিণতি-রূপ যে স্বভাব বা প্রকৃতি, তাহা হইতেই হইয়া থাকে। 'প্রকৃতির' বিরুদ্ধে গমন করার নাম ধর্ম্মসাধনা, এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ প্রতিবাদকর্ত্তার অনভিজ্ঞতা ও হঠকারিতারই পরিচয় দিতেছে।

হইতে পারে, প্রতিবাদকর্ত্তা যে 'প্রকৃতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ তাঁহারই 'মনগড়া' কোনরূপ 'প্রকৃতি' হইবে, যাহার সহিত গীতোক্ত এই 'প্রকৃতির' সম্বন্ধ নাই ; সেই 'প্রকৃতি' আমার মনে হয়, তাঁহার বুদ্ধির বিকৃতি ব্যতিরিক্ত আর কিছু নহে। গীতাতে বহুস্থলেই এই 'প্রকৃতি' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রতিবাদকর্ত্তার 'প্রকৃতি' কিন্তু সেই সকল 'প্রকৃতি' হইতে ভিন্নরূপ। গীতার সপ্তম অধ্যায়েও দুই প্রকার প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

গীতা ৭অঃ ৪।৫ শ্লোক,

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টধাবিভক্ত আমার প্রকৃতি, এই প্রকৃতি—অপরা প্রকৃতি, ইহা হইতে অন্য আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহা পরা প্রকৃতি, তাহার নাম—জীব। সেই জীবরূপ পরা প্রকৃতি স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

গীতার এই দুইটি শ্লোকে যে দ্বিবিধ প্রকৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দ্বিবিধ প্রকৃতির প্রতিকূল গমনের নাম যদি প্রতিবাদকর্ত্তার অভিমত ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলেও প্রতিবাদকর্ত্তার এই উক্তি উন্মত্তের প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। কেন তাহা বলি,—

'অপরা প্রকৃতি' শব্দের অর্থ হইতেছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুদ্, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই অষ্টবিধ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গমন করিলেই ধর্ম্মসাধনা হয়, ইহাই যদি প্রতিবাদকর্ত্তা বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হয়, মনের বিরুদ্ধে যে গতি, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যে গতি, তাহার নাম—ধর্ম্মসাধনা। অহঙ্কারের অর্থাৎ 'আমি' এই প্রকার নিশ্চয়ের বিরুদ্ধে যে গতি, প্রতিবাদকর্ত্তার মতে তাহাই ধর্ম্মসাধনা, কিংবা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের বিরুদ্ধে যে গমন, তাহাও প্রতিবাদকর্ত্তার মতে ধর্ম্মসাধনা। অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহেন—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিরুদ্ধে গমন বা অসীম শক্তিশালী পঞ্চভূতের বিরুদ্ধে যে গমন, তাহাই তাঁহার মতে ধর্ম্মসাধনা। ধর্ম্মসাধনার এই অপূর্ব্ব অপব্যাখ্যা হিন্দু কখনও শুনে নাই, কোন শাস্ত্রেও ইহা নাই। মানুষ নিজের মনের, নিজের বুদ্ধির এবং নিজের অহংজ্ঞানের বিরুদ্ধে চলিতে পারে না, এ পর্য্যন্ত কেহ চলেও নাই ; কখনও যে কেহ চলিবে, তাহাও সম্ভবপর নহে, অথচ প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় স্বভাবনিয়ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের জীর্ণোদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, হে অধর্ম্মনিরত কলিযুগের ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুগণ! তোমরা নিজের মনের, নিজবুদ্ধির ও নিজ অহং-প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে চল, তাহা হইলেই তোমাদের ধর্ম্মসাধনা হইবে। আর যদি তাহার বিরুদ্ধে না চলিয়া তাহার অনুকূল-ভাবে চল, তাহা হইলে তোমরা অধার্ম্মিক হইবে— তোমাদের অধোগতি হইবে।

কি অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য! ইহার কি পুরস্কার, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তাহা স্বয়ং বিবেচনা করিয়া শীঘ্রই প্রতিবাদকর্ত্তাকে দিবেন, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অপরা প্রকৃতির মধ্যে পঞ্চভূতেরও উল্লেখ আছে, তাহার বিরুদ্ধগতি যদি ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলে সাধক যে একক্ষণও জীবিত থাকিতে পারে না, প্রতিবাদকর্ত্তার তাহাই যদি ইষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অচিরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ার নামই সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মসাধনা। বলা বাহুল্য, এ ধর্ম্মসাধনা যিনি সমাজকে শিখাইতে চাহেন, তাঁহার উক্তি উন্মত্তের উক্তি ব্যতি-রিক্ত আর কি হইতে পারে? তাহার পর পরা প্রকৃতির কথাও ঐ গীতার শ্লোকে দেখিতে পাই, সে পরা প্রকৃতি হইল জীব, জীবের—আত্মার বিরুদ্ধে যে গতি, প্রতিবাদকর্ত্তার মতে তাহাই যদি ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্মসাধনায় কোন হিন্দুরই কোন কালে প্রবৃত্তি ছিল না- হইতেও পারে না। আত্মার আত্মবিরুদ্ধ গতি ধর্ম্মসাধনা, এ কথা হিন্দুর নিকটে—আত্মোপাসকের নিকটে কিছুতেই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতির স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সাংখ্যদর্শনোক্ত ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তিশালিনী জীবনিবহের ভোগাপবর্গসম্পাদিকা—প্রকৃতির বিরুদ্ধে গমন করাই যদি প্রতিবাদকর্ত্তার অভিমত ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলেও বলিব, সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাংখ্যদর্শনেরই সিদ্ধান্ত অনুসারে এ পর্য্যন্ত কেহ যায় নাই, যাইতেছে না, যাইতে পারেও না। এরূপ অবস্থায় প্রতিবাদকর্ত্তার বিচিত্র 'প্রকৃতি' অশ্বডিম্ব ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে—তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই বিচার করিয়া দেখুন। এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিব না, প্রতিবাদকর্ত্তা যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার এই বিচিত্র 'প্রকৃতিটি'কে সাধারণের সমক্ষে কখনও উপস্থিত করেন, তখনই আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ফল কথা এই হইতেছে যে, হিন্দুর দর্শনে, হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে, হিন্দুর অভিধানে, প্রকৃতিশব্দের যত প্রকার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিবাদকর্ত্তার এ 'প্রকৃতি' তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না; এ নূতন প্রকৃতির স্বরূপ যদি প্রতিবাদকর্ত্তা দেখান, তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব।

প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিতেছেন—"সনাতন ধর্ম্ম নিবৃত্তিপ্রধান," কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণঃ নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।" প্রবৃত্তিলক্ষণ যে ধর্ম্ম, তাহাতে প্রবৃত্তিই প্রধান, ইহা শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্করের উক্তির দ্বারাও তাহাই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই সকল ধর্ম্মকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বলা যায়। এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মে নিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, কিন্তু প্রবৃত্তিরই প্রাধান্য আছে। নিবৃত্তিলক্ষণ সন্ন্যাসাদি ধর্ম্মেই নিবৃত্তির প্রাধান্য আছে, প্রবৃত্তির প্রাধান্য নাই। এই ভাবে ধর্ম্মের বিভাগ আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্মমাত্রই নিবৃত্তিপ্রধান—ইহা এ পর্য্যন্ত কোন আচার্য্যই কোন গ্রন্থেই বলেন নাই, সুতরাং ইহা প্রতিবাদকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। নিবৃত্তিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্ম, ইহাই হইল শিষ্টগণের সিদ্ধান্ত; ইতিহাসও সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ প্রকৃতস্থলে শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তি। এ সংসারে বহুল দুঃখমিশ্রিত সুখ দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা সাধিত হয়, অথচ তাহা নিতান্ত অচিরস্থায়ী, এই কারণে আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসসম্পন্ন আস্তিক ব্যক্তিগণ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত চিরস্থায়ী সুখের সাধনস্বরূপ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হন, সেই সকল কর্ম্মকেই প্রবৃত্তিপ্রধান কর্ম্ম বলা যায়, এই সকল কর্ম্ম করিতে হইলে যেরূপ প্রবৃত্তির আবশ্যকতা হয়, তাহা উচ্ছৃঙ্খল হইতেই পারে না, শাস্ত্র উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির নিরাকরণের জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান করিয়া থাকে, শুধু শাস্ত্র কেন—লোকেও এই প্রকার প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য কর্ম্মিগণের সাবধানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদরান্নের জন্য পরের চাকরী করিতে গেলেও 'চাকরী' করিবার সময়, যে চাকর, তাহার প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যথেচ্ছ প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না, সেরূপ করিতে গেলে তাহার 'চাকরী'রূপ জীবিকাই নষ্ট হয়, এই কারণে তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিতেই হয়। এইরূপ প্রবৃত্তিসঙ্কোচ চাকরের আছে বলিয়া, তাহার চাকরীকে যে নিবৃত্তিপ্রধান কর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ কোন হেতু দেখা যায় না।

এইরূপ লৌকিক কার্য্যমাত্রেই সর্ব্বতোমুখী প্রবৃত্তির সঙ্কোচ যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে হইলেও সেই কার্য্যের অনুকূল প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিতে হয় এবং অন্যপ্রকার প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইতে হয়, সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্তি ও লৌকিক কার্য্যে প্রবৃত্তির মধ্যে কোন বৈষম্যই বিদ্যমান নাই। লৌকিক কার্য্য করিতে গেলে সংযমের আবশ্যকতা আছে, শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে গেলেও সংযমের আবশ্যকতা আছে। সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ কাম্য কর্ম্ম করিতে গেলে সংযমের আবশ্যকতা আছে বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ ধর্ম্মকে যদি প্রতিবাদকর্ত্তার মতানুসারে নিবৃত্তিপ্রধান বলা যায়, তাহা হইলে লৌকিক কার্য্য করিতে গেলেও সংযমের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, লৌকিক কার্য্যও নিবৃত্তিপ্রধান হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে লৌকিক কার্য্যের ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের নিবৃত্তিপ্রধানতা তুল্যভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ শাস্ত্রীয় কার্য্য নিবৃত্তিপ্রধান, লৌকিক কার্য্য নিবৃত্তিপ্রধান নহে, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা নিতান্ত অসার, নির্যুক্তিক ও সাধারণ জনের ভ্রান্তির উৎপাদক হইয়া থাকে। এই ভাবে নিবৃত্তিপ্রধান ধর্ম্ম লইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা যে বাহাড়ম্বর করিয়াছেন, তাহা বিবেচকগণের নিকট একান্ত উপেক্ষণীয় বলিয়াই প্রতীত হইবে।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ ধর্ম্মেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, অপর প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। অধিকতর সুখ-

ভোগাদির কামনায় যে কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কামনায় যে কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ বা প্রবৃত্তিপ্রধান ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকগণই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্যগণের নিকট কোন দিনই এই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত আদৃত হয় নাই, প্রত্যুত উপেক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুর সকল ধর্ম্মকেই নিবৃত্তিপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া যিনি নির্দ্দেশ করেন, তিনি বৌদ্ধসিদ্ধান্তেরই প্রচার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মকে আকুল করিয়া থাকেন, ধর্ম্মবিপ্লবের পথকে উন্মুক্ত করেন, এক কথায় বলিতে গেলে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর নিকট প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াই তিনি পরিগৃহীত হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন। শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুমাত্রেই এইরূপ মতকে চিরদিন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং এখনও যে করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে—'মানুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে না, একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ই সর্ব্বজ্ঞ' এই যে সিদ্ধান্ত আমি 'শাস্ত্র-সমস্যায়' উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপর প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সকলই যে নির্যুক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই দেখান হইতেছে।

বুদ্ধ প্রভৃতি অসাধারণ পুরুষগণের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করাই কুমারিল ভট্টের অভিমত, মন্বাদি মহর্ষির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন তাঁহার অভিমত নহে। সুতরাং বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডনপর কুমারিল ভট্টের রচনাবলী শাস্ত্র-সমস্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদকর্ত্তা আমার প্রতি যে মিথ্যাবাদিতা, প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা—তিনি কুমারিল ভট্টের বাক্যসমূহ ও তদন্তর্নিহিত যুক্তি ও প্রমাণের স্বরূপ নিজেও যে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। মনুষ্যমাত্রের সর্ব্বজ্ঞতা-নিরাকরণই যে কুমারিল ভট্টের অভিমত, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'শাস্ত্র-সমস্যায়' আমি যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই—

"সর্ব্বজ্ঞোঽসাবিতি হ্যেষ তৎকালে তু বুভুৎসুভিঃ।
তজ্জ্ঞানজ্ঞেয়বিজ্ঞানরহিতৈর্গম্যতে কথম্॥ ১৩৪
কল্পনীয়াশ্চ সর্ব্বজ্ঞা ভবেয়ুর্বহবস্তব।
য এব স্যাদসর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্বজ্ঞং ন বুধ্যতে॥ ১৩৫
সর্ব্বজ্ঞোঽনববুদ্ধশ্চ যেনৈব স্যান্ন তং প্রতি।
তদ্বাক্যানাং প্রমাণত্বং মূলাজ্ঞানেঽন্ধবাক্যবৎ॥" ১৩৬

ইহার অনুবাদও আমি যাহা 'শাস্ত্র-সমস্যায়' করিয়াছি, তাহা এই—

"কোন্ মানুষ সর্ব্বজ্ঞ—ইহা সেই মানুষ যখন বিদ্যমান থাকে, তৎকালে লোক কি প্রকারে বুঝিবে? যাহারা তাহার সর্ব্বজ্ঞতা বুঝিতে চাহে, এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহার সাহায্যে তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। যাহারা সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহারা যাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অনুমান করিবে, তাহার সেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান কি-স্বরূপ, এবং সেই জ্ঞানের বিষয় যে কোন্ কোন্ বস্তু, তাহা তাহারা নিজেই বুঝে না, এইরূপ ব্যক্তিগণ অপরের সর্ব্বজ্ঞতা-বিষয়ক অনুমান কোন্ হেতুর সাহায্যে করিতে পারে? সর্ব্বজ্ঞতারূপ সাধ্যের সাধক কোন হেতুই অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করিবে, তাহারও সর্ব্বজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। তাহাই যদি মানুষের সর্ব্বজ্ঞতাবাদিগণের ইষ্ট হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয় যে, এ সংসারে সর্ব্বজ্ঞ এক জন নহেন, যাঁহারা অপরের সর্ব্বজ্ঞতার অনুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সকলেই সর্ব্বজ্ঞ। কারণ, অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কখনই সর্ব্বজ্ঞের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যে ব্যক্তি যাহার সর্ব্বজ্ঞতা অনুভব করিতে পারে না, সে ব্যক্তি তাহার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে না, এবং সেই কারণে এইরূপ কল্পিত সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অলৌকিক বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়া থাকেন, তাহার কোন মূল প্রমাণ না থাকায়, সেই সকল বচনের উপর প্রামাণ্য-বুদ্ধি হওয়া অসম্ভব।"

কুমারিল ভট্ট এই কয়টি শ্লোকে বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিবার জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যদি বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যুক্তিরই সাহায্যে মন্বাদিরও সর্ব্বজ্ঞতা কেন খণ্ডিত হইবে না, তাহার উত্তর প্রতিবাদকর্ত্তা কিছুই বলেন নাই। তিনি কেবল দেখাইয়াছেন যে, এই শ্লোকে 'অসৌ' এই যে শব্দটি আছে, তাহা পূর্ব্ব-প্রক্রান্ত বুদ্ধকেই বুঝাইতেছে, সুতরাং বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডনই কুমারিল ভট্টের অভিমত। মনু প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন তাঁহার অভিমত নহে। ইহার উপর আমার বক্তব্য এই যে, অপরের সর্ব্বজ্ঞতা কাহারও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অনুমানের সাহায্যেই তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, সেই অনুমান করিতে হইলে যেরূপ সাধ্য ও

হেতুর নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, তাহারই খণ্ডন করা কুমারিল ভট্টের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, মন্বাদি মহর্ষির সর্ব্বজ্ঞতাও আমাদিগের কাহারও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, সুতরাং মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিতে হইলে আমাদিগকেও অনুমানের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে, মানুষের সর্ব্বজ্ঞতার সাধক কোনরূপ অনুমানই যে নির্দ্দুষ্ট হইতে পারে না, এই সকল শ্লোকে তাহা কুমারিল ভট্ট অতি বিশদভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্টের সেই সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডনপর অনুমানপদ্ধতির খণ্ডন,প্রতিবাদকর্ত্তা যে পর্য্যন্ত না করিবেন, সে পর্য্যন্ত, তাঁহার মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধির জন্য যত কিছু প্রয়াস, সবই অরণ্যে রোদন ব্যতিরিক্ত আর কিছুই হইতে পারে না।

কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকাচার্য্যগণ যে কারণে বুদ্ধ প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধবাদিগণের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই প্রতিবাদকর্ত্তা কুমারিল ভট্টের এ কয়টি শ্লোকের অসম্ভব বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মীমাংসক আচার্য্যগণ—সকলেই একবাক্যতা সহকারে ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন, একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইয়া থাকে, বেদমূলক নহে, এমন কোন পৌরুষেয় বাক্যই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ে সমর্থ নহে, কারণ, কোন পুরুষের এরূপ শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে সে কি ধর্ম্ম বা কি অধর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে পারে। সুতরাং শাশ্বত বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে স্মৃতিনামে প্রসিদ্ধ মন্বাদি মহর্ষি-প্রণীত শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না, এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, স্মৃতিরূপ পৌরুষেয় বচননিবহ শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মেরই স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ে সাক্ষাৎ প্রামাণ্য না থাকিলেও তত্তদ্ ধর্ম্মে প্রমাণভূত বেদবাক্যের অনুমান আমরা স্মৃতির সাহায্যে করিয়া থাকি বলিয়াই স্মৃতিকেও আমরা ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; মন্বাদি মহর্ষিগণ শ্রুতিপাদিত অর্থই প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের মত প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, শ্রুতি যাহা প্রতিপাদন করেন নাই, সেইরূপ কোন ধর্ম্ম যদি মন্বাদি মহর্ষি প্রতিপাদন করিতেন, তাহা হইলে তাহা কখনই ধর্ম্ম বলিয়া শিষ্ট-সমাজে অঙ্গীকৃত হইত না, এই প্রকার মীমাংসকগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, তোমার আমার ন্যায় সাধারণ পুরুষ অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ নহে—ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বুদ্ধদেব ত তোমার আমার ন্যায় সাধারণ পুরুষ ছিলেন না, তিনি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, সর্ব্বজ্ঞতাই তাঁহার এই অসাধারণ পুরুষত্বের হেতু, সেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকল বস্তুই যখন জানিতেন,তখন কি ধর্ম্ম ও কি অধর্ম্ম, তাহাও তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি যাহা নিজে সর্ব্বজ্ঞতার প্রভাবে বুঝিয়া ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে ধর্ম্মই হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই—এইরূপ বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিবার জন্যই কুমারিল ভট্ট বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন—যে সকল যুক্তির সাহায্যে তিনি বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন, মন্বাদি মহর্ষির সর্ব্বজ্ঞতাও তাহার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই খণ্ডিত হইয়াছে। যে সকল যুক্তি দ্বারা বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে খণ্ডিত হইয়াছে—প্রতিবাদকর্ত্তা যদি সেই সকল যুক্তির অসারতা বা দুষ্টতা বিচারের দ্বারা ব্যবস্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে বুদ্ধেরও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইয়া যায়, আর যদি সেই সকল যুক্তিকে তিনি অখণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মনু প্রভৃতিরও সর্ব্বজ্ঞতা তাহা দ্বারাই খণ্ডিত হইবে—জিদের বশে একটি অদ্ভুত আজগুবি মত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি এই "উভয়তঃ পাশা"-রজ্জু নিজের গলদেশে লাগাইয়া ঝুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের কি উপায়, তাহা তিনি পারেন ত, আবিষ্কার করুন।

তিনি যে জিদের বশে মনু প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কথাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে; কারণ, তাঁহার তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি নিজের মুখেই বলিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্ববেদজ্ঞতা মন্বাদির ছিল না, কুমারিলের এই মত যদি কেহ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেও জ্ঞানপূর্ব্বকই আমি তাহা মানিব না; কারণ, ঋষি অপেক্ষা কুমারিলের কথা অধিক মান্য নহে, ঋষিবাক্য যেখানে কুমারিলের প্রতিকূলে, সেইখানে ঋষিবাক্যই মানিব, কুমারিলের বাক্য মানিব না।" ইহা জিদ ছাড়া আর কি হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই অবধারণ করুন। কুমারিলের এই মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বজ্ঞতাখণ্ডন কোন্ ঋষিবাক্যের বিরোধ করিতেছে, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। কুমারিল ভট্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই

সর্ব্বশিষ্টসম্মত। কুমারিল নিজেই বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা স্থির। ইহাতেও যদি তিনি ঈশ্বরব্যতিরিক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে, ইহা রক্ষা করিবার জন্য কুমারিল ভট্টকেও মানিব না বলিয়া আস্ফালন করিতে বিরত না হয়েন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার জিদ্‌ ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

মীমাংসাশাস্ত্র না পড়িয়া, মীমাংসকের কি সিদ্ধান্ত, তাহা না বুঝিয়া, প্রতিবাদকর্ত্তা আমার প্রতি যে দোষাভাসের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার উদ্ভট বিচারকুশলতার সুন্দর পরিচয় দিতেছে, কিন্তু পাঠকের তাহা বিশেষ উপভোগ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের' তৃতীয় সংখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"মীমাংসক মতের অনুবর্ত্তী 'সমস্যা'র রচয়িতার উক্তিতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাও যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; কারণ, মীমাংসক মতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে।" প্রতিবাদকর্ত্তা না জানিতে পারেন, কিন্তু মীমাংসক মতে ঈশ্বর—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যে স্বীকৃত, তাহা মীমাংসাগ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রতিপাদিত হয়। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ "মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ" গ্রন্থেও লিখিত হইয়াছে,—

"ন হি বেদঃ পুরুষনির্ম্মিতঃ।

'বেদস্যাধ্যয়নং সর্ব্বং গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকম্।
বেদাধ্যয়নসামান্যাদধুনাধ্যয়নং যথা॥'

ইত্যাদিনা বেদাপৌরুষেয়ত্বস্য সাধিতত্বাৎ। যঃ কল্পঃ সকল্পপূর্ব্বঃ। ইতি ন্যায়েন সংসারস্যানাদিত্বাৎ ঈশ্বরস্য চ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরো গতকল্পীয়ং বেদমস্মিন্ কল্পে স্মৃত্বা উপদিশতীত্যেতাবতৈব উপপত্তৌ প্রমাণান্তরেণার্থমুপলভ্য রচিতত্বকল্পনানুপপত্তেশ্চ।"

এই উদ্ধৃত অংশে ঈশ্বর ও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা মীমাংসকপ্রবর আপদেব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন; বহু মীমাংসাগ্রন্থেও এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্টেরও ইহা সম্মত। এখানে বিস্তৃতিভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইতেছে না, আবশ্যক বোধ হইলে তাহাও যথাসময়ে উদ্ধৃত করা যাইবে। স্বায়ম্ভুব মনুর মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব নাই, সুতরাং বর্ত্তমান মনুসংহিতার কর্ত্তা মনু মন্ত্রদৃক্ ঋষি নহেন, ইহাই আমি শাস্ত্রসমস্যায় দেখাইয়াছি। তিনি এই মতের খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপ্‌সব মনু নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই আপ্‌সব মনুই যে স্বায়ম্ভুব মনু, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য বহু বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। সেই সকল বাক্যের অসারতাও আগামীবারে দেখাইব, পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আপাততঃ এইখানেই বিরত হইতেছি, ইহার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যার স্বকপোলকল্পিত যুক্তিনিবহের অসারত্ব ও অশাস্ত্রীয়ত্ব বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

তারেই ভালবাসি

তারেই ভালবাসি—আমি
　　তারেই বাসি ভালো—
আঁধার-ভরা অন্তরে মোর
　　জ্বালায় পুলক আলো।

নিদ্রাবিহীন নীরব রাতে,
এ মোর স্মৃতির একতারাতে,
অশ্রু-ঝরা করুণ সুরে—
　　সান্ত্বনা সে গাহে;

স্বপন-ভরা ভোরের বেলায়,
শিশির-ঝরা ফুলের মেলায়,
অরুণ আলোর করুণ চোখে—
　　নয়নে মোর চাহে;

কূলহারা মোর নিরাশ গাঙ্গে,
সেই ত ভয়ের বাঁধন ভাঙ্গে,
হাল ধ'রে সে জমায় পাড়ি—
　　উঠলো রে ঢেউ কালো।

তাই ত তারে প্রাণে প্রাণে,
জাগাই আমার গানে গানে,
হৃদয় দিয়ে জানাই চুপে—
　　তারেই বাসি ভালো!

শ্রী অমূল্যকুমার রায়-চৌধুরী (বি. এ)।

অভিভাষণ *

মেদিনীপুর নামটি বাল্যবয়স হইতে-ই আমার শ্রবণপথে সঙ্গীতের ধ্বনি ঢালিয়া দেয়। পৃথিবীর ডাকনাম ছাড়া আর যতগুলি নাম আছে, তার মধ্যে মেদিনী নামটি আমার বড় মিষ্ট লাগে। এই বঙ্গদেশের অনেক বিভাগ, অনেক নগর, অনেক গ্রাম-ই নামকরণের ইঙ্গিতে নিজ-নিজ প্রাচীন গৌরবের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। বঙ্গভূমে মাটীর আদর চিরকাল, মাটী আমাদের সত্য সত্য-ই স্নেহময়ী স্তনদাত্রী, পালয়িত্রী। 'মা'-টি আমাদের অন্ন দেয়; মাটী দিয়ে আমরা ঘর গড়ি, মাটী গোড়ে দেয় আমাদের ভাতের হাঁড়ি, মাটী আমাদের সাবান;—চুলের ময়লা ধুইয়া মূল শক্ত করিতে, গাত্র পরিষ্কার করিতে, উচ্ছিষ্ট তৈজসের দুর্গন্ধ দূর করিতে মাটীর ন্যায় অনায়াসলভ্য পবিত্র দ্রব্য আর কিছু-ই নাই; মৃত্তিকা পবিত্র বলিয়া-ই মৃন্ময়ী প্রতিমা রচনা করিয়া আমরা পূজা করি। বোধ হয়, বহুগুণময়ী মৃত্তিকার গৌরবে মুগ্ধ হইয়া-ই আপনাদের এই দেশের কোনো প্রাচীনতম পুরুষ সগর্ব্বে এই স্থানকে মেদিনীপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

এক দিন এই মেদিনীপুর আমাদিগের কলিকাতাবাসীর কাছে কত দূরে-ই না ছিল। মেদিনীপুরের সৌন্দর্য্য আমার বাল্য-দৃষ্টিতে প্রথম পৌঁছাইয়া দিয়াছিল আপনাদের চারু কারু-কার্য্যের গ্রামজ ঐশ্বর্য্য সূক্ষ্ম সুচিত্র মাদুর; মেদিনীপুরের সুরভি কলিকাতায় প্রথম বহন করিয়া লইয়া যায় চন্দ্রকোণার অমৃতোপম ঘৃত; সেকালের গৃহিণীদের কাছে পূজাহ্নিকের জন্য মেদিনীপুরের তসরের শাটী বড় আদৃত ছিল; কার্পাস-বসনের দায়ে-ও মেদিনীপুরের তন্তুবায়গণ স্বল্প সহায়তা করিতেন না।

কার্য্যের আদেশে বা আত্মীয়তার আহ্বানে বঙ্গের অনেক জেলাতে-ই আমি গিয়াছি, কিন্তু নিজ মেদিনীপুর সহরে অতিথি হইবার সৌভাগ্য-সুযোগ ইতিপূর্ব্বে এ দীনের অদৃষ্টে ঘটে নাই। ঝাঁকি-দর্শনে উলুবেড়ে চিনিয়াছি, গেঁয়োখালিতে রাঁধিয়া খাইয়াছি, কাঁথিতে এক রাত্রি বাস করিয়াছি, আর অবশেষে আজ প্রায় দশ বৎসর গিদ্নীতে কিঞ্চিৎ ভূমির আশ্রয় লাভ করিয়া আপনাকে মেদিনীপুরের অধিবাসী বলিয়া-গণ্য করিবার অধিকার-ও পাইয়াছি; কিন্তু আমার সহরে এই আগমন আপনাদের-ই সৌজন্যে। বয়সশেষে এ প্রাচীনের আজীবনের সাধ যাঁহারা মিটাইলেন, সস্নেহ-সম্ভ্রমে আমি তাঁহাদের অভিবাদন করি।

সংস্কৃত "সাহিত্য" শব্দের মৌলিক অর্থ হইতে-ই বুঝা যায় যে, বাক্য অক্ষরের অবয়বে অঙ্কিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে-ই এ দেশে পরস্পরের সাহচর্য্যে জ্ঞানের চর্চ্চা হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইংরাজী 'লিটারেচার' কথাটি 'লেটার' বা অক্ষর হইতে-ই উৎপন্ন; কিন্তু আমরা অক্ষর প্রচলনের পরে-ও সেই সম্মিলন-অর্থবোধক প্রাচীন সাহিত্য কথাটি এ কাল পর্য্যন্ত ব্যবহারে বজায় রাখিয়াছি এবং সাহিত্যের সঙ্গে সম অর্থবোধক 'সম্মিলন' কথাটি জুড়িয়া না দিলে পাঁচ জনে যে একত্র জড়ো হইতে হইবে, এ কথা মনে আসে না। যাহা হউক, মানুষের মনে এই 'মিলন' কথাটি এত মধুরতার সঞ্চার করে যে, একবারের জায়গায় দশবার বলিলে-ও উহা বে-মানান্ শুনায় না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার চক্ষুর উপর বিকসিত আজিকার এই চাঁদের হাট প্রকটিত করিতেছে।

ভক্ত-জন-জননী পণ্ডিত-প্রসবিনী মাতর্বঙ্গভূমি! জ্ঞান-ধ্যানপরায়ণ কাব্যানন্দের লীলাক্ষেত্র বলিয়া তুমি চির-প্রসিদ্ধ। প্রেম-ভক্তির প্রেরণাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটি-ই কবি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এত নিরক্ষর নরনারী-কবি, মুখে মুখে পদ-রচনা-ক্ষম কবি অন্য কোন-ও দেশে জন্মিয়াছে কি না জানি না। ইংরাজীতে সাধারণ প্রয়োগে 'ডক্টর' অর্থে 'চিকিৎসক' বুঝাইলে-ও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে-ই ঐ 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ দেশে-ও এক সময় কবি শব্দের ঐরূপ ব্যবহার ছিল এবং সেই জন্য-ই দেহধারীর বিশেষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে এখন পর্য্যন্ত 'কবিরাজ' বলা হয়।

নানা দেশে কথিত বা লিখিত রচনার শৈশব সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে-ই দেখা যায় যে, সকলে-ই মনের উচ্ছ্বাস ছন্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। রস সহজে-ই তরল; তালে তালে টপ-টপ্ করিয়া পড়ে; লহরে লহরে ঝরিয়া বাহির হয়; গলিয়া গলিয়া মাটী ফাটাইয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে ফুলিয়া মহানের সঙ্গে মিশিতে ধায়। এই জন্য-ই ভাবে

* মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

উচ্ছ্বাসে যিনি যখন যাহা রচনা করেন, তাহা চোদ্দবাদ গদ্য হইলে-ও মধ্যে মধ্যে পদ্যের ঢেউ তোলে। প্রাণ থাকিলে-ই পদ্য থাকিবে। যখন আমরা বড় বিনয়ে, শিষ্ট, শান্ত, সুবোধের মত কোন-ও "পরমপূজনীয়কে" লিখি, "সেবকশ্রী অমুকচন্দ্র, অমুকপত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে, পরে মহাশয়ের কোন-ও সংবাদ বহুদিন না পাইয়া নিতান্ত চিন্তিত আছি, ইত্যাদি;" তখন যেন পরিষ্কার বুঝাইয়া দিই যে, আমি কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তিত নই, কেবল একটা প্রয়োজন সাধনের ভূমিকায় খানিকটা গদ্‌গদে গদ্যের তাগাড়্‌ মাখিয়া ঢালিয়া দিতেছি। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন লোক-সমাজে কমনীয় কথা প্রচারের অবলম্বন ছিল একমাত্র শ্রুতি ও স্মৃতি। যুক্তান্ত পদাবলী স্মৃতির কক্ষে রক্ষা করা গদ্য অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সহজ; পদ-রচনা মুক্তান্ত হইলে-ও শব্দ ও অক্ষরের মধ্যে যে মিত্রতার মাধুর্য্য থাকে, তাহা-ই তাহাকে সহজে স্মৃতি-গ্রাহ্য করিয়া তোলে। ইহার উপর আবার পদাবলীর ছন্দ তালসংযোগে গ্রথিত হওয়ায় উহা সুরের সহায়ে গীতে অভিব্যক্ত হইবার উপযোগী। ছন্দের আনন্দের মধ্যে এমন একটা শান্তির সান্ত্বনা আছে যে, শিশুর নয়নে সুষুপ্তির সঞ্চারের জন্য বাঙ্গালীর "ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসীর" মত ইংরাজের-ও লালেবাই এবং অপর অপর জাতির অইরূপ গীতি ছন্দের ব্যবহার চিরদিন প্রচলিত।

বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে অই-রূপে পদ্যে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, বাঙ্গালী! তোমার জাতীয় আহার্য্য কি? তবে আমরা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিব, "ভাত, ডাল, মাছের ঝোল।" সেইরূপ জাতীয় সাহিত্য কি, এ প্রশ্নের সহজে উত্তর আসিবে, রামায়ণ ও মহাভারত; কৃত্তি-বাস ও কাশীদাস। আহার্য্যের পর্য্যায়ে ক্রমে যেমন ভাজা-ভুজি, ডাল্‌না-চচ্চড়ি হইতে পলান্ন, পরমান্ন পর্য্যন্ত তাহার ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে; জাতীয় পরিধেয় ধুতি উত্তরীয় ও শাটীর পারিপাট্য গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে; বিবিধ অঙ্গাবরণ ও অলঙ্কার-আভরণ সেইরূপ উক্ত দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা চির-জীবনের জন্য আমাদের জাতীয় ভাবপুষ্টি ও লজ্জা নিবারণের উপায় হইবার পর অন্ততঃ এই পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে আমাদের ভাষা-ভগবতী তিক্ত-কষায়-লবণাম্ল মধুররসের সঞ্চারে বারে বারে মুখ বদ্‌লাইয়া, সেই শঙ্খ, সিন্দুর, কঙ্কণ হইতে সুরু করিয়া বাজু বাউটির পৈঠাপারে এক্ষণে নেকলেস ব্রেস্‌লেটের গেটের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দেবগৃহ, রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, স্তরে স্তরে আপনার আদরণীয় স্থান অধিকার করণানন্তর যে বস্তু কৃষকের কুটীরের মধ্যে-ও প্রিয় এবং সহজ ব্যবহার্য্য হইতে পারে, তাহা-ই যথার্থ জাতীয় নামে গণিত হইবার যোগ্য। এই কারণে-ই কৃত্তি-বাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ দুইখানিকে আমি জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। মুকুন্দ-রামের চণ্ডী-ও অই গণ্ডীর মধ্যে; এক হিসাবে অই পুঁথিখানি আমাদের আরো নিকটতর আত্মীয়, কেন না, শ্রীমন্তের কাহিনী একেবারে খাঁটী বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য ও কর্ম্মজীবনের বর্ণনায় পরিপূর্ণ; নিজ বাঙ্গালার অংশ-বিশেষের প্রাচীন ভৌগোলিক চিত্র আর কোনো সেকেলে গ্রন্থ এমন বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে কি না জানি না। কেতকাদাসের মনসার ভাসান-ও উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত, উহাতে গ্রাম্য চিত্রের রম্য প্রফুল্লতা ধান্যের ন্যায় সমাজের অতি নিম্ন ভূমিতেই স্বর্ণের শোভনীয় ঝলক তুলিয়াছে।

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রাণের ভাবের সঙ্গে যদি একেবারে না জড়াইয়া যাইত, তাহা হইলে পাঠকের পঠনে, কথকের কথনে, গায়েনের গানে, প্রবাদের বচনে, যাত্রার পালায়, নাট্য-শালার মঞ্চে, এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চির নূতন শক্তিতে এই গ্রন্থগুলি কখন-ই জীবিত থাকিত না। এই রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম্মমঙ্গল আদি গ্রন্থ এতটা বাঙ্গালী জাতায় যে, বাঙ্গালার অন্নের ন্যায় ইহারা জাতিবিচার না করিয়া বঙ্গবাসী কোটি কোটি নর-নারী হিন্দু-মুসলমান সকলকে-ই শত শত বর্ষ তৃপ্তি ও দীপ্তি দিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর বিষয় এখনো উল্লেখ করি নাই; কারণ, ভক্তিকে প্রেমের পবিত্র মধুররসে সিক্ত করিয়া চণ্ডীদাসাদি মহাজনগণের পদাবলী জগতের কাব্যকাননে উহা এক অনুপ-মেয় অপূর্ব্ব অমৃতফলপ্রদ কল্পতরু সৃষ্টি করিয়াছে। প্রেম-রসের বিচিত্রতার মধ্যে 'মানের' অবতারণা পৃথিবীর আর কোন কাব্যেই দৃষ্ট হয় নাই; যশোমতীর ন্যায় মাতৃস্নেহের করুণ-মধুর ভাব আর কোন্‌ কাব্যে প্রস্ফুটিত? ইংরাজীতে-ও প্যাষ্টোরাল পাঠ করিয়াছি, কিন্তু গোষ্ঠের এমন মিষ্টতা কোথা-ও ত পাই নাই। আর এই বহুল পদাবলী জীবিত, জাগ্রত ও বাঙ্গালার নর-নারীর মর্ম্মগত করিয়া রাখিয়াছে সংকীর্ত্তন।

হে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব! তোমার ন্যায় সমদর্শী পণ্ডিত,

তোমার তুল্য উদার সমাজসংস্কারক, তোমার তুল্য প্রেমময় প্রচারক, তোমার সমান কবিস্রষ্টা কবে কোন্ যুগে কোন্ দেশে আর ঐশপ্রভায় আবির্ভূত হইয়াছেন!

বড় দুঃখেই মধু দত্ত গাহিয়াছিলেন :—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ।"

য়ুরোপীয় প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সাহিত্য-জ্ঞানে পণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ্ য়ুরোপীয় ধর্ম্মগ্রহণকারী, বেশে ও নামে য়ুরোপীয়ের অভিমান, বঙ্গের কবিপ্রধান সেই মাইকেল-ই যখন বিলাতী শিক্ষার আগ-জোয়ারির অবসানে আপনার ঘরের পানে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাঙ্গালা কত মধু-ভরা, তখন নিশ্চয় আশা আছে যে, আমাদের এখনকার বারমুখো ছেলেরা আবার ত্বরায় ঘরমুখো হবে। বৃটিশ-বঙ্গে এই মাইকেল-ই বাঙ্গালার কবিতাকে নূতন পয়ারের ঝাঁকে জম্‌কাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি ও এই প্রাচীন পঞ্জরমধ্যে শ্বাস-রোধের আশঙ্কায় বঙ্গের প্রাচীন, মধ্য ও বর্ত্তমানকালের কবি-গণের সর্ব্বজনবিদিত নামের তালিকা দিয়া আর আপনাদিগকে বিরক্ত করিব না।

বর্ত্তমান গদ্য যে বৃটিশ-বঙ্গে নূতন সৃষ্টি, এ কথা স্বীকার করিতে-ই হইবে। গ্রাম্য গামছা ছাড়াইয়া ভাষাকে নিমন্ত্রণ-রক্ষার পরিচ্ছদে সজ্জিত করণের গৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, এবং মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত—এই তিন স্বনামধন্য পুরুষের-ই প্রথম প্রাপ্য বলিলে বোধ হয় অনেকে-ই প্রতিবাদ করিবেন না। ইঁহারা যে কেবল অলঙ্কারের জমকে-ই ভাষাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, ভাষার অবয়ব এবং ভাবের মধ্যে-ও একটা তেজের দীপ্তি প্রথম ফুটাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু অবসরবিনোদনের পিপাসায় জনসাধারণ সেই অলঙ্কৃতা সুন্দরীর সমক্ষে যাইতে শঙ্কিত হইবে মনে করিয়া অই সময় মহোদয় কালীপ্রসন্ন সিংহ ও উদার-হৃদয় প্যারীচাঁদ মিত্র কথনীয় ভাষায় কাহিনী লিখিয়া প্রচার করেন। "হুতুম" ও "আলালের ঘরের দুলাল" এই সত্তর বৎসরাধিক কাল বঙ্গের ঘরে ঘরে আদর-মাখা কোলের দুলাল হইয়া বিরাজ করিলে-ও যে বাঙ্গালী "গলায় গজমতি মুক্তার হার, দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার" বলিয়া বাণীর বন্দনা করে, সে মায়ের পরণে লালপেড়ে শাড়ী ও হাতে গালার রুলী দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

১২৬০ সালের পর হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-স্রোতস্বতী ভাদ্রের ভরা জোয়ারে ফুলিতে ফুলিতে ক্রমে এমন একটা প্রবল বন্যা বহাইয়া দিয়া গিয়াছে যে, দেশের বিস্তীর্ণ সাহিত্য-ক্ষেত্র সেই সলিলসঞ্চারে আবর্জ্জনাকে-ও সারে পরিণত করিয়া নানা শস্য-পুষ্প-ফলপ্রদ নব উর্ব্বরতা লাভে গৌরবান্বিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ তাহার একমাত্র ললিত-কাব্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' ছন্দ-হিল্লোল ও ভাব-গন্ধে আনন্দভোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশিত হইয়া সখের জল-পান পরিবেষণে পুরাতন পর্ব্বাধ্যায় শেষ করিয়া, গুটি চার পাঁচ ভবিষ্যৎ সাহিত্যবীরের হস্তে নিজের খাঁকের লেখনীটি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া ব্যবহার করিবার জন্য দিয়া গেলেন। উক্ত পূর্ব্ব পর্ব্বে আমাদিগের চির-গর্ব্বের ধন ভক্ত রাম-প্রসাদাদির সঙ্গীত ও নিধুবাবুর প্রাণস্পর্শী গান জাতির আভিজাত্য ঘোষণা করিতেছে।

যে পঞ্চপুরুষের পবিত্র নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা নূতন অধ্যায়ের শুভ-সূচনা করিয়া দিবার পর দেখিতে দেখিতে বঙ্গের সাহিত্যাকাশ নক্ষত্রদলের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাল্যে রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়" প্রথমে দেখাইয়া দিল যে, আমাদের পায়ে শিকল; কৈশোরে মাইকেলের 'মেঘনাদের' মধ্যে ভাষা-সুন্দরীকে কেশরিবাহিনী শক্তি-স্বরূপিণীভাবে দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইলাম; যৌবনাগমে হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" প্রাণের আবেগে কণ্ঠস্থ করিয়া প্রথম দীর্ঘ নিশ্বাসের বিলাস-সুখ অনুভব করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই ক্ষুব্ধ দেশ-প্রেমিকের জ্বলন্ত করুণোচ্ছ্বাস বুক ফাটাইয়া দিয়া কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া বলিল :—

"বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এখন নূতন জিমন্যাষ্টিক্‌-দক্ষ হাতখানা যেন বাম কটিপার্শ্বে এক একটা বিলম্বিত বস্তুর অভাব সক্ষোভে অনুভব করিল। অনতিবিলম্বেই সুহৃদ্‌বর নবীন "আবার আবার সেই কামান-গর্জ্জন" করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

সে গেছে এক কবিতার যুগ; কাব্যাবতার রবীন্দ্রনাথের বাল্য-ব্রজ-বনলীলা আরম্ভ সেই যুগে-ই। বঙ্গের সৌভাগ্য যে, আজো তিনি বিরাজিত, কভু বংশীধারিরূপে বোলপুরে, কভু বা চক্রকরে দ্বারকায় ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনায়।

কিন্তু সে যুগের পূর্ণাবতার হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন, আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র। গদ্যের মধ্যে পদ্যের মাধুরী ঢালিয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র-ই দেখাইয়া গিয়াছেন যে,মাখমের দলার সঙ্গে মিছরিখণ্ড কত উপাদেয়— কত মুখপ্রিয়। তাঁহার লেখনী বুঝাইয়া দিল যে, "একদা এক" না লিখিয়াও কাহিনীকে মন্দ-প্রবাহিণী করা যায়।

এক্ষণে বঙ্গের সাহিত্য-গগন সহস্র নক্ষত্র-ঝলকে উজ্জ্বল; বিবিধ রত্নসঞ্চয়ে ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য এখন দশদিক্‌ হইতে দশ জনকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইবার উপযুক্ত। দেশের সাহিত্যের পত্রেই জাতির পরিচয় লিখিত থাকে। যখন ইংরাজের হিসাবের খাতা আমাদের চক্ষুতে পড়ে নাই, মাত্র সাহিত্যের উক্তিতে ইংরাজ-চরিত্র আমাদের সমক্ষে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তখনই আমরা তাঁহার নিকট সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়াছিলাম; যে য়ুরোপীয়গণ প্রথম ভারত-প্রবেশে হিন্দুগণকে 'জেন্টু' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা-ই আবার পরে সংস্কৃত গ্রন্থের পত্রাবলীর মধ্যে আমাদের প্রাচীন জ্ঞানচর্চ্চার পরিচয় পাইয়া আর্য্যগণকে সভ্যতার শিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

জাতির চিন্তা, তাহার মনোভাব, চরিত্রের শক্তি বা দৌর্ব্বল্য মুখরিত হয় তাহার সাহিত্যের কথায়। লোকে কথা শুনিলে কে ভদ্র কে ইতর বুঝিতে পারে; "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" পোষাকে যেমন মানুষ ঠিক চেনা যায় না, মলাটে-ও তেমনই গ্রন্থগত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান বাজারে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় পুস্তকের আবির্ভাব হইতেছে, অনেকে-ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন; সম্ভবতঃ এই ঘটনাটি অবাধ বাণিজ্যের ফল। পণ্যের ন্যায় ভাবের আদান-প্রদানে-ও জাতির মঙ্গল সাধিত হয়, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু আত্মহারা আমরা যেমন এতদিন পরে কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি যে, যে অর্থনীতির শাসনে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের পণ্যের আদান-প্রদান চলিতেছে, তাহাতে আমাদের দোকানপাট ক্রমে দেউলিয়ার দুয়ারের দিকে-ই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, সেইরূপ বোধ হয়, অল্পকাল পরে-ই বুঝিতে পারিব যে, ভাবের আমদানীতে-ও আমরা ঠিক মাল চিনিয়া সওদার আদেশ দিতেছি না। যে রেলের বল বোম্বাইয়ের চাদর আমাদের বিছানায় পাতিয়া দিতেছে, আল্‌ফ্যান্সো আম্রের মধুরতায় রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছে, কুষ্টিয়া হইতে মোহিনী মিলের শাটী গুজরাটের বাজারে পৌঁছিয়া দিতেছে, সেই রেল-ই আবার এক দিন বোম্বাইয়ের প্লেগের বীজ ঝটিতি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গ-বিহারে ছড়াইয়া দিয়াছিল। যে য়ুরোপে স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক উপাদান প্রস্তুত হয়, সেই য়ুরোপ-ই আবার কত কুৎসিত ব্যাধি দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া দেয়।

ব্যাধির ন্যায় ভাবের-ও সংক্রামকতা দোষ আছে। যে রুসিয়ার টলষ্টয় মানবচরিত্রের পুষ্টিসাধন করে, সেই রুসিয়াতে-ই আবার জন্ম নিয়েছেন কুপরিণ; গোড়ায় 'কু' শেষে 'ঋণ'।

শিক্ষা অবশ্য শিশুর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে-ও পাওয়া যায়; কিন্তু নব-রুসিয়া যে এখন-ও আঁতুড়ে ছেলে, অনেক গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রসূতিকে বেদনায় কাতর করিয়া সবেমাত্র সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; এখন-ও খাদ্যে ও মলমূত্রে তাহার ভেদজ্ঞান জন্মে নাই; প্রসবকাতরা জননী তার এখনো অর্দ্ধ-মূর্চ্ছাপন্না, সদ্যোজাত শিশুকে ধুইয়া মুছিয়া দিতে পারেন নাই; তার উপর আঁতুড়ে ছেলেকে মাঝে মাঝে পেঁচোয় পায়। এ হেন রুসিয়ার সকল রস-ই যে সুপেয়, এ কথা যাঁরা আমাদের যুবকদিগকে শিখাইয়াছেন, তাঁরা নিশ্চয়-ই আজো জনকের উপাধি লাভ করেন নাই। নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ একুশ দিন পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য। আর ফ্রান্স ত ভোগলালসা-তৃপ্তির লীলাক্ষেত্র, বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের চারি সহস্র বৎসরের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে সাহিত্য-উপবনে মদনের এমন দৌরাত্ম্য বারে বারে দেখা দিয়াছে; সে দিন-ও বটতলার মলয়ে ধাপার দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছিল; আবার অই পুরীষ পচিয়া-ই যে সার প্রস্তুত হইল, তাহার-ই জমীর উপর বর্ত্তমান বঙ্গের কাব্য-গরিমা নব ভব্যতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল!

উপসংহারে জিজ্ঞাস্য, এই দীর্ঘ অভিভাষণে আপনাদের সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় প্রাণের যতটুকু সংহারসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কি ধৃষ্টতা?

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

অতীতের স্বপ্ন

ডকের কায।—বর্ষা নাই, শীত নাই, খাতা হাতে দাঁড়া-ইয়া দাঁড়াইয়া 'টালি' করি। রাতে এবং দিনেও।

দেশের শস্য-সম্পত্তিতে 'হোল্ড'গুলা ভরিয়া লইতে দেশান্তরের জাহাজের দল সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙ্গাইয়া আসে এবং চলিয়া যায়। মাল চালানের হিসাব রাখি আমরা।

ঠিকা গাড়ীর অবস্থা।—বড় বাবু কাযে জুড়িয়া দিলে, বার ঘণ্টা খাটুনির পর দেড় টাকা মিলে। সকল দিন কায জুটে না। বড় বাবু বলেন, "সে হয় না মুখুয্যে, পক্ষপাত আমার ধর্ম্ম নয়।"

বলেন ঐ পর্য্যন্ত। সকলের প্রতি ব্যবস্থা সমান নহে। উমেদার আমরা জন পনেরো। প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী বয়সে এবং খাতিরে সকলের অগ্রবর্ত্তী। বড় বাবুকে প্রত্যহ চা তৈয়ারী করিয়া দিবার ভার তাঁহার উপর। আর কেহ সে কাযে অগ্রসর হইলে চক্রবর্ত্তী বলেন, "উঁহু, এ দিকে নয়। ইটি আমার নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির বিশেষ ক্রিয়া!" এইরূপে যোলটা বৎসর টিকিয়া আছি।

রতিনাথ বটব্যাল দ্বিতীয় পক্ষের গঙ্গাপ্রাপ্তির পরই টালি-বহি হাতে করিয়াছেন। বুড়া মানুষ- বাতও আছে। রাতের হাওয়া সহ্য হয় না, দিনের ডিউটি তাঁহার প্রত্যহ চাই। নতুবা আফিম ও দুধের খরচ উঠে না। কাযেই রতিনাথের প্রত্যহ দুই শ্লাইস মাখন-রুটী কাগজে মুড়িয়া না আনিলে চলেই না।—চায়ের সঙ্গে রুটীটার প্রতি বড় বাবুর একটু পক্ষ-পাত আছে। রামচরণ ও বামাপদ পাণ-দোক্তার ইজারাদার।

ইহাদের কাযের অভাবও হয় না। পক্ষপাতও নাই।

আমার ও ফকীরের অবস্থাটা একটু সঙ্কটাপন্ন। ভগবান্ আমাদের যেন এক ধাতু দিয়া গড়িয়াছেন। লোকটার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই যে কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে, সে-ও এক আশ্চর্য্যের বিষয়।

ফকীর কথা কহে কম। কায পাইলে মুখে হাসির আভাস যেমন ফোটে না, না জুটিলে দুঃখও করে না।

তাহার ভিতরের কথা জানা ছিল না, তবু মনে হইত, বিপুল বৈরাগ্যে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। টালা হইতে হাঁটিয়া লোকটা পাঁচটার মধ্যে ডকে আসিয়া হাজির হয় এবং দেখিলে মনে হয় না যে, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। অথচ, ডকে আসার সেই প্রথম রাতেই লোকটি আমায় আপনার করিয়া লইয়াছিল।

রাত্রিতেই ডিউটি পড়িয়াছিল। চেনা নাই, শুনা নাই, প্রায় সারারাত্রি লোকটি আমার পাশে, এক সময়ে সে আসিয়া বলিল, "এই অল্প বয়সেই এ লাইনে ঢুকলে।—আচ্ছা, যাও, এখন ঘুমিয়ে নাও গে। একটা বস্তা কিম্বা পাটের 'লটের' উপর চ'ড়ে শুয়ে পড় গে। আমি তোমার কায দেখছি।"

"আর আপনি?"

"আমার জন্যে ভাবনা নেই। সে হয়ে যাবে।"

"কি রকম?"

"জেগে জেগে,—আবার কি রকম।"

সেই দিন হইতেই আমরা যেন এক হইয়া গেলাম।

ফকীর বলিত, "সামান্য চব্বিশ গণ্ডার জন্যে ওরা নিজের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত জবাই করতে পারে। আমি ভাই—"

আমিও—বলিয়াছিলাম।

এইখানেই আমরা ছিলাম অভিন্ন। চক্রবর্ত্তী-বটব্যালের প্রাণান্তকর চাটুবৃত্তি দেখিয়া হাসিও পাইত, কান্নাও আসিত।

উপর্য্যুপরি এক সপ্তাহ বড় বাবু আমায় 'বুক' করেন নাই, ফকীরকে মাত্র দুই দিন। সপ্তাহের শেষে পেমেণ্ট লইয়া ফকীর আমার কাছে আসিল। কহিল, "তুই পেমেণ্ট নিবি না, মুখুয্যে?"

"না। ফেরৎ দিলাম।"

"বটে।—কাম ছিল না বুঝি? আচ্ছা, এক দিন আমার ওখানে খাস।"

"সেই টালায়?"

"আচ্ছা, অতদূর যেতে কষ্ট হয়, এই টাকা পয়সা কটা রাখ।—চলবে না এতে?"

"আর তুমি?"

"সে হয়ে যাবে।"

এই 'হয়ে যাবের' উপর সে দিন আস্থাস্থাপন করি নাই। কিন্তু এই অদ্ভুত মানুষটা মনে মনে যে কত বড় বৈরাগী, তাহার পরিচয় সে দিন, বোধ করি, লুকানো থাকে নাই।

চক্রবর্ত্তী ফকীরকে দেখিলেই এক চোখ টিপিয়া হাসিতেন। বটব্যাল বলিতেন, "খবর কি ওয়ারিয়ার? আবার কবে যুদ্ধ বাধছে?"

ফকীর কথা কহিত না। আমার বিস্ময় লাগিত।

এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওরা আপনাকে ওয়ারিয়ার ব'লে ঠাট্টা করে কেন?"

ফকীর বলিল, "যুদ্ধে গিয়েছিলাম, তাই। বাঙ্গালীর পক্ষে যুদ্ধটা একটা মর্ম্মান্তিক ঠাট্টা কি না!"

এইটুকুই জানা ছিল।

তার পর, হঠাৎ এক দিন তাহার গোপন বেদনার কাহিনীটি জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলাম।

সে দিন রাত্রির ডিউটিতে দুই জনেই 'বুক' হইয়াছি। শীতকাল; জলে স্থলে কুয়াসায় সর্ব্বত্র ঢাকিয়া গিয়াছে। জাহাজের উপর—ওভার সাইডে কাম, র‍্যাপার এবং কম্ফর্টার মুড়িয়া কোনমতে টেঁকসই হইয়া কাষে লাগিয়াছি।

রাত্রি দুইটার মুখে 'বোট' কাবার হইয়া গেল। ছুটী, ফকীরকে বলিলাম, "এই রাতে বাড়ী যাবে নাকি, ফকীর দা?"

ফকীর কহিল, "না। আজ সকাল থেকেই শরীরটা আছে খারাপ হয়ে। পারছি না। একটা কোণ দেখে শুয়ে পড়ি গে চ।"

"তাই চল। কিন্তু তোমারও শরীর খারাপ হয়, ফকীর দা?"

"হবে না? কি বলিস তুই! বলি! যতই যা-ই করি, মানুষ ত'।"

ফকীর চুপ করিল না। অনেকটা নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "বাইরেটা দেখেই মানুষকে বোঝা যায় না, মুখুয্যে,—আমাকেও না। এই যে ডকের ধূলো-কালির মধ্যে নিতান্ত মূল্যহীন দিনগুলো কাটিয়ে চলেছি—এইটুকুই আমার সব নয়। এইখানে বসেই আমি কোনও দূরান্তের স্বপ্ন দেখি, কাষ ভুলে যাই, কাঁদি—।"

ফকীরদাও যে কোন দিন কোনও কারণে এমনই মুখরিত হইয়া উঠিতে পারে সে ধারণা আমার কোনও দিনই ছিল না। চুপ করিয়া রহিলাম।

ফকীর কহিল, "আজ আর ভিতরে নয়। এই বাইরে বসেই তোকে একটা গল্প বলি, শোন।"

"কিসের গল্প?"

"এই আমারই। শুনবি?"

ফকীরদার কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আমার ছিল না। বলিলাম, 'বলো।"

ফকীরদা বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কথা নাই। যেন কোন্ সীমাহীন বেদনায় সমাধিস্থ।

কহিল, "যুদ্ধে গেছলাম, এ কথা বোধ হয় তোকে বলেছি। কিন্তু তার মূলে কোনও ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী ছিল না—যেটাকে আমি সকলের চেয়ে বেশী ভয় করি। কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য মুখুয্যে, আজ তোমাকে একটা ব্যর্থপ্রেমেরই গল্প শোনাতে বসেছি। হঠাৎ ঘটে গেল আমারই জীবনে—

"বাল্যকাল হইতে ছিলাম শক্তির পূজারী। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চেঙ্গিস খাঁর স্বপ্ন দেখিতাম, নেপোলিয়নকে পূজা দিতাম। লেখা-পড়ায় বিশেষ কিছু হয় নাই, বি, এটা ফেল করা ছাড়া। হঠাৎ খেয়াল গেল, চিরকালের স্বপ্নকে কিছু দিন হাতে-কলমে অভ্যাস করিয়া ফেলা যাউক। বাড়ীর বাঁধন বাল্য হইতেই শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তাই সৈন্যদলে নাম লিখাইতে কিছুমাত্র বাধা পাইতে হইল না।

"এক দিন বাঙ্গালার নদীকে অভিবাদন করিয়া আমাদের জাহাজ ছাড়িল। বসোরা, মেশোপোটেমিয়াম নাম ভূগোলের মানচিত্রেই দেখা ছিল। এবার চলিলাম নিজে প্রত্যক্ষ করিতে। মনের মধ্যে কত বড় আশা। হয় ত বা মেজর হইব, অন্ততঃ একটা কর্পোর‍্যাল—কে জানে! কিন্তু কিছুই হয় নাই, মুখুয্যে। তাই আজ ডকের ভিড়ের ভিতর দাঁড়াইয়া তোমায় এই গল্প শুনাইতে বসিয়াছি। নতুবা—যাক্!

"যুদ্ধে গিয়াছিলাম. কিন্তু না দে'খলাম এক দিন প্রকৃত যুদ্ধ, না করিলাম এক দিন অস্ত্রব্যবহার। সেটা খাপের মধ্যেই ঘুমন্ত রহিল।

"ক্যাম্পে বসিয়া কামানের আওয়াজ শুনিতাম। দূরে হয় ত একটা গ্রাম ধ্বংস হইয়া যাইতেছে—সেখানকার মরণোন্মুখ নরনারীদের আর্ত্তনাদ কর্ণে আসিয়া পৌঁছিত। আমরা কয় জন ক্যাম্পের মধ্যে তাস পিটিয়া বীরধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতাম। শত্রুর ভয়ে অন্ধকার রাত্রিতে গা ঢাকিয়া ছাউনি হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, কোন দিন তাহার শোধ লইতে পারি নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়াও বাঙ্গালীর ধর্ম্ম অক্ষতই রাখিয়াছিলাম।

* * * *

"তার পর, হঠাৎ কোথা হইতে কি যে হইয়া গেল!—

"তখন একাবায় আমাদের ক্যাম্প পড়িয়াছে। কোথায় বাঙ্গালার ছায়া-নিবিড় ছোট একখানি গ্রাম, আর কোথায় আরবের রণ-ধূমে আচ্ছন্ন. কুয়াসা-আবিল. বালুময় কঠিন রণভূমি।—সেইখানেই এক দিন এই মানুষ-জীবনে ভালবাসার স্বপ্ন দে'খলাম।"

ফকীর দাদা হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে হাসির দাম বহু বিন্দু অশ্রু,—এ কথা সে দিন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি।

ফকির দাদা কহিল, "আর একটুখানি ধৈর্য্য ধর মুখুয্যে, গল্প জম্‌ল ব'লে। এতক্ষণে ভূমিকা শেষ হ'ল।"

কথা বলিলাম না। নিঃশব্দে উহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। জাগরণ ও চেতনার মাঝখানে ফকীর যেন আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া দিয়াছে; জাগিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে—দূর একাবায়।

"আমাদের ক্যাম্পের কাছেই ছিল হাঁসপাতাল, তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। সে দিনের তিথি, সন কিছুই মনে নাই,—সেই দিনটি ছাড়া। শরীর ভাল ছিল না—সবাই বেড়াইতে গিয়াছে, আমি যাই নাই। বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ দেখিলাম, নরম ফুলের মত কচি একটি মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। বোধ হয় পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে?'

"সে আমার কথা বুঝিতে পারিল না। অতটুকু মেয়ে, এখনও ইংরাজী শিখে নাই। বুঝিলাম, প্রশ্ন করা শুধু পণ্ডশ্রম। কোলে করিয়া ক্যাম্পের ভিতর লইয়া আসিলাম, একটি চকলেট খাইতে দিলাম। মেয়েটি চুপ করিল। তাহার দ্রাক্ষালতার মত নমনীয় অঙ্গুলিগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। তার পর একটা কাগজ লিখিয়া ক্যাম্পের বাহিরে টাঙ্গাইয়া দিলাম, 'এই পথ-হারানো মেয়েটির কেউ খোঁজ নিলে বাধিত হব।'

"তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। দিনের আলো নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্ধকার গাঢ় হয় নাই। এমটি মেয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স পনেরো হইলেই খুব বেশী হইয়াছে বলিতে হইবে। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ছায়ান্ধকারের মধ্য দিয়াই উভয়ের দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। বলিলাম, 'কি চান?'

'ওই কাগজটা বাইরে—ওকি আপনারই লেখা?'

'হুঁ। আপনি?'

'ওর দিদি।'

'বেশ, নিয়ে যান।'

"মেয়েটি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখে—বাঙ্গালীর মেয়ের মত একটি সহজ কুণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল। সে হয় ত আমায় ধন্যবাদ দিতে চাহে, কিন্তু ভাষাটাকে তাহার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতে পারিতেছে না। তাহার আয়ত স্নিগ্ধ চোখের কোলে বাঙ্গালার বটচ্ছায়ার সন্ধান পাইলাম। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, 'আপনি?'

"আমি বলিলাম, 'ভারতীয়।'

"সেই ম্লান অন্ধকারেও মনে হইল, মেয়েটি যেন চমকিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'অনেক নদী-পাহাড়ের তফাৎ।'

"আমি বলিলাম, 'তাই বটে।'

"সে আমার দিকে হাত বাড়াইয়া খুকীকে লইতে আসিল। কিন্তু হাত দুইটি কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে কিম্বা লজ্জায়?

"খুকীকে তাহার কোলে তুলিয়া দিলাম। সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, চুম্বনে কচি মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

"সে ব'লল, 'ধন্যবাদ। চল্‌লাম।'

"কিন্তু তাহার যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল—অনাবশ্যক বিলম্ব। যেন ছোট খুকীটির মত সে নিজেও পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে গেল না; ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'সমস্ত

পথ খুকীর জন্তে কাঁদতে কাঁদতে এসেছি। কত যায়গায় খুঁজলাম। শেষে তোমার দয়ায়—'

"বলিয়াই সে হঠাৎ নিজের জীর্ণ পোষাকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার চোখে যেন বেদনা ঘনাইয়া আসিল। ক্ষণপরে সে নিজেই বলিল, 'আমাদের ডেরা হাঁসপাতালের পশ্চিম দিকেই। খুব কাছে,—অথচ তোমায় এক দিনও দেখি নি! আশ্চর্য্য!'

"আমি বলিলাম, 'আশ্চর্য্য কিসের? এমন বড় লোককে ত তুমি দেখ নি।'

"মেয়েটি হাসিল। বলিল, 'তা বটে। এই এতটুকু একাবায়—সমস্ত পৃথিবীর লোক কোথায় পাব।'

"তার পর সে নিঃশব্দেই চলিয়া গেল। মনে মনে হাসিলাম। এ আবার কি? আমার জন্মভূমির হাজার হাজার মাইল দূরে এ কিসের সূচনা—?

"হঠাৎ মনে হইল, অন্ধকার যেন সহসা গাঢ় হইয়া গেল। হাসিলাম আর একবার।"

ফকীর দাদা নীরব হইল। আমি মুখের দিকে তন্দ্রাগতের মত চাহিয়া রহিলাম। জাহাজে মাল তোলার তখনও বিরাম নাই, কুলীদের চীৎকার, গাড়ীর শব্দ। চারিদিকের কুয়াশার মধ্যে অচেনা চোখের মত ইলেকট্রিক আলো। তাহারই এক পার্শ্বে নিতান্ত বে-মানানভাবে আমরা দুই জন। ফকীর দাদা কথা কহিল না, আমিও না। সে যেন তাহার স্মৃতির একাবায় হারাইয়া গেল, আমিও তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিলাম না।

কতক্ষণ এইভাবে নিঃশব্দেই কাটিয়া গেল।

শেষে আমি বলিলাম, "ঘরে চল। যে কথা তোমার মনে আছে, তা মনেই থাক্।"

ফকীর বলিল, "না মুখুয্যে। আজও এতটা দুর্ব্বল হই নি। ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু তা সহ্য করবার ক্ষমতা আজও হারাই নি। তাই আজও বেঁচে আছি, সামান্য জীবিকার জন্য দিন-রাত্রি গাধার মত খেটে চলেছি—"

বুঝিলাম, ভুল হইয়াছে। বলিলাম, "বলো।"

"তার পর দিন-তিনেক কাটিয়া গিয়াছে। শরীরটা আরও বেশী খারাপ হওয়ায় ক্যাম্পের বাহির হওয়া আর হয় নাই। সে দিন ভোরে মার্চ্চ করিতে বাহির হইয়াছি। তখনও সূর্য্য ওঠে নাই। পায়ের তালে তালে আমাদের বুক অবধি নাচিতেছে; আমি মানুষ, সমস্ত মন দিয়া এইটুকু অনুভব করিতে করিতে চলিয়াছি। হঠাৎ তাহার সঙ্গে দেখা। কূয়া হইতে জল তুলিতেছে। আমাকে দেখিয়া তার মুখ ভোরের আলোর মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দু'হাত তুলিয়া ছেলে-মানুষের মত আমায় অভিনন্দিত করিল। তাহার সুধা-সিক্ত দৃষ্টি বন্ধুর পথকে মধুময় করিয়া দিল। আমরা আগাইয়া চলিলাম।

"তার পর দিবা দ্বিপ্রহরে নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই পথে বাহির হইলাম। কিছু পরে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে উদার মাঠ রৌদ্রালোকে ধূ ধূ করিতেছে—ফল নাই, ফুল নাই। সেই সুদূর-আস্তৃত মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনে হইল, আমি আজ আকাশকে সুরার মত পান করিয়া ফেলিতে পারি, মৃত্যুকে মালার মত বুকে ধারণ করিতে পারি আমি অসীম! সেই উত্তপ্ত দিবালোকের মধ্যস্থলে অনর্থক দাঁড়াইয়া রহিলাম, কেহ আসিল না। ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম।

"হাঁসপাতালের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। ছোট একখানি ঘর। সম্মুখে একটা ঘোড়া বাঁধা—সে মাঠের ঘাস খাইতেছে। কিন্তু যাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছি, তাহার ছায়াটিও নাই। দাঁড়াইয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে সে এক বোঝা ঘাস মাথায় করিয়া বাহিরে আসিল। আমাকে দেখিয়াই যেন সে মৃত্যুকামনা করিয়া বসিল—লজ্জায়!

"কাছে আসিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি তুলিয়া বলিল, 'তুমি!'

"আমি বলিলাম, 'অন্য কাউকে প্রত্যাশা করছিলে বুঝি?'

"এই খোঁচা বুঝিবার বুদ্ধি বুঝি তাহার ছিল না। সে বলিল, 'কেন বল ত?'

"আমি বলিলাম, 'কেন, তা ভেবে বলি নি।'

'তা এদিক্ দিয়ে কোথায় চলেছিলে?'

'এইখানেই এসেছিলাম।'

'এখানে? কোথায়?'

'তোমার কাছে।'

"সে হাসিয়া ফেলিল! যেন মস্ত একটা হাসির কথা! বলিল, 'যাঃ, তা-ও বুঝি হয়?'

"আমি বলিলাম, 'হয় না? সত্যি বলছি, শুধু তোমার জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি—কত কাল ধ'রে। সেই কূয়োটার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কতক্ষণ!'

"মেয়েটি হাসিতে গেল, পারিল না। হঠাৎ তাহার চোখ

দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। আমার হাত দুইটা ধরিতে আসিল, পরক্ষণেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তুমি যাও।'

"আমি বলিলাম, 'যাবার জন্যে আসি নি।'

'যে জন্যই আস, যাও।'

"সে চলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, 'যাব না, তোমার নাম বল।'

'বলবো না।'

'বেশ। চল্লাম তবে।'

"আমি অগ্রসর হইলাম, অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, পশ্চাতে হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সে নিকটে আসিয়া বলিল, 'দাঁড়াও। কি জিগ্‌গেস করছিলে ?'

'ভুলে গেলে না কি ?'

'না। আমার নাম ইসাবেলা। চল্লাম।'

"বলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। কতকটা অগ্রসর হইয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বালিকার মত পশ্চাতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্‌ছ না যে ?'

'কেন ?'

'চ'লে যাচ্ছি যে! ফেরাও।'

"আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, 'বেশ, ফিরে এসো।'

"সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কি বলিবে, যেন ভাবিয়া পাইল না। মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, 'তোমাকে দেখলে মোটেই সে দেশের লোক ব'লে মনে হয় না।'

'কেন বল ত ?'

'আরসীতে মুখ দেখনি কোনও দিন ?'

'হুঁ। তাতে কি ?'

'তুমি ভারী দুষ্টু! আমি নিজে মুখে তোমার প্রশংসা না করলে হয় না বুঝি ?'

"মাথার ভিতরে যেন সহস্র মধুকর গুঞ্জন করিয়া উঠিল। এই শুষ্ক কঠিন পৃথিবী যেন নব-যৌবনার মত অপরূপ হইয়া উঠিল!—হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে গেলাম। তখনই মনে হইল, তাহার ও আমার মধ্যে হাজার হাজার মাইল আর অনেক নদী-পাহাড়ের তফাৎ!

"বলিলাম,—'কি ক'রে চলে তোমাদের—'

"ইসাবেলার মুখখানি হঠাৎ শুকাইয়া গেল। নয়ন দুইটি একবার জলিয়া উঠিল। সে বলিল, 'এ তোমার অনধিকার-চর্চ্চা।'

'তা বটে। কিন্তু এর অধিকার কি একেবারেই পেতে পারি না ?'

"সে বলিল, 'না।'

"তার পর সে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

* * * *

"সে নিজে না বলুক, তবু জানিতে পারিলাম, কি করিয়া উহাদের দিন গুজরাণ হয়। সংসারে মা আর সেই ছোট্ট বোন্‌টি ছাড়া তাহার আর কেহ নাই। মা ও মেয়ে সূচের কায করে, ঘাস-খড় বেচিয়া কোনও মতে দিন গুজরাণ করে।

"বুঝিলাম, কেন তাহার সংসারের কথা সে দিন সে প্রকাশ করে নাই, বিদেশীর দান গ্রহণ করিতে হয় ত সে চাহে না।

"অনেক দিন দেখা হয় নাই, মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ক্যাম্পের বৈচিত্র্যহীন কর্কশ জীবন আর ভাল লাগে না। জীবনের অবশিষ্ট অপরিচিত পথের জন্য সাথী চাহি—যাত্রা-সহচরী—সঙ্গিনী। এই কুৎসিত রণোল্লাসের মধ্যে তাহাকে পাইব কোথায় ?

"নেপোলিয়ান চেঙ্গিসের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রত্যেক শুষ্ক তৃণ, প্রত্যেক ঝরা ফুলের জন্য অনুকম্পায় আমার বুক ভরিয়া উঠিল। এই লৌহ-কঠিন হিংসুক দেহটার মধ্যে যে এত বড় একটা বেদনা-কাতর দয়ার্দ্র হৃদয় লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত ?

"মানুষ হইয়া মানুষ-ধ্বংসে সহায়তা করিতে আসিয়াছি—কিসের জন্যে ? কাহার জন্যে ? পৃথিবীতে বন্যা আছে, মহামারী আছে, ভূমিকম্প আছে,—তাহাদের কায মানুষের দ্বারা সম্পন্ন করার অপেক্ষা অধিক বর্ব্বরতা আর কি আছে, কে জানে ?

"পৃথিবী আজ চেঙ্গিস চাহে না, নেপোলিয়ানও নহে। সে চাহে নূতন বুদ্ধ, নূতন খৃষ্ট—যাঁহারা শান্তির বাণী প্রচার করিবেন, তাঁহাদিগকে।"

—"মুখুয্যে, ঘুম এলো না ত ? গল্পের যে এখনও অনেক বাকী।"

"না, বলো।"

ফকীর পকেট হইতে পাণের কৌটা বাহির করিয়া গোটা দুই পাণ মুখের মধ্যে পূরিল। বলিল, "এও চাই। শোন।"

"ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ইসাবেলা যে

যাচিয়া আমার নিকটে আসিবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল ? কিন্তু সে আসিল। অনেকগুলি বাঙ্গালীর ছেলে তখন ক্যাম্পের মাঝে জটলা করিতেছিল। দ্বারপ্রান্তে নারীমূর্ত্তি দেখিয়া সবাই সচকিত হইয়া উঠিল। সবাই যেন হঠাৎ প্রতিপদের দিন চাঁদ দেখিয়া ফেলিয়াছে !

"অতগুলি ছেলের কল-গুঞ্জন ও কৌতূহলী দৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া তাহার সঙ্গে আমি বাহিরে গেলাম।

"আমি বলিলাম, 'কি চাও ?'

'একটা অনুরোধ ছিল।'

'অনুরোধ ? —আমায় ? অনেক পাহাড় আর নদীর তফাৎ যা'র সঙ্গে ?'

'তবু তোমাকেই বল্‌তে এলাম।'

'আশ্চর্য্য ! আচ্ছা, বলো।'

'আমরা 'হজ্জে' যাব,—তীর্থে। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।'

"বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'ঠাট্টা করছ, ইসাবেলা ?'

"অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া সে বলিল, 'না, ঠাট্টা নয়।'

'এ কেমন ক'রে সম্ভব হয় ? ক্যাম্প ছেড়ে আমি কেমন ক'রে যাবো ? আর তোমরাই বা হঠাৎ যাচ্ছ কেন ?'

'সে অনেক কথা। এখানে থাকা আমাদের সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি চলো।'

"আমি বলিলাম, 'তোমার দেশের এত লোক থাকতে সদ্যঃ পরিচিত আমাকেই বা কেন তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে, তা বুঝতে পারা শক্ত। কিন্তু তা' সহজ হ'লেও আমার যাবার পথ সরল হ'ত না। যাবার হুকুম আমাদের নেই। এ'দের সর্ত্তে সই ক'রে আমরা কেবল মানুষ মারবার অধিকারই পাই নি, নিজেদেরও মারবার ভার নিয়েছি। কিন্তু তুমি কেন যাচ্ছো ?'

"ইসাবেলার চোখের পাতা দুইটি জলে ভিজিয়া আসিল। সে বলিল, 'এ কাযের আজ আমাদের শেষ দিন। তুমি কি একটিবার আমাদের ঘরে যাবে না ?'

'না ইসাবেলা! সে অধিকার তুমি আমায় এক দিন দিতে চাও নি। আজও তা নিতে চাই না।'

'বেশ। কিন্তু এখান থেকে একটু স'রে যেতেও কি তোমার আপত্তি হবে ?'

'না।'

"দুই জনে একটা গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিলাম। আজও দিবা দ্বিপ্রহর। কিন্তু সে দিনের মধ্যাহ্নের সঙ্গে আজ ইহার কত প্রভেদ !

"এতটা পথ আসিতে দুই জনের মধ্যে একটিও কথা হয় নাই।

"আমি বলিলাম, 'এখনও বুঝতে পারলাম না ইসাবেলা, এই বিদেশীকে তোমার এতখানি প্রয়োজন কেন ?'

"সে চুপ করিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার শঙ্খের মত শুভ্র হাতখানিতে আমার হাত রাখিলাম। সে-ও বাধা দিল না।

"সে বলিল, 'আমরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। আমাদের কেউ নেই। তুমি আমাদের সহযাত্রী হও।'

'তোমার দেশে তোমার সহযাত্রী হবার উপযোগী কাউকে পেলে না, ইসাবেলা ?'

'তা হ'লে তোমায় অনুরোধ করতাম না। তোমায় দেখেই মনে হয়েছিল, তুমি আমার আপনার, বন্ধু।'

"সেই মুহূর্ত্তে আকাশ যেন আমার শিরশ্চুম্বন করিল। মনে ভাবিয়াছিলাম, এই মুহূর্ত্তটির মত আমি বিধাতা অপেক্ষাও বড়।

"আমার চোখে জল আসিতেছিল। বলিলাম, 'কিন্তু এত দিন ত' এর আভাসও পাই নি, বেলা !'

'কোনও দিনই পেতে না। কিন্তু বিদায়ের মুহূর্ত্ত যতই আসন্ন হয়ে এল, ততই তোমায় মনে পড়তে লাগল,—বলো যাবে ?'

"উত্তর দিতে পারিলাম না। অসহ্য ব্যথায় নীরব রহিলাম। সে আবার বলিল,—'বলো।'

"সে হাত দুইখানি আমার স্কন্ধের উপর তুলিয়া দিল। তাহার নয়ন দুইটিতে অপার মিনতি। তাহার নিশ্বাস, তাহার কেশের সুরভি, তাহার স্পর্শ—আমার দেহে-মনে একটি অপূর্ব্ব রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিল। তবু সে কাতর দৃষ্টিমাখা অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। উপায় নাই।

"সে যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মত ফুলিয়া উঠিয়া তটের উপর আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'হয় ত তোমাকে এতখানি বেদনা সইতে হবে বলেই এখানে এসে পড়েছিলাম। নইলে তোমার

আমার মধ্যে কত দূরের তফাৎ। কিন্তু দেশের, বর্ণের, জাতের সমস্ত বৈষম্য তুচ্ছ ক'রে দিলে যে ভালবাসা, তারও মূল্য দিতে পারলাম না। তোমার চির-জীবনের অশ্রু দিয়ে আমায় ক্ষমা কর।'

"কথা বলিবার মত অবস্থা তখন ছিল না। সে নীরবে সমুদ্রের মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

'আজই যাবে?'

'আজই; এখনই।'

'কিন্তু কেন যাবে, তা আজও শুনতে পেলাম না।'

'সে শোনবার কথা নয়। সে আমাদের লজ্জার ইতিহাস, কলঙ্কের কাহিনী। তোমার শোনবার নয়।'

"আরও কতক্ষণ দুই জনে সেই তরুচ্ছায়ায় নিঃশব্দেই বসিয়া রহিলাম। এই করুণ মুহূর্ত্তটির জন্য তাহাকে নিকটে পাইয়াছিলাম, ইহার পর, আর তাহার ছায়ামাত্র দেখিব না, এই কথা মনে হইতেই উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বুকখানা ভরিয়া গেল। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। এই ভাল! এই ভাল! জগতের কোনও মিলনই যে পরিপূর্ণ নহে, আর এত বড় জিনিষ পাওয়াটাই কি সব, হারানো কিছু নহে?

"ইসাবেলা উঠিয়া দাঁড়াইল। দূরের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওই যে মা এগিয়ে চলেছেন। যাই আমি।'

"তাহার দিকে আর একবার তাকাইলাম, কিছু বলিতে পারিলাম না। হঠাৎ ইসাবেলা আমার হাতখানা মুখের কাছে লইয়া গেল—তার পর ছুটিয়া চলিয়া গেল।

"পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। চোখে জলও আমার এক ফোঁটা ছিল না! শুষ্ক বালুকারাশি হাওয়ার সঙ্গে উড়িয়া তাহাদের যাইবার পথটিকে ঢাকিয়া দিল।

"ক্যাম্পে ফিরিতে পারিলাম না। এই নিতান্ত স্বল্প সময়টুকুর মধ্যে এতখানি পাওয়া ও হারানোর কল্পনা কে করিয়াছিল!

"পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। আবার আমি একা!"

ফকীরের দিকে চাহিতে ভয় হয়। তাহার ওই ছোট্ট বুকের মধ্যে সাতটা সমুদ্র যেন উন্মত্ত হইয়া প্রলয়-নৃত্য করিতেছে!

ফকীর কহিল, "লড়াই থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে গিয়েছিলাম তার খোঁজে! সন্ধান পাইনি। হয় ত আরও দূরে কোথায় গেছে—হয় ত পৃথিবীর বাইরেই কোথাও! কিন্তু আমায় কি দিয়ে গেছে জানিস্, মুখুয্যে? দিয়ে গেছে অফুরন্ত বেদনা, অফুরন্ত আনন্দ! নাটকের মত শোনাচ্ছে না? তা শোনাক, নাটক শুধু কল্পনা আর মিথ্যেই নয়, সত্যিও বটে।"

ফকীর ক্ষণেক নীরব রহিল। আবার বলিল, "আজ সে দূরে। কিন্তু এক দিন তাকে পেয়েছিলাম এই দেহের—ক্ষণিক স্পর্শের মধ্যে। সে স্পর্শ আজও আমার স্নায়ু'তে শিরায় রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে, একটি বিবশ স্বপ্নে আমার নিশীথের মুহূর্ত্তগুলি রমণীয় ক'রে তোলে। অন্ধকার নির্জ্জনতার মধ্যে ভাবি—সে এসেছে। বিচ্ছেদকে মিথ্যা ব'লে মনে হয়। দিনের আলোয় চেয়ে চেয়ে দেখি এই দেহটাকে। এর কত ত্রুটি, কত অভাব। তবু একেই এক দিন তার সকলের চেয়ে সুন্দর মনে হয়েছিল;—এই শীর্ণ শুষ্ক হাতে তার স্পর্শ মাখানো আছে, এর অস্থিসার আঙুলগুলো তার অধরের মদিরায় অভিষিক্ত হয়েছে।"

ফকীর যেন আপনার ভাবে তন্ময় হইয়া গেল। যেন তাহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

আমি বলিলাম, "ফকীর দা, আজ থাক—আর এক দিন—"

ফকীর চমকিয়া উঠিল, ব'লল, "না, না, শোন। চেয়ে চেয়ে ভাবি। আবার চেয়ে দেখি। আজকে আমার চরম দারিদ্র্য ও অগৌরবের মধ্যেও আমাকে রাজার মত শক্তিমান মনে হয়। সে তার অতুলনীয় স্নেহ-ভালবাসায় এই জীর্ণ দেহটাকে মহার্ঘ লোভনীয় ক'রে তুলেছে। এক অঙ্গে তার স্পর্শ—দেহের সুরভি। চোখ বুজে যখন সেই বিদায়ের মুহূর্ত্তকে মনে করি, তখন নিজেকে বড়বাবুর চেয়ে ঢের বড় ব'লে মনে হয়। তার বুকের মণিপুরে আমি একটি ঘৃত-দীপ-শিখা হয়ে চিরকাল জ্বলব। এই আমার সকলের বড় সুখ। এর চেয়ে সুখ চাই না।"

রাত্রির কালো আকাশের গায় ভোরের শুকতারাটি জ্বল-জ্বল করিতেছিল। ফকীর সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কুলীর দল মাল লইয়া তেমনই ছুটা-ছুটি করিতেছে। ক্রেনের তলায় কম্ফার্টার মাথায় চক্রবর্ত্তী তখনও কাযে ব্যস্ত! কিন্তু সে সব দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুছিয়া যায়। মনে হয়, সুদূরের এক বিরহিণী যেন শুক-তারার মধ্য হইতে ফকীরের মুখের দিকে চাহিয়া আছে!

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

শিল্পকলা

শিল্প শাস্ত্রেরই আলোচ্য বিষয় হইলেও শিল্পকলা-সমূহের উল্লেখ অপর তিন শ্রেণীর সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণু-পুরাণেই বিশেষভাবে শিল্পকলার তালিকার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহের মধ্যে ললিত-বিস্তর ও উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে শিল্পকলা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কামশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে বাৎস্যায়নের কামসূত্র উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০,৪৫,৩৩-৩৫) দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ ও বলরাম একবারমাত্র শুনিয়াই অখিল বেদ, সাঙ্গ উপনিষদ, সরহস্য ধনুর্বিদ্যা, ন্যায়পর ধর্ম্মসমূহ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ও ষড়্‌বিধ রাজনীতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ৬৪ দিনে ৬৪ কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ৬৪ শিল্পকলার বিবরণ ভাগবতে নাই। টীকাকারদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাদের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, আবার অপর কেহ কেহ ইহাদের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বিজয়রাঘব আচার্য্য, বিজয় ধ্বজতীর্থ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শিল্প ৬৪ প্রকারের, এইমাত্র বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী, বল্লভ আচার্য্য ও শুকদেব ৬৪ শিল্পের নাম ও আংশিক বিবরণ দিয়াছেন। শিব-তন্ত্র-নামক কোন অনির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ হইতে এই সকল টীকাকার শিল্পের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। জীব গোস্বামী নামক অন্য-তম টীকাকার বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের অন্তিম পর্ব্ব হরিবংশ হইতে শিল্পের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ মনে হয়। বৌদ্ধদের ললিত-বিস্তরে (১০,১) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুকল্পকোটি বৎসরে বোধিসত্ত্ব সংখ্যা, লিপি, গণনা, ধাতুতন্ত্র ও অপ্রমেয় (অসংখ্য) শিল্পযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। জৈনদের উত্তরাধ্যায়ন সূত্রেও (২১,৬-৭) উল্লেখ আছে যে, রূপযৌবনসম্পন্ন প্রিয়দর্শন মহাবীর বিশেষ আয়াসের সহিত ৭২ কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎকালে তিনি রূপবতী রূপিণী প্রিয়তমার সহিত দ্বিকুন্দক দেবতার ন্যায় মনোরম প্রাসাদে বিহার করিতেন।

কামশাস্ত্রের প্রধানতম উপকরণই রূপ ও যৌবন। বাৎ-স্যায়নের কামসূত্রের অবয়বীভূত চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা প্রাগ্-যৌবন বা কিশোর কাল হইতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শিক্ষণীয়। ৫১৮ অন্তর কলার উল্লেখ থাকিলেও প্রধানতঃ চতুঃষষ্টিই মূল কলা। প্রথমতঃ এই ৬৪ মূল কলার নাম ও বিবরণ যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

(১) গীত। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার জীবগোস্বামীর ও বল্লভ আচার্য্যের মতে গান শিক্ষা, গীত নির্ম্মাণ, রাগভেদ, তালমাত্রাদি রচনাপ্রকার ও সাধক বাধক স্বরাদির মেলন-পরিজ্ঞান গীতের অন্তর্গত। কামসূত্রের ব্যাখ্যাকার যশোধর গীতের স্বরগ, পদগ, লয় ও অবধান নামক চারি ভাগ করিয়া-ছেন। বস্তুতঃ গীত সভ্যলোকের একটি প্রধান শিল্পকলা বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

(২) বাদ্য। যন্ত্রাদিভেদে বাদ্যেরও নানা বিভাগ আছে। যশোধরের মতে কাংস্য, পুষ্করতন্ত্রী ও বেণু প্রভৃতির দ্বারা বাদ্যের ঘনত্ব, বিততত্ব ও সুষিরত্ব প্রভৃতি ভেদ যথাক্রমে সূচিত হয়। জল-তরঙ্গাদির উল্লেখ পরে দ্রষ্টব্য।

(৩) নৃত্য। নৃত্য বলিতে সাধারণতঃ 'নাচ' বা নর্ত্তন বুঝায়। নাট্য ও অনাট্য নামক ইহার দুই ভেদ আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালবাসীর কার্য্যের অনুকরণ নাট্যনৃত্য এবং নর্ত্তকাশ্রিত অনাট্য নৃত্য। কিন্তু অঙ্গবিক্ষেপ, বিভাব, ভাব ও অনুভাবাদি রসের অভিব্যক্তি নৃত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদয়ের বিবরণ পরে আলোচিত হইয়াছে।

(৪) নাট্য। ইহার অপর নাম দৃশ্যকাব্য। ইহাতে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পট প্রভৃতির সাহায্যে সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষ-ভাবে কথাবার্ত্তার দ্বারা ঘটনা ও গল্পবিশেষ প্রত্যক্ষরূপে দেখান হয়। নাট্য-শাস্ত্রকাররা দশ প্রকারের নাটক ও অষ্টাদশ প্রকারের নাটিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) আলেখ্য। ইহার অন্য নাম চিত্রকলা। রূপভেদ, প্রমাণ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক মাপ, ভাব ও লাবণ্য-যোজন, সাদৃশ্যরক্ষা ও বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি আলেখ্যের ষড়ঙ্গ। চিত্রবিদ্যাও সর্ব্বজনস্বীকৃত অন্যতম প্রধান শিল্পকলা।

(৬) বিশেষকচ্ছেদ্য। ইহা একরূপ উল্কি। বিবাহের প্রাক্কালে কন্যার কপোলাদিতে চন্দনাদির দ্বারা নৈপুণ্যের সহিত চিত্রাঙ্কনই এ স্থলে আলোচ্য বিষয়। কর্ণপত্রভঙ্গ দ্রষ্টব্য (১৮)।

(৭) তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার। বস্তুতঃ এই এক

শিরোনামার মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র শিল্পকলার বিবরণ আছে। তণ্ডুলবিকার অর্থাৎ নৈবেদ্যের ন্যায় ভোজনপাত্রে নৈপুণ্যের সহিত তণ্ডুলাদি ভোজ্যদ্রব্য সাজান। কুসুমবিকার দ্বারা সুশোভনভাবে ফুলের তোড়া প্রভৃতির রচন ও পাত্রবিশেষে পুষ্প সাজান বুঝায়। বলিবিকার বলিতে পূজার উপকরণের ন্যায় বিভিন্ন পাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া নৈপুণ্যের সহিত পরিবেশন করা বুঝিতে হইবে।

(৮) পুষ্পাস্তরণ। উদ্যানাদিতে ফুলের কেয়ারী রচনা করা। ইহা বাস্তুশাস্ত্রেরও আলোচ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে শিল্পজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন।

(৯) দশন-বসন-অঙ্গরাগ। ইহাতেও তিনটি স্বতন্ত্র শিল্পকলা উল্লিখিত হইয়াছে। দশনরাগ বা দাঁতে মিশি মাখান। বসনরাগ বা নানাভাবে কাপড়ে রঙ্‌ করা। অঙ্গরাগ আপাততঃ অতিরিক্ত মাত্রায় সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে দরিদ্র স্ত্রীলোক অর্থাভাবেই বোধ হয় পাউডারের পরিবর্ত্তে হলদি পর্য্যন্ত মাখিয়া থাকে।

(১০) মণিভূমিকাকর্ম্ম। যশোধরের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহার দ্বারা ঘরের মেজে মার্ব্বল প্রভৃতি প্রস্তরের উপর নৈপুণ্যের সহিত মণি-বসান। ইহার দ্বারা মেজের সৌন্দর্য্য ও শীতলতা বৃদ্ধি পায়।

(১১) শয়ন-রচন। জীবগোস্বামী ও বল্লভ আচার্য্যের মতে ইহার দ্বারা খাট-পালঙ্কাদির নির্ম্মাণ বুঝায়। কিন্তু যশোধর সাধারণ অর্থেই ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। শয্যারচনা কামশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যশোধর শয্যারচনার কারণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সম্ভোগ ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকই শয্যার প্রধান উদ্দেশ্য।

(১২) উদকবাদ্য। সাধারণতঃ জলতরঙ্গ নামে পরিচিত। যশোধর মুরজাদি বাদ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। জীবগোস্বামী উদকপূরিত পাত্রের ন্যায় "সরোবরাদি স্থাপিত ভাণ্ডে"ও মধুর তান সমুত্থান অর্থে উদক বাদ্যের ব্যবহার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ফ্রাঙ্কলিন নামক কোন সঙ্গীতবিশারদ ইহার উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার উল্লেখ সম্ভবতঃ ফ্রাঙ্কলিনের অনেক পূর্ব্বকালবর্ত্তী।

(১৩) উদকঘাত। জীবগোস্বামীর মতে জলের ফোয়ারা নির্ম্মাণ। বল্লভ আচার্য্য ও যশোধর ইহাকে একরূপ জলক্রীড়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামী উদকবাদ্য ও উদকঘাত এক শিরোনামায়ই উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৪) চিত্রযোগ। ইহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে টীকাকারদের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। নানা অদ্ভুত দর্শনে সম্যক্ উপায় বলিয়া জীবগোস্বামী অস্পষ্টতর পরিচয় দিয়াছেন। বল্লভ আচার্য্য অনুমান করেন, ইহার দ্বারা বিচিত্র প্রকার পুষ্পের মালা-গাঁথন বুঝিতে হইবে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর সর্ব্বত্রই কামের লীলা দেখাইতে চাহেন। তাঁহার মতে চিত্রযোগ অর্থে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-পালিতীকরণ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। ঈর্ষ্যাবশতঃ পরের অতিসন্ধানার্থ ইহার প্রয়োগ। ইহা কুচুমারের অন্তর্গত। কুচুমার স্বতন্ত্র শিরোনামায় গৃহীত হইয়াছে। পরে দ্রষ্টব্য।

(১৫) মালাগ্রথনবিকল্প। নানা প্রকার মালা গাঁথন। শ্রীমদ্ভাগবতের জীবগোস্বামী ও বল্লভ আচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকাররা ইহার ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ছয়টি বিষয়ের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যশোধরও ইহার দ্বারা শিরোমালা গ্রন্থন বুঝিতে হইবে বলিয়াছেন। কিন্তু পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শিরোনামারও এই অর্থ করিয়াছেন। মাল্যগ্রথন সহজবোধ্য, বস্তুতঃ ইহার বিশেষ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই নাই।

(১৬) শেখরাপীড়যোজন। মাথার চুলে ও কপাল প্রভৃতি স্থানে নৈপুণ্যের সহিত অলঙ্কার পরিধান।

(১৭) নেপথ্য-প্রয়োগ। নাটকাদির অভিনয়ের জন্য পারিপাট্যের সহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান। বল্লভাচার্য্যের মতে 'ষ্টেজ' বা অভিনয়ের মঞ্চ-রচনাও ইহার অন্তর্গত।

(১৮) কর্ণপত্রভঙ্গ। চন্দনাদির দ্বারা আকর্ণ কপোলে চিত্রাঙ্কন। বিশেষকচ্ছেদ্য (৬) দ্রষ্টব্য। যশোধরের মতে নাটকাভিনয়েই ইহার প্রয়োজন। কিন্তু স্থলবিশেষে বর-কন্যার বিবাহের সময়ও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। মাঙ্গলিক কার্য্যমাত্রেই দধিমঙ্গলের সময়ও ইহার প্রচলন আছে।

(১৯) গন্ধযুক্তি। নানাপ্রকার সুগন্ধিনির্ম্মাণ। বল্লভ আচার্য্য অনুমান করেন, ইহার অন্য ব্যাখ্যাও হইতে পারে; যথা, চন্দনাদির পুষ্প-বস্ত্রাদি আকারে নির্ম্মাণ।

(২০) ভূষণ-যোজন। পারিপাট্যের সহিত নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অলঙ্কার পরিধান। যশোধরের মতে অভিনয়ই ইহার উদ্দেশ্য। তিনি ইহার সংযোজ্য ও অসংযোজ্য নামক দুই বিভাগ করিয়াছেন। সংযোজ্য বলিতে কণ্ঠাদিতে

মণিমুক্তা-প্রবালাদির যোজন বুঝিতে হইবে। আর অসংযোজ্য অর্থে কটক-কুণ্ডলাদি বিরচন।

(২১) ঐন্দ্রজাল। যাদুবিদ্যাবিশেষ। বল্লভ আচার্য্য ইহার বিংশতি প্রকারের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু নামাদি বিবরণ দেন নাই।

(২২) কুচুমার-যোগ। বস্তুতঃ ইহার পাঠ 'কুচমার-যোগ' হওয়াই সম্ভব। এই পাঠে ইহার অর্থ হইবে—যুবতীর স্তনের সৌন্দর্য্যরক্ষা ও অলঙ্করণাদি-কৌশল। কোন কোন ব্যাখ্যাকার 'কুচুমার' পাঠের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা উপনিষদধিকার নামক অপরিচিত গ্রন্থের কুচুমার নামক গ্রন্থ-কার-বিশেষের কোন অনির্দ্দিষ্ট শিল্পকলা। জীবগোস্বামী বলেন, ইহা 'নাভারূপ' ব্যঞ্জনাবিশেষ। বল্লভ আচার্য্য 'কটুরূপ প্রকার' নামক দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যশোধর বলেন, উপায়ান্তর অসিদ্ধ সাধনার্থ সুভগকরণ।

(২৩) হস্তলাঘব। হস্ত-কৌশল দ্বারা নানাদ্রব্যের গোপনাদি ক্রীড়া। পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ কৌশলের অভাব যুবক-যুবতীর শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সপ্রমাণ করে।

(২৪) বিচিত্র শাকপূপভক্ষবিকারক্রিয়া। বিচিত্র প্রকারের শাকসবজি, পিষ্টক ও অপর সকল প্রকারের ভোজ্য-দ্রব্য রন্ধন। শাক-সব্জি বলিতে দশবিধ নিরামিষ দ্রব্য বুঝায়। যথা, বৃক্ষলতা গুল্মাদির মূল, পত্র, বাঁশ প্রভৃতির শিকড়, কলি, ফল, গুঁড়ি, ডাঁটা, ছাল, পুষ্প ও কাঁটা। পিষ্টকও নানাবিধ এবং রুটী, লুচি প্রভৃতি পিষ্টকের অন্তর্গত। অপর ভোজ্যদ্রব্য সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত। যথা, ভক্ষ্য বা চর্ব্ব্য, ভোজ্য বা চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। পেয় দ্রব্য আবার দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে—অগ্নিসংযোগে রন্ধনকৃত ও অরন্ধিত বা কাঁচা। রন্ধনকৃত পেয় দ্রব্যের নাম যুষ এবং দুই প্রকারের যথা, সূপ, সুরুয়া বা ঝোল এবং পাঁচন। অরন্ধিত পেয় দ্রব্যও দুই ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম অসন্ধানকৃত ও সন্ধানকৃত। অসন্ধানকৃত অরন্ধিত পেয় পর্য্যুষিত বা পচা দ্রব্য চুয়াইয়া মাদক দ্রব্যাকারে প্রস্তুত হয় এবং দ্রাবিত ও অদ্রাবিত এই দুই নামে পরিচিত। দ্রাবিত পেয় ডাল, চিনি ও তেঁতুলের মিশ্রণে প্রস্তুত এবং এক প্রকার মৃদু মদ্য নামে খ্যাত। অদ্রাবিত পেয় আরক আকারে পরিণত লতাপাতা, তাল ও কলার মোচার মিশ্রণে প্রস্তুত এবং রস বা সার নামে পরিচিত।

মদ্যাদির বিবরণ পশ্চাদ্বর্ত্তী সংখ্যায়ও উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মাছ-মাংসের রন্ধন বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। ইহা হইতে মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবত ও কাম-সূত্রের যুগে মৎস্য-মাংসের ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

খাওয়া ও থাকা এই দুইটা বিষয় জীবমাত্রের পক্ষেই অপরিহার্য্য। কিন্তু রন্ধনপ্রণালী ও বাসগৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দ্বারাই লোক, সমাজ ও জাতিবিশেষের সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি পরিমাপ করিতে পারা যায়। অপর শিল্পকলাসমূহও সভ্যতার পরিমাপক, তাহারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপসংহারে করা হইবে।

(২৫) পানক রস রাগাসব যোজন। পানীয় দ্রব্য-সমূহের প্রস্তুতকরণ। যশোধর ও বল্লভ আচার্য্য উভয়ের মতেই আসব বলিতে মাদকদ্রব্য বুঝায় এবং মাদকতার ক্রম অনুসারে মৃদু, সাধারণ ও উচ্চ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাগ দ্রব্য ত্রিবিধ, যথা, লেহ্য, চূর্ণ ও তরল এবং তাহাদের স্বাদ লবণ, অম্ল, কটু ও ঈষৎ মধুর।

যশোধর মনে করেন, ভোজ্যদ্রব্যসমূহ ও পানীয় দ্রব্যসমূহ এক রন্ধন-শিল্পেরই অন্তর্গত। তাহা সত্য হইলেও এই দুই শ্রেণীতে নানাবিধ কলার উল্লেখ রহিয়াছে, যাহা আজকালও বিশেষ আয়াসের সহিত স্বতন্ত্রভাবে শিখিতে হয়।

(২৬) সূচিবায় কর্ম্ম। সিলাই ও বয়ন। যশোধরের মতে সিলাই তিন প্রকারের। যথা, সীবন বা জামা প্রভৃতি সিলাই করা, উতান বা ছেঁড়া কাপড়ের রিপু করা এবং বিরচন বা বিছানার চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত করা। বয়ন বলিতে সূতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন উভয়ই বুঝায়। সূতা কাটা স্বতন্ত্রভাবেও উল্লিখিত হইয়াছে। তর্কুকর্ম্ম নামক শিরোনামা (৩৬) দ্রষ্টব্য।

(২৭) সূত্রক্রীড়া। যশোধরের মতে হস্তকৌশলের সাহায্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ভস্মীভূত সূত্রকে অবিকল পূর্ব্ব অবস্থায় দেখান। কিন্তু জীব গোস্বামীর মতে এই ক্রীড়া অন্য রকমের এবং তিন প্রকারের। প্রথমতঃ সূত্রকৌশলের সাহায্য সজীব লোকের ন্যায় পুতুল খেলান। দ্বিতীয়তঃ দড়ির উপরে হাঁটা ও নৃত্য করা। তৃতীয়তঃ দড়ির দ্বারা হাত, পা প্রভৃতির বাঁধন কৌশলে খুলিয়া ফেলা।

(২৮) বীণা ডমরুপ বাদ্য। বাঁশী, বেহালা প্রভৃতি

তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র এবং ঢোলক, মৃদঙ্গ, ডগ্‌গি, তবলা প্রভৃতি চামড়াযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বাজান।

(২৯) প্রহেলিকা। নানাপ্রকারের সমস্যা পূরণ।

(৩০) প্রতিমালা। জীব গোস্বামী ও বল্লভ আচার্য্যের মতে ইহার দ্বারা ভাস্কর্য্য বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু যশোধর সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন প্রথম অক্ষর অনুসারে শ্লোকরচনা বা শ্লোক বাদানুবাদ বুঝিতে হইবে।

(৩১) দুর্বাচকযোগ। হরবোলা বা পশুপক্ষীর শব্দ বা অর্থের অনুকরণ।

(৩২) পুস্তকবাচক। জীব গোস্বামী ও বল্লভ আচার্য্যের মতে সর্ব্বসাধারণের নিকট নৈপুণ্যের সহিত কোন বিষয়ে বক্তৃতা করা। কিন্তু যশোধরের মতে সুললিতভাবে পুস্তক আবৃত্তি বা পঠন।

(৩৩) নাটক আখ্যায়িক দর্শন। ইহা প্রকৃত নাটক অভিনয় হইতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন। ইহাতে কোন প্রকার কথাবার্ত্তা বা চলাফেরা নাই। ইহাতে কোন প্রসিদ্ধ চিত্র, ঘটনা বা ব্যক্তির অনুকরণ করা হয়। ইহাতে নিশ্চল ছবির মত অবিকল সাজসজ্জা করা লোকসমূহকে দেখান হয়।

(৩৪) কাব্যসমস্যা পূরণ। অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আলোচিত হইয়াছে। শাব্দিক বা আর্থিক সমস্যা ইহার আলোচ্য বিষয়।

(৩৫) পট্টিকা (বা পেটিকা) বেত্রবসন বিকল্প। বেত, বাঁশ ও রশি প্রভৃতির সাহায্যে ধমু, লাই, ওড়া, মোড়া, ডোল, বেত প্রভৃতি বানান। যশোধরের মতে ইহার দ্বারা বেতের চৌকি প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। বল্লভ আচার্য্য 'পত্রিকা চিত্র বচন বিকল্প' পাঠ গ্রহণ করিয়া মেষাদির যুদ্ধ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মেষ-কুক্কুটাদির যুদ্ধ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী এক শিরোনামায় স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হইয়াছে।

(৩৬) তর্কুকর্ম্ম। ইহার দ্বারা চরকা প্রভৃতির সাহায্যে সূতাকাটা বুঝায়। কিন্তু শ্রীধর স্বামী ও বল্লভ আচার্য্য ইহার 'তর্ককর্ম্ম' পাঠ গ্রহণ করিয়া "বাদানুবাদ" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ইহার 'যক্ষকর্ম্ম' পাঠ আছে। কিন্তু ছুতারের কায অর্থে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শিরোনামায় তক্ষকর্ম্মের উল্লেখ আছে। যশোধর অনুমান করেন, ইহার অর্থ খেলো জিনিষ দিয়া কুন্দুক বা গোলক তৈয়ার করা।

(৩৭) তক্ষণ। কাষ্ঠাদির দ্বারা দরজা, জানালা, চৌকি, খাট প্রভৃতি তৈয়ার করা। যশোধর মনে করেন, ইহাতে বর্দ্ধকী বা একরূপ রাজমিস্ত্রীর কায বুঝায়। কিন্তু তাহা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী 'বাস্তুবিদ্যা' নামক শিরোনামারই অন্তর্গত।

(৩৮) বাস্তুবিদ্যা। দিঘনিকায় (১, পৃ ৯,১২) এবং শুক্রনীতিতে বাস্তুবিদ্যা ও বাস্তুকর্ম্মের একরূপ অলীক বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের (৪৫ অধ্যায়) সংজ্ঞা অনুসারে বাস্তু বলিতে গৃহ, ক্ষেত্র, আরাম, সেতু-বন্ধ, তড়াগ ও আধার বুঝায়। অগ্নিপুরাণে (১০৬, ১) নগরাদি বাস্তুর উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণে (৪৬ অধ্যায়) প্রাসাদ, আরাম, দুর্গ, দেবালয় ও মঠ প্রভৃতি বাস্তু বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (ব্রহ্মখণ্ডে ১০, ১৯-২১) উল্লেখ আছে যে, বাস্তুবিদ্যার প্রবর্ত্তক বিশ্বকর্ম্মা নয় শ্রেণীর শিল্পীর পিতা ছিলেন, যথা, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার, সূত্রধার, কুম্ভকার, কুবিন্দক বা তন্তুবায়, চিত্রকার ও মালাকার।

শিল্পশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ মানসারে বাস্তুবিদ্যা ও বাস্তুকর্ম্মের সম্পূর্ণ সঠিক ও বিশদ বিবরণ আছে। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, বাস্তু বলিতে নৈপুণ্যের সহিত যাহা নির্ম্মাণ করা যায়, তাহাই বুঝিতে হইবে। বাসগৃহ, মন্দির, দুর্গ, গ্রাম, নগর ও প্রতিমাদির নির্ম্মাণ ত বুঝিতেই হইবে। অধিকন্তু গৃহের আসবাব, যান, রথ, চাকতি, কল, শিবিকা, রাস্তা, ঘাট, দীঘি, পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ, সেতু, উদ্যান, নর্দ্দমা, রাজ-মুকুট, পশু-পক্ষীর নীড়, গহনা, এমন কি, কেশবন্ধন পর্য্যন্ত বাস্তুবিদ্যার অন্তর্গত। এ সকলের বিবরণ লেখকের 'হিন্দু শিল্পের অভিধান' ও 'ভারতীয় শিল্প' নামক গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(৩৯) সুবর্ণ-রৌপ্য-রত্ন পরীক্ষা। জহুরীর কায। কিন্তু শিল্প-বিশেষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

(৪০) ধাতুবাদ। মৃৎ, প্রস্তর, রস বা পারদ প্রভৃতি পাতন, শোধন ও মেলন করিবার জ্ঞান।

(৪১) মণিরাগ-জ্ঞান। রত্নাদির উপর নৈপুণ্যের সহিত নানাবিধ রং করা।

(৪২) আকর-জ্ঞান। সোনা ও কয়লা প্রভৃতির খনি আবিষ্কার করা। বাহ্যতঃ ইহাতে শিল্পকলার কোন স্থান দেখা যায় না। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ইহা সৌখীন অল্প ধনীদের কায বলিয়া পরিগণিত হইত।

(৪৩) বৃক্ষ আয়ুর্ব্বেদযোগ। যশোধরের মতে উদ্যানাদিতে বৃক্ষাদির রোপণ, পরিপোষণ, চিকিৎসা ও সুদৃশ্যভাবে বিন্যাস করা। বল্লভ আচার্য্য ফলের বৃক্ষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪৪) মেষ-কুক্কুট-লাবক যুদ্ধবিধি। ইহাতে শিল্প-কৌশলের স্থান আছে। কিন্তু ইহা মূলতঃ সখেরই বিষয়।

(৪৫) শুক-সারিকা প্রলাপন। নানাপ্রকার পক্ষীকে কথাবার্ত্তা ও গান করিতে শিখান। যুদ্ধাদিতে পাখীর সাহায্যে দুর্গম স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হইত। প্রণয়-বন্ধুদের দূত-রূপে এরূপ ভাবে শিক্ষিত পাখী ব্যবহার করিবার প্রথা ছিল।

(৪৬) উৎসাদন ও সংবাহন। হাত ও পা দিয়া দেহের নানা স্থান মর্দ্দন করা। ইহাতে বিস্তর শিল্প-কৌশলের প্রয়োজন। কামশাস্ত্রে যুবক-যুবতীর পক্ষে এরূপ কলা অপরিহার্য্য। ইদানীং চিকিৎসকদের মতে কোন কোন দুরারোগ্য রোগও একমাত্র মর্দ্দন-কৌশলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৪৭) কেশমার্জ্জনা-কৌশল। নৈপুণ্যের সহিত চুল বাঁধা। ইহাতে বিস্তর শিল্প-কৌশলের প্রয়োজন।

(৪৮) অক্ষর-মুষ্টিকা কথন। জীব গোস্বামী ও বল্লভ আচার্য্যের মতে মুটের ভিতর লুক্কায়িত দ্রব্যাদি আন্দাজ করিয়া বলা। কিন্তু যশোধরের মতে সাভাসা ও নিরাভাসা নামক কবিতা রচনা এবং উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, যথা লুক্কায়িত দ্রব্য অনুমান করিয়া বলা ও সংক্ষেপে কবিতা রচনা।

(৪৯) ম্লেচ্ছিত বিকল্প। যশোধরের মতে অপরের দুর্ব্বোধ্যতার বা চোরা ভাষা ব্যবহার করা।

(৫০) দেশভাষা-বিজ্ঞান। নানা দেশ প্রদেশের কথিত ও লিখিত ভাষা শিক্ষা করা।

(৫১) পুষ্পশকটিকা-নির্ম্মিতজ্ঞান। ফুলের গাড়ী তৈয়ারী করা। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পুষ্পশকটিকা ও নির্ম্মিত-জ্ঞান বলিয়া দুই বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার যশোধর দ্বিতীয় ভাগের কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। জীব গোস্বামী পুষ্পশকটিকা ও নিমিত্তজ্ঞান পাঠ দিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ ব্যাখ্যা দেন নাই। শ্রীধরস্বামী পুষ্পশকটিকা ও নির্মিতিজ্ঞান এরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই।

(৫২) নিমিত্তজ্ঞান। বল্লভ আচার্য্য সাধারণ অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাকাদির ডাক শুনিয়া শুভাশুভ নির্দ্দেশ করা। কিন্তু কামসূত্রের টীকাকার যশোধর সর্ব্বত্র কামের লীলা দেখাইতে গিয়া ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন।

(৫৩) যন্ত্রমাতৃকাঃ। যশোধরের মতে ইহার অর্থ সজীব ও নির্জীব যন্ত্রসমূহের যানোদক সংগ্রামের জন্য বিশ্বকর্ম্মা-প্রোক্ত ঘটনা শাস্ত্র।

(৫৪) ধারণ মাতৃকা। সাধারণতঃ ইহার অর্থ, সংক্ষেপার্থ কবিতা রচনা। যশোধর ইহার অর্থ করিয়াছেন, শ্রুতগ্রন্থের ধারণ বা স্মরণ রাখিবার জন্য শাস্ত্র-বিশেষ। আপাততঃ এরূপ কোন শাস্ত্রের কথা কোথাও পাওয়া যায় না।

(৫৫) সংপাঠ্য। খেলা ও তর্কবিতর্কের জন্য একরূপ গ্রন্থপাঠ। যশোধরের ব্যাখ্যা অনুসারে এক জন পূর্ব্বধারিত কোন গ্রন্থপাঠ করে, দ্বিতীয় জন না শুনিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করে।

(৫৬) মানসী কাব্যক্রিয়া। বলিবামাত্র মনে মনে কাব্য রচনা করা, কবিতার পংক্তি বলিয়া দিলে পংক্তি মুখে মুখে রচনা করা। যাহা আজকাল কবির পাঁচালী নামে পরিচিত। অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রথম অক্ষর লইয়া কবিতা রচনা করা, অথবা অপরের মনের ভাব অনুমান করিয়া কবিতার আকারে প্রকাশ করা।

(৫৭) অভিধানকোষ। শব্দের প্রতিশব্দসমূহ সংগ্রহ করিয়া বলা।

(৫৮) ছন্দোজ্ঞান। সাধারণ অর্থে ছন্দঃ জ্ঞান ও ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করা। কিন্তু যশোধরের মতে ইহার অর্থ কোন যুবা পুরুষকে দেখিবামাত্রই তাহার ছন্দোজ্ঞান ও চিত্তবৃত্তি যুবতীর অনুমান করিয়া লওয়া।

(৫৯) ক্রিয়া, বিকল্প। ধাতুরূপ প্রভৃতি ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র শিক্ষা।

(৬০) ছলিত যোগ। প্রবঞ্চনা ও ছলনা প্রভৃতি শিক্ষা করা। যশোধরের মতে ইহাও একরূপ সংক্ষেপার্থ কবিতা-বিশেষ এবং ইহার উদ্দেশ্য প্রবঞ্চনা করা।

(৬১) বস্ত্রগোপন। সাধারণতঃ ইহার অর্থ সূতার কাপড়কে রেশমী কাপড়ের মত প্রদর্শন করান। কিন্তু যশোধর এখানেও কামের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। ক্রটিত বস্ত্রকে অক্রটিতরূপে দেখান, বড় কাপড় হইলেও এরূপ ছোট করিয়া পরিধান করা যেন যুবতীর লোভনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষ অপরের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।

(৬২) দ্যূতবিশেষ। জুয়া খেলা।

(৬৩) আকর্ষ ক্রীড়া। যশোধরের মতে পাশা খেলা। কিন্তু জীব গোস্বামীর মতে কোন দূরের জিনিষকে কৌশলে আকর্ষণ করা রূপ কোন অনির্দ্দিষ্ট খেলা।

(৬৪) বালক্রীড়নক। ছেলেদের খেলিবার পুতুল তৈয়ার করা।

(৬৫) বৈনয়িক জ্ঞান। বিনয় প্রভৃতি সদাচার শিক্ষা।

(৬৬) বৈজয়িক জ্ঞান। বিজয় বা যুদ্ধের উপযোগী ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা।

(৬৭) ব্যায়ামিক জ্ঞান। শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি শিকার করা।

এই তালিকা হইতে সহজেই দেখা যাইবে যে, অনেক বাদ দিয়া ধরিয়াও 'চৌষট্টি' কলা বলিয়া যে মামুলী কথা আছে, তাহা মিলাইতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুসংখ্যক টীকাকার কিংবা ললিতবিস্তরের গ্রন্থকার ইহা মিলাইতে পারেন নাই। উত্তরাধ্যয়নসূত্রে চৌষট্টির পরিবর্ত্তে 'বাহাত্তর' সংখ্যা বলা হইয়াছে। কামসূত্রের গ্রন্থকার বাৎস্যায়নও তাহা মিলাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার টীকাকার যশোধর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, চৌষট্টি মূলকলা মাত্র। এইগুলিকে ৫১৮ প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে।

এই চৌষট্টি মূলকলা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। মূল কলাসমূহের মধ্যে যশোধর বলেন, চব্বিশটি প্রয়োজনীয় শিল্প, যথা—গীত, নৃত্য, বাদ্য, লিপিজ্ঞান, বচন, চিত্রবিধি, পুস্তক কর্ম্ম, পত্রচ্ছেদ্য, মাল্যবিধি, আস্বাদ্য বিধান, রত্নপরীক্ষা, সীব্য বা সেলাই কায, রঙ্গপরিজ্ঞান, উপস্করণক্রিয়া, মানবিধি, আজীবজ্ঞান, তির্য্যগ্‌যোনি-চিকিৎসা, মায়াকৃত পাষণ্ড সময়জ্ঞান, ক্রীড়া-কৌশল, লোকজ্ঞান, বিচক্ষণতা, সংবাহন, শরীরসংস্কার ও বিশেষ কৌশল। কুড়িটি জুয়াখেলার অন্তর্গত, তাহার মধ্যে পনরটি নির্জীব, যথা আয়ুঃপ্রাপ্তি, অক্ষবিধান, রূপসংখ্যা, ক্রিয়ামার্গ, বীজগ্রহণ, নয়জ্ঞান, করণ আদান, চিত্র-অচিত্রবিধি, গূঢ়রাশি, তুল্য অভিহার, ক্ষিপ্রগ্রহণ, অনুপ্রাপ্তি, লেখাস্মৃতি, অগ্নিক্রম, ছলব্যামোহ ও গ্রহদান এবং পাঁচটি সজীব, যথা—উপস্থানবিধি, যুদ্ধ, রুত বা রোদন, গীত ও নৃত্য। শয়ন উপচারিকা ষোলটি, যথা—পুরুষের ভাবগ্রহণ, স্বরাগপ্রকাশ, প্রত্যঙ্গদান, নখদন্তের বিচার, পরমার্থে কৌশল, হর্ষণ, সমানার্থতা, কৃতার্থতা, অনুপ্রোৎসাহন, মৃদুক্রোধ প্রবর্ত্তন, সম্যক্ ক্রোধনিবর্ত্তন, ক্রুদ্ধের প্রসাদন, শয্যা পরিত্যাগ, চরম স্বাপ বা শয়নবিধি। শেষ চারিটি উত্তর-কলা, যথা—অশ্রুপাতের সহিত বিহারের জন্য শয়ন করা, প্রস্থিতের অনুগমন ও পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ ইত্যাদি। এই সকল যুবতীজনসুলভ কলা। ইহাতে সকলে সমানভাবে পারদর্শী নহে। ইহাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় অশ্লীলতা দোষের আশঙ্কা আছে। বস্তুতঃ যশোধর কামসূত্রের (অধ্যায় ৩) ব্যাখ্যায় নিজেই বলিয়াছেন যে, এই সকল কলা কন্যা গোপনে একাকী অভ্যাস করিবে। বলা বাহুল্য, এই তালিকার কোন কোন কলা কেবল পুরুষের শিক্ষার বিষয়, আবার কোন কোন কলা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষণীয়।

এই তালিকায় যশোধর চৌষট্টি কলা মিলাইয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সহিত কামসূত্রের তালিকার মিল নাই; শ্রীমদ্ভাগবত, ললিতবিস্তর ও উত্তরাধ্যয়নের তালিকার সহিত ত মিলিবার কথাই নহে।

বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্রে (অধ্যায় ৩) শিল্পকলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। শিল্পকলায় পারদর্শী রূপ (গুণ) যৌবন ও শীলতাসম্পন্ন বেশ্যাও লক্ষ্যভূত ও সকলের প্রার্থনীয় হয়, রাজসভায় ও গুণিসমাজে পূজিত হয়।

রাজপুত্রী ও বড়লোকের মেয়েরা সহস্র সপত্নী সত্ত্বেও স্বামীকে নিজের বশে রাখিতে পারে এবং পতিবিয়োগে দারুণ ব্যসনগ্রস্ত হইয়া দেশান্তরেও নিজের শিল্পকুশলতার গুণে সুখ ও সম্মানের সহিত জীবনযাপন করিতে পারে। আর কলাকুশল পুরুষ অনতিবিলম্বে অপরিচিত স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে এবং দেশ-কালের অপেক্ষা না করিয়া শিল্পকলার ব্যবসায় দ্বারা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাদি উপার্জ্জন করিয়া সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০, ৪৫, ৩৩-৩৫) কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য, ললিতবিস্তরে (অধ্যায় ১) বোধিসত্ত্বের শিক্ষার জন্য এবং উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে (২১,৬-৭) মহাবীরের শিক্ষাসমাপ্তির জন্য শিল্পকলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে ৬৪ কলাতেই সমানভাবে দক্ষ হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহা হইলেও শিল্পকলা-বিশেষে সুদক্ষ না হইতে পারিলে নর-নারী—উভয়েরই শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

রূপ-যৌবনই শিল্পের জীবন। ইহাই শিল্পকলা সমালোচনার

েষ ও মুখ্য তত্ত্ব। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় সম্প্রদায় ও জাতি-বিশেষেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু যৌবন বয়স নিরপেক্ষ। যুবকের মধ্যেও অকালবার্দ্ধক্য দেখা যায়, বৃদ্ধের মধ্যেও যৌবনের জোয়ার উঠে। যৌবনের ষোল কলায় পরিপূর্ণ অবস্থায়ও বুদ্ধ রূপসী স্ত্রী, অনতিপ্রসূত শিশু সন্তান, অসীম রাজসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া ভিতরে বা'হিরে বৈরাগী হইয়াছিলেন। প্রায় সেরূপ বয়সেই সংসার ত্যাগ করিলেও শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ের বৈরাগ্য ছিল না; শুদ্ধা প্রেমভক্তির প্রবাহ ছিল। নবদ্বীপের সংকীর্ত্তন ও বৃন্দাবনলীলা তাহার প্রমাণ। যতই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়াস থাকুক না কেন, গোপীসখা রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শিরোমণি, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, এলেন টেরীর ন্যায় নটী প্রায় আশী বৎসর বয়সের সময়ও ষোড়শী যুবতীর ভুমিকা অভিনয় করিয়া সমজদার দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের বৃদ্ধকালের 'শেষের কবিতা,' যৌবনের 'চোখের বালি' 'নৌকা-ডুবির' কাব্যরসের ন্যূনতায় হীন নহে।

ফ্রাঙ্ক ক্রেণ সত্যই বলিয়াছেন যে, যৌবন জীবনের বিশেষ কোন বয়সের উপর নির্ভর করে না, ইহা মনের একটা অবস্থামাত্র। জীবন-উৎসের নবীনত্বের উপরই যৌবন নির্ভর করে। ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় সম্প্রদায় ও জাতিবিশেষেও নিজেকে অজর ও অমর মনে করিতে না পারিলে বিদ্যা ও অর্থের চিন্তা করিতে পারে না। জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতির পক্ষে শিল্পচর্চ্চা অসম্ভব। ভোগীর জন্যই শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি, ত্যাগীর জন্য নহে।

এই সকল সত্য ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় সম্প্রদায়-বিশেষের উদাহরণ হইতেও বু'ঝতে পারা যায়। ত্যাগের ভিতর দিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি। বুদ্ধ স্বয়ং অকালে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য-সম্পদ্ ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে 'শিবম্ সুন্দরম্'-এর কোন স্থান নাই। বুদ্ধের উপাসক ও উপাসিকারা নির্জীবতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষে মাথার চুল, দেহের বস্ত্র পর্য্যন্ত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। নৃত্য-গীতের অবসর ছিল না। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের দ্বারা রসনা সরস করার উপায় ছিল না। উপাসনার জন্য মূর্ত্তি বা মন্দিরের প্রয়োজন হইত না। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের আদিম স্তূপ রাশীকৃত পাথরের ঢিবিমাত্র। যখন স্তূপের সঙ্গে সুদৃশ্য স্তম্ভ প্রভৃতি যোগ হইতে লাগিল, তখন বৌদ্ধ জৈন উভয়ই মূর্ত্তিপূজক ও সৌন্দর্য্যসেবক হইয়া উঠিয়াছিল।

মক্কার মরুভূমিতে মুসলমান ধর্ম্মের জন্ম। ইস্‌লাম ত্যাগের ধর্ম্ম না হইলেও ইহা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী। সুতরাং ইস্‌লামে মন্দির বা উপাসনাগৃহের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কোরাণে নির্দ্দেশ আছে যে, পায়খানা ও পয়োধি ব্যতীত সর্ব্বত্রই নমাজ পড়া যাইতে পারে। ফলে মসজিদে কোনরূপ ভাবের অভিব্যক্তি নাই। তিন বা পাঁচ গম্বুজযুক্ত মসজিদে বাস্তু-শিল্পের নিপুণতা দেখা যায় না। ক্যানিংহাম সত্যই বলিয়াছেন যে, মুসলমানরা প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিত, কিন্তু তাহাতে না ছিল রূপ, না ছিল ভাব। ইস্‌লামের পুরোহিত মোল্লা, মৌলবী ত্যাগী নহেন, গৃহী। কিন্তু উপাস্য দেবতা অশরীরী, বাক্য ও মনের অগোচর। ইস্‌লামের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ গদ্যে লেখা, তাহাতে কবিত্বের অবসর নাই। নৃত্য গীত অভিনয়া'দি ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সে জন্য ইস্‌লাম হইতে কোনরূপ শিল্পকলার উৎপত্তি বা উৎকর্ষ হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধপ্রিয় মুসলমানের 'নবাবী' বা সৌখীনতা অন্য দিক্ দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পকৌশলপরিপূর্ণ দুর্গ যুদ্ধ ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে নির্ম্মিত। তাজমহল ও সেকেন্দ্রা প্রভৃতি স্মৃতি-সৌধ ধর্ম্মের দিক্ হইতে উৎপন্ন নহে। তাহা মূলতঃ মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তি সা'ারণের নিকট জীবিত রাখিবার ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন। অর্থাৎ ধর্ম্মের দিক্ দিয়া মুসলমান জাতি শিল্পের চর্চ্চা করিবার অবসর মোটেই পায় নাই, ভোগ ও লালসার দিক্ দিয়াই তাহারা একরূপ প্রধান শিল্পপ্রিয় লোক হইয়া উঠিয়াছিল। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিপুণতা, অশন-বসনের পারিপাট্য, বিবাহবিষয়ে অতুলনীয় পরিব্যাপকতা ও স্বাধীনতা ভোগ-বিলাসেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

বুদ্ধদেব যেমন ত্যাগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, মহম্মদ যেমন ভোগের জন্য একতা ও দলবদ্ধতারূপ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যিশু খৃষ্ট সেরূপ প্রেমের ধর্ম্ম সৃষ্টি করেন। রূপ-যৌবনের অনতিক্রমণীয় অবাধ প্রেম হইতেই খৃষ্টের জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই ঘটিয়াছিল। সে জন্যই খৃষ্টধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। গির্জ্জায় গির্জ্জায় কেবল খৃষ্টের মূর্ত্তি নহে, ফাঁসিকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত সুরক্ষিত। উপাসক-উপাসিকা ক্রুশের প্রতিমূর্ত্তি জপের মালার মত বক্ষে ধারণ করে। মূলতঃ মূর্ত্তিরই উপাসনা

হয় বলিয়া মন্দির বা গির্জ্জা ছাড়া খৃষ্টীয় উপাসনা অসম্ভব। মুসলমানদের ন্যায় খৃষ্টিয়ানরাও সমবেত হইয়া উপাসনা করে। কিন্তু খৃষ্টীয় উপাসনায় গান ও বাজনা একান্ত আবশ্যক। উপাসনা-দিনের জন্য খৃষ্টানদের সুন্দরতম পোষাকের ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ রূপ-যৌবনের অভিব্যক্তি যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উন্নতিলাভ করিতে পারে, সে সমুদয়ই গির্জ্জায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের পুরোহিত পাদরী ত ত্যাগী নহেই, পরন্তু আমাদের পক্ষে একটু অতিরিক্ত ভোগী বিলাসী বলিয়াই মনে হয়। গান, বাজনা, নাচ, পানাদি ও শিকার পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যবসায়-বিরোধী নহে। সমবেত বা কোরাসে কিশোর দলের ধর্ম্মগান উপাসনার প্রথম অঙ্গ। বাইবেল্ পদ্যে লেখা এবং কবিত্বপরিপূর্ণ। গানবাজনা কেবল গির্জ্জাতেই আবদ্ধ নহে। আহার-বিহার, জন্ম-মৃত্যু, যুদ্ধ-বিগ্রহ গান-বাজনা ব্যতীত খৃষ্টীয়ানদের চলিতেই পারে না। ফলে গির্জ্জাতেই বাস্তশিল্পের নিপুণতা এবং অন্যত্র প্রায় সকল বিষয়েই কারুকার্য্যের পারদর্শিতা খৃষ্টীয়ান জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একাধারে বুদ্ধের ত্যাগ, ইসলামের একতা ও ভ্রাতৃত্বভাব ও খৃষ্টের প্রেমের অভিব্যক্তি আছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস সাধারণ জীবনের চারি বিভাগ। কিন্তু শঙ্কর আচার্য্য প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিত। ত্যাগী হইলেও সন্ন্যাসিদলের একতা, ভ্রাতৃত্বভাব ও দলবদ্ধতা ইস্লামের 'আল্লা হো আকবরের' শব্দে সমবেত মুসলমানদলের একভাব হইতে কোন অংশে হীন নহে। উদ্দেশ্যবিহীন অনুষ্ঠান পালনের জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে, এরূপ নিয়মও হিন্দুধর্ম্মের মত অন্যত্র দেখা যায় না।

জ্ঞানমার্গচারী সন্ন্যাসী যোগীর ত্যাগের কঠোরতা ও কর্ম্মপন্থীর আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের গোঁড়ামীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি-পথাবলম্বীর দ্বিবিধ প্রেমের লীলাও ধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিল, এরূপ অনুমান অতিরঞ্জন নহে। এক দিকে তান্ত্রিক উপাসনায় যেমন মদ্য মাংস মহিলাদি পঞ্চদ্রব্যের ব্যবহার হইত, অন্য দিকে তেমনই ধর্ম্মের নামে পবিত্র কৃষ্ণলীলার ব্যর্থ অনুকরণে বিলাসিতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

খৃষ্টান পাদরীর ন্যায় হিন্দু পুরোহিতও সাধারণতঃ গৃহী, কিন্তু তাদৃশ বিলাসী হওয়া হিন্দু পুরোহিতের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। দলবদ্ধ হইয়া উপাসনা করা সাধারণ নিয়ম না হইলেও নৃত্য-গীত উপাসনার প্রধান সহায়। হিন্দুদেরও জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই নৃত্য-গীতের প্রয়োজন। পূজার নৈবেদ্য সুচারুভাবে প্রস্তুত, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অন্ন-ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি ষোড়শ উপচারে শিল্প-কৌশলের সহিত সজ্জিত করিয়া দেওয়া সাধারণ নিয়ম। উপাস্য দেবতার ধ্যান সুললিত ছন্দোবদ্ধ কবিতা। স্তোত্র-সমূহ কবিত্বে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের মূলগ্রন্থ বেদ পদ্যে লিখিত। সামবেদ গীতিপুস্তিকা নামেই পরিচিত। স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতি পদ্যেই লিখিত। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ ও সূত্রাদি প্রভৃতি কয়েকটি টীকা-গ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃতের অসংখ্য বিজ্ঞান রাজনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ পদ্যেই লিখিত।

নিরাকারের উপাসনা চরম উদ্দেশ্য হইলেও ধ্যানাদির দ্বারা মূর্ত্তিরই পূজা করা হয়। বৈদিক যুগ হইতেই উপাস্য দেবতা সহস্রশির, সহস্রচক্ষুর্বিশিষ্ট পুরুষ হইয়া পড়িয়াছেন। পৌরাণিক যুগে উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি স্থলবিশেষে বিসদৃশ রূপ ধারণ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ষষ্ঠী দেবীর মূর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কালীর করালী মূর্ত্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের রসিক-চূড়ামণির মূর্ত্তির মতই রূপ ও যৌবনের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রদায়-বিশেষে মূর্ত্তিপূজা যে পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের দেবায়তন ও মন্দিরাদিও সে অনুপাতে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই ইহার বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। ত্যাগী সন্ন্যাসীর উপাসনার জন্য মন্দিরের প্রয়োজন হয় নাই, শিল্প-কৌশলবিহীন মঠ বা গুহাই তাহাদের আশ্রয়স্থান। অনুষ্ঠানপালন মাত্র কর্ম্মের জন্যও বিশেষ কোন মন্দিরের আবশ্যক হয় না। ব্রাহ্ম প্রভৃতি মূর্ত্তি পূজার বিরোধী হিন্দুর শাখা সম্প্রদায়-বিশেষের উপাসনা-স্থান সুরম্য হর্ম্ম্য নহে, বক্তৃতা করিবার উপযোগী শিল্প-কৌশলবিহীন সভাস্থান বা হল-ঘর মাত্র। ভক্তিমার্গের অভিসারক মূর্ত্তিপূজকের প্রেমপাত্রের অভ্যর্থনার জন্যই মূলতঃ মন্দির-শিল্পের সৃষ্টি। বৈদিক যুগের যজ্ঞকুণ্ড হইতে মন্দিরের উৎপত্তি, তাহা লেখকের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে দেখান হইয়াছে। হিন্দুর দেবায়তনই শিল্পের হিসাবে বিশেষ গৌরবের বিষয়। হিন্দুমন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল ও ব্যয়-বাহুল্যতার আভাস

মাত্র দেওয়ার অবসরও এ স্থলে নাই। লেখকের ভারতীয় শিল্প ও 'হিন্দু শিল্পের অভিধান' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণের ব্যবস্থাও প্রেম-প্রণোদিত ভক্তিমার্গের উপাসকের পক্ষেই প্রযোজ্য।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে মনে হইতে পারে যে, হিন্দুর শিল্পকলা ধর্ম্মমূলক। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য। ধর্ম্মমূলক হইলেও হিন্দু-শিল্প অন্যদিক দিয়াও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে তাহার প্রমাণ আছে। টীকাকার যশোধর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, চতুর্ব্বর্গের মধ্যে অর্থ ও কামের চরিতার্থতার জন্যই শিল্পকলা-চর্চ্চার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সে জন্যই শিল্পচর্চ্চার অধিকারী যুবক-যুবতী এবং প্রধান উপকরণ রূপ ও যৌবন। এই কথাটা জাতি ও দেশ-বিশেষের ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেও উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আফিং খাইয়া চীনদেশ যখন জরাগ্রস্তের মত ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সময় হইতে চীনবাসী সুপ্রসিদ্ধ চীন-প্রাচীর উঠাইবার কৌশল, সাহস ও সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। আফ্রিকার 'পিরামিড' ও নশ্বর দেহের রক্ষণোপযোগী 'মামী' নির্ম্মাণের আকাঙ্ক্ষা ও কৌশল মিশরের রাজন্যবর্গের স্বপ্নেরও অগোচর হইয়া পড়িয়াছে তখন, যখন নানা রাজনৈতিক কারণে আফ্রিকার আদিম দেশবাসীর দেহ ও হৃদয় রূপযৌবনবিহীন হইয়া সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীসীয় ও রোমীয় শিল্পেও এক্ষণে আর রূপ-যৌবনের সেরূপ অভিব্যক্তি দেখা যায় না। হিন্দুরাও এক্ষণে আর সুদূর সাগরপারে বুরুবোদরের হর্ম্ম্যশ্রেণীর ন্যায় মন্দিরনির্ম্মাণ করিবার ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। বাঙ্গালাদেশের "মসলিন" নামক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নকারী তাঁতি-জোলার হাত এক্ষণে খাদি-খদ্দর প্রস্তুত করিতে অপারগ। পক্ষান্তরে, জাপানীর অনুকরণ-দক্ষতা, ফরাসীর নিত্যনূতন সৌখীনতা, ইংরাজের সর্ব্বগ্রাহিতার পারদর্শিতা, জর্ম্মাণের অসামান্য দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, এবং আমেরিকাবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া মনে হয় যে, এ সকল দেশ ও জাতি রূপ-যৌবনের উদ্দামতা অতিক্রম করিয়া কখনও জরা-মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে না। প্রধানতঃ এই কারণে এ সকল দেশে শিল্পের চর্চ্চা ও আবিষ্কার দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে, তাহা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও রাজনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতার অপেক্ষা করিয়া শিল্পচর্চ্চা ছাড়িয়া দেওয়া বা স্থগিত রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে যে, যাহাদের যত্ন-চেষ্টার ফলে নূতন নূতন শিল্পের আবিষ্কার ও উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অখ্যাতনামা দরিদ্রের সন্তান। সৌখীনতা স্বচ্ছলতা-সাপেক্ষ হইলেও রূপ, যৌবন, বোধ, যাহা শিল্পের উপকরণ, তাহা রং ও বয়সের ন্যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আর্থিক সমৃদ্ধিমূলক নহে। তাহা অধিকাংশে চিত্তবৃত্তি বা সৌন্দর্য্য-বোধের উপরেই নির্ভর করে। যাহারা সীঁতির সিন্দূর ও কপালের টিপ, পাউডারে মুছিয়া ফেলিয়াছে, বুটজুতার ভিতরে যাহাদের পায়ের আলতা ঢাকা পড়িয়াছে, যাহাদের মাথার ঘোমটা, বুকের কাপড় ও বাহুর আবরণ চলিয়া গিয়াছে, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক স্বাধীনতা থাকিলেও তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। রূপ-যৌবন থাকিলেও যাহাদের সৌন্দর্য্যবোধ নাই, তাহারা শিল্পচর্চ্চার অধিকারী হইতে পারে না। মরুভূমিতে প্রোথিত বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। সবুজ পত্র, সুন্দর ফুল ও সুমিষ্ট ফল রসহীন লতাগুল্ম ও তরুতে জন্মিতে পারে না। ফলতঃ ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি ও দেশবিশেষে সৌন্দর্য্য-বোধই শিল্পকলা-প্রচারের পরিচালনা-শক্তি। শিল্পের সৌন্দর্য্যবোধ শিল্পজ্ঞানসম্ভূত। আমাদের দেশে শিল্প-শাস্ত্রের অধ্যয়ন হইতেই শিল্পের জ্ঞানলাভ সম্ভব। আমাদের শিল্পশাস্ত্রের ৫ শত ১৮ শ্রেণীর আবিষ্কার অসম্ভব হইলেও বহু শতসংখ্যক শিল্পের গ্রন্থ এখনও পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। তাহা দেশের ও দশের কর্ত্তব্য।

ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য (অধ্যাপক)
(আই, এস, এম, এ; পি, এইচ, ডি; ডি, লিট)।

১৬
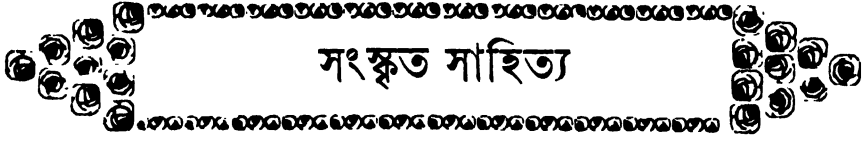
"বিবাহকালে সীতার বয়স কত ?"

[প্রতিবাদের উত্তর]

গত মাঘ মাসের মাসিক বসুমতীর ৫২২ পৃষ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী) মহাশয়, গত আষাঢ় মাসের উক্ত পত্রিকায় আমার লিখিত "বিবাহকালে সীতার বয়স কত" শীর্ষক অসমাপ্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদটি যদি কেবল আলোচ্য রামায়ণানুগত প্রকৃত "প্রতিবাদ" হইত, তবে আমার বক্তব্য কিছুই থাকিত না। কেন না, আমিই উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারকালে সবিনয়ে বলিয়াছি—"যদি কোন মনস্বী এই সকল স্থলের কোনরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন, জানাইলে কৃতার্থ হইব।" সুতরাং প্রতিবাদ-নামক কোন প্রকৃত সমাধান পাইলে আমি কৃতার্থই হইতাম। দুঃখের বিষয় এই যে, মিত্র মহাশয় এক জন প্রবীণ এবং চক্ষুষ্মান্ লেখক হইয়াও, আমার প্রবন্ধে, যে সকল কথা আমি আদৌ বলি নাই, প্রত্যুত যেরূপ কথার আমি ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছি, সেই কথা আমি বলিয়াছি বলিয়া, এবং সেইরূপ কথার মৎকৃত প্রতিবাদ চাপিয়া গিয়া ভাষার কৌশলে একটা বৃথা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ক্রমে দেখাইতেছি। পাঠকগণই বিচার করিবেন।

প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, মিত্র মহাশয়, বোধ হয়, একটু রোষোদ্ধশোণিত হইয়া, "সংস্কার-ধ্বজী"—"বালক-বালিকাদিগকে ভুল বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া"—"সংস্কারধ্বজীরা,—আমাদের গৌরবের দিনে, রামায়ণের দিনে, এইরূপ বিবাহ ছিল না—রাম-সীতা যুবক-যুবতী ছিলেন,—তাহা দেখাইবার চেষ্টা"—করেন, ইত্যাদি নিতান্ত অমিত্র বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। করুন, কিন্তু ঐরূপ বাক্য-প্রয়োগে তাঁহার প্রকৃত বক্তব্যের কোনই উপকার হয় নাই। তিনি আরও অনেক তীব্রোক্তি করিয়াছেন, তাহা আমি আর উদ্ধৃত করিতে চাহি না। মৌনাবলম্বনই সঙ্গত মনে করি। উক্ত "প্রতিবাদে"র বহু স্থানে—কতকগুলি মিথ্যার আরোপ করা হইয়াছে। যেমন ৫২৩ পৃষ্ঠে "এখন দেখা যাউক, উপরি-উক্ত স্থলগুলি প্রক্ষিপ্ত বলা হইতেছে কেন"।—কে "প্রক্ষিপ্ত" বলিল? আমার প্রবন্ধের কোন স্থলেই ত ওরূপ বলা হয় নাই। আমাদের বসুমতী দেখিলেই ত প্রতিপন্ন হইতে পারে। হঠাৎ—ঐরূপ একটা কল্পিত অসত্য নির্ম্মাণ এবং পরে তাহারই সমাধানের ছলে—ত্রেতার ব্যাপার প্রমাণ করিতে গিয়া কলির—বিংশ শতাব্দীর আদম সুমারীর গণনার অঙ্কপাতের কি কারণ, ঠিক বুঝিলাম না। উক্ত পৃষ্ঠেই—"বেজায় অসঙ্গত বলার কোন কারণ দেখা যায় না"—লিখিয়াছেন। কে "বেজায় অসঙ্গত" বলিল? মিত্র মহাশয় মদীয় প্রবন্ধের কোন্ স্থানে—কত পংক্তিতে ঐ "বেজায় অসঙ্গত"—উক্তি দেখিয়াছেন,—বলিলে বাধিত হইব। উক্ত পৃষ্ঠেই "কেন ভয়ানক অসঙ্গত, তাহা ত বুঝিলাম না।" মদীয় প্রবন্ধের কোন্ স্থলে মিত্র মহাশয় ঐ "ভয়ানক অসঙ্গত" উক্তিগুলি পাইয়াছেন, দয়া করিয়া দেখাইলেই—পাঠকগণের সন্দেহ-ভঞ্জন হইতে পারে। ঐ প্রকার—বহু স্থলে,—আমার প্রবন্ধে যাহা নাই, যাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই,—লেখা ত দূরের কথা, সেইরূপ প্রতিবাদ-যোগ্য কথার সৃষ্টি করিয়া মিত্র মহাশয় কি সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ আর তুলিতে প্রবৃত্ত হয় না। পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ,—তাঁহারা গত আষাঢ় মাসের বসুমতীর আমার প্রবন্ধ এবং গত মাঘ মাসের বসুমতীর মিত্র মহাশয় কৃত প্রতিবাদ—এই দুইটি প্রবন্ধ একবার মিলাইয়া পাঠ করিবেন। এই দুইটিই যখন মুদ্রিত হইয়াছে, তখন আর অধিক তুলিয়া—দেখাইবার এবং দেখাইয়া প্রতিবাদকর্ত্তার অধিকতর রোষের ভাজন হইবার প্রয়োজন নাই। এখন প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুসরণ করি।

"ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্দ্ধমানাং মমাত্মজাম্।
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব॥"—বালকাণ্ড,
৬৬ সর্গ ১৫ শ্লোক।

"ক্রমে আমার অযোনিসম্ভবা কন্যা যখন 'বর্দ্ধমানা' (প্রাপ্তযৌবনা) হইলেন" ইত্যাদি।—এই স্থলে মৎকৃত বঙ্গার্থের প্রসঙ্গে মিত্র মহাশয় বলিতেছেন—"বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদিও শ্লোকগুলি তুলিয়াছেন, তথাপি তাহার বাঙ্গালা অর্থ লিখিবার সময়ে লিখিলেন"—বলিয়াই মৎকৃত বন্ধনীমধ্যগত "প্রাপ্তযৌবনা"—শব্দটি যেন আমারই নবীন কল্পনাপ্রসূত,

—এইরূপ মত প্রকাশ এবং আমি কোন "মান্য মত উদ্ধৃত" করি নাই, বলিয়া ঐ প্রকার অর্থের অকিঞ্চিৎকরত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, মিত্র মহাশয়ের এ কথারই বা কি মূল্য।

রামায়ণের ঐ শ্লোকের বঙ্গার্থ করিতে যাইয়া, বাঙ্গালা সন ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত রামায়ণ ও তাহার অনুবাদে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"পরে ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই কন্যা যৌবনসম্পন্না হইলে,—অনেক রাজা আসিয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিলে—" ইত্যাদি। সুতরাং 'বর্দ্ধমানা" শব্দের "প্রাপ্তযৌবনা" অর্থ নূতন নহে। আর উক্ত "মত"ও যে "মান্যমত" নহে, ইহাও কি মিত্র মহাশয় বলিতে চাহেন? উক্ত প্রতিবাদের স্থানান্তরে (বসুমতী, মাঘ, পৃঃ ৫২৪। ক)

"পতি-সংযোগ-সুলভং বয়োঽবেক্ষ্য পিতা মম।
চিন্তামভ্যাগমদ্ দীনো বিত্ত-নাশাদিবাধনঃ॥"

(অযোঃ ১১৮ সর্গ ৩৪ শ্লোক)

এই শ্লোকের মৎকৃত "আমার পতিসংযোগসুলভ বয়স দেখিয়া পিতা একান্ত চিন্তিত হইলেন—" এই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মিত্র মহাশয় বলিতেছেন,"ইহা হইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুমান করিলেন যে, কন্যা প্রাপ্তযৌবনা," ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া আমার এই কথা যে "অত্যন্ত অসঙ্গত" এবং "এরূপ অনুমান করার কোন সঙ্গত কারণ নাই, এবং সীতার নিজের কথা যে প্রক্ষিপ্ত এবং তৎসঙ্গে অন্যস্থানগুলিও প্রক্ষিপ্ত, এ কথা বলিবার কোন ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত কারণ দেখা যায় না"—বলিয়া মিত্র মহাশয়—নিজেই তাঁহার—"ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত" রায় দিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য—"সীতার নিজের কথা" ও "তৎসঙ্গে অন্য স্থানগুলিও প্রক্ষিপ্ত"—এ কথাগুলি মিত্র মহাশয় কোথায় পাইলেন? আমার প্রবন্ধের মধ্যেও এ সব স্থল "প্রক্ষিপ্ত"—এরূপ কোথাও বলা হয় নাই। এই ভাবে টানিয়া আনিয়া কলহ-প্রবৃত্তির হেতু কি? আর তার পর আমি "পতি-সংযোগ-সুলভ" শব্দের অর্থ করিতে গিয়া "প্রাপ্তযৌবনা"—অর্থ "অনুমান" করিয়াছি, ইহা বলিতে মিত্র মহাশয় সঙ্কোচবোধ করুন না করুন, তাঁহার ন্যায় এক জন প্রবীণ ভূয়োদর্শী ও সুলেখকের এইরূপ অর্ব্বাচীন উক্তিতে আমিই অত্যন্ত সঙ্কোচানুভব করিতেছি। কেন না, বাল্মীকি রামায়ণের ঐ শ্লোকের "পতি-সংযোগ-সুলভ" শব্দের "প্রাপ্তযৌবনা"—অর্থ—আমার "অনুমান"-জাত নহে। ঐ অর্থই প্রাচীন পণ্ডিতগণ-সম্মত এবং সম্প্রদায়াগত। কেন, তাহা বলিতেছি।

রামায়ণের প্রায় চল্লিশখানি প্রাচীন টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বজনমান্য টীকা দুইখানি। "কতক" নামক টীকা ও গোবিন্দরাজ-কৃত রামায়ণ-ভূষণাখ্যা টীকা। "কতক" টীকার রচয়িতার নাম নাই। ইহাই প্রাচীনতম। বারাণসী সংস্কৃত কলেজ-পুস্তকালয়ে এবং তাঞ্জোর প্যালেস পুস্তকালয়ে এই দুই স্থলে উহার হস্তলিখিত দুইখানি পুঁথি আছে মাত্র। আর গোবিন্দরাজের টীকা কিছুদিন পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গোবিন্দরাজের মনু-টীকা আদর্শ করিয়াই কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার টীকা নির্ম্মাণ করেন। গোবিন্দরাজ নিজেই রামায়ণ-টীকায় ১১২১ শক কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে ১৮৫০ শক, সুতরাং গোবিন্দরাজ এখন হইতে ৭৩৯ (সাত শত উনচল্লিশ) বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তাঁহার টীকার বহু স্থলে "কতক" টীকার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের "পতি-সংযোগ-সুলভ" শব্দের অর্থ করিতে গিয়া গোবিন্দরাজ বলিয়াছেন, "পতিসংযোগং বিনা স্থাতুং অশক্যযৌবনাবস্থাং—ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ পতির সহিত সংযোগ বিনা থাকিতে অসমর্থ যে যৌবনাবস্থা, তদ্‌যুক্ত বয়ঃক্রম। সুতরাং ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বেও যে পদের যে অর্থ, যেরূপ তাৎপর্য্য পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত ছিল, আমি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছি মাত্র। "অনুমান" করি নাই।

সুপ্রসিদ্ধ "মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্যত"কার এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট গ্রন্থরচয়িতা নাগেশভট্ট এবং রামেশ্বর ও মহেশ্বর তীর্থও স্ব স্ব রামায়ণ-টীকায় ঐ "পতি-সংযোগ-সুলভ" পদের কি তাৎপর্য্য, কি অর্থ করিয়াছেন, মিত্র মহাশয় জিগীষু না হইয়া জিজ্ঞাসুভাবে তাহা দেখিলেই ঐ অর্থ যে আমার "অনুমান" নহে এবং উহাই যে প্রকৃত অর্থ, তাহা অন্ততঃ মনে মনেও বুঝিতে পারিবেন। যদি প্রয়োজন হয়, পরে আমিই উহা প্রদর্শন করিব। রামায়ণের উপর পুস্তক লিখিবার বাসনায় আমিই উহা সংগ্রহ করিয়াছি।

এক্ষণে মিত্র মহাশয়ের অন্যতম প্রধান (?) আপত্তিমূলক

স্থলটাই দেখা যাউক। বালকাণ্ডের সাতাত্তর সর্গের তের ও চৌদ্দ শ্লোক এই :—

"দেবতায়তনান্যাশু সর্ব্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্ব্বা রাজসুতাস্তদা॥ ১৩
রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ সহিতা রহঃ।
কুমারাশ্চ মহাত্মানো বীর্য্যেণাপ্রতিমা ভুবি॥" ১৪

এই স্থলে দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের সোজাভাবে এই অর্থ হয়—তার পর (অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের অভিবাদ্যদিগের যথাবিধি অভিবাদনাদির পর) সমস্ত রাজকন্যা—অর্থাৎ সীতা, মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা ও শ্রুতকীর্ত্তি—এই চারি ভগিনী স্ব স্ব পতির সহিত নির্জ্জনে আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। মিত্র মহাশয় "শব্দকল্পদ্রুমে" "রম" ধাতুর অর্থ ক্রীড়াই পাইয়াছেন, "রতিক্রীড়া" পান নাই। সুতরাং তাঁহার মতে রাজকন্যারা নির্জ্জনে স্ব স্ব "অল্পবয়স্ক" পতিদের সহিত খেলাধূলা করিয়াছিলেন। এই প্রকার অর্থ করিলেই সীতা প্রভৃতি যে খুব ছোট মেয়ে ছিলেন, ৬।৭ বৎসরের ছিলেন, তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা। বিশেষতঃ যখন "শব্দকল্পদ্রুমে" রম ধাতুর অর্থ "রতিক্রীড়া" নাই, তখন আর কথা কি? এ স্থলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই,—শুধু এখানে কেন, তাহা হইলে কোন স্থলেই ত রম ধাতুর অর্থ "রতিক্রীড়া" হইতে পারে না, যেহেতু, শব্দকল্পদ্রুমে ঐ অর্থ নাই। তাহা হইলে অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে রতিক্রীড়া অর্থে যে রম ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, উহা নিশ্চয়ই মিত্র মহাশয়ের মতে অপপ্রয়োগ, কেন না, শব্দকল্পদ্রুমে উহা নাই। প্রয়োজন হইলে, বেশী নহে, এক শত কি দেড় শত স্থলে—রম ধাতু যে রতিক্রীড়া-বাচক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইব। এক কালি-দাসেই বহু স্থলে আছে। মাঘ-নৈষধে, রামায়ণ-মহাভারতে, যে কোন পুরাণেও অসংখ্য। রতিক্রীড়াবাচক ক্রিয়াপদ রম ধাতুতেই শতকরা ৯৯টি নিষ্পন্ন হয়। "রেমিরে" এই ক্রিয়াপদে মিত্র মহাশয় অশ্লীলতা দেখিয়া চমকাইতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও মাহাত্ম্যে এবং সত্যবাক্ ঋষির বাক্যে উহাতে অস্মাদৃশ অল্পজ্ঞান ব্যক্তিরা আদৌ কোন দোষ দেখিতে পায় না। ক্রীড়্ ও খেল্ ধাতুর অর্থও খেলা, রম্ ধাতুর অর্থও খেলা, কিন্তু এই দুই খেলার ভিতর প্রভেদ অনেক। উভয় খেলাই একরূপ নহে। শৃঙ্গার শব্দের অর্থ হইল, "তৎ-সমং ক্রীড়া"—ভাষার এ বৈশিষ্ট্য মিত্র মহাশয়ের অবিদিত নহে। এক ভাষার বৈশিষ্ট্য, শক্তি প্রভৃতি অন্য ভাষায় ঠিক তেমনই ভাবে কি বজায় থাকে? শব্দকল্পদ্রুম ছাড়া আর একটা জিনিষ যদি মিত্র মহাশয় বিস্মৃত না হইতেন, তবেই আর এ গোলে তিনি পড়িতেন না। সেটি এই—

"অর্থাৎ প্রকরণাল্লিঙ্গাদৌচিত্যাদ্দেশ-কালতঃ।
শব্দার্থাস্তু বিভিদ্যন্তে ন রূপাদেব কেবলাৎ॥"

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য :—সীতা প্রভৃতি তাঁহাদের "অল্পবয়স্ক পতিদিগের সহিত খেলাধূলা করিয়া থাকেন"—মিত্র মহাশয়ের এই "খেলাধূলা"র মানে কি? যেমন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা—শিশুরা ছুটাছুটি লাফালাফি করে, ধূলামাটি গায়ে মাখে, সেইরূপ? না—লুডো, ক্যারম, তাস, পাশা, দাবা খেলে? আর যদিই বা তাই ধরা যায়, তবে তাহা আবার "রহঃ" নির্জ্জনে কেন? মিত্র মহাশয় "সীতা প্রভৃতি" বলিয়া অর্থ করিলেন,—প্রতিপন্ন করিলেন যে, "রেমিরে" মানে "রতিক্রীড়া" নহে, অথচ অতি সন্তর্পণে, "রহঃ" (নির্জ্জনে) এই শব্দটিকে একদম বাদ দিলেন কেন? অত দূরই যখন করিলেন, তখন বলুন না,—তাঁহার মতে—

"রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ সহিতা রহঃ"

ইহার মানে—"সীতা প্রভৃতি তাঁহাদের অল্পবয়স্ক পতিদের সহিত নির্জ্জনে খেলাধূলা করিলেন।"—ইহাতেই আমার প্রতিপাদ্য সপ্রমাণ হইবে। আচ্ছা, মিত্র মহাশয়, "অল্পবয়স্ক" কথাটা হঠাৎ (শ্লোকে নাই) কোথা হইতে আনিলেন? শব্দকল্পদ্রুমে আছে না কি?—"বৃদ্ধ বাল্মীকিকে" বাঁচাইতে গিয়া মিত্র মহাশয়কে অনেক বেগ পাইতে হইল, অথচ বাল্মীকির মরিবার মত আদৌ কিছুই হয় নাই। সংস্কৃতভাষার আদি কবির মূল-রামায়ণখানিতে অন্ততঃ একবার চোখ বুলাইলেও উপলব্ধ হইতে পারে যে, রম্ ধাতু "রতিক্রীড়া" অর্থে কতবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য,—মাসিক বসুমতীতে এ পর্য্যন্ত রামায়ণ সম্বন্ধে আমার চারিটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যায় "রামায়ণ-কথা" (ক) বলিয়া যে প্রথম প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, তাহাতে উপক্রমেই আমি বলিয়াছি, "এই স্থলে পাঠকবর্গের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা, তাঁহারা যেন মনে না

করেন যে, আমি রামায়ণের কোনরূপ 'নূতন' বা 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে, তাহাই অকপট-হৃদয়ে পাঠকবৃন্দের সমক্ষে—সুধী-সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।”—“ইহাতে মূল গ্রন্থের বিরোধী কিছুই লিখিত হইবে না, বা কোন প্রয়োজনীয় কথাও অনুক্ত থাকিবে না।”—মিত্র মহাশয় কি এটুকু পড়েন নাই? হইতে পারে, হয়ত তিনি পড়েন নাই,—কিন্তু যে প্রবন্ধটার তিনি প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, “বেজায় অসঙ্গত” “প্রক্ষিপ্ত” “অন্য-স্থানগুলিও প্রক্ষিপ্ত”—ইত্যাদি উক্তি আমি করিয়াছি বলিয়া সাদায়-কালায় কালী-কলমে লিখিয়া ফেলিয়াছেন,—অথচ উহার কোন উক্তিই আমি করি নাই,—সেই প্রবন্ধেরই উপসংহারে আমি যে “প্রক্ষিপ্ত” বলিয়া হঠাৎ—একটা এত বড় জিনিষ উড়াইয়া দিবার আদৌ পক্ষপাতী নহি, বরঞ্চ ঘোর বিরোধী, এবং সেই জন্যই ঐ উপসংহারে বলিয়াছি যে, “অবশ্য উদ্ধৃত বিরোধী স্থলগুলির এক কথায়—যা' হোক্ একটা সমাধান করা যায়।” “অমুক অংশ প্রক্ষিপ্ত” বলিয়া কায অনেকটা সোজা করা যায়। কিন্তু হঠাৎ অতটা বলিবার মত বুকের পাটা আমার নাই। আবার সন্দিগ্ধ স্থলের কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার মত যোগ্যতায়ও এ দীন লেখক বঞ্চিত। কাব্য কাব্য, তাহাকে দর্শন শাস্ত্রের পেষণে নীরস করিয়া কবির প্রতি অমর্য্যাদা করিতে সাহস সকলের হয় না।—এই তুচ্ছ অংশটুকুও কি প্রতিবাদী মহাশয় দেখেন নাই?

প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, বর্ত্তমানকালোচিত ভাবধারার মোহন আকর্ষণে পাঠকের চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট করিবার প্রলোভনে “—আমাদের অশনে-বসনে, বিলাসে-রুচিতে, হাসিতে-কাসিতে পাশ্চাত্যদের অনুকরণপ্রিয়, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতিবিহীন সংস্কারধ্বজীরা বদ্ধপরিকর”—ইত্যাদি উক্তি করিবার মত কি সুযোগ শিক্ষিত মিত্র মহাশয় পাইলেন? তাঁহার তীব্র বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়াও তাঁহার জন্য তাদৃশ এক জন সুলেখক “এটর্ণি” সাহিত্যিকের জন্য আমার সত্যই দুঃখ হইতেছে। ধর্ম্মাধিকরণে বাদি-প্রতিবাদীর পক্ষসমর্থনকালে ক্বচিৎ, অভ্যুদয়লোলুপ ব্যবহারাজীবের পক্ষে এতাদৃশ অঙ্গভঙ্গিদ্যোতক উচ্ছল ও অসংযত ভাষা, সাময়িক উপভোগ-যোগ্য হইলেও মিত্র মহাশয়ের মত প্রবীণের পক্ষে উহা কি ঠিক হইয়াছে? মূল রামায়ণ ও হাজার দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের টীকা প্রভৃতি পড়িয়া আছে। নিরপেক্ষভাবে যিনি দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে, বিবাহকালে সীতার বয়স কত ছিল। মিত্র মহাশয় ঐ “রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বাঃ” কবিতাটির “বঙ্গবাসী”র রামায়ণের অনুবাদটুকুও অন্ততঃ একবার পাঠ করুন। আর একটি কথা বলিয়াই আমি শেষ করিব। বালকাণ্ডের ৭৭ সর্গে একটি শ্লোক দেখিতেছি—

“স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ।
রামশ্চ সীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহূনৃতূন্॥” ২৫

“—সেই রাম সীতার সহিত দ্বাদশবর্ষকাল বিহার করিলেন। (সন ১৩১১ সালে প্রকাশিত “বঙ্গবাসী” রামায়ণে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কৃত অনুবাদ) মিত্র মহাশয়ের মতে ৬ বৎসর বয়সে সীতার বিবাহ হয় এবং তার পর বারো বছর রাম সীতার সহিত বিহার করিলেন। অর্থাৎ সীতার ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। এ স্থলে বিহার মানে কি সেই “খেলাধূলা”? না—ঐ ১২ বছরের অর্থাৎ বিবাহের পরবর্ত্তী বারো বছরের প্রথমার্দ্ধ বা অর্দ্ধেকের কিছু বেশী কাল “খেলাধূলা”—আর তার পর বাকীটা বিহার শব্দের শক্তিলভ্য অর্থ? শুধু এই-ই নহে। এরূপ আরও অনেক আছে। সময় হইলে দেখিতে পাইবেন।

আমার শেষ অনুরোধ, মুদ্রাকরের ভ্রান্তি নিবন্ধন বা আমার দোষে আমার উদ্ধৃত শ্লোকে যে ভুল ছিল, মিত্র মহাশয়ের প্রতিবাদেও সেই শ্লোকে সেই ভুল দেখিলাম। তাই মনে হইতেছে, তিনি মূল রামায়ণখানি খুলিবার অবসরও পান নাই। এখন হইতে মূলখানা দেখিবেন, তাহা হইলে হয় ত প্রতিবাদের পূর্ব্বেই অনেক তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

জাতীয় সমস্যা

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাভাস

সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের যে খুব একটা দাবী আছে, এ কথা জোর গলায় বলা হয় ত শক্ত! তবে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগিনেয় শ্রীমান্ কিশোরী হালদারকে তার মামার মৃত্যুর পর ছোট গল্প আর উপন্যাসে হাত পাকাইতে দেখিয়া সকলে বলিল, এটা সেই পুরানো শাস্ত্র-বচন 'নরাণাং মাতুল-ক্রমঃ'—তারি ফলে। তবে দু'জনের পদ্ধতিতে একটু তফাৎ ছিল। কাশীনাথ লিখিত জমাট ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস —তা'তে নর-নারীর যেমন সমারোহ, বৈধ ও অবৈধ প্রেমের তেমনি ঠাশ-বুনানি; তবে পরিশেষে ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইতে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী কখনো কার্পণ্য করিয়াছেন, এ কথা তাঁর অতি-বড় শত্রু 'চামচিকার' অসমসাহসিক সম্পাদক-সমালোচকও অস্বীকার করেন না। শ্রীমান্ কিশোরী হালদার নূতন যুগের লেখক হইলেও তাঁর রচিত গল্পে ও উপন্যাসে তরুণ-তরুণীর প্রেমের একটা অতি মৃদু ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। জাতীয়তা-গঠনের নানা হদিশ,—যথা চরকা, খদ্দর, দেশী ছুরি-কাঁচির কারখানা, টিনে মুড়ি ভরিয়া বিলাতে চালান্ দিবার প্রচেষ্টা, এমনি সব কাজের কথায় তার লেখা গল্প-উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠা ঠাশা থাকে। অলীক প্রেমের রঙীন্ স্বপ্ন রচা—তার ধাতে মোটেই বরদাস্তই হয় না।

কাশীনাথের বাস ছিল বাঁশবেড়েয়। গঙ্গার ধারে পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়ী। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের বালাই বহু পূর্ব্বে ঘুচিয়া গিয়াছিল, কাজেই তার মৃত্যুতে হিন্দু আইন-মতে কাশীনাথের একমাত্র ভাগিনেয় শ্রীমান্ কিশোরী হালদার সম্পত্তির মালিক হইয়া বাঁশবেড়েয় বাস করিতে আসিল। এ বাড়ীতে পূর্ব্বেও তার আসা-যাওয়া ছিল, তবে এবারে আসিল কায়েমী-ভাবে বাস করিতে।

একতলার বড় ঘরের মাঝখানে একখানা তক্তাপোষ—আর দেওয়ালের গায়ে আলমারি আঁটা। সেই আলমারির মধ্যে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত সেই সব অমূল্য উপন্যাস—"সাত খুন", "রক্ত-গঙ্গা", "বিস্কুটে বিষ", "সপ্তদশী সুন্দরী কনককামিনী"—যেগুলির প্রতিপৃষ্ঠা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ, যা' পড়িয়া বাঙ্গালার পাঠক-পাঠিকার হৃৎকম্প হইলেও বার বার পড়িবার সাধ জাগে!

কিশোরী আলমারি খুলিয়া একখানা বই বাহির করিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিল। মামার লেখা কোন বই সে আগাগোড়া পড়ে নাই। মনে আজ প্রথম পড়িবার ইচ্ছা জাগিল। মামার সম্পত্তি তুচ্ছ করিবার মত নয়। বাঙ্গালা দেশে পঞ্চাশখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিয়া যিনি বই ছাপাইয়াছেন, তাঁর আর্থিক অবস্থা যে কোন বড় উকীল বা পেন্‌শন্-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়েও নিরেশ নয়, এ কথা কে না মানিবে! মামার পরিত্যক্ত এই এষ্টেটের কিশোরীই এখন একমাত্র মালিক। মানুষের কৃতজ্ঞতা বলিয়াও একটা বস্তু আছে। তায় কিশোরীর—বিশেষ যখন সে জাতীয়তাগঠন-সাহিত্যের এক জন উদীয়মান পুরোহিত।

কিশোরী পড়িতে লাগিল,—

—মধুসূদন থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি তাহার ভ্রম? কিন্তু পর-ক্ষণেই সেই শব্দ—প্রথমে অতি ক্ষীণ বাসর-শয্যায় নববধূর প্রথম প্রণয়-কাকলীর মতই সলজ্জ মৃদু আভাস, পরক্ষণেই শ্রবণ-যুগল-বিদারী কোদণ্ড টঙ্কার সদৃশ বজ্রনাদী।

মধুসূদনের নির্ভীক বীর-হৃদয় প্রকম্পিত হইল। একদৃষ্টে সে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া যে নীল নভোমণ্ডল দেখা যাইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়াছিল। একটি, দুইটি, তিনটি অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিতেছে—কখনো জ্বলিতেছে, কখনো নিবিতেছে; যেন মানিনী অভিসারিকা নয়নমধ্যবর্ত্তী ভ্রূকুটিভঙ্গীর ন্যায়।

সহসা বীণা-বিনিন্দিত স্বরে পার্শ্বে কে কহিল—আপনার অতুল সাহস, ডিটেক্‌টিভ বাহাদুর…

চমকিয়া মধুসূদন দেখে—সে কি দৃশ্য! পাঠক, ঘনকৃষ্ণ আকাশ-বক্ষে তুমি স্থির কাদম্বিনী দেখিয়াছ? পাঠিকা, দর্পণে প্রিয়-সমাগমজনিত হর্ষ-পরিপূর্ণ আস্যে নিজের হাস্যচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছ?——

কিশোরীর মনে হইল, ধেৎ! এই সব উপমার পাহাড় তুলিয়া বক্তব্যকে পিছাইয়া দেওয়া—এ যে কি বদ রোগ! তবু—না, নেহাৎ মন্দ লাগিতেছে না ত! ঘটনা বেশ জটিল হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে এত নারীর সমাবেশ কেন? আর একটা পৃষ্ঠা সে খুলিল,—লেখা আছে,—

কুলসম পান চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—তোমার ভুল বাপজান্। তুমি যাকে দেখিয়াছ, সে ফতিমা নয়। তার নাম লুৎফুন্নেসা। দেখিতে ফতিমার মতই। ফতিমার পাশে তাহাকে দেখিলে ফতিমার যমজ ভগ্নী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

এই এক পৃষ্ঠার তিন ছত্রে তিন জন নারী,—এরা আবার মুসলমান! ব্যাপার কি?

সে ঘরে ফিরিল এবং আলমারির মধ্যে বই রাখিয়া চারিধারে ঘুরিয়া সব দেখিয়া লইল। বাড়ীর পাশেই একটা গলি, গলির দুধারে শিবের মন্দির, মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন একখানি ফুলের বাগান। মন্দির ও তার গৃহের মধ্যে যে-গলি, সেই গলি এই প্রান্তে পায়ে-চলা ঘাটের সৃষ্টি করিয়া নদীর গায়ে মিশিয়াছে।

সে ভাবিল, পল্লীর এই নিভৃত কোণে ভাগ্যক্রমে যখন আস্তানা মিলিয়াছে, তখন এ অবসরটুকুর পরিপূর্ণ সুযোগ লইয়া সে জাতীয়তা-গঠনের উদ্দেশ্যে এমন চিন্তার রাশি উপন্যাসের মধ্য দিয়া দেশের সম্মুখে ধরিবে, যা পড়িয়া কাঙ্গালী আবার মানুষ হইবে, অচিরে স্বরাজ তার করতলগত হইবে! মাঝের বড় ঘরটিই লেখার পক্ষে চমৎকার জায়গা—সামনে ওই নদীর জল - ওপারে গাছের অন্তরাল—তার পরে কি আছে, দেখা যায় না! তার মনের মধ্যকার সমস্যারাশির মতই—এ সমস্যার পিছনে কি অপূর্ব্ব আলো-ভরা সুন্দর সমাধানেরই না দেখা মিলিবে!—মন তার খুশীতে ভরপুর হইয়া উঠিল।

সঙ্গীর মধ্যে একটি মাত্র কুকুর—নামজাদা নয়। নেহাৎ পথের, সম্পূর্ণ দেশীয় জীব; পথে অনাহারে পড়িয়া ছিল, দেখিয়া কিশোরীর মনে করুণার সঞ্চার হয়—ভগবানের সৃষ্ট প্রাণী—কুড়াইয়া ঘরে আনে। সেই অবধি তারি আশ্রয়ে থাকিয়া গিয়াছে। মায়া কোন্ দিক দিয়া আসিয়া কার প্রাণে চরণপাত করে, বুঝিবার উপায় নাই! কুকুরটার উপর কিশোরীর মায়া জন্মাইয়াছিল, বাঁশবেড়েয় আসিবার সময় তাকে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই। কাজেই কালু তার সঙ্গে আসিয়াছে।

প্রভুর মত কালুও খুশী—কোথায় ঘরের বদ্ধ কোণে অন্ধকারে পড়িয়াছিল—এখানে অবাধ মুগ্ধ আলো-হাওয়া—উন্মুক্ত প্রান্তর!

গঙ্গার ঢেউ দেখিতে দেখিতে কিশোরী ডাকিল,—কালু—

কালুও নদীর দিকে চাহিয়া ছিল; এ আহ্বানে লাঙ্গুল নাড়িয়া আসিয়া প্রভুর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল—একটা আনন্দের সাড়া তুলিল—ভৌ—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত

পরের দিন। বেলা প্রায় আটটা। তক্তাপোষে শুইয়া মোটা খাতা লইয়া কিশোরী "জাতীয়-সমস্যা" উপন্যাস লিখিতেছিল। দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যার কথা ফাঁদিবার পরই স্বদেশীয়ানার বনিয়াদ না হইলে জাতীয়তার বিরাট সৌধ তোলা সম্ভব নয়—এই কথাটা মহানন্দ স্বামীর মুখে গুঁজিয়া দিয়াছিল, তার পর সে খদ্দর আর চরকার মশলা মাখিয়া কার মুখে ধরিবে, ভাবিতেছিল, এমন সময় ঘরের পাশে একটা কণ্ঠস্বর ফুটিল—জনুদা——

জনুদা ওরফে জনার্দ্দন কাশীনাথের ডান হাত ছিল। তার রান্না-বান্না দেখা, উপন্যাসের হিসাব রাখা, ভি-পি ডাকে বই পাঠানো—এ সব কাজে সে খুব পাকা। আজ কাশীনাথ নাই, কিন্তু জনুদা আছে। এবং কাশীনাথের পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে এই জনার্দ্দন মান্নাও কাশীনাথের ভাগিনেয় শ্রীমান্ কিশোরী হালদারের অধিকারে অর্শাইয়াছিল।

ডাক শুনিয়া কিশোরী ফিরিয়া চাহিয়া দেখে—একটি ছোকরা। আদুড় গা, ময়লা রং, দ্বারের পাশে অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে দাঁড়াইয়া। কিশোরী কহিল,—জনু বাড়ী নেই। ডাকঘরে গেছে টাকা আনতে। কি চাই? এদিকে এসো——

ছোকরা আসিল, আসিয়া কহিল,—বই। পিসিমা বই পড়ে কি না—পড়া হয়ে গেছে। এটা ফেরত এনেছি। আর একখানা বই চাই।

—কি বই?

ছোকরা বইখানা কিশোরীর হাতে দিল। মলাট দেওয়া। পাতা উল্টাইয়া কিশোরী দেখে, তাহারি স্বর্গীয় মাতুলের লেখা উপন্যাস, "রেলে কাটা"। কিশোরী কহিল,—কে তোমার পিসিম' ?

ছোকরা কহিল,—এই যে বামুন-বাড়ী আছে না ? সামনে ঐ মস্ত তেঁতুল গাছ—বুঁচির পিসিমা। তা বুঁচিও এসেছে। বুঁচি আমায় সঙ্গে আসতে বললে কি না——

কিশোরী হাসিল, হাসিয়া কহিল—বুঁচি আবার কে ? সে কোথায় ?

ছোকরা কহিল,—সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, নতুন কে লোক এসেছে, চেনে না। তার আসতে লজ্জা করছিল, তাই আমায় দিয়ে——

কিশোরী কহিল,—ওঃ! ব্যাপারখানা সে বুঝিল। সে কহিল,—তোমার নাম কি ?

ছোকরা কহিল,—আমার নাম ঠাকুরদাস। বামুনদের বাড়ীর ঠিক পিছনেই——

কথা তার শেষ হইল না। বাহিরে কুকুরের ডাক ও সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীত আর্ত্ত স্বরে দুই জনেই চমকিয়া উঠিল, এবং ঠাকুরদাস কথার খেই ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—ও যে বুঁচি! বলিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুট দিল। কিশোরীকেও উঠিতে হইল।

উঠিয়া বাহিরে আসিয়া কিশোরী দেখে, তারই প্রিয় অনুচর কালু এক কীর্ত্তি বাধাইয়াছে। একটি মেয়ে সামনের গাছতলায় পড়িয়া, আর কালু তাকে ঘিরিয়া মহা-আস্ফালনে কলরব তুলিয়া লম্ফ-চর্চ্চা করিতেছে!

কিশোরী মেয়েটিকে তুলিল, তার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, ঠোঁটও ছেঁচিয়া গিয়াছে। মেয়েটি কাঁদিয়া কহিল,—আমার টেপু—টেপু—টেপু—ও ঠাকুরদাস রে——

বিস্ময়ে কিশোরী ঠাকুরদাসের পানে চাহিল। ঠাকুরদাস কহিল,—টেপু ওর বেরাল। কোথায় গেল রে, বুঁচি!

বুঁচি কহিল—আমার কোলে ছিল। এই লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটা কোথা থেকে এসে ঘেউ ঘেউ ক'রে তাকে কামড়াতে গেল। টেপু ভয়ে পালিয়ে গেল। আমিও প'ড়ে গেলুম। বুঁচি ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিশোরী সমস্যায় পড়িল। জাতীয়তা-গঠনের বিপুল সমস্যার মাঝে এ সমস্যা কোনো দিন তার মনে উদয় হয় নাই!

কিন্তু সমস্যা নিজেই না কি অনেক সময় সমাধানের উপায় খোঁজে। সুতরাং এ সমস্যা কিশোরীর চোখে সমাধানের উপায়ও দেখাইয়া দিল। কিশোরী কহিল,—বাড়ীতে এসো বুঁচি।

বুঁচি উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পায়ে অত্যন্ত বেদনা। সে কাঁদিয়া উঠিল,—পায়ে লাগছে।

ঠাকুরদাস কহিল,—পা মচকে গেল না কি ?

কালু তখনো লম্ফ সহযোগে চীৎকার করিতেছিল। সেটা ঠিক অভিনন্দন নয়! কিশোরী সবলে তাকে একটা পদাঘাত করিল। এ শাস্তি সে বহু দিন ভুলিয়া ছিল; সহসা পূর্ব্বস্মৃতি জাগিতে কালু আর্ত্ত রব তুলিয়া ল্যাজ গুটাইয়া একদিকে ছুট দিল।

কিশোরী তখন ঠাকুরদাসের সাহায্যে বুঁচিকে একরূপ দোদুল অবস্থায় আনিয়া তক্তাপোষের উপর শোয়াইয়া দিল।

তার পরে পরিচর্য্যা। জল আসিল, ঠাকুরদাস কোথা হইতে একরাশ দুর্ব্বাঘাস আনিয়া জলে ভিজাইয়া ছেঁচিয়া কিশোরীর হাতে দিল, কহিল—কাটা জায়গায় এগুলো চেপে দিন্!

সসম্ভ্রমে কিশোরী ঠাকুরদাসের পানে চাহিল। টিংচার আয়োডিনের কথা তার মনে জাগিতেছিল, কিন্তু ঘরে সে বস্তুই নাই! এ সমস্যার সমাধানে ঠাকুরদাসের মুষ্টিযোগ-চিকিৎসার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। ছেঁচা ঘাসগুলা সে বুঁচির ঠোঁটে ও কপালে লেপিয়া দিল। বুঁচি কহিল—আঃ—?

ঠিক! কিশোরী কবে কোন্ দৈনিক কাগজে ফার্ষ্ট এড-এর কথা পড়িয়াছিল। তাহা মনে পড়িল। বুঁচির দুই পা ধরিয়া হুঁসিয়ার ভাবে সে টানিয়া দিল; বুঁচি চীৎকার করিয়া উঠিল,—ওগো, মা গো—

ফ্যাশাদ! কালুর উপর রাগে কিশোরী তাতিয়া উঠিল। এই নির্জ্জন গৃহতলে অখণ্ড নির্ম্মল অবসরে জাতীয়তা-গঠনের কত বড় বড় কথাই না মনে জাগিয়াছিল, সহসা কোথা হইতে এ—

কিশোরী কহিল,—পা ভেঙ্গেছে কি না, তা তো বুঝতে পারছি না। ওহে ঠাকুরদাস—

ঠাকুরদাসও মুস্কিলে পড়িয়াছিল। বুঁচির কথায় বই আনিতে আসিয়া এ বিভ্রাট ঘটিবে, তা কি সে জানিত!

বামুন পিসির কাছে এর কৈফিয়ৎও দিতে হইবে। তা ছাড়া সাঁতায়ের আজ মস্ত আয়োজন—সুইমিং কম্পিটিশনের একটা ছোটখাট রিহার্শাল আছে।

কিশোরীর আহ্বানে ঠাকুরদাস হতাশ নেত্রে তার পানে চাহিল। কিশোরী কহিল,—ডাক্তার পাবে না এক জন?

—পাবো। ঐ যে বনমালীর দোকানের পাশে দাতব্য ঔষধালয় আছে—

—একবার ছাখো ত! ভিজিট দেবো'খন।

ঠাকুরদাস ছুটিল। কিশোরী বুঁচির পানে চাহিয়াছিল, দৃষ্টি খুবই করুণামাখা। মেয়েটি সুশ্রী নয়—আত্মীয়েরা সস্নেহে যাকে বলেন, 'পাঁচ-পাঁচি', তাই। তরুণ সাহিত্যিকের মোহ-বিভ্রম জাগাইবার বস্তু তো নয়ই! তা ছাড়া কিশোরী—সে গোঁড়া স্বদেশী! প্রেমের নামে খড়্গহস্ত! অতএব, পাঠক-পাঠিকা এ ক্ষেত্রে যা কল্পনা করিতেছেন, সে সবের বালাই মোটেই নাই!

বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর কিশোরী কহিল,—পায়ে খুব লাগছে?

বুঁচি কহিল—চেটোয়। চেটো যেন খ'সে যাচ্ছে।

কিশোরী কহিল—হুঁ।

তার মাথার চারিধারে সমস্যা জটিল জাল বুনিতে সুরু করিল। এম্‌ব্রোকেশন, বেলেডোনা লিনিমেণ্ট, গুলার্ডলোশন, অনেক কথা মনে উঁকি দিতে লাগিল, কিন্তু এ তো সহর কলিকাতা নয়, বাঁশবেড়ে—অজ পাড়াগাঁ। সুতরাং জাতীয় সমস্যার ফর্দ্দ আর এক দফা বাড়িয়া উঠিল।

ডাক্তার আসিলেন। নাম শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র পরামাণিক; ক্যাম্বেলের পাশ। তা হইলে কি হয়, চাল-চলনে পুরা সাহেব! মুখে বচনের রাশি—ক্ষুদ্র বাঁশবেড়ে গ্রাম সে বচনের ধাক্কা সামলাইয়া কি করিয়া টিঁকিয়া আছে, তা ভাবিয়া কিশোরীর তাক্ লাগিয়া গেল!

পা দেখিয়া তিনি কহিলেন,—হাড় ভাঙ্গে নাই, মচকাইয়াছে—তবে——লাটিন না হিব্রু কি কতকগুলা দুর্বোধ্য কথা বলিয়া ডাক্তার পরামাণিক তাঁর মন্তব্য সমাপ্ত করিলেন।

কিশোরী কহিল,—উপায়? কলকাতার হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে না কি?

ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র পরামাণিক কহিলেন,—না। তিনি এ সম্বন্ধে স্পেশাল ষ্টাডি করিয়া জার্ম্মাণ দাওয়াই আনাইয়া রাখিয়াছেন, তারি মালিশ, এবং একটা মেক্সিকান দাওয়াই ইঞ্জেক্‌শন্! দুটা দাওয়াইয়ের মূল্য দশ টাকা মাত্র—তবে কোথাও কোনো ক্রটি যে থাকিবে না, এ নিশ্চিত! তার উপর পায়ের হাড় জন্মের মত মজবুৎ বনিয়া উঠিবে—হাঁটিতে যেমন জোর মিলিবে, কড়া জুতায় পায়ের চামড়ার কোথাও তেমনি ফোস্কা পড়িবে না!

কালুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিশোরী করিল, ছাব্বিশ টাকায়—দশ টাকা ঔষধের দাম ও ষোল টাকা ভিজিট দিয়া। ডাক্তারটার উপর মন খুব যে প্রসন্ন হইল, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্বেলের উপরও মেজাজ বিগড়াইল! তার পর—বুঁচিকে বাড়ী পাঠানো! ডাক্তার পরামাণিক বলিলেন,—না—চব্বিশ ঘণ্টা নড়া-চড়া মোটে নয়!

টাকা লইয়া সহর্ষে পরামাণিক প্রস্থান করিলেন এবং মজুর সাহায্যে বুঁচির পিসিমা প্রভৃতিকে আনাইয়া তাঁদের ঘর ছাড়িয়া দিয়া কিশোরী মর্ম্মাহত বুকে এবং লজ্জিত মুখে ও-পাশের ছোট কামরায় আশ্রয় লইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয়তার যজ্ঞ

চার ঘণ্টা পরে বুঁচির এক আত্মীয় যুবা আসিল বুঁচিকে দেখিতে। দূর-সম্পর্কে ইনি বুঁচির পিসিমার কি রকম ভাসুরপো; নাম অমিয়লাল। অমিয় হুগলি কলেজে পড়ে এবং বাঁশবেড়ের তরুণ-সভার সম্পাদক; কবিতা লেখে, গল্প লিখিতেও সুরু করিয়াছে। কোন্ জমীদারের পোষ্য-পুত্রকে বাগাইয়া একটা মাসিকপত্র বাহির করিবার কথাবার্ত্তাও পাকা করিয়া ফেলিয়াছে, শুধু প্রতিশ্রুত অর্থ হাতে পায় নাই; পাইলেই আগামী শুভ-আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মাসিকপত্র বাহির করিবে।

সে কিশোরীর পরিচয় পাইল এবং কিশোরী লিখিয়ে হইয়াও এ-বয়সে তরুণ-তরুণীর অবাধ প্রেমের লেখার মায়া কাটাইয়া জাতীয় সমস্যার কথা লিখিতেছে শুনিয়া তার মনে বিস্ময়ের সঙ্গে একটু শ্রদ্ধাও জাগিল। মামুলির পথের বাহিরে শ্রদ্ধার কেমন ঝোঁক আছে, এ তারি দৃষ্টান্ত! কিশোরীকে ফস্ করিয়া সে বলিয়া বসিল,—আমাদের সভায় একটা প্রবন্ধ পড়ুন না—

কিশোরী কহিল,—আপনাদের সভায় জাতীয়তা-গঠনের কোনো ব্যবস্থা আছে ?

অমিয় কহিল,—সাহিত্য-চর্চা। সাহিত্যই ত জাতীয়তা-গঠনের মূল।

কিশোরী কহিল,—ও সব সাহিত্য ঢের হয়েছে। খালি প্রেমের গল্প আর প্রণয়ের কবিতা—ও সব রেখে মনকে বলিষ্ঠ সুদৃঢ় করতে হবে।

—অর্থাৎ ? অমিয় সভয়ে কিশোরীর পানে চাহিল।

কিশোরী কহিল,—মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা চাই। ধনীর ধন বিলাসে ব্যয় হবে না—চাষের ক্ষেতে, লোহার কারখানায়, তুলার ফশলে, কাপড়ের চরকায় লুটিয়ে দেওয়া চাই।

কিশোরীর মুখের বচনে আগুন ছুটিল। অমিয় চোখে দেখিতে লাগিল, যেন সে কথার আগুনে ধনীর সিন্দুক, বিলাতী সাজ-পোষাকের মস্ত দোকান, জহরতের আলমারি, বিলাতী বুট, ম্যাঞ্চেষ্টারের জাহাজ অবধি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে ! আগুনের সে কি সতেজ লেলিহান শিখা !

অমিয় কহিল,—কিন্তু আমাদের এ যে গল্পের দেশ, গাথার দেশ——

কিশোরী কহিল,—গল্প-সাহিত্যে তরুণদের মন পঙ্কিল হয়ে উঠবে! মনে তাদের পচ্ ধরবে——ওতে কাজ হবে না—অগ্নিশুদ্ধি চাই। শুধুই নারীর চটুল চাহনি, রক্ত অধর, আর ললিত বাহু——না, নারী এ বিরাট কর্ম্মশালায় আসতে চায় যদি তো তাকেও ঐ হাফরে ফুঁ পাড়তে হবে, ওই হাতুড়ি হাতে তুলে নিতে হবে! নিকুঞ্জে ব'সে ফুলের মালা গাঁথার ছবি আঁকা চলবে না! এমনি উপন্যাস চাই!

বাস রে! অমিয়র মনে পড়িতেছিল,—এই গৃহে বসিয়াই কাশীনাথের মুখে এক দিন সে শুনিয়াছিল—কি করিয়া উপন্যাসের প্লটে মোচড় দিতে হয়—পাঠকের মনে লাগে এমন ঘটনার প্রলেপ কি করিয়া লাগাইতে হয়——আর আজ ?——এই বয়সে কিশোরীর মনের মধ্যে এত আগুন জ্বলিল কি করিয়া ভাবিয়া তার তাক লাগিয়া গেল!

সে কহিল,—কিন্তু এই সব কবিতা গল্পে মানুষের মনের কত পরিচয়—তার সুখ-দুঃখ——কথাটা আর শেষ হইল না।

বুঁচির পিসিমা আসিয়া কহিলেন—ওর পা ভালো আছে বাবা——ওকে বাড়ী নিয়ে যাই।

কিশোরী কহিল—কিন্তু ডাক্তারে নড়া-চড়া বারণ ক'রে দেছেন।

পিসিমা কহিলেন—কৈলেদ তো? ওর ধূমধাম সব-তাতেই আছে। তোমার অনর্থক এতগুলো টাকা—

সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও মুখে কিশোরী কহিল—বাজে খরচ নয় তো—

পিসিমা কহিলেন—তোমার উপর এ শুধুই জুলুম হচ্ছে, বাবা——কিছু ভাবতে হবে না। প'ড়ে গেছলো, পায়ে লেগে-ছিল—একটু রেড়ির তেল মালিস ক'রে দেবো—সেরে যাবে।

কিশোরীর মনে আবার এক সমস্যার উদয় হইল। ওই জার্ম্মাণ ঔষধগুলা——বিদেশে বিজাতীয়দের ধাত বুঝিয়া তৈরী, বাঙ্গালার ধাতে ও-সব খাপ খাইবে কি? তার চেয়ে সনাতন যুগ হইতে যে রেড়ির তেল, গাছগাছড়ার রস চলিয়া আসিতেছে——! জাতীয়তার সহিত জাতিটাও তো এই সব ঔষধে টিঁকিয়া আসিতেছে এত কাল!——তার বিরাট গ্রন্থের নির্ঘণ্ট আবার বাড়িয়া উঠিল। এও এক সমস্যা!

পিসিমা শুনিলেন না, বৈকালে রোদ পড়িলে বুঁচিকে বুকে তুলিয়া কোনমতে গৃহে আনিলেন। কিশোরা সঙ্গে আসিল। পিসিমা বলিলেন,—বরাবর এখান থেকে কত বই চেয়ে-চেয়ে পড়েছি—একখানা সঙ্গে বই দিয়ো বাবা, পড়ার নেশা—প'ড়ে ফিরিয়ে দেবো।

কিশোরী কহিল,—বেশ তো! নেবেন।

সেই সঙ্গে দুঃখও হইল, লঘু সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালার শুদ্ধান্তঃপুরকেও ঘিরিয়া ফেলিতেছে! শুধু খদ্দরের কাজ নয় এ জঞ্জাল সাফ করা!

কালুর পাপটুকুকে উপলক্ষ করিয়াই অজানা গ্রামে স্নেহ মিলিল। পরের দিন বুচি আসিয়া হাজির—একখানা বই চাই—এখানা পড়া হয়েছে।

কিশোরী কহিল,—তোমার পা সেরে গেছে ?

বুঁচি কহিল,—হ্যাঁ।

কিশোরী কহিল,—টেপু কৈ? বিড়ালের নামটা কিশোরী ভোলে নাই—এমনই! তার বিশেষ হেতু ছিল না।

বুঁচি কহিল,—হ্যাঁ, তাকে আর আন্‌ছি কি না! যে কুকুর—মা গো! কাল তাকে পেলে ত ছিঁড়েই খেতো!

কিশোরী কহিল,—এই সব বই যে নিয়ে যাও, তুমিও পড়ো ?

বুঁচি কহিল,—হ্যাঁ।

কিশোরী কহিল,—কিন্তু এ সব তো তোমাদের পড়ার যোগ্য বই নয়।

বুঁচি কহিল,—বা রে, তা কি পড়বো? আমি খবরের কাগজও পড়ি।

কিশোরী কহিল,—পড়ো? আচ্ছা, আমরা যে-দেশে বাস করছি, সে-দেশের নাম কি, জানো?

বুঁচি কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে কিশোরীর পানে চাহিল, কহিল,—তা আর জানি না! এ হলো বাঙ্গলা দেশ, আমরা বাঙ্গালী! সোনার বাঙ্গালা আমি তোমায় ভালোবাসি।

বাঃ, এত দূর! কিশোরী যেন কূল পাইয়াছে, এমনি ভাবে খুশী মনে কহিল,—বাঙ্গলা দেশ, জানো তা হ'লে! কিন্তু বিশ্ব-সভায় বাঙ্গলা দেশ ঢুকতে পারছে না কেন, তা জানো?

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বুঁচি কিশোরীর পানে চাহিল। কিশোরী কহিল,—তার কারণ, বাঙ্গালীর জাতীয়তা এখনো জাগেনি। বিদেশীর ভাষায় বিদেশী আইডিয়া নিয়েই তার কারবার। বিশ্ব-সভা নকল চায় না, সে চায় আসল। আসল বাঙ্গালীয়ানা হলো তার জাতীয়তায়। যত দিন বাঙ্গালী নকল ছেড়ে সেই আসল জাতীয়তার পরিচয় না দেবে, তত দিন জগৎ-সভায় বাঙ্গালী ঠাঁই পাবে না। এই জন্মই চাই আজ দেশে বাঙ্গালীর মেয়ে চরকা চালাবে, আর বাঙ্গালীর ছেলে খদ্দর পরবে—বক্তৃতা ক'রে কোনো জাত বড় হয় নি, কোনো দিন তা হবেও না।

কথা শুনিয়া বুঁচি অবাক্! সে কহিল,—কিন্তু কাগজে তো পড়ি, যত নেতা বক্তৃতা দিয়েই বেড়াচ্ছেন——

কিশোরী কহিল—ওটা দোকানদারি। ওতেও কিছু হবে না। খাঁটি মানুষ হ'তে গেলে চাই দরদ, চাই দেশকে ভালোবাসা, দেশের মাটী, দেশের খানা-ডোবা, পুকুর-মাঠ—সবের উপর খাঁটি অনুরাগ আর প্রীতি——

বুঁচি বসিল; কিশোরীর মুখের পানে তাকাইয়া ভাবিল—এ কি যে সব বলে!

কিশোরী কহিল—তোমায় আমি পড়তে দেবো মজার বই। পড়বে? কল-কারখানার আত্মকাহিনী। প'ড়ে বুঝবে, কি ক'রে আমেরিকা য়ুরোপ আজ ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কি বিরাট শক্তি নিয়ে সে সারা পৃথিবীর অভাব মোচন করছে——

বুঁচি কহিল,—পড়বো। কিন্তু সেই সঙ্গে "জালিয়াৎ যজ্ঞেশ্বর" বইটাও চাই। আমার আধখানা পড়া আছে, তার পর পিসিমার অসুখ হলো ব'লে আর বইটা শেষ করতে পারি নি।

কিশোরী কহিল,—আগে কলকারখানাটা প'ড়ে শেষ করো, তার পর জালিয়াৎ যজ্ঞেশ্বর দেবো।

বুঁচি আব্দারের কান্নার সুর তুলিয়া কহিল,—না, পিসিমা চেয়েছে ঐ বইখানা।

সে রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া কিশোরী স্বপ্ন দেখিল, সুবৃহৎ বটবৃক্ষচ্ছায়ে প্রকাণ্ড বেদী, সেই বেদীর উপর বসিয়া কিশোরী জাতীয়তার বিরাট যজ্ঞ-সম্পাদনে রত—যজ্ঞাগ্নি ধূ-ধূ শিখা-বিস্তারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—বুঝি গগন স্পর্শ করিবে। আর সে যজ্ঞে সমিধ বহিয়া আনিতেছে বাঁশবেড়ের ক্ষুদ্র পল্লী-গৃহ-বাসিনী ওই ক্ষুদ্র বালিকা বুঁচি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিরুদ্ধ ঘটনা

দু'চার দিনের মধ্যেই কিশোরী দেখিল, এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির চারিদিকে অসংখ্য সমস্যা জড়ো হইয়া আছে, নানা রোগ ঠিক সহরের মত। অথচ ঐ পরামাণিক ডাক্তারের জার্ম্মাণ আর মেক্সিকান্ দাওয়াইয়ের দাম রোগীরা দিতে পারে না, কাজেই চিকিৎসার অভাবে যা হয়, ভাবিতে গা শিহরিয়া ওঠে। পুষ্করিণী আছে, তাহাতে জল নাই। একটা ঘরে আগুন লাগিলে মানুষ-জন ছুটিয়া আসে, কিন্তু শূন্য কলসী দেখাইলে আগুন তো নিভিবে না! দোকানে খাবার যা আছে, তা খাওয়ার চেয়ে জঙ্গলের সাপের মুখে যাওয়ায় একটু আরাম তবু এই যে, প্রাণটা গেলেও দু'চারিটা পয়সা-কড়ি যা সম্বল আছে, সেটুকও প্রাণের সঙ্গে অদৃশ্য হয় না! স্কুল আছে, মাষ্টার আছে, ছাত্রও আছে—তবে এ তিনের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য নাই—ছাত্র যা বুঝিতে চায়, মাষ্টার তা বুঝাইতে পারে না, সে জন্য অনুযোগ তুলিলে মাষ্টার বলে, এ টাকায় অত বিদ্যা শেখানো চলে না! লাইব্রেরী আছে, তবে লঘু সাহিত্যে পরিপূর্ণ। লোকে প্রেমের চটুল গল্প পড়িয়া মশ্গুল হইতে চায়। দেশকে চিনিবার দিকে কারও আগ্রহ নাই। কোথাও দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হইয়াছে শুনিলে ছোকরারা

নাচিয়া ওঠে—সে বন্যা বা দুর্ভিক্ষ-দায় ঘুচাইবার জন্য তত নয়, যতটা ওই ওজুহাতে দু'চার রাত্রি আলিবাবা কি আবু-হোসেনের রিহার্শাল চালাইবার জোগাড় হইয়াছে ভাবিয়া! যা'দের টাকা আছে, তারা বিদেশে গিয়াছে; যা'দের টাকা নাই, তারা দেশে পড়িয়া ঘুমায়। জাগিয়া থাকিলে পরচর্চ্চা করে! কিশোরী দেখিল, মনে তো দু'চারিটা সমস্যা দেখা দেয়, কিন্তু গ্রামের দিকে চাহিলে সমস্যা চতুর্দ্দিকে!

অমিয়কে ডাকিয়া তরুণ সমিতির অধিবেশন বসাইল—দেশের দারিদ্র্যের কথা জানাইল, সমস্যাগুলার দিকে সকলের নজর ফুটাইল। অধিবেশনের পর যে যার কাজে মন দিল, সমস্যা মুখের কথায় ঝরিয়া আবার কিশোরীর মনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল—ঠিক যেন মেঘ—সাগরের বুক হইতে আকাশে উঠিয়া আবার সেই সাগরেই শয়ন!

অমিয় আসিয়া কহিল,—স্যাকরাদের মেয়েটাকে তার শ্বশুর-বাড়ীতে মার-ধর করতো বেজায়—মেরে ফেলার যোগাড়! স্যাকরা গিয়ে নিয়ে এসেছিল—নিজের মেয়ে তো! তা তারা পুলিশ ডেকে মেয়ে আর স্যাকরাকে অবধি বেঁধে নিয়ে গেল!

এও এক সমস্যা! জাতীয় সমস্যার আর অন্ত নাই! সমাধান হয় কি করিয়া? একার এ কাজ নয়! এই গ্রামেই যদি ছোট একটা দল—

অমিয়কে সে কথাটা খুলিয়া বলিল। অমিয় বলিল,—আমার এবারে এগজামিন—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিশোরী কহিল,—বটে।

বৈকালে বুঁচি আসিল বই চাহিতে। কিশোরী কহিল,—পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করো, কালী সিঙ্গির মহাভারত পড়তে চান?

বুঁচি কহিল,—মহাভারত আমাদের আছে।

কিশোরী কহিল,—তুমি জানো মহাভারতের গল্প?

বুঁচি কহিল,—আহা, তা আর জানি না! গল্প আমি যে কত পড়েছি।

কিশোরী কহিল,—গল্প ছাড়া আর কিছু পড়তে ভালো লাগে না?

বুঁচি কহিল,—না।

কিশোরী কহিল,—আমাদের দেশ কত গরীব, তা জানো? অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই—

এই যে থাকিয়া থাকিয়া কিশোরী কি সব বকে, বুঁচির শুনিয়া তাক্ লাগিয়া যায়! তার মনে পড়ে সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে—সেবার আসিয়া পারঘাটে আস্তানা লইয়াছিল, কত কি বকিত, আর মাঝে মাঝে ব্যোম্-ব্যোম্ করিত, কোনো অর্থ বুঝা যাইত না! শেষে এক দিন বাঁড়ুদের ভাগ্নীকে প্যাঁড়া খাইতে দিয়া ভুলাইয়া গহনা চুরি করে—ভাগ্যে ধরা পড়ে, তখন সকলে বলিয়াছিল, ভণ্ড বুজরুক! ব্যোম ব্যোম করার মতলব এতদিনে বুঝা গেল! এ-ও তেমনি কোনো মতলব লইয়া এই সব হেঁয়ালি বকিয়া যায়? বুঁচির গা কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল,—বই দাও পিসিমার—

কিশোরী কহিল,—কি বই?

বুঁচি কহিল,—তা আমি কি জানি? একটা নতুন গল্পের বই!

কিশোরী ভাবিল, গল্প চাহিলে কাহাকেও বড় কথা বুঝানো কঠিন। সভা ডাকিয়া সে দেখিয়াছে, আর এই যে বাহিরের সর্ব্বপ্রভাববিমুক্ত ক্ষুদ্র বুঁচি—এও ঐ এক কথা কয়! সকলে বলে, গল্প, গল্প চাই! তাও ঐ প্রেমের গল্প, ঘর ভাঙ্গার গল্প—তার মধ্যে দেশের সমস্যার সমাধান নাই!

কিশোরী ডাকিল,—জমু—

জমু কহিল,—কেন?

কিশোরী কহিল,—একে একটা বই দাও-আর সেই খাতাটা দিও আমাকে—

বুঁচি বই লইয়া চলিয়া গেল। কিশোরী দোয়াত-কলম-খাতা লইয়া গঙ্গার ধারে বাঁধানো চাতালে গিয়া বসিল। পাটের চাষে দেশের কি ক্ষতি হইতেছে, নিজেরা কি করিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে রশি বাঁধিয়া বিদেশে পাঠাইতেছি—এটাকে ভিত্তি করিয়া সে নূতন উপন্যাস ফাঁদিবে।

ওপারে যতদুর দেখা যায়—ঐ গাছপালার রন্ধ্রপথ! সে লিখিতে বসিল, ঐ গাছের রন্ধ্রপথ দিয়া একটি মেয়ে ঘাটে আসিতেছে। গৃহে তার দারিদ্র্য,—বাপ পয়সার জন্য এধারে-ওধারে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, মেয়ে ডাগর হইয়াছে—বিবাহ হয় না, সে জন্য পাড়ার লোকের গঞ্জনার অন্ত নাই! এমনি ব্যাপারে দুটো পরিচ্ছেদ চট্‌পট সে শেষ করিয়া ফেলিল। তৃতীয় পরিচ্ছেদ কি দিয়া সুরু করিবে—সে ভাবিতে বসিল। ঐ মেয়ের বাপ এক বড়লোকের দ্বারে দুঃখ জানাইতে গিয়াছে? না, মা কার গৃহে পাচিকাবৃত্তির উমেদারীতে

চলিয়াছে? সে ভাবিল, তার আগে পড়িয়া দেখা যাক্, কি লিখিলাম।

নিজের লেখা দুই পরিচ্ছেদ সে পড়িতে লাগিল। পড়িয়া অবাক্ হইল—এ কি! এ মেয়েটি ত হুবহু বুঁচি! তার সেই বিড়াল টেপুটা অবধি! বুঁচির জায়গায় নাম দিয়াছে খুঁচি! তার অজ্ঞাতে বুঁচি কোথা হইতে আসিয়া এ উপন্যাসে দেখা দিল? নাঃ, এ ঠিক নয়!

দুই পরিচ্ছেদ পড়িয়া সে ভাবিল, এ লেখা বদ্‌লাইতে হইবে—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে পিসিমার কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। বই বাহির হইলে মুস্কিল বাধিবে। ওঁরা চটিয়া যাইবেন, এমন করিয়া ঘরের কথা লেখা? এ ত পরচর্চ্চার সামিল! বই রাখিয়া সে উঠিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কিশোরী গ্রামের দিকে বেড়াইতে চলিল।

বুঁচিদের রোয়াকে একটা সভার মত বসিয়াছে। বয়স্ক দু' চার জন মাতব্বর চেহারার লোক, তা ছাড়া অমিয় প্রভৃতি! বয়স্কদের এক জন বলিতেছেন,—ও সব বক্তৃতায় কিছু হবে না রে বাপু—ও সব ডব্লিউ সি, সুরেন বাঁড়ুয্যে, গোখলে—এঁদের আমল থেকে বক্তৃতা হয়ে আসছে। হাতে-কলমে কিছু করতে পারো ত এসো বাপু নেতাগিরি করতে! তা নয়, নিজেরা মোটরগাড়ীতে বসবে, আর আমরা সেই গাড়ী ঠেলবো—আমরা চাষ করবো, আর কামিনী ধানের ধপ্‌ধপে চালে তোমাদের পরমান্ন বানাবো! হুঁঃ! ও-সব চলবে না আর।

অমিয় বলিল,—কিন্তু এই যে চারধারে সব বিষম সমস্যা—এ না হ'লে আমাদের জাতিই যে লোপ পাবে।

কথাগুলা সে যা বলিতেছিল, সবই কিশোরীর কাছ হইতে ধার-করা। কথাগুলা বলিতে বলিতে তার বুকের মধ্যটা আনন্দে গৌরবে দুলিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় কিশোরীকে সামনে দেখিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে ভাব কাটাইয়া তর্ক-লড়ায় জোর পাইবার আশায় সে কহিল,—এই যে কিশোরী বাবু—আসুন—ওই সব কথাই হচ্ছে আমাদের।

কিশোরী সস্মিত মুখে আসিয়া রোয়াকে বসিল।

যে মাতব্বর এ তর্ক-সভার প্রধান বক্তা, তাঁর নাম ধরণীধর ঘোষাল। রেলোয়েতে চাকরী করিতেন, কি একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে চাকরী খোয়াইয়াছেন, আদালতে যাইতে হয় নাই, মস্ত সৌভাগ্য।

তাকে দেখিয়া ঘোষাল কহিল,—এই যে আমাদের কাশীদার ভাগ্‌নে তুমি? বটে! খদ্দর পরো?

কিশোরী কহিল,—আজ্ঞে হাঁ, এ ছাড়া আমাদের জাতের মুক্তির পথ নেই!

ধরণীধর কহিলেন,—বটে! সব খদ্দর আঁটলেই ইংরেজ রাজ্যটি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দেশে যাবে—না?

কিশোরী কহিল,—আজ্ঞে, তা নয়। তবে বিদেশী কাপড়ে যত টাকা বেরিয়ে যায়, তাতে আমাদের দারিদ্র্য বাড়ে। খদ্দর পরলে দেশের টাকা দেশে থাকবে। তা ছাড়া ম্যাঞ্চেষ্টার এ দেশ থেকে পয়সা না পেলে এ-দেশের লোককে শ্রদ্ধা করবে, তখন আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে তারাও সহায় হবে।

ধরণীধর কহিলেন,—ওঃ, রক্ষা! তার পর তোমরা পাওনা-গণ্ডা আদায় ক'রে আবার ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় ধর্‌বে?

কিশোরী কহিল,—তা কেন?

ধরণীধর কহিল,—তবে কেন বাপু, তারা, তাদের যারা কাপড় বন্ধ ক'রে পয়সা বন্ধ কর্‌বে—তাদের পাওনা আদায়ে সাহায্য কর্‌বে?

কিশোরী কহিল,—এর মধ্যে আরও অন্য কথা ঢের আছে। মানে—

ধরণী কহিল,—মানে রেখে দাও বাপধন! ও পলিটিক্স বুঝি না—আমরা যে খেতে পাচ্ছি না, খেতে দেবে? ভালো জলের অভাবে রোগে ভুগছি, জল দেবে? ওষুধ দেবে? কন্যাদায়ের জ্বালায় বাড়ীতে মেয়েগুলোকে অভিশাপ দিয়ে দিবারাত্র তাদের মরণ কামনা করছি—যে-নারীকে তোমরা বক্তৃতায় কাগজের প্রবন্ধে শক্তি ব'লে গলাবাজী করছো গো—সেই নারীর বিয়ের যৌতুকের ভয়ে তা'দের গলা টিপে মারতে পারতুম, যদি পেনাল কোড না থাকতো—তার হদিশ বাৎলাতে পারো বাপু? ত্রাতার দল মোটর-ছাড়া চলেন না, রেলে ফার্ষ্ট ক্লাশ টুর, লাট-সাহেবের মত টুর-প্রোগ্রাম বেরুচ্ছে, যখনই যা চাঁদা চাইছেন, তখনি সে ব্যাপারে হুড় হুড় ক'রে চাঁদা দিচ্ছি, তার হিসেব চাইছি না—ফলে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই! মাঝে থেকে চতুর উকীল ত্রাতা আদালতে ত্রাতাগিরির সার্টিফিকেট এঁটে পশার বাড়াচ্ছেন, ত্রাতা ডাক্তার রোগীর বাড়ী ফী নিচ্ছেন মুঠো মুঠো, আর লিখিয়ে আর বকিয়ের দল ঢাউস ঢাউস কাগজ বার ক'রে ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা করছেন! ও-সবে হবে না,

আর ভুলবো না, বাবা। সমস্যার চাপে মরবো, সে-ও বি আচ্ছা ! কিন্তু তোমাদের মাতব্বরির চাপ সইতে পারবো না। এই যে, এসো তো বাবু—পাটের চাষ বন্ধ করতে চাও, নিজেরা এসে লেগে যাও—তা না, মুখে বলবে পাট বন্ধ কর, আর চেক কেটে পাটের শেয়ার কিনবে !

ধরণীধরের বয়স হইয়াছে—রেলোয়েতে চাকরী করিয়াছে, তা-ও অত বড় ব্যাপারে চাকরী খোওয়াইয়াছে, তার মুখের ধার সহা কিশোরীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সে কহিল,—দেখুন, চরকার আদর যখন ছিল, তখন আমাদের ঘরে অন্নও ছিল—আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা দোলদুর্গোৎসব ক'রে গেছেন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন, অতিথি-পালন—

ধরণীধর হাসিয়া কহিল,—বাপু হে, সেকালে পয়সার দর ছিল স্বতন্ত্র। টাকায় তিন সের ঘী পাওয়া যেতো—লোক-সংখ্যা ছিল কম, বাহিরের এমন প্রচণ্ড আঘাত সইতে হতো না। জিনিষ ছিল শস্তা, লোক ছিল কম, ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষাও ছিল ছোট—সেকাল নিয়ে তর্ক তুলো না। তখন চোর ছিল, ডাকাত ছিল, লুঠ ছিল, লাঠালাঠি ছিল—এখন ডাকাত নেই, লাঠালাঠি নেই—তার বদলে যা আছে, আদালত, মামলা মোকর্দ্দমা, উকীল-ব্যারিষ্টার, রোগে অবধি ডাক্তারের নানা ফন্দী—ও-সব কাজের কথা নয়। কাজের কথা হচ্ছে মনকে বড় করতে হবে, দরদী হতে হবে, আর এই শিক্ষা-দায়, অন্নদায়, কন্যাদায়—এই বড় দুর্ভাবনাগুলো থেকে বাঁচাবার উপায় করো তো বাবা—তখন দেখবে। স্বাস্থ্য ফিরতে কতক্ষণ ? ও দুর্ভাবনা ঘুচলে মানুষের পরিপাকশক্তি ফিরবে, আর দুর্ভাবনা ঘুচলে ডায়েবিটীশও দেশ ছেড়ে পালাবে।

সবেগ এ তর্কের মুখে কিশোরী দাঁড়াইতে পারিল না। যুক্তির চেয়ে আস্ফালন যে-তর্কে বেশী, সে-তর্কের সঙ্গে লড়াই করাও দায় !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাধান

কিশোরীর মাথায় ধরণীধরের কথাগুলা বিষম জোরে বসিয়া গিয়াছিল। বক্তৃতায় প্রবন্ধে জাতিকে জাগানো সম্ভব নয়। মহাত্মাজীর দৃষ্টান্ত তো লোকের চোখের উপর—সে ত্যাগ-মন্ত্র কেহ লইতে পারিল ? বিলাসী মন বিলাসে ভুলিয়া থাকে, মাঝে মাঝে বিলাসের খোলস ছাড়িয়া খদ্দর আঁটে, সেটা ভড়ংএর জন্য—কালীঘাটের পথ-চারী কমণ্ডলু-চিম্‌টা-লোটা-ধারী ভণ্ড সন্ন্যাসীর মতই !

তবু দেশের জন্য কিশোরীর প্রাণ কাঁদিয়াছিল। আত্মীয়-বান্ধবহীন তরুণ মন কোথাও কোনও আস্তানা বাঁধিবার সুযোগ পায় নাই ! অবলম্বন নহিলে মানুষের মন থাকিতেও পারে না। তার তরুণ মনে দেশের দুঃখ সত্যই একটা স্পন্দন তুলিয়াছিল। তবে কোন্ পথ দিয়া গেলে দেশের দেখা মিলিবে এবং কি করিলে দেশের কাজ করা হইবে, তার কোন সন্ধান সে পায় নাই। খবরের কাগজকেই সে দেশ-গীতা ভাবিয়াছিল। এখন বাস্তবের সঙ্গে বাস করিতে আসিয়া পদে পদে তার বাধিতেছিল খুবই।

লেখা ! তা দিয়াও আবার মানুষকে পথের হদিশ বাৎলানো চলে ? লোকে লেখার তারিফ করিবে,—গল্প হয় যদি তো গল্পের গাঁথুনিরই বিচার করিবে, ভিতরে তার কোন বড় কথা যদি থাকে তো দু'চার জন দু'চারিটা কাগজে তা লইয়া আলোচনাও নয় করিবে, কিন্তু তার পর ? তার মনে দ্বিধা জাগিল, মানুষ এত শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াও সেই আদিমকালের মতই বর্ব্বর রহিয়া গিয়াছে ! দরদ নাই, সহানুভূতি নাই, সমবেদনা নাই—তবে কি ছাই মানুষ মানুষের জন্য বহি লেখে ? কাব্য রচনা করে ? শুধু দুটা তারিফের জন্য ? কাহারো প্রাণ জাগিয়া উঠিবে না ?

বুঁচি আসিয়া ডাকিল,—অমুদা——

সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িল। কিশোরী কহিল,—এদিকে এসো বুঁচি—

বুঁচি আসিল। কিশোরী কহিল,—বই চাই বুঝি ?

বুঁচি কহিল,—না।

কিশোরী বিস্মিত হইল। বই চাই না ? সে কহিল, বই চাই না কেন ? পিসিমা——

বুঁচি কহিল—বই ফিরিয়ে দিতে এসেচি। পিসিমার অসুখ।

অসুখ ! কিশোরী কহিল—কি অসুখ ?

বুঁচি কহিল—তা জানি না। কারো সঙ্গে কথা কইছে না। মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সকাল থেকে—

কিশোরী কহিল—ডাক্তার দেখছে না ? তোমার পিসেমশায়——?

বুঁচি কহিল—পিসেমশায় রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে।

সে কি! কিশোরী কহিল—চলো, দেখে আসি।

কিশোরী আসিয়া দেখিল, পিসিমা স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। সে কহিল,—এ কি পিসিমা, তবে যে বুঁচি বললে, আপনার অসুখ!

পিসিমা কহিলেন,—না বাবা। ও পাগল মেয়ের কথাও আবার শোনে!

পিসিমার স্বর গাঢ়, মুখ ফুলিয়াছে! পিসিমা কি কাঁদিয়াছেন? কিশোরীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—কি হয়েছে পিসিমা? বলুন না আমায়—

কিশোরী পিসিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

পিসিমা কহিলেন,—ঐ হতভাগা মেয়েটাই আমায় খাবে।

বুঁচি অবাক্। কিশোরী বুঁচির পানে চাহিল, কহিল—কি করেছে বুঁচি?

বুঁচি কাঁদিয়া ফেলিল; কহিল,—বা রে, আমি কি করলুম!

পিসিমা তার পানে চাহিলেন। পরে কহিলেন,—ভুতুর কাছ থেকে বই আনলিনে তো? যা, নিয়ে আয়—বই আনিসনে বলেই তো—

বুঁচি তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ছুট দিল।

পিসিমা কহিলেন,—বাপ-মা-মরা মেয়েটা—বড় অভাগী, তা'ও কি ছাই রূপ আছে? বিয়ে যে কি ক'রে হবে! তা উনি বলছিলেন, ওঁর আপিসে কে এক জন তেজপক্ষে বিয়ে করতে চায়—পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে আছে। তা এ বিয়ে আমি কি ক'রে দি বাবা!

কিশোরীর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাই তো! এ যে মহাদায়—বাঙ্গালীর সব চেয়ে বড় সমস্যা! মেয়ে—তার বিবাহ দেওয়া চাই, তা-ও সুপাত্রে—

সহসা বাহিরে কণ্ঠস্বর—কোথায় গো বৌমা, জননী?—

—ঘোষাল খুড়ো! বলিয়া পিসিমা মাথায় ঘোমটা টানিলেন এবং সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেদিনকার তার্কিক সেই ধরণীধর ঘোষাল।

ঘোষাল কহিল,—গেছলুম গো বৌমা তোমাদের ওই স্বদেশী চাঁইদের কাছে—তাঁরা বলেন, দেশের বড় বড় কায তাঁদের হাতে, কৌন্সিল, বাজেট, লেবর—এই সব—এ-সবের ভাবনায় তাঁরা কাতর। এর মধ্যে কোথায় কে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, সে ভাবনা করতে গেলে চলে কখনো? তার পর ঐ মস্ত আড্ডাটায় গেলুম, ছোকরারা খদ্দর ঘাড়ে নিয়ে বিক্রী ক'রে দেশকে স্বর্গে তুলবে ভেবে বুক দশ হাত করছে যেখানে! তারা জিজ্ঞাসা করলে, মেয়ে ডাগর? বললুম, হাঁ। জিজ্ঞাসা করলে, লেখাপড়া জানে? বললুম, হাঁ। জিজ্ঞাসা করলে, সুন্দরী? বললুম, না বাবা, এই আমার গায়ের রং! তা বললে, না মশাই, এখন বিবাহের অবসর নেই, তবে ডাগর সুন্দরী মেয়ে হ'লে এবং এম্পায়ারে দু'দিন নাচতে বা এ্যাক্ট করতে পারার ক্ষমতা থাকলে চেষ্টা দেখতুম! থিয়েটারে টাকা আর যৌতুকটা একটা ফণ্ডে জমা দিতুম! তা মা, মডার্ণ ইয়ং বেঙ্গলরা যখন এলো না, তখন এই আমি আছি—আজ দশ বছর গৃহিণী গেছেন—ভেবেছিলুম, আর ও পথে নয়! তা ব্রাহ্মণের দায়—ব্রাহ্মণ, নয় আবার মাথা মুড়োলুম!

কিশোরী কহিল,—আপনি?

ঘোষাল কহিল,—হ্যাঁ বাবা, আমিই। মেয়েটার বিবাহ কি হবে না? গরিব; পয়সা-কড়ি দিতে পারবে না যখন, অনাথা—তখন ওর এই বানের জল ছাড়া আর গতি হবে কোথায়? দেশের নেতারা বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন—আমরা এই ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করি।

কিশোরী কহিল,—আমি বিয়ে করবো বুঁচিকে।

ঘোষাল কহিল,—তুমি? ঐ কালো মেয়ে? ওতে ত Poetry নেই, বাবা!

কিশোরী কহিল,—ইংরেজ আমাদের কালা নিগার বললে আমরা জ্ব'লে উঠি, আর দেশের ছেলে দেশের মেয়েকে কালো ব'লে ঘৃণায় নাক সিঁটকুবে, এর বাড়া পাপ যে আর হ'তে পারে না!

ঘোষাল কহিল,—তুমি! বক্তৃতাবাজ কিশোরী!

কিশোরী ঘোষালের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া কহিল,—আপনার কথাই ঠিক ঘোষাল মশায়—দেশের যদি যথার্থ মঙ্গল কিছুতে হয় তো সে বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে হবে না, হবে শুধু হাতে-কলমের কাজে। দেশের উপর যথার্থ দরদ, যথার্থ ভালোবাসা মানুষের যে দিন জাগবে, কন্যাদায় আর সে দিন দায় থাকবে না, দেশের নারীও যথার্থ সে দিন শক্তি হয়ে পুরুষের বুকে বিরাজ করবেন—যে দিন তাঁর পাণি পুরুষ সাধনার বস্তু ব'লে বরণ করবে, পীড়নে তা গ্রহণ করবে না!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

এইবার আমরা সতীত্বের অঙ্গ, উপাদান, প্রসার, উৎকর্ষ, পরিণতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিব। সতীত্ব মূর্ত্ত হয় কিসের উপর, সতীত্ব প্রস্ফুটিত হয় কি লইয়া, কিসে তাহার বিকাশ, তাহা দেখিব। বলা বাহুল্য, ইহাদের সহিত সতীত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গৌণ এবং কতক মুখ্য। মুখ্যগুলি (১) বিবাহ, (২) রূপ এবং প্রণয়, (৩) লজ্জা ও সংযম, (৪) মাতৃত্ব, (৫) ভূমা সুখ, (৬) সেবা-দয়াদি, (৭) সতীত্ব ও সমাজ বা জগৎ, (৮) সতীত্ব ও শিক্ষা। ইহা ভিন্ন গৌণও আছে, তাহা আমরা প্রসঙ্গক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই মুখ্য বিষয়গুলি অল্পবিস্তর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া, সতীত্বের দিক্ দিয়া এবং সার্থকতার ভিতর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহার বিপরীত দিকের কথাও আমরা বুঝিতে বাধ্য, নচেৎ জিনিষটা ঠিক ধরা যাইবে না।

বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে গোটাকতক কথা প্রথমে বলা আবশ্যক। বিবাহ সাধারণতঃ (১) কন্যা এবং পাত্রের অভিভাবক, পিতা বা তৎস্থলীয় কাহারও দ্বারা স্থির হয়, (২) পাত্র এবং পাত্রী নিজের ইচ্ছামত লোক বাছিয়া লয়েন, (৩) অন্য প্রকারের বিবাহ। আবার বিবাহের পূর্ব্বে কোর্টসিপ, পরে ডাইভোর্স, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার আছে। আমরা এ পরিচ্ছেদে বিবাহ-প্রথাভেদ সম্বন্ধে প্রধানতঃ যাহা আজও এ দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই দেখিব। অন্য দেশের খবর তত আবশ্যক নহে, কারণ, বোধ হয়, মোটামুটি সব রকমের বিবাহ এ দেশে প্রচলিত আছে। হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টানদের বিবাহপ্রথা মোটামুটি সকলেরই পরিচিত, এজন্য অন্য অসাধারণ বিবাহ-প্রথাই আমরা দেখিব। মানুষ ছাড়িয়া পশুর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, এক প্রকার বিবাহ আছে। জীবের মধ্যে পক্ষিজাতি অধিক যৌন সম্বন্ধভাবে ক্রিয়াসক্ত, তথাপি তাহাদের মধ্যে একটি সহচর বা সহচরী লইয়া জীবন-যাপন সাধারণ নিয়ম। গরিলা ওরাংওটাংএর মধ্যেও ইহা দৃষ্ট হয়।

১। কাশ্মীর প্রদেশে কোন কোন স্থানে ক্ষেত্রজ বিবাহ আজিও প্রচলিত আছে। স্বামী বৃদ্ধ হইলে কোন যুবা দ্বারা সন্তানোৎপাদন করান হয় এবং ইহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া গণ্য হয় না, বিশেষতঃ যদি স্ত্রী যুবতী হয়।

২। সন্তানরা পিতার পরিবর্ত্তে মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, এমন সম্প্রদায় দক্ষিণ-ভারতবর্ষে নায়ার জাতি।

আলমোরার নিকটে কতকগুলি ভূটিয়া পল্লী আছে, যথায় বিবাহিত এবং অবিবাহিত নর-নারীর রাত্রিবাসের জন্য স্বতন্ত্র বাটী আছে। দশ বৎসর বয়স হইতে প্রথম সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত নারীরা কদাচ স্বগৃহে বাস করে না।

৩। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান যেরূপ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন, কোন সভ্য জাতিই তাহার অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন না। ফলে এই সম্প্রদায় দুইটির মধ্যে অসতী কম। কতকগুলি অসভ্য জাতির মধ্যে কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে সমান ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, যেমন শক্কর, জাঠ, মেৱ। জাঠ এবং পাঠানদের মধ্যে পলায়নকারী এমন কি পরের দ্বারা উৎপাদিত সন্তানসহ স্ত্রীকেও গ্রহণ করে। দক্ষিণ-ভারতে কোথাও কোথাও বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর সহিত বালকেরও বিবাহ হয়। যত দিন স্বামী বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তত দিন স্বামীর পিতা প্রভৃতির সহিত তাহার সহবাসে কোন দোষ হয় না। কোন কোন জাতি স্ত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে, যখন যাহার সহিত ইচ্ছা বিহার করিতে পারে। স্বজাতিমধ্যেই ইহা অধিক, কিন্তু ভিন্ন জাতিতেও চলে। তোডা প্রভৃতি জাতি ঈর্ষ্যা কাহাকে বলে জানে না। তাহারা স্ত্রীর ব্যভিচার নিতান্তই স্বাভাবিক মনে করে। মাদ্রাজে এক জাতি আছে, তাহারা পত্নীদের যথেচ্ছা বিহারে কোন দোষ দেখে না, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীর অথবা বিধবার ব্যভিচারে নারীকে জাতিচ্যুত করে। এক স্বামীর বহু পত্নী গ্রহণ প্রথা অনেক স্থানে আছে। কৌলীন্য প্রথা ইহার দৃষ্টান্ত। মুসলমানরা চারিটি পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন।

৪। ডাইভোর্স (স্বেচ্ছায় পতি বা পত্নী ত্যাগ) হিন্দুদের মধ্যে নাই, কারণ, হিন্দু বিবাহকে ধর্ম্মের অঙ্গ একটি সংস্কার বলিয়া মনে করেন। নীচজাতীয়ের মধ্যে কিন্তু ইহা দেখা যায় না। ইরুলা জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথাই নাই। নারী ইচ্ছানুসারে যত দিন খুশী যাহার সহিত ইচ্ছা বাস করিতে পারে। কোরভা জাতির মধ্যে যে নারী সাতবার বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় এবং বিবাহ বা ধর্ম্মকার্য্যে তাহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তোডা, খন্দ, খাসীয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে অতি সহজে ডাইভোর্স হয়। নেপালে নেওয়ার নামে এক জাতি আছে, তাহারা বিছানার উপর দুইটি সুপারি রাখিয়া গেলেই স্বামীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু সে আবার যখন ইচ্ছা স্বামীর ঘর করিতে আসিতে পারে। কিছু মূল্য ধরিয়া দিয়া স্বামীকে ত্যাগ করার প্রথা পাঞ্জাবে কোথাও কোথাও দেখা যায়। মুসলমানরা অতি সামান্য কারণে স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারেন। বৌদ্ধরাও বর্ম্মায় তাই করেন।

৫। অতি সভ্য পাশ্চাত্য দেশেও ডাইভোর্স ভীষণভাবে চলিয়াছে। কত সহস্র নর-নারীর যে দৈনিক ডাইভোর্স হইতেছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বিবাহটা যে ছেলেখেলার জিনিষ বলিয়া সভ্য জগতে মনে করিতে সুরু করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন এই ডাইভোর্স ব্যাপারে বুঝা যায়। আমরা দুইটিমাত্র উদাহরণ দিব—

(ক) ৯৪ বৎসর বয়সে এক ব্যক্তি তাঁহার ৩৭টি স্ত্রীকে ডাইভোর্স করিয়াছেন। এখন তিনি ৩৮ নম্বরের স্ত্রীর পাণি-প্রার্থী। এ ব্যক্তির ৫০টির অধিক সন্তান জন্মিয়াছে, ঠিক তাহাদের সংখ্যা কত, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, উক্ত ৩৭টি স্ত্রীকেই কিছু দিনের জন্য ভালবাসিয়াছিলেন। এই ৭০ বৎসর যাবৎ তিনি তাহাদের মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি সানন্দে এই কথা বলিয়াছেন যে, কতকটা শান্তির কারণ তাঁহার এই যে ৩৭টি স্ত্রীতে মিলিয়া তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত চির-নবীন করিয়া রাখিয়াছে (Statesman, 5 April 1925).

(খ) মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ৭ লক্ষ বালিকা (অর্থাৎ যাহারা বয়সে ১৬ বৎসরের কম) বিবাহ করিয়াছে। সভ্যতার খনি নিউইয়র্ক নগরে "Trial marriage" অর্থাৎ পরীক্ষা-বিবাহ আইনসঙ্গত। ১৬ বৎসরের তরুণী এই আইন অনুসারে বিবাহ করিতে পারে। যদি ১৮ বৎসর বয়সে সে দেখে যে, কোন কারণে তাহার বিবাহ-জীবন পোষাইতেছে না, সে সন্তানবতী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বিবাহ নাকচ করিতে পারে। এ প্রদেশে বিবাহ যেখানে সেখানে যখন তখন হইতে পারে। আবশ্যক হইলে ১০ মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা হইয়া শেষ হইতে পারে (Statesman, 5 April 1925).

৬। বিধবা-বিবাহ বাঙ্গালা দেশে নীচজাতির মধ্যে হয়। পাঞ্জাবে "দ্বিজ" যাহারা, তাহারা বিধবা-বিবাহ দিতে পারে। ইহা কতক কতক রাজপুতনায় এবং অন্ত্যজ ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখা যায়। সিংভুম, মধ্যপ্রদেশেও ইহা চলে। কাছাড়ী হোলেয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক জন বিপত্নীকের সহিত বিধবাকে থাকিতে দেওয়া হয় এবং তাহাতে বিধবার জাতিনাশ হয় না। সন্তানাদিও জারজ বলিয়া গণ্য হয় না। বিধবাদের স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত বিবাহ-প্রথা মনুতে আছে। উড়িষ্যায় স্থানে স্থানে ইহা প্রচলিত। শঙ্করজাতীয়া বিধবা স্বামিগৃহে থাকিয়া যথেচ্ছ বিহার করিতে পারে, সন্তান জারজ বলিয়া গণ্য হয় না। চীনদেশীয়রা বিধবা-বিবাহ পছন্দ করে না।

৭। হিন্দুর সগোত্রে বিবাহ চলন নাই। মুসলমান কুমারীকেই প্রথম বিবাহ করে। কাকার, জ্যেঠার, মামার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে ঘটে। খৃষ্টানদের মধ্যেও ইহা চলে। গিল্‌ঘিটে মুসলমানরা এ প্রথা মানে না, বেলুচিস্থানে কিন্তু ইহা খুব প্রচলিত। বর্ম্মাদেশবাসীদের মধ্যে খুব নিকট-সম্পর্ক ব্যতীত সকলকেই বিবাহ করা চলে।

৮। এ দেশে প্রায় সর্ব্বত্র যৌতুক লইয়া বিবাহ প্রচলিত। দাসত্ব বিনিময়ে বিবাহপ্রথা আসামে আছে।

৯। আসাম লখিমপুরে কুমারীদের কলাগাছের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। সৎনামী চামারদের মধ্যে বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে একটা ভোজ হয় এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা বধূর রাত্রিযাপন বিধি। পাঠানদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ-রাত্রিতে বধূকে পূর্ব্ব-পরিচিত যুবকের সহিত রাত্রিবাস করিতে দেয়।

১০। বিবাহকালে পাত্রের পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও তরবারি, লাঠি প্রভৃতির সহিত বিবাহ হয়। রাজপুতদের মধ্যে ইহা প্রচলিত। পতিতাদের মধ্যেও বিবাহ আছে। কখন বা মানুষ, কখন তরবারি, গাছ, ছুরী প্রভৃতির সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। [এ অধ্যায়ে যাহা বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা সার এডোয়ার্ড গেট কৃত Census Report of India 1911 হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। Ps. 235-61]

১১। মেলানেশিয়া দেশে এবং জাপানে পতিতারাও সাধারণের মত বিবাহ করিতে পারে। দক্ষিণ শ্লাভ দেশে বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়ীদের দত্ত উপহার মহা গৌরবে স্বামীকে দেখান হয়।

আমরা বিবাহ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। কারণ, সতীত্ব আখ্যা বিবাহিতা নারী সম্বন্ধেই সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহ-প্রথা হইতে সতীত্বের বিকাশ বুঝা যাইবে বলিয়া এবং অসভ্য জাতির মধ্যেও বিবাহ-পদ্ধতিও সতীত্বের ধারণা কম বেশী আছে, ইহা বুঝিবার জন্য। আর এক বিশেষ কথা এই যে, তরুণ যে পথ আজ দেখাইতেছেন,—অবাধ মেলা-মেশা, নর-নারীর অবাধ যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করার চেষ্টা ইত্যাদি,—তাহার গতি কি স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে না যে, এত যুগ ধরিয়া সভ্য মানুষ যে পথের মধ্য দিয়া আসিয়া আজ সতীত্বের আসন এত উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—নবীন আবার সেই পথের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতেছেন? পুনরায় কি অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য জাতিদের প্রথা অবলম্বনের চেষ্টা হইতেছে না এবং সভ্যতার আবরণেই সেই পথে ফিরিয়া যাইবার প্রয়াস পাওয়া হইতেছে না? আদিম যুগের মানুষ হওয়া হয় ত অনেক বিষয়ে ভাল হইতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তির বিষয়েও কি তাহাই বলিতে হইবে? তবে সভ্যতার অর্থ কি? বর্ব্বর অসভ্যেরই মত জ্ঞানহীন লোক ব্যভিচার করে, আর সভ্য মানুষ সাধারণতঃ বিষাক্ত ভ্রমাত্মক যুক্তির দ্বারা মনকে আঁখি ঠারিয়া, লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সেই কাম হাসিল করিতে চাহে। প্রভেদ এইমাত্র।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রূপ এবং প্রণয়

রূপ ও প্রণয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। কারণ, প্রণয় জন্মিবার একটি প্রধান কারণ রূপ। ইহা নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযুজ্য। সতীত্বের সম্বন্ধে বিশদ ধারণা বুঝাইবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, প্রেম বা প্রণয় ব্যতীত সতীত্ব দাঁড়াইতে পারে না। প্রেম মূল, প্রণয় তাহার ছায়ামাত্র। কিন্তু এতদুভয়ের সম্পর্কও অত্যন্ত নিকট, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। রূপ কি? প্রণয় কি? দুই চারিটা কবিতা হইতে দেখা যাউক—

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে।
ভানু কোটি চন্দ্র কোটি কোটি মদন হারে॥
(উদ্ধবদাস)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
সখি কারে বা সুধাই আমি।
এরা সবাই হ'ল কৃষ্ণের অনুরাগী॥
এস হে এস প্রাণে এস সখা।
আমি তৃষিত অতি, আঁখি-রঞ্জন
আঁখি ভরিয়ে দাও হে দেখা॥ (রবীন্দ্রনাথ)

আবার— ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে, মদন মুরছা পায়॥
(গোবিন্দদাস)

কিংবা— কো বিহি নিরমিল বালা!
অপরূপ রূপ, মনোভব মঙ্গল,
ত্রিভুবন-বিজয়ী মালা॥ (বিদ্যাপতি)।

অথবা— অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল,
হরিণী-হীন হিমধামা॥ (বিদ্যাপতি)

অপরূপ এক বালা দেখিলাম। তাহার মুখ স্বর্ণলতার উপর অকলঙ্ক চন্দ্রের মত।

ইহা শান্তরূপের বর্ণনা। আবার —

"পিরিতি সুখের সায়র দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়,
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুখের বায়।"

এই রূপ এবং প্রণয় লইয়া জগতে কাব্য, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য সবই সৃষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ের আলোচনা জগৎ-সৃষ্টি হইতে চলিতেছে, চিরকাল চলিবে। তাবৎ সকল বিষয়ই ইহার কাছে তুচ্ছ। এই দুই লইয়াই জগৎ ভরপুর। তাহা ত হইবেই। কেন না, রূপের কাঙ্গাল—ভালবাসার কাঙ্গাল নহে কে? "রূপং দেহি ধনং দেহি"—এই রব অনন্তকাল মানুষ উচ্চারণ করিতেছে। এই রূপের ধারণা মানুষ কোথা হইতে পাইল? এ প্রণয়ের ধারণা তাহাকে কে দিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় কোন মহাকবির কাহিনী মনে আসে। এক দিন তিনি সমুদ্রতটে বেড়াইতেছেন। ভাবুক সমুদ্রের সেই ভোলা ভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন। কি খেয়াল হইল, এক খণ্ড শাঁখ তুলিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সেটিকে নিজের কাণের উপর রাখিলেন। তাহার ভিতর সমুদ্রের গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি পাইয়া তিনি ভাবসাগরে ডুবিয়া গেলেন। ভাবিলেন যে, এই শঙ্খ বহু বহু যুগ ধরিয়া সমুদ্রবক্ষে ছিল। কতকাল ধরিয়া সমুদ্র-বক্ষে ছিল, কত কাল ধরিয়া সমুদ্রবক্ষে থাকিয়া তাহার প্রেম অনুভব করিয়া তাহাকে এতই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে যে, যদিও তাহারই অদৃষ্টবশে সমুদ্র তাহাকে বক্ষ হইতে নামাইয়া দিয়াছে, তথাপি এই শঙ্খটি সমুদ্রের ভালবাসা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। অহরহঃ, অবিরাম তাহারই নাম, রূপ, শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। নিজের সত্তার প্রতি অণু-পরমাণুতে তাহার সেই ভালবাসা বিচরণ করিয়া, তাহার অতীত স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সে-ও সেই বাঞ্ছিতকে, চির-প্রার্থিতকে অবিরাম ডাকিতেছে—"এস—তুমি এস -।" "আবার তোমার বুকে আমায় নাও—আমায় তৃপ্ত কর—আমায় শান্ত কর।" এই না বেদের "আবিরাবির্ম্মএধি?" এই না সেই অনন্ত প্রেমের অহোরাত্র আবাহন? এই না ভূচর, খেচর, জলচর, জল, স্থল, মরুৎ, ব্যোম, দিবা, রাত্রি, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে; ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। এই রূপ, এই প্রণয়, এই প্রেমও কি তাহাই নহে? কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আমরা সেই পরম প্রেমাস্পদের বক্ষে ছিলাম। আজ কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে, অদৃষ্টবশে, আমরা সেই প্রেমময়ের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। কিন্তু স্মৃতি ত যায় না—চাপা পড়ে মাত্র। সদ্যঃপ্রসূত শিশু আনমনে খেলা করিতেছে, কিছুক্ষণ পরেই কাঁদিয়া উঠিতেছে। বালক একটা খেলনা লইয়া সব ভুলিয়া যায়, কিছুক্ষণ পরেই সেটা ফেলিয়া দেয়, আবার একটা দাও বলে! খানিক পরে তাহারও এই দশা।

তরুণ-তরুণী একটা লইয়া কিছুকাল কাটায়, আবার একটা চাহে। প্রৌঢ়, বৃদ্ধও তাহাই। মানুষ প্রত্যেক জিনিষে তাহার সেই হারান ধন খুঁজিতেছে; পূর্ব্বানুভূত স্মৃতির সহিত কোনটিই মিলিতেছে না। তাহার জন্য কিছুতেই তাহার তৃপ্তি, শান্তি আসিতেছে না। যে প্রেমময়ের জগন্মোহন রূপ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি পাই নাই, কারণ, অনন্তকাল দেখা হয় নাই; যে স্নেহ ক্ষরিত হইয়া জীবন অমৃতময়,—মধুময় করিয়াছিল, তাহা আজ হারাইয়াছি বলিয়াই শিশুকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই হারানিধিকে খুঁজিতেছি। সারা জীবন এটা কার, ওটা কার, এটা নাড়ি, ওটা নাড়ি, এখানে যাই, ওখানে যাই, তবু তৃপ্তি নাই, তবু শান্তি নাই। এই যে অহরহঃ অশান্তি মানুষের বুকে অহোরাত্র জ্বলিতেছে—চিতার মত ইহা কি স্পষ্ট দেখাইতেছে না, যে আমাদের কাম্য জগতের জিনিষ ছাড়া? শুধু মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বেড়াইতেছি? এই যে পাইলাম না বলিয়া অশান্তি, অবসাদ, খেদ, ইহার মূল কি পূর্ব্বানুভূত স্মৃতিই নহে? বৈজ্ঞানিকও অরূপের রূপ বিষয়ে প্রকারান্তরে কি একই কথা বলেন না? তিনি বলেন—মানুষ এবং মানুষের অন্য পদার্থের যে নিকট-সম্বন্ধ আছে, অন্য পদার্থ এই অন্ত শক্তির যে কার্য্য, তাহা দেখিয়া আমার আর সন্দেহ নাই যে, প্রকৃতিদেবী অরূপ হইতে ক্রমশঃ রূপে বিকশিত হইয়াছেন। অরূপ হইতে রূপ সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা যখন মানিতেছেন, তখন অরূপের সন্ধানই যে রূপ-বিশিষ্টদিগকে প্রেরণা দেয়, ইহাও প্রকারান্তরে মানিতেছেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শ এবং তাহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা

কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে, স্মরণাতীতকালে, পুণ্যভূমি ভারতের স্থাপত্য-শিল্প উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া আপনার অনন্য-সাধারণ গৌরবপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল এবং ভারতবাসীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধন রাখিয়া মন্দির এবং হর্ম্ম্য, দেউল ও মঠ, ভারতের নগরে ও পল্লীতে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক আলোচনা এ ক্ষেত্রে করিতেছি না। জাতির স্থাপত্য-কলা জাতির আত্মার ও জাতীয় জীবনের প্রতিভূ। স্থাপত্যের বিনাশ হইলে জাতির উচ্ছেদ অনিবার্য্য। বিদেশীর শাসনের ফলে আমরা আমাদের সেই বিশিষ্ট স্থাপত্য-কলার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি। দেশের এই জাগরণের যুগে বিদেশী পণ্যবর্জ্জন, পল্লীগঠন প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের মত আমাদের নিজস্ব স্থাপত্য-কলার উদ্ধার-সাধন ও জীবন রক্ষা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন; সেই আবেদন লইয়া আপনাদের সকাশে আমি নতশিরে সমাগত হইয়াছি। আর এই যুগেও ভারতের প্রাচীন শিল্পের পুনরভ্যুত্থান অসম্ভব নহে। অন্ধ সংস্কারের বশে আমরা তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

অতি প্রাচীন যুগেও আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে কি আধ্যাত্মিক, কি জাগতিক, সর্ব্ববিষয়েই জগতের কল্যাণকর একটি মহান্ আদর্শ বর্ত্তমান ছিল। সেই আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বেদে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে, সাহিত্যে ও কাব্যে, ধর্ম্ম-দর্শনাদি যাবতীয় শাস্ত্রে, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় এবং স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে তাঁহারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, যাহাতে তাঁহাদের মহান্ পরিকল্পনা মানবের অন্তরের ভিতর যে একটি চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে—তাঁহাদের হৃদিতন্ত্রী যে এক তপোবনপ্রসূত সাম-গানের কোমল ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে—তাহার উদাত্ত সুর কোনও প্রকারে যেন উপেক্ষিত না হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের জলবায়ু ও যাবতীয় প্রাকৃতিক অবস্থার বৈষম্যের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকারের বিবিধ জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের চিন্তার ধারা গঠিত হইয়াছে। সেই কারণে আমাদের-ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আমাদের জীবনের আদর্শ, আমাদের স্থাপত্য-শিল্প, আমাদের গৃহ-নির্ম্মাণপ্রণালী সমস্তই পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর বিভিন্ন ধরণের আদর্শ হইতে পৃথক্‌ভাবে গঠিত ও বিকশিত হইয়াছে। মিশর, রোম, গ্রীসের মত আমাদের দেশেও স্থাপত্যের গরিমাময় কয়েকটি যুগ আসিয়াছিল। ভারতের সেই সৃষ্টির যুগে আমাদের দেশজাত উপাদান, জলবায়ু ও জাতীয় জীবনের অনুকূল আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদের স্থাপত্যের যুগব্যাপী পরীক্ষা চলিয়াছিল। আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এই শত শতাব্দী পরীক্ষিত প্রাচীন স্থাপত্যের পরিণতি।

বিগত পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র ব্রহ্মদেশ ও চীনসীমান্তপ্রদেশ পর্য্যটন করিয়া আমি দেশের শিল্পের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ভারতীয় শিল্পাত্মার কি বিসদৃশ পরিণাম হইয়াছে! সুদূর ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের "মিচিনা" অর্থাৎ "স্বর্ণ" প্রদেশের ছায়াশীতল আম্রকাননের বৌদ্ধ সংঘারামে এবং চিরতুহিন, তুষারমৌলি হিমালয়ের ক্রোড়াঙ্কে অবস্থিত মহাতীর্থ বদরীনারায়ণে সর্ব্বত্রই য়ুরোপীয় আদর্শের বাসভবন পরিদৃষ্ট হয়।

ভারতের নিখিল সভ্যতার পরিচয় দেশের বেদে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে ও ধর্ম্ম-দর্শন-ন্যায়-জ্যোতিষাদি যাবতীয় শাস্ত্রে ও চিত্রাদি কলাবিদ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির ও উৎকর্ষের অবিসম্বাদী প্রমাণ তাহার প্রাচীনকালের মন্দির, মসজিদ, দুর্গ ও প্রাসাদগুলির স্থাপত্য-কলা হইতেই মিলিয়া থাকে। হিন্দু যুগের ভারতের প্রাচীন মন্দির ও সৌধাবলীর অধিকাংশই তুর্কীদের ভারত-লুণ্ঠনকালে এবং পরবর্ত্তী কালের পাঠান, পোর্টুগীজ এবং মোগল বাদশাহ-দিগের ঈর্ষ্যা ও ধর্ম্মান্ধতার ফলে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত। কিন্তু যে কয়টি রক্ষা পাইয়াছে, সেগুলি পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের ব্রহ্মণ্য যুগের এবং বৌদ্ধ ও জৈন যুগের অক্ষয়কীর্ত্তির চিরন্তন কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। মোগলযুগে দেশীয় স্থাপত্যকলার একটি নূতন ধারা প্রবাহিত হয়—প্রধানতঃ হিন্দুস্থাপত্যের, বাইজান্টাইন স্থাপত্যকলায় অনুপ্রাণিত আরবীয় স্থাপত্যের এবং পারস্যের স্থাপত্যের আংশিক সংমিশ্রণে। তাজমহল সেই নব-শিল্পের মুকুটমণি—মধ্যযুগের "হিন্দু মোস্লেম" সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

তাজমহলে বাঙ্গালার প্রাচীন পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রভাব প্রকটিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতের তেলেগু, তামিল ও কানাড়া প্রদেশের সুদূর জনপদে, বীরপ্রসূ রাজপুতানার উত্তর মরুপ্রাঙ্গণে—আরও দূরে, যথায় অসিধারী মুসলমান সেনানীর সমাগম হয় নাই, অথবা যে সকল নিরালা বেলাভূমিতে কালাপাহাড়ের ধ্বংস-লীলা হিন্দুর দেবালয়ের বিলোপসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই —অনিন্দ্যসুন্দর শিখরবিমানসমন্বিত, অনন্যসাধারণ কারুকার্য্য-অলঙ্কৃত, অশেষবিধ হর্ম্ম্যচূড়া, দেউল ও মঠ অদ্যাপি যে সকল স্থানে দেখা যায়—তাহাদের শিল্পের শোভা, পুণ্যের প্রভা পরিম্লান হয় নাই—তপোবনপ্রসূত সামগান, বৌদ্ধ-জৈন-থেরীগাথা ও দ্রাবিড়ের মহাসঙ্গীতমুখরিত, শঙ্খঘণ্টা-মঙ্গলারতির পূতস্মৃতি-বিজড়িত, সেই অজন্তা ও এলোরা, মহাবলিপুর ও মাদুরা, জৈসলমের ও আবু, খাজুরাহো ও ভুবনেশ্বর, দ্বারকা ও মুধেরা অদ্যাবধি আমাদের স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের ব্রহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনযুগের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেবলমাত্র হিন্দুস্থানে, সাঁচি অমরাবতীর মঙ্গল তোরণে, অথবা মহাসাগরের তীরবর্ত্তী কোনারকের সূর্য্য-মন্দিরে ভারতের স্থাপত্যের সীমা আবদ্ধ নহে, বহির্ভারতের কাম্বোজের নরপতি সূর্য্যবর্ম্ম-বিনির্ম্মিত "আঙ্কর থোম" বা "নগরধাম" এবং মহা-চক্রি-বংশসম্ভূত রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত "আঙ্কর বাট" অপিচ যবদ্বীপের "বরবুদুর" মন্দিরের অতুলনীয় কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, সেই প্রশংসা উক্ত বহির্ভারতের সভ্যতার জননী হিসাবে ভারতেরও প্রাপ্য। চীন, কোরিয়া ও জাপানী শিল্পেও ভারতের শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান।

পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সিন্ধু ও পঞ্চনদ প্রদেশের অধি-বাসীরা পরিণত সভ্যতার অধিকারী এবং উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন; মহেনজো-দাড়ো ও হারাপ্পার খনন হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তৎকালীন ভারতবাসীর স্থাপত্য, জল-সরবরাহ ও জলনিকাশপ্রণালী এবং ধাতু ও মর্ম্মর-ক্ষোদিত মূর্ত্তির নিদর্শন অতীব বিস্ময়প্রদ। বিংশ শতাব্দীর কলিকাতা মুানিসিপাল ড্রেণের মত সেকালেও জলনিকাশের সুব্যবস্থা ছিল। কথিত আছে, আলেকজেন্দ্রিয়াতেই কাচের উদ্ভব প্রথম হইয়াছিল। তাহার বহুপূর্ব্বে সিন্ধুপ্রদেশের অধিবাসীরা কাচ ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ উক্ত খনন হইতে পাওয়া গিয়াছে। ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনগুলির সহিত মহেনজো-দাড়োর নিদর্শনগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাম্রযুগেও ভারতবর্ষ সুসভ্য ছিল। ছোটনাগপুর, দক্ষিণাবর্ত্ত ও রাজপুতানায় Poleolithic যুগের প্রহরণ পাওয়া গিয়াছে। Neolith যুগের নিদর্শনও অনেক। শিঙ্গনপুর গুহায় যে শিকার প্রভৃতির চিত্র আছে, তাহা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম য়ুরোপের Auriguacian মানবের কৃত চিত্রাবলীর আভাস পাওয়া যায়। ভারতবাসীর সভ্যতার এই যে নিদর্শন আমরা সিন্ধুপ্রদেশে পাই, তাহা আর্য্যজাতির সৃষ্ট নহে, আর্য্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রাবিড়দের সৃষ্ট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ভারতের স্থাপত্যশিল্পের প্রসঙ্গে ফার্‌গুসন লিখিয়াছেন, "ভারতের শিল্পীরা অতীব বিশালকায় সৌধনির্ম্মাণেও বিমুখ হইতেন না। তাঁহারা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অথবা জটিলতম কারুকার্য্যগুলি অবলীলাক্রমে সমাধা করিতেন——সৎ, চিৎ ও আনন্দের পরিকল্পনায় তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শিল্পী সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যত্র পরিদৃষ্ট হইবে না।" লণ্ডনে 'রয়েল সোসাইটী অফ আর্টস্'এ সার জর্জ্জ বার্ডউড ভারত-শিল্পের আদর্শের প্রতিকূল বক্তৃতা করায়, ভারত-শিল্পের অকৃত্রিম সুহৃৎ ত্রয়োদশ জন বিশিষ্ট ইংরাজ শিল্পী ও সমালোচক লণ্ডন 'টাইমস্'এ যে প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ এই;—

"নিম্নে স্বাক্ষরকারী শিল্পের সমালোচক এবং শিক্ষার্থী আমরা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম শিল্পে ভারতবাসীর ধর্ম্মপ্রাণতার অতি মহান্ আদর্শ পাই এবং ঈশ্বরের ধ্যানে তাঁহারা যে কিরূপ বিভোর থাকেন, তাহার পরিচয় পাই। ধ্যানী বুদ্ধদেবের পবিত্র মূর্ত্তির মধ্যে আমরা যে স্বর্গীয় সুষমা পাই, তাহা মানবজাতির একটি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। আমরা মনে করি যে, ভারতে যে প্রাণবন্ত, বিশিষ্ট শিল্পের ধারা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে, তাহা অমূল্য। প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমসহকারে ভারতবাসীর তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, দেশীয় শিল্পের মর্য্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আবশ্যকমত বিদেশী শিল্পের নিকট হইতে উপাদান গ্রহণ করা অলজ্ঘনীয়; কিন্তু ভারতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে—যে স্বাতন্ত্র্য ভারতের ইতিহাস এবং প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত এবং যাহার মহান্ ধর্ম্মভাব সমগ্র প্রাচ্য ভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।" দক্ষিণ-ভারতের ভাস্কর্য্য দেখিয়া পৃথিবীপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রোথেনষ্টেইন বলেন—"মনোহারী গঠন ও প্রাণবন্ত নৃত্যের

ভাবে নটরাজ ভাবুকশ্রেষ্ঠ চীনা শিল্পীরও কল্পনাকে পরাজিত করিয়াছে।" আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর আগুস্তে রোডিন বলেন, "ভাব ও ভঙ্গিমার প্রতিযোগিতায় নটরাজ মিলোর ভেনাস-মূর্ত্তিকে পরাজিত করিয়াছে।" বোষ্টনের পৃথিবীপ্রসিদ্ধ শিল্প-মন্দিরে বক্তৃতা প্রদানকালে ডাঃ আনেসাকি বলিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ-চীন শিল্পকলা এবং জাপান-শিল্প প্রাচীনতর ভারত-শিল্প হইতে প্রেরণা গ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রাচীনতম মায়া সভ্যতার উপর বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাব আছে, তথাকার অধিবাসীদের ধর্ম্ম, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। Dr. Thomas Gann লণ্ডনের 'ডেলি নিউজ' পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কলম্বসের তথাকথিত আমেরিকা আবিষ্কারের অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ শ্রমণরা দক্ষিণ-আমেরিকাতে যাতায়াত করিতেন এবং অধিবাসীদিগকে সভ্যতার আলোক বিতরণ করিতেন।

বিদেশীর শাসনের ফলে মিশর যুগের সমসাময়িক ভারতের শিল্পের, ভারতের সভ্যতার লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতেছি। খৃষ্টান মিশনরীদের মতবাদ প্রচারের মত, খৃষ্টান স্থাপত্যশিল্পী আসিয়া ভারতের বৈশিষ্ট্যের ও শিল্পের ধ্বংসসাধন করিতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টার ভারতের বস্ত্র-শিল্পেরও এইমত দুর্দ্দশা করিয়াছে। বিদেশী ধরণের ঘর-বাটী আসিয়া আমাদের পিতামহদের প্রিয় বাস্তু-শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিতেছে। তাহারা আমাদের জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক গতি বিনষ্ট করিতেছে। আমাদের নূতন গৃহে আমাদের গৃহ-দেবতা আসিয়া অধিষ্ঠান করিতে পারেন, এরূপ পীঠস্থান বা চণ্ডীমণ্ডপ নাই। দেশের ধনকুবেরগণ বহু অর্থব্যয়ে আধুনিক ধরণের সৌধ, মন্দির ও উদ্যান প্রস্তুত করাইতেছেন। কিন্তু সেই সকল উদ্যানে গমন করিলে প্রাচীন ভারতের বিলাস-উদ্যানের কোনও প্রতিচ্ছবিই লক্ষিত হয় না! সংস্কৃত সাহিত্যে নরপতি ও শ্রেষ্ঠীদের বিলাস-ভবনের যে উজ্জ্বল বর্ণনা আছে, তাহাতে সমগ্র চিত্রটি পাঠকের মানস-পটে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। অধুনাতন ভারতে সেই প্রাচীন উদ্যান বা বাসভবন প্রস্তুতকরণের ধারা বিলুপ্ত হইতেছে। রাজপুতনায় প্রাচীনকালের উদ্যান-রচনার পদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। মোগলরা আসিয়া তৎসহ পারস্যের ও মধ্য-এসিয়ার উপাদান যুড়িয়া দিলেন। তাহার ফলে, মোগলযুগের অপূর্ব্ব শোভন উদ্যান-রচনা—তাহার পরিচয় উত্তর-ভারতের প্রাচীন নগরীতে এখনও পাওয়া যায়। আগ্রার তাজ-উদ্যান এবং কাশ্মীরের শালিমর বাগ হিন্দু-মোগল বাগানের চরম আদর্শ। প্রাচীন ভারতের যন্ত্রধারা-গৃহ, প্রেক্ষাগার, নৃত্যশালা, সাগরগৃহ, মণিশিলাপট্ট, মানমন্দির, তমাল-বীথিকা, বকুল-বীথিকা, বেণুকুঞ্জ, মাধবী-কুঞ্জ, বসন্ত-মঞ্চ, পারাবত-রব-মুখরিত উদ্যান-বাটিকার বলভী, তাহাদের সংস্কৃত নামের মোহ-মধুরিমা লইয়া কেবলমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থেই অধিষ্ঠিত আছে; কিন্তু মধ্যযুগের মোগল-ভারতের মতিবাগিচার ফোয়ারা, বারাদরী, আঙ্গুরীবাগ, যশমিনবাগ, আসমান-চবুত্রা, রেওটি, সজ্জন-বিলাস, ঘটিকাযন্ত্র, মর্ম্মর আসন, দোলমঞ্চ,—সেই প্রাচীন ভারতের উদ্যান-বাটিকারই বস্তু, মাত্র ভিন্ন নামে সেই দিন পর্য্যন্ত আমাদের ধনীদের বাগানে বিরাজ করিত। ইটালীয় ও ফরাসী খেয়ালের বাগানের অনুকরণে আমরা এই সকল প্রাচীন ধারার "অচ্ছোদ-সরসীনীরের" সোনার বাগান বর্জ্জন করিয়াছি! বসন্ত-কুঞ্জের দোলমঞ্চের পাষাণ আঙ্গিনা প্লাবিত করিয়া কুঙ্কুমের স্রোত আর বহিয়া যায় না! সেই হেতু এক্ষণে ধনীদের উদ্যানে প্লাষ্টারের ভিনাস্ মূর্ত্তি, জুতা পায়ে উড্ডীয়মানা সিমেণ্টের পরী, লোহার রেলিং, লোহার বেঞ্চ, গ্যাসপোষ্ট, ভিক্টোরিয়া গার্ডেনের ঢালাই লোহার ফোয়ারা প্রভৃতি বিচিত্র বস্তুর বেসুরা সমাবেশ,—যেন অধুনাতন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের হস্তিনার রাজোদ্যানের জমকাল দৃশ্যপট। উদয়পুরে, যোধপুর-মন্দোরে, লাহোরে, বীকানীরে ও বারাণসীর রামনগরে, বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে, আজও পর্য্যন্ত প্রাচীন ধরণের উদ্যান আছে, যাহা আমাদিগকে চাঁদের আলোর স্বপ্নের রাজত্বে লইয়া যায়। শীষমহলের কৃত্রিমজলপ্রপাত রামধনু-বর্ণে বিচ্ছুরিত হইয়া অদ্যাপি সখীসহ নূরজাহানের স্নানলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়। কালে তাহারাও লোপ পাইবে। রঙ্গ-মহালের কনককুট্টিমে কমল-উৎসের কোমল রবাব ময়ূরের কেকা আজ নীরব, নিথর! বাপ্পারাওএর বংশসম্ভূত উদয়পুরের মহারাণার সূর্য্য-মূর্ত্তি-বিচিহ্নিত, কিরীট-কলস-ঝরোখা-চবুত্রা-অলঙ্কৃত, রথের আকৃতি পাষাণ-প্রাসাদে, অথবা অতুলনীয় তাহার চিত্রশালায় যে সুগভীর বিশালতা, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য গম্ গম্ করিতেছে, আধুনিক ধনীর গৃহের 'করিন্থিয়ান ক্যাপিটল'-সমন্বিত হাল-ফ্যাসানের সৌধমালায় বা

তন্মধ্যস্থ বহুমূল্য ঝাড়, ফানুস, ইটালিয়ন মর্ম্মরমূর্ত্তি ও ফরাসী চিত্র-শোভিত হলঘরে তাহা অনুভূত হয় না। মেবারের চিতোর দুর্গে, প্রাতঃস্মরণীয়া পদ্মিনীর জল-প্রাসাদের, দীর্ঘিকাবলোকনকারী ফুলদার গবাক্ষ পরিদর্শন করিয়া 'মার্ব্বেল প্যালেসের' লোহার রেলিংসংযুক্ত বারান্দা দেখিলে প্রাণে ব্যথা লাগে। আরাবল্লীর পর্ব্বতশিখরে—দিলবায়ার নাটমন্দিরের ফুটন্ত কমলের অনুকৃতি পাষাণ-চন্দ্রাতপের নিম্নকার, অথবা বরোদার প্রাসাদে, লক্ষ্মীবিলাস দরবার-গৃহের পাষাণময়ী সঙ্গীতমুখরা অপ্সরার হাস্য-লাস্য-ভঙ্গিমাভরা বন্ধনী বা ব্র্যাকেটগুলি স্বর্গের সুষমা উৎসারিত করিয়া দিতেছে। আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত ভারতীয় জমীদারবর্গের বিলাস-প্রাসাদের ড্রয়িংরুমে তাহার একান্ত অভাব। আমাদের উদ্যানে ঢালাই লোহার কৃত্রিম ফোয়ারা এবং গ্রীক দেবী আফ্রোদিতীর মূর্ত্তি শোভা পায় না। তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম হিমালয় হইতে উদ্ভূত গোমুখী-জলধারারূপী গঙ্গা এবং মথুরার ওথান-শিল্পীর ত্রিভঙ্গিমঠামে নৃত্যরতা 'মালবিকার' ভাস্কর্য্যই বাঞ্ছনীয়।

কাশী, গয়া, দিল্লী, শ্রীনগর, উদয়পুর, জৈসলমের, মাদুরা, তাঞ্জোর, মান্দালয় প্রভৃতি প্রাচীন সহরের প্রাচীন মহল্লাতে যে মনোহর, প্রাচীন-ভারতীয় ভাব দেখিয়াছি, তাহা সেই সকল সহরের আধুনিককালে গঠিত পল্লীতে অথবা কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি এ যুগের সহরে পরিদৃষ্ট হয় না। উজ্জয়িনীর বিশাল প্রাচীর, উন্নত তোরণ এবং সিন্দুররঞ্জিত ও প্রজ্বলিত-গন্ধ-তৈল-প্রদীপের কৃষ্ণ-কালিমালিপ্ত কুলুঙ্গি-সমন্বিত পাষাণের সিংহদ্বার-পরিবেষ্টিত বণিক্-মহল্লায় বা চৌকে, উষ্ণীষধারী গন্ধবিক্রেতার সারি সারি মনোহারী বিপণিশ্রেণী ও উজ্জয়িনীর সেই বক্র, সঙ্কীর্ণ, পাষাণ-পথোপরি আলোক ও ছায়ার লুকোচুরি-খেলা এবং অলঙ্কারপরিহিত, উল্কীচিত্রিত, অর্দ্ধশয়ান বৃষবরের অলসনেত্র ও উন্মন রোমন্থন যিনি অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভারত-স্থাপত্যের, ভারতের নগরের প্রাণ কোথায়!

ভারতের নূতন সহরে জীবনের স্পন্দন নাই; বারাণসীর কচুরি গলির প্রাণ-মাতানো দেশী ছাপ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই—তাহারা য়ুরোপের আদর্শে কলুষিত। বিংশ শতাব্দীর সৃষ্ট Factory townএ করগেট লৌহের বস্তিসমূহে যেন কেমন একটি বৈচিত্র্যবিহীন মলিন ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। নাগরিকদের যেন সমাজ, ধর্ম্ম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, চেতনা, দেশাত্মবোধ নাই। ইহাতে আধুনিক কলকারখানার সভ্যতার উৎকট তাণ্ডব আছে, তাণ্ডবান্তে অবসাদের ভাবও আছে—নাই আনন্দ-কূজন, নাই সৌন্দর্য্য—নাই স্নিগ্ধভাব। যেন ধরিত্রীর সঙ্গে সহরের সদ্ভাব নাই। পাঁচ ছয় আনা পারিশ্রমিকে তুষ্ট ক্রীতদাসের জীবন বহন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদের লালসার ইন্ধনে আত্মাকে আহুতি দিতেই যেন অধিবাসীদের জন্ম। সেই একঘেয়ে পথ—একঘেয়ে বাংলো বাড়ী; রসবর্জ্জিত একঘেয়ে "এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার" ভাব। আলোকস্তম্ভের বৈদ্যুতিক আলোকশিখা দেশবাসীদের রুগ্ন চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। রাক্ষসের মত লোহার কারখানার ভয়াবহ চিমনীগুলি প্রতিনিয়ত ধূমোদ্গিরণ করিয়া সহরবাসীদের শাসাইতেছে!

বর্ত্তমান ভারতের পরাধীনতা ও অর্থসঙ্কটের যুগেও প্রাচীন ধরণের সুন্দর, অথচ আধুনিককালের সম্পূর্ণ উপযোগী, সৌধ-মন্দির ও উদ্যান রচনা করা আয়াসসাধ্য নহে। যে অর্থব্যয় করিয়া বর্ত্তমানকালের অট্টালিকাগুলি গথিক, করিন্থিয়ান ও রেণেসাঁস যুগের গুরুভার অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া রচনা করা হয়—অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থব্যয়ে, অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক সুন্দর, সুঠাম, সুদৃঢ় অথচ সম্পূর্ণ স্বদেশী ধরণের প্রাসাদ, উদ্যান ও গৃহস্থের আবাস নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর, তাহা আমরা একাধিকবার প্রমাণ করিয়াছি। পাশ্চাত্যপ্রথায় শিক্ষিত, এঞ্জিনীয়র ও কনট্রাক্টর মহাশয়রাও এক্ষণে তাহা স্বীকার করিতেছেন। দেশীয় স্থাপত্যের আদর্শে বাটীনির্ম্মাণের পথে অযথা অতিরিক্ত খরচের ভয়-ই সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। দেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। অধিক অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় দেশবাসী বর্ত্তমান বিদেশী ধরণের শ্রীহীন বাটী নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হন। এ ক্ষেত্রে আমাদের বুঝাইতে হইবে যে, তাঁহাদের ভয় অযথা, বিশ্বাস অমূলক। রাজপুতানায় এঞ্জিনীয়ররূপে অবস্থানকালে যখন আমি ছাত্রের মত দেশীয় স্থাপত্যের আদর্শে বাটী নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলাম,তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ইট-কাঠ লইয়া বাঙ্গালাদেশে দেশীয় ভাবের সুদৃশ্য বাটী নির্ম্মাণ করা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হইবে না। আমরা সচরাচর যে সকল বাটী নির্ম্মাণ করি, তাহাতে অল্পবিস্তর কারুকার্য্য থাকে। সেই সকল কার্য্যেও অর্থব্যয় হয়। কিন্তু কয়েক পুরুষ হইতে আমরা সেই সকল বাটী দেখিয়া এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবা-

কালে সেইগুলির প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না। সেই-গুলিও যেন দরজা, জানালা, কার্ণিশের সামিল প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পক্ষান্তরে, দেশীয় স্থাপত্যে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের গঠন ও কারুকার্য্যের সমাবেশ আছে, তাহা দেখিতে আমরা অভ্যস্ত না থাকায় আমাদের মনে হয়, ঐরূপ স্তম্ভ, জালি, চূড়া প্রভৃতি করিতে আমাদের অনেক অর্থব্যয় হইবে এবং সেগুলি করা বাহুল্যমাত্র। মালমসলা ও মজুরীর উপর অট্টালিকার খরচ নির্ভর করে।

গোলাকার স্তম্ভ, বিলাতী গড়ন ও গম্বুজ প্রভৃতি করিতে যে পরিমাণে ইট, চূণ, বালি, সিমেণ্ট প্রভৃতি আবশ্যক হয়, অষ্ট-কোণী স্তম্ভ, পদ্মফুল এবং কলস প্রভৃতি করিতেও সেই পরি-মাণে মসলা আবশ্যক হয়। কাঠের ফর্ম্মার সাহায্যে তাহাদের গঠন করিতে হয়। সেই ফর্ম্মাগুলি বৃত্তাকার অথবা বিলাতী ফুলের মত না করিয়া অষ্টকোণ এবং পদ্মফুলের মত করিলেই দেশী জিনিষ করা হইল—এবং তাহাতে দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিল; পারিশ্রমিক অধিক পড়িল না; বাটীও সুদৃশ্য হইল। কলিকাতার রয়েল এক্সচেঞ্জ অথবা হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল কোম্পানীর বাটীর 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভশীর্ষ, রেনেসাঁস মোল্ডিং ও গম্বুজ করিবার জন্য যে মসলা ও মজুরী খরচ হইয়াছে, কারুকার্য্যসমন্বিত, সুদৃশ্যতর, দেশীয় ভাবের স্তম্ভ ও বিমান করিতে তদপেক্ষা অল্প অর্থব্যয় হইত সন্দেহ নাই। এই স্থলে আমি ভারত গভর্ণমেণ্টের Consulting Architect Mr. J. Begg F. R. I. B. A. মহাশয়ের লিখিত রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিলাম। বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ারের অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। মিঃ, 'বেগ' লিখিয়াছেন, "ভারত-স্থাপত্যের পদ্ধতি অনুসারে বাটীনির্ম্মাণে অধিক খরচের ভয় করিবার কারণ আমি দেখি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, রেনেসাঁস অথবা ক্লাসিক আদর্শে বিদেশী ধরণের বাটী নির্ম্মাণেই অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক খরচ হয়।" এইরূপ বিদেশী অলঙ্কারমণ্ডিত অট্টালিকাশ্রেণী ভারতের প্রতি সহরে পল্লীতে দণ্ডায়মান। কিন্তু গতানুগতিক অভ্যাস ও সংস্কারের বশে আমরা তাহা বিচার করিতে অসমর্থ। একে আমাদের কুসংস্কার দেশী ভাবে বাটী নির্ম্মাণের বিরোধী, তাহার উপরে বাঙ্গালায় আমরা বাটীর নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল পূর্ত্তবিদ্ ও স্থপতি অর্থাৎ এঞ্জিনীয়র নিযুক্ত করি, দেশীয় প্রণালীতে বাটীনির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁহাদের অক্ষমতা হেতু, তাঁহারাও প্রাণপণে বাধা দেন ও গৃহস্বামীকে ভয়প্রদর্শন করেন, যাহাতে সে ভাবের বাটী না করা হয়। ইংরাজ ত আমাদের জাতীয় জাগরণের কার্য্যে বাধা দিবেই; কিন্তু দেশের সন্তানের পক্ষে সেটা লজ্জাকর ও ধর্ম্মদ্রোহী কার্য্য। বিদেশী শিক্ষা ও রাজ-নীতিক কৌশলের ফলে আমাদের চিত্ত এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, নূতন ধরণের অতি সহজ কার্য্যও আমরা অসাধ্য বলিয়া ভাবি। আমাদের একতা নাই। পরস্পরকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, প্রাণপণে আমরা পরস্পরকে বাধা প্রদান করি। য়ুরোপীয়দিগের সে দোষ নাই; সেই জন্য তাঁহারা শক্তিশালী; আর আমরা ক্রীতদাসের জীবন বহন করিতেছি। উক্ত পূর্ত্তবিদ্‌গণ দেশীয় ভাবের বাটীর নক্সা ও তত্ত্বাবধান করিতে শিখিয়া লইতে পারেন। কয়েক বৎসর হইতে আমি ম্যুনিসি-পালিটীর কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি, তাঁহা-দের পূর্ত্তবিভাগে ভারতীয় স্থাপত্যের একটি শাখা খুলিতে। গভর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্কস বিভাগের চীফ এঞ্জিনীয়র এবং এবম্বিধ উচ্চপদস্থ পূর্ত্তবিৎ ও কণ্ট্রাক্টারগণ, সার জগদীশ, অবনীন্দ্রনাথ, ডাক্তার সুনীতিকুমার প্রভৃতি আমাকে যেমন উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার তেমনই আমার পরিকল্পনাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতেও চাহিয়া-ছিলেন, বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমান ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়—যেখানে প্রস্তর পাওয়া যায় না, যেখানে শিক্ষিত রাজমিস্ত্রী নাই, সেখানে উক্ত প্রকারের কার্য্য করা নিতান্ত অসম্ভব। মুখের কথায় আমি তাঁহাদের বুঝাইতে পারি নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ বহু পরিশ্রম করিয়া আমি যে কয়েকখানি বাটী প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা হইতে আমি তাঁহাদের বিচার করিতে বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে, বক্তৃতাকালে অথবা প্রবন্ধ লিখিয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম, প্রতি বর্ণে আমি তাহা পালন করিয়াছি কি না? শুধু যে আমার "উদ্দাম পরিকল্পনা"কে মূর্ত্তিমতী করিয়া আমার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছে, তাহা নহে, এত অল্পব্যয়ে যে এতাদৃশ সুদৃঢ় সুদৃশ্য (বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একবাক্যে তাহা করিয়াছেন) বাসভবন করাইতে পারি, তাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। এতদ্বিষয়ে সাধারণের সহিত ভাবে আলোচনা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

গৃহস্থের টিনের অথবা খড়ের ছাদের কুটীর-আবাসও

অর্থব্যয়ে সুন্দর ধরণে করা যায়। দীর্ঘকালব্যাপী এই আন্দোলনের ফলে, আজ কলিকাতায় এবং বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে অল্প-বিস্তর দেশী ভাবের কতকগুলি নূতন বাটী প্রস্তুত হইতেছে। আরও কয়েকখানি বাটী সুলভ মূল্যে নির্ম্মিত হইলে, এবং সাধারণের অলীক ভয় দূরীভূত হইলে, দেশীয় স্থাপত্যের প্রসার সুনিশ্চিত হইবে। তবে স্থাপত্যের সম্বন্ধে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র দেশীয় ভাবের কয়েকটি অলঙ্কার পরাইয়া বিদেশী 'প্লানের' বাটী নির্ম্মাণ করিলেই দেশীয় স্থাপত্যের আদর্শ ও মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে না, তাহার প্লানটিও আলোক, বাতাস ও স্বাস্থ্যরক্ষার পথ অটুট রাখিয়া, যথাসম্ভব দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে। কলিকাতার সঙ্কীর্ণ পরিসরে বিবিধ মহলের বাটী করা অসম্ভব। সহরের বাহিরে স্থানের অভাব হইবে না; সুতরাং সেখানে যথারীতি দেশীয় ভাবের প্লান করা কষ্টকর হইবে না। বিদেশী আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া, শাস্ত্রসঙ্গত বিশুদ্ধ স্থাপত্য-কলা হইতে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর না হইলেও আমাদের স্বাধীন চিন্তার ও শিল্পের ধারা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চালিতে হইবে। অদূর-ভবিষ্যতে দেশ ও কালের উপযোগী ভারতীয় স্থাপত্যের নূতন সংস্করণ করিতে আমরা সফলকাম হইব। প্রাচীন মৌর্য্য যুগ হইতে মুসলমান শাসনকাল পর্য্যন্ত ভারত-স্থাপত্যে যুগধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা করিয়া বহুবিধ সংস্করণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান-কালেও দেশীয় স্থাপত্যের নূতন সংস্করণ হওয়া বিচিত্র নহে। বরঞ্চ তাহা বাঞ্ছনীয়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—অবিলম্বে আমাদের বিপথগামী চিন্তার স্রোতকে পরিবর্ত্তন করা এবং মৃতপ্রায় ভারত-শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করা। কার্য্যের সুফল হইতে কিছু সময় লইবে। আর যথার্থ কার্য্য হইবে তখন—যখন আমরা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিব। আমাদের অজ্ঞানকৃত অবহেলার জন্য যে সকল দেশীয় শিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে—তাহাদের পুনঃ প্রচলন করা—এখন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। অজন্তা, এলোরা, ভুবনেশ্বরের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে শীঘ্র হয় ত আমরা সফলকাম হইব না। না হইলেও ক্ষতি নাই। শিক্ষাগার খুলিয়া ছাত্র তৈয়ারী করিতে হইবে। কে বলিতে পারে—সেই ছাত্রের বংশধর অজন্তা ও তাজমহল অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর শিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে না?

বাঙ্গালার স্থাপত্য-শিল্প এক দিন সমগ্র ভারতখণ্ড ও বহির্ভারতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার শিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—সহস্র বর্ষের প্রাচীন পাহাড়পুরের, উৎকলের কেশরিবংশের, বরেন্দ্র-ভূমির পাল ও সেনরাজগণের, গৌড়ের ও বিষ্ণুপুরের অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত টালিসমন্বিত মন্দির, মসজেদ ও পাষাণের প্রাণবন্ত তক্ষণ-মূর্ত্তি। আসাম প্রদেশস্থ প্রাচীন আহোম রাজগণের পুরাকীর্ত্তির যে সকল ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে—বাঙ্গালার শিল্পের প্রভাব তাহাতে প্রকটিত। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও উক্ত অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত টালির মৃৎশিল্প ও terracotta বাঙ্গালায় জীবিত ছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল বৃদ্ধ মিস্ত্রীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম—তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, উক্ত প্রকারের মসৃণ টালি ও পালযুগের পৃথিবীপ্রসিদ্ধ তক্ষণ-মূর্ত্তি বাঙ্গালীর নিজস্ব ও তাহার কল্পনাপ্রসূত। বাঙ্গালার স্থাপত্য-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে সেই শিল্পের উদ্ধার করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বিগত পনর বৎসর যাবৎ আমি কামনা এবং শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া আসিতেছি যে, মৃত্তিকা দ্বারা এবং কৃত্রিম প্রস্তরে আমি উক্ত প্রকার টালি নির্ম্মাণ করিব এবং তৎসাহায্যে দেশীয় ধরণের বাটী অলঙ্কৃত করিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব—যাহাতে দেশের শিল্পে তাঁহাদের মমতা ফিরিয়া আসে। রাজপুতানা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠে। বাঙ্গালার কোনও প্রসিদ্ধ কলাভবনকে উক্ত কার্য্যের কেন্দ্র করিয়া উক্ত শিল্পের প্রসার করিবার ব্যবস্থা আমি কলাভবনের কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত করি। কলাভবনের কার্য্য-সচিব এক জন আদর্শ শিল্পী। দেশের শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁহার মহান্ ত্যাগ ও জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা প্রকৃতই অসাধারণ। পরম উৎসাহের সহিত তিনি ছাত্র-শিল্পীর গঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নানা কারণে সেই কলা-ভবনে শিল্পের কারখানা সম্ভবপর হইল না। অগত্যা স্থানীয় কয়েক জন কুম্ভকার শিল্পী সংগ্রহ করিয়া আমি একাকীই উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইলাম। জয়পুরের কলা-ভবন দেখিয়া, জয়পুরের শিল্প য়ুরোপ-আমেরিকাতে সমাদৃত ও বিক্রীত হওয়ায় উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিপুষ্ট ও উন্নত হইতেছে প্রণিধান করিয়া আমি যেরূপ আশান্বিত ও উৎফুল্ল হইয়াছিলাম, বাঙ্গালার কলা-ভবনের ছাত্রদের কুসংস্কার ("ছাত্ররা

শিল্পীর কাজ শিখিতে চাহে না" বলিয়া কলা-ভবনে টালি প্রস্তুত সম্ভব হয় নাই) ও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য আমার মর্ম্মকে তদ্রূপ সম্পীড়িত করিয়াছিল। যাহা হউক, কলিকাতার কুম্ভকার শিল্পীর সহায়তায়, মাত্র একখানি বাটী মূর্ত্তি ও টালির দ্বারা শোভিত করার পর হইতেই উক্ত শিল্পের আদর ও প্রসার দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে কুম্ভকাররা তিন বৎসর পূর্ব্বে উক্ত দেশীয় ভাবের মূর্ত্তি ও টালির কায শিখিতে ঘোরতর অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, বাজারে তাহা চলিতে পারে না, অনেক বুঝাইয়া অনেক পরিশ্রম করিয়া, আমি তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রে নামাইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহারা দুর্গা-প্রতিমা নির্ম্মাণে অবসর পান না, এতই নূতন কাযের ভিড়, এতই উৎসাহ, এতই লাভ। চারিদিক্ হইতে এখন টালির অনুরোধ আসিতেছে। পরিণাম এই হইয়াছে যে, যে টালি আমি সর্ব্বপ্রথমে ছয় আনায় পাইয়াছিলাম, কুমারটুলী এক্ষণে তাহার মূল্য দশ আনা চাহেন। গরজ বড় বালাই, লইতেই হইবে। মুনিসিপালিটী অথবা বাঙ্গালার কোনও কলা-ভবন যদি কারখানা খুলিয়া ভাস্কর্য্য, তক্ষণ, কৃত্রিম প্রস্তর, মৃন্ময় এবং দারু ও ধাতু-শিল্পের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও নির্দ্ধারিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেন, তাহা হইলে উক্ত শিল্পের প্রসারের পথ অধিকতর সুগম হইত। আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ Municipal School of Art and Crafts আছে বলিয়া শুনা যায়। দেশহিতৈষী অনেক কর্ম্মী যুবক হয় ত বেকার বসিয়া আছেন; চাকরী মিলে না, অথবা গোলামী করিবার স্পৃহা নাই। দেশীয় শিল্প আয়ত্ত করিয়া তাঁহারা দেশীয় স্থাপত্যের আদর্শে সৌধ, মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করুন এবং টালি ও ধাতুর মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার কারখানা পরিচালনা করুন। আমি কয়েকটি মূর্ত্তি ও টালির আলোক-চিত্র আনিয়াছি, তাহার মূল্য যথাসম্ভব সুলভ। আধুনিক কালের উপযোগী ভারত-স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ আমার পরিকল্পিত কয়েকখানি নূতন বাটীর চিত্রও গৃহীত হইয়াছে। যদি কোন স্বদেশী স্থাপত্যের অনুরাগী এঞ্জিনীয়র আমার কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার উপদেশ অথবা সাহায্য গ্রহণ করিব। যদি কোন ছাত্র দেশীয় স্থাপত্য-শিল্প শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি সানন্দে তাঁহাকে, আমার সাধ্যমত, শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব। আশা করি, আমাদের সমবেত চেষ্টায় অচিরে বঙ্গের লুপ্তপ্রায় স্থাপত্য-শিল্প নবজীবন লাভ করিবে।

দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। এই জাগরণের দিনে স্থাপত্যের নবজীবন অবশ্যম্ভাবী। দেশের নানা স্থান হইতে

উদ্যান-বাটিকা।

[লেখক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
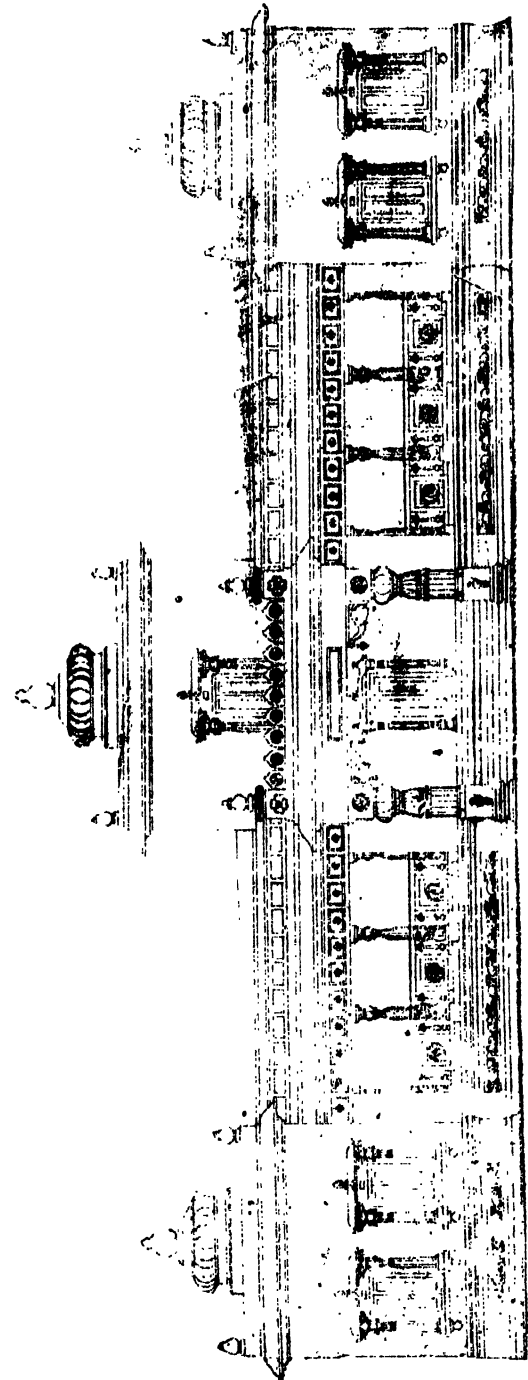
আমরা সহানুভূতি এবং উৎসাহ পাইতেছি। দেশপূজ্য দানশীল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, রাজা জগৎকিশোর এবং শশিকান্ত প্রমুখ বাঙ্গালার নেতৃস্থানীয় জমীদাররা, কালীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী এবং ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর প্রভৃতি ভারত-স্থাপত্যের উদ্ধারমানসে ব্রতী হইয়াছেন। রেবার মহারাজা

উদ্যান-বাটিকার তোরণ [লেখক কর্তৃক পরিকল্পিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বাহাদুর বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশীয় ধরণের নূতন প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করাইবেন। তজ্জন্য আমি সেখানে আহূত হইয়াছিলাম। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দেশীয় প্রণালীতে প্রাসাদ, সৌধ, উদ্যান, মন্দির নির্ম্মাণ করিবার আমন্ত্রণ আসিতেছে। দেশে কর্ম্মের পাঞ্চজন্য বাজিয়াছে। এই শুভক্ষণে মহৎ কল্পনাও আমাদের নিখিল সভ্যতার চরম বিকাশের জন্য নিদর্শন—আমাদের কর্ম্মপটুতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—আমাদের বিশ্ববিশ্রুত স্থাপত্য-কলাকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা ও স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভারত-স্থাপত্যের, ভারত-শিল্পের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া, অথবা তাহার ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করিয়া, যাদুঘরে রক্ষা করিলে অথবা তাহার মহিমা সম্বন্ধে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ অথবা বক্তৃতা করিলে চলিবে না। এই যুগেও যাহাতে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচলন হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গীত-রত্নাকর পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিলেই সঙ্গীত-কলা রক্ষা করা যায় না, সঙ্গীতের চর্চ্চা করা চাই। তক্ষণ-শিল্প

দারু-শিল্প, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, ধাতুর মূর্ত্তি ও তৈজস প্রভৃতি সুকুমার শিল্পগুলি বিশাল স্থাপত্য-মহীরুহের শাখা-প্রশাখার মত। এক স্থাপত্যকে রক্ষা করিতে পারিলে উহারা রক্ষা পাইবে। স্থাপত্যের বিনাশ হইলে উহাদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালার "আর্ট স্কুল" অচল, অথচ জয়পুরের আর্ট স্কুল সচল কেন? তাহার কারণ, জয়পুরে দেশীয় স্থাপত্য জীবিত রহিয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালার স্থাপত্য মৃত। বাঙ্গালার চিত্র-শিল্পীরা উদরান্নের জন্য লালায়িত। বাঙ্গালার শিল্পীরা আসুন, দেশের শিল্পের উদ্ধারকল্পে শিক্ষাগারের প্রতিষ্ঠান করুন। ছাত্ররা দেশীয় শিল্প শিক্ষা করুন। তাঁহাদের অন্ন-সমস্যা দূর হইবে। জনে জনে শিল্পবিশারদ হইয়া ভারতের সহরে পল্লীতে শিক্ষাগারের কেন্দ্র স্থাপনা করুন এবং দেশীয় প্রণালীতে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, সুকুমার চারুশিল্পে তাহাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, দেশের শিল্পকে, দেশের ধর্ম্মকে রক্ষা করুন। ম্যুনিসিপালিটী, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি দেশীয় অনুষ্ঠানগুলি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার এবং পরিচালনার ভার লউন। দেশের নেতারা দেশের অন্যান্য সৎকার্য্যের সহিত দেশের শিল্পের উদ্ধারকার্য্যে তৎপর হউন। তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক। দেশের স্থাপত্যের উদ্ধার না হইলে জাতীয় জীবনের সঞ্চার হইবে না। দেশের ছাত্ররা জাতীয় জীবনের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত না হইলে প্রকৃত মানুষ হইবে না। কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে আমাদের চিত্তবৃত্তি এতদূর দাসভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশী শিক্ষা ও রাজনীতি-কৌশলের ফলে আমাদের দৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তি এতদূর সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, নূতন ধরণের সহজ কাযও আমরা অসাধ্য বলিয়া ভাবি। আমেরিকায় পঞ্চাশ-তল বাটী হইতেছে, মরুভূমির মধ্যে কৃত্রিম নদী প্রবাহিত করা হইতেছে, সাহারায় নলকূপ বসাইবার জল্পনা চলিতেছে—আমরা তাহার সম্ভাবনা বিশ্বাস করি, কিন্তু আমাদেরও যে আমেরিকাবাসীদের মত হস্তপদ, মস্তিষ্ক আছে এবং তাহার চালনা করিলে আমাদের শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। আমাদের নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস নাই। আমাদের স্বাস্থ্যের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়া সুস্থ সবল হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সুখের বিষয়, এতদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিদেশী এঞ্জিনীয়র আসিয়া দেশী পূর্ব্ববিদের দশগুণ বেতন লইয়া বিদেশী ধরণের সহর নির্ম্মাণ করিয়া যাইতেছেন, আর আমরা তাঁহাদের অধীন থাকিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সহরে জাতীয়তার বিরোধী নিয়মানুসারে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতেছি। পূর্ব্বে দেশজাত শালকাঠে এ দেশের কড়ি-বরগা প্রস্তুত হইত এবং তাহার পরমায়ু শত শত বৎসর ছিল (পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের যে দারুনির্ম্মিত প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে, তাহা শালকাষ্ঠের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে)! এক্ষণে ভারতের উৎপন্ন শাল ও সেগুণ জাহাজে বোঝাই হইয়া বিদেশে যাইতেছে। পরিবর্ত্তে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিদেশে প্রস্তুত লোহার কড়ি-বরগা আসিয়া শাল-সেগুণের স্থান দখল করিয়াছে। শীঘ্রই বিলাত হইতে ষ্টীলের জানালা-দরজা আসিতে পারিবে, এরূপ পরামর্শ ও আয়োজন চলিতেছে, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাদের পরমায়ু শত বৎসরের কম। এইরূপে বিদেশী ব্যবস্থা ও উপকরণ আসিয়া দেশীয় সনাতন গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী ব্যবস্থা এবং প্রাচীন উপকরণ অর্থাৎ specificationsগুলির বিনাশসাধন করিতেছে। এ দেশের জলহাওয়ায় তাহা প্রযোজ্য নহে। দেখা গিয়াছে যে, সরকারী বাটীর নূতন ছাদে জল চোঁয়ায়, নূতন খিলান ফাটিয়া যায়। সহস্র বৎসরেও কিন্তু সেকালের গাঁথুনি শিথিল হয় নাই। প্রাচীন ছাদে জল চোঁয়াইত না। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার অজন্তা-গুহা মন্দিরের নানাবর্ণের চিত্রগুলি অদ্যাপি মলিন হয় নাই।

দেশের শিল্পকে রক্ষা করিতেই হইবে। যে ভারতবাসীর পিতামহরা আবু, ভুবনেশ্বর, তাজমহল, বিষ্ণুপুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—যে ভারতবাসীর পিতামহরা মসলিনকে ও শালকে সম্ভবপর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আভিজাত্য-মর্য্যাদা ও পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজনীতির যত বক্তৃতাই তাঁহারা শ্রবণ করুন, ধর্ম্মের ও জাতীয়তার আদর্শে নগর নির্ম্মিত না হইলে এবং সেই নগরে বিচরণ না করিলে যুবকদের জাতীয় জীবনসঞ্চার হইবে না। দিল্লীর দুর্গ ও জুম্মা মসজিদ যত দিন দণ্ডায়মান থাকিবে, স্থানীয় মুসলমানের জাতীয়তা তত দিন লুপ্ত হইবার নহে। জগৎপূজ্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মিঃ গেডিসেরও সেই মত। প্রাচীন ভারতের অদ্ভুত নগরনির্ম্মাণনীতির সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রশংসার কথা লিখিয়াছেন; আর বলিয়াছেন, মন্দিরের সঙ্গে সৌধের এবং

দেবতার সঙ্গে নাগরিকদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। স্বয়ং চাণক্য পাটলীপুত্রের নগর-বিজ্ঞান রচনা করিয়াছিলেন—যাহার তুলনা জগতে পাওয়া যায় না। পাটলীপুত্রের মুনিসিপ্যালিটির পরিচালনার ভার চাণক্য ত্রিশ জন নগরপালের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং ইহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক যে, আধুনিক মুনিসিপ্যালিটীর কার্য্যপদ্ধতির সহিত পাটলীপুত্রের মুনিসিপ্যালিটীর কার্য্যপ্রণালী আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। হিন্দুর স্থাপত্য ও মূর্ত্তি-শিল্পের স্বরূপ পরিচয় দান করিয়া যাঁহারা ভারত-শিল্পে য়ুরোপ-আমেরিকার অনুরাগ আকৃষ্ট করিয়াছেন, মহাত্মা হ্যাভেল এবং ডাঃ কুমারস্বামী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হ্যাভেল বলেন, "কেবলমাত্র রুচির অনুরোধেই যে ভারতের স্থাপত্যকে সংরক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নহে, জাতির কার্য্যকারিতাশক্তি ও চরিত্রের আদর্শের রক্ষাকল্পেও করিতে হইবে। সহস্র সহস্র বর্ষজীবী অনাবিল শিল্পধারাকে বিদেশী শিল্পের চরণে আহুতি প্রদানের প্রতিদানস্বরূপ, প্রতীচ্যের প্রদত্ত সমগ্র সাহিত্য ও সমগ্র বিজ্ঞানলাভেও তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে না, রাজনীতির কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভেও নয়। দেশের শিল্পের বিনিময়ে স্বরাজ পাইলেও দেশবাসীকে বিদেশীর ক্রীতদাস এবং জড় হইয়া থাকিতে হইবে।"

ভারত-স্থাপত্যে অভিজ্ঞ শিল্পী ও মিস্ত্রীদের সমন্বয়ে কলিকাতায় একটি "স্থাপত্য শিক্ষামন্দির" প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস হইতেছে, বাস্তু-শিল্পে অধিকারী যে সকল যুবকের দেশের শিল্পের জন্য প্রাণ কাঁদে, তাঁহাদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে। তাঁহারা উক্ত শিক্ষাগার হইতে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেশের সর্ব্বত্র মন্দির ও গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত হউন। তাহাতে দেশের ধর্ম্ম ও গৌরব রক্ষা করা হইবে। চাকুরীজীবী হইয়া উদরান্নের জন্য তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে না। আমরা সাধ্যমত তাঁহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিব। শিক্ষাদানকালে ছাত্রদের যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা ও পরিকল্পনা করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। গভর্ণমেণ্ট এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্ররা উক্ত শিক্ষামন্দির হইতে আবশ্যকমত শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার পাইবেন। আশা করি, আমাদের আয়োজন বিফল হইবে না। আশা করি, জগতের ইতিহাস হইতে ভারতবাসীর নাম, রেড ইণ্ডিয়ানদের মত চিরতরে মুছিয়া যাইবে না।

"দিন আগত ঐ, ভারত শুধু কই ?
সে কি রহিবে লুপ্তবীর্য্য সব জন-পশ্চাতে ?
লউক বিশ্ব কর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান্ হে, জাগ্রত ভগবান্ !"

গৃহলক্ষ্মী

তোমারে যে দাসী বলে সে অজ্ঞ জানে না
ও রাতুল চরণে যে এই প্রাণ কেনা।
তোমারি রচিত গেহে তুমি আলো বাতি
পরাও প্রিয়ের গলে ফুলমালা গাঁথি।

তোমারি গৃহের দ্বারে দাও আলিপনা
এ নহে বন্ধন প্রিয়ে মুক্তির কামনা।
হৃদি-গগনের তুমি পরিপূর্ণ চাঁদ
মোর পর্ণ-কুটীরের দেব-আশীর্ব্বাদ।

বিকশিত ফুল তুমি মরম-তরুর
হৃদয়-বীণার তুমি সুকোমল সুর।
মরম সিন্ধুর তুমি রতন-সম্ভার
প্রেমের মূরতি তুমি জগতের সার।

নহ তুমি শুধু মোর গৃহের গৃহিণী
আনন্দরঙ্গিণী তুমি মর্ম্মবিলাসিনী॥

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

হারানিধি

১

শীত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাশীধামে শিবরাত্রির বিষাণ বাজিয়াছে,—শিবপুরী ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনিতে মুখর। দুর্গাপূজা ও বড়দিনের বিরাট পর্ব্ব ফতে করিয়া, কাশীর যে সকল দোকানদার, গাড়ীওয়ালা, গোয়ালা, গাড়োয়ান, কুলী, গাঁটকাটা প্রভৃতি মাস দুই তিন নিঝুম হইয়া ঝিমাইতেছিল, তাহারা আবার পরিপূর্ণ উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া উপায়ের আসরে অবতীর্ণ।

শিবরাত্রির সাত আট দিন পূর্ব্বে—ডেরাডুন এক্সপ্রেসখানি যখন কাশী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন গাড়ীগুলির ভিতরের অবস্থা দেখিয়া, ষ্টেশনের অসমসাহসী এবং এরূপ দৃশ্যদর্শনে সদা অভ্যস্ত অসীমসহিষ্ণু কর্ম্মচারিগণ চমকিত হইলেন। যাত্রি-লব্ধ কুলী, শিকারে সমাগত পাণ্ডাপ্রভুগণ পরম পুলকিত-মনে ব্যোম্ ভোলানাথের নামে জয়ধ্বনি করিয়া ট্রেণ হইতে অবতরণে তৎপর জনস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ট্রেণের শেষভাগে একখানি রিজার্ভ করা মধ্যম শ্রেণী হইতে পাঁচ জন মাত্র প্রাণী প্লাটফরমে অবতরণ করিলেন। সে দিকে কুলী ও পাণ্ডার দৃষ্টি তখনও পড়ে নাই। কাশী ষ্টেশনে গাড়ী দুই তিন মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না, কাযেই এই পাঁচটি প্রাণীর কর্ত্তা কুলীর পাত্তা না পাইয়া নিজেই ভৃত্যের সহায়তায় নিতান্ত ব্যস্ত-ভাবে মালপত্র নামাইতে লাগিলেন। কর্ত্তার স্ত্রী, তরুণী কন্যা ও পরিবারস্থ আর একটি প্রৌঢ়া মহিলা মালপত্রগুলি গুছাইতে আরম্ভ করিলেন।

যাত্রী যাইবার গেটের নিকট সাতাশ আটাশ বৎসরের এক ভদ্রবেশী যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা তাহার দৃষ্টি এ দিকে পড়িল; সে তখনই সবেগে সেই রিজার্ভ কামরার সম্মুখে আসিয়া প্রথমেই বক্রদৃষ্টিতে তরুণী কন্যার অপূর্ব্ব মুখখানি দেখিয়া লইল। পরক্ষণে কামরার দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে নিতান্ত পরিচিতের মত বলিল, —"তাই ত, অনেকগুলো মাল যে এখনও রয়েছে দেখছি! ব্যস্ত হবেন না আপনারা, আমি সব নামিয়ে দিচ্ছি—এখনই ট্রেণ ছাড়বে—'

যুবক তৎক্ষণাৎ গাড়ীর মধ্যে ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করিয়া সুকৌশলে অবশিষ্ট মালগুলি নামাইতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে গার্ডের বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু সেই সাহসী যুবক গতিশীল ট্রেণের কামরা হইতে সুশৃঙ্খলে সর্ব্বশেষ দুইটি ট্রাঙ্ক নামাইয়া ফেলিল।

সপরিবার কর্ত্তাটি প্রশংসমান নয়নে এই পরোপকারী প্রিয়-দর্শন যুবার দিকে চাহিয়া ছিলেন। কর্ত্তা সস্নেহে এইবার তাহার কাঁধের উপর হাতখানি রাখিয়া অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন,—"বাবা, তুমি আজ যে উপকার করলে—"

বাধা দিয়া অতি বিনীতভাবে যুবক বলিয়া উঠিল,—"বিলক্ষণ! কি বলছেন আপনি? এই হাত দুখানাকে আপনার কাযে একটু লাগিয়ে দিয়েছি, এই মাত্র। এতে পয়সা খরচও হয় নি, কষ্টও বিশেষ কিছু করি নি; এ যদি না করব, তা হ'লে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন?"

কথাগুলি দক্ষ অভিনেতার ভঙ্গীতে অতি হৃদয়গ্রাহিরূপে উদ্গার করিয়াই যুবা অদূরে দণ্ডায়মানা তরুণীর দিকে আর একবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিল। তরুণীও তাহাদের সাহায্যকারী এই মিষ্টভাষী যুবার দিকে চাহিয়া তাহার অপূর্ব্ব ভঙ্গীপূর্ণ কথাগুলি নিবিষ্ট-মনেই শুনিতেছিল; যুবার বক্রদৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িবা-মাত্র তরুণী দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

কর্ত্তা যুবকের কথায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তুমি প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে চলন্ত ট্রেণ থেকে জিনিষ নামিয়ে এনেছ; জানা নেই, চেনা-পরিচয় নেই, তবু তোমার এত দরদ! বাবা বিশ্ব-নাথ তোমার স্বাস্থ্য অটুট রাখুন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি বাবা,—তোমরা?"

ঈষৎ হাসিয়া যুবা বলিল,—"কুণ্ঠিত হয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন, বলুন ত?"

সহাস্যে কর্ত্তা বলিলেন,—"বলতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই বাবা, আজকাল শুনতে পাই. নাম আর জাতের কথা জিজ্ঞাসা করা নাকি অভদ্রতা।"

যুবা বলিল,—"এ কথা মিথ্যে নয়। কাশীতেও এ রোগ ঢুকেছে; কিন্তু আমি সে দলের নই। আমার নাম—শ্রীগোবর্দ্ধন রায়, জাতি ব্রাহ্মণ।"

সসম্ভ্রমে ও সশ্রদ্ধায় কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রাহ্মণ? তা হ'লে প্রাতঃপ্রণাম হই, রায় মশাই।"

গৃহিণী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার তিনিও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার দেখাদেখি প্রৌঢ়া মহিলাটি, এমন কি, ভৃত্যও ব্রাহ্মণ-যুবার উদ্দেশে কঙ্করময় প্লাটফরমে কপাল ঠেকাইয়া লইল। গৃহিণী বলিলেন, "শিখা, তুই চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্? বাবাকে গড় করলি নি?"

কর্ত্তার এই তরুণী কন্যার নাম শিখা; বয়স আঠার উনিশ হইবে। পরিপূর্ণ অটুট স্বাস্থ্য ও উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যের জোয়ার তাহার দেহে তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

মায়ের কথায় কন্যার অপাঙ্গে হাসির একটা ছটা খেলিয়া গেল! কয়েক মুহূর্ত্তের পরিচয়ে এই অপরিচিত যুবাটিকে একেবারে দেবতার আসনে তুলিতে দেখিয়া সম্ভবতঃ শিখা চমৎকৃত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এ জন্য সে একটু কৌতুকও অনুভব করিতেছিল। মাতৃবাক্যে শিখা একবার কৌতুকভরা নেত্রে এই নূতন দেবতাটির উপর একটু কটাক্ষ করিয়া, নবনীত-কোমল সুগৌর করযুগলখানি সাঁমন্তে তুলিয়া দেবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

২

গোবর্দ্ধন কয়েক জন কুলীকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত মালপত্র তাহাদের মাথায় চাপাইয়া, কর্ত্তা ও তাঁহার পরিজনগণকে লইয়া প্লাটফরমের বাহিরে ষ্টেশনের হাতায় আসিয়া দেখিল, একখানি গাড়ীও খালি নাই। তখনও বহু যাত্রী মালপত্র লইয়া পথের উপর গাড়ীর অভাবে অবসন্নভাবে বসিয়া আছে।

কর্ত্তা বলিলেন,—"এখন উপায় ?"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা কোথায় উঠবেন স্থির করেছেন, আগে তাই বলুন ত।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"স্থির কিছুই করিনি, রায় মশাই,—বিশ্বনাথের টানে বেরিয়ে পড়েছি। বাঙ্গালীটোলায় গিয়ে একটা বাসা টাসা ভাড়া ক'রে নেবার ইচ্ছা আছে। এখন গাড়ী ত পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে এই সব লটবহর, যাই কি ক'রে ?"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"বড়ই ভুল করেছেন, কর্ত্তা মশাই; পূজায়, বড়দিনে, গ্রহণে আর শিবরাত্রির সময় কাশীতে বাড়ী খালি পাওয়া দায়; আগে থাকতে বাড়ীর ব্যবস্থা না ক'রে যাঁরা কাশীতে সপরিবার আসেন, তাঁদের খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"পয়সার জন্যে কিছু আসে যাবে না, রায় মশাই। যেমন তেমন একখানা বাড়ী পেলেই হ'ল! এখন ভাবনা এই—যাওয়া যায় কি ক'রে ? বেলাও ক্রমশঃ বাড়ছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"এক কায করা যাক্, কর্ত্তা মশাই। গাড়ী এখন পাওয়া যাবে না। কাছেই গঙ্গা,—চলুন, আপনাদের নৌকা ক'রে পৌছে দিই।"

কুলীরাও গোবর্দ্ধনের এই সমীচীন উক্তির সমর্থন করিল। নৌকা করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া গঙ্গাতটবর্ত্তী ঘাটগুলি দেখিতে দেখিতে যাইবার কল্পনায় কর্ত্তা ও গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন!"

গঙ্গা-সৈকতে এই যাত্রিদল অবতরণ করিতে না করিতেই মাল্লার দল তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। কর্ত্তা দশাশ্বমেধ-ঘাটে নামিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র মাল্লারা স্ব স্ব নৌকা দেখাইয়া দর হাঁকিতে লাগিল;—দশ টাকা হইতে পাচু টাকা দর নামিল। শেষে গোবর্দ্ধন এক জন পরিচিত মাল্লার হাত ধরিয়া একটু তফাতে লইয়া গিয়া বিজ্ঞের মত কি কথাবার্ত্তা কহিল, পরক্ষণে তাহাকে রাজী করাইয়া কর্ত্তার নিকট আসিয়া বলিল,—"এরই নৌকায় উঠুন কর্ত্তা,—তিন টাকা দেবেন।"

কর্ত্তা সানন্দে সপরিবারে নৌকায় উঠিলেন। গোবর্দ্ধন বিশেষ ভাবে তদ্বির করিয়া মালপত্র উঠাইয়া দিল। কুলীরা এমন গুরু কার্য্য সমাধার দক্ষিণাস্বরূপ দশ টাকা বখশিশ চাহিল।

সবিস্ময়ে কর্ত্তা বলিলেন,—"দশ টাকা!"

গোবর্দ্ধন কর্ত্তার পাশে গিয়া চুপি চুপি বলিল,—"আপনি এদের সঙ্গে দর কশাকশি ক'রে পারবেন না, আমাকে গোটা তিনেক টাকা দিন দেখি,—এক টাকার রেজকি বরং দেবেন।"

বিনা বাক্যব্যয়ে কর্ত্তা পকেট হইতে দুইটা টাকা, একটা আধুলি ও আটটা আনি বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনের হাতে দিলেন। গোবর্দ্ধন কুলীদের ডাকিয়া পূর্ব্বোক্ত সোপান ধরিয়া রাস্তার উপর উঠিল এবং চারি জন কুলীকে মিঠে-কড়া কথায় বাধ্য করিয়া একটা টাকা দিয়া বিদায় করিল। তাহার পর নৌকার কাছে আসিয়া কর্ত্তার হস্তে ছয়টা আনি ফেরৎ দিয়া বলিল,—"বেটারা সব পেয়ে বসেছে। আর কলকেতার বাবুরাই ত এদের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছে! পাঁচ টাকার কমে কিছুতেই নেবে না,—জোর জবরদস্তি ক'রে দুটাকা দশ আনা দিয়ে বিদেয় করেছি।"

কর্ত্তা প্রসন্নভাবে বলিলেন, "বেশ করেছ, বাবা,—এখন তা হ'লে বিশ্বনাথের নাম নিয়ে রওনা হওয়া যাক।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"আমাকেও কি সঙ্গে যাবার দরকার হবে, কর্ত্তা মশাই ?"

কর্ত্তা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি বাবা! কষ্ট যখন গোড়া থেকেই ক'রে আসছ, তখন ত সহজে তোমাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি না। বিশ্বনাথ তোমাকেই যে আমাদের অভিভাবক ক'রে পাঠিয়েছেন, বাবা!"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কাশীতে আমরা এই প্রথম আসছি, পথ-ঘাট কিছু জানি না; তোমাকে কষ্ট দেওয়া হবে, তা জেনেও হঠাৎ ত ছাড়তে সাহস পাচ্ছি না, বাবা! বিশেষ ক্ষতি হবে কি আমাদের সঙ্গে বাঙ্গালীটোলা পর্য্যন্ত গেলে ?"

গোবর্দ্ধন কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া লইয়া ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিল,—"না, এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হবার নয়। আমার যা কায, তা পরে করলেও চ'লে যাবে; আর আমার বাসাও বাঙ্গালীটোলায়; তা চলুন।"

গোবর্দ্ধন নৌকায় উঠিয়া আসিল।

৩

কথায় কথায় কৌশলক্রমে গোবর্দ্ধন কর্ত্তার পরিচয় জানিয়া লইল। কর্ত্তার নাম—রাজীবলোচন মণ্ডল, জাতিতে মাহিষ্য। কলিকাতার সান্নিধ্যে ইঁহার জমীদারী, কলিকাতাতেও ভূসম্পত্তি ও কয়েকখানি বড় বড় বাড়ী আছে। ইঁহারা নবাবী আমোলের প্রাচীন জমীদার, নাম-ডাক যথেষ্ট। কলিকাতাতেই বেশীর ভাগ থাকেন।

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমিও চব্বিশ পরগণার লোক, আমার আদি নিবাস বেহালায়। আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি, আজ আপনাকে দেখে আমি ধন্য হয়েছি।"

রাজীবলোচন বলিলেন,—"অমন কথা বল না, বাবা। উনি আমাকে একটু ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন বলেই যে আমাকে দশ হাত উঁচুতে তুলে আমার সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা কইতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিশেষতঃ তুমি ব্রাহ্মণ,—পুরুষানুক্রমে আমা

ব্রাহ্মণকে দেবতার মত ভক্তি ক'রে আসছি, তুমিও সেই ব্রাহ্মণ! আমিই ধন্য হয়েছি কাশীতে এসে প্রথমে ব্রহ্মদর্শন ক'রে।"

গোবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনি বনেদী বংশের বংশধর, তাই আপনার মুখে এ কথা শুনতে পেলুম। আপনি অতি মহৎ, অতি সজ্জন, অতি ভাগ্যবান্।"

রাজীবলোচন শিহরিয়া উঠিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, "ভুল বলেছ বাবা, ভুল! আমি অতি দীন, অতি অধম, অতি দুর্ভাগা! আমার দুঃখের কথা শুনলে পাষাণও গ'লে যায় বাবা—"

সবিস্ময়ে গোবর্দ্ধন বলিল, "সে কি?"

রাজীবলোচন বলিতে লাগিলেন, "শুধু পয়সা থাকলেই কি মানুষ ভাগ্যবান্ হয় মনে কর? ভগবান্ আমাকে পয়সা দিয়েছেন, নাম দিয়েছেন, মানসম্ভ্রম দিয়েছেন যথেষ্ট; কিন্তু শান্তি মোটেই দেননি। ঐ মেয়েটি দেখছ, এই আমার একমাত্র সন্তান; আমি একে ছেলের মত আদরে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি; রূপবান্ বিদ্বান্ পাত্রের হাতেও একে সম্প্রদান করেছি। জামাইকে আমি কাছে রেখে জমীদারীর কাজ শিখাচ্ছিলেম। অমন বাধ্য সুশীল মেধাবী ছেলে সচরাচর দেখা যায় না; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কলকেতায় যেই নন-কো-অপারেশনের হুজুগ উঠল, অমনই জামাই আমার দুই ছত্রের একখানি চিঠিতে—দেশের ডাকে চল্লেম—লিখে—বিবাগী হয়ে পালিয়ে গেল! সেই থেকে তার কোন সন্ধান নেই। খুঁজতে কোথাও বাকী রাখিনি। আমাদের এই যে কাশীতে আসা—শুধু শিবরাত্রি দেখার উদ্দেশ্যে নয়,—এই কাশীতেই সে লুকিয়ে আছে, এ কথা কোন সূত্রে জানতে পেরে, শিবরাত্রিকে উপলক্ষ ক'রে এখানে এসেছি, বাবা।"

গোবর্দ্ধনের মনোরাজ্যে এতক্ষণ এক অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল। বৃদ্ধের কথা-প্রসঙ্গে শিখার সঙ্কোচশূন্য আরক্ত মুখখানির উপর সে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—যেন এই পতিপরিত্যক্তা তরুণীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী তাহাকে কতই না অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। বৃদ্ধের কথা শেষ হইবামাত্র সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ!—বলেন কি? আহা-হা—এমন দেবীর মত স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ ক'রে গেলেন! আচ্ছা, আপনি বল্লেন, তিনি কাশীতেই আছেন শুনেছেন; তাঁর নামটা কি? চেহারা কি রকম বলুন ত?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "অরিন্দম হালদার তার নাম। দিব্যি লম্বা-চওড়া চেহারা, গৌরবর্ণ, খুব বলবান্। বয়েস এত দিনে হবে প্রায় উনত্রিশ বছর, কাণ দুটো খুব বড় বড়—"

সোৎসাহে গোবর্দ্ধন বলিল, "নাকটাও বাঁশীর মত বেশ লম্বা কি, আর মাথায় চুল খুব বড়, বাউরীর মত ঘাড় পর্য্যন্ত লতান?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ, নাকটা লম্বা বটে, কিন্তু চুল সে বরাবরই ছোট ক'রে কাটত, আর গোঁফটাও রাখত না, তা, তুমি কি বাবা—"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তা হ'তে পারে, হয় ত চুল এখন বড়ই রেখেছেন; কিন্তু ঠিক এই চেহারার একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে; আমার খুব বিশ্বাস—"

সকলের চক্ষুই এখন গোবর্দ্ধনের মুখের উপর, সবাই উদ্‌গ্রীব। বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কোথায় থাকে, বাবা? এখনও আছে এখানে?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তিনি কোথায় থাকেন, তা ঠিক বল্‌তে পারব না, কেন না, তিনি এক স্থানে থাকেন না; তবে কাশীতে বছরের অর্দ্ধেকেরও বেশী থাকেন। আমাকে তিনি ছোট ভায়ের মত ভালবাসেন, আর কাশীতে এলেই, দয়া ক'রে আমার বাসাতেই ওঠেন। তাঁর আগেকার নাম বা পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই বলেন না, বল্‌তে মোটেই চান না। এখন তাঁর নাম ইন্দু স্বামী। দেশের কাজেই তিনি নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, এও শুনেছি; অন্নকূটের পর তিনি কাশী থেকে চ'লে গেছেন, খুব সম্ভব এই শিবরাত্রিতেই আবার আসবেন; এবার এলেই সব জানা যাবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাদের জামাইকে খুঁজে বার করব-ই—যদি তিনি কাশীতে থাকেন।"

গৃহিণী গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "এমন দিন কি হবে? হয় ত শিখার আমার দুঃখের অবসান হয়েছে,—বাবা। বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা বুঝি এত দিনে মুখ তুলে চেয়েছেন, নইলে আমরাই বা হঠাৎ কাশীতে আসব কেন, আর বাবা, তোমার সঙ্গেই বা এ ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ হবে কেন? আশীর্ব্বাদ কর বাবা, তোমার কৃপাতেই যেন আমরা আমাদের হারানিধি ফিরে পাই।"

রাজীবলোচন বিশ্বনাথের উদ্দেশে করযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সবই বিশ্বনাথের ইচ্ছা।"

৪

দ্বিপ্রহর হয় হয়, এমন সময় নৌকা আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে ভিড়িল। গোবর্দ্ধন আরোহিগণকে কিছুক্ষণ নৌকায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাসার সন্ধান করিতে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িল। ঘাটের উপর দিয়া রাস্তায় উঠিয়া সে একবার নৌকার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ব্যস্ত হবেন না, এখনই বাসা ঠিক ক'রে আমি লোকজন নিয়ে আস্‌ছি।"

অতঃপর দ্রুতপদে সে কালীতলায় আসিয়া মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইল; পকেট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া মায়ের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া করযোড়ে করুণস্বরে ডাকিল, "মা, তোমারই প্রসাদে আজ আমার সুপ্রভাত। জবর শিকার জুটিয়ে দিয়েছ মা, দেখো মা। যেন শেষরক্ষা হয়—মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয়।"

কালীতলার সম্মুখ দিয়া খালিসপুরার রাস্তা গিয়াছে। গোবর্দ্ধন দ্রুতপদে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বড় গলি-পথে খালিসপুরায় একখানি বড়-সড় ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। সদর-দরজার ছিটকিনির সূতায় ত্রিতলের বারান্দা হইতে টান পড়িল, দরজা খুলিয়া গেল; উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"কে?"

গোবর্দ্ধন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "আমি গোবর্দ্ধন, তর্করত্ন মশাই! নমস্কার; খবর আছে, নেমে আসুন একবার।"

সিঁড়িতে খড়ম বাজিয়া উঠিল; তর্করত্ন মহাশয় সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি সংবাদ?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ঘর চাই; ভদ্র ভাড়াটে, বেশী দিন থাকবে,

পাঁচটি মাত্র প্রাণী ; কর্ত্তা, গিন্নী, মেয়ে, রাঁধুনী আর চাকর ; কিন্তু পুরো একটা তালা ছেড়ে দিতে হবে,—তেতালা হলেই ভাল হয়, দিতে পারবেন ?"

তর্করত্ন মহাশয় সমস্ত মুখখানি রীতিমত সঙ্কুচিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন, তাহার পর খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিলেন, "সকাল থেকে এই শুনতে শুনতে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল ! সবাই বলে—ঘর চাই ; আরে বাপু, আর পাই কোথায় ? একতালা, দোতালা সব ভ'রে গেছে, নিজেদের ঘরগুলো পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে, গিন্নী ছেলেপুলে আর রান্নাবান্না নিয়ে দোতালার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন ; বৈঠকখানা থেকে ছ'কেতা ভাড়া তোলবার ব্যবস্থা করেছি, তক্তোপোষের পায়ার নীচে তিনখানা ক'রে ইট দিয়ে উঁচু ক'রে দিয়েছি—উপরেও ভাড়াটে থাকবে—বুঝেছ ভায়া ?"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তা বুঝিছি ; এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কি বুঝলেন, তা বলুন ; আমার যাত্রীরা নৌকায় অপেক্ষা করছে।"

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "বটে ! তা পুরো তেতালাটা খালি ছিল, আর এখনও যে নেই, তা নয় ;—কিন্তু আজই একটু আগে এক জনকে কথা দিয়িছি, পাকা কথাই হয়ে গেছে—ভাড়া দিন দেড় টাকা !"

গোবর্দ্ধন বলিল, "টাকা তারা জমা দিয়ে গেছে ?"

তর্করত্ন বলিলেন, "জমা না দিলেও কথাটা পাকা হয়ে গেছে ; ও-বেলা টাকা দেবে। তবে তুমি যদি রোজ ছ'টাকা দেওয়াতে পার, তা হ'লে বিবেচনা করতে পারি ; কিন্তু তাঁদের অন্ততঃ পনের দিন থাকতে হবে, আর টাকাটা আগুড়ি দেওয়া চাই।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তাই হবে, কিন্তু আমারও একটা কথা আছে।"

তর্করত্ন বলিলেন, "তোমার আর এর মধ্যে কোন কথা থাকতে পারে না,—তুমি এর ওপর যা পার, ক'রে নিও।"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল, "সেই কথাই আপনাকে বলছি। শুনুন, আপনি রোজ তিন টাকা হিসাবে ভাড়ার কথা বলবেন, ছ'টাকা আপনার, এক টাকা আমার !"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "অ্যাঁ ! আমার বাড়ী, আমি তার ভাড়া পাব ছ' টাকা, আর তুমি তার দালালী নেবে এক টাকা ! এ বড় অন্যায় !"

গোবর্দ্ধন জবাব দিল, "তা ত বটেই ! বেশ, অন্য বাড়ী আমি দেখছি ; এ ভাড়ায় অনেকে সেধে বাড়ী দেবে।"

তর্করত্ন মহাশয় বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আহা-হা, চট কেন ভায়া ? আমি কি বাড়ী দিতে নারাজ ? একবারে মুলো-তোলা ক'রে খেতে নেই, বুঝে-সুঝে হিসেব ক'রে খেতে হয়।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "সে উভয়তই তর্করত্ন মশাই !"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "তা বটে ! আচ্ছা ভায়া—যাও, তোমার মক্কেলদের নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ ঘরগুলো সাফ করবার ব্যবস্থা করি, সাফাই খরচাটা কিন্তু পাওয়া চাই ভায়া,—সেটা আধা-আধি বখরা, বুঝলে ?"

"তাতে আটকাবে না" বলিয়া গোবর্দ্ধন চলিয়া গেল।

৬

তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীর ত্রিতলে রাজীবলোচন মণ্ডল সপরিবার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনখানি ছোট ছোট কামরা, তাঁহারা ট্রেণের যে কামরা রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই বড় নহে। দুই দিক্ বন্ধ, দুই দিক্ খোলা, ছাদের এক পার্শ্বে টীনের ছাদ দেওয়া ক্ষুদ্র রন্ধনাগার, তাহারই এক ধারে টীনের দেওয়াল দিয়া আড়াল করা ভাঁড়ার,—আর এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র কলঘর, স্নানের ঘর ও পায়খানা। পনের দিনের অগ্রিম ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং সাফাই খরচা তিন টাকা, মোট আটচল্লিশ টাকা দাখিল করিয়া তবে মণ্ডল মহাশয় গৃহ-প্রবেশের অধিকার পাইয়াছেন।

কয় দিনের নিত্য যাতায়াতে ও মেলামেশায় গোবর্দ্ধন এই পরিবারের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যত্ন ও সর্ব্ববিষয়ে নিখুঁত দৃষ্টি, উপযাচক হইয়া প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া আনিয়া দিবার আগ্রহ ও সকলেরই সহিত তাহার আন্তরিকতা এই নবাগত প্রবাসী পরিবারকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইতিমধ্যে সে সকলেরই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়াছে। আশৈশব গোবর্দ্ধন পিতৃমাতৃহীন, আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই ; তাই পিতৃতুল্য রাজীবলোচনকে সে এখন বাবা বলিয়া সম্ভাষণ করে, সেই সূত্রে গৃহিণী তাহার মা হইবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য ; গৃহিণীর আশ্রিতা স্বজাতীয়া পাচিকা হইয়াছে তাহার দিদি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই, তরুণী সুন্দরী শিখার সঙ্গে সে বাছিয়া বাছিয়া সম্পর্ক পাতাইয়াছে—বৌদি।

গৃহিণীকে গোবর্দ্ধন বুঝাইয়াছে যে, তাঁহার জামাতা যে তাহারই সেই দাদা, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাযেই শিখাকে সে বৌদি বলিয়াই ডাকিবে।

শিখারও চিত্তে প্রথমতঃ যে সঙ্কোচ ছিল, গোবর্দ্ধনের ব্যবহারে তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। গোবর্দ্ধনের কথা কহিবার কৌশলপূর্ণ বিচিত্র ধারা, কাশীর লাইব্রেরীসমূহ হইতে উপযাচকভাবে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া যোগান দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি তাহার প্রতিবাদহীন কোমল বিনম্র ব্যবহার শিখাকে তাহার প্রতি অনেকটা আকৃষ্টও করিয়াছে।

প্রয়োজন না থাকিলেও গোবর্দ্ধন অনেক সময় মণ্ডল মহাশয়ের বাসায় হাজির থাকিত। গল্প-গুজবে, কাশীর কথায় শিখার সহিত তাহার আলাপ ভালই জমিত, কিন্তু যখনই শিখা এই আলাপের ভিতর দিয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিত, তখন এহেন বিচক্ষণ বাকপটু গোবর্দ্ধনকে একবারে বেকুব হইতে হইত। তখনই নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহার স্মরণপথে উদিত হইয়া তাহাকে অভিভূতের মত অন্যত্র টানিয়া লইয়া যাইত। কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিতা বিদুষী শিখা গোবর্দ্ধনের শিক্ষাদীক্ষার দৌড় কতদূর এবং কোথায় তাহার দুর্ব্বলতা, তাহা বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল। সেই জন্য যখনই গোবর্দ্ধনের উপস্থিতির দীর্ঘতা বা আন্তরিকতার বাড়াবাড়ি তাহার পক্ষে বিরক্তিকর বোধ হইত, তখনই সে আলোচ্য বিষয়ের মোড় ঘুরাইয়া তাহাকে উচ্চ-সাহিত্যের এমন প্রস্তরবন্ধ পথে লইয়া তুলিত যে, বেচারা গোবর্দ্ধন তখন কার্য্যের অছিলায় পলাইবার পথ পাইত না।

গোবর্দ্ধন মনে করিয়াছিল, সে এই স্বামিপরিত্যক্তা সুন্দরী

কৈবর্ত্ত-যুবতীর হৃদয়-দুর্গ তাহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্য্যের সাহায্যে সহজেই জয় করিয়া লইবে। শিখার শিক্ষার কথা রাজীবলোচনের মুখে শুনিয়া সে মনে করিয়াছিল, সাধারণ লেখাপড়া-জানা মেয়েদের মত এই মেয়েটিরও শিক্ষার দৌড় রামায়ণ-মহাভারত বা বড় জোর সোজা সোজা নাটক-নভেল পড়িবার দক্ষতা পর্য্যন্ত; কিন্তু আলাপসূত্রে যখন এই তরুণী সেলি, সেক্সপীয়ার, টেনিসনের লেখা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিত, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার প্রসঙ্গ তুলিত, তখন গোবর্দ্ধন বেশ বুঝিয়া লইল যে, এ হাটে বেসাতি করিতে আসা তাহার পক্ষে নিতান্ত ঝকমারীর কায হইয়াছে।

শিখার পিতা রাজীবলোচন যদিও ইদানীং সহরের সংস্পর্শে আসিয়া সহরের রীতিনীতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি আবাল্যের সংস্কারসঙ্কুল সনাতন বিধি-ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই মানিয়া চলিতেন। সহরে থাকিয়াও সহরের আব-হাওয়ায় পরিপুষ্ট কৃত্রিমতা ও আভিজাত্যের স্পর্দ্ধার সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ তিনি পান নাই। তিনি যাহাকে দেখিতে পারিতেন না, কদাচ তাহার সংস্পর্শে যাইতেন না; কিন্তু যাহার সহিত খাপ খাইত, তিনি প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত মিশিতেন, মনের কোন প্রান্তে তাহার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করিতেন না। তাঁহার চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব ছিল, উপকারকের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। কোনও প্রকারে উপকারককে সাহায্য করিবার অবকাশ পাইলে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। সরল, উদার, মহানুভব মানুষটির প্রকৃতিগত মহত্ত্ব বা দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে, কাশীর এই কৃতিমান্ ভদ্রবেশী 'ভামপায়ায়,' সুচতুর গোবর্দ্ধনকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই।

গৃহিণীর প্রকৃতিও স্বামীর প্রকৃতির প্রতিবিম্বস্বরূপ ছিল। তিনি কাহাকেও কখনও উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিতেন না। কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতেও জানিতেন না,—নিঃসম্পর্কীয়, পথে পরিচিত গোবর্দ্ধনের মত যুবাকে তাঁহার বিবাহিতা যুবতী কন্যার সহিত অবাধে অসঙ্কোচে মেলা-মেশা করিতে দেখিয়াও তিনি মনে কিছুমাত্র সংশয় পোষণ করেন নাই। তাঁহার মেয়ে যে কখনও খারাপ হইতে পারে, আর গোবর্দ্ধনের মত এমন পরোপকারী ব্রাহ্মণ-সন্তান যে তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে, এ কল্পনাকেও তিনি মনের মধ্যে আমোল দিতে পারেন নাই।

কিন্তু শিখার প্রকৃতি ছিল পিতা-মাতার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষার প্রভাবে অথবা কলেজের বিভিন্ন সমাজের শিক্ষিতা মেয়েদের সংস্পর্শে আসার ফলে সে পিতামাতার প্রকৃতিগত মহত্ত্বকে তাঁহাদের মনের দুর্ব্বলতা ভাবিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইত। গোবর্দ্ধনের প্রতি কার্য্যে নিঃস্বার্থ পরোপকার-স্পৃহা দেখিতে পাইলেও, শিখা কিন্তু তাহার অযাচিতভাবে এই সকল ফাইফরমাজ খাটা ও ব্যাপকভাবে সর্ব্বদা তাহাদের সাংসারিক সকল কার্য্যের সংস্পর্শে থাকার মধ্যে পরার্থপরতার মর্ম্মগ্রহণ করিতে অক্ষম হইত; তাহার রূপের শিখা ও তাহার পিতার অর্থের প্রভাব যে গোবর্দ্ধনকে একান্ত অভিভূত করিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখার বিলম্ব হয় নাই। তথাচ এই অশিক্ষিতপটু যুবকটির ভাবভঙ্গী, ভব্যতাজনক চালচলন, সুশিক্ষিতের মত সুসঙ্গত কথাবার্ত্তা শিখার সন্দিগ্ধ অন্তরকেও তাহার পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল।

এক দিন শিখা কৌতূহলবশে কথায় কথায় গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি ত নিজেই স্বীকার করেছ, কখনও স্কুলে বই নিয়ে বস নি, ইংরিজী অক্ষরও তুমি চেন না; কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হয়—তুমি যেন সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছ। এ সব কথা শিখেছ কোথায় শুনি ?"

গোবর্দ্ধন কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বেশ সরল ও খোলা-খুলিভাবে বলিল, "বিদ্যে আমার শুধু তোমার কাছেই ধরা প'ড়ে গেছে, বৌদি! নতুবা এ পর্য্যন্ত কেউ আমার এত বড় চালাকী ধরতে পারে নি। ছেলেবেলা থেকে মা-বাপ-হারা, স্কুলে পড়াবে কে বল? ছেলে-বয়েসেই সখের থিয়েটারের আখড়ায় ঢুকলুম। সেটা আখড়া হ'লেও ছিল অনেকটা স্কুলের মত; পার্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারের চেষ্টায় বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ ক'রে পার্ট পড়বার বিদ্যে পর্য্যন্ত লাভ করা গেল। আর এই সূত্রেই অনেক লেখাপড়া-জানা লোকের সংস্রবে এসে কথার মার-প্যাঁচ আর লোক বুঝে কথা বলবার ধারাটা আয়ত্ত ক'রে নেওয়া গেছে।"

হাসিয়া শিখা বলিল, "বটে, তাই বল, থিয়েটারের ফেরত তুমি! দেখ, একবার আমাদের কলেজে চাটগাঁর ফ্লডে সাহায্য করবার জন্যে আমরা থিয়েটার করি। তার রিহারসেলের সময় ষ্টার থিয়েটারের এক জন নামজাদা অ্যাক্টরকে আনা হয় মোসন শেখাবার জন্যে—যেমন তাঁর চেহারার পারিপাট্য, তেমনই কেতাদুরস্ত চাল, রোজই তিনি একখানা কেতাব হাতে ক'রে আসতেন। বাঙ্গালা কেতাব নয়, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, জার্ম্মাণ, রাসিয়ান অথারদের নামজাদা বই; আমরা দেখে অবাক্ হয়ে ভাবতুম—না জানি কত বড় পণ্ডিত! শেষে এক দিন হঠাৎ একটা সামান্য কথায় তাঁর বিদ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন জানা গেল, তিনি মোটেই ইংরিজী জানেন না! তখন আমাদের কি হাসির ধুম! তিনি আর সে-মুখো হন নি।"

বিজ্ঞের মত গোবর্দ্ধন বলিল, "এই জন্যেই বিবেকানন্দ ব'লে গেছেন—চালাকীর দ্বারা কোন কায করা যায় না!"

শিখা একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন কথা ব'ল না, ঠাকুরপো। তোমার ওপর তা হ'লে ঘা পড়ে যে!"

গোবর্দ্ধন নির্ব্বাক্ নয়নে শিখার চপল হাস্যময় মুখখানির দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল।

৬

সে দিন আর আলাপ ভাল জমিল না। সন্ধ্যার একটু আগে বিদায় লইয়া গোবর্দ্ধন বাসায় ফিরিয়া আসিল। খালিসপুরার বড় রাস্তার মাঝামাঝি অংশ হইতে একটি সরু গলি বাহির হইয়াছে; গলিটি কুকুর-গলি নামে বিদিত। এই গলির ভিতর একখানি জীর্ণ দোতালা বাড়ী। গোবর্দ্ধন পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে

মধ্যে কোনও ঋতুতেই বোধ হয় এ স্থানে সূর্য্যদেব দৃষ্টি দিবার ফুরসৎ পান না।

দ্বিতলের একটি ঘরের মধ্যে গোবর্দ্ধন প্রবেশ করিল। তাহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে করিতেও দ্বিধা হয় যে, এই অপরিচ্ছন্ন জঘন্য গৃহের সে অধিবাসী। দেওয়ালের এক দিকে দ্বারপার্শ্বে একটি লোহার হুকে বহু দিনের পুরাতন টীনের একটি দেয়ালগিরি ঝুলিতেছিল, দেয়াশলাই বাহির করিয়া গোবর্দ্ধন তাহা জ্বালিয়া দিয়া গৃহমধ্যস্থ খাটিয়ায় বসিয়া পড়িল।

সারা পথই আজ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, শিখার কথাটার অর্থ কি? কি মনে করিয়া এ কথা সে বলিল?

গোবর্দ্ধন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল; শিখার সহিত পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সকল কথা, সকল আচরণ একে একে মনের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। প্রায় পনের মিনিট চিন্তার পর সে আপন মনে বলিয়া উঠিল "না, না, এ তার পরিহাস! আমাকে মূর্খ দেখে সে আমাকে নিয়ে কৌতুক করে মাত্র! কৈবর্ত্তের মেয়ে লেখাপড়ার দেমাকে আমাকে—আচ্ছা, আমি তাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নেব। শিখাকে আমি না পেতে পারি, কিন্তু—"

সহসা কি এক সয়তানী চক্রান্ত তাহার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া তাহাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। আকস্মিক উল্লাসে গোবর্দ্ধন সবেগে উঠিয়া পড়িল। তাহার মূর্ত্তি তখন অন্যরূপ! সুপরিচ্ছদধারী এই সৌখীন যুবকটির আবাসভূমির অপরিচ্ছন্নতার মত, তাহার সুন্দর মুখখানির উপর মনের কদর্য্যতা পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়া তাহাকে প্রেতের মত ভয়াবহ দেখাইতেছিল।

ক্ষিপ্রহস্তে আলো নিবাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন বাহির হইয়া পড়িল।

৭

শঙ্করলাল কাশীর কোনও বিখ্যাত পাণ্ডার প্রধান শিষ্য, পালক-পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তাহার বয়স বাইশ তেইশ বৎসর—অসাধারণ লম্বা-চওড়া সুন্দর যুবা পুরুষ। পাণ্ডামহলে তাহার ন্যায় সুপুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। পাণ্ডাজী তাহার প্রতি একান্ত স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে শুধু মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া স্বতন্ত্র শিক্ষক রাখিয়া তিনি তাহার শিক্ষার ব্যবস্থাও কতকটা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সংস্পর্শে তাঁহাকে প্রায়ই আসিতে হয় বলিয়া তিনি শিষ্যকে বাঙ্গালী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালা ভাষাও শিখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ফলে শঙ্করলাল বাঙ্গালা ভাষাই শিখিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন এই নবীন যুবকের মনের খোরাক যোগাইবার জন্য তাহার নর্ম্ম-সহচর বা স্তাবকদল দশাশ্বমেধ-ঘাট হইতে বাছিয়া বাছিয়া ছবিওয়ালা বটতলার প্রেমোদ্দীপক কেতাবগুলি সংগত করিয়া আনিত, পরমাগ্রহে সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া নবীন যুবার মনে এই ধারণাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাঙ্গালীই প্রেমের মর্য্যাদা বুঝে, তাই তাহারা এমন কেতাব লিখিতে পারে। কালক্রমে পাণ্ডার শিষ্যের এই বাঙ্গালী-প্রীতি প্রেমলালসার মধ্য দিয়া তাহার বাঙ্গালী নর্ম্ম-সহচরদের সহায়তায় এমন কদর্য্যপথে বহিয়া চলিল যে, তাহার পরিণাম পরে ভীষণ হইয়া উঠিল।

পাণ্ডাজী দিবারাত্রিই দেব-সেবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকিতেন; নিজের সাধনভজনও সময়মত করিতেন। পুত্রতুল্য শিষ্য পাণ্ডাজীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া দিবাভাগে প্রহরখানেকমাত্র দেবায়তনে থাকিয়া তাহার পর নিজের খাসকামরায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। এইখানে বসিয়া সে তাহার বিলাস-জীবনের একমাত্র কাম্য, তাহার আরাধ্য রূপসীদের রূপ চিন্তা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। সুন্দরী-সংগ্রহের জন্য এই তরুণের অনেকগুলি পোষা দালাল ছিল। তাহারা স্বভাবসিদ্ধ চাতুরীর প্রভাবে কল্পিত সুন্দরীর প্রসঙ্গ তুলিয়া এই বিষয়-বুদ্ধি-হীন অর্ব্বাচীন যুবককে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া পাকে-চক্রে তাহার নিকট হইতে প্রভূত অর্থ শোষণ করিত। ভদ্র ঘরের মহিলারাই এই পাপিষ্ঠের আকাঙ্ক্ষার পাত্রী ছিল এবং এই দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য সে টাকা ছড়াইতে দৃক্‌পাত করিত না; তাহার অনুগৃহীত দালালরাও এই সূত্রে কাশীর ডালমণ্ডির বার-বনিতাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিত এবং পাণ্ডানন্দনও এইভাবে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া ক্রমশঃই স্পর্দ্ধিত ও প্রলুব্ধ হইতেছিল।

গোবর্দ্ধন ছিল এ সব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ সুদক্ষ ওস্তাদ। সময়ে অসময়ে পাণ্ডার শিষ্যের লালসার অনলে ইন্ধন যোগাইয়া সে তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। শঙ্করলালের খাস মজলিসে গোবর্দ্ধনের খাতিরও সামান্য ছিল না। কিন্তু সে রাত্রিতে গোবর্দ্ধন যখন বাসা হইতে বাহির হইয়া বরাবর শঙ্কর-লালের খাস কামরায় ঢুকিয়া সিদ্ধিপানের মৌজে রত প্রভুর উদ্দেশে সহাস্যে রাম রাম করিয়াও বিনিময়ে কোনও প্রকার সম্ভাষণ বা আহ্বান পাইল না; বরং মহাবীর তাহাকে দেখিবা-মাত্র সিদ্ধিপাত্রটি মুখ হইতে ঈষৎ নামাইয়া মহাবীরেরই মত বিকট দন্তবিকৃতি ও ভ্রূকুটি করিয়া সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িল, তখন গোবর্দ্ধন একটা প্রমাদ কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তত্রাচ সে দমিল না এবং দমিবার পাত্রও সে নহে; কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ফরাসের উপর বসিয়া পড়িয়া সে বলিল, "বাবুজীর আজ হয়েছে কি?"

বাবুজী গোবর্দ্ধনের মুখের দিকে একবার চাহিয়া পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল, "আর হবে কি? তোমার বেইমানী ধাপ্পাবাজী চালাকী- আজ ধরা প'ড়ে গেছে!"

গোবর্দ্ধনের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মুখ শুকাইল না, মুখের উপর কুটিল হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল, "তাই না কি? তা ব্যাপারখানা কি, শুনি?"

শঙ্করলাল বলিল, "তুমি যে মস্ত বড় পাজী, সেটা জানা কথা। কিন্তু তার চেয়েও বড় মিথ্যেবাদী যে তুমি, তা আমি জানতুম না।"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া গোবর্দ্ধন অম্লানবদনে পাণ্ডা-শিষ্যের মুখের উপর বলিল, "হাঃ হাঃ! বাবুসাহেব বুঝি এত দিন জেনে এসেছেন যে, পাজীরা সবাই সত্যবাদী! এ ভুল ত এক দিন ভেঙ্গে যেতই; বাবুজীর এর আগেই জানা উচিত

ছিল, মিথ্যের মদৎ না নিয়ে পেজোমী কখনও পয়দা হ'তে পারে না।"

গোবর্দ্ধনের কথার ধারায় শঙ্করলালের অপ্রসন্ন মন কতকটা তাজা হইলেও ভিতরের প্রচ্ছন্ন জ্বালা তখনও তাহাকে পীড়া দিতেছিল। সে এবার ভূমিকা ত্যাগ করিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "তোমার মত ভণ্ড বেহায়া আমি দুটো দেখিনি; সে দিন তুমি গেরস্তির বৌ ব'লে যে মাগীটাকে এনে দিয়ে মবলগ দুশো টাকা নিয়ে গেলে, সে হারামজাদী কুণ্ডিটোলার তিন পুরুষে সতী!"

মুখ শুকাইয়া আসিলেও দক্ষ অভিনেতার মত গোবর্দ্ধন সাধা কৌশলে অবসন্ন মনকে সবলে তাজা করিয়া মুখের উপর কৌতূহলের উচ্ছ্বাস টানিয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল, "সত্যি না কি? সে বেটী কোথায় বলুন ত?"

মুখ বিকৃত করিয়া শঙ্করলাল বলিল, "আর ন্যেকা সেজে কায নেই। টাকার বখরা নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় সে নিজেই আমার কাছে এসে সমস্ত ব'লে দিয়ে গেছে। এমনই ক'রে তোমরা আমাকে বেকুব বানিয়ে এসেছ? ছি! আর আমি তোমাদের ফাঁদে পা দিচ্ছি না। এ সব নোংরা কাযে আর থাবও না।"

বক্রদৃষ্টিতে গোবর্দ্ধন একবার এই বৈরাগ্যপরায়ণ পাণ্ডানন্দনের দিকে তাকাইয়া আবেগভরা গাঢ়স্বরে বলিতে লাগিল, "বাবুজী হচ্ছেন রইস-আমীর; বাড়ীতে ব'সে পয়সার জোরে মনের সাধ মেটান; আমরা গরীব পরোয়া, বাবুজীর এই সাধের চীজ জোগাড় করতে তামাম সহর ছুটোছুটি করি। কোথায় মোগলসরাই, কোথায় সহরতলী, কোথায় নাগোয়া;—দিন-রাত ঘুরে মরি। কত যায়গায় ঠেঙ্গানি খাই, গালাগালি খাই—তার নিরিখ নেই। আর কাশীর এঁরাও আজকাল পাল-পার্ব্বণে ঘাটে-পথে বেরুতে আরম্ভ করেছেন, দেখলেই মনে হয় ভদ্রঘরের মেয়ে! কাযেই আমাদেরও এতে ধোঁকায় পড়া বা ভুল হওয়া বিচিত্র নয়! আর আপনি যার কথা তুলেছেন, তার স্বরূপ আমিও ক'দিন হ'ল জানতে পেরেছি; কিন্তু তার সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে তাকে এনেছি, এ মিথ্যে কথা; ইচ্ছা হয়, তাকে আনিয়ে প্রমাণ করুন, আমি এতে পেছপাও নই; কিন্তু এ সব ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা করতে গেলে, হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে, এটা যেন বাবুজীর মনে থাকে।"

শঙ্করলাল নিরুত্তর রহিল। চতুর গোবর্দ্ধন বুঝিয়া লইল—তাহার বক্তৃতা ব্যর্থ হয় নাই।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া এইবার গোবর্দ্ধন তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। সে বলিল, "সত্যই কাযটা বড়ই নোংরা হয়ে গেছে। ভদ্র ঘরের মেয়েদের ওপর যে আপনার অনুরাগ, তা কি আমি না জানি? আমারই ভুলের দোষে যা হয়েছে, এবার তা দূর ক'রে দেব। এ ক'দিন কি আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম মনে করেন? জানেন ত শিবরাত্রির মরসুম পড়েছে। আজ ক'দিন হ'ল ভাগ্যক্রমে হঠাৎ এক বড়ঘরের মেয়ে আমার হাতে এসে পড়েছে। বাবুজী অনেক রূপ দেখেছেন, কিন্তু এমনটি এ পর্য্যন্ত দেখেন নি—এ আমি শপথ ক'রে বলতে পারি।"

বাবুজীর মনের ভিতরের সমস্ত গোলমাল ও অপ্রসন্নতার অন্ধকার এই মুখরোচক সংবাদটির উচ্ছ্বাসে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কৌতূহলবিহসিতমুখে জিজ্ঞাসুনয়নে সে গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিল।

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল, "বয়েস আঠার উনিশ। খাস কলকেতার মেয়ে, লেখাপড়া-জানা, কালেজে পড়া, পাশ করা—"

শঙ্করলালের ধৈর্য্যের বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। সহর্ষে সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাগাতে পেরেছ তাকে? সে কি চায়?"

গোবর্দ্ধন অসম্ভবরূপ গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে কিছু চায় না, তার বড় একটা অভাবও নেই, কিন্তু তার সঙ্গে যারা থাকে, তাদের হাত করতে আর মুখ বন্ধ করতে হাজারখানেক ছাড়তে হবে। এর মধ্যেই আমার শ আড়াই গ'লে গেছে। কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই;—এমনটি আর মিলবে না; সাদি হলেও তার স্বামী নেই,—নিরুদ্দেশ; কাযেই হাঙ্গামারও কোন ভয় নেই।"

অস্থিরভাবে শঙ্করলাল পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত প্রকাণ্ড তাকিয়াটির উপর উঠিয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে গোবর্দ্ধনকে বলিল, "হাজার টাকা লাগে, তাই দেব আমি; তুমি নিয়ে এস তাকে; আজই—এই রাত্রেই।"

ধীরে ধীরে বিজ্ঞের মত গোবর্দ্ধন বলিল,—"অত ব্যস্ত হ'লে হবে না, বাবুজী!—যে সে ঘরের মেয়ে নয় সে। খুব কায়দা ক'রে আনতে হবে।"

"তা হ'লে কবে আনছ শুনি?"

গোবর্দ্ধন একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল,—"সে কথা কাল এই সময় আপনাকে জানাব। তবে বেশী দেরী হবে না, শিবরাত্রির মধ্যেই কায হাসিল ক'রে দেব। কিন্তু তার আগে শ তিনেক টাকা আমাকে আগাড়ি দিতে হবে।"

শঙ্করলাল বলিল,—"তাতে আটকাবে না, কাল এসে নিয়ে যেও। কিন্তু মনে রেখো—এও যেন কুণ্ডিটোলার আমদানী না হয়,—তা হ'লে কিন্তু এবার তোমার নিস্তার থাকবে না!"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল,—"বাবুজী তাকে দেখলেই বুঝবেন সে কোথাকার আমদানী,—কলকেতার কলেজ থেকে পাশ করা—"

তাম্বূলপূর্ণ রূপার সুবৃহৎ ডিপাটি পাণ্ডানন্দন গোবর্দ্ধনের হাতের নিকট বাড়াইয়া দিল। গোবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে কয়েক খিলি পাণ তুলিয়া লইয়া বাবুজীকে অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল।

৮

নিত্য গঙ্গাস্নান ও দেব-দেবী-দর্শন কাশীতে আসিয়া অবধি রাজীবলোচন ও তাঁহার গৃহিণীর নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। পাচিকা ও ভৃত্যটিও সময় সময় ইঁহাদের সঙ্গে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম গোবর্দ্ধনই ইঁহাদের পাণ্ডাস্থানীয় হইয়া সকল কাযকর্ম্ম ও দর্শনাদি করাইত। ইদানীং তাহার সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। গোবর্দ্ধনকে প্রত্যহ কষ্ট দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন। গোবর্দ্ধনও ইহাদিগকে পরিহার করিয়া নির্জ্জনে শিখার সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজিত। কিন্তু শিখাকে ঠিক এই সময় গৃহস্থালীর কার্য্যে রন্ধনশালায় এত ব্যস্ত দেখা যাইত যে, অধিকাংশ

দিনই গোবর্দ্ধনকে নিরাশ হইয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে বাসায় ফিরিতে হইত।

গৃহিণী অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাঁহার এই খেয়ালী মেয়েটিকে এক দিনের জন্যও কোনও মন্দিরে লইয়া যাইতে পারেন নাই। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে শিখা মায়ের মুখের উপর বলিত,—"আগে আমার দেবতাটিকে খুঁজে এনে দাও, তার পর খুব ধূমধাম ক'রে তোমাদের দেবতার পূজো দিতে যাব; কিন্তু তার আগে নয়।"

মেয়ের কথায় গৃহিণী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না; কর্ত্তার নিকট গিয়া মেয়ের কথা বলিতেন। পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গদ্‌গদস্বরে উত্তর দিতেন,—"এতে দুঃখ কর না গিন্নি, দেবতা এতে রুষ্ট হবেন না, বরং শিখার এ সাধনায় তুষ্ট হয়ে তার দেবতাকে মিলিয়ে দেবেন, দেখো।"

শিখার স্বামী অরিন্দম রূপে, গুণে, চরিত্রে, শিক্ষায় শিখার মনের মত হইলেও, একটি বিষয়ে শিখা স্বামীর সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে মিলিতে পারে নাই এবং মিলনের এই অন্তরায়টি তাহার স্বামী ও পিতা-মাতার নিকট সৌভাগ্য ও আনন্দদায়ক হইলেও শিখার মনে তাহা নিতান্ত অবমাননাকর বলিয়া পীড়া দিত। সেটি—স্বামীর স্বাবলম্বনের অভাব বা পরনির্ভরতা। আশৈশব মাতুলালয়ে প্রতিপালিত এই দরিদ্র যুবকটির কুলশীল, প্রকৃতি ও বিদ্যার পরিচয় পাইয়া দূরদর্শী রাজীবলোচন তাঁহার একমাত্র সন্তান গুণবতী শিখার উপযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে জামাতা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বিবাহের পর অরিন্দম শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের বিষয়-সম্পত্তি পরিদর্শনে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শিখা তাহার জীবনের কাম্য দেবতাস্থানীয় চরিত্রবান্ শিক্ষিত স্বামীকে পিতার অন্নদাস হইতে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর দারিদ্র্য তরুণীকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। কিন্তু তাহার আত্মনির্ভরতার দৈন্য শিখাকে পীড়া দিত। স্বামীর সহিত সে পর্ণকুটীর আশ্রয় করিলেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, কিন্তু স্বামিসহ পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্যমধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে পরিতুষ্ট হইতে পারে নাই। আত্মীয়-স্বজন যখন তাহার আরাধ্য স্বামীর এই হীনতার সুযোগে তাহার ধনাঢ্য পিতার উদারতার প্রসঙ্গ তুলিত, তখন শিখার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় কালো হইয়া উঠিত, অনির্ব্বচনীয় বেদনায় বুকখানি টন্ টন্ করিত, সে মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিত।

অরিন্দম প্রাণ ভরিয়া শিখাকে ভালবাসিলেও, শিখার অন্তরের এই অতৃপ্তি কাঁটার মত তাহার মনে খোঁচা দিত এবং তরুণ দম্পতির এই মানসিক বৈষম্য তাহাদের মিলনকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই।

শিখার আকাঙ্ক্ষা অরিন্দমের ন্যায় শিক্ষিত যুবার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু সংসারের মধ্যে আপনার বলিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইবার এক কাঠা ভূমি বা একখানি পর্ণকুটীরও যাহার নাই, সদ্য কলেজ হইতে বাহির হইয়া, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে যে ধনীর সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে, স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের কোনও পন্থার সহিত যে এখনও পরিচিত হয় নাই,—সে কোন্ ভরসায় শিখার মত সুন্দরী শিক্ষিতা ধনি-কন্যাকে লইয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবে?—অথচ স্বামী হইয়া, পুরুষ হইয়া, যাহাতে তাহার ভয় ও সংশয়,—শিখার তাহাতেই স্পৃহা ও উৎসাহ পূর্ণ মাত্রায়! অরিন্দম অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠিক এই সময় মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগের ভেরী গুরুগম্ভীর মন্দ্রে বাজিয়া উঠিল। কলেজের ছেলে, অফিসের কেরাণী, উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী—কর্ত্তব্যের প্রেরণায় যেমন অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পথে ছুটিয়া বাহির হইল,—তেমনই আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান্—যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঝুঁকিতেছিল, তাহারাও আত্মগোপন বা আত্মপ্রবঞ্চনার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ইহাকে উত্তম উপায়-রূপে গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটাইয়া এই পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অরিন্দমও উপায় অন্বেষণে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। আর বিচার করিবার অবসর না লইয়াই দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তান-রূপে দেশের আহ্বানে সে-ও নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইল।

অরিন্দমের দুই ছত্রের পত্র পড়িয়া বাড়ীর সকলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেও, শিখা কিন্তু তাহাতে মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। অরিন্দমের বিচ্ছেদ-ব্যথা অপেক্ষা পরানুবর্ত্তিতা হইতে তাহার মুক্তির আনন্দ এই স্বভাব-তেজস্বিনী তরুণীকে অধিকতর অভিভূত করিল। কিন্তু ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, অরিন্দমের কোনও সমাচার পাওয়া গেল না;—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল,—বহু অসহযোগী জীবনের ভুল বুঝিয়া জীবনযাত্রার পথে আবার যখন ফিরিয়া আসিল,—তখনও অরিন্দমের কোনও সমাচার আসিল না,—তখন সকলের অপেক্ষা শিখার স্বামিপ্রেমপূর্ণ ক্ষুদ্র বুকখানি ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে যাতনা, তীব্র অনুশোচনা, সে একাই দিবারাত্রি অনুভব করিত।—অরিন্দমের অন্তর্দ্ধানের সূত্র সে ভিন্ন অন্য কেহই জানিত না। সকল কষ্ট—সকল দুর্ভাবনা অন্তরে তাহাকে একাই সহ্য করিতে হইত।

শিখা শুনিয়াছিল, কাশীতে আসিলে, কাশীনাথকে কায়মনঃপ্রাণে ডাকিলে মানুষের কামনা পূর্ণ হয়। তাই সে মনে মনে আশা পোষণ করিতেছে যে, তাহার কামনা কাশীতে অপূর্ণ থাকিবে না। মায়ের কাছে দেবদর্শন সম্বন্ধে সে বড়াই করিলেও, মায়ের অগোচরে মনে মনে বিশ্বনাথের উদ্দেশে সে বলিত,—"তুমি বিশ্বনাথ: শুধু একটা ক্ষুদ্র মন্দিরের নাথ নও, বিশ্বের মানুষের মনের মন্দিরেও তুমি; আমার মনের কথা তোমার অগোচর থাকতে পারে না, মনের মন্দির থেকেই তুমি আমার প্রার্থনা শোন না—আমার মনের দেবতাকে মনের মত ক'রে দেখিয়ে দাও।"

* * * * * *

সে দিন গোবর্দ্ধন আসিয়া বলিল,—"শুনেছ বউদি, কাশীতে এক জন আসল সাধু এসেছেন।"

শিখা বলিল,—"কলকেতার লোক সাধুর কথা শুনলেই ভণ্ড ব'লে বসে; তাইতে আমাদের সাধু-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে উঠে না।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"কাশীর লোকও আজকাল আর সাধু মানে না; তবে এ সাধু একটু অন্যরকমের; পয়সা-কড়ির ধার দিয়েও যায় না, ভণ্ডামী মোটেই নেই, কিন্তু শক্তি সত্যিই আছে;

যে যা জিজ্ঞেসা করেছে—তাই ব'লে দিয়েছে, আর হুবহু মিলে গেছে।"

শিখা একটু আগ্রহের সহিত বলিল, "তা হ'লে আমাকে সেই সাধুর কাছে নিয়ে যাবে ঠাকুরপো ?"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"স্বচ্ছন্দে ; যে দিন যাবার ইচ্ছা হবে বলো, নিয়ে যাব। কিন্তু শিবরাত্রির পরই তিনি চ'লে যাবেন।"

শিখা বলিল,—"বেশ ত, তা হ'লে শিবরাত্রির দিনই নিয়ে চল না কেন !"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"সে ত ভাল কথাই, শিবরাত্রির দিন মন্দিরেই ভীড় হবে ভীষণ। সাধুর ওখানে সে দিন বড় একটা কেউ যাবে না। কথাবার্ত্তা বলবার সেই দিনই সুবিধার। তা হ'লে মা ও বাবা যাবেন ত ?"

শিখা কি ভাবিল, পরক্ষণে বলিল,—"না, না, তাঁদের এ কথা জানিয়ে কায নেই ; আমি একাই যাব। অনেক দিন থেকেই আমার সাধ, ভাল সাধু পেলে, তুচারটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রে মনের সংশয় মেটাব। কিন্তু সে সুযোগ এ পর্য্যন্ত ঘ'টে ওঠে নি, দেখি এবার যদি তোমার প্রসাদে তা হয়ে যায়।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"দাদার কথা শুনে অবধি আমার মনে শান্তি নেই ;—আমি যাঁকে কল্পনা ক'রে রেখেছি,—এখনও পর্য্যন্ত কাশীতে তাঁর আগমন হয় নি। এই সাধুর কথা শুনে অবধি আমার মনে একটা আগ্রহ হয়েছে,—তিনি যা বলেন, মিথ্যা হয় না ; এখন আমাদের অদৃষ্টক্রমে—"

এই সময় রাজীবলোচন সস্ত্রীক দেবদর্শনাদি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গোবর্দ্ধন আলোচ্য কথার মোড় ঘুরাইয়া লইয়া, শিবরাত্রির দিন কি ভাবে সুশৃঙ্খলে তাঁহাদের বিশ্বনাথদর্শন করাইবে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

৯

শিবরাত্রির গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যে বারাণসী আজ ঝলমল করিতেছে ; হর হর ব্যোম ব্যোম রবে কাশী আজ মুখরিত।—কিন্তু এমন পুণ্যদিনেও স্বার্থপর ভণ্ড নরপশুরা তাহাদের পাপাচরণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে ; বিশ্বনাথের মন্দির-সন্নিহিত সকল গলী-পথেই সমভাবে বিপুল জনস্রোত চলিয়াছে।

শিখা এই জনতা দেখিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিল,—"চল ঠাকুরপো, ফিরে যাই ; বিষম ভীড় আজ।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"এসে ত পড়েছি, এখন ফিরতেও যতখানি, এগুতেও ততখানি।"

লোকের ভীড় হইতে কতকটা পরিত্রাণ পাইবার জন্য গোবর্দ্ধন শিখাকে লইয়া মানমন্দিরের রাস্তায় ঢুকিয়া চার পাঁচটা গলী অতিক্রম পূর্ব্বক একখানি চিত্র-বিচিত্র করা বাড়ীর দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শিখা একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কোথায় আনলে, ঠাকুরপো ?"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল,—"ঠিক যায়গাতেই এনেছি, এই বাড়ীতেই সেই সাধু আস্তানা নিয়েছেন। চল একবার উপরে উঠে সাধু দর্শন করা যাক।"

রাস্তার উপরেই বাড়ীর দেউড়ীযুক্ত চৌতারা। তাহারই উপর দিয়া সোপানশ্রেণী দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়াছে ; বারান্দা সুদৃশ্য রেলিং দিয়া ঘেরা ; বারান্দার উপর দিয়াই ভিতরের কামরায় যাইবার পথ।

এই বাড়ীর দেউড়ী ও বারান্দার উপর বিজলীর আলোক জ্বলিতেছিল। নিকটস্থ কোনও দেব-মন্দিরের ডায়নামোর সহিত সংযোগে সৌখীন গৃহস্বামী এই বাড়ীতেও বিজলীর আলো আনাইয়াছিলেন। তখন কাশীর রাস্তায় বিজলী বাতির সৃষ্টি হয় নাই।

শিখা গোবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বারান্দায় উঠিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল। সেখান হইতে চারিদিকে ও গাড়ী-বারান্দার সম্মুখবর্ত্তী অপ্রশস্ত গলী-পথে চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বত্রই লোক চলাচল করিতেছে, যাত্রিকণ্ঠের কোলাহলে সে স্থান পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বারান্দার পরেই একটা অনতি-পরিসর দরদালান, তাহার পার্শ্বেই সুবিস্তৃত সুসজ্জিত হল-ঘর, ঘরের মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর গোবর্দ্ধনের কথিত সাধু সমাসীন। সাধুর পরিধানে গৈরিক বর্ণের রেশমী ধুতি, তদনুরূপ ঢিলা পাঞ্জাবী, মাথায় ঐ বর্ণেরই পাগড়ী ; সাধুর স্বর্ণতুল্য অত্যুজ্জ্বল বর্ণের উপর গৈরিক বর্ণের সুসঙ্গত পরিচ্ছদ। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক-সম্পাতে তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ঝলসিয়া উঠিতেছিল।

গোবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে সাধুকে প্রণাম করিল, শিখাও যুক্ত-করে মস্তক নত করিয়া সাধুকে অভিবাদন করিল। কিন্তু পরক্ষণে সাধুর মুখের দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল,—অতিকায় অজগর তাহার খরতর দৃষ্টির ধাঁধায় ফেলিয়া অসহায় ক্ষুদ্র পশুদিগকে যে ভাবে মুখের দিকে টানিয়া লয়, অজগররূপী এই সাধুটার দুইটা উজ্জ্বল চক্ষুর লালসা-ব্যঞ্জক ভয়াবহ দৃষ্টিও ঠিক সেই ভাবে শিখাকে যেন তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। বিস্ময়াতঙ্কে অভিভূত হইয়া শিখা গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিল।

গোবর্দ্ধনের চক্ষুও তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। শিখার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র সে একটু থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, —"বাবা, আমরা এসেছি আপনার কাছে, এঁর হাতটা একবার দেখতে হবে।"

সাধু আবার শিখার দিকে চাহিল, আবার সেই দৃষ্টি। শিখার অপরূপ রূপ দেখিয়া সাধুর বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

শিখা বলিল,—"ঠাকুরপো, আজ ফিরে চল, আর এক দিন আসা যাবে, আমার শরীরটা কেমন করছে।"

এবার সাধুর কথা ফুটিল ; পরিষ্কার বাঙ্গালায় সাধু বলিল, "কামনা নিয়ে সাধুর কাছে এসে না জানিয়ে ফিরে যেতে নেই। তাতে অপরাধী হ'তে হয়। সাধুর কাছে লজ্জা কিসের ? উঠে এসে ব'স—"

গোবর্দ্ধনও সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "উঠে ব'স বউদি, রাত হয়ে যাচ্ছে, দেরী ক'রে কি ফল, হাত দেখাও না—"

অভিভূতের মত শিখা ফরাসের উপর বসিয়া পড়িল। এই সাধুটিকে তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। অথচ তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরিয়া যাইবারও শক্তি তাহার ছিল না—তুমুল সন্দেহের মধ্যেও নারীসুলভ অদৃষ্ট-পরীক্ষার কৌতূহলটুকুও তখনও তাহার মনের দ্বারে ধীরে ধীরে উঁকি দিতেছিল।

সাধু একটু ঝুঁকিয়া শিখার বাম হাতখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিল, তাতে টান পড়ায় শিখা সাধুর দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিল, কিন্তু তাহার বুক তখনও কাঁপিতেছিল।

সাধু শিখার সেই অনিন্দ্যসুন্দর কুসুমকোমল করতল দুই করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা পরীক্ষার ভঙ্গীতে টিপিতে লাগিল; ঠিক এই সময় গোবর্দ্ধন পা টিপিয়া অতি ধীরে ধীরে সেই বৃহৎ হলঘরের দরজা দিয়া পাশের কক্ষে প্রবেশ করিল।

সহসা হলঘরের উজ্জ্বল আলো নিবিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সাধুর দুইখানি সবল বাহুর নিবিড় বেষ্টনে শিখার কমনীয় দেহখানি আবদ্ধ হইল।

যে মুহূর্ত্তে এই কদর্য্য ব্যাপার ঘটিল, তাহার পরমুহূর্ত্তেই সাধুবেশী শঙ্করলালের মর্ম্মভেদী তীব্র আর্ত্তনাদে সেই অন্ধকারময় হলঘর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; পরক্ষণেই সর্ব্বত্র বিজলীর আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং পার্শ্বের ঘর হইতে গোবর্দ্ধন ও শঙ্করলালের কয়েক জন অন্তরঙ্গ চেলা শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সে কি হৃদয়ভেদী ভয়াবহ দৃশ্য!—প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ার উপর মহাবীরপ্রসাদের বিশালদেহ এলাইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীলোকের চুলের কাঁটার আকারে তৈয়ারী সোনার তারে জড়ানো সজারু-নামক জানোয়ারের এক জোড়া সুতীক্ষ্ণ বিঘত-প্রমাণ লম্বা কাঁটার অর্দ্ধাংশেরও অধিক তাহার দক্ষিণ চক্ষুটির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে! ফিন্‌কি দিয়া তখনও রক্ত ছুটিতেছে, রক্তধারায় শুভ্র ফরাস, তাকিয়া ও শঙ্করলালের গৈরিক বসন হোলীর উৎসবকালের মত সুরঞ্জিত!—আর পতনোন্মুখিনী শিখা তখন অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ফরাস হইতে নামিয়া সেই হলঘরের কার্পেট-পাতা মেঝের উপর দাঁড়াইয়াছে—তাহার দেহলতাখানি তখন বিদ্যুল্লতার মত জ্বলিতেছে।

গোবর্দ্ধন অতি ব্যস্তভাবে ফরাসের উপর উঠিয়া পড়িয়া মহাবীরের চক্ষুকোটর হইতে সতীহস্তের সেই ভীষণ অস্ত্রখানি সবলে টানিয়া বাহির করিয়া দূরে কার্পেটের উপর ছুড়িয়া ফেলিল; দারুণ যাতনায় পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিয়া মহাবীরপ্রসাদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার তাৎকালীন শোচনীয় অবস্থা, রক্তাপ্লুত মুখমণ্ডল,—শিখার এত বড় বিপদ ও লাঞ্ছনার মধ্যেও তাহার নারীহৃদয় সেই লম্পট, লাঞ্ছনাকারীর যন্ত্রণায় আর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। পরক্ষণে পরিণামচিন্তা এই তরুণীকে ভবিষ্যৎ আতঙ্কে অস্থির করিয়া তাহার অনিচ্ছায় তাহাকে সেই ভয়াবহ ঘরের বাহিরে লইয়া গেল—মুক্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া নৈশ বায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শে সে যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

শঙ্করলালের চেলাদের বীরত্ব এইবার বিস্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইল। প্রভুর মুখের গ্রাস প্রভুকেই ঘাল করিয়া সরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাহারা হুঙ্কার করিয়া শিখাকে আটকাইতে ছুটিল। শিখা তখন নিজের বিপদ্ বুঝিয়া লইল। সে এবার অসমসাহসে সেই বারান্দার রেলিঙে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার আততায়ীদের দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া দৃপ্তস্বরে বলিল, "এখানে এলেই আমি চীৎকার ক'রে লোক ডাকব, পুলিস দিয়ে তোমাদের সকলকে ধরিয়ে দেব!"

চেলারা স্তম্ভিতভাবে ফরাসে শায়িত আহত প্রভু ও তাহার শুশ্রূষায় তৎপর গোবর্দ্ধন ও অপর দুই জন সঙ্গীর দিকে নিরুপায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। প্রভুর তখন কথা কহিবার অবস্থা নহে। গোবর্দ্ধন বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শিকার এমন স্থানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, যেখান হইতে পাকড়াও করিতে গেলেই একটা গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত সে ও তাহার প্রভু অনেক শিকারের সংস্পর্শে আসিলেও এমন মারাত্মক শিকার কখনও দেখে নাই এবং এ হেন জবরদস্ত শিকারীও কখনও শিকারের হস্তে এ ভাবে জখম ও ঘাল হইয়া পড়ে নাই! এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহারই এখন প্রথম ও প্রধান চিন্তা হইল, ইহার কি পরিণাম? শিখাকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখা অথবা তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া একটা রফা করা—কি কর্ত্তব্য, তাহাই সে স্থির করিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্তের চিন্তায় কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া গোবর্দ্ধন এবার নিজেই উঠিল; কিন্তু ঠিক সেই সময় বারান্দার উপর শমনতুল্য এক ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু স্বভাবতই মুদিয়া আসিল, কাঁপিতে কাঁপিতে সে ফরাসের উপর বসিয়া পড়িল।

১০

ঠিক যে সময় শিখা বারান্দা হইতে দৃপ্তস্বরে বলিতেছিল—পুলিস দিয়ে তোমাদের ধরিয়ে দেব,—সেই সময় বেনারস ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের বড় কর্ত্তা রায় বাহাদুর এই পথ দিয়া সদলবলে বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে যাইতেছিলেন। শিখার কথাগুলি বিউগলের মত তাঁহার কাণে বাজিয়া উঠিল। তিনি বারান্দার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্করলালের এই বিলাস-ভবনটির সহিত তিনি অপরিচিত ছিলেন না, কাশীর খুঁটি-নাটি প্রত্যেক সংবাদ তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছাইত। এই বিলাসী যুবকের রমণীপ্রীতি সম্বন্ধে অনেক কদর্য্য কুৎসিত কথা তাঁহার শ্রুতিস্পর্শ করিলেও তিনি প্রমাণসঙ্গত কোনও তথ্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তত্রাচ শঙ্করলালের উপর তাঁহার সংশয় ও লক্ষ্য কতকটা ছিল; আজ সেই মহাবীরপ্রসাদের বিলাসবাটীর অলিন্দ হইতে বাঙ্গালী যুবতীর এই বাণী তাঁহাকে চমৎকৃত করিল।

রায় বাহাদুরের সঙ্গে কয়েক জন পুলিসপ্রহরী এবং জনৈক প্রিয়দর্শন যুবক ছিল। এই যুবকটি অবসরকালে স্বেচ্ছায় রায় বাহাদুরের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। রায় বাহাদুর তাহাকে ছোট ভাইএর মত ভালবাসেন। যুবকটি কাশীর উদীয়মান কোন বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী।

রায় বাহাদুর এই স্নেহাস্পদ সহচরকে পার্শ্বে ডাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝছ?"

যুবক বলিল, "আর বোঝাবুঝি কি, উঠে পড়ুন, অঘটন কিছু ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "এ কার বাড়ী জান? পাণ্ডাকুলের প্রিন্স অব ওয়েলস্—শঙ্করলালের।"

যুবক উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, "এই রত্নটিকেই না আপনি অনেক দিন থেকে জালে গাঁথবার চেষ্টায় আছেন? দেখুন, বিশ্বনাথ হয় ত আজ আপনার কামনা পূর্ণ করতেই এ পথে আপনাকে এনেছেন! দেখুন, দেখুন—মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে কাঁপছে, প'ড়ে না যায়—"

আনমনা

বসুমতী চিত্র বিভাগ। [শিল্পী—মিঃ ঠাকুর সিং
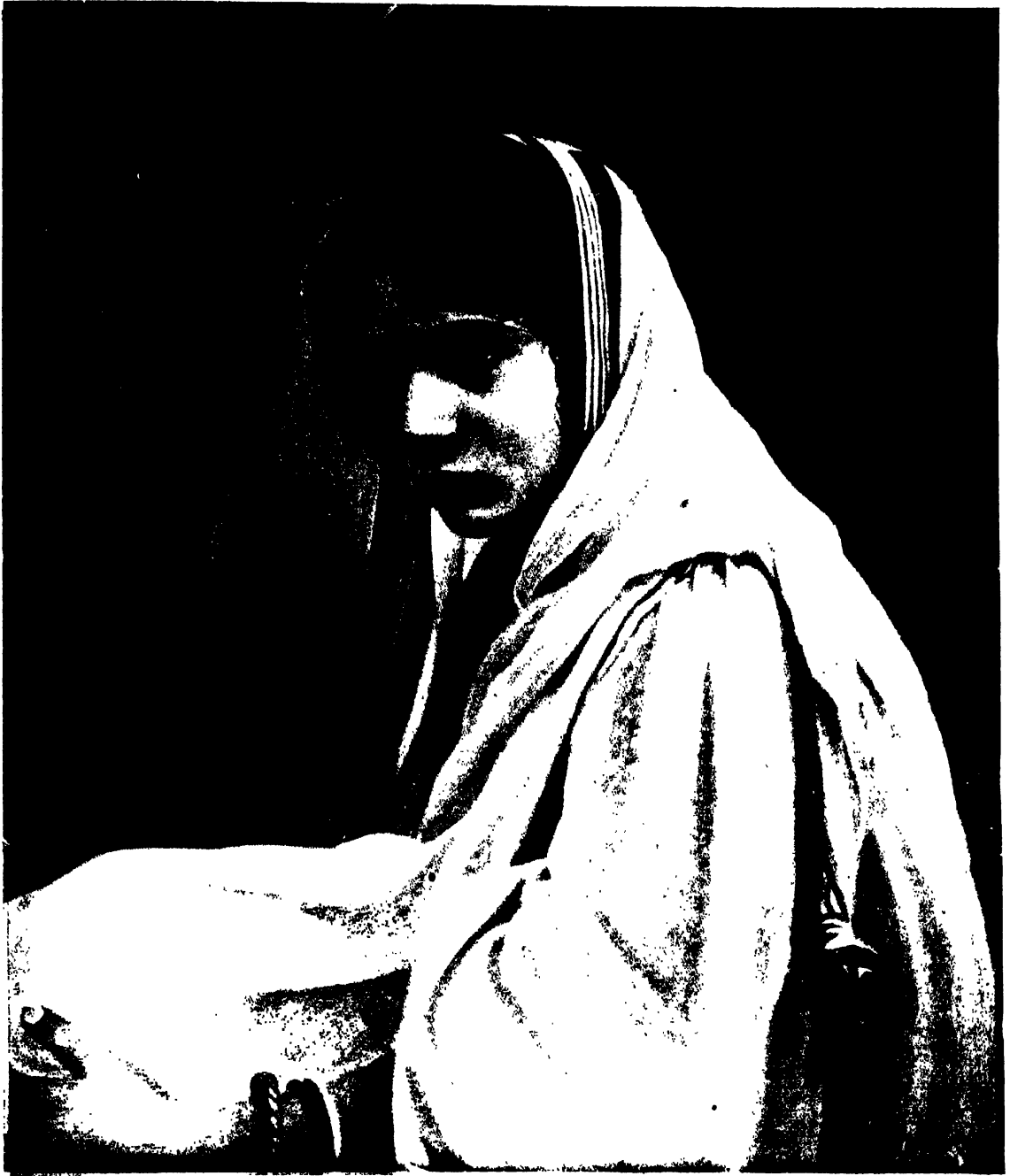
রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রহরীদিগকে চৌতালার নিকট মোতায়েন করিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলেন। যুবকও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

বারান্দায় পদার্পণ করিবামাত্র শিখার অগ্নিশিখাবৎ জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি তাঁহার উপর পড়িল। রায় বাহাদুর দেখিলেন—সেই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুৎ ঝলসিত হইতেছে। তাহার সুন্দর প্রদীপ্ত মুখখানি সিন্দূরের মত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় কি যেন বলিবার জন্য কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না। ঘরের ভিতরের দিকে চাহিবামাত্র রায় বাহাদুর দেখিতে পাইলেন, দরদালানের উপর দুই তিন জন জোয়ান তাহার দিকে ঝুঁকিয়াছে। রায় বাহাদুরকে দেখিয়াই তাহারা পিষ্টের মত হলঘরে ফিরিয়া গেল।

রায় বাহাদুর অগ্রসর হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "কি হয়েছে মা? কেন অমন ক'রে চীৎকার করছিলে? সব বল ত মা, নির্ভয়ে বল; আমরা পুলিসের লোক।"

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শিখা প্রবীণ রায় বাহাদুরের সেই সৌম্য গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তাঁহার মুখের উপর চক্ষু দুইটি তুলিয়া সে বলিল, "আপনি পুলিসের লোক? আমাকে রক্ষা করুন।"

অবিচলিত দৃঢ়স্বরে রায় বাহাদুর বলিলেন, "নিশ্চয়; তুমি যদি কাশীর মেয়ে হও মা, আমার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে—আমাকে কাশীর সকলে রায় বাহাদুর ব'লে জানে।"

শিখা মুখ নত করিয়া বলিল, "আমি কলকেতার মেয়ে, তা হলেও যে বাসায় আমি থাকি, সেখানে আপনার নাম শুনেছি। আপনি চোর-ডাকাতের যম। আমিও আজ ডাকাতের হাতে পড়েছি, আমাকে রক্ষা করুন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কি হয়েছে মা, অকপটে আমাকে সব বলতে হবে। ভিতরে চল মা, কোন ভয় নেই; ঐ দেখো, নীচে আমার পাহারাওয়ালারা দাঁড়িয়ে আছে।"

হলঘরের সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া রায় বাহাদুর চমকিয়া উঠিলেন। ফরাসের এক পার্শ্বে গোবর্দ্ধন বসিয়া ছিল। রায় বাহাদুরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সে সভয়ে মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু রায় বাহাদুর তৎপূর্ব্বেই সশ্লেষে বলিয়া উঠিলেন, "আরে কে-ও!—হ্যালো মাইডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড! তুমিও এখানে এসে জুটেছ? বাহোবা!"

কার্পেটমণ্ডিত কক্ষতলে কয়েকখানি খুরসী পাতা ছিল। রায় বাহাদুর সস্নেহে শিখার হাত ধরিয়া একখানি খুরসীর উপর তাহাকে বসাইয়া দিয়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে বসিলেন। যুবকও তাঁহার পশ্চাতে আর একখানি খুরসী অধিকার করিয়া বসিল।

শঙ্করলাল তখন সংজ্ঞা পাইলেও রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আতঙ্কে আবার অচৈতন্যের ভাণ করিল। রায় বাহাদুরের উপস্থিতি তাহার আর্ত্তনেত্রের অসীম যন্ত্রণা অপেক্ষাও মর্ম্মন্তুদ হইতেছিল; হতভাগ্যের অপর নয়নও সহচরের ভীষণ অবস্থা দেখিয়া আপনিই মুদ্রিত হইয়াছিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বল মা, কি ক'রে এখানে এলে, কে এ কাণ্ড করেছে, সমস্ত আমি শুনতে চাই।"

শিখার পদতলে তাহার আত্মরক্ষার সেই অস্ত্র পড়িয়া ছিল। ধীরে ধীরে সেটিকে তুলিয়া লইয়া উজ্জ্বল চক্ষুযুগল রায় বাহাদুরের মুখের উপর তুলিয়া সে দৃঢ় অথচ গাঢ় স্বরে বলিল, "দেখুন, এটা আমারই চুলের কাঁটা, এই এ কাণ্ড করেছে; আর এরই জন্যে ঐ পাষণ্ডের হাত থেকে আমি আমার সম্মান রক্ষা করতে পেরেছি। এখন আমার ইতিহাস শুনুন।"

তখন শিখা কাশীর ষ্টেসন হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য এই ভণ্ড সাধুকে আক্রমণ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী রায় বাহাদুরের নিকট যথাযথ প্রকাশ করিল।

শুনিতে শুনিতে রায় বাহাদুরের মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বার বার তিনি শয্যাশায়ী পাষণ্ড ও তাহার বাহন গোবর্দ্ধনের উপর দৃষ্টি-সঞ্চার করিতেছিলেন। গোবর্দ্ধন রায় বাহাদুরকে ভালরূপেই চিনিত। সে তাঁহার ক্রোধরক্ত দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

সকল কাহিনী বলিয়া মুখখানি নত করিয়া শিখা বলিল,—"আত্মরক্ষার জন্যই আমি এ নিষ্ঠুর আঘাত করেছি, এ ভিন্ন আমার আর রক্ষার উপায় ছিল না; হয় ত এ জন্য আমার শাস্তি হবে, কিন্তু আমি নির্দ্দোষ।"

রায় বাহাদুর দৃপ্ত স্বরে বলিলেন,—"তোমার কখনও শাস্তি হ'তে পারে না, মা। বরং এ সাহসের জন্য তোমার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়াই উচিত। ভাল কথা, এইবার আমি তোমার পরিচয় জানতে চাই, মা; তোমার বাপের কি নাম, মা?"

শিখা মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন মণ্ডল, আমাদের—"

রায় বাহাদুরের প্রিয় সহচর এতক্ষণ অখণ্ডভাবে এই তেজস্বিনী তরুণীর সাহসপ্রতিভাপূর্ণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে অসীম কৌতূহলের সহিত তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অপরিচিতা তরুণীর এই বিপন্ন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ তাহার উপর দৃষ্টিপাত নিন্দনীয় জানিয়াও, যেন কোন অতীত স্মৃতির আকর্ষণে—এই মুগ্ধ যুবকের সন্দিগ্ধ চক্ষু এই তরুণীর অরুণবর্ণ মুখের উপর আবদ্ধ হইয়াছিল। এইবার সে যেন সহসা সর্পাহতবৎ চমকিয়া ক্ষিপ্রভাবে লাফাইয়া উঠিয়া শিখার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়-বিস্ফারিত দুই চক্ষু তাহার শান্ত মুখখানির উপর তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল—"তুমি—শিখা?"

এ যে সেই চিরস্মৃতিমাখা চিরপরিচিত সুমধুর স্বর! শিখা স্তব্ধ হইল, সমস্ত ভুলিয়া গেল, মুগ্ধের মত সে প্রশ্নকর্ত্তার প্রদীপ্ত মুখখানির উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তাহার কাম্য, তাহার ইষ্ট, তাহার ধ্যান, তাহার দেহ ও মনের দেবতা, এই দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে তাহারই সম্মুখে!

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া শিখা অরিন্দমের পদতলে মস্তক নত করিল।

রায় বাহাদুর অরিন্দমের কাহিনী সমস্তই শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইল না।

* * * *

পরদিন অরিন্দমের অসির বাটীতে শিবরাত্রির পারণের মহোৎসবে রাজীবলোচন সপরিবার আমন্ত্রিত হইয়া রায় বাহাদুরের মধ্যস্থতায় সমস্তই শুনিলেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"মণ্ডল মশাই, আপনার জামাতা দেশের ডাকে বাঙ্গালা দেশের বাইরে এসে প'ড়ে সরকারের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। বাবাজীর উপর আমাদের খুব কড়া নজরই ছিল, যদিও পরে জানা গিয়েছিল—তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, কোন গলদ তাঁতে নেই! শেষে ঘটনাচক্রে এক দিন উনি গুপ্তঘাতকের হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দেন, সেই থেকে আমি ওঁকে ছোট ভাইএর মত দেখে আসছি, আর আমারই একটু চেষ্টার ফলে—আপনার জামাতা আজ কাশীর এক জন বড় মার্চেণ্ট।"

অরিন্দম ভক্তিভরে শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া বলিল,—"শিবরাত্রির পরই আমি চরণদর্শন করতে কলকাতায় যেতেম, আমার ভাগ্যফলে এখানেই দেখা হয়ে গেল।"

রায় বাহাদুর রাজীবলোচনকে বলিলেন,—"মণ্ডল মহাশয়, সে কালের সরল যুগ চ'লে গেছে; উপকারের বিনিময়ে অপকার পাওয়াই হচ্ছে এ যুগের ধারা; সরল বিশ্বাসটা এ ভাবে যার তার ওপর ন্যস্ত করবেন না! গোবর্দ্ধনের কাণ্ড দেখে আপনিও এবার সতর্ক হোন।"

রাজীবলোচন বলিলেন,—"কাশী এমন তীর্থস্থান, বিশ্বনাথের ধাম, এখানেও এমন কুৎসিত কাণ্ড হয়—এমন নরকের কীট ভদ্রবেশে এখানে শিকার খুঁজে বেড়ায়—তা ত স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, রায় বাহাদুর!"

* * * *

রায় বাহাদুরের কৃপায় ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াইবার অবকাশ পায় নাই। তবে শুনা যায়, রায় বাহাদুর গোবর্দ্ধনকে অরিন্দমের বাড়ীর সম্মুখস্থ হাতায় তাঁহার আরদালীর দ্বারা পাকড়াও করিয়া আনিয়া—স্বহস্তে পঁচিশ কশা লাগাইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

* * * *

শিখা এক দিন তাহার মাকে বলিল,—"চল মা, এবার এক দিন আমরা ঘটা ক'রে বিশ্বনাথের পূজো দিয়ে আসি।"

মা বলিলেন,—"দেব বৈ কি মা, বাবার কৃপায়—বাবার ধামে এসে আমরা যে আমাদের হারানিধি ফিরে পেয়েছি।"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতচন্দ্র

তুমি বঙ্গ কবিকুঞ্জ-রঞ্জন হে।
কত মধুর তোমার গুঞ্জন হে॥
রচিলে মালঞ্চ ফুটাইলে ফুল।
সুষমা সৌরভ ভুবনে অতুল॥
মন্দ মন্দ গন্ধ বহে তব ছন্দে।
শীতল শিশির ঝরে চিরানন্দে॥
শব্দের ঝঙ্কারে মোহে মন মুগ্ধ।
কল্পনা আল্পনা দিতে নহে ক্ষুব্ধ॥
রসের তরঙ্গে মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বঙ্গ-কাহিনী হর-মোহিনী রঙ্গ॥
অন্নগত-প্রাণ অন্নের কাঙালী।
অন্নদে বলিয়া ডাকে মা বাঙালী॥
অন্নদামঙ্গলে বাঙ্গালার গান।
প্রতাপ-আদিত্যে বীরত্ব সম্মান॥
যশোহর সাজে বাজে ভের-ডঙ্কা।
রণে আগুয়ান প্রাণে নাহি শঙ্কা॥
নাদিল বাঙালী বাধিল লড়াই।
কোমর কষিয়া রুষিয়া চড়াই॥
সে-ও-সে বাঙালী হিংসা-বিষে দহে।
গৃহ-ছিদ্র কথা অরি-পুরে কহে॥
বঙ্গের বিদুষী বিদ্যালাভ সঙ্গে।
ভাসে বিদ্যাবতী প্রেমের তরঙ্গে॥
আপনি সাজিলে রঙিলা মালিনী।
হীরে ঝলা হীরে সুরসশালিনী॥
বিদ্যারে জিনিতে পেতে বিদ্যাবল।
কবি জনে চাই সিঁধ-কাটা কল॥
তব বারমাসে বিকশিত বঙ্গ।
কুল-লাজে সাজে রজনী উলঙ্গ॥
বঙ্গ-রুচিকর রেঁধেছ ব্যঞ্জন।
গড়েছ গহনা বাঙালী-রঞ্জন॥
বঙ্গের ভারত তুমি বঙ্গ-চন্দ্র।
রঙ্গ-রসে ভরা বাঁশরীর রন্ধ্র॥
বাঙালীর কবি বাঙালীটি খাঁটি।
রায় গুণাকর মাজুগাঁয় বাটী॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

আফগানিস্থান

জালালাবাদের যুদ্ধ

ছেলেবেলা হইতেই স্বাধীন দেশ দেখিবার একটি প্রবল ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনের ভিতর উঁকি মারিত। মানবের আন্তরিক ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকে না। তাই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সহকারী Engineerএর নিয়োগপত্র পাইয়া অর্থের জন্য ও স্বাধীন দেশ দেখিবার ইচ্ছায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আফগানিস্থানে যাত্রা করিলাম।

তখন ছাড়পত্রের ততটা কড়াকড়ি না থাকায় পেশোয়ারের বৃটিশ পলিটিক্যাল অফিসারের নিকট হইতে মাত্র অনুমতিপত্র লইয়া খাইবার গিরিসঙ্কট অতিক্রম করি। সেখানে একাদিক্রমে প্রায় তিন বৎসর থাকিবার পর ছুটী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসি। এখানে কিছু দিন বেকার বসিয়া থাকিবার পর গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুনরায় আফগানিস্থান যাত্রা করি।

খাইবার রেলপথ

হাওড়া হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পঞ্জাব মেলে যাত্রা করি। পরদিন প্রায় অর্দ্ধ-রাত্রিতে দিল্লীতে উপস্থিত হই। সেখানে তিন দিন ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। আফগান-দূত আমাদের মধ্যে আর দুই জনের ছাড়পত্র দস্তখত করিয়া দেন, আর আমাকে বলেন, "আপনি পেশোয়ার হইতে স্থানীয় বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের ছাড়পত্র লইলে তবে সেখানে আফগান বৈদেশিক দূত আপনাকে আফগান ছাড়পত্র দিবেন।" সেই দিন রাত্রিকালে দিল্লী হইতে রওয়ানা হইয়া পরদিন রাত্রি ৯টার সময় পেশোয়ারের বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ হইতে ছাড়পত্র লইয়া আফগান বৈদেশিক দূতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ছাড়পত্র দস্তখত করিয়া দেন। তাহার পরদিন সকালে মোটরে আফগানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করি।

পেশোয়ার হইতে ৯ মাইল দূরে জমরুদ নামক স্থানের বৃটিশ দুর্গে ছাড়পত্র দেখাইতে হয়। দুর্গের প্রহরী ছাড়পত্র দেখিয়া দুর্গের দ্বার খুলিয়া দেয়। জমরুদ হইতে দুই মাইল দূরে গিয়াই প্রকৃত খাইবার গিরিসঙ্কট আরম্ভ হইল। দুই দিকে উচ্চনীচ খাড়া পাহাড়, মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া তিনটি পথ গিয়াছে। একটি মোটর বাস প্রভৃতি গাড়ী যাইবার পথ, একটি খাইবার রেলের পথ ও তৃতীয়টি মানুষ এবং পশুর গতায়াতের পথ। খাইবারের অপর পারে লাণ্ডিকোটাল দুর্গ। সেখানেও একটি দুর্গদ্বার দিয়া যাইতে হয়। তবে সেখানে ছাড়পত্র দেখাইতে হয় না। কিন্তু মোটরের একটি সাঙ্কেতিক নাম (যাহা জমরুদ হইতে বলিয়া দেয় মাত্র সেইটাই) বলিতে হয়। এতদ্ব্যতীত খাইবার গিরিসঙ্কটের ভিতরে আরও কয়েকটি দ্বার আছে। সেই সমস্ত স্থানে মোটর ধীরে চালাইতে হয়। দ্রুতবেগে চালাইলে ইংরাজের খাইবার রাইফলস সামরিক পুলিস তখনই গুলী করে। লাণ্ডিকোটালের

পর লাণ্ডিখানা। সেখানেও ছাড়পত্র দেখাইতে হয়। ইহার কিছু দূর পরেই তার্খাম। সেখানে উত্তমরূপে ছাড়পত্র পরীক্ষা করিবার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছাড়িয়া দেয়। ইহাই বৃটিশ এলাকার শেষ সীমানা। ইহার পরেও খাইবার গিরিসঙ্কট আছে, কিন্তু সেই অংশটুকু আফগান সরকারের এলাকাভুক্ত। তার্খাম দ্বারের পার্শ্বেই আফগানদের মাত্র একটি ডাকঘর আছে। তার্খাম হইতে ৫।৬ মাইল দূরে ডাক্কা বলিয়া একটি স্থান আছে। সেখানে আফগান রাজকর্ম্মচারীকে ছাড়পত্র দেখাইতে হয়। সেখানে আফগানদের একটি দুর্গ আছে। ডাক্কাতে বাক্স, বিছানা প্রভৃতি খুলিয়া দেখে। নূতন জিনিষ থাকিলে শুল্ক দিতে হয়। সে শুল্ক আমীর সাহেবের নিকট হইতেও আদায় করা হয়। ডাক্কা হইতে ৪০ মাইল দূরে জালালাবাদ সহর অবস্থিত। সেখানেই থাকিবার জন্য আমাদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

আমরা জালালাবাদে পৌছিয়া রয়াল হোটেলে উঠি; কারণ, জালালাবাদের শাসনকর্ত্তা পূর্ব্বাহ্লে টেলিফোঁযোগে ডাক্কায় আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, আমাদের থাকিবার জন্য ঐ স্থানেই সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। হোটেলে ২৪ ঘণ্টা থাকিবার পর আফগান সমর-সচিবের আশ্রয়ে আমাদের থাকিবার জন্য বন্দোবস্ত হয়।

ঐ স্থানে প্রায় দুই মাস থাকিবার পর গাজী আমীর আমান-উল্লা খাঁন কান্দাহারের পথ দিয়া ভারত হইয়া য়ুরোপ ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। সে দিন উজীর ও অন্যান্য বড় বড় রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হন। আমাদের চিফ এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন লাহিড়ীও সেই অভ্যর্থনাকালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমীর সাহেব ফার্সিতে বলেন যে, "আমি আপনাকে দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলাম, কেন না, আপনি ইস্লামের 'খেজমত' করিবার জন্য পুনরায় আসিয়াছেন।"

আমীর সাহেব আসিয়া বিশ্রামের জন্য ১৫ দিন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর 'অকবার আমান্' নামীয় সংবাদপত্রে প্রচার করেন যে, "হে আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ! তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। এক বৎসর পর শত্রুর সহিত যুদ্ধ হইবে।" আফগানিস্থানে ছোট, বড় প্রজা, এমন কি, স্ত্রীলোক পর্য্যন্তও বন্দুক ছুড়িতে পারে। এ জন্য আমীর সাহেব আফগান নারীগণকেও উল্লেখ করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পর আফগান রাজ্যের "স্বাধীনতার দিন" উপস্থিত হয়। প্রত্যেক বৎসর ঐ দিনে কাবুলের সন্নিকটে পাগমান নামক স্থানে (বাগে মুমি) মুমি নামীয় বাগানে একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। এবার ঐ দিনে আমীর সাহেব প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রত্যেক জেলা ও গ্রামবাসীর মনোনীত

জালালাবাদ—রয়্যাল হোটেল

এক এক জন ব্যক্তিকে ঐ সভায় আহ্বান করেন। মোল্লা, সৈয়দ প্রভৃতিও ঐ আহ্বানে বাদ যায় নাই। এ সভার নাম "লোহে জীরগা।" এ সভায় প্রত্যেক বৈদেশিক দূতাবাসের কর্তৃপক্ষকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং অন্য বৈদেশিকও ইচ্ছা করিলে ঐ সভায় যাইতে পারেন।

প্রথমে আমীর আমান-উল্লা খাঁন গাজী বৈদেশিক দূতগণের সহিত আলাপ করিবার পর বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া

খাইবার গিরিবর্ত্ম

"আমাদের দেশ বড় দরিদ্র। কেন আমরা অনর্থক ১০গজ কাপড়ের পাগড়ী বানাইয়া এক জনে ১০গজ কাপড় আটকাইয়া রাখি? যদি আমরা উহা দিয়া টুপী তৈয়ার করি, তাহা হইলে ঐ ১০গজ কাপড়ে অন্ততঃ দশটি টুপী হইতে পারে, এবং তাহা পাগড়ী হইতে অনেক দিন টিকিবে, পয়সাও কম খরচ হইবে ও এক ব্যয়ে ১০ জনের কাষ চলিবে!

"সাধারণতঃ আমরা যে ইজার তৈয়ারী করি, তাহাতে খুব কম হইলেও ৬ গজ কাপড় লাগে, অথচ একটি প্যাণ্ট ২ গজেই হয়। ইজার পরিষ্কার করিতেও খরচ বেশী লাগে। প্যাণ্টে তাহা হয় না। অতএব আমাদের উচিত, ইজারের পরিবর্ত্তে প্যাণ্ট পরা।

"কাহারও সহিত দেখা হইলে আমরা কোলাকুলি, হাতে ও মুখে চুম্বন, সেলাম-আলেকম, আলেকম সেলাম, জোর আস্তি, বখায়ার

প্রথমে দেশবাসীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন। পরে বলেন,—"আমি সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছি, সমস্ত দেশই উন্নত, কেবল আমাদের জন্মভূমি পশ্চাতে পড়িয়া আছে! আমার ইচ্ছা যে, আমার দেশকেও উন্নত করিব।

"শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সেই জন্যই আমি গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে ছাত্রগণকে আহার ও পরিচ্ছদ বিনামূল্যে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়া, অবৈতনিক স্কুল-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। যাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ শিক্ষা-লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। শিক্ষার জন্য আমার ও মন্ত্রীদের পুত্রগণকে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পাঠাইয়াছি। তোমাদের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য স্কুলে ছেলে পাঠাইতে ভয় পাওয়া উচিত নহে। আজ যদি আমার দেশে অনেক শিক্ষিত লোক থাকিত, তাহা হইলে জার্ম্মাণ, রাসিয়ান, ভারতীয় প্রভৃতি বৈদেশিকরা আসিয়া দেশের পয়সা লইয়া যাইতে পারিত না।

আমীর আমান-উল্লা ও রাজ্ঞী সৌরীয়া

আস্তি, খুব জোর আস্তি, খুব বথায়ার আস্তি, মান্দন-বাসী, জেম্দাবাসী ছেলামতবাসী, স্ত্রৈমাসী, মথয়া রাগে, টাকা নাওরে, রাজীরাজী প্রভৃতি বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করি। সময়ের যে কি মূল্য, তাহা তোমরা একেবারেই বুঝ না। আজ যদি আমাদের দেশে রেলগাড়ী থাকিত, তাহা হইলে তোমরা নিত্যই গাড়ী ফেল করিয়া আমার নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করিতে। যাহা হউক, এবার জার্ম্মাণী হইতে চিনির কল, কাগজের কল প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছি। তোমরা যদি বাজে কথায় এরূপ ভাবে সময় কাটাও, তবে কি করিয়া কায চলিবে?"

মহামান্য আমীর সাহেবের এ সব কথায় প্রায় সকলেই সম্মত হয় ও উচ্চৈঃস্বরে বলে, বিছিয়ার খুব,—এ সব খুবই ভাল।
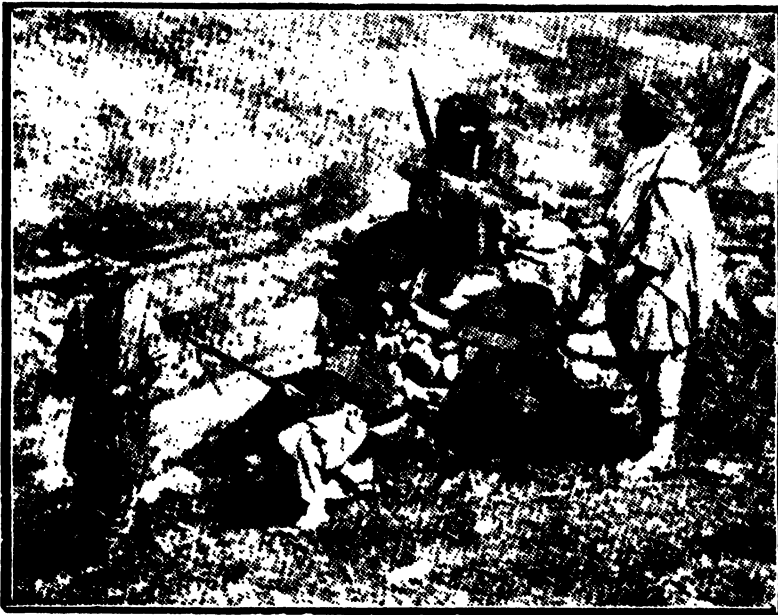
ছোনোয়ারী উপজাতি

তাহার পর আমীর সাহেব বলেন, "আমি বুর্খা উঠাইতে চাহি। কেন না, প্রকৃত কায আরম্ভ হইলে দেশের লোকসংখ্যা এত নাই যে, সমস্ত কায পুরুষের দ্বারা চলিতে পারে। প্রয়োজন হইলে দেশের নারীদিগকেও দেশের কাযে লইতে হইবে।" আমীর সাহেবের এই কথায় কৃষক-সম্প্রদায় বলে যে, "আমাদের পরিবার বুর্খার ভিতর থাকে না। তাহারা মুখ খুলিয়াই মাঠে আমাদের খাবার লইয়া ও দুম্বা প্রভৃতি চরাইতে যায়। বুর্খা থাকিলে বা না থাকিলে আমাদের কিছু আসে যায় না।" উত্তরে আমীর সাহেব বলেন যে, "কেহ ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ পরিবারদের বুর্খা রাখিতে বা উঠাইয়া দিতে পারেন।"

সর্ব্বশেষে আমীর সাহেব বলেন, "আমি কয়েক জন আফগান বালিকাকে শিক্ষার জন্য অন্য একটি মুসলিম দেশে অর্থাৎ তুর্কীদেশে পাঠাইতে ইচ্ছা করি।" ভয়ে হউক, কি বাস্তবিক দেশের হিতের জন্য হউক, ইচ্ছায় হউক, কি অনিচ্ছায় হউক, মোল্লা ও অন্যান্য লোক ইহাতে সম্মত হইয়া দস্তখত করিয়াছেন।

সাত দিন ধরিয়া সভা থাকে, সেখানে ঘোড়দৌড়, কৃত্রিম যুদ্ধ, রাত্রিকালে সিনেমা প্রভৃতি খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদও হইয়াছিল। সাত দিন পরে সভাভঙ্গ হয়।

ইহার কিছুদিন পরে আমীর সাহেব ২০ জন আফগান বালিকাকে তুর্কীদেশে পাঠাইয়া দেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

জালালাবাদ হইতে প্রায় ১২মাইল দূরে ছোনোয়ার বলিয়া একটি প্রদেশ আছে। সেখানকার বাসিন্দাকে ছোনোয়ারী (সিনওয়ারী) বলে। তাহারাই প্রথম বিদ্রোহী হয় এবং ছোনোয়ারী সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত কাই দুর্গ বিনা যুদ্ধে অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করে। মেসিন গান ও কামান কাফেরের জিনিষ বলিয়া তখনই ভাঙ্গিয়া ফেলে। বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র আপনারা রাখিয়া দেয়।

ছোনোয়ার প্রদেশে এক জন সহকারী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি উহাদের সহিত মিলিত হইয়াই হউক, কি নিজে মিটাইতে পারিবেন ভাবিয়াই হউক, জালালাবাদ কিংবা কাবুলে কোন সংবাদ পূর্ব্বে দেন নাই। যখন বিদ্রোহানল দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হয়, তখন বাধ্য হইয়া জালালাবাদে সংবাদ দেন। জালালাবাদের শাসনকর্ত্তা খুগিয়ানি, চাপলিয়ারী ও অন্যান্য উপজাতিকে ছোনোয়ারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে বন্দুক ও

তদুপযোগী গুলী দেন। তাহারা বলে, "কেমন করিয়া ভায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব?" আমীর সাহেবের নিকট এ সংবাদ যাওয়ায় তিনি "রেছে স্থরা" (প্রধান মন্ত্রী) সের মহম্মদ খানকে নিজের প্রতিনিধিরূপে জালালাবাদে প্রেরণ করেন। সের মহম্মদ আসিয়া 'শিশাম' নামীয় বাগানের নিকট মাঠে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি প্রথমে বলেন যে, "আমীর সাহেব তোমাদিগকে সেলাম বলিয়াছেন।" তাহাতে সবাই বলে যে, 'আলেকম সেলাম'। তার পর তিনি আমীর সাহেবের লিখিত কাগজখানি পাঠ করেন, "হে আমার প্রজাবৃন্দ! তোমরা কেন দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছ? নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাতে সয়তান লুকাইয়া আছে। সে সয়তান আমাদের দেশের শত্রু, দশের শত্রু, এমন কি, আফগানিস্থানের মাটীরও শত্রু। আমাদের উচিত সেই সয়তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা।" তারপর তিনি নিজের ফরমানখানা পাঠ করেন। তাহাতে আমীর সাহেব লিখিয়াছেন যে, "আমি সের মহম্মদ খান (রেছে স্থরা)কে আমার ক্ষমতা দিয়া পাঠাইলাম। ইনি যাহা করিবেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা মানিয়া লইব।" "রেছে স্থরা" সের মহম্মদ খান বলেন যে, "এখন বেলা অধিক হইল, তোমাদের যা বলিবার থাকে, 'সারবাগ' রয়াল হোটেলে আমার নিকট বলিবে, আমি তোমাদের কথা শুনিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। রমনে খোদা, তোমাদিগকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিলাম, এই কথা বলিয়া মোটরে উঠিয়া 'সার' নামক বাগানে চলিয়া যান। আমিও বক্তৃতার পর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। সের মহম্মদ খান আসিবার পূর্ব্বে জালালাবাদের শাসনকর্ত্তা ছোনোয়ারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যে বন্দুক দিয়াছিলেন, তাহা আর তখন ফিরাইয়া লইবার উপায় নাই। তখন পরশুরামের মত ধনু-তীর দিয়া শাসনকর্ত্তা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। সের মহম্মদ বহু চেষ্টা করিয়াও বন্দুক ফিরাইয়া লইতে পারেন নাই।

আমরা সহরের বাহিরে সমর-সচিবের বাড়ীতে ছিলাম। ওখানকার অনেকে বলেন যে, "আপনারা সহরের ভিতরে কিংবা আমাদের বাড়ীতে আসুন।" কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের সহিত আফগানরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, সেই সাহসেই আমরা বলি যে, "ছোনোয়ারী আমাদিগকে কিছুই বলিবে না।" তখন বিপ্লবের কোন ধারণাই আমাদের ছিল না বা বিপ্লব হইলে কি হয়, সে বিষয়েও আমরা অনভিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু যখন ছোনোয়ারীরা সহরের নিকটবর্ত্তী আডা নামক স্থানে জমায়েৎ হয়, তখন সেই আডা হইতে আমাদের চাকর আসিয়া বলে, "আপনারা সহরের মধ্যে কিংবা
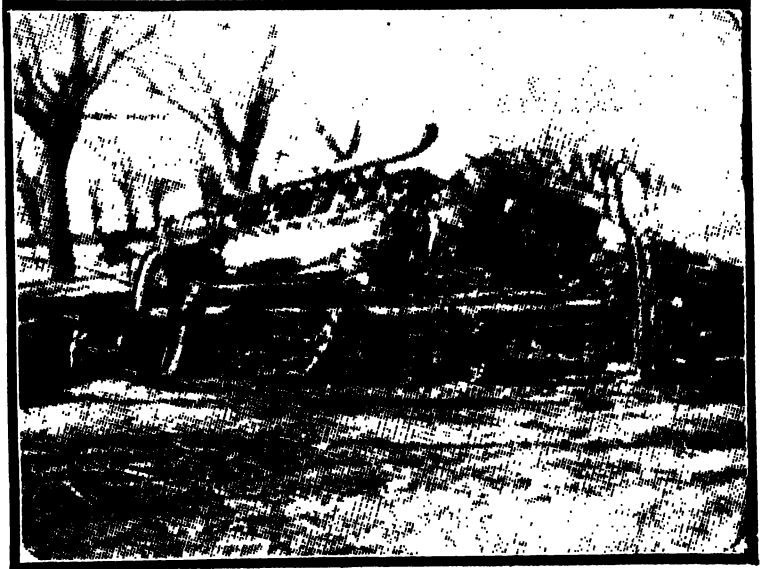
ভূপতিত আফগান বিমান

কোথাও চলিয়া যান। আগামী পরশ্ব নিশ্চয়ই তাহারা জালালাবাদ আক্রমণ করিবে। তাহারা আরও বলিয়াছে যে, কাফের আমান্ উল্লা যাহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদিগকেও ছাড়িবে না।" আমরা বলিলাম, "যত কিছু আক্রমণ সহরেই করিবে, সেখানে যাইয়া কি করিব?" তাহাতে সে বলে যে, "সহর আক্রমণ করিলেও তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না।"

জালালাবাদ সহরটি চারিদিকে মোটা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, চারি দিকে চারিটি দরজা,—কাবুলি দরজা, পেশোয়ারী দরজা, আডা দরজা, ও বিছুদী দরজা। সহর তখন যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত ছিল। চারি দরজার উপর চারিটি কামান ও চারিটি মেসিন গান ও ৫।৬টি বন্দুক এবং প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া মেসিন গান এবং প্রাচীরের উপর ২ হাত অন্তর এক জন করিয়া সৈনিক একটি করিয়া বন্দুক ধরিয়া ছিল।

আমাদের চাকর পুনঃ পুনঃ বলায় আমরা বাধ্য হইয়া সহরের ভিতরে আসিলাম। পরদিন সকালে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে ১১টা গুলী চলে, এইরূপ চারিটা বন্দুকের জন্ম আমীর

বেলুচীস্থানের পার্ব্বত্য পথ

সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট আবেদন করি। বেলা ১১টার সময় আবেদন মঞ্জুর হইলে, বেলা ১টার সময় বন্দুক আনিবার জন্ম সহরের বাহিরে (সার বাগে) রয়্যাল হোটেলে যাই। আমি কার্ড দিয়া বসিবার পর পাহাড়ের দিকে বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। ছোনোয়ারী আসিয়াছে শুনিতে পাইয়া সের মহম্মদ খান হোটেল ছাড়িয়া জালালাবাদ দুর্গে চলিয়া যান।

আমিও সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখি যে, সহরের চারি ধারে খুগিয়ানী, চাপলিয়ারী, লগমনি ও অল্পসংখ্যক ছেনোয়ারী সহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমি তাহাদের মধ্যে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সহরের ভিতর উপস্থিত হই। আমি সহরের মধ্যে প্রবেশ করার প্রায় ৬ মিনিট পরে সহরের চারিটি দরজাই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার ১১ মিনিট পর বিদ্রোহীরা সহরের কাবুলি দরজা কুঠার বন্দুক প্রভৃতি লইয়া আক্রমণ করে। বিদ্রোহীরা বারংবার "বিছমোল্লা এ রহমন রহিমলায় লাহা ইল্লিল্লা মম্মহদ রছুল উল্লা" বলিতে বলিতে কুঠার দ্বারা কাবুলি দরজার উপর আঘাত করিতে থাকে। সে দিন জীবনের আশা একবারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কারণ তাহারা সে দিন সহরে প্রবেশ করিতে পারিলে কাহাকেও ছাড়িত না। কাবুলি দরজার সৈন্যগণ তাহাদের সহিত একমত থাকায় দরজার উপর হইতে পলাইয়া নিজেদের পোষাক খুলিতে আরম্ভ করে। আমি ও আর কয়েকজন নিকটেই ছাদের উপর উঠিয়া সিপাহীদিগকে বলি যে, "উহাদিগকে গুলী কর।" উত্তরে সিপাহীরা বলে যে, "তোমরা আসিয়া গুলী কর।" আমরা বলিলাম যে, "আমাদের নিকট বন্দুক নাই, কি দিয়া গুলী করিব?" তাহাতে তাহারা বলে যে, "তোমরা এখানে আইস, আমরা তোমাদিগকে বন্দুক দিব।"

দরজা কাটিতে তখন মাত্র অর্দ্ধ ইঞ্চি বাকি আছে, সেই সময় শুল্ক আফিস হইতে এক জন রক্ষী বাহির হইয়া চৌকাঠের নীচু দিয়া গুলী করিলে তিন জন লোক ধরাশয্যা গ্রহণ করে ও অবশিষ্ট লোক পলাইয়া যায়। সহর হইতে রণে ভঙ্গ দিয়া বিদ্রোহীরা প্রথমে স্কুল, তার পর দাতব্য চিকিৎসালয়, বৃটিশ দূতাবাস (বাগে কোকাব), আমীর সাহেবের নিজের দপ্তর, সমরসচিবের গৃহ, কুঠি আয়না, রয়্যাল হোটেল, সিরাজ-উল-ইমারাৎ

(আমীর সাহেবের প্রাসাদ) ও অন্যান্য কয়েকখানা বাড়ী লুঠ করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহারা ১১খানা মোটর লরি, ৪খানা ষ্টীম লরি ও ১৭খানা মোটর গাড়ী পুড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় প্রায় ২০ হাজার ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সম্মুখ-সংগ্রাম করিবার উপযুক্ত সৈন্য এবং আমীর সাহেবের আদেশ না থাকায় এ সব ক্ষতি চোখের উপরই ঘটিতে লাগিল। সে সময় দুর্গ হইতেও অনেক সৈন্য পলাইয়া যায়। এই ব্যাপার ২৯শে নভেম্বর ঘটে। ১লা ডিসেম্বর বিদ্রোহী দল সহরের বাহিরে বিছুদী দরজার নিকট মস্‌জিদে একত্র হইয়া একটি নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করে। তাহারা আবেদন করায় শাসনকর্ত্তা (হাকিম আলা) পুলিস-কর্ত্তা (কমনদান), কয়েক জন মোল্লা ও কয়েক জন বৃদ্ধ লোক বাহিরে সেই মস্‌জিদে যান। তাঁহারা গেলে বিদ্রোহী দল বলে, "আমাদিগকে কোষাগার ও অস্ত্রাগারের দখল দিয়া আপনারাও আমাদের সহিত মিলিত হউন। আমরা কাফের আমান-উল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া কাবুল আক্রমণ করিব।" এই কথায় শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সম্মত হন, কিন্তু কমনদান বলেন যে, "এ বিষয়টি একবার চিন্তা করিয়া দেখি, তার পর যাহা হয় বলিব।" তিনি পরে সহরে আসিয়া বলেন যে, "যদি কোষাগার ও অস্ত্রাগার উহারা দখল করে, তবে সহর রক্ষা কি দিয়া করিব ? আর আমীর সাহেব বিশ্বাস করিয়া এ সমস্তই আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার পর যদি বাহিরের শত্রু আসে, তবে কি দিয়া নিজের দেশকে রক্ষা করিব ? আমার প্রাণ থাকিতে এই সয়তানের দলকে কিছুই দিব না।" পেশোয়ারী দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিছুটী দরজার উপর উঠিয়া বিদ্রোহী দলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে বাহিরের প্রাসাদ, ডাক্তারখানা, ইমারত প্রভৃতি লুঠ করিয়া জালাইয়া দিতে না। অন্য বাদশা হইলেও তাঁহার একটি প্রাসাদের প্রয়োজন। যদি তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব থাকিত, তাহা হইলে আমি সমস্ত দিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিতাম। তোমরা যে আমান-উল্লাকে কাফের বলিতেছ, আমি দেখিতেছি যে, তোমরা তাঁহার অপেক্ষাও কাফের। তোমরা কেবল ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে চাও। তাহা না হইলে তোমরা কাবুল নিজেরাই আক্রমণ করিতে বা আমীর সাহেবের নিকট আবেদন করিতে। তোমাদিগকে বধ করিলে কোন পাপ নাই।" এই কথা বলিয়াই তিনি কামান, মেসিনগান প্রভৃতি দাগিবার জন্য হুকুম দেন
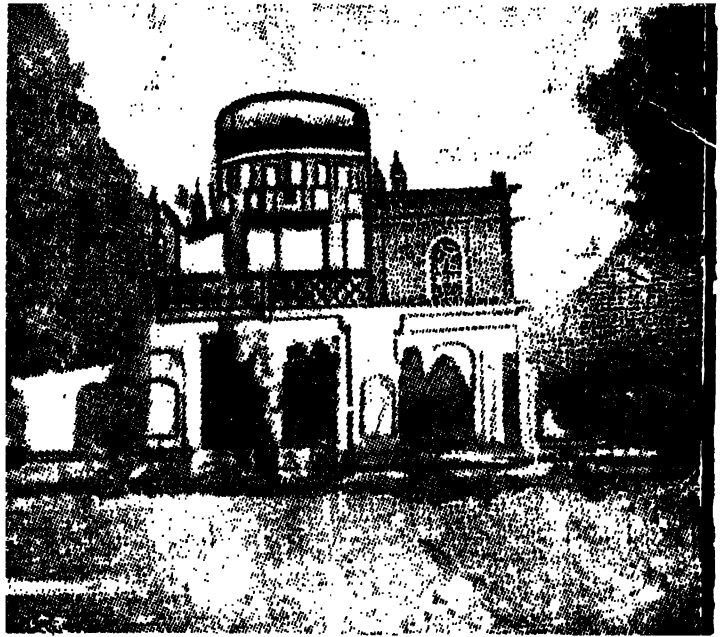
আমান-উল্লার পিতার সমাধি সৌধ

অমনই সহর হইতে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে সমস্ত কামান, বন্দুক, মেসিনগান শত্রুসংহারে ব্যস্ত হইল। এই শব্দ পাইয়া সহরের বাহিরে দুর্গ হইতে প্রায় ৫০।৬০ জন সৈন্য একটি কামানসহ কাবুল নদীর ধার দিয়া বিদ্রোহিগণের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করে। চারিদিক হইতে গুলীবৃষ্টি হওয়ায় প্রায় ৫ শত বিদ্রোহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদের পলায়নও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। তাহারা কিছু দূর যাইয়া পিছনের দিকে তাকাইয়া এক একবার বন্দুক ছুড়ে, আবার দৌড়ায়। সহর হইতে যেই কামান-দাগা হয়, অমনই

বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড

সাহেব লিখিয়া পাঠান, "তুমি কি বুঝিবে ? সৈন্য আমার ডান হাত, প্রজা আমার বাম হাত, কে নিজের একখানা হাত নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে ? যুদ্ধ করিলে প্রজা ও সৈন্য উভয়ই নষ্ট হইবে। নিজেদের ভিতর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র যদি খরচ হইয়া যায়, তবে কি করিয়া বাহিরের শত্রুকে আটকাইয়া রাখিবে এবং কি দিয়াই বা ইস্‌লাম ও মুসলমানগণকে রক্ষা করিবে ? এই যুদ্ধে যতগুলি আফগানের প্রাণ নষ্ট হইবে, বাহিরের শত্রুর সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাহাদের এক এক জন অন্ততঃ শত্রুদের এক এক জনকে মারিয়া গাজী বা সৈয়দ * হইতে পারিবে। তাই লিখিতেছি,

মাটীর উপর শুইয়া পড়ে। এইরূপ ভাবে প্রায় ১৫ মিনিট পরে তাহারা দৃষ্টির বাহিরে যায়। যুদ্ধ প্রায় এক ঘণ্টাকাল হইয়াছিল, আমরা ছাদের উপর হইতে সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে-ছিলাম। যুদ্ধের পর আমি ছাদ হইতে নামিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া দেখি যে, চারিদিকে কত শত মৃতদেহ পড়িয়া আছে, আর আমীর সাহেবের শববাহী সৈন্যগণ নিজেদের শব লইয়া সহরে প্রবেশ করিতেছে ও বিদ্রোহীদের প্রায় ৫০।৬০ জনকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে রুধির-স্নাত। এ পক্ষের ৫।৬ জন হত ও ৩০।৩৫ জন আহত হইয়াছিল। দূর হইতে কামানের গোলা-বর্ষণে ও আকাশের এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ করায় কত জনকে যে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু তখনও দয়ালু আমীর সাহেব নিজ সৈন্যগণকে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন নাই। তবে সহর ও (ছাউনি) দুর্গ রক্ষা করিতে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহাই করিবার হুকুম দেন। এ দিকে বিদ্রোহীরা তার, টেলিফোঁ ও বেতার-যন্ত্র নষ্ট করিয়া ও ডাক লুঠ করিয়া সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দেয়। আমরা ৪ মাসের ভিতর দেশে কোন সংবাদ দিতে পারি নাই।

পরদিন (রেছে সুরা) সের মহম্মদ খান উড়ো কলের মারফতে আমীর সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, কেন তিনি অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিবেন না ? তাহার উত্তরে আমীর

মোল্লা ও বৃদ্ধ লোকদিগকে পাঠাইয়া উহাদিগকে সৎপরামর্শ দিতে চেষ্টা কর। আর তুমি লিখিয়াছ যে, বিদ্রোহীরা বাহিরের সমস্ত লুঠ করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া আমার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। তাহাদিগকে বলিও যে, তাহারা আমার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই, তবে ক্ষতি করিয়াছে ইস্‌লামের, আর ক্ষতি করিয়াছে দেশের।

"কাই দুর্গ লুণ্ঠন করিয়াছে লিখিয়াছ। সে-ও আমার নিজের সম্পত্তি নহে। আমি তাহাদেরই নিকট হইতে খাজনা লইয়া কাফেরের হাত হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার ও ইস্‌লামকে রক্ষা করিবার জন্য বন্দুক, কামান প্রভৃতি খরিদ করিয়া তাহাদের হাতেই রক্ষার ভার দিয়াছিলাম। এখন তাহারা তাহাদের নিজের দেশের সম্পত্তিই নষ্ট করিয়াছে বা লুণ্ঠন করিয়াছে। যে সকল ইমারত ছিল, আমার পিতা বা ঠাকুরদাদা কেহই মরিবার সময় উহা কবরে লইয়া যান নাই। ডাক্তারখানা প্রভৃতি তাহাদের জন্যই তৈয়ারী করিয়াছিলাম। এ সব থাকিলে থাকিত ইস্‌লামের, আর থাকিত আফগানিস্থানের প্রজাবৃন্দের। তাহাদিগকে আরও বলিও, তাহারা যে কালিমা বা কলমা পড়ে, সেই কলমা পড়িলে কাফের পর্য্যন্ত মুসলমান হইতে পারে; আমিও সেই কালিমাই পড়িয়া থাকি। তবে আমি কিসে কাফের হইলাম ? আমি

* কাফেরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবিত থাকিলে গাজী, মৃত্যু হইলে সৈয়দ হয়।

এখন যে কালিমা পড়িয়া থাকি, তাহা এই ;—'বিছ মোল্লা এ রহমন রহিম লায় লাহা ইল্লিল লা মহম্মদ রসুল উল্লা।' তবে যদি তাহারা নূতন কালিমা জানিয়া থাকে বা পড়ে এবং সেই কালিমা পড়িলে যদি মুসলমান হওয়া যায়, লিখিয়া পাঠাইলে এই পুরাতন কালিমা ছাড়িয়া নূতন কালিমা পড়িব।"

আমীরের বক্তৃতা

উপসংহারে আমীর বাহাদুর লিখেন যে, "যত দিন পারিব, তত দিন মুসলমান হত্যা করিব না। জিনিষ গেলে জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু মানুষ গেলে মানুষ পাওয়া কঠিন। যদি তাহারা ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া ভয় পাইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে বলিও, যাহা নষ্ট বা লুঠ করিয়াছে, সেগুলি আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দিলাম এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনিও যেন ইহাদের সমস্ত দোষ ভুলিয়া যান।"

কয়েক দিন রাত্রিকালে অবিরত গুলীবৃষ্টি হইতেছিল। কেন না, অন্ধকারে বাহিরের কোন লোককে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল সহরকে রক্ষা করিবার জন্য নগরের কর্তৃপক্ষ এই আদেশ দেন। ১০।১২ দিনের মধ্যে বিদ্রোহীরা দিনে ও রাত্রিকালে ৪।৫ বার নগর আক্রমণ করে ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

৬ই ডিসেম্বর বেলা ৩টা ৩৭ মিনিটের সময় কাবুলি দরজা অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সহরের বাহিরে যান। আমি কয়েক জন আফগান ও শিখ সমভিব্যাহারে বাহিরে যাই।
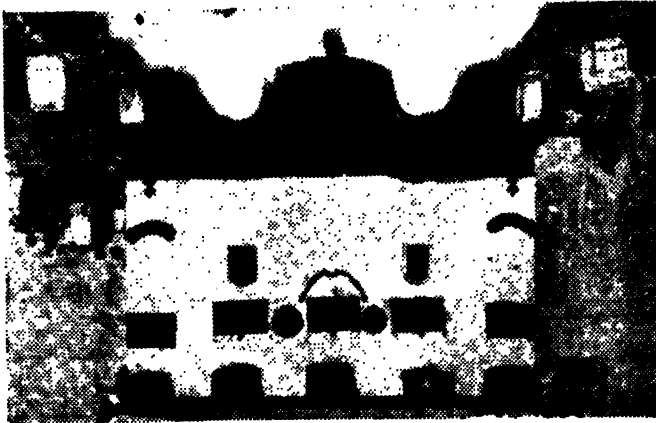
কাবুল নদীতে সেচের বাঁধ

বাহিরে যাইয়া দেখি, গাছপালা শাখাপ্রশাখাবিহীন হইয়া ধ্বংসের সাক্ষ্য দিতেছে। আকাশ নীলবর্ণ ও শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। এ কয় দিন অবিরত বারিবর্ষণ বিদ্রোহীদের পরাজিত হইবার এক কারণ। প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ। চারিদিকে তাকাইয়া দেখি, মৃতের হাত, পা, মাথা লইয়া কুকুর সকল টানাটানি করিতেছে। এ কয় দিন অবিরত গুলীবৃষ্টি হওয়ায় শৃগাল, শকুনি প্রভৃতি দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। তাই আজ সহরের দরজা খোলা পাইয়া সহরস্থিত কুকুরগণ বাহিরে আসিয়া মহানন্দে নররক্ত ও নরমাংস আস্বাদন করিতেছে। বাহিরে ছাদহীন ঘরের ভিতর গাদায় গাদায় মড়া পড়িয়া আছে। বিদ্রোহিগণ যাহা লইয়া যাইতে পারিয়াছে, গর্দ্দভ ও অশ্বতরের পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া গিয়াছে। এ কয় দিন সহরস্থিত চড়াই, শালিক প্রভৃতি পক্ষিগণ আহার ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই শঙ্কিত-চিত্তে এ-ছাদ হইতে ও-ছাদ, এ-প্রাচীর হইতে ও-প্রাচীরে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। শাবক ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই, তাই সন্তানের জন্য তাহারা নিজের প্রাণটি দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। সহরবাসীর প্রত্যেকের মনই তদ্রূপ ছিল।

১ মাস ২৩ দিন কিল্লা বন্ধ রাখিতে হয়। সহরের বাহিরে কাহারও যাইবার উপায় ছিল না।

বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়, এই প্রবাদ-বচনটি সহরবাসীমাত্রেই অনুভব করিতে আরম্ভ করে। লোক আটার পরিবর্ত্তে যব, গম প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমরা কয়েক দিন রাত্রিকালে এক বেলা কোনক্রমে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলাম। কত দিন যে বিনা ঘৃতে ডাল, তরকারী আহার করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঘৃতের কথা শুনিয়া হয় ত মনে করিবেন যে, তৈল হইলেই যথেষ্ট, আবার ঘৃত কেন? কিন্তু আফগানিস্থানে কেহ তৈলের রান্না খায় না। তৈলটা মাত্র প্রদীপে পোড়ায়। স্বাধীন দেশ, কোন জিনিষ বাহিরে যায় না, তাই ছোট হউক, বড় হউক, ধনী হউক, গরীব হউক, সবাই রাত্রিতে পোলাও মাংস ও দিনে রুটী খায়। এখানকার তৈলের দরে সেখানে ঘৃত বিক্রয় হয়। তবে কেন লোক ঘৃত না খাইবে? দিদিমাদের নিকট শুনিতে পাই যে, আমাদের দেশেও নাকি ১ টাকায় ৫।৬ মণ চাউল, ১ টাকায় ১০ সের তৈল ও এক টাকায় ২ সের ঘৃত ছিল। সত্য হইলেও তাহা আমাদের নিকট গল্পের মত বোধ হয়।

আফগানিস্থানে আমীর সাহেবের প্রধান আদেশ, কেহ ঘৃত, চাউল, আটা, দুম্বা, মেষ, অশ্ব ও সোনা-রূপা বাহিরে পাঠাইতে পারিবে না। যদি কেহ গোপনে পাঠায়, ধরা পড়িলে সে সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। আমরাও কোনবার মাহিয়ানার টাকা লইয়া আসি নাই, তবে আনিয়াছি পেশোয়ারের দোকানদারের উপর হুণ্ডি।

এই ব্যাপারের মধ্যে এক দিন সন্ধ্যাবেলা ছোনোয়ারীর দুই জন লোক দুর্গের নিকট আসিয়া বলে যে, "আমাদের ভয়ানক শীত লাগিতেছে, একটু আগুন তাতাতে দাও।" অমনই দুই জন সৈন্য দুটি গুলীর দ্বারা তাহাদিগকে শীত-গ্রীষ্মের অনুভব হইতে মুক্তি দেয়। আর একদিন আমি সহরের দরজার দেওয়ালের উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে দুই জন লোক আসিয়া সহরের দরজার নিকট সিপাহীকে বলে, "আটা মাখিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, একটু লবণ দাও।" এক জন সৈন্য দুটি গুলীর দ্বারা তাহাদের চিরজীবনের জন্য লবণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দেয়। প্রথমটি গুলী খাইয়া প্রায় ২ ফুট লাফাইয়া যেখানে ছিল, তাহার প্রায় ৫ পাঁচ ফুট দূরে ছিটকাইয়া পড়ে ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। অপর লোকটি পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু অন্য একটি গুলীর ঘায়ে তাহাকেও বন্ধুর অনুসরণ করিতে হইল। এই দৃশ্য চক্ষুর সমক্ষে দেখিয়া ঘরে ফিরিবার সময় এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল,—সেই ছেলেবেলাকার শোনা যাত্রার গান—

"দাদা অভি কেন যাবি সে ঘোর শ্মশানে
সে যে যুদ্ধক্ষেত্র নয়, মৃত্যুর আলয়,
কত শত হত সেখানে।"

আমীর সাহেব যখন দেখিলেন, গোলমাল মিটিতেছে না, তখন আলী আহম্মদ খান (ওয়ালি) অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধিকে নিজের ক্ষমতা দিয়া জালালাবাদ পাঠান। তিনি আসিতেই সকলে একটু শান্তভাব ধারণ করে। যখন তিনি জালালাবাদ হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে চারবাগে পীর সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছেন, তখন ছোনোয়ারী, খুগিয়ানী প্রভৃতি উপজাতি সেখানে যাইয়া বলে যে, "আপনি আমাদের আমীর হউন। আমান-উল্লা কাফের হইয়াছে, তাহাকে আর আমীর বলিয়া মানিব না।"

আলী আহম্মদ জান

আলী আহম্মদ জান ভয়ানক চতুর রাজনীতিক। তিনি উত্তরে বলেন, "আমি (সরিয়তে) কোরাণের লিখিত নিয়মে বাদসা হইতে পারি না। তার পর আমি তাঁহার বেতনভোগী ভৃত্য। তোমাদের গোলমাল আমি মিটাইয়া দিব।" তিনি সেখানে দুই দিন থাকিয়া, বৈকাল বেলা জালালাবাদ দুর্গে আসেন। তিনি আসিলে সেরমহম্মদ খান উড়ো কলে কাবুল চলিয়া যান। তিনি দুর্গে আসিলে সৈন্যাধ্যক্ষ আলী আহম্মদ জানকে বসিবার জন্য চেয়ার দেন। তিনি তাহাতে না বসিয়া সকলের সহিত সতরঞ্চির উপর উপবেশন করেন। পরদিন বেলা ৩টা ২১ মিনিটের সময় তিনি পেশোয়ারী দরজা দিয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করেন এবং সহরস্থ কাহারও সহিত হাত মিলাইয়া, কাহারও সহিত কোলাকুলি করিয়া, কাহারও হাত, কাহারও মুখ চুম্বন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কাবুল

দরজার নিকট আসিয়া তাঁহার থাকিবার যায়গার নিকট দাঁড়াইয়া বলেন যে, "তোমাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই তোমাদের কষ্ট লাঘব করিব।" তিনি আসিতে আর ৪।৫ দিন দেরী করিলে অনেক লোক না খাইয়া মরিত সন্দেহ নাই।

দুই দিন পর আলী আহম্মদজান সহরের কাবুলি ও পেশোয়ারী দরজা খুলিয়া দেন ও সওদাগরদিগকে বাহির হইতে আটা, ঘৃত, চাউল, কাঠ, কেরসিন তৈল প্রভৃতি আনিবার জন্য ১২ হাজার টাকা দেন। পথে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী বিদ্রোহী উপজাতি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে বড় বড় মালেক (জমিন্দার) খান, মোল্লা প্রভৃতিকে তাহাদের সহিত পাঠাইয়া দেন।

সপরিবারে প্রিন্স এনায়েতুল্লা

জেনারেল নাদির খাঁ

সওদাগরদের সহিত এই চুক্তি রহিল যে, তাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ গ্রহণ করিয়া বাকি ১২ হাজার টাকা আলী আহম্মদ জানকে ফিরাইয়া দিবে।

পরদিন তিনি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেন। তার পর বিদ্রোহীদের বড় বড় লোককে ডাকিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করেন। কাহাকেও টাকা দিয়া, কাহাকেও ভাল জামা-কাপড় দিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য কোরাণস্পর্শ করাইয়া স্বীকার করাইয়া লয়েন। তাহারা নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া নিজেদের দলস্থ লোকদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করায় তাহারা বলে যে, "তুমি উৎকোচ লইয়া এইরূপ বলিতেছ, অতএব তুমি আমাদের মালেক নও।" সেই রাত্রিতেই ছোনোয়ারীরা তাহাদের বড় পাণ্ডা মহম্মদ আলাম ও তাহার সহকারীর বাড়ী লুঠ করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। পরে অধিকাংশ ছোনোয়ারী ও খুগিয়ানী জালালাবাদে আলী আহম্মদের নিকট আসিয়া বলে, "আমরা আমীর সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব।"

আলী মহম্মদ যখন দেখিলেন যে, গোলযোগ মিটিবার নহে এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, আমান-উল্লার দিকে কায করিলে ছোনোয়ারী, খুগিয়ানী, চাপলিয়ারী প্রভৃতি উপজাতিরা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে, তখন হইতে তিনি

উহাদিগকে থামাইয়া রাখিবার জন্য আমীর সাহেবের বিরুদ্ধে নানা রকম কথা বলেন। তাহাদের আন্তরিক যুদ্ধের ইচ্ছা দেখিয়া আলী আহম্মদ জান বলেন যে, "তোমরা যদি যুদ্ধ করিতে চাও, তবে তাহার পূর্ব্বে আত্মীয়-স্বজনদের সহিত একবার দেখা করিয়া আইস; কারণ, যুদ্ধে গেলে যে বাঁচিয়াই থাকিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তোমরা সাত দিন পরে ফিরিয়া আসিবে।" তাহারা ফিরিয়া আসিলে বলেন যে, "এ পোষাকে কাবুল যাওয়া অসম্ভব, কারণ, কাবুলে ও রাস্তায় এখন প্রায় তিন ফুট বরফ পড়িয়া আছে। তোমরা সেখানকার উপযুক্ত পোষাক তৈয়ারী করিয়া লইয়া আইস।" এইরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া পুনরায় গ্রামে পাঠাইয়া দেন।

আলী আহম্মদের আশা ছিল, শীঘ্র হউক কি বিলম্বে হউক, কাবুল হইতে সৈন্য আসিবে। আমীর সাহেব সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা নিমলা নামক স্থানে আক্রান্ত হইয়া বন্দুক কামান ইত্যাদি শত্রুহস্তে ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ঐ সৈন্য আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হওয়ায় আমীর সাহেব নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য কান্দাহার যাত্রা করেন। তিনি তিন দিনের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স এনায়েতুল্লা খানকে কাবুলের সিংহাসনের ভার অর্পণ করিয়া যান। কাবুলে তখন সৈন্য খুব কমই ছিল। এই অবসরে (বাচ্চাএ-সাকাও ভিস্তিওয়ালার ছেলে ডাকাইত হবিউল্লা নামে পরিচিত এক জন লোক কাবুলের সিংহাসন আক্রমণ করে। বাচ্চা অর্থে পুত্র, সাক অর্থে ছিটান এবং আও অর্থে জল। সে দুইবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। আমীর সাহেব এই সংবাদ পাইয়া নিজে কান্দাহার হইতে না আসিয়া লোক দ্বারা কাবুল হইতে উড়োকল, টাকা-পয়সা ও যুদ্ধের সরঞ্জাম কান্দাহারে লইয়া যাইতে আরম্ভ করেন। চারি দিন পরে (বাচ্চাএ সাকাও) হবিউল্লা পুনরায় কাবুল আক্রমণ করে। এনায়েতুল্লা খান ভীত হইয়া ইংরাজের উড়োকলে পেশোয়ার হইয়া কান্দাহারে ভ্রাতার আশ্রয়ে চলিয়া যান। (বাচ্চাএ সাকাও) হবিউল্লা প্রায় ৫ শত লোক লইয়া কাবুলের অরক্ষিত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে।

বাচ্চাএ সাকাও.

এ দিকে আলী আহম্মদ জান যখন দেখিলেন যে, কাবুল হইতে সৈন্য আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি জালালাবাদের মস্‌জিদে শুক্রবারে মোল্লা ও খানগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া (সিমতে মুছরাফি) পূর্ব্বাঞ্চলের আফগানগণের অনুরোধে আপনাকে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে আমীর বলিয়া প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি

পরিবারবর্গকে কান্দাহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সহরের রাজপতাকা নামাইয়া রাখেন ও বলেন, "যত দিন (বাচ্চাএ সাকাও) হবিউল্লাকে ও আমান-উল্লাকে আফগানিস্থান হইতে সরাইয়া দিতে না পারিব, তত দিন পতাকা উড্ডীন করিব না। আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আলী আহম্মদ, শ্যালক আমান-উল্লার বিরুদ্ধাচরণের ভাণ করিলেন। আলী আহম্মদ মস্‌জিদ হইতে ফিরিয়া সহরে আসিয়া সৈন্যদের বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতি করিয়া দেন। অনেককে ২।৩ ও ৪ মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার প্রদান করেন। নগদ টাকা কাহাকেও দেন নাই, কারণ, তখন জালালাবাদ কোষাগারে এক পয়সাও ছিল না, এবং কাবুল হইতেও টাকা-পয়সা আসা বন্ধ হইয়াছে।

আলী আহম্মদ বাদশা হইবামাত্র এক দিন জালালাবাদে অবস্থান করিয়া ছোনোয়ারী, খুগিয়ানী, চাপলিয়ারী প্রভৃতির বড় বড় খান, মালেক ও মোল্লা সমভিব্যাহারে (বাচ্চাএ সাকাও) হবিউল্লার পথরোধ করিবার জন্য কাবুল ও জালালাবাদের মাঝামাঝি জগদলিক নামক স্থানে গমন করেন। জালালাবাদে তাঁহার সহকারীকে রাখিয়া যান। তিনি আবদুল রহমান খান নামক এক ব্যক্তিকে জালালাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন এবং পূর্ব্বের পুলিস-কর্ত্তাকে জবাব দেন।

আলী আহম্মদ জান জগদলিকে ৬।৭ দিন থাকিবার পর সয়তান খুগীয়ানী, ছোনোয়ারী প্রভৃতি কোনক্রমে বুঝিতে পারে যে,নূতন আমীর সাহেব 'কাফের' আমান-উল্লার অনুকূলে কার্য্য করিতেছেন। সেই রাত্রিতেই তাহারা জগদলিক লুঠ করে। আলী আহম্মদ জান পুত্রসহ একবস্ত্রে পলাইয়া লগমন্ নামক স্থানে পৌছেন। এই কথা শুনিয়া কুনাড়ের পাচা সাহেবের পুত্র প্রায় আড়াই শত লোক দিয়া তাঁহাকে সসম্মানে কুনাড়ে নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। কাল রাজা, আজ ফকির !

জগদলিক লুঠ করিবার দুই দিন পরে বিদ্রোহীরা সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। তখন জালালাবাদের শাসনকর্ত্তা আলী আহম্মদের সহকারীর অগোচরে রাত্রিকালে প্রায় ৩ শত ছোনোয়ারীকে গোপনে সহরের ভিতর লইয়া আসেন। কি উদ্দেশ্যে, ভগবান্‌ই জানেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম যে, ছোনোয়ারী বন্দুক, মেসিন-গান প্রভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জামপত্র লুঠ করিতেছে। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই তাহারা পিঠে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি লইয়া প্রাচীর টপকাইতেছে। সহরের দরজা তখনও বন্ধ। বিদ্রোহীরা, সৈন্যগণ যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই তাহাদের বন্দুক ছিনাইয়া লয়। এই কার্য্য বেলা ১২টা পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল।

এক জন পরিচিত মোল্লা লুঠ করিয়া জিনিষপত্র আনিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলাম, "সেলাম আলেকম মোল্লা সাহেব, এই লুঠ করায় পাপ হয় না ?" তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি আমার ভায়ের জিনিষ লইয়া আসিতেছি।" আফগানিস্থানে এই মোল্লার দল যত কম হইবে, ততই মঙ্গল। তার পর কে যে সহরের তিনটি দরজা খুলিয়া দেয়, বলিতে পারি না। অন্য ছোনোয়ারীর দল যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। একটি ঘোড়াকে বহু চেষ্টায় ধরিতে না পারায় গুলী করে। আফগানের অব্যর্থ গুলীতে ঘোড়াটি প্রায় ১৫ মিনিট ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করে। তখন ছোনোয়ারীগণ আমাদিগকে বলে, "তোমরা ভয় পাইও না, তোমাদিগকে কিছুই বলিব না বা তোমাদের বাড়ী লুঠ করিব না। আমরা মাত্র সরকারী জিনিষ লইব।" ইহারা চলিয়া গেলে বেলা দুইটার সময় এক দল খুগিয়ানী সহরের ভিতর আসে। তাহারা প্রথমে জাবাখানা ঘরে যায় ও গুলীর বাক্স ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। ইহারই মধ্যে কে এক জন লোক বারুদখানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। আবার কেহ বলে, পাথর দ্বারা গুলীর বাক্স ভাঙ্গিবার সময় লৌহ ও পাথরের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হয় ও বারুদে আগুন লাগে। বারুদ, কামানের গোলা, হাত-বোমা, ও কার্ত্তুজে আগুন লাগিয়া যে একটি শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল, বোধ হয়, ৩০।৩৫টি কামান একসঙ্গে দাগিলেও এত জোর শব্দ হয় না। বারুদখানা ও তাহার চারিধারে ৮।৯টি বাড়ী ঐ কম্পনে পড়িয়া যায় ! উহাতে প্রায় ৮ শত ৭৫ জন খুগিয়ানী ও ৫।৬ জন সহরবাসী মারা যায়। আমি সেই সময়ে একাকী দ্বিতলে বসিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করিতেছিলাম। হঠাৎ একটি ভীষণ শব্দ হইয়া চারিদিক ধোঁয়া, ধূলা ও বারুদের কণায় সমাচ্ছন্ন হয়। ঐ সময় একটি দরজা ভাঙ্গিয়া আমার মাথার উপর পড়ায় ও চারিদিক অন্ধকার দেখায় ঠিক সেই সময় মনে হইতেছিল যে, কেহ এই দিকে কামান দাগিয়াছে, আর আমি পড়িয়াছি তাহারই সম্মুখে। প্রায় ৫ সেকেণ্ড পরে বুঝিলাম যে, আমার মৃত্যু হয় নাই। তখন অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে নিম্নতলে নামিয়া

আসি। সহরের মেয়ে, পুরুষ, বালক-বালিকাদের গভীর আর্ত্তনাদে আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আমি আমার বাঙ্গালী বন্ধুটির অনুসন্ধান করিতে চলিলাম। পথিমধ্যে দেখি, তিনিও আমার খোঁজ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় সম্যক্ প্রকাশ করা কঠিন। সহরের যে সকল স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ইহাতে অন্ধ, খঞ্জ, আহত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা করা ভার। বিদ্রোহীদের প্রায় ৯ শত লোক মারা যাওয়ায় ওখানকার লোক বলিতে লাগিল, পীর সাহেবের কথা অমান্য করিয়া সহর লুঠ করায় তাহাদের ঐরূপ মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বারুদখানা পুড়িয়া গেলে খুগিয়ানীরা লোকের বাড়ী লুঠ করিতে আরম্ভ করে, এবং লুঠ করিয়াই আগুন দিয়া অন্য বাড়ী আক্রমণ করিতে থাকে। সেই সময় চারিদিক হইতে দলে দলে খুগিয়ানী, চাপলিয়ারী, সুরখোদী, লগমনি, বিছুদী, আডা, অওলা, খোসকুমণ্দী, বালাবাগী, সুলতানপুরী প্রভৃতি উপজাতিসমূহ লুঠ করিবার জন্য সহরের ভিতর প্রবেশ করে। তবে তাহাদের মধ্যে এই একতা ছিল, যে জিনিষ এক জন স্পর্শ করিল, উহা বহুমূল্য হইলেও অন্য কেহ উহা স্পর্শ করিল না।

তখন আমরা কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম, দস্যুরা অমানুষিক ও নাস্তিকের মত যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে, তাহা দেখিলে অতি বড় সাহসীরও মনে ভয় হয়! অত বড় অত্যাচার মানুষ মানুষের উপর করিতে পারে না। কেহ খোদার দোহাই দিলে বা কোরাণ সম্মুখে ধরিলে লুণ্ঠনকারীরা পদাঘাত করিয়া আপনাদের নৃশংস কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে লাগিল।

আমরা তখন কি করিব, কোথায় যাইব, ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া জিনিষ-পত্রের ও প্রাণের মায়া এককালে ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে অস্থিরভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ঠিক সেই সময়ে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি, আমাদের ভৃত্য! দেখিয়া মনটা এককালে আনন্দে নাচিয়া উঠিল, পরক্ষণেই মনে হইল, এও যদি লুণ্ঠনকারী হয়, তবে?

আমাদের ভুল বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া সে নিজেই বলিল, "আমি আপনাদিগকে অনেকবার বলিয়াছি যে, অন্য কোথাও চলিয়া যান। এখন কি করিবেন? যদি বাঁচিতে চান, তবে আমার উপর বিশ্বাস করিয়া জিনিষপত্রসহ আমার সহিত আমাদের বাড়ীতে চলিয়া আসুন।" হাতে চাঁদ পাইলাম। সে বলিল, "আমি জিনিষপত্র লইয়া যাইবার জন্য দুই জন লোকও আনিয়াছি।" তখন তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব জিনিষপত্র লইয়া সে নিজে ও অন্য দুই জন বহিয়া লইয়া চলিল। আমরাও তাহাদের সহিত ছদ্মবেশে বাহির হইলাম। স্কন্ধে রহিল কোরাণ সারিফ। আমরা যখন সহর হইতে বাহির হই, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। বালুকারাশি, সমতল ক্ষেত্র ও পাহাড় পার হইয়া পদব্রজে রাত্রিকালে ৫ মাইল দূরে আডায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আসিয়া পৌছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। সারাদিন যে কিছু খাওয়া হয় নাই, সে কথা মনে পড়ায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলাম। মাথায় হাত দিয়া দেখি, মাথাটা বেশ ফুলিয়াছে, তখন হইতে মাথাও বেদনা করিতে আরম্ভ করিল। আধ ঘণ্টার পর আহারের জন্য রুটী ও চা আসিল, কোনমতে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া গাধা-গরুর সঙ্গে গোশালায় শয়ন করিলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, ছোনোয়ারীগণ হিন্দুদের ছোট ছোট তিনটি ছেলেকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে পয়সার জন্য। দেড় হাজার দুই হাজার টাকার কম কাহাকেও মুক্তি দিবে না। আডার অনেক লোক বলিল, "ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, স্বয়ং ভগবান্‌ও পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, ছেলে-মেয়েদের অপরাধ ক্ষমা করিতে বাধ্য হন। আর তোমরা বিনা অপরাধে ইহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ।" কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" ছোনোয়ারীরা উত্তরে বলিল, "অদ্য ভগবান্‌ই ইহাদিগকে মিলাইয়া দিয়াছেন। এরা (মোরগে তিলা) সোনার মোরগ, সোনার ডিম প্রসব করিবে।" সাধারণতঃ আফগানিস্থানে হিন্দুদেরই পয়সা অধিক। তাই কাহারও কোন কথা না শুনিয়া ছোনোয়ারীরা বালকদিগকে লইয়া গেল। বালকগণ কোথাও হাঁটিয়া, কোথাও হামাগুড়ি দিয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। এই সব দেখিয়া বড় ভয় হইল। সেই দিন বৈকালে এক জন লোক আসিয়া আমাদিগকে বলিল, "তোমাদের এখানে থাকা নিরাপদ্ নহে ; কারণ, ছোনোয়ারীরা জানিতে পারিলে তোমাদিগকে পাহাড়ে ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং তোমাদের

বাড়ী হইতে ৩.৪ হাজার টাকা না আসা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিবে না। আর ঐ টাকার জন্য রোজ রোজ তোমাদিগকে বড় কষ্ট দিবে।” তাহাতে আমাদের সেই পুরাতন ভৃত্য বলিল, “আমার প্রাণ থাকিতে ও হাতে বন্দুক থাকিতে ইহাদের কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।” যাহা হউক, তাহাকে ভাল ভাবে বুঝাইয়া রাত্রি সাড়ে ৩টার সময় ঐ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চারবাগে পীর সাহেবের বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইলাম। বাহিরে ভয়ানক শীত, মনের ভিতর সর্ব্বদাই ভয়। কোথাও

তখন তাঁহাদের অঙ্গে নাই সে যুদ্ধের পোষাক, নাই সে কটিতে তরবারি ও পিস্তল, নাই সে পৃষ্ঠে বন্দুক, আর নাই সে বুকে-পিঠে চামড়ায় বাঁধা কার্ত্তুজ। আছে কেবল মুখে ভয়ের চিহ্ন। আলী আহম্মদের সহকারী পীর সাহেবের বাড়ীতে ৪ দিন থাকিয়া লগমনে আলী আহম্মদ জানের নিকট চলিয়া যান। পীর সাহেবের নিকটে সবাই সমান। যে যায়, তাহাকেই তিনি আশ্রয় দেন। কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, সবাই সেখানে সমান আদর পায়। সেখানে

আফগানিস্থানে বিপন্ন বিদেশীয়গণ

বা দৌড়াইয়া, কোথাও বা গুহার ভিতর লুকাইয়া, এইভাবে সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ৮ মাইল পাহাড় অতিক্রম করিয়া পীর সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া যেমন শান্তি বোধ হইল, তেমনই আনন্দ হইল। সেখানে যাইয়া দেখি যে, সহর হইতে পলাতক জেনারেল, ক্যাপ্টেন, কর্ণেল, ব্রিগেড্ মজবদার, হাবিলদার নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। তিন মাস সহরের ভিতর থাকায় প্রায় সকলের সঙ্গেই একটু আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল।

গেলে পীর সাহেব তিন দিন খাইতে দেন, পরে সেখানে থাকিয়া নিজেদের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। আফগানবাসী যাহাদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে, এই অরাজকতার সময় সেই ‘কাফের’ তিন জন ইংরাজ সেখানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে উড়োকল খারাপ হওয়ায় তিন জন ইংরাজ সেখানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। জালালাবাদের বৃটিশ-দূতও সেখানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

চারবাগের পীর সাহেবকে ধার্ম্মিক লোক বলিয়া সকলেই সম্মান ও ভক্তি করে।

সকলকে দেখিয়া বেশ একটু তৃপ্তিবোধ করিতে লাগিলাম। আর দুঃখ ও দয়া হইল ইংরাজদের নবজাত শ্মশ্রুযুক্ত মুখ দেখিয়া। কারণ, যাঁহারা প্রত্যহ শ্মশ্রু না কামাইলে বাহির হইতে পারেন না, তাঁহাদের আজ ৮।৯ দিন ক্ষৌরকর্ম্ম একেবারেই বন্ধ। নাপিত সেখানে যথেষ্টই আছে, কিন্তু কে কাফেরের ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে? এক জন নাপিতকে অনুরোধ করায় সে বলে যে, "তোমাদের জন্য আমি আমার একখানা হাত নষ্ট করিতে পারি না। কারণ, তোমাকে যে হাত দিয়া

আমরা ইংরাজের দূতকে যাইয়া বলিলাম যে, "আমাদের দেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিন।" কেন না, তিনি পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছেন যে, "আমরা কেবল আপনাদের জন্যই আছি। কোন কষ্ট হইলেই আমাকে জানাইবেন, আমরা তখনই তাহার প্রতীকার করিব।" আজ সেই জন্যই তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দূত বলিলেন, "আগে য়ুরোপীয়দিগকে পার করি, তার পর ২৫ জন বসিতে পারে, এইরূপ একখানি উড়োকল পেশোয়ারে চাহিয়া পাঠাইব। তাহাতে সমস্ত হিন্দুস্থানী যাইতে পারিবে।"

এ দিকে শুনিতে পাইলাম যে, কাবুল হইতে ভারতবাসী-

আফগানিস্থানে বৃটিশ বিমানে য়ুরোপীয়গণ

কামাইব, সে হাতে আর রুটী খাইব না। সে হাত কাটিয়া ফেলিলেই ভাল হয়।"

আফগানদের ভিতর কেরাণীর শিক্ষা থাকুক বা নাই থাকুক, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ যে শিক্ষায় মানুষ নিজের দেশকে চিনিতে বা ভালবাসিতে পারে, তাহার অভাব নাই। শত্রুকে ঘৃণা করিতে তাহারা ছেলেবেলা হইতেই কথায় কথায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়। তাই আজ মাত্র ৯৬লক্ষ কি এক ক্রোর লোক জগতের বক্ষে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছে।

দিগকে উড়োকলে পেশোয়ারে চালান করা হইতেছে। আমি আমাদের চীফ এঞ্জিনীয়ারের কথা জিজ্ঞাসা করায় বৃটিশ-দূত বলিলেন যে, "তিনি বোধ হয় উড়োকলে পেশোয়ারে চলিয়া গিয়াছেন।" কথাটা কত দূর সত্য, অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ও পরে জানিতে পারিলাম, যে ইংরাজের প্রজা, তাহাকেই পেশোয়ারে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাই আজও শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন লাহিড়ী কাবুলেই আছেন।

কয়েক দিনের মধ্যে পীর সাহেবের বাড়ীর নিকট নূতন একটি উড়োকলের আড্ডা তৈয়ারী করা হইল। এক দিন একখানা উড়োকল দুই জন ইংরাজকে লইয়া আসিল। তাহার তিন দিন পরে এক জন ইংরাজকে লইয়া যাইবার জন্য দুইখানা উড়োকল যায়, একখানা ভূমিতে অবতরণ করে, অন্যখানা প্রায় ৫০ ফুট উচ্চে অনবরত ঘুরিতে থাকে। তার পর পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ উহাতে উঠিলে উক্ত উড়োকলখানাও সঙ্গ লয় এবং পীর সাহেবকে "জাহাজী সেলাম" দিয়া অর্থাৎ তাঁহার বাড়ীর উপর এক পাক ঘুরিয়া পেশোয়ার চলিয়া যায়।

উড়োকল উড়িয়া চলিয়া গেলে আমরা বৃটিশ দূতের সহিত দেখা করিয়া বলি, "আমাদের জন্য উড়োকল কবে আসিবে?" তাহাতে তিনি বলেন, "অত টাকার উড়োকলখানা যদি নামিতে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কে তাহার জন্য দায়ী হইবে?" আমরা বলিলাম, "কেন, এই ত দুইখানা উড়োকল নামিল ও উড়িয়া গেল, তাহাতে ত কিছুই হইল না।" তাহাতে বৃটিশ দূত বলিলেন যে, "আপনাদের জন্য বড় জাহাজের দরকার এবং তাহার দাম বেশী। ভাঙ্গিয়া গেলে কে দায়ী হইবে?" বৃটিশ দূত এক জন ভারতীয় পেশোয়ারী মুসলমান। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের এই কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে মরিতে হইবে। মনে কত চিন্তাই আসিল, আজ সমগ্র ভারতবাসী বিদেশীর উপর নির্ভর করিয়া মরিতে বসিয়াছে! সে আমাদের কে? কেনই বা আমাদের জন্য করিবে? তাহাদের উপর আমাদের দাবী কি? তাহারা আমাদের উপর সমস্ত দাবী করিতে পারে বা করে, কারণ, আমরা বৃটিশ-প্রজা। আজ আমাদের দেশ নাই, অর্থ নাই, আর নাই সামর্থ্য। আমরা সেখানে ১২।১৩ জন ভারতবাসী ছিলাম। আমাদের মধ্যে মৌলবী শুক্কা নামক এক ভদ্রলোক সপরিবারে ছিলেন। বড় দুঃখে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করাই পাপ।"

সে দিন যেন পরাধীনতার বৃশ্চিক-দংশন শিরায় শিরায় অনুভব করিলাম। আজও সে যন্ত্রণা ভুলিতে পারি নাই। তাহাদেরই বা দোষ দিই কেন? যাহা হউক, পরে নিজেরা চেষ্টা করিয়া পীর সাহেবকে অনুরোধ করায় তিনি দয়া করিয়া এক জন লোক আমাদের সঙ্গে দেন এবং স্থানে স্থানে চিঠি দিয়া আমাদের পাঠাইয়া দেন। পেশোয়ারের দুই জন মোটর-চালক দুইখানা মোটর লইয়া ঐ স্থানে আটক পড়িয়াছিল। পীর সাহেব সেই মোটর আমাদের জন্য ঠিক করিয়া আমাদিগকে পেশোয়ারে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে আমাদের ৩০টি স্থানে বিদ্রোহীরা আটক করিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ও পীর সাহেবের নামে ও চিঠিতে ২৯টি স্থানে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক স্থানেই জীবন-মরণ সমস্যার ভিতর পড়িতে হইয়াছিল, কারণ, শত্রুর উদ্যত বন্দুক আমাদের মস্তক উড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। অবশেষে বৃটিশ-সীমানার নিকটে বিদ্রোহীরা আমাদিগকে শেষবার আটক করে। সেখানে পীর সাহেবের চিঠি-পত্রের বা লোকের কোন কথাই গ্রাহ্য হইল না। তাহারা বলিল, "আমরা খোদা, কোরাণ, পয়গম্বর কাহাকেও মানি না। পীর ত পীর!" তাহারা পকেট ও মোটর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমার পকেটে একটি ফাউণ্টেন পেন ছিল। তাহারা সেটা দেখিবামাত্র ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল ও টাকা-পয়সার জন্য বারংবার বিরক্ত করিতে লাগিল। আমরা দুইখানা মোটরে ৪ জন ভারতবাসী ছিলাম এবং আমাদের সহিত এক জন আফগান বিমান-বিদ পাইলট, আমীর সাহেবের পত্নীর মাতুল, ৪ জন আফগান ও ৪ জন মোটর-চালক ছিল। অবশেষে সকলে মিলিয়া ৭০৲ টাকা দিয়া দস্যুদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলাম। আমরা ছদ্মবেশে অপরাহ্ণ ৫টা ৪৬ মিনিটের সময় তার্খামে বৃটিশ এলাকায় আসিয়া পৌঁছিলে মনে হইতে লাগিল, আমার যেন পুনর্জন্ম হইল। তার্খামে ছাড়পত্র দেখাইবার পর রওনা হই। সে দিন আর পেশোয়ারে আসিতে পারি নাই, কারণ, সন্ধ্যা ৬টার সময় পেশোয়ারের দরজা বন্ধ হইয়া যায়। তাই সেই রাত্র জামরুদে যাপন করিতে বাধ্য হইলাম। আমরাও সে দিন রোজা গ্রহণ করি, কেন না, সকাল হইতে আহার জুটে নাই। রাত্রিতে জমরুদে আসিয়া সে দিন রোজা ভঙ্গ করি।

সকালে উঠিয়া পেশোয়ারে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ (Dr. C. C. Ghose) মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উঠি। তিনি আমাদিগকে জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে ও মধুর ব্যবহারে আমরা সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। সেখানে তিনিই আমাদের আহার ও নিদ্রার বন্দোবস্ত করেন। অনেক দিন পরে বাঙ্গালা খাবার দেখিয়া ও খাইয়া বেশ একটু তৃপ্তিবোধ করিলাম।

আমাদের সঙ্গে টাকা-পয়সা একবারেই ছিল না। তবে আফগান সরকারের হুণ্ডি ছিল। তাহা লইয়া বেলা ১০টার সময় আফগান বাণিজ্য-কর্ম্মচারীর নিকট যাইয়া বলি, "এই হুণ্ডি রাখিয়া আমাদের টাকা দিন।" তিনি হুণ্ডিখানা দেখিয়া আমাদের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলেন, "আমাকে আমীর সাহেব, বাচ্চাএ সাকাও, ও আলী আহম্মদ জান সবাই টাকা কাহাকেও দিতে বা খরচ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি কেমন করিয়া সে আদেশ অমান্য করি? আপনারা বাড়ীতে তার করিয়া দিন টাকা পাঠাইতে। টাকা আসিলে চলিয়া যাইবেন।" অধিক কথা বলা অনর্থক মনে করিয়া

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার লাহিড়ী

ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তার ঘোষ মহাশয়কে সমস্ত কথা বলিতে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের দুই জনকে টাকা কর্জ্জ দিলেন। তাঁহার দয়ায় আজ কয়েক দিন হইল বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আমরা চারবাগ পীর সাহেবের বাড়ীতে থাকিবার সময় আমীর আমান-উল্লা খান এক ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—"হে ছোনোয়ারী, চাপলিয়ারী, খুগিয়ানী! এত দিন আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ তোমরাই করিয়াছ, আমার দিক্ হইতে একটি আক্রমণও এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। আমি তোমাদের অনুরোধ করিয়াছি, যাহাতে মুসলমান রাজত্বে মুসলমান অযথা হত্যা না হয়। তোমরা কিছুতেই শুনিলে না। আমি বুঝিলাম, তোমরা বিনা রক্তপাতে বিরত হইবে না। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমি রমজানের পরে বরফ গলিয়া গেলেই আসিতেছি।" তখন কান্দাহারে ৪ ফুট বরফ ছিল।

চারি মাস কাল বেতন না পাওয়ায় এবং সেখানে কোথাও কর্জ্জ পাইবার আশা না থাকায় আমরা চলিয়া আসিলাম। আমরা আসিবার প্রায় ২৪।২৫ দিন পূর্ব্বে আমীর সাহেব বৈদেশিক দূতগণকে ও প্রবাসী বৈদেশিকগণকে এক নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে, "আপনারা ইচ্ছা করিলে কান্দাহারে কিংবা নিজের দেশে কিছু দিনের জন্য যাইতে পারেন।"

আমরা যখন চারবাগ হইতে আসি, তখন পূর্ব্ব-আফগানিস্থানে কোন শাসনকর্ত্তা বা তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন না।
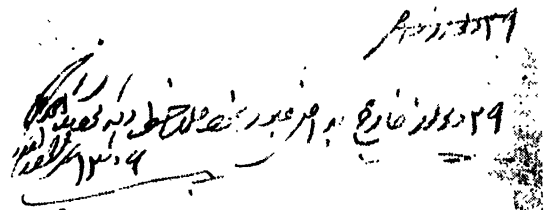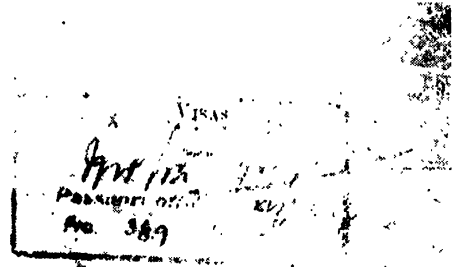
আফগানিস্থানের ছাড়পত্র

সে স্থান সম্পূর্ণ অরাজক। মোল্লা-মৌলভীরাই তথায় তখন প্রবল। যে মোল্লা চুরি করিতে নিষেধ করিতেছেন, তাঁহাকে বিদ্রোহীরা উত্তম-মধ্যম দিয়া বিদায় করিতেছে। আর যে মোল্লা বলিতেছে যে, কাফেরের জিনিষ চুরি করা উচিত, তাহাকে তাহারা মাথায় করিয়া নাচিতেছে।

এখনও আমীর আমান-উল্লার পক্ষে কান্দাহারী ও গজনীর লোক, হিরাটী, হাজারা, তুরকিস্থানী এবং প্রয়োজন হইলে অফ্রেদি ও মোমানরাও যোগদান করিবে, এইরূপ শুনিয়া আসিয়াছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার লাহিড়ী।

সাহিত্যের দরবারে ভুবনের বিচার
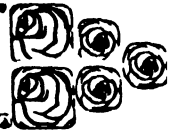
বঙ্গগৌরব প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় "বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে" "ভুবন" নামক যে বালকের পরিচয় দিয়াছেন, তাহারই আখ্যানভাগ বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্যীভূত বিষয়। "ভুবন নামে এক[illegible] বালক ছিল। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন বালক মাসীমার অপ[illegible]ত স্নেহে পরিপুষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ে পুস্তক চুরি আরম্ভ[illegible] এবং চৌর্য্যাপরাধের শেষ পরিণামফলে চরম [illegible] ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত হইয়াছিল।" আখ্যানভাগটির উপসংহার এমনই মনোজ্ঞ যে, পূজ্যপাদ লেখকের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনীপ্রসূত "মাসী, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ" কথাটি বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গের প্রত্যেক গৃহে ও পরিবারের মধ্যে মাসীর শেষ দুর্দ্দশা মাতৃস্বসাদের বা তথাকথিত অভিভাবকদের উপদেশস্বরূপ বিরাজমান।

"বর্ণপরিচয়ের" উল্লিখিত নিরীহ আখ্যানভাগটি বঙ্গের লক্ষ লক্ষ শিশু ও শিক্ষকমণ্ডলী কোনও দিন কোনও কূটতর্কের আশ্রয় না লইয়া নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে কোনও দিন কোন প্রকার আপত্তি সাহিত্য-সমাজে উত্থাপিত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য এমন একটি সজীব আকার ধারণ করিয়াছে, যাহার জন্য এই সমুদয় সরল নিরপবাধ আখ্যায়িকা তোষামোদ-প্রিয় টেক্স্‌ট বুক কমিটীর বা পাঠ্যনির্দ্ধারণ সমিতির অনুগ্রহে সুধী-সমাজের বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। তবুও রস-সাহিত্যে "ভুবনের" স্থান নেহাৎ তুচ্ছ বা হেয় নহে, তাহারই আলোচনার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ঐতিহাসিক স্বীয় সহজ জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন যে, উক্ত আখ্যানভাগটি একটি যুক্তিহীন অসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা কোনও প্রকারে তর্কের আলোকে সুধী-সমাজে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। কোথাকার কোন্ ভুবন কোন্ যুগে কোন্ প্রদেশে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কোথাও কোন প্রাচীন তাম্রফলকে বা শিলোৎকীর্ণ পাঠে কিম্বা আধুনিক ও প্রাচীন পাশ্চাত্য ইতিহাসে "ভুবনের" নামগন্ধ না পাইয়া বঙ্গের ঐতিহাসিকবৃন্দ সন্দিগ্ধ অথচ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন যে, ভুবনের আখ্যায়িকাটি আদ্যোপান্ত মিথ্যা কাহিনী ও কল্পনায় পরিপূর্ণ। আধুনিক ঐতিহাসিকের দল যখন কণ্ঠস্থ বিদ্যার নির্ভুল সোনার কাঠির সাহায্যে "ভুবন" সম্বন্ধে কোনও প্রকার তথ্যের আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাঁহাদেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁহার নিপুণ তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে আধুনিক ঐতিহাসিক দলের চক্ষু কতকটা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। প্রাত্নিক বলিলেন, আধুনিক ঐতিহাসিক পুস্তকাবলী যতই ফুটনোট বা পাদটীকায় পূর্ণ হউক না কেন, তাহার মূল্য কিছুই নাই। ইতিহাসের স্বাধীন গবেষণা বহুকাল হইল এ দেশে মৃতা হইয়াছেন। মৃতবৎসা জননীর সন্তানের গলদেশে যতই অমর ও অব্যর্থ মৃত্যুঞ্জয় কবচ বাঁধিয়া দেওয়া যাউক না কেন, তাহার হতভাগী প্রসূতির মৃতবৎসা-রূপ অভাগ্য প্রকটন ব্যতীত সন্তানের কোনও পরমায়ুর্বৃদ্ধি হয় না। অন্ততঃ ইহাই শিশুবিভাগের আদম সুমারীর (census) রিপোর্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

"ভুবন নামে একটি বালক ছিল", এই বাক্য হইতে প্রাত্নিক সাব্যস্ত করিলেন, "ছিল" শব্দ যখন "অতীত-জ্ঞাপক", তখন "১৯১২ সংবতের ১লা আষাঢ় তারিখ অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ" যে দিন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে "ভুবনের" অস্তিত্ব এ নশ্বর জগতে বিদ্যমান ছিল। আভ্যন্তরীণ (internal) প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ১৯১২ সংবতের পূর্ব্বে ভুবনের অস্তিত্বকল্পনা কখনই ভ্রমাত্মক নহে। কিন্তু কতকগুলি অনৈতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে আখ্যায়িকার শেষভাগ সমাপ্ত হইয়াছে কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়।

চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা যে যুগে প্রচলিত ছিল, ভুবন সেই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে পারি। যেহেতু, চৌর্য্যাপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা এবং ভবলীলার অবসান। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নাই। বৈদিক শাস্ত্র দণ্ডনীতি কিম্বা সমাজনীতির প্রবর্ত্তক নহেন। পরবর্ত্তী সংহিতাকার মনবত্রি-বিষ্ণুহারীত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকদের সংহিতায় চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায় না। সুতরাং আমাদের ভুবন যে সে যুগের লোক নহেন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে প্রাচীন

(Draconian Law) অর্থাৎ গ্রীক আইনের অবস্থাবিশেষে, চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ভুবনকে প্রাচীন গ্রীক জাতীয় লোক সাব্যস্ত করা সমীচীন নহে। যাহারা গ্রীক পণ্ডিত (Xenophon) জনোফন্ ও ভুবনকে এক বংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের যুক্তির মধ্যে কোনও সারবত্তা উপলব্ধি হয় না। কারণ, তাহা হইলে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় "ভুবনের" ইতিবৃত্ত "বর্ণপরিচয়ে" সন্নিবেশিত না করিয়া বৈদেশিক সাহিত্য সঙ্কলিত তাঁহার "আখ্যান-মঞ্জরী" ও চরিতাবলী"র "ডুবাল" "বেকনর" প্রভৃতির সহিত একত্র গ্রথিত করিতেন। আর একটি কথা এ স্থলে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মাতৃ-আজ্ঞা পালনকারী মহাবীর সেকেন্দার বাদশাহ মাতৃকোলে পালিত হইয়া মাতৃ-আজ্ঞানুযায়ী রাজকার্য্য চালাইতেন বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু মাতৃস্বসা-পালিত কোন গ্রীক বীরের পরিচয় আমরা বলিতে পারি না, কিম্বা কোন ইতিহাসে প্রাপ্ত হই নাই। সুতরাং বুঝিলাম, "ভুবন" গ্রীক জাতীয় লোক ছিলেন না।

চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যাহা দৃষ্ট হয়, এ স্থলে তাহারও উল্লেখ করা সঙ্গত বটে। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ "অন্নদামঙ্গলে"র অন্তর্গত "বিদ্যাসুন্দর" নামক উপগ্রন্থে চোর "সুন্দর"কে রাজা বীরসিংহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরিণামে চোর "সুন্দরের" ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহার যে চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহা অবিসংবাদী সত্য। সুতরাং রায় গুণাকর যে সময় কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় "চৌষট্টি কলা"য় বিদ্যমান, তাহার কিছু পূর্ব্বে হয় ত হতভাগ্য ভুবনের আবির্ভাব যুগ। কিন্তু, আপত্তি এই যে, "বিদ্যাসুন্দর" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকে অনেকে কবির কল্পনা-প্রসূত রূপক কাব্য বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কথাটি নেহাৎ উপেক্ষণীয় নহে। ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে "বীরসিংহ" নামক সামান্য একটি প্রাদেশিক নরপতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত দণ্ডাজ্ঞা সমুদয় বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, অনেকে বিশ্বাস করেন না। না করিলেও তাহা বিশেষ দোষাবহ নহে।

আলোচনার কষ্টি-পাথরে যে দিন প্রাত্বিক সাব্যস্ত করিলেন যে, সম্ভবতঃ ইংরাজ যুগের প্রথম আমলে অর্থাৎ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ যখন বঙ্গদেশের গভর্ণরের মসনদে আসীন, সেই সময় বঙ্গদেশে ভুবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বাস্তবিক পক্ষে সেই দিন বঙ্গ ঐতিহাসিকের পক্ষে লোহিত অক্ষরের দিন (red letter day)। বুঝিলাম, যে যুগে "জালিয়াত" অপরাধে ব্রাহ্মণ-পুত্র নন্দকুমারের আইন অনুসারে বিচারে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল, সেই যুগে চৌর্য্যাপরাধে নিশ্চয়ই ফাঁসির ব্যবস্থা ছিল। কারণ, আমরা সাধারণতঃ "চোর" বা "জালিয়াতকে" একই শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করি। এই স্থানে আর [illegible] প্রসঙ্গের অবতারণা করিলে উক্ত অনুমানের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। ইংরাজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল না, যে দুই একটি পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে কোনও পুস্তক অধীত হইত না। তালপাতার বা তুলট কাগজের পুঁথিই তখন ব্যবহৃত হইত। ইংরাজের আমলেই এ দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং পুস্তকাবলীর আবির্ভাব। "ভুবন" "বিদ্যালয়ে" "পুস্তক" চুরি করিয়া সর্ব্বপ্রথমে চৌর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় "ভুবনের" আখ্যানভাগে তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে "হতভাগ্য" ভুবন সশরীরে এই নশ্বর জগতে বিদ্যমান ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক তাহার গবেষণার জয়গর্ব্বে যখন উৎফুল্ল, সেই সময় তরুণ আর্টিষ্টের দল স্মিতহাস্যে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের দলকে উপহাসস্বরে বলিলেন, তর্কশাস্ত্র নামক বাক্যবহুল শাস্ত্রের প্রতীক্ষায় আমাদের ক্ষণভঙ্গুর যৌবনকে উপেক্ষা করিতে পারি না। অনর্থক অতীতের স্মৃতি লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডার কোনও প্রয়োজন নাই। ভুবনের জন্মতিথি কিংবা গোষ্ঠী-পরিচয় কিছু না থাকিলেও আমাদের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। শুধু তাহার নামে এক গল্প-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান আছে, জানিতে পারিলেই আমাদের আর্ট সার্থক বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাই বলিয়া ঐতিহাসিকের নীরস কঠোর ও কঠিন সমালোচনার দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহি, কিংবা সে ধৈর্য্য ও সংযম আমাদের নাই।

হায় রে ভুবন! কবে কোন্ যুগে কোন্ মাতৃস্তন্য-পিতৃসোহাগ-বঞ্চিত আঁতুড়-ঘর হইতে তোমার মাতৃস্বসা স্নেহপরবশে তোমাকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! কোন্ মহীয়সী মধুরিমার সবুজ অন্তরালে শৈশবে নীরস প্রস্তরোপরি প্রোথিত শুষ্ক পাদপ-শিশুর ন্যায় তুমি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলে!

হতভাগী মাতৃষ্বসা কোন্ স্পর্দ্ধাভরে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিদ্যালয়ে তোমাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। হয় ত ভাগ্যহতা বিধবার পদ-তাড়িত কুলাল-যন্ত্রের আশ্রয়লব্ধ লক্ষ্মী-রেণুকাসমষ্টি সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষু গুরুমহাশয়ের তলবানা ও পার্ব্বণিকের মধ্যে নিঃশেষিত হইত! কত নিশিদিন জঠরানলের উদ্দীপ্ত জ্বালায় শুধু দেবী-প্রতিমা মাসীমার স্নেহালিঙ্গনে জঠরাগ্নির [illegible] জালা নির্ব্বাসিত করিয়াছ! ভগবানের রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিনিধি বিষ্ণুদেব যে দিন বৃষরূপী ধর্ম্মের কৃপায় কৃপণ ধনীর গূঢ় ধনাগারে কিংবা উচ্ছৃঙ্খল ধনী-সন্তানের purse বা মুদ্রাগারে সমুদয় ঐশ্বর্য্য প্রেরণ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে বটপত্রের শয্যায় কিংবা শৈলশৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন হইতে বুভুক্ষু নিঃস্ব দরিদ্রের নিরর্থক ক্ষুধিত কোলাহল পালনকর্ত্তার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করে কি না, জানিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই উৎসুক। কৃপণ ধনীর আচরণে সমাজে যে "ভুবনের দল" প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য আধুনিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যতীত অন্য কেহ দায়ী নহেন। যে দিন মহাপ্রাণ ভুবন! তুমি স্পর্দ্ধাভরে কৃপণ ধনিপুত্রকে তুচ্ছ করিয়া তাহারই পৈতৃক ধন-ক্রীত পুস্তক সম্বন্ধে কোনও দ্বিধাপ্রকাশ না করিয়া ন্যায্য অধিকারে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলে, তাহাতে তোমার মাতৃষ্বসা তোমাকে শাসন করিলেন না বলিয়া নৈতিক গুরু আক্ষেপ প্রকাশ করেন। নীরস, কঠোর, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরপ্রচলিত সংহিতা-শাসিত নীতির অনুবর্ত্তনে তোমার কার্য্যকে পাপ ও অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার "নীতিবোধ"কে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। সমাজ ও সাহিত্যের বর্ত্তমান নায়ক, সাহিত্যের সমবেদনারসে যে দিন এই সমস্ত গতানুগতিক অতীত নীতি-শাসিত অপরাধকে আর্টের মহিমোজ্জল করুণায় আমাদের সম্মুখে প্রতিফলিত করিলেন, তখনই বুঝিতে পারিলাম—অতীতের নীতিশাস্ত্র বা তথাকথিত সংহিতাশাসিত সমাজের সহিত বর্ত্তমান সমাজের কোনও co-operation বা সহযোগ সম্ভবপর নহে। যেহেতু, কবির তুলিকা-চিত্র "শ্রীকান্তের" "ইন্দ্রদা" স্বর্গমন্ত্র শিক্ষার অছিলায় কিংবা "অন্নদাদিদির" স্নেহের প্রতিদানস্বরূপ যে সমুদয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তোমার কার্য্যাবলী কখনই হেয়তর নহে। মাতৃস্বরূপিণী মাসীমাতাকে পালন করিবার জন্য কৃপণ ধনীর বিরুদ্ধে তুমি যে যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছিলে, অদ্যাপিও তাহার অবসান হইল না, পরন্তু ভীষণতর বেগে তাহা সমুদয় সভ্য জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। প্রতীচ্য জগতের সাম্রাজ্যবাদী, শ্রেষ্ঠ দাম্ভিক জার্ম্মাণী যখন "কুলটুর" (kultur) লইয়া সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার চেষ্টায় হতাশ্বাস হইলেন, তখনই অত্যাচারমুক্ত সোভিয়েট রাসিয়া "লেনিনে"র কর্ত্তৃত্বে ধনগর্ব্বিত আভিজাত্যের বিরুদ্ধে তোমার ন্যায় যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। শত শত বর্ষের কঠিন রাজনৈতিক তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত সভ্য সমাজ আজ তোমারই আদর্শে সদর্পে ধন-গর্ব্বিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছেন। যে অচলায়তন বৃদ্ধ-সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য আমরা অভিযান করিতেছি, তাহারই বিরুদ্ধে না জানি কোন্ অতীত শতাব্দীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া তুমুল বিক্রমে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলে। হে ভুবন! তুমি কি আমাদের সোভিয়েট রাসিয়ার পূর্ব্ব-পুরুষ—না আমাদের ন্যায় অন্ধের পথিপ্রদর্শক কর্ম্মবীর!

হে চির-সবুজ ভুবন! তুমি এই নশ্বর সংসার হইতে বিদায়-গ্রহণকালে কেন যে আজন্ম-প্রতিপালনকারিণী মাতৃষ্বসার কর্ণচ্ছেদ করিয়াছিলে, তাহার মীমাংসা বর্ত্তমান স্বার্থোদ্ধত সমাজে অসম্ভব। আমরা যদি সেই যুগে আবির্ভূত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে, সংঘবদ্ধ আমরা, সেই কঠিন রাজপুরুষ, যাঁহার লেখনী-সঞ্চালনে এত বড় একটি মহাপ্রাণ এই হতভাগ্য দেশ হইতে অনন্তের পথে প্রধাবিত হইল, সেই রাজপুরুষ ও তাঁহার আদালত সম্বন্ধে এমন একটা গুরু সনাতন সত্যাগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিতাম, যাহাতে তোমার মাতৃষ্বসার প্রতি তোমার কোনও কাপুরুষ আচরণ করিতে হইত না। কিন্তু জানি না, কোন দুর্ব্বল ধর্ম্ম ও নীতির পথিভ্রষ্ট মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তুমি তোমার কৃত শেষ বীর-কার্য্যকে প্রাচীন নীতির হিসাবে চৌর্য্যাপরাধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে! যে প্রাচীন অচলায়তন সমাজ ও ধর্ম্মের কুসংস্কার তোমার মহানুভব চরিত্রে এই দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান যুগে বিলুপ্ত হইলেও আমাদের যুগ-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে অতীত ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির কুশিক্ষায় প্রণোদিত হইয়া ন্যায়-ধর্ম্মানুমোদিত সমাজ-রক্ষাকারী এত বড় একটি মহৎ কার্য্যকে যুগাবতার তুমি,

অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, তাহার ধ্বংসসাধন করা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। যেহেতু, আর্টের বিশ্ববিজয়ী (workshop) বা কারখানায় কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ধর্ম্ম ও সমাজ বুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত ও লুপ্ত হইতেছে। কবে কোন্ যুগের প্রারম্ভে কোন্ অদৃষ্টপূর্ব্ব সোভিয়েট রাসিয়ার অজ্ঞাত, অব্যক্ত দ্যোতনায় প্রণোদিত হইয়া আভিজাত্যের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলে, তাহা আমরা জানি না। তবে যে অতীতের অচলায়তনকে ধ্বংস করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদা উন্মুখ, হে চির-নূতন, চির-সবুজ ভুবন! তুমি তাহারই অগ্রগামী দূত। তুমি চির-অনবদ্য, সুতরাং ভূত-ভবিষ্যতের সন্দেহ-প্রহেলিকা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। হে চির-বর্ত্তমান! হে চির-সবুজ ভুবন! তোমার আবির্ভাব দারিদ্র্যক্লিষ্ট ইহ-সংসারে যুগে যুগে সম্ভব।

আর্টিষ্ট যখন করুণ-গীতি সহকারে "ভুবন"কে আর্টের একটি মস্ত আদর্শস্বরূপে সভ্যজগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন, সে সময় প্রাচীনের দল এমন একটি কঠোর অযথা আর্ত্তনাদে দেশমাতাকে সজাগ করিয়া তুলিলেন যে, হতভাগী শুধু জৃম্ভণ ত্যাগপূর্ব্বক পার্শ্বপরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোনও জীবনীশক্তির পরিচয় দিলেন না। দেশমাতৃকার নির্ব্বেদ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সুসন্তানদল ভুবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হারম্যান কোম্পানীর প্রস্তুত গেরুয়া বসনে সজ্জিত, রিমেলের ভস্মাচ্ছাদিত দেহে ও হ্যামিণ্টনের রৌপ্য-চিম্‌টা হস্তে শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া হারল্ডের হারমোনিয়াম সংযোগে জাতীয় সঙ্গীতের প্রবল তাড়নায় দেশমাতার চৈতন্য উৎপাদনে যত্নপর হইলেন। জানি না, কোন কুহকিনীর মোহ-মন্ত্রবলে চালিত হতভাগী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া গুজরাটের ও পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক আফগানিস্থান ও পারস্য দেশের দিকে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন!

ভাবিলাম, ইতিহা[illegible] আর্টের সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়োজন, কিংবা তদুপযোগী ব[illegible] আমাদের নাই। যিনি যেমনই 'সবুজ' হউন না কেন [illegible]হাকেই যে বৃন্তচ্যুত পত্রের মত আগামী কল্য নীরস[illegible] প্রাচীনতার ধূলিকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, ইহাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পরীক্ষিত সত্য। বর্ত্তমান, তাহার চির-সবুজ মনোজ্ঞ কান্তিতে যখন ধূসর-বর্ণ-সমাচ্ছন্ন অতীতকে তুচ্ছ করিয়া সদর্পে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই (perfect tense) অর্থাৎ অনন্ত-অতীতকে আমরা শঙ্কিত চিত্তে ভাবিতে থাকি, আর একটুকু এক পদ অগ্রসর হইলে চিরযৌবন "সবুজ" অন্যতম মনোহর কান্তি পরিহারপূর্ব্বক ভবিষ্যতের বিচারে অতীতের হরিদ্বর্ণ ধারণ করিবে। বর্ত্তমান "সবুজ" ভবিষ্যের বিচারালয়ে যতই বৃদ্ধ হউক না কেন, তাহার আপাতঃমনোজ্ঞ কান্তি উপভোগ্য বটে। আর্টিষ্টের দল স্বাভাবিক সুন্দর সুমধুর বিনয়নম্র গীতিস্বরে আত্মনিবেদন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া অন্যতন সবুজ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমুহূর্ত্তে ভবিষ্যের অন্তরালে আমাদের ন্যায় বৃদ্ধ সাজিয়া বসিল, ইহাই বর্ত্তমান আর্টের সর্ব্বাপেক্ষা করুণ ক্রন্দন!

শ্রীবিনোদলাল মজুমদার (বি, এল)।

এস বৈশাখ

এস বৈশাখ, জয়-পতাকা তুলি'
বিজন গহন বন-পথে,
হাস ঝলসি', এস রণরঙ্গে
ঝঞ্ঝা-বহা রাঙা রথে।
শিথিল সুপ্তি সব টুটি',
ভীষণ বিষাণ তব বাজায়ে,
এস লৌহ আগার,
আর দুর্গ-দুয়ার,
ঝন্‌ঝনি, থরথরি কাঁপায়ে॥

এস থরকর ঘন ঘোর আঁধারে,
হরষ ভরসা আন প্রাণে,
রুধির নাচায়ে দাও শিরায় শিরায়,
রুদ্র হে, অশনির গানে।
এস বৈশাখ, এস বীর বৈশাখ,
প্রলয়, তুফান, ঝড় সাথে,
শক্তির অপলাপ,
আবিলতা সব পাপ
ঘুচায়ে দাও হে এ প্রভাতে॥

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর *

কলিকাতা হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে গঙ্গার পশ্চিম পারে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রসিদ্ধ ষ্টেসন—সাঁতরাগাছি। এই ষ্টেসনের কিছু দূরে ঐ নামের গ্রামেই ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। কোথা হইতে এবং কোন্ সময়ে তাঁহারা এই গ্রামে প্রথম আগমন করিয়া ছিলেন, তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর

সাঁতরাগাছির করবংশ অতি সম্ভ্রান্ত পরিবার। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের প্রপিতামহ রামমোহন কর এবং পিতামহ ভৈরবচন্দ্র কর উভয়েই প্রতিপত্তিশালী ও অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহাদের নীলকুঠী ছিল এবং তাহার আয়ে হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সমারোহের সহিত তাঁহাদের গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। পিতামহ ভৈরবচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল ও মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেয়ারম্যান্ গোপাললাল মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভাগনীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র স্বনামখ্যাত ডাক্তার দুর্গাদাস কর এবং তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর।

দুর্গাদাসের বয়স যখন ২।৩ বৎসর, তখন তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সে সময়ে গোপাললাল মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ মিত্র গভর্ণমেণ্ট্ হাউসের তোষাখানার দেওয়ান ছিলেন। দুর্গাদাস বালককালেই লেখাপড়ার জন্য কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল রামপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ ডফ্ স্কুলে ও তৎপরে কলিকাতা মেডিকাল্ কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকাল্ কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী বিভাগে সরকারী চাক্‌রী গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম চাক্‌রীস্থল বরিশাল। ভারতে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি বরিশালেই ছিলেন। যখন ঢাকায় মিট্‌ফোর্ড্ হস্‌পিটাল্ (Mitford Hospital) স্থাপিত হয়, তখন তিনি বরিশাল হইতে ঢাকায় গমন করিয়া প্রায় ৬।৭ বৎসর উক্ত হাসপাতালে কার্য্য করেন। তাঁহার চেষ্টায় ঢাকার হাসপাতাল সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে এই হাসপাতালে অনেক দেশী গাছগাছড়ার, ঔষধ হিসাবে

---

* বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। এই অধিবেশনে ডাক্তার করের তৈল-চিত্র উন্মোচিত হইয়াছিল।

গুণাগুণ পরীক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঢাকা হইতে কলিকাতা মেডিকাল কলেজে বদলী হইয়া আসেন।

সেই সময়ে কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ইংরাজী শিক্ষা-বিভাগের সহিত একটি বাঙ্গালা শিক্ষা-বিভাগ (Vernacular Department) সংযুক্ত ছিল। তাঁহাকে এই বাঙ্গালা বিভাগে ভৈষজ্য-তত্ত্বের (Materia medica) শিক্ষকরূপে ঢাকা হইতে কলিকাতায় আনয়ন করা হইয়াছিল। মেডিকাল কলেজের এই বাঙ্গালা শিক্ষা-বিভাগ পরে একটি স্বতন্ত্র মেডিকাল স্কুলে পরিণত হয়; এক্ষণে উহা ক্যাম্পবেল্ মেডিকাল স্কুল নামে পরিচিত। ডাক্তার দুর্গাদাস কর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন এবং মেডিকাল কলেজের বাঙ্গালা শিক্ষাবিভাগে ৯ বৎসর কাল অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় ১০৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থিত বাটী ক্রয় করেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উহার সংস্কারসাধন করেন। ডাক্তার দুর্গাদাস কর কলিকাতায় অবস্থানকালীন ভৈষজ্য-রত্নাবলী নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট দুর্গাদাস করের মেটিরিয়া মেডিকা নামে সুপরিচিত। চিকিৎসাবিজ্ঞান-বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বহুতথ্যপূর্ণ সাধারণের বোধগম্য প্রয়োজনীয় পুস্তক বোধ হয় আর একখানিও এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তকখানি, বাঙ্গালাভাষা এবং বাঙ্গালী জাতিকে ডাক্তার দুর্গাদাস করের অপূর্ব্ব ও অমূল্য দান। ইহার জন্য বাঙ্গালার চিকিৎসা-সমাজে দুর্গাদাস করের নাম চিরদিন স্মরণীয় থাকিবে।

ডাক্তার দুর্গাদাস কর কলিকাতার হোগলকুড়িয়া-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ৪ পুত্র এবং ৫ কন্যা। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং অপর তিন পুত্রের নাম রাধামাধব, রাধারমণ ও রাধাকিশোর। রাধারমণ কর আমার সমবয়স্ক ও সহপাঠী ছিলেন।

রাধাগোবিন্দ তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি সাঁতরাগাছিতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আট মাসে তিনি ভূমিষ্ঠ হন, এই জন্য তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে বাল্যকালে তিনি "আটাশে ছেলে" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি হেয়ার্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা পাশ করেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু নানাবিধ পারিবারিক গোলযোগ হেতু এবং যুবজনসুলভ তরল আমোদ-প্রমোদে তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায় এক বৎসরমাত্র ডাক্তারী পড়িয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে কতিপয় শিক্ষিত যুবকের উৎসাহে ও উদ্যোগে কলিকাতায় অবৈতনিক সাধারণ নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাধাগোবিন্দ ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রাধামাধব, উভয়েই অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত এই নূতন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমাদের পল্লীতে ৺রাজেন্দ্র পালের বাটীতে [illegible] নাট্য-সম্প্রদায় দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নামক নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। আমি তখন স্কুলের ছাত্র, বয়স ১১।১২ বৎসর। সেই অভিনয় দর্শন করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল এবং ডাক্তার করকে "সারদাসুন্দরীর" অভিনয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি সেই প্রথম, কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং সেই সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যান্য খ্যাতনামা অভিনেতার অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর পুলিসের হস্তে বিনাপরাধে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। ৺শ্যামাপূজা উপলক্ষে বাজী পোড়ান লইয়া এই হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রতিবাসী ও আত্মীয় কোন বালক গোপাললাল মিত্র মহাশয়ের বাটীর বড় রাস্তার ধারের প্রাচীরের উপর তুবড়ি রাখিয়া পোড়াইতেছিল। বীটের (Beat) কনেষ্টবল্ তাহা জোর করিয়া ফেলিয়া দেয়। ইহাতে তাহার সহিত ডাক্তার করের ভ্রাতাদিগের এবং অন্যান্য প্রতিবাসীদিগের বচসা হয় এবং কনেষ্টবল্ তাঁহাদিগের দ্বারা প্রহৃত হয়। সে সময়ে ডাক্তার কর বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসেন, তখন পুলিস দলবল লইয়া তাঁহার বাটী ঘেরাও করে। যাহারা মারিয়াছিল, তাহারা তৎপূর্ব্বে সকলেই ঘটনাস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিল, কেহই সে বাটীর মধ্যে উপস্থিত ছিল না। প্রহৃত কনেষ্টবল্ আসিয়া ডাক্তার করকে এক জন দাঙ্গাবাজ বলিয়া সনাক্ত করে এবং তিনি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। নিরপরাধ প্রমাণের তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল, তিনি ১৫ দিনের জন্য শ্রম-রহিত কারাবাসে (Simple imprisonment) দণ্ডিত

হইলেন। সময়ে সময়ে পুলিসের হস্তে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে যে দণ্ডভোগ করিতে হয়, এই ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই সময়ে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইনি লাহোরের প্রসিদ্ধ উকীল যোগেন্দ্র[illegible] বসু এবং হোগলকুড়িয়ার ডাক্তার সুরথচন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয়ের [illegible]নী ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না।

উপরি-উক্ত দুইটি ঘটনার সমাবেশে [illegible]র করের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এই সময়ে, স[illegible]পনাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য তাঁহার অন্তরে একটা প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ উপস্থিত হয় এবং এই আগ্রহই তাঁহাকে পুনর্ব্বার চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করে। তিনি ১৮৮০।১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথাকার তৃতীয় বার্ষিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের বিখ্যাত ডাক্তার আশুতোষ মিত্রের সহিত একত্র চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গমন করেন এবং এডিন্‌বরা হইতে L. R. C. P. ডিপ্লোমা গ্রহণ করিয়া ১ বৎসর পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্যামবাজারস্থ নিজ বাটীতে থাকিয়া তিনি চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পল্লীর মধ্যে তাঁহার পসার বেশ জমিয়া যায়। তিনি একাধারে Physician এবং Surgeon ছিলেন। তাঁহার নিজ বাটীতেই অস্ত্র-চিকিৎসার উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা ছিল এবং অনেক দরিদ্রের কঠিন রোগের অস্ত্র-চিকিৎসা এই স্থানেই সম্পন্ন হইত। বিষ-চিকিৎসায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এ অঞ্চলে কোন ব্যক্তি আত্মহত্যার জন্য বিষ ভক্ষণ করিলে ডাক্তার করকেই লোক ডাকিত এবং এই চিকিৎসায় তাঁহার হাতযশও যথেষ্ট ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্লেগ রোগ কলিকাতায় যখন প্রথম দেখা দেয়, তখন প্লেগ-রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। ইহাতে সহরের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে একটা ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং শত সহস্র বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সহর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এই উপলক্ষে কলিকাতায় একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন সার্ জন্ উডবর্ণ বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন। তাঁহার হৃদয় দয়া ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি রোগীকে তাহার আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা সাধারণভাবে নিরোধ করেন এবং গৃহস্থের বাটীর একপ্রান্তে অবস্থিত একটি সুপরিষ্কৃত গৃহে অথবা সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপর অল্প খরচে একটি কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্লেগ-রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছিলেন। সার্ জন্ উডবর্ণের এই সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার কার্য্য দ্বারা, আগুনে জল ঢালার মত, সমস্ত গোলযোগ অল্পদিনের মধ্যেই নির্ব্বাপিত হইল। সেই সময়ে ডাক্তার কর তাঁহার পল্লীবাসীদিগের মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পল্লীর প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে কোথায় রোগীর জন্য গৃহ প্রস্তুত হইতে পারে, পূর্ব্ব হইতে তাহা নির্ণয় করিবার ভার সরকার কর্ত্তৃক তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং তিনি ব্যক্তিগত সুখস্বচ্ছন্দতা, এমন কি, নিজ ব্যবসায় পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া, দিনের পর দিন নিজেকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতিবাসী ও পল্লীবাসিগণকে মহামারী হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন। এই একটি কার্য্য দ্বারাই তাঁহার সহৃদয়তা ও মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাঁহার বাটীর বাহিরের রোয়াক্ পল্লীর "চণ্ডীমণ্ডপ" বা বৈঠকখানা ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তথায় বহু লোক একত্র হইয়া সাময়িক নানা বিষয়ের আলোচনা ও গল্পগুজবে ২।৩ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতেন।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় এই বৈঠকের এক জন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁহার রচিত কবিতা-পুস্তকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৈঠকে বসিয়া শ্যামপুকুর তেলিপাড়া-নিবাসী ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমার জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাকে রাজকার্য্য উপলক্ষে শীঘ্র সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার গণনা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। ইহার কিছু দিন পরে, সরকারী চাকরী উপলক্ষে এক বৎসরের জন্য আমাকে উত্তর-ব্রহ্মদেশে যাইতে হইয়াছিল।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের দুইটি কার্য্যের জন্য বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালা ভাষা চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে :—

(১) দেশে চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার বিস্তারকল্পে

ঐকান্তিক চেষ্টা—এবং (২) চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ পুস্তক রচনা বা সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সম্পদবৃদ্ধি এবং পুষ্টিসাধন করা।

(১) বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামে সুচিকিৎসকের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গড়ে ২০ হাজার ৩০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে এক জন মাত্র উপাধিধারী, পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিলে পাওয়া যায়। ইহার ফলে সুদূর পল্লীগ্রামে অনেক লোক বিনা চিকিৎসায়, এমন কি, এক বিন্দু ঔষধ না পাইয়া, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তার পূরণ করিবার জন্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বঙ্গদেশের অন্যান্য বিভাগে এক একটি নূতন মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বাঁকুড়াতে ক্রিশ্চিয়ান্ মিশন্ কর্তৃক আর একটি মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হ[illegible]।

এই দেশব্যাপী অ[illegible] কিঞ্চিৎপরিমাণে দূর করিবার জন্য ডাক্তার কর ১৮৮৭ [illegible] অনধিক ১২ জন মাত্র ছাত্র লইয়া কলিকাতা মেডি[illegible] স্কুল স্থাপন করেন। তিনি এই স্কুলের সম্পাদক এবং [illegible] অমূল্যচরণ বসু সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুত অমৃতলাল বসু

ডাক্তার জগবন্ধু বসু

কর এই অভাব কতক পরিমাণে দূর করিবার জন্য দেশে চিকিৎসা-শিক্ষার বিস্তারকল্পে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, বে-সরকারী মেডিকাল স্কুল বঙ্গদেশে তাঁহারই চেষ্টায় প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। তখন বঙ্গদেশে তিনটিমাত্র সরকারী মেডিকাল স্কুল ছিল, যথা, কলিকাতার ক্যাম্পবেল্ মেডিকাল স্কুল, ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল এবং কটক মেডিক্যাল স্কুল। এই তিনটি স্কুলেই তখন দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। কিন্তু ইহা দ্বারা বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসকের অভাব তখনও মিটিত না এবং এখনও মিটে নাই। এই অভাব যথাসম্ভব ছিলেন। রায় বাহাদুর ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কমিটীর সভাপতি ছিলেন। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সার্ নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণধন বসু, এম্, এন্ বানার্জ্জি, সুরথচন্দ্র বসু, ভোলানাথ বসু, সুন্দরীমোহন দাস, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদনাথ গাঙ্গুলী, এম্ এল্, দে প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা চিকিৎসক এই স্কুলস্থাপনে ডাক্তার করের সবিশেষ সহায়তা করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বিবিধ বিষয়ে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। অপার্ সার্কুলার রোডের ২৯৮নং বাটী ভাড়া করিয়া এই স্কুল স্থাপিত হয়। শুনিয়াছি,

ডাক্তার কর একখানি খোলার ঘর ভাড়া লইয়া এই স্কুলের কার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন। 'ইণ্ডিয়ান্ মিরারের' তদানীন্তন সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন এই স্কুলের ট্রষ্টীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহীশিষ্য ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় ... সময়ে এই স্কুলে রসায়নবিজ্ঞানের শিক্ষকতা করিতেন।

স্কুল যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ছাত্রদিগকে তথায় তিন বৎসর পড়িতে হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ... অধ্যয়নের কাল আর এক বৎসর বৃদ্ধি করা হয়। ... বৎসরেই ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য স্কুলের বাটীতেই ১৪ জন রোগী লইয়া একটি হাসপাতাল খোলা হয়; ভবিষ্যতে ইহাই এল্‌বার্ট ভিক্টর্ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার্ জন্ উডবর্ণ বেলগাছিয়াতে এল্‌বার্ট ভিক্টর্ হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মোচন করেন। এল্‌বার্ট ভিক্টর্ সম্বর্দ্ধনা কমিটী চাঁদার উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ১৫ হাজার টাকা এই হাসপাতালের বাটী-নির্ম্মাণের জন্য ডাক্তার করের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস.

ডাক্তার করের ক্ষুদ্র বিদ্যালয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কার্ম্মাইকেল মেডিকাল কলেজ নামে একটি সুবৃহৎ বর্ত্তমান কালের উপযোগী মেডিকাল কলেজে পরিণত হয় এবং ঐ বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ বি পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার জন্য আংশিকভাবে এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতিলাভ করে। এই পূর্ণসম্মতি পাইবার সময়ে ভারত-গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা-বিভাগের ডিরেক্টর্ জেনারল সার্ পাড্রি লিউকিস্ (Sir Pardrey Lukis) সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রায় ৬ শত যুবক এই নব প্রতিষ্ঠিত মেডিকাল কলেজে সুশিক্ষা লাভ করিতেছে এবং প্রতিবৎসর অনেকানেক ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের যশ ও সম্মান রক্ষা করিতেছে। এল্‌বার্ট ভিক্টর্ হাস্‌পাতালের পরিসর (Indoor and Out-door) এক্ষণে সবিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়া কলিকাতার উত্তরপ্রান্ত ও নগরের উপকণ্ঠস্থিত বহুসংখ্যক দরিদ্র রোগীর আরাম ও আশ্রয়স্থল হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা সহরের উত্তর অঞ্চলের একটি প্রকৃত অভাব দূর হইয়াছে। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, ডাক্তার কর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নানা দৈন্য ও অভাবপীড়িত এবং সাধারণের নিকট একপ্রকার উপেক্ষিত একটি বাঙ্গালা মেডিকাল স্কুল, কালে সরকার-প্রতিষ্ঠিত প্রায়শতায়ুজীবী কলিকাতা মেডিকাল কলেজের সমকক্ষতা করিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞান-শিক্ষাসম্বন্ধে দেশের একটা প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইবে! সুখের বিষয় এই যে, ডাক্তার কর তাঁহার স্বহস্তে রোপিত ক্ষুদ্র বীজকে শাখাপত্রপুষ্পফলশোভিত বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইতে দেখিয়া যাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। এই চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন এবং ইহার উন্নতিসাধনকল্পে ডাক্তার কর যে মহৎ আত্মত্যাগ, উদ্যম, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং স্বদেশ-প্রেমিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে সুদুর্ল্লভ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি এক দিনের জন্যও আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন এবং সকলের পশ্চাতে থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

তিনি দেশের লোকের নিকট হইতে এ বিষয়ে প্রথমে সবিশেষ উৎসাহপ্রাপ্ত হন নাই, অধিকন্তু অনেকেই তাঁহাকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ডাক্তার কর তাঁহার নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়

তাঁহাকে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সাধারণ স্কুল ও মেডিকাল স্কুল স্থাপন করা, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কয়েকখানা বেঞ্চ ও চেয়ার লইয়া একটা সাধারণ স্কুল স্থাপন করা যায়, কিন্তু মেডিকাল স্কুল স্থাপন করিতে হইলে বিস্তর অর্থ, সরঞ্জাম ও লোকবলের প্রয়োজন। উপযুক্ত সরঞ্জামের এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের যোগাড় না হইলে মেডিকাল স্কুল একটা ভুয়া জিনিষ হইবে মাত্র; তাহা দ্বারা দেশের কাষ হইবে না। যাহা হউক, দেশের লোকের সহানুভূতির অভাব ও নিরুৎসাহের স্রোত ডাক্তার করের অদম্য উৎসাহ ও উদ্দাম কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত বা বন্দীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা তাঁহার জীবনের চিরঈপ্সিত মহাব্রতকে সাফল্যদান করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন এবং পরে দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে উৎসাহ, সহানুভূতি এবং অর্থানুকূল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই মেডিকাল স্কুলের পরিণতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া যাইবে, সুতরাং উহা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত College of Physicians & Surgeons of Bengal নামক একটি বে-সরকারী কলেজের সহিত সম্মিলিত হয় এবং এই সম্মিলিত বিদ্যালয়ের কলেজ বিভাগে ইংরাজীতে এবং স্কুল বিভাগে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। রসায়ন-বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং মেডিকাল জুরিসপ্রুডেন্সের পরীক্ষকরূপে এই বিদ্যালয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর ডাক্তার করের কার্য্যের সহায়তা করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল এবং তাঁহারই অনুরোধে ঐ সময়ে আমি "ফলিত রসায়ন" নামক রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় প্রথম প্রকাশ করি। বেলগাছিয়ার যে স্থানে এখন কারমাইকেল মেডিকাল কলেজ অবস্থিত, উহা ১২ বিঘা জমি-সমেত একটি বাগানবাড়ী ছিল। ডাক্তার কর তাঁহার স্কুলের জন্য ঐ বাগানবাড়ী [illegible] হাজার টাকায় ক্রয় করেন এবং সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া স্কুল ও কলেজ ঐ বাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যুবরাজ প্রিন্স এলবার্টের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য চাঁদা তোলা হয় এবং সম্বর্দ্ধনা কমিটী উদ্বৃত্ত টাকা যুবরাজের নামে একটি হাসপাতাল খুলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ডাক্তার করের হস্তে প্রদান করেন। এই টাকা হইতেই ঐ সম্মিলিত বিদ্যালয়ে যুবরাজের নামে একটি হাসপাতাল খোলা হয়। কিছুকাল পরে গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবে সম্মিলিত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বাঙ্গালা স্কুল বিভাগ উঠাইয়া দিয়া শুদ্ধ ইংরাজী কলেজ বিভাগ সংরক্ষণ করেন এবং উহা কারমাইকেল মেডিকাল কলেজ নামে অভিহিত হইয়া এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কলেজের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গালার বদান্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া হাসপাতাল যদিও এক্ষণে বিশেষ ভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে, তথাপি এখনও ইহার অনেক অভাব

কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজের চক্ষুরোগ বিভাগের ডাক্তার ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েটগণ

রহিয়াছে এবং তন্নিবারণার্থ কলেজের অধ্যক্ষগণ সম্প্রতি অর্থসাহায্যের জন্য সাধারণের নিকট পুনরায় আবেদন করিয়াছেন। কারমাইকেল মেডিকাল কলেজ বাঙ্গালীর একটি জাতীয় গৌরব। আশা করি, ইহার উন্নতির জন্য এবং ইহার মর্য্যাদারক্ষাকল্পে জনসাধারণ যথোচিত অর্থসাহায্য করিতে পশ্চাদ্পদ হইবেন না।

বঙ্গ-জননীর বরেণ্য-সন্তান স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ডাক্তার করের নিকট-আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই ডাক্তার করের মেডিকাল স্কুলের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ভূপেন্দ্র বাবুর অনুরোধে বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল কলিকাতা কর্পোরেসন হইতে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। স্কুল উঠাইয়া দিয়া কলেজ গঠনের সময়ে লর্ড কারমাইকেলের গভর্ণমেণ্ট যথোচিত অর্থ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেলের এই বদান্যতার জন্য তাঁহার নামে এই কলেজের নামকরণ করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের সরকারী নাম কারমাইকেল মেডিকাল কলেজ হইলেও আজি পর্য্যন্ত ইহাকে লোকে "কর সাহেবের স্কুল" এবং "কর সাহেবের হাসপাতাল" বলিয়া থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে এই নামে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। ডাক্তার করের নাম ইহার সহিত প্রকাশ্যভাবে জড়িত না থাকিলেও চিরদিন ইহার সহিত যে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত থাকিবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ডাক্তার কর "আটাশে ছেলে" ছিলেন। আমাদের দেশে সাধারণের বিশ্বাস যে, "আটাশে" সন্তান অন্যান্য সন্তান হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে এবং একটা না একটা কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া যায়, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক। ডাক্তার কর যে সুকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য

বাঙ্গালার চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

(২) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা মেডিকাল স্কুল কালে মেডিকাল কলেজে পরিণত হইলেও দেশে বাঙ্গালাভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাহাতে সবিশেষ প্রসারলাভ করে, তিনি তাহার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইহার অভাব তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কর তাঁহার রচিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, "বাল্যকাল হইতে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, নিজের দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে, মাতৃভাষার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আমার স্বল্প বিদ্যায় ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতদূর সাধ্য, তাহার সমাধানে ত্রুটি করি নাই।" এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাকার্য্য ও স্কুলের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া তাঁহার যাহা কিছু অবসর থাকিত, তাহা তিনি চিকিৎসা-বিষয়ক বিবিধ পুস্তকরচনায় নিয়োগ করিতেন এবং ইহার ফলে বাঙ্গালাভাষার চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিভাগ গ্রন্থসম্পদে সবিশেষ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তিনি বাঙ্গালাভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভাষার যে শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন, ইহার জন্য বাঙ্গালাভাষা চিরদিন তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। বোধ হয় বাঙ্গালাদেশে এ বিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি তাঁহার পিতার রচিত, বাঙ্গালী ডাক্তারমাত্রেরই নিকট [illegible] রচিত "ভৈষজ্যরত্নাবলী" নামক সুবৃহৎ মেটিরিয়া মেডিকার ২৭টি সংস্করণ করিয়া গিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

এই গ্রন্থ তাঁহার পিতৃদেব ডাক্তার দুর্গাদাস কর কর্তৃক ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে কোন ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় এরূপ বৃহৎ ও মূল্যবান কোন পুস্তক প্রকাশ করিবার বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং ইহার পরেও বাঙ্গালাভাষায় এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা যেমন প্রয়োজনীয়, চিকিৎসকের পক্ষেও ইহা তদ্রূপ উপকারী। এক সময়ে পল্লীগ্রামের অনেকানেক ছোটখাট ডাক্তার কেবলমাত্র এই পুস্তক অবলম্বন করিয়াই সুযশ ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে যে সকল ক্রমোন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, ডাক্তার কর তৎসমুদায় এই পুস্তকের পরের পর সংস্করণে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের আকার ও প্রয়োজনীয়তার বৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকের আকার খুব বড়, ১২১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং বিস্তর

গাছ-গাছড়ার চিত্র দ্বারা পরিশোভিত। এই পুস্তকের সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টি সংস্করণ হইয়াছে। শেষ দুই সংস্করণ ডাক্তার করের পরলোকগমনের পর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় আর কোন পুস্তকের ২৯টি সংস্করণ হইয়াছে কি না, ইহা আমার জানা নাই। ইহার মূল্য ১২ টাকা। এই সকল চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয়ের জন্যই বোধ হয় স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরীর প্রবর্ত্তন করেন।
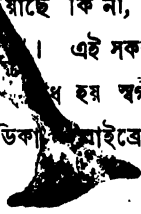
১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কর বাঙ্গালায় এনাটমি (Anatomy) সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের নাম "সংক্ষিপ্ত শারীর-তত্ত্ব"। এই পুস্তকখানির ছয়টি সংস্করণ হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালা মেডিকাল স্কুলের ছাত্রসমূহের পাঠ্য-পুস্তক। ইহার চিত্রগুলি অতি উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়জ্ঞাপক। ইংরাজীতে Gray's Anatomy যেরূপ মূল্য-বান পুস্তক, বাঙ্গালাভাষায় ইহা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহা ৮৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার মূল্য ১২ টাকা। ডাক্তার করের যাবতীয় গ্রন্থ কলিকাতার বিখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, "কর সিরিজ" (Kar Series) নাম দিয়া এতাবৎকাল প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

"ভিষক্-সুহৃদ্" (The Physician's Vade Mecum) ডাক্তার করের আর একখানি সুবৃহৎ, বহুচিন্তা ও পরিশ্রমপ্রসূত ডাক্তারী গ্রন্থ। ইহাতে যাবতীয় রোগের উৎপত্তি, নিদান ও চিকিৎসা আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অস্‌লারের Principles and Practice of Medicineএর ন্যায় ইহা বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহার ১৪টি সংস্করণ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ছাত্র ও চিকিৎসকের পক্ষে এই গ্রন্থ কিরূপ প্রয়োজনীয় ও উপকারী। ইহা ১২২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং অনেকগুলি চিত্রসমন্বিত। ইহার মূল্য ১২ টাকা।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কর, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ ডাক্তার সেফারের (Schaeffer) "Atlas and Epitome of Gynœcology" নামক পুস্তকের, "স্ত্রীরোগের চিত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব" নাম দিয়া বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। যাবতীয় স্ত্রীরোগের বিবরণ, রোগনির্ণয় ও তাহার চিকিৎসা এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। ইহা সচিত্র এবং ইহার দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। ইহা ৩৪৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কর শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার নাম "সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালচিকিৎসা", দাম ২॥০ টাকা, ৫২১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও সচিত্র।

"সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব" নামক মেটিরিয়া মেডিকা ও ঔষধপ্রয়োগ সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও সংশোধিত ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় বর্ণিত ঔষধপ্রস্তুত সম্বন্ধে যাবতীয় নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ইহার ৫টি সংস্করণ তিনি সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ৭১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, গাছ-গাছড়ার বহু উৎকৃষ্ট চিত্রে পরিপূর্ণ; মূল্য ৫ টাকা।

নূতন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যের জন্য তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে "কর-সংহিতা" (A Handbook for the use of young Medical Practitioners) নামক রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাসম্বন্ধে আর একখানি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি সাইজে অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় বড় না হইলেও খুব ছোট অক্ষরে ছাপা এবং ৪৪৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার ৪র্থ সংস্করণ হইয়াছে। ইহার মূল্য ৩ টাকা।

"ভিষকবন্ধু" বা Prescription book তাঁহার রচিত

রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন

আর একখানি গ্রন্থ। প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখিবার ধারা, প্রয়োগ হিসাবে ঔষধবিশেষের গুণের বৃদ্ধি বা হ্রাস, প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের অনেকানেক প্রেসক্রিপসন্ প্রভৃতি চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য নানা প্রয়োজনীয় তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

রোগীর শুশ্রূষাসম্বন্ধে ডাক্তার কর একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহা "রোগী-পরিচর্য্যা" নামে পরিচিত। শুশ্রূষা ব্যতীত রোগীর বিবিধ পথ্যাদি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সঠিক বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গৃহস্থ মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। ইহার মূল্য ১৲ টাকা।

এ স্থলে ডাক্তার কর কর্তৃক রচিত পুস্তকাবলীর একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট কি বিষয়ে ঋণী, তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমি বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া দেশের লোকের নিকট যে গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইয়াছি এবং যৎকিঞ্চিৎ সম্মান লাভ করিতেও সমর্থ হইয়াছি, তাহার মূলে ডাক্তার করের মঙ্গলহস্ত বিরাজ করিতেছে। তাঁহার নিকট হইতেই আমি বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক লিখিবার জন্য প্রথম প্রের[illegible] হই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমি তাঁহার স্থাপিত মে[illegible]ল স্কুলে প্রাক্টিকাল্ কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপনা করিতাম। [illegible]হারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বা[illegible]ভাষায় "ফলিত রসায়ন" নাম দিয়া একখানি প্রা[illegible]ষ্ট্রী রচনা করি এবং স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ছাপাখানা হইতে উহা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার কর তাঁহার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকরূপে উহা অনুমোদন করেন। সেই আমার বই লিখিবার প্রথম "হাতে খড়ি।" আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তাঁহার আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ব্যতীত আমার উক্ত পুস্তক প্রকাশ করা ঘটিয়া উঠিত না। তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়া পুস্তক কতদূর অগ্রসর হইল, তাহার সংবাদ সর্ব্বদা লইতেন। এই প্রথম উদ্যমে সফলকাম হইয়া ভবিষ্যতে অন্যান্য পুস্তক প্রকাশ করিতে আমার ভরসা হইয়াছিল। ইহার জন্য আমি ডাক্তার করের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিব।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

তাঁহার আজীবনসঞ্চিত স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি কারমাইকেল মেডিকাল কলেজের উন্নতিবিধানে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। নিঃসন্তানা বিধবা পত্নী জীবদ্দশায় তাঁহার সম্পত্তির অধিকারিণী; তাঁহার অবর্ত্তমানে এই সমস্ত সম্পত্তি কারমাইকেল মেডিকাল কলেজের অধিকারভুক্ত হইবে।

এই অক্লান্তকর্ম্মা, পরহিতৈষণাব্রতী মহাত্মার পবিত্র স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আমার এই অসম্পূর্ণ নানা-ত্রুট-বিজড়িত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।
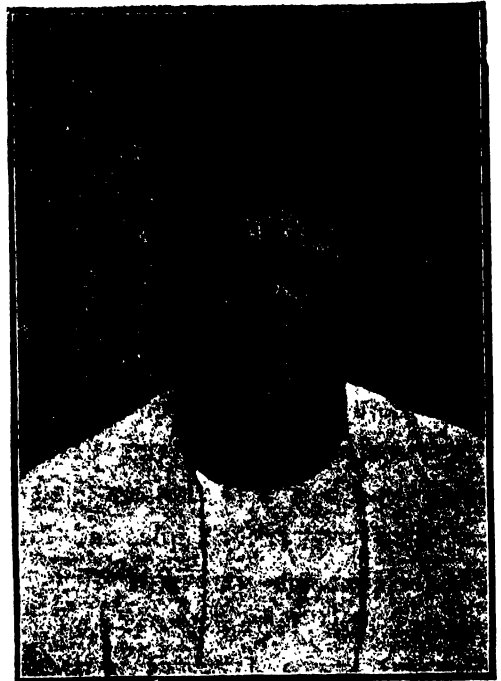
ডাক্তার প্রাণধন বসু

১৩২৫ সালে (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে) ৪ঠা পৌষ, বৃহস্পতিবার ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি শান্তিধামে গমন করেন। তিনি দোষ-গুণে জড়িত মানুষ ছিলেন বলিলে, তাঁহার স্মৃতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে না। তবে তাঁহার অসামান্য গুণরাশি তুচ্ছ উপেক্ষণীয় দোষকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহাকে সাতিশয় সম্মান, শ্রদ্ধা ও অনুরাগভাজন করিয়াছিল। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারকল্পে যে কল্যাণপ্রদ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সুফল জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাঁহার দেশবাসিগণ চিরদিন ভোগ করিতে থাকিবে। তিনি মরণেও সেই প্রতিষ্ঠানের সুব্যবস্থা করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি

ডাক্তার চুনীলাল বসু

শ্রীচুনীলাল বসু (রসায়নাচার্য্য)

সোনার পাহাড়

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অগণ্য শত্রুর আক্রমণ

আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণায় স্থির হইল যে, শত্রুরা যদি রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করে, তাহা হইলে যাহার উপর যে ঘাঁটি রক্ষার ভার আছে, সে সেই ঘাঁটিতে উপস্থিত থাকিয়া শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। বালক, বৃদ্ধ ও রমণীগণ গৃহের মধ্যস্থিত কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন। তাহার উপর নৈশ সমীরণ-প্রবাহে অরণ্যের বৃক্ষপত্র-সমূহ শর শর শব্দে কম্পিত হওয়ায় শত্রুপক্ষের দামামা-ধ্বনি আমাদের দলের অন্য কাহারও কর্ণ-গোচর হয় নাই, কেবল আমিই তাহা শুনিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর শত্রুগণের সাড়া-শব্দ না পাওয়ায় আমরা বাহিরের প্রাচীরে শাস্ত্রী রক্ষার ব্যবস্থা করিলাম না; ইহাতে আমাদিগকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

সেই রাত্রিকালে শত্রুপক্ষের 'টুমডুনির' শব্দ আমার কর্ণগোচর হইলে আমি যাশোটোয়ারোকে তাহা জানাইলাম। তিনি আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আমি আমার ঘাঁটি ত্যাগ না করিয়া বন্দুক লইয়া সেই স্থানে পাহারায় থাকিলাম। কিন্তু শীঘ্র বিপদের আশঙ্কা আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

যাশোটোয়ারো আমার সঙ্গেই ঘাঁটির পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন; তিনি কিছুকালের জন্য ঘাঁটি ত্যাগ করায় আমি সেখানে একাকী রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে শত শত শত্রুর ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল, যেন তাহা বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধাকাশ আচ্ছন্ন করিল। নাবিক আমরা, ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন জীবনে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় দিগন্তব্যাপী অরণ্যের বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত আলোড়িত হইলে যে শ্রবণবিদারক শব্দ উত্থিত হয়, তাহাও আমাদের অপরিচিত নহে; কিন্তু সেই রাত্রিতে অগণ্য শত্রুর মিশ্র কণ্ঠের যে গর্জ্জনধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হইল, তাহার তুলনা নাই। তাহারা সমস্বরে গর্জ্জন করিয়া সমুদ্রের বিপুল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে আমাদের উপর নিপতিত হইল। তাহাদের আক্রমণের বেগ দেখিয়া মনে হইল—ঝটিকাবর্ত্তে যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, অট্টালিকা-সমূহ সহ গ্রাম, নগর প্রভৃতি চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত হয়, সেই প্রবলপরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত শত্রুর আক্রমণে আমাদের ক্ষুদ্র জনপদ, সমগ্র অধিবাসিবর্গ সহ সেই ভাবে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইবে, কাহারও কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে না। শত্রুপক্ষের সেই ভীষণ আক্রমণে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম না; আমি নৌ-যুদ্ধের শিক্ষা বিস্মৃত হই নাই, এই সঙ্কটকালে তাহা আমার কাযে লাগিল। শত্রুগণকে কৃষ্ণবর্ণ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে মহা বেগে আমাদের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী-বর্ষণ আরম্ভ করিলাম। আমার বন্দুক মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া শত্রুগণের উপর যেন বজ্রাঘাত করিতে লাগিল। আমি হাতের কাছে সারি সারি বন্দুক সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম, একটি শূন্যগর্ভ হইলে, তাহা রাখিয়া আর একটি তুলিয়া লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। যতগুলি বন্দুকে গুলী-ভরা ছিল, সকলগুলিই এই ভাবে ব্যবহৃত হইল। আমি এইভাবে

গুলীবর্ষণ করিয়া বহু শত্রু বিধ্বস্ত করিলাম; আমি তাহাদের প্রচণ্ড গতি আংশিকভাবে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলাম, এবং আমরা যে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। এই স[illegible] কৃষ্ণকায় বর্ব্বর দস্যু বন্দুক দেখিলে আতঙ্কে বিহ্বল হয়[illegible]আমার বন্দুক প্রতি মুহূর্ত্তে বজ্রানল উদ্গিরণ করিতেছে আর [illegible]দের দলের লোক গুলী খাইয়া পড়িতেছে ও মরিতেছে, ইহ[illegible]দেখিয়া তাহারা আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না[illegible] মিনিটের জন্য তাহাদের গতিরোধ হইল। সেই স[illegible]দের দলের লোক আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আমরা যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহার তিন চারি স্থানে শুষ্ক কাঠ ও বোঝা বোঝা ঘাস স্তূপীকৃতভাবে সজ্জিত রাখিয়াছিলাম; তাহাতে তার্পিণ তেল ও কুমীরের চর্ব্বি ঢালিয়া তাহা ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। আমাদের সঙ্কল্প ছিল—শত্রুরা রাত্রিকালে আমাদিগকে আক্রমণ করিলে যদি তাহাদের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে কে শত্রু, কে নিজের লোক, তাহা চিনবার প্রয়োজন হইবে; সুতরাং তখন সেই সকল সহজ-দাহ্য কাষ্ঠ ও তৃণস্তূপে অগ্নি সংযোগ করা হইবে। এরূপ না করিলে আমাদের দলের লোকগুলিকেও শত্রু বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা ছিল। যে সকল লোকের উপর সেই সকল স্তূপে অগ্নি-সংযোগ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা যথাসময়ে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করায় সহসা চতুর্দ্দিক্ অগ্নিময় হইয়া উঠিল। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি ও তৈল মিশ্রিত থাকায় অগ্নির লোল জিহ্বা বহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যেন আকাশ লেহন করিতে উদ্যত হইল। শত্রুগণ সেই অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া কিছু কাল দাঁড়াইয়া রহিল। সেই বহ্নিচক্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে তাহাদের সাহস হইল না।

সেই অগ্নিজিহ্বার উজ্জ্বল আলোকে অসংখ্য উলঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ রাক্ষসের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এরূপ দলবদ্ধ নরপশুকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিতে আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। কিন্তু অসভ্য হইলেও তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ নহে, তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শিক্ষিত সৈন্যের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহারা সামরিক নৃত্য আরম্ভ করিল, এবং ভীষণ হুঙ্কার সহকারে তাহাদের হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার বর্শাগুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে ঘুরাইতে লাগিল। অগ্নির উজ্জ্বল আলোকে তাহাদের সশস্ত্র ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, অসংখ্য দানব আমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। সেরূপ ভীষণ দৃশ্য জীবনে আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। তাহাদের ভীষণ চীৎকারে আমাদের কর্ণ বধির হইল, এবং আমাদের দলের লোকগুলিকে উচ্চৈঃস্বরে যে আদেশ জ্ঞাপন করা হইল—তাহারা তাহা শুনিতে পাইল না। আমি যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম; আমি বহু শত্রু বধ করায় শত্রুরা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য সদলে আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দলের প্রায় বারো জন বীর পুরুষ আমাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া আমাকে পরিবেষ্টিত করিল। তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই এক একটি বন্দুক ছিল। তাহারা শত্রুদলের উপর গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিলে আমি বন্দুকে গুলী ভরিবার সুযোগ পাইলাম, এবং তিনটি বন্দুক গুলী-বারুদে পূর্ণ করিলাম। এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু তাহারা কিছু দূরে থাকিয়া রাশি রাশি বর্শা দ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা যেন বিদ্যুৎস্ফুরিত মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইলাম; তাহাদের বর্শার আঘাতে আমাদের দলের কয়েক জন সাহসী বীরপুরুষ আহত ও ধরাশায়ী হইল। আমাদের দলের অনেকে ভয় পাইয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল; সেই সুযোগে শত্রুগণ হুঙ্কার দিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন আমরা তরবারি উন্মুক্ত করিয়া তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিলাম। এই সকল শত্রুর হস্তে বর্শা ভিন্ন তরবারি ছিল না; সুতরাং তাহারা অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত হওয়ায় বর্শা ব্যবহারের সুযোগ পাইল না, কিন্তু আমরা অবলীলাক্রমে তরবারি পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে আহত করিতে সমর্থ হইলাম। আমার সহযোগীরা জানিত, তাহারা পরাজিত হইলে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে, তাহাদের স্ত্রী-কন্যাগণ শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে। এই জন্য তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

কিছু কাল যুদ্ধের পর আমাদের সম্মুখে মৃতদেহের স্তূপ প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠিল; আহত ও নিহত শত্রুগণের শোণিতে ধরাতল পিচ্ছিল হইল। আমরা বহু শত্রু বধ করিয়া উৎসাহিত হইলাম। আমাদের আশা হইল, শীঘ্রই তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিবে; কিন্তু আমরা যে দলের সহিত যুদ্ধ

করিতেছিলাম, তাহাদের অনেকে হত ও আহত হইয়াছে দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎ হইতে আর এক দল সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিল। তাহাদের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা পশ্চাতে হটিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে গ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে আমাদের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেখানে কে শত্রু কে মিত্র, তাহা চিনিবার উপায় রহিল না। হঠাৎ কয়েকখানি কুটীরে অগ্নি-সংযুক্ত হওয়ায় কুটীরগুলি জ্বলিয়া উঠিল; সেই আলোকে বহুদূর পর্যন্ত দিবালোকের ন্যায় আলোকিত হইল। গ্রামে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া বালক-বালিকা ও রমণীগণ প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া আততায়ীরা যুদ্ধজয়ে কৃত-নিশ্চয় হইয়া বিকট হুঙ্কারধ্বনি আরম্ভ করিল; তাহা শুনিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আমি যুদ্ধ করিতে করিতে বহু দূরে নীত হইলাম; শত্রুরা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ায়, ক্রমশঃ আমাদিগকে পশ্চাতে হটিতে হইতেছিল। আমি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দলের কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, তাহারা দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আমি একাকী দুর্দ্দান্ত শত্রুসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছি। শত্রুরা আমার সেইরূপ অসহায় অবস্থা দেখিয়া, আমাকে বর্শা-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। আমি একাকী তথাপি তরবারি-পরিচালন-কৌশলে কয়েক মিনিট তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিলাম; কিন্তু ক্রমশঃ আমার দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিল, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইল; বুঝিলাম, আর আমার নিস্তার নাই, আর অধিককাল শত্রুসৈন্যের উদ্যত বর্শা প্রতিরোধ করা আমার অসাধ্য হইবে। তাহারাও আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অধিকতর উৎসাহে আমাকে আক্রমণ করিল। আমার আত্মরক্ষার শক্তি বিলুপ্ত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার পশ্চাতে 'হুর্‌রো' ধ্বনি শুনিতে পাইলাম; বুঝিলাম, তাহা বার্ণির কণ্ঠস্বর। মুহূর্ত্ত পরে বার্ণি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ভাই সকল, বন্ধুগণ, আমাদের দলপতির জীবন বিপন্ন, উহার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। ঐ জংলী ভূতগুলাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা কর। উহাদিগকে আমাদের রণ-কৌশল দেখাও। যদি মরিতে হয়, মারিয়া মর।"

অতঃপর পুনঃ পুনঃ সুগম্ভীর বজ্রনাদ আরম্ভ হইল, শত্রু-সৈন্যের উপর মুহুর্মুহুঃ গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল। শত্রুগণ আমার চতুর্দ্দিকে দলে দলে আহত ও নিহত হইয়া ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিল।

বার্ণি আমার পাশে আসিয়া উৎসাহভরে চীৎকার করিয়া বলিল, "আর ভয় নাই ভাই, আমরা ঠিক সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। শত্রুকবল হইতে [illegible]কে উদ্ধার করিব।"

আমার তখন কথা [illegible]বার অবসর ছিল না। আমি পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলা[illegible] বার্ণি তাহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী নসিস্‌কাকে সঙ্গে [illegible]য়া আমার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে, এবং তাহারা উ[illegible]মান তৎপরতার সহিত বিপক্ষ সৈন্যের উপর গুলী বর্ষণ করিতেছে। আমি সেই সুযোগে একটু হাঁফ ফেলিবার অবসর পাইলাম, এবং আমার দলের লোকগুলিকে সংগৃহীত করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।

আরও কিছু কাল যুদ্ধের পর শত্রু-সৈন্যরা ছত্র-ভঙ্গ হইল; বর্শা লইয়া দীর্ঘকাল বন্দুকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসাধ্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া, বহু সৈন্যক্ষয়ের পর তাহারা হতাশ হইয়া পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিল। এই সময় রাত্রিও অবসান হইয়াছিল; উষার সুলোহিত কিরণে পূর্ব্বগগন আলোকিত হইল। আমাদের বাসপল্লীর চতুর্দ্দিকে যে দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল, তাহার অন্তরালস্থিত অন্ধকার-রাশি ধীরে ধীরে অপসারিত হইল। সেই আলোকে শত্রু দলের উপর গুলী-বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইল। তাহারা জয়লাভের আশা ত্যাগ করিয়াও কিছু কাল অসমসাহসে যুদ্ধ করিল; অবশেষে প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণজাল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রসারিত হইলে বন্দুকের গুলীতে তাহাদের কত সৈন্য নিহত হইয়াছে, তাহা তাহারা দেখিতে পাইল। স্থানে স্থানে মৃত দেহের উচ্চ স্তূপ, কত হতভাগ্য আহত ব্যক্তি সেই স্তূপের নীচে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। শোণিতের স্রোতে রণস্থল কর্দ্দমিত হইয়া অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বোধ হয় পূর্ব্বে কোন দিন তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বন্দুকের গুলীতে তখনও শত্রুরা দলে দলে ধরাশয্যা অবলম্বন করিতেছিল। শত্রু-সৈন্য, আর জয়লাভের আশা নাই বুঝিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই ভীষণ যুদ্ধে আমি যৎসামান্য আহত হইয়াছিলাম। যুদ্ধাবসানে আমার সঙ্গীদের দশা কি হইল দেখিবার জন্য

আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম ; বিশেষতঃ বার্ণি ও নসিস্কা আহত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি কয়েক গজ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দে[illegible]ম, নসিস্কা আহত বার্ণির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া সেই স্থানে বা[illegible]বে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছে! নসিস্কার ব্যাকুলতা দেখিয়া আ[illegible]দয় ক্ষোভে পূর্ণ হইল। বুঝিলাম—আমাকে শত্রু-কবল হই[illegible]দ্ধার করিতে গিয়াই বার্ণির এই বিপদ! কিন্তু তখন ন[illegible]কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর ছিল না[illegible]র চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল, শত্রু-নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রক্তের ধারা বহিতেছিল। আমি তৎক্ষণাৎ বার্ণিকে নসিস্কার ক্রোড় হইতে তুলিয়া লইলাম, এবং তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া গ্রামের ভিতর ধাবিত হইলাম।

গ্রামে উপস্থিত হইয়া, পাদরী মহাশয়কে একখানি চালা-ঘরে কতকগুলি আহত গ্রামবাসীর নিকট দণ্ডায়মান দেখিলাম। তিনি তাহাদের শুশ্রূষা করিতেছিলেন, ঔষধাদিও বিতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার কয়েক জন সহকারী আহত গ্রামবাসীদের ক্ষতস্থলে পটী বাঁধিতেছিল, ঔষধপ্রয়োগ করিতেছিল। আমি বার্ণিকে পাদরী মহাশয়ের নিকট রাখিয়া নসিস্কাকে তাহার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিতে বলিলাম। নসিস্কাকে এরূপ অনুরোধ করিবার প্রয়োজন ছিল না। পাদরী মহোদয় ও নসিস্কা বার্ণির পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন—দেখিয়া আমি আমার অন্যান্য সঙ্গীদের সন্ধানে ধাবিত হইলাম।

কিছুকাল অনুসন্ধানের পর আমার ছুতোর বন্ধু ও জিম স্মিথের সাক্ষাৎ পাইলাম। শুনিলাম, তাহারা শত্রু-সৈন্যের সহিত সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের দেহে অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। যুদ্ধ-জয়ের আনন্দে বিহ্বল হইয়া, আমি আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী সুহৃদ্ যাশোটোয়ারোর সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। অবশেষে জানিতে পারিলাম—যাশোটোয়ারো সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া আমি শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলাম। আমি কঠোর-হৃদয় নাবিক, শোকে-দুঃখে অধীর হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করা দুর্ব্বলতার নিদর্শন বলিয়াই আমার ধারণা ছিল; কিন্তু সে দিন অবিরল ধারায় অশ্রুত্যাগে আমি লজ্জা অনুভব করিলাম না। আমি জানিতে পারিলাম—যাশোটোয়ারো যুদ্ধ করিতে করিতে আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছেন; সেই সময় বহু শত্রু-সৈন্য তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। তিনি আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি একাকী বহু শত্রু ধ্বংস করিয়া তাহাদের বর্শাঘাতে আহত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি ধরাশায়ী হইলে, শত্রুরা তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। হায় বৃদ্ধ, আমাদের প্রাণরক্ষার জন্যই তিনি সমর-ক্ষেত্রে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিলেন! তাঁহার ন্যায় মহাপ্রাণ সদাশয় অধিনায়কের প্রাণের বিনিময়ে আমরা এই যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়াছি—এ কথা চিন্তা করিয়া ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইলাম; যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আমরা রণজয়ের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ সেই গ্রামের যে সকল পুরুষ অধিবাসী স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য আততায়িগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক লোক এই যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করায়—যুদ্ধ-জয়ের পর ঘরে ঘরে যে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল, তাহা শুনিয়া আমরা কেহই আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, যুদ্ধাবসানে আমরা জানিতে পারিলাম, শত্রুরা আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল, এবং তাহাই তাহাদের পরাজয়ের কারণ। অসংখ্য শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা যদি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামখানি পরিবেষ্টিত করিত, এবং গ্রামের অধিবাসিবর্গ চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে গ্রাম অধিকার করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা সেই ভাবে আক্রমণ না করিয়া, আমি ও যাশোটোয়ারো যে অংশে সশস্ত্র উপস্থিত থাকিয়া শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,—তাহারা সেই স্থানেই এক সময়ে সদলে আক্রমণ করায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহাদের আক্রমণ-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য দিক্ হইতে আমাদের সহযোগীরা আমাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল; আমাদের সম্মিলিত পরাক্রম সহ্য করিতে না পারায় তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই যুদ্ধে আমরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু শত্রুপক্ষের ক্ষতি অনেক অধিক হইয়াছিল। যুদ্ধের পর

আমরা শত্রুপক্ষের ভূতলশায়ী দেহ গণনা করিয়া পাঁচ শতাধিক মৃত দেহ দেখিতে পাইলাম! কিন্তু যাহারা অল্লাধিক আহত হইয়াছিল, শত্রুরা পলায়নকালে তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এরূপ আহত শত্রুর সংখ্যাও অল্প ছিল না। যদি আমরা পলায়নপর শত্রুগণের অনুসরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদিগকে সদলে বিধ্বস্ত করা আমাদের অসাধ্য হইত না। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় আমরা তাহাদের অনুসরণ করি নাই। বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও ছিল না; যুদ্ধের পর পাদরী মহাশয় বলিলেন, সেই সকল পশুস্বভাব বন্য জাতির চরিত্রগত বিশেষত্ব তাঁহার সুবিদিত, তাহারা এই ভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে; ভবিষ্যতে দুই চারি বৎসরের মধ্যে আর তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। এরূপ জনক্ষয় ও পরাজয় তাহাদের পক্ষে নূতন, এবং ইহা তাহাদের ধারণাতীত দুর্ঘটনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কঠিন-হৃদয় নাবিক, দয়া-মায়া স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি বহু দিন পূর্ব্বেই হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম; আমি শোকে-দুঃখে সহজে বিচলিত হইতাম না। এই যুদ্ধের পর আমি গ্রামবাসী বহুসংখ্যক নর-নারীকে প্রিয়জনের শোচনীয় মৃত্যুতে কাতরভাবে রোদন করিতে দেখিয়াও বিচলিত হইলাম না; মৃত্যু বিধাতার দান, তাহা হইতে কাহারও নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই ভাবিয়া নির্ব্বিকার রহিলাম বটে, কিন্তু অবশেষে যাশোটোয়ারোর শোণিত-সিক্ত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলাম না। বাষ্পাবেগে আমার কণ্ঠরোধ হইল, এবং অশ্রুপ্রবাহে আমি চারিদিক্ ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম। কেহ হয় ত বলিতে পারে, যাশোটোয়ারো স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া আমাদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন; যদি তিনি আমাদের সহিত স্বর্ণ-ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে অনুচরবর্গের সাহায্যে প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করিতেন, এবং স্বয়ং তাহা ভোগ করিতেন; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি এইরূপ স্বার্থপরতার আরোপ করিতে সাহস করিবে, সে আমার সম্মুখে এ কথা বলিলে আমি এক লাঠিতে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিব। যাশোটোয়ারোর ন্যায় পরোপকারী, স্বার্থপরতার সংস্রব-রহিত, মহাপ্রাণ বৃদ্ধ পৃথিবীতে অতি বিরল, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, যৌবন-সুলভ লোভ বা উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে বিচলিত ও মুগ্ধ করা দূরের কথা, তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারিত না। তিনি জানিতেন, তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ দিনগুলি শেষ হইয়া আসিয়াছে, শান্তিময় জীবন-সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; পরমেশ্বরের [illegible] হইতে কখন্ ডাক আসিবে, কখন্ তাঁহাকে চিরবি[illegible] তিমিরাচ্ছন্ন ভবনদী পার হইতে হইবে, তাহারই প্রতী[illegible] তিনি জীবনের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি অতিবাহিত করি[illegible]লেন। যদি তিনি আমাদের দলে যোগদান না করিয়া [illegible]গুয়েতে বাস করিতেন, তাহা হইলে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে, পরম শান্তিসুখে অতিবাহিত করিতে পারিতেন; কিন্তু আমাদের ন্যায় কয়েকটি হতভাগ্য স্বদেশবাসীর কল্যাণ-কামনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টা-যত্ন ও কৌশলে আমরা ভীষণ পারদ-খনি হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনি আমাদের পথিপ্রদর্শক হইয়া, দুস্তর অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম ও অজ্ঞাত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি অম্লান বদনে অকুণ্ঠিত-চিত্তে সকল কষ্টই আমাদের জন্য সহ্য করিয়াছেন, এবং সকল বিপদই প্রশান্তভাবে বরণ করিয়া আজ শত্রু-হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। বন্ধুহীনের তিনি বন্ধু ছিলেন, অসহায় বিপন্নের তিনি আশ্রয় ছিলেন। আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমাদের ন্যায় হৃদয়হীন কঠোরপ্রকৃতি নাবিকের হৃদয়ও শোকে-দুঃখে অভিভূত হইবে এবং আমরা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার অন্তিম কার্য্য সম্পন্ন করিব, ইহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ আছে?

আমরা তাঁহারই মৃতদেহ সর্ব্বপ্রথমে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, রৌদ্রের উত্তাপ ততই প্রখরতর হইতে লাগিল; সেই দুঃসহ উত্তাপে মৃতদেহ বিকৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা তাহা শীঘ্র সমাহিত করিবার জন্য উৎসুক হইলাম। গ্রামের প্রান্তভাগে একটি সুদীর্ঘ ও প্রাচীন তাল-তরু ছিল, আমরা তাহারই পাদমূলে একটি গভীর সমাধি-গহ্বর খনন করিয়া যাশোটোয়ারোর মৃতদেহ বহন করিয়া সেই স্থানে লইয়া চলিলাম; আমাদের মনে হইল, পরম ভক্তিভাজন পিতৃদেবের মৃতদেহ আমরা বহিয়া লইয়া যাইতেছি! শবাধারের পরিবর্ত্তে আমরা তাল-পাতার পাটি বুনিয়া একটি শবাবরণ প্রস্তুত করিলাম, এবং তদ্দ্বারা

'মোটর-কোটরে বাবু অন্ধকার মুখে'

বসুমতী চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী- শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘাশোটোয়ারোর মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া তাহা সমাধি-গহ্বরে নামাইয়া দিলাম; তাঁহার বন্দুকটি ও সুদীর্ঘ তরবারিখানি তাঁহার পার্শ্বেই রাখিলাম। পাদরী মহাশয় তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য আবেগপূর্ণ ভাষায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন; আমরা জানু নত করিয়া অশ্রুসজল নেত্রে তাহা শ্রবণ করিলাম। তাহার পর মৃত্তিকা দ্বারা সমাধি আবৃত করিয়া তাহার উপর কয়েক খণ্ড ভারী পাথর সংস্থাপিত করিলাম। সেই সকল প্রস্তরখণ্ড কর্দ্দমসিক্ত করিয়া তাহা স্তূপাকারে পরিণত করিলাম। আমাদের একটি বন্ধুটি 'পালো মুলাটো' নামক সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষের একখানি তক্তা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা একটি 'ক্রস্' নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার নিম্নভাগে নিম্নলিখিত স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করিল :—

"বন্ধুর জন্য যিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর প্রেমিক পুরুষ আর কেহই নাই। এই স্থানে যিনি মহানিদ্রাগত, তিনি পুরুষোত্তম ঘাশোটোয়ারো, তিনি সুদক্ষ শিকারী, স্বার্থ-বিরহিত, বন্ধুবৎসল, সাহসী, সরল, সাধুহৃদয়; মহত্ব তাঁহার অতুলনীয়। সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিনি বীরের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। যাহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই দেহ-পাত করিলেন। তাঁহার গুণগ্রাহী বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ তাঁহাকে এখানে সমাহিত করিল। পরমেশ্বরের নিকট তাহাদের আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি মৃত বীরের আত্মার কল্যাণসাধন করুন।"

যে সকল কথা উৎকীর্ণ হইল, তাহার একটিও মিথ্যা বা অত্যুক্তি নহে।

ঘাশোটোয়ারোর মৃতদেহ সমাহিত হইলে, আমরা গ্রামপ্রান্তে দুইটি সুদীর্ঘ গহ্বর খনন করিয়া একটিতে গ্রামবাসী মৃত বীরগণের দেহ সমাহিত করিলাম; অন্যটিতে শত্রুগণের মৃতদেহ সমাহিত হইল। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে সারাদিন অতিবাহিত হইল, রাত্রি গভীর হইলে আমাদের কায শেষ হইল। রাত্রিকালে অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিরাশি প্রজ্বালিত করিয়া সেই আলোকে সকল কায শেষ করিতে হইল। এই গভীর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য শেষ হইলে আমরা বিশ্রাম করিতে চলিলাম, এবং অবশিষ্ট রাত্রিটুকু গাঢ় নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কি উদ্দেশ্যে—কোথায় যাত্রা করিয়াছি—তাহা আমাদের কাহারও স্মরণ রহিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ

চলচ্চিত্রের প্রচারের ফলে রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা এখন ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্য চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেখানে Movies বা চলচ্চিত্র এত জনপ্রিয় যে, বোধ হয় প্রতি গ্রামে গ্রামে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী দেখা দিতেছে। এতদ্ব্যতীত যাযাবর চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীও সংখ্যায় অল্প নহে। কেবল Movies নহে, এখন Talking pictures অথবা বাক্‌পটু চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীও দেখা দিতেছে। ছায়াচিত্র যে ভাবে নড়িবে চড়িবে, ওষ্ঠ নাড়িবে, ঠিক সেই ভাবের অনুযায়ী করিয়া শক্তিশালী গ্রামোফোন যন্ত্রযোগে কথাবার্ত্তা, সঙ্গীত, চীৎকার ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হইবে, প্রদর্শনীতে এমন ব্যবস্থা করা হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার কোন কোন প্রদর্শনীতে এই ভাবের চলচ্চিত্রের আমদানী হইয়াছে

এখন যতই দিন যাইতেছে ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের উন্নতি হইতেছে, ততই রঙ্গমঞ্চের অবস্থা শোচনীয় হইতেছে! যে পরিমাণে চলচ্চিত্র দর্শক আকর্ষণ করিতেছে, সেই পরিমাণে থিয়েটার অপেরায় লোকসমাগম হ্রাস হইতেছে। মার্কিণ দেশের অবস্থাভিজ্ঞ লোকরা এ বিষয়ে যাহা চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ :—

সম্প্রতি যে শোচনীয় মরশুমের মধ্য দিয়া নিউইয়র্কের থিয়েটার-ম্যানেজারদিগকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনা বোধ হয় অতীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ যাবৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থশ্রেণীর (Middle class) লোকই

থিয়েটার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের অর্থেই থিয়েটার চলিয়াছে। এখন তাহারা যেন ক্রমশঃ থিয়েটার ছাড়িয়া দিতেছে। ইহার কারণ কি?

কারণ অনেক। প্রথমতঃ পূর্ব্বে থিয়েটারের টিকিটের দাম নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং উহা মধ্যবিত্ত গৃহস্থশ্রেণীর পক্ষে সহজসাধ্য ও সুলভ ছিল। নানা শ্রেণীর লোকের রুচি ও অবস্থা অনুসারে আসনের তারতম্য ও প্রদর্শনীর (অভিনয়ের) style ও quality নির্দ্দিষ্ট থাকিত। আর গ্যালারীর আয়টা থিয়েটারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিত। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর আয় যেমন রেলের প্রাণ রক্ষা করে, গ্যালারীর আয়ও তেমনই থিয়েটারের প্রাণ রক্ষা করিত।

এক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। থিয়েটার এক্ষণে অবস্থাপন্ন লোকের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার স্থানে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের রুচি অনুসারে এখন আর থিয়েটার পরিচালনা করা হয় না। থিয়েটারের টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে, আসনের ও অভিনয়ের Style ও quality ও পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। নিত্য আহার্য্য-পানীয়ের red wineএর পরিবর্ত্তে এখন জনসাধারণকে থিয়েটার শ্যাম্পেন পান করিতে দিতেছে।

এই হেতু থিয়েটার ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারাইতেছে।

ম্যাক্স রিন্‌হার্ড

সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র লাভবান্ হইতেছে। সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের চিত্তবিনোদনের উপযোগী খোরাকের নিত্য যোগান দেওয়া হইতেছে। প্রথমতঃ উহা দামে সস্তা, অর্থাৎ উহার টিকিটের মূল্য জনসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য; দ্বিতীয়তঃ চিত্রসমূহ থিয়েটারের অভিনয় হইতে বহুগুণ অধিক

মিস্ লিলিয়ান গিস্

চিত্তচমকপ্রদ (Sensational)। বিশেষতঃ মূক অভিনয়ের একটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা আছে। এ কথা চলচ্চিত্র-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার ম্যাক্স রিন্‌হার্ড (Max Reinhardt) স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—

"Silence is one of the strongest weapons of the dramatic artist. Mimickry and pantomime are of the utmost importance on the stage to-day. Those pauses in the dramatic action and the dialogue are of the essence of drama. As the complication of the play unfolds, there come periods of great stress-bitter pain-poignant grief, pauses are being used more and more, climaxes come invariably in these gripping hiatuses of silence."

পাঠকবর্গের স্মরণার্থ এই স্থলে বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ম্যাক্স রিণহার্ডই সম্প্রতি মার্কিণ দেশের চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী লিলিয়ান গিস্‌কে লইয়া শীঘ্রই মার্কিণ চলচ্চিত্রের রাজ্যে এক যুগান্তর আনয়নের উদ্যোগ করিতেছেন।

যাহা হউক, এই সকল কারণে থিয়েটার ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা হারাইতেছে, আর চলচ্চিত্র তাহার নষ্টরাজ্য অধিকার করিতেছে। আমাদের দেশের থিয়েটার-ম্যানেজারদিগের পক্ষেও এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা আছে। এ দেশেও চলচ্চিত্র লোকের মনোরাজ্য ক্রমশঃই জুড়িয়া বসিতেছে।

অম্বর-শীর্ষে *

কি সুখে আছিস্ ভুলে   বল্ মা পাষাণি খুলে
তুই কি সে প্র[illegible]র যশোর-ঈশ্বরী।
বুক চিরে রক্ত-ধারে   [illegible] জবা-বিল্ব-উপহারে
প্রতাপ-আদিত্য যাকে [illegible]ত শঙ্করি!
যার মায়াপাশে পড়ি'   [illegible]রণচণ্ডী রূপ ধরি'
এক দিন রণাঙ্গনে কত [illegible]লি।
মায়ের মতন থাকি,'   রক্ষা-কব[illegible] ঢাকি',—
বুক দিয়ে কত যুদ্ধে যা'রে বাঁচ[illegible]
বল্ পাষাণের মেয়ে!   কি [illegible] পেয়ে,
কেমনে তেমন পুত্রে পাসরিলি তারা!
আজি এ অম্বর-শিরে   কালি! তোর দশা হেরে'
নিবারিতে নারি মা গো, নয়নের ধারা॥
কোথায় সে দিল্লীশ্বর,   কোথা সে ক্ষত্রিয়-বর
মানসিংহ অম্বরের গর্ব্বিত ভূপতি!
প্রতাপ ও আকবর,   রাজপুত-অধীশ্বর,
কালের পেষণে আজ সব এক গতি॥
চিরস্নিগ্ধ চিরশ্যাম   চিরানন্দ অভিরাম
"যশোর-নগর-ধাম" সে "সুন্দরবনে"।
প্রকৃতির লীলাভূমি   যাহার চরণ চুমি
আনন্দে গর্জ্জিত সিন্ধু জলদ-গর্জ্জনে॥
ভুলিয়া সে মনোলোভা   "সুন্দরবনের" শোভা
নিসর্গের রমণীয় নন্দন-উদ্যান,
মরুবক্ষে অদ্রিশিরে   থাকিতে কি পাষাণি রে!
তিলেকের তরে তোর কাঁদে না পরাণ!
ভুলেও কি স্মৃতি তার,   মনে নাহি জাগে আর,—
জাগে না সে বাংলার মোহন মুরতি!
প্রতি তরু-লতা-আড়ে   উষায় সন্ধ্যায়, হা রে!
শ্যামা-দোয়েলের সেই স্তুতি মধুমতী॥
আপনি পাষাণী হয়ে   পাষাণ মন্দির লয়ে'
তুই না সে "প্রসাদের" গানে ঘুরেছিলি?
বল মা সরল প্রাণে   ভুলিয়া কাহার গানে
ছাড়ি সে সুজলা বঙ্গে—মরুতে আসিলি?
গিরিদুর্গে রুদ্ধকক্ষে   সতত প্রহরী রক্ষে,
অপরাধিনীর মত লো অপরাজিতা।
আজি তোর দশা হেরে   থাকি থাকি মনে পড়ে—
আহা সে অশোকবনে নির্ব্বাসিতা সীতা॥
বল ত মা এই দেশে   তোরে কি গো সেবে এসে
নীল জলধির ঊর্ম্মি-শীতল-সমীর?
পাদপদ্ম-রেণু-আশে   ঘোরে কি মা, আসে-পাশে
হেথায় সে দক্ষিণের সমীরণ ধীর?
এ দেশের এ বাতাসে   হেথাও কি ভেসে আসে
মৃদু মন্দ কুসুমের গন্ধ মনোহর।

চরণ-পদ্মের তোর   মকরন্দ-পানে ভোর
হয়ে কি গো আত্মবলি দেয় কোন নর?
বল্ ত মা শবাসনে!   হেথা কি গো বীরাসনে
ভক্ত আসি' বক্ষে চাপি' শবসাধনায়?
বুক চিরে রক্ত দিয়ে   ও-রাঙ্গা চরণ নিয়ে
হৃদে রাখি নয়নের সলিলে ধোয়ায়॥
ছাতি ফাটে পিপাসায়   ক্ষুধায় পরাণ যায়
তবু তোর পদে জবা অঞ্জলি না দিয়ে
এক বিন্দু জল মুখে   না দিয়াও কত সুখে
থাকিত যে শুধু তোর চরণ স্মরিয়ে॥
শয়নে স্বপনে রণে   ধর্ম্মাসনে সিংহাসনে
তোর পাদপদ্ম হৃদে ধ্যান যে করিত।
রাজভূষা তুচ্ছ করি'   নামাবলী গায়ে পরি'
কালী-তারা-নাম সদা যে জন জপিত॥
শিশুর মতন হায়,   বসি তোর পদছায়
মা মা বলি উভরায় কাঁদিত সে জন।
দিগম্বরি! বল ত রে,   তেয়াগি সে ভক্তবরে
কি লোভে আসিলি রাজপুতের সদন?
আছিস্ একাকী পড়ে'   যথা বাঙ্গালীর ঘরে
দুখিনী মায়ের মত "মাসোহারা" খেয়ে।
কভু কোনো পান্থ আসি'   নয়নের জলে ভাসি'
ডাকে শুধু মা মা ব'লে তোর পানে চেয়ে।
অম্বরের অধীশ্বর   প্রসারি' গর্ব্বিত কর
যবে পরশিল তোর ও বরাঙ্গ কালি!
বল পাষাণের মেয়ে,   ছিলি কি পাষাণী হয়ে,
দানব-দলনী-নাম নামে বুঝি খালি?
আজ বহু দিন পরে   ডাকিতেছে পুত্র তোরে,
নৃমুণ্ড-মালিনি! পুন নরমুণ্ড পরি'।
লোলজিহ্বা অট্টহাস   দানবের চিরত্রাস
পদ-ভরে বসুন্ধরা প্রকম্পিত করি'॥
ভাঙ্গি অম্বরের কারা   চল্ মা ত্রিলোক তারা
চল্ ফিরে চল্ সেই "যশোর-নগরে"।
মাতৃহারা বঙ্গবাসী   কাঙ্গালের বেশে ভাসি'
তোর পুত্র হয়ে দেশে দেশে কাঁদি' মরে॥
বরাভয়-করে নিয়ে   তুই মা দাঁড়ালে গিয়ে
আবার আসিবে বঙ্গে ফিরিয়া সুদিন।
নব-সঞ্জীবন-মন্ত্রে   জাগিয়া নবীন-তন্ত্রে
আবার হাসিবে বঙ্গ এবে যা মলিন॥
কিংবা যদি মহাভাগে!   যেতে কোন দ্বিধা লাগে
রাজপুত-নিমকের গুণ মনে করি'।
আমি যাবো আগে আগে মা গো, তোর পুরোভাগে,
দে আমারে সেই বল ত্রিলোক-ঈশ্বরি!
এই বক্ষ-সিংহাসনে   বসাইয়া ত্রিনয়নে!
ভারত কম্পিত করি' তাণ্ডব-নর্ত্তনে।
নিয়ে যাবো তোরে ঘরে   নিরখিবে দেব-নরে
মা'র পুত্র মা'কে আনে উদ্ধারি' কেমনে॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

---

* দিল্লীশ্বরের সেনাপতি অম্বরের রাজা মানসিংহ যশোহরের স্বাধীন নৃপতি প্রতাপাদিত্যকে যখন বন্দী করিয়া লইয়া যান, তখন সেই সঙ্গে যশোহরের চিরপ্রসিদ্ধ "যশোরেশ্বরী" নামক পাষাণময়ী কালীকেও লইয়া অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

ভাবের অভিব্যক্তি

পার্টিসান ঘুট বাধিল, কি উপায় করি ?

হত্যার সঙ্কল্পে বিভীষিকা-দর্শন !

ফুটবল

বাঙ্গালায় ফুটবলের মরশুম সমুপস্থিত। এখন হইতে প্রায় শারদীয়াপূজার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর ছেলেদের আহার-নিদ্রা এক-রূপ পরিত্যক্ত হইবে। ছেলের দল আহার ছাড়িয়া ম্যাচ দেখিতে মাঠে ছুটিবে, ঘুমাইয়া ফুটবলের স্যুট আর গোলের স্বপ্ন দেখিবে। এমন নেশা বাঙ্গালীর আর কিছু আছে কি না, জানি না।

শিল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান টিম—১৯১১
ইহার মধ্যে শিব দাস, বিজয় দাস, রাজেন, অভিলাষ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে

মাসিক বসুমতীর কোন এক পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় "চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকা" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, চলচ্চিত্রের নেশা যখন সংক্রামক রোগরূপে বাঙ্গালীকে ধরিয়াছে, যখন উহার হস্ত হইতে নিস্তার-লাভের উপায় নাই, যখন কালস্রোতের গতিরোধের সাধ্য নাই, তখন যাহাতে ঐ ব্যবসায় হইতে বাঙ্গালী লাভবান্ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাকে এড়ান যায় না, যাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে, তাহাকে যাহাতে নিজের সুবিধামত করিয়া ঘরে তুলা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ফুটবল খেলা সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। ইহা বিজাতীয় বিদেশীয় খেলা; পরন্তু ইহা বহুব্যয়সাধ্য খেলা। এই হেতু ইহা আমাদের ধাতুসহ নহে। আমাদের জাতীয় খেলা হাডু-ডুডু (চুচু অথবা সেল কপাটী) অথবা গুলীডাণ্ডা আমাদের ধাতুসহ। এই দরিদ্র দেশে যে খেলায় গাঁটের কড়ি ব্যয় নাই, সেই খেলাই আমাদের মত দরিদ্র জাতির ধাতুসহ। এ সব খেলায় য়ুনি-ফরম নাই, গোল-পোষ্ট নাই, বল নাই, ব্ল্যাডার নাই, এসোসিয়েশান বুট নাই, নেট নাই, হাফটাইম নাই, মাঠভাড়া নাই, তাঁবু নাই, মালী নাই, কিছু নাই,—আছে কেবল নিছক মাল-কোচা মারা আর মাঠে নামিয়া পড়া, ঘণ্টাখানেক ছুটাছুটি করিয়া দম করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসা!

দাশরথি মুখোপাধ্যায়
হেয়ার স্পোর্টিংয়ের বিখ্যাত ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়

কিন্তু যখন ফুটবল বাঙ্গালীর হাডুডুডু, গুলীডাণ্ডা অথবা ঘুড়ী উড়ানর স্থান অধিকার করি-য়াছে, তখন ইহাকে আর বাঙ্গালা হইতে তাড়াইবার উপায় নাই,—তখন যাহাতে এই খেলাকে আমাদের ধাতুসহ করিয়া লওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বস্তুতঃ ফুটবল খেলা এখন বাঙ্গালীর জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার এমন জিলা বা গ্রাম নাই, যেখানে ছেলেরা ফুটবল না খেলে। এমন কেন্দ্র নাই, যেখানে একটা না একটা কাপ-ম্যাচ খেলা হয়। সুতরাং এখন আর এই খেলাকে 'বিদেশী' ও 'বিজাতীয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

বলিয়াছি, বাঙ্গালী এখন ফুটবলের স্বপ্ন দেখে। বস্তুতঃ আমরা দেখিয়াছি, ছেলেরা পড়িতে পড়িতে খাতায় বা শ্লেটে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া

আপন মনে বলে, এই স্থানে অমুককে খেলিতে দিলে ভাল হইত, অমুক খেলোয়াড় দক্ষিণ পদে সুট না করিয়া বাম পদে সুট করিলে গোলটা নির্ঘাত হইত। বুয়র যুদ্ধের সময় যেমন ক্রোঞ্জি ধরা পড়ার দিন দুই বাঙ্গালী কেরাণীতে ক্রোঞ্জির পক্ষ ও বিপক্ষ লইয়া হাতাহাতি হইয়া গিয়াছিল, তেমনই ফুটবল খেলায় মোহনবাগান বা অন্য কোন বাঙ্গালীর প্রিয় খেলোয়াড়দলের হারজিত সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হাতাহাতিতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। লীগ, শিল্ড, ট্রেডস্ বা অন্য কাপ-খেলা হইলে সহরের ও সহরতলীর '১৫ আনা ভাগ ছেলে বেলা ১টার পর হইতেই মাঠে ছুটিতে থাকে, ইহা বোধ হয়, অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সির কোথাও তিলধারণেরও স্থান থাকে না। গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া, ঘুষাঘুষি ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করিয়া, কাপড়-জামা ছিঁড়িয়া, লাঞ্ছিত অবমানিত হইয়া, মাঠ হইতে 'ম্যাচ' দেখিয়া ফিরিতে

ট্রেড চ্যালেঞ্জ কাপ-বিজয়ী ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশান—১৯০০

বাঙ্গালীকে অনেকেই দেখিয়াছেন। এক এক ম্যাচে কত হাজার হাজার টাকার ছিনিমিনি খেলা হইয়া যায়, তাহাও অনেকে জানেন। বাঙ্গালীর ছেলেকে ফুটবল ক্লাবের ঠিকুজী-কুলুচি জিজ্ঞাসা করিলে খেলোয়াড়দের নামধাম বিষয়ে উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অনর্গল আওড়াইয়া যাইবে, 'পাল', 'রবি গাঙ্গুলী', 'বলাই চাটুয্যে' বলিতে সে অজ্ঞান হইবে, কিন্তু তাহার নিজের পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিবে না। এমনই বাঙ্গালীর ফুটবলের নেশা!

এ হেন ফুটবল খেলাকে তুচ্ছ খেলা বলিয়া ফেলিয়া রাখা যায় না। এ খেলার কোথায় উৎপত্তি এবং কিরূপে বর্ত্তমানে পরিণতি হইয়াছে, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। এ সম্বন্ধে তাই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ফুটবল অতি প্রাচীন ক্রীড়া। প্রাচীন মিশরীয়রা ফুটবল খেলায় আনন্দলাভ করিতেন, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ আছে। মিশরীয় স্থাপত্য-শিল্পে ফুটবল খেলার 'পাসিং'এর নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার কালের ফুটবল বড় রকমের প্লাম-পুডিংএর আকারের ছিল। নীল নদের তটে ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরীয়রা ফুটবল খেলায় কি ভাবে মাতিতেন, এখনকার ফুটবলের ম্যাচ দেখিয়া তাহা জানিতে ঔৎসুক্য হয়। তখনকার কালে মিশরীয়রা ... পায়ে ফুটবল খেলিতেন। তাহা বলিয়া কেহ মনে ... বেন না যে, সে খেলা এখনকার রাগবি খেলার অনুরূপ ...।

ফুটবল কথার অ... হইতেছে—পায়ে খেলার বল; সুতরাং উহা যে পায়ে ... রয়াই প্রধানতঃ খেলিবার নিয়ম ছিল, তাহাতে সন্দেহ ...ই। তবে ফুটবলের প্রথমাবস্থায় যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রা...তে খেলার আবিষ্কার বা প্রচলন হয় নাই, তখন মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া শত্রুর কোটে ফুটবল লইয়া গিয়া কোনরূপে শত্রুকে জয় করাই নিয়ম ছিল। তাই বোধ হয়, ফুটবলের আদিম যুগে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষার বিলক্ষণ সুযোগ ছিল এবং সেই হেতু ঐ খেলায় হাত পা উভয় অঙ্গের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। পরন্তু মাথা, কাঁধ, ঘাড়, কনুইও যে অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হইত না, তাহাও বলা যায় না।

ইংলণ্ডে রোমানদিগের পরাজয়ের উৎসবে সর্ব্বপ্রথমে ডার্বি সহরে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় জনগণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহাই প্রথম ফুটবলের উল্লেখ। ইহার পর ডেনদিগের মাথার অনুকরণে ফুটবল তৈয়ার করিয়া খেলা হইত। ডেনরা দস্যুরূপে ইংলণ্ড লুণ্ঠন করিত বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শনের জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এ সকল কিংবদন্তী। বস্তুতঃ ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রকৃতপ্রস্তাবে জাতীয় খেলারূপে ফুটবল দেখা দেয় নাই। তদানীন্তন ইংলণ্ডের

রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড ফুটবল খেলার ভক্ত ছিলেন না। ঐ খেলা ধনুর্বিদ্যা, শিকার প্রভৃতি মনুষ্যোচিত ব্যসন হইতে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া জাতিকে হীনতেজ করিতেছে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তাই তিনি রাজ্যমধ্যে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিষেধাজ্ঞায় কোন কায হয় নাই, ফুটবল খেলা ইংলণ্ডে [illegible] শ্রীবৃদ্ধিই লাভ করিতে থাকে এবং ক্রমে উহা অত্যন্ত [illegible] হইয়া উঠে। যাহা হউক, ফুটবল খেলা সম্বন্ধে রাজা[illegible]নিষেধাজ্ঞা ইতিহাসজ্ঞের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক, কেন না, ফু[illegible] খেলা সম্বন্ধে উহাই জগতে প্রথম আইনের উক্তি।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ফু[illegible] উহা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। রাণী এলিজাবেথ [illegible] বাঁধিয়া দেন যে, ফুটবল খেলা করিলে লোকের জেল হইবে। কিন্তু তাহাতেও ফুটবল খেলার প্রভাব ও প্রসার বিন্দুমাত্র উপশমিত হয় নাই। মহাকবি সেক্সপিয়ার সেই সময়ে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "কিং-লিয়ার" নাটকের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছিলেন—"You bas- Foot-ball pl ye !" তখনকার কালে ফুটবল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পায়ে পা জড়াইয়া অন্যায়রূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত, ইহারই প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সেক্সপিয়ার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা তখনকার ফুটবল খেলোয়াড়ের প্রতি সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়। এই খেলায় মারামারি হাতাহাতি হইত বলিয়া ইহার প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোক বীতরাগ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি সত্ত্বেও এবং পার্লামেণ্ট ও রাজার কৃত কঠোর আইনের সৃষ্টিসত্ত্বেও এই খেলা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও জন-প্রিয়তা লাভ করিতে থাকে।

এই সময়ে ফুটবল খেলাকে একটা নিয়মবদ্ধ করা হয়। প্রতি-যোগী পক্ষদ্বয়ের খেলোয়াড়ের সংখ্যা সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। একটা খোলা মাঠে পরস্পর পরস্পর হইতে ৮০ গজ তফাতে থাকিয়া শত্রুপক্ষের ব্যূহের মধ্যে বলটি বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া এবং উহাদের 'গোলের' মধ্য দিয়া ঐটিকে পাশ করিয়া দেওয়া উভয় পক্ষের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পরস্পর ৪ ফুট তফাতে ভূগর্ভে প্রোথিত দুইটি শক্ত কাষ্ঠদণ্ড বা পোষ্টকে 'গোল' বলিয়া অভিহিত করা হইত। পাঠক দেখিবেন, ইংরাজীতে 'গোল' কথাটির অর্থ লক্ষ্য। তখনকার কালে শূকরের পিত্তের থলিয়াকে ব্ল্যাডাররূপে পরিণত করিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত খোলের মধ্যে পূরিয়া 'ফুটবল' তৈয়ার করা হইত। কোনরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের গোলটির মধ্য দিয়া বল লইয়া যাওয়াই তখনকার খেলার চরম উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে নাসিকা, চক্ষু, হস্ত-পদাদি কাহারও কোন অঙ্গহানি হইল কি না হইল, দেখিবার কাহারও প্রয়োজন হইত না। আর প্রায়শঃ বিকলাঙ্গ ও আহত না হইয়া তখনকার কালে খেলা হইতে কেহ ঘরে ফিরিত না। এ সম্বন্ধে কোনরূপ বাঁধাধরা কড়াকড়ি আইন-কানুনও ছিল না। বিশেষতঃ লৌহ-কীলক-শোভিত বুটজুতার লাথি সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম না থাকায় অনেক সময়ে বিষম খুন-জখম হইত।

কালী মুখুর্য্যে—শোভাবাজার ক্লাবের বিখ্যাত ব্যাক

দেবেন্দ্রনাথ গুঁই—ফুটবল এসোসিয়েশানের অন্যতম সেক্রেটারী

এই সময়ে ফুটবল খেলার হার-জিতের দ্বারা ব্যক্তিগত অথবা দলগত বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবার প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়। যেমন প্রাচীনকালে ordeal দ্বারা লোকের অপরাধ অথবা নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করা হইত, তেমনই এই সময়ে দুই বিভিন্ন

গ্রামের কোন লোক বা দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইত। সেই পরীক্ষার হার-জিতের উপর বিবাদের হার-জিত নির্দ্ধারিত হইয়া যাইত। প্রত্যেক গ্রাম নিজের পক্ষের খেলোয়াড় বাছিয়া লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। এই জন্য ইংরাজীতে প্রবাদই হইয়া গিয়াছে যে, Try it out at Football. এই সূত্র হইতে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ফুটবল ম্যাচ খেলার প্রবর্ত্তন হয়।

ডার্বির প্রতিযোগিতা খেলা ইংলণ্ডের ফুটবল ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। ডার্বি সহরের দুইটি প্যারিসের (Parish) মধ্যে স্রোভ সহরের পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। সহরের দুই প্রান্তে দুইটি গোল-পোষ্ট থাকে, এক দল অপর দলের গোলের দিকে বল লইয়া যাইবার জন্য করে না, এমন কায নাই বলিলেও হয়। ইহার জন্য খেলোয়াড়রা বাড়ীর ছাদে উঠে, খানাডোবা সাঁতার দিয়া পার হয়, বিপক্ষ পক্ষের নিকট হইতে বল কাড়িয়া লইবার জন্য সম্মুখে নাসিকা, চক্ষু, ক[illegible], পদ, উদর যাহা পায়, তাহা বিকল করিয়া দেয়। [illegible] সহরবাসীরা যে যাহার দ্বার-গবাক্ষ লোহার চাদর দি[illegible]ড়িয়া রাখে।

সে সময়ে যদিও [illegible]জ খেলার স্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল,

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা—য়ুরোপীয়ান বনাম ভারতীয়—১৯২৭

(খৃ-পর্ব্ব) মঙ্গলবার দিন ঐ খেলা হইয়াছিল। সেই খেলাকে হাতাহাতি যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেলা দ্বিপ্রহরে খেলা আরম্ভ হয় এবং খেলার ভীষণতা অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। সন্ধ্যার মধ্যে খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন অল্প লোকই ছিল, যাহার একটা না একটা অঙ্গ জখম হইয়া গেল না! তখনকার খেলার এমনই বাহার ছিল। এখনও ইংলণ্ডে ডার্বি ফুটবল খেলার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখনও প্রতি স্রোভ মঙ্গলবার দিন ডার্বি সহরে এলোমেলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভয়ঙ্কর মার-ধর ও হাঙ্গামার সহিত সারাদিন ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়! সে সময়ে তথাপি সে নির্দ্দেশের নিয়ম পালিত হইত না। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে যেমন চুচু বা ভেলডিগ্‌ডিগ্‌ খেলায় শেষ খেলোয়াড় 'চুরে-আপ' দিয়া অপর পক্ষের কাহাকেও 'মারিয়া' বা 'মোড়' করিয়া খাল-বিল কাঁটা-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া নিজের কোর্টে ফিরিয়া আসে, তখনকার ফুটবল খেলোয়াড়রাও গ্রামে গ্রামে প্রতিযোগিতা পরীক্ষার সময় ৮০ গজের নিয়মের প্রতি কদলী-প্রদর্শন করিয়া খানা-খন্দ বাগান-বেড়া টপকাইয়া পাহাড় উপত্যকা চষিয়া বল লইয়া দৌড় দিত। এই জন্য তখনকার কালের ফুটবল খেলায় লোকের দৈহিক শক্তি ও

সহিষ্ণুতার পরীক্ষাই করা হইত—বিজ্ঞানসম্মত (Scientific) লোচনানন্দদায়ক (Spectacular) খেলার তখন নামগন্ধও ছিল না। ইহার ফল এই হইত যে, দেশের বিপদের দিনে ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে সৈন্য বাছিয়া লওয়ার সুবিধা হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম [illegible] যে সকল ফুটবল প্রতিযোগিতা পরীক্ষার খেলা হইয়াছিল, তন্ম[illegible] স্কটলণ্ডের ক্যাটেনহ নামক স্থানের খেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যা[illegible] ডেল অফ ক্যারো এবং সেলকার্ক নামক দুইটি গ্রামের মধ্যে [illegible] খেলা হয়। বিউক্লিউর ডিউক, তাঁহার পুত্র আরল অফ ডা[illegible]থ ও লর্ড জন স্কট এবং অন্যান্য বহু অভিজাতবংশীয় ভদ্র[illegible] খেলার দর্শকরূপে

ক্যামেরণ টিম

উপস্থিত ছিলেন। ডিউক স্বয়ং খেলার প্রারম্ভে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে (centre) বলটি ফেলিয়া দেন। খেলাস্থলে বিউক্লিউ বংশের প্রাচীন পতাকা উড্ডীন করা হয় এবং প্রাচীন স্কট জাতির সমরকালীন চীৎকার (War cry) উত্থিত করা হয়। এই ফুটবল যুদ্ধে সেলকার্ক গ্রামের জয় হয়।

এই সময় হইতে বৃটেনের সম্ভ্রান্তবংশীয়রা ফুটবল খেলায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং ফুটবল খেলা তখন হইতে ধীরে ধীরে 'নীচ' আখ্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ইংরাজের 'জাতীয়' খেলায় পরিণত হইতে আরম্ভ করে। হাতে পায়ে খেলার নাম 'রাগ্‌বি'। ক্রমে রাগ্‌বি খেলার আইন-কানুন প্রস্তুত হইতে থাকে। এ খেলা বড় শক্ত খেলা, ইহাতে শরীর থাকা চাই, শরীরে শক্তি থাকা চাই, অসাধারণ সহ্যগুণ থাকা চাই, হাড়গোড় ভাঙ্গিতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। রাগ্‌বি খেলায় ক্রমে খেলার মাঠের আয়তন, খেলার সময় এবং খেলোয়াড়ের সংখ্যা (১৫ জন) নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। খেলায় মধ্যস্থ নিয়োগ করার প্রথাও প্রবর্ত্তিত হয়।

কিন্তু নয়নানন্দদায়করূপে রাগবি হইতে এসোসিয়েশান খেলার প্রভাব অত্যধিক। বৎসর ৫০এর মধ্যে এসোসিয়েশান খেলার জন্ম হইয়াছে বটে, কিন্তু এই খেলা রাগ্‌বি অপেক্ষা বহুগুণে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যেখানে রাগ্‌বি খেলায় এক শত দুই শত দর্শক সমবেত হইত, সেখানে এসোসিয়েশান খেলায় হাজার হাজার—এমন কি, লক্ষাধিক দর্শকও সমবেত হইতেছে। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুদূর হাওয়াই দ্বীপে, আফরিকার জলাজঙ্গলে, ভারতের সহরে মফঃস্বলে—সর্ব্বত্রই প্রায় এখন এই খেলার আদর হইয়াছে। বাঙ্গালীর ত কথাই নাই, বোধ হয়, ইংরাজের পরেই বাঙ্গালীর এই খেলা জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে।

অথচ মাত্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম ফুটবল এসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহাই এসোসিয়েশান খেলা নিয়ন্ত্রণের প্রথম সূত্রপাত। এই সময়ে লণ্ডন ও সেফিল্ড সহরের মধ্যে ফুটবল এসোসিয়েশানের কাপখেলা হয়। উহাই বোধ হয় জগতে প্রথম এসোসিয়েশান ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা

পরীক্ষা। সে সময়ে ম্যাচ খেলার আইন-কানুন সরল ও সহজ ছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই খেলার সম্বন্ধে নিত্য নূতন সমস্যা উপস্থিত হইতে লাগিল, আর তাহার ফলে ক্রমশঃ খেলার আইন-কানুন কঠিন ও জটিল হইতে লাগিল।

লণ্ডন সহরের লাডগেট হিল পল্লীর একটি গৃহের ছোট একটি ঘরে ফুটবল এসোসিয়েশানের প্রথম সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যখন ঐ সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, তখন (১৮৬৩ খৃঃ) সভার সদস্যরা কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফুটবল এসোসিয়েশান ফুটবল খেলার কি আইন-কানুন গঠন বা পরিবর্ত্তন-পরিবর্ত্তন সংশোধন করিবেন? খেলায় যে ক্রমে নানা জটিল সমস্যার উদয় হইয়াছে, তাহাও কি তাঁহারা কখনও উদয় হইবে বলিয়া স্বপ্নেও মনে করিয়াছিলেন?

দিয়া দলে ভাল খেলোয়াড় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা হইতে 'প্রোফেসানাল' বা ভাড়াটিয়া খেলোয়াড়ের উদ্ভব হইল। যেখানে প্রোফেসানাল খেলোয়াড় পাওয়া যায়, সেইখানেই টাকা লইয়া প্রোফেসানালদের সাধাসাধি চলিতে লাগিল। টাকার 'ডাক' উঠিতে লাগিল, যে যত অধিক দিতে পারে, সেই ক্লাব সর্ব্বাপেক্ষা তত ভাল খে[illegible] যোগাড় করিতে পারিল। প্রোফেসানাল রাখা ফুট[illegible] আইন-কানুনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

প্রথমে ক্লাবগুলিকে [illegible] এসোসিয়েশানের আইন-কানুনের অধীনে আনয়ন কর[illegible] সহজসাধ্য ছিল না। প্রায়ই দেখা যাইত, প্রত্যেক স্থানের [illegible] আপনার নিজস্ব আইন মানিয়া চলিত। ইহাতে কাপ ম্যাচ[illegible] গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। এই

ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য

ক্রমে লণ্ডন ব্যতীত অন্যান্য মফঃস্বলের সহরে ফুটবল দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, বিলাতের এমন সহর রহিল না, যেখানে এক কিম্বা ততোধিক ফুটবল ক্লাবের সৃষ্টি না হইল। গ্লাসগো সহরের কুইন্স পার্ক ক্লাব এ সম্বন্ধে অগ্রণী হইয়াছিল। বিশেষতঃ যে দিন হইতে 'কাপ' ম্যাচ খেলার প্রবর্ত্তন হইল, সেই দিন হইতে খেলার পদ্ধতি ও আদর্শেরও দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল।

কাপ ম্যাচ খেলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রথারও প্রবর্ত্তন হইল। কাপ খেলায় জয়লাভ করিবার ইচ্ছা সকল ক্লাবেরই যে হইতে লাগিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সকলেই পয়সা

হেতু দুই চারিটি স্থানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে পরামর্শ করিয়া ক্লাবগুলি একই নিয়মাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সর্ব্বপ্রথমে দেখা যায়, লণ্ডন সহরের উত্তরস্থ সেফিল্ড এসোসিয়েশান লণ্ডনের ফুটবল এসোসিয়েশানের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে রাজী হইল। তখন হইতে সেফিল্ডের দেখাদেখি অন্যান্য এসোসিয়েশান লণ্ডনের ফুটবল এসোসিয়েশানের অধীনতা স্বীকার করিল। ফলে লণ্ডনের ফুটবল এসোসিয়েশান খেলার আইনের হাইকোর্ট হইয়া দাঁড়াইল।

ফুটবল খেলার আদি যুগে খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহর এত অধিক ছিল যে, অনেক সময়ে ইহার জন্য রক্তারক্তি

পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তও পূর্ব্বে দিয়াছি। ক্রমে এসোসিয়েশানের নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ির ফলে 'রেফারী' বা মধ্যস্থের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন খেলার ভীষণতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। খেলায় জুয়াচুরী, ইচ্ছা-পূর্ব্বক অপরকে আঘাত করিবার চেষ্টা, প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতিক [illegible] 'বে-আইনী' বলিয়া ঘোষিত হইল এবং রেফারী কঠোর শা[illegible] ঐ সকল অনিয়মের শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে [illegible] ক্রমশঃ বিজ্ঞানসম্মত ও কৌশলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত [illegible] লাগিল। খেলায় হার-জিত হইলে পরস্পর মনোমালিন্য [illegible] কিবার আর কারণ রহিল না, খেলার শেষে বিজেতা [illegible] করমর্দ্দন করিয়া ভবিষ্যতে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া শুভকামনা করিতে অভ্যস্ত হইল।

এমেচার অর্থাৎ অবৈতনিক এবং প্রফেসনাল অর্থাৎ বেতনভুক্ খেলোয়াড় পাশাপাশিই এক ক্লাবে খেলা করিতে অভ্যস্ত হইল। প্রথমে ইহাতে আপত্তি উঠিয়াছিল। এসোসিয়েশান প্রথমে প্রফেসানালদিগকে আমল দেন নাই। শেষে অনেক বাগ্-বিতণ্ডার পর প্রফেসানালরাও অবৈতনিক দলের খেলোয়াড়ের মত যে কোনও দলে খেলিতে পাইবে, এইরূপ আইন হইল। স্কটলণ্ড বহুকাল পরে এই আইন মানিয়া লইয়াছিল। শেষে এমন দিন আসিল, যখন ডেভিড জ্যাক অথবা জ্যাকহিলের মত প্রফেসানাল খেলোয়াড়ের 'ফি' বা বৃত্তি এক মরশুমে ১০ হাজার পাউণ্ড ও ৮ হাজার পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইল! আমাদের দেশে খেলোয়াড়ের এত বেতনের কথা শুনিলে লোক নিশ্চিতই বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। আমাদের দেশে পালোয়ানদের বৃত্তি দিয়া পোষণ করার পদ্ধতি আছে বটে, কিন্তু তাহাতে এত অধিক পরিমাণে বৃত্তিদানের কথা শুনা যায় না। প্রফেসানাল খেলোয়াড়ের উপস্থিতি হেতু ফুটবল খেলার যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না, তাঁহাদের ন্যায় খেলার বিশেষজ্ঞ সুনিয়ন্ত্রিত খেলার বা ম্যাচের সময়ে সকল দিকে আইন ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে ও মানাইতে সমর্থ খেলোয়াড় শ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন যে দলে থাকে, সে দলের সকলে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদেরই অনুকরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খেলিয়া ভাল খেলোয়াড় হইতে ত অভ্যস্ত হয়ই, পরন্তু আইন ও শৃঙ্খলা মানিয়া সমস্ত নিয়ম-কানুন অবগত হইয়া খেলিতে বাধ্য হয়। ফুটবল খেলার কৃতিত্বের যে দুইটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধতা ও বন্ধুতা-সঞ্জাত একপ্রাণতা, সেই দুইটি উপকরণ সংগৃহীত হওয়া সকল দলের পক্ষে দুষ্কর; কিন্তু দেখা গিয়াছে, যে দলে দুই এক জন প্রফেসানাল খেলোয়াড় আছে, সেই দলে এই উপকরণ সহজে ও শীঘ্র সংগৃহীত হইয়াছে। যে একাদশ জন খেলোয়াড় ম্যাচ খেলিতে নামে, তাহারা ১১ জনই যেন ঠিক এক জনে পরিণত হইয়া খেলিতেছে, প্রফেসানালের নিকট শিক্ষালাভে এমনই দৃশ্য সম্ভবপর হয়।

ইণ্টার্ন্যাশানাল অথবা আন্তর্জাতিক খেলার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই খেলা প্রথমে ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়। এই খেলার বিশেষত্ব এই যে, এক গ্রামের বা নগরের খেলোয়াড়ের বিপক্ষে অপর গ্রামের বা নগরের খেলোয়াড়রা খেলে না, ইহাতে এক জাতির বিপক্ষে আর এক জাতি খেলিয়া থাকে। অর্থাৎ একটা গোটা জাতির মধ্যে যত দল আছে, তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একাদশ জনকে লওয়া হয়। এইরূপ দুইটি জাতির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণকে লইয়া একটি প্রতিযোগিতা পরীক্ষার খেলা হয় এবং কাপের হার-জিত হয়। ইংলণ্ডে প্রথমে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ দেশের মধ্যে ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলা হয়। ঐ ম্যাচে ওয়েলস্ জয়লাভ করিয়াছিল। অমনই ইংলণ্ডের বড় দল ওয়েলস্ হইতে ভাল ভাল খেলোয়াড়কে মাহিনা দিয়া রাখিতে লাগিল। এইরূপে ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলোয়াড়ও প্রফেসানাল খেলোয়াড়ে পরিণত হইতে লাগিল। ক্রমে স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ প্রভৃতি দেশে ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলোয়াড় দল তৈয়ার হইতে লাগিল এবং সেই সকল ইণ্টার্ন্যাশাল দলের মধ্যে কাপ-ম্যাচ খেলা আরম্ভ হইল। ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলোয়াড়দের নাম জগতের সর্ব্বত্র বড় বড় লোকের নামের মত ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র অথবা মুষ্টিযুদ্ধের নায়কদের মত তাহাদের 'দর্শন'লাভের জন্য হাজার হাজার নরনারী অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, পথে-ঘাটে, রেলে-ষ্টীমারে, বাজারে দোকানে তাহাদের চিত্র রাজারাজড়া অথবা দেবদেবীর ছবির মত বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহাদের হাতের একটু সামান্য লেখা পাইবার জন্য, তাহাদের সহিত করমর্দ্দন করিবার নিমিত্ত হাজার হাজার পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয়িত হইবে না কেন? তাহারা যে কাপ-ম্যাচে খেলে, সেই খেলা দেখিতে হাজার হাজার পাউণ্ড টিকিট বিক্রয় হয়। কাযেই ব্যবসায়ের হিসাবেও তাহারা যে প্রার্থনীয় ও দর্শনীয় জীব হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্বে বিখ্যাত ক্যালকাটা ক্লাবে জ্যাকসন, হাণ্টার, উইনক্ওয়ার্থ প্রভৃতি দুই চারি জন ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলোয়াড় খেলিতে আসিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাদের খেলা দর্শনের সুখ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সে খেলা কত উচ্চাঙ্গের। একবার এক শিল্ড ম্যাচে ক্যালকাটা ক্লাব প্রায় শিল্ড হারাইতে বসিয়াছিল। সেবার উইঙ্কওয়ার্থ সেণ্টার হাফব্যাক না খেলিয়া ফুলব্যাকে খেলিয়াছিলেন। বিপক্ষ-পক্ষে প্রায় গোল দেয়, এমনই অবস্থা, এমন সময়ে একটা উড়ন্ত বল মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই উইঙ্কওয়ার্থ প্রায় নিজের গোলের সান্নিধ্য হইতেই সেই বলটা ব্যাক সট করিয়া এমনই ভঙ্গি করিলেন যে, সেই বলটি ফিরিয়া বিপক্ষ-পক্ষের গোলের এক অসম্ভব কোণ দিয়া প্রবেশ করিল। চারিদিকে উইঙ্কওয়ার্থের ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কোনও দর্শক কাগজে লিখিয়াছিলেন—Winckworth's shot would have beaten a professional. বস্তুতঃ সে সট সকল খেলোয়াড়কেই ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিত সন্দেহ নাই। বিপক্ষ-পক্ষের চতুর ফরওয়ার্ড খেলোয়াড় যখন বল লইয়া ডজ্ বা ড্রিবল করে, তখন অপর পক্ষের হাফব্যাক হঠাৎ অতর্কিতভাবে একখানা পা বাড়াইয়া দিয়া বলটা'র গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে বিপক্ষ-পক্ষের খেলার কারচুপি ভাঙ্গিয়া যায়। এই কৌশলটা প্রথমে উইঙ্কওয়ার্থ এ দেশে প্রবর্ত্তন করিয়া যান। আর একবার জ্যাকসন, ড্যালহাউসির মাঠের পূর্ব্ব প্রান্তের ব্যাকরূপে এমন একটি ভঙ্গি করিয়াছিলেন যে, বলটি মাঠ, থানা,

প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া রেড রোডের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। অত দীর্ঘ (powerful tall kick) আর কেহ করিয়াছে কি না জানা যায় নাই। কেবল ৫ম আর্টিলারীর এক দীর্ঘনাসিক ব্যাককে (Spindley) কতকটা ঐ ধরণে কিক্ করিতে দেখা গিয়াছে।

ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলোয়াড় ছাড়া ইংলণ্ডে কাউন্টি খেলোয়াড় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়ের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রত্যেক কাউন্টিতে গ্রাম ও নগর হইতে বাছা বাছা খেলোয়াড় লইয়া কাউন্টি খেলোয়াড় তৈয়ার করা হয়। তাহারাও ইণ্টার্ন্যাশানালের পরের পদ পাইবার যোগ্য। এ দেশে য়ুরোপীয় ক্লাবসমূহ অনেক কাউন্টি খেলোয়াড় আমদানী করিয়া আপন আপন দলকে শক্তিশালী করিয়া থাকেন। তাহার পর অক্সফোর্ড ব্লু (ক্যালকাটা ক্লাবের) হোসির মত অক্সফোর্ড ক্যাম্বিজ আদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা খেলোয়াড়রাও যত্র তত্র সমাদরে আমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের মত মার্কিণ দেশেরও হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়রা জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ইংরাজ জাতির উৎকৃষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়ের আর একটি জন্মভূমি সৈন্যশ্রেণী। হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ব্ল্যাকওয়াচ, হাইলাণ্ডারস্, রয়্যাল স্কটস্, বর্ডারারস, রয়্যাল আইরিশ, আইরিশ রাইফেলস্, ওয়েলস ফুজিলিয়ার্স, ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি, সারউড ফরেষ্টার্স, চেসায়ার্স, মিডলসেক্স, হ্যামসায়ার, ওয়েষ্টকেণ্ট, কিংসওন স্কটিস্ বর্ডারার, গর্ডনস্ প্রমুখ বৃটিশ সেনাদলের খেলা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, ফুটবল খেলা কতদূর মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। এক এক সেনাদলে অনেক কম্প্যানী থাকে। প্রত্যেক কম্প্যানীর স্বতন্ত্র দল থাকে, তাহারা প্রত্যহ দিনে দুইবার, কখনও কখনও চাঁদনী রাত্রিতে একবার ফুটবল খেলা অভ্যাস করে। কাযেই তাহারা খেলায় অতিমাত্র দক্ষতালাভ করে। এই হেতু সমস্ত কম্প্যানী হইতে বাছিয়া যখন একটা সেনা খেলোয়াড় দল গঠন করা হয়, তখন তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করা অপর দলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

সকল সময়েই যে উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় দল কাপ ম্যাচে জয়লাভ করে, তাহা নহে, কেন না, ফুটবল খেলা অনেকটা দৈবের উপর—ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। আবার শক্তিশালী, ওজনে ভারী, দৃঢ় মাংসপেশী-সমন্বিত খেলোয়াড়দলই যে সকল সময়ে জয়লাভ করে, তাহাও নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আমাদের বাঙ্গালী মোহনবাগান দল প্রতি বৎসরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলা দেখাইয়াও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট দলের নিকট পরাজিত হইত না, আবার তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ওজনে ভারী বুটপরিহিত গোমাংসসেবী গোরা সেনাদলকে লইয়া খেলার ছিনিমিনি খেলিতে পারিত না।

পূর্ব্ব-যুগে যে সকল ইংরাজ খেলোয়াড় দল দেখা দিয়াছিল, তন্মধ্যে রয়্যাল আইরিশের গোলকিপার বেরেসফোর্ড 'ম্যাজিসিয়ান' আখ্যা লাভ করিয়াছিল, এমনই অদ্ভুত গোল-কিপারী সে করিয়াছিল। কিন্তু যখন ক্যালকাটা, ডালহাউসি প্রভৃতি কয়েকটি দল সম্মিলিত হইয়া এই প্রথম শিল্ড-বিজয়ী দলের সহিত ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ খেলিয়াছিল এবং এসটন্ ও লিগুজের সহযোগিতায় বেরেসফোর্ডের গোলে ৪টি গোল ঢুকিয়াছিল, তখন তাহার ম্যাজিসিয়ান নাম ঘুচিয়াছিল। ব্যুয়র যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাচীন হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি কলিকাতায় যখন বাজীর খেলা খেলিতে আসিয়া হঠাৎ যুদ্ধে আহূত হইয়াছিল, তখন যাত্রার পূর্ব্বে এক দিন এখানকার সম্মিলিত দলসকলের সহিত তাহা[illegible] একটা খেলা হইয়াছিল; সেই সম্মিলিত দলে ক্যালকাটা, [illegible]সি, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ৭টি দলের বাছা বাছা খেলোয়াড় [illegible] কিন্তু হাইল্যাণ্ডারা সেই দলকে বিনা আয়াসে ৪টি [illegible]দিয়াছিল! আর তাহারা যে খেলা দেখাইয়াছিল, তাহার [illegible]না খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মজা এই, তাহারা ধাক্কাধুক্কির [illegible] দিয়াও যায় নাই। এক ব্যাকের কাছে বিপক্ষ ২।৩ জ[illegible]য়া গেলে অপর ব্যাক তাহাকে সাহায্য করিতে যায় নাই, সে[illegible] একাকী বিপদ দূর করিয়াছে। হাফ-ব্যাক, ব্যাক, সবাই 'সর্ট পাসিং' করিয়া খেলিয়াছিল। যেন ছবির মত তাহারা এক নিয়মের অধীন হইয়া খেলা দেখাইয়াছিল। আর একবার ক্যালকাটা ও কিংস ওন্ স্কটিস বর্ডারারদের মধ্যে শিল্ড খেলা হইয়াছিল। সে খেলা উপভোগ্য, বর্ণনীয় নহে। এমনই ভাবের খেলা ক্যালকাটা বনাম প্রপসায়ারে, ক্যালকাটা ড্যালহাউসিতে, ক্যালকাটা মিডলসেক্সে হইয়াছে এবং শিমলায় মোহনবাগান সারউড়ে ও বোম্বাইতে মোহনবাগান ডারহামে হইয়াছিল, বলিয়া শুনিতে পাই।

রয়্যাল আইরিশ রাইফলসের মত কিন্তু এযাবৎ কেহ নাম কিনিতে পারে নাই। তাহারা এক মরশুমে লিগ খেলায় সকল দলকে গোল দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বিপক্ষে একটি গোলও হয় নাই। শিল্ড খেলাতেও তাহাদের বিপক্ষে একটিও গোল হয় নাই, কেবল ফাইনালে তাহারা বিপক্ষ-পক্ষকে ৬ গোল দিয়াছিল ও বিপক্ষ-পক্ষ তাহাদিগকে মাত্র ১ গোল দিয়াছিল। সারা মরশুমে তাহাদের বিপক্ষে মাত্র ঐ একটি গোল হইয়াছিল! 'ষ্টেটসম্যান' সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন, "Fall of the Irish citadel!" আর নাম কিনিয়াছিল গর্ডন হাইলাণ্ডার দল ও ক্যালকাটা ক্লাব। এই দুই ক্লাব পর পর ৩ বৎসর শিল্ড জয় করিয়াছিল। প্রাচ্যের মধ্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে আমাদের মোহনবাগান। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শিল্ড জয় করিবার পূর্ব্বে তাহারা উপর্য্যুপরি ৩বার ট্রেডস্‌কাপ জয় করিয়াছিল এবং যেখানে খেলিতে গিয়াছে, সেই স্থানে বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী সকলেরই প্রাণে আনন্দ দান করিয়াছে। দ্বিতীয়বার শিল্ড জয় করিতে না পারিলেও তাহারা সকল খেলাতেই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ বহন করিয়াছে। পূর্ব্বযুগে কালীঘাট ন্যাশানালও ঠিক এইরূপে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অতীত যুগে যে সকল খেলোয়াড় এ দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রয়্যাল আইরশের বেরেসফোর্ড; বাফসের ইভান্স; আর্টিলারির লোমাক্স ও স্পিণ্ডলে; ক্যালক্যাটার কামলে, প্লেটার, বড় ওয়াটসন, ছোট ওয়াটসন, অ্যাসটন, নিউটন, বার্কমায়ার, মাসার, জ্যাক্সন, হাণ্টার, হ্যারিস; ড্যালহাউসির লিগুসে, ওয়ারিংটন, কারি; নেভাল্ ভলান্টিয়ারস্ (বর্ত্তমান রেঞ্জাস্) দলের বাথো, ম্যাথিসন; হাওড়ার ম্যাক্‌লেল্যাণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আর বাঙ্গালীদের মধ্যে শোভাবাজার

ক্লাবের কালী মুখুয্যে ও কালী মিত্র, ন্যাসানালের নন্দকিশোর, হরি মুখুয্যে; আর্সেনালের আবদুল ও ক্ষেত্র মিত্তির; শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কালেজের হরিশ ভাদুড়ী; টাউনের ভোলা, গোপাল, বিশু; হেয়ার স্পোর্টিংএর শরৎ সর্ব্বাধিকারী, দাশু মুখুয্যে, উপেন দাস, স্থরেশ রায় প্রভৃতির নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। লোমাক্স বল অতি সুন্দর ড্রিবল করিতে পারিত। ম্যাক্‌লেল্যাণ্ড এক গোল হইতে অপর গোল পর্য্যন্ত সমস্ত খেলোয়াড়কে কাটাইয়া বল লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু এত জোরে সুট করিত যে, গোল প্রায়ই হইত না। তাহার পা দুইখানা ছিল যেন বাঁখারী বা বেড়ার মত,—উহার মধ্য হইতে কেহ বল কাড়িয়া লইতে পারিত না। লিগুসের মত দূর হইতে সুট করিয়া কেহ গোল দিতে অদ্যাপি পারে নাই। তাহার সুটের বল কামানের গোলার মত ছুটিত, গোলকিপার ধরিলে হাত ফাটিয়া রক্ত বাহির হইত। অ্যাসটন্, কামলে, শ্লেটার, মার্সার প্রভৃতি সুন্দর ড্রিবল্ করিত ও পাসিং গেম খেলিত।

মধ্যযুগে উইঙ্কওয়ার্থ, বাক্‌লে, কিংকাম্, ইসুমে, ফাইফ, কুপার, বড় সার্ম্যান, ছোট সার্ম্যান ক্যালকাটার; প্রাইক, বড় ব্রাউন, ছোট ব্রাউন, পিগট, ষ্টিভেনটন্, হাডাওয়ে ড্যালহাউসির; মেঞ্চাসের রসার, আপকার, কোডি; ই, বি, আরের চার্চ্চহিল, শিরীষ, জোসেফ, বঙ্কিম, প্রফুল্ল; কাষ্টমের হাইল্যাণ্ড, গলব্রেথ, ম্যাকরেডি, দুই স্মিথ ভ্রাতা; ন্যাসানালের গোবর, হরি চাটুয্যে, গোরা, সত্যধেনু, ক্ষেত্র মিত্র; মোহনবাগানের শিবু ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী, অভিলাষ, হাবুল, সুধীর, কানু, রাজন; এরিয়ানের দুখীরাম, নির্ম্মল, মুটে; তাজহাটের সুবল—প্রভৃতি স্বনামপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন। তাহার পরের যুগেও হোসি, কলভিন, নাইট, বেনেট, টড, ফেন, টমাস, ডেভিডসন, ডেভিস (ড্যালহাউসির গোলকিপার) মার্শাল য়ুরোপীয়দের মধ্যে; গোষ্ঠ পাল, আর দাস, বলাই চাটুয্যে, সুধাংশু, রবি গাঙ্গুলী, কুমার, নরেন বাঁড়ুয্যে (মোহনবাগান), সামাদ (ই বি আর), প্রশান্ত বর্দ্ধন, তালুকদার, মোনা দত্ত, দুলাল, সূর্য্য চক্রবর্ত্তী (ইষ্টবেঙ্গল), রহমান, মজুমদার (এরিয়ান), দেবী ঘোষ (হাওড়া য়ুনিয়ন)।

এ দেশের ফুটবলের ইতিহাস ধরিতে গেলে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ডেই এসোসিয়েশান খেলা বৈজ্ঞানিক ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, কি না সন্দেহ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় combination খেলার প্রথম নিদর্শন দেখাইয়াছিল। উহার পূর্ব্বে রাগ্‌বি খেলাই প্রশস্ত ছিল এবং এসোসিয়েশান খেলা কতকটা রাগবি-মিশ্রিত এসোসিয়েশান খেলারই মত ছিল। আমাদের দেশেও প্রথমে রাগ্‌বি খেলা প্রচলিত হয়। য়ুরোপীয়রাই ঐ খেলায় আমোদ উপভোগ করিতেন, এদেশীয়দের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত কেহ ইহা দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিত না।

বোধ হয়, ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার গড়ের মাঠে প্রথম য়ুরোপীয়রা এসোসিয়েশান খেলা আরম্ভ করেন। তখন

বেঙ্গল সকার লীগের বাছাই খেলওয়াড়ের দল

'ট্রেডস্' ক্লাব নামে য়ুরোপীয়দের একটা খেড়োয়াড় দল ছিল। চৌরঙ্গী ও ড্যালহাউসি স্কোয়ারের য়ুরোপীয় দোকানদারদের এসিষ্টাণ্টরাই ইহার খেলোয়াড় শ্রেণীভুক্ত হইতেন। তখন মাঠে দর্শকের একান্ত অভাব ছিল। ফুটবল বিজাতীয় ও নূতন ধরণের খেলা বলিয়া এদেশীয়রা উহা দেখিতে আগ্রহান্বিত ছিল না। তখন গ্রীষ্মকালে ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি ওড়ানই মস্ত খেলা ছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'ট্রেডস কাপের' সৃষ্টি হয়। এ দেশে বোধ হয় সাধারণের মধ্যে উহাই প্রথম কাপ প্রতিযোগিতা খেলা, তৎপূর্ব্বে গোরাদের মধ্যে কাপ প্রতিযোগিতা খেলা ছিল কি না জানি না। মাঠে 'বাফস্' নামক গোরা সেনাদলের সহিত বাঙ্গালী "ওক্স" নামক দলের এক রাগ্‌বি ম্যাচ হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা খালি পায়ে খেলিয়াছিল ও পেট. ভরিয়া হারিয়াছিল। তাহাদের কাহারও কাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল, কাহারও মাথা ফাটিয়াছিল, কাহারও হাত-পা মচকাইয়া গিয়াছিল। ইহার পর "ওক্স" দল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। ইহা বোধ হয়, [illegible]৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন য়ুরোপীয় দলগুলির মধ্যে [illegible]বি খেলা হইত। রাগ্‌বি কাপ খেলায় তখন ক্যালকা[illegible]াব, বাফস্ রেজিমেণ্ট, বোম্বাই জিমখানা প্রমুখ বড় ব[illegible] খেলিত। বোম্বাই জিমখানা দল

লীগের খেলার ভারতীয় বাছাই খেলওয়াড়ের দল—১৯২৭
কে ঘোষ, এন গোঁসাই, তালুকদার, গুঁই, সামাদ, মোনাদত্ত, গোষ্ঠ, সূর্য্য চক্রবর্ত্তী ও কুমার

প্রথম ট্রেডস্ কাপ ড্যালহাউসি ক্লাব পাইয়াছিল, সেবার ১০টা দল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে—৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে প্রতিযোগী দলের সংখ্যা উঠিয়াছে ৬৬টি। বুঝিয়া দেখুন, ফুটবল এ দেশে কি দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে।

এ দেশে প্রথমে রাগ্ বি খেলার আমদানি হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রথম মনে পড়ে, গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের কাছে একটা যেবার (বোধ হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় কাপ খেলিতে আসিয়াছিল, সেবার সে দলে মার্শাল, রীড, ওয়ালপোল ও সেণ্টপল নামক বড় বড় খেলোয়াড় আসিয়াছিল। ইহারা ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলোয়াড় ছিল। ক্যালকাটা ক্লাবেরও ম্যাকিনন, ফেগান, ওয়াটসন, হেণ্ডার্সন প্রভৃতি বিখ্যাত রাগ্‌বি খেলোয়াড় ছিল। একবার এক খেলায় যখন ফেগান বল লইয়া ট্রাই করিতে দৌড়িতেছিল, তখন তাহার দলের লোক তাহাকে উৎসাহিত

করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, 'Now Fagan, now is the time.' ফেগান একটা লম্ফ দিয়া এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে টপকাইয়া যেমন ট্রাই করিল, অমনই তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল। খেলার মাঠেই ফেগানের মৃত্যু হয়। রাগবি খেলায় কণ্ট্রোলার জেনারল ষ্টিফেন জ্যাকবের পুত্র পি, জি, জ্যাকবের মত অসাধারণ শক্তিশালী অথচ শিষ্ট ভালমানুষ খেলোয়াড় এ যাবৎ কুত্রাপি দেখি নাই। মাটিতে পড়ে, জ্যাকব ৭।৮ জন মানুষের নিকট কাঁধে পিঠে পায়ে বাঁধা থাকিয়াও বল লইয়া ট্রাই করিয়াছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে তখন শোভাবাজার ক্লাবই 'আদি ও অকৃত্রিম'। এইরূপে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ট্রেডস্ কাপ জয় করে। শ্রীযুক্ত মন্মথ গাঙ্গুলী এই দলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। সেবার ১৭টি দল ঐ খেলায় প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। কিন্তু ন্যাশানালের পূর্ব্বেও শোভাবাজার ক্লাব প্রতিযেগিতা খেলায় প্রথম রাউণ্ডে ইষ্ট সারে নামক গোরা সেনাদলকে ৩ গোলে হারাইয়া দিয়াছিল। সেই খেলায় শোভাবাজারের ব্যাক কালী মুখুয্যে অত্যন্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মাঠের ছোকরারা তখন বাঙ্গালী ভাল খেলোয়াড় মাত্রকেই 'কালী বাবু' আখ্যা দিয়াছিল এবং বাঙ্গালী খারাপ খেলিলেই ব্যঙ্গ করিয়া বলিত, "কালী বাবু চিংড়ী মাছ খেয়েছে!"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মোহনবাগান ক্লাব ট্রেডস্ কাপ জয়

ইষ্টবেঙ্গল—১৯২৮

করে এবং পর পর ১৯০৭ ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কাপ জয় করিয়া ট্রেডস্ কাপে যাহা হয় নাই, তাহা সম্পন্ন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৩২টি, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২৮টি এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৩৫টি দল প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় দলের সংখ্যা অল্প ছিল না। বিশেষতঃ তখনকার কালে মেডিক্যাল কালেজের মিলিটারী ষ্টুডেণ্ট খেলোয়াড়রা খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। শিবদাস ভাদুড়ী একবার বহুদূর কর্ণারের নিকট হইতে পড়িতে পড়িতে যে কৌশলে স্যুট করিয়া গোল দিয়াছিল, তাহা ফুটবল-আমোদী দর্শকমাত্রে আজিও

কালা মিত্র মহাশয়ের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, তিনি আলীপুরের উকীল ছিলেন। তিনিই এই ক্লাবের প্রাণ ছিলেন। তাঁহারই যত্নে কালী মুখুয্যে, নগেন ও বিনয় সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি বাঙ্গালী এসোসিয়েশান ফুটবল খেলোয়াড় তৈয়ার হয়। বাফস্ রেজিমেণ্টের ইভান্স শোভাবাজার দলকে খেলা শিখাইত।

বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা য়ুরোপীয়দের দেখাদেখি নিজ নিজ দল গঠন করিতে থাকে। তাহারা এই খেলায় শীঘ্রই এত দক্ষতা লাভ করে যে, য়ুরোপীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় দাঁড়াইতে অগ্রসর হয়। কালীঘাটের ন্যাশানাল এসোসিয়েশান

মনে করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। বিজয়দাস ও শিবদাস —দুই ভাদুড়ী ভ্রাতার combination এক অপূর্ব্ব পদার্থ ছিল, উহা দর্শনে মন আনন্দরসে ভরিয়া উঠিত। সেণ্টার হাফে রাজেন সেনের খেলা উপভোগ্য ছিল। ন্যাশানাল এসোসিয়েশানের গোবর, হরি চাটুয্যে, জোসেফ, হুইলার, ক্ষেত্র মিত্র এবং হেয়ার-স্পোর্টিংএর দাশু মুখুয্যে ও শরৎ সর্ব্বাধিকারীর খেলাও অতি সুন্দর ছিল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠা বোধ হয় সহস্রাধিক কাপ খেলার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর নূতন নূতন কাপের সৃষ্টি হইতেছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিল্ড খেলায় রয়্যাল আইরিশ গোরা সেনাদল শিল্ড জয় করে। সেবার ১০টি দলে লড়াই হইয়াছিল। বেরেশ-ফোর্ড রয়্যাল আইরিশের গোলকিপারী করিয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়াছিল। গর্ডন হাইল্যা[illegible] গোরা সেনাদল ১৯০৮ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপ[illegible] ৩ বৎসর শিল্ড জয় করিয়াছিল। ক্যালকাটা ক্লাবও ১৯২[illegible] হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ বার

মোহনবাগান ও পুলিশ

হয়, এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদল-সমূহের মধ্যে খেলার প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বৎসরেই এসোসিয়েশান হইতে শিল্ড প্রতিযোগিতা খেলার প্রবর্ত্তন করা হয়, আর 'ট্রেডস্ কাপটিকে' জুনিয়ার বা ছোট প্রতিযোগিতা খেলার মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হয়। আবার ঐ বৎসরেই কেবল দেশীয় খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা খেলার জন্য কুচবিহারের মহারাজার উদ্যোগে এসোসিয়েশানের কর্তৃত্বে "কুচবিহার কাপ" খেলারও প্রবর্ত্তন করা হয়। এখন যে কত 'কাপ' খেলা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। কেবল কলিকাতায় নহে, সহরতলী ও মফঃস্বলে উপরি উপরি শিল্ড জয় করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র মোহনবাগান ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শিল্ড জয় করিয়াছিল। ঐবার মোট ২০টি দল প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় যোগ দিয়াছিল। বড় বড় নামজাদা অভিজ্ঞ গোরা সেনাদলকে একের পর একে হারাইয়া মোহনবাগান য়ুরোপীয় সমাজকে চমৎকৃত করিয়া দিয়া-ছিল এবং বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সে মোহনবাগান আর নাই!

'কুচবিহার কাপ' ও ন্যাশানাল এসোসিয়েশান ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি ৩ বার জয় করিয়া কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ন্যাশানাল এসোসিয়েশানের অস্তিত্বই আর নাই।

এখন খেলার অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এখন বাঙ্গালী মোহনবাগান ও ইষ্ট-বেঙ্গল শিমলায় ডুরাণ্ড খেলায় বড় বড় মিলিটারী খেলোয়াড় দলের সহিত খেলিয়া নাম কিনিতেছে। রেলের এক শ্রেণীর দল (য়ুরোপীয় ও ভারতীয় খেলোয়াড়) শিমলায় ডুরাণ্ডকাপ খেলায় ফাইনাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা খেলায় (International) ভারতীয় দল য়ুরোপীয় দলকে একাধিক বৎসর জ্যাকসন, হান্টার, উইকওয়ার্থ, সার্ম্মান, ফাইফ, কুপার, প্রাইক, বেরেসফোর্ড, লোমাক্স, ষ্টীভনটন, চার্চ্চিল, ম্যাকে, স্মিথ ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ যে শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় এ দেশে দেখা গিয়াছে, তাহাদের তুলনায় এখনকার খেলোয়াড়ের খেলা যেন 'নিরেস' বলিয়া মনে হয়। হয় ত এখনকার খেলায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তার সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তখনকার খেলায় উহার অভাব থাকিলেও উহার আকর্ষণী শক্তি যে অসাধারণ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সে যাহা হউক, যখন এই ফুটবল খেলা বাঙ্গালী বৃদ্ধ হইতে

সেরউড ফরেষ্টারস শিল্ড-বিজয়ী—১৯২৭

পরাজিত করিয়াছে। এখন ভারতীয়দের মধ্যে মোহনবাগান ব্যতীত অন্য অনেক খেলোয়াড় দল য়ুরোপীয় দলের বিপক্ষে সমান তেজে খেলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এ সকল কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও আমার মনে হয়, প্রাচীন যুগে আমরা কালী মুখুয্যে, দ্বারিক, নন্দকিশোর, গোরা, গোবর, ক্ষেত্র মিত্র, হরি চাটুয্যে, দাশু, উপেন, শরৎ সর্ব্বাধিকারী, গোপাল, বিশু, জোসেফ অরুণলম্বনম্, শুকুল, রাজেন, বিজয়, শিবদাস প্রমুখ যে সকল বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের খেলা দেখিয়াছি, অথবা য়ুরোপীয়দের মধ্যে লিগুসে, ম্যাক্লেলাণ্ড, অ্যাসটন, কমলে, প্লেটার, শিশুকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে এবং উহা বাঙ্গালীর জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে, তখন বিলাতের মত এই খেলাকে বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে 'সঙ্ঘবদ্ধ' অথবা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা উচিত। খেলায় জাতিগত বৈষম্য-বিদ্বেষ আনয়ন করিতে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালীর প্রধান খেলোয়াড় দলের মধ্যে এই খেলার কর্ত্তৃত্ব বাঙ্গালীর হস্তে রাখিতে দোষ নাই। ফুটবল এসোসিয়েশান এখন যে ভাবে গঠিত, তাহাতে কর্ত্তৃত্ব যেন বেশীর ভাগ য়ুরোপীয়দের হস্তে ন্যস্ত। অথচ য়ুরোপীয় দল সংখ্যায় বাঙ্গালী দল অপেক্ষা অনেক কম। ইহার

কারণ কি ? দেখা যায়, খেলার মাঠ বাঙ্গালীর ভাগ্যে ভাল পড়ে না। ভাল মাঠগুলি য়ুরোপীয়রাই দখল করিয়া আছেন। শিল্ড বা কাপ ম্যাচগুলি তাঁহাদের মাঠেই খেলা হয়। খেলার ব্যবস্থা আদি তাঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যাহাতে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, বাঙ্গালীর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তাহা করা উচিত। এক বৎসর তাঁহাদের তাঁবুতে, অন্য বৎসর ভারতীয়দের তাঁবুতে—টাই ড্র করা উচিত। কাপ খেলাও যাহাতে ভারতীয়দের খেলার মাঠে হয় এবং ভারতীয়রাও যাহাতে ভাল মাঠ পায়, তাহার জন্য আন্দোলন করা উচিত।

ভারতীয়দেরও অনেক দোষের কথা বলিবার আছে। তাঁহারা যখন এই ব্যয়বহুল খেলাকে আপনাদের করিয়া লইয়াছেন, তখন
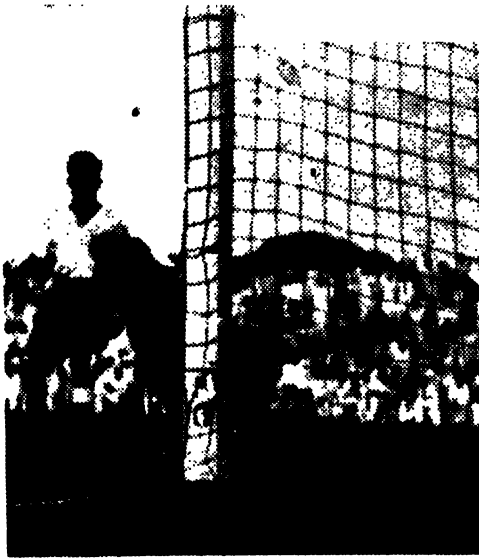
খেলার একটি দৃশ্য

তাহার জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করাও কর্ত্তব্য। তাঁহাদের খেলার মাঠ য়ুরোপীয়দের মত যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয় না কেন ? তাঁহাদের খেলার মাঠ বিস্তারে ছোট হয় কেন ? তাহা ঘিরিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না কেন ? খেলা বুট পরিয়া না হইলে ভাল হয় না। দেখা গিয়াছে, অনেক সময়ে বুটের ভয়ে বাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলায় অগ্রসর হইতে পারে না। অথবা পায়ের 'বাগে না পাইলে' বুটের অভাবে গোল দিতে পারে না। জলকাদায় খালি পায়ে খেলায় পরাজয় হইবেই। ফুটবল জলকাদার মরশুমের খেলা। সে সময়ে বুট পরিয়া খেলার অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। 'জল হ'ল, না হ'লে মোহনবাগান দেখিয়ে দিত,'—এই বাহানা লইলে চলিবে না।

আর একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বাঙ্গালী দর্শকের অন্যায় এবং অভদ্রোচিত পক্ষপাতিতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার

খেলার আর একটি দৃশ্য

করিতে হইবে। খেলার হার-জিত আছে। কিন্তু সেজন্য বাঙ্গালী দলের পক্ষপাতিতা করিয়া য়ুরোপীয় দলকে ইতর ভাষায় গালি দেওয়া কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। খেলার উন্নতি করিতে হইলে বাঙ্গালী দর্শককে এই দোষ সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে।

খেলার অন্য দৃশ্য

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

নবদুর্গা

(উপন্যাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফুল বুঝি ফুটিল

কালীঘাটের পাণ্ডা প্রকাশ হালদার মহাশয় বড় ভাল লোক। অন্য পাণ্ডাদের মত তাঁহার মুখে কেবল "দেহি দেহি" রব নাই; গরীব যজমানকেও যত্নসহকারে দর্শনাদি করাইয়া থাকেন। তাঁহার দুইটি বাড়ী আছে—একটি পাকা দ্বিতল কোঠা, মা'র মন্দিরের অতি নিকটেই; অপরটি আদি-গঙ্গায় যাইবার পথে; এ বাড়ীর দেওয়ালগুলি ছিটাবেড়ার উপর কাদার প্রলেপ দিয়া তৈরী, উপরে খোলার চাল। এই মেটে বাড়ীতেই একটি ঘর ও রান্নার একটু স্থান দৈনিক আট আনা হিসাবে ভাড়া লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্ত্রী-কন্যা সহ অবস্থিতি করিতেছেন।

কালীঘাটে আসিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাণ্ডা ঠাকুরকে কলিকাতায় আসার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; হালদার মহাশয়ও একটি সু-পাত্র অন্বেষণ বিষয়ে তাঁহাকে যথাশক্তি সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গতকল্য এক জন ঘটকীকে তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবদুর্গাকে দেখাইয়াছেন। ঘটকী বলিয়া গিয়াছে, "টাকা-কড়ি যখন দিতে পারবেন না, প্রথম পক্ষের পাশ করা ছেলে জোটানো শক্ত; তবে ডাগর মেয়ে, রূপও আছে, দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র জুটে যেতে পারে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইয়াছেন; বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পক্ষে আপত্তি নেই, তবে বয়সটা নিতান্ত বেশী না হয়, দু'টা মোটা ভাত, দুখানা মোটা কাপড় দিবার যদি সংস্থান থাকে, তবে তিনি কন্যাদান করিতে প্রস্তুত।" মোহান্তের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও গুপ্তচর বিপিনবিহারী সরকার ছদ্ম পরিচয়ে এই বাটীতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতেছে। বিপিনও সেখানে সে সময় উপস্থিত ছিল। সে বলিয়াছিল, "আহা, এমন খাসা মেয়ে, যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী, একে দোজবরে দেবেন ভটচায মশায়? কি বলবো, আমি মাহিষ্য; যদি বামুন আর আপনাদের স্বঘর হতাম, তা হ'লে আমার বড় ছেলেটির সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়ে, বাড়ীতে বারোমেসে দুর্গো প্রতিষ্ঠে করতাম।" বিপিন সরকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নিজ পরিচয়ে "কেদারেশ্বরের" ক-অক্ষরটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করে নাই; বলিয়াছে, রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমায় তাহার নিবাস, সেখানে উহার কিছু পত্তনী সম্পত্তি আছে, একটা মামলায় হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে; সেই মামলা তদ্বিরের জন্যই কয়েক দিন তাহার কালীঘাটে থাকা; কারণ, তাহার উকীলবাবু কালীঘাটেরই বাসিন্দা।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভাতে উঠিয়া, আদিগঙ্গায় গিয়া স্নান-আহ্নিক করিয়া মন্দিরে যান। যে দিন যাত্রীর ভিড় কম, স্ত্রী-কন্যাকেও সঙ্গে লইয়া যান। মাকে দর্শন করিয়া, বাসায় ফিরিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে বাজারে যান। বাজার হইতে প্রায়ই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। মাছ-তরকারীর মহার্ঘতাই তাঁহার ক্রোধের কারণ। "শুনছ গিন্নি, এই ক'টা কুচো চিংড়ী, এর দাম দশ পয়সা। এই সজনে-খাড়াগুলো, পেকে ত ঝিঁকুট হয়ে গেছে, এক পয়সায় চার গাছার বেশী দিলে না। এই বিলিতী কুমড়োর ফালিটুকু, ফুঁ দিলে উড়ে যায়, এর দাম দু' পয়সা। বাপ রে বাপ, কি ক'রে মানুষ যে কলকাতায় বাস করে, তা জানিনে!"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রার পর উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায়ই গিয়া মন্দির-সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বসেন। তথায় নানা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করেন, "ঘটকী এসেছিল?"—গৃহিণী বলেন, "কৈ, না।" ভট্টাচার্য্য বলেন, "আজও এল না? কি করছে মাগী তা হ'লে? কত দিন আর এ রকমভাবে এখানে ব'সে থাকবো!"

এইভাবে পনেরো দিন কাটিয়া গেলে, হঠাৎ এক পাত্রের সন্ধান আসিল, স্বয়ং পাণ্ডা ঠাকুরেরই মুখে। সে দিন দেহটা একটু অসুস্থ বলিয়া বিকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাটমন্দিরে যান নাই। সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া, রাস্তার ধারে দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া হুঁকা হস্তে ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রকাশ হালদার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "হালদার মশাই যে, আসুন আসুন।"—বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বসাইলেন। "তামাক ইচ্ছে করুন"—বলিয়া হুঁকাটি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "খবর কি?"

হালদার বলিলেন, "খবর আছে। ক্ষান্ত আর এসেছিল?"

ভট্টাচার্য্য। ক্ষান্ত কে?

হালদার। ঐ সেই ঘটকী ঠাকরুণ।

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, কাল এসেছিল। তিনটি দোজবরে পাত্রের সন্ধান বল্লে। তা, সে রকম পাত্রকে মেয়ে দেওয়ার চাইতে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল। একটির বয়স বাহান্ন, একটির পঞ্চান্ন, একটির বুঝি ষাট।

হালদার হাসিয়া বলিলেন, "প্রত্যেকেই 'বয়সে বাপের বড়'—বলুন!"

"বড়ই ত। আমি এই পঞ্চাশ পেরিয়ে একান্নয় পড়েছি। তা ছাড়া, যে বলেছে বাহান্ন, সে বোধ হয় ষাট, যে বলেছে ষাট, সে বোধ হয় সত্তর। কিঞ্চিৎ হাতে রেখে বলবে ত!"

হালদার বলিলেন, "বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ হাতে রেখে বলাই সম্ভব। তা, সে যাক। 'মেল' ছাড়া পাত্র হ'লে বিয়ে দেবেন?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কেন দেবো না? আমার আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই। 'মেল' নিয়ে কি ধুয়ে খাব? কেমন পাত্র, বাড়ী কোথায়?"

"বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। পাত্রের নাম অধরনাথ মুখোপাধ্যায়।"

"কত বয়স হবে?"

"এই, তিরিশের ভেতরেই। দিব্যি স্বাস্থ্য। পশ্চিমে থাকে কি না!"

"কি করে?"

"কোন এক মেড়ো রাজার এষ্টেটে তসিলদার।"

"দোজবরে ত? সন্তানাদি আছে?"

"হাঁ, একটি ছেলে, একটি মেয়ে আছে শুন্লাম। ছুটী নিয়ে দেশে গিয়েছিল; এখন কর্ম্মস্থানে ফিরে যাচ্ছে। পথে মাকে দর্শন করতে এসেছে। আমারই পাকা বাড়ীতে ক'দিন রয়েছে সে।"

"বটে!"

"আজ বিকেলে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, হালদার মশাই, আমি প্রায়ই দেখি, ফর্সা মতন এক জন বুড়ো ভদ্রলোক, সঙ্গে দুটি মেয়েছেলে—একটি গিন্নী-বান্নি, একটি বোধ হয় কুমারী; ধপ্ ধপ্ করছে রঙ—আপনি তাদের সঙ্গে নিয়ে দর্শন করাতে যান, কে তারা? আমি পরিচয় বল্লাম। মেয়ের বিয়ের জন্তেই যে আপনার কলকাতায় আসা, তাও বল্লাম। কার সন্তান, কয় পুরুষে, কি মেল, সবই ত আপনি আমায় বলেছিলেন, তাও বল্লাম। তাতে সে বল্লে, ওঁরা ফুলে, আমরা কিন্তু খড়দা। যদি ভিন্ন 'মেল' পাত্রকে মেয়ে দেন, তবে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করুন না। মেয়েটিকে দেখে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। আমি এক পয়সাও চাই নে, বরং উল্টে, ওঁর কিছু সাহায্যের দরকার হ'লে, তাও করতে প্রস্তুত আছি।"

ভট্টাচার্য্য মনে মনে বলিলেন, "জয় বাবা সত্যনারায়ণ! এত দিনে বোধ হয় তোমার দয়া হ'ল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা হ'লে, ছেলেটিকে একবার গিয়ে দেখলে ত হয়?"

"দেখবেন বৈ কি! কাল যখন মাকে দর্শন করতে যাবেন, এঁদের বাসায় রেখে একলাই যাবেন এখন। মন্দির থেকে ফেরবার পথে ছেলেটিকে দেখে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে যা হয় ঠিক ক'রে ফেলবেন। কি বলেন?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ, তাই।"—বলিয়া তিনি আর এক ছিলিম তামাক সাজিবার জন্ত উঠিলেন। উভয়ে ধূমপান করিতে করিতে, এই বিষয়েই আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি নয়'টার সময় হালদার মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে, বিপিন সরকার আসিল। ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, উকীল-বাড়ী গিয়েছিলে না কি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমার মোকর্দ্দমা উঠতে আর দেরী কত ?"

"বোর্ডে ত উঠেছে, কিন্তু একেবারে তলায়। উঠতে, যার নাম এখনও দু'হপ্তা। কর্ম্মের ভোগ যদ্দিন আছে, তদ্দিন ভুগতে হবে ত!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "যা বলেছ। কর্ম্মের ভোগই বটে! আমার ত প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে, ভাই!"

বিপিন বলিল, "কোনও পাত্রের সন্ধান পেলেন? সে ঘটকী আজ এসেছিল?"

"না, ঘটকী আজ আসে নি। তবে পাণ্ডা ঠাকুর একটা সন্ধান এনেছেন। এই ত কতক্ষণ হ'ল তিনি উঠে গেলেন।"

বিপিন শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, কিন্তু সেই অল্পালোকে সে হাসি কেহ দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম পাত্র?"

ভট্টাচার্য্য প্রকাশ হালদারের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন, সমস্তই বিপিনের কাছে বর্ণনা করিলেন।

বিপিন শুনিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবছ হে?"

বিপিন গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি ভাবছি, লোকটা নিজের সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছে, সে সব সত্যি, না দমবাজি! আপনি সরল মানুষ, সেকেলে লোক, কলকাতায় কত জোচ্চোর যে কত মৎলবে ঘুরে বেড়ায়, তা ত আপনি জানেন না!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "জোচ্চোর? বল কি হে! জুচ্চুরি ক'রে আমার মেয়েকে বিয়ে ক'রে তার কি লাভ?"

"বেচ্‌বে। সোনাগাছি-রামবাগানের কোনও বাড়ী-উলী, কম বয়সের এমন সুন্দরী মেয়ে পেলে এখনই দু'চার হাজার টাকায় কিনে নিতে প্রস্তুত হবে।"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাও হয় না কি? কি সর্ব্বনাশ!"

বিপিন বলিল, "আকছার হচ্ছে। এই ত সে দিন পুলিস কোর্টে একটা মোকর্দ্দমা হচ্ছে দেখ্‌লাম, বাঁকড়ো জেলার কোন্‌ গ্রামের এক ভদ্রলোকের সুন্দরী বিধবা পুত্রবধূকে বদ্‌ লোকে ফুস্‌লে এনে রামবাগানে বিক্রী করেছিল, পুলিস অনেক দিন পরে অনেক কষ্টে সে মেয়েকে উদ্ধার করে। সেই বাড়ী-উলী আর তার বাবুর বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে কেনার অপরাধের জন্যে বিচার হচ্ছে।"

"কি হ'ল শেষটায়?"

"মেয়েটা প্রথমে পুলিসের কাছে সব সত্যি কথাই বলেছিল। তার পর এক মাড়োয়ারী বাবু, উকীল লাগিয়ে জামিনে তাকে খালাস ক'রে নিয়ে যায়। এখন মেয়েটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে, সে সব কথা বিলকুল অস্বীকার করছে। মেয়েটাকে তারা শিখিয়ে পড়িয়ে ফেলেছে কি না। ছিল গরীব গৃহস্থ ঘরের বউ, এখন রাজার হালে আছে কি না! হাকিমের কাছে বল্লে, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী বাড়ীতে আমায় জ্বালা-যন্ত্রণা দিত, আমি নিজ ইচ্ছায় বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে এই বৃত্তি অবলম্বন করেছি। মেয়েটা বেনারসী শাড়ী, এক গা গহনা পোরে এসেছে,—তাকে দেখবার জন্যে আদালতে একবারে লোকে লোকারণ্য!"

"আসামীদের খালাস হয়ে গেল?"

"খালাস হবে না? আদালতের বাইরে এক মাড়োয়ারী বাবুর মস্ত এক মোটরকার দাঁড়িয়ে ছিল, হাসতে হাসতে তারা সেই মাড়োয়ারী বাবুর সঙ্গে মোটরে উঠে ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো করতে করতে বেরিয়ে গেল।"

কথা কহিতে কহিতে বিপিন বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। উহা প্রস্তুত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রসাদি করিয়া লইয়া নিজে ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ধূমপান শেষ করিয়া বিপিন বলিল, "বেশ ক'রে খোঁজ-খবর নিয়ে, জেনে শুনে,—তার পর; বুঝলেন? মেয়ের বিয়ে দিয়ে শেষে ফাঁপরে না প'ড়ে যান। এ ক'দিন আপনার সঙ্গে একত্র থেকে, আপনাদের উপর কেমন একটা মমতা জন্মে গেছে। নইলে আমার আর কি? আপনি কোন্‌ দেশের লোক, আমি কোন্‌ দেশের—দু'দিনের জন্যে যাত্রি-বাড়ীতে আলাপ! বিশেষ, মেয়েটাকে দেখেও আমার বড় মায়া হয়। আমারও ঠিক অত বড় একটি মেয়ে আছে। আজ তিন বছর হ'ল তার বিয়ে দিয়েছি। গত বছর তার একটি খোকা হয়েছে। গাইবান্ধায় থাকে তারা, জামাই গাইবান্ধায় মোক্তারী করেন।"

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। উভয়েই তখন আহারাদির জন্য উঠিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাত্র দেখা

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গা-স্নান সারিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বিপিন ভায়া, আজ এ বেলা কি তোমার আবার উকীলবাড়ী যেতে হবে না কি ?"

বিপিন বলিল, "না, কেন ?"

"মাকে দর্শন ক'রে, সেই ছেলেটিকে একবার আমি দেখতে যাব। তুমিও চল না আমার সঙ্গে !"

বিপিন বলিল, "যেতে পারি, তাতে আর আপত্তি কি ?"

পাণ্ডা প্রকাশ হালদার যথাসময়ে উভয়কে সঙ্গে করিয়া নিজ পাকা বাড়ীতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "অধর বাবু, ভট্‌চায্যি মশাই এসেছেন।"

অধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কপট ভক্তিভাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। সকলে উপবেশন করিলে, হালদার মহাশয়ের ইঙ্গিতে বাসার ঝি তামাকু প্রস্তুত করিয়া আনিল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাত্রকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ভট্টা। বাবাজীর নিবাস কোথা ?

অধর। ফরিদপুর জেলার কুণ্ডুপুকুর গ্রামে।

ভ। পিতাঠাকুর বর্ত্তমান আছেন ?

অ। আজ্ঞে না,—মা বাপ দু'জনেই স্বর্গবাসী।

ভ। বাবাজীর ভাই-বোন্ কি ?

অ। দুটি ভাই, তারা আমার ছোট। একটি বোন্ আছে, সে বিধবা হয়েছে।

ভ। কোথায় বিবাহ দিয়েছিলে তার ?

অ। ফরিদপুরে। জজের পেস্কার আনন্দ চাটুয্যে মশাইয়ের পুত্র কিশোরী চাটুয্যে আমার ভগ্নীপতি ছিলেন। ওকালতী পাস ক'রে সবেমাত্র বছর দু'তিন প্র্যাক্‌টীস করেছিলেন, এমন সময়—" বলিয়া অধর একটি কপট দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ভ। বাবাজীর পরিবারটি কত দিন হ'ল গত হয়েছেন ?

অধর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "আজ্ঞে না, তিনি ত গত হন নি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই বিস্মিত হইয়া, পাণ্ডা ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তবে যে হালদার মশাই কাল আমায় বল্লেন—"

হালদার একটু থতমত খাইয়া গেলেন। সবিনয়ে বলিলেন, "আমি তা হ'লে ওটা ভুল বুঝেছিলাম। অধরবাবুর সঙ্গে আলাপে প্রথম দিনই আমি শুনেছিলাম যে, ওঁর একটি ছেলে, একটি মেয়ে আছে। তার পর, কাল যখন উনি নিজের বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন, তখন আমি ধ'রেই নিলাম যে, ওঁর পরিবার তা হ'লে গত হয়েছেন ; কারণ, আমাদের এ কলকেতা অঞ্চলে, আজকালকার দিনে, এক স্ত্রী বেঁচে থাকতে কেউ ত আবার বিবাহ করে না কি না!—অবশ্য বাঙ্গাল দেশে—"

অধর বাধা দিয়া বলিল, "না হালদার মশাই, বাঙ্গালদেশেও ভদ্রসমাজে বহুবিবাহ আজকাল নিন্দনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, আমি যে আবার বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছি, তার একটু বিশেষ কারণ আছে। আমার পরিবার বলতে গেলে চির-রুগ্না। উপস্থিত, তার বাঁচবার আশা খুব কম।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আহা! রোগটা কি তাঁর ?"

অধর। ক্ষয়কাস। আমার ছোট মেয়েটা জন্মাবার পর থেকেই সে রোগের সূত্রপাত। আমি প'ড়ে থাকি বিদেশে, দু' তিন বচ্ছর অন্তর দু' এক মাসের ছুটী পাই। নিজে দেখতে শুনতে পারি নি। তবে চিকিৎসা রীতিমতই হচ্ছে, সে বিষয়ে ত্রুটি হয় নি। কিন্তু রোগের উপশম ত হ'ল না। বছর বছর বেড়েই চলেছে।"

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা আছেন তিনি ? আপনাদের বাড়ীতে, না তাঁর পিত্রালয়ে ?"

"তাঁর পিত্রালয়েই আছেন। আমাদের বাড়ীতে লোকাভাব কি না। দেখা-শুনো, সেবা-শুশ্রূষা কে করে ?"

বিপিন বলিল, "আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ?"

"তারাপুর গ্রামে, কুণ্ডুপুকুর থেকে আড়াই ক্রোশ পথ। মধ্যে চন্দনা নদী আছে, সেই চন্দনা পার হ'লেই আর কি !"

বিপিন। আপনার শ্বশুর মশাইয়ের নাম কি ?

অধর। অন্নদাচরণ জ্যোতির্ভূষণ। তাঁর নাম আপনারা শুনে থাকবেন হয় ত, মস্ত পণ্ডিত তিনি।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কি চিকিৎসে হচ্ছে আপনার পরিবারের ? কবিরাজী না এলোপ্যাথি ?"

"কবিরাজী চিকিৎসাই গোড়া থেকে হচ্ছিল। সম্প্রতি অবস্থা অত্যন্ত খারাপ চিঠি পেয়ে, বহু কষ্টে এক মাসের ছুটী যোগাড় ক'রে বাড়ী গিয়েছিলাম। অনেক খরচপত্র ক'রে

কোটালিপুর থেকে গিরিশ কবিরাজ মশাইকে এনে দেখালাম। তাঁর ওষুধের গুণে উপস্থিত রোগের কিঞ্চিৎ উপশম দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু কবিরাজ মশাই আমায় গোপনে বলেছেন, এ রোগ শিবের অসাধ্য, তবে রীতিমত চিকিৎসা চালালে বড় জোর মাস দু'তিন টিকতে পারেন, তার বেশী নয়।"

ভট্টাচার্য্য ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন—"বড়ই দুঃখের বিষয়।"

হালদার বলিলেন, "অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই!"

বিপিন বলিল, "তা অধরবাবু, আপনার সে পরিবার বেঁচে থাকতে আপনি যদি আবার বিবাহ করেন, সে খবর শুনে তাঁর ত বড়ই মর্ম্মান্তিক হবে!"

বিপিনের এ কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই বিরক্ত হইলেন। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বিপিনের পানে চাহিলেন।

"তোর কি বাপু! তুই আবার খোঁচা তুলিস্ কেন?" মনে মনে এই কথা বলিয়া, অধর উত্তর করিল, "তা ত হতেই পারে। কিন্তু আমার অবস্থাটা ত আপনি বুঝছেন না। খোট্টার দেশে থাকি, খোট্টা রাজার চাকরী করি। দু'তিন বছর অন্তর দুই এক মাসের ছুটী দেয়। অথচ, একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিবাহ না করলে আমার সংসার অচল। আমার এখনও বারো দিন ছুটী আছে, আর দশ দিন আমি কলকাতায় থাকবো। তবে, সব কথা আপনাদের কাছে খোলাখুলিই বলি। কয়েক দিন আগেই দেশ থেকে যে চ'লে এলাম, তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, দেখে শুনে একটি বিবাহ ক'রে, এখান থেকে একেবারে কর্ম্মস্থানে নিয়ে যাব। আমাদেরই এষ্টেটের ডাক্তার কেদার গাঙ্গুলী মশাই, তিনিও ছুটীতে এসেছেন, পটলডাঙ্গায় তাঁর বাড়ী। তিনি আমার জন্যে একটি পাত্রী খুঁজতে ঘটকী লাগিয়েছেন। দুটি মেয়েকে ইতিমধ্যে আমি দেখেও এসেছি, কিন্তু কোনটিই পছন্দ হ'ল না। ভট্চায মশাই যদি আমায় কন্যাদান করেন, তবে আর অন্য কোনও স্থানে চেষ্টা করিনে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তোমার মত জামাতা পাওয়া ত আমার সৌভাগ্য বাবাজী—"—আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বিপিন ওদিক হইতে চোখ টিপিল, সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিয়া গেলেন। বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কর্ম্মস্থান কোথায়, অধরবাবু?"

"আমি ডুমরাওন রাজার এষ্টেটের একটা পরগণার তসীলদার। অর্থাৎ আপনারা এ দেশে যাকে নায়েব বলেন আর কি! রাজধানী থেকে ১৮ ক্রোশ দূরে বিন্দোগী ব'লে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে আমার কাছারী।"

বিপিন বলিল, "কিছু মনে করবেন না, কত বেতন পান?"

অধর হাসিয়া বলিল, "বেতন সামান্যই পাই—পঁচিশ টাকা মাসে।"—বলিয়া অধর হুঁ হুঁ করিয়া হাসিল।

হালদার বলিলেন, "রাজ এষ্টেটের চাকরী, বেতনে কি করে? আমার এক যজমান আছেন, তিনিও পশ্চিমে কোন্ এক খোট্টা রাজার এষ্টেটে চাকরী করেন, তাঁর বেতন ১৫৲ টাকা; কিন্তু বাড়ীতে ফি বছর দোল-দুর্গোৎসব ক'রে থাকেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বেলা হ'ল, আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠি। বাবা অধর, গিন্নীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে, যেমন হয়, ও বেলা এসে তোমায় জানাব।—এস হে বিপিন!"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিলেন।

অধরও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে। হালদার মশাইয়ের কাছে আপনার অবস্থার কথা আমি আগেই শুনেছি। যদি আপনার মত হয়, তবে দান, পণ, অলঙ্কার আপনাকে কিছুই দিতে হবে না, বরং আপনার দরকার হ'লে আমিই—"

হালদার মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সব কথা বলেছি আমি ভট্চায মশাইকে।"

অধর মুখখানি নীচু করিয়া, মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "কিছু মনে করবেন না, বেহায়ার মত নিজের বিয়ের কথা নিজেকেই চালাতে হচ্ছে, কিন্তু উপায় কি! যদি কোনও কারণে, আমাকে মেয়ে দেওয়ায় আপনাদের অমতই হয়, তবে দয়া ক'রে ওবেলাই আমাকে জানাবেন; কারণ, সময় বেশী নেই, এই দশ দিনের মধ্যেই সমস্ত শেষ ক'রে আমায় পশ্চিম যেতে হবে।"

ভট্টাচার্য্য অধরের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ও বেলা আমি এসে যা বল্‌বো, একেবারে পাকা কথাই ব'লে যাব, বাবা!"

বিপিন বলিল, "পাকা কাঁচা ওসব কিছু বুঝিনে ভট্চায মশাই—আমি বুঝি ভবিতব্য। কত পাকা কেঁচে যেতে দেখলাম, আবার কত কাঁচা পেকে উঠলো। আপনি পণ্ডিত লোক, আমি মুখ্যু মানুষ, আমার মুখে এ কথা সাজে না বটে, কিন্তু কি করবো, ঠোঁট-কাটা মানুষ, ব'লে ফেল্লাম।"

"কিছুই অন্যায় বল নি তুমি বিপিন, ঠিকই বলেছ। আচ্ছা বাবা, আসি আমরা তা হ'লে। হালদার ভায়া, নমস্কার।"—বলিয়া বিপিনকে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আলোকরশ্মি-সম্পাতে অশ্বের চিকিৎসা

রৌদ্রালোক মানুষ ও অশ্ব প্রভৃতি সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষেই প্রয়োজন। চিকাগো সহরে ঘৌড়দৌড়ের ঘোড়ার দেহে প্রত্যহ আলোকপাত করা হইয়া থাকে। উহাতে অশ্বের শরীরে কোন প্রকার পীড়া থাকিতে পারে না। সমস্ত দিবস সূর্য্যালোকে থাকিলে যে উপকার হয়, আলোকাধার হইতে নিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিতে কিছুক্ষণের জন্য থাকিয়া অশ্ব সেইরূপ উপকার পাইয়া থাকে। শীতকালেই এইরূপ আলোকসম্পাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আলোকসম্পাতে অশ্বের চিকিৎসা

অভিনব দন্ত-চিকিৎসা

দক্ষিণ-আমেরিকার জনৈক এঞ্জিনীয়ার সংপ্রতি এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন। উহার সাহায্যে দন্তমূলে ঔষধ প্রয়োগ করিলে দন্তরোগ দূরীভূত হয়। অনেক সময় দন্তমূলে স্ফোটক প্রভৃতি হইলে দন্ত উৎপাটনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই যন্ত্র-সাহায্যে আয়োডাইন প্রযুক্ত হইলে দন্তোৎপাটনের প্রয়োজন হয়

অভিনব দন্তরোগ-চিকিৎসা

না। ঔষধ দন্তমূলের রোগ-যন্ত্রণা প্রশমিত করিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষার দ্বারা বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিমানপোত হইতে ধূম্র-যবনিকা

বিমানবিভাগ বিমানপোত হইতে ধূম্র-যবনিকা বিস্তারের প্রচেষ্টা করিতেছেন। ২শত ফুট উচ্চস্থান হইতে এইরূপ যবনিকা সৃষ্টি করা যায়। ধূম্র-যবনিকা যুদ্ধকালে বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহার অন্তরালে থাকিয়া বিপক্ষ পক্ষের যুদ্ধ-জাহাজকে আক্রমণ করিবার সুবিধা ঘটিয়া থাকে। ত্রেতাযুগে মেঘনাদ
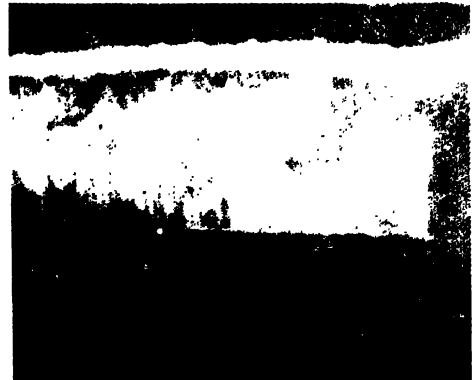
বিমানপোত হইতে ধূম্র-যবনিকা

কি এইরূপ কৌশল আরম্ভ করিয়া মেঘান্তরালে আত্মগোপন করিয়া শত্রুকে পরাজিত করিত ?

চিহ্ন দেখিতে পাইলেই সতর্ক হয়। রাত্রিকালে ঐরূপ আলোকের দ্বারা রাজপথ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

হাঁপকাস-দমনে গ্যাসের মুখোস

হাঁপকাস-নিবারক মুখোস

জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ারগণ হাঁপকাস-পীড়িত নরনারীর চিকিৎসার জন্য এক-প্রকার গ্যাসের মুখোস উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই মুখোস পরিধান করিয়া গৃহকর্ম্মাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায়, মুখোস পরিধান ও উন্মোচন করিতে বেশী সময় লাগে না।

কুকুরের পোষাক

শূকরচর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা দ্বারা কুকুরের পদচতুষ্টয় আবৃত করিয়া দেহটিও সুদৃশ্য আচ্ছাদনে আবৃত করিবার প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এইভাবে পোষা কুকুরকে শীতের প্রভাব হইতে শীতকালে রক্ষা করা হইয়া থাকে, কুকুররাও পরম আরামে যাপন করে।

কুকুরের পোষাক

কণ্ঠস্বরে ট্রেণ-নিয়ন্ত্রণ

বিদ্যুৎ-চালিত মডেল ট্রেনের গতি কণ্ঠস্বরের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে, গবেষণাগারে ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। 'থাম' এই শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিনের গতি থামিয়া যায়; "ফেরো" বলিবামাত্র ট্রেণের গতি বিপরীত দিকে চলিতে থাকে; "ঐ দিকে যাও" বলিবামাত্র অগ্রসর হইতে থাকে। মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়া কণ্ঠস্বরের তরঙ্গ সাহায্যেই এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

কণ্ঠস্বরে ট্রেণ-নিয়ন্ত্রণ

দ্বিচক্রযান রক্ষার ব্যবস্থা

দ্বিচক্রযান প্রায়ই চুরী গিয়া থাকে। এখন বার্লিনে চোরের উপদ্রব হইতে দ্বিচক্রযান রক্ষার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে; একটি যন্ত্রের ছিদ্রপথে মুদ্রা ফেলিয়া দিলেই উহার মধ্য হইতে একটি সুদৃঢ় শৃঙ্খল ও তালাচাবি বাহির হইয়া আইসে। আরোহী উক্ত চেনের দ্বারা দ্বিচক্রযানকে আবদ্ধ করিয়া চাবিটি পকেটে ফেলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যায়। তাহার যান যে চোরের দ্বারা আর অপহৃত হইতে পারিবে না, এ বিষয়ে সে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকে।

দ্বিচক্রযান রক্ষার ব্যবস্থা
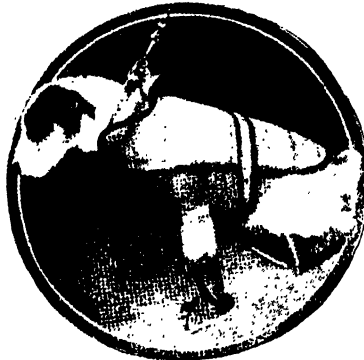
আলোকধারী পুলিস

অধুনা আমেরিকার কোলাকাস অঞ্চলের রাজপথ-নিয়ন্ত্রণে প্রহরীদিগের কোমরবন্ধে লোহিত বর্ণের কাচযুক্ত গোলাকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংলগ্ন করা হইতেছে। রক্তবর্ণ বিপদের চিহ্নজ্ঞাপক। যানচালকগণ ঐ

লোহিত চিহ্ন ও আলোকধারী পুলিস

সাধারণ স্থলে এইরূপ যন্ত্রযুক্ত চাবি রক্ষিত থাকে। ইহা হইতে উক্ত যন্ত্রের অধিকারীরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। দ্বিচক্র-যানারোহীরাও চোরের হস্ত হইতে নিরুপদ্রব হয়।

চিত্রবিচারে এক্স-রে

এক্স-রের সাহায্যে চিত্রের মৌলিকতা বিচার

এক্স-রে সাহায্যে চিত্রের মৌলিকতা ধরা পড়িয়া যায়। অনেক চিত্রশিল্পী পুরাতন, বিবর্ণ চিত্রের উপর নূতন বর্ণবিন্যাস করিয়া সাধারণতঃ উহা পুরাতন প্রসিদ্ধ শিল্পীর অঙ্কিত বলিয়া বাজারে বাহির করিয়া থাকেন। এক্স-রের সাহায্যে এই কৌশল ধরা পড়িয়া থাকে। এইরূপ পুরাতন চিত্রে যদি আধুনিক যুগের বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে নিঃসংশয়রূপে তাহা ত ধরা পড়িবেই, অধিকন্তু যদি পুরাতন যুগের বর্ণের সাহায্যে ঐরূপ চিত্রকে পুনরায় বর্ণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে সে কৌশলও ধরা পড়িয়া থাকে।

অত্যুচ্চ সৌধ

মিনিয়াপোলিস্ নামক স্থানে সম্প্রতি বিমানচারীদিগের সুবিধার জন্য একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। এই সৌধ ৪ শত ৫০ ফুট উচ্চ এবং বাত্রিশতলবিশিষ্ট। ভূগর্ভেও পাঁচতল আছে। ভূগর্ভস্থ তলগুলির দুইটিতে গাড়ীগুলি অবস্থান করিবে। প্রত্যেকটিতে আড়াই শত যান রাখিবার স্থান আছে। বিমানচারীদিগের জন্য ইতিপূর্ব্বে এত বড় সৌধ আর কোথা নির্ম্মিত হয় নাই।
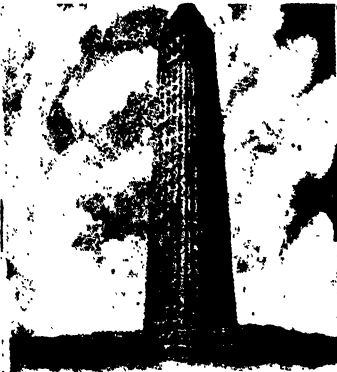
বিমানচারীদিগের সুবিধার জন্য বিরাট সৌধ

চুরুট ধরাইবার বৈদ্যুতিক আলোক

চুরুট ধরাইবার বৈদ্যুতিক আলোক

আলোক জালিবার বৈদ্যুতিক 'বাল্ব' যে প্রকারে ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকার আলোক উৎপাদক তারযুক্ত ব্যবস্থা অনুসারে চুরুটিকা, চুরুট প্রভৃতি ধরাইবার সুবিধা অধুনা হইয়াছে। আলোকাধারের সংশ্লিষ্ট তার প্রাচীরে অবস্থিত 'সকেটের' ছিদ্র-পথে সংলগ্ন করিয়া দিলেই আলোক উৎপাদিত হয়। এই চুরুটিকা ধরাইবার যন্ত্রও সেইভাবে ব্যবহার করিতে হয়।

মোটর-চালিত নৌকা

যাহারা জলক্রীড়া-ভক্ত, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অধুনা নদী বা সমুদ্রবক্ষে নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসে। সাধারণ নৌকায় নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, এজন্য সম্প্রতি নৌকার সহিত মোটর সংলগ্ন করিয়া ইচ্ছামত জলবিহারের আনন্দ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই নৌকার এক প্রান্তে রজ্জু সংলগ্ন থাকে। আরোহী রজ্জু ধারণ করিয়া নৌকার উপর

মোটর-চালিত নৌকা

দাঁড়াইয়া থাকে। মোটর-চালিত নৌকা ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ধাবিত হইতে থাকে। নৌকার মোড় ফিরাইবার জন্য হালের প্রয়োজন হয় না। আরোহী ইচ্ছামত যে দিকে দেহের ভার অর্পণ করিবে, সেই দিকেই নৌকা ঘুরিয়া যাইবে। আরোহী যদি ঘটনাক্রমে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া যায়, তখনই নৌকা আপনা হইতে থামিয়া যাইবে।

টর্পেডোবাহী বিরাট্ বিমানপোত

সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটি বিরাট্ বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমানপোত সাড়ে ২৪ মণ ওজনের টর্পেডো বহন করিয়া
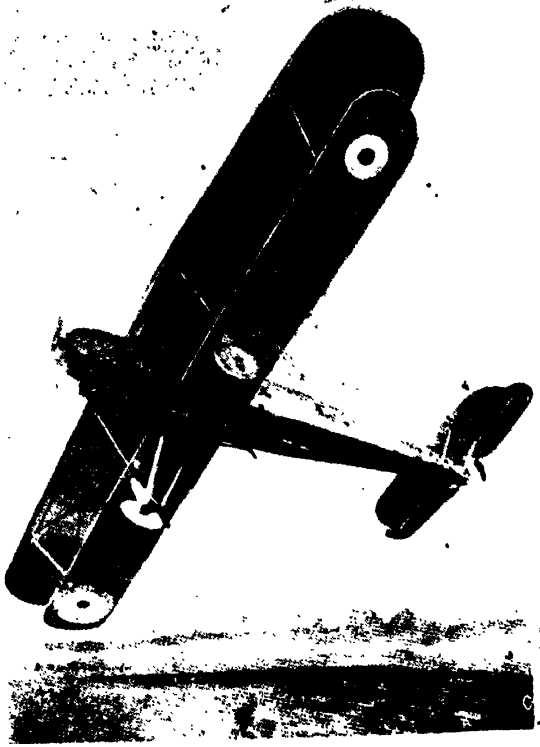
টর্পেডোবাহী বিরাট্ বিমানপোত

থাকে। এই টর্পেডো বিদারিত হইলে প্রকাণ্ড জাহাজকে অনায়াসে জলনিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে। এই টর্পেডো অত্যন্ত ভারী হইলেও বিমানপোত উহাকে লইয়া অতি দ্রুতগতি ধাবিত হইতে পারে।

চামচের স্তূপ

জার্ম্মাণীর লিপজিগ নগরে সম্প্রতি একটা মেলা হইয়া গিয়াছে। উক্ত মেলায় এক ব্যক্তি চামচের সাহায্যে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ২৫ হাজার চামচ উক্ত স্তূপে ব্যবহৃত হয়।

চামচ-নির্ম্মিত স্তূপ
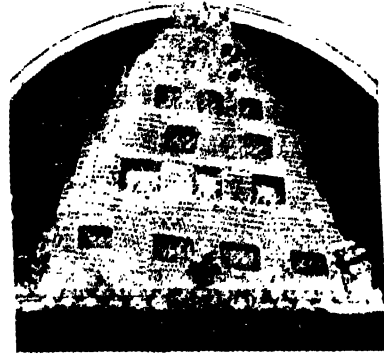
স্তূপটিকে নয়নরঞ্জক করিবার জন্য সুড়ঙ্গ, পথ প্রভৃতির সমাবেশও তাহাতে ছিল। এই স্তূপটি মেলার দর্শনীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বৃক্ষ-নির্গত দুগ্ধধারা

গোয়াটেমালা অঞ্চলে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, উহাতে ছিদ্র করিয়া দিলে, গো-দুগ্ধের ন্যায় স্বাদ ও বর্ণযুক্ত রসধারা নির্গত হইতে থাকে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল রেকর্ড কতিপয় সদস্য সহ সম্প্রতি ঐরূপ বৃক্ষ দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সেই দেশের অধিবাসীরা উহা কফিতে মিশ্রিত করিয়া পান করে। আসল দুগ্ধ অনেকক্ষণ গরম করিয়া না রাখিলে যেমন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এই রসধারাও সেইরূপ শীঘ্র টক হইয়া যায়।

বৃক্ষ-নির্গত দুগ্ধধারা

মহাত্মা গন্ধী ও বাঙ্গালার পুলিস

কে বড় ? জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গন্ধী, না কলিকাতার পুলিস কমিশনার সার চার্লস টেগার্ট ? মহাত্মা গন্ধীর গ্রেপ্তার ও দণ্ডে প্রমাণ হইয়া গেল যে, ভারতের ও তথা জগতের (আমাদের কথা নহে, মার্কিণ পাদরী রেভারেণ্ড হোমসই এ কথা বলিয়াছিলেন) মধ্যে বর্ত্তমানে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া পরিগণিত, যাঁহাকে য়ুরোপ ও মার্কিণের একাধিক খৃষ্টান পাদরী দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করেন,—সেই মহাত্মা গন্ধীও ভারতের বৃটিশ-রাজের অতি সামান্য এক জন রাজপুরুষেরও নিকটে কিছুই নহেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব ব্যাপার উপলক্ষে মহাত্মা গন্ধীর গ্রেপ্তার ও পরে বিচার ও দণ্ডের কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন ; কেন না, দৈনিক বহু সংবাদপত্রের মারফতে পাঠকগণ সে কথা অবগত হইয়াছেন। বিচারে এবার একটি কথা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পার্ক বা স্কোয়ারও ষ্ট্রীটের পর্য্যায়ভুক্ত বা অংশ, যেমন তৎপূর্ব্বে হাইকোর্টের এক বিচারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট বলিতে প্রত্যেক সিভিলিয়ান ও পুলিসের লোক বুঝায়। আইনের ব্যাখ্যা, ইহাতে কথা কহিবার কিছু নাই।

বিচারক আরও একটা সমস্যা সমাধান করিয়া দিয়াছেন, এই মামলা রাজনীতিক কারণে উত্থাপিত হয় নাই, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে রাজপথে লোকের পক্ষে বিপজ্জনক বহ্ন্যুৎসব করার অপরাধে সাধারণ আইন অনুসারে ১৲ টাকা অর্থদণ্ড করা হইয়াছে। বিচারককে জিজ্ঞাসা করা হয়, এমন বহ্ন্যুৎসব ত ইতিপূর্ব্বে বহুবার হইয়া গিয়াছে, তখন ঐ আইন প্রযুক্ত হয় নাই কেন ? তাহার উত্তরে বিচারক বলেন, তখন হয় নাই বলিয়া যে আইন কখনও ব্যবহার করা হইবে না, এমন কোন কথা নাই। আইনের অস্তিত্ব আছে, তবে তাহার ব্যবহার সকল ক্ষেত্রেই যে হয়, এমন নহে। সুতরাং এ ব্যাপারের এইখানেই যবনিকাপাত হওয়াই ভাল।

তাই মনে হয়, ভারতে যখন এ সব সম্ভব হয়, তখন বিলাতে Manchester Gurdian পত্রের এ কথা—It is very unpleasant to have to keep Mahatma Gandhi in prison—বলার সার্থকতা কি বুঝিতে পারি না। এ দেশের ব্যুরোক্রেশীর দৃষ্টিতে—বিশেষতঃ আইনের দৃষ্টিতে—মহাত্মা গন্ধীও যে, এক জন পথের কুলী-মজুরও সে। হইতে পারে, তিনি কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যের রাজা, হইতে পারে, তিনি জগতের মনীষীদিগের নিকটে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব—দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট, হইতে পারে, তিনি সত্য ও অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক,—কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়, আমলাতন্ত্র শাসনের শাসনচক্র কি সে জন্য যথারীতি আবর্ত্তন করিতে বিরত থাকিবে ?

বিচারকালে মহাত্মা স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—"আমি বলিতেছি, জনতা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল, তাহারা কোনও রূপ অসংযত ভাব প্রকাশ করে নাই। পাশের কোন দ্রব্য ক্ষুদ্র বহ্ন্যুৎসব হেতু নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল না। যে স্থানে বহ্ন্যুৎসব হইতেছিল, উহা চারিদিকে উত্তমরূপে বেষ্টিত ও অন্যান্য স্থান হইতে পৃথক্ করা ছিল। এই হেতু এই শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ বহ্ন্যুৎসবে হস্তক্ষেপ করা পুলিসের কর্ত্তব্য ছিল না। তাহাদের এই হস্তক্ষেপ আমার মতে হঠকারিতা, জবরদস্তি এবং কারণহীন হইয়াছিল। অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে গিয়া তাহারা আদালতের কর্ত্তব্য অন্যায়রূপে হস্তগত করিয়াছিল এবং আদালতের বিচারে যাহার ন্যায় অন্যায় সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছিল।" মহাত্মা গন্ধী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিবার পর, এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য সভ্য দেশের পুলিসের কিরূপ ব্যবহার দেখা যায়, তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, এ সকল কথা বলা নিরর্থক হইয়াছে। যখন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আসামী পক্ষে তর্ক তুলিয়াছিলেন যে, আইনের যে ধারা অনুসারে বিচার হইতেছে, তাহাতে **'Place of public interest'** কথাটা নাই, উহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই হেতু পার্কে খড় ইত্যাদি অগ্নিযোগে দগ্ধ করা নিষিদ্ধ নহে,—তখন বিচারক বলেন, "The **Law is only what commonsense is** expected to be, মানুষের সহজবুদ্ধিতে যাহা বলে, আইনে তাহাই বুঝায়, সুতরাং এই সকল জিনিষ পার্কে দগ্ধ করা নিষিদ্ধ।" অর্থাৎ আইনের ধারায় পার্ক কথাটা না থাকিলেও, মানুষের সহজবুদ্ধিতে যখন পার্ক বুঝাইতেছে, তখন উহা ধরিয়া লইতে হইবে। তবে বিচারক ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, "The drafting of **the section is hardly of the best,** ধারার রচনা খুব ভাল নহে।"

আইনের এই হেঁয়ালী যখন সাধারণ মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই, ধারায় কোন কথা না থাকিলেও যখন সেই কথা উহার মধ্যে ধরিয়া লওয়াই আইন, তখন মহাত্মার এ সকল যুক্তি প্রদর্শন করার সার্থকতা কোথায় ? যে বুঝিবে না, তাহাকে কে বুঝাইতে পারে ? সহজ বুদ্ধির কথা বিচারক পাড়িয়াছেন। তা' সহজবুদ্ধিতেই বুঝা যায়, এই আইন যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, রাজনীতিক ব্যাপার তাহার অন্তর্গত নহে। খোলা ময়দানের এক কোণে সামান্য দুই চারিখানা বস্ত্রে অগ্নি প্রদত্ত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বিপদের যে সম্ভাবনা, বিবাহাদি ব্যাপারে, কালীপূজাকালে অথবা মহরমের সময় আগুনের খেলায় তাহার অপেক্ষা বিপদের অধিক সম্ভাবনা থাকে না কি ? তবে সে সময়ে আইনের যত কড়াকড়ি না হয়, এই রাজনীতিক আন্দোলনঘটিত ব্যাপারে তাহার অধিক কড়াকড়ির কি প্রয়োজনীয়তা ছিল, সহজবুদ্ধিতে ত

তাহা বুঝা যায় না। তবে কথা, যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, ইহাতে বলিবার আর কিছুই নাই। ইহা দেখিয়া দেশের লোক এখন তাহাদের কর্ত্তব্য পথ নিরূপণ করুক। যাহাতে ঘরে ঘরে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হয়, দেশময় তাহার আয়োজন হউক। **Bloody Mary**র রাজত্বকালে এক খৃষ্টান **Martyr** ভূমিতে প্রোথিত দণ্ডে আবদ্ধ হইয়া অগ্নিদগ্ধ হইবার সময়ে অন্যকে বলিয়াছিলেন, **"Play the man master Ridley We would kindle such a fire today as no power on earth would ever extinguish."** তেমনই ভাবে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বহ্নি আকুমারী হিমাচল সর্ব্বত্র জ্বলিয়া উঠুক, তবেই মহাত্মা গন্ধীর দণ্ডের সমুচিত উত্তর দেওয়া হইবে।

ধরপাকড়

মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানার জোরে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বহু খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় হইয়া গেল এবং বহু ব্যক্তি ধৃত হইয়া মীরাটে বিচারার্থ নীত হইলেন। পার্লামেণ্টে আর্ল উইণ্টার্টনের স্বীকারোক্তিতে এবং ব্যবস্থাপরিষদে সরকার পক্ষের কথায় প্রকাশ, ধৃত ৩১ জন আসামীর মধ্যে ১৭ জন এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

সরকার পক্ষ বলিতেছেন, দেশের সাধারণ আইনের (ভারতীয় দণ্ডবিধির) ১২১ (ক) ধারা অনুসারে অর্থাৎ রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আসামীরা ধৃত হইয়াছে। এই ধারার ব্যাখ্যায় আছে, **"To constitute a conspiracy under this section it is not necessary that any act or illegal ommision shall take place in pursuance thereof."** যে দেশের সাধারণ আইনে রাজদ্রোহ অপরাধের ব্যাখ্যায় **Disaffection** অর্থে **want of affection** ব্যবহৃত হইতে পারে, সে দেশে রাজার বিপক্ষে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করার অপরাধের ব্যাখ্যা যে এইরূপ হইতে পারে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সরকার এ যাবৎ ১২১ (ক) ধারা অনুসারে যে সকল মামলা চালাইয়াছেন, সাক্ষ্যের অভাবে প্রায় সে সকল মামলা ফাঁসিয়া যায় নাই।

সুতরাং যাঁহারা এই অপরাধে ধৃত হইয়াছেন, তাঁহারা যে জীবন-মরণের খেলার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অপরাধের দণ্ড দ্বীপান্তর অথবা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড। সুতরাং কত বড় গুরুতর কার্য্যে সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সরকার এই ব্যাপারে কোনরূপ 'ঢাক ঢাক' 'গুড় গুড়' কার্য্য করেন নাই। বে-আইনী আইনে **Deportation**এর গন্ধ ইহাতে নাই। সরকার সহজ সরল প্রকাশ্য আদালতে বিচারের পথ ধরিয়াছেন। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহারা চারিদিকে আটঘাট বাঁধিয়া অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তবে ধরপাকড়ের বেড়াজাল ফেলিয়াছেন। সে সাক্ষ্যপ্রমাণের স্বরূপ কি, বিচারকালেই তাহা প্রকাশ পাইবে। এতগুলি শিক্ষিত গণ্য লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং সরকার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে করিয়াই ইহাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। মামলা বিচারাধীন, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে এখন কোন মতামত প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত বা আইনসঙ্গত নহে।

কিন্তু একটা কথা অঙ্ক হিসাবে বলা যাইতে পারে। মিঃ থার্টল পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করেন, "এই ধরপাকড় বিলাতের সরকারের প্ররোচনায় করা হইয়াছে কি না ?" ইহার উত্তরে আর্ল উইণ্টার্টন ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলেন, "এমন অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না।" কিন্তু ধরপাকড়ের ১০ দিন পূর্ব্বে বিলাতের **Sunday Worker** পত্র ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, প্রথমে ভারতে ও পরে বিলাতে কম্যুনিষ্টদিগকে ধরপাকড় করা হইবে। আর্ল উইণ্টার্টনও স্বয়ং পার্লামেণ্টে তৎপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের এবং বিদেশী কম্যুনিষ্টদিগের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থার জন্য ভারত-সরকার ব্যবস্থাপরিষদে **Public Safety Bill** উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং এ দেশের কম্যুনিষ্ট দলনের জন্য যে পূর্ব্ব হইতে একটা আয়োজন চলিতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। বিলাতের কোন কোন লোক বলিতেছেন, এ সকল সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য চালবাজী। ভারতে একটা ঘোর অশান্তি দেখা দিয়াছে প্রমাণিত হইলে কন্‌জারভেটিভ দলের শাসনপাটে আরও কিছু দিন পাকাপোক্ত হইয়া বসিবার সম্ভাবনা থাকে, তাই এই আয়োজন, কোন কোন বিলাতী সংবাদে এইরূপ প্রকাশ। কিন্তু আমাদের সংশয় হয়, ইহা কি সত্য হইতে পারে ? যেখানে মানুষের জীবন-মরণ লইয়া খেলা, সেখানে কি বিলাতের দলাদলি ও চালবাজীর হাত থাকা সম্ভব ? সরকার উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না সংগ্রহ করিয়া কি এমন মামলায় অবতরণ করিতে পারেন ?

সে যাহা হউক, যাঁহাদিগকে ধরা হইয়াছে, সরকারের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, তাঁহাদের মধ্যে ১৭ জন ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কোন সভায় বলিয়াছেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ধরপাকড় হইতেছে। তবে কি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সহিত কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের সম্পর্ক আছে ? বিচারে অবশ্যই সে রহস্য প্রকাশ পাইবে। তবে আমাদের বিশ্বাস, এ দেশের জনসাধারণ—বিশেষতঃ শ্রমিক ও কৃষক কম্যুনিজম বা অন্য কোন ইজমের ধার ধারে না। তাহারা অশিক্ষিত, তাহারা বুঝে একমাত্র পেটনীতি। সুতরাং যাহারা তাহাদের নেতৃত্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যদি কম্যুনিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাজার বিপক্ষে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতে তাহাদিগকে হাজার উপদেশ দেন, তাহা হইলেও তাহারা তাহা বুঝিবে না। তবে অনর্থক তাঁহারা কি জন্য ষড়যন্ত্র করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

অবশ্য শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ নিশ্চিতই আছে, না হইলে ঘন ঘন ধর্ম্মঘট ও শ্রমিক-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত না। কিন্তু সে কারণ কি ? কম্যাণ্ডার কেনওয়ার্দি পার্লামেণ্টে সে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আর্ল উইণ্টার্টনকে প্রশ্ন করেন, "কম্যুনিষ্টদের উৎপাত দূর করিবার অন্য এক উপায় হইতেছে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ দূর করা। সরকার কি সে বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন ?" আর্ল উইণ্টার্টন এ কথার কিন্তু স্পষ্ট কোন জবাব দেন নাই। কেন ? শ্রমিকদের যথার্থ অভাব-অভিযোগের কারণ না থাকিলে তাহারা চঞ্চল হয় না বা

ধর্ম্মঘট করে না, অন্ততঃ এ দেশের অদৃষ্টবাদী জনসাধারণ ত করেই নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। পেট যখন বড় কাঁদে, তখন তাহারা চঞ্চল হয়। খুলনার দুর্ভিক্ষকালে দেখা গিয়াছে, স্ত্রীপুত্রকে আহার দিতে না পারিয়া দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক আত্মহত্যা করিয়াছে। কেহ কেহ ক্ষুধার জ্বালায় পুত্র-কন্যা বিক্রয়ও করিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টবাদী তাহারা রাজার বিপক্ষে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের কথায় কর্ণপাত করিবে কেন? তাহাদের অভাব-অভিযোগের সহিত ষড়যন্ত্রের সম্পর্ক কি?

বিচারকালে প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, এ মামলার বিচারফল যাহাই হউক, যদি যথার্থই শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের কারণ থাকে, তবে তাহা অবিলম্বে দূর করা হউক, অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য আপনিই দূর হইবে। উপযুক্ত উর্ব্বরক্ষেত্র না পাইলে কম্যুনিষ্ট বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইবে কিরূপে?

সাইমন কমিশনের সাফাই গাওনা

বোরখা-ঢাকা মুসলীম নারীর মত পুলিস-আশ্রয়-আচ্ছাদিত সাইমন কমিশন ভারতের ও ব্রহ্মের নানাস্থান ঘুরিয়া এইবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। যাত্রার পূর্ব্বে নাগপুর সহরে তাঁহারা তাঁহাদের মনের গোপন কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। সার হরি সিং গৌর নাগপুর সহরে তাঁহাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন উপলক্ষে যে ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই ভোজের সভায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতা করিয়া মনের কপাট অনর্গল করিয়াছেন।

আমাদের গৃহস্থের গৃহে গৃহিণী যখন একটা আবদারের কথা—বাহানার কথা কর্ত্তার সকাশে নিবেদন করিতে চাহেন, তখন তিনি কর্ত্তার আহারের পর বিশ্রামের সময়ে পাণের ডিবা হস্তে লইয়া ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে গিয়া থাকেন। কেন না, তখন কর্ত্তার মেজাজ সরিফ থাকে। আমাদের ভাগ্য-বিধাতা ধলা কর্ত্তারা যখন আহারের পর বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহাদের মনের গোপন কথাটি কেমন অসাবধানে আচম্বিতে বাহির হইয়া পড়ে। কেন না, তাঁহাদের খানার সঙ্গে 'পিনা'টার এমনই শক্তি যে, উহার ফলে তাঁহাদের মেজাজটা বাঙ্গালী গৃহস্থের অপেক্ষা আরও সরিফ হইয়া পড়ে।

নাগপুরেও তাহাই হইয়াছিল। এত দিন তুষের আগুনের মত কমিশনের কর্ত্তা সার জন সাইমনের মনে যাহা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহা সেই ভোজের খানাপিনার পর ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, একবারে লোল জিহ্বা বাহির করিয়া ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এত বড় স্পর্দ্ধা—তাঁহারা আসিয়াছেন ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভারতের মঙ্গল করিতে, আর তাহারা কি না অসভ্য ছোটলোকের মত (Vulgar and noisy demonstrations) চীৎকার দ্বারা তাঁহাদের কমিশনকে সন্ত্রস্ত উত্ত্যক্ত করে?

সার জন ঠিক এই ভাবে বক্তৃতার মুখবন্ধ করিয়া বলিয়াছেন, "রাজনীতিক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধ দলের প্রধান মন্ত্রী ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারের একটা পন্থা নির্ণয়ের জন্য আমার উপর ভার দিয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এ কার্য্য অত্যন্ত কঠিন—শ্রমসাধ্য। কিন্তু এ আহ্বান বৃটেন ও ভারতের। যত বিরাট স্বার্থত্যাগেরই প্রয়োজন হউক না, এ আহ্বানে আমি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারি নাই।" বুঝুন, পরম লিবারল, পরম আইনজ্ঞ, পরম ন্যায়ধর্ম্মের উপাসক সার জন সাইমন কত বড় স্বার্থত্যাগী ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী লোক! একাধারে তিনি তাঁহার জন্মভূমির সেবা এবং ভারতের মঙ্গলসাধন করিতে এ দেশে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে আসিয়াছেন! যীশু যেমন পাতকীর বোঝা বহিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাও যেন কতকটা সেইমত।

অথচ দুঃখ এই, ক্ষোভ এই, অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী তাঁহাকে চিনিল না, বুঝিল না—"স্বদেশের জনমতের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া আমাদের এই বৃটিশ কমিশন কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, সুতরাং অশিষ্ট ইতরজনোচিত চীৎকার ও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ আন্দোলন বৃটিশ কমিশনের সদস্যদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটী ইহা তুচ্ছ মনে করিতে পারেন না—তাঁহারা স্বদেশবাসীর নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িবেন। তবে তাঁহারা সাহসী, বীর, দেশপ্রেমিক। তাঁহারা জানেন, স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণকল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালন করিয়া যাইতেছেন।"

বহুৎ খব! খানাপিনার পর সার জনের মনের কথাটি কেমন আচম্বিতে অতর্কিতভাবে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! এ দেশের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া তাঁহার কমিশনের 'অভ্যর্থনার' স্বরূপ বুঝিয়া তিনি অবশ্যই কমিশনের প্রতি এ দেশবাসীর মনোভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যবহারাজীব, তিনি বার বার তাঁহার কমিশনের প্রতি এ দেশবাসীর অনাস্থার ভাব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কি করিবেন, লোকের মনের উপর কাহারও জোর নাই, তাই ব্যর্থ রোষে তাঁহার অন্তরে তুষানল জ্বলিতেছিল, এত দিনে উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মনের কপাট খুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—এ দেশে দুইটা দল হইয়া গিয়াছে, একটা এদেশবাসী জনসাধারণ, যাহারা অভদ্র ইতরের মত চীৎকার ও আন্দোলন করে, আর অপরটা কেন্দ্রীয় ভারতীয় কমিটী, যাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করেন। তাঁহার কমিশন ভারতের মঙ্গল করিতে আসিয়াছেন, তা ভারতবাসী কমিশনকে প্রার্থনা করুক বা না করুক। সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটী তাঁহাদিগের সাহচর্য্য করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, আর আন্দোলনকারী অভদ্র ইতররা নিজেদের অমঙ্গল ও সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া।

ইহাই হইল সার জনের খানাপিনার পর বক্তৃতার সার মর্ম্ম। লেবার পার্টির মাকা-আঁটা মিঃ হার্টসরণও তাঁহার মত মনের কপাট খুলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—"They had asked for co-operation but did not get it, তাঁহারা ভারতবাসীর নিকট সহযোগ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হন নাই।" এমনভাবে কমিশনের ব্যর্থতা-স্বীকার বোধ হয় খানাপিনার পরে ভিন্ন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইত না। মিঃ হার্টসরণের ক্ষোভ ও দুঃখ এই হেতু যে সার জনের অপেক্ষা কম, তাহা নহে। যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর! মিঃ হার্টসরণ বক্তৃতায় বুঝাইয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পার্টির (লেবার)

লোকরা ভারতবাসীকে ও ভারতকে কত ভালবাসেন, তাহাদের জন্য কত স্বার্থত্যাগ করিয়া তিনি এ দেশে আসিয়াছেন. টোরী-দিগের উপর কত কৌশলজাল বিস্তার ও চালবাজী করিয়াছেন, তাহা কি অকৃতজ্ঞ ভারতবাসীরা বুঝে! বার বার বলড়ুইনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবার পর তিনি কেবল ভারতবাসীদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এই কমিশনে সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। পাছে টোরী-লিবারলদের দলীয় কমিশনের সাইমন প্রমুখ আর ৫ জন সদস্য ভারতবাসীর প্রতি অবিচার করে, তাই তাহাদের উপর খরদৃষ্টি রাখিতে ও তাহাদিগকে শায়েস্তা করিয়া 'ধাতে' রাখিতে তিনি ও তাঁহার সহকর্মী লেবার সদস্য ভারতে ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আরও একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। পাছে তাঁহার জন্মভূমি তাঁহার অমৃতসমান উপদেশের অভাবে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটা কিছু কিম্ভূত-কিমাকার কার্য্য করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় তিনি কমিশনে বসিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি বা তাঁহার দল ভারতের সম্বন্ধে সুপরামর্শ না দিলে টোরী সরকার একটা অকাণ্ড কুকাণ্ড ঘটাইয়া বসিবে আর সাম্রাজ্যটা ছারেখারে দিবে। পান-ভোজনের আনন্দে বিভোর হইয়া মিঃ হার্টসরণ বলিয়াছেন,—"চারিদিকে যে ঝন্-ঝন্ ঘড়-ঘড় অর্থহীন শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না,—সে জন্য আমরা বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নহি। আমাদের বিচারশক্তি তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না। আমরা ভারতকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দিব বলিয়া আসিয়াছি, সে প্রাপ্য দিবার সঙ্কল্পও করিয়াছি। তখন ভারতবাসী বুঝিতে পারিবে, যাহারা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত দেশ-সেবা করিয়াছে।"

তা দিও প্রভু, ভারতকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দিও—সে ত ভাল কথাই। ভারতবাসী অকৃতজ্ঞ অভদ্র ইতর যাহাই হউক, তোমরা ত ন্যায়পরায়ণ, কার্য্যকালে তাহারা দেখিবে, তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির পরিণাম কি হয়। তোমাদের সত্যবাদিতার—তোমাদের ন্যায়পরায়ণতার পরীক্ষা ত সেই দিন হইয়া যাইবে। তবে এখন হইতে তাহার বড়াই কেন, আর সেই বড়াই করিতে গিয়া ভারতবাসীকে গালি পাড়া কেন? ভারতবাসী কি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের কমিশনকে বর্জ্জন করিয়াছিল, না তোমাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের কোন আক্রোশ আছে? আজ প্রতিশ্রুতি দিতেছ, ভারতের ভাল করিবে, এমন প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেশের বড় বড় লোক বহুবার দিয়াছে। কিন্তু বহুবারই ভারতবাসী আশাহত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে তোমাদের প্রতিশ্রুতিরও কোন মূল্য নাই, এ কথা যদি ভারতবাসী বলে, তবে কি তাহারা বিশেষ অপরাধ করে?

কেন তাহারা কমিশন বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ইতিহাসও বোধ হয় সার জনের ও মিঃ হার্টসরণের অবিদিত নাই। সে সকল চর্ব্বিতচর্ব্বণের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। জিজ্ঞাস্য, ভারতবাসী যখন বলিয়াছিল, পার্লামেণ্ট তাহাদের ভাগ্যবিধাতা নহে, তাহারা স্বয়ং তাহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবে, পরন্তু কমিশন বসিলে সেই কমিশনে ভারতবাসীরও স্থান থাকিবে, তখন বলড়ুইনের টোরী গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে রয়্যাল কমিশন বসাইয়াছিল, সার জন ও মিঃ হার্টসরণ তাহাতে স্থান গ্রহণ করিলেন কেন? সার জন লিবারল, মিঃ হার্টসরণ লেবার পার্টির। তাঁহারা যদি কমিশনে বসিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে এই কলঙ্কের বোঝা টোরী গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধেই নিপতিত হইত, ইতিহাস সাক্ষ্য দিত, ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্ব্বাবিধ সংস্কার-বিরোধী টোরী গভর্ণমেণ্ট ভারতের উপর এক ভাণ কমিশন বসাইয়াছেন। কিন্তু লেবার ও লিবারল সদস্য ইহাতে স্থান গ্রহণ করাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বৃটেনের সকল দলের অনুমোদন ও সম্মতিক্রমে ভারতের উপর কমিশন চাপাইয়া ন্যায়বিচারই করা হইয়াছে। এমন কমিশনে ভারতবাসী সাহায্য বা সহযোগ দিতে যাইবে কেন?

বুঝা যাইতেছে, কমিশন-বর্জ্জন আন্দোলন সফল হইয়াছে, নতুবা সার জন ধৈর্য্যহারা হইয়া ভারতবাসীকে গালি পাড়িতেন না, তাহাদের প্রতি এমন অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার ও মিঃ হার্টসরণের মানের গোড়ায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই আজ তাঁহারা সেই বেদনায় চীৎকার করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশবাসী জয়ী হইয়াছিল, এই বর্জ্জন আন্দোলনেও হইল,—ইহাই আমাদের স্বরাজলাভের পূর্ব্বসূচনা।

খড়্গবাহাদুর

নেপালী বালিকা রাজকুমারীর উপর অনাচার আচরণের প্রতিশোধ লইবার এবং ভবিষ্যতে ধনী অত্যাচারী লম্পটের মনে আতঙ্ক-সঞ্চারের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত নেপালী যুবক খড়্গবাহাদুর এক মাড়োয়ারী ধনীকে হত্যা করিয়া ৮ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ কথা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। তাহার দণ্ড মকুব অথবা হ্রাস করিবার জন্য তাহার শাস্তির পর তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লীটন ও বড়লাট লর্ড আরউইনের নিকট দেশবাসীর তরফ হইতে একাধিক আবেদন ও ডেপুটেশান প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সরকার কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই। গত ১৭ই চৈত্র খড়্গবাহাদুর রাজসাহী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তাহার দণ্ড হইয়াছিল ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১২শে মার্চ্চ তারিখে। তাহা হইলে সরকার তাহাকে পূর্ণ দুই বৎসর দণ্ডভোগের পর অব্যাহতি দিলেন। দণ্ডের ৬ বৎসরকাল তাহাকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া সরকার অবশ্যই দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু সময়ে এই দণ্ড মকুব করিলে সরকার যে জনমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহার মূল্যও সামান্য হইত না। এই সকল খুঁটিনাটী কার্য্যে সরকার রাজনীতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন না কেন, বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, খড়্গবাহাদুরের মুক্তিতে দেশবাসী তাহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছে। যে দেশে মাতৃজাতির প্রতি অনাচার অত্যাচার নিত্য অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত, সে দেশে এক জন শিক্ষিত যুবকও যে সৎসাহস ও সদ্‌দৃষ্টান্তের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাও সুখের কথা। অবশ্য নরহত্যা আইন অনুসারে সমর্থিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া লম্পট পশুপ্রকৃতির লোকের সামাজিক কোনওরূপ শাসন না

হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। সমাজ শৃঙ্খলাবাহাদুরকে সম্মানিত করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

মার্কিণে যৌন-সম্বন্ধ

সামাজিক আচারগত নরনারীর সম্বন্ধের পরিমাপের বিরুদ্ধে নাকি মার্কিণের তরুণ-তরুণীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা "পরীক্ষা-বিবাহ" প্রচলনের পক্ষপাতী। পরীক্ষা-বিবাহটা কি পদার্থ, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না; কেন না, এ ভাবের 'সভ্য' বিবাহ এ দেশের লোকের অপরিচিত, বোধ হয় ধাতুসহও নহে। এই বিবাহ-আইন সমাজের আইনের অন্তর্গত নহে, নরনারী আপন আপন ইচ্ছামত আইন গঠন করিয়া লয়। এক নারী ও পুরুষের মধ্যে স্থির হইল, তাহারা উভয়ে স্ত্রী-পুরুষের মত কিছুদিন বসবাস করিবে; তাহার পর যদি দেখা যায়, তাহারা বেশ বনিবনাও করিয়া চলিতে পারিবে, তবেই ঐ সম্বন্ধ আরও কিছুদিন স্থায়ী হইবে, অন্যথা ভাঙ্গিয়া যাইবে; ঐ নারী ও পুরুষ আবার নিজ নিজ মনের মত পুরুষ ও নারী বাছিয়া ঘর-সংসার করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী থাকিবে। কেমন চমৎকার বন্দোবস্ত! কিন্তু পোড়া মার্কিণ মুল্লুকেও গোটাকতক সেকেলে পাদরী আছে, তাহারা দেশের দিন দিন এই 'সভ্যতার' উন্নতি দেখিয়া একবারে হতভম্ব হইয়া গেল। তখন তাহাদের **Federal Council of Churches** এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান এবং মন্তব্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটি কমিটী গঠন করিল। কমিটী বহুদিন যাবৎ নরনারীর প্রচলিত সামাজিক সম্বন্ধস্থাপনের বিরোধী এবং পরীক্ষা-বিবাহের পক্ষপাতী 'উন্নত সভ্য' শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর পরস্পর একত্র পরীক্ষা-বসবাসের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে যে,—

(১) খৃষ্টান আদর্শের বিবাহ কোনরূপ শিথিল যৌন-সম্বন্ধের সহিত রক্ষা করিতে পারে না,

(২) সখা-সখীরূপে বসবাসমূলক বিবাহের (**Companionate marriage**) বিপদ এই যে, এই বিবাহ লালসাকেই প্রথম স্থান প্রদান করে,

(৩) সমতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্টা স্বাধীনা নারী মাত্র এক জন পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হইতে পারে,

(৪) খৃষ্টান ধর্ম্ম (চার্চ্চ) যদিও বিবাহবিচ্ছেদ সমর্থন করে, তথাপি বিবাহ-বিচ্ছেদকে শোচনীয় ও অপমানজনক ব্যর্থতা (**a tragic and humiliating failure**) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

যে মার্কিণের ধর্ম্মযাজকরা তাঁহাদের দেশের বর্ত্তমান সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে এই ভাবের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মার্কিণের মিস্ মেয়ো ভারতবর্ষের সামাজিক অনাচারের কথায় চোখে সাঁতারপানি বহাইয়াছেন, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ভারতের ড্রেণ ইনস্পেক্টর এই মেয়ো এত বড় নির্লজ্জ যে, "**Slaves of the gods**" নামে এক গ্রন্থ লিখিয়া সে আবার ভারতের কুৎসা-প্রচারে ব্রতী হইয়াছে! যাহার নিজের ঘর আবর্জ্জনায় পূর্ণ, সে সেইখানে নর্দ্দামা না ঘাঁটিয়া পরের দোর খুঁজিয়া বেড়ায় কেন, তাহা বুঝিতে হইলে গোড়ার রহস্যটা না বুঝিলে চলিবে না। যে উৎস হইতে এই প্রচারকার্য্যের স্রোতঃ উদ্গাত হইতেছে, সে উৎসের মুখ বন্ধ না করিলে নর্দ্দামা-ঘাঁটার দলের মুখ বন্ধ হইবে না—তাহারা ত ভাড়াটিয়া লেখকমাত্র!

ডাকমাশুল ও লবণ-শুল্ক

এবার অনেকে আশা করিয়াছিলেন, এ বৎসর অন্ততঃ এক পয়সার মূল্যের পোষ্টকার্ড ও দুই পয়সা মূল্যের খামের পুনঃ প্রচলন হইবে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। সরকারের আশঙ্কা, ইহাতে রাজস্বের আয় কমিয়া যাইবে। কিন্তু ডাকমাশুল হ্রাস হইলে আয় বৃদ্ধি পাইবে বৈ কমিবে না, ইহা অনেকেরই ধারণা। কেন, তাহা বুঝাইতেছি। এ দেশের লোকের চিঠিপত্রাদি লিখিবার প্রবৃত্তি এখনও সম্যক্ জাগ্রত হয় নাই, ইহার কারণ তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। শিক্ষার বিস্তার যত হইবে, ততই পত্র লিখিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। সংবাদপত্রাদির উপর অধিক মাশুল বসাইয়া সরকার সেই পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন। সংবাদপত্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করে, এ কথা সরকার অস্বীকার করিতে পারেন কি? তবে? তবে তাঁহারা এইভাবে সংবাদপত্র প্রচারের পথে অন্তরায় উপস্থিত করিতেছেন কেন? অশিক্ষিত লোক আত্মীয়স্বজনকে বা ডাক্তার উকীলকে সহজে পত্র লিখাইতে চাহে না। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার হইলে তাহাদের সেই প্রবৃত্তি সহজেই জাগ্রত হইবে। তাহার পর অনেকে দুই পয়সা দিয়া কার্ড বা চারি পয়সা দিয়া খাম কিনিতে পারে না; কারণ, অর্থাভাব। তাই ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা মনে মনেই পত্র লিখিবার প্রবৃত্তির লোপ করিয়া দেয়। কিন্তু যদি মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা চতুর্গুণ লোক চিঠি-পত্র লিখিতে অগ্রসর হইবে। ফলে ডাক-বিভাগের আয়ও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, সিকি তোলা ওজনের চিঠির জন্য আধ আনা মাশুল দিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ চিঠি লেখায় অভ্যস্ত হয়। তাহার পর তাহাদিগকে আরও অধিক উৎসাহদানের জন্য আধ তোলা ওজনের চিঠি আধ আনায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ডাকের আয় বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তাই মনে হয়, সরকার যদি এখন পুনরায় সিকি তোলা বা আধ তোলা ওজনের চিঠি আধ আনায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে ডাকের আয় বাড়িয়া যাইত। সেইরূপ হইলে ক্রমশঃ এক তোলা ওজনের চিঠির মাশুলও হ্রাস করা যাইতে পারিত।

এবার ব্যবস্থা পরিষদ লবণ-শুল্ক মণকরা ১ টাকা করিয়া ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মণকরা ৪ আনা মাত্র হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বড়লাট লর্ড আরউইন আপনার বিশেষ ক্ষমতাবলে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া লবণ-শুল্ক ১।০ পাঁচ সিকাই ধার্য্য রাখিয়াছেন।

ইহাতে ভারত-শাসনে স্বৈরাচারের পরিচয়ই পরিস্ফুট। লবণ বায়ু ও জলের মত মানুষের 'প্রাণ' বলিয়া কথিত। লবণ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। এ দেশের দরিদ্র কেবল লবণ সহযোগেই অন্ন আহার করিয়া থাকে। দেশের লোক পূর্ব্বে লবণের কারবার করিতে পাইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথমে লবণের কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ দেশের লোককে লিভারপুলের লবণ যোগান দিবারও ব্যবস্থা হয়। ব্যবস্থা-পরিষদ লবণ-শুল্কের সবটা না কমাইয়া সামান্য অংশ কমাইতে চাহিয়াছিলেন। কেন না, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এই অন্যায় শুল্ক দরিদ্র প্রজার উপর বড়ই অন্যায়রূপে চাপিয়া বসিয়াছে। কিন্তু সরকার তাঁহাদের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবও গ্রাহ্য করিলেন না। ইহাতেই এ দেশের শাসন-সংস্কারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা কঠিন হয় না। জন ব্রাইট ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন,—**To tax the salt of a people whose entire food is vegetable so that it costs at least twenty times more than it does in this country is positively disgraceful.** তখনও যে কথা, এখনও সেই কথাই খাটে। ইহারাই আবার এ দেশে 'সভ্য' গভর্ণমেণ্টের বড়াই করেন!

ব্যাঙ্কিং

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস-সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক কথা জানিবার ও বুঝিবার আছে। আমরা উহা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"সুসম্বদ্ধ ও উন্নত প্রণালীর ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অন্যান্য সভ্যদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে যুগান্তরের অবতারণা হইয়াছে। আমাদের পক্ষেও উহা সম্ভবপর হইতে পারে। আমাদের মহাজন, শেঠী; নিধি, চেট্টি প্রভৃতি মহাজন ও ব্যবসায়িগণ যে দেশীয় প্রণালীতে ব্যাঙ্কিং চালাইয়া আসিতেছেন, তাহা পৃথিবীর অন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আমাদের হুণ্ডির কারবার আমাদের নিজস্ব, উহা অতি প্রাচীন যুগ হইতেই কার্য্যকারিতায় উন্নত ব্যাঙ্কিং প্রণালীর সহিত সমতা রাখিয়া আসিয়াছে। তথাপি বর্ত্তমানে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিং পশ্চাৎপদ।

"প্রথমতঃ বিলাত, মার্কিণ এবং জাপানের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ধরা যাউক। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিবরণে জানা যায়, বিলাতে মোট ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১১ হাজার ৯ শত ৭৬টা, মার্কিণে ৩০ হাজার, জাপানে ৭ হাজার ৪ শত ৬৫টা ছিল। ভারতবর্ষে বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যা কোন মতে ৫ শত ৯৬টা হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহের আর্থিক উন্নতির মূলে তাহাদের ব্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্য; আমাদের তদ্বিপরীত। ঐ বৎসর ঐ সকল দেশের ব্যাঙ্কসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল যথাক্রমে কিঞ্চিদধিক ১১ কোটি, ৬৬ কোটি ও ১৫ কোটি পাউণ্ড মুদ্রা। আর আমাদের দেশে ছিল মাত্র এক কোটি পাউণ্ড মুদ্রা! আমানতের হার মার্কিণের ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—মোট ১ হাজার ৩৭ কোটি পাউণ্ড; বিলাতের ২ শত ৫১ কোটি এবং জাপানের ১ শত ১ কোটি পাউণ্ড। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বাদে আমাদের দেশের ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ মোট ৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ জন প্রতি ৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং মাত্র! আর বিলাত, মার্কিণ ও জাপানের জন প্রতি ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ পাউণ্ড, ৮৭ পাউণ্ড ও ২৪ পাউণ্ড।

"দেশে এই হেতু খাঁটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রসার বাঞ্ছনীয়। স্কটল্যাণ্ড দেশের গ্রামে গ্রামে এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে তথাকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে অধুনা প্রায় ৬ শত ব্যাঙ্ক নামে চলিতেছে বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেকেরই অর্থ আদান-প্রদানের রীতি তথাকথিত 'বিধবার ব্যবসার' নামান্তর মাত্র। ইহার আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

"পাশ্চাত্য দেশে ব্যাঙ্কিং শিক্ষার জন্য ব্যাঙ্কার্স ইনষ্টিটিউট গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানে শিক্ষার্থীদিগকে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশেও এইরূপ আশা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতীয় কর্ম্মচারিগণের প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যেরূপ আচরণের কথা শুনা যায়, তাহাতে নিরুৎসাহ হইতে হয়। এখন দেশের ব্যাঙ্কসমূহে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্শ বা অর্থনীতি বিভাগের গ্রাজুয়েটগণকে নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে একটা উপায় হইতে পারে।"

আশা করি, দেশের লোক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা কয়টি ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স ও তরুণ কন্‌ফারেন্স

এবার রঙ্গপুরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স এবং বঙ্গীয় তরুণ-সঙ্ঘের কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইয়াছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষোক্ত কন্‌ফারেন্সে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের নেতৃরূপে সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালার অতীত গৌরবকাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের মধ্য দিয়া তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিয়াও তিনি তাঁহার দেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দেশের অতীত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনবত্ব বা নূতনত্ব না থাকিলেও, তাহা যে বাঙ্গালীর মনে তাহার জাতীয় মহত্ত্বের শৌর্য্য-বীর্য্যের, অধ্যবসায় ও সাহসিকতার সুখস্বপ্ন জাগাইয়া দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী উহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ভাবিতে পারে,—কিসে তাহার পূর্ব্বপুরুষের নষ্ট-গৌরবকে সে আবার উদ্ধার করিতে পারে, অন্ধকার কালসমুদ্রে নিমগ্ন মাতৃমূর্ত্তিকে কিরূপে তাহারা আবার কমলাকান্তের মত উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে। এ হিসাবে সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ বাঙ্গালীর মনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়াছে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে কিরূপে কেন্দ্রে কেন্দ্রে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা

করিয়া কংগ্রেসকে সজীব ও সতেজ করিয়া তুলিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধেও সুভাষচন্দ্র ন্যূনাধিক যোড়শটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে সকলগুলি সার্থকতা-সম্পাদন দুরূহ হইলেও সুভাষচন্দ্রের কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

তবে সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় অভিভাষণে থাকিলেও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, তিনি তাহা ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজ-ধ্বংসের আবহাওয়ায় পুষ্ট ভাবনিচয়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যাঁহারা আমাদের ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে ও সাংসারিক জীবনে কালা-পাহাড়ী পরিবর্ত্তনের যুগ আনয়নের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র যে সেই গড্ডলিকাস্রোতের সংস্রব হইতে আপনাকে অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার অভিভাষণেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার ধারণা, দেশকে আবার পূর্ব্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে হইলে আমাদিগকে হয়

(১) জাতিভেদ একবারে তুলিতে হইবে,

(২) না হয় সমস্ত বর্ণকে শূদ্রে পরিণত করিতে হইবে,

(৩) অন্যথা সকল বর্ণকে ব্রাহ্মণে পরিণত করিতে হইবে।

কেবল সুভাষচন্দ্র নহেন, তরুণ কন্‌ফারেন্সের প্রবীণ সাহিত্যিক সভাপতির নেতৃত্বেও সেই কন্‌ফারেন্সে জাতিভেদ তুলিয়া দিবার মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। যদি এই সঙ্কল্পটা আন্তরিক হইত, তাহা হইলেও বরং কথা ছিল না। জগতে মানুষ যে কোনও কার্য্যেই অগ্রসর হউক না, তাহার মূলে যদি আন্তরিকতা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা আজ কালাপাহাড় সাজিয়া সমাজ ও ধর্ম্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য লম্ফ-ঝম্প করিতেছেন, তাঁহারাই বক্তৃতান্তে ঘরে ফিরিয়া বংশানুক্রমিক প্রথানুসারে আহার-বিহার এবং পুত্র-কন্যার বিবাহ স্বজাতি ও সমান ঘরে দিবার পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না। তবে দেশের ভাবপ্রবণ তরুণগণকে ছায়ার অনুসরণে অনর্থক উৎসাহিত করিয়া ফল কি?

বৃথা বাক্যচ্ছটায় বিদেশীর নিকটে সংস্কারকরূপে বাহবা পাইবার প্রত্যাশায় যাঁহারা আজ 'জাতি ভাঙ্গিয়া দাও' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা কি বুঝেন না যে, আমাদের এই কথায়-কাযে মিলের অভাবে আমাদের স্বরাজ-সাধনায় সিদ্ধিলাভের কাল যুগ যুগ পিছাইয়া যাইতেছে? তরুণের মন আশা উৎসাহের গোলাপী নেশায় বিভোর, সুতরাং তাহারা যাহা ভাবে, তাহা বে-পরোয়া হইয়াই ভাবে; যাহা শুনে, তাহা বে-পরোয়া হইয়াই শুনে, ভবিষ্যতের ধার, পরিণামের ধার তাহারা ধারে না। সুতরাং তাহারা যখন কন্‌ফারেন্সে ও সম্মেলনে বক্তৃতায় শুনে,—'জাতি ভাঙ্গিয়া দাও, না হইলে রাজনীতিক মুক্তি নাই', তখন তাহারাও মুখে বলে, "জাতিত্বের কুসংস্কার পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেল", তাহারা তখন একবারও নিজের গৃহের কথা, গ্রামের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা, সমাজের কথা মনে রাখিয়া সে কথা বলে না। কেন না, ঘরে ফিরিয়াই সে আবার শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ বালকের মত মা-বাপের আদেশ, গুরুজনের আদেশমত সমাজের বন্ধনের গণ্ডীর মধ্যেই থাকিয়া যায়। ক্রমে যখন সে স্বয়ং গৃহস্থ ও সংসারী হয়, যখন তাহার ধমণীর উষ্ণ রক্ত বরফের মত শীতল হইয়া যায়, তখন সে নিজেই অতীতের উদ্দাম অসংযত কল্পনার কথা মনে করিয়া লজ্জিত হয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং ইহাতে আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে অপরাধী করিবার কিছুই নাই। তরুণের উদ্দাম কল্পনা কত কি না করিতে চাহে? রঙ্গ-মঞ্চে 'বলিদানের' অভিনয় দেখিয়া তরুণ প্রতিজ্ঞা করে, বিনা পণে বিবাহ না হইলে সে বিবাহ করিবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের গণ্ডী ছাড়াইয়াই সে প্রতিজ্ঞা কোথায় থাকে? তরুণের যদি এই সুমতি হইত, তাহা হইলে আজ আমাদের দেশ কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতার হাহাকারে ভরিয়া যাইত না।

যাহা কেবল কল্পনায় শুনিতে মধুর, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিবার উপদেশ দেওয়া কি নেতৃত্বপদকামীর পক্ষে শোভনীয় হয়? সত্য সত্যই এক দৈনিক সংবাদপত্র লিখিয়াছেন, "যে সামাজিক নিয়মাধীনে জাতি ও ধর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব মান্য হয়, সেই সামাজিক নিয়মানুবর্ত্তী জাতির মধ্যে রাজনীতিক স্বাধীনতার স্ফুরণ হওয়া অসম্ভব।" অতএব বুঝিতে হইবে, এই শ্রেণীর ভাবুক ও উপদেশকের ধারণা, আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতার মূল অন্তরায় আমাদের সামাজিক অবস্থা, সুতরাং সমাজ ওলট-পালট করিয়া না দিলে আমাদের স্বরাজলাভের উপায় নাই। তাঁহারা মনে করেন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা পরিহার সম্বন্ধে প্রস্তাব উভয় কন্‌ফারেন্সে বহুসংখ্যক ভোটের জোরে গৃহীত হওয়ার ফলে জনসাধারণ জাতীয় দলের গণ্ডীর মধ্যে আসিতে সমর্থ হইল।

অতএব বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের মতে জাতিভেদই যত অনিষ্টের মূল। তরুণ-সঙ্ঘের কন্‌ফারেন্সের সভাপতি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিভাষণে বলিয়াছেন, —"প্রকৃত বিপ্লব মানুষের মনের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। যখন নির্দ্দয় সমাজের, প্রেমহীন ধর্ম্মের, বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সম্বন্ধের, আর্থিক অবস্থার অসমতার এবং নারীর প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহারের বিপক্ষে বিপ্লব ঘটাইয়া জমী প্রস্তুত করা হইবে,- তখন রাজনীতিক বিপ্লব ঘটান সম্ভবপর হইবে।"

তবেই মনে হয়, এই শ্রেণীর উপদেশক ও ভাবুকের মতে আমাদের রাজনীতিক অধীনতার মূল কারণ,—সমাজের নির্দ্দয়তা, ধর্ম্মের প্রেমহীনতা, সামাজিক আর্থিক সাম্প্রদায়িক অবস্থার অসমতা এবং নারীর প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার। এই দোষগুলির বিপক্ষে বিপ্লব ঘটাইয়া সমাজকে দোষশূন্য করিবার পর আমরা রাজনীতিক বিপ্লব ঘটাইয়া স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত হইব। মোটের উপর ইহাই ইঁহাদের বক্তব্য ও উপদেশ।

ধরিয়া লওয়া গেল, আমাদের দেশ জাতিভেদ-জর্জ্জরিত বলিয়া আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেও ত জাতিভেদ নাই, তবে তাহারাও আমাদের মত পরাধীন কেন? কেবল এ দেশে নহে, মিশরে, মরক্কোয়, আলজিরিয়ায়, আরবে,ইরাকে মুসলমানরা পরাধীন কেন? আয়র্ল্যাণ্ডে জাতিভেদ ছিল না, সেখানে লোক এত দিন পরাধীন ছিল কেন? ফিন্, ল্যাপ প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না, তাহারা এত দিন পরাধীন ছিল কেন? শিবাজী মহারাজের সময়েও জাতিভেদ ছিল। তিনি তাঁহার শূদ্রজাতীয় সৈন্য ও মুসলমানধর্ম্মী সৈন্যকে তাঁহার উচ্চবর্ণীয় সৈন্যের সহিত একজাতিতে পরিণত করিবার

পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, ইতিহাস এমন কথা বলে না। এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়।

সুতরাং বুঝা যায়, জাতিভেদ পরাধীনতার কারণ নহে, অন্য কোন অবস্থাই ইহার কারণ। তাহার পর সামাজিক নির্দ্দয়তা কি অন্য স্বাধীন শক্তিশালী দেশে নাই? সে সব দেশ কি প্রেমমূলক ধর্ম্মসাধনায় বিভোর? সে সব দেশে কি নারীদের উপর কোনও নিষ্ঠুরতা আচরিত হয় না? তবে যে বিলাতী সংবাদপত্রেই দেখা যায়, এখনও লণ্ডনের আশে-পাশে বালিকা ও যুবতীর slave trade পুরামাত্রায় বিদ্যমান আছে? মার্কিণ ও য়ুরোপেও White slave trade বিদ্যমান, এ কথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতীচ্যের স্বাধীন দেশসমূহে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসমতাজনিত অনাচার ও অত্যাচারের তুলনা কোথায়?

তবে? এ সকল দোষ দেখাইয়া সমাজধ্বংসে তরুণগণকে উৎসাহিত করিবার এ প্রচেষ্টা কেন? সকল সমাজই দোষ-গুণে জড়িত। সমাজের যথার্থ দোষ পরিহার করা হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। তাহা বলিয়া সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে কেন? বরং যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং দলাদলি আমাদের স্বাধীনতালাভের প্রধান অন্তরায়, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করাই কি সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

বাঙ্গালার পাট

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উক্ত সভায় বাঙ্গালার পাট-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে একটি জুট বোর্ড বা পাট-তদারক সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি অতি সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিদেশী ব্যবসায়ীরা এ যাবৎ কি উপায়ে বাঙ্গালার পাট-চাষীদের মাথায় হাত বুলাইয়া অবলীলাক্রমে পাটের আয়ের সারটুকু সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহাতে বিদেশী বণিকের বন্ধু 'ষ্টেটস্‌ম্যান' বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন যে, বৃটিশ ব্যবসায়ীর চেষ্টা ও উদ্যমের ফলেই পাটের ব্যবসায় আজ এত প্রসার লাভ করিয়াছে, নতুবা তাঁহাদের এ দিকে দৃষ্টিপাত না হইলে সে ব্যবসায় কোথায় পড়িয়া থাকিত?

অবশ্য কথাটা যে আংশিক সত্য নহে, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু বৃটিশ ব্যবসায়ী এ দেশে আসিবার পূর্ব্বেও যে এ দেশে পাটের ফসল হইত না বা পাটের ব্যবসায় চলিত না, তাহা কি সহযোগী জোর করিয়া বলিতে পারেন? বহু শতাব্দী যাবৎ এ দেশের লোক পাট বা কোষ্টার বস্তায় বা থলিয়ার ধান-চাল চালান দিয়া আসিতেছে। দড়ী, দড়া, কাছি, রশি, এমন কি, জাহাজের পাইল পর্য্যন্ত এই পাটের সূতায় এ দেশে প্রস্তুত হইত। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাঙ্গালার পাটের কথা পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থ যখন রচিত হয়, তখন বিদেশী বণিক্ কোথায় ছিল?

এ দেশের লোক ঘরে ঘরে টেকো ও চেরায় পাট কাটিয়া বহুকাল হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। সেই সূতা সংগৃহীত হইয়া যুগী ও তাঁতিদের ঘরে প্রেরিত হইত। তাহারা উহা হইতে চট, থলিয়া বা বোরা ও বস্তা প্রভৃতি বয়ন করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন দপ্তরের কাগজপত্রে দেখা যায়, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে পাটের থলিয়া কিনিবার জন্য কলিকাতায় লোক আসিত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা দেশেও এই বাঙ্গালার থলিয়া ও বোরা রপ্তানী হইত।

ক্রমে পাটের এই শ্রীবৃদ্ধিমূলক ক্ষমতার উপর দৃষ্টি পড়ায় বৃটিশ বণিকরা এ দেশে পাটের এবং থলিয়া, চট, বোরা ইত্যাদির এক-চেটিয়া ব্যবসায়ে শীঘ্রই প্রসারণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহারা এ জন্য অনেক টাকা মলধন ফেলিয়া কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া পাটের ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের পাট-চাষীদের তাহাতে কি বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে? ব্যবসার মজাটুকু তাঁহারাই উপভোগ করিতেছেন, চাষীরা যে দরিদ্র, সেই দরিদ্রই আছে।

এ কথাও বলা যায় যে, এখনকার মত পূর্ব্বে পাটের ব্যবসায় ফলাও হয় নাই বটে, তথাপি পুরাতন পুথিপত্র হইতে জানা যায় যে, ১৭৪৯।৫০ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৪ শত ৪১টি থলিয়া এবং ২ লক্ষ ৩৮ হাজারেরও উপর চট কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। সে সময়ে তাহার মূল্য ছিল ২৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫ শত ৫১ টাকা। তখনও বৃটিশ বণিক এ দেশে পাটের বা চটের ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন নাই।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রক্সবার্গ বাঙ্গালার পাট পরীক্ষা করিয়া ইহার নমুনা বিলাতে প্রেরণ করেন। তাহার পর হইতেই স্কটলণ্ডের ডাণ্ডি সহরের ও বিলাতের অন্যান্য স্থানের ধনীরা বাঙ্গালার যুগী, তাঁতি ও জোলার অন্নের হন্তারক হইতে আরম্ভ করেন। ডাণ্ডি এবং কলিকাতা ও সহরের উপকণ্ঠস্থ ভাগীরথীতটস্থ নগরসমূহের বুকের উপর যে দিন হইতে পাটের কল বসিল, সেই দিন হইতেই কৃষকরা ধানের চাষ ফেলিয়া অধিক জমীতে পাট বুনিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যুগী জোলাদের ঘরের তাঁত বন্ধ হইল।

সুতরাং 'ষ্টেটসম্যানের' গর্ব্বপ্রকাশের কোন কারণ দেখা যায় না। ডাণ্ডির লোক বাঙ্গালায় পাট বা চটের কল না বসাইলে যে পাটের ব্যবসায় জাহান্নামে যাইত, এমন কিছু কথা নাই। জগতে থলিয়া বা বস্তা ও চটের যতই চাহিদা বাড়িত, ততই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার হাতের তাঁত বাড়িত, সুতরাং কুটীর শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশাও ঘুচিত, লোক নিত্য হা অন্ন যো অন্ন করিয়া মরিত না, বা দুই বেলা পেট পূরিয়া দুই মুষ্টি অন্নসংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে হত্যা দিয়া বেড়াইত না। হয় ত কালে বাঙ্গালী নিজেই প্রয়োজন বুঝিয়া এ দেশে পাটের ও চটের কল খুলিত, আর সেই সকল কলসম্পর্কিত আফিসে বহু বাঙ্গালী কেরাণী অন্ন করিয়া খাইত, যেমন এখন অনেক বিদেশী পাটের বা চটের কলের আফিসে করিয়া খাইতেছে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের সন্নিহিত রিষড়া গ্রামে প্রথম পাটের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর ক্রমে বরাহনগর, গরিফা শ্যামনগর, প্রভৃতি স্থানে বর্ষার ব্যাঙের ছাতার মত বিদেশী পাট ও চটের কল গজাইয়া উঠে। কিঞ্চিন্ন্যূন এক শত বৎসরের মধ্যে বিদেশীরা এ দেশে পাটের ব্যবসায় ফাঁদিয়া কোটি

কোটি টাকা সাগরপারে লইয়া গিয়াছে। বিনিময়ে পাট-চাষীরা কি পাইয়াছে? কলের প্রতিষ্ঠায় আমাদের একটা কুটীর-শিল্প (জোলা-তাঁতির) লোপ পাইয়াছে, অধিকন্তু ধান্যের চাষ হ্রাস হইয়াছে ও পাট পচানীর কল্যাণে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরন্তু বিদেশী বণিকরা পাট-চাষীকে মুঠার মধ্যে পাইয়া আপন দরে পাট কিনিতেছে। সুতরাং ইহাতে 'ষ্টেটশম্যানের' বড়াই করিবার কি আছে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় পাটের চাষ ও ব্যবসায় হইতে যে রাজস্ব আদায় হইতেছে, তাহার কিয়দংশ পাট-চাষীদের অবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যয় করিতে বলিয়া কি মহাপাতক করিয়াছেন, তাহাও ত বুঝিলাম না।

মাজু সাহিত্য-সম্মেলন

হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাজুগ্রামে এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মূল অধিবেশনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও মাজুগ্রামবাসীরা দেবী ভারতীর পুত্রগণকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাঙ্গালীর চিরাচরিত আতিথ্য-সেবার পর্য্যাপ্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক সম্মেলন-ক্ষেত্রে যোগ দিয়াছিলেন। সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রঙ্গপুর তরুণ সম্মেলনে বিশেষ কার্য্যে বিব্রত ছিলেন বলিয়া সাহিত্য-শাখার নায়কতা করিবার অবসর পান নাই—তারযোগে তাঁহার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইতিহাস-শাখার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, দর্শন-শাখার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, বিজ্ঞান-শাখার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠে সুধীবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্মেলন সাহিত্যিকগণের কাম্য মিলনক্ষেত্র; কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও প্রসারের দিকে মাঝে মাঝে দেশবাসীর প্রাণের সাড়া পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায় না, ইহা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। এবার মাজুবাসীদিগের হৃদয়ে সে প্রেরণা প্রকট হইতে দেখা গিয়াছে, আশা করি, উত্তরকালে বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীদিগের সম্মেলনরূপ মিলন-ক্ষেত্রটি আরও প্রশস্ত ও ব্যাপকভাবে দেশবাসীর চিত্ত অধিকার করিবে।

মুসলিম লীগ ও নেহেরু রিপোর্ট

লর্ড বার্কেণহেড এক সময়ে সদম্ভ উক্তি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয়রা নিজেই জানে না, তাহারা কি চাহে, তাহাদের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি ও নীতি কি প্রকারের হইবে, সে সম্বন্ধে তাহারা এ যাবৎ একমত হইতে পারে নাই। নেহেরু রিপোর্ট ইহারই উত্তর। লক্ষ্ণৌএ সর্ব্বদল-সম্মেলন নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করেন। গত ডিসেম্বরের শেষে কলিকাতায় কংগ্রেস ও

মাজু-সাহিত্য-সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ—মধ্যস্থলে মাল্যভূষিত মূল সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

কন্‌ভেনশন নেহেরু রিপোর্ট মূলতঃ সমর্থন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় মুসলিম লীগের অধিবেশন হইয়াছিল। মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে পঞ্জাবের সার্ মহম্মদ সফির দল মুষ্টিমেয় হইলেও সকল দল সম্মেলন, কন্‌ভেনশন, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় মুসলিম লীগেও দলাদলি হয়। ইহার ফলে লাহোরে মুসলিম লীগের ও দিল্লীতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈঠকও বসিয়াছিল। এবার কলিকাতায় লীগের অধিবেশনকালেও লীগের সদস্যদের মধ্যে ভীষণ দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। সভাপতি মিঃ জিন্না এই মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত লীগ মুলতুবি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গত মার্চ্চ মাসের শেষে দিল্লীতে অসম্পূর্ণ মুসলিম লীগের অধিবেশন সাঙ্গ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। কেন না, সভাপতি মিঃ জিন্না উহা পুনরায় মুলতুবী রাখিয়াছেন। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ডাঃ আলামের সভানেতৃত্বে মুসলিম লীগের অধিবেশন সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এ কথা যদি ধরা যায়, তাহা হইলে মুসলিম লীগের অধিবেশন সাঙ্গ হইয়াছে বলা যায়।

গোল নেহেরু রিপোর্ট লইয়া। লীগের এক দল সদস্য নেহেরু রিপোর্ট অনুমোদন করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্য এক দল উহা সংশোধন-পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় দল একবারেই নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, তাঁহারা উহাকে মুসলমানের স্বার্থবিরোধী হিন্দুদের চক্রান্তের ফল বলিয়া ঘোষণা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। আর এক দল দিল্লীর মুসলমান সম্মেলনের দাবী গৃহীত না হইলে লীগে থাকিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

স্বয়ং সভাপতি মিঃ জিন্না তৃতীয় দলের অগ্রণী। মিঃ মহম্মদ আলী ও তস্য ভ্রাতা শৌকৎ আলীও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। তাঁহারা সার মহম্মদ সফির দলকে লীগে আনিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে গিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, সার মহম্মদ লীগে না গেলে তাঁহারাও যাইবেন না। এই ভাবে মুসলিম লীগে বিষম দলাদলি উপস্থিত হয়, ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একতার তরণী মাঝ দরিয়ায় পড়িয়া বানচাল হইবার উপক্রম হয়। মুসলমানরা নিজের ঘরই সামলাইতে পারিতেছেন না, হিন্দুর সহিত মিলিত হইবেন কিরূপে? সুতরাং বার্কেণহেডের সদম্ভ উক্তি বুঝি সার্থক হয়, এই আশঙ্কা অনেকের মনে জাগিয়াছিল।

এ দেশে কখনও জয়চাঁদ-মিরজাফরের অভাব হয় নাই। তাহা না হইলে খিলাফৎ আমলের ও অসহযোগ যুগের আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মত ও মিঃ জিন্নার মত দেশপ্রেমিক মুসলমান নেতা ভারতের মুক্তিসমরের এই সঙ্কটসঙ্কুল সন্ধিক্ষণে এই শ্রেণীর মিরজাফর-জয়চাঁদের পরামর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন কেন? অভাগা ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহারা নেহেরু রিপোর্টকে একবারে বাতিল করিয়া দিতে চাহিলেন। মিঃ জিন্না তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ১৪ পয়েন্টের সর্ত্ত দিলেন। ফলে এই হইল যে, কেবল মুসলমান সমাজে চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইল না, শিখ ও হিন্দু সমাজও বিচলিত হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে যে শিখ কন্‌ফারেন্স বসিল, তাহাতে কোন শিখ সদস্য প্রস্তাব করিলেন, নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করা হইবে না। এই আপত্তির মূল অবস্থা মিঃ জিন্নার আপত্তির বিপরীত। শিখদের ধারণা এই যে, নেহেরু রিপোর্ট অযথা মুসলমান-স্বার্থ রক্ষা করিয়া সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করিয়াছে। তাই তাঁহারা নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিবেন না।

ব্যাপার বুঝুন! যে রিপোর্ট মুসলমানকে অযথা অন্যায় অধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া শিখের ধারণা, সেই রিপোর্টই মুসলমান-স্বার্থের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চক্রান্ত-প্রসূত,—ইহাই মিঃ জিন্না প্রমুখ মুসলমান নেতার অভিমত।

এ দিকে সুরাটের হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাক্তার রাওজী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"হিন্দুরাই যথার্থ জাতীয়তার উপাসক। তাহারা সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। খিলাফৎ আন্দোলনকালে হিন্দুরা মুসলমানকে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়াছিল। কোন হিন্দু নেতা এ যাবৎ বলেন নাই যে, তিনি প্রথমে হিন্দু, তাহার পর ভারতীয়। কিন্তু একাধিক মুসলমান নেতা বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে মুসলমান, তাহার পর ভারতবাসী। কংগ্রেস ক্রমশঃ বর্দ্ধমান জাতীয়তার বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাবী সমর্থন করিতেছেন। হিন্দুরা যেন মুসলমানদের এই বিভীষিকা-প্রদর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাদের দাবীর সমর্থন না করেন।"

এ কথার উত্তরে মিঃ জিন্না বা মিঃ মহম্মদ আলী কি বলিতে পারেন? এ অবস্থা কাহারা আনয়ন করিয়াছে? মিঃ মহম্মদ আলী প্রকাশ্যে অনেক স্থলে বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে মুসলমান। এমন কি, তিনি সমস্ত হিন্দুকে এবং বিশেষতঃ মহাত্মা গন্ধীকে মুসলমান করিতে পারিলে সন্তোষ লাভ করেন বলিয়াছেন। যে কংগ্রেসের এক দিন তিনি প্রেসিডেণ্ট পদে বসিয়াছেন, সেই কংগ্রেসের সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিতে তিনি স্বধর্ম্মীদিগকে উপদেশ দিতেছেন। তিনি ও তাঁহার মত মুসলমান নেতারা যদি এইরূপ করেন, তবে তাহার উত্তরে হিন্দুসভা ও শিখ কন্‌ফারেন্স এমন জবাব দিবেন না কেন? তবেই হইল, ইহাতে ত মিলনের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বিরোধই বাড়িয়া যাইবে, অথবা তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের স্বরাজের স্বপ্ন স্বপ্নমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

সৌভাগ্যের বিষয়, সকল মুসলমান এই প্রকৃতির নহেন। খিলাফতের মহম্মদ আলী, বর্ত্তমানে কমরেডের মহম্মদ আলীরূপে দর্শন দিলেও ডাক্তার আন্সারী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মামুদাবাদের মহারাজা ও ডাক্তার আলামের মত দেশপ্রেমিক মুসলমান নেতারও ভারতবর্ষে অভাব নাই। তাঁহারাও বুঝেন, হিন্দু-মুসলমান-মিলন ব্যতীত ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্য পরে নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিয়াছেন। মিঃ জিন্না যখন হাকিম আজমল খাঁর গৃহে গিয়া আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে বুঝাইয়া লীগ সভায় ফিরাইয়া আনিতে যান এবং তজ্জন্য লীগের অধিবেশনে বিলম্ব ঘটান, তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার আলাম লীগের সভানেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, অধিকাংশ মুসলমান নেহেরু রিপোর্ট বাতিল করিয়া দিবার পক্ষে নহেন; তবে কেহ কেহ রিপোর্টের কোন্ কোন অংশ সংশোধন-পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে চাহেন। ইহা ত ভাল কথা।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ এ বিষয়ে সংবাদপত্রে যে

কাশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে বলিয়াছেন,—
"আবদর রহমানের উপস্থাপিত প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে পক্ষে ৪৮ এবং বিপক্ষে মাত্র ৭ ভোটে গৃহীত হয়। ইহার ফলে লীগের প্রায় অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক নেহেরু রিপোর্ট সমর্থিত হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হয়।"

তবেই বুঝা যাইতেছে, লর্ড বার্কেণহেডের সদম্ভ উক্তি সার্থক হয় নাই। অধিকাংশ ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান যে নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিতেছে, উহাই ভারতের সম্মিলিত দাবী। সেই রিপোর্ট অভ্রান্ত, এমন কথা আমরা বলি না, কেহই বলে না। উহা সংশোধন-পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া উহাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি গড়িয়া লইতে পারা যায়।

ডাক্তার আলাম বলিয়াছেন, মুসলীম লীগ সভায় কয় জন লোক লাঠী-সোটা লইয়া গোলযোগ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহারা সংখ্যায় অল্প, তাহারাই গুণ্ডামী করিয়া সভা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারা যে সংখ্যায় অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা কাহারা? মিঃ মহম্মদ আলী কোকনদ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দাবী কি প্রকারে উপস্থিত করা হয়, তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন,— To follow the fashion of British journalists during the war, there is no harm now in saying that the Deputation was a 'Command' performance. এখন যাহারা নেহেরু রিপোর্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, কংগ্রেসের সংস্রব বর্জ্জন করিতেছে, মুসলিম লীগে লাঠী-সোটা লইয়া দেখা দিতেছে, মিঃ মহম্মদ আলী বলিতে পারেন কি, তাহারাও Command performance করিতেছে কি না?

পরলোকে যতীন্দ্রমোহন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব যতীন্দ্রমোহন ২৭শে ফাল্গুন শেষরাত্রে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন কলিকাতা পুলিস-কোর্টের এক জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন। পুলিস কোর্টে কোনও ব্যবহারাজীবকে ইঁহার ন্যায় যশঃ, প্রতিপত্তি ও সম্মান অর্জ্জন করিতে দেখি নাই।

হাওড়া জেলার আমতার নিকট রামপুর গ্রামে ১২৭৮ সালে শ্রাবণ মাসে যতীন্দ্র বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বি,এল পাশ করিয়া ইনি হাইকোর্টের উকীল হইয়া পুলিস-কোর্টেই প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করেন। হাকিমগণ ইঁহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। যতীন্দ্র বাবু কিছু দিন আবগারী বিভাগের সরকারী উকীল ছিলেন। পরে যখন তাঁহাকে পুলিস-কোর্টের সরকারী উকীল করিবার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি সে পদমর্য্যাদা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন।

কলিকাতা পুলিস-কোর্ট প্রথমে ব্যারিষ্টার ও পরে এটর্ণীদিগের একচেটিয়া ব্যবসায়-কেন্দ্র ছিল। যতীন্দ্র বাবু সেই সমস্ত ব্যারিষ্টার ও এটর্ণীর প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া উকীলদিগের প্রভাব বৃদ্ধি করেন।

আইনের কূট ও জটিল তর্ক সমাধানে তাঁহার ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। আমরা অনেক সময়ে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারগণকে তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়াছি।

যতীন্দ্র বাবু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে সুখচরে গঙ্গাতীরে কালী ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আজমীরে বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বৈদ্যনাথধামে ত্রিকূট পাহাড়ে সাধুদিগের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার সরল ও মধুর স্বভাবে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। প্রথম জীবনে তিনি সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "সাধনা" নামক ধর্ম্মমূলক নাটক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার কিং লীয়রের অনুবাদ আজিও সাহিত্যসেবিগণের আদরের গ্রন্থ। ইদানীং তিনি ধর্ম্মালোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার প্রণীত "পরম গীতা" সাধকগণের উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্র ও বিধবাগণের আশ্রয়স্থল ছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ

ভারতবর্ষে এমন তীর্থস্থান নাই, যেখানে তিনি যান নাই— সুদূর নেপাল, বদরিকা হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যম পুত্র সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ কলিকাতা পুলিস-কোর্টের উকীল ও ভ্রাতুষ্পুত্র রমেন্দ্রকুমার ঘোষ হাইকোর্টের এড্ভোকেট। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য (বি, এল)।
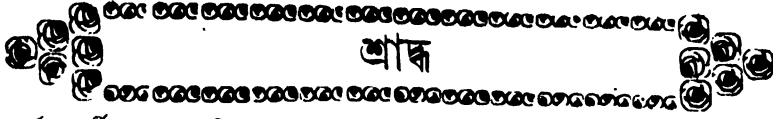
শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধ, যোগবিশেষ; বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর অবশ্যকরণীয় কর্ম্মযোগ—এই শ্রাদ্ধ; 'পাত্রান্ন' প্রসঙ্গ ইহাতেই আছে। অতএব ইহার আলোচনা করিতেছি।

য়ুরোপ ও মার্কিণে এখন মৃতাত্মা-বিষয় অনুশীলন চলিয়াছে। স্থূল জগৎ অর্থাৎ জীবিত জীবের ভোগ্য জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম জগৎ মৃত জীবের ভোগ্য-জগৎ আছে, ইহা এখন সত্য বলিয়া এতদ্দেশীয় অনেক বিচক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন, অতএব 'শিক্ষিত' সংজ্ঞাযুক্ত এতদ্দেশীয়গণ এখন উহা বিশ্বাস করিতেছেন,—শাস্ত্রকারগণের কথা হাস্যাস্পদ বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও পাশ্চাত্য মত উপেক্ষিত হইতে পারে না, অতএব সেই দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলেও শ্রাদ্ধ জিনিষটা আর কুসংস্কার-প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকে চাহিবেন না, এমন ভরসা হয়।

মৃত ব্যক্তির তৃপ্তিসাধনার্থ যে বিশেষ প্রকার বৈধ কর্ম্ম, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। মৃত ব্যক্তি অর্থে শ্রাদ্ধকর্ত্তা যাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়াছেন, তিনি।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং প্রস্তুত হইবেন, তাঁহার এই সময় অন্তঃকরণ যেন বিশুদ্ধ ও একাগ্রভাবে মৃতাত্মাকে (মৃতব্যক্তির—অন্তঃকরণ-সম্মিলিত জীবাত্মাকে) আনিতে সমর্থ হয়।

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই মৃত আত্মা শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিবেন,—তিনি পাত্রীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধতা আবশ্যক। বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যে তাঁহার উৎকর্ষ ত আবশ্যক বটেই; দোষবিশেষ দ্বারা তাঁহার সেই উৎকর্ষ কলুষিত না হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য। শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিন হইতে শ্রাদ্ধদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পালনীয় কতকগুলি নিয়ম আছে—তাহাতে সেই বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ অধিকতর সাধিত হইয়া থাকে। মনু-সংহিতা তৃতীয়াধ্যায়ে পাত্রীয় ব্রাহ্মণের গুণ-দোষের সবিশেষ আলোচনা ও উপদেশ আছে।

সেই প্রকার যোগ্য ও নির্দোষ ব্রাহ্মণ যদি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে কুশময় ব্রাহ্মণে মৃতাত্মার আনয়ন করিতে হয়। কুশময়-ব্রাহ্মণ-নির্ম্মাতার মন্ত্রশক্তি ও বিশুদ্ধতা এ স্থলে আবশ্যক। এ বিশুদ্ধতা পাত্রীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় না হউক—সদাচারপালন, বৈধকর্ম্মনির্ব্বাহ-যোগ্যতা, শাস্ত্রবিশ্বাস ইত্যাদি-রূপে যতটা হইতে পারে, ততটাই আদরণীয়। কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ, প্রায়শঃ পুরোহিতই করিয়া থাকেন, অতএব পুরোহিতের বিশুদ্ধিরক্ষা যজমানের একান্ত কর্ত্তব্য।

তিল ও কুশের সহিত মৃতাত্মার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—তিল তাঁহাদিগের প্রিয় এবং কুশজাতীয় তৃণ তাঁহাদিগের আকর্ষণে উপযোগী। মৃত ভোগ্য-জগতের সহিত এই দুই স্থূল বস্তুর আভ্যন্তরিক সম্বন্ধতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে কতিপয় বিপশ্চিৎ নিযুক্ত আছেন, অবসরমত তাহার ফল জ্ঞাপন করিব। এখন শাস্ত্রানুমত যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি।

তিল-প্রক্ষেপের মন্ত্রে দেখা যায়, 'তিলোঽসি সোমদৈবত্যঃ' চন্দ্র পিতৃযান পথের প্রকৃষ্ট দেবতা, তিলের সহিত সেই দেবতার বিশেষ সম্বন্ধ মন্ত্রে ঘোষিত হইতেছে,—অতএব চন্দ্রাশ্রিত পিতৃগণ (মৃতাত্মগণ) সেই বস্তু দ্বারা যে তৃপ্তিলাভ করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। এক জন এদেশী বাঙ্গালী উত্তর-পশ্চিমে গিয়া ডাব-নারিকেল পাইলে যেমন তৃপ্তিলাভ করে—স্থূলজগতে আগত মৃতাত্মার পক্ষে সোমদৈবত্য তিল দ্বারা সেইরূপ তৃপ্তিলাভ হয়।

কুশের শক্তি অপূর্ব্ব, কুশভূমির কুশের উচ্ছেদসাধন অতীব দুঃসাধ্য, যে শক্তিপ্রভাবে এই দীর্ঘজীবন সংঘটিত, তাহা তৈজসশক্তি, দেবতাগণের মনুষ্যাপেক্ষা দীর্ঘজীবন যে শক্তি-প্রভাবে হয়, সেই জাতীয় শক্তি; তাহা সত্ত্বপ্রধান, কুশ-তৃণে এই সত্ত্বগুণের যে আধিক্য, তদ্বিষয় দেবতার আসনে 'বার্হিষি মাদয়ধ্বং' ও 'এদং বর্হিঃ' আজ্যশোধনে 'পবিত্রেণেবাজ্যম্' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রও প্রমাণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সত্ত্বপ্রধান তৃণে পিতৃজীবের আকর্ষণ সঙ্গত।

হলায়ুধ শূলপাণি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নিবন্ধধৃত স্মৃতি-বচনে কুশময় ব্রাহ্মণের কথা উক্ত হইয়াছে।

> "নিধায়াথ দর্ভচয়ম্ আসনেষু সমাহিতঃ।
> প্রৈষানুপ্রৈষসংযুক্তং বিধানং প্রতিপদায়েৎ।
> ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্।
> শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্ বিপ্রেষু দাপায়েৎ॥"

যোগ্য নির্দোষ ব্রাহ্মণে মৃতাত্মার আকর্ষণে যে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হইত, তাহাতে শ্রাদ্ধকর্ত্তার যতটা একাগ্রতা প্রয়োজন ছিল, এখন তদপেক্ষা অধিক একাগ্রতা আবশ্যক; সঙ্কল্পের দৃঢ়তাও ততোঽধিক আবশ্যক; কারণ, পাত্রীয় ব্রাহ্মণের সহায়তা তখন যে পরিমাণ মিলিত, কুশময় ব্রাহ্মণে সে পরিমাণ সহায়তালাভ অসম্ভব।

অন্ততঃ ৫ শত বৎসর এই বাঙ্গালায় কুশময় ব্রাহ্মণেই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ মৃতব্যক্তির নামে উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতেন, তখন 'পাত্রান্ন' সম্বন্ধে 'উত্তরা প্রতিপত্তি' অর্থাৎ পরে কোথায় তাহা অর্পণীয়, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইত না।

কিন্তু কুশময় ব্রাহ্মণস্থলে পাত্রান্নের 'উত্তরা প্রতিপত্তি' চিন্তনীয়, তৎসম্বন্ধে বিধি, যথা; - শ্রাদ্ধতত্ত্বে—

"দর্ভময়ব্রাহ্মণমাদায় শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ব্রাহ্মণায় প্রতিপাদয়েৎ, তদভাবেঽগ্নৌ জলে বা ক্ষিপেৎ।" দানকাণ্ড কল্পতরুধৃতনারদবচনম্—"ব্রাহ্মণস্য চ যদ্দেয়মিত্যুপক্রম্য—দদ্যাৎ সজাতিশিষ্টেভ্যস্তদভাবেঽপ্সু নিক্ষিপেৎ।"

অত্র 'সজাতিশিষ্যেভ্যঃ' ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

উক্ত বিধি পালনার্থ, শ্রাদ্ধান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণের পূর্ব্বে গঙ্গাতীরবাসী শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পাত্ররক্ষিত গঙ্গাজলে পূজা করিয়া

"ইদং পাত্রীয়ান্নং গঙ্গাম্ভসি সমর্পিতং পিণ্ডমপি" ইহা বলিয়া পুষ্পিত গঙ্গাজলে কিয়দংশ পাত্রান্ন ও পিণ্ডাংশ প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে 'উত্তরা প্রতিপত্তি' বিধি প্রতিপালিত হইবার পর অবশিষ্ট 'পাত্রান্ন' প্রদান যদি অযোগ্য পাত্রেও হয়, তাহাতে শ্রাদ্ধের কোন ক্ষতি হয় না, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তারও প্রত্যবায় হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ অদ্বৈতাচার্য্য সেইরূপ পাত্রান্ন হরিদাস ঠাকুরকে প্রদান করায় ভক্তগণের নাম-মাহাত্ম্যে ভক্তির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইল, এই যে গূঢ় রহস্য, ইহা কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য, লোকোপকারার্থই কখন প্রকাশ করেন নাই।

শ্রাদ্ধে যে এমন একটা ব্যাপার আছে, তাহা যাহারা জানে না, তাহারাই অদ্বৈতাচার্য্য যবন-বৈষ্ণবকেও পাত্রান্ন দিয়াছিলেন বলিয়া লাফালাফি করে।

আর একটি সাধারণ কথা এই যে, হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা বৈষ্ণবগ্রন্থসম্মত।

তিনি বেদপ্রামাণ্য বিশ্বাসী এবং অনন্যসাধারণ নিষ্ঠাসহ হরিনামকীর্ত্তন দ্বারা যবনসংসর্গজ পাতক হইতে তিনি যখন বিমুক্ত, তখন 'সজাতিশিষ্ট'রূপে পাত্রান্নের উত্তরা প্রতিপত্তি তাঁহাতেও হইতে পারে। সজাতিশিষ্য এই পাঠ হইলেও অসঙ্গতি নাই, কারণ, হরিদাস যে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

> অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান।
> গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।
> ভাগবত-গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল॥
> অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।

যে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমরণ সেই জাতি তাহার থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন পাপে অথবা প্রায়শ্চিত্ত বা শুদ্ধি দ্বারা হয় না, কিন্তু ইহকালকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়। ভক্তিযুক্তের গঙ্গাস্নান ও অনন্যপরায়ণ সাধকের হরিনামও প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত হরিদাস এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ, অতএব 'পতিতাস্ত্যজাদিভিন্নত্বে সতি বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃত্বং শিষ্টত্বং' এই যে শিষ্ট লক্ষণ, তাহা হরিদাস ঠাকুরে থাকায় তিনি 'পাত্রান্ন' প্রতিপত্তির অধিকারী।

নিষ্পাপ হইলেও তাঁহার শরীরকে তিনি স্মৃতিবচনানুসারে 'অব্যবহার্য্য' বলিয়া জানিতেন। সেই জন্য চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে,'পুরীর শ্রীমন্দিরে তিনি কখন প্রবেশ করেন নাই।'

> "হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
> জগন্নাথ-মন্দিরে না হি যায় তিন জন॥"
> চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

হরিদাসকে পাত্রান্ন প্রদান করায় যে সকল জাতিই বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে,এই কল্পিত মত সমর্থিত হয় না।

পাত্রান্নপ্রসঙ্গ এইখানেই সমাপ্ত, অতঃপর প্রকৃতমনুসরামঃ। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয় অন্নদানের পর যে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা, তাহা শ্রাদ্ধকর্ত্তার সঙ্কল্পময় মৃত জীবের তৃপ্তির জন্য,—অন্নদান শ্রাদ্ধের প্রধান কর্ম্ম, পিণ্ডদান উদীচ্য (পরবর্ত্তী) অঙ্গ; স্থূলকে আশ্রয় করিয়া যোগের যেমন প্রথম প্রকৃতি, সূক্ষ্ম তাহার পরিণতি, সেইরূপ শ্রাদ্ধযোগেও—স্থূলালম্বনে, ব্রাহ্মণ বা কুশময় ব্রাহ্মণে প্রথম কার্য্য, তাহাতে চিত্ত সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি হইল, সঙ্কল্পময় সূক্ষ্ম আলম্বনে সেই মৃতোদ্দেশে পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধকর্ত্তার উচ্চাঙ্গের যোগসাধন।

শ্রাদ্ধ, যোগবিশেষ বলিয়াই শ্রাদ্ধের আদি, অন্ত ও মধ্যে তিনবার করিয়া 'মহাযোগিভ্য এব চ' প্রণাম করিতে হয়। 'যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং' ইত্যাদি মন্ত্রও স্মার্ত্তমতানুসারে পঠিত হইয়া থাকে। ইহাই শ্রাদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)।

দোলযাত্রা

ফাগুন আগুন—পিক কুহু গায়।
কুঞ্জে গুঞ্জে অলি সম্ভাষে ফুলকলি, মধুরে সুরভি বিলায়॥
বসন্ত-উৎসব আবির রঙ্গে,
টলটল নিধুবন প্রেম-তরঙ্গে,—
নবীন বিপিনরাজি আমোদে আবিরে সাজি
হেলিছে দুলিছে মৃদু বায়॥
আবির-রঞ্জিত নীল তমাল দোলে,
সঙ্গীত তর তর মাধুরী হিল্লোলে,
ফাগ-রাগ মাখি হরষে বরষে পাখী স্বরসুধা লহরী-লীলায়॥
মোদিনী যমুনা আবির রঙ্গে
হেলাদোলা তরঙ্গ-ভঙ্গে,
আমোদে আপনহারা ব্রজগোপী মাতুয়ারা হোরিমত্ত খেলায়॥

আকুল কুন্তল, আলুথালু অঞ্চল,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে অনঙ্গ চঞ্চল,
সোহাগ-রাগমাখা বদন ফাগ-ঢাকা বিকশিত মাধুরীমালায়॥
আমোদে কুসুম দোলে মেদিনী টলমল,
লালে লাল ধরা শ্যামল অঞ্চল,
লালে লাল প্যারী, লাল বনোয়ারী
দোলত কুসুম-দোলায়॥
আবির সনে দোলে পবনে কমল-রেণু,
দোলে বোলে নবরাগে মোহন-বেণু,
গগন গহনকোলে মুরলীতান দোলে
দোলে যুগল কালা কানু॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু